ষোড়শ বর্ষ

আষাঢ়

প্রথম সংখ্যা

১৩৬৭

গল্প-ভারতী

সম্পাদকীয়

আমাদের নববর্ষ

"প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে
পুত্র, মিত্রবদাচরেৎ"।

'গল্প-ভারতী' ষোড়শরূপে সাবালিকা হয়ে উঠলেন। গত ১৫ বছর ধরে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এই পত্রিকা যেভাবে সেবা করেছে সাহিত্যরসিক জনসাধারণ তা বুঝেছেন। এই নূতন বর্ষ থেকে আমরা আরও নূতন পরিকল্পনার সাহায্যে গল্প-ভারতীকে নূতন ভাবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করব। আমাদের এই শুভ প্রচেষ্টায় গল্প-ভারতীর লেখক, পাঠক, হিতার্থীদের ও বিজ্ঞাপনদাতাদের সাদর সহযোগিতা কামনা করছি। আজকের দিনে সাহিত্য পত্রিকার ক্রমবর্ধমান গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করে আশাকরি সবাই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ

রামমোহন (১৭৭২—১৮৩৩) যখন ঘুরা ও কলকাতায় আসাযাওয়া করছেন, তখন—অর্থাৎ ১৮ শতকের শেষদশকে—সাহেবরা বাংলা যাত্রা গান শুনতেন, তাযাও কিছু বুঝতেন। তখন রুশ সাহিত্যিক Heresim Lebedeff গোলোক দাসের সাহায্যে দুখানি ইংরেজী প্রহসন বাঙালী নট-নটীর দ্বারা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করান: The Disguise এবং Love is the Best Doctor (ফরাসী Moliere রচিত Amour Medium স্মরণ করায়)। বাংলা কবিতার মধ্যে ১৭৯৪—৯৬ সালে তিনি, ভাল গান খুঁজে না পেয়ে লুকে নেন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে। তার কিছু দিনের মধ্যে দেখেছি Fort William College (১৮০০) প্রতিষ্ঠা ও Rev. Carey (১৭৬১-১৮৩০) রচিত রামায়ণ, বাঙালী গ্রামাবেরেদের "কথোপকথন" ও বাংলায় বাইবেল অনুবাদ

(রামমোহনের হাত ছিল)। এসব মনে পড়ছে কারণ বাংলা ভাষার সাধক Carey সাহেবের জন্মদ্বিশতাব্দী (Bicentinary) আগতপ্রায়। সহজর সাহেব ও হিন্দু-ব্রাহ্ম-খৃষ্টান সবাই মিলে বাংলা সাহিত্যের প্রসার কিভাবে তাঁরা করে গেছেন সেটি আজ স্মরণ করাতে চাই। ১৮১০-২০ সালের মধ্যে দেখি জন্মেছেন ঈশ্বর গুপ্ত ও প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে পাদ্রী), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭) ও ঈশ্বরচন্দ্র (১৮২০-১৮৯১)। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে এঁদের দান চিরস্মরণীয়।

কিন্তু "গৌড়ীয় ব্যাকরণ" রূপ বীজ থেকে বাংলা সাহিত্য মহীরুহ কেমন করে বেড়ে উঠল তার সন্ধান করলে প্রথমে দেখতে পাব, দুটি খাঁটি কবিকে : হিন্দু কলেজের বিতাড়িত কবি-দার্শনিক ডিরোজিও (১৮১১-৩১) ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)। প্রথমটি জাত খৃষ্টান ও সব রচনা তাঁর ইংরেজীতে ; অথচ বাংলা বিহারের মিষ্ট প্রকৃতির ও স্বাদেশিক কবিতার প্রথম উন্মেষ Derozio-র রচনায় পেয়েছি। তাই ঈশ্বর গুপ্তের মত লহরী তাঁকে সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করেছেন।

তার পরে পাই গদ্যে ও পদ্যে দুজনের রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১) ও মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) ; ১৮৫১ সালে মনীষী রাজেন্দ্রলাল যখন তাঁর শ্রেষ্ঠ পত্রিকা "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" প্রকাশ করেন, তখন ১৮৫১ সালেই সরকারী উদ্যোগে বঙ্গ-ভাষানুবাদ-সমাজ (Vernacular Literature Society) কত মূল্যবান বিদেশী গ্রন্থ অনুবাদ করেন, তার কিছু সন্ধান পাই Rev. Long's, Catalogue of Bengali Books and Periodicals পড়ে।

কিন্তু শুধু অনুবাদ সম্বল না হয়ে, সৃজন-শিল্পীরা (creative artist) এ সময়ে দেখা দিলেন বলেই সকল ভাষার মধ্যে বাংলা আজ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম ভাষা হয়েছে। তাঁদের আধ্যাত্মিক অগ্রজ অমরকবি মধুসূদনকে আজ বিশেষভাবে স্মরণ করি। যশোহরের কপোতাক্ষী নদী থেকে বাংলার কাশীরাম, কৃত্তিবাস সবাইকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসে কাব্যবন্দনা রেখে গেছেন। আবার 'তিলোত্তমা-সম্ভব' ও 'মেঘনাদ বধ' রচনায় পয়ারের নিগড় ভেঙে, অমিত্রাক্ষর ছন্দকে শুধু সম্ভব নয় সার্থক করে তিনি অমর হয়ে ছিলেন। অথচ প্রথম ৩০ বছর ধর্মান্তরিত মাইকেল প্রাণে খৃষ্টান না হলেও কাজে ছিলেন পুরো ইঙ্গ-বঙ্গীয় কবি ও Captive Lady রচয়িতা। আত্মীয়বন্ধুবর্জিত মাইকেল, প্রায় দশ বছর মাদ্রাজ প্রবাসে কত কষ্টে সপরিবারে গ্রাসাচ্ছাদন সমস্যা মেটান ও অতি সঙ্কীর্ণ অবসরেও মাইকেল যেখুন সাহেব প্রশংসিত Captive Lady ছাড়া গদ্যে পদ্যে আরো কতো রচনা Madras Circular প্রভৃতি মাদ্রাজী পত্রিকায় ছাপেন—কেউ এখনো তাঁর পূর্ণ সন্ধান করেননি। কলকাতা ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকীতে মাইকেল Research বৃত্তি দেওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু তাঁরা একর্তব্য মনে রাখেননি। ভবিষ্যতে বহু অজ্ঞাত নূতন তথ্য আশা করি মাদ্রাজ থেকে বেরবে।

দুর্দিনের বন্ধু গৌরদাস বসাক নিজে মাদ্রাজে গিয়ে যখন মাইকেলকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনলেন তখন সাহিত্য ও সঙ্গীতাদির কেন্দ্র কলকাতায় ছিল তিনটি : শোভাবাজারে (রাধাকান্ত দেবের) রাজবাটী, সেখানে মধুসূদন অভিনয় করান "একেই কি বলে সভ্যতা ?" জোড়াসাঁকোর "মহর্ষি ভবনে" হয়েছিল তাঁর "কৃষ্ণ কুমারী"র অভিনয় ও পাইকপাড়ার সিংহ-ভবনে তাঁর "শর্মিষ্ঠা"। সে স্থানগুলি নিজে দেখেছি ও দুঃখ পেয়েছি, কারণ কোন স্মৃতি-ফলক আজও সেখানে বসান হয়নি। অথচ জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রথম পরিকল্পনা মধুসূদনের। তাঁর "মেঘনাদ বধ" মহাকাব্য হলেও নাট্যাকারে কত কাল বাংলার নরনারীদের প্রেরণা ও আনন্দ দিয়েছে, সেটি বহুবাজার অক্রূর দত্তের বাড়ী সাবিত্রী লাইব্রেরীতে দেখেছি (এখানে বঙ্কিম ও

দ্বিজেন্দ্র, রবীন্দ্র প্রবন্ধ পড়েছেন) মধুসূদনের বিডিরপুরের বাড়ী জাতীয় সম্পদ রূপে গণ্য হওয়া উচিত, একথা আমি ও বন্ধুবর শিশির ভাদুড়ী, মধুসূদন স্মৃতি সভায় বলেছিলাম। কাব্য নাট্যরসিকদের এই অবিস্মরণীয় পরিশোধে এগিয়ে আসা উচিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মধুসূদনের অনুরাগী ছিলেন ও তাঁর পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়ে মাইকেল বিলাতযাত্রা করেন (১৮৬১) [কবিতা]।

Bishops College তখন কলকাতায় নয় শিবপুরে ছিল। সেখানে আধুনিক Sibpur D. E. Collegeএর পত্তনকারিকী সভার স্মরণ করাই যে New Convert খৃষ্টান মাইকেলকে সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সেই Bishops Collegeএই তিনি সংস্কৃত, লাটিন, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি শিখে—রামমোহনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, তাঁর দীক্ষা গুরু Rev. কৃষ্ণ বন্দ্যো encyclopaedia Bengalensis বঙ্গীয় বিশ্বকোষ রচনার প্রথম প্রচেষ্টা করেন ও মূল গ্রীক Homer মহাকাব্যের কিছু সংস্কৃতে অনুবাদ শুরু করেন। তাঁর ও তৎশিষ্য মাইকেলের এই বৈদগ্ধ মনীষার কথা আলোচনা করার লোক আজ নেই। পরে হয়ত অসম্ভব হবে, তাই বাংলা ভাষাকে তাঁরা নানা ভাষার রত্ন অলঙ্কার পরিয়ে "ভুবন মনোমোহিনী" সাজিয়ে ছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তর-সাধকরূপে মধুসূদনকে অর্ঘ্য দিয়ে গেছেন ও পরে অনুতাপ করেছেন যে ভারতী পত্রিকায় কৈশোরের কাঁচা সমালোচনা লিখে 'মেঘনাদ বধ' কাব্যটির তিনি অমর্যাদা করেছিলেন।

—"একদিন যখন বারান্দার রেলিং ধরে একলা চুপ করে বসেছিলুম, পাশ দিয়ে যেতে যেতে বড়দা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) আমার মাথা নাড়া দিয়ে বললেন, রবি হবে কিলজমার। চুপ করে থাকার ক্ষেতে কিলজমি ছাড়াও অন্য ফসল ফলে।

ক্ষেতে প্রথম দেখা দিল কাঁটাগাছ, চাষ না করা জমিতে বিশ্বকে খোঁচা মেরে আপন অস্তিত্ব প্রমাণ করবার এই ঔদ্ধত্য।

হরিণ বালকের প্রথম শিং উঠলে তার যে চাল হয় সেই উগ্র চাল প্রথম কৈশোরের বালক আপন বাল্যসীমা পেরোবার সময় সীমা লঙ্ঘন করতে চায় লাফ দিয়ে। তার পরিচয় সুরু হয়েছিল "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সমালোচনা যখন লিখেছিলেম পনেরো বছর বয়সে (১৮৭৬)……এই সময়েই যাত্রা করছি বিলেতে" (১৮৭৬) —রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের আদি নাট্যযুগের 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি মনদিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে যে তাদের মধ্যে মধুসূদনের ভাষা ও ছন্দগত (ভাবগত নয়) প্রভাব কী গভীর। অপূর্ব গদ্য রচনা পঞ্চভূতে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই মনীষী অগ্রজ মধুসূদন ও বঙ্কিমকে যেন স্মরণ করে, 'গদ্য ও পদ্য' লিখেছেন, আবার কালিদাস ভবভূতি ও জয়দেবকে মনে করে যেন লিখে গেছেন অপূর্ব কবিতা "ভাষা ও ছন্দ"—১৮৯৭ তাঁর প্রথম রচনা সংগ্রহ ছাপার যুগে। শুধু ভাষা ও ছন্দের গঠন ও ভাঙ্গানই নয়; ভাব প্রেরণা ও বক্তারে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা ঋদ্ধিকা নৈবেদ্যের ভিতর দিয়ে ১৯ শতকের বাংলাসাহিত্যকে গীতাঞ্জলী (১৯১০-১৩) ও Noble Prize যুগে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গীভূত ও জ্যোতির্ময় করেছেন। প্রাচীন ও নবীনের "জোড়াসাঁকো" আমাদের মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি আজ বিশেষভাবে স্মরণ করাতে চাই। সেই সঙ্গে বেদনামথিত চিত্তে স্মরণ করি, চিৎপুর রোডের এক কোণে ৬নং চিৎপুর রোড (লালবাজারে) মাইকেল লেখেন "মেঘনাদ বধ" ও আর এক কোণে চিৎপুরের আর একদিকে ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন ২২শে শ্রাবণে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ও পরে বিরাট শোভাযাত্রা ; বালক, বৃদ্ধ, শিশু নিয়ে অগণ্য নরনারী চলেছে জননী জাহ্নবীর তটে।

এমনি বর্ষার ঘনান্ধকারে, বাঙালী আমরা হারিয়েছি মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথকে। তাঁদের দুজনকেই আজ মনে পড়ছে, নীরব স্মরনে :

"দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের ধরজায়
বন্ধুর পথ সেই খামল।" (গীতালি)

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

সম্প্রতি একুশ বছর পরে মেদিনীপুরে বৈষ্ণবচকে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন "এটি যেন সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং বাংলাসাহিত্যের প্রসার ও উন্নতি হয় এবং পরিভাষা সৃষ্টির দ্বারা বাংলাভাষার বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপযোগী হয়—আমি ইহাই আন্তরিকভাবে কামনা করি।" বাংলা-ভাষা-ভাষী প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তিই এই ব্যাপারে ডাঃ রায়ের সঙ্গে একমত হবেন বলে আমরা আশা করি। গল্প-ভারতী এই ব্যাপারে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ৭৯তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে তাঁকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিজ্ঞানে বাঙালী শীর্ষস্থান অধিকার করে পৃথিবীকে হয়েছেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শতাব্দী উৎসব তার সাক্ষ্য দেয়। তাঁদের শিষ্য ও প্রশিষ্যরা ভারতের বহু শিক্ষায়তন আলোকিত করছেন। প্রাণাচার্য ডাঃ নীলরতন সরকারের জন্মশতাব্দী ১৯৬১ সালেই হবে সে কথাও আজ স্মরণ করাই। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শেষ চিকিৎসার সময়ে পার্শ্বে ছিলেন ডাঃ নীলরতন সরকার। আশা করি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এ ব্যাপারে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিকাশ হয়েছে, আরো হবে এবং এই বিষয়ে সব সংবাদ সংগ্রহ করে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ অভিধানাকারে প্রকাশ করা দরকার।

বন্ধুবর অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে এ ক্ষেত্রে অগ্রণী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

সুখ

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

একটি মানুষকে সুখী করা কি সোজা কাজ! আমি তো মনে করি এর চেয়ে একটা সাম্রাজ্য জয় করা সহজ।

কিশোর বয়সে আমার বিশ্বাস ছিল সবাইকে সুখী করতে পারা যায়। আমি যদি না পারি সেটা আমারি দোষ। বার বার ঠেকে দেখলুম সবাইকে সুখী করা আর যারি সাধ্য হোক আমার তো অসাধ্য। একে একে আর সকলের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে একজনকেই সুখী করার সাধনায় নিমগ্ন হলুম।

পারলুম কি সেই একজনকেও সুখী করতে! ব্যর্থতা বহন করে যখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসি তখন আমার বয়স বিশের কোটার শেষ সীমানায়। কাউকেই আমি সুখী করতে পারব না। সে বিশ্বাসই আমার নেই।

তা হলে কি আমি আপনাকে সুখী করতে চাইব? না, সেটাও আমার স্বভাব নয়। তাতে আমার আত্মাভিমানে বাধে। আমাকে সুখী করবে আর সকলে। কেউ যদি না করে কাউকেই আমি সাধতে যাব না। কারো উপর রাগও করব না। অপেক্ষা করব; করতে করতে একদিন মরে যাব।

আমি জানি যে, এ জগৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি আমার মতো নগণ্য প্রাণীকে সুখী করার জন্যে এত বড় বিশ্বব্যাপার ফেঁদে বসেননি। তাঁর অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। তাই কোনো দিন তাঁকে ভুলেও প্রার্থনা করিনি যে, প্রভু, আমাকে সুখী কর।

প্রার্থনা যখন করেছি তখন এই বলে করেছি যে, প্রভু, আমাকে সৃষ্টিক্ষম কর, সৃষ্টিতৎপর কর। আমার সামান্য একটুখানি সীমার মধ্যে আমিও যেন তোমারি মতো স্রষ্টা হতে পারি। তেমনি নিন্দাপ্রশংসার ঊর্ধ্বে। তেমনি ক্রয়বিক্রয়ের অতীত।

আমি আরো জানি যে, দুটো বর বিধাতা কাউকে দেন না। দিলে একটাই দেন। সেইজন্যে ওই একটাই বর প্রার্থনা করেছি। তার উপর যদি বলতুম, হে প্রভু, আমাকে সুখী কর, তা হলে পর পর দুটো বর চাওয়া হতো। বরাবর এমন ভয়ও ছিল যে সুখ বর দিলে তিনি হয়তো সৃষ্টি বর দিতেন না। কিংবা দিয়ে কেড়ে নিতেন। সুখ নিয়ে আমি করতুম কী যদি সৃষ্টি করতে না পারলুম! সুখ যদি আপনা থেকে আসে তা হলে বেশ। যদি আপনা থেকে না আসে তা হলেও বেশ। এলে মাথা পেতে নেব। না এলে হাত পাততে যাব না। বিধাতার কাছেও না।

আমি যে সৃষ্টি বর পেয়েছি এ আমার একমাত্র প্রার্থনার উত্তর।

তুমি সাহিত্যিক, তোমার অভিজ্ঞতা কী রকম, জানিনে। আমি চিত্রকর, আমার অভিজ্ঞতা যদি জানতে চাও তো বলি, সৃষ্টির পক্ষে হতাশ প্রণয়ের মতো আর কিছু নয়। দেশে ফিরে এসে দিনরাত ছবি আঁকি সর্বগ্রাসী বেদনাকে ভুলতে ও ভাঙতে। ভূতের মতো খাটি সিদ্ধীহিসাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে ও জনজনের একজন হতে। সুখের কল্পনা একদিনের জন্যেও মনে উদয় হয়নি। তা সত্ত্বেও সুখ মাঝে মাঝে

পথ ভুলে এসেছে। বড় কিছু নয়। ছোটখাটো সুখ। দু'হাত ঘোড় করে নিয়েছি। কিন্তু একবারও ভুলিনি যে আমাকে সৃষ্টি করে যেতে হবে কী শীত কী গ্রীষ্ম কী বর্ষা কী শরৎ।

কত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘটল। একদিন লক্ষ্য করি আর্ট একজিবিশনে আমার আঁকা ছবি একদৃষ্টে ধ্যান করছেন বছর পঞ্চাশ বয়সের এক বাঙালী ভদ্রলোক। তাঁর অদূরে এক বাঙালী মহিলা। মহিলার মনোযোগ অন্য একজনের অঙ্কনের উপর ন্যস্ত। এঁদের আমি আগে কোথাও দেখিনি। কৌতূহল জাগল। কারা এঁরা? নজরবন্দী করলুম এঁদের। ভদ্রলোক ছবির দাম দেখতে দু'পা এগিয়ে গেলেন। তার পর মহিলার সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করলেন। তার পর আপিসে গিয়ে খবর দিলেন যে কিনতে চান।

আমি তাঁর ও তাঁর গৃহিণীর অনুসরণ করছিলুম। আপিসে যাঁদের ডিউটি তাঁদের একজন বললেন, "ওই যে, স্বয়ং আর্টিস্ট আপনাদের পিছনে দাঁড়িয়ে।"

তাঁরা খুশি হলেন তাঁরা আমাকে দেখে। আর আমিও তাঁদের অনুগ্রহ দেখে। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডকটর ও মিসেস দস্তিদার। দু'জনেই অনুরোধ করলেন আমি যেন একদিন ওঁদের ওখানে আসি। ভদ্রমহিলা বললেন, "আমরা বুধবার সন্ধ্যায় রিসিভ করি।"

আমি বললুম, "আচ্ছা, আমি কোনো এক বুধবার সন্ধ্যায় সন্ধানে যাইব।" জানতে চাইলুম তাঁদের বাড়ীর ঠিকানা, তাঁদের সঙ্গে চলতে চলতে।

ভদ্রলোক একটা বিখ্যাত রাস্তার নাম করে বললেন, "চোদ্দ নম্বর। মনে থাকবে তো? চোদ্দ পুরুষ। চোদ্দ ভুবন। শিবচতুর্দশী। চতুর্দশপদী কবিতা।"

আমি হেসে বললুম, "এক কথায় মনে রাখতে হলে—সনেট।"

এই বলে তাঁদের তুলে দিলুম তাঁদের মোটরে। তাঁরা বার বার করে বলতে থাকলেন, "আসবেন কিন্তু? আসবেন।"

এর পর ছবিখানার তলায় কাগজ এঁটে লিখে দেওয়া হলো "বিক্রী হয়ে গেছে।"

রাস্তার নাম ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। নম্বরও আমার মনে ছিল। কিন্তু বুধবার না গিয়ে আমি বৃহস্পতিবার যাই। বার ভ্রম।

বাড়ী নয়। ফ্ল্যাট। কলিং বেল টিপতেই সাড়া দিল একটি বর্ষী মেয়ে। কার্ড পাঠিয়ে দিলুম ভিতরে। দাঁড়াতে হলো না। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে ধরে নিয়ে গেলেন কর্তা স্বয়ং। যেন কতকালের পরিচয়।

"কাল আমরা আপনাকে অনেকক্ষণ প্রত্যাশা করেছিলুম। এলেন না দেখে ধরে নিলুম যে এ সপ্তাহে আপনার সময় হলো না, পরের সপ্তাহে আসবেন! তার পর? ঠিক নম্বর খুঁজে পেয়েছিলেন তো!"

"হাঁ, সার। সনেট আওড়াতে আওড়াতেই এসেছি। কিন্তু বারটা যে বৃহস্পতি নয় বুধ তা তো খেয়াল করিনি। ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। অদিনে এসে আপনাদের জ্বালাতন করছি। দেখুন, আজ বরং আমি ফিরে যাই। বুধবার আসব ঠিক।"

"আরে না, না। তা কি হয়! আর্টিস্টরা ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঘেঁটে বাছা বাছা ভুলগুলিই নিয়েছে। আমাদের জন্যে—বৈজ্ঞানিকদের জন্যে—কিছু রাখেনি। ওঁরা খেতে বসেছেন। আসুন, আপনাকে খাবার ঘরে নিয়ে যাই।"

ভেবেছিলুম সৌরবে বহুবচন। তা নয়। খাবার টেবলে আরো একজন ছিলেন। ধন্তিদার হল্পতীর একমাত্র কন্যা—একমাত্র সন্তান।

মালাকে তুমি তার ষোল বছর বয়সে দেখনি। আমি দেখেছি। আমার পরম সৌভাগ্য! ও বয়সে ও যা ছিল তা অবর্ণনীয়। আমি তো সাহিত্যিক নই। তাহার বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়। তুমি দিয়ে করতে পারতুম হয়তো। সে রকম একটা প্রস্তাবও ওঁদের দিক থেকে এসেছিল কিছুদিন পরে। রাজী হইনি কেন, জানো?

আচ্ছা, বলছি। তার আগে যদি সেদিন খাবার ঘরে কী হলো। ওঁরা আমাকে জোর করে টেবিলে বসিয়ে দিলেন। মালার মুখোমুখি। খাব না, খাব না করে খেলুম সবই। বরং অপরের চেয়ে বেশী করেই খেলুম। ছবি আঁকার সময় ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। তারপর এমন খিদে পায় যে ভদ্র ও ভদ্রাদের সঙ্গে বসে অভদ্রের মতো গিলি। ভাগ্যিস্ ওঁরা পান করেন না। পানীয় সামনে রাখেননি। নইলে সেদিন আমার উপর ওঁদের বেয়া ধরে যেত।

ডক্টর ধন্তিদার বৈজ্ঞানিক হলেও সেকালের ঋষিদের মতো গভীর দৃষ্টিমান। কিছুক্ষণ একসঙ্গে কাটালেই বোঝা যায় ইনি প্রাচীন ভারতের কণ্বমুনি আর এঁর কন্যাটি আশ্রমকন্যা শকুন্তলা।

মালা না হয়ে ওর নাম হওয়া উচিত ছিল মিরান্দা। সরলতার, নিরীহতার নিখুঁৎ প্রতিমূর্তি। আজন্ম বর্মার মানুষ। এই এক বছর আগে কলকাতা এসেছে। প্রধানত ওর জন্যেই বোধ হয় মা বাবাকে বর্মা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। নইলে আরো বছর দশেক চাকরি করতে পারতেন ধন্তিদার। অসময়ে পেনসন নিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে কি তাঁর সাহস হতো? কিন্তু মালার মা পাঁচ বছর ধরে তাগিদ দিচ্ছিলেন যে তাঁকে তাঁর তপোবন ছেড়ে লোকালয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করতে হবে।

উদ্যানবেষ্টিত তপোবনের মতো ভবন। হরিণ চরে বেড়ায়। লোকলস্কর পশুপাখীতে জমজমাট। প্রকৃতির কোলে লালিত হয় তাঁর মালা। তাঁর শকুন্তলা বা মিরান্দা। প্রকৃতির কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে নেবার কথা ভাবতে কি তাঁর মন চায়? থাকুক না আরো কয়েক বছর। কী এমন বয়স হয়েছে! কিন্তু জননী নিষ্ঠুর। মেয়ের বিয়ে দিতে হলে আগে থেকে সেই ভাবে তৈরি করতে হবে। রেঙ্গুনে রেখে সে ভাবে তৈরী করা যায় না। "হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে" বলে নাকি একটা গান আছে। সেটা গাইতে শেখা চাই। "নৃত্যের তালে তালে" নাচতে শেখা চাই। নইলে ভালো বিয়ে হয় না। আর ভালো বিয়ে না হলে মেয়েমানুষের জীবন মাটি। বাপ মা তো চিরদিন বাঁচবে না। তখন ও মেয়ের কপালে দুঃখ আছে। যদি না—

সেদিন অতটা আঁচ করিনি। পরে একটু একটু করে বুঝতে পেরেছিলুম যে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে মা বাবার দু'জনের দু'রকম পরিকল্পনা ছিল। বাপ পনেরো বছর নিজের ইচ্ছা খাটিয়েছেন, আর পারেননি, হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এখন মায়ের ইচ্ছা খাটছে। রেঙ্গুনের সঙ্গে ধন্তিদারের সম্পর্ক পঁচিশ বছরের। সেখানে তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। সকলেই তাঁর নাম জানে, তাঁকে ভক্তি করে। কলকাতায় তিনি কে? অত বড় বাড়ী তাঁকে দেবে কে? বাগান তাঁকে দেবে কে? কারফেগে মাথা গুঁজে পড়ে আছেন এলগিন রোড অঞ্চলের একখানা ফ্ল্যাটে। আসবাবপত্র জলের দরে বিক্রী করে দিয়ে এসেছেন। সঙ্গে এনেছেন ওই মোটরটি আর ওই বর্মী আয়িভাটি। মালার বালাসখী। বাড়ীর কাজকর্মে সাহায্য করে।

"জীবনকে নতুন করে আরম্ভ করতে হবে। এই ভেবে ভেবে জীবন গেল আমার।" বসবার ঘরে আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে মৃদু স্বরে বললেন ডক্টর দস্তিদার।

আমার দৃষ্টি তখন মালার অনুসরণ করছে। সারা ইউরোপে এ রকম মেয়ে আমি একটিই দেখেছি। এক হাঙ্গেরিয়ান আর্টিস্টের কন্যা। যেন এ জগতের নয়। মাটি দিয়ে নয়, আকাশ দিয়ে গড়া। আর একটি দেখলুম এত দিন পরে আমার স্বদেশে। এদের আঁকা খুবই কঠিন। বিশেষত আমাদের মতো আধুনিক শিল্পীদের পক্ষে। আমরা শরীরের অ্যানাটোমি শিখি। তাই যথেষ্ট নয়। মডেল সামনে রেখে বার বার দেখি, বার বার মিলিয়ে নিই। এই তো আমাদের শিক্ষা। আমাদের যদি যীশুজননী মেরী আঁকতে বলা হয় তো আমরা হাত হাত ঠেকে পড়ি। সে পবিত্রতা আমরা পাব কোথায়? কার কাছে? ও সব বিষয়ে আমরা হাত দিইনে। নিজেদের অক্ষমতা ঢাকি এই বলে যে, ও সব এখন সেকেলে। ওর মধ্যে নূতনত্ব নেই। পবিত্রতাকেও হেসে উড়িয়ে দিই। মাতৃত্বের মাধুরী আমাদের স্পর্শ করে না। তাই এলিজাবেথকে আঁকিনি। মালাকেও না।

সেদিন বসবার ঘরে দেখি আমারি আঁকা সেই প্রদর্শনীর ছবি। তারিফ করলেন মিসেস দস্তিদার। বললেন, "হাঙ্গিলিঙের লেপচা মেয়ের ছবি তো এমন সুন্দর হয় না। একে আপনি কোথায় দেখলেন জানতে ইচ্ছা করে।"

আমি কস করে জবাব দিলুম, "ঘুম ছাড়িয়ে টাইগার হিলের পথে।"

তিনজনেই ওঁরা সরলবিশ্বাসী। আমার কথা বিশ্বাস করলেন। কিন্তু সেই যে একবার ধরা পড়ে গেলুম তার পর থেকে আমি অতি সতর্ক। মালার ছবি আঁকলে সেই প্রশ্নই ঘুরে ফিরে শুনতে হতো। আসলে যা হয়েছিল তা তুমি নিশ্চয় অনুমান করেছ। লেপচা মেয়ে আমি টাইগার হিলের পথে নয় হোক হাঙ্গিলিঙের পথে ঘাটে দেখেছি। কিন্তু ছবি আঁকতে গিয়ে যা ঘটল তা আমার নিজের চোখও বিশ্বাস করতে চায় না। সাদৃশ্য ফুটল আর একটি মেয়ের। যার ছবি রাশি রাশি এঁকেছি। হাঁ, প্যারিসের মেয়ে। প্যারিসিয়েন। প্রিয়দর্শনা ওদিল।

কথায় কথায় বললুম, "আমিও আপনাদের মতো এক বছর হলো ফিরেছি। প্যারিসের রেশ এখনো মিলিয়ে যায়নি। অসম্ভব নয় যে অজানতে বিদেশিনীর আদল এসে পড়েছে। ছিলুমও তো ষড় কম দিন নয়। লণ্ডনে দুই আর প্যারিসে পাঁচ বছর।"

"ওঃ! তাই নাকি!" দস্তিদারের কৌতূহল উজ্জীবিত হলো। "কত কাল দেখিনি। মহাযুদ্ধের দু'বছর আগে আমি ইংলণ্ড থেকে সরাসরি বর্মায় পাড়ি দিই। বেশীর ভাগ সময় কেমব্রিজেই কাটিয়েছি। ছুটিতে কন্টিনেন্টে বেরিয়েছি। হাঁ, প্যারিসেও গেছি। ফরাসীরা হলো জাত বিপ্লবী। তাদের ভিতরে আগুন আছে। অমন একটা বিপ্লব কি আর কোনো জাত বাধাতে পারত? আপনারও কি তা মনে হয়নি?"

মানলুম। বললুম, "জাত বিপ্লবী না হোক ধাত বিপ্লবী। কিন্তু ওদের মুশকিল হয়েছে এই যে ইতিহাস ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। এখন বিপ্লব বলতে বোঝায় রুশবিপ্লব। ফরাসীবিপ্লব নয়। সকলের নজর রাশিয়ার উপরে। ফ্রান্সের উপর কারো নজর নয়। বিপ্লব ওরা অবশ্য যে-কোনো দিন ঘটাতে পারে। সে শক্তি ওরা রাখে। কিন্তু ঘটনার স্রোত কি সেইখানেই থামবে? ঘটিয়ে তুলবে রুশবিপ্লব। তখন না থাকবে লিবার্টি, না থাকবে প্রপার্টি। ফরাসীদের যে-দুটি না হলেই নয়। সেইজন্যে

বিপ্লবকে ঘৃণা করে ওরা অন্তরে অন্তরে ভালোবাসে তবু বিপ্লবকেই ওরা হাতে হাতে ডরায়। ওদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান কোনো দিন হবে না।"

দস্তিদার বললেন, "মহাযুদ্ধের আগে এরকম তো দেখিনি।"

আমি বললুম, "না, মহাযুদ্ধের আগে এ রকম ছিল না। এ পরিস্থিতি যুদ্ধোত্তর যুগের। আমরা প্রথমে ভেবেছিলুম যুদ্ধের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। তা নয়। এখন রোগনির্ণয় হয়েছে। এটা বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায় নয়, রুশবিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়। যতদিন না সেন নদীর তীরে আর একটা রুশবিপ্লব ঘটছে ততদিন এর সমাপ্তি নেই। কিন্তু তা তো কেউ প্রাণ থাকতে ঘটতে দেবে না। কাজেই এ রোগের প্রতিকার নেই।"

মিসেস দস্তিদার নীরবে শুনছিলেন। বললেন, "না থাকাই ভালো। লিবার্টি আর প্রপার্টি যদি দিলে জীবনে আর বাকী থাকে কী? আপনার ওই আর্ট ক'দিন থাকবে? আর এঁর এই সায়েন্স ক'দিন থাকবে?"

আমি নিজেও ওঁর মতো সন্দিহান। তা হলেও আমাকে বলতে হলো, "আর্ট ক'দিন থাকবে, এ প্রশ্ন তো আজকেও করা যায়। ফরাসীরা বিপ্লবের নেশা ছাড়বে না। ওটা ওদের জীবনের অঙ্গ। ও না হলে ওরা ফরাসীই নয়। অথচ বিপ্লব মানে তো সর্বনাশ। তাই ওরা করছে কী, না বিপ্লবের স্বাদ আর্টে খুঁজছে। জীবনে যা ঘটানো গেল না আর্টে ঘটাবে। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবে। ব্যবহারিক জগতে তার মূলও নেই, তার ফুলও নেই। তা হলে বেঁচে থাক ওরা ওদের লিবার্টি আর প্রপার্টি নিয়ে। তাও পারছে কোথায়? অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জর। ভিতরে ভিতরে অসুস্থ।"

সেদিন আরো অনেক গল্প হলো। কলকাতা শহরে ওঁরাও নবাগত, আমিও নবাগত। আমার কেবল সাত বছর ইউরোপে নয়, চার বছর লখনউয়ে কেটেছে। উভয় পক্ষে একটা যোগসূত্র পাওয়া গেল। সেটা নবাগতের প্রতি নবাগতের সহানুভূতি। ওঁরা বললেন, "বুধবার-বুধবার তো আসবেনই। তা ছাড়াও যখন আপনার খুশি।"

যখন খুশি অবশ্য যাওয়া যায় না। সাত দিনে একদিন যেতে হলেও বুধবারগুলোর হিসাব রাখতে হয়। আমি বেহিসাবী মানুষ। বুধবার কবে কেমন করে পেরিয়ে যায় আমার খেয়াল থাকে না। পরে আবিষ্কার করি। মাসে হয়তো একবার হাজিরা দিই। ওঁরা অনুযোগ করেন। আমি অজুহাত দেখাই।

এমনি করে ও-বাড়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। কবে এক সময় ওঁরা আমাকে তুমি বলতে আরম্ভ করেন। আর আমিও ওঁদের মাসিমা ও মেসোমশায় বলে ডাকতে শুরু করি। ভেবেছিলুম দাদা বৌদি বলে ডাকব। কিন্তু তা হলে দাদার কাকাবাবু বনতে হয়। তাতে আমার অরুচি। আমি ওর দাদা হতে পারলেই সুখী হই।

তা বলে ওর প্রতিকৃতি আঁকতে সম্মত নই। জানি ব্যর্থ হব। মাসিমা যখন অনুরোধ করলেন আমি বলনুম, "মাসিমা, দাদা আপনার চক্ষের মণি। আমার কাছেও কম আদরের নয়। কিন্তু আর্টের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি ফরমায়েশ ধার ধারেন না। আর্ট সেদিক থেকে বিজ্ঞানেরই মতো নির্মম। দাদার ছবি দেখে আপনি হয়তো চমকে উঠবেন। কৈফিয়ৎ দাবী করবেন। কী কৈফিয়ৎ আমি দেব? দেওয়ালে লোকে চার শতাব্দী ধরে ঝুলছে। মোনালিসার মুখ নেই কেন? তবু তো তখনকার দিনে

প্রতিকৃতি ছিল মোটের উপর অনুকৃতি। এখন ফোটোগ্রাফির যুগে পাছে আমাদের কেউ ফোটোগ্রাফার বলে সেই ভয়ে আমরা অনুকৃতির ছায়া মাড়াইনে। আপনি হয়তো বলবেন বিকৃতি।"

মাসিমা শিউরে উঠলেন। "তা হলে কাজ নেই এঁকে।"

আমি বললুম, "তার চেয়ে আপনি কোনো ভালো ফোটোগ্রাফারকে দিয়ে ওর পোর্ট্রেট করান। আজকাল ফোটোগ্রাফির আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে। হাতে আঁকার মতোই দেখতে। অথচ অবিকল সেই মানুষটি। সেই সোনা লিসা, সেই ভুরু দুটি।"

"কিন্তু সেই হাসিটি নয়।" বাধা দিলেন মেসোমশায়।

"আহ্! সেই হাসিটি নয়।" আমি দুই হাত তুলে টেবিলে তাল দিয়ে বললুম, "সেই হাসিটি নয়। কিন্তু সে হাসির আবার রকমারি অর্থ করা হয়। কেউ কেউ বলে, ওটা শয়তানী হাসি। দেখুন দেখি, লেওনার্দোর পাল্লায় পড়ে কী বদনাম হয়েছে বেচারির! এই যা কী! এল গ্রেকোর হাতে গ্র্যাণ্ড ইন্‌কুইজিটর মহোদয়ের কী দশা হলো জানেন তো। তখনকার দিনে কেউ টের পায়নি—স্বয়ং গ্র্যাণ্ড ইন্‌কুইজিটরও না—যে, এল গ্রেকো ভাবীকালের জন্যে একটি ভয়াবহ দলিল সম্পাদন করে যাচ্ছেন। ইনকুইজিটরের আত্মা সেখানে উলঙ্গভাবে উদ্‌ঘাটিত। অথচ বাইরে কেমন ধর্মের ভড়ং। সাক্ষাৎ মহাসাধু।"

মেসোমশায় আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন, "ওহে দেবপ্রিয়, তা হলে তুমি এক কাজ কর। তুমি আমার ছবি আঁক।"

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, না, সার। কিন্তু মাসিমা আমার কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "না, বাবা, তোমাকে আঁকতে হবে না। সুনামের সঙ্গে সারাজীবন কাটিয়ে এসে শেষকালে তোমার খপ্পরে পড়ে কী যে চেহারা খুলবে অধ্যাপকের। লোকে বলবে জ্ঞানী না বুনো। তা নেহাৎ ভুল বলবে না বোধ হয়।"

সে সময় আমি জানতুম না যে ওঁদের দু'জনের মধ্যে একটা আড়াআড়ি চলছিল; একটু একটু করে আবিষ্কার করি। একদিনে নয়, একজনের মুখে শুনে নয়। মাসিমা বহুকাল সহ্য করে এসেছেন, আর পারছেন না। বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে তো। কর্তা গাছপালা নিয়ে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করতে চান করুন যত খুশি। কিন্তু মানুষ তো উদ্ভিদ নয়। আর সে তাঁর মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে কি তার অসহায়তার সুযোগ নিতে হয়! মাসিমা স্বামীকে পুত্র উপহার দিতে পারেননি বলে মনে মনে অপরাধী বোধ করতেন। তাই মানার বেলা পিতার ইচ্ছায় কর্ণ মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সব জিনিসের একটা সীমা আছে।

দেখে বিশ্বাস হয় না যে মেসোমশায় ছিলেন স্বদেশীযুগে সন্ত্রাসবাদীদের দলে। তাঁর বাবা সে কথা জানতেন না। যেদিন জানতে পেলেন সেদিন সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে বিলেত পাঠানোর আয়োজন করলেন। তিনি তখন এম-এ পড়ছিলেন, বিলেত গিয়ে কেম্‌ব্রিজে পড়তে হবে শুনে আনন্দে অধীর। কিন্তু একটা সর্ত ছিল। বিয়ে করে যেতে হবে। তাঁর তাতে ঘোরতর আপত্তি। তখন একটা রফা হলো। বিবাহ নয়, বাগ্‌দান। মাসিমা তখন ভগিনী নিবেদিতার স্কুলের ছাত্রী। নিবেদিতার প্রিয়পাত্রী। বাগ্‌দান তাঁকে স্কুলের পড়া শেষ করার সময় দিল। তার পরে মেসোমশায় বলে পাঠালেন তিনি ডক্টরেট না নিয়ে ফিরবেন না। মাসিমাকে আরো দু'বছর অপেক্ষা করতে হলো। সে দুটো বছর তিনি তাঁর ভাবী স্বামীর নির্দেশে বেথুন কলেজে পড়েন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মসমাজের বাইরে সেটা একটু অসাধারণ।

বিলেতের জলহাওয়ায় মেসোমশায়ের সহ্যগুণ সেরে যায়। তা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে বাংলাদেশে চাকরি করা নিরাপদ হতো না। টিকটিকি তো পিছনে লাগতই, দারোগাও ছাড়তেন না, অন্তত চাঁদাটা আদায় করতেন। তাই তিনি স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যান। মাসিমা কী আর করেন। সীতার মতো অনুগতা হন। রেঙ্গুনের কাছে বোট দিয়ে তারপরে এক সময় কলকাতা এসে মেসোমশায় বিয়ে করে মাসিমাকে নিয়ে যান। সেখানে ওঁরা সুখেই ছিলেন। একমাত্র দুঃখ তাঁদের সন্তানভাগ্য আশানুরূপ হয়নি। আশা ছিল তিন ছেলেমেয়ের মা-বাপ হবেন। তাদের নাম রাখবেন অঙ্গদ বরুণ কিরণমালা। অঙ্গদ বরুণ তো এলোই না। কিরণমালা এলো দশ বছর বাদে। ততদিনে কিরণমালা নামটা সেকেলে হয়ে গেছে। তাকে ছেঁটে ছোট করা হলো, যাতে আধুনিকদের মনে ধরে। মালা বলে নামকরণ হলো মেয়ের।

মেসোমশায়ের বাবা বিশ্বাস করতেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ তার অতীতের পুনরাবর্তন। তিনি ছিলেন তপোবনের পক্ষপাতী, তপোবনে বালকদের আবাসিক শিক্ষার পক্ষপাতী। মেসোমশায়ের বাল্যকালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তাঁর বয়সটা ততদিনে আশ্রম বিদ্যালয়ের বয়ঃসীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই তাঁর মনে একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। তপোবনের প্রতি অনুরাগ ও সন্ন্যাসবাদের প্রতি আকর্ষণ এক স্তরের নয়। একটা সুগভীর, অন্যটা অগভীর। বিলেত থেকে ফিরে আসার পরও তিনি তপোবনের চিন্তায় বিভোর থাকেন। তবে সেকালের তপোবন ও একালের তপোবন একই রকম হতে পারে না। বল্কল পরিধান, সমিধ সংগ্রহ, অগ্নিহোত্র ও বেদমন্ত্র পাঠ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য পুত্রকন্যাকে জননীর কোল থেকে নিয়ে প্রকৃতির কোলে তুলে দেওয়া। কিন্তু প্রকৃতি বলতে বনজঙ্গল বোঝায় না, বোঝানকার অধীশ্বর পশুরাজ। প্রকৃতি বলতে বোঝায় তপোবন, যেখানকার কুলপতি মহর্ষি। মহর্ষিরও বাঁধাধরা সংজ্ঞা নেই। তিনি বৈজ্ঞানিকও হতে পারেন আইনস্টাইনের মতো। ধর্মগুরুও হতে পারেন শোয়াইটসারের (Schweitzer) মতো। তিনি নিরীশ্বরবাদী হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু তপস্যা তাঁকে করতে হবেই। করতে হবে আলোর জন্যে, ভালোর জন্যে, যার জন্যে হট্টগোল থেকে অপসরণ না করে উপায় নেই।

একমাত্র কন্যাকে মেসোমশায় অন্য কোনো ঋষির তপোবনে পাঠাননি, নিজের কাছে রেখে নিজেই তার জন্যে তপোবন গড়ে তুলেছিলেন। নিজেই হতে চেয়েছিলেন কুলপতি ঋষি। ও মেয়ে জলে ভিজেছে, রোদে পুড়েছে, বড়কাপটায় ঘরে বন্ধ থাকেনি। ও মেয়ে খালি পায়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, প্রত্যেকটি ফুল পাতা চিনেছে, পাখী পুষেছে, শুটিপোকা থেকে প্রজাপতি উৎপন্ন করেছে। বীজ বুনেছে, গাছ লাগিয়েছে, বাগান করেছে। লেখাপড়াও শিখেছে। গান গেয়েছে। ছবি এঁকেছে। মূর্তি গড়েছে। আবার ঘরকন্নার কাজও করেছে। কি চাকরের উপর নির্ভর করেনি। তাদের সঙ্গে ব্যবধান রক্ষা করে চলেনি। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তিনি তার মূল্যবোধকে উচ্চগ্রামে বেঁধেছেন।

কোনটা নিত্য কোনটা অনিত্য, কোনটা সার কোনটা অসার, কোনটা সত্য কোনটা অসত্য, কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায়, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, কোনটা শ্রেয় কোনটা প্রেয়, কোনটা ধ্রুব কোনটা অধ্রুব, কোনটা সুন্দর কোনটা অসুন্দর, এ নিয়ে মালার সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনা গল্পগুজব ওর আট ন'বছর বয়স থেকেই। মালাকেও তিনি নিজের যুক্তি খাটাতে বলতেন, নির্বিচারে মেনে নিতে বলতেন না। এমনি করে মালার শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল। উপনিষদের ঋষিকন্যাদের মতো।

ঋষিকন্যাদের মতো মালারও একদিন বিবাহ হবে, মেসোমশায় তা জানতেন। ও যখন সাবালিকা হবে তখন কেউ যদি ওকে প্রার্থনা করে তখন প্রার্থনা পূরণ করবে কি করবে না সেটা ও নিজে স্থির করবে।

তখন পরামর্শ চাইলে পরামর্শ দেওয়া যাবে, সাহায্য চাইলে সাহায্য করা যাবে। কিন্তু বিবাহের জন্যে উপযাচিকা হওয়া ওর দিক থেকে যেমন অবমাননাকর ওর পিতামাতার দিক থেকেও তেমনি। কেনই বা তাঁরা বরপক্ষের দ্বারে উপযাচক হয়ে দাঁড়াবেন! মালা যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো তা হলে কি কন্যাপক্ষের দ্বারস্থ হতেন! আর মালারও কি আত্মসম্মান নেই! মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে কি ওর আস্থা নেই! বর্মী মেয়েদের দেখে শিখুক কেমন করে নিজের মান নিজে রাখতে হয়। তথাকথিত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে বিকিয়ে দিতে হয় না।

ওদিকে মৈত্রেয়ীর মতো মাসিমার কেবল একটিমাত্র জিজ্ঞাসা। "যা দিয়ে আমার মেয়ে সুখী না হবে তা নিয়ে আমি কী করব?" তাঁর মতে সেই হচ্ছে বিদ্যা যা ভালো বিয়ের জন্যে। ভালো বিয়ে দাও, দেখবে মেয়ে চিরজীবন সুখী হবে। মেয়ের জন্মের পর থেকেই তাঁর মাথায় ঘুরছে কবে কেমন করে এ মেয়ের ভালো বিয়ে হবে। মেসোমশায়ের কাছে মালা ব্যক্তিবিশেষ। তার অবাধ বিকাশ পূর্ণ বিকাশ হলো কাম্য। বিকাশ যেমন পুরুষের হয় তেমনি নারীরও হবে, কিন্তু ব্যক্তিগত পূর্ণতাটাই আসল। আর মাসিমার কাছে মালা মেয়ে ছেলে। বেটা ছেলে নয়। ভুলে ভুল হবে যদি তাকে বেটা ছেলের মতো করে মানুষ করা হয়। গোড়া থেকে মেনে নিতে হবে যে একদিন একটি সুপাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। বিয়ে হবে বনে নয়, গ্রামে নয়, বর্মায় নয়, কলকাতা শহরে, বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে। সম্ভবতঃ বনেদী একান্নবর্তী পরিবারে। তা হলে সেই অনুসারেই তাকে প্রস্তুত করতে হবে। শ্বশুরশাশুড়ী কেমনটি চান, তাঁদের ছেলে কেমনটি চায়, দেওর ননদ কেমনটি চায় এইটেই আসল। চাহিদা যাতে মেটে সেইটেই কাম্য। তাতেই সুখ, কারণ তাতেই নিরাপত্তা। নারী চায় নিরাপত্তা। আর সব তো অনাবশ্যক।

মেয়ে যতদিন হয়নি ততদিন রেঙ্গুনে তাঁরা বেশ নিশ্চিন্তেই ছিলেন। স্থানান্তরের কথা চিন্তা করেন নি। মালার যখন স্কুলে যাবার বয়স হলো মাসিমা বললেন, চল, কলকাতা যাই। বর্মায় কি কলকাতায় হয় না? হয়, হয়, চেষ্টাচরিত্র করলে হয় বইকি। নজীর আছে। মেসোমশায় বললেন, চেষ্টাচরিত্র মানে তো ঘরাঘরি। মোসাহেবী। সেটি আমাকে দিয়ে হবে না। আমি কাজ পেয়েছি যোগ্যতার জোরে, বর্মা বেছে নিয়েছি খোলা চোখে। বর্মা না চেয়ে বেঙ্গল চাইলে তখনি তা পাওয়া যেত। কেন চাইনি তা তো তুমি জানো। সম্রাদবাবু একটুও কমে নি। কমলে পরে তখন দেখা যাবে।

মাসিমা কী আর করেন! স্বামীকে হঠকারিতা থেকে অযোধ্যায় ফিরে যেতে পারেন না। ভাগ্যিস্ এ সমস্যা সীতার জীবনে উদয় হয় নি। মাসিমার আত্মীয়রা তাঁকে লিখেছিলেন, তুই তোর মেয়েকে নিয়ে এখানে চলে আয়, বুদ্ধি। তারপর কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমনি মেয়ের বাপও আসবে। মাসিমা তাতে রাজী হন নি। স্বামীকে তিনি একদিনের জন্যেও ত্যাগ করেন নি। কিন্তু মালার জন্যে অনবরত মন খারাপ করেছেন। বিয়ে অবশ্য কম বয়সে দিতে ইচ্ছা নেই। কিন্তু বিবাহের প্রস্তুতি অল্প বয়স থেকেই শুরু করতে হয়। ব্রত উপবাস লক্ষ্মীপূজা শিবপূজা এসব নিয়েই শুরু। তারপর বিয়ে না হয় দু'দিন পরে হবে, না হয় আঠারো বছর বয়সে, কিন্তু বিয়ের নির্বন্ধ দুদিন আগে হলেই বা ক্ষতি কী! এই ধরো এগারো বারো বছর বয়সে। গরিবের ছেলেকে বেঁধে রাখতে হয় মেডিকাল কলেজে বা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়িয়ে। কিংবা বিলেত পাঠিয়ে। বড়লোকের ছেলেকে বেঁধে রাখতে হয় সম্পত্তির আশা দিয়ে। সময় থাকতে কলকাতার বসে খোঁজ খবর না রাখলে ভালো ভালো পাত্রগুলি সব বেহাত হবে। পড়ে থাকবে নিরেস মাল। সময় ও জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না।

রেঙ্গুনের স্কুল মাসিমার মনে ধরেনি। ওখানকার শিক্ষা বাঙালীর মেয়েকে বাঙালীর সমাজে খাপ

খাওয়াতে অক্ষম। চিরটা কাল তাকে বেখাপ হয়ে থাকতে হবে। তার চেয়ে বাড়ীতে প্রাইভেট পড়া ভালো। তা বলে বাড়ীটাকে হস্পোবন করে তোলার মর্ম তিনি বোঝেন না। লোকালয়েই যাকে বাস করতে হবে বরাবর তাকে লোকালয়ের উপযুক্ত করে মানুষ করতে হয়। হস্পোবন থেকে লোকালয়ে গিয়ে সে কি জলের মাছ ডাঙায় সাঁতার কাটবে? আর ওই যে ভালো মন্দ ন্যায় অন্যায় সত্য অসত্যের চুলচেরা সংজ্ঞাবিশ্লেষণ ও কি ব্যবহারিক জীবনের পেশে টিকবে? বেঁচে থাকতে হলে আপোস করতে হয়। মুনি ঋষিরাও নিখুঁত ছিলেন না। সংসারে টিকে থাকতে হলে অনেক অনাচার অত্যাচার চোখ বুজে হজম করতে হয়। বিশেষ করে মেয়েমানুষকে।

অবশেষে বর্মা স্বতন্ত্র হলো। মেসোমশায়ের মনে হলো বর্মার লোকের মতো তিনিও ভারতের থেকে স্বতন্ত্র ধরে পড়েছেন। তাঁকেও মনঃস্থির করতে হবে। কোনটা তাঁর স্বদেশ? ভারত না বর্মা? বর্মাকে তিনি প্রাণভরে ভালোবাসতেন, কিন্তু তার জন্যে তিনি ভারতের প্রতি আনুগত্য হারাতে রাজী ছিলেন না। তাহলে বর্মায় তাঁকে বিদেশীর মতো বাস করতে হয়। তাতেও তিনি নারাজ। রেঙ্গুন থেকে বদলি হওয়া সম্ভব ছিল না। পেনসন নেওয়া সম্ভব ছিল। তিনি বেছলেন সেই ভালো। তারপর গৃহিণীর ইচ্ছায় কর্ম। কলকাতায় সংসার পেতে বসা। আপাতত ফ্ল্যাটে। পরে নতুন তৈরী নিজের বাড়ীতে। তারপর মনের মতো কাজ যদি জুটে যায় করবেন। নয়তো জীবনটাকে নতুন করে গুছিয়ে নেবেন। সেটাও তো একটা কাজ। বরং সেইটেই সবচেয়ে গুরুতর কাজ। তার জন্যে অবশ্য মজুরি মেলে না। নাই বা মিলল। জীবন তো জীবিকা নয়।

মেয়ের বিয়ের কথা ভেবে মাসিমা চাকরীর মতো ছোটেন। আর মেয়ের বিকাশের কথা ভেবে মেসোমশায় বই কেনেন, ছবি কেনেন, রেকর্ড কেনেন, চারাগাছ কেনেন। তবে মাসিমার যেমন সেই একমাত্র ভাবনা মেসোমশায়ের তেমন নয়। তাঁর সঙ্গে কথা বললে তিনি মেজান, মাতিস, পিকাসো নিয়ে মেতে থাকেন, আশ্চর্য তাঁর কৌতূহল ও গ্রহিষ্ণুতা। কিন্তু হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন আর বলেন, "নতুন করে আরম্ভ করতে চাই, কিন্তু কোনখান থেকে যে আরম্ভ করি! পুরাতন করে চাকরি করাই কি নতুন করে আরম্ভ।"

অকার পেয়েছিলেন দু'চার জায়গা থেকে। বললেন, "থাক, কাজ নেই যুবকদের অন্ন মেরে। ওরা বেকার থাকলে ওদের মন ভেঙে যাবে। আমি বেকার থাকলে আমার তেমন কোনো আপত্তি নেই। তবে হ্যাঁ, চর্চার অভাবে যেটুকু শিখেছি সেটুকু ভুলে যেতে পারি। কাজ যদি হয় এমন কোনো কাজ যা যুবকদের দিয়ে হবার নয়, যার জন্যে প্রার্থীও নয় তারা, তা হলে বিবেচনা করতে পারি।"

গৃহিণী তা শুনে রাগ করেন। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে। বসে বসে খেলে কুবেরের ধনও ফুরোয়। পেনসনের টাকায় তো কুলোয় না। পুঁজি ভাঙতে হয়। তা হলে মেয়ের বিয়ে হবে কী দিয়ে?

তখন কর্তা বলেন, "বালার বিয়ের সময় হলে আমি স্বয়ংবর সভা ডাকব। দেখবে কত রাজপুত্তুর আসে। বালা তাদের একজনের গলায় মালা দেবে। সেই মালাবান হবে সবার চেয়ে ভাগ্যবান।"

ভদ্রিমাদের নতুন বাড়ী তৈরী হয়েছিল। গৃহপ্রবেশের দিন ওঁরা আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন আমার বোন নীলিমাকেও যেন নিয়ে যাই। সেদিন নীলির সঙ্গে বালার আলাপ হয়। আলাপ ক্রমে বন্ধুতায় পরিণত হয়।

বণ্ডেল রোডের এই নতুন বাড়ীতে মেসোমশায় নবীন উদ্যমে তপোবন রচনা করছিলেন। বহু কালের পুরোনো গাছ ছিল অনেকগুলি। গাছের গোড়ায় বেদীনির্মাণ হলো। নতুন গাছ লাগানো হলো যাতে সুদূর ভবিষ্যতে পুরোনো গাছের অভাব পূর্ণ হয়।

"এটাও একটা কাজের মতো কাজ! এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। আমি দেখতে পাব না। তাতে কিছু আসে যায় না। পরে যারা আসবে তারা দেখলেই আমারও দেখা হবে। কী বল, দেবপ্রিয়?" মেসোমশায় আমার সমর্থন আশা করলেন।

আমি বললুম, "আপনাকে আমরা অনায়াসেই আরো ত্রিশ বছর পাচ্ছি। যেমন শরীরের গাঁথুনি আর নিয়মনিষ্ঠ জীবন ত্রিশ কেন চল্লিশ বছর।"

তিনি আমার দুই কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, "এসব গাছ বনস্পতি হতে অনেক বেশী সময় নেবে। এ যেন অজন্তার গুহাচিত্র। এক একখানা আঁকতে তিন পুরুষ লেগে যায়। এ তোমাদের আধুনিক চিত্রকলা নয় যে তিন দিনে একখানা সারা হবে। রাগ কোরো না। তোমাকে লক্ষ্য করে বলিনি।"

"বললেও আমি রাগ করতুম না, মেসোমশায়। কথাটা আমার বেলাও খাটে। তিন দিনে একখানা না হোক তিন মাসে একখানা আঁকা না হলে মনে হয় বৃথাই বেঁচে আছি। আর সবাই ঘোর কলিতে এগিয়ে গেল। আমি ঘোড়দৌড়ের শেষ ঘোড়া।"

তিনি আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন, "ধরণোশ দৌড়ের শেষ কচ্ছপ।"

ইতিমধ্যে তিনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছিলেন আমার আরো খানকয়েক ছবি কিনে। কেন যে কিনলেন তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি তো ইণ্ডিয়ান আর্ট বা ভারতীয় ঐতিহ্যের ধার ধারিনে। একবার বলেও ছিলুম ও কথা।

তিনি বলেছিলেন, "তুমি সচেতনভাবে ভারতীয় শিল্পী নও। কিন্তু তোমার সৃষ্টি যে উৎস থেকে রস আকর্ষণ করছে সেটা ভারতেরই গঙ্গোত্রী। শুধু পদ্ধতিটা পাশ্চাত্য। তুমি শত চেষ্টা করলেও সেজানের রসের উৎস আবিষ্কার করতে পারবে না, মাতিসেরও না। ওঁদের কতকগুলো প্রবলেম আছে। সেসব প্রবলেম আজিকের বলে ভ্রম হয়। কিন্তু ওর ভিতরে আরো কথা আছে। যন্ত্রযুগের সঙ্গে ওঁরা একটা বোঝা-পড়া করতে চান। তোমার কাছে এখনো সেসব সত্য হয়নি, কারণ ভারতের পক্ষে সত্য হয়নি।"

একজন বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে আর্ট শিখতে হবে আমাকে! হা ভগবান! যে-আমি অত যত্ন করে কিউবিজম সিম্বলিজম ও সুররিয়ালিজম আয়ত্ত করে এনুম। শুধু কি পদ্ধতি? ও দেশে আমার জীবন-যাত্রা ছিল যোগেমিয়ান! যেমন আর দশ জন আর্টিস্টের। সেটি কি এ দেশে হবার জো আছে! আর প্রবলেমের কথা যদি উঠল তা হলে বলি, ওসব প্রবলেম এ দেশেও দেখা দেবে, কারণ আধুনিকতা অপরিহার্য। ওসব পাশ্চাত্য নয়, বিশ্বজনীন।

আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম যে মেসোমশায়ের টাকা আমি তাঁকে কৌশলে ফেরৎ দেব। মালার বিয়ের সময়। ও টাকা আমার পাওনা নয়, তিনি আমার ছবি ঠিক চিনতে পারেন নি। প্যারিসের প্রদর্শনীতে আমাদের ছবি দেখে সমঝদারেরাও ধরতে পারেননি যে, ও ছবি একজন ভারতীয়ের আঁকা। মেসোমশায়ও ধরতে পারতেন না যদি প্যারিসে দেখতেন। উঃ! বুকটা ফেটে যায় শুনলে যে আমি ভারতীয় শিল্পী! আমি ভারতীয় হতেও রাজী আছি, শিল্পী হতেও রাজি আছি, কিন্তু ভারতীয় শিল্পী হতে নারাজ।

আমার ছবি ইউরোপীয়রাই কেনে বেশী। আর বেশী দাম দিয়ে। ওদের ধারণা ভারতীয় চিত্রকলার

নিদর্শন সংগ্রহ করছে। মরুক গে। টাকাটা আমার দরকার। আমি কেন ছাড়ি? কিন্তু পরে একদিন ওদের দেশের সমজদারদারাই বলবে যে আইকং একজন মডার্ণ আর্টিস্ট, যাঁর দেশ নেই, কাল আছে।

আমার মনে হয় মেসোমশায় এটা জানতেন, সব জেনেশুনেই আমার ছবি কিনতেন, কারণ তাতে এমন কিছু ছিল যা তাঁকে স্পর্শ করত। আমি তো রক্ত দিয়ে আঁকতাম না, আঁকতুম রক্ত দিয়ে। যে বেদনা অহরহ আমাকে বিহ্বল করে রেখেছিল তারই একটা ক্যাথারসিস অন্বেষণ করতুম চিত্রকলায়। ওদিকে মেসো-মশায়েরও একটা ব্যথা ছিল। ছেড়ে চলে এসেছেন চিরাচরিত জীবন।

একদিন বললুম, "জীবন তো নতুন করে আরম্ভ হলো। যেমনটি চেয়েছিলেন।"

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তার পর ধীরে ধীরে বললেন, "পুরোনো পরিবেশটাকে কোনো রকমে ফিরিয়ে আনা গেল। এই পরিবেশেই আমি সুখী ছিলুম, তাই আবার আমার সুখী হওয়াতো উচিত। তবু হতে পারছি কই? পুরোনো বোতলে আমি চাই নতুন মদ। ভারতও চায় তাই। কিন্তু কোথায় সে নতুন মদ। তুমি বলবে, কেন? ইউরোপে! দূর! ইউরোপ যাকে নবযৌবন বলছে সেটা কাকরক্ত।"

এ নিয়ে আমি তাঁকে আর খোঁচাইনি। তিনি যদি নতুন করে আরম্ভ করতে জানতেন তা হলে করে দেখাতেন। জানতেন না বলেই আকুলতা বোধ করতেন। আমার যদি জানা থাকত আমি তাঁকে সবিনয়ে জানাতুম। আমার নিজের ধারণাও তখন অস্পষ্ট। এখনো খুব এমন কী স্পষ্ট!

বাইরে ত্রিশ বছর কাটিয়ে এসে মেসোমশায় মনে করেছিলেন দেশের লোক সেই স্বদেশী যুগেই রয়েছে। সেই তপোবন পুনরাবর্তনের যুগে। মোহভঙ্গ হতে দেরী হলো না। ধর্ম আর ধর্মের জন্যে নয়। ধর্ম এখন রাজনীতির জন্যে। মেউলিয়া রাজনীতিকদের সম্বল হলো ধর্ম। তাঁরা ভাজেন বিড়ে তো বলেন পটল। তেমন ধর্ম দিয়ে রাজনীতিক অভিসন্ধি হাসিল হতে পারে, কিন্তু একটা মহৎ জাতির পুনর্জাগরণ সাধিত হবে না। তা হলে কী দিয়ে সাধিত হবে? বিজ্ঞান? বিজ্ঞানের উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান যেমন অশেষ মঙ্গল হতে পারে তেমনি অপরিমীম অমঙ্গলও হতে পারে। তার রাশ টানবার জন্যে যদি থাকে ধর্মবুদ্ধি, তা হলেই তার দ্বারা বিশুদ্ধ মঙ্গল হবে। আর নয়তো অনিয়ন্ত্রিত হয়ে সে মানবকুল ধ্বংস করবে। ধর্মকে মানুষের বড় দরকার। এটা ঠকরি।

ওদিকে মাসিমা তাঁর নতুন বাড়ী নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মেয়ের বিয়ের ভাবনায় একটু ঢিলে দিয়েছিলেন। কলকাতার বাজার দেখে একটু ঘাবড়েও গেছলেন। তাঁর দিদিরা তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, বুড়ি, মেয়েটাকে অমন করে বসিয়ে রাখিসনে। দিনকাল বদলে গেছে! সেকালে যেমন পাশ করা মেয়ে শুনলে ভয় পেয়ে যেত একালে তেমন পায় না। শাশুড়ীরাই চায় পাশ করা বৌ। দুটো একটা পাশ হলো হাতের পাঁচ। কে জানে কখন কাজে লেগে যায়!

মালাকে কিছু আধা আর কিছু পুন কিনে দেওয়া হয়েছে। সে আধাপুন মেয়ে প্রাইভেট ম্যাট্রিকের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তার বাপ তার প্রধান সহায়। পেশাদার এক টিউটরও রাখা হয়েছে। নীলির মতো বান্ধবীরাও একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়। নীলির কাছে শুনি বনের পাখীকে খাঁচার বুলি কপচাতে শেখানো হচ্ছে। যে ছিল অকুতোভয় তাকে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার ভয় দেখানো হচ্ছে।

সাধে কি মেসোমশায়ের মুখখানা শ্রাবণের মেঘলা আকাশ! কী করা যায়। রূঢ় বাস্তব! সীতাকেও অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। মালাকেও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে হবে। দুনিয়া তাকে বাজিয়ে নেবে। অমনিতেই স্বীকার করবে না যে সে শিক্ষিতা মহিলা। কে জানে কোনদিন কাজকর্মেরও প্রয়োজন হবে। তখন স্বীকার

করবে না যে তার যোগ্যতা আছে। অধিকন্তারা একালে জন্মান্তর গ্রহণ করলে তাদেরকেও সার্টিফিকেট নিতে ও দেখাতে হতো।

মালা জানে সবই, কিন্তু গুছিয়ে লিখতে পারে না, লিখলেও পরীক্ষার মতো করে নয়। মাস্টার মশায় তার ভালোর জন্যেই তাকে দিয়ে ভুল ইংরেজী লেখান। সে বিদ্রোহ করে। তার বাপ অসহায়। পরীক্ষকরাই যে মাস্টারের মাস্টার।

"মালা ভুল ইংরেজী লিখছে বলে ওর বাপের যে মাথাব্যথা তার সিকির সিকি যদি থাকত ওর ভালো বিয়ের জন্যে! তাহলে এইদিনে একটা হিল্লে হয়ে যেত বড়দা।" মাসীমা বলেন একদিন তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর গুপীবাবুকে।

"ভায়া হে," গুপীবাবু বলেন মেসোমশায়কে, "আমাকে তুমি বুঝিয়ে দিতে পারো ভুল ইংরেজী শিখে আমার কী ক্ষতি হয়েছে আর ঠিক ইংরেজী শিখে তোমার কী লাভ হয়েছে? দিব্যি ওকালতি করে খাচ্ছি। তোমার চেয়ে ঢের বেশী রোজগার করেছি ও করছি। সত্তর আশি বছর পর্যন্ত করতে থাকব। কই, জজ সাহেবেরা তো আমার ইংরেজীর ভুলের জন্যে আমাকে মোকদ্দমা হারিয়ে দেন না।

মেসোমশায় নিরুত্তর। তাঁর তাবড়া-তাবড় ইংরেজীনবিশ সরকারী চাকুরে। মিষ্টার চৌধুরী তাঁর হয়ে উত্তর দেন, "কিন্তু জজ সাহেবরা কোনো কালে আপনাকে জজ সাহেব করবেন না।" তারপর মেসোমশায়ের দিকে ফিরে বলেন, "অমৃত, তোমাকেও ছাড়ছিনে। তোমার মেয়েকে তুমি ক্লাউড-কুকু-ল্যাণ্ডে রাখতে চেয়েছিলে। এখন তাকে মাটির পৃথিবীতে নেবে আসতে দেখে কষ্ট পাচ্ছ। কিন্তু এটাও তার শিক্ষার অঙ্গ। রোমে যখন যাবে তখন রোমানদের মতো আচরণ করবে। সেখানকার লোকে ঠিক ইংরেজী বোঝে না। ঠিক জ্যোতির্বিজ্ঞান জেনেও চন্দ্রগ্রহণের দিন হাঁড়ি ফেলে। গঙ্গাস্নান করে। তোমার মেয়ে যদি বিদ্যা ফলাতে যায় শ্বশুর বাড়ী গিয়ে অশান্তি ভোগ করবে।"

মেসোমশায় চুপ করে শুনে গেলেন। একটি কথাও শোনালেন না। পরে মাসিমাকে বললেন, "এত বড় দেশে একটি মেয়ে একটু অরিজিনাল হবে কেউ সেটা সহ্য করবে না। কেউ তার জন্যে ত্যাগস্বীকার করবে না। সে-ই করবে সকলের জন্যে ত্যাগস্বীকার। অন্যায় নয়? আমি স্থির করলুম আমার মেয়ে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবে না, জুনিয়র কেম্ব্রিজ দেবে। তার পর সিনিয়র কেম্ব্রিজ। একটু দেরি হবে এই যা আফসোস।"

মাসিমার চক্ষু স্থির। তিনি অবশ্য প্রাইভেট ম্যাট্রিকই বহাল রাখলেন। কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম। মেসোমশায় পীড়াপীড়ি করলেন না।

আমাকে একান্তে বললেন, "ত্রিশ বছর বাদে দেশে ফিরে দেখছি জাতকে জাত সুবিধাবাদী বনে গেছে। এদেশের কপালে দুঃখ আছে, দেবপ্রিয়।"

ভুলে গেছলুম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল দশ বছর বাদে যেদিন সেখানে সন্ধ্যা ত্যাগ করে নিল।

"মালাকে আমি কেমন করে বাঁচাব এর ছোঁয়াচ থেকে! এই সর্বনেশে সুবিধাবাদের ছোঁয়াচ থেকে! আমার আজকাল রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, দেবপ্রিয়।" আমাকে বিশ্বাস করে বললেন মেসোমশায়। সত্যি তাঁর চোখের কোল কোলা কোলা।

আমি এর উত্তরে কী বলতে পারি! অন্য প্রসঙ্গ পাড়ি।

এদিকে মাসিমারও রাত্রে ভালো ঘুম হয় না। একদিন স্পষ্ট বললেন আমাকে। "অবাধ বিকাশের ফল কী হয়েছে, দেখেছ তো। মালাকে মনে হয় নীলিমার চেয়ে বড়। লোকে যখন শোনে ওর বয়স ষোলো সতেরো তখন মুচকি হাসে। ভাবে দু'তিন বছর হাতে রেখে বলছি। মেয়ে যার দিন দিন শশিকলার মতো বাড়ছে—পূর্ণিমার পরেও থামতে চায় না—তার তো রোজ রাত্রে কোজাগরী।"

নীলির বয়স তখন উনিশ। তখনো বিয়ের ফুল ফোটেনি। আমার মা তত লেখাপড়া জানতেন না। তবু একটু আধটু ইংরেজীর ফোড়ন দিয়ে বলতেন, "আমার মাথার উপর আপোক্যালিপ্সের খড়্গ ঝুলছে।"

বাবার কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাত ছিল না। তিনি তাঁর দ্বিতীয় সংসার নিয়ে স্বতন্ত্র বাস করতেন। ছেলেবেলায় তাঁর উপর রাগ করে আমি বাড়ী থেকে পালাই। ফিরতে ইচ্ছা ছিল না। ফিরি তো কৃতী হয়ে ফিরব। ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল। লখ্‌নউতে গিয়ে আর্ট স্কুলে ভর্তি হই। এখানকার এক বাঙালী ডাক্তার পরিবার আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরে আমি তাঁদের সম্রান্ত পেশেন্টদের প্রতিকৃতি এঁকে আত্মনির্ভর হই। তাঁদের একজন পরে উজীর হন। সরকারী সাহায্য দিয়ে আমাকে লণ্ডনে পাঠান। সাহায্য মাত্র দু'বছরের জন্যে। দু'বছরে কতটুকুই বা শেখা যায়! কপাল ঠুকে হাজির হলুম আর্টিস্টদের মক্কায়। আমার উত্তম দক্ষিণ হস্ত আমাকে অভাবে পড়তে দেয়নি। কিন্তু খাটতে হয়েছে শ্রমিকের মতো।

বাস্তবিক, শিল্পীতে শ্রমিকে ভেদ নেই। কস্মিন্‌কালে ছিল না। বুর্জোয়া মূল্য বোধ এসে ভেদবুদ্ধি জাগিয়েছে। বুর্জোয়াদের কমিশন না হলে ছবি আঁকাই হয় না, তাই আমরা বুর্জোয়াদের খাতির করি। যেমন রাজমিস্ত্রী যায় প্রাসাদ গড়তে। তা হলে নিজে বুর্জোয়া হতে চাইনে। সে পথে মরণ। বুর্জোয়াত্ব পাবার পর শিল্পী আর শ্রমিক থাকে না। এ যুগে সেই হয়েছে বিপদ। সমাজে যেই তার উত্থান হয় রূপলোকে অমনি তার পতন। ডানা কাটা এন্‌জেল যেমন। ডানা কাটা গেলে এন্‌জেলের আর কী থাকে। আমি উড়তে চাই মর্ত্য থেকে স্বর্গে, স্বর্গ থেকে মর্ত্যে। ডানা আছে আমার। আমার মত ধনী কে!

নীলিকে আমি বলি, "অভাবে স্বভাব নষ্ট। অভাবে পড়া ভালো নয়। আবার পায়ের উপর পা দিয়ে আরামে থাকলেও স্বভাব নষ্ট। পরগাছা হওয়াও ভালো নয়। তোকে বোধ হয় ডানা কাটা পরী বলে কারো ভ্রম হবে না। তবু তুই তোর ডানা দুটো কাটতে যাস্‌নে। বরের জন্যেও না। ঘরের জন্যেও না। উদরান্ত পরিশ্রম করতে হবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে। সে অন্নের স্বাদই আলাদা।"

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর মালাকে নিয়ে তাঁর মা পাহাড়ে ঘুরে এলেন। তার বাবা গাছপালা ছেড়ে কোথাও নড়বেন না। গরমেই তিনি ভালো থাকেন। তাঁর যে ব্যথা সে তো পাহাড়ে গেলে সারবে না। আমি মাঝে মাঝে যাই। একটু গল্প করি। তাতে আমার নিজের হাওয়া বদলের কাজ হয়।

"বৈজ্ঞানিককে মারে কে? এটা তারই তো যুগ!" মেসোমশায় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন। "তবে তোমাদের কথা আলাদা। এ যুগে তোমাদের বেঁচে থাকা শক্ত। কায়িক অর্থে বাঁচলে যদি তো আত্মিক অর্থে নির্বাণ লাভ করলে। তোমরা আবার বাঁচাবে কাকে! বাঁচলে তো বাঁচাবে।"

আমি কি এ কথা মাথা পেতে মেনে নিতে পারি! আর্টের প্রেস্টিজে বাধে। ধর্ম অর্থ কাম এরাই হলো চিরকালের ঋষিষ্টির ভীম ও অর্জুন। তার পরে কে বড়। আর্ট না বিজ্ঞান? নকুল না সহদেব? বয়স হলেও নকুলই বড়। আর্ট আগে হয়েছে। তারপরে বিজ্ঞান। যে কোনো সভ্যতার ইতিহাস বলে। বিশে শতাব্দীর সভ্যতা কি সরীসৃপ?

"এ যুগটা তো, মেসোমশায়, আপনার চোখের সুমুখেই সরে যাচ্ছে। এই যে আবার মহাযুদ্ধ বাধবে শুনছি এ যদি বাধে তবে যুগান্তর অনিবার্য। তখন দেখবেন শ্রমিকদের যুগ এসেছে। শিল্পীরাও শ্রমিক তো। কাজেই সেটা হবে শিল্পীদেরও যুগ। আমরা তখন সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ব। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বাড়ী উঠবে শ্রমিকদের জন্যে, সাধারণের জন্যে। আমরা গিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুরাল চিত্র আঁকব। ওরাই আমাদের চাঁদা করে খাওয়াবে পরাবে, আস্থানা জোটাবে। আমাদের জন্যে সব কিছু ফ্রী। তাই আমাদের দিক থেকেও সব কিছু ফ্রী। ছবি এঁকে আমরা এক পয়সাও নেব না। অশন বসন আবাসের জন্যে এক পয়সাও দেব না। বেচাকেনার নাগপাশ থেকে আমরা বাঁচতে চাই। ওরা যদি আমাদের বাঁচায় আমরাও ওদের বাঁচাব। বাঁচবে ওরা সৌন্দর্যের অমৃত পান করে। এমন জাদু করব যে যেদিকেই তাকাবে সেদিকেই সৌন্দর্য। চোখ চাইলেই সৌন্দর্য।"

মেসোমশায় সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, "ওটা দেখবার মতো স্বপ্ন। শিল্পী বল, বৈজ্ঞানিক বল, দার্শনিক বল, আসলে ওরা এসেছে একটা বাণী নিয়ে। সেটা দিয়ে না যাওয়া অবধি ওদের মুক্তি নেই। বাণীকে পণ্য করে বেচাকেনার ব্যাপারে নামলে বাণী তার পোটেন্সী হারায়। এই সওদাগরি যুগ থেকে পরিত্রাণ না পেলে আমরা আর্টিষ্টরা ও ইনটেলেকচুয়ালরা ধীরে ধীরে নির্বীর্য হব। অথচ ঋষিদের ভারতে বা সোক্রেটিসের গ্রীসে ফিরে যাবার পথ গেছে হারিয়ে। পথ করে নিতে হবে আমাদের, কিন্তু কেমন করে তা আমি জানিনে।"

আমি তখনকার দিনে সবজান্তা। বললুম, "আমি জানি। রেলে যারা কাজ করে তারা যেমন ফ্রী পাশ পায় তেমনি শিল্প বিজ্ঞান দর্শন নিয়ে আছে তাদেরও ফ্রী পাশ দেওয়া হবে। শুধু রেল ভ্রমণের জন্য নয়, সব কিছুর জন্যে। বাড়ী চাই। পাশ দেখালুম। অমনি বাড়ী মিলে গেল। ভাড়া গুনতে হবে না। গাড়ী চাই। পাশ দেখালুম। অমনি গাড়ী মিলে গেল। ভাড়া লাগবে না। খাবার চাই। পাশ দেখালুম। অমনি খাবার মিলে গেল। দাম দিতে হবে না। পোশাক চাই। পাশ দেখালুম; অমনি পোশাক জুটে গেল। বিল মেটাতে হবে না। বাকীটা আপনি কল্পনা করে নিন।"

"কিন্তু ঐ পাশখানার পরিবর্তে তুমি কি দিচ্ছ?" জেরা করলেন তিনি।

"রাশি রাশি ছবি। ঐ নিয়েই তো আছি দিনরাত।"

মেসোমশায় বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু ওটা অত সহজ নয়। আমাদের সমাজে ও পরীক্ষা তিন হাজার বছর ধরে হয়েছে। পৈতে যেখানে পাড়াগাঁয়ে কিছুদিন আগেও সব কিছু অমনি পাওয়া যেত। যার পৈতে নেই তার তেক। তেক নিয়ে ভিক্ষায় বেরোলে এখনো সবকিছু অমনি পাওয়া যায়। এর মূলে ছিল ওই আইডিয়া যে, যারা বিজ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞান নিয়ে আছে তাদের ফ্রী পাশ দিতে হবে। দিয়ে দেখা গেল ব্রাহ্মণ হলে যেমন পৈতে নেয় তেমনি পৈতে নিলেই ব্রাহ্মণ হয়। বৈষ্ণব হলে যেমন তেক নেয় তেমনি তেক নিলেই বৈষ্ণব হয়। তখন আর তাকে ব্রহ্মজ্ঞানী হতে হয় না, ভগবদ্ভক্ত হতে হয় না। ধর্ম বলতে সেই খাড়া বড়ি খোড়। বিদ্যা বলতে সেই খোড় বড়ি খাড়া। শিশুর হাতে সোনা ধরিয়ে দিয়ে চালাকরা সোনাটা দানাটা নেবে। তেমনি তোমার পাশ সিস্টেমও হয়ে দাঁড়াবে পৈতে সিস্টেম বা তেক সিস্টেম। দিনরাত লোক ভোলানো মোয়া তৈরি চলবে। তারই নাম দেওয়া হবে দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প। পাশ যার আছে সেই বৈজ্ঞানিক বা শিল্পী। বাণী নাই বা থাকল।"

"তা হলেও," আমি তর্ক করলুম, "আপনি স্বীকার করবেন যে সভ্যতা আজকের এই চোরাগলির

ভিতর দিয়ে আর বেশী দূর যেতে পারবে না, তার ঘর বন্ধ হয়ে আসবে। মোড় তাকে নিতেই হবে। পাশ থাকে বলছি সেটা একটা সিম্বল। আপনি তার বদলে আর কোনো সিম্বল ব্যবহার করতে পারেন। এমন একদিন আসবে যেদিন আমার মুখ দেখেই সবলে সব কিছু দেবে। মুখ দেখেই চিনতে পারবে যে আমি একজন দাতা।"

মেসোমশায় চিন্তান্বিত হয়ে বললেন, "কিন্তু মুশকিল বাধবে কোথায় তা জানো? তুমি যা দিলে আর তুমি যা নিলে এ দুইয়ের মধ্যে সমতা থাকা এসেন্‌সিয়াল। তুমি বলবে সমতা আছে। সমাজ বলবে সমতা নেই। মতবিরোধ অনিবার্য। যাঁরা আর্টের কদর জানেন তাঁরা তোমার পক্ষে। যাঁরা বাড়ীভাড়া গাড়ীভাড়া খোরাক পোষাক ইত্যাদির কদর জানেন তাঁরা তোমার বিপক্ষে। এমন বিচারক কোথায় যিনি স্পিরিচুয়াল ও মেটিরিয়াল উভয়বিধি সামগ্রীর কদর ও তৌল জানেন? এ রকম তো প্রায়ই দেখা যায় যে, শিল্পীর মৃত্যুর এক শ' দু' শ' বছর পরে তার এক একখানা ছবি পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকায় বিকোয়। অথচ তার দীর্ঘ জীবনে হয়তো সে সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকাও উপার্জন করেনি। সমসাময়িকদের বিচারে স্পিরিচুয়ালের অনুপাতে মেটিরিয়ালের দাম বেশী। সময়ের ব্যবধান ভিন্ন আর কোনো উপায় নেই যাতে তোমার সৃষ্টির কদর চাষী মিস্ত্রী ধনি ইত্যাদির উৎপন্ন সামগ্রীর মোট দরের সঙ্গে সমতাসম্পন্ন বলে প্রমাণিত হবে। তুমি মনে কোরো না যে একটা যুদ্ধ বা একটা বিপ্লবের ফলে সময়ের ব্যবধান সংক্ষিপ্ত হবে।"

আমি তো প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলুম, মেসোমশায় তা অনুমান করে বললেন, "সত্যতার মোড় ফিরবে কখন, জানো? যখন সমাজ স্বীকার করবে যে মেটিরিয়ালের অনুপাতে স্পিরিচুয়ালের দাম বেশী। বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ রস, বিশুদ্ধ রূপ ইত্যাদির সঙ্গে সমতা রাখতে পারে এমন ঐশ্বর্য কুবেরের ভাণ্ডারেও নেই। এসব ব্রতে যারা নিযুক্ত তারা যদি ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে তা হলে তারা যা দিয়ে যায় তা দান-বাস্তার পরম সম্পদ। সমাজের কাছে এমন একটা স্বীকৃতি আজকের দিনে কোনো দেশেই লক্ষিত হচ্ছে না, বিপ্লবী দেশ বলে যাদের পরিচয় সে সব দেশেও না। ক্রান্সেও না, রাশিয়াতেও না। এর জন্যে দোষ কিন্তু শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদেরও কম নয়। তাঁরা মনে করেন নিছক নূতনত্বই অগ্রসরতা, গতি মাত্রেই অগ্রগতি। তা নয়। যা বেশি টিকবে না তাকে বাদ দিলে পরে যা বাকী থাকবে প্রগতি। তোমাকে এমন ছবি আঁকতে হবে যা বাকী থাকবে। তার জন্যে তুমি লাখ টাকা যদি পাও তা হলেও সেটা ফ্রী। সেটা তুমি অমনি দিয়ে গেলে।"

জানি, লাখ টাকা আমাকে কেউ দেবে না। তবু ভাবতে দোষ কী যে, যা দিল তা রং তুলি ক্যানভাস ইত্যাদির কেনা দাম ও তার সঙ্গে দেবপ্রিয় আইকং বলে এক শ্রমিকের পারিশ্রমিক। কিন্তু আসল ছবিখানা অমনি পেয়ে গেল। ওটা আমার দান। ওটা ফ্রী। আমি সেই গর্বে ছবি আঁকি আর ছবির দাম ধরি আর দাম নিয়ে ফ্রি দিই। ওটা দেবপ্রিয় বলে এক প্রেমিকের প্রেমের মূল্য অমূল্য। শ্রমিক দাম নেয়। প্রেমিক নেয় না।

তার পর কী হলো শোন। দাদা মেট্রিক পাশ করল ঠিক। পাহাড় থেকে ওর মা ওকে নিয়ে ফিরলেন। - রূপ যা খুলেছে মেয়ের! ইচ্ছে করে এঁকে অমর করে দিতে। আমি আর্টিস্ট, আমি এই সব ভাবছি। আর ওদিকে ওর মা ভাবছেন ওর রূপ অম্লান থাকতেই ওর বিয়ে দিয়ে দিলে ভালো বর ভালো ঘর পাবেন। এখন থেকে ঠিকঠাক করে রাখলে পরের বছর শুভ বিবাহ। নারীর যৌবন ক'দিন থাকে! সেকালে বলত কুড়িতেই বুড়ি। একালে তা বলে না। কিন্তু কুড়ি পেরিয়ে গেলে ফিরেও তাকায় না।

অতএব মালাকে অবিলম্বে কোনো এক সুপাত্রের গলায় ঝুলিয়ে দাও। কলেজ? কলেজে পড়তে চায় বিয়ের পরে পড়বে। আপাতত? আপাতত কলেজে নামটা লেখাক। পড়াটা নামে মাত্র। তবে সেটারও একটা বাজার দর আছে। বিয়ের বাজারে।

নীলির মুখে এসব কথা শুনি আর সে বেচারিকে সান্ত্বনা দিই ও মনের জোর জোগাই। মালার চেয়ে সে বয়সে বড়। তারই তো আগে বিয়ে হওয়া উচিত। কিন্তু বিয়েতে বর লাগে। বর আমি কেমন করে জোটাব? বাবা চেষ্টা করলে পারতেন। কিন্তু তিনি চেষ্টা করলেও নীলি তাঁর অনুগ্রহ নেবে না। তা ছাড়া বাংলা দেশের শ্যামলা মেয়ে বলে সে এমনিতেই অভিমানী। নীলির বিয়ের ভাবনা যা ভাবছেন। আপাতত সে আমার কাছে ছবি আঁকা শিখছে। তার ডিসাইনের হাত ভালো। তাকে বলেছি তার বিয়ে না হওয়া অবধি আমারও বিয়ে হবে না। কিন্তু এর থেকে সে যেন ভুল না বোঝে আমি শুধু বোনের বিয়ের জন্যে দায়ে পড়ে দারপরিগ্রহ করব। মা সে রকম কিছু বলতে উদ্যত হলে আমি বাড়ী ছেড়ে পালাবার ইশারা দিয়ে ঠেকাই। মাকে আর নীলিকে মাসীর বাড়ী থেকে উদ্ধার করে ভবানীপুরে বাসা বেঁধেছি। তা বলে আবার উড়ব না এমন কোনো কথা নেই। দেখে যদি তেল নুন লকড়ি না জোটে দ্বিতীয় বার আমাকে বিদেশে যেতে হবে। ওটা হয়তো পেট্রিয়টিজম নয়। কিন্তু দেশকে ভালোবাসি বলে ভিক্ষুকের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে আমার বাধে।

এমন যে আমি সেই আমার উপর মাসিমার আদেশ হলো, "দেবপ্রিয়, মালার জন্যে একটু বলে দেখবে তোমার বন্ধুবান্ধবদের? হয়তো লেগে যাবে।"

আমার বলা উচিত ছিল মাসীমাকে, আমাকে মাফ করবেন, মাসিমা। আমার এতে বিশ্বাস নেই। একজনের সাথী কে হবে আরেক জন তা ঠিক করে দিতে পারে না। মালা বড় হলে মালার উপরেই ছেড়ে দিতে হবে এ ভার।

মাসিমাকে না বলে বললুম কিনা নীলিমাকে। নীলি তো হেসে অস্থির। শেষে বলল, "অন্ধমহিলা কি তোমাকে অত কথায় বলতে পারেন যে তাঁর মেয়েটিকে তুমিই বিয়ে কর? বলেছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।"

আমি তা শুনে রেগে অস্থির। নীলির মাথাখানা জিলিপির প্যাঁচ। চাঁটি মেরে বললুম, "যা। যা। বাজে বকিস্‌নি। অসম্ভব।"

"অসম্ভব বলে একটা শব্দ—নেপোলিয়ন বলতেন—বোকাদের অভিধানেই মেলে। আমার দাদা তো বোকা নয়।" এই বলে সে গম্ভীর স্বরে বলল, "তবে একটা বাধা আছে। মালার বয়ুকভাঙা পণ সে রাজপুত্তুর ভিন্ন আর কারো গলায় মালা দেবে না।"

"তাই নাকি?"

"তাই তো ও বলে। ওর বিশ্বাস এটা রূপকথার জগৎ। এর কোথাও একজন রাজপুত্র আছে। সে যথাকালে আসবে ও কী যেন একটা বীরত্বের কাজ করবে। তখন মালা তাকে মালা দিয়ে বরণ করবে।"

আমি অবাক হলুম। রুদ্ধশ্বাসে বললুম, "তার পর?"

"তার পর আর কী? তুমি তো রাজপুত্র নও। মন্ত্রীপুত্রও নও। নিদেন পক্ষে সওদাগরপুত্রও নও।" নীলিমা আবার লঘুভাবে বলল, "তবে সওদাগরি আফিসের বড়বাবুর ত্যাজ্যপুত্র বটে।"

আমি সংশোধন করে বললুম, "ত্যাজ্য নয়, ত্যাগী। তিনি আমাকে ত্যাগ করেননি, আমিই ত্যাগ করেছি তাঁকে।" রুদ্ধশ্বাস দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হলো।

তা হলে মালার বিশ্বাস এটা রূপকথার জগৎ। অদ্ভুত মেয়ে! ওর কপালে আছে মোহভঙ্গ। মোহভঙ্গ থেকে ওকে বাঁচাবে কে?

যা হোক, মাসিমাকে আমি ওসব কথা বললুম না। মালার জন্যে রাজপুত্রের অন্বেষণ করলুম। আমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ছিলেন দুবরাজপুরের যুবরাজ কুসুমাকর সিংহ রায়। দুবরাজপুর যে কোথায় তা আগে জানা ছিল না। কুসুমাকর কলকাতায় এলে কোনখানে থাকতেন তা আমি জানতুম। দুবরাজপুর হাউস বলে তিন তলা একটি বাড়ীতে। আলীপুরে। তিনি যেবার লণ্ডনে যান আমি তাঁর গাইড হয়েছিলুম। পরে তিনি আমার ছবি কিনেছেন। বয়স আমার চেয়ে কম। চেহারা আমার মতো কালো নয়। অবিবাহিত।

কুসুমাকরকে একদিন ধরে আনা গেল বুধবার সন্ধ্যায় বালীগঞ্জ অঞ্চলে। ঘুণাক্ষরেও তাঁকে জানাইনি যে মালার জন্যে আমরা পাত্র খুঁজছি। জানলে পরে তিনি সেদিন কলকাতা ছেড়ে উধাও হতেন। অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির ছেলে। গ্রাম্য পরিবেশে মানুষ হয়েছেন। কলকাতার নাগরিকদের তিনি বিষম ভয় করেন। পাছে কেউ তাঁকে পাড়াগেঁয়ে বলে হাসাহাসি করে। কেউ হাসছে দেখলেই তিনি ঘামে পেতে যেন। এমন মুখ করেন যেন কেউ তাঁর বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। লণ্ডনে তাঁকে আমি হাতে নিয়েছিলুম। সে কী রকমারি! ও দেশের মেয়েরা কারণে অকারণে খিল খিল করে হাসে। কুসুমাকর মনে করেন বিদেশিনীদের চোখে তিনি একটি গরিলা কি ওরাং ওটাং। স্বদেশিনীদের সম্বন্ধেও তাঁর একই রকম ধারণা।

মাসিমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বলি, "এঁরা উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট জমিদার। সেই বারো ভূঁইয়ার এক ভূঁইয়া। লণ্ডনে পড়েছেন।"

কুসুমাকর যথেষ্ট ভদ্রতার সঙ্গে আমার প্রতিবাদ করে বলেন, "উত্তরবঙ্গের নয়। পশ্চিমবঙ্গের। বিশিষ্ট নয়। সামান্য। জমিদার নয়। পতনিদার ও কয়লার খনির মালিক। বারো ভূঁইয়ার এক ভূঁইয়া নয়, ইংরেজ আমলের খেতাবধারী। লণ্ডনে পড়াশুনা করিনি। ডিনার খেয়ে টার্ম রেখেছি। পরীক্ষার ভয়ে পালিয়ে এসেছি।"

কী বিনয়! আমি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললুম, "হীয়ার। হীয়ার।"

মালার মাসতুতো ও মাসতুতো বোনেরা খিল খিল করে কী যেন বলছিল। আমার মনে হলো ওরা বলছে, বারো ভূতের এক ভূত।

কুসুমাকরকে একবার শিকারের কাহিনী বলিয়ে দিতে পারলে তিনি নির্ভীক। তখন সাহসই বা আছে কার যে হাসবে। বাঘ যে কত রকম চাতুরী করতে পারে, মানুষকে যে কত বড় বিপদে ফেলতে পারে, প্রাণ দেবার আগে প্রাণ নেবার জন্যে কত কাছে যে আসতে পারে সেসব কুসুমাকর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেন আর সাসপেন্স সৃষ্টি করেন। গায়ে কাঁটা দেয়।

"তার পর?" মালা প্রশ্ন করে ছোট মেয়েটির মতো গালে হাত দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে শুনতে শুনতে। যেমন শুনত ডেসডেমোনা ওথেলোর বীরত্ব অবদান।

"তার পর সেবারেও আমি বেঁচে যাই নেহাৎ পরমায়ু ফুরোয়নি বলে।" কুসুমাকর উত্তর দেন দু'হাত জোড় করে।

এই তো কেমন রাজপুত্র! এই তো কেমন বীরত্বের কাজ! মালা আর কী চায়? এক কাঁড়ি

টাকা আছে, কলকাতায় বাড়ী আছে, শিক্ষাও মন্দ নয়, স্বভাবটিও ভালো ! পরের বার অর্গ্যান বাজিয়ে ও অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে কুসুমাকর প্রমাণ করে দিলেন যে সাংস্কৃতিও বটে। ওর বিরুদ্ধে একটিমাত্র পয়েন্ট আমি দেখি। ওর বয়সটা মালার চেয়ে দশ এগারো বছর বেশী। পরে শুনেছিলুম ওর নাকি একবার বিয়ে হয়েছিল সতেরো আঠারো বছর বয়সে। সে বৌ বারো বছর বয়সে মারা যায়।

আমি কুসুমাকরকে বাজিয়ে দেখলুম। মালা যে কলকাতার মেয়েদের মতো নয় এটা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। আমার কাছে যখন শুনলেন যে, সে বর্ষায় মানুষ হয়েছে শকুন্তলার মতো তপোবনে, তখন বিশেষ আকৃষ্ট হলেন। বললেন, "বাড়ীর লোকের অমত না থাকলে আমারও কোনো আপত্তি নেই, দাদা।"

বাড়ীর লোককে একবার দেখাতে হবে। মাসিমা তা শুনে বললেন, "তা হলে বুধবার নয়। অন্য একদিন আমরা আলাদা একটা পার্টি দেব। বিকেলবেলা গার্ডন পার্টি। ওই বুধবারের দলটিকে আমি এড়াতে চাই।"

এসব ব্যাপারে মেসোমশায়ের পরামর্শ চাওয়াও হয় না, নেওয়াও হয় না। তিনি নির্লিপ্ত পুরুষ। তাঁর পড়ার ঘরে বসে অধ্যয়নরত। কিংবা তাঁর প্রাইভেট ল্যাবরেটরিতে গবেষণারত। আর নয়তো তাঁর তপোবনে ধ্যানরত। গার্ডন পার্টির দিন তাঁকে টেনে বার করা হলো ল্যাবরেটরি থেকে। তিনি একটি তরুবেদীতে আশ্রয় নিলেন। তাঁকে দেখলে মায়া হয়। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দুটো একটা কথা কয়ে আসি।

কুসুমাকরের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর কাকা রত্নাকর, তাঁর দুই ভাই করুণাকর ও কমলাকর আর তাঁর বোন লবঙ্গলতা ও ভগ্নীপতি মধুরামোহন। এই সব সম্মানিত অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে যখন মেসোমশায়কে নিয়ে আসা হলো তিনি এঁদের সাজসজ্জা দেখে হকচকিয়ে গিয়ে উর্দুতে বাতচিৎ শুরু করলেন।

যাক, সেদিন বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা কুসুমাকরকে মালার সঙ্গে নিরিবিলি বেড়ানোর সুযোগ ঘটিয়ে দিই। মালা দেখাচ্ছে আর কুসুমাকর দেখছে তপোবনের ওষধি বনস্পতি। আর আমরা দূর থেকে তাদের উপর নজর রেখেছি। ভোজনপর্ব চলেছে। মেসোমশায় লুকিয়ে সরে পড়েছেন তাঁর গবেষণাগারে।

একটা নারকেল গাছ ঘেঁষিয়ে দিয়ে মালা বলল কুসুমাকরকে, "ডাব খেতে ইচ্ছা করছে। পারবেন পেড়ে দিতে ?"

"পারব না ? আকাশের চাঁদ পেড়ে আনতে পারি, যদি আজ্ঞা পাই।" কুসুমাকর বললেন বীরের মতো সপ্রতিভ ভাবে।

মালা বলল, "সে আরেক দিন হবে। আজ ওই ডাবটাই পেড়ে দিন না।"

কুসুমাকর বললেন, "অত বড় মই পাই কোথায় ?"

[ক্রমশঃ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

সম্বুদ্ধ

অনেক বছর আগের কথা।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

এলগিন রোডের একটি বাড়ি। বড় বাড়ি, অনেক লোকজন, কিন্তু কেমন যেন নিঃশব্দ। আলো জ্বলছে; কিন্তু মানুষজনের কোলাহল নেই।

বুদ্ধ-পূর্ণিমার রাত। চাঁদের আলো বন্যার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে পৃথিবীতে। এই বাড়িরও ছাতে আর পাঁচিলে, জান্‌লা গ'লে ঘরের মেঝেয়, তার অকুণ্ঠ অবলুণ্ঠন। তবু সে আলোর কোন প্রতিফলন মানুষের মনে নেই।

দোতলার একটি ছোট ঘর। সুন্দর সাজানো। খাটের ওপরে, বুকে বালিশ দিয়ে, একটি মেয়ে নিঃশব্দে শুয়ে আছে। বয়স ২৬।২৭; অপূর্ব সুন্দর চেহারা। এই মুহূর্তে বেশবাস আগোছালো, চোখ কোলাকোলা, মুখ থমথমে লাল—যেন প্রচণ্ড একটা ঝড় চলছে ভেতরে; প্রাণপণে তাকে চেপে রাখতে চেষ্টা করছে। দুই হাত সামনে জড়ো করা, তার ওপরে থুতনিটি রেখে সামনে চেয়ে নিশ্চল শুয়ে আছে। চোখে দৃষ্টি নেই। চোখের কোণে জল নেই। কিন্তু জল থাকলে বোধ হয় বেঁচে যেত। মাথা খোলা, এলো চুল মুখের দুপাশ দিয়ে বেয়ে পড়ছে।

একটি মধ্যবয়সী ঝি, পাশে বসে, ওপরে পাখা ঘুরছে, তবু তার হাতে একটি হাতপাখা। বড়লোকের বাড়ির ঝি, সাক-সুতরো, সহবৎ জানে।

একজন শুয়ে একজন বসে, দু'জনেই নিশ্চুপ নিশ্চল। শুধু দু'একবার চাপা দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছে—খুব ধীরে ধীরে। যে নিঃশ্বাস ফেলছে মেয়েটি—শুধু শ্বাস টানবার সময়ে তাতা কাঁপনের শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে সে শ্বাসের আড়ালে আছে একটা বিরাট ক্রন্দন।

ঘরের পেছন-দেওয়ালে, মাঝখানে, দরজা। ভেজানো, বন্ধ নয়।

অনেকক্ষণ কাটল। তারপর হঠাৎ বাইরে নরম জুতোর শব্দ হ'ল। শব্দ এসে ঘরের বাইরে থামল। অতি মৃদু গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল—মানদা! একটু থামল তারু, আবার এল,—মানদা, বৌমাকে বল আমি যাচ্ছি।

মানদা ফিসফিস করে বললে, বড়বাবু। বৌদিমণি!

মেয়েটি নড়ল না, চোখ ফেরালে না।

গালের ওপর থেকে চুলের গোছা আলগোছে সরিয়ে দিলে মানদা, মাথার কাপড় টেনে দিলে, হাতের পাখা নিয়েই উঠে দাঁড়াল।

দরজা খুলে গেল। বড়বাবু ঘরে এলেন। দীর্ঘ গৌরবর্ণ মূর্তি, রূপবান্। পদক্ষেপে, কথার ভঙ্গিতে, আভিজাত্য পরিস্ফুট। পায়ে পাৎলা চটি, গায়ে হাতকাটা বেনিয়ান।

ঘরে ঢুকে মেয়ের কাছেই একটুকাল চুপ করে দাঁড়ালেন। একবার মেয়েটির দিকে তাকালেন তারপর ওপরে ছাতের দিকে, তারপর সামনের জান্‌লা দিয়ে বাইরে।

তারপর বললেন, মানদা, বৌমাকে বল, যেন অধীর না হন। আমি পুলিশে, হাসপাতালে, সর্বত্র খবর নিতে পাঠিয়েছি, এখন অবধি কোন খবর পাইনি। দুঃসংবাদ হলে এতক্ষণ চাপা থাকত না।

একটু থেমে আবার বললেন, বলো, আমি নিজে টেলিফোন ধরেই বসে আছি। কোন খবর এলে তক্ষুনি জানিয়ে দেব। উনি যেন চিন্তা না করেন।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। মানদা আবার বসল। পিঠের ওপর আলগোছে হাত রেখে বললে, শুনলে ত, বৌদিমণি। কোন চিন্তা নেই, তারা নিশ্চয় ভাল আছে।

মেয়েটি কথা কইলে না। একবার হয়ত শুধু মুখটা একটু উঁচু করে তুলল, চোখের দৃষ্টি একবার ওপরে উঠ্‌ল, আর-একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস পড়্‌ল। দেহটা সামান্য একটু নড়েচড়ে উঠ্‌ল কি উঠ্‌ল না, আবার, তেম্‌নি করেই শুয়ে পড়ে রইল।

কলকাতার মিউজিয়াম।

একতলায়, ঢুকে ডানদিকের বড় ঘর—সে ঘরে পাথরের মূর্তি আর গেটগুলো সাজানো। এখনকার মত নয়, ত্রিশ বছর আগে যেমন ছিল। তারও ডানদিকের—দক্ষিণ দিকের ঘরে আছে মোহেন্‌জোদারো আর প্রস্তরযুগের জিনিস, মাঝখানে কাচের কেসে ইজিপ্টের মমী, মুখের হাড় বার করা।

প্রথম ঘর থেকে পূর্বদিকের বড় ঘরে যাবার পথে সরু ঘর, তাতে ঢুকে ডানহাতি গ্যালারিতে পাথরের অপ্সরামূর্তি, গ্যালারির শেষে একেবারে দক্ষিণ জানালার গায়ে, দুইপাশে দুইজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—মুণ্ডহীন কপিঞ্জ আর লাল পাথরের অম্বিতাভ বুদ্ধ। বুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন পূবমুখো হয়ে, কপিঞ্জের মুখ থাকলে সেটা পশ্চিমমুখো হ'ত।

রাত আটটা। মূর্তির ঘর অন্ধকার। শুধু বন্ধ শার্সির মধ্য দিয়ে চৌরঙ্গী রাস্তার আলোর খানিকটা আভাস এসে ঘরে ঢুকছে, আবছা আলোয় ভরে দিয়েছে ঘরটিকে। মানুষকে দেখা যায়, তার মুখ চোখ স্পষ্ট দেখা যায় না।

মমীর ঘর থেকে পায়ের শব্দ এল। ছোট ছোট পা, দু'জোড়া, দৌড়ে আসছে। ঘনঘন নিঃশ্বাসের শব্দ।

পা এসে থাম্‌ল এই ঘরে। আবছা আলোয় ব্যক্তি-দুটিকে দেখা গেল। বড়টি হোল বছর আটেক বয়স। ছোটটি মেয়ে, বছর ছয়েক।

এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, হাঁপিয়ে নিলে। যেন দম ফেরাচ্ছে। তারপর মেয়েটি বললে, বাবাঃ কী ভয় পেয়েছিলাম!

ছেলেটি হাঁপাচ্ছে তখনও। মেয়েটি বললে, কি হ'ল। কথা বলছিস না কেন।

ছেলেটির গলা স্বাভাবিক হয়নি। বললে, কি বলব বল্।

—কথা বলবি। নইলে ভয় করে-যে।

—করবেই তো।

—বাবাঃ, আমার যা হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, মাস্টা ঠিক এইবার হাত বাড়িয়ে আমাদের ধরে ফেলবে।

—চুপ কর।

—কি হবে এখন, ও দাদা। সব তো বন্ধ। বাড়ি যাব কি করে।

—যাব না আর।

—যাব না তো কি করব। এইখানেই বসে থাকব সারা রাত?

—থাকতে হবে না বেশীক্ষণ। মাস্টারা ঘরে এই দেখ্‌না গপ্ করে গিলে ফেলে দেবে।

—ভয় দেখাবি না, ভাল হবে না বলছি। মাকে বলে দেব দেখ্‌বি।

—বল্‌বি, মাকে পাচ্ছিস কোথা।

—কেন?

—যার সঙ্গে আর দেখা হচ্ছে না। আজ বেঁচে থাকলে তবে তো।

—আবার। বলছি ভয় দেখাস্ নে! তোর জন্যেই তো হ'ল।

—আমার জন্যে?

—নয় তো কি। যুৎ—ঐ দিকটাতে চল। এখানে সব খালি কালো কালো ছায়া—ভয় করছে।

দুজনে হাত ধরাধরি করে, এগিয়ে গেল, সরু গ্যালারিতে। বাইরে পূব-আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদকে দেখা যায় না। কিন্তু তার আলো ঘরে এসে পড়েছে শার্শির ভেতর দিয়ে, বুদ্ধের মুখে তার আভাস।

ছেলেটি বললে, এখন তারি 'ভয় করছে', তো এলি কেন?

—তুই তো নিয়ে এলি।

—তুই তো আসতে চাইলি। ঘ্যানঘ্যান করতে লাগলি। চল্ ভাই, দাদা ভাই, কক্ষনো মিউজিয়াম দেখিনি।

—আমি তো ছোট। ছোটরা কত কথা বলে। বললাম বলেই তুই নিয়ে এলি?

—আচ্ছা। আমি বড় দাদা না? বড়দের কাজই হচ্ছে ছোটদের নিয়ে যাওয়া।

—বেশ। এবার ফেলুক ভূতে খেয়ে।

—ভূত কোথা?

—মাস্টারাই তো ভূত। কেন তুই এলি?

—বা। তুই কেন ঘুমিয়ে পড়লি।

—ঘুম পেল-যে। তুই কেন ডাকিস নি? তুই তো বড়।

—আমারও-যে ঘুম পেল। জেগে উঠে দেখি সব অন্ধকার।

—এখন কি করব আমরা?

—কে জানে। ভয়েই মরে যাব।

—না। চল ঐদিকে যাই। তাহলে মাস্টাটা আমাদের দেখতে পাবে না।

—তারপর কি হবে ?

—ঐদিকে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে বসে থাকব। ভূতেরা যদি খেয়ে না ফেলে, তবে কাল যখন আবার খুলবে, তখন বাড়ি চলে যাব।

—চল।

দুজনে হাত ধরে এগিয়ে গেল। সরু বারান্দাটিতে, ডান দিকের পাখায়, জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। আবছা আলো এইখানটাতে স্পষ্টতর। অপ্সরা মূর্তিকে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ছেলেটির নাম বুবুল। মেয়েটির নাম টুটুল।

টুটুল বললে, এটা কিরে, দাদা ?

বুবুল বললে, অপ্সরা। অপ্সরা কাকে বলে, জানিস ?

—জানি। স্বর্গে থাকে। নাচে। তাদের রাণীর নাম উর্বশী। কিন্তু, পাথরের অপ্সরা নাচে কি করে ?

—দূর বোকা। সত্যিকার অপ্সরা তো নয় এটা। সে অন্যরকম।

—কি রকম ?

—কে জানে ? এটা হচ্ছে পাথর দিয়ে বানানো। অপ্সরার মত করে।

—এইটে অপ্সরার মত ! ত্যাট্ !

—আরে, এটা তো পাথর। সে আসল অপ্সরা হচ্ছে—মানে একেবারে ইয়ে। এটা তার পুতুল। ঐ ভাখ না—বুদ্ধদেবের পুতুল, কণিষ্কের পুতুল।

টুটুল কণিষ্কের মূর্তির দিকে তাকালে। চোখে ভয় ফুটে উঠল। বুবুলের পায়ে ঘেঁষে এল, তার হাতটাকে শক্ত মুঠো করে ধরল দুইহাতে।

বুবুল বললে, কি রে। ভয় করছে ?

টুটুল সবেগে মাথা নেড়ে জানালে, না। কিন্তু হাতের মুঠি ঢিলে করল না।

বুবুল দাদা হ'য়ে তাকে ঘিরে ধরল দুই হাত দিয়ে।

টুটুল দাদার হাতের ফাঁক দিয়ে—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। বললে, কিন্তু, কণিষ্ক তো খুব মস্ত বড় রাজা। তাহ'লে তার মুণ্ডু নেই কেন ?

বুবুল বললে, সবার কি সব থাকে।

—যাঃ। ছিল, ভেঙে গেছে।

—কিন্তু তলোয়ারটা দেখেছিস। কী মস্তবড়।

—যদি ভেঙে আসে ঐ তলোয়ার দিয়ে ?

—ভাগ্। ভেঙে আসবে কি করে। ও তো পাথর।

—আমার ভয় করছে।

—দেখিসনে ওকে। এইদিকে ফিরে থাক।

টুটুল বুবুল কণিষ্কের দিকে পেছন করে দাঁড়াল। লাল বেলেপাথরের প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি সামনে দাঁড়িয়ে।

টুটুল। এ কে রে ?

বুবুল। বুদ্ধ।

—বুদ্ধদেব? কপিলাবস্তু নগরীর?

—হ্যাঁ। বল তো নগরী কি?

—আচ্ছা। নগরী মানে রাজ্য।

—খুব। রাজ্যের নাম ছিল শুদ্ধোদনা। কপিলাবস্তু, টাউন, রাজধানী।

—কিন্তু, কী সুন্দর। একটুও ভয় করছে না দেখে।

—করবেই না তো।

—কেন, এটাও তো পুতুল। কপিলকে দেখে কেন ভয় করল তবে?

—কপিল যুদ্ধ করত। মানুষ মারত। বুদ্ধ যুদ্ধ করতেন না। অহিংসা করতে বলতেন। জানিসনে, হাঁসের গল্প।

—হ্যাঁ।

—তবে? তিনি ভালবাসতেন সবাইকে। তাই তাঁকে দেখে ভয় করে না। বাবা বকে, তাই বাবাকে ভয় করে। দাদুকে দেখে করে? করে না তো? সেইরকম।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। ক্লান্তি লাগছে। টুটুলের হাই উঠল। বুবুলেরও ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু সে দাদার মহিমা রক্ষার্থে প্রাণপণে জেগে থাকবার চেষ্টা করছে।

রাত বাড়ছে। চাঁদ ক্রমে ওপরে উঠছে। এখনও দেখা যাচ্ছে না তাকে, কিন্তু শালির ভেতর দিয়ে তার আলো বুদ্ধের মুখের ওপর এসে পড়েছে, সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দু'জনে বসে। পা ভেঙে আসছে, চোখ ঢুলে পড়ছে। শেষটা টুটুল আর পারল না—

টুটুল। দাদা, ঘুম পাচ্ছে।

বুবুল। ("দাদা") ঘুমো না।

—কি করে ঘুমুব?

—আমি বলছি। আমার কোলের ওপর মাথা রেখে তুই শুয়ে পড়্।

—তুই ঘুমুবি না?

—আমি জেগে থাকব।

—তোর ঘুম পাচ্ছে না?

—না। আমি জেগে থাকব। তুই ঘুমো।

বুবুল বসল। টুটুল শুয়ে পড়ল।

একটু পরে বললে, ধুৎ। ঘুমুতে পারছি না।

বুবুল বললে, ঠিক হ'য়ে যা।

—ভয় করছে।

—কিসের ভয়। আমি তো জেগে আছি। বলছে, কিন্তু বুবুলেরও গলা কাঁপছে একটু একটু।

টুটুল। যদি সত্যি যদি কেউ আসে, তুই কি করবি?

বুবুল। (ভয়ে ভয়ে) কে আসবে?

—যারা আসে।

—ওসব বলিস নে। বলতে নেই। শুনতে পাবে।

—শুনতে পাবে?

—হ্যাঁ। ভয় পেয়েছি জানতে পেলেই তেড়ে আসবে। ভয় যে পায় ভয়ও তাকেই পায়।

—কিন্তু সত্যি-যে ভয় করছে। ঐ কণিষ্কটা। হাত বাড়ালেই তো ধরে ফেলবে।

—তাকাসনে ওর দিকে। বুদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাক। একদম অন্যদিকে চোখ ফেরাবি না।

চাঁদের আলো আরও প্রখর হয়েছে। বুদ্ধের মুখ উদ্ভাসিত।

টুটুল। আচ্ছা দাদা, বুদ্ধ তো ভাল?

বুবুল। নিশ্চয়ই।

—তাহলে, বুদ্ধ তো মারবে না? কণিষ্ক যদি মারতে আসে, বুদ্ধ আমাদের?

—কি ক'রে?

—যা ক'রে করে। কণিষ্ককে বলবে, খবরদার মারতে পাবে না।

—বলবে? কি জানি।

—কেন বলবে না? আমরা হারিয়ে গেছি, আমাদের ভয় করছে—কণিষ্ক যদি তা টের পায়, বুদ্ধ পাবে না কেন?

—তা পাবে। ঠিক বলেছিস। পণ্ডিত-স্যার বলেছেন, ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্।

—তার মানে?

—মানে হচ্ছে, ধর্ম নিজে এসে ধার্মিককে রক্ষা করেন। ধর্ম হচ্ছে বুদ্ধ। বুদ্ধধর্ম বলে, জানিস?

—ধার্মিক কাকে বলে?

—যারা ধর্মকে মানে, ভালবাসে।

—আমরা কি ধার্মিক?

—হ্যাঁ। আমরাও তো ভালবাসি বুদ্ধকে।

—সত্যি। কী সুন্দর, ঠিক দাদু যখন আপিস থেকে ফিরে এসে আমাদের ডাকেন, তেমনি করে মুখটা। না রে?

—হ্যাঁ। তবে আর কি। বুদ্ধই রক্ষা করবেন।

—আয় আমরা বুদ্ধকে বলি। কি বলে যেন ডাকতে হয়, মেয়রকা বলল সেদিন?

—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধর্মং শরণং গচ্ছামি। সংঘং শরণং গচ্ছামি।

—সংঘং কি রে?

—কে জানে। হবে কি একটা।

—মানে না জানলে ব'লে কি হবে। ওসব থাক, আমরা আয় শুধু বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি বলি।

—সবটা না বললে যদি বুদ্ধ রাগ করে?

—ধুৎ। রাগ করবে কেন। বুদ্ধ কি খারাপ লোক, কণিষ্কর মত? বুদ্ধ ঠিক বুঝবে আমরা বলতে পারছি না, ব'লে তাই বলছি না, আমাদের কিছু দোষ নেই।

—বেশ, তাই বল।

টুটুল উঠে বসল। দুজনে খুব ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসল, গায়ে গা লেপ্‌টে, তাতে তবু একটু সাহস পাওয়া যায়। তাদের পেছনে কণিষ্ক, তাকে ভুলে থাকবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে দু'জনে। কণিষ্কের পাদপীঠ তাদের পিঠের কাছে; সতর্ক হয়ে রয়েছে যেন সেটা পিঠে না ঠেকে। দুই হাত কোলের ওপর জড়ো করে দু'জনে বসল।

টুটুল। কি রকম ক'রে বলে রে? মেজকা বলছিল কিরকম সুর করে বলতে হয়।

বুবুল। সুর জানিনে তো। থাকগে, সুর ভুল হয়ে গেলে হয়তো বুঝতেই পারবে না কি বলছি। তার চেয়ে এমনিই বলি আয়।

দু'জনে, প্রায় অস্পষ্ট দ্রুতস্বরে, বলতে শুরু করল—বুদ্ধ বুদ্ধ বুদ্ধ, তুমি রক্ষা কর—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—আমাদের ভয় করছে বুদ্ধ, তুমি এসো না! বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—

নিশ্চল দেহ, একাগ্র কণ্ঠ, দুই চোখের স্থির দৃষ্টি বুদ্ধের মুখের ওপরে।

কতক্ষণ ধরে বলল কে জানে। অনেকক্ষণ।

টুটুল এক-একবার একা-একা বলছে, ও বুদ্ধ, এসো না। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে যে—এস চলে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—

চাঁদ জানলার সোজা উঠে এল। চাঁদের আলোয় ঘরের সে জায়গাটা প্লাবিত হ'য়ে গেল। বুদ্ধের মূর্তিকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। দুজনে আরও একাগ্র হ'য়ে বলে যাচ্ছে—বুদ্ধ বুদ্ধ বুদ্ধ, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—

বলতে বলতে তাদের চেতনা জুড়ে তন্দ্রা নামছে, ঘরের সব-কিছু আবছা রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে, প্রাণপণে বলে চলেছে দু'জনে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধ বুদ্ধ, এসো এসো, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—

বুদ্ধের ঠোঁট কি নড়ে উঠল? দু'জনেরই মনে হল, হ্যাঁ, নড়ছে ঠোঁট। গলার আওয়াজ নিঃশব্দ হয়ে গেল, শুধু ঠোঁট নেড়ে দু'জনে বলতে লাগল, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—

এবার সত্যিই নড়ে উঠল ঠোঁট। খুব মৃদু, মিষ্ট কণ্ঠ শোনা গেল, ভয় নেই।

টুটুল নিঃশব্দে দাদাকে ঠেলে দিলে, বললে, শুনলি?

বুবুল তেমনি নিঃশব্দে বললে, চুপ্‌।

বুদ্ধমূর্তির ঠোঁট আবার পাথর হয়ে রইল। চাঁদের দীপ্তি তেমনি জ্বলতে লাগল।

আরও অনেকক্ষণ পরে। চাঁদ পশ্চিমে হেলেছে। বুদ্ধমূর্তির ওপরে ছায়া পড়েছে। শুধু একটি রশ্মি বাঁকা হয়ে এসে মেঝেয় পড়েছে। সেই আলোটুকুর মধ্যে নিবিড় জড়াজড়ি করে শুয়ে ভাইবোন ঘুমুচ্ছে।

৩

পরদিন। বেলা এগারোটা।

এলগিন রোডের বাড়ি ক্লান্ত, হতাশ, অবসন্ন। সারা রাত বাড়ির কেউ ঘুমোয় নি—ঘণ্টায় ঘণ্টায় লোকের ছুটোছুটি আর টেলিফোন, শহরের বাইরেও যেখায় যেখায় টেলিগ্রাম, ট্রাংককল। ছেলেমেয়ের কোন খোঁজই নেই।

দোতলার ঘরে বুবুল-টুটুলের মা সেই একভাবেই শুয়ে; মানদা ঠিক তেমনি করে পাশে বসে। কাল রাতে মনে হয়েছিল বুঝি চোখমুখ ফেটে রক্ত বেরুবে। আজ মনে হচ্ছে যেন একটি গাছের ডাল, তার সমস্ত পাতা আগুনে ঝলসে গেছে। মানদা নিঃশব্দে বসে আছে। কিছু বলছে না, বলবার কথা নেই কিছু। এ বাড়িতে যে মানুষ আছে, বলে দিলেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

গেটের গায়ে বাঁধা কুকুরটা হঠাৎ কাঁপিয়ে পড়ে ডেকে উঠল—আদরের ডাক, উল্লাসের ডাক,—লাফিয়ে এক্ষুণি শিকল ছিঁড়ে ফেলবে এমনই উতলা।

বড়বাবু মুখ ফেরালেন না, স্থির স্বরে বললেন, কে?

বাইরে চাকরদের একজন চিৎকার করে উঠল—এসেছে, এসেছে।

—কে?

—কে এসেছে?

—কে এসেছে?

ঘুমন্ত পুরী হঠাৎ জেগে উঠল ধড়মড় করে। মুহূর্তের মধ্যে বাড়িসুদ্ধ এসে উঠোনে জমে গেল, যে যেভাবে ছিল। আব্রুর বালাই নেই, নিয়ম নেই। বুবুল-টুটুলের মা ছোড়ে গিয়ে তাদের সামনে পড়লেন, হুঁশই নেই যে বড় ভাশুরকে ঠেলা মেরে দিয়ে গেছেন।

সবাই মিলে কলরব। হঠাৎ কলরব থেমে গেল। বুবুল-টুটুলের বাবা ধীর গতিতে নেমে এলেন। রাসভারী মানুষ, সবাই ভয় করে। এগিয়ে এলেন, সবাই পথ ছেড়ে দিলে। বুবুল-টুটুলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। গম্ভীর মৃদু-গলায় বললেন, কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

বুবুল চোঁক গিলল। বললে—আমরা—বুদ্ধদেব—

টুটুল তাকে টিপে দিলে। ফিস্‌ফিস্ করে বললে, চুপ কর, ওরা বুঝবে না।

টুটুল সামনে এগিয়ে এল। বড় বড় দুটি চোখ তুলে বললে, আমরা হারিয়ে গিয়েছিলাম।

আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। রবীন্দ্রনাথ

ভানুমতী

চিত্তরঞ্জন মাইতি

[সমুদ্র থেকে উঠে আসে মৌসুমীর মেঘ। পশ্চিম ঘাট পর্বতমালায় বৃষ্টি হয়। তার পর সেই মেঘ ভেসে আসে বিন্ধ্যপর্বতে। শীতল বর্ষাধারার আশীর্বাদ লাভ করে বিন্ধ্যের নত মস্তক। একটি মেঘধারা চলে যায় পূর্বাকাশে। অন্য শাখা আসে আরাবল্লীতে। আরাবল্লীর পূর্বভাগ ধারাস্নানে সিক্ত হয়। অঞ্চলের মাটিতে তাই যৌবনের চল নামে। অফুরন্ত ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ এ জনপদ। আরাবল্লীর পশ্চিমে বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল। সেখানে অনন্ত তৃষ্ণা। বিপন্ন জুড়ে ধূ ধূ দগ্ধ মরু প্রান্তর। মাঝে মাঝে বালির পাহাড় তৃষার্ত মরুর স্তবের মত জেগে আছে।

কচিৎ এখানে বৃষ্টি হয়। অমনি বালির পাহাড়ের কোলে সৃষ্টি হয় লবণাক্ত হ্রদ। সেই হ্রদ থেকে কখনো বেরিয়ে আসে একটা স্রোতস্বতী। সারা বেহে তার লবণের আলো। কিছু পথ গিয়ে সে জলধারা হারিয়ে যায় মরুপ্রান্তরে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। মরুভূমির বুকে কোথাও কোথাও জেগে আছে শিলাস্তূপ।

এমনি কতকগুলি অনুচ্চ পাহাড় আর ধূ ধূ মরুভূমি নিয়েই গড়ে উঠেছে জয়শলমীর রাজ্য। এ রাজ্যের অধীশ্বর রাণা গহর। জয়শলমীরের অধিবাসীরা রাণার অধীন, কেবল একদল বেদুইন ছাড়া। তারা মরুভূমির বুকে বাস করে নয়টি বালির পাহাড় ঘেরা দুর্গে। তারা ঘুরে বেড়ায় মরুপথে। এ পথটিকে রাজপুতনার অধিবাসীরা বলে, মৃত্যুপথ। যে সব যাত্রী এই পথে যাতায়াত করে, তাদের বিত্ত হরণ করে বেদুইনরা সংগ্রহ করে তাদের জীবিকা। ঐ নয়টি দুর্গের মাঝে একটি মরুস্থান আছে। শক্তিমান বেদুইন সর্দার কৈলুন সেই মরুস্থানের মাঝে তৈরী করেছিল সুবিশাল এক শিলাদুর্গ। এক সময় কৈলুনের মৃত্যু হল। তখন বিবাদ আরম্ভ হল দলপতি নির্বাচন নিয়ে। শেষে সমস্ত দল মৃত কৈলুনের কন্যা শিলাদীকেই নেত্রী নির্বাচন করল। এ ধরণের নির্বাচনের পিছনে অবশ্য একটি কারণ ছিল। কৈলুন কেবল নেতা ছিল না, সে ছিল এক দক্ষ যাদুকর। শিলাদী পিতার কাছ থেকে সেই আশ্চর্য যাদুবিদ্যা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল। যাদুর কৌশলে সে মরুভূমির বুকে সৃষ্টি করতে পারত মরুস্থান। দূরাগত যাত্রীরা সেই উদ্যানের শোভায় আকৃষ্ট হত। বেদুইন দস্যুরা সেই সুযোগে হরণ করত তাদের ধনসর্বস্ব।]

শিলাদী তাকিয়েছিল। দুর্গের গবাক্ষরন্ধ্রে সে দেখছিল দিগন্তজোড়া মরুভূমি। আকাশ থেকে আগুনের রাশি রাশি ফুলকি ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। জ্বলছে সারা মরুপ্রান্তর। কী ভাবছে শিলাদী! কী দেখছে ঐ আগুন জ্বলা মরুভূমির বুকে দুটি চোখ মেলে দিয়ে। মরুর বুকে যে তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা আজ শিলাদীর বুকে।

এখানে আকাশ ছেয়ে নেমে আসেনা মৌসুমী। ঘোর অন্ধকারে ঢেকে যাবে এই তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালাময়ী আলোর আগুন। আঁধি উঠবে। ছিঁড়ে খুঁড়ে যাবে দিগদিগন্তে। সেই আঁধার, সেই ঝড় আজ কামনা করছে শিলাদী।

এমন সময় দূর থেকে শৃঙ্গধ্বনি শোনা গেল। এ ধ্বনির অর্থ জানে শিলাদী। বেদুইনের দল নতুন কোন শিকারের সন্ধান পেয়েছে। সেই শিকারকে তুলিয়ে আনবার জন্যে তাকে মায়াজাল পাততে হবে।

লুণ্ঠনের সময় অবশ্য দরকার হয় না শিলাঙ্গীর। সে সহ্য করতে পারে না আহতের আর্তনাদ। তার মনে হয় নির্জন দুর্গে একাকী ঘুরে ঘুরে তার যেমন মাঝে মাঝে এমন আর্তনাদ করে, এর সঙ্গে কোথায় যেন তার যোগ আছে।

দুর্গের শিখর থেকে শিলাঙ্গী তাকিয়ে ছিল। সহসা দূর দিগন্তের এক বিন্দুতে তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। বাদলের সংকেত পেয়ে যেমন পিপীলিকার দল শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সহসা তাদের গোপন গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনি দিগন্তের আড়াল থেকে একটি দল বেরিয়ে এল। প্রথমে বিন্দু। তারপর সে বিন্দু স্পষ্টতর হল। ক্রমে কাছে আসতে দেখা গেল নাতিদীর্ঘ এক শোভাযাত্রা। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল শিলাঙ্গী। প্রথমে সজ্জিত কয়েকটি উট। তাদের ওপর বসটি সুবেশা কন্যা, হাতে তাদের প্রদীপ। একটি উট বিশেষভাবে সজ্জিত। কিন্তু তার চারদিকে আবরণ। আরোহীকে দেখা যায় না। তার ঠিক পেছনেই অশ্বারোহণে এক যুবা পুরুষ। অপরূপ সজ্জা তাঁর। যোদ্ধার বেশ। এমন মূর্তি কোনদিন চোখে পড়েনি শিলাঙ্গীর! তারপর আবার উটের সারি। কয়েকজন যোদ্ধা পুরুষ। অস্ত্র আসবাব সামগ্রী। শিলাঙ্গী মুগ্ধ দৃষ্টিতে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল যুবা পুরুষের দিকে।

আবার শৃঙ্গধ্বনি হল। এবার শিলাঙ্গীকে তার যাদু বিস্তার করতে হবে। শৃঙ্গধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল সমস্ত দলটি। কিন্তু এ কি হল। যাত্রীর দল মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেন, আকাশ আর আগুন ঢালা সূর্যের আলো নেই। ওর ওপর কে যেন লঘু মেঘের একটা আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে। কিছু পরেই শুরু হল ঝিরঝিরে বৃষ্টি। নুক্তোর দানার মত সারা বালু প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ল বৃষ্টির ধারা। একটা উল্লাসের কলরব শোনা গেল যাত্রীদের ভেতর। যোদ্ধারা ভারী পোশাক খুলে রেখে বৃষ্টির ধারায় ভিজতে লাগল। শিলাঙ্গী দেখল, আবরণ ঘেরা একটি উটের ওপর থেকে একটি মুখ বেরিয়ে এল। ঘোমটা ফাঁক করে সেও দেখতে লাগল সেই বিচিত্র বর্ষণ। শিলাঙ্গী চোখ ফেরাতে পারল না। নারী এত সুন্দর। অশ্বারোহী পুরুষটির পাশে এই নারীটিকে কল্পনা করে সে বুঝল এরা বর-বধূ। কোন রাজপুত বিবাহ যাত্রী এরা। যাদু বিস্তার করেছে শিলাঙ্গী। কিন্তু কী এক অবাক যন্ত্রণায় ভরে গেল তার মন। সপ্তদশী মেয়েটা তার কান্নার ওমরে ওমরে উঠতে লাগল! যাদুর বর্ষণের সঙ্গে বুঝি মিশে গেল শিলাঙ্গীর চোখের ধারা।

যোদ্ধাদের অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগ নিল বেদুইনের দল। একটা তীক্ষ্ণ তীব্র চীৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল যাত্রীদের ওপর।

শিলাঙ্গীর কাজ শেষ হয়েছে। সে আর থাকবে না এ দৃশ্য দেখবার জন্যে। দুর্গের শীর্ষ থেকে সে নেমে এল নীচে। যে জলাধারটি দুর্গ বেষ্টন করে গেছে তার ভেতরে সে দেখতে লাগল নিজের দেহের ছায়া। জল কাঁপছে। তার ভেতর কি এক উদ্বেল আবেগে থরথর করে কাঁপছে তার সপ্তদশী যৌবনশ্রী।

লুণ্ঠন শেষ করে একটি বেদুইন খবর দিয়ে গেল শিলাঙ্গীকে। এই রীতি চলে আসছে শিলাঙ্গীর নেত্রী হবার পর থেকে। দুটি যোদ্ধা হত হয়েছে। অন্যদের সর্বস্ব হরণ করে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। দুটি যোদ্ধা হত হয়েছে! সংবাদ শুনে কেঁপে উঠল শিলাঙ্গীর বুক। তাহলে সেই যোদ্ধা যুবক। কি পরিণতি হয়েছে তার। শিলাঙ্গী সংবাদটি বেদুইনটিকে জিজ্ঞেস করে জানল প্রবল শক্তিশালী সেই যুবককে বেদুইনরা যুদ্ধে আকর্ষণ করে বলভ্রষ্ট করে দিয়েছে। তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

একটা অস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শিলাঙ্গী।

কতক্ষণ কেটে গেল। রক্তকরণ হতে হতে সূর্যের আয়ু নিভে এল একসময়। বালি পাহাড়ের

আড়ালে চন্দ্রোদয় হল। শিলাদুর্গ থেকে অশ্বারোহণে বেরিয়ে এল শিলাঙ্গী। মরুভূমির ধারে ন-টি অতি উচ্চ বালির স্তূপ। চন্দ্রের বিপরীত দিকে দীর্ঘ ছায়া পড়েছে তাদের। ধূ ধূ প্রান্তরে অস্পষ্ট ম্লান জ্যোৎস্না। সমস্ত প্রকৃতি রহস্যময়। বেদুইনদের দু-একটা কুকুরের ডাক দূর থেকে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। শিলাঙ্গী খুঁজে চলেছে সেই ঘোড়াকে, যে তার মনে এক অব্যক্ত ব্যথার স্পর্শ রেখে দিয়ে গেছে।

নির্জন মরুর বুকে সে ঘুরল কতক্ষণ। মনে পড়ল 'লুনী' নদীর কথা। যদি জলের খোঁজে সেদিকে গিয়ে থাকে। কিন্তু এখন ত সে নদী সম্পূর্ণ শুষ্ক। 'লুনী'র তীর অবধি আর আসতে হল না শিলাঙ্গীকে। প্রথমেই চোখে পড়ল একটি নুড় অশ্ব। ইতস্তত খোঁজ করতেই পাওয়া গেল অশ্বারোহীকে। শিলাঙ্গী পরীক্ষা করে দেখল, দেহে প্রাণ রয়েছে, কিন্তু তৃষ্ণায় সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন।

বেদুইনকন্যা তাকে তুলে নিয়ে এল শিলাদুর্গে। পিতা কৈলুনের মৃত্যুর পর নিভৃত নির্জন দুর্গে সে একাকী কাটিয়েছে। বলের নেত্রী সে, তাই তার পক্ষে সংসারজীবন নিষিদ্ধ। মন কেঁদেছে। কিন্তু সে বোবা কান্না পাষাণ প্রাকারের বাইরে যেতে পারে নি, ফিরে এসেছে নিজের কাছে। আজ তার বন্দী মন হঠাৎ মুক্তির স্বাদ পেল। কেমন এক মমতায় ভরে উঠল তার হৃদয়। সে নেত্রী নয়—নারী, এমনি একটা অনুভূতি তার সমস্ত চেতনাকে নাড়া দিয়ে গেল। শিলাঙ্গী অচৈতন্য মানুষটির সেবায় তৎপর হয়ে উঠল। সারারাত্রি ধরে চলল আহতের সেবা। অসংলগ্ন কতকগুলি কথা থেকে সে বুঝল অমরলমীরের কুমার তার আশ্রয়ে। বিবাহ শেষে ফিরছিল আপন রাজ্যে। একটি নাম কুমারের মুখে বার বার সে উচ্চারিত হতে শুনল, সে নাম যোধপুর রাজদুহিতা উদাবাঈএর। শিলাঙ্গীর চোখের ওপর ভেসে উঠল আর একটি মুখ। ঘোমটার আড়ালে আশ্চর্য সুন্দর সে মুখের ছবি। যাদুকরী শিলাঙ্গীর মুখ অদ্ভুত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শেষ রাত্রি। শুকতারা আকাশে মল মল করছে। চাঁদের আলো দুর্গের রঙ্গপথে এসে পড়েছে আহতের শয্যায়। কুমার চোখ মেলে তাকাল। সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টি। পরক্ষণেই আবার চোখ বন্ধ করল। আবার তাকাল। এ আমরা কোথায় রয়েছি উদাবাঈ! উদাবাঈ ইংগিতে কথা বলতে বারণ করল। আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেননি কুমার, বেদুইন সর্দারের কন্যার দয়ায় আমরা তারই দুর্গে আত্মগোপন করে আছি।

চোখ বন্ধ করল কুমার শরণসিংহ।

শিলাঙ্গী সরে এল শয্যার পাশ থেকে। দ্রুতপায়ে সে এসে দাঁড়াল দুর্গসংলগ্ন জলাধারের পাশে। নিজের কামনার এমন আশ্চর্য রূপ সে দেখবে, এ যেন তার কল্পনারও অতীত। ছায়া পড়েছে জলে। শিলাঙ্গী তাকিয়ে আছে সেদিকে। মনের কামনায় সে হয়ে গেছে উদাবাঈ। অবাক হয়ে শিলাঙ্গী দেখছে উদাবাঈকে। আর উদাবাঈএর মন নিয়ে দেখছে অমরলমীরের রাজকুমারকে। আজ তার যাদুকরী জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ খেলার মুখোমুখী এসে সে দাঁড়িয়েছে। যাদুমন্ত্রী শিলাঙ্গী হয়ে গেছে শরণ সিংহের মানসলক্ষ্মী উদাবাঈ।

শিলাঙ্গী আজ বধূ। মরুভূমির বুক জুড়ে আজ সত্যই মৌসুমী নামল। অজস্রধারায় সিক্ত হল মরুভূমির বুক, সিক্ত হল শিলাঙ্গীর তপ্ত হৃদয়। শরণ সিংহ সেই শিলাদুর্গ থেকে শুধু দেখল তার নব পরিণীতা বধূর মুখ, পেল তার অফুরন্ত সেবা আর উত্তপ্ত সান্নিধ্য। দিনে দিনে মাস কাটল। ঋতুচক্রে আবার ফিরে এল নতুন বছর। দুর্গে বসে বসে শরণসিংহ ভেবে চলল মুক্তির উপায়। উদাবাঈকে এক সময় কাছে ডেকে বললেন, কি করে আমরা মুক্ত হই উদাবাঈ। সেই বেদুইন কন্যা, কি পারেনা আমাদের মুক্তির পথ দেখিয়ে দিতে?

অদ্ভুত এক হাসি ফুটে উঠল উদাবাঈএর মুখে। সে হাসি আশার কি বেদনার তা বোঝা গেল না।

উদাবাঈ বলল, পৃথিবীর বুক থেকে আমায় সরিয়ে হাতে তোমায় লাভ করতে চায় বেদুইন কন্যা। তাই আজও আমরা তাঁর কৃপার বন্দী হয়ে আছি। শরণসিংহ কথাটিকে পরিহাস বলে ধরে নিয়ে বললেন, পরিহাস করোনা উদাবাঈ। এ বন্দীজীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

নতমুখে বসে রইল উদাবাঈ। সত্যই ত এ বন্দীজীবনে শান্তি কোথায়। এতে যে অশেষ দুঃখের জ্বালা। এ যাদুর ছদ্মবেশ সে ছিঁড়ে ফেলবে। সে শিলাদী, বেদুইন কন্যা এই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। নিজেকে ছলনায় বন্দী করে আর সে ভালবাসাকে অপমান করবে না।

সেদিন আকাশে আশ্চর্য সুন্দর চন্দ্রোদয় হল। শরণসিংহের কাছে এসে উদাবাঈ বলল, দুর্গের পাশেই এক উদ্যান আছে। চলুন কুমার আজ আমরা সেখানে যাই।

কুমার শরণসিংহ উদাবাঈএর হাত ধরে দুর্গসংলগ্ন উদ্যানে এসে বসলেন। সামনেই জলাধার। চাঁদের আলোয় শিলাদুর্গের স্পষ্ট ছায়া এসে পড়েছে তার ওপর। তীরে কয়েক খর্জুর বৃক্ষ। অদূরে একটি ফুলের গাছ দেখিয়ে উদাবাঈ বলল, কুমার, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, ঐ গাছ থেকে কিছু ফুল তুলে আনি

চঞ্চল পদক্ষেপে চলে গেল উদাবাঈ। তাকিয়ে রইলেন শরণসিংহ। ফুল তুলে আবার ফিরে আসছে উদাবাঈ। আজ এই ফুল দিয়েই কি স্মরণ করবে তাদের মিলন-যামিকী।

একি হল। কোথায় উদাবাঈ, মোহপুর কন্যা! শরণসিংহের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে এসে নতজানু হয়ে বসল শিলাদী। ফুলগুলি অঞ্জলি দিয়ে সে বলল, আমি শিলাদী, যাদুকরী।

তুমি যাদুকরী শিলাদী! কোথায় আমার উদাবাঈ? বিহ্বল হয়ে প্রশ্ন করলেন কুমার শরণসিংহ।

শিলাদী বলল, দীর্ঘ একটি বছর তোমার সেবা করে আমি তৃপ্ত হয়েছি কুমার। অজ্ঞাত দুর্গে তুমি লাভ করেছ তোমার স্ত্রীর সঙ্গসুখ। আমি যাদুকরী, এ সবই আমার যাদুর খেলা। তোমার উদাবাঈ আজ আমার মধ্যে জেগে উঠেছে কুমার। আজ আমার এ দুঃসহ ছলনার শেষ হোক্।

নতমুখে বসে রইল শিলাদী। তীব্র এক ঘৃণার জ্বালায় কতক্ষণ অস্থির হয়ে রইলেন শরণসিংহ। একবার মনে হল এ নিদ্রিতের স্বপ্ন। আবার বিহ্বল হলেন। দীর্ঘ একটি বছর বন্দীজীবনের মাঝেও যাকে ঘিরে তার আশার দীপটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন সে মিথ্যা উদাবাঈ মুহূর্তে নিভিয়ে দিলে সব আলো।

দীপ্ত অগ্নিশিখার মত শাণিত অসি কোষমুক্ত করলেন শরণসিংহ। শিলাদী হেসে বলল, মৃত্যুতে আর আমার ভয় নেই কুমার। নারীর সবচেয়ে বড় সেবার সুযোগ আমি লাভ করেছি। জীবনের স্বাদ আমি পেয়েছি। আর মিথ্যা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখতে চাই না। ত্যাগ করবার আগে তুমি আমাকে হত্যা কর।

কুমার শরণসিংহ অসি কোষবদ্ধ করলেন। বললেন, নারী হত্যায় রাজপুতের কোন গৌরব নেই। তোমাকে আমি বধ করব না। কামনার যন্ত্রণায় তুমি ক্ষতবিক্ষত হবে, এই তোমার যাদুবিদ্যার পুরস্কার।

সেই চন্দ্রালোকে শরণসিংহ বেরিয়ে পড়লেন মরুভূমির বুকে। কত পথ পেরিয়ে এলেন। উদ্‌ভ্রান্তের মত ডাকতে লাগলেন উদাবাঈএর নাম ধরে। হৃদয় শূন্য হয়ে গেছে। দীর্ঘ একটি বছর যে হৃদয়কে

উদাবাঈএর সঙ্গ দিয়ে পূর্ণ করে তুলেছিলেন তাকে আজ শূন্য করে দিতে হল। কি দিয়ে আবার তাকে ভরে তুলবেন কুমার শরণসিংহ।

শ্রাবণের ধারাবর্ষণ হয়েছে। বালির পাহাড় থেকে নেমেছে 'লুনী' নদী। তারই কূলে কূলে এগিয়ে চললেন কুমার শরণসিংহ।

এদিকে পতির অপেক্ষায় শিলাদুর্গের বন্ধপথে তাকিয়ে রইল শিলাদেবী। কি অনন্ত তৃষ্ণা তার বুক জুড়ে। পুরুষের সঙ্গ সে লাভ করেছে। শরণসিংহ খুলে দিয়েছে তার নারী আকাঙ্খার উৎসমুখ। কিন্তু সমস্ত প্রবাহ তার শুষ্ক হয়ে গেল মরু নদীর মত। এখন সারা বুক জুড়ে অস্থির হাহাকার। কতদিন এমনি করে সে তাকিয়ে রইল শূন্য মরুভূমির দিকে। যদি ফিরে আসে সেই পথভ্রষ্ট পথিক। শ্রাবণী এল। ধারাবর্ষণে পূর্ণ হল মরুনদী, কিন্তু শিলাদেবীর শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করবার জন্য ফিরে এল না কুমার শরণসিংহ।

একদিন শিলাদেবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল দুর্গসংলগ্ন জলাধারে। পরম শান্তির আশ্রয় বলে মনে হল তার। অনিবার্য এক আকর্ষণ সে অনুভব করল। সহসা সেই জলাধারের জল সশব্দে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পরক্ষণে স্থির হয়ে গেল।

[এই কাহিনীর একটি উপসংহার আছে। অতৃপ্ত কামনা যে মৃত্যুহীন, শিলাদেবীর আকাঙ্ক্ষা সে প্রমাণ দিয়ে গেছে। শরণসিংহ পথ চিনে একদিন স্বয়ম্বরা হরণলক্ষীরে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি পাননি যোধপুর রাজদুহিতা উদাবাঈকে। যেদিন শরণসিংহকে হারিয়ে সমস্ত জলটি হরণলক্ষীরে ফিরে গেল, সেদিন যোধপুর রাজকন্যাকে বধূ বলে কেউ বরণ করতে এল না। অলক্ষ্মীর অপবাদ নিয়ে উদাবাঈকে ফিরে যেতে হয়েছিল পিত্রালয় যোধপুরে। সেই থেকে হরণলক্ষীর আর যোধপুরের মধ্যে চলল প্রবল শত্রুতা। শরণসিংহ ফিরে এলে রাণা গহর পুনরায় পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। পিতার কার্যে প্রতিবাদ তুললেন শরণসিংহ। শুধু তাই নয়, যোধপুরে গিয়ে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন উদাবাঈকে। কিন্তু রাণা অবাধ্য পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করলেন।

আবার সেই মরুভূমির পথের ওপর এসে নামলেন শরণসিংহ। অশ্বারোহণে চললেন যোধপুরের দিকে। যেমন করেই হোক তাঁকে ফিরে পেতে হবে তাঁর মানসলক্ষ্মীকে।

আবার রৌদ্রদগ্ধ মরু। পথভ্রান্ত শরণসিংহ ভীষণ বালুঝড়ে চিহ্নিত পথ হারিয়ে ফেললেন। ঘুরতে ঘুরতে তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকিয়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল আশ্চর্য একটি ছবি। দীর্ঘ ছায়াচ্ছন্ন পথ। সেই পথে একটি কন্যা এগিয়ে চলেছে, মাথায় তার জলপূর্ণ কলস। অশ্ব থেকে অবতরণ করে শরণসিংহ সেই কন্যাকে অনুসরণ করে চললেন। এক সময় পথ ফুরিয়ে গেল,. তিনি এসে পড়লেন একটি দুর্গের সামনে। এ দুর্গ যেন তার চেনা বলে মনে হল। আচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি রহস্যময়ী কন্যার অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন দুর্গ শিখরে। কোথায় কন্যা, তিনি আর তাকে দেখতে পেলেন না। ইতস্তত অন্বেষণ করতে করতে শরণসিংহ এসে দাঁড়ালেন শিখর কিনারে। এবার চোখ পড়ল নীচে জলাধারের ওপর। টলমল করছে তৃষ্ণার জল। এত শান্তি তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। শরণসিংহ ঝাঁপিয়ে পড়লেন শিলাদুর্গ থেকে। গভীর জলতলে তলিয়ে যাচ্ছেন তিনি, তবু মনে অপার শান্তি। মৃত্যুও এমন কাম্য হতে পারে। মৃত্যুর প্রেমে মগ্ন হয়ে গেলেন কুমার শরণসিংহ।]

রম্যাণি বীক্ষ্য

উৎকল পর্ব

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

(পূর্বানুবৃত্তি)

ছয়

রাতের ঘুম যখন ভাঙল, রাত তখনও শেষ হয়নি। ঘর অন্ধকার। ঘরের ভিতর পাথরের মতো ভারি হয়ে আছে। খোলা জানালা দিয়ে যেটুকু স্বচ্ছতা আসছে, জানালার কাছেই তা ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমুদ্রের ডাক কিছুতেই ফুরোচ্ছে না। অবিশ্রান্ত ডাকছে। যখন ঘুমতে যাই তখনও এ ডাক শুনেছি, ঘুম থেকে উঠেও শুনছি। এ গর্জনের কি শেষ নেই!

রামানন্দবাবু ঘুমে অচেতন হয়ে আছেন। আমি উঠে পড়লুম। সাবধানে দরজা খুলে বাইরে এলুম।

পৃথিবীর এ কী রূপ! সামনের পথ আর বালি ডিঙিয়ে পৃথিবীটা বুঝি শেষ হয়ে গেছে। সমুদ্র নেই, আকাশও নেই। কুয়াশার ভিতর দিয়ে একটা নীল পর্দা দেখতে পাচ্ছি। মাথার উপরে যদি আকাশ থাকে, সেই আকাশেরই প্রান্ত দেখছি চোখের সামনে। পর্দার কালরের মতো তার নিচেটা অল্প অল্প দুলছে।

আমি আর ইট কাঠের আশ্রয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। মন আমার দেহটাকে টেনে নিয়ে গেল ওই কুয়াশার আচ্ছন্ন রহস্যের দিকে।

সমুদ্রের কাছে গিয়ে আরও আশ্চর্য হলুম। বেলাভূমি জনশূন্য নয়। দূর থেকে যাদের দেখতে পাইনি, কাছে এসে তাদের দেখতে পেলুম। আমার মতো আরও অনেক পাগল এসে জুটেছে। আর জেলেরা করছে জলে নামবার উদ্যোগ। তাদের ছোট ছোট কাঠের নৌকো তীরের উপরে তোলা আছে। কালো কালো কতগুলো, মানুষ বিরাট লম্বা জাল নিয়ে টানাটানি করছে। তারপর সমুদ্রে নামবে। ভাসতে ভাসতে দৃষ্টির আড়ালে যাবে চলে। অপরাহ্নে তাদের জাল গোটাবার পালা। একে একে সবাই আবার ফিরে আসবে।

আমার মতো যাঁরা বেড়াতে এসেছেন, তাঁদের চোখ পূবের আকাশের দিকে। তাঁরা সূর্যোদয় দেখবেন। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে কী মায়া আছে জানিনা, দেখবার জন্যে মানুষ পাগলামি করে। গ্রামের মানুষ এসব রোজ দেখে। খোলা মাঠে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দেখে। শহরের লোক বুঝি দেখতে পায় না। তাই এদের সুযোগ থাকে জেগে, শহরের বাহিরে এসে তাই বোধ হয় পাগলামি করে।

হঠাৎ আমি সেই ক্যামেরাওয়ালা ভদ্রলোককে দেখতে পেলুম। ভদ্রলোক তাঁর ক্যামেরা নিয়ে ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করছেন। লক্ষ্য তাঁর পূবের আকাশ। আমার মনে হয়, তাঁর ফলটিও হয়তো কাছে আছে। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলুম না। হঠাৎ এক মহিলার দিকে নজর পড়ল। একখানা গরম শালে দেহটা ঢেকে দূর থেকে ভদ্রলোককে লক্ষ্য করছেন। এ সেই মহিলাটি, যিনি স্নানের সময় এগিয়ে এসে ক্যামেরার জন্য শোক প্রকাশ করেছিলেন। এ মহিলা যে তাঁর স্ত্রী তাতে আর আমার সন্দেহ রইল না।

কালই আমার নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত ছিল স্ত্রী না হলে কি এমন আগলে চলেন! এ বুঝি সন্তান আগলাবার চেয়েও বেশি জ্বালা। স্বামী ভুলো হলে খেয়ালী হলে পাগল হলে জ্বালার বুঝি শেষ নেই।

পুবের আকাশ তখন প্রতিমুহূর্তে রূপ পরিবর্তন করছে। কত বিচিত্র রঙ! সিল্কীর রঙের বাক্স বুঝি উল্টে গেছে। এত রূপ এত রঙ তার সারাদিন কোথায় থাকে! আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি।

পিছনে হঠাৎ ডাক শুনে আমি চমকে উঠলুম। ঘতা ডাকছে, একি, গোপালবাবু!

আমি তার দুচোখ ভরা বিস্ময় দেখলুম। বললুম: অমন আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?

কেন!

আমি কোন কথা না বলে তারই উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

ঘতা বলল: আপনিই বলুন আমার কি আশ্চর্য হওয়া অন্যায়!

আমিও আশ্চর্য হচ্ছি।

কেন?

আপনাকে আশ্চর্য হতে দেখে।

আমি আশ্চর্য হব না!

কেন হবেন?

সাত সকালে যে আপনি সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন!

আপনিও তো এসেছেন, আরও এসেছেন এত সব মানুষ!

কাল আপনারা সারাদিনটা বারান্দায় বসে কাটালেন কিনা, তাই বলছি।

আমি আর প্রতিবাদ করলুম না। ঘতা বলল: আপনার সঙ্গী কোথায়?

ঘুমোচ্ছেন।

উনি আপনার আত্মীয় বুঝি?

না।

বন্ধু?

না।

তবে?

যেমন আপনি, ঠিক তেমনি।

ব্যাপারটা যে ঘতা বুঝতে পারেনি, আমি তার চোখের দিকে তাকিয়েই তা বুঝতে পারলুম। বললুম: আপনাকে আমি প্রথম দেখেছি সমুদ্রের জলে, আর রামানন্দবাবুকে ট্রেনের কামরায়। একদিন আগে আর পরে।

আমাকে সমুদ্রের জলে দেখেছেন?

ইচ্ছে করে দেখিনি।

তবে?

আপনি এত চেঁচাচ্ছিলেন আর লাফাচ্ছিলেন যে সকলের মাঝে আমি আপনাকে চিনেছি।

ছিছি, এ আপনার ভারি অন্যায়।

পারের সবাই এই অন্যায় করেছে। আমি বোকা বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলুম।

চালাক হলে কী করতেন?

অসভ্য বলবেন না তো?

অসংকোচে ওঝা বলল : না।

আমিও অবাধে বললুম : দুচোখ ভরে রূপ দেখতুম, ক্যামেরা এনে ছবি তুলতুম, তারপর—

ওঝা লজ্জা পেল কিনা জানিনা, প্রশ্ন করল : তারপর?

তারপর এই রকম। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখা।

আপনি তো অদ্ভুত মানুষ!

অদ্ভুত নই, বোকা বলুন।

মনে হল, ওঝা একটু বিব্রত বোধ করছে। তাই বললুম : চেহারাটাও তো বোকা বোকা, তাই একথা মেনে নিতে কষ্ট হবে না।

ছিছি, এসব আপনি কী বলছেন?

হেসে বললুম : দাদা বৌদি কোথায়?

ওঝা খানিকটা আরাম পেল, বলল : তারপরেই আমাকে জিজ্ঞাসা করল : আপনারা কতদিন থাকবেন?

রামানন্দবাবুর কথা আমি জানিনে। জিজ্ঞাসা করিনি। নিজের কথাও ঠিক জানিনে।

সে কি!

পাঠশালা থেকে পালিয়ে এসেছি। গুরুমশায় অভয় না দিলে ফিরতে পারব না।

ওঝা খিল খিল করে হেসে উঠল : গুরুমশায়ের ভয় আপনার এখনও যায়নি! খুব মার খেতেন বুঝি?

ভাল গুরুমশায়রা মারেন কম, শুধু লাঠি উঁচিয়ে রাখেন। আমার গুরু মশায় ভাল না মন্দ, এখনও জানতে পারিনি।

এখনও আপনার গুরুমশায় আছেন?

আছেন বৈকি। গুরুমশায়ের শাসন সারা জীবন ধরে। শুধু পাঠশালায় কেন, সংসারে সমাজে সর্বত্র গুরুমশায় আছেন। বাপমা ভাইবোন স্ত্রী পুত্র কন্যা সবারই শাসন আছে। যার কোন বালাই নেই, তার আছে বিবেক। বিবেকের বেত সবচেয়ে কড়া, চাবুকের মতো ঘাড় কেটে পড়ে।

ওঝা হঠাৎ প্রশ্ন করে উঠল : আপনি বুঝি দর্শনের ছাত্র।

দর্শনের ছাত্র তো আমরা সবাই। আপনা থেকে তো জ্ঞান হয় না, জ্ঞান হয় দেখে। আমার মতো বোকারা শেখে ঠেকে।

নিজেকে আপনি বারে বারে বোকা বলছেন।

সবাই বলে কিনা, আমারও তাই সত্য বলে বিশ্বাস হয়েছে।

ওঝা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : দেখুন দেখুন।

পূব দিকে মুখ করেই আমরা দাঁড়িয়েছিলুম। দেখলুম, দিগন্তের নিচে থেকে সূর্য উঠছে। চাঁদের মতো সূর্য। একটু বেশি লাল, কতকটা সিঁদুরের মতো। খানিকক্ষণ পরে চাঁদের মতো সোনালী হবেনা। হবে রূপোর মতো সাদা। জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ আলো করবে না, বিদ্যুতের মতো তীব্র আলোয় চোখে

ধাঁধা লাগবে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম, ক্যামেরার মালিক তখন তৎপর হয়ে উঠেছেন। আর তাঁর স্ত্রী এসে পাশে দাঁড়িয়ে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন।

কান পেতে আমি তাঁদের কথা শোনবার চেষ্টা করলুম। আমার মনে হচ্ছিল, আমি কিছু শুনতে পেলে হয়তো আমার সম্মানের কথা। মহিলা বলছিলেন: এইবারে তুলে নাও, আর দেরি সময় থাকলে আজ একখানা নিও।

স্বামীর কথা আমার মনে পড়ল। তিনিও আমাকে নানা উপদেশ দেন। ভাবেন তাঁর পরামর্শ ছাড়া আমার এক পা-ও চলবার ক্ষমতা নেই। খানিকটা অহংকার হয়তো আছে, বাকি সবটাই মমতা। দীর্ঘদিন এক সঙ্গে থাকার অনিবার্য ফল।

খতা বলল: আপনার চোখ আকাশে আছে। কিন্তু মন তো নেই।

মন অন্য দিকে আছে।

খতা বোধ হয় ভেবেছিল, আমি আবার কোন অসংলগ্ন কথা বলব। তাই সাহস করে কিছু জানতে চাইল না। আমিই বললুম: আপনার দিকেও মন নেই।

আমার দিকে কেন থাকবে!

সেই ভয় করেছিলেন বলেই তো জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলেন না।

আপনি একটু বাড়াবাড়ি করছেন।

তবে থাক।

আমি এগিয়ে যাচ্ছিলুম, কিন্তু খতা বাধা দিল, বলল: রাগ করছেন কেন।

রাগ নয়, হতাশ হয়েছি।

কেন?

আপনাকে খুব প্র্যাকটিকাল মনে হয়েছিল। মিনমিনে ন্যাকামির জন্যে সিনেমার নায়িকা খুঁজব। কিংবা উপন্যাসের। আপনাকে আমি নায়িকা ভাবিনি।

এখন কি তাই ভাবছেন?

কিছুই ভাবছিনে। ভাবা আমার স্বভাব নয়।

তবে আপনি কী করেন?

কিছু না।

এ কি কোন উত্তর হল?

আপনি কী করেন?

আমি?

হ্যাঁ আপনি।

আমি তো কিছুই করিনা।

দেখলেন তো। উত্তরটা একই হল। কোন মেয়ে সামনে এলে তাকে দেখেই আমরা ক্ষান্ত হই। তাকে নিয়ে ভাবতেও বসিনে, হা-হুতাশও করিনে। মেয়েদের সম্বন্ধে দুর্বলতার যুগ চলে গেছে। বুদ্ধির একটু গোলমাল না থাকলে নিজেকে কেউ রোমিও ভাবেনা। আর পথচারী নারীকে ভাবেন হেলেন।

আপনার মধ্যে কবিত্বও আছে দেখছি।

আমি কিন্তু সূর্যের উপর থেকে আমার চোখ সরাইনি। আকাশের রঙের খেলা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। স্বল্পালোকিত আকাশ দেখে একটু আগে মনে হয়নি যে আজ সূর্যোদয় হবে। এমন দুর্ঘটনার কথা শুনেছি। অপলিত তৃষিত নয়নারীকে হতাশ করে সূর্য একেবারে উপরে উঠেছে। জ্যোতিষ্মান সূর্য। আজ আমরা সমুদ্রের উপর সূর্যোদয় দেখছি। মনে হচ্ছে, সূর্য উঠছে সমুদ্রের ভিতর থেকে। আরও মনে হচ্ছে, চুম্বকের মতো একটা শক্তি তাকে টেনে রাখছে। সূর্যকে আর গোল দেখাচ্ছে না। কলসের মতো আকার হয়েছে। শুভার উত্তর দিতে আমি ভুলে গেলুম।

হঠাৎ এক সময় মনে হল যে নিচের আকর্ষণ গেল ছিঁড়ে। এক লাফে খানিকটা উঠেই সূর্য আবার গোল হয়ে গেল। দেখতে পাইনি, আকাশ আবার কখন রক্তিম হয়ে গেছে। দূরে বুঝি সমুদ্রের সীমা দেখতে পাচ্ছি। সমুদ্র ফুলে উঠে আকাশের সঙ্গে মিশেছে।

এমন দৃশ্য আরও বোধহয় অন্যখানে দেখেছি। কোথায় দেখেছি মনে করতে পারলুমনা।

শুভাও মুগ্ধ হয়ে এই দৃশ্য দেখল। একসময় স্বগতভাবে বলল: অদ্ভুত সুন্দর!

সামনের মহিলার গলা শুনতে পেলুম: কলসীর ছবি ঠিক নিয়েছ তো?

নিয়েছি সময়মতোই, এখন উঠলে হয়।

কেন উঠবেনা?

স্যাটারটা কেমন শব্দ করছে। নোনা জলে মরচে না পড়ে।

তাহলে কী হবে?

ভদ্রলোক তাঁর সন্দেহের কথাটা আর বললেন না: চল এবারে ফেরা যাক। চায়ের জন্যে মন কেমন করছে।

কাল সূর্যাস্তের সময় সমুদ্রের রঙ দেখেছি। নীল নয়, এনামেল পেইন্টের মতো ঝকঝকে সাদা। নীলের রেখা দেখেছি তরঙ্গের ভাঁজে ভাঁজে। সূর্যাস্তের পরও ঠিক নীল হলনা। কালচে ছাইয়ের মতো একটা গম্ভীর রঙ হল। সমুদ্রের জল কখন নীল হয় জানিনে।

সমুদ্রের তীরে তীরে আমরা ফিরছি। পায়ের নিচের বালিও কতকটা জলের মতো। এই বালিকে দূর থেকে জল বলে হবে।

শুভা হঠাৎ বলে উঠল: পশ্চিমের আকাশটাকে এখন অন্য পৃথিবীর আকাশ মনে হবে।

আর জলটাকে?

শুভা একবার পিছন ফিরে পূবের আকাশ আর জল দেখল, তারপর বলল: একেবারে অন্যরকম।

সমুদ্রের স্থির জল খানিকটা দূর থেকে সাপের ফণার মতো ফুলে উঠছে। ধেয়ে আসছে, কিন্তু তীরের উপর আছড়ে পড়ছেনা। কাছাকাছি এসেই ফেটে ভেঙে জলপ্রপাতের মতো গড়িয়ে পড়ছে। একরাশ সাদা জল নীল জলের উপর পড়ে তীরের কাছটা তোলপাড় করে দিচ্ছে। কাল স্নান করতে এসে আমি সমুদ্রের এই রূপ দেখেছি প্রাণভরে।

হঠাৎ এক জায়গায় ভিড় দেখে আমরা থমকে দাঁড়ালুম। ভ্রমণ বিলাসী একদল নরনারী কী একটা ঘিরে কৌতূহল ও আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে। শুভা বলল: ও কী গোপালবাবু?

বললুম: মাছ।

মাছ!

এই দিকে দেখুন। জেলেদের ঐ ছোট নৌকোটা আসছে। ওটাকেও অমনি ঘিরে ফেলবার জন্যে এই মানুষগুলো অপেক্ষা করে আছে।

উঁকি দিয়ে আমরা মাছ দেখলুম। ছোট ছোট মাছে জাল ভর্তি হয়ে গেছে। জেলেরা হাড়িয়ে হাড়িয়ে সেই মাছ নৌকোর ভিতর রাখছে।

খত্তা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : দেখছেন গোপালবাবু ?

তার ছেলেমানুষীর পরিচয় পেয়ে আমি হাসলুম। যে নৌকোটা তীরে এসে ঠেকেছিল, জেলেরা সেটা কাঁধে করে শুকনো ডাঙার উপর সরিয়ে আনছে। এই দৃশ্য খত্তার অদ্ভুত ভাল লেগেছে। বলল : এইসব জিনিষের ছবি নিতে হয়। প্রকৃতির চেয়ে মানুষই তো বেশি ইন্টারেস্টিং।

তবে প্রকৃতির আকর্ষণ বড়।

মানুষের চেয়েও ?

মানুষ যত বড় হয় তত বেশি লোককে সে আকর্ষণ করতে পারে। প্রকৃতির আকর্ষণ ধর্মের মতো, তার শেষ নেই।

মনে হল, খত্তা আমার কথা পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। তাই বললুম ; সাধারণ মানুষ টানে একজন দুজন দশজনকে। সেই মানুষ যত অসাধারণ হবে তত বেশি লোককে টানবে। একদা নীলাচলে মহাপ্রভুকে দেখবার জন্য দেশের সমস্ত লোক ভেঙে পড়ত। আজ তারা জগন্নাথ দর্শনে আসে, আসে সমুদ্র দেখতে। শেষ রাতে উঠে এত লোক এসেছে, সমুদ্রের ধারে। কিন্তু ঐ ক্যামেরাওয়ালা ভদ্রলোকের জন্য শুধু তাঁর স্ত্রী এসেছেন। কাল হয়তো আমার জন্যে আপনি আসবেন, কিম্বা আপনার জন্যে আমি।

খত্তা রাগতভাবে বলল : বলিহারী আপনার পথ।

পথ নয়, আকর্ষণ বলুন। ওটা তো যুক্তি মেনে চলে না, চললে সুবিধে হত।

খত্তা অনেকক্ষণ কোন কথা কইল না। অনেক ঘুরে বড় রাস্তার প্রায় শেষ প্রান্তে আমাদের হোটেল দেখা যাচ্ছে। বাহিরের চেয়ারে বসে সমুদ্রের শোভা দেখছেন।

এক সময় খত্তা বলল : আজ আপনারা কী করবেন ?

বললুম : বালির উপর শুয়ে থাকবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রামানন্দ বাবু আজ পুরী পরিক্রমায় বেরতে চান। আমি সঙ্গে থাকলে তাঁর রিক্স ভাড়া অর্ধেক লাগবে।

আপনি যাবেন তাহলে ?

পুরো ভাড়াটা দিলে যদি রেহাই পাই, তবে যাব না।

খত্তা আশ্চর্য হল, বলল : বেড়াতে আপনার ভাল লাগেনা ?

না।

তবে এখানে এসেছেন কেন ?

কিছু না করতে।

খত্তা আমার মুখের দিকে তাকাল। কী ভাবল সেই জানে, পরে আর কোন উত্তর দিল না।

[ক্রমশঃ

খেয়ালী যাদুকর

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

"The more I see of men, the more I love my dog." অর্থাৎ "মানুষের সঙ্গে যত বেশি পরিচিত হই, আমার কুকুরটিকে ততই বেশি ভালোবাসি।"

এ কথা বলেছিলেন যাদুকর "লাফায়েৎ" (The Great Lafayette)। কথাটি একটি বোর্ডে লিখে তাঁর ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, এবং মৃত্যুর অনেক আগেই আগাম ইচ্ছা প্রকাশ করে রেখেছিলেন তাঁর সমাধির ওপর তাঁর প্রিয় কুকুরের মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই প্রিয় কথাটিও যেন খোদাই করা থাকে।

খ্রীষ্টীয় বিশ শতকের প্রথম বিশ বছরে যে কয়েকজন অসাধারণ যাদুকর সারা ইউরোপে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, যাদুকর "লাফায়েৎ" ছিলেন সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের একজন। বলা বোধ হয় বাহুল্য "লাফায়েৎ" তাঁর পেশাদারী নাম। তিনি ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে সিগমুণ্ড্ নয়বার্গার (Sigmund Neuberger), জাতিতে জার্মান।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বা নামের সঙ্গে খুব অল্প লোকেরই পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর, অত্যন্ত স্বল্পবাক্, অত্যন্ত রহস্যময়। কোনো সভায়, কোনো সমিতিতে তিনি যেতেন না, এমন কি যাদুকরদের সভা সমিতিতে বা বৈঠকেও নয়। কারও সঙ্গে দেখা করতেও তিনি চাইতেন না। প্রিয় কুকুরটীর সাহচর্য্যে নিজেকে যেন বাকী পৃথিবী থেকে সর্ব্বদাই আলাদা করে রেখে নিজের পৃথিবীতে একা থাকতে চাইতেন তিনি, যেন মানুষের প্রতি তাঁর একটা বিরূপ ধারণা বা বিতৃষ্ণা জন্মেছে, তাই মানুষের সঙ্গের চাইতে কুকুরের সঙ্গই তাঁর বেশী প্রিয়।

লাফায়েৎ (Lafayette) তাঁর কুকুরটিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, ভালোবেসে তার নাম দিয়েছিলেন 'বিউটি'। কুকুরটি যেমন ছিল প্রভুভক্ত, প্রভু লাফায়েৎও তেমি ছিলেন কুকুরটির ভক্ত। প্রভুর জন্য কুকুর প্রাণ দিয়েছে এমন কাহিনী এযাবৎ শোনা গেছে। লাফায়েৎ তাঁর কুকুরটির জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরা শহরের যে থিয়েটারে তিনি যাদু প্রদর্শন করছিলেন তাতে রহস্যময়ভাবে আগুন ধরে গিয়ে বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটে। অলন্ত থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসেই লাফায়েৎ-এর খেয়াল হল তাঁর প্রিয় কুকুরটি স্টেজের পেছনের ঘরে বন্দী থেকে গেছে, তাকে উদ্ধার করে নিয়ে না এলে বেচারা অসহায়ভাবে পুড়ে মরবে। অমনি তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে আবার প্রবেশ করলেন সেই অগ্নি-অরণ্যের ভেতরে; প্রিয় কুকুরটিকে উদ্ধার করে আনতেই হবে, অসহায়ভাবে পুড়ে মরতে দেবেন না তাকে। কিন্তু আগুনের নির্মম যাদুর কাছে হেরে গেলেন যাদুকর লাফায়েৎ। কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে কুকুরের সঙ্গে তিনিও পুড়ে মরলেন। পৃথিবী একজন অনন্যসাধারণ যাদুকর হারাল।

এডিনবরায় লাফায়েৎ-এর সমাধির ওপর তাঁর অনুরোধমত তাঁর প্রিয় কুকুরটির প্রস্তরমূর্তি বসানো রয়েছে। 'মহান্' লাফায়েৎ-এর (Great Lafayette) এই সমাধিতে যাদুকরেরা এখনো এসে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে যান। অন্য কোনো যাদুকরের কোনো কীর্তিই এমন কাহিনি খ্যাতি লাভ

করেনি, যেমন করেছে লাফাতেৎ-এর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ তীক্ষ্ণধার উক্তি :
the more I love my dog."

আরেকটি চমৎকার উক্তি মনে পড়ছে :

"অপনা দিল্ সাফ রখ্না, ঔর দুসরেকী পাকিট সাফ কর্না।" অর্থাৎ

"হৃদয় সাফ রেখে আপনার চিত্ত
পরের পকেট সাফ করে যাও নিত্য।"

উক্তিটি কল্‌কাতার ৺ইউসুফ ওস্তাদের। শুনেছি সাকরেদদের উদ্দেশে এই ছিল তার বাণী, তার নিজের জীবনেরও এই ছিল আদর্শ। বহু পকেট সাফের মূলে ছিল তার প্রতিভা, কিন্তু আপন চিত্তটিকে সে বরাবর মুক্ত রেখেছিল মালিন্যের স্পর্শ থেকে।

হাত-সাফাইতে ইউসুফ ছিল অসাধারণ সিদ্ধহস্ত। টাকাপয়সা, বিড়ি, দিয়াশলাই, গুলি, বোতাম, আংটি প্রভৃতি ছোটখাট খুঁটিনাটি জিনিষ নিয়ে শুধুমাত্র হাতের কারবা আর ধোঁকাবাজির সাহায্যে সে এমন সব অদ্ভুত ভেল্‌কি দেখাত যে দর্শকেরা তাই দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকত।

শোনা যেত হাতসাফাইয়ে যাদুকর ইউসুফের সঙ্গে কল্‌কাতার মীনা সেখোয়াত্নী, বাঁহাতিয়া কানু প্রভৃতি তখনকার নাম করা ওস্তা সর্দারদের খুব খাতির এবং কল্‌কাতার একাধিক মহাবিদ্যার আখড়ায় ইউসুফ ওস্তাদ পকেটমারা এবং আনুষঙ্গিক হাতসাফাইয়ের তালিম দিয়ে থাকে। এই সন্দেহ-জিজ্ঞাসিক দুর্নামের জন্যই তথা যাদুশিল্পী হিসেবে সুধীসমাজের প্রাপ্য সুনাম সে অর্জন করতে পারেনি। সেজন্য তার কোনো ক্ষোভ ছিল না, কারণ এই সুনামের লোভও তার ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না। হস্তকৌশল প্রধান যাদুর খেলায় (sleight-of-hand conjuring) তার অসামান্য দক্ষতা থাকলেও যাদুবিদ্যাকে প্রত্যক্ষভাবে অর্থ উপার্জনের উপায়রূপে সে গ্রহণ করেনি, যাদুবিদ্যা ছিল নিতান্তই তার খেয়ালখুশি, হবি বা শখের ব্যাপার। এ হিসেবে তাকে বলা যেতো 'অ্যামেচিউর ম্যাজিশিয়ান'।

ইউসুফের চরিত্র ছিল খামখেয়াল-প্রধান। আমরা ছেলেবেলায় পড়েছি "না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়।" ইউসুফের মনে এ ধরণের ছোটখাট সংকীর্ণতা ছিল না। তার প্রশস্ত চিত্তে এই বিশ্বাস ছিল যে পরের দ্রব্য নেবার সেরা উপায় হচ্ছে না-বলে নেওয়া ; কারণ বলে নিতে গেলেই বিভিন্ন রকমের বাধা, বিরোধ বা মনোমালিন্য আসতে পারে। না বলে এবং না জানিয়ে পরের দ্রব্য পরম স্বেচ্ছাসুখভাবে আপন করে নেবার জন্যে চাই পাকা হাত সাফাই ; আর সেইজন্যেই প্রয়োজন পাকা তালিমের।

ইউসুফ ওস্তাদের গোপন দান কিছু ছিল কিনা জানিনা ; প্রকাশ্যে সে যে দান করত সে দান যাদুক্রীড়ার ছদ্মবেশে। একবার এক বৃদ্ধা জরাজীর্ণা ছিন্নবসনপরিহিতা পথের ভিখারিণীকে কিছু অর্থ দেবার ইচ্ছা হল যাদুসৌখিন ইউসুফের। ইউসুফ বললে, "বুড়ী মা, তোমার আঁচলে ও কি বাঁধা রয়েছে ?"

"কই, কিছুইতো নয় বাছা।" বললে ভিখারিণী। সত্যি কথাই, কিছু বাঁধা ছিল না বুড়ীর আঁচলে।

দুহাত উল্‌টে পাল্‌টে খালি দেখিয়ে ওস্তাদ ইউসুফ বুড়ীর আঁচল ধরে ধীরে ধীরে ঝাড়তেই মুক্তাবৃষ্টি—পয়সা, আনি, দুআনি, সিকি, আধুলি, টাকা। বুড়ীর চক্ষু চড়কগাছ। একি ভূতুড়ে কাণ্ড ? না না, ভূতুড়ে কাণ্ড নয়, এ ঘোর ঘোরার মেহেরবানী, বুড়ীকে বোঝালে ইউসুফ। ঈশ্বরের আশীর্বাদী মুক্তাগুলো বুড়ীর ঝুলিতে ভরে দিলে আপন হাতে।

বুড়ী চলে গেল ইউসুফকে আশীর্বাদ করতে করতে, খোদার অলৌকিক মেহেরবানীতে মুগ্ধ হয়ে; বুঝলে না সে যা আঁচল ভরে নিয়ে গেল তার মূলে হয় তো খোদারই মেহেরবানী, কিন্তু তা এসেছে ইউসুফেরই পকেট থেকে।

এতিমখানার জন্যে চাঁদা দিতে হবে? ওসব খয়রাতি ফয়রাতির ভেতর নেই ইউসুফ ওস্তাদ। ইউসুফের পকেটে পয়সার কিছু বাহুল্য ঘটে নি, আর পয়সা অত সস্তা নয় যে দাও বললেই অমনি উপুড়-হস্ত হওয়া যাবে। সুতরাং ইউসুফ করলে কি? না, তুলে নিলে একফালি সাদা কাগজ, তাকে কাটলে দশ টাকার নোটের সাইজ করে। সেই সাইজ করে কাটা কাগজ ভাঁজ করে দুহাতে ঘষতে ঘষতে কি সব দুর্বোধ্য মন্ত্র পড়লে ইউসুফ, তার ফল হলো অদ্ভুত। কাগজখানার ভাঁজ খুলতেই দেখা গেল সাদা কাগজের ফালিটি পরিণত হয়েছে একখানা আস্ত দশটাকার নোটে !!!

নোটখানা এতিমখানার চাঁদা-সংগ্রাহকের হাতে দিলে ইউসুফ ওস্তাদ। বিস্মিত মৌলভী সাহেব উল্টে পাল্টে দেখে আরো বিস্মিত হ'লেন। এযে সত্যি সত্যি দশ টাকার নোট। হ্যাঁ বাবা ইউসুফ, এ নোট ঠিক নোট তো? ঠিক চলবে তো বাবা?

"বিলকুল ঠিক। বিলকুল চলবে মৌলভী সাহেব।" হেসে বললে ইউসুফ। সে হাসি অভয় হাসি।

ইউসুফের জবানের ওপর অসীম আস্থা মৌলভী সাহেবের, যেমন আস্থা অন্য সবারই—যে কেউ এসেছে ইউসুফের সংস্পর্শে। এতিমখানার ফাণ্ডে খাঁটি দশ টাকা জমা বাড়ল, এতে তাঁর আর সন্দেহ রইল না। আর নিঃসন্দেহ হবার সঙ্গে সঙ্গে সহসা একটা রঙীন, আশা-মধুর কল্পনায় ভরে উঠল এতিমখানার বাপ-মা-হারা অনাথদের অন্যতম অভিভাবক মৌলভী সাহেবের মন। ইউসুফের হাতের অনেক অদ্ভুত খেলা দেখে অনেকবার তাক লেগেছে তাঁর, কিন্তু ইউসুফের হাতের যাদুতে যে সাদা কাগজের টুকরো অমন অনায়াসে দশ টাকার নোটে পরিণত হয় এ তিনি এই প্রথম জানলেন। তাহলে আর এতিমখানার ফাণ্ডের জন্যে ভাবনা কি? সাইজ মতো কাগজ কেটে কেটে ইউসুফের হাতের যাদুতে নোটের পর নোট যত খুশি বানিয়ে নিলেই তো হবে। আবেগে ইউসুফের হাত চেপে ধরলেন তিনি। বললেন, "আরো আরো আরো নোট এমি করে বানিয়ে দাও বাবা ইউসুফ। এতিমখানার কচি কাঁচাগুলোর একটু হাল ফেরাই, আর—"

ইউসুফ হাত জোড় করে বললে, "এ নোট তো সহজে তৈরী হয় না মৌলভী সাহেব, এক একটি নোট বানাতে আমার আধ সের রক্ত জল হয়ে যায়।" অর্থাৎ আরো নোট বানাতে গেলে তার গায়ের আরো রক্ত জল হবে। তাতে ইউসুফের আপত্তি বোধ করা অসম্ভব বা অন্যায় নয়। সুতরাং তখনকার মত ঐ একখানা দশটাকার নোট নিয়েই বিদায় হলেন এতিমখানার সেবাব্রতী মৌলভী সাহেব।

উনিশ শতকের শেষদিকের বিখ্যাত ইংরেজ যাদুকর চার্লস্ বারট্রামের (ব্যক্তিগত জীবনে জেম্স্ ব্যাবেট) শখ বা খেয়াল ছিল নানারকমের ঠক এবং জুয়াড়িদের কার্যকলাপ এবং হস্তকৌশল পর্যবেক্ষণ করে সেগুলোকে যাদুশিল্পের উপযোগী করে নেওয়া। লণ্ডন শহরের পার্কে এবং পথের ধারে তিনি পেশাদার জুয়াড়ি বা জুয়াচোরদের যে "তিন তাসের খেলা" দেখেছিলেন তার বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। এ খেলাটি থ্রি কার্ড ট্রিক (Three card trick), থ্রি কার্ড মন্টি (Three card monte) বা ফাইণ্ড দি লেডি (Find the lady) নামে খ্যাত।

খেলাটি নির্দোষ কৌতুক বা পেশাদার যাদুকরের হাতে যেমন দর্শকদের বিস্ময় এবং আমোদ

যোগাতে পারে, তেমনি হাতসাফাই-বিশারদ পেশাদার জুয়াড়িরা এই খেলাটির সাহায্যে লোক ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করে। বিশ্বের ঠকবাজদের ভেতর হয়তো তাদের আসন প্রথম আছে, অথবা ওদের চিন্তাধারায় আশ্চর্য রকমের মিল আছে। যাদুকর ওয়ার্লস্ বায়ট্রাম এবং ওয়ার্লস্ কার্টার ("কার্টার দি গ্রেট", যিনি এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দিকে ভাগে এদেশে খেলা দেখিয়ে গেছেন) বর্ণিত এবং ব্যাখ্যায়িত এই তিন তাসের খেলা আমি কলকাতা শহরের ফুটপাথেও একাধিকবার দেখেছি।

এ-খেলায় ব্যবহৃত হয় তিনটি তাস—একটি বিবি এবং দুটি অন্য (ছবিহীন) তাস। মনে করে নেওয়া যাক জুয়াড়ি ফুটপাথে বসেছে খেলা দেখাতে। আপনাদের দেখিয়ে একটি একটি করে তিনটি তাস সে উপুড় করে পাশে পাশে এক সারিতে ফেলবে। আপনাদের কাজ হচ্ছে তিনটির ভেতর কোন্‌টি বিবি সেটা ঠিক রাখা। মনে করা যাক আপনারা পরিষ্কার দেখলেন বিবি তাসটিকে রাখা হয়েছে অন্য দুটী তাসের মাঝখানে। আচ্ছা বেশ, এইবার খুব হুঁশিয়ার হয়ে লক্ষ্য রাখুন। জুয়াড়ি ধীরে ধীরে তিনটি তাসের জায়গা অদল বদল করবে। (বলা বাহুল্য, তিনটি তাসেরই পেছন দিকটা থাকবে ওপর দিকে।) কিছুক্ষণ পর বাজী ধরা হবে। জুয়াড়ি বলবে, "বলুন এবার, কোন তাসটা বিবি।"

"এইটে বিবি।" বলে কোনো দর্শক একটি তাসের ওপর কিছু টাকা রাখলে পর তাসটা উল্টে যদি দেখা যায় সেটি অন্য তাস, তাহলে দর্শকের রাখা ঐ টাকাটা বাজেয়াপ্ত হয়ে চলে যাবে জুয়াড়ির পকেটে। দর্শক বাজী হারলেন। আর যদি দেখা যায় তাসটি সত্যিই বিবি, তাহলে দর্শক বাজী জিতলেন। যত টাকা তিনি বাজী রেখেছেন ঠিক তত টাকা জুয়াড়ির পকেট থেকে আসবে দর্শকের পকেটে। কিন্তু সাধারণতঃ প্রথমটাই হয়ে থাকে, কারণ তাস খেলার মধ্যে জুয়াড়ির যে সূক্ষ্ম হাত সাফাইয়ের কৌশল থাকে তাতে দর্শক ভ্রান্তিতে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত অন্য তাসকে বিবি বলে ভুল করেন।

এ খেলার মূল কৌশল বা চালাকিটুকু এইভাবে বুঝুন। প্রথমে বিবি তাসটিকে দেখিয়ে উপুড় করে ফেলুন। তার ওপর ফেলুন অন্য একটি তাস, মনে করুন নওলা। এবারে একদিকে বুড়ো আঙুল এবং অন্যদিকে তর্জনী এবং মধ্যমাঙ্গুলি দিয়ে দুটি তাস একসঙ্গে তুলে ফেলুন। এবার এই দুটি তাস একটির পর একটি আলাদা জায়গায় ফেললে সাধারণত নীচের তাস অর্থাৎ বিবি প্রথমে পড়বে, এবং দ্বিতীয়বারে পড়বে বাকি তাসটা। অর্থাৎ নওলা। স্বভাবতই মনে হবে আগে নীচের তাস না ফেলে ওপরের তাসটা ফেলবার উপায় নেই। প্রথমবার ঠিক তাই করে দেখিয়ে দিন প্রথমবারে যে তাসটি পড়েছে সেটিই বিবি। তারপর নওলাটিকে আবার বিবির ওপর রেখে আবার একসঙ্গে তুলে নিন।

এই দ্বিতীয় বারেই হচ্ছে আসল চালাকি। নীচের তাসটিকে (অর্থাৎ বিবি) ধরুন বুড়ো আঙুল আর মধ্যমাঙ্গুলির ডগা দিয়ে, এবং ওপরের তাসটিকে (নওলা) ধরুন বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ডগা দিয়ে, তাহলেই দুটি তাস আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—মধ্যমাঙ্গুলি দিয়ে নীচেকার বিবি তাসটী, এবং তর্জনী দিয়ে ওপরকার নওলা তাসটী। এ অবস্থায় আপনি ইচ্ছামতো যেকোন তাস প্রথমে ফেলতে পারেন। ডান হাতটা ওপর থেকে নীচের দিকে দুলিয়ে মধ্যমাঙ্গুলিটি তুলে নিলেই নীচের বিবি তাসটি পড়বে। আর মধ্যমাঙ্গুলের চাপ ঠিক রেখে তর্জনীটি তুলে নিলেই ডান হাতের খোলায় ওপরের তাসটী (নওলা) আলগা হয়ে পড়ে যাবে। দর্শকদের মনে হবে নীচেকার তাসটী অর্থাৎ বিবিই প্রথমে পড়ল, কিন্তু আসলে বিবিটী রয়ে গেল আপনার হাতে। এটি আপনি দ্বিতীয় বারে ফেললেন। আপনার আসল কার্য্য সমাধা হয়ে গেল; দর্শক নওলা তাসটিকে বিবি বলে জানলেন। (অবশ্য এটি নিখুঁতভাবে করাটা প্রচুর অভ্যাস-

সাপেক্ষ। ছটি তাস ধরবার কায়দা ছবি দেখলে সহজেই বোঝা যাবে।) এরপর আপনি ধীরে, অতি ধীরে তাসগুলো আলাদাভাবে তুলে নিয়ে কয়েকবার জায়গা অদল বদল করুন, দর্শকদের বলুন ওঁদের দৃষ্টি বিবির ওপর রাখতে। তাঁরা নজর রাখবেন আসলে নওলাটির ওপর, কারণ ওটিকেই তাঁরা বিবি বলে ভুল করে বসে আছেন।

এই কৌশলটিই প্রধান ভিত্তি হলেও তিন তাসের বাজীতে আরো নানারকম কায়দা আছে, এবং পাকা অভিজ্ঞ জুয়াড়ীরা কখন কোন্ কায়দা কাজে লাগাবে বা লাগাচ্ছে তা বোঝা সহজ নয়।

একটি ঘটনার কথা বলি। কলকাতা শহরের অভিজাত রাস্তার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অংশের ফুটপাথ। কাছাকাছি পুলিশপাহারা বা অনুরূপ কোনো আপদ উপস্থিত নয়, সুতরাং প্রায় নিরাপদেই বে-আইনী লোকঠকানোর ব্যবসা কিছুক্ষণ চালানো চলে। সেই পথে গল্প করতে করতে চলেছিলাম একজন লেখক বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধুটি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, "ঐ দেখ।" দেখলাম। এবং বুঝলাম। একটী তিন তাসের জুয়াড়ি তার তিন তাস নিয়ে বসেছে ফুটপাথের ওপর, সামনে ছোট্ট একটি ভিড়। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নিলাম এই 'প্রাথমিক' ভিড়টি নিছক কৌতূহলী পথচারী দিয়েই গড়া নয়, এর ভেতর জুয়াড়ির নিজের লোকও রয়েছে। এই 'প্রাথমিক' ভিড় দেখে কৌতূহলী পথচারী দুজন একজন করে এসে ধীরে ধীরে ভিড় বাড়াতে লাগল। আমার বন্ধুটি এবং আমিও গিয়ে ভিড় বাড়ালাম। জুয়াড়ি তার বাজীর সর্তটা বুঝিয়ে দিলে। সোজাসুজি সর্ত।

পরিষ্কার বোঝা গেল বিবি তাসটি রয়েছে মাঝখানে। ওটীর ওপর বাজী ধরলেই জয়লাভ সুনিশ্চিত। কিন্তু প্রথম ঝুঁকিটা কেউ নিতে চায় না। তখন এক ভদ্রলোক (?) পকেট থেকে মনিব্যাগ খুলে একখানা দশ টাকার নোট মাঝখানের তাসটির ওপর রেখেই তাসটি সঙ্গে সঙ্গে উল্টে দেখিয়ে দিলেন সেটিই বিবি। জুয়াড়ি তখন মুখটি কাঁচুমাচু করে (চমৎকার অভিনয়!) ভদ্রলোকের পকেট থেকে একখানা কড়কড়ে দশটাকার নোট বার করে বাজী-বিজেতা ভদ্রলোকের (?) হাতে দিলে। ('ভদ্রলোকটী জুয়াড়ির দলের লোক।) সরল আনাড়ীরা জুয়াড়ির এই অদ্ভুত হওয়ায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। 'ভদ্রলোক' জুয়াড়িকে আবার তাস ফেলতে বাধ্য করলেন, এবং জুয়াড়ির অনুনয়ে নিজে আর বাজী ধরলেন না, উপস্থিত একজন ভদ্রলোককে (জুয়াড়ির দলের লোক নন) বললেন, "কত আছে আপনার মনিব্যাগে বার করুন শীগগীর।" যেন একটু দেরি হলেই মস্ত বড় একটা দাঁও হাতছাড়া হয়ে যাবে। দুনম্বর ভদ্রলোক এক নম্বরের ধমকে ধতমত খেয়ে চার টাকা বার করে দিলেন। এক নম্বর 'ভদ্রলোক' ঐ চার টাকা ছোঁ মেরে একটি তাসের ওপর রেখেই তাসটি উল্টে দিলেন। দেখা গেল সেটি বিবি। "বার করো টাকা।" বলে এক নম্বর 'ভদ্রলোক' জুয়াড়ির কাছ থেকে চার টাকা আদায় করে দুনম্বর ভদ্রলোককে দিলেন। চার টাকা জিতে দুনম্বর ভদ্রলোক ভারি খুশি হয়ে তাকালেন এক নম্বরের মুখের দিকে, ভাবটা যেন "আপনিই তো এটাকা জিতিয়ে দিলেন। আমি তো সাহসই পাচ্ছিলাম না।"

বাজীর খেলা চালু করিয়ে দিয়ে এক নম্বর 'ভদ্রলোক' চলে গেলেন। তখন আবার তাস ফেলে ধীরে ধীরে তাদের জায়গা বদলালে জুয়াড়ি। পরিষ্কার (?) বোঝা গেল ডান ধারের তাসটা বিবি। আমার লেখক বন্ধুটি আমার হাঁ হাঁ করে বাধা দেবার চেষ্টা ব্যর্থ করে একখানা দশ টাকার নোট ডান ধারের তাসের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বললে, "এই বিবি।" জুয়াড়ি সঙ্গে সঙ্গে তাসটা উল্টে দেখিয়ে দিলে সেটি অন্য তাস, আর সঙ্গে সঙ্গে দশটাকার নোটখানি পকেটস্থ করলে। কি ভেবে জানি না, জুয়াড়ি ঐ নোটখানা

ফেরৎ দিয়ে দিয়েছিল একটু পরেই। হয়তো ভেবেছিল আমি ওর খেলার রহস্য সমস্তই জানি, অতএব এক হিসেবে ওর সম্প্রদায়ভুক্ত, সুতরাং আমার বন্ধুর পকেট মারাটা অধর্ম হবে।

তারপর আরেকটু বলি। তিনটি তাস এক লাইনে উপুড় করে রেখে জুয়াড়ি থুথু ফেলবার অজুহাতে পিছন দিকে কিছুক্ষণের জন্যে মুখ ফিরিয়ে রইল। (এটি তার একটি মস্ত ভাঁওতা।) সেই ফাঁকে (?) একটি অতি-চালাক লোক (বলা বাহুল্য, এটিও জুয়াড়ির দলের লোক) অন্যান্য সকলের দিকে চোখ টেরে করলে কি? না, বিবি তাসটি তুলে নিয়ে সবাইকে দেখিয়ে তার একটী কোণা ওপর দিকে উল্টে দিয়ে তাসটি আবার যথাস্থানে রেখে দিলে। দিয়ে আরেকবার আমাদের সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে দুষ্টুমির হাসি হাসলে (ভাবটা যেন "এইবার এই তিন তাসকে জুয়াড়ি যত খুশী এধার ওধার করুক না কেন, ঐ উল্টানো কোণা দেখেই বিবি তাসটিকে নির্ভুলভাবে চেনা যাবে।" থুথু ফেলা শেষ করে জুয়াড়ি আবার নিরীহভাবে তিন তাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল, যেন এর ভেতর ওকে জব্দ করার জন্যে কি কৌশল করা হলো সে কিছুই বোঝে নি। কয়েকবার তাসগুলোর জায়গা বদল করে তারপর জুয়াড়ি বললে, "এইবার!" সবাই দেখলে কোণা-উল্টানো তাসটী পড়ে আছে বাঁয়ারে। তিনজন লোভী ব্যক্তি লোভ সামলাতে না পেরে তাদের সঙ্গের যথাসর্বস্ব মনিব্যাগ থেকে বার করে রাখলে ঐ তাসের ওপর—মোট দাঁড়াল ত্রিশ টাকার কাছাকাছি। জুয়াড়ি বেচারা প্রায় কাঁদকাঁদ কণ্ঠে বললে, "এক সঙ্গে তিন তিনজনের বাজী চলবে?"

"হাঁ হাঁ, আলবাৎ চলবে। এক সঙ্গে একজনার বেশি বাজী ধরা চলবেনা এমনতো কথা ছিল না।" সমবেত কণ্ঠে জোর গলায় বললে। এবারে আচ্ছা আটকানো আটকেছে লোকটা। আর রেহাই নেই।

"তাহলে এ বাজীই সই, বলছেন আপনারা?"

"আলবাৎ সই।"

"আপনারা হারলে আপনাদের এসব টাকা আমি নিয়ে নিব।"

"নেবে।" বললেন তিনজন আশা-উৎফুল্ল বাজীকর। তাসটি উল্টে দেখেই তিনজন আশাবাদীর চোখ কপালে উঠে গেল। বিবি নয়, নওলা!!!! ব্যাপার কি? (ব্যাপার আর কিছুই নয়, তাসগুলো হাতাবার সময় জুয়াড়ি সকলের অলক্ষ্যে বিবি তাসখানার উল্টানো কোণটী চেপে সোজা করে দিয়ে নওলার একটি কোণ ঠিক ঐ রকম ছোট্ট করে উল্টে দিয়েছিল।) এক বাজীতে টাকা ত্রিশেক তিনজনের পকেট থেকে চলে গেল জুয়াড়ির পকেটে।

এই তিন তাসের বাজীর প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে যাবার আগে তিন তাসের জুয়াড়ির আরেকটি সূক্ষ্ম চালাকির কথা বলি। মনে করা যাক, এক ভদ্রলোক ডান ধারের তাসটিকে বিবি মনে করে তার ওপর পাঁচ টাকা বাজী ধরলেন। জুয়াড়ি ঐ উপুড় করা তাসটিকে নিজের দিকে তুলে (অপর কেউ যেন দেখতে না পারে সেটি প্রকৃতপক্ষে কি তাস) দেখে বলবে "বিবি"—যদিও আসলে সেটী বিবি নয়, অন্য তাস। দেখেই আবার যেমন ছিল তেমনি উপুড় করে রেখে দেবে তাসটিকে, এবং বাজী হেরে (অর্থাৎ হারার ভাণ করে') বাজীর টাকাটা দিয়ে দেবে। এতে দর্শকদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হবে ঐ তাসটিই নিশ্চয় বিবি, তা নইলে লোকটা বাজীর টাকা পকেট থেকে বার করে দিয়ে দিল কেন? এর পর জুয়াড়ি ঐ তাস তিনটির জায়গা বদল করবে এত ধীরে ধীরে যেন সবাই নির্ভুলভাবে খেয়াল রাখতে পারেন শেষ পর্যন্ত বিবি তাসটি (!) কোথায় থাকছে। এইবার একজন (অথবা একাধিক জন) বেশী টাকার বাজী ধরবেন, কারণ ভাববেন বাজী জেত.

(তিনি ভুল করে ভাবেন) সুনিশ্চিত। কিন্তু এবার জুয়াড়ির জিত। উল্টে দেখা যাবে বিবি নয়, অন্য তাস। বাকী টিকে টাকাটা পকেটস্থ করবে জুয়াড়ি। অতএব এ প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে বলি : পেশাদার জুয়াড়িদের সঙ্গে জুয়ার ভাগ্য পরীক্ষা বা বাজী ধরে চালাকির লড়াই করতে না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

উনিশ শতকের শেষ দিকের বিখ্যাত মার্কিন যাদুকর আলেক্‌জাণ্ডার হারম্যান (Alexander Herrmann) যেমন ছিলেন অসাধারণ যাদুশিল্পী, তেমি ছিলেন চূড়ান্ত খানখেয়ালী। (ইনি 'হারম্যান দি গ্রেট' নামে অসামান্য খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।) শুধু মঞ্চে খেলা দেখাবার সময় নয়, যখন তখন যেখানে সেখানে তিনি ভোজবাজি সুরু করতেন। একদিন বাজারে গিয়ে এক বুড়ির কাছ থেকে কয়েকটি ডিম কিনে প্রত্যেকটির ভেতর থেকে একটি করে সোনার মোহর বার করে বুড়ীকে বললেন, "ভারি আশ্চর্য ডিম তো। বাকি ডিমগুলোও আমি কিনে নেবো।" বুড়ী তখন ঐ ক'টি ডিম বিক্রী করে ফেলেই পস্তাচ্ছিল, আর একটিও ডিম বেচতে রাজি হল না। তখন মহা বিষণ্ণতার ভান করে চলে গেলেন যাদুকর হারম্যান। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখেন বুড়ী তার কুড়ির অনেকগুলো ডিম ভেঙে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে। বেচারা ভেবেছিল ডিমগুলো ভেঙে একগাদা মোহর পেয়ে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যাবে, কিন্তু ডিম-ভাঙা লোকসানই সার হল। হারম্যান তখন বুড়ীকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি বুড়ীর সঙ্গে একটু তামাসা করে যাদুর খেলা দেখিয়েছিলেন মাত্র। আর ডিম ভাঙতে মানা করে তাকে সবগুলো ডিমের দাম দিয়ে গেলেন তিনি। বুড়ী খুশী হয়ে ধন্য ধন্য করতে লাগল। চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল খানখেয়ালী যাদুকর 'হারম্যান দি গ্রেট'-এর এই তামাসা আর সহৃদয়তার কথা। ফলে অতি কম খরচে অতি মূল্যবান বিজ্ঞাপন হয়ে গেল তাঁর। সেই শহরেই এক থিয়েটার হলে তিনি যাদু দেখাচ্ছিলেন। লোকে লোকারণ্য হতে লাগল এই খেয়ালী যাদুকরের যাদু দেখতে।

অসাধারণ যাদুকর আলেক্‌জাণ্ডার হারম্যান এক হিসেবে অসাধারণ সৌভাগ্যবানও ছিলেন। তিনি তাঁর সহকারীরূপে পেয়েছিলেন অসামান্য যাদু প্রতিভাধর উইলিয়াম রবিনসনকে। (এই রবিনসনই পরে হয়েছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুকর "চুং লিং সু"। চুং লিং সু-র বিস্ময়কর কাহিনী পরে বলা যাবে।) হারম্যান নিজে ছিলেন যেমন অসাধারণ প্রতিভাধর অভিনেতা, তেমি তালিম দিয়ে রূপসজ্জা এবং অভিনয়ে অসামান্য দুরন্ত করে তুলেছিলেন সহকারী রবিনসনকে। অবশ্য রবিনসনের নিজের অসাধারণ প্রতিভা ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। হারম্যানের চলাফেরা, হাবভাব, কথাবার্তা এবং যাদুপ্রদর্শনের ভঙ্গীগুলো রবিনসন এমনভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন যে তিনি যখন হারম্যান সেজে মঞ্চে খেলা দেখাতেন, তখন দর্শকরা টের পেতেন না তিনি আসল হারম্যান নন।

মঞ্চে হারম্যান যে সব অদ্ভুত খেলা দেখাতেন তা দেখে অনেকেরই মনে বিশ্বাস ছিল হারম্যানের অনেক অলৌকিক ক্ষমতা আছে। এমনও গুজব রটেছিল যে একই সময় তিনি দুজায়গায় উপস্থিত থাকতে পারেন !!! এটি হয়েছিল কি ভাবে তাই বলি। হারম্যান ছিলেন ঘোড়দৌড়-ভক্ত। ভালো ঘোড়দৌড় থাকলে তিনি দেখতে যাবার সুযোগ পারত পক্ষে ছাড়তেন না।

এমনও হতে পারে যে স্বামীরা যখন ঘোড়দৌড়ের মাঠে জনস্যান্ত হারম্যানকে দেখে তাঁর সঙ্গে রীতিমত আলাপ আলোচনা করে বাড়ী ফিরলেন তখন স্ত্রীরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ম্যাটিনী শো-তে জলজ্যান্ত হারম্যানের ম্যাজিক দেখে ফিরেছেন। স্বামী-স্ত্রীরা হিসেব করে দেখলেন হারম্যান যে সময় ঘোড়দৌড়ের মাঠে হাজির ছিলেন, ঠিক সেই সময় তিনি থিয়েটার হ'লের মঞ্চে যাদুক্রীড়াও দেখাচ্ছিলেন !!! স্বামীরা জোরগলায় বলেন, "নিজের চোখে দেখে এসেছি, নিজের কানে শুনে এসেছি।" স্ত্রীরাও জোর গলায় ঠিক তাই বলেন। সুতরাং একই সময় রহস্যময় হারম্যান দু জায়গায় উপস্থিত ছিলেন। খোদ হারম্যানকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি শুধু একটু রহস্যময় হাসি হাসতেন, যেন এর ভেতর সত্যিই কিছু অলৌকিক ব্যাপার রয়েছে। বলতেন না যিনীরা ম্যাটিনী শো-তে যে "হারম্যান"কে ম্যাজিক দেখাতে দেখে এসেছেন, সে হারম্যান আসল হারম্যান নয়, হারম্যানের নিখুঁত ছদ্মবেশে তাঁর সহকারী উইলিয়াম রবিনসন।

বাঙ্গালীর আশা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

পাঠান, মোগল, ইংরেজ—দীর্ঘকাল বাঙ্গালায় শাসন করিয়া বাঙ্গালীর স্বাধীনতার প্রতি তাহার প্রকৃতিগত আকর্ষণ নষ্ট করিতে পারে নাই—বাঙ্গালী যখনই সুযোগ অনুভব করিয়াছে, তখনই স্বাধীনতা পুনরায় লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছে—ব্যর্থতা সে চেষ্টা নির্ম্মূল করিতে পারে নাই। তাহা বাঙ্গালীর মনে —suspended animation অবস্থায় আত্মপ্রকাশের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সুযোগ আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, কিন্তু সুযোগ ব্যর্থ হয় নাই। বাঙ্গালী বাহুবলে হীন নহে, পরন্তু তাহার বৈশিষ্ট্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সেই বাহুবলকে যে ভাবে পরিচালিত করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। মুসলমানের শাসন শেষ হইল—এক বিদেশীর স্থান অন্য বিদেশী গ্রহণ করিল। সে অধিক কৌশলী এবং বিজ্ঞানের অনুশীলনরত। কিন্তু সে দেশে বিশৃঙ্খলার স্থানে সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিল। বাঙ্গালী তাহার বাঞ্ছিত সুযোগ লাভ করিল। সে প্রতীচীর জ্ঞানবিজ্ঞান অধিকৃত করিতে ও দেশে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতে আত্মনিয়োগ করিল।

সে কথা "স্বদেশী আন্দোলন" নামে ইতিহাসে পরিচিত স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় লালা লজপত রায় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—বাঙ্গালী প্রথম ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, বিধাতার ইহাই অভিপ্রেত যে, বাঙ্গালী ভারতে (স্বাধীনতার) নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিবে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাঙ্গালী প্রস্তুতিরূপেই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল— (১) জাতি গঠন। জাতি গঠন করিতে হইলে জাতিকে জাতীয়তায় অনুপ্রাণিত করিতে হয়। জাতীয়তার পাবনী ধারা বাঙ্গালার গোমুখীমুখ হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং ভগীরথ যেমন শঙ্খধ্বনি করিয়া গঙ্গাকে হিমালয় হইতে সাগরে লইয়া গিয়াছিলেন, বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথ তেমনই সেই ধারা সমগ্র ভারতে লইয়াছিলেন। সেজন্য বিদেশী ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

(২) বাঙ্গালায় জাতীয়তার জনগণের মধ্যে বহুমুখ করিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙ্গালীকে 'আনন্দমঠের' প্রতিষ্ঠাতা করা। সেজন্য অনুশীলন মাতৃভাষা—যে ভাষা সর্ব্বজনবোধ্য। বাঙ্গালী যে সে বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অবহিত হইয়াছিল, তাহা সমসাময়িক প্রচেষ্টা—বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনে ও বাঙ্গালা সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয়তা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা-প্রচার প্রচেষ্টায় আমরা দেখিতে পাই।

রাজস্থানের ইতিহাস বীরের ইতিহাস। সেই জন্য কবি বলিয়াছিলেন—রাজপুতানা—"বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি-মেখলায়।" কর্ণেল টড বহু শ্রম স্বীকার করিয়া কিম্বদন্তী ফেনপুঞ্জতুল্য হইতে সত্যের ধারা আবিষ্কৃত করিবার যে প্রশংসনীয় চেষ্টা করেন তাহার ফল—বিরাট গ্রন্থ। ভারতীয় ভাষার মধ্যে কেবল

বাঙ্গালায় তাহার একাধিক অনুবাদ হইয়াছিল। রাজস্থানের কীর্ত্তি অবলম্বন করিয়া রঙ্গলাল যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্বর্ণহারে মণির মত লিখিয়াছিলেন—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল, বল, কে পরিবে পায় রে,
কে পরিবে পায়?

ভাব মৌলিক নহে—আইরিশ কবি মূরের কবিতা হইতে গৃহীত—

"From life without freedom say, who would
not fly?
For one day of freedom, oh! who would
not die?"

কিন্তু ইহা রঙ্গলালের রচনায় যেরূপ শোভা পাইয়াছে, সেরূপ সচরাচর পায় না।

বাঙ্গালী স্বাধীনতার সাধনার দুই পথ অবলম্বন করিয়াছিল—উভয়ই দেশপ্রেম হইতে প্রসারিত। এক অহিংস—অপরটি প্রয়োজনে হিংসাশ্রয়ী।

য়ুরোপে যাইয়া মধুসূদন বুঝিয়াছিলেন—বাঙ্গালীই এক দিন ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবে—পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করিবে। তাই তিনি "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর" শেষ কবিতায় জননীর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—

"হে বরদে, এই বর মাগি তোমা কাছে—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত রতনে।"

বাঙ্গালাই ভারতের রত্ন—শ্রেষ্ঠ স্থান। তিনি কি কবি-প্রতিভায় তাহা উপলব্ধি করেন নাই?

মধুসূদনের সমসাময়িক—বন্ধু দুই জন মনীষী—রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

রাজনারায়ণ বসু

রাজনারায়ণ তাঁহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালায় সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। বাঙ্গালার সাংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতি। তিনি তাঁহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা সমগ্র হিন্দু সমাজে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন :—

"আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম্মের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিলটন তাঁহার স্বজাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন— 'Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep, and shaking his invincible locks; methinks I see her as an eagle mewing her mighty youth and kindling her undazzled eyes at the full mid-day beam.' আমিও সেইরূপ হিন্দু জাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবলপরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত

হইয়া বীরকুঞ্জর পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতায় উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দু জাতির কীর্ত্তি, হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।"

বহুদিন পরে অতুলচন্দ্র গাহিয়াছিলেন—

"বল বল বল সবে
ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে।"

সে কর্ম্মে ও ধর্ম্মে মহান হইবে।

রাজনারায়ণবাবু তাঁহার প্রবন্ধ-শেষে হিন্দু মেলায় গীত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। তাহাতে ছিল :—

"কেন ভয় ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়
কি ভয়—কি ভয়?
গাও ভারতের জয়।"

এই গীত সম্বন্ধে 'বঙ্গদর্শনের' মন্তব্য—

"এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক; হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক; গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্ম্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ন্ত্র ইহার সহিত বাজিতে থাকুক।"

রাজনারায়ণবাবুর আশা ও আকাঙ্ক্ষা—হিন্দুজাতি সেই হিন্দুদিগের মধ্যে বাঙ্গালী একাংশ। যে সকল হিন্দু বিদেশী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া সে শিক্ষার সারাংশ গ্রহণ করিলেও আপনাদিগের বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন করেন নাই, তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্রণীদিগের একজন।

ভূদেববাবু রাজনারায়ণবাবুর বন্ধু। তিনি বঙ্গভূমিকে মহাজ্ঞান ও মহতী প্রীতির সম্মিলন ভূমি বলিয়াছেন।

বঙ্গদেশে একদিকে ন্যায়, অন্যদিকে তন্ত্র ও আর একদিকে বৈষ্ণব প্রেমধর্ম্ম—এই তিনের আলোচনা, আদর ও পরিপুষ্টি। ভূদেববাবু বলিয়াছেন—

"এই মহাতীর্থবাসের সমগ্র সুফল এখানকার মনুষ্যগণের মধ্যে ফলিত রহিয়াছে। তাহাদিগেরও চিত্তভূমি মহাজ্ঞান এবং মহতী প্রীতির সঙ্গমস্থল। শাঙ্খ্য-সূত্রপ্রণেতা কপিলদেব অন্য সকল দেশ ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি করেন, তাঁহারই অংশাবতারগণ ন্যায় দর্শন ব্যাখ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এই

দেশে অবতীর্ণ হইবে এবং শ্রীতিপীযূষপূর্ণ গোবিন্দগীতি ও এই দেশে সংগীত হয়। কিন্তু অন্য কথার প্রয়োজন কি? চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সুস্নায়ুসন্ধায়ী তার্কিকবর্গের—এবং প্রকৃত জ্ঞান-মার্গাবলম্বী শক্তি সমুপাসকদিগের প্রসূতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও বেদ তাঁহার প্রায় সমগ্রভাগেই অধিকারী হইয়া আছে।"

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

তিনি বলেন—"যদি কখন সত্যযুগের সরস্বতীর সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এই যুগে ভাগীরথী সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্যের ভার সমর্পিত হইয়াছে। ইঁহাদিগেরই দেশে পূর্ব্বপিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

অর্থাৎ জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত হইয়া বাঙ্গালীরাই ভারতের দুরবস্থা দূর করিবেন—ভারতের পরাধীনতার অবসান ঘটাইবেন।

বাঙ্গালীর সম্বন্ধে ভূদেববাবুর কথা—

"এই বঙ্গভূমি সমুদয়ই মহাতীর্থ। ইহার মৃত্তিকা দেবাদিদেব মহাদেবের শরীরবিধৌত বিভূতি। ইহার জল তাঁহার জটাজূটোত্থিত ব্রহ্মবারি। এখানকার পাষণগণ দেবকল্প। এখানকার ফলমূল শস্যাদি সাক্ষাৎ অমৃতপূর্ণ। ইহা ভূলোকের নন্দনকানন।"

এই ভাব দেশবাসীদিগের মনে স্থায়ী হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা তাহার হানি না করিয়া যে তাহা প্রবল করিয়াছিল—রাজনারায়ণ, ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রমাণ। আর এই ভাবই "স্বদেশী" আন্দোলনকালে সমাদৃত একটি সঙ্গীতে সমগ্র বঙ্গদেশে গীত হইয়াছিল :—

"স্বদেশের ধূলি স্বর্গরেণু বলি
রেখ রেখ হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান—
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে,
অনিলে মলয় সদাবহমান।

নন্দনকাননে শোভা কিবা তার
বনরাজিকান্তি সুষমা তাহার—
ফলশস্য তার সুধার আধার—
স্বর্গ হতে সে যে মহা গরীয়ান।

পিতামহদের অস্থি কণা যত
এই ধূলি সাথে রয়েছে মিশ্রিত,

এই ধূলি হতে হইবে উত্থিত—
ভাবীকালে তব ভবিষ্য সন্তান।
কংসকারাগারে দেবকীর মত
বক্ষেতে পাষাণ লৌহশৃঙ্খলিত
জন্মভূমি তব আছেন পতিত ;
পরিচয়ে তুমি তাঁহারই সন্তান।
নিজদেহ প্রাণ করিয়া অর্পণ
যে করিবে মার শৃঙ্খল মোচন
যেন তারই হবে সার্থক জীবন—
হবে তার মানুষণ-প্রতিষ্ঠান।"

ভূদেববাবু বলেন—

"এখানকার নরনারীগণ দেবদেবী। কালধর্ম্মবশে ইহারা পাতালগামী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ঐ রসাতলগামী গঙ্গাবারি কি তন্মমাত্রাবশিষ্ট সাগরসন্তানদিগকে উদ্ধার করে নাই ?

"কপিল দেবপ্রিয়া, স্থাংশাস্ত্রপ্রসূতি, ওজস্বাস্ত্রজননী বঙ্গমাতা কতকাল আত্মবিস্মৃতা হইয়া নীচানুকরণরতা থাকিবেন ?"

এই শেষ উক্তি পাঠ করিলে একটি কথা মনে পড়ে। "বন্দেমাতরম" মন্ত্র যখন প্রথম লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়, তখন তাহাতে ছিল—

"সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
কে বলে মা তুমি অবলে ?"

পরে "কে বলে মা তুমি অবলে" পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিত হয়—"অবলা কেন মা এত বলে ?" ভূদেববাবুর সহিত আলোচনার পরে বঙ্কিমচন্দ্রই পরিবর্ত্তন প্রকাশ করিয়াছিলেন—একথা ভূদেববাবুর দৌহিত্রী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বলিয়াছেন। তাহা হইতেও পারে। তখন মনীষীদিগের মধ্যে ভাবের বিনিময় ও আলোচনা হইত। তখন বিদেশ শাসনে সকল কথা সুস্পষ্টরূপে বলিবার পথ বিপদকণ্টক-কণ্টকিতও যে ছিল না, তাহা নহে। হেমচন্দ্রের "ভারত সঙ্গীত" প্রকাশের জন্য 'এডুকেশন গেজেটের' সম্পাদক ভূদেববাবুকে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের অনবদ্য সঙ্গীতে ("বঙ্গ আমার")—

"আমরা ঘুচাব, মা, তোর কালিমা
মেহের শোণিত করিয়া দেব
দেবী আমার, সাধনা আমার, ধাত্রী আমার,
আমার দেশ।"

সেইরূপ কারণে হইয়াছিল—

"আমরা ঘুচাব, মা, তোর কালিমা,
মানুষ আমরা নহিত মেষ—
দেবী আমার, সাধনা আমার, ধাত্রী আমার
আমার দেশ।"

পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের জয়ে নবীনচন্দ্র দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সপ্তম-কিরণ।
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে যেব করিলে গমন
আসিবে ভারতে চিরবিষাদরজনী।
অধীনতা অন্ধকারে চিরদিন তরে
ডুবাবে ভারতভূমি যেও না তপন।"

এই আক্ষেপোক্তির কারণ :—

"যবনের অবনতি করি দরশন,
নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরব বর্দ্ধিত,
কোন্ হিন্দু চিত্ত নাহি—নিরাশাসঘন
হয়েছিল স্বাধীনতা আশায় পূরিত?"

কিন্তু সে আশার আর অবকাশ রহিল না বলিয়াই দুঃখ। কারণ—

পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী
স্বাধীন নরক বাস; অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক ওই তরুতলে বসি
অধীন ভূপতি হতে সুখী সমধিক।
চাহি না স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন
মুহূর্ত্তেক পাই যদি স্বাধীন জীবন।"

হেমচন্দ্রের ভূর্য্যনাদ আরও সুস্পষ্ট এবং তাহা যুদ্ধের আহ্বান বলিলে অসঙ্গত হয় না।—

"বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারতভূমি যবনের দাস,
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা!
আর্য্যবংশজয়ী পুরুষ যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা—
জনকত শুধু প্রহরী পাহারা
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা।

তাঁহার উপদেশ—

যাও সিন্ধুনীরে, ভূধরশিখরে,
গগনের গ্রহ তারকা ধ'রে
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বীসহ সমকক্ষ রণে—
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।

• •

অস্ত্রপরাক্রমে হও বিশারদ,
রণরঙ্গরসে হওরে উন্মাদ,
তবে সে বাঁচিবে ঘুচিবে বিপদ
জগতে যদপি থাকিতে চাও।"

এই স্থানে হিংসা ও অহিংসার কোন কথা নাই—যাহা প্রয়োজন তাহাই করণীয়।

সেই কথাই অরবিন্দ বলিয়াছেন—আমাদিগের রাজনীতি বৈদান্তিক। বেদান্ত যেমন ধর্ম্মমতের প্রভেদ সম্বন্ধে ব্যস্ত নহে—কিন্তু যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প সময় ও সুনিশ্চিতরূপে মোক্ষলাভ করা যায় তাহাই তাহার লক্ষ্য, তেমনই কি উপায়ে আমরা সুনিশ্চিতরূপে ও সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প সময়ে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি, তাহাই আমাদিগের লক্ষ্য। আমরা চাহি—ভারত অখণ্ড এবং স্বাধীন! সেই কার্য্যের জন্য যে উপায় প্রয়োজন তাহাই আমরা গ্রহণ করিব। হিংসায় ও অহিংসায় সমন্বয়—জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত বাহুবলের সমন্বয় সব দেখা যায়—চরম পরিণতি "বন্দেমাতরম" মন্ত্রে। একদিকে খরকরবাল আর একদিকে বিদ্যা ও বিজ্ঞান। সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আশা—স্বাধীন ভারতের স্বরূপ—মা যাহা হইবেন বুঝা ইহার পূর্ব্বে তিনি যাহা ছিলেন ও যাহা হইয়াছেন বুঝাইয়াছিলেন :—

মাতৃভূমি ছিলেন জগদ্ধাত্রীরূপিনী—"ইনি কুঞ্জরকেশরী প্রভৃতি বন্যপশু সকল পদতলে দলিত করিয়া বন্য পশুর আবাসস্থলে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কার পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন! ইনি বালার্কবর্ণাভ—সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী।"

তাহার পরে মা যাহা হইয়াছিলেন—"কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃদয়সর্ব্বস্ব সেই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন।"

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আশা ও আকাঙ্ক্ষা কি? 'মা যাহা হইবেন'—

দশভূজ দশদিক প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পাদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিক্‌ভূজা—নানা প্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী,—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিনী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী; সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।"

ইহাই বাঙ্গালীর আশা এবং এই আশাই বাঙ্গালার সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল্যবান বৈশিষ্ট্য।

ইতিহাসের পাতা থেকে

ইংলণ্ডের উপকূলের ফার্নহীলের লাইট হাউসের (বাতিঘর) তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উইলিয়াম ডারলিং। সম্মুখে তরঙ্গসঙ্কুল বিশাল সমুদ্র; সেই সমুদ্রে পথভ্রষ্ট জাহাজের নাবিকগণ বাতিঘরের আলোকে পথ খুঁজে পেত, বিপদে সাহস পেত।

উইলিয়ামের কিশোরী মেয়ে গ্রেস্। সমুদ্রের তরঙ্গ, সমুদ্রের ঝড়, সমুদ্রের নীলিমা তার বড় প্রিয়। রাত্রে ঘুমের ঘোরেও সে শুনতে পেত সমুদ্রের আহ্বান, সমুদ্রের উদাত্ত সঙ্গীত। দিনের বেলায় বাতিঘরের জানালা দিয়ে সে দেখত সাগরচিলেরা কেমন ঢেউয়ের মাথায় উড়ে উড়ে খেলা করে, ঢেউয়ের ফেনা কেমন রামধনুর রঙে সেজে ওঠে।

গ্রেসের বয়স বাড়তে লাগল, কিশোরী হলো তরুণী। নানান্ রকমের ভাল বই গ্রেসের বাবা তাকে পড়তে দেন। সমুদ্রকূলে সোনারবরণ চুল বাতাসে উড়িয়ে গ্রেস আপনমনে ছুটাছুটি করে, সমুদ্রের সঙ্গে তার পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে। উত্তাল তরঙ্গ দেখে সে আর ভয় পায় না, কালো আকাশের নিচে ঝড়ের তাণ্ডবলীলা দেখে সে আনন্দে হাততালি দেয়। এই দুঃসাহসিকা মেয়েটির দিকে চেয়ে তার বাবা ভাবেন সমুদ্রকে ভয় করে না, এত সাধারণ মেয়ে নয়। তা' ছাড়া একটি ছোট বোটে একলা দাঁড় টেনে সে কখন কখন যায় সমুদ্রের বুকে অনেকদূর পর্যন্ত।

হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে সমুদ্রের বুকে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। তারিখটা ১৮৩৮ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর। সে রকম ঝড় বড় একটা দেখা যায় না। সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন পাগল হয়ে কূলের পাহাড়ে আছড়ে পড়ছে। কেঁপে উঠছে বাতিঘর। তার সঙ্গে উঠছে আকাশে অবিরত বজ্রধ্বনি।

গ্রেস চুপ করে শুয়ে আছে তার বিছানায়। চোখে তার ঘুম নেই। শুধু একটি ভাবনা মনের মধ্যে মুহুর্মুহু জেগে উঠেছে এ দুর্যোগে কোন জাহাজ বিপন্ন হয় নি ত? তার প্রাণ উঠল বেদনায় অস্থির হয়ে। তখন ছুটে গেল সে তার বাবার কাছে। সেই একটি কথাই—এই মহা দুর্যোগে কোন জাহাজ বিপন্ন হয়নি ত। এ ঝড়ে সলিল সমাধি লাভ করবে! হয়েছিল কিন্তু ঠিক তাই। ইংলণ্ডের ফরফারসায়ার জাহাজ (The Forfarshire) এ প্রচণ্ড ঝড়ে বাতিঘরের কিছুদূরে সমুদ্রে ভেঙ্গে গেল। যে ক'জন নাবিক ছিল তাদের অনেকেই প্রাণ দিল সাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে। যারা তখনও বেঁচেছিল তারা ভাঙ্গা কাঠের টুকরা আঁকড়ে ধরে জলে ভাসতে লাগল। বাতিঘরের তীব্র আলোকে দূর থেকে গ্রেস দেখতে পেল এই মর্মন্তুদ দৃশ্য, ঝড়ের বুকে শুনতে পেল যেন তাদের দিশাহারা হাহাকার। প্রাণ গেল, গেল তার করুণায়। পর মুহূর্তেই সে মরণকে উপেক্ষা করে তার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে একখানি ছোট বোটে তখনি পাড়ি দিল বিক্ষুব্ধ সাগরের বুকে।

গ্রেসের অক্লান্ত চেষ্টায় নাবিকেরা প্রাণে বাঁচল, যদিও সংখ্যায় তারা খুবই কম। মাত্র ন'জন পুরুষ আর একটি মহিলা।

পরদিনই গ্রেস ডারলিং-এর নাম সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে তার এই অদ্ভুতপূর্ব বীরত্ব কাহিনী ইতিহাস হয়ে রইল। এই সাহসিকতাপূর্ণ অভিযানের জন্যে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পেলেন ১০৭০ পাউণ্ড পুরস্কার।

কিন্তু সবচেয়ে বড় পুরস্কার হোল তিনি আজও অমর হয়ে আছেন ইতিহাসের পাতায়।

বিজ্ঞান-কথা

সত্যজিৎ

সৌরকলঙ্ক (২)

পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে, গড়ে প্রতি ১১ বছর অন্তর সূর্যের ক্রিয়াশীলতার পুনরাবর্তন ঘটে অর্থাৎ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। এর মধ্যে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা একবার সর্বাধিক ও একবার সর্বনিম্ন হয়। সংবৎসরকালে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা গণনা করে ক্রিয়াশীলতার পরিমাপ করলে ১১ বৎসর আবর্তনকালটি ধরা যায়।

সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব ও লয়ের মধ্যে কতকগুলি সুন্দর নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত একটি স্থান বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তার পাশে কয়েকটি কালো বিন্দু দেখা যায়। কয়েকদিনের মধ্যেই বিন্দুগুলি ক্রমশ জমাট বাঁধতে থাকে এবং শীঘ্রই সমুদয় বিন্দুগুচ্ছতে দুটি বড়ো কলঙ্ক দেখা যায়। এদের একটি অপরটির কয়েক ডিগ্রী পশ্চিমে থাকে। পশ্চিমদিকেরটিকে বলা হয় 'চালক' এবং অন্যটিকে 'অনুচর'। কারণ দুটিই একসঙ্গে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলতে থাকে। এই চলার দিকেই সূর্যপৃষ্ঠের আবর্তন লক্ষ্য করা যায়। চলবার সময় চালক ও অনুচরের পরস্পর দূরত্ব দু-তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলঙ্ক কখনো কখনো চালক ও অনুচরকে ঘিরে থাকে। সূর্যের ক্রিয়াশীলতা যখন কমতে থাকে তখন প্রথমত অনুচরটি খণ্ডখণ্ড হয়ে ভাঙতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। চালকটি তখন পাশের ছোট ছোট বিন্দুগুলিকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কিছুকাল নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে এবং তারপর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সূর্যদেহে কলঙ্ক দেখা গিলে পৃথিবীতে বেতারবার্তায় বিঘ্ন ঘটে। এর কারণ কি? এই কারণ অনুসন্ধানে আমাদের চুম্বকধর্ম সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। একটি সৌরকলঙ্কের মধ্যে ইলেকট্রনের মতো তড়িৎকণা যদি বৃত্তাকার ঘুরতে থাকে তা হলে তড়িৎচুম্বকীয় নিয়মানুসারে কলঙ্কটি চুম্বকধর্মী হবে। এই চুম্বকধর্ম প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করা কঠিন। মার্কিন বিজ্ঞানী হেল এর জন্যে একটি পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করেন। বহুপূর্বে ডাচ বিজ্ঞানী জিম্যান প্রমাণ করেছিলেন, একটি পরমাণু যদি শক্তিমান চুম্বকের কাছে থাকে তবে ঐ পরমাণুজাত এক একটি বর্ণরেখা বিভক্ত হয়ে দুই বা ততোধিক বর্ণরেখায় পরিণত হয়। এই সূত্র অবলম্বন করে হেল সৌরকলঙ্ক ও উজ্জ্বল সূর্যপৃষ্ঠের একই বর্ণরেখার সূক্ষ্মভাবে তুলনা করে প্রমাণ করতে সমর্থ হন যে, সৌরকলঙ্কের বহু রেখা প্রকৃতপক্ষে জিম্যান ফলানুসারে বিভক্ত। সুতরাং সৌরকলঙ্কগুলিকে চুম্বকধর্মী বলতে হবে। জিম্যান ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে চুম্বকের মেরুত্বও নির্ণয় করা সম্ভব। এইভাবে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে নির্ণীত হয় যে, প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই কলঙ্কগুচ্ছের চালকের চৌম্বকমেরু পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর অনুরূপ এবং অনুচরের চৌম্বকমেরু তার বিপরীত। এই হলো সূর্যের উত্তর গোলার্ধের কলঙ্কের চুম্বকধর্ম। দক্ষিণ গোলার্ধের চুম্বকধর্ম এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯০৮ সালের কিছুকাল পর সূর্যের সর্বনিম্ন ক্রিয়াশীলতার কাল উত্তীর্ণ হলে যখন ১৯১২ সালে কলঙ্কগুচ্ছ পুনরায় দেখা দেয় তখন লক্ষ্য করা গেল, তাদের চুম্বকমেরু ১৯০৮ সালের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ চালকটি উত্তর এবং অনুচরটি দক্ষিণ মেরুধর্মী। সৌর কলঙ্কের এই চুম্বক ধর্মের সহসা পরিবর্তন ঘটলে বেতারবার্তায় বিঘ্ন ঘটে। বিজ্ঞানীরা এই পরিবর্তনকে 'চৌম্বক ঝড়' বলেন। বেতারতরঙ্গের আয়নমণ্ডলে সুপ্রবেশ ও প্রতিফলনের ওপর বেতার-বার্তা নির্ভরশীল এবং আয়নমণ্ডল আবার সূর্যের ক্রিয়াশীলতার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং সূর্যের ক্রিয়াশীলতায় আকস্মিক পরিবর্তন ঘটলে বেতার-বার্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

আজকের দুনিয়া

জার্মানীতে এই বৈজ্ঞানিক যুগে লোকে আর ঘরোয়া কাজে মোটর চড়ে যায় না। মোটরের চেয়েও কম দামে টু-সিটার এরোপ্লেন দেদেশে সহজেই পাওয়া যায় (It is cheaper to purchase planes than cars)। দরকার মাফিক টু-সিটার এরোপ্লেনে চড়ে পার্টি, বন্ধুবান্ধবের বাড়ী, কারখানা, সমুদ্রতটে বেড়ানো সব কিছুই চলে। ইচ্ছা করলেই ছোট্ট নিজস্ব প্লেনটিতে বসে বেশ খানিকক্ষণ ঘুরে আসাও যায় (Germans now own private aeroplanes for business and pleasure)। এছাড়া নিজের বাড়ীতে ঐ ছোট্ট এরোপ্লেন রাখবার জায়গা না থাকলে বড় বড় এরোড্রোমেও ভাড়া দিয়ে রাখা যায়। এজন্য অন্ততঃ ১০৪টি এরোড্রোম নির্মিত হয়েছে (There are 104 aerodromes in the country for the use by private owners.) লিঙ্ক

• • •

ভারত গভর্ণমেণ্ট বিশেষ অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন, ভাটি রাজপুতদের মধ্যে এখনও এক বীভৎস কুপ্রথা বর্তমান আছে। ঐ রাজপুত সম্প্রদায়ের রমণীরা কন্যাসন্তান প্রসব করলে আঁতুরঘরেই ঐ শিশুকন্যাকে মুখে বালি চাপা দিয়ে মেরে ফেলা হয়। (Every female child is killed as soon as it is born, Bagfuls of sand are pressed on its mouth. The child can neither cry nor breathe and soon expires.)। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে যে কন্যা জন্মালেই তার ভবিষ্যতের বিবাহের যৌতুক হিসাবে সমাজপতিদের নিয়মিত চাঁদা দিতে হয়। এই চাঁদা দেওয়া থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যেই এই ভয়াবহ কুপ্রথা। ইণ্ডিয়ান নিউজ ম্যাগাজিন

• • • •

চীন দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় অভিনেতা মেই-লান্-ফাং তাঁর অতুলনীয় অভিনয় দ্বারা সারাবিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছেন। ইউরোপের অভিনয়-বিশেষজ্ঞেরা তাঁর সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ (Even in Europe his reputation is widely known as unusual thing for a Chinese actor.)। মিষ্টার স্কট, পাশ্চাত্য দেশ থেকে এসেছিলেন তাঁকে দেখতে ও তাঁর সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু পিকিং গভর্ণমেণ্ট তাঁকে মেই-লান্-ফাংএর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে মাত্র দু'ঘণ্টা সময়ের অনুমতি দেন। (With the special permission of the Chinese Government to meet this hero but was only able to obtain two hours with him.)। ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইণ্ডিয়া

• • • •

স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও প্রকৃত স্থান ও পাত্রাদির সমন্বয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ছায়াচিত্র তোলবার জন্যে ব্রিটিশ থেকে বিশিষ্ট ছায়াচিত্র কর্তৃপক্ষেরা নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ডুতে এসেছেন। এ বিষয়ে রক্ষণশীল নেপালের রাজা মহেন্দ্র ও রাণী রত্নরাজ্যেবীর সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে। রাজা মহেন্দ্রের হলিউড পরিদর্শন উপলক্ষ্যে এই অনুমতি লাভ করা হয়। ফিল্মটির নাম "The mountain is young". সুবিখ্যাত চিত্রপরিচালক Luigi Luraschi এই চিত্রটির পরিচালনা করবেন। হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পূর্ণভাবে এই চিত্রে দেখবার আশা অনেকেই করেন।

•

হলিউডে ভারতীয় নর্তকী শ্রীমতী অরুণা দেবী ও নর্তক শ্রীরূপেশ গুহ তাঁদের নৃত্যকলা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করেছেন। খাস আমেরিকায় ভারতীয় সংস্কৃতির আদর ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এ কথা বলাই বাহুল্য। হলিউডে যে নৃত্য-অনুষ্ঠান হয় তাতে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে অনেক নামজাদা নর্তক-নর্তকী এসেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে ঐ শিল্পীযুগলের উচ্চ প্রশংসা সকলেই একবাক্যে করেছেন।

বিশ্ব কেয়ার

•

প্রেমপত্র লিখে লিখে বান্ধিতার হৃদয় জয় করে তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে আমেরিকা এক আদর্শ দেখিয়েছে। সেখানে এক তরুণ তাঁর অপরিচিতা নায়িকাকে ৩২৮৫খানি প্রেমপত্র লিখেছিলেন। নায়িকা শেষে বিব্রত বোধ করে তরুণটিকে বিয়ে করে তবে রক্ষা পান। বেলজিয়ামে আর এক মজার কাণ্ড হয়েছে। সেখানে কোন সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করবার তরে দু'জন যুবক প্রায় ক্ষেপে ওঠেন। তরুণীর বাবা চালাক লোক, তিনি একটা মোটা টাকার অঙ্ক দেখিয়ে বললেন যে, ঐ টাকা না পেলে তিনি তাঁর মেয়েকে কারোর সঙ্গেই বিয়ে দেবেন না। যুবকদের কারোর অত টাকা ছিল না, তখন তারা সকলে নিজ নিজ সমস্ত সম্পত্তি ও টাকা এক সঙ্গে জড় করে জুয়ো খেলতে বসল। যে জিতবে ঐ সমস্ত তারই হবে। অবশ্য তাদের মধ্যেই একজন জুয়ো জিতেছিল ও ঐ তরুণীকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু এতে অন্য তরুণদের ঈর্ষা হয়নি।

জন্ উইকলি

• •

বড়দিন উৎসব খৃষ্টানদের বিশেষ ধর্মোৎসব। ২৫শে ডিসেম্বর যীশুখৃষ্টের জন্মদিন বলে সকলেই জানেন ও বিশ্বাস করেন। কিন্তু এখন ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ করেছেন যে ঐ তারিখ যীশুখৃষ্টের জন্মদিন নয় (December 25th as the birth-day of christ is not based on fact—but legend.)। নানারকম গবেষণার পর স্থির হয়েছে যে, যীশুখৃষ্টের জন্ম তারিখ জানবার কোন সঠিক উপায় নেই। ২৫শে ডিসেম্বর ঐ পুণ্য তারিখ বলেই এতকাল চলে আসছে।

ফেমিনা

• • •

বিলেতের কিংসওয়ে, লাঙ্কাশায়ারে, শরীরে অস্ত্রচিকিৎসার পর (after an operation three months ago) একটি বারো বছরের ছেলে অসম্ভব রকমে বেড়ে ওঠে। তার শরীর দু' ফুট লম্বা ও ওজনে ১০ ষ্টোন ৭ পাউণ্ড হয়। এই ব্যাপারে সকলে বিস্ময়াভিভূত হয়েছে, চিকিৎসক মহলেও বেশ সাড়া পড়ে গেছে। অপারেশনের ফলে কেমন করে এ অসম্ভব সম্ভব হোল সেটা সারাজগৎকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে।

মিরর

রবীন্দ্রনাথের "রথযাত্রা"

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুদিন পূর্বে প্রবাসীতে 'রথযাত্রা' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটিকা প্রকাশিত হয়। কবি নিজে সম্প্রতি স্বীকার করেছেন যে ওঁর স্নেহাস্পদ ছাত্র আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর কোনো রচনা থেকে ওঁর মনে এই নাট্যসূত্রের ভাবটি আসে। পরে "কালের যাত্রা"র 'রথের রশি' নাম দিয়ে এটি আগাগোড়া পুনর্লিখিত ও পরিবর্তিত হয়। 'কালের যাত্রা'র আর একটি ইতিহাস আছে। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশতম জন্মতিথিতে (১৩৩৯ ভাদ্র) কবি তাঁকে এই পুস্তকটি উৎসর্গ করেন। তিনি চিঠিতে লেখেন—তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টী এই—রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি—কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সহজ বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসম্মান হয়ে গেছে, তাই চলছেনা রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে ; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে। আজকের এই তিথিগত রথযাত্রার দিনে কবির মনে যে মনোরথের ছায়া রূপ নিয়েছিলো তার ছন্দ ও সৌষম্য নিয়ে, সে কথা স্মরণ করলে ভবিষ্যদ্রষ্টা কবিকে বারে বারে সাধুবাদ জানাতে ইচ্ছা করে।

রথযাত্রার মেলায় মেয়েরা এসেছে, ছেলেরা ছুটেছে, রাজা প্রজা সাধু সন্ন্যাসী ভক্ত নাগরিক সৈনিক—কিন্তু রথ নড়ে না। ছুটে এলুম রথ দেখতে, বেলা হয়ে গেল ; রথের নেই দেখা। চাকার নেই শব্দ—সব চুপচাপ, কেনাবেচা পর্যন্ত বন্ধ, রাস্তার ধারে ধারে লোক জটলা করছে—কিন্তু রথ আর আসেনা। রথের দিন প্রথম যাত্রার দিন—বেরুবেন ব্রাহ্মণঠাকুর শিষ্যপ্রশিষ্য নিয়ে, বেরুবেন রাজা, পিছনে চলবে সৈন্যসামন্ত, বেরুবেন পণ্ডিত মশাই, ছাত্ররা চলবে পুঁথিপত্র হাতে। মহাকালের পাণ্ডা ত মাথায় হাত দিয়ে বসেই পড়েছে—এ কী অনাচার—রথ নড়ে না। এরি মাঝে অকল্যাণের বাণী শুনিয়ে যায় সন্ন্যাসী ঠাকুর—

সর্বনাশ এল
বাঁধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।

সন্ন্যাসী বলে—জানো না লক্ষ্মীর ভাণ্ড আজ শতছিদ্র, তার প্রলয়ধারা শুষে নিচ্ছে মরুভূমিতে—ফলছেনা কোনো ফল। ওরা ফসলের ক্ষেতে বাস করছে উপবাস।

সন্ন্যাসীর মুখে আমরা শুনছি কবির কথা—

তোমরা কেবলই করেছ ধন
কিছুই করনি শোধ,
দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিত্ত
তাই নড়েনা আজ আর রথ
ঐ যে পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে তার অসার হড়িটা।

মেয়েরা বলে—সত্যিইত, পুজো দিয়ে দেবতার ঋণ শোধ ত করিনি—পুজোর কথা ত ছিলনা, ভেবেছিলাম রথের মেলায় বেচব কিনব, বাজি দেখব যাদুকরের আর দেখব বাঁদর নাচ। ঘড়ি-দেবতার পুজো ত দেওয়া হয়নি। এ ঘড়ি যুগযুগান্তরের, দেশদেশান্তরের ঘড়ি—যা পড়ে থাকে অনড় হয়ে ঘাটি কামড়ে, সময়ে সময়ে কণা ধরে, হোঁচটও মারে। ব্যাপার কী—রথ কি তাহলে চলবেনা—আগে পুরুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে রথ চলত। নাগরিকরা চিন্তিত হয়ে ওঠে। সন্ন্যাসী ওদেরও ভয় দেখিয়েছে, বলেছে—ভূমিকম্পের ভয় হচ্ছে। পুবে পশ্চিমে আকাশ হয়েছে রক্তবর্ণ—প্রলয়দীপ্তির আংটি পরেছে দিকচক্রবাল। মেয়েরা কিন্তু প্র্যাকটিকাল্। তাদের বোধহয় জানাছত তারা ঘড়ি নারায়ণের পুজো আরম্ভ করি দিলে—ঘি ঢালে, দুধ ঢালে, গঙ্গাজলের ঘটি নিয়ে আসে, মানত করে—একমাস ভাত খাওয়া ছেড়ে দেব, নাগকন্যার বেণীর মত যে ঘড়ির ডগা তাকে দেব সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে ইত্যাদি। কিন্তু এতো করেও রথ চলেনা—উঁচু-নিচুর সাঁকোর উপর দিয়ে যে রথ এতদিন চলেছে।

এবার এলো সৈনিকরা—তারাও পারেনি রথকে ঘোলাতে। রাজা ডাক দিলেন শেঠজীকে কলিযুগে নাকি শাস্ত্র চলেনা, চলে শুধু স্বর্ণচক্র। এমনকি পুষ্পগুচ্ছ ছিলেটাও বেনের টানেই মিঠে সুরে টংকার দেয়। এ যুগের অধিদেবতা—অর্থ বেনে—রাজেশ্বর। ধনপতির ধনও কিন্তু পাত্তা পেলেনা। সিদ্ধি হল না করায়ত্ত সিদ্ধিবস্তু বলেও। আসা যাওয়া বৃথাই হলো নর্মদাতীরের বাবাজীর। পঁয়ত্রিশ বছরের উপবাসের তার চাকাটি সামলাতে না পেরে সোজা ঢুকলো মেদিনীতে।

মেয়েরা আবার চেষ্টা করলে তাদের প্রকৃতির তুকতাক দিয়ে। ঘড়িনারায়ণ শুনলেন না নিবেদন। সতেরো বছরের বামনের মেয়ে বোম ভোলানাথ বলে তালপুকুরে ঠিক দুপুর বেলা এক ডুবে পাট-শিয়ালা তুলে ভিজে চুল দিয়ে বেঁধে ঘড়ি-প্রভুর কাছে পোড়ালে—প্রভুর টনক নড়লো না। মানত করলে নতুন করে পঁয়তাল্লিশ ভরি সোনার আংটি, এমন কি বললে তিন বছর থাকব দাসী হয়ে—ভোগ দেব তিনবেলা—টললো না তাঁর মন। শেষ পর্যন্ত চর এসে খবর দিলে—আসছে সূত্রপাড়ার ওরা দল বেঁধে—আমরা এলাম বাবার রথ চালাতে মন্ত্রীমশায় শুধু চালাক লোক নন, বহুদর্শী, বললেন খাতির করে—তোমরা-ই ত বাবার রথ চালিয়ে এসেছ চিরদিন কিন্তু এতদিন তারা পড়তো রথের চাকার তলায় দলে গিয়ে ধুলোয় যেতো চ্যাপ্টা হয়ে বাবা আর সে বলি নেবেন না। তারা এবার চায় রশির টানে যোগ দিতে।

আমরাই ত যোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ
আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।

সৈনিকরা ত ক্ষেপেই অস্থির—এসব কী প্রলাপ বকে ওরা, মন্ত্রীমশায় থামান্ দুপক্ষকেই, ওদের বলেন—আরে তোমরাই ত মহাকালের বাহন, নারায়ণের গরুড়।

হেইয়ো—টান পড়ে—রথ চলে—জয় মহাকালনাথের জয়। এ পক্ষরা ভাবে—একী হলো—মহাকাল বোধ হয় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন—বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে তাঁর। রথ ছুটেছে, নতুন হাতের স্পর্শ পেয়ে যেন জেগে উঠেছে। কিন্তু মাতাল রথ কোন্‌দিকে বেঁকে ছুটবে তা কেউ জানে না। ধনপতির দল ভয়ে সিঁটকে ওঠে তাদের ভাণ্ডার বুঝি গুঁড়িয়ে গেলো—সৈনিকের অস্ত্রশালাও বুঝি ভেঙে পড়ে।

এমন সময় হলো কবির আবির্ভাব। সবাই ধরলে কবিকে—বলো, পুরুতের হাতে রথ চললো না, রাজার হাতে নয়, সৈনিকের হাতে নয়, ওদের হাতে গড়াগড়িয়ে চলে কেন? কবি জবাব দিলে—তোমাদের

মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু, মহাকালের রথের চূড়োর দিকেই কেবল দৃষ্টি, নীচের দিকে নামল না চোখ, রথের দড়িটাকে করলে তুচ্ছ। মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন তাকে মানলে কই? আজ রথ চালাতে গেলে চাই পায়ের জোর নয়, হৃদয়ের জোর। সৈনিক বললে—কবীশ্বর, তুমি ত উপদেশ দিয়ে খালাস, ওদিকে যে আগুন লাগল্। কবির প্রশান্ত উত্তর হল—যুগাবসানেই আগুন লাগে। যা ছাই হবার তাই ছাই হয়, যা টিঁকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।

রথঘরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবেনা টলমলিয়ে, যদি ওঠে তাহলে আসবে উল্টোরথের পালা। তখন আবার নতুন যুগে উঁচুতে নীচুতে হবে বোঝাপড়া। সে যখন হয় হোক্ আজ যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দাঁড়াক্ একবার মাথা তুলে। রথচলার ঐ মন্ত্র।

এক এক সময় বিদ্যুতের মত আমার মনে হয় যেসব কাজকে আমরা অত্যন্ত বেশি মনে করি—বক্তৃতা করি, লিখি, হাঁসফাঁস করিয়া বেড়াই, দেশ উদ্ধার করিবার ফিকির করি—এ সমস্তই বাজে কাজ। জীবনটা ইহাতে কেবল খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। প্রেমই নিত্য, শান্তিই চিরন্তন। দুঃখ এই যে, মানুষকে ক্ষণিক ক্ষোভ সাময়িক অশান্তি কাটাইয়া এই নিত্য পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। এমনি করিতে করিতেই জীবনটা কাটিয়া যায়—তখন কোথায় তুমি কোথায় আমি। সম্পূর্ণতা কেবল মরীচিকার মত আগে চলে তাহার পথের আর শেষ নাই। এমনি করিয়া কে আমাদিগকে কেবলি টানিয়া চলিয়াছে। এক একবার ইচ্ছা করে বিদ্রোহ করি—সব কাজকর্ম ফেলিয়া মুখামুখি করিয়া বসি—হৃদয়টাকে পূর্ণ করিয়া ফেলি। কিন্তু পথের আহ্বান যখন আসে তখন লক্ষ্মীছাড়া আর বসিয়া থাকিতে পারে না—আবার দৌড় আবার দৌড়! একটা পাকের মধ্যে পড়িয়া গেছি। সমস্ত বিশ্ব জগৎটা একটা পাক—কেবলি ঘুরিতেছে—ঘোরাই যেন তাহার পরিণাম—মানবলোকও একটা পাক—কেবলি ঘুরিয়া চলিতেছে—তাহার পরিণাম কোথায়? এইজন্যই ভগবান বুদ্ধ ব্যাকুল হইয়া এই পাক হইতে কোনমতে বাহির হইবার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমস্ত মানুষ বাহির না হইলে একজনের বাহির হইবার যো নাই। জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া এই মানুষ ঘূর্ণীতে ঘুরিয়া মরিতে হয়। তোমাদের বিজ্ঞানের মতে আকাশের এক জায়গায় পাক খাইয়া জগৎ অগণ্য গ্রহতারায় ঝলকিয়া উঠিয়াছে—কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ বলে না? এই পাকের মধ্যে অগণ্য চক্র—নক্ষত্রচক্র, সৌরচক্র, গ্রহচক্র, জীবচক্র—এই পাকের বাহিরেই স্থির শান্তি। প্রাণটা সেইখানকার জন্য দুইহাত বাড়ায়, কিন্তু ভীষণ জগতের টান তাহাকে আপনার অনন্ত ঘূর্ণায় বার বার টানিয়া লয়। —রবীন্দ্রনাথ

"কথা প্রসঙ্গে"

প্রায় একমাসকাল আসামে বাঙালী বিতাড়নের লাঞ্ছনা নামে যে অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চলিতেছে, আসাম সরকার ও ভারত সরকার যে তাহার অবসান ঘটাইতে পারিতেছেন না, ইহা যেমন দুঃখের সেইরকম লজ্জার বিষয়। কিছুদিন হইতেই আসামে বাঙ্গালী বিদ্বেষ মধ্যে মধ্যে অত্যাচার ও অনাচারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ গঠন সম্পর্কে অনুসন্ধান ও মতপ্রকাশ করিবার জন্য ভারত সরকার যখন সমিতি গঠন করেন, তখন ভাষা অবলম্বন করিয়া এই বিদ্বেষ বর্বরতায় পরিণতি লাভ করিয়াছিল এবং সেই অবস্থার প্রতিবাদ করাই যাঁহাদের কর্তব্য ছিল, তাঁহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ বাঙ্গালী বিতাড়নে যোগ দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় আসাম সরকার তাহাদিগকে মামলায় সোপার্দ করেন নাই।

এবার আবার অসমীয়া ভাষাই আসামের রাষ্ট্রভাষা হইবে কি না—এই প্রশ্ন লইয়া আসামের দিকে দিকে বাঙ্গালীর প্রতি অকথ্য অত্যাচার চলিতেছে। কোন কোন স্থানে শান্তিস্থাপনের জন্য সেনাদলকে নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। ট্রেন চলাচল অনিয়মিত, গৃহ ভস্মীভূত এবং বাঙ্গালীরা প্রহৃত হইতেছেন। নারীদের উপর চরম অত্যাচারও হইয়াছে। যে কোন সভ্যজাতির পক্ষে ইহা চরম লজ্জার বিষয়। সভ্য দেশের ইতিহাসে ইহার চেয়ে অবমাননাকর আর কোন কার্যই হইতে পারে না। যে আসামে হিন্দুর তীর্থক্ষেত্র কামরূপে প্রতি বৎসর লক্ষাধিক বাঙ্গালী নরনারী তীর্থযাত্রা করিয়া থাকেন, যে আসাম বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যেমন রাজনীতি ক্ষেত্রেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; যে আসাম "চৈতন্যদেবের পিতৃভূমি, যে আসাম হইতে বিপিনচন্দ্র পাল আসিয়া পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন; যে আসাম হইতে আগত বাঙ্গালী তারাকিশোর চৌধুরী কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারকের পদের দায়িত্বে আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিরাট নিঃস্বার্থ সম্প্রদায়ের মোহান্ত হইয়া সন্তদাস হইয়াছিলেন—সেই আসামে যে আসামীরা বাঙ্গালীদিগকে বিতাড়িত করিতে বর্বরতার আশ্রয় লইতেছেন, ইহা সংস্কৃতি, শান্তি ও স্বাধীনতার পক্ষে আশঙ্কার কারণ।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—আসামীদের কাজ সমগ্রতন্ত্রে ধারুন আঘাত। প্রায় শতবৎসর কাল ভারতীয় নেতারা বিচ্ছিন্ন বিভক্ত ভারতকে জাতীয়তার দ্বারা মহাভারতে পরিণত করিবার যে স্বপ্ন সফল করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন—আজ কি আমরা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থহেতু সেই স্বপ্ন ব্যর্থ করিয়া—রাষ্ট্রের ঐক্য নষ্ট করিয়া—জাতীয় সংস্কৃতির সর্বনাশ করিয়া রাষ্ট্রকে দুর্বল করিব? যে সময়ে রাষ্ট্র বিপন্ন, সেই সময়ে আমরা তাহার বিপদ বৃদ্ধি করিয়া নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিব?

ভারতীয় সংস্কৃতি আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত—সেই জন্য ভারতবর্ষ শান্তির পরিবেশই সৃষ্টি করিতে চায়। সেই জন্যই ভারত মহামানবের তীর্থক্ষেত্র। পরাধীনতার দুঃখমুক্ত ভারত আবার বিশ্বসভায় তাহার শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিবে। জড়বাদজর্জরিত সভ্যতায় বিপন্ন প্রতীচী যখন ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে সেই সময় ভারত রাষ্ট্র যদি ক্ষুদ্র স্বার্থে হিংসায় উন্মত্ত হইয়া তাহার স্বার্থ ভুলিয়া যায় তাহা হইলে শুধু ভারতের পক্ষেই নহে, সমগ্র সভ্য জগতের পক্ষেই তাহা অকল্যাণের কারণ হইবে। আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া মর্মাহত হইয়াছি। রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ হইতে সুভাষচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ হইতে শ্রীঅরবিন্দ—যে সাধনার শিক্ষা ও আদর্শ দিয়া গিয়াছেন আজ কি স্বাধীনতা লাভের পরে ভারত তাহাই বিসর্জন দিবে? ভারতীয় সংস্কৃতি কি বিশ্বমান বিশ্বে শান্তিস্থাপনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে?

যে সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় আদর্শের আলোকে করিয়া আন্তর্জাতিক ব্যাপারে বিভিন্ন দেশকে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের আদর্শ গ্রহণ করিতে বলিতেছেন, সেই সময় ভারত রাষ্ট্রেরই একটি রাজ্যে এই ধরণের ঘটনা ঘটিতেছে ইহা আমাদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও দেশের সংহতিকেই বিপন্ন করিবে এই আশঙ্কায় আমরা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছি।

"প্রবাসী বাঙ্গালী"

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

[আজকে বাঙালী এক গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন—তার সম্মুখে অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন, তার সভ্যতা-সংস্কৃতি, পরিবর্ধন ও উৎকর্ষসাধনের সমস্যা, তার দূর-দূরান্তরে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুণ, তার পরিচর্যার পারস্পরিক ও ঘনিষ্ঠতার অভাব। সুদূর অতীতকাল থেকে বাঙালী বিশ্বমুখী, দূরদূরান্তরে সে অভিযান করেছে, নীড় বেঁধেছে দূর প্রবাসে। বাণিজ্যসূত্রে সে গিয়েছে দেশে দেশান্তরে। ইংরেজ আগমনের পর বাঙলার শিক্ষিত সমাজ কর্মসূত্রে ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র ভারতবর্ষে তথা বিশ্বের নানাস্থানে। অনেক অনুন্নত অঞ্চলে বাঙালী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথপ্রদর্শক। কালক্রমে আমাদের ঘর ভেঙেছে, বিখণ্ডিত হয়েছে বাংলাদেশ, কর্মক্ষেত্রে এসেছে তীব্র সংগ্রাম, সমগ্র জাতির শিয়রে ঘনীভূত হয়েছে সঙ্কট। পরস্পরকে জানার আজ বড় প্রয়োজন। এই প্রয়োজন উপলব্ধি করে "গদ্য-ভারতী" একদিন এই কথা আবেগে বলেছিল: "যেখানে বাঙালী সেখানেই বাঙলা।" ভারতের সর্বত্র সেদিন বাঙালী গভীর প্রত্যয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছিল, বিশ্বের বহুস্থানে তার বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিল। আমরা জানিনা আজও এই বাঙলার সন্তান কোন দূর প্রবাসে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে, বিদেশের মাটিকে করে তুলেছে আর এক বাঙলা। আমরা আহ্বান জানাই সকলকে, বাঙলার বাইরে বাঙালীর কীর্তি, বাঙালীর গৌরব, বাঙালীর মহিমাকে তাঁরা প্রকাশ করুন, বাঙালীর সম্মুখে তার আর এক ঐশ্বর্যের পরিচয় উদ্ঘাটিত হোক, দূর নিকট হোক।

এই অধ্যায়ে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে দূরদূরান্তরের বাঙালীদের জীবনযাত্রা ও শিক্ষা-দীক্ষার ধারা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য, পরিবেশ গ্রহণে পটুতা এবং স্বকীয়তাবোধ—যার ফলে দেখা দেবে সহানুভূতি, ঘনিষ্ঠতা, ঐক্যবোধ ও পারস্পরিক সহমর্মিতা।]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে সব বাঙালী লখনউ সহরকেই নিজেদের কর্মস্থল বলে গ্রহণ করেছিলেন কবি অতুলপ্রসাদ তাঁদের অন্যতম। ব্যারিষ্টারি করতে এসে প্রচুর অর্থ রোজগার ক'রলেন আবার লোকহিতে প্রচুর অর্থ বিলিয়ে দিলেন দু'হাতে। মানুষ হিসেবে ওদেশবাসীর কাছে এ. পি. সেন একজন বিরাট মনীষী—যাঁর দ্বার থেকে প্রার্থী কোনদিন ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেনি। আজ বাঙালীর কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত শোনা যায় না—কিন্তু অবাঙালীরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে A. P. Sen Road ও A. P. Sen Hall নাম রেখেই ক্ষান্ত হননি—Municipal Parkএ তাঁর প্রস্তর মূর্তি গড়ে রেখেছেন। লখনউ কোর্টে তাঁর অসাধারণ সম্মান ছিল, আজও সেখানে তাঁর প্রতিকৃতি টাঙিয়ে রেখেছেন Bar Association-এর সভ্যেরা। কিন্তু তবু কবির মন পড়েছিল সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাঙলার দিকে। তাই তাঁর কণ্ঠে শোনা গেছে—

"প্রবাসী চল্‌রে দেশে চল্‌
কোথায় পাবি এমন হাওয়া
এমন গাঙের জল।"

অতুলপ্রসাদকে কেন্দ্র করে একদল বুদ্ধিজীবী নবীন বাঙালী বাঙলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরলেন সুধী সমাজে। সঙ্গীতে ও সাহিত্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ঘূর্জটিপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রভৃতি

কয়েকজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের নাম উল্লেখযোগ্য। একদিকে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় অন্যদিকে Govt. Art College এই দুটিকে কেন্দ্র করে প্রতিভাবান বাঙালী সমাজ গড়ে উঠলো। এ ছাড়া কালীবাড়ী, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বেঙ্গলী ক্লাব প্রভৃতি বিভিন্ন সঙ্ঘকে কেন্দ্র ক'রে বাঙলার সংস্কৃতি ছড়িয়ে প'ড়লো।

অতুলপ্রসাদ সেন

লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব কৃতি বাঙালী এক একটি বিভাগের অধ্যক্ষ হ'য়ে বহুদিন কৃতিত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে অধ্যাপনার কাজ ক'রেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ভারত বিখ্যাত। স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভাইসচ্যান্সেলার হ'য়ে খুব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর সুযোগ্যা পত্নী শেষ জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে শ্রীযোগমায়া নাম নিয়ে আলমোড়ায় শ্রীমৃদাবন আশ্রম স্থাপনা করেন। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় কিছুদিন ভাইসচ্যান্সেলারএর পদ অলঙ্কৃত করেন। এখনও তাঁর কর্মস্থল লখনউ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র সিদ্ধান্ত লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়এ ইংরিজি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তা ছাড়া, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, ৺ভূধরভূষণ, ৺নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীনন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মিত্র—এঁরা সকলেই কীর্তিমান ও খ্যাতিমান অধ্যাপক ব'লে স্বীকৃতি পেয়েছেন। ধূর্জটিপ্রসাদের বহুমুখী প্রতিভা সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদের "সুর ও সঙ্গতি" সঙ্গীত বিশারদদের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। বীরবলের প্রিয় শিষ্য ধূর্জটিপ্রসাদের বুদ্ধিদৃপ্ত মৌলিক রচনা একদিন বাংলা ভাষায় প্রাণশক্তি এনেছিল। তাঁর নতুন পরিচয়ের যে প্রয়োজন নেই—তা পুরানো "পরিচয়" পত্রিকার পাতায় পাওয়া যাবে। এরপর উল্লেখযোগ্য নাম হোলো ভূধরবাবুর। তিনি কিছুদিন পূর্বে স্বর্গত হ'য়েছেন। তাঁর মনীষা সম্বন্ধে লখনউ বাঙালী মহলে নানাবিধ গল্প প্রচলিত আছে। বাঙালীর ছেলে, যুক্তপ্রদেশে শিক্ষকতা ক'রতে গিয়ে প্রায়ই মনে প'ড়তো বাঙলাদেশকে। লেকচারের সময় মাঝে মাঝে চিৎকার ক'রে ব'লে উঠতেন—"My Sweet Bengal."

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

বাঙলার সংস্কৃতিকে রক্ষা করার আর একটি কেন্দ্র গ'ড়ে উঠলো গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজএ। ১৯২৫ সালে শিল্পী অসিতকুমার হালদার এলেন এখানকার প্রিন্সিপাল হ'য়ে। খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "লখনউ সহরে আম যখন পেকে উঠবে তখন তোর এই ফল-লোলুপ দাদাকে মনে করিস।"

অবনীন্দ্রনাথের ফিরে পাওয়া ভারতীয় শিল্পকে এখানে বাঁচিয়ে রাখলেন অসিতকুমার। স্বর্গীয় ললিতমোহন সেন, শ্রীবীরেশ্বর সেন, শ্রীহিরণ্ময় রায়চৌধুরী প্রভৃতি চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্প গড়ে তুললেন এখান থেকে। ললিতকলার 'শ্রী' বেড়ে গেল লখনউ সহরে। আজও এখানকার

আর্ট কলেজের প্রধান শিক্ষক বিখ্যাত শিল্পী শ্রীসুধীরঞ্জন খাস্তগীর। তাঁরই উৎসাহে শিল্পী অসিতকুমারের নামে এখানে "হালদার হল" তৈরী হোলো। শান্তিনিকেতনের শিল্প-শ্রী ফুটে উঠলো বাঙলার বাইরে।

বাঙালী ছেলেমেয়েদের বিশেষ ভাবে বাঙলার সৌন্দর্যবোধ ও কৃষ্টি বজায় রেখে শিক্ষা দেবার উদ্দেশে এই শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই এখানে কয়েকটি বিদ্যালয় গ'ড়ে ওঠে। তার মধ্যে জুবিলি গার্লস কলেজকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া চলে। বর্তমানের বহু মায়েরা শিক্ষালাভ করেছিলেন এখান থেকে এবং এখন তাঁদের মেয়েরাও সেখানে প'ড়তে যায়। অর্থের অভাবে কিছু কিছু অসুবিধার মধ্যে পড়লেও জুবিলি গার্লস কলেজ বাঙালীর ঐতিহ্য বজায় রাখবার চেষ্টা করছেন। এ ছাড়া শশীভূষণ গার্লস স্কুল, বিদ্যান্ত কলেজ, এ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুল, কুইন্স কলেজ প্রভৃতি বাঙালী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বাঙালী ও অবাঙালী ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দেবার চেষ্টা করে চলেছেন। লখনউ সহরে গুটিকয়েক বাঙালী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অল্প-বিস্তর খ্যাতি লাভ করেছেন। Sen and Sanyal (contractors) একসময় সমগ্র যুক্তপ্রদেশেই নিজেদের খ্যাতি বৃদ্ধি করেছিলেন। এখন সে প্রসার নানা কারণে ক্ষুণ্ণ হয়ে এসেছে। তবুও তাঁরা বাঙালী ব্যবসায়ীদের গর্ব একথা স্বীকার্য। ইউনাইটেড্ রিফ্রিজারেটরস্, স্বদেশী ভাণ্ডার, প্রীতম বুক হাউস্ প্রভৃতি ব্যবসাকেন্দ্র এখানে মধ্যবিত্ত বাঙালীর সুনাম রক্ষা ক'রে চ'লেছে। বর্তমানে যখনই সহরে যাঁরা নতুন বাসা বেঁধেছেন তাঁদের অনেকেই সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইন্সটিটিউটকে কেন্দ্র ক'রে বিজ্ঞানের গবেষণায় লিপ্ত আছেন। তাঁদের ওপর লখনউবাসীর বহু আশা, বহু ভরসা। এখানকার Director ডাঃ বি, মুখার্জি অনেক বাঙালী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িত। রেলের চাকুরি নিয়ে যে সব মধ্যবিত্ত বাঙালী এদিক ওদিক থেকে এসেছেন—তাঁদের সংখ্যাও খুব কম নয়। নিজেরা আলাদা ভাবে দুর্গাপূজা করেন এবং আর পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁরা অন্ন নিয়ে আছেন বিশেষ অভাব বোধ করেন না, কারণ প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা তাঁদের মন। সুন্দরবাগ, মৌলভীগঞ্জ, মডেল হাউস, নজরবাগ এসব দিককার বাঙালীরা বহু পুরাতন বাসিন্দা এবং লখনউকেই দেশ মনে ক'রে ওখানকার লোকেদের সঙ্গে মিশে আছেন। ছেলেমেয়েরা বাঙলা বড় একটা কেউ পড়ে না। তারা পরিবেশের চাপে পড়ে বেশীর ভাগ সময় হিন্দিতেই কথা বলে। এক সঙ্গে বাঙালী চার পাঁচটি স্কুলের ছেলে নিজেদের মধ্যে বিশুদ্ধ হিন্দিতে কথা ব'লছে এসব খুঁজে বার ক'রতে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে মা-বাবার সঙ্গে তারা যে কথা বলে এবং যা উত্তর পায় তার শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র বাংলা শব্দ। আরও দুঃখের কথা বাঙলা অক্ষরও অনেকে তাড়াতাড়ি লিখতে পারেন না তাই কিছু বাংলায় লিখতে হ'লে দেবনাগরি অক্ষরেই লিখে নেন এ রকম ছেলেও পেয়েছি। এর প্রধান কারণ স্কুলে আজকাল বাঙলা পড়ানো হয় না। বাঙালীর ঐতিহ্য বজায় রাখবার চেষ্টা ক'রেছেন দুটি মেয়েদের স্কুল—জুবিলি ও শশীভূষণ। অথচ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্যনাট্যের বহুল প্রচলন আছে এখানে। এমন কি ওদেশের ছেলেমেয়েরাও তাতে যোগ দেয়। শান্তিনিকেতনের ললিতকলা ওদেশবাসীর মনকে আকৃষ্ট ক'রেছে।

বাদশাবাগ, নিউ হায়দরাবাদ, মহানগর প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক বাঙালীর বাড়ী ও গাড়ী আছে। তরুণী মেয়েরা বিকেলের দিকে একটু "গঞ্জিং" ক'রতে যান। "গঞ্জিং" শব্দটি লখনউএর ভাষাতত্ত্ববিদদের নিজস্ব অবদান। বিকেলে সেজেগুজে হজরৎগঞ্জে বেড়াতে যাওয়ার নাম "গঞ্জিং"। উর্দু ও ইংরিজি মেশানো একটি গালভরা কাকার মাত্র। শব্দটির মধ্যে কম বয়সের বাঙালী মেয়েদের প্রতি কোথায় যেন একটি কটাক্ষ আছে। লখনউএ শীতকালে "কোয়ালিটি"তে

ব'সে বাঙালী মেয়েদের গরম কফি ও গরমের দিনে ঠাণ্ডা আইসক্রীম খাওয়ার রীতি অনেকেই মেনে চলেন। হজরৎগঞ্জের পাশেই লালবাগ। এখানে কয়েক ঘর ধনেদি বাঙালী থাকেন। লালবাগের সার্বজনীন দুর্গাপূজা লখনউ-বাঙালী মহলের একটা গর্বের বিষয়। একসঙ্গে প্রায় চার পাঁচ হাজার বাঙালী, অবাঙালী এতে যোগদান করেন। অসংখ্য ছেলেমেয়ে—তাদের মা-বাবা, প্রিয়জন সকলের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ ক'রছেন। নানান ভাষার গুঞ্জন শোনা যায়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এই লালবাগে বাঙালীদের একটি মহিলা সমিতি আছে। যাদে একটি শনিবার তরুণীরা একত্রিত হয়ে গরীবদের সাহায্যকল্পে তাঁদের কর্মতৎপরতা, স্বার্থত্যাগ ও দান লখনউএর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে অল্প সংখ্যক বাঙালী শিল্পী আছেন—যদিও নিয়মিতভাবে বাঙলা প্রোগ্রাম শোনা যায় না। লাইট মিউজিকে কুমারী সুজাতা চক্রবর্তীর অপূর্ব কণ্ঠ শুধু লখনউ নয় ভারতের নানা স্টেশন থেকেই শোনা যায়। তাঁর কণ্ঠে আমরা রবীন্দ্র সঙ্গীতও শুনেছি; সত্যিই শোনার মত, কিন্তু লখনউ সহরের আর ক'জন শুনেছেন জানি না। এটা বোধ হয় তাঁর প্রাণের জিনিস, জনসভায় ব্যক্ত করার জন্য নয়: জীবন বীমার কাজ নিয়েও কিছু বাঙালী এখানে এসেছিলেন। বাঙালীর সামাজিক জীবনে তাঁদের দানও কম নয়। ছোট বড় আরও অনেক সভা সমিতি আছে যাঁরা বাঙলার কৃষ্টিকে বজায় রাখার চেষ্টা ক'রছেন। তার মধ্যে বেঙ্গলী ক্লাব ও সবুজ সঙ্ঘের নাম উল্লেখযোগ্য। সবুজ সঙ্ঘ প্রতি বৈশাখে বিপুল সমারোহে রবীন্দ্র জয়ন্তী করেন। বয়সেও এঁরা সবুজ এবং কাঁচা—মতে একটু বামপন্থী—অর্থাৎ সবুজের গায় কোথায় যেন একটু লালের আভাও আছে। এঁদের সাহিত্য আলোচনার মুখপত্র "সমন্বয়" মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হবার অল্পদিনের মধ্যেই নানা কারণে লুপ্ত হয়, কিন্তু তার ভেতরে মুন্সিয়ানার ও সাধনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে।

এমনি ভাবেই কৃতিত্বে অকৃতিত্বে, সুখে দুঃখে লখনউএর বাঙালী জীবন এগিয়ে চ'লেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে জোয়ার একদিন দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে আজ স্তিমিত। তবু তারা বাঙালী, সে গর্ববোধ তাদের আছে—শুধু সভাসমিতিতে আজ আর শোনা যায় না লখনউ-কবির অমরগীতি —"মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাঙলা ভাষা।"

গভীর রাত্রে বাড়ীর সকলের ঘুম ভেঙে গেল এক অপূর্ব বাজনা শুনে। ধ্বনিটা আসছে যে ঘরে পিয়ানো থাকে সেই ঘর থেকে।

কে বাজাচ্ছে ঐ আশ্চর্য সুর? সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

ছুটে গিয়ে সকলে দেখে বাড়ীর বছর দশেকের ছেলে হাণ্ডেল (Handel) চমৎকার পিয়ানো বাজাচ্ছে।

—"কোথায় শিখলি তুই এ সুর?"—বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে সকলে হাণ্ডেলকে।

—"তা আমি বলতে পারি না, বাজাবার ইচ্ছে হোল, তাই ঘুম থেকে উঠে চুপি চুপি বাজাতে এসেছি। যেদিকে হাত চলে হাত চালাচ্ছি,—সুর ও জানি না।"

এ প্রতিভা চাপা রইল না, জগতে ছড়িয়ে পড়ল সেই শিশুর নাম। বিস্মিত জগৎ আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে সঙ্গীত-স্রষ্টা হাণ্ডেলকে।

দেশ-বিদেশ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

"সমাজে যখন সদ্‌বিশ্বাস দুষ্প্রাপ্য তখন অন্ধবিশ্বাস ছাড়লে শূন্যের প্রকোপ অপ্রতিকার্য; এবং তদনুরূপ অবস্থায় বৈনাশিক নিন্দনীয় নয়, বরঞ্চ তার অসম সাহস মনীষীর মতো সাধুরও অনুকরণীয়। অগত্যা সংস্কারমুক্তি আজ সত্যাগ্রহের অগ্রগণ্য; এবং দুরাশার অভাবে আমি সর্বনাশের বিভীষিকা দেখি না, পুরুষকারের প্রয়োজন বোধ করি।" (দুরাশা ও কালপুরুষ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) বিরল উক্তিটির স্রষ্টা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্বজীবনেও সফল হয়েছিলেন। অর্থাৎ যে পুরুষকারের প্রয়োজন তিনি বোধ করেছিলেন নিজ জীবনে তিনি তাই হতে পেরেছিলেন।

তিনি সদ্‌বিশ্বাসে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন—তাঁর আদ্যোপান্ত সাহিত্যজীবন এ সত্যের স্বাক্ষর বহন করে। সদ্‌বিশ্বাসকে লালন করতে কী রকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন তার উপলব্ধি খুব কম লোকেরই আছে। ঠিক একারণেই একথাটি বলতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, বাংলা সাহিত্যের হাটে অনেক নামই শুরুচিত হয়। অনেক নাম নিয়ে প্রকাশক মহলের বেনেস্বভাবের জোয়ার ভাঁটা চলে, অনেক নাম নিয়ে সাহিত্য পত্রের সম্পাদকেরা বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে তথা শাশ্বত সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত করার নির্লজ্জ প্রয়াস করেন কিন্তু আঙুলে গণনা করা যায় সে ক'জনকে যাঁদের সত্যিই সদ্‌বিশ্বাস ছিল এবং আছে। সদ্‌বিশ্বাস আয়ত্ত হয় অখণ্ড জীবন দিয়ে। সুধীন্দ্রনাথ সে বিরলদের মধ্যে অন্যতম। লালিত্যের চটুল সম্ভারে অনেকের প্রাণে পুলকের সঞ্চার হয় তাতে জনপ্রিয়তা রৌপ্যমুদ্রা প্রাপ্তি ঘটে। সুধীন্দ্রনাথ অতিপ্রযত্নে সে পথ এড়িয়ে চলেছেন চিরকাল। তাঁর এড়িয়ে চলার পথ ছিল ঋজু, বলিষ্ঠ, নিঃসঙ্গ এবং মোহবর্জিত। তিনি নিজ অনুভবের উচ্চকক্ষে উপনীত হবার প্রতিটি স্তরকে অর্জন করেছিলেন দারুণ নিষ্ঠা দিয়ে। রৌদ্ররসের পরিপূর্ণ তাপ ছিল তাঁর সে প্রতিটি অর্জনের। পুরুষকার যিনি, তিনিই নিঃসঙ্গ। সুধীন্দ্রনাথ সমস্ত চেতনায় নিঃসঙ্গ ছিলেন।

বিখ্যাত সলিসিটর গৌড়া সংস্কৃত পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র এবং বিখ্যাত অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালের ৩০শে অক্টোবর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বেনারস এনি বেশান্ত বিদ্যালয় এবং কলকাতা স্কটিশচার্চ্চ কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন কাটে। ১৯২৯ সালে যখন কবিগুরু তাঁর ঘুরপ্রাচ্য ও আমেরিকা ভ্রমণে বের হন তরুণ অথচ বুদ্ধি ও জ্ঞানে তীক্ষ্ণ সুধীন্দ্রনাথ সঙ্গে গিয়েছিলেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর রীতিমত ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ছিল। ফলে বিশ্বদৃষ্টির উজ্জ্বল আলোক তাঁকে অনেকখানি আপন চিন্তার সংস্কারমুক্তি আনতে সাহায্য করেছিল এবং সে চিন্তার পরিধিও ছিল ব্যাপকভাবে প্রসারিত। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন এবং পরে বীমাপ্রতিষ্ঠানে কাজও করেছিলেন। কিন্তু কোথাও স্বস্তি না পেয়ে তিনি সাহিত্যে ডুব দিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি বিখ্যাত মাসিক 'পরিচয়' বের করলেন। তাঁর সম্পাদনায় 'পরিচয়ে'র ক্লাসিক চরিত্র অর্জিত হয়েছিল। 'পরিচয়' সম্পাদনায় তাঁর সুগভীর নিষ্ঠা এবং সুদৃঢ় প্রত্যয় সাহিত্যপত্র সম্পাদনা ক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় এবং শিক্ষনীয় আলোকবর্তিকা। এলিয়টের 'Criterion-'এর মতো একাগ্রতেও লিখবার জন্যে দরকার হত পাণ্ডিত্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং ধারালো যুক্তি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে তিনি 'ষ্টেটসম্যানে' সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৪৮ সালে ঘামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে

প্রিন্সিপাল ইন্‌ফরমেশন অফিসার হিসেবে যোগ দেন। সেখান থেকে অবসর নিয়ে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনায় ব্রতী হন। ১৯৫৭-৫৮ সালে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে তিনি কাজ করেছিলেন। ২৫শে জুন শনিবার (১৯৬০) উনষাট বছর বয়সে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর রচনা : কাব্য গ্রন্থসমূহ—'ক্রন্দসী', 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী', 'সংবর্ত', 'উত্তর ফাল্গুনী', 'দশমী' এবং অনুবাদ কবিতাগ্রন্থ 'প্রতিধ্বনি'। প্রবন্ধ পুস্তক : 'স্বগত' এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ'।

যেহেতু সুধীন্দ্রনাথ পুরুষকার ছিলেন এবং সেহেতু যখন সাফল্যের প্রতিটি ধাপকে পূর্ণতার নিকষে লাভ করেছিলেন, তখন এটা প্রিয় সত্য যে তিনি আপন স্বভাবের জোরে বাংলা গদ্যে এবং পদ্যে অনন্য ছিলেন। এমনধারা অভিধানে তাঁকে তাই সহজে কণ্ঠবিদ্ধ করতে পারেনি যে তিনি অতিমাত্রায় দুর্বোধ্য বাক্যের অন্তরালে নিজের চিন্তার অপদার্থকে গোপন করতে চেয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ মনে করতেন, 'বুদ্ধির সামান্যীকরণ সব সময়ে সত্যের নাগাল পায় না ; এবং সাধারণই বিজ্ঞানের অনিষ্ট বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারে ব্যাপক সিদ্ধান্তের মূল সরল সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশী।' (উক্তি ও উপলব্ধি)। অলস চিত্তবৃত্তি তাঁর ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি এবং চিন্তার যেখানে গভীরে যাবার কথা তিনি সেখানে গিয়েছেন। এর জন্যে তিনি আত্মদর্শনের চরম উৎকর্ষ অর্জনে অতি যত্নবান হওয়ার রীতি আনবার চেষ্টা করেছেন। ফলে এই অন্তর্মুখীন মনোবৃত্তি পরিহার করায় তিনি দুরাহত্বকে অর্জন করার দুর্যোগ্য পরিমণ্ডল গড়েছেন। এটা তাঁর স্বভাব-চর্চারই পরিণতি। এজন্যে লিখেছেন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। অথচ যখন প্রকাশ করেছেন, কোথাও তিনি গলতি রাখেন নি এতটুকু। বুদ্ধিজীবী সত্তা যে দেশের জন-সম্ভোষ উৎপাদনের বিরূপ অপকর্ষণে পলাতক, সুধীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন।

এ অনন্য সফলতা এ দুঃসাহসিকতার লক্ষণ। বিশেষ করে কাব্যের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের বাসু আলো তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সুধীন্দ্র-স্বাক্ষর উজ্জ্বল স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথও তা স্বীকার করেছেন। ভাষার বলিষ্ঠতা তাঁর মনের আত্মীয়। যেহেতু মন ছিল দৃঢ়, চেতনার ভিটেয় অলস চিত্তবৃত্তির স্বাক্ষর ছিল না সেহেতু কবিতার সমগ্র শরীরে ছিল দুর্দান্ত বৈশাখী রুদ্রতা। তাঁর কবিতা-পাঠ সে রুদ্রবিনাদের প্রতিনিধি। এখানে উদ্ধৃতির অবকাশ কম। নাহলে দেখানো যেত। মননের রথে তিনি চড়েছিলেন। সে মনন সহজ অধিকারকে স্বীকার করেনি বলে অথণ্ড অগ্রসরতা ছিল তাঁর পুরস্কার। এ বিষয়ে পণ্ডিত কবি সমালোচক সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলেছেন : এ দুঃসাহস তারুণ্যের আবেগে ক্ষণজীবী নয়, ক্রমোন্নত হয়ে সুদৃঢ়, চেতনার চৈত্যের মতন স্থান-কাল-ব্যাপ্ত, একটি শাশ্বত জীবনের নৈবেদ্যের বা মন্ত্রপূতাত্মে অকাতর।' (আধুনিক কবিতার ভূমিকা)।

তাঁর গদ্য সম্পর্কেও কিছু বলবার আছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রমথ চৌধুরীর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন না মোটেই তা ভাষার ব্যাপারে। সেখানে একক এবং সমৃদ্ধ প্রমথ চৌধুরীর ভাষাকে মননরূপে ব্যবহার করতে চাইলেও অবিচ্ছেদের অভাব তাতে যথেষ্ট। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির ভাষা অবিচ্ছেদের বিরল চরিত্র পেয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর পথিকৃৎ কেউ নন। জটিল জীবনে বাস করে চিন্তা জটিল হলে কিছু বলবার নেই। কিন্তু সে জটিল চিন্তা যদি যুক্তির শক্ত রজ্জু ধরে অতিকথনকে বর্জন করে পরিমিত চরিত্র অর্জন করতে পারে সে সাফল্যে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে হর্ষোৎফুল্ল হওয়ার অসীম অবকাশ রয়েছে। তাঁর উক্তি উদ্ধৃতিতুল্য : 'যার চিৎপ্রকট যত অসামান্য, তিনি যদি ততোধিক নৈর্ব্যক্তিক হতে পারেন, তবে তাঁর আত্মপ্রকাশের আশা বিড়ম্বনা। পক্ষান্তরে অহংকারবিস্মৃতির অন্য উপায় বিনা প্রশ্নে অবগতির আজ্ঞা পালন ; এবং অবগতি যেহেতু ঐকান্তিক, তাই তার বিজ্ঞাপন প্রায়ই অসম্ভব।' সুধীন্দ্রনাথ নিষ্ঠারসংগে তা পালন করেছেন শেষ পর্যন্ত'।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লাউয়ে

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মাক্স ভন লাউয়ে কিছুদিন পূর্বে এক মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করেছেন। বিশ্বের প্রথমশ্রেণীর পেদার্থবিজ্ঞানীদের অন্যতম ছিলেন লাউয়ে পদার্থবিজ্ঞানে ডিফ্র্যাকশন, ইণ্টার-ফেরেন্স ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অবদান অসামান্য। ১৯১২ সালে তিনি ফেলাসের দ্বারা একস-রশ্মির ইণ্টারফেরোমেন্ট আবিষ্কার করেন এবং তাঁর এই অনন্যসাধারণ আবিষ্কারের জন্যে ১৯১৪ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মাক্স ভন লাউয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল। ১৮৯৮ সালে তিনি ষ্ট্রাসবার্গ থেকে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গটিনজেন ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের পর ১৯০২ সালে তিনি বার্লিনে বিশ্ববিশ্রুত পদার্থ বিজ্ঞানী মাক্স প্ল্যাঙ্কের অধীনে গবেষণা করার জন্যে আসেন। ১৯০৩ সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯০৯ সালে লাউয়ে মিউনিক গবেষণাগারে অধ্যাপক সমারফেল্ডএর সহকারীরূপে যোগদান করেন। এখানে এসে তিনি প্রথম শ্রেণীর গবেষকমণ্ডলীর সঙ্গ লাভ করেন এবং এক্স রশ্মির ব্যতিসরণ ও অন্তঃক্ষেপন সংক্রান্ত গবেষণায় নিমগ্ন থেকে বহু উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর অটো হন, হাইসেনবার্গ ও অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে লাউয়ে-কে ইংলণ্ডে কিছুকাল নজরবন্দী রাখা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি গটিনজেনে কাইজার উইলহেম ইন্‌স্টিটিউট ফর ফিজিক্স-এ সহকারী অধিকর্তা এবং গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিক অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ফিটজ হেবার ইন্‌স্টিটিউটের অধিকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৯ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু ইন্‌স্টিটিউটের প্রশাসনিক কাজ থেকে অবসর নিলেও তিনি গবেষণা কাজে তরুণ গবেষক ও সহকর্মীদের উৎসাহ ও উপদেশ দান করছিলেন জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত।

মাক্স ভন লাউয়ে শুধু একজন শ্রেষ্ঠস্থানীয় বিজ্ঞানী ছিলেন না, মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন মহৎ। বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধতায় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং তিনি ছিলেন মানবতার এক পরম পূজারী।

শ্রীনেহেরুর পত্রাবলী

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরুর লেখা কতকগুলি চিঠিপত্রের একটি সংগ্রহ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিকে আমেরিকায় প্রকাশিত হবে। শ্রীনেহেরুকে লেখা কতকগুলি চিঠিও এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হবে। আমেরিকার এ. আই. এস. পাবলিশিং হাউস পুস্তকটি প্রকাশ করবেন।

পূর্বতন "পত্রগুচ্ছ" নাম দিয়ে ১৯৪৮ সালে ভারতে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় ৪০৮টি পত্রাবলী এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী নেহেরু, গান্ধিজী, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, অ্যানিবেসান্ত, মিস্রা, মহম্মদ ইকবাল, জর্জ বার্ণার্ডশ, রুজভেল্ট, মাও সে তুং এবং আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির ভাবধারা, ভাবাবেগ, আশা, আকাঙ্খা, বিচার-বিবেচনা প্রতিফলিত হয়েছে এর মধ্যে। মাঝে মাঝে পাদটীকায় এর কিছু কিছু ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে।

খেলাধূলা

ক্রীড়ামোদী

খেলার মাঠে সত্যাগ্রহ বা বয়কট

সত্যাগ্রহ, বয়কট বা ধর্মঘট রাজনৈতিক আন্দোলনেরই অঙ্গীভূত। সামাজিক আন্দোলনের কোন কোন অবস্থাতেও কখন এরা এসে হাজির হয়। কিন্তু খেলাধুলোর ক্ষেত্রে এদের কথা পূর্বে কখনও শোনা যায়নি। আজ তাও হল। খেলার মাঠে বয়কট প্রথা পুরোপুরি দেখা দিয়েছে। রেফারীর খেলা পরিচালনায় অসন্তুষ্ট হয়ে মহমেডান স্পোর্টিং দল সর্বপ্রথম "বয়কটকে" খেলার মাঠে প্রবেশপত্র দেয়। কিন্তু তারপর থেকে "বয়কট" বোধ হয় মহদানের মাঠ কাটাতে পারেনি। মহমেডান দলের পর মোহনবাগান তারপর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সভ্য ও সমর্থক দল খেলা দেখা "বয়কট" করেছেন। জানি না কোথায় গিয়ে এর শেষ হবে। সভ্য-সমর্থক-কুল খেলা দেখা "বয়কট" করলেও খেলা কিন্তু বন্ধ থাকেনি। খেলার দিনে সভ্য-সমর্থক দল মাঠে হাজির থাকেনি। মাঠের বাইরে থেকে তাঁরা আই এফ এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ফলে সভ্য-সমর্থকদের উপস্থিতি ব্যতিরিকেই মহমেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের কয়েকটি খেলা হয়েছে। দর্শকশূন্য গ্যালারী খেলোয়াড়দের মনে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে কিনা জানিনা তবে কল-কোলাহলের বাইরে মাঠের নিস্তব্ধ রূপটি কেমন যেন বেমানান ঠেকেছে। কলকাতার ফুটবল খেলার এক বিশেষ রূপ ও প্রবাহ আছে। ফুটবল খেলেন বাইশজন খেলোয়াড়। কিন্তু এই খেলাকে নানারসে মণ্ডিত করে—উপভোগ্য করে তোলেন মাঠের অগণিত দর্শক ও সমর্থক দল। তাঁদের কলকোলাহল সারা মাঠে প্রাণ-চাঞ্চল্যের জোয়ার বইয়ে দেয়। এ থেকেই খেলোয়াড়েরাও পান উৎসাহ ও উদ্দীপনা কিন্তু মাঠের চিরাচরিত এই রূপটির অন্যথা হলেই কেমন যেন খাপছাড়া, বেমানান মনে হয়।

দর্শক-সমর্থকদের খেলা বয়কট ও বিক্ষোভ আই এফ এর কর্মকর্তাদের মনে কতখানি প্রতিক্রিয়া এনেছে সেই কথা ভাববার বিষয়। যোগ্য ও দক্ষ রেফারী খেলা সুপরিচালনা করুন—খেলার মাঠে খেলোয়াড়ী মনোভাব ও শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করুক এটা ক্রীড়ামোদী মাত্রেরই কাম্য। আশাকরি আই এফ এ সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে প্রয়াসী হবেন। খেলার মাঠকে মিলন তীর্থ বলা চলে। পারস্পরিক প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ওপর ভর করে এই মিলন তীর্থের বনিয়াদ সৃষ্টি। অবাঞ্ছিত কোন ঘটনায় অথবা কার্যকলাপে এই বনিয়াদে যাতে না কোন ফাটল ধরে তার জন্য খেলোয়াড়, পরিচালক, দর্শক ও ক্রীড়ামোদী সকলকেই সচেষ্ট থাকতে হবে।

• • • •

ত্রিমুখী লীগ প্রতিযোগিতা

মহমেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল—এই তিন দলের মধ্যেই এবারকার প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ সীমাবদ্ধ রয়েছে। শেষ পর্যন্ত কোন্‌দলের ভাগ্যে যে বিজয়ীর জয়মাল্য অর্পিত হবে তা বলা সুকঠিন। লীগ প্রতিযোগিতা প্রায় সমাপ্তিপর্যায়ে। বর্তমানে লীগ কোষ্ঠীতে এই তিনটি দলের অবস্থান ও পয়েন্টের ব্যবধান পত্রিকাই উৎসাহ-ব্যঞ্জক। একটি দল এক পয়েন্ট হারালে প্রতিদ্বন্দ্বী অপর

৪টি দলের ভাগ্যে তা যোগ হচ্ছে। এই উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত একটি দল বিজয়ী মুকুট মাথায় করে বেরিয়ে আসবে।

তবে এই তিনটি দলের মধ্যে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের শক্তি অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আসন্ন রোম অলিম্পিকের জন্য এই দুই দলের কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে শিক্ষা শিবিরে যোগদান করেছেন। তাঁদের বদলে যে সব তরুণ ও নবাগত খেলোয়াড়েরা খেলছেন তাঁরা যদি নিজ নিজ দলের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে ও অভিলাষ পূর্ণ করতে পারেন তাহলে সেটাই হবে তাদের বিশেষ কৃতিত্বের কথা।

নীল ফ্রেজার উইম্বলডন বিজয়ী

অষ্ট্রেলিয়ার তরুণ টেনিস-খেলোয়াড় নীল ফ্রেজার এবারের উইম্বলডন বিজয়ীর আখ্যা লাভ করেছেন। ফাইন্যালে তিনি স্বদেশীয় রড় লেভারকে পরাজিত করে বিশ্বের অপেশাদারী টেনিস প্রতিযোগিতার সবচেয়ে গৌরবময় সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। এর আগে ফ্রেজারের গলায় উইম্বলডন বিজয়ীর মালা দোলেনি। অবিশ্যি রড় লেভার এবার নিয়ে উপর্যুপরি দুবছর উইম্বলডন রাণার-আপ হয়েছেন। এই দুই বীরযোদ্ধার ফাইন্যাল খেলাটিও নাকি খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও উচ্চ পর্য্যায়ের হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেভারকে ৬-৪, ৩-৬, ৯-৭, ৭-৫ সেটে হার মানতে হয়।

উইম্বলডনে ভারতের একমাত্র আশা ছিল রামনাথন কৃষ্ণান। কিন্তু সে আশা সফল হয়নি। সেমিফাইন্যালে তিনি ফ্রেজারের কাছে পরাজিত হন।

অলিম্পিকে ভারতীয় দল

রোম অলিম্পিকে ভারতের এথলেটিক্স, হকি ও ফুটবল দলের যোগদান সুনিশ্চিত। কিন্তু অন্যান্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতীয় দল গঠনে সমস্যা দেখা দিয়েছে। সাঁতার, মুষ্টিযুদ্ধ, ভারোত্তলোন, কুস্তি প্রভৃতি দল গঠনে আধিক সমস্যা নাকি প্রকট হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে পুরোপুরি সরকারী আনুকূল্য পাওয়া গেলে হয়ত সমস্যার সমাধান হতে পারে।

ইংলিশ চ্যানেলে বাঙালীর মেলা

বিলি বাটলিন আয়োজিত আন্তর্জাতিক ইংলিশ চ্যানেলে আবার বাঙালীর মেলা হচ্ছে। এঁরা সকলেই প্রতিযোগী। ইংলিশ চ্যানেল উত্তরণে সাফল্যলাভকারী ব্রজেন দাস ও আরতি সাহা (বর্তমানে গুপ্ত) ছাড়াও এবার আছেন শচীন নাগ, নিমাই দত্ত ও লীলা ব্যানার্জী। শচীন নাগ বাংলা ও ভারতের একজন কীর্তিমান সাঁতারু। এশিয়ান গেমস ও দুবারের বিশ্ব অলিম্পিকে ইনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তরুণ সাঁতারু নিমাই দত্ত দূরপাল্লার সাঁতারে ইতিমধ্যেই বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন। লীলা ব্যানার্জী (পূর্বে ছিলেন চ্যাটার্জী) তিনটি সন্তানের জননী এবং পুরোপুরি গৃহিনী। বিয়ের আগে তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাতনাম্নী সাঁতারু। সুতরাং দীর্ঘকাল অনভ্যাসের পর তিনি এক দুঃসাহসিক পরীক্ষার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

নতুন অভিযানকারীদের সাফল্য কামনাই। এরা সফলকাম হলেই ইংলিশ চ্যানেল—বিষয়ে বাংলা ও বাঙালীর একরকম একচেটিয়া অধিকার জন্মাবে।

॥ রবীন্দ্রপাঠচক্র ॥

প্রত্যভিনন্দন

বেসান্ত সুপরিচিত রজনীদাসের প্রতি

বিদেশীদের সভায় দিল অন্ধকারে ঘরির বন্ধন।
দিনান্তে বিদায় নিবে, সন্ধ্যায় না মানিল বন্ধন।

সোনালোকের ছন্দে হোতে
উষাঘরে উর্ধ্বে স্রোতে
নদী নামি উদ্ঘাটিল আলোকের কী অভিনন্দন॥

মুক্তিরথ ডিঙি ভেসে' এল দূর আকাশে দিন আসি'
সুপ্তমুখে বাক্যবলে সভায় মুক্তির মন্ত্র বাণী।
মহাকাশে কল্যাণীর
কী রব পশিল ধীর,
ঘুচায়ে দিয়ে বিরাটিল অবজ্ঞা নরের রজনীদিনী॥

"অন্ধের পূর্ণ মোরা" এহারা ভুলালো বিস্ময়!
আত্মবিমর্দন করি' আত্মারে কে দলিল অন্যায়!
ভৈরবের আনন্দের
দুঃখেতে দিবিল ফেরে,
কবীর মুক্তানন্দচন্দ মুক্তের কে দিল পরিচয়॥

১১ পৌষ
১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্র পাঠচক্র

রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

[রবীন্দ্রনাথ রসস্রষ্টা কবি, রসগ্রাহী সমালোচক, বিশ্বসচেতা মনীষী ও ক্রান্তদর্শী ঋষি। 'রবীন্দ্র-পাঠচক্র' পর্য্যায়ে বিভিন্ন লেখক রবীন্দ্রনাথের মনীষার বিচিত্র ধারা সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার এক একটি বিশিষ্ট দিক সম্পর্কে প্রত্যেক সংখ্যায় স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা হইবে। এইরূপ আলোচনার মধ্য দিয়াই আমরা বাংলার সাধনার উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, ভারতের অন্তরাত্মার বাণীমূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ও মানব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিব। —সম্পাদক, গল্প-ভারতী।]

এ বৎসর দেশে-বিদেশে রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিক উৎসবের প্রস্তুতি-পর্ব্ব চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল অক্লান্তভাবে বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া আমাদিগকে আনন্দ পরিবেশন ও কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার বিচিত্র ও বিশ্বতোমুখী প্রতিভা, তাঁহার অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা, তাঁহার অনন্যসাধারণ মনীষা ও প্রবল ব্যক্তিত্ব সমগ্র পৃথিবীর চোখে এক বিরাট বিস্ময়। তিনি যেন এক মহাসমুদ্র যেখানে 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা' আসিয়া মিলিত হইয়াছে,—তিনি যেন এক বিশাল বনস্পতি যাহা স্বদেশের মৃত্তিকা হইতে রস আহরণ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে শাখা-প্রশাখা মেলিয়া ধরিয়াছে। যিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে, সমগ্র ভারতবাসীকে এবং নিখিল বিশ্বের সমস্ত মানুষকে পরমা শান্তি ও চরম কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অকৃপণ হস্তের ভূরি দানে যিনি সাহিত্যের সকল বিভাগ (গীতিকবিতা, গান, ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্যকাব্য, নাটক, রসরচনা, সমালোচনা, নানা বিষয়ক নিবন্ধ প্রভৃতি) সমৃদ্ধ ও প্রতিভার আলোকচ্ছটায় প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার শতবার্ষিকী যদি সর্ব্বত্র সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত না হয়, তবে যে আমাদের লজ্জা ঢাকিবার আর কোন উপায়ই থাকে না। কিন্তু আমাদের এই পিতৃ-যজ্ঞ বা তর্পণ সার্থক হইবে না যদি না আমাদের অন্তরে সেই শ্রদ্ধা-বুদ্ধির সঞ্চার হয়, যে শ্রদ্ধা একদিন বালক নচিকেতাকে আশ্রয় করিয়াছিল। এই শ্রদ্ধার আবির্ভাবেই নচিকেতা যমরাজের সহস্র প্রলোভনেও বিচলিত হন নাই, তিনি প্রেয়ের পথ পরিহার করিয়া শ্রেয়ের পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন। এ শ্রদ্ধা কিন্তু অন্ধ ভাবাবেগ বা বিচার-মূঢ়তা নয়, ইহার অর্থ মনন ও নিদিধ্যাসন। এই মনন ও অনুধ্যানের মধ্য দিয়াই কবি আমাদের মধ্যে জীয়মান হইবেন এবং যে বিপুল সম্পদ তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার যোগ্য উত্তরাধিকারী হইব। এই জন্যই কবির রচনাবলীর সহিত, বিশেষতঃ তাঁহার প্রবন্ধ সাহিত্যের সহিত আমাদের পরিচয়ের প্রয়োজন। গঙ্গাজলেই আমরা গঙ্গাপূজা করিব, কবির রচনাবলীর মধ্য দিয়াই আমরা স্বদেশ-প্রেমিক ও মানব-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইব এবং আমাদের এই মাতৃভূমিকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিব। সভা-সমিতির দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, একমাত্র রবীন্দ্র-পাঠচক্রের মধ্য দিয়াই এইরূপ মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

অবশ্য পাঠচক্রের প্রত্যেকটি সভ্যকেই জিজ্ঞাসু ও তপস্থ হইতে হইবে এবং উদার ও সংস্কারমুক্ত মন লইয়া আলোচনায় যোগদান করিতে হইবে। এইরূপে পাঠচক্রে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অজস্র গীতি-কবিতা ও গানের মধ্যেই বা তাঁহার ছোট গল্প, উপন্যাস ও নাটকের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকিবে না, ভারতীয় সাধনার উত্তরাধিকারী ও ভারত-জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য-সমালোচক ও সাহিত্য-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ, সমাজ-বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ, রাষ্ট্রচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ, মানুষের ধর্মে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নানা বিষয়েই গবেষণা করিতে হইবে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার স্বদেশ বা তাঁহার যুগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে চলিবে না। উনিশ শতকে প্রতীচ্য শিক্ষা-দীক্ষার ফলে আমাদের দেশে যে নব-জাগরণ ঘটিয়াছিল, তাহার কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ,—স্বাধীনতা-স্পৃহা, মানবতা-বোধ, ঐতিহাসিক চেতনা, ভারতীয় সাধনা ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি রবীন্দ্র-পূর্বগামী মনীষীদের মধ্যে কতখানি প্রকট হইয়াছিল তাহারও নিরপেক্ষ আলোচনা করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁহার পিতৃদেবের, বাংলার অন্যতম স্মরণীয় ও বরণীয় পুরুষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এবং তাঁহার অগ্রজগণের প্রভাব কতখানি, যে সকল মনস্বী পুরুষের সান্নিধ্য তিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বা প্রভাব কতটুকু, তাহাও আমাদের প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে। ইহার দ্বারা রবীন্দ্র-প্রতিভা আমাদের নিকট আরও উজ্জ্বলতর হইয়া দেখা দিবে।

যাঁহারা রবীন্দ্র-পাঠচক্রের প্রবর্তন করিবেন, আমরা সর্বান্তঃকরণে তাঁহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছি। তাই আমরা 'কবিমনীষী' রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে নিদর্শনে প্রবৃত্ত হইলাম।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে যে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন, আজ সে সম্পর্কে দুই চারিটি কথা বলিব। অবশ্য, এ কথা গোড়াতেই বলিয়া রাখি যে, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি প্রধানত ভারতবর্ষের তিন মহাকবির সাহিত্য-কীর্তির মধ্যে ভারতের মর্মবাণীর সন্ধান করিয়াছেন। আমরা সাধারণত এই তিন মহাকবির নাম এক সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া থাকি, কেননা, ইঁহারাই ভারতের সাধনার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। মহর্ষি বাল্মীকি ও বেদব্যাস এবং মহাকবি কালিদাস ভিন্ন বাণভট্টের গদ্যকাব্য সম্পর্কে তিনি 'কাদম্বরী চিত্র' নামে একটি নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তিনি কাদম্বরীর কাব্য-সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং এই কথা বা আখ্যানকাব্যের মধ্যে সে যুগের ভারতবর্ষের যে পরিচয় রহিয়াছে, সেই পরিচয়টি উদ্ঘাটন করিয়াছেন। 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধটিকে আমরা সাহিত্য-সমালোচনা মনে করিলে ভুল করিব, এই প্রবন্ধটিতে আমরা কবির সহানুভূতিশীল হৃদয়েরও অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। 'ধম্মপদ' নামক পালি গ্রন্থটিকে সাহিত্য বলা চলে না, যদিও ইহা স্থানে স্থানে উপমাদি অলঙ্কারের প্রয়োগে সাহিত্য-গুণে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে—রবীন্দ্রনাথও সাহিত্য-হিসাবে গ্রন্থখানির আলোচনা করেন নাই, তিনি ইহার মধ্যে দেখিয়াছেন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট প্রকাশ, শুনিতে পাইয়াছেন ভারতের সভ্যতার মর্মবাণী। রামায়ণ ও মহাভারত সম্পর্কে কবি বলিয়াছেন—এই দুইখানি মহাকাব্য 'বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতলজঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আবরণদ্বারা দান করিয়াছে।'

'কালিদাসের শকুন্তলা কুমারসম্ভবে বিশেষ ভাবে কালিদাসের নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতকে, মনে হয়, যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র।'

রামায়ণ ও মহাভারত একদিকে মহাকাব্য, অপরদিকে ইতিহাস, কিন্তু সাধারণত যে অর্থে আমরা ইতিহাস কথাটির প্রয়োগ করি, সে অর্থে রামায়ণ বা মহাভারতকে ইতিহাস বলা যায় না। মনস্বী ভূদেব তাঁহার 'সামাজিক প্রবন্ধে' বলিয়াছেন—দেশভেদে ইতিহাস-রচনার প্রণালী ভিন্ন হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নাই, এ কথা সত্য নহে, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে ইতিবৃত্ত-রচনার প্রণালী স্বতন্ত্র ছিল, ইহাই সত্য। অবশ্য, 'ইতিহাস' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, 'এমনটি ছিল বা ঘটিয়াছিল' (ইতি হ আস); তথাপি আমাদের ইতিহাসে কালগত সত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই, প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে ভাবগত সত্যকে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যবর্ণ্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।'

রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ড বা লঙ্কাকাণ্ড নামে একটা বৃহৎ কাণ্ড আছে বটে, কিন্তু যুদ্ধবর্ণনা সেখানে মহাকবির প্রধান উদ্দেশ্য নহে। মহাকবি এই কাব্যে ভারতের গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আদর্শকেই মহিমান্বিত করিয়াছেন। গার্হস্থ্যাশ্রম সম্পর্কে মনু যে কথাটি বলিয়াছেন, 'চতুর্ণামাশ্রমাণাম্ভ গার্হস্থ্য শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্' রামায়ণের কাহিনীর মধ্য দিয়া মহর্ষি বাল্মীকি সেই কথাটিই স্থাপন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বাহুবল নহে, বিদ্যা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, পাত্তরদাম্পত্য গৃহধর্ম্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করি। তাহাকে সুমহৎ বীর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, মহর্ষি রামায়ণে দেবতার চরিত্র অঙ্কিত করিয়া দেবমহিমাকে খর্ব্ব করেন নাই, মহামানবের চরিত্র অঙ্কিত করিয়া মানুষকে দেব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় মহর্ষি বাল্মীকি নারদকে বলিতেছেন—

'দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
ভুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।'

মহর্ষি বাল্মীকি যে নানাগুণান্বিত একজন লোকোত্তর পুরুষের চরিত্রই অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছিলেন, রামায়ণে তাহার প্রমাণ আছে। এই নর-চন্দ্রমা সর্ব্বপ্রথম উদিত হইয়াছিলেন মহর্ষির চিত্তাকাশে, তারপর তিনি ভারতের সর্ব্বত্র শুভ্র কিরণচ্ছটা বিকিরণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটা প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে', আর মহর্ষি জগদ্বন্দ্য পুরুষগণের ও বিশ্ব-বন্দিতা নারীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়া আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকেই জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন। তাই তো যুগের পর যুগ চলিয়া গেল, পৃথিবীর বুকে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, কিন্তু রামায়ণী কথা আজও পুরাতন হইল না। যুগ-যুগ ধরিয়া এই মহাকাব্য আমাদের মনুষ্যত্বের প্রেরণা দিয়াছে, বিপদে ধৈর্য্য শিক্ষা দিয়াছে, সম্পদে অনুদ্ধত হইতে শিক্ষা দিয়াছে। মহর্ষি সত্যই বলিয়াছেন :—

'যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণী কথা ভূতলে প্রচারিষ্যতি॥'

রামায়ণ, মহাভারত ও কালিদাসের রচনাবলীতে কবি আবিষ্কার করিয়াছেন শাশ্বত ভারতকে। তিনি বলেন—'মহাভারতে যে একটা বিপুল কর্ম্মের আন্দোলন দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়াছে। মহাভারতে কর্ম্মেই কর্ম্মের চরম সমাপ্তি নহে। তাহার সমস্ত শৌর্য্যবীর্য্য রাগদ্বেষ হিংসা-প্রতিহিংসা প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে শ্মশান হইতে মহাপ্রস্থানের ভৈরব সংগীত বাজিয়া উঠিতেছে। রামায়ণেও তাহাই ; পরিপূর্ণ আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যায়, করায়ত্ত সিদ্ধি স্খলিত হইয়া পড়ে—

সকলেরই পরিণামে পরিত্যাগ। অথচ এই ত্যাগে দুঃখে নিষ্ফলতাতেই কর্মের মহত্ব ও সৌন্দর্যের প্রভাব রজতগিরির ন্যায় উজ্জ্বল অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে।

'সেইজন্য কালিদাসের সৌন্দর্য্য-চাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগবৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনই কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্য্য-ভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য সৌন্দর্য্য-বিলাসেই শেষ হইয়া যায় নাই—তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন।' (কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা)।

রবীন্দ্রনাথ শুধু মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার কাব্যসৌন্দর্য্যই বিশ্লেষণ করেন নাই, তিনি দেখাইয়াছেন, এই তিনখানি কাব্যেই (ভারতীয় আলংকারিকদের মতে নাটকও কাব্যের অন্তর্গত) কালিদাসের জীবনদর্শন প্রতিফলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'কালিদাস দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেম-সম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকার-প্রমত্ত করে তাহা দুর্বাসার দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার আলোকে 'মেঘদূতের' এক নূতন তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ।' এই প্রবন্ধটি পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে পড়িয়া যায় পারস্যের কবি জালালউদ্দীন রুমির কথা, মনে পড়ে সিন্ধু পুরুষ কবীরের কথা, মনে পড়ে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথা। ভক্ত কবীর বলিয়াছেন, মানুষের অন্তরে বিরহ জাগে বলিয়াই তো মানুষের গৌরব—

'কবীর বিরহ বিনা তন্ শূন্য হ্যায়
বিরহ হ্যায় সুলতান।
যো ঘট বিরহ না সঞ্চারে
সো ঘট জান মশান।'

জার্মাণ কবি নাট্যকার গোটে (Goethe) কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের যে প্রশস্তি-গাথা গাহিয়াছেন, তাহার অর্থ কত গভীর রবীন্দ্রনাথ বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। টেম্পেষ্ট ও শকুন্তলার কাব্যরস যে এক নয়, তাহাও রবীন্দ্রনাথ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, মিরাণ্ডা যে দ্বীপবাসিনী ইহা একটি আকস্মিক ঘটনা, কিন্তু শকুন্তলা নাটকে তপোবন-প্রকৃতি চৈতন্যময়ী, স্নেহময়ী, শকুন্তলা ও তাহার সখীগণের মতই আনন্দ-বেদনার চঞ্চলা; তাই শকুন্তলা তপোবন-প্রকৃতির সহিত সখীত্বের বন্ধনে আবদ্ধা; আবার শকুন্তলার প্রকৃতি যেমন 'স্বাভাবিকভাবে বিকশিত' হইয়াছে, মিরাণ্ডার তেমনটি হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি পড়িতে পড়িতে মনে হইয়াছে, ইহা শুধু সমালোচনা নহে, ইহা এক নূতন সৃষ্টি।

শুধু এক স্থানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের মতের অনৈক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, দুর্বাসার অভিশাপের বীজ দুষ্মন্তের চরিত্রের মধ্যে ছিল। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ তিনি দুষ্মন্তের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। হংসপদিকা যখন গানের মধ্য দিয়া দুষ্মন্তকে তর্ৎসনা করিয়াছেন, তখন দুষ্মন্ত বিদূষককে বলিয়াছেন—'সকৃৎকৃত প্রণয়োঽয়ং জনঃ', এখানে রবীন্দ্রনাথ কথাটির সহজ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন—'অয়ং জনঃ', এই ব্যক্তিটি অর্থাৎ দুষ্মন্ত, 'সকৃৎকৃত প্রণয়ঃ' অর্থাৎ 'একবার মাত্র প্রণয় করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়'। প্রাচীন পণ্ডিতেরা কিন্তু 'অয়ং জনঃ' কথাটির দ্বারা হংসপদিকাকে বুঝিয়াছেন। ফলে কথাটির অর্থ দাঁড়ায় এই—'হংসপদিকার প্রতি একবার মাত্র প্রণয় প্রদর্শিত হইয়াছে।' এই অর্থই অধিকতর সঙ্গত ও কালিদাসের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। কালিদাস যদি দুষ্মন্তের চরিত্রকে মসীলিপ্ত করিতে চাহিতেন, তবে তিনি

দুষ্মন্তকে 'শকুন্তলা ক্ষত্রিয়ের পাণিগ্রহণযোগ্যা হইবে কিনা,' এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত করিতেন না, অথবা তাঁহার মুখে—

'সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।'

এইরূপ উক্তি সন্নিবেশিত করিতেন না।

'কাদম্বরী-চিত্র' প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের সকলেরই প্রণিধানযোগ্য।

'প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে অসামান্যতা ছিল সন্দেহ নাই। অন্য দেশে নগর হইতে সভ্যতার সৃষ্টি, আমাদের দেশে অরণ্য হইতে। বসনভূষণ ঐশ্বর্যের গৌরব সর্বত্রই আছে, আর বিবসন নির্ভূষণ ভিক্ষাচর্যের গৌরব ভারতবর্ষেই। অন্যান্য দেশ ধর্মবিশ্বাসে শাস্ত্রের অধীন, আহার বিহার আচারে স্বাধীন, ভারতবর্ষ বিশ্বাসে বন্ধনহীন, আহার বিহার আচারে সর্বতোভাবে শাস্ত্রের অনুগত। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই গল্প শুনিতে ভালোবাসে; কিন্তু কেবল প্রাচীন ভারতবর্ষেরই গল্প শুনিতে কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। সকল সভ্য দেশই আপন সাহিত্যে ইতিহাস, জীবনী ও উপন্যাস আগ্রহের সহিত সঞ্চয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখা যায় না; যদিবা ভারত-সাহিত্যে ইতিহাস উপন্যাস থাকে, তাহার মধ্যে আগ্রহ নাই। বর্ণনা, তত্ত্বালোচনা ও অবান্তর প্রসঙ্গে তাহার গল্প-প্রবাহ পদে পদে খণ্ডিত হইলেও প্রশান্ত ভারতবর্ষের ধৈর্যচ্যুতি দেখা যায় না। এগুলি মূল কাব্যের অঙ্গ না প্রক্ষিপ্ত, সে আলোচনা নিষ্ফল। কারণ, প্রক্ষেপ সহ্য করিবার লোক না থাকিলে প্রক্ষিপ্ত টিকিতে পারে না। ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন, তখন সমস্ত ভগবদ্গীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নাই। কিষ্কিন্ধ্যা এবং সুন্দর কাণ্ডে সৌন্দর্যের অভাব নাই, এ কথা মানি; তবু রাক্ষস যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, তখন গল্পের উপর অত বড়ো একটা জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলে সহিষ্ণু ভারতবর্ষই কেবল তাহা মার্জনা করিতে পারে। কেনই বা সে মার্জনা করে? কারণ, গল্পের শেষ শুনিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র সত্বরতা নাই। চিন্তা করিতে করিতে, প্রশ্ন করিতে করিতে, আশপাশ পরিদর্শন করিতে করিতে, ভারতবর্ষ সাতটি প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং আঠারোটি বিপুলায়তন পর্ব অকাতর চিত্তে মৃদুমন্দ গতিতে পরিভ্রমণ করিতে কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ করে না।'

'ধম্মপদ' প্রবন্ধে কবি চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত ধম্মপদের সমালোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধটিতে তিনি বলিয়াছেন—ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে, এ ইতিহাসের উপাদান রহিয়াছে আমাদের কাব্যে, পুরাণে, বৌদ্ধ শাস্ত্রে, সামাজিক অনুষ্ঠানে। (তুলনীয়, রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধ।) ভারতবর্ষে কত বিচিত্র সাধক সম্প্রদায় আছে, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য 'কর্মকে নিবৃত্তির অভিমুখ' করা, সকলেই কর্মের মধ্য দিয়া কর্মকে অতিক্রম করিতে চান। এই 'ধর্ম-প্রচেষ্টার ঐক্যই ভারতবর্ষের ঐক্য।' ধম্মপদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'ভগবদ্গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিত্তাকে যেমন এক স্থানে একটি সংহত মূর্তি দান করিয়াছেন, ধম্মপদেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে। এই জন্যই কি ধম্মপদে কি গীতায় এমন অনেক কথাই আছে ভারতের অন্যান্য নানা গ্রন্থে যাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।'

"আজকের কথা"

বাঙালী যুবকদের প্রতি—

আমি চাই একদল আগুনের মতন তেজস্বী ও জোয়ান বাঙালী ছেলে। এরাই দেশের আশা ভরসার স্থল। চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, পরার্থে সর্বত্যাগী ও আজ্ঞানুবর্তী যুবকদের ওপরই আমার আশা ভরসা।

• • • •

লোহার মত পেশী ও ইস্পাতের মত স্নায়ু গড়ে তোল। হে আমার যুবক বন্ধুরা, তোমরা আগে বলবান হও—ধর্ম তার পরে আসবে। তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাইছেন। তোমরা সকলে বীর হও।

আগে নিজের ওপরে বিশ্বাস আনো—ঈশ্বরে বিশ্বাস তারপরে আপনি আসবে। যার আত্মবিশ্বাস নেই, সে আত্মহত্যাকারীর চেয়েও মহাপাপী।

পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ো। দেশে দেশে যাও। দেশে দেশে নিজের বিদ্যা ও প্রতিভার শ্রেষ্ঠতা দেখাও। নিজের দেশকে জগতের কাছে গৌরবান্বিত করো।

• • •

আসল শিক্ষার অভাবেই আমাদের আজ এত দুর্দশা। যে শিক্ষায় মানুষকে জীবনসংগ্রামে জয়ী করে না, যাতে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে না, যাতে চরিত্রের বিকাশ হয় না—সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। মানুষ তৈরী করাই আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

• • • •

দুর্বলতাই সবচেয়ে বড়ো পাপ। দুর্বলতা দূর করো। নিজের উপর যার বিশ্বাস নেই, তার কোনদিনই উন্নতি হয় না।

টাকায় কিছু হয় না, নামে যশে কিছু হয় না, বিদ্যাতেও কিছু হয় না। চরিত্রই সমস্ত বাধাবিঘ্নের লৌহ-দৃঢ় পাচীলকে ভেদ করতে পারে।

দেশের মধ্যে, দেশবাসীর মধ্যেই তোমার ভগবান আছেন। দেশকে ভালবাসো, দেশের সেবা করো। দেশের সেবায় সমস্ত স্বার্থ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য বলি দাও।

• • • •

যত দিন যাচ্ছে ততই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—মনুষ্যত্বের বিকাশই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

বহুদিন কেঁদে কাটিয়েছি কিন্তু আর নয়। ওঠ, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও ও মানুষ হও। যে ধর্ম মানুষ করে সেই ধর্ম আমাদের চাই। যে মতবাদ মনুষ্যত্ব এনে দেয়, সেই মতবাদ আমাদের চাই। যে শিক্ষা সর্বপ্রকারে মানুষ তৈরী করে সেই শিক্ষা আমাদের চাই।

সত্যের পরিচয়—যা তোমার দেহ, মন ও আত্মাকে দুর্বল করে তা বিষবৎ পরিত্যাগ করো। জেনো যার মধ্যে জীবন নাই তা সত্য হতে পারে না। সত্য বলপ্রদায়ক, সত্য পবিত্র, সত্যই জীবন। সত্য শক্তি না দিয়েই পারে না, জ্ঞান না দিয়েই পারে না, সজীবতা না দিয়েই পারে না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

বাঙ্গালীর অনেক দোষ আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর একটা গুণ আছে যাতে অনেক দোষ ঢাকা পড়েছে এবং যার ফলে সে আজ জগতের মধ্যে মানুষ বলে গণ্য। বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাস আছে, বাঙ্গালীর ভাব-প্রবণতা ও কল্পনাশক্তি আছে—তাই বাঙ্গালী বর্ত্তমান বাস্তব জীবনের সকল ত্রুটী, অক্ষমতা, অসাফল্যকে অগ্রাহ্য করে মহান আদর্শ কল্পনা করতে পারে—সেই আদর্শের ধ্যানে ডুবে যেতে পারে এবং আপাত দৃষ্টিতে যা অসাধ্য, তা সাধন করবার চেষ্টা করতে পারে। এই কল্পনাশক্তি ও আত্মবিশ্বাস আছে বলেই বাঙ্গালা দেশে এত সাধক জন্মেছেন এবং এখনও জন্মাবেন। এই কারণেই দুঃখ কষ্ট ও অত্যাচারের চাপে বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড কখনও ভাঙবেনা। যে জাতির আদর্শ-প্রীতি আছে সে জাতি তার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্রণা ক্লেশ সানন্দে বরণ করে নিতে পারে।

* * * *

নেতা যদি খুঁজে না পাও—তবে কি তোমরা চুপ করে বসে থাকবে? তোমরাই নেতা সৃষ্টি করে কাজে লেগে যাও। নেতা আকাশ থেকে পড়ে না—কাজের মধ্য দিয়ে নেতা গড়ে ওঠে। লড়াইয়ের মাঝে যখন নেতারা পেছিয়ে পড়েন, তখন সাধারণ কর্ম্মীদের এগিয়ে গিয়ে কর্ত্তব্য কাজ শেষ করতে হবে।

এই মর্ত্ত্য সংসারে সব কিছুই বিনষ্ট হয় ও হবে, কিন্তু ভাব, আদর্শ ও স্বপ্নের মৃত্যু নেই। কোনও ব্যক্তি ভাবাদর্শের জন্য মৃত্যু বরণ করতে পারে, কিন্তু সেই ভাবাদর্শ, তার তিরোধানের পর সহস্র ব্যক্তির জীবনে মূর্ত্ত হয়ে উঠতে বাধ্য। এই ভাবেই বিবর্ত্তনের চাকা ঘুরে চলেছে, এই ভাবেই এক যুগের স্বপ্ন কামনা ধ্যান-ধারণা পরবর্ত্তী যুগে বাহিত হয়ে চলেছে। দুঃখবরণ ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে ছাড়া কোন আদর্শই আজ পর্য্যন্ত এ পৃথিবীতে সার্থকতায় মণ্ডিত হয়নি। আদর্শের জন্য জীবন ধারণ ও মৃত্যুবরণ অপেক্ষা বড় সান্ত্বনা মানুষের পক্ষে আর কী থাকতে পারে? তার বাণী গিরি উপত্যকা আর বিস্তৃত সমতল পেরিয়ে তার দেশের সকল প্রান্তে এবং সপ্ত সাগর অতিক্রম করে দূর দূর দেশে গিয়ে পৌঁছেছে—এই নিশ্চিত সম্ভাবনা অপেক্ষা তার আত্মা আর কী মহত্তর পুরস্কার আশা করতে পারে? —নেতাজী

যেখানে বাঙালি, সেখানে বাঙলা—

বহু সমস্যার দ্বারা বাঙলা দেশ এবং বাঙালি জাতি বিপর্য্যস্ত। এই সমস্যাগুলির যথাশক্তি সমাধান করবার জন্য আমরা সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকি। বাঙলার বাইরে বাঙালি সম্প্রদায়ের যা কিছু অভাব অভিযোগ ও অসুবিধা, সে সকল আমরা বাঙলা দেশের সমস্যার অন্তর্গত বলে মনে করি; কারণ আমাদের সুনির্দ্দিষ্ট এবং দৃঢ় প্রতাবিত নীতি—যেখানে বাঙালি, সেখানে বাঙলা।

এর দ্বারা এমন আমরা নিশ্চয়ই বলিনে যে, বাঙলার বাইরে বাঙালি সম্প্রদায়ের স্থানীয় জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা চাই, বাঙালি সম্প্রদায় এবং স্থানীয় জনসমাজ ঐকান্তিক ভ্রাতৃত্ব বোধে আবদ্ধ হয়ে সৌহার্দ্যের সহিত বিরাজ করুক; কিন্তু তার সঙ্গে তথাকার বাঙালি সম্প্রদায় যেন এক এবং অভিন্ন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতিবন্ধের সূত্রে গ্রথিত বাঙলা দেশেরই একটি খণ্ড রূপে বজায় থাকে। আমরা চাইনে প্রবাসী বাঙালি বাঙলা দেশের সংস্কৃতি বিস্মৃত হয়ে, ভাষা ভুলে গিয়ে, জাতিধর্ম্ম থেকে স্খলিত হয়ে যায়।

এই আমাদের বাঙলা—

এই আমাদের বাঙলা দেশ। এই মাটিতেই জন্মেছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, ঈশ্বরচন্দ্র। এই মাটিতেই জন্মেছেন রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র। মাটি নয়, মা। এই মাটি খুঁড়েই ওঠে প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, উল্লাসকর দত্ত, কানাই দত্ত, সূর্যসেনের মতো বিপ্লবীর দল।

এক হাতে গীতা আর এক হাতে আগ্নেয়াস্ত্র—জীবন এবং মৃত্যু। লক্ষ লক্ষ বিপ্লবীর রক্তে এই মাটিই হয়েছে অভিষিক্ত। এই দেশেরই সন্তান ফাঁসির দড়ি গলায় পরে বলে, বন্দে মাতরম! ধ্বনি নয়, মন্ত্র। যে মন্ত্রে মরা মানুষ জেগে ওঠে, এক হয় বহু। —পল্লী-ভারতী

———

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা

—"বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর কখানা বাড়ী, কটা বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ, এ আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না। কোম্পানীর কাগজের খবর কি দেবে? কিন্তু সো সো করে বড়বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা খাতা খেয়েই হোক আর বেড়া ডিঙিয়েই হোক তখন কত বাড়ী, কত বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ তিনিই বলে দেবেন। বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আবার দ্বারবান সব সেলাম করবে। তাই ধর্ম্ম চাই। ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবে না। সো সো করে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাক, প্রার্থনা কর, 'দেখা দাও' বলে। ব্যাকুল হয়ে কাঁদ। শুধু 'তিনি আছেন' বলে বসে থাকলে কি হবে? সাধন চাই। চালধার পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার কর, চার কেন, চাতড়ুতো, ছিপ জোগাড় কর। গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেল—মাছটা লম্ফ দিয়ে উঠল। যখন দেখা গেল তখন আনন্দ।"

—"সকলকে ভালবাসতে হয়। কেউ পর নয়। সর্ব্বভূতেই সেই হরিই আছেন। তিনি ছাড়া কিছুই নাই। প্রহ্লাদকে ঠাকুর বললেন, 'তুমি বর নাও।' প্রহ্লাদ বললেন, 'আপনার দর্শন পেয়েছি, আমার আর কিছু দরকার নাই।' ঠাকুর ছাড়লেনা তখন প্রহ্লাদ বললেন, 'যদি বর দেবেন, তবে এই বর দিন, আমার যারা কষ্ট দিয়েছে, তাদের অপরাধ না হয়।' এর মানে এই যে হরি একরূপে কষ্ট দিলেন। সেই লোকদের কষ্ট দিলে হরির কষ্ট হয়। সাধুর রাগ দ্বেষ থাকবে না, সব সহ্য করা সাধুর দরকার। তাই হৃদয়কে বলতাম, তুই আমার কথা সহ্য করবি, আমি তোর কথা সহ্য করব, তবে হবে, তা না হলে মামাকে ডাকতে হবে।"

—"আমারই ধর্ম্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা, এটা ভাল নয়। আমি দেখি তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। মানুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম, সকলের ভিতরই এক দেখি। এক ছাড়া দুই আমি দেখিনা। অনেকে মনে করেন আমাদের মত ঠিক, আর সব ভুল—আমরা জিতেছি আর সব হেরেছে। কিন্তু যে এগিয়ে এসেছে সে হয়তো একটার জন্য আটকে গেল। পেছনে যে পড়েছিল সে তখন এগিয়ে গেল। গোলকধাম খেলায় অনেক এগিয়ে এসে, পোয়া ঘুঁটি আর পড়ল না। হাবজিত তাঁর হাতে। তাঁর কার্য্য কিছু বোঝা যায় না। দেখ না ডাব অত উঁচুতে থাকে, রোদ পায়, তবু ঠাণ্ডা শক্তি। এদিকে পানিফল জলে থাকে, গরম শুণ। মানুষের শরীর দেখ। মাথা যেটা মূল (গোড়া), সেটা উপরে চলে গেল।"

—"জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া না। শিবজ্ঞানে জীবের সেবা। ত্রৈলোক্য বললেন, সংসারে থাকতে গেলে টাকাও তো চাই, সঞ্চয়ও চাই! পাঁচটা দান ধ্যান—কি? আগে টাকা সঞ্চয় করে তবে ঈশ্বর। আর দান, ধ্যান, দয়া ত কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ—আর পাশের বাড়ীতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট হয়—অনেক হিসেব করে দিতে হয়। খেতে পাচ্ছেনা লোকে, তা আর কি হবে, ও শালারা মরুক আর বাঁচুক, আমি আর আমার বাড়ীর সকলে ভাল থাকলে হ'ল। মুখে বলে সর্ব্বজীবে দয়া।"

বাংলার রঙ্গমঞ্চ

প্রবাসী—আষাঢ় ১৩৬৭

সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য

গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট

এম,বি,সরকার এণ্ড সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন,-৩৫-১৭৬১ ১৩৭/সি ৯৩৭ সি/১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা-১২ গ্রাম-বীরিয়ন্টর

ব্রাঞ্চ-বালি গঞ্জ-২০৬/১সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-১৯ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬

সোকানের পুরাতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১,অরবিন্দ রোড স্ট্রীট,কলিকাতা-১২

কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৪৫৮-এ

পেট্রোল

কেরোসিন তেল

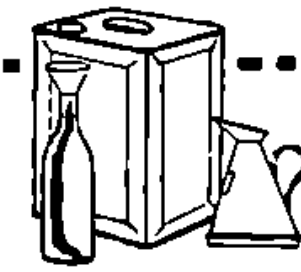

এখন লিটারের মাপে বিক্রী হয়

পেট্রোলিয়ামের দিন তাদের মাপ ব্যবস্থা মেট্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করেছেন। পেট্রোল এবং কেরোসিন তেল এখন লীটারে বিক্রী হচ্ছে।

এই সামান্য কারণের জন্যে এগুলির মূল্যে কোন পরিবর্তন হবেনা।

গ্যালন	লীটার	লীটার	গ্যালন
১	৪·৫৫	১	·২২
২	৯·১	২	·৪৪
৩	১৩·৬	৩	·৬৬
৪	১৮·২	৪	·৮৮
৫	২২·৭	৫	১·১০
৬	২৭·৩	৬	১·৩২
৭	৩১·৮	৭	১·৫৪
৮	৩৬·৪	৮	১·৭৬
৯	৪০·৯	৯	১·৯৮
১০	৪৫·৫	১০	২·২০
২০	৯০·৯	২০	৪·৪০
৩০	১৩৬·৪	৩০	৬·৬০
৪০	১৮১·৮	৪০	৮·৮০
৫০	২২৭·৩	৫০	১১·০০
৬০	২৭২·৮	৬০	১৩·২০
৭০	৩১৮·২	৭০	১৫·৪০
৮০	৩৬৩·৭	৮০	১৭·৬০
৯০	৪০৯·১	৯০	১৯·৮০
১০০	৪৫৪·৬	১০০	২২·০০

১ গ্যালন = প্রায় ৪½ লীটার

মেট্রিক পদ্ধতি

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত

D4 Bdp

ATTRACTIVE PACKAGING SELLS YOUR PRODUCT

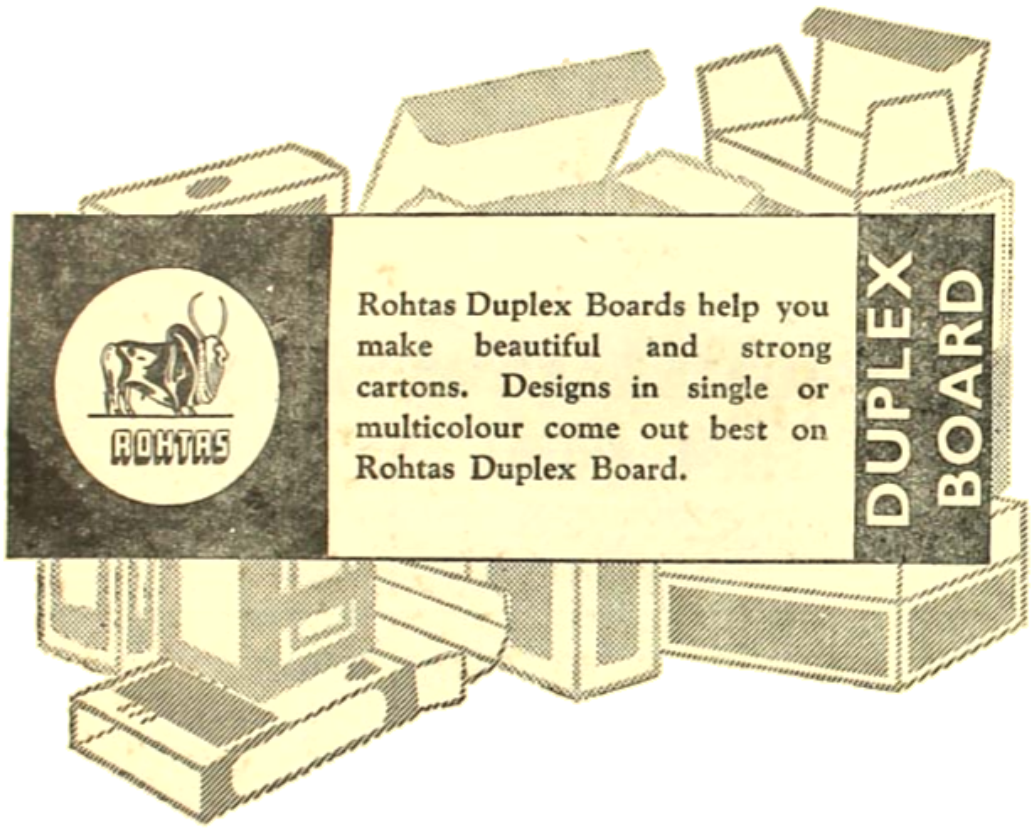

SAHAJANAND PUBLISHERS

ROHTAS INDUSTRIES LTD.

Dalmianagar, Bihar

LARGEST PRODUCERS OF PAPERS AND BOARDS IN THE COUNTRY

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

— আর কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

আদরের পুতুলের জন্য সুন্দর জামাকাপড়!
মিনু তার পুতুলের জন্য সর্বদাই সুন্দর জামাকাপড় যোগাড় করে। মিনু তার ঘিয়ির জামা নেয়, ওর মার শাড়ী নেয়, আর তাছাড়া ওর নিজের জামাকাপড় তো আছেই। আর সব জামাকাপড় অল্প একটু সানলাইট দিয়ে কাচা—কিন্তু কি ধপধপে ফর্সা আর তক তকে ঝরঝরে!

জামাকাপড় তোয়ালে আর চাদরগুলোর দিকে দেখুন। অত সব কাপড় কাচতে অল্পই একটু সানলাইট লেগেছে। সানলাইটের দরের তুলনায় প্রচুর ফেনায় অনেক কাপড় কাচা যায়, আর আছড়ানোর দরকার হয়না। আপনার কাপড় কাচার জন্য সানলাইট সাবানই ব্যবহার করুন।

সানলাইটে জামাকাপড়কে ***সাদা*** *ও* ***উজ্জ্বল*** *করে*

HP. 8-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

HELPING TO BUILD

A BETTER FUTURE FOR ALL

INDIAN ALUMINIUM COMPANY LIMITED.

A CANADIAN-INDIAN ENTERPRISE

বাংলা রঙ্গমঞ্চের উৎপত্তি ও গিরীশচন্দ্র

শিশিরকুমার ভাদুড়ি

বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠাকল্পে গিরিশচন্দ্রের উদ্যোগ ও সার্থক প্রয়াসের একটা বিস্তারিত বিবরণ আজও পর্যন্ত সংগৃহীত হয়নি। যতদিন আমাদের কৃতবিদ্য সম্প্রদায় নাট্যশালার যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করতে না পারবেন ততদিন এ সম্বন্ধে কোনও সজ্ঞান ও সশ্রদ্ধ চেষ্টাও হবে না। আমাদের নাট্যশালার আদিযুগে শক্তিশালী লোকের অভাব ছিল না। অমৃতলাল বসু ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি দুজন প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। নাট্যকার হিসাবে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের অগ্রণী। তাঁর প্রথম নাটক "হীরকচূর্ণ" গিরীশবাবুর নাটক লিখবার প্রায় দুই বৎসর আগে লেখা। অর্দ্ধেন্দুশেখর অভিনেতা হিসাবে গিরীশচন্দ্রের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি, গিরীশচন্দ্রের চেয়ে অনেকটা কৃতকার্য হয়েছিলেন। এক বিনোদিনী ও তিনকড়ি ছাড়া গিরীশচন্দ্রের নামজাদা শিষ্য বা শিষ্যা কেউ ছিল না। অর্দ্ধেন্দুর কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন এমন নট ও নটী বাংলার রঙ্গমঞ্চে অসংখ্য। স্বয়ং অমৃতলাল বসু অর্দ্ধেন্দুকে তাঁর নাট্যগুরু বলে স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশে স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে ভুবনমোহন নিয়োগী, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির সঙ্গে অর্দ্ধেন্দু ও অমৃতলাল সর্বপ্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু সেটা কার্যে পরিণত করতে এঁদের গিরীশ ঘোষকে ডাকতে হয়েছিল। যে সকল গুণ থাকলে একটা নাট্য প্রতিষ্ঠানকে নিজের পায়ে দাঁড় করান যায় সে সকল গুণ গিরীশচন্দ্রের মধ্যে অতিমাত্রায় বর্তমান ছিল। নিজে খুব বড় অভিনেতা না হলে, অভিনয় সম্বন্ধে খানিকটা তত্ত্বজ্ঞান (Theoretical knowledge) না থাকলে কেউই একটা অভিনেতৃগণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন না। গিরীশচন্দ্র অভিনয় কলার theory ও practice দুই বিষয়েই তাঁর সংযোগীদের মধ্যে ছিলেন প্রকৃষ্টতম। অনেকের ধারণা উচ্চশ্রেণীর অভিনয় নৈপুণ্য অর্জন করতে হলে লেখাপড়া জানার বিশেষ প্রয়োজন নেই। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। লেখাপড়া শিক্ষিত বিদ্যা নটের বিশেষ প্রয়োজন। গিরীশচন্দ্রের বিদ্যার পরিধি ছিল বহু বিস্তৃত। ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে বহুবিস্তৃত ইংরাজী সাহিত্য, তার সঙ্গে গিরীশচন্দ্রের পরিচয় সামান্য ছিল না। ইংরাজি সাহিত্য, ইতিহাস ও নাট্য সমালোচনার প্রায় সকল বিভাগেই তিনি সদ্যপ্রবেশ ছিলেন। সমসাময়িক ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসও তাঁর অজানা ছিল না। বহু প্রবন্ধে তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যের দর্শন বিভাগেও তাঁর অধিকার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার লাভ করে। তবে জ্ঞানমার্গের থেকে ভক্তিমার্গেই তাঁর ছিল আন্তরিক প্রবণতা। সবচেয়ে বড় কথা এই যে কলাবিদেরা সচরাচর যে রকম বেহিসেবী হ'ন তিনি তা মোটেই ছিলেন না। তিনি থিয়েটারে প্রবেশ করার আগে ছিলেন বুককিপার বা হিসাব পরীক্ষক। এই কাজে তাঁর দক্ষতার সুনাম ছিল এবং এতে তাঁর যা উপার্জন ছিল, সেটা তাঁর কালের পক্ষে পর্যাপ্ত বলে ধরে নিতে পারা যায়। যখন অবৈতনিক হিসাবে কিছুদিন মঞ্চের সেবা করে তিনি বুঝলেন দেশে থিয়েটার ব্যবসা হিসাবে স্থায়ী হবার কোন প্রতিবন্ধক নেই, তখনই তিনি তাঁর সমস্ত প্রাণধন নাট্যশালা গড়ে তুলবার দিকে নিযুক্ত করলেন। তাঁর জীবিতকালে কোন নটেরই এই ব্যবসায়

বুদ্ধি ছিল না, এবং এই ব্যবসায় বুদ্ধির বলেই তিনি বাংলার থিয়েটারকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে তুলতে পেরেছিলেন যা অর্দ্ধেন্দু বা অমৃতলাল পারেন নি।

গিরীশচন্দ্রের থিয়েটারে সক্রিয়ভাবে যোগ দেবার প্রথম ইতিহাসে একটু গোলমেলে। দল বাঁধবার সঙ্গে সঙ্গে দলাদলি সুরু হয়। এক সময়ে গিরীশবাবু তাঁর ভূতপূর্ব বন্ধুদের বাঙ্গ করে খবরের কাগজে বেনামী চিঠিও লেখেন। "লুপ্ত বেণী বইছে তেরোধার" বলে ছড়াও কাটেন। বস্তুতঃ এ সময় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস একটা দলাদলি-ঝগড়ার ইতিহাস। টাকাপয়সা সাজসরঞ্জামের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হল দলটি দুভাগে বিভক্ত হল। এই দুদলের এক দলে ছিলেন গিরীশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর, মতিলাল বসু, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। অন্য দলে অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বেলবাবু প্রভৃতি। Stage manager হিসাবে ধর্মদাসবাবুর হেফাজতে Stage ও Scene, Scenery ছিল। তিনি যখন তাই নিয়ে গিরীশবাবুর আশ্রয় নিলেন, ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন গিরীশবাবু National Theatre নিজের নামে রেজেষ্ট্রী করে নিলেন। পূর্বে গিরীশচন্দ্র National Theatreএর প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। National Theatreএর অভিনয় নৈপুণ্য ও সাজ সরঞ্জাম নিয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি অথচ এই থিয়েটার যখন দাঁড়িয়ে গেল তখন সেই গিরীশচন্দ্র কৌশলে উহা অধিকৃত করলেন। এটা তাঁর দল ছাড়া আর সকলের কাছেই অশোভন ঠেকল। অর্দ্ধেন্দু ও অমৃতলাল বসু গিরীশচন্দ্রের দলে ছিলেন না। তাঁরা এই রেজেষ্ট্রারী ব্যাপারটা একেবারেই ভাল চোখে দেখেন নি। আজও পর্য্যন্ত অনেকেই মনে করেন এটা গিরীশচন্দ্রেরই অগৌরবের কথা। কিন্তু এর আর একটা দিক আছে। গিরীশের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী কর্মীপুরুষ সহজেই অনুমান করে নিয়েছিলেন যে এই নবজাত সম্প্রদায় যদি এক কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত না হয়, এর অকালমৃত্যু অবধারিত। নাট্যশালা গঠনের শক্তি যে একমাত্র তাঁরই ছিল এ সম্বন্ধেও তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। এই জন্যই আইনসঙ্গত উপায়ে নিজের নেতৃত্ব তিনি পাকা করে নিলেন। অভিনয়ের সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সমেত একটি নাট্যসম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা না হতে পারলে তিনি কোন রকমেই বাংলা থিয়েটারকে সজীব ও প্রাণবন্ত করতে পারতেন না। অমৃতলাল বা অর্দ্ধেন্দু জীবনের শেষ পর্যন্ত কখনও কোন নটসম্প্রদায়ের সকল নেতৃত্ব করতে পারেন নি। বৃদ্ধ বয়সে অমৃতলালকে তাঁর থিয়েটারের পরিচালনার ভার বাধ্য হয়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল এটা প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাস। আরো স্মরণ রাখতে হবে গিরীশচন্দ্র কেবল নেতৃত্বই গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর দীর্ঘ ৬৮ বৎসর নট জীবনে কখনো নিজেকে কোন সম্প্রদায়ের স্বত্বাধিকারী করবার প্রয়াস পান নি। নিজের শিল্পদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজেকে লাভবান করেন নি। অমৃতলাল তাঁর থিয়েটারের চার আনা স্বত্বাধিকারী ছিলেন। কিন্তু কোন অভিনেতৃ সম্প্রদায় নেতা বা গুরু হিসাবে তাঁকে বরণ করেনি। এরপর থেকেই National Theatre অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলতে লাগলো। গিরীশচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে থিয়েটার চালাতে পারে প্রায় বিশ বৎসরের মধ্যে এমন কোন লোক পাওয়া যায় নি। অদ্ভুতকর্মা অমরেন্দ্রনাথ দত্তই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই গৌরব অর্জন করেন। কিন্তু থিয়েটার অমরেন্দ্রনাথ বেশীদিন চালাতে পারেন নি।

যখন প্রথম থিয়েটারে যোগ দেন তখন নাট্যকার হবার কল্পনা গিরীশচন্দ্রের ছিল না। কিন্তু যখন দীনবন্ধু, মাইকেলের নাটক ফুরিয়ে গেল, বঙ্কিম, তারক গাঙ্গুলী প্রভৃতির উপন্যাসের নাট্যরূপ আর চলে না, তখন বাধ্য হয়ে ১৮৭৭ সালে গিরীশচন্দ্র নিজেই নাটক লেখার ভার নেন, এবং উপর্যুপরি

রাবণ বধ, সীতার বনবাস, অভিমন্যু বধ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস প্রভৃতি নাটক রঙ্গমঞ্চের গৌরব বর্দ্ধন করে।

১৮৮৩ সালে National Theatre, বিডন ষ্ট্রীটে বাড়ী করে তাঁর থিয়েটার নাম নিয়ে যখন ব্যবসা সুরু করল, তখন গিরীশচন্দ্রের "দক্ষযজ্ঞ" নিয়েই তাঁর থিয়েটারের শুরু হয়। এতদূর পর্যন্ত নাট্যশালার ইতিহাস যাঁরা অনুসরণ করে এসেছেন তাঁদের কাছে গিরীশচন্দ্র যে বাংলা থিয়েটারের আদি নায়ক ও প্রধান পুরুষ তা বুঝিয়ে বলবার আর কোন প্রয়োজন নেই। বর্তমান প্রবন্ধে এই কথাই আমাদের প্রতিপাদ্য। উপসংহারে গিরীশচন্দ্র বাংলা থিয়েটারকে কতখানি ভালবাসতেন, কতখানি তার কল্যাণ কামনা করতেন সেই সম্বন্ধে দুটি ঘটনা আমরা উল্লেখ করবো।

১৮৮৭ সালে ধনকুবের গোপাললাল শীলের হঠাৎ থিয়েটারের দল বাঁধবার সখ হয়। তিনি গিরীশ বাবুকে বিশ হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক ৪০০ কি ৫০০ টাকা বেতন দিয়ে তাঁকে নিয়ে যেতে চান তাঁর নির্মীয়মান Emerald Theatreএ। গিরীশবাবু অস্বীকৃত হলে তিনি তয় দেখান যে গুণ্ডা ও আগুনের সাহায্যে তাঁর থিয়েটারকে তিনি নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। গোপাললাল শীলের পক্ষে এ কার্য মোটেই অসম্ভব ছিল না। সমসাময়িকরা তাঁর এই ধরণের নানা কীর্তির কথা অবগত ছিলেন।

গিরীশচন্দ্র তাঁর বন্ধু ও শিষ্যদের বললেন, লোকটা অপরিমিত ধনী, গোঁয়ার ও খেয়ালী, থিয়েটারের খেয়াল তার এক বৎসরের বেশী টিকবে না, তাকে চটিয়ে থিয়েটারের ক্ষতি করার চাইতে তার মতে মত দেওয়াই ভাল। বৎসরান্তে গোপালবাবুর থিয়েটারের নেশা কেটে গেলে তিনি আবার ফিরে আসবেন। এই বলে তিনি বোনাসের বিশ হাজার টাকা থিয়েটারের উন্নতিকল্পে তাঁর স্নেহের দান হিসাবে বন্ধুদের হাতে তুলে দিলেন। গিরীশচন্দ্রের ভাই অতুলবাবু এতগুলো টাকার সমস্তটা এই ভাবে দেওয়ায় ক্ষুণ্ণ হন। তখন তাঁর থিয়েটারের তৎকালীন স্বত্বাধিকারীরা মাত্র ৪ হাজার টাকা অতুলবাবুকে প্রত্যার্পণ করেন।

আর একটি ঘটনা। এটি আমরা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের লেখা "রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ" নামক পুস্তকে পাই।

১৯০৪ সালে মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীমনোমোহন পাঁড়ে আড়াই হাজার টাকার এক কোবালার বলে অমরেন্দ্রনাথকে গৃহচ্যুত করতে চান। অমরেন্দ্রনাথ টাকাটা চুকিয়ে দিতে স্বীকৃত হন। মনোমোহনবাবুও আপোষে সম্মত হন। অবশ্য আইনতঃ তিনি তখনই বাড়ী দখল করতে পারতেন। এই সময় অমরেন্দ্রনাথের অত্যন্ত অভাবের অবস্থা। রবি, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতিদিন sale আবার পাওনাদারকে assign করা ছিল। অমরেন্দ্রনাথ মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এই সময়ে তাঁকে বাঁচালেন গিরীশচন্দ্র। তিনি অমরেন্দ্রনাথের বিপদের কথা শুনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে ২৫০০৲ টাকা দিয়ে ঋণমুক্ত করলেন। অমরেন্দ্রনাথ সে যাত্রা পরিত্রাণ পেলেন।

গিরীশচন্দ্র লিখেছেন—"রঙ্গভূমি ভালবাসি,
হৃদে সাধ রাশি রাশি,
আশায় নেশায় করি জীবন যাপন।"

রঙ্গমঞ্চের উপর ভালবাসা ও রঙ্গভূমি ছিল গিরীশচন্দ্রের নেশা ও পেশা।

যুগ-প্রবর্ত্তক শিশিরকুমার

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তিমিরাম্বরের কালিমা ফুঁড়ে অবনিতে যখন ফুটে উঠল আলোকের পুলকিত পদ্মপলাশ, তখন সকলেরই দৃষ্টি হ'ল বিস্ময়চকিত ও সম্মোহিত। আত্মস্থ হয়ে মন বললে, দেখলুম অভাবিতকে।

আমাদের সাধারণ নাট্যজগতে তখন ঘোর দুর্ভিক্ষ। গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের পর থেকেই বৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায়ের কর্ম্মীরা রসিকদের মানসক্ষুধা নিবারণ করতে পারছিলেন না। তখনকার অভিনেতাদের নায়ক দানীবাবু পর্য্যন্ত পুরাতন কায়দায় কচ্‌লে 'গ্যালারি'র করতালিধ্বনি শুনেই পরিতৃপ্ত ছিলেন। প্রায় এক যুগের মধ্যে একজনমাত্র উল্লেখযোগ্য নূতন শিল্পীকে দেখা যায়নি পাদপ্রদীপের আলোকে।

কিন্তু গিরিশ-যুগের অবস্থা ছিল না এমন অধঃপতিত। সে যুগের প্রায় প্রত্যেক বিখ্যাত নটের শক্তির সঙ্গে সুপরিচিত হবার সৌভাগ্য আমি অর্জ্জন করেছি। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে কারুর তুলনা করব না, কারণ অভিনেতা হিসাবে এদেশে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর সহনট অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল মিত্রও ছিলেন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। এবং এই ত্রয়ীর ছায়ায় থেকে আরো একদল শক্তিধর রূপদক্ষ লাভ করতেন প্রেক্ষকদের প্রশস্তি। গিরিশোত্তর যুগে তাঁদের মধ্যে তিন-চার ব্যক্তি প্রতাপ-প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েও বিদ্যমান ছিলেন বটে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। দুই-একটা কোকিলের ডাকে বসন্তের স্মৃতি মাত্র জাগতে পারে, কিন্তু তাদের কূজনে জাগে না পরিপূর্ণ বসন্ত-সমাগমের মহাসমারোহ।

বাংলাদেশের বৈতনিক নাট্যশালার সম্বন্ধে যখন একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছি, তখন অকস্মাৎ অবৈতনিক নাট্যশালার সামনে ব'সে একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই অরূপকে কল্পনাতীত রূপধারণ করতে দেখলুম। সে এক বিপুল বিস্ময়, স্বপ্নাতীত দৃশ্য, আশ্চর্য্য আবিষ্কার। ১৩২২ সাল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে হ'ল "ফাল্গুনী"র নাট্যাভিনয়। তার অপূর্ব্ব প্রয়োগকৌশল ও নূতনত্বের ঢেলা মনের মধ্যে অম্লান থাকতে থাকতেই ১৩২৪ সালে আবার ঐখানেই মঞ্চস্থ হ'ল "ডাকঘর"।

অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ, সংকীর্ণ পরিসর, কিন্তু প্রতিবেশ প্রভাবে, প্রতিভার মায়াস্পর্শে এবং যুগোপযোগী নাট্য-পরিচালনায় ও প্রয়োগনৈপুণ্যে ক্ষুদ্র যে কতটা বৃহৎকে প্রকাশ করতে পারে ঐ দুটি অপূর্ব্ব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তা উপলব্ধি করলুম। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—রূপসাগরে ডুব দিয়ে সকল হ'ল অরূপরতন লাভ করবার আশা।

কিন্তু সে তো হচ্ছে দুটি ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎচকিতের মত, তা দেখে পথনির্দ্দেশ করবার জন্যে সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের কোন নাট্যাচার্য্যই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না এবং কতিপয় বাছা বাছা রসিকজন ছাড়া জনসাধারণ সেই অপরূপ রূপকথার কোন রসই গ্রহণ করতে পারলে না। তাদের কেউ হাজির থাকলেও দৃষ্টিগম্য বস্তুকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে নিশ্চয়ই বলত—নৈবচ, নৈবচ! কারণ সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা দর্শকদের তৈরি ক'রে তুলতে পারেননি। এ সত্য গিরিশচন্দ্র নিজেই স্বীকার ক'রেছেন একাধিকবার।

বাংলার-রঙ্গমঞ্চ চিত্রে

"যাঁরা বাংলার রঙ্গমঞ্চে জ্বেলেছেন প্রাণশিখা,
যুগযুগ ধরি' বাঙ্গালীর ভালে দিয়েছেন জয়টিকা,
যাঁরা সাহিত্যে, নাট্যশিল্পে করেছেন কত দান,
-তাঁদের কীর্ত্তি হোক্ অক্ষয়, মহীয়ান, গরীয়ান ॥"

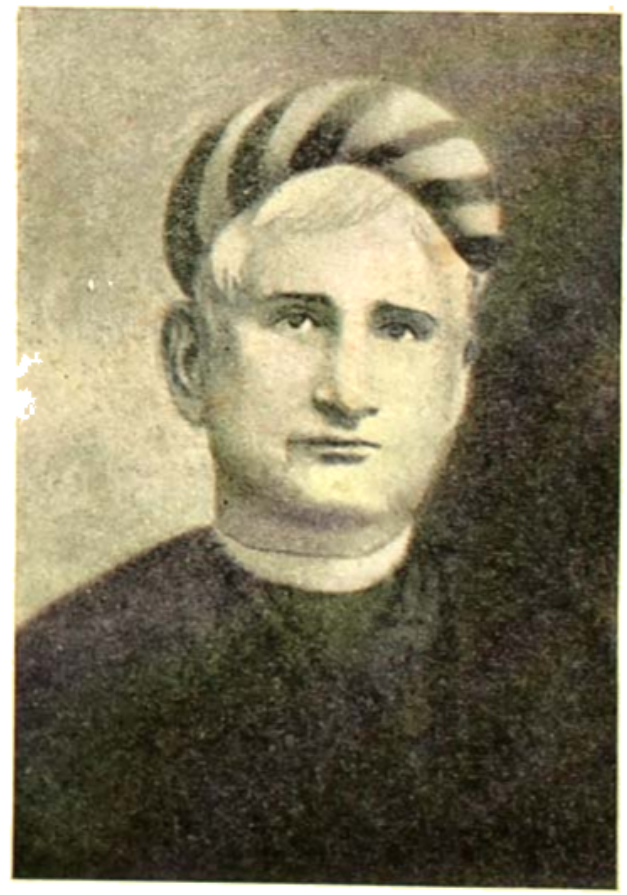

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

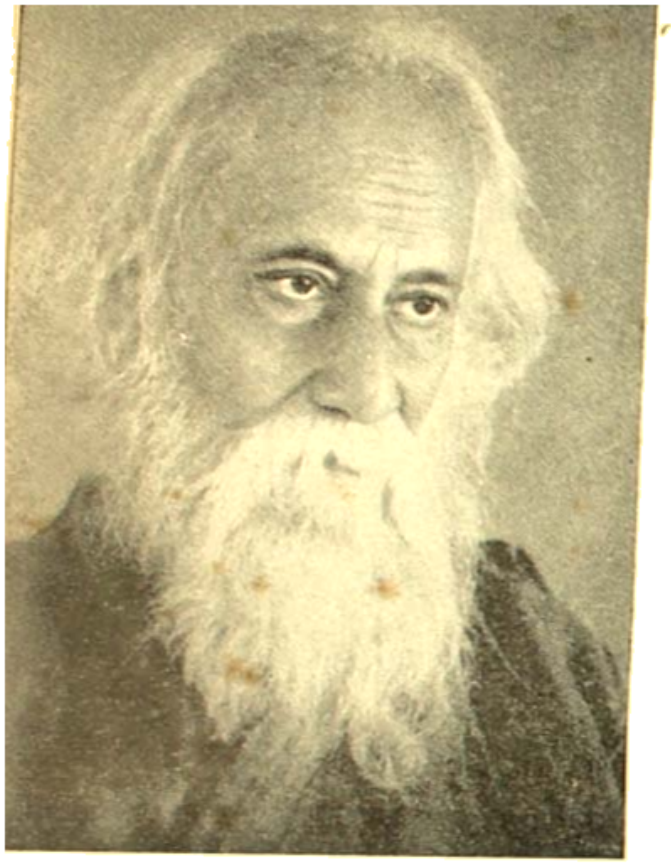

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

রসরাজ অমৃতলাল বসু

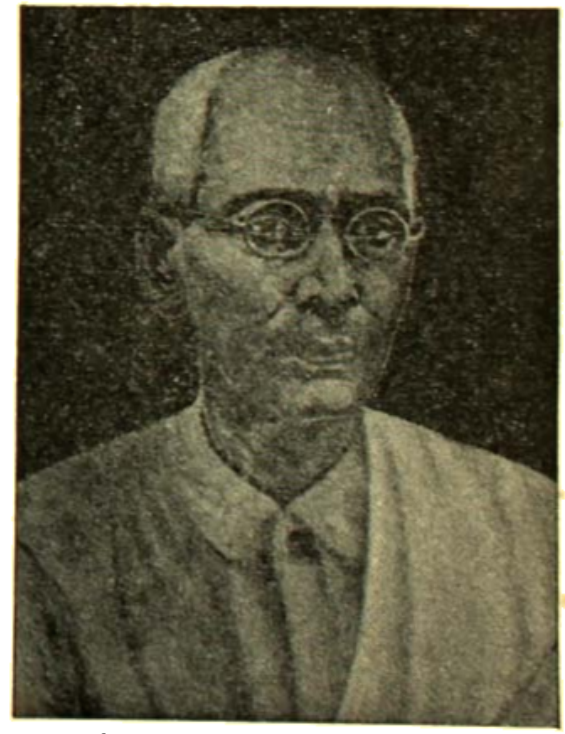

-লাই ক্যার ক্যার ক্রেপ্রেক্ত ত্রিপাঠিরাজ

নাট্যগুরু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী

জনপ্রিয় অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)

প্রখ্যাত নট অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন

নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রসন্নকুমার ঠাকুর

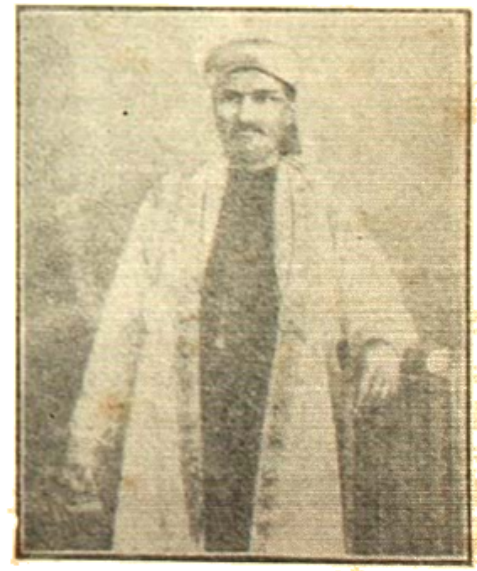

প্রতাপচন্দ্র সিংহ

অভিনেত্রী কুমারী বিনোদিনী

★

মহেন্দ্র লাল বসু

শরৎচন্দ্র ঘোষ

নবীন চন্দ্র বসু

বাল্মীকি প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ

মৃণালিনী নাটকে পশুপতির ভূমিকায় শিশিরকুমার

যুগ-প্রবর্ত্তক শিশিরকুমার

পেশাদার নাট্যশালা অচলায়তনের মধ্যেই জাগ্রত নিদ্রায় অভিভূত হয়ে রইল।

আবার অন্ধকার। বাইরে আলোর মালা, মনের ভিতরে অন্ধকার।

১৯২১ খৃষ্টাব্দ। আচম্বিতে এক অভাব্য প্রতিভা-শিখা জ্বালিয়ে দিলে আমাদের মানসপ্রদীপ। সচমকে চেয়ে দেখলুম শিশিরকুমারকে। তিনি "আলমগীর"। মন বললে, কি আশ্চর্য্য! তোমার মতই একজনকে দেখবার জন্যে যে "এতদিন বসেছিলুম পথ চেয়ে আর কান পেতে!"

তবে দুমকেতনের মত প্রতিভাধরের সেই ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশে গিরিশোত্তর যুগের অধঃপতিত নাট্যমঞ্চ স্তম্ভিত ও বিচলিত হ'ল এবং অভিনেতা শিশিরকুমারের যশঃকীর্ত্তনে রসিকসমাজ মুখরিত হয়ে উঠল বটে; কিন্তু তখনও নিশীথিনীর কৃষ্ণাঞ্চলের আবরণ থেকে আমরা মুক্তিলাভ করতে পারিনি। এখনো সময় হয়নি বুঝে শিশিরকুমার আবার আড়ালে গাঢাকা দিলেন। ব্যষ্টি নয়, চাই সমষ্টি। চাই নবযুগের নাট্যশৈলী।

তারপর যথাক্রমে রাধিকানন্দের ও নরেশচন্দ্রের এবং নির্ম্মলেন্দুর আবির্ভাব। তারপর একসঙ্গে তিনকড়ি, দুর্গাদাস ও অহীন্দ্র প্রভৃতির আগমন। রাতের আঁধার পাৎলা হয়ে আসে, প্রভাতের পদধ্বনি যেন শোনা যায়, পূর্ব্বগগনপ্রান্তে জাগে যেন উষার শুভ্র ইঙ্গিত। কিন্তু এখনো এক সুরে বাঁধা নাট্যশৈলীর অভাব।

তারপর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ। "সীতা"র নাট্যাভিনয়। প্রভাত এসে খুলে দিলে রাত্রির তিমিরাবগুণ্ঠন —বিহঙ্গদের সভায় ধ্বনিত হয়ে উঠল প্রভাতকেরী। নবযুগের উদ্বোধন।

এর মধ্যেই উপর-উপরি কয়েকটি ভূমিকায় শিশিরকুমারের অনবদ্য অভিনয় দেখে নিঃসংশয়িত প্রমাণ পেয়ে বুঝতে পেরেছি যে, তিনি হচ্ছেন অনন্যতন্ত্র এবং বাংলাদেশে একমাত্র গিরিশচন্দ্র ছাড়া আর সব অভিনেতার উপরেই তাঁর আসন।

কিন্তু "সীতা"র নাট্যাভিনয় প্রমাণিত করলে আর একটি বৃহৎ সত্য। বাংলাদেশের সাধারণ নাট্য-জগতে শিশিরকুমারই হচ্ছেন প্রথম, প্রবীন ও সার্থক প্রয়োগকর্ত্তা। এই সত্য ধরা পড়েছিল রবীন্দ্রনাথেরও গুণগ্রাহী দৃষ্টিতে।

শিশিরকুমারের আবির্ভাবের আগে পেশাদার রঙ্গালয়ের মধ্যে প্রয়োগকর্ত্তার জন্যে কোন পৃথক আসনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না, প্রয়োগকর্ত্তার নামও কেউ শ্রবণ করেনি। গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর অভিনয়-শিক্ষা দিতেন, কিন্তু অন্য সব দিক নিয়ে যে বেশী ঘামাতেন না তার বহু প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। (মৎপ্রণীত "বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার" পুস্তকে তা দেখাবার চেষ্টাও করেছি)। গিরিশচন্দ্র ছিলেন নাট্যাচার্য্য, কিন্তু প্রয়োগকর্ত্তা বলতে নাট্যাচার্য্য বুঝায় না।

প্রয়োগকর্ত্তা হচ্ছেন অনন্য। যেকোন নাট্যাভিনয়ের বহুধা বিভক্ত কর্ত্তব্যের ভার গ্রহণ করেন একমাত্র তিনিই। সমস্ত পালাটিকে তিনি একই সুর ও ছন্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই অভিনয় শিক্ষা দিতে হয়। গীতিকার, সুরকার ও নৃত্যকারকে হ'তে হয় তাঁরই মুখাপেক্ষী। দৃশ্যপট-শিল্পীও হন তাঁরই নির্দ্দেশে চালিত। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক যে যুগকে প্রকাশ করে, দৃশ্যপটে ও সাজপোষাকে ঠিক সেই যুগটিকে হুবহু ফুটিয়ে তোলবার জন্যে প্রয়োগকর্ত্তাকে রীতিমত গবেষণা করতে হয়। তারপর প্রয়োগকর্ত্তাই বেঁধিয়ে দিতে পারেন, যথোচিত আলোকপাত কৌশলের উপরে নাটকীয় ক্রিয়া কতখানি নির্ভর করে।

বাংলাদেশের সাধারণ নাট্যজগতে "সীতা"ই হচ্ছে প্রথম নাট্যাভিনয়, যার প্রত্যেকটি বিভাগে কাজ করা হয়েছে একমাত্র মস্তিষ্কের নির্দ্দেশে এবং সেই একমাত্র মস্তিষ্ক হচ্ছে প্রযোগকর্ত্তার মস্তিষ্ক।

শিশিরকুমার কেবল প্রযোগকর্ত্তা নন, সেই সঙ্গে অভিনয়-শিক্ষকও। তাঁর অভিনব নাট্যশৈলী কীর্ত্তিমান করেছে বহু অভিনেতাকে। সাধারণত তিনি বড় বড় অভিনেতাকে নিজের দলভুক্ত করবার চেষ্টা করতেন না এবং নবীন ও অখ্যাত শিক্ষার্থীদের সহস্তে তৈরি ক'রে নিয়ে তিনি যে কতটা উচ্চশ্রেণীর সৌন্দর্য্য প্রকাশ করতে পারতেন, "সীতা"র নাট্যাভিনয়ই হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আজ শিশিরকুমার পরলোকে, কিন্তু আজও তাঁর দ্বারা আবিষ্কৃত নাট্যশৈলীর প্রভাব সমগ্র নাট্যজগতে বিস্তৃত হয়ে আছে। এইজন্যেই তিনি নূতন যুগের প্রবর্ত্তক এবং বর্ত্তমান যুগকে অনায়াসেই শিশির-যুগ ব'লে বর্ণনা করা চলে।

শিশিরকুমারকে নবযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা ব'লে অভিনন্দন দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর প্রশস্তি রচনা করবার সময়ে সর্ব্বদাই এই সত্যটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনি হচ্ছেন আমাদের নাট্যজগতের সর্ব্বপ্রথম প্রযোগকর্ত্তা এবং এই গুণের জন্যেই তিনি এখানে নবযুগ প্রবর্ত্তন ও রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন, আর কেউ বা পারেনি।

অভিনেতা ও নাট্যাচার্য্য না হ'লেও একমাত্র প্রযোগকর্ত্তার গৌরব নিয়ে শিশিরকুমার আমাদের সাধারণ নাট্যজগতে অমরাত্মা রূপে স্বীকৃত হ'তে পারতেন।

"আমার উপসংহারে এই প্রার্থনা, জাতীয় নাট্যসমাজ রূপ মহোচ্চ উপাধির কার্য্য করিতে যেন আপনারা ত্রুটী না করেন যেন স্বদেশের কুরীতি কুনীতি, কুপ্রথা, কুব্যবহারের সংশোধনে তিলমাত্র শিথিল যত্ন না হয়েন—আবার যেন সেই কুরীতি, কুনীতি, কুপ্রথা প্রভৃতি দূরীভূত করিতে গিয়া ও পক্ষের অতিম সীমায়, অর্থাৎ একেবারে স্বদেশের পূর্ব্ব সর্ব্ব অতি মন্দ, ইউরোপীয় সকলই উত্তম, আমাদের যত রীতি নীতি সব অধম, সকলই সংস্কার, পরিবর্ত্তন বা মূলোৎপাটনের যোগ্য, এরূপ অতি গমনশীল অন্তর বৃত্তির সোনাপানি খাইয়া রুদ্ধ হইয়া না পড়েন।—যেন কেবলই আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশের রুচিকে কদর্য্যপথে চালিত না করেন—যেন কুরসিকতা ও ভণ্ডরসিকতা অধিকাংশ লঘুচেতা শ্রোতৃবর্গের আপাততঃ ভালো লাগে বলিয়া কুরসিক লেখকদিগকে উৎসাহ না দেন—যেন যথার্থ সৎকার, সুরসিক, সুভাবুক নাট্যকারগণকেই আপনাদের প্রিয় লেখক ও প্রিয় নিয়ন্তা করিয়া তুলেন—যেন বাদকোমত্তাদিরূপ সামাজিক পাপে আপনাদের কাহাকেও লিপ্ত হইতে না দেন এবং যাহাতে দেশমধ্যে ছোট বড় তাবৎলোকে সে সব পাপের প্রতি ঘৃণা করে, এমন তেজস্বী, ও মনস্বী অভিনয় দ্বারা যথার্থই স্বজাতির পরম হিতৈষী নটসমাজরূপে সভ্য অবনীতে পরিচিত হইতে পারেন।

মনোমোহন বসু (নাট্যকার)

নাট্য ও নবনাট্য

বিজন ভট্টাচার্য

কথাটা যদি 'নাট্য' আন্দোলন হয় তবে তার সংজ্ঞা সুস্পষ্ট, কিন্তু 'নবনাট্য' আন্দোলন কথাটা অস্পষ্ট এবং কতকটা বিভ্রান্তিকর—নাট্যামোদী ও সমালোচক মহলে বিষয়টি নিয়ে বিতর্কমূলক জল্পনা কল্পনা আছে। আমার ব্যক্তিগত ধারণায়, তর্কটা খানিকটা সখের বলে মনে হয়। যুক্তিবাদী বিলাসী মনের স্বখাত আলাপ বিলাপ। কেন না 'নব' কথাটা থাকলো কি থাকলো না, তার জন্যে নাটকের আন্দোলনের গতি প্রকৃতি কোন কালেই নির্দ্ধারিত হবে না। হবে না এই কারণে যে, কোন বিশেষ সংজ্ঞা নিরপেক্ষ হয়েই জীবনধারা অব্যাহত চলতে থাকবে। নাটক লেখা হ'লো কি হ'লো না তাতে করে প্রাণের আসরে নাট্য প্রযোজনা ক্ষণকালের জন্যও বন্ধ হবে না। উন্মোচনের কালাকাল যদি বা নিরূপিত হয়, যবনিকা পতন কবে কি ভাবে হবে, অকল্পনীয়। ইতিমধ্যে সৃষ্টি প্রকরণে সূর্য্য উঠবে, চাঁদ ডুবে যাবে। পাহাড় অরণ্য নদী সমুদ্রের পটভূমিকায় প্রাণের অষ্টপ্রহর, রামধনুতে যে কটা রং আছে তারও সাতগুণ রং-যে রূপায়িত গুণায়িত হয়ে বিরাম বিহীন চলতে থাকবে।

এ তো গেল নাট্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানের কথা। তবু হদ-এর কথাটাও প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে বলে মনে করি। নবজাতক যদি কামনার হয়, তবে নব. নাট্যই বা অপাঙক্তেয় হতে যাবে কেন? জাতক যদি না ভূঁইফোড় সম্ভব হয়, নবনাট্যের মধ্যেও তো তার ঐতিহ্য জীবনধারা স্বতঃসিদ্ধ। তবে বিতর্কটা কোথায়? স্বীকৃতিতে? তবেই মনে হয় তর্কের খাতিরেই এই তর্ক। সুতরাং অর্থহীন।

তবে একটা কথা থেকে যায়। সার্থকতার কথা। নাট্যপ্রচেষ্টা যদি না সার্থক হয়, তবে হাজারটা 'নব' জুড়লেও সে 'নবনাট্যে' প্রাণসঞ্চার হবে না। কিন্তু নবনাট্যের এ হেন অপমৃত্যু অনুশোচনার বিষয়বস্তু, শোকতাপ করবার ব্যাপার; কুঞ্চিত নাসিকায় শ্লেষাত্মক পেচক-উল্লাসের কিছুমাত্র অবকাশ নেই এখানে। ঘর পুড়িয়ে ছাই যায়, এমনও মানুষ দেখেছি কি না!

গোলমালটা বাধবে আসলে এই সার্থকতার সংজ্ঞা নিয়ে। কাকে সার্থক বলবো। এই জীবনে গরল অমৃত কম বেশী মেশামেশি। যেমনি অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে, নাট্যশিল্পেও এই গরল অমৃত, কুশ্রীতা সুশ্রীতা, অসুন্দর সুন্দর—চমৎকার চমৎকার কন্ট্রাস্ট-এর সৃষ্টি করে। এমনই সে বিভ্রম যে, মরণ পর্যন্ত ভয়ঙ্করী না হয়ে প্রকাশ্য জঘন্যতারও সে মনোহারী হতে পারে। খুবকুড়োনি ক্ষুধা এক ভাগ্যবিড়ম্বিত মা জননী জীবনের লাঞ্ছনা বঞ্চনা সহ্য করতে না পেরে নারকোলের মালাতে করে সেঁকো বিষ খাচ্ছে হাইড্রোজেনের ভলে ভলে, মঞ্চের ওপর এ দৃশ্য যদি না দর্শকচিত্ত হরণ করতে সক্ষম হয়, স্ফটিকের পাত্রে ঈষৎ নীল তীব্র হলাহল চাঁপার কলি আঙুলে ধরে যদি কোন অপরূপ সুন্দরী এক ব্যর্থপ্রেম রাজনন্দিনী খেদোক্তি কোরতে কোরতে সেই বিষ পান করে—এ দৃশ্য অতি নাটকীয় হয়েও দর্শক মনে সমান খেদোক্তির অভিব্যক্তি নিঃসন্দেহে ফুটিয়ে তুলবে। এ ক্ষেত্রে আঙ্গিকের দিক থেকে বোলতেই হয় নাটক হলো, কিন্তু শিল্পীর

ধর্মাধর্মে নাট্যের আসরে শিল্পের প্রাণবস্তু মারা পড়লো। কেন না নায়কোলের মালাতে করেই হোক আর ফটিক পায়েই হোক, ঐ মরণ স্বাভাবিক নয় বলে নেহাৎই অপমৃত্যু। বঞ্চনার জীবন বঞ্চনাতেই তার শেষ। আরও অঘটন এই যে ঐ অপমৃত্যু নাটকের রীতিগতি মতে সার্থক হয়েছে বলেই সমধিক দুশ্চিন্তার হয়ে রইল। কেন না ঘাটো শিল্পের বদি বা নয়, শিল্পীর দায়িত্ব থেকেই যায়।—মারলে কেন? আর বদি বা মারলে সে মরণ স্বাভাবিক হলো না কেন? কেন সে মৃত্যুতে এই সত্য প্রতিভাত হলো না যে মৃত্যুরই মরণ হ'লো তাতে করে। নাট্যশিল্পের রীতিনীতি প্রকরণ মতে জীবনমৃত্যু পাত্রের ভৃত্য হলেও, নবনাট্য বলবে মৃত্যুটা অবান্তর। ঘটনাটা অনিবার্য হলেও জীবনের ক্ষেত্রে তার সমর্থন পাইবার দরকার নেই। এই রকম সমাজ ও জীবন বিরোধী যে কোন অঘটনের বিপক্ষেই নবনাট্য আন্দোলনের রায় সুস্পষ্ট। জীবনবিচ্যুত কর্মাকর্ম এখানে দুর্ঘটনার মত জীবনের ক্ষেত্রে সম্ভব হলেও তার স্বপক্ষে কোন ওকালতি করবার কারণ নেই।

নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই স্বেচ্ছাসেবাব্রতের দায় অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলির। কেন না পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্বেফ বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণেই বৃহত্তর মূঢ় মানসের সংস্কার ও অন্ধতার প্রতি তাস্তুতি চাইবে না। চাইবে না, কেন না মুনাফায় ঘাটতি পড়বে। অন্য যে কোন ব্যবসায়ের বেলায় যেমন, নাট্যশিল্পের বাজারেও খরিদ্দার চটিয়ে জল ঘোলা করতে অর্থনীতির সূত্রে বারণ আছে এঁদেরও। তবে শেয়ার বাজারের 'ভাও'-এর মতই বৃহত্তর জনমানসের কোন সুস্থ রেজেস্ট্রও এখানে নাট্যের ক্ষেত্রে সংযোজনা করা হয়, হচ্ছেও। চাহিদা ও আমদানির টানাপোড়েনেই পেশাদার মঞ্চে শিল্পের স্বরূপ কমবেশী নির্ধারিত হতে বাধ্য। সোনার দাম আর কত? অনাথ, সন্তানহারা, অন্ধ, নারীর চোখের জল, যে জল কোনকালেই গঙ্গাজল নয়, পেশাদার রঙ্গমঞ্চে কত মূল্যে বিকোয় শুনলে আশ্চর্য হতে হয়। এই ধরণের পেশাদার রঙ্গমঞ্চে নাটকের বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতা নিয়ে কোন বৈধতার প্রশ্ন নেই। চললেই ভাল। সমালোচনার যে অবকাশ বাস্তুতঃ আছে, ওটা ব্যবসায়েরই একটা অঙ্গ। ওটা রাখতেই হয়। যে কোন কারবারী প্রতিষ্ঠানেই এই রেওয়াজ চালু আছে। নবনাট্য আন্দোলনের শিল্পীরা নাট্যের এই ধরণের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপোষণ করেন না বা করা উচিত নয়।

প্রশ্ন হবে, পরিপোষণ তো করেন না বুঝলাম, কিন্তু করেন কি? করেন, চেষ্টা করেন সার্থক জীবনধর্মী নাট্যশিল্পের প্রসারে, অপরিসীম বাধা বিপত্তি বুক দিয়ে ঠেলে ঠেলে।

নবনাট্যের শিল্পশিল্পীর দায়দায়িত্ব তাই আজ সব চাইতে বেশী। জীবনের দায়তায় শিল্পাশ্রয়ী হয়েছে বলেই পরিবেশনের ক্ষেত্রে এর সংযোজনও আঙ্গিক নিজস্ব পদ্ধতিতে বিশিষ্ট। অভিনয়কলা ও স্বরবিন্যাসে যাদুকর না হয়েও নাট্যবস্তুর প্রাণধর্মে ঠোঁট ও মুখের মাধ্যমে এখানে বুক দিয়ে কথা বলেই মানাবে ভাল। কেন না অভিনয়কলা ও স্বরবিন্যাসের চলতি সহজ শিক্ষাপাঠ রপ্ত করেও অভিনয় কলাকৌশলে নতুন আঙ্গিকের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে এই সৃষ্টিপ্রাণধর্মী প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে। আঙ্গিক আবরণ না হয়ে তখনই হবে আভরণ। দৃশ্যসজ্জা, আলো, অভিনয় আঙ্গিক সব কিছুরই সমন্বয় আনবে নাট্যবস্তুর প্রাণকেন্দ্রকে প্রবতারা করে। গয়না পরলেই গয়না মানাবে না।

যুগমানসে নবচেতনার এই উন্মেষ একদিন শিশিরকুমারের সার্থক নাট্য প্রযোজনায় প্রকৃষ্টভাবেই দেখা গিয়েছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের যুগে শিশিরকুমারের অবিসংবাদী নাট্যপ্রতিভা ঝড়ের মত বলসে উঠেছিল শাজাহান, আলমগীর, রঘুবীর, চন্দ্রগুপ্ত, ষোড়শী, প্রফুল্ল প্রভৃতি নাটকে।

সাধারণ মানুষ নাট্যাচার্যের সম্মান সব সময়েই দেবে কিন্তু সাহজাহান, রঘুবীর, আলমগীর এর দাবী হয় তো তারা সহ্য করবে না। শিশিরকুমারও মনে হয় এ সম্পর্কে অবহিত হয়েই 'প্রস্ন' 'দেশবন্ধু' 'জীবনরঙ্গ' প্রভৃতি গুটিকয়েক নাটক প্রযোজনা করেছিলেন। কিন্তু যুগমানসে তখন বোধ হয় নাটকের বিষয়বস্তুরও বিচার বিশ্লেষণ সুরু হয়ে গিয়েছে। সামাজিক সমস্যামূলক নাটকগুলোও সে রকম আর জমলো না।

ইতিমধ্যে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'—দুটি নাটকের সার্থক পরিবেশন হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য দুটি নাটকই রচনাশৈলী ও অভিনয় আঙ্গিকের দিক থেকে ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন না হয়েও সম্পূর্ণ নতুন। যুগসত্যের এক নতুনতরো রূপ প্রতিভাত হলো এই নাটক দুটির মধ্যে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করে। শিশিরকুমারও অকুণ্ঠচিত্তে এ কথা আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন তাঁরই শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে 'নবান্ন' অভিনয়ের কোন এক রজনীতে। আমার স্পষ্ট মনে আছে—বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর কাঁধে হাত রেখে শিশিরকুমার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি এ সব পেলেন কোথায়?—এ শিক্ষাই বা আপনার হলো কি করে? নিষ্ক্রান্ত হবার পরই পুনঃপ্রবেশের তাগিদ ছিল আমার মনে। তাই বেশী কথা বলার অবকাশ ছিল না। প্রতিনমস্কার জানিয়ে শুধু বলেছিলাম, আপনি আমাকে আপনি বলবেন না দয়া করে।…আর শিক্ষা ও পাওয়া পাওয়ি নিয়ে যে প্রশ্ন করলেন না, তার উত্তরে আমি শুধু একটা কথাই বলতে পারি—সবই রাস্তাঘাট থেকে, চলতে ফিরতে…। প্রশ্নটায় খানিকটা অসহায় বোধ করেছিলাম, আর সময়ও ছিল না হাতে। শিশিরকুমার আমাকে বল্লেন, আচ্ছা আচ্ছা, পরে কথা হবে। পরে অবিশ্যি এ নিয়ে শিশিরকুমারের সঙ্গে আমার আর কোন কথা হয় নি। কিন্তু শিশিরকুমারের সমুন্নত মানসের গোটা ছবিটা ফুটে উঠেছিল আমার চোখে সেইদিন, যে দিন আমি শুনলাম, তিনি তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' পরিবেশন করছেন নতুন উদ্যমে। শিল্প ও শিল্পী—আবার নতুন প্রতিভাত হলো আমার চোখের সামনে। কিন্তু যখন শুনলাম তিনি অভিনয় করবেন না 'দুঃখীর ইমান' তখনই শিশিরকুমার অন্তর্ধান করলেন আমার সামনে থেকে। আলমগীর, আলমগীর। প্রজাপুঞ্জের সঙ্গে বসে একসাথে অন্নপানের গৌরব হয় তো তাঁর বোধগম্য হয়েও ভাল লাগলো না। তারপর আর কি? তারপর মিলিয়ে গেলেন শিশিরকুমার-এর মত প্রতিভাও।

কিন্তু মিলিয়ে গিয়েও আজও রয়ে গেছেন তিনি অবিসংবাদীভাবে শিল্পীকে আচ্ছন্ন করে। দুটি ধারাই এখন সমান প্রবহমান। একটি শিশিরকুমারের, অপরটি নবনাট্যের। তবে নবজাতকের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতে আস্থা স্থাপন করবার হেতু আছে। স্বয়ং শিশিরকুমারেরও তাতে আশীর্বাদ রয়ে গেছে পিতৃহস্তের।

অনূদিত বাংলা নাটক

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ

অনুবাদ-সাহিত্যের উৎপত্তি হয় দুটি কারণে। ভিন্ন সাহিত্যের কাহিনী ও রসের দ্বারা নিজের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার ইচ্ছা অনেক লেখকেরই থাকে। প্রত্যেক দেশের সাহিত্য সেই দেশের জাতীয় ও সামাজিক প্রকৃতি, নৈসর্গিক পরিবেশ, বিশিষ্ট চিন্তা ও আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই সাহিত্যের বস্তু ও ভাবজগৎ একটু পরিচিত গতানুগতিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ না হ'য়ে পারে না। সেজন্য ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশের বৈচিত্র্যের জন্য লেখক ও পাঠক ভিন্ন দেশের সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। সেই সাহিত্যকে অনুবাদ করলে একটি অভিনব জগতের রূপ ও রস পাঠক-সমাজ আস্বাদ করতে পারেন। শুধু কেবল বস্তু ও ভাবের দিক দিয়ে নয়, আঙ্গিক ও রচনাশৈলীর দিক দিয়েও লেখকগণ নিজেদের সাহিত্যে নানা নূতনত্বের প্রবর্তন করতে পারেন। এ ধরণের অনুবাদ প্রত্যেক সাহিত্যেরই কাম্য এবং এই অনুবাদের মধ্য দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যের মত অনেক সমৃদ্ধ সাহিত্য আরো বহুগুণে সমৃদ্ধতর হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু অনুবাদের প্রেরণা যখন আসে লেখকের সৃষ্টিশক্তির দৈন্য এবং পাঠকের নিজের সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব থেকে তখন সেই অনুবাদ পরানুকরণের নামান্তর মাত্র। সেই অনুবাদ সাহিত্যকে গৌরবের আলোকে উজ্জ্বল না করে অক্ষয় হীনতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে।

এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যে অনুবাদের প্রাধান্য দেখা গিয়েছে তার অনিশ্চয়তা ও অবসাদের মুহূর্তে, সেজন্য এ-অনুবাদ আমাদের আশান্বিত করেছে যতখানি আশঙ্কিত করেছে তার চেয়ে বেশি। বাংলা নাটকের সূচনায় যে অনুবাদের প্রাধান্য দেখেছিলাম তার পরিণতিতে আবার সেই অনুবাদেরই প্রাধান্য দেখছি। অনুবাদের বশ্যতা থেকে মুক্তি লাভ ক'রে বাংলা নাটক তার স্বাধীন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পেয়েছিল, আবার সেই অনুবাদের বশ্যতা স্বীকার ক'রে সে কি তার স্বাধীন চলার পথ হারিয়ে ফেলবে? এই সমস্যা আজ আমাদের সামনে এসে দেখা দিয়েছে। সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করবার আগে অনূদিত নাটকগুলির ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক।

মৌলিক নাটকের উদ্ভবের পূর্বে সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদই প্রাধান্য পেয়েছিল। কারণ, এই অনূদিত সংস্কৃত নাটকের শিল্পরূপ ও রসই বাংলা নাটকের প্রথম যুগে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদগুলি যে আক্ষরিক অনুবাদ ছিল তা নয়। সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল ভাবানুবাদ। নাট্যকারগণ বাঙালী দর্শকের রুচির দিকে লক্ষ্য রেখেই নতুন নতুন চরিত্রের আমদানী করতেন এবং বাংলা সমাজের সংস্কার, রসবোধ ও বাগ্‌ধারা অবলম্বন ক'রে দৃশ্যবস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করতেন। তবে অধিকল অনুবাদের সবচেয়ে সার্থক রূপ আমরা বোধ হয় দেখেছি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনূদিত নাটকগুলির মধ্যে। মূল সংস্কৃত নাটকের অবিকৃত রস পরিবেষণ করতে তাঁর মত আর কেউই সক্ষম হন নি।

শেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদের মধ্য দিয়ে অনূদিত বাংলা নাটকের আর একটি ধারা প্রবর্তিত হ'ল। প্রাথমিক অনুবাদকদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষকেই প্রথম স্থান দিতে হয়। প্রথম যুগের অনুবাদকগণ শেক্সপীয়রের নাটকগুলি শুধু কেবল ভাষান্তরিত নয়, নামান্তরিত ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাবান্তরিত করে ফেলেছিলেন। এতে শেক্সপীয়রের নাটকের রস বজায় ছিল না এবং বাঙলা নাটক রূপে এদের রসও যে খুব চমৎকার হয়েছিল তাও মনে হয় না।

শেকসপীয়র যেমন করুণ ও গম্ভীর নাটকের আদর্শ স্বরূপ হয়েছিলেন তেমনি মলিয়েরও প্রহসন-রচয়িতাদের লক্ষ্য হ'য়ে উঠেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রহসনের যে ধারা প্রবাহিত হয়েছে তার উপর মলিয়েরের প্রভাব অপরিসীম। মলিয়েরের অনেকগুলি নাটক অনূদিত হয়েছিল এবং অনেক মৌলিক বাংলা নাটকের ঘটনা ও চরিত্র মলিয়েরের নাটকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' যথাক্রমে Tartuffe ও The Miser নামক নাটকের প্রধান চরিত্র দুটির প্রভাবে লিখিত। কলকাতা সাহিত্যে সুপরিচিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনগুলিও মলিয়েরের নাটকের হুবহু অনুবাদ আর না হয় ছায়া অবলম্বনে রচিত। 'হঠাৎ নবাব' ও 'যায়সে পড়ে পালা' যথাক্রমে The Cit Turned Gentleman ও Marriage Force নাটকের অনুবাদ। 'অলীক বাবু' ও 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো' প্রহসন দু'খানির উপর Romantic Ladies ও The Miser নাটকের প্রভাব সুস্পষ্ট। The Miser নাটকের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের আরো অনেক প্রসিদ্ধ প্রহসনের উপর পড়েছে, যথা, অমৃতলালের 'কৃপণের ধন', দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম' ইত্যাদি। দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের সঙ্গে Romantic Ladies-এর কোনো কোনো দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক নাটকরচয়িতা শ্রীপ্রমথ বিশীর নাটকও ঘটনা ও চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়ে মলিয়েরের নাটকের সঙ্গে গভীর সাদৃশ্যযুক্ত।

আধুনিক কালের নবীন নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই বিদেশী নাটকের অনুবাদের দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন। শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য কয়েকখানি প্রসিদ্ধ নাটকের সুঅনুবাদ ক'রে খ্যাতি লাভ করেছেন। গোর্কির Lower Depths এবং গলসওয়ার্দির Strife তিনি যথাক্রমে 'নীচের মহল' ও 'দ্বন্দ্ব' নাম দিয়ে অনুবাদ করেছেন। শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ফরাসী নাট্যকার সার্ত্রের 'Men without Shadows' নাটকখানি 'ছায়াবিহীন' নাম দিয়ে অনুবাদ করেছেন। মূল নাটকের ভয়ানক ও বীভৎস রস অনুবাদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। অনুবাদে নাট্যকার শ্রীঅজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁর অনূদিত নাটকগুলির মধ্যে 'থানা থেকে আসছি' সবচেয়ে জনপ্রিয়।

বর্তমানে একাঙ্ক নাটকের যে প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে তার পিছনে মৌলিক সৃষ্টির প্রেরণা অপেক্ষা অনুবাদের তাগিদই যেন বেশি দেখা যাচ্ছে। শক্তিশালী নাট্যকার যখন কতকগুলি মৌলিক নাটক রচনার সঙ্গে কিছু কিছু অনুবাদও করেন তখন সেগুলির মধ্যে তাঁদের বৈচিত্র্যানুসন্ধিৎসা ও অভিনব সৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু আত্মবিশ্বাসহীন নাট্যকার যখন শুধুমাত্র অনুবাদের উপরই একান্ত ভাবে নির্ভর করেন তখন তার মধ্যে লেখকের অক্ষম পরবশতার হীন রূপই পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। শ্রীঅনঘ বৈরাগী ও শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী কয়েকখানি বিদেশী একাঙ্ক নাটক অনুবাদ করেছেন। যে সব একাঙ্ক নাটক বহু নাট্যকার-দের দ্বারা অনূদিত হ'য়ে রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তাদের মধ্যে কয়েকটির নাম করা যায়' যথা— The Rising Moon, Hewers of Coal, The Monkey's Paw, A Night at an Inn ইত্যাদি।

পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক যে অনূদিত নাটকগুলির কথা উপরে উল্লেখ করা হ'ল সেগুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাট্যকারগণ বিদেশী নাম ও পরিবেশ পরিবর্তন ক'রে দেশী নাম ও পরিবেশের অবতারণা করেছেন। তাঁরা হয়তো ভাবেন যে দেশী নাম ও পরিবেশ বাঙালী দর্শকদের কাছে অধিকতর রুচিকর ও প্রীতিপ্রদ হবে। কিন্তু এ-ধরনের অনুবাদে অনুবাদের মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হ'য়ে যায়, কারণ অনুবাদ মানেই ভাষান্তর ; ভাবান্তর অথবা রূপান্তর নয়। বিদেশী নাম ও পরিবেশ বজায় রাখলে আমাদের কল্পনার যে উদার স্ফূর্তি ও বিচিত্র বৃত্তজগতের অভিজ্ঞতাজনিত যে আনন্দ লাভ করা যায় তা দেশী নাম ও পরিবেশের মধ্যে পাওয়া যায় না। বরং দেশী নামধারী কোনো চরিত্রের বিজাতীয় আচরণ ও আমাদের পরিচিত পরিবেশের মধ্যে কোনো অপরিচিত ঘটনার সমাবেশ হলে একটা উৎকট অসঙ্গতিই আমাদের চোখে ধরা পড়বে। কোনো কোনো নাট্যকার বিদেশী নাটকের ছায়া অবলম্বনে নাটক রচনা করেন। এঁদের অনুবাদ করার সাহস নেই, আবার সৃষ্টি করবারও ক্ষমতা নেই। এই ধরনের নাট্যরচনাকে কখনো প্রশংসা করতে পারবো না। আবার কোনো কোনো অক্ষম ও ভীরু নাট্যকার বিদেশী নাটকের ভাব নিয়ে নিজের বলে চালাতে চান। বলা বাহুল্য এটা সাহিত্যিক পরস্বাপহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোন্ শ্রেণীর অনুবাদ দর্শকচিত্তে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তা কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাট্যাভিনয়ের তুলনা করলেই বোঝা যাবে। ইবসেনের কয়েকখানি নাটকের অনুবাদ সাম্প্রতিককালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বহুরূপী-নাট্যসম্প্রদায় ইবসেনের একাধিক নাটক অনুবাদ করে অভিনয় করেছেন। বর্তমানে তাঁরা A Doll's House-এর 'পুতুল খেলা' নাম দিয়ে অনুবাদ ক'রে অভিনয় করছেন। তাঁদের অভিনয় প্রশংসনীয় কিন্তু অভিনয় দেখবার সময় কেবলি মনে প্রশ্ন জাগে এ-চরিত্রগুলি আমাদের সমাজের কখনকার কোন্ স্তর থেকে গৃহীত হয়েছে? এঁদের নাম বাঙালীর, কিন্তু প্রকৃতি ও আচরণ তো ঠিক বাঙালীর নয়। এদের নাম ও পোষাক-পরিচ্ছদ নরওয়ের পরিবেশে আমাদের কল্পনাকে ধাবিত হতে দিল না, আবার এদের বিদেশী মানসসংস্কার বাঙালী দর্শকদের সঙ্গে আত্মীয়তা-সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথেও বাধা দিল। এই নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের আর একটি সুখ্যাত নাট্যসংস্থার ইবসনের Ghosts নাটকের অভিনয়ের তুলনা করা যেতে পারে। শৌভনিক সম্প্রদায়ের অভিনয়ের কথাই উল্লেখ করছি। শৌভনিক সম্প্রদায় Ghosts নাটকের ভাষাই শুধু পরিবর্তিত করেছেন, আর কোনো প্রকার পরিবর্তন তাঁরা করেন নি। সেজন্য চরিত্রগুলির নাম ও পোষাক-পরিচ্ছদ মূল নাটকের জগৎকেই আমাদের কাছে অত্যন্ত বাস্তবভাবে উদ্‌ঘাটন করে। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সমাজে যে নূতন জীবনজিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল তারই যথাযথরূপ ও জীবনরস আমরা এই অভিনয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে উপভোগ করি। সময় ও পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের কোনো সংশয় থাকে না। অথচ আমাদের কল্পনাশক্তিকে সক্রিয় রেখে নাটকের চরিত্রগুলির সঙ্গে একটি রসসম্পর্কও স্থাপন করতে পারি। লিটল থিয়েটারের দুটি স্মরণীয় নাট্যাভিনয়ের কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের 'ওথেলো' ও 'নীচের মহল' দুটি নাটকের অভিনয়ই অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ওথেলো নাটকের অভিনয়ে শুধু কেবল ভাষারই পরিবর্তন দেখা গেল, কিন্তু আর সবদিকে মূল নাটকের সঙ্গে কোনো প্রভেদই দেখা গেল না। সেজন্য এই অভিনয়ে শেকসপীয়রের রস আস্বাদ ক'রে দর্শকচিত্ত বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু নীচের মহলে চরিত্রগুলির নাম পরিচ্ছদ ও পরিবেশ সব কিছুরই জাতীয়করণ হয়েছে। কলকাতার বস্তিতে চরিত্রগুলিকে সমাবেশিত করার খুব বড় রকমের অসঙ্গতি চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু তাদের স্বভাব আচরণ ও কথা বলবার ভঙ্গি খুঁটিয়ে বিচার করলে কোথাও কোথাও একটু বিজাতীয় গন্ধ যে না পাওয়া যায় তা নয়। আমাদের সব চেয়ে বড় ক্ষতি গোর্কির জগৎকে আমরা পেলাম না। গোর্কিকে রুশ জেনেই আমরা ভালোবাসি এবং তাঁর চরিত্রগুলিকেও আমরা রুশ দেখেই ভালোবাসতে চাই। গোর্কি ও তাঁর চরিত্রগুলিকে যেই আমরা বাঙালীর ছদ্মবেশে সাজাব সেই মুহূর্তেই তাঁদের সম্বন্ধে সব আগ্রহ ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলব। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রাক্তিক শাখার ২০শে জুন নাটকের অভিনয়ও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই নাটকের চরিত্রগুলির নাম পোষাক ও পরিবেশ অপরিবর্তিত রয়েছে বলেই রোজেনবার্গ দম্পতীর করুণ ঘটনাশ্রয়ী রসধারা এত সহজ ভাবে আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করে।

অনুবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, অনুবাদ মৌলিক সৃষ্টির অনুবর্তন করবে, কখনো অগ্রগমন করবে না। নাট্যকারগণ মৌলিক নাটকরচনার দায়িত্ব পালন করেই তবে অনুবাদের দিকে নজর দিতে পারেন। আমাদের যদি দেবার কিছু না থাকে, তবে অন্য ভাষা থেকে কিছু নিতে গেলেই আমাদের লজ্জাকর দীনতা প্রকটিত হয়ে পড়বে। নবীন নাট্যকারগণ অনেক সময় মৌলিক নাট্যসৃষ্টি সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েন, কারণ, নাট্যসংস্থাগুলির কাছ থেকে তাঁরা যথোপযুক্ত উৎসাহ পান না। বাংলা দেশের শক্তিশালী নাট্যসংস্থাগুলি বর্তমানে অনূদিত নাটকে অভিনয়ের দিকে যে অত্যধিক প্রবণতা দেখাচ্ছেন তা বাংলা নাটকের সমৃদ্ধিশালী আত্মবিকাশের অনুকূল নয়। দেশের নাটক কিছু দুর্বল হ'লেও সর্বতোভাবে তাকে উৎসাহ দান করা উচিত। অনূদিত নাটকের অভিনয় মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যের জন্যই চলতে পারে এবং অনূদিত নাটকের ভাষাই শুধু বাংলা হবে আর সবদিক দিয়ে অনূদিত নাটক মূল নাটকেরই অনুরূপ হবে এটাই আমরা কামনা করি।

ঊনবিংশ শতকের বঙ্গরঙ্গালয়

শচীন সেনগুপ্ত

পল্লি-ভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুরোধ তাঁদের কাগজে বাংলার রঙ্গালয় সম্বন্ধে কিছু লিখতেই হবে। ও সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য, তা আমার বাংলা নাটক ও নাট্যশালা বইখানায় লিখে ফেলেছি। আবার তারই পুনরাবৃত্তি করতে হবে ভেবে তাঁদের অনুরোধ এড়াতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু তাও পারলাম না। এককালে নাটক লিখেছিলাম বলে সারাজীবন যে নাটক সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে হবে আগে তা জানতাম যদি, তাহ'লে হয়ত নাটক লিখতে কলম হাতে তুলে নিতাম না। যে-সাংবাদিক ছিলাম, সেই সাংবাদিকই থেকে যেতাম।

সত্যি করে বলছি, যুগ-প্রবর্তনার স্পর্ধা নিয়ে আমি নাট্যক্ষেত্রে পা বাড়াইনি। যেমন আকস্মিক ভাবে সাংবাদিক হয়েছিলাম, তেমনই আকস্মিক ভাবে নাটুকে হয়ে পড়লাম। আবার তেমনই অপ্রত্যাশিত ভাবে ব্যক্তিগত স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর সদস্য মনোনীত হলাম। ওখানে আমি কারুর প্রতিনিধি নই। কিন্তু সাহিত্য আকাদেমীতে আমাদের আকাদেমীর প্রতিনিধি। সেখানে আমার স্বতন্ত্র স্বীকৃতি সেই সাহিত্যিক হিসেবে।

ত্রিশবছর কাল বাংলার বিভিন্ন রঙ্গালয়ের জন্য বত্রিশখানা নাটক লিখেছি বলে, এবং বিভিন্ন রঙ্গালয়ের উত্থান-পতনের সঙ্গে, তাদের মালিকদের আশা-হতাশার সঙ্গে, অভিনেতৃদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি বলে বাংলা রঙ্গালয়ের ওপর আমার একটা মায়া দাঁড়িয়ে গেছে; প্রত্যক্ষ সংযোগ যদিও আজ কিছুমাত্র নেই।

ওই মায়ার মধ্যে আছি বলেই আমি মনে করি বাংলার রঙ্গালয়ের এবং বাংলা নাটকের প্রতি সুবিচার করা হয়না। আগেকার বিদগ্ধরা তা করতেন। থিয়েটার বলতে আমরা যা বুঝি তা ইংরেজরা এদেশে আমদানি করেন পলাশী যুদ্ধের দুবছর আগে। তার প্রথমটির নাম ছিল প্লে-হাউস। তারপর ক্রমে-ক্রমে আসে ক্যালকাটা থিয়েটার (১৭৭৬), মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটার (১৭৮৯), লেবেদেফের বেঙ্গলী থিয়েটার (১৭৯৫), চৌরঙ্গী থিয়েটার (১৮১৩), সাঁতুচি থিয়েটার (১৮০৯) আসে, আবার ভেঙেও যায়। ইংরেজের থিয়েটারগুলির সঙ্গে বাঙালীর সম্বন্ধ মধুরই ছিল। বাঙালী অভিজাতরা অভিনয় দেখতেন, বাঙ্গালী শিল্পীরা অভিনয় শিখতেন, কোন-কোন বাঙ্গালী ওদের সঙ্গে অভিনয় করে ওদের শিল্পীদের মতোই খ্যাতি অর্জন করেছেন।

ওদের দ্বিতীয় গুরুত্ব এই যে, ওদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদগ্ধরা, যেমন ডক্টর উইলসন, ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন, মিঃ পার্কার প্রভৃতি শিক্ষাসোপানের সঙ্গেও সংযুক্ত ছিলেন বলে তখনকার স্কুলের বাঙালী ছাত্রদেরকে তাঁরা যেমন ইংরেজী নাট্য-সাহিত্য পড়াতেন, তেমন অভিনয় রীতিও শেখাতেন। ডেভিড হেয়ার একাডেমী, মেট্রোপলিটন একাডেমী, ওরিয়েন্টাল একাডেমী প্রভৃতির ছাত্ররা তখনকার দিনে শেকস্‌পীয়ারের অনেক নাটক ইংরেজীতে অভিনয় করেছেন।

কিন্তু ইংরেজদের এই প্রয়াস থেকে রুশী লেবেদেফের প্রয়াস ছিল পৃথক। লেবেদেফের মনে ইংরেজ বিদগ্ধদের মতো সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের (cultural conquest) বাসনা ছিলনা; সাংস্কৃতিক জাগরণের সহায়তা করবার আকাঙ্খাই ছিল। তাই তিনি ইংরেজী, ফরাসী, অথবা রুশীতে নয়, বাংলা ভাষাতেই মলেয়ারের ফরাসী নাটক পরিবেশন করেছিলেন, তাতে বিদ্যাসুন্দরের গান দিয়েছিলেন, অভিনয় করিয়েছিলেন বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেরকে দিয়ে, অর্কেষ্ট্রায় বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে দেশী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। এক কথায় জাতির মানুষের মর্ম-বীণে যে-সুর ধ্বনিত হয়, নাটকে তাই ধ্বনিত করতে পারলেই তবে তবে তা জাতীয় নাটক, এই বোধ সেই ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে

বাঙালীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন লেবেদেফ। তখনকার ইংরেজানুরাগী বাঙালীরা তা বোঝেননি; বুঝলেও কাজে ফলিয়ে তুলতে চাননি।

লেবেদেফের প্রয়াসের সময় দেশী ভাষায় কখনো যে নাট্যাভিনয় হোতনা তা নয়। শহরের ও মফঃস্বলের নানা স্থানেই, নানা ফর্মেই তা হোতো। কোন-কোন নাটক সংস্কৃত ভাষায় রচিত হোত, কোন-কোন নাটক সংস্কৃতে-প্রাকৃতে-বাংলায় মিশিয়ে রূপ দেওয়া হোতো, কোন-কোন নাটক অবিমিশ্র বাংলা গানের ও নাচের মাধ্যমে স্বল্প-সংলাপের সাহায্যে অভিনীত হোতো, কোন-কোন নাটক অলঙ্কারযুক্ত দীর্ঘ-সংলাপ, স্বল্প-ক্লাসিক গান সহ একক অভিনেতা কর্তৃক পরিবেশিত হোতো। সবই ছিল নাটক। প্রকারভেদে কোনটিকে নাট্য বলা হোতো, কোনটিকে যাত্রা, কোনটিকে কীর্তন, কোনটিকে কথকতা। মঞ্চ বা আসর প্রকারভেদে পৃথক হোতো। মূল কথা ছিল রস, রূপ নয়। রস-সৃষ্টির জন্য এবং সমবেত শ্রোতৃদেহকে রস-পিপাসী করবার জন্য যখন যে রূপের প্রয়োজন মনে করা হোতো, তখন সেই রূপের মাধ্যমেই রস পরিবেশন করা হোতো। বাংলা নাটকের বিচার করবার সময় এ-কথাগুলি মনে রাখা দরকার। কেননা রূপ আর অরূপ সম্বন্ধে বাংলার, তথা ভারতের, চিন্তা আর ও-সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যের চিন্তা এক নয়।

পাশ্চাত্ত্য জীবন-সাধনা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সংঘাতে জয়-পরাজয়ের মূল্যায়ণে। বলাৎকারের দ্বারা দেশজয় করতে হবে; মানুষকে দাস করতে হবে, পৃথিবীর যেখানে ভোগের যা-কিছু উপাদান আছে সবাইকে সব থেকে বঞ্চিত করে তা কেড়ে আনতে হবে, সম্রাট হতে হবে, সীজার হতে হবে, জুয়েরার হতে হবে, ডুসে হতে হবে, ডিক্টেটর হতে হবে। গ্রীক, রোমান, এংলো-স্যাক্সন, সব সংস্কৃতির মূল কথাই ওই। নাটকের ও সঙ্গীতের বেলাতেও তাই। কড়া নির্দেশ, এই করতে হবে, তাই না করলে চলবেনা। ওই কড়া নির্দেশের ফলে কিছুই যে হয়নি তা বলছিনা। অবশ্যই হয়েছে, অদ্ভুত-পূর্ব্ব অনেক কিছু হয়েছে যা চিরন্তন গৌরবের বিষয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু কাদের গৌরবের বিষয় হয়ে রয়েছে? কেবলমাত্র তাদেরই যারা জ্ঞানী, গুণী এবং ধনী। সমগ্র মানব জাতির তুলনায় তারা কজন? খুবই যে স্বল্প, তাতে সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষ স্বল্প সুখকে, আর স্বল্পের সুখকে, কখনো বড় করে দেখেনি। তার বর্ণাশ্রম (পরে তা জাতিভেদে পরিণত হয়ে যে ক্ষতিই করে থাকুক) যেমন মানুষকে গুণ ও কর্ম অনুসারে চার বর্ণে ভাগ করেছে, তেমন তাদের ওপর পৃথক-পৃথক কর্তব্য আরোপ করে তাদের সকলকে সামাজিক স্বীকৃতিও দিয়েছে। আবার বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে প্রতি নরের মাঝে একটি করে নারায়ণ আছে এ-কথা মনে রেখে সে তেত্রিশকোটী দেবতাও কল্পনায় এনেছে। তার চেয়েও বড় কথা, কল্পনাকে সে প্রত্যক্ষও করেছে মানুষের মাঝে। বারবার দেখা গেছে জাতিভেদের বিকারোদ্ভূত তথাকথিত নিম্নস্তর থেকেও মাঝে মাঝে এক একটি নরদেবতার আবির্ভাব ঘটেছে, আর সমাজের সকলে তাঁদের পদতলে পতিত হয়েছে। তখন কিন্তু তারা জাতি বিচার করেনি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু দেশের শ্রেষ্ঠতম বিদগ্ধরাও তাঁর কথামৃত পান করে জীবন সার্থক করে তুলতেন। তিনি বর্ণজ্ঞান সম্পন্ন কিনা, সে বিচার কেউ করতেন না।

আবার এমনও দেখা গেছে যে, সিদ্ধিলাভ করেই সিদ্ধপুরুষরা কণ্ঠে জীবনের সঙ্গীত নিয়ে সর্বাগ্রে ছুটে গেছেন সংসারী মানুষেরই কাছে। বুদ্ধ গিয়েছিলেন কণ্ঠে প্রাকৃত ভাষা (জনগণের কথ্য ভাষা) নিয়ে। চৈতন্য গিয়েছিলেন শুধু নাম নিয়ে। দোঁহা নিয়ে, ভজন নিয়ে, ললিতকান্ত পদাবলী নিয়ে গিয়েছিলেন ভারতের দিক থেকে দিগন্তে অগণ্য অসংখ্য সত্যদর্শি সিদ্ধ পুরুষ।

ওঁদের অনুভূতি, ওঁদের উক্তি, ওঁদের দোঁহা ভজন, পদাবলী ভারতের কাব্য সাহিত্য-সৃষ্টি করেছে, এবং তাইই বাহন হয়েছে বেদের উপনিষদের, পুরাণের, রামায়ণের, মহাভারতের বাণীকে জনগণের কাছে, তাদেরই বোধগম্য করে বহন করে নিতে। জন-সংযোগ ছাড়া যেমন অধ্যাত্মরস সার্থকতা খুঁজে পায়নি, বেদ পুরাণ কাব্য সাহিত্য শিল্পও তা পায়নি।

একটি আন্তর্জাতিক নাট্য সম্মেলনে জনৈক ফরাসী নাট্য পরিচালক বলেছিলেন, ভারতবর্ষ জানে পপুলার থিয়েটার কি, ইউরোপ তা জানে না। ইউরোপে প্রিমিটিভ আর্টের পরিচয় কিছু কিছু এখনো আছে, লোক আর্টের পরিচয় তার চেয়ে বেশি পাওয়া যায়, কিন্তু পপুলার আর্ট, সার্বজনীন আর্ট, যথার্থ ন্যাশনাল আর্ট, আজও রূপ পরিগ্রহ করেনি ; শহরে আর্ট, বিদগ্ধ সমাজের আর্ট নিয়েই সে পরবে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়—যার সঙ্গে শতকরা আশীজনের কোন প্রকার যোগ নেই।

তিনি এ-কথা বলেছিলেন আমাদের যাত্রা, কীর্তন, কথকতা, তামাসা, নৌটঙ্কি, তাওয়াই এবং অপরাপর নাটকের কর্মের কথা শুনে এবং কিছু কিছু দেখেও।

আমাদের অভিনয়-শাস্ত্র আর সঙ্গীত-শাস্ত্র যে বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি আদৌ করে নি, তা নয়, করেছে, খুবই করেছে ; কিন্তু স্বাধীনতাও দিয়েছে প্রচুর। রূপকে-উপরূপকে কুড়ি রকম নাটককে তা স্বীকার করেছে গুণ ও রূপ অনুসারে। সঙ্গীতে ও গায়ককে যেমন শক্ত বাঁধনে বাঁধা হয়েছে, তেমন স্বাধীনতাও দেওয়া হয়েছে। সে ত হবেই। অসংখ্য বন্ধনের মাঝেও মুক্তির আনন্দই যে অক্ষয় আনন্দ, অপরাজেয় আনন্দ, এই জাতি যে তাই উপলব্ধি করেছে।

ইংরেজ আমাদের দেশে জোর করে অনেক কিছু করেছে, কিন্তু জোর করে আমাদের ঘাড়ে থিয়েটার চাপায়নি ; বরং ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হতে না হতেই (১৮৭২) তাকে পঙ্গু করে রাখবার জন্য আর্মস গ্যাক্ট, প্রেস গ্যাক্ট জারি করবারও আগে ড্রামাটিক পারফরমেন্সেস গ্যাক্ট (১৮৭৬) চালু করে। ইংরেজ তার থিয়েটার এদেশে এনেছিল তার সম্প্রদায়ের লোকেদেরকে আনন্দ দেবার জন্য, আমাদের দেশে ন্যাশনাল থিয়েটার গড়ে তুলবার জন্য নয়।

আমাদের নাট্যরসিকরা নিছক নকলনবিশী করবার জন্য ইংরেজের থিয়েটারের অন্ধ-অনুকরণ কখনো করেননি, তার গুণ দেখেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাঙ্গালী সর্বপ্রথমে যে-দুটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে, তার একটি জোড়াসাঁকোর বাগানে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার (১৮৩১), আর দ্বিতীয়টি শ্যামবাজারে নবীন বসুর থিয়েটার (১৮৩১-৩২)। হিন্দু থিয়েটার ইংরেজী ভাষায় অভিনয় শুরু করেন সংস্কৃত 'উত্তররাম চরিত' তর্জমা করে। ওটি হোলো ইংরেজী-নবীশ বাঙ্গালী অভিজাতদের থিয়েটার। আর নবীন বসুর থিয়েটার হোলো খাঁটি বাঙ্গালীর 'পপুলার থিয়েটার' ; নাটক বিদ্যাসুন্দর। লেবেদেফের বেঙ্গলী থিয়েটারের পরে নবীন বসুর থিয়েটারেই স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় করবার জন্য সর্বপ্রথমে অভিনেত্রী নিয়োগ করা হয়। নবীন বসুর থিয়েটার বিদ্যাসুন্দর অভিনয় করেও ট্রাডিশন তৈরি করতে পারে না। কিন্তু ইংরেজীতে ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটক পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী অভিনীত হতে থাকে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। ওর ফলে সংস্কৃত থেকে রূপান্তরিত ইংরেজী নাট্যরূপে নৃত্য নাট্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পরে যখন সংস্কৃত নাটক বাংলায় রূপান্তরিত হতে লাগল, তখন আর নৃত্য নাট্যাভিনয়ের অভিজ্ঞ অঙ্গ হয়ে রইল না। তারও পরে যখন নৃত্যকে বাংলা নাটকে আনা হোলো, তখন তা এলো অনেকটা 'অধিকন্তু ন দোষায়' প্রক্ষিপ্ত বা interlude হিসেবে। তাই আজ আমরা বুঝতে পারছি না মূল শকুন্তলা যখন প্রথম অভিনীত হয়েছিল, তখন তা কি ভাবে অভিনীত হয়েছিল। এখন শকুন্তলা সংস্কৃতেই হোক্ কি বাংলাতেই হোক্, ইংরেজী রীতিতেই অভিনীত হয়। আমাদের মনে তা নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু বিদেশীরা নানা প্রশ্ন করে যার সদুত্তর আমরা দিতে পারিনা। অভিনয়ে মুদ্রার অর্থ এবং নৃত্যের তাৎপর্য, আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এমনকি কীর্তন থেকেও তা লোপ পেতে বসেছে। সব কিছুরই অভাব আমরা ভাষা দিয়ে পূর্ণ করতে চাই। তাই অনেক সময় নাটকের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তা কৃত্রিম বলে মনে হয়। নাটককে যে দৃশ্যকাব্য বলা হোতো, তার মানে এ-নয় যে, অঙ্কিত দৃশ্যপট ওর পক্ষে অপরিহার্য বলে বিবেচিত হোতো, বলা হোতো এই কারণে যে, ওর অঙ্গাভিনয়ে আর নৃত্যাভিনয়ে ওর পুরো রূপ প্রকট হোতো, আর ওর পুরো রস গ্রহণ করা সম্ভব হোতো।

ইংরেজী অভিনয় রীতিতে যে অঙ্গাভিনয় আছে, আমরা যখন তার অনুকরণ করতে যাই, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা physical feat অথবা gymnastic হয়ে দাঁড়ায় আমাদের দেহের, আমাদের ভাষার, আমাদের বাচনের সঙ্গে তার

ছন্দের মিল থাকেনা বলে। সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিহীন, স্বভাব-বিরোধী, কোন রীতিকে নিজস্ব করে নেওয়া বড় শক্ত কাজ। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছাড়া কেউ তা পারেনা। তবুও আমাদের দেশের অনেকেই তা পেরেছিলেন। প্রতিবাদের ভয় না রেখে এ-কথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে, বিদেশী রীতিকে আমরা যতটুকুই নিজস্ব করে নিতে পেরেছি, আমাদের রীতিকে বিদেশীরা ততটুকুও নিজস্ব করে নিতে পারেননি। বিদেশী নাটকের ও অভিনয়ের সঙ্গে আমাদের নাটকের ও অভিনয়ের যাঁরা তুলনা করে আমাদের ওই দুই আর্টকে নিকৃষ্টতর প্রমাণিত করতে চান, তাঁরা সব দিক ভেবে দেখেন না। কিন্তু তাঁদেরকেও স্বীকার করতে হবে যে, বিদেশী রীতিকে আত্মসাৎ করতে নাটক যতটা সমর্থ হয়েছে, সঙ্গীত ততটা সমর্থ হয়নি ; নৃত্য ত নয়ই। উপন্যাস কতটা সমর্থ হয়েছে সে আলোচনা পরে করব।

সে যাই হোক, ঊনবিংশ শতকের মাঝা-মাঝি প্রায় পঁচিশ বছর কাল ইংরেজী নবিশ বাঙালীরা ইংরেজী ভাষায় ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটক অভিনয় করে বুঝতে পারলেন যে, ওতে হবেনা ; নাটক বাংলায় লিখতে হবে, এবং বাংলাতেই অভিনয় করতে হবে। কিন্তু দুই-ই করতে হবে ইংরেজী রীতিতে। এই চিন্তার মাঝে সঙ্গতি ছিল। তা থাকলেও তা বাংলা নাটকের জন্ম দিল।

প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক রচিত হোলো ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে। নাটকের নাম 'কীর্তিবিলাস', রচয়িতা গোপেন্দ্র গুপ্ত। নাটকের গল্পটি থেকে কিন্তু সন্দেহের উদ্রেক হয় সেটিও যথার্থ মৌলিক কিনা।

ওর আগে শকুন্তলা বাংলায় রূপান্তরিত করেন রামতারক ভট্টাচার্য ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে। আরো কিছু-কিছু সংস্কৃত নাটক ওই সময়ে বাংলায় রূপান্তরিত হয়।

বাংলার একটি বৃহত্তম জাতীয় সমস্যা নিয়ে রচিত প্রথম বাংলা নাটক যা অভিনীত হয়, তা হচ্ছে রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীনকুল সর্বস্ব' (১৮৫৬)। জাতীয় নাটকের পক্ষে অপরিহার্য যা, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তা এই নাটক অবশ্যই পালন করেছে, যদিচ তা সমাজের একটি মাত্র শ্রেণীরই সমস্যার প্রতিফলন। নাটকখানি অভিনীত হয় নতুন বাজারের চড়কডাঙ্গা পল্লীতে জয়রাম বসাকের বাড়ীতে। এই নাটকের সাফল্য নব-যুগের সৃষ্টি করে। সে নব-যুগের অর্থ, ইংরেজী নাটক অভিনয়ের পরিবর্তে ইংরেজী-রীতিতে মৌলিক বাংলা নাটক রচনার এবং সংস্কৃত থেকে বাংলায় নাটক রূপান্তরিত করবার, আর অভিনয় করবারও ঝোঁক।

বিত্ত ধনীরা প্রতিযোগিতা করে বাংলা নাটক অভিনয়ের ভার নিতে উঠলেন। দাতুবাবুর বাড়ীতে নন্দকুমার রায় রূপায়িত 'শকুন্তলা' অভিনীত হোলো ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠবার সময়, কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে বিদ্যোৎসাহিনী করলেন রামনারায়ণ রূপায়িত 'বেনী সংহার'। ওই অভিনয়ে নাকি লক্ষাধিক টাকা মূল্যের পোষাক ব্যবহার করা হয়েছিল। পাইকপাড়ার রাজারা বেলগেছিয়া থিয়েটার স্থাপন করেন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে সেই মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে একটি থিয়েটার গড়ে ওঠে, শোভাবাজার দেবীকৃষ্ণ সেনের বাড়ীতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রাইভেট থিয়েটার অভিনয় করে। সিঁদুরিয়া পটিতে গোপাললাল মল্লিকের বাড়ীতে ব্রজানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রযোজনায় উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত 'বিধবা বিবাহ' ১৮৫১ সালে অভিনীত হয়। বহুবাজার নাট্যসমাজ গড়ে ওঠে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে। ওই বছরেই ঠনঠনিয়া নাট্যালয়, আশুলি লেনে, অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করেন, পাবলিক থিয়েটারের মতো টিকিট বিক্রী করে, বাগবাজার এমেচিয়ার ড্রামাটিক এসোসিয়েশন ন্যাশনাল থিয়েটার নাম নিয়ে ১৮৭১ সালে শ্যামবাজার রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে 'লীলাবতী' অভিনয় করেন। তার আগে তাঁরা ১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' অভিনয় করেন। এই দলেই গিরিশ, অর্দ্ধেন্দু, নতিসুর, বেলবাবু, নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্র বসু প্রমুখ দিকপালরা অভিনয় করলেন। এই দলই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রথম পাবলিক থিয়েটার ঘোষণা করেন, এবং জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে (বড়িওলা

বাড়ী বলে পরিচিত) ৭ই ডিসেম্বর তারিখে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে ওর উদ্বোধন করেন। গিরিশ ওতে থাকেন না, কিন্তু অমৃতলাল ও আর সকলেই ছিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালীর নাট্যান্দোলনে অংশ নিতে যে-সব খ্যাতিমান ও কীর্তিমান বঙ্গসৌরব কৃতীপুরুষ এগিয়ে আসেন, অভিনয় করেন ও নাটক রচনা করেন, তাঁদের নাম নাট্যানুরাগীদের স্মরণ রাখা উচিত। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন, তাঁরা নাটকও লেখেন, অভিনয়ও করেন, পাইকপাড়া ও শোভাবাজারের রাজারা ; কালীপ্রসন্ন সিংহ নাটকও লেখেন অভিনয়ও করেন ; ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন ইংরেজী ও বাংলা নাটক দুই-ই অভিনয় করেন ; রামনারায়ণ প্রায় সকল প্রখ্যাত দলের জন্যই নাটক লেখেন ; মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ নাটকও লেখেন পৃষ্ঠপোষকতাও করেন ; দীনবন্ধু মিত্র আর মাইকেল মধুসূদন নাটকও লেখেন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, অক্ষয়চন্দ্র সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন শুধু নরেন্দ্র ছিলেন তখন একবার অভিনয় করেন, পরে করেন পৃষ্ঠপোষকতা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও পরবর্তিকালে গিরিশকে নাট্যশালার সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে আদেশই করেন।

এই সব সমাজনায়ক ও চিন্তানায়করা কি একটা অসার বস্তুকে নিয়ে উন্মত্ততা করেছিলেন? নিশ্চিতই নয়। তাঁরা ওর প্রয়োজন বুঝেছিলেন, ওর অবদানের রসের স্বাদ পেয়েছিলেন। তাইত ওদের সৃষ্টিগুলি দেখবার জন্য সাহেব-সুবোদেরকে, বিদগ্ধদেরকে, এবং ধনবানদেরকেও ডেকে আনতেন। পনেরো বছরে ওই প্রতিষ্ঠানগুলি যে-সব নাটক পরিবেশন করেছে, তার মাঝে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদগুলি বাদ দিলেও দেখা যাবে কেবল বাংলা নাটকগুলি কেমন সমাজকে প্রতিফলিত করেছে ; ভাষায়, ভাবে ও আদর্শে এবং নব নব রূপে (কর্মে) বিস্ময়কর হয়ে রয়েছে। কয়েকখানার নামোল্লেখ করি : কুলীনকুল সর্ব্বস্ব, বিধবা বিবাহ, নবনাটক (বহুবিবাহ বিরোধী) সধবার একাদশী, নীলদর্পণ, লীলাবতী, শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, সাবিত্রী ও সত্যবান, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট, চক্ষুদান, বুঝলে কিনা, কিছু-কিছু বুঝি। তাছাড়া সংস্কৃত থেকে রূপান্তরিত শকুন্তলা, রত্নাবলী।

ওই তালিকা থেকে দেখা যায় নাটক রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ করেছে, নানা প্রকাশ ভঙ্গীর আশ্রয় নিয়েছে, সমাজ চেতনা জাগিয়েছে, সামাজিক কুপ্রথাকে আঘাত হেনেছে, তা থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, হাস্যকর প্রথা নিয়ে হাসাহাসি করেছে। জোড়াসাঁকো থিয়েটার পুরস্কারও ঘোষণা করেছে যে, বহু বিবাহ, হিন্দুমহিলাগণের দুরবস্থা, পল্লীগ্রামে জমিদারের অত্যাচারের প্রতিবাদ করে যে নাট্যকার অভিনয়োপযোগী নাটক লিখে দেবেন, তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে। কোন্ ধরণের কতগুলি নাটক তাঁরা পেয়েছিলেন, তা আমাদের জানা নেই। তবে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে নাটক লিখে (নবনাটক) রামনারায়ণ পুরস্কার পেয়েছিলেন তা শোনা আছে। একটি বিশেষ সভা করে নাট্যকারকে অভিনন্দন জানানো হয়, এবং রৌপ্যাধারে দুইশত টাকা রেখে তাঁকে অর্পণ করা হয়।

যে প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে আলোচনা করছি, তার মাঝে পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার, বেলগাছিয়া থিয়েটার, জোড়াসাঁকো থিয়েটার, শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটার আর বাগবাজার ক্লাব কয়েকটি কারণে বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। যতীন্দ্রমোহনের আর সৌরীন্দ্রমোহনের প্রভাবে তাঁদের থিয়েটার সঙ্গীতকে নাটকের অন্যতম আকর্ষণের বিষয় করে তোলে। মাইকেল কৃষ্ণকুমারীর জন্য তিনখানা গানই যতীন্দ্রমোহনকে বেঁধে দিতে অনুরোধ করেন, এবং সে সম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন—He is sure to do justice to the play. ও ছাড়াও ওই থিয়েটারের দান রয়েছে অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রতিভা প্রকটের সহায়তা। অর্দ্ধেন্দু ওদের আত্মীয় ছিলেন। কিন্তু ওই অভিজাতদের সঙ্গে তিনি সম্বন্ধ ছিন্ন করতে বাধ্য হন, এবং গিরিশের সঙ্গে যোগদান করেন।

বেলগেছিয়া থিয়েটারের প্রধান অবদান মাইকেলকে বাংলা নাটক রচনায় ব্রতী করা, এবং আজকের দিনে যারা ইংরেজী নাটক অভিনয় করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁদের কয়েকজনকে বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্য নিযুক্ত করা।

তাঁদের মাঝে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকখানি মাইকেল তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলেন এই কথা লিখে—"আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে অর্পণ করিতেছি। আপনি আধুনিক বঙ্গদেশীয় নটকুল শিরোমণি; ইহার দোষগুণ কিছুই আপনার অবিদিত থাকিবে না। বিশেষত আমার এই বাসনা যে, ভবিষ্যতে এ-দেশীয় পণ্ডিত সম্প্রদায় জানিতে পারেন যে, আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্য-বিশারদ একজন মহোদয় ব্যক্তি মানুষ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ প্রকাশ করিতেন।" মাইকেল স্বভাবত এমন বিনয়ী ছিলেন না, কিন্তু যাঁর গুণে মুগ্ধ হতেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

সোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটারকে স্মরণ রাখবার কারণ এই যে, নাটক মঞ্চস্থ করে পরে তা বন্ধ করে দেবার রেওয়াজ তাঁরাই চালু করেন। মাইকেলকে অনুরোধ করে তাঁর 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ' আর 'একেই কি বলে সভ্যতা' তাঁরা মঞ্চস্থ করেন, কিন্তু পুনরভিনয় বন্ধ করে দেন; প্রথমখানি প্রাচীনদের দাবী অনুসারে, আর দ্বিতীয়খানি Young Bengalদের দাবী অনুসারে। মাইকেল ছিলেন তাঁর যুগের সব চেয়ে কড়া ইয়ং বেঙ্গল। আর তাঁর পরবর্তি যুগের ইয়ং বেঙ্গলরা তাঁরাও নাটক বন্ধ করবার জন্ত উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিলেন। তারপরও যখন রাজারা তাঁর কাছে আবারো নাটক চাইলেন, তিনি লিখলেন —Mind, you broke my wings about the forces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali, and write books in Hebrew or Chinese. আমরা যখন অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন চালু করবার জন্ত বিগত ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ মুখর করি, তখন ভুলে যাই যে ওর জন্ত আমাদের দেশের লোকের প্রয়োচনাও অবশ্যই ছিল। আজই কি পুরোপো এবং কোন-কোন নতুন ধরণের নাটকের অভিনয় অসম্ভব করে দেবার আয়োজনের অভাব আছে?

বাগবাজার দল কেবল পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পথই সুগম করে দেননি, তাঁরা দেশের লোককে দীনবন্ধুর অবদান গ্রহণ করবার জন্ত প্রস্তুত করে দিয়েছেন আর জোড়াসাঁকো ত প্রস্তুতির উৎস হয়েই রইল।

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েও কিন্তু জাতীয় নাট্যশালার শূন্য স্থান পূর্ণ করতে পারলনা। গিরিশ জানতেন তা পারবে না। তাই তিনি প্রথমে ওতে যোগ দেননি। ওর প্রতিষ্ঠা নিয়ে পরিহাসও করেছেন। ন্যাশনাল থিয়েটার কেমন হওয়া উচিত, তাই নিয়ে তাঁর মনে একটা প্রশ্ন ছিল। তাই তাঁর সহযোগিরা যখন তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেলেন, তখন তিনি হঠাৎ একটা যাত্রার দল খুলে ফেলেন। হয়ত তাঁর মনে হয়েছিল বাংলা দেশে, তথা ভারতবর্ষে, থিয়েটারকে ন্যাশনাল করতে হলে যাত্রার রূপ দিতে হবে। নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারও মাঝে-মাঝে বলতেন, একটা যাত্রার দল গড়তে পারলে মন্দ হোতনা। আমি এখনো অনেক সময় ওই কথা ভাবি, থিয়েটারের নকল করা যাত্রার দল নয়, ছেলে-বয়েসে যে-রকম যাত্রার দল দেখেছি, তারই আধুনিক একটা কোন রূপ।

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার পরের বছরেই ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মাইকেলের (২৯শে জুন) ও দীনবন্ধুর (১লা নভেম্বর) মৃত্যু হয়। নতুন কোন নাট্যকার তখন কাজ আরম্ভ করেননি। ন্যাশনাল থিয়েটার 'নীলদর্পণ' দিয়ে থিয়েটারের উদ্বোধন করলেন ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে। তারপর তাঁরা খুললেন দীনবন্ধুরই 'নবীন তপস্বিনী'। তারপর 'ভারতমাতা'; রচয়িতা কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই 'ভারতমাতার' কল্পনা ও অভিনয় যেমন নাট্যকারকে, তেমন নাট্যশালাকেও বিশেষ মর্য্যাদা দেয়; কেননা বন্দেমাতরম্ তখনও প্রকাশিত হয়নি, রচিত যদিও বা হয়ে থাকে। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে এই নাটকের স্মৃতি নিয়ে অনেক কথা লিখেছেন। এর একটি গানের দু' লাইন অনুবাদ করে তিনি বোঝাবারও চেষ্টা করেছেন যে, নাট্যশালা জাতির মানুষের মনে-মনে দেশপ্রীতি জাগাবার কি চেষ্টা করেছে। গানটি এই:

মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি।

তখনকার নাট্যশালাকে বুঝতে হলে এই কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে :

(ক) বাংলা পদ্য সাহিত্যের রূপ পেয়েছে ওই ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বছর আগে, বিদ্যাসাগরের প্রয়াসে, ১৮৪৭-৬৯ খৃষ্টাব্দের মাঝে।

(খ) মধুসূদনের পদ্মাবতীর সামান্য একটু অংশ ছাড়া নাটক রচনার উপযোগী বাংলা পদ্য রচনার পরিচয় বাংলা-সাহিত্যে তখন আদৌ ছিলনা।

বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন ওই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ, সীতারাম বঙ্গদর্শনে ১৮৭২-৮৮তে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনী লেখেন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ রচিত হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। মাইকেলের শর্মিষ্ঠা রচিত হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ আর পদ্মাবতী রচিত হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে, বঙ্কিম কপালকুণ্ডলা লেখেন ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, আর মৃণালিনী লেখেন ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে। দীনবন্ধুর সধবার একাদশীও ওই বছরেই অভিনীত হয়, লীলাবতী অভিনীত হয় ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে। বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, আর বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

(গ) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (জনসংঘের রাজনীতিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার চার বছর পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে, আর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, আনন্দমঠ প্রকাশিত হবার তিন বছর পরে, আর নীলদর্পণ এবং কৃষ্ণকুমারী রচিত হবার পঁচিশ বছর পরে। বাংলা নাটকের আলোচনা করতে হলে ওই তারিখগুলি মনে রাখতে হবে। নইলে সুবিচার হবে না। বিপিনচন্দ্র তাই ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত ভারতমাতা নিয়ে আবেগের ভাষায় আলোচনা করেছিলেন, এবং ওর গানের একটি অংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার চেষ্টায় বাংলার রঙ্গালয় তখন থেকেই ব্রতী হয়েছে—যখন আনন্দমঠ রচিত হয়নি, বন্দেমাতরম ধ্বনিত হয়নি, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কল্পনাতেও আসেনি।

তবুও একথা বলব যে, ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েই জাতীয় নাট্যশালা হতে পারেনি। তা না পারলেও পাবলিক থিয়েটার হয়েছিল বলেই, যে টিকিট কিনবে তারই অভিনয় দেখবার অধিকার থাকবে বলেই রাজা-মহারাজারা শৌখ-মুৎসুদ্দিরা যে থিয়েটার করতেন, তার থেকে ওর রূপ পৃথক হয়ে গেল ; জাতির সকল শ্রেণীর, সকল স্তরের লোক ওকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে গ্রহণ করল।

কিন্তু ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙ্গে গেল গিরিশ তাতে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও। ন্যাশনাল ভেঙ্গে গেল দলাদলির ফলে। ভাঙবার পর চুইয়ল পুনরায় মিলিত হয়ে গড়ে তুললেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৪) ছয় নম্বর বিডন ষ্ট্রীটে, এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার। ওটি আর্টিষ্টদের থিয়েটার বলেও মালিকানা সত্ত্বে পরিচালিত। মালিক ভুবনমোহন নিয়োগী। তিনি বেশিদিন চালাতে পারলেন না। জনৈক ধনী মাড়োয়ারী প্রতাপ জহুরী, ওটিকে কিনে নিলেন। তিনিই গিরিশকে সওদাগরী আফিসের চাকুরী থেকে ছাড়িয়ে এনে তাঁর ওপর সমস্ত ভার দেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎ ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটার খোলেন। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী আমদানি করা হয় বলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ওই থিয়েটারের পরামর্শদাতৃ কমিটি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 'শর্মিষ্ঠা' দিয়ে অভিনয় শুরু করেন। এখনকার বিডন ষ্ট্রীট ভাকঘর সেখানে, সেইখানেই থিয়েটারের বাড়ী ছিল। রামনারায়ণ ও মধুসূদনের নাটক ছাড়তে তাঁরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' অভিনয় করেন। ও নাটক ইতিহাস মূলক ; দেশাত্মবোধের প্রেরণাপ্রদ। 'আজমীর কুমারী' আর একখানি নাটক যা ক্ষাত্রবীর্য্যের পরিচয় দেয়। ওর অভিনয়কালে হিরোইনের ভূমিকাভিনেত্রী ঘোড়ায় চড়ে

ঢকাবতরণ করতেন। গ্রেট ন্যাশনালেই সর্বপ্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী আর কপালকুণ্ডলা অভিনীত হয়। নাট্যরূপ দেন গিরিশ। স্ত্রী-ভূমিকা পুরুষরাই অভিনয় করেন। কপালকুণ্ডলার পরেই গ্রেট ন্যাশনাল স্ত্রী-ভূমিকার জন্য অভিনেত্রী সংগ্রহে মন দেন, এবং সতী কি কলঙ্কিনী নাটকে অভিনেত্রীরা অবতীর্ণা হন (১৮৭৪)। তাঁদের মাঝে ছিলেন ক্ষেত্রমণি যিনি পরবর্তিকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই গ্রেট ন্যাশনালে আর বেঙ্গলেই উপেন্দ্র দাস বোমা-বিস্ফোরণ করেন যথাক্রমে শরৎ-সরোজিনী আর সুরেন্দ্র-বিনোদিনী অভিনয়ের আয়োজন করে। তার পরের বছরেই (১৮৭৫) গ্রেট ন্যাশনাল করেন গজদানন্দ অভিনয়। ওর পরেই সরকার ১৮৭৬ সালের ড্রামাটিক পারফরমেন্সেস ন্যাক্ট আইন জারী করেন সারা ভারতবর্ষে, আর্মস ন্যাক্ট ও ভার্নাকুলার প্রেস ন্যাক্ট জারি করবারও আগে। ওই আইন অনুসারে উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, বেলবাবু প্রভৃতি গ্রেফতার বরণ করে নেন। নিম্ন আদালতে তাঁদের সাজা হয়, কিন্তু হাইকোর্টে তাঁরা মুক্তি লাভ করেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় তার নয় বছর পরে। ওই আইনের উপলক্ষ ছিল অশ্লীলতা নিবারণ, কিন্তু লক্ষ্য ছিল জাতীয়তাবোধ আন্দোলন নিরোধ। একটা আপোষ হিসেবে পুলিসের প্রি-সেন্সরশিপ কনভেনশন সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার ফলে নাট্যশালা দেশাত্মবোধ প্রচারে বিরত হয় না। তবে নাট্যকারদেরকে কিছু চাতুরীর আশ্রয় নিতে হয় বলে নাটকের রচনায় কৃত্রিমতা এসে পড়ে। ওই আইন জারী হবার পরই যথাক্রমে দেবলদেব বধ আর পদ্মাবতীর দুঃখ অভিনীত হয়। দুখানারই নাট্যরূপ দেন গিরিশ। ওই সময়ে এত বিভিন্ন থিয়েটার উদ্ভূত ও বিলুপ্ত হয় যে, তার বিবরণ এ প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়, দিলেও বিশেষ কোন লাভ নেই, কেননা কেউ তা মনে রাখতে পারবেন না। শুধু উল্লেখ্য বিষয়গুলিই বলি। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে গুরুমুখ রায় নামক জনৈক পাঞ্জাবী ধনী গিরিশকে নিয়ে ৬৬, বিডন ষ্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটার খোলেন। ওই বাড়ীতেই পরে যথাক্রমে এমারেল্ড, ক্লাসিক, কোহিনুর, মনোমোহন, মনোমোহন নাট্যমন্দির এবং পুনরায় শুধু মনোমোহন নাম দিয়ে বিভিন্ন অধিকারীরা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নানা ধরনের নাটক পরিবেশন করেন। এখন সেই যায়গা ঘিরে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিন্যু চলে গেছে। গুরুমুখ বেশিদিন থিয়েটার চালাতে চাইলেন না। গিরিশ তখন তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, দাশু নিয়োগী আর হরি বসুকে থিয়েটারের মালিকানী দান করিয়ে দিলেন। ষ্টার খোলা হয় গিরিশের কমলে কামিনী দিয়ে। কিন্তু চৈতন্যলীলা ষ্টারের ভাগ্য ফিরিয়ে দেয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ওই অভিনয় দেখতে থিয়েটারে পদধূলি দেন। কর্ণেল অলকট, কাদার লাফোঁ প্রমুখ বিদেশী অধ্যাত্মবাদীরা ওই অভিনয় দেখে হিন্দু থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন। আমার মনে হয় গিরিশও পথের নির্দেশ পান। প্রখ্যাতা অভিনেত্রী বিনোদিনী চৈতন্যের ভূমিকা অভিনয় করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গিরিশের 'বুদ্ধদেব চরিত' অভিনীত হয়। Light of Asia প্রখ্যাত লেখক এড্‌উইন আর্নল্ড নাটকের ও অভিনয়ের সুখ্যাতি করেন। পরের বছর 'বিল্বমঙ্গল' অভিনীত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বিল্বমঙ্গল দেখে বলেন "G. C. শেক্সপীয়ারকেও অতিক্রম করেছে।" ও-কথা গুরু-আইয়ের প্রতি ধরদ দেখাবার জন্য বলেন নি, বলেছেন মানুষের রূপান্তরের অনুপম চিত্র দেখে।

ষ্টার খুব ভালোই চলছিল। কিন্তু তাই বোলো আনা কাল। কোলকাতার খ্যাতনামা ধনী গোপাললাল শীলের সখ হোলো থিয়েটার খোলবার। তিনি ষ্টার থিয়েটারের জমিটি কিনে নিলেন। গিরিশ অনেক কষ্টে কেবল মাত্র থিয়েটারের নামটির সত্ত্ব তাঁর সহযোগিদের জন্য বাঁচাতে পারেন। গোপাললাল থিয়েটারটির নাম দেন এমারেল্ড। এবং গিরিশকে এর পরিচালক করতে চান। গৃহহারা সহযোগিদের কথা ভেবে তিনি তাতে অসম্মত হন। গোপাললাল তাঁকে ২০,০০০৲ টাকা বোনাস ও মাসিক ৪০০৲ টাকা বেতন দিতে চান। সহযোগিরা তাঁকে তা গ্রহণ করতে সম্মত করান। গিরিশ বোনাস থেকে ১৬,০০০৲ টাকা সহযোগিদের হাতে তুলে দিয়ে বলেন একটি শিল্পীদের থিয়েটার গড়ে তোলবার চেষ্টা কর।

তাঁদেরই চেষ্টার ফলে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গড়ে ওঠে হাতীবাগানের ষ্টার থিয়েটার। গোপাললাল বেশিদিন থিয়েটার চালান না। তিনি তা লিজ দেন অপর কয়েক জনকে। গিরিশ এমারেল্ড ছেড়ে দিয়ে সহযোগিদের ষ্টারে যোগদান করেন।

কিন্তু একসময়ে পারিবারিক কারণে কিছুকাল অনুপস্থিত থাকায় তাঁর সহযোগিরা তাঁকে কর্মচ্যুত করেন—সেই সহযোগিরা, যাঁদের হাতে তিনি নোনাদের ১৮,০০০৲ টাকা তুলে দিয়েছিলেন, এবং যেনামে 'নসীরাম' নাটক লিখে দিয়েছিলেন যা দিয়ে হাতীবাগানের ষ্টার যাত্রোদঘাটন করেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গিরিশ 'ম্যাকবেথ' নিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার খোলেন। নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে মিনার্ভা আজও সেই ৬, বিডন ষ্ট্রীটে স্থায়ী হয়ে রয়েছে : তখনকার বাড়িটি অবশ্য নেই।

যে থিয়েটারগুলির নাম করলাম, সেগুলি ছাড়া আর যে থিয়েটার সুবিখ্যাত হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে ক্লাসিক থিয়েটার। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এমারেল্ড থিয়েটার লিজ নিয়ে ওই নামে তা রূপান্তরিত করেন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। অমরেন্দ্রনাথের রঙ্গজগতে আবির্ভাব স্মরণীয় ঘটনা নানা কারণে। সে আলোচনায় এখানে প্রবৃত্ত হবনা। শুধু এই কথা বলব যে, প্রখ্যাত বিত্ত ও ধনী পরিবারের এই দুলাল নিজের আয়ু অকালে ক্ষয় করে রঙ্গরঙ্গালয়ের আয়ু বাড়িয়ে তাকে কালজয়ী হবার পথে এগিয়ে দিয়ে গেছেন।

আর যে থিয়েটারটি ভাগ্যান্বেষীদের আশ্রয় স্থল এবং উদীয়মান নাট্যকারদের বিকাশের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল, এবং অবিরত হস্তান্তরিত হয়েও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিল, তা হচ্ছে বীণা থিয়েটার নেড়ুবাবাজার ষ্ট্রীট ষ্টাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে উনবিংশ শতকের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত যে নাটকগুলি কোন-না-কোন কারণে খ্যাতি লাভ করেছিল, তার একটা তালিকা দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। তা এই :

দীনবন্ধুর নীলদর্পণ (১৮৭২), লীলাবতী (১৮৭৩), মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী ও শর্মিষ্ঠা (১৮৭৩), মহাশ্বা শিশিরকুমারের নয়শ রূপেয়া (১৮৭৩), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম (১৮৭৪), বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী (১৮৭৩), মৃণালিনী (১৮৭৪), উপেন্দ্রনাথের শরৎ-সরোজিনী (১৮৭৫), অমৃতলালের বীরকচূর্ণ, চোরের উপর বাটপারী (১৮৭৫), হেমচন্দ্রের বৃত্র সংহার (১৮৭৫), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী (ঐ), উপেন্দ্র দাসের সুরেন্দ্র-বিনোদিনী (ঐ), রমেশ দত্তের বঙ্গবিজেতা (ঐ) নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ (ঐ), গজদানন্দ, হনুমান চরিত (ঐ), মাইকেলের মেঘনাদ বধ (১৮৭৭), বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ, গিরিশ রূপান্তরিত (১৮৭৮), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতী নাটক (১৮৮০), গিরিশের আলাদীন (১৮৮১), রমেশ দত্তের মাধবী কঙ্কন (১৮৮২), গিরিশের পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৮৮৩), রাজকৃষ্ণ রায়ের তরুনীসেন বধ (১৮৮৩), কেদার চৌধুরী রূপান্তরিত বঙ্কিমের আনন্দমঠ (ঐ), গিরিশের দক্ষযজ্ঞ ও নলদময়ন্তী (ঐ), চৈতন্য লীলা (১৮৮৪), অমৃতলালের বিবাহ বিভ্রাট (ঐ), রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহ্লাদ চরিত্র (ঐ), গিরিশের নিমাই সন্ন্যাস (১৮৮৫), বুদ্ধদেব চরিত (ঐ), রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণীর হাটের নাট্যরূপ রাজা বসন্ত রায়, কেদার চৌধুরী রূপায়িত (১৮৮৬), গিরিশের বিল্বমঙ্গল, বেল্লিক বাজার (ঐ), অতুল মিত্রের নন্দবিদায় (১৮৮৮), গিরিশের নসীরাম (ঐ), তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতার রূপান্তর সরলা (ঐ), অমৃতলালের তাজ্জব ব্যাপার (১৮৮৯), গিরিশের প্রফুল্ল (১৮৯০), রাজকৃষ্ণ রায়ের মীরাবাঈ, ধিরস্নী (ঐ), রাজকৃষ্ণ রায়ের লায়লা-মজনু (১৮৯১) অমৃতলালের কালাপাণি (১৮৯২), অতুল মিত্রের বিধবা কলেজ (ঐ), অতুলমিত্র রূপান্তরিত বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইল (ঐ), গিরিশ রূপান্তরিত ম্যাকবেথ (১৮৯৩), গিরিশের আবুহোসেন, মুকুল মুঞ্জরী, জনা (ঐ), অমৃতলালের বিজয়বসন্ত (ঐ), অমৃতলাল রূপান্তরিত চন্দ্রশেখর (ঐ), রাজসিংহ (১৮৯৬), বৌমা or Modern wife (১৮৯৬), নরেন্দ্র চৌধুরী রূপান্তরিত হরিরাজ (১৮৯৭), ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবা (ঐ), অমরেন্দ্র দত্তের হোলীলীলা (১৮৯৮, প্লেগের বছর), ক্ষীরোদ প্রসাদের প্রমোদরঞ্জন (ঐ), অমৃতলালের হরিশ্চন্দ্র (ঐ), দ্বিজেন্দ্রলালের বিরহ (১৮৯৯), গিরিশের হীরার ফুল (১৮৯৯), অমরেন্দ্রনাথ রূপান্তরিত ভ্রমর (ঐ), পাণ্ডব গৌরব (১৯০০), গিরিশ রূপান্তরিত সীতারাম (ঐ)।

ওদিকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে বাল্মিকী প্রতিভা অভিনীত হয় (১৮৮১), বাল্মিকী—রবীন্দ্রনাথ, বালিকা ও সরস্বতী—কুমারী প্রতিভা, পরে লেডী আশুতোষ চৌধুরী। তারপর অভিনয় হয়, ওই বছরেই, চিরঞ্জীব শর্মা রচিত

নবরত্নকানন। ওতে কেশবচন্দ্র (ব্রহ্মানন্দ) এবং নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) অভিনয় করেন। কালমৃগয়া (১৮৮২)। তারিখগুলি আর তথ্য সবই নিয়েছি ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ভারতীয় নাট্যমঞ্চ থেকে।

উনবিংশ শতকে যে নাটকগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে দেখা যায় নাটক ও নাট্যশালা ন্যাশনাল হবার দিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হয়েছে। সামাজিক নাটকগুলি যদিচ শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই বিশেষ করে প্রতিফলিত করে চলেছে, পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকগুলি হিন্দু উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণ সকলের কাছেই একটা আদর্শ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। শিক্ষিতদেরকে বাদ করে কোন প্রহসন রচিত হয়নি। নানা নাট্যকারের নানা নাটকের তালিকা উপরে দাখিল দিয়েছি, তার মাঝে গিরিশ নবযুগের মতো ভাস্কর হয়ে উঠেছেন, যেমন নাট্য রচনায়, তেমন সকল নাট্যশালার আকর্ষণের পাত্র হয়ে। তাঁর অভিনয় আমি দেখিনি, তবে শুনেছি তাঁর চেয়ে শক্তিমান অভিনেতা বাংলাদেশ দেখেনি।

কিন্তু, সে কথাও বড় কথা নয়। বড় কথা এই যে, তাঁর আবির্ভাব না ঘটলে বাংলা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা পেতোনা, জন-সংযোগ পেতো না। নাটকের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার প্রয়াস সর্বপ্রথমে কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বিশেষভাবে করেছেন। গিরিশ উনবিংশ শতকে রাজনীতির মাধ্যমে তা করেননি, করেছেন বিংশ শতকে।

উনবিংশ শতকে তিনি বাংলা নাটকের এমন রূপ দিতে চেয়েছেন, যার সঙ্গে বাঙালীর সংস্কারগত ও সংস্কৃতিগত একটা যোগ থাকে। তিনি বিদেশী নাটক থেকে দুই হাতে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু জাতির সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যা তিনি মেলাতে পারবেন বলে মনে করেছেন কেবল তাই-ই ব্যবহার করেছেন। চৈতন্যলীলার সাফল্য থেকে তিনি হয়ত বুঝতে পারেন নাটকের কোন্ রূপ বাঙালীর চিত্ত স্পর্শ করে। চৈতন্যদেব যে নাট্যরীতি অবলম্বন করেন, তাও হয়ত তাঁর মনে পড়ে। চৈতন্যদেব সংস্কৃত নাট্যাভিনয় করেছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি সংস্কৃত-রীতি বর্জন করে নাটককে নিয়ে যান মন্দির অঙ্গনে, গৃহস্থের আটচালায়, পথে ও প্রান্তরে। ঠিক সেই কালে, যে কালে শেক্সপীয়ার এলিজাবেথের কোর্টেই কেবল নাটক পরিবেশন করতেন। নাট্যাভিনয় শ্রীচৈতন্যের পেশা ছিল না। ভাগবৎ প্রেম পাবার জন্য তিনি পাগল হয়েছিলেন। তিনি বুঝছিলেন সে প্রেম একা পাওয়া যায় না, সকলের প্রেম পেলে তবেই তা পাওয়া সম্ভব। নাটকেরও ওই কথা। খুব ভালো নাটক লিখেও, শাস্ত্রসম্মত নাটক লিখেও, নাটককে ফলপ্রদ করা যায় না,—যদিনা নাটক জনচিত্ত স্পর্শ করে নাটককে আর জন-মনকে এক স্তরে তুলতে পারে। গিরিশ জেনেছিলেন প্রেমকে আর ভক্তিকে ভিত্তি করে সুরে-ছন্দে-নৃত্যে আবেদন করতে পারলে জনচিত্তের স্পর্শ ই শুধু পাওয়া যায় না, জন-মনকে জাগ্রতও করা যায়। তিনি নাটককে সেই রূপ দেবার কথা ভাবতে লাগলেন।

কিন্তু নাটকের উপযোগি অথচ সরল পদ্য কোথায়, কোথায়ই বা সরল গদ্য। মাইকেলও বলতেন, বাংলা নাটক পদ্যে না লিখলে, তা সফল হবেনা। কিন্তু একমাত্র 'পদ্মাবতী'তে সামান্য ভাবে তিনি পদ্য ব্যবহার করলেন, ছন্দকে বন্ধন মুক্ত করবার পরও নাট্য রচনায় তাকে নিয়োগ করলেন না। শেক্সপীয়ার যেমন মার্লোর পদ্যকে তৈরিই পেয়েছিলেন, গিরিশ তেমন কিছু পেলেন না। কিন্তু পেলেন না বলে হাল ছেড়েও দিলেন না, অভিনয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে তিনি ছন্দ সৃষ্টি করে নিলেন। সেই ছন্দের সাহায্যে শেক্সপীয়ারকেও তিনি সার্থক অনুবাদ করতে সক্ষম হলেন, বুদ্ধ শঙ্করকেও সেই ছন্দে ফলিয়ে তুলতে পারলেন, প্রেম-নবীন যুদ্ধ করে গেলেন। গদ্য তিনি যতদূর সম্ভব মুখের ভাষা থেকে সংগ্রহ করলেন, সম্পূর্ণরূপে কেতাবশ্রয়ী না হয়ে। সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করে তিনি যখন নাট্য নিবেদন শুরু করলেন, তখন শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, তা থেকে রস গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন। বহুদিন যাবত যারা পৃথক ছিল, নাটককে অবলম্বন করে তারা একসঙ্গে বসে একই রস উপভোগ করতে সক্ষম হলেন। বাংলা নাট্যশালা প্রধানত তারই প্রয়াসে উনবিংশ শতকে জাতীয় নাট্যশালা হবার দিকে এগিয়ে চলে।

সাধারণ নাট্যশালা থেকে দূরে থেকে আর একজন সাধক বাংলা নাটককে স্বদেশী রূপ দেবার সাধনা করছিলেন। তিনি বিশ্বরেণ্য রবীন্দ্রনাথ। গিরিশ যখন নাটক লেখেন, তখনই তিনি নাটক দেখা শুরু করেন, বয়সে গিরিশের চেয়ে সতেরো বছরের ছোট হয়েও। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁর বয়েস কুড়ি বছর মাত্র, তখনই তিনি রচনা করেন বাল্মিকী প্রতিভা। গিরিশ প্রথম নাটক লেখেন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। বাল্মিকী প্রতিভা এমন ভাবে রচিত, যাকে তখনকার নাটক দেখিয়ে বাঙালীরা নাটক বলে মানতে দ্বিধাবোধ করত। তিনি লিখলেন বাল্মিকী প্রতিভা, কিন্তু তাঁর প্রেরণা ও গানের সুর নাকি তিনি নিয়েছিলেন আইরিশ ব্যালাড্ থেকে। যদি তিনি নিজে ও-কথা না বলে দিতেন, তাহলে কেউ ও-কথা ভাবতেও পারতনা। ওর নয় বছর পরে তিনি লেখেন রাজা ও রাণী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, রূপ সেক্সপীয়ারের, লিরিক, রোমান্টিক, অনুভূতি ও আদর্শ পুরো ভারতীয়। এই রাজা ও রাণী লিখিত হবার তিন বছর আগে আর বিসর্জন রচিত হবার দুবছর আগে (১৮৮৭) গিরিশ লেখেন বিল্বমঙ্গল। যে-বছর রাজা ও রাণী রচিত হয়, সেই বছরেই গিরিশ প্রফুল্ল রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের মালিনী আর গিরিশের মায়াবসানের তর্জমা, আর জন্ম একই বছরে লেখা হয় (১৮৯১)। মালিনী দেখে Trevelian কবিকে বলেছিলেন ওই নাটকে তিনি গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ দেখেছেন। তিনি যদি বিল্বমঙ্গল আর জন্ম দেখতেন তাহলেও হয়ত ওই কথাই বলতেন।

এই সময়গুলির উল্লেখ করছি এই কারণে যে বাংলা নাটকের সাহিত্যের স্থান যাঁরা নির্ণয় করতে চান, তাঁদেরকে একই সময়ে রচিত নাটক ও উপন্যাসগুলি একসঙ্গে পড়ে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

উনবিংশ শতকের সমাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই গিরিশের, রবীন্দ্রনাথের, অমৃতলালের, ক্ষীরোদপ্রসাদের, দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য রচনা শেষ হয়নি। আগামী সংখ্যায় বিংশ শতকের নাটক আলোচনা করব। তখন তাঁদের সম্বন্ধেও আলোচনার প্রয়োজন উপস্থিত হবে।

"এতদিন থিয়েটার নাটকের জন্য পরমুখাপেক্ষী ছিল। পরদত্ত অনুগ্রহে পুষ্ট তাহার ক্ষীণকায় ঠিক পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। আজ দীনবন্ধুর নাটক, কাল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নাটকাকারে অভিনীত হইয়া কাহক্রমে যেন থিয়েটারের মর্য্যাদা রাখিতেছিল। তারপর দুর্ভিক্ষের সময়ে যেমন অন্নের বিচার থাকে না, লোকে কদন্ন আহার করে, তেমনি যার তার ছাই পাঁশ রাবিশ নাটক অভিনয়ের চাপে রঙ্গমঞ্চ প্রাণশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। নাট্যবাণীর বরপুত্র গিরিশচন্দ্র ইহার সেই মৃতকল্প দেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। তাঁহার সময় হইতেই লোকে বুঝিল, কেবলমাত্র অভিনয়-প্রতিভা লইয়া জন্মাইলেই নাট্যশালার সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। নাট্যবাণীর পূজার প্রধান উপকরণ—ইহার প্রাণ—ইহার অন্ন—নাটক। গিরিশচন্দ্র এদেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানে—তিনি অন্ন দিয়া ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন; ইহার মজ্জায় মজ্জায় রস সঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন; আর এইজন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the Native Stage. ইহার খুড়া, জ্যাঠা আর কেহ কোন দিন ছিল না। ইহা এক প্রকার অভিভাবকশূন্য বেওয়ারিশ অবস্থায় টলিতেছিল, পড়িতেছিল, ধূলায় গড়াইতেছিল। যে অমৃতপানে বাঙ্গলার নাট্যশালা এই পঞ্চাশ বৎসরাধিক বাঁচিয়া আছে, প্রকৃতপক্ষে সে অমৃতের ভাণ্ড বহন করিয়া আনিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র। কাজেই বাঙ্গলা নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা গিরিশচন্দ্র।"

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—"রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর"

লেবেডফের প্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি
ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হয়।

By permission of the Honorable the Governor-General
Mr. LEBEDEFF'S
NEW THEATRE IN THE DOOMTULLAH
Decorated in the Bengallee Style
Will be opened very shortly, with a play called
The Disguise,
The Characters to be supported by Performers of both sexes
To commence with Vocal and Instrumental Music, called
THE INDIAN SERENADE

To those Musical Instruments which are held in esteem by the Bengallees, will be added European. The words of the much admired Poet Shree Bharot Chondro Ray, are set to Music.

BETWEEN THE ACTS
Some amusing Curiosities will be introduced

The Day for Exhibition, together with a particular detail of the Performance, will be notified in the course of the next week.

এই বিজ্ঞপ্তির তিন সপ্তাহ পরে ১৭৯৪ সালের ২৯শে নভেম্বর "ক্যালকাটা গেজেটে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়।

BENGALLY THEATRE
No. 25. DOOMTULLAH
Mr. LEBEDEFF
Has the honour to acquaint the Ladies and Gentlemen of the Settlement,
THAT HIS THEATRE
will be opened
To-morrow, Friday, 27th Inst.
With a comedy,
Called
THE DISGUISE

The play to commence at 8 O'clock precisely.

Tickets to be had at his Theatre

Boxes and Pit	Sa.	Rs. 8
Gallery		Rs. 4

ষোড়শ বর্ষ

শ্রাবণ

দ্বিতীয় সংখ্যা

১৩৬৭

গল্প-ভারতী

সম্পাদকীয়

গল্প-ভারতীর বর্ষা-আবাহন করেছিলাম কবিগুরুর গান স্মরণ করিয়ে—

"দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল॥"

বাঙালীর জীবনে যেন চরম দুঃখের বরষা গর্জে নামছে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা আসামে, তখন স্বপ্নেও আমরা ভাবিনি। দেশমান্য নেতা পণ্ডিত নেহেরু আসামে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এখন প্রত্যেক বাঙালী নরনারীর কর্তব্য—দুঃখে অভিভূত না হয়ে একমনে স্থায়ী প্রতিকার চিন্তন। বহুবার বহুধা খণ্ডিত বাংলার যদি কোনও ভবিষ্যৎ থাকে সেটির সন্ধান ও প্রমাণ করার দায়িত্ব ও গৌরব হবে বাঙালীদের। তাই বাঙালীর ঘরে ঘর ভাইবোন সবাইকে জানাতে চাই রবীন্দ্রনাথের সেই অমর মন্ত্র, গানের সুরে যেটি ৫৫ বছর আগে স্বদেশীযুগে রাখী-বন্ধনের বন্দনায় প্রাণবন্ত করেছিলেন তিনি—

"বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান—
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান—
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,

সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান—
বাঙালীর মন বাঙালীর প্রাণ
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।"

সেই স্বদেশীগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে তরুণ তরুণীরা সেই সময় আত্মবলিদানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মনে পড়ে তখন অমর কবি গেয়েছিলেন—

"এবার তোর ভরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' ব'লে ভাসা তরী"

যুগ-জন-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ঋষিতুল্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছিলেন বাঙালী মেয়েদের জন্য "বাংলার ব্রতকথা"—অনুপম গ্রন্থ রচনা। আজ আসামের দুর্দিনে বাঙালী মেয়েদের নূতন করে সেই বইটি পড়তে বলি। মনে পড়ে আবার ১৯৪৬-৪৭ সালের নরমেধ যজ্ঞের কথা। তখন আর-এক শোচনীয় অঙ্গচ্ছেদের মূল্য এই বাঙলা ও পাঞ্জাবকেই দিতে হয়েছিল। নিরপরাধ নারী, পুরুষ ও শিশু-হত্যার আর্তনাদে অস্থির হয়ে মহাত্মা গান্ধী ছুটে এসেছিলেন—এই বাঙলায়—নোয়াখালিতে; নিজ জীবন বলি দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন তিনি।

মহাত্মা-রক্তপাতের কলঙ্ক বাঙলাকে বহন করতে হয়নি; কিন্তু বিনষ্ট হয়েছে কত পুরুষ, বিধ্বস্ত হয়েছে কত নারী, তা বাঙালী ভোলেনি—ভুলতে পারে না। লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারাদের কঠিন সমস্যার সমাধান কেন্দ্রীয় সরকার আজও করতে পারেননি। তার উপর আবার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল আসামে নিশ্চিহ্ন অগণ্য বাঙালী। তাই যে যেখানে বাঙলা ভাষায় মাতৃনাম ও মাতৃভূমিকে স্মরণ করছে—সবাইকে সাদরে আহ্বান করি—নব রাখীবন্ধনের এ ব্রত উদ্‌যাপনে।

সেই সঙ্গে স্মরণ করি ঋষি অরবিন্দের জন্মতিথি ১৫ই আগষ্ট (১৮৭২)। জাতীয় স্বাধীনতার পূর্ণাভাষ তাঁরই শুভ জন্মদিনেই যেন হয়েছিল। ১৮৭২ সালে যখন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ করেন, তখনো বাঙলাভাষাই আসামের প্রধান ভাষা ছিল, বেদ বড়ুয়া প্রমুখ অহমিয়া লেখকগণ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রেরণায় (বুরঞ্জী বহির্ভূত) আধুনিক আসাম-সাহিত্যকে গড়ে তোলেন। সূর্য্যকুমার ভুঁইয়া, বাণীকণ্ঠ কাকতি প্রভৃতি আসামের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা বাঙলা চর্চ্চার ভিতর দিয়ে সেটি প্রমাণ করেছেন। তাঁদের কথা স্মরণ করে বাঙালী আমরা যেন নূতন ভাবে কঠিনতর পরীক্ষায় নামতে পারি। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বাঙালী অমৃতের সন্ধান পেয়েছে। তাই চরম নির্য্যাতনেও বাঙালী মরেনি—আজও বেঁচে আছে।

সাবিত্রী মহাকাব্যের অমর কবি শ্রীঅরবিন্দের জন্মতিথিতে এই কথা স্মরণ করাতে চাই। "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" এই প্রাণমাতান কবিতাটিও রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে সবাইকে পড়তে অনুরোধ করি।

[illegible]

সুখ

শুভদর্শনের রায়

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

"ও তো আমাদের মালাও পারে।" মালা বলল ঈষৎ হেসে।

হাসিকে কুসুমাকর ফাঁসীর মতো ভয় করেন। দেখা গেল তিনি ওইখান থেকে পিছু হটছেন আর সকাতরে বলছেন, "নারকেল গাছে উঠতে হলে কোমরে দড়ি বাঁধতে হয়। দড়িও তো এখানে মিলবে না।"

"ওতো আমাদের মালাও পারে।" বলতে বলতে হেসে ফেলল মালা।

কুসুমাকরকে এবার জোরে জোরে পা চালাতে দেখা গেল। মালা রইল পিছনে পড়ে।

এমনি করে একটি ফলের জন্যে একটা রাজপুত্তুর হাতছাড়া হলো।

৩

এই দুর্ঘটনার পর থেকে আর আমি ঘটকালি করিনি। মাসীমাও করতে বলেননি। আশ্চর্যের কথা মাসিমাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর আন্তরিক অভিপ্রায় নয় যে ও-রকম একটা পরিবারে মালার বিয়ে হয়। তিনি চান ক্যালকেশিয়ান। রাজপুত্তুর না হলেও ক্ষতি নেই।

নীলি বলল, "কেমন? যা বলেছিলুম তা ঠিক কি না? রূপকথার রাজপুত্তুর না হলে ও মেয়ে মালা দেবে না।"

"সে কী রে! কুসুমাকর কি রাজপুত্র নয়!" আমি বিস্মিত হই।

"উহুঁ! রূপকথার রাজপুত্র নয়। তুমি ভুল বুঝেছিলে।" নীলা বলল রূপকথার উপর জোর দিয়ে। শুধু রাজপুত্র হলে হবে না। রূপকথার রাজপুত্র হওয়া চাই।

আমি হার মানলুম। রূপকথার রাজপুত্রের সন্ধান আমি জানিনে। একদিন মেদোমশাইকে কথায় কথায় বললুম, "জগতে কী মিলতে পারে আর কী মিলতে পারে না, প্রত্যেক ছেলেমেয়ের এটা জানা উচিত। বিজ্ঞান তো তোজবাজি নয় যে চাইলেই রূপকথার রাজপুত্র এনে দেবে।"

তিনি এর জন্যে তৈরি ছিলেন না। চমকে উঠলেন। তেবে বললেন, "না। বিজ্ঞান অমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় না। কিন্তু প্রত্যেক ছেলেমেয়ের এটা মনে রাখা উচিত যে, কোনো ভুল করে চাইতে নেই। কারণ চাওয়া অনেক সময় ফলে যায়। যে যা চায় সে তা পায়। ভুল করে চাইলে ভুল করে পায়। ভক্তরা সেইজন্যে স্বর্গও চান না। তাঁরা চান ভগবানকে। স্বর্গ নিয়ে তাঁরা করবেন কী, যদি ভগবানের দেখা না পান? চাইলে স্বর্গও পাওয়া যায়। কিন্তু উন্নত আত্মার পক্ষে সেটা ভুল করে চাওয়া।"

"কিন্তু কোনো মেয়ে যদি রূপকথার রাজপুত্রকে চায়?" আমি ধাঁধায় পড়লুম।

"তাহলে সে রূপকথার রাজপুত্রকে পাবে। ঐ যে পাওয়া ওটা ভুল করে নয়। কারণ এই যে চাওয়া এটা ঠিক করে চাওয়া।"

আমার ধাঁধা ঘুচল না। বললুম, "মেসোমশায়, তা কী করে হতে পারে? রূপকথার রাজপুত্র থাকলে তো পাবে? রূপকথার জগৎটাই যে অলীক।"

"আমি অতটা নিশ্চিত নই। রূপকথার জগৎ যদি অলীক হয় তবে রূপের জগৎটা কি কম অলীক?" মেসোমশায় পালটা প্রশ্ন করলেন। "চাঁদের মুখখানা কি চাঁদমুখখানি? এক এক করে সব ক'টা প্রতিমারই খড় বেরিয়ে পড়বে, যদি দূরবীন বা অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে যাও। কিংবা যদি ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে মনঃসমীক্ষণ কর। তা বলে কি মানুষ এতদিন অসুন্দরকে সুন্দর বলে ভ্রম করেছিল? বিজ্ঞান তার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে?"

আমি ভাবতে বসি। মেসোমশায় আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেন। "না। তাও নয়। রূপের জগৎও সত্য। চাঁদের মুখে বসন্তের দাগ থাকলেও সে সুন্দর। বিজ্ঞান তার সৌন্দর্যকে অপ্রমাণ করতে পারবে না। চাইও না। বিজ্ঞানের দৃষ্টি সৌন্দর্যদৃষ্টি নয়। সৌন্দর্যদৃষ্টির যাথার্থ্য বিজ্ঞান অস্বীকার করে না। তেমনি ঋষিদের দিব্যদৃষ্টিও যথার্থ; সে দৃষ্টিতে জগৎ অমৃতময়। আনন্দের জগৎও সত্য। তেমনি আর একটি দৃষ্টি আছে। সে দৃষ্টি শিশুবয়সে তোমারও ছিল। এখন হয়তো নেই। সে দৃষ্টিতে জগৎ রহস্যময়। রূপকথার জগৎও সত্য।"

হাঁ। এ দৃষ্টি আমারও ছিল। কবে এক সময় হারিয়ে গেছে। তাই আমি এখন বাস্তববাদী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুররিয়ালিস্ট। জীবনে নয়, শিল্পে।

মেসোমশায় বলতে লাগলেন, "বরং ওই রূপকথার জগৎই সত্যের সং চেয়ে কাছাকাছি। আর সব চেয়ে দূরে হলো আমাদের প্রাত্যহিক সংসারযাত্রার জগৎ, দিন আনা দিন খাওয়ার জগৎ, শাদা চোখে দেখা ব্যবহারিক জগৎ। কেবল কি সত্যের থেকে দূরে? সৌন্দর্যের থেকেও। রূপকথার জগতের যে রূপ ফুটেছে সে শুধু অতীতের আভ্যন্তরিক সত্য নয়, সব কালের। একালেরও। দেখবার চোখ আছে যার সে-ই দেখতে পায়। মালার সে চোখ আছে। আমার আশঙ্কা হয় সেও দিনে দিনে হারাবে। তখন সে আর রূপকথার রাজপুত্রকে পাবে না। চাইবেই না।"

তাঁর কণ্ঠে গভীর উদ্বেগ। সে উদ্বেগ কন্যার উত্তম বিবাহের জন্যে নয়। সাংসারিক সাফল্যের জন্যেও নয়। সেটা মাসিমার ভাগে পড়েছে। মেসোমশায় ভাবছেন মালা যেন তার শিশুসুলভ বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। যেন চাইতে পারে। যেন ঠিকমতো চায়।

বললেন, "তখন সে আর সত্যের অন্দর মহলে প্রবেশ পাবে না। আমাদের মতো দেউড়িতে কিংবা সদর দালানে ঘুরে বেড়াবে।"

এবার তাঁর আক্ষেপ নিজের জন্যেও। কে জানে হয়তো আমার জন্যেও।

জগতের যে চেহারা আমি দেখি তা অশেষ বৈচিত্র্যময়। তা সত্ত্বেও তাতে আমার মন ওঠে না। মনে হয় আমি সদর দালান ঘুরে ঘুরে দেখছি। অন্দরে আমার প্রবেশ নেই। অন্দরে যেতে হলে মালার মতো চোখ নিয়ে যেতে হয়। যে চোখ দিয়ে দেখা যায় রূপকথার সত্য। এক কালে আমারও সেখানে যাওয়াআসা ছিল। কিন্তু এখন আমি বড় হয়েছি কিনা। এখন আর ছোট হতে পারিনে। আমি হারিয়ে ফেলেছি আমার চাবী, আমার সাঙ্কেতিক শব্দ। মায়া কপাট বন্ধ হয়ে গেছে। আর খুলবে না।

এই নিয়ে নীলির সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। সে মালার কাছে মাঝে মাঝে যায়। মালাকে পড়াশুনায় সাহায্য করে। বলে, "মালা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে যে রূপকথার রাজপুত্র একদিন আসবে। কিন্তু তাকে যখন জিজ্ঞাসা করি কেমন করে রাজপুত্রকে চিনবে, কী কী লক্ষণ দেখে, সে তখন চুপ করে থাকে। উত্তর দিতে পারে না। ভয় হয়, দাদা, একদিন একটা বাজে লোক কি পাজি লোক এসে তার হাত থেকে রাজপুত্রের পাওনা মালাগাছি নেবে। পরে অবশ্য সে টের পাবে, কিন্তু ও মালা একবার দিলে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।"

ও ভয় কেবল নীলির মনে নয়, আমার মনেও ছিল। ভাবতুম মালার বাবার চেয়ে মালার মা-ই তার প্রকৃত বন্ধু। বাবা তাকে রূপকথার পাখাপক্ষ রাজপুরীতে ঘুমন্ত রাজকন্যা করে রেখেছেন, সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে কবে তার রাজপুত্র আসবে। আর তার মা তাকে জাগাতে চান, তার স্বপ্নের ঘোর কাটাতে চান। এই বাস্তব দুনিয়ায় কেমন করে চলতে হয় ফিরতে হয় তা শেখাতে চান। জানাতে চান কত ধানে কত চাল। সে যদি কোন জিনিসের কত দাম তার খোঁজ না রাখে তা হলে পদে পদে ঠকবে। এমন লোকও থাকতে পারে যে তাকে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচবে। এ বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে রূপকথার ধরন ধারন খাটে না।

এক এক সময় মালাকে দেখে মনে হতো সে রূপকথার কিরণমালার মতো অকুতোভয়ে মায়া-পাহাড়ের অভিমুখে চলেছে। আনতে হবে তাকে সোনার শুকপাখী, মুক্তা করার জন্য। সে ঠিক ঘুমন্ত রাজকন্যা নয়। সে বীরবেশী রাজকন্যা। তার বাবা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন কার নাম সত্য কার নাম অসত্য, কার নাম ন্যায় কার নাম অন্যায়, কার নাম উচ্চ কার নাম তুচ্ছ, কার নাম সার আর কার নাম অসার। ভাববিলাসে তার কৈশোর কাটেনি। সে আশ্রমকন্যা। স্বল্পাহারী, পরিশ্রমী, শীতে গ্রীষ্মে অকাতর। তার জীবনের ছিৎ শক্ত করে পাতা হয়েছে। ভয় কিসের?

রূপকথার রাজপুত্রকে কি কেউ পায়? মালাও পাবে না জানি! তা বলেও আমার প্রার্থনা হলো, আহা, এই মেয়েটি যেন পায়! যেন পায় তার রূপকথার রাজপুত্রকে! কেমন করে পাবে সে আমি জানিনে। তবু প্রার্থনা করে যাই, যেন পায়, যেন পায় এই একটি মেয়ে। এই একটি মেয়ে তার রূপকথার রাজপুত্রকে!

প্রার্থনা করি, কিন্তু নিঃসঙ্গ চিত্তে নয়। যা কেউ কখনো পায় না তা যদি পেতে হয় তবে তার জন্যে দাম দিতে হয় কত! এইটুকু মেয়ে কি পারবে অত দাম দিতে? ও কি জানে, ও কি বোঝে সুখের মূল্য দুঃখ? পরম সুখের মূল্য পরম দুঃখ? ও কি পারবে অত দুঃখ সইতে? অত দাম দিতে? কেন তবে প্রার্থনা করে ওর কপালে দুঃখ টেনে আনি!

মালা আমাকে দেবুদা বলে ডাকে। আমার বালা বোনটির জন্যে আমি সুখ সৌভাগ্য কামনা করি। যেমন করি নীলি বোনটির জন্যেও। আমি চাই তাকে দুঃখ দুর্গতি থেকে রক্ষা করতে। যেমন চাই নীলিকেও। কিন্তু তা বলে আমার সেই প্রার্থনার ভাষা বদলে দিইনে। বলিনে, মালা যেন একটি ভালো বর পায়, একটি ভালো ঘর পায়। যেন শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটায়।

নীলির জন্যেও কি এ ভাষায় বলি? না, তার জন্যেও না। কারো জন্যেই না। এ জগৎ যাঁর সৃষ্টি তিনি যদি দয়া করে যেন এসব তবে উত্তম। না দিলে ওঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যাব না। নিজেরাই এর উদ্যোগ আয়োজন করব। সফল হই, উত্তম। না বলে নিজেদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব না।

অদৃষ্টকেও এর মতো টেনে আনব না। বার বার চেষ্টা করব। কোনো বিয়েকেই আমি চরম বলে স্বীকার করিনে। এক বিয়ে ব্যর্থ হলে সে বিয়ে ভেঙে দেবার দাবী রাখি, তার পর আরেক বিয়ের কথা ভাবি। পড়ে পড়ে সহ্য করতে তোমাকে বলছে কে? ভগবান? কই, হিন্দু পুরুষকে তো তিনি তা বলেন না।

মানুষ সুখ শান্তির জন্যে সমাজ গড়ে, পরিবার গড়ে। সুখ শান্তি না পেলে আবার ভেঙে গড়ে না কেন? কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে যে সুখ শান্তি না পেলেও সমাজকে পরিবারকে আস্ত রাখতে হবে? ধর্ম? সেইজন্যে ধর্মের উপর থেকে একালের মানুষের শ্রদ্ধা চলে গেছে। শ্রদ্ধা ফিরে আসবে তখনি, যখন ধর্ম বলবে সুখ শান্তির জন্যে ভেঙে আবার গড়। ভাঙনটাও ধর্ম, যদি পুনর্গঠনের জন্যে হয়। আর সেই পুনর্গঠন হয় মানুষের সুখ শান্তির জন্যে।

আমার নীলি খেলনটিকে আমি ছবি আঁকতে শেখাচ্ছিলুম, যাতে সেও আমার মতো সৃষ্টির আনন্দ পায়। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়ে দাঁড়ায়। তারপর বিয়ে করতে চায় করবে। সুখী না হলে ভেঙে দেবে। ইচ্ছা হলে আবার করবে।

নীলির জন্যে আমার প্রার্থনা ছিল, নীলি যেন পরাজিত না হয়। যেন পরাজয় মেনে না নেয়। তার সুখ শান্তির আশা যেন তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে। সে যেন বিয়ের জন্যে বা বিয়ের ঠাট বজায় রাখার জন্যে আপনাকে ছোট হতে না দেয়।

নীলির উপর আমার ভরসা ছিল সে কারো পায়ে লুটিয়ে পড়বে না। পতিরও না পতিকুলেরও না। মা'র মেয়ে তো! মা'র কাছে সে ও-শিক্ষা পেয়েছিল। মা'র দৃষ্টান্ত দেখে। তবে মা তাকে এ-শিক্ষা দেননি যে স্বামী আরেক জনকে বিয়ে করলে স্ত্রীও আরেক জনকে বিয়ে করতে পারে, করলে সেটা অধর্ম নয়। মা বলতেন, এক পক্ষ যদি অন্যায় করে অপর পক্ষ কেন পালটা অন্যায় করবে? করবে অসহযোগ, করবে সত্যাগ্রহ। তাই তিনি করে এসেছেন। এখনো তাঁর আশা আছে যে বাবা নিজের ভুল কবুল করবেন।

তবে কবুল করলেই বা হবে কী? বাবা আবার বিয়ে করেছেন। দুটি মেয়ে, একটি ছেলে হয়েছে। সবাই মিলে মিশে মনের সুখে বাস করবে এ কি কখনো সম্ভব? মা এ-কথা জানেন। সেইজন্যে তাঁর চোখের জল শুকোয়নি। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়নিশ্চিত যে অসহযোগের যথেষ্ট কারণ ছিল। নিজের সংসারে রানীর মতো থাকতে পারলে পরিবের বৌ হয়েও সুখ আছে। বাঁদির মতো থাকতে হলে বড়লোকের বৌ হয়েও সুখ নেই। একতরফা ত্যাগস্বীকার কি সারাজীবন চলে? এলো একদিন একটা ব্রেকিং পয়েন্ট। মা চলে এলেন আমাদের নিয়ে। বাবা করলেন আরেকবার বিয়ে।

এত বড় একটা করুণ অভিজ্ঞতার পরও মা বিশ্বাস করেন গুরুজনের নির্বন্ধে। নীলি নিজের পছন্দমতো বিয়ে করবে এ তিনি ভাবতেই পারেন না। এতে নাকি সুখ হয় না। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করব যে, আমার হাতে সাক্ষীপ্রমাণ থাকলে তো? নিজের পছন্দমতো বিয়ে করেও কি বড় কম মেয়ে অসুখী হয়েছে? ইউরোপে গেলে এনুম অনেকগুলি উদাহরণ। আমার নিজের অভিজ্ঞতাই যুক্তির বিপক্ষে যাবে। বিয়ে করিনি, কিন্তু করলে কি ও-ছাড়া আর কোনো পরিণাম হতো?

ওদিলকে আমি দোষ দিইনে। জীবনে সুখী হতে কে না চায়? আমাকে নিয়ে সুখী হবার আশা থাকলে সে কেনই বা আর কারো কথা ভাবত? আর্টিস্টরা এমনিতেই সৃষ্টিছাড়া মানুষ। তাদের সঙ্গে ঘরসংসার করা দুরূহ ব্যাপার। তাদের নিয়ে সুখী হওয়া দুঃসাধ্য। তাদের সময় নেই অসময় নেই

দিন নেই রাত নেই। ঘর কৈতু বাহির, বাহির কৈতু ঘর, তাদের মুখেই এটা মানায়। আর সব মানুষ যখন ঘুমিয়ে তখন তারা জেগে। আর সব মানুষ যখন জেগে তখন তারা যোগে। শিল্পীর স্ত্রী হওয়াও একটা শিল্প। কেউ যদি হয় অনিচ্ছুক বা অক্ষম তাকে তার বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়াই শ্রেয়।

বাবাকে ও ছোট মাকে আমি এড়িয়ে এড়িয়ে চলি। তাঁরাও আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু ছোট ছোট ভাই বোনগুলি কী দোষ করেছে? বাণী আর কল্যাণী আর কানু এদের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। আমার ইডিওতে আসে। বাসাতেও। তবে ঠাকুমার সঙ্গে তো ও তাবে দেখা হবে না। মাঝে মাঝে ও-বাড়ীতে যাই।' তখন নীলির বিয়ের কথা উঠবেই। আমার বিয়ের কথাও। আমার বিয়ের প্রসঙ্গ বেশী দূর এগোয় না। সকলেই জানে আমি বেকার। কিন্তু নীলির বেলা সেটা খাটে না।

মার্চেন্ট আফিসে বাবার অসামান্য প্রতিপত্তি। কর্মপ্রার্থীরা রোজ সকালে তাঁর দরজায় হাজিরা দেয়। তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলেদেরও দেখা যায়। ইচ্ছা করলে তিনি নীলির জন্যে স্বয়ংবর সভা ডাকতে পারতেন। নীলি যার কণ্ঠে মালা পরিয়ে দিত তিনি তার কণ্ঠে বাকলেস বেঁধে দিতেন। বড়বাবুকন্যা ও বড় চাকরি পেয়ে সে আনন্দে লাফ মারত। আহা, তার চেয়ে প্রার্থনীয় আর কী হতো! তেমন আভাসও তিনি দিয়েছিলেন নীলিকে। নীলি প্রায়ই যেত ও বাড়ীতে। সকলের সঙ্গে ওর সদ্ভাব।

কিন্তু নীলি কী বলে, শুনবে? নীলি বলে, "ম্যাচ করে যদি আমার বিয়ে দেওয়া হয় তবে আমার বর হবে হাজার টাকা মাইনের চাকুরে বা এক হাজারী মনসবদার। আর ভালোবেসে যদি আমাকে বিয়ে করতে দেওয়া হয় তবে আমরা দু'জনে মিলে উপার্জন করে সংসার চালাব, যার যতটুকু সাধ্য।"

বাবা পেছিয়ে যান। ঠাকুমাও মাথায় হাত দিয়ে বসেন। ছোট মা নীলির পক্ষ নেন। মা শুনতে পেয়ে চোখের জল ফেলেন। আমার দিকে তাকান। আমি নিঃস্পন্দ। সুখী নই বলে সুখী করার জন্যে আমি ব্যাকুল নই। সুখী করার কৌশল আমার জানা নেই। কী করলে আমার দুঃখিনী মা সুখী হন তা আমি জানিনে। তাঁর ধারণা নীলির আর আমার বিয়ে হয়ে গেলে তাঁর মরা গাঙে সুখের বান ডাকবে। কিন্তু সে ধারণা ভুলও হতে পারে।

নীলিকে আমার বলা আছে সে যেদিন বিশেষ কাউকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইবে আমাকে বললেই আমি মাকে রাজী করাব। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভালোবেসে বিশেষ কেউ তাকে বিয়ে করতে চায়নি। সে যে মালার মতো রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখে তা নয়। সে আমারি মতো বাস্তববাদী। কিন্তু তারও হৃদয় বলে একটি পদার্থ আছে। হৃদয় চায় হৃদয় বিনিময়। হৃদয় দিয়ে হৃদয় পাবে কি না বলবার সময় এখনো আসেনি। আরো দু'পাঁচ বছর সবুর করলে ক্ষতি কী? ইতিমধ্যে নিজেও তো যোগ্য হয়ে থাকবে। জীবনসংগ্রামের যোগ্য।

কতকটা পরিহাস ছলে কতকটা সত্যি সত্যি নীলিকে বলি, "যোগ্যতা বলতে মেয়েদের বেলা বিবাহযোগ্যতাও বোঝায়। তার জন্যে শুধু লেখাপড়া বা গৃহকর্ম বা কলাবিদ্যা যথেষ্ট নয়। ফরাসিনীদের মতো রূপচর্চা প্রসাধনচর্চা করণীয়। অলিভ অয়েল মাখিস্।"

তা শুনে নীলি বলে, "বৃথা। বৃথা। বেগাবনে মুক্তো ছড়ানো। বাংলাদেশের কালা আদমীরা

ঠিক দক্ষিণ আফ্রিকার গোরা আদমীদের মতোই বর্ণান্ধ। তুমি মানবে কি না জানিনে, কিন্তু এ দেশের বিয়ের বাজারে একটা প্রচ্ছন্ন 'কালার বার' আছে। আমার তো সন্দেহ হয় যে এ-দেশের ছেলেদের ভালোবাসাও বর্ণনির্ভর।"

বলতে যাই, "অথবা বর্ণনির্ভর।" কিন্তু আমিও তো এ-দেশের ছেলে। অভিযোগটা আমারও গায়ে লাগে। মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলি, "তাদা কি গৌরীর চেয়ে কম সুন্দর! আমার তো মনে হয় ভারতীয় শিল্পীদের রূপধ্যান তাদাতেই সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত। তাঁর সম্বন্ধেও অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারা যায়, নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী। কিন্তু ও কথা শুনলে আবার ধর্মাচরণ ক্ষেপে যাবেন।"

নীলি হেসে বলে, "প্যারিসে বসে বসে নগ্নমূর্তি আঁকতে আঁকতে তোমার চোখ জলসে গেছে। শিব ঠাকুর কিন্তু এ-দেশের ছেলে। তাই কালীর সঙ্গে ঘর করেন না, গৌরীর সঙ্গেই থাকেন। মাথায় করে রাখেন যাঁকে তিনিও যমুনা নন, গঙ্গা। যাঁর জল কালো নয়, সাদা। না, দাদা, তুমি যাই বল, আমরা এ দেশের মেয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করি।"

আছে হয়তো এর পিছনে কোনো আশাভঙ্গ। খোঁচাতে যাইনে। তবে রয়ে সয়ে নীলিকে আমার প্যারিসের আখ্যায়িকা শোনাই। বলি, "কে যে কী দেখে ভালোবাসে তা কেউ জানে না, জানতে পারে না। সে রহস্য ঈশ্বরের মতোই দুর্জ্ঞেয়। মাইকেলের মতো একটি কালো রঙের পুরুষকেও পর পর দুটি গৌরবর্ণা নারী ভালোবেসেছিলেন। তুই তো তাঁর মতো কালো নয়। তোর আশা আছে। কিন্তু ভালোবাসা পাওয়াটাই তো সব কথা নয়। পেয়ে রাখতে পারে ক'জন? যেখানে দু'জনেই দু'জনকে চায় সেখানে কিছুই তাদের মাঝখানে দাঁড়াতে পারে না। না ধর্ম, না জাতি, না বর্ণ, না স্বর্গ। কিন্তু কে জানে কখন তৃতীয় একজন এসে দাঁড়াতে পারে। আমি সুখী যে আমার বিয়ের আগেই এটা ঘটেছে, বিয়ের পরে নয়। নইলে কি আমার মুখ দেখানোর জো থাকত? তা হলেও আমি সুখী হতুম এই ভেবে যে এমন কিছু আমি করিনি যার জন্যে সত্যি লজ্জিত হতে পারি। লোক-লজ্জাটা তো আসল লজ্জা নয়। যে জগতে আমরা বাস করি সে জগতে তৃতীয় জনও আছে, তারও দাবী আছে, প্রেমের দাবী। এ কথাটা মনে রাখলে অনেক দুঃখ বাঁচে, বোন। মনে রাখিস্, মনে রাখিস্।"

নীলির মনের গভীরে বদ্ধমূল যে বর্ণ কমপ্লেক্স তা কি একদিনে যায়! সে আমাকে পালটা বোঝায় যে আমি ভ্রান্ত। ওদিল নাকি আমাকে ততদূর ভালোবাসেনি যতদূর ভালোবাসলে একটি কালো রঙের পুরুষকে বিয়ে করা যায়। এবং কালা পানী পার হওয়া যায়। তখন তাকে নিয়ে যেতে হলো আমার বন্ধু সিতাংশুর বাড়ী। সেখানে আলাপ করিয়ে দিতে হলো ডেনমার্কের মেয়ে কারিনের সঙ্গে। ওদিলের চেয়ে আরো ধবধবে। নীলির বিশ্বাস হলো যে বর্ণ থেকে যে দুঃখ আসে সেটা সকলের বেলা নয়, কিন্তু তৃতীয় জনের প্রবেশ থেকে যে বেদনা সেটাই সার্বত্রিক।

"কী ভয়ঙ্কর জগতে আমরা বাস করছি।" এই হলো নীলির আতঙ্কিত প্রতিক্রিয়া।

"কেন রে? অত ভয়ের কী আছে!" আমি তাকে সাহস দিতে গেলুম।

"এর পদে পদে তৃতীয় জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ!" উত্তর দিল নীলি।

"তা বলে ট্র্যাজেডী তো ঘরে ঘরে ঘটছে না। কচিৎ এক আধ জায়গায় ঘটে।" আমি তাকে আশ্বাস দিতে চাইলুম।

"না, দাদা, পর্দা উঠিয়ে দিয়ে ভালো কাজ করছেন না দেশের নেতারা। বাইরে মেলামেশার এত বেশী সুযোগ ভালো নয়।" নীলি গম্ভীরভাবেই বলল।

"তা হলে তো মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষার সুযোগও হারায়। বহুমুখী জীবিকার সুযোগও। মেয়েদের ঘরে বন্ধ রেখেও কি ট্র্যাজেডী এড়ানো যায়? যা হবার তা হবেই।" একটু অর্থপূর্ণ ভাবে তাকালুম।

ইঙ্গিতটা মর্মভেদ করল। নীলি মাথা নিচু করে বলল, "তা সত্ত্বেও আমি মনে করি ম্যাচ করে বিয়ে করাই ভালো। তাতেই দুঃখ কম। মা বাপকে দোষ দিয়ে অদৃষ্টকে দায়ী করে গায়ের জ্বালা জুড়োয়। আমাদের মা বাসিমাদের জগৎ এমন ভয়ঙ্কর ছিল না। ট্র্যাজেডী তো ঘরে ঘরে ঘটত না। কচিৎ এক আধ জায়গায় ঘটত।" এই বলে নীলিমা আমারি উক্তি আমারি গায়ে ছুঁড়ে মারল।

"তা হলে আর কী!" আমি হেসে দিয়ে বললুম, "এবার বাবাকে গিয়ে সুসমাচারটা শুনিয়ে দাও। শুভস্য শীঘ্রম্। সেই সঙ্গে শর্তটাও একটু নাথাও। হাজার থেকে পাঁচ শ'তে নামলে বাবা হয়তো ভরসা পাবেন। আমি কিন্তু এর মধ্যে নেই। আমি মনে করি অমন সুখের চেয়ে দুঃখ অনেক ভালো। দুর্ভাগ্যের জন্যে আমিই দায়ী, আমিই দোষী। মা বাবাকে জড়াতে চাইনে। অদৃষ্টকেও টেনে আনতে চাইনে।"

"আমার জন্মের জন্যে আমি দায়ী নই। আমার বিয়ের জন্যেও আমি দায়ী নই। জন্মদাতাই দায়ী। তা বলে অত নিচে আমি নামব না।" নীলি হেসে উড়িয়ে দিল।

ঘাট মণ ঘিও পুড়বে না। রাধাও নাচবে না। নীলি জানে, তবু হাজার টাকার উপর জোর দেয়। বুঝতে পারি যে ওটা হাসির কথা নয়। ওর আড়ালে আছে ওর আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। বিয়ের বাজারে যদি বিকোতেই হয় তবে চড়া দরেই বিকোবে। নয়তো নয়। বিয়ে না করে আমি যেমন মা'র কাছে আছি সেও তেমনি মা'র কাছে থাকবে। থাকা দরকার। বৌদি তো আসছে না। যাকে দেখবে শুনবে কে? আমি আর্টিষ্ট, ধ্যানমগ্ন। নীলি ছবি আঁকছে বটে, কিন্তু আর্টিষ্ট নয়, নিতান্তই একজন নকলকার বা কারিগর। এটা অবশ্য নীলির কথা। আমার নয়। আমি বিশ্বাস করি যে ইচ্ছা করলে নীলিও আমার মতো আর্টিষ্ট হতে পারে। আর আমিই বা কী এমন আর্টিষ্ট?

ওদিকে ইউরোপে মহামারী আরম্ভ হয়ে গেছল। সত্য মানুষ তো প্লেগে মরবে না। প্লেগ উঠিয়ে দিয়েছে। দুর্ভিক্ষে মরবে না। দুর্ভিক্ষ উঠিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির হাতে মরবে। প্রকৃতির উপর খোদকারী করেছে। মরবে তা হলে কিসে? তা হলে কি সে অমর হবে নাকি? তার ওই অপরিমিত ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য নিয়ে সে যদি অমর হতে চায় তবেই হয়েছে! সমগ্র বিশ্বের ভারসাম্য নষ্ট হবে। তাই তাকে মাঝে মাঝে যুদ্ধে বিগ্রহে বিনষ্ট হতে হয়। কতকটা তার নিজের ইচ্ছায়, কতকটা বিধাতার।

যুদ্ধ আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। জানতুম যে অতগুলো দেশ যখন ওর জন্যে কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত হচ্ছে তখন তাদের প্রস্তুতিই প্রস্তুতী হবে যুদ্ধের। তা বলে আমি কি কল্পনা করতে পেরেছি যে এত সত্বর তার আবির্ভাব ঘটবে আর এমন ঝড়ের বেগে নাট্সীরা মাজিনো লাইন ভেদ করে প্যারিসের পতন ঘটাবে! হায় প্যারিস! সুন্দরী নাগরী! এবার তো গাম্‌বেত্তার মতো প্রেমিক নেই। কে তোমাকে রক্ষা করতে প্রাণপণ করবে! সেবার চার মাস ধরে তুমি প্রতিরোধ করেছিলে। এবার একদিনেই

আত্মসমর্পণ। মাঝখানের সত্তর বছরে ফ্রান্স আপনাকে আরো দুর্বল করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে বোঝা যায়নি। বিপ্লবের দেশ বিপ্লবের থেকে আরো দূরে সরে গেছে। তার জন্যে পরিতাপ বৃথা।

তবু আমার মনে গভীর আঘাত লাগল। আমি তো কেবল ওদিলকেই ভালোবাসিনি। ভালো বেসেছিলুম প্যারিসকেও। আমার বন্ধুদের পরপর্যায়ের অবমাননা আমাকেও স্পর্শ করেছিল। ইচ্ছা করলেই তাঁরা প্যারিস ছেড়ে যেতে পারতেন। তাতে তাঁদের সম্মান বাঁচত। কিন্তু তাঁরা তা করবেন না। প্যারিসের টান। প্যারিসের প্রতি আনুগত্য। আমার বন্ধু সিতাংশু বলত, "প্যারিস এমন সুন্দরী যে পতিতা হলেও তার সৌন্দর্যের ক্ষয় নেই। তুমি শিল্পী, তুমি যা হারালে তার প্রতিরূপ পাবে কোথায়! এই কলকাতায়! এখানে তোমার কিছু হবে না।"

প্যারিসে থেকে গেলেও কিছু হতো না। ঝড়ের আগের হিমেল হাওয়া আমার গায়ে লেগেছিল। ঝড়ের মুখে ঝরা পাতার মতো আমাকে উড়ে যেতে হতোই। সম্ভবত লণ্ডনে। এ ঝড় কি সেখানেও পৌঁছত না? প্যারিসের পতনের পূর্বে ইংলণ্ডের উপর আকাশ থেকে যে শিলাবৃষ্টি হলো সেই ব্লিট্‌সের মার খেয়ে কে কে বেঁচে আছেন জানিনে। আমি যে বাঁচতুম তার নিশ্চয়তা কোথায়! নিশ্চয়তা অবশ্য এ দেশেও নেই। কোন দিন কে যে আক্রমণ করে বসে বলা যায় না। মরতে হয় নিজের জন্মভূমিতেই মরব। ফিরে আসার সময় এ কথাও ভেবেছি। আরো ভেবেছি বিপ্লবের কথা। এবার বিপ্লব যদি কোথাও ঘটে তো ভারতবর্ষেই ঘটবে। ইতিহাস যাঁরা ওলে খেয়েছেন তাঁরাই আমাকে বলেছেন। তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্য হয় তবে বিপ্লবের দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দর্শন করব। আর স্বহস্তে অঙ্কন করব। এ বাসনা আমার অনেক দিনের। অবশ্য বিপ্লবের দিন যদি প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকি।

না। দেশে ফিরে এসে আমি ভুল করিনি। তবে এ কথাও আমি ভুলে যাইনি যে চিত্রকলার মূলস্রোত সেন নদীর কূলে প্রবহমান, গঙ্গা নদীর তটে নয়। আমি চলে এসেছি বলে মূলস্রোতটাও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসেনি। যেখানকার স্রোত সেখানেই রয়ে গেছে। ন্যাশনাল বুকের তলায় প্যারিসের মাটি কামড়ে পড়ে আছেন যে ক'জন তাঁরাই মূলস্রোতের অবগাহী। আর্টের খাতিরে আর্টিস্টকে অনেক অপমান মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। যেমন সন্তানের খাতিরে জননীকে। আমার মা-ও মনে মনে অনুশোচনা করেন। লোকে যখন জানতে চায় আমার কাছে, "এইটেই কি আধুনিকতম" আমি কাঁপরে পড়ি। যদি বলি, "না" তা হলে আমার ছবি বিকোবে কোন গুণে। আমি তো দেশধর্মী নই। আমি যুগধর্মী। অথচ মূলস্রোত থেকে অত দূরে সরে এসে কোন মুখে বলি, "হাঁ?" তবু তো এত দিন প্যারিসের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। পত্রিকা আসত। ফোটো আসত। প্রতিলিপি আনিয়ে নিতুম। বই কিনতুম। এখন সব সম্পর্ক ছিন্ন হলো। মূলস্রোত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি তা হলে করি কী?

কেন? গোগ্যাঁ কী করেছিলেন? তাহিতি তো পৃথিবীর উল্টো পিঠে। আমার চেয়ে ঢের বড় শিল্পী। আমার চেয়ে ঢের বেশী আধুনিক। তাঁর তো লেশমাত্র পিছুটান ছিল না। তিনি তো ভুলে যেতে পেরেছিলেন। হাঁ, গোগ্যাঁ মূলস্রোত থেকে স্বেচ্ছায় সরে গেছলেন। কারণ তিনি আরো মৌলিক স্রোতের সন্ধান পেয়েছিলেন। সে স্রোত আদিকাল থেকে আগত। আদিকালেই অবস্থিত। অথচ জীবন্ত। আমাদের এ দেশেও সেরূপ ধারা ছিল। এখন নেই। থাকলেও তার স্থিতি আদিকালে নয়। আধুনিক কালেও নয়। তার মধ্যে জীবনের ভাগ অল্প। তাকে জীবন্ত না বলে নিবন্ত বলাই সঙ্গত। সাঁওতালরাও সে সাঁওতাল নয়, গোণ্ডরাও সে গোণ্ড নয়, নাগারাও সে নাগা নয়, লেপচারাও সে লেপচা নয়। তাহিতিও

কি আর সে তাহিতি আছে? যেখান থেকে পালাব সেইখানেই পৌঁছব। গিয়ে দেখব সভ্যতা আমার আগেই হাজির হয়েছে। এমন মিশোল ঘটিয়েছে যে আদিমদের মধ্যে আর আদমকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ইভকেও সাপের বদ আপেল খাইয়ে দিয়েছে। গোগাঁর ভাগ্যে যে সুখ ছিল সে সুখ চিরকালের মতো অস্ত গেছে। উষ্ণতা যদি না থাকে নগ্নতা নিয়ে আমি কী করব?

ও ভুল আমি করিনি। ইয়ারদের হাসিতামাশার পাত্র হয়েছি। এমন কি মেয়েরাও আমাকে কৃপার পাত্র মনে করেছে। তা সত্ত্বেও আমি কাচের বদলে কাঞ্চন সঁপে দিইনি। ওরা যাকে সুখ বলে তার মধ্যে উষ্ণতা কোথায়? হৃদয় উষ্ণ নয়, দেহ উষ্ণ নয়। ওর চেয়ে বরফজলে স্নান করা আরামের। যে উষ্ণতা প্রাণ সৃষ্টি করে শিল্পও তার সংস্পর্শ পেলে বাঁচে। কিন্তু সূর্যের আলোর উষ্ণতা চাঁদের আলোয় নেই। 'নগ্নতা', 'নগ্নতা' করে প্যারিসের শিল্পীগুলো মোলো। সবাই নয় অবশ্য। বোঝে না যে দু'রকম নগ্নতা আছে। সদ্যোস্নাত শিশুর নগ্নতা। সে নগ্নতা জীবনধর্মী। চিতার আগুনে মরদেহের নগ্নতা। সে নগ্নতা মরণধর্মী। উত্তাপ দিয়ে তাকে ঘিরে দিলে কী হবে? ভিতরে তার উষ্ণতা নেই। ঘিরে তাকে রূপ দিতে পারো। কিন্তু তাপ দেবে কী মন্ত্রবলে? আদিক? আঙ্গিক এখানে কোন কাজে লাগবে? শেষপর্যন্ত শিল্পীর সম্বল তার নিজের হৃদয়ের, নিজের প্যাশনের উষ্ণতা। অবশ্য ও জিনিস সোনার সোহাগা নয়। কচিৎ তার সাক্ষ্য পাই। বহুভাগ্যে মেলে।

আধুনিকতাকে আমি কিসের সঙ্গে তুলনা করব? সূর্যের আলোর সঙ্গে নয়। চাঁদের আলোর সঙ্গে নয়। ওই স্রোতের সঙ্গে। প্রবাহের সঙ্গে। সারা পৃথিবী জুড়ে এর বিস্তার। কিন্তু মূল স্রোত সর্বত্রব্যাপী নয়। অগণ্য সাংকের পরম্পরাগত লাংনার ফলে পশ্চিম ইউরোপেই শিল্প ও সাহিত্যের মূল স্রোত। তার থেকে স্বেচ্ছায় সরে এলেও আমি একেবারে বিযুক্ত হতে চাইনি। এই মহাযুদ্ধ আমাকে বিয়োগব্যথা দিল। আমার ছবি যে আধুনিকতম নয় এ যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। দেশবরণী সমালোচকরা যখন ছুন ছিটিয়ে দেয় তখন আমি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করি। আর দেশধর্মী সমালোচকরা আমাকে স্বেরুদ বলে আমলই দিতে চান না। আমি যে তাঁদের স্রোতে গা ভাসাইনে।

আমরা এক পালকের পাখীরা মিলে ছোট একটা ঝাঁক বাঁধি। সমালোচকদের খোঁটা আমাদের সকলের গায়ে বাজে বলে আমরা নিজেরাই নিজেদের তারিফ করি। "ওরা বলছে?" "কী বলছে?" "বলতে দাও।" এই হলো আমাদের উত্তর। বাচনিক উত্তর। আসল উত্তর যেটা সেটা তো কথার নয়, কাজের। যা আঁকছি তা যদি সুন্দর হয়ে থাকে সত্য হয়ে থাকে তবে তাকে না দেখেছে কে? ছবি যদি দর্শনীয় হয়ে থাকে তবে লোকে ভিড় করে দেখবেই। ওটা একটা মিথ্যে বিপদ। ওটার জন্যে আমরা পরোয়া করিনে। কিন্তু আর একটা বিপদ আছে। সেইটেই সত্যি বিপদ।

তোমরা সাহিত্যিকরা বিদেহী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারো। আমরা চিত্রকররা ভাস্কররা কি তা পারি? দেহ বাদ দিলে ছবির বা মূর্তির কী থাকে? নগ্ন দেহই বা না আঁকব কেন? না গড়ব কেন? অবশ্য তার বেলাতি করে যারা বড়লোক হতে চায় তাদের কথা আলাদা। তাদের হয়ে জবাবদিহি করা আমাদের সাজে না। পর্নোগ্রাফিকে আমরা আর্ট বলিনে। তা বলে নগ্নতাকে সচেতনভাবে বর্জন করাও কি আর্ট? আমরা যদি গোড়া থেকেই সমালোচনার ভয়ে আর্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি তা হলে ছবি হতে পারে, মূর্তি হতে পারে, কিন্তু আর্ট হবে না। তাই যদি না হলো তবে আমরা কিসের জন্যে জীবন উৎসর্গ করলুম? ভালো ছেলে হওয়াই যদি মনোগত অভিপ্রায় তবে আর্ট ছাড়া কি দুনিয়ায় আর কোনো উপজীব্য ছিল না?

ছেলেবেলায় আমার ঠাকুর্মা আমাকে বলতেন, যাকে রাখ সেই রাখে। বড় হয়ে আমিও আমাকে বলে থাকি, যাকে রাখ সেই রাখে। আমি যদি আর্টকে রাখি আর্ট আমাকে রাখবে। কিন্তু লোকের যদি রস রস জ্ঞান না থাকে, তারা যদি আর্টকে ভাবে পর্ণোগ্রাফি আর পর্ণোগ্রাফিকে ভাবে আর্ট তবে তাদের মার পড়বে নির্দোষীর পিঠে আর হার দুলবে দোষীর গলায়। তার লক্ষণ দেখে মনের জোর কমে যায়। মেসোমশায়ের কাছে যাই নৈতিক সমর্থনের খোঁজে। শিল্পের যেটা অপরিহার্য অঙ্গ তার নাম মানবের অঙ্গ। এ তত্ত্ব তিনি মানেন। তবে তার সঙ্গে আত্মাও থাকবে। নইলে অপূর্ণতা রয়ে যাবে। নগ্নতা সম্বন্ধেও তাঁর বিকার নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে পূর্ণতা থাকা চাই। পূর্ণতাই লক্ষ্য। পূর্ণ সৌন্দর্য। সেই পূর্ণতা যেখানে আছে নগ্নতা সেখানে পূর্ণতার মধ্যেই আছে। তাকে বাদ দিলে পূর্ণতাও থাকে না। যেমন গ্রীক ভাস্কর্যে।

প্রাচীন গ্রীকরা প্রাচীন ভারতীয়রা রসিক ছিলেন। মধ্যযুগেও রসিকজনের অভাব ঘটেনি, কিন্তু সাধুজনের প্রভাব সাধারণের রসবোধকে আচ্ছন্ন করেছিল। আধুনিক যুগ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ হয়নি। সমস্যার বিপদ এইখানেই।

মেসোমশায় তখনো তাঁর নিজের জীবনের পুনরারম্ভ নিয়ে চিন্তাকুল। আমাকে খুলে বলতেন না, কাউকেই না, কোনখানে তাঁর বাধা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নকুন চাকরি তো তিনি পায়ে ঠেললেন। আবহাওয়া তাঁর পছন্দ নয়। অমন আবহাওয়ার কাজ হয় না।

ওদিকে মাসিমার সেই এক ভাবনা, এক ধ্যান। মালার ভালো বিয়ে দিতে হবে। জগৎ জুড়ে যুদ্ধ হতে পারে, দেশ জুড়ে সত্যাগ্রহ হতে পারে, মানবসভ্যতা টলমল করতে পারে, কিন্তু মাসিমা হলেন সেই আদিকালের ভবী। ভবী ভোলে না। ভোলে না যে তার মেয়ের বয়স দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, এই বেলা তাকে পাত্রস্থ করতে না পারলে পরে আর ও মেয়ের ভালো বিয়ে হবে না।

আমার সাহায্য চেয়ে সে-বার তিনি নাকাল হয়েছিলেন। সেটা যদিও আমার দোষে নয় তবু আমার সঙ্গে সেটার কাকতালীয় সম্পর্ক ধরে নিয়েছিলেন। আর আমাকে বলতেন না। তাঁর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন তো কলকাতা শহরে বড় কম নেই। তাঁদের বলতেন। চেষ্টাচরিত্র করতেন। ভালো মন্দ মাঝারি সবরকম ছেলে একে একে হাজির হতো। অবশ্য পার্টিতে নিমন্ত্রণছলে।

আমার মালা বোনটি কিন্তু এখন অবুঝ। সে-বার যেমন রাজার ছেলেকে ভাব পাড়তে বলে অপ্রস্তুত করেছিল তেমনি সলিসিটারের ছেলে, ব্যারিস্টারের ছেলে, ডাক্তারের ছেলে, হাকিমের ছেলে, ইঞ্জিনীয়ারের ছেলে এদের এক একজনকে এক একটি অসাধ্য সাধন করতে বলে অপদস্থ করেছে। অসাধ্য সাধন? নয় তো কী? ভদ্র মহিলার রুমাল মাটিতে পড়ে গেলে কুড়িয়ে আনা সুসাধ্য সাধন। কিন্তু হঠাৎ এক পাটি চটি ছিঁড়ে গেলে সেটিকে বিশেষরূপে বহন করা বিবাহের জন্যে অসাধ্য সাধন নয় কি? গ্যালাণ্ট হলে তাও পারা যায়, কিন্তু ছেঁড়া কাগজের টুকরো, কমলালেবুর খোসা ইত্যাদি লিটার কুড়োনো কি ভদ্রলোকের ছেলের সাজে? মালাকে বিয়ে করতে চাইলে মালী হতে হবে! হ্যাঁ!

বেচারিদের মাথা কাটা যায়। মুখ লাল হয়ে ওঠে। তার পরে অন্তর্ধান। মাসিমা মেয়েকে ধমকি দেন। মালা করুণ চোখে তাকায়। সে-চোখ দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না যে, মালা ইচ্ছে করে বিস্কুটটা ফেলে দিয়েছে বা চটির পাটি ছিঁড়ে ফেলেছে। বরং স্বীকার করবে অমন হয়ে থাকে। মাসিমা কিন্তু হাড়ে হাড়ে জানেন কী যার অঘটন আপনি ঘটে না, ঘটতে পারে না। মালাই ঘটিয়েছে। আর

যদি আপনি ঘটেও তবু চুপ করে থাকলেই হয়। ভদ্রলোকের ছেলেকে এটা সেটা কুড়োতে বলা কেন? মালা এর উত্তরে বলে, সব মানুষ সমান, সব প্রশ্নই সম্মানের। মাসিমা রেগে যান।

রায় বাহাদুরের ছেলেকে ফুল কুড়তে বলে মালা যে কাণ্ডটি বাধাল সেটি তো দৈব ঘটনা নয়। ছেলেটি সত্যি খুব ভালো। মালার মুখ রক্ষা করল, ফুল কুড়ল। কিন্তু তার পর থেকে অদৃশ্য। মাসিমা কেটে পড়লেন। মেয়েকে বললে, "একটা কথা আছে মালু। অতি ঘরন্তী না পায় বর। কোনো বরই যার মনে ধরে না তার বিয়ে হয় না। তোমাকে একদিন এর জন্যে পস্তাতে হবে, মা।"

মালা বলল, "বিয়ে না হলে পস্তাতে হবে এমন কী কথা আছে? আমাদের লেডী প্রিন্সিপ্যালের তো বিয়ে হয়নি। কই, তাঁকে তো দিন দিন শুকিয়ে যেতে দেখিনে।"

তা শুনে হাসাহাসি পড়ে গেল। মাসিমার যুক্তি এক কথায় খণ্ডিত হলো।

তিনি মেসোমশায়কেই এর জন্যে দায়ী করলেন। মেয়েকে ছেলেবেলা থেকে এমন কুশিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সে ভদ্রলোকের ছেলেদের অসাধ্য সাধন করতে বলে। কেন তারা তা করবে? কী এমন রূপসী গুণবতী ধনীর মেয়ে যে তার জন্যে ব্যারিষ্টারের ছেলে চটি জুতো কুড়িয়ে আনবে, জজসাহেবের ছেলে সিটার কুড়োবে। যিনি তাকে কুশিক্ষা দিয়েছেন তিনি কেন হাফব্রহ্ম সেজে টঁটো হয়ে বসে আছেন? দিন কেমন করে দেবেন মেয়ের বিয়ে। ভালো বিয়ে।

মেসোমশায় বলেন, "মালা এখন সাবালিকা হয়েছে। কলেজে পড়েছে। ওর যদি বিয়ে করতে ইচ্ছা না থাকে আমরা কী করতে পারি। সবুর করো। আগে ওর পড়াশুনো শেষ হোক। বয়স এমন কী হয়েছে।"

মাসিমা বলেন, "তা বলে এতগুলি ভালো ভালো পাত্র অকারণে হাতছাড়া হবে? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা তোমার স্বভাব। তোমার মেয়েরও স্বভাব হবে?"

তাঁদের মতবিরোধ ধীরে ধীরে দাম্পত্য কলহের ধার ঘেঁসে চলেছিল। মাসিমার স্থির বিশ্বাস মেসোমশায় প্রশ্রয় দেন বলেই মালা অমন বেপরোয়াভাবে সুপাত্রদের বরখাস্ত করে। তিনি যদি তাঁর মেয়েকে শাসন না করেন তবে মাসিমার সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হবে। ওর বয়সের প্রত্যেকটি মেয়ের এক এক করে ভালো বিয়ে হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। একদিন দেখা যাবে ওর বয়সের গাছপাথর নেই। তখন সে কী বিপদ!

সে যে কী বিপদ সেটা মেসোমশায় অনুধাবন করতে পারেন না। মেয়ে যদি অনূঢ়া থেকে যায় তিনি দুঃখিত হবেন নিশ্চয়। কিন্তু মেয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বে বিয়ে হলেই কি তিনি সুখী হবেন? জীবনটা তাঁর নয়, মাসিমারও নয়। জীবনটা মালার। তার জীবন সে কেমনভাবে খরচ করবে সেটা তার উপর ছেড়ে দেওয়া ভালো। মাসিমা কিন্তু ও তত্ত্ব মেনে নিতে নারাজ। তাঁর মতে ওটা ভালো নয়, মন্দ।

এখন মেয়ের ইচ্ছা নেই বলে মেয়ে বিয়ে করবে না, কিন্তু যখন তার ইচ্ছা হবে তখন কি তার জন্যে সুপাত্ররা বসে থাকবে? না তাদের কেউ বসে থাকতে দেবে? দু'মিনিট দেরি করে পৌঁছলে বাথার থেকে মাছ উধাও হয়ে যায়। তার পর তুমি সারা দিন সন্ধান করে ফুই কাতলা ইলিশ পাবে না, পেলে হয়তো পাবে আড় কি বাচা কি বোয়াল। ইহাই নিয়ম। ইংরেজীতে বলে, সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। আমরা হলে বলতুম, সময় আর সুপাত্র কারো জন্যে সবুর করে না।

মাসিমা আমার কাছে আফসোস জানান। "তুমি, বাবা, মালাকে একটু বোঝাও। নীলি তো ওর খুব বন্ধু। সেও যদি একটু বোঝায়।"

মালাকে আমি এ বিষয়ে কিছু বলিনে, বলতে পারিনে। নীলি বলে। তখন মালা জবাব দেয়, "রূপকথার রাজপুত্তুর যখন আসবে তার আগেই যদি আমি পরের হয়ে থাকি তবে তিনটি জীবন ব্যর্থ হবে। যে কর্মের পরিণামে তিনটি মানুষ অসুখী সেটা কি শুভকর্ম?"

"আর রাজপুত্তুর যদি না আসে!" নীলি প্রশ্ন তোলে।

"যদি আসে?" মালা কাটান দেয়।

"আহা! একবার মেনে নে না! যদি না আসে?" নীলি টেনে টেনে বলে।

"তুই মেনে নে না! যদি আসে?" মালা আরো টেনে টেনে বলে।

"কেমন করে জানলি যে আসবে?" নীলি ঘুরিয়ে জেরা করে।

"কেমন করে জানব যে আসবে না?" মালা কাটিয়ে যায়।

এ তর্কের মীমাংসা নেই। যার যা বিশ্বাস। নীলির বিশ্বাসে রূপকথার রাজপুত্রের অস্তিত্ব নেই। থাকলে তো আসবে। যারা আছে ও আছে তাদেরই একজনের গলায় মালা দেওয়াই বিজ্ঞতা। মালার বিশ্বাস রূপকথার রাজপুত্র আছে ও আসবে। তার জন্যে মালা গেঁথে তুলে রাখাই শ্রেয়। আর কারো গলায় মালা দেওয়া অপরিণামদর্শিতা। প্রতীক্ষা যদি নিষ্ফল হয় তবে সে একা অসুখী হবে। প্রতীক্ষা যদি না করে তবে তিনটি মানুষ অসুখী হবে। কোনটা ভালো? একজন অসুখী না তিনজন অসুখী?

"শুনলে তো, দাদা, মালার যুক্তি!" নীলি সবিস্তারে শোনায়।

"শুনলুম। তা বলে ওই পাগলীর প্রলাপ এক কথায় উড়িয়ে দিতেও পারিনে।" আমি রায় দিই। "রাজপুত্র না থাক, এমন কেউ হয়তো আছে যাকে দেখলেই আপনার বলে চেনা যায়। সে যদি বিয়ের পরে আসে তবে তাকে পর বলে অস্বীকার করা ভীরুতা। অথচ তাকে আপনার বলে স্বীকার করাও দুষ্কর। তখন তিনটি কেন, আরো কয়েকটি মানুষও অসুখী হয়। যদি জন্মে থাকে। তার চেয়ে যতকাল সম্ভব সবুর করাই কম দুঃখের।"

যাহা হলে সবুর করতে নীলিও রাজি। কিন্তু একটির পর একটি সুপাত্রকে একটা না একটা ছলে নামঞ্জুর করবে এতখানি সাহস তার নেই। সাহস তো নয়, আস্পর্ধা। যার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সেই তো আপনার। জন্মে জন্মে আপনার। সে ভিন্ন আর সকলেই তো পর। বিয়ের পরে কবে কে একজন আসবে, সেই হবে আপন, সোয়ামী হবে পর? মা গো! ভাবতে পারা যায় না। ঘেন্না করে।

মাসিমা কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। তিনি বরং শক্ত হাতে হাল ধরবেন। মেয়ের বাপ তো উদাসীন, মাও যদি উদাসীন হন তবে আর ও-মেয়ের সময়ে বিয়ে হবে না, পরে ও নির্ঘাত অপাত্রে পড়বে। তখন ও মা-বাপকেই দোষ দেবে। তার চেয়ে সময়মতো ওর বিয়ে দেওয়াই ভালো। ওর মত থাক আর নাই থাক। মেয়েদের মত নেওয়ার রেওয়াজ হলো কবে থেকে? যত সব সাহেবিয়ানা। সাহেবদের ভালো গুণগুলো তো নিতে জানে না। মন্দ গুণগুলোই নেয়। বিবাহের মতো পবিত্র ব্যাপারে গুরুজনের মতই শিরোধার্য। গুরুজন যেটুকু স্বাধীনতা দিয়েছেন সেটুকুর সদ্ব্যবহার করলেই মঙ্গল। ওই যে

সুপাত্রদের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে দেওয়া হয়েছে ওটা কত বড় একটা প্রগতির লক্ষণ। বল, কথা বল কিন্তু বুল ঝাড়তে জুতো কুড়োতে তাব পাড়তে বোলো না। ওটা স্বাধীনতার অপব্যবহার।

মাসিমা এখন থেকে অবরুদ্ধ হলেন। পাত্র ঠিক করার ভার নিজের হাতেই নিলেন। তাঁর যাকে পছন্দ তাকেই বিয়ে করবে মালা। কিন্তু মেসোমশায়ের দিক থেকে তিনি লেশমাত্র সহানুভূতি পেলেন না। কর্তা অধিকাংশ সময় মৌন। দুটো একটা কথা যখন বলেন তখন ও-প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। শীতল যুদ্ধের পূর্বাভাস।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর একদিন কথায় কথায় মেসোমশায় আমাকে বললেন, "না। তপোবনের উপযোগী আবহাওয়া নেই। না কলকাতায়, না কলকাতার এক শ' মাইলের মধ্যে কোনো খোলা জায়গায়। স্থান নির্বাচনে ভুল হয়েছিল তাঁর। আমারও।"

আমি বললুম, "মেসোমশায়, তবে বলি কি নির্ভয়ে বলি?"

তিনি অভয় দিলেন। তখন আমি বললুম, "শুধু স্থান নির্বাচনে নয়। কাল নির্বাচনেও। বিংশ শতাব্দী যদি খ্রীষ্টপূর্ব বিংশ শতাব্দী হতো তা হলে তপোবনের উপযুক্ত আবহাওয়া আপনারা যে কোনো জায়গায় পেতেন। খ্রীষ্টোত্তর হয়েই মাটি করেছে। আবহাওয়া আপনি কোনোখানেই পাবেন না।"

মেসোমশায় মাথা নাড়লেন। "আমি অতটা নিশ্চিন্ত নই। হিমালয় এখনো আছে। ভাবছি হিমালয়ে গিয়ে বাস করব। আলমোড়ায় কি রামনবোলায়। মুশকিল হচ্ছে সেখানে বিজ্ঞানের উপযুক্ত আবহাওয়া নেই। কী নিয়ে থাকব?"

মনটা কেমন করে উঠল। মেসোমশায়রা তা হলে কলকাতায় থাকবেন না, আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। ক'টা দিনেরই বা আলাপ, তবু অলক্ষ্যে একটা স্নেহের বাঁধন তৈরি হয়েছিল! তা ছাড়া বড়বাপটার যুগে অন্তর যখন বিক্ষুব্ধ তখন শান্তির জন্যে আলোর জন্যে কার কাছেই বা যাই! মেসোমশায় ছিলেন আমার আলোকস্তম্ভ, আমার পোতাশ্রয়।

বুঝতে পারছিলুম কলকাতায় তাঁর মন বসছে না। চাকরি পেলেও না। গাছ যেমন মাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ পাতায় মানুষও তেমনি তার বাসস্থানের সঙ্গে। গৃহনির্মাণ করলেই কি সম্বন্ধ পাকা হয়? প্যারিসে তো আমার ঘরবাড়ী ছিল না। তবু তো একটা সম্বন্ধ পাতানো হয়েছিল। জীবনের সঙ্গে জীবন মিলিয়ে দিতে পারলেই মানুষ অঙ্গাঙ্গিতা অনুভব করে। মেসোমশায় তো কলকাতার জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন।

কলকাতা ছাড়তে মাসিমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। চল্লিশ পঁচিশ বছর রেঙ্গুনে কাটিয়ে এসে কলকাতায় তিনি জমিয়ে বসেছেন। এই তো তাঁর স্বস্থান। এখান থেকে নড়তে হবে শুনলে তিনি বিদ্রোহ করবেন। তলে তলে তাঁর সাধ ছিল একটি বরজামাই সংগ্রহ করা। মালার হাত থেকে নিজের হাতে নির্বাচনের ভার কেড়ে নিয়ে তিনি নতুন করে সে বিষয়ে উদ্যোগী হলেন। আবিষ্কার করলেন যে পাত্র তাঁর হাতের মুঠোয়।

বুধবারের পার্টিতে প্রায়ই আসত একটি ফিটফাট যোগদুরস্ত ছেলে। কী করত জানিনে। চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরেজী বলত আর পরিবেশনের সময় মাসিমার পায়ে পায়ে ঘুরত। নাম শুনেছিলুম টোগো। টোগো খাশনবিস। টোগোর একটা মস্ত গুণ ছিল নিজের মোটরে আমার মতো পদাতিকদের তুলে নিয়ে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া। মাঝে মাঝে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে আসা। যেদিন পার্টিতে লোকজন কম সেদিন

সে গাড়ী করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমার মতো গরহাজিরদের ধরে নিয়ে আসবেই। মাসিমার প্রতি আনুগত্যে তার দোসর ছিল না। বিনয়, নম্রতা, সৌজন্য অপরের প্রতি বিবেচনায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাকে মিষ্টার খাসনবিশ বললে সে অভিমান করে। বলতে হবে টোগো। আপনি বলা চলবে না। বলতে হবে তুমি। অথচ সে যে কে, কার কী হয়, তাই আমার জানা নেই।

পরে জেনেছিলুম তার মা বাপ দু'জনেই কোয়েটার ভূমিকম্পে মারা যান। সে ও তার দুই বোন কোনোগতিকে রক্ষা পায়। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাই তার এখন বাড়া হাত পা। ইতিমধ্যে বিলেত ঘুরে এসেছে। কিন্তু কারকর্ম জোটেনি। দরকারও নেই। সম্পত্তি আছে। সুযোগ পেলে আমিতে যাবে। কিংবা নেভিতে। টাকার জন্যে নয়। য়্যাডভেঞ্চারের জন্যে। কোনো রকম বদ খেয়াল নেই। নেহাৎ সামাজিকতার খাতিরে হোয়া আর পানী দুই রকম পান করে।

টোগোর পরিচয় দেবার সময় মাসিমা বলতেন, "মিষ্টার খাসনবিশ। জার্নালিস্ট।" কোন কাগজে লেখে তা বলতেন না। সেও চুপ করে থাকত। চাপ দিলে এড়িয়ে যেত। পরে আমাকে বিশ্বাস করে আপনি বলেছিল যে সে টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার সামাজিক সংবাদদাতা। ওরা তার নাম প্রকাশ করে না। জানাজানি হয়ে গেলে সকলে সতর্কভাবে মিশবে। তা হলে আর সংবাদ কী হলো? সংবাদ হলো তাই যা অসতর্ক মুহূর্তে লোকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এই উপলক্ষে কলকাতার সমাজের বিভিন্ন মহলে তার গতিবিধি। কিন্তু ইতিমধ্যেই এতে তার অবসাদ এসেছে। আসল সংবাদ যেখানে উৎপন্ন হচ্ছে সেখানে তো তার প্রবেশ নেই। যেমন বড়লাটের শাসন পরিষদে বা জঙ্গীলাটের দপ্তরে বা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বা কমিউনিস্ট পার্টির অন্তঃপুরে।

জাপান যখন যুদ্ধে নামল টোগো তখন যুদ্ধের ঘোড়ার মতো চঞ্চল হয়ে উঠল। ভারতীয় ফৌজ ও নৌবহর যে ভারতের বাইরে এক অনির্দিষ্ট রণাঙ্গনে প্রেরিত হয়েছে এ খবর আমরা কেউ জানতুম না। টোগো কেমন করে জানতে পেরেছিল। সেও তাদের সঙ্গে যেতে চায়। কিন্তু ভারতীয় সাংবাদিকদের হাত পা বাঁধা। চাইলেই তো চাওয়া মঞ্জুর হয় না। কমিশন পেলে ইউনিফর্ম পরে সৈনিক হতেও সে প্রস্তুত। আসল সংবাদ যেখানে উৎপন্ন হচ্ছে সেখানে গিয়ে হাজির হবার সেও তো এক উপায়। তাতে আর কিছু হোক না হোক তার কৌতূহল চরিতার্থ হবে।

জাপান যখন সিঙ্গাপুর নিল তখন টোগোর মুখে হঠাৎ শোনা গেল, "জাপানকে রুখতে হবে।" আমাদের মধ্যে সেই সব চেয়ে উত্তেজিত।

তা শুনে মাসিমা বললেন, "টোগোকে রুখতে হবে।" তিনিও সমান উত্তেজিত।

"কেন, মাসিমা, টোগোকে রুখতে হবে?" জিজ্ঞাসা করলুম আমি। "সে তো জাপানী য়্যাডমিরাল টোগো নয় যে ভারত আক্রমণ করবে।"

"উঁহুঁ, তুমি বুঝতে পারছ না। টোগো জাপানীদের আক্রমণ ঠেকাতে চায়। অমন করলে কি ও বাঁচবে!" মাসিমার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ।

"ও না বাঁচুক দেশশুদ্ধ মানুষ বাঁচবে।" আমি ভালোমানুষের মতো বলি।

"বা! তুমি তো ওর বেশ হিতৈষী দেখছি। কোয়েটার ভূমিকম্পে ও মরতে মরতে বেঁচে গেছে। ওর মা থাকলে কি ওকে মরতে পাঠাতেন? ওর মা নেই বলে কি কেউ নেই? তোমার মা কি তোমাকে যুদ্ধে যেতে দেবেন?" মাসিমা চোখ কপালে তুললেন।

আমি শিল্পী। আমি যুদ্ধে গেলে শিল্প মরবে। কিন্তু টোগো যুদ্ধে গেলে কার কী ক্ষতি? এই হলো আমার প্রশ্ন। এর উত্তরে মাসিমা দৃষ্টি দিয়ে অগ্নিবৃষ্টি করলেন।

নীলি আমার চেয়ে বেশী জানত। শুনে আশ্চর্য হলো না যে মাসিমা টোগোকে জাপানীদের হাত থেকে বাঁচাতে চান। বলল, "মায়ের চেয়ে শাশুড়ীর দরদ বেশী।"

কথাটা এমন কিছু ধারালো নয়। তবু আমার মনের ভিতরে কী যেন কেটে গেল। শাশুড়ী! মাসিমা হবেন টোগোর মতো একটা যে সে লোকের শাশুড়ী! মালা পড়বে মুক্তোর মালার মতো বাঁদরের গলায়!

আমার ভাব দেখে নীলি হেসে আকুল। "কী দাদা! তোমার মুখখানা কালো হয়ে গেল কেন! তোমার তো খুশি হওয়া উচিত যে এতকাল পরে মালা বোনটির বিয়ের ফুল ফুটল। বোনের সুখ তোমার সহ্য হচ্ছে না!"

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, "টোগো যদি মালার যোগ্য বর হতো আমি এই মুহূর্তেই ওর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করতুম।"

নীলি খিল খিল করে হাসল। "যোগ্য বর হলে তুমি আরো ব্যথা পেতে, দাদা। আমার কাছে লুকিয়ে কী হবে? তুমি ধরা পড়ে গেছ।"

সত্যি কি তাই? আমি অবাক হয়ে ভাবি। নীলি হাসতেই থাকে।

আমার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "নীলি, বিয়ে করবি।"

"কাকে?" সন্ত্রস্ত হলো নীলি।

"টোগোকে।" রুদ্ধশ্বাসে বললুম আমি।

"যাও!" নীলি এমন স্বরে বলল যেন টোগো একটা মানুষই নয়। তার হাসি থামল। পরে একটু পরিষ্কার করে বলল, "বন্ধুর বর চুরি করা অন্যায়।"

সঙ্কোচের সঙ্গে জানতে চাইলুম মালা কি মাসীমার নির্বন্ধে রাজী?

নীলি বলল, "না। সে রূপকথার রাজপুত্র ভিন্ন আর কারো বধূ হবে না।"

ধন্যবাদ। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারিনে। মাসিমা হয়তো মালাকে বাধ্য করবেন। মেসোমশায় হয়তো হিমালয়ে যাবার জন্যে রাতারাতি দায়মুক্ত হতে চাইবেন। মালা বেচারি কার ভরসায় বেঁকে বসবে? কাল্পনিক এক রাজপুত্রের ভরসায়?

খুব একটা গর্হিত কাজ করতে হলো আমাকে। টোগোর সঙ্গে নীলির বিয়ের সম্বন্ধ। নীলিকে টোগো আগেই দেখেছিল, মোটরে করে পৌঁছে দিয়েছিল। তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল। একদিন টোগোকে আমাদের বাসায় নেমন্তন্ন করে মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম। প্রস্তাবটা মা'র মুখ দিয়েই করা হলো। নীলি ও আমি তখন আড়ালে। থতমত খেয়ে টোগো সময় নিল ভাবতে। ভেবে বলল, "আচ্ছা।"

মাসিমার মনে যাই থাক তিনি টোগোর কাছে কোনো দিন প্রকাশ করেননি যে তাকে তিনি জামাই করতে ইচ্ছুক। সুতরাং টোগোর দিক থেকে অপরাধ কিছু হয়নি। কিংবা আমার দিক থেকে। মাসিমা আমাদের দোষ ধরতে পারেন না। ভিতরে ভিতরে আঘাত পেলেন ঠিকই। বাইরে আনন্দ দেখালেন। নীলিকে সোনার সিঁথিমৌর গড়িয়ে উপহার দিলেন।

এর পর শুরু হলো টোগোর নিন্দাবাদ। পড়াশুনায় ভালো নয়। বিলেত থেকে যে ডিগ্রী এনেছে তার বাজারদর নেই। ও-রকম ছেলের যুদ্ধে নাম দেওয়াই ভালো। জাপানীরা তো: বর্মা দখল করে ফেলেছে। আর ক'দিন পরে চাটগাঁয় ঢুকবে। তখন তাদের রুখবে কে? এটা কি বৌ নিয়ে সুখে ঘর করার সময়?

টোগো যুদ্ধে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছিল। মাসিমার কটু কথা তাকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিল। নৌবহরের উপর বরাবর তার একটা ঝোঁক ছিল। যাদুরী ভাবনা তাদুরী সিদ্ধি। নেভীতে একটা কমিশন জুটে গেল। তখন তাকে পায় কে! নীলিকে বলল, "এইবার আমি র‍্যাডমিরাল টোগো না হয়ে ছাড়ছিনে।"

তা শুনে মাসিমার মুখ শুকিয়ে গেল। র‍্যাডমিরাল না হোক কমোডোর কি ক্যাপটেন তো হবে। সমাজে কত সম্মান! তবে প্রাণে বাঁচলে হয়!

আমার মা'রও অবিরল একই চিন্তা। নীলি কিন্তু নির্ভয়ে তার স্বামীকে যুদ্ধের জন্যে স্বহস্তে সাজিয়ে দিল। বলল, "তুমি বীরপুরুষ। আমি ধন্য হয়েছি।"

আমিও টোগোর প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলুম। এতদিন ও নিজের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করছিল, তার কারণ প্রকৃত সুযোগ পায়নি, প্রকৃত সঙ্গিনী পায়নি। দেখতে দেখতে লোকটার চেহারা বদলে গেল। সে আর মাসিমার মেজর ডোমো বা টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার কলামনিষ্ট নয়। সে একজন যোদ্ধা, একজন দেশরক্ষী।

এর পর থেকে মাসিমার মুখে আমি তার প্রশংসা ভিন্ন আর কিছু শুনিনি। কিন্তু নীলিকে কিংবা আমাকে তিনি ক্ষমা করেননি। যদিও ব্যবহারে সেটা বুঝতে দেননি। নীলি একদিন মালাকে সব কথা খুলে বলেছিল। তা শুনে মালা তার গলা জড়িয়ে ধরে চোখের জল ঝরিয়েছিল। "কী বাঁচন বাঁচিয়েছিস আমাকে তোরা দু'জনে!" এই বলে সে নীলিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিল।

দেখলুম আমার প্রতিও সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তার বেশী না। আমি তো রূপকথার রাজপুত্র নই। সে-রকম কোনো অভিমানও আমার ছিল না। আমি যা আমি তাই। নিতান্তই একজন আর্টিষ্ট। জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত। সেই আমার রাক্ষসের সঙ্গে রণ। অসুন্দরের সঙ্গে রণ। শিল্পীর জীবনসংগ্রাম নিছক জীবিকার জন্যে নয়, সৌন্দর্যের স্বীকৃতির জন্যে। আমি যা সৃষ্টি করে যাচ্ছি তার ভিতরে যদি সৌন্দর্যের স্বীকৃতি থাকে তবে তার বাইরেও সেই সৌন্দর্যের স্বীকৃতি থাকবে। থাকতেই হবে। সেই অনুপাতে অসুন্দরের অধিকার খর্ব হবে। অসুন্দরের পরাজয় হবে। এ বিশ্বাস যদি হারিয়ে ফেলি তবে আমার পরাজয়। লক্ষ টাকার মালিক হলেও।

সিঙ্গাপুরের পতনের পর থেকে কলকাতার লোকের মনে ভয় ঢুকেছিল। রেঙ্গুনের পতনের পর সে ভয় বেড়ে গেল। যে কোনো দিন কলকাতায় বোমা পড়বে। যে কোনো দিন বাংলাদেশে জাপানীরা প্রবেশ করবে। স্থলপথে পৌঁছতে কিছু সময় লাগতে পারে, কিন্তু জলপথে সাত দিনও লাগে না। বুদ্ধিমানরা ইতিমধ্যেই পালাতে শুরু করেছিলেন। কলকাতার বাইরে তো নিশ্চাই, বাংলাদেশের বাইরেও। যার দৌড় যত দূর তার নিরাপত্তা তত দূর। যেখানে যত পোড়ো বাড়ী ছিল সব ভরে গেল।

মেসোমশায় টলবার পাত্র নন, কিন্তু মাসিমার আত্মীয়স্বজনদের টনক নড়েছিল, তাই দেখে মাসিমারও। তাঁদের কেউ দেওঘরে, কেউ শিমুলতলায়, কেউ বেনারসে, কেউ দেরাদুনে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তখন মাসিমাও নানান জায়গায় বাড়ী খুঁজতে লাগলেন। ঠিক এমনি সময়ে মেসোমশায় একখানা চিঠি পেলেন এলাহাবাদ থেকে তাঁর বন্ধুরা তাঁর জন্যে একটা চাকরি জোগাড় করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ। নেবেন কি নেবেন না? তিনি ইতস্তত করছিলেন। মাসিমা তাঁর হাত ধরে টেলিগ্রামের ফর্ম সই করালেন। নিলেন।

মালার মনে আতঙ্ক ছিল না। কিন্তু সেও কলকাতা ছাড়তে পারলে বাঁচে। এখানকার সমাজে সে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছিল না। আর নিষ্প্রদীপ তার মনের উপর ঘেরাটোপ পরিয়ে দিয়েছিল। এয়ার রেড কবে হবে কে জানে। তার জন্যে এখন থেকেই গর্ত খুঁড়ে সাইরেনের আওয়াজ শুনবামাত্র গর্তে ঢোকায় তার ঘোর আপত্তি। ওর চেয়ে বোমা খেয়ে মরা অনেক সহজ। তা বলে সে কলকাতা থেকে পালাতে চায়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষকে পিছনে ফেলে পালানো মানে তো মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে যাওয়া, শত্রুর হাতে সঁপে দিয়ে যাওয়া। কী লজ্জা! কী অন্যায়! তারা পালাবে কোথায়! তাদের যে জীবিকা এখানে।

তবু মালাকেও চলে যেতে হলো তার মা বাবার সঙ্গে। না গিয়ে উপায় ছিল না। কারণ মাসীমা কী জানি কার পরামর্শে বাড়ীখানা জলের দামে বেচে দিয়েছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে জাপানীরা যখন রেঙ্গুন দখল করতে পেরেছে তখন কলকাতা দখল না করে ছাড়বে না। নেহাৎ যদি তা না পারে তবে ধ্বংস করে যাবে। এমনও হতে পারে যে ইংরেজই পোড়ামাটি করবে, যাতে জাপানীর হাতে না পড়ে।

মেসোমশায় ইচ্ছা করলে বাড়ী বিক্রী বন্ধ করতে পারতেন। কিন্তু তা হলে বাড়ীর জন্যে তাঁর পিছুটান থাকত। হয়তো বাড়ীর টানে তাঁর পা উঠত না। অন্যের চোখে যা পলায়ন তাঁর চোখে তা অচল অবস্থা থেকে উদ্ধার। কলকাতায় তিনি যা আশা করে এসেছিলেন তা পাননি। তাঁর নিজের জীবনের পুনরারম্ভ। আর মাসিমাও কি পেলেন যা প্রত্যাশা করেছিলেন? মেয়ের ভালো বিয়ে? দেখতে দেখতে বছর পাঁচেক কেটে গেল। অচল অবস্থা সচল হবার লক্ষণ নেই। তা হলে আজ এখনি মনঃস্থির করতে হয়। যুদ্ধ যদি কলকাতার দিকে এগিয়ে না আসত তা হলে মনঃস্থির করতে আরো সময় লাগত। হয়তো কোনো দিন মনঃস্থির করার মতো মনের জোর খুঁজে পাওয়া যেত না।

যুদ্ধকে তাহলে ধন্যবাদ দিতে হয়। তার দ্বারা অন্তত এইটুকু হয়েছে যে মাসিমার কলকাতা থেকে মন উঠে গেছে। আগে প্রাণ, তার পরে ধনসম্পদ। বেঁচে থাকলে আবার বাড়ী হবে। যদিও কেমন করে হবে তা তিনি জানেন না। পঁচিশ বছরের অর্জন সবই তো বাড়ীর পিছনে গেল। দাম যা পাওয়া গেল তা সুদের চেয়েও কম। মাসিমা কী করবেন! অদৃষ্ট। তবু তো তাঁর ভাগ্য ভালো যে পাঁচ বছর আগে বর্মা থেকে চলে আসতে পেরেছেন। নইলে জাপানীদের আক্রমণের মুখে ঘরসংসার ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিতে হতো। তখন কোথায় দাঁড়াতেন! তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধব সবস্বান্ত হয়ে চল্পট দিতে না পেরে জাপানীদের খপ্পরে পড়েছে। মা গো! গা শিউরে ওঠে।

মাসিমা কাঁদতে কাঁদতে ট্রেনে উঠলেন। মেসোমশায় গম্ভীর বদনে। মালা শান্ত চিত্তে। এঁদের সঙ্গে আমার জীবন এমন ভাবে জড়িয়ে গেছল যে এঁদের ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে আমার মন কেমন করছিল। বললুম, "মাসিমা, জাপানীদের আক্রমণের মুখে আমাকে ফেলে যাচ্ছেন। আপনি বড় নিষ্ঠুর।"

মাসিমা অভিভূত হয়ে বললেন, "তা হলে তুমিও চল।"

আমি কৃতার্থ হয়ে বললুম, "না মাসিমা। স্পেনে কেন যাইনি তার জন্যে এখনো জবাবদিহি করে মরছি। কলকাতা কেন ছাড়লুম তার জন্যে জবাবদিহি অসম্ভব। আমাকে থাকতেই হবে। এর শেষ কোথায় তা দেখতেই হবে। অন্যের পক্ষে যা দুর্যোগ শিল্পীর পক্ষে তাই সুযোগ। কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকলে সঞ্জয় দেখত কী আর দেখে বলত কী? মহাভারত লেখা হতো কী নিয়ে? এবার কৌরবকে নয়, আপনাকে রুখতে হবে।"

মাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম তাঁর ইচ্ছায় দেশের বাড়ীতে। নীলি তার বিয়ের পর থেকে বাপমাধারে তার শ্বশুরবাড়ীতে থাকে। চৌগোর আত্মীয়রা কেউ মরতে চান না। এর মধ্যেই দু' দু'বার কলকাতার বাইরে লটবহর নিয়ে ঘুরে আসা হয়েছে। বলেন, রামে মরলেও মরেছি, রাবণে মরলেও মরেছি। আমরা তো মরেই রয়েছি। তা হলে খামকা কলের জল ফেলে কুয়োর জল খেয়ে কলেরায় মরি কেন? জাপানী বোমার চেয়ে আমাদের বেশী মশা কম কিসে? না, বাপু, আর আমরা নড়ছিনে।

মেসোমশায় ট্রেন ছাড়ার সময় বললেন, "দেখ, দেবপ্রিয়, যার যেখানে কাজ তার সেখানে স্থিতি। কলকাতায় আমার কাজ বলতে কিছু ছিল না। মালার বিয়ের চেষ্টার জন্যেই সেখানে থাকা। তা তো হবার নয়। যেখানে আমার কাজ সেখানে আমি যাচ্ছি। যুদ্ধের থেকে পালিয়ে যাচ্ছিনে। তফাৎ আছে। মনে রেখো।"

আমার মন মানল না। এটা একপ্রকার পলায়নই। স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দিতে যাইনি বলে আমার বিবেক আমাকে খোঁটা দিত। ফাসিস্টদের জিততে দিয়েছি, তাই তারা এখন দাবানলের মতো দুনিয়ার দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। ভারতেও ছড়াতে কতক্ষণ! এবার আর দূর থেকে দেখা নয়, ঘুরে পালিয়ে গিয়ে দাবানলের গ্রাস থেকে বাঁচা নয়, এবার তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। বুঝতে হবে। সমস্ত শক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধ করতে হবে। প্রতিরোধ করতে হবে। আমি শিল্পী। আমার হাতে হাতিয়ার নেই। তুলিকেও আমি হাতিয়ার করতে নারাজ। কিন্তু একশ' রকম উপায়ে আমি অন্যায়কে বাধা দিতে পারি। ন্যায়কে জোর দিতে পারি।

কিন্তু এইখানেই খটকা বাধল। ন্যায়কে জোর দিতে যাব যে, তার কি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের দিকে? আগে তো ওরা সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করুক। করেছে তার প্রমাণ দিক। নয়তো সাম্রাজ্যবাদকেই জিতিয়ে দেওয়া হবে। কেমন করে বলব যে, সেটা ফাসিবাদের চেয়ে ভালো? হয়তো একপোঁচ কম কালো। কিন্তু কালো বইকি। ক্রিপস্ মিশন ফিরে যাবার পরে দেশের লোককে বোঝানো শক্ত হলো যে, কম কালোর পক্ষেই ন্যায়, বেশী কালোর পক্ষে অন্যায়, সুতরাং কম কালোর পক্ষে খাড়া হতে হবে।

অথচ নিরপেক্ষ থাকাও লজ্জাকর। কেবল লজ্জাকর নয়, অপরাধজনক। জাপানীরা ধ্বংস করতে করতে ভারতের বুকের উপর দিয়ে এগিয়ে আসবে, ইংরেজরা ধ্বংস করতে করতে ভারতের বুকের উপর দিয়ে পিছু হটবে, ভারতের লোক উলুখড়ের মতো দু'পক্ষের মার খেয়ে মরবে। কে এ দৃশ্য দেখে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে! করতে একটা কিছু হবেই। সম্ভব হলে অহিংসভাবে। না করলে অপরাধ হবে। দেশের কাছে, জনগণের কাছে। করলে আবার কথা উঠবে যে, ফাসিস্টদের সহায়তা করা হচ্ছে। ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। তার আগে দুনিয়া জুড়ে বদনাম দেওয়া হবে। হিংস্র বলে বদনাম। বিভীষণ বলে বদনাম। আমরা তা হলে মুখ দেখাব কী করে? কালো মুখ নিয়ে ফাঁসীকাঠে ঝুলব? তা ছাড়া এমনও তো হতে পারে যে, ফাসিস্টরা তার সুযোগ নিয়ে জিতবে। আর সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সঙ্গে ফাসিবাদবিরোধীদেরও হার হবে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মেসোমশায়কে চিঠি লিখি। তিনি উত্তর দেন, "আতিথিসাবে স্বাধীনতা কবে পাব জানিনে, কিন্তু স্বাধীনতাবে সিদ্ধান্ত আজ এখনি নিতে পারি। নেওয়া উচিতও। সিদ্ধান্তটা আমাদের হাতে। কলাক্ষল ইতিহাসের হাতে। এমন লগ্ন বহু শতাব্দীতে একবার আসে। আজকের এই লগ্নে গান্ধীজীই বর। আর সকলে বরযাত্র। আমিও তাঁর পিছনে। যদিও আমাকে আমার পেনসন বাঁচিয়ে চলতে হবে।"

চিঠিখানা আমি ছিঁড়ে ফেলি।

গান্ধীজী তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "যে কোনো লোক একটা সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাতে পারে। কিন্তু আমি চাই জনগণকে জাগাতে।" তাই ঘটল। জনগণ জাগল। ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব সেই জাগরণ। জগতের ইতিহাসেও তার তুলনা নেই। যুদ্ধের মাঝখানে কে কবে সাহস পেয়েছে যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাশক্তিকে জাগাবে! পরে বোঝা গেল আসলে ওটা যুদ্ধবিরোধী উদ্যোগ। যুদ্ধের প্রতিরোধই তার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ভারতের মাটিতে যুদ্ধবিগ্রহ হলো না।

জাপানীরা এলো না। কিন্তু আমার মতো একচক্ষু হরিণদের অবাক করে দিয়ে কোথা থেকে এসে হাজির হলো মন্বন্তর। বাংলাদেশে পঁয়ত্রিশ লাখ মানুষ মারা গেল মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষে। যুদ্ধে কি এত লোক মরত! লজ্জায় ক্রোধে গ্লানিতে আমার গেয়ালা হয়ে গেল। যুদ্ধের দৃশ্য বিপ্লবের দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা যায় ও আঁকা যায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষের দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখাও পাপ। এমন নৈতিক সঙ্কটে কখনো আমি পড়িনি। আমি যে খেয়ে দেয়ে বেঁচে আছি এটা তো শুধু আরেকজন বা আরো কয়েকজন না খেতে পেয়ে মারা গেছে বলেই। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ভূত প্রেত পিশাচ আঁকি। জানতে চেয়োনা পিশাচ কারা। প্রদর্শনীতে ছবি দিই। দর্শকরা বলেন, ঠিক যেন পাগলের প্রলাপচিত্র। অনুভব করি শিল্পকে পাগলের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। যে পালায় সেই বাঁচায়।

অগাস্ট মাসের বিস্ফোভ বা বিপ্লবের পর লক্ষ্য করি আমার নিজের অভ্যন্তরেও একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। আমি আমার স্বকালের হতে গিয়ে স্বদেশের হতে ভুলেছিলুম। এখন উপলব্ধি করলুম যে, ভারতের অনাদি অনন্ত শিল্পীপরম্পরা থেকে বিযুক্ত হলে আমি কেউ নই। আমি না ঘরকা না ঘাটকা। ভারতের ইতিহাসের স্রোত যেদিকে আমার সৃষ্টির স্রোতও সেইদিকে। সুতরাং পলায়নের সংকল্প যখন নিলুম তখন তার নাম দিলুম ভারতের শিল্পী পরম্পরার অন্বেষণ।

এলাহাবাদ আমার পথে পড়ে। বিছানাপত্তর স্টেশনে রেখে টাঙ্গা য় চেপে বসলুম। [ক্রমশঃ

ধনী বললে, দেখো, আমার টাকার কোনো অভাব নেই। আর তুমি নিতান্তই গরীব। তোমার উচিত আমাকে সমীহ করে চলা।"

উত্তরে গরীব বন্ধু বললে, "কেন? তোমার টাকা আছে—তাতে তো আমার কোন লাভ হচ্ছেনা, আমি কেন তোমাকে সমীহ করতে যাব?"

"আচ্ছা, ধরো, তোমাকে যদি আদেক টাকা দিয়ে দিই?"

"তাহলেই বা কি, তোমার আর আমার অবস্থা সমান হয়ে যাবে। তখন কে কাকে সমীহ করবে তা ঠিক করে দেবে কে?"

"বেশ, তোমাকে যদি আমার সব টাকাটাই দান করে দিই, তবে? তখন আমাকে খুব সম্মান করতেই হবে।"

"কেন? সব টাকা যদি আমারই হোল, তবে তো উল্টে তুমিই আমাকে সমীহ করবে হে।"

আবর্তন

অমলা দত্ত

সারাদিনের ঘোরাঘুরির ক্লান্তিতে ডিভানটার উপর গা এলিয়ে দেয় অনীতা। ক'দিন ধা বেড়ানো সুরু হয়েছে, নিউইয়র্ক সহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত চষে ফেলা হচ্ছে। যা উৎসাহ মিহুদি আর প্রশান্তদার—সারাদিনই দু'জনে গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন। দিন তিনেক হ'ল মিহুদি আর প্রশান্তদা ওয়াশিংটন থেকে নিজেদের গাড়ী নিয়ে নিউইয়র্কে এসেছেন; আছেন অনীতাদের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কাছে—কিংস্ ক্রাউন হোটেলে। প্রশান্তদা এ দিকটাতে থাকতে ভালবাসেন; সহরের ভীড় আর অত উঁচু উঁচু বাড়ীর ধাক্কাতে নাকি ওঁর নিঃশ্বাস বন্ধ এবং দৃষ্টি ব্যাহত হয়। গতবার এসেও মিহুদিরা এই কিংস্ ক্রাউন হোটেলেই উঠেছিলেন। অনীতা তখন সবে কলকাতা থেকে সবাইকে ছেড়ে একটা স্কলার-শিপ পেয়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছে। এত বড় সহরে বিশেষ কাউকেই তখন চেনে না; মিহুদি আর প্রশান্তদাকে পেয়ে সে সময় কী ভালই যে লেগেছিল। ওঁরাই উৎসাহ করে সে সময় অনীতাকে নতুন সহরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন—এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং-এর ১০২ তলার উপরে নিয়ে যাওয়া, সেখানে নিজের গলার স্বর রেকর্ড করানো, সেখান থেকে বন্ধুবান্ধবদের কাছে চিঠি লেখা—সবটাতেই অনীতা লক্ষ্য করেছে যে তার নিজের চেয়ে মিহুদিদের উৎসাহ অনেক বেশী।

সন্ধ্যাবেলায় মিহুদি টাইমস্ স্কোয়ারে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসেন; ব্রডওয়ে ফরটিসেকেণ্ড ষ্ট্রীট, কিথ্ এ্যাণ্ড্রিনিয়ু, এ্যাণ্ড্রিনিয়ু অফ দি আমেরিকানস-এ বার বার চক্কর দিয়েও মিহুদির ক্লান্তি নেই। মিহুদির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য প্রশান্তদা এবং অনীতাকেও ঘুরতে হয়, কিন্তু অনীতা ভেবে পায় না এই এত বেশী আলোঝলমল রাস্তায় লোকে বেড়িয়ে কি সুখ পায়। মিহুদিদের উৎসাহ রাত্রে ডিনারের পরও মেটে না, আবার অনীতাকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যায় সিনেমায়—ফিরতে সেই রাত্রি একটা; সে সময়েও এই নিশাচর সহরের চোখে নিদ্রার লেশমাত্র নেই—অনবরত বাস আর গাড়ী চলছে। রাত্তিরে মিহুদিরা বাসেই ফিরেছেন। অত রাত্রে ফিরে এসে পার্কিং-এর জায়গা খোঁজার ভয়ে প্রশান্তদা আর সে সময়ে গাড়ি নেন নি, গাড়িটা অচলগড়ের রাজা হয়ে রাস্তার শোভা বর্দ্ধনই শুধু করছে।

পরের সকালবেলাই আবার মিহুদিদের সঙ্গে অনীতা গেছে ইউনাইটেড নেশনসের বাড়ীটা দেখতে। মিহুদিরা সঙ্গে থাকাতে জেনারেল এ্যাসেমব্লির একটা মিটিংও তারা দেখে এসেছে। হেড্-ফোনটা কানে দিয়ে চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানা ভাষার বক্তৃতাটা শুনতে অনীতার যা মজা লেগেছিল; আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিতও হচ্ছিল অনুবাদকারীদের অদ্ভুত তৎপরতায়। কী করে যে লোকে এত তাড়াতাড়ি অনুবাদ করতে পারে অনীতা ভেবে পায় না; একবারও মনে হয় না যে বক্তৃতাটার অনুবাদ শুনছি—মনে হয় বক্তার মুখের কথাই আগাগোড়া শুনছি। অনীতা ছেলেমানুষের মত ভাবে এ চাকরীটা ওকে দিলে কী খেলেছারিই না হয়। সে নিজে কখনও এমন ক্ষিপ্রগতিতে অনুবাদ করতে পারবে না। নিজের মনেই হেসে ওঠে অনীতা, কী আবোল তাবোল ভাবছে সে। এ চাকুরী নিতে যেন সাধছে সবাই

তাকে। কত দেশের লোকই না দেখা যায় এই ইউনাইটেড নেশন্‌সের প্রাঙ্গণে। এখানেই তো "ব্রাতরঃ মানবাঃ সর্বে" করার একটা চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। মিসুদির সঙ্গে অনীতাও গতবার ইউনাইটেড নেশনসের গেস্টহাউসের দোকান থেকে দু' চারটা ছোট ছোট জিনিষ কিনে নিয়েছিল; কী সুন্দর করেই না সব দেশের শিল্প নিদর্শন সাজানো আছে ছোট দোকানটায়। গতবারের কেনা পিতল খোদাই করা আর্ক'টা অনীতার ভারী প্রিয়।

ইউনাইটেড নেশন্‌স থেকে ম্যানহাটানে আসতে অনীতাদের কত যে সময় লেগেছিল। গাড়ির ভিড়ে গাড়ি চলা দায়। শম্বুকগতিতে গাড়িগুলি চলতে থাকে; দক্ষিণ ম্যানহাটান পৌঁছতেই এক যুগ—সেখান থেকে আবার দক্ষিণ ফেরী। দক্ষিণ ফেরী থেকে বোটে করে বেডলো দ্বীপে ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখতে যাওয়া। সেই বোটে কত দেশ বিদেশের লোকের ভিড়, সবাই চলেছে বিশ্ববিখ্যাত মূর্তিটি দেখতে। বোটে দেখা সেই ফরাসী মেয়ে দু'টির যেন একটু গর্বের ভাবও সেই সঙ্গে মেশান ছিল —পৃথিবী-বিখ্যাত মূর্তিটি ফরাসী শিল্পীরই হাতের কাজ।

বোটে উঠেই পোলারয়েড ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার ধুম পড়ে গেল চারদিকে। পোলারয়েড ক্যামেরার ভারী সুবিধে—ছবিটা তখন তখনই বোঝা হয়ে একেবারে বের হয়ে আসে। ছবিটা কী রকম উঠল সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যায়। একটা ভাল না হলে তখনই আর একবার ছবি তোলা যায়। একটা পোলারয়েড ক্যামেরা কিনবার সখ অনীতার কিন্তু দেশে ফিরলে তো আর ক্যামেরার ফিল্ম পাওয়া যাবে না—এই ভেবেই আজও পর্যন্ত পোলারয়েড ক্যামেরা কেনা হ'ল না অনীতার। প্রশান্তদা সেবারে অনেক ছবি তুলেছিলেন। বোট থেকে নেমে ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখতে গিয়ে অনীতা তো লিফটে ব্যালকনি অবধি উঠেই থেমে গিয়েছিল, মিসুদিরা আগে আরও আসা সত্ত্বেও সেবারও স্পাইরেল বেয়ে একেবারে উপরে উঠেছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসেও দু'জনের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে নি; হেরাল্ড স্কোয়ারে এসে আবার ঢুকেছেন মেসি-র দোকানে বাজার করতে। ওয়াশিংটনে বান্ধবীদের হাতে চমৎকার দস্তানা, sheer নাইলনের মোজা, নতুন ধরণের স্কার্ফ আরও কি সব দেখেছিলেন সে সব এখনই 'মেসি' থেকে না কিনলেই নয় মিসুদির। এতবড় যে দোকান থাকে দেশে থাকতে ধারণাই ছিল না অনীতার।

মিসুদিদের সঙ্গেই অনীতা দেখতে গিয়েছিল প্ল্যানেটারিয়াম। ভারী ভাল লেগেছিল; দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হয়েছিল সত্যি তারা তরা আকাশই যেন দেখছে। হলের বাইরে এক এক গ্রহে নিজের কী রকম ওজন হবে সেই ওজন নেবার যন্ত্রগুলোতে উঠে ছোট মেয়ের মত খুশী হয়ে উঠেছিল অনীতা।

কোথায় আছে মেট্রোপলিটান আর্ট মিউসিয়াম, কোথায় মডার্ণ আর্ট মিউসিয়াম কিছুই মিসুদির কল্যাণে বাদ পড়েনি। সিলোন-ইণ্ডিয়া রেস্তোরাঁয় ঢুকে দিশী রান্না অবধি খাওয়া হয়েছে। কার্নেগী হলের অর্কেষ্ট্রাটাই শুধু গতবার শোনা হয় নি, অত তাড়াতাড়ি কিছুতেই টিকিট পাওয়া গেল না। সে আপশোসটা এবার মিটিয়ে যেবেন প্রশান্তদা—এসেই এ সুসংবাদটা জানিয়ে রেখেছেন।

গতবার ব্রুকলিনে কোনী আইল্যাণ্ডেও গিয়েছিল অনীতারা। অ্যাটলান্টিকের উপর সুন্দর জায়গা, তিন মাইল লম্বা বেলাভূমি। কিন্তু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার আতিশয্য মনকে আঘাত করে। মিসুদিরা সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও ওখানকার লোকগুলির চাহনি এবং ভাব-ভঙ্গি অনীতাকে অস্বস্তিতে ভরে দিয়েছিল; কেমন গা ছম ছম করছিল। এত সুন্দর জায়গাটাও তাই ঠিকমত উপভোগ করতে পারে নি।

কিন্তু রকফেলার সেণ্টারে কি আনন্দেই না সারাটা বেলা কেটেছে অনীতার। রেডিয়ো সিটি যেন একটা আলাদা জগৎ। আধুনিক বিজ্ঞানের দান—ইলেকট্রনিকস্, রেডিও, টেলিভিশন, রাডার, ইলেকট্রনিক

যন্ত্রপাতির সাহায্যে গ্রহে সংবাদ প্রেরণ, নাবিকদের কাজের সুবিধার জন্য আধুনিকতম যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক মাইক্রোসকোপ—কত যে সেখানে দেখা যায়। অনীতার অবশ্য সবচেয়ে বেশী আনন্দ হয়েছিল নিজেকে টেলিভিশনে দেখে; দেখে দেখে অনীতার যেন আর আশ মিটছিল না, অবশেষে প্রশান্তদার তাড়ায় মিসুদি এবং অনীতাকে এ কৌতুক ছেড়ে আসতে হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে অনীতা এ দেশে এসেছে; এখন পর্যন্ত এদেশের বিশেষ কিছুই সে দেখে নি। এ দেশটাকে সে ভাল ক'রে দেখতে এবং বুঝতে চায় অনীতা। শুধু পাঠ্য বইয়ে মুখ গুঁজে রেখে একটা ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরবার ইচ্ছা নেই তার। ফিরবার আগে যতটা পারে এ দেশটাকে দেখে এবং বুঝে নেবে অনীতা।

সেবার নিউইয়র্ক থেকে ফিরবার সময় মিসুদিরা জোর করে ওঁদের সঙ্গে অনীতাকে ওয়াশিংটন নিয়ে গিয়েছিলেন। ওয়াশিংটন যাওয়ার পথে মিসুদিদের সঙ্গে অনীতা প্রিন্সটনে তিনদিন কাটিয়ে গেছে। অনীতারা ছিল প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটু দূরে পাইন-উড মোটেলে। মোটেলে (মোটর + হোটেল)। এর আগে অনীতা আর কখনও থাকে নি। নিউইয়র্কের উঁচু উঁচু বাড়ীগুলো দেখে দেখে ঘাড় ব্যথা এবং চোখের দৃষ্টি ঘোলা হবে যাওয়ার পরে প্রিন্সটনের গাছপালায় সবুজের সমারোহ অনীতাকে ভারী আরাম দিয়েছিল। নিউইয়র্কে তো সেন্ট্রাল পার্কে না গেলে সবুজ গাছপালা দেখবারই উপায় নেই। অনীতারা অবশ্য সেদিক থেকে অনেক সৌভাগ্যবতী; অনীতাদের ডর্মিটরির চারপাশে সুন্দর গাছপালা, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও গাছপালার দুর্ভিক্ষ নেই, কলাম্বিয়ার পাশের রিভারসাইড ড্রাইভ এবং হেনরি হাডসন ড্রাইভ অনীতার প্রিয় জায়গা, কত সময় বন্ধুদের নিয়ে অনীতা এই হাডসন নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রিন্সটনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভিন্ন ধরণের; পাইন গাছে ঘেরা প্রকৃতির কোলে এই মোটেলটার স্মৃতি অতি মনোরম হয়ে অনীতার মনে আঁকা আছে। আইনস্টাইনের পুণ্যস্মৃতি জড়ানো এমন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় এবং এমন প্রাকৃতিক পরিবেশ একসঙ্গে পাওয়া দুর্লভ। ওয়াশিংটনে মিসুদিদের বাড়ীতে ক'টা দিন অনীতার অফুরন্ত আনন্দে কেটেছিল। খাওয়া দাওয়া, লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, এবং সর্বোপরি মিসুদি ও প্রশান্তদার আদর যত্নে আবার যেন ক'লকাতার নিজেদের বাড়ীর স্বাদ পেয়েছিল অনীতা। মিসুদিদের গাড়িতে জর্জ ওয়াশিংটনের বাড়ী মাউন্ট ভার্নন দেখতে গিয়েছে, জ্যোৎস্নারাতে পোটোম্যাক নদীর ধারে হেইন্‌স্ পয়েন্টে ঘুরে বেড়িয়েছে। জেফারসন মেমোরিয়েলে চেরীফুলের উৎসব দেখেছে; চেরীফুলগুলি এত সুন্দর, মনে হয় এগুলো যেন সত্যি নয়, শুধুই মরুদ্যান-এর স্বপ্ন। ১৮৫৩তে কমোডোর পেরী জাপানে গিয়ে সেখান থেকে চেরীফুলের গাছ আমেরিকায় নিয়ে আসেন; সেই থেকে প্রতি বছর এপ্রিল মাসে জেফারসন মেমোরিয়েলে চেরী ফুলের উৎসব হয়। বিভিন্ন রাজ্য (স্টেট) থেকে মার্কিন সুন্দরীরা আসেন চেরীপুষ্পের রাণীর আসনের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে।

সেবার সবল বলে মিসুদিদের সঙ্গে স্কাইলাইন ড্রাইভে পিকনিকেও গিয়েছিল অনীতা। কত রকমের দিশী বিদেশী সুখাদ্যই যে সঙ্গে নিয়েছিলেন মিসুদি এবং তাঁর বন্ধুরা। দলের মধ্যে সান্যালমশাই ছিলেন খুব রগচটা লোক, সব সময়ই তিনি অমিয়ে রাখতেন। মিসুদির বন্ধুরা প্রত্যেক পরিবারই এক একটি খাদ্য রান্না করে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্কাইলাইন পিকনিক গ্রাউণ্ডে গিয়ে মিসুদিরা আগেই একটি বড় টেবিল অধিকার করে ফেলেছিলেন, এক আঁটি জ্বালানি কাঠ কিনে খাবার-গুলো গরম ক'রবার ব্যবস্থাও চটপট করে নিলেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত সাহেবদের দেখা নেই। সবগুলো গাড়ি একই সময়ে রওনা হয়েছিল, আর সব

গাড়িই এসে গেছে কিন্তু দাশসাহেবদের গাড়ির কোনই পাত্তা নেই। দাশসাহেবের গাড়ি না আসাতে সবাই উদ্বিগ্ন, প্রশান্তদা তো প্রায় গাড়ি নিয়ে খুঁজতে যাওয়ার উপক্রম করছিলেন। সান্যাল মশাই পরিস্থিতিটা হালকা করে দিয়ে বলে উঠলেন যে, দাশসাহেব এখনই এসে পড়বেন সেজন্য ভাববার কিছু নেই কিন্তু আসল সমস্যা হচ্ছে যে পোলাওয়ের হাঁড়িটা রয়ে গেছে দাশসাহেবের গাড়িতেই; তাই যতক্ষণ ওঁরা এসে না পৌঁছান ততক্ষণ এই শর্মা ব্রাহ্মণের তণ্ডুল বন্ধ। অবস্থাটা হালকা হয়ে চারদিকে একটা হাসির স্রোত বয়ে গেল।

মিনুদি হঠাৎ দূর থেকে দাশসাহেবের গাড়িটা দেখতে পেয়ে উল্লাসে হৈচৈ করে উঠলেন। সান্যাল মশাই বলে উঠলেন—যাক্ মশাই ধড়ে প্রাণ এলো, পোলাওয়ের অভাবে সুখাদ্যগুলো কোলে নিয়ে আর বসে থাকতে হবে না, দক্ষিণ হস্তের খেলাটা এখনই সুরু করা যাবে। জানেনই তো 'ভোজনে নৃত্যন্তি বিপ্রাঃ'। মিসেস সান্যালের দিকে একটা কটাক্ষ করে সান্যাল মশাই বলেন—বাড়ীতে তো আমি মাত্র দু'টো কোর্স' খাই—এক নিরামিষ আর এক আমিষ। চারদিকে আবার একটা হাসির ঘুম পড়ে গেল। খাওয়ার পরে অনেক কটো তোলা হ'ল, পায়ে হেঁটে চারদিকটা একটু ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যাবেলা আবার গাড়ি নিয়ে ফিরে আসা গেল। কটা দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেছে, টেরও পায়নি অনীতা। অফিস থেকে ফিরে প্রশান্তদা মিনুদি ও অনীতাকে নিয়ে সারা ওয়াশিংটন ঘুরে বেড়াতেন। রক-ক্রীক্ পার্ক তো অনীতার অতি প্রিয় জায়গা হ'য়ে উঠেছিল। চলতে চলতে তারা এক একদিন সহর ছাড়িয়ে চলে যেতো—কোনদিন যেতো ইষ্ট ওয়েষ্ট্ হাইওয়ে ধরে। মিনুদি আবার ফ্রেডরিশ হাইটের সুপার-মার্কেটে বাজার করে নিতেন। কোনদিন তারা চলে যেতো "ফ্রট ফিফ্‌টি" ধরে। চলতে চলতে এক একদিন কতদূরে যে চলে আসতো; বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেতো। একটু বেশী রাত্রে ডিনার খাওয়া হ'তো, খেতে খেতে কত রকম গল্পই না হ'তো। ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এসে নিউইয়র্কের ডর্মিটরিতে আর মনই ব'সতো না অনীতার। আগের সেমিষ্টারে অনেক ক্লাস ক'রে অনেক পয়েন্ট ক'রে রেখেছে অনীতা; এ সেমিষ্টারে ক্লাস অনেক কম ক'রলেও তার চলবে।

সুসান, ফ্লোরি এবং অ্যানের সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছে অনীতার। এরা কেউ নিউইয়র্ক ষ্টেটের মেয়ে নয়। সুসান ইলিনয়েসের মেয়ে। ওর বাবা শিকাগোতে ডাক্তার। বেশ পড়ুয়া ধরণের মেয়ে সুসান; এখানকার মেয়েদের মত বাপ মার শাসনের বাইরে স্বাধীনতা ভোগ ক'রবার জন্যই সে কলম্বিয়াতে আসেনি; নিজের ষ্টেটেই আবদ্ধ না রেখে মেয়ের দৃষ্টির প্রসার বাড়াবার জন্যই সুসানের বাবা মেয়েকে দূরে পাঠিয়েছেন; বড়দিনের ছুটিতে সুসি অনীতাকে তাদের শিকাগোর বাড়ীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল,—জানিয়েছিল যে অনীতাকে পেলে সুসির বাবা মাও খুব খুসী হবেন। কিন্তু তখনও সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারেনি অনীতা, তাই সুসিদের বাড়ীতে যাওয়াও হয়ে ওঠেনি।

এবার চার বন্ধু মিলে ঠিক করেছে সামনের সপ্তাহে কলেজ ছুটি হলে তারা গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন বেড়াতে যাবে। প্রথমে সুসিদের শিকাগোর বাড়ীতে দু' দিন থাকবে, শিকাগো বেড়িয়ে সেখান থেকে যাবে গ্রাণ্ড ক্যানিয়নে। বড়দিনের সময় অনীতাকে সুসি শিকাগোতে বেড়ানোর অনেক প্রলোভন দেখিয়েছিল। সুসিদের বাড়ীটা লেকের কাছে, নর্থ ক্লারেনডন এ্যাভিনিয়ুতে; সে অঞ্চলে ইঁট কাঠ দেখে দেখে চোখ ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ঘোড়ে করে কেমন তারা লেক মিশিগানে ঘুরে বেড়াবে—সে কেমন দুই লেভেলের জল—নীচু লেভেলের জলে বোটটা বাঁধা থাকে, তারপর লকগেট খুলে নৌকোটাকে

কেমন মিসিগান হ্রদের উঁচু জলে নিয়ে আসে। কী যে মজা লাগে এই সমুদ্রের মত বিশাল হ্রদে ছোট নৌকো নিয়ে ভেসে বেড়াতে। লেকের ধারে মিসিগান অ্যাভিনিয়ুতে ঘুরে বেড়াতেও কত যে ভাল লাগবে। লেক-সাইড ড্রাইভে মোটর করে ঘুরে বেড়ানোর নাকি তুলনা হয় না। অত বড় সহরের বুকের উপরে অত সুন্দর এবং অত বড় বীচও সহরে মেলে না। 'দার্শাল ফিল্ডের' দোকানে বাজার করার আকর্ষণই বা কম কি। সারেল্স মিউজিয়ামটা ভাল ক'রে দেখতেই তো অনীতার দু'টো দিন কেটে যাবে। পুরো সাইজের কয়লার খনি সে মিউজিয়ামে আছে, লিফ্‌ট দিয়ে একেবারে খনির গর্ভে নেমে যন্ত্রপাতির সাহায্যে কি ভাবে খনির কাজ চলে সব দেখে আসা যায়। একদিকে রয়েছে আমেরিকান চাষীদের জীবনযাত্রা প্রণালী দেখানো। প্রধান সাইজের বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, দরজায় মস্ত মস্ত গাড়ি দাঁড়ানো। এক পাশে ট্র্যাক্টর প্রভৃতি কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রপাতি। কত যে দেখবার জিনিষ আছে—কোনটা ছেড়ে কোনটার নাম করবে সুদি। একদিকে আছে টেলিফোনে নিজের গলার স্বর নিজে শুনবার ব্যবস্থা। সেখানটায় সব সময়েই নাকি ঘা ভিড় থাকে, আধ মিনিটের নিজের গলার স্বর বেশীক্ষণ নিজে শুনবারও উপায় নেই।.....কিন্তু তবী ভুলবার নয়, সেবার সব প্রলোভনই কাটিয়ে উঠেছিল অনীতা। এবার কিন্তু শিকাগো ভ্রমণের প্রোগ্রাম তৈরী ক'রতে অনীতার উৎসাহ কারো চেয়েই কম নয়। বেড়ানোর আলোচনা করে তরুণীরা এখনই অনেকটা আনন্দ উপভোগ করে নিচ্ছে।

ক্লোরি এসেছে ফিলাডেলফিয়া থেকে। ফিরবার পথে একদিন ক্লোরিদের বাড়ীতে থেকে এই পুরণো সহরটা অনীতা দেখে নেবে। সুসি অবশ্য ঠাট্টা করে বলে, ক্লোরিদের ঐ পুরণো সহরে চেষ্টনাট স্ট্রীট আর ওয়ালনাট স্ট্রীটের সরু গলিতে কী বা দেখবার আছে। কিন্তু নাইবা থাকলো সেখানে আমেরিকার অন্যান্য আধুনিক সহরের মত প্রশস্ত রাস্তা, কিন্তু যেখানে জাতির ইতিহাস তৈরী হয়েছে সেই ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স হল, লিবার্টি বেল প্রভৃতি বিখ্যাত জায়গাগুলি না দেখে কি করে পারে অনীতা। ক্লোরি অনীতাকে গেটিস্‌বার্গেও নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছে। এব্রাহাম লিঙ্কনের মানুষের মুক্তির বাণী যেখান থেকে ঘোষিত হয়েছিল সে পুণ্যভূমি একবার নিজের চোখে দেখে এবং অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে না এলে অনীতার শান্তি নেই। ভার্জিনিয়ার জর্জ টাউন এবং ইয়র্ক টাউনে ইংরেজের সঙ্গে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি বা ফিলাডেলফিয়া কংগ্রেসের ট্যাক্স না দেওয়ার সঙ্কল্পের স্মৃতি আমেরিকানদের মনে তত জীবন্ত নয় যতটা জীবন্ত গেটিসবার্গের সিভিল যুদ্ধের স্মৃতি। অজানা সৈন্যরা—যারা মানুষের মুক্তির জন্য প্রাণ বিসর্জন করেছিল—সেই সব বীর শহীদের স্মৃতির উদ্দেশে অনির্বাণ অগ্নিশিখা জালিয়ে রেখেছে সেখানে। গেটিস্‌-বার্গ মিউজিয়ামে নাকি দু'টো ভিন্ন রঙ্‌এর ইলেকট্রিক বাতির সাহায্যে উত্তর এবং দক্ষিণের সৈন্য বাহিনীর অবস্থান এবং সৈন্য পরিচালনা বিশদভাবে দেখানো হয়। ছেলেবেলা থেকে এসব দেখে এখানকার ছেলেমেয়েদের কাছে দেশের ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ওঠে।

অ্যান এসেছে নিউইংল্যাণ্ড থেকে। তার কথাবার্তা ধরণ ধারণের মধ্যে এখনও কোথায় যেন ইংল্যাণ্ডের ছাপ রয়ে গেছে। নিউ ইংল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা অনীতা বহুবার মিছদিদের কাছে শুনেছে। সেবার মেইন্ বেড়িয়ে এসে মিসেস সেখানকার বর্ণনায় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। অক্টোবর মাসে পাতার রঙ্‌ বদলাবার সময় নিউ ইংল্যাণ্ড নাকি অপূর্ব হয়ে ওঠে। সে সময়ে মেরিট পার্কওয়ের নাকি তুলনা মেলে না; নিউইয়র্ক টার্ন পাইকের মত সেটা শুধু টানা লম্বা রাস্তাই নয়, দু'পাশের

গাছপালার বর্ণ বৈচিত্র্যে রঙীন ছবির মত অপূর্ব সুন্দর মেরিট পার্কওয়ে। কবে যে যেতে পারবে অনীতা সে সব দিকে।

নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের পশ্চিম দিকে গেলে নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখে আসবে সেই সঙ্গে। নায়েগ্রা যাবার নাম ক'রলে এ-দেশী বন্ধুরা নানা রকম ঠাট্টা করে; অনীতা বোঝে না এতদূরে এসে সেই ছেলেবেলায় পড়া নায়েগ্রা জলপ্রপাত না দেখে কি করে ফেরা যায়; ওরা কি ভারতবর্ষ দেখতে গিয়ে তাজমহল না দেখে ফিরতে পারবে? বন্ধুরা বলে জোড়ায় জোড়ায় নবদম্পতিরা নাকি মধুযামিনী যাপন ক'রতে নায়েগ্রা যায়। রেইন বো ব্রীজের উপর থেকে নায়েগ্রা দেখে দু'জনে দু'জনকে আরও বেশী করে ভালবেসে ফেলে; ব্রাইডাল ভেইলের কাছে হাত ধরাধরি করে দু'জনে ঘুরে বেড়ায়; রাত্রে আবার তারা এসে নায়েগ্রার জলে রঙীন আলোর খেলা দেখে; নিজেদের মনে রঙ্এর নেশাও সেই সঙ্গে নিবিড় হয়ে ওঠে।

মিসুদিদের কানাডা ভ্রমণ কাহিনী অনীতা অনেকবার শুনেছে। নায়েগ্রা থেকে মিসুদিরা ছুটেছিলেন এলিজাবেথ পার্কওয়ে ধরে—এমন সুন্দর রাস্তা, পাশে পাশে রয়েছে লেক অণ্টেরিয়ো কখনও বা আমাদের দেশের পুণ্যতোয়া গঙ্গা নদীর মত পূর্ব কানাডার প্রাণদায়িনী সেণ্ট লরেন্স নদী। মিসুদিরা সারাদিন গাড়ি নিয়ে ছুটে 'গানানকী'তে এক মোটেলে রাত্তিরে ছিলেন। এই জায়গায় সেণ্ট লরেন্স নদী লেক অণ্টে-রিয়োতে মিশেছে এবং এখানটায় সৃষ্টি হয়েছে সহস্রাধিক দ্বীপ। আমেরিকা ও কানাডার ধনী লোকেরা এক একটি দ্বীপ নিয়ে তাদের গ্রীষ্মাবাস তৈরী করেছে। নৌকো করে তারা কিংষ্টন বা গানানকীতে আসে বাজার করতে; সাতদিনে একদিন ডাক বিলি হয় সে সব দ্বীপে। সভ্যতার চাপে সহরে দম বন্ধ হলে তারা এ জায়গায় গ্রীষ্মকালে এসে আবার দম নিয়ে যায়। শীতকালে এ সব দ্বীপ খাঁ খাঁ ক'রতে থাকে, জন মনুষ্যের দেখা মেলে না। এই সহস্র দ্বীপ বা থাউজ্যাণ্ড আয়ল্যাণ্ডসে মিসুদিরা বোটে করে কেমন এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এরই একটা বড় দ্বীপে স্বামী বিবেকানন্দ কিছুদিন ছিলেন। মিসুদিরা সেখানেও দু'দিন থেকে এসেছেন।

মিসুদির মুখে কুইবেকের গল্প শুনে জায়গাটা সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করে অনীতা। সেখানকার প্রাচীন দুর্গ, দিল্লীর মত সহরের বিভিন্ন গেট, পুরণো কামান, ফরাসী কায়দাকানুন যেন ভুলে যাওয়া পুরণো যুগকে অনীতার মনের সামনে টেনে আনে। মিসুদির মুখে লরেন্সিয়ান মাউণ্টেনের কথা শুনতে শুনতে অনীতার দু'চোখে স্বপ্ন ঘনিয়ে আসে; এত সুন্দর সুন্দর দেখবার জায়গা আছে, অনীতা কি কোনদিন এসব দেখে উঠতে পারবে? একা একা এসব জায়গা দেখেও সুখ নেই। প্রশান্তদা সঙ্গে থাকাতেই মিসুদি এমন ক'রে এত জায়গা দেখতে পেরেছেন এবং এমন করে উপভোগও ক'রেছেন।

কানাডা পর্যন্ত যদি অনীতা নাও যেতে পারে তবু মেইনে একবার অনীতাকে যেতেই হবে। অ্যান তো বহুবার অনীতাকে তাদের কানেক্‌টিকাটের বাড়ীতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। 'বার-হারবারে'ও অ্যানদের একটা কটেজ আছে। অ্যানের মা তার দিদিমার কাছ থেকে এ বাড়ীটা পেয়েছেন। ছেলে-মেয়েদের স্কুল কলেজ ছুটি হ'লে প্রতি বছরই অ্যানের মা বার-হারবারে চলে যান। অ্যানের বাবা অবশ্য কাজকর্ম ছেড়ে বেশীদিনের জন্য সেখানে যেতে পারেন না, কিন্তু ওরা ফিরবার আগে প্রতি বছরই তিনি কয়েকটা দিন বার-হারবারে কাটিয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে কানেক্‌টিকাটে ফিরে আসেন। বার-হারবারের দিনগুলির কথা বলতে বলতে অ্যান যেন অন্য জগতে চলে যায়; পাহাড় এবং সমুদ্রে মাখামাখি

সেসব জায়গা আমেরিকার কাছে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী এবং স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এক আলাদা রাজ্য। ক্যাডিলাক পাহাড় থেকে আটলান্টিক দেখার নাকি তুলনা হয় না। আর রায়-হারবার ন্যাশনাল পার্ক নাকি আমেরিকার শ্রেষ্ঠ পার্ক, তা ক্যালেফোর্নিয়ানরা যতই তাদের 'যোশ্টেমিটি' পার্কের গর্ব করুক না কেন।

সারাদিন ঘোরাঘুরির ক্লান্তিতে ডিভানের উপরেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল অনীতা। হঠাৎ ডিনার গঙ্গ এর আওয়াজে চমকে উঠলো। মিসমিসের সঙ্গে ঘুরে এসে সেই পোষাকেই ঘুমিয়ে পড়েছিল অনীতা। এবার তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে শাড়ীটা বদলে নিতে হবে খাবার ঘরে যাওয়ার আগে। চিঠিপত্রের খোঁজও নিতে হবে একবার। আজ লস এঞ্জেলেস থেকে সুবীরের চিঠি আসার কথা। এর আগের চিঠিতে অনীতা গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন বেড়াতে যাচ্ছে শুনে সুবীর আনন্দ প্রকাশ করেছিল। সুবীরও সে সময়ে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন এসে অনীতার সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে চায়। সুবীর অবশ্য এর আগেই গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন দেখে গেছে কলেজের দলবলের সঙ্গে। এবার তার মেক্সিকো যাবার প্ল্যান ছিল—এবং সম্ভব হলে দক্ষিণ আমেরিকাটাও এক নজর দেখে নেওয়ার ইচ্ছা। অনীতা গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নে আসছে শুনে তার সব প্ল্যানই অবশ্য ওলট পালট হয়ে গেছে; এখন গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নে এসে অনীতার সঙ্গে দেখা করতে পারলেই সে সব চেয়ে বেশী খুশী হবে। এখন শুধু অনীতার সম্মতির অপেক্ষা।

হাত মুখ ধুয়ে শাড়ি বদলে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসে অনীতা। চিঠির খোঁজ নিতে এসেই দেখে সুবীরের চিঠি এসেছে। আগ্রহভরে খামটা ছিঁড়ে পড়তে সুরু করে অনীতা। সুবীর লিখেছে, পরশুদিনই সে নিউইয়র্ক আসছে। এ'পর্যন্ত সুবীরের নিউইয়র্ক আসা হয় নি। এতবড় দেশের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে পূর্বপ্রান্তে আসা সহজে হয়ে ওঠে না। নিউইয়র্ক দেখবার ইচ্ছার চেয়ে অনীতাকে দেখবার ইচ্ছাই অবশ্য সুবীরের প্রবল,—একথা জানাতেও সে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করে নি। অনীতার গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন আসা পর্যন্ত সে ধৈর্য ধরতে পারছে না। এবারের ছুটিটা নিউইয়র্কেই কাটালে কি অনীতা খুব বেশী নিরাশ হবে? সুবীর চিরদিনই এমনি চঞ্চল, আর এমনি দিলখোলা; কোন বিষয়েই কোনদিন রেখে ঢেকে কথা বলতে জানে না। এ নিয়ে ক'লকাতায় থাকতে অনীতাকে বাবা মা এবং দাদাদের সামনে কতবার যে অপ্রস্তুত হতে হয়েছে। সুবীর এবং অনীতা বালিগঞ্জে একই পাড়ায় মানুষ। দু'বাড়ীর সৌহার্দ্যও অনেক দিনের। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময় অনীতা ও সুবীরের বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়েছে। এ নিয়ে দু'বাড়ীরই একটু সন্দেহ প্রশ্রয় আছে।

দু'দিন পরেই সুবীর আসছে: অনীতার সমস্ত হৃদয় গভীর আনন্দে নেচে ওঠে। এবার গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন না যেতে পারলে অনীতার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই; অবশ্য না যাওয়ার একটা সঙ্গত কারণ সুলানদের জন্য তৈরী করে রাখতে হবে। নাইবা গেল অনীতা অন্য কোথাও—নিউইয়র্কের মত জায়গা হয় না। আর শুধু শুধু অনেকগুলি জায়গা দেখে বেড়ানোরও কোনো মানে হয় না—তাতে অনেক পয়সা নষ্ট, অনেক সময় নষ্ট।

———

রম্যাণি বীক্ষ্য

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী

উৎকল পর্ব

(পূর্বানুবৃত্তি)

সাত

একজন বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে রামানন্দবাবু বাহিরে বসেছিলেন। খতাকে আমার সঙ্গে ফিরতে দেখে চমকে উঠলেন ভূত দেখার মতন। খতা তাঁকে আরও চমকে দিল, বলল : রামানন্দবাবু আজ কোথায় বেড়াতে যাচ্ছেন ?

সসম্ভ্রমে রামানন্দবাবু উঠে দাঁড়ালেন, বললেন : যেখানে বলবেন।

আপনি নিজে কিছু ঠিক করেননি ?

সে আবার ঠিক করা ! নটবর যা বলেছে, তাই মেনে নিয়েছি।

নটবর বুঝি আপনার রিক্সওয়ালা ?

নটবর নয়, নটবর, ব্রহ্ম।

খতা হেসে বলল : কোথায় কোথায় আপনাকে নিয়ে যাবে ?

ভদ্রলোক একরকম ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন, তার পরমুহূর্তেই তাঁর খাতা নিয়ে বাহিরে এলেন। খস খস করে পাতা উল্টে পড়তে শুরু করলেন : স্বর্গদ্বারে নিমাই চৈতন্যের মঠ, বিদ্যুরাশ্রম, মুলুকদাস বাবাজীর মঠ, স্বর্গদ্বার সখী, কানপাতা হনুমান—

খতা খিল খিল করে হেসে উঠল।

ওপাশের ঘর থেকে তার বৌদি ডাকলেন : খতা !

আসছি বৌদি।

হাসি শুনে রামানন্দবাবু থেমে গিয়েছিলেন, আবার শুরু করবেন কিনা ভাবছিলেন। খতা বলল : আমাকে সঙ্গে নেবেন ?

সঙ্গে ?

রিস্কর জন্যে আপনাকে ভাবতে হবেনা। আমাদের নাথ আসবে।

খতা নাথ বলল না, শুদ্ধ ভাবে নাথ বলল, থ অ। তারপরেই ঘরে গিয়ে ঢুকল।

রামানন্দবাবু বিহ্বলভাবে তাকিয়েছিলেন আমার দিকে। হেসে বললুম : আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে চাইছিল।

রামানন্দবাবু অভিভূত হলেন, বললেন : সত্যি !

সত্যি কি মিথ্যে, সে তো নিজের কানেই শুনতে পেলেন।

ব্যস্তভাবে ভদ্রলোক বললেন : তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিই আসুন।

যে বুড়ো ভদ্রলোক হাঁ করে বসেছিলেন, আমি তাঁকে নমস্কার করেছিলুম। তিনিও নিঃশব্দে আমাকে উত্তর দিয়েছেন। এইবারে পরিচয় হল। ভদ্রলোকের নাম মিষ্টার নিগম, দেশে এবং বিদেশে ব্যবসা আছে, সাধারণে অমায়িক ভদ্রলোক। হিন্দীতে আমার সঙ্গে কথা শুরু করেছিলেন। কিন্তু রামানন্দবাবুর তর সইছিলনা। তিনি আমাকে তৈরি হবার জন্য টেনে নিয়ে গেলেন। আমার দিকে চেয়ে নিগমবাবু শুধু হাসলেন।

নটবর মাইটার আগেই এল। রামানন্দবাবু তখন অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন। নটবরকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন : নাথ কোথায় ?

নাথ !

আরে তোদের হিন্দওয়ালা নাথ।

আমি বললুম : আপনি ব্যস্ত কেন হচ্ছেন ! প্রভু নাথ জগন্নাথ সবাই এসে সময়মতো হাজির হবে।

আস্তে আস্তে বললুম, এবারে তো ভাল সঙ্গী পেয়েছেন, আমাকে রেহাই দিন না।

একা আমার সঙ্গে বেরবেন কি ?

আমার সঙ্গে তো বেরিয়ে ছিলেন !

তা বটে।

আমার প্রস্তাব যে রামানন্দবাবুর ভাল লেগেছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু খতাকে সে কথা কী করে বলা যায় ! একটু ভেবে বললেন : আপনার তো যাবার একেবারে ইচ্ছেই ছিলনা। আমিই তো জোর করে নিয়ে যাচ্ছি।

ঠিক কথা।

তবে সে কথা আপনি বলুন।

নিশ্চয়ই বলব।

নিগমবাবু অল্প অল্প বাঙলা বোঝেন। হিন্দীতে বললেন : ঘরে বসেই বা কী করবেন ! তার চেয়ে একটু ঘুরে আসলে মন ভাল লাগবে।

মন ভাল লাগার কথায় আমি চমকে উঠলুম। বুড়ো কি আমার মনের সংবাদ খানিকটা পেয়েছেন, না এই নিস্পৃহতায় সন্দেহ করছেন আমাকে। বললুম : আপনার সঙ্গেই গল্প করে সময়টা বেশ কাটবে।

ঠিক এই সময়েই খতা বেরল সেজে গুজে। রামানন্দবাবু আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাড়া দিলেন নটবরকে।

খতা বলল : নাথ তো একা আসবেনা, আরও একজনকে ধরে আনবে। দাদা বৌদিও বেরবেন তো ?

তাই বুঝি।

রামানন্দবাবু খানিকটা ঝিমিয়ে পড়লেন। তারপরে সামলে নিয়ে আমাকে বললেন : এখানে বসে থেকেই বা কী করবেন !

নিগমবাবু বললেন : যান যান, ঘুরে আসুন। বসে গল্প করবার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

খতা বলল : আপনি কি যাবেননা ভাবছেন ?

রেহাই পেলে কৃতার্থ হই।

না খোশামোদ চাই ?

চাইবার অনেক বড় জিনিষ আছে। সামান্য খোশামোদের জন্যে কেন ভিখিরি সাজব।

এক সময় নাথ এল। সঙ্গে আর একজন রিক্সওয়ালা। ওটা তার বৌদির সঙ্গে নাথের রিক্সয় উঠলেন, তার দাদা উঠলেন আর একখানায়। ইচ্ছে করলে রামানন্দবাবু ওঁদের সঙ্গেই যেতে পারতেন, কিন্তু নটবর আগে থেকে এসে বসে আছে। সে গোলমাল শুরু করবে। তাতেই আমাকে ছেড়ে যেতে তাঁর আপত্তি হল। ওঁদের দাদাও বললেন : এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে, দুর্গা বলে উঠে পড়ুন।

বেশি আপত্তি করলে বিসদৃশ দেখাবে, তাইতেই আমি রিক্সয় উঠলুম।

ওঁরা আগে চলেছে, আমরা পিছনে। রামানন্দবাবুর বাঁ হাতে নোট বুক, আর ডান হাতে কলম। আমাকে বললেন : এদের মশাই বিশ্বাস নেই। যখন ভাড়া ঠিক করে, তখন নাম করে ছত্রিশ জায়গায়। মনে না রাখলেই বিপদ। রাস্তার ধারের গাছ আর পাথর দেখিয়ে সংখ্যা পূর্ণ করে নেবে।

আপনার সঙ্গে তো আর চালাকি খাটবেনা।

রামানন্দবাবু খুশী হয়ে বললেন : এই নটবর, মুখ বন্ধ করে চলেছিস কেন!

নটবর বলল : ওই যা, ওরা তো বেকলনা বাবু। হরিদাস ঠাকুরের সমাধি কি দেখবেন না?

কী বিপদ!

রামানন্দবাবু একবার এধারে দেখলেন, আর একবার তাকালেন সামনের দিকে। আমার মুখের দিকেও তাকালেন একবার। নটবর থামতে চাইছিল, কিন্তু রামানন্দবাবু বললেন : চল চল, ওদের পিছনেই চল। ও জায়গা না হয় ফেরার পথেই দেখব।

তার তো সুবিধে নেই বাবু, ফেরার অন্য রাস্তা!

আমি বললুম : দেখবার কী ছিল তাই বল!

নটবর বলল : হরিদাস ঠাকুরের নাম তো শুনেছেন, গৌরাঙ্গ গুরু হরিদাস! সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত মহাপ্রভু আর রাধারমনের মূর্তি।

বাস বাস, ওতেই আমাদের কাজ চলবে।

নটবর বলল : ঐ পথেই ছিল সারস্বত গৌড়ীয় মঠ। সেখানে বিষ্ণু লক্ষ্মী ও শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি। এখানে মঠের শেষ নেই বাবু, পুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠ, মিশন গৌড়ীয় মঠ, আর গোবর্ধন মঠ।

গোবর্ধন মঠ তো শঙ্করাচার্যের।

এসব পুরনো কথা। শঙ্করাচার্য ভারতে যে কয়টি মঠ স্থাপন করেছিলেন বেদান্ত চর্চার জন্য, তার মধ্যে দ্বারকার সারদা মঠ দেখিছি, দক্ষিণে শুনেছি শৃঙ্গেরী মঠের নাম আর হিমালয়ের উপর যোশী মঠ। শঙ্করাচার্য শুধু ধর্মরক্ষা করেননি, দেশকেও রক্ষা করেছিলেন। আজ তাঁর সম্মান রক্ষার কী ব্যবস্থা আছে, চুপিচুপি গিয়ে দেখে আসব।

রামানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : গোবর্ধন মঠে কী দেখবার আছে?

নটবর এক নিঃশ্বাসে বলে গেল : ভুবনেশ্বরী, পঞ্চরুদ্র, সত্যনারায়ণ, গৌরীশঙ্কর মহাদেব, গোপাল মূর্তি ও শঙ্করাচার্যের মূর্তি। রাস্তা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে মন্দির। তবে তাদের প্রচুর ফুলপাতার গাছ।

পথ চলতে চলতেই নটবর বলল : ওদিকে না গিয়ে ভালই হয়েছে। বালিবে কিমতি দিবা।

নটবরের মুখে হঠাৎ তার দেশের ভাষা শোনা গেল। রামানন্দবাবু বলে উঠলেন : ওটা কী হল!

নটবর তার অনবধানতার জন্য লজ্জা পেল। বলল : সমুদ্রের মতো বালি বাবু, গাড়ি ঠেলতে হয়, অথচ পা চলেনা।

রিক্স থেকে নেমে নেমে আমরা কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখলুম। বাসুদেব আশ্রমে কৃষ্ণমূর্তি দেখলুম, সিদ্ধবকুলে সেই প্রাচীন বকুল গাছ। গাছের গোড়া কেটে গেছে সৌচির করে, শুধু বাকলের সঙ্গে যুক্ত থেকে অত বড় একটা গাছ মাটি থেকে রস গ্রহণ করছে। নটবর বলল: বুঝলেন বাবু, এই বকুলের নিচে তপস্যা করে যবন হরিদাস সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

নাথ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, বলল: বকুলের কাহিনী বড় অদ্ভুত!

শুভা বলল: থাম থাম রাস্তায় আর তোমার কাহিনী শোনাতে হবে না।

গম্ভীরার আবহাওয়া সত্যিই বড় গম্ভীর, বড় শান্তিময়। সেখানে আমরা মহাপ্রভুর পাদুকা কমণ্ডলু ও কাঁথা দেখতে পেলুম। আর দেখলুম রাধাকান্ত মন্দির। বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য যেখানে মহাপ্রভুর সঙ্গে বেদান্তের তর্ক করেন, সে কাষ্ঠাসনটিও দেখলুম। মনে হল, এসব জায়গা ঠিক এমন করে দেখবার নয়। এখানে এসে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে হয়। এই স্থান গম্ভীর পরিবেশে স্তব্ধ আপ্লুত হবে, দেবতার দর্শন হবে চিন্তার গভীরতায়।

রিক্সায় চেপে রামানন্দবাবু বললেন: বকুলের কাহিনীটা বলতো নটবর।

নটবর যে ফাঁপরে পড়েছে তা আমি পিছনে বসেই বুঝতে পারলুম। কিন্তু হার মানবার ছেলে সে নয়, বলল: সে আর এমন কী গল্প। তেমন বাজ পড়লে তো গাছ পুড়েই যায়! তাকে একটু আরাম দেবার জন্য আমি বললুম: থাক তোমার বকুলের গল্প, তার চেয়ে এবারে কী দেখাবে তাই বল।

নটবর হাল ছেড়ে বঁ চলল, বলল: এবারে সোজা শ্বেতগঙ্গা। সেখানে শ্বেতমাধব দেখবেন। সেখা থেকে মার্কণ্ড সরোবর।

রামানন্দবাবু বললেন: ওঁদের রিক্সাওয়ালা এর চেয়ে জানে বেশি।

তারজন্যে আপনি ভাবছেন কেন! বাজার থেকে একখানা জগন্নাথ ক্ষেত্র মাহাত্ম্য কেনা যাবে। এসব খবর তাতে নির্ভুল থাকবে।

রামানন্দবাবু অপরিমিত খুশী হলেন, বললেন: ঠিক বলেছেন।

শ্বেতগঙ্গা একটি বাঁধানো চতুষ্কোণ সরোবর। পথের উপর নেমে এই সরোবরের তীরে এসে দাঁড়াতেই অদূর পারে খানিকটা দূরে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। শুভা তার দাদা বৌদির সঙ্গে অনেকটা এগিয়ে গেছে, কিন্তু পিছনে রামানন্দবাবুকে দেখতে পেলুমনা, কোথা থেকে এক ব্রাহ্মণ এসে শ্বেতগঙ্গার বিবরণ শোনাতে শুরু করলেন। ত্রেতা যুগের কাহিনী। শত বৎসর অনশন করবার পর শ্বেতরাজ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্গে জগন্নাথ দেবের অর্চনা করেছিলেন। এখন তিনি ভগবানের মৎস অবতারের সঙ্গে শ্বেত মাধব রূপে বিরাজিত।

ব্রাহ্মণকে আমি ইসারায় এগিয়ে দিয়ে রামানন্দবাবুর খোঁজে রাস্তায় এলুম। ভদ্রলোক নাথের সঙ্গে কথা কইছিলেন। কথা শেষ করে প্রসন্ন মনে ফিরে দাঁড়াতেই আমাকে দেখতে পেলেন। লজ্জিত হলেন কিনা বুঝতে পারলুম না। বললেন: বুঝলেন গোপালবাবু, সেই গল্পটা শুনে নিলুম। আমাদের হতভাগাটা কিছুই জানেনা।

বললুম: তাড়াতাড়ি দেখে নিন, নইলে আমাদের ফেলে রেখেই শুভারা চলে যাবে।

অ্যা, বলেন কি, এত তাড়াতাড়ি তারা চলে যাবে!

ভদ্রলোক তীরের মতো ছুটে গেলেন। শ্বেতগঙ্গা শ্বেতমাধব দর্শন করে শুভাদের সঙ্গে এক সঙ্গেই

ফিরলেন। ব্রাহ্মণটি পথ ছাড়েননি। রিক্সর কাছে এসে তিনি হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। নাথ বলল: খাণ্ডবদহনের গল্প বলেছ তো ঠাকুর?

ব্রাহ্মণ করুণভাবে তাকালেন।

বল নি?

কী করে বলি, কিছু বলতে গেলেই তো বকুনি খাচ্ছি।

চল চল।

বলে গুতা তার বৌদির পাশে বসল।

আমরাও তাদের পিছনে চললুম। আমাদের রিক্সচালক নটবরের অজ্ঞতায় যে রামানন্দবাবু ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তা তাঁর মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পারছিলুম। কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই নটবর বলল: নাথর এই দোষ। নিজের কাজ না করে সারাক্ষণ পরের চর্চায় তেল দেয়। আরে বাবা, তুই রিক্সওয়ালা। ভাল করে রিক্স চালালেই তোর ছুটি। ব্রাহ্মণ কী করল আর বলল, তা নিয়ে তোর মাথা ব্যথা কেন! কোনদিন কড়া সওয়ারি ওর গাড়িতে উঠলে নিশ্চয়ই লাথি খাবে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রামানন্দবাবু বললেন: হতভাগার পাকামি দেখেছেন। পাছে ওকে খাণ্ডবদহনের গল্প জিজ্ঞাসা করি, তাই আগেই লাফাই গাইছে।

সে গল্প তো আপনি জানেন।

বলেছেন বেশ। এই খেতপদ্মার সঙ্গে সম্বন্ধটাও কি মহাভারতে লেখা আছে!

যা নেই তা সত্য নয়। তা না জানার জন্যে দুঃখ কিসের।

মানে?

আমি নটবরকে জিজ্ঞাসা করলুম: এবারে কোথায় নটবর?

আজ্ঞে মার্কণ্ডেশ্বর সরোবর।

রামানন্দবাবু খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন, তারপর বললেন: সিদ্ধ বকুলের গল্পটা বোধ হয় জানেন না?

জানি না স্বীকার করলুম।

ভদ্রলোক বললেন: যবন হরিদাস মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। তপস্যা করতেন প্রখর সূর্যের নিচে। একদিন একখণ্ড বকুলের ডালে দাঁত ঘষতে ঘষতে মহাপ্রভু তাঁকে দেখতে এলেন। এসে তাঁর কষ্ট দেখে সেই ডালটি মাটিতে পুঁতে দিলেন। দেখতে দেখতে একটি বকুল গাছ বেড়ে উঠে তাঁর মাথার উপর স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করল।

অলৌকিক ব্যাপার।

তারপর শুনুন। জগন্নাথ দেবের নবকলেবর হবে। রাজা বললেন, ঐ বকুল গাছটি চাই। কিছুতেই কোন কথা মানলেন না। লোক পাঠালেন গাছটা কাটবার জন্য। তারা এসে দেখল, আশ্চর্য ব্যাপার। গাছ আছে, গুঁড়ি নেই। কাঠের বদলে ভেতরটা একেবারে ফাঁপা। শুধু বাকলের উপর ডালপালা। সিদ্ধ বকুলের আজও সেই একই অবস্থা।

আমি কোন মন্তব্য করলুম না দেখে রামানন্দবাবু বললেন: বিশ্বাস করলেন না বুঝি?

বিশ্বাস না করে তো উপায় নেই। সিদ্ধবকুল যে নিজের চোখে দেখে এলুম।

ঠিক বলেছেন। নিজের চোখে না দেখলে এসব গল্প বিশ্বাস করা কঠিন।

মন্দিরের পিছন দিয়ে ঘুরে আমরা মার্কণ্ডেয় সরোবরে পৌঁছে গেলুম। বেশ গ্রাম্য পরিবেশ। কিন্তু সরোবরটি বাঁধানো। মন্দির রাস্তার ধারেই। রিক্স থেকে নেমেই রামানন্দবাবু নাথুর পিছনে ছুটলেন। কিন্তু আমি সবিস্ময়ে দেখলুম যে নাথু তাঁর কথার জবাব দিল না! রাগতভাবে ভদ্রলোক ফিরে এলেন। আমি তাঁর ক্ষোভের কথা শুনলুম: তারি দেমাক দেখছি। দু'গণ্ডা পয়সা দিলে ঢের লোক পাওয়া যাবে।

পাওয়া নিশ্চয়ই গিয়েছিল। কেননা বিস্ময় বলেই ভদ্রলোক আমাকে শোনালেন মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র

বললেন: এসব গল্প আপনাকে পরে পড়ে কেন শোনাচ্ছি জানেন?

জানিনা।

মানুষের স্মৃতিশক্তির একটা সীমা আছে। এতগুলো জায়গা দেখে ফেরবার পর সবই হয়তো গুলিয়ে ফেলব।

আমাকে কি আপনি সাক্ষী রাখছেন?

আপনার বয়স কম, আপনার তো মনে রাখার বাধা নেই।

বাধা কারোরই নেই, কিন্তু মনে থাকে না সকলের।

বলবার জন্য রামানন্দবাবু ব্যস্ত হয়েছিলেন। বললেন মহা প্রলয়ের সময় মহর্ষি মার্কণ্ডেয় সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে শ্রীক্ষেত্রের নিকট এলেন। এবং নীল পর্বতের উপর অক্ষয় বটগাছ দেখতে পেলেন। আরও কাছে গিয়ে আরও আশ্চর্য হলেন! বৃক্ষমূলে ভগবান নীলমাধব। তিনি বললেন, বৎস, উপরে সর্বকালাম্বা বালকমূর্তি, তুমি তাঁর উদরে প্রবেশ কর। মহর্ষি তাঁর উদরে প্রবেশ করে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জীবজগতের সাক্ষ্য পেলেন।

আশ্চর্য!

শুনুন তারপর। মহর্ষি যখন সেই উদর থেকে বেরিয়ে এলেন, ভগবান বললেন, তুমি তীর্থ নির্মাণ কর। তাঁরই আদেশে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় সুদর্শন চক্র দিয়ে অক্ষয়বটের বায়ুকোণে এই সরোবর নির্মাণ করলেন। নাম হল হরিদ্রা খাত। মার্কণ্ডেয়র মহাদেবের যে মন্দির দেখলেন, সত্যযুগে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তা নির্মাণ করে দিয়েছেন। আজ এই তীর্থ দর্শনে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য হয়। এখন প্রতি বৎসর বারুণীতে উৎসব!

গল্প শুনতে শুনতে আমার ঘুম আসছিল। রামানন্দবাবু আমায় জাগিয়ে দিয়ে বললেন: হতভাগা নাথুর জন্যে আমার দুগণ্ডা পয়সা খরচ হয়ে গেল।

কেন খরচ করলেন?

উপায় কী বলুন!

উপায় তো বলেছিলুম, বাবারে একখানা তীর্থ মাহাত্ম্য কেনা যাবে।

রামানন্দবাবু তখন অন্য কথা ভাবছিলেন, বললেন: আমার কী মনে হয় জানেন? ঐ মেয়েটা নাথুকে কিছু শিখিয়েছে।

কী করে বুঝলেন?

হাসছিল আমাকে দেখে। বলছিল, খাতায় টুকে রাখুন, নইলে ভুলে যাবেন।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: কী ভুলই করেছি একদমে বেরিয়ে।

বললুম: যেতে দিন না ওদের। আমরা ধীরে ধীরে যাব।

রামানন্দবাবুকে বড় অসহায় দেখাল। বললেন: এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে।

করুণভাবে তাকালেন সামনের রিক্সর দিকে।

(ক্রমশঃ)

কঃ পন্থা

ডক্টর হরেন্দ্রনাথ রায়

সলিলাকে চাকরীটা কিন্তু জুটিয়ে দেয় অপরেশ।

বি. কম পাশ করা মেয়ে। পাশ করেছিল ভালভাবেই। সে সময়টা সে নিজেকে নিয়োজিত করেছিল সংসারে সচ্ছলতা বাড়াবার কাজে। তারপর কর্মফল, নিয়তি, ভাগ্যচক্র এদের তিনটেরই অথবা যে কোন একটির যোগাযোগে সে একদিন গৃহিণী হ'য়ে এল অপরেশের ঘরে।

তাই তার ভোজের দিকটা সে বোঝে একটু বেশী। স্বামীর ঘর করতে এসে এ দিকটা সে বুঝল আরও ভাল। বুঝল অধীত বিদ্যে আর ফলিত বিদ্যে ঠিক এক জিনিষ নয়। কাগজে কলমে গবেষণায় যা সচল, হাতে কলমে তা অচল। স্বামীর সব কিছুই তার কাছে মনোরম শুধু ভোগটাই ব্যতিক্রম। তাই সে থাকতে না পেরে একদিন বলে ফেলে, দাও না গো, আমাকেও একটা চাকরী জুটিয়ে। দুটো ত বন্ধ বাড়বে কিছুটা। এখন ত অনেকেই করছে আজকাল।

অপরেশ অপ্রতিভ মুখে বলে, সত্যি সময়টা আমার বড় কম। কেরাণীর চাকরী, কি করি বল। তোমার অদৃষ্ট।

সলিলা ভ্রূকুটি করে। বলে, আমি কি তাই বলেছি তোমায়? বলেছি যে আমার অদৃষ্ট খারাপ?

—আকারে বলনি বটে কিন্তু—

—প্রকারে বলেছি?

—বলাই ত উচিত।

—না, উচিত নয়। আমার ভাগ্য নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। তবে তুমি বেরিয়ে গেলে সারা দুপুরটা ছটফট করে মরি। একা একা ভালো লাগে না! তাই বলছিলুম চাকরী বাকরী যদি একটা পাই ত মন্দ হয় না।

কথাটা মনে লাগে অপরেশের। তাই সে সক্রিয় হয়ে উঠে তলায় তলায়।

অফিসের বড়বাবু দয়ালবাবু। সদাশিব মানুষ। তাকে বলে রাখে অপরেশ। কথাটাকে রেখে ঢেকেই বলে, ছা পোষা মানুষ স্যার, দেখলে দুঃখ হয়। স্বামীর আয় কম। সুন্দরী স্ত্রীর জন্যে চাকরী খুঁজছে একটা। আপনাকে বলবার জন্যে আমায় ধরেছে বড়। মেয়েটি বি, এ পাশ, ফর্মার্সে বি, এ। মনে হয় খারাপ হবে না কিছু।

দয়ালবাবু হেসে বলে, খারাপ হবে আমিও বলি না। তুমি যখন বলছ, সুযোগ পেলে জানাব তোমায়।

সুযোগ আসে। করে দেয় অপরেশই। প্রমোশন পেয়ে এক ধাপ উঠে যায় সে। দয়ালবাবু হেসে বলে, এ তোমার কৃতিত্ব অপরেশ, আমার কিছু নয়। তুমিই পথ প্রশস্ত করে দিলে তোমার প্রার্থীর। একখানা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিও, চেষ্টা করে দেখব একবার।

দয়ালবাবুর কথার নড়চড় হয় না। সলিলা চাকরী পায়। খুশিতে চঞ্চল হয়ে বার্তা বহে আনে অপরেশ। স্ত্রীকে বলে, মনে থাকে যেন—

—কি? সলিলা প্রশ্ন করে।

—তুমি সলিলা মুখার্জি, আর কিছু নও।

—নই ত। ব্যানার্জি ত আমি নিজেকে বলি না।

—তা বল না। কিন্তু এখন থেকে বলাই বোধ হয় ভাল হবে।

—কারণ?

—কারণ আমাদের বাহ্যিক কোন পরিচয় না থাকাই মঙ্গল।

—কেন?

—একবার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলেই সর্বনাশ। কচ্‌কে ছোঁড়ার দল, রক্ষে রাখবে না। অতিষ্ঠ করে তুলবে তোমাকে। এমনিতেই দেখবে, মাছি মক্ষিকার দল তোমাকে ঘিরে কেমন ভন ভন করবে সারাক্ষণ। বুঝেছ?

—বুঝেছি। সলিলা ঘাড় নেড়ে হাসে।

সলিলাকে চাকরী করতে যেতে হয়। তবে অপরেশের কথামত সে চাকরী করতে যায় না, মাথায় সিঁদুর এবং হাতে শঙ্খ বলয় নিয়েই সে চাকরী করতে যায়। দয়ালবাবু সুরসিক ব্যক্তি। প্রথম দিন থেকেই তিনি সলিলাকে নিজের ঘরে তার সীট করে দেন। বলেন, কাজ যদি শিখতে চাও এখান থেকেই শিখতে পারবে সব। ছেলে ছোকরাদের কাছ থেকে কাজ শিখতে পারবে না কোন দিনই।

সেইখান থেকেই কাজ শেখে সলিলা। সলিলা বুদ্ধিমতী। কিন্তু তার চেয়েও বেটা বড় গুণ তার, সেটা তার অসাধারণ স্মরণশক্তি। শুধু চাকরী জীবনে কেন, জীবনের সর্বস্তরেই এ গুণ পরম সম্পদ। সেই দয়ালবাবু বলেন সলিলাকে, তুমি জীবনে উন্নতি করবে, একথা আমি নিশ্চয়ই করে বলতে পারি। তোমার এ গুণটি বড় সহজ গুণ নয় জেন।

অফিসের মোটা মোটা পুরাণ ফাইল নিয়ে সলিলা নাড়াচাড়া করে। দয়ালবাবু উৎসাহ দেন। বলেন, ওদের মধ্যে কোম্পানীর অনেক তথ্যই খুঁজে পাবে যা যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। বিশেষ করে কোম্পানী ভার্সেস গিরিধারীলাল চৌহানের কেস্‌টা একটু ভাল করে দেখে রেখ, যে-কোনদিন কেসটা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। অনেক টাকার কেস এটা। হারলে কোম্পানীর সর্বনাশ। সলিলা বৃদ্ধের কথা শোনে। অবসর সময়ে পুরাণ ফাইলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে! কিন্তু এতটা সহ্য হয় না ছেলেদের। বলে, বুড়োটা আগ্‌লে আছে দেখ শ্রীমতীকে। তবুও যদি না নাতনীর বয়সী হ'ত।

—রস ত ঐখানে ভায়া। বলে কি জান? বলে, এমনটি নাকি আর হয় না। যেমন বুদ্ধি ধরে, তেমনি স্মৃতি ধরে। একেবারে সাক্ষাৎ স্মৃতিধরী। বুড়ো, সলিলা বলতে অজ্ঞান।

অপরেশ শোনে। স্ত্রীর কৃতিত্বে গর্ব অনুভব করে। সলিলার স্মৃতিশক্তি যে অসাধারণ এ কথা তার কাছে গোপন নেই। এই গুণটির জন্য দয়ালবাবু যে তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন এ কথাও সলিলা একাধিকবার গল্প করেছে তার কাছে। কিন্তু সহকর্মীদের আলোচনাটা একটু ভিন্ন খাতে চলেছে বুঝতে পেরেই সে প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার প্রয়াস পায়। বলে, বুদ্ধিমতীই হ'ক আর স্মৃতিমতীই হ'ক, তা নিয়ে

আমরা মাথা ঘামিয়ে মরি কেন। চয় ত একেবারে মাকাল ফল নয়। কিছুটা বুদ্ধি ধরে, তা না হলে দয়ালবাবুই বা এতখানি প্রেম করবেন কেন।

—প্রেম? একেবারে তরলিত প্রেম।

তাই ওমোরে মাটিতে পা পড়ে না মেয়ের। আজ যতীনকে কি অপমানটা করেছে জান?

শোনবার জন্ম সকলে উৎসুক হ'য়ে উঠে। কিন্তু উদ্বেগের ছায়া পড়ে অপরেশের মুখে। যতীনকে কি অপমান করেছে সলিলা সে জানে না কিন্তু যতীনকে সে চেনে। অত্যন্ত হীন চরিত্রের যুবক সে। মেয়েদের পিছু নেওয়াই স্বভাব তার। তাদের সম্বন্ধে অশ্লীল ইঙ্গিত আর অশ্রাব্য ভাষার ব্যবহারই তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট। সলিলার সম্বন্ধে সে যে সজাগ হয়ে উঠবে এ বিষয়ে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। যে বড়বাবুর ঘরকে সে এড়িয়ে চলে এসেছে এতদিন, পারত্‌ পক্ষে যে ঘরের ভিতর মাথা গলাত না সে, আজকাল ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেই ঘরের মধ্যে তার যাতায়াত। তুচ্ছ ব্যাপার, তাই নিয়ে বড়বাবুর মতামত তার জানা চাই। এবং প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত সময় সেখানে কাটিয়ে আসা চাই। এ দৃষ্টি এড়ায়নি কারো। তাই সকলেই মুখ টেপাটেপি করে, হাসাহাসি করে। কিন্তু যতীন বেপরোয়া, এ সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না সে।

নরেন মিত্তির বলে, যতীন ভাল মুখেই তাকে বলতে গিয়েছিল কথাটা কিন্তু রূপসী তাকে ধাক্কা মেরে চলে গেল গট্ গট্ করে?

—ধাক্কা মেরে?

—তা নয় ত কি? আজকালকার মেয়ে, কেয়ার করে কি কিছু? চাকরী করতে এসে চিনে নিয়েছে ঠিক, কোন জায়গায় তৈল মর্দন করলে আখের ভাল হবে তার। তাই না বুড়োর সঙ্গে—

অপরেশ বিরক্ত হয়। বলে, সবরা মেয়ে—

—ওদের চিনতে ত আমার বাকী নেই। ওরা সবই পারে। দেখ না, এ অপিসে ত এতগুলো ছেলে, তুমিও ত একজন বন্ধুর ছাড়া কার্তিক হে, কারো সঙ্গে মিশতে দেখেছ। না, হেসে দুটো কথা বলতে দেখেছ। গোমরা মুখ গোমরা ক'রে আছেই দিনরাত। ওর যত হাসাহাসি, ফষ্টি নষ্টি সব ঐ বুড়োর সঙ্গে। যতীন বলেছে, এ অপমান সে ভুলবে না। সুযোগ্ পেলেই শোধ তুলে ছাড়বে।

অপিসের ছুটির পর নির্দিষ্ট স্থানটিতে ওরা এসে মেশে দু'জনে। সলিলাই আগে এসে দাঁড়িয়ে থাকে অপরেশের অপেক্ষায়। এখান থেকেই তারা বাড়ী যাবে খুশিতে উপচে-পড়া-মন নিয়ে। কিন্তু সেদিন অপরেশ এসেই প্রশ্ন করল উৎকণ্ঠিত মুখ নিয়ে, আজ কি হয়েছে তোমার যতীনের সঙ্গে?

—যতীন? ঐ ডেঁপো ছোঁড়াটা? ফাজিল ছোকরা কোথাকার।

—শুধু ফাজিল নয়, একেবারে সর্বনেশে। ওর অসাধ্য কিছু নেই। ওর দৃষ্টি পড়েছে তোমার ওপর।

সলিলা হাসে। বলে, তোমার ভয় করছে? নির্ভাবনায় থাক, ওদের আমি গ্রাহ্য করি না। যারা রাত দিন ঘোরে মেয়েদের পিছু পিছু তারা অপদার্থ। তারা মেয়েদের মন পায় না।

—বল কি? তাহলে আমি?

সলিলা স্বামীর মুখের উপর কটাক্ষ করে। বলে, তুমিও। দিন রাত আঁচল ধরে ঘুরে বেড়ালে তুমিও মন পাবে না। সেই জন্যই ত চাকরী নিলাম। তবুও কিছুটা সময় ছাড়াছাড়ি থাকতে পাব বলে।

অপরেশ কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

সলিলা প্রশ্ন করে, কি হ'ল ?

—ভাবছি কতখানি স্বার্থপর তোমরা। তোমার জন্যে আমার ভাবনার অন্ত নেই। আর কেমন নির্বিকার চিত্তে রয়েছ তুমি।

সলিলা হেসে বলে, তোমরাও থাকতে যদি তোমাদের কোঁচা ধরে ঘুর ঘুর করে বেড়াতাম আমরা। নিজেদের ঘরেও ত পরিবার আছে।

—তা আছে। কিন্তু পরেরটি যেমন মিষ্টি ঘরেরটি তেমন নয়।

—আমাদের কাছে পরের চেয়ে ঘরই মিষ্টি।

—ওটি তোমার মন রাখা কথা হল সীলা। পরকে দেখেছ কি ?

সলিলা রাগ করে বলে, না। আমি বত্তীন নই। পরকে দেখবার মত সময় আমার নেই, প্রবৃত্তিও নেই। তারপর একটু থেমে বলে, বত্তীন মানেই ত তোমরা। হাঁড়ির ভাত। একটি টিপলেই ভেতরের সব খবর পাওয়া যায়।

—অর্থাৎ সলিলাকে দেখে সব মেয়ের খবর পাওয়া যাবে ?

—যাবেই ত'।

—তবে ওরা যে বলে দয়ালবাবুর কপাল ভাল। সঙ্গিনী পেয়ে বুড়ো আছে বেশ।

—ছিঃ ! সলিলা ঘুরে দাঁড়ায়। দু'চোখে বিদ্যুৎবহ্নিতরে স্বামীকে তাড়না করে, লজ্জা করল না এ কথা উচ্চারণ করতে তোমার। বাপের বয়সী লোক। তাকে নিয়ে রোমান্স। ঘৃণায় সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

এতক্ষণ দুজনে চলছিল পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে। এরপর ঘনিষ্ঠতার মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেল। একজনের দৃষ্টির মধ্যে তখন হাসিখুসির বিলিক, কিন্তু অপরের দৃষ্টি ঘনঘোর।

অপিসে হুলস্থুল পড়ে গেল।

খবর এসেছে দয়ালবাবু শয্যাগত। রক্তের চাপের হরণ ট্রোকে আক্রান্ত। খেতে বসে এ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। অপিসের পক্ষে এ সত্যই দুর্ঘটনা। তাই হুলস্থুল চারিদিকে। অপিসের সব কিছুতেই দয়ালবাবু। ভাল মন্দ সব কিছুর সঙ্গে পরিচিত তিনি। বড় থেকে ছোট সব সাহেবই তাঁকে বিশ্বাস করতেন আন্তরিক ভাবে। তাই সব ঝঞ্ঝাট তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে সকলেই হতে চাইতেন নির্ঝঞ্ঝাট। এখন এক যোগে সচকিত হয়ে উঠলেন সকলেই।

শেষ খবর এসেছে অবস্থা ভাল নয় দয়ালবাবুর। পক্ষাঘাতে ডান দিকটা সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু হয়ে গেছে। খবর পেয়ে সলিলা ছুটেছিল দেখতে। ফিরে এসে নিরাশ কণ্ঠে বলল, এ যাত্রায় রক্ষা নেই বোধ হয়। ডাক্তারেরা আশা দেন না কিছু।

অপিসের পক্ষে দুঃসময়। তাই গিরিবারীলাল চৌহানের মামলাটাও বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এ সময়ে। কোম্পানীকে আক্রমণ করে বসল চারিদিক থেকে। এ বেগ প্রতিরোধ না করতে পারলে পরাজয় সুনিশ্চিত। বিব্রত হয়ে পড়লেন ডিরেক্টরের দল। মামলার নথিপত্র যা কিছু, এর নাড়ী নক্ষত্র সবই দয়ালবাবুর নখাগ্রে। এখন সেই নখাগ্র পঙ্গু। তাই কর্তৃপক্ষরা মহা উদ্বিগ্ন।

অফিসের ষ্টাফেদের মধ্যে বত্তীন সিনিয়র। সে দিন সকাল বেলায় ডাক পড়ল তার—বড় সাহেবের

ঘরে। মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে। যাবার বেলায় আস্তিন গুটিয়ে অপরাধী সহকারে বলে গেল সকলকে শুনিয়ে, দয়ালবাবুর জায়গায় চার্জ যদি আমায় নিতে বলে সাহেব আমি নেব, কিন্তু অপমানের শোধ নিতে হয় কেমন ক'রে তা দেখিয়ে দেব। আমি ষষ্ঠীন বাগচি, বাঘা ষষ্ঠীনের ছেলের। মেয়েলি নাকি সুর আমার মন গলাতে পারবে না বাবা।

কিন্তু এরই আধ ঘণ্টা পর বাঘা ষষ্ঠীনের ছেলের যখন ফিরে এল, তখন তার ব্যাঘ্র যে লাঙুল গুটিয়ে কোন পথে পালাল তা সে নিজেই জানল না। শুধু আকর্ণ রঞ্জিত করে কোন মতে নিশ্বাস ছেড়ে বলল, সরস্বতীর পুতের দল, চার্জ দেবার নাম নেই, শুধু জেরা। এটার কি জান, ওটার কি জান, মকর্দমার কাগজপত্র গেল কোথায় সব। মর হারামজাদার দল, এত খবর যদি জানব আমি, তবে আগে থেকে বড়বাবু কেন করলি না আমাকে। আগে চার্জটাই বুঝে নিতে দে; তবে ত জানতে পারব সব। না, রাম না হতেই রামায়ণ। ও সব বুজরুকিতে বাবা ভুলচি না আমি। কেল কড়ি মাখ তেল। আমি ষষ্ঠীন বাগচি। সবাইকেই চিনি।

কিন্তু ষষ্ঠীন বাগচির চেনাচিনির উপর নির্ভর করল না কিছুই। যা কিছু সব পরিষ্কার হয়ে গেল আধ ঘণ্টার মধ্যেই। বড় সাহেব নিজেলন এসে বসলেন দয়ালবাবুর ঘরে। সেখানে একে একে ডাক পড়ল সকলেরই। ডাক পড়ল অপরেশেরও। কিন্তু সদুত্তর পাওয়া গেল না কারও কাছ থেকেই। গিরিধারীলাল চৌহানের মামলা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয় কেউ। মামলার নথিপত্র সম্বন্ধেও আলোকপাত করতে পারল না কেউ। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে আসতে হ'ল সলিলাকেই। মামলা সংক্রান্ত মোটামুটি একটা ইতিহাস যা সে শুনেছিল দয়ালবাবুর মুখে—বলে গেল সাহেবকে। সেই সঙ্গে একে একে এগিয়ে দিল কাগজপত্রগুলোও। সলিসিটরের চিঠিগুলি নম্বর দিয়ে একের সঙ্গে অপরের যোগাযোগ দেখিয়ে দিল সাহেবকে। বছর তিনেক আগেকার ঘটনা। সব কথা মনে রাখা সম্ভবপর নয়। ভেবে দেখাও সম্ভবপর নয়। কিন্তু সম্ভবপর হ'ল সলিলার গুছিয়ে দেখান এবং বলার ভঙ্গিমায়। সাহেব মুগ্ধ হয়ে যান। বলেন, ইয়ং লেডি, অল্পদিন হ'ল তুমি এসেছ আমাদের অপিসে। কিন্তু তোমার মত ইন্টারেষ্ট নিয়ে এদের কাজ করতে দেখলাম না কাউকেও। তোমায় আমি ভুলব না। ভবিষ্যৎ তোমার উজ্জ্বল। উপস্থিত যতদিন না দয়ালবাবু কাজে যোগ দিতে পারেন, এ চেয়ারে বসবে তুমি। আজই সার্কুলার জারি করে দিচ্ছি আমি। সাহেব অঙুলি নির্দেশে দয়ালবাবুর চেয়ারখানা দেখিয়ে দেন সলিলাকে।

অপিসের কল গুঞ্জনে ভাটা পড়ে। কেরাণীর দল অসন্তুষ্ট হয় সকলেই। কিন্তু এ বড় সাহেবের আদেশ। কড়া আদেশ। তাই মাথা নত করে মেনে নেয় সকলেই।

সলিলা বাড়ী ফেরে। গাম্ভীর্যের মুখোস পরে স্বামীকে বলে, এবার থেকে একটু সমীহ করে কথা বলতে হবে আমার সঙ্গে। সেলাম করে ঘরে ঢুকবে আর কুর্নিশ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। বুঝলে?

—বুঝলাম।

—কি বুঝলে?

—এবার চাকরী ছাড়তে হবে?

—কারণ?

—পেটিকোট গভর্ণমেণ্টের উপদ্রব সহ্য হয় অন্দরে। বাইরে এ উপদ্রব অসহ্য।

—ইস্! তা বই কি। কোট-প্যাণ্ট গভর্ণমেণ্টের মুরদ ত দেখলুম সব। কোমর থেকে বেল্ট খুলে

ক'বার উপক্রম হয়েছিল আর একটু হলেই। মাইরী বলছি, এমন দুঃখ হচ্ছিল তখন তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে।

—খুব আমোদ হচ্ছিল না, আহ্লাদী মেয়ে।

—হচ্ছিলই ত। শুধু মায়া হচ্ছিল তোমাকে দেখে। ভাবছিলাম, এখন থেকে আমি হ'লাম বাস্। কি মজা। যা বলব, শুনতে হবে। যা হুকুম করব তামিল করতে হবে। বেয়াদপি চলবে না। তোমার ফাইল হাতে এসে পড়লে লিখে দেব, প্লীজ স্পীক। অমনি ছুটে আসতে হবে কম্পমান হয়ে।

—বয়ে গেছে। চাকরী ছেড়ে দেব।

—সে আরও ভাল হবে। তুমি থাকবে বাড়ীতে, ঘরকন্না দেখবে। আমি যাব অপিসে চাকরী করতে। উপায় করে যা আনব সব তুলে দেব তোমার হাতে। তুমি সংসার চালাবে।

—থাম ফাজিল মেয়ে। অপরেশ ধমক দিয়ে উঠে। কিন্তু নিজেই বোঝে, এ তার অক্ষমতার এর মধ্যে যুক্তি নাই, অযুক্তি আছে। আনন্দের ঔদার্য্য নাই, আছে ঈর্ষার আতিশয্য।

সলিলা ভয় পেয়ে যায়। স্বামী যে অসন্তুষ্ট হয়েছে বুঝতে পারে সে। তাই অপ্রস্তুতে পড়ে অপরেশের কাছে সরে আসে। দু'হাতে তার মুখখানি তুলে ধরে বলে, রাগ কর কেন। ঠাট্টাও বোঝ আমাদের সম্বন্ধ কি বাস্ হবার সম্বন্ধ। নাগো মশাই না। অতো সোজা নয়। ভগবান যাকে বাস্ করবার ঠিকই করে দিয়েছেন তিনি। আমার অন্তরের বাইরের বাস্ চিরদিনই তুমি। লক্ষ্মীটি ছেলেমানুষী ক'র না। রাত হয়েছে।

ক'দিন ধরেই একটা খস্‌খসে হাওয়া বইছিল অপিসের মধ্যে। সেদিন তাতে ঝড় বইয়ে দিল যতীন। দু'খানা 'ফাইল' ফিরত পাঠিয়েছে সলিলা। দু'খানাই এসে পড়েছে যতীনের হাতে। একখানা অপরেশের। ফাইলের উপরের চিঠির এক পাশে লেখা আছে 'প্লীজ স্পীক'। অর্থাৎ আমার সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে কথা বল। দ্বিতীয় ফাইলটি যতীনের। ড্রাফটিংয়ের ফাইল। যতীন ড্রাফটিং করে পাঠিয়েছিল সলিলার অনুমোদনের জন্য। পাণ্ডিত্যপূর্ণ ড্রাফটিং কিন্তু এলোমেলো, বিষয় বহির্ভূত। সলিলা ফিরে পাঠিয়েছে সংশোধিত আকারে। ছোট ছোট মোট দিয়ে। তারই মধ্যে ড্রাফটিংয়ের দোষ ত্রুটি দেখিয়ে দিয়েছে সে।

ফাইল দু'খানা দু'হাতে তুলে ধরে যতীন চেঁচিয়ে উঠে, ঘুঁটে কুড়ুনির কি স্বপ্ন দেখেছে। একদিন তিজে বেড়ালটির মত ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াত আনাচে কানাচে, এখন বাসিং সুরু করেছে। ড্রাফটিং করে করে আঙুল চুপসে গেল আমার, এবার ভুল ধরেছে আমার ড্রাফটিংয়ের। আমার বেলায় আজ্ঞা হয়েছে, আবার মক্স করে লিখে পাঠাও। আর অপরেশের বেলায় আদেশ হয়েছে আমার কুঞ্জে এসে দেখা কর। যাও হে অপরেশবাবু, রাইয়ের কুঞ্জ থেকে ঘুরে এস একবার।

মহিম যতীনের প্রায় সমসাময়িক। কাজও করে একই টেবিলে। টিপ্পনি কেটে বলে, যাই বল যতীনদা খামোকা তোমার রাগ করা সাজে না। স্বীকার কর ত যে অপরেশবা তোমার তুলনায় সাহেব মানুষ। নবগৌরাঙ্গ।

যতীনদা সইতে পারে না, বিশেষত আজ চেহারার নিন্দা। একেবারে ফেটে পড়ে বলে, রোস বার করাচ্ছি এবার সাহেবগিরি আর মেমগিরির। আমি যতীন বাগচি। বাবা যতীনের ছোপর। কত ধানে কত চাল জানা আছে আমার। শিমুল গাছকে যদি তেলপানা না করতে পারি ত' কি বলেছি।

যতীনের রাগ করবার গোপন কারণও ছিল। মজালবাবু থাকতে ওঁর ঘরে যতীনের হাজিরা

ছিল ঘণ্টায় ঘণ্টায়। কারণে অকারণে, বিনা আহ্বানে একই ফাইল বগলে করে সে এসে হাজির হত যখন তখন। গল্প করে চলত অনর্গল। নড়বার নামটি করত না। কিন্তু এখন সে সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। সলিলাই বন্ধ করে দিয়েছে সেটা। এ লোকটির ব্যবহার গোড়া থেকেই পছন্দ করত না সে। বিশেষ করে তার এই পায়ে-পড়ে আলাপ করবার প্রচেষ্টাকে। তাই সেদিন স্পষ্টই বলে দিয়েছিল তাকে, বারবার কষ্ট করে আপনার আসবার কোন প্রয়োজন নেই মিঃ বাগচি। তেমন দরকার পড়লে আমিই ডেকে পাঠাব আপনাকে।

কিন্তু তেমন দরকার পড়ল না আজও। যতীন নিজ থেকে আগ্রহ প্রকাশ করা সত্ত্বেও সুযোগ দেয় নি সলিলা। শুধু টুকরো টুকরো নোট দিয়েই কাজ সেরেছে সে। আর গুমরে মরেছে যতীন।

মহিম বলে, যেতে দাও যতীনদা ও সব কথা। অনর্থক মেজাজ খারাপ কর কেন?

—অনর্থক নয়রে ভাই। ওদের 'ভাবন' দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। মেজাজ এমনিতেই বিগড়ে আসে।

অপরেশ এতক্ষণ কোন কথা বলেনি টিপে টিপে হাসছিল শুধু। তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই যতীন মুখ খিঁচিয়ে উঠে বলে, যাও না হে 'লব কার্তিক'। এবার তোমার ডাক পড়েছে। যত সব জুটেছে এখানে এসে।

অপরেশ ফাইলটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মুচকি হেসে বলে, যেতে হবে বই কি দাদা। হাজার হক বস্ত, উপায় কি না গিয়ে।

—রাবিস্। যতীন গুমরে উঠে।

সলিলার চেম্বার। সামনে সবুজ রংয়ের বাহারি পর্দা। অপরেশ মাথাটা ভিতরে গলিয়ে দিয়ে বলে, ভেতরে আসতে পারি, মাদাম।

সলিলা মুখ তোলে না। একটা বিরাট ফাইলের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলে, নিশ্চয়ই পার।

অপরেশ এগিয়ে আসে। মুখোমুখি বসে বলে, কি ব্যাপার?

—কিছু না। সলিলা হাসে।

—তবে?

—তবে আর কিছু নয়। সারাক্ষণ মুখ বুজে বসে থেকে অভাগিনীর সময় আর কাটে না। তাই ডেকেছি তোমায়। সামনে বসে থাক চুপটি ক'রে।

—সর্বনাশ। এতখানি নির্দয়তা কেন এ অভাগার প্রতি।

—সারাদিন ফাইলের স্তূপ নেড়ে নেড়ে অভাগিনী অস্থি: তাই স্মরণ নিলাম মহাশয়ের। সলিলা হেসে ফেলে। তারপর তরল কণ্ঠে বলে, সত্যি বলছি এর চেয়ে ঢের ভাল তোমার ঘরকন্না করা। চাল, ডাল, আলু, পটলের হিসেব রাখা, আর রাঁধতে রাঁধতে তোমার সঙ্গে খুনসুটি করা। এক একটা ফাইল যেন প্যাসেফিক ওসেন। এর তল নেই, আদি নেই, অন্ত নেই। এর মধ্যে মাথা গলানো মানে চক্র ব্যূহে মাথা গলান।

—কিন্তু এই চক্র ব্যূহে সাধ করে মাথা গলিয়েছ তুমি ত নিজেই।

—ভুল করেছি। এবারের মত দাওনা গো একটুখানি পথ বেৎলিয়ে। তুমি ত আমার ভব সমুদ্রের কাণ্ডারী। এ সমুদ্রেরও কর্ণধার হও না গো।

—বয়সের মুখে এরকম কথা শোভা পায় না লীলা।

—পাব। তোমার কাছে আমার সব পাওনা পাব। দেখ, এ বছরে তোমার কন্‌ফিডেনশিয়াল রিপোর্ট খুব ভাল ক'রে লিখে দেব। সলিলা হেসে উঠে খিল্ খিল্ ক'রে।

চাপরাশি চা নিয়ে আসে। রোজই সে চা নিয়ে আসে এমনি সময়ে। ধূমায়িত সুগন্ধি চা সলিলা এগিয়ে দেয় অপরেশের দিকে।

অপরেশ প্রশ্ন করে, তোমার?

সলিলা মুখ টিপে হেসে বলে, তোমার পর প্রসাদ পাব।

—তাই দেও। অপরেশ চায়ে চুমুক দেয়। হঠাৎ পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকে যতীন। অপরেশের দিকে বাঁকা দৃষ্টি হেনে সলিলাকে বলে, ষ্ট্রাকচিংটা দেখিয়ে নিতে এসেছিলুম একবার—

সলিলা আরক্ত হয়ে উঠে। কোন মতে আঙুল দিয়ে পাশের ট্রেখানি দেখিয়ে দিয়ে বলে, ঐখানে রেখে যান। আমি পরে দেখে নেবখন।

এ আদেশ যতীন অমান্য করতে সাহস করে না। অনিচ্ছুক চরণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

অপরেশ বলে, আহা বেচারী, একটুখানি বসতে এসেছিল তাও দিলে না।

না। সলিলা মাথা নাড়ে।

—দোষ ওর নয় সলিলা।

—না, দোষ আমার। যেহেতু আমি মেয়ে, না?

—না, তাও না। তোমার ধর্ম তুমি পালন করেছ মাত্র।

—মানে? সলিলা ভ্রুকুটি করে।

—মানে, গোলাপের ধর্ম জান ত? তার ধর্ম চিত্ত আকর্ষণ করা। তাই সে সর্ব অবস্থায় প্রিয়। এটা লোকের পক্ষপাতিত্ব নয় এটা গোলাপের কৃতিত্ব।

—তুমি থাম।

অপরেশ খুশি মুখে বলে, যতীন যদি তোমার সঙ্গে একটু বাক্যালাপ করে খুশি হয় তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে তোমার। বরং কথা না বলতে পেরে তুমি যে হাঁপিয়ে উঠছ তা থেকে পরিত্রাণ পাবে। চাই কি তোমার প্যাসেফিক ওসেনেরও তল হয়ত খুঁজে পাবে। বলত এখানেই না হয় পাঠিয়ে দি তাকে।

—রক্ষে কর ঠাকুর। আর যাই কর ও উপকারটি কর না। যে-ইজ্জতের সীমা থাকবে না তা হ'লে। মেয়ে মানুষ পুরুষের দৃষ্টিকে চিনতে ভুল করে না। ওর দৃষ্টিকে চিনেছি আমি।

—তাত চিনেছ। কিন্তু আমায় যে তোয়াজ করে চা খাওয়াচ্ছ এ ত দেখে নিলে সে।

—নিলেই বা। হয়েছে কি?

—এখনও হয় নি, তবে আশা করি হবে। যাকে বলে শোচনীয়, হবে তাই।

—মানে?

—মানে আমার অবস্থা। অপিসে একেবারে শোচনীয় করে তুলবে সে। হয়ত এতক্ষণে লাউড স্পীকার ফিট হয়ে গেছে চারিদিকে আর মাইকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—।

—যতীন, এইত। দাঁড়াক। সত্যের অগ্নি হয় না। তার গায়ে দাগ পড়ে না।

এতদিন চলছিল বেশ। অফিস থেকে দুজনে ফিরত একসঙ্গে। কোনদিন মার্কেটিং সেরে, কোন দিন সিনেমা দেখে, ফিরত হাসিমুখে। কিন্তু এখন সে ব্যবস্থায় ছেদ পড়ল। এখন কাজের চাপ বেশী। অফিস থেকে সলিলা বেরুতে পারে না সময় মত। সকর্মার গুরু দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে সে গলদ-ঘর্ম। কাগজপত্র দলিল ইত্যাদির তদারক করা, সেগুলি গুছিয়ে উকীলের হাতে হাতে তুলিয়ে দেওয়ার ভার পড়েছে তার উপর। বড় সাহেব নিজেলন অগাধ বিশ্বাস করেন সলিলাকে। তার কর্মপটুতায় অত্যন্ত প্রীত তিনি। কোম্পানীর একখানা গাড়ীই ছেড়ে দিয়েছেন সলিলাকে। খাটা-খাটুনির অন্ত নেই সলিলার। অনেক দিনই তাকে থেকে যেতে হয় অফিসে ছুটির পরও। অগত্যা অপরেশকেই ফিরতে হয় একা একা।

প্রথম প্রথম কষ্ট হলেও এ ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছিল অপরেশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল সেও। বিরক্ত হবার কারণ অফিসের থার্ড অফিসার জয়ন্ত ভট্টাচার্য। আজকাল প্রায়ই সঙ্গী হয় সলিলার। সলিলাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ী নিয়ে চলে যায় সে। এতখানি মাখামাখি ভাল লাগে না অপরেশের। জয়ন্ত সম্বন্ধে অফিসের ধারণা কি এ তার অবিদিত ছিল না। তাই একদিন অসহিষ্ণু হয়ে সে বলে উঠল স্ত্রীর মুখের উপর, বাড়াবাড়িটা একটু যেন সীমা ছাড়িয়ে যেতে চলেছে না আজকাল?

অফিস থেকে সেইমাত্র ফিরেছে সলিলা। আজও জয়ন্ত তাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে অফিসের গাড়ীতে করে। সারাদিনের পরিশ্রমে সে ক্লান্ত। তাই স্বামীর কথাটা কানে যাওয়া মাত্র ঘুরে দাঁড়িয়ে ভ্রুকুটি করে প্রশ্ন করল, মানে?

—মানে সোজা। জয়ন্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে মাখামাখিটা একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না কি?

—না। তারপর?

—তারপর? সলিলার নির্লিপ্ততায় সহসা অপরেশ ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে লজ্জা করল না, এ কথা জিজ্ঞাসা করতে তোমার! জয়ন্ত ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা ক'র তোমার 'তারপরের' উত্তর পাবে সেখানে। সলিলা শান্ত কণ্ঠে বলে, উত্তর আমি পেয়েছি। এ নিয়ে কাউকে প্রশ্ন করতে হবে না। ভট্টাচার্যকেও নয়, মুখার্জিকেও নয়। তোমার মত অতোখানি অধোগতি হয় নি আমার যে এ সব নোংরা কথায় কান দিতে হবে আমাকে; ছিঃ! সলিলা আঁচলটা তুলে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে পাশের ঘরে চলে যায় আর অপরেশ সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকে নির্বোধের মত দৃষ্টি মেলে।

সেদিন থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা বন্ধ। সলিলার অফিস থেকে ফিরতে তেমনিই দেরী হয় বটে, তবে সে একাই ফেরে আজকাল। জয়ন্ত ভট্টাচার্যকে সে এড়িয়ে চলে। যেদিন অনুবিধে বোঝে—বোঝে জয়ন্ত বসে আছে তারই অপেক্ষায় সেদিন নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে সে অফিস ছেড়ে। বাড়ী ফেরে ট্রামে বাসে। জয়ন্তর সঙ্গ সে পছন্দ করেনি কোন দিনই। কিন্তু অফিসার মানুষ অনুরোধ জানায় একই গাড়ীতে ফেরবার, তাই সে উপেক্ষা করতে পারে না এ অনুরোধ। পারে নি বলেই এ বিপত্তির উৎপত্তি আজ।

আজকাল অপরেশেরও ফিরতে রাত হয়। এ তার ইচ্ছাকৃত রাত করা। সহরের এদিক ওদিক ঘুরে যখন সে ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফেরে তখন রাত বেশ এগিয়ে যায়। সলিলা দেখে, বোঝে আর মৌন করুণ মুখে তাকিয়ে থাকে।

সেদিন এক বিভ্রাট বাধিয়ে বসল অপরেশ। অফিস থেকেই গিয়েছিল এক বন্ধুর আমন্ত্রণে, কলকাতার বাইরে তার নবনির্মিত বাড়ীতে। রাতের শেষ ট্রেণখানি ফেল করে সেইখানেই আটক পড়ে

গেল সে। বাড়ীতে কোন কথাই বলে যায়নি অপরেশ তাই সলিলা জানতেও পারল না আসল ব্যাপারটা। ভয়ে দুশ্চিন্তায় সে কাঠ হ'য়ে গেল। অভুক্ত অবস্থায় সারা রাত ঘরবার করে আর ভগবানকে স্মরণ করে কাটিয়ে দিল কোনমতে।

সকালের দিকে অপরেশ যখন ফেরে তখন অফিস যাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আজকাল একটু সকাল সকালই যেতে হয় সলিলাকে। সে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নেয়। তারপর ঠাকুরকে উপদেশ দিয়ে, নিজহাতে অপরেশের খাবার ঠাঁই করে দিয়ে অভুক্ত অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে অফিসের উদ্দেশে।

এ কদিন অফিসের কাজেরও চাপ পড়েছে অত্যধিক। গিরিধারীলালের মামলা ঘোরালো হয়ে উঠেছে বেশ। দু' একদিনের মধ্যেই হয়ত চরম নিষ্পত্তি হয়ে যাবে এর। হার জিতের কথা বলা যায় না কিছুই। দু পক্ষই লড়ে চলেছে সমানে। সলিলাও কাগজপত্র ঘুগিয়ে চলেছে সমানে। ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে অনেক মূল্যবান তথ্যই সে উদ্ধার করেছে এরই মধ্যে। চৌহানকে কাবু করার মত এমন কয়েকখানা নথিপত্র খুঁজে বার করেছে যার জোরে মকর্দমার মোড় ঘুরে গেছে সম্পূর্ণভাবে। এখন সন্ধানে আছে আর একখানা চিঠির। নিজের চোখ দিয়ে সলিলা পড়েছে সে চিঠি। এখনও অস্পষ্টভাবে মনে আছে তার। দু তরফের পাটের লেনদেন। পাঁচলক্ষ টাকার লেনদেন। পাটের বাজার মন্দা পড়াতে সর্তমত পাট দিতে পারেনি কোম্পানী। তাই চৌহান পাঁচ লক্ষ টাকার দাবী করে মামলা রুজু করে কোর্টে। কিন্তু একটি সর্তসাপেক্ষ চৌহান রাজি হয় আরও তিন মাসকাল অপেক্ষা করতে। সে কথা চিঠি লিখে জানায় চৌহান। তারই মধ্যে এক বিরাট ফাঁক ছিল। সে কথা দয়ালবাবুই বলেছিলেন তাকে। এই চিঠিখানাই সলিলার মনে হয় কোম্পানীর পক্ষে পরম মূল্যবান চিঠি। কোম্পানীকে বাঁচাতে গেলে এ চিঠি অপরিহার্য। এ চিঠি আছে সে জানে। তাই সব কাজ ছেড়ে দিয়ে সে ফাইল ঘাঁটতে বসে।

রাত দশটা। ফাইলের পর ফাইল ঘেঁটে চলেছে সলিলা। ফাইলের স্তূপ জড় হয়ে উঠেছে টেবিলের উপর, আশেপাশে চারিদিকে। কিন্তু তার বিরাম নেই। একটির পর একটি দেখে সে তন্ন তন্ন ক'রে। শেষ পর্যন্ত সন্ধান সে পায়। সারাদিনের উৎকণ্ঠা আর পরিশ্রমের জয় হয়। বিরাট এক ফাইলের স্তূপের তলায় আত্মগোপন করেছিল এই ফাইলটা। তারই ভিতর ছিল চিঠিখানা। সলিলা উদ্ধার করে তাকে। শীতকালেও ঘামে শরীর তার ভিজে যায়। অমানুষিক পরিশ্রমে মাথা ছিঁড়ে পড়ে। চোখের শিরাগুলি টনটনিয়ে উঠে। তারই মাঝে প্রভাতের নির্মল আলোর মত আশা দেখা দেয়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে সলিলা। এতবড় সুসংবাদটা বড় সাহেবকে জানাবার জন্য অকস্মাৎ সে উতলা হয়ে উঠে। টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ডাক দেয়, হ্যালো। আমি মিসেস মুখার্জি স্যার। হ্যাঁ, অফিস থেকেই বলছি। বাড়ী যাইনি কারণ, কাল মকর্দমার দিন স্যার। একখানা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি খুঁজছিলুম এতক্ষণ ধরে। গিরিধারীলাল চৌহানের চিঠি। হ্যাঁ পাওয়া গেছে। সারাদিন খোঁজাখুঁজির পর এইমাত্র একটা ফাইলের ভেতর থেকে খুঁজে বার করলুম সেখানাকে। মামলার পক্ষে এ চিঠি আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র হবে স্যার। আমার ত মনে হয় এ মামলায় আমাদের জয় সুনিশ্চিত। রাত অনেক হয়ে গেছে। তা না হলে আমি নিজেই যেতাম আপনার কাছে। কিন্তু এখুনি একবার সলিসিটরের বাড়ী যেতে হবে আমাকে। না গেলেই নয়।

অন্য সাহেব নিকলসন। বলেন, মেনি থ্যাঙ্কস্ মিসেস মুখার্জি। আমার কাছে এসে তোমার কাজ নেই। তোমার উপর যথেষ্ট আস্থা আছে আমার। অপিসের গাড়ী নিয়ে সলিসিটরের কাছ থেকে ঘ'রে তুমি বাড়ী ফিরে যেও।

শেষ পর্যন্ত মামলায় জয় হ'ল কোম্পানীর। সলিলা ঠিকই বুঝেছিল, গিরিধারীলাল চৌহানের মৃত্যুবাণ লুকান ছিল ঐ চিঠিখানির ভিতর। তারই অমোঘ প্রয়োগে মামলা জিতে গেল কোম্পানী।

অনেক টাকার মামলা। হার হ'লে দেউলিয়া হয়ে যেত কোম্পানী। সলিলাই বাঁচাল তাকে। সলিলাকে নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেল চারিদিকে। স্বয়ং নিকলসন সাহেব এসে হ্যাণ্ডসেক্ করে গেলেন তার সঙ্গে সকলের সামনেই। আবেগভরে বললেন, কর্মনিষ্ঠ বালিকা, তোমার কথা কোম্পানী ভুলবে না কোনদিন। তোমার প্রাপ্য সম্মান কোম্পানী তোমায় দেবে নিশ্চয়ই। সলিলা সম্মান পায়। মাস চারেকের মধ্যেই এ প্রাপ্য সে পেয়ে যায় যখন বড় সাহেব আট মাসের ছুটি নিয়ে বিলেত যান। প্রমোশন পায় মেজ সাহেব হেণ্ডারসন, পায় জয়ন্ত ভট্টাচার্য, আর তারই জায়গায় পায় সলিলা। বড় সাহেব নিজেই অপিসার করে বসিয়ে দিয়ে যান তাকে। বলে যান, তোমার যোগ্য স্থানে আমি বসিয়ে দিয়ে গেলাম তোমাকে। আশা করি এর মর্যাদা তুমি দিতে পারবে মিসেস মুখার্জি।

যা এতদিন সীমাবদ্ধ ছিল গুঞ্জনে, সহসা তাই পরিণত হল গর্জনে। আকাশে বাতাসে এতদিন যে সপ্রশংস আলোচনাটা ভেসে বেড়াচ্ছিল তাই রূপ নিল ভিন্ন খাতে। সকলের প্রথমে গর্জে উঠল ষতীন, ঘুঁটে কুড়োনির কি, বুঝেছ হে, অপিসার হ'ল আজ। কাজে যেন্না ধরে গেল বাবা।

মহিম বলে, কিন্তু হ'ল কি ক'রে ষতীন দা। তাজ্জব ব্যাপার বটে।

—তাজ্জব না আর কিছু।

—কিন্তু যাই বল কাজটা ত করে গেলেন নিকলসন সাহেব স্বয়ং।

হুঁঃ। দায় পড়েছে নিকলসন সাহেবের। একটা মেয়েকে অপিসার করে যাবেন তিনি। তেমন সাহেবই বটে নিকলসন। ষতীন ফোঁস করে উঠে।

—তবে? মহিম প্রশ্ন করে।

—তবে শুনবে? এ সব গুহ্য তত্ত্ব। ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছিল এতদিন, টের পাও নি ত কিছু।

সকলে কি যেন রহস্যের সন্ধান পায়। তাই ষতীনকে ঘিরে ধরে ঘন হয়ে। অপরেশ নিকটে আসে না বটে, কিন্তু দূর থেকেই উৎকর্ণ হয়ে উঠে। বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। ষতীনের মুখ আগলহীন। কি বলতে কি বলে বসবে, কে জানে। মহিম বলে, কি ব্যাপার ষতীন দা। আমরা জানি না ত কিছু!

—জানবে কি ক'রে ভায়া। চোখ কান থাকলে জানবে ত? এত তাড়াতাড়ি প্রমোশন, এমনিতে হয় না কি ভেবেছ। আরে রামঃ।

সকলে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে ষতীনের দিকে। ষতীন আর একটু রহস্যঘন হয়ে দু চোখ টিপে বলে, এ সব এমনিতে হয় না ভায়া, এমনিতে হয় না। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না, বুঝেছ?

বুঝুক না বুঝুক ঘাড় নাড়ে সকলেই।

ষতীন উৎসাহ পায়। সোৎসাহে বলতে থাকে, রাত দশটা পর্যন্ত জয়ন্ত ভট্টাচার্যকে নিয়ে আপিসে কাজ চলে। কি না, মকর্দমার ফাইল দেখা হচ্ছে। তাই রাত্রি বেলায় নিরিবিলিতে বসে বসে ফাইল

দেখা হয়। এ সব কি বুঝি না আমরা। কচি খোকা নই যে শাঁখা-সিঁদুরের বাহার দেখে ভুলে যাব সব। ও সব ক্যামোফ্লাজ তারা, ক্যামোফ্লাজ।

—বল কি ষষ্ঠীন দা। অন্ত ভট্টাচার্য! এ সব জানলে কি করে তুমি?

ইচ্ছে থাকলে সবই জানতে পারা যায়। শুধু চোখ কানকে কষ্ট করে একটুখানি সজাগ রাখা। হরোম সিংকে জানত। আমাদের দরোয়ান। অফিসের নীচের তলাতেই ত সে থাকে। তাইই কাছে জানতে পারি অনেক কথা। ব্যাটা হাঁবারাম। সর্দার দি বললেই গলে যায়। আর খুশিতে বলে ফেলে সব গড় গড় করে। কবে অন্ত ভট্টাচার্য হাত ধরে মালিনীকে তুলেছিল গাড়ীতে, কবে গাড়ী বিকল হ'য়ে যেতে ট্যাক্সি করে ফিরেছিল দুজনে, ট্যাক্সি ডেকে দিয়েছিল হরোম সিং, অফিসে এক ঘরে কত রাত বসে থাকে দুজনে, একে একে বলে ফেলে সব। নিকলসন সাহেব ত অন্ত বলতে অজ্ঞান। কাজেই যেমনটি বলেছে অন্ত, করেও গেছেন তাই।

—আশ্চর্য! অফিসেও এই। মহিম বিস্ময়ের ভাণ করে।

—আশ্চর্য নয়। এও আজকালের একটা ফ্যাশান। ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে অফিস অঞ্চলে। কিন্তু এবার ওর আর রক্ষে নেই। এবার দৃষ্টি পড়েছে হেওারসন সাহেবের। বিস্ময়ে সকলের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু-প্রশ্ন করে মহিম, এ যে অবাক কাণ্ড দাদা।

ষষ্ঠীন একটু মুচকি হাসে। মুরুব্বির হাসি। বলে, এতদিনে ঠিক কথা বুঝেছে তোমাদের সলিলা দেবী! চুনো পুঁটিতে মন উঠছে না। এখন বুঝেছে, মারি ত হাতী, লুটি ত ভাণ্ডার। জমিয়েছে ভাল। চা খাবার সময় হ'লেই সাহেব ছুটবে এসে ওর ঘরে। তারপর হাসি মস্করায় ঘর মশগুল হ'য়ে উঠবে। বাঙালীর মেয়ের কি অধোগতি দেখ। বিশ্বাস না হয় স্বচক্ষে দেখে এস দুটিতে মুখোমুখি বসে আছে কেমন। আমি দেখে তবে আসছি।

—আহা বেচারা স্বামী! ঘুণাক্ষরেও জানে না এ সব কিছু।

—আরে রামঃ। স্বামী থাকলে জানবে ত। আর থাকেও বা যদি, সে-ও হয় ত আর এক উচুন চণ্ডে। মেতে আছে আর কোন এক লীলা বা নীলাকে নিয়ে।

এর পর আর সওয়া যায় না। রক্ত চনচনিয়ে উঠে অপরেশের মাথায়। সে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তারপর তেমনিই নিঃশব্দেই এসে দাঁড়ায় সলিলার অফিস ঘরের সামনে। দরজায় নীল বর্ণের পর্দা ঝোলান। বাইরে থেকে ভিতর দেখা যায় না বটে কিন্তু সলিলার মিষ্টি হাসি বাতাসে ভেসে আসে। অপরেশ ইতস্ততঃ করে এক মুহূর্ত, তারপর সরিয়া হয়েই দু'হাতে পর্দা সরিয়ে মাথাটাকে গলিয়ে দেয় ভিতরে। ষষ্ঠীনের কথাই ঠিক। সলিলা ঠিক মুখোমুখি বসে আছে হেওারসন সাহেব টেবিলের উপর ঠিক কনুই রেখে। সাহেবের হাতে জলন্ত চুরুট। চুরুটের গন্ধে আর ধোঁয়ায় ঘর ভরপুর। মনে হয় কি একটা রসিকতা করেছিল সাহেব। হয়ত তারই উত্তরে হাসিমুখে ঘূর্ণায়িত চায়ের পেয়ালাটি চামচে দিয়ে নাড়তে নাড়তে এগিয়ে দিচ্ছিল সলিলা, এমনি সময়ে দরজায় দেখা দিল অপরেশ।

এ অসম্ভব আশা করেনি সলিলা। তাই সে চমকে উঠল অন্তরে। হাত কেঁপে খানিকটা চা চলকে পড়ে গেল টেবিলের উপর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে অপরেশের উদ্দেশে ইংরাজিতে বলে উঠল, ইয়েস্ প্লীজ।

কিন্তু ততক্ষণে পিছিয়ে গেছে অপরেশ। পর্দার অন্তরালে সে নিজেকে গোপন করে নিয়েছে

সহসা মনে হল তার কে যেন নির্মমভাবে মাড়িয়ে থেঁতলে দিয়ে গেল তার মর্মস্থলকে। সে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সেইখানে। হেওারসনের স্বর ভেসে এল কানে, কি ব্যাপার?

সলিলা উত্তর দিল, কিছু না। রেকর্ড সেক্সন থেকে দেখা করতে এসেছিল হয় ত কোন প্রয়োজনে। সলিলার কণ্ঠে জড়তা, স্বর দ্বিধা জড়িত।

—ড্যাম ইট্। সাহেব টেবিলে চাপড় দিল, লাঞ্চের সময় দেখা করবার সময় নয়, এ কর্মচারীদের বোঝা উচিত।

এরপর আর অপরেশ দাঁড়াতে পারে না। ছুটে চলে আসে নিজের সীটে। দু কানে তখনও তার বাজতে থাকে, ড্যাম ইট, ড্যাম ইট্। শরীরের ভিতর শত-সহস্র সরীসৃপ যেন একসঙ্গে কিলবিলিয়ে উঠে। যতীনের কথা আর সে নূতন করে শুনতে পায়, এবার দৃষ্টি পড়েছে হেওারসন সাহেবের। আর রক্ষে নেই। অপরেশ ঘেমে উঠে। মনের মধ্যে এলোমেলো চিন্তার স্রোত ঘর বেগে বহে চলে। একটা প্রবল আক্রোশে সে যেন ফেটে পড়তে চায়। কিন্তু আক্রোশ প্রকাশের সমুচিত পন্থা খুঁজে পায় না বলে সে প্যাড থেকে কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে অসুস্থ শরীরের অজুহাতে এক লম্বা ছুটির দরখাস্ত লিখে চলে। তারপর গন্তব্য স্থানে সেখানা পাঠিয়ে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়।

আধ ঘণ্টা পর। সলিলার চাপরাশী ছুটে আসে। কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে বলে, মেম সাব সেলাম ভেজা আপকো।

এতক্ষণে অপরেশ ফেটে পড়ে। চীৎকার ক'রে বলে, কাঁহে।

বল গিয়ে, আমি যেতে পারব না এখন।

যতীন ছুটে আসে। হাঁ হাঁ করে বলে, কি কর অপরেশ। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তোমার যে ডাক পড়েছে। এ সুযোগ হারাতে আছে। একবার ব্যাপারখানা দেখেই এসো না গিয়ে।

অগত্যা যেতে হল অপরেশকে। সলিলার ঘরে এসে ঢোকে। চোখে মুখে এক উদ্ধত ভাব নিয়ে। সলিলা বসেছিল উদগ্রীব প্রতীক্ষায়। হাতে তার অপরেশের ছুটির দরখাস্ত।

স্বামীকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে দাঁড়ায়। সোৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার বলত? শরীর খারাপ যদি, আমায় বল নি কেন?

অপরেশ উদ্ধতভাবে জবাব দেয়, প্রয়োজন বোধ করিনি।

—বাঃ! বেশ ত! আমাকে বলারও প্রয়োজন বোধ কর নি?

অপরেশ মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে বলে, না। আর কিছু বলার আছে?

—আছে। বল, বলছি! শরীর যদি খারাপই হয়ে থাকে, চল, আমিও ছুটি নিয়ে দিনকতক ঘুরে আসি তোমার সঙ্গে।

অপরেশ শ্লেষের হাসি হাসে। বলে, তুমি গেলে অফিস চলবে কি ক'রে। অমন ভট্টাচার্য, হেওারসন সাহেব এদের অবস্থা হবে কি?

—মানে? সলিলা ভ্রূকুঞ্চিত করে।

—মানে শুনবে? কিন্তু পর মুহূর্তে অপরেশ নিজেকে সামলে নেয়। বলে, থাক, এটা অফিস অফিসের নিয়ম কানুন আছে। চাকুরী যখন করি, সেগুলো মেনে চলতেই হ'বে। কিন্তু অফিস না হয়ে এটা যদি বাড়ী হ'ত—।

—বাড়ী হলে কি করতে তুমি ?

—কি করতুম ? অপরেশ আর নিজেকে সামলাতে পারে না। এতক্ষণকার রুদ্ধরোষ এবার বোমার মত সশব্দে ফেটে পড়ে। তর্জনীটা তুলে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বলে, কি করতুম জান ? চাবকে লাল করে দিতুম। সলিলা চমকে ওঠে। বোকার মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে। তারপরই সম্বিত ফিরে পায়। অপমানে সারা মুখ তার রাঙা হয়ে উঠে। আর্তকণ্ঠে বলে, কি, কি বললে তুমি ? বলতে পারলে এ কথা ? উঃ ভগবান !

অপরেশ হয়ত চেষ্টা করছিল আরও কিছু বলবার। কিন্তু বলতে দিল না সলিলা। ডান হাতখানি তুলে শান্ত কণ্ঠে বলল, থাম। চাপরাশী পিয়নের দল কাছেই আছে। গোলমাল শুনে তারা হয় ত ছুটে আসবে এখুনি। এটা অফিস। তার নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে। তুমি যাও—যাও এখান থেকে। তোমার ছুটির দরখাস্তের উত্তর পাবে এখুনি।

উত্তর পেতে বিলম্ব হয় না অপরেশের। ছুটি না মঞ্জুর করেছে সলিলা।

ঘটনা বলে, এ জানা কথা। তোমাকে চোখের আড়াল করতে চায় না। কি চোখেই না দেখেছে তোমাকে। তার পর বলে, বাড়াবাড়ি করতে যেও না তাহা। একটু সরে সরে চল। চেহারাখানা আছে আর সলিলা দেবী যখন পছন্দ করেছে, বাজি মাত করতে পারবে তুমি। আখের গুছিয়ে নাও। দলে ভিড়ে পড় চট্‌পট্।

অপরেশ গর্জে উঠে, ভিড়ছি। বোস দেখি, ছুটি কেমন না দেয় আমাকে। সে আবার প্যাডের কাগজ টেনে নেয়। চড়চড় করে লেখে, এ আদেশ একদেশদর্শী। সুতরাং মানতে আমি অপারগ। এর পর চাকরী করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুতরাং আজ থেকেই আমি ইস্তফা দিলাম। চিঠিখানা আর্দালীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অপরেশ অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে।

এরই ঘণ্টা খানেক পর।

অপরেশ বসেছিল মেঝের উপর উবু হয়ে, সামনে খোলা সুটকেস। একপাশে জামা কাপড়ের স্তূপ। সে গুলিকে সে গুছিয়ে নিচ্ছিল সুটকেসের ভিতর থাক দিয়ে দিয়ে। এ তার বাড়ী ছেড়ে যাবার প্রস্তুতি। হয় ত দেশ ছেড়েও চলে যেতে পারে সে। এরপর সলিলার সঙ্গে একত্রে বাস করা অসম্ভব। সে পারবে না। কিছুতেই পারবে না। না—না—না। অপরেশ দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ে। ঠিক এমনি সময়ে ঘরে এসে ঢোকে সলিলা। অফিস থেকেই এক ছুটে চলে এসেছে সে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, এ সব হচ্ছে কি ?

অপরেশ উত্তর দেয় না। জামা কাপড়ের থাক দেওয়াও বন্ধ করে না। যেমন দিচ্ছিল তেমনিই দিয়ে চলে। সলিলা আরও এক পা এগিয়ে আসে। বলে, তোমার মাথা খারাপ হল নাকি ? এতক্ষণে অপরেশ মুখ তোলে। স্ত্রীর মুখের উপর দু'চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলে, এখনও হয় নি। তবে হতে সুরু হয়েছে। এখন তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।

—বাঁচ মানে ?

—মানে ? সে অনেক কথা। আগে বার হই এ গোলক ধাঁধাঁ থেকে, তারপর বলব। সলিলা বসে পড়ে। হাত দিয়ে সুটকেস বন্ধ করে দিয়ে বলে, না, তোমায় বলতেও হবে না আর এভাবে পালাতেও হবে না। আমি তোমায় যেতে দেব না। কেন ? কি এমন অপরাধ করেছি আমি যে এভাবে শাস্তি দিতে চাও আমাকে ? আমি অসচ্চরিত্রা ? স্বামী হয়ে এ কথা তুমি ভাবলে কি ক'রে ? সলিলার চোখ

দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। অপরেশ বলে, শুধু আমি কেন, আজকাল অফিস শুদ্ধ লোক ঐ কথা বলে।

—মিছে কথা। সলিলা গর্জে উঠে।

—না। ষষ্ঠীন দেখেছে, শুনেওছে সব।

—ষষ্ঠীন? তুমি ষষ্ঠীনের কথা শুনে অসম্মানিত করছ নিজের স্ত্রীকে। চাবুকে লাল করে দিতে চেয়েছ। হা ভগবান! অপরেশ অপ্রস্তুতে পড়ে। ইতস্ততঃ করে বলে, কিন্তু—। সলিলা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে আসে। স্বামীর মুখের সামনে নিজের মুখখানিকে তুলে ধরে বলে, কিন্তু নয়, নিজের চোখ দিয়ে দেখ। দেখ, এ মুখে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করেছে কি না। তোমার গুরুস্থ ভট্টাচার্য, হেওারসন সাহেবের কোন কালো ছিটকে লেগেছে কি না। বিয়ের রাতে এ মুখ যেমন নিষ্কলঙ্ক দেখেছিলে, এখনও ঠিক তেমনি আছে কি না। দেখ, দেখ, দেখতে পাও কি কিছু। বলতে বলতে অসীম উত্তেজনায় নিজের মুখখানিকে স্বামীর চোখের আরও নিকটতর করে আনে।

কিংকর্তব্য অপরেশ বিস্ময়ের আধিক্যে নির্বাক হয়ে থাকে। কিন্তু সলিলা থামে না। বলে চলে, নিজের স্ত্রীকে অসম্মানিত করতে এতটুকু বাধল না তোমার। ছিঃ ছি। কিন্তু কি দোষ আমার। আজও পর্যন্ত যা কিছু করেছি আমি সব তোমার মুখ চেয়ে, তোমার মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে।

—আমার মুখ চেয়ে? অপরেশ অবাক হয়ে যায়।

—তোমার। শুধু তোমার। তোমার মঙ্গলের বড় আর কি আছে আমার। এতদিন তোমায় বলিনি, আজ বলছি শোন। নিকলসনকে ধরেছিলুম আমি তোমার জন্যে, দয়ালবাবুর পদে তোমায় বহাল করবার জন্যে বলেছিলুম, তোমার সাহায্য না পেলে মকর্দমার অতো সব কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া যায় কত আমার পক্ষে। সাহেব বিশ্বাস করেছিলেন সে কথা। তাই মঞ্জুর করে গেছেন আমার আবেদন। যেটুকু বাধা ছিল হেওারসনের দিক থেকে, তাও অপসারিত করে এসেছি আজ। এর মধ্যে শুধু এতটুকু শিষ্টাচার, এতটুকু সৌজন্যের অপচয় হয়েছে মাত্র। তার বেশী কিছু নয়। কোন অসম্মানের কাজ আমি করিনি জেন।

—সীলা! অপরেশ আর্তনাদ করে উঠে।

সলিলা বলতে থাকে, তোমরা পুরুষ, তোমরা জাননা, কী বাধা বুকে নিয়ে মেয়েরা চলাফেরা করে এ সংসারে। তা থেকে রেহাই পাইনি আমিও। কিন্তু আর না, আজ সবেরই হিসেব নিকেশ শেষ করে দিয়ে চলে এসেছি আমি।

সলিলা থেমে যায়। কিন্তু অপরেশ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে। বলে, শেষ করে দিয়ে চলে এসেছ মানে?

—মানে? সলিলা একটুখানি ম্লান হাসি হাসে। তার পরে বলে, মানে, এর পর ওখানে আর পোষাবে না আমার। তাই তোমার পরিবর্তে নিজের পদত্যাগ পত্র দাখিল ক'রে চলে এসেছি আমি। এতক্ষণে সেখানা গিয়ে পড়েছে হেওারসনের হাতে। তোমার খানা ফিরিয়ে এনেছি। এই নাও তোমার দরখাস্ত। বলে দরখাস্তখানা ছিঁড়ে কুটি কুটি ক'রে ছড়িয়ে দেয় মেঝের উপর।

অপরেশ বজ্রাহত হ'য়ে পড়ে। কাতরকণ্ঠে বলে, এ তুমি কি করেছ সলিলা?

—ঠিকই করেছি। ভুল করিনি। এ কদিনের আবর্তে পড়ে বুঝেছি অনেক, শিখেছি অনেক।

বুঝেছি, মেয়েদের সিঁথির সিঁদুরের ভার বড় কম নয়, তার দায়িত্বও কম নয়। এর আভিজাত্য তুলনাহীন। চাকরীর সম্মানে এর সম্মান যাবে না। তুমি ভুল বোঝনি। সেখানে জয়ন্তর দৃষ্টি আছে, হেওারসনের দৃষ্টি আছে। সে দৃষ্টি আমি দেখেছি। তাদের অন্তরালে কি কামনা মাখান আছে, জেনেছি। সেখানে উদারতা নেই। সে শিক্ষাও তাদের নেই। নেই বলেই শিখিয়ে দিয়ে এসেছি আমি।

—তুমি? তুমি শিখিয়ে দিয়ে এসেছ? কিন্তু কি শিক্ষা দিয়ে এসেছ সলিলা? সলিলা আবার হাসে। এ হাসি ভারী মিষ্ট হাসি। বলে থাক তুমি স্বামী নাইবা শুনলে সে কথা। তার চেয়ে আমার কথা শোন। এ কদিন প্রতি মুহূর্ত ধরে বোঝাপড়া করে আসছি নিজের সঙ্গে। মনকে বুঝিয়েছি, সিঁথির সিঁদুর আর হাতের লোহার সম্মান বজায় রেখে চাকরী করা চলে না। চাকরীকে সম্মান দিতে গেলে এদের সম্মান থাকে না। তাই এদের সম্মানে এতটুকু আঘাত লাগতে দিইনি। তার আগে চাকরী জীবনে ইতি করে দিয়ে ফিরে এসেছি তোমার কাছে।

অপরেশ মুগ্ধ হয়ে যায়। সহসা দুহাত বাড়িয়ে পত্নীর লাবণ্যমণ্ডিত মুখখানাকে কাছে টেনে এনে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে ডেকে উঠে, সলিলা, সলিলা আমার।

সলিলা বাধা দেয় না। নিজেকে এ আকর্ষণে তলিয়ে দেয়। আবেশ মাখান স্বরে বলে, সত্যি, আজ অদ্ভুত ভাল লাগছে আমার। অপরের দাসত্ব করার চেয়ে তোমার এ দাসত্ব অনেক ভাল। মেয়ের এ কথা কেন বোঝে না, জানি না। সে চক্ষু দুটি মুদ্রিত ক'রে স্বামীর হাতে মুখ লুকোয়।

লোকটার কিছু হবে না,—এই ছোল বন্ধুবান্ধবদের ধারণা।

লোকটা কিন্তু ছাড়েন না তাঁর কাজ, দিবারাত্র হয় তুলি দিয়ে ছবি আঁকেন, নয় ছেনি দিয়ে পাথরে মূর্তি খোদাই করেন।

হঠাৎ একদিন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এল দেশবিদেশের মনীষীরা, শিল্প-সমালোচক পণ্ডিতের দল।

—ব্যাপার কি?—আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করেন লোকটি।

—ফ্লোরেন্সের পাহাড়ে ডেভিডের (David) মূর্ত্তিটি কি আপনি পাথরে খুদেছেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

ফ্লোরেন্সের জয়দেবীর (Statue of Victory) মূর্ত্তিটীও কি আপনারই ভাস্কর্য?

—আজ্ঞে হাঁ।

—হে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর। তোমার তুলনা কোথায়?

ওসব কথায় কান না দিয়ে মাইকেল এঞ্জেলো তৎক্ষণে হয়ত আবার রং তুলি বা ছেনি নিয়ে বসে গেছেন নিজের কাজে।

পা বাড়ালেই রাস্তা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাড়ি ত ছাড়তেই হবে। তাই দিলীপ অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে মাকে নতুন একটা বাড়ি দেখাতে এনেছে।

মায়া প্রথম আসতে চায়নি। বলেছে—আমাদের মত অবস্থার লোকের বাড়ি কি শহরে ছড়াছড়ি যাচ্ছে যে চাইলেই পাবেন। যা পাবেন তার ভাড়া গোনবার ক্ষমতাই আমাদের নেই। শহরে নয় বরং এবার শহর ছাড়িয়ে রেলে আসা যাওয়া যায় এমন কোন দূরের ষ্টেশন টেশনের কাছে দেখতে হবে আমাদের সাধ্যে যা কুলোয়।

দিলীপ পেড়াপীড়ি করে বলেছে,—আহা তবু একবার দেখতে দোষ কি ? চলুন না ?

এখন বাড়ি দেখে মায়ার চক্ষুস্থির। মাথা খারাপ না হলে এরকম পরিবেশে এমন বাড়ি তাদের জন্যে দিলীপ দেখতে আনে।

বাইরে থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দিলীপ জিজ্ঞাসা করে,—কি, বাড়িটা পছন্দ হয় ?

হলেই বা কি আর না হলেই বা কি ?—দিলীপের পাগলামিতে মায়া একটু শুধু হেসে বলে—পছন্দ'ত রাজবাড়িও হতে পারে।

পাগল ! দিলীপ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানায়,—সাধ করে কেউ রাজবাড়ি পছন্দ করে ? বাড়ি হবে প্রাণের বন্ধুর মত। নিশ্চিন্ত নির্ভরের মত থাকবে কিন্তু রাত দিন সাড়া দেবে না। তার বদলে খানসামা বেয়ারা পাইক বরকন্দাজ হয়ে সে বাড়ি যদি সব সময়ে সেলাম ঠোকে তাহলে সেখানে থাকা যায় ?

সেখানেও যেমন যায় না এখানেও তাই। মায়া দিলীপের উৎসাহে প্রশ্রয় দেয় না,—চলুন, চলুন। কোথায় কি বাড়ি আছে বলছিলেন দেখাবেন চলুন। এ বাড়ি এতক্ষণ ধরে দেখাও শাস্তি।

শাস্তি !—দিলীপ যেন অবাক !

শাস্তি ছাড়া কি ! মিছি মিছি মন খারাপ করা ছাড়া'ত কিছু নয় !

আহা, মন খারাপই একটু না হয় করলাম।—দিলীপ বোঝাবার চেষ্টা করে,—মনটা যে মরে যায়নি মিছি মিছি খারাপ করেও তা মাঝে মাঝে পরখ করতে হয়।

দিলীপ এবার বাড়িটার দিকে এগোয়।

অনিচ্ছায় বাধ্য হয়েই তার সঙ্গে যেতে যেতে মায়া বলে—কেন যে সময় নষ্ট করছেন জানি না !

দিলীপ কোন উত্তর না দিয়ে বাইরের ঘেরা দেওয়ালের কাঠের গেটটা খুলে ধরে বলে—এই দেখুন কাঠের গেটটা খুললেই ছোট্ট একটু বাগান।

মায়া একেবারে হতভম্ব। নতুন বাড়ি এখনো একেবারে সম্পূর্ণ হয়নি। বিশেষ করে কাঠের গেট পেরিয়ে ছোট মাটির উঠোনটায় এবড়ো খেবড়ো ঘাসের চাপড়া ছাড়া কিছু নেই।

অবাক হয়েই সে তাই জিজ্ঞাসা করে—বাগান কোথায়? শুধু ত দেখছি ঘাসের চাপড়া!

ওই ঘাসের চাপড়া কি আর থাকবে?—দিলীপ হেসে ওঠে। তারপর উঠানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে,—এইখানে কটা সূর্যমুখী, ওখানে একটা হাস্নাহানার ঝাড়, আর ওদিকে একটা লিউলি।

মায়া এতক্ষণে দিলীপের কৌতুকের ধরণটা বুঝেছে। নিজেও তাতে যোগ দিয়ে হেসে বলে,—বাগানটা কিন্তু কিরকম হল?

একি আর সাজানো লোকদেখানো বাগান—দিলীপ ব্যাখ্যা করে দেয়,—এ বাগান খেয়াল খুশির, তাই বাঁধা নিয়ম মানে না। আচ্ছা বাগান থেকে এবার বাড়ির ভেতর।

দিলীপের সঙ্গে মায়াকেও বাড়ির ভেতর ঢুকতে হয় কৌতুক ভরে।

বাইরে মেঠো উঠোন থেকে কয়েকটা ধাপ উঠে একটা বারান্দা ঘেরা প্রশস্ত ঘর। নতুন তৈরী ঘরে দেওয়াল ঝক্‌ঝক্ করছে।

ঘরটা চমৎকার নয়?—দিলীপ জিজ্ঞাসা করে।

খুব চমৎকার!—মায়া সায় দিয়ে বলে,—এটা ত বাইরের ঘর।

বাইরের ঘর!—দিলীপ যেন ক্ষুণ্ণ।—পাগল! এরকম একটা ঘর বাইরের লোকজনের জন্যে নষ্ট করতে আছে। এরকম একটা ঘরে বসতে পেলে বাইরের লোক ত আর উঠতেই চাইবে না।

হাসি চেপে দিলীপের কাল্পনিক মজার খেলায় উৎসাহ দিয়েই মায়া কপট বিস্ময় প্রকাশ করে,—ও আপনি বাইরের লোক জনকে বেশী আদর দিতে চান না।

দেব কখন? সময় কোথায়? দিলীপ রীতিমত গম্ভীর।

দিলীপ কল্পনায় ফাঁকা ঘরটা সাজিয়ে ফেলে এবার।

—এই জানালার এধারে একটা বড় টেবিল। তার পাশে একটা বইএর আলমারী। টেবিলের ওপর একটা মোরাদাবাদী পেতলের ফুলদানিতে রজনীগন্ধা। আর এখানে একটা টিপয়ের ওপর একটা —একটা···

ব্রজের মূর্তি!—মায়াই কথা জুগিয়ে দিয়ে কল্পনাটা টেনে নিয়ে চলে,—তার ওপরে দেওয়ালে একটা বাঁধানো ছবি, অবন ঠাকুর কি নন্দলাল বোসের। জানালায় দরজায় হাতের এমব্রয়ডারী করা পর্দা হাওয়ায় দুলছে। ওধারে···

ধীরে একটু ধীরে—দিলীপ বাধা দিলে—মাথা ওদিকে আসল কথাটা ভুলে যাবো।

আসল কথাটা কি?—মায়া কৌতূহলী।

আমি এইখানে বসে কাজ করছি,—দিলীপ কল্পনার রাশ ছেড়ে দেয়, আর মাঝে মাঝে ওই দরজার ওধারে রান্নাঘরের দিকে চেয়ে চেঁচাচ্ছে, কই কফি হল?

মায়ার মুখটা একটু বুঝি রাঙা হয়ে ওঠে, কিন্তু হাল্কা হাসিতে সে সলজ্জ অস্বস্তিটা চাপা দিয়ে বলে,—আর ওখান থেকে আওয়াজ আসে,—কফি হবে কিসে? চিনি বাড়ন্ত।

দুজনেই এবার হাসতে থাকে।

মায়াই প্রথম হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে,—যাক্ ঢের পাগলামি হয়েছে। এখন চলুন। কাজের বাড়ি ঢুকেছেন, এখুনি তাড়া খেতে হবে হয়ত।

মায়া যাবার জন্যে পা বাড়াবার আগেই দিলীপ বাধা দিয়ে গম্ভীর ভাবেই বলে,—আচ্ছা সত্যিই যদি এ বাড়িটা পাওয়া যায়।

তাহলে বুঝি আকাশ কুসুম সত্যি সত্যি কখনো ফোটে।—মায়ার মুখের হাসিটা এবার একটু বুঝি করুণ।

তাহলে বলি সত্যি ফুটেছে!—দিলীপ উজ্জ্বল মুখে বলে—এ বাড়ি পেয়েই গেছি মনে করতে পারেন। একটু শুধু উপদ্রব সহ্য করতে হবে।

সমস্ত ব্যাপারটা এখনো তামাসা মনে করেই মায়া কৌতুকের স্বরে জিজ্ঞাসা করে,—উপদ্রবটা আবার কি?

উপদ্রব আমি স্বয়ং। মায়ার দিকে কেমন একটু অদ্ভুত ভাবে চেয়ে দিলীপ যেন মিনতি করে,—এ বাড়িতে আমায় একটু জায়গা দিতে হবে।

মায়ার কাছে ব্যাপারটা এখনো ছেলেমানুষী কল্পনা। সে উদার ভাবেই সম্মতি জানিয়ে বলে,—তা না হয় দেওয়া যাবে। এমন একটা বাসার জন্যে ওটুকু উপদ্রব না হয় সইলাম।

দেখুন, ঠিক ত? শেষে আবার পিছিয়ে যাবেন না। আমায় থাকতে দেওয়ার জামেলা আছে।

যেমন! মায়ার চোখে দুষ্টুমির হাসি।

তা ঠিক আমি নিজেই কি জানি এখনো! দিলীপ যেন ভেবে চিন্তে বলে,—একটু আদর আব্দারা পেলেই হয়ত আবদার বাড়তে থাকবে। ঘরে থাকতে পেয়ে ঘরণী-ই চেয়ে বসব।

নেহাৎ ঠাট্টার ছলে বলা কথা। কিন্তু একজন বলে আর একজন শুনে দুজনেই কেমন খানিকক্ষণ অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

পরিহাসের সুরটাই নিরাপদ বলে মায়াই তারপর হেসে উঠে বলে,—তাহলে আব্দারা দেওয়া সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হবে।

তাই থাকবেন। দিলীপও হাসে কিন্তু হাসিটা একটু বুঝি আলাদা জাতের। পরের কথাগুলো কৌতুকের ভঙ্গিতে বললেও স্বরটা কেমন গাঢ়—শুধু একদিন আনমনা হয়ে ওই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে পারেন···

দিলীপের মুখের দিকে চেয়ে কৌতুকের ভানটাই রাখবার চেষ্টা করে মায়া বলে,—দাঁড়ালাম তারপর···

তারপর?—দিলীপ মায়ার দিকে একবার চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে একেবারে অন্য সুরে গাঢ় গভীর স্বরে বলে,—তারপর ঐ দূর-দিগন্তের দিকে চেয়ে মনে হতে পারে। কোন মানে হয় না হৃদয়ের চারিদিকে এমন বেড়া দিয়ে রাখবার।

তাই মনে হ'ল। তারপর?—মায়ার কণ্ঠও কি একটু ধরা?

দিলীপ একবার একদৃষ্টে মায়ার দিকে তাকিয়ে গাঢ় গভীর স্বরে বলে,—তারপর কাছে এসে যে দাঁড়িয়েছে তার হাতে ধীরে ধীরে একটা হাত হয়ত রাখা যায়।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দুজনেই খানিক নীরব নিস্পন্দ হয়ে থাকে। তারপর সত্যিই মায়া হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে প্রায় অস্ফুট স্বরে বলে,—তাই রাখলাম।

হাতটা কতক্ষণ ধরা থাকত বলা যায় না। হঠাৎ একটা বিশ্রী আওয়াজে তাদের চমক ভাঙে। খালি বাড়ির বারান্দার রেলিঙে বসে দুটো শালিক উচ্চকণ্ঠে কিচির মিচির করছে যেন তাদেরই ভৎর্সনা করে।

দুজনেই হেসে উঠে পরস্পরের হাত ছেড়ে দেয়। দিলীপ তারপর বলে,—এবাড়িই তাহলে আমাদের বোক মায়া।

মায়া আর হাসে না। একটু ব্যথিত স্বরেই বলে,—ঠাট্টাটা একটু নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছেনা এবার?

না মায়া, ঠাট্টা নয়। দিলীপ শান্ত স্বরে বলে,—সত্যিই চৌধুরী সমবায় থেকে এবাড়ি আমায় দিচ্ছে। মনে হচ্ছে চাকরিরও একটা উন্নতি হচ্ছে সেই সঙ্গে।

একটু হেসে কি একটা দ্বিধা যেন জয় করে দিলীপ বলে,—তোমার—তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে এ বাড়ি নিতে পারি।

নিতে তুমি সত্যি চাও? প্রশ্নটা করতে মায়ার বেশ দেরী হয়। এটা যেন প্রশ্নও নয় ঠিক বিস্মিত বিহ্বল মনের একটা অর্ধস্ফুট ধ্বনি।

দিলীপ উত্তর না দিয়ে মায়ার হাতটা আর একবার ধরে শুধু একটু হাসে। [ক্রমশঃ

আফ্রিকার কোন পাহাড়ের পথে লিভিংষ্টোন কোন এক মুহূর্তে নিজের দলছাড়া হয়ে পড়েন। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন এক সিংহ তাঁকে অনুসরণ করছে, একটু সুবিধা পেলেই তাঁর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।

হাতে তাঁর বন্দুক থাকলেও, ঘুরে দাঁড়িয়ে সিংহকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছোঁড়ার অবসর আর নেই। তিনি একটু দ্রুতপদেই এসে একেবারে পর্বতমুখের কিনারে পৌঁছে গেলেন। সেখানে খাড়া পাহাড়ের একদিকে অতলস্পর্শী গহ্বর, অন্যদিকে সাক্ষাৎ মৃত্যু-রূপী সিংহ।

এইবার সিংহটিকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে তিনি তাঁর বন্দুকটীকে খাড়া তুলে ধরে তার উপরে তাঁর মাথার টুপিটি রেখে পাথরের আড়ালে রইলেন।

মুহূর্তমধ্যে সিংহটি টুপিটি লক্ষ্য করে দিল এক প্রচণ্ড লাফ। কিন্তু তাল সামলাতে না পেরে সে টুপিটি শুদ্ধ অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল। সেখানে তার সিংহ-লীলা তখনি যে শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

নিশ্চিত মৃত্যুকে সামনে দেখেও ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের এমন উদাহরণ জগতে খুব কমই পাওয়া যায়।

আফ্রিকায় ফরাসী যাদুকর

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

সাল—১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ। মাস—অক্টোবর। স্থান—ফরাসী অধিকৃত আলজিরিয়া, আফ্রিকার উত্তর উপকূলে। ফরাসী দেশ থেকে এসে হাজির হলেন, অদ্বিতীয় ফরাসী যাদুকর রবের্যার উদ্যাঁ (Robert Houdin), ফরাসী সরকারের বিশেষ অনুরোধ এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। পৃথিবীর যাদুচর্চার ইতিহাসে উদ্যাঁই (Houdin) বোধ করি একমাত্র যাদুকর, যিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শুধু যাদুবিদ্যার সাহায্যে নিজের দেশের একটি বিরাট উপকার করেছিলেন।

ফরাসী সরকার কেন বাধ্য হয়েছিলেন উদ্যাঁকে আলজিরিয়ায় পাঠাতে? কি উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন উদ্যাঁ, এবং কি কৌশলে? সেই কাহিনীই বলছি। আলজিরিয়ার অধিবাসীরা দুর্ধর্ষ আরব বংশোদ্ভূত। যেমন দুর্ধর্ষ, তেমনি অশিক্ষিত, সরল বিশ্বাসী, কুসংস্কারগ্রস্ত। তাদের সরল বিশ্বাস আর কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে একদল আরব মোল্লা বা পুরোহিত ধাপ্পাবাজ চতুর ব্যক্তি বিভিন্ন রকমের ভেলকি ভোজবাজি দেখিয়ে নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে প্রতিপন্ন করে তাদের উপর বেশ গভীর এবং ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আলজিরিয়ার অশিক্ষিত অন্ধবিশ্বাসী দুর্ধর্ষ আরবদের কাছে এদের কথা ছিল বেদবাক্যের মতো, সেই সুযোগে এই মোল্লারা নানাভাবে উসকানি দিয়ে ফরাসী সরকারের প্রতি বিদ্রোহীভাবাপন্ন করে তুলত। ক্রমে ক্রমে আলজিরিয়ার অধিবাসীদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগল যে, ফরাসীরা কিছুতেই আর আলজিরিয়ায় তাদের আধিপত্য রক্ষা করতে পারবে না। ফুরিয়ে এসেছে তাদের ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির দিন। ফরাসী সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভীতির ভাব দ্রুতবেগে মুছে যেতে লাগল তাদের মন থেকে। তারা ভাবলে তাদের এই মোল্লাদের ক্ষমতা যখন এমন অদ্ভুত অলৌকিক, অসম্ভবকে সম্ভব করা যে এদের কাছে ছেলেখেলা, তার চাক্ষুষ প্রমাণ এরা পেয়েছে ভোজবাজির অনেক খেলায়, সুতরাং এরা যখন ফরাসী আধিপত্যের পতন আসন্ন বলে ঘোষণা করছে তখন সত্যিই তা আসন্ন। তাছাড়া আর কিছু না হোক, এদের অলৌকিক যাদুর জোরেই ফরাসী সরকার হটে যাবে, বাপ বাপ বলে পালাতে পথ পাবেনা।

আলজিরিয়ার ফরাসী শাসন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারের ভেতর আগামী মহাবিপদের নিশ্চিত সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেলেন। শংকিত হলেন। শংকা জানিয়ে খবর পাঠালেন খোদ ফরাসী সরকারের কাছে। ফরাসী সরকার গভীরভাবে ব্যাপারটি ভেবে দেখে সিদ্ধান্ত করলেন পুলিশ মিলিটারি গোলাগুলি দিয়ে এ জিনিষের মূল ওপড়ানো যাবে না, মূল ওপড়াবার সেরা এবং একমাত্র উপায় হচ্ছে ঐ চতুর ভেলকিবাজ মোল্লাদের প্রভাব সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়া। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই ফরাসী সরকার আমন্ত্রণ জানালেন ফরাসী যাদু-গৌরব রবের্যার উদ্যাঁ-কে। ইউরোপময় তখন তাঁর অসামান্য 'অলৌকিক' যাদুর অসাধারণ খ্যাতি।

এতদিন শুধু জনমনোরঞ্জনের জন্যই তিনি যাদুর খেলা দেখিয়ে এসেছেন। এবার যাদু দিয়ে রাজনৈতিক জগতে দেশকে সেবা করবার সুযোগ পেয়ে তিনি সানন্দে এ দায়িত্ব শিরোধার্য করে নিলেন। যাদু প্রদর্শনের সরঞ্জামাদি নিয়ে আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স' শহরে উপস্থিত হলেন যাদুকর রবের্যার উদ্যাঁ ও সস্ত্রীক। সেখানকার সেরা থিয়েটার হলে শুরু হল তাঁর যাদু প্রদর্শন। তামাশা দেখবার সুযোগ

পেয়ে পুলকিত হল সেখানকার আরব জনসাধারণ, কিন্তু তাদের নিজেদের মোল্লা-যাদুকরদের যাদুর তুলনায় এই শাদা যাদুকরের যাদু যে নিতান্তই ছেলেখেলা মাত্র হবে, সে বিষয়ে এদের কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে বলে মনে হল না।

কিন্তু উর্তা-র "হাল্‌কা আর ভারি বাক্স" (Light and heavy chest) খেলাটি দেখে সমবেত আরবদের মনে জাগল বিস্ময় আর আতঙ্ক। খেলাটা এই। একটা ছোট হাল্‌কা বাক্স মঞ্চের উপর রেখে একজন ভীমকায় পালোয়ান আরবকে উর্তা বললেন, "দেখ তো এই বাক্সটা তুলতে পার কিনা।" বলা বাহুল্য অনায়াসে বাক্স তুলে ফেলল সেই পালোয়ান লোকটা। তুলে আবার রেখে দিয়ে তাচ্ছিল্যভরে হাসল একটু। সেই তাচ্ছিল্যের হাসির ছোঁয়াচ লাগল সারা হলের আরবদের মুখে। উর্তা তখন সেই আরব পালোয়ানটিকে বললেন, "এইবার আমি আমার যাদুর বলে তোমার দেহ থেকে শক্তি কেড়ে নিচ্ছি। ধীরে ধীরে তোমার শক্তি কমে যাচ্ছে। আচ্ছা, এইবার চেষ্টা করে দেখ তো বাক্সটি তুলতে পার কিনা। আবার পরম তাচ্ছিল্যভরে সেই বাক্সের হাতলে হাত লাগাল সেই অসুরের মত শক্তিশালী আরব। কিন্তু বাক্সটি তুলবার চেষ্টা করতে গিয়েই তার মুখের হাসি ঘুচে গেল। দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করল সে, দাঁতে দাঁত লাগিয়ে। দেহের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল, সারা দেহ কাঁপতে লাগল থর থর করে। কিন্তু বাক্সটা সে কিছুতেই তুলতে পারল না!!! একি অলৌকিক ব্যাপার! কলির এই ভীমকে কি যাদুর বলে শিশুর চাইতে দুর্বল বানিয়ে দিয়েছেন যাদুকর উর্তা, তার দেহ থেকে শক্তি শুষে নিয়ে। সমবেত দর্শকদের মুখ থেকেও হাসি অন্তর্হিত হয়ে গেল এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, বৈদ্যুতিক চুম্বকের (electro magnet) প্রয়োগ। মঞ্চের নেপথ্যে উর্তা-র সহকারী উর্তার ইশারা অনুযায়ী বিদ্যুৎ তরঙ্গ চালু করে দিলেই বাক্সের তলার লোহা মঞ্চের ওপরে লোহার সঙ্গে বৈদ্যুতিক চুম্বকের আকর্ষণে আটকে থাকত, সে অবস্থায় (অর্থাৎ বিদ্যুৎ তরঙ্গ চালু থেকে বৈদ্যুতিক চুম্বকের আকর্ষণ যতক্ষণ বজায় থাকত) মঞ্চ থেকে বাক্সটি তোলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পালোয়ানের পক্ষেও সম্ভব হত না। নেপথ্য সহকারী বিদ্যুৎ-তরঙ্গটি বন্ধ করে দিলেই বৈদ্যুতিক চুম্বকের আকর্ষণ আর থাকত না, সুতরাং বাক্সটি অনায়াসে তোলা যেত। কিন্তু সে সময় (অর্থাৎ এখন থেকে একশো বছরেরও বেশি আগে) বিদ্যুৎশক্তি মাত্র নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে, ইউরোপেও খুব অল্প লোকই এই শক্তির খবর জানত। আলজিরিয়ার এই আরবরা তো এ ব্যাপারে ছিল একেবারেই অজ্ঞ, সুতরাং তারা যে এ ব্যাপারটাকে ভূতুড়ে, অলৌকিক ভাববে এতে বিস্ময়ের কি আছে? যাদুকর উর্তা শুধু যাদুর চর্চাই করতেন না, বিজ্ঞান চর্চাও করতেন, বিশেষ করে ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎতত্ত্বের। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যুতের কার্যকরী প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি মৌলিক আবিষ্কারের জন্য পারী (Paris) শহরের একটি প্রদর্শনীতে তিনি একটি পদকও পেয়েছিলেন। যাদুবিদ্যায় বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগে তিনিই বিশ্বের সর্বপ্রথম যাদুকর।

বাক্সটি তুলতে না পেরে সেই পালোয়ান আরবটি একবার হাল ছেড়ে দিয়ে তারপর মরিয়া হয়ে আবার চেষ্টা করতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উর্তার গোপন ইঙ্গিতে নেপথ্যের সহকারী এমনভাবে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চালালেন যে বিদ্যুতের শক্ খেয়ে লোকটা হঠাৎ অবসন্ন বোধ করল। তার দুটি হাঁটু বেঁকে গেল, আর কাঁপতে কাঁপতে সে বসে পড়তে বাধ্য হল। নেপথ্য থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ হঠাৎ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতেই পেছন দিকে ছিটকে পড়ে গেল লোকটা। তারপর "ইয়াল্লা!" বলে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল। জীবনে সে বুঝি কখনো এমন নাকাল হয়নি, এমন ভয় পায়নি।

আরবদের আরো যেসব খেলা উদ্যা আলজিরিয়ায় দেখিয়েছিলেন, তাদের সম্পূর্ণ ফিরিস্তি বা বর্ণ দেবার দরকার নেই, যে খেলাগুলো তাদের সবচেয়ে বেশি চমকে দিয়েছিল তাদের কথাই বলি। একটি খেলায় একজন আরবকে তিনি মঞ্চের ওপর ডেকে আনলেন। এনে বেতের তৈরি একটা বড় ঝুড়ি চাপা দিলেন তার ওপর। তারপর ঝুড়িটি তুলে নিজেই দেখা গেল জলজ্যান্ত লোকটা বেমালুম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে !!! ভূতুড়ে কাণ্ড দেখে কয়েকজন আরব দর্শক ভয়ে চিৎকার করতে করতে হল থেকে বেরিয়ে গেল, পাছে এই খেতকায় যাদুকর বেতের ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে তাদেরও অমনি করে উড়িয়ে দেন। কিছুক্ষণ বাদে সেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া লোকটাকে আবার সশরীরে হাজির হতে দেখে সবাই দুচোখ কপালে তুলে বললে, "ইয়া আল্লা !"

বন্দুকের গুলি ধরার খেলাটা প্রথমে একটু নতুন ভাবে দেখালেন উদ্যা। একটা চিহ্নিত গুলি ভরা হল বন্দুকে। একটা ছুরির ফলা উঁচু করে তাতে একটা আপেল বিঁধিয়ে ধরে রইলেন যাদুকর উদ্যা। বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া হল আপেলটিকে লক্ষ্য করে। গুলির ধাক্কায় নড়ে উঠল আপেল, কেঁপে উঠল উদ্যার হাত। ছুরি দিয়ে আপেলটি কেটে তার ভেতর থেকে তিনি বার করে দেখিয়ে দিলেন বন্দুক থেকে সদ্য ছোঁড়া সেই চিহ্নিত গুলিটি !!

আল্‌জিয়ার্স শহরটি সমুদ্র উপকূলে। উপকূল দিয়ে ফেলে উদ্যা তাঁর যাদু প্রদর্শনী নিয়ে চলে গেলেন আলজিরিয়ার অভ্যন্তরে। সেখানে তিনি যাদুর খেলা দেখাচ্ছেন এমন সময় একজন আরব এগিয়ে এসে বললে, "আপনি তো মস্ত যাদুকর। আমার নিজের পিস্তল দিয়ে আমাকে নিজের হাতে আপনার ওপর গুলি চালাতে দিতে পারেন ?

এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে জান বিপন্ন হবে বটে, কিন্তু গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলে সঙ্গে সঙ্গে মান যাবে ; শুধু নিজের মান নয়, ফরাসী জাতির। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আলজিরিয়ায় এসেছেন, তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুতরাং জান বিপন্ন করেও তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। বললেন, "পারি, এক দেবো। কিন্তু তার আগে আমার সহায়ক শক্তির আবাহন করে নিতে হবে। কাল রাত্রে তোমাকে আমি সুযোগ দেব।"

পরদিন ভোরবেলা উদ্যা এই বিপদসংকুল দুরূহ পরীক্ষার জন্ত তৈরি হতে লাগলেন। মোম এবং ভূষা (lamp-black) মিশিয়ে তাই দিয়ে পিস্তলের একজোড়া নকল টোটা তৈরী করলেন তিনি। বাল্যকাল থেকেই বন্দুকের কাজে আর বিভিন্ন জিনিষ তৈরীতে অসাধারণ দক্ষতা ছিল তাঁর। টোটা দুটি দেখতে প্রায় হুবহু আসল টোটার মতই হল। একটি টোটার বহিরাবরণ জমে শক্ত হতেই তাতে একটি ফুটো করে ভেতরের মোম বার করে ফেলে সেই ফাঁপার ভেতরে খানিকটা রক্ত পুরে দিয়ে মুখটা আবার বুজিয়ে দিলেন।

পরের রাত্রিতে যাদু প্রদর্শনের সময় সেই সন্দেহগ্রস্ত আরব লোকটির হাতে একটি ছোট প্লেটে কতকগুলো পিস্তলের টোটা দিয়ে বললেন, "পরীক্ষা করে দেখ এগুলো সত্যি সত্যি সীসার তৈরি কিনা।"

লোকটি টোটাগুলো পরীক্ষা করে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে নিজের পিস্তলটা দিলে যাদুকর উদ্যার হাতে। প্লেট থেকে একটি টোটা নিয়ে সেটিকে ঐ পিস্তলে পুরে তাতে বারুদ ঠেসে ঐ আরব লোকটির হাতে দিলেন যাদুকর। টোটাটি তিনি যখন পিস্তলে পুরে দিচ্ছিলেন, তখন কড়া নজরে তার হাতের দিকে তাকিয়েছিল লোকটা। একটু কেঁপে উঠেছিল যাদুকরের বুক, কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্তের জন্ত। তাঁর বক্ষ হাতের কৌশলে আগে থেকে হাতে লুকিয়ে রাখা একটি নকল টোটা (যার ভেতরে রক্ত নেই) চলে গেল পিস্তলের ভেতর। আসল টোটাটি লুকিয়ে রইল তার হাতে। অত্যন্ত পাকা হাতের টোটা ধরা পড়ল না আরব লোকটির চোখে।

পেছনদিকে কিছুদূর গিয়ে বুকের ওপর দুহাত আড়াআড়িভাবে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন যাদুকর উদ্যা। বললেন, "চালাও গুলি।"

লোকটা টিপে দিল পিস্তলের ঘোড়া। 'গুড়ুম' আওয়াজও শোনা গেল। কিন্তু একি? এতটুকু টললেন না তো যাদুকর। দেখা গেল দুই দাঁতের ফাঁকে তিনি সদ্য-নিক্ষিপ্ত টোটাটি ধরে ফেলেছেন!!! পিস্তল যে ছুঁড়েছিল সে নিজেই এসে উদ্যার হাত থেকে টোটাটি নিয়ে দেখল সত্যিই এ তার পরীক্ষিত সীসার টোটা। (বোধকরি বলে দিতে হবে না সবার অলক্ষ্যে এক ফাঁকে হাতের টোটাটি মুখের ভেতর নিয়ে নিয়েছিলেন উদ্যা, এবং আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে টেনে এনে দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছিলেন।)

যাদুকর বললেন, "কি আশ্চর্য! জলজ্যান্ত মানুষের গায়ে গুলি চালিয়েও এক ফোঁটা রক্ত বার করতে পারলে না? এই দেখ আমি গুলি মেরে ঐ দেয়ালের গা থেকে রক্ত বার করছি।"

বলে লোকটির হাত থেকে পিস্তলটি নিয়ে তাতে নতুন করে আর একটি টোটা ভরলেন তিনি। (বলা বাহুল্য রক্ত পোরা দু নম্বর নকল টোটাটি এবার ভরে দেওয়া হল পিস্তলে।) দেয়ালের সামনে গিয়ে পিস্তল ছুঁড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের গায়ে রক্তের ছোপ পড়ল। আরবরা ভিড় করল দেয়ালের পাশে। দেয়ালে হাত দিয়ে দেখল সত্যিকারের রক্ত!

এতক্ষণ যা ছিল বিস্ময়, তা এবার বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে গভীর ভীতিতে পরিণত হল। এবার আরবদের মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে যাদুবিদ্যায় এই ফরাসী যাদুকরের কাছে তাদের যাদুকরেরা নিতান্তই শিশু।

যাদুকর উদ্যার মন ভরে উঠল আনন্দে। আলজিরিয়ার মোল্লা-যাদুকরের দুরন্ত সর্বনাশা প্রভাবের ভিৎ নড়িয়ে দিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এখানেই থেমে গেলে চলবে না, আর একটু এগোনো দরকার। তিনি আরবদের বুঝিয়ে দিলেন, "এতদিন ধরে তোমাদের আপন যাদুকরদের ভোজবাজির ফাঁকিকে ফাঁকি বলে ধরতে না পেরে অলৌকিক ব্যাপার বলে তোমরা ভুল করে এসেছো। আমার খেলাগুলোও তেমি একটিও অলৌকিক নয়। সবগুলোই লৌকিক কৌশলের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"

যাদুকর উদ্যা তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বে এবং নিপুণ নিখুঁত যাদু প্রদর্শনে আলজিরিয়ার আরবদের ওপর কি আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার কিছুটা আভাষ দেবার জন্য তাঁদের দেওয়া বিদায়-অভিনন্দনপত্রের আংশিক ভাবানুবাদ নীচে দিচ্ছি:

"জয় হোক আল্লার"

যিনি অজানাকে জানান, যাঁর স্নেহেরবানিতে আমরা মনের ভেতরকার সুন্দর ফুলগুলো বাইরে ফোটাতে পারি হরেক রকম সাজিয়ে।

বজ্র বিদ্যুতের মধ্য দিয়ে স্নিগ্ধ, ভূমি-উর্বর-করা বৃষ্টিধারার মতো, উদার বিধাতা আমাদের ভেতর পাঠিয়েছেন এ যুগের পরম বিস্ময়, বিস্ময়-উৎপাদনের শিল্পে ও বিজ্ঞানে অসামান্য সুপণ্ডিত মহামতি রবের্তার উদ্যা-কে।

আমাদের এই শতাব্দীতে তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই! অতীতের সমস্ত বিস্ময় তাঁর সৃষ্ট বিস্ময়ের তুলনায় ম্লান। আমাদের যুগ তাঁকে আপন বলতে পেরে ধন্য হয়েছে।

তিনি জয় করেছেন আমাদের হৃদয়। তাঁর বিস্ময়কর বিজ্ঞানের রহস্যময় খেলা দেখিয়ে তিনি অভিভূত করেছেন আমাদের মন। চোখের সামনে এত রকমের অসম্ভব সম্ভব হতে আমরা আর কখনো দেখিনি। তাঁর বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি আমাদের যেসব অপূর্ব বিস্ময় দেখিয়ে গেলেন, সেজন্য আমরা চিরদিন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।.....

— তাঁর উপযুক্ত প্রশংসা করবার ভাষা নেই। বৃষ্টি যতদিন ভূমিকে উর্বর করবে, রাত্রি যতদিন চাঁদের আলোয় আলোকিত হবে, যতদিন সূর্যের আলোর দুঃসহ তীব্রতা হ্রাস করবে মেঘমালা, ততদিন তাঁর প্রতি পরম শ্রদ্ধায় আমাদের চিত্ত বিনম্রে অবনত থাকবে।"

পল্টন নম্বর "৩৪৩"

শ্রীঅমিয় হালদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[বারো]

উত্তরপরাণে যোগীনদা,—খিট্‌খিটে, বদমেজাজী, ছোট বড় খুবপানে অভ্যস্ত হ'লেও লোক খারাপ না। মেজাজ তিরিক্ষি হ'লেও, মনটা নরম। নেহাত অশিক্ষিতও নয়। খান্‌দানী ঘরের ছেলে, কিন্তু বিট্‌কেল্ তার রুচি!

মাঝে মাঝে বিগড়ে গিয়ে হয়ে পড়ে বড়ই একগুঁয়ে—বিশেষ রঙিন অবস্থায় যখন বেসামাল হয়ে পড়ে। তার এই একগুঁয়েমির জন্যে মুখ্‌কিলে পড়তেও হয়েছে অনেক সময়। করাচি থাকতে তাকে বে-এখ্‌তিয়ার অবস্থায় "এম্ পির" দিকে আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে গিয়ে আস্ফালন করতেও দেখেছি। মিলিটারী পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে দি সে'বার "ক্লোরার ব্রেথ্‌রেটে" গা ঢাকা দিয়ে। রোল্ কলেতে প্রক্সি দেয় বোকেন।

জন্ম হয়েছে এই কিন্তে এসে। বছর কাবার হয়ে গেলো এই মেসোপোটেমিয়ায়, কিন্তু আজও তোটেনি তার এক কোঁটাও বে-সামাল হবার যাওয়াই। সে এখন নাকি "হাসিসের" (Hashish) খোঁজে ঘোরে। অপর পল্টনের সাদা-কালো ফৌজীদের মধ্যেও আছে নাকি তার দোস্ত। এখন তাদের আড্ডা জমে তাঁবু ফ্রেকে, নদীর ধারে—স্বামিজীর আশ্রমে।

এ সবের জন্যে তার সংগে ঝগড়া করি। হাতা-হাতিও হয়। নাক মুখও কাটে। দে'দিন ঘুটু, মনি, সুরথের সংগে জোট বেঁধে ফেলেও দিয়েছি তাকে কাঁটা বনে,—চ্যাংদোলা ক'রে। সেও পাল্টে আমাদের চোখের মধ্যে ছুঁড়ে মেরেছে মুঠো ভরতি বালি। তারই ফলে, চোখে অন্ধকার দেখে শরণাপন্ন হয়েছি হাসপাতালের। কিন্তু, গোপন করেছি ডাক্তার ক্যাপ্‌টেনের কাছে। বলিনি আসল কথা। রিপোর্ট দিয়েছি—"মস্ত ঘূর্ণি হাওয়ার মাঝে পড়ে চোখের মধ্যে উড়ে এলো ঘুরপাক খাওয়া তপ্ত বালি।"

এত কাণ্ড ঘটে গেলেও মনের মধ্যে জমা করিনা দুশমনি। ঝের দোস্তি হয় মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাদেই। আমার করি খেলারত—দু'প্যাকেট প্যাটাকেক্। মৌজ ক'রে হাতে হাত মিলিয়ে পান করি চা। খুশ্‌মনে আবার চলে আমাদের মধ্যে সাহায্যের আদান প্রদান। যেন কিছুই ঘটেনি'। অর্থাৎ আমাদের হাতের ব্যাপারটা রয়ে যায় হাতের মধ্যেই—একটুও পৌঁছোয় না মনের কোণে। এইটেই তো ফৌজীদের রেওয়াজ।

যোগীনদা "হাসিস্" সেবন করে,—নেশাখোর। তাকে ভালবাসলেও ওগুলোকে ঘৃণা করি। অনেক সময় তাকে এড়িয়েও চলি। কিন্তু, কী জানি কেন, কোন ফাঁকে ঘুরে ফিরে এসে পড়ি ওরই পাল্লায়। আবার নতুন নতুন মতলব শোনায়, হুজুগে মাতায়।

আজ আমায়—"গাবু-পিস্" হলাম! বিকেলে এলো-মেলো ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম খোলা মাঠে,—পুরোণো ট্রেঞ্চগুলোর ধারে। হুকুমির ওপর নজর পড়লো।

গম্ভীর ভাবে ডাক দেয়—"এই তিনশো তেত্রিশ,—শোন্, এদিকে আয়,—কথা আছে।"

কাছে এসে বলি,—"তোমারতো ঘরে সব বেয়াড়া কথা—কী ব'লবে বল ?"

ইসারায় দেখিয়ে বলে—"ওখানে ওদের কি হচ্ছে বল্‌তো ?—চল্‌না দেখি।"

দেখলাম পুরোণো টেকগুলোর মধ্যে ব'সে জন দুয়েক গোরা কৌজী ওস্তানি ক'রে কি যেন খেল্‌ছে।

জিগ্‌গেস্ করি। খবর নি'। শুনলাম হচ্ছে নাকি—"স্মোকিং কম্‌পিটিসন্"।

সামরিক, বেসামরিক দুরেক রকম প্রতিযোগিতা দেখিছি,—দেখিনি ধূমপানের। শুনলামও এই প্রথম। পরিচয় পেলাম, সৈনিকদের আর এক নতুন খেয়ালের। দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগলাম ওদের ধূমপানের খেলা।

একটা সিগারেটের শেষের দিকে প্রায় ইঞ্চিখানেক ওপরে চিহ্ন থাকবে একটা কালো দাগের, খেলা সুরু হওয়া মাত্র যে যার সিগারেটের মুখাগ্নি ক'রে সুরু ক'রবে টান্‌তে। যে খেলোয়াড় সিগারেট মুঁকে ঐ কালো দাগ পর্য্যন্ত আগে পোড়াতে পারবে, সেই হবে প্রথম। পুরস্কার পাঁচ প্যাকেট সিগারেট,—তাতে কি চার আনা।

আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শিখিনি ধূমপান ক'রতে। আগ্রহও নেই মোটেই!

বল্লাম মুরুব্বিকে,—"শুধু শুধু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি ?—বরং ওদিকে চলো, একটু ঘোরা-ফেরা করি।"

কথার কোনও জবাব দিলোনা। নিজের মনেই দেখতে লাগলো ওদের কাণ্ডকারখানা।

ওর হাল-চাল দেখে বিরক্ত হয়ে বলি—"আমার কথাতো তুমি শুনবে না, তবু বল্‌ছি যোগীনদা, যদি ইজ্জত বাঁচাতে চাও তো ওর মধ্যে আর যাবা গদিও না। তুমি "হাসিস্-খোর" বলেও, ওদের সংগে তফাত, অনেক। দেখ্‌ছ না, ওদের ঠোঁটগুলো কত পুরু—পোড়াপোড়া!—ওরা পাকা সিগারেট-খোর,—সিগারেট-সম্রাট বল্‌লেও অন্যায় হবে না। যোহাই যোগীনদা,—এ আশা ছাড়ো।"

আমার ওপর চটে গেল। ধমক দিয়ে বলে—"তুই চুপ কর, ডেঁপোমি করিস্‌নি,—আজকাল দেখ্‌ছি খুবই সবজান্তা হয়ে পড়েছিস্। এদিকে আয়,—যা করি দাঁড়িয়ে ছাখ্, ওদের মত-চেঁচা,—চিয়ার-আপ্ দে।"

ওর রোখ্ দেখে চুপ ক'রে গেলাম। বুঝ্‌ছি, খাটিয়ে লাভ নেই।

মুরুব্বি কিছুক্ষণ চুপচাপ দেখলো। এবার প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা সিকি বার ক'রে বলে,—"আমায় নেবে তোমাদের খেলায় ?"

দলে তারা নিলো। একটু টিট্‌কারিও দিলো। বল্লে—"ভারতীয়রা এ বিষয় যে খুবই কাঁচা তা তা'রা বিলক্ষণ জানে,—পারবে কী ?"

তর্কাতর্কি ক'রলো না। শুধু বল্‌লে—O, K, (ঠিক আছে), ওস্তাদজীর ওপর এ বিশ্বাস আমার না থাকলেও সহানুভূতির সুরে বলি—"কী বল্‌লে—ঠিক আছে!—পারবে ?"

জোর দিয়ে বলে মুরুব্বি—'কুট্‌মুট্ খাটাস্‌নি',—ছাখ্‌না কী হয়।"

কথা না বাড়িয়ে উৎসাহ দিয়ে আমিও বলি—"আচ্ছা, তা-ই হবে, লাগাও তো ওস্তাদজী,—চালো তো এক হাত।"

গম্ভীর ভাবে অপর প্রতিযোগীর মত সেও তুলে নিলো ঐ রকম দাগ দেওয়া একটা সিগারেট

পুরোণো এই ট্রেঞ্চের মধ্যে গোল হয়ে বসে, "ওয়ান্-টু-থ্রী" বলার সংগে সংগে সুরু হ'ল ওদের ধূমপানের লড়াই।

খুবই উদ্দীপনার মধ্যে ফস্-ফস্ ক'রে টান্‌তে সুরু ক'রেছে যে যার সিগারেট। দেখলাম, যোগীনদাও তার সিগারেটটা চট্ ক'রে ধরিয়ে ফেল্‌লো। নিমেষের মধ্যে বসিয়ে দিলো সেটাকে তার ডান হাতের পাঁচটা আঙুলের মধ্যে। অর্থাৎ যেমন ক'রে হুকে ধরে ধূমপান করে, ঠিক সেই ভাবে আঙুল গুলোর মধ্যে ভরে দিয়ে বস্‌লো উবু হয়ে। সংগে সংগে চোখ দু'টো আধা বোজা ক'রে বলে উঠলো—"জয় বাবা ভোলানাথ!"

সুরু হ'ল টান্। দেখছি তার সিগারেটটা চড়্ চড়্ ক'রে পুড়ে চলেছে হাউইএর মত। চারিদিকে ভরে গেল ধোঁয়ায়। সিগারেটের গন্ধে অস্থির হয়ে উঠলেও, হলাম না পিছপাও। অপর জোয়ানদের মত আমিও উৎসাহ দিচ্ছি আমার খেলোয়াড়কে। ওরাও যেমন চিৎকার ক'রে বলে—"বাগ্-আপ্ জিমি, জনি।" তেমনই আমিও ওদের গলা ছাপিয়ে বলি—"সাবাস ওস্তাদজী, আরও জোরসে লাগাও টান্। দেখবো হিন্দুস্থানের মান বাঁচাতে—জয়, জয় বাবা ভোলানাথ।"

গোরাদের যখন মাত্র অর্ধেকটা পুড়েছে, ঠিক সেই সময় বেবাক্ দাখিল ক'রলো ওস্তাদজী তার সিগারেটের টিকিটুকু মাত্র তিন টান দিয়েই।

এবার ছাড়তে লাগলো ধোঁয়া—নাক মুখ দিয়ে। ওরাও ছাড়ছে সমানে।

ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে সত্যিই ভুলে গেছি আমি কোথায়!—হুবহু যেন কায়ারিং লাইন। বেশ খোটা কয়েক বোমা ফাটলে যে অবস্থা হয়, ঠিক সে'রকম দেখতে হয়েছে এই পুরোণো ট্রেঞ্চটা, সেরেফ সিগারেটের ধোঁয়ায়।

মুখ তার হয়ে উঠেছে লাল। চোখ যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌ছে। ভয় হয় তার দিকে তাকাতে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কায়ারিং লাইনে থেকে শত্রুদের ওপর কয়েক ঘণ্টা মেসিনগান চালিয়ে, এই মাত্র ফিরে এল—"ডাগ্-আউটে" কত বিক্ষত দেহে।

খুব হুরোড়ের সংগে শেষ হল ধূমপানের প্রতিযোগিতা। গোরাদের দলতো হতভম্ব। সকলেই বাহবা দিলো এই ভারতীয় যোদ্ধাকে। আমিও উচ্ছ্বাসের সংগে বলে ফেল্লাম—"সাবাস্ যোগীনদা, সুন্দর তোমার দেশপ্রেম! আজ তুমি ভারতীয় পল্টনের মান বাঁচিয়েছো,—জেতেছো গোরাদের দম্ভ।—জয় ওস্তাদজীর জয়,—জয় হিন্দুস্থানের জয়!"

আজিজীয়ার দু'চারবার ব্লক-হাউস ডিউটীতে রাত জাগলেও, এই "কুত্তের" ডিউটী পুরোদস্তর সুরু ক'রেছি কোম্পানির তাঁবুতে এসে। বহুদিন পর যোগাযোগ হয়েছে আজ, এই ব্লক-হাউস ডিউটীতে—যোগীনদার পাড়েজীর সংগে। আজও ভুলিনি সিড্‌লিজ পাউডারের সরবত পান।

মুরগি কীর্ত্তির কথা পাড়েজী ভুলে গেলেও, মনে আছে যোগীনদার।

আজ নতুন ক'রে কথা পাড়লো, খেয়ালে আনলো পাড়েজীর—আমার শপথের কথা। সকলের উৎসাহের মধ্যে, বেড়ে গেল পাড়েজীর আগ্রহ।

আমাকে লক্ষ্য ক'রে বল্লেন—"হ্যাঁ, তাইতো! কীহে,—কি ক'রবে?—কাল ভোরে তবে কি মুরগির খোঁজ হবে?"

বুঝি, যোগাড় করা সহজ নয়,—খুবই শক্ত। মুরগি জোটেতো পকেট ফাঁকা,—পকেট ভারী থাকেতো

দর্শন মেলেনা মুরগির। যখন খাপ খেয়ে যায় পকেটের সংগে মুরগির, তখন অভাব হয় "পাড়েজী-যোগীনদার" সম্বলাত। অসাধ্য ব্যাপার এই তিনটির মিলন!

দেখ্‌ছি সব কিছি আমারই ওপর। তবু, কিছুমাত্র ঘমে না গিয়ে বলি,—"হাঁ, হাঁ তা হবে বৈকি—তবে মুরগি কোথায়?" যোগীনদা, আমার দিকে তাকালো—শুনিয়ে দিলো, সেই এক কথা—"ঠিক্ আছে।"

আয়োজনের কথা বল্লাম বটে, কিন্তু ভাবছি কি ক'রে ব্যাপারটা সম্ভব হবে!

গভীর রাত। নিস্তব্ধ ঘুমন্ত মফর যুকে ব্লক-হাউসের ট্রেকের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি তারের বেড়া—ভাবছি মুরগি।

এক ফাঁকে পেট্রল ক'রে কাছে আসি। ফিস্ ফিস্ ক'রে বলি—"কি উপায় যোগীনদা, কাল পাঁড়েজীতো ক্ষেপে যাবে, আমার সম্বলতো মাত্র দু'টাকা। বলি, টাকা পয়সা আছে?—ধার ছাড়বে?"

গলা নামিয়ে ধমক দিয়ে বলে—"টাকা হাতে নেই তো রাজী হলি কেন?"

—বারে মজা, তুমিই তো কথা তুল্‌লে! আমিও ভাবলাম নিশ্চয় তুমি হাত তেড়াবে।"

একটু কী ভাবে। ভরসা দিয়ে বলে—"ঠিক আছে, কাল ভোরে টাকা দুটো আমায় দিবি,—কাউকে কিছু বল্‌বি না,—বুঝলি?"

রাত কাবার ক'রে আবার ভোর। ঘণ্টার ঘণ্টায় কফি পান ক'রে শেষ হ'ল রাত ডিউটীর পালা। একদিকে ব্লক-হাউসের ভেতর চল্‌ছে চায়ের আয়োজন, অপর দিকে মুরব্বি আছে মুরগির খোঁজে। বসেছে বেড়ার ধারে, তার জড়ানো কাঁটকের পাশে।

দেখ্‌ছি, নিত্য দিনের মত আজও আসছে আরব রক্ষিদের দল। আসছে গাঁয়ের থেকে বেসাতি নিয়ে। চলেছে "কুতের" বাজারে। কেউবা হেঁটে, কেউবা গাধায়, কেউবা আছে ঘোড়ার পিঠে। আছে সেই মামুলি জিনিষ—মুটা, কাঁকড়ি, খেজুর, তরমুজ। আছে দুধ।—নেই দিলাজ,—নেই বিষাদ।

একের পর এক জিগ্‌গ্যেস ক'রছে—"রফিগ, দিলাজ (মুরগি) আকু?"

জবাব আসে, আগেরই মতন—"মাকু রফিগ।"

একটু একটু ক'রে কাটছে সময়। বাড়ছে রোদের তেজ। এখনও আসছে আরবের দল। বোলছে —"মাকু"।

আমি হতাশ হলেও, ধৈর্য্য হারায়নি যোগীনদা। একই ভাবে তার চলছে প্রশ্ন।

কানে এলো—"আকু রফিগ।"

হাত হাঁকে—"সিত্তা ফুলুস" (সাত টাকা)।

শুনছি দর কষাকষি। মুরব্বি বলে—"তেলাতা (তিন) রুপি।"

আরব রফিগ দিতে নারাজ। আঁকড়ে আছে,—"সিত্তা ফুলুস।"

হঠাৎ উভয়েই হ'ল নীরব। উঁকি দিয়ে দেখি সওদা। দেখি চোখে চোখে কথা হয়। আর দেখি, ওস্তাদজী যেন, ধরে দিলো একটা ছোট পুঁটলি।

আরবও মুহূর্তের মধ্যে সেটা নিয়ে অদৃশ্য হয় গ্রামের পথে।

যোগীনদার কাছে আসতেই মুরগিটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে—"এই নে, যা হাবিলদার সাহেবকে দেখা।"

খোলাখুলি জিগ্‌গ্যেস করি—"তা' তো হ'ল, কিন্তু পুঁটলি করে দিলে কী?"

গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়—"কই, কিছুই দিইনি তো!"

ধমক দিয়ে আমিও বলি—"হ্যাঁ, দিয়েছি—সত্যি বল, কি দিলে?"

চারিদিক একবার তাকিয়ে দেখে। কানের কাছে মুখ এনে বলে—"চাল।"

আঁতকে উঠে বলি—"চাল! সে কী, সরকারি রসদ দিয়ে মুরগি নিলে? ধরা পড়লে "কোর্ট-মারশাল," তা জেনেও তুমি এ কাজ করলে?"

আবার সেই কষ্ট ভাব। সুরু হ'ল ধমকানি—"খুব তো তালেবরের মত কথা শোনাচ্ছিস! তুই অতি উলবুক্,—যদি হাজত হয় তবে দেখছি তোর জন্যেই হবে। আখ, তোর হিতোপদেশ আর সহ্য হয় না, সেই করাচি থেকে সুরু করেছিস—ন্যায়-নীতি;—কী মনে করেছিস্—ইস্কুল?"

আমিও এখন গড়ে উঠেছি। মুরুব্বির ধমকে কিছু মাত্র দমে না গিয়ে বলি—"কেন ব'লবোনা সে'দিন তুমি ঠকালে জেলেতি মাছওয়ালাকে। বেচারি করেন্ (coin) চেনে না, সেই সুযোগে কিনা সিকির বদলে দুয়ানি দিয়ে বেমালুম তুলে নিলে বোয়াল মাছটা! আজ আবার নিলে চালের বদলে মুরগি! না যোগীনদা, এ খুবই অন্যায়—তোমার জন্যে আমিও কোনদিন কেঁসে যাবো।"

আমার কথাগুলোর ওপর কিছুমাত্র আমল না দিয়ে বলে—"আমার বেলায় অন্যায় দেখলি,—আর, ও যে ঠকালে:—বোয়াল ব'লে হাঙরের বাচ্চা দিয়ে?—তার বেলায়?"

—তা হোক, তুমি এ সব আর কোরবে না:—আমার লাই ওয়ার্নিং।

—বেশ, ঠিক আছে। তবে এও বলি, আমাকে তো চাল দিয়ে মুরগি নিতে দেখলি, কিন্তু পাশের পল্টনের কৌজীরা যে, "ডেট্-আসির" বদলে ডিম নেয়, মশারির বদলে মুরগি হাতায়; আরও ক'তকি করে "ঘড়ি-কম্পাসের" বিনিময়ে,—তার খবর রাখিস কী?

মুরগি হাতে এলেও, সমস্যা অনেক। অপর পল্টনের ফেলে যাওয়া পুরোনো টিন-ক্যানেস্তারাটা বরাবর উনুনের কাজ করলেও, অভাব আলানীর। তা ছাড়া, ঘি মসলার চিন্তাতো আছেই।

হুট্ নিয়ে এলো মরুভূমির আধা শুকনো কাঁটা গাছ। মাইল দুয়েক দূর থেকে ছাগলে (shagle) ভরে "ধরা" আন্লো জল। বাকী সব যোগাড় করলাম কাছেরই এক ছাউনি থেকে। অনেক কিছু গুছিয়ে দিয়েছে ঐ "লেবার-কোরের" গোরা সার্জেন্ট। সিগারেটের টিনে দিয়েছে ঘী। দুটো মাত্র আলু হলেও, প্রচুর পিঁয়াজ। দিতে তোলেনি কারি-পাউডার।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চল্ছে মুরগি রন্ধন। বেয়নেট্ খুঁচিয়ে বার ক'রছি উনুনের ছাই, আবার সংগে সংগে ভরে দিচ্ছি কাঁটাগাছ। ধপ্ করে জ্বলে উঠেই মিনিট খানেক হয় আগুন, পরক্ষণেই ছড়িয়ে দিচ্ছে ধোঁয়া। একে, "একশো ছত্রিশ" ডিগ্রী রোদের তাপ, তার ওপর ঘর ভরতি ধোঁয়ার মধ্যে পড়ে যথেষ্ট নাজেহাল হলেও অভাব নেই উৎসাহের।

ঘণ্টা পাঁচেক ধুনির সংগে কসরত করে ভেকচি নামলেও, বিরক্তি নেই কারও। তবে কিছুটা চিন্তিত আমার মুরুব্বি! ভেবেছিল মুরগি তোদের নিরিবিলি স্নান নাকি এই ব্লক-হাউস্। কিন্তু সে ভুল ভেঙে দিয়েছে "ভাতের-কেটিগের" দল। নিয়ম মাফিক ছাউনির থেকে এনেছিলো তারা দিনের তোষা-খিচুড়ি। মুরগির ব্যবস্থা দেখে আট্কে গেছে তারা দু'জনেই। ধোঁয়াই পেড়েছে রোদের। আর ঐ লেবার কোরের গোরা সার্জেন্ট? অন্যায় হবে তার সময় জ্ঞানের প্রশংসা না ক'রলে। এই দুপুর রোদে সেও এসে হাজির,—"টিপারারী" গান গাইতে গাইতে।

টুপিতে আঁটা বিরাট সান্‌সেড, পিঠে স্প্লাইন্-প্রটেকটর—চোখে গগল্‌স্! বগলে তার ফুটখানেক লম্বা পাউরুটি—সংগের সাথী এক কর্পোর‍্যাল্!

হ্যাঁ, সত্যিই মজলিসি মার্জেট! আসামাত্র জমিয়ে দিলো আসর, বিলিয়ে দিলো রুটি।

এই তরা দুপুরে উল্লাস, আনন্দের মধ্যে শেষ হ'ল এগারো মোয়ানে একটি মাত্র মুরগি তক্ষণ। তাতে কণিকা মাত্র জুটলেও আমোদ ক'রলাম প্রচুর। এই আনন্দটুকু আছে বলেই তো স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারছি শুষ্ক মরুভূমির ওপর। যেখানে দিনে প্রচণ্ড রোদের তাপ, সন্ধ্যা নেমে আসার সংগে সংগে শুরু হাইয়েনার কামড়! সব কিছু সহ্য ক'রে রাতের পর রাত ঘুমকে নির্বাসন দিয়ে পাহারা দিতে পারি, শুধু এই নিত্য নতুন দুষ্কৃতের মধ্যে কাটিয়ে রসসৃষ্টি হয় ব'লেই। যেখানে ক্ষণিকের জন্যে চোখ বুঁজে এলে মাথার ওপর বোমে মৃত্যুদণ্ড, সামান্য অসাবধানে বেদুইনের বুলেট; সেখানে তুচ্ছ বিষয়কে উপলক্ষ্য ক'রে মাতামাতি না করে উপায় কী? দিনের পর দিন করছিও তাই। সে জন্যেই তো আমরা অকপটে অপর সাথীকে খাবারের ভাগ দি'! ভোজন করি একই পাত্রে। একই বোতলে মুখ লাগিয়ে পান করি জল। চুপি চুপি জাগিয়ে দি সাথীকে সেন্ট্রিপোস্টে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলে। গোপন করি তারা অন্যায় কিছু করলেও। এটা ভাল কি মন্দ সে বিচার আমরা করি না। তবে, এটাই আমরা করি, এটাই আমাদের দস্তুর।

যদি দেখতাম ঠাকুরদার হাজত হল, তাহলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতাম; মনকে বোঝাতাম, আবার দু'চার মাস বাদে নিশ্চয় তার দর্শন পাবো। কিন্তু এ যা ঘটে গেল তা ভাবলেও মনটা বিকল হয়ে পড়ে। তার সংগে হঠাৎ এ ভাবে যে ছাড়াছাড়ি হবে তা কোনদিনও কল্পনায় আমার আসেনি। সে নিজেও ভাবতে পেরেছে কিনা সন্দেহ।

বরাবরই সে ছিলো খামখেয়ালি। ঝোঁকের ওপর হঠাৎ কিছু ক'রে বসা তার ছিলো অভ্যাগত স্বভাব: এরকম খেয়াল সে কিছুতেই বদলাতে পারেনি; এবং তারই ফলে তাকে ছাড়তে হল ছাউনি! ছাড়তে হল আমাকে—গুরুদেবকে—রামকে।

১৬ নম্বর ছাউনি থেকে বদলি হয়ে চলে এসেছি হেড-কোয়ার্টারে। এখানে এসে দেখছি, হিড়িক পড়ে গেছে ছাউনি পরিষ্কারের। তকতক্ ক'রছে ছাউনির রাস্তা। আরও চেক্‌নাদার করা হয়েছে লাংগার-খানার বাসন। ডাইবিনের ভেতর বাইরে লাগানো হয়েছে মাছি মারা তেল। ল্যাট্রিনে উঠছে খাস্তীর সিমানা—"হলদে কাওা"। ঘষা-মাজা করা হয়েছে চামড়ার সাজ সরঞ্জাম। চক্‌মক্ ক'রছে রাইফেল, বেয়নেট, মেসিন গান। ঘোড়া-মিউলের আস্তানা থেকে সুরু ক'রে অফিসারদের তাঁবু পর্য্যন্ত কোথাও নোংরা নেই একটুও। যে কেউ দেখ্‌লে ব'লবে—"সাবাস্!"

জেনারেল আসছেন। দেখবেন নাকি আমাদের হালচাল, শরীর, স্বাস্থ্য। দেখবেন প্যারেড। অর্থাৎ—"জেনারেল্ ইন্‌স্পেক্‌শন"। তাই এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ঘুম। এ রকম দেখা এই প্রথম নয়। পূর্বেও হয়ে গেছে আরও কয়েকবার। শেষ দেখা সেই বাগ্‌দাদে।

সেবার এসেছিলেন এখানকার সর্বেসর্বা,—বড় কর্তা। পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর উদার মনের। দেখেছিলেন একের পর এক প্রতিটি ফৌজীকে। সিগনালার, মেসিনগানার, ট্রান্‌স্‌পোর্টকোর-বিউগ্‌লার বাদ যায়নি কেউ। শুনিয়ে ছিলেন তাঁর বক্তৃতা, প্রশংসা করেছিলেন খুবই। ফিরে যাবার সময় বদ্‌লে গেলেন, হু'-আউন্‌সের স্থানে হু'-আউন্‌স্ দুধ।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

বুধবারের গির্জে

অঞ্জনা রাওয়েল

চোখ দুটো বার বারই জলে ভরে আসছিল এলেনের।

অবাকও লাগে ভাবতে, আজকে নিয়ে তো পর পর চারটি বুধবার পেরিয়ে গেল শুধু মাহিমের এই গির্জেতে আসার সেই প্রথম দিনটির মতই বুকটা কেন তার এমন করে ভরে ওঠে কান্নায় বারের পর বার?

বম্বের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবারের মেয়ে এলেন। জাতে রোমান ক্যাথলিক। সেই ছোট্টবেলা থেকেই শুনে আসছে বম্বের মাহিমের প্রান্তে যে বড় গির্জেটা আছে সেটা বুধবারের গির্জে। এখানে এসে পর পর নটি বুধবার যে কেউ মা মেরীর কাছে ভক্তিভরে প্রার্থনা জানায় তারই মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

আজকালকার শিক্ষিতা মেয়ে এলেন! আগে এসব বিশ্বাস করত না সে। কিন্তু ওর মা মিসেস রডরিকসএর এই গির্জেতে আসা যেন জীবনেরই একটা অঙ্গ বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘরে থেকে চোখ খুলেছে এ যেন তবে থেকেই দেখে আসছে সে তার মাকে আসতে এই গির্জের কোনও না কোনও একটি মানত নিয়ে। মনে মনে হাসত তখন এলেন কিন্তু মুখে কিছু বলত না।

উপেক্ষা ভরা এলেনের এই হাসিটুকুই বুঝি দেখতে পেয়েছিলেন মা মেরী আর তাই পড়তে হয়েছিল এলেনকে জীবনের এই কঠিনতম পরীক্ষায়।

একটি করে বুধবার যায় আর গোণে এলেন ন'টি হতে কত বাকি! তারপর বেরিয়ে আসে গির্জে থেকে। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরে। তিনমাইল দূরে তার বাড়ি। কিন্তু তাই তো মানত করেছে এলেন বাড়ি থেকে হেঁটে আসবে সে প্রতি বুধবার পরে আবার পায়ে হেঁটেই ফিরবে বাড়ি।

আমেরিকান এমব্যাসিতে স্টেনোগ্রাফারের কাজ করে এলেন। বাবা জন রডরিকসএর পুরণো বন্ধু স্যামুএল ডি সুজার জন্যই এই কাজটি সে পেয়েছিল। বলতে গেলে কনসালের তিনি ডান হাত। তাই টাইপ করতে গিয়ে চিঠিপত্রে ভুল হওয়া সত্ত্বেও এই কাজটি এখনও এলেনের টিকে আছে শুধু এই ডি. সুজার জন্য।

এলেনের টাইপ করা চিঠি পত্র প্রায়ই গিয়ে পড়ত আমেরিকান কনসাল মিঃ টেইলারের হাতে। ভুল দেখে তিনি ক্ষেপে উঠতেন। বলতেন, এক্ষুণি নোটিশ দিয়ে ছাটাই করা হোক ভুলোমন এই স্টেনোটিকে। কিন্তু তা হত না। পিতৃবন্ধু ডি. সুজাই তা আটকে দিতেন টেইলারকে বুঝিয়ে।

পাশাপাশি দুটো বাড়ি নিয়ে আমেরিকান এমব্যাসির আপিস। কনসাল মিঃ টেইলার বসেন তার পাশেরটাতে কাজ করে এলেন। কিন্তু এত দূরে থেকেও টেইলারের প্রচণ্ড রাগ এলেন একদিন এড়াতে পারল না কিছুতেই। বাবার বন্ধু ডি. সুজা থাকা সত্ত্বেও না।

হাঁটতে হাঁটতে মনটা হঠাৎ কয়েকমাস পিছিয়ে যায় এলেনের। চার মাস পেরিয়ে গেছে। এটা সেপ্টেম্বর আর সেটা ছিল জুন মাস।

১০ই জুন! অনস্বলে হয়ে রয়েছে সেই দিনটি এখনও এলেনের মনে। সেদিন ডাক পড়েছিল এলেনের মিঃ টেইলরের ঘরে বেলা তিনটের সময়। ভয়ে কেঁপে উঠেছিল এলেনের বুক এবং সেই সঙ্গে যেন সমস্ত আপিসটাও।

কি যেন এক মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে এলেন জরুরী কি এক চিঠিতে। তাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন মিঃ টেইলর। ডি. সুজার মুখেও কোন সান্ত্বনাই সেদিন আর যোগায় নি।

এখনও মনে আছে এলেনের, পা দুটো তার কি রকম কাঁপছিল থর থর করে টেইলরের ঐ ঘরে ঢোকবার সময়। সেই প্রথম এলেন দেখছিল মিঃ টেইলরকে তিনমাস এসব্যাসিতে কাজ করবার পর। অবাক হয়ে গিয়েছিল এলেন কনসালের অমন স্বাস্থ্য, রূপ এবং অত কম বয়েস দেখে।

ঘরে ঢুকে মাথা নিচু করে যখন এলেন বলেছিল, গুড আফটার নুন স্যার! তখন চোখ তুলে গম্ভীরমুখে মিঃ টেইলর দেখে নিয়েছিলেন এলেনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

কিছুক্ষণ এমনি করে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, মিস্ রডরিকস্ আপনার কাজে প্রায়ই এত ভুল হয় কেন? আমি তো ভেবেছিলাম আপনাকে এবার নোটিশ দেব।

বুকের ভেতরটা আবার কেঁপে উঠেছিল এলেনের দুরু দুরু করে। মাথাটা তেমনি নিচু করে অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বলতে পেরেছিল এলেন, সেরি সরি স্যার!

এলেনের কথা হয়ত কিছুই শুনতে পাননি মিঃ টেইলর। তিনি শুধু দেখছিলেন ভীত অনুতপ্ত অসহায় এই এলেনকে। কিছুক্ষণ পরে বলেছিলেন, আচ্ছা যান আজকে। দেখবেন ভবিষ্যতে যেন আর এমন ভুল না হয়।

মুখে কোনও মতে সামান্য একটু হাসি ফুটিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে একরকম ছুটেই বেরিয়ে এসেছিল সেদিন এলেন মিঃ টেইলরের ঘর থেকে।

পরদিন আপিসের পর রাস্তায় বেরিয়েছিল এলেন বন্ধুদের সঙ্গে হাসি গল্পে মেতে। ফিরোজপুর রোডে এসে বাসের কিউটাতে দাঁড়াতেও প্রায় যাচ্ছিল, এমনি সময় হঠাৎ এক পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল সদ্য কেনা নতুন মডেলের ক্যাডিলাকটার পাশে দাঁড়িয়ে মিঃ টেইলর তারই নাম ধরে ডাকছেন।

মিস রডরিকস, কোনদিকে যাচ্ছেন আপনি?

ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল সেদিন এলেনের মুখটি। আমতা আমতা করে বার কয়েক ঢোঁক গিলে অবশেষে শুধু একটি কথাই বলতে পেরেছিল এলেন, বারান্দায়।

হেসে গাড়ির দরজা খুলে বলেছিলেন মিঃ টেইলর, তাহলে উঠে পড়ুন। ঐ দিকেই আমি যাচ্ছি।

সত্যি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল এলেন। নিজের অজান্তে কেমন করে যেন উঠে পড়েছিল সে গাড়িতে। বসেছিল মিঃ টেইলরের পাশের সিটে।

আজ গির্জে থেকে বাড়ি ফেরবার পথে হাঁটতে হাঁটতে হাতের রুমালটা দিয়ে নিজের চোখ দুটি একবার মুছে নেয় এলেন। মনে পড়ে যায় তার পরের ঘটনাগুলি। ছবির মত সব যেন ভেসে ওঠে চোখের সামনে একটার পর একটা। তারপর থেকে আপিসের পর রোজ বিকেলে মিঃ টেইলরই গাড়ি করে বাড়ী পৌঁছে দিতেন এলেনকে। কোনওদিন হয়ত নিয়ে যেতেন সিনেমায়; নয়ত কোথাও বেড়াতে যেতেন এই এলেনেরই সঙ্গে।

আস্তে আস্তে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবারের বাইশ বছরের অতি সাধারণ এই ভারতীয় মেয়ে এলেনের এবং আমেরিকার এক কোটি পতি বিধবার উনত্রিশ বছরের ধনবান গুণবান এবং একমাত্র পুত্র জর্জ টেইলরের হৃদস্পন্দনগুলোও যে কখন মিলেমিশে এক হয়ে গেল দুজনের কেউ তা জানতেও পারল না।

হ্যাঁ। সে তারিখটাও তো ঠিকই মনে আছে এলেনের। ৯ই আগস্ট ছিল সে দিন!

আপিস থেকে ফেরবার পথে গাড়িটা সেদিন মালাবার হিলের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছিল জর্জ। ভেতরে জর্জের গা ঘেঁষে বসে ছিল এলেন। চারিদিকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির হুল্লোড় চলছিল বলেই জনমানবহীন হয়ে ছিল জায়গাটা। সাতহাজার টাকা মাইনের আমেরিকান কনসাল জর্জ টেইলর তারই অতি সাধারণ এক কর্মচারী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে নিজের জীবন সঙ্গিনী করবার প্রার্থনা জানিয়েছিল। সেদিন বিশ্বাস করতে পারে নি এলেন জর্জের এই কথা। ভেবেছিল এ নিশ্চয়ই তার ঠাট্টা। কিন্তু আজ? আজ মনে হয় জর্জের মত প্রেমিক, এমন সত্যনিষ্ঠ পুরুষ কি এ পৃথিবীতে আর কেউ আছে?

মনে পড়ে যায় এনগেজমেন্টের সেই দিনটির কথা। ১৫ই আগস্ট। স্বাধীনতা দিবসের দিনটিতেই এনগেজমেন্ট হয়েছিল জর্জ আর এলেনের। বিভিন্ন এমব্যাসি এবং অন্য সব গণ্যমান্য সরকারী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় চারশ লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেদিন মিঃ রডরিকসের বাড়িতে। প্রায় তিন হাজার টাকা তাঁর খরচ হয়ে গিয়েছিল ঐ একটি দিনের অনুষ্ঠানে।

কিন্তু এই অবিশ্বাস্য খবরটি শুনে থ হয়ে গিয়েছিল আমেরিকান এমব্যাসি। কনসাল জর্জ টেইলর কিনা বিয়ে করবে একটি ভারতীয় অ্যাংলোকে?

তারপর?

তারপরই তো সব শেষ হয়ে গেল। বুকটা আর ঠোঁট দুটি যেন এক সঙ্গেই থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে এলেনের।

বাড়ি এসে গেছে। মা মিসেস রডরিকস্ গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে। বাড়ি ঢুকতেই চুমু খেয়ে বললেন, এই নাও মা তোমার চিঠি।

গালে রক্তিম একটু আভা দেখা যায় এলেনের। চকল হয়ে ওঠে চোখ দুটো। মার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে এলেন পড়তে বসে।

এলেন, প্রায় দেড় মাস হতে চলল কিন্তু এখনও তো কোনও পথই খুঁজে পাচ্ছি না আমি। প্রাণপণ চেষ্টা করছে এরা তোমার কথা ভুলিয়ে দিতে। নিত্য নতুন পার্টি হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে আবির্ভাব হচ্ছে নিত্য নতুন সুন্দরীর যাতে এদের দেখে আমি সেই নগণ্য ভারতীয় মেয়েটিকে ভুলে যাই। তোমাকে বিয়ে করার কোন সুযোগই এরা আমাকে দেবে না। কিন্তু এলেন! আমার প্রিয়তমা এলেন! এ বিশ্বাস কখনো তুমি হারিও না যে তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই ভালবাসতে পারব না আমি। আমার স্ত্রী তুমি ছাড়া আর কেউ হতে পারবে না। তুমি আশা ছেড়ো না লক্ষ্মীটি। বুধবারের গির্জেতে যাচ্ছতো ঠিক ঠিক? ভরসা রেখ প্রার্থনার জোরে একদিন না একদিন এ সুযোগ আসবেই আসবে···

আর পড়তে পারে না এলেন। গরম গরম চোখের জলে সমস্ত চিঠিটা ভিজে যায়।

জর্জ লিখেছে, তারা কিছুতেই হতে দেবে না এ বিয়ে। কিন্তু কেন? কেন সমস্ত জগৎটাই এমন ভাবে শত্রু হয়ে উঠেছে? ভারতীয় অ্যাংলো হয়ে জন্মানোটাই কি অপরাধ এলেনের?

এনগেজমেন্টের দুদিন পরেই হঠাৎ তার পেয়েছিল জর্জ টেইলর, তাকে বদলী করা হয়েছে লণ্ডনের

আপিসে! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ভারত ছাড়বার হুকুম ছিল তাতে। মাথায় যেন হঠাৎ বাজ পড়েছিল এলেন এবং জর্জের। বিনা দোষে কেন এখন বদলী? বৈ ভারত ছাড়ার কোন কথাই তো হয়নি এর আগে? তা ছাড়া এই সেপ্টেম্বর মাসেই যে বিয়ের ঠিক করেছিল দুজনে? ব্যাপারটা পরে জানা গিয়েছিল মিঃ ডি সুজার কাছ থেকে। এমব্যাসির উচ্চপদস্থ সব কর্মচারীদের নাকি লজ্জায় মাথা কাটা গিয়েছিল অধস্তন ঐই স্টেনোর সঙ্গে তাদেরই এক সহকর্মীর বিয়ের কথা শুনে। তা ছাড়া এলেন যে সামান্য ভারতীয় অ্যাংলো। এরকম কাণ্ড হলে এখানে প্রেসটিজ বলে কিছু থাকে নাকি কারো? তাই গোপনে আলোচনা হয়ে গেছে টেলিফোনে দিল্লীতে অবস্থিত আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। সুদূর আমেরিকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও নাকি কথা হয়ে গেছে। তাই হঠাৎ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে জর্জকে জরুরী এক তার পাঠিয়ে।

কেঁদে আকুল হয়ে গিয়েছিল এলেন। কি হবে এখন? বিয়ে যা হবে কি করে আর এখানকার আত্মীয় বন্ধুরাই বা বলবে কি? এদের কাছে মুখ দেখাবে কি করে এলেন?

নিজে উদ্বিগ্ন হয়েও সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল জর্জ, কেঁদোনা এলেন। ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখ। আমি সত্যি তোমাকে ভালবেসেছি আর তোমাকেই বিয়ে করব আমি। কিন্তু আজ যদি আমি ভারত ছেড়ে লণ্ডনে গিয়ে কাজে যোগ না দিই তাহলে এ চাকরিটি আমার যাবে। আর চাকরি যদি যায় তাহলে আমার মান সম্ভ্রম নষ্ট হবে, অন্য কাজও জুটবে না। তাহলে তোমায় বিয়ে করব কি করে?

জর্জকে বিদায় দিতে এসে বিমানঘাটিতে সেদিন এলেনের সঙ্গে সঙ্গে মা মিসেস রডরিক্সও কেঁদে ছিলেন অঝোর ধারে। জলে ভরে এসেছিল জর্জ টেইলারেরও দুটি চোখ।

এমব্যাসির উপস্থিত সকলের সামনে এলেনকে বলেছিল জর্জ, তোমাকে আমি নিজের করে নেবই তা সে যেমন করেই হোক। লড়াই যদি করতে হয় এ পৃথিবীর প্রতিটি লোকের সঙ্গে তবু আমি ছাড়ব না তোমাকে। নিজের একটা ব্যবস্থা করে শিগগিরই ফিরে আসব আমি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে। চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল তখন এলেনের সারা গাল চোখ মুখ ঠোঁট। অস্ফুট স্বরে শুধু বলতে পেরেছিল সে, ভগবান তোমায় রক্ষা করুন। মঙ্গল করুন!

পরের দিনই আপিস থেকে ছাটাইএর চিঠি পেয়েছিল এলেন। হঠাৎ যেন এক নিমেষে নিভে গিয়েছিল এই জীবনের আলো নিয়তির একটি ফুঁএ। লজ্জা দুঃখ ও পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে নিজের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল এলেন।

নিদারুণ সেই দুঃসময়ে একদিন আদর করে বলেছিলেন মিসেস রডরিক্স, মা এলেন একবার যদি তুমি যাও ঐ বুধবারের গির্জায় আর মা মেরীর কাছে ভক্তিভরে প্রার্থনা কর পর পর নটি বুধবার তা হলেই সব দুঃখের অবসান হবে। মনস্কামনা সিদ্ধ হবে তোমার।

তার পরদিনটাই ছিল বুধবার। মায়ের-সঙ্গে সেই প্রথম এসেছিল এলেন বুধবারের এই গির্জেয়। বেদীতে টাঙানো মা মেরীর বড় ঐ ছবিটার সামনে নতজানু হয়ে করেছিল সে প্রার্থনা আকুল হয়ে অশ্রুজলে ভিজে। সেই দিনই বাড়ি ফিরে জর্জের চিঠি পেয়েছিল এলেন। জর্জ লিখেছিল, তুমি পাসপোর্ট করিয়ে যত শিগগির পার চলে এস এখানে। বিয়ের ব্যবস্থা সব আমি করে রেখেছি। দেখলাম ভারতে গিয়ে বিয়ে করার চাইতে এখানে ব্যবস্থা করা অনেক বেশী সুবিধে। আমার ছুটি পাওয়াও কঠিন। তাই তোমাকে লিখছি চলে আসতে যত শিগগির পার। তারপর শুরু হয়েছিল ঘোরাঘুরি আর তদ্বির এলেনকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ ডি সুজার এ আপিস থেকে ও আপিস। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হল না। পাসপোর্ট যদিও বা পাওয়া গেল ভিসা মিলল না।

জানা গেল তিসা আটকে দেওয়া হয়েছে ইচ্ছে করেই, যাতে এলেন লণ্ডনে যেতে না পারে।

কেঁদে কেটে সব কথা খুলে লিখেছিল এলেন জর্জের কাছে। নিরুপায় জর্জ কোন উপায় খুঁজে পায়নি। শুধু ভরসা দিয়েছে। বলেছে অপেক্ষা করতে। আশ্বাস দিয়েছে আসবে, নিশ্চয়ই সেদিন আসবে।

তারপর থেকে এলেন নিয়মিত ভাবেই জর্জের চিঠি পায়। প্রায় একই কথা থাকে প্রতি চিঠিতে। দুঃখের কথা, বেদনার কথা, আশার কথা আর থাকে বুধবারের গির্জেতে যাওয়ার কথা।

লণ্ডনে বসে এই বুধবারে জর্জও নিয়মিত প্রার্থনা করে। আজও সেই কথাই লিখেছে জর্জ এলেনের কাছে এই চিঠিতে। সামনে টাঙানো মা মেরীর মস্ত বড় ছবিটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে এলেন আকুল হয়ে কেঁদে বলে, মা মেরী আমায় শক্তি দাও, শক্তি দাও, আর যে আমি সইতে পারি না।

নতজানু হয়ে চোখ বুজে প্রার্থনা করছিল এলেন এক মনে। হঠাৎ নিজের মায়ের গলার স্বর কানে এল তার। মা যেন ডাকছেন ফিস ফিস করে, এলেন, এলেন।

চমকে ফিরে তাকায় এলেন। সত্যি মিসেস রডরিকস এসে দাঁড়িয়েছেন এলেনেরই পেছনে চোখভরা জল আর মুখে মৃদু হাসি নিয়ে। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেন তিনি এলেনকে, আর স্নেহ চুমোয় ভরিয়ে দেন তার মুখখানি।

অবাক হয়ে বলে এলেন, কি হয়েছে মা? বাড়ি খালি রেখে তুমি অমন করে চলে এলেছ কেন মা?

রুমাল দিয়ে চোখ দুটি মুছে মৃদু হেসে মিসেস রডরিকস্ হাতের ব্যাগ থেকে হলদে খামটি তুলে এগিয়ে দেন এলেনের দিকে?

টেলিগ্রাম?

বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে এলেনের।

কার টেলিগ্রাম মা? জর্জের?

মায়ের দিকে চোখ দুটি বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে এলেন আর ক্ষিপ্র হাতে বার করে খাম থেকে টেলিগ্রাম। পড়তে পড়তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এলেনার মুখ। হাসতে হাসতে দু'চোখের জল উপচে পড়ে।

জর্জ লিখেছে, এলেনের ভিসার সব ব্যবস্থাই সে করেছে তার এক বন্ধু মাইকেল ম্যাকডিন্ডের সাহায্যে। তার কাছে গেলেই এলেন পেয়ে যাবে ভিসা একদিনের মধ্যেই। পরদিনই যেন সে রওনা হয়। যেদিন লণ্ডনে এসে পৌঁছবে এলেন সেইদিনই তাদের বিয়ে হবে।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে দুই বাহু দিয়ে মার গলা জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে এলেন, মা! আমার মা।

সস্নেহে মেয়ের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মিসেস রডরিকস্ বলেন, সবই মা মেরীর আশীর্বাদ, ওঁকে আগে ধন্যবাদ জানাও মা।

অন্ধকার! সমস্ত পৃথিবীটাই আজ অন্ধকার হয়ে গেছে এলেনের কাছে। কাঁদতেও আর পারে না, বুঝতেও পারে না যে নির্বান্ধব এই শহরে কোথায় সে যাবে আর কাকে গিয়েই বা শোনাবে তার দুঃখের কথা। তাই সর্বক্ষণই বসে থাকে এলেন পিকাডেলী সার্কাসে মিসেস ম্যাকেনজীর বাড়ীর কোনের দিকের এই ঘরটায় যেখানে মা মেরীর ঐ ছবিটাকে সামনে রেখে।

এই তিন সপ্তাহ ধরে রোজ কতবারই তো অভিযোগ করেছে সে, মা মেরী কি দোষ করেছি আমি যে এমন করে শাস্তি দিচ্ছ আমাকে ? তুমি তুমি দয়াময়ী কিন্তু আমার বেলায় এমন নির্দয় তুমি কেন হ'লে মা ?

জর্জের চিঠি পাবার তিন দিনের মধ্যেই ভিসা পেয়ে গিয়েছিল এলেন। পরের প্লেনেই রওনা হয়েছিল এলেন এই অচেনা অজানা লণ্ডনের দিকে তার জীবনের সাথীর সঙ্গে মিলনের আশায়।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্য।

এলেনের ভারত ছাড়ার খবর আগেই এসে পৌঁছেছিল আমেরিকান এমব্যাসিতে এবং ঠিক একদিন আগেই জর্জ টেইলর পেয়েছিল এক টেলিগ্রাম আমেরিকার লস্‌এঞ্জেলেস থেকে। তার মার নাকি মারাত্মক এক অসুখ হয়েছে এবং জর্জ যেন এক্ষুণি রওনা হয় লস্‌এঞ্জেলেসে মার কাছে। সেইদিনই পিকাডিলি সার্কাসে মিসেস ম্যাকেনজীর এই ঘর খানি এলেনের জন্য ঠিক করে মার কাছে রওনা হয়ে গিয়েছিল জর্জ এক বন্ধুকে এলেনের ভার দিয়ে। বলেছিল, এলেনকে বলতে সাতদিন পরেই সে ফিরে এসে বিয়ে করবে। এলেন যেন ভয় না পায়। আশা না ছাড়ে।

তারপর একদিন চিঠি পেয়েছিল এলেন জর্জের কাছ থেকে। জর্জ লিখেছিল,

এলেন,

মায়ের অসুখের জন্য আমাকে নিয়ে আসা হয়নি এখানে, আনা হয়েছে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। মাও বলছেন মিনতি করে তোমাকে যেন ছেড়ে দিই আমি। বিয়ে না করি। মার মনে দুঃখ না দিই। এ বিয়ে হলে সমাজে মার সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। নিজেদের সমাজের মধ্যে কত ভাল ভাল সব মেয়ে রয়েছে ইত্যাদি সব কথা। কিন্তু মাকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি, বিয়ে যদি করি এলেন শুধু তোমাকেই করব। ঠিক তার পর দিনই অফিস থেকে নোটিশ এল, এখন থেকে নিউইয়র্ক-এর অফিসে আমাকে বদলী করা হল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে গিয়ে চার্জ নিতে হবে। লণ্ডনে যাওয়া আর আমার হবে না। বলত এখন কি করি আমি ? তোমার মনের অবস্থা সবই আমি বুঝি এলেন কিন্তু পুরুষমানুষ হয়েও যে আজ আমি কত নিরুপায় তা কি করে তোমায় বোঝাই ? এ কাজ যদি আজ আমি ছেড়ে দিই তবে কোনও ভাল কাজ আর জীবনে কখনও পাব না আমি। আর যদি ওরা আমায় বরখাস্ত করে কাজ থেকে তাহলে হয়ত আত্মহত্যাই করতে হবে আমাকে। মা কোটিপতি বিধবা মানুষ ; কিন্তু এখনও টাকা পয়সা তাঁর হাতে। কোটিপতির সন্তান হয়েও নিজের বলতে আমার কিছু নেই এই চাকরিটি ছাড়া। এলেন ! দেখছি এ জীবনে তোমার সঙ্গে আর বুঝি দেখা হবে না আমার ! অথচ তুমি আমার বাগদত্তা। তাই তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি আমি। যদি পার বিয়ে করে সুখী হয়ো এই আমার কামনা। আমার পথ বেছে নিয়েছি আমি। ঠিক করেছি, বাকী জীবনটা সংসার ছেড়ে গির্জেতে গিয়ে পাদ্রী হয়ে কাটাব। এই জন্য প্রথম কমিউনিয়ন (প্রথম মন্ত্র) ২।১ দিনের মধ্যেই নিয়ে ফেলব আমি। কিন্তু দ্বিতীয় কমিউনিয়ন নিয়ে পুরোপুরি পাদ্রী হবার আগে তোমার সেই নবম বুধবার পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। এইটিই হোয়াইট আমার শেষ ক্ষীণ আলো আমাদের দুজনের জীবনে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল এলেন জর্জের এই চিঠি পড়ে। এসব কি লিখেছে জর্জ ? এ কি সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসেছে সে। তাকে এত বেশী ভালবাসে জর্জ ? ভাবতেও বুকটা উদ্বেল হয়ে ওঠে অনির্বচনীয় সুখের এক আবেগে। কিন্তু জর্জ শেষে পাদ্রী হবে ? আবার বুকটা যেন ফেটে যায় কান্নায়। না না না কিছুতেই তা হতে দেবে না এলেন।

চিঠি লেখে এলেন। মিনতি করে লেখে এ কাজ কখনও কোরোনা তুমি সামান্য এই এলেনের জন্য। কিন্তু জর্জ তা শোনে না। অনেক ভেবে ঠিক করেছে এ ছাড়া তার অন্য পথ নেই। নবম বুধবার পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে তারপর জীবনের মত পাত্রী হয়ে যাবে।

আকুল হয়ে ভাবে এলেন সেই নবম বুধবারটির আর মাত্র চারটি দিন বাকি। তার পরই শেষ হয়ে যাবে এলেনের বেঁচে থাকার সব আশা।

এই একটি কথাই সারাদিন ভাবে এলেন ; ঘুমিয়েও স্বপ্ন দেখে সেই কথা। বসের মাহিমের গির্জেতে মিসেস হডরিকস্ এলেনের হয়ে প্রতি বুধবার প্রার্থনা জানাতে যান ; আর এখানে তো সারাদিনই পড়ে থাকে এলেন মা মেরীর ছবির সামনে হাত জোড় করে। তবু শুধু মনে হয় আর মাত্র চারটি দিন বাকি আছে তার। তারপর ফুরিয়ে যাবে সব।

তাই আজ চিঠি লেখে এলেন, আমার প্রাণাধিক প্রিয় মা, আমার জন্যে তোমার মনে যে কি নিদারুণ দুঃখ এবং অশান্তির ঝড় বয়ে যাচ্ছে তা আমি জানি মা। কিন্তু মা তুমি তো জান সবই ভগবানের ইচ্ছা। নইলে কত আশা করে মেয়ের সুখের জন্যে এতদূর দেশে একা তাকে পাঠিয়েছিলে তুমি এবং বাবা কিন্তু তার ভাগ্যে সুখ হল কৈ? মাত্র চারটি দিন পরেই তোমাদের সন্তানের জীবনে যে একমাত্র আশা সেই জর্জ মনের দুঃখে এই জীবন ছেড়ে পাদ্রীর জীবন বরণ করে নেবে। তাহলে মা তোমার এলেন বাঁচবে কি নিয়ে? তাই মা সে তার ভাগ্য মেনে নিয়েছে। ঠিক করেছে শেষ করে দেবে সে দুর্ভাগা এই দেহটা নির্বান্ধব এই পুরীতে। আমি জানি তুমি কত কষ্ট পাবে এই খবরে। কিন্তু তুমিই তো শিখিয়েছ মা যে বাইবেলে আছে, ভগবানের দেওয়া প্রাণ যখন তিনি ফিরিয়ে নেন তখন তাতে দুঃখ করতে নেই কাঁদতে নেই।

সারাটা দিন কেটে গেছে। হাঁটু ভেঙে মা মেরীর ছবিটার সামনে বসে প্রার্থনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এলেন। অবোর ধারে কেঁদে কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে সে।

অন্ধকার হয়ে গেছে ঘরটা। বাইরের রাস্তা থেকে ইলেকট্রিকের আলো ঘরে ঢুকে আবছা হয়ে ছড়িয়ে গেছে।

বুধবারের সন্ধ্যা আজ। সেই দিনটার সন্ধ্যা, যে সন্ধ্যার পর জর্জকে পাবার আর কোন আশাই থাকবে না। সেই দিনের সন্ধ্যা যার পর সূর্যের আলো আর দেখবে না এলেন।

দরজা খুলে মিসেস ম্যাকেনজী ঘরে ঢোকেন চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে। অবাক হয়ে কাছে এসে ডাকেন, এ কি হল মিস হডরিকস্? আপনি এমনি করে মাটিতে শুয়ে? শরীর খারাপ নাকি? আজ বুধবার এখনও মোমবাতি জ্বালেননি?

মা মেরীর ছবির সামনে তেমনি লুটিয়ে পড়ে থাকে এলেন। কোন সাড়া দেয় না।

ব্যাকুল হয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে ডেকে ওঠেন মিসেস ম্যাকেনজী, মিস হডরিকস্! মিস হডরিকস্!

অনন্তরা ক্লান্ত চোখ দুটি খুলে মিসেস ম্যাকেনজীর দিকে শুধু তাকায় এলেন। অস্ফুট কণ্ঠে মিনতি করে বলে, দয়া করে আপনি এই মোমবাতিগুলি একটু জ্বালিয়ে দেবেন মিসেস ম্যাকেনজী?

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ এলেনের দিকে তাকিয়ে থেকে মোমবাতিগুলি একে একে জ্বালিয়ে দেন মিসেস ম্যাকেনজী।

এমন সময় ঘরদোর কাঁপিয়ে বেলটা হঠাৎ জোরে জোরে বেজে ওঠে টুং টুং টুং টুং একটানা শব্দ করে।

বিরক্ত হন মিসেস ম্যাকেনজী। নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলেন, নিশ্চয়ই মিস বাক এলেন আবার আমায় জ্বালাতে! নিজের তো কাজ নেই তাই যখন তখন এসে আমার কাজ পণ্ড করেন। এই বলে বেরিয়ে যান মিসেস ম্যাকেনজী।

দরজাটা খুলে দিয়েছেন মিসেস ম্যাকেনজী। এলেনের কানে দুটি মেয়েলী গলার স্বর ভেসে আসে। হঠাৎ মিসেস ম্যাকেনজীর চীৎকার শোনা যায়, মিস রডরিকস্। মিস রডরিকস!

বুকটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে ওঠে এলেনের। কে? কে এসেছে? উঠে বসে সে তাড়াতাড়ি।

বাইরে থেকে গলা শোনা যায় মিসেস ম্যাকেনজীর; মিস রডরিকস্! এক ভদ্রমহিলা দেখা করতে এসেছেন আপনার সঙ্গে। ভদ্রমহিলা? মনটা একেবারে ঘুরে যায় এলেনের। তার মনটা যে জর্জের নামেই ওরে উঠেছিল হঠাৎ; দরজা খুলে ঘরে এসে দাঁড়াল মিসেস ম্যাকেনজী একটি বৃদ্ধা মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় এলেন। বৃদ্ধার চেহারায় এবং পোশাকে মস্ত বড় ঘরের ছাপ। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তিনি এলেনের দিকে।

এলেনও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে চিনতে না পেরে। এগিয়ে আসেন ভদ্রমহিলা বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে। আস্তে আস্তে বলেন, আমি মিসেস টেইলর। তোমার সঙ্গে দরকারী কাজে এসেছি।

যতদূর হয়ে যায় এলেন। কিছুই বুঝতে পারে না সে। টেইলর? কোন টেইলর? কোথাকার টেইলর? মাথার মধ্যে কেমন যেন সব জট পাকিয়ে যায়।

আরও কাছে এগিয়ে এসে বলেন মিসেস টেইলর, মাই গার্ল! আমি জর্জের মা।

ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে ওঠে এলেনের। চোখ দুটোতে যেন হঠাৎ জলের জোয়ার এসে যায়।

মিসেস টেইলর বলেন, আমার একমাত্র ছেলে তোমাকে না পেয়ে নিজে পাগল হয়ে যাচ্ছিল। তাই আমি একবার দেখতে এসেছি তোমাকে। দেখতে এসেছি কতখানি ভালবাস তুমি আমার ঐ ছেলেকে।

কোন কথাই বলতে পারে না এলেন। যাদুর মত পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে সে। শুধু চোখ দুটি থেকে ঝর ঝর জল পড়ে অঝোর ধারে!

এলেনের একেবারে কাছে এসে মিসেস টেইলর হাতের রুমাল দিয়ে সস্নেহে এলেনের চোখ দুটি মুছিয়ে দেন। মৃদু হেসে এলেনের উসকো খুসকো মাথায় চুম্বন দিয়ে বলেন, কেঁদো না মা! আমি জানি আমার ছেলে যতটা তোমায় ভালবাসে তার চেয়ে তোমার ভালবাসাও এক বিন্দু কম নয় কিছু। তাই ত আজ তোমার এই অবস্থা। মা এলেন জর্জও এসেছে আমার সঙ্গে।

হঠাৎ যেন কি হয়ে যায়! মাথাটা ঝন্‌ঝন্ করে ঘুরে ওঠে এলেনের। বুকের মধ্যেও কেমন যেন একটা দুস্‌দাম্ শিটুনি শুরু হয়।

মা! বলে চেঁচিয়ে উঠে দুই বাহু দিয়ে মিসেস টেইলরকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে এলেন।

নিজের চোখ দুটি মুছে শক্ত করে এলেনকে বুকে চেপে ধরে মিসেস টেইলর বলেন, ইজি মাই গার্ল! ইজি! শান্ত হও।

তার পর আদর করে এলেনের পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন মিসেস টেইলর, কালই বিয়ে তোমাদের, আমি নিজে সব ব্যবস্থা করে এসেছি। জর্জ আছে রেজিষ্টারের আপিসে। এখানেই কাল বিয়ে হবে, এই লণ্ডনে।

মিসেস টেইলরের বাহু পাশ থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে এলেন হাত দুটি জোড় করে, মা মেরী জয় হোক তোমার! তুমিই ধন্য!

এই বলে নতজানু হয়ে মা মেরীর ছবির সামনে বসে পড়ে সে।

তাকিয়ে দেখেন মিসেস টেইলর, মোমবাতির আলোয় মা মেরীর মুখখানাও যেন ঝলমল করছে খুশির কি এক উজ্জ্বাসে। যেন মৃদু মৃদু হাসছেন তিনি।

কথোপকথন

শ্রীসদানন্দ

স্থান : সায়েন্স কলেজ
২৪শে আগষ্ট ১৯৬০ (বিকাল)

[আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কেদারায় বসে 'বঙ্গদর্শনে'র পাতা উল্টোচ্ছেন। পাশে বিজ্ঞান কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক। একদল ছাত্র এসে আচার্যদেবের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াল। আচার্যদেব তাদের দিকে তাকালেন ও অনেকক্ষণ ধরে চেনবার চেষ্টা করলেন, কাউকে কাউকে চিনতেও পারলেন। তারপর তিনি তাদের নাম ধরে ডেকে বললেন]

কে দুর্গাপদ? কে শিশির? বহুদিন পরে দেখা হল তোমাদের সঙ্গে। কেমন আছ? কে কি করছ? কার কারবার করছ তো? কেমন চলছে?

দুর্গাপদ। না স্যার কার কারবার করব কোত্থেকে, আমরা সবাই প্রায় বেকার, আমি আর শিশির চাকরি করছিলাম, তাও কিছুদিন হোল গিয়েছে।

[একথা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে আচার্যদেব দুর্গাপদর মুখের দিকে চেয়ে বললেন] দুর্গাপদ, তুমি তো সেবারে বেশ ভালভাবেই পাশ করেছিলে আর কেমেনের* চেষ্টায় বাগমারীতে (কলকাতা) একটা ছোটখাট সাবান তৈরীর কারখানাও করেছিলে জানতাম, সে সব গেল কোথায়? আর তোমার মত ছেলে—তুমিও বেকার?

দুর্গাপদ। হ্যাঁ স্যার, কারবার আমার ভালই চলছিল, বাজারে সাবানের চাহিদাও হয়েছিল বেশ, আর কিছুদিন চালাতে পারলে দাঁড়িয়েও যেতাম, কিন্তু সেবারে হাঙ্গামায় সব লুঠ হয়ে গেল, নতুন করে গুছিয়ে নেবার শক্তি তখন আমার ছিল না, তাই মনে করেছিলাম কিছুদিন চাকরি করে কিছু টাকা জমিয়ে আবার ব্যবসা করব। চাকরিও একটা জুটেছিল বেশ, কিন্তু বেশীদিন টিকল না। শিশিরও কাজ করতে করতে ছাঁটাই হয়ে গেল, আর আমাদের সঙ্গে যাদের দেখতে পাচ্ছেন তারা সবাই বেকার।

(* ডাঃ এইচ কে সেন, সায়েন্স কলেজের ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের নাতনী-জামাই।)

শিশির। কদিন ধরে আপনি আসবেন শুনে আমরা কত আশা করে বসে আছি, দেশে তো আর এখন মানুষ নেই, এমন কেউ নেই যার কাছে গিয়ে পরামর্শ পাই, একটু আশা ও বল পাই। আপনারা যখন ছিলেন কত বল ভরসা ছিল আমাদের, কত উৎসাহ পেতাম আপনাদের কাছ থেকে, আপনার কথা শুনলে আমাদের মন ভরে যেত উৎসাহ উদ্দীপনায়।

আচার্যদেব। হেমেন তোমাদের কতই না ভালবাসত, আমি তো জানি কি করে তোমাদের সব হাতেকলমে কাজ শিখিয়েছে, শুধু কলেজে নয় কলেজের বাইরেও যখনি তোমাদের যা প্রয়োজন হোত সে যত্ন করে দেখাত, তোমাদের ওপর তার কত আশা ছিল। সেবারে সে তোমাদের, সাবান, প্রেসের কালি আরো কত কি তৈরী করতে শিখিয়েছিল, তার চেষ্টাতেই তো দুর্গাপদ সাবানের কারখানা করেছিল—তাই না? তার সব নষ্ট হয়ে গেল—বড়ই দুঃখের বিষয়। দেখ শিশির, আমি ছেলেদের কখনো কাউকে চাকরি করতে বলিনি, আমি বার বার বলে এসেছি, তোমরা ব্যবসা শেখ—ব্যবসা কর—নিজেদের পায়ে দাঁড়াও। চাকরি করলে মনুষ্যত্ব লোপ পেয়ে যায়। তখন আমার কথা ছেলেরা যদি শুনত তাহলে বাংলার আজ এই দুর্দিন আসত না। সকলে কেরানীগিরি করবে—পরের চাকরি করবে—গোলামগিরি করবে—এতে না আসে মঙ্গলতা, না আসে সুখশান্তি, শুধু জীবনটাকে বিকিয়ে দেওয়া বৈ তো নয়—আমি সারাটি জীবন চীৎকার করে মরেছি—বাঙালীর ছেলে ব্যবসা শেখ—ব্যবসা কর। কিন্তু কজন শুনেছে আমার কথা?

ছাত্র। আমাদের না আছে টাকা না আছে পয়সা, ব্যবসা করব কোথেকে স্যার।

আচার্যদেব। টাকা নেই, পয়সা নেই—এ-কথা শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে—আরে বাবা ছোট ছোট কাজ কারবার করতে গেলে টাকার প্রয়োজন হয় না, চাই চরিত্র, চাই পরিশ্রম করবার ক্ষমতা, জীবনপণ করে লেগে থাকতে হয়। দেখে দেখে কাজ শিখতে হয়, কাজ জানলে, কাজ করতে পারলে, কিছু তৈরী করতে পারলে টাকা নিজেই ছুটে আসবে তোমার কাছে, তখন কতলোক টাকা নিয়ে সাধাসাধি করবে তোমাকে। কথাটা কি জানো—তোমাদের সততা (business honesty) নেই, পরিশ্রম করবার ক্ষমতাও নেই, তোমরা হয়ে গেছ বাবু, তোমরা চাও আরামে পয়সা করব, সে কি অমনি হয়? ব্যবসা বড় হলে তখন নিশ্চয় আরাম করতে পারবে, আর কারবার ছোট থেকেই বড় হয়। আমি কত বলেছি ব্যবসাবিমুখ বাঙালী কেবল শিখেছে চাকরি করতে, শুধু তোমাদের নয় যখন যেখানে সুযোগ হয়েছে আমি একথা বলতে কখনো ভুলিনি।

ছাত্র। তার আমরা দুবেলা দুমুঠো খেতেই পাইনা বাবু হব কোথেকে!

আচার্যদেব। আরে আমি কি বলতে চাই জানো—তোমরা মোটেই কষ্ট করতে চাও না, নিজের উপর নির্ভর করনা। খেতে পাওনা বটে! কিন্তু ডাইং ক্লিনিংএ কাপড় পাঠাও তো! রেষ্টুরেন্টে খাও ঢেরেচিত্তে সিনেমাও তো দেখ! এসব করলে কি চলেরে বাবা, আমি নিজের কাপড় এখনো নিজে কাচি, তাতো জানো। দুর্গাপদ, শিশির, বহুদিন পরে আমি তোমাদের দেখে কত খুশীই না হয়েছিলাম কিন্তু এসব জেনে আমার বুক ভরে উঠল ব্যথায়। যাবার আগে দুটো কথা বলে যাই, মানুষ হও, চরিত্রবান হও। বাঙালী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ—কম গৌরবের কথা নয়, চেয়ে দেখ পেছনে, কী গৌরবময়—কী উজ্জ্বল তোমাদের অতীত; কেবল "বাঙালী কোথায়" বলে চীৎকার করলে কিছুই হবে না, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ, নিজের পায়ে দাঁড়াও, ব্যবসায় আত্মনিয়োগ কর, কেন পরের মুখের দিকে তাকিয়ে

থাকবে! চাকরির জন্যে পরের দরজায় দরজায় ঘুরে মরবে! আজ তোমরা স্বাধীন, কত পথ তোমাদের সামনে, অর্থের প্রয়োজন হলে জাতীয় সরকার থেকে তোমাদের অর্থ, তোমরা কষ্ট করে ত্যাগ স্বীকার করে সততার দ্বারা যদি কোন শিল্প গড়ে তুলতে পার, তাতে দেশের হবে কতখানি লাভ, শুধু কি তোমরাই বাঁচবে, তোমরাই হবে সুখী, স্বাধীন ভারতের ঐশ্বর্য কত বেড়ে যাবে। আমি সেদিনও যা বলেছিলাম আজও তাই বলছি। কিন্তু সেদিন বলেছিলাম পরাধীন ভারতে আর আজ বলছি স্বাধীন ভারতে—যেখানে কত সুবিধা, কত সুযোগ হাত বাড়িয়ে আছে তোমাদের জন্যে। তোমরা ব্যবসায়ে মন দাও, নিজে সুখী হও, বাপ মাকে সুখী কর, দেশের গৌরব বাড়াও। তোমাদের আশীর্বাদ করি।

এই বলে তিনি অদৃশ্য হলেন।

আমাদের যুবকেরা ডিগ্রী ও চাকরির মোহ ছাড়াইয়া উঠিতে না পারিলে এ দুর্দশার অন্ত নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি ব্যবসায় ও শ্রমের মর্যাদা বুঝেন এবং জীবনের নানাক্ষেত্রে একত্র সম্মিলিত হইয়া দাঁড়াইতে শিখেন, তবে তাঁহাদের উদাহরণ দেখিয়া অশিক্ষিত জনসাধারণ ঐ সকল গুণের আদর করিতে শিখিবে। জাতীয় চরিত্রের এই দোষ-ত্রুটি সংশোধিত না হইলে আমাদের অন্ন সমস্যা দূর হবার কোন আশা নাই।

যদি দিনে প্রত্যেক ঘরে চার পাঁচ ঘণ্টা ক'রে চরকা চালান যায়, তা'হলে আমরা আমাদের বস্ত্র সমস্যার সমাধান করতে পারি। মেয়েরা চরকা না ধরলে চলবে না। ছেলেরা প্রথমে চরকা কেটে মেয়েদের লজ্জা দেবে, মেয়েদের শেখাবে। আমি এই যে কাপড় পরে আছি, এ আমার গ্রামবাসীর দান—দেশের কার্পাসে দেশের মেয়েদের হাতে ঘরের চরকায় কাটা-সুতায় দেশের তাঁতীর দেশী-তাঁতে তৈয়ারী। কাপড়খানা খুব মোটা সত্যি, কিন্তু এ কাপড় আমি মাথায় করে রেখেছি—রজনীকান্তের কথায় "এ যে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়—মাথায় তুলে নে রে ভাই।" আমার দেশবাসী এই কাপড়ের পরিবর্তে যদি কাপড়ের ওজনে সোনা দিতেন তাতে আমি তৃপ্ত হতুম না। মোটা কাপড়ে দোষ কি? আমরা যতই সভ্য হচ্ছি ততই অধঃপাতে যাচ্ছি। আমার এই কথা শুনে মনে করবেন না যে আমি একেবারে পশ্চিমের সম্পর্কই বর্জন করতে চাচ্ছি। ভারত যদি "নিশ্বাস রুধে দু চক্ষু মুদে" পশ্চিমের দিকে পিছন ফিরে বসে ও পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান—শিক্ষা চর্চ্চার সম্পর্ক ত্যাগ করে, তবে ভারতের পক্ষে সে দুর্দিন হবে; কিন্তু কচের ন্যায় বিদ্যা অর্জন করতে হবে শুক্রাচার্য্যের কাছে, স্বদেশে স্বদেশীর হিতসাধনের জন্যেই।

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

বিজ্ঞান-কথা

সত্যজিৎ

রয়েল সোসাইটির ত্রি-শতবার্ষিকী

বিশ্বের সর্বপুরাতন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ত্রিশতবার্ষিকী সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হয়েছে। সুদীর্ঘ ৩০০ বৎসর কাল নিরবচ্ছিন্নভাবে বিজ্ঞানসাধনার এমন সুমহান গৌরব অর্জন করা পৃথিবীর আর কোন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে ফ্রান্সিস বেকনের নেতৃত্বে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের ভিত্তিতে যে আন্দোলন শুরু হয়, তখনকার বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের মনোজগতে তা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অক্সফোর্ডে একদল বুদ্ধিজীবী মানুষ ১৬৪৫ সাল বরাবর লণ্ডনে নিয়মিতভাবে মিলিত হতেন। ব্রিটেনের গৃহযুদ্ধের ফলে তাঁদের নিয়মিত সম্মিলনে বাধা সৃষ্টি হলো। তাঁরা তখন লণ্ডন থেকে অক্সফোর্ডের ওডহাম কলেজে আলোচনা-চক্র স্থানান্তরিত করলেন। ১৬৬০ সালে এই দলের বার জন বিশিষ্ট সদস্য 'পরীক্ষাভিত্তিক জ্ঞান' জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে একটি সোসাইটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই দলের মধ্যে ছিলেন লর্ড ব্রাউঙ্কার, রবার্ট বয়েল, সার উইলিয়ম পেটি, জন উইলকিনস এবং সার ক্রিস্টোফার রেন। ইংলণ্ডে তখন ধর্মযাজকদের অপ্রতিহত প্রভাব। তাঁরা এই 'নবদর্শন' আন্দোলনকে ভালো চোখে দেখলেন না, পরন্তু অধর্মীয় কার্যকলাপ বলে ঘোষণা করলেন। সমাজের প্রভাবশালী এই ধর্মযাজক ও গোঁড়া সম্প্রদায়ের বিপুল বিরোধিতা রোধ করার জন্যে সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যেরা এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। রাজকীয় সনদের দ্বারা সোসাইটিকে রক্ষার জন্যে তাঁরা রাজা দ্বিতীয় চার্লসের কাছে রক্ষাকবচ প্রার্থনা করলেন। চার্লস সোসাইটিকে শুধু রাজকীয় সনদই প্রদান করলেন না, স্বয়ং সোসাইটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হতে সানন্দে স্বীকৃত হলেন। সোসাইটির তখন নামকরণ হলো The Royal Society of London for promoting Natural knowledge (বর্তমানে যা সংক্ষেপে রয়েল সোসাইটি নামে বিশ্বে সুপরিচিত)।

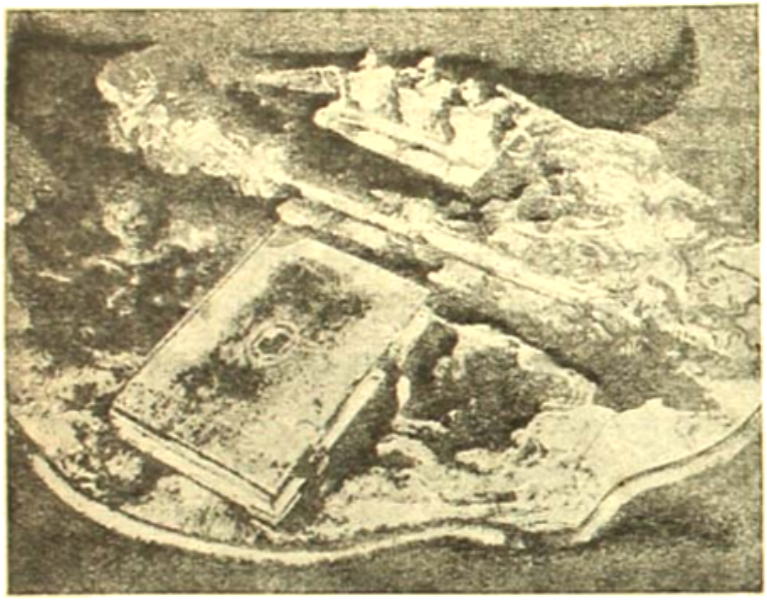

রাজা দ্বিতীয় চার্লস প্রদত্ত রয়েল চার্টার ও রাজকীয় দণ্ড

এই রাজানুগ্রহ লাভ করায় সোসাইটির চলার পথে একটি প্রবল বাধা অপসারিত হলো। গোড়ার দিকে সোসাইটিতে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল বেশী। ১৭০৩ সালে মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন যখন সোসাইটির সভাপতি পদে বৃত হলেন, তখন থেকে অবস্থান্তর ঘটতে লাগলো। ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞানীরা সোসাইটির

পরিচালন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতে লাগলেন এবং ১৮২০ সালে সোসাইটির পরিচালক সমিতিতে প্রকৃত বিজ্ঞানীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেন। বর্তমানে একমাত্র প্রতিষ্ঠাবান বিজ্ঞানীরাই সোসাইটির ফেলো বা সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন। নিউটন ছাড়া ডালটন, ফ্যারাডে, ডারউইন, জে জে টমসন, রাদারফোর্ড প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীদের নাম সোসাইটির সদস্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। রয়েল সোসাইটি বিজ্ঞানীদের সহায়তা করতে ও তাঁদের মর্যাদা দান করতে কোনদিন কুণ্ঠিত হয় নি। বর্তমানে সোসাইটির ফেলোর সংখ্যা ৭১৪ জন। বছরে ২৫ জনের বেশি নতুন ফেলো গ্রহণের নিয়ম নেই। প্রতি বছরে বিশ্বের চারজন প্রতিষ্ঠাবান বিজ্ঞানীকে বিদেশী ফেলো রূপে গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে বিদেশী ফেলোর সংখ্যা ৬৩ জন। ১৯৪৫ সালের আগে কোনো মহিলা-বিজ্ঞানীকে সোসাইটির ফেলো নির্বাচন করা হত না, বর্তমানে সে বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হয়েছে। পরোক্ষভাবে বিজ্ঞানে বিশিষ্ট অবদানের জন্যে একজন অ-বিজ্ঞানীকেও প্রতি বছর ফেলো নির্বাচন করার নিয়ম আছে। সোসাইটির ফেলো পদে নির্বাচনের জন্যে সম্ভাব্য সদস্যের নাম কমপক্ষে ৩ জন পূর্বতন ফেলো কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। তাঁদের মধ্যে ৩ জন আবার প্রস্তাবিত সদস্যের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবেন।

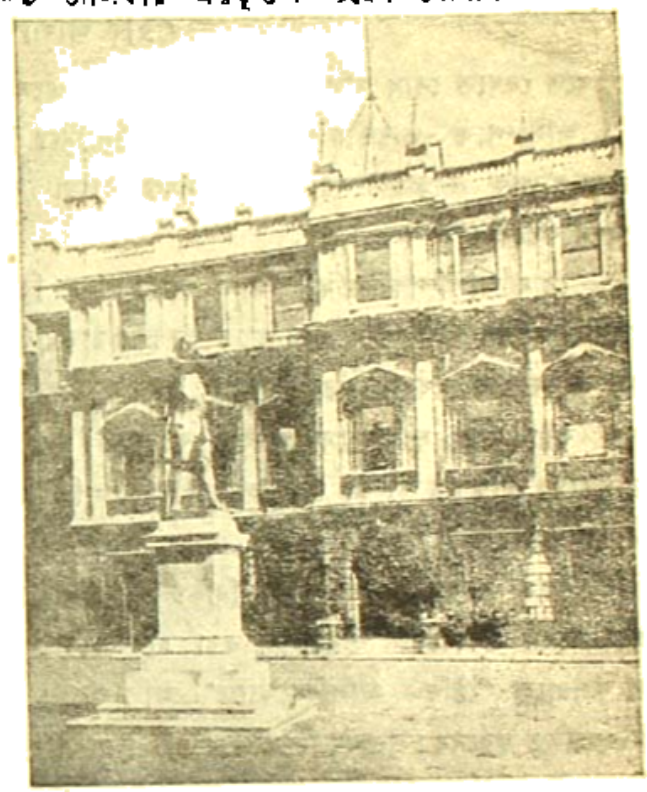

রয়েল সোসাইটির প্রধানদপ্তর বার্লিংটন হাউস।

আজ পর্যন্ত ১৫ জন বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানী রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন হচ্ছেন বাঙালী—জগদীশচন্দ্র বসু (১৯২০), মেঘনাদ সাহা (১৯৩১), প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশ (১৯৪৫), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৯৫৮) ও শিশিরকুমার মিত্র (১৯৫৮)।

ফেলো নির্বাচন করা ছাড়া সোসাইটি বিজ্ঞানে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্যে প্রতি বছর কয়েকটি পদক প্রদান করে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে সম্মানজনক হচ্ছে কোপলে পদক। ১৭৩১ সাল থেকে এই পদক দেওয়া হচ্ছে এবং বিশ্ববিশ্রুত অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন কুক এই পদকপ্রাপ্তদের অন্যতম।

রয়েল সোসাইটির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে ১৬৬৫ সাল থেকে 'ফিলোসফিক্যাল ট্রানজাকশন' এবং ১৮৩২ সাল থেকে 'প্রসেডিং অফ রয়েল সোসাইটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। সোসাইটির এই দুটি সাময়িকীই বিশ্ববিখ্যাত। সোসাইটির প্রধান দপ্তর বার্লিংটন হাউসে অবস্থিত সুবৃহৎ গ্রন্থাগারটিও বিশেষ আকর্ষণীয়। রয়েল সোসাইটি কোনদিন সরকারী অর্থসাহায্য গ্রহণ করে নি। কিন্তু বিগত ৩০০ বছরে ইংলণ্ডের সমস্ত বৈজ্ঞানিক অভিযান, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও আবিষ্কার হয়েছে রয়েল সোসাইটির সহযোগিতায়। রয়েল সোসাইটি একদিকে ব্রিটেনের বিজ্ঞান সাধনার মূর্তিক স্বরূপ এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের মিলনকেন্দ্র।

খেলাধূলা

রোম অলিম্পিক

দেখতে দেখতে রোম অলিম্পিক সুরু হওয়ার দিন এসে গেল। আগের কয়েকটি সংখ্যায় আমরা রোম অলিম্পিকে ভারতীয় অলিম্পিক দল গঠন নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। এবারও আমরা রোম অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে তার বিষয় আরও নতুন সংবাদ পরিবেশন করবো।

রোম অলিম্পিক কমিটি আশা করেছেন যে, বিশ্বের প্রায় ৮৫টি দেশ থেকে ৭০০০ হাজারের মত ক্রীড়ামোদী সপ্তদশ অলিম্পিকে এসে জড় হবেন। এ ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় লক্ষাধিক ক্রীড়ামোদী দর্শকও ঐ অনুষ্ঠান দেখবার জন্য যাবেন। ইটালীতে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় পক্ষই অতিথিবৃন্দের সমাদর করার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা করেছেন। হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট ছাড়াও স্কুল এবং বোর্ডিং-এ বহিরাগতদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। টেলিভিশন যোগে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় অলিম্পিকের ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রচার করা হবে।

রোম নগরীর বিভিন্ন স্থানে নির্মিত ১৫টি ষ্টেডিয়ামে ২৫শে আগষ্ট থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনা করা হবে বলে রোম অলিম্পিক কমিটি ঘোষণা করেছেন। ২৫শে আগষ্ট অপরাহ্নে "ষ্টেডিও অলিম্পিকোতে" অলিম্পিকের অনির্বাণ দীপশিখা ইটালীর রাষ্ট্রপতি গিয়োভানি গ্রন্থি প্রজ্জ্বলিত করবেন। প্রথম দিনে মাত্র ছুটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হবে। ষ্টেডিও ডেল নুওটো এবং পিসিনা ডেলি রাগ ওয়াটার পোলো এবং প্যালাজা ডেল স্পোর্টে রাত্রিতে বক্সিং এর কয়েকটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হবে। ২৬শে থেকে অন্যান্য সমস্ত ক্রীড়ানুষ্ঠান আরম্ভ হবে।

ঐ ১৫টি ষ্টেডিয়ামের মধ্যে যেটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে সেটি হলো প্যালাজা ডেলো স্পোর্ট। প্রায় আড়াই বছর ধরে এটা তৈরী হয়েছে। এর ছাউনিতে আছে এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী এক বৃত্তাকার ধিরাট গম্বুজ এবং চারপাশ কাঁচ দিয়ে ঘেরা রয়েছে। ১৫০০০ হাজার লোক এই ষ্টেডিয়ামে বসে বক্সিং এবং বাস্কেট বল প্রতিযোগিতা দেখতে পারবেন।

ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ষ্টেডিও ফ্লামিনোতে। হকি খেলা হবে ষ্টেডিও ডেল মামি এবং ভেলোড্রোমো অলিম্পিকেতে। হকি এবং ফুটবল প্রতিযোগিতা ২৬শে আগষ্ট তারিখ থেকে সুরু হবে। এ্যাথলেটিকের প্রতিযোগিতা ষ্টেডিও অলিম্পিকেতে অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য প্রতিযোগিতাগুলিতে ভারতবর্ষ থেকে কোন প্রতিযোগী যোগদান করছেন না।

ভারতীয় দল গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বহু মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে বলে এ বিষয়ে নতুন করে কিছু বলবার নেই। যাঁরা বাদ পড়েছেন তাঁদের পক্ষে এমন কথা কেউ বলতে পারেননি যার দ্বারা মনে হয় যে কারুর প্রতি বিশেষভাবে অবিচার করা হয়েছে। কারণ আমাদের দেশে এখনও ক্রীড়ামান এমন পর্যায় এসে পৌঁছয়নি যাতে কারুর স্বপক্ষে কিছু বলা যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বছরের পর বছর বিভিন্নদেশে ক্রীড়ামানের ক্রমশঃ উন্নতি হয়েছে আর আজকে সেটা এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যার

নাগাল পেতে আমাদের এখন বহু বছর সময় নেবে। ক্রীড়াজগতের মানোন্নয়নের জন্য যে সাধনার প্রয়োজন তার সূচনা মাত্র হয়েছে আমাদের দেশে।

লণ্ডন ক্রিকেট কন্‌ফারেন্স

গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে লণ্ডনে যে ক্রিকেট সম্মেলন বসে তার প্রধান এবং প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল ফাষ্ট বোলিং সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা। কারণ কয়েক বছর ধরে ফাষ্ট বোলিং ব্যাটসম্যানদের পক্ষে একরকম আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংলণ্ড দলের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণের সময় সংবাদপত্রে এ বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা সুরু হয়ে যায়। ইংলণ্ডের কাগজে কাগজে খেলার পাতায় তখন "বিষার" আর "বাম্পার" বলের সোরগোল। তারপর দক্ষিণ আফ্রিকার ভ্রমণে ক্রিকেটের প্রতি আম্পায়ারদের ক্রমাগত "নো'বল" ডাকার বদ অভ্যাসকে একেবারে চরমে নিয়ে যায়। ফাষ্ট বোলারদের বিরুদ্ধে এই অভিযানকে অষ্ট্রেলিয়ার সংবাদপত্রে মেকিক এবং রোরকের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন ও অব্যক্ত আক্রমণ ও তাদের ক্রিকেট খেলা থেকে বিদায় দেবার একটা প্রচেষ্টা বলে সন্দেহ হয়। অষ্ট্রেলিয়া থেকে স্বয়ং স্যার ডন ব্র্যাডম্যান ও অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান ঐ বৈঠকে যোগ দিতে আসেন।

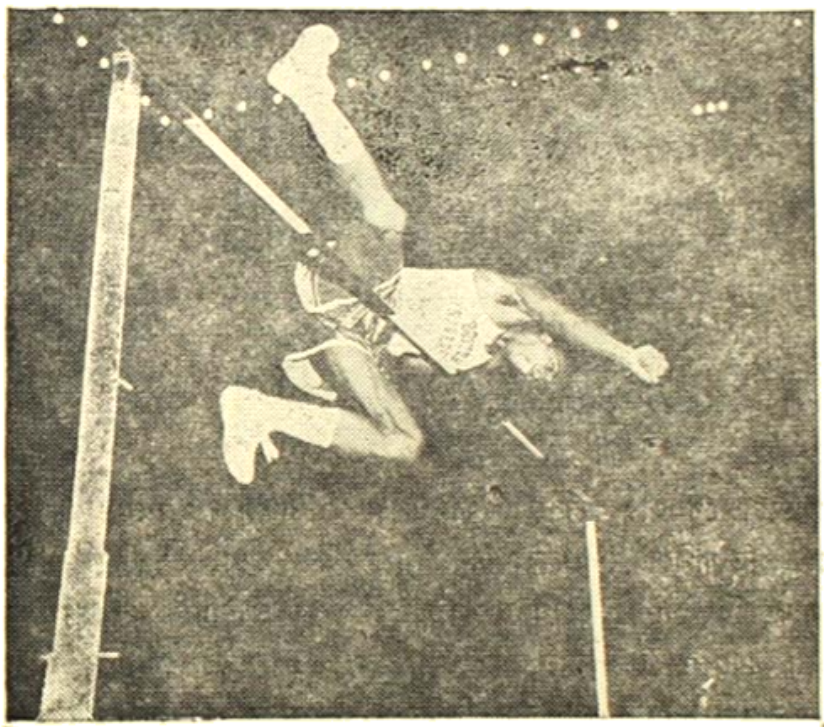

অলিম্পিক প্রতিযোগী আমেরিকার হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ান জনটমাস

বৈঠকে শেষ পর্যন্ত "বল ছোঁড়া" নিয়ে যে আলোচনা হয় তার সম্পূর্ণ বিবরণ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিরা ফাষ্ট বোলিং এবং বল ছোঁড়ার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত সম্মেলনে হয় তা গ্রহণ করতে পারেন নি বলে মনে হয়। তাঁরা যে বিবৃতি দিয়েছেন তা থেকে ব্যাপারটার সুরাহা হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে অষ্ট্রেলিয়া আর ইংলণ্ড ক্রিকেট খেলার দুই বড় সরিকদের দেশের কাগজে কাগজে যে বাদ প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় তাতে আমাদের সেই লাকড ব্র্যাডম্যান ঝগড়ার কথা মনে পড়ে যায়। ১৯১০-৩১ সালে ইংলণ্ডে অষ্ট্রেলিয়া দলের ভ্রমণ সুরু হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এর শেষ দেখবার জন্যে।

জার্মান ক্রীড়া শিক্ষক ওটো পেলজার : জার্মান ক্রীড়া শিক্ষক ডক্টর ওটো পেলজার সম্প্রতি ভারতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগীদের ক্রীড়া শিক্ষাদানের জন্য ভারতে অবস্থান করছেন। ডক্টর পেলজার খেলাধূলা বিষয়ে বহু পুস্তকের লেখক। কয়েকটি খেলায় তিনি বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। রাজকুমারী অমৃত কাউর পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতে অলিম্পিক খেলোয়াড়দের শিক্ষাদানের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে,

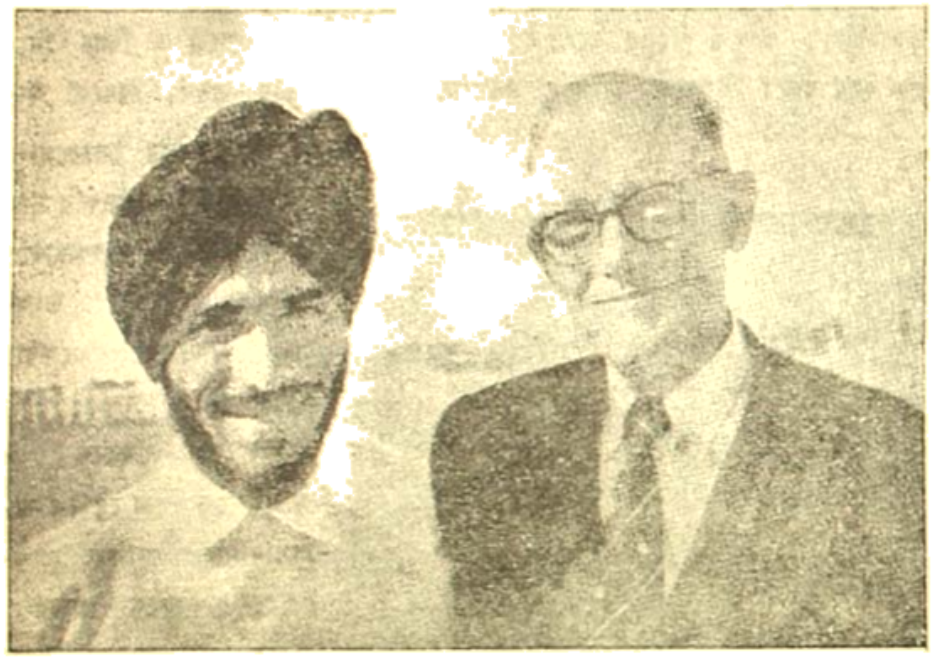

মিলখা সিং ও জার্মান ক্রীড়া শিক্ষক ডক্টর ওটো পেলজার

সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ডক্টর ওটো পেলজার ভারতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগীদের শিক্ষা দিচ্ছেন। ডক্টর পেলজার ভারতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগীদের বিশেষতঃ মিলখা সিং এবং অন্যান্য শিক্ষার্থী ভারতীয় প্রতিযোগীদল সম্পর্কে বিশেষ সাফল্যের আশা করেন। ডক্টর পেলজার ক্রীড়াজগতে সাফল্য জনক ইতিহাস সৃষ্টির ব্যাপারে পাঞ্জাবী খেলোয়াড়দের বিশেষ প্রশংসা করেন। ডক্টর পেলজার জার্মানী পরিভ্রমণের জন্য ভারতীয় খেলোয়াড়দের আহ্বান জানান। তিনি আশা করেন যে, জার্মান যুবকদের ক্রীড়াকৌশলের সঙ্গে পরিচিত হলে ভারতীয় যুবকরা নিজেদের ক্রীড়ার মান উন্নত করতে পারবেন।

———

গল্প-ভারতী

॥ রবীন্দ্র পাঠচক্র ॥

রবীন্দ্র পাঠচক্র

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক সাহিত্য

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

আমাদের শাস্ত্রে কবিকে বলা হইয়াছে প্রজাপতি, কেননা, তিনি স্রষ্টা; কিন্তু শুধু কবি-প্রতিভাই যে নির্মাণক্ষম, তাহা নহে, যাঁহারা সমালোচক, তাঁহারাও নির্মাণক্ষম, তাঁহারাও সৃষ্টিশক্তির অধিকারী। তাঁহারা কাব্য ও কবি-জীবনের উপর নূতন আলোকপাত করেন, ফলে কবির রচনা আমাদের নিকট নূতন তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনালাভ করে। প্রতিভাবান ব্যক্তি ভিন্ন কেহ যথার্থ সমালোচক হইতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ বলেন, কবি-প্রতিভার ন্যায় সমালোচনার প্রতিভাও একটি দুর্লভ সামগ্রী। আমরাও মনে করি, কবি-প্রতিভা যেমন একটি দৈবী সম্পদ, সমালোচনার প্রতিভাও তাই। রবীন্দ্রনাথের 'সমালোচনা' তাঁহার কবিতা বা গানের মত প্রচুর নয় বটে; কিন্তু উহার মধ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রগাঢ় মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন সাহিত্যের ন্যায় আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনাও তাঁহার মনীষার দীপ্তিতে ভাস্বর। আজ আমরা তাঁহার 'আধুনিক সাহিত্য' সম্পর্কে আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে (১২৮৮–১৩১৩) বিভিন্ন সাহিত্যিক ও তাঁদের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে 'সাধনা,' 'ভারতী' ও 'বঙ্গদর্শনে' যে সকল নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেগুলি 'আধুনিক সাহিত্য' নামে সংকলিত হইয়াছে। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, 'আধুনিক সাহিত্য' একালের সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস নয় বা সাহিত্যিকদের সম্পর্কিত কালানুক্রমিক আলোচনাও নয়; সাহিত্য কাহাকে বলে, সাহিত্যে আধুনিকতাই বা কি, এ প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে কোন আলোচনা উত্থাপন করেন নাই। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—মধ্যযুগের কবি বিদ্যাপতির প্রসঙ্গ কেমন করিয়া 'আধুনিক সাহিত্যে' স্থান পাইল, অথবা যতীন্দ্রমোহন সিংহের দার্শনিক সমস্যামূলক গ্রন্থ 'সাকার ও নিরাকার' কেমন করিয়া সাহিত্য পদবাচ্য হইল? উত্তরে কেহ হয়তো বলিবেন—বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি হইলেও তাঁহার কাব্যে আধুনিক রোমান্টিক প্রেমের সুর লক্ষ্য করা যায়, আর 'সাহিত্য' কথাটাও রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন—কেবল রসাত্মক বাক্যই সাহিত্য নয়, যাহা কিছু মানবমনের জিজ্ঞাসা বা কৌতূহলকে পরিতৃপ্ত করে, তাহাও সাহিত্য। আমরা এসকল কষ্টকল্পিত কথার সমর্থন করি না। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে প্রধানত সাহিত্যিক বা তাঁহাদের সাহিত্যকৃতি-সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, আর সম্ভবত এই কারণেই তিনি গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন 'আধুনিক সাহিত্য'।

'আধুনিক সাহিত্যের' প্রথম প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র। এই নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ, বঙ্কিম-প্রতিভার বীর্য ও সৌকুমার্য, তাঁহার মনীষার বহুমুখিতা, তাঁহার প্রবল ব্যক্তিত্ব, তাঁহার হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দুইটি উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য। (১) 'বঙ্কিম-সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন'। (২) নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন'।

'বিহারীলাল' প্রবন্ধটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'বিজনবাসী ভাবনিদ্র কবি বিহারীলালকে 'ভোরের পাখীর' সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বিহারীলাল বাংলা সাহিত্যে যে নূতন ধরণের

গীতি-কবিতার প্রবর্তন করিয়াছেন, উহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিশদভাবে ও প্রচুর উদ্ধৃতিসহকারে আলোচনা করিয়াছেন। বিহারীলালের কাব্যের ভাষা, ছন্দ এবং বিষয়-বস্তু—Form ও matter, বিশেষতঃ সারদামঙ্গলে ভাব-কল্পনার অভিনবত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে রসগ্রাহী আলোচনা করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা বড় বেশি মিলে না। সারদার সঙ্গে ইংরেজ কবি শেলির spirit of beauty'র তুলনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ সারদামঙ্গল কাব্যের মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন এই অভিনব প্রেমের কবিতার মধ্যে বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর যে বিচিত্রমূর্তি কবি চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই'। প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ সবিনয়ে অথচ অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার সাহিত্যগুরুর নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ'র সমালোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি কথা 'তাঁহার (সঞ্জীবচন্দ্রের) প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না' সঞ্জীব অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতবিরোধটি উপভোগ্য। 'পালামৌ' নামক ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিপ্রেমিক ও মানব-প্রেমিক, চিত্রকর ও ভাবুক সঞ্জীবচন্দ্রের যে পরিচয় পাইয়াছেন, প্রবন্ধের উপসংহারে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। 'সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিষ সজীব কৌতূহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রবীণ চিত্রকরের ন্যায় প্রধান অংশগুলি নির্বাচন করিয়া লইয়া তাহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন'।

'আধুনিক সাহিত্যে 'সঞ্জীবচন্দ্রের' পরেই 'বিদ্যাপতির রাধিকা' প্রবন্ধটি স্থান পাইয়াছে। প্রবন্ধটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' পত্রিকার চৈত্রসংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। সে সময়ে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা প্রসার লাভ করে নাই কিন্তু এ সম্পর্কে তাঁহাদের কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে এবং কেহ কেহ এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে চিরন্তন প্রেমগীতি হিসাবেই বিদ্যাপতির পদাবলীর আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকের দৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা' মিলিত হইয়াছে' কিন্তু তাঁহাকে বিশেষ কোন ভাবধারা বা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী মনে করিবার কারণ নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে বিদ্যাপতি মহাজন অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রত্যক্ষদর্শী, আর রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিদ্যাপতি প্রধানত সেই প্রেমের কবি যে প্রেম চিরনবীন হইয়াও চিরপুরাতন এবং যে প্রেম পরিণতি লাভ করে পরিপূর্ণ আত্মবিলোপ ও আত্ম-নিবেদনে।

'আধুনিক সাহিত্যে' 'বিদ্যাপতির রাধিকা' যেন প্রক্ষিপ্ত, কেননা, বিদ্যাপতি মধ্যযুগের এবং প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি। এই প্রবন্ধে কবি স্বরূপপ্রসঙ্গে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর'। তবে, বিদ্যাপতি যে রসোল্লাসের পরিণামের কথা বলিতেও বিস্মৃত হন নাই, সম্ভোগের মধ্যে জাগিয়া থাকে যে বিরহের আর্তি, যে চিরন্তন অতৃপ্তি তাহাও অনুকরণীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং চণ্ডীদাসের পদাবলীর জন্য আমাদের মনকে প্রস্তুত করিয়াছেন; কবি সে কথাটিরও উল্লেখ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর আলোচনা করেন নাই, রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তেও বিতর্কের অবকাশ আছে, তথাপি প্রবন্ধটির মধ্যে তিনি যে নিপুণ বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্রে' রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছেন 'প্রতিভার একটি প্রবল স্বাধীন বল'—রবীন্দ্রনাথের মতে বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থে 'স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন'। বাস্তবিক, বঙ্কিমচন্দ্র শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধার করিয়াছেন তিনি পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ যুক্তিবাদী বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, 'আমাদের মতে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অধিনায়ক স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি'। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা বিচারের যে প্রণালী বঙ্কিমচন্দ্র অবলম্বন করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই, তিনি তথ্য ও সত্যের পার্থক্য দেখাইয়া বলিয়াছেন, সত্য তথ্য অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। এ ব্যাপারে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মতের পার্থক্য আমাদের প্রণিধানযোগ্য। মহাভারতকার যে মানবতার আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য কৃষ্ণচরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ কথাও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নাই। এ সকল বিষয়ে অবশ্য বিতর্কের অবকাশ আছে। ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্পর্কেও বঙ্কিমের যুক্তি রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করিয়াছেন, কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও কোথাও অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন, কারণে অকারণে অপরের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং 'য়ুরোপীয় জাতির প্রতি বৈরিতা প্রকাশ করিয়াছেন'। আমরা বলি, বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসহিষ্ণুতা সমর্থনীয় না হইলেও অহেতুক নয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তির বিরূপ মনোভাব এবং য়ুরোপের পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদের শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে শোচনীয় অজ্ঞতা ও তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের ফলে স্বাজাত্যাভিমানী বঙ্কিমচন্দ্র অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। যে হেষ্টিসাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্র পত্রিকার মাধ্যমে বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই হেষ্টি লিখিয়াছিলেন—

'What is Krishna, after all, but an imaginary embodiment of the sensuous feeling of the East?

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রোধ righteous indignation যাহাকে বৈদিক ঋষিগণ বলিয়াছেন 'মন্যু'।

'রাজসিংহ' পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে এই ঐতিহাসিক উপন্যাসখানির মাত্র কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে এই উপন্যাসখানির বৈশিষ্ট্য ঘটনার অবিশ্রাম দ্রুত গতি, কাহিনী হইতে অনাবশ্যক ভাবের বর্জন, ইতিহাসের ঘটনা বাহুল্যের পরিহার ও হৃদয়-বিশ্লেষণের ব্যাপারে শিল্পিজনোচিত সংযম। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

'আধুনিক সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' ও শরৎকুমারী রায় চৌধুরীর 'শুভ বিবাহ' এই তিনখানি উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু এই রচনাগুলি কালজয়ী হইতে পারে নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় শক্তিমান লেখক হইয়াও কেন ঔপন্যাসিক হিসাবে সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথ তাহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। 'তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, হইলেন ঐতিহাসিক, ছিলেন ভাবুক, হইলেন নীতি প্রচারক। আমরা রসসম্ভোগের সত্যযুগ হইতে তর্কবিতর্কের যুগান্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম'।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা' একখানি সঙ্গীত পুস্তক ও 'আষাঢ়ে' হাস্যরস প্রধান কবিতাগুচ্ছ। 'আর্যগাথার' আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ কাব্য ও সঙ্গীতের সীমারেখা অঙ্কিত করিয়াছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কাব্য ও সঙ্গীতের মিলন যে সম্ভবপর, তাহাও দেখাইয়াছেন। 'আষাঢ়ে' গ্রন্থের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের এবং তাহার ভাষা; ভঙ্গী ও বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন। 'মন্ত্র' কাব্যের

চেষ্টাহীন সৌন্দর্য্য' ও 'স্বাভাবিক সরলতা'র কথা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন—'দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু বাংলা ভাষার একটা নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন'।

'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসের' আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ মুসলমান ও খৃষ্টান জাতি সম্পর্কে যে কথা বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা আমরা 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চর্চ্চা' প্রবন্ধে করিব।

যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'সাকার ও নিরাকার-তত্ত্ব' প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন 'সাকার ও নিরাকার' প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি 'আধুনিক সাহিত্যে' স্থান পাইল কেন, সে সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমরাও বলি, বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া প্রবন্ধটি 'ধর্ম্ম' বা 'পথের সঞ্চয়' বা এই জাতীয় কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইলেই ভাল হইত। যতীন্দ্রবাবু 'সাকার ও নিরাকার-তত্ত্ব' সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা একেবারে অযৌক্তিক নয়, রবীন্দ্রনাথের যাহা বক্তব্য, তাহাও আমাদের প্রণিধান যোগ্য। বিষয়টি দার্শনিক ও ইহাতে বিতর্কের অবকাশ আছে। সুতরাং আমরা 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসাধনা' প্রসঙ্গে ইহার আলোচনা করিব।

ম্যাথু আর্নল্ড্ যেমন ফরাসী মনীষী জুবেয়ারের সহিত ইংরেজি পাঠকদের পরিচয় সাধন করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি তাঁহার সহিত বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় ঘটাইয়াছেন।

জুবেয়ার নানা বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহার এই চিন্তারাশি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু কখনও সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে মুদ্রিত এই লেখাগুলি চিন্তার উদ্দীপক (Thought provoking) তাঁহার কথাগুলি স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত, অনেকটা সূত্রের মত কিন্তু তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট। তাঁহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—তাঁহার চিত্ত ফলের বাগান নহে, ফসলের ক্ষেত্র। সে ফসল নানাবিধ। ধর্ম্ম কর্ম্ম কলারস সাহিত্য কত কী তাহার ঠিক নাই।

জুবেয়ারের অনেকগুলি উক্তি রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'স্টাইল' সম্পর্কে জুবেয়ার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ 'স্টাইল' ও ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের 'রীতির' পার্থক্য দেখাইয়াছেন। 'সাহিত্য-সমালোচনা' সম্পর্কে জুবেয়ারের মত রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'পূর্ব্বে যাহা সুখ দেয় নাই তাহাকে সুখকর করিয়া তোলা এক প্রকার নূতন সৃজন।০ ০ লেখকের মনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়াই সমালোচনার সৌন্দর্য্য।০ ০অকরুণ সমালোচনায় রুচিকে পীড়িত করে। ০০ যেখানে সৌজন্য এবং শান্তি নাই, সেখানে প্রকৃত সাহিত্যই নাই। সমালোচনার মধ্যেও দাক্ষিণ্য থাকা উচিত—না থাকিলে তাহা যথার্থ সাহিত্যশ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে না'।

'আধুনিক সাহিত্যের' শেষ প্রবন্ধ টেনিসনের ডি প্রোফণ্ডিসের আলোচনা। এই কাব্যে টেনিসন দুইটি পৃথক দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহার সন্তানকে দেখিয়াছেন। তাঁহার সন্তানের যেমন একটি মর্ত্ত্য জীবন আছে, তেমনই একটি চিরন্তন সত্তা আছে। এই কবিতাটির মধ্যে এমন একটি রহস্যময়তা আছে, এমন একটি অতীন্দ্রিয় লোকের স্পর্শ আছে যাহা কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই কবিতায় কবি যেন ঋষির দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করিয়াছেন। টেনিসনের এই কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনাকে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

———

আজকের দুনিয়া

বাপমায়েরা স্কুলে পড়বার সময়ে দৈহিক আয়তনে যেমনটি ছিলেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা আজকাল ঠিক সেই বয়সে তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী লম্বা-চওড়া হয়ে পড়ছে, এটা একটা ভাববার কথা বটে। (The school children of today are bigger and heavier than their parents were at the same age)। বিলাতের Education Ministryর রিপোর্টে প্রকাশ, সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে ছেলেমেয়েদের জন্য যে পরিসর স্থানটিতে গড়পড়তা পাঁচজনের স্থান নির্দিষ্ট ছিল, রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকে ঠিক সেই স্থানটিতে ঘেঁষাঘেষি করে ধাঁচ করিয়েও চারজনের বেশী ছেলেমেয়েকে রাখা যায়নি। হয়ত পরবর্তী কোন রাজ্যাভিষেকে সংখ্যা আরো কমে যাবে। হঠাৎ ছেলেমেয়েদের এই শারীরিক growth কেন বেড়ে চলেছে, এটা এখন চিন্তাশীলদের কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিলাতের নানা প্রতিষ্ঠান এখন কর্মপ্রার্থীদের কাছ থেকে নিজের-হাতে লেখা দরখাস্তই চাইছেন। (Personal officers and staff managers of industrial firms are insisting on applications for jobs being in applicant's own hand writing). অবশ্য এতে একটা সমস্যা দাঁড়িয়েছে যে কর্মপ্রার্থীদের কাছ থেকে হাতের লেখা দরখাস্তের জন্য জোরাজোরি করলে সত্যিকারের প্রতিভাশালী কাজের লোক কেবলমাত্র হাতের লেখার অজুহাতে চাকুরীলাভ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। ইংলিশ ডাইজেস্ট

কোরিয়াদেশে লেখাপড়ার চর্চা আজকাল এত বেড়ে গেছে যে সেখানে কোন বই প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই তা' ফুরিয়ে যায়। এখন শরীরের খোরাকের চেয়ে মনের খোরাক পাওয়ার জন্য কোরিয়া দেশের লোক অস্থির হয়ে উঠেছে (People in their daily life need more food for the mind)। নিরক্ষরতা এখন একরকম নাই বললেই হয় (Now the entire nation is absorbed in learning)। অন্য সব কাজের চেয়ে পড়াশুনার চর্চাই সে দেশে খুবই বেড়ে চলেছে (Reading is an essential part of life for the Korean people)। সেখানে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে এই প্রতিজ্ঞা করতে হয়,—"আমি গত বছরের চেয়ে এ বছর পড়াশুনায় বেশী মন দেব" ("I must read and study this year more earnestly than last year")। কোরিয়া

ইতিহাসের বিষয়বস্তুগুলিকে সহজ ও সরলভাবে ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য এক অভিনব পদ্ধতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্লাশের মধ্যে ছেলেমেয়েরাই শিক্ষকের সামনে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে অভিনয় দ্বারা পরিস্ফুট করে তোলে (A history lesson becomes an adventure into mind for these fortunate boys and girls)। স্কুলে যাবার জন্যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে অপূর্ব্ব উৎসাহ দেখা যায়, সেটা শুধু ইতিহাসের এই আকর্ষণের জন্য (No wonder then that "school" to these boys and girls is something to be looked forward to.)।

ফেমিনা

প্রাচ্যদেশ সমূহ থেকে অনেক প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য পাশ্চাত্য দেশবাসীরা চুরি ও লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে, এ অভিযোগ এখন প্রমাণ সহযোগে লোকে জানতে পেরেছে। চীনদেশের মণিমুক্তাখচিত অনেক বহুমূল্য জিনিষ "(Were looted by the U. S. imporialist, Now they are exhibited in the University Museum of the University of Pennsylvania in Philadelphia). চীন দেশ থেকে চুপি চুপি চুরি হয়ে গেছে কত যে মূল্যবান ঐতিহাসিক জিনিষ তার ইয়ত্তা নেই। (stolen by U. S. Imperialist elements), হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয় মিঃ লাংডন ওয়ারনার চীনের পাঁচটি গুহা থেকে ছত্রিশটী দামী পাথর খুলে নিয়ে গেছেন (Langdon Werner stripped and took away 38 blocks of murals from five caves)। চৌ রাজবংশের কল্পনাতীত মূল্যের আসবাবপত্রও বিদেশে চালান হয়ে গেছে।

চাইনা

বহু দূরবর্ত্তী গ্রহ-উপগ্রহাদি খুব কাছে দেখবার জন্যে আজকাল যে সব অতিকায় দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে সেগুলির চেয়েও মহাশক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে, এর নাম দেওয়া হয়েছে Radio Telescope, কোটি কোটি মাইল দূরবর্ত্তী নক্ষত্রগুলিকে কাছে দেখবার (Closest to the stars) সুযোগ পেয়ে বৈজ্ঞানিকেরা আকাশের অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। এই Radio Telescope আবিষ্কারের মূলে রয়েছেন পোল্যাণ্ডের W. Dziewulski (Professor of Astronomy) এবং W. Iwanowska (Professor of Astrophysics).

পোল্যাণ্ড

নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর

বাংলার রঙ্গমঞ্চ

সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য

গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট

এম,বি,সরকার এণ্ড সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন:-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-ডিলিপ্রাইস

ব্রাঞ্চ-বালি গঞ্জ-১৩৮/১/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-১৯ ফোন- ৪৬-৪৫৬৬

স্মোকমের পুরাতন টিকানা ১২৪,১২৪/১,বহুবাজার ষ্ট্রীট,কলিকাতা-১২

কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর - মিটি - ২৫৫৮এ

রঙ্গালয়

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সমস্ত জগৎ রঙ্গালয় ও জগতের লোক তাহার অভিনেতা, এ কথাটি পুরাতন। কিন্তু বালকের মুখে একটি নূতন প্রশ্ন ষ্টেটস্‌ম্যানের বিবিধ স্তম্ভে প্রকাশ হইয়াছিল যে, যদি সকলেই অভিনেতা, তবে দর্শক কে? কথাটি হাসির কথা বলিয়াই প্রকাশিত হয়; কিন্তু ভাবুকহৃদয়ে হাস্যরস-উদ্দীপক কথা নহে। প্রত্যেক অভিনেতার সঙ্গে এক একজন দর্শক আছে ও সেই দর্শক নাট্যরঙ্গ দিন দিন দেখে। পণ্ডিতেরা বলেন, বাহ্য জগত মনোজগতের প্রতিরূপ মাত্র। মনোজগতে সাধু আছে, বিষয়ী আছে, চোরের আছে, লম্পট আছে, মনোজগতে যাহা নাই, বাহ্যজগতেও তাহা নাই। এই মনোজগত রঙ্গালয়ের অভিনয় একজন দর্শক মনোজগতে বসিয়া নিত্য দেখেন, কিন্তু অভিনেতা আপনার অভিনয়েই বিভোর, দর্শকের প্রতি প্রায়ই তাঁহার দৃষ্টি পড়ে না। এই বাহ্যজগত-রঙ্গালয়ে মনোনাট্যক্ষেত্রের ছায়া মাত্র পড়ে এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতে অভিনেতারা অভিনয়কার্যে নিযুক্ত আছেন। এ নাট্যালয়ে নিজ নিজ অংশ ভুলিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ধনলিপ্সা, মানলিপ্সা, ইন্দ্রিয় সুখলিপ্সা অভ্রান্ত ভাষায় তাহার অংশ তাঁহাকে উপস্থিত মতে শিখাইয়া দেয়। পরের জীবননাটকের ঘটনাস্থল আপনি গলিয়া যায়। কথায় বলে, "চোর নিযুক্ত করিয়া চোর ধর।" বাহ্যজগতে চোর ধরিতে গেলে অন্তর্জগতে যে চোর আছে, তাহাকে নিযুক্ত করিতে হয়। অন্তর্জগতের সাধু বাহ্যজগতের সাধুকে চেনেন। অতএব বাহ্যজগতের সমস্ত অভিনয় দর্শন করিতে হইলে মনোজগতের যে বৃত্তি, যে অভিনয় দর্শনে সক্ষম, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া দেখিতে হয়। সচরাচর যে সমস্ত অভিনয় চলিতেছে, তাহার দর্শনোপযোগী বৃত্তি খুঁজিয়া লইবার প্রয়োজন হয়না, স্বার্থ ঘটনাটীর যা পড়লেই যে বৃত্তির প্রয়োজন সজ্জিত হইয়া মনোরঙ্গালয়ে অধিষ্ঠিত হন এবং তাহার অভিনয়ের প্রতিরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়েরা বাহ্যজগতে প্রকাশ করিতে থাকে। পাঠক, দেখুন বাহ্যজগতে একজন অভিনেতা অপর অভিনেতার ধনাপহরণ মানসে আসিয়া প্রলোভন বাক্য রচনা করিতেছে। প্রলোভন বাক্য, লোভের শ্রুতিমধুর হইল,—লোভ চঞ্চল হইয়া উঠিল। পরামর্শ করিতে লাগিল,—কি করি। লোভের সঙ্গে সতর্কতা ছিল,—সে মহাকৌশলী; শুধু যে আপনি সতর্ক, তাহা নয়,—পরকে ভুলাইয়া যে ধন উপার্জ্জন করিতে পারে, সে বৃত্তি এই সতর্কতার পরম বন্ধু। হীরা, হীরা কাটিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। স্বার্থ, কি কথায় কি উত্তর দিতে হয়, উত্তমরূপে শিখাইতেছে। দিব্য নাটক চলিতে লাগিল। আবার সে দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল। অন্য অঙ্কে আবার ঐ সকল নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের অভিনয় হইবে। কিন্তু আপাততঃ দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইয়া মধুপানে উন্মত্ত, সজ্জিত কাম নারীরত্নের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। কাম যেন প্রেমের ভান জানে, স্বার্থ তাহাকে শিখাইয়াছে—এদিকে রতিও বিশুর অর্থলোলুপ; রতিও সুসজ্জিতা—স্বার্থের দ্বারা প্রেমের কথায় যেন শিক্ষিতা। এ দৃশ্যে ফাঁকা একটি প্রেমকাব্যের খানিক অভিনয় হইল। দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনে যশোলিপ্সা আসিয়া উপস্থিত। এ লিপ্সাও যথেষ্ট শিক্ষিত, দয়াভাব প্রকাশ করিতে বেশ জানে, মূর্খতা ঢাকিয়া বিদ্যার বুকনি ঝাড়িতেও শিখিয়াছে, সদ্‌গুণের পরিচ্ছদ চুরি করিয়া ভূষিত রঙ্গালয়ে খানিক যেন রঙ্গ করিতে লাগিল। প্রতিদ্বন্দ্বী যশোলিপ্সার সহিত যেন খানিক সংঘর্ষ হইল। পরে ঘৃণা

আসিয়া দুই নেতাকে রঙ্গালয়ের দুই ধারে লইয়া গেল। এই রূপ অহর্নিশি অভিনয় হইতেছে। নিশ্চিন্ত অবস্থায় স্বপ্ন সহযোগে যে অভিনয় চলিতেছে। অবিরাম স্রোতে রসের অবতারণা হইতেছে। নিরপেক্ষ দর্শক সকলই দেখিতেছে। কিন্তু সে দর্শকের প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়ে না। একবার তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই অভিনয় ফুরায়। মনকে মনোজগতে নিবিষ্ট করিতে পারিলে, বাহ্যজগতের সমস্ত অভিনেতাকেই দেখা যায়। কিন্তু দর্শককে খুঁজিয়া পাওয়া বড় কঠিন। লক্ষের ভিতর দুই একজন, সেই দর্শকের অনুসন্ধান করে এবং এই রূপ লক্ষ "দুই একজনের" ভিতর দুই একজন সেই দর্শকের দর্শন পায়। কেহ বা দর্শন পাইয়া আর খেলিতে চাহে না, তাহার আর খেলার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কেহ বা আর পাঁচজনকে সেই দর্শককে চিনাইবার নিমিত্ত রঙ্গালয়ে পুনঃপ্রবেশ করে। নাটকের অভিনেতা, নাটকের ভাষাই বুঝে। নাটকের ভাষায় এই অভিনেতা অপরকে বুঝাইতে চেষ্টা করে। এই বুঝাইবার চেষ্টাতে এই বৃহৎ রঙ্গালয়ের উপর ক্ষুদ্র একটি রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। এই বুঝাইবার চেষ্টায় নাটক সৃষ্টি হয়। বৃহৎ রঙ্গালয়ের অভিনেতাবর্গ দুইভাগ হইয়া যান। কতকগুলি অভিনয়কার্যে প্রবৃত্ত হন, আর অধিকাংশই দর্শক। আর জীবন-নাট্যের দর্শককে যিনি দর্শন করিয়াছেন—তিনি নাটককার। নাটককার সেক্সপীয়র এই শ্রেণীর লোক,—মলেয়ার এই শ্রেণীর লোক,—কিন্তু ইহাঁদের প্রথা স্বতন্ত্র।

উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মনোক্ষেত্রে অভিনয় চলিতেছে,—মনোক্ষেত্রের অভিনয়ে স্তরে স্তরে ধ্বনিপট আছে,—রসের ঐক্যতানবাদন শব্দ না পাইলে এ ধ্বনি লক্ষিত হয় না, যবনিকা উঠে না। তাঁহারা রসের ঐক্য-তানবাদন বাজাইয়া মনোরঙ্গালয়ের যবনিকা উত্তোলন করেন এবং বাহ্যজগতে যে সকল অভিনয় হইতেছে, মনোজগতের অভিনয়ের সহিত মিলাইবার চেষ্টা পান। মনোজগতে যাহা নাই,—তাহা বাহ্যজগতে দেখাইলে কেহই চিনিতে পারে না। কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বাহ্যজগতে মনোজগতের ছায়া অভিনয় হইতেছে। মনোজগৎ দ্রষ্টার সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি নাটক লিখিয়াছেন। সেই দ্রষ্টারই পরামর্শ লইয়া ক্ষুদ্র রঙ্গালয়ে যেমন—বৃহৎ রঙ্গালয়ে কিরূপ অভিনয় হয়। কোন মনোবৃত্তি সুসজ্জিত হইয়া বাহেন্দ্রিয় দ্বারা মনের দ্বারা অভিনয় প্রকাশ করিতেছে। সেই দ্বারা অভিনয়ে কিরূপ স্বার্থসংঘর্ষ হইতেছে, তিনি দর্শককে মনোবৃত্তি প্রধান করিয়া বাহ্যিক দ্বারা অভিনয় দেখিতে বলেন। তাহাদের নাটকের অভিনয় দেখিতে হইলে মনঃসংযোগ প্রয়োজন। মনঃসংযোগ করিতে গেলে, মনকে কতকটা বাঁধিতে হয়। সে বন্ধনে মনের কষ্ট আছে। কিন্তু সে কষ্ট স্বীকারে, কষ্টের সংস্রাবণ আনন্দ উৎপাদন করে। সংযোগী দ্রষ্টা দেখিতে পায় যে' রিপুর তাড়নায় মানব মরিচীকার বারি পান করিতে ছুটিতেছে। ছুটিয়া তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়িতেছে,—অবশেষে সেই পিপাসা প্রাণবিনাশক হইয়া উঠে। আবার দেখিতে পায়, উচ্চবৃত্তি চালিত হইয়া ধর্ম ধার্মিকতা প্রভৃতি অবলম্বন পূর্বক কষ্টের জীবন পথে পান্থিলাভ করিয়া মানব চলিতেছে। বাহ্যনিষ্ঠির রঙ্গভূমিতে কষ্টের হাত এড়াইবার উপায় নাই। কিন্তু বারি অন্বেষণে মরিচীকায় ধাবিত না হইয়া বুদ্ধি প্রদর্শিত পথে চলিলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। তাঁহাদের দ্বারা বিয়োগান্ত নাটক রচিত হয়।

এই সকল নাটককার কেহ হাসিয়া, কেহ কাঁদিয়া অভিনয় দেখাইতেছেন। কিন্তু হাসুন বা কাঁদুন, বৃহৎ রঙ্গালয়ের একই পরিণাম, বিয়োগান্ত নাটক ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে সকল দর্শক বিয়োগান্ত নামে কম্পিত হইয়া, অভিনয় দর্শনে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাদিগকে নাটককার হাসিয়া হাসিয়া, মনোভিনয় ও তাহার প্রতিচ্ছায়া দ্বারা অভিনয় প্রদর্শন করেন। কিন্তু ইহাতেও সেই স্বার্থ সংঘর্ষ,—ইহাতেও সেই আত্ম-প্রসাদ লাভ, ও বারি উদ্দেশে মরিচীকার অপসরণে নিদারুণ তৃষ্ণা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। উচ্চ ও নীচ

বাংলার রঙ্গমঞ্চ

॥ চিত্রে ॥

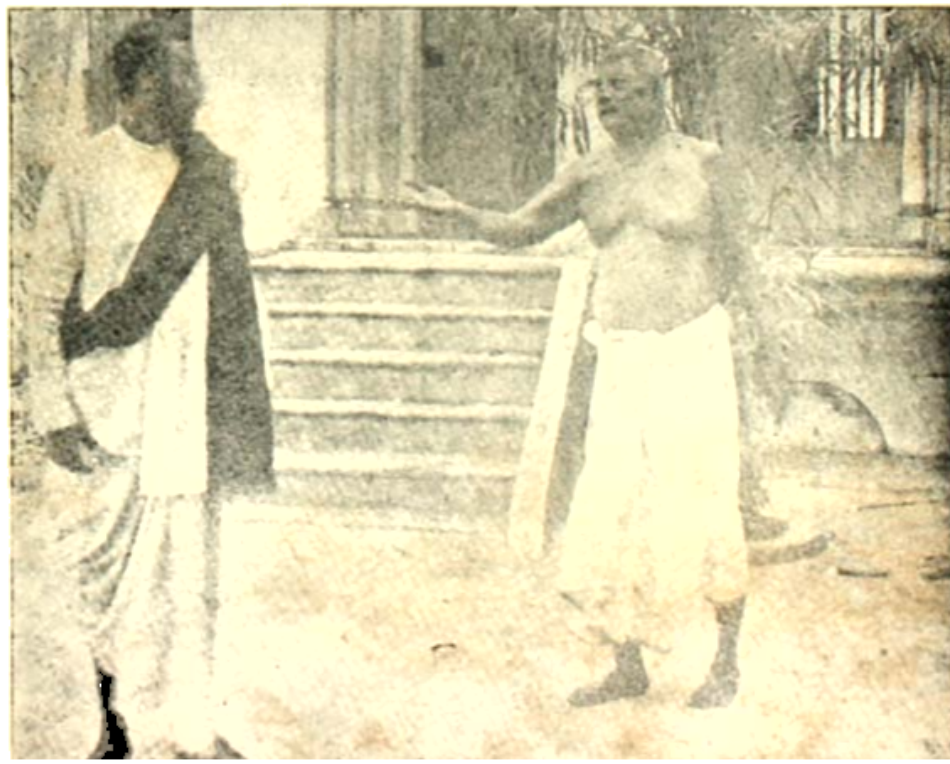

মাইকেল নাটকে মাইকেল—শিশিরকুমার

রিজিয়া নাটকে
বক্তিয়ারের ভূমিকায়
—শিশিরকুমার

'ডাকঘর' অভিনয়ের শেষ দৃশ্যে ঠাকুর্দার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ১৯১৭

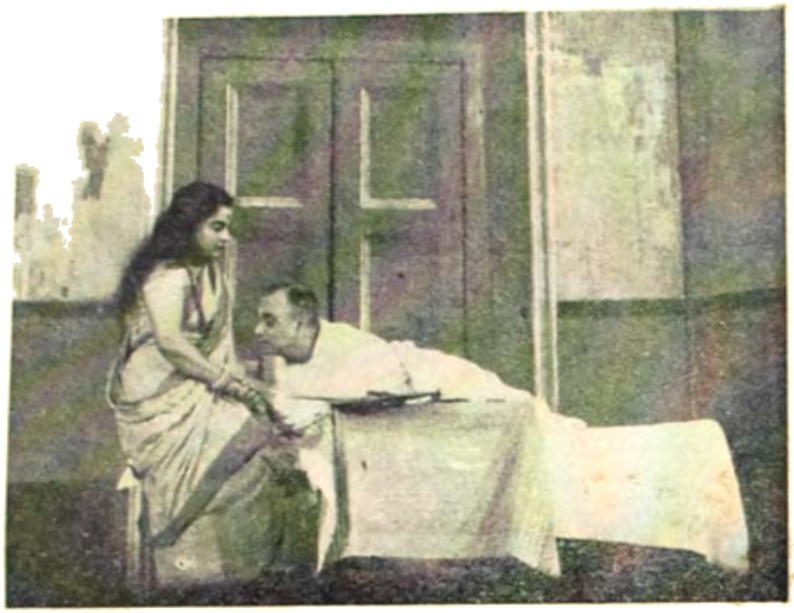

বৃত্তির স্বরূপ ছবি, উভয় নাটকেই প্রকাশিত হয়। মনঃসংযোগী দর্শক সেই সকল ছবি দেখিয়া মনোদৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও প্রসারিত করেন। মনরঙ্গালয়ের অভিনয় দর্শনে সক্ষম হন এবং সেই অভিনয়ে নিরপেক্ষ দ্রষ্টার উপর কাহারও কাহারও লক্ষ্য পড়ে এবং সেই নিরপেক্ষ দ্রষ্টার দৃষ্টান্তে নিরপেক্ষ হইয়া সংসার অভিনয় দর্শন করিতে পারেন। যে সকল মহাত্মা মনোদৃষ্টি প্রদর্শনে এরূপ সমর্থ,—তাঁহারা মানব-পূজ্য। তাঁহাদের দ্বারা মিলনান্ত (comedy) নাটক প্রকাশ পায়।

যাঁহার নিজের মনোক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, তিনিও বুঝিতে পারেন যে, মন কত রকমে সং সাজে। কেবল পরের নিকট হাস্যাস্পদ হইবার জন্য একটি আবরণ ঢাকা আছে। এক শ্রেণীর নাটককার আবরণখানি তুলিয়া দেখান যে, মন কিরূপ সং সাজিয়া থাকে—সং দেখিয়া আসি। কিন্তু যিনি হাসিতে হাসিতে বুঝিতে পারেন যে, তাহারও মন সং সাজিয়া নাচিতেছে, এ অভিনয় দেখা তাহার সার্থক। এই অভিনয় যিনি চিত্র করেন, তাঁহাদিগের নাটক লেখাও সার্থক। আমরা যাহাকে নক্সা (Burlesque) বলি, ইনি সেই নক্সা অঙ্কিত করেন।

আর এক জাতীয় নাটককার, মানসিক অভিনয়ের আর এক দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করেন। এ স্থলে মন সং সাজিয়াও সং সাজিয়াছে বুঝিতে পারে না। ক্রোধকে ন্যায় বলিয়া আদর করে, কামকে প্রেম জ্ঞানে, লোভকে ধর্মকর্মান্বিত বিবেচনা করে, মোহকে ধর্ম বলিয়া আদর করে। মদের নাম আত্ম-সম্মান, ও মাৎসর্য্যের নাম কুকার্য্যান্বেষী জ্ঞান করিয়া সম্মানের সহিত স্থান দেন, এই শ্রেণীর নাটককার মানব-প্রতারিত বুদ্ধির দণ্ডকর্ত্তা। ব্যঙ্গচ্ছলে ঐ প্রতারিত বুদ্ধির প্রতি তীব্র তীর আঘাত করে। তাহাদের রঙ্গ রচনায় দর্শক কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতির কতক পরিমাণে স্বরূপমূর্ত্তি দর্শন পায় এবং হাসিতে হাসিতে বুঝিতে পারে তাহারাও কিরূপ প্রতারিত হইতেছে। এরূপ দর্শকের দর্শন সার্থক ও নাটককারের কল্পনাও সার্থক। এই নাটককারের নাম প্রহসন (farce) রচয়িতা।

অপর জাতীয় নাটককার আর একটি হৃদয়পট উত্তোলন করে। সর্পের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া খেলায়। বাহ্যেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন নিমিত্ত মনোক্ষেত্রের দাবানলের আলোকে, যে স্বার্থ সংঘর্ষণ জনিত অভিনয় হইতেছে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর বস্তু অনুসন্ধানে যে ঘোরতর মনোদ্বন্দ্ব চলিতেছে, সেই স্তরে বাহ্যেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর অথচ নির্দ্দোষ কতকগুলি সুন্দর ছবি প্রদর্শন করে। মনোরাজ্যের নন্দনকাননে কতকগুলি অপ্সরী নৃত্য করিতেছে, ইন্দ্রিয় তাড়নায় সেই নন্দনকাননের অভিনয় প্রায়ই দৃষ্টিপথে পতিত হয়না। এই শ্রেণীর নাটককার সেই অপূর্ব্ব কাননের ছায়া অভিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই সুন্দর কাননের প্রতি মনোদৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং রসময়ী সুন্দরী লহরীতে ভাসাইয়া পরম সুন্দরের রূপের ছটার দূর আভা সম্মুখে আনিয়া ধরে। যে দর্শক পরম সুন্দর ছটার দূর আভাস পান, তাঁর সেই অভিনয় দেখা সার্থক এবং যিনি দেখাইতে পারেন—তাঁহারও কল্পনা সার্থক। এই শ্রেণীর নাটককার ক্ষণকাল অভিনয় ছাড়াইয়া কথায় সঙ্গীত স্রোত ও কবিতা-স্রোত মিলিত হইয়া মহা সৌন্দর্য-স্রোতে ধাবমান, সেই সৌন্দর্যে প্রতিফলিত ছবি আনিবার চেষ্টা পান। ইঁহার চরম অভিনয় কেহ কখনও দেখেন নাই। বোধ হয় এই অভিনয় বলে বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে গঙ্গাদেবী প্রবাহিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু উৎকৃষ্ট বস্তু মন্দ হইলে যতদূর মন্দ হয়। সাধারণ বস্তু সেরূপ হয় না।

এইরূপ হীন কল্পনা-প্রসূত বিয়োগান্ত নাটকে কতকগুলি অস্বাভাবিক পাপের ছবি প্রদর্শিত হয়, শেষে কতকগুলি খুনাখুনি—সেই নিমিত্তই তাহার বিয়োগান্ত নাম। হীন কল্পনা-প্রসূত মিলনান্ত নাটক তাহা অপেক্ষাও ঘৃণিত হইয়া উঠে। পাপের ছবি তাহাতে আরও উজ্জ্বলরূপে প্রদর্শিত হয়। পাপের প্রতি ঘৃণা না হইয়া পাপ আরও আদরের হইয়া উঠে। হীনকল্পনা প্রসূত Burlesque ও farce বাক্তি বিশেষের কুৎসামাত্রও কুৎসিত প্রসঙ্গ, কুৎসিত কথা, রসিকতা নামে সাধারণকে উপহার দেওয়া হয়। উন্নতরুচি রঙ্গালয়ে এসকল নাটককারের স্থান নাই। রঙ্গালয় শুদ্ধির শুভ প্রকাশের স্থান,—রঙ্গালয় হীন অনুকারী, কুরুচি সম্পন্ন, নির্গুণের স্থান নয়। রসিকবৃন্দের আদরের স্থান রঙ্গালয়।

আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক পাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। এত অধিক ছিল যে বিদ্যাভ্যাসকালে বাইরণের Manfred ও Childe Harold-এর দুই Canto এবং মেঘদূত ও উত্তর চরিতের কাব্যাংশ আমি মুখস্থ করিয়া ছিলাম। বিলাতে গিয়া ক্রমাগত Shelly পড়িতাম এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্রমাগত Wardsworth ও Shakespeare বার বার পড়িতাম; ও শেষোক্ত কবির নাটকের যে যে অংশ কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ বোধ হইত, মুখস্থ করিতাম।

বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে আমি 'হেমলতা' নাটক ও 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক সৌখীন অভিনেতৃ দল কর্ত্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'প্রহসন' নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addison-এর Cato এবং Shakespeare-এর Julius Cæsar-এর আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চসমূহে অভিনয় দেখি। এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয়।

১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি গান রচনা করিতাম। ১২ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত রচিত আমার গীত গুলি ক্রমে 'আর্য্যগাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোন কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল 'দেবঘরে সন্ধ্যা' নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা নব্য-ভারতে প্রকাশিত হয়। বিলাতে গিয়া ইংরাজিতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া Sir Edwin Arnoldকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাই এবং তৎসঙ্গে কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লিখেন ও সে কবিতাগুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি সাগ্রহে দান ক'রেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে Lyrics of Ind আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গালা ভাষার হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে Ingoldsby Legendsএর অনুকরণে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়া, "আষাঢ়ে" নামে প্রকাশ করি। সেই সময়ে আমি ইংরাজি গান খুব গাইতাম। ইংরাজি গান প্রায় বাঙ্গালী শ্রোতারই ভাল লাগিত না। তখন ইংরাজি গান গাওয়া ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গালায় গান রচনা করিয়া গাহিতে আরম্ভ করি। বিবাহান্তে অনেকগুলি প্রেমের গান রচনা করিয়া আর্য্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ নাম দিয়া ছাপাই এবং কতকগুলি হাসির গানও রচনা করি। এই হাসির গানগুলি অবিলম্বে অনেকের প্রিয় হয় এবং আমি কার্য্যোপলক্ষে কোন নগরে যাইলেই ঐ সকল গান আমায় স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হইত। সেগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে বহুদিন পরে প্রকাশিত হয়। আমি এই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি; কারণ উপরি লিখিত প্রত্যেক ব্যাপারই আমার নাটক লিখিবার প্রবৃত্তির সহায়তা করিয়াছিল।

প্রথমতঃ প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে 'কল্কি অবতার' একখানি প্রহসন গদ্যে ও পদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পূর্ব্ব রচিত কতকগুলি হাসির গান একত্রে গাঁথিয়া "বিরহ" নাটক রচনা করি। এবং ক্রমে সে নাটক ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। তৎপরে উক্তরূপ "ত্র্যহস্পর্শ"

রচনা করি এবং উহাও ষ্টারে অভিনীত হয়। পরে "প্রায়শ্চিত্ত" রচনা করি এবং সেখানি ষ্টারে অভিনীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার গম্ভীর রচনাও চলিতেছিল। সংগ্রহীত "সীতা" নাট্য-কাব্য নব-প্রভায় প্রকাশিত হয়। পরে "পাষাণী" নাটক প্রকাশ করি। তৎপরে আমি "তারাবাঈ" নাটক প্রকাশ করি। যে কারণে আমি প্রহসন লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার অনুরূপ কারণে আমি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় নাট্য-সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও আখ্যান বস্তু গঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম, কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাব বোধ হইত। আমার কাব্যশক্তি (যাহা কিছু ছিল) আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমে Shakespeare-এর অনুকরণে Blankverseএ নাটক লিখিতে আরম্ভ করি। "তারাবাঈ" প্রকাশিত হইবার পরে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে এক কপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর—মাইকেলের ছন্দোমাধুরী ইহাতে নাই—এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের নৈরাশ্যী মনে হইল—যে অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন চলিতে পারে না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু দ্রুত কথোপকথনে কথা ও গদ্যের মত হইতে হইবে। Shakespeareএর অমিত্রাক্ষর Miltonএর অমিত্রাক্ষর হইতে পৃথক। Of man's disobedience ইত্যাদির একটা ঝঙ্কার আছে। কিন্তু To be or not to be that is the question—

ইহা ত গদ্য বলিলেই হয়। তবে কবিতা বলিয়া ইহা চালান কেন? গদ্যে লিখিলে কি ক্ষতি হইত। কিন্তু তৎপরেই Who would bear the whips and scorns of time কিম্বা For in that sleep of death what dreams may come ইহা মন্ত্রের মত কবিতা! দেখিলাম যে Shakespeare এ খানিক গদ্য খানিক পদ্য তথাপি দুইটি খাপ খাইতেছে। কারণ ইংরাজি ভাষায় সেরূপ অবস্থা আসিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলাতে "তুমি যদি আস সখি, আমি দেখা যাবো।" ইহার পরে "নবীন নীরদ শ্যাম নিকুঞ্জবিহারী" এরূপ রচনা অসহ্য বিসদৃশ বোধ হইবে। কিন্তু গদ্যে একত্রে উভয়ই চলে। গদ্যের এখন সে অবস্থা আসিয়াছে।

Carlyle-এর মতে সামান্য হইতে গম্ভীরতম এমন কোন ভাব নাই যাহা পদ্য অপেক্ষা গদ্যে সুন্দরতর রূপ প্রকাশ করা না যায়। পদ্যের ঝঙ্কার গদ্যে দেওয়া যায় কিন্তু গদ্যের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাগতি পদ্যে নাই। বঙ্কিমবাবুর গদ্য অনেক স্থলে ত পদ্য। Schiller, Lessing, Ibrée Moliere ইত্যাদি মহানাট্যকার-গণের বহু মহা-নাটক গদ্যে লেখা আছে, তাহাতে ত তাঁহাদের মহিমা কমে নাই। Schiller-এর গদ্যের ভাষা ও রূপক অনুপ্রাসে পদ্যের চৌদ্দপুরুষ। তদ্ব্যতীত নাটক অভিনয় করিবার জিনিষ। অভিনয় ঘটনাগুলি যত প্রত্যক্ষবৎ হয় ততই ভাল। সেই জন্য উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক হয় তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অবশ্য ততই শ্রেয়। লোকে কথাবার্ত্তা পদ্যে করেনা গদ্যে করে। অতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্তিগুলি অস্বাভাবিক ঠেকিবেই।

এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি তখন হইতে নাটকগুলি গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম। সেইজন্য আমি আমার তারাবাইয়ের পরবর্ত্তী নাটকগুলি (রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস, মুরজাহান, মেবারপতন ও সাজাহান) যথাক্রমে গদ্যেই রচনা করি। কিন্তু কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। অথচ যেখানে সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা প্রচলিত শব্দ বেশী জোরের সহিত ভাব প্রকাশ করে বলিয়া বোধ হইয়াছে সেখানে প্রচলিত শব্দই ব্যবহার করিয়াছি।

যখন উক্ত গদ্য নাটকগুলি রচনা করিতেছিলাম তখন একখানি অপেরা (সোরাব রুস্তম) পদ্যে গদ্যে রচনা করি। কারণ 'অপেরা'র কথাবার্ত্তা স্বাভাবিক হওয়ার চেয়ে শ্রুতিমধুর করাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিলাম। সে অপেরাখানি অনেক স্থলে Shelleyর অনুকরণে প্রণয়ন করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহা কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তির ফল। মাঝে মাঝে কবিতায় দুই একখানা নাটক লিখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

'মহাকবি'!—গিরিশচন্দ্রের এই আখ্যাটি ভারত গৌরব শ্রেষ্ঠ কবি ও অনন্যসাধারণ সমালোচক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনই প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিতেন "মহাকবি বলি কাহাকে? যাঁহার রচনায়, যাহার কবিতায়, যাঁহার সঙ্গীতে জাতীয়তা আছে, ধর্ম আছে, মুক্তির সন্ধান আছে তাঁহাকেই বলি মহাকবি। গিরিশ খাঁটি দেশী কবি, তিনি দেশীভাবে খাঁটি বাঙ্গালীর মত দেশমাতৃকার সেবা করিয়াছেন। দেশের প্রাণের কথা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—এই জন্যই তিনি মহাকবি দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। এমন দিন আসিবে, নিশ্চয়ই আসিবে, যেদিন সমস্ত জগৎ ভারতের দ্বারে আসিয়া নতমাথা হইয়া ভারতের ধর্ম সাহিত্য কাব্য নাটক আলোচনা করিবেন—তখন গিরিশচন্দ্র স্বরূপমূর্তিতে তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, গিরিশচন্দ্র কত বড় মহাকবি।"

বস্তুতঃ দেশবন্ধুই গিরিশচন্দ্রকে খাঁটিভাবে বুঝিয়াছেন। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ভারতের কৃষ্টি, সাহিত্য, আনন্দ পরিবেশ ও জাতীয়তার এমন বান্ধব গিরিশের ন্যায় কোন কবি বা সাহিত্যিকই নহেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত রচনায় গিরিশই প্রথম বলিয়াছিলেন "শঙ্কর মাতৃবন্ধন উন্মোচন করিয়াছিলেন, শিবাজী মাতৃবন্ধন উন্মোচন করিয়াছিলেন, মাতৃ উপাসক রাণা প্রতাপের সিংহনাদে ভারত সম্রাট আকবরও কম্পিত হইতেন। তবে কি নিখিল আপনাকে হীন বিবেচনা করিব? সিদ্ধমন্ত্র রহিয়াছে তার গ্রহণ করিবার কি কেহই নাই?"

'চন্দ্র' উপন্যাসে সোমনাথ একজন মাতৃ উপাসক, বাঙ্গালার বন্ধু সিরাজদ্দৌলা ষড়যন্ত্রকারী ভারত শত্রুদের সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "নিশ্চয় জানবেন ফিরিঙ্গি বাঙ্গলার দুষমণ"—

"সিংহাসনে হয় যদি সৌকত স্থাপিত—
বাঙ্গলার ক্ষতি নাহি তাহে
হয় যদি বিদ্রোহ সফল
বাঙ্গলায় বঙ্গবাসী হইতে নবাব
কিন্তু সাবধান!
ফিরিঙ্গিরে নাহি দিও সূচ্যগ্র স্থান।

বিরুকালিম স্বদেশী মন্ত্রের জলন্ত প্রমাণ। 'ছত্রপতি শিবাজী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম প্রতীক। বস্তুতঃ এমন দিন গিয়াছে ১৯০৪ সনের স্বদেশীর দিনে একরাত্রি সিরাজদ্দৌলার অভিনয়ে যে শিক্ষা দিত, একশতটা রাজনৈতিক সভায় এমন কি বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ও তেজস্বী বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতায়ও তাহা হইত না।

কিন্তু রাজনৈতিক শিক্ষায়ই কেবল জাতীয়তা শিক্ষা হয় না। যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সম্মান শিবাজীর পক্ষ মুসলমান পরিবারের মহিলাদিগের প্রতি "ছত্রপতি শিবাজী" নাটকে দেখানো হইয়াছে, আজ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে সেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান শতাংশের একাংশও দেখিতে পাই না।

দ্বিতীয় প্রধান শিক্ষা গিরিশচন্দ্রের নাটকে আমরা পাই—রিলিজিয়াস ইউনিটি—ধর্মে ঐক্য। ধর্মে

নিরপেক্ষতা দেখাইয়া হিন্দু মুসলমানকে এক করিতে সক্ষম হয় নাই। এমন কি হিন্দু হিন্দুকেও এক করিতে পারে নাই। মায়াবসান নাটকে গিরিশচন্দ্র স্পষ্টই বলিয়াছেন "আপনারা কি মনে করেন, হিন্দু মুসলমানের রাজনৈতিক ঐক্য সম্ভব? বস্তুতঃ এই দীর্ঘ ৭৪ বৎসরে তাহাতো সম্ভব হয়ই নাই, বরং ভারতের পক্ষে ঘোরতর অমঙ্গল হইয়াছে। স্বাধীনতা পাইয়াও পঞ্চনদ হিন্দু মুসলমানের শোণিতে এমন কলঙ্কিত হইয়াছে যে ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গৌরব একেবারে মসীলিপ্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে দেশপ্রেমিকের চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত হইয়াছে। সর্বত্র ক্রন্দন ও হাহাকারের রোল, অন্নাভাব, আশ্রয়াভাবে লোক সব লক্ষ্মীছাড়া। তাই গিরিশচন্দ্র বলিতেছেন—সকলেই ভগবানের সন্তান। এরূপ হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা হইলেই অর্থনৈতিক বল। সমাজ বিষয়ে বল, রাজনীতিতে বল সর্বত্রই হইবে ন্যায়পরায়ণতা (Justice) Equality সমান ভাব, ভ্রাতৃবন্ধন বা জাতির ঐক্য (Fraternity)—তাই গিরিশচন্দ্র বলিতেছেন হৃদয়ে অনুভব কর ভারতবাসী তোমার ভাই, কেননা হিন্দু বল, মুসলমান বল, খৃষ্টান বল, জৈন বল সকলেই ভগবানের সন্তান। এই equality বা সমান ভাব ধারণাই ভারতের ঐক্য সম্ভব অন্য কিছুতে নয়। সকলকে তাই তিনি ধারণা করিতে বলিতেছেন—

"যথা জল একোয়া ওয়াটার পানি
বোতায় সলিলে, সেই মত আল্লা খোদ্
ঈশ্বর জিহোবা যিও যেই জন
যেই নামে ডাকে সনাতনে। সেই জন
সেই নাম উচ্চারণে। বহু নাম
প্রতি নাম সর্বশক্তি মান
যার যেই নামে ভক্তি প্রীতির উদয়
যেই নামে। প্রফুল্ল হৃদয়
যেই নামে পূর্ণ মনস্কাম, সেই
জন, সেই নাম উচ্চারণে

ধর্মে ঐক্যে থাকিলে আসামে হিন্দুর প্রতি হিন্দুই কি কোনরূপ নৃশংতা দেখাইত বা বর্বর আচরণ করিতে পারিত? গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা সর্বত্র প্রচার হইলে আর সেই ভাবে সকলে কাজ করিতে দৃঢ় মনোরথ হইলে হিন্দুতে হিন্দুতে, হিন্দু মুসলমানে। বৌদ্ধ খৃষ্টানের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য আসিবে, বিদেশে Co-Existence কো একজিসটেন্স বলিয়া সংঘে চক্ষা পিটাইলেও তাহা সম্ভব হইবে না। তাই বলি, যদি Anti-Social (সমাজ বিরোধী) কাজ হইতে দেশবাসীকে বিরত করিতে চাও, বলিদানের কিশোর চরিত্র ও বান্ধব সমিতির সভ্যগণের আচরণ অনুসরণ কর। যদি শ্রীলোকদিগকে স্বাবলম্বী করিতে দৃঢ় মনোরথ হও, শান্তি কি সাবিত্রী পাগল ও হরমণির চরিত্র প্রকৃতভাবে বোঝ, যদি ধর্মের তত্ত্ব বুঝিতে আগ্রহ হয়, বিল্বমঙ্গল, রূপসনাতন, নদীরাম, কালাপাহাড়, অশোক, শঙ্করাচার্য হরপোবনের অমৃতধারা পান করিতে প্রয়াসী হও। আর যদি সাধারণ লোককে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিতে চাও, যদি 'মানুষ আমার দেবতা' এই ভাব দৃঢ় করিতে চাও, তবে ভ্রান্তির সদালয় ও সদাচরিত্র, গৃহলক্ষ্মীর মন্দির। নিরকাশিমের তারা চরিত্রের মূল বুঝিতে চেষ্টা কর, দেখিবে ভারতবাসীকে ভাই বলিতে দ্বিধা হইবে না। অনাচার উৎপীড়ন উন্মত্ত পাশবিক আচরণ অন্তর্হিত হইবে। আর যদি অহঙ্কার বর্জন করিতে দৃঢ় পণ হইয়া সর্বদা ভগবদ গীতার

উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে চাও তবে রাজা অশোকের ন্যায় সর্বস্ব দেবতাকে উৎসর্গ কর। শিবাজীর ন্যায় রামদাস স্বামীর শিষ্য হইয়া কার্যে রত হও। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ কর দেখিবে—

"শক্তি কার? মূলাধার ভগবান শক্তির
আকর। ভাবে মুগ্ধ নর শক্তিধর আপনারে
জলধরে বর্ষে বারিধারা। চলে প্রণালী
বাহিয়ে জল, জল নহে প্রণালীর। যেনো স্থির
শক্তি সেই মত, অহঙ্কার কর দূর—"

এই সব মহামূল্য শিক্ষা পাইলে বুঝিতে পারি। তাঁহার গুরুদেবতায় গিরিশচন্দ্রের কি অসীম ভক্তি ছিল। আর সেই যুগ-অবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁহার পাঁচসিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস জানিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গিরিশের বকলমা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা কেবল কথায় হইবে না। কাজে দেখানো চাই। কাজ আর কিছুই নয়, এমন থিয়েটারের সৃষ্টি করিতে হইবে যেখানে গিরিশচন্দ্রের নাটক অভিনীত হয়—অভিনেতারা গিরিশের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অভিনয় করেন। কিন্তু আজ নূতনের দিনে কে শিখাইবে? কেন তুমি আমি শিখাইব। আজ নূতন পুরাতন কিছু নাই। গিরিশচন্দ্রের স্বাভাবিক অভিনয় ও কণ্ঠসাঙ্গীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই নূতনের দিনেও পুরাতন ধানিবাবু যোগেশ, উপেন, দুর্গাসুন্দর, শ্যামাকান্ত প্রভৃতি দেখাইয়া তুড়ি দিয়া নূতনকে একশত হাত পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। এবারও অনেক গিরিশভক্তের অভিনয়, অভিনয় মনে হয়না সাংসারিক গৃহস্থালীই মনে হয়। এখনও পুরাতন কর্তৃক যোগেশ, উপেন, কঙ্কাবতী, চাণক্য ও দুকড়ি সেনের অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চ প্রশংসায় মুখরিত হয়। তাই বলি গিরিশের স্বাভাবিক ধারাই প্রকৃষ্টতম ধারা বলিয়া সকলের সম্মান করা উচিত। নূতন পুরাতন সব তর্ক বিদূরিত করিতে হইবে।

সকল দিক হইতে ধারণা হওয়া উচিত রঙ্গমঞ্চই শিক্ষা মন্দির, কেবল আমোদ বা শিক্ষানিকেতন নয়। কিন্তু কিরূপে এই শিক্ষানিকেতন রঙ্গমঞ্চ সৃষ্ট হইল? সেই ইতিহাসও বড়ই বিস্ময়কর। তাই এইখানে সেই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করিব।

কলিকাতায় যখন ধনী গৃহস্থদের বাড়ীতে যদু মল্লিকদের সখের অভিনয় হয়, ধনী লোকই সেখানে স্থান পাইত, সাধারণ লোক নয়। যদি বা কেহ যাইতে পারিত। লাঞ্ছনার একশেষ হইত। সাধারণের এই লাঞ্ছনা দূর করিবার জন্যই গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী অভিনয় করিয়া সর্বজন প্রশংসিত শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলিয়া পরিচিত হইলেন। ইহার পরেই ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা লীলাবতীর অভিনয়, নীলদর্পণের ব্যবস্থা—কিন্তু থিয়েটারে টাকা লইবার প্রস্তাবে অমত হওয়ায় শিষ্য বর্জন ও দল পরিত্যাগ। পরে, অনেক পরেই আবার গুরুপদে বৃত হন। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী নাটকগুলিও করেন। সেখানেও যদু, পলাশীর যুদ্ধে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া, এবং থিয়েটার যায় যায় হইলে চাকুরী ছাড়িয়া নিজে সব ভার গ্রহণ করেন। তারপরই হীর, মিনার্ভা, কোহিনূর প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। অভিনয়ে গ্যারীকের অপেক্ষা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান, অসংখ্য নাটক রচনা করেন এবং রামকৃষ্ণদেবের উপদেশে থিয়েটারকে ধর্মমন্দিরে পরিণত করেন। গিরিশচন্দ্র স্বর্গে, আর কি তাহার নাটক সর্বত্র অভিনীত হইয়া অগাধ লোকশিক্ষা প্রচারিত হইবে না? জয়তু রামকৃষ্ণ ও ভক্ত ভৈরব।

———

বিংশ শতকের বঙ্গ রঙ্গালয়

শচীন সেনগুপ্ত

উনবিংশ শতকের সঙ্গে বিংশ শতকের বাংলার বিস্তর প্রভেদ, যেমন প্রভেদ উনবিংশ শতকের বাংলার সঙ্গে তার আগেকার বাংলার। কিন্তু এক-একটি শতাব্দী পাঁজিতে এবং ইতিহাসে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও একটা জাতির রূপান্তরে তা হয় না। এক শতাব্দীর অঙ্কুর অন্য শতাব্দীতে বৃক্ষে পরিণত হয় এবং ফুলে ফলে আর পুনরায় বীজে পরিণত হয়ে আরও এক শতাব্দীর আবর্তন হয়। মাঝে-মাঝে ফল ফুল ঝরে পড়ে, গাছ শুকিয়ে যায়, ফলনের চারা লাগিয়ে আবার উদ্যান সাজাতে হয়।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি (১৭৫৭) বাংলা পরবশ হয়, ষোড়শ শতকেও আর একবার পরবশ হয়েছিল তুর্কি আক্রমণের ফলে। উপদ্রব হিসেবে দুই পরবশতা এক হলেও ফলের দিক দিয়ে এক হয়নি। প্রথমবারের পরবশতার পরও বাঙালী সাত-সাগরে সপ্ত-ডিঙা মধুকর সাজিয়ে বাণিজ্য করেছে, শিল্পে ও স্থাপত্যে নানা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে, ললিতকান্ত পদাবলী কণ্ঠে নিয়ে দৈনন্দিন কাজ করেছে, বাউল হয়ে সীমা আর ভূমার সন্ধান করেছে, ভাটিয়ালির তান ধরে তরী-গাঙে পাড়ি জমিয়েছে, ঘরাইভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, আর গোয়ালভরা গোধন পেয়ে বারোয়ারী তলায় কীর্তনানন্দে প্রমত্ত হয়েছে। কিন্তু পলাশীর পরাজয়ের পরে ও সবই যেন স্বপ্ন হয়ে গেছে। তবুও মানবনা পলাশীর পরাজয় বাঙালীকে সকল রকমে কাঙাল করে রেখে গেছে।

পলাশীর পরাজয়ের মাত্র পনেরো বছর পরে (১৭৭২ খৃষ্টাব্দে) পল্লী-বাংলায় জন্মগ্রহণ করে উত্তর-কালে যিনি সমগ্র ভারতের এবং তখনকার ভারতাধিকারী ইংলণ্ডেরও পরম বিস্ময়কর হয়ে উঠেছিলেন, সেই রামমোহন রায় ভুঁই-চাঁপার মতো হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠেন নি, বাংলার সংস্কৃতি থেকেই ফুটে উঠেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"তিনি যে বাঁধ বাঁধিয়া দিলেন বৃহৎ বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল।"

এই ঐতিহ্য বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন শ্রীরামপুরের পাদরীরা, ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতরা, ভারত-হিতৈষী ডেভিড হেয়ার, আর পর্তুগীজ-ভারতীয় সঙ্কর-সন্তান হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজারিও। ওঁদের প্রতি অনুরাগী আর বিরাগীদের জীবনাদর্শের সংঘাতের ও সমন্বয়ের ফলেই হলো বাংলার নবজন্ম—রেনেসাঁ। তার সুফল (ক) দেশাত্মবোধ (খ) ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ (গ) নিজস্ব ভাষার ও সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি (ঘ) বিদেশীদের প্রতি শ্রদ্ধা (ঙ) সামাজিক চেতনা। আর কুফল (ক) অনুকরণপ্রিয়তা (খ) বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অতি নির্ভরতা (গ) শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের ব্যবধান বৃদ্ধি (ঘ) ঐতিহ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা।

উনবিংশ শতকের যে বাংলা নাটকগুলি স্মরণীয় বলে আগেকার সংখ্যায় আমি উল্লেখ করেছি সেগুলির বিষয়বস্তু মনে রাখলে বোঝা যাবে রেনেসাঁকে নাটকই প্রতিফলিত করেছে সাহিত্যের অন্যান্য কর্মগুলির আগে, গল্প উপন্যাসে রূপ পাবার পূর্বে, এমন কি সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবারও পূর্বে। সন্দেহ যার হবে, তিনি আগেকার সংখ্যায় আমার দেওয়া নাটকের তালিকার উপর আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে বুঝতে পারবেন আমি বাজে কথা মোটেই বলিনি।

উনবিংশ শতকের বাংলার সঙ্গে বিংশ শতকের বাংলার তুলনা করে অনেকে বিংশ শতকের বাংলাকে নিম্নস্তর প্রতিপন্ন করতে চান। আমার মনে হয় তা করতে গিয়ে তাঁরা ভুল করেন। উনবিংশ শতক ভাব-প্লাবনের যুগ,—পরস্পর-বিরোধী ভাবের অকল্যাণকর-কল্যাণকর, উভয়বিধ ভাবের। বিংশ শতক কর্ম্মের যুগ, প্লাবনকে সংহত করে বিশিষ্ট বিশিষ্ট খাতে বহিয়ে বেগবতী ধারা সৃষ্টি করবার যুগ, যে জন-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল রেনেসাঁর দিনে, তার সন্ধি-সাধনের যুগ। আমার একথা যে মিথ্যে নয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। ক্ষুদ্র প্রয়াসে, ক্ষুদ্রের প্রয়াসে, স্বল্পের আয়াসে, এই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা পায়নি। কেবল বিপ্লবের, কেবল ভাববিলাসীদের কেবল আইডিয়া-টাওয়ারের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছার ফলে এই স্বাধীনতা আসেনি,—শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে জাতির এক বৃহৎাংশ অধিবাসীর বহু-ধন নিবেদিত প্রয়াসের ফলেই তা এসেছে। পরবশ জাতির কাছে স্বাধীনতার চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। এই স্বাধীনতা হারাবার বেদনা আর এই স্বাধীনতা ফিরে পাবার জোড়নার দায়িত্ব সর্ব্বপ্রথমে নাটকই গ্রহণ করেছিল, বঙ্কিমের এবং হেম-নবীনের আবির্ভাবেরও আগে। সে-কথা আগেই বলেছি।

বঙ্কিম প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রথম গ্রাজুয়েটদের তিনি অন্যতম। ডিরোজেরিওর মৃত্যুর সাতাশ বছর পরে (১৮৫৮) তিনি গ্রাজুয়েট হন। সে-সময়ে ডিরোজিয়ান-দের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হ্রাস পেয়েছে, রূপান্তরও ঘটেছে। বঙ্কিম আর কেশবচন্দ্র একই বৎসরে (১৮৮৪) লোকান্তরিত করেন, রামমোহনের মৃত্যুর পাঁচবছর পরে। তাঁরা ঠাকুর রামকৃষ্ণের দুবছরের, আর বিদ্যাসাগরের আঠারো বছরের কনিষ্ঠ। বঙ্কিমের মৃত্যু হয় বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর তিন বছর, ঠাকুর রামকৃষ্ণের মৃত্যুর আট বছর, কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর দশ বছর পরে, আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর আঠারো বছর আগে। মাইকেল দীনবন্ধুর যখন মৃত্যু হয়, (১৮৭৩) বঙ্কিমের বয়েস তখন পঁয়ত্রিশ বৎসর। ওর এক বছর আগে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়।

মনে হয় বঙ্কিম রামমোহনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে চেয়েছিলেন, যদিও তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন ধর্ম-সমাজ স্থাপন করেন নি, অথবা প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্ম-সংস্থার সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করেন নি। কিন্তু তাঁর ধর্মমত, তাঁর রুক্ষ চরিত্র, তাঁর বাংলার কৃষকের দুর্গতি, এমন কি তাঁর আনন্দমঠ পড়লে অনুমান করা অসঙ্গত হয় না যে, রামমোহনের রচনাবলী তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছিল। ডিরোজারিওর সমসাময়িক নন বলে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবে বঙ্কিম প্রভাবান্বিত হন নি, কিন্তু ডিরোজারিও যে-সব পাশ্চাত্য দার্শনিক দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, তাঁদের কারুরই মতবাদের সঙ্গে বঙ্কিমের পরিচয়ের অভাব ছিল না। বঙ্কিমও রামমোহনের মতোই মেনে নিয়েছিলেন হিন্দুর মতো উদার জাতি পৃথিবীতে আর নেই। রামমোহন প্রতিমা পূজাকে প্রয়োজনীয় মনে করেন নি, বঙ্কিম করেছেন। তার পরিচয় যেমন পাওয়া যায় আনন্দমঠে, তেমন পাওয়া যায় 'আমার দুর্গোৎসবে'। কিন্তু ওই দুই-রচনাতেই দেখা যায় মাতৃভূমিকে তিনি যেমন সুন্দরী রূপে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, তেমন তাঁর চিন্ময়ী রূপও প্রকাশ করেছেন। মন্ত্রকে যখন তিনি দেশমাতৃকার সেবার মন্ত্রে দীক্ষা দান করাচ্ছেন, সেখানে তিনি প্রতিমার সহায়তা নিয়েছেন; আর সন্তানরা যখন দেশমাতৃকাকে কল্পনায় আনছেন তখন তাঁর চিন্ময়ী মূর্ত্তি চিত্তমন্দিরে স্থাপন করে নেয়েছেন সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্,…বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং রিপুদল বারিণীং মাতরম্। আবার সেই মাকে প্রত্যক্ষ করে এই বলে প্রণতি জানাচ্ছেন—নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং সুস্থিরা

সুবিতাম্ মাতরম্। বঙ্কিম ওই একটি গানের ভিতর দিয়েই পুরো হিন্দু-সংস্কৃতিকে রূপায়িত করেছেন—বহুবলধারিণী রিপুদলবারিণী মাতাকে অমলাং অতুলাং সুস্মিতাং রূপে প্রত্যক্ষ করাই হচ্ছে শক্তির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সিনথেসিস্, জাতির জীবনকাব্য। দুঃখের বিষয় নানা কারণে, হয়ত সঙ্গত কারণেই, এমন একটি অনুপম সঙ্গীত, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবার পর জাতীয় সঙ্গীত হতে পারল না। কিন্তু এমন কোন জাতীয় সঙ্গীত আমার জানা নেই যা কাব্যে, রূপে, সুষমায়, বাস্তবতায় ও আধ্যাত্মিকতায় এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মন্ত্র বলে বিবেচিত হতে পারে। বঙ্কিমের গঙ্গস্তুতি বিদ্যাসাগরের স্তুতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও পুনরায় কথা ভাষাকে স্বীকৃতি দেয়। বিদ্যাসাগর ঈশ্বরকে মানুন আর না-ই মানুন ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না, মাইকেলকে বিকশিত হতে দেবার কাজে তাঁর সহায়তা ত সুবিদিত। বঙ্কিম কখনো ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন কিনা, অথবা রামকৃষ্ণ সমীপে কখনো গিয়েছেন কিনা, তা আমার জানা নেই। হয়ত যাননি। তাঁর যাবার প্রয়োজনও ছিল না। কেননা তিনি কোন সত্যকে মনে মনে অস্বীকার করেন নি, সকলের লক্ষ সত্যকে হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করবার প্রয়াস করেছিলেন। তাই গোঁড়া হিন্দুরা, গোঁড়া ব্রাহ্মরা, গোঁড়া ধর্মীয় খ্রীষ্টানরা এবং গোঁড়া মুসলমানরা তাঁকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু তাঁরা তা না করলেও, জাতি তাঁর মন্ত্র গ্রহণ করল। তা করবার কারণ দেশ তখন সত্যানুসন্ধানের চুল-চেরা বিচারে ক্লান্ত হয়ে সমন্বয় চাইছিল, মুক্তি চাইছিল, প্রতিষ্ঠা চাইছিল। বঙ্কিমের কাছ থেকে তারা তাই পেল।

বঙ্কিম বুঝতে পেরেছিলেন জাতি তখন সৃষ্টির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তত্ত্ব নিয়ে বিচার করবার ধৈর্য্য আর তার নেই। সকল সৃষ্টির মূলে রৈব তাড়না ও যেমন থাকে, তেমনই থাকে রোমান্স। রোমান্স পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘনের দুরাশায় উদ্বুদ্ধ করে, বাস্তব বাধাকে তুচ্ছ করবার স্পর্দ্ধা এনে দেয়। সেদিন জাতির সম্মুখে নানা দুস্তর বাধা ছিল। তা অতিক্রম করবার দুঃসাহসিক অভিযানে যাত্রীদেরকে উদ্বুদ্ধ করাতে হলে জাতিকে রোমান্স দিয়ে সঞ্জীবিত করতে হবে। তিনি রোমান্স সৃষ্টি নিয়েই সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু র‍্যাশনালিষ্ট বঙ্কিম রোমান্স রচনায় ব্রতী হলেও আইডিয়ালিজমকে অবহেলা করতে পারলেন না। সে আদর্শবাদ দুঃখের ভিতর দিয়ে রূপান্তর, ত্যাগের ভিতর দিয়ে পরম মুক্তির স্বাদ প্রাপ্তি। পুরোপুরি ভারতীয় জীবন আদর্শ, নৈরাত্মবাদ নয় প্রত্যাশাবাদ; প্যাসিভিজম নয় অ্যাক্টিভিজম; অদৃষ্টবাদ নয় পুরুষাকারবাদ।

বঙ্কিমের প্রকাশিত হবার আগে তাঁর তিনখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তা হচ্ছে দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯)। বাকি উপন্যাসগুলি ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার পর বঙ্কিমের প্রকাশিত হয় ১৮৭২ থেকে ১৮৮৮র মাঝে। এই তিনখানি উপন্যাসের মাঝে একমাত্র মৃণালিনীতেই তিনি রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাতে রাজনীতিকে তিনি প্রাধান্য দেননি, জ্যোতিষ গণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অনেক উপন্যাসেই তাই দিয়েছেন, ভাবটা যেন এই—যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। ওকে ডেষ্টিনিও বলা যেতে পারে, কিন্তু তা গ্রীক ডেষ্টিনি নিশ্চিতই নয়। গ্রীক ডেষ্টিনী ঘটায় অপরে; বঙ্কিম চরিত্রের ডেষ্টিনী দুর্ব্বার বহু চরিত্রগুলির কৃতকর্ম্মে। তার মাঝে দেবতাদের বা অদৃষ্ট কোন শক্তির দণ্ড পুরস্কারের কোন কথা নেই।

বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসের আগে যে সামাজিক নাটকগুলি লেখা হয়েছে, তাতে রোমান্সের ছাপ্পায় থাকলেও তা প্রথানত প্রতিবাদ অথবা বিদ্রূপ। কর্ম্মকাণ্ড তখনো শুরু হয়নি ত।

গিরিশ প্রথম সামাজিক নাটক (প্রফুল্ল) লেখেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে। তার আগে তিনি বঙ্কিমের অনেকগুলি উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু তবুও তাঁর নিজের লেখা নাটকে রচনার দিক দিয়ে বঙ্কিমের কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। সামাজিক নাটককে তিনি রোমান্টিক রূপ দেননি, বাস্তব সমাজকেই প্রতিফলিত করেছেন ; এবং তাতে কাব্যপ্রবণ, করেননি বঙ্কিম যা করেছেন। বিংশ শতকেও তিনি তিনখানি সামাজিক নাটক লিখেছেন। তা হচ্ছে বলিদান (১৯০৫), শাস্তি কি শাস্তি (১৯০৯) আর গৃহলক্ষ্মীর কিছু অংশ। কিন্তু ওর কোনখানিই রোমান্টিক নয়, সমাজ প্রতিফলন। ওদের ভাষাতেও কাব্যপ্রবণতা নেই, ভক্তিবাদও নেই, প্রতিবাদ আছে, ক্ষোভ আছে, পুরুষকার যে নেই তা নয়—তবুও কেবলমাত্র পুরুষকার যে দুঃখ থেকে, অবনতি থেকে, মানুষকে রক্ষা করতে পারে না তার চিত্র আছে। তাঁর জীবনে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বক্লমা নিয়েছিলেন বলেই কি তিনি আশে পাশে যে চরিত্রগুলি দেখতেন, তাদেরকে নাটকে স্থাপন করে ঠাকুরকেই দেখাতেন? জানিনা। হতেও পারে। তিনি দর্শক করে কতগুলি চরিত্র নাটকে সৃষ্টি করতেন, যারা নাটকের অংশ হয়েই নাটক দর্শন করছে এবং অনাগতের আভাস দিচ্ছে এমন ভাষায় যা কখনো হেঁয়ালী হলে নাটকের পাত্রপাত্রীরা (প্রেক্ষাগৃহের শ্রোতৃরা নয়) মনে করে। যেমন বলিদানে 'ভোখী' পাগলী, প্রফুল্লে 'যদন ঘোষ', শাস্তি কি শান্তিতে 'পাগল', গৃহলক্ষ্মীতে 'নকুলানন্দ অবধূত'। ওরা কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর 'অভিরাম স্বামী'র মতো নয়, রজনীর সন্ন্যাসীর মতো নয়, চন্দ্রশেখরের রামানন্দ স্বামীর মতও নয়। ওরা শাস্ত্র পড়ে জ্ঞানী হয়নি, ধ্যান-ধারণা করে সত্যকে পায়নি, বঞ্চিত হয়ে, দুঃখের তাপে দগ্ধ হয়ে, অন্তর্যামীর সকল অভিমানকে ভাসিয়ে দিয়ে ওরা সচ্চিদানন্দ হয়েছে। ওদেরই অনুরূপ চরিত্র কতগুলি রবীন্দ্রনাথের নাটকেও পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁরা তাদের চরিত্র পেয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। তাই তাদের সংলাপে যেমনার বঙ্কনার আভাস পাওয়া যায় না। তারা সত্যের সন্ধান দেয় বড় মধুর ভাবে, হেসে খেলে নেচে। তারা হচ্ছে পরিত্রাণ, প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তধারার 'ধনঞ্জয় বৈরাগী' অচলায়তনের 'দাদাঠাকুর', রক্তকরবীর 'বিশুপাগলা'।

গিরিশ তাঁর সামাজিক নাটকের সংলাপে লিরিকের ছায়াপাত্র আনেন নি, কিন্তু গান দিয়েছেন। বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে লিরিকের প্লাবন এনেছেন, গানও দিয়েছেন—মৃণালিনীতে, ইন্দিরায়, বিষবৃক্ষে, রাজসিংহেও। সে গান একক ও ডুয়েট। চন্দ্রশেখরে বঙ্কিম নিজে কোন গান দেননি, কিন্তু ওর নাট্যরূপে কয়েকটি গান দেওয়া হয়। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে বঙ্কিম উপন্যাসের গান দর্শকদের বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হয়েছিল, এবং গায়ক ও গায়িকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হতো সেইসব গান গাইবার কৃতিত্বের উপর। রবীন্দ্রনাথের নানা নাটকে গান রয়েছে। আজকালকার পাঠকরা তা জানেন।

বঙ্কিমের মৃত্যু হয় ঊনবিংশ শতকের অস্তিমকালে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, অথচ বিংশ শতকের বৈশিষ্ট্য যা, সেই দেশপ্রীতির গভীরতর আবেদন এবং পরবশতা থেকে মুক্তিলাভের সক্রিয় প্রয়াস বঙ্কিমের আবির্ভাবের পর থেকেই আবেগ সঞ্চার করে। এই নিরক্ষর দেশে কি করে তা সম্ভব হোলো? রাজনৈতিক আন্দোলনের নায়করা বঙ্কিম-রচনা থেকে নিশ্চিতই প্রেরণা নেননি। তাঁদের অনুবর্তিদের সকলেই যে বঙ্কিম-রচনাবলী পড়বার সুযোগ পেয়েছেন, তাও মনে করবার কোন কারণ নেই। কেননা বঙ্গদর্শন কাগজের কাটতি (১৮৭২—৮৮ খ্রীষ্টাব্দে) কত ছিল? কত থাকবার সম্ভাবনা? তখনকার মাসিক পত্রের প্রচার কত সংখ্যক হতে পারে বলে কল্পনা করা যায়? দু'তিন হাজারের বেশী নিশ্চিতই নয়, পাঁচ-সাত শত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ থেকে বঙ্গরঙ্গালয়ে বঙ্কিম উপন্যাসের যে-সব নাট্যরূপ বছরের

পর বছর পরিবেশন করেছে বিংশ শতকের পদক্ষেপকাল পর্যন্ত, তা লক্ষ লক্ষ নরনারী দেখবার সুযোগ পেয়েছে। সে দর্শকদের বেশির ভাগই নিরক্ষর অথবা বই কিনতে অসক্ত। বঙ্গরঙ্গালয় বঙ্কিমের ভাবধারা বিস্তার করেছে সমগ্র বাংলাদেশে অভিনয়ের মাধ্যমে। আর শুধু বঙ্কিমেরই ভাবধারা নয়, রমেশচন্দ্র দত্তের, হেম-নবীনেরও।

তখন বই কেনবার আগ্রহ ও শক্তি দেশের লোকের এতই নগণ্য ছিল যে, কয়েকজন প্রকাশক, যেমন বসুমতী ও হিতবাদী, রঙ্গালয়ের দর্শকদের জন্য গ্রন্থাবলী স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করবারও ব্যবস্থা করেছিলেন, বিনামূল্যেও কখনো কখনো উপহার দেওয়া হয়েছে রঙ্গালয় থেকে কেবলমাত্র ছাপাই ও বাঁধাই খরচ নিয়ে। রঙ্গালয় তা করেছে দর্শক আকর্ষণের জন্য, বৃহৎ কোন আদর্শ নিয়ে নয়। বসুমতী বঙ্কিম গ্রন্থাবলী দিয়েছেন, হিতবাদী দিয়েছেন যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের গ্রন্থাবলী। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণকে বোধ করি আজকালকার তরুণ-তরুণীরা কোন ঘুলাই দেন না, কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমে এবং দেশের সকল মুক্তিকামী তরুণ-তরুণী তাঁর 'রাজপুত কীর্তিমন্দির', তাঁর 'ম্যাটসিনি', তাঁর 'গ্যারিবল্ডি' পড়বার জন্য কী ব্যাকুলতা প্রকাশ করতেন, আমার তা জানা আছে। বঙ্গরঙ্গালয় ওদের বহুল প্রচারের উপলক্ষ হয়ে ধন্য হয়েছিল এবং দেশেরও হিত করেছিল। কিন্তু এ সবও গৌণ কথা।

আমি মনে করি না যে, জনগণ পরাধীনতার বেদনা কোন বই পড়ে আর বক্তৃতা শুনে অনুভব করে, অথবা অনাচারের প্রতিকার-প্রয়াসী হয়। বেদনা ও প্রতিকারের স্পৃহা সকলেরই থাকে। তা যদি না থাকত তাহলে বাঙালার তাঁতীরা, বাংলার কৃষকরা, সাঁওতালরা, সিপাহীরা, ওয়াহাবিরা শিক্ষিতদের আগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করত না। জনসাধারণকে বুঝে, তাদের আবেগকে জেনে, তাদের চিত্তস্পর্শ করে, তাদের বোধগম্য রূপে সাহিত্য, দর্শন, নাট্য, পরিবেশন করতে পারলেই ওসব যথার্থ জাতীয় সম্পদ হবার অবকাশ পায়।

বিংশ শতকের প্রথমেই (১৯০৫) লর্ড কার্জন বাংলাদেশ বিভক্ত করেন। ওই একটিমাত্র স্বৈরাচারী কাজ যে ফল সৃষ্টি করে, যুক্তিতর্কের সাহায্যে তা পেতে হলে শতাব্দীকাল ধরে শিক্ষার প্রসার করতে হোতো. কুটিরে কুটিরে সংবাদপত্র, পুস্তক-পুস্তিকা পৌঁছে দিতে হোতো। কিন্তু কার্যত তখন ওসব কিছুই করতে হয়নি, সারাদেশ ওর প্রতিবাদ করবার জন্য যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। স্বদেশী ও বয়কট নিমেষেই নিভৃত পল্লীতে পর্যন্ত প্রতিকারের পন্থা বলে স্বীকৃতি লাভ করল। এবং যেহেতু নাটক দেখতে, গান শুনতে, অক্ষর জ্ঞানের আবশ্যক হয় না, সেই হেতু গান ও নাটক জনপ্রিয় হয়ে উঠল, বন্দেমাতরমের স্রষ্টা কে, কোন্ উপন্যাস অবলম্বন করে তা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তা জানবার প্রয়োজন উপলব্ধি করল না কেউ, দেশের মাটিতে যখন জন্মিই হওয়া গেছে, তখন দেশমাতৃকা যা, জন্মদায়িনী জননীও তাই, একথা বুঝতে এ দেশের জনগণকে বই হাতড়াতে হোলো না, নোট মুখস্থ করতে হোলো না। তারা যে বংশানুক্রমে লোক-সঙ্গীতের মাধ্যমে বহু দার্শনিক তত্ত্ব, ন্যায় ও কাব্য, প্রকৃতির সম্পদ, মানব মনের ঐশ্বর্য জানবার বোঝবার অবকাশ পেয়েছে, বুদ্ধ-চৈতন্যকে তারা বোঝবার অবকাশ পেয়েছে। অসুরবিনাশিনী দুর্গাকে, শবাসনা শ্যামাকে, বীণাপাণি বাণীকে তাঁরা ত মা বলেই জানে—দেশমাতৃকাকে মাতৃরূপে কল্পনা করতে তাদের মনে দ্বিধা উপস্থিত হবে কেন?

বঙ্কিম তখন জীবিত নেই। তার এগারো বছর আগে (১৮৯৪) তিনি মহাপ্রস্থানে গিয়েছেন। গিরিশের বয়স তখন একষট্টি বছর। রবীন্দ্রনাথের বয়েস তখন পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু তখনই তিনি সহস্র

কিরণলাল বিস্তার করে দেশের ধর্মধিক উদ্ভাসিত করেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন আর বঙ্কিমের আরব্ধ কাজ পরিণতির পথে এগিয়ে নেবার জন্যই উদিত হয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনকে সার্থক করবার মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে তিনি পৌরোহিত্য গ্রহণ করলেন।

রঙ্গালয়ে তখনো অবিরত ভাঙাগড়া চলছে, নতুন নতুন থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, আবার উঠেও যাচ্ছে; প্রাচীন থিয়েটারগুলির লেসি ও ম্যানেজার পরিবর্তিত হচ্ছে, অভিনেতা অভিনেত্রীরা এক থিয়েটার ছেড়ে অন্য থিয়েটারে চলে যাচ্ছে, অথচ নতুন নাটক রচিত হচ্ছে, অভিনীত হচ্ছে, দর্শকরাও পরিতৃপ্ত হচ্ছে. যে থিয়েটারে তাদের প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাবেশ বেশি থাকত, সেই থিয়েটার তাদের সমর্থন পেতো বেশি। পুরাতন থিয়েটারের নাকে দিনার্ভা, হাতীবাগানের হীরা, ক্লাসিক হাত বদল হলেও নাম বজায় করে রাখে—নতুন নাম নিয়ে নতুন নতুন থিয়েটার যা দেখা দেয় তা হচ্ছে অরোরা রয়েল ষ্টেজ (১৯০১), ইউনিক (১৯০৩), গ্র্যাণ্ড থিয়েটার, কার্জন থিয়েটার, পরে যা আলফ্রেড হয়, কোহিনুর (১৯০৭), বিজন ষ্টীটের হীরা, এমারেল্ড, মনোমোহন, মনোমোহন নাট্যমন্দির এবং স্বল্পস্থায়ী আর কটি প্রতিষ্ঠান। এই অবিরত পরিবর্তনের উত্থান-পতনের ভাঙাগড়ার মোটামুটি কারণ (ক) অর্থনৈতিক অভাব (খ) ব্যক্তিগত ও দলগত বিরোধ, (গ) বিশেষ দু-একটি ক্ষেত্রে আদর্শগত পার্থক্য (ঘ) ব্যবসায় বুদ্ধির অভাব।

অমরেন্দ্র দত্ত ব্যবসার দিকে ঝোঁক দেন। কিন্তু তিনি নিজেই ছিলেন আদর্শবাদী, অব্যবসায়ী, এবং অমিতব্যয়ী। তবুও তিনি (ক) প্রচারণার জন্য অর্থব্যয় প্রয়োজনীয় মনে করেন এবং প্রচারণাকে ফলপ্রদ করবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেন, যেমন থিয়েটারের প্রতি মোহসৃষ্টির চেষ্টা করেন, তেমন ফলপ্রদ বিজ্ঞাপনকেও প্রশ্রয় দান করেন। তাই বলে তিনি যে শুধু প্রচারণা সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন তা কিন্তু সত্য নয়। নাটক ও নাট্যশালা সম্বন্ধে তিনি সর্বপ্রথমে (১৯০১) রঙ্গালয় নামক মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে ওর প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত করেন। বাংলার বহু বিদগ্ধজন ওই মাসিকপত্রে নাটক সম্বন্ধে নানা আলোচনা করতেন। (খ) অভিনেতাদের বেতনের, বোনাসের এবং বেনিফিটের ব্যবস্থা করতেও তিনি ব্রতী হন। (গ) থিয়েটারের ম্যানেজারের পদকে মহিমান্বিত করেন অমরেন্দ্রনাথ। ঘুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে তিনি ছোটলাটের বাড়ীতে এবং উচ্চপদস্থ সাহেব-সুবোদের কাছে যেতেন, এবং তাদেরকে থিয়েটারে নিয়ে আসতেন। তিনি যখন দল নিয়ে বাইরে অভিনয় করতে যেতেন, তখন দলের ম্যানেজার হিসেবে রেলকর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সেলুনও দাবী করতেন, শুনিছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা থিয়েটার কটক, বালেশ্বর, গৌহাটি, মণিপুর, ত্রিপুরা, পাটনা, ভাগলপুর, বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর, দিল্লী, হিয়াট, সিমলা প্রভৃতি শহরে শক্ত করে। ওর অধিকাংশ জায়গায় ওর ফলে বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্য স্থায়ী দলও গড়ে ওঠে; থিয়েটার ভবনও গড়ে ওঠে।

অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর থেকে বাংলার রঙ্গশালায় দৃশ্যপট আসবাবপত্র প্রভৃতিতে বাস্তবতার অনুভূতি জাগাবার চেষ্টা চলে। তার আগেও যে সে-চেষ্টা করা হয়নি, তা নয়। চন্দ্রশেখরে ঐনা পুষ্করিণীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিতা থেকে সুন্দরী ও শৈবলিনী 'নাচে তালে তালে কালো জল' যে গান গাইত, তা শোনবার ও দেখবার জন্য দর্শক ভেঙে পড়ত, বাঈজীর পুষ্করিণীর দৃশ্যও ইলিউশন্ সৃষ্টি করত। হাস্যকর সৃষ্টি যে হোত না, তা নয়। তাও হোত। কিন্তু তখন সরঞ্জাম ছিল স্বল্প, অর্থও ছিল অপ্রতুল।

জাতিগঠনে রঙ্গমঞ্চ

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

সাহিত্যের মহিমা কীর্তন করিয়া মনস্বী বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন, 'সাহিত্য পাঠে অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিও আনন্দাস্বাদনের মধ্য দিয়া চতুর্বর্গ ফল লাভ করিতে পারে'। আবার বিষ্ণু পুরাণকার বলিয়াছেন—নাটক মানুষকে ত্রিবর্গ ফল প্রদান করে (ত্রিবর্গসাধনং নাট্যম্)। কথাগুলি এ যুগের পাঠকের কাছে অতিশয়োক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আমরা যুগপৎ শ্রেয় ও প্রেয়, আনন্দ ও কল্যাণ লাভ করিয়া থাকি। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি ও লোককল্যাণ। রবীন্দ্রনাথ বলেন—মেঘদূতের ন্যায় প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। পূর্বমেঘ আমাদিগকে পথের সৌন্দর্য দেখাইয়া মোহিত করে আর উত্তরমেঘ আমাদিগকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দেয়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক দিয়া বিচার করিলেও বলিতে হয়—সাহিত্যের মধ্যে মিলনের ভাব ও কল্যাণের ভাব দুইই আছে, তবে সাহিত্য মানুষকে কান্তার ন্যায় অমৃত-রসিনী বাণীর মধ্য দিয়া শ্রেয়ের পথ নির্দেশ করে, তাই সাহিত্যের উপদেশ কান্তাসম্মিত।

আমাদের দেশে নাটককে বলা হইয়াছে রূপক, কেননা, ইহা গতিশীল মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি। নাটক দৃশ্যকাব্য, সুতরাং রসসৃষ্টিই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। অভিনীত হয় বলিয়া নাটকে আমাদের দুইটি প্রধান ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকে, আবার নাটকে আমরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মধ্যে ক্রোধ, ভয়, বিস্ময়, আনন্দ, ঈর্ষা, ঘৃণা প্রভৃতির প্রকাশ দেখিয়া বিচিত্র ভাবে অভিভূত হই। সুতরাং নাটক আমাদের মনের উপর যতখানি গভীর প্রভাব বিস্তার করে, অন্যান্য কাব্য ততখানি করে না। এইজন্য নাট্যকার সহজে সমাজের দুর্নীতি দূর করিয়া উহার সংস্কার সাধন করিতে পারেন অথবা স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তার মন্ত্রে জাতিকে দীক্ষা দান করিতে পারেন, কিন্তু কোন কবি বা প্রবন্ধ-লেখকের পক্ষে কাজটি সহজ নয়। বাংলাদেশে মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর যে মহাভাবের প্লাবন আসিয়াছিল, তাহার ফলে সংস্কৃত নাটকেরও পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবধারার ধারক ও বাহক, তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ প্রেমধর্ম-প্রচারের জন্য নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শুধু এরূপ রচনার উৎসাহদাতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অভিনয়-নিপুণ রসিক-শেখর।* অবশ্য, আমরা যে সব নাটকের কথা বলিলাম পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে সেগুলির বিচার করিলে চলিবে না, মনে রাখিতে হইবে, 'এগুলি ভাবাবিষ্ট ভক্তগণের প্রেম বিগলিত হৃদয় হইতে নির্ঝরের মত সহজধারে উৎসারিত হইয়াছে।

যাত্রাগানের আদিরূপের কথা আমরা এখানে আলোচনা করিব না। এই যাত্রাগান বা গীতাভিনয় যে আমাদের দেশে লোকশিক্ষার প্রধান বাহন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত যাত্রাগানসমূহ দর্শকদের মনে কর্তব্যনিষ্ঠা, সত্যানুরাগ, ভগবৎপ্রেম প্রভৃতি মহৎ ভাবসমূহ জাগাইয়া তুলিত। যাত্রাগানের একটি মাত্র শিক্ষা ছিল—যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।

[* চন্দ্রশেখরের গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও তাঁহার পরিষদ্‌বর্গের রুক্মিণীলা অভিনয়ের কথা চরিতগ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হইয়াছে।

বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসও আমাদের আলোচ্য নয়। উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকেই আমরা বাংলা নাটকের মধ্যে সমাজ-সংস্কারের একটা প্রবল প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। আমাদের দেশে নাটকের মধ্য দিয়া লোকশিক্ষা দিবার যে প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছিল, উহা তিনটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল। (১) সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অনাচার দূর করিবার জন্য বহু সামাজিক নাটক রচিত হইয়াছিল। রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'কে যথার্থ নাটক বলা চলে না, ইহা বিচ্ছিন্ন দৃশ্যসমূহের গ্রন্থনমাত্র, তথাপি ইহার অভিনয় কিয়ৎকাল খুবই প্রচলিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে লোককল্যাণের উদ্দেশ্যে বহু সামাজিক নাটক রচিত হয়। (২) বাঙ্গালী স্বভাবতই ভাবপ্রবণ এবং প্রেমধর্মের পরাকাষ্ঠা ঘটিয়াছিল বাঙ্গালীর প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মধ্যে, আবার কৃত্তিবাস ও কাশীরাম রামায়ণ পাঁচালী ও ভারত-পাঁচালী রচনা করিয়া বাঙ্গালীকে কর্তব্যপরায়ণ ও ধর্মনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল; বাঙ্গালীর এই স্বাভাবিক প্রবণতার কথা চিন্তা করিয়াই বোধ হয় নাট্যকার মনোমোহন বসু পৌরাণিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার 'রামাভিষেক', 'সতী', 'হরিশ্চন্দ্র' প্রভৃতি নাটক বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নাট্যকারগণ পৌরাণিক নাটকের এই ধারাকেই পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন।

(৩) বাংলা দেশে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তার আদর্শ প্রথম প্রচারিত হয় কাব্য ও উপন্যাসে এবং পরে নাটকের 'মাধ্যমে'। স্বাধীনতা মন্ত্রের উদ্গাতা রঙ্গলাল, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, মহাকাব্য ও খণ্ড কবিতার মধ্য দিয়া স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তার দীক্ষাদানকারী হেমচন্দ্রও, অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং শাশ্বত ধর্ম ও যুগধর্মের সমন্বয়কারী কবি নবীনচন্দ্র সমগ্র জাতির জীবনে আনিয়াছিলেন এক নব চেতনা, এক অভিনব উদ্দীপনা। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তার আদর্শ প্রচারের জন্যই প্রথম নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু এ বিষয়ে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল।

মনস্বী জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আমাদের জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ঐতিহাসিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার 'পুরুবিক্রম', 'অশ্রুমতী', 'স্বপ্নময়ী' প্রভৃতি নাটক এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাতিকে কোন শ্রেয়ের পথ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। বিশেষত অশ্রুমতী নাটকে প্রতাপের স্বদেশপ্রেমের চেয়ে প্রতাপ-দুহিতা অশ্রুমতী ও ভারত সম্রাট সেলিমের কল্পিত প্রণয় কাহিনী প্রাধান্য লাভ করায় নাট্যকারের উদ্দেশ্য প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে এবং নাটকখানি দর্শকদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শক্তিশালী ও ব্যঞ্জনকুশল লেখক ছিলেন। তথাপি তাঁহার নাটক-সমূহে দেশপ্রেমরূপ কঠোর ভাবের চেয়ে করুণা, মমতা, ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই যুগের অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকসমূহের মধ্যে হরলাল রায়ের 'হেমলতা' ও 'বঙ্গের সুখাবসান' এবং উমেশচন্দ্র গুপ্তের 'বীরবালা' ও 'মহারাষ্ট্র কলঙ্কের' নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য ইঁহাদের কেহই তেমন শক্তিমান লেখক ছিলেন না।

বাংলার নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের দান বিপুল। তাঁহার সৃষ্টিশক্তির মধ্যে যেমন প্রাচুর্য ছিল, তেমনই বৈচিত্র্য ছিল। বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাঁহাকে অবিশ্রান্ত ভাবে নূতন নূতন নাটক রচনা করিতে হইয়াছে, আর এই কারণেই তাঁহার অধিকাংশ নাটক কালজয়ী হইতে পারে নাই। স্বদেশী যুগে গিরিশচন্দ্র আমাদের জাতীয় ভাব উদ্দীপিত করিয়া তুলিবার জন্য 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক রচনা করেন এবং নাটকখানি দর্শকদের প্রাণে একটা বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করে। নাটকখানি দোষে-গুণে বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কবি নবীনচন্দ্র একদিন 'পলাশীর যুদ্ধ'

অবলম্বনে যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সিরাজের চরিত্র মসীলিপ্ত হইলেও হতভাগ্য নবাবের পতনে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সিরাজের চরিত্রকে কলঙ্কমুক্ত করিবার এবং তাঁহাকে স্বাধীনতাকামী ও জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত নবাবরূপে চিত্রিত করিবার জন্য লেখনী ধারণ করেন। গিরিশচন্দ্র অক্ষয়কুমারের রচনার দ্বারা বিশেষভাবেই প্রভাবিত হন এবং সেইজন্য তিনি সিরাজকে প্রজাহিতব্রতী নবাবরূপে চিত্রিত করেন। পরবর্তীকালে আচার্য যদুনাথ সরকারের গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, সিরাজ একজন অপদার্থ স্বেচ্ছাচারী নবাব ছিলেন এবং তাঁহার চরিত্রও নানা দোষে কলঙ্কিত ছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের লেখাতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক, গিরিশচন্দ্র মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল করিয়াছিল। 'সিরাজদ্দৌলা' ছাড়া গিরিশচন্দ্র আরও কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন একাধারে পরিহাস-রসিক ও ব্যঙ্গকুশল কবি, সংগীতে নূতন ধারার প্রবর্তক ও নাট্যকার। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি ছিল তাঁহার নিজস্ব, সমালোচকের দৃষ্টিতে তাঁহার নাটকে কিছু কিছু দোষত্রুটি থাকিলেও তাঁহার অধিকাংশ নাটকই অভিনয়ে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। স্বদেশী যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটকের মধ্য দিয়া আমাদিগকে স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেমে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস' ও 'মেবার পতনের' নাম উল্লেখযোগ্য। স্বদেশপ্রেমের চেয়েও যে উদার মানবপ্রেম অনেক বড়, 'মেবার পতন' নাটকের ইহাই প্রতিপাদ্য। পতন বা অভ্যুদয়, সম্পদ বা দারিদ্র্য, স্বাধীনতা বা পরাধীনতা জাতির জীবনে বড় কথা নয়, জাতি মনুষ্যত্বের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিল কিনা, ইহাই আসল সমস্যা। তাই 'মেবার পতনের' শেষে চারণীদের কণ্ঠে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের বাণী শুনিতে পাই—'আবার তোরা মানুষ হ। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকেও দ্বিজেন্দ্রলালের উদার দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় পাই। ভারতীয় সভ্যতা ও গ্রীক সভ্যতার মিলনে একদিন যে মহাসভ্যতার জন্ম হইয়াছিল, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই তাহার সূচনা হইয়াছিল,—চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যের দিকে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

বর্তমানকালে নাটকের পুনরুজ্জীবনের একটা চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু এ যুগের নাটক-লেখকেরা অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রান্ত ও চলচ্চিত্রের প্রভাবে মোহগ্রস্ত হইতেছেন; যে সমাজের চিত্র তাঁহারা অঙ্কিত করিতেছেন, উহা অনেক ক্ষেত্রে দেশী বা বিদেশী কোন সমাজেই নয়। আর আমাদের দেশ নানা সমস্যায় জর্জরিত, সমাজের নানা স্তরে অনাচারের স্রোত প্রবাহিত, প্রাণঘাতী আত্মকলহে সমস্ত দেশ লিপ্ত, ভারতের সনাতন ধর্মের আদর্শ হইতে জাতি ভ্রষ্ট, আমাদের প্রাক্তন সুধিগণ যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সে স্বাধীনতা এখনও বহুদূরে অবস্থিত,—এ অবস্থায় যদি আমাদের দেশের কথাসাহিত্যিকগণ ও বিশেষত নাট্যকারগণ কল্যাণের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হন, তাহারা যদি আমাদের দেশের ভাবী নাগরিকদের মর্মে লালসার বহ্নি সঞ্চারিত করিয়া তোলেন, তবে দেশ ও জাতির ধ্বংস অনিবার্য। আজ কোথায় সেই দেশপ্রেমিক কথাশিল্পী ও নাট্যকারগণ, আপনারা সেই সম্পদ জাতিকে দান করুন, যাহার অধিকারী হইলে জাতি বলিষ্ঠ ভ্রষ্টি হইতে পারে এবং বলবীর্যের অধিকারী হইয়া মাতৃভূমির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে।

———

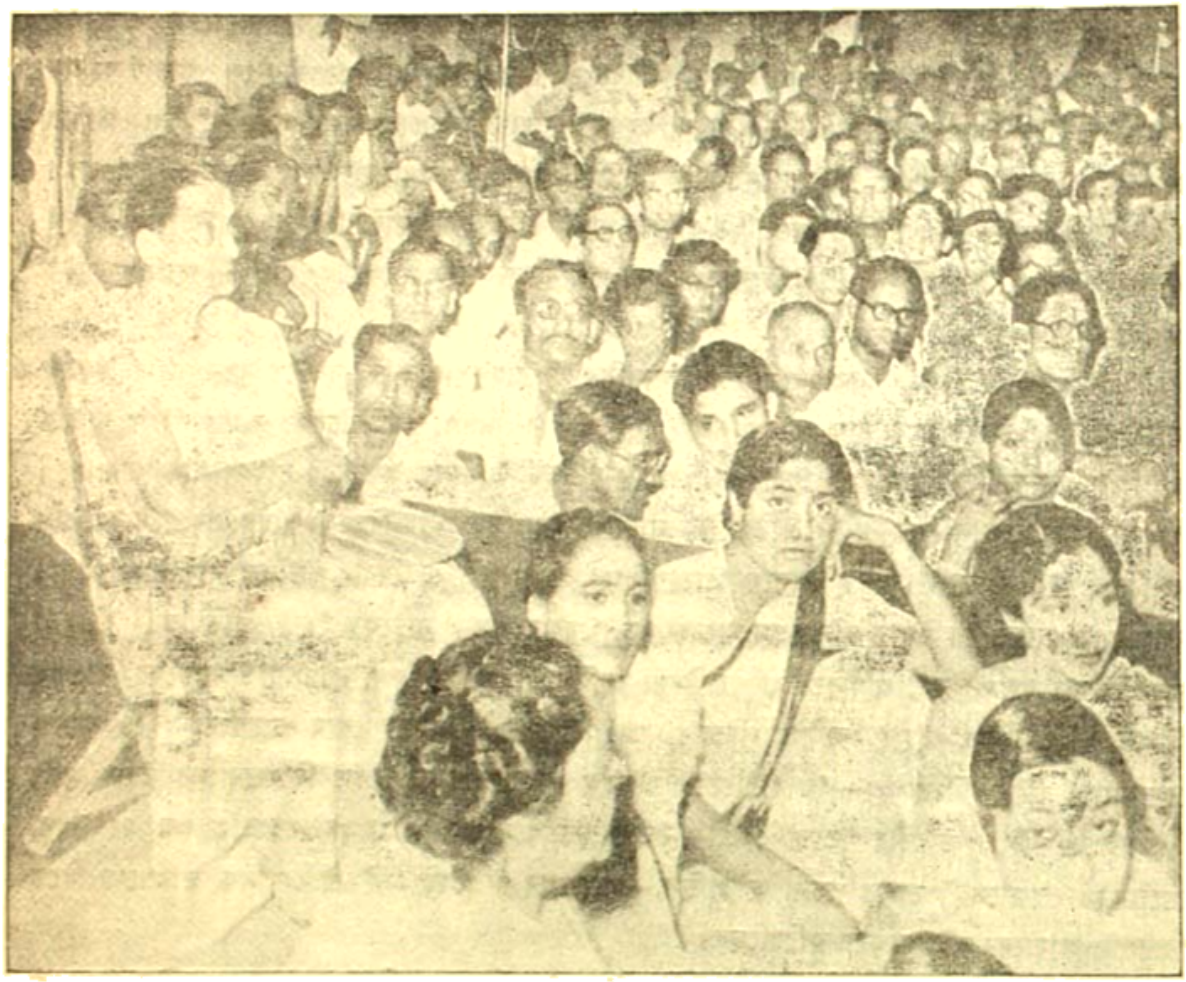

মহাজাতি সদনে রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে দর্শকবৃন্দের মধ্যে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর তিরোধানে রবীন্দ্রযুগের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল। তাঁর মৃত্যুতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের শেষ দীপ শিখাও নির্বাপিত হল। সেকালের ও একালের তিনি ছিলেন যোগসূত্র।

তাঁর অনেকগুলি লেখা পত্র-ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে পরপৃষ্ঠায় একটি লেখা পুনঃমুদ্রিত করা হল।

রবীন্দ্র সঙ্গীতে নূতন ইঙ্গিত

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

ভারতী সম্পাদককে
লিখিত পত্র

শেষাপল্লী, শান্তিনিকেতন

রবিবার, ১৩-৯-৫৩

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রোত্তর পত্রাকারেই দিচ্ছি। তা'তে এক হিসেবে সহজ ভাবে লেখা সহজ হয়। অপর পক্ষে ছাপানো হ'তে পারে মনে করলে কৃত্রিমতা এসে পড়া আশ্চর্য্য নয়। যদিও সেটা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

অনেকদিন পরে আপনার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম বল্লে একটু অত্যুক্তি হয়। কারণ অনেক কথা মনে পড়ল যা হাতে তোলাই ভাল। আবার এদিক থেকে পূজা সংখ্যার লেখার জন্য তাগিদ আসছে যে, বোঝার উপর শাকের আঁটিও ভার ব'লে বোধ হয়।

সামান্যের সঙ্গে অসামান্যের তুলনা করতে গেলে, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের মহান্তের পর যেমন তাঁর সঙ্গীতের কদর বেড়েছে ব'লে দেখা যায়, তেমনি আমিও হঠাৎ দেখছি লেখিকার পদবীতে উন্নীত হয়েছি, হয়ত' সম্বর্দ্ধনার গুণে বা দোষে। আমি একেবারে লিখতে পারিনে, সে মিথ্যা বিনয় করব না; কিন্তু এ কথাও সত্য যে, আমি এমন ধরের লেখিকা নই, যার হাত বাড়লে পর্ব্বত। যেমন উপনিষদে বলে, যে মনে করে তাঁকে জেনেছে সে জানে নি, এবং যে মনে করে জানে না সেই জেনেছে। কিন্তু ক্রমাগত ছোট মুখে বড় উপমা দেওয়ার চেয়ে উপমা স্থগিত রাখাই ভাল।

আমি অন্যান্য তাগিদ কোনো রকমে ঠেকিয়ে রেখেছি, কিন্তু আপনার অনুরোধে দু লাইন লিখতে ইচ্ছে হ'ল। অথচ কি লিখব ভেবে পাইনে।

আপনি ত' লেখার বিষয়বস্তু পর্য্যন্ত বাৎলে দিয়েছেন, কিন্তু চর্ব্বিত চর্ব্বণ কাঁহাতক করা যায়? স্মৃতি-রোমন্থন করতে করতে চোয়াল ব্যথা হ'য়ে গেল; আর গীতসুধারও অরুচি হবার উপক্রম।

আমাদের ছেলেবেলায় বাড়ীতে সঙ্গীতের কিরূপ আবহাওয়া ছিল, তা পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের "ছেলেবেলা" থেকে আরম্ভ ক'রে নানা প্রবন্ধাদির মধ্যে দিয়ে শ্রীশান্তিদেব ঘোষের "রবীন্দ্র সঙ্গীত" পর্য্যন্ত পড়লে আর জানতে কিছু বাকি থাকে না। আমার নগণ্য ব্যক্তিগত সঙ্গীত শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে যেটুকুও বা অজ্ঞাত ছিল, তা সম্প্রতি স্মৃতিসমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক সাধ্যমত নিঃশেষে সম্বর্দ্ধনা সমিতির উত্তান করতলে তুলে দিয়েছি; যদিও তা জেনে কার কি উপকার হবে তা জানি নে। অতএব এখন খুসিবাড়া।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের অগাধ সমুদ্র মন্থন করলে এখনো অনেক রত্ন উদ্ধার করতে পারা যায় ব'লে আমার বিশ্বাস। নানাভাবে তাকে বিশ্লেষণ, তার তথ্যনির্ণয় এবং গবেষণা করা বাকি আছে, যা সেদিন একজন লেখক কোন প্রবন্ধে লিখেছেন দেখছিলুম। কিন্তু করে কে? আমাদের ত' কাল গেছে, কিম্বা গতপ্রায়।

তবু ভগবৎ কৃপায় এখনো একেবারে স্মৃতিলোপ পায়নি ব'লে কিছু কিছু পুরাণো রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরলিপি ও সম্পাদনা ক'রে থাকি, ও সেজন্য গাল খাই।

আমার অনেকদিন থেকে ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারাবাহিক সোদাহরণ ইতিহাস সাধারণ্যে ব্যাখ্যাত হয়,—যে কাজ কল্যাণীয় দিনেন্দ্রনাথই সব চেয়ে ভাল করতে পারতেন; কিন্তু তাঁর অভাবে কল্যাণীয় সৌম্যেন্দ্র আমার সে ইচ্ছা অনেকাংশে পূর্ণ করেছেন। এবং নানাভাবে তাঁদের এই অমূল্য পৈতৃক সম্পত্তির রক্ষা ও প্রচারে যত্নবান হয়েছেন দেখে খুবই আনন্দ বোধ করি। বিশ্বভারতীর এ বিষয়ে আগ্রহ উদ্যোগও যথার্থ প্রশংসনীয় এবং তাঁদের অধিকার বেশি ব'লে দায়িত্বও বেশি। একাজে অগ্রসর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও পরস্পরের পরিপূরক ব'লেই আমি মনে করি। কাউকেও পর ভাবি নে।

মনে ত' হয় এঁরা সবাই মিলে বাঙালীর এই প্রাণপ্রিয় সম্পদটিকে নষ্ট হ'তে দেবেন না। যদিও বিশুদ্ধ ভাবে রক্ষা করবার দিকে আর একটু মনোযোগ দিলে আরো ভাল হ'ত। আমরা যে "সবাই রাজা"—কেউ কাউকে মানতে রাজী নই। তবু যথার্থ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতা নিয়ে দু'তিনজন লোকও যদি এক্ষেত্রে একত্র দাঁড়ান ত' ক্রমশঃ তাঁদের দল পুষ্ট হবে ব'লে বিশ্বাস—অন্ততঃ আশা করা যায়। রেডিও কোম্পানীও ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারেন। সর্বসাধারণের সহযোগিতাও কামনা করি।

এখানকার নানা খুচরা কাজ ও লোকসমাগমের ভিড়ে ফরমাইয়েসী লেখা সরবরাহ করা শক্ত। কাল রাত ১২টা পর্যন্ত ব'সে কোনো রকমে এই অকিঞ্চিৎকর কয়েক পংক্তি লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছি। তাও আপনার নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পাঠাতে পারলাম না বলে ত্রুটি মার্জনীয়।

কবিগুরু স্বয়ং কোন যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা করেন নি। তাই ব'লে তিনি তার পক্ষপাতী ছিলেন না মনে করা সমীচীন হবে না। আমার নিজের ঐদিকে ঝোঁক আছে ব'লে মনে হয় তাঁরই গানের সুর নিয়ে- কথা বাদ দিয়ে, সুন্দর যন্ত্রসঙ্গীত তৈরি করা যায়,—অবশ্য উপযুক্ত শিল্পীর হাতে পড়লে।

তার পরে তাঁর গানে ছোট ছোট তান যোগ করা যেতে পারে কি না, তারও পরীক্ষা করার সময় এসেছে আমার বিশ্বাস। তিনিই বলেছেন কিছুই দাঁড়িয়ে থাকে না, সমস্তই প্রবাহের মত চলেছে। তাই তাঁর সঙ্গীতেরও কোন্ পথে গতি ও উন্নতি হ'তে পারে—অবশ্য অতি সন্তর্পণে—তারই একটু ইঙ্গিত ক'রে গেলুম মাত্র। আশা ও আশীর্বাদ করি পরবর্তী নিরবধি কালে সমানধর্ম কারো দ্বারা এই দুঃসাধ্য সাধন সৌষ্ঠব সহকারে সম্পন্ন হবে। যদিও আমরা শুনতে আসব না, তবুও প্রধান অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ ক'রে রাখা ভাল।

আর কি বলব?—গল্প-ভারতীর অনুরোধ রক্ষা হ'ল বটে,—তবে গল্প হ'ল না, হ'ল শুধু ভারতীর কথা।

---

* বিনয় এবং অকারণ কুণ্ঠার ফাঁকে ফাঁকে লেখিকা যেসকটি মূল্যবান কথা বলেছেন; তন্মধ্যে চাঞ্চল্যকর ভাবে নূতন ও মূল্যবান—রবীন্দ্রসঙ্গীতে ছোট ছোট তানপ্রবর্তিত করার ইঙ্গিত। তানের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত অপরূপ মূর্তিপরিগ্রহ করতে সমর্থ হতে পারে, এ বিশ্বাস বহু সঙ্গীত-রসিক মনে মনে পোষণ করেন। —সম্পাদক গল্পভারতী

ষোড়শ বর্ষ ভাদ্র

তৃতীয় সংখ্যা ১৩৬৭

গল্প-ভারতী

সম্পাদকীয়

"এত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনি
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।"

সীতাদেবীর পিতৃভূমি মিথিলায় বসে বিদ্যাপতি পদকীর্তন রচনা করেছিলেন। দ্বারবঙ্গ থেকে সে অপূর্ব পদাবলী কবে কেমন করে বাংলায় প্রবেশ করে জানি না। শুধু জানি রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সেই "বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস" আলোচনা করেছেন ও তন্ময় হয়ে বিদ্যাপতির পদে প্রথম নিজ সুর বিন্যাসও করেছেন :—

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর।"

তাঁর কণ্ঠে এ গান শুনে বশ হয়েছি ও ক্রমশ শিখেছি যে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা—সুরদাস থেকে চণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্য, শঙ্করদেব অর্থাৎ বিহার বঙ্গ কামরূপ (আসাম) অতিক্রম করে উড়িষ্যার ভক্ত রামানন্দ রাওকে পর্য্যন্ত মাতিয়েছিল। পদকর্ত্তাদের অমর কীর্তন আজো উৎকলবঙ্গে ও আসামের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হয়ে তবু প্রাণ জাগে না কেন? দীনদুঃখীর ভগবান কি বধির? মানুষ নয় আমরা যেন অমানুষ হয়ে গেছি। ব্রহ্মপুত্রেই হোক আর যমুনা-গঙ্গা অববাহিকায় হোক, এখানের নরনারী ভক্তিস্রোতে ভেসে এসেছে,—সেই মধ্যযুগের ভীষণ অন্ধকার ও বিজাতীয় নির্য্যাতনের মধ্যেই। কামরূপ, কামাখ্যা থেকে কাশী, বৃন্দাবন ও শ্রীক্ষেত্র—

সবারই তীর্থ জগন্নাথের মন্দির—সবই কি আমরা ভুলতে বসেছি? তাও কি প্রাণের সম্পর্ক নয়—মাত্র রাজনীতির বাঁধন? তেরো বছরের স্বাধীনতা পেয়েও আমরা অমানুষ হয়ে যাচ্ছি কি করে? কেন? ইতিহাস তার উত্তর দেবে। কত সযত্নরচিত ঘর ভেঙেছে—তার সঙ্গে ভেসে গেছে কত সোনার স্বপন—কাঞ্চনমূল্যে যা কেনা যায় না। দেশ কাল ও ভাষাভেদ ভুলে "মহাজন পদাবলী" আমাদের শুনতে হবে—শোনাতে হবে। তবেই দুঃখঅভিসারের শেষ হবে—হয়ত এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

"ভাষাসঙ্গম"

জাতীয় স্বাধীনতা লাভের যুগে (১৯৪৭-৪৮) বন্ধুবর সাহিত্যিক—নেতা শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সী (K. M. Munshi) দিল্লীর ভাষাসঙ্গমে একদিন আমায় সভাপতিত্ব করতে আহ্বান করেন। বাংলার মানুষ বলে আমি প্রথমেই আহ্বান করি সিন্ধিভাষার কবিকে যিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় জানান তাঁর প্রাণের কথা যে, তাঁদের সাহিত্য ও ভাষা আছে কিন্তু সিন্ধুদেশ নাই (সিন্ধুদেশ বর্তমানে পাকিস্তান কবলিত)। আবার বিশাল অন্ধ্রের তেলেগু ভাষাভাষী বহু নরনারী অধুনা নির্দ্ধারিত বহু রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছেন। এই রকম বহু সমস্যাই প্রকট হয়ে উঠেছিল বারো বছর আগেকার ভাষা-সঙ্গমে। সেখানে বলেছিলাম—ভালবাসা ও ভক্তিস্রোতে ভেসে গেছে কত ভাষার ব্যবধান, দেশ ও কালের কূল ছাপিয়ে মানব ঐক্যের চিরন্তন বাণী প্রচার করে গেছেন ১৫ শতকের গুরু নানক ও মহাপ্রভু চৈতন্য। পরবর্তীকালে নিখিল ভারতীয় ঐক্যপ্রসারে আমরা পাই কবীর, দাদূ, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ ও রামমোহনকে। তাঁদের প্রেরণাই এখন আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, কারণ ভাষাকে উপলক্ষ্য করে ভাই ভাই বিচ্ছেদ সৃষ্টি হচ্ছে এক "মহাভারত" পরিবারের মূল সত্যটিকে ভুলে। শ্রীহট্ট বংশজ শ্রীচৈতন্য ও কামরূপের শঙ্করদেব বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় যে ভক্তিস্রোত বইয়েছিলেন তার প্রভাব সারা ভারতে পড়েছিল। মিথিলার বিদ্যাপতি কেমন বাঙালীর প্রাণের ঠাকুর হয়েছিলেন তার প্রমাণ এখানে একটু দিয়ে যাই;

"বিদ্যাপতি-বিরচিত পদাবলী অপেক্ষা প্রাচীন রচনা এ পর্যন্তও আমাদের নয়নপথে পতিত হয় নাই। এই নিমিত্ত ইঁহাকেই আমরা বঙ্গ-কবিকুলের আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করি।"* (শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সংকলিত "বাঙ্গলা সাহিত্য সংগ্রহ" ১৮৭২ পৃষ্ঠাব্দ) ঐতিহাসিক ভ্রান্তি থাকলেও উক্তিটির অন্তর তাৎপর্য্য আছে, সেটি বুঝিয়েছেন সুসাহিত্যিক শ্রী হরপ্রসাদ মিত্র তাঁর "কবিতার বিচিত্র কথা" গ্রন্থকে (১৯৫৭)। এমনি গভীর গবেষণা ও মৈত্রী ভাবনা বাংলা তথা অন্য দেশীয় সাহিত্যে জাগুক এই আজ আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

---

* দ্বারবঙ্গ (মিথিলা) ও বঙ্গ সেকালে কত গভীর আত্মীয়তায় কত কাছে এসেছিল তার প্রমাণ বাংলা ভাষায় বিদ্যাপতির বহুল প্রকাশে। সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয় সরকার, রবীন্দ্রনাথ ও নগেন গুপ্ত প্রভৃতি আর্থিক বিদ্যাপতিভাষ্য রচনা করে গেছেন।

সুখ

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫

জানতুম সেই বিয়ের ব্যাপারের পর থেকে মাসিমা আমার উপর অপ্রসন্ন। কিন্তু অবাক হয়ে আবিষ্কার করলুম যে, প্রয়াগে কেবল গঙ্গাযমুনা নয়, অন্তঃসলিলা ফল্গুও প্রবহমান। মাসিমা আমার ওপর আপত্তি কানে তুললেন না। স্টেশনে লোক পাঠিয়ে মালপত্তর আনিয়ে নিলেন।

মাসিমারও পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি ও তাঁর মতো কয়েকজন মহিলা মিলে একটি মণ্ডলী করেছেন। তাঁদের কাজ হলো রাজবন্দীদের পরিবারের তত্ত্ব নেওয়া, নির্যাতিতদের জন্যে চাঁদা তোলা, উৎপীড়িতদের আদালতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। এর দরুন তাঁদের সরকারী মহলের বিষ নজরে পড়তে হয়েছে। মাসিমা নিমন্ত্রণ করলে কেউ তাঁর বাড়ীতে আসেন না, আসতে সাহস পান না। পাছে রিপোর্ট যায় যে রাজদ্রোহী। তাঁকে বা মেসোমশায়কেও কোথাও নিমন্ত্রণ করা হয় না। ব্যতিক্রম কেবল অধ্যাপক মহল।

"অন্যায় তো আমরা কিছু করিনি বা করছিনে। মানুষের প্রতি মানুষের যেটুকু কর্তব্য শুধু সেইটুকু করতে চেষ্টা করছি। তার দরুন যদি কষ্ট পেতে হয় পাব। কিন্তু রাঙা চোখ দেখে পেছিয়ে যাব না। কালো মানুষের রাঙা চোখ দেখলে হাসিও পায় আমার। ছি ছি! বিদেশীর কাছে এমন করে দাসখৎ লিখে দিতে আছে!" মাসিমা ধিক্কার দেন।

"তা হলেও, মাসিমা, একটু সাবধান হওয়া ভালো। মেসোমশায়ের পেনসন—" কথাটা আমি শেষ করবার আগেই মাসিমা কেড়ে নেন।

"সেইখানেই তো বাধছে। নইলে আমিও প্রমাণ করে দিতুম ভারতের বীরাঙ্গনারা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। জানো, দেবপ্রিয়, ওরা গ্রামকে গ্রাম ঘেরাও করে লোকগুলোকে পশুর মতো গুলী করে মেরেছে। ওঃ! আমরা অসহায়। আমরা দেশশুদ্ধ লোক অসহায়। জবাহরকে যে কোথায় চালান দিয়েছে কেউ বলতে পারছে না। শুনছি নাকি দক্ষিণ আফ্রিকায়। বেঁচে আছে কি না কে জানে! হাঁ, ওরা সব পারে। যেমন তোমার জাপানী তেমনি তোমার ইংরেজ।"

আমি যে পাগল হবার ভয়ে পালিয়ে এসেছি সে কি এইসব শুনতে! তা হলে তো আবার পাগল হতে হয়। গান্ধীজী অসহায় বলেই তিন সপ্তাহ অনশন করে জগতের দরবারে তাঁর আক্ষেপ জানালেন। আমিও অসহায়। কিন্তু আমার তো অনশন করার ক্ষমতা নেই। দিন তিনেক চালিয়েছিলুম তার পর থেকে সে ভার যোগ্যতরদের উপর অর্পণ করেছি।

মেসোমশায়ের ঘরে গিয়ে দেখি তিনি আপন কাজে তন্ময়। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো স্থির। ধ্যানীবুদ্ধের মতো আত্মলীন। তাঁর ভাস্বর মুখমণ্ডল ঘিরে অদৃশ্য একটি আভামণ্ডল। আমি তার তপোভঙ্গ করিনে। এক কোণে আসন নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। পকেট থেকে কাগজ পেনসিল বার করে আঁকি।

"এই যে, নির্মল, কখন এলে?" মেসোমশায় আমাকে প্রথমটা চিনতে পারলেন না। তারপর বললেন, "ও! দেবপ্রিয়! কখন থেকে বসে আছো? আমি ভাবছি নির্মল। আমার ইনস্টিটিউটের সহকারী। আসবে একটু পরে। আলাপ করে খুশি হবে।"

"আপনার জীবনের পুনরারম্ভ দেখে আরো খুশি হচ্ছি, মেসোমশায়।" বললুম তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে।

যে ফসল ফলাতে ছ'মাস লাগে তাকে তিন মাসে ফলানো যায় কি না এই নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা। তা যদি সম্ভব হয় তবে বছরে চার বার ফসল ফলবে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের পেট ভরবে। তিনি বললেন, "এই তোমার মন্বন্তরের ওষুধ।"

"মেসোমশায়", আমি বললুম, "এই তা হলে আপনার প্রশান্তির সীক্রেট। আমি যে এদিকে পাগল হয়ে গেলুম চারদিকে অনাসৃষ্টি দেখে দেখে।"

তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন, "অনাসৃষ্টির উত্তর সৃষ্টি। যেমন অনাবৃষ্টির উত্তর বৃষ্টি। ওরা যেমন তোমাকে পাগল করে দিচ্ছে তুমিও তেমনি ওদের সুস্থ করে দেবে। কার জোর বেশী? ওদের না তোমার? পাপের না পুণ্যের? কুশ্রীতার না সৌন্দর্যের? ওরা যদি চলে ডালে ডালে তো তুমি চলবে পাতায় পাতায়। অন্যায়ের উপর ন্যায় একদিন জয়ী হবেই। অসত্যের উপর সত্য। কিন্তু পালিয়ে আসা তো কোনো সমাধান নয়। ওদের আওতা থেকে তুমি যেমন বাঁচলে তেমনি তোমার আওতা থেকে ওরাও তো বঞ্চিত হলো। সেটা কি ওদের পক্ষে ভালো হলো?"

আমি গলে গেলুম। বললুম, "আমার যদি জানা থাকত প্রশান্তির সীক্রেট!"

"ওরে দেবপ্রিয়," তিনি বললেন কারুণ্যের সঙ্গে, "যা দেখছ তা নয়। আমার মতো অশান্ত আর কে? দেশ আমার পরাধীন। স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছে। আমি যোগ দিতে পারছি কই? রেডক্রসের কাজ করছেন আমার গৃহিণী। সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য। তার বেশী কী আর করতে পারি দেশকে স্বাধীন করতে? ভিতরে ভিতরে জ্বলছি। গান্ধী তাঁর সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেবার সময় চমৎকার একটি কথা বলেছিলেন। চারদিকে যখন আগুন জ্বলছে তখন আগুনে ঝাঁপ দিয়েই শীতলতা। আমি তাঁর উক্তির নীর বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু নিয়েছি। রাজনৈতিক কর্মপন্থা ছেড়ে নৈতিক কর্মপন্থা। আগুন জ্বলছে। আমিও জ্বলছি। প্রাণ আমার শীতল। আঃ কী ঠাণ্ডা!"

তিনি যে জ্বলছেন তার আঁচ আমার অঙ্গেও লাগছিল। নিবাত নিষ্কম্প যে দীপশিখা সেও তো জ্বলতে জ্বলতেই নিবাত নিষ্কম্প।

মেসোমশায় বলতে লাগলেন, "তোমার মাসিমাকে বলি, আজকের পৃথিবীতে তুমি সুখ দেখছ কোথায়? সুখ চাইলেই কি সুখ মেলে? সুখ পেলেও কি সুখ ভোগ করতে লজ্জা করবে না? যেখানে এত দুঃখ। এত অসুখ। মাসীকে বলি, এমন কিছু কর যাতে মানুষ বাঁচে, যাতে মানুষ সুখী হয়। তা হলে তুইও বাঁচবি, তুইও সুখী হবি। যে বাঁচায় সেই বাঁচে। যে সুখী করে সেই সুখী হয়। তোমাকেও বলি, পালিয়ে তুমি যাবে কোন স্বর্গে। সর্বত্র এই একই দুঃখ, একই অসুখ। নাম রূপ ভিন্ন। ইউরোপে জন্মালে কি তুমি এতদিন বেঁচে থাকতে? থাকলে হয়তো এতদিনে যুদ্ধক্ষেত্রে কি বন্দিশালায় কি পাগলা-গারদে। স্বাধীনতা নেই বলে আমরা অশান্ত। কিন্তু স্বাধীনতা থেকেও তো ওরাও অশান্ত। তা হলে মানুষ কী চায়? কী পেলে মানুষ শান্ত হবে?"

আমি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। কোনো দিন এ নিয়ে চিন্তা করিনি। প্রতিধ্বনি করলুম, "কী পেলে মানুষ শান্ত হবে?"

মেসোমশায় ভাবাকুল স্বরে বললেন, "এক এক বয়সে এক এক উত্তর দিয়েছি। এই তো কিছু দিন আগে বলতুম, ঈশ্বরকে। এখন মনে হচ্ছে ঈশ্বরকে পেলেও মানুষ শান্ত হবে না। তা হলে কি ঐশ্বর্যকে পেলে শান্ত হবে? তাই যদি হতো তবে বুদ্ধ কেন গৃহত্যাগ করলেন? সেন্ট ফ্রান্সিসও তো বড়লোকের ছেলে। না, এটা একটা উত্তরই নয়। যম নচিকেতার কাছে এই প্রস্তাবই করেছিলেন। নচিকেতা প্রত্যাখ্যান করেন। ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যো। আছে আর কোনো উত্তর। যা পেলে এক নিমেষেই এ লড়াই থেমে যেতো।"

একটিমাত্র উত্তর আমার মনে আসছিল। মানুষ চায় মানুষেরই প্রেম। জগতে যা সবচেয়ে দুর্লভ। রাশিয়ানদের প্রেম পেলে জার্মানরা নিরস্ত্র হতো, জার্মানদের প্রেম পেলে রাশিয়ানরা নিরস্ত্র হতো। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে রাশিয়ান জার্মানকে ও জার্মান রাশিয়ানকে ভালোবাসলেও জাতিগতভাবে ভালোবাসতে শেখেনি। বরং আরো ঘৃণা করতে শিখছে। জাতিদের দিনকের দিন অরো নিবিড় হচ্ছে। যুদ্ধে হারজিৎ অনিশ্চিত, কিন্তু জাতিদের সুনিশ্চিত। একালে একজন মহাপুরুষকেই জাতিগতভাবে ভালোবাসার শিক্ষা দিতে দেখি। একটিমাত্র দেশেই। কিন্তু বুকে হাত রেখে বলতে পারিনে যে গান্ধীর শিক্ষা আমরা গ্রহণ করেছি। অহিংসার উপর আস্থা আগে যেটুকু ছিল এখন সেটুকুও নেই।

আমার মুখে এসব কথা শুনে মেসোমশায় বললেন, "গান্ধীকেই সাক্ষ্য দিয়ে যেতে হবে। ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। প্রেম ব্যক্তিগত থেকে জাতিগত হবে যদি প্রথমে একজনের অন্তরে জয়ী হয়। গান্ধী তো হেরে যাননি। না গেছেন?

আমি আবেগস্বরুদ্ধকণ্ঠে বললুম, "না। তিনি হেরে যাননি। নইলে এতগুলি দিনের অগ্নিপরীক্ষায় মারা মহাত্মা গান্ধীকী জয়!"

"তুমি আমার জীবনের পুনরারম্ভ দেখছ বলছিলে," মেসোমশায় অন্য প্রসঙ্গে গেলেন,

"পুনরারম্ভ অত সহজ নয়। কাজটা মনের মতো, স্থানটা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম প্রাণকেন্দ্রের অন্যতম, স্মৃতি তিন হাজার বছর পেছিয়ে যেতে কোথাও ছেদ পায় না, ভারতের প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকে অসংখ্য নরনারী আসে ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করতে—যেমন আসত তিন হাজার বছর আগে, যেমন এসেছে তিন হাজার বছর ধরে। ভারতীয় সভ্যতার মূলস্রোতে অবগাহনের আনন্দ আমারও প্রতি অঙ্গে। তা হলেও পুনরারম্ভ এ নয়। আমি চাই এমন এক সরোবরে স্নান করতে যা আমাকে নতুন করে দেবে, তরুণ করে দেবে। সামনে যে আরো তিন হাজার বছর রয়েছে। স্বপ্ন দেখতেহবেবে।" বলতে বলতেতাঁর নয়নে স্বপ্ন নেখে এল ভাবী ভারতের।

তাঁর দিকে চেয়ে মনে হলো আমিই তাঁর তুলনায় বৃদ্ধ। কারণ আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীন। আমি তো সামনের ত্রিশ বছরের বেশী দেখতে পাইনে। তার সমস্তটা জুড়ে এই শতাব্দীর অভিনব থার্টি ইয়ার্স ওয়ার। এ যুদ্ধ কি ত্রিশ বছরের আগে থামবে? থামলেও ধোঁয়াতে থাকবে তার আগুন। আবার একদিন জ্বলে উঠবে। যতদূর দৃষ্টি যায় আমি শুধু দেখতে পাই অনর্থ আর অনাসৃষ্টি, পতন আর ভাঙন। আমি শুধু দেখতে পাই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয় আর অপচয়। স্বপ্ন দেখতেও আমি ভয় পাই। সারা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে স্বপ্ন দেখেছিল ইউরোপের মানুষ। তার পরিণাম হলো সারা বিংশ শতাব্দী ধরে সংগ্রাম আর সংঘাত আর বিপ্লব আর ধ্বংস।

মেসোমশায় তা শুনে বললেন, "তোমার সব কথা মেনে নিলেও এই হচ্ছে ছবি আঁকবার স্বপ্ন দেখবার ধ্যান করবার সময়। বীজ বুনতে হলে বুনতে হয় এই দুদিনেই। একটা যুগের বা একটা শ্রেণীর পতনকেই তুমি মানবসভ্যতার বা ভারতসভ্যতার পতন বলে চাল ছেড়ে দিয়ো না। সেখানে সভ্যতার যথার্থ ভিৎ সেখানে কড়ের দাপট পৌঁছয় না। সত্য বা সৌন্দর্য বা প্রেম তার দ্বারা একটুও টলে না। আমি থাকব সত্য নিয়ে, তুমি থাকবে সৌন্দর্য নিয়ে, গান্ধী থাকবেন প্রেম নিয়ে। কে আমাদের কী করতে পারবে? সাধককে দুঃখও সাহায্য করে।"

মালারও পরিবর্তন হয়েছিল। এই এক বছরে সে অনেকখানি বেড়েছে। ছিল বালিকা হয়েছে নারী। তার মনের নাগাল পাওয়া ভার। কেবল আমার পক্ষে নয়, তার জননীর পক্ষেও। তিনি একদিন আমাকে বলছিলেন যে তাঁর মেয়ে তাঁর কাছে মন খোলে না। মেয়ের মন জানতে হলে যেতে হয় তার সখীদের দ্বারে। সখীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় মনোরমা কওল। কাশ্মীরী। একদিন সেই মনোরমার সঙ্গেও আমার আলাপ হয়ে গেল। ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। ফরওয়ার্ড মেয়ে। পরে সালোয়ার কামিজ ও চুড়ি। মালাও তাই ধরেছে। ঘোরে সাইকেলে চড়ে। তাও লেডিজ সাইকেল নয়। মালাও তাই করে। তবে ওর যেমন বব করা চুল মালার তেমন নয়। বেণী আছে।

মালাকে একদিন নিভৃতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, "আচ্ছা, মালা, এখনো কি তুমি বিশ্বাস কর যে এটা রূপকথার জগৎ?"

মালা চমকে ওঠে। প্রশ্নটা তার প্রত্যাশাতীত। বলে, "কার কাছে শুনেছেন এ কথা? নীলির কাছে?" তার পর ধীরে ধীরে মন খোলে, "হাঁ, দেবুদা, এখনো আমি বিশ্বাস করি যে এটা রূপকথার জগৎ।

"বল কী!" আমারও চমক লাগে। "এত বড় বিপর্যয়ের পরেও! কলকাতার বাড়ীখানা নীলাম হয়ে বিকিয়ে গেল। এলাহাবাদে এসে আশ্রয় নিতে হলো। তবু তুমি বলবে এটা রূপকথার জগৎ। তাই যদি হবে তো এই সব যুদ্ধ বিপ্লব মন্বন্তর এ জগতে কেন?"

"রূপকথা পড়েননি?" মালা বলে বিস্ময়ের সঙ্গে বিষাদ মিশিয়ে, "তাতেও দেখবেন রক্তের নদী হাড়ের পাহাড়। রাক্ষস রাক্ষসী। নিষ্ঠুর রাজা। ডাইনী রাণী। নিরীহ শিশুর প্রাণনাশ। উঃ! কী নেই তাতে!" মালা শিউরে ওঠে, তার পরে সামলে নিয়ে বলে, "তা সত্ত্বেও সেটা রূপকথার জগৎ। সে জগতে সুন্দর আছে। রাজপুত্র আছে। সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। আর বিভীষিকার সঙ্গে লড়াই করে। আর জেতে। আর অমনি সব ঠিক হয়ে যায়। সংসারে সুখ ফিরে আসে। মরেছে যারা তারাও বেঁচে ওঠে।"

এই সরল নিষ্ঠি মেয়েটিকে আমি কেমন করে বোঝাব যে, সেই সব রক্তের নদী আর হাড়ের পাহাড় যদিও আছে, সেই সব রাক্ষস রাক্ষসীও আছে যদিও, নিষ্ঠুর রাজা আর ডাইনী সওয়াগর যদিও রয়েছে, তবু আজকে এ জগতে রাজপুত্র নেই, থাকলেও সে লড়াই করে না, লড়াই করলেও সে জেতে না, জিতলেও সব অমনি ঠিক হয়ে যায় না। লড়াই একটা বাধে বইকি, কিন্তু তার মধ্যে রাজপুত্র কোথায়! জয় একটা ঘটে বইকি। কিন্তু তার মধ্যে মহত্ত্ব কোথায়! শান্তি ফিরে আসে না, সুখ ফিরে আসে না। মরেছে যারা তারা মরে বেঁচেছে। বেঁচে ওঠার প্রস্তাব করলে তারা বলবে, "বাঁচিতে চাহি না আমি কুৎসিত ভুবনে।"

মালা তার ডাগর দুটি চোখ আকাশের দিকে তুলে আপন মনে বলে যায়, "আমার কেমন যেন বোধ হয় আমি কোনো এক রূপকথার ভিতর দিয়ে চলেছি। ঘটনাগুলো রূপকথার ঘটনার মতো লাগছে। যুদ্ধ আর বিদ্রোহ মন্বন্তর সব যেন রূপকথার ঘটনা। সুন্দর আর অসুন্দর আর সু আর কু সব যেন আমার

চেনা চেনা ঠেকছে। মনে হচ্ছে এ কাহিনীটা আমার জানা। খুব একটা নতুন কিছু নয় যে উত্তেজিত হব।"

আমি আশ্চর্য হয়ে সুধাই, "কোন কাহিনী, বলত?"

মালা নির্বিকারভাবে উত্তর দেয়, "অরুণ বরুণ কিরণমালা। কিরণের মতো আমিও চলেছি মায়া-পাহাড়ের পথে। দুর্গম পথ। পাথরের পর পাথর। যত সব পথিক রাজপুত্র। পথে প্রাণ দিয়েছে। আনতে হবে মুক্তা ঝরার জল। সে জল ছিটিয়ে দিলে ওরা বাঁচবে। আনতে হবে সোনার শুকপাখী। সে পাখী ঘরে নিয়ে ওরা সুখী হবে। পারব কি আমি আনতে? পারব কি ওদের বাঁচাতে সুখী করতে? না ওদেরি মতো পাথর হয়ে যাব।"

যা ভয় করেছিলুম তাই। ওর নাম যে কিরণমালা থেকে মালা। মনে ছিল না বলে জিজ্ঞাসা করি, "কেন ওরা পাথর হয়ে যায়? ওই সব পথিক রাজপুত্র?"

"জানেন না?" মালা বলে তার সুন্দর চোখ দুটি আমার চোখে রেখে, "ওরা ভুলে যায় যে পিছন ফিরে তাকালেই পাথর হয়ে যাবে। যেই পিছন ফিরে তাকিয়েছে অমনি পাথর হয়ে গেছে।"

"কিন্তু কেন পিছন ফিরে তাকায়?" আমার মনে পড়ে না বলে সুধাই।

"ওঃ! আপনার মনে নেই বুঝি!" কাহিনীটার যেই স্মরিয়ে দেয় মালা। বলে, "ওরা জানত যে পিছন ফিরে তাকালেই পাথর হয়ে যেতে হবে। তবু ওরা কেউ বা ভয় পেয়ে কেউ বা প্রলোভনে ভুলে কেউ বা আর্তনাদ শুনে করুণায় গলে গিয়ে পিছন ফিরে তাকায়। আর অমনি মায়াপাহাড় ওদের পরাস্ত করে।"

হাঁ। আমার মনে পড়ে। কিন্তু বুঝতে পারিনে আমি কী ওর তাৎপর্য। জানতে চাই। "তার পর, মালা। ওই যে সব রাজপুত্র ওরা কারা?"

"ওরা কারা?" মালা আমার প্রতিধ্বনি করে। "ওরা এই যুগের সাধারণ সৈনিক। ওদের মধ্যে অহিংসাবাদী সৈনিকেরাও আছে। ওদের কার কী দেশ বা রাষ্ট্র, কার কী জাত বা ধর্ম, কার কী মতবাদ বা আদর্শ সেসব আমার গণনা নয়। আমি দেখতে পাই সকলেই ওরা যে যার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। বেশীর ভাগই পথের মাঝখানে প্রাণ দিয়েছে বা দেবে। যুদ্ধশেষে ফিরবে যারা তারাই বা কী হাতে করে ফিরবে? সে কেরাটা কি মুক্তা ঝরার জল আর সোনার শুকপাখী নিয়ে ফেরা? তা যদি না হয় তবে আবার তাদের যাত্রা শুরু হতে হয়। লড়াই করতে হয়। আবার প্রাণ দিতে হয় পথের মাঝখানে।"

আমি অবাক হই। মালাও তা হলে এত কথা ভাবে। ওই একরত্তি মেয়ে। ওর এত কথা মনে আসে। না, একরত্তি মেয়ে নয়। এখন কত বড় হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকেই পিতার তপোবনে বাধাহীনভাবে বেড়েছে। অরিজিনাল ভাবে মানুষ হয়েছে। শুধু বড় হয়েছে তা নয়। বড় হয়েছে।

সবাই তো আজকাল চুল চেরা বিশ্লেষণ করে। মানুষের সঙ্গে মানুষের কোথায় অমিল, কেন অমিল। কারা কাসিষ্ট, কমিউনিষ্ট কারা, কারা ইম্পিরিয়ালিষ্ট, কারা গান্ধীবাদী। মানুষে মানুষে মিল দেখছে কে? সে ওই মালা। ওর কাছে অমিলটা তুচ্ছ।

কিন্তু আমার কাছে তো নয়। আমি কেমন করে সায় দিই? আমি বলি "মালা মুক্তা ঝরার জল কিন্তু সকলের জন্যে নয়। তুমি যদি কিরণমালা হতে তা হলে হয়তো করুণা করে নাট্সীদেরও বাঁচাতে। তা হলে কী সর্বনাশ হতো বল দেখি!"

মালা বলে তন্ময়ভাবে, "মুক্তা বরার জল যদি সত্যি পাই তা হলে আমি কার্পণ্য করব না। বাছ-বিচার করব না। যতগুলো পাথর দেখব প্রত্যেকটার গায়ে ছিটিয়ে দেব। তা ছাড়া পাথরগুলো যদি পাশাপাশি পড়ে থাকে একটার গায়ে ছিটোনো জল আরেকটার গায়েও লাগবে। এড়ানো যাবে না। পাথরের রূপ দেখে চিনবই বা কী করে, কে নাটুসী কে নয়।"

এ যুক্তির উত্তর নেই। তবু আমি ভাবতেই পারিনে যে মুক্তা বরার জল সকলের জন্যে। মানবের পক্ষে দানবের জন্যেও। বলি, "মালা, তুমি যাকে বাঁচাবে সে যদি আর পাঁচজনকে বাঁচতে না দেয় সে যদি হয় কালসাপ, তা হলে তাকে বাঁচানো মানে তো আর পাঁচজনকে মারা। তখন তুমিই হবে তাদের মৃত্যুর নিমিত্ত। না, মালা, মুক্তা বরার জল সকলের জন্যে নয়। আর সোনার শুকপাখী। সেও কি সকলের জন্যে? যারা আর দশজনকে অসুখী করবার জন্যেই বাঁচে সেই সব ভাইনী সওদাগরদের হাতে সোনার শুকপাখী দিলে কি তারা পাখীটার ঘাড় মটকিয়ে সোনাটাকে মুনাফায় খাটাবে না? আর-দশজনকে অসুখী করবে না?"

মালা টলে না। বলে, "সে ভাবনা কিরণমালার নয়। সে ভাবনা ভাবলে মুক্তা বরার জল আনতে যাওয়া হয় না। গেলেও সে যাওয়া নিষ্ফল।"

"মালা", আমি তারই ভালোর জন্যে বলি, "শুনেছি কিরণমালা থেকে মালা তোমার নাম। তা বলে কিরণমালার মতো তুমি কেন যাত্রা করবে নিশ্চিত বিপদের হানা এলাকায়? কার কী তোমার মুক্তা বরার জল সোনার শুকপাখী আনতে গিয়ে!"

"ওসব তবে আনতে যাবে কে? অরুণ বরুণ তো নেই। আপনি?" মালা আমার দিকে তাকায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

"আমি!" আমি হকচকিয়ে যাই। আমি গেলে যদি মালার যাওয়া বন্ধ হয় তা হলে আমি যেতে রাজী। কিন্তু আমি যে স্বীকারই করিনে এটা রূপকথার জগৎ বা এখানে মুক্তা বরার জল সোনার শুকপাখী খুঁজলে মেলে। অবিশ্বাস নিয়ে যদি রওনা হই তবে অরুণ বরুণের মতো আর ফিরে আসব না। তখন মালাকেই বাহির হতে হবে।

"আমি!" আমি সামলে নিয়ে বলি, "না, মালা। আমি নয়।"

"তা হলে" মালা বলে মলিন মুখে, "কিরণকেই যেতে হয়। তার নিয়তি।"

আমি মেনে নিতে পারিনে। আবেগের সঙ্গে বলি, "এত বড় জগতে আর কেউ কি নেই? যার খুশি সে যাক। তুমি কেন যাবে? তোমার বয়সের তরুণীদের মতো তুমিও হাসবে খেলবে আমোদ আহ্লাদ করবে। ভালোবাসবে বিয়ে করবে সুখী হবে।

"ওঃ! এই আপনার সুখের সূত্র!" মালা হেসে ওঠে। তার চোখে বিজলী ঝলক।

তার চোখে চোখ রেখে আমার চকিতে মনে হয় এ মেয়ে ভালোবাসা কাকে বলে জানে। এলাহাবাদে এসে মালার যে পরিবর্তন হয়েছে এই তার সঙ্কেত। মালা প্রেমে পড়েছে।

কেন জানিনে আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে পারলুম না। ভুলে গেলুম কী ওর জিজ্ঞাসা। এই তো একটু আগে ওকে বলছিলুম ভালোবাসতে বিয়ে করতে সুখী হতে। তাও গেলুম ভুলে। আমার অন্তর তখন উদ্বেল। মালা প্রেমে পড়েছে। কে জানে কে সেই ভাগ্যবান যার প্রেমে পড়েছে। সে কি নির্ধন? না, জানতে চাইনে। জানতে আমার প্রবল অনিচ্ছা।

আকাশে রামধনু দেখলে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের হৃদয়টা নেচে উঠত। যেমন ছেলেবয়সে তেমনি

যুবাবয়সে তেমনি বুড়োবয়সে। আমার হৃদয় নেচে ওঠে যখন শুনি কোনো মেয়ে বা কোনো ছেলে প্রেমে পড়েছে। সম্পূর্ণ অহেতুক আমার পুলক। যেমন কিশোরকালে তেমনি প্রথম যৌবনে তেমনি মধ্যযৌবনে। আমার সঙ্গে যার শত্রুতা আছে এমন কোন যুবক প্রেমে পড়েছে শুনলে আমি শত্রুতা ভুলে গিয়ে অকারণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হই। সে হয়তো খবরই রাখে না যে আমি আমার মনে মনে তার সুখ কামনা করছি। মনে মনে বলছি, সুখী হোক, সুখী হোক বিটকেলটা। রামকেলটা সুখী হোক।

প্রেমের সঙ্গে সুখের কী সম্পর্ক? বৈষ্ণব কবি বলে গেছেন, "সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ আসে তার ঠাঁই।" তাঁর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করতুম, "আজ্ঞা, গোসাঁই ঠাকুর, দুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি কী আসে তার ঠাঁই।" তিনি বোধহয় ঝাঁপরে পড়ে বলতেন, "সুখ।" তা হলে সুখী হবার কৌশলটা শিখে নিতুম দুঃখের ভিতর দিয়ে গিয়ে। দশ বছর দুঃখ পেলে যদি এক বছর সুখ মেলে তো তাতেই আমি রাজী।

কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় সে রকম বলে না। সুখের জন্যে আমি ভালোবাসিনি। তবে ভালোবেসে সুখ পেয়েছি। আর পেয়েছি দুঃখ। মালাও কি দুঃখ পাবে? কে জানে। হয়তো পাবে। তা হলে কেন বলি ভালোবাসতে বিয়ে করতে সুখী হতে? একটার সঙ্গে আরেকটার শাশ্বতকাল সম্পর্ক কী? কিছুই না। এমনি ওটা একটা কামনা, একটা আশা। সব মানুষের অন্তরের বাসনা ভালোবেসে বিয়ে করা, বিয়ে করে সুখী হওয়া।

"কী বলছিলে, মালা? সুখের সূত্র আমার এই?" মনে পড়ল তার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে সে নীরবে অপেক্ষা করছে। তার চোখে স্থির প্রদীপের আভা।

"কত রকম সুখ আছে জীবনে। এই যেমন রামধনু দেখে সুখ। আবার রামধনু এঁকেও সুখ। আমার নিজের খেয়ালের রামধনু। প্রকৃতির প্রতিকৃতি বা অনুকৃতি নয়। সুখের কি সংখ্যা আছে না সংজ্ঞা আছে? কিন্তু সব বলার পর যা বাকী থাকে তা এই।" আমি আর খোলসা করতে পারিনে। ইঙ্গিতে বোঝাই।

"তা এই?" মালা বোঝে। শুধু নিশ্চিত হতে চায়।

"তা এই?" আমি নিশ্চয়তা দিই।

মালা উঠে দাঁড়ায়। বলে, "সোনার শুকপাখী আনতে যেতে হবে এ কথাটাও বাকী। যাতে সকলের সুখ তাই তো সুখ।"

শুনে চমক লাগে। ব্যথাও লাগে। মালা যে সকলের সুখের জন্যে মায়াপাহাড়ের বিভীষিকার অভিমুখে নিঃসঙ্গ যাত্রা করবে এ কি আমি সমর্থন করতে সহ্য করতে পারি? না, না। আমার একটুও ভালো লাগে না এ কথা ভাবতে। অথচ কী এমন উপায় আছে যা দিয়ে আমি ওর গতি রোধ করতে পারি, ওর মতি পরিবর্তন ঘটাতে পারি। সাধ্য যদি কারো থাকে তবে তা ওর প্রেমাস্পদের। আমার নয়।

কিন্তু ও যে প্রেমে পড়েছে এটা তো আমার অনুমান। এর উপর ভিত্তি করে বলতে কি পারি কিছু? বলা উচিতও নয়। আমি অনধিকারী। আমি কে যে একটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে প্রেম নিয়ে আলোচনা করব। নীলির সঙ্গেও তা করিনি।

বাধিতভাবে পরিহাস করে বলি, "যাদের জন্যে তুমি সোনার শুকপাখীর সন্ধানে যাবে তারা কিন্তু সোনার লক্ষ্মীপেঁচা হাতে পেলেই স্বর্গসুখ পায়। ইহলোকে স্বর্গরচনার যতগুলো পরিকল্পনা দেখি সর্বত্র লক্ষ্মীপেঁচা কী জয়।"

"আপনি তা হলে লক্ষ্মীপেঁচার অন্বেষণে যান।" মালা আমার মুখের উপর ছুঁড়ে মারে এই উক্তি। মেয়েটা পরিহাস বোঝে না।

আরো ব্যথা পাই। বুকে আরো বাজে। আমি শিল্পী। আমি কি ধনের জন্যে ছবি আঁকছি? ধনী হবার এটাও কি একটা পথ? যা আমি বেছে নিয়েছি আমার জীবনে? হায়; কন্যা! কেমন করে তোমায় আমি বোঝাই যে আমার অন্বিষ্ট লক্ষ্মীপেঁচা নয়। নয় শুকপাখীও। আমি যাকে খুঁজে ফিরছি তার নাম সৌন্দর্য। তার প্রতীক নীলপাখী।

সেই যে নির্মল বলে ছেলেটি মেসোমশায়ের সহকারী তার সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার আলাপ জমেছিল। যদিও সে বিজ্ঞানের ঘরানা তবু আর্টের খবরও মন্দ রাখে না। বিশেষ করে সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রকলার। আমার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই আমার কাজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। আমাকে সমীহ করে। তার ধারণা আমি যে ইণ্ডিয়ান আর্টের বিশেষ অংশটার উপর তেমন ঝোঁক না দিয়ে বিশেষ অংশটার উপর দিই সেইটেই ঠিক। বিপরীতটা বেঠিক। ছবি যদি আর্ট হিসাবে না বাঁচে তার স্বদেশিয়ানা কি তাকে তরাবে? নির্মল তাই আশ্চর্য হলো যখন শুনল যে আমি ভারতীয় পরম্পরার মধ্যে নিজের স্থান খুঁজতে বেরিয়েছি। আমি যদি ভারতীয় না হই তো আমি কেউ নই।

ছেলেটি মালার কাছাকাছি বয়সী। কিন্তু বিলকুল অন্য ধাতের। ঘোরতর বাস্তববাদী ও যুক্তিনিষ্ঠ। যেমন বিজ্ঞানের প্রতি তেমনি জীবনের প্রতি তার সমীপবর্তিতার ধারাটা প্র্যাকটিকাল। রূপকথার জগৎ থেকে সহস্র যোজন দূরে। তা বলে আমার জগতের নিকটতর নয়। যেচে আকাল পড়লে সে আমায় মত পালিয়ে বেড়াবে না। ঘটনাস্থলে গিয়ে অনুসন্ধান করবে। রিপোর্ট তো লিখবেই, চাঁদা তুলে লঙ্গরখানা খুলবে ও বহুলোককে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে। বাঁচানোর ওই একটিমাত্র অর্থ সে জানে ও বোঝে। মালার মনের ভূমার তার কাছে রুদ্ধ। কিন্তু এমনিতেই তাদের দু'জনায় খুব ভাব। মালার বন্ধুত্বের জন্যে জালি দিয়ে ঘেরা অষ্টাব্জ ঘরখানা তারই তদারকে গড়া। ডিজাইনটা যদিও মালার নিজের।

দু'জনায় খুব ভাব এলাহাবাদে এসে হয়েছে তা নয়। জাপানীরা যখন ব্রহ্ম আক্রমণ করে তখন নির্মলরা রাতারাতি রেঙ্গুন ছেড়ে উত্তর দিকে পালায়। তারপর হাঁটাপথে ভারতে প্রবেশ করে। সে এক রোমহর্ষক কাহিনী। বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে তাদের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভরসা ছিল না। কে জানে জাপান যদি বাংলা দেশে হানা দেয়। তা হলে তো আবার দৌড়তে হবে। তার চেয়ে বেশ কিছু দূর এগিয়ে থাকা ভালো। এলাহাবাদে তখন বাস করা স্থির হয়। মেসোমশায়রা তখনো সেখানে হাজির হন নি। নির্মল কেবার বলেছিল। মেসোমশায় তাকে উদ্ধার করলেন। সেও হলো তাঁর দক্ষিণ হস্ত। পুরোনো জবটা বাগিয়ে নেওয়া গেল। দুই পরিবারের মধ্যে। মাঝখানে দীর্ঘ একটা ছেদ। সেটা প্রবাসের ও দুর্দিনের কল্যাণে হ্রস্ব হয়ে এলো।

নির্মলকে দেখে বিশ্বাস হয় না যে সে রূপকথার রাজপুত্র। মালা তাহলে তাকে কি মনে করে ভালোবাসবে? ভাব আর ভালোবাসা একই কথা নয়। নির্মলের সঙ্গে আমি অনেক দিন চাঁদায় করে বেড়িয়েছি। সে আমার ও আমি তার গাইড। নতুন এলাহাবাদ আমার অচেনা, তার চেনা। পুরোনো এলাহাবাদ তার অচেনা, আমার চেনা। দেখতে দেখতে তার সঙ্গে আমারও ভাব হয়ে যায়। যদিও বয়সের ব্যবধান মালার তুলনায় বেশী। নির্মলকে বাজিয়ে দেখি সে প্রেমে পড়েনি। মালা যদি তার প্রেমে পড়ে থাকে তবে সেটা এখনো তার অগোচর। মালা তবে কার প্রেমে পড়েছে? নির্মলকে জিজ্ঞাসা করিনে।

করতে অনিচ্ছা জাগে। কে জানে সেও হয়তো আমারি মতো অজ্ঞ। হয়তো আমায় চাইতেও। হয়তো খবরই রাখে না যে মালা কোনো একজনকে ভালোবেসেছে।

এলাহাবাদে আমি থাকতে আসিনি। মেসোমশায়ের প্রতিকৃতি অনুনয়ের অনুরোধে আর কতদিন থাকা যায়। অথচ যেতে আমার পা ওঠে না। খাজুরাহো বড় দূর। একা কেমন করে যাই! সাথী যদি জোটাতে পারতুম একজনকে। নির্মল হলেও মন্দ হতো না। গড়িমসি করি। এমন সময় মালা ছিল আমাকে আঘাত। আমাকে লক্ষ্ণৌয়ের অম্বেষণে যেতে বলে।

এর পরে একদিন নির্মলকে বলি, "খাজুরাহো আমার লক্ষ্য। এলাহাবাদ আমার পথে পড়ে। কিন্তু এখন দেখছি কবে আমার ব্রেক-জার্নির মেয়াদ পেরিয়ে গেছে। নড়তেও পা সরছে না। টাঙ্গায় চড়েই আমি র‍্যাডক্লিফারের সুখ পাই।"

"তা হলে থেকেই যান না, দেবুদা।" মালার দেখাদেখি নির্মলও আমাকে 'দেবুদা' বলে ডাকে। খাজুরাহো সম্বন্ধে তারও যথেষ্ট ঔৎসুক্য। কিন্তু সে এই মুহূর্তে সাথী হতে নারাজ।

"কিন্তু মাসিমার স্নেহমমতার সুযোগ নিয়ে আর বেশীদিন তাঁদের ওখানে থাকা চলে না। মেসোমশায়ের প্রতিকৃতি তো পর্যাপ্ত ঋণশোধ নয়।" বলি একটু কুণ্ঠা সহকারে।

"বেশ তো। আমার ওখানে আপনার জায়গা হবে। মন খুঁৎ খুঁৎ করলে ভাড়া দিয়েবে যা খুশি দেবেন। যতদিন খুশি থাকবেন।" নির্মল বলে উৎসাহভরে।

"না, না, তোমাদের অসুবিধে হবে।" আমি পেছিয়ে যাই। জানি ওর সঙ্গে থাকেন ওর বিধবা মা, বিধবা বোন ও ছোট ছোট দুটি ভাগনে। পাড়াটাও ঘিঞ্জি। বাড়ীটাও পুরোনো। একখানা মাত্র বাথরুম।

নির্মল আমার মুখ দেখে খাঁচ করে বলল, "অসুবিধে আমাদের নয়, আপনারই হবে। পরে ভালো একটা আস্তানা খুঁজে নেবেন।"

বিবেচনা করতে সময় চাই। আশঙ্কার কথা মাসিমার বাড়ী ছেড়ে নির্মলের ওখানে উঠে গেলে তিনি তার অন্য অর্থ করবেন। বিরূপ হবেন শুধু আমার উপর নয়, নির্মলেরও 'পরে। আর কোনো বাসা কি পাওয়া যায় না? সন্ধান নিয়ে দেখি যেখানে যা খালি ছিল বর্ষাওয়ালারা দখল করে বসে আছে। জাপান কবে হারবে, কবে ওরা বর্মায় ফিরে যাবে। তারপর আবার খালি হবে।

তাদের আস্তানাবাদের হেতু ছিল। জাপান আর ভারতের দিকে এগোয়নি। দেড় বছর হল স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। তার গতিগতি দেখে মনে হয় না যে সে ভারতের মাটিতে এসে "যুদ্ধং দেহি" বলবে। ওদিকে দুর্ভিক্ষের উপর নতুন বড়লাটের নজর পড়েছে। এর আগে ছিলেন তিনি জঙ্গীলাট। জঙ্গী ধরনে দুর্ভিক্ষ দমনে লেগে গেছেন। পারবেন বলে ভরসা হয়।

তা হলে কলকাতায় ফিরে যাইনে কেন? একদিন আচমকা এই চিন্তা মাথায় এলো। খাজুরাহো না হয় এযাত্রা বাকী রইল। রইল বাকী রাজস্থান ও পাটনা। বেঁচে থাকলে হবে অন্য কোনো সময়। ভারতীয় শিল্পীগরম্পরা কি চাক্ষুষ দর্শনের অপেক্ষা রাখে? বই পড়ে প্রতিলিপি দেখে কি হয় না? হয় বইকি। নইলে খরচ বাঁচে।

হাঁ, সেটাও একটা ভাববার কথা। আমার আর বয়স নেই যে একবস্ত্রে ভারত বেড়িয়ে আসব আহারনিদ্রা অবহেলা করে। ঘর তত্ত্ব খেয়ে ও খেকে। নির্মলকেই প্রথম জানাই, "ভাবছি কলকাতা ফিরে যাব।"

"সে কী! কলকাতা!" নির্মল আশ্চর্য হয়ে শুধায়, "হঠাৎ?"

"সেখানে," একটু রহস্যময় করে বলি, "লক্ষ্মীপেঁচা থাকে।

"লক্ষ্মীপেঁচা! তার মানে?" সে বিস্ময়বিমূঢ়।

বুঝিয়ে বলি তার মানে। সে হো হো করে হেসে ওঠে। টাঙাওয়ালা পিছন ফিরে তাকায় আমি কিন্তু গম্ভীর।

বলি, "খালি রুটি খেয়ে মানুষ বাঁচে না। কিন্তু বাঁচতে হলে রুটিও চাই। মুক্তা ঝরার জল খেয়ে কি পেট ভরে?"

"তার মানে কী বলো, বেবুন?" নির্মল আবার বিমূঢ় হয়।

আবার বোঝাতে হয় তাকে। এবার কিন্তু তার হাসি পায় না। তার ধোঁকা লাগে।

এবার আমি ভেঙে বলি, "ছেলেবেলায় কে না বিশ্বাস করে যে এটা রূপকথার জগৎ। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সব স্বপ্ন মিলিয়ে যায়। মালার কিন্তু এখনো বিশ্বাস যে আমাদের এটা রূপকথার জগৎ। সোনার শুকপাখী আর মুক্তা ঝরার জল এসব নাকি সত্যি কোনো এক মালা পাহাড়ে গেলে পাওয়া যায়। এসব পাওয়া নাকি খুব জরুরি। যুদ্ধে যারা নিহত হচ্ছে তাদের বাঁচানের জন্যে, বাঁচানোর পর তাদের সুখী করার জন্যে।"

নির্মল স্তম্ভিত হয়ে মন্তব্য করে, "ওয়ান্ডার!"

"যা বলেছ!" আমি তার পিঠ চাপড়ে দিই। আমার বুঝতে বাকী থাকে না যে মালা নির্মলকে বলেনি। বলত না কেন, যদি প্রেমে পড়ে থাকত নির্মলের?

"মালা মেয়েটা বরাবরই আন্‌প্রাকটিকাল।" নির্মল আমাকে শোনায়। "তা বলে এতদূর পাগল!"

"এখন এই পাগলের ভার নেয় কে? বাপ মা থাকতেই এই। কাজেই তাঁরা অপারগ। এখন তুমিই একমাত্র ভরসা।" আমি আঁধারে ঢিল ছুঁড়ি।

"আমি!" নির্মল যেন আকাশ থেকে পড়ে। টাঙা থেকে নয়। কী ভাগ্যি।

বেচারার চেহারা দেখে আমার সংশয়মোচন হয়। না, নির্মল নয়। তবে কে? কাকে মালা দিতে চায় মালা? অশিষ্ট আমার কৌতূহল। কিন্তু অধমা।

"তুমি যদি না হও তবে তোমারি মতো আর কোনো নওজোয়ান। মালা থাকে রূপকথার রাজপুত্র বলে চিনেছে।" আমি ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে তাকাই।

"কই, আমার তো চোখে পড়ে না। এক মনোরমা কওলকেই বার বার দেখি।" নির্মল আমার মনেও ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।

মেসোমশায়ের প্রতিকৃতি সমাপ্ত করে তাঁর সামনে তুলে ধরতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি কে হে, বেবুন? চিনি চিনি মনে হচ্ছে, কিন্তু ঠিক চিনতে পারছিনে।"

এতদিন তাঁকে জানানো হয়নি যে আমি তাঁর প্রতিকৃতি আঁকছিলুম। মাসিমা জানতেন। মালা জানত। কিন্তু তাঁর জন্মদিনে তাঁকে একটা সারপ্রাইজ দেবার মানসে আমরা তিনজনেই চুপ করেছিলুম নির্মলও। কৌশলে আমি তাঁর মুখের আদরা এঁকে নিয়েছিলুম তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁর ল্যাবরেটারিতে বসে।

"ইনি," আমি হাসি চেপে বললুম, "একজন ভারতীয় ঋষি। ঋষির আইডিয়াটাই কোটাতে

চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেকালের ঋষি মন। তাই দাড়িগোঁফ বা জটাজুট নেই। একালের ঋষি ধ্যান করছেন টেস্ট টিউব হাতে নিয়ে। তপোবনে নয়। ল্যাবরেটরিতে।"

এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হলো। তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, "ওহে, আমি নয় তো? হাঁা! আঁকলে কী করে! কবে! কই, সিটিং দিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না। এই দেখ, তোমরা ইমপ্রেসনিস্টরা কী দাংঘাতিক লোক!"

আমরা অবশ্য ইমপ্রেসনিস্ট বলে পরিচয় দিইনে। আমরা পোস্টইমপ্রেসনিস্ট। কিন্তু কী হবে তর্ক করে? মেসোমশায় যে চিনতে পেরেছেন এই ঢের। চেনা দুঃসাধ্য। আমরা তো অনুকৃতি আঁকিনে। আমরা তো ফোটোগ্রাফার নই। আমরা ভাবগ্রাহী।

মেসোমশায় সত্যি খুব খুশি হলেন। তিনি তো বোঝেন এ ধরনের কাজ এ দেশে দুর্লভ। কিন্তু মাসিমার উৎসাহ নিবে গেল। তাঁরও প্রতিকৃতি আমি আঁকি এ রকম একটা প্রত্যাশা তাঁর ছিল। নমুনা দেখে তাঁর চক্ষুস্থির।

কেন আর এলাহাবাদে থাকা! একদিন টিকিট কেটে পূর্বগামী ট্রেনে উঠে বসা গেল। আরো পশ্চিমে যাবার সংকল্প আপাতত পরিত্যক্ত হলো। ভারতীয় শিল্পীপরম্পরার সঙ্গে আমি মনে মনে সন্ধি করেছিলুম। আমিও তাঁদেরি মতো ভারতীয়, আমিও তাঁদেরি মতো শিল্পী, আমিও অন্তরে অন্তরে ভারতীয় শিল্পী অথচ আমি বিংশ শতাব্দীর জীবনের মধ্যে জীবিত, স্পন্দনের মধ্যে স্পন্দিত, গতির মধ্যে গতিমান, বেগের মধ্যে বেগবান। সেইসূত্রেই ইরোপের নিকটতর। এত নিকট যে প্রায় অস্তিত্ব।

কলকাতা ইতিমধ্যে বদলেছে। এ নগরী দিনে দিনে বদলায়। যতবার দেখি ততবার দেখি আর একটু কম পুরাতন, আর একটু বেশী নূতন। মন্বন্তর নিয়ে আর কেউ ভাবছে না। চলতি গুজব আই এন এ। ভারতের মুক্তি বিধাতা নাকি বর্মায় পৌঁছে গেছেন। যে-কোনো দিন স্থলপথে ভারতপ্রবেশ করবেন।

দেখি আমার বন্ধুরা কেউ বসে নেই। আজ একটা বাজার সাগর পার হয়ে এসেছে। মার্কিন সৈনিকরা ভারতীয় ছবির সওদা করছে। দেশে নিয়ে যাবে স্মরণচিহ্ন রূপে। বন্ধুরা তাই ভারতীয় ছবির যোগান দিতে দিনরাত খাটছেন। তার মধ্যে ছবিত্ব না থাক, ভারতীয়ত্ব থাকলেই হলো। আমিও তাদের সঙ্গে ভিড়ে যাই।

এই রোজগারের মরসুমে আমি আর কোনো দিকে তাকাবার অবসর পাইনি। না লিখেছি চিঠি না দিয়েছি চিঠির জবাব। খোঁজ নিইনি মেসোমশায়রা কেমন আছেন। মালা কী করছে। তার মায়াপাহাড় যাত্রার কতদূর। তার ভালোবাসার কী খবর।

যুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি। তবে তার ফলাফল একরকম জানা গেছে। কলকাতা নিরাপদ। তার চেয়ে বড় কথা প্যারিসের মুক্তি আসন্ন। আমি এ ক'বছরে যা জমিয়েছিলুম তা দিয়ে জাহাজের প্যাসেজের বাসনা করলুম। যুদ্ধের পর প্রথম জাহাজে যারা যাবে তাদের মধ্যে থাকবে আমার নাম। জানি একবার প্যারিসে পৌঁছতে পারলে আর সব আপনি হবে। আঃ! কত বড় একটা বাঁচোয়া যে বিয়ে করিনি, বাঁধা পড়িনি।

কিন্তু মা যেতুম মন্বন্তরমতো প্রতিকূল। গেলে তো ফিরতে আবার সাত আট বছর। ততদিন কি তিনি বেঁচে থাকবেন? নিতান্তই যদি যাই তবে বিয়ে করে বৌ রেখে যেন যাই। বৌ হবে আমার

জাবিন বা হস্টেজ। শেষে মা'র সঙ্গে রফা হলো আমি এক বছরের বেশী বাইরে থাকব না। ফিরে এসে বিয়ের কথা ভাবব।

টোগো ডাঙ্গারিয়াল হয়নি। স্বামী কমিশন পায়নি। তাকে ওরা যুদ্ধের পরে ফিরিয়ে দেবে। তার তাতে ক্ষোভ নেই। সে চেয়েছিল ম্যাজেস্টেকার। তা মন্দ হয়নি। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে চায়। জাহাজের কারবারে ঢুকে করে নিতে পারবে। মা তা হলে মেয়ে জামাইকে কাছে পাবেন। তাঁর দেখাশোনার জন্যে আমার আবশ্যক নেই। আমি স্বচ্ছন্দেই একটা বছর প্যারিসে কাটিয়ে আসতে পারি।

এইসব জল্পনাকল্পনা হচ্ছে এমন সময় মাসিমার একখানা চিঠি এসে হাজির। এলাহাবাদ থেকে নয়। কলকাতার পার্ক সার্কাস থেকে। আমাকে ডেকেছেন চা খেতে। আমি তো অবাক। কবে এলেন এমনি বেড়াতে না বরাবরের জন্যে, সবাই এসেছেন না একা তিনি, কিছুই খুলে বলেননি। টেলিফোন নম্বর দেননি। অগত্যা কৌতূহল চেপে রাখতে হলো।

গিয়ে দেখি মাসিমা তাঁর বান্ধবী মিসেস মুখার্জির অতিথি। মালা নেই। মেসোমশায়ও না। ব্যাপার কী! তিনি এক কথায় জানালেন যে কলকাতায় থাকা যখন নিরাপদ তখন মিছিমিছি এলাহাবাদে পড়ে থেকে হবে কী! কাজেই একটুকরো জমির সন্ধান পেয়ে দেখতে এসেছেন। পছন্দ হলে ছোট একটা বাড়ী তৈরি করা যাবে।

তার পর মাসিমার সঙ্গে যেতে হলো জমি দেখতে। জমিটা ভালো। কিন্তু পাড়াটা যাচ্ছে। আমি বললুম, "এত রাত্রি থাকতে পার্ক সার্কাস! তাও বস্তির মাঝখানে!"

"বণ্ডেল রোডের বাড়ীখানা জলের দরে ছেড়ে দিয়ে কী মূর্খতাই না করেছি!" মাসিমা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "এখন পুঁজি কোথায় যে মনের মতো পাড়ায় বাড়ী করব! কর্তা চান প্রচুর ফাঁকা জায়গা। আমি চাই ট্রাম লাইনের কাছাকাছি। মালা চায়—মালা অবিশ্যি মুখ ফুটে বলে না সে কী চায়, আমার মনে হয় সে চায় নিরিবিলি। সব দিক যোগাতে হলে এই অঞ্চলেই ডেরা তুলতে হয়।"

তিনি শহর থেকে দূরে যেতে নারাজ। নইলে টালিগঞ্জ প্রস্তাব করতুম। যাই হোক মাসিমার কথায় সায় দিলুম। তিনি আমার উপর ভার দিলেন কোনো ইউরোপীয় বাস্তশিল্পীকে দিয়ে বাড়ীর ডিজাইন প্রস্তুত করাবার। তিনি স্বাদেশিকতার পক্ষে নন। তিনি নিশ্চিত জেনেছেন যে ওসব তপোবন টপোবন এ যুগে অচল। আবার যদি কখনো বেচে দিতে কি ভাড়া দিতে হয় তপোবন করলে এ কালের বড়লোকেরা পেছিয়ে যাবে। ভালো দাম বা ভালো ভাড়ার উপর নজর রাখতে হলে খানদানীদের রয় সুঁইকোঁড়দের রুচি মেনে চলতে হয়।

মাসিমা এলাহাবাদে ফিরে গেলেন। সেখান থেকে আমাকে চিঠি লিখতে ও তাগিদ দিতে থাকলেন। আমার হাতের কাজের সঙ্গে এই উপরি কাজ যোগ দিয়ে আমাকে মাতিয়ে রাখল। আমার জাহাজ হাতছাড়া হলো। গৃহনির্মাণের কাজেও মাসিমা আমার সহায়তা চাইলেন। দোসরা জাহাজের জন্যে তাবি কখন! ইচ্ছা রইল মাসিমাদের নতুন বাড়ীতে হিতিবান করে দিয়ে তার পরে সমুদ্রে ভাসব।

যুদ্ধ সত্যি সত্যি শেষ হলো। হিরোশিমা আমার বিবেককে বিঁধল বটে, কিন্তু আর সকলের মতো আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। ব্ল্যাক আউট তো কেবল বাইরে নয়, মনেরও নিষ্প্রদীপ ঘটেছিল। ফাসিস্টদের যে পতন হলো এটা ধর্মের জয় কি না জানিনে, কিন্তু অধর্মের পরাজয় তো ঘটেই। দূর থেকে

করাসীদের সঙ্গে উৎসব করতে সাধ গেল। কলকাতায় বসে যতটা সম্ভব। মস্ত একটা পার্টি দিলুম বন্ধুদের। চাইনীজ রেস্টোরাণ্টে।

মাস কয়েক পরে মাসিমারা গৃহপ্রবেশ করলেন। লক্ষ্য করলুম মাসিমা যেমন আহ্লাদে আটখানা মেসোমশায় তেমনি বিষাদে ম্রিয়মাণ। মনে হলো তাঁর পরাজয় ঘটেছে। মহাযুদ্ধে নয়, গৃহযুদ্ধে। আর মালা? মালার দিকে তাকালে মনে হয় খুব যেন একটা দ্বন্দ্ব চলেছে তার অন্তরে আর বাইরে। তাই তার চেহারা কেমন শুকনো আর বিরস আর ক্লান্ত। মৈর্ষে বেড়েছে। প্রশ্নে ক্ষীণ।

আবার বুধবার বুধবার হাজিরা দিতে চলো। তেমনি রিসেপশন। অথচ তেমনি নয়। মাঝখানে চার বছর ব্যবধান। ছেঁড়া তার জোড়া লাগে না। আগেকার দিনের সে দলটা ভেঙে গেছে। কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন যারা আসে তাদের মন অশান্ত ও চালচলন অস্থির। যেন তাদের জীবন থেকে শ্রী হারিয়ে গেছে। লালিত্য মিলিয়ে গেছে। পড়ে আছে উৎকট বাস্তববাদ। তারা অনেক খবর রাখে। তাদের মুখ দিয়ে কথার ফুলঝুরি ছোটে। তারা সব পারে। দরকার হলে সাধারণ ধর্মঘট, সশস্ত্র বিদ্রোহ, দাঙ্গাহাঙ্গামা। তাদের জীবনদর্শন হলো "বাঁচতে তো হবে।"

দেখি মাসিমাও তাদের সঙ্গে একদিন্। কথায় কথায় তিনিও বলেন, "বাঁচতে তো হবে।" এই আবহাওয়ায় আমি বেশীক্ষণ মাথা ঠিক রাখতে পারিনে। তর্ক করতে যাই। তর্কের উত্তরে শুনি, "আপনি মশায়, ইউরোপীয়ান। আপনি তো অমন বলবেনই।" তখন তর্কে ভঙ্গ দিই। সঙ্গে সঙ্গে উঠি। মালা আমার দিকে অসহায়ভাবে তাকায়। আর মেসোমশায় তো নীরব শ্রোতা। তিনি একটিও কথা বলেন না, বললে নেহাৎ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। এই যেমন, "টোগো আজকাল কী করছে হে? নীলিকে দেখিনে কেন?"

মালার সঙ্গে বাক্যালাপের সুযোগ বিশেষ হয় না। জানতে ইচ্ছা করে কী তার মনে আছে। তার অন্তরের সমাচার। নীলি ছিল এককালে তার ও আমার মাঝখানে সেতু। সে এখন তার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। মালাকে একদিন সে জিজ্ঞাসা করেছিল কেন এলাহাবাদ থেকে চলে আসা হলো। মালা বলেছিল, "সে অনেক কথা।"

একদিনে নয়, একটু একটু করে নানা সূত্রে আমি জানতে পাই অনেক কথা যদিও কী বোঝায়। মেসোমশায় চেয়েছিলেন আরো পশ্চিমে ও আরো উত্তরে যেতে লছমনঝোলায় কি আলমোড়ায়। মাসিমা রাজী হননি। তাঁর পিছুটান কলকাতা মুখো। মালা চেয়েছিল নারীশিক্ষে যোগ দিয়ে গ্রামের কাজে লাগতে। মাসিমা রাজী হননি। এলাহাবাদ শহরে বসে মা'র চোখে চোখে থেকেও যে হরিজন মেয়েদের জন্যে পাঠশালা চালাবে তার জো নেই। ছোটলোকদের সঙ্গে মেশা চলবে না। কী তা হলে সে করবে? পড়াশোনা তো শেষ। মাসিমা বলেন সঙ্গীত শিখবে। এলাহাবাদ সঙ্গীতচর্চার পক্ষে প্রশস্ত। মালা যে সঙ্গীত ভালোবাসে না তা নয়। কিন্তু তার আন্তরিক ইচ্ছা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া। পাঁচজনকে নিয়ে কাজ করা। যেমন করছে মনোরমা কাওল। সে এখন একজন বিখ্যাত মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি।

অবশ্য মনোরমার সঙ্গে মালার ঠিক মেলে না। মালার জীবন রূপকথার রেখা ধরে চলেছে। সে চায় বাঁচাতে। সে চায় তৃষ্ণার জল বয়ে এনে মুখে দিতে। সে চাহে সুখী করতে। অসুখ সারাতে। নিছক রাজনীতি তার কাছে তুচ্ছ। নিছক যুদ্ধবিগ্রহ তাকে মাতায় না।

নীলি জানতে চেষ্টা করেছিল মালা তার রাজপুত্রের দেখা পেয়েছে কি না। মালা ধরাছোঁয়া দেয়নি। দেখা একজনের পেয়েছে হয়তো, সে জন কিন্তু রাজপুত্র নয়। তাকে ভালোবেসেছে কি? কে

জানে কাকে বলে ভালোবাসা! নীলি তখন জানায় যে ভালোবাসা হচ্ছে বিয়ে করতে চাওয়া। মালা হাসে। বলে, না, সে রকম কোনো অভিপ্রায় নেই। বিয়ে করলে ভালোবাসা উড়ে যেতেও পারে।

মাসিমা টের পেয়েছিলেন বইকি। না পেলে কি এলাহাবাদের চাকরিটা অকালে ছেড়ে আসতে মেসোমশায়কে প্রবর্তনা দিতেন? চাকরি কি চাইলেই পাওয়া যায়! তা ছাড়া ওটা ছিল জীবিকার চেয়ে বড়। ওটা ছিল জীবনের কাজ। মেসোমশায় কি মাসিমার কথায় জীবনের কাজ ছেড়ে চলে আসতে রাজী হতেন? হলেন মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবেই। মেয়েকে তো যার তার হাতে সঁপে দেওয়া যায় না। বেশীদূর গড়াতে দিলে সঁপে দিতে হতোই। এসব ক্ষেত্রে স্থানত্যাগের বিধান আছে। অবশ্য নিজেরা স্থানত্যাগ না করে মালাকে স্থানান্তরে পাঠাতে পারতেন। তা হলে মালা দুঃখ পেতো। বিদ্রোহী হতো কি না কে জানে! তাকে তো ছেলেবেলা থেকেই শেখানো হয়েছে যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হয়। না, মেয়েকে কাছে রাখাই নিরাপদ।

মেসোমশায় যে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হচ্ছেন তা কি আমার জানতে বাকী ছিল? মেয়েকে যার তার হাতে সঁপে দেওয়া যায় না, এটা কেবল মেয়েলি শাস্তর নয়। মহাপণ্ডিতরাও এটা মানেন। মেয়েকে যার তার হাতে সঁপে দিলে তার পরিণামে মেয়েই কষ্ট পাবে। তাকে তার কৃতকর্মের পরিণাম থেকে রক্ষা করাই কর্তব্য। যদিও তার বয়স হলো চব্বিশ কি পঁচিশ তবু তার নিজের বিবেচনার উপর তার বিবাহের নির্বন্ধ ছেড়ে দেওয়া যায় না। সে ভুল করবে। তার জন্যে পরে পস্তাবে। কিন্তু তখন আর পিছু হটবার উপায় থাকবে না। বিয়ে একবার করলে চিরকালের মতো করা হয়ে যায়। বিশেষ করে মেয়েদের বেলা। স্বামী চিরদিন স্বামী। জীবনে আর সব ব্যাপারে পুনর্বিবেচনার অবকাশ আছে। কিন্তু বিবাহ ব্যাপারে একবার যদি অবিবেচনা ঘটে তবে চিরকাল তার জের চলে। মাসিমার মতো মেসোমশায়েরও এই ধারণা।

বুঝি সব। কিন্তু সমর্থন করতে পারিনে প্রবীণদের এই মূঢ়তা। মালার উপর ছেড়ে দিলে সে হয়তো ভুল করত, কিন্তু সে ভুল এমন ভুল নয় যা সংশোধনের অতীত। সমাজের মনে লাগবে, লোকে নিন্দা করবে, কেলেঙ্কারিতে কান পাতা যায় হবে। সব সত্যি। তবু এ কখনো হতে পারে না যে একটি মেয়ে যদি একটা ভুল করে থাকে তবে তা সংশোধনের অতীত, অতএব তাকে ভুল করতে দেওয়া হবে না, ঠিক করতেও দেওয়া হবে না, তাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হবে। মেয়েদের বিয়ে যখন বারো তেরো বছরে দেওয়া হতো তখন যা নীতি ছিল এখন বিয়ের বয়স দু'গুণ হলেও সেই একই নীতি খাটানো হবে। মালাকে যে ছেলেবেলা থেকে ঢের বড় বড় কথা শেখানো হয়েছে সেসব তা হলে কাজের কথা নয়। কাজের বেলা ঠাকুর্দা দিদিমাদের মেয়েলি শাস্তর।

থাক গে। আমার কী? আমি কে? আমার অত মাথাব্যথা কিসের? আমি আমার চির সাধনায় মগ্ন থাকতে চাই। আকসোসের বিষয় প্যারিসে যাবার সেই পরিকল্পনাটা কবে ভেস্তে গেছে। মাসিমার বাড়ী বানানোর ধান্ধায়। তারপর আর আমি উত্তোলী হইনি। জাহাজের পর জাহাজ হাতছাড়া হতে দিয়েছি। আগ্রহ কিছুমাত্র কমেনি। কিন্তু পালটা আকর্ষণে ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলছি। মালা সম্বন্ধে কৌতূহল। তার রুচি সম্বন্ধে কৌতূহল। কাকে তার মনে ধরেছে? কে তার ভালোবাসা পেয়েছে?

বল দেখি এসব কথায় আমার কী! কেনই বা আমি আমার প্যারিস যাত্রা স্থগিত রাখি আর মাকে ভোক দিই! অথচ মাসিমার ওখানেও নিয়মিত হাজিরা দিতে গাফিলতী করি? তবে ছবি আঁকা আমার বন্ধ

থাকে না। পেটের দায়ে বল, প্রাণের দায়ে বল, স্বপ্নের দায়ে বল কাজ আমাকে প্রতিদিন করে যেতে হয়। কাজ যেদিন করিনে ভাত সেদিন খাইনে। নেই খাটুনি তো নেই খাওন। লেনিনের মতো আমার ফতোয়া। নিজের উপরেই আপাতত ওটা জারি হচ্ছে। পরে দেশের লোকের উপরেও হবে। কথায় কথায় এরা হরতাল করে। হরতালের দিন অনশনের বিধান দিলে কর্মে মতি হবে। নেই খাটুনি তো নেই খাওন।

মালা বস্তির ছোট ছোট মেয়েদের খেলার ছলে লেখাপড়া শেখাতে চায় আর সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিয়মকানুন, যতটুকু তার জানা। এই নিয়ে একদিন কথা কাটাকাটি হয়ে গেল মাসিমার সঙ্গে। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, "আমি তো হদ্দ হয়ে গেলুম বোঝাতে বোঝাতে। এখন তুমি যদি বোঝাতে পারো। কাজটা যে ভালো তা তো আমি অস্বীকার করছিনে। কিন্তু যে মেয়ে এম-এ পাশ করেছে সে কেন বস্তির মেয়েদের নিয়ে সময় নষ্ট করবে? পড়াতে চায় কলেজে চাকরি নিক! কিংবা হাই স্কুলে।"

আমার কতকগুলো কৌশল আছে যা দিয়ে আমি কথা বার করি। সেদিন মাসিমার আপত্তির আসল কারণটা ছেঁকে করে বার করলুম। বস্তিটা মুসলমানদের। ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে মিশতে গেলে বড় বড় গুণ্ডাদের নেকনজরে পড়তে হবে। তারা ত্যাগের মহিমা জানে না। জানে একটি জিনিস। সেই ভয়ে মুসলমান মহিলারা বোরকায় সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখেন। নইলে উলটো দোষ দেওয়া হয় ওঁদের। কেন ওঁরা পুরুষদের প্রলুব্ধ করতে যান? মালাকেও উলটো দোষ দেওয়া হবে তো। গুণ্ডারাই রটাবে যে ওরা তো শিশু, মালাই মিষ্টার। মালা না হয়ে নীলি হলে কি আমি তাকে মুসলমানদের বস্তিতে মেয়েদের পাঠশালা খুলতে দিতুম। কিংবা বস্তির মেয়েদের ডেকে এনে বাড়ীতেই পাঠশালা বসাতে?

বুকে হাত রেখে বলতে পারব না যে মুসলমান গুণ্ডাদের নামে ভয় পাইনে আমি। পাই। পাই। একটু আধটু পাই। মাসিমা আমার মনের দুর্বল জায়গায় আঘাত করলেন। আমাকে মানতেই হলো যে নীলিকে আমি ওরকম কোনো ঝুঁকি নিতে দিতুম না। শিক্ষার ভার কর্পোরেশন নিয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি শিক্ষা থেকে কেউ বঞ্চিত থাকে তবে খবরের কাগজে চিঠি লেখা যেতে পারে। স্বাস্থ্যের ভারও তো কর্পোরেশনের। ট্যাক্স্ দিচ্ছি। তাই যথেষ্ট নয় কি? মাসিমা আমার যুক্তি শুনে পরম আপ্যায়িত হন। আর আমাকেও আপ্যায়ন না করেন তাও চরম।

কিন্তু মালার সামনে আমার মুখ ফোটে না। সে বেচারি একেবারে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো নিষ্ক্রিয়। কত রকম পক্ষাঘাত আছে। এও একরকম। সে চায় দুর্গম পথে যাত্রা করতে। সুগম পথ আর যারই জন্যে হোক মালার জন্যে নয়। সে চায় ওই পথের শেষে মুক্তা ঝরার কূলে পৌঁছতে। সে চায় বাঁচাতে। এক একটি দুর্গম পথের দিকে পা বাড়ায়। আর অমনি তার মা এসে তার পথ আগলে দাঁড়ান। সে নজরবন্দী। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে নয়। সে যদি ইচ্ছা করে ভদ্র ঘরের মেয়েদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে রেস্পেক্টেবল কাজ করতে পারে। মালার অভিরুচি সেদিকে নয়। যা হোক একটা কিছু করতে হবে এ মনোভাব তার নয়।

আমি চুপ করে বসে আছি দেখে মালা বলে, "কারো বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই, বেবুন। কোনো খেদও নেই আমার মনে।"

"তা হলে তো কোনো কথাই ওঠে না।" আমি বলি, "তা হলে তো সব ঠিক আছে।"

কথাবার্তা এর বেশী এগোয় না। আমি ভাবতে থাকি। মালা বলে, "মা যা করতে বারণ করেছেন

তা করতে আমিও যে এখন কিছু অধীর হয়ে উঠেছি তা নয়। আমাকে অধীর করে তোলা সহজ নয়। আমি স্বভাবতই ধীর।"

"সে আমি জানি। তোমার ধৈর্যের সীমা নেই।" আমি তার প্রশংসা করি। বাস্তবিক তার প্রশংসা না করে পারিনে। কবে থেকে সে স্বপ্ন দেখছে কিরণমালার মতো। স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারার দুঃখ আমি বুঝি।

"ধৈর্য অসীম বলে কি মা'র সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়? আমি লজ্জিত।" সে আমার কাছে অনুশোচনা প্রকাশ করে। "মা যে আমার ভালোর জন্যেই চিন্তিত তা কি আমি বুঝিনে?"

এর কিছুদিন পরে টোগো এসে হাজির। মাদল উত্তেজিত। কী একটা বলতে চায়, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরয় না।

"কী হয়েছে, টোগো?" আমি তাকে ধরে নাড়া দিই।

"সর্বনাশ!" সে এক কথায় সারে।

"সর্বনাশ! কার সর্বনাশ! কী সর্বনাশ!" আমি বিমূঢ় হয়ে বলি। যত রকম সর্বনাশ হতে পারে তার মিছিল দেখতে থাকি কল্পনার চোখে।

"মিউটিনি!" সে ধপ করে বসে পড়ে।

"মিউটিনি।" আমি আতঙ্কিত হই। কিন্তু সে আতঙ্ক অবিমিশ্র নয়। আনন্দমিশ্রিত। যদি তা হলে আর একবার সিপাহীযুদ্ধ। এবার ইংরেজ সামলাতে পারলে হয়।

টোগো আরো পরিষ্কার করে বলে, "নেভাল মিউটিনি। বম্বেতে, করাচীতে গুলী বিনিময় চলেছে। ভাগ্যিস আমি ওর মধ্যে নেই।"

আমি তামাশা করে বলি, "বা! এত বড় একটা ম্যাজেস্টেক্যার তোমার বিদ্যমানে ঘটল না, এর জন্যে তোমার আফসোস নেই।"

টোগো দার্শনিকের মতো বলে, "তোমার বোনের দিকটাও একবার ভেবে দেখতে হয়। বাবা! ব্যাকশনে মরতে আমি যে কোনোদিন তৈরি ছিলুম। কিন্তু কোর্ট মার্শালের হুকুম শুনলেই আমার হার্ট ফেল করত। আহা, এই হতভাগারা জানে না এদের কপালে কী আছে! আমি জানি, তাই আমার বুক কাঁপছে।"

কথাটা সত্যি। নেভাল মিউটিনি ইংরেজরা অনায়াসেই দমন করতে পারবে। একমাত্র তরসা যদি এবার ফোর্সে ও আর্মিতে ছড়ায়।

যা ভেবেছিলুম। এবার ফোর্সেও ছড়াল। কিন্তু তার আগেই নেভির আগুন নিবেছিল। তেমনি এবার ফোর্সের আগুনও নিবল। আমি যে টোগোর মতো নিশ্চিন্ত হলুম তা নয়। আমার মনে হলো ভারতবর্ষ একটা ঐতিহাসিক সুযোগ হারালো।

কিন্তু এসব ঘটনা ব্যর্থ হলো না। ক্যাবিনেট মিশন এলো নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে। আসর জমে উঠল রাজনীতিবিশারদদের। সেসব কূটতর্ক আমার মতো অব্যবসায়ীর বোধগম্য নয়। টোগো যদিও সাংবাদিকতা ছেড়ে জাহাজের কারবারে ভিড়েছে তবু প্রত্যেকটি রাজনৈতিক চালের সন্ধান রাখে ও অর্থ বোঝে। দেখা হলেই আমাকে শোনায়।

"জিন্না ভেবেছিলেন ইংরেজ তাঁর ভাগি হয়ে ব্রিজ খেলতে বসেছে।" টোগো রসিয়ে বলে, "এ, বাবা, সে ইংরেজ নয়।"

আমি জানতুম না যে ইংরেজ এতদিন ভাসি হয়ে খেলছিল। অজতা ঠেকে বলি, "তাই তো! ইংরেজ কবে থেকে এমন লায়েক হলো!"

"ওরা এতকাল পরে নির্ঘাত সমঝেছে," টোগো সবজান্তার মতো বলে, "নেহরুকে চটালে মিটটিনি। জিন্নাকে চটালে তেমন কিছু নয়। ঘোর একটু দাঙ্গাহাঙ্গামা। তাও ইংরেজের গা বাঁচিয়ে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি," সে আমাকে বিশ্বাস করে বলে খবরের কাগজের ভাষায়, "ক্যাবিনেট মিশন নিষ্ফল হলেও নেহরুকেই আহ্বান করা হবে তাঁর নিজের পছন্দমতো গবর্নমেন্ট গঠন করতে।"

ক্লাসে আমি তিন মাস অন্তর অন্তর গবর্নমেন্ট গঠনের দৃশ্য দেখেছি। তাই একটু রগড় করে বলি, "ক'মাসের জন্যে?"

টোগো আমার উপর খাপ্পা হয়। "তুমি কিস্যু বোঝ না, মেরিপ্রিয়। স্বরাজ আমাদের হাতে আসছে কে জানে ক'শতাব্দী পরে। এই প্রথম আমরা দিল্লী থেকে গবর্নমেন্ট চালাব বাঙালী, বিহারী, গুজরাতী, মারাঠা, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, হিন্দু, মুসলমান, পার্শী খ্রীস্টান মিলে। আঃ! কত কালের কত বড় একটা স্বপ্ন সফল হতে চলল! হায়, রবীন্দ্রনাথ! তুমি কেন বেঁচে রইলে না আরো কয়েকটা বছর! গুরু হে, তুমিই সত্য।"

এই বলে সে গুনগুনিয়ে ওঠে, "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা!"

আমার জ্বরেও ঘোলা লাগে। বলি, "মহাভারত পড়েছ নিশ্চয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগ দিতে এসেছিল সারা ভারতবর্ষ। গান্ধার, মদ্র, বাহ্লীক, সিন্ধু, পাঞ্চাল, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুণ্ড্র, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মালব, অঙ্গ, দ্রাবিড়, সিংহল, কাশ্মীর। সেকালের ভারতবর্ষ একালের চেয়েও বৃহত্তর ছিল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ দেখে কেই বা সেদিন কল্পনা করেছিল যে এর পরে আসছে কুরুক্ষেত্র? কেন ও রকম হলো? হলো এইজন্যে যে যুধিষ্ঠিরের খাতে হর্ষ দুর্যোধনের তাতে বিষাদ। আর দুর্যোধনের শিবিরটিও কম যায় না।"

টোগো হুংকার দেয়। "তুমি বলতে চাও আর একটা কুরুক্ষেত্র বাধবে?"

"অসম্ভব নয়, যদি যুধিষ্ঠির তাঁর ভাই দুর্যোধনকে ভালোবাসা দিয়ে জয় না করে বুদ্ধি দিয়ে চালমাৎ করতে যান। বুদ্ধির খেলায় হেরে গেলে লোকে বাহুবলের পরীক্ষা চায়। বিনা যুদ্ধে হার মেনে নেয় না।" আমি গম্ভীরভাবে বলি।

"তুমি এসব বিষয়ের কিস্যু বোঝ না। একদম আনাড়ী।" টোগো হেসে উড়িয়ে দেয়। "রাজনীতির খেলায় চালমাৎ হলেই অমনি যুদ্ধ বেধে যায় না। আর বাধলেই বা কী? আমরাই বাহুবলে শ্রেষ্ঠ।"

"আমরা" কথাটা আমার কানে খট করে বাজে। একরকম গুলীর আওয়াজ। আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করি, "তোমার ওই 'আমরা' কথাটার মানে কী?"

টোগো ঘাবড়ে গিয়ে বলে, "কেন? আমরা? মানে হিন্দুরা।" তার পরে শুধরে দিতে গিয়ে বলে, "হিন্দুরা আর শিখেরা জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা। যাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়েছিলেন নেতাজী। আহা, নেতাজী! তুমিই সত্য।"

এমন মানুষের সঙ্গে তর্ক করবে কে? আমি চুপ দিই। মনটা হায় হায় করে ওঠে। কী যে আছে দেশের কপালে! সবাই মিলে বিদেশী শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করা এক কথা। সবাই মিলে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। তখন 'সবাই' আর সবাই থাকে না। ধর্মের টানে বা রক্তের টানে একপক্ষের সৈনিক অপর পক্ষে চলে যায়। এই আজাদ হিন্দ ফৌজকে যদি বলা হতো জিন্নার দলের

বিদ্রোহ দমন করতে, দৌজ দু'ভাগ হয়ে যেতো। সংহতিনাশ অনিবার্য। জাতীয়তাবাদী সেন্টিমেন্ট বাইরের লোকের বিরুদ্ধে জাগানো যায়। ঘরের লোকের বিরুদ্ধে নয়। তখন যা স্বভাবত জাগে তা হিন্দু বা মুসলিম সেন্টিমেন্ট।

জিন্না এ রহস্য সকলের চেয়ে বেশী বুঝতেন। কারণ একদা তিনি নিজেই একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ছিলেন। মেহেরু গবর্নমেন্ট গড়তে গিয়ে সৌজন্যবশত জিন্নার সহযোগিতা চাইলেন। জিন্না প্রত্যাখ্যান করলেন। মেহেরু দিল্লীর মসনদে বসবার আগেই শুরু হয়ে গেল ওতাদের মার। ডাইরেক্ট য়্যাকশন।

উঃ! সে কী পৈশাচিক কাণ্ড! সশস্ত্র পুরুষের সঙ্গে সশস্ত্র পুরুষের বলপরীক্ষা নয়। যুদ্ধ বলতে যা বোঝায়। এমন কি ওকে দাঙ্গা বললেও ভুল বলা হয়। দাঙ্গাও তো সংঘের সঙ্গে সঘের, সশস্ত্রের সঙ্গে সশস্ত্রের। ফরাসীদের ইতিহাসে পড়েছি একদা সেপ্টেম্বরে ঘটেছিল সেন্ট বার্থোলোমিউ দিবসের ম্যাসাকার। ক্যাথলিকরা বলপ্রয়োগে চড়াও হয়ে বা ষেরাও করে নিরীহ প্রোটেস্টাণ্টদের নির্বিচারে নিকাশ করে। প্ররোচনা দিয়েছিলেন স্বয়ং ক্যাথারিন ড মেদিসি। প্রবল পরাক্রান্ত রাজমাতা। রাজ্যের প্রকৃত শাসক। কারণটা ধর্মগত নয়, রাজনীতিগত। ষোড়শ শতাব্দীর সেই ফরাসী পৈশাচিকতা দেশকাল অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর ভারতে উপনীত হেখে আমি তো বেবাক দিশেহারা। পরিণ দুঃস্থ পথচারী, নারী ও শিশু হয়েছে তাদের শিকার।

দেখলুম প্রোটেস্টাণ্টরাও কিছু কম যায় না। অবিকল একই রকম শিকারপদ্ধতি ও শিকারীপনা। কে কাকে শেখাবে! খুন চেপে গেছে মাথায়। রক্তের বদলে রক্ত। মাংসের বদলে মাংস। না, মাংস সম্বন্ধে আমি ততটা নিশ্চিন্ত নই। তবে একেবারেই যে নিরামিষ ব্যাপার তা বিশ্বাস করা শক্ত।

টোগো একদিন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলে, "কী করে উদ্ধার করা যায়, বল তো!"

আমি চমকে উঠে বলি, "কাকে!"

"মালাকে ও তার মা বাবাকে।" সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "ওদের পার্ক সার্কাসের বাড়ীটা পড়েছে মুসলিম পকেটে। ওখানে পুলিশ পর্যন্ত যেতে ভয় পায়। ভলান্টিয়াররা ভয়ে ঘেঁষতে চায় না। আমি একা কী করতে পারি!"

আমি ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকি। মালা! মালার মা বাবা! হা ঈশ্বর! কোনো মতে বলি, 'ওঁরা বেঁচে আছেন ঠিক জানো!"

"ঠিক জানি। অন্তত আধ ঘণ্টা আগেও বেঁচেছিলেন।" টোগো আমার অশান্ত অন্তরে যা ছিটিয়ে দিল তা শান্তিজল নয়।

"তা হলে চল যাই উপায় দেখি।" আমি তৎক্ষণাৎ তৈরি হয়ে নিই।

পথে যেতে যেতে শুনি মেসোমশায়ের বাড়ীর চার দিকে গুণ্ডারা হানা দিচ্ছে। ভিতরে ঢুকতে পারেনি তার কারণ মাসিমা পশ্চিম থেকে গুটি দুই হিন্দুস্থানী ঠাকুর চাকর এনেছিলেন, তারা লুচি বেলতে ততটা সিদ্ধহস্ত নয় লাঠি চালাতে যতটা। কিন্তু তারাও তো মনিবকে ছেড়ে বাইরে গিয়ে খবর দিতে পারছে না। খবরটা তাহলে দেবে কে? বাড়ীতে টেলিফোন নেওয়া হয়নি। ডাকপিয়নও যায় না, যেতে সাহস পায় না। মুসলমান দরজি গেছল জামার ডেলিভারি দিতে। তাকেও ঢুকতে দেয়নি। কিন্তু লোকটা ধর্মভীরু। মেসোমশায়কে ভক্তি করত। সে তার নিজের বুদ্ধিতে এইটুকু করেছে যে ব্রাইট স্ট্রীট পর্যন্ত হেঁটে এসে তার আরেকজন ধর্মেরকে অর্থাৎ টোগোকে খবরটা দিয়েছে। হাঁ, সবাই বেঁচে আছেন।

গবর্ণমেণ্ট হাউসে আমার যাতায়াত ছিল। নতুন গবর্ণর আমাকে চেনেন না, কিন্তু এঁর আগে যিনি ছিলেন, তিনি চিনতেন। কারণ তিনি ছবি চিনতেন। সেই সূত্রে স্টাফের সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিল। সশরীরে হাজির হয়ে আমার কার্ড পাঠিয়ে দিই। মিলিটারি সেক্রেটারি আমাকে দর্শন দিলেন। আমার জন্যে তিনি কী করতে পারেন? করতে পারেন আমার স্বজনদের উদ্ধার কার্যে সাহায্য।

চললুম আমি সরকারী গাড়ীতে করে গোরা সার্জেণ্টের সঙ্গে পার্ক সার্কাস। আমাকে দেখে যারা মারতে আসত গোরাকে দেখে তারা বিনা বাক্যে অন্তর্ধান। সাদা চামড়ার প্রেসটিজ কত! আমি তো লজ্জায় মরি। অন্য সময় হলে কখনো ওদের সাহায্য নিতুম না। কিন্তু এ হল একটি পরিবারের জীবনমরণ সমস্যা। বলা বাহুল্য টোগোও ছিল আমার সঙ্গে। সে না থাকলে সার্জেণ্টের সঙ্গে চাল দেবে কে? সার্জেণ্ট তাকে 'সার' বলছিল।

মাসিমা আমাদের দু'জনকে দেখে কেঁদে ফেললেন। আর মেসোমশায় এমন এক হাসি হাসলেন যা কেবল সাধুসন্তেরা পারেন। যাদা যেন রূপকথার রাজ্যে বাস করছে। সে তার স্বপ্নের ঘোরে বলে, "অরুণ, বরুণ, তোমরা বেঁচে আছো তো? পাথর হয়ে যাওনি তো?"

টোগো আমাকে এক ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে বলে, "পাগলামির পূর্বলক্ষণ।"

আমি বলি, "না। থাক, তুমি বুঝবে না।"

বাড়ী রইল ঠাকুর চাকরের পাহারায়। মালিটী মুসলমান। সে তার স্বধর্মীদের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। গোরা সার্জেণ্টকে দেখে তারও বুকে সাহস জাগল। সেও পাহারা দেবে। মাসিমা অবিশ্বাস করছিলেন, আমি তাঁকে অভয় দিয়ে পাড়ার লোককে ডাক দিয়ে বললুম, "ভালো করে দেখে নাও, গাড়ীখানা লাটসাহেবের বাড়ীর।"

এন্‌তার সেলাম কুড়োতে কুড়োতে মাসিমাদের তিনজনকে নিয়ে ব্রাইট স্ট্রীটে নীলির হাতে পছিয়ে দিলুম। এটা টোগোদের সৈন্যিক ভদ্রাসন নয়। তার কোম্পানী তাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। বন্দুকধারী দারোয়ান ছিল। তাকে দেখে মাসিমার প্রত্যয় হলো যে ওণ্ডাশাহীর দাপট অতদূর পৌঁছবে না। তিনি আরো একবার কেঁদে ফেললেন। টোগোর সঙ্গে যাদার বিয়ে কেন হলো না তাই ভেবে বোধ হয়।

সার্জেণ্টকে ও সোফারকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দেওয়া হলো। না, শুধু ধন্যবাদে চিঁড়ে ভেজে না। গলা ধাতে ভেজে এমন দ্রব্যও টোগো তার সেলার থেকে বার করে গোপনে পাচার করে দিল বাড়ী থেকে গাড়ীতে।

মেসোমশায়কে কখনো গান করতে শুনিনি। স্থানকালপাত্র ভুলে তিনি গান ধরলেন, "সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।"

গান শেষ হলে আপন মনে বলতে লাগলেন, "গেল! গেল! এই তিনটি দিনে নিঃশেষ হয়ে গেল তোমার পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার অভিমান! তোমার মহত্ত্বের গল্প! তোমার সিন্থেসিসের বড়াই! তোমার শুকসিরির দর্প!"

তারপর হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, "গো অ্যাণ্ড রিপেণ্ট। যাও। অনুতাপ কর। প্রায়শ্চিত্ত কর। তপস্যা কর। চুপ। চুপ। একটি কথাও না। হিন্দু করেনি, মুসলমান করেছে, শুনতে চাইনে এ কথা। কে হিন্দু? কে মুসলমান? একই চেহারা। একই অপরাধ। কে ফরিয়াদী? কে আসামী? গো অ্যাণ্ড রিপেণ্ট। যাও, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে।"

আমরা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। তখন তিনি একটু শান্ত হলেন। তিন দিন তাঁর নিদ্রা হয়নি। তখন একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন।　　(ক্রমশঃ)

বিশ্ব সাহিত্য

অন্ধ পাচক

লেখক : কনস্তান্তিন পাউস্তভস্কি

অনুবাদক : বিভূরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

(মূল রুশ থেকে অনূদিত)

১৮৬ সালের শীতের এক সন্ধ্যা। তিফ্লিস শহরের ঠিক বাইরে ছোট কাঠের বাড়ীতে এক অন্ধ বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায়। বৃদ্ধ কাউকেস তুনের প্রাক্তন পাচক। সত্যি বলতে এটাকে বাড়ী বলা চলে না। জীর্ণ কেবিন বাগানের মাঝখানে। বাদুড়াড়িত পচা ডালপালায় বাগান ভর্তি। প্রতি পদক্ষেপেই তাদের খসখস শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে ধূপরীতে শেকল বাঁধা কুকুরের মৃদু ঘেউ ঘেউ শব্দ। প্রভুর মত কুকুরটিও মৃত্যুপথযাত্রী, বার্ধক্যহেতু জোরে ঘেউ ঘেউ করার ক্ষমতাও আর নেই।

পাচক দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে কয়েকবছর আগে উনানের আঁচে। সেই থেকে কাউকেসের ম্যানেজার ওকে থাকতে দিয়েছে এই কেবিনে, মাঝে মাঝে দিয়েছে দুচার রোবল করে।

পাচকের সঙ্গে থাকত ওর আঠারবছরবয়সী কন্যা মারিয়া। কেবিনের আসবাবপত্র বলতে একটি হক্কাপোশ, নড়বড়ে কয়েকটি বেঞ্চি, অতি-সাধারণ একটি টেবিল, কিছু ফাটা মাটির বাসনপত্র, আর ছিল ট্র্যাভিকর্ড, মারিয়ার একমাত্র সম্পত্তি!

ট্র্যাভিকর্ড ছিল এত প্রাচীন যে আশেপাশে কোনও শব্দ হলে অনেকক্ষণ ধরে তার অনুরণন হতে থাকত এর তন্ত্রীতে। পাচক হেসে এর নামকরণ করেছিল 'আমার বাড়ীর পাহারাদার।' বাড়ীতে কেউ ঢুকতে গেলে প্রথমেই অভ্যর্থনা জানাবে এই জীর্ণ যন্ত্র হেঁড়ে সুরের ঢেউ তুলে।

মুমূর্ষুকে মারিয়া ধুয়ে মুছে দিল, পরিয়ে দিল ঠাণ্ডা, পরিষ্কার সার্ট। বৃদ্ধ বলল :

—পুরুত ও সাধুদের কোনদিন সহ্য করতে পারিনি। অপরাধ স্বীকৃতির জন্য এদের কাউকে ডাকতে পাঠাচ্ছি না অথচ মৃত্যুর পূর্বে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি।

—কি করতে হবে?—ভয় পেয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল মারিয়া।

—রাস্তায় চলে যা।—বলল বৃদ্ধ,—প্রথম যে ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হবে আসতে বলবি আমাদের বাড়ি, বলবি মৃত্যু পথযাত্রীর স্বীকৃতি শুনতে হবে। কেউ আপত্তি করবে না আসতে।

—আমাদের রাস্তা এত নির্জন ···· মারিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলল, তারপর রুমালটি মাথায় জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বাগানের ভিতর দিয়ে ছুটে চলল মারিয়া। মরচে ধরা গেটটি খুলতে বেশ কষ্ট করতে হল। গেটটি খুলে বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুরু সড়ক, হাওয়া ছড়িয়ে দিচ্ছে ঝরা পাতা, আর অন্ধকার আকাশ থেকে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা, ঠাণ্ডা ফোঁটা।

মারিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল উৎকর্ণ হয়ে। শেষ পর্যন্ত ওর মনে হল বেড়ার পাশ দিয়ে কেউ যেন আসছে গুনগুন্ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। কয়েক পা এগিয়ে গেল মারিয়া ওর সঙ্গে কথা বলতে। হঠাৎ ঠোকাঠুকি হয়ে রাস্তাতে চিৎকার করে উঠল। লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ল, জিজ্ঞাসা করল :

—কে ও ?

মারিয়া ওর হাত ধরে নিয়ে পিতার প্রার্থনা জানাল, বলতে গিয়ে কেঁপে গেল ওর গলা।

—বেশ,—লোকটি বলল শান্ত গলায়! যদিও আমি পুরুত নই, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। চল, যাওয়া যাক।

ওরা বাড়ী ঢুকল। মোমবাতির আলোয় মারিয়া দেখল লোকটিকে দেখতে ছোটখাট রোগা চেহারার। লোকটি ওর হেঁড়া বর্ষাতি ছুঁড়ে ফেলল বেঞ্চির উপর। ওর পোষাক মার্জিত রুচির পরিচায়ক কিন্তু সাদাসিধে। মোমবাতির আলোয় চিকমিক্ করছে ওর কালো ক্যাম্বিসোল, কাঁচের বোতাম আর লেসের কাজ করা সার্টের সম্মুখভাগ।

আগন্তুকের বয়স খুবই কম। ঠিক ছেলে মানুষের মত মাথায় কাঁকুনি দিয়ে পাউডার মাখান, পরচুলটি ঠিক করে নিয়ে, কটিতি একটি টুল টেনে নিয়ে বসল গিয়ে আগন্তুক শয্যাপার্শ্বে, তারপর মাথা নীচু করে হাসিভরা দিয়ে মুখ তুলে ধরল মুমূর্ষুর মুখপানে।

—বলুন! হয়তো আমি আপনার শেষ মুহূর্ত কয়টি সহজ করতে পারি, হৃদয়ের গুরুভার মুক্ত করতে পারি। এ ক্ষমতা আমার ভগবদত্ত নয়, যে চারু কলার পূজারী আমি, সেই সংগীত বিদ্যাই আমায় দিয়েছে এই ক্ষমতা।

চির জীবন কাজ করেছি আমি, যতদিন দৃষ্টিশক্তি ছিল,—অস্ফুট কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ, তারপর আগন্তুকের হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বলল : আর যে কাজ করে তার পাপ করার সময় কোথায়? স্ত্রীর হ'ল ক্ষয়রোগ—ওর নাম ছিল মার্থা—ডাক্তার নির্দেশ দিলেন নানারকম দামী ওষুধপত্রের, খাওয়াতে বললেন ক্রিম, দুধ, গরম লাল মদ, আমি কাউন্টেস তুনের সেট থেকে চুরি করলাম সোনার একটি ছোট ডিস ওটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে বিক্রী করলাম। যখন মনে পড়ে এ কথা আর মেয়ের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে হয় সে কথা মনে পাই অসহ্য যন্ত্রণা। আমি যে মেয়েকে এমন শিক্ষা দিয়েছি যেন অপরিচিত লোকের টেবিলের খুদিকণাও না ছোঁয়।

কাউন্টেসের ভৃত্যদের কাউকে এ জন্য শাস্তি পেতে হয়েছে?—আগন্তুক জিজ্ঞাসা করল।

—শপথ করে বলছি, কেউ না,—বলে বৃদ্ধ কেঁদে ফেলল।—যদি জানতাম, সোনা মার্থার কোন কাজে আসবে না তাহলে কি চুরি করতাম!

—আপনার নাম কি? আগন্তুক প্রশ্ন করল।

—ইওগান মেইয়র, মহাশয়।

—বলছিলাম কি ইওগান মেইয়র,—আগন্তুক হাত রাখল বৃদ্ধের অন্ধ আঁখির উপর—লোকের চক্ষে আপনি নিরপরাধ। আপনি যা করেছেন তাকে অপরাধ বলা চলেনা, চুরি বলা চলে না, বরঞ্চ, আপনার এ কাজ হয়তো গণ্য হবে প্রেমের পরাকাষ্ঠা বলে।

—আমেন!—অস্ফুট কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ।

—আমেন!—প্রতিধ্বনি করে বলল আগন্তুক!—এখন বলুন, আপনার শেষ অভিলাষ কি?

—যদি মারিয়াকে দেখাশোনা করার ভার কেউ নিত।

—আমি সে ব্যবস্থা করব। আর কোন অভিলাষ নেই আপনার?

অকস্মাৎ হাসি ফুটে উঠল মুমূর্ষুর মুখে, উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল :

—আমি মার্তাকে আর একবার দেখতে চাই যেমন দেখেছিলাম যৌবনে। দেখতে চাই সূর্যালোক আর এই জরাজীর্ণ বাগানে বসন্তের ফুলের সমারোহ। এ সবই অবশ্য অসম্ভব, মহাশয়। যাকে বকবক করেছি বলে রাগ করবেন না আমার উপর। অসুখে ভুগে ভুগে কথার আর মাথামুণ্ডু নেই কিছু।

—বেশ তাই হবে,—বলে উঠে পড়ল আগন্তুক।—তাই হবে,—আবার বলল আগন্তুক, তারপর এগিয়ে বলল গ্রামোফোনের সামনে টুলের উপর।—তাই হবে,—উচ্চস্বরে বলল আগন্তুক তৃতীয়বার।

শত শত কাচের ছোট বর্তুল মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলেছে কেউ, অকস্মাৎ এমনি ঝঙ্কার ছড়িয়ে পড়ল বাড়ীর চারধারে।

আগন্তুক বাজাতে শুরু করল। মার্তার পরে মনে পড়েছে ওর মুখ যখন ওর হাতের নীচে প্রথম বেজে উঠল যন্ত্রটি। অস্বাভাবিক পাণ্ডুর দেখাচ্ছিল ওর ললাটদেশ আর কালো হয়ে আসা চোখে কাঁপছিল প্রদীপশিখা।

অনেক বছর হয়ে গেল তার মধ্যে গ্রামোফোন এই প্রথম গাইছে এমন প্রাণ খুলে। শুধু বাড়ী নয়, সারা বাগান পর্যন্ত ঝঙ্কারিত হতে লাগল যাদুমন্ত্রের ঝনঝনানি। বুড়ো কুকুরটি খুপরী থেকে বেরিয়ে এসে বসে পড়ল। মাথা এক ধারে হেলিয়ে, কান খাড়া করে ল্যাজ দোলাতে লাগল। ভিজে বরফ পড়ছে কিন্তু সারমেয় শুধু কান নাচাতে লাগল।

—দেখতে পাচ্ছি, মহাশয়! বলে উঠল বৃদ্ধ, তারপর শয্যা থেকে একটু উঠে বলতে লাগল—দেখতে পাচ্ছি সেদিন; যেদিন মার্তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ আর পরম তীব্র ও দুখের যন্ত্রণা ফেলে ভেঙে ফেলল। ব্যাপারটা ঘটেছিল শীতকালে, পাহাড়ের উপর। আকাশ ছিল পরিষ্কার, আকাশের রঙ নীল কাচের মত আর মার্তা হাসছিল। হাসছিল,—তারের ঝঙ্কার শুনতে শুনতে পুনরুক্তি করল বৃদ্ধ।

আগন্তুক বাজাতে লাগল, বৃষ্টি ওর কালো গবাক্ষ পানে।

—আচ্ছা বলুন, কিছু দেখতে পাচ্ছেন?—প্রশ্ন করল আগন্তুক!

বৃদ্ধ নীরব, উৎকীর্ণ হয়ে শুনছে।

—এ কি সম্ভব আপনি দেখতে পাচ্ছেন না,—বাজাতে বাজাতে বলল তাড়াতাড়ি আগন্তুক,—দেখতে পাচ্ছেন না কালো রাত্রি হয়ে এল নীল, তারপর আসমানী উল্কাটা ছড়িয়ে পড়ছে উপর থেকে, আর আপনার তরুবেদীর প্রাচীন পাথা প্রশাখায় প্রস্ফুটিত হচ্ছে শ্বেতপুষ্প? আমার তো মনে হচ্ছে এসব আপেল ফুল, যদিও এখান থেকে এই ঘরের থেকে এদের দেখাচ্ছে বড় বড় টিউলিপ ফুলের মত। আপনি দেখছেন, প্রথম কিরণপাতে পাষাণ প্রাচীর হয়েছে উত্তপ্ত আর ধূমায়িত হচ্ছে তা থেকে। এ নিশ্চয়ই দ্রবীভূত বরফ চাপা শৈবাল শুকোচ্ছে। আরও দেখুন, ক্রমশঃ আকাশ উঠছে আরও উর্দ্ধে, হয়ে যাচ্ছে আরও নীল, আরও অপূর্ব, আর এরি মধ্যে পাখীর ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে উত্তরে, আমাদের এই প্রাচীন ভিয়েনার উপর দিয়ে।

—এ সমস্তই দেখতে পাচ্ছি আমি। চীৎকার করে উঠল বৃদ্ধ।

পাখানি চলার মৃদুশব্দ হলো, গ্রামোফোন গেয়ে উঠল বিজয়োল্লাসমুখর গান, এ যেন একটি যন্ত্রের সংগীত নয়, শত শত কণ্ঠের আনন্দকলোচ্ছ্বাস।

—না মহাশয়,—বারিয়া বলল আগন্তুককে,—এই ফুলগুলো মোটেই টিউলিপের মত নয় দেখতে। এগুলো আপেল গাছ, একরাত্রের মধ্যেই ফুল ফুটেছে।

—সত্যি,—উত্তরে বলল আগন্তুক,—এগুলো আপেল গাছ, পাপড়িগুলো কিন্তু খুব বড় বড়।

—জানালা খুলে দে, মারিয়া,—বলল বৃদ্ধ।

মারিয়া জানালা খুলে দিল, আর ঝনঝনে হিমকা হাওয়ায় ঘর ভরে গেল। আগন্তুক বাজিয়ে চলল, মৃদুস্বরে ও ধীরে।

উপাধানের উপর এলিয়ে পড়ল বৃদ্ধের দেহ। শুরু হল শ্বাস নেওয়ার উৎকট প্রয়াস, সঙ্গে সঙ্গে কম্বলের গায়ে হাতড়ে বেড়াতে লাগল ওর অসহায় দুটি হাত। মারিয়া ঝুঁকিয়ে পড়ল ওর উপর। আগন্তুক বাজনা বন্ধ করল, বসে রইল ক্লাভিকর্ডের পাশে নিশ্চলভাবে, যেন আপন সংগীতে আপনি সম্মোহিত।

আর্তনাদ করে উঠল মারিয়া। আগন্তুক উঠে দাঁড়াল, অগ্রসর হলো শয্যার পাশে। বৃদ্ধ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল :

—সব আমি দেখতে পেয়েছি এত স্পষ্ট, ঠিক যেমনটি অনেক বছর আগে। কিন্তু আমি তো মরতে পারব না না জেনে·· নাম। নাম!

—আমার নাম উলফগাং আমাদিয়ুস মোৎসার্ট—বলল আগন্তুক।

মারিয়া শয্যা থেকে নেমে এল, নীচু হয়ে, প্রায় নতজানু হয়ে দাঁড়াল মহান সংগীতকারের সম্মুখে।

মারিয়া যখন আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল, বৃদ্ধের মৃত্যু ঘটেছে। গবাক্ষের বাইরে অরুণরাগে আরক্তিম দিগন্ত, সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে, সিক্ত বরফের ফুলে ঢাকা বাগানটি।

(১৯৪০)

আমেরিকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সুপ্রশস্ত কক্ষ। কয়েকটি পুতুল নিয়ে বসে আছেন অধ্যাপক মিস্ লুই কিংম্যান···। শৈশবে মিস্ কিংম্যান পুতুল নিয়ে প্রতি-বেশীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আনন্দ বিবরণ করতেন; প্রচুর আনন্দ পেতেন নিজেও। পরিণত জীবনে পুতুল-নিয়ে-খেলাই হল তাঁর কাজ···তাঁর জীবনের পুণ্যব্রত।

কথা বলতে পারে না সহজভাবে কত ছেলে মেয়ে, কথা তাদের জড়িয়ে যায়, কথা বলার প্রয়াস হয় ব্যর্থ। মিস্ কিংম্যানের ব্রত এই সব ছেলেমেয়েদের কথার জড়তা, ভাষার জড়তা দূর করে তাদের জীবনকে সুস্থতায় আর স্বাস্থ্যে ভরিয়ে তুলবেন, স্বাস্থ্য শুধু তাদেরই নয় সমাজেরও। কিন্তু কবে উদ্‌যাপন করবেন তিনি এই মহৎ ব্রত?·····

মিস্ কিংম্যানের স্মৃতিতে ভেসে উঠল তাঁর শৈশব। বুঝলেন তিনি সৃষ্টির আনন্দের প্রবল বন্যায় খড়কুটোর মত ভেসে যাবে সব বাধা, ভাষার জড়তা আর এখনকার সমস্যা। ·····সুরু হল সাধনা, পরীক্ষা নিরীক্ষা চিন্তা এবং গবেষণা। ছাত্র-ছাত্রী জুটতে দেরী হ'ল না; তাদের সকলকে নিয়ে তিনি প্রথমেই সুরু করে দিলেন পুতুল গড়া আর সেই পুতুলকে ঘিরে অভিনয় করানোর কাজ। লেখা হলো কাহিনী, তৈরী হোলো মঞ্চ, কাহিনীতে সংযোজিত হোলো সংলাপ। মিস কিংম্যানের পরিচালনায় ছাত্র-ছাত্রীরাই কিন্তু করল সব কিছু। সামনেই অভিনয়ের দিন; অভিনয়ও সুরু হলো। আশ্চর্য! দেখা গেলো প্রত্যেকেই তাদের জড়তাকে অনেক পরিমাণে কাটিয়ে উঠে আবৃত্তি করে চলেছে সংলাপ।·····

দুরারোগ্য ব্যাধি, কিন্তু কি সহজ অপূর্ব অনাড়ম্বর তার চিকিৎসা।

পা বাড়ালেই রাস্তা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্বানুবৃত্তি)

মাসাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে দিলীপ যখন চৌধুরী সাহেবের অফিসের দিকে রওনা হয় তখন তার সমস্ত মন যেন টান করে বাঁধা কোনো তারের বাজনা। সামান্য একটু হাওয়ার ছোঁয়াতেই তা কেঁপে উঠে ঝঙ্কার তোলে।

রাস্তা ঘাট মানুষ জন সবই যেন নতুন। আকাশ পৃথিবী সব কিছুর ওপর যেন রঙের নতুন পোঁচ! তার মনের একদিক বলে, এরই নাম সত্তা ভাবানুভূতা। একে প্রশ্রয় যে দেয় সে মূঢ় কিন্তু মনের আরেক দিক বলে মূঢ়তায় যদি এত বিস্ময় আর আনন্দ তাহলে কাজ কি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান হয়ে।

দিলীপ চৌধুরী সমবায়ের কারখানায় পৌঁছোবার আগেই কেষ্টকে চৌধুরী সাহেবের খাস গাড়ি নিয়ে অফিসের গাড়ি বারান্দার নিচে ঢুকতে দেখা যায়। তার গাড়ির আরোহীদের দেখে একটু অবাক হবারই কথা। স্বয়ং চৌধুরী সাহেব ত' ননই, তাঁর ধারে কাছে থাকবার মত কেউও নয়। জীর্ণ মলিন থান পরা কঙ্কাল সার এক বৃদ্ধা আর ছেঁড়া ময়লা ফ্রক পরা হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বছর ছয়েকের একটি ছোট্ট মেয়ে।

গাড়ি বারান্দায় বাদুর দল যেন কেষ্টর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। কেষ্ট গাড়ি থামাতেই বাদু এগিয়ে এসে রুক্ষ স্বরে বলে—এই যে তোমাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলাম! গাড়ি আনতে এত দেরী হল যে!

কেষ্ট নিজে নেমে পেছনের দরজা খুলে বৃদ্ধা ও ছোট মেয়েটিকে নামাতে নামাতে তাচ্ছিল্য ভরে বলে—সে কৈফিয়ৎ কি তোমায় দিতে হবে নাকি!

মেজাজ যে বড় চড়া দেখছি।—বাদু মুখ বাঁকিয়ে বলে—দাওয়াই এখনো পড়েনি কি না। যাও বিনোদ বাবু খুঁজছেন।

আমিও তাঁকেই খুঁজছি।—কঠিন স্বরে জবাব দিয়ে কেষ্ট বৃদ্ধাকে তার পেছনে আসতে বলে।

বৃদ্ধার কিন্তু যাবার উৎসাহ দেখা যায় না। চারিদিকে চেয়ে ভীত কাতর কণ্ঠে তিনি বলেন,—আমাদের কেন নিয়ে এলে বাবা আমি ত আসতে চাই নি!

আপনি চলুন না—। আপনার কোন ভয় নেই। কেষ্ট তাঁকে আশ্বাস দিয়ে এক রকম জোর করেই সঙ্গে নিয়ে যায়।

নিজের গরজে একরকম জোর করে বৃদ্ধা ও ছোট মেয়েটিকে বিনোদ বাবুর কাছে নিয়ে যাবার কারণটা খানিক বাদেই ভালো করে বোঝা যায়।

বিনোদ বাবুর সে শান্ত অমায়িক চেহারাই আর নেই। তিনিও এখন খুদে চৌধুরী সাহেব হয়ে কেষ্টকে ধমকাচ্ছেন শোনা যায়।

বুধলাম ছাদের টালি খসে পড়ে হাত ভেঙেছে। তার জন্যে হাসপাতাল থেকে আবার খানায় নিয়ে গেছ। আবার সেখান থেকে গাড়ি করে নিয়ে এসেছ এখানে? তুমি এ গাড়ির ড্রাইভার না মালিক! এ কাজ কি তোমার?

কেষ্ট কঠিন স্বরে জবাব দিলে—হ্যাঁ, আমার। মানুষ হ'লে সামনে সে থাকবে একাজ তারই। আর চৌধুরী সদনবাবের ড্রাইভার বলেই এটা আমার দায় বলে মনে করেছি। এনেছি ত' শুধু এই দুজনকে। হাসপাতালে আরেকজনকে যে রেখে আসতে হয়েছে সে খবর আপনি করি জানেন।

হ্যাঁ জানি।—বিনোদ বাবু গর্জন করে উঠলেন,—কিন্তু থানায় নিয়ে গিয়েছিলে কেন? কে হুকুম দিয়েছিল?

কেউ দেয় নি!—কেষ্টর গলাতেও কঠিন বিদ্রূপ—আপনাদের হুকুম তামিলের কোনো গেলাম শুধু —আমি নই বোধ হয়।

দাদুর দলও ইতিমধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

কেন ফজুল বাত করছেন বিনোদ বাবু!—দাদু ঠোঁটে বেঁকিয়ে বললে—ছেড়ে দিন আমার হাত। ঘাড়ে দুটো রদ্দা দিলেই হুকুম বুঝবে।

বৃদ্ধা এসব কথা বার্তা শুনে—আর দাদুদের দলের চেহারা ভাব ভঙ্গি দেখে ভয়ে একেবারে শুকিয়ে গেছেন তখন। কাকুতি মিনতি করে প্রায় কেঁদে উঠলেন—আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দাও বাবা। আমাদের ভাগ্যে যা হবার হয়েছে।

না। দাঁড়ান।—কেষ্ট তার সকলে অটল।

কি! ধরে-বেঁধে নালিশ করাবে নাকি?—দাদুর দল গলা ছেড়ে হেসে উঠল!

দিলীপ তখন এসে পৌঁছেছে। অফিস ঘরের ভেতর দিয়ে চৌধুরী সাহেবের খাস কামরার দিকে যেতে যেতে শেষ কথা গুলোই তার কানে গেল।

ভিড়ের মাঝখানে কেষ্টকে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়তেই দাদু ও তার দল সসম্ভ্রমে মাথায় হাত ঠেকাল।

—সেলাম—দিলীপ বাবু!

সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে একটু অবাক হয়েই দিলীপ জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে কি?

প্রশ্নটা কেষ্টকেই করেছিল, জবাব দিল দাদু নিজে।

—হ'বে আবার কি তার। এই কেষ্টো ড্রাইভারের একটু চুলবুলুনি বেড়েছে। মক্কেল বলছে নালিশ নেই তবু উনি লাটখুড়ি করে লড়তে এসেছেন।

দিলীপ কেষ্টকেই সরাসরি এবার জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপারটা শুনি কেষ্ট?

ব্যাপার চৌধুরী কোম্পানীর একটা বাড়ি।—কেষ্ট তিক্ত স্বরে বুঝিয়ে দিলে;—কি বাড়ি বুঝতেই —পারছ! ভাঙা ছাদের টালি খসে এই মেয়েটার হাত ভেঙেছে আর ওর ছোট ভাইয়ের মাথা। ওই রাস্তা দিয়েই আসছিলাম, তাই গাড়িতে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে—সেখান থেকে থানায় একটা ডায়েরি করিয়ে এসেছি এই আমার অপরাধ!

আপনিই শুনুন দিলীপ বাবু!—বিনোদবাবু দিলীপকেই সাক্ষী মানলেন,—থানায় ডায়েরী করিয়ে এসেছে চৌধুরী কোম্পানীর নিমক খোর ড্রাইভার।

দিলীপ বিনোদ বাবুকে কোন জবাব না দিয়ে বৃদ্ধার দিকেই ফিরে এবার বলল,—আপনারা আমার সঙ্গে আসুন ত!

না বাবা আমাদের বাড়ি পৌঁছে দাও,—বৃদ্ধার ভীত কণ্ঠে সেই এক কথা।

দিলীপ কিন্তু সে আপত্তি না শুনেই তাঁদের নিয়ে চলল চৌধুরী সাহেবের ঘরের দিকে।

চৌধুরী সাহেব ধৈর্য ধরে সব কথাই শুনলেন, তার পর বিনোদ বাবুকেই ভৎর্সনা করে বললেন,—না, বিনোদবাবু এটা আপনারই অন্যায়। থানায় ডায়েরি করাতে দোষ কি হয়েছে? করাই ত উচিত—

বৃদ্ধার দিকে ফিরে তারপর তিনি আশ্বাস দিলেন,—আপনার কোন ভাবনা নেই বুড়ি মা। ঐ ব্যাপারের যা উচিত ব্যবস্থা আমি এখুনি করছি। আপনার যা কিছু নালিশ আছে নির্ভয়ে আমার কাছে জানিয়ে যান।

এ আশ্বাসেও বৃদ্ধার কাছে কোন নালিশ শোনা গেল না। কাতরভাবে সেই এক কথাই তিনি বললেন,—আমার কোন নালিশ নেই বাবা। আমরা বাড়ী যেতে চাই। ভাগ্যে আমাদের এই শাস্তি ছিল মানুষ কি করবে!

যা করবার মানুষই করেছে, ভাগ্য নয়!—দিলীপ রাগ চাপতে না পেরে প্রায় ধমক দিয়ে উঠল,—যে বাড়িতে থাকেন তার অবস্থা আপনি বলুন .....

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না।—দিলীপকে বাধা দিয়ে মধুর ভাবে হেসে চৌধুরী সাহেব বললেন,—তবে আপনি বলছেন আমার কোন নালিশ নেই!

না বাবা কিছু নেই।—বৃদ্ধা সকলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ব্যাকুল,—ওই ড্রাইভার বাবু আমাদের অনেক উপকার করেছেন। উনি না পেড়াপেড়ি করলে এখানে আসতাম না। আমাদের বাড়ি যেতে দাও বাবা!

হ্যাঁ হ্যাঁ এখুনি আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি!—চৌধুরী সাহেব নিজেই ব্যস্ত হয়ে বিনোদ বাবুকে আদেশ দিলেন—এঁদের গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন বিনোদ বাবু। আর তার আগে ওঁর যে কোন নালিশ নেই টিপ সই দিয়ে সেটা লিখিয়েও নেবেন।

তার মানে?—দিলীপ জ্বলে উঠল,—অসহায় বুড়ো মানুষ ভয় পেয়েছেন বলে তাকে দিয়ে ওই কথা লিখিয়ে নেবেন।

মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?—চৌধুরী সাহেব স্নিগ্ধ স্বরে দিলীপকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ও লেখানোটুকু ত' শুধু কাগজে কলমে। নইলে যা করবার সবই করা হবে। যান বিনোদ বাবু নিয়ে যান।

বিনোদ বাবু বৃদ্ধা ও ছোট মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর তিক্ত হতাশার স্বরে চৌধুরী সাহেবের দিকে ফিরে দিলীপ বললে,—চৌধুরী—ইনডাষ্ট্রিসের কেন এত উন্নতি তা এখন বুঝতে পারছি।

বুঝবেন দিলীপ বাবু, আরো কিছু দিন থাকলে আরো বুঝবেন।—চৌধুরী সাহেবের হাসিতে যেন ঘেন্নাই ঝরে পড়ছে—মনে হ'ল।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে—কি একটা কাগজ বার করে তিনি এবার জিজ্ঞাসা করলেন—তা ও বাড়ি সম্বন্ধে কি ঠিক করলেন?

ঠিক আর কি করব!—দিলীপের গলাটা আলিয়ে যেন জবাবটা বার হ'ল,—আপনি দিলে নেব। অত বড় লোভ কি জয় করতে পারি!

জয় করবেনই বা কেন?—চৌধুরী সাহেব বেশ জোরেই হেসে উঠলেন,—সবাই আমরা মুনি ঋষি হ'লে বিধাতার দুনিয়াই যে অচল হবে! হ্যাঁ ও বাড়ি পাওয়ার সামান্য যে বাধাটুকু ছিল তাও আর নেই।

হাতের কাগজটা দিলীপের দিকে এগিয়ে দিয়ে চৌধুরী সাহেব বললেন,—এই নিন আপনার নতুন appointment letter আপনি এখন চৌধুরী কোম্পানীর বড় অফিসার।

নির্বাক নিস্পন্দ দিলীপের হাতটা ধরে ড্রয়ার নেড়ে দিয়ে চৌধুরী সাহেব খুশিতে গদ গদ হয়ে বললেন,—আমিই আপনাকে প্রথম অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—ক্রমশঃ

"উত্তর দেশের যাদুকর"

শ্রীঅজিত কৃষ্ণ বসু

শহর—লণ্ডন। সাল—১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ। যত্র—খ্রীষ্টের দেবভাগ। ইংলণ্ডের সিংহাসনে সমাসীনা মহারাণী ভিক্টোরিয়া। লাইসিয়াম (Lyceum) থিয়েটারে কিছুদিন ধরে চলছে একজন বিখ্যাত যাদুকরের যাদু প্রদর্শন। যাদু প্রদর্শনের বিজ্ঞাপিত মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে, এমনি সময় দুটি মহিলার স্বাক্ষরিত একটি ছাপানো প্রচার-পত্র বহু সংখ্যায় বিতরিত হয়ে সারা শহরে সাড়া জাগাল। প্রচার-পত্রটির যথাসম্ভব হুবহু বাংলা তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায় :

"ইংলণ্ডের মহিলাদের প্রতি……

লাইসিআম থিয়েটার থেকে সাবধান!!! প্রফেসর অ্যাণ্ডারসনের অদ্ভুত ব্যবহার!!! ভগিনীগণ, বড় দুঃখের সহিত আমরা একটি নালিশ জানাচ্ছি, আমরা দুজন দরিদ্র অসহায়া বিধবা, আমাদের এই সাম্প্রতিক বৈধব্যের জন্যে দায়ী অদ্ভুত চরিত্রের মিস্টার অ্যাণ্ডারসন, লাইসিআমের নয়তান যাদুকর। আমাদের নাম শ্রীমতী মার্গারেট উইলসন এবং শ্রীমতী ডরোথি জোন্‌স্। আমাদের স্বামীরা একজন ছিলেন দরজি, তাঁর নাম ছিল মিস্টার উইল্‌সন, আরেকজন টিন প্লেটের কাজ করতেন, তাঁর নাম ছিল মিস্টার জোন্‌স্। যাদুকরের খুব নামডাক শুনে গত সোমবার রাত্তিরে আমরা গেলাম লাইসিআম থিয়েটারে। আমাদের স্বামীরা মাথাপিছু দু শিলিং করে প্রবেশমূল্য দেবার পর আমরা ঢুকতে পেলাম। ভেতরে এত ঠেলাঠেলি ভিড়, যে মাত্র তিন হপ্তা আগে বানানো আমাদের নতুন জামাকাপড়ের দফা প্রায় রফা হবার জোগাড়। যাহো'ক, অনেক হাঙ্গামা হুজ্জুত করে তো জায়গা দখল করে বসা গেল। তারপর খেলা শুরু হলে যে সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে লাগলাম তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না।…অনেক বিস্ময়কর খেলা দেখিয়ে তারপর মিস্টার অ্যাণ্ডারসন (লোকটাকে 'প্রফেসর' অ্যাণ্ডারসন কেন বলা হয় জানি না) এক মস্ত ঝুড়ি এনে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর একটি ছুটফুটে ছোট্ট ছেলেকে টেবিলের ওপর বসিয়ে ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর বিড় বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়ে তিনি ঝুড়িটি তুলে নিতেই আমরা দেখলাম—কী সর্বনাশ! ছেলেটি বেমালুম উধাও! এর পরে আর একটি ছেলে আর একটি মেয়েকেও যাদুকর বেমালুম উড়িয়ে দিলেন। ব্যাপার দেখে আমাদের পতি দেবতারা—এঁরা দুজনেই যেমন গোঁয়ার তেমি বোকা—জেদ ধরলেন স্টেজে উঠে গিয়ে দেখবেন যাদুকর ওঁদেরও উড়িয়ে দিতে পারেন কিনা। আমরা অনেক বোঝালাম; বললাম যেও না, গেলেই অনর্থ ঘটবে। কিন্তু পুরুষ মানুষের গোঁ, অবলা নারীর সাধ্য কি তাতে বাধা দেয়? মিস্টার উইল্‌সন প্রথমে গেলেন, ঢাকা পড়লেন ঝুড়ির তলায়। যাদুকর ঝুড়ি তুললেন—মিস্টার উইল্‌সন হাওয়া!!! তারপর গেলেন মিস্টার জোন্‌স্। তিনিও হাওয়া হয়ে গেলেন!!! আমরা দুজন অবলা স্ত্রী প্রতীক্ষা করে রইলাম, কিন্তু স্বামীরা ফিরলেন না। খেলার শেষে হল ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল, আমরা সভয়ে লক্ষ্য করলাম আমাদের স্বামীরা তবু ফিরছেন না। ওঁরা বেরিয়ে গেছেন ভেবে বাইরে গিয়ে গরু খোঁজা খুঁজলাম। ওঁদের টিকিটিও দেখতে পেলাম না। বাড়ী ফিরে গেলাম, অপেক্ষা করে রইলাম সারা রাত জেগে জেগে। বৃথা হল রাত জাগা। ফিরলেন না আমাদের স্বামীরা।

পরদিন ভোরবেলা শয়তান যাদুকরের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করলাম। অনেক কষ্টে বিকেলবেলা তাঁর দেখা পেলাম। বললাম, 'ফিরিয়ে দাও আমাদের স্বামীদের।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা, দেখবো'খন কি করা যায়।' দেখবো'খন কি করা যায়!!! ততক্ষণ কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে আমরা খাই কি? শুনে মনিব্যাগ খুলে উনি আমাদের দু'জনের হাতে এক পাউণ্ড করে দিলেন। সারা মঙ্গলবারটা কাটল মহা উদ্বেগে, তারপর বুধবার বিকেলে গেলাম, যাদুকরের সঙ্গে কিছুতেই দেখা করা গেল না। বিমুৎবার অনেক কষ্টে দেখা মিলল বটে, কিন্তু উনি বললেন, 'আমি বড় দুঃখিত, আপনাদের স্বামীরা দুজনেই এত দূরে চলে গেছেন যে ওঁদের খুঁজে আনবার মতো সময় আমার নেই। এই ক্রীসমাসের সময়ে কোভেন্ট গার্ডেন থিয়েটারে আমার নতুন যাদুপ্রদর্শন শুরু হবে, তারই তোড়জোড়ে আমি এখন বড় ব্যস্ত। অবশ্য পরে খুঁজে পেলেই আপনাদের স্বামীদের খোঁজ করবার চেষ্টা করব। যদ্দিন তাদের কেরৎ না পান ততদিন চুপচাপ থাকুন,—এ নিয়ে সোরগোল করবেন না। এই চুপ করে থাকার জন্য আমি আপনাদের প্রত্যেককে হপ্তায় এক পাউণ্ড করে দেবো।' কি ধুর্ত্ত! স্বামীর বদলে হপ্তায় এক পাউণ্ড!!!

ভগিনীগণ! আমরা বিচার চাই, স্বামীদের ফিরে চাই। গরীব অবলা নারী আমরা, আদালতে মোকদ্দমা করবার পয়সা আমাদের নেই। বিধবা না হয়েও আমরা বিধবার চাইতে বেশী অসহায়া। একজন সহৃদয় ছাপাখানার মালিক দয়াপরবশ হয়ে বিনামূল্যে আমাদের এই আবেদন-পত্র ছেপে দিয়েছেন। আশা করি অন্তত কয়েকজন সহৃদয়া ভগিনী আমাদের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে একজন উকিলের বন্দোবস্ত করে দেবেন, যিনি আদালতে আমাদের হয়ে মোকদ্দমা লড়ে আমাদের সুরাহা করে দিতে পারেন। আপনাদের কাছে এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। ইতি।

মার্গারেট উইল্‌সন, ৪৯, ফুলটন্‌স্ বেন্ট্‌স্, হল্‌বর্ণ্।
ডরোথি জোন্‌স্, ঐ (ঘোড়লা)।"

প্রথমেই বলেছি, বহু সংখ্যায় প্রচারিত এই অ-সাধারণ ইস্তাহারটি সারা শহরে বেশ চমক এবং সাড়া জাগিয়েছিল। যাদু প্রদর্শনের জগতে চমকদার বিজ্ঞাপনের (sensational publicity) এটি একটি চমৎকার উদাহরণ। মজাদার এই আবেদন-পত্রটির খসড়া করেছিলেন স্বয়ং যাদুকর জন হেনরি অ্যাণ্ডারসন, যিনি নিজেকে "উত্তর দেশের যাদুকর" (Wizard of the North) বলে প্রচার করতে করতে ঐ উপনামেই বিখ্যাত হয়ে যান। প্রচার মাহাত্ম্য তিনি বেশ ভালোই জানতেন, এবং পুরোপুরি তার সদ্ব্যবহার করতে কখনো চেষ্টার ত্রুটি রাখতেন না। সাধারণ মামুলী ধরণের বিজ্ঞপ্তির চাইতে ঐ অভিনব চমক জাগানো আবেদন-পত্রের ছদ্মবেশে বিজ্ঞাপন যে অনেক বেশী কার্যকরী হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। লাইসিআম থিয়েটারে প্রফেসর অ্যাণ্ডারসনের (নামের আগে এ ধরণের 'প্রফেসর' বসানোর রেওয়াজটা নতুন নয়) যাদু প্রদর্শন দেখতে যাঁরা তখন পর্যন্ত যান নি, এই বিচিত্র আবেদন-পত্রটি পড়ে তাঁদের অনেকেই গিয়েছিলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের জানা হয়ে গিয়েছিল যে কোভেন্ট গার্ডেন থিয়েটারে আসন্ন ক্রীসমাসে "উত্তর দেশের যাদুকর"-এর নতুন যাদু প্রদর্শনের মরশুম শুরু হবে।

"উত্তর দেশের যাদুকর" উপনামে খ্যাত ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্যার ওয়ালটার স্কট, যাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "আইভান-হো"-র সঙ্গে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস "দুর্গেশ-নন্দিনী"-র আশ্চর্য মিল আছে। স্কটল্যাণ্ড ইংলণ্ডের উত্তরে, এবং ওয়ালটার স্কট কথাসাহিত্যের 'যাদুকর' লেখক, এই জন্যেই সাহিত্যামোদী মহলে তিনি "উইজার্ড অভ্ দ নর্থ" উপনামে খ্যাত হয়েছিলেন। সম্ভবত স্কটের এই উপনামটি

শুনেই পছন্দ হয়ে যাওয়ায় এবং নিজেও উত্তর দেশের মানুষ এবং পেশায় যাদুকর বলে যাদুকর অ্যাণ্ডারসন এটিকে আপন করে নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বলতেন এ উপনামটি স্বয়ং স্যার ওয়াল্টার স্কট তাঁকে দিয়েছিলেন। অ্যাবট্‌স্ ফোর্ড শহরে যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের যাদুর খেলা দেখে স্কটস্‌ম্যান বলেছিলেন "লোকে আমাকে বলে 'উত্তর দেশের যাদুকর', কিন্তু মিস্টার অ্যাণ্ডারসন, আমার মনে হয় এই নামটি আপনার পক্ষেই বেশী উপযোগী। সুতরাং আপনি এই নামই গ্রহণ করুন।"

এখানে বলে রাখা দরকার, অ্যাণ্ডারসনের উল্লেখযোগ্য যাদু প্রদর্শন শুরু হয় ১৮৩৭ সালে, কিন্তু ঔপন্যাসিক স্যার ওয়ালটার স্কটের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে। তার আগে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের গোড়াতেই স্কটের শরীর আর মন দুই-ই ভেঙে পড়েছিল। তাই মনে হয় ঔপন্যাসিক স্কট অ্যাণ্ডারসনকে 'উত্তর দেশের যাদুকর' নাম দিয়েছিলেন একথা হয়তো ঠিক নয়। ঐ উপনামটুকু সম্ভবত নিজেই নিজেকে দিয়েছিলেন যাদুকর অ্যাণ্ডারসন! কিন্তু তাঁর বড় সাধের এই উপনামটির জন্যে তাঁকে কয়েকবার কিরকম বেকায়দায় পড়তে হয়েছিল তাই বলছি। একবার স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরা শহরে বেশ সাফল্যের সঙ্গে যাদু প্রদর্শন করে তিনি গেলেন তার মাইল বারো দূরে ফরেস (Forres) নামে একটি ছোট্ট শহরে যাদু প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করতে। ফরেসের অনতিদূরে ধূ ধূ করা নির্জন প্রান্তর, সেই প্রান্তরের নিঃসীমাতেই ম্যাকবেথ তিনটি রহস্যময়ী যাদুকরী ডাইনীর দেখা পেয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি ছিল। এই তিনটি ডাইনীর অশুভ প্রভাবের ফলেই বীর সেনাপতি ম্যাকবেথ তাঁর গৃহে অতিথি বৃদ্ধ রাজা ডানকানকে হত্যা করে স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন, এবং পরে নিয়তির বিধানে এই পাপের শাস্তি হিসেবে তাঁকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল—যে কাহিনী শেক্‌স্‌পীয়রের "ম্যাকবেথ" নাটকে অমর হয়ে আছে। ঐ ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে সন্ধ্যার পর কেউ যাতায়াত করতে ভরসা পেত না, এমন কি দিন দুপুরেও ওপথে যেতে অনেক সাহসী মানুষেরও গা ছম ছম করত। ডাইনীদের যাদুর পাল্লায় পড়েই ম্যাকবেথকে অমন শোচনীয় পরিণাম সইতে হয়েছিল, সুতরাং ঐ প্রান্তরের আশেপাশের মানুষের মনে যাদুবিদ্যা এবং যাদুকরের সম্পর্কে একটা ভীতির ভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক।

যাদুকর অ্যাণ্ডারসন প্রথমেই ফরেস শহরের এক ছাপাখানায় গিয়ে তার আসন্ন যাদু প্রদর্শনীর আগাম জানানী দেবার জন্যে হ্যাণ্ডবিল ছাপতে দিলেন। তারপর ছাপাখানার মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন এখানে কয়েকদিনের জন্যে কোথায় আশ্রয় নেওয়া যায়। মালিক তাঁকে এক বিধবা ভদ্রমহিলার খোঁজ দিয়ে বললেন, "এঁর বাড়ীতে খান দুয়েক ঘর খালি আছে। আপনি ভাড়া নিতে পারেন।"

অ্যাণ্ডারসন গেলেন, ঘর দেখলেন, পছন্দ হল। বললেন "সাত দিনের জন্যে ভাড়া নিলুম।"

বিধবা বাড়ীওয়ালী বললেন "কিছু মনে করবেন না, অনেক ঠকে ঠকে এখন আর ঠকবার সাধ নেই। আপনি দেখতে শুনতে খুবই ভদ্রলোক, তবু কথায় বলে সাবধানের মার নেই। অর্ধেক ভাড়া আগাম দিতে হবে।" অ্যাণ্ডারসন সঙ্গে সঙ্গে আগাম টাকা দিয়ে দিলেন বাড়ীওয়ালীকে। বুড়ী ভারি খুশি।

ঘর ভাড়ার ব্যাপারটা চুকিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। অ্যাণ্ডারসন ভাবলেন একবার ছাপাখানায় গিয়ে দেখে আসা যাক হ্যাণ্ডবিল ছাপার কাজ কতটা এগুলো। বৃষ্টি হবার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল বলে সঙ্গে ছাতা এনেছিলেন, কিন্তু এখন দেখলেন আকাশ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে, অতএব অনর্থক ছাতার বোঝা বইবেন কেন? বললেন "আমার ছাতাটা আপনার কাছেই রাখুন, আমি একটু কাজ সেরে আসছি।" বাড়ীওয়ালীর কাছে ছাতা রেখে তিনি চলে গেলেন ছাপাখানায়।

নগদ টাকা হাতে পেয়ে নতুন অতিথির ওপর বুড়ীর মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অতিথি বেরিয়ে যাবার পর তাঁর ছাতাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি দেখলেন ছাতার হাতলের ওপর লেখা রয়েছে "Great wizard of the North"—অর্থাৎ "উত্তর দেশের মহা যাদুকর !!!"

ছাপাখানা থেকে ফিরে এসে যাদুকর দেখলেন বুড়ীর হাবভাব একেবারে বদলে গেছে। তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছেন ভদ্রমহিলা, আর নিজে আপাদমস্তক কাঁপছেন থরথর করে, দুই চোখে ভীত সন্ত্রস্ত ভাব।

বিষম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ী বললেন, "আপনি কে ? কি করা হয় আপনার ?"

বুড়ীর ভয় দেখে একটু কৌতুক বোধ করে অ্যাণ্ডারসন হেসে বললেন "আমি একজন ভয়ানক চরিত্রের লোক। আমাকে হয়তো আগে দেখেন নি কখনো, কিন্তু আমার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। আমার নাম অ্যাণ্ডারসন, উত্তর দেশের যাদুকর বলে আমার এক ডাকে সবাই চেনে।"

বিধবা বাড়ীওয়ালী ভীষণ ভয় পেয়ে ছাতাটা যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন "দয়া করে তাহলে শীগ্‌গীর বেরিয়ে যান। আমার বাড়ীতে যাদুকরের ঠাঁই দিতে পারব না। এই নিন আপনার টাকা। আর কখনো এ মুখো হবেন না।" বলে যাদুকরের দেওয়া টাকাগুলো মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে গেলেন। পড়বার সময় একটা টুলে তাঁর মাথা ঠুকে গেল, গায়ের ছাল উঠে গেল খানিকটা। বুড়ীর চীৎকার শুনে পাড়াপড়শীরা ছুটে এসে দেখেন বুড়ী অজ্ঞান হয়ে মরার মতো পড়ে আছেন। কাটা মাথা থেকে রক্ত পড়ছে। দেখে মেয়েরা চীৎকার করে উঠলেন, "লোকটা খুন করেছে বুড়ীকে।" আর পুরুষরা পাকড়াও করলেনন 'খুনী' যাদুকরকে।

এমনি সময় এলসিন শহরে যাবার ঘোড়ার গাড়ী এসে হাজির। গাড়োয়ান চিনত যাদুকর অ্যাণ্ডারসনকে, অনেকবার তাঁর যাদুর খেলা দেখে দেখে তাঁর বেশ ভক্তও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কথা তখন কে শোনে ? 'খুনী' লোকটাকে ছেড়ে দিতে কেউ রাজী নয় তারা।

অ্যাণ্ডারসন দেখলেন গতিক সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না, বুড়ী কি মরেই গেল নাকি ? "আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে চলো।" মনে ভাবলেন ব্যাপারটা ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝিয়ে বলাই নিরাপদ।

কিন্তু মাইল সাতেকের মধ্যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন না। এই সন্ধ্যায় কে আবার হাঙ্গামা করে অত মাইল দূরে যায় ? সুতরাং দুজন পুলিশ কনষ্টেবল্ ডেকে যাদুকর অ্যাণ্ডারসনকে সে রাতটা বন্দী থাকবার জন্যে জেলখানার হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান অগত্যা উত্তর দেশের যাদুকরকে না নিয়েই চলে গেল এলসিন শহরে সেই থিয়েটারে, যেখানে সেই সন্ধ্যাবেলায় যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের যাদু প্রদর্শন হবার কথা। যাদু দর্শনার্থীরা হল ভর্তি করে ফেলেছে, আর সময় হয়ে গেছে অথচ যাদুকরের টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না বলে অনেকে খেপে উঠেছেন। এমি সময় সেই গাড়োয়ান গিয়ে খবর দিল যাদুকর এক বুড়ীকে খুন করে 'কয়েস'-এর জেল হাজতে বন্দী রয়েছেন, যাদুর জোরে সেখান থেকে বেরোতে পারেননি।

বুড়ীকে খুন করেছেন যাদুকর অ্যাণ্ডারসন !!!! শুনে সারা হলময় একটা শিহরণের সাড়া জাগল যেন। তারপর সবাই হৈ হৈ শুরু করে বললেন টিকিটের দাম ফেরৎ চাই। নিশ্চয়, নিশ্চয়। এতো খুবই ন্যায্য কথা। দাম ফেরৎ দেওয়া হলো সবাইকে। এলসিন শহরে সে রাতে সবার মুখে এক কথা "যাদুকর অ্যাণ্ডারসন এক বুড়ীকে খুন করে ফেলেছেন। কি আশ্চর্য। কি সর্বনাশ !"

খবর পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট এসে পড়লেন পরদিন ভোরবেলা। ততক্ষণে বুড়ী সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে

উঠেছেন। তাঁর মুখে সমস্ত ঘটনাটা শুনে ম্যাজিস্ট্রেট তাড়াতাড়ি হাজত থেকে যাদুকরকে মুক্তি দিয়ে এই অসুবিধার জন্য তাঁর কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এ খবরটা যথারীতি পৌঁছে গেল এল্‌গিন শহরে, আর এ-দ্বারা চমৎকার প্রচার বা 'পাবলিসিটি'র কাজ হলো যাদুকরের। অ্যাণ্ডারসন আরো বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক এসে তাঁর যাদু প্রদর্শনীতে ভিড় করতে লাগল। ফলে যে কয়দিন তাঁর এল্‌গিন শহরে যাদু প্রদর্শন করার কথা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি দিন তাঁকে থাকতে হল। সুতরাং বলা চলে এক রাত জেলখানার হাজতে বাস আপাত দুঃখকর হলেও যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের পক্ষে শাপে বর হয়েছিল।

উপরোক্ত ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৭২ সালে। এর এগারো বছর বাদে যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের যে আরেকটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটিও অনেকটা ঐ ধরণের। বলা যায় ট্র্যাজি কমিক (tragi-comic), অর্থাৎ ব্যাপারটা প্রায় ট্র্যাজেডি হতে হতে শেষ পর্যন্ত কমেডিতে পরিণত হলো। সেই কাহিনীটি বলি।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া তখন স্কটল্যাণ্ডে বাল্‌মোরাল (Balmoral)-এর প্রাসাদে অবস্থান করছেন। যাদুকর অ্যাণ্ডারসন পেলেন মহারাণীর আমন্ত্রণ—প্রাসাদে একদিন যাদু প্রদর্শন করবার। অ্যাণ্ডারসন উঠলেন এসে মহারাণীর প্রাসাদের কাছাকাছি ক্রেইথি (Craithie) নামক জায়গার একটি সরাইখানায়। সেখানে সে সময় অতিথিদের ভেতর ছিলেন একজন রসিক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যিনি অ্যাণ্ডারসনকে ছোটবেলা থেকেই চিনতেন। সরাইখানার মালিক যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, কুসংস্কারগ্রস্ত চরিত্রের লোক, তাও তাঁর জানা ছিল। তিনি ভাবলেন সরাই-ওয়ালাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে একটু রসড় দেখা যাক।

"ওহে বাপু, নতুন অতিথিকে যে বড় আদর আপ্যায়ন করে ঢুকিয়ে দিলে, জানো লোকটি কে?" দূর থেকে যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের দিকে ইঙ্গিত করে রসিক বৃদ্ধ বললেন সরাই-ওয়ালাকে কানে কানে ফিস করে, অত্যন্ত রহস্যময় ভঙ্গীতে।

সরাই-ওয়ালা বললে, "আজ্ঞে না, কর্তা। কোনো বড়লোক টড়লোক হবেন, এদিকে বেড়াতে এসেছেন; ওর চেহারা আর সাজপোষাক দেখেই বুঝে নিয়েছি।"

বৃদ্ধ বললেন "হুঁই বুঝেছ। ইনি একজন অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন যাদুকর। উত্তর দেশের যাদুকরের নাম শোনো নি? ইনি সেই।"

শুনে পরম উদ্বিগ্ন হয়ে সরাই-ওয়ালা বললে, "যা—দু—ক—র !!! সত্যি সত্যি যাদু জানেন?"

রসিক বৃদ্ধ আরো গম্ভীর, আরো রহস্যময় ভঙ্গীতে বললেন "ভয়ানক সত্যি সত্যি। যাদুর জোরে তোমার পকেটের সব টাকা উনি নিজের পকেটে নিয়ে নিতে পারেন। তোমার সোনা রূপোর টাকা বা অন্য যা কিছু আছে, যাদুর জোরে সীসে বানিয়ে দিতে পারেন। তোমার রুমাল পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে তোমার চোখের সামনে সেই ছাইকে আবার আস্ত রুমাল বানিয়ে দিতে পারেন। আরো যে কত রকম অদ্ভুত কাণ্ড করতে পারেন, তা তোমায় আর কি বলব? তালা-চাবি বন্ধ করে এঁকে আটকে রাখা যায় না। বন্দুকের গুলি চালিয়ে এঁকে মারেল করা যায় না, দাঁত দিয়ে কামড়ে ইনি গুলি ধরে ফেলেন।".....

সর্বনাশ! তাহলে এখন উপায়??? না জেনে এমন সাংঘাতিক লোককে আশ্রয় দিয়ে ফেলে তো আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেছে। ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল সরাই-ওয়ালা। কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে সে বহু কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে যাদুকরকে পরম বিনীতভাবে অনুরোধ করল তার সরাইখানা ছেড়ে যেতে। কিন্তু আশ্রয় নেবার মতো জায়গা কাছাকাছি আর কোথাও ছিল না, তাই অ্যাণ্ডারসন রাজী হলেন না সরাইখানা

ছাড়তে। অথচ তাঁকে জোর করে তাড়াবার মত সাহস বা ক্ষমতাও নেই সরাইওয়ালার। সে বেচারা এ ব্যবসায় যা কিছু পংসা কামিয়েছিল সব যাদুর মুদ্রায় জমিয়ে রেখেছিল তার ঘরেই। তার মনে হলো এই যাদুকরটির সঙ্গে একই ছাতের তলায় যখন থাকতে হচ্ছে, তখন ঘরে যাদুর মুদ্রা রাখা নিরাপদ নয়। তার সব টাকাগুলো থলিতে পুরে নিয়ে এক ফাঁকে ব্যাংকে চলে গিয়ে মুদ্রার বদলে কাগজের নোট নিয়ে এসে তার নিজের বিছানায় একটি বালিশের ভেতর সবগুলো নোট লুকিয়ে রেখে দিল।

তারপরই ঘটল মজার ব্যাপার। সরাইখানায় অতিথির আধিক্য ঘটল। সরাইখানার পরিচারিকা একজন নতুন অতিথিকে দেবার জন্য সরাইওয়ালার বিছানা থেকে একটি বালিশ নিয়ে গেল সরাইওয়ালার অজানিতেই। বিধাতার ছিল রগড়ের মতলব, তাই পরিচারিকার হাতে ঠিক সেই বালিশটিই গেল যার ভেতরে ছিল সরাইওয়ালার জীবনের সঞ্চয়—সব নোটের টাকায়। রাতে শুতে এসে বিছানার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল সরাইওয়ালা। একটা বালিশ নেই, আর সেই বালিশেই লুকানো তার সমস্ত টাকা। এ নিশ্চয় সেই সর্বনেশে যাদুকরের কাজ। নিশ্চয় সেই লোকটাই যাদুর জোরে টাকাওয়ালা বালিশটি সরিয়েছে।

এতগুলো টাকার শোক সোজা নয়। সেই শোকে তার ভুলে গিয়ে শাসাতে লাগল যাদুকরকে—শীগ্‌গীর আমার বালিশ বার করুন মশাই, নইলে আমি পুলিশ ডাকব। খবর পেয়ে ছুটে এলো পরিচারিকা, সেই বালিশটি নিয়ে। বলা বোধ হয় বাহুল্য, সব টাকাই পাওয়া গেল বালিশের ভেতর। তখন শুরু হলো সরাইওয়ালার ক্ষমা চাওয়ার পালা। হাসিমুখে তাকে ক্ষমা করেও দিলেন যাদুকর অ্যাণ্ডারসন।

এবারে শোনাই "উত্তর দেশের যাদুকর"-এর মার্কিন অভিজ্ঞতার কাহিনী। তিনি যখন তাঁর যাদু প্রদর্শনী নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম গেলেন, তখন সেখানে ক্রীতদাস প্রথা নিয়ে উত্তরের রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর প্রচণ্ড মতভেদ এবং সংঘর্ষ চলছে। উত্তরীয়রা দাবী করছে ক্রীতদাস প্রথার অবসান হোক; আর দক্ষিণীরা তার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাচ্ছে, জোর গলায় বলছে, "ক্রীতদাস প্রথা আইনতঃ চালু থাকবে। ক্রীতদাস প্রথা যদি কেন্দ্রীয় আইনসভায় আইন করে লোপ করে দেওয়া হয় তা হলে আমরা উত্তরীয়দের সঙ্গে এক রাষ্ট্রে থাকবো না, আমরা দক্ষিণীরা দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোকে একত্র করে আলাদা যুক্তরাষ্ট্র করবো।" রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন বলিষ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করলেন দেশকে বিখণ্ডিত করবার এই সর্বনেশে দক্ষিণী সংকল্পে তিনি সর্ব শক্তি দিয়ে বাধা দেবেন। এর ফলে যদি গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়, তবুও গৃহযুদ্ধের আশু অকল্যাণ এড়াবার জন্যে তিনি দেশ বিভাগের চরম অকল্যাণ তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না। স্বদেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আদর্শ রাষ্ট্রপতি লিংকনের এই অনমনীয় দৃঢ়তার ফলে দাস প্রথা-অবসান-বিরোধী দক্ষিণীরা আরো ক্ষেপে উঠল। সংঘর্ষ বাধল উত্তরে দক্ষিণে।

এই অস্বস্তিকর আবহাওয়ার ভেতরেই—কি ছিল বিধাতার মনে!—যাদু প্রদর্শনের মতলবে যাদুকর অ্যাণ্ডারসন প্রথম দর্শন দিলেন মার্কিন দেশে। অ্যাণ্ডারসনের ম্যানেজার সাটন চলে গেলেন ভার্জিনিয়ায়, আগাম প্রচারের ব্যবস্থা করবার জন্য। (ভার্জিনীয়া দক্ষিণীদের এলাকা, এ কথাটা মনে রাখা দরকার।) বিরাট বিরাট পোষ্টার তৈরী করিয়েছিলেন সাটন। পোষ্টারের বুকে বড় বড় হরফে লেখা: "WIZARD OF THE NORTH" (উত্তর দেশের যাদুকর)

আর তার ওপর যাদুকর অ্যাণ্ডারসনের মুখের মস্ত ছবি। পোষ্টারে ঘোষণা ছিল "উত্তর দেশের যাদুকর" শীগগীরই ভার্জিনিয়ায় আসছেন তাঁর অসাধারণ অত্যাশ্চর্য অনুকরণীয় যাদুর খেলা দেখাতে। ভালো জায়গা বেছে বেছে সাটনের ভাড়া করা লোকেরা এই পোষ্টার লাগাতে লাগল। দক্ষিণীদের মেজাজ তো এমিতেই

যহা খাপ্পা হয়ে ছিল। এই পোস্টার দেখে সে মেজাজে আরও খাপ্পা হয়ে উঠল। "উত্তরী" যাদুকরের এত বড় আস্পর্দ্ধা, দক্ষিণ এলাকায় এসে 'অকুলনীয়' ভেল্‌কি দেখাবে বলে দক্ষিণের দেয়ালে দেয়ালে নিজের ঢাক পিটছে !!!!!!! দক্ষিণীরা বিষম খেপে উঠে সবগুলো পোস্টার ছিঁড়ে ফেলল, পোস্টার লাগানেওয়ালা লোকগুলোকে উত্তম মধ্যম লাগিয়ে তাড়িয়ে দিল, আর উত্তর দেশের যাদুকরের মুণ্ডু ছিঁড়ে নিয়ে (পোস্টার থেকে অবশ্য) তাই নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় যে ভাবে চেঁচাল তা থেকে আন্দাজ করা শক্ত ছিল না যাদুকরকে হাতের সামনে পেলে ওরা কি করত। যাদুকরের ম্যানেজার সাটন অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেন। ··

যাদুকর আাণ্ডারসনের ঘটনাবহুল জীবনের আরো অনেক বিচিত্র কাহিনী আছে। "উত্তর দেশের যাদুকর" উপন্যাসটির রচনা তাঁর যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এবার শুধু তাই থেকে বেছে কয়েকটি কাহিনী বললাম।

ফরাসী বিপ্লবের সূচনায় ফ্রান্সের ধনবতী ও রূপবতী তরুণী ম্যাডাম রোঁলা বিপ্লবের সহায়ক ছিলেন কিন্তু যখন তিনি দেখলেন স্বাধীনতার ধুয়া তুলে এমন সব বৈশাচিক কাণ্ড হচ্ছে ফ্রান্সে, যাতে বিপ্লবকে আর সমর্থন করা চলে না, তখন তিনি ফ্রান্সের সংস্কৃতি ও অভিজাত সমাজকে রক্ষা করার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন। ভাগ্যের পরিহাসে তিনি বিপ্লবীদের হাতে ধরা পড়লেন ও তাঁর শিরচ্ছেদ হয় গিলোটিন যন্ত্রে।

মৃত্যুর আগের দিন তাঁর এক বালা সহচরী তার সঙ্গে গোপনে শেষ দেখা করতে এসে তাঁর জায়গায় নিজেকে বন্দী রাখতে চাইলেন। অবশ্য এতে পোশাক বদলাবার সুযোগ ছিল।

ম্যাডাম রোঁলার চোখে জল এল;—"এত ভালবাসো তুমি আমায়?"—বালা সহচরীকে জড়িয়ে ধরে তিনি আবেগ চঞ্চল কণ্ঠে একথা বললেন।

—"তোমার জীবন আমার চেয়ে অনেক মূল্যবান"—বললেন সহচরী।

—"কিন্তু আজ তুমি আমাকে যে অনুরোধ করতে এসেছ, তাতে তোমার জীবনের দাম যে আমার চেয়ে অনেক গুণ বেশী হয়ে গেছে বন্ধু।

ম্যাডাম রোঁলা অনেক কষ্টে বুঝিয়ে তাঁর বালা সহচরীকে ফিরিয়ে দিলেন কারা-রক্ষের হাত থেকে।

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তিনি শুধু বলেছিলেন—"O liberty what crimes are committed in thy name !"

রম্যাণি বীক্ষ্য

উৎকল পর্ব

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

আট

দ্রষ্টব্য স্থানের শেষ নেই পুরীতে। জগন্নাথদেবের মন্দির আজ আমরা দেখবনা, তবু আমাদের দেখা আর শেষ হচ্ছেনা। মহাদেবই কত! মার্কণ্ডেশ্বর কপোতেশ্বর লোকনাথ। রামানন্দবাবুর ভেদ চেপে গেছে। নাথকে জিজ্ঞাসা না করেই তিনি সমস্ত খবর সংগ্রহ করছেন। কপোতেশ্বর নামের কাহিনীও যোগাড় করেছেন। মহাদেবের নাকি ইচ্ছা হল, তিনিও জগতে পূজা হবেন। কাজেই জগন্নাথদেবকে সন্তুষ্ট করা দরকার। বিরজামণ্ডল ও নীলাচলের মধ্যে কুশস্থলী এক ভয়ানক স্থান। জল নেই, বৃক্ষলতা নেই। মহাদেব সেখানে জলাশয় খনন করলেন, উদ্যান করলেন সুবৃক্ষ বৃক্ষলতার। তারপর তপস্যার ক্লেশে কপোতাকার ধারন করলেন জগন্নাথ কল্পনায়, তাই মহাদেব এখানে কপোতেশ্বর নামে পূজা পাচ্ছেন।

লোকনাথ মহাদেবেরও একটা কাহিনী আছে। সে রামায়ণের যুগের কাহিনী। রাম সীতা উদ্ধারে চলেছেন। এই নীলাচলের পশ্চিমে শবরদের দেশে এসে শিবলিঙ্গ পেলেন না। তখন শবর প্রবর একটি লাউ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করলেন। সেই শিব আজ লাউক নাথ বা লোকনাথ নামে পরিচিত। শিবরাত্রিতে এখানে মেলা হয়।

তর্ক করার প্রবৃত্তি আমার নেই। তর্কের যে শেষ নেই। সীতা অপহৃতা হয়েছিলেন দণ্ডক বন থেকে, সেখান থেকে কিষ্কিন্ধার দক্ষিণের পথ। শ্রীক্ষেত্রে তিনি নিশ্চয়ই আসেননি। শবরীর সঙ্গে যুক্ত করেই বোধহয় এই গল্প। অন্য সব কাহিনীও খুব দুর্বল। তা হোক। যুক্তে বিশ্বাস রেখেই মানুষ বাঁচে। বাঁচুক তারা।

সমর রাস্তার উপর জগন্নাথবল্লভ একটি মঠ। প্রশস্ত উদ্যানের ভিতর একটি মনোরম স্থান। রামানন্দ বাবু একটি প্রবাদ সংগ্রহ করেছেন। একবার পুরীর কোন রাজা বাম হাতে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন ভ্রমে। তারপর গভীর ক্ষোভে সেই হাতটি কেটে ফেলে এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেন। সেই হাত নাকি বৃক্ষরূপে আজও এই বাগানে আছে।

রায় রামানন্দ গোস্বামীর নামের সঙ্গে এই মঠের নাম বোধহয় যুক্ত আছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে কারও কোন আগ্রহ দেখলুম না।

নিকটে নরেন্দ্র সরোবর। স্বচ্ছ জলের বিরাট পুষ্করিণী। লোকে চন্দন পুষ্করিণীও বলে। এরই ধার দিয়ে বাঁধানো রাস্তায় আমরা আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি মন্দিরে এলুম। মনে হলনা যে এই আচার্যের নামের সঙ্গে কেউ পরিচিত আছেন। এক জায়গায় তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাবের সন তারিখ লেখা। রামানন্দবাবুকে ডেকে বললুম : আপনার নোট বুক তাড়াতাড়ি বার করুন।

রামানন্দবাবু এগিয়ে এলেন ব্যস্তভাবে।

খতা বলল : লিখুন, আবির্ভাব ১২৬৮ সন উনিশে শ্রাবণ কুলন পূর্ণিমা, আর তিরোভাব ১৩০৬ সন বাইশে জ্যৈষ্ঠ। হল ?

হাতের উপর খাতা ধরে রামানন্দবাবু লিখছিলেন, বললেন : ১৩০৬ সন—

খতা বলল : বাইশে জ্যৈষ্ঠ।

রামানন্দবাবু টেনে টেনে বললেন : বাইশে জ্যৈষ্ঠ।

তারপর লিখুন, গোস্বামী প্রভুর চাকায় ভজন কুটীর গাত্রে স্বহস্তে লিখিত উপদেশ—

ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যায় নমঃ

এইছা দিন নাহি রহেগা।

১। আত্ম প্রশংসা করিও না।

২। পরনিন্দা করিও না।

৩। অহিংসা পরমোধর্ম।

৪। সর্বজীবে দয়া কর।

৫। শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।

৬। শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলিবেনা তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর।

৭। নাহং কারাৎ পরো রিপুঃ।

রামানন্দবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন : দাঁড়ান দাঁড়ান। আস্তে আস্তে বলুন।

আমি অন্যধারে একটি নির্জন স্থানে এসে বসলুম।

বিজয়কৃষ্ণের জীবনের সমস্ত ঘটনা আমার জানা নেই। যেটুকু জানি তা আমার ভাল লাগে। ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা আমরা তাঁর প্রথম জীবন থেকেই দেখতে পাই। একবার এক শিষ্যা তাঁর পা ধুইয়ে দিচ্ছিল। তিনি তাতে খুশী হতে পারলেননা। ভাবলেন যে মানুষকে তিনি ঠকাচ্ছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে উপনিষদের ব্যাখ্যা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। সমাজের আচার্যও ছিলেন। তারপর তিনি অন্য পন্থা নিলেন।

আর একটি গল্প আমার মনে পড়ল। জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে অনেক সাধু বঞ্চনা করেছেন। তাই একবার বিজয়কৃষ্ণের কাছে সাধুর লক্ষণ জানতে পাঠিয়েছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ জানিয়েছিলেন, যিনি নিজের প্রশংসা করেন না, পরের নিন্দা করেন না, আর ধনীর অতিথি হননা, তিনিই সাধু।

এই নিঃসম্বল সাধু পুরীতে এসে ধনী হয়েছিলেন। মানুষ তাঁকে অঞ্জলি ভরে দিয়েছে। প্রাণের আবেগে দিয়েছে। বিজয়কৃষ্ণ তাঁদের কী দিয়েছিলেন তারাই জানে। সে সব কথা এই সমাধি মন্দিরে সম্পূর্ণ লেখা নেই। সংক্ষেপে যা আছে খতা তাই রামানন্দবাবুকে বলছে লিখতে। বলছে : তাড়াতাড়ি লিখুন। দাদা বৌদি দেখা সেরে বেরিয়ে গেল।

রামানন্দবাবু বলছেন : আপনার সবটাতেই একটু বেশি তাড়া।

তাড়া একটু বেশি বলেই তো আলাপও হয় তাড়াতাড়ি। আপনার বন্ধু কোথায় ? আমি আড়ালে ছিলুম, কিন্তু নিকটে। পরিষ্কার ভাবে তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলুম।

গোপালবাবু ?

রামানন্দবাবু যে চমকে উঠেছিলেন, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই তা বুঝতে পেরেছি।

ঝতা বলল : ভদ্রলোকের মাথায় একটু গোলমাল আছে, তাই না!

ঠিক বলেছেন।

কী গোলমাল বলুন তো!

গোলমাল নয়? নিশ্চয়ই গোলমাল।

তাতে তো সন্দেহ নেই। কিন্তু আর কিছু সন্দেহ করেছেন?

আর কী বলুন তো?

ঝতা বলল : চলুন এবারে।

আমি জানি, রামানন্দবাবুর উত্তরে ঝতা খুশী হয়নি। হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তার কৌতূহলের কী কারণ! আমি কি নির্লিপ্ত থাকবার চেষ্টা করে সবার কৌতূহলের কারণ হচ্ছি! ছি ছি, এ যে আরও লজ্জার কথা!

ঝতার পাশে পাশে রামানন্দবাবু এগিয়ে গেলেন। আর দেরি না করে আমিও তাদের অনুসরণ করলুম।

একটুখানি এগিয়েই কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর সমাধি আশ্রম। নিরিবিলি নির্জন স্থান। আশ্রমই বটে। কিন্তু আমার মন তখন অন্য রাজ্যে চলে গেছে। রামানন্দবাবু ঝতার দাদা বৌদির সঙ্গেও গল্প জমিয়ে ফেলেছেন। উৎসাহের সঙ্গে নানা কথা আলোচনা করছেন। আমি ঝতার কথা ভাবছিলুম। মেয়েটার আচরণে আমার খটকা লেগেছে। রামানন্দবাবুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা যেন বাহিরের ব্যাপার। ভিতরে কোন রহস্য হয়তো আছে। আমি কিছু অনুধাবন করতে পারিনি। কিন্তু সন্দেহ করবার সুযোগ পেয়েছি।

স্বাতির সঙ্গেও আমার এমনি করেই দেখা হয়েছিল। এমনি অকস্মাৎ অভাবিত রূপে। ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে সেই পরিচয় আমাদের ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছে। রহস্য সেদিন কারও ছিল না, ছিল শুধু দুটি প্রাণ দুটি বীণার মতো। কখন এক সময় একই সুরে বাজতে শুরু করল। দুজনেই বিস্মিত হলুম, বিহ্বল হলুম। কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। ফেরার পথ নেই, বালির উপর পিছনের পায়ের চিহ্ন গেছে মুছে। এগিয়ে চলতেই হবে!

তারপর?

তারপর আজ আমি পালিয়ে এসেছি। ভয়ে পালিয়েছি। সাহস থাকলে এমন করে লুকিয়ে থাকতুম না। ঝতা কে? সে কি আর এক ছলনা নয়! নারীই তো ছলনা! আমার মনে হল, এই ঝতারা আমার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করবে, কারণ হবে আমার অপমৃত্যুর।

ছি ছি, এসব আমি কী ভাবছি! এ তো সুস্থ মানুষের ভাবনা নয়! এসব অদ্ভুত কথা আজ আমার কেন মনে হচ্ছে! আমার মনোবল কি আজ আমি হারিয়ে ফেলেছি!

এখান থেকে আমরা গ্রাম্য পথে আঠারো নালা দেখতে গেলুম। শহর ছাড়িয়ে সেই মনোরম স্থান। রাস্তার ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত দিগন্ত বিস্তৃত। শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য। রামানন্দবাবু বললেন; এও আবার কোন দ্রষ্টব্য বস্তু?

নটবর একটা উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করল। বলল : এ নালা নয় বাবু, এ নদী, নাম ভাগিরথী। অনেক দিন আগে সমুদ্রের সঙ্গে যোগ ছিল। আজও তাই প্রতি বারো বছরে সমুদ্রের পূজা হয়।

রামানন্দবাবু বললেন : তবে আঠারো নালা নাম কেন হল?

সে বাবু ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার জন্যে। নিজের আঠারোটা ছেলেকে এইখানে কেটেছিলেন।

বল কি।

রামানন্দ বাবু চমকে উঠলেন।

ঠিকই বলছি বাবু।

আরে নিজের ছেলেদের কেন কাটলেন তা তো বলবে।

নটবর যে বিপদে পড়েছে তা বুঝতে পেরেছি। তাকে রক্ষা করবার জন্য বললুম: ছেলেদের কাটবার জন্যে নিশ্চয়ই কাটেননি। দেশের বা দশের কল্যাণের জন্যেই এমন একটা মর্মান্তিক কাজ করেছিলেন।

রামানন্দ বাবু বললেন: নটবর একেবারেই নটবর। নাম হলে নিশ্চয়ই বলতে পারত!

ধানের ক্ষেত দেখিয়ে নটবর বলল: এরই নাম শস্ত্রী জলা। এই জমিতে বারো মাস ধান হয়।

এইখান থেকেই আমরা শহরের দিকে ফিরলুম। নটবর বলল: এখন আমরা মাসির বাড়ি যাচ্ছি!

রামানন্দ বাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন: সে আবার কী!

গুণ্ডিচা বাড়ির নাম মাসির বাড়ি।

রামানন্দ বাবু আমার দিকে ফিরে বললেন: শুনুন কথা। মাসির বাড়ি যদি বা বুঝতে পাচ্ছিলুম, এ একেবারে গুলিয়ে দিল।

আমি তাঁকে সাহস দিয়ে বললুম: চলুননা গিয়েই দেখি।

এক সময় একটা দেওয়ালের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নটবর বলে উঠল: এই হল মামার বাড়ি।

মামার বাড়ি।

রামানন্দ বাবু বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

নটবর একবার পিছন ফিরে তাকাল। দেখে আশ্চর্য হলুম যে সে দু'পাটি দাঁত বার করে মনের আনন্দে হাসছে। রামানন্দ বাবু চটে গেলেন; হাসছিস যে!

বললুম; কোন রসিকতা করেছে নিশ্চয়ই।

আরও খানিকটা এগিয়ে ডানহাতে মোড় ফিরে তার রসিকতাটা বুঝতে পারলুম। সদর দরজায় প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। পুরীর জেলখানা এটি।

মন্দিরের সামনে থেকে যে বড় রাস্তাটা সোজা এগিয়ে গেছে, তারই শেষপ্রান্তে গুণ্ডিচা বাড়ি। দূরত্ব প্রায় দু'মাইল হবে। ফটকের সামনে এসে আমরা রিক্স থেকে নেমে পড়লুম।

ওস্তা বলল: হাতি দেখেছ বৌদি?

সত্যিই একটা হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে শুঁড় নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল। ওস্তা বলল: ওরে বাবা, এদিকেই যে আসছে।

ওস্তার দাদা বললেন: ভয় কিসের, পিঠের ওপর তো মানুষ বসে আছে।

রামানন্দ বাবু তখন নাথকে চেপে ধরেছেন। গুণ্ডিচা বাড়ীর গল্প তাঁকে জানতেই হবে। এই তীর্থের সঙ্গে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। গুণ্ডিচা নাকি তাঁর পাটরাণীর নাম। এই নামেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। পণ্ডিতরা কোন প্রাচীন গ্রন্থে ইন্দ্রদ্যুম্নের কোন রাণীর নাম পাননি। কিন্তু নানা পুরাণে গুণ্ডিচাগাত্রের নাম আছে। ব্রহ্মপুরাণ নারদ পুরাণ নাম পুরাণেও আছে। মন্দিরকে তবু পুরাণের মতো পুরাণো মনে হয়না। বাহির থেকে প্রাচীর দেখে জেলখানার মতোই লাগে। কুড়ি ফুট উঁচু

আর পাঁচ ফুট চওড়া প্রাচীর। ভিতরের প্রাঙ্গন লম্বা ও চওড়ায় হবে চারশো বত্রিশ আর তিনশো একুশ ফুট। পশ্চিমে সিংহদ্বার ও বিজয়দ্বার উত্তরে। রথযাত্রার সময় জগন্নাথের দারুমূর্তি সিংহদ্বার দিয়ে ভিতরে আসেন। আর বাহির হন বিজয়দ্বার দিয়ে। বিশ্বকর্মা নাকি এই শুণ্ডিচা বাড়িতেই দারু ব্রহ্মের ওঙ্কার মূর্তি নির্মাণ করেন। সে স্বতন্ত্র গল্প।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি মন্দিরের গঠন প্রণালী লক্ষ্য করছিলুম। ওঝা আমার কাছে এসে বলল: অমন মনোযোগ দিয়ে কী দেখছেন?

কিছুনা।

কিছু নয় বলবেন না, বলুন বলবেন না।

সত্যিই আমি মিথ্যা বলেছি! তাই তাড়াতাড়ি বললুম: উড়িষ্যার সমস্ত মন্দির একটা বিশেষ ধরণে তৈরি। যেমন জগমোহন নাটমন্দির ভোগ মণ্ডপ।

বুঝিয়ে বলবেন?

এগিয়ে দেখুন। সবচেয়ে উঁচুটা মূল মন্দির, তার নাম দেউল। জগমোহন তার গায়ে লেগে আছে চার চালার মতো। নাট মন্দিরের সমতল ছাদ আর ভোগ মণ্ডপ জগমোহনের মতো।

আপনি বুঝি এইসব দেখতে ভালবাসেন?

উত্তর দেবার ইচ্ছা ছিলনা, বললুম: যা চোখে পড়ে তাই দেখি।

দেউলের মধ্যে আমরা কালো পাথরের একটা হাত বেদী দেখতে পেলুম। রথযাত্রার দিন থেকে উত্থানদ্বাদশী পর্যন্ত জগন্নাথ এই বেদীর উপর অবস্থান করেন। ব্রাহ্মণেরা ওঝার দাদা বৌদিকে এই গল্প শোনাচ্ছেন পরম আগ্রহে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর বেশি দূরে নয়। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নাকি যজ্ঞের দক্ষিণায় অসংখ্য গাভী দান করেছিলেন। সেই গরুর ক্ষুরে গর্ত ও উৎসর্গের জলে জলাশয় হয়েছে। স্কন্দ পুরাণের উৎকল খণ্ডে এই গল্প আছে। এই সরোবরে স্নান ও তর্পন করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। তাই এই তীর্থের নাম অশ্বমেধাঙ্ক। পাথর দিয়ে বাঁধানো এই সরোবরটি ছোট নয়। লম্বায় চারশো ছিয়াশি ফুট আর চওড়ায় তিনশো ছিয়ানব্বই ফুট। অসংখ্য কচ্ছপ দেখে ওঝার পুলক আর ধরে না।

রামানন্দবাবু তৎক্ষণ কচ্ছপের পূর্বপুরুষকে চিনে ফেলেছেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নেরই তারা বংশধর। বংশ থাকলে কীর্তিনাশ, এই ছিল রাজার ধারণা। তাই তিনি জগন্নাথের কাছে বংশলোপের প্রার্থনা জানান। জগন্নাথ তাঁর প্রার্থনা রাখেন নি, কিন্তু অভিশাপ পূর্ণ করেছেন। তাঁর বংশধরেরা কচ্ছপ রূপে বেঁচে রইল বটে, কিন্তু তাঁর কীর্তিকে অতিক্রম করবার সুযোগ পেল না। আজ এই সরোবরের তীরে নৃসিংহ ও নীলকণ্ঠের মন্দির।

বেলা অনেক হয়েছিল। ওঝার দাদা বললেন: এইবারে ফেরা যাক।

রামানন্দবাবু তাড়াতাড়ি খাতা দেখে বললেন: সবই প্রায় সেরে ফেলেছি। শুধু চক্রতীর্থ আর সোনার গৌরাঙ্গ বাকি আছে।

সে আর একদিন হবে।

রামানন্দবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললুম: সেই ভাল।

ঠিক এই উত্তরটি তিনি আশা করেন নি, বললেন: সেই ভাল মানে!

ওঁরা তাঁদের বিস্ময় চেপে বলেছিল। বললুম : পুরী থেকে তো পালিয়ে যাচ্ছি না। আর একদিন বেরুলেই চলবে।

বেশ বলেছেন! আর একদিন দেখব বললে কি নটবর তার পয়সা কম নেবে, না সেদিন বিনি পয়সায় দেখাবে!

কাজেই আমাদের ফেরা হল না। ওঁরা আমাদের সামনে দিয়ে হোটেলের দিকে চলে গেলেন, আমরা গেলুম চক্রতীর্থের দিকে। সমুদ্র তীরে একটি ক্ষুদ্র সরোবর, তারই নাম চক্রতীর্থ। শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছিলেন প্রভাস তীর্থে। যে গাছটির উপর দেহত্যাগ করেছেন, একদিন সেই গাছটিই ভেসে এসে এই চক্রতীর্থে ঠেকল। এই তো দারু-ব্রহ্মের আবির্ভাব। এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করে লোকে বালির পিণ্ড দেয়।

আমরা চক্রনারায়ণ দেখলুম, তারপর দেখলুম সোনার গৌরাঙ্গ। রামানন্দবাবু শুনেছেন, এখানে কোন কাহিনী আছে। কাকি কাবেরি মুকুন্দদেবের কাহিনী। কিন্তু নটবর কোন খবরই রাখে না। নাথে আর নেই। কাজেই রামানন্দবাবুকে শান্ত হতে হল।

ফেরার পথে নটবর আমাদের রেলের হোটেল দেখাল। বিরাট ব্যাপার। আমাদের হোটেলের সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না। মানুষ গুলোও বোধ হয় অন্য জাতের। ঐ জাতের হলে আজ আমাকে কলকাতা থেকে পালিয়ে আসতে হত না।

রামানন্দবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার দেশ কোথায় গোপালবাবু?

ভারতবর্ষ।

আরে না মশাই, আমি আপনার বাড়ি কোথায় জানতে চাইছি।

বাড়ি নেই।

মরণ কোথায় থাকেন?

উত্তর পাড়ায়।

কে কে আছেন বাড়িতে?

কেউ না।

আত্মীয় স্বজন?

নেই।

স্ত্রী-পুত্র?

জোটেনি।

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বল্লেন : কী করেন আপনি?

কেরাণি গিরি।

ভদ্রলোক চমকে উঠলেন না ঠিকই কিন্তু মনে হল যেন একটু সরে বসলেন। সংকীর্ণ রিক্সর উপর স্পর্শ বাঁচাতে পারলেন না। আমি জানি, মজুর বললে তিনি চমকে উঠতেন, হয়তো বা লাফিয়ে নামতেন রিক্স থেকে। বললুম : আপনি তো মাষ্টারি করেন!

গম্ভীরভাবে ভদ্রলোক বললেন : প্রফেসরি।

আমিও গম্ভীর ভাবে বললুম : কলেজের মাষ্টার।

বাকি পথটুকু ভদ্রলোক নীরবে অতিক্রম করলেন। ক্রমশঃ

করবী বসু

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

আমি বরাবর মুঙ্গেরে থাকি। মুঙ্গেরেই আমাদের বাড়ি। সরকারী কাজ নিয়ে ঠাকুর্দা প্রথম বেশ ছেড়ে মুঙ্গেরে আসেন। তারপর থেকে এই তিন পুরুষ মুঙ্গেরেই কেটে যাচ্ছে। বাড়ির সামনেই গঙ্গা। কষ্ট-হারিণী ঘাটটা কাছেই। অবশ্য সীতাকুণ্ড একটু ঘুরেই পড়ে।

বেশ ক'মাস ভুগে সেরে উঠেছি তখন। একটু জোরও পেয়েছি গায়ে। ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছিলেন—সন্ধ্যা-সকাল পায়ে হেঁটে বেড়াতে। ওষুধ আর খেতে হয় না। পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে মুঙ্গেরেই হাওয়া খাই—ওটাই ওষুধ ও পথ্য দু'য়েরই কাজ করে।

শীতকাল। কুয়াসা খুব। একটা হাল্কা ধোঁয়াটে আমেজ চারিধারে। দেখছি চেয়ে—মা গঙ্গা কুহেলির চাদর গায়ে ঢাকা দিয়ে আছেন। দূর থেকে বোঝা যায় না কিছুই। তীরে গিয়ে দাঁড়ালে নিশ্বাস প্রশ্বাসের একটা প্রশান্ত রব শোনা যায় মা গঙ্গার। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বেশ। তবু বেরিয়ে পড়েছি বেড়াতে—প্রায় আপাদমস্তক গরম কাপড়ে আবৃত হয়ে। পায়ে উলের মুলমোজা—পরিধানে একখানা মোটা খদ্দরের ধুতি—গায়ে পরপর তিনটে জামা আর একখানা ধারিয়াল লুই—মাথায় 'মনকি-ক্যাপ'—দস্তানা-পরা হাতে বেড়াবার ছড়ি। যেন লড়াই দিতে বেরিয়েছি সর্বরকমে সশস্ত্র হয়ে মুঙ্গেরের শীতের সঙ্গে। ডাক্তারবাবুর প্রেস্‌ক্রিপসনটা অবহেলা করতে পারিনি মোটেই—কেননা জগতে বাঁচবার ও দেখবার আকাঙ্ক্ষা আমার তখন খুব।

পূবদিকে সূর্য উঠে গেছে অনেকক্ষণ। ঘড়ি দেখে হাতের তা' বুঝতে পারছি—আকাশ দেখে নয়। শুরু হয়েছে লোক চলাচল। গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে—রোজই যায়। একে মুঙ্গেরের জলহাওয়া—তারওপর নিত্য গঙ্গাস্নান—সুস্থ স্বাস্থ্য গঠনে যোগাযোগটা খুব। কিন্তু তাহলে কি হয়—অসুখবিসুখ আছে, আছে ডাক্তারবাবুদের পসার—চিতা জ্বলে তবু মুঙ্গেরের শ্মশানে।

চক্কর দিকটা ঘুরে যাবো—তাই পা বাড়ালাম সেইদিকে। এক পাউণ্ড খাস্তা বিস্কুট কিনতে হবে—হুকুম আছে গৃহিণীর। হঠাৎ দেখি, কাঁচা নরম রোদ ফুটে উঠলো চারিধারে—একেবারে হু-হু ক'রে। কুয়াসার ঘোমটা গেল খুলে একেবারে যেন ঘাউ-ঘাউ করে। কী মিষ্টি লাগছিল সেদিন রোদটুকু! মৃদু উষ্ণ পরশ—যেন বিয়ে-করা নতুন বৌয়ের প্রথম হাতধরা—একটু বিষণ্ণ নিরালায়—একটু প্রশস্ত সঙ্গোপনে।

ইঞ্জিনের সিটি শুনতে পেলুম। জামালপুর থেকে গাড়ী আসছে ৭৩ এক্সপ্রেসের যাত্রী নিয়ে মুঙ্গের স্টেশনে প্রথম সকালে। প্ল্যানটা লেট্ করেছিল একটু। পথে আশুবাবুর সঙ্গে দেখা। আশুবাবু আমার মত মুঙ্গেরবাসী। হন্‌হন্ করে চলেছেন স্টেশনের দিকে। আমায় দেখতে পেয়ে স্মিতমুখে জিজ্ঞেস করলেন, কি রকম—শীতটা কেমন?

—বেশ—কোথায় চললেন?

—যাচ্ছি স্টেশনে। দিদি আসছেন ভাগলপুর থেকে—তাঁকে 'রিসিভ্' করতে।

আর দাঁড়ালেন না আশুবাবু। এগিয়ে গেলেন অনেকটা।

প্রাতঃভ্রমণ সেরে এবং গৃহিণীর হুকুমটা তামিল করে বাড়ি ফিরলুম ঘণ্টাসময়ে। এক কাপ চা খেয়ে—বাড়ির সামনে একফালি ফুলবাগান আছে—ঢুকলুম তারই ভেতর চারা গাছগুলোর একটু সেবা করতে। আমাদের বাড়িটা রাস্তার ধারেই। কাঠের কটকটা ঠেললেই ফুলের বাগান—বাগানটুকু পেরুলেই ভদ্রাসন। কিন্তু—ওরা কারা—একটি তরুণ আর একটি তরুণী! দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার পাশে। যুবকটির হাতে একটি ছোট 'সুটকেস'। খুঁজছে বোধ হয় কোন বাড়ির ঠিকানা। উভয়ের দৃষ্টি যেন উৎকণ্ঠামিশ্রিত—ক্লান্তিময়।

অভ্যর্থনার খাতিরে এগিয়ে গেলুম। জিজ্ঞেস করলুম, কোন্ বাড়ি খুঁজছেন?

যুবকটির বয়স প্রায় বত্রিশ তেত্রিশ। বেশ সৌম্যদর্শন—সুন্দর স্বাস্থ্য।

যুবকটি বললেন, না—বাড়ি কোন খুঁজিনি। আচ্ছা মশাই—মুঙ্গেরে থাকবার ভালো হোটেল কোন নেই?

বললুম, না—তেমন হোটেল এখনও হয়নি। স্টেশনের কাছে একটা—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন যুবকটি, সেটা দেখেছি—বড় 'ডার্টি'—নোংরা।

সঙ্গিনীর বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হবে। বেশ ঢল-ঢল মুখখানি। দেহপাত্রে সুষমাটুকু বেশ টলমল করছে। মাথায় সিঁদুর। কাঁধের কাছে এলিয়ে-পড়া খোপাটা বাঁ হাত দিয়ে একটু টেনে তুলতে তুলতে বললে, কি Nasty (ন্যাশটি) জায়গা—ধর্মশালাটাও যা দেখলুম, একেবারে ঢুকতে ইচ্ছে করে না।

পরক্ষণেই একটু অভিমান-ভরা বিরক্তি প্রকাশ করে যুবকটিকে বলে উঠলো, চলো—চলো এখান Next Train-এ চলে যাই।

থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম, আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

যুবকটি উত্তর দিলেন, আসছি কোলকাতা থেকে।

—এই নিদারুণ শীতে—আপনাদের জন্য 'লাগেজ' কোথায়?

—লাগেজের দরকার হবে না। আমরা সীতাকুণ্ড দেখে সন্ধ্যার ট্রেণেই ফিরে যাবো রামপুরহাটে। ঐখানেই আমাদের সব রয়েছে। এসেছি মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড দেখতে।

বিদেশে দেশের লোক দেখলে আমার কেমন মনটা আনচান্ ক'রে ওঠে। আমার কেন—সকলেরই। মনে পড়ে যায় তখন কালিদাসের মেঘদূতের কথা। মনে হয় যেন—আমরা সেই যক্ষপত্নীর মত কর্মসূত্রে অলকায় বন্দী। দেশের লোক দেখলে মনে হয়—ওরাই যেন মেঘদূত। এসেছে যেন সেই রাম-গিরিশির হতে আমাদের হৃদয়ের সেই অভিশপ্ত যক্ষের মর্ম-আকুতি নিয়ে। বাঙলা দেশে ঘরেতে নতুন জামাই এলে আমরা যতটা না পুলকিত হই—তার চেয়ে বেশি আমাদের মনের পাখা ঝট্‌পট্ ক'রে ওঠে যদি এমন করে বিদেশে আমরা দেশের লোককে কাছে পাই।

বললুম, বেশ তো—তা'তে কি হয়েছে। ভালো হোটেল নেই ব'লে কি আপনাদের মুঙ্গের আসা ব্যর্থ হবে। আসুন—আসুন—আমার বাড়িতেই আসুন।

কেমন গররাজী হলেন উভয়ে। লজ্জা সঙ্কোচের সাঁড়াশির মাঝে যেন দু'জনে আটক পড়লেন। আমি ছাড়লুম না কিছুতেই। রাত-জাগায় দু'খানি করুণ মুখে ক্লান্তির মধুর আলপনার রেখা ফুটে উঠেছে বেশ। মায়াও হলো—লাগ্‌লোও ভালো। যুবকটির হাতের সুটকেসটা জোর করে হাতে নিয়ে জানালুম সাদর অভ্যর্থনা। আমার আন্তরিকতা আর তাঁদের লৌকিক ভদ্রতায় অল্পবিস্তর চললো একটু মোলায়েম বচসাবচি। শেষে জয় হলো আমার। চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলুম মধু চাকরকে। আমার গলা পেয়ে

প্রথম বেরিয়ে এলেন আমার গৃহিণী তাঁর ছোট তিনটি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে। পরে ছুটে এলো মধু। মধুর হাতে সুটকেশটা দিয়ে আমি যুবকটির হাত ধরলুম। আমার মুখে ব্যাপারটা একটু শুনে বুঝে নিয়ে আমার গৃহিণী হাত ধরলেন মেয়েটির। উপরোধ আর ঠেলতে পারলেন না দু'জনে। সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় এ উপরোধ তাঁদের গ্রহণ করতে হলো। কাঠের ফটকটা বন্ধ ক'রে ঘরে এনে বসালাম উভয়কে। তারপর চলতে লাগলো ক্রমিক পর্যায়ে অতিথি-সৎকারের পালা।

কথাপ্রসঙ্গে পরে পরিচয় পেলুম—উভয়ে স্বামী-স্ত্রী। রামপুরহাটে বেড়াতে এসেছেন বড়দিনের ছুটিতে। ওখানে তাঁদের এক আত্মীয় থাকেন। হঠাৎ উভয়ের বড় ইচ্ছা হলো সীতাকুণ্ড দেখবার—তাই চলে এসেছেন মুঙ্গেরে। যুবকটির নাম শিশিরবাবু—শিশির বসু। বেশ শিক্ষিত—কোলকাতার এক স্কুলে মাস্টারী করেন। মেয়েটির নাম করবী—বেশ রূপে-গুণে মার্জিতরুচি—ভব্যতাসম্পন্না। থাকেন—কোলকাতার দক্ষিণে বালিগঞ্জ রেলে। খুব আনন্দ হলো এই স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গলাভে। তাঁদের সীতাকুণ্ড দেখবার ব্যবস্থা ক'রে দিলুম। সঙ্গে গেল আমারি এক বয়স্থা অবিবাহিতা মেয়ে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উভয়ে আমাদের বেশ আপনার হয়ে উঠলো। বাড়িতে যেন একটা নতুন বি-জামাই আসার আবেশ ছড়িয়ে পড়লো চারিধারে।

সন্ধ্যার ট্রেণে তাঁরা ফিরে যেতে চান রামপুরহাটে। কিন্তু ছাড়লেন না আমার গৃহিণী। আমার মেয়ে বুকিয়ে রাখলে তাঁদের সুটকেশটা। বেশ ভাব হয়ে গেছে তার করবীর সঙ্গে। অগত্যা সেরাত্রে তাঁদের থাকতে হলো। গৃহিণী পৃথক্ ঘরে স্বামী-স্ত্রীর শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। আমার মেয়ে গান জানে। সে কেমন বুঝতে পেরেছিল, শিশিরবাবুর স্ত্রীও বেশ গায়িকা—ঠিক যেমন করে বুঝতে পারে এক কেরাণী আর এক কেরাণীকে—পেশা জিজ্ঞেস না ক'রেও।

মেয়ে আমার সন্ধ্যার পর জিদ্ ধরে বসলো—করবীর গান শুনবে। করবীও গাইবে না কিছুতে—আর ছাড়বে না কিছুতে আমার মেয়েও। মেয়ে উদ্বোধন করলে সেদিনের সান্ধ্য সঙ্গীতাসর নিজেই প্রথম একখানা গান গেয়ে। তারপর আরম্ভ হলো করবীর গান। পাশের ঘর থেকে শুনতে লাগলুম আমি। আধুনিক ভজন গাইলে দু'খানা। আহা—সে কী গলা! গান শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল—গায়িকার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে থাকি খানিকক্ষণ—এমনই সুরমূর্ছনা—এমনই আবেগ-ব্যঞ্জনা সে ভজন সঙ্গীতের! সত্যই কোকিল-কণ্ঠী করবী। ধন্য তার সাধনা—ধন্য তার জীবন!

পরদিনও তাঁরা ছাড়া পেলেন না। আমার পরিবারবর্গের সঙ্গে উভয়ের আত্মীয়তা বেশ নিবিড় হয়ে উঠলো। দু'দিন দু'রাত তাঁদের ধরে রাখলুম। তারপর আর পারা গেল না। শিশিরবাবুর সন্তানাদি হয়নি। স্বামী-স্ত্রী বেশ কাড়া হাত-পা। মাঝে মাঝে এই রকম বেরিয়ে পড়েন বিদেশ ঘুরতে। রামপুরহাটে তাঁদের আত্মীয় চিন্তিত হবেন। আর তাঁরা থাকতে পারবেন না কিছুতেই। তৃতীয় দিনে তাঁরা বিদায় নিলেন আবার মুঙ্গেরে বেড়াতে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। আমরা বাড়িশুদ্ধ সদলবলে তাঁদের বিদায় অভিনন্দন দিলুম মুঙ্গের ষ্টেশনে গিয়ে উভয়কে গাড়ীতে তুলে দিয়ে।

বাড়িতে ফিরে এসে গৃহিণী বললেন, বেশ মেয়েটি—অমন মনপ্রাণ-খোলা মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। ভাতার লোক লেখাপড়া জানে—তার ওপর গান বাজনা—

বাধা দিয়ে বললুম, হ্যাঁ—ছেলেটিও বেশ—যেমন শিক্ষিত, তেমনি বিনয়ী। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মিলনটা সবদিক দিয়ে বেশ মধুর হয়েছে। সত্যি—অমন প্রায় দেখা যায় না।

এর প্রায় এক বছর পরে আমায় একবার কোলকাতায় আসতে হয়—আমার মেয়ের জন্যে এক পাত্রের সন্ধানে। কাজটা সেরে একদিন সন্ধ্যার পর বালিগঞ্জ প্রেসে গেলুম। খুঁজে খুঁজে বার করলুম শিশিরবাবুর ঠিকানা। এক ভদ্রলোক রাস্তার ধারে ঘরখানিতে বসে কি একখানা বই পড়ছিলেন। সামনের টেবিলের ওপর একরাশ ছেলেদের পরীক্ষার খাতা। খানকতক দেখা হয়েছে—আর বাকি সব অদেখাই আছে এখনও। ভদ্রলোকটির বয়স প্রায় আমারই মত। মুখের আকৃতি বেশ গম্ভীর। চোখে চশমা। একটু স্থূলকায়। গায়ের রঙটা একেবারে মিশ্‌মিশে কালো।

জিজ্ঞেস করলুম, শিশিরবাবু আছেন?

—কে শিশিরবাবু?

—শিশির বসু।

—কোত্থেকে আসছেন?

—আমি আসছি মুঙ্গের থেকে। তাঁকে একবার দয়া ক'রে খবরটা যদি দেন। বলবেন, মুঙ্গের থেকে জগৎবাবু এসেছেন দেখা করতে।

ভদ্রলোকের চোখ মুখের চেহারা যেন কেমন হয়ে গেল। ঘরে বসতে বললেন। বসলুম। চেয়ে আছি তাঁর মুখের পানে।

জিজ্ঞেস করলেন এবার চোখ থেকে চশমা নামিয়ে, কাকে খুঁজছেন—শিশিরবাবুকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—শিশির বসু—স্কুলমাষ্টারী করেন—

বললেন, আমার নাম শিশির বসু—আমিই স্কুলমাষ্টারী করি।

কি হলো—ঠিকানা ভুল করলুম না কি! আমার পরিচিত শিশির বসু তো এ ভদ্রলোক নয়। কেমন যেন মনে একটু খোঁকা লাগতে লাগলো।

ভদ্রলোক বললেন, আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না। কি নাম বললেন আপনার—জগৎবাবু—মুঙ্গেরের জগৎবাবু—

সাহসভরে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি কি বরাবর এইখানেই থাকেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—এই তো আমার পৈত্রিক বাড়ি। মাষ্টারী করি—ছেলে পড়াই—আর বাপ-পিতামহের ভিটেয় সন্ধ্যে প্রদীপ দিই। বড় লোকজন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আমার তেমন যোগাযোগ নেই। আমি বড় একটা চিনিনা কারোর। বসুন—আমার স্ত্রী করবী আসুক—তিনি বোধ হয় চিনতে পারবেন আপনাকে। বসুন একটু—এক্ষুনি তিনি এসে পড়বেন।

মাথাটা কেমন আমার ঘুরে গেল। বসতে আর পারলুম না। গা-হাত আমার কেমন থরথর ক'রে কাঁপছিল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, তিনি কোথায় গেছেন?

ভদ্রলোকটি বললেন, তিনি গেছেন সিনেমায়। পাটনা থেকে তাঁর এক সম্পর্কের দাদা এসেছেন—

আর শুনতে চাইলুম না বাধা দিয়ে ব'লে ফেললুম, আচ্ছা থাক্—আমি এখন চলি। পরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করব'খন। আমার একটু বিশেষ কাজ আছে—কিছু মনে করবেন না।

একটা 'লেটার প্যাড্' আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন ভদ্রলোক, আর একটু বসলেই দেখা হতো। তা বেশ, বিশেষ কাজ আছে যখন বলছেন—আচ্ছা, এই প্যাড্‌টায় আপনার নামটা দয়া করে লিখে যান। করবী এলে আমি তাঁকে দোব'খন।

—না, না—তার প্রয়োজন হবে না। আমি নিজেই আসবো'খন—নিজেই আসবো'খন।

—কি নামটা বললেন—জগৎবাবু—মুঙ্গেরের জগৎবাবু—

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

আর দাঁড়ালুম না। একটা ক্ষিপ্র নমস্কার হাত তুলে ভদ্রতার খাতিরে সেরে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কেমন যেন দম আটকে আসছিল আমার ঘরের মধ্যে। ভদ্রলোকের সামনে আর মুখ তুলে কথা বলতেই পারছিলুম না।

সাড়ে আটটা তখন বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি রাস্তার মোড়টা পেরিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচি। একটা জোরে দমকা নিশ্বাস ফেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে না বাঁচতেই একবারে করবী বসুর সামনা-সামনি। পরস্পর পরস্পরকে এড়াবার মোটেই উপায় ছিল না। এমনি অবস্থাটা। একখানা দামী সিল্কের শাড়ী পরণে—পায়ে হাল্কা জরির কাজ করা একজোড়া স্যাণ্ডেল্—হাতে ঝুলছে একটি ছোট গোলাকার রঙবেরঙের 'ভ্যানিটি ব্যাগ'। একটা কিসের যেন উচ্ছ্বাস চোখে মুখে উছলে পড়ছে করবীর।

বেশ দ্বিধাহীন হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলে করবী, এই যে—জগৎবাবু যে—কখন এসেছেন?

সঠিক উত্তর মুখে আমার কেমন জড়িয়ে যেতে লাগলো। তাই আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগলুম।

করবী সহজকণ্ঠে বলে উঠলো, আসুন—একটু চা খেয়ে যাবেন।

—না—না—আজ থাক্। আবার একদিন আসবো'খন।

—ঐযে আমাদের বাড়ি।

বললুম, হ্যাঁ জানি। ঐ বাড়ি থেকেই আসছি। শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে।

করবী একটু হেসে উঠলো—চটুল হাসি। হাত তুলে নমস্কার করতেই প্রতি-নমস্কারের পালাটা কোনও রকমে সেরে পা দু'টো ধীরে ধীরে এগিয়ে দিলুম। তারপর পা চালালুম দ্রুত। চোখের সামনে করবী বসুর হাতের বটুয়া চঙের ভ্যানিটি ব্যাগ্‌টা নমস্কারের তালে তালে দুলছে যেন দেখতে পেলুম। আজও যেন মাঝে মাঝে তেমনি ঘোলে দেখতে পাই করবী বসুর হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ্‌টা—সেই বটুয়া চঙের ভ্যানিটি ব্যাগ্‌টা!

একটি অপূর্ব প্রবন্ধ লিখেছেন চার্লস ল্যাম্ব। অনেকে ধরে পড়ল, বলতেই হবে, কি করে রচনা করলেন এমন প্রবন্ধ।

উত্তরে মৃদু হেসে ল্যাম্ব বললেন, দুধ পাবার জন্যে আমি অবশ্য কুড়িটা গাই দুয়েছিলাম কিন্তু তা থেকে মাখন যা তুলেছি তা সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব।

আমাদের দেশে সম্প্রতি যা পরিবেশিত হচ্ছে তা দুধ থেকে তোলা মাখন নয়, জোলো ঘোলও

আজকের দুনিয়া

পঙ্গপাল যে মুহূর্তমধ্যে একটা প্রকাণ্ড দেশ উৎসন্ন দিতে পারে এ তথ্য জগতের ইতিহাসে বহুবারপ্রমাণিত হয়ে গেছে। সম্প্রতি রুশ বৈজ্ঞানিকেরা পঙ্গপালের সঙ্গে সূর্য্যের একটা নিবিড় সম্পর্ক আবিষ্কার করে' সকলকে বিস্মিত করেছেন। "Locust invasions no longer catch scientists unawares; it has proved that there is some connection between solar activity and the mass multiplication of these destructive insects."

সোভিয়েট ইউনিয়ন

• • • •

চীনদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে সকলের দৃষ্টি চীনের উপর নিবদ্ধ। একেই ত চীন জনসংখ্যানুপাতে বোধ হয় জগতে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে, তার উপরে আরও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অপরাপর দেশে উপনিবেশ স্থাপন ও পররাজ্যাধিকার তার পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে উঠ্‌বে। চীন দেশের ডাক্তারেরা ত পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছে। রোগীর ত সীমা সংখ্যা নেই।—"The increase in population has also resulted in tremendous pressure on medical faculties. In 1958 nearly 5000000 outdoor patients were treated at Government and Government-aided hospitals."

ইলাস্‌ট্রেটেড্‌ উইকলি অব ইণ্ডিয়া

• • • •

দেশের আইন অনেক সময়ে অপরাধী ও দুষ্কৃতদের সহায়ক হয় এটা অনেকেই হয়ত ভেবে দেখেছেন "In some countries crime is actually encouraged by antiquated or inconsistent laws." অবশ্য আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার পক্ষে দেশের কেতাবী আইন যে সব সময়ে কার্য্যকরী হয় না এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। অপরাধী এমন চমৎকার ভাবে কার্য্যসিদ্ধি করে যে আইন তার নাগালই পায় না। নোটজাল যারা করে তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এমন চমৎকারভাবে নকল করে যে কার সাধ্য তাদের ধরে। এখন জাল নোট সহজে ধরতে না পেরে সেটা জিভে ঠেকিয়ে চেখে দেখার বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে, "by running tongue over its edge," এতে নাকি জালনোট সহজেই ধরা পড়ে।

লাইফ

• • • •

সহরের মধ্যেই যে বিদ্যালয়গুলিকে রাখা হবে এটাও ঠিক নয়,—একথা জার্ম্মাণীর অনেক শিক্ষাব্রতীই আজকাল জোর গলায় বলেন। তাঁদের মতে সহরের উপকণ্ঠে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই আদর্শ বিদ্যালয় থাকা উচিত। তাঁরা মনে করেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যে অপূর্ব প্রভাব আছে, কিশোর ও তরুণমনে তার প্রভাব পড়বেই পড়বে। বিদ্যালয়গুলি এমন স্থানে থাকবে যে স্থান "surrounded by beautiful woods and lakes,—responsible for the cultural life and the education of the youth."

জার্ম্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক

• • • •

এতকাল ক্যান্সার চিকিৎসায় রেডিয়াম অপরিহার্য্য ছিল। অনেকে এতে উপকার পেলেও সম্পূর্ণভাবে রোগনিরাময়ের সাহায্য এর দ্বারা খুব বেশী পাওয়া যেত না। কিন্তু বহুদিনের গবেষণার ফলে চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকেরা একটি নূতন ঔষধ আবিষ্কার করেছেন। ঔষধটির নাম "Tretamine." যেসব রোগী

অন্য কোন চিকিৎসায় ফল পান নাই তাঁদের পক্ষে "treatment with Tretamine" আশ্চর্য্য ফল দিয়েছে, —drug acts as a kind of "sentry" halting the spread of the invading Cancer cells." চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ গবেষক Ronald Bedford Tretamine সম্বন্ধে বলেন—"A Powerful new drug has saved the lives of patients suffering from Cancer." ডেলি মিরর

• • • •

গ্রহ-উপগ্রহাদি থেকেও আজকাল Signal ধরা পড়ছে পৃথিবীতে, "After a pretty long period of time, a signal is received from some planet in reply to a signal sent from the earth." এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ প্রমাণ পেয়েছেন যে অতি দূরাবস্থিত তারকাদেরও সৌরজগতের মত গ্রহ-উপগ্রহাদি আছে, "they are surrounded by systems of planets." আজকাল অতিক্রত প্রসারী "electrogamnetic waves" পাঠালেও সেই সব অতি দূরবর্ত্তী তারকাজগৎ থেকে খবর আসতে আসতে অনেক বৎসর লেগে যাবে, "almost a century will go by before a reply comes from the planet of some star". সোভিয়েট ল্যাণ্ড

• • • •

ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যে আজকাল ভারতের বাইরেও অনেককেই আকৃষ্ট করে তার প্রমাণ আমরা বহুক্ষেত্রে বহুবার পেয়েছি। একজন বিদেশিনী মহিলা যে ইদানীং ভারতকে কত অন্তরঙ্গভাবে দেখেছেন, অনুভব করেছেন, সেটা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জগৎ জানতে পেরেছে। ভিয়েনা শহরের সুবিখ্যাত ডাক্তার জোসেফ আগ্‌নারের কন্যা ইল্‌সী সিলার ভারতকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, ভারতের কথাই বলতে সদ্বন্ধ করেন ও ভারতের স্বপ্নই দেখেন। "India has left an impression on Ilse which she will carry with her forever." আর্থানস্ ডিনিস্

• • • •

লর্ড ক্লাইভ যে বিবাহ করেছিলেন তার সাক্ষ্য দিচ্ছে St. Mary's Church, Fort St. George, এর marriage register. সেটা এখনও সেখানে আছে, অবশ্য জরাজীর্ণ অবস্থায়। ক্লাইভের নিজ হস্তাক্ষর ও সই সেখানে রয়েছে। সম্প্রতি জগতের সব church বাদ দিয়ে আমেরিকার বিত্তশালিনী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা Molly Bower শেষে এই church-এ বিবাহিতা হয়েছেন। বিয়েটা অবশ্য তাঁর খেয়ালখুশী মতই হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে চার্চ্চের কর্তৃপক্ষেরা বলেন—"She was a bewitching bride indeed." বর্ত্তমানে Molly Bower এর জন্যে St. Mary's Church সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ফেমিনা

• • • •

পোল্যাণ্ডে আজকাল থিয়েটারের চাহিদা এত বেশী হয়েছে, যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও নানা জায়গায় থিয়েটার খুলেছে। অবশ্য এতে তাদের অভিভাবকদের সম্মতি আছে। পোল্যাণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছেলেমেয়েদের "Lalka" থিয়েটারে গত বৎসরের ১৪০১টী প্রদর্শনী হয়েছিল। প্রায় ৩২৪৯১২ জন দর্শক সে সব অভিনয় দেখেছেন। এই থিয়েটার সকলেরই মনোহরণ করেছে,—"This theatre won the hearts of many and the first place at the International competition." পোলাণ্ড

॥ রবীন্দ্রপাঠচক্র ॥

Visva-Bharati represents India where
she has her wealth of mind which is for all.
Visva-Bharati acknowledges India's obligation
to offer to others the hospitality of her best
culture and India's right to accept from
others their best

Rabindranath Tagore

।। রবীন্দ্র পাঠচক্র ।।

রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা (১)

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

প্রতীচ্যের একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক বলিয়াছেন—বিশাল বিশ্বে দুইটি জিনিষ আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে, ঊর্ধ্বে তারকা-খচিত অনন্ত আকাশ, আর নিম্নে মর্ত্যলোকে মানুষের মন। আকাশের রহস্যের সন্ধান করেন জ্যোতির্বিদ কিন্তু মানুষের মনের রহস্য জানিবার জন্য অন্তরিন্দ্রর কৌতূহল বোধ হয় মানব-সাধারণের। মানুষ যে মননশীল বিচারক্ষম জীব, এইখানেই তরুলতা ও পশুপক্ষী হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু মানুষ শুধু চিন্তা করে না বা বিচার-বিশ্লেষণ করে না, সে আবিষ্কার করে, সে সৃষ্টি করে। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মধ্য দিয়া বৈজ্ঞানিক করেন আবিষ্কার, আর আত্মসমাহিত অবস্থায় কবি করেন সৃষ্টি। অবশ্য অনেক বৈজ্ঞানিকও অনেক সময় সমাহিত অবস্থায়ই সত্যকে সাক্ষাৎকার করেন আবার কবি ও সাহিত্যিকও আপন অভিজ্ঞতা হইতেই সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেন। যাহাকে আমরা কবি-কল্পনা বলি, তাহাও তো শূন্যগর্ভ নয়, তাহারও উৎস সন্ধান করিতে গেলে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার কথাই বলিতে হয়। যাহা হউক, বিধাতাপুরুষের মত কোন কোন মানুষের মনেও সিসৃক্ষা প্রবল, আর এই সিসৃক্ষা হইতেছে মূলত আত্মপ্রকাশেরই ইচ্ছা। বিধাতার বিশ্ব-সৃষ্টি বৈদান্তিকের চোখে মায়া হইলেও ভক্তের চোখে লীলা, 'লীলাবত্তু সৃষ্টিরৈবলম্য'। কবিদের সৃষ্টিও বোধহয় বিধাতার সৃষ্টিরই মত লীলাবিলাসমাত্র, এইজন্য আমাদের দেশে আলঙ্কারিকেরা বলেন, কবিই প্রজাপতি, 'কবিরেব প্রজাপতিঃ'।

বাংলা দেশের একজন মনীষী বলিয়াছেন—বিধাতার সৃষ্টির ন্যায় কবির সৃষ্টিও মানুষের মনে জাগাইয়াছে বিস্ময়, তাই মানুষ কাব্যসৃষ্টির রহস্য-সন্ধানে প্রয়াস পাইয়াছে আর এই প্রচেষ্টা হইতেই 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' বা 'সাহিত্য-তত্ত্বের' জন্ম হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার ফলেই পাশ্চাত্য দেশে পোয়েটিক্সের উদ্ভব হইয়াছে। আবার মানুষ সুন্দর ও অসুন্দরের আদর্শের সন্ধান করিতে গিয়া নন্দন-তত্ত্ব বা ঈসথেটিক্সের সৃষ্টি করিয়াছে, এই নন্দন-তত্ত্বের আলোকে অনেকে সাহিত্য-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের দেশে যে অলংকার শাস্ত্রের বা কাব্যতত্ত্ব বিচারের উদ্ভব হইয়াছে, উহা নানা মনীষীর দানে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। সেই মনীষীদের মধ্যে 'কাব্যাদর্শ'-প্রণেতা দণ্ডী, 'কাব্যপ্রকাশ'- প্রণেতা মম্মট, রুদ্রট ও 'সাহিত্য-দর্পণ'-প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এতদ্ব্যতীত, কুন্তক, অভিনব গুপ্ত, আনন্দবর্ধন এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের শেষ বিকাশক ও 'রসগঙ্গাধর' নামক গ্রন্থের রচয়িতা জগন্নাথ সাহিত্যতত্ত্ব-বিচারে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

আমাদের দেশে 'কাব্য' কথাটি 'সাহিত্য' কথাটির চেয়ে প্রাচীনতর হইলেও পরবর্তীকালে দুইটি শব্দই এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সাহিত্য কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই কথাটির মধ্যে একই সঙ্গে সহিতত্ব বা মিলনের ভাব এবং হিত বা কল্যাণের ভাব রহিয়াছে। প্রাচীনকালের

আলঙ্কারিক কুন্তক 'সাহিত্য' কথাটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিতেছেন—ইহাতে শব্দের সহিত শব্দের সাহিত্য বা মিলন, বাক্যের সহিত বাক্যের সাহিত্য, বাক্যের সহিত অর্থের সাহিত্য,—এইরূপ সর্বপ্রকার 'সাহিত্য'ই থাকিবে। মহাকবি কালিদাস বাক্ ও অর্থের মিলনকে জগৎপিতা মহেশ্বর ও জগন্মাতা পার্বতীর মিলনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। রঘুবংশের প্রথম শ্লোকে মহাকবি বলিয়াছেন—

'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ'।

অভিধানে একার্থবোধক বহু শব্দ থাকিলেও কবিগণের সমাহিত চিত্তে যখন যে শব্দের স্ফুরণ জাগে, তাহাতেই তাঁহার জগত ভাবটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ লাভ করে, প্রাচীন আলঙ্কারিক কুন্তক সে কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ এই যে, উহার প্রত্যেকটি শব্দ অপরিবর্তনীয়, তাই অনুবাদে উহার সৌন্দর্যের অপকর্ষ না ঘটিয়া পারে না। আধার কবিরা যে শব্দের সাহায্যেই অবলীলাক্রমে চিত্র অঙ্কন করেন এবং কখনও বা সঙ্গীতের মত ধ্বনিস্পন্দ উৎপন্ন করেন, প্রাচীন আলঙ্কারিক সে কথার উল্লেখ করিতেও ভোলেন নাই। কিন্তু 'সাহিত্য' কথাটির মধ্যে যে একটি মিলন বা সান্নিধ্যের ভাব আছে কুন্তক কোথাও সে কথার উল্লেখ করেন নাই। অথচ সাহিত্যের দ্বারা দিয়াই যে আমরা দেশ ও কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবের সঙ্গে যুক্ত হই, একথাটা রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলিয়াছেন। তাই, 'কাব্যালোকের' রচয়িতা পরলোকগত সুধীর দাশগুপ্তের সিদ্ধান্ত এই, কুন্তক সাহিত্যের স্বরূপসম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অদ্ভুত বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও তাহা অসম্পূর্ণ, সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত যে অর্থটি রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া সে অর্থটিও আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। কুন্তকের সাহিত্যব্যাখ্যানে যে অসম্পূর্ণতা, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যানটি গ্রহণ করিয়া তাহা দূর করিতে হইবে।

নানা দেশে বিভিন্ন যুগে সাহিত্যের বিচারকর্তাগণ সাহিত্যের নানা সংজ্ঞা দিয়াছেন। আমাদের এই ভারতবর্ষেও তো 'নানা মুনির নানা মত'। তবে সাহিত্যের এমন কোন সংজ্ঞা কেহ দিতে পারেন নাই যাহা নৈয়ায়িকের চোখে নির্দোষ। আমাদের দেশে কেহ বা বলিয়াছেন, 'রসবীর অর্থবিশিষ্ট শব্দের সমষ্টিই কাব্য' কেহ বা বলিয়াছেন, 'দোষরহিত গুণযুক্ত ক্বচিৎ অলংকৃত বাক্যরাশিই কাব্য', কেহ বলিয়াছেন, 'রীতিই কাব্যের আত্মা', ('রীতি' কথাটি প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন), কেহ বলিয়াছেন, 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য', কেহ বলিয়াছেন, 'ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাই কাব্যের আত্মা', কেহ বা দেখাইয়াছেন, ধ্বনিবাদ বা রসবাদে মৌলিক কোন বিরোধ নাই, কেননা ধ্বনিমাত্রেই রসে পর্যবসান লাভ করে, আবার কেহ দেখাইয়াছেন, রসবাদ বা ধ্বনিবাদ অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষে দুষ্ট। সুতরাং আমরা শুধু এইটুকু বলিতে পারি, যাহাতে অলৌকিক চিত্ত-চমৎকার ঘটায় তাহাই কাব্য। পাশ্চাত্য দেশেও কাব্যের নানারূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা এবিষয়ে সংক্ষেপে জানিতে চান, তাঁহারা মনস্বী হড্‌সনের An Introduction to the Study of Literature বইখানি পড়িয়া দেখিবেন।

ভারতবর্ষে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলেও উহাদের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য ছিল। সেই ঐক্যসূত্রটি ধরিতে না পারিলে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের সাহিত্যতত্ত্ব যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না, প্রাচীন ভারতের লৌকিক বা অলৌকিক রস-তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণা সুস্পষ্ট হইবে না, আর কেনই বা আমাদের দেশে নন্দন-তত্ত্ব বা ঈস্‌থেটিক্‌সের পরিবর্তে রসশাস্ত্র রচিত

হইয়াছে, তাহাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব না। প্রতীচ্যে যাঁহারা কাব্য-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন-দর্শনের সঙ্গেও অর্থাৎ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁহাদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গেও আমাদের পরিচিত হইতে হইবে।

প্রাচীন আলংকারিকদের মধ্যে দণ্ডী ছিলেন 'দশকুমারচরিত' নামক গদ্যকাব্যের রচয়িতা, অর্থাৎ তিনি ছিলেন কবি-সমালোচক। (যাঁহারা সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আমরা 'সমালোচক' আখ্যা দিতে পারি।) প্রতীচ্য দেশে কবি-সমালোচকদের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কোলরিজ, ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। সমালোচকদের রসোপলব্ধি ও জীবনদৃষ্টি কতখানি গভীর হইতে পারে, ডাউডেন, ব্রাডলে, ওয়াল্টার পেটার প্রভৃতির গ্রন্থে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। আমাদের পরম সৌভাগ্য, রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার গীতি-কবিতা ও গানকেই অজস্র ধারায় পুষ্ট করেন নাই, তাঁহার মনীষার দীপ্তি নানা বিষয়ের ন্যায় সাহিত্য ও সৌন্দর্যতত্ত্বের উপরও আলোকপাত করিয়াছে। আমরা তাঁহার 'প্রাচীন সাহিত্য' ও 'আধুনিক সাহিত্য' সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। এবার তাঁহার 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্য', প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

'সাহিত্যের পথে'র মুখবন্ধরূপে রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' হইতে শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মূল কথা এই—সাহিত্যের মধ্য দিয়াই মানুষ আত্মোপলব্ধির আনন্দ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—'বিশ্বকে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য; তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিশ্বের যাথার্থ্যে নয়।

বাস্তবিক, বিজ্ঞানীকে সংস্কারমুক্ত মন লইয়া নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে সত্যের সন্ধান করিতে হয়। কোনরূপ বদ্ধমূল ধারণা বা হৃদয়াবেগ তাঁহার সত্য-দর্শনের বিঘ্ন ঘটায়। মনস্বী বেকন বলেন, মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে না, তেমনই সংস্কারাচ্ছন্ন মনে সত্যের প্রতিফলন ঘটে না। বৈজ্ঞানিকের ন্যায় দার্শনিকও সত্যানুসন্ধানী। বিজ্ঞান যাহা স্বীকার করিয়া লয়, তিনি তাহার সত্যাসত্যের বিচার করেন এবং বিজ্ঞানের বিচ্ছিন্ন সত্যগুলিকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেন। অবশ্য, পাশ্চাত্য দর্শনের উদ্দেশ্য মানবমনের সীমাহীন কৌতূহলের নিবৃত্তি আর ভারতীয় দর্শনের উদ্দেশ্য দুঃখনিবৃত্তি বা অপবর্গলাভ। দার্শনিককেও বৈজ্ঞানিকের ন্যায় নিরপেক্ষভাবে সত্যের সন্ধান করিতে হয় এবং হৃদয়াবেগকে যথাসম্ভব সংযত করিতে হয়।

কবি কিন্তু অনুভূতির সাহায্যেই সত্যকে দর্শন করেন, আর সেই সত্য তাঁহার নিকট সুন্দরের বেশে প্রকাশিত হয়। তিনি সহৃদয়, হৃদয় লইয়াই তাঁহার কারবার, তাঁহার অনুভূতি যখন নিবিড় হয়, তখন তাঁহার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হয়। সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়া তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন, আপন অন্তরের আনন্দ-বেদনাকে মুক্তি দান করেন। সাহিত্যিকও সত্যদ্রষ্টা, কিন্তু যে সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেন, তাহা বস্তু-জগতের সত্য নয়, ভাব-জগতের সত্য। 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'আমাদের মন যে জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করে, সেটা দুইমুখো পদার্থ—তার একটা দিক হচ্ছে তথ্য, আর একটা দিক হচ্ছে সত্য। যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য, সেই তথ্য যাকে অবলম্বন করে থাকে সেই হচ্ছে সত্য। তথ্য খণ্ডিত, স্বতন্ত্র,—সত্যের মধ্যে সে আপন বৃহৎ ঐক্যকে প্রকাশ করে।' তাই আমরা 'ভাবা ও ছন্দ' কবিতায় নারদের মুখে শুনিতে পাই—

'কবি, তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো'।

কাব্যে অনেক সময় যে গভীরতম সত্য প্রকাশ পায়, তথ্যসন্ধানী লোকের নিকট তাহা অসম্ভব ও মূল্যহীন, হয়তো বাতুলের প্রলাপ মাত্র। যাহা রসিক পাঠকের অনুভূতিগম্য, বস্তুজগতে তাহার সত্যতা প্রমাণ করা যায় না। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতা হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যেমন জ্ঞানদাসের পদ—

'রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল'।

অথবা বিদ্যাপতির নামে প্রসিদ্ধ একটি পদ—

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল'।

অথবা জ্ঞানদাসের আর একটি পদ—

'এক দুই গণইতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই'।

আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতেও এমন বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিতে পারি যেখানে সত্যের অনুরোধে তথ্য উপেক্ষিত হইয়াছে।

'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কালগত সত্য ও ভাবগত সত্যের মধ্যে, ঘটনামূলক ইতিহাস ও ভাবমূলক ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। রামায়ণের প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—'এই সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া মনে করিবার কোন প্রয়োজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূলক বলিয়া মনে করি। ইহার মধ্যে হয়তো তথ্য খুঁজিলে ঠকিব, কিন্তু সত্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে'। (ইতিহাস)

সাহিত্যবিচারে রবীন্দ্রনাথও রসবাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বনাথের মতে এই রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশ ও আনন্দচিন্ময়, ইহা বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য ও ব্রহ্মাস্বাদেরই সগোত্র। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'ইংরেজীতে যাকে বলে 'রিয়াল', সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিত ভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। মন যাকে বলে, 'এই তো নিশ্চিত দেখলুম—অত্যন্ত বোধ করলুম', জগতের হাজার অচিহ্নিতের মধ্যে যার উপর সে আপন স্বাক্ষরের সিলমোহর দিয়ে দেয়, যাকে আপন চিরস্বীকৃত সংসারের মধ্যে তুক করে নেয়, সে অসুন্দর হলেও মনোরম, সে রসস্বরূপের সনন্দ নিয়ে এসেছে।

'সৌন্দর্যপ্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অলঙ্কারশাস্ত্রে চরম কথা বলা হয়েছে: বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং'। (সাহিত্যের পথে)

অন্যত্রও নিন্দা রবীন্দ্রনাথকে বারে বারে পীড়িত করিয়াছে,—বিদ্রূপগণের মূলস্তোবদেশে তিনি ব্যথিত, মর্মাহত হইয়াছেন, তাই বন্ধুরুচির সঙ্গে তিনিও প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

'বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে
হানিবে, অবিচল বুক তাহে।
রসের নিবেদন অরসিকে
ললাটে লিখো-না হে, লিখো না হে'।

——— (সাহিত্যের পথে : তথ্য ও সত্য)

বিজ্ঞান-কথা

সত্যজিৎ

সাগর পানে তাকাই

সৃষ্টির আদিকালে আমাদের আবাসভূমি এই পৃথিবী ছিল এক জলন্ত উত্তপ্ত বস্তুপিণ্ড। তখন পৃথিবীর ভিতরে বাইরে সর্বত্রই উত্তপ্ত পদার্থের প্রবল আলোড়ন। পৃথিবীর বুকে মহাদেশ বা মহাসাগর কোন কিছুই সুনির্দিষ্ট রূপ পায়নি। তখন জল, বাতাস এবং প্রাণের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তারপর কিভাবে মহাদেশসমূহের বিন্যাস হলো? কি করে সাগরের সৃষ্টি হলো? কিভাবে আবহাওয়ার বর্তমান সংযুক্তি সম্ভব হলো? কি করে সাগরে প্রাণের প্রথম আবির্ভাব হলো? কিভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্তমান বিবর্তন সংঘটিত হলো?

আমাদের পৃথিবীর প্রাকৃতিক ইতিহাসের এইগুলিই হচ্ছে প্রাথমিক প্রশ্ন। এবং এই প্রশ্নাবলীর উত্তরের সন্ধানে সাগরের পানে আমাদের তাকাতে হবে। কারণ এই সকলের মূলে সাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সাগরই আমাদের আবহাওয়ার আর্দ্রতা সরবরাহ করে, আমাদের প্রাণধারণের বৃষ্টি সৃষ্টি করে, আবহাওয়ার উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং সাগরই হচ্ছে মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও খাতবপদার্থের সুবৃহৎ সঞ্চয়াগার। ভূপৃষ্ঠে জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে ভূগর্ভের সম্পদ অতিক্রান্ত নিঃশেষ হয়ে আসছে। তাই মানুষের চাহিদা মেটাতে সাগরের দিকে দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ধরাপৃষ্ঠে কিভাবে মহাদেশ ও মহাসাগরের সৃষ্টি হলো তার একটি ব্যাখ্যা এই যে, ভূগর্ভস্থ পদার্থের মৃদু পরিচলনের ফলে সাগর ও মহাদেশের সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ ভূগর্ভের উত্তপ্ত পদার্থসমূহের ঊর্ধ্বগমন ও অপেক্ষাকৃত শীতল পদার্থগুলির অবনমন; জল ফোটবার সময় যেমন উত্তপ্ত জলকণাগুলি ওপরে উঠে যায় ও অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জলকণাগুলি নিচে নেমে আসে। ভূগর্ভের উত্তপ্ত পদার্থ ঊর্ধ্বগমনের দরুন যেখানে ফুলে উঠেছে সেখানে হয়েছে মহাদেশের সৃষ্টি আর শীতলতর পদার্থের অবনমনের ফলে যেখানে গর্তের উদ্ভব হয়েছে সেখানে হয়েছে সাগরের সৃষ্টি। মহাদেশ ও সাগর সৃষ্টির এই সরল প্রকল্পের দ্বারা আমরা পৃথিবীতে ভূমি ও সাগরের বিন্যাসের বৈপরীত্যের একটা ব্যাখ্যা দিতে পারি।

সাগরের অভ্যন্তরে জীবনধারার ব্যাখ্যা দিতে হলে এর উদ্ভব, বিবর্তন এবং সূর্যকিরণ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর পুষ্টির সঙ্গে সাগরের যে সম্পর্ক-চক্র আছে তা ভালোভাবে বুঝতে হবে। সামুদ্রিক জীবনের সঙ্গে পার্থিব ও স্থলভাগের অন্যান্য প্রাণীর (তার মধ্যে মানুষও অন্তর্ভুক্ত) যোগসূত্রও আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

স্থলভাগে ও আকাশে প্রাণীর আবির্ভাবের বহু পূর্বে সাগরে প্রাণীর আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক প্রধান প্রাণী-পরিবারের আদিপুরুষরা সাগরেই প্রথম জীবনযাত্রা সুরু করেছিল এবং আদিযুগের বহু প্রাণী আজও সাগরে বিদ্যমান। স্থলভাগে প্রাণীসমূহের নতুন নতুন প্রজাতির যত দ্রুত বিবর্তন ঘটেছে সাগরে তা ঘটেনি। এ কারণে স্থলভাগ অপেক্ষা সাগরে প্রাণের অস্তিত্ব অনেক দীর্ঘকালের হলেও এবং পৃথিবীতে

স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগের পরিমাণ বেশি হলেও জীবিত প্রজাতিসমূহের মধ্যে শতকরা মাত্র কুড়িভাগ প্রাণীর বাস সাগরে।

যে সব অঞ্চল পর্যায়ক্রমে আর্দ্র ও শুষ্ক, যেমন উপকূলবর্তী স্থানগুলি যেখানে সাগর ও স্থলভাগ মিশ্রিত হয়েছে এবং যেখানে সাগরতরঙ্গ স্থলভাগকে কখনো নিমজ্জিত করেছে এবং কখনো বা প্রবল তাপ বা শৈত্যের সম্মুখীন করেছে, সেই অঞ্চলগুলিতে প্রাণীসমূহের বিবর্তন সর্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। পক্ষান্তরে, সাগরের গভীরে যতই প্রবেশ করা যায় সেখানে আবহাওয়া একই রকম থাকায় এবং নিম্ন উষ্ণতায় রকম সকল রাসায়নিক বিক্রিয়া মৃদুহারে সংঘটিত হওয়ায় বিবর্তনের হার অতি মন্থর। এ ছাড়া, মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব (যা প্রাণীর বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে) থেকে সাগর প্রাণীদের রক্ষা করে।

তাই সাগরে আমরা জীবন্ত 'ফসিল'-এর (যে সকল প্রাণীর রূপ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে) সন্ধান পাই। সিলাকাথ হচ্ছে এরূপ একটি প্রাণী এবং মাছ ও স্থলভাগের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে এই প্রাণীটি রচনা করেছে। যতই আমরা সাগরকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের উপায় উদ্ভাবন করতে পারব এবং তার গভীর গহনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারব, যুগ যুগ ব্যাপী অপরিবর্তিত আরও বহু প্রাণি-রূপের সন্ধান পাব। বিজ্ঞানীদের সন্ধানী দৃষ্টি বর্তমানে তাই সাগরের প্রতি বিশেষভাবে নিবদ্ধ।

মহাশূন্য অভিযানে অগ্রগতি

বিজ্ঞান জগতের সাম্প্রতিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য খবর হচ্ছে, দুটি কুকুর, ইঁদুর, মাছি ও উদ্ভিদসহ প্রায় ১২৩ মণের দ্বিতীয় স্পুতনিকে মহাশূন্যযানকে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপন করে সাফল্যজনকভাবে ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এই মহাশূন্যযানটি পৃথিবীর ২০০ মাইল উর্ধ্বে ১৮ বার প্রদক্ষিণ করার পর বেতার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেছে। জীবদেহে ও উদ্ভিদে মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখবার উদ্দেশ্যে মনুষ্যেতর প্রাণী ও উদ্ভিদকে এই মহাশূন্যযানে পাঠানো হয়েছিল।

মহাকাশযানের এই নিরাপদ প্রত্যাবর্তন মহাশূন্য অভিযানে একটি বড় রকমের পদক্ষেপ এবং মানুষের গ্রহান্তর যাত্রার ভূমিকা রচনা করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

আর একটি উল্লেখযোগ্য খবর, 'ইকো' নামে দেড়মণ ওজনের মানব কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর প্রায় দু হাজার মাইল দূরত্ব থেকে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের টেপরেকর্ড করা একটি বেতার-বাণী পৃথিবীর সর্বত্র প্রেরণ করেছে।

মহাশূন্য অভিযানে বিজ্ঞানের এই দ্রুত অগ্রগতি আমাদের মনে এই আশা সঞ্চার করে যে, মানুষের গ্রহান্তর যাত্রার স্বপ্নের সার্থকতা লাভের সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হয়ে এলো।

———

অরসিকেষু

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত প্রভৃতি ললিতকলার মর্ম্ম উপলব্ধি করেন রসিকসমাজ একথা সর্ব্বজনবিদিত। গুণগ্রাহী রসিক শ্রোতা শিল্প-সৃষ্টির সমন্বিত রূপকে গ্রহণ করেন, সেখানে শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে analysis করেন না—যেখানে ভাবের প্রাচুর্য্য সেখানে ব্যাকরণের সামান্য বিচ্যুতি কোন মতেই রস সৃষ্টির প্রতিকূল হতে পারে না। রসিক শ্রোতা বলতে বুঝি যাঁরা সঙ্গীতাদি শিল্পকে ভালবাসেন—তাঁরা হয়ত' কোন দিন সঙ্গীত শেখেননি, তার শাস্ত্রকে বোঝবার চেষ্টাও করেননি, তাঁরাও অনেক সময় উচ্চশ্রেণীর শ্রোতা হন। আবার সঙ্গীত শিক্ষা করেও, অথবা 'অল্পবিদ্যা—' হয়েও বড় দরের সমালোচক হয়ে ওঠেন। এদের মধ্যে অনেক এমন আছেন—ভাল লাগলেও ভাল বলতে কুণ্ঠিত হন অথবা এমন সমালোচনা করে বসেন যেটা শিক্ষিত সমাজের হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে। তাছাড়া অনেক সময় এই শ্রেণীর সমালোচনা স্বার্থপ্রসূত বা দলগত। অনেক সময় প্রবন্ধ বা সমালোচনার মধ্যে স্বীয় বা দলীয় প্রচারকার্য্য চলে সব ক্ষেত্রেই। এটাও ঠিক সুরুচির পরিচায়ক নয়। এরূপ তথাকথিত শ্রোতা বা সমালোচক অপেক্ষা অরসিক শ্রোতা বা সমালোচক ভাল। অরসিক শ্রোতার রসগ্রহণ অনেক সময় humour সৃষ্টি করে, যা' art এর পর্য্যায়ভুক্ত। এমন দেখা যায় বিশিষ্ট ব্যক্তি গানের আসরে উপস্থিত থেকে এরূপ বেছন্দে তাল দিতে আরম্ভ করলেন যে গায়ক ও বাদকের লয়চ্যুতি ঘটল। অথচ ঐ বিশেষ শ্রোতার অবস্থা বুঝে দুঃখ লাগে কারণ তিনি যে সমঝদার এটা প্রমাণ করা, তাল দেওয়া, ভিন্ন বোধ হয় দ্বিতীয় পন্থা নেই। অরসিক শ্রোতা সম্বন্ধে আরও দু'টি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। অনেকদিনের কথা বাংলার কোন এক রাজবাড়িতে যাত্রা উপলক্ষে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ্ প্রভৃতি আমন্ত্রিত হন। দেশ তখন ইংরাজ অধীন দেশীয় তাগ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বিদেশী।

কোন এক বিখ্যাত দলের 'রাবণ বধ' অভিনয় চলছে, চারিদিকে দর্শকে ভরা। লঙ্কাদহন দৃশ্যে হনুমানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সাহেবদের মুখে নীরসতার পরিবর্ত্তে সরসতা দেখা গেল। High jumpএ পারদর্শী হনুমানের অংশ গ্রহণকারী নট হুঙ্কার দিয়ে যখন সাজঘর থেকে দুই লাফে আসরে নামল তখন ক্রমান্বয়ে হাততালি পড়তে লাগল।

কিন্তু এই দৃশ্যের পর যখন পুনরায় উকিলের বেশধারী ছুড়িরা গান ধরলেন তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রাজাকে বললেন, "Raja Saheb will you please ask that monkey man to appear again and shout. He is splendid. I want the vakils to stop their music, they are better in argument but not in music. I am tired of them." রাজা নিরুপায় হয়ে যাত্রার অধিকারীকে হনুমানের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করতে বললেন। হনুমানের লাফের আগুনে লঙ্কার যেরূপ অবস্থা হয়েছিল আসরের অবস্থাও তদ্রূপ হল। আর এক ঘটনা—বিদেশীগণকে দেশী সঙ্গীত শোনাবার আয়োজন হয়েছে—একজন শ্রেষ্ঠ সুরবাহার বাদক আমন্ত্রিত হয়েছেন। তখনকার দিনে রেডিও, গ্রামোফোন, রেকর্ড প্রভৃতি না থাকায় ওস্তাদগণ সময় সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন না—আসরে আসার পূর্ব্বে সুর বাঁধার রীতি তখন

ছিল না—আসরে বসেই যন্ত্রগুলির সুর ঠিক করা হ'ত। সুরবাহারের তারগুলি বাঁধতে প্রায় ১০ মিনিট সময় লাগে। সুর বাঁধা শেষ করে শিল্পী যখন বাজাবার জন্য যন্ত্রটি তুলেছেন, সাহেবরা তখন 'Thank you for your excellent music' বলে বিদায় নিলেন। শিল্পী ও অন্যান্য শ্রোতাদের অবস্থা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই শ্রেণীর শ্রোতারা হিসাবমত অরসিক হলেও একদিকে খুবই রসিক। পদস্থ ব্যক্তি হলেই সঙ্গীতরসিক বা সমঝদার হবেন এরূপ কোন কথা মনু লিখেছেন বলে আমার জানা নেই—তবে অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের উক্তি বিপদের সৃষ্টি করে। Shakespeare লিখে গেছেন, যে মানুষ সঙ্গীত জানে না সে নাকি অমানুষিক কাজ করতে পারে। সেইজন্যই বোধ হয় মানুষের tendency সঙ্গীত জানেন বা বোঝেন এরূপ ভান করা। তাই আমাদের দেশের রাজনীতিবিদ, রাজকর্মচারী, আইনজীবি, চিকিৎসাজীবি প্রভৃতি সকলেই সঙ্গীতবিদ বা সঙ্গীত সমালোচক হতে চেষ্টা করেন! আরও দুঃখের বিষয়, এমনও দেখা যায় শিক্ষা না করেই সর্বত্র যার বহু দেখে একমাত্র উস্তাদ যার সঙ্গীতে আশ্রয় নেন। কিন্তু অযাচিতকে স্থান দিলে আশ্রয় ভেঙে যায়। সঙ্গীতের অনেক ক্ষেত্রে তাই হয়ে থাকে।

সাহিত্য সম্মেলনে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে বিজ্ঞান সম্মেলনে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে সভাপতিরূপে দেখা যায় কিন্তু সঙ্গীত সম্মেলনে অনেক ক্ষেত্রে তার বিপরীত দেখা যায়। এর কারণ কি? সঙ্গীতসমাজ চিন্তা করুন সঙ্গীতরাজ্ঞী কেশরবাঈ গান করছেন—হলে ৩০।৪০ জন মাত্র শ্রোতা। সভাপতি ভাষণ দেবে চলে যাচ্ছেন—তাঁর সঙ্গে সমস্ত শ্রোতাই প্রায় বেরিয়েছেন তাঁকে বিদায় দেবার জন্য বা তাঁর গুডবুই পাবার জন্য। শিল্পীর এইরূপ অবমাননা দ্বারা কোন দেশে সঙ্গীত স্বার্থকতা লাভ করতে পারে না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে প্রায় যখন বিদায় দিতে চলেছে তখন বিখণ্ডিত বাংলার একটি অংশ সঙ্গীতের মর্যাদা রক্ষা করে চলেছে। বাংলার সংস্কৃতির মান এখনো রক্ষিত হচ্ছে। এখন ভারতের মধ্যে একমাত্র কলকাতাতেই একাধিক সঙ্গীত সম্মেলন হয়ে থাকে—এই সম্মেলনের মাধ্যমে লুপ্ত সঙ্গীত উদ্ধার, উচ্চতর শিক্ষার মান এবং সঙ্গীতের প্রচার আশা করা যায়। গতানুগতিক সঙ্গীত সম্মেলনের কোন সার্থকতা নেই। এবিষয় চিন্তা করার সময় এসেছে সঙ্গীত সমাজের।

শাবনী

এক সময়ে বাঁকুড়া জেলার সীমান্তে, শাবনী, চৈতি, প্রভৃতি ঋতু বিষয়ক গান প্রচলিত ছিল। এরূপ একটি গান পাওয়া গেছে। রচনা অজ্ঞাত। ঐ গানটির স্বরলিপি প্রদত্ত হইল।

রিম্ ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি পড়ে শাবন মাসে
শাবন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রোদ্দুর হাসে
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্।
কদম কোটে কেয়া চাপা শাবন মাসে
নদীর একূল ওকূল দুকূল বেয়ে জোয়ার আসে
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্।
মেঘের ডাকে ত্রাস লাগে শাবন মাসে
কে বিরহী কোথা কোন এক দূর দেশে
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্।

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
পা -া মা | জ্ঞা রা সা I সা ন্া রা সা -া I সজ্ঞা জ্ঞা -া সা সা -া I
রি ম্ ঝি | ম্ ঝি ম্ ঝ্ ষ্টি প ড়ে ০ শাব০ ব ন্ মা সে ০

১´ ০ ১´ ০ ১ ০
রমা মা -া | রা রা -া I রমা মা -া রা রা -া I সা -া ন্া রা সা -া I
শা০ ব ন্ | মে ঘের ডা০ কে ০ ডা কে ০ রো ০ দ্ হা সে ০

১´ ০ ১´ ০
সা জ্ঞা জ্ঞা | রা জ্ঞা -া I রা মা জ্ঞা ধা সা -া II
রি ম্ ঝি | ম্ ঝি ম্ রি ম্ ঝি ম্ ঝি ম্

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
মা মা পা | পা পা -া I পা পা -া ধা পা -া I ধা পা পা ধা পা -া I
ক ব ম্ | কো টে ০ কে য়া ০ চা পা ০ পা ব ন ঘা সে ০

১´ ০ ১´ ১´ ১´ ০
-া -া | -া পা পা I পা পা পা | ধা পা -া I ধা পা -া | ধা পা ধা I
০ ০ | ০ ন দীর এ কূ ল | ও কূ ল ছ কূ ল | বে য়ে ০

১´ ০ ১´ ০ ১´
পা মজ্ঞা -া | রা সা -া I সা জ্ঞা জ্ঞা রা জ্ঞা -া I রা মা জ্ঞা
ছো য়া ০ ন্ | আ সে ০ রি ম্ ঝি | ম্ ঝি ম্ রি ম্ ঝি

০
রা সা -া II
ম্ ঝি ম্

১´ ০ ১´ ০ ১´
সা সা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -া I সা সা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -া I সা রা গা |
মে ঘে র | ডা কে ০ ত রা স্ | লা গে ০ শা ব ন |

০ ১´ ০ ১´ ০
গা রসা -া I পা পা পা | ধা পা -া I ধা পা -া | ধা পা ধা I
ঘা সে০ ০ কে ০ ঝি | র ঝী ০ কো য়া ০ | কোন্ এ ক

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
পা মজ্ঞা -া | রা সা -া I সা জ্ঞা জ্ঞা | রা জ্ঞা -া I রা মা জ্ঞা | রা সা -া II II
ন্ ০০ ন্ | মে শে ০ রি ম্ ঝি | ম্ ঝি ম্ রি ম্ ঝি | ম্ ঝি ম্

লালিতা

সম্পূর্ণ উপন্যাস | সুশীল রায়

মাঝে মাঝে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে, আবার কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়ছে মাধবী। তার মনের ভিতরের এই ভাবটা ফুটে উঠছে তার মুখের উপর। একটা নিটোল জলাশয়ের উপরে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চললে অনবরত যেমন তার চেহারা বদলায়, মাধবীর মুখের চেহারা বদলাচ্ছে অবিকল সেইভাবে।

হাঁা, হাঁা, হাঁা। সে ভাগ্যবতী। অমন যশস্বী পুরুষের স্ত্রী সে। এমন ভাগ্য ক'জন মেয়ের জীবনে ঘটে? বলতে গেলে, বাংলাদেশের মেয়ের ঈর্ষার পাত্রী সে। তা সে বোঝে।

বোঝে। কিন্তু তবুও মনের কোথায় যেন একটু গ্লানি। অমন যশস্বী পুরুষের স্ত্রী সে, কিন্তু সে নিজে কোনোরকম যশের ভাগী নয়।

ভাগ্যবতী মাধবীর মন ভেঙে পড়ে, মেঘের ছায়া এসে পড়ে সুডৌল মুখের উপর। সে ভাবে, সে যদি হতে পারত ললিতা, তাহলে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে—

হর্ণ বুঝি বাজল মোটরের। দরজার পর্দা ফেলে ব্যালকনিতে চলে এল মাধবী, রেলিঙে ওর ঘিরে ঝুঁকল। মোটরের প্রসেসন চলেছে যেন চকচকে পিচের রাস্তায় ছায়া ফেলে ফেলে।

না। ইন্দ্রজিৎ না।

আজ ওরমালা গলায় পরে আসবে ইন্দ্রজিৎ—সেই মালাটা তার গলায় কি রকম মানায় তা দেখার বড় কৌতূহল হয়েছে মাধবীর। তার স্বামী আজ ফিরে আসছে নতুন বিশেষণ ধারণ করে। আজকের সভায় তাকে অভিনন্দন দেওয়া হবে, মানপত্র দেওয়া হবে এবং শহরের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে তাকে আখ্যাত করা হবে—নটসারথি। এটা কম গৌরবের কথা নয়। নিজেকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত করে তুলতে গিয়েই অন্য কথা মনে পড়ে মাধবীর।

ললিতা ঐ আসরে সম্মান সম্মানই পাচ্ছে, কি যেন আখ্যায় ভূষিত হবে সে?—নাট্যপটিয়সী।

সৌভাগ্যের সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছে বুঝি সে পুরোপুরি। এত যশ, এত খ্যাতি, এতটা জনপ্রিয়তা, এবং সেইসঙ্গে এতটা ঐশ্বর্য এরই মধ্যে অর্জন করা অবিশ্বাস্য ঘটনা।

সেই অসম্ভব ঘটনাই ঘটেছে তার জীবনে।

সেইজন্যে নিজের কথাও এক-এক সময়ে বলে ইন্দ্রজিৎ, বলে, "জীবনটাই একটা নাটক। এটা একটা রঙ্গমঞ্চও। নাটকটা ধাপে ধাপে যেমন এগিয়ে যেতে-যেতে ওঠে ক্লাইম্যাক্সে, জীবনও তাই। অন্ধকার রঙ্গমঞ্চ হঠাৎ যেমন আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে, আবার যেমন ঝরতে আরম্ভ করে আলোর বন্যা। জীবনটাও তাই।"

একটু থেমে ইন্দ্রজিৎ বলে, "আমি সেই নাটকের নায়ক। আমি সেই রঙ্গমঞ্চের নট।

ইন্দ্রজিৎ নামটা ওর আসল নাম নয়। ওর নাম অমিয়শংকর গুপ্ত। কিন্তু আসল নামটা গুপ্ত রেখে ও এখন ইন্দ্রজিৎ নামেই খ্যাত। ওর আসল নাম কেউ জানেনা, জানতেও চায় না। এমন কি ও নিজেও বুঝি সেই নামের কথাটা ভুলে গিয়েছে।

অভিনয়ে অসাধারণ দক্ষতা তার। কিন্তু তার জনপ্রিয়তার মূলে হয়তো অভিনয়-ক্ষমতা নয়, এর মূলে ওর চেহারা।

একজন জীবন্ত পুরুষের মত চেহারা ইন্দ্রজিতের।

ইন্দ্রজিতের সুনাম অনেক রকমের, তার উপর আর একটা সুনাম এই যে, সে ইন্দ্রিয়জিৎ। অভিনয়ের কাজ নিয়ে থাকলে যে দুর্নামের ভাগী হতে হয়, তার থেকেও নিষ্কৃতি পেয়েছে সে। এটাও তার কম সৌভাগ্য নয়।

তার জীবন সত্যিই যেন সৌভাগ্যের সঙ্গে একটা চুক্তি করে নিয়েছে। জীবনে আরও উন্নতি যে সে করবে—এ বিষয়ে কারও সন্দেহ নাই।

তার খ্যাতি প্রতিপত্তি দেখে বন্ধুরা বলে, সে নাকি মুকুটবিহীন রাজা।

সেই মুকুটবিহীন রাজার সম্রাজ্ঞী হচ্ছে মাধবী গুপ্ত। তবু কেন যেন তার তৃপ্তি নেই। ইচ্ছে হয়, এই সাম্রাজ্য ত্যাগ করে সে হোক একটু ঘরের ভাগী। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, নিজের শরীরের পরিপূর্ণ ছায়া দেখে সে হাসে, হঠাৎ গম্ভীর হয়, হঠাৎ কি যেন বলে নিজেকে সম্বোধন ক'রে। এর কোনো-কিছুরই মানে নেই। এ বুঝি তার অভিনয় করার চেষ্টা মাত্র। কেন, হবে না তাকে দিয়ে অভিনয়? অভিনয় করতে হলে নতুন কোন্ যোগ্যতা আবার দরকার?

জীবণ ইচ্ছে করে মাধবীর অভিনয় করতে, গলা ছেড়ে গান গাইতে। ঘরের এই অখ্যাত নিভৃতি থেকে একেবারে প্রকাশ্য মঞ্চের খ্যাতিতে গিয়ে দাঁড়াতে।

পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল এলাচ, জিজ্ঞাসা করল, "কিছু বলছিলেন দিদিমণি?"

শব্দ করে হেসে উঠল মাধবী, বলল, "নাঃ রে, কিছু বলিনি। তোর দাদাবাবু যেমন করে আমি তেমন পারব কি না চেষ্টা করে দেখছিলাম।"

এলাচ একটু আশ্চর্য হয়ে তাকাল মাধবীর মুখের দিকে। দিদিমণির শরীর ভালো নয়, একটু জ্বর হয়েছিল, এখন কি অসুখটা একটু বেড়েছে তাহলে? কিছু বুঝতে না পেরে সে মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি করে দাদাবাবু?"

"কি করে জানিস নে? গ্রে করে।"

"ও, গেলে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই তাই। আমিও তাই করছিলাম। সেই গলা শুনে তুই বুঝি ছুটে এলি?"

এলাচ বলল, "ভাবলাম ডাকছ। তা, না ডাকলে। কিন্তু শরীর এখন তোমার কেমন দিদিমণি?"

এলাচ এগিয়ে এসে মাধবীর হাত ধরল। বলল, "এখনো তাত আছে। তুমি একটু শোও।"

যেন আশ্চর্য হয়ে গেল মাধবী, বলল, "শোব কি রে। তোর দাদাবাবু আজ সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে আসবে। দেখব না?"

দেখবে বই কি?

এলাচের বয়স খুব বেশি না হলেও খুব কমও না। অনেক বাড়িতে কাজ সে করেছে। অনেক রকমের গিন্নির সঙ্গে তার পরিচয় আছে। অনেক রকমের দাদাবাবু দেখেছে সে। সেসব রকমসকমের গল্প যদি সে বলতে বসে তাহলে একটা যুগ লেগে যাবে।

কিন্তু এখানকার এই দাদাবাবুটির সম্বন্ধে ধারণা তার আলাদা। এ দাদাবাবু লোকটা বড় ভালো।

এত নাম-ডাক, এত টাকা-পয়সা, তবু এতটুকু বদখেয়াল নেই, এতটুকু বেমাক নেই। এখানে এসে এলাচ আরামে আছে।

আর, এই দিদিমণিটি? এও বড় সরেস মেয়ে। বড় ভালো জাতের মেয়ে। যে সব মেয়ের স্বামীদের খুব নাওড়াক হয়, সেসব মেয়ের অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না। কিন্তু এই দিদিমণিটি একেবারে মাটির মানুষ।

বাড়িটাও খুব ঠাণ্ডা। বরফ বসিয়ে সারা বাড়ি ঠাণ্ডা করা হয়েছে বলে নয়, আসলে বাড়িটার মেজাজই বড় ঠাণ্ডা। কর্তায়-গিন্নিতে এমন মিল দেখা যায় না। অন্তত এলাচ এমনটি দেখেনি। আজ আবার নতুন কিছু বুঝি দেখতে হবে তাকে। সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে আসবে নাকি তার দাদাবাবু।

এলাচ জিজ্ঞাসা করল, "সত্যি বলছ। মাথায় মুকুট পরে আসবে আজ দাদাবাবু।"

পালঙ্কের কোণে বসে বালিশের মধ্যে কনুই ডুবিয়ে একটা হাই তুলল মাধবী, বলল, "এমন দিনে আমার শরীরটা খারাপ হল। আজ যেতে পারলাম না। নিজের চোখে দেখতে পেলাম না। আজকে খুব যে মস্ত কাণ্ড হবে রে এলাচ।"

এলাচ একটু সরে এসে দাঁড়াল মাধবীর কাছে সেই কাণ্ডের কাহিনী শোনার জন্যে।

মাধবী বলল, "তোর দাদাবাবু আজ খেতাব পাবে।"

"এই-না বললে সোনার মুকুট!"

"মুকুটের থেকে তার দাম কম না রে। রাজমুকুটের চেয়ে তার দাম বেশি, তা জানিস?

"কত হবে—লাখ টাকা?"

বিছানার মধ্যে সর্বাঙ্গ গড়িয়ে দিয়ে হাসতে আরম্ভ করল মাধবী। ভীষণ হাসতে লাগল সে।

হতভম্ব হয়ে গিয়েছে এলাচ, এত হাসির মানে বুঝতে পারছে না সে। খাটের ওপর হাতের ভর রেখে ঝুঁকে সে জিজ্ঞাসা করল, "অত হাসছ কেন। শরীর কি খারাপ হল দিদিমণি?"

মাধবী সোজা হয়ে বসে বলল, "উঁহুঁ। শরীর খারাপ হয় নি আমার। তোর মাথা খারাপ হয়েছে। একটা খেতাবের দাম মাত্র লাখ টাকা হবে কেন। পঞ্চাশ লাখ, ষাট লাখ, সত্তর লাখ, আশি লাখ—

"থাক্, থাক্। বুঝতে পেরেছি। কোটি টাকা। কোটিপতি হবে আজ দাদাবাবু।"

গম্ভীর হয়ে বসল মাধবী, বলল, "কিছু বুঝিস নি। খেতাবের দাম কখনো টাকা দিয়ে মাপা যায় না। মানসম্মান কি কখনো বাজারে কেনা-বেচা হয়?"

কি বুঝল সে তা বলা কঠিন। কিন্তু সায় দিয়ে মাথা নাড়তে লাগল এলাচ।

মাধবী বলল, "এখনো আসছে না কেন? রাত্তির কত হল? আমার শরীর অসুখ জেনে গিছে তো!"

"এসে পড়বে। তুমি শুয়ে পড়। বিশ্রাম কর। রাত্তির বেশি হয় নি। একা-একা আছ। তাই সময়টা ভারী মনে হচ্ছে।"

হয়তো তাই। সব অনুষ্ঠানে আর উৎসবে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যায় মাধবী। ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে তার যেমন গর্ব, তাকে নিয়েও ইন্দ্রজিতের গর্ব যেন সেইরকমই। এই জন্যে কোনো অনুষ্ঠান থেকে স্ত্রীকে কখনো বাদ দেয়নি সে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা হঠাৎ এলোমেলো হয়ে গেল। হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়ল মাধবী।

বিশেষ করে আজকের অনুষ্ঠানটা দেখার খুবই ইচ্ছা ছিল মাধবীর। আজ ওরা দু-জনেই এক সঙ্গে সম্মান পাবে—সমান সম্মান। নায়ক ও নায়িকা আজ নতুন নতুন আখ্যায় ভূষিত হবে।

ইন্দ্রজিৎ আর ললিতা, ললিতা আর ইন্দ্রজিৎ।—সকলের মুখে একসঙ্গে উচ্চারিত হয় এই দুই নাম। এই নায়ক ও নায়িকা দেশের প্রাণে নতুন সাড়া এনেছে। কোনো নাটকই এদের দু-জনকে ছাড়া চলে না। সব নাটকেই প্রধান পাত্রপাত্রী এরা দু-জন—ইন্দ্রজিৎ আর ললিতা।

শুধু বাংলাদেশ বলব কেন, এদের নাম ছড়িয়ে গিয়েছে এই দেশের বাইরেও।

অনেকে এমন কথাও বলে যে, যদি কোন বিদেশ থেকে ভারতবর্ষের কাছে চাহিদা আসে এক জোড়া নায়ক-নায়িকা যোগান দেবার জন্যে তাহলে সেই নায়ক-নায়িকা হবে ইন্দ্রজিৎ আর ললিতা।

এবং এরকম জুটি ভারতবর্ষের নাট্য ইতিহাসে নাকি এর আগে কখনো দেখা যায় নি। কখনো কোনো সেরা নট দেখা দিয়েছে, কখনো কোনো সেরা নটী—কিন্তু একই সঙ্গে মানানসই আর লাগসই নট-নটীর এমন জুটি এই নাকি প্রথম।

আমরা নাটক দেখি। নাট্য-ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া আমাদের কম। এইজন্যে এসব কথার কোনো প্রতিবাদ না করে নির্বিবাদে ঐ অভিমত মেনে নেওয়াই সমীচীন মনে করেছি। এটুকু অবশ্য আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই জুটি সত্যিই একটী আদর্শ জুটি। যে-কোনো রকম চরিত্রে অভিনয় করবার ক্ষমতা এদের আছে। সামাজিক হোক, ঐতিহাসিক হোক, পৌরাণিক হোক—এই দুই নায়ক-নায়িকা সেই নাটকের সুযোগ্য নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করে যেতে পারে। সামাজিক নাটকের মধ্যেও স্তরভেদ আছে—মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, অভিজাত, শিক্ষিত, অশিক্ষিত। এ'তে বিভিন্ন রূপসজ্জায় সেজে যখন দর্শকের সম্মুখে এসে এরা দাঁড়ায়, মনে হয়, বুঝি নাটক নয়, নাটকের পাত্রপাত্রী না—প্রকৃতই দুইটি মানব-মানবী। কখনো তারা প্রেমিকা, কখনো প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী কখনো অর্থকৃচ্ছ্রতায় হতভাগ্যের বেশ, কখনো আবার অর্থের প্রাচুর্যে উজ্জ্বল চেহারা।

চরিত্রের মধ্যে ভেদ আছে। নাটকের বিষয়বস্তুতে ভেদ আছে। কিন্তু এই দুটি নায়ক-নায়িকার মধ্যে ভেদ নাই কোথাও। এইখানেই এদের কৃতিত্ব।

তারা দুজনেই সমান, এই জন্যে নাগরিকদের পক্ষ থেকে আজ তাদের দেওয়া হচ্ছে সমান সম্মান। একজন হচ্ছেন নটসারথি, আর একজন হচ্ছেন নাট্যসম্রাজ্ঞী।

পার্ক সার্কাসের বিশাল ময়দানটি আজ ভাই লোকে লোকারণ্য। ময়দানের মাঝখানে খুব উঁচু প্যাণ্ডাল তৈরি হয়েছে। বাইরেটা দেখতে সাধারণ ও সামান্য, কিন্তু ভিতরটা ইন্দ্রপুরীর মত অপরূপভাবে সাজানো। ময়দানের চারধারে রং-বেরঙের আলোর ডুম বসানো, চিত্রবিচিত্র কাপড়ের কারুকাজ দিয়ে প্যাণ্ডেলে ঢোকার প্যাসেজ তৈরি। চারদিকের রাস্তাও উৎসুক জনতায় ভরে গিয়েছে।

ভিতরের মঞ্চে বসে আছে মাননীয় অভ্যাগতেরা। দর্শকের আসনে অগণিত নরনারী।

বাংলা নাট্যমঞ্চের এককালের সেরা নট বৃদ্ধ জগন্ময় লাহিড়ি উঠে দাঁড়িয়ে এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলেন। তারপর ইন্দ্রজিৎকে নূতন আখ্যায় সম্বোধন করে তার হাতে মানপত্র দিলেন।

হাততালিতে ফেটে পড়ল দর্শকদের আসন।

তারপর এলেন ললিতা। এতবড় অভিনেত্রী, কিন্তু সাজগোজে আড়ম্বর নেই কোনো, আছে

কেবল পারিপাট্য। যাঁরা দর্শক হয়ে এসেছেন সেই সব মেয়েদের প্রায় প্রত্যেকের সাজই চাকচিক্যের দিক থেকে ললিতার সাজের থেকে অনেক চটকদার।

বিনয়ে নম্র হয়ে দাঁড়িয়ে মানপত্র গ্রহণ করল ললিতা। ঝিলিক দিয়ে উঠল ফটোগ্রাফারদের আলো, ঐ আলোয় ঝলসে গেল যেন ললিতার চেহারার লালিত্য।

মানপত্রের উত্তরে ইন্দ্রজিৎ সেনকে আলোর নীচে দাঁড়িয়ে বলল, "আজ আমার জীবনের স্মরণীয় দিন। আপনাদের আশীর্বাদ আজ লাভ করেছি পরিপূর্ণভাবে। শ্রীযুক্ত জগন্ময় লাহিড়ি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাই—তিনি আমার জীবন গৌরবান্বিত করলেন। আমি তখন খুব ছোট, সেই সময়ে তাঁর অভিনয় একবার দেখেছি, আজও তা চোখে লেগে আছে। তখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, অভিনয় থেকে অবসর গ্রহণ করবার কথা ভাবছেন। সেই সময়ে তাঁর সাজাহান দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর জীবনের সেরা সময়ে তাঁর অভিনয় দেখার ভাগ্য ঘটেনি বলে নিজেকে বঞ্চিত বলে মনে করি। কিন্তু, আজ তাঁর মত একজন অভিনেতার কাছ থেকে এই সম্মান লাভ করায় আমার জীবনের সব আক্ষেপ দূর হয়েছে। উপস্থিত সকলকে নমস্কার জানাই—আপনারা আমাদের উৎসাহ দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করলেন।"

হাততালির শব্দ থামার পর ধীরে ধীরে মাইকের কাছে এগিয়ে এল ললিতা। ধীরে ধীরে বলল, "কি বলব আমি। আমি বলতে জানিনে। অভিনয় করি। মুখস্থ করার কথা কেবল বলে যাই মাত্র। সে সব কথা তো অন্যের কথা। নিজের কথা কখনো বলিনি। বলতে জানিনে। আমার অভিনয় আপনাদের ভালো লাগে—এজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু জীবনটা তো কেবল অভিনয় নয়। আমি যেমন অভিনেত্রী, তেমনি আপনাদের মত আমি একজন নারী। অভিনেত্রীর জীবনের এই দিকটার প্রতি কেউ দৃষ্টি হয়তো দেন না। অভিনেত্রী নিজেও দৃষ্টি দেওয়ার সময় পায় না। এইখানেই এই জীবনের, যাকে নাটকীয় ভাষায় বলে ট্র্যাজেডি, তাই। কিন্তু সে করুণ কাহিনী বলার সময় এ নয়। আপনারা আমার নমস্কার নিন।"

ব্যাপার কি? দর্শকেরা আশ্চর্য হয়ে গেছে। ললিতা করজোড়ে নমস্কার করে তার আসনের দিকে চলেছে, তার বলবার কথা শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু কেউ হাততালি দিল না। কিসের ট্র্যাজিডি, কেন ট্র্যাজিডি—এই প্রশ্নে সকলে বুঝি হতভম্ব।

অবশেষে বেজে উঠল হাততালি। ললিতা ততক্ষণে বসে পড়েছে নিজের আসনে।

জগন্ময়বাবু কিছু বলার জন্যে উঠছিলেন, হাততালির শব্দে তিনি বসে পড়লেন।

বসে পড়ে ভালোই করেছেন। এখন তাঁর কথা শোনার মত মন নেই কারো। সমস্ত প্যাণ্ডেলে গুঞ্জন বেজে চলেছে—

"ব্যাপার কি? কি হল ওর জীবনে?"

"ইন্দ্রজিতের কাছে কোনো ঘা খেয়েছে নাকি?"

"ইন্দ্রজিৎ লোকটা নাকি খুব সাচ্চা।"

"সাচ্চা আর ঝুটা দিয়ে কথা হচ্ছে না। সাচ্চা লোকেরা প্রেম করবে না,—ঝুটারাই বুঝি—"

"ওসব বোধ হয় না। অভিনয় করে করে হয়তো টায়ার্ড, হয়তো বিশ্রাম চায়।"

"কিন্তু এই খ্যাতি, এই নাম। এর কি কোন দাম নেই? বিশ্রাম নিলেই যে মুছে যাবে নাম।"

"তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, তাহলে যে ভেঙে যাবে এই জুটি। ইন্দ্রজিতের পাশে দাঁড়ায় এমন নায়িকা আর নেই।"

"তা ঠিক। আবার এও ঠিক যে ললিতার সঙ্গে তাল রেখে অভিনয় করে এমন নায়কও দুর্লভ।"

"কিন্তু হল কি ললিতার?"

সারা প্যাণ্ডালে ছেঁটে বেড়াতে লাগল গুঞ্জন। কিন্তু এতে কিছু এগলো না। জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল সমানে, কিন্তু সমস্যার মীমাংসা হল না।

উদ্যোক্তাদের মধ্যে একদল উঠে মাইকের কাছে দাঁড়িয়ে করজোড়ে অনুরোধ করতে লাগলেন, "আপনারা একটু চুপ করুন। শ্রীযুক্ত জলধর লাহিড়ি মহাশয় কিছু বলবেন। অনুগ্রহ করে চুপ করুন। অর্ডার প্লিজ।"

অনেক কষ্টে গুঞ্জন একটু থামল। সকলে তাকাল মঞ্চের দিকে। পাশাপাশি দুই চেয়ারে বসে ইন্দ্রজিত আর ললিতা গল্প করছে। সীটে বসেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও বুঝি কৌতূহল মিটল না, পিছনের সীটের সকলে উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল দৃশ্যটা। নায়ক ও নায়িকা পাশাপাশি অন্তরঙ্গভাবে বসে মৃদু মৃদু হাসছে আর গল্প করছে।

মন্তব্য করল তারা, "ওটাও অভিনয়। যা বলে গেল তাও অভিনয়। ওদের বিশ্বাস নেই। ওদের কথা বর্তব্যের মধ্যে না। মন বলে কোন পদার্থই নেই ওদের।"

"বটেই তো। ধোঁকা দিয়ে তামাসা দেখার মতলব।"

"অভিনেত্রীর আবার ট্র্যাজিডি! হাসি পায়।"

জলধর লাহিড়ি অবশেষে কি বললেন, সে কথা শোনার ধৈর্য কারো ছিল না। তখন সকলে নিজেদের সমস্যা নিয়েই বিব্রত। নিজেদের সমস্যা—অর্থাৎ অভিনেত্রীটির জীবনের ট্র্যাজিডির সমস্যাটা।

নৌচাকে ঢিল মেরেছে যেন ললিতা। নিজের কথা বলতে জানিনে বলে বিনয় দেখিয়ে এমন মোক্ষম কথা শুনিয়ে দিয়েছে যে মৌমাছিদের মধ্যে রীতিমত আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। এমন কথা ও এমন দিনে কেন বলল—এ গবেষণার অন্ত যেন নেই।

প্যাণ্ডাল ছেড়ে জনস্রোত বয়ে চলেছে। কেউ গিয়ে গাড়িতে উঠছে, কেউ রিক্সায় কেউ বা পদব্রজে। কিন্তু সকলের মুখে আজ এক কথা—ললিতা।

কেউ কেউ বলছে, এবার মেয়েটার হয়তো বিয়ে করার শখ হয়েছে। তেজী আলোর নীচে দাঁড়িয়ে প্রেম নিবেদন করে কুলাণ হয়েছে, এবং হয়তো একটু বদল চায়। এবার চায় অন্ধকার বাসর ঘরে প্রেম নিবেদন করতে।

কারও বা মত অন্যরকম, বলে, ইন্দ্রজিতের পপুলারিটিতে ঈর্ষা হতে পারে। তাই আচমকা একটা কথা বলে সকলের মনোযোগ একা গ্রাস করার মতলবও এটা হতে পারে। মেয়েই হোক, নারীই হোক, মহিলাই হোক—আসলে তো একজন অভিনেত্রী।

"তাই। মেয়ের মধ্যে মন বলে কিছু নেই ওদের। সবটাই ইয়ে—"

যেন মস্ত রসিকতার কথা বলা হয়েছে, এইভাবে অট্টহাস্য করে উঠল লোকটি। সঙ্গীর কোমরে একটা গুঁতো দিয়ে বলল, গ্র্যাণ্ড। দেখতে কিন্তু সত্যিই লোভনীয়। যেমন ফিগার তেমনি ফিচার।"

কথাটা ঠিক। ললিতার গড়ন ও গঠন সত্যিই সুন্দর। কেবল অভিনেত্রী বলেই নয়, একজন মেয়ে হিসেবেও সে অনিন্দ্যসুন্দরী!

মাধবীর সঙ্গে তুলনা করে লাভ নেই। কিন্তু যদি তুলনা করা হয় তবে মাধবীর চেয়ে দেখতে সে অনেক ভালো। মুখে রং মাখতে হয়, সেইজন্য আসল চেহারাটা অনেক সময় চাপা পড়ে যায়। তখন মনে হয় মাধবীই বুঝি অনেক সুশ্রী!

রাত একটু বেশিই হয়ে গিয়েছে ফিরতে। এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। অভিনেতাদের ঘরে ফেরার সময়ের বাঁধা নিয়ম বড় একটা থাকে না। অনুষ্ঠানসূচীটা রীতিমত লম্বা ছিল, বক্তাদের বক্তৃতার সারবত্তা কিছু থাক্ বা থাক্, তাদের বক্তৃতাও ছিল দীর্ঘ, তার উপর দু-চারটে গান, কিছু আবৃত্তি—এইসব মিলে সময় লেগেছে অনেক।

ইন্দ্রজিতের মোটর এসে যখন হর্ণ দিল, কিন্তু পর্দা সরিয়ে ছুটে কেউ ব্যালকনিতে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল না।

বারান্দার কোণে বসে ঝুপুরি কুচচ্ছিল এলাচ, সে চট করে উঠে সিঁড়ির আলো জেলে দিল। নীচে কোলাপসিবল্ গেট খোলার শব্দ পাওয়া গেল, দারোয়ান নিশ্চয় খুলে দিল।

ধীরে ধীরে উপরে উঠে এল ইন্দ্রজিৎ। গলায় মালা নেই, কপালে জয়তিলক নেই, মাথায় সোনার মুকুট নেই—হাতে মাত্র কি একটা জিনিস।

পর্দা টেনে ধরল এলাচ। ইন্দ্রজিৎ ঘরে ঢুকল।

নরম বিছানার মধ্যে ডুবে গিয়েছে সমস্ত শরীরটা। মাধবী অকাতরে ঘুমচ্ছে!

ফিকে নীল আলো জ্বলছিল ঘরে, একটা সুইচ টিপতেই ঘরটা যেন ফুটফুটে জ্যোৎস্নার ভরে গেল।

মাধবী উঠে বসল বিছানায়।

"কেমন আছ?"—জিজ্ঞাসা করল ইন্দ্রজিৎ।

উত্তরে মাধবী জিজ্ঞাসা করল, "রাত এখন কটা?"

"অনেক ঘুমিয়েছ নিশ্চয়। রাত বেশি হয়নি। মাত্র একটা।"

"তাই বুঝি? আমি ভাবলাম ভোর হয়ে গেল।"

আঁচল দিয়ে চোখের কোণ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে মাধবী বলল, "কি নিয়ে এলে পুরস্কার?"

ইন্দ্রজিতের হাত থেকে মানপত্রটি নিল মাধবী। লাইনগুলোর উপরে খুব দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল বলল, "বা, চমৎকার, সুন্দর! তুমি এবার নটসার্বভৌম।"

বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল সে, বলল, "এটা, সম্মান। এর জন্যে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে আমার। ভীষণ—ভীষণ।"

একটু থামল সে, বলল, "কিন্তু এর মানে নেই। কথাটার মানে নেই, না থাক্ বয়ে গেল। জীবনেরই বা কী মানে আছে বল।"

কৌচের মধ্যে বসে পড়েই ইন্দ্রজিৎ মাথা উঁচু করে মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, "তা ঠিক। ঠিকই ধরেছ। কোনো খেতাবেরই আসলে মানে কিছু নেই।"

কৌচের হাতলের উপর বসে মাধবী তার আনন্দ জানাতে লাগল, বলল, সে বাঁধিয়ে রাখবে এই মানপত্রটি সোনার ফ্রেম দিয়ে, টাঙিয়ে রাখবে বারান্দায়—যাতে সকলের চোখে পড়ে সহজে।

ইন্দ্রজিৎ আচমকা বলে উঠল, "খবরদার! অমন কাজ কোরো না। সোনার ফ্রেম দিয়ে বাঁধিয়ে খোলা জায়গায় রাখলে চুরি যাবে যে।"

মাধবী হারবার পাত্রী নয়, বলল, "তা থাক। মানপত্র চুরি গেলেও মান কেউ চুরি করতে পারবে তুমি মানী লোক—তা সকলেই জানে। আরো ভালো করে জানুক তারা।"

ইন্দ্রজিৎ মাধবীর হাতটি আলগোছে ধরে বলল, "সেসব কথা পরে ভাবা যাবে। আছ কেমন বলো। গায়ে হাত দিয়ে মনে হচ্ছে তাপ যেন এখন নেই।"

"না। গায়ে নেই। তাপ গিয়ে জমেছে সব মনের মধ্যে। এমন রাগ হচ্ছিল তোমার উপর—"

"দেরী দেখে?"

"আজ্ঞে না। দেরী দেখে নয়। এমন দিনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে না বলে। আমি নিজের চোখে দেখতে পেলাম না অনুষ্ঠান। এমন কিছু খারাপ হয়নি আমার শরীর, যার জন্যে এতটা সাবধান হতে হবে।"

স্বীকার করল ইন্দ্রজিৎ, স্বীকার করলে যে সাবধানতার মাত্রা একটু বেশিই হয়েছে। কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি। গায়ে যে তাপ ছিল তা চলে গেছে। এটা কি কম লাভ?

এদের কথা যেন থামে না। রাত একটায় ফিরেছে, এখন প্রায় দুটো বাজতে চলল। ওদের নাহয় চোখে ঘুম নেই। ওরা নাহয় সারারাত জেগে থাকতে পারে, আনন্দে। কিন্তু এলাচের তো ঘুমতে হবে একটু। এঁরা নাহয় বেলা পর্যন্ত ঘুমবেন। কিন্তু এঁদের কাছে ভোর থেকে যে অতিথি-অভ্যাগতেরা আসতে থাকবেন, তাঁদের বসানো, চা দেওয়া, কফি দেওয়া, তাঁদের মুটফরম শটা খাটা—সে সব তো করতে হবে এই দাসী-বাঁদীদেরই। তাদের কথা তো একটু ভাবা উচিত কর্তাগিন্নির।

ইন্দ্রজিতের হাত ছাড়িয়ে মাধবী পর্দা পর্যন্ত এগিয়ে এসে ডাক দিল, "ওরে এলাচ, তোর বাবুর খাবারটা দিয়ে যা লক্ষ্মীটি। এত রাতে তাঁর আর ইচ্ছে করছে না খাবার ঘরে যেতে।"

ট্রেতে করে খাবার সাজিয়ে এলাচ যখন কাৎ হয়ে কনুই দিয়ে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকছে জোড়া সিঙ্গির ঘড়িতে তখন রাত আড়াইটার ঘণ্টা বাজল।

মাধবী বলল, "এলাচ মানুষটা খুব ঠাণ্ডা। তাই হাসিমুখে সব অত্যাচার সহ্য করে। যা ভাই এলাচ, তুই শুতে যা এবার।"

ইন্দ্রজিৎ বলল, "আজ আমার দিনটাই ভালো যাচ্ছে। এই দিনে মান পেলাম, মানপত্র পেলাম, এইদিনে যা মাংস পেলাম—স্বাদ তার অপূর্ব। কে, রেঁধেছে কে?"

"যে রোজ রাঁধে। এলাচ।"

খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে ওরা দু-জনে শুলো। এদিকে নীল বাল্বটা জ্বলতে লাগল ঘরে। ওদের বুঝি ঘুমবার ইচ্ছে নেই। রেডিয়োতে বহু গুঞ্জনে বেজে চলেছে কোন্ দূর বিদেশের জোক-সং।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল ওদের। ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। কিন্তু জানালা দরোজার পুরু পর্দা ভেদ করে রোদ ঘরে ঢুকতে পারেনি। ঘরের আলো হয়ে জ্বলছে নীল বাল্বটা।

আনন্দ পালিত রোডের এই বাড়িটা এস্টালী-অঞ্চলের একটা নামজাদা বাড়ি। বাড়িটা বড় না। ছয় কামরার একটা দোতলা বাড়ি। চেহারার কোনো বৈশিষ্ট্যও নেই বাড়িটার। একমাত্র বৈশিষ্ট্য বাড়িটার

পর্দা। এ-বাড়ির কেউই পর্দানশীন নয়, কিন্তু এর সর্বাঙ্গই প্রায় ভারী পর্দায় ছাওয়া। মনে হয় যেন, এর ভিতরে ভীষণ রকমের কোনো রহস্য ঢাকা দেওয়া আছে।

অথচ, রহস্য কিছু নেই। মানুষের কৌতূহলী চোখের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্যেই এই রকমের একটা ঘেরা-টোপ তৈরী করে নিতে হয়েছে। কেবল পথচারীর চোখ নয়, প্রতিবেশীরও।

আনন্দ পালিত রোডের এই তরুণটি লোকসমূহের কাছে এই মন্ত্রে একটা রহস্যের খাসমহল হয়েই আছে।

জানলার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়েই মাধবী বলে উঠল, "উ, এ যে দুপুর। শিগগির ওঠো।"

পাশ ফিরে শুলো ইন্দ্রজিৎ, বলল, "হবে থাক্। বিকেলেই উঠব। দুপুরের ঘুমটা সেরেই নিই।"

"হয়েছে। এবার উঠুন দয়া করে।"

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ এবং সেইসঙ্গে এলাচের গলা শুনে মাধবী দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসেই পিছিয়ে যাচ্ছিল, কের এগিয়ে মৃদু হেসে বলল, "আসুন, আসুন। আর নাম ধরে ডাকব না। আসুন নাট্যপটিয়সী।"

ললিতা উঠে এসে মাধবীর কাঁধে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল, "তামাসা হচ্ছে বুঝি? নাট্যপটিয়সী আমি বুঝি নই?"

বালিশের থেকে মাথা একটু তুলে ইন্দ্রজিৎ বলল, "কে? চোখে ঘুম নেই বুঝি। এত ভোরে এভাবে জ্বালাতন করতে আসার মানে?"

হাসতে হাসতে ললিতা কৌচের মধ্যে যেন চুপ হয়ে ভেঙে পড়ল, বলল, "নাটক। নাটক। সব সময় নাটকীয় ভঙ্গি। কিন্তু জীবনটা যে নাটক নয়, তা উনি জানেন না।"

পাশের কৌচে বসে পড়েছে মাধবী, সে বলল, "কি জানি। নাটক বুঝি নে। হিরোতে হিরোয়িনে হচ্ছে, আমরা থাকতেও চাইনে বাপু তার মধ্যে।"

"কার সঙ্গে এলে?" উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল ইন্দ্রজিৎ।

"আমি? বাবার সঙ্গে এসেছি। বাবা ছাড়া আমার আর বন্ধুও নেই, সঙ্গীও নেই।"

ব'লে ললিতা মাধবীর দিকে তাকাল।

মাধবী অন্যমনস্ক ছিল, জিজ্ঞাসা করল, "কি বললে? আর বন্ধুও নেই, সঙ্গীও নেই?"

ললিতা বলল, "আছে নাকি?"

কথাটা বলেই ললিতা বুঝতে পারল মাধবীর প্রশ্নের মানে। নিজেকে তাই সে যেন শুধরে নিল, বলল, "হ্যাঁ, আছে।"

ইন্দ্রজিৎ উঠে এসে কৃত্রিম কৌতূহল দেখিয়ে বলল, "কে, কে? কে সেই বন্ধু ও সঙ্গী?"

ললিতা বলল, "তার নাম মাধবী।"

মাধবীতে ও ললিতায় বন্ধুত্ব অগাধ। কোনো দ্বেষ নেই, ঈর্ষা নেই, গ্লানি নেই। মাধবীর স্বামী হিরো, আর ললিতা হচ্ছে তার হিরোয়িন। অনেক প্রেমের অভিনয় স্বচক্ষে বহুবার দেখেছে মাধবী, কিন্তু সেজন্যে তার মনের কোণে কখনো এতটুকু কাঁটা বেঁধেনি। অথচ তার বুকে যে কাঁটা একেবারেই নেই এমন কথা সে কখনো বলে না। কিন্তু সে ঈর্ষার কাঁটা নয়, সে কাঁটা অন্য।

ইচ্ছে হয় মাধবীর, সে যদি নিজে হতে পারত যশস্বিনী। যশস্বীর পত্নী হয়ে যশস্বিনী হওয়া নয়, ললিতার মত স্বয়ং যশস্বিনী।

ললিতার বাসনা আবার অন্যরকম। কিন্তু সে কথা এখন নয়। এখন কেবল এইটুকুই বলা

যায় যে, সে তার জীবনের ট্র্যাজিডির কথা বলেছে, তার কাঁটা তার বুকের মধ্যেও মাঝে মাঝে খচখচ করে ওঠে।

আমরা সেসব কাঁটার সন্ধান করতে এখন ইচ্ছুক নই। এখন আমরা তাদের জীবনের ঘটনা বিবৃত করার কাজে লিপ্ত আছি।

উত্তরোত্তর যশস্বিনী হয়ে উঠছে ললিতা। উত্তরোত্তর যশের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে ইন্দ্রজিৎ। তাদের জীবনের এই অভিযান সফল হোক—এই কামনাই সকলে করছে।

নাট্যজগতে এমন জুটি আর কখনো জোটেনি। ইন্দ্রজিৎ আর ললিতার নাম সকলের মুখে। সকলের চোখে-চোখে ভাসে ঐ দুই যুগল মূর্তি।

ইন্দ্রজিৎ বলে, "জীবনটাই একটা নাটক।"

কিন্তু ললিতার অভিমত এর বিপরীত, সে বলে, "জীবনটা তো কেবল অভিনয় নয়।"

তাদের নিজেদের অভিমত যেমনই হোক, জনসাধারণের অভিমত এই যে, জীবনই নাটক, নাটকই জীবন। কেননা, এই দুই নটনটী জীবনকে নাটকীয় করে তুলতে পেরেছে, এবং নাটককেও জীবন্ত করে তুলেছে।

অতএব তাদের চাহিদা বেড়ে চলেছে ক্রমশ। মঞ্চে যারা ছিল বাঁধা তাদের ডাক আসতে আরম্ভ করেছে পর্দা থেকেও। চলচ্চিত্রের অভিনয় করার জন্যে অনুরোধ আসছে অনবরত।

যারা নটসার্বভৌম ও নাট্যশিরোমণি নামে আখ্যাত হয়েছে, এবার বুঝি তারা দুজন হবে অন্য জিনিস—ছায়ানট ও ছায়ানটী।

এত দিন অভিনয় তারা করেছে দর্শকের সামনে, এবার অভিনয় করতে হবে দর্শকের আড়ালে।

"পারবে তুমি?" জিজ্ঞাসা করল মাধবী।

"পারতে হবে।" ইন্দ্রজিৎ তার আত্মবিশ্বাসের উপর জোর দিয়ে বলল কথাটা।

"ললিতা পারবে?"

"না পারার কথা না।"

অতএব আর কোনো কথা না। অচিরে মঞ্চের এই দুই শিল্পী হয়ে গেল ছায়াছবির আর্টিস্ট।

দেখতে দেখতে যশ গেল ছড়িয়ে। এতদিন যে-যশ ছিল মঞ্চের চৌহদ্দির মধ্যে বাঁধা আর পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত, সেই যশ ছড়িয়ে গেল পর্দায় পর্দায়।

যারা ছিল কেবল নাটকের হিরো-হিরোইন, তারা হয়ে পড়ল সারা দেশের নায়কনায়িকা।

যখন যেখানেই শুটিংএ যায়, ইন্দ্রজিৎ সঙ্গে করে নিয়ে যায় মাধবীকে। স্টুডিয়োর শুটিংএ অবশ্য নিয়মিত যায় না মাধবী, কিন্তু কোনো আউটডোরের কাজ হলে সেখানে সে যায়ই।

মাধবীর কেমন যেন লোভ হয়, ঐ রকম অভিনয় সে করে।

আমরা যেমন দ্রুত বলে গেলাম, ঘটনা অত দ্রুত ঘটেনি। অত দ্রুত ঘটতে পারে না। কিন্তু

তাদের জীবন বয়ে চলেছে রীতিমত দ্রুতবেগে—যেভাবে পর্দায় ঘটনাগুলি পরপর তরতর বেগে এগিয়ে চলে সেইভাবে।

তাদের আদর-আপ্যায়ন আগে ছিল ছোট পরিসরে, এখন তা বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। এখন তারা বুঝি কেবল বাংলার না, সারা ভারতবর্ষের।

তারা এসেছে রাজগীরে। এখানে ছবি তোলা হবে। অনেকের ধারণা হয়েছিল, হয়তো কোনো বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী নিয়েই ছবি। লোকেশনটা রাজগীর হওয়ার দরুণই সকলের এই ধারণা হয়। কিন্তু আসলে তা নয়। কাহিনীটা সামাজিক। সেই চিরাচরিত কাহিনী, সেই অতিপুরাতন বিরহমিলন নিয়েই এই ঘটনা। কেবল, একটু পাহাড় চাই, আর চাই উন্মুক্ত একটি প্রান্তর। এইজন্যে মাত্র ইউনিট নিয়ে তারা চলে এল এখানে।

বক্তিয়ারপুরে নামল ভোরের ট্রেণে। সেখান থেকে মুদে ট্রেণে চেপে ঝিকমিক করতে করতে চলল রাজগীর। তেত্রিশ মাইল মাত্র রাস্তা, কিন্তু প্রায় চার ঘণ্টা সময় লাগল এই পথটুকু পার হতে।

ট্রেণে মাধবীর স্ফূর্তির অন্ত নেই। শহরে থেকে থেকে মনে হয়েছিল সারা পৃথিবীটাই বুঝি পিচ দিয়ে ঢালাই করা। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবীতে ঘাস আছে, গাছ আছে, মাটি আছে, পাহাড় আছে, প্রান্তর আছে।

ট্রেণের জানলায় বসে সে বার বার ললিতাকে বলছে, কি মজা, কি মজা। ট্রেণের কামরাগুলো যদি আর একটু বড় হত তবে আরো ভালো লাগত।"

"কেন, তোমার চোখ বুঝি জানলার চেয়েও বড়? সবটা চোখ দিয়ে দেখতে বুঝি বাধা হচ্ছে?"

"তা নয়। কিন্তু মনে হচ্ছে, কত কী যেন দেখতে পাচ্ছিনে। তোমার মন ভরছে?

ললিতা কেন-যেন একটা নিশ্বাস ফেলল, বলল, "আমাদের আবার মন! আমরা অভিনেত্রী। অভিনেত্রীদের মন থাকতে নেই।"

ডিরেক্টর ক্যামেরাম্যান সাউণ্ডরেকর্ডার ইত্যাদি অন্যদের সঙ্গে ওপাশে বসে গল্প করছে নায়ক। অতি সরল সহজ ও সাধারণ যেন ইন্দ্রজিৎ। এতটুকু অহংকার নেই, নিজের খ্যাতি সম্বন্ধে পরম উদাসীন। সে। তাই সহজভাবে বসে সহজ আলোচনা করছে সে। তাদেরই একটু তফাতে বসে আছেন ললিতার বাবা।

ট্রেণ এসে গেল বিহারশরিফে। অন্য কামরা থেকে লোকজন নেমে তাদের কামরার সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। নিজেদের বাড়ির দরজায় পর্দা দিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টি এড়ানো গিয়েছে, কিন্তু এখানে দরজায়-জানলায় পর্দা নেই। সুতরাং কৌতূহল আড়াল করারও উপায় নেই কোনো।

সকলে চেয়ে-চেয়ে দেখছে ইন্দ্রজিৎকে। আনন্দে চীৎকার বলছে তার নাম; কেউ-বা ললিতাকে দেখার জন্য ট্রেণের কামরার গায়ের কাছে হুটোপুটি আরম্ভ করে দিয়েছে।

ললিতা পরে এসে বসল জানলা ছেড়ে কামরার মাঝখানে। উৎসাহীদের কাছ থেকে যেন নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এল নিজেকে। ইন্দ্রজিৎ কিন্তু পারল না। যেমন বসেছিল সেইরকম নির্বিকার ভাবে বসে রইল। ওদিকে মাধবীও চুপচাপ বসে রইল জানলার কাছে।

বিরাট ভিড় জমেছে স্টেশনে। বিহারশরিফে—এমন ভিড় বুঝি এর আগে কখনো হয়নি।

ট্রেণ ছাড়ল। উন্মত্তের মত চীৎকার করে উঠল জনতা।

মাধবী ইশারা করে ললিতাকে কাছে ডেকে নিল। বলল, "পালাবে কেন? কি করবে ওরা? আমি তো ভয় পেলাম না।"

একটু চুপ করে থেকে ললিতা বলল, "তোমার ভয় কি, তুমি অভিনয় কর না।"

"তাতে কি?"

"তাতেই সব। ওরা আমাদের সম্মানও করে না, শ্রদ্ধাও করে না। উৎসাহের মুখে যা খুশি ওরা করে বসতে পারে। ওরা যে আমাদের ভক্ত। আমাদের বেইজ্জৎ করার অধিকার ওদের আছে। তাই সাবধান হতে হয়।"

একটা নিশ্বাস ফেলে ললিতা আরও বলল, "কিন্তু তুমি? তুমি একজন ভদ্রমহিলা। তোমার কথা আলাদা।"

মাধবী বুঝি বুঝতে পারল না এই কথার মানে, সংক্ষেপে বলল, "ও।"

ললিতা চলন্ত গাছপালার দিকে চোখ রেখে বলল, "তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার সখী। কিন্তু তোমাতে আর আমাতে তফাৎ কেবল এইখানে। তোমার আছে মান, আমার আছে নাম।

ললিতা সেদিন সত্যবতকে দাঁড়িয়ে বিনয় করে যা বলেছিল, সে কথা বলতে জানে না। কিন্তু তার এখনকার কথা শুনে তেমন মনে হয় না। অল্পকথায় সে তাদের দুজনের পার্থক্য সহজেই বলে গেল। সে তাহলে নিশ্চয়ই নিজেকে বিচার করেছে, বিশ্লেষণও করেছে।

ললিতা আরও বলল, "নাম আমি কখনো চাইনি। নামের জন্যে যে কাঙালপনা ক'রে মরে, নাম তাকে ঘৃণা ক'রে দূরে সরে যায়। আমি নাম চাইনি ভাই।"

"তবে কি তোমার ইচ্ছে, কি চাও তুমি ভাই?"

"সে কথা তুমি বুঝবে না!"

আশ্চর্য। মাধবীর বুদ্ধি বা বোধ কি এতই কম যে, একটি মেয়ের মনের বাসনার কথাটাই সে বুঝতে পারবে না? সেও মেয়ে, মেয়েদের মন সে বোঝে—এই বিশ্বাস এতদিন তার ছিল। কিন্তু ললিতা বুঝি তার সে বিশ্বাসটা ভেঙে দেবে একেবারে।

মাঝে নালন্দা স্টেশনে তাদের গাড়ি দু-মিনিটের জন্যে দাঁড়িয়েছিল। তারা তাদের নিজেদের কথায় এমনই মত্ত হয়ে আছে যে, কোন্ স্টেশন এখন ছাড়ল ট্রেণ তা তারা জানেই না।

"ওরে বুঁচি, কিছু খাবি নাকি?"

বাবার গলা শুনে ললিতা ফিরে তাকাল, একটু যেন বিরক্তই হল, বলল, "নাঃ। আমি খুকিটি না। অনবরত খেতে চাইনে।"

"চোখমুখ কেমন দেখাচ্ছে দেখে ভাবলাম বুঝি খেটা পেয়েছে।"

ডিরেক্টর ভবানীভূষণ বললেন, "ও নরহরিবাবু, আপনার মেয়ে কিন্তু আমাদের ছবির হিরোয়িন। ওঁর শরীর মন চাঙ্গা রাখার জন্যে আমরা ব্যস্ত হয়েই আছি। কিন্তু এখন খাওয়া থাক। এইবার আমরা নামব।"

ক্যামেরাম্যান একটু হাসল, ভবানীভূষণের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "বুঁচি নাম শুনেই নায়িকার মুখ কেমন লাল হয়ে উঠল দেখলেন? ঘরোয়া নাম ঘরেই সাজে, সবার ও-সব উচ্চারণ না করাই ভালো।"

ইন্দ্রজিৎও হাসল একটু, বলল, "নাম রাখার সময় একটু ভবিষ্যৎ ভেবে রাখাই ঠিক।"

ভবানীভূষণ বললেন, "যেমন আপনাই নাম—অমিতশংকর।"

ইন্দ্রজিৎ বলল, "চুপ। ওটা গুপ্ত থাক্।"

তবে থাক।

ব্রেক কষল ইঞ্জিন। সামান্য একটু ঝাঁকি দিয়ে ট্রেন থেমে গেল।

চারিদিকে পাহাড়। মাঝখানে এই ডরমিটরি। বেশ বাড়িটা। দিনের বেলা একরকম। রাত্রি-বেলায় মনে হয়, এ বুঝি একটা স্বপ্নের দেশ।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সামনের সদর রাস্তা দিয়ে স্বাস্থ্যান্বেষীরা যায় হট্-স্প্রীঙে স্নান করতে। মেয়ে-পুরুষ বাচ্চাকাচ্চা ছেলেমেয়ে। রিক্সা চেপে, পায়ে হেঁটে, কিংবা মোটরে। রাস্তাটা সরগরম হয়ে থাকে। কিন্তু বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকাটা নির্জন আর নির্জীব হয়ে যায়।

ডিরেক্টররা লোকেশন বাছবার জন্যে সকাল বেলা বেরিয়ে যান। ফিরতে বেলা হয়। ইন্দ্রজিতের ফেরবার উপায় নেই, রাস্তায় বেরলেই লোকজনের ভিড় জমে যায়। এইজন্যে তাকে নজরবন্দী হয়ে থাকতে হয় এই ডরমিটরির মধ্যে।

বাড়িটায় অনেকগুলো ঘর, আর ব্যবস্থাও ভালো। দোতলায় তিনটি ঘর। একটিতে থাকে ইন্দ্রজিৎ আর মাধবী, একটিতে ললিতা আর নরহরিবাবু, আর একটিতে থাকে ডিরেক্টর ভবানীভূষণ। টেকনিশিয়ানরা একতলার ঘরগুলিতে।

দোতলার বারান্দায় বসে গল্প করছিল তিনজনে। ডিরেক্টর তো টেকনিশিয়ানদের নিয়ে বেরিয়েছেন, নরহরিবাবুও গিয়েছেন হট্স্প্রীঙের দিকে।

ললিতা চারদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল, বলল, "ইচ্ছে করে, এইখানেই থেকে যাই। কি হবে ছাই কলকাতায় ফিরে!"

মাধবী রসিকতার ভঙ্গিতে বলল, "সে কি বুঝি? তাহলে নায়িকা সাজবে কে?"

ললিতা বাধা দিয়ে বলল, "ও নাম উচ্চারণ করবে না। বাবার যত-সব কাণ্ড!"

ইন্দ্রজিৎ মাঝখান থেকে বলল' "বলি? তবে বলি? মাধবীরও একটা নাম আছে কিন্তু, বলি!"

ইন্দ্রজিতের মুখ চেপে ধরে মাধবী বলল, "ভালো হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি। কক্ষনো বলবে না।"

ললিতা হেসে যেন গড়িয়ে পড়তে লাগল, বলল, "মনে হচ্ছে আমারটার চেয়েও খারাপ? অবশ্য এর চেয়ে বিশ্রী আর কিছু হতে পারে বলে জানিনে। তবু, তবু শুনিই না একটু।"

বাধা দিল মাধবী, বলল, "যা ঘরোয়া তা ঘরোয়াই।"

হেসে উঠল ইন্দ্রজিৎ, বলল, "এটাও তো ঘর, তবে পরোয়া কি?"

শক্ত হয়ে বসে মাধবী বলল, "না। পরের সামনে ও কথা বলা চলবে না।"

কথাটা ললিতার বুকে গিয়ে যেন ধাক্কা দিল, সে হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসতে পারল না।

মাধবী বুঝতে পারল কথাটা সে ভালো বলেনি। এইজন্যে সেও চুপ করে গেল।

ইন্দ্রজিতের এখন উভয়সংকট। সে এখন কোনো মন্তব্যই করতে পারছে না। কেবল বুঝতে পারছে, ডরমিটারির এই বারান্দার আবহাওয়াটা বড় ভারী হয়ে গিয়েছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে তাই ধোঁয়া ছাড়তে লাগল সে। মাঝে দু-একবার চোখ ইসারায় মাধবীকে কি যেন বলতে চেষ্টা করল।

মাধবী চুপ করে বসে ছিল এতক্ষণ। এবার সে ধীরে ধীরে বলল, "যত সব বাজে প্রসঙ্গ। কারো থাকে ডাক নাম, কারো থাকে নাম ডাক। তাতে কারই বা কি ক্ষতি, কারই বা কি লাভ। ও-সব বাদ দাও। চলো, একদিন স্নান করে আসি ওখানে—কত লোক যাচ্ছে।"

"যেতে হবে একদিন। দিনের আলোয় নয়, রাত্রির অন্ধকারে। আমাদের ডাক নাম নেই বটে, কিন্তু অন্তটা যে আছে।"

ললিতা তাকাল ইন্দ্রজিতের দিকে। একটা নিশ্বাস ফেলল সে।

মাধবী তার পাশে গিয়ে বসে বলল, "রাগ কোরো না ভাই। তোমাকে পর বলিনি। এখানে আরো তো অনেকে এসেছেন। তাঁরা এখন নেই বটে, কিন্তু কখন এসে পড়বেন, কে বলতে পারে। আমি তো তোমার বন্ধু, আমি তো তোমার সঙ্গী।"

পরিষ্কার আর স্বচ্ছ ভাবে হেসে উঠল ললিতা, বলল, "জানো না, আমি অভিনেত্রী। কিছু মনে করিনি, মুখের ভাব দেখে ভুল করেছ, ওটা আমার অভিনয়।"

সত্যি, নিখুঁত অভিনয় করল ললিতা। মনের মধ্যে একটা আঘাত চেপে রেখে অদ্ভুত ভাবে হাসতে লাগল সে।

ভবানীভূষণ রায় ফিরছেন। ঐ যে নেমে আসছেন পাহাড়ের গা বেয়ে। যেন হিমালয় অভিযান সমাপ্ত করে বিজয়ীর মত তাঁরা আসছেন। মন্দ লাগছে না দেখতে। ঠিক এইভাবেই হয়তো হাঁটেন শহর-কলকাতায়, কলকাতার ষ্টুডিয়োর চত্বরে। কিন্তু এখন তাঁদের হাঁটার ভঙ্গিটাই দেখাচ্ছে নতুন। হয়তো লোকেশন নির্বাচন হয়ে গেছে তাঁদের। হয়তো আদেশ হবে—কাল থেকেই আরম্ভ হবে ছবির কাজ।

ওদের চেয়ে চেয়ে দেখছে ললিতা, আর ভাবছে কালই আবার মাখতে হবে রং, পরতে হবে স্বচ্ছ শাড়ি, নাটকীয়ভাবে বলতে হবে ইন্দ্রজিৎকে "বলো তুমি আমার কে? কেন তুমি এলে এ-জীবনে?"

কাল রাত্রে বার কয়েক রিয়ার্সেল দিয়েছে তারা, কিন্তু তবু হয়তো কথাগুলো ভালো করে রপ্ত হয়নি তার। তাই এখন বসে বসে ললিতা মনে মনে আবার রিয়ার্সেল দিতে লাগল, "বলো, তুমি আমার কে? কেন তুমি এলে এ-জীবনে?"

পাহাড়ি ব্যাকগ্রাউণ্ড চাই এই দৃশ্যে, কেননা ছবির কাহিনীতে আছে, নায়ক ও নায়িকা চুপ করে পালিয়ে গিয়েছে এক পাহাড় প্রদেশে। পাহাড়ি ব্যাকগ্রাউণ্ড আরো চাই এই জন্যে যে, এইখানে আছে একটি সাংঘাতিক পরিস্থিতি, জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে নায়িকা ঝাঁপ দেবে গভীর খাদে।

ললিতা সেই কথাই ভাবছিল। ভাবছিল, মিথ্যা একটা ঝাঁপ দিতে গিয়ে সত্যিসত্যিই সে ঝাঁপ দিয়ে না বসে।

দূর পাহাড়ের দিকে চেয়েছিল ইন্দ্রজিৎ, অনেকক্ষণ ঐ দিকে চেয়ে থেকে এতক্ষণে মুখ খুলল, বলল, "ভবানীভূষণ হয়তো সেই খাদটা খুঁজে পেয়েছেন।"

"কোন্ খাদ?" জিজ্ঞাসা করে উঠল মাধবী।

"যার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে ললিতা।"

ললিতা যেন আপত্তি জানিয়ে উঠল, বলল, "পারব না। ওসব পারবনা। প্রাণের বড় মায়া আমার। আগে দেখে নেব গর্তটা। বেশি গভীর হলে অন্য একটা খুঁজে বের করতে বলব।"

"কিন্তু ভয়ের আছে কি?" মাধবী বলল, "জায়গাটা দেখতেই ভালো। কিন্তু পাহাড়ের যা ছিরি দেখছি, এখানে খাদ আবার কোথায়?"

"ঐ জন্যেই তো এই জায়গায় আসা হয়েছে। পাহাড় আছে, কিন্তু খাদ নেই। অর্থাৎ ঝুঁকি নেই কোনো। যত ইচ্ছে ঝাঁপ দিতে পারে নায়িকা।"

ইন্দ্রজিতের কথা শুনে হাসতে লাগল ললিতা, বলল, "ঐ রকম আশ্বাসই চাই। তা না হলে আমি নামব না।"

পর দিন সকাল থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল। দুপুর বেলা টেক্ হবে। ললিতার হাব-ভাব সকাল থেকেই অন্য রকম। সে নিপুণ অভিনেত্রী, অভিনয়ের আগে বা পরে সে স্বাভাবিক একটি মেয়ে। কিন্তু অভিনয়ের সময়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। এখন অভিনয়ের সময় আসন্ন। সে তাই নিজেকে পুরোপুরি প্রস্তুত করার জন্যে মনে মনে আউড়ে যাচ্ছে কথাগুলো এবং মেক-আপ-ম্যানের সামনে বসে মুখ দেখে নিচ্ছে।

মাধবী এই ধরণের অনেক দৃশ্যের ছবি নেওয়া আগেও দেখেছে, তাই তার মনও বেশ পরিষ্কার। ঠিক তার মনের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজ পরে নিচ্ছে সেও উপরের ঘরে। আয়নার দিকে চেয়ে চেয়ে হয়তো ভাবছে কে বেশি সুন্দরী।

নীচে নেমে আসতেই ইন্দ্রজিৎ বলল, "এই যে। আমরাও তৈরি। লোকেশনে যাবে তো তুমিও।"

উত্তর না দিয়ে মাধবী পাশের ঘরে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, ললিতারও সাজ হয়ে গিয়েছে। মনে মনে কি যেন বলছে ললিতা, হয়তো ঠোঁট একটু নড়ে উঠেছে, মাধবী জিজ্ঞাসা করল, "কি বলছ?"

"বলছি?" ভুরু দুটো কপালের দিকে একটু ঠেলে তুলে মাধবী বলল, "বলছি—বলো, তুমি আমার কে?"

"আমি?" মাধবী বলল, "তোমার বন্ধু ও সঙ্গী।"

কিন্তু ঘণ্টা কয়েক বাদে পাহাড়ের ওই উঁচুতে উঠে মাইক্রোফোনের নীচে পাথরের ওঁড়িতে হেলান দিয়ে ক্যামেরার কোকাসের মধ্যে ললিতা যখন ইন্দ্রজিতের হাত ধরে বলল ঐ কথাগুলি, অদূরে দাঁড়িয়ে মাধবী তখন ইন্দ্রজিতের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ইন্দ্রজিৎ নায়কের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমিই বলো, আমি তোমার কে?"

"তুমি?" ললিতা বলল, "তুমি আমার সব, আমার সমস্ত।"

স্ক্রিপ্টিকের শব্দ বেজে উঠল, ডিরেক্টর বলল, "চমৎকার। চমৎকার হয়েছে।"

ললিতা বসে রইল সেই শিলাখণ্ডের উপর, ইন্দ্রজিৎ মাধবীর কাছে এসে বলল, "কেমন হয়েছে।"

"সুন্দর।" একটু থেমে মাধবী বলল, "আত্মহত্যার সীনটা কবে নেওয়া হবে?"

"হয়তো আজই। আলোর উপর নির্ভর করছে। সূর্যটা থাকতে থাকতে তৈরি হয়ে নিতে পারলেই—"

"বেশ।"

কিন্তু আত্মহত্যা সেদিন হল না। ক্যামেরাম্যান জানাল যে, আলো ইনসাফিশিয়েন্ট।

রাত্রিবেলা এই পাহাড়তলীর নিভৃত ঘরে চাপা গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল, মাধবী অনুযোগের সুরে

তার স্বামীকে বলছে, "কই ? একদিনও তুমি অমন ভাবে কথা বলোনি আমার সঙ্গে। অমন সুন্দর করে কথা তুমি কেন বলনা আমার সঙ্গে ?"

"বলতে নেই।"

"কেন ?"

"তুমি যে আমার স্ত্রী। স্ত্রীর সঙ্গে ওভাবে কথা কেউ বলে ?"

"কিন্তু স্ত্রীর যদি শুনতে ইচ্ছে করে ওরকম কথা ?"

"তাহলে অভিনয় করতে হবে। স্ত্রীর সঙ্গে অভিনয় কেউ করে ?"

"কিন্তু, আমার যে ভীষণ ভালো লাগল শুনতে। স্ত্রীর যদি শুনতে ভালো লাগে তাহলে বললে ক্ষতি কি ?"

"ভীষণ ক্ষতি। তাহলে স্বামী পর হয়ে যায়।"

"তুমি তো অভিনয় জান, একটু পর নাহয় সাজলেই।"

"তোমার সঙ্গে অভিনয় করব ?"

"হ্যাঁ। মনে কর, আমি মাধবী না, আমি অভিনেত্রী। সত্যি বলছি, অভিনেত্রী হতে আমার ভীষণ ইচ্ছে। কত নাম, কত যশ, কত—"

হঠাৎ মুখ বন্ধ হয়ে গেল মাধবীর। সব গুঞ্জন থেমে গেল। একটু পরে ইন্দ্রজিৎ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় কি যেন বলতে লাগল, শোনা গেল না। কিন্তু মাধবীর চাপা গলাটা শোনা গেল, সে বলছে, "তুমি আমার সব, আমার সমস্ত।"

ভোরবেলা ললিতা এসে কড়া নাড়তে লাগল, বলতে লাগল, "মশাইরা উঠুন। সকাল হয়েছে। কি রকম লাল টুকটুকে একটা সূর্য উঠছে চোখ রগড়ে একবার দেখুন এসে।

হট্-শ্রীতে স্নান করার খুব ইচ্ছে মাধবীর। ললিতার ইচ্ছেও তার চেয়ে কম না। কিন্তু ললিতার অনেক বাধা। অনামধন্যা একজন অভিনেত্রী প্রকাশ্য জায়গায় দাঁড়িয়ে স্নান করলে আর রক্ষে নেই। সারা দুনিয়া হয়তো তাহলে ভেঙে পড়বে।

ললিতা বলল, "বিপদ আমাদের অনেক। কিন্তু তার জন্যে তোমার যাওয়ায় বাধা কি! তুমি যাও না।"

"একা ?"

"একা কেন। বাবার সঙ্গে যাও।"

প্রস্তাব মন্দ না। অল্পক্ষণের মধ্যেই নরহরিবাবুর সঙ্গে মাধবী চলল স্নানে। পায়ে হেঁটেই চলল।

চলতে চলতে মাধবী বলল, "আপনার কী ভাগ্য। আপনি একজন নামজাদা মেয়ের বাবা। কত নাম ওর, কত সুখী ও ?" নরহরি বাবু বললেন তুমি কি সুখী না ?

"সুখী। খুব সুখী। কিন্তু ওর মত হতে পারলে আরো সুখী হতাম"। ঢালু পথটা তড় তড় করে নামতে নামতে মাধবী বলল, "তা বলে আমাকে দেখে এখন ভিড় জমে যেত রাস্তায়। এখন যাচ্ছি, দেখুন, কেউ চেনেই না। কেমন বিশ্রী না ?"

"ওই তো মজা।" নরহরিবাবু এগিয়ে মাধবীর সমান সমান হয়ে বললেন, "ও আবার চায় সব নাম মুছে দিয়ে একেবারে সামান্য হতে, সাধারণ হতে।"

"বোকা একটা।"

কথা বলতে বলতে চলেছে দুজনে। কত কথা, কথার যেন শেষ নেই। কেন ললিতা নাম চায় না, নামটা তো বেশ মজার জিনিস, কেন চায় সে সাধারণ হতে? তা যদি চায়, তবে কেন হল অভিনেত্রী?

"সে অনেক কথা।"

"একটু শুনিই না!"

বুড়ো বাবার একমাত্র মেয়ে। দেখতেও ভালো। চালাক চতুরও। একটা ছোট নাটকে, পাড়ার ছেলেদের নাটকে, প্রথমে নামল। দেখা গেল, বেশ করে। টাকার দরকার ছিল, টাকা নিয়ে দু-এক জায়গায় মামানো হল। নামের তো একটু জাদু আছে, লোভ দেখায়। লোভে লোভে এগতে এগতে—

থমকে দাঁড়াল মাধবী, বলল, "নামের জাদু আছে—স্বীকার করেন তাহলে?"

"আছে।" নরহরিবাবু বললেন, "কিন্তু কি কষ্ট বলো—ইচ্ছামত চলাফেরা করা বন্ধ। কই, আসতে পারল সে এখানে নাইতে? কই, পারলাম আজ পর্যন্ত ওর পাত্র জোগাড় করতে?"

যেন হোঁচট খেল মাধবী, বলে উঠল, "বিয়ে? বিয়ে করতে চায় বুঝি ললিতা?"

"চায়।"

এ যেন একটা অবান্তর সংবাদ শুনল মাধবী। সে আশ্চর্য হয়ে গেল। যে মেয়ের এত খ্যাতি প্রতিপত্তি, এত নাম এত যশ—তারও এমনি সাধারণ ইচ্ছে।

হোক ইচ্ছে, সে ইচ্ছের মানে বোঝার সাধ্য তার নেই। বুঝতেও সে চায় না। সে হেটে চলল। ঐ যে ঝিরঝির করে জল নেমে আসছে, পাথরে বাঁধানো চৌবাচ্চার মধ্যে, অগুন্তি মানুষ কাপড় কাচছে, ওইটে বুঝি বর্ণা?

নরহরিবাবু বললেন, "না। ভিতরে চলো। ওটা স্নানকরা নোংরা জল।"

ব্রিজে উঠে পড়ল তারা। ব্রিজ পার হয়ে এসে গেল ছট খ্রীষ্টের চত্বরে।

অদ্ভুত লোক। লোকে লোকারণ্য বলা চলে। ঠিক, না এসে ভালোই করেছে ললিতা। সে এলে আর রক্ষে ছিল না।

নরহরিবাবু বাইরে বসে রইলেন। মাধবী কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে ঢুকে পড়ল ছাদহীন একটা ঘরে। তার দেয়ালে শেতপাথরের সিংহের মুখ দিয়ে জল ঝরছে। হাত দিয়ে দেখল, উঃ, ভীষণ গরম।

ঐ ঘর থেকে একটা দেওয়ালের গা দিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গিয়েছে মস্ত চৌবাচ্চায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে আছে স্ত্রী আর পুরুষ।

না। এভাবে স্নান হবে না। সিংহের মুখ দিয়ে যে জল ঝরছে তার নীচেই বসতে হবে। কিন্তু প্রত্যেকটার লোকের ঘটনা।

ওরই মধ্যে ফাঁক বুঝে মাধবী গিয়ে এক সময় বসে পড়ল। গরম জলে ভেতে উঠল তার সর্বাঙ্গ।

কাল রাতে ইন্দ্রজিতের নিশ্বাস যেন এই রকম গরম ছিল।

৩

রাজগীরের নাটকের কাজ সেরে তারা নালন্দা ঘরে ফিরেছে মাস-কয়েক হল। নালন্দার যে-ধ্বংসস্তূপ দেখে তারা ফিরেছে, এখন মাধবীর অবস্থা সেই ধ্বংসস্তূপের মত।

প্রায় সব সময়ই সে শুয়ে থাকছে। সব সময়ই তার পাশে বসে থাকছে এলাচ।

আনন্দ পালিত রোডের বাসা ছেড়ে দিয়েছে তারা। এখন তারা এসেছে ষ্টুডিয়ো-পাড়ার কাছে। নাকতলায়।

এ আস্তানাটা একটু নিরিবিলিও বেশ, জমজমাটও তেমনি। শহরের উপকণ্ঠে বসানো এলাকাটি, তাই নিরিবিলি। এখানেই সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাস, তাই জমজমাট।

ইন্দ্রজিৎ তো দেবরাজ। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছেও সে রাজসম্মান পায়। জনপ্রিয়তার দিক থেকে বিচার করতে গেলে তার জুড়ি নেই। এইজন্যে ইন্দ্রজিতের বাড়িতেই আসর জমে বেশি। তাস খেলা, পাশা খেলা, দাবা খেলা—সব এখানে। এককথায়, সব আড্ডা বসে এই ইন্দ্রালয়েই।

ইন্দ্রজিতের নিজের বাড়ি হয়েছে। বাড়িটার নাম দেবার ভার নিয়ে ছিল মাধবীকুঞ্জ; কিন্তু মাধবীর তাতে ঘোর আপত্তি। তাকে চেনেনা-শোনেনা কেউ, তার নাম এতবড় এই বাড়ির ফটকে বসিয়ে দিলে লোকে হাসবে যে: তার চেয়ে অন্য কোনো নাম দিলেই হয়।

অবশেষে বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে নাম দেওয়া হয়েছে। নাম হয়েছে ইন্দ্রালয়।

আসল ইন্দ্রালয় দেখতে কেমন তা চাক্ষুষ দেখেনি কেউ, কিন্তু মর্ত্যের এই ইন্দ্রালয়টির চেহারাও নেহাৎ তুচ্ছ করার মত নয়।

আশুবাবু, হরিবাবু, রাখালবাবু, মণিমালা, কুমকুম সকলেরই নিজের নিজের বাড়ি হয়েছে।

কিন্তু বাড়ি করেনি একজন, সে ললিতা।

"ললিতার সবই অদ্ভুত। অভিনয়ও করে অদ্ভুত ভালো, চেহারাও অদ্ভুত ভালো। খেয়ালও অদ্ভুত রকমের।"

রাখালবাবুর এ মন্তব্যে সায় দিল সকলে। সকলেরই কেমন ইচ্ছে—সেরা নট যে, সে যখন বাড়ি করল; সেরা নটীরও উচিত একটা লাগসই বাড়ি হাঁকানো।

কিন্তু ললিতার ইচ্ছেটা চাপা, এবং ইচ্ছেটা বিপরীত। সে বুঝি বাড়ি চায় না সে চায় ঘর। এই রকমের বাউণ্ডুলে জীবন যাপন করতে করতে সে বুঝি ক্লান্ত হয়েছে। এ ক্লান্তি এক-এক সময় ফুটে ওঠে তার চোখে-মুখে, তার কথায়।

ললিতার মনের এই কথা নিয়ে ইন্দ্রালয়ের তাসের আসর এক-একদিন সরগরম হয়ে ওঠে।

আশুবাবু বললেন, "আমাদের এখন উচিত লতার জন্যে কিছু করা।"

আশুবাবু বুড়ো মানুষ, অভিনেত্রীদের প্রায় প্রত্যেকের তিনি নতুন নামকরণ করেছেন। তাঁর দেওয়া নাম পেয়ে সকলে মজাই পায়। আজ তিনি নতুন একটা নাম উচ্চারণ করলেন। তা শুনে রাখালবাবু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কে?"

"চিনলে না? আমাদের রক্তের টেক্কার কথা বলছি।"

এ কথাতেই বোঝা গেল না, তিনি ঠিক কার কথা বলছেন। তিনি যে কোনো-একজন অভিনেত্রীর বিষয়ে বলছেন, তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল তাঁর কথায়। কিন্তু সেই বিশেষ অভিনেত্রীটি কে, তা স্পষ্ট করে বোঝা গেল না।

হরিবাবু হাসতে লাগলেন। তাঁর স্বভাবই ঐ। যখন তিনি কোনো কথা বুঝতে না পারেন তখনই তিনি অমন অদ্ভুত ভাবে হাসতে আরম্ভ করেন।

হরিবাবুর হাসি দেখে আশুতোষবাবু বুঝি একটু বিরক্তই হলেন। হাতের তাস ফেলে দিয়ে বললেন, "তবু হাসছ? অত না হেসে ব্যাপারটা একটু তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলে ক্ষতি কি?"

"খুলে বললেই তো মিটে যায়!"

আশুবাবু তাকিয়াটায় ঠেস দিয়ে বসে বললেন, "সবই যদি খোলসা করে বলতে হয় তাহলে জগৎ থেকে উঠে যাবে সব কাব্য। একটি বাঁধা কিংবা একটু বাধা না থাকলে রস জমে না হে।"

"বুঝেছি।" রাখালবাবু বললেন, "তাহলে আপনি একটু রসের কথাই বলছেন? কিন্তু কাকে নিয়ে রস, শুনিই-না!"

আশুবাবু একটু নড়ে বসে বললেন, "রসের টীকা বলায় যদি বুঝতে অসুবিধে, তবে অন্যভাবে বলি। হরতনের বিবি।"

হরিবাবু কি করে ধরে ফেললেন এতক্ষণে, বললেন, "বুঝেছি। ললিতার কথা হচ্ছে।"

"ইয়েস।" আশুবাবু বললেন, "তুমি ইডিয়ট হলেও তুমি ইন্‌টেলিজেন্ট।"

আশুবাবুর কথার ধরণই ওই রকম। তাঁর কথায় কেউ রাগ করে না। তিনি কথা দিয়ে সকলকে মাতিয়ে ও তাতিয়ে রাখতে পারেন।

"কিন্তু তার জন্যে কি করতে বলছেন আমাদের। অত বড় একজন আর্টিষ্ট, তার কাছে আমরা তো সব নস্য। তার কড়ে আঙুলের যোগ্য নই আমরা।"

হরিবাবুর কথায় আশুবাবু যেন আশ্চর্য হলেন। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "বলি, জীবনে লেখা-পড়া কিছু করা হয়েছে? না, সারাটা জীবন নাটক করেই কাটানো হল? পড়া হয়েছে সেই গল্প? কি যেন গল্পটা! ঐ যে হে, একটা ক্ষুদে ইঁদুর একটা সিংহের উপকার করেছিল। ছোট হতে পারি আমরা, কিন্তু সিনসিয়ার বলে উপকারও করতে পারি।"

"কিন্তু উপকারটা কি?"

"না থাক।" আশুবাবু যেন প্রসঙ্গ চাপা দিলেন। বললেন, "ওর বাবার সঙ্গেই কথা বলব এ-বিষয়ে। তোমাদের সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করা, হচ্ছে সময়ের অপচয়।"

কথা তিনি আর বললেন না। কিন্তু কথাটা বুঝি চাপাও আর থাকল না। ললিতার জীবনের একটা সঙ্গী জোগাড় করা চাই।

তার বাবাই তার বন্ধু ও সঙ্গী বটে। কিন্তু বাপের বন্ধুত্ব নিয়ে মেয়েদের চলে আর কতদিন। তাদেরও জীবনের চাহিদা আছে, তারাও জীবনটা ধারণ করতে চায়। অভিনয়টাই হয়তো তার জীবন, কিন্তু জীবনটাই কখনোই অভিনয় নয়।

ইস্রাফিলে বসে এ-সব কথা নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক দিন। ইস্রাফিলের কানেও গিয়েছে এ-সব কথা। কিন্তু সে বেশ মার্জিত, পরিচ্ছন্ন, আর পরিপাটি ধরণের মানুষ। অন্যের কথায় কর্ণপাত করার ইচ্ছে তার কম। কানে কোনো কথা গেলেও তা নিয়ে সে আলোচনায় রত হতে ইচ্ছে করে না। তার উপর ললিতা তার জীবনের নায়িকা না হলেও, তার অভিনয়ের নায়িকা। কোনো নায়িকাকে নিয়ে নায়কের আগ্রহ দেখাতে নেই, কৌতূহল প্রকাশ করতে নেই।

কিন্তু মাধবীর এ-রকম কোনো বাধা নেই। ললিতা তার বন্ধু, বন্ধু বলেই তার কৌতূহল বেশি। এবং মেয়েদের সম্বন্ধে মেয়েদের কৌতূহলের মাত্রা সাধারণত বেশিই হয়ে থাকে। তার শরীর সুস্থ তো

হয় নি, বরঞ্চ দিন দিন শরীর ভারী হয়ে উঠছে। আজকাল ইন্দ্রজিতের সঙ্গে সে বেশি বের হতে পারে না। ঘরে নিজেকে বন্দী রাখতে হয় বলে কৌতূহল যেন একটু বেড়েই গিয়েছে।

মাধবী ডাকে, "ওরে এলাচ। শোন্।"

দক্ষিণের বারান্দায় ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে মাধবী। সামনে প্রকাণ্ড উদ্যানে নানা রঙের ও নানা জাতের ফুল ফুটে আছে এই ইন্দ্রালয়ের উদ্যানে। গৃহের যিনি ইন্দ্রানী, তিনি কেমন যেন বিমর্ষ আর বিষণ্ণ।

মাধবী ডাক দেয় আবার, "এলাচ!"

এলাচ কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, "ডাকছিলে?"

"ডাকছিলাম। একটু বোস। একেবারে একা থাকতে ভালো লাগে না।"

এলাচ তার পায়ের কাছে বসল, বলল, "শরীর কেমন লাগছে? একটু হাঁটো দিদিমণি, এই অবস্থায় একটু হাঁটা-চলা করতে হয়।"

"যত ডাক্তার হয়েছিস তুই। নার্স বলে গেল চুপ করে বসে থাকতে, আর তুই বলছিস হেঁটে চলে বেড়াতে।"

"ওরা তো দিদিমণি পুঁথি-পড়া বিদ্যে জাহির করে—"

এলাচ হাসতে লাগল, এ কথার বিশেষ উত্তর দিল না।

মাধবী বলল, "হাসছিস? আমার কষ্ট দেখে তোর বুঝি ফুর্তি হচ্ছে। আমোদ পাচ্ছিস বুঝি?"

"হাঁ দিদিমণি আমোদ হচ্ছে। নুন খোকা হবে, তাকে নিয়ে কত খেলা খেলব ঐ বাগানে। ফুল দিয়ে দিয়ে তাকে সাজাব। আমোদ হবে না?"

এলাচের মুখের দিকে তাকাতে লাগল মাধবী। তার শিরায় শিরায় সত্যিই যেন বইতে আরম্ভ করল আনন্দের বন্যা। আজ সে একেবারে একা বলে তার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তার সমস্তটা সময় জুড়ে থাকবে হয়তো—

এলাচ বলতে লাগল, "আজ একা ঠেকছে। তখন দেখবে অবসরই পাবে না।"

"কিন্তু এলাচ", মাধবী বলল, "জীবনটার এই কি মানে? জীবন তবে বুঝি শেষ হয়ে গেল? বন্দী হয়ে গেলাম তবে? কোনো খ্যাতি হল না, নাম হল না, দুনিয়ার কেউ কোনো পরিচয় জানল না—"

বাধা দিয়ে উঠল এলাচ, বলল, "পরিচয় জানল না আবার কি কথা। তুমি অত বড় মানুষের বৌ—এটা কি একটা কম পরিচয় নাকি। ক'জন মেয়ের ভাগ্যে এমন ঘটে?"

আকাশের দিকে তাকাল মাধবী, নীল আকাশের গায়ে হালকা ওড়নার মত ফিকে মেঘ লেগে আছে। অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছে ঐ পাখিরা। ওরা বুঝি চিল। অনেক উঁচুতে ওরা উঠেছে—কত আনন্দ ওদের। অমনি যদি ওঠা যেত অনেক উচ্চে ডানা মেলে দিয়ে তবে জীবনে আনন্দের সীমা যেন থাকত না।

মাধবী বলল, "ভাবি ললিতার কথা। ওর জীবন কেমন সুখের। কত নাম ওর, কত যশ। ওর ভাগ্য দেখে জানিস এলাচ আমার জীবন হিংসে হয়।"

কথাটা বলেই নিজেকে শুধরে নিল মাধবী, বলল, "ওকে কিন্তু হিংসে করিনে। ওকে ভালোই বাসি। কিন্তু হিংসে হয় ওর ভাগ্যটাকে। কত উঁচুতে ও উঠে গিয়েছে।"

সত্যি, অনেক উঁচুতে সে উঠেছে। প্রত্যহ খবরের কাগজের পাতায় তার ছবি ছাপা হয়। বিভিন্ন ভঙ্গির ললিতা বিভিন্ন চিত্রের নায়িকা রূপে হাজার রকমের কাগজে দেখা দেয়। শহরের রাস্তার দু'পাশের দেয়ালে দেয়ালে ওই মুখের ছাপ। বাংলাদেশের নায়িকা সে, কিন্তু তার ডাক আসছে বাংলার বাইরে থেকেও—বোম্বাই থেকে, মাদ্রাজ থেকে।

পাশের টেপাহাতে অনেকগুলো কাগজ রাখা ছিল। মাধবী একটা কাগজ তুলে নিয়ে সেটা মেলে ধরল। প্রকাণ্ড ছবি, প্রায় একটা পাতা জোড়া—ললিতার মুখ। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রজিৎ।

এর জন্য কোনো রকম হিংসে তার নেই। সে চিনেছে তার স্বামীকে। সে বিশ্বাস করেছে তার স্বামীকে। কেবল স্বামীকে বিশ্বাস করাই নয়, সে বিশ্বাস করেছে ললিতাকেও। এইজন্যে এসব ছবি দেখে তার মনে গ্লানি লাগে না। কিন্তু গ্লানি লাগে তার অন্য কারণে।

ইচ্ছে হয়—ঐ মুখ ললিতার না হয়ে যদি তার হত! উঃ ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়, তাহলে মাধবী হত অনামধন্যা।

এলাচ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "নাম করা বড় কষ্ট দিদিমণি। নাম সহা আরোও কষ্ট।"

"কি বললি তুই এলাচ? কি করে জানলি তুই এসব?"

মাধবী যেন তার দিকে একটু ঝুঁকল, "নাম সহা আরোও কষ্ট—তার মানে?"

"খুব কষ্ট। নামজাদা লোকেরা নিজের খ্যাতির আগুনে দগ্ধাতে থাকে। তার চেয়ে, এই ভালো, বেশ আছি।"

"কি করে জানলি তুই এসব! তোর দাদাবাবুরও তবে বুঝি কষ্ট আছে?"

"আছে। থাকতেই হবে। উনি নিজেও হয়তো জানে না। কিন্তু মনের মধ্যে আঁচ একটা থাকেই। বলোই-না গো, যখন যেখানে খুশি তুমি আর আমি যেমন যেতে পারি, উনি কি পারেন তেমন? নিজেকে এমন নজরবন্দী রাখা, এটা কি কম কষ্ট?"

"এত জানলি কি করে এলাচ?"

"জানি, জানি।" স্তব্ধ হয়ে বসে রইল এলাচ।

স্তব্ধ হয়ে বসল সে। ভাবতে লাগল সে কত কথা! এদের বাড়িতে কাজ নিয়েছে সে আজ অনেক দিন হল। ছায়াছবিতে তখন কাজ শুরু করে নি ইন্দ্রজিৎ, তখন সে কাজ করে যেত। সেই সময় থেকে এলাচ এসে জুটে গিয়েছে তাদের সঙ্গে। রঙ্গমঞ্চের সূত্রেই তার এখানে আগমন। সেই সূত্রেই যদি আগমন, তবে তার কি জানা নেই কিছুই? সে কি তাহলে আসেনি কোনো নটের সংস্পর্শে? নামজাদা নট কি দেখেনি সে কাছে থেকে? সে কি পায়নি তাদের জীবনের কোনোই পরিচয়? আজও এলাচ যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সেই গলার স্বর—"দেখ, এলাচ এক—এক সময় ইচ্ছে করে সবার রাস্তায় একটু পায়চারি করি, একটু পার্কে গিয়ে বসে লোকজন দেখি। বন্ধু বান্ধবদের বাড়িতে গিয়ে কড়া নেড়ে বলি—কেমন আছিস। কিন্তু সব কেমন যেন কল্পনার মত। তার আর উপায় নেই। আমি বেরনো মাত্র লোকের ভিড় জমে যাবে আমাকে ঘিরে। আমি যে কেউ-কেটা নই, আমি যে নামজাদা নট—আমি যে সাধনকুমার।

সেই সাধনকুমারের কথা মনে পড়ে এলাচের। অল্প বয়সে হঠাৎ যদি মারা না যেত তাহলে আজ, কে বলতে পারে, ইন্দ্রজিৎকে হার মানাত কিনা।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল এলাচ। যেসব কথা সে ভুলেই ছিল, আজ কথায় কথায় উঠে পড়ল সেই কথা। কথাটা উঠে পড়ায় পুরনো স্মৃতিকে সে একটু আলিয়ে দিল বটে, কিন্তু এই স্মৃতিমন্থনে একটু যেন কষ্ট আছে। কষ্ট আছে আরও এই জন্যে যে, সেদিনের সেই বিখ্যাত নটী—তাকে নিয়ে যেন অত হৈ চৈ—আজ তাকে কেউ আর মনে রাখেনি।

এলাচ বলল, "মেয়ালির পোকা। এ জীবন বড় পাজি জীবন দিদিমণি।"

"কিসের পোকা বললি?"

"মেয়ালির। সেই আলোর রাতে তাদের মাতামাতি, রাতটি শেষ হলেই পায়ের নীচে পড়ে থাকে গালিচার মত।"

কিছুই বুঝতে পারছে না মাধবী। এলাচ এমন গুরুগম্ভীর ভাবে হঠাৎ এমন তত্ত্বকথা বলতে আরম্ভ করল কেন, এবং এই তত্ত্বকথাগুলোর মানেই-বা কি?

হাতের কাগজটি নামিয়ে রেখে মাধবী জিজ্ঞাসা করল, "তোর হল কি রে, এলাচ? তোরও কি সখ হয়েছে আমারই মত? তুইও কি চাস বিখ্যাত হতে?"

ভীষণ আপত্তি তার, জোরে জোরে সে মাথা নেড়ে বলল, "না, না, না। এই বেশ আছি—কেউ জানে না, কেউ চেনে না। আজ মাথায় তুলে নাচবে, কালই ফেলে দেবে পায়ের তলায়?"

"কে কাকে ফেলবে রে? মেয়ালির পোকা আবার কে?"

এলাচ এবার ব্যাপারটা করে বুঝিয়ে বলল সব কথা। তার আক্ষেপ কিসের তা খুঁটিনাটি করে বলল না, কিন্তু বুঝিয়ে সে বলল তার আক্ষেপের হেতুটা। যে ক'দিন বাঁচব, প্রাণের সুখে বাঁচব, অন্যের তারিফের উপর নির্ভর করে বেঁচে লাভ নেই।

বুঝিয়ে বলল বটে সে, কিন্তু মাধবী তা বুঝতে চাইল না। তার মনে যে লালসা জন্মে উঠেছে, তার হাত থেকে নিজেকে সে মুক্ত করতে পারল না। তার যেন ভয়—এই-যে নবীন আগন্তুক আসছে তাদের ঘরে, সে এসেই তার সমস্ত ভবিষ্যৎটা গ্রাস করে নেবে কিনা।

ললিতার জীবনে কোনো জটিলতা নেই, তার ভবিষ্যৎ গ্রাস করবে এমন কোনো আগন্তুক আসার সম্ভাবনাও তার নেই—সে কেমন মুক্ত, সে কেমন নিশ্চিন্ত।

সে যদি ললিতা হতে পারত!

এই একটি চিন্তায় সে বিভোর। তার বাগানের ফুলগুলির রঙের বাহার দেখাও ঘটে ওঠে না তার। ফুলে মনে ফুল ফুটে ওঠে, ফুলের মনেই ঝরে যায় সেই ফুল। মাধবী নিজেকে ললিতার মত ভাগ্যবতী করে তোলার স্বপ্ন দেখে শুধু।

যথাসময়ে আবির্ভূত হল একটি স্বপ্ন। মানুষের গলায় কেঁদে উঠল সেই শিশু।

এলাচ মাধবীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "চেয়ে দেখ মুখটা। টেনে নাও বুকের কাছে।"

কয়েক মাসের মধ্যে সেই শিশুটি হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে আরম্ভ করেছে বারান্দায়।

বারান্দার সোফাসেটে বসে আছে তিনটি প্রাণী—ইন্দ্রজিৎ মাধবী ও ললিতা। তারা শিশুটির স্বাভাবিক নড়াচড়া দেখে তারই তারিফ করছে কত!

"কি নাম রাখলে শেষ পর্যন্ত?" জিজ্ঞাসা করল ললিতা। বাচ্চাটিকে কুড়িয়ে এনে কোলের মধ্যে আলগোছে চেপে ধরে আদর জানিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলল, "দেবরাজ।"

মাধবী জিজ্ঞাসা করল, "কেমন হয়েছে নাচটা।"

"সুন্দর।" মন্তব্য করল ললিতা, বলল, "ইন্দ্রজিতের মত।"

"মত আবার কি! ইন্দ্রজিৎই।" ইন্দ্রজিৎ বলল, "আমাকে সবাই বলে মুকুটহীন রাজা। অর্থাৎ আমি নটরাজ। কিন্তু আমার এই পুত্র হচ্ছে আসল ইন্দ্রজিৎ—এ দেবরাজ।"

তিনজনে হেসে উঠল একসঙ্গে। ওরই মধ্যে ললিতার হাসিটা দেখাল একটু যেন ম্লান।

থামে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে এলাচ এই তামাসা দেখছে। ঠেসান দিয়ে আছে বটে, কিন্তু সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইশারা পেলেই সে শিশুটিকে নিয়ে নেবে কোলে। এদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে শিশুটি যেন কোনো বিঘ্ন ঘটাতে না পারে সে বিষয়ে এলাচ সতর্ক আছে।

কিন্তু ইশারা আসছে না, ইঙ্গিত পাচ্ছেনা সে। ওরা নিজেদের আলাপ-আলোচনা ভুলে গিয়ে খেলা করছে এই শিশুটিকে নিয়ে। সে খেলার বুঝি বিরাম নেই।

দক্ষিণের খোলা বারান্দার হাওয়া আসছে অফুরন্ত। সেই হাওয়ার মতই অফুরন্ত আনন্দে ওরা লোফালুফি করছে বাচ্চাটিকে নিয়ে।

ইন্দ্রজিৎ উঠে গিয়ে মাধবীকে বলল, "এই নাও তোমার পুত্র। এই দস্যি ছেলেকে আর আমি রাখতে পারব না।"

দু হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কোলে নিতে নিতে মাধবী প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, "দস্যিপণা কখন করল শুনি। ছেলে যেন একা আমার। আয়রে আমার কাছে, আমি তোকে আদর করব।"

ইন্দ্রজিৎ নিজের সোফার দিকে ফিরে যাচ্ছিল, মাধবীর কথা শুনে আবার তার দিকে গেল, বলল, "একা তোমার নয় এ ছেলে। বেশ তবে চলে আয়রে আমার কাছে। আজ আমার স্টুডিয়ো নেই, কোনো কাজও নেই। আজ তুই ও আমি সারাদিন খেলা করব ঐ বাগানে।"

বিরাট এলাকা নিয়ে এই বাড়ি। ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াবার মত যথেষ্ট জায়গা আছে বাড়িতে। কিন্তু ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াবার মত বয়স হয়েছে কিনা, সামর্থ্য আছে কিনা এই শিশুটির সে হিসাব বুঝি এখন অবান্তর। তাই ইন্দ্রজিৎ সারাদিন ধরে বাগানে খেলে বেড়াবার জন্যে তাকে আমন্ত্রণ করছে।

মাধবী নিজের জায়গায় বসেই হাতে তালি বাজিয়ে বলে, "না রে, দেবরাজ। ভুলিস নে ওদের কথায়। আয় রে জাদু পালিয়ে।"

ডল পুতুলের মত দেখতে বাচ্চাটি। কাজল টানা দুটি বড় বড় চোখ মেলে সে তাকাতে লাগল তার মায়ের দিকে। তার দৃষ্টি দেখেই বোঝা গেল যে, বাবার থেকে মাকেই তার বেশি পছন্দ। শুধু তাকানো নয়, মাধবীর হাততালির শব্দ শুনে সে দুহাত বাড়িয়ে দিল তার মায়ের দিকে।

মাধবী উঠে এসে কেড়ে নিল তার বাচ্চাকে, বলল, যাস না রে ওদের কাছে। ওরা মন দিয়ে আদর করতে জানে না, একটু গাল টিপে দিয়েই পালিয়ে যায়। লোক দেখানো আদর ওদের।"

ইন্দ্রজিৎ আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাচ্চাটা কেঁদে উঠে বাধা দিল, বুকের মধ্যে চেপে ধরে সোহাগ জানাতে লাগল মাধবী।

এলাচ এগিয়ে এসে বলল, "দাও।"

"থাক্-না একটু আমার কাছে!" মাধবী বলল' "রাতদিনই তো তোমাদের কাছে থাকে।"

মাধবীর বুকের মধ্যে মুখ লুকাল বাচ্চাটি।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ললিতা, বলল, "চলি।"

"সে কি? হঠাৎ হল কি?" মাধবী যেন চমকে উঠেছে, "হঠাৎ অমন উঠে দাঁড়ালে কেন? বোসো।"

কিন্তু না। কিছুতেই আর বসল না ললিতা। ইন্দ্রজিতের অনুরোধও সে শুনতে চাইল না।

এলাচের দিকে চেয়ে ললিতা বলল, "ড্রাইভারকে বলো তো—গাড়ি আনুক।"

এমন কথা ছিল না। কথা ছিল এ-বেলাটা এখানেই খেকে যাবে, কিন্তু হঠাৎ এই রকম মত বদলের হেতু কি?

সে হেতু জানবার জন্য ইন্দ্রজিৎ আর পিড়াপিড়ি করল না।

পাথরকুচির রাস্তায় উপর চাকার খড়খড় শব্দ বাজিয়ে, বাগানটা পাক খেয়ে, ফটক পার হয়ে চলে গেল ললিতার গাড়ি।

"হল কি?" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল মাধবী।

"কি জানি।" ইন্দ্রজিৎ সোফার মধ্যে ডুবে বসে বলল, "ও ওই রকমই। একটু অদ্ভুতই। রাধাবাবু বলেন-না, যেমন অদ্ভুত ভালো দেখতে, তেমনি অদ্ভুত ভালো অভিনয় করে, স্বভাবটাও তেমনি অদ্ভুত। ওর যা খেয়াল হয় তা ও করেই। আজ পর্যন্ত ওকে দিয়ে কেউ বাড়ি করাতে পারল?"

মাধবী বলল, "তোমাদের লাইনটাই অদ্ভুত।"

একটু থেমে বলল, "এই জন্যেই তোমাদের লাইনের উপর আমার এত টান। আমরাও অদ্ভুত হতে চাই ইচ্ছে। হয়তো ও অদ্ভুত বলেই আমার এত ভাল লাগে ওকে।"

ইন্দ্রজিৎ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল, "ওর জীবনে হয়তো কোনো দুঃখ আছে। চাপা মেয়ে, বলে না। কিন্তু লক্ষ্য করেছি—অভিনয় করতে করতেও মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ওর বাবাটা নিশ্চয় ওকে কষ্ট দেয়। ওর বাবার নাম নরহরি, কিন্তু নরত্ব নেই এতটুকু। আসলে একটা পশু!"

"কি রকম?" মাধবী এমন তার্ত গলায় বলল, যেন আঁচ করেছে ভীষণ কথা।

ইন্দ্রজিৎ বলল, "মেয়েকে ভালোবাসে না, ভালোবাসে মেয়ের টাকা। সব নিয়ে নেয়, সব রেখে দেয় নিজের নামে। লোকটা সত্যিই পশু।"

৪

দেবরাজ বড় হয়ে উঠেছে। এখন সে একা-একাই ছুটোছুটি করে ঘুরে বেড়াতে পারে সারা বারান্দায়, সারা লনে, সারা বাগানে। দারোয়ানকে বলা আছে—গেট পার হয়ে রাস্তায় না চলে যায় সেদিকে নজর রাখতে।

এলাচেরও নজর আছে পুরোপুরি। দেবরাজ কখন কোন্ দিকে পালিয়ে যায় তা সে সব সময় সতর্ক প্রহরীর মত দেখে।

দেবরাজ বড় হয়েছে। ইতিমধ্যে ইন্দ্রজিৎও বড় হয়েছে আগের চেয়ে অনেক। আগের চেয়ে আরো বেশি নাম হয়েছে তার, তার ও ললিতার।

তাদের এই ছুটি ভাঙার জন্যে চেষ্টাও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। নতুন নতুন নায়ক ধরে নিয়ে এসে তাকে রীতিমত কঠিন ভূমিকায় অভিনয় করানো হচ্ছে। নতুন নায়িকাও আনা হচ্ছে।

কিন্তু প্রতিপক্ষের এই চেষ্টায় এদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। জনসাধারণের কাছে এই দুটির দাম অনেক। যে ছবিতে এরা নেই, সে ছবির তেমন কদর হচ্ছে না কিছুতে।

নতুন নায়িকারা উপনায়িকা হয়ে যাচ্ছে, নতুন নায়কদের অনেকেই হয়ে যাচ্ছে সেনাধ্যক্ষ—অর্থাৎ তাদের আর কোনো চাহিদা থাকছে না।

আশ্চর্য এদের কৃতিত্ব। আশ্চর্যভাবে এরা জাদু করেছে জনসাধারণকে।

ওদের সাম্প্রতিক ছবির নাম—মহীয়সী। এই ছবিটী সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ছবির কাহিনীটী তেমন জোরালো না, কিন্তু এদের অভিনয়ের জোরে তা বেশ জোরদার হয়েছে। দু-জনেই অভিনয় করেছে ডবল ভূমিকায়—অর্থাৎ চার জন অভিনেতার কাজ করেছে তারা দুজনে। দুইজনেই অভিনয় করেছে বিপরীত চরিত্রে। ইন্দ্রজিৎ অভিনয় করেছে একটি উচ্ছৃঙ্খল যুবকের ভূমিকায় এবং একটি সাদাসিধে নম্রযুবকের ভূমিকায়; ললিতা অভিনয় করেছে একটি উন্মাদিনী তরুণীর একটি শিক্ষিতা সচ্চরিত্রা যুবতীর ভূমিকায়।

উচ্ছৃঙ্খল যুবকটীর জন্যে মেয়েটি পাগল হয়েছে, সাদাসিধে নম্র ছেলেটি করুণাপরবশ হয়ে তাকে নিয়ে গেলেন আরোগ্যশালায়, তার প্রণয়িনী যুবতীটি একাজে তার সহযোগিতা করল। কিন্তু অবশেষে, নাটকে যা ঘটে থাকে, সেই ভদ্রলোক প্রণয়াশক্ত হলেন পাগলিনীর—সে এখন রোগমুক্ত। এর পরে সুস্থ ও শিক্ষিতা যুবতীটির মধ্যে বিকৃতি দেখা দিল। আরোগ্যশালা থেকে যখন ওরা বেরিয়ে আসছে তখন নতুন রুগী ঢুকছে সেখানে, ফটকে এক মুহূর্ত মাত্র চোখাচোখি হল। ওরা যখন ষ্টেশনে এসে উপস্থিত, দেখে উস্কখুস্ক চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে সেই উচ্ছৃঙ্খল যুবক। দুই যুবক দুজনের মুখের দিকে তাকাল, কে কাকে ভর্ৎসনা করবে বুঝতে পারল না। উৎকণ্ঠভাবে অট্টহাস্য করে উঠল উচ্ছৃঙ্খল যুবকটি।

নাটকটি খুব বিকোচ্ছে। এর হিন্দি আর তামিল সংস্করণের জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে প্রযোজকরা।

তা পরে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে, এরা ভারতের সেরা নটনটী। এই ছবিতে এদের সংবর্ধনার অন্ত নেই। ঘরে ঘরে এদের নিয়ে আলোচনা—আশ্চর্য করে দিয়েছে ললিতা, পাগলিনীর বেশে তার চোখের চাউনি কেমন অস্বাভাবিক করে তুলেছিল তোলা যায় না। আর ইন্দ্রজিৎ? লাস্ট সিনে উচ্ছৃঙ্খল যুবকের বেশে অট্টহাস্য করে উঠল—বুকের ভিতরটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল। ঐ হাসি দিয়েই কেমন চমৎকার ভাবে বুঝিয়ে দিল যে, আমাকে বলছ উচ্ছৃঙ্খল কিন্তু তোমার জীবনে শৃঙ্খলা কোথায়, তুমি ভুলে গেলে নিজের প্রণয়িনীকে, তোমার উপেক্ষায় সে উন্মাদ হয়ে গেল, তবু আমি একাই বুঝি উচ্ছৃঙ্খল?

না, এ হচ্ছে মাণিকজোড়। এদের না হলে কোনো নাটক জমবে না, কোনো ছবি

গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে মাধবীর। তার স্বামীর এই কৃতিত্বে তার আনন্দের সীমা নেই ললিতার কৃতিত্বের জন্যেও তার আনন্দ আছে। কিন্তু সেই আনন্দের মাঝে একটু যেন বিষাদ।

কাল রাত্রে ওদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে টাউন-হলে। শহরের সাচ্চা মানুষরা জমায়েত হয়েছিলেন সেখানে।

মঞ্চের উপরে পাশাপাশি বসেছিল ওরা দুজন—ইন্দ্রজিৎ আর ললিতা! তাদের সম্বন্ধে বিস্তর প্রশংসার কথা বলা হল, তারা বাংলাদেশের মুখোজ্জ্বল করেছে বলেও অনেক বক্তা বক্তৃতা দিলেন। তাদের দুজনের গলায় মালা অর্পণ করা হল। দুজনের হাতে সোনার কাজ-করা দুটি রূপোর ফুলদানি দেওয়া হল। অপর্যাপ্ত আলোর মধ্যে বসে তারা প্রশস্তি পাচ্ছে পুরস্কার পাচ্ছে।

মাধবী বসে আছে কয়েক ফুট নীচে সামনেরই একটি চেয়ারে। সে বসে বসে ধিক্কার দিচ্ছে তার ভাগ্যকে। সে কে? কেন সে এসেছে এই সংসারে। তার মুখের উপর আলাদা একটা আলো ফেলে কেউ তো দেখছে না তাকে। বড় নগণ্য আর বড় সামান্য বলে মনে হচ্ছে নিজেকে। একটি নোনুপ দৃষ্টি মেলে বসে আছে মাধবী।

চুপ করে বসে আছে মাধবী। অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে গিয়েছে। তার যেন কোনো উৎসাহও নেই উদ্দীপনাও নেই।

হঠাৎ শাড়ির খসখস শব্দ হল তার পায়ের কাছে। সে তাকাল। একজন মহিলা—দেখে বেশ সম্ভ্রান্ত বলেই মনে হল—অপরূপ মার্জিত সাজে সজ্জিত, মাধবীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, "আপনি একটু আসুন।"

"কোথায়?"

"একটু উপরে। ঐ মঞ্চে।"

ভীষণ আশ্চর্য ঠেকল মাধবীর, ভদ্রমহিলার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে সে বলল "ওখানে আমি কেন?"

"আপত্তি করবেন না আসুন।"

"আমি কে, চেনেন তো? ভুল করেননি তো?" মাধবী বিব্রত চোখে তাঁর দিকে চেয়ে বলল।

আরও কয়েকজন মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন ইতিমধ্যে, তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, "ভুলই করেছি আমরা। অনেক আগেই আপনাকে নিয়ে যাওয়া আমাদের উচিত ছিল। আপনি তো ইন্দ্রজিৎবাবুর স্ত্রী।"

মঞ্চে ইন্দ্রজিতের দিকে একবার তাকাল সে। তারপর উঠে তাঁদের সঙ্গে চলল।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করার মত করে সভাপতি মহাশয় বললেন, "আপনাদের সম্মুখে এখনই উপস্থিত হচ্ছেন এক মহীয়সী মহিলা। ইন্দ্রজিৎবাবুর স্ত্রী" পাশের একজনের কাছ থেকে নাম জেনে নিয়ে বললেন, "শ্রীমতী মাধবী গুপ্তা—মাধবী দেবী। ওই উনি এসেছেন।"

হাততালিতে কেটে পড়ল হল। করযোড়ে নমস্কার করল সকলকে মাধবী। সারা হলে গুঞ্জন আরম্ভ হল। তাকে ভালো করে দেখার জন্যে পিছনের দিকের সকলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

সভাপতি মহাশয় বললেন, "ইনি আমাদের সকলের নমস্য। পুরুষের পিছনে প্রেরণা থাকে প্রকৃতির। ইনি সেই প্রকৃতি। ইনি আর্টিস্টের বধূ। আর্টিস্টের বধূ হওয়া বড় কঠিন জিনিস। অনেক সহ্য করতে হয় তাকে। অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করেন আপনারা। ভালো অভিনয় করার জন্যে আজ আমরা ইন্দ্রজিৎকে আমাদের সাধ্য অনুসারে পুরস্কৃত করেছি কিন্তু তিনি যে এমন ভালো বধূ লাভ করেছেন তার জন্যে পুরস্কার নয়, তার জন্যে তিনি আমাদের অভিনন্দন নিন।

আবার বেজে উঠল হাততালি। সংকোচে মাথা কাটা যাচ্ছে মাধবীর। মাথা নীচু করে সে বসে আছে, অনেকটা যেন নববধূর মত।

হাততালি থামলে সভাপতি মহাশয় আবার বললেন, "এঁকে আমরা পুরস্কার দিতে পারিনে। ইনি আমাদের প্রীতি গ্রহণ করুন, এবং—এবং আমাদের প্রণাম।"

ওরা যখন দল ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে তিনজনে কয়েকটি ছেলে আর মেয়ে ছুটে এসে

অটোগ্রাফ চাইল ইন্দ্রজিতের। অটোগ্রাফ চাইল ললিতার, আর আশ্চর্য, তারা মাধবীর কাছে কিছুই চাইল না, কেবল তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

গাড়িতে বসে ললিতা বলল, "ভাগ্যবতী।"

"কার কথা বলছ?" জিজ্ঞাসা করল মাধবী।

ললিতা বলল, "আমার কথা না। আমরা অভিনেত্রী, আমরা নাম পাই, মান পাইনে।"

অনেক দিন আগে ঠিক এই কথাই বলেছিল ললিতা, মনে পড়ল মাধবীর। আজ বুঝি হাতে নাতেই তার প্রমাণ দিয়েছে। এই জন্যেই আজ আবার সে বলল ঐ কথা।

আর কেউ কোনো কথা বলল না। শহরের সকলকে পিছের রাস্তায় ছায়া ফেলতে ফেলতে ছুটে চলল তার গাড়িটি।

জীবনে একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে মাধবী। যারা তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে তাদের সে মনে মনে আশীর্বাদ করছে। এ জন্যে গর্বও বোধ করছে সে। তবু আশ্চর্য, তার কেবলই যেন মনে হচ্ছে ললিতাই ভাগ্যবতী।

ফাঁক পেলেই ললিতা আসে। বারান্দায় বসে গল্প করে। কাঠের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘোরাফেরা দামালপনা করে ওধারে। টাল রাখতে না পেরে যাতে না পড়ে যায় এইজন্য এলাচ ঘোড়ার লেজ ধরে থাকে শক্ত হাতে।

ললিতা তাকায় চারধারে, বলে, "বেশ। বেশ আনন্দ লাগে তোমাদের দেখে। বেশ সুখের সংসার গড়ে তুলেছ ধীরে ধীরে"।

মাধবী বলে ওঠে, "হ্যাঁ। সুখ তো কত। যতক্ষণ ঘেমে থাকে ও, ততক্ষণ সকলকে ভটস্থ থাকতে হয়। একটু কি শান্তিতে থাকতে দিতে চায় ভেবেছ? তুমি বেশ আছ ভাই, বেশ ঝাড়াঝাপটা। কেমন নিশ্চিন্ত জীবন তোমার একবার ভেবে দেখ তো!"

ললিতা বলল, "ঠিকই বলেছ। একটু বাড়াবাড়ি রকমের নিশ্চিন্ত। তাই তো সময় পেলেই ছুটে আসি।"

"কিন্তু আমার অবস্থা দেখ। ওর জন্যে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। ভাগ্যিস একটু ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই এলাচের জিম্মায় রেখে সেদিন যেতে পেরেছিলাম টাউন হলে।"

ললিতা বলল, "গিয়ে ভালো করেছ। কত প্রণাম তোমার জন্যে জমে ছিল ভাব তো!"

একটু থেমে বলল, "তুমি পেলে প্রণাম, আমি পেলাম কুলদানি। বাজারে অবশ্য কুলদানিটারই দাম বেশি।"

একটা নিশ্বাস ফেলল ললিতা। আর কোনো কথা বলল না।

একটু পরে বলল, "জীবনটাকে বদলে নিতে হবে।"

মাধবী হাসতে হাসতে তার হাত চেপে ধরে বলল, "আমার সঙ্গে বদলা-বদলি করবে ভাই? আমার বড় ইচ্ছে খুব নাম করি। আমাকে সেদিন ওরা বলল মহীয়সী মহিলা। কিন্তু তুমি ঐ ছবিটায় যে মহীয়সীর চরিত্রটি ফুটিয়েছি, তার কাছে আমি কোন্ ছার।"

এ কথার উত্তর বুঝি খুঁজে পেলনা ললিতা। কেবল ভাবতে লাগল মাধবীর কথা। ভাবতে লাগল মাধবীটা কেমন সরল। একটা ছায়ার জীবনের উপর তার কেমন আশ্চর্য মায়া। ভাগ্যিস, সত্যিসত্যি

এমনজীবনের স্বাদ পাওয়ার সুযোগ তার ঘটেনি, তাহলে বুঝতে পারত—এ জীবন কতটা আনন্দি কতটা বিস্বাদ।

ললিতা বলল, "বদলাবদলি না। তোমার ভাগ্যটা কেড়ে নিতে চাইনে। নিজের ভাগ্যটা বদলে নিতে চাই। চেষ্টা করব!"

"আমিও তবে বদল করব আ　　মাধবী বলল, "আচ্ছা ললিতা, অভিনয়টা কি খুব কঠিন জিনিস? আমি পারব না চেষ্টা করলে?"

"পেরে কাজ নেই। কঠিন হয়তো তত নয়, কিন্তু ভীষণ বিশ্রী ভীষণ ওয়ংকর।"

উঠে গিয়ে ললিতা বেবরাজের গালে একটু টোকা দিয়ে আদর জানিয়ে মাধবীর দিকে চেয়ে বলল, "চলি। তোমার কর্তার নিশ্চয় ফিরতে আজ দেরি আছে। ছুটো সেটুএ আজ তাঁর কাজ।"

ললিতা চলে যাবার পর এলাচ মাধবীর কাছে এসে দাঁড়াল, বলল, "বড় ভালো মেয়ে। অহংকার নেই। অত ভালো হওয়া ভালো না। লোকে মানে না। লোকে শোষণই করে। যেমন করছে ওর বাপটা। মেয়ের ভবিষ্যৎটা ভাবতে হয়।"

কথা শুনে অবাক হয়ে গেল মাধবী, বলল, "ওর আবার ভবিষ্যৎ কি রে। ওর ভবিষ্যৎ তো দারুণ উজ্জ্বল। ওর আর ভাবনা কি!"

এলাচ বলল, "যাস। ওদের সখী লাগে না? সহায় লাগে না? স্বামী লাগে না? ওর ইচ্ছে করে না—তোমার মত একটা খোকা হোক!"

মাধবী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "এসব ইচ্ছে ওদের নেই।"

এলাচ বুঝি একটু বিরক্ত হল, কিন্তু তা চেপে রেখে বলল, "তুমি তাচ্ছিল্য করতে পারলে ও অভিনয় করে বলে। তুমিও ওকে মান দিতে পারলে না দিদিমণি। তবে, নিজে কেন ঐ তুচ্ছ কাজের জন্যে লোভ কর।"

"ওতে যে অনেক নাম রে।"

এলাচ বলল, "নাম আছে, কিন্তু প্রণাম নেই দিদিমণি।"

কথাটার মধ্যে একটু বুঝি ঝাঁজ ছিল, একটু বুঝি ঝাল ছিল। তার মুখের দিকে চেয়ে মাধবী বলল, "প্রণাম পেয়েছিলাম, শুনেছিস বুঝি? কিন্তু তার দাম কি রে?"

"তার দাম নেই? সম্মানের যদি না থাকে তবে কিসে তুমি দাম খুঁজবে দিদিমণি।"

"এলাচ!" মাধবী বলল, "তোর কথায় যেন একটু ঝাল আছে। তোমাকে তবে আর এলাচ বলে ডাকব না।"

"কি বলবে তবে দিদিমণি?"

"দারচিনি।" মাধবী বলল, "ললিতা যেমন তার জীবন বদল করতে চায়, আমি তেমনি তোর নাম বদল করে দিতে চাই। তোর কথাগুলি সত্যিই দারচিনির মত। মিষ্টি করে বলছিস, কিন্তু একটু ঝাঁঝও দিচ্ছিস। আমি যদি নাম ভালোবাসি, তাতে তোর এত আপত্তি কেন?"

আপত্তি কেন হবে। আর, আমার আপত্তি শুনবেই-বা কেন। তুমি ঘরের বৌ, তোমার কত সম্মান বুঝতে পারছ না। ঐ সম্মান চায় বলেই ললিতা বদল করতে চায় জীবন। বুঝলেন না তার কথায়?"

বক্র জবাব দিল মাধবী, বলল, "তোর মত বুদ্ধি যদি থাকত তা নেহাতই যে বোকা আমি, তাই তোর মত মানুষও আমাকে উপদেশ দেয়।"

এলাচ আর কথা বলল না, ঘোড়ার পিঠ থেকে বেবরোককে তুলে নিয়ে বাগানে নেমে গেল।

৫

যা কেউ কখনো ভাবেনি অকস্মাৎ তাই বুঝি ঘটতে চলল। এ-ব্যাপারে মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে নরহরিবাবুর। তাঁর আদরের কন্যা বুঁচি—তার এমন দুর্মতি হবে, এ যে ভাবাই যায় না।

বুঁচি নাকি তার বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে যে, সে তার জীবন বদল করতে চায়। কথাটার মানে প্রথমে বোঝা যায় নি। মনে হয়েছিল, একই নায়কের সঙ্গে অভিনয় করে করে সে বুঝি ক্লান্ত, সেইজন্যে সে বুঝি নায়ক বদল করতে চায়।

প্রথমে বোঝা যায় নি, কিন্তু যখন বোঝা গেল তখন দেখা গেল কথাটা ঠিকই। নায়কই বদল করতে চায় সে। সে চায় জীবনে একটি নায়ক বেছে নিতে।

নরহরি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, "ব্যাপার কি? আমার মেয়ে হয়ে তোমার এতটা অবনতি ঘটল কি করে ভাবতে পারি নে বুঁচি। তোর মা মরার পর থেকে তোকে মানুষ করলাম কত কষ্টে। কত কষ্ট করে তোকে আমি এমন বড় করে তুললাম। নিজের সব সুখ আমি ছেড়েছি তোর জন্যে।"

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে খোঁপা ঠিক করছিল ললিতা, আয়নার দিকে চেয়েই সে বলল, "কি কি সুখ ছাড়লে শুনি?"

পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন বয়স্ক নরহরিবাবু, বললেন "চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে? বাপের সঙ্গে কথা বলছ—এটা মনে রেখ। যেন অ্যাক্টিং করা হচ্ছে—কি কি সুখ ছাড়লে শুনি। লজ্জা করেনা ও ভাবে কথা বলতে?"

উঠে দাঁড়াল ললিতা, বলল, "না বাবা, লজ্জা আর করছে না। আর পারছিনে অ্যাক্টিং করতে। এবার সাধারণ জীবন চাই—কথাটা অনেক আগেই বলতাম, কিন্তু পারিনি লজ্জার জন্যে। কিন্তু লজ্জা আর করছেনা বাবা। আমি ছুটি চাই।"

বজ্রাঘাত হয়েছে নরহরিবাবুর মাথায়। জীবনের সমস্ত সুখ তিনি ছেড়েছেন। নিজের জীবনের উন্নতির জন্যে এতটুকু চেষ্টা তিনি করেননি নাকি, করার সুযোগ নাকি পাননি। কিসে মেয়ের উন্নতি হয়, কিসে মেয়ে পাঁচজনের একজন হয়—এই চেষ্টাতেই তাঁর দিন গিয়েছে। সেই মেয়ে এমন বেইমানি করবে, তিনি কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি।

তুলর উপরে আলগোছে আঙুল বুলাতে বুলাতে ললিতা বলল, "স্বপ্নের কথা বোলো না। আমিই কি কখনো স্বপ্নে ভাবতে পেরেছি যে, আমার বাবা আমাকে দিয়ে টাকা রোজগার করিয়ে নিয়ে বড়লোক হতে চায়। তুমিতো বাবা, এখন মস্ত ধনী, তোমার জীবনের বাকিটুকু এখন হেসেখেলে চলে যাবে। আমাকে ছুটি দাও এবার।"

হুঁ। মারাত্মক কথা বলে ফেলেছে মেয়েটা। ভয়ংকর সত্যি কথা বলে ফেলেছে। এর উত্তর খুঁজে যেন হঠাৎ পেলেন না নরহরিবাবু। তাই চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। বুঝতো বুঝলেন, মেয়ের কাছে ধরা যখন পড়ে গিয়েছেন তখন আর ঐ কথা নিয়ে আলোচনায় লাভ নেই।

ঠাণ্ডা গলায়, মেয়ের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুই কি সত্যিই পাকা করে ফেলেছিস তোর প্ল্যান ?"

"হ্যাঁ।"

একটু হাসলেন নরহরিবাবু, বলল, "বা, বেশ তো গল্পটা। কি সেন্ট মেখেছিস রে ?"

বাবার কথা শুনে ললিতাও একটু হাসল। সত্যি, বড় মজার মানুষ। মানুষকে তোয়াজ করে চলে অদ্ভুত স্বভাব বানিয়েছেন যা-হোক।

ললিতা বলল, "নতুন কিছু না। যা রোজ মাখি তাই। আজ বোধ হয় গন্ধটা একটু মিষ্টি লাগছে।"

"কেন রে, কেন রে ? এত মিষ্টি লাগছে কেন বল্ তো !"

"একটা শুভসংবাদ পেয়েছ যে আমার কাছে !" বাবার কথার যেন ঠিক প্রতিধ্বনির মত করে সে বলল।

শুভসংবাদ বলছে একে ললিতা ! যে-সংবাদে তাঁর মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে তাকে কিনা ও বলছে শুভসংবাদ !

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কৌচের মধ্যে ডুবে বসলেন নরহরিবাবু। মেয়েকে ডাকলেন কাছে, পাশে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

ললিতা বসল।

নরহরিবাবু বললেন, "তোর মা যখন মারা গেলেন, তোর বয়স তখন দশ। তখন আমার বিয়ের বয়স ছিল। কিন্তু বিয়ে আর করিনি। বুঝেছি, বিয়েতে লাভ নেই। এই জন্যেই বলছি—মত বদলে নে। বিয়ে করে কী হবে। এখন আছিস বেশ স্বাধীন, তখন জুটবে একজন মনিব। অকারণে মাতব্বরি করবে। তার-চেয়ে, তোর এই জীবন কি সুখের না ?"

ঠোঁট ওল্টানোর মত করে সামান্য একটু ঠোঁট নেড়ে ললিতা বলল, "বুঝতে পারছি নে। মাত্র একরকম জীবন জানি—দু রকম না দেখলে কোন্‌টা সুখ বুঝব কি করে বল !"

"অভিনয় তবে ছেড়ে দিবি ?"

"ঠিক করিনি। কিন্তু কিছুদিনের জন্যে নিশ্চয় ছাড়ব।"

স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে নরহরি হঠাৎ যেন ফুঁসে উঠলেন, বললেন, "নিষ্ঠুর ! এমন একটা ত্রুটি, তা ভেঙে দিতে এতটুকু মায়া হবে না ?

"মায়া ?" ললিতা বলল, "ত্রুটির উপর তোমার যতটা মায়া তার এক কণা যদি থাকত তোমার মেয়ের উপর ?"

"অর্থাৎ ? বলতে চাও কি, আমার মায়া-মমতা নেই। আমি নিষ্ঠুর।"

ললিতা বলল, "ও কথা উচ্চারণ করিনি আমি। কেন চীৎকার করছ অকারণে ?"

নরহরি রেগে গিয়েছেন, বললেন, "শুনতে পারি কি, সে হতভাগাটি কে ?

"ওকি বাবা ! ওভাবে কথা বলছ কেন ? ভুলে গিয়েছ বুঝি, তুমি তোমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলছ ? থাক্, এ নিয়ে আমরা আর আলোচনা না করলাম।"

"আলোচনা আর করব না ! কিন্তু আমাকে জানতে হবে কে সেই ছোকরা। তার নাম কি, পরিচয় কি !"

"বলব না। বলব না। বলব না।"

নরহরিবাবু উঠে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ঘর থেকে তাঁর বেরিয়ে যাবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কথাটা চালু হয়ে গেল সর্বত্র। চালু হয়ে গেল—কুমারী ললিতার বিবাহ। এবং, সেইসঙ্গে এ-কথাও রটে গেল যে, চিরদিনের মত সে বিদায় নিচ্ছে অভিনয় থেকে।

খুব বেগে একটা মোটরগাড়ি এসে ঢুকল ইন্দ্রালয়ের ফটক ভেদ করে।

বারান্দায় বসে ছিল মাধবী ও ইন্দ্রজিৎ। দেবরাজকে নিয়ে বারান্দার অপরপ্রান্তে বসে আছে এলাচ।

গাড়ীটা দেখে ইন্দ্রজিৎ মাথা তুলে তাকাল। ঘড়ঘড় শব্দ করতে করতে বাগানটা পাক খেয়ে গাড়িটা এসে দাঁড়াল সিঁড়ির গায়ে।

ভবানীভূষণ এসেছে।

"হ্যাল্লো, কি খবর?"

"স্যাড স্যাড স্যাড।" বলতে বলতে ধাপে ধাপে উঠে এল ভবানীভূষণ, বারান্দায় উঠে এসে বলল, "ভেরি স্যাড নিউজ।"

ভবানীভূষণ বসল। বসে সে বিবৃত করল সব কথা। বিবৃত করল ললিতার জীবনের গ্লানি। ললিতার বাবা তাঁর মেয়ের সংকল্পের কথা সর্বত্র বলে বেড়াচ্ছেন। ভবানীভূষণ জেনে নিয়েছে—গ্লানিটা সত্যিই পাকা।

মাধবী আর ইন্দ্রজিৎ যেন শুনছে না, যেন গিলছে কথাগুলো। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত লাগছে সব কথা। কিন্তু হঠাৎ এমন হল কেন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

দেবরাজকে কোলে নিয়ে নাকে কাপড় দিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে এলাচ। এলাচের ঐ ধরণ, কখনো কোনো উৎকণ্ঠা উপস্থিত হলে সে নাকে কাপড় দেয়।

মাধবী বলল, "সেই ভদ্রলোকটি কে? কে সেই ভাগ্যবানটি! আশ্চর্য চাপা মেয়ে যা-হোক আমার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব, আমাকেও বলেনি কোনদিন। কিন্তু তলে-তলে সব পাকা করে ফেলেছে।"

মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে ইন্দ্রজিৎও বলল, "সত্যি, কে সে?"

"জানার বড় কৌতূহল হচ্ছে।" বলল ভবানীভূষণ।

কিন্তু কৌতূহলটাই তার বড় কথা নয়, এখন, এমন নায়িকা আর জুটবে কোথায়—এইটেই আসল সমস্যা। একটা ছুটি জোড়া লেগে গেলে—

মাঝখান থেকে মাধবী বলল, "অত ভাবনা কিসের আপনাদের? একটা নায়িকা গেলে আর কাউকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না? তা কি কখনো হয়! তার জন্যে আমার কিন্তু ভাবনা হয় না। আমার ভাবনা অন্য—ললিতার জীবনের নায়ক কে।"

ভবানীভূষণ বলল, "সে ভাবনা তো সকলেরই। কিন্তু সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা নিয়ে তাই ভাবছিনে। আমরা এখন নতুন ছবিটায় কাজ করব, তার জায়গায় নেব কাকে, পাব কাকে—তাই ভাবছি।"

মাধবীর শরীর যেন একটু রোমাঞ্চিত, একটু কণ্টকিত হয়ে উঠল। যেন পুলকের প্লাবন খেলে গেল তার শিরার রক্তে। উঠে দাঁড়াল সে, ইন্দ্রজিতের মুখের দিকে না চেয়ে, গায়ের আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, "দেখুন তো, ভবানীবাবু, পদ্মশ্রী হয় কিনা। আমি হব নায়িকা। পারব, পারব, পারব। ললিতার থেকে খারাপ করব না।"

মাধবীর কথা শুনে ইন্দ্রজিৎ একটু হাসল। সে বুঝি ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্বই দিল না।

কিন্তু গুরুত্ব দিল এলাচ। কেননা সে জানে তার দিদিমণির মনের কথাটা।

ভবানীভূষণ মাধবীর সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েছে, কিছু একটা মন্তব্য করার তার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বলতে গিয়েই, থেমে গিয়ে সিগারেট ধরাল।

এলাচের সাহস আজকাল বেড়েছে। সে দু-এক পা করে কাছে এসে গিয়েছে, বলল, "ও দিদিমণি গো, এ কি কথা গো। তুমি ঘরের বধূ! ওসব চিন্তা ছাড়।"

ভবানীভূষণ মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে আশ্চর্য চোখে তাকাল এলাচের দিকে, বলল, "বাব্বা, কথা জানে তো!

মাধবী ধমক দিল এলাচকে, বলল, "এসব কথায় তুমি এস না এলাচ, সরে যাও।"

এলাচ চলে গেল।

ভবানী বলল, "কথাটা বলেছে কিন্তু বেশ। কথার ভিতরে একটু ব্যাঁজ আছে।"

ইন্দ্রজিৎ বলল, "আছে। এইজন্যে মাধবী ওর একটা নাম দিয়েছে।"

"কি?"

"ধারচিনি।"

সকলে একসঙ্গে উচ্চহাস্য করে উঠল।

আর্মেনিয়ার যুবরাজ টাইগ্রেনস বন্দী হয়েছেন সাইরাসের হাতে। তাঁর প্রিয়তমা পত্নীও বন্দিনী।

পরে তাঁরা মুক্তি পেলেন।

কৃতজ্ঞ টাইগ্রেনস স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, সাইরাসকে তোমার কি মনে হয়? তাঁর মহত্ত্ব আছে, তাই না আমরা মুক্তি পেলাম।

—সত্য বলতে কি, রমণী উত্তর করলেন, সাইরাস কি প্রকৃতির লোক তা আমি জানি না কেননা আমি তার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিনি।

—তাহলে তুমি সর্বক্ষণ কার দিকে তাকিয়েছিলে? টাইগ্রেনস উৎসুক হয়ে উঠলেন।

—আমি সর্বদাই চেয়েছিলাম আমার স্বামীর দিকে যিনি আমার মুক্তি মূল্য হিসাবে আপন প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন সাইরাসের কাছে।

একজন আর কয়েকজন

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

প্রখ্যাত সাহিত্যিক বনফুলের আমন্ত্রণে ভাগলপুরে রওনা হলাম আমরা। ভাগলপুর সাহিত্য পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। উপেন্দ্রনাথ তার প্রাণ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন।

সভাপতি উপেন্দ্রনাথকে ঘিরে মজলিশ বসেছে বনফুল আবাসে।

ভাগলপুরের একটি রমণীয় সন্ধ্যা। নানা আলাপ-আলোচনার মাঝে ভগবৎ বিশ্বাসের প্রসঙ্গ উঠলো। ভাব-রহস্যের অনেক চমকপ্রদ গল্প চলছিল।

নিজ অভিজ্ঞতা প্রসূত চাঁপাফুলের এক অলৌকিক কাহিনী শোনালেন সুপ্রসিদ্ধ কাহিনীকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্তরনিহিত আগ্রহে তারাশঙ্করদা কেমন করে ভগবৎ সেবার অসময়ে চাঁপাফুল পেয়েছিলেন তার মনোমুগ্ধকর কাহিনী শুনলে অতি নাস্তিকের মনেও ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদ সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মায়।

উপেন্দ্রনাথও বললেন সেই সাধুর কাহিনী। পূর্ণিয়ার প্রসিদ্ধ উকীল ঈশ্বর পরায়ণ তেওয়ারীজী। এক অলৌকিক সাধুর দর্শন পেয়েছিলেন তেওয়ারীজী—যাঁর আহার দু'মাসে মাত্র তিন আঙুলে তোলা অল্প একটু বেলের পাঁস। যিনি একবেলায় পদব্রজে পূর্ণিয়া থেকে প্রয়াগে যেতে পারেন। সেই বৈঠকে এই অলৌকিক কাহিনীকে লিপিবদ্ধ করেছেন উপেন্দ্রনাথ।

অলৌকিক বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিক সত্যে তবু যাচাই করে দেখেন উপেন্দ্রনাথ। বলেন, বিশ্বাসকে অন্ধ হয়ে মেনে নিও না। যুক্তিকে দেখো।

এই যুক্তিকে তিনি বার বার দেখেছেন—যাচাই করেছেন। তাঁর সাহিত্য যুক্তির সাহিত্য।

'অভিজ্ঞানে'র সন্ধ্যা যুক্তির খাতিরেই শেষ পর্যন্ত মিলনান্ত কমেডিতে পরিণত হতে পারলো না। আর পারলো না বলেই বাঙলা উপন্যাস সাহিত্যে 'অভিজ্ঞান' একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

আধ্যাত্মিক জীবনে বিশ্বাস তাঁর সদা জাগ্রত। তাই তেওয়ারীজীর কাহিনীকে তিনি সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও আছে। সে প্রশ্নকে যাচাই করতে গিয়ে যোগবলকে তিনি টেলিপ্যাথি বলেছেন। 'Star to star vibrates light, may not soul to soul ?'—এই soul to soul-এর যোগাযোগ উপেন্দ্রনাথের মতে টেলিপ্যাথি।

'কিছু নেই, সব মিছে'—এ হচ্ছে এপ্‌কেপিটের কথা। উপেন্দ্রনাথ এপ্‌কেপিট নন। প্রবল দুঃখভারে পীড়িত হয়ে, সমস্যায় জর্জরিত হয়ে তিনি কখনো বলেন না, 'সব মিছে। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।'

'সংসার অরণ্য, জীবন অসার, সুখমোহ'—এই বলে পলায়নপর বৃত্তিকে ধরবার প্রয়াস যেমন নেই তাঁর—তেমনি বস্তুসুখে রত হয়ে রয়েও, অলৌকিকতা বা বিশ্বাসকেও একেবারে বর্জন করেননি কখনো।

তাই প্রবল দুঃখভারে পীড়িত হয়ে, শোকে তাপিত হয়েও তাঁকে দেখি সহনশীলতার অদ্ভুত প্রতিমূর্তি,

জীবনবোধে প্রাক্ত যথার্থ বিশ্বাস-পরায়ণ প্রবীণ—যিনি কখনো বলেন না, 'কিছুই কিছু নয়, সব মিছে, সবই মায়া।'

বয়স আশ্বস্ত হই তাঁর কথায়. 'বেঁচে থাকতে হলে এ-সব প্রিমিয়ম তো দিতে হবেই। তবে কি জান ভাই, তবু কষ্ট হয়, তবু ব্যথা পাই।'

কিন্তু আত্মহত্যার বিরুদ্ধে তার জন্যে কোনো জেহাদ ঘোষণা নেই উপেন্দ্রনাথের।

জীবনে এই ভাবকে কোথা হতে গ্রহণ করলেন উপেন্দ্রনাথ? এক জীবন-দর্শন? বোধের জ্ঞান? অধীত বিদ্যা কিংবা উপলব্ধি সঞ্জাত? অথবা সংস্কার?

এ-প্রশ্ন দু'একবার করেছি উপেন্দ্রনাথকে।

মৃদু হেসে তিনি এ-কথার উত্তরে দু একটি অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির কথা বলেন। জীবনের প্রথম জিজ্ঞাসা তার কিশোর কালের পূর্ণিয়ার কালী-মন্দিরে উত্থিত হয়। প্রকৃতির কাছ থেকেও অনেক শিক্ষা তিনি লাভ করেছেন। কিশোর বালকের চোখে দেখা পূর্ণিয়া থেকে কারাগোলার পথে গঙ্গার বিস্তার—সাপের ফণার মতো অগণন ঢেউ উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে।

জীবন ঘিরে সৃষ্টিকে ঘিরে তার পর থেকেই সুরু হয়েছে কত প্রশ্ন—কত জিজ্ঞাসা! জীবন কী? জীবনের পরবর্তী কালই বা কী? সুখই বা কী আর দুঃখই বা কী?

সুউন্নত দেহ, সুঠাম গঠন, সুচারু বেশ-বাস, মিষ্টি হাসি এবং পরিতৃপ্তি যে মানুষের মুখমণ্ডলে আজো যিনি উঠে হেঁটে, হেসে-খেলে বেড়ান কাল তাঁর অন্তিম শয়নে সবই কী মিলিয়ে যায়?

মড়ার মাথার হাসি নিয়ে 'বিগত দিনে' লঘু পরিহাসের ছলে তাই দেখি জীবনের গুরুতর সমস্যা।

ভাগলপুরের প্রান্তভূমিকে ব্রত করে প্রবাহিত ভাগীরথী। দুই ভাই যাঁদের সম্পর্ক বহু স্থানীয়, দুজনেই যাঁরা সাহিত্যিক, সেই উপেন্দ্রনাথ আর গিরীন্দ্রনাথ বড় গঙ্গার ধারে ভ্রমণ করবার জন্যে নির্গত, হয়েছেন। হেমন্ত লক্ষ্মীর মায়া কুহেলিকায় সন্ধ্যা সমাকীর্ণ। এমন সময় পাশের কাছে এক ঝলক দুষ্ট শুভ্র অদ্ভুত হাসির রূপে উভয়েই চমকে উঠলেন।

'আরে, আরে! এ যে সত্যই হাসছে!'

মহাপুলকে উভয়ে সামনা-সামনি বসে পড়লেন, মধ্যে রইলেন সেই অদ্ভুত হাসি, অর্থাৎ শুভ্র এক মড়ার বেঁচে থাকতে ছাড়ত বিলোল কটাক্ষ এখন ছাড়ছে বিকট।

'কবিতা বশিষ্ঠস্যেব নিত্য রসবাহিনী'—কবিতা সম্পর্কে এই উক্তি নিয়ে বৈঠক জমে উঠেছে।

কবিতা কী শুধুই বশিষ্ঠস্যেব?—তার পৌরুষ, তার ভাব-দর্শন, তার জটিলতা, তার ইন্‌টেলেকচুয়েলিজম, তার পরিবেশ, বিশেষ করে গভীর অরণ্যের ন্যায় তার দুরূহতা, তার বিশালতা—তাকে শুধু বশিষ্ঠ পর্যায়ে রেখে দেবে?—প্রশ্নটি তুলেছিলেন এ-কালের কোন একজন কবি।

ভাগলপুরে বনফুল আবাস থেকে ফেরার পথে শেষ রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে একখানি ফার্স্ট ক্লাস কম্‌পার্টমেণ্টে বসে কাব্য আলোচনা চলছিল।

কয়েকটি আধুনিক পর্যায়ের কবিতা হাতের কাছে ছিল—রোমান্টিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে তা একেবারে এ-কালীন কবিতা। দেহ এ্যানাটমির দেহবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে বস্তুধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে কবি প্রয়াসী হয়েছেন।

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা

বৈরাগ্য দুই প্রকার। তীব্র বৈরাগ্য আর মন্দা বৈরাগ্য। মন্দা বৈরাগ্য—হচ্ছে হবে—চিমে তেতালা। তীব্র বৈরাগ্য—শাণিত ক্ষুরের ধার—মাথাপাশ কচকচ করে কেটে দেয়। তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে একটা গল্প শোন, "এক দেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে। চাষীরা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে। একজন চাষার খুব রোখ আছে। সে একদিন প্রতিজ্ঞা করল যতক্ষণ জল না আসে, খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয় ততক্ষণ খানা খুঁড়ে যাবে। এদিকে স্নান করবার বেলা হলো। গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে বললে, বাবা, বেলা হয়েছে তেল মেখে নেয়ে ফেল। সে বললে, তুই যা, আমার এখন কাজ আছে। বেলা দুই প্রহর, তখনও চাষা মাঠে কাজ কচ্ছে। স্নান করার নামটি নাই। তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে বললে, এখনও নাও নাই কেন? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি। না হয় কাল করবে, কি খেয়ে কেরেই করবে। তখন গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে করে তাড়া করলে; আর বললে তোর আক্কেল নাই। বৃষ্টি হয় নাই। চাষবাস কিছুই হলো না, এবার ছেলেপুলে কি খাবে? না খেয়ে সব মারা যাবে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, মাঠে আজ জল আনব তবে আজ নাওয়া খাওয়ার কথা কবো। স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে। তখন একধারে বসে দেখতে লাগল যে নদীর জল মাঠে কুলকুল করে আসছে। তার মন তখন শান্ত আনন্দে পূর্ণ হল। বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললে, নে, তেল দে, আর একটু তামাক সাজ। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়ে খেয়ে, সুখে তোঁস তোঁস করে নিদ্রা যেতে লাগল।' এই হোল, তীব্র বৈরাগ্যের উপমা।'

"একজন লোক কোন পাহাড়ের উপর অনেক মেহনত করে একখানি ঘর করেছিল। কিছুদিন পরে একদিন ভারি ঝড় এল। কুঁড়ে ঘর টলমল করতে লাগল। তখন ঘর রক্ষার জন্য সে ভারি চিন্তিত হল। "বললে, "হে পবনদেব দেখো ঘরটি ভেঙো না বাবা।" পবনদেব কিন্তু শুনছেন না। ঘর মড় মড় করতে লাগল। তখন লোকটা একটা কিকির ঠাওরালে তার মনে পড়ল যে হনুমান পবনের ছেলে। যেই মনে পড়া অমনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল "বাবা ভেঙো না, হনুমানের ঘর দোহাই তোমার।" ঘর তবুও মড় মড় করে। কেবা কার কথা শুনে। অনেকবার 'হনুমানের ঘর', 'হনুমানের ঘর' করার পরে দেখলে যে কিছুই হল না। তখন বললে 'বাবা রামের ঘর' 'রামের ঘর' দেখো বাবা ভেঙো না, দোহাই তোমার।' তাতেও কিছু হল না। ঘর মড় মড় করে ভাঙতে আরম্ভ করল। তখন প্রাণে বাঁচতে হবে বলে, লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় বলছে 'যা শালার ঘর'।—তাই বলছি যা কিছু হয়েছে, জানবে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছাতেই হল আবার তাঁর ইচ্ছাতেই যাচ্ছে; তুমি কি করবে? এখন কর্তব্য যে ঈশ্বরেতে সব মন যাও—তাঁর প্রেমের সাগরে বাঁপ যাও।"

দেশ-বিদেশ

অ্যাংরি ইয়ংম্যান

প্রত্যয়ের পরিমণ্ডলে যোগাযোগ সংঘটিত হলে বুদ্ধির গতি বিপরীতমুখী হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রত্যয়ের সঙ্গে বুদ্ধির আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ না হলে কোন ব্যক্তিবিশেষের অস্তিত্ব শূন্য, সেইজন্য প্রত্যয় আয়ত্ত না করে আত্মবিকাশের পথ অন্বেষণ করা মূঢ়তা। কিন্তু প্রত্যয় আয়ত্ত করা সারা জীবনের সাধনার বস্তু। সবচেয়ে অসুবিধা হয় সেসমস্ত সমালোচকদের নিয়ে, যাঁরা অতিসত্বর বুদ্ধির মুক্তিকে প্রত্যয়নিষ্ঠ হয়ে দিগ্বিজয়ী দেখতে চান। তাদের কাছে আত্মচিন্তার বহুল শিথিলতা উপেক্ষিত। সে শিথিলতা অতিক্রম করে দৃঢ় ঋজু হবার জটিল সম্ভাব্য বাধানিষেধ চূর্ণ করে প্রত্যয়ের প্রান্তে উপনীত হওয়ার কঠোর পদ্ধতি তাদের কাছে সুবিদিত কিনা জানিনা তবে আত্মচিন্তা প্রণালীতে বিচরণ করতে গিয়ে তাঁরা সে পদ্ধতি বিষয়ে নিশ্চিতই বিস্মৃত থাকেন।

কোন কোন সমালোচক যাদের জন্ম এযুগে কিন্তু মন যাদের বাস করছে বিগত যুগের প্রথম প্রান্তে এসময়ের এ পৃথিবীর নানাবিধ দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়ার সন্ধান রাখেন না। ঘটনা বা দুর্ঘটনা কী রকম সঙ্গিন এবং সূক্ষ্ম ভঙ্গীতে মানুষের জীবনে ছায়া প্রছায়া প্রসারিত ক'রে সাদাকালো চিহ্নগুলোকে নিয়ে যেমন তেমন খেলা করে, এ খবর যাদের জানা নেই, তারাই হচ্ছেন এ সমাজের অনর্থক সৃষ্টিরসিক।

ইংলণ্ডের অবস্থা দুরবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়—এ হচ্ছে যুদ্ধের পরেকার। পৃথিবীর সর্বত্র দাপটে সাম্রাজ্যবিপনির ভূমিকা পরিচালনা করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইংলণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ইংরেজ সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পরমুহূর্ত থেকেই সম্ভাবনার খুসিতে ভরপুর থাকত। ইংলণ্ড তাকে খুসী করতে না পারলে সে চলে আসত ভারতবর্ষে, সিংহলে এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে। জীবনে হতাশার মুখদর্শন করার দুর্ভাগ্য তাদের কপালে ছিল না। কাঁচামাল সাম্রাজ্যিক সুবিধার (Imperial Preference) স্বর্ণখাঁচার পুরে নিয়তুমে এনে সমৃদ্ধির বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। রাণীর রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যাবার নয়। ইংরেজ সন্তান সারা জীবন সূর্য ওঠা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্য রবিকে উজ্জ্বলতর রাখতে অসুবিধে বোধ করত না। অবশেষে রাণীর রাজ্যেও ক্রমে ক্রমে সূর্য অস্তমিত হতে লাগল। যেখানে সূর্য বরাবর অস্তমিত থাকত, সেখানে সে অন্ধকারে শ্বেতবর্ণের দল চুপি চুপি খনি খুঁড়ত। সেখানেও সূর্য ওঠা শুরু হল। সেখান থেকে যে তৈল নিয়তুমে প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নিশিখাকে অনির্বাণ রাখা হত, সে তৈলে বাটতি শুরু হতে হতে প্রায় বন্ধ হবার মুখে। যুদ্ধোত্তর ইংরেজ সন্তান এ কালব্যাধি সইতে রাজী হল না। অস্তিত্বের প্রশ্ন বর্ষরিত হতে লাগল। শ্রেণীবৈষম্যের ভিত্তির ওপর দর্ভরা নিয়তব্যবিত্তকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করতে লাগল।

এই পটভূমিকে পেছনে রেখে ক্রোধে জ্বলতে লাগলেন একদল তরুণ সাহিত্যিক। তাঁদের ক্রোধের কারণ খাঁটি এবং যথার্থ। কিন্তু তাঁদের ক্রোধের রূপ যুগের রূপের মতই অসমঞ্জস। তাঁদের শক্তিমত্তা অনস্বীকার্য। তাঁদের মননের পরিধি সুবিস্তৃত। কিন্তু গভীরতার সঙ্গে দূরদর্শিতার যোগ দারুণ অভিন্ন, তাই তাদের মননের গভীরতা অনেকখানি অনাস্বাদ্য এবং অস্থির।

তাঁদের বক্তব্যকে গুছিয়ে এক কথায় লিখতে গেলে দাঁড়ায় :

১) তাঁরা বাস করছেন এক বিদ্রোহিত এবং হতবুদ্ধিকর যুগে।

২) তাঁরা নিম্ন বিষয়গুলোর ওপর আস্থা হারিয়েছেন—ক) ঈশ্বর খ) ধর্ম গ) রাষ্ট্র

৩) তাঁরা এক নূতন ধর্মের জাগরণে তীব্রভাবে কামনা করছেন, যে ধর্ম মানুষকে অবক্ষয়ের লক্ষ্যে না টেনে ক্রমশঃ আনন্দময় জীবনের গতিতে চুম্বকবৎ আকর্ষণ করে নেবে।

এই রকম বক্তব্যের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁরা তীব্রতার সংগে ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে, শিক্ষাবিধির এবং তার ধারকদের বিরুদ্ধে, রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে সর্বত্রই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এদের তাঁদের 'অ্যাংরি ইয়ংম্যান' বলে বলা হয়। নামটি বাছা হয়েছে জন অসবোর্ণের 'লুক ব্যাক ইন অ্যাংগার' নাটকের নায়ক জিমি পোর্টারকে দেখে, প্রতিনিয়ত তিনি সবার বিরুদ্ধে ক্রোধ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিংসের 'লষ্ট জেনারেশন', ত্রিশের 'ব্রাইট ইয়ং ম্যান'—এ দুটোর মতই এঁদেরো নাম হল পঞ্চাশের 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান'। দুজন মহিলা লেখিকা ডরিস লেসিং, আইরিস মারডোক সহ জন অসবোর্ণ, কলিন উইলসন, জন ব্রেয়ান, জন ওয়েন, কিংসলি এমিস প্রভৃতি বিখ্যাত।

অ্যাংরি ইয়ং ম্যানদের জিজ্ঞাসা আছে, প্রত্যয়াভিমুখিতা আছে, বলিষ্ঠ প্রতিবাদ আছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, খ্যাতিকে উপেক্ষা করার মত সৎসাহস আছে, রৌপ্যমুদ্রারজীবনে ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত এ বোধ তাঁদের আছে, মানুষের মৌন সারল্য, সততা, বিশুদ্ধ সম্পর্ক বিষয়ে এঁদের ক্ষুধা সুতীব্র। এবং এ যুগের অসামঞ্জস্য তাদের মূল জিজ্ঞাসাকে প্রত্যাহিত করতে পারেনি, কিন্তু বহির্জীবনের এবং উপরে মূল বিষয়গুলোকে লাঞ্ছিত করেছে। এঁরা পথ নির্দেশ করতে পারেননি। এঁরা অবস্থাকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রতিবাদ করেছেন।

সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনী

সম্প্রতি 'হাওড়া বার্তার' অষ্টম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে হাওড়ায় সাময়িক পত্র-পত্রিকার একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি শ্রী জে, সি, মল্লিক।

সাময়িক পত্রপত্রিকার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সাধনা ঔষধালয়ের স্বত্বাধিকারী আয়ুর্বেদাচার্য্য ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ। ডাঃ ঘোষ তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন :

"দেশের অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে সাময়িক পত্র-পত্রিকার যোগাযোগ এত গভীর এবং ব্যাপক যে ভাষা এবং সাহিত্যক্ষেত্রে কেবল নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের বিকাশে সাময়িক পত্র-পত্রিকার ভূমিকা গৌরবনীয়। চলতি জীবনের সুখ দুঃখের কথা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—এই সাময়িক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে আগামী দিনের কথা। ইতিহাসে দেখি যে, সাময়িক পত্র-পত্রিকা জন্মকাল থেকে জনমতের ধারক ও বাহক। সম্পাদকগণ তাই জনমতের নেতৃত্ব কেবল গ্রহণ করেন না—আগামীদিনের পথের কথাও তাঁরা জাতিকে বলেন. তাঁরা ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে সমসাময়িক ঘটনাকে বিচার করে জাতির প্রকৃত মঙ্গল কোন পথে সে কথা সাহসের সঙ্গে প্রচার করেন। সত্যানুসরণ সাময়িক পত্র-পত্রিকার ধর্ম—এই ধর্ম পালনে তাঁদের নিষ্ঠা জনমতকে সত্যপথে পরিচালিত করে।"

জাতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ ঘটানোর প্রয়োজনে এ ধরণের সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনীর বিশেষ সার্থকতা আছে। এরকম প্রচেষ্টার মাধ্যমে একদিকে লোকশিক্ষা বিস্তারিত হয়, অন্যদিকে চিন্তা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জন-মানসের পরিচয় স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

(সাময়িক পত্র-পত্রিকা নিজেই একএকটা স্বাধীন সত্তা দেশের কল্যাণে, জাতির কল্যাণে যা সত্য বলে অনুভব করে—সাহসের সঙ্গে সে কথা নিজের জ্ঞান বুদ্ধিমত প্রকাশ করে) যে সকল সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্র বর্তমানের ঘটনা নিখুঁৎ করে আঁকছেন—তাঁরা শুধু বর্তমান কালের আদর্শবাদী নেতা নন, অনাগত ভবিষ্যৎ তাঁদের আদর্শবাদের ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করবে।

রোমে অলিম্পিক

ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রাক্কালে

কীর্তি যাঁদের অমর করেছে
তাঁদের কয়েকজন—

মিল্‌খা সিং

লণ্ডনের হোয়াইট সিটি ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক দৌড় প্রতিযোগিতায় অমেচার এথলেটিক এসোসিয়েশনের পক্ষে ভারতের মিল্‌খা সিং ৪০০ মিটার দৌড়ে ৪৬.৬ সেকেণ্ড সময় অতিক্রম করিয়াছেন। যুক্তরাজ্যের মধ্যে এই দৌড় রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে

জন্ ব্র্যাগ

জন ব্র্যাগ্
অনুষ্ঠিত

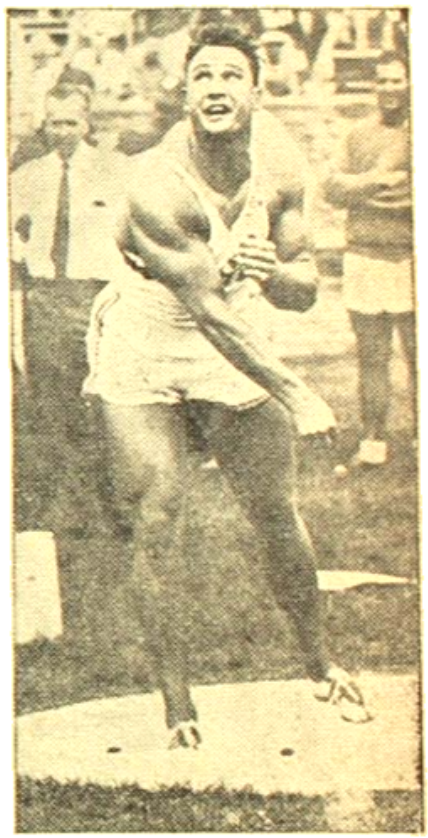

প্যারী ও' ব্রায়েন

প্যারী ব্রায়েন
নিক্ষেপ করার প্রতিযোগিতায়
কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কে
বেলফাস্ট নগরে অনুষ্ঠিত
অ্যাথলেটিক ইউনিয়নের কাড়া
তিনি নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন

লণ্ডনের ঐতিহাসিক অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গন

হ্যারিসন ডিলার্ড

ক্রস কাট্রি ও হার্ডল্ রেসে ইনি চ্যাম্পিয়নরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। তিনি ইউ. এস্. এ অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ট্রায়েল্ এ সাফল্যভাবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ১০০ মিটার রেসে বিখ্যাত দৌড়বীরদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি হেল্সিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে ১১০ মিটার হার্ডল রেসে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

মিস্ মেরী বিগ্‌হাল

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের প্রতিযোগিতায় মিস্ মেরী বিগ্‌হাল শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইয়াছেন। হাইজাম্প্, লংজাম্প্ ও ৮০ মিটার হার্ডল রেসে তিনি রোমে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে

আইরাণ্ ব্ল্যাক

১৮ বৎসর বয়স্ক অটলাণ্ডের ছাত্র আইরান্ ব্ল্যাক তিনবার ইউরোপে চ্যাম্পিয়ান হন। প্রথমবার ৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রেসে, দ্বিতীয়বার ১৫০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রেসে ও তৃতীয়বার ৪০০ মিটার রেসে তিনি স্বীয় প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখেন। অলিম্পিক অনুশীলন প্রতিযোগিতায় তিনি ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রেসে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

এই আমাদের ভারতবর্ষ

If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow—in some parts a very paradise on earth—I should point to India.

If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant—I should point to India.

And if I were to ask myself from what literature we here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of Greeks and Romans, and of one Semitic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact, more truly human, a life not for this life only, but a transfigured and eternal life—again I should point to India.

—MAX MULLER.

ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি—কর্মভূমি,—ইহা সত্য, সত্য, অতি সত্য। যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহাদের কর্মফল ভুগিতে আসিতে হইবে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে ভগবন্মুখাভিলাষী জীবমাত্রকেই পরিণামে আসিতে হইবে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে মনুষ্যজাতির চিত্তর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষান্তি, ধৃতি, দয়া, শৌচ প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছে—যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে—তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতভূমি। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্মের সংস্থাপকগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎকে বারংবার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাইয়াছেন। এখান হইতেই উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ ছুটিবে। সমগ্র জগতের ইহলোক-সর্বস্ব সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে। অপর দেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়রক্তকারী জড়বাদরূপ অনল নির্বাণ করিতে যে অমৃতসলিলের প্রয়োজন, তাহা এখানেই বর্তমান। ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে। [স্বামী বিবেকানন্দ]

দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে শুস্থিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শক্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে অবিশ্বাসে অনাচারে অনুকরণে এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। • • • আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না, জানিতে পারিতেছি না, ইংরেজী স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্ঞাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই

আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, • • • তাহা বলিষ্ঠজীবন, তাহা দুঃখ সহিষ্ণু, উপবাসব্রতধারী; তাহার তপঃপ্রভাবের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় কোমারি এখনো জ্বলিতেছে।

জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, উদার, যাহা নির্বাক, তাহারই জয় হইবে: • • • তপস্যাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া বিদায় লইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে—"পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।"

তিনি কহিবেন—"ওঁ ইতি ব্রহ্ম।"

তিনি কহিবেন—"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

তিনি কহিবেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।" [রবীন্দ্রনাথ]

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য বিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য বিধাতা।

[রবীন্দ্রনাথ]

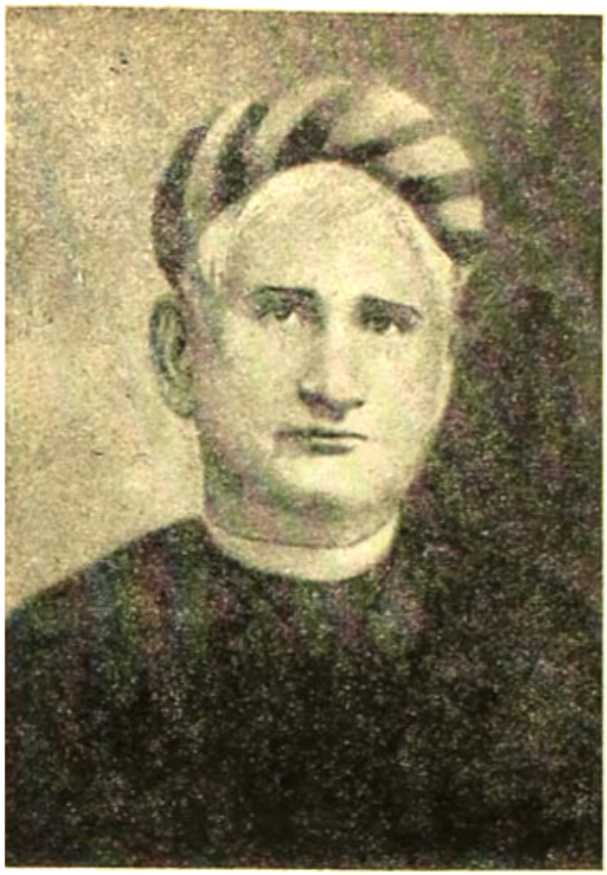

স্বামী বিবেকানন্দ

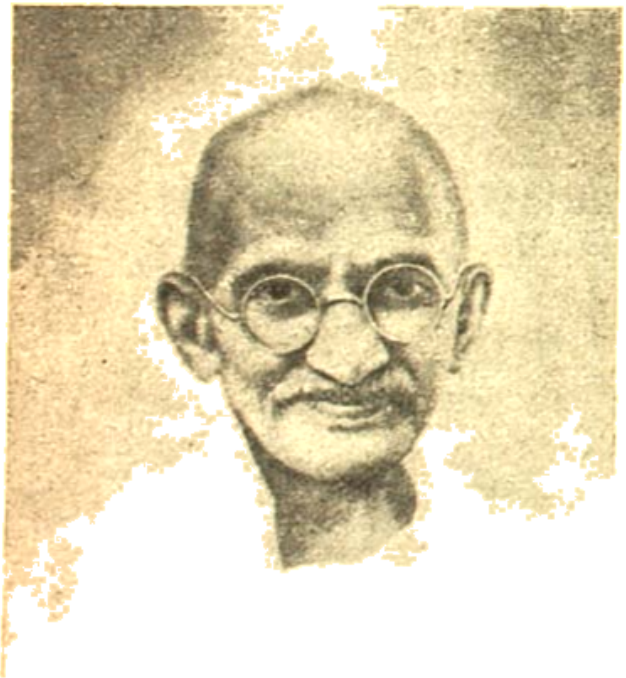

ভারতের স্বাধীনতা

শ্রীতীর্থপথিক

আমার ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল থেকে স্বপ্ন দেখে এসেছে সে এক হবে, অখণ্ড হবে, তার অঙ্গে না কোন ভেদরেখা, সর্বত্র বিরাজ করবে সুমহান ঐক্যচেতনা, খণ্ড দেশ ও বিচ্ছিন্ন জাতির সমস্ত প্রাচীর নিঃশেষে অবলুপ্ত হবে।

ভারতের বুকে কত রাজা কত রাজধানী, প্রাচীনকাল থেকে এ দেশের মাটি কত রাজার বিজয়াভিযানে কম্পিত, কত উর্বা বিধ্বস্ত হিংসার হলাহলে ইতিহাস কলঙ্কিত। মহাভারতের যুগে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে জেগেছিল এই দুরন্ত আশা: এই ভারতবর্ষের জ্ঞান ও কর্ম, ধ্যান ও আদর্শকে এক অভিন্ন ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করতে হবে, ভারতরাষ্ট্রে যুযুধান ক্ষাত্রশক্তির পরিবর্তে স্থাপন করতে হবে সামাশ্রিত শান্তির আদর্শ।

রাষ্ট্রিক ভারতবর্ষ কালে কালে শতকে শতকে এই স্বপ্ন দেখে এসেছে, হিন্দুযুগ এই আশা করেছে, মোগলযুগ এই আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছে, রাজা শিবাজীর এই আদর্শ ছিল, সম্রাট আকবর প্রকাশ করেছিলেন মিলনকামনা।

উনবিংশ শতাব্দীতে নব জাগরণের আলো এল বাঙলায়, তখন এই বিশাল দেশে পরশাসনের দুর্বহ বেদনা, স্থানে স্থানে করদ মিত্র রাজ্যের ক্ষত, জাতির ঐক্যচেতনা অন্তর্হিতপ্রায়।

মুক্তির সাধনায় বসল বাঙলা। বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে যিনি জাতিকে দীক্ষা দিলেন তাঁরই দৃষ্টিতে সত্য প্রতিভাত হল :

দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল কাহাদের মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।.....যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই। [বঙ্কিমচন্দ্র]

ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্টতা বিশ্বের সম্মুখে যিনি উপস্থাপন করলেন তিনিই নির্দেশ দিলেন জাতিকে

বলি—জীবন বলি, তাহাদের জন্য—যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীনদরিদ্র উৎপীড়িতদের জন্য। [স্বামী বিবেকানন্দ]

কবিমনীষীর কণ্ঠে স্বাধীনতার বাণী উচ্চারিত হল :

বিশ্বের সঙ্গে যোগেই মানুষ সত্য,—এইজন্যে সেই সত্যের মধ্যে মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা পায়। আমরা একার স্বাধীনতার শুষ্কতাকে চাইনে, আমরা ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সম্বন্ধের পরিপূর্ণতাকে চাই, তাকেই বলি মুক্তি। যখন দেশের স্বাধীনতা চাই তখন নেতিবাচক স্বাধীনতা চাইনে, তখন দেশের সকল লোকের সঙ্গে সম্বন্ধকে যথাসম্ভব সত্য ও বাধামুক্ত করতে চাই। সেটা হয় ভেদের কারণ দূর করে দিয়ে, কিন্তু সে কারণ ভিতরেও থাকতে পারে, বাইরেও থাকতে পারে। ... আমরাও যখন বলি স্বাধীনতা চাই, তখন ভাবতে হবে কোন ভেদটা আমাদের দুঃখ-অকল্যাণের কারণ—নইলে স্বাধীনতা শব্দটা কেবল ইতিহাসের বুলিরূপে ব্যবহার করে কোন ফল হবে না। [রবীন্দ্রনাথ]

স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের আহ্বান করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এক গৌরবময় আত্মপ্রতিষ্ঠিত জাতির সার্থক মিলনের এক অতি অপরূপ ভবিষ্যৎ চিত্র উপস্থাপন করলেন তাঁদের সম্মুখে :

ধাও বীর, যুদ্ধ কর। ইতিহাসের মহাগৌরবান্বিত যুদ্ধের সৈনিক তোমরা, তাহা কদাপি ভুলিও না। যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, যখন সন্ধি হইবে শান্তি আসিবে—তাহা নিশ্চয়ই আসিবে—তখন সংযত, শান্ত পদক্ষেপে সেই শান্তিময় মিলনমন্দিরে সমুন্নত শিরে তোমরা দলে দলে প্রবেশ করিবে—এই স্বপ্ন সাশ্রুনেত্রে আমি নিরীক্ষণ করিতেছি।

কেমন হবে আগামী দিনের ভারতবর্ষ? রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে গড়ে উঠবে যানের ভারত? জাতীয় আন্দোলনের নেতা প্রকাশ করলেন তাঁর আশা:

আমার স্বপ্নের স্বরাজ দীন-দরিদ্রের স্বরাজ।

অহিংসার পথে প্রতিষ্ঠিত স্বরাজে কারও সঙ্গে কারও বৈরিতা নেই……সবাই জানবে সেখানে লিখতে ও পড়তে… ব্যাধি ও পীড়া প্রায় লোপ পাবে সে সমাজে। নিঃস্ব কেউ থাকবে না, শ্রমের পক্ষে কাজের অভাব ঘটবে না। ঘৃণা, পাপদোষ, নীতিহীনতা এবং বর্ণবিদ্বেষ অন্তর্হিত হবে সে সমাজ থেকে। ০ ০ ০ অহিংস স্বরাজে কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না, পক্ষান্তরে কারও কোন অন্যায় অধিকার থাকবে না। [মহাত্মা গান্ধী]

স্বাধীনতার দাবী উচ্চারিত হল লোকমান্য তিলকের কণ্ঠে: স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার, আমি তা ভোগ করবই করব।

দেশবাসীর উদ্দেশে প্রচারিত তাঁর সতর্কবাণী আজও কান পেতে শুনতে হবে:

তোমাদের ভবিষ্যৎ রয়েছে তোমাদের নিজেরই হাতে। যদি সমস্ত অন্তর দিয়ে স্বাধীনতা কামনা করে থাকো, তোমরা স্বাধীন হতে পারবেই; আর যদি স্বাধীনতা তোমাদের অন্তরের কাম্য না হয়, তোমাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হবে, চিরপদদলিত হয়েই তোমাদের থাকতে হবে।

এমন একটি ভারতবর্ষের স্বপ্ন নেতাজী সুভাষচন্দ্র দেখেছিলেন যেখানে—

সমাজে, রাজনীতিক্ষেত্রে, আর্থিক ব্যাপারে—সর্বত্র এবং সর্ববিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান অধিকার দিতে হইবে – ইহাতে বৈষম্য রাখিলে চলিবে না।

এই সঙ্গে তাঁর উদাত্ত আহ্বান জাতির কর্ণকুহরে ধ্বনিত হল:

এস আমরা একসঙ্গে বলি, "আমরা মানুষ হব; নির্ভীক, মুক্ত খাঁটি মানুষ হব। নূতন স্বাধীন ভারত আমরা ত্যাগ, সাধনা ও প্রচেষ্টার বলে গড়ে তুলব। আমাদের ভারতমাতা আবার রাজ-রাজেশ্বরী হবেন; তাঁর গৌরবে আমরা আবার গৌরবান্বিত হব। কোনও বাধা আমরা মানব না; কোনও ভয়ে আমরা ভীত হব না। আমরা নূতনের সন্ধানে, অজানার পশ্চাতে চলব। ০ ০ ০"

সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরে মুদ্রিত হোল আগামী দিনের আশা আকাঙ্খা:

ভারতের স্বাধীনতা বলতে আমরা বরাবর যে ধারণা করেছি এবং কথায় প্রকাশ করেছি তা এই যে, ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর প্রত্যেকে সমান স্বাধীনতা ও সমান সুযোগ লাভ করবে। [জওহরলাল]

এ আশা কি পূর্ণ হয়েছে?

খণ্ডিত ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল।

নূতন জীবনের বাণী উচ্চারিত হল ঋষিকণ্ঠে:

যে শক্তি স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, সেই শক্তিই এনে দেবে ঐক্য। ঐক্যবদ্ধ পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতের হবে—জননী তাঁর সন্তানদের তাঁর চারিদিকে একত্রিত করবেন, তাঁদের মিলিয়ে এক মহান্ অখণ্ড জাতীয় জীবনের একমুখী সামর্থ্যে গেঁথে তুলবেন। [শ্রীঅরবিন্দ]

আমাদের প্রশ্ন: ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের সে শক্তি কোথায়? এত মানুষের সাধনা, এত মনীষীর আহ্বান, এত অশ্রু এবং রক্ত, মৃত্যু এবং আত্মবলি—সব কি মুছে গেল মানুষের মন থেকে?

আজ ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে চেয়ে আছি·····ভারতবর্ষ বহুবার বিদেশী শক্তির আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছে, এর কারণ সমগ্র ভারতবর্ষ কোনদিনই সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেনি, সর্বাবয়ব ভারতবাসীর মধ্যে অখণ্ড রাষ্ট্রীয় চেতনার অভাব, আর সেইজন্য আক্রমণকারীরা পেয়েছে প্রভূত প্রতিষ্ঠার সুযোগ।

বহু ভাষাভাষী বহু জাতিতে বিভক্ত ভারতবর্ষ পূর্বে কখনো ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারেনি। আজকের ভারতবর্ষ এক রাষ্ট্রে সংহিত। কেবলমাত্র ভারতের নয় সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব অধ্যায়। যা কখনো ছিল না অথচ যার সম্ভাবনায় আমার ভারতবর্ষ চিরচঞ্চল আজ তাই সম্ভব হয়েছে—ভারতবর্ষের ইতিহাসে এত বৃহৎ, ব্যাপক এবং গভীর যুগপরিবর্তন আর কখনো আসেনি।

আর এই যুগেই ভারতবর্ষ বাইরের এবং ঘরের শত্রুদ্বারা সমভাবে আক্রান্ত আজ ভারতের প্রতিটি মানুষ অন্তরে অন্তরে অনুভব করছে যে ভারতের ঐক্য এখনো আসেনি, একে লাভ করতে হলে চাই এই সুমহান দেশের কোটি কোটি মানুষের দেশপ্রেম, সততা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা এবং ত্যাগস্বীকার আজকের ভারতবর্ষে সে সাধনা আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত। মনুষ্যত্বের যে মহান্ আদর্শ একদিন ভারতবর্ষ তুলে ধরেছিল আজকের দেশে তার সবচেয়ে বেশী অভাব। জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে, তার স্থান নীতিবোধ সমস্ত অসাড়, দুর্নীতি দেশের সর্বত্র, আজকের ভারতবাসী হয়ে পড়েছে একান্ত আত্মকেন্দ্রিক।

আজ দেশ চুলেছে মানুষ হওয়ার শিক্ষা, দেশবাসীর উদরে নেই অন্ন, মনে নেই আশা ও সাহস, হৃদয়ে নেই আদর্শের উদ্দীপনা, ব্রত উদযাপনের উদ্দীপনা, চরিত্রে নেই নিষ্ঠা। মানুষের আচরণে ভর করেছে শ্রদ্ধাহীনতা, ছাত্র গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, সন্তান পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবনত নয়, এক অন্তঃসারশূন্য উদ্ধত অহমিকা বৃথা আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে দেশের সর্বত্র। জীবনকে শ্রদ্ধা, সাধনা ও নিষ্ঠার দ্বারা গঠনের চিন্তা এখানে নেই।

একটা জাতির নবলব্ধ স্বাধীনতার মূলে দেশবাসীর এই অনৈক্য, ব্যক্তির চরিত্রে গভীর অসামঞ্জস্য এক মহাচিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণতন্ত্রের পরীক্ষায় আমরা কি কেবলমাত্র ক্ষুদ্র স্বার্থপূরণের অধিকার লাভের জন্যে চেষ্টা করব, নাকি এই সঙ্গে গ্রহণ করব গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব, এ জিজ্ঞাসার উত্তর দাবী করে আজকের ইতিহাস।

আজ স্মরণ করিয়ে দিই মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের বাণী :

কি ধর্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রীয় গঠনে, যখন ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র ছিল—ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও সাধনা জীবনের সকল বিভাগে সর্বদাই সমষ্টির ঐক্যের ভিতরে ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কোথাও কোনো সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া সেই সঙ্ঘের অন্তর্গত ব্যক্তি বা বিষয়ের স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যকে বিনাশ করে নাই। • • • আর সর্বত্রই প্রায় মানুষকে এক ছাঁচে ঢালিয়া একাকারের উপরে ঐক্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে। সে চেষ্টা সফল হয় নাই। মানুষের প্রকৃতিতে এরূপ নিষ্পেষণ সহ্য হয় না।

• • • এই নূতন যুগেও সেই পুরাতন বাঙ্গালী চরিত্র ও সাধনাই অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। কেবল রূপের পরিবর্তন হইয়াছে, মূল বস্তু নষ্ট হয় নাই ; তাহা যেমন ছিল, তেমনই আছে।

সে মূল বস্তুটি স্বাধীনতা। বাংলা চিরদিন—কি সমাজের কি ধর্মের—সকল প্রকারের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া মুক্তভাবে আপনার সার্থকতার অন্বেষণ করিয়াছে·····

বাঙলাদেশে আজ নতুন করে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হোক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাণী :

বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি।

অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাঙালী একটি বিশিষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙলা সেই রূপের মূর্তি। আমার বাঙলা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ।

আজকের ভারতবর্ষের একটি মাত্র স্বপ্ন : মাগুন চাই।

আজকের বাঙলা যে ঘনঘোর দুর্যোগের সম্মুখীন তা তার ইতিহাসে অভাবিতপূর্ব। নানা কঠিন আঘাতে ঘুমন্ত জেগে উঠুক যেমন জেগে উঠেছিল বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনে, সেদিনের আহ্বান আজ আবার শুনতে হবে :

হে বঙ্গের নবীন যুবক, তোমার দুর্ভাগ্য এই যে, তুমি আপনার সম্মুখে কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত পাও নাই। কিন্তু যদি ইহাকে অপরাজিত চিত্তে নিজের সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পার, যদি বলিতে পার, নিজের ক্ষেত্র আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া তুলিব, তবেই তুমি ধন্য হইবে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সুখলাভ আনয়ন করো, জড়ত্বের মধ্যে জীবন সঞ্চার করো, শৈথিল্যের মধ্যে উদ্যমকে আহ্বান করো, এই মহৎ আস্থা স্থাপন করো, নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করো, এবং ফলের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়ো না। ... আপে পাপে টানিয়া মাঝে বাঙলা দেশকে দুই টুকরা করিতে গবর্মেণ্ট পারেন। বাঙলা ভাষাকে গবর্মেণ্ট নিজের ইচ্ছা মতো চারখানা করিয়া ভাগ করিতে পারেন। আর আমরা সমস্ত বাঙালী তাহার ঐক্যসূত্রকে অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারি না? এই যে আশঙ্কা, ইহা কি নিজের প্রতি নিদারুণ অশ্রদ্ধারোপ নহে? যাহা দুরূহ তাহা অসাধ্য নহে, এই বিশ্বাসে কাজ করিয়া যাওয়াই পৌরুষ। ..... সঙ্কটকে স্বীকার করিয়া, দুঃসাধ্যতা সম্বন্ধে অন্ধ না হইয়া, নিজেকে আশুফললাভের প্রত্যাশায় না ভুলাইয়া, এই দুর্ভাগা দেশের বিনা পুরস্কারের কর্মে দুর্গম পথে যাত্রা করিতে কে কে প্রস্তুত আছ, আমি সেই বীর যুবকদিগকে অদ্য আহ্বান করিতেছি—রাজদ্বারের অভিমুখে নয়, পুরাতন যুগের তপঃসঞ্চিত ভারতের স্বকীয় শক্তি যে খনির মধ্যে নিহিত আছে সেই খনির সন্ধানে। কিন্তু খনি আমাদের দেশের মর্মস্থানেই আছে—যে জনসাধারণকে অবজ্ঞা করি, তাহাদেরই নির্বাক হৃদয়ের গোপন স্তরের মধ্যে আছে। প্রবলের মন পাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া সেই নিভৃত গুহার গভীরতম ঐশ্বর্যলাভের সাধনায় কে প্রবৃত্ত হইবে? [রবীন্দ্রনাথ]

জাতির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ এই স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা আকাশ থেকে পড়েনি। বহু দুঃখ-কষ্ট, সহস্র বাধা-বিপত্তি, লক্ষ লক্ষ নরনারীর সীমাহীন কৃচ্ছ্রসাধন, ত্যাগস্বীকার, আত্ম-বলিদান ও অশ্রুপাতের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের স্বাধীনতা।

ঠিক যেভাবে যে পথে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা একে রক্ষাও করতে হবে—এর পবিত্রতা ও মর্যাদা অটুট রাখতে হবে ঠিক সেই পথে সেই ভাবে। ভারতের স্বাধীনতারক্ষা তথা কোটি কোটি মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বিধান করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সেই আত্ম-বলিদান, নিঃস্বার্থ সেবা ও আত্মত্যাগ। ভারতবর্ষ ত্যাগের দেশ। ত্যাগই এদেশের প্রাণধর্ম। আমরা স্বাধীনতার খোলস চাই না, আমরা চাই স্বাধীনতার সারবস্তু। জাতিকে আবার নূতন করে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে, আবার সেই দুঃখ-কষ্ট এবং অশ্রুপাতের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করতে হবে, তবেই আমরা পৌঁছতে পারব আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে।

বাংলার রঙ্গমঞ্চ

গল্প-ভারতী—ভাদ্র, ১৩৬৭

সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য

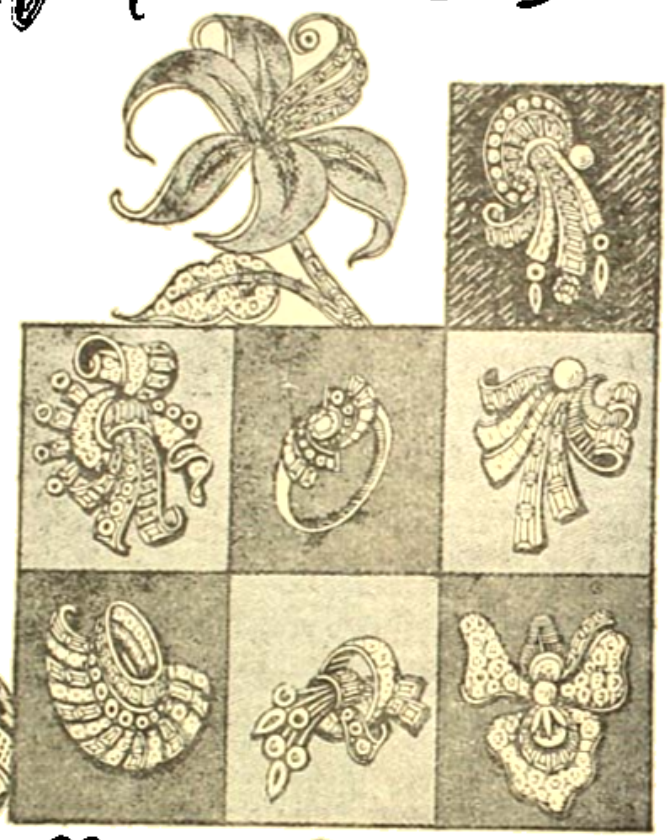

গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট

এম,বি,সরকার
এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ৯৬৭ সি/১ মহাত্মা গান্ধী ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-স্বর্ণশিল্পিক

ব্রাঞ্চ-হাল্দি গেট-২৩৯/পি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-১৯ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬

দোকানের পুরোতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৪৫৮এ

একাঙ্ক নাটকের গতি ও প্রকৃতি

ডক্টর অজিত কুমার ঘোষ

একাঙ্ক নাটক। এই বিশেষ শ্রেণীর নাটকের স্বরূপ ও লক্ষণ বিচার করতে গেলে দুটি কথার উপরেই বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ, এই নাটকের একাঙ্কত্ব ও নাটকত্ব। একাঙ্ক যখন বলা হল তখনই একে যেন একটু বিশিষ্ট ক'রে মেলেরা হল। সাধারণ নাটকের অঙ্ক সংখ্যা একাধিক এবং নাটক বলতে এই একাধিক অঙ্কবিশিষ্ট নাটকের সংস্কারই দর্শকচিত্তে বহুমূল হ'য়ে আছে। একাঙ্ক যেন সেই সাধারণ নাট্য সংস্কারের এক বৈচিত্র্যময় ব্যতিক্রম, দর্শক যেন সকৌতূহল আগ্রহ নিয়েই এই নাটকের রসসন্ধানী হয়ে থাকেন কিন্তু একাঙ্কের রূপ ও রহস্য নির্ণয় করবার আগে অঙ্ক সম্বন্ধে একটু সাধারণভাবে আলোচনা করা দরকার।

নাটকের কাহিনী শুধুমাত্র একটি গল্প নয়, এর গতি সরলরেখাশ্রয়ী নির্বাধ অগ্রগমন মাত্র নয়। বিরোধ ও সংঘাতে এই কাহিনী জটিল এবং বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করতে হয় বলে এর চলা তীব্র বেগ ও প্রবল শক্তি সংগ্রহ করে। এই ঘাত-প্রতিঘাতময়, সমস্যাজটিল নাট্যকাহিনীর দুটি অংশ রয়েছে অ্যারিষ্টটলের কথায় এই দুটি অংশের নাম যথাক্রমে Complication ও Denouement। অর্থাৎ, প্রথম থেকে নায়ক কিংবা নায়িকার ভাগ্যপরিবর্তন পর্যন্ত কাহিনীর Complication অথবা জটিলতা এবং ঐ পরিবর্তন থেকে শেষ পর্যন্ত নাট্যাংশটুকু Denouement অথবা জটিলতা মোচন। কাহিনীর গতি অনুধাবন করলে বুঝতে পারা যায় এই গতি প্রথম অংশে ক্রমোচ্চ পথ বেয়ে শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করে, এবং শেষ অংশে পুনরায় অবতরণের পথ দিয়ে একেবারে শান্ত সমাবস্থায় উপনীত হয়। কাহিনীর গতিপথের এই যে বিচিত্র চড়াই ও উতরাই—এদের মধ্য দিয়ে চলবার সময় মাঝে মাঝে থামতে হয়। কিন্তু থামাটাও যেখানে সেখানে এলোমেলোভাবে হ'লে চলবে না। এ যেন ছন্দের ছেদ, অর্থের ছেদ পড়ল কিন্তু গতির বেগ থামল না। নাটকেও কাহিনীর সাময়িক ছেদের মধ্য দিয়ে আবেগের গতি কিন্তু চলবে অব্যাহত ভাবে। এই গতিকে অব্যাহত রাখবার জন্য সাময়িক বিরামের পূর্বে গতির মধ্যে তীব্রতা ও অতিশয়িত প্রাণশক্তি সঞ্চার করা হয়। নাটকের এই সাময়িক বিরাম চিহ্নিত হয় অঙ্কের দ্বারা। এই অঙ্কবিভাগ আমাদের দেশে সংস্কৃত নাটক থেকেই দেখা গিয়েছিল আর পাশ্চাত্য দেশে এই অঙ্কবিভাগ আরম্ভ হয়েছিল রোমীয় নাটক থেকে। গ্রীক নাটকে কোনো অঙ্কবিভাগ ছিল না বটে, কিন্তু Prologue, Parode, Episode, Stasimon ও Exode এই পাঁচ অংশে নাট্যকাহিনী বিভক্ত ছিল এবং এই পাঁচ অংশের মধ্যে পরবর্তী রোমীয় নাটকের পঞ্চাঙ্কের প্রাথমিক রূপই দেখা গিয়েছিল। রোমীয় নাটকের পঞ্চাঙ্ক বিভাগ শেক্সপীয়রের পঞ্চাঙ্ক বিভাগের মধ্যে পরিণতি লাভ করেছিল। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকই বহুদিন ধরে নাটকের সর্বজনস্বীকৃত সাধারণ রূপ ছিল। ইবসেনের সময় থেকে এই পঞ্চাঙ্ক বিভাগের বরাবাঁধা কোনো নিয়ম আর রইল না এবং চার অঙ্ক, তিন অঙ্ক এবং দুই অঙ্কের নাটক বহু লিখিত হল। বর্তমানে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট নাটকই বেশি দেখা যায় বটে, তবে অঙ্ক সম্বন্ধে নাট্যকারেরা যথেচ্ছ স্বাধীনতা দেখিয়ে

থাকেন। অভিনয়ের সময়ের সংক্ষিপ্ততা, সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কাহিনীর অবিচ্ছিন্ন রূপদানের আগ্রহ প্রভৃতি কারণের ফলেই আধুনিক নাটকের অঙ্ক সংখ্যা কমে এসেছে।

সংস্কৃত নাটকেও যে পঞ্চাঙ্ক বিভাগের চেতনাই সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় নাটকের পঞ্চসন্ধি বিভাগে। অবশ্য নাটক ও প্রকরণের অঙ্কসংখ্যা পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত হত। সমবকার, ঈহামৃগ ও ডিমের অঙ্কসংখ্যা তিন কিংবা চার হত। সংস্কৃত নাটকেই সর্বপ্রথম একাঙ্ক নাটকের নানা রূপবৈচিত্র্য দেখা যায়। ব্যায়োগ, উৎসৃষ্টিকাঙ্ক, প্রহসন, ভাণ ও বীথী এই পাঁচরকম একাঙ্ক নাটকের কথা নাট্যশাস্ত্রে কথিত হয়েছে। হাস্য, করুণ, বীর ও আদি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার রসের অবতারণাই এই একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে দেখা গিয়েছে। ভাসের একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে বোধ হয় আমরা পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন একাঙ্ক নাটকের সন্ধান পেলাম। মধ্যমব্যায়োগ, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ, দূতবাক্য প্রভৃতি ভাসের প্রসিদ্ধ একাঙ্ক নাটক। ভাসের নাটকের বিষয়বস্তু ও রসের আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে, সংস্কৃত নাটকে একাঙ্কের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নাট্যকারগণ গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়ে গভীর ভাবাবেগপূর্ণ বিষয় অবলম্বন ক'রেই সার্থক রসোত্তীর্ণ নাটক রচনায় মনোনিবেশ করতেন।

কিন্তু অনেক পরবর্তী কালে ইউরোপীয় সাহিত্যে একাঙ্ক নাটকের যে অপূর্ণ ও অপরিণত রূপ দেখা গিয়েছিল তার মধ্যে বিষয় ও রসের কোনো গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য ছিল না। মূল নাটকের আগে অথবা পরেই তখন একাঙ্ক নাটকের অভিনয় হত। এই নাটকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দর্শকদের একটু খুশি করা, মূল নাটকের আগে কিংবা পরে প্রেক্ষাগৃহ একটু জমিয়ে রাখা। একাঙ্ক নাটকের স্বতন্ত্র ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ রূপ দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দী থেকে। তখন থেকে আমরা দেখলাম, একাঙ্ক নাটকের কাজ শুধু কেবল তরল আমোদ যোগানো নয়, পূর্ণাঙ্গ নাটকের মতই এই নাটক যে কোনো জটিল সমস্যা ও গভীর জীবন চেতনা নিয়ে লেখা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীতে একাঙ্ক নাটকের উদ্ভবের সঙ্গে সাহিত্যের আর একটি বিশিষ্ট বিভাগের অভ্যুদয়ের তুলনা করা চলে তা হল ছোট গল্প। উনবিংশ শতাব্দীর আগে ছোট গল্প ছিল শুধুমাত্র গল্প। কল্পনার ডানায় সে ভর দিয়ে চলত, রোমান্সের স্বপ্নলোকের স্বর্গের দিকে ছিল তার গতি। কিন্তু বিগত শতাব্দীতে ছোটগল্প বাস্তব মাটির সংস্পর্শে এসে জীবনের গভীরতর সমস্যা ও জিজ্ঞাসা তুলে ধরল। আকারে ছোট হলেই গুণে লঘু হয় না, এ সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল ছোটগল্পে ও একাঙ্ক নাটকে। ছোট গল্প ও একাঙ্ক নাটকের বহিরঙ্গ আলাদা, কিন্তু অন্তরঙ্গে উভয়ের মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। হঠাৎ আলোকিত কোনো জীবনের খণ্ডাংশ সুসংবদ্ধ রূপ ও ঘনীভূত রসপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলাই হল উভয়ের উদ্দেশ্য। ছোটগল্প ও একাঙ্ক নাটকের এই ভাব ও উদ্দেশ্যগত মিলের জন্যই অনেক লেখক সমসাময়িক মতই গল্প ও একাঙ্ক নাটকের দুই ধারা একই সঙ্গে তাঁদের সাহিত্যে যুক্ত করে দিলেন। অস্কার ওয়াইল্ড, শেকভ, গলসওয়ার্দি ইত্যাদি অনেক লেখকের নামই দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে গত শতাব্দীতে একাঙ্ক নাটকের সূচনা হলেও তার পূর্ণ ও পরিণত রূপ দেখলাম কিন্তু এই শতাব্দীতে। বিষয় ও রসের অপূর্ব বৈচিত্র্য নিয়ে এই নাটক এখন পূর্ণ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে।

বাংলা সাহিত্যেও একাঙ্ক নাটকের ধারা খুব বেশী দিন আগে আরম্ভ হয়নি। খাঁটি একাঙ্ক নাটকের উদ্ভবের আগে অবশ্য এই নাটকের অনুরূপ ক্ষুদ্রাকার নাটক কিছু কিছু রচিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র

ও অমৃতলালের কয়েকটি দৃশ্যবহুল কৌতুকরসাত্মক নাটকগুলির কোনো কোনোটিকে একাঙ্ক নাটকের ধর্মাবিশিষ্ট বলা যেতে পারে। তবে দু' একটি খাঁটি একাঙ্ক নাটকেরও নাম করা যায়, যথা অমৃতলালের 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম।' রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র মধ্যেও আমরা কয়েকটি উপভোগ্য একাঙ্কিকার সন্ধান পেলাম। 'বিনি পয়সার ভোজ' নামক নাটিকাকে আমরা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আত্মভাষী (Monologue) একাঙ্ক নাটক তাদের পর্যায়ে ফেলতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে-সব নাটকের পরিচয় আমরা পেলাম সেগুলি শুধুমাত্র হাল্কা রসসৃষ্টি করবার জন্যই রচিত হয়েছে। তখন পর্যন্ত কেউ একাঙ্ক নাটকের প্রতি কোনো গভীর গুরুত্ব আরোপ করেননি, এই নাটকের মধ্য দিয়ে যে কোনো জটিল জীবনসমস্যার অবতারণা করা যায় তাও কারো ধারণা ছিল না। একাঙ্কিকার মধ্যে জীবনের নানা সমস্যা ও সংঘাত সৃষ্টি ক'রে একে সচেতন শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত করলেন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার মন্মথ রায়। তিনি একাঙ্ক নাটকের এক অদৃষ্টপূর্ব সম্ভাবনার পথ মুক্ত ক'রে দিলেন। মন্মথরায়ের পর অনেকেই একাঙ্ক-নাটক রচনায় প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বনফুল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, বনজ বৈরাগী, গিরিশংকর, সুনীল দত্ত, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রমেন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। বর্তমান জীবনের বহুতর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এঁদের একাঙ্ক নাটকে স্থান পেয়েছে। কিছুকাল ধরে নানাস্থানে যে-সব একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতার আয়োজন চলেছে তাদের মধ্য দিয়ে একাঙ্ক নাটকের প্রসার ও জনপ্রিয়তা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একাঙ্ক নাটকের অভিনয়ে খরচ ও ঝামেলা খুবই কম, সেজন্য বহু অপেশাদার নাট্যসংস্থা এই নাটকের অভিনয় করতে আগ্রহান্বিত, এবং তাঁদের অভিনয়ের প্রয়োজনে তরুণ নাট্যকারগণ একাঙ্ক নাটক রচনায় উৎসাহিত হচ্ছেন। কিন্তু অনেক স্থানেই দেখা যায়, তাঁদের লেখবার আগ্রহ যত বেশি জানবার আগ্রহ তত বেশি নয়। একাঙ্ক নাটকের আঙ্গিক ও রচনারীতি সম্বন্ধে ভালো ভাবে না জেনেই অনেকে নাটক রচনা করতে প্রবৃত্ত হন। ফলে একাঙ্ক নাটকের নানা শিথিল ও এলোমেলো রূপ আমরা দেখতে পাই এবং দর্শক, পাঠক ও সমালোচকদের মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

একাঙ্ক নাটক সম্বন্ধে অনেকের মধ্যে এই ভুল ধারণা আছে যে একটি মাত্র অঙ্ক থাকলেই বুঝি তাকে সব ক্ষেত্রে একাঙ্ক নাটক বলা চলে। আজকাল অনেক নাটক কয়েকটি দৃশ্যে বিভক্ত থাকে, কিন্তু তাদের নিশ্চয়ই একাঙ্ক নাটক বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' চারটিমাত্র দৃশ্যে বিভক্ত, কিন্তু ঐ নাটকটিকে কখনই একাঙ্ক নাটক বলা চলে না। দৃশ্যগুলি ওখানে অঙ্কের কাজই করেছে। দৃশ্যস্থানের বৈচিত্র্য, সময়ের বিস্তৃতি ও কাহিনীর জটিলতা আছে বলেই নাটকটিকে একাঙ্ক নাটক বলা চলে না। আবার 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটক দুটির মধ্যে একটি করে মাত্র অঙ্ক থাকা সত্ত্বেও একাঙ্ক নাটকের শ্রেণীতে ওদের ফেলা যাবে না, কারণ নাটক দুটির মধ্যে চরিত্রের যে বহুলত্ব ও ঘটনার যে বিচিত্র আবর্তময়তা দেখা যায় সে-সব একাঙ্ক নাটকের ধর্মবিরোধী।

তবে একাধিক দৃশ্যবিশিষ্ট নাটককেও কোনো কোনো স্থলে একাঙ্ক নাটকের শ্রেণীভুক্ত করা হয়। একাধিক দৃশ্যবিশিষ্ট একাঙ্ক নাটকের আবার দুটি বিভাগ করা যায়। প্রথম বিভাগে ফেলা যায় সেই নাটক-গুলিকে যেগুলির শুধু দৃশ্যসংখ্যাই একের অধিক নয়, দৃশ্যপরিবেশও একাধিক। এই ধরণের নাটককে একাঙ্ক বলা খুবই শক্ত, কারণ দৃশ্যপরিবেশের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাগত অবিচ্ছিন্নতা ও ভাবগত ঐক্য

হয়। একাধিক দৃশ্যবিশিষ্ট দ্বিতীয় বিভাগে সেই নাটকগুলির স্থান দেওয়া যায়, যেগুলিতে দৃশ্যের বহুলত্ব থাকলেও দৃশ্যসজ্জার বৈচিত্র্য নেই। The Monkey's Paw, নোয়েল কাওয়ার্ডের Firmed Oak প্রভৃতি নাটককে এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে। এই ধরনের নাটকে একাধিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয় শুধু কেবল সময়ের অতিক্রান্তি বোঝাবার জন্য। কিছুক্ষণ পর্দা ফেলে অভিনয়ের বিরতি ঘটিয়ে দর্শকদের মনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সম্বন্ধে বিশ্বাস উদ্রেক করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য। অভিনীত নাটকের ঘটনার ব্যাপ্তি যদি অভিনয়ের সময়ের অপেক্ষা বেশি হয় তা হলেই এই রকম পর্দাপাতের প্রয়োজন হয়। অবশ্য অনেক সময় মঞ্চের কোনো অভিনেতার দ্বারা টুকিটাকি কোনো কাজ করিয়েও সময়ের ব্যবধান বোঝানো হয়ে থাকে। ঘরসাজানো, কাপড়চোপড় গোছানো, বিছানাপাতা, আসবাবপত্র ঝাড়ামোছা প্রভৃতি অনেক নীরব কাজের মধ্য দিয়েও সময়ের ব্যাপ্তি অনেক সময় বোঝানো হয়। স্ট্রীণ্ডবার্গের Miss Julia নাটকে জন ও জুলিয়া কথা বলতে বলতে নাচবার জন্য বেরিয়ে গেল, আবার কিছুক্ষণ নাচবার পরে ফিরে এল। এই নাচবার সময়টুকু বোঝাবার জন্য তারা চলে যাবার পর কুষ্টিন টেবিল পরিষ্কার, থালা ধোয়া, প্রসাধন ইত্যাদি কাজগুলি করেছে। আজকাল আলোকনিয়ন্ত্রণের দ্বারা দিয়েও সময়ের অতিক্রান্তি বোঝানো হ'য়ে থাকে। অবশ্য আলোকনিয়ন্ত্রণের দ্বারা দিয়ে একই দিনের বিভিন্ন সময় শুধু বোঝানো সম্ভব, বহুদিনের ব্যবধান আলোকনিয়ন্ত্রণের দ্বারা দিয়ে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সকালের কোনো দৃশ্যে হয়তো নাটকের আরম্ভ হল, কিছুক্ষণ ঘটনা চলবার পর হয়তো আলোকসম্পাতের দ্বারা দিয়ে সন্ধ্যার দৃশ্য দেখানো হ'ল। দিনের বিভিন্ন বর্ণ বর্তমানে সুকৌশলী আলোকসম্পাতের দ্বারা দিয়ে ধরা পড়ে বলে দর্শকদের সময়ের ব্যবধান বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। শুধু কেবল দু'জন কি তিনজন লোক নাটকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যদি কথা ব'লে যায় তবে ঘটনা একঘেয়ে ও মন্থরগতি হয়ে পড়বার সম্ভাবনা। সেজন্য ঘটনার বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন চরিত্রের আমদানী করা দরকার, আবার এও দেখতে হবে চরিত্রসংখ্যা বেশি হ'লেও চলবে না। একাঙ্ক নাটকের একটি গুরুতর সমস্যা এখানে। একটি কি দু'টি চরিত্রকে একই দৃশ্যের মধ্যে বার বার আনতে হবে, অথচ প্রতিবার তাদের আগমন যাতে অনিবার্য হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে, আবার একই চরিত্রের দু'বার আগমনের মধ্যে বেশ কিছুটা সময়ের ব্যবধানও বোঝাতে হবে। অনেক প্রসিদ্ধ নাটকেই এগুলি সম্বন্ধে একটু শিথিলতা দেখা যায়। Riders to the Sea নাটকে বার্টলি মা ও বোনেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেলায় যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ল, পিছনের ঘোড়ার ধাক্কায় সমুদ্রের মধ্যে পড়ে ভেসে গেল এবং পরে তার দেহ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসা হ'ল। এই সব ঘটনার দ্বারা দিয়ে যে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে তা মা ও মেয়েদের কথোপকথনের সময় থেকে অনেক বেশি। মাত্র কয়েক মিনিটের কথোপকথনের অন্তরালে অন্তত কয়েক ঘণ্টার ঘটনা ঘটে গেছে এটা দর্শকদের বিশ্বাস করে নিতে হয়। Waterloo নাটকটির মধ্যে সার্জেন্ট তিনবার করপোর‍্যালের বাড়িতে এসেছে। নাটকটির অভিনয় বড় জোর আধঘণ্টা পর্যন্ত চলতে পারে। সেই সময়টুকুর মধ্যে একই দৃশ্যে কোনো একটি চরিত্রের তিনবার আসা একটু অস্বাভাবিক ঠেকতে পারে। অবশ্য এই অস্বাভাবিকতাটুকু দর্শকরা মেনে নেয়। যেখানে ঘটনার সময়-ব্যাপ্তি ও অভিনয়ের সময়-ব্যাপ্তি প্রায় একরূপ হয় সেখানেই একাঙ্ক নাটকের নিখুঁত রূপটি আমরা পাই। The Rising of the Moon, The Bishop's Candlestics প্রভৃতি নাটকের মধ্যে আঙ্গিকের এই উৎকর্ষ আমরা লক্ষ্য করি।

একাঙ্ক নাটকের অন্তর্বিকটি এখন আমরা একটু বিচার ক'রে দেখব, তা হল এর নাটকত্ব। একাঙ্ক

নাটক একাঙ্ক হলেও নাটক তো বটে, তাই নাটকের গুণগুলি, অর্থাৎ ঘাতপ্রতিঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব, নাট্যোৎকণ্ঠা, বিস্ময় ও আকস্মিকতা প্রভৃতি সব একাঙ্ক নাটকের মধ্যে সার্থকভাবে সৃষ্টি করা দরকার। ঘটনার মধ্য দিয়ে এই নাটকে ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টি করবার সুযোগ কম, ক'রণ স্বল্পপরিসর ঘটনা ও স্বল্পবিস্তৃত সময়ের মধ্যে এই নাটককে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। সেজন্য চরিত্রের মধ্যে যে জটিলতা ও পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তি থাকে সেগুলিই পরিস্ফুট করে নাটকের মধ্যে তীব্র নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। Miss Julia নাটকে জুলিয়া চরিত্রের যে প্রেম ও ঘৃণার পর পর প্রকাশ নাটকের মধ্যে দেখা গিয়েছে তার মধ্য দিয়ে চরম নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে। Salome নাটকের মধ্যে যে স্যালোমে জোনাকানকে একটি চুম্বন দেবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠল সেই আবার তার ছিন্ন মস্তক পাবার জন্য অনমনীয় দাবী জানিয়ে বসল। এই অপ্রকৃতির প্রবৃত্তিময়তা আমরা দেখতে পাই শ্রীমন্থ রায়ের রাজপুরী, বিদ্যুৎপর্ণা প্রভৃতি নাটকে। কবিশেখরের প্রেমে আত্মহারা রাণী অবশেষে তারই চোখ দুটি উৎপাটন করে এনে দিতে বললেন। এরূপ পরস্পরবিরোধী প্রকৃতির সমাবেশ নাট্যকার যত অধিক পরিমাণে করবেন ততই তাঁর নাটক নাট্যগুণসমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে। নাটকীয়তা সৃষ্টি করবার আর একটি উপায় হল Suspense অথবা নাট্যোৎকণ্ঠা জমিয়ে তোলা। Suspense সমস্ত নাটকটিকে চুম্বকের মত ধ'রে রাখে। ঘটনার কোনো অপরিজ্ঞাত রহস্য, কিংবা চরিত্রের কোনো অজ্ঞাতপ্রায় দিক সম্বন্ধে দর্শকদের উত্তেজনাপূর্ণ কৌতূহল যতই জাগিয়ে রাখা যাবে ততই নাট্যোৎকণ্ঠা জমে উঠবে। নাট্যোৎকণ্ঠা সুকৌশলে সৃষ্টি করতে পারলে নাটকের ঘটনা কিরূপ শ্বাসরোধকারী তীব্রতা লাভ করে তার পরিচয় পাওয়া যায় Hewers of Coal, A Night at an Inn, The Monkey's Paw, বনফুলের শিবকাবাব প্রভৃতি নাটকে।

একাঙ্ক নাটকের বিস্তৃতি কম বলে এই নাটকের মধ্যে চরিত্রের বহুলত্ব এবং ঘটনার ধারাবৈচিত্র্য আনবার সুযোগ নেই। পূর্ণাঙ্গ নাটকে বিভিন্ন ধরণের চরিত্রের অবতারণা করে কিংবা ঘটনার প্রধান ধারার সঙ্গে নানা উপধারার সংযোগ ক'রে যে কৌতূহলোদ্দীপক রসের বিচিত্রতা সৃষ্টি করবার সুযোগ আছে একাঙ্ক নাটকে তা নেই। বৈচিত্র্যের স্থলে ঐক্য এবং বিস্তারের স্থলে ক্রতধাবমান গতিই হ'ল একাঙ্ক নাটকের আদর্শ। পরিসর সীমাবদ্ধ বলে নাটকের চূড়ান্ত স্তরটি (climax) আনতে বিলম্ব করলে চলবে না। দ্বন্দ্ব-জটিলতার মধ্য দিয়ে নাটকের দ্রুতপরিণতি ঘটানোই হ'ল এই নাটকের উদ্দেশ্য। এই পরিণতিতে নাটকের গোড়ার অবস্থার বৈপরীত্য হ'তে পারে, যেমন Miss Julia ও The Rising of the Moon নাটক দু'টিতে জুলিয়া ও সার্জেন্ট চরিত্রের বিপরীত অবস্থাপ্রাপ্তি। আবার এই পরিণতিতে মধ্যকালীন সঙ্কটের পর প্রথম অবস্থার সমরূপও দেখা যেতে পারে, যেমন Hewers of coal নাটকের গোড়ায় কয়লাখনির শ্রমিকদের যে নিরাপদ অবস্থা দেখি, নাটকের মধ্যবর্তী সঙ্কটের পর অবশেষে সেই নিরাপদ অবস্থার আভাসেই নাটকের শেষ হ'ল।

একাঙ্ক নাটকের সংলাপেরও একটা বিশিষ্টতা আছে। পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংলাপে মাঝে মাঝে যে ব্যাখ্যা ও বিস্তার দেখা যায় একাঙ্ক নাটকে তার কোনো স্থান নেই। এই নাটকের সংলাপ দ্রুত ও ক্ষিপ্র হওয়া দরকার। এখানে অল্প কথায় অনেক বেশি ভাব ব্যক্ত করতে হয় বলে সংলাপের বাক্যগুলি ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী না হ'লে চলে না। বিরোধী উক্তি, শ্লেষগর্ভ মন্তব্য, গূঢ় অর্থদ্যোতক বাক্যবিন্যাস এখানে বিশেষ উপযোগী।

বিংশ শতকের বঙ্গ রঙ্গালয়

শচীন সেনগুপ্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

১৯০১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সব নাটক কোন না কোন কারণে স্মরণযোগ্য তার একটা তালিকা দিই :—

রবীন্দ্রনাথের রচনার নাট্যরূপ 'বসন্তরায়' (মিনার্ভা ১৯০১) চুনীলাল দেবের 'কৃষ্ণ ও দয়রী' (ঐ) অমর দত্তের 'চাবুক' (ক্লাসিক, ঐ) গিরিশের 'অশ্রুধারা' (ঐ) মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর। ওর চরিত্র ভারতমাতা, ভারত সন্তান, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, অরাজকতা। নাটকখানি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এখানি ভিক্টোরিয়া-শাসন প্রশস্তি, তাঁর তিরোভাবে ভারত-সন্তানগণের শঙ্কা ; 'নীলদর্পণ' (ষ্টারে পুনরাভিনীত, ঐ) অমৃত বসু রূপান্তরিত 'বিষবৃক্ষ' (ষ্টারে ঐ) ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দাক্ষিণ্য' (অরোরা, ঐ) দ্বিজেন্দ্রলালের 'বড় আছো' (ক্লাসিক, ১৯০২) গিরিশের 'ছত্রপতি শিবাজী' (ঐ) গিরিশের 'ভ্রান্তি' (ঐ) অমৃতলালের 'নবজীবন' (ষ্টার ঐ) ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নন্দনী প্রতিমা', 'সাবিত্রী', 'বেদৌরা' (ঐ) রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাল-পরিণয়' (অরোরা) মনোমোহন রায়ের 'রিজিয়া' (ঐ)। রিজিয়া সম্বন্ধে স্মরণীয় বিষয় এই যে, স্কটের কেনিলওয়ার্থকে লেখক রিজিয়ায় রূপান্তরিত করেছিলেন, এবং নাটকখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল ; দীর্ঘকাল জনপ্রিয় ছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' (মিনার্ভা ১৯০৩) 'আনন্দমঠ' (ঐ) ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' (ষ্টার, ঐ) স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার দু'বছর আগে, হারাণ রক্ষিতের 'বঙ্গের শেষ বীর' অমর দত্ত কর্তৃক প্রতাপাদিত্য নামে রূপান্তরিত (ক্লাসিক ঐ) অতুল মিত্রের 'হিরণ্ময়ী' (ঐ) দ্বিজেন্দ্রলালের 'তারাবাঈ' (ইউনিক, ঐ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'হিতে বিপরীত' (মিনার্ভা ১৯০৪) মনোমোহন গোস্বামীর 'সংসার' (ঐ) অর্দ্ধেন্দুশেখরের 'ভগবান ভূত' (ঐ) প্রতাপাদিত্য (ঐ, পুনরভিনীত) ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঞ্জাবতী' (ষ্টার ঐ) অমৃতলালের 'বাহবাবাতিক' (ঐ) গিরিশের 'সংনাম' (ক্লাসিক, ঐ) দুইটি অভিনয়ের পর পুলিশ আভিবিধেবের অজুহাতে অভিনয় বন্ধ করে দেয়। সংনামী সম্প্রদায় ঔরঙ্গজেবের ইস্লামীকরণের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেছিলেন, তাই নিয়ে এই নাটক রচিত। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (ঐ), গিরিশের 'বলিদান' (মিনার্ভা ১৯০৫), দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণাপ্রতাপ' (ষ্টার, ২২শে জুলাই, ঐ), আবার মিনার্ভা (২৯শে জুলাই, ঐ), ষ্টারের অভিনয় শ্রেষ্ঠতর হয়। গিরিশের সিরাজদ্দৌলা (মিনার্ভা ঐ), ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পদ্মিনী' (ষ্টার, ঐ) মনোমোহন গোস্বামীর 'পৃথ্বীরাজ' (গ্রাণ্ড থিয়েটার, আলফ্রেড, ঐ), বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ (১৬ই অক্টোবর, ঐ) গিরিশের মীরকাসিম (মিনার্ভা, ১৯০৬), অতুলমিত্রের 'শিরীফরহাদ' (ঐ) দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' (ঐ) গিরিশের 'ব্যাপনা কী ত্যায়সা' (ঐ) ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (ষ্টার, ঐ) ক্ষীরোদ প্রসাদের 'চাঁদবিবি' (কোহিনুর, ১৯০৭) গিরিশের 'প্রফুল্ল' (ষ্টারে, ঐ, মিনার্ভায় ঐ) দ্বিজেন্দ্রলালের নূরজাহান (মিনার্ভা ১৯০৮) দ্বিজেন্দ্রলালের 'সোরাব রোস্তম' (মিনার্ভা, ১৯০৯) গিরিশের 'শাস্তি কি শান্তি' (ঐ) দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' (ঐ) ক্ষীরোদ প্রসাদের 'অশোক' (কোহিনুর, ঐ) 'বাসন্তী ও বরুণা' (ঐ) হরনাথ

বসুর 'পাঞ্জাব গৌরব' (ঐ) দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' (মিনার্ভা, ঐ) হরনাথ বসুর 'মথুর সিংহাসন' (কোহিনুর, ঐ) হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের 'দুর্গাবতী' (ঐ) ক্ষীরোদ প্রসাদের 'বাঙ্গলার মসনদ' (মিনার্ভা ১৯১০) অমর দত্ত এই বছরে নাট্যমন্দির মাসিক পত্র প্রকাশ করেন নিজ সম্পাদনায়। মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজীরাও' (গ্রেট ন্যাশনাল, ১৯১১) দ্বিজেন্দ্রলালের 'হরিনাথের শ্বশুর বাড়ী যাত্রা' (ষ্টার, ঐ) অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রকমারি' (মিনার্ভা, ঐ) অতুল মিত্রের 'রকমফের' (ঐ) শেরিডানের School for Scandal এর অনুপ্রেরণায় রচিত, গিরিশের শেষ সম্পূর্ণ অবদান 'তপোবল' (ঐ) হরিশ সাহ্যালের 'বিশ্বমিত্র' (কোহিনুর, ঐ) ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯১২ গিরিশের মৃত্যু হয়। ২১শে সেপ্টেম্বর 'গৃহলক্ষ্মী' (মিনার্ভা, ঐ) ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে খণ্ডিত বাংলা পুনরায় সংযোজিত হয় প্রবল গণ-আন্দোলনের ফলে, এবং ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কোলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। বিংশ শতকের প্রথম বারো বছরে যে নাটকগুলি প্রসিদ্ধিলাভ করেছে, তা পড়বার সুযোগ যাদের হবে না শুধু নামগুলি নজরে রেখে তাঁরাও বুঝতে পারবেন, জাতীয় আন্দোলন বঙ্গরঙ্গালয় কী আশ্চর্য নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিফলন করেছে।

গিরিশের মৃত্যুর পর চার বছর পরে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ই জানুয়ারী তারিখে অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। ১৯১২ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত যে নাটকগুলি প্রসিদ্ধিলাভ করে তা এই :—

মনোমোহন গোস্বামীর 'ধর্ম-বিপ্লব' (ষ্টার, ১৯১৩) অমরেন্দ্রনাথের 'কিসমিস' (ঐ) ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' (মিনার্ভা, ঐ) রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' (ঐ) প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'ভাগ্যচক্র' (ঐ) অমৃতলালের 'নবযৌবন' (ঐ) রবীন্দ্রনাথের শান্তির নাট্যরূপ 'অভিমানিনী' (ষ্টার, ১৯১৭) দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরূপ 'অকলঙ্কশশী' (ঐ) মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহল্যাবাঈ' (ঐ) ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ক্ষত্রবীর' (ঐ) অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের 'আহুতি' (Sign of the Cross অবলম্বনে মিনার্ভা, ঐ) অমরেন্দ্রনাথের Sign of the Cross (ষ্টার, ১৯১৫) ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সওদাগর' Merchant of Venice অবলম্বনে (ষ্টার, ঐ) দ্বিজেন্দ্রলালের 'সিংহল বিজয়' (মিনার্ভা, ঐ) অপরেশের 'শুভদৃষ্টি' (ঐ) মিলটন অবলম্বনে, দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের 'কণ্ঠহার' (মনোমোহন, ঐ) রাধালাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রমা' (থেসপিয়ান, ঐ) হেনরী উডের ইংরেজীর গল্প, রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' (ঐ) 'রমা'য় নট-নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী সর্বপ্রথমে নকশাঙ্কন করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গনারী' (মিনার্ভা ১৯১৬) অপরেশের 'রামানুজ' (ঐ) নিশিকান্ত বসুর 'বাজীরাও' (মনোমোহন, ঐ) সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোগল-পাঠান' (ঐ) পাথিপথ (মনোমোহন ১৯১৭) নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাহুকালা' (ঐ) ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বঙ্গে রাঠোর' (ঐ) প্রমথ রায়চৌধুরীর 'চিতোরোদ্ধার' (মিনার্ভা ১৯১৮) ক্ষীরোদপ্রসাদের 'কিন্নরী' (মিনার্ভা, ঐ) শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌয়ে'র নাট্যরূপ, ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত (ষ্টার, ঐ) নিশিকান্ত বসুর 'দেবলাদেবী' (মনোমোহন, ঐ) পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের 'পরদেশী' (মনোমোহন, ঐ) বরদাপ্রসাদ গুপ্তের 'মিশরকুমারী' (মিনার্ভা ১৯১৯) দেবেন্দ্র বসু অনুদিত ওথেলো (ষ্টার, ঐ) অপরেশের 'উর্বশী' (ঐ) জ্ঞানেন্দ্র গুপ্ত আই, সি, এস রচিত 'মনীষা' (মিনার্ভা, ১৯২০) রবীন্দ্রনাথের 'বশীকরণ' (ঐ) 'বিল্বমঙ্গল' ফিল্ম চিত্র সহ (মনোমোহন ঐ) অপরেশের 'রাখীবন্ধন' ইবসেনের Warriors of Heligoland অবলম্বনে, 'ছিন্নহার' মাল্লী করেলী অবলম্বনে (ষ্টার, ঐ) ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেলোর কীর্তি' (মিনার্ভা, ১৯২১) সত্যেন্দ্র দে রূপান্তরিত আগাহসার কুনা অবলম্বনে 'অপরাধী কে?' (বঙ্গ কোম্পানীর বেঙ্গলী থিয়েট্রিকাল, উত্তরা সিনেমা, ঐ) ক্ষীরোদ

প্রসাদের 'ক্ষণিকমীর' (ঐ) নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের ব্যবসায়ী 'রঙ্গালয়ে' প্রথমাবতরণ। অপরেশের 'বাসবদত্তা' (ষ্টার, ঐ) তাস অবলম্বনে। অপরেশের 'অযোধ্যার বেগম' (ঐ) 'চন্দ্রগুপ্তে'র পুনরভিনয় (মিনার্ভা ১৯২২) নটশেখর নরেশ মিত্রের আর রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ব্যবসায়ী মঞ্চে অবতরণ। নির্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নবাবী আমল' (ষ্টার, ঐ) নিশিকান্ত বসুর 'বঙ্গেবর্গী' (মনোমোহন, ঐ) মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মুক্তার মুক্তি' (বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী, ঐ) ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রক্তেশ্বরের মন্দির' (ঐ)

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার যখন মনন কোম্পানীর থিয়েটারে অবতীর্ণ হন, তখন কেউ কল্পনাও করেনি যে, ইংরেজী সাহিত্যের একজন অধ্যাপক অধ্যাপনা ত্যাগ করে নটের পেশা অবলম্বন করবেন। যদিচ তাঁর অভিনয় খ্যাতি তার বহু পূর্বেই ছড়িয়ে পড়েছিল ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে এবং ওভাবে তিনি যে-সব অভিনয় করেছিলেন তাই থেকে। গ্রাজুয়েট অভিনেতা তার আগেও ব্যবসায়ী মঞ্চে অভিনয় শুরু করেন। নাট্যকার হারাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নট-নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামীও তাই করেন। নট-নাট্যকার যোগেশচন্দ্রও শিক্ষকতা ত্যাগ করে ব্যবসায়ী থিয়েটারে যোগ দেন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। নরেশ মিত্র ওকালতির জন্য তৈরী হয়েও তা উপেক্ষা করে, আর রাধিকানন্দ সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটে চাকুরী ছেড়ে ব্যবসায়ী মঞ্চে যোগদান করেন শিশিরকুমারের এক বৎসর পরে, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য দুই বছর পরে। যখন কোম্পানীর কর্ণধার রোশনজী একদিন কোন বাঙালী অভিনেতার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে শিশিরকুমারের সামনেই বাঙালী জাতি সম্বন্ধে অসম্মানজনক উক্তি করেন। শিশিরকুমার তখনই তাঁর কাছ থেকে থিয়েটারের চিঠি লিখবার কাগজ চেয়ে নিয়ে কর্মত্যাগপত্র লিখে রোশনজীর হাতে অর্পন করে তখনি অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন। রোশনজী কিছুতেই আর তাঁকে ফিরিয়ে নিতে পারেন না!

শিশিরকুমার ব্যবসায়ী মঞ্চে যোগদান করে কোলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ধনিক ও নাট্যরসিক নাগরিককে একটি আধুনিক থিয়েটার গড়ে তোলবার প্রেরণা দেন। তাঁরা হচ্ছেন বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের সিনিয়র সত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, তৎকালীন প্রখ্যাত সলিসিটর সতীশ সেন, ধনাঢ্যবন্ধু নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, তাঁর মাতুল বিখ্যাত মাইকা-ব্যবসায়ী কুমারকৃষ্ণ মিত্র, পরে সুবর্ণ বণিক সমাজের নায়ক গঙ্গাধর মল্লিক, এবং প্রসাদ দাঁস বড়াল কোম্পানীর অরুণ বড়াল। এই অভূতপূর্ব যোগাযোগ সাধন করেন প্রমোদচন্দ্র গুহ মহাশয়, যিনি পরবর্তীকালে নাট্যজগতের বিসদার্ক বলে কথিত হতেন।

ওঁদের চেষ্টায় লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আট থিয়েটার গঠিত হয়। ওঁরা স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠানটি কিনে নেন (বাড়িটি নয়) এবং বাড়িটিকে ও প্রেক্ষাগারকে নতুন রূপ দেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জুন দিয়ে আট থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। দৃশ্যপটে, পোষাক-পরিচ্ছদে, কর্ণার্জুন নানা নূতনত্ব আনয়ন করে, সব স্টারের ঘর দিয়ে কনসার্ট বাজাবার ব্যবস্থা করা হয়। তিনকড়ি চক্রবর্তী অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায় এই নাটকেই সর্বপ্রথমে ব্যবসায়ীমঞ্চে অবতরণ করেন। নরেশমিত্রও ওঁদের সঙ্গে যোগ দেন। কর্ণার্জুন সব দিক দিয়েই নব-যুগের পরিচয় দেয়।

ওই বছরেই বড় দিনের সময় ইডেন গার্ডেনে একটি একজিবিশন হয়। সেই একজিবিশনে শিশিরকুমার একটি সম্প্রদায় গঠন করে বিজেন্দ্রলালের সীতা অভিনয় করেন। বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারাকুমার ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবি রায়, জীবন গাঙ্গুলী, প্রভা, শিশিরকুমারের সঙ্গে অভিনয় করেন।

মনোমোহন ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কোন দলেই জমাতে পারে না। থানীবাবুকে নিয়েও নয়।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর বদ্যসপ্তাহিক নিবেদন হিসেবে অপরেশচন্দ্র রচিত 'ইরাণের রাণী' (অস্কার ওয়াইল্ডের দি ডাচেস অব পাদুয়ার অনুবাদ) স্টেজ করিয়ে তোলে। বাংলার প্রথম একাঙ্ক নাটক মন্মথ রায়ের মুক্তির ডাক ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বড় দিনের সময় অভিনীত হয়। প্রমথ চৌধুরী নাটকখানির প্রশংসা করেন।

বাড়ী পুড়ে যাওয়ায় মিনার্ভা থিয়েটার আলফ্রেড মঞ্চে মনোমোহন রায় রচিত 'জীবন-যুদ্ধ' (১৯২৪) অভিনয় করেন। হুগোর লে-মিজারেবেল্ অবলম্বনে নাটকখানি লিখিত হয়। ওই বছরেই মিনার্ভা সম্প্রদায় ওই মঞ্চে ভূপেন্দ্রনাথের 'ভোর বরাত' আর 'কুতান্তের বজ্র দর্শন' অভিনয় করেন। তারপর সম্প্রদায় শহরতলীতে অভিনয় করে ঘুরে বেড়ান। তখন শিশিরকুমার মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত রসমঞ্জরী লীলা নিয়ে ওই মঞ্চেই তার নব-সম্প্রদায়ের উদ্বোধন করেন।

নিশিকান্ত বসুর 'ললিতাদিত্য' (মনোমোহন ১৯২৪) অভিনীত হয়। কিন্তু দানী বাবুর অভিনয় নিয়ে কয়েকখানি কাগজে ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশিত হওয়ায় থিয়েটারের মালিক মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় মনে করলেন নতুন দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পূর্বোক্ত প্রাচীনেরা পেরে উঠবে না। তিনি থিয়েটারের ব্যবসা ত্যাগ করবেন স্থির করলেন। ওই ব্যবসা করে তিনি প্রকাণ্ড জমিদারী করেছিলেন, বিডন ষ্ট্রীটে অনেকগুলি বাড়ী করেছিলেন, কাশীতে ধর্মশালা করেছিলেন, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর টাকা দিয়েছিলেন। এ সবই তিনি করেছিলেন থিয়েটারের ব্যবসা করে,—তাঁর মুখ থেকেই আমি শুনেছি। ব্যবসাদারের ক্ষতিতে সর্বস্ব পাছে নষ্ট হয়, এই ভয়েই তিনি ব্যবসা গুটিয়ে নিতে চাইলেন। শিশির সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন। তিনি থিয়েটার লিজ নিয়ে তার নাম দিলেন মনোমোহন নাট্য-মন্দির। তিনিই সর্বপ্রথমে থিয়েটারের বাংলা নাম দিলেন এ কথায় সবটাই সত্য নয়। বাণী থিয়েটার, কোহিনূর থিয়েটার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তবুও থিয়েটার শব্দটি তাঁরা ত্যাগ করতে পারেন না। শিশিরকুমার থিয়েটার শব্দটিই ব্যবহার করলেন না, নাট্যমন্দির থিয়েটারের চেয়ে অনেক বড় বস্তু বলে তিনি মনে করলেন। এই নাম নির্বাচন থেকেই তার আদর্শের আভাস পাওয়া যায়।

শিশিরকুমারের ইচ্ছা ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা নিয়েই মনোমোহনে তিনি অভিনয় শুরু করবেন, কিন্তু আর্ট থিয়েটার গোপনে গোপনে তার সত্ব কিনে নিয়েছিলেন। শিশিরকুমার পরাভব স্বীকার করবার পাত্র নন। তিনি যোগেশচন্দ্রকে দিয়ে সীতা লিখিয়ে নিলেন। তিনি নিজেই বলতেন সীতাহারা রামচন্দ্র স্বর্ণ-সীতা গড়িয়ে নিয়েছিলেন, আমিও তাই গড়িয়ে নোব। নিয়েছিলেনও তাই। সীতা চিরন্তন কাব্য। তাই নাটকের রচনা দুর্বল হলেও দর্শকদের চিত্ত জয় করল রচনার গুণে নয়—প্রযোজনা ও অভিনয়ের গুণে। কাব্যময় বিষয়বস্তুকে যে আবহে পরিবেশন করা প্রয়োজন, শিশিরকুমার তার দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। সমগ্র পরিবেশনাটি এমনই কাব্যময় হয়েছিল যে হাজার হাজার বছরের পুরাতন সীতাও দর্শকদের কাছে একেবারে নতুন মনে হোলো। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় হেমেন্দ্রকুমার রায়, চারু রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন।

সীতায় যে কাব্যসম্পদ ছিল, আর্ট থিয়েটারের কর্ণার্জুনে তা ছিল না, বহিরঙ্গের উপর ঝোঁক ছিল বেশি। শিশিরকুমার কবি ছিলেন। আর্ট থিয়েটারের প্রযোজকর্তাদের মাঝে কেউ তা ছিলেন না। তাই কর্ণার্জুনের প্রযোজনা ও অভিনয় ছিল স্থূল, সীতায় দুই-ই ছিল সূক্ষ্ম। বাঙালী জাতি দুয়ের তারতম্য বুঝতে পারল, কার্ণার্জুনের চেয়ে সীতাকে মর্যাদা দিল বেশি। অবশ্য দলগত খ্যাতি-অখ্যাতি প্রচারও কম ছিল না।

কর্ণার্জুনে মাটির ঘোড়া জোড়া রথের কথা ভুলে যারা পরিহাস করতেন, তাঁরা কিন্তু সীতায় সাঁচি-স্তূপের তোরণের অসঙ্গতির কথা ভেবে যেতেন।

সীতায় ও কর্ণার্জুনে যুগানুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ, স্থাপত্য নিদর্শনের পরিচয় সর্বপ্রথমে পাওয়া যায়, তা না মনোমোহনের, না আর্ট থিয়েটারের, বৈকল্পের পরিচয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংস্কৃত কলেজের অভিনয়ে ওর প্রবর্তনা করেন, এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তা আমদানি করেন ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে। রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্রভাবে ওর রূপায়োগ করতেন, এবং তা যুগের কথা ভেবে করতেন না, করতেন নাটকের বিষয়-বস্তুর কথা ভেবে। দৃশ্যপট এবং আলোর খেলা প্রভৃতি বিষয়ে পার্শি থিয়েটারের ঋণ অস্বীকার করা অসঙ্গত হবে। শিশিরকুমার এবং আর্ট থিয়েটার ও বিষয়ে যেমন যামিনী রায়, চারু রায় প্রভৃতির সাহায্য নিতেন, তেমন পার্শি থিয়েটারের চিত্রকর জহর সাহেবকেও মাঝে মাঝে নিয়োগ করতেন। জহর মিঞাও ছিলেন কবি প্রকৃতির মানুষ।

সীতা-কর্ণার্জুন যখন নবযুগ ঘোষণা করল, তখন মিনার্ভা থিয়েটার ডক্টর নরেশ সেনের 'ঠকের-মেলা' এবং বরদা দাশগুপ্ত রূপান্তরিত দেশবন্ধুর 'ভালিম' মঞ্চস্থ করে (১৯২৫)। শেষের নাটকে একটি বাগান-বাড়ীর রূপ বিস্ময়কর ভাবে দেওয়া হয়। ও-দুটি নাটক অভিনীত হয় আলফ্রেড মঞ্চেতে। ওই বছরেই মিনার্ভার নতুন বাড়ী তৈরি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তার উদ্বোধন করা হয় মহাতপচন্দ্র ঘোষ রচিত 'আত্মদর্শন' নামক নাটক দিয়ে। প্রাচীন সংস্কৃত নাটক প্রবোধচন্দ্রোদয়ের ও-খানি বাংলা রূপ। নাটকখানি সীতা কর্ণার্জুনের চেয়ে কম জনপ্রিয় হয় না।

আলফ্রেড থিয়েটারে নাট্যকার সুধীন্দ্র রাহার প্রয়াসে বেঙ্গল থিয়েটারস লিমিটেড অভিনয় শুরু করেন। নির্মলেন্দু ছিলেন ওর নায়ক। রাহা মহাশয়ের 'মহারাষ্ট্র' ওই দলের প্রথম এবং শেষ নাটক।

১৯২৫ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে যে নাটকগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করে তার তালিকা :

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'গোলকুণ্ডা' (ষ্টার, ১৯২৪) রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' (ঐ) 'গৃহপ্রবেশ' (ঐ) ডক্টর নরেশ সেনের 'ঋষির মেয়ে' (ঐ) ব্যারিষ্টার শ্রীশ বসুর 'পুণ্ডরীক' (মনোমোহন, ঐ) ওই অভিনয়ের পর শিশিরকুমার নাট্যমন্দির লিমিটেড গড়েন। ওর ডিরেক্টর হন শিশিরকুমার, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র এবং তুলসী গোস্বামী। ম্যানেজিং এজেন্টস ভাদুড়ী এণ্ড কোং। কোম্পানি তখন শ্রী চিত্রগৃহটি নিজ নেন, এবং তার নাম দেন নাট্যমন্দির। ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালী' (মিনার্ভা, ১৯২৬) অমৃতলালের 'অধ্যাপিকা বিদায়' (ঐ) অপরেশচন্দ্রের 'ঐরঙ্গ' (ষ্টার, ঐ) সৌরীন্দ্র মুখুজ্জের 'লাখটাকা' (ঐ) রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ' (ঐ) অপরেশের 'চণ্ডীদাস' (ঐ) শিশিরকুমার মিত্র (মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়েরপুত্র, সলিল মিত্রের জ্যাঠতুত ভাই) জানেন্দ্র মিত্র (মহেন্দ্র ও উপেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ছোটবাবু, বঙ্গরঙ্গালয়ের আর এক বিসমার্ক) ভূতপূর্ব সম্পাদক শিশির বসু একত্র মিলিত হয়ে আলফ্রেড মঞ্চে বরদা দাশগুপ্তের 'শ্রীদুর্গা' দিয়ে অভিনয় শুরু করেন 'মিত্র থিয়েটার' নাম দিয়ে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় তাঁরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হন, কিন্তু থিয়েটার তুলে দেন না, ক্ষীরোদ প্রসাদের 'জয়শ্রী' (ঐ) এবং বহু পুরাতন নাটক অভিনয় করেন। নাট্যমন্দির লিমিটেডের উদ্বোধন হয় শ্রী চিত্রগৃহে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক দিয়ে। অভিনয়ের প্রযোজনায় অনুপম নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। গিরিশের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' (ঐ) ক্ষীরোদ প্রসাদের 'নরনারায়ণ' (ঐ) রবীন্দ্রনাথের 'পরিত্রাণ' (ষ্টার, ঐ)

শিশির কুমার নাট্য মন্দির গঠন করে শ্রী গৃহে স্থানান্তরিত হলে আর্ট থিয়েটার মনোমোহন মঞ্চেও অভিনয়ের আয়োজন করেন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে অপরেশের 'শ্রীরামচন্দ্র' দিয়ে। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের

'তুলসীদাস' (মিনার্ভা ১৯২৭) শ্রীশ মুখোপাধ্যায়ের 'রামানন্দ আর্ট' (ঐ) মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর' (মনোমোহন ঐ) শরৎচন্দ্রের 'বোড়শী' (নাট্য মন্দির, ঐ) রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা' (ঐ, একমাস পরে) দু'খানি নাটক একসঙ্গে অভিনীত হতো। অমৃতলালের 'যাজ্ঞসেনী' (মিনার্ভা, ১৯২৮) জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'সত্যের সন্ধান' (ঐ) শরৎ ঘোষের 'জাতিচ্যুত' (ঐ) রাজা গণেশের কাহিনী। পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের 'আরবী হুর' (মনোমোহন) বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের 'ঘাঁটোয়াল' (ঐ) নিশিকান্ত বসুর 'পথের শেষে' (ঐ) ধানীবাবু দুর্গাশঙ্করের ভূমিকায় পূর্ণখ্যাতি অর্জন করেন। মন্মথ রায়ের 'রেবাসুর' ও 'শ্রীবৎস' (ষ্টার, ঐ) শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' (ঐ) শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ 'রমা' নামে (নাট্যমন্দির, ঐ) যোগেশচন্দ্রের 'বিশ্বজয়ী' (ঐ) বরদা, দাশগুপ্তের সুভদ্রা হরণ, (মিনার্ভা (১৯২৯) শরৎ ঘোষের শ্রী (ঐ) বরদা দাশগুপ্তের 'কর্ণধার' (মনোমোহন ঐ) জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রাণের দাবী' (ঐ) শচীন সেনগুপ্তের 'রক্তকমল' (ঐ) সামাজিক নাটকে নতুন বিষয়-বস্তু ও নতুন ধর্ম দেওয়া হয়। নজরুল গান রচনা করেন। মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাগরণী' (ঐ) মন্মথ রায়ের 'মহুয়া' (ঐ) ওই বছরের ২রা জুলাই অমৃতলালের মৃত্যু হয়। ভূপেন্দ্র বন্দ্যোর শঙ্খধ্বনি (নাট্যমন্দির, ঐ) The Bells অবলম্বনে রচিত। রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' (ঐ) নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমারের শেষ অভিনয়, নাট্যমন্দির লিমিটেডের অবসান।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত যে-সব নাটক কোন-না কোন কারণে খ্যাতি পেয়েছিল, উপরে তারই তালিকা দিয়েছি। আরো বহু নতুন নাটক অভিনীত হয়, পুরাতন নাটকের পুনরাভিনয়ও হয় প্রচুর। তার হিসেব দিই নি। রবীন্দ্রনাথ যে-সব নাটক রচনা করেন, তাও জানা দরকার। এখন তাই দিচ্ছি— বাল্মিকী প্রতিভা (১৮৮১) কালমৃগয়া (১৮৮২) বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮৯) রাজা ও রাণী (ঐ) বিসর্জন (১৮৯০) মালিনী (১৮৯৬) বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭) শারদোৎসব (১৯০৮) প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯) রাজা (১৯১০) ডাকঘর (১৯১২) বিদায় অভিশাপ ও অচলায়তন (ঐ) ফাল্গুনী (১৯১৬) গুরু (অচলায়তনের অংশ ১৯১৮) অরূপরতন (১৯১৯) গুপ্তপোষ (১৯২১) মুক্তধারা (১৯২২) গৃহপ্রবেশ (১৯২৩) শোধবোধ, নটীর পূজা, ঋতু উৎসব, রক্তকরবী (১৯২৬) পরিত্রাণ, তপতী (১৯২৯) তাসের দেশ, চণ্ডালিকা (১৯৩৩) চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য (১৯৩৬) শ্যামা ও চণ্ডালিকার নতুনতর রূপ (১৯৩৯)।

নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের উদ্যোগপর্বই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ। নাট্যমন্দির উঠে যাওয়ায় তিনি অত্যন্ত মুষড়ে পড়েন, এবং তখন থেকেই তিনি বলা শুরু করেন যে দেশের লোক তাকে অবজ্ঞা করল। কিন্তু দেশের লোক তা করে নি। লোক সমাগমের অভাবে তাঁর থিয়েটার উঠে যায় নি। থিয়েটার চালু রাখবার মতো অর্থ দর্শকরা যুগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি যে অপব্যয় করতেন, তাতে সাগরও শুকিয়ে যেত। ধনী অনুরাগীরা তাঁকে বরাবরই সহায়তা করেছেন, কিন্তু তাঁর অবিরত অনাচারে শুধু তাঁরাই নন, দর্শক সাধারণও ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন। নাট্যমন্দির উঠে যাবার পর তিনি আর্ট থিয়েটারে কিছুদিন অভিনয় করেন এবং সেখান থেকেই একটি দল গড়ে আমেরিকার যান অভিনয় করবার কনট্রাক্ট নিয়ে।

১৯০০ থেকে কোলকাতার থিয়েটারে অভিনীত এই নাটকগুলি স্মরণ যোগ্য :—অপরেশের 'শকুন্তলা' (ষ্টার ১৯০০) রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' (মনোমোহন, ঐ) শচীন সেনগুপ্তের 'পৈরিক পতাকা' (মনোমোহন, ঐ) তখন কংগ্রেস বে-আইনি বলে বিঘোষিত, সংবাদপত্র বন্ধ। বিক্ষুব্ধ জাতি এই নাটকে মুক্তির বাণী পেয়ে মুগ্ধ হলো। নাটকখানি কারারুদ্ধ মুক্তাবচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত, ঐতিহাসিক নাটকের নব যাত্রাপথ রচনা করে। মন্মথ রায়ের কারাগার (ঐ) পূর্ববর্তী নাটকের মতোই উত্তেজনার সঞ্চার করে ; নজরুল রচিত গান। পুলিশ

নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেয়। সৌরীন মুখোপাধ্যায়ের 'স্বয়ম্বরা' (সাহিত্য, ষ্টার ১৯৩১) অপরেশের 'শ্রীগৌরাঙ্গ' (ঐ) ঘানীবাবু চালান গোপাল। গৈরিক পতাকার অর্ধাগান শুরু হতেই প্রবোধ গুহ মহাশয় রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের পুরো-কারখানাটিতে নাট্যনিকেতন গড়বার কল্পনা করেন এবং গড়েও তোলেন, কিছু ধার-দেনাও করেন। সেই বাড়িই শিশিরকুমারের হাতে গিয়ে শ্রীরঙ্গম হয়, এখন হয়েছে বিশ্বরূপা। নাট্যনিকেতনের প্রথম নাটক প্রবতারা উপন্যাসের নাট্যরূপ হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৯৩৬) শচীন সেনগুপ্তের 'ঝড়ের রাতে' (ঐ) তিনঘণ্টা ব্যাপী এক অঙ্কের এক দৃশ্যের নাটক, একটি রাতের ঘটনা। সেটিং ও আবহ সৃষ্টিতে সতু সেন বিস্ময় সৃষ্টি করেন। সপ্তাহের দাত দিনই অভিনীত হোতো ; মেম্বারশিপ থিয়েটারের প্রথম প্রয়াস। নজরুলের গীতিনাট্য 'আলেয়া' (ঐ) নিরুপমা দেবীর 'দিদি' শিবরাম চক্রবর্তী প্রদত্ত নাট্যরূপ (ঐ) শরৎ ঘোষের 'অভিশাপ' (মিনার্ভা ঐ) সামাজিক নাটকে নতুন বিষয়-বস্তু।

নাট্যনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হবার পর কৃষ্ণচন্দ্র দে, আর রবীন্দ্রমোহন রায় ইউসুফ সাহেব নামক জনৈক মুসলমান কনট্রাকটারের সহায়তায় বর্তমান রঙমহল ভবনটি তৈরি করেন। শিশিরকুমার আমেরিকা থেকে ফিরে এসে রঙমহলে যোগ দেন। যোগেশ চৌধুরী বিরচিত 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' (১৯৩৮) নিয়ে উদ্বোধন হয়। সতু সেন এই নাটকে সর্বপ্রথমে তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। কিন্তু শিশির কুমারের দল বেশি দিন ওখানে থাকেন না। শচীন সেনগুপ্তের 'সতীতীর্থ' (নাট্যনিকেতন, ১৯৩২) মণিধর চট্টোপাধ্যায়ের 'আধারে আলো' (ঐ) সত্যেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্তের 'মহাপ্রস্থানের পথে' (ঐ) শিশিরকুমার, কঙ্কাবতী আর যোগেশ চৌধুরী এখানে যোগ দেন। অনুরূপাদেবীর 'পোষ্যপুত্র' অপরেশ প্রদত্ত নাট্যরূপ (ষ্টার, ঐ) শ্যামাকান্ত লাহিবাবুর শেষ অভিনয়। ওই শেষ অভিনয়ে তিনি তাঁর প্রতিভার পরম পরিচয় দিয়ে যান। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্র মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' (ষ্টার, ১৯৩২) শচীন সেন গুপ্তের 'জননী' (নাট্যনিকেতন, ১৯৩৩) এই নাটকে প্রথম ওয়াগন-স্টেজ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তা সফল হয় না, পরে অপরেশ রূপান্তরিত অনুরূপা দেবীর উপন্যাস 'মা' (ঐ) নাটকে ওয়াগন-স্টেজ সফল ভাবে কাজ করে। শিশিরকুমার মল্লিক আর যামিনী মিত্র রঙমহল পরিচালনার ভার নেন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে, নরেশ মিত্র আর সতু সেন যুগ্ম পরিচালক নিযুক্ত হন। যোগেশ চৌধুরী প্রদত্ত অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' (রঙমহল, ঐ) ওই সময়ে সতু সেন মঞ্চকে রিভলভিং করেন—প্রথম রিভলভিং স্টেজ। প্রযোজনা অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ হয়। মন্মথ রায়ের 'অশোক' (ঐ) যামিনী রায় এই নাটকের দৃশ্যপট অঙ্কনের নির্দেশ দেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের 'চক্রব্যূহ' (নাট্যনিকেতন ১৯৩৪) তাঁদের পঞ্চরাত্র অবলম্বনে।

আর্ট থিয়েটার উঠে যাবার পর শিশিরকুমার নবনাট্যমন্দির নামে ষ্টার মঞ্চে অভিনয় শুরু করেন। তিনি নিজেই শরৎচন্দ্রের বিরাজ-বৌ নাটকে রূপান্তরিত করেন (১৯৩৪) সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরমা' (ঐ) শচীন সেনগুপ্তের 'মথের সাথী' (ঐ) এক অঙ্কের এক দৃশ্যের তিনঘণ্টাব্যাপী নাটক। শরৎচন্দ্রের প্রদত্ত নিজ রচিত 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বিজয়া' (ঐ) কুমার বীরেন্দ্র নারায়ণের উপন্যাসের নাট্যরূপ 'পতিব্রতা' (রঙমহল, ঐ) সৌরীন মুখোপাধ্যায়ের 'কাজরী' (ঐ) প্রভাবতী সরস্বতীর 'বাংলার মেয়ে' (ঐ) 'পথের সাথী' (ঐ, ১৯৩৪) শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' (ঐ) শচীন সেনগুপ্তের 'আবুল হাসান' (রূপমহল, চিৎপুর, ঐ) 'বাংলার দুলাল' (ঐ) প্রবোধ মজুমদারের 'জন্মতিথি' (নাট্যনিকেতন, ঐ) মন্মথ রায়ের 'খনা' (ঐ) শচীন সেনগুপ্তের 'নরদেবতা' (ঐ) পুলিশ কমিটনিজম প্রচার বলে অভিনয় বন্ধ করে দেয়। আসলে কিন্তু ওখানা মারী করেলীর Temporal Power গল্প অবলম্বনে রচিত। সত্যেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্তের 'ভাষা' (নব-

নাট্যমন্দির, ষ্টার, ঐ) জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক' (ঐ) যুগ্ম-রচয়িতা হিসেবে শিশির কুমারের নাম প্রচারিত হয়। রমেশ গোস্বামীর 'কেমার রায়' (নাট্যনিকেতন, ক্যালকাটা থিয়েটার্স ১৯৩৬) নরেশ মিত্র রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' (ঐ) যোগেশচন্দ্রের 'মন্বন্তরীর সংসার' (রঙমহল, ঐ) রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ উপন্যাসের নাট রূপ (ষ্টার, নবনাট্যমন্দির, ঐ) নবনাট্যমন্দিরের শেষ অভিনয়। মন্মথ রায়ের 'সতী' (নাট্যনিকেতন, ক্যালকাটা থিয়েটার্স ১৯৩৭) সুধীন্দ্ররাজার 'বজ্রবাহন' (ঐ) ওই মঞ্চে কালকাটা থিয়েটার্সের শেষ অভিনয়। 'অভিষেক' (রঙমহল ঐ) শিশির মল্লিক থিয়েটারের সংস্রব ছেড়ে গিয়েছিলেন, যামিনী মিত্র আর রঘুনাথ মল্লিক চালাতে থাকেন। শচীন সেন গুপ্তের 'প্রলয়' (ঐ) বিহার ভূমিকম্পের ঘটনাবলম্বনে রচিত। শরদিন্দু বন্দ্যোর 'ডিটেকটিভ' (ঐ) দুখানা বই একসঙ্গে অভিনীত হোতো আগে পরে। শচীন সেনগুপ্তের 'স্বামী-স্ত্রী' (ঐ) বিহর্ণসনের A Newly Married Couple এর সঙ্গে আরো দুটি দৃশ্য সংযুক্ত। আড়াই ঘণ্টারও কম সময় অভিনীত হোতো। দুপয়সার ঘটার বলে খ্যাতি পায়। এই নাটক থেকেই রবিবারে দু'বার অভিনয়ের রীতি চালু হয়। মিনার্ভায় অবশ্য পূর্ব্ব থেকেই শনি-রবিবার একই নাটক দু'বার অভিনীত হোতো। কিন্তু সেখানকার প্রবেশ মূল্য ছিল সিনেমার অনুরূপ। মহেন্দ্রগুপ্তের 'মহাতীর্থ' (মিনার্ভা, ঐ) রমেশ গোস্বামীর 'বিষ্ণাপতি' (ষ্টার, বিমল পাল পরিচালিত, ঐ) অমরেন্দ্র বক্সীর 'অভিসারিকা' (ঐ) শচীন সেনগুপ্তের 'কালের যাত্রী' (ঐ) ওই সময় ষ্টার থিয়েটারের বর্তমান মালিকরা বাড়ী দখল নেন। মহেন্দ্র গুপ্তের 'চক্রধারী' (ষ্টার, ঐ) শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' (নাট্য নিকেতন, ১৯৩৮) জ্যোতি বাচস্পতির সংসার' (ঐ) মন্মথ রায়ের 'মীরকাসিম' (ঐ) বিধায়কের 'মেঘমুক্তি' (রঙমহল, ঐ) শচীন সেনগুপ্তের 'তটিনীর বিচার' (ঐ) যোগেশ চৌধুরীর 'মাকড়সার জাল' (রঙমহল, ১৯৩৯) অমরেন্দ্র বক্সীর 'ডক্টর মিস কুমুদ' (ঐ) বিধায়কের 'মাটির ঘর' (ঐ) নূতন সামাজিক প্রশ্ন তোলা হয়।

রঘুনাথ মল্লিক 'তটিনীর বিচার' নিয়ে আগেকার আলফ্রেড মঞ্চে নাট্যভারতী প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রিভলভিং ষ্টেজ করে। নজরুলের 'মধুমালা' (ঐ) শচীন সেনগুপ্তের 'সংগ্রাম ও শান্তি' (ঐ) মহেন্দ্রগুপ্তের 'অভিযান' (মিনার্ভা, সেলওয়ার হোসেন ও চণ্ডী চরণ বন্দ্যোর কর্তৃত্বে, ঐ) 'দেবী দুর্গা' (ঐ) 'সোনার বাংলা' (ষ্টার, ঐ) শচীন সেন গুপ্ত রূপান্তরিত শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' (নাট্যনিকেতন, ঐ), ওই সময়ে নাট্যনিকেতনে রিভলভিং ষ্টেজ হয়। মহেন্দ্র গুপ্তের 'সতী তুলসী', 'উত্তরা' 'রণজিৎ সিংহ' (ষ্টার, ঐ), সুধীন্দ্র রাহার 'রণজিৎ প্রসাদ', মহেন্দ্র গুপ্তের 'গঙ্গাবতরণ', 'উদ্ধারণ' (ঐ) শচীন সেনগুপ্তের 'নাসির হোসেন' (নাট্য ভারতী, ঐ) জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'সিঁথির সিন্দুর', 'পি ডব্লিউ ডি' (ঐ)।

বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের 'ব্লাক আউট' (মিনার্ভা ১৯৪১) জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'হাউস ফুল', মিনার্ভা (ঐ) মনোজ বসুর 'প্রাবন' (নাট্যভারতী, ঐ) বিধায়কের 'রক্তের ডাক', 'তুমি ও আমি' (রঙমহল, ঐ) তুলসী লাহিড়ীর 'মায়ের দাবী' (ঐ) যোগেশ চন্দ্রের 'পরিণীতা' (নাট্যনিকেতন, ঐ) শচীন সেনগুপ্তের 'ভারতবর্ষ' (ঐ) তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' প্রভৃতির সময়ই শিশিরকুমার নাট্যনিকেতন দখল নিয়ে ওর নাম শ্রীরঙ্গমে রূপান্তরিত করেন। তারা কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবন রঙ্গ' (শ্রীরঙ্গম ১৯৪২) নিতাই ভট্টাচার্যের 'উড়ো চিঠি'(ঐ) মনোরঞ্জনের 'দেশবন্ধু' পেট্রিয়ট অবলম্বনে (ঐ) মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল' (রঙমহল, শরৎ চট্টোপাধ্যায় লেখা, ঐ)।

বেতার-নাট্য

নির্মলেন্দু মান্না

ঘোষক : আকাশবাণী থেকে বলছি, এখন আরম্ভ হচ্ছে আমাদের আজকের নাটক—"বেতার-নাট্য।"

যন্ত্রসঙ্গীত : বীণের বাঁশীর আলাপ একবার জোর হয়েই মাঝে মাঝে মিলিয়ে গেল। সময়—১০ সেকেণ্ড।

লেখক : বাস্, সব ছকে ফেলেছি, ঘটনা, চরিত্র, প্লট—সব কলিন ধরে মাথায় চেপে বসে আছে, বেশ মনমাতানো কাহিনী, বেশ বিচিত্র আর বিশিষ্ট চরিত্র—হ্যাঁ এইবার নাটকের আকারে সমস্ত বিষয়টাকে সাজিয়ে নিতে হবে। আচ্ছা, প্রথমেই নাম দেয়া যাক—কী নাম—কী নাম—হ্যাঁ পেয়েছি—অসম্পূর্ণ—অসম্পূর্ণ—

শব্দ : দরজা খুলে যাচ্ছে, কাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ।

প্রযোজক : সে কি লেখক মশায়, এখনো নাটক লেখা শেষ হোল না?

লেখক : আজ্ঞে না, এটা নাটকের নাম, আমার কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নাম, এইমাত্র খুঁজে পেলাম।

প্রযোজক : বিষয়টা কি শুনতে পারি?

লেখক : নিশ্চয়। নারী কামনা করে পুরুষের ভালবাসা, সেই তার পূর্ণতা। সেইটি যখন নারী পেয়ে হারায় তখন জীবনের সবটাই বিচ্ছিন্ন, বিষন্ন, অসম্পূর্ণ।

প্রযোজক : বেশ, একটু কাহিনীটাই বলুন না, আবার আবার তো শোনাতে হবে বেতারের লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে।

লেখক : এ নাটকে চরিত্র মাত্র চারটি। দুটি ছেলে : স্বরূপ ও মদন, দুটি মেয়ে : মিনতি আর প্রণতি।

প্রযোজক : আহা, বলুন শ্রোতারা শুনবে একটি যুবকের বলিষ্ঠ পুরুষালি গলা, একটি কিশোর-কণ্ঠ, একটি তরুণীর গলা আর একটি কিশোরী-কণ্ঠ। মানে শ্রোতারা কিছু দেখতে পাবে না তাই শুধু কণ্ঠস্বরের পার্থক্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে কার কত বয়েস, কে কী ধরণের মানুষ।

লেখক : ঠিক তাই। কথা যখন উঠল বলি, ঐ যে মেয়েটি, যার নাম মিনতি, যার জীবনে ঘটেছে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আর তার ফলে যে হারাতে চলেছে তার প্রেমাস্পদকে তার কণ্ঠে থাকবে নিম্ন স্বরগ্রাম আর ঐ স্বরূপ নামে ছেলেটি যে মেয়েটিকে বিবাহ করতে অস্বীকার করছে তার গলার ভলিউম হবে চড়া, তারপর আপনাকে দেখতে হবে স্বরের দূরত্ব, কে কার কাছ থেকে কত দূরে কথা বলছে, যেমন এখানে মেয়েটির মুখটা অ্যাসিড বাথে পুড়ে গেছে, তাই সে একটু দূরে একটা পর্দার আড়াল থেকে কথা বলছে আর দুজনের মধ্যস্থ করছে তার ছোট বোন প্রণতি, সে দুজনের মধ্যে যাতায়াত করছে, এছাড়া এতে থাকবে বিভিন্ন স্বরের সংমিশ্রণ, সবাই একসঙ্গে কথা বলে ওঠার রাটকীয় এফেক্ট—

প্রযোজক : ওরে বাবা, খুব জটিল ব্যাপার যে দেখি—

লেখক : আজ্ঞে না, বেতার-নাট্য খুব জটিল হলে শ্রোতাদের বুঝতে অসুবিধে হয়, ঐ জন্যে এ নাটকে উপ-কাহিনী নেই, ঘটনার বিস্তার নেই, বেশী চরিত্রের ভিড় নেই। একটি ছেলে, একটি মেয়ে, কথা ছিল বিদেশ থেকে ফিরে ছেলেটি বিয়ে করবে মেয়েটিকে, এর মধ্যে এক দুর্বৃত্তের আক্রমণে মেয়েটির সৌন্দর্য চলে যায়, অনেকদিন পরে মেয়েটির কাছে এসে ছেলেটি সব জানতে পারে আর তখন সে পড়ে যায় দ্বন্দ্বে। এই ত্রিবিধ কাহিনী তীক্ষ্ণ ভাবালুতার মধ্যে বলতে হবে এবং সমস্ত কথাবার্তা সমস্ত ঘটনা এক অনিবার্য পরিণামের দিকে এগিয়ে যাবে যা শ্রোতাকে উন্মুখ করে রাখবে সবটা শুনতে।

প্রযোজক : বেশ বেশ তবে মনে থাকে যেন সুরু থেকে শেষ যায় যেবকের ঘোষণা পর্যন্ত ঠিক আধঘণ্টার ভেতর ফুরাতে হবে, এই নির্দিষ্ট সময়জ্ঞান আপনাকে যেমন লেখার ক্ষেত্রে রাখতে হবে, আমাকেও তেমনি পরিচালনার সময় দেখতে হবে।

শঙ্খ : ঘরজা খোলার মৃদু আওয়াজ।

সমবেত কণ্ঠস্বর : আসতে পারি? আসতে পারি?

লেখক : অবশ্যই, অবশ্যই, আপনারাই হলেন আমার নাটকের প্রাণ, মানে আপনাদের কণ্ঠস্বর আর কি?

নারী কণ্ঠস্বর : আমার নাম কি রাখছেন?

লেখক : মিনতি—ডাক নাম—যে নামে ছেলেটি ডাকবে—তা হল মিনু।

পুরুষালি কণ্ঠস্বর : আমার নামটা জানতে পারি?

প্রযোজক : স্বরূপকুমার। এবারে আপনার স্বরূপ ধরা পড়বে কিনা। বুঝুন, অভিনয় নেই, দৃশ্যপট নেই, অঙ্গসঞ্চালন নেই, মুখভঙ্গী নেই, আলোকসম্পাত নেই—এমন কি দর্শকও নেই—কিছুই নেই—তবু আছে—লক্ষ লক্ষ শ্রোতা আছে আর আছে আপনার গলা—কখনো কর্কশ, কখনো কঠিন, কোমল, মধুর, কত রকমের কণ্ঠস্বর, তরল, হুড়োল—কখনো যান্ত্রিক—আর কথা—বড় বড় শব্দ নেই, সহজে বোধগম্য কথা—তাকেই উচ্চারণ করতে হবে এমন করে যে শ্রোতারা যেন সব দেখতে পায়, ঐ যে আপনার কবিতার একটা কথা পালটিয়ে এক্ষেত্রে বলা চলে : শ্রবণ হল নয়ন তব।

মিনতি : বেশ বলেছেন, এ কাজে আপনার সাহায্য পাব তো?

প্রযোজক : আমার কথা কি জানেন—আমি সব কিছু বাজিয়ে নেব, শুনব সেটা অচল না সচল। অনেক লোকের গলা শুনেছি, বেশ চমৎকার, কিন্তু সেই স্বর যন্ত্রের মধ্যে ঢোলাই হয়ে যখন এল তখন আর মাধুর্য নেই। যেমন আপনার ছবি। আপনাকে দেখতে সুন্দর কিন্তু ক্যামেরায় তত সুন্দর এল না।

মিনতি : মানে আমার ফটো খারাপ—এই বলছেন তো—যান আমি অভিনয় করব না।

প্রযোজক : কী ক্যাসাদ দেখ দেখি। এটা উদাহরণ। আর আপনাকে কে দেখতে পাচ্ছে। আপনার কথায় বুঝিয়ে দিতে হবে যে আপনি ভারী কোমলা।

লেখক : বিভিন্ন পরিস্থিতিও বোঝাতে হবে, একে বলে আকুস্টিক্যাল রিলেশান, ধরুন আপনি ছোট ঘরে কথা বলতে বলতে কুয়োর সামনে এসে দাঁড়ালেন তারপর ঢুকলেন বড় হল ঘরে, একই কথা বা বিভিন্ন কথা এক স্বরগ্রাম, ভলিউম আর কোয়ালিটির হয়েও ভিন্ন রকম শোনাবে।

মিনতি : নমস্কার, আমি চললুম, ও আমি পারব না।

প্রযোজক : চমৎকার, আপনার এই বলার ভঙ্গীটা, বলতে বলতে আওয়াজটাকে ক্ষীণ করে চলে যাওয়া বোঝানো—চমৎকার উৎরেছে।

মিনতি : না-না, আমি রেহাই চাইছি, সত্যিকারের ছুটি—

প্রযোজক : তবে ওরকম করে বললেন কেন?

মিনতি : আমরা তো বাস্তবে ওরকম করেই বলি।

প্রযোজক : চমৎকার, নাটক, নাটকের উপস্থাপনা একেবারে বাস্তব হওয়া চাই, শুনতে সহজ কিন্তু খুব কঠিন, সাধনা করে বাস্তব হতে হবে, কৃত্রিম উপায়ে অকৃত্রিম।

যন্ত্রসংগীত : বাঁশীর সুর।

স্বরূপ : এই যে বংশীবাদক, কী মনে করে?

বংশীবাদক : আমাকে কোথায় সেট করলেন? কোথায় কেমন সুরের বাঁশী লাগবে বলুন।

লেখক : এই সেরেছে, নাটকই লেখা হয়নি, এ যে দেখি রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ!

শব্দরক্ষক : হাঁা, রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ, আমি সাউণ্ডম্যান, সবরকম শব্দ রেকর্ড করে রেখেছি, যেখানে যেমনটি দরকার ছেড়ে দেব, আপনার নায়ক-নায়িকা কি মোটরে আলাপ করবেন?

লেখক : না।

শব্দরক্ষক : তাহলে মোটরের আওয়াজ, হিস্সার ঠুস্ঠুস—এমন সব মিশ্রশব্দ দিলুম যে মনে হোক ঠিক রাস্তার ওপর দিয়ে চলেছে। থাক। ওঁরা কি ট্রেণে যাবেন? তাহলে হুইসিল। ঝম্ ঝম্। কিংবা ট্রামে-বাসে? তাহলে ঘটাং ঘটাং কিংবা ভোঁপ ভোঁপ। আর যদি বসন্তকালে ফুলে বনে ওনারা আলাপ করেন তাহলে জানাবেন, কোকিল আর বউ কথা কও-এর একখানা যা রেকর্ডিং আছে না—কিংবা ধরুন বর্ষাকাল—বাজ পড়ল—কড় কড় কড়াৎ—তাও দিয়ে দোব, শ্রোতাদের মনে হবে আকাশ ফেটে চৌচির।

প্রযোজক : যান মশায়, রাতের একেই আনতে হবে, ঝিঁঝির আওয়াজ ধরুন।

শব্দরক্ষক : ওরে বাবা, এই সহরে অত ঝিঁঝি পাব কোথায়।

প্রযোজক : কেন মশায় কাঠ ঠুকে ঠুকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনাতে পারেন আর—

শব্দরক্ষক : পারি, সব পারি, পৃথিবীর যেখানে যত সুর ওঠে সব আমি বন্দী করি, এটাও পারব।

মিনতি : আমিও পারব মনে হচ্ছে। আপনার কি মনে হচ্ছে?

স্বরূপ : পারব না মনে হচ্ছে।

প্রযোজক : কি পারবেন না?

লেখক : বলুন—আমার নায়কের সর্বশেষ উক্তিটা বলুন—পারবো না এ বিবাহে মত দিতে।

স্বরূপ : পারব না এ বিবাহে মত দিতে।

প্রযোজক : খাসা, চমৎকার পেরেছেন। লেখকমশায়, আপনারা বেতার-নাট্য লিখে ছাপাতে পারেন না? বিদেশে কত বেতার নাট্য—কত বিচিত্র অনুষ্ঠান—কত বই প্রকাশিত হচ্ছে—এ যে এক উপভোগ্য পাঠ্যবস্তু।

লেখক : বাস্, বাস্ থামুন, এদেশের লোক নাটকই পড়ে না তা বেতার-নাট্য পড়বে, তাছাড়া বাংলায় কটা বেতারকেন্দ্র আছে মশায় যে লিখলেই তা প্রচারিত হবে।

প্রযোজক : তা'হলে এমন একটা নতুন মাধ্যম—বলবার এমন একটা নতুন টেকনিক—

লেখক : তবে হ্যাঁ, আজকাল পাড়ায় পাড়ায় নাট্যানুষ্ঠান হচ্ছে, উৎসাহীরা মাইকযোগে বেতার-নাট্য শোনাতে পারেন, লাউড স্পীকারে যখন লোকে গান শোনে, রেকর্ডনাট্য শোনে, তখন এটাও শুনবে। আজকাল নাটক নিয়ে দেশবিদেশে কত রকমের পরীক্ষা হচ্ছে—বেতার-নাট্য নিয়েও হওয়া উচিত এদেশে।

প্রযোজক : আর কতখা'নি লাভ দেখুন, মকসজ্জা নেই, বেশবিন্যাস নেই, আলোকসম্পাত নেই, অথচ অভিনয় আছে, নিখরচায় রীতিমত অভিনয়।

বংশীবাদক : আর আমরাও তাহলে বেশি করে চান্স পাই বাঁশী বাজাবার।

প্রযোজক : হা হা তাও তো বটে, তাহলে আপনি লিখতে থাকুন আমরা আসি। চল মিনতি, স্বরূপ, শঙ্খের ভাণ্ডারী, চল হে বংশীওয়ালা, করুণ সুরটা প্র্যাকটিশ কর ততক্ষণ।

সমবেত কণ্ঠস্বর : চলুন, চলুন, ওনাকে লিখতে দিন।

যন্ত্র সঙ্গীত : বাঁশী বাজতে বাজতে মিলিয়ে গেল। সময় এক মিনিট।

ঘোষক : আজকের নাটক 'বেতার-নাট্য' এইখানেই শেষ হল। অভিনয়ে যারা অংশগ্রহণ করলেন তাঁরা সত্যিই অভিনয় করেননি। তাঁরা আমাদের স্ক্রিপ্ট রুমে বসেগল্পগুজব আলাপ চালাচ্ছিলেন আমরা টেপরেকর্ড করে রেখেছি। তারই একটু এদিক ওদিক করে আজকের মত মুখ রক্ষে করলুম। শ্রোতাদের প্রতি অনুরোধ, দোহাই আপনাদের, আবার সম্পাদকের নামে কড়াচিঠে সবিনয় নিবেদন ছাড়বেন না যেন, তাহলে নাট্যকারের চাকরী বজায় রাখা দুষ্কর হবে, বুঝছেন তো এই বাজারে—নমস্কার।

———

এনামেলের বাসন

● দামে সস্তা ● ভারে লঘু ● ব্যবহারে টেঁকসই ● বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর।

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিমিটেড

২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১২

মডার্ণ ডেকরেটরস

৬৫-এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন-৫৫-২৫৪৯

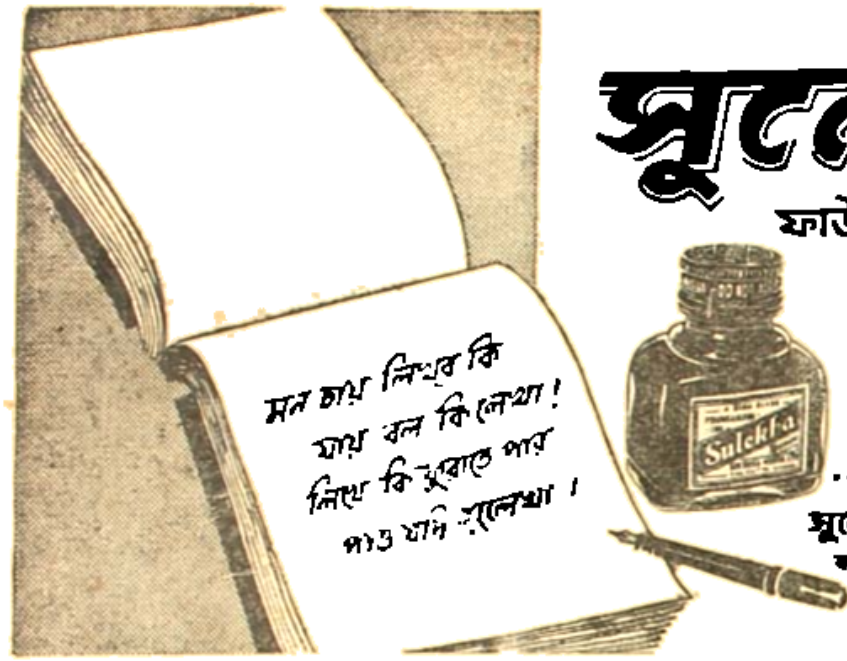

সুলেখা

ফাউন্টেনপেন কালি

সহজ, সরল, স্বচ্ছ
ও সুন্দর লেখার
জন্য অদ্বিতীয়

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা · দিল্লী · বোম্বাই · মাদ্রাজ

বেঙ্গলের বই মানেই সেরা লেখকের সার্থক সৃষ্টি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের	নিখিলরঞ্জন রায়ের	সন্তোষকুমার দের
অবিস্মরণীয় উপন্যাস	ভারত-সীমান্তের অন্তরঙ্গ ভ্রমণকাহিনী	মনোজ্ঞ রঙের রসমধুর গল্প
মহাশ্বেতা ৫·৫০ ॥	**সীমান্তের সপ্তলোক**	**বৈঠকী গল্প** ২·৫০ ॥
রচনা-সংগ্রহ ১০·০০	তিন টাকা	[বিখ্যাত ব্যঙ্গশিল্পী রেবতীভূষণ বিচিত্রিত]

আনন্দকিশোর মুন্সীর	অধ্যাপক বীরেন্দ্রমোহন আচার্যের	ধনঞ্জয় বৈরাগীর
অমধুর বিচিত্র উপন্যাস	শিক্ষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ গ্রন্থ	সামাজিক নাটক
রাঘব বোয়াল ৩·০০ ॥	**আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব** ৬·৫০ ॥	**রূপোলী চাঁদ** (৩য় মু:) ২·৫০ ॥

পুনর্মুদ্রণ

প্রবোধকুমার সান্যালের দুর্গাদ্বারকারী উপন্যাস : **হাসুবানু** (৪র্থ মু:) ৮·০০ ॥ মনোজ বসুর অপূর্ব উপন্যাস : **সবুজ চিঠি** (৩য় মু:) ৩·০০ ॥ দেবেশ দাশের অপরূপ রম্যসৃষ্টি : **ইয়োরোপ।** (৭ম মু:) ৩·০০ ॥ **রাজোয়ারা** (৬ষ্ঠ মু:) ৪·০০ ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় দুটি উপন্যাস : **পুতুলনাচের ইতিকথা** (৭ম মু:) ৫·৫০ ॥ **সোনার চেয়ে দামী : বেকার** (৩য় মু:) ২·২৫ ॥ সমরেশ বসুর উপভোগ্য উপন্যাস : **গঙ্গা** (৪র্থ মু:) ৫·৫০ ॥

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের	মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের	মনোজ বসুর
অনন্যসাধারণ সাহিত্যকীর্তি	নব্য ইয়োরোপ পায়ে-হেঁটে বেড়ানোর	সর্বোত্তম উপন্যাস
জর্জ বার্নাড শ ৮·৫০ ॥	সচিত্র বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী	**মানুষ গড়ার কারিগর**
(একত্রে তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ জীবনী)	**চরণিক** ৩·০০ ॥	[সাড়ে পাঁচ টাকা ॥

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা - বারো ॥

বন্দেমাতরম্

গল্প-ভারতী

কমলাকান্তের দুর্গাপূজা

প্রণাম — শ্রীশ্রীদীন শ্রদ্ধাস্পদ

জয় জয় জয় জয় জগদাত্রি
জয় জয় জয় বঙ্গ জগদ্ধাত্রি।
জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমঙ্করি।
ষোড়শদলনি সন্তান পালিনি।
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।

বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের মুখে এই দুর্গাস্তোত্র উচ্চারিত করিয়াছিলেন। এই স্তোত্র যে ভাবের সঙ্গে উদ্গীত হইয়াছিল—সে ভাবের উচ্ছ্বাস আজ আর বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্ফুরিত হয় না। প্রাণের সে সরসতা যেন শুকাইয়া গিয়াছে। কমলাকান্ত বলিলেন,—

"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে আমার সর্বার্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুলপালিকে! ধর্ম-অর্থ-সুখদুঃখ-দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর।

এই ভক্তি প্রীতি বৃত্তি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, বিশ্ববিমোহিনী মূর্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা গৃহে এসো ছয়কোটি সন্তানে একত্রে এককালে দ্বাদশকোটি কর যোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব"।

অতঃপর আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র—যে সন্তানের আদর্শ স্থাপন করিয়া দেশমাতৃকা-পূজার চিত্র দেখাইয়াছেন—সে আদর্শ আজ আমরা ভুলিয়াছি। স্বাধীনতালাভ হইয়াছে সত্য কিন্তু মাতৃচরণে নিবেদিত-প্রাণ সন্তান সম্প্রদায় আজ কল্পনার অতীত। স্বার্থ, লোভ ও মোহরূপী পিশাচ আজ ভারতের স্কন্ধে ভর করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'কে নিরানন্দে পর্যবসিত করিয়াছে। "উঠ মা এবার সুসন্তান

হইব, সংযমে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা দেবি! দেবাসুগৃহীতে এবার আসনা তুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, অনৈক্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা।"

মাতৃপূজার এই পরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত বঙ্গবাসীকে—তথা ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। আজ সে আদর্শের কথা আলোচিত হয় না। যাঁর উদাত্তবাণীর ঝঙ্কারে সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে দেশপ্রেমের বন্যা বহিয়াছিল—আজ সে ঝঙ্কারের রেশ গগনে বিলীন!

যদিও স্বাধীনতালাভই ছিল আনন্দমঠের সন্তানগণের প্রধান উদ্দেশ্য, তথাপি বলিব—স্বাধীনতা লোকের আকাঙ্ক্ষিত হয় এইজন্যই যেহেতু মানুষ তাহার প্রাণধারণ নিরাপদ ও শান্তিময় হইবে মনে করে। নিরাপত্তা ও শান্তির উৎস কেবলমাত্র—অর্থ নহে। অর্থাগম ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষ শান্তির রসাস্বাদ করে। ন্যায়কে ভারতবাসী—ধর্মের মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে,—মানুষ প্রয়োজনের দাস হইয়া ন্যায়কেও লঙ্ঘন করিতে সাহস করে, কিন্তু ধর্মকে অতিক্রম করিতে সঙ্কোচ ও ভয় আসে। এজন্য বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের আদর্শ অঙ্কিত করিতে ভগবৎপ্রাণ সন্তানের সৃষ্টি করিয়াছেন। সন্তানদিগের কণ্ঠে—'হরে মুরারে মধুকৈটভারে', 'জয় জগদীশ হরে' প্রভৃতি শ্রীভগবানের নামমাধুরী গাওয়াইছেন। যখন সন্তানদের প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন,—তখনও সত্যানন্দ-মুখে প্রকাশিত হইয়াছে—ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর—আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জন করিবে না। যাহা উপার্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে। সনাতন ধর্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে। রণে কখনও ভঙ্গ দিবে না।

এই সমস্ত ভাবের প্রবাহে ভারতের সংস্কৃতি যেন নবমূর্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যে জাতীয়মন্ত্র বাঙ্গলার তথা সমগ্র ভারতের প্রাণে নবজাগরণের স্পন্দন আনিয়াছিল—তাহার মধ্যেও দেখা যায় যে—তিনি দেশ-মাতৃকা ও শ্রীদুর্গামূর্তিকে অভিন্নরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। নবীনভাবের সহিত প্রাচীন মানসপ্রবাহকে এক প্রণালীতে মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই মিলনের মূলে আছে—বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃপিতামহের সাধনার এক অপূর্ব প্রভাব। নবীন ভাবের ভাবুক বঙ্কিমচন্দ্র—চিরন্তন শ্রীদুর্গাপ্রতিমাপূজার ভাবধারাকে মিলিত করিয়াছেন এই দেশমাতৃকা আরাধনার ধারার সহিত। এখনও সেই পিতৃপিতামহের আরাধনার স্থান দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবন সংলগ্ন প্রকাণ্ড পূজামণ্ডপ আজও দাঁড়াইয়া আছে। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, ছোট ছোট বৃক্ষলতাগুল্মে মেঝে ও দেওয়াল আচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু সেই বহুছড়-শোভিত পাঁচটি সারি সারি স্তম্ভ সম্মুখের উচ্চ দেওয়াল মস্তকে ধারণ করিয়া আজও পূজা-ভবনের বিশালতার সাক্ষ্য দিতেছে। সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও প্রাঙ্গণ হইতে মণ্ডপে উঠিবার জন্য প্রশস্ত সোপানশ্রেণী আজও পূজা-মণ্ডপের শোভাবর্ধন করিতেছে। দক্ষিণদ্বারী এই দালানের এই পুরোবর্তী প্রাঙ্গণ পার হইলেই আজও দেউড়ি ও মোটা মোটা পেরেকে কণ্টকিত কাষ্ঠনির্মিত উচ্চ দ্বারদেশ প্রাচীন আভিজাত্যের প্রমাণ প্রদান করিতেছে।

বহু বৎসর ধরিয়া এই মণ্ডপের মধ্যদেশে শ্রীদুর্গাপ্রতিমা পূজিতা হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতাদেব ও মাতৃদেবী উভয়ই পরম নিষ্ঠা ও ভক্তিসহকারে এই পূজা নির্বাহ করিতেন। গভীর রাত্রিতে সন্ধিপূজার সময়েও সমস্ত পরিবারবর্গের সহিত গৃহকর্তারা সশরীরে উপস্থিত থাকিতেন। পুরোহিত পূজা করিলেও গৃহকর্তারা জোড়হস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া অশ্রুপাত করিতেন। ভট্টপল্লী সন্নিহিত গ্রাম, সেখান হইতে জ্ঞানসম্পন্ন পুরোহিত আনাইয়া পূজা করাইতেন, নিজেরা মন্ত্র শ্রবণ করিতেন। আরতিকের সময় ধূপধুনার আয়োজনে আদেশ দিতেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের মতই অনিমন্ত্রিত অব্রাহ্মণদিগকে সাদরে প্রসাদ পরিবেশন করাইতেন। এই পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্র-জীবনে গভীরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। যাহার জন্য বঙ্কিম-সাহিত্যে ও 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে—দেশমাতৃকা শ্রীদুর্গার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীদুর্গাপ্রতিমা মৃন্ময়ী, দেশমাতৃকাও মৃন্ময়ী, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবসাধনায় উভয়ই যেন চিন্ময়ী হইয়া উঠিয়াছেন।

আমরা চণ্ডীগ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম বটে—

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায়তে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥

হে মা দুর্গে! তুমি সমস্ত জগতের একমাত্র আধার, কেননা তুমিই পৃথিবীস্বরূপে অবস্থিতা, আর তুমি, হে অলঙ্ঘ্যবীর্য্যে! জলস্বরূপে বিরাজিতা হইয়া এই জগৎকে আপ্যায়িত—তৃপ্ত করিতেছ। অথর্ববেদেও পৃথিবীস্তুতি মন্ত্রগুলি অপূর্ব দেশভক্তিপরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অথর্ববেদে—"না নো ভূমির্বিসৃজতাং মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ।"—সেই পৃথিবী মাতা পুত্র আমি—আমাকে পয়ঃ (জল ও দুগ্ধ) দান করুন। পৃথিবী যে মাতৃরূপিণী ইহা বৈদিক সিদ্ধান্ত হইলেও তাহা পরিস্ফুট হইবার মত ভাষায় তেমন আলোচনা হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমর লেখনীযোগে সেই প্রাচীনভাবকে নবীন ভাষায় নবীন উদ্দীপনায় প্রকাশ করিয়া বিশ্বকে বিস্মিত করিয়াছেন।

"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলবনবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী"॥

মহামায়ার আগমনী

শ্রীরমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সুমঙ্গল শঙ্খধ্বনি ও সুমধুর আগমনী গান, এক শারদ প্রাতের আকাশ বাতাস আনন্দমুখর করে তুলল। সে দিন আনন্দময়ীর আগমন। রূপ রস গন্ধে ভরা ধরণী। সোণার বরণ ধানের ক্ষেত—নদী, খাল, পুষ্করিণী জলে ভরা। জলে পদ্ম, স্থলে জবা। প্রকৃতি তার ডালি সাজিয়েছে মহামায়ার বরণকল্পে। বিগত বছরে মায়ের সন্তানগণ জলভরা চোখে বিজয়ার গান গেয়েছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে আকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা করেছিল এই শুভ দিনটিকে। এই আনন্দ দিনে মানুষ ভুলে যায় পরস্পর দ্বন্দ্ব, দুঃখ, দৈন্য। মানুষকে দীক্ষিত করে সাম্য, মৈত্রী, নিষ্ঠা, সাধনার মহামন্ত্রে। এই শারদীয়া পূজা একদিন জনগণের মনে নূতন প্রাণ সঞ্চার করত। গ্রামে, সহরে, মানুষ উৎসবে মেতে উঠত। কালের রুদ্র হস্ত এখন সে আনন্দকে হরণ করেছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তন হচ্ছে। সে প্রাকৃতিক পরিবেশ, সে আত্মীয়তা বা সামাজিক বন্ধন খুব অল্পই দেখা যায়। বাঙ্গলার অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের ভক্ত কবিগণ মাতৃবন্দনা—আগমনী গান লিখে ধন্য হয়েছেন। আগমনী গান এখন মহাপূজায় শোনা যায় না। যান্ত্রিক যুগে যন্ত্র পরিচালিত ভাবহীন, হৃৎস্পন্দিত রুচিপূর্ণ গান মানুষকে বিব্রত ও রোগগ্রস্ত করে তোলে। কে জানে, সুদূর কোন এক শান্তিপূর্ণ গ্রামে, মায়ের বন্দনা যথারীতি সম্পন্ন হয় কিনা! বরেণ্য বাঙ্গলার কবি দাশরথি রায় রচিত আগমনী গান এক সময় বাঙ্গালীর অন্তরকে অভিভূত করেছিল। এই সংখ্যায় দাশরথি রায় রচিত একটি আগমনী গান স্বরলিপি সহ প্রদত্ত হল।

আগমনী

মিশ্র বিভাস—ঝাঁপতাল

কৈ হে গিরি। কৈ সে আমার
প্রাণের উমা নন্দিনী
সঙ্গে তব অঙ্গনে, কে এল রণরঙ্গিণী
এযে সর্ব্বমঙ্গলা তিমির নাশিনী॥
করি অরিতে করি ভর
করে করিছে রিপু সংহার
পদ ভরে কাঁপে মহী মহিষমর্দ্দিনী
ত্রিলোকধন্যা ত্রিলোকজননী॥

১´ ০ ৩ ১´ ২
সরা সরগা গা গা গপা ধপা পগা গা I গা গমা রগা রাসা
কৈ০ ০০০ রি রি কৈ০ সে০ আ আর প্রা পে০ র০ উ মা

০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
সরা সরগা | গরা সা -া I গা গপা | পা গপা ধনা | ধনা ধপা
ন০ ০০০ | ঝি০ নী০ স ঙ্গে০ | ত অ০ ০০ | ন্ত০ নে০

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
পা ধা ধা -া পা ধা পা পমা গা -া I রা গা | গা মপা পমা | গা | গরা সা -া I
কে এ ল০ র ণ র ঝি০ নী০ ৎ সে | স ০০ র্শ০ ম | ন্ত০ লা০

১´ ২ ০ ৩
গা পা | গপা ধনা নধা | পা ধপা | মগা রসা -া II
তি মি | র০ ০০ না০ | মি ০০ | নী০ ০০

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০
পগা গা পা পা ধা ধর্সা র্সা | র্সা -া -া I র্সা র্রা | র্সা র্সর্গা র্গা র্রা র্সা
ক০ রি অ রি তে কে০ রি | ত্ত০ র ক রে | ক রি০ ০ছে | রি পু

I ধা-া ০ পা ধা | ৩ পা ধপা মপা I ১´ গমা গা |
রে কা পে | ম ০০ নী০ ম০ মি

২ ০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
রা -া রা | গমা রসা -া -া I সধা সা | সা সরা রা রা গা গা -া -া I
ষ ০ ম | ঝি০ ন্ত০ ০০ ত্রি০ ০ | লো০০ ক ষ ০ ন্ত ০ ০

১´ ২ ০ ৩
পা ধনা | ধপা -া মা | গমা রগা | রসা -া -া II II
ত্রি ০০ | লো০ ০ ক | ন্ত০ ন০ নী০ ০ ০

মডার্ণ ডেকরেটরস
৬৫-এ, ডব্লু, সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন-৫৫-২৫৪৯

সাহিত্যে অভিজ্ঞতা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

লেখকের অভিজ্ঞতাবহির্ভূত অপরিচিত কোনো পরিবেশ-বিশেষকে লেখার মধ্যে আরোপ করিবার প্রয়োজন হইলে লেখক যদি সেই পরিবেশের কতকগুলি বিশেষক বৈলক্ষণ্য (distinctive feature) নির্ভুলভাবে জানিয়া লইয়া সেগুলিকে বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত নিজ রচনায় পরিবেশের অঙ্গে নিবেশিত করেন, তাহা হইলে লেখক রচিত সেই পরিবেশের রূপ প্রকৃতপক্ষে অজানা পরিবেশের রূপের এত কাছাকাছি যাইতে পারে যে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরও মনে হইবে লেখক নিজের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা হইতেই ঐ পরিবেশ রচিত করিয়াছেন। এইভাবে লেখক তাঁহার অভিজ্ঞতার অভাব সার্থকভাবে অতিক্রম করিতে পারেন। নিজ প্রতিপাদ্য প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নিজ বয়সের বাল্য ব্যবহার করা যদি রুচিবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে একটা ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দিই।

এক সময়ে বিচিত্রা মাসিক পত্রিকায় দীর্ঘকাল ধরিয়া আমার অভিজ্ঞান উপন্যাস মাসে মাসে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। অভিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাস্থল ছিল ঝাড়গ্রামের নিকটবর্তী অরণ্যময় পার্বত্যভূমি। সে সময়ে ঝাড়গ্রামের মহকুমা হাকিম ছিলেন বন্ধুবর শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্। বিচিত্রা প্রকাশিত হইবার পর প্রায় প্রতি মাসেই তিনি অভিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাকে তাঁহার মন্তব্য লিখিয়া জানাইতেন। একবার তিনি এইভাবে লিখিয়াছেন, "যেরূপ নিখুঁতভাবে আপনি এখানকার পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল সমাকীর্ণ অঞ্চলের বিবরণ দিচ্ছেন, তা'তে মনে হয় এখানকার প্রতিটি বৃক্ষ-গুল্ম-লতা যেন আপনার পরিচিত।" হায় প্রতিটি! একটিও যদি পরিচিত হইত তাহা হইলেও বুঝিতাম। ঝাড়গ্রামের অরণ্যভূমি ত' দূরের কথা, তথাকার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মভূমিতে আজ পর্যন্ত কোনোদিন পদার্পণ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ঐ পথ দিয়া যাতায়াতের সময়ে দ্রুত ধাবমান রেলগাড়ির জানলার ভিতর দিয়া ও অঞ্চলের তরু-গুল্মলতার যৎসামান্য পরিচয় আহরণ করা সম্ভব ছিল, ততটুকুই ছিল আমার মূলধন। সেই মূলধনের তিলকে সযত্ন অনুসন্ধান এবং সতর্ক অনুমানের সাহায্যে তাল করিয়া সুধাংশুকুমারের মতো বিচক্ষণ ও অবহিত পাঠককে ভুল বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ঝাড়গ্রামের ভূদৃশ্যের (Scenery) রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ও-অঞ্চলের অধিবাসী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট অনুসন্ধান চালাইয়া তথাকার ভূদৃশ্যের কয়েকটি বিশেষক (characteristic) উপাদানের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম। যথা—ওখানকার মাটির রঙ ধূসর মৈরিক অথবা কালচে ; প্রান্তর সমতল অথবা উচ্চাবচ ; ভূমি কণ্টকগুল্মে কঙ্করে আকীর্ণ কি-না ; কোন্ কোন্ বৃক্ষলতা ও-অঞ্চলের বিশেষক, এবং কোন্ কোন্ বৃক্ষলতা তথায় বিরল অথবা অপ্রাপ্য, ইত্যাদি। অনুমান হয়ত' করিয়াছিলাম, ভূমি যখন কঙ্কর কণ্টকাকীর্ণ, প্রান্তর তখন সাধারণতঃ তৃণ বিরলই হইবে। এইরূপে, অনুসন্ধান ও অনুমান-লব্ধ

করেকটি উপাদান একটা হিসাব মতো সাধারণ ভূগোলের ক্ষেত্রে আরোপ করিয়া সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার অভাব সত্ত্বেও তন্মধ্যে রাঢ়প্রান অঞ্চলের ভূগোলের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ আরোপ করা অসম্ভব হয় নাই। একথা নিশ্চয় স্বীকার করি, কোনো বিষয়ে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থাকিলে তাহার শব্দচিত্র অঙ্কিত করা আরও খানিকটা সহজ, হয়ত' আরও খানিকটা বাস্তবানুগও হয়; কিন্তু সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা না থাকিলে সে বিষয়ে লেখকের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই, একথা স্বীকার করি না। মহৎ লেখক যে যুগে বাস করেন দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে সে যুগ অতিক্রম করিয়া তিনি নূতন যুগের সৃষ্টি করেন। সাধারণ লেখক অভিজ্ঞতার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বস্তুদৃষ্টিবশতঃ বর্তমান কালের চৌহদ্দির মধ্যে আটকাইয়া থাকেন। শরৎচন্দ্র তাঁহার লেখার মধ্যে যে সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছিলেন সে চিত্র তাঁর নিজ জীবন-কালের সমাজের ততটা নহে, যতটা অনাগত কালের সমাজের। অভিজ্ঞতা রক্ষণশীল সাবধানী বন্ধু; সাহস তাহার অল্প, দুঃসাহস একেবারে নাই। তাই তাহার কলশ্রুতির অঙ্গে নূতন চিন্তার দীপ্তির দৈন্য।

কল্পনার কিন্তু উন্মুক্ত দৃষ্টি; সুদূর ভবিষ্যতের অঙ্গে উপনীত হইবার তাহার আশ্চর্য ক্ষমতা। আজি হ'তে শতবর্ষ পরের নবীন ফাল্গুন দিনে পাঠিকাকে আপন বসন্তগীতি পাঠাইয়া অনাবদ্ধদৃষ্টি সাহসী কবিই বলিতে পারেন—

'আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে—
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্মরে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে॥'

লেখকের অভিজ্ঞতা লইয়াই কিছু বলিলাম। কিন্তু পাঠকের অভিজ্ঞতার কথাটাও অগৌণ নহে। বরং অবস্থা বিশেষে সাহিত্যের হাটে-বাজারে লেখকের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা পাঠকের অভিজ্ঞতাই দর চড়ানোতে সাহায্য করে বেশি। কথাটা সহসা ঈষৎ রহস্যাবৃত মনে হইতে পারে, সুতরাং খুলিয়া বলি।

সাহিত্যিক তাঁর আপন সৃষ্টিশালার নির্জনে বসিয়া নিজ অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে সম্বল করিয়া সাহিত্য রচনা করেন, কিন্তু বস্তুতঃ সে সাহিত্যের বাজার দরের যাচাই হয় পাঠকের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরের উপর। যে ক্ষেত্রে লেখকের কিছু অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু পাঠকের নাই, অথবা যেটুকু আছে তাহা এত দুর্বল যে, তাহার দ্বারা লেখকের অভিজ্ঞতার প্রযুক্তির যথার্থতার বিচার করা চলে না, সেখানে লেখক তাঁর স্বল্প অভিজ্ঞতার মূলধন লইয়াও আসর জমাইতে পারেন। অর্থাৎ পাঠক-সাধারণ্যের নিকট যে সমাজ অজানা, যে প্রদেশ অচেনা, যে নরনারী অপরিচিত, যে মরু-মেরু-কান্তার অনধিগম্য, তদ্বিষয়ে অতিরঞ্জিত অভিজ্ঞতার নীর্ণ কঙ্কালে কল্পনার মেদ-মাংস-মজ্জা যোজনা করিয়া প্রতিভাবান লেখক যে সাহিত্যের সৃষ্টি করেন, পাঠক এবং সমালোচক তাহাকে গ্রহণ করেন দ্বিধাহীন নিশ্চিন্ত আনন্দে। কিন্তু লেখক এবং পাঠকের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র যেখানে অভিন্ন, সেখানে

লেখকের অতি সতর্ক না হইয়া উপায় নাই। বাঙালী নরনারীর হৃদয়বৃত্তির খেলা দেখাইয়া লেখক যখন বাঙালী পাঠকের চিত্তবিনোদন করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ফাঁকিবাজি কোন আকারে অথবা প্রকারে চলে না ; ফাঁকি দিলেই রসিক পাঠক মাথা নাড়িতে থাকিবে, 'না, না, ঠিক হ'ল না, ভুল হ'ল।'...তাই সামাজিক এবং পারিবারিক কথাসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যত তীব্র, কৃতিত্ব অর্জন করাও সেখানে তেমনি কঠিন। "পল্লী সমাজ" রচনা করিবার সময়ে শরৎচন্দ্রকে নিজ সমাজের কাহিনী রচনা করিতে হইয়াছিল বলিয়া যে পরিমাণ সতর্ক এবং সচেষ্ট হইতে হইয়াছিল, ব্রহ্মদেশীয় সমাজের কাহিনী 'ছবি' রচনা করিবার সময়ে নিশ্চয়ই ততটা হইতে হয় নাই। ব্রহ্মদেশীয় সমাজ সম্বন্ধে তাঁর যে-পরিমাণ অভিজ্ঞতা ছিল, তাহার তুলনায় বাঙলাদেশের সাধারণ পাঠক সম্প্রদায়ের প্রায় কিছুই ছিল না। সুতরাং 'ছবি' গল্পের পটভূমিকা এবং চরিত্রবিন্যাসের বিরুদ্ধে সমালোচনা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাও শরৎচন্দ্রের তেমন কিছু ছিল না।

সাহিত্যে অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলাম, তন্মধ্যে প্রধানতঃ দুটি কথা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রথমতঃ আলোচ্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা সাহিত্যিকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হইলেও সর্বাধিক প্রয়োজনীয় নহে ; সতর্ক বিবেচক শক্তি হইতে উৎপন্ন অনুমান এবং দৃষ্টি কার্যকারিতার অভিজ্ঞতাকে পিছনে ফেলিয়া যায়। এবং দ্বিতীয়তঃ, অভিজ্ঞতা বিষয়ে লেখকের অভিজ্ঞতাই একমাত্র কথা নহে, পাঠকের অভিজ্ঞতাও কার্যক্ষেত্রে প্রভাবশালী বস্তু।

উত্তর-তোরণ
উপন্যাস
শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

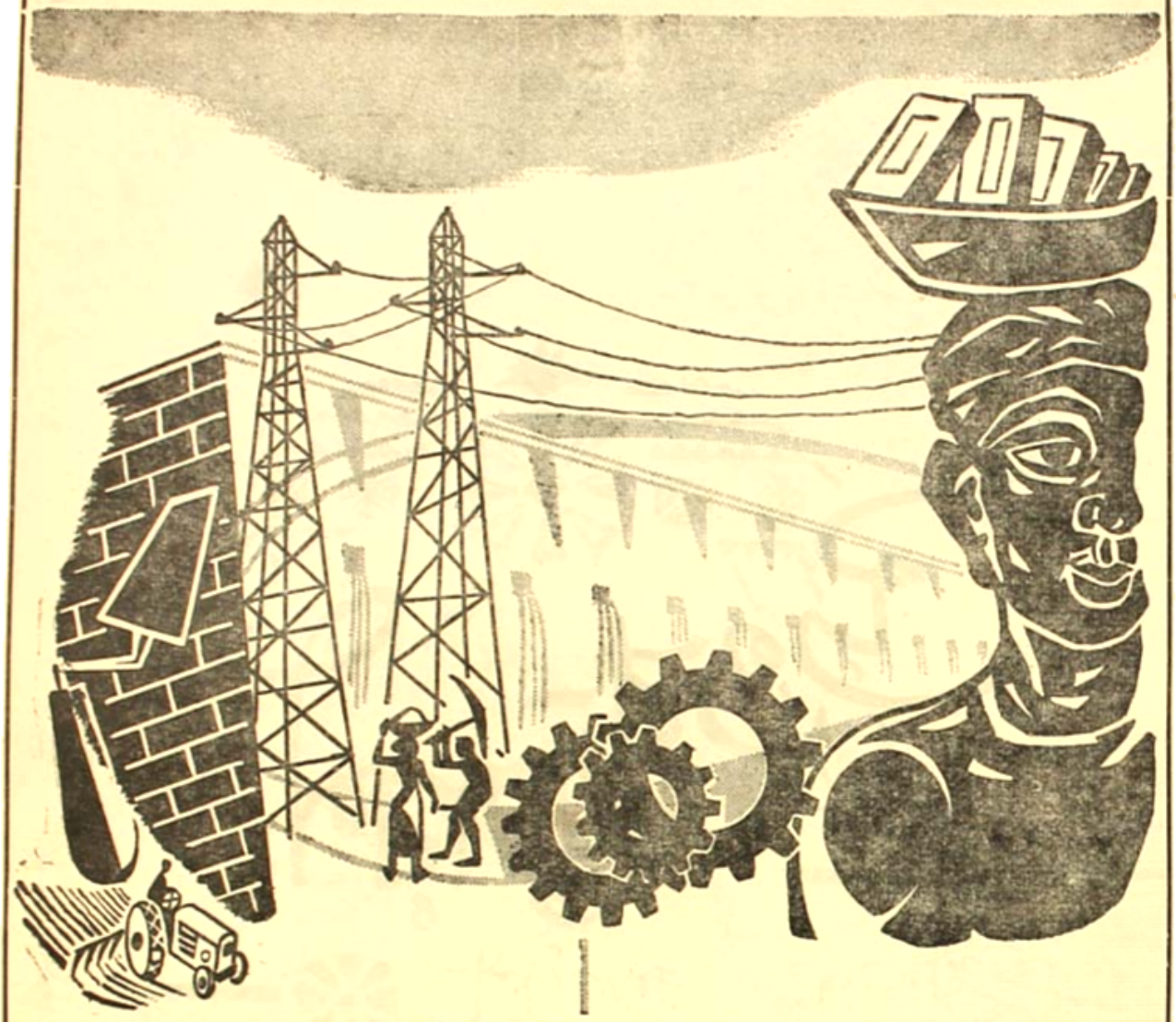

পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ

উন্নয়ন খাত	প্রথম পরিকল্পনায় বিনিয়োগ	পরিকল্পনায় ব্যয় (কোটি টাকার হিসাবে)	দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগ
কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন	৮.৫	৮.৪	৩৪.৪
জলসেচ ও বিদ্যুৎ	১৫.৮	১৩.৫	৩০.৭
শিল্প	১.১৪	১.১৫	১০.০
যানবাহন ও যোগাযোগ	১৫.৫	১৫.১০	১৯.৫
সমাজ সেবা	৩১.৩	২৯.৪	৫৩.৯
বিবিধ	...	...	৯.২
	৭২.২৪	৬৭.৫৫	১,৫৭.৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

উত্তর তোরণ

যেদিন সুপ্রকাশের জেলের খবর এল হৃষিকেশবাবুর কাছে, সেইদিনই ধূর্জটিবাবুর কাছে এল অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়োগপত্র। সন্ধ্যায় ধূর্জটিবাবুর কাছারীতে নহবত বেজে উঠল। হৃষিকেশবাবুর সন্দেহ রইল না এই আনন্দের অর্ধেক অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের জন্যে আর অর্ধেক সুপ্রকাশের জেলের জন্যে।

কিছুদিন থেকেই মহকুমার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ নিয়ে হৃষিকেশ ও ধূর্জটির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। সম্ভাবনা, কিছুদিন আগে পর্যন্তও, হৃষিকেশবাবুরই বেশি ছিল। ইঙ্গিতে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে এক প্রকার কথাই দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে সুপ্রকাশ আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার হল।

তদ্বির বিরুদ্ধপক্ষের তরফ থেকেও কম হচ্ছিল না। তাঁদের কাছ থেকে সুপ্রকাশের কংগ্রেসী কার্যকলাপের কথা শুনে শেষ মুহূর্তে ম্যাজিস্ট্রেট মত বদলালেন এবং হৃষিকেশবাবুর পরিবর্তে ধূর্জটিবাবুর জন্যেই সুপারিশ করলেন।

এ সমস্ত কথা হৃষিকেশ পুখরাজ টের পাননি। তিনি মনে মনে শেষ পর্যন্ত আশাই পোষণ করছিলেন।

ইতিমধ্যে নহবত বেজে উঠল।

অগ্নিগর্ভ পাহাড়ের মতো হৃষিকেশবাবু নিষ্ফল আক্রোশে গর্জন করতে লাগলেন।

সুপ্রকাশ হৃষিকেশবাবুর একমাত্র সন্তান। স্কুল-কলেজের পরীক্ষাগুলো ভালো করে পাস করে কলকাতার একটি কলেজে অধ্যাপনা করে। মনের দিক দিয়ে এবং প্রকৃতির দিক দিয়ে আসলে সে অধ্যাপকই। কিন্তু খদ্দর পরে, আন্দোলনের সময় জেলে যায় এবং অবসর সময়ে কংগ্রেসের কাজও কিছু কিছু করে।

বলা বাহুল্য তাতে হৃষিকেশবাবুর সম্মতিও নেই, সমর্থনও নেই। পিতার মতের বিরুদ্ধেই সুপ্রকাশ এই সমস্ত করে। সাবালক, উপার্জনক্ষম এবং শিক্ষিত একমাত্র সন্তানের কার্যকলাপ তাঁকে নিঃশব্দে সহ্য করে যেতে হয়। উপায় কি?

এমন কি, সুপ্রকাশের অধ্যাপকবৃত্তি গ্রহণেও হৃষিকেশবাবুর আপত্তি ছিল। তাঁদের বংশে কেউ কখনও দাসত্ব করেনি। অধ্যাপনাও তো একরকমের দাসত্ব। কি দুঃখে তাকে চাকুরি করতে হবে? অভাব তো কিছুই নেই।

তাছাড়া সে একমাত্র সন্তান। হৃষিকেশবাবুর বয়স হচ্ছে। সকল সময় সে কাছে কাছে থাকবে, জমিদারীর কাজকর্ম দেখবে, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা।

কিন্তু সুপ্রকাশ শুনলে না।

সে যে উদ্ধত এবং অবিনয়ী তা নয়। পিতাকে সে সম্মান করে, ভক্তিও করে। কিন্তু মুখুয্যে বংশের অনমনীয় জেদ এবং দুর্বিনীত তার রক্তের মধ্যে ছিল। বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান হৃষিকেশ সেই কারণে পুত্রকে সম্ভবমত এড়িয়ে চলতেন। পিতাপুত্রে দেখা হত কম, কথা আরও কম হত।

উপরের বালাখানার প্রশস্ত টানা বারান্দায় পাইচারি করতে করতে একমাত্র সন্তানের দেওয়া এই আঘাতও তাঁকে নিঃশব্দে সহ্য করতে হল।

পরের দিন দূর্জটিবাবু এসে খুব ভক্তিভরে হৃষিকেশবাবুর পায়ের ধুলো নিলেন।

মুখুয্যেদের কাছারিতে বড় একটা তিনি আসেন না। আজ কেন এলেন অনুমান করা হৃষিকেশ-বাবুর পক্ষে শক্ত হল না।

উচ্চহাস্যে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, আরে বিলক্ষণ! এখন থেকে তুমি হলে গিয়ে একটা হাকিম। কবে একদিন তোমার কাঠগড়ায় জোড়হাত করে গিয়ে দাঁড়াতে হবে হয়তো। আমি শুনেছি, সব শুনেছি। বোসো, বোসো।

পরম সমাদরে হৃষিকেশবাবু তাঁকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

দূর্জটি বিনীতভাবে বললেন, কী যে বলেন দাদা! যা হয়েছি সে আপনাদেরই পাঁচজনের আশীর্বাদে।

হৃষিকেশবাবু বললেন, পাঁচজনের আশীর্বাদ তো আছেই। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হল তোমার নিজের কৃতিত্ব। বুঝলে ভায়া, তোমার নিজের কৃতিত্ব।

দূর্জটি হাত জোড় করলেন: ওকথা বলবেন না দাদা। আমি আপনাদের ছোট ভাই, চিরদিন ছোটই থাকতে চাই। আমার ওপর স্নেহ রাখবেন এইটুকুই প্রার্থনা।

কিছুক্ষণ দুই মহারথীর বাক্যের প্যাঁচ কষাকষি চলল।

হঠাৎ এক সময় দূর্জটি বললেন, যাকগে ওসব কথা। কিন্তু এ কি শুনছি দাদা?

এর জন্যেও হৃষিকেশ অপেক্ষা করছিলেন।

—কি শুনছ ভাই?

মুহূর্তের জন্যে তাঁর ললাটে ভ্রূকুটির রেখা যদি বা দেখা গেল, তখনই তা মিলিয়েও গেল।

দূর্জটি জিজ্ঞাসা করলেন, সুপ্রকাশের নাকি জেল হয়েছে?

উত্তরে প্রশ্নকর্তাকে সচকিত করে হৃষিকেশ অট্টহাস্য করে উঠলেন: এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কি বুঝি বা দুঃসংবাদ আছে। হ্যাঁ ভাই, সুপ্রকাশ আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেই গেছে। খবরটা শুনে ভাবলাম, তোমার নহবতের সঙ্গে আমিও একটা নহবত জুড়ে দিই। কিন্তু—

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

দূর্জটি প্রথমটা চমকে গিয়েছিলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, কিন্তু আমাদের নিত্য হাকিম আর দারোগা নিয়ে কারবার। আমাদের ঘরে—

—নিশ্চয়। সেই জন্যেই তো মহবত বলাম না। তবে কি জান ভায়া, আমাদের আর ক'দিন আমাদের কারবার তো এবার গুটিয়ে আনার সময় হয়েছে। না কি বল?

গম্ভীরভাবে ধূর্জটি বললেন, তা তো বুঝলাম দাদা, কিন্তু সরকার সাহেব যা কড়া ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি বোধ হয় এতে—

কিন্তু হৃষিকেশ যেন ধূর্জটির কাছে হার মানবেন না পণ করেছেন। ধূর্জটির মুখের কথা লুফে নিয়ে বললেন, খুশি হবেন না। তাও জানি। সে এক পর্ব রইল তাঁকে খুশি করা। কিন্তু আসল কথাটা কি জান?

যেন মস্তবড় একটা গোপন রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে হৃষিকেশ ভালো করে নড়ে-চড়ে বসলেন।

বললেন, কথাটা আর কিছুই নয়। আমরা মুখুয্যেরা, তো যৌতিত্রসূত্রে জমিদারী পাইনি। এ আমাদের একদিন লাঠির জোরে দখল করে নিতে হয়েছে। লাঠি আর নেই, কিন্তু জোরটা যে এখনও রয়েছে, ছেলেদের রক্তে তার পরিচয় পেলে মনটা বড় খুশি হয়। বুঝলে না ভায়া?

ভায়া বুঝলেন কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু 'যৌতিত্রসূত্রে'র উল্লেখে তাঁর মুখে কে যেন কালি লেপে দিলে।

উঠতে উঠতে বললেন, কি জানি দাদা, কি করে আপনার হাসি আসছে। আমার তো শুনে পর্যন্ত মনটা ভালো নেই। দুধের ছেলে, কে জানে এতক্ষণ ঘানিই টানছে, না দড়িই পাকাচ্ছে। কথায় বলে ফাটক!

হৃষিকেশ এরও জবাব দিতে যাচ্ছিলেন! কিন্তু ধূর্জটিকে উঠতে দেখে ব্যস্তভাবে বললেন, ওকি! উঠলে যে! একটু চা খেয়ে যাও।

ধূর্জটি করজোড়ে বললেন, আর একদিন এসে খাব দাদা। এ তো নিজেদেরই বাড়ি!

তিনি আর দাঁড়ালেন না।

হৃষিকেশও নিজের মনে একটু কুটিল হেসে ভিতরে চলে গেলেন, বোধকরি সরকার সাহেবকে কি করে খুশি করা যায় তারই উপায় উদ্ভাবনের জন্যে।

যৌতিত্রসূত্রের কথাটা যদি:

দেবীপুরের মুখুয্যে এবং চাটুয্যে উভয় বংশই সম্মানিত এবং সম্ভ্রান্ত। কিন্তু মুখুয্যেরাই গ্রামের আদি জমিদার।

সাতপুরুষ আগে এই বংশে হরিহর এবং ধনঞ্জয় দুই সহোদর ছিলেন। দুই ভাই যখন পৃথক হলেন তখন হরিহরের তরফ বড় তরফ এবং ধনঞ্জয়ের তরফ ছোট তরফ নামে অভিহিত হল।

ধনঞ্জয়ের পুত্রসন্তান ছিল না। একটিমাত্র কন্যা। কন্যাটির তিনি বিবাহ দিলেন নিজ গ্রামের বিশ্বনাথ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে। মুখুয্যে বংশের অর্ধেক সম্পত্তি বাঁড়ুয্যে বংশের হাতে চলে গেল।

মুখুয্যেদের পক্ষে এটা সুখ প্রীতির বিষয় হল না।

এই সময় থেকেই বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে উভয় পরিবারে দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং গোলযোগ আরম্ভ হল।

আরও দুই পুরুষ পরে বিশ্বনাথের পৌত্র শম্ভুনাথও একটিমাত্র কন্যা-সন্তান রেখে মারা গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনিও নিজ গ্রামের হরসুন্দর চাটুয্যের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেলেন। মুখুয্যেদের অর্ধেক সম্পত্তি আবার হাত বদলালো বাঁড়ুয্যে বংশ থেকে চাটুয্যে বংশে।

বদলালো না শুধু মুখুয্যেদের মনোভাব। পুরাতনের জের টেনে দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং মামলা-মোকদ্দমা যেমন চলছিল সমানে তেমনি চলতে লাগল।

এখনও উভয় পরিবারের মধ্যে মোটা তিনেক জটিল মামলা তার আনুষঙ্গিক জটিলতর শাখা-প্রশাখা নিয়ে তিন কোর্টের মধ্যে ছুটোছুটি করছে। বিষয়-সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেছে। রক্তের সম্পর্কও ছিন্ন। কিন্তু উভয় পরিবার মামলার অচ্ছেদ্য বন্ধনে এখনও আবদ্ধ রয়েছে।

আরও একটি বন্ধন আছে: কুলদেবতা সিংহবাহিনী এবং তাঁর দেবোত্তর সম্পত্তি।

হরিহর ও ধনঞ্জয়ের পূর্বপুরুষ এই ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন যে দেবোত্তর সম্পত্তি ভাগ হতে পারবে না। পরিবারে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁরই হাতে থাকবে দেবসেবা ও দেবোত্তর পরিচালনার ভার। ওটা একটা পৃথক এস্টেট এবং কুলপ্রথা অনুযায়ী দ্বিবিকেশই এখন তার পরিচালক।

আরও একটা ব্যবস্থা আছে। পৃথক দুর্গাপ্রতিমা আনার ব্যবস্থা নেই। দুর্গাপূজার প্রচলিত পদ্ধতিতে ওই কয়দিন সিংহবাহিনী দেবীরই পূজা হয়। বিবাদ-বিসম্বাদ, মামলা-মোকদ্দমা সত্ত্বেও এই প্রাচীন ব্যবস্থাই এখনও পর্যন্ত বলবৎ আছে।

গোলযোগের উপলক্ষ্যের যে অভাব আছে তা নয়। একটি পুষ্প অথবা বলিদানের মহা-প্রসাদ নিয়ে গোলযোগ লেগে গেলেই হয়। কিন্তু দূরদর্শী পূর্বপুরুষেরা সে ব্যবস্থাও করে গেছেন।

প্রত্যেক পূজার সময় কুলগুরু নিজে উপস্থিত থাকেন। মতভেদের ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। উভয় পক্ষকেই বিনা প্রতিবাদে সেই সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করতে হয়। কোনো পক্ষের আপত্তি চলে না।

গুরুবংশ পুরুষানুক্রমে এই প্রথার মর্যাদা রক্ষা করে আসছেন। এঁদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। প্রত্যেক পর্বেই জমিদারসুলভ ঘটেই সমারোহ। কুলগুরু প্রত্যেক পর্বে সর্বকর্ম পরিত্যাগ করেও উপস্থিত থাকেন। কিন্তু এঁদের বৈষয়িক বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে দূরে থাকেন। তার মীমাংসার ভার লাঠিয়ালের লাঠি এবং ইংরেজের আদালতের হাতে।

হরিহর এবং ধনঞ্জয় যখন পৃথক হন, এই অবশ্য. হয়তো তাঁরা কল্পনাও করেন নি।

ধনঞ্জয় বাড়ি করলেন আদি বাড়ি দাদাকে ছেড়ে দিয়ে সেই বাড়ির পিছনেই। সদর, অন্দর, খিড়কির পুকুর, আম-কাঁঠালের বাগান এই নিয়ে আদি বাড়ির সীমানা। তারপরেই একটা রাস্তা। রাস্তার ওপরেই আরম্ভ হল নতুন বাড়ির বাগান, খিড়কির পুকুর, অন্দর এবং সদর।

এবাড়ির সদর থেকে ওবাড়ির সদর যদিও অনেকখানি পথ, কিন্তু বাগানের খিড়কিপথে একটি রাস্তার এপার-ওপার। দুইবাড়ির মেয়েদের যোগাযোগ রক্ষার জন্যেই এইভাবে বাড়ি তৈরি হয়েছিল।

বিশ্বনাথের আমলেও উভয় পরিবারের সদরে যত লাফা-লাফালি এবং খুনোখুনি চলুক, অন্দরের যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি। ক্রিয়াকর্ম-পালপার্বণে উভয় পরিবারের মেয়েদের পরস্পরের বাড়ি যাতায়াত ছিল।

ধীরে ধীরে তাও বন্ধ হয়ে গেল।

তারপরেও কিছু দিনে উভয় বাড়ির খিড়কির দরজা খোলাই থাকত ঝি-চাকরের কল্যাণে। গৃহিণীদের অজ্ঞাতসারে দুই বাড়ির ঝি-চাকরদের সোজা-রাস্তা ছিল খিড়কি দিয়ে।

এবং, যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য, কর্তা-গৃহিণীদের অজ্ঞাতসারে ও ঝি-চাকরের প্রশ্রয়ে এই অত্যন্ত অচিন্ত্যনীয় সোজা-রাস্তায় একদিন ধরিকেশের একমাত্র পুত্র সুপ্রকাশ আর দুর্জটির একমাত্র কন্যা অসীমার খেলাপাতির ঘরকন্না বসে গেল কখনও এবাড়ির বাগানে, কখনও ও-বাড়ির। দুই বাড়িরই কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে।

সেও অনেক দিনের কথা।

তখন সুপ্রকাশের বয়স বছর এগারো, অসীমার ছয়।

—হ্যাঁ সুপুদা, তুমি নাকি ফার্স্টো হয়েছ?

—হ্যাঁ—সুপ্রকাশের কণ্ঠস্বর গাম্ভীর্যপূর্ণ।

—কি করে ফার্স্টো হয়?

—খুব ভালো পড়াশুনো করলে।

অসীমা সকৌতুকে খিলখিল করে হেসে উঠল: তুমি কি খুব ভালো পড়াশুনো কর? তুমি তো সমস্ত দিন আমার সঙ্গে খেলা কর।

সেটাও মিথ্যা নয়।

সুপ্রকাশ চিন্তা করে বললে, কখনও কখনও ভালো পড়াশুনো না করলেও ফার্স্ট হয়। তুমিও হবে।

—সব সময় খেলা করে? ধ্যেৎ, আমি ফার্স্টো হব না।

—হয়ে যাবে দেখো।

অর্থাৎ সুপ্রকাশের ধারণা ছাত্রেরা ফার্স্ট হয় না, হয়ে যায়।

অসীমা তথাপি বিশ্বাস করতে পারে না: আমার যে পড়তে ভালোই লাগে না।

—আমারও তো। তবু ফার্স্ট হই।

এর উপর আর প্রশ্ন চলে না। অসীমার দোলাচলচিত্ত বোধ হয় স্থির হল।

বললে, তাহলে কি হবে জান?

—কি ?

—ভালো পড়াশুনো করলে মা আমাকে কলকাতায় মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

—কেন ?

—পড়াশুনো করতে। সে ভারী বিশ্রী।

অসীমা ঠোঁট কোলালো।

সুপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, বিশ্রী কেন ?

—বা রে ! বিশ্রী নয় ? তুমি থাকবে না, খেলব কার সঙ্গে ?

প্রথমটা সুপ্রকাশও দমে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই উৎসাহিত হয়ে বললে, দূর বোকা ! আমিও তো ম্যাট্রিক দিয়ে কলকাতায় পড়তে যাব। তখন আবার খেলা করব।

বাটি-ভরা দুধ নিয়ে দুজনের কি এল দুদিকের অন্দর থেকে।

অসীমা তাদেরই সালিশী মানলে : আচ্ছা বংশীর মা, কলকাতায় কি খেলা যায় ?

বংশীর মা বহুকাল আগে একবার সিমীমার সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিল, ঘুর্জটিবাবুর তখন সবে বিয়ে হয়েছে। হাওড়ার পুল, কালীঘাট, চিড়িয়াখানা সব তার দেখা। মায় দানীবাবুর থিয়েটার পর্যন্ত।

চোখ কপালে তুলে সে বললে, ও সরস্বতি, খেলা ? কলকাতায় ? যা গাড়ি-ঘোড়া-টেরাম, সেখানে খেলার যো কি !

অসীমা সভয়ে সুপ্রকাশের দিকে চাইলে : তবে ?

—কি তবে ?—সুপ্রকাশ দমলো না। চোখ পাকিয়ে বললে,—আহা, বাড়ির ভেতর আবার গাড়ি-ঘোড়া কি ?

অসীমা বংশীর মায়ের দিকে চাইলে।

সে স্বীকার করলে, না। বাড়ির ভেতর গাড়ি-ঘোড়া নেই।

অসীমা জিজ্ঞাসা করলে, বাড়ির ভেতর আমরা খেলতে পারি ?

বংশীর মা জবাব দেবার আগেই উৎসাহের সঙ্গে দুই হাতে তালি বাজিয়ে সুপ্রকাশ বললে, নিশ্চয় পারি। একশোবার পারি। দুশোবার পারি। বাড়ির ভেতর কিছু নেই।

বংশীর মা আবার চোখ কপালে তুললো : কিছু নেই, বল কি ! নিচের অন্ধকার-অন্ধকার ঘরগুলোয় বুড়ো-আঙুলের মতো ফুদে ফুদে ভূতগুলো তো দিনরাত কিলবিল করছে।

এবারে সুপ্রকাশ এবং অসীমা দুজনেরই মুখ শুকিয়ে গেল। অজ্ঞাতসারেই দুজনে নিজের নিজের মির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

—তাই নাকি !

—হ্যাঁ। সন্ধ্যের পর দরজা খুলেছ কি পায়ের ফাঁক দিয়ে সুরুৎ সুরুৎ করে ছুটোছুটি করবে।

পা মাটিতে রাখা আর নিরাপদ নয়। ভূতের পক্ষে, বিশেষ ছোট ছোট ভূতের পক্ষে, কলকাতা থেকে দেবীপুর ক'সেকেণ্ডেরই বা পথ!

দুজনে তড়াক করে লাফিয়ে নিজের নিজের বিয়ের কোলে উঠে পড়ল।

অসীমা জিজ্ঞাসা করলে, আমার মামার বাড়িতেও আছে?

দুজনকে কোলে নিয়ে দুটি বিই বিপন্ন।

বাধ্য হয়ে বংশীর মাকে বলতে হল, না সেখানে নেই।

তবে আর কি!

দুজনেই কোল থেকে নেমে ওদের নিষ্কৃতি দিলে।

আরও বছর দুই পরে অসীমার মাসীমা এসে অসীমাকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। এখানে থাকলে অসীমার লেখাপড়া হবে না। ধূর্জটিবাবুর জেদ মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে হবে।

তাঁর ছেলে নেই। ছেলের আশা তিনি প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। ধনঞ্জয়ের বংশে মাঝে মাঝে বংশলোপ হওয়াই বোধহয় বিধিলিপি। পর পর দু'বার এমনি হল। মুখুয্যে থেকে বাঁড়ুয্যে, বাঁড়ুয্যে থেকে চাটুয্যে বংশে দুবার সম্পত্তি হাতবদল হল। এবারে আবার কোন বংশে যাবে কে জানে।

সুতরাং অসীমাকে লেখাপড়া শেখাতে হবে। সে যেন নিজেই জমিদারী, বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শোনা করতে পারে। ঘরজামাই আসবে, উপায় কি? দৌহিত্র সম্পত্তির মালিক হবে, তারও কোনো উপায় নেই। কিন্তু অসীমা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারিণী হলেও যেন পরের হাত তোলা না থাকে।

এ হল একটা যুক্তি। কিন্তু আরও যুক্তি কি নেই? ধূর্জটির চেতন অথবা অবচেতন মনের নিভৃত কোণে? অবিকেশের ছেলেটা পড়াশুনায় ভালো হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত ওদের দুই তরফে পড়াশুনার ঝামেলা ছিল না। সুপ্রকাশই প্রথম ব্যতিক্রম হতে চলেছে। খুব সম্ভবত সে শেষ পর্যন্ত পড়াশুনা করবে, পাঁচজনের একজন হবে। আর চাটুয্যে বংশ পিছিয়ে থাকবে? মুখুয্যে বংশ চাটুয্যে বংশের উপর টেক্কা মেরে যাবে? শুধু চাটুয্যে বংশে ছেলে নেই বলে?

তা হতে পারে না।

দেবীপুরে মেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা নেই। কোনো কোনো বাড়ির ছোট ছোট মেয়েরা প্রাথমিক স্কুলে ছেলেদের সঙ্গে পড়তে যায় বটে, কিন্তু সে নাম মাত্র। শিক্ষক এবং ছাত্রী উভয়েই জানে, কোনো রকমে সোলে হরিবোল দেওয়ার জন্যে মেয়েদের পড়তে আসা। বিয়ের পর চিঠি-পত্র লিখতে পারার মতো বিদ্যা অর্জনের জন্যে।

তাও ক'টা দিন?

নয় থেকে এগারো বছর বয়সের মধ্যেই অধিকাংশের বিবাহ হয়ে যায়। হয়তো অল্প কোনো

কোনো ক্ষেত্রে ভালো পাত্রের অপেক্ষায় মেয়েদের তেরো-চৌদ্দ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। পনেরো পেরুলে তো সমাজে ঘোঁট পড়ে যাবে।

এবং তেরো-চৌদ্দ বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলেও অত বড় বয়স পর্যন্ত স্কুলে কোনো মেয়েই যায় না। তারা বাড়িতেই থাকে। খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়।

একা অসীমার জন্যেও তো আর একটা মেয়েদের স্কুল করা যায় না ধূর্জটিবাবুর যত টাকাই থাক, পরের মেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে খরচ করতে যাবেনই বা কেন? আর সে ইচ্ছা যদি থাকতোও তাহলেও ছাত্রীর অভাবে স্কুল চলতে পারত না।

অত বয়স পর্যন্ত গ্রামের মেয়ে স্কুলে পড়বে? বিদ্যি হবে?

সর্বনাশ!

এই আপত্তি ধূর্জটিবাবুর স্ত্রী সুলোচনাও তুলেছিলেন। কিন্তু ধূর্জটির স্বভাব হচ্ছে, যেটা তিনি স্থির করেন সে বিষয়ে কোন আপত্তি সহ্য করতে পারেন না। তাতে তাঁর জেদ আরও চড়ে যায়।

সুলোচনা স্বামীর এই স্বভাব জানেন। মাত্র একবার প্রতিবাদ জানিয়েই চুপ করে গেলেন। আশা করলেন ধূর্জটি, কোনো পক্ষ থেকে আপত্তি না উঠলে, নিজেই একদিন অসীমার পড়া বন্ধ করে দেবেন।

কিন্তু তার যো কি!

ধূর্জটি তো একা নন। তাঁর পিছনে আছেন অসীমার মাসী নিরুপমা। তিনি কলকাতায় থাকেন, সেখানে মেয়েদের লেখাপড়ার চলন প্রবলবেগে আরম্ভ হয়েছে। দিদির কাছ থেকে যাতে আসতে পারে ভেবে তিনি নিজেই বোনঝিকে নিতে এসেছেন।

কোনো দুর্বল মুহূর্তে ধূর্জটির স্নেহপ্রবণ মনে অন্য ইচ্ছা জাগলেও উপায় নেই। তিনি এই সপ্রতিভ বাকপটু শ্যালিকার মুঠোর মধ্যে। বিধা করার উপায় ছিল না।

গোড়ায় অসীমারও খুব ইচ্ছা ছিল সুপ্রকাশের মতো খুব ভালো লেখাপড়া শিখবে। সুপ্রকাশও তাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিল। কিন্তু মাসীমা এসে পড়তে যাওয়ার পূর্বাহ্নে দুজনেরই উৎসাহ ফুস করে নিভে গেল। কিন্তু তখন নিরুপায়। তাকে যেতেই হবে।

দুপুরের গাড়িতে অসীমারা যাবে।

ওদের বন্ধ খিড়কির দরজার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাইতে চাইতে সুপ্রকাশ তাদের বাগানে অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছে।

হায় ভগবান! যাওয়ার আগেই অসীমা কি তাকে ভুলে গেল!

বেলা হচ্ছে। সুপ্রকাশের নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, সেদিকে খেয়ালও নেই। শুধু অস্থিরভাবে একটানা পায়চারি করে চলেছে।

আশা যখন আর নেই, ওদের গাড়ির সময় হয়ে এসেছে, তখন হঠাৎ ওদের খিড়কি দরজাটা খুলে গেল। বিড়ালের মতো বিদ্যুৎবেগে এবাড়ি ঢুকে পড়ল অসীমা।

তার ডান হাতে মাসীমার আনা কলকাতার খাবার। বাঁ হাতে পেয়ারা। খাবারটা সুপ্রকাশের মুখে পুরে দিয়ে পেয়ারাটা ওর দুই হাতে গুঁজে দিলে।

সুপ্রকাশ বললে, আমি এখানে সেই সকাল থেকে ঘুরছি।

—জানি। আবার আমি পুজোর সময় আসব। কেঁদো না। বলে অসীমা নিজেই কেঁদে ফেললে।

॥ দুই ॥

তারপরে অসীমা এসেছিল। পুজোতেই।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, চারদিনই দেখা হয়েছিল। মায়ের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে এসেছিল। সুপ্রকাশ একদৃষ্টে চেয়েছিল তার দিকে। কিন্তু একবারও চোখে চোখ পড়েনি।

অসীমা কলকাতা গিয়ে কেমন বদলে গেছে।

বিজয়া দশমীর দিন সুপ্রকাশ বাগানে গেল। ওদের দু'জনের পাতা খেলাঘর এতদিন সযত্নে সে রক্ষা করে এসেছিল। অসীমা বলে গিয়েছিল পুজোয় আসবে। তখন আবার খেলা হবে সেই আশায়।

অসীমা এসেছে। কিন্তু এ যেন অন্য অসীমা। এ আর কোনোদিন বাগানে খেলাঘর পাতবে ও বাড়ির খিড়কির দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে।

অভিমানে সুপ্রকাশের চোখ জলে ভরে এল।

রাসও হল। প্রচণ্ড মুখুয্যে বংশের রাস।

অসীমা ভাবে কি? তাকে নইলে সুপ্রকাশের খেলা হবে না? তার কি আর সঙ্গী-সাথী নেই?

সমস্ত খেলাপাতি এক এক করে সুপ্রকাশ খিড়কীর পুকুরে ফেলে দিলে। দুম দুম করে পা ফেলে দোতলার শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে নামল কান্নার বন্যা। বন্যা এবং ঝড়।

দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং মামলা-মোকদ্দমা যতই হোক, বিজয়ার রাত্রে পরস্পরের বাড়ি যাওয়া-আসা, প্রণাম এবং আলিঙ্গন এখনও অব্যাহত আছে।

সুপ্রকাশ ওদের বাড়ি গিয়েছিল। কাকাবাবু এবং কাকীমাকে প্রণাম করেছিল। কিন্তু দাঁড়ায়নি। অসীমার প্রণামের জন্যে অপেক্ষাও করেনি।

সুলোচনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সুপু চলে গেল নাকি দিদি?

সুপ্রকাশের মা অমলা বিস্মিতভাবে চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, ওমা, তাইত! কখন পালাল?

অসীমা কোথায় ছিল, এসে বললে, অনেকক্ষণ।

—ওমা, তাই নাকি?

সুলোচনা হেসে বললেন, ভারী লাজুক ছেলে আপনার। ওর মিষ্টিটা আপনাকেই নিয়ে যেতে হবে।

এরা যখন ও-বাড়ি গেলেন, সুপ্রকাশ দালানেই ছিল। অসীমাকে আসতে দেখেই সরে পড়ল।

এই কয় মাসে ওদের দুজনের কি যেন হয়েছে। উভয়ের মধ্যেকার অনেকখানি মাটি যেন সরে দুই পারে থেকে দুজনে কেন যেন আড়াল খুঁজছে।

বোধ করি এই বয়সে এই হয়। যখন মাখামাখি তখন খুবই মাখামাখি। চোখের আড়াল হলেই আবার নতুন করে পরিচয়ের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় সে সুযোগ মেলে না। যেমন এদের হয়েছে।

দুজনের খুবই ইচ্ছা আবার দুজনে মিলে বাগানে তেমনি খেলাঘর পাতে। তেমনি করে সমস্ত দিন ধরে খেলা তমাল গাছের চিকন পাতার নিচে। সমস্ত দিন ধরে খেলা। অফুরন্ত খেলা।

কিন্তু পারছে না।

অসীমা ভাবে, কেনই বা কলকাতা গেলাম। সুপুদাকে হারালাম।

সুপ্রকাশ ভাবে, আমিই উৎসাহ করে পাঠালাম। কেন পাঠালাম? অসীমা তো যেতে চায়নি।

কলকাতার বাসীমার মেয়ে সুবর্ণ অসীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, হেথে কার সঙ্গে খেলতিস রে?

—সুপুদার সঙ্গে।

এইটুকু বলতেই সুপ্রকাশের জন্যে তার মন-কেমন করে উঠেছিল।

সুবর্ণ চোখ বড় বড় করে বলেছিল, সে কি রে! বেটাছেলের সঙ্গে খেলতিস!

—বেটাছেলে আবার কি! সুপুদা তো!

সুপুদা সেদিন ছিল সুপুদা। পুরুষও নয়, নারীও নয়। কিন্তু কি কুক্ষণে সুবর্ণ যে ওই কথাটা বলেছিল, আজ আর সেই সুপুদাকে কিছুতেই সে ফিরে পাচ্ছে না। খেলাঘরও পাতা হচ্ছে না। আর বুঝি কোনোদিনই পাতা হবে না।

অসীমা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে।

এক একজন ক্ষণের মাথায় এক একটা কথা বলে। নরম মনে যা কঠিন দাগ কেটে যায়। সে দাগ সহজে মোছে না। হয়তো কোনো দিনই মোছে না।

সুবর্ণ অসীমার চেয়ে কতই বা বড়? সমবয়সী বলা চলে। এক স্কুলে এক ক্লাসেই পড়ে। অথচ—

শহরের মেয়েরা কি গ্রামের মেয়েদের চেয়ে আগে পাকে?

তারপরেও অসীমা আরও কতবার এসেছে।

পরের বড়দিনেই এসেছে। সেবারে সুপ্রকাশের সঙ্গে এক-আধবার দেখা হয়েছে। প্রথমবার সুপ্রকাশ এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে কথা বলবার চেষ্টা করেছিল।

অসীমা হেসে পাশের গলিতে ঢুকে পড়েছিল। ওকে কথা বলবার সুযোগ দেয়নি।

সুপ্রকাশ অপ্রস্তুত হয়েছিল। কারণ সঙ্গে বন্ধুরা ছিল। পাছে কথা বলতে হয় বলে অসীমা সে পাশের গলিতে সরে পড়ল, এটা তাদেরও চোখ এড়ায়নি।

জিজ্ঞাসা করেছিল, অসীমা তোর সঙ্গে আর কথা কয় না, না কিরে?

ভারী গলায় সুপ্রকাশ উত্তর দিয়েছিল, তাই তো দেখছি!

উত্তর দিতে লজ্জায় সুপ্রকাশের মাথা কাটা গিয়েছিল।

—ব্যাপারটার কি হল রে?

কি নিয়ে মামলা, কোথায় চলছে এ সমস্ত খবর রাখার বয়স ওদের কারও নয়। সে সম্বন্ধে কারও কোনো কৌতূহলও ছিল না। বোধ হয় ওদের মনে এই সন্দেহ হয়েছিল যে, উভয় পরিবারের বিরোধের ছোঁয়াচ বুঝি ওইটুকু মেয়ে অসীমার মনেও সংক্রমিত হয়েছে। নইলে যাদের মধ্যে কয়েক মাস আগেও অত ভাব ছিল,—সমস্ত দিন দু'জনে খেলা,—এর মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেল কেন?

সুপ্রকাশ বড়লোকের আদুরে ছেলে। অসীমারও সেই অবস্থা। তার ফলে বাইরের সঙ্গে উভয়েরই সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। পারেনি বলেই বিধের সোজা পথ হিসাবে দু'বাড়ির খিড়কির দরজা যখন খুলে গেল, দু'জনে তার সুযোগ গ্রহণ করলে।

তখন দু'জনেরই দু'জন ছাড়া গতি রইল না।

দুজনে খেলা জমল। ভাবও।

আজ সুপ্রকাশ যেমন সমবয়সী বন্ধু পেয়ে গেছে, অসীমাও তেমনি। আর যে-বয়েসে ছেলের সঙ্গে মেয়ের খেলা জমে সে বয়সও দুজনেরই পার হয়ে গেল।

দু'জনের মধ্যে কেমন একটা সংকোচও এসে গেছে যেন। সেই সংকোচ আগে এল অসীমার মনে, পরে সুপ্রকাশের মনেও।

গ্রীষ্মের ছুটিতে অসীমা এল তখন সুপ্রকাশের মনে শুধু সংকোচ নয়, ঔদাসীন্যও এসে গেছে।

দশটায় স্কুলে যায়, চারটের পরে ফেরে। কিছু খেয়েই খেলার মাঠ। ফুটবল খেলা জোরদার আরম্ভ হয়ে গেছে। ক্রমাগত 'ম্যাচ' খেলা চলছে বিভিন্ন স্কুলের টিমের সঙ্গে।

সুপ্রকাশ জমিদারের ছেলে। খেলায় খরচ আছে। সুতরাং স্কুলের টিমের সেই ক্যাপ্টেন।

তার সময় নেই। কখনও টিম নিয়ে অন্য গ্রামে খেলতে যাচ্ছে। দূরে হলে অনেক সময় সেদিন ফিরতে পারে না। কখনও অন্য গ্রামের টিম আসছে। দূরের হলে তাদের রাত্রে থেকে যেতে হয়। তার যথাযোগ্য আয়োজন আছে।

পড়াশুনা আর এই সমস্ত নিয়ে সে সমস্ত সময় এত ব্যস্ত ছিল যে, গ্রীষ্মের ছুটিতে অসীমা কবে এল আর কবে চলে গেল, খেয়ালই রইল না।

তার মন থেকে অসীমা একদিন মুছে গেল।

সংকোচে নয়, অভিমানে নয়, এমন কি উভয় পরিবারের বিরোধের ছোঁয়াচ লেগেও নয়। ঘুচে গেল শুধু সময়ের অভাবে। সুপ্রকাশের কিশোর মনে অন্য চিন্তা এবং অন্য উৎসাহ এসে ভিড় করেছে। অসীমার কথা চিন্তা করবারও সময় নেই।

সময় অসীমারও নেই। তারও অনেক বন্ধু জুটে গেছে। অনেক খেলা, অনেক উদ্যম। সেখানে সুপ্রকাশের কোনো স্থান নেই। সে যে এতবার আসছে-যাচ্ছে, এর মধ্যে সুপ্রকাশের সঙ্গে একবার দেখা করে আসা তার মনেই পড়ল না।

দেখা করা কিছুই কঠিন ছিল না। ঝি-চাকরের সোজাসুজি হিসাবে উভয় বাড়ির খিড়কি এখনও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। উভয় পরিবারের মহিলাদের প্রয়োজনে এখনও তা মাঝে মাঝে খোলে, যদিচ বেশির ভাগ সময়ই বন্ধ থাকে।

ইতিমধ্যে উভয় পরিবারে একটা প্রকাণ্ড দাঙ্গা হয়ে গেল। একটা বিঘের স্বত্ব নিয়ে। খুন হল না বটে, কিন্তু উভয়পক্ষে অনেকগুলো লাঠিয়াল জখম হয়ে গেল।

তাদের কয়েকজন অবশ্য প্রাথমিক চিকিৎসার পরই হাসপাতাল থেকে ফিরে এল। কিন্তু দু'জনের জখম বেশ গুরুতর। তারা হাসপাতাল থেকে ফিরবে কি না সন্দেহ।

এরাই দুজন দুপক্ষের লাঠিয়ালদের সর্দার।

এমন হত না। এমন হয়ও না।

পয়সার জন্যে ওরা লাঠি ধরে, দাঙ্গা করে। অনেক সময় দুপক্ষের সর্দারদের মধ্যে সখ্যতাও থাকে, সদব্যবসায়ী হিসাবে। অনেক সময় যে জায়গায় দখল নিয়ে দাঙ্গা, দুপক্ষের সর্দার গোপনে নিজেদের মধ্যে বিচার করে দেখে সেটা কার হওয়া উচিত।

তারপরে দুপক্ষে দাঙ্গা হয়, কিন্তু অল্প-স্বল্প রক্তপাতের উপর দিয়েই জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়।

মুখুয্যে এবং চাটুয্যেদের অনেক দাঙ্গাও ইতিপূর্বে দু'পক্ষের সর্দারের গোপন বিচারে অল্প রক্তপাতের উপর দিয়ে এইভাবে মীমাংসিত হয়েছে। জমিদার পক্ষ তা জানতেও পারেননি।

এবারে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কেষ্ট সর্দার এবং বেষ্টো সর্দার দুই খুড়তুতো-জাঠতুত ভাই। দুই ভায়ে এতাবৎ সম্প্রীতিরও অভাব ছিল না। মাস দুই থেকে সেই সৌভ্রাত্রে কাটল ধরেছে।

কেষ্টর শালার ছেলের সঙ্গে বেষ্টোর মেয়ের বিয়ে হয়েছে বছর চারেক হল। কিন্তু মেয়ে ছোট ছিল বলে এতদিন বাপের বাড়িতেই ছিল। বড় হতে মাস ছয় আগে শ্বশুরবাড়ি যায়। কিন্তু এই ছ'টা মাস তার বড়ই নির্যাতনের মধ্যে কেটেছে। প্রথম প্রথম মুখ বুঁজেই মেয়েটা শ্বশুর-শাশুড়ী ননদ-স্বামীর অত্যাচার সহ্য করেছিল। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

অবশেষে আর সহ্য করতে না পেরে একদিন রাত্রে সকলের অগোচরে সে শ্বশুর-বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি পালিয়ে আসে। তার সর্বাঙ্গে মারের দাগ দেখে বেষ্টোর মতো নিষ্ঠুর লাঠিয়ালও ডুকরে কেঁদে উঠল।

সকালে মেয়েটাকে টানতে টানতে কেষ্টোর বাড়ি নিয়ে গেল।

পাশের বাড়ি।

কেষ্টো ভাইঝির গায়ে মারের চিহ্ন দেখে দুঃখিত হল। বললে, ভারী অন্যায় করেছে।

কিন্তু তার স্ত্রী নিজের ভায়ের অন্যায় স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। সে মেয়ে রাত্রে, একা ছ'ক্রোশ পথ হেঁটে বাপের বাড়ি পালিয়ে আসতে পারে, সেও যে সহজ মেয়ে নয় এই কথা প্রমাণ করবার জন্যে বেষ্টোর স্ত্রীর সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়ায় নেমে পড়ল।

সেইদিনই কেষ্ট আর বেষ্টোর মধ্যে লাঠির মারফত একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত। হৃষিকেশ আর দুর্জটিকে এমনভাবে বিব্রত হতে হত না। কিন্তু পাড়ার পাঁচজন মাতব্বর মাঝখানে এসে পড়ায় সেযাত্রা ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াতে পেল না।

লাঠিয়ালেরা কথা বেশি বলতে পারে না। বলেও না। দুটো কথার পরেই লাঠি বের করে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু সকলের অনুরোধে লাঠি ঘরের মধ্যে তুলে রাখল।

ফলহটা তোলাই রইল। দুজনেই মনে মনে স্থির করল, সামনের দাঙ্গায় দেখা যাবে।

হলও তাই। দাঙ্গা সনাতন পদ্ধতিতে হাঁক-ডাক, গালাগালি এবং ইষ্টকবর্ষণ দিয়ে আরম্ভ হল না। একেবারেই দুপক্ষ দুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দুপক্ষও ঠিক নয়।

সকলের আগে বেষ্টো সর্দার ঝাঁপিয়ে পড়ল কেষ্টো সর্দারের উপর। এমন সাধারণতঃ হয় না। প্রথম চোটেই সর্দারে সর্দারে বড় একটা বাধে না।

ব্যাপার দেখে অন্য লাঠিয়ালেরা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। নির্বাক বিস্ময়ে দুটি বিখ্যাত লাঠিয়ালের লড়াই দেখতে লাগল ইতিপূর্বে যা দেখার সৌভাগ্য কারও হয়নি।

সে কি যুদ্ধ!

পরস্পর আস্ফালন করে, গর্জন করে আর পাখসাট মারে। দুজনের হাতে লাঠি ঘোরে। লাঠি দেখা যায় না, কানে শুধু ঝোঁ ঝোঁ আওয়াজ আসে। লাঠিতে লাঠিতে যখন ঠোকাঠুকি লাগে তখন স্ফুলিঙ্গ বেরোয়।

দুজনেই চোট খায়। দুজনেরই মাথা, কপাল দিয়ে রক্তের স্রোত বইছে। কিন্তু কেউ তাতে আমল দেয় না।

অনেকখানি জায়গা নিয়ে তারা যুদ্ধ করছে। বিলের মাঠ। দুজনের পায়ের ঘর্ষণে জায়গাটা ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেছে। ভালো করে দেখা যাচ্ছে না তাদের। দুপক্ষের লাঠিয়ালরা শাঁখ বাজিয়ে নিজেদের সর্দারকে উৎসাহিত করছে।

কেষ্ট প্রথমে পড়ল।

বেষ্টোর দল হুঙ্কার দিয়ে উঠল। বেষ্টো তাকে চরম আঘাত দেবার জন্যে একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এল। কেষ্টোর দল সভয়ে চীৎকার করে উঠল।

কিন্তু কেষ্টোকে আর এগিয়ে আসতে হল না। সেও যথেষ্ট জখম হয়েই ছিল। ছোটবার সময় গাছের শিকড়ে পা লেগে সেই যে পড়ল আর উঠল না।

তারপরও উভয় পক্ষের লাঠিয়ালেরা নিজেদের নিজেদের সর্দারকে ঘিরে আধ ঘণ্টাটাক খেলেখেলা করলে, তারপর পিছিয়ে গেল।

অন্য লোকেরা যখন খবর পেয়ে এল তখন দুই সর্দারই অচৈতন্য, এবং দুজনেরই পাশের অনেকখানি জায়গা চাপ চাপ রক্তে লাল।

এই অবস্থায় তাদের হাসপাতালে পাঠানো হল গরুর গাড়ি করে। আট মাইল দূরে হাসপাতাল। গাড়ির পিছু পিছু চলে দুজনের পরিজনবর্গ, কাঁদতে কাঁদতে।

পরের দিন মুখুয্যে আর চাটুয্যেদের খিড়কির দরজা ভিতর থেকে তালাবন্ধ হয়ে গেল।

॥ তিন ॥

সুপ্রকাশের ম্যাট্রিকুলেশন পাশের খবর যেদিন বেরুলো সেদিন সারা গ্রামে সমারোহ পড়ে গেল। মুখুয্যে এবং চাটুয্যে বংশে এই প্রথম একটি ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার পার হল। এতাবৎ এই দুটি জমিদার বংশে লেখাপড়া সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ ছিল না। খেটে যখন খেতে হবে না, তখন তার প্রয়োজনও কখনও অনুভূত হয়নি। পড়া তো চাকরি-বাকরির জন্যে। সেই প্রয়োজন যার নেই তার পক্ষে লেখাপড়া করা সময় এবং স্বাস্থ্যের অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়।

হৃষিকেশবাবু এবং ধূর্জটিবাবু দুজনে ছাত্রবৃত্তি স্কুলে কয়েক বৎসর পড়েছিলেন। কিছু বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল আর কিছু পাটিগণিত শুভঙ্করী পড়ে চৌদ্দ বৎসরের মধ্যেই ইস্তফা দিয়েছিলেন, এবং পরের বৎসরই বিবাহ করে পিতার অধীনে জমিদারীর কাজ শেখায় মনোনিবেশ করেছিলেন।

সুপ্রকাশ এই ধারার প্রথম ব্যতিক্রম।

হৃষিকেশের ইচ্ছা ছিল নহবত বসান। সুসংবাদটা নহবতের মারফত ধূর্জটির কাছে পৌঁছানো দরকার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি ভেবে সে ইচ্ছা দমন করলেন। কিন্তু তার পরিবর্তে যা করলেন তাও নহবতের চেয়ে বিশেষ কম সমারোহ নয়।

প্রথমত সিংহবাহিনীর পূজা দিলেন খুব ধুমধাম করে! ষোলো আনা প্রসাদ পেলে।

তারপরে আরম্ভ হল, সম্মেলনের পর সম্মেলন। স্কুলের সমস্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের ডাকা হল। সেই সঙ্গে গ্রামের মধ্যে যারা কখনও কলেজে পড়েছে, সকলকে।

সুপ্রকাশকে কোথায় পড়ানো যায় ?

এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ হল না। সমবেত ভদ্রলোকদের কেউই কলকাতায় কলেজে পড়েননি। অর্থের অভাবেই তা সম্ভব হয়নি। ছবিকেশবাবুর যখন পয়সা আছে এবং অঢেল পয়সা, তখন সুপ্রকাশের কলকাতায় ছাড়া অন্য কোথাও পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে তার কলকাতায় পড়াই সাব্যস্ত হল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন কোন্ কলেজে পড়বে ?

তখন ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। সুতরাং কলেজে স্থানাভাবের প্রশ্ন উঠত না। সমস্যা সেদিক দিয়ে নয়।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, সুপ্রকাশ প্রথম বিভাগে পাস করেছে। শুধু তাই নয়, আমার বিশ্বাস ও অন্তত একটা জেলা-বৃত্তি পাবে। যদি নাও পায়, পরীক্ষায় যে নম্বর ও পাবে বলে আশা করি, তাতে প্রেসিডেন্সীতে ভর্তি করা চলবে। সেন্টজেভিয়ার্স কি স্কটিশ চার্চে তো চলবেই।

থাকবে কোথায় ?

মা-বাপ ছেড়ে সুপ্রকাশ কখনও বাইরে থাকেনি। নিজের কোনো কাজই নিজে করতে পারে এমন কি ক্ষুধা পেলে বুঝতে পারে না। ওইটুকু ছেলে মেসে-হস্টেলে কি থাকতে পারবে ?

এ একটা গুরুতর প্রশ্ন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসা বাইরের লোকের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ নিরুত্তর পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

ছবিকেশবাবু বললেন, বাসা একটা করা যায়। তাহলে সুপ্রকাশের গর্ভধারিণীকে যেতে হয়। তার সঙ্গে হরি চাকর এবং বিন্দু ঝি যেতে পারে। যাবার জন্যে ওরা তৈরিও। কিন্তু তাহলে এখানে কে থাকবে ?

এত বড় বাড়ি, দাসী-চাকর, দেবসেবা, অতিথি সেবা, লোক-লৌকিকতা,—সুপ্রকাশের মা না থাকলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। সে একটা সোজা সমস্যা নয়।

অথচ ধীরে ধীরে ভাববার সময়ও নেই। পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে। অনতিবিলম্বে না গেলে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হওয়া মুশকিল হবে।

কিন্তু এই শেষের সমস্যাটির কোনো সমাধান সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ করতে পারলেন না। চুপ করে রইলেন।

ব্যাপার শুনে ধূর্জটিবাবু একটা সমাধান করে দিলেন : ছবিকেশবাবু প্রেসিডেন্সী কলেজটাকেই দেবীপুরে উঠিয়ে নিয়ে আসুন। তাহলে আর কোন অসুবিধা থাকবে না।

ছবিকেশবাবুর কানে যথাসময়ে একথা এল। তিনি রাগলেন ভিতরে ভিতরে। কিন্তু বাইরে প্রকাশ করলেন না।

সুপ্রকাশের কলকাতা যাবার জন্যে একটা শুভদিন দেখা হল। স্থির হল, হেড মাস্টার মশাই সঙ্গে যাবেন। তাঁর সঙ্গে এস্টেটের ম্যানেজার এবং একজন ভৃত্য।

অন্দর থেকে সদরে আসবার দরজায় আম্রপল্লব সংযুক্ত জলপূর্ণ ঘট রাখা হল। পুরোহিত দেবীর নির্মাল্য নিয়ে সসম্ভ্রমে ডানদিকে দাঁড়িয়ে।

পাইক ছুটলো স্টেশনে যাবার রাস্তায়, যেন পালকি করে যাবার সময় কোনো অযাত্রা সুপ্রকাশের সামনে না পড়ে।

এদিকে অন্দরের উঠানে গ্রামের স্ত্রীলোককুল ভেঙে পড়েছে। সুপ্রকাশের মা কাঁদছেন। তাঁর দেখাদেখি পরিজন ও দাসীরা আঁচলে চোখ মুছচে। উঠানে দাঁড়িয়ে গ্রামের মেয়েরা কেউ বা টিপে টিপে হাসছে। নিজের অনুপস্থিত সন্তানের কথা স্মরণ করে কারও বা চোখে জল এসে গেছে।

ক'টি ঝি চলে গেছে গ্রাম-প্রান্তের সরোবরে। সেই পথ দিয়ে সুপ্রকাশের পাল্‌কি যাবে। তাদের জলভরা কখন হয়ে গেছে। রাস্তার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাল্‌কিতে যাবার পথে সুপ্রকাশ বামে পূর্ণকুম্ভ দেখবে।

কিন্তু অন্য স্রোতের উজান বেয়ে সুপ্রকাশের বেরুতে দেরী হচ্ছে। পূর্ণকুম্ভ কাঁখে নিয়ে দাসীরা ঠায় দাঁড়িয়ে।

শুভক্ষণ অবশেষে এসে গেল। অবিলম্বে যাত্রা করবার জন্যে বাইরে থেকে হৃষিকেশের পুনঃ পুনঃ তাড়া আসতে লাগল। হেড মাস্টার মশাই, ম্যানেজার এবং ভৃত্য বাক্স বিছানা নিয়ে গরুর গাড়িতে আগেই রওনা হয়ে গেছেন।

ট্রেনের অবশ্য এখনও অনেক বিলম্ব। কিন্তু শুভক্ষণ বেশিক্ষণ থাকবে না। সেইজন্যই তাড়া।

অবশেষে কোঁচানো ধুতি, শার্ট এবং চাদরে সুসজ্জিত সুপ্রকাশ মা এবং অন্যান্য গুরুজনকে প্রণাম করে নিচে এল। কপালে তার দই-এর ফোঁটা।

মা এবং অন্যান্য পুরনারীরা তার পিছু পিছু অন্দরের দরজা পর্যন্ত এলেন।

দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে নির্মাল্য হাতে পুরোহিত।

তিনি উচ্চস্বরে সুর করে স্বস্তি-বাচন করলেন। সুপ্রকাশের মাথায় দেবী সিংহবাহিনীর পুষ্প স্পর্শ করে তার বুক-পকেটে সেগুলো পুরে দিলেন।

সদরের বাইরে পালকি অপেক্ষা করছে।

স্টেশন যদিচ দূরে নয়, মাইল দেড়েকের, মধ্যে তবু জমিদারীর কৌলীন্য-মর্যাদায় বরযাত্রের পাল্‌কিতে যাওয়াই রেওয়াজ। স্কুলে পাঠকালে সুপ্রকাশ এই মর্যাদার অধিকার পায়নি। এখন সে কলেজে পড়তে যাচ্ছে। সুতরাং বরযাত্রের মধ্যে গণ্য হল এবং এই প্রথম পাল্‌কিতে চড়ার মর্যাদা লাভ করল। তার জীবনে যেন একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল, এবং এজন্যে সে মনে মনে যথেষ্ট গৌরববোধ করতে লাগল।

কিন্তু কাজ তার এখনও শেষ হয়নি।

সদরে এসে প্রথমে চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম। বালাখানার নিচের বারান্দায় দশারিবয় ঋষিকেশবাবু অপেক্ষা করছেন।

সুপ্রকাশ প্রথমে পিতার এবং তারপরে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের পায়ের ধুলো নিলে। সেখান থেকে তাঁদের সকলের সঙ্গে গেল দেবী সিংহবাহিনীর মন্দিরে। পুরোহিত আগেই সেখানে গিয়ে মন্দিরের দ্বার খুলে রেখে তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

দেবীকে প্রণাম করে সুপ্রকাশ ফের সদরে ফিরে এল সেখানে পালকি অপেক্ষা করছে। সেখানে তার বন্ধুরাও অপেক্ষা করছে। তাদের সঙ্গে কোলাকুলি সেরে সুপ্রকাশ পালকিতে উঠবে।

পালকিতে ওঠবার আগে আর একবার বাপের দিকে চাইল। সদরের দরজায় তিনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। জলভরা মেঘের মতো শান্ত স্তব্ধ সৌম্যমূর্তি। কৃতী ছাত্র উচ্চতর শিক্ষার জন্যে যাচ্ছে, সে আনন্দ আছে। তারই সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিচ্ছেদ-বেদনা,—তীব্র অথচ সংহত।

পিতার এ মূর্তি সুপ্রকাশ কখনও দেখেনি। ধীরে ধীরে, অন্যমনস্কভাবে সে পালকিতে উঠল।

পরীক্ষায় ভালো নম্বরই সুপ্রকাশ পেয়েছিল। সুতরাং প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হতে তার অসুবিধা হল না। হস্টেলেও সীট পাওয়া গেল।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ক্লাস আরম্ভ হতে কয়েকদিন দেরি ছিল। ইচ্ছা করলে সুপ্রকাশ হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে বাড়ি যেতে পারত। আবার ক্লাস খোলার মুখে ফিরে আসত। কিন্তু কয়েকটা দিনের জন্যে যাওয়া আবার আসা তার ভালো লাগল না। পরে যাবে বলে রয়ে গেল।

হস্টেলে তখন শুধু দ্বিতীয় আর চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র একজনও নেই। সব ক্লাস আরম্ভ হবার আগে আসবে। তাকে নিয়ে মাত্র গুটিতিনেক প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সকলেই দূরের ছেলে এবং কলকাতায় এই প্রথম পদার্পণ।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছেলেরা উঁচু ক্লাসে পড়ে, এদের ছোঁয়াই নেয় না। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছেলেরা তাদের ছোঁয়া নেয়, কিছু অসুবিধা হচ্ছে কি না মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তাদের ব্যবহারে এমন কৃপামিশ্রিত যে, সুপ্রকাশ মনে মনে বিরক্ত হয়, কিন্তু কিছু বলতে পারে না।

ওরাও বড়দের (এক বছরের বড়) এড়িয়ে চলে।

নতুন কলকাতায় এসে দূরে যেতে সাহস করে না, পাছে রাস্তা হারায়। ইচ্ছা ছিল ক্লাস খোলবার মুখে অন্য সতীর্থেরা ফেরবার আগেই তারা কলকাতায় পুরোনো হয়ে যাবে। থিয়েটার, সিনেমা, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, মায় বটানিক্স্ পর্যন্ত দেখা হয়ে যাবে। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছেলেরা তাদের সঙ্গে যেমন মুরুব্বিয়ানা করে, ওরা নবাগত সতীর্থদের সঙ্গে তেমনি করতে পারবে।

কিন্তু কিছুই হল না।

তিনজনই শুধু নবাগতা নয়, অত্যন্ত নিরীহ এবং ভীরু প্রকৃতির। বেশির ভাগ সময় ঘরের মধ্যেই আড্ডা দেয়। নয়তো কাছাকাছি রাস্তায় একসঙ্গে পায়চারি করে। আর নয় বিকেলে গোল-দীঘিতে বেড়ায়। একদিন চিত্তরঞ্জন এভিন্যু ধরে ধরাবর এস্প্ল্যানেড পর্যন্ত গিয়েছিল এবং নির্বিঘ্নে ফিরেও এসেছিল।

এই দুঃসাহসিকতার কথা দ্বিতীয় বার্ষিক ছেলেদের কানে যেতে তারা গুণ্ডা আর পকেটমারের এমন ভয় ধরিয়ে দিলে যে, ওরা মুখে উপহাস করে উড়িয়ে দিলেও কার্যত আর কখনও এত বড় লম্বা পাড়ি দিতে সাহস করেনি।

কাজ না থাকলে যা হয়, এই সময় সুপ্রকাশের লম্বা লম্বা চিঠি লেখার অভ্যাস হয়, এবং তার গ্রামের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ একটি বন্ধুর কাছে যে চিঠি লিখেছিল তার থেকে জানা যায়, রাত্রে মায়ের জন্যে সে শুয়ে শুয়ে কাঁদত!

"বাপের জন্যে নয়। তার মানে এ নয় যে, বাবাকে আমি মায়ের চেয়ে কম ভক্তি করি। ভক্তি হয় তো বাবাকেই বেশি করি। কিন্তু তাঁকে যেন মায়ের মতো ভালোবাসা যায় না। তাই নয়? ছেলে যেমন মায়ের সঙ্গে মিশে যেতে পারে, মায়ের মধ্যে তার নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলতে পারে, বাপের সঙ্গে তেমন কদাচিৎ সম্ভব হয়।

"এতদিন হস্টেলে আমরা মাত্র তিনজন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছিলাম। সবাই গ্রাম থেকে নতুন শহরে এসেছি, কলকাতার মত বড় শহরে,—অন্যেরা ঠাট্টা করত, ভয় দেখাত। আমরা দূরে কোথাও যেতে, নতুন নতুন জায়গা দেখতে, সাহস করতাম না।

"এখন ক্লাস খুলতে সব এসে গেছে। 'নরক গুলজার'। এবার সিনেমা-থিয়েটার দেখছি আর দর্শনীয় জায়গায় যাচ্ছি। সন্ধ্যার পর ঘরে ঘরে জমাটি আড্ডা বসছে। সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত স্থির হয়ে কোনো কিছু ভাববারই ফুরসুত পাই না।

"তারপরে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে,—ঠিক শোওয়ার পরেই নয়, তার অনেক পরে,—মনটা মায়ের জন্যে হু হু করে। নিঃশব্দে কতক্ষণ কাঁদি। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি।

"ছেলের জীবনে মায়ের প্রয়োজন যে এত বেশি, মাকে ছেড়ে আসার আগে তা একদিনও বুঝতে পারিনি।"

এই সময়কার চিঠি থেকে সুপ্রকাশের মনের আর একটি পরিচয় পাওয়া যায় গ্রামের প্রত্যেকটি জিনিসের উপর তার টান। গ্রামের অতি তুচ্ছ বস্তু,—যা গ্রামের বন্ধুদের চোখেই পড়ে না, গ্রামে থাকতে সুপ্রকাশেরও চোখে পড়ত না হয়তো,—তাদের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত আগ্রহের সঙ্গে জানতে চায়।

"এখানে প্রচণ্ড বর্ষা নেমেছে। দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ভালো লাগে না। কিন্তু আমাদের দেবীপুরে বর্ষণ কত মিষ্টি, কত সুন্দর! জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি: দেবীপুরের বাড়িতে হঠাৎ দুপুর রাত্রে ঝমাঝম বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙে জানালার বাইরে চেয়ে দেখি বিস্তীর্ণ মাঠময় লক্ষ আলোর ছুটোছুটি।

"পাউবে মাছ ধরছে।

"এখানে শুয়ে শুয়ে নিশ্বাস ছাড়ি : জমিদারের বংশে জন্মে জীবনটা কত দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। এমনি বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রে কখনও পাউবে মাছ ধরতে বেরুইনি!

"হস্টেলে শুয়ে রত্নাকরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি : টোকা মাথায় বেনেপুকুরের নালায় পাউবের মাছ ধরছে। তার কষ্টিপাথরের মতো নিকষ-কালো বলিষ্ঠ দেহ বেয়ে বর্ষার ধারা। হারিকেনের আলোয় চিকচিক করছে! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

আর একখানা চিঠি পূজার পূর্বে গ্রামের সব ক'টি শিউলি ফুলগাছকে স্মরণ করেছে। জানতে চেয়েছে, কাপড় রাঙাবার জন্যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিউলির ফুল কুড়োবার ধুম পড়ে গেছে কি না।

চার ॥

বিষ্ণুপদ চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। নিষ্ঠাবান কংগ্রেসী। পরিধানে মোটা খদ্দর। জামা-কাপড় তো বটেই, কতুয়া থেকে গামছা পর্যন্ত। কিছুই ধোপাবাড়ি দেয় না। ছুটির দিনে নিজেই সাবান দিয়ে কাচে।

কথা খুব কম বলে। যেটুকু বলে, তাও অধিকাংশ সময় মধ্যপথেই মুচকি হাসি দিয়ে শেষ করেন।

কি জানি কেন, এই ছেলেটি সুপ্রকাশকে (এবং তার অনেক গ্রাম-থেকে-আসা নতুন সতীর্থকেই) আকর্ষণ করে। অথচ বিষ্ণুপদ এত গম্ভীর এবং স্বল্পবাক যে, নিজে থেকে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে সাহস করে না। স্যাণ্ডাল পায়ে (বিষ্ণুপদকে কেউ কখনও অন্য জুতো পরতে দেখেনি) প্রায়ই তাকে বারান্দার সামনে দিয়ে যেতে-আসতে দেখে, কিন্তু সুপ্রকাশরা কিছু বলতে পারে না।

শুনেছি, আশ্চর্য ছেলে এই বিষ্ণুপদ। কোথাকার যেন বড় ব্যবসায়ীর ছেলে। অনেক টাকা তার হাত-খরচ আসে। অথচ ওই তার বেশ-ভূষা। সিনেমা-থিয়েটার দেখে না। আড্ডাবাজিরও বিলাসিতা নেই, এবং, আশ্চর্য, মাসের কুড়ি তারিখের মধ্যেই রিক্তহস্ত হয়ে পড়ে। অত টাকা নিয়ে কি যে করে কেউ জানে না।

সবাই জানে, কংগ্রেসের কাজ করে।

তার বন্ধুরা বলে, শুধু কংগ্রেস নয়। কংগ্রেসে পয়সা খরচের কি আছে! কংগ্রেসের চেয়েও ওর বড় ব্যক্তিক জনসেবা। কোথায় কোন বস্তিতে মহামারী দেখা দিয়েছে, ও গিয়ে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দেহ দিয়ে, অর্থ দিয়ে তাদের সেবা করবে। তাছাড়া কতকগুলি দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের পড়ার খরচও নাকি দেয়। মাসের অর্ধেক দিন মুড়ি-মুড়কি ওর বিকেলের জলখাবার। বাকি অর্ধেক দিন তাও জোটে না, এক গ্লাস জল খেয়েই কাটায়।

কিন্তু এ সবই শোনা কথা।

ওর সম্বন্ধে আসল খবর কেউই জানে না। এমন কি, যারা ওর সাকরেদি করে তারাও না। হস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ওর নাম দিয়েছেন: The Mystrious Boy—রহস্যময় ছেলে।

ম্যাট্রিকুলেশনে বিষ্ণুপদ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু ইণ্টারমিডিয়েটে মাত্র প্রথম বিভাগে পাস করেছে। অধ্যাপকেরা বলেন, এরকম মেধাবী ছাত্র তাঁরা বেশি পাননি। ও যদি পড়ত তাহলে আই. এ.তে নিঃসন্দেহে প্রথম স্থান অধিকার করত।

কিন্তু পড়ে না। সমস্ত দিন কোথায়-কোথায় ঘোরে। সব দিন সব ক্লাসও করে না। রাত্রে কখন চুপি চুপি ফেরে কেউ টের পায় না। বোধ হয় দারোয়ানের সঙ্গে ব্যবস্থা আছে। সে ওর সাড়া পেলেই গেট খুলে দেয়। রাত্রের খাওয়া কোনোদিন হয়, কোনোদিন হয় না।

ওর প্রথম বিভাগে পাস করাটাই তো আশ্চর্য ব্যাপার। কেউ কখনও ওকে পড়তে দেখেনি। অন্য সময় তো নয়ই, এমন কি পরীক্ষার মুখেও নয়। ওর রহস্যজনক ঘোরাঘুরি তখনও অব্যাহত থাকে। পরীক্ষা আসছে, এ নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগের চিহ্ন ওর মুখে কখনও দেখা যায়নি।

অধ্যাপকেরাও তা জানেন। তাঁরা বলেন, ক্লাসের পড়া যা শোনে তাইতেই অবলীলাক্রমে প্রথম বিভাগে উৎরে যায়।

হবে, এবং নাও হতে পারে।

আসলে ওর সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কেউ কিছু জানে না। নিশ্চিত শুধু এইটুকু যে, ছেলেটি আশ্চর্য, এবং যার সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কেউ কিছু জানে না, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তার চারিদিকে সত্যে-মিথ্যায় মেশানো অনেক কিংবদন্তি জড়িয়ে পড়ে।

বিষ্ণুপদরও তাই হয়েছে। কিছু তার নিজের চরিত্র ও প্রতিভার গুণে, কিছু বা নানা সত্য-মিথ্যা কিংবদন্তির কল্যাণে তার চারিদিকে একটা মনোহর আভার সৃষ্টি হয়েছে। সে যা বলে এবং যা করে তা যত সাধারণই হোক না কেন, আভার প্রতিফলন তা বিচিত্র বর্ণ ধারণ করে। তার ফলে যারা তার সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য পায় শুধু তারাই নয়, যারা দূরে থেকে দেখে তারাও আকৃষ্ট হয়।

এই হস্টেলে শুধু আবাসিক এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্টই নয়, চাকর-বাকর পর্যন্ত এই আত্মভোলা, সরলস্বভাব, অগোছাল ছাত্রটিকে ভালোবাসে। তার কোনো কাজে আসতে পারলে নিজেদের ধন্য এবং কৃতার্থ মনে করে।

বিষ্ণুপদ এই হস্টেলে একটি বিশেষ আবাসিক।

একদিন সকালে সেই বিষ্ণুপদ হঠাৎ সুপ্রকাশের ঘরে এসে উপস্থিত!

সুপ্রকাশ ব্যস্ত হয়ে চেয়ারটা এগিয়ে দিলে। একজন অধ্যাপক তার ঘরে এলেও সে এত সম্মানিত এবং কৃতার্থ বোধ করত না।

বিষ্ণুপদ হাতের ইসারায় তাকে বাধা দিতে নিষেধ করে স্মিতহাস্যে তক্তাপোষের একাংশেই বসল।

—তোমার নাম সুপ্রকাশ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এত আবাসিকের মধ্যেও বিষ্ণুপদ তার মতো একজন নবাগতের নাম জানে দেখে সুপ্রকাশ যেমন বিস্মিত তেমনি পুলকিত হল।

তুমি একটি বৃত্তি পেয়েছ।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। খবরের কাগজে নাম দেখে এলাম। দেবীপুরের স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলে তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে পেয়েছ। কাগজটা দেখে আসতে পার।

ঘরে বিষ্ণুপদর মতো ছাত্র বসে। তাকে ফেলেও কাগজখানা দেখতে যাওয়া যায় না। অথচ এত বড় একটা সুসংবাদ নিজের চোখে দেখে আসবার জন্যে ভিতরে ভিতরে সুপ্রকাশ অস্থির হয়ে উঠল।

বিষ্ণুপদ তা বুঝতে পেরে মুখ টিপে একটু হাসলে।

বললে, ভিতরটা খুব ছটফট করছে, না ?

সুপ্রকাশ লজ্জিতভাবে হাসলে।

বিষ্ণুপদ হেসে বললে, যাও, দেখে এস। আমি একটু অপেক্ষা করব। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

সুপ্রকাশ বেরিয়ে গেল এবং মিনিট দশেকের মধ্যে হাসতে হাসতে ফিরে এল।

বিষ্ণুপদ জিজ্ঞাসা করলে, পেয়েছ বৃত্তি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমার অভিনন্দন নাও। তুমি তো আর্টস নিয়েছ ?

সুপ্রকাশ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

বিষ্ণুপদ বললে, আচ্ছা, এইবার বল তোমার জীবনের লক্ষ্য কি ?

লক্ষ্য ? জীবনের লক্ষ্য ? সুপ্রকাশ থতমত খেয়ে গেল। সবে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছে। জীবনের লক্ষ্যের কথা স্থির করা দূরে থাক, সে সম্বন্ধে কিছু ভাবেওনি।

বিষ্ণুপদ বললে, কিছুই ভাবনি ? সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবে, কি ব্যারিস্টার হবে, কি অন্ত কোনো ভালো চাকুরি করবে,—কিছুই ভাবনি ?

—না।

আরও একটু ভেবে সুপ্রকাশ বললে, তবে চাকরি করব না, এটা ঠিক।

শুনে বিষ্ণুপদ যেন একটু বিস্মিত হল : চাকরি করবে না ? কেন ? তার দরকার হবে না ?

সুপ্রকাশ নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লে : তাই।

—জমিদারী আছে ?

—আছে একটু।

—তাই দেখাশোনা করে চলে যাবে ?

—হ্যাঁ।

বিকুপদ শুনে যেন খুশি হল না। বললে, জমিদারী চাকরির বাড়া।

—কি করে ?

—নিত্য হাঙ্গামা থাকে। সরকারী আমলাদের খুশি করতেই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ !

বিকুপদ হাসতে লাগল।

সুপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, ঠিক জানেন ?

—জানি।

সুপ্রকাশ জানে না। কিন্তু ভেবে দেখলে, ঝাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে থাকে সত্যি। মহকুমা-শাসক থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীদের ভিড়ও লেগে থাকে। বিশেষ খবর না রাখলেও এটা মনে পড়ল যে, এদের যথাযোগ্য সম্বর্ধনার জন্যে ছবিকেশবাবু সকল সময়ই তৎপর থাকেন। ভূরিভোজনের ব্যবস্থা তো আছেই, তা ছাড়াও আরও কিছু আছে কি না কে জানে।

সুপ্রকাশ চিন্তা করে বললে, বাপ-পিতামহের জমিদারী, সে তো রক্ষা করতেই হবে।

—নিশ্চয়। আমার বক্তব্য তাইতেই যেন তোমার সমস্ত সময় এবং উদ্যম শেষ না হয়।

—আর কি করতে পারি ?

বিকুপদ হাসলে।

বললে, তা আমি কি জানি। তোমার কর্তব্য তোমাকেই ভেবে নিতে হবে। তোমার প্রজা আছে, গ্রামের লোক আছে, দেশবাসী আছে, সকলের উপরই তোমার কর্তব্য আছে।

—আমার নিজের উপরও তো আছে।

—আছে বই কি !—বিকুপদ উৎসাহিত হয়ে বললে,—কিন্তু তা সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন পৃথক একটি সত্তা নয়। বহুকে নিয়েই এক। বহু হবার জন্যেই এক।

—তার মানে ?

বিকুপদ বললে, তার মানে আর একদিন বলব। শোন, তোমার কাছে কিছু টাকা আছে ? বিশেষ দরকার।

—কত টাকা ?

—অন্তত পনেরো ?

সুপ্রকাশ তৎক্ষণাৎ বাক্স খুলে দুখানা দশ টাকার নোট বের করে বিকুপদর হাতে দিলে।

বিষ্ণুপদ খুশি হল : কুড়ি টাকা! ভালোই হল। কিন্তু তোমার অসুবিধা হবে না তো?

সুপ্রকাশ হেসে বললে, অল্প কিছু তো হতেই পারে।

—তা হোক। দেখবে, অন্যের জন্যে কিছু অসুবিধা সহ্য করার মধ্যে একটা বিশেষ আনন্দও আছে।

বিষ্ণুপদ উঠল।

বিষ্ণুপদর সঙ্গে সুপ্রকাশের খুব ভাব হয়ে গেল। সবাই বললে সুপ্রকাশের পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল। ছেলেটা ভালো। পড়াশুনা যা করছিল, এইবার খতম।

তা কিন্তু হল না।

বিষ্ণুপদ সত্যই আশ্চর্য ছেলে। তার যখন প্রয়োজন তার সঙ্গে গল্প করা চলে। তার প্রয়োজন না থাকলে তার ঘরে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলেও গল্প হবে না। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বাধ্য হয়ে এক সময় সুপ্রকাশকে উঠে আসতে হবে।

সুতরাং সুপ্রকাশের পড়ার ক্ষতি বিশেষ হচ্ছিল না। যখন সুপ্রকাশের পড়ার সময় নয়, তখন অফুরন্ত গল্প চলে। যখন তার পড়ার সময়, তখন বিষ্ণুপদ ধরে নেই, নয় এমন গম্ভীর হয়ে আছে যে, কথা বলাই দুষ্কর।

বিষ্ণুপদ নিজের পড়ায় অমনযোগী হলেও অন্যের পড়া সম্বন্ধে নয়।

তার গল্পও যেন কেমনতর।

ছেলেদের গল্প বেশির ভাগই সিনেমা নয়তো থিয়েটার। কে কোন বইতে কেমন অভিনয় করল, কে কাকে বিবাহ করল, কার ছেলের নাম কি, এসব নিয়ে।

কি বড় জোর সাহিত্য নিয়ে। কিংবা আরও সত্য করে বলতে গেলে সাহিত্যিক নিয়ে। তার সুবিধা হচ্ছে, তার জন্যে সাহিত্য পড়বার দরকার হয় না। কোন কাগজে কার সম্বন্ধে কি লেখা বেরিয়েছে সেই পড়া থাকলেই যথেষ্ট।

বিষ্ণুপদর গল্প এর কোনটা নিয়ে নয়। সাহিত্য সে পড়ে না। আদৌ কোনো বই পড়েছে কি না সন্দেহ।

—বিষ্ণুদা রামবাবুর লেখা আপনার কেমন লাগে?

বিষ্ণুপদ আকাশ থেকে পড়ে : রামবাবু কে?

—সে কি! রামবাবুর নাম শোনেন নি? তাঁর 'প্রচ্ছদপট' তো একটা যুগান্তকারী উপন্যাস!

অনেকক্ষণ ভেবে বিষ্ণুপদ বললে, নামটা শোনা মনে হচ্ছে। কিন্তু তাঁর কোনো বই পড়েছি বলে স্মরণ হয় না।

বিষ্ণুপদর গল্প দেশ নিয়ে, দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে। কি ছিল, কি হয়ে গেল, কি হতে পারে।

গল্প মানুষ নিয়ে।

নানা দেশের, নানা কালের মানুষ। কি সে চায়, কি পায়, কেন এমন হয়।

যাযাবর মানুষ কত পথ দেশ ঘুরে, কত সভ্যতা অতিক্রম করে কোথায় এসে পৌঁছুল। কত নতুন নতুন সভ্যতার সে জন্ম দিলে। কত নতুন চিন্তাধারার। আজও চলেছে। চরৈবেতি, চরৈবেতি। কিন্তু কোথায়?

ক্লাসের লেকচারের মতো কিন্তু নয়। এসব কথা অন্যের মুখে শুনতে কারো ভালো লাগবে না। কিন্তু বিষ্ণুপদ যখন বলে সুপ্রকাশ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে।

—চল সুপ্রকাশ একটু বেড়িয়ে আসি।

—চলুন।

জামাটা গায়ে দিয়ে সুপ্রকাশ বিষ্ণুপদর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। বড় রাস্তায় এসে জিজ্ঞাসা করলে কোথায় যাচ্ছি?

—একটা আশ্চর্য জায়গায় যেখানে ভাবী ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা হচ্ছে রক্তের কালিতে।

—সে কোথায়?

—চল না।

সুপ্রকাশ নিঃশব্দে ওর সঙ্গে চলতে লাগল। চলতে চলতে ধর্মতলা স্ট্রীটে একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল।

চেয়ে দেখলে ফটকের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে: বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি।

উপরে উঠে দেখলে একখানা বড় হলঘরে একখানা প্রকাণ্ড বড় খেজুর পাতার চাটাই বিছানো। একখানা জাজিম তার অর্ধেকখানা মাত্র আবৃত করেছে। আবৃত অংশের কথা অজ্ঞাত; কিন্তু অনাবৃত অংশে চাটাইটা স্থানে স্থানে ফুটো।

ওরা দুজনে নিঃশব্দে এক প্রান্তে বসল।

অত্যন্ত সুপুরুষ এক ব্যক্তি কি যেন বলছিলেন। কাঁচা সোনার মতো রং, সোনার চশমার অন্তরালে স্বপ্নালু চোখ, মাথায় প্রশস্ত টাক।

কথা।

সকল মানুষই কথা বলে। সুপ্রকাশরা কথা বলে। তাদের অধ্যাপকেরাও। বিষ্ণুপদ চমৎকার কথা বলে। কিন্তু এ সেরকম কথা নয়। এর যেন হাজরের মতো ঝকঝকে দাঁত আছে। মনের যেখানে বসে, তার কিয়দংশ তুলে নিয়ে চলে যায়।

কি যেন একটা নতুন আন্দোলনের ছক পাতা হচ্ছে। সুপ্রকাশ ঠিক বুঝল না। শুধু এইটুকু বুঝল যে তার মনের কিয়দংশ ওই কথার সংগে চলে গেছে।

ফেরবার পথে জিজ্ঞাসা করলে, উনি কে?

—সুভাষবাবু। তার পাশে কিরণবাবু।

পথের উপরই সুপ্রকাশ চমকে দাঁড়িয়ে গেল।

বিকুপদ জিজ্ঞাসা করলে কি হল?

—সুভাষচন্দ্র বসু?

—হ্যাঁ।

—কিরণশঙ্কর রায়?

—হ্যাঁ। কেন?

—কিছু নয়।

ওরা আবার চলতে আরম্ভ করলে।

সুভাষচন্দ্রকে ইতিপূর্বে সুপ্রকাশ চাক্ষুষ কখনো দেখেনি। ছবিতে দেখেছে। সেই ছবি মনের মধ্যে যেখানে রয়েছে সেখানে তাঁর মাথায় মুকুট নেই বটে কিন্তু তিনি রাজাই।

সেই সুভাষচন্দ্র খেজুর গাছের চাটাইয়ে বসে! সেইখানে ভাবী ভারতবর্ষের ইতিহাস রচিত হচ্ছে।

এবার সুপ্রকাশ হাসলে। সে জমিদারের ছেলে, ঐশ্বর্যের সঙ্গেই পরিচিত।

—বিকুদা!

চলতে চলতেই বিকুপদ সাড়া দিলে, কি?

—ওই ছেঁড়া চাটাইয়ে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখা হচ্ছে?

হেসে বিকুপদ ওর দিকে চাইলে: তাতে অবাক হবার কি আছে?

—নেই?

—না। চল ওই পার্কের মধ্যে বসিগে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এক কোণে সুপ্রকাশকে বসিয়ে বিকুপদ জিজ্ঞাসা করলে, দেবীপুরে তোমাদের বিখ্যাত মুখুয্যে বংশের যিনি পত্তন করেন তাঁর নাম জান?

—না। জেনে নিতে পারি।

—তাঁর কোনো ছবি আছে তোমাদের বাগানবাড়ীর টাঙানো?

—না।

—তাঁকে কল্পনা করতে পার?

—যাঁকে দেখিনি, যাঁর ছবিও দেখিনি, তাঁকে কল্পনা করব কি করে?

—আমি পারি। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা হাড়ে-মাসে জড়ানো শরীর। প্রকাণ্ড বড় গোঁফ আর জালপাট্টা। জবাফুলের মত রক্তিম আগুনভরা চোখ। গলায় বাঘের নখের হার। লাফ দিয়ে পড়তেন ভেসে-যাওয়া সওদাগরী নৌকোর উপর। আর্তনাদে আকাশ কেঁপে উঠত। রক্তে নদীর জল

লাল হয়ে যেত। এমনি করে জমতে লাগল তাল তাল সোনা। মুখুয্যে বাড়ির ভিৎ উঠল তারই উপর।

গুরুকণ্ঠে সুপ্রকাশ বললে, এসব কোথায় পেলেন? আমি তো কখনও শুনিনি।

—আমিও শুনিনি। অনুমান করলাম।

—তাই বলুন। আপনি মাঝে মাঝে এমন ভয় দেখান।

বিকুপদ ওর ভয় দেখে হেসে ফেললে।

বললে, দেবীপুর তুচ্ছ ব্যাপার। উপমা দেবার জন্যে দেবীপুরের কথা তুললাম। কিন্তু সমস্ত দেশের ইতিহাস খুঁজে দেখ, যারা দেশকে বড় করেন, কত ত্যাগ, কত দুঃখ বহন এবং দুঃসাহসিকতার পথে তাঁদের চলতে হয়েছে। যারা তাঁদের নাম ভাঙিয়ে খায়, আরাম এবং বিলাস আসে তাঁদের জীবনে, পরে।

সন্ধ্যা হয়ে এল।

পার্কের এবং রাস্তার ধারের আলোগুলো জ্বলে উঠল।

বিকুপদ বললে, চল। হোস্টেলে ফেরা যাক।

॥ পাঁচ ॥

আরও কিছুদিন পরে সুপ্রকাশ কংগ্রেসে যোগ দিলে।

তার মানে এ নয় যে, সে বিকুপদর মতো কংগ্রেসের কাজ নিয়ে মেতে গেল। মত্ততা, কোনো-কিছু নিয়ে মেতে যাওয়া, তার প্রকৃতির মধ্যে নেই। সে কংগ্রেসের কাজ করে কর্তব্যবোধে। দেশের কাছে তার যে ঋণ আছে, তাই পরিশোধ করবার চেষ্টা করে। কাজ শেষ হয়ে গেলেই আবার বই নিয়ে বসে। পরীক্ষার পড়া তৈরি করে।

তার ফলে তার পড়াশোনার বিশেষ ক্ষতি হয় না। তারও চেয়ে বড় কথা, দেশের কাজ করার জন্যে তার মনে কোনো গৌরববোধ কি অহংকার জাগে না।

হৃষিকেশবাবু এত খবর জানেন না।

সুপ্রকাশ পিতাকে ভয় করে। ছেলেবেলা থেকে, একমাত্র সন্তান হয়েও সেইরকমই তার অভ্যাস। তাঁর চোখের আড়ালে, দূরে থেকে সে কংগ্রেসের কাজ করে। কিন্তু বিকুপদর অনুরোধেও গ্রামে একটা কংগ্রেস কমিটি প্রতিষ্ঠা করতে সাহস করেনি।

গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে গেছে। কংগ্রেসের নীতি এবং কর্মপদ্ধতি স্বাধীনতার প্রয়োজন সম্বন্ধে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আলোচনা করেছে; গ্রামের রাস্তা-ঘাট ও পুষ্করিণী সংস্কার এবং স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে পরামর্শ করেছে; কিন্তু কার্যত কিছু করতে সাহস করেনি শুধু বাপের অসন্তোষের ভয়ে।

এমন কি, সে যে কলকাতায় কংগ্রেসের কিছু কিছু কাজ করে এ কথাও বাড়িতে দূরে থাক, বন্ধু-বান্ধবের কাছে পর্যন্ত বলতে সাহস করেনি।

ছুটি ফুরুলে কলকাতায় ফিরেছে। মাঝে মাঝে কংগ্রেস অফিসে গেছে। নেতাদের ফাই-ফরমাস খেটেছে। আর সামনের পরীক্ষার পড়া তৈরি করেছে।

এমনি করে ইণ্টারমিডিয়েট দিলে।

তখন হলওয়েল মনুমেণ্ট ভেঙে সত্যাগ্রহ করার প্রস্তুতি হচ্ছে। পরীক্ষা ভালোই দিয়েছে, সেজন্যে মনটা খুশি ছিল।

বিকুপদ তখন এম. এ. পড়ছে। এ হস্টলে থাকে না। কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা হয়। বেশির ভাগ দেখা হয় কংগ্রেস অফিসে।

জিজ্ঞাসা করলে, পরীক্ষা হয়ে গেলে, বাড়ি গেলে না?

সুপ্রকাশ হেসে বললে, না।

—সত্যাগ্রহে নাম দিলে নাকি?

—দিলাম তো।

—বাবা রেগে যাবেন না?

—কি জানি। রাগবেন বোধ হয়।

—তাহলে?

বিকুপদ চিন্তিত হল। জমিদারের একমাত্র সন্তানের পক্ষে সত্যাগ্রহে যোগ দেওয়া ঠিক হবে কি না তার মনে সন্দেহ আছে।

আবার জিজ্ঞাসা করলে, বৈষয়িক ব্যাপারে তোমার বাবার কিছু ক্ষতিও হতে পারে বোধ হয়।

—তা পারে।

বিকুপদ নিঃশব্দে কি যেন চিন্তা করতে লাগল।

সুপ্রকাশ হেসে বললে, বিকুদা, ভারতবর্ষের কোনো মানুষের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, অথচ একদিন সুপ্রভাতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে যাবে, এমন কোনো ফর্মুলা আপনার জানা আছে?

বিকুপদ হেসে ফেললে: না।

সুপ্রকাশ বললে, সেই তো কথা। বাবা জমিদার, ইংরেজের আমলার সঙ্গে তাঁর দৈনন্দিন কারবার, তিনি কিছু করতে পারবেন না। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান, পড়াশুনো করি, আমিও কিছু করতে পারব না। এই সমস্ত জটিল সমস্যার কথা অনেক দিন থেকেই ভাবছি।

—সিদ্ধান্ত কি হল?

—এই হল যে, বিশেষ কিছুই আমি করতে পারব না। কিন্তু এই ছুটির ক'টা মাস তো দেশকে দিতে পারি। এটুকুও না পারলে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।

বিষ্ণুপদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়েছিল। অস্ফুট স্বরে শুধু বললে, সত্যি।

—তাই সত্যাগ্রহে নাম লেখালাম। ঘুরে আসি ক'দিন জেল থেকে।

একটা ফিকা হাসি তার ওষ্ঠ প্রান্তে খেলে গেল।

—বাড়ি যাচ্ছ না তাহলে?

—কি করে আর যাই?

—মা ভাববেন নিশ্চয়ই?

—ভাবাই তো স্বাভাবিক।

সুপ্রকাশ আবার তেমনি করে হাসলে। ফিকা কিন্তু আশ্চর্য! তার মধ্যে একটি সচেতনতা প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, সামান্য যেটুকু দেশের কাজ সে করতে যাচ্ছে, তার মধ্যে তার বাপ-মায়েরও অংশ রয়েছে।

বাপের অংশ, পুত্রের কৃতকর্মে তাঁর বৈষয়িক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। মায়ের অংশ, পুত্রের জন্যে দুশ্চিন্তায় তিনিও অনেক দুঃখ পাবেন।

কিন্তু কি আর করা যায়?

নিজের প্রথম কারাবরণের কথা স্মরণ করে বিষ্ণুপদ একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল।

সুপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, আপনি যাচ্ছেন না বিষ্ণুদা?

—কোথায়?

—সত্যাগ্রহে?

বিষ্ণুপদ হাসলে: সবাই কি যাবার সুযোগ পায়?

—ইচ্ছে থাকলেও পায় না?

—না। অনেককে অপেক্ষা করতে হয়।—সুপ্রকাশ আবারও হাসলে।—আমার ডাক এখনও আসেনি। এসে যাব না এলে পরের গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করব।

বিষ্ণুপদ এখন আরও একটু উপরের স্তরে উঠেছে। এখন আর কথায় কথায় কারাবরণের সুযোগও সে পায় না। আন্দোলন মানেই দল-বেঁধে জেলে যাওয়া নয়। তার পিছনে প্রস্তুতির এবং সত্যাগ্রহের স্রোত অব্যাহত রাখার বৃহত্তর কাজ রয়েছে। ওর স্থান হয়েছে সেইখানে।

সুপ্রকাশ জেলে চলে গেল।

ব্যাপারটা মোটেই শক্ত নয়: ওদের দশজনের একটা দল এক মধ্যাহ্নে 'বন্দেমাতরম' বলে মনুমেন্টের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুলিশ মনুমেন্ট ঘিরে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। এক পাশে কালো রঙের কয়েদী গাড়ি মজুত।

ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ টপ্ টপ্ করে সবাইকে প্রায় লুফে নিলে। কেউ বাধা দিলে না। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে কয়েদী-গাড়িতে উঠল।

রাজপথের জনস্রোত মুহূর্তকাল যেন স্তব্ধ করে গেল। সুকুমার ছেলেদের কারাবরণের তরঙ্গ সকলের মনেই অল্প-বিস্তর আঘাত করলে হয়তো।

তারপর যে-যার কাজে চলে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস কেউ ফেললে, কেউ বা চেপেই গেল।

আর কয়েদী-গাড়ি চলল লালবাজার হাজতের নরককুণ্ডে। সে রাত্রি সকলের সেখানেই কাটল। পরদিন তাদের আদালতে হাজির করা হল।

প্রকাণ্ড ঘরটা জুড়ে কেমন একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। নাকে কাপড় দিয়েও নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না পাকে দেয়। মাথা ঝিম ঝিম করে।

এ কোথায় নিয়ে এল রে বাবা!

অথচ ওদিকে আরও অনেকগুলি সাধারণ কয়েদী। কেউ দিব্যি নিদ্রা যাচ্ছে, কেউ নিশ্চিন্তে বিড়ি টানছে, কেউ বা 'তোমায় ভালোবাসি বলে' গান গাইছে গুনগুন করে।

আরও ওদিকে কে যেন একজন অসহ্য যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে। একটা অল্পবয়স্ক ছেলে বোধ হয়।

—কি হয়েছে? কি হয়েছে?

সুপ্রকাশরা জিজ্ঞাসা করলে ব্যস্তভাবে।

কে যেন জবাব দিলে: শালা পকেটমার বাবুমশাই। লোকের হাতে মার খেয়ে ওর শরীলে আর কিছু নেই। তারই যন্ত্রণায় শালা সেই বিকেল থেকে চিল্লাচ্ছে!

ছেলেটাকে সান্ত্বনার স্বরে বললে, কেঁদে কি হবে বাবা! কেউ আসবে না! এ শালার জায়গা পুলিশের সঙ্গীনের ওপর দাঁড়িয়ে, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। মিছিমিছি আর পাঁচজনের ঘুমটা মাটি করিসনি।

পুলিশও কবার এসে ধমকে গেল।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! সারারাত সমানে একটানা গোঁ গোঁ করে ভোরের দিকে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম সুপ্রকাশদের চোখেও নেই।

এই দুর্গন্ধ, তার উপর বাড়ি থেকে সেই যে দুটি খেয়ে বেরিয়েছিল তার পরে আর পেটে একটি দানা পড়েনি। দুটি করে মুড়ি দিতে এসেছিল, কিন্তু ওরা নেয়নি। এই ভ্যাপসা দুর্গন্ধের মধ্যে বসে মুখে কিছু দেওয়া অসম্ভব।

সবাই নিঃশব্দে ভোরের প্রতীক্ষা করছিল।

ভোর হতে মুখ-হাত ধুয়ে এল। একটু করে চা-পাউরুটিও মুখে দিলে। আরও কিছুক্ষণ পরে আবার সেই কালো রঙের কয়েদী-গাড়ি চড়ে আদালতে হাজির হল।

অত্যন্ত সহজ সরল প্রক্রিয়ার বিচার। মিনিট পনেরোর মধ্যে শেষ হয়ে গেল:

—দোষী কি নির্দোষ?

—নির্দোষ।

—মনুমেণ্ট ভাঙতে গিয়েছিলেন ?

—গিয়েছিলাম !

হুকুম হল, পঁচিশ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে সবাই আবার সেই কালো গাড়ি করে জেলে চলে গেল। জরিমানার টাকা কেউ দিলে না।

পরদিন বিকেলে এই খবরটা তারযোগে হৃষিকেশবাবুর কাছে পৌঁছুল। তার পিঠ-পিঠ দূর্জটিবাবুর কাছে খবর এল, হৃষিকেশবাবু নয়, তিনি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন।

তাঁর সদরে নহবত বসল।

কিন্তু আরও একটা জায়গায় নহবত বসল। কিন্তু সুপ্রকাশ ছাড়া আর কেউ তা শুনতে পেলে না। যেন অনেক দূর থেকে ভেসে-আসা অত্যন্ত করুণ এবং অত্যন্ত মৃদু সুরের নহবত। অত্যন্ত মৃদু হলেও সমস্ত মন তোলপাড় করে দেয়।

গ্রামে যখন ছিল, স্কুলে পড়ত, তখন তার পৃথিবী ছিল নিজেদের প্রকাণ্ড বড় বাড়ি, আত্মীয়-পরিজন, স্কুল, খেলার মাঠ আর বন্ধুদল। কলকাতা এসে পৃথিবীর পরিধি বেড়ে গেল।

কত বড় শহর ! কত গাড়ি-ঘোড়া, ট্রাম-বাস, সিনেমা-থিয়েটার, লোক-জন ! মানুষের কত কাজ, কত ব্যস্ততা, কত ছুটোছুটি ! আমোদ-প্রমোদ, আনন্দ আহরণের কত অসংখ্য উপকরণ !

কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হতে চের পেলে, এরই ভাঁজে ভাঁজে সযত্নে লুকোনো রয়েছে কত মর্মান্তিক বেদনা, কত গভীর গ্লানি, কত নিদারুণ বঞ্চনা !

আত্মজ্ঞান বিদ্ধি।

কিন্তু জানবে কি, মনের মুখোমুখি দাঁড়াতেই ভয় পায়। ক্লেদ জমেছে এত বেশী।

জেলে এসে তার সামনে পৃথিবীর আর এক তোরণ খুলে গেল,—উত্তর তোরণ।

অনেকদিন আগে একটি অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে সুপ্রকাশ একবার হাসপাতাল গিয়েছিল। সারি সারি শয্যায় রকমের-রকমের রোগী শুয়ে। ঘরের পর ঘরে রোগী। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিল্‌ডিং ভর্তি। তার যেন আর শেষ নেই ! কিছুক্ষণ পরে তার মাথা ঝিম ঝিম করে উঠেছিল। মনে হয়েছিল সুস্থ কেউ নেই, পৃথিবীশুদ্ধ সমস্ত মানুষ রোগী, রকমারি রোগের যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে।

জেলে এসেও তার তেমনি মনে হল।

খোপে-খোপে কত পাপ ! লোভ আর হিংসা আর নিষ্ঠুরতায় কঠিন হয়ে উঠেছে পাপের জঞ্জাল। একটু আরাম, একটু বিলাস, একখানা বাড়ি, দু'খানা গাড়ি,—সে তো অনেক বড় কথা। দু'চামচ ভাতের জন্যে মানুষ না করতে পারে এমন অপকর্ম নেই।

দুদিন জেলে থেকেই তার মনে হল, সাধু কেউ নেই। সমস্ত মানুষ পাপী। পাপের জ্বালায় সকলের দেহ কেঁচোর মতো চিক চিক করছে।

বিষ্ণুপদ তাকে ধর্মতলায় নিয়ে গিয়েছিল কংগ্রেস অফিসে। সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে। বলেছিল, খেজুর পাতার ছেঁড়া চাটাইএর উপর এখানে ভারতবর্ষের নতুন ইতিহাস রচিত হচ্ছে।

সুপ্রকাশের মনে হল, সেই নতুন ইতিহাসের ধারা তো ধর্মতলা থেকে এই পথ দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে। এই কারাগারের পথ দিয়ে!

সেখানকার রক্তস্রোত কি এখানকার রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে? সঙ্গে মিশছে সাম্রাজ্যবাদের অস্তিম শ্বেত রক্ত।

ত্রিবেণী সঙ্গম!

এখনই মিশে যাচ্ছে না বটে: এখনও পাশাপাশি চলেছে তিন রক্ত: লাল, কালো আর শাদা। কিন্তু নিশ্চয়ে, নিশ্চয়ে নিশ্চয়ই আরও কিছু দূর গিয়ে মণিকর্ণিকার ঘাটে পৌঁছুবার আগেই।

তখন?

তখন কী হবে সেই ইতিহাসের রূপ? যেদিন গান্ধীজী থাকবেন না, সুভাষচন্দ্র থাকবেন না, সেদিন?

উত্তর তোরণপথে কি দেখা যায়?

অনাগত কালের মনুষ্যস্রোত, আজকের পাপের বোঝায় তাদের শীর্ণ দেহ নুয়ে পড়েছে, নিষ্প্রভ চোখে কি দেখে আর কি দেখে না কিছুই বুঝতে পারে না, শ্রান্ত শ্লথপদে পিপীলিকার মতো সারি বেঁধে চলেছে পাহাড়ের পথে।

কেন?

এই জমাট কুয়াশা আর মেঘের ওপারে পাহাড়ের চূড়ায় যদি একটু আলো থাকে, একটুখানি মুক্ত বায়ু, সেই আশায়।

মুক্তির দিন যখন কাছে এসে পড়েছে, তখন পাসের খবর এল। জেলে খবরের কাগজের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু খবরের অসংখ্য খিড়কির পথ খোলা।

সেই পথে খবর পেলে এবারে সে প্রথম দশজনের মধ্যে হয়েছে।

হুর রে, হুর রে!

তার কারাগারের বন্ধুরা আনন্দে চীৎকার করে উঠল। লাফাতে লাগল। শেষে সুপ্রকাশকে কাঁধে নিয়ে সামনের উঠানে এক প্রস্থ ঘোড়দৌড় করে এল।

নামাও, নামাও।

গল্প-ভারতী

কে কার কথা শোনে! সুপ্রকাশ কি সোজা ছেলে! তাদেরই সঙ্গে এক অপরাধে, এক জেলে বন্দী সুপ্রকাশ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম দশজনের একজন হয়েছে! এরই মধ্যে তাকে নামাবে কি!

সুপ্রকাশ চীৎকার করে আর কখনও এমন হবে না এবারে নামাও, নামাও।

আরও অনেকক্ষণ ছোড়াদৌড় করে ক্লান্ত হয়ে তবে তাকে নামিয়ে দিলে। সে কী হাসি! যত তারা হাসে, তত সুপ্রকাশ। এই পাষাণপুরীর মধ্যে আনন্দ, সহজ আনন্দ এতই দুর্লভ যে অল্পে কেউই ছাড়তে রাজী নয়।

তার অনেক পরে।

রাত্রে অন্ধকার কারাগৃহে লোহার খাটে, খড়ের গদির উপর শুয়ে সুপ্রকাশ ব্যাপারটা সুস্থভাবে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল:

কি হয়েছে?

চতুর্থ হয়েছে।

তাতে কি? পৃথিবীর কিছু কি পরিবর্তন

না।

সমাজের?

না।

তার নিজের?

সুপ্রকাশ অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল। মনের অলি-গলি খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগল। কিছুই খুঁজে পেল না। তার মনে হয়, ভারতবর্ষে সবই নিরর্থক। জেলে আসা না আসা, পাস করা না করা, এমন কি ভালো করে পাস করারও কোনো অর্থ নেই। একটা অর্থহীন গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে যা-কিছু ভালো, যা-কিছু মন্দ, যা-কিছু পুণ্য, যা-কিছু পাপ কারা প্রাচীরের অন্তরালে এসে হারিয়ে যাচ্ছে!

কি আশ্চর্য!

অকস্মাৎ খড়ের বালিশে মুখ ঢেকে সুপ্রকাশ কাঁদতে আরম্ভ করল, অত্যন্ত চুপে; পাছে ওয়া টের পায়।

মাকে মনে পড়ল কি?

তারপর বোধহয় একটু সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল টুং-টাং শব্দে। সামনের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডের বাথরুমে বোধ হয় একটা এ্যালুমিনিয়াম পাত্রে বিন্দু বিন্দু করে জল পড়ার শব্দ।

অবিকল কনক-কিঙ্কিনীর মত।

মনে হয় পাশেই কোথাও একটি মেয়ে স্নান করছে। গাত্র-মার্জনায় হাতের চুড়ি নড়ছে আর শব্দ হচ্ছে।

আধ-ঘুমঘোরেই সুপ্রকাশের মস্তিষ্কের রক্ত অত্যন্ত দ্রুতবেগে শিরা-উপশিরায় ছুটোছুটি আরম্ভ করেছে।

হঠাৎ তার মনে পড়ল অসীমাকে। অনেকদিন পরে।

কে জানে সে এখন কত বড়টি হয়েছে!

॥ ছয় ॥

সুপ্রকাশ জেল থেকে বেরিয়ে এল যেন অন্য মানুষ। তার বয়সসুলভ তারুণ্যের উপর একটা গাম্ভীর্যের ছাপ পড়েছে। কথা অল্প বলে। সব সময় কেমন চিন্তাযুক্ত।

প্রথমে সে হোস্টেলে এল।

সেখানে তার জন্যে ফুলের মালা তৈরিই ছিল। কারাবরণের জন্যে সভা করে সম্বর্ধনা জানানো বিষ্ণুপদ সভাপতির আসন গ্রহণ করলে। বক্তৃতা হল। অলযোগের ব্যবস্থাও ছিল।

কিন্তু সুপ্রকাশ কেমন চিন্তাযুক্ত, অন্যমনস্ক। কিছুতে যেন উৎসাহ নেই। সব শুনলে, সব দেখলে, অথচ কিছুই যেন শুনলে না, কিছুই দেখলে না, কিছুই বললেও না। শুধু একবার উঠে সকলকে প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানালে।

বিষ্ণুপদ লক্ষ্য করলে। জেল, বলতে গেলে তার শ্বশুরবাড়ি। জেলের অবস্থা সে জানে। নানা মনের উপর তার নানা প্রতিক্রিয়া।

নিরিবিলি একসময় জিজ্ঞাসা করলে, বল জেল কেমন লাগল?

—ভালো লাগেনি।

বিষ্ণুপদ হাসলে: ভালো লাগবার তো কথা নয়। অন্তত জেলকে যে শ্বশুরবাড়ি বলে সেটা সত্যি নয়। কিন্তু ভালো লাগাতে হয়। যারা দীর্ঘমেয়াদী, তাদের তো তা ছাড়া উপায় নেই। মনে হচ্ছে তুমি সেটা পারনি।

আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—হুঁ!

বিষ্ণুপদ ও নিয়ে আর আলোচনা বাড়ালে না। অন্য প্রসঙ্গ তুললে: ভর্তি হচ্ছ কবে?

জানি না। বাড়ি থেকে ফিরে এসে স্থির করব। বাবাকে যতদূর জানি জেলে যাওয়ার পর আর তিনি আমাকে এখানে রাখবেন কিনা সন্দেহ!

কিন্তু বাড়ি গিয়ে সে রকম কিছুই সুপ্রকাশ দেখল না।

মা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে বললেন, কি রোগা হয়ে গেছিস!

ওটা তাঁর স্বভাব। ছেলেদের সব সময়ই রোগা দেখেন।

সুপ্রকাশ কিছু বললে না। শুধু হাসলে।

ভয় ছিল তার বাবাকে। কিন্তু আশ্চর্য, তিনি কোনরকম তিরস্কার করলেন না। সুপ্রকাশ বড় হয়ে গেছে। হয়তো সেই কারণেই 'নিগ্রহবাচরণ' করছেন। কি হয়তো জমিদারী রক্ষার খাতিরে প্রকাশ্যে না করলেও ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসের তিনি বিরোধী নন। যাই হোক, তিনি তিরস্কারও করলেন না, অভিনন্দনও জানালেন না। না তাঁর স্বভাব, দু'চারটে মামুলি কুশল প্রশ্নের পরেই অন্য কাজে মন দিলেন।

সবচেয়ে আশ্চর্য, সে যে ইণ্টারমিডিয়েটে চতুর্থ হয়েছে, তা নিয়ে কারো কাছ থেকে একটা অভিনন্দনও পেলে না। তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তার জেলে যাওয়া।

উঠান কৌতূহলী স্ত্রীলোকের ভিড়ে জমজমাট। অবাক হয়ে তারা সব সুপ্রকাশের দিকে চোখে বুঝি পলক পড়ে না। দেখছে, জেল থেকে কী চতুর্ভুজ হয়ে ফিরেছে সে।

পরীক্ষায় অত ভালো করে পাস, সে অনেক পিছনে!

সুপ্রকাশ লক্ষ্য করলে।

সে স্কুলে বরাবর প্রথম হয়ে এসেছে। যদিচ তখন কেউ কেউ বলত হৃষিকেশবাবুর ছেলে বলে মাস্টারে খোসামুদি করে তাকে ফার্স্ট করে দেন, তবু সে যে ভালো ছেলে এটা সবাইকেই স্বীকার করতে হত। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তার চতুর্থ হওয়ায় আশ্চর্য কেউই হয়নি। স্কুলের পরীক্ষা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা তাদের কাছে প্রায় একই ব্যাপার।

তাদের আকর্ষণ করেছে কারাবরণ!

চোর জেলে যায়, খুনে জেলে যায়। দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্যে কখনও কখনও লাঠিয়ালও জেলে যায়, যেমন বেহুঁ গেছে তিন বৎসরের জন্যে। আপীলে ছমাস কমেছে।

কিন্তু এ তা নয়।

জেলে গেল প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদারের শিক্ষিত একমাত্র সন্তান। মায়ের চোখের জল, বাপের ভ্রূকুটি, কিছুই তার পথ রোধ করতে পারেনি। সেই ছেলে ফিরে এসেছে, তাকে দেখতে আসবে না ভিড় করে?

পাসের বাজারদর অনেক! ভালো করে পাসের আরও বেশি। কিন্তু গ্রামের লোকের কাছে তারও চেয়ে বেশি মূল্য (বাজারের অবশ্য নয়) দেশের জন্যে জেলে যাওয়ার।

কিন্তু দেশকে এরা চেনে? সুপ্রকাশের মনে প্রশ্ন ওঠে।

চেনে। স্পষ্ট করে যদিও নয়, কিন্তু আবছাভাবে চেনে। যারা দেশের জন্যে দুঃখ সয় তাদের ভালোবাসার চেষ্টা করে।

কিন্তু চিনলে কি করে? নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্মের বিচিত্র সমাবেশে গঠিত যে এক এবং অখণ্ড ভারতবর্ষ, গ্রামের বাইরে না গিয়ে তাকে চেনা যায়?

হয়তো যায়। ঘুমপোক্ত অবোধ শিশু সহস্র নারীর মধ্যেও যেমন করে তার মাকে চেনে, হয়তো তেমনি করেই।

তাহলে দেবীপুরের বড় তরফের অন্দরের উঠানে ভিড় না করে এরা জেলে গিয়ে ভিড় করে না কেন? তাহলে তো কবে কারাগারের অভ্রভেদী লাল প্রাচীর চুরমার হয়ে ধূলিসাৎ হত!

না। তা পারে না। এবং সেই না-পারার অক্ষমতায় কুণ্ঠিত থাকে। শিক্ষিতদের মতো নানা কূট যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে সে অক্ষমতা ঢাকবার চেষ্টা করে না। কুণ্ঠিত থাকে, এবং পারা পারে তাদের দেখবার জন্যে ভিড় করে আসে।

অন্তত সেদিন এই বলে সুপ্রকাশ নিজের মনে অবস্থাটার ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলে।

সমস্ত দুপুরটা মায়ের কাছে কাটলো।

সুপ্রকাশ খাটে শুয়ে শুয়ে জেলের গল্প করে। নেবের বসে মা সুপুরি কাটেন আর শোনেন।

একটা মাস কিছুই নয়। কত গল্পই বা থাকতে পারে? কিন্তু তার মনের মধ্যে যেন অফুরন্ত গল্প জমে রয়েছে। কত তুচ্ছ কথা। কত কথা তার কোনো অর্থই নেই। কিন্তু যেখানে কথক আর শ্রোতা উভয় পক্ষেই উৎসাহের অভাব নেই সেখানে নিরর্থক কথাতেও গল্প জমানোর কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না।

—জেলে আমার একটা মুহূর্তও ভালো লাগত না। কত রাত্রি কেঁদে কাটিয়েছি।

মা চমকে ওঠেন: কেন রে? খুব কষ্ট দিত নাকি?

—না, না। কষ্ট কিছুই না। খালি খাওয়া-শোয়া আর বেড়ানো।

—তবে কাঁদতিস কেন?

—তোমার জন্যে।

লজ্জায় সুপ্রকাশ মুখ লুকতে চাইলে।

—আমার জন্যে?

মায়ের চোখও ছলছল করে উঠল।

—হ্যাঁ মা। শুধু তোমার জন্যে। প্রথম প্রথম হস্টেলে গিয়েও তোমার জন্যে কান্না আসত। কিন্তু এ অন্যরকম কান্না। দিনে নয়, মাঝে মাঝে রাত্রে হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ত, আর কিছুতে কান্না থামাতে পারতাম না। কাঁদতে কাঁদতে কখন এক সময় ঘুমিয়ে যেতাম!

সুপ্রকাশ হাসলে।

মায়ের অবস্থা তখন শোচনীয়। চোখ জলে ভরে এসেছে। মুখ তোলবার উপায় নেই। সেই অবস্থা ঢাকবার জন্যে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়লেন: পরমের ছুটিতে অসীমা এসেছিল।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ। তোর ছেলের খবরে খুব দুঃখ পেয়েছে। রোজ দুপুরে এবাড়ি আসত। আর কাঁদত।

শুনে সুপ্রকাশ খুব খুশি হল মনে মনে। মুখে বললে, আগে তো এবাড়ি আসত না।

—কখনও না। তোর ছেলে হওয়ার জন্যেই বোধ হয় আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসত। রূপ তো ছিলই, শহরে গিয়ে যেন আরও সুন্দরী হয়েছে। আর কি মিষ্টি কথা! শহরে থাকলে চাল-চলনই অন্যরকম হয়ে যায়।

সুপ্রকাশ সাড়া দিলে না। বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে গেল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, আছে এখনও? না চলে গেছে?

—এই ক'দিন হল গেছে। খুব ইচ্ছে ছিল তোকে দেখবার। তুই তো এলি না।

সুপ্রকাশ চুপ করে রইল।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, তোর সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই শুনলাম।

—না।

—তার মামার বাড়ির ঠিকানা জানিস না বুঝি?

—না।

—আহা, কলকাতায় ফিরে গিয়ে একদিন দেখা করিস। তোকে দেখবার জন্যে খুবই ব্যস্ত হয়েছে।

সুপ্রকাশ সাড়া দিলে না।

একটু পরে বললে, ছেলে কোনো কোনো দিন ওর কথাও মনে পড়ত।

আবার সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

বিকেলে বেড়াতে বেরুবে, কি মনে করে বাগানের দিকে গেল। বহুকাল এদিকে আসেনি। বাগানের দুরবস্থা দেখে মনে হয় এদিকে কেউই বোধ হয় আর আসে না।

খিড়কির দরজা বন্ধ।

যেখানে ওদের খেলাপাতি বসত সেখানে গেল। যে নিরিবিলি জায়গাটুকু নিজের হাতে পরিষ্কার করে খেলাঘর পেতেছিল, বড় বড় ঘাসের জঙ্গলে তা আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। ঘাস সরিয়ে সরিয়ে অনেক কষ্টে একটা জায়গা বের করলে। মনে হল, এইটেই সেই জায়গা হবে।

কিন্তু খেলাপাতির চিহ্নমাত্র নেই।

একদৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরে সুপ্রকাশ সেই তৃণাচ্ছন্ন জায়গাটার দিকে চেয়ে রইল। কি যে খুঁজছে তা বোধ হয় সে নিজেই জানে না।

চিহ্ন?

কিছুরই চিহ্ন থাকে না। যত ঘাস আমরা কাটি, সবই বুঝি জলের উপর। তখনই মিলিয়ে যায়। সময়ের স্রোত উদাসীন হয়ে বয়ে চলে বিস্মৃতির পারাবারের দিকে।

সুপ্রকাশ অজ্ঞাতসারেই একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে।

মাঠে একটা ম্যাচ খেলা ছিল। ওদের স্কুলের সঙ্গে পাশের গ্রামের স্কুলের। সকালেই বন্ধুরা এসে খবর দিয়ে গিয়েছিল, খেলায় ওকেই রেফারী হতে হবে।

যেতে হল, যদিও যেতে খুব উৎসাহ বোধ করছিল না। কিন্তু মাঠে পৌঁছেই শরীর এবং মন চাঙ্গা হয়ে উঠল। কলকাতার ভদ্রতার মুখোশপরা আড়ষ্ট জীবন, জেলের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা উপবাস-খিন্ন মন নয়। গ্রামের মাটির গন্ধে ভরা সতেজ জীবন এবং সবুজ মন যেন আবার অনেক দিন পরে ফিরে এল।

খেলার মাঠে কী তার সমাদর!

জেলে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে, পরীক্ষার ফলের জন্যেও।

—কে যেন বলছিল, আপনি নাকি আর পড়বেন না। পড়ে-শুনে কিই বা হবে যখন খেটে খাবার দুশ্চিন্তা নেই। সমস্ত জীবন দেশকে দিতে পারবেন। সে কি কম কথা?

এ কথা আবার কে রটালে?

সুপ্রকাশ বললে, না; পড়ব বই কি! তারই ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সাধ্য দেশের কাজ করব। সাধ্য তো বেশি নয়।

—বলেন কি! আপনি আমাদের এ অঞ্চলের ছেলেদের গৌরব। অনেক গর্বের বস্তু। পড়া ছেড়ে দিচ্ছেন শুনে মনে কষ্টই হয়েছিল। আপনাকে নিয়ে আমাদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হয় কি না।

সুপ্রকাশ সংক্ষেপে বললে, না, পড়ব।

—তারপরে ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেত যাবেন নিশ্চয়।

—কি জানি।

—আমার মনে হয়, আপনার মতো ছেলের সিভিল সার্ভিসের জন্যে যাওয়া উচিত। বারে সুখ নেই। ভারাক্রান্ত হয়েছে।

সুপ্রকাশ হাসলে: দেখি।

ওরা সুপ্রকাশের হাত চেপে ধরলে: না। তা বললে শুনছিনে দাদা। আমাদের এই দিকটা একেবারে বাঁজা হয়ে গেছে। হাতুড়ে রামডাক্তার, আর মহকুমা আদালতে মক্কেলহীন মোক্তার জনার্দন। একটা আই. সি. এস. এখান থেকে বার করতেই হবে।

ওদের যেন আর তর সইছিল না। পারে তো এখনই ঠেলে সুপ্রকাশকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে পাঠায়।

বললে, Ma. F.এর জঞ্জাল আর বইতে পারি না।

সুপ্রকাশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, Ma. F.টা কি?

—ম্যাট্রিক ফেল! যাকে জিগ্যেস করবেন, শুনবেন ম্যাট্রিক ফেল! হা-ভোর ছেলের নিকুচি করেছে।

ছোকরা আকাশের উদ্দেশ্যে ঘুঁষি পাকালে।

—এই আপনাদের দেবীপুর ইস্কুলের কথাই বলুন। কি হয়ে এসেছে। পনেরোটার মধ্যে তিনটে পাস: দুটো থার্ড ডিভিশন, একটা লেকেণ্ড ডিভিশন। আটাশটার মধ্যে চারটে। হঠাৎ আপনি একেবারে জলপানির কোটায় উঠে পড়লেন। উঠলেন যদি আর থামবেন না। মুখ তুলে চাইবার মতো লোক দেশের অনেক আছে। কিন্তু এই হতভাগা দেশের আপনি ছাড়া আর কে আছে। বলুন? থামবেন না।

ছেলেটার মনটি সরল। বকতেও পারে অনর্গল। খেলা শেষ হবার পর, কাছেই গ্রাম, চলে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বকলে। দেশ, জাতি, ধর্ম, মামলা-মোকদ্দমা, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা কিছু বাদ দিলে! সব বিষয়েই তার মত দৃঢ় এবং স্পষ্ট। কোথাও দ্বিধা নেই।

বাড়ি ফিরে সুপ্রকাশ ছেলেটির কথা ভেবে আপন মনেই হাসলে।

থামবেন না।

না থামবে কেন? থামবার প্রশ্ন এখনও তো ওঠেনি।

হৃষিকেশবাবু এখনও পড়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি বটে। তাঁর মনের মধ্যে হয়তো একটু ক্ষোভ রয়েছে। অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদটা হাতছাড়া হয়ে গেল। তার চেয়েও বড় কথা, সেটা চলে গেল পূর্ণটিবাবুর হাতে। সুতরাং ক্ষোভ হতেই পারে।

কিন্তু পরীক্ষায় চতুর্থ হওয়াটাই তো সামান্য কথা নয়। একদিকে পিতাকে যেমন দুঃখ দিয়েছে অন্যদিকে আনন্দও দিয়েছে বৈকি! তারপর জেল থেকে সে ফিরে এল। তাতে করে, যতখানি ক্ষোভ জমেছিল তার অনেকখানি এতদিনে নিশ্চয় অপসারিত হয়েছে।

হতে পারে সবে কাল সুপ্রকাশ অনেকদিন পরে ফিরেছে বলেই এখনও প্রসঙ্গটি তোলেননি।

হলও তাই!

পরদিন সকালেই সুপ্রকাশকে ডেকে বললেন, তোমার কলেজ তো খুলে গেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভর্তি হওয়া সুরু হয়ে গেছে বোধ হয়?

—কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে।

—তুমি কবে ভর্তি হচ্ছ?

হৃষিকেশবাবু পঞ্জিকাটা খুলে মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলেন। বললেন, আজ কাল দুটো দিনই ভালো নয়। পরশু গেলে ক্ষতি হবে?

—না। আমি প্রিন্সিপালকে বলে এসেছি। আমার জন্যে তিনি অপেক্ষা করবেন বলেছেন।

—তবে আর কি! পরশু বিকেলের ট্রেনে যাবে।

হৃষিকেশবাবু নিশ্চিন্ত মনে পঞ্জিকার পাতাটা তুলে নিলেন। রাজনীতি করা নিয়ে একটা কথাও

তিনি বললেন না। তিরস্কার করেও না, উপদেশ দিয়েও না। একটা আরামের নিশ্বাস ছেড়ে কলকাতা যাওয়ার কথাটা মাকে জানাবার জন্যে ভিতরে গেল।

সেখান থেকে পাড়া বেড়াতে।

বিকেলে খেলার মাঠে। আজ আর ম্যাচ ছিল না। এমনি খেলতে গেল।

আশ্চর্য কালকের ছেলেটি! অনর্গল বকে।

থামবেন না দাদা!

না, থামবে না। জেলের মধ্যে গিয়ে সমস্ত কিছুর উপর যে বিশ্বাস সে হারিয়েছিল, খেলার মাঠে আবার তা কুড়িয়ে পেলে।

॥ সাত ॥

সুপ্রকাশ কলেজে ভর্তি হয়ে গেল।

বিষ্ণুপদর সঙ্গে দেখা হয়। কখনও সুপ্রকাশ তার হস্টেলে যায়, কখনও সে সুপ্রকাশের হস্টেলে আসে। নানা বিষয়ে আলোচনা হয়, রাজনীতিই বিশেষ করে। বিষ্ণুপদর বুদ্ধির দীপ্তি এবং হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও সততার উপর তার শ্রদ্ধা বেড়ে চলে।

কিন্তু কংগ্রেস অফিসে বড় একটা যায় না। যখন বিষ্ণুপদর সঙ্গে যায়, বিষ্ণুপদ যায় বলেই যায়। চক্ষুলজ্জায় যায়। বলতে পারে না বলেই যায়। কিন্তু যাওয়া-আসা ধীরে ধীরে কমিয়ে দিতে লাগল।

বিষ্ণুপদ সেটা বুঝতে পারে। তার আশঙ্কা হয়, জেল থেকে ফিরে এসে জেল সম্বন্ধে কি সুপ্রকাশের ভয় জাগল? অসম্ভব নয়, অনেকের এমন জাগে। কিন্তু যতখানি সুপ্রকাশকে সে চিনেছে তাতে তার সম্বন্ধে এমন সন্দেহ করতে তার প্রবৃত্তি হয়! সুপ্রকাশের সাহস, সততা ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে সে প্রায় সুনিশ্চিত।

তবু একদিন জিজ্ঞাসা করে বসল:

—তোমার কংগ্রেস অফিসে যাবার আগ্রহ যেন অনেকখানি কমে গেছে।

সুপ্রকাশ লজ্জা পেলে।

বললে, না, কমেনি। কিন্তু সামনের কয়েকটা বছর একটু দূরে থাকতে চাই।

বিস্মিতভাবে বিষ্ণুপদ প্রশ্ন করলে, কেন বলতো? সামনের কয়েকটা বছর কি আছে?

লজ্জিতভাবে সুপ্রকাশ উত্তর দিলে, পড়া।

—পড়া! বিষ্ণুপদ আকাশ থেকে পড়ল।—পড়া তো আমারও আছে। আর কটা মাস পরেই এম. এ পরীক্ষা।

হেসে সুপ্রকাশ বললে, কিন্তু সবাই তো বিষ্ণুপদ নয় যে, একসঙ্গে সব তাল সমানে রক্ষা করবে।

কিন্তু পরীক্ষায় তোমার ফল তো আমার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।

—হয়েছে কিন্তু প্রাণপণ খেটে! আর আপনি না খেটে। যাই হোক, আমি ভেবে দেখেছি, দেশের কাজ করবার জন্যে সমস্ত জীবনই পড়ে রয়েছে, কিন্তু পড়ার সময় আর পাব না।

—এ চিন্তা কি জেলে যাওয়ার ফলে?

—সত্যি তাই।

বিষ্ণুপদর বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে: দাঁড়াও দাঁড়াও! কি ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বলতো?

ওরা পার্কে গিয়ে বসল।

বিষ্ণুপদ বললে, বল।

সুপ্রকাশ বললে, এবার আমাকে ফার্স্ট হতেই হবে। কিন্তু সেটা খুব সহজ নয়। যে ছেলেটি এবার আমাদের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে,—সে ম্যাট্রিকেও ফার্স্ট হয়েছিল,—সেও ইংরিজিতে অনার্স নিয়েছে। তাকে হারাতে গেলে প্রচুর পরিশ্রম করা দরকার।

—হায় ভগবান!—বিষ্ণুপদ মাথায় করাঘাত করলে,—ইংরিজিতে ফার্স্ট হবার জন্যে কংগ্রেসের সংস্রব ছাড়বে!

—না সংস্রব ছাড়ব না, কমাব। সামনের দুটো বছর এবং তারও পরের দুটো বছর। আপনি কিছু মনে করবেন না।

সুপ্রকাশ হাত জোড় করলে।

বিষ্ণুপদ বোধ হয় আঘাত পেলে। গম্ভীর কণ্ঠে বললে, আমার মনে করার তো কথা নয় সুপ্রকাশ, দেশের কথা ভাব।

সুপ্রকাশ তাড়াতাড়ি বললে, দেশের কথা ভেবেছি। জেলে গিয়ে দেখেছি, জেলে যাওয়াটা আসল কথা নয়, আসল কথা দেশের কাজ করা। দেশের কাজ করতে গিয়েই জেলে যেতে হয়। সেই কাজ শেষ হতে এখনও অনেক দেরি। চারটে বছর দেশ খুব অপেক্ষা করতে পারবে।

বিষ্ণুপদ ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ধীরে ধীরে বললে, জেলে যেতে এরকম করে ভাবতে, না?

—না।

যে ছেলেটি বলেছিল, থামবেন না দাদা, সুপ্রকাশ তার গল্প করলে।

বললে, আমার সর্বপ্রথম ঋণ আমার গ্রামের কাছে। তারপরের ঋণ দেশের কাছে। সর্বপ্রথম ঋণ সর্বপ্রথম শুধতে হবে।

বিষ্ণুপদ হো হো করে হেসে উঠল: তোমার ধারণা এম. এ.তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলেই তোমার গ্রামের ঋণ শেষ হবে?

ওর হাসিতে সুপ্রকাশ লজ্জা পেলে : না, তা ঠিক নয়।

কিন্তু কি যে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারলে না।

বিষ্ণুপদর দুশ্চিন্তা অনেকখানি কেটে গেল। না, সুপ্রকাশের জন্যে তার ভাবার কিছু নেই। ওকে বিরক্ত করার দরকার নেই। ও তাদের সঙ্গেই রয়েছে, বাইরে চলে যায়নি।

ছেলে নির্মল বসে থেকে থেকে একটা অভ্যাস সুপ্রকাশের হয়েছে : চিন্তা করার অভ্যাস। একটা-কিছু হলেই সে ভাবে। তার ভূল-চেরা বিচার করে। সকল সময়ই তার ভাবনার খোরাক জোগাবার কিছু-না-কিছু আছেই।

পড়ার সময় পড়া করে। কলেজে গিয়ে লেকচার শোনে। মন দিয়েই শোনে। কিন্তু হাতে যখনই কাজ থাকে না, তখনই ভাবে। কোনো সময় সুশৃঙ্খল চিন্তাধারা, কখনও এলো-মেলো, নিতান্তই আবোল-তাবোল। অনেক রাত্রি বিনিদ্র কেটে যায়।

এটা তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেক সময় বিরক্ত হয়। কিন্তু অভ্যাস ছাড়তে পারে না।

শুধু অভ্যাস নয়, কেমন যেন একটা নেশাও রয়েছে। আপন মনে অনর্গল স্বপ্নের জাল বুনে ভালো লাগে। ওর মধ্যে উত্তেজক নেশার আমেজ রয়েছে।

সেদিন বিকেলে এমনি জাল বুনতে বুনতে সুপ্রকাশ আপন মনে নেশার ঝোঁকে চলেছে।

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। গাছের পাতা ভিজে। রাস্তা ভিজে। তার উপর শেষ-বিকেলের রোদ উঠেছে। ঝিলমিলিয়ে উঠেছে পথ-ঘাট।

সেই আলো-ঝিলমিল পথ দিয়ে আপন মনে হেঁটে চলছিল সুপ্রকাশ। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে চলতে চলতে যখন বেথোর কোণে পৌঁছেছে, তখন হঠাৎ—

সুপুদা! সুপুদা!

এ নাম তো দেবীপুরে ফেলে এসেছে অনেকদিন। কে ডাকে সেই ফেলে-আসা নাম ধরে?

চমকে সুপ্রকাশ পিছনে চাইলে।

অসীমা!

অসীমাই সত্যি। হাতে বই, ডান হাতে বেঁটে ছাতা। বেথুন স্কুল থেকে আরও অনেক মেয়ের সঙ্গে বেরুচ্ছে।

মুখে একমুখ হাসি।

মা মিথ্যে বলেননি, অসীমা সত্যই খুব সুন্দরী হয়েছে।

কথা বলার ভঙ্গীতে গ্রাম্যতা নেই। তার জন্যে কণ্ঠস্বরেরও যেন পরিবর্তন হয়েছে বোধ হয়। হঠাৎ খুশির ঝলকানি লেগেছে তার বড় বড় দুই চোখে।

—ভালো আছ?

—হ্যাঁ। তুমি?

অসীমা সে প্রশ্নের আর উত্তর দিলে না। জিজ্ঞাসা করলে, কতদিন হল কলকাতায় এসেছ, আমার সঙ্গে দেখা করনি যে বড়!

অভিমানের ছায়া ঘনাল চোখে।

—জ্যাঠাইমা বলেননি? তাঁর কাছে ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম, যেননি?

একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্নের গোলাবর্ষণ!

সুকুমার হেসে বললে, প্রায়ই ভাবি যাব, কিন্তু কিছুতে সময় করে উঠতে পারি না।

—রাখ। অনেক বাজে কৈফিয়ত দেবে জানি। এখন কোথায় চলেছ?

—একটি বন্ধুর কাছে।

—না।

অসীমা ঘাড় বাঁকালে। সেই পুরোনো অসীমা! খেলা করতে করতে রেগে গিয়ে মাঝে মাঝে এমনি করে ঘাড় বাঁকাত।

সুপ্রকাশ হেসে বললে, না কি?

—আমার সঙ্গে চল। আমার মামার বাড়ি।

—হ্যাঁ। আমাদের বাড়ি চলুন।

সুপ্রকাশ এতক্ষণ খেয়াল করেনি, আরও একটি মেয়ে অসীমার পিছনে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল। অসীমারই সমবয়সী, কিন্তু অল্প কিছু বড়ই হবে। চমৎকার দেখতে।

কথা শুনে সুপ্রকাশ তার দিকে চাইলে।

অসীমা বললে, আমার মাসতুতো বোন সুবর্ণ। আমরা এক সঙ্গেই বেথুনে পড়ি। চল।

সুপ্রকাশ বুঝিয়ে বললে, এই তোমরা স্কুল থেকে ফিরছ। গিয়ে হাত-মুখ ধোবে, খাবার খাবে, বিশ্রাম করবে। এখন কি যায়? বরং পরশু রবিবার আছে। পরশু বিকেলে যাব।

মাথা দুলিয়ে অসীমা বললে, ওরে বাবা! পরশু! তবেই হয়েছে! কতকাল পরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল তাই। নইলে তোমার পাত্তাই পেতাম না। তোমার কথায় আমি ভুলি!

—না, না। দেখা যখন হয়ে গেল তখন পরশু নিশ্চয় আসব। কথা দিলাম।

—কথা ওখানে গিয়ে রেখে যে, পরশু আবার আসবে। আজকে ছাড়চি নে।

অসীমা হেসে হেসে মাথা দোলাতে লাগল।

সুবর্ণও মজা দেখছে, আর মুখ ফিরিয়ে টিপে টিপে হাসছে।

সুপ্রকাশ বুঝলে আজ আর তার পরিত্রাণ নেই। তবু একবার শেষ চেষ্টা করলে, কিন্তু বন্ধুর ওখানে না গেলেই যে নয়। বিশেষ জরুরী দরকার।

অসীমার সেই এক কথা: যত দরকারই হোক আজ আর অন্য কোথাও যাওয়া হচ্ছে না।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, ভয়ানক কিদে পেয়ে গেছে সুপুর্ণা! কেন মিছিমিছি দেরি চল।

উপায় নেই। সুপ্রকাশকে বাধ্য হয়ে যেতেই হল।

সুপ্রকাশ একেবারে মিথ্যা কথা বলেনি। অসীমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে মাঝে মাঝে তার খুবই ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু কারও বাড়ি, বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যেতে সে খুব লজ্জা পায়। তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যেতে পারেনি।

কিন্তু গিয়ে খুশি হল।

অসীমার মাসীমা নিরুপমা চমৎকার মহিলা। সুপ্রকাশ নামের দিক দিয়ে এবাড়ির সকলের কাছেই সুপরিচিত। সকলেই তার ছেলে যাওয়ার কথাও জানে, পরীক্ষার ফলের কথাও জানে। এমন কি, অসীমার মুখে বর্ণনা শুনে শুনে তার চেহারা সম্বন্ধেও সকলের একটা মোটামুটি ধারণা জন্মেছিল।

সে-চেহারার সঙ্গে সুপ্রকাশের আসল চেহারার মিল যদিও সামান্যই, কিন্তু অসীমা যখন মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করলে, বল তো, কাকে সঙ্গে এনেছি, তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, আহা, আমি যেন চিনি না! সুপ্রকাশ। এস বাবা, এস।

—কি করে চিনলে?

—তোর মুখে শুনে শুনে। সুপ্রকাশ ছাড়া কাকে আর তুই রাস্তা থেকে ধরে ধরে নিয়ে আসবি। এস বাবা, এস। শরীর ভালো আছে তো? বাড়ির চিঠি পেয়েছ? বাবা, মা সব ভালো আছেন?

মাসীমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে এক কথায় সুপ্রকাশ উত্তর দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

শান্ত গম্ভীর মহিলা। চেহারায় সুন্দর একটি মাতৃভাব। দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। কোনো বাজে অনুযোগ করলেন না, মিথ্যে উচ্ছ্বাসও দেখালেন না। এক মুহূর্তেই সুপ্রকাশের লজ্জা এবং সংকোচের ভাব কেটে গেল।

বাড়িখানিও চমৎকার।

ওদের দেশের বাড়ির মতো অনেকখানি জায়গার উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রকাণ্ড একটা ইমারৎ নয়। আধুনিক প্যাটার্নের মাপসই ঠাস-বুনুনির বাড়ি। কোথাও এতটুকু স্থান ফেলা যায়নি। না প্রকাণ্ড বড় টানা বারান্দা, সুবিস্তৃত উঠান,—না সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে অনেকখানি করে ফেলা জায়গা। স্থান এখানে মূল্যবান। কোথাও অপচয়ের দো নেই।

পল্লীভবনে মনের উড়বার অবকাশ যথেষ্ট। এখানে উড়ন্ত পাখা গুটিয়ে রাখার আরাম।

সুপ্রকাশের ভালো লাগল।

প্রথমেই বসবার ঘর। তার পরের ঘরটিই ওদের পড়বার ঘর। ওরা সেইখানে সুপ্রকাশকে বসালে।

বই-খাতা নিজের নিজের টেবিলের উপর রেখে অসীমা বললে, তুই হাত-মুখ ধুয়ে আয়। আমি পাহারা দিচ্ছি। তুই এলে আমি যাব।

সুবর্ণ বললে, ভালো বুদ্ধি করেছিস। লোক সুবিধের নয়। স্যুট করে পালাবেন হয় তো।

অত্যন্ত সুপ্রতিভ মিতকে মেয়ে।

সুপ্রকাশ হেসে বললে, কিছু ভয় নেই। মাসীমার জিম্মায় রয়েছি, সাধ্য কি পালাই।

—তবু সাবধানের মার নেই।

বলতে বলতে সুবর্ণ হাত-মুখ ধুতে চলে গেল।

সুপ্রকাশ একটু হেসে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

—কি ভাবছ?—অসীমা জিজ্ঞাসা করলে।

—ভাবছি, সংসারে কত আশ্চর্য জিনিসই না ঘটে।

—কেন?

সুপ্রকাশ বললে, একদিন এক মুহূর্তের ছাড়াছাড়ি সইতে পারতাম না। আর একদিন কথা বলতে গেলে তুমি পাশের গলিতে পালাতে, অন্য একদিন রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এলে!

অসীমা অপরাধীর মতো মুখ নামালে। ধীরে ধীরে বললে, কেন জানি না, কি রকম লজ্জা করত।

—বোধ হয় লজ্জা কি তা জানতে না বলেই লজ্জা করত। না?

অসীমা হেসে ফেললে: হবে।

সুপ্রকাশ বললে, কলকাতায় প্রথম যখন এলাম, চেনা-জানা কেউ নেই। ভারী ইচ্ছে করত এখানে আসবার।

—আসতে না কেন?

—ভয়ে। যদি তুমি কথা না বল।

অসীমা চুপ করে রইল।

সুপ্রকাশ বললে, ছেলে দুজনের কথা মনে হত। মায়ের কথাই বেশি। তোমার কথাও।

—বাজে কথা বোলো না।

—বাজে কথা আমি বলি না, জান তো।

তার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য কোমল এবং গম্ভীর। অসীমা অবাক হয়ে ওর দিকে চাইলে। এই কণ্ঠস্বর তার মনের অপরিজ্ঞাত একটা পর্দায় অত্যন্ত স্পষ্ট একটি সুর তুললে।

নিরুপমা এলেন। অসীমাকে ধমক দিলেন, তুই এখনও হাত-মুখ ধুসনি?

অসীমা বললে, আমি যে পাহারা দিচ্ছি!

—কাকে?

—সুপ্রভাকে।

নিরুপমা হেসে ফেললেন, আর পালারা দিতে হবে না, যা। তোদের তিনজনকে একসঙ্গে খাবার রোধ।

নিরুপমার বাড়াবাড়ি নেই। সেটা তাঁর আন্তরিকতার পরিচয়। সুপ্রকাশের তারী ভালো লাগল।

যাবার সময় অসীমা বললে, সুপুদা, তুমি তো বাজে কথা বল না।

—না। কেন?

—তাহলে সেই কথাটা বলে যাও।

—কি কথা?

—যে পরশু, রবিবার, আবার আসবে।

—আচ্ছা।

সুপ্রকাশ হাসতে হাসতে চলে গেল।

॥ আট ॥

মেয়েদের সঙ্গে সুপ্রকাশ গল্প করতে ভালো পারে না। কিছুটা তার অনভ্যাসের জন্যে। মেয়েদের সঙ্গে গল্প করার সুযোগ ঘটেনি। কিছুটা সে কথাই বেশি বলতে পারে না। পুরুষ-বন্ধু মহলে আড্ডা জমে, কিন্তু তার গুণে নয়, অন্যদের গুণে। বেশির ভাগ সময় সে শোনে; মাঝে মাঝে ফোড়ন কাটে। সবাই তাই নিয়ে যখন উত্তেজিত হয়, তর্ক তুমুল বাধে, সে চুপ করে যায়। কোনো কোনো সময় প্রবল উত্তেজনার মুহূর্তে অন্যেরা হঠাৎ লক্ষ্য করে সুপ্রকাশ সরে পড়েছে!

সুপরিষ্কার তর্কে অনেক সময় বিষয়টা পরিষ্কার হয়। কিন্তু, বিষ্ণুপদর মতে, সাধারণত যাকে তর্ক বলে, এলোমেলো তর্ক, তাতে বিষয়ের জটিলতাই বাড়ে।

সুপ্রকাশ পারতপক্ষে তর্ক এড়িয়েই চলে।

কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে গল্প তারও চেয়ে কঠিন জিনিস, এই সত্য সুপ্রকাশ উপলব্ধি করলে অসীমাদের সঙ্গে কয়েকদিন মেশবার পরেই।

ওদের পৃথিবী আলাদা। চিন্তা স্বতন্ত্র, ভাষাও স্বতন্ত্র। তার সঙ্গে সুপ্রকাশের পরিচয় নেই। কিসে ওরা খুশি হয়, কেন রাগে, তার জানা নেই। তবু ওদের হাসি ভালো লাগে, এমন কি রাগও। বোধ করি সেই কারণেই ছেলেদের তর্কের মাঝখানে চুপি চুপি সরে পড়ে, এখানে তা করে না। অপ্রতিভ হয়, কিন্তু পালায় না। অপেক্ষা করে।

তার চেয়ে বেশি আরাম পায় সে অসীমার মাসীমার সঙ্গে গল্প করে। মায়ের সঙ্গে গল্প করার অভ্যাস আছে। সে ভাষা জানা, সে চিন্তা পরিচিত।

বস্তুত অনেক সময় তার মনে হয়, মা এবং মেয়ে, এই এক পুরুষের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি,

যাকে ঠিক স্বাভাবিক বলা চলে না। যুগধর্ম এই একটা পুরুষের মধ্যে দুই পুরুষের মতো ব্যবধান গড়ে উঠেছে। বোধ করি শিক্ষার প্রসারের ফল।

এই নিয়েই একদিন তর্ক বেধে উঠল।

সুপ্রকাশ বললে, তোমাদের আমি বুঝতে পারি না।

ওরা বললে, কেন? কোথায় দুর্বোধ্যতা?

—মা-কাকীমা-মাসীমাদের মতো তোমরা নও।

—কেন, তফাত কোথায় দেখিয়ে দাও।

দেখিয়ে দেওয়া কঠিন। সুপ্রকাশ বিব্রতভাবে অন্যদিকে গেল। বললে, কবি বলেছেন: 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা'। সেকালে মেয়েরা তাই ছিল।

—এখনকার মেয়েরা কি হয়েছে?

ওদের চোখে কৌতুক। পুরুষের চোখে মেয়েরা কি, তা জানতে সকল মেয়েই উৎসুক।

বিব্রতভাবে আবার কিছুক্ষণ সুপ্রকাশ ভাবলে। তারপর বললে, বোধ হয় স্পষ্টই হয়েছে। কল্পনার অবকাশ কমেছে।

ওরা খিলখিল করে হেসে উঠল: তাতে বোঝাবার অসুবিধাটা কি হল?

—অনেক। জানো, স্পষ্ট জিনিসের চেয়ে দুর্বোধ্য আর কিছুই নয়।

ওরা হেসে গড়িয়ে পড়বার মতো হল: সুপুদা, তুমি অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বল।

অদ্ভুত কিছুই নয়। সুপ্রকাশ বোঝাতে চেষ্টা করল। পুরুষের কল্পনায় নারী একটা রহস্যময় রূপ পেয়েছিল। সব সময় মন্থিত রহস্য-সমুদ্র থেকে লক্ষ্মীর মতো সে নতুন করে উঠছে। তার এক হাতে সুধাভাণ্ড, অন্য হাতে কি-যেন-একটা। এখন মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখছে। কিছুটা পুরুষালি ভাব পাচ্ছে। রহস্যের আবরণ যাচ্ছে ছিঁড়ে। কবিদের আঁকা নারীর সঙ্গে তোমাদের মিল খুঁজে পাচ্ছি না। চিনতে কষ্ট হচ্ছে। অথচ, আশ্চর্য, আগের চেয়ে অনেক কাছে এসেছে।

সুবর্ণ হেসে উঠল: কাছের মানুষকে চিনতে কষ্ট হলে দোষ মেয়েদের নয়, পুরুষের চোখের।

সুপ্রকাশ অস্বীকার করলে না। তাও হতে পারে। দোষ যে পক্ষেই হোক, চেনার অসুবিধা হচ্ছে।

—কি হয়েছে? কি হয়েছে?

ওদের চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে নিরুপমা ছুটে এলেন।

সুবর্ণ তাড়াতাড়ি বললে, কিছুই হয়নি মা। সুপুদা আবার চা চাইছেন।

—আবার মানে কি? একবার কি চা দিয়েছিস?

—আমরা দিইনি, উনি হস্টেল থেকে খেয়ে এসেছেন। বলছিলাম, বেশি চা খাওয়া ভালো নয়।

স্বামীর হেসে ফেললেন, বললেন, তা হোক, আর একটু চা দাও। তোমাকে আর পণ্ডিতি করতে হবে না।

ভারী সরল মানুষ নিরুপমা।

হেরফের বোঝেন না, সাতে-পাঁচেও থাকেন না। সকাল-সন্ধ্যা সংসারের কাজকর্ম নিয়ে থাকেন। ঠাকুর রাখার পয়সা আছে। কিন্তু স্বামী-পুত্রের আহারাদি ঠাকুরের হাতে ছেড়ে দিতে ভরসা পান না। সকলের আপত্তি সত্ত্বেও রান্নাটা নিজের হাতেই রেখেছেন।

নেশার মধ্যে পান-দোক্তা, বই আর সিনেমা।

পান-দোক্তা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বোধ হয় চলে। দুপুর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে উঠে পান তৈরী করে খাবেন। আর উপন্যাস,—ডিটেক্টিভ হলেই ভালো হয়,—ছাপার হরফে যে-কোনো উপন্যাস দুপুরে শোবার সময় চাই-ই। নইলে ঘুম আসবে না।

বিকেলে সিনেমা। পৌরাণিক হলে তো দেখতেই হবে। ধর্ম-কর্মের বই সিনি-বায়িষের না দেখলে চলে না। অন্য বই হলেও দেখতে হবে। আজকালকার দিনে আজকালকার বই না দেখলে পিছিয়ে পড়ে থাকতে হবে। যখনকার যা।

নিয়ে যাবার লোকের জন্যে মাঝে মাঝে অসুবিধায় পড়েন। সম্প্রতি সুপ্রকাশকে পেয়ে সেই অসুবিধা অনেকখানি দূর হয়েছে। নিরীহ ছেলে সুপ্রকাশ, তার উপর নতুন পরিচয়। ইচ্ছা না থাকলেও না বলতে পারে না।

সেই টিকিট কাটে, সেই ওদের তিনজনকে নিয়ে যায়, নিয়ে আসে। প্রতি শনিবার, নয়তো রবিবার।

নিরুপমা হাসতে হাসতে যান, কাঁদতে কাঁদতে ফেরেন। দুঃখের গল্প তিনি মোটে সহ্য করতে পারেন না। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে আরম্ভ করেন। অল্পতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যান। আঁচলে চোখ মোছেন আর দেখেন। অথচ দুঃখের গল্পই তাঁর সবচেয়ে প্রিয়।

ফিরে এসে সুপ্রকাশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা: অমন ছেলে হয় না। হীরের টুকরো ছেলে! অনেক তপস্যা করলে তবে এমন ছেলে পাওয়া যায়। যেমন রূপ, তেমনি গুণ।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের মেয়ে দুটোর নিন্দা: আর আমার এই বাঁদরী দুটো, হাসে! আ মোলো, হাসিস কি? অমন দুঃখের 'সিনে' হাসি! মায়া-দয়তা বলে কি কিছু আছে?

ওরা দুটিতে তথাপি হাসে: আর তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না মা। ফোঁস ফোঁস কান্নার শব্দে কিছু কি শোনা যায়! তোমার ওই হীরের টুকরো ছেলের সঙ্গে যেও। আমরা আর নয়।

নিরুপমা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন: নিয়ে গেলে তো যাবি! তোদের নিয়ে যাওয়া মানে পয়সা নষ্ট।

তারপরেও ওদের নিয়ে যান। আবার কান্নার জায়গায় ওরা হাসে। আবারও বকুনি খায়।

—জানলে বাবা সুপ্রকাশ, এখনকার মেয়েদের মায়া-মমতা বলে কিছু নেই। ছেলেদের মতো নিষ্ঠুর হচ্ছে।

সুপ্রকাশ উৎসাহিত হয়ে বললে, সেই তর্কই সেদিন হচ্ছিল মাসীমা। ওরা কিছুতে স্বীকার করবে না, ওরা বদলে যাচ্ছে। ওরা আপনাদের মতো নয়।

নায়িকার দুঃখে নিরুপমার বিগলিত ভাব তখনও যায়নি।

বললেন, নয়ই তো। ওরা আমাদের পায়ের নখের যুগ্যি নয়। না জানে রান্না-বাড়া, না জানে ভাই-বোনের যত্ন!

ওরা ঝঙ্কার দিলে: রান্না-বাড়া জানি না?

—না।

—ভাই-বোনের যত্ন করি না?

—ছাই করিস! কেঁদে মরে গেলেও ফিরে চাস না।

—সিনেমার পাত্র-পাত্রী কি ভাই-বোন, যে তারা কাঁদলে ফিরে চাইব?

—ওরে, সব মানুষই ভাই-বোন। যে ভাই-বোনের জন্যে কাঁদে, সেই পরের জন্যে কাঁদতে পারে। জানিস?

সুপ্রকাশ সায় দিলে: ঠিক বলেছেন।

—মরে গেছে পরের জন্যে কাঁদতে, তাতে যা বল, তাই বল। আর সুপুদা যতই ফোড়ন কাটুন!

সুপ্রকাশ বললে, দেখছেন মাসীমা! বলছে আমি ফোড়ন কাটছি!

মাসীমার রাগ তখনও থামেনি। বললেন, ওই রকম ওদের কথার ছিরি! লেখাপড়া শিখছে, না ছাই শিখছে।

ওরা তার রাগ থামাবার জন্যে বললে, তুমি বোটানিক্সে যাবে বলেছিলে। সুপুদাকে বল না মা!

—না। তোমাদের নিয়ে আমি কোথাও যাব না।

সুপ্রকাশও সায় দিলে, না। নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

অসীমা বললে, বলছ বটে, কিন্তু যখন মাংস রেঁধে খাওয়াব, বলবে ভাগ্যিস ওদের নিয়ে এসেছিলাম।

এবার রাগতে গিয়েও নিরুপমা হেসে ফেললেন। বললেন, যা বলেছিস। তোদের রান্না খেলে তাই মনে হয় বটে! তুমি ভয় পেও না বাবা। ওদের আমি হাঁড়ি ছুঁতে দোব! তবে সেই কথাই রইল, সামনের রবিবারে বটানিক্সে।

হুকুম পেলে নিরুপমা সব ভুলে যান।

কিন্তু সে যাই হোক, সুপ্রকাশকে নিরুপমার বড্ড ভালো লেগেছে, এবং সেই কথা একদিন রাত্রে চুপি চুপি স্বামীর কাছে প্রকাশ করলে।

বললেন, আমি একটা কথা ভাবছি।

—সিনেমা?—বনমালীবাবু নিরীহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

—না, না।

—বই?

নিরুপমা বিরক্তভাবে বললেন, আঃ! বই হবে কেন?

—তবে এত রাত্রে আর কি হুজুগের কথা ভাবতে পারো?

নিরুপমা রেগে গেলেন: আমি তো দিনরাত্রি হুজুগের কথাই ভাবি: সিনেমা আর থিয়েটার আর বই!

—আর জর্দার কথাও মাঝে মাঝে ভাব অবিশ্যি। আজ ওই দিক দিয়েই ফিরেছি। কিন্তু যে-দোকান থেকে আনি সেটা আজ বন্ধ।

এবার নিরুপমা ভীষণ রেগে গেলেন। কিন্তু বিষয়টা এমন গুরুতর যে রাগ সম্বরণ করলেন।

গম্ভীরভাবে বললেন, দেখ আমাকে রাগিও না। আমি কাজের কথা বলতে এলাম, আর তুমি—

বনমালী ভালো করে উঠে বসলেন: কাজের কথা! কি আশ্চর্য! বল বল। অনেকদিন তোমার মুখ থেকে কাজের কথা শুনিনি।

নিরুপমার হাসি এসেছিল। কিন্তু বিষয়টি এমনই গুরুতর যে তাও চেপে গেলেন।

বললেন, তুমি সুপ্রকাশকে জান?

—কে সুপ্রকাশ?

এতদিন সুপ্রকাশ এবাড়ী আসা-যাওয়া করছে, কিন্তু কোনোদিন এঁর চোখে পড়েনি।

—আমাদের হৃষিকেশবাবুর ছেলে গো!

হৃষিকেশবাবুকে বনমালীবাবু চেনেন। দেবীপুরে কয়েকবারই দেখেছেন। কিন্তু 'আমাদের হৃষিকেশবাবু' বলতে নিরুপমা যে তাঁকেই বোঝাচ্ছেন, বুঝতে পারলেন না।

—কোন্ হৃষিকেশবাবু?

—আহা, আমাদের ঘূর্জটিবাবুর দাদা গো! চেন না তাঁকে?

বিলক্ষণ চিনি। ও-রকম দাঙ্গাবাজ কূটচক্রী লোক কচিৎ দেখা যায়। ঘূর্জটিকে হয় নিতে দিচ্ছে

সেদিন চর নিয়ে একটা খুনোখুনি হল, আবার শুনছি—

বাধা দিয়ে নিরুপমা বললেন, আহা, তার জন্য লোক খারাপ হতে যাবে কেন? বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে জাতিতে-জাতিতে ওরকম হয়। সেকথা নয়

—তবে?

—ওঁর একমাত্র ছেলে, তার নাম সুপ্রকাশ।

—বেশ।

—ছেলেটি বি. এ. পড়ছে আই. এ. তে জলপানি পেয়েছে। খুব ভালো ছেলে। বাপের অঢেল টাকা। দেখতেও চমৎকার।

বনমালী বিস্মিতভাবে বললেন, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ?

চোখ মটকে নিরুপমা বললেন, সম্পর্ক নেই, কিন্তু হলে ভালো হয় না ?

বনমালীর বিস্ময় তখনও কাটেনি। বললেন, কি করে ?

—মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে।

—তিনি দেবেন কেন ?

—না দেবার কি আছে ? আমরা পালটি ঘর, মেয়েও দেখতে অপরূপ সুন্দরী না হলেও সুন্দরীই বলতে হবে, দেওয়া-থোয়াও মন্দ করব না। তাছাড়া—

এবারে নিরুপমা স্বর নিচু করলেন : তাছাড়া সুপ্রকাশেরও বোধ হয় অমত হবে না।

বনমালী হেসে উঠলেন : কি করে জানলে।

নিরুপমা আবার চোখ মটকালেন : জানি।

—আহা, কি করে জানলে তাই জিজ্ঞাসা করছি।

ধমক খেয়ে ভদ্রমহিলা বিব্রত হয়ে উঠলেন : অসীমাকে দেখতে সে তো এ বাড়ি প্রায়ই আসে।

—অসীমাকে দেখতে ! ওদের মধ্যে মামলা চলছে না ?

—আহা, বাপে-বাপে মামলা তা ওদের কি ?

—হুঁ।

বনমালী ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

নিরুপমা বললেন, তা ছাড়া তোমাতে আর অম্বিকেশবাবুতে যেমন সম্পর্ক, ওদের তেমন নয়। দুজনে ভাই-বোনের মতো কী ভাব ! দু'দিন সুপ্রকাশ না এলে অসীমা ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

—হুঁ।

—হুঁ কি ?

—পাত্র সব দিক দিয়েই ভালো। কিন্তু—

বনমালী চুপ করলেন। বোধ হয় বিষয়টির অন্যদিক অনুধাবন করার জন্য।

—কিন্তু ?

—ভাবছি ধূর্জটি রাজি হবে কি না।

কাঁধের সঙ্গে নিরুপমা বললেন, আমাদের মেয়ের বিয়ে দোব তাতে তাঁর রাজী না হওয়ার কি আছে ?

নিরুপমা ভীষণ ঝুঁকেছেন।

বনমালীরও মন লোভাতুর। বললেন, সে তো বটেই।

॥ নয় ॥

অনেকদিন সুপ্রকাশ কংগ্রেস অফিসে যায়নি। বিকুপদর সঙ্গেও দেখা নেই। এবারে তার এম. এ. দেবার বৎসর। তাই নিশ্চে সে সে ব্যস্ত আছে এমন মনে করার কারণ নেই। আসলে তার বিবেক এবং সন্ধ্যা অসীমারাই দখল করে ফেলেছে বিশেষ করে। কিন্তু তা তো আর বিকুপদকে বলা যায় না।

এতদিন সুপ্রকাশ বিকুপদর খবর নেয়নি মনে করে সুপ্রকাশ লজ্জা পেলে। স্থির করলে সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে আজ বিকেলে বিকুপদর হস্টেলে যেতেই হবে।

তাই বেরুল। কিন্তু বিকুপদর হস্টেলের রুম পর্যন্ত আর যেতে হল না, হস্টেলের প্রবেশপথেই দুজনে

বিকুপদ বোধ হয় কোথাও বার হচ্ছিল। গায়ে ঘিয়ে রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি। কাঁধে ঝুলি।

বিকুপদ সুপ্রকাশকে জড়িয়ে ধরল: কি আশ্চর্য! সুপ্রকাশ যে! ভেবেছিলাম, আমার হস্টেলের রাস্তা বুঝি ভুলেই গেলে!

উত্তর সুপ্রকাশের মুখে তৈরিই ছিল।

বললে, তার যো কি দাদা! রোজই ভাবতাম একদিন আসি। কিন্তু আপনি পরীক্ষার পড়া তৈরি নিয়ে ব্যস্ত। বিরক্ত করা ঠিক হবে না ভেবে আসতে পারছিলাম না।

—পরীক্ষা!—বিকুপদ যেন আকাশ থেকে পড়ল!—পরীক্ষা তো এবার দিচ্ছি না।

—সেকি!

—না, দিচ্ছি না। প্রথমত পড়া একেবারেই তৈরি হয়নি। কিন্তু সেজন্যে ঠিক নয়। কবে আর পড়া তৈরি করে পরীক্ষা দিয়েছি! ব্যাপার আসলে দামোদরের বন্যা।

—বন্যা! তার সঙ্গে পরীক্ষার কি?

—তার সঙ্গেই তো সব। বর্ধমানের এক গ্রামে এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে থেকে কলকাতায় পরীক্ষা দেওয়া যায়?

—না, তা যায় না।—সুপ্রকাশ হাসলে।—আপনি কি বন্যাত্রাণে যাচ্ছেন নাকি?

—যাচ্ছি মানে? এক প্রস্থ ঘুরে আসা হয়ে গেল! মানুষের কি দুঃখ যে দেখে এলাম সুপ্রকাশ! চল, পার্কে বসিগে।

পার্কে বসে বিকুপদ মানুষের দুঃখের কথা বলতে লাগল:

চারিদিকে থৈ থৈ করছে লাল জল। গ্রামের কোনো চিহ্ন নেই। এক-আধটা দালান-বাড়ির ছাদটুকু চিক চিক করছে কোথাও। সেখান থেকে কিছু লোক সাদা কাপড় উড়িয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের আকুল চেষ্টা করছে। উঁচু উঁচু বটগাছের মাথাটা জেগে আছে। সেখানেও কতক মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। তাদেরও সেই একই চেষ্টা। দু'তিন দিন ধরে তারা অনাহারে, অনিদ্রায়, রোদ-বৃষ্টি তুচ্ছ করে ওই সব জায়গায় বসে। বাচ্চা-কাচ্চাও আছে। দুটো তিনটে পরিবার।

স্রোতে ভেসে যাচ্ছে মানুষ গরু-মহিষ। খড়ের চালে ঘেঁষাঘেঁষি করে ভেসে চলেছে সাপে-

মানুষে। বিষধর সাপ। কেউ কারও অনিষ্ট করার কথা চিন্তাও করছে না। সকলেই প্রাণরক্ষার দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত। সাধারণ বিপদ শত্রুর মধ্যেও ঐক্য আনে।

সার বেঁধে ভেসে চলেছে মড়া। বিপন্ন চতুষ্পদ সবই আছে।

সুপ্রকাশ স্তব্ধশ্বাসে শুনে যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলে, অনেক মানুষ মারা গেছে, না?

—না। খুব অনেক নয়। এইটেই আশ্চর্য সুপ্রকাশ, মানুষ সহজে মরে না! কি করে যেন বেঁচে যায়।

বিকুপদ হাসলেন।

বললে, যুদ্ধে, মহামারীতে, রাষ্ট্র-বিপ্লবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, দেখা গেছে, যত মানুষের মরার কথা সে তুলনায় খুবই কম মরে। বাইরে থেকে দুঃসংবাদের ভয়াবহতায় মনে হয়, অল্প কয়েকজন ছাড়া আর সবই বুঝি গেছে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, অল্প কয়েকজনই গেছে, বাকি সবাই বেঁচে রয়েছে!

বললে, গ্রামের মধ্যে গেলাম। বন্যার জল চলে গেছে, কিন্তু গ্রামে ঢোকবার পথ নেই। দু'পাশের মাটির ঘর পড়ে রাস্তা বন্ধ। লোকেরা পুকুরের উঁচু পাড়ে দুদিন কাটিয়ে গ্রামে ফিরেছে, কিন্তু কোনটা কার বাড়ি চিনতে পারছে না। মাটির নিচে চাপা মরা ছুঁচো-বেরাল-ইঁদুরের গন্ধে টেকা যায় না। কিছু চাল-চিঁড়ে-আটা বিতরণ করে রাত্রে আর ফিরতে পারলাম না। স্কুল বাড়িতে খাটিয়া পেতে দিলে বাইরে। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনি ওদিকে কারা যেন পরমানন্দে ডুবকি বাজিয়ে গান জুড়ে দিয়েছে!

বিকুপদ হাসলে: মানুষ কি বিচিত্র! হিসেবের মধ্যে তাকে পাওয়া যায় না।

সুপ্রকাশ একাগ্রচিত্তে শুনে যাচ্ছিল। হাসছিল না। তার চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছিল ছবির পর ছবি,—কোথাও করুণের মধ্যে হাস্যকর, কোথাও হাসির মধ্যে করুণ।

জিজ্ঞাসা করলে, আবার কবে যাচ্ছেন?

—কবে কি? কালকেই। তুমি দেখছ না?

—যাব।

বিকুপদ খুবই খুশি হল। সুপ্রকাশের আশা সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। এখন ভরসা হল, সে হারায়নি, আছে। দরকারের সময় তাকে ঠিক পাওয়া যাবে।

বললে, সকাল সাতটা বারোর ট্রেন। তুমি ঠিক ছ'টায় আমার হস্টেলে আসবে। ওখান থেকে দু'জনে বেরিয়ে যাব। অসুবিধা হবে?

—না, কিছুমাত্র না। আমি তো ভোরেই উঠি।

অন্যমনস্কভাবে সুপ্রকাশ উত্তর দিলে।

অথচ অসুবিধা একটু ছিল।

সামনের রবিবার, অর্থাৎ দুটো দিন পরেই, মাসীমা ও অসীমাদের নিয়ে বোটানিকাল গার্ডেনে

যাবার কথা। সুপ্রকাশ কথা দিয়েছে। আশা অবশ্য সুরে নয় যে, একটা সুযোগ হারালে আর একটা পাওয়া দুর্ঘট। বন্যাত্রাণ থেকে ফিরে এসে সুপ্রকাশ স্বচ্ছন্দে ওদের আর একদিন নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু তা নয়।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে। বাড়ির বাইরে কোথাও গিয়ে একটু আনন্দ করা, এবং এদিক দিয়ে নিরুপমা মেয়েদের চেয়ে কম যান না। এর মধ্যে কর্মতালিকা হয়তো ঠিক হয়ে গেছে। কখন যাবে, কখন ফিরবে, কি খাওয়া হবে, সবকিছু।

বনমালী হয়তো সেইদিনের সমস্ত কাজ বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি ওদের সঙ্গে যাবেন না নিশ্চয়ই, কিন্তু গাড়িখানা তো সমস্ত দিনের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে।

স্কুল থেকে ফিরে নিরুপমাকে নিয়েই প্রত্যহ হয়তো গবেষণা চলছে। নিত্য নূতন নূতন কর্ম হচ্ছে আর কাটা যাচ্ছে। মনঃপূত না হলেই নিরুপমা রেগে যাচ্ছেন। বটানিক্স্ যাওয়া ভেঙে যাচ্ছে। ওরা আবার খানিকটা তোয়াজ করে ওঁকে টেনে আনছে।

কিন্তু ভয় ওর নিরুপমা নয়। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও মুখে তিনি কিছু বলতেন না। বরং বন্যার মানুষের দুঃখের কথা শুনে কষ্ট পাবেন। খুব নরম মন ভদ্রমহিলার। হয়তো সুপ্রকাশের শরীরের জন্যে খানিকটা উদ্বেগ প্রকাশ করবেন। একটু ভিরস্কারও করতে পারেন। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তার বেশি কিছু করবেন না।

ভয় তার মেয়ে দুটোকে। এত বড় একটা আনন্দানুষ্ঠান অকস্মাৎ পণ্ড হওয়ায় ওরা যা রাগবে তা আর বলবার নয়। তার পিছনে বিছুটির মতো লাগবে। তাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে।

কিন্তু কি আর করা যায়?

বিকুপদকে কথা দেওয়া হয়ে গেছে। তা আর ফেরান যাবে না। কিন্তু শুধু কথা দেওয়ার জন্যেই নয়। বর্ধমানের বন্যা প্লাবিত গ্রামগুলি, তার ভেসে-যাওয়া মানুষ, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন তাদের দুর্দশার দিনগুলি তাকে ডাকছে। অমোঘ সে ডাক। পড়ার ক্ষতি করে দেশের কাজে আর নামবে না বলে যত প্রতিজ্ঞাই করে থাক, বিকুপদর মুখে বন্যাপীড়িতদের দুর্দশার বর্ণনা শুনতে শুনতেই তার চক্ষুকে পিঠ সুরসুর করে উঠেছে। সেখানে না গিয়ে সে পারে?

উচিত ছিল অসীমাদের বাড়ি গিয়ে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে ছুটি নিয়ে আসা। হাতে সেটুকু সময় ছিল। কিন্তু সাহস করলে না। জানে, মেয়ে দুটোকে অন্ততঃ কেউ বোঝাতে পারবে না। নিরুপমা হয়তো কিছুই বলতেন না, মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হতেন। কি হয়তো অত বড় বিপদের মুখে যাওয়া নিয়ে আপত্তিও করতে পারতেন। সেটা তাঁকে ধীরে-সুস্থে বোঝানও চলত।

কিন্তু অসীমারা বোঝবার দিক দিয়েও যেত না। রেগে, কেঁদে, চীৎকার করে তারা অনর্থ বাধাত। সে তোড় সামলানো সুপ্রকাশের পক্ষে অসম্ভব হত।

তার চেয়ে চিঠি দেওয়া ভালো।

সুপ্রকাশ তাই করলে। তার কাছে পোস্টকার্ড ছিল। তাইতে বন্যার কথা এবং সেখানে তার যাওয়া বিশেষ দরকার, কয়েক লাইনে এই কথাটা জানিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এল।

কাল দুপুর নাগাদ চিঠিখানা ওদের কাছে পৌঁছে যাবে আশা করা যায়।

কল্পনা করতে পারে, চিঠি পেয়ে অসীমাদের অবস্থা কি হবে। হাতের কাছে সুপ্রকাশকে না পেয়ে নিষ্ফল রোষে কি যে তারা করবে ভেবে পাবে না। নিরুপমা তাদের মতো চীৎকার না করলেও আপন মনে গজগজ করতে ছাড়বেন না।

এর ওপর টিননী আছে বনমালীবাবুর। আনন্দোৎসব পণ্ড হওয়ার জন্যে একমাত্র তিনিই খুশি হবেন। তার ফলে ওদের ক্রোধে ঘৃতাহুতি পড়বে। ওরা আরও চেঁচাবে এবং আরও রাগারাগি করবে।

কিন্তু সুপ্রকাশ তখন বর্ধমানের কোনো এক নাম-না-জানা গ্রামের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বন্যার তাণ্ডব দেখছে হয়তো।

তাই বটে।

ওরা বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছুল একটার পরে। সেখানে বিশ্রামেরও অবসর মেলে না। কোনোমতে চা-পান করে চাল, আটা, গুঁড়ো দুধ, কিছু পুরোনো কাপড়-জামা প্রভৃতি নিয়ে দুখানা নৌকায় করে বেরিয়ে পড়ল সেবা-কেন্দ্রে।

সেই গ্রামের নামও সুপ্রকাশ কখনও শোনেনি। সে যে কোথায়, কত দূরে, কোনদিকে তাও জানে না। তার মতো অনেকেই জানে না, যারা বাইরের ছেলে।

নৌকা চলে।

বিকুপদ এক সময় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, সাঁতার জান তো সুপ্রকাশ? কথাটা জিগ্যেস করা হয়নি।

—জানি।—সুপ্রকাশ হাসলে।—কিন্তু নৌকো যদি ডোবে, কত সাঁতার কেটে, কোনদিকে কোথায় গিয়ে ডাঙা পাওয়া যাবে, সেটা জানা নেই।

কথাটা সত্য। চারিদিকে শুধু ঘোলা জল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। দু-একটা গাছের ডগা, দালানবাড়ির চূড়া ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। সেও বহু দূরে দূরে।

বিকুপদ বললে, সাঁতার জানা থাকলে বুকে বল থাকে। আর কিছু জানবার দরকার হয় না। ভাসতে ভাসতে যেখানে হোক এক জায়গায় ঠেকে যাবে।

—যদি ইতিমধ্যে কুমীরে না গিলে নেয়।

—কুমীর!—বিকুপদ চমকে উঠল। এদিকে কুমীর আছে নাকি?

—জানি না। জলে কুমীর তো থাকে।

সুপ্রকাশ নিস্পৃহভাবে উত্তর দিলে।

বিষ্ণুপদ বললে, না। কুমীর বোধহয় নেই। কাউকে কুমীরে খেয়েছে বলে শোনা যায়নি।

সুপ্রকাশ হেসে ফেললে: শুনবেন কোত্থেকে? যাকে খেয়েছে সে কি আর বলে যাবার সময় পেয়েছে?

বিষ্ণুপদ হাসলে: না। কুমীর থাকলে তারাও এই তোড়ের মুখে মানুষের মতো বিপন্ন। সবাই আশ্রয় খুঁজছে।

—সেই সঙ্গে আহারও।

বিষ্ণুপদ বললে, না, কুমীর নেই। আসল বিপদ কোথায় জান?

—জানি। সর্বত্র।

বিষ্ণুপদ আবারও হাসলে: আসল বিপদ হচ্ছে, নদীর খাতে গিয়ে পড়লে আর রক্ষা নেই। নৌকোও সেখানে পড়লে বেসামাল হয়ে যাবে।

নদীর খাত! এটা কি?

—এটা চাষের মাঠ। ধানের জলে ডুবে আছে। নদীর খাত অনেক দূরে।

মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলে, এখানে কত জল মাঝি?

—জল কমে এসেছে বাবু। এখন তিন চার হাতের বেশি হবে। মধ্যেখানে একটা পুকুর পার হয়ে এলাম। সেখানে হাতদশেক জল ছিল।

মাত্র তিন চার হাত জল এখানে! অথচ হাওয়া দিচ্ছে, তুফান উঠছে। ঢেউ এসে ধাক্কা দিচ্ছে নৌকার গায়ে। শব্দ হচ্ছে ছলাৎছল। দুলছে নৌকা! কী ভয়ঙ্কর জলের চেহারা! দেখে মনে হয়, কত বুঝি জল! ভয় করে।

সুপ্রকাশ ভাবছিল।

বিষ্ণুপদ জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছ?

বিহ্বল দৃষ্টি মেলে মুহূর্তকাল সুপ্রকাশ ওর দিকে চেয়ে রইল।

বললে, ভয়ঙ্করেরও একটা সৌন্দর্য আছে। তা দুঃসাহসিকে দুর্গমের পথে ফসলে নিয়ে যায়। না?

—হ্যাঁ।

সকলের আঁচলে মুড়ি বাঁধা। শহরে তাড়াতাড়ির মুখে খাওয়ার সময় পায়নি। এখন এক মুঠো করে মুখে দিচ্ছে আর চিবুচ্ছে।

বিষ্ণুপদ বললে, ওই দেখ একটা গ্রামে এসে গেছি।

'জল, শুধু জল, দেখে দেখে চিত্ত মোর হয়েছে ব্যাকুল'।

এরই মধ্যে ডাঙার জন্যে সুপ্রকাশের মনও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। উৎসাহের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, গ্রাম? কই গ্রাম?

—ওই তো। দেখছ না, বহু লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বহু লোক দেখা যায় বটে। কেউ কেউ কাপড় ওড়াচ্ছে। উৎসাহের আধিক্যে কেউ বা এক হাঁটু জলেই নেমে পড়েছে।

—কি ব্যাপার! ওরা কি করছে?

—আমাদের নৌকার অপেক্ষা করছে। চাল পাবে, আটা পাবে, গুঁড়ো দুধ পাবে, কিছু পুরোনো কাপড়-চোপড়ও পাবে।

সুপ্রকাশ তথাকথিত গ্রামখানির দিকে চাইলে।

একখানি ঘরও দাঁড়িয়ে নেই। তেঁতুলগাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় শুধু উঁচু নীচু মাটির স্তূপ।

জিজ্ঞাসা করলে, ঐখানেই ওরা থাকে?

—কি করবে? মেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছে অন্য জায়গায়। বিভিন্ন সেবাকেন্দ্র থেকে যা পায় তাই খায় গাছতলায় রেঁধে।

—এখানে আছে কেন?

—সে একটা প্রশ্ন। প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু ছিল। টাকা-কড়ি, গয়না-গাঁটি, কাপড়-চোপড়, থালা-বাসন, কিছুই তো নিয়ে যেতে পারেনি। সবই মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে। এখন সেগুলো বার করছে, আর যা বার করতে পারেনি তা পাহারা দিচ্ছে।

সুপ্রকাশ শুনতে লাগল।

বিষ্ণুপদ বললে, এই গাঁয়ে একটা তেঁতুল গাছের ডালে একটা আশি বছরের থুনথুনে বুড়ো আর একটা ছ'মাসের ছেলে দু'রাত্রি কাটিয়েছে।

—কি রকম?

—বান যখন আসছে তখন একদল নিরাপদ জায়গার সন্ধানে মেয়েদের নিয়ে ছুটল। কিন্তু ওই দুজনকে নিয়ে দূরপাল্লার যাওয়া অসম্ভব বুঝে কয়েকজন ছোকরা তেঁতুল গাছের ডালে তক্তা দিয়ে মাচা করে ওদের দুটোকে তুলে দিয়ে পালাল। দুরাত্রি না-খাওয়া না-ঘাওয়া দুটিতে ঐখানেই কাটিয়েছে।

—আশ্চর্য!

—আশ্চর্য, মানুষ সহজে মরে না। আমরা যখন এখানে এলাম তখনও গ্রামের লোক ফিরতে পারেনি। গাছের ডাল থেকে দুজনকে নামালাম। পাকা ভুরুর ফাঁক দিয়ে বুড়ো জলজল করে আমাদের দিকে চাইলে। কি যে ব্যাপার যেন বুঝতে পারছে না। বাচ্চাটা অসাড়। গুঁড়ো দুধ গুলে দুজনকে অল্প অল্প করে খাইয়ে কিছুটা সুস্থ করে তুললাম। এমন সময় কয়েকজন গ্রামের লোক ফিরল।

—তারপরে?

—গ্রামের লোকেরা নৌকো করে অন্য জায়গায় নিয়ে গেল।

—এখানে নেই?

—না। থাকবার জায়গা কই? গাছের ডালে একটা ওই রকমের বুড়ো মানুষ কদিন থাকতে পারে বল।

একটু চুপ করে থেকে সুপ্রকাশ বললে, আমরা তো এইখানেই থাকব?

—না। এখানে থাকবার জায়গা নেই। আমাদের কেন্দ্র এর পিছনের গ্রামে।

—সেখানে থাকবার জায়গা আছে?

—সেখানে কিছু বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। নিকার মূল ঘরে আমাদের আস্তানা। ভীষণ জোঁক আর মশা।

—সেবাব্রতী বলে আমাদের খাতির করে না?

—কিছুমাত্র না।

দুজনে হাসতে লাগল।

যে মোষ পাঁকে পড়ে সে চুনো বল ঘরে। একথা প্রাণী মাত্রেরই সম্বন্ধে প্রযোজ্য। মানুষের সম্বন্ধেও।

বন্যার তোড়টা কেটে যেতেই সব নিজের নিজের কোটে ফিরে এসেছে। যার বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে আর যার ভিটের চিহ্ন নেই, সকলেরই এক অবস্থা। খাবার কারও ঘরে নেই।

এরই মধ্যে পুনর্বাসনের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। উঁচু জায়গা যেখানে পাচ্ছে, খোঁটা পুঁতে গরু বাঁধছে। নিজের বাড়ির মৃত্তিকাস্তূপ সরিয়ে জিনিসপত্র উদ্ধার করছে। ওরই মধ্যে অত্যন্ত উৎসাহীরা বাঁশ-বাখারি নিয়ে ঘর বাঁধতেও সুরু করেছে।

এমনি কয়েকখানা নতুন-বাঁধা বেড়ার ঘর সুপ্রকাশ দেখলে।

মন্দ হয়নি।

ছাচি-বেড়ার কাঠামো। তার উপর মাটির পলস্তারা। একখানি ঘরে জানালারও ব্যবস্থা হয়েছে।

মেঝে এখনও ভিজে। আর বর্ষা নেই। চনচনে রোদও উঠেছে। কিন্তু বন্যার জলে মাটির এত গভীর পর্যন্ত ভিজে যে, এই সোঁতাভাব কাটতে সময় নেবে।

মেঝের পাতা রয়েছে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার-করা তক্তাপোষ। বিছানা কিন্তু নেই। লেপ-তোষক-বালিশের আড়ম্বর পাড়াগাঁয়ে বড় একটা কোনদিনই নেই। তবু যার যা-বৎসামান্য ছিল, তার কিছুই পাওয়া যায়নি। যেগুলো উদ্ধার করা গেছে তাও অব্যবহার্য।

অনাবৃত তক্তাপোষে একটি ছেলে বসে বসে কাঁদছে।

—বাচ্চা কাঁদে কেন?

—কি জানি মশাই। ছেলের বাবা বললে।—ভোরবেলায় উঠে কাঁদতে আরম্ভ করে, সন্ধ্যে-বেলায় না ঘুমোন পর্যন্ত কাঁদে।

—একটানা?

—আজ্ঞে না। কাঁদছে, থামছে, আবার কাঁদছে।

—কিসের?

—আজ্ঞে তাই বা বলি কি করে? খেয়ে উঠেও কাঁদছে।

—জ্বর নয় তো?

—কি করে জানব? গা তো গরম নয়।

—তবে?

লোকটি বললে, বাবের পর নিজেদের বাড়ি-ঘর তো খুঁজে পাচ্ছে না। সব নতুন ঠেকছে। ওর মা বলে, তাইতে কাঁদছে, অচেনা জায়গায় ছেলেরা যেমন কাঁদে।

বিচিত্র নয়। ছেলের মনের ব্যথা মা হয়তো ঠিকই ধরেছেন।

সুপ্রকাশ দেখলে মেঝের কাদা। জল উঠছে। তথাপি ঘরটিকে গোছগাছ করার প্রয়াস রয়েছে।

একপাশে তিন পা-এয়ালা বেঞ্চি ইটের সাহায্যে পাতা হয়েছে। তার উপর মুড়ির টিন, গুঁড়ো দুধের কৌটো, চালের বস্তা, মসলাপাতি সুদৃশ্যল সাজান।

একটুখানি বেদি মতন করে একটি পিতলের শিলমুড় বসানো। তার উপর মাটির প্রদীপ। দুটি জলভরা ঘড়া আর একধারে পাশাপাশি,—একটি পিতলের, একটি মাটির।

বাক্স-পেটরার কোনো চিহ্ন নেই। হয়তো কোনো কালেই ছিল না। কি হয়তো মাটির নিচে থেকে উদ্ধার করার পর অব্যবহার্য বিবেচনায় ফেলে দেওয়া হয়েছে।

সবচেয়ে যে জিনিসটি সুপ্রকাশদের বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সে হচ্ছে, দেওয়ালের এখানে-সেখানে আটা দিয়ে আঁটা দেশলাই-বাক্সের ছবি। মাঝে মাঝে নতুন কাপড়ের ছবিও রয়েছে।

সৌন্দর্যতৃষ্ণা অমর।

দুঃখ-দুর্দিনের মধ্যেও তা উঁকি মারে। জ্ঞান যতক্ষণ থাকে, সৌন্দর্যবোধ সঙ্গ ছাড়ে না।

সুপ্রকাশ বিষ্ণুপদর হাত টিপে ইসারা করলে।

বিষ্ণুপদর সেদিকে দৃষ্টি নেই। সে ভাবছিল ছোট শিশুটির কথা। কেন কাঁদে। শরীর জীর্ণ, পেটটি সার। ভিতরে ভিতরে কিছু অসুখ হওয়াই সম্ভব।

বললে, পরশু আমাদের ডাক্তার আসবেন। তুমি খোকাকে একবার দেখিও বরং।

লোকটি হাসলে: আজ্ঞে ও দেখানই বটে। জ্বর-আসা নয়, হলে ওর মাই সবচেয়ে টের পেত। বাবুমশাই, ডাক্তারের চেয়ে মায়ে ছেলে চেনে বেশি।

তবে আর কথা কি!

লোকটি বলল, বানের জন্যে এখন আর ভাবছি না। যা-হোক করে সামলে এনেছি কোনো প্রকারে। কিন্তু মাঠে যে ফসল হল না, সম্বৎসর খাবো কি, তাই ভেবে সব মাথায় হাত দিয়েছি। ছেলের কান্না তখন তো আর থামানই যাবে না।

॥ দশ ॥

দিন দশেক পরে সুপ্রকাশ কলকাতায় ফিরল।

রং তামাটে হয়ে গেছে। গায়ে হাজা। হাতের ওগুলো খোস সম্ভবত। বন্যার দূষিত জলে খোস হওয়াই সম্ভব। কদিন থেকে সন্ধ্যার দিকে গা ও একটু গরম হচ্ছে।

যাব-যাব মনে করেও অসীমাদের বাড়ি সুপ্রকাশের যাওয়া আর হয়ে উঠছে না। ওরা রেগে আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বন্যার আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প দিয়ে ওদের রাগ ভাঙাতে পারবে এ বিশ্বাস সুপ্রকাশের আছে।

কিন্তু এই চেহারা, বিশেষ হাজা আর খোস নিয়ে কোনো ভদ্রলোকের বাড়ি যাওয়া যায় না।

সুপ্রকাশ কিছুই গোপন করলে না। নানারকম ভণিতা করে এবং বারবার ক্ষমা চেয়ে নিরুপমাকে একখানা চিঠি লিখে দিলে।

পরদিন আর কলেজ যেতে পারলে না। খোসের জন্যই হোক, আর বন্যার দূষিত জল ঘাঁটার ফলেই হোক, তার শরীরটা খারাপ করতে লাগল। দিনে ভাত খেলে না, কলেজও গেল না। একটা চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে রইল।

সম্ভবত জ্বরের জন্যেই একটু নিদ্রাকর্ষণও হয়েছিল।

—সুপুদা!

সুপ্রকাশ চমকে চেয়ে দেখে অসীমা এবং সুবর্ণ!

—কি ব্যাপার! তোমরা! হস্টেলে!

সুপ্রকাশ প্রায় চীৎকার করে উঠল।

—হ্যাঁ। ওঠ।

অসীমার কণ্ঠ বেশ ভারিক্কি এবং গম্ভীর।

—উঠব? কোথায়?

সুপ্রকাশ কিছুই বুঝতে পারছে না। জ্বরের বেশ ঘোর রয়েছে। চোখ আরক্তিম।

—নিচে। এইতো তোমার সুটকেশ? এতে তোমার জামা-কাপড় আছে।

—হ্যাঁ। কেন?

উঠতে পারছে না। তবু সুপ্রকাশ উঠল।

—বললাম না, নিচে?—সুবর্ণ ধমক দিলে।

—সেখানে গাড়িতে মাসীমা বসে রয়েছেন। তোমাকে তো সবাই চেনেন কি না। তাই পাছে না আস বলে তিনি নিজেই এসেছেন তোমাকে নিয়ে যেতে।

সুপ্রকাশের জ্বরের ঘোর কেটে যাবার মতো কি সর্বনাশ! তিনি নিজে এসেছেন আমাকে নিয়ে যেতে!

—বললাম তো। আর কতবার বলব!

—কি সাংঘাতিক! তোমরা তো জান না, হস্টেল আর একটা জেলখানা। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিনা অনুমতিতে হস্টেল থেকে চলে যাবার উপায় নেই।

—বস্ত্রাঘাতে যাওয়া ছাড়া।

—না। তাতেও অনুমতি নিতে হয়েছে।

—বেশ তো। তাই নাও না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোন পাড়ায় থাকেন?

—না, না। হস্টেলেই থাকেন। কিন্তু—

এবার অসীমা ভীষণ রেগে গেল।

বললে, কিন্তু-কিন্তু নয় সুপুদা। মাসীমা একটা গাড়িতে অপেক্ষা করছেন। যা করবার তাড়াতাড়ি কর। বিলম্বে অনর্থ হবে।

সুপ্রকাশকে উঠতে হল।

অসীমা ওর কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করে বললে, উঃ! গা পুড়ে যাচ্ছে!

—হ্যাঁ। দুপুর থেকে একটু জ্বরের মতো হয়েছে। কলেজ যাইনি সেইজন্যে।

অসীমা সুবর্ণর দিকে চেয়ে বললে, বলিনি? বস্ত্রাঘাত কি সোজা জিনিস! যারা মরে গেছে, তারা তো বেঁচে গেছে। যারা বেঁচে আছে, তাদেরও মরবার ব্যবস্থা। উঃ! মাসীমা কি খুশিই যে হবেন।

সুবর্ণ বললে, আর দেরি নয় সুপুদা। অনুমতি-টনুমতি যা যা নেবার চটপট নিয়ে আসুন। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সুপ্রকাশ টলতে টলতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে গেল। মিনিট-দশেকের মধ্যেই ফিরে এসে বললে, চল।

তারপরে কী জ্বর!

ডাক্তার এলেন, ঔষধ দিলেন, বলে গেলেন ভয় নেই। কিন্তু অত জ্বরের মুখে লোকে ভয় না পেয়ে পারে? নিরুপমা তো রইলেনই, তাঁর সঙ্গে মেয়ে দুটোও। সারারাত্রি ধরে কপালে ও'ডিকলোনের জলপটি আর হাওয়া।

জ্বরের সঙ্গে ভুল বকা।

থেকে থেকে চীৎকার করে উঠছে: ডুবল, ডুবল! যাঃ, ডুবে গেল!

কে ডুবল? কোথায় ডুবল?

ওঁরা অনুমান করলেন, বোধ হয় বন্যার জলে। বস্ত্রাত্রাণ থেকে ফিরে এসে সুপ্রকাশ সেখানকার স্বপ্ন দেখছে।

জ্বরের বাড়াবাড়ি দেখে বনমালীবাবু ভয় পেয়ে গেলেন। ক'বারই তিনি সুপ্রকাশের চীৎকারে ভয় পেয়ে এঘরে এলেন। তার মুখে ঈষৎ বিরক্তির ছাপ। ব্যবসাদার লোক, লগ্নী করার সার্থকতা যে বোঝেন না তা নয়। কিন্তু একটা অনিশ্চিত কারবারে এত আগে থেকে লগ্নী করা হয়তো পছন্দ করেন না।

জিজ্ঞাসা করলেন, ওর বাড়িতে বোধ হয় একটা টেলিগ্রাম করে দেওয়া দরকার।

চিন্তা বোধ হয় এই যে, সুপ্রকাশের বাবা এসে ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাবেন। চিকিৎসার ব্যয় এবং সেবার শক্তি দুইই বেঁচে যাবে। একথা ভাবলেন না যে, চিকিৎসার ব্যয় হয়তো বেঁচে যেতে পারে, কিন্তু পরিষাণ সেবার শক্তিও হয়তো। কিন্তু সুপ্রকাশের বাবা-মা যদি এখানেই এসে ওঠেন! (সম্ভবত এইখানেই উঠবেন। বাধ্য হয়ে। আর কোথাও তাঁদের আত্মীয়-স্বজন আছেন বলে জানা নেই।) তাহলে?

স্বামেলার মুখে মানুষ সব সময় সবদিক ভেবে কথা বলে না। বনমালীবাবুও বলেন নি।

নিরুপমা উদ্বিগ্ন মুখে সুপ্রকাশের বিছানার শিয়রে বসে ছিলেন। বললেন, ডাক্তার বলে গেলেন ভয়ের কোন কারণ নেই। রাত্রিটা তো দেখি। সকালে যা হোক করা যাবে।

ভোরের দিকে সুপ্রকাশ কিছুটা শান্ত হয়ে এল। জ্বর নেমে এল, সেই সঙ্গে ভুল-বকাও অনেক কমল। আরও একটু পরে সুপ্রকাশ ঘুমিয়ে পড়ল।

নিরুপমা সওয়া পাঁচ আনা পয়সা সুপ্রকাশের কপালে ছুঁইয়ে তার বালিশের নিচে সন্তর্পণে রেখে দিলেন।

ডাক্তার সকালে এলেন। বুক, পিঠ ঠুকে, জিভ দেখে বললেন, আজও দুপুরে জ্বর অল্প একটু উঠতে পারে। কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই। কালকেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন। ঠিক নিয়মিত সময়ে ঔষধ খাওয়াবার জন্যে অসীমাদের বারবার হুঁসিয়ারী করে নিরুপমাও রান্নাঘরে চলে গেলেন।

সুপ্রকাশ চোখ বন্ধ করলে।

অসীমা সুবর্ণকে চুপি চুপি বললে, তুই থাক, আমি গা'টা ধুয়ে আসি। দুজনের যাওয়া চলবে না।

চোখ বন্ধ করেই সুপ্রকাশ বললে, দুজনেই যেতে পার যদি আমাকে বেঁধে রেখে দিয়ে যাও।

ওরা চমকে উঠল: তুমি জেগে আছ?

সুপ্রকাশ মৃদুকণ্ঠে টেনে টেনে তার আগের কথার অনুবৃত্তি করে বলে চলল: ঘুমিয়ে থাকলেও ভরসা নেই। জেগে উঠে যদি কোনো বেআইনী কাজ করে বসি। বেঁধে রেখে যাও।

অসীমা ভ্রূকুটি হেনে বললে, তুমি যা ছেলে, তাই করাই উচিত।

—করছ না কেন ?

সুবর্ণ বললে, হাতের কাছে দড়ি পাচ্ছি না বলে।

—নইলে করতে ?

—নিশ্চয়। ডাক্তার বলে গেছেন, কথা বেশি বলবে না, নড়াচড়া যথাসম্ভব কম করবে। বুঝলে ?

—'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে'। থাকতাম হস্টেলে, তাহলে দেখাতাম।

সুপ্রকাশ হেসে চোখ বন্ধ করলে।

—কি করতে হস্টেলে থাকলে ?

—কিছুই করতাম না। শুধু মাথাটা ধুয়ে ফেলে ক্লাসে যেতাম।

—সেইরকম অবস্থাই বটে !—ওরা হেসে ফেললে।—কাল সারা রাত ভুল বকেছ মনে আছে ?

—আছে বই কি ! ইচ্ছে করেই ভুল বকছিলাম।

—আর জ্বরটা ? তাও কি ইচ্ছে করে ?

—নিশ্চয়। তোমাদের ভয় দেখাবার জন্যে।

—খুব বাহাদুর ! যা বললাম মনে আছে তো ?

সুপ্রকাশ বিনীতভাবে ঘাড় নেড়ে বললে, সমস্ত।

—কি বললাম ?

—বললে, কথা বেশি বলতে হবে, নড়াচড়া খুব করতে হবে। এই তো ?

—হ্যাঁ। স্মরণশক্তি খুব প্রখর !

অসীমা হেসে চলে গেল।

চোখ বন্ধ করতে গিয়ে সুপ্রকাশ আবার চোখ মেললে। বললে, একটু জল দেবে ? গলাটা শুকিয়ে গেছে।

—যাবে না ? কথা বললে কতখানি !

সুবর্ণ জল দিলে।

ক্লান্তভাবে সুপ্রকাশ চোখ বন্ধ করলে।

জ্বর ছেড়ে গেল বটে, কিন্তু অসম্ভব দুর্বলতা। মনে হয় যেন কতদিন জ্বর ভোগ করে উঠল। অসীমাকে নিষেধ করতে হয়, কথা সে বেশি বলতেই পারে না। চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে শোনে ওদের গল্প। ভারি আশ্চর্য লাগে। মনে হয় যে স্বপ্নে কথা শুনছে। একটু আবছা, একটু অস্পষ্ট কথা। সব কথার যেন মানে নেই, কিন্তু মিষ্টি।

আর ভাবে।

বন্যাপীড়িতদের দুঃখ-দুর্দশা সে নিজের চোখে দেখে এসেছে। তাদের কথা সে ভুলতে পারে না।

কত বিচিত্র মানুষের দুঃখ! আর সেই দুঃখ সহ্য করবার কি প্রচুর শক্তি তার মনে! সুদুর্জয়, কিছুতে দমে না, কিছুতে হটে না, কেউ তাকে ক্ষয় করতে পারে না।

আর একটি বাতায়ন তার চোখের সামনে খুলে গেল।

ছেলেবেলায় একটি গল্প শুনেছিল, এক রাজপুত্র এক সন্ন্যাসীর হাতে পড়েছিল। সন্ন্যাসী রাজপুত্রকে সবদিকে যাবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, বাদে একটি দিক। বলে দিয়েছিলেন, ওইদিকের দরজা কিছুতে খুলবে না।

দুর্বল মস্তিষ্কে গল্পের শেষটা সুপ্রকাশ মনে করতে পারে না। কিন্তু তার মনে হয় সে ওই-দিকের দরজা, মানুষের দুঃখের দিকের। সিদ্ধার্থের সামনে সহস্র সতর্কতা সত্ত্বেও, ওই দরজা খুলে গিয়েছিল। তিনি আর ঘরে ফেরেন নি।

বিষ্ণুপদও ঘরে ফিরছে না। ওই জানালা দিয়ে সেও মানুষকে দেখেছে।

সুপ্রকাশও কি আর ঘরে ফিরবে না?

ভাবতেই তার নিমীলিত চোখের কোণ বেয়ে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা অশ্রু বালিশের উপর গড়িয়ে পড়ল।

কাছেই ছিল অসীমা।

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, কাঁদছ কেন সুপুদা? কাকীমার জন্যে মন কেমন করছে? তাঁদের আসতে লিখে দোব?

স্বর অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুপ্রকাশ নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

—তাহলে কাঁদছ কেন?

অস্ফুট স্বরে সুপ্রকাশ বললে, কি যেন স্বপ্ন দেখছিলাম।

—স্বপ্ন? কিন্তু তুমি তো জেগেই ছিলে।

জেগেই ছিল! ঘরের চারিদিকে সুপ্রকাশ একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। হ্যাঁ, জেগেই ছিল।

অসীমার একখানি হাত সুপ্রকাশ নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে পরম স্নেহে মুহূর্ত কয় নাড়া-চাড়া করলে।

জিজ্ঞাসা করলে, জেগে জেগে তুমি কখনও স্বপ্ন দেখনি?

—না। আমি কেন দেখব? আমি তো বন্যাত্রাণে যাইনি।

—না গেলেও। কোনো বিরল মুহূর্তে পাশের তাড়া পাশে সরিয়ে রেখে স্বপ্ন দেখনি? সামনে পড়ার বই খোলা, কিন্তু মন অন্যখানে? হয়নি এমন?

অসীমার মত দুরন্ত মেয়েও লজ্জায় মুখ নিচু করলে।

বললে, না।

—না ?—সুপ্রকাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে। তুমি ভাগ্যবতী। আমি কিন্তু স্বপ্ন দেখি, অনর্গল, অফুরন্ত। জেগে জেগে।

অসীমার ইচ্ছা করছিল জিজ্ঞাসা করে, কার অত স্বপ্ন দেখ ? কে সে ? কিন্তু লজ্জায় পারল না।

হেসে বললে, স্বপ্ন দেখে কাঁদে ?

—কাঁদে। তেমন স্বপ্নও আছে। যে স্বপ্ন দেখে মানুষ ঘর ছাড়ে। আর ফেরে না। তেমনি স্বপ্ন দেখছিলাম।

অসীমার বুকের স্পন্দন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। মুখ ছাইয়ের মত শাদা।

—ওসব কথা বোলো না। আমার ভয় করে।

অসীমার করতল তখনও সুপ্রকাশের মুঠোর মধ্যে। সেই পথ বেয়ে অসীমার ভয় আর না-বলা কথা, সমস্তই সুপ্রকাশের মনের মধ্যে সঞ্চারিত হল।

বললে, ভয় আমারও করে অসীমা। তবু নোঙর ছেঁড়ার সেই স্বপ্ন জেগে জেগে দেখতে ভাল লাগে।

—না। ওরকম স্বপ্ন দেখবে না। জ্যাঠাইমার কথা ভাব। তাঁর কথাও ভাববে না ?

—ভাবি মায়ের কথা, আরও অনেকের কথা। ভাবি আর অমন স্বপ্ন দেখব না। তারপরে কখন এক সময় ওই দিকের জানালাটা খুট করে খুলে যায়।

কোন দিকের ?

—সে একটা দিক আছে। তুমি জান না। নিষিদ্ধ জানালা। খুলে যায়। তখন হুড়মুড় করে জোয়ারের জলের মতো স্বপ্ন ঢোকে। নোঙরের কাছিতে পট্ পট্ শব্দ ওঠে। ছিঁড়ল বুঝি। সকলের ছেঁড়ে না। নৌকো বারকয়েক দুলে আবার স্থির হয়ে যায়। কিন্তু কারও কারও ছেঁড়ে। বিষ্ণুদার ছিঁড়েছে।

—কে বিষ্ণুদা ?

—তুমি চেন না। কেউ তাকে চেনে না। জেনেছি তার নোঙর ছিঁড়েছে। ভয় পাই আমারও না ছেঁড়ে। ভয় পাই অথচ ভালো লাগে।

অসীমা কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছে না। তবু ভয় পাচ্ছে। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা কি রকম করছে।

সে রেগে গেল। বললে, ওসব কথা বললে আমি চলে যাব।

ও চলেই যাচ্ছিল। সুপ্রকাশ হাতের মুঠিটা শক্ত করে ধরল। কিছু বললে না। শুধু একটু হাসলে।

॥ এগারো ॥

দু'নৌকায় পা দেওয়াই বিপজ্জনক। সুপ্রকাশ তিন নৌকায় পা দিয়ে চলেছে : কলেজের পড়া, কংগ্রেসের কাজ (যাকে সুপ্রকাশ পরিহাস করে বলে বিষ্ণুদার ব্যাপার) আর অসীমা। সুতরাং

বি. এ.তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে না পারলেও ফার্স্ট ক্লাস থার্ড যে হতে পেরেছে তার জন্যেই তাকে বাহাদুরি দেওয়া উচিত।

অসীমাদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল তার আগেই ওরা প্রথম বিভাগে পাস করেছে।

ওরা দুজনেই তখন দেবীপুরে। সুপ্রকাশও।

অসীমা একা থাকলে কি হত বলা যায় না। দুর্জটির ভ্রূকুটিতে ভয় পেয়ে সে হয়তো বড়বাড়ি আসতেই পারত না। কিন্তু সঙ্গে সুবর্ণ থাকায় সুবিধে এই হল যে সে তো মেসোমশাইএর ভ্রূকুটি সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপহীন, সুতরাং যখন তখন বড়বাড়ি আসা-যাওয়া করতে লাগলো।

খিড়কির দরজা আবার খুলে গেল। কুটুম্বের মেয়ে বহুকাল পরে এসেছে। বিশেষ অসীমা সেইখানে থেকে পড়াশোনা করে। সুতরাং মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারলেন না। সেই সুযোগে অসীমাও শরিক হল।

বহুকাল আগে যেখানে একদিন গোলাঘর পাতা হয়েছিল সেইখানে কেলিকদম্ব গাছের নিচে ওদের লম্বা আড্ডা পড়ল। অনেক সময় খাবার খেতে যাওয়ারও সময় পেত না। দুই বাড়ীর ঝি খাবার নামিয়ে দিয়ে যেত।

ছেলেতে মেয়েতে এরকম মেলামেশা কলকাতায় কিছুই নয়। কিন্তু গ্রামের লোকের চোখ টাটায়। হৃষিকেশবাবু রেগে গেলেন, দুর্জটিবাবুও। কিন্তু কেউ কিছু বলতে সাহস করলেন না।

ব্যাপারটা যে কুটুম্বের মেয়ের জন্যই ঘটছে, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। কারণ গ্রীষ্ম এবং পূজার ছুটিতে যখন শুধু অসীমা আর সুপ্রকাশ বাড়ি এসেছে, তখন এরকম ঢালাও আড্ডা পড়েনি।

জমিদারের বাড়ির ব্যাপার। লোকে বড় গলা করে কিছু বলতে সাহস করল না বটে, কিন্তু কানাকানি কেউ বন্ধ করতে পারে না। গ্রামের লোক সুনিশ্চিত ভাবে জেনে ফেললে যে, সুপ্রকাশের সঙ্গে অসীমার মাসতুতো বোনের বিয়ের সব ঠিকঠাক, শুধু সুপ্রকাশের এম. এ. পাস করার অপেক্ষা।

হয়তো একটু সময় নেয়, কিন্তু ছোটদের কানাকানিও বড়দের কানে পৌঁছয়। কথাটা কানে আসতে হৃষিকেশবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল।

একদিন চুপি চুপি গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাগা, এসব কি শুনছি?

প্রশ্নের ধরনেই গৃহিণী ব্যাপারটা আঁচ করেছিলেন। এই শ্রেণীর কানাকানি পুরুষের কানে ওঠার অনেক আগেই মেয়েদের কানে পৌঁছে যায়।

তবু বললেন, কি সব?

—দুর্জটির ভাগীপতির মেয়েটার সঙ্গে নাকি সুপুর বিয়ে?

গৃহিণী হেসে ফেললেন, কে বললে?

—পাঁচজনে ওদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে কানাকানি আরম্ভ করেছে যে!

—তাদের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। হলে তো ভালোই হয়। ওই রকম একটি মিষ্টি মেয়েই খুঁজছি।

হৃষিকেশবাবুর পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল। চোখ কপালে তুলে বললেন, তুমি বল কি! ধূর্জটি আমার পরম শত্রু। তার শ্যালীপতির মেয়ে হবে আমার পুত্রবধূ!

—হলেই বা। ধূর্জটিবাবু আমাদের শত্রু, তাঁর শ্যালীপতির সঙ্গে কি? মেয়েটি সুন্দরী, লেখাপড়া শিখছে, বাপের পয়সা প্রচুর,—আবার কি মেয়ে চাও তুমি?

হৃষিকেশের সুর খানিকটা নামল: কিন্তু আমার ছেলের বিয়ে আর আমরাই জানলাম না!

গৃহিণী হেসে ফেললেন: হয়তো মেয়ের বাপ-মাও জানেন না। যখন হবে তখন দুপক্ষই জানতে পারব। আমাদের না জানিয়ে বিয়ে হবেই বা কেন?

কথাটা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু হৃষিকেশবাবুর মন তথাপি প্রসন্ন হল না। বিরক্তচিত্তে তিনি বাইরে চলে গেলেন। বলে গেলেন, না, না। এসব ভালো নয়। এ আমি পছন্দ করি না।

অন্যদিকে ধূর্জটিবাবুও খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কুটুম্বের মেয়ে, বলতে পারছেন না কিছুই। তাছাড়া পাত্র হিসাবে সুপ্রকাশের তুলনা নেই। অমন ছেলেকে জামাই করতে পারা ভাগ্যের কথা। তবু ছেলে-মেয়েতে এই মেলামেশা, যা নিয়ে পাড়াগাঁয়ে কানাঘুষা চলবেই, সেটা তার ভালো লাগে না।

সুলোচনাকে বলছেন, দেখ বিয়ে যখন হবে তখন হবে। কিন্তু এখন মেলামেশা বন্ধ কর। কুৎসায় কান পাতা যাচ্ছে না।

চোখ মটকে সুলোচনাকে বললেন, দাঁড়াও। এ কি তোমার মতো পাত্র যে টোপ ফেললেই হাঁ করে গিলে নেবে! হীরের টুকরো ছেলে, তাঁকে গাঁথতে অনেক চাষ করতে হবে, ভাৎনার দিকে চেয়ে বহুদিন বসে থাকতে হবে।

ধূর্জটিবাবুর বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে সুলোচনা বলতে লাগলেন, ভরসা আমার দাদাবাবুর ওপর নয়, দিদির ওপর। গাঁথা হয়তো হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও কিছু খেলবে। ঘাটে আসতে সময় নেবে।

বিস্ময়ে ধূর্জটিবাবু তোৎলা হয়ে গেলেন: এসব কি বলছ তুমি? এ বিষয়ে কিছু জান?

—এইটুকু জানি যে, দিদির নজর পড়েছে সুপুর ওপর।

—তারপরে?

—সুপুর ঘনঘন ওবাড়ি যাওয়া-আসাও আছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আরও শুনলাম, সুপুর একবার অসুখ হয়েছিল। দিদি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। সুবর্ণ খুব সেবা-শুশ্রূষাও করেছিল।

—বল কি !

—তাইতো ওদের মুখেই শুনলাম।

একটু চিন্তা করে ধূর্জটিবাবু বললেন, তাহলে বনমালীবাবু দেরি করছেন কেন ?

—ওই যে বললাম, বড় মাছ আরও একটু খেলবে বোধ হয়।

ধূর্জটিবাবু আবার কি যেন চিন্তা করলেন। বললেন, তোমার কি মনে হয়, সুবিদাকে না জানিয়েই বিয়ে হবে ?

—সময় হলে দাদাবাবু নিশ্চয় বট্‌ঠাকুরের কাছে কথাটা পাড়বেন। বট্‌ঠাকুর রাজি না হলে তাঁর অমতেই বিয়ে হবে।

আনন্দে ধূর্জটিবাবুর পা দুলতে লাগল।

বললেন, হলে ভাল হয়। ব্যাচারা জব্দ হন।

সুলোচনা বললেন, তা হন। তুমি তো পারলে না, হয়তো ছেলেই জব্দ করবে।

পা দোলাতে দোলাতে ধূর্জটি আরও অনেক কিছু ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ একসময় পা দোলান বন্ধ হয়ে গেল।

বললেন, কিন্তু কি তা পারবে বলে মনে হয় ?

সুলোচনাও বললেন, তেমন ছেলে ও নয়। কিন্তু গাঁথা মাছের নিজের জোর তো থাকে না।

আনন্দে ধূর্জটি তাঁর মুখ থেকে কথাটা যেন লুফে নিলেন : এই যা বলেছ ! গাঁথা মাছের···

আবার পা দুলতে লাগল।

কিন্তু যাদের নিয়ে ঘরে-বাইরে এত ঘোট, তারা এর কিছুই খবর রাখে না। হাস্য-পরিহাসে, গল্প-গুজবে তারা মশগুল। বাইরের জগতের কথা তাদের কানেই আসে না।

সম্প্রতি এই অবারিত আনন্দস্রোতে যেন একটু ভাঁটা পড়েছে। ম্যাট্রিকুলেশনের ফল বেরুতে আর দেরি নেই। কি যে হবে সেই চিন্তা অসীমাদের পেয়ে বসেছে।

সুপ্রকাশ আশ্বাস দেয় : কেন ভাবছ ? তোমরা দুজনেই পাস করে যাবে।

অসীমা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হেসে উঠল।

সুপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, হাসলে যে ?

—মনে পড়ে সুপুদা, ছেলেবেলায় একদিন তোমাকে জিগ্যেস করেছিলাম, কি করে ফার্স্ট হয় ? তুমি বলেছিলে, ভালো করে পড়া করলে। আমি বলেছিলুম, তুমি তো দিনরাত খেলা কর। একটু ভেবে তুমি বলেছিলে, ভালো পড়াশুনা না করলেও ফার্স্ট হয়। মনে পড়ে ?

—পড়ে।

—এখন বড় হয়ে দেখছি, তোমার দুটো কথাই সত্যি। তুমি হলে দ্বিতীয় দলে : পড়া

না করলেও ফার্স্ট হবে। আমাদের তো ফার্স্ট হওয়ার ব্যাপার নয়, কোনোরকমে ঠেলেঠুলে পাস করা তাই হয় কিনা সন্দেহ।

অসীমা হাসতে লাগল।

অসীমারা দুজনেই প্রথম বিভাগে পাস করেছে। টেলিগ্রামটা এল দুপুরবেলায়। সুপ্রকাশ ওদের অভিনন্দন জানাবার জন্যে ছোটবাড়ি গিয়ে দেখে হুলুস্থুল বেধে গেছে।

অসীমা মেঝেয় উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর সুলোচনা শিয়রে বসে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আর সুবর্ণ এক কোণে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করবে, সুপ্রকাশের এমন শক্তি নেই। সেও দরজার গোড়ায় স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তাহলে কি সে মিথ্যে খবর শুনল? ওরা, অন্তত অসীমা (কারণ সেই কাঁদছে) কি তাহলে পাস করেনি?

ওকে দেখে সুবর্ণ কোণ থেকে বেরিয়ে এল। ইসারায় ডেকে নিয়ে গেল ওদের কেলিকদম্ব তলার আড়ালে।

বললে, সাংঘাতিক ব্যাপার!

শুষ্ককণ্ঠে সুপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে?

—দুপুরে তো দুজনের পাসের খবর এল—

—পাস করেছে?

—হ্যাঁ।

—প্রথম বিভাগেই?

—হ্যাঁ।

—তাহলে অসীমা কাঁদছে কেন?

—সেই তো ব্যাপার। মেসোমশাই ওকে আর পড়াতে চান না। বলছেন, মেয়েছেলের ওর বেশি লেখাপড়া করার দরকার নেই। এবারে ওর বিয়ে দেবেন।

সুপ্রকাশ বললে, বিচিত্র নয়। এদিকে মেয়েদের লেখাপড়ার রেওয়াজ নেই। লেখাপড়া শেখেও অসীমার জন্যেই ম্যাট্রিক পাস করলে।

—তার জন্যেই ও কলেজেও পড়বে। শোন।

—বল।

—এখনি তোমাকে স্টেশনে গিয়ে মাকে একটা টেলিগ্রাম করে দিতে হবে। খুব সোপনে এইসব কথা জানিয়ে তাকে আসতে বলবে। তিনি এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—সে ভরসা আমারও আছে। আমি চললাম।

তখনই স্টেশনে গিয়ে সুপ্রকাশ একখানা জরুরী টেলিগ্রাম করে এল। পরের দিনই দুপুরে একখানা টেলিগ্রাম এল ধূর্জটিবাবুর কাছে, নিরুপমা আসছেন ; স্টেশনে যেন পালকি থাকে।

ধূর্জটিবাবু তো অবাক!

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ উনি আসছেন কেন? মেয়ের বিয়ের জন্যে নাকি?

সুলোচনা বললেন, তাই হবে।

যাই হোক, স্টেশনে পালকি গেল। সঙ্গে দারোয়ান। যথাসময়ে নিরুপমা এলেন।

ধূর্জটিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার দিদি? হঠাৎ যে!

—মিষ্টি খেতে। মেয়ে পাস করেছে, মিষ্টি খাওয়াবেন না?

—নিশ্চয়। একটি নয়, দুটি মেয়ে পাস করেছে। আপনার তো ডবল মিষ্টি পাওনা।

সন্ধ্যা পর্যন্ত অসীমা আড়ালে আড়ালে বেড়ালো। নিরুপমাও ইচ্ছা করেই তার কথা একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না।

সন্ধ্যার পর দক্ষিণের বারান্দায় ওঁদের মজলিস বসল।

একথা-সেকথার পর ধূর্জটিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ের বিয়ের কথা কিছু ভাবছেন?

—এর মধ্যে? মেয়ে পড়ছে। পড়া শেষ হোক।

—সে তো অনেক দেরি।

—তা বছর চারেক তো বটেই।

ধূর্জটিবাবু অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলেন।

নিরুপমা বলতে লাগলেন, অবশ্য একেবারেই যে ভাবছি না তা নয়, কিছু কিছু ভাবতে হচ্ছে বই কি?

—ভাবছেন মানে কি? রাত্রে শোবার সময় একবার করে ভাবছেন, না পাত্রও খুঁজছেন?

নিরুপমা হেসে বললেন, দুইই।

—খুঁজে কিছু পেয়েছেন?

—পাব বলে মনে হচ্ছে।

—কে পাত্র? সুপ্রকাশ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে দেরি করছেন কেন? হাতছাড়া হয়ে যেতেও পারে।

—কেন সে-রকম শুনছেন নাকি?

—না, শুনিনি কিছুই।

নিরুপমা একটু চিন্তিত হলেন। বললেন, আমিও এখনই বিয়ে দিতে চাই না। এম. এ. পাস না করে সুপ্রকাশও বিয়ে করবে না বোধ হয়।

—কিছুই বলা যায় না। আমি বলি কি, এসেছেন যখন তখন সুপুর মাকে অন্তত একটু ছুঁইয়ে যান।

দেখি।

ধূর্জটিবাবু যেন একটু বিরক্তই হলেন। বললেন, দেখুন। আমি কিন্তু অসীমার বিয়ে সামনের অঘ্রাণেই দিতে চাই।

—পাত্র পেয়েছেন?

—খুঁজছি। ওকে কলেজে পড়াবার ইচ্ছে আমার নেই

অসীমার মা এবারে কোমর বাঁধছেন: অসীমাকে স্কুলে পড়ালে কে?

—আপনি।

—তাহলে ওকে কলেজে পড়ান হবে কিনা সে ভারও আমার ওপর দেওয়া উচিত। না কি

ধূর্জটিবাবু থতমত খেয়ে গেলেন। বললেন, কিন্তু বিয়ে তো দিতে হবে। মেয়ের বয়েস তো হচ্ছে।

—এখানকার হিসেবে হয়তো হচ্ছে, কিন্তু কলকাতার হিসেবে হয়নি। ও এখানকার মেয়ে নয়, আপনাদেরও মেয়ে নয়। মেয়ে আমার।

ধূর্জটিবাবুকে বলতে হল, সে তো বটেই।

নিরুপমা বললেন, চাটুয্যে মশাই, আমি মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে এখানে আসিনি। যদিও এসেছি যখন, তখন একবার সুপ্রকাশের মায়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করে যাব। কিন্তু আমি এসেছি অসীমাকে নিয়ে যেতে। এ সন্দেহ আমার ছিল যে, ওকে বেশি পড়াতে আপনি আপত্তি করতে পারেন। সেইজন্যে আসা। আশা করি এর পরে আপনি আপত্তি করবেন না।

ধূর্জটিবাবু চুপ করে রইলেন।

নিরুপমা বললেন, সেইজন্যেই বুঝি মেয়েটাকে দেখতে পাইনি? এসে পর্যন্ত পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে? ডাক তো তাকে।

পাশের ঘর থেকে সবই ওরা শুনছিল। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে নিরুপমার পায়ের ধুলো নিলে।

॥ বারো ॥

পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে। ভর্তি আরম্ভ হয়ে গেছে। দেরি করা চলে না। মাত্র দু'তিন দিন থেকেই অসীমার মাসী মেয়েদের নিয়ে চলে গেলেন।

তখন গ্রামের অবস্থা হল ঢাকের বাজনা হঠাৎ থেমে গেলে যেমন হয় তেমনি। মেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনার উৎসাহ শহরের চেয়ে গ্রামেরই বোধ হয় বেশি। বস্তুত এই দুটো মাস সুপ্রকাশ এবং

সুবর্ণই তাদের প্রধান উপজীব্য ছিল। তাদের সমস্ত উৎসাহ এবং উদ্যম এই নিয়েই বেঁচে গেল। ওরা চলে যেতেই ওদের রসধারার উৎসমুখে কে যেন ভুম করে একটা ধ্বাদল পাথর চাপিয়ে দিলে।

আর সুপ্রকাশ।

অসীমারা চলে যাওয়ায় তার মনে হল, শুধু তারা নিজেরাই চলে যায়নি, গ্রামের সমস্ত লোককে সঙ্গে নিয়ে গেছে! গ্রামে আর লোক নেই, গ্রাম খালি।

তার পরীক্ষার ফল কবে বেরুবে, কবে সে কলকাতায় যাবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এর পরে ইণ্টারমিডিয়েটের ফল বেরুবে, তারপরে বি. এ.র। মাঝের এই ক'টা দিন কি করে যে কাটবে তাই ভেবে দস্তরমতো চিন্তিত হয়ে পড়ল।

অসীমারা বলে গিয়েছিল কলকাতা পৌঁছেই চিঠি লেখে, ভর্তি সম্পর্কে কি হল না হল জানাবে। কিন্তু সাতটা দিনের মধ্যে কোনো চিঠি না পেয়ে উদ্বেগ বোধ করতে লাগল।

আরও দু'দিন দেখে সে নিজেই একখানা চিঠি দিলে। তারও কোন জবাব নেই।

সুপ্রকাশ ওবাড়ি গেল। ধূর্জটিবাবুর স্ত্রী বললেন, তাঁরা এর মধ্যে কখানাই চিঠি পেয়েছেন। ওরা দুজনেই বেথুনে ভর্তি হয়েছে। ভালো আছে। শেষ চিঠিতে লিখেছে সুপ্রকাশকে তারা দুখানা চিঠি দিয়েছে।

আশ্চর্য, একখানা চিঠিও সুপ্রকাশের হাতে পৌঁছয়নি! কোথায় গেল?

একটি বন্ধু চুপি চুপি সন্দেহ প্রকাশ করলে, পাড়ার কতকগুলো দুষ্টু ছেলে হয়েছে। তার সন্দেহ তারা চিঠি মারছে।

—কি করে?

তা সে জানে না।

—তাদের উদ্দেশ্য কি?

সেটা সে অনুমান করতে পারে, কিন্তু প্রকাশ করলে না।

এই গোলমালে কয়েকটা দিন গেল। তার মধ্যে ইণ্টারমিডিয়েটের ফল বেরিয়ে কিছুদিন পরে তারও পরীক্ষার ফল বেরুল। অসীমা টেলিগ্রাম করে জানালে।

হৃষিকেশবাবুর ইচ্ছা ছিল একটু ধুমধাম করা। কিন্তু সুপ্রকাশ আর একটা দিনও থাকতে রাজী হল না। সে না থাকলে আর ধুমধাম কিসের?

মা এক সময় বললেন, কর্তা বলছেন এইবার একটি ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে দেবেন।

সুপ্রকাশ চমকে উঠল: ওসব এখন নয় মা। এম. এ. পাস না করে বিয়ে নয়।

—কেন বিয়ে করলে কি এম. এ. পাস করা যায় না? বেশ তো। আমাদের পছন্দের সঙ্গে তোর পছন্দ যদি না মেলে, তুই নিজেই পছন্দ কর। আমরা সেই মেয়েই বৌ করব।

—না মা, না মা। ওসব এখন থাক!

সুপ্রকাশের মা এসব বুঝতে পারেন না। না এখনকার ছেলেদের, না কলকাতার ছেলেদের।

অসীমার মাসী এলেন দেখা করতে। কিন্তু কী রকম যেন। স্থির হয়ে দু'দণ্ড কথা বলতে পারেন না। সুপ্রকাশের প্রশংসা করলেন। তার অসুখের কথা বললেন, মেয়েদের সঙ্গে ভদ্রতার কথা বললেন, সবশেষে বললেন, শুধু বিয়ের কোনো কথা পাড়লেন না। কিংবা যদি পেড়েও থাকেন, সে এমন সূক্ষ্মভাবে যে সুপ্রকাশের মা ধরতে পারেননি।

কলকাতার সিল্পী-বাদ্মিরাও যেন কেমন ছেলেমানুষের মতো!

সুপ্রকাশ চলে যেতে তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন! এখনকার ছেলেরাও কি রকম যেন! বাপ-মায়ের কথা শোনে না। বিয়েতে মন নেই। শুধু উড়ে উড়ে বেড়াতে ভালবাসে!

ওদিকে ধূর্জটিবাবু মুখে কিছু বলতে পারলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হলেন।

সুলোচনাকে বললেন, কুটুম মানুষ, তার ওপর অসীমাকে সত্যিই মায়ের মতন ভালোবাসেন। সেজন্যে কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু কাজটা ভাল হল না।

সুলোচনারও মন খুঁৎ খুঁৎ করছিল। চুপ করে রইলেন।

ধূর্জটিবাবু বললেন, সপ্ততীর্থ মশাইও কলেজে পড়ার পক্ষপাতী নন। তিনি দুঃখ করে বললেন, কাজটা ভালো করলে না বাবাজী।

সুলোচনা তথাপি চুপ করে রইলেন।

ধূর্জটিবাবু বলতে লাগলেন, ভালো যে হল না সে আমিও বুঝছি। মেয়ে দুটোকে তো দেখলে, প্রজাপতির মত কেবল সাজ-পোশাক আর উড়ে বেড়ানো।

ওই রকমই হয়েছে আজকাল।

আমাদের পল্লীসমাজে তা তো এখনও হয়নি। তাছাড়াও বলি, আমার আর একটা ভয় করছে।

সুলোচনার মুখ শুকিয়ে গেল: কি ভয়?

—সে ভয় হচ্ছে, অসীমা যেন আর আমাদের মেয়ে নয়। যেন আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

—না, না।

—না, না বললে শুনব না ছোটবৌ। এবারে আমি খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছি। দূরে সরে যাচ্ছে, গ্রামের থেকেও আমাদের থেকেও। এটা ভালো কথা নয়।

বললেন, আমাদের একমাত্র সন্তান বলেই এত কথা মনে হচ্ছে। নইলে আর কি! শ্বশুর বাড়ি চলে যেত, যা হত তাই হত। শহরে মানুষ হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, নয়তো শহরেই বিয়ে দিতাম। তা তো নয়।

—বটেই তো।

—বিয়ের পরেও এইখানেও ওকে থাকতে হবে। বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করতে হবে। কিন্তু ভয় হচ্ছে, গ্রামে আর ও থাকতে পারবে না। বাবার জন্যে বাস্তুতা দেখবে না?

সুলোচনা বললেন, অথচ দেখ, জমি-জমিদারী, বিষয়-সম্পত্তি দেখতে হবে বলেই ওকে লেখা-পড়া শেখান! সেইজন্যেই কলকাতায় পাঠান!

—সেইজন্যেই তো। ভাবলাম, ও-বাড়ির সুপু লেখাপড়া শিখছে। তার টক্কর দিয়ে চলতে গেলে অসীমারও লেখাপড়া শেখা দরকার।

ঠোঁট উল্টে সুলোচনা বললেন, টক্কর দেবে! সুপু ওর কাছে দেবতার মত।

হাত নেড়ে ধূর্জটিবাবু বললেন, ওটা কিছু নয় ছোটবৌ। আমাদের এই দুই বাড়ির এখন আর রক্তের সম্পর্কও নেই। অথচ পাশাপাশি থাকার জন্যে এখনও নিকট জ্ঞাতির মতো রয়েছি। ছেলে-বেলায় আমিও হৃষিবাবুকে শুধু মুখেই 'বড়দা' বলতাম না, নিজের দাদার মতোই শ্রদ্ধা করতাম। আর আজকে দেখ।

ধূর্জটিবাবু হাসতে লাগলেন।

বললেন, মুখে আজও আমাদের কোনো অসদ্ভাব নেই। অথচ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা-মোকদ্দমাও ঠিক চলছে। সেদিক দিয়ে অসীমারও কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু—

ধূর্জটিবাবু চিন্তাগ্রস্ত হলেন।

সুলোচনা বললেন, কিন্তু সুবর্ণর সঙ্গে সুপুর যদি বিয়ে হয়, তখন কি হবে?

ধূর্জটিবাবু হেসে বললেন, তখনও মামলা চলতে থাকবে। কিছু পুরোনো মামলার জের, কিছু নতুন মামলা।

—আমরা যখন থাকব না, তখন?

—তখনও। যতদিন শরিকানি জমিদারী থাকবে, ততদিন মামলাও থাকবে। আজ ভায়ে-ভায়ে চলছে, তখন শালী-ভগ্নীপতিতে। সে আরও মজা হবে।

ধূর্জটিবাবু হাসতে লাগলেন ভবিষ্যতের সেই মজাটা কল্পনায় উপলব্ধি করে।

সুলোচনাও যেন মজা পাচ্ছিলেন। বললেন, তখন দাদাবাবু কি করবেন?

—কি আবার করবেন? অসীমা তাঁর মেয়ে, সুপু জামাই, যেমন আছে তেমনি থাকবে। তাঁর কি? কিন্তু কথা হচ্ছে, তিনিও কি তখন বেঁচে থাকবেন? তোমার দাদাবাবু-দিদি তো চারযুগের অমর নন।

তা বটে! অসুবিধা কোনোদিক দিয়েই নেই। সুবর্ণর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে সুপ্রকাশের বিয়ে হতে পারে।

কিন্তু হৃষিকেশবাবু যেন প্রশান্ত মহাসমুদ্র। মনের গভীরে সাইক্লোন বইলেও বাইরে তার প্রকাশ থাকে না। এটি মুখুয্যে বংশের ধারা। রক্তের সূত্রে হৃষিকেশবাবু পেয়েছেন। ধূর্জটিবাবু অতখানি পাননি।

সুপ্রকাশ এবং সুবর্ণকে নিয়ে গ্রামে কানাঘুষা উঠল, তিনি অল্প একটু বিচলিত হয়েছিলেন। অমলার সঙ্গে কথা বললেন, সুবর্ণকে দেখলেন, সুস্থ হলেন।

অমলা ঠিক কথাই বলেছেন। মেয়েটি দেখতে-শুনতে ভালো। এবাড়ির বধূ হবার যোগ্য। বেশ সপ্রতিভ এবং বুদ্ধিমতী। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

নিরুপমাকেও প্রথম দেখায় (অবশ্য দূর থেকে দেখায়) মন্দ লাগেনি। শহরের মেয়েদের চাল-চলনে সাবলীল আত্মপ্রত্যয়ের ভাব থাকে। সেটা উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে শক্ত হয়নি।

কিন্তু অমলার কাছে যখন শুনলেন, তিনি এসে অনেকক্ষণ গল্প করে গেছেন, কিন্তু বিবাহের কোনো প্রস্তাব করেননি, তখন তাঁর ললাটে একটু ভ্রূকুটি খেলে গেল।

এর অর্থ কি ?

তাঁরা যা অনুমান করছেন, সে অনুমান সত্য হলে তাঁরা খুশিই হবেন, তা কি তবে সত্য নয় ?

বাইরে ললাটে ভ্রূকুটি খেলে গেল মুহূর্তের জন্যে। ভিতরে, অনেক নিচে, চিন্তার বড় বড় ঢেউগুলো গড়াতে লাগল কয়েকদিন ধরে। মেয়ের যা নিচু হয় না, এ কি রকম কথা !

সুপ্রকাশ কলকাতা চলে যাওয়ার পরে একদিন গড়গড়া টানতে টানতে বললেন ঘুর্ণটির শালিকা আমাকে ডাক লাগিয়ে দিয়েছেন !

অমলা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ?

—এলেন, নানা গল্প করলেন, অথচ বিয়ের কোনো প্রসঙ্গই তুললেন না !

—না।

—কি ব্যাপার বল তো ?

—কি করে জানব ? সুপ্রকাশকে বললাম, এবারে তোর বিয়ের চেষ্টা করব। সে বললে, এখন নয়। এম. এ. পাস করার পরে।

—বললে ?

—হ্যাঁ।

—তার মানেটা কি হতে পারে মনে কর ?

—কি করে জানব ?

হৃষিকেশবাবু নিঃশেষে তামাক টানেন আর ধোঁয়া ছাড়েন। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল। দুরূহ বিষয় সম্বন্ধে এইটেই তাঁর চিন্তা করার পদ্ধতি।

অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর একটু হাসলেন।

অমলা বললেন, হাসলে যে !

— হাসিরই ব্যাপার বড়বৌ। ব্যাপারটা বোঝ, সুপু এম. এ. পাস না করে বিয়ে করবে না। এটা ওঁরা জানেন নিশ্চয়ই।

—কি করে জানবেন ?

—মুপুর কাছ থেকেই। আর কি করে? জানেন বলেই কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব করলেন না! এত আগে প্রস্তাব করে কি হবে ?

অমলা অত্যন্ত ভালোমানুষ। জটিল বিষয়ে তাঁর গোলমাল লাগে। সাঁতার না-জানা লোক জলে পড়লে যেমন হাঁকায়, তেমনি হাঁফিয়ে ওঠেন।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তার থেকে কি বুঝছ ?

হৃষিকেশবাবু একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাসলেন, যাতে অমলা আরও ভয় পেয়ে গেলেন।

হাসতে হাসতে হৃষিকেশবাবু বললেন, বুঝছি, এরকম ক্ষেত্রে যা হয় তাই হয়েছে।

—তার মানে ?

—তার মানে ছেলে ওঁদের মুঠোর মধ্যে চলে গেছে। ওঁরা সব জানেন এবং নিশ্চিন্ত আছেন।

ব্যস্তভাবে অমলা বললেন, না, না। মুপু তেমন ছেলে নয়।

হৃষিকেশবাবু বললেন, তেমন ছেলে যারা নয়, ভয় তো তাদের নিয়েই বেশি। বদ ছেলেদের জন্যে ভয় নেই। তারা কেটে বেরিয়ে আসে। এরা আটকে পড়ে। বেরুতে পারে না। বড়বৌ, ছেলের নামে হাত ধোও।

শুনে অমলা কেঁদে ফেললেন।

হৃষিকেশবাবু বললেন, অসুখের সময় সুপ্রকাশকে হস্টেল থেকে নিয়ে গিয়ে অত সেবা-শুশ্রূষা করলেন। আমাদের একটা খবর পর্যন্ত দিলেন না, পাছে নিরিবিলি শুশ্রূষার অসুবিধা হয়। এ সবের মানে কি ?

হৃষিকেশবাবু আবারও হাসলেন। বললেন, কিন্তু ভদ্রমহিলা যত চালাকই হোন, আমিও ঋষি মুখুয্যে, যার ভয়ে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খায়। তিনি যদি ডালে-ডালে বেড়ান, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। আমিও বুঝিয়ে দেব, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া সব সময় নিরাপদ নয়।

এই বলে তিনি উঠে পড়লেন।

বনমালীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, জিতে এলে ?

সগর্বে নিরুপমা উত্তর দিলেন, আসব না ? এ কি তুমি ?

—দুর্জটি আটকালে না ?

—ইচ্ছে ছিল। সাহস করলে না।

—পাড়াগাঁয়ের লোকগুলো ওই রকমই হয়। মেয়েদের মানুষ বলেই মনে করে না।

—না, করে না। আমার সামনে তো আপত্তি করতে ভদ্রলোক সাহসই করলেন না!

সৌন্দর্য্য সাধনায়...

পরশের নির্মল নীলাকাশের আলোয় ধরিত্রী উৎসবের যে ধারা আনে তাতে নরনারীর চির আনন্দময় হয়ে ওঠে।

নিত্যকে ঐ পরিবেশের অনুকূল সৌরভে মণ্ডিত করে তোলবার আকাঙ্খাও জাগে সকলের মনে। ক্যালকেমিকোর প্রসাধন সামগ্রীগুলি, নরনারীর সৌন্দর্য সাধনায় চিরসঙ্গী হয়ে থাকে।

- **লাবনি** স্নো এবং ক্রীম
- **মলয়** চন্দন সাবান
- **ক্যাষ্টরল** সুবাসিত ক্যাষ্টর অয়েল
- **কান্তা** বরফিয়া সুরভিসার
- **রেণুকা** স্নো ও ট্যালকাম পাউডার

প্রস্তুতকারক

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ

কলিকাতা ২৯

বনমালীবাবু হেসে বললেন, সে তুমি বলে। মেয়ে মানুষ বলে নয়।

—আমি কি মেয়েমানুষ নই ?

—না। তুমি শালিকা। তোমার খাতির আলাদা।

আর এক সময় নিরিবিলি জিজ্ঞাসা করলেন, তারপরে ওদিকের কি খবর বল।

—কোন্ দিকের ?

—হৃষিকেশবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলে ?

—করেছিলাম।

—বিয়ের কথা তুলেছিলে ?

—না।

বনমালীবাবু বিরক্ত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ?

—কি রকম লজ্জা করল।

—লজ্জা ? লজ্জা কিসের ? মেয়ের মা কি ছেলের মায়ের কাছে বিয়ের কথা পাড়ে না ?

লজ্জিতভাবে নিরুপমা বললেন, তা নয়। মনে হল, এত আগে থেকে কথা না পাড়াই

—আর যদি ইতিমধ্যে কোথাও বিয়ের ঠিক হয়ে যায় ? বি. এ. পাস করল। কত মেয়ের বাপ ঘোরাঘুরি আরম্ভ করবে।

—এত অল্প বয়সে কেউ মেয়ের বিয়ে দেয় ?

পাড়াগাঁয়ে এর চেয়েও অল্প বয়সে দেয়।

নিরুপমা মনে মনে ভয় যে একটু না পেলেন তা নয়। বস্তুত অনেকবারই ইচ্ছা হচ্ছিল কথাটা পাড়েন। লজ্জাতেই পাড়তে পারেন নি।

বললেন, দেয় দিক। এত অল্প বয়সে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে বলতে পার ?

—সুপাত্র পেলে কেন দোব না ?

এবারে নিরুপমা রাগলেন। বললেন, তোমরা সবাই সমান। মেয়েদের মানুষ বলেই মনে কর না। তোমার শালীপতিও না, তুমিও না।

নিরুপমা রেগে হন হন করে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তখনই আবার ফিরে এসেই বললেন, দিলেই হয়। ছেলে তো আমাদের হাতে।

বনমালীবাবু বললেন, এখন তাই ভাবছ। বিয়ের সময় ছেলেরা পিতৃভক্ত হয়ে যায়।

—সুপ্রকাশ তেমন ছেলে নয়।

সুপ্রকাশ সম্বন্ধে তার মায়েরও এই ধারণা, তার মাসীমারও এই ধারণা। উভয়েই নিশ্চিত সে 'তেমন ছেলে' নয়।

॥ তেরো ॥

এম. এ.তে সুপ্রকাশ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে গেল। অনতিবিলম্বে একটি বেসরকারী কলেজে অধ্যাপকের পদও জুটে গেল।

একমাত্র সন্তান, ছাত্রজীবনটা যার বাইরে বাইরেই কাটল, কর্মজীবনটাও সে বাপ-মায়ের থেকে দূরে বাইরে-বাইরেই কাটাবে, বিষয়-সম্পত্তি দেখবে না, এটা হৃষিকেশবাবুর ইচ্ছা ছিল না। তিনি নিজে কোন চিঠি দেননি বটে, কিন্তু অমলা তাঁর ইচ্ছা সুপ্রকাশকে জানিয়েছিল।

সুপ্রকাশ লিখেছিল, অধ্যাপনা তার সবচেয়ে প্রিয় বৃত্তি, এবং এতে এত লম্বা লম্বা ছুটি আছে যে, বিষয়-সম্পত্তি দেখারও অসুবিধা হবে না। এই বয়সে গ্রামে নিষ্কর্ম বসে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব।

হৃষিকেশবাবু এর পরে আপত্তি করেননি। হয় তিনি বুঝেছিলেন আপত্তি নিষ্ফল, অথবা পুত্রের যুক্তির সারবত্তা মনে মনে স্বীকার করেছিলেন।

কিন্তু সবচেয়ে খুশি হয়েছিল, অসীমা আর সুবর্ণ।

অসীমা বললে, তোমাকে আজ আমরা খাইয়ে দোব সুপুদা।

সুপ্রকাশ বিস্মিতভাবে বললে, আমাকে খাইয়ে দেবে কি! আমারই তো খাওয়ানোর কথা।

সুবর্ণ বললে, সেটা আমরা ছেড়ে দিচ্ছি না। সে তুমি একদিন খাইও। কিন্তু আমরা খাওয়াব।

—কেন বলতো?

অসীমা বললে, তুমি যে কি বাঁচা আমাদের বাঁচালে সে আর বলবার নয়।

—কি রকম?

সুবর্ণ বললে, তোমার পরীক্ষার ফল বেরুনোর পর থেকে আমাদের বুক দুর দুর করছিল!

—কেন?

সুবর্ণ বললে, কেন বুঝতে পারছ না? যদি আমাদের কলেজে আস, তাহলে তো গেলাম! ক্লাসে মাথা তুলতে পারতাম না! সে ভারী বিশ্রী!

অসীমা বললে, আমরা এমন পর্যন্ত ভেবেছিলাম কাউকে বলিনি যদিও, যে আমাদের কলেজে তুমি এলে আমরা অন্য কোনো কলেজে চলে যাব।

—কি সর্বনাশ! এত কাণ্ড বয়ে গেছে!

সুবর্ণ বললে, দিনরাত মা কালীকে ডেকেছি, সুপুদা যেন আমাদের কলেজে না আসে।

সুপ্রকাশ হেসে বললে, মিথ্যে ডেকেছ। আমাকে আগে জানালে বলে দিতাম, তোমাদের কলেজ কেন, কোনো সরকারী কলেজেই আমার চাকরি হবার নয়।

কেন?

—কারণ আমার রাজনৈতিক চরিত্র ভালো নয়। এ হল ওদের দিকের কথা। আমার দিকের কথা হচ্ছে, সরকারী চাকরি পেলেও আমি নিতাম না। অধ্যাপনা আমার ব্রত, বৃত্তি ঠিক নয়। কলেজ থেকে মাইনে যা পাব, এমনিতেও বাবা আমাকে তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা পাঠিয়েছেন।

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করলে, সামান্য মাইনেয় চালাবে কি করে?

অসীমা বললে, টুইশান। যা করে সবাই।

সুপ্রকাশ বললে, না। ওইটি পারব না। কলেজে পড়াব, বাকি সময় পড়ব। মাইনে যা পাব তাইতেই কোনো রকমে চালাব।

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করলে, তারপরে যখন বিয়ে করবে তখন?

—তখন?—সুপ্রকাশ বললে, যিনি আসবেন তাঁকে এই কথা বুঝেই আসতে হবে যে, তিনি ছাড়া আমার ঘর আলো করবার আর কিছু নেই। না সোনা, না রূপো।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে অসীমা বললে, কেন তোমার অতবড় জমিদারী রয়েছে কি জন্যে?

—প্রজা উচ্ছেদ আর শরিকানী মামলা-মোকদ্দমার জন্যে। বেশে থেতে তিনি তাও করতে পারেন।

সুবর্ণ বললে, দায় পড়েছে তার! সে বলবে, আরও টাকা আন। টুইশান কর, নোট লেখ।

—তথাস্তু। কিন্তু তাহলে তিনি সিনেমা দেখবেন কখন?

—রবিবারে।

—সপ্তাহে একদিন দেখলে হবে?

সুবর্ণ বললে, না। অন্তত তিনদিন চাই।

—টুইশান করে আর নোট লিখে সে সময় কই?

সুবর্ণ বললে, ন'টার শোতে যাবেন।

—কবে? কবে?

নিরুপমা এসে পড়েছেন!

অসীমা বললে, সুপুদা একটা প্রকেসারী পেয়ে গেছে মাসীমা।

নিরুপমা বললেন, তাই সিনেমা দেখাচ্ছে!

সুপ্রকাশ বললে, হ্যাঁ মাসীমা। আমি বলছি আজকেই। ওরা বলছে ন'টার শো'তে।

নিরুপমা বললেন, সেলে ছটার সেতে হয়। ন'টায় আবার মেয়েদের নিয়ে যায় নাকি?

সুপ্রকাশ বললে, বলুন তো। তাহলে তৈরী হয়ে নিন মাসীমা। আমি একটা ট্যাক্সি ডাকি?

ওদের মুখের দিকে চেয়ে নিরুপমার সন্দেহ হচ্ছিল। দ্বিধাভরে বললেন সত্যি?

—নিশ্চয়। কি বই দেখবেন ঠিক করুন।

নিরুপমা বললেন, পৌরাণিক যদি থাকে তাহলে তাই।

সুবর্ণ বললে, পৌরাণিক আছে; কিন্তু হিন্দি।

—না বাবা, হিন্দি বুঝতে পারি না। তাহলে বাংলা যা আছে তাই। আমি শাড়িটা বদলে আসি।

বনমালীবাবু এতদিন ধৈর্যের সঙ্গে চুপ করেছিলেন। সুবর্ণর পরীক্ষা সামনের বছরেই। মধ্যে ক'টা মাসই বা আছে!

নিরুপমাকে বললেন, এবারে তো সুপ্রকাশের মাকে একখানা চিঠি দেওয়া উচিত। না আমিই ছবিকেশবাবুকে লেখব?

কথাটা নিরুপমার মনের মধ্যে আছে। কিন্তু এবাড়িতে সুপ্রকাশের আসা-যাওয়া, মেলামেশা এত সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, কথাটা খেয়াল থাকে না। বলতে কি, নিরুপমার ভরসা সুপ্রকাশের বাপ-মার চেয়ে সুপ্রকাশের উপরই বেশি। অথচ কি সুপ্রকাশ, কি সুবর্ণ, কারও ভাব-ভঙ্গী তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না।

বললেন, আর একটু অপেক্ষা কর। ওদের ভাবভঙ্গীটা একটু বুঝি।

—সময় তো অনেক গেল। এখনও ভাবভঙ্গী বুঝতে পারনি?

—না। আর একটু অপেক্ষা কর। ওদের পরীক্ষাটা হয়ে যাক।

—পরীক্ষার আর দেরি কই?

—তাই তো বলছি। এই ক'টা দিন সবুর কর।

বনমালীবাবু বিরক্তভাবে বললেন, সবুর তো করেই আছি। তোমার যা গড়িমসি, শেষে হাত-ছাড়া না হয়ে যায়।

নিরুপমার কেমন যেন সংকোচ বোধ হচ্ছে।

বললেন, ঘূর্জটিবাবুকে তুমি একখানা চিঠি দেবে?

বনমালীবাবু বললেন, কি হবে? ওদের দুজনে যা ভাব, ওপথ দিয়ে গেলে বিয়ে হয়তো ভেঙেই যাবে।

—তাহলে?

—চিঠি দিলে ছবিবাবুকে নয় তাঁর স্ত্রীকে দিতে হয়, এবং আর দেরি না করাই ভালো।

নিরুপমা বললেন, একটা কাজ করলে কি হয়?

—কি কাজ?

—আগে অসীমাকে দিয়ে সুপ্রকাশের কাছে কথাটা যদি পাড়া যায়? তার অমতে তো কিছুই হবে না।

—তার অমত হতে পারে বলে কি সন্দেহ হয়?

—না। বরং মনে হয়, ওদের যা ভাব, সুপ্রকাশ খুশিই হবে। আর সুপ্রকাশের মত আছে জানলে ছবিবাবু কিংবা তাঁর স্ত্রীরও আপত্তির কোনো কারণ থাকবে না। তুমি কি বল?

নিরুপমার বুদ্ধির উপর বনমালীর কোনোদিনই খুব বেশি আস্থা ছিল না। কিন্তু এখন মনে হল, বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের বোধ হয় একটা সহজাত বুদ্ধি আছে।

বললেন, বেশ। তাই দেখ।

নিরুপমা বললেন, কিন্তু তাড়া দিও না বাপু। আমি তোমার মতো তাড়াতাড়ি কাজ করতে একটু রয়ে-বসে করি।

—তাই কোরো। তবে খুব বেশি রয়ে-বসে নয়।

বনমালী সেদিন আর কিছু বললেন না।

মাস দুই পরে জিজ্ঞাসা করলেন, কতদূর এগুলো ?

নিরুপমা কিছুই অগ্রসর হননি। দুটো মাস কি করে যেন ভাবতে ভাবতেই কেটে গেল !

ভদ্রমহিলা খুব বিব্রত হলেন এবং বোধ করি সেইজন্যেই খুব রেগেও গেলেন।

বললেন, দাঁড়াও বাপু। তোমার সবেতেই তাড়া। কিন্তু বলি কাকে ! সামনে পরীক্ষা। ওরা ঘুম নেবার ফুরসুত পাচ্ছে না। এর ওপর সুপ্রকাশ রোজ এসে ওদের পড়িয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষাটা ভালোয়-ভালোয় হয়ে যাক, তারপরে দেখা যাবে।

বনমালীবাবু হাসলেন। বললেন, তাই দেখ।

তাঁর বুঝতে বাকি রইল না, নিরুপমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। মেয়ের কাজ নয়। বরের সারথ্য তাঁকেই নিতে হবে।

সন্ধ্যাবেলায় অসীমাদের পড়াতে এসে সুপ্রকাশ দেখে অন্ধকার ঘরে দুজনে চুপচাপ বসে।

সভয়ে সুপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার ?

সুবর্ণ উঠে গিয়ে আলোটা জেলে দিলে। বললে, তোমার চা নিয়ে আসি সুপুদা।

সুপ্রকাশের ভয় কাটেনি। বললে, চা পরে হবে। আগে বল তো ব্যাপারটা কি।

—কিছুই নয়।—সুবর্ণ বললে।

—অন্ধকারে দুজনে বসেছিলে কেন ?

অসীমা বললে, ভয় করছিল।

—তাই অন্ধকারে ভয় ভাঙাচ্ছিলে ?

সুপ্রকাশের কণ্ঠস্বর খুব রূঢ় শোনাল। বৈসাদৃশ্য দেখে সুবর্ণ 'আসছি' বলে সরে পড়ল।

—অসীমা বললে, কি যে হবে সুপুদা, ভেবে আর দিশে পাচ্ছি না।

সুপ্রকাশ বললে, ফলের ভাবনাটা পরীক্ষার পরের জন্যে তুলে রাখ। এখন পরীক্ষার কথা ভাব।

—পড়তে ভালো লাগছে না।

—সে আবার কি !

—হ্যাঁ। তোমাকে ভয়ে বলিনি, পড়তে আমার কোনদিনই ভালো লাগে না।

—তবে পড় কেন ?

—তোমার ভয়ে।

সুপ্রকাশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমার ভয়ে? তার মানে?

—তুমি রাগ করবে বলে। নইলে আমি কবে পড়া ছেড়ে দিতাম।

অসীমা কেঁদে ফেললে।

সুপ্রকাশ ওর পাশে বসে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল: কিন্তু ভয় পেও না। আমি তোমাদের পড়াচ্ছি। আমি জানি, যা তোমাদের তৈরি হয়েছে তাতে অক্লেশে তোমরা পাস করে যাবে। আমার কথা বিশ্বাস কর।

কে বিশ্বাস করবে?

অসীমা টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বললে, তুমি তো পড়িয়ে চলে যাও। আমরাও ভাবতাম, পড়া মন্দ তৈরি হচ্ছে না। এখন দেখছি কিছু মনে নেই।

—সে কি?

—হ্যাঁ।

সুপ্রকাশ সুবর্ণকে ডাকলে। সে বোধ হয় দরজার আড়ালে লুকিয়েছিল। ডাক শুনে ভিতরে এল।

সুপ্রকাশ তাকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমারও মনে থাকছে না?

তারও চোখে জল। কথা বলবার শক্তি নেই। ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

সুপ্রকাশ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ল। তখন ওরা ইণ্টারমিডিয়েট পড়ে। সুপ্রকাশ ওদের পড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে ওরা সভয়ে বলেছিল, তোমার কাছে পড়লে ফেল করে যাব।

ক্ষুণ্ণভাবে সুপ্রকাশ বলেছিল, কেন? আমি কি পড়াতে পারি না?

—না। তা নয়।

—তবে?

—ফেল করে যাব।

অবশেষে তাই কি হতে চলেছে? না কি অতিরিক্ত পড়ার ফলে স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়েছে?

দুটোই হতে পারে। হয়তো ওর পড়ানো ওরা মন দিয়ে শোনে না। ও যখন বকে চলে তখন অন্য কথা ভাবে। কি হয়তো এত খাটছে যে, স্নায়ু সেই টান সহ্য করতে পারছে না।

অসীমা এবং সুবর্ণ দুজনে পড়াশুনায় ভালো। গত দুটো পরীক্ষাই ভালো করে পাস করেছে। তৃতীয় পরীক্ষার সামনে এসে এমন ভয় পেয়ে গেল কেন?

বললে, আজ পড়া থাক। চল একটু বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়?

—চল ব চলতে চলতে ঠিক হবে

—ঘিঞ্জি গুন্ডামো ওর বলতে

ছোক। অসীমা।

নিরুপমা এসে বললেন, কি ব'ব

—ওদের নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি

—বেশ তো।

স্বপ্রকাশ ওদের নিয়ে বেরুলো। রাস্তায় নেমে ওদের মনটা যেন একটু সুস্থ হল। ওরা হাঁটতে লাগল। অনেক দূর হেঁটে একটা ভাঙা রেস্তোরাঁয় ঢুকল। সেখানে চা-টা কিছু খেল।

—এখন কেমন বোধ হচ্ছে?

অসীমা বললে, ভালো।

সুবর্ণ বললে, আমরা রোজ আসব তো এই রকম বেড়ানো আর খাওয়া

জনগণের সেবায় নিয়োজিত সেই পুণ্যস্মৃত স্বদেশী যুগের

বঙ্গলক্ষ্মী

আজও জনগণের দ্বারা সমাদৃত

মাতৃপূজায় ও নিত্য ব্যবহারে

বঙ্গলক্ষ্মীর

ধুতি.....শাড়ী.....লংক্লথ

অপরিহার্য্য

ভারতের প্রাচীনতম গৌরবময় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

হেড অফিস—৭নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩

সুপ্রকাশ বললে, মাঝে মাঝে।

সুবর্ণ বললে, একদিন সিনেমায় যাব না? অনেক দিন যাইনি।

সুপ্রকাশ বললে, না। সে সব পরীক্ষার পরে। আজ গিয়ে পড়বে না। কালও না। পরশু আমি আসব।

একটা ট্যাক্সি করে ওদের সুপ্রকাশ বাড়ি পৌঁছে দিল।

॥ চৌদ্দ ॥

বনমালীবাবু কাজের লোক। নিশ্চেষ্টভাবে দীর্ঘকাল স্ত্রীলোকের উপর নির্ভর করে থাকার পাত্র নন।

তিনি হৃষিকেশবাবুর কাছে যথারীতি বিবাহের প্রস্তাব করে পত্র দিলেন এবং উত্তরের জন্যে দিন গুনতে লাগলেন। একথা নিরুপমাকে জানালেন না। পাড়াগাঁয়ের লোকগুলো বড় ঝঞ্ঝাটে। হৃষিকেশবাবু কি জবাব দেবেন কে জানে?

অনেকদিন অপেক্ষা করে করে হৃষিকেশবাবু এরকম চিঠির আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। গ্রামবাসীরাও অবাক হল: কি ব্যাপার! ভেস্তে গেল নাকি? দুর্জটিবাবু পর্যন্ত মাঝে মাঝে সুলোচনাকে তাগাদা দেন: কি গো তোমার দাদাবাবু-দিদির সে পাত্তা নেই?

সুলোচনা বলেন, তা আমি কি করব?

—করার কিছু নেই। ভাবছি, বিয়ে হয়ে গেল নাকি চুপি চুপি? একেবারে অন্নপ্রাশনের সময় খবর দেবে?

সুলোচনা ভয় পেয়ে যান: না, না। তাই কখনও হয়।

—হবে না কেন? কলকাতায় সবই হয়!

দুর্জটি হাসেন।

গ্রামের লোকেরও সেই সন্দেহ। এতদিন অবধি বিয়ে নিশ্চয়ই আটকে নেই। বিয়ে, নিজের পক্ষে বিয়ের মতন একটা-কিছু হয়ে গেছে। বাপকে সময়মত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একেবারে বৌ-ছেলে নিয়ে সুপ্রকাশ ঘরে ঢুকবে। একমাত্র বংশধর সন্তান। বাপ-মায়েরও না বুঝে উপায় থাকবে না।

—বাবা, সে লোক ঘুঘি চাটুয্যে নয়। তার কাছে ছেলেমেয়ের খাতির নেই। একমাত্র সন্তান হলেও না। সে হল বাঘের জাত।

কিন্তু বাঘও ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

কি হল? এতদিন ঘরে চুপ-চাপ থাকার মানে কি? মেয়ের বাপের যেন গা নেই। গ্রামে যে গুজব রটেছে, তাই কি শেষে সত্য হবে?

এই অবস্থায় বনমালীর চিঠি এল।

যিনি পাতায়-পাতায় বেড়ান তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে কখন মাটিতে নেমে এসেছেন!

হাসতে হাসতে চিঠি নিয়ে অন্দরে এলেন।

—এই নাও। বনমালীবাবু এতদিন পরে খবর নিয়েছেন?

কি লিখছেন?

অমলার মুখ কিন্তু তখন সাদা হয়ে গেছে। গ্রামে তো গুজবের ঠেলায় কান পাতা দায়। কে জানে কি লিখছেন!

হৃষিকেশবাবু বললেন, মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করেছেন। এতদিন পরে!

অমলার যেন গলা দিয়ে জল নেমে গেল! যে গুজব গ্রামে রটছে, দুজনেই শুনছেন কিন্তু নিজেদের মধ্যে গোপনেও আলোচনা করতে সাহস করছেন না, তা তাহলে সত্য নয়!

বিয়ে হয়নি এখনও! পরবর্তী অধ্যায়ও মিথ্যে।

অমলা বললেন, তুমি লিখে দাও আমাদের অমত নেই। এ নিয়ে যেন জমিদারী চাল চালতে যেও না।

হৃষিকেশবাবু হাসলেন। সর্বস্বান্ত লোক যেমন করে হাসে তেমনি ফিকা। বললেন, ছেলের কল্যাণে জমিদারী চাল কবে শেষ হয়ে গেছে। এখন গ্রামের মধ্যে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখরক্ষা করতে পারলে বাঁচি।

কিন্তু জমিদারী চাল সহজে যায় না।

হৃষিকেশবাবু পত্রের উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু তখনই তখনই নয়, দিনকয়েক পরে। যাতে বনমালীবাবু না মনে করেন তাঁর মেয়েকে নেবার জন্যে ওঁরা হাঁ করে বসে আছেন।

লিখলেন: মেয়ে আমাদের দেখা। ঘর জানা। আপনি আমাদের পুরাতন কুটুম্ব। সুতরাং কাজ অনেক হালকা হইয়াই আছে। শুধু শহরের মেয়ে পল্লীগ্রামে আসিয়া থাকিতে পারিবেন কি না জানা প্রয়োজন। আর ঘোটক-বিচারের জন্য আপনার কন্যার কোষ্ঠি, অন্তত একখানি পাঠাইবেন। অন্যান্য আলোচনা সাক্ষাতে হইতে পারিবে।

ঠিকুজী-কোষ্ঠি। একটুখানি জমিদারী চালের খোঁচা রইল। তা থাক, চিঠির ভাষা খুব সংযত, ভদ্র এবং গাম্ভীর্য-পূর্ণ। এই বিষয়ে হৃষিকেশবাবুর মনের মধ্যে যে উত্তাপ রয়েছে, তার চিহ্ন কোথাও নেই।

অমলা বললেন, বেশ লিখেছ।

বনমালীবাবু অপেক্ষা করে করে যখন হতাশ্বাসের প্রায় কিনারায় এসে পৌঁছেছেন তখনই হৃষিকেশবাবুর চিঠিখানি পেলেন। সংক্ষিপ্ত চিঠি, অথচ দু'বার তিনবার পড়লেন।

ঘর জানা। মেয়ে দেখা। সেদিক দিয়ে করার কিছু নেই। সাক্ষাতে আলোচনার জন্যেও চিন্তার কিছু নেই। বনমালীবাবু বিত্তশালী লোক। সুবর্ণ তাঁর একমাত্র সন্তান। দেওয়া-থোওয়ার কোনো ত্রুটি হবে না। তিনি সাধ্যাতিরিক্ত খরচ করবার জন্যে প্রস্তুত।

এই পর্যন্ত কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ঠিকুজি-কোষ্ঠী?

সুবর্ণর কোনো ঠিকুজি-কোষ্ঠী আছে কিনা সন্দেহ। নিরুপমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। যদি না থাকে, তাহলে কি হবে? সুবর্ণর জন্মমাস মনে আছে, জন্মবারও। কিন্তু সাল-তারিখ?

তারপর ঘোটক-বিচারে যদি মিল না হয়? শুধু পল্লীগ্রামেরই নয়, শহরের বহু লোকও ঘোটক-বিচারে বিশ্বাসী। যদি মিল না হয় তাহলে হৃষিকেশবাবু কোনো মতেই বিবাহ দিতে সম্মত হবেন না, এবং সুপ্রকাশকে দূর থেকেও যতটুকু তিনি চিনেছেন, তাতে পিতার অমতে সে যে বিবাহে সম্মত হবে, এমন মনে হয় না।

সেক্ষেত্রে কি করা যাবে?

বনমালীবাবু চিন্তিত হলেন। সবরকম সুবিধা সত্ত্বেও এমন সুন্দর একটি বিবাহ শুধু ঠিকুজি-কোষ্ঠীর অমিলের জন্যে ভেঙে যেতে পারে, এমন চিন্তা যন্ত্রণাদায়ক। সেই যন্ত্রণা বনমালীবাবু দেহে-মনে অনুভব করতে লাগলেন। নিরুপমাকে কিছু বলতে চান না। তাঁর মতে সে সময় এখনও আসেনি। সুতরাং সমস্ত যন্ত্রণা তাঁকে একা-একাই ভোগ করতে হল।

সুপাত্র কি আর নেই? লক্ষ্মী-সরস্বতীর কৃপা কি একমাত্র সুপ্রকাশের উপরই পড়েছে? নাই যদি হয়, এ বিয়ে কি এমন হবে?

কিন্তু না। শুধু নিরুপমারই নয়, সুপ্রকাশের উপর আরও কেমন একটা স্নেহদৃষ্টি পড়েছে। সবাই সুপ্রকাশকে স্নেহ করে,—নিরুপমা, অসীমা এবং সবচেয়ে যা লক্ষণীয়, স্বয়ং সুবর্ণও। সুপ্রকাশ এলে ওদের সকলের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বাড়ির আবহাওয়া বদলে যায়। না এলে গোটা বাড়িটাই কেমন ম্লান বোধ হয়।

ন'বছরে গৌরীদানের কাল পার হয়ে গেছে। এখন বড় বড় ছেলেমেয়ে। মেলামেশা যেটা সবচেয়ে বড় বিচার্য বিষয়, সেটা ঠিকুজি-কোষ্ঠী নয়, ছেলেমেয়ে উভয়ের মনোভাব।

কিন্তু সেই মনোভাব এবং দুটি সুকুমার মন নিয়ে মনোভাবের খেলা বনমালী যেমন জানেন, হৃষিকেশ তো তেমন করে জানবার সুযোগ পাননি। বনমালীও কিছু 'চলতি-হাওয়ার পন্থী' নন। বরং তাঁকেও হৃষিকেশের মতোই সনাতনপন্থী বলা যেতে পারে। শুধু সুবর্ণকে দেখে-শুনে তাঁর মত পরিবর্তন হয়েছে।

বনমালীবাবু ভাবতে লাগলেন, কি করা যায়।

বাড়িতে যদি সুবর্ণর কোষ্ঠী, কি একটা ছকও থাকে, সেটা এখনই পাঠিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। কে জানে সুপ্রকাশের কোষ্ঠীর সঙ্গে মিলবে কি না।

বনমালী কোনো ঝুঁকি নিতে রাজী নন।

দিন সাতেক অসহ্য দুশ্চিন্তা ও যন্ত্রণাভোগের পর তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এল: যদি কোনো প্রকারে সুপ্রকাশের কোষ্ঠীর একটা নকল, অন্তত তার জন্ম-সাল-তারিখ-সময় সংগ্রহ করতে পারেন, তাহলে প্রথমে সুবর্ণর কোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন। যদি মেলে তাহলে তো কথাই নেই।

যদি না মেলে তাহলে সুপ্রকাশের হুক অনুযায়ী একটা জাল-কোষ্ঠী অল্পেশে তৈরি করা যেতে পারে।

বনমালী ব্যবসায়ী মানুষ। তাঁর বিবেক অত্যন্ত দ্বিতিস্থাপক। মেয়েকে সুপাত্রে সম্প্রদানের জন্যে জাল-কোষ্ঠী প্রস্তুতে তাঁর কোনো দ্বিধা নেই।

কিন্তু সুপ্রকাশের কোষ্ঠী কি করে পাওয়া যায়?

মেয়েদের উপর বনমালীর আস্থা কম। ধূর্জটি যদি পারেন। তিনি খেলোয়াড় লোক। হৃষিকেশের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা চললেও মৌখিক সদ্ভাবের অভাব নেই।

বনমালী তাঁকে সমস্ত কথা জানিয়ে এবং বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন রাখবার অনুরোধ করে একখানি চিঠি দিলেন, এবং তার উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অন্যদিকে হৃষিকেশবাবুকে তাঁর পত্রের জন্যে অজস্র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে জানালেন, সুবর্ণর ঠিকুজি-কোষ্ঠী কিছুই নেই। একজন প্রসিদ্ধ নষ্ট-কোষ্ঠী-উদ্ধারকারককে তার কোষ্ঠী প্রস্তুতের জন্যে দিয়েছেন। হয়তো একটু বিলম্ব হতে পারে। হৃষিকেশবাবু মহানুভব ব্যক্তি। নিজ গুণে এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব যেন তিনি মার্জনা করেন।

মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকে না। নিরুপমাকে এ বিষয়ের কিছুই তিনি জানালেন না।

বনমালীবাবুর চিঠি পেয়ে ধূর্জটিবাবু হাসলেন।

না, যতটা ভাবা গিয়েছিল অবস্থা তত সঙ্গীন নয়। সুপ্রকাশের সঙ্গে সুবর্ণর বিবাহ হয়ে যায়নি। কিন্তু ব্যাপার সঙ্গীন না হলেও তার কাছাকাছি। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে বিবাহ হওয়াই চাই। আবশ্যক হলে জাল-কোষ্ঠীর সাহায্যেও। তাছাড়া কোনো পথ নেই।

নিষেধ থাকায় সুলোচনাকে তিনি কিছু বললেন না।

শুধু একদিন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, সুপ্রকাশের বয়স কত হল বলতে পার?

—তা, তেইশ-চব্বিশ হবে। কেন?

—এমনি জিগ্যেস করছি। তেইশ-চব্বিশ হবে?

সুলোচনা হিসাব করে বললেন তা হবে বই কি? সেবারে আশ্বিনের সেই ঝড় ঝড়ে দীঘির পাড়ের বটগাছটা পড়ে গেল, সেই অঘ্রাণে ও হয়েছে। ঝড় বাড়িতে নহবত বসল, মনে নেই?

নহবত এঁরা কথায়-কথায় বসান। সুতরাং কোন নহবত কবে বসল এতদিন পরে স্মরণ করা কঠিন। কিন্তু আশ্বিনের ঝড় ঝড়টা হিসাব করলে পাওয়া যেতে পারে।

সাল এবং মাস জানা গেল। যতদূর মনে পড়ে, বিকেলের দিকে সুপ্রকাশ ভূমিষ্ঠ হয়। আরও একটু চিন্তা করলে হয়তো মোটামুটি জন্ম-সময়টাও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তারিখ এবং বার?

বনবাদাড় ঝোপঝাড় পেরিয়ে পালকি চলে।

মৌরের মন চলে তারও আগে। সোঁদামাটি আর

শিউলি ফুলের গন্ধে মন আনচান। বাপের বাড়ীর দেশ আর কতদূর?

উত্তর মাদার দুরন্তের বাবা মহন্ত হোক

পূর্ব রেলওয়ে

উড়িষ্যার লোকশিল্পের নিদর্শন।

এ গ্রামের সমস্ত কোষ্ঠী সপ্ততীর্থ মহাশয় করেন। অনেক জন্ম-সাল ও তারিখ তাঁর খাতায় লেখা তাঁর উপর নির্ভরও করা যায়। নিষেধ করলে বিষয়টি তিনি গোপন রাখবেন।

ধূর্জটিবাবু একদিন সন্ধ্যায় নিরিবিলি তাঁকে ডেকে পাঠালেন।

—কি বাবা?

ধূর্জটিবাবু সশ্রদ্ধভাবে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন। তিনিও বিশুদ্ধ শাস্ত্র মতে আশীর্বাদ করলেন।

ধূর্জটিবাবু প্রথমে সপ্ততীর্থ মহাশয়ের পারিবারিক কুশল প্রশ্ন করলেন। তারপরে চতুষ্পাঠীর অবস্থা জানতে চাইলেন। তারপরে আরও নানা প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করে অবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের দুই বাড়ীর ঠিকুজি-কোষ্ঠী তো আপনারই তৈরি?

—হ্যাঁ বাবা। আমিই তো করি। শুধু তোমাদের দু'বাড়ির কেন, গোটা গ্রামেরই।

—তার কি কোন নকল রাখেন?

—নকল—সপ্ততীর্থ মহাশয় বেশ মোটা একটা টিপ নস্য গ্রহণ করে বললেন,—সকলের কোষ্ঠীর নকল হয়তো থাকে না। কিন্তু তোমাদের দু'বাড়ির তো থাকবার কথা।

—একটু কষ্ট করে খুঁজে দেখবেন?

—এর আর কষ্ট কি বাবা। নিশ্চয়ই দেখব। কারও কোষ্ঠী কি হারিয়েছে?

ধূর্জটিবাবু বললেন, আপনি আমাদের পিতৃতুল্য এবং উভয় পরিবারেরই শুভাশুধ্যায়ী। আপনার কাছে গোপন করার কিছু নেই। যদিও বিষয়টি খুবই গোপনীয়। কর্ণান্তরে যেন না যায়।

সপ্ততীর্থ মহাশয় নিজে বিশুদ্ধ বাংলা বলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সময় হৃষিকেশবাবু এবং ধূর্জটিবাবু উভয়েই তাঁর অনুকরণে যথাসাধ্য বিশুদ্ধ বাংলাই ব্যবহার করে থাকেন।

সপ্ততীর্থ মহাশয় আশ্বাস দিলেন, তুমি নিশ্চিন্তে সমস্ত কথা বলতে পার। কর্ণান্তরের কোনো আশঙ্কা নেই।

ধূর্জটিবাবু বললেন, বিষয়টি বিবাহঘটিত। কিছু কিছু হয়তো আপনিও শুনে থাকবেন। সেই উপলক্ষ্যে সুপ্রকাশের কোষ্ঠীর নকল, অন্তত ছকের নকল প্রয়োজন। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

সপ্ততীর্থ মহাশয় হো হো করে হেসে উঠলেন: জানি, জানি। আর বলতে হবে না। কিছু কিছু আমার কর্ণেও প্রবেশ করেছে। এ আর বেশি কথা কি। বিবাহ ব্যাপারে এসবের প্রয়োজন তো উভয়পক্ষেরই হয়ে থাকে। আমি দেখব। আমার বিশ্বাস, নকল আমার কাছে আছে। আমি দুয়েক দিনের মধ্যেই জানাব।

ধূর্জটিবাবু বললেন, আপনার অনুগ্রহ। কন্যার পিতার অবস্থা তো বুঝতে পারছেন, পাত্রের পিতার কাছে চাইবার সাহস নেই। তাই আমাকে লিখেছেন। অবশ্য এর জন্যে উপযুক্ত প্রণামী আপনি পাবেন।

উঠতে উঠতে সপ্ততীর্থ মহাশয় বললেন, আর বলতে হবে না। আমি সমস্তই বুঝতে পেরেছি।

দুর্জটিবাবু তাঁর পিছু পিছু চলতে চলতে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন যে বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয়। কোনো প্রকারে যেন কর্ণান্তরে না যায়।

সে বিষয়ে সুনিশ্চিত আশ্বাস দিয়ে সপ্ততীর্থ মহাশয় প্রস্থান করলেন।

॥ পনেরো ॥

২৮শে জানুআরি।

২৪শে জানুআরি পর্যন্ত সুপ্রকাশ অসীমাদের পড়িয়েছে। ২৫শে সে এল না। ২৬শেও না। এমন কি তার পরের দিনও না। ওরা ভাবলে অসুখ-বিসুখ কিছু হয়তো সুপ্রকাশের হয়ে থাকবে। ২৮শে সকালে ওরা সুপ্রকাশের জন্যে চিন্তিত হল।

নিরুপমাও ওদের তিরস্কার করলেন, যে রোজ পড়াতে আসে, সে আজ চারদিন এল না, একবার খবর নেওয়াও দরকার ছিল না?

বনমালী উপর থেকে ঠক ঠক করে নেমে এলেন। হাতে খবরের কাগজ। সেইটে নাড়তে নাড়তে নেমে আসছেন।

বললেন, তার দরকার হবে না। সে আলিপুরের সেন্ট্রাল জেলে।

নিরুপমা প্রায় চীৎকার করে উঠলেন: জেলে কি গো?

বনমালী বললেন, এই দেখ না। ২৬শে জানুআরি স্বাধীনতা দিবসে যারা ময়দানে পতাকা তুলতে গিয়েছিল, সুপ্রকাশ তাদের একজন। কাল বিচারে তার এক বৎসরের জেল হয়েছে।

বনমালী উত্তেজনায় কাঁপছিলেন।

ওরা সমস্বরে বলে উঠল: এক বৎসর!

—হ্যাঁ। আপীল করতে পারত। কিন্তু আপীল করছে কে? ওরা কোর্টে আত্মপক্ষ সমর্থনও করেনি।

সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

গত চার দিন যে সুপ্রকাশ আসেনি, সে জ্বরের জন্য নয়, অন্য কোনো অসুস্থতার জন্যও নয়। সে জেলে গেছে। অসীমারা কেউ ঘুণাক্ষরেও তার কিছু জানতে পারেনি।

ওরা নিঃঝুম হয়ে গেল।

সুপ্রকাশদের উপর ভার পড়েছিল, ময়দানে পতাকা উত্তোলনের। সকাল থেকে পুলিস জায়গাটা ঘিরে রেখেছিল। পকেটে পতাকা পুরে দর্শকের মতো ওরা সেইখানে ছড়িয়েছিল।

নির্দিষ্ট সময়ে 'বন্দেমাতরম' বলে লাফিয়ে ওরা পুলিস বেষ্টনী ভেদ করে। পুলিস সঙ্গে সঙ্গে বেটন হাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সকলেই অল্প-বিস্তর আহত হয়।

সুপ্রকাশের মাথায় চোট লাগে।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিস-ভ্যানে ওদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে লালবাজার হাজতে। পরদিন কোর্টে হাজির করা হয়।

বিচারে সকলের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। দলের নেতা হিসাবে সুপ্রকাশের এক বৎসর সশ্রম। সেই খবরটা আজকের কাগজে বেরিয়েছে।

নিরুপমা কাঁদতে কাঁদতে রান্নাঘরে চলে গেলেন। অসীমারাও চোখ মুছতে মুছতে পড়ার ঘরে। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বনমালীবাবুও অফিসঘরে গিয়ে বসলেন।

হাতে সেই বজ্রগর্ভ সংবাদপত্র।

এ কী হল!

কাল সন্ধ্যায় বনমালীবাবু জ্যোতিষীর বাড়ি গিয়েছিলেন। সুবর্ণর কোষ্ঠী পরিবর্তনের কিছুমাত্র আবশ্যক নেই। ধূর্জটিবাবু সুপ্রকাশের যে কোষ্ঠী পাঠিয়েছিলেন তার সঙ্গে সুবর্ণর কোষ্ঠী বিচার করে দেখা গেছে, দুজনে রাজ-যোটক হয়েছে। বনমালী স্বচ্ছন্দে সুবর্ণর কোষ্ঠীর নকল হৃষিকেশবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

সেইমত আজ সকালের ডাকে হৃষিকেশবাবুর কাছে সুবর্ণর কোষ্ঠী পাঠাবার কথা। সেই সঙ্গে ধূর্জটিবাবুকেও সমস্ত খবর জানানো।

ইতিমধ্যে বজ্রাঘাত!

দেবীপুরে খবরের কাগজ যায় কোথ হয়। গেলে আজ বিকেলেই হৃষিকেশবাবুরা এই সুসংবাদ পেয়ে যাবেন এবং সেখানেও কান্নাকাটি পড়ে যাবে।

এ সময় কোষ্ঠী পাঠানো নিরর্থক।

বনমালীবাবু বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা জানিয়ে একখানা চিঠি ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ধূর্জটিবাবুকে রাজ-যোটকের কথা বিস্তৃতভাবে জানিয়ে এই সঙ্গে পৃথক পত্র দিলেন।

আবার সেই জেল।

এবং এক বৎসরের সশ্রম!

জেলে সময় অত্যন্ত একঘেয়ে ঢিমে তালে চলে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত মাপা যায়। জেলের এক বৎসর, সুপ্রকাশ জানে অনেকদিন। একটি একটি করে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন। মিনিট-সেকেণ্ডের হিসেবে আরও অনেক দিন।

দণ্ডিতের সংখ্যা কয়েক শত হবে। কাউকে কিছু বলতে হল না। সবাই এসে নিজের নিজের পুরোনো ঘরে পরিচিত বিছানায় দিব্যি শুয়ে পড়ল। পরদিন থেকে নরক গুলজার!

কিন্তু তথাপি জেলের এক বৎসর অনেকদিন। সরসরম ভাবটা কয়েকদিনের মধ্যে কেটে যায়। তখন পরিচিত অন্ধকারে প্রত্যেকের কথা। কথা ফুরিয়ে আসে।

তখন একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন মুহূর্ত। প্রত্যেকটি মুহূর্ত একই রকম। সময় যেন চলছে না। একই জায়গায় ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। তাদের সমষ্টি যে দিনরাত্রি, তারও সেই একই অবস্থা।

সুপ্রকাশের মনে হয়, সময় যেন একটা পূতিগন্ধময় বদ্ধ জলাশয়। তার সামনে একা সে নিস্তব্ধ বসে।

দেখা যাচ্ছে, দিন যায় রাত্রি আসে, জীবন চলেছে গতীর থেকে গতীরে। কিন্তু মনে হয়, দিনরাত্রি ঠায় দাঁড়িয়ে। সেই সঙ্গে জীবনও।

বিষ্ণুপদ সকল সময়ই ব্যস্ত। এ-ওয়ার্ড থেকে সে-ওয়ার্ড, সেখান থেকে অন্য ওয়ার্ড। তার আর বিশ্রাম নেই।

হঠাৎ এক সময় হন্তদন্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কাছে ঘড়ি আছে? কটা বাজে সুপ্রকাশ?

—বাজে!—সুপ্রকাশ হেসে বললে—বাজছে না।

—কেন? ঘড়ি বন্ধ?

—হ্যাঁ। সমস্ত ঘড়ি। আমাদের পৃথিবীর সমস্ত ঘড়ি। সেই সঙ্গে আমাদের পৃথিবীও।

বিষ্ণুপদ হাসলে: তোমার ভালো লাগছে না, না?

—মোটেই না।

—মন-কেমন করে?

—খুব।

—বাপ-মার জন্যে?

—না।

—তবে?

সুপ্রকাশ বললে, বিশেষ কোনো ব্যক্তির জন্যে নয়, সমস্ত পৃথিবীটার জন্যে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, এখানে এসে টের পাই এর বুড়ো হাড়ে ঘুন ধরেছে। এর আর কিছু নেই।

সুপ্রকাশ হাসতে লাগল।

বিষ্ণুপদ বললে, সুপ্রকাশ চুপ করে বসে থেকো না। এখানেও কাজ করবার আছে। কাজ কর।

—না।

—না কেন?

হাত জোড় করে সুপ্রকাশ বললে, এখানে আর কাজের কথা বোলো না বিষ্ণুদা। কাজ ফেলে এসেছি জেলের বাইরে। এখানে এই জরাজীর্ণ ঘুণধরা বুড়ো পৃথিবী আর মুমূর্ষু মানুষ,—মুখোমুখী নিশ্চেষ্ট নিশ্চল বসে থাকা,—এই।

সুপ্রকাশ কিছুই করে না। কোথাও যায় না। কারও সঙ্গে বিশেষ কথাও বলে না। শুধু বারান্দায় বসে থাকে। দেখে—

সুমুখে ন্যাড়া গাছটির নিচে সারি বেঁধে কয়েদীরা পরমোল্লাসে লপসি খাচ্ছে।

তার ডালে একটা চিল দম্পতি বাসা বেঁধেছে। বাসার মুখে বসে সতর্ক পাহারা দেয় মা। বাসার ভিতর থেকে বাচ্চাটা মাঝে মাঝে মুখ বার করে,—গাছটার মতোই ন্যাড়া, কদাকার ছোট্ট একটা মাথা।

দূরের একটা ডালে নিস্পৃহভাবে বসে থাকে চিলের দার্শনিক বাপ। মাঝে মাঝে হঠাৎ উড়ে যায়। ফিরে আসে ঠোঁটে করে বাচ্চার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে। মায়ের কাছে বাসার দোরগড়ায় নামিয়ে দিয়ে আবার পরম দার্শনিক ভঙ্গীতে দূরের ডালটিতে বসে।

তাদের পিছনে লেগেছে একটি বাবলাগাছ। তাদেরও বাসা করার সময় এসেছে। কিন্তু তার পরিশ্রম স্বীকার করতে চায় না। চুপি চুপি এসে চিলের বাসার কাঠি চুরি করে পালায়। মা-চিল তাড়া দেয়। সতর্ক প্রহরা। তবু কিছু কিছু প্রতিবারই চুরি যায়।

এই পৃথিবী। এখানে নতুন কিছু সৃষ্টি হয় না। পুরোনো মাল হাতবদলে নতুন রূপ নেয়।

নিচের রাস্তা দিয়ে মানুষ চলে। জেলের মানুষ। কিন্তু যেন কলের মানুষ। ওরা চলছে না। অন্যে চালাচ্ছে।

সুপ্রকাশ নড়ে না। শুধু দোতলার বারান্দায় বসে বসে দেখে। সেলবারের থেকে এবারে তফাত শুধু এইটুকু যে, সে কাঁদে না;—কারও জন্যেই না। হাসে। সমস্ত সময়ের জন্যে তার ঠোঁটে বিদ্রূপমাখা একটুকরো হাসি। ঝকঝকে ধারালো।

আর আপন মনে আবৃত্তি করে :

"বল্ সন্ন্যাসী, মুখ ফুটে বল্,
কে কোথা ডুবিয়া খেয়েছিস জল.
কিছুতে পড়ে না শিবের মাথার পূজার ফুল।
বিশ্বভুবন চড়কে ঘুরিয়া হল বিভুল!"

আবৃত্তি করে :

"মরণে কে হবে সাথী?
প্রেমধর্ম জাগিতে পারে না, বারোটার বেশি রাতি।"

পুলিস রিপোর্টের ফলে সুপ্রকাশ প্রথম শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য হল। অসীমাদের পরীক্ষা হয়ে যাবার পর ওরা একদিন জেলে সুপ্রকাশের সঙ্গে দেখা করতে এল।

জেলের প্রথম ফটক পেরিয়েই বাঁদিকের যে ঘর সেখানে শতরঞ্চ পাতা। একজন পুলিস

গল্প-ভারতী

নিরুপমাদের সেইখানে বসাল। সামনে কোণের দিকে একখানা ছোট টেবিল আর চেয়ার। সেখানে বসে মোম দিয়ে মাজা গোঁফওয়ালা একজন পুলিস।

পরে আরও কয়েকটি দল এসে পৃথক পৃথক গুচ্ছে বসল। প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীরা নিজের নিজের আত্মীয় দলের মধ্যে একে একে এসে বসে মন খুলে দিল।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘর থেকে প্রচুর কোলাহল উঠছে।

অন্য দল থেকে কে একজন জিজ্ঞাসা করলে, ওখানে অত গোলমাল কিসের?

উত্তরে শুনলে, ওখানে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের সঙ্গে ওদের আত্মীয়-স্বজনদের কথা হচ্ছে।

—অত জোরে জোরে কেন?

—সময় সংক্ষেপ। সবাই ওইটুকু সময়ের মধ্যে যত কথা আছে সবই বলতে চায়, একসঙ্গে। একটা তারের জালের এক পারে কয়েদীরা, অন্য পারে আত্মীয়-স্বজন। একসঙ্গে এত লোক কথা বলছে যে, আস্তে কথা শোনা যাবে না। তাই অত হট্টগোল।

অসীমাদের মন খারাপ হয়ে গেল। মাসে একটিবার দেখাশোনা। রাজনীতি নয়, নিতান্ত ঘরোয়া তাতে ইংরেজ-রাজত্ব উলটে যাবার আশঙ্কা নেই। তাতেও এত সতর্কতা!

এমন সময় সুপ্রকাশ এল।

গায়ে গিলে-করা মিহি খদ্দরের পাঞ্জাবি, তার উপর চাদর, পরনে কোঁচানো খদ্দরের ধুতি। হাসতে হাসতে এসে নিরুপমার পায়ের ধুলো নিলে। নিরুপমাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর গা-ঘেঁসে বসল।

ওরা অবাক! এমন বাবু বেশে সুপ্রকাশকে কখনও ওরা দেখেনি। এমন উচ্ছ্বসিতও না।

নিরুপমার বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না।

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছ?

—কি রকম মনে হচ্ছে?

—ভালো।

—হ্যাঁ, ভালোই আছি।—বলেই অসীমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে,—বাড়ির কোনো খবর জান? মায়ের? বাবার? এখানে এসে পর্যন্ত আমি কোনো চিঠি পাইনি।

নিরুপমার মনে হল, সুপ্রকাশ একটু যেন চঞ্চল, প্রগলভ। একসঙ্গে এত কথা, দৃষ্টির চঞ্চলতা, এসব তার ছিল না।

অসীমা বললে, ভালো আছেন। বাবা মধ্যে কলকাতায় এসেছিলেন। জ্যাঠামশাইও।

সুপ্রকাশের চোখটা হঠাৎ করে জ্বলে উঠল: মামলাসূত্রে বোধহয়? হাইকোর্টে মামলা-মোকদ্দমা—

অসীমা বললে, হ্যাঁ।

—থাক, আর বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি।

সুপ্রকাশের স্বাস্থ্য খারাপ হয়নি। বরং একটু ভালোই বোধ হয়। কিন্তু চোখের কোলে কালি পড়েছে। তার আড়ালে তার বড় বড় চোখে কেমন একটা অস্বাভাবিক জ্বালা।

জিজ্ঞাসা করলে, পরীক্ষা কেমন দিলে?

—ভালোই তো মনে হয়।

—ডিস্টিংশন পাবে?

ওরা হেসে উঠল: তা জানি না।

—পাবে। তার কারণ, আমি পড়াইনি।

—আহা!

সত্যি। এখানে বসে যখন ভাবি, স্পষ্ট দেখতে পাই, আমি বকে যাচ্ছি আর তোমরা আমার মুখের দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে আছ। আমার কথাগুলো এক কান দিকে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

অসীমা হেসে ফেললে: তাও দেখতে পাও?

—পাই বই কি। ধোঁয়ার মতো গোল-পাকানো কথা, একান দিয়ে ঢুকে ওকান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। যাক সে, পরীক্ষার পরে কি কি নতুন বই দেখলে?

অসীমা সুবর্ণর দিকে চাইলে, সুবর্ণ অসীমার দিকে।

নিরুপমা বললেন, তুমি এখানে আসার পর থেকে ওরা কোনো বই দেখতে পায়নি।

—কেন?

—ওদের জিজ্ঞেস কর।

সুপ্রকাশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতেই ওরা মুখ নামালে।

হেসে সুপ্রকাশ বললে, সে কি কথা! আমি জেলে আছি বলে তোমরা আনন্দ করবে না! হবে না। মাসীমা, ওদের নিয়ে আপনি বেরুবেন মাঝে মাঝে।

মাসীমা কোন সাড়া দিলেন না।

সুপ্রকাশ বললে, অসীমা, আমরা যখন জমিদারীর মালিক হব তখন মামলা-মোকদ্দমার চিহ্ন রাখব না, কি বল?

অসীমা হাসলে।

ওঠবার সময় নিরুপমা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা-বাবাকে কিছু জানাতে হবে?

সুপ্রকাশ এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। ধীরে ধীরে তার মুখের উপর একটা কালো ছায়া নামল। বললে, না।

॥ ষোলো ॥

মানুষ অনেকগুলি সত্তার সমষ্টি। সে উদার, সে সংকীর্ণ। সে দাতা, সে সবই। বিশেষ বিশেষ আবেষ্টনে বিশেষ সত্তা প্রাধান্য লাভ করে।

জেলের মধ্যে এসেই সুপ্রকাশ সমস্ত কিছুর উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যেই জেলের বাইরে এসে উন্মুক্ত নির্মেঘ আকাশের দিকে চাইলে, অমনি তার মনে প্রসন্নতা এল। শরতের দাক্ষিণ্যের স্পর্শে মন প্রসারিত হল।

যখন সে জেল-ফটকের বাইরে এল তখন বেলা দুটো। একজন কালভু তার বাক্স-বিছানা ফটকের বাইরে নামিয়ে দিলে আবার ভিতরে ঢুকে গেল।

বাইরের মুক্তির মধ্যে এসে সে একবার ঊর্ধ্বাকাশের দিকে, একবার সম্মুখের চলমান ট্রাম-বাসের দিকে চাইলে।

দিনটা বোধ হয় শারদীয়া পঞ্চমী।

আকাশের গায়ে লঘু শাদা মেঘের মন্থরতায় ছুটির বার্তা লেখা। জনতার চঞ্চলতায় সেই আনন্দ যেন ঝিলমিলিয়ে উঠেছে। চারিদিকে কাজ শেষ করার অপরিসীম তাড়া পড়ে গেছে।

সুপ্রকাশ যেন কার প্রত্যাশায় একটু বিলম্ব করলে। কর্মব্যস্ত অপরিচিত জনতার মধ্যে কাকে যেন খুঁজলে।

কিন্তু মিথ্যে খোঁজা।

সে যে আজ ছাড়া পাবে তা অসীমা কি সুবর্ণ কারও জানার কথা নয়। বস্তুত, সকাল ন'টা পর্যন্ত সে নিজেই জানত না যে, আজকে ছাড়া পাবে। হিসাবমত তার ছুটি পেতে এখনও মাস দুই দেরি। কিন্তু দিল্লীর কর্তাদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কি যেন একটা আপোষের আলোচনা চলছে। তাই সরকার একে একে রাজনৈতিক বন্দীদের ছাড়তে আরম্ভ করেছেন। এ মুক্তি নিতান্তই অপ্রত্যাশিত।

সুপ্রকাশ তার বালপত্র নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠল, এবং একটু পরেই তার হোটেলে এসে উপস্থিত হল।

কে জানে, অসীমা এখনও কলকাতায় আছে কি না। জেলের মধ্যেই অসীমাদের পাসের খবর সুপ্রকাশ পেয়েছিল। ঘূর্জটিবাবুর আপত্তি (এবারে প্রবল আপত্তি) সত্ত্বেও অসীমারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। নিরুপমার সাহায্যে নয়, নিজের জোরে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গেছে।

তবু একবার চেষ্টা করতে দোষ নেই। হাত-মুখ ধোয়ার আগেই সুপ্রকাশ তাকে টেলিফোন করতে গেল:

হ্যালো, আমি সুপ্রকাশ। অসীমা আছে?

হ্যালো, সুপুদা! কি আশ্চর্য! কখন ছাড়া পেলে?

আধঘণ্টা আগে। শোন, আমি ভেবেছিলাম তুমি বাড়ি চলে গেছ।

দাদারই কথা। এখন দেখছি, একসঙ্গে যাব বলেই বোধ হয় আটকে গেছি। এক মিনিট দাঁড়াও।

সুপ্রকাশের মনে হল, অসীমা যেন কার সঙ্গে বলতে গেল। একটু পরেই আবার তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

হ্যালো, সুপুদা, শোন।

বল।

মাসীমা বলছেন, 'তুমি আজকে এখানেই খাবে। এখান থেকে সন্ধ্যার গাড়িতে দু'জনেই বাড়ি যাব। তুমি কোথায় উঠেছ?

হোটেলে।

তাহলে জিনিসপত্র নিয়ে এখনই চলে আসছ তো? সময় বেশি নেই কিন্তু। সবাই সাগ্রহে তোমার প্রতীক্ষা করছে।

সুপ্রকাশ হাতঘড়িটা দেখলে। সময় বেশি নেই সত্যি।

বললে, জিনিসপত্র আর কি? সুটকেসটা শুধু।

তবে আর কি! চলে এস। দেরি কোরো না। বুঝলে?

যে আজ্ঞে।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে শিস দিতে দিতে সুপ্রকাশ বেরিয়ে এল। বিছানাটা যেমন বাঁধা আছে থাক। শুধু দাড়িটা কামাতে হবে। আর বেশ ভালো করে সাবান মেখে একটা স্নান। এই ক'মাসের কারাজীবনে যে ক্লেদ তার দেহ-মনে সঞ্চিত হয়েছে, তা নিশ্চিহ্ন করে ধুয়ে ফেলা দরকার।

নিরুপমার বাড়িতে আন্তরিকতার অভাব কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু এবারে যেন একটু বেশি-বেশি মনে হল। সুপ্রকাশ আসবে বলে বাড়িতে যেন ধুমধাম পড়ে গেছে। গৃহস্থ-গৃহে জামাই এলে যেমন হয়।

নিরুপমা একপ্রস্থ কাঁদলেন। সে কিছু নয়। কিন্তু বনমালীবাবু এতকালের মধ্যে কখনও সুপ্রকাশের সামনে এসে দাঁড়ান নি। তিনিও উৎসাহের সঙ্গে নেমে এসে কুশল-প্রশ্ন এবং আশীর্বাদ করলেন।

হাতে সময় বেশি নেই।

অসীমা সেজেগুজে তৈরি। কিন্তু সুবর্ণ আটপৌরে পোশাকে একপাশে দাঁড়িয়ে।

সুপ্রকাশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি যাবে না সুবর্ণ।

সে উত্তর দেবার আগেই নিরুপমা বললেন, সবাই চলে গেলে আমরা থাকব কি করে?

বনমালী সপ্রশংস দৃষ্টিতে গৃহিণীর দিকে চাইলেন। মেয়েদের বুদ্ধির উপর এই প্রথম তাঁর শ্রদ্ধা এমন দুঃসই জবাব তিনি দিতে পারতেন বলে মনে হল না।

জবাবটা নিরুপমা এখনই তৈরি করেন নি।

অনেকদিন পরে সুপ্রকাশ এল। অসীমা যাচ্ছে। সুবর্ণরও খুব ইচ্ছা ছিল যাওয়ার। কেলিকদম্বের নিচে শরতের স্নিগ্ধ ছায়ায় আবার কতদিন পরে আড্ডা বসবে। সেই লোভ বড় সহজ নয়।

সেও জেদ ধরেছিল যাবার জন্যে। তাকেও নিরুপমা ওই একই উত্তর দিয়েছিলেন। পূজার সময় বাপ-মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সে এর পরে আর কিছু বলতে পারেনি।

অথচ তাকে না পাঠানর আসল কারণটা শুধু দুজনে জানেন, বনমালী আর নিরুপমা। আর কেউ না। অসীমা তো নয়ই, এমন কি সুবর্ণও না।

সুপ্রকাশ ফিরে এল। এবারে অগৌণে বিবাহের কথাবার্তা পাকাপাকিভাবে আরম্ভ হবে। এ সময় সুবর্ণর দেবীপুর যাওয়া সঙ্গত হবে না।

নিরুপমার উত্তরের পরে সুপ্রকাশও আর কিছু বলতে পারলে না। এ সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে মায়ের কাছে আসে। মায়ের কাছ থেকে যাবার সময় এটা নয়।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরেই অসীমা এবং সুপ্রকাশ ট্যাক্সি করে স্টেশনে ছুটল। তাড়াতাড়ি দুখানা টিকিট কেটে ওরা গাড়িতে এসে বসল, তার মিনিট দুয়েক পরেই ট্রেন ছেড়ে দিলে।

ভিড়টা ষষ্ঠীর দিন যেমন হয়, পঞ্চমীর দিন তেমন নয়। ওদের প্রথম শ্রেণীর কামরায় পাঁচ-ছ'জন ছিলেন। কিছুদূর গিয়ে তাঁরাও নেমে গেলেন।

চারিদিক চাঁদের আলোয় ফুটফুট করছে। অঘ্র-হাওয়া মিষ্টি হাওয়া যেন গায়ে হাত বুলোচ্ছে। লাইনের পাশে কাটিংএর চাষ অতি দ্রুত দুব-সাঁতার কাটছে। দুলে দুলে কাশফুলগুলি যেন তাদের হাত-ইসারায় ডাক দিচ্ছে।

অসীমা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি যাচ্ছ, বাড়ির লোকেরা জানেন?

সুপ্রকাশ হেসে বললে, কি করে জানবেন? আজ সকাল ন'টা পর্যন্ত আমি নিজেই জানতাম না। কিন্তু কি আশ্চর্য জানো, বেরিয়ে এসেই চারিদিকে চাইলাম, তোমার খোঁজে। মনে হল, যদি কোনো জাদুমন্ত্রে খবরটা জেনে তুমি উপস্থিত থাক তো বেশ হয়।

—তবু তো গেলে আমায়। কিন্তু যদি আমি মহালয়ার দিনেই চলে যেতাম!

ঊর্ধ্বাকাশের বাঁকা-চাঁদ, ঢেউ খেলানো সবুজ ধানের ক্ষেত এবং শুভ্রশীর্ষ কাশবনের দিকে চোখ সুপ্রকাশ বললে, তাহি বিপ্রী লাগত তাহলে। বাড়ি যাওয়ার আনন্দই পেতাম না।

—অথচ মহালয়ার দিন না যাবার কোনো কারণ ছিল না। মাসীমার অসুখ, কিন্তু সে কিছুই নয়। অথচ রয়ে গেলাম। এখন বুঝছি কেন?

—কেন বল তো ?

—কি জানি কেন !

জানালার বাইরে চেয়ে অসীমা টিপে টিপে হাসতে লাগল।

একটু পরে অসীমা বললে, এবারে তোমার শরীর ভালো দেখাচ্ছে না তো ?

—না। তোমরা যেদিন দেখা করতে গেলে তার দিনকয়েক পরে জ্বরে পড়েছিলাম। তার থেকে মাঝে মাঝেই জ্বর হচ্ছিল। মোটে পাঁচ-ছ'দিন হল পথ্যি করেছি।

একটা উদ্বিগ্ন দৃষ্টি ওর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে অসীমা জিজ্ঞাসা করলে, তাহলে ? খবর দাওনি, পথ আসবে না। অতখানি পথ এই শরীরে যাবে কি করে ?

—কলকাতায় যেমন করে যাই। হেঁটে।

—কিন্তু তোমার শরীর যে দুর্বল।

সুপ্রকাশ হাসলে : এখনও যা আছে তাতে আমার সুটকেস, তোমার সুটকেস, এমন কি ওপরে তোমাকে বসিয়েও ওই পথটা হেঁটে যেতে পারি, জানো ?

অসীমা আশ্বস্ত হল না : জানি। তুমি খুব বীরপুরুষ !

বলে জানালার বাইরে চেয়ে রইল।

সুপ্রকাশ একখানি হাত ধীরে ধীরে ওর কাঁধের উপর রাখলে। তাতেও অসীমা সাড়া দিলে তেমনি নিঃশব্দে বাইরে চেয়ে রইল।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, পরের স্টেশনে বাড়িতে একখানা টেলিগ্রাম করে কখন পাবে ?

—আমরা বাড়ি পৌঁছবার আধ ঘণ্টা পরে।

অসীমা রাগতে গিয়েও হেসে ফেললে।

বললে, আমাদের বাড়ি পৌঁছুতে আর কতক্ষণ লাগবে ?

—ঘণ্টা দেড়েক।

—ভালোই হবে। তোমার সামনে দিয়ে পালকি করে আমি চলে যাব। পিছু পিছু সুট মাথায় করে তুমি এস।

বলেই বললে, আর ভাবতে পারি না। একটু শুই।

অসীমা ক্লান্তিভরে সেইখানে শুয়ে পড়ল। ওর মাথাটা সুপ্রকাশ পরম স্নেহে নিজের কো তুলে নিলে। অসীমা বাধা দিলে না। একটু হাসল।

কিন্তু স্টেশনে যখন ওরা নামলো, অসীমা কিছুতেই পালকিতে উঠল না। শুধু সুটকেস তাতে তুলে দিলে।

—পালকিতে যাবে না ?

—না। তোমার সঙ্গে হেঁটে যাব।

—চমৎকার! আর দু'জনের বাড়ির কথা তো জান।

বিরক্তিভাবে অসীমা বললে, আমি কিছুই জানি না সুপ্রভা। হাঁটবার কথা ভাবতেই আ জ্বর আসছে। কিন্তু এই রাতে ওই শরীরে তোমাকে এতখানি পথ একলা হেঁটে যেতে কিছু দোব না। চল।

বলে নিজেই আগে আগে হাঁটতে সুরু করলে।

॥ সতেরো ॥

মহাসমারোহে সপ্তমী পূজা হয়ে গেল।

সেবোত্তরের পূজা। সেবাইত হিসাবে হৃষিকেশবাবু এবং ধূর্জটিবাবু উভয়েই পূজার সময় প শরে উপস্থিত থাকেন। পরস্পরের মধ্যে মৌখিক কোনো অদ্ভাব নেই। দেখলে বোঝবার উ নেই যে, তাঁদের মধ্যে মোটা দশেক জটিল মামলা চলছে।

ধূর্জটিবাবু বললেন, সুপ্রকাশের শরীরটা বড় খারাপ দেখলাম বড়দা। সেবারে শরীরটা ভালোই দেখেছিলাম।

বিরক্তভাবে হৃষিকেশবাবু বললেন, ওর কথা আর বোলো না ভায়া। বলছে তো জ্বর হয়েছি কি হয়েছিল ওই জানে।

—কলেজের চাকরিটা আছে তো?

—কিছুই জানি না ভাই।

ধূর্জটিবাবু মনে মনে হাসলেন: থাকুক আর না থাকুক; এখন আর ছাড়বেন না। মা হাতে খেয়ে শরীরটা একটু সারুক। আহা, অমন সুন্দর ছেলে, যেন সোড়া-কাঠ হয়ে গিয়েছে।

—দেখি।

ধূর্জটিবাবু বললেন, নতুন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে এখনও আপনার পরিচয় হয়নি। ভীষণ কংগ্রে বিদ্বেষী। সেদিন বলছিলেন।

এমন সময় টেলিগ্রাম এল একখানা হৃষিকেশবাবুর। সই করে তিনি টেলিগ্রামটা প লালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। হৃষিকেশবাবু চীৎকার করে দিলেন: ওকে ধুতি-চাদর আর পাঁচটা টাকা বখশিস দাও।

ধূর্জটিবাবুর পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা ক্রমেই কঠিন হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের টেলিগ্রাম

হৃষিকেশবাবু টেলিগ্রামটা তাঁর সামনে ফেলে দিলেন।

পড়তে পড়তে ধূর্জটিবাবুর মুখ কালো হয়ে গেল। প্রিভি কাউন্সিলের মামলায় হৃষিকেশ যার খরচা ডিক্রি পেয়েছেন!

হৃষিকেশবাবু বললেন, এর জন্যে একটা নহবত বসান উচিত। কি বল তারা?

তারা সাড়া দিলেন না। মুখ কালো করে পূজার মণ্ডপ থেকে চলে গেলেন।

হৃষিকেশবাবু মনে মনে হাসলেন। একটু পরেই তাঁর নিজের বাড়ির ফটক থেকে নহবতের ভেসে এল। হঠাৎ তাঁর কি মনে হল, হুকুম দিলেন, ঠাকুরদালান, নাটমন্দির, সমস্ত আরও আলো দিয়ে সাজাতে। তাঁর নিজের বাড়িতে যত ঝাড়-লণ্ঠন ছিল, সব এসে গেল।

খবরটা দুর্জটিবাবুর কানে গিয়ে পৌঁছুতেই তিনি বারুদের মতো জ্বলে উঠলেন: ঠাকুর-দা হৃষিকেশবাবুর একার নয়। সেখানে রোশনাই জ্বালিয়ে স্ফূর্তি করবার তিনি কে?

হুকুম দিলেন, ভাঙো ঝাড়-লণ্ঠন। দু'চারটে দাঙ্গা পড়ে পড়ুক। কুছ পরোয়া নেই!

রাগে দুর্জটিবাবুর সর্বশরীর কাঁপছে। আরক্ত চোখের তারা ভাঁটার মতো ঘুরছে। তাঁকে এরকম উন্মত্ত হতে তাঁকে কেউ কখনও দেখেনি।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটল লাঠিয়াল। ঝনঝন করে ভাঙতে লাগল ঝাড়-লণ্ঠন। সমস্ত অন্ধকার পুরোহিতেরা পালাতে পারলেন না। রাত তিনটের সন্ধিপূজা। ঠাকুরঘরে খিল বন্ধ করে দিলে প্রতিমা-দর্শনার্থী আবালবৃদ্ধবনিতা পড়ি তো-মরি কে যে কোথায় পালাল তার স্থিরতা রইল না। চক্ষের পলকে পূজামণ্ডপ অন্ধকার হয়ে গেল।

তখনই খবর গেল হৃষিকেশবাবুর কাছে। হুকুম দিলেন, আলো জ্বালাও। দু'চারটে লাঠি পড়ে যায় যাক।

ছুটল এ পক্ষের লাঠিয়াল।

পূজার দালানের ফটক বেহাতের দখলে। বাইরে থেকে কেষ্টো আস্ফালন করে। বিজয় বেষ্টো যখন অন্ধকার পূজার দালানে সদলবলে ঝনঝন করে লাঠি ঘোরায় তখন হঠাৎ পিছনের পাঁচটাকে কেষ্টো এবং তার পিছু আরও কয়েকজন হুংকার দিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

আরম্ভ হল কুরুক্ষেত্র। লাঠির ঠকাঠক শব্দে আর লাঠিয়ালদের কর্কশ ভাঙা গলায় বাহ্যজ্ঞানে মহাষ্টমীর রাত্রি পঙ্কিল হয়ে উঠল।

বাবুরা নিজের নিজের কোটে। মুহুর্মুহু সংবাদ আসছে তাঁদের কাছে। কখনও উল্লাসে, কখনও ক্রোধে গর্জন করে উঠছেন তাঁরা। ঠক ঠক করে কাঁপছে গোটা গ্রামের লোক। হায়, এ কী হল! সকলে তারস্বরে মাকে ডাকছে, পরিত্রাহি, পরিত্রাহি!

আর বড়তরফের বালাখানা থেকে আওয়াজ উঠছে: আলো জ্বালাও, আলো জ্বালাও!

কিন্তু সে কি সহজ কথা! আলো নেভানো যায়, জ্বালতে সময় নেয়। কেষ্টো চেষ্টা করছে প্রাণপণ। কিন্তু বেষ্টোকে হঠাতে পারছে না।

ছোটতরফের বালাখানায় একা উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছেন দুর্জটিবাবু। লাঠির সঙ্গে এঁর পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ যে, হুঙ্কার শুনে দূরে থেকেও টের পান, কে জিতছে, কে হারছে।

রাত তখন একটা।

সুলোচনা কাঁদতে কাঁদতে বাসাবাড়ির ছুটে এলেন।

—কি ব্যাপার?

কথা বের হচ্ছে না সুলোচনার। পরে রাতে বললেন, অসীমাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—তার মানে?

—তার মানে জানি না। লক্ষ্ণৌ স্টেশনে গিয়েছিল। বলছে অসীমাকে আর সুপ্রকাশ এসপ্রেসটার গাড়িতে উঠতে দেখেছে।

ধূর্জটির ললাটে ভ্রকুটি। সেটা কলকাতার গাড়ি।

—কি সর্বনাশ!

ধূর্জটিবাবু স্তব্ধ। সুলোচনা ঠক ঠক করে কাঁপছেন। ঘরে লণ্ঠির শব্দ স্তিমিত। এসেছে। বোধ হয় তারা ক্লান্ত।

কিন্তু নরবর বেজে চলেছে

———

TWO OUTSTANDING PRODUCTS

SAP HACKSAWS

SAP HACKSAW BLADES
—both for hand and power use —are the only quality blades made in India in the latest and most up-to-date factory.

SHIELD Brand SCREWS
are manufactured strictly in accordance with Indian Standard Specifications with perfect gimlet point and sharp threads.

PHC
23-4
23-5

STEEL & ALLIED PRODUCTS LIMITED

শুধু একটি রাতের জন্যে

—সমাপ্তি-দেবী

বিয়ে করে বৌ এনে তোলাতে পারে এমন কোনও ফালতু ঘর অরবিন্দদের বাড়ীতে নেই। নেই অরবিন্দর মেজদা শরদিন্দু আইবুড়োই রয়ে গেল!

বাড়ীটা বানিয়েছিলেন এদের ঠাকুর্দা জগবন্ধু ঘোষ। বাপ দীনবন্ধু ঘোষ সেই উত্তরাধিকার অধিকারবলে বাড়ীর অনেকখানি জায়গা দখল করে আছেন—তাঁর হাঁক কাস বরমেজাজ রাস্তায় কেনা সস্তামার্কা ডিটেকটিভ্ নভেলের বোঝা নিয়ে।

গৃহিণী বিজনপ্রভা গৃহিণীত্বের দাবীতে বেশ খানিকটা বিস্তৃত করে রেখেছেন নিজেকে, তাঁর গোবিন্দ-গীতা সোবর গঙ্গাজল', আর লম্বা হলুদ সর্ষে পাঁচকোড়নের সকরসন্তার নিয়ে।

বড় ছেলে সুধাসিন্ধুর তরুণী বৌ তো তার নিজের সোনার ধানের ভাগেই টলমল। উপরন্তু দু'একটা ছিটকে-ছাটকে বেরিয়ে এসে নিজেদেরকে অন্য খাজে ভরে নিতে সুরু করেছে। তা বেশী বোঝা চাপালে বিদ্রোহ করবে বলে চোখ রাঙিয়েছে তাদের তিন পিসি! দীনবন্ধুর তিন মস্ত আইবুড়ো মেয়ে।

অরবিন্দ শরদিন্দু ছোট্ট একটা ঘরে কোনরকমে নিজেদের একটু ঠাঁই বজায় রেখেছে, বি আনার অবস্থা নেই। বৌ আনলেই এক ভাইকে ঘরছাড়া হ'তে হবে।

মাঝে মাঝে এক একবার তিনতলায় ঘর তোলার কথা ওঠে, সঙ্গতিও যে একেবারে নেই তা দু'দুটো বেওয়ারিশ রোজগারী মানুষ যখন রয়েছে সংসারে। ভালই রোজগারী মানুষ। কিন্তু কথাটা থেমে যায়, বাড়ীখানায় তিনতলার উপযুক্ত বনেদ আছে কিনা এই সন্দেহে। সন্দেহটা ওঠান আর বিজনপ্রভা।

ভাল ভাল রোজগারী ছেলে দুটো, দু'দুটো পরের মেয়ে এনে বাড়ীতে খাবেনা যায় ওঁদের পছন্দ নয়। তাছাড়া আইবুড়ো বোন ঘরে থাকতে ভাইয়েরা বিয়ে করবে, এমন অহিন্দুয়ানী তাঁদের অনুমোদন নেই।

এই পরিস্থিতিতে অরবিন্দ কিনা কোথায় কোন একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ে। বলতে গেলে সংসারের মাথায় একটা হাতুড়ির ঘা মেরে বসলো!

হাতুড়ির ওপর হাতুড়ি, শুধু প্রেমে পড়েই ক্ষান্ত নয়, বলে কি না 'বিয়ে করবো।'

সুধাসিন্ধুর বৌ গালে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'তুমি যে অবাক করলে ছোটঠা

মেজঠাকুরপোও তো এ পৃথিবীতে চারে বেড়াচ্ছে, তোমার আগে থেকেই বেড়াচ্ছে, কই এমন 'ধানা পড়ে বসেনি তো? এত বুদ্ধির বড়াই কর, আর শেষকালে কি না এই?

অরবিন্দ বললো, 'ভেবে দেখলাম বকের রাজ্যে হংস হয়ে থেকে কোন লাভ নেই। এ বোকার মধ্যে একজন বুদ্ধিমান বেমানান।'

তিন বোনের একজন বড়ভাজের পুনরুক্তি করে বললো, "ছি ছি ছোড়দা, শেষকালে কিনা এই একজন বললো 'প্রেমে পড়েছিলে, পড়েছিলে, বেশ করেছিলে, বিয়ে করবো বলে নাচছো কি ছোড়দা? এ বাড়ীতে আবার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি?' আর একজন বললো, 'ভেতরে ভেতরে যে এতটা স্বার্থপর তা একথা কোনদিন জানতুম না। সংকল্প স্থির করে ফেলবার আগে একবার সংসারের অবস্থাটা বিবেচ করা উচিত ছিল।'

অরবিন্দ বললো, 'শেষকালে এই হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। প্রথমে কিছুদিন তো অন্ত অভিভাবকদের সদ্বিবেচনার ওপর আস্থা রাখা উচিত!' বললো, 'সদস্যসংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে বাপদা কেউই তো চিন্তাশীলতার পরিচয় দেননি, হঠাৎ আমার ব্যাপারটাই চোখে পড়ছে কেন বলতো বললো, 'মেজদার পরার্থপরতার উপস্বত্বটা তো সংসার পুরোপুরিই ভোগ করছে, আমার স্বার্থপরত কতটুকু কি এসে যাবে?'

বিজনপ্রভা বললেন, 'ভালগাছ প্রমাণ আইবুড়ো বোনেরা বসে থাকতে, বিয়ে করতে য তোমার লজ্জায় না বাধে, কর। আমাদের মতামতে কি এসে যাচ্ছে? এখন তো গভর্ণমেণ্ট ইংরি বিয়ের ব্যবস্থা করে তোমাদের খুব সুবিধে করে দিয়েছে!'

দীনবন্ধু বললেন, 'ঘোষের বাড়ীতে দাসেদের মেয়ে? তোমরা যাহে-তাহোক আর যা করো কবে আমার বরকর্তা হয়ে দাঁড়াতে বোল না।'

কোন মন্তব্য করলো না শুধু শরদিন্দু। পিঠোপিঠি দাদা শরদিন্দু। চুপিচুপি খালি জিগে করলো, 'কেমন দেখতে রে?'

এর বেশী আর কিছু নয়। সাহস দিয়ে বলতে পারলো না—'কর বিয়ে, আন বৌ, আ আছি।'

বলবে কোন ভরসায়?

যার ঘর নেই, তার 'বর'ও নেই। শরদিন্দু এ বায়না করে বসলে আর পাঁচজনে নিন্দা বলে বসবে, 'বলছো তো? কিন্তু ঝামেলাটি নেবে কে? তুমি পারবে নিতে? বাড়তি একটা মা এসে কোথায় থাকবে, কোথায় শোবে, কোন দড়িতে শাড়ী শুকোতে দেবে, ব্যবস্থা করবে তুমি?'

'করবো, পারবো', একথা বলবার মুখ কোথায় তার? যার বৌ নেই! যার বৌ সংসা খাটছে, তা'র দাপট কত। আইবুড়োরা টাকা দিয়েও চোর!

নইলে বলতে গেলে সংসারের পনেরো আনাই তো চলে শরদিন্দুর টাকায়। তবু 'এটা ব কেন?' এ সুরে কথা কইলেই সুধাসিক্ত এণ্ড কোং বলে উঠবেন, 'করবে কে? হোটেলের আ আছ, চারটি টাকা দিয়ে খালাস, কত ধানে কত চাল হিসেব রেখেছ কখনও?'

সত্যিই কখনো হিসেব রাখেনি শরদিন্দু কত টাকায় কত আরাম। অতএব চুপচাপেরই ' সে। আর চুপি চুপি ভাইকে বলে, 'আলাদা সংসার করলে, তোর যদি খরচে আটকায়, অ কাছে লজ্জা করিসনে।'

তা অরবিন্দ তার মেজদাকে লজ্জা করবে না ঠিকই। লজ্জা করলে প্রেমে পড়ার গল্পটা বিশদ বর্ণনায় বলতে পারত না মেজদাকে।

কিন্তু সেই আলাদা সংসারটা কোথায়?

কবে পাওয়া যাবে সেই নীড়খানি? সেখানে কুসুম নিয়ে এসে অরবিন্দ রচনা করবে সংসার। প্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করবার বেদী।

বাড়ী খুঁজতে কত কষ্ট পাচ্ছে অরবিন্দ, কীভাবে হয়রান হচ্ছে, কত আশা পেয়ে আশ আর কত বা মানুষের ব্যবহার বৈচিত্র্যে চমৎকৃত হচ্ছে, সে সব কথা আর লিখে লাভ কি? ি হয় কার না জানা? না, জানা কথা জানতে চাই না, শুধু বর্তমান পরিস্থিতি এই, কুসুম প্রায় করে বসছে অরবিন্দকে, চেষ্টার আন্তরিকতার ব্যাপারে। উঠে পড়ে লেগে চেষ্টা করলে নাকি দু'একখানা ঘর পাওয়া যায় না!' এই কুসুমের মনের ভাব। সেই ভাবের তাপে কুসুমের মনের প ওঠানামা করছে—বিশ্বাস আর সন্দেহের ডিগ্রী কাঁটায়।

মোটের মাথায় একদিকে বাড়ীর লোকের ঔদাসীন্য, একদিকে বাড়ীওলাদের নিষ্ঠুরতা, অন্য একদিকে একখানি অভিমানাহত মুখের গঞ্জনা, এই তিন যন্ত্রণায় টানাপোড়েনে উদ্‌ভ্রান্ত অ এখন অনবরত শুধু ভাবছে প্রেমে পড়ার আগে তার কাজটা কি ছিল? কি নিয়ে কাটাতো এ অবসরের ঘণ্টা?

কুসুমের কাছে চেষ্টার আন্তরিকতার প্রমাণ দেখাতে না পেরে, অরবিন্দ যখন প্রায় তা দেখানো বন্ধ করার চিন্তা করছে, তখন ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত এক বন্ধু এসে বললো, 'এ খুঁজছিলি না? চাস ঘর? ঠিক দুই যেমনটি চাস তেমনটি। দু'খানি ঘরের স্বয়ংসম্পূর্ণ বাড়ী, বি ছিমছাম। তবে কিনা ইয়ে, ভাড়াটা একটু বেশী লাগবে।'

মেজদার আশ্বাসটা মনে পড়ায় বুক বেঁধে বলে ফেললো অরবিন্দ, 'লাগুক। তুই দেখা কোথায় সেই বাড়ী।'

মরীয়া হয়েই বলে, 'না খেয়ে পড়ে থাকি সেও আচ্ছা, বাড়ী চাই।'

বাড়ী চাই, কারণ শুধুই তো কুটুমের গল্পনা নয়, নিজের বাড়ীতেও যে স্নেহ বিদ্রূপ গল্পনা 'কথাবন্ধ'র চাষ চলছে। অরবিন্দ বাড়ী খুঁজছে, আর পেলেই বিয়ে করে ফেলে, বৌ নিয়ে আসা হয়ে যাবে, এই বার্তা প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত সংসারে টেকা ভার হয়েছে অরবিন্দর। বন্ধুকে তাই তং ঠেলে নিয়ে যেতে চাইল সে।

বন্ধু বলে 'রোস, কথা আছে। তা'হলে খুলেই বলি, বাড়ীটা আমারই মেসোমশাইয়ের বসতবাড়ীর গায়ে ওই ছোট্ট বাড়ীটুকু করেছিলেন ভদ্রলোক কিছু ইন্‌কামের আশায়। কিন্তু তুমি খানা তো জানো? কোত্থেকে এক ভাইঝি না ভাগ্নী এসে বিনি ভাড়ায় দখল করে বসে আছে!'

'সে কি?' বিস্ময়টা একটু বেশীই প্রকাশ করে ফেলে অরবিন্দ বন্ধুর মন রাখতে।

বন্ধু এ বিস্ময়ের জবাব দার্শনিকের ভঙ্গীতে বলে 'তবে আর দুনিয়া দেখাচ্ছি কেন? ছুঁচ। চোকা, আর ফাল হয়ে বেরা আর কি। দিদি একই, সেও লাভ ম্যারেজের ব্যাপার! ম্যারেজটা বাড়ীতে শ্বশুর ম্যানেজ করাতে না পেরে মহিলাটি তাঁর বাড়ীবান কাকার শরণাপন্ন হলেন, "কাকা, ক'দিন বাড়ী না পাচ্ছি—তোমার বাড়ীতে একটু জায়গা।"

'তা' ভাড়াই তো নিতে পারতো', অরবিন্দ অবাক হয়ে বলে 'খুঁজছিলই যখন।'

'ভাড়া! হুঁঃ!' বন্ধু সমস্ত ঘটনাটাই নস্যাৎ করে দিয়ে মুচকি হেসে বলে, 'সে চেষ্টা আর করেনি ভেবেছো? কিন্তু আমার মেসোটিও তো তেমনি ঘুঘু। বুঝছেন ভাইঝির কাছে গলাকা দাম নেওয়া চলবে না, তাই স্নেহশীল কাকার ভূমিকা নিয়ে বলছেন, 'হ্যাঁরে তোর কাছে ভাড়া নে ভেবেছিলেন ওতেই কাজ হবে, কিন্তু তারাও তেমনি চালাক, 'খুঁজছি খুঁজছি' ছুতো করে দি গেটিয়ে বসে আছে। তাই এখন আমার মেসোমশাই—' বন্ধু মাথাটা একটু চুলকোয়।

ইতাবসরে অবশ্য অরবিন্দর আশার গাছে প্রায় ছাই পড়ে এসেছে। বিনিভাড়ায়, আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে যারা 'দিব্যি গেটিয়ে' বসে থাকতে পারে, তা'রা নড়বে এ ভয় কোথায়?

ম্লানভাবে বলে 'কি তোমার মেসোমশাই?'

'ইয়ে মানে আর কি একটু কৌশলের আশ্রয় নিতে চাইছেন।' বন্ধু হেসে ওঠে, 'তোমাকে তার একটু পার্ট অভিনয় করতে হবে। মেসো তাঁর ভাইঝিকে বলেছেন বাড়ী তৈরির দেনার দা বাড়ীটাই তিনি বেচে দিচ্ছেন। এখন তোমাকে হতে হবে সেই ক্রেতা। বাড়ী তুমি কিনেছ, সামনে সোমরা থেকে দখল নেবে। বুঝেছ? তুমি তো আর কারুর কাকা খুড়ো নয় যে আবদার চলবে।'

অরবিন্দ হতাশমুখে বলে, 'এসব আবার কি গোলমেলে কথা?'

'গোলমালের কিছু নেই! তোমাকে একটি মিছে কথা বলতে হচ্ছে না, শুধু তুমি যে বাড়ী ভাড়াটে, সেই সত্যটুকু জাহির করে না বেড়ালে, এই আর কি! মেসো তাদের সব কিছু বানি

বলে রেখেছেন, তুমি যখন দেখতে যাবে, বাড়ীটা যেন বিক্রেছ,—এইভাবে একটু ভারীক্কি দেখাবে, ব্যস।

ব্যস! তাহলেই সামনের দোসরা থেকে পেয়ে যাবে অরবিন্দ তা'র স্বপ্নের স্বর্গ!! যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনটি! মিটবে কুসুমের অভিমান, মিটবে অরবিন্দের বাড়ীর বাকাবাণের অ পৃথিবীর সম্রাট হয়ে পড়তে পারবে অরবিন্দ মাত্র কটা দিন পরেই। শুধু যদি একটু ভারিক্কী দেখায়! তাছাড়া—শুধু কি নিজেরই উপকার? বন্ধুর মেসো, বলতে গেলে নিজেরই মেসো তাঁকেও তো অতবড় একটা লোকসানের হাত থেকে বাঁচানো যাবে তা'তে।

অরবিন্দের তিনি গলা কাটবেন?

তা' কাটুন! অরবিন্দ তো গলা বাড়িয়েই বেড়াচ্ছিল ক্ষুরের আশায়।

'আমি রাজী।' বললো ঝট করে। 'কবে নিয়ে যাচ্ছ?'

'আজই যেতে পারো।'

এ পর্যন্ত যখনি বাড়ী দেখেছে অরবিন্দ, কুসুমকে যাহোক করে টেনে এনেছে তার বাড়ী যে গোড়ায় আপত্তি করতো না বাপ, এখন এসে দিয়েছে। কিন্তু আজ আর কুসুমকে নয়, একাই।

একটু তো গোলমেলে ব্যাপার!

কথাবার্তাগুলো ওর আড়ালে হওয়াই ভাল।

একেবারে নিয়ে যাবে ঠিকঠাকের পর। ইতিমধ্যে ইংরিজি বিয়ের কাজটা এগোনো হোক।

বিয়েটা তো কবেই হতে পারতো। শুধু কুসুমই বাধা দিয়েছে। বলেছে, 'না, বাড়ী না নয়। এ তবু বাবার বাড়ীতে আছি, জোরের ওপর আছি। তখন হবে 'বাপের বাড়ী' থাকা। থাকবে না। হঠাৎ যদি বাবা তোমাকে বলে বসেন 'তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাও আমার বাড়ী থে কি করবে তুমি?'

কিছু করবার নেই বটে।

আর কুসুমের বাবার মেজাজ রহস্য কুসুমই ভাল জানে। অতএব বিয়েটা পিছিয়ে আছে। এইবার তোড়জোড়।

বন্ধু বাড়িয়ে বানিয়ে বলেনি!

সত্যিই ঠিক যেমনটি চেয়েছিল অরবিন্দ তেমনটি!

কাটুক গলা—বন্ধুর মেসো!

ভারীক্কি চালে এদিক ওদিক দেখে বেড়ায় অরবিন্দর বন্ধু আর বন্ধুর মেসোর সঙ্গে। যে

ভাইঝি সামনে বেরোয় না, বোধহয় রান্নাঘরে আত্মগোপন করেছে, ভাইঝি জামাই অফিসে। অতএ নিরঙ্কুশ দর্শন।

দেখে আর হাসে অরবিন্দ, এই সৌখীন গ্রীল বসানো দেয়ালজোড়া জানলায়, ওই ছিরি পর্দা! ছেঁড়া শাড়ীকাটা কিনা তাই বা কে জানে।

এমন ঘরে আমকাঠের তক্তপোষ!

তাও একটা ভাল বেডকভার পর্যন্ত নয়! প্যাকিং কাঠের টেবল! ফুটপাথে কেনা চেঁচাড়ি চেয়ার! ছি ছি! কী রুচি!

মন নিসপিস করে অরবিন্দর, এই কদর্য্য জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলে বাড়ীটুকু অপূর্ব্ব সুন্দর করে সাজিয়ে ফেলতে।

কী চমৎকার সেলাইয়ের হাত কুসুমের, বাপের বাড়ীর অতগুলো জানলা টেবল সব ওর শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর নিয়ে বিরাজিত। কত কিই বলে রেখেছে কুসুম। ঘরের দরজার দুপাশে নাকি সে সময় সাজিয়ে রাখবে সে 'চিত্রকরা' মঙ্গলঘট, দোরের সামনে রোজ আঁকবে বিচিত্র আলপনা। দেওয়ালে লাগাবে বাহারে লতা, জানলার কোণে কোণে টব বসিয়ে ফুলগাছ।

ফুলগাছ যে দেখছি এনারাও লাগিয়েছেন, মনে মনে হাসে অরবিন্দ, ছুটো টবে ছুটো রোগা হ্যাংলা গাছ দেখে।

মেসো চোখ টিপে মুখ মুচকে উচ্চকণ্ঠে বলেন, 'তা'হলে ওই কথাই থাকলো। আপনি আপনার উকিল নিয়ে আমার ওখানে আসবেন, আমিও আমার এটর্নীকে বলে রাখবো। তবে ওঁ যা বলসান টাকাটা একেবারে নগদ! বাড়ীটা করে পর্য্যন্ত লোকসান চলছে।

শেষ লাইনটা যেন একটু বেশী সশব্দ হ'ল মনে হয় অরবিন্দর।

দোসরা হবল!

মনে মনে দিন গোনে অরবিন্দ, হাতে আর তেরোটা দিন! ম্যারেজ নোটিসটা দিয়ে ফেলতে হবে, কালই। আসবাবপত্রের অর্ডার দিতে হবে কপাকপ! ইংরিজি বিয়ে হলেও বাড়ীতে একটা ভোজের ঘটা না দিতে পারলেই বা মন মানে কি করে! একপাল ভাইপো ভাইঝি, ছোট বোনের সবাই রয়েছে। মোটা হাতে খরচা করে কোন দোকানে ছাইডিশের অর্ডার দিতে হবে, আর আইসক্রীম ভীষণ ভালবাসে ছেলেগুলো।

বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ানো না হয় ও-বাড়তেই হবে। খাবার টেবলটা কিন্তু নেহাৎ দু'জনের মত করলে চলবে না, মেজদাকে নেমন্তন্ন করতে হবে মাঝে মাঝে, আর বোনেদেরও। আহা বেচারী! 'ওদের ওপর রাগ করি বটে মাঝে মাঝে', ভাবে অরবিন্দ, কিন্তু কেন হিংসুটে হবে না ওরা?

জীবনে ওরা কি পেয়েছে?

দু'চারখানা ভাল শাড়ী, সামান্য একটু গহনা, মাসে এক আধদিন সিনেমা দেখা, এর বা এর উর্দ্ধে, সুখের আর কোন সংজ্ঞা নেই ওদের কাছে। কি জেনেছে ওরা সুখের! কত ভালবাসায়, কত সুখ ভালবাসা পাওয়ায়, জানতে পেরেছে কখনো?

কোথা থেকেই বা জানবে? কোথায় পেয়েছে বাইরের আলো?

সনাতনী বাড়ীর কড়া শাসন, 'নিরভিভাবকে বাইরে যাবে না কোথাও।' আর যাবে কেন? মা বলেন, 'হাতী হাতী বয়েস হলো, লজ্জা করে না 'এখানে যাবো ওখানে যাবো' বল পাঁচদিকে যখন শুনি, অমুকের ছেলে অমুকের মেয়ের সঙ্গে ভাব করেছে, অমুকের মেয়ে অমুকের পালিয়ে গেছে, গায়ে কাঁটা দেয় আমার। না, একা কোথাও বেরোবে না, যদি তোমাদের নামে কিছু বলে বসে, গঙ্গায় ডুবে মরতে হবে আমার।'

ঈশ্বর ইচ্ছেয় আজও বিজনপ্রভাকে গঙ্গায় ডুবে মরতে হয়নি। কেউ কোনদিন একটা বলেনি। একখানি ঘরের মধ্যে তিনটি বোন এক বোঁটায় তিনটি বোনের মত ফুটে আছে।

এতদিন ওদের হিংসুটেমীটাই চোখে পড়তো অরবিন্দর, এখন ওদের রিক্ততাটাই বেশী চোখে পড়ে।

শুধু ভোজই দেবে না, বিয়ে উপলক্ষে বোনেদের কিছু উপহারও দেবে অরবিন্দ।

'উপহার? উপহার আবার কিসের?'

কুসুম আহ্লাদে উৎসাহে অনায়াসে দানপত্র লেখে, 'উপহার আবার কিসের? কিছু হবে না আমাকে! ওই তো দিচ্ছ আমাকে পরম উপহার। ওই ঘর! তুমি আমায় যে ইটের ঘর দিচ্ছ, তার মধ্যে রচনা করবো আমার 'সুখের ঘর, ভালবাসার ঘর, আনন্দের ঘর।' ব 'বামুনে ঘটকে বিয়ে নয়, বাপ নয় সম্প্রদাতা, এ বিয়েতে আবার তোমার অত ভদ্রতাবাসের কেন? পরে দিও। যত পারো দিও। এখন শুধু সব টাকা দিয়ে ঘর সাজাবো আমরা।

'আর ক'দিন আছে?' কুসুম বলে।

আর 'চারদিন' অরবিন্দ উত্তর দেয়।

'আর কদিন?'

'আর দুদিন।'

'উঃ, আমার যে আর ধৈর্য্য ধরছে না বাড়ীটা দেখবার জন্যে। কেন যে একবারটি নিয়ে যাচ্ছ

'আঃ বলেছি তো সে কথা! তিরিশ তারিখে বাড়ী ছেড়ে দেবে ওরা, পরশু থেকে এল পাবো। একেবারে নিজস্ব ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখাবো।

'আর কবে একেবারে ছিতি ?' আবেশে আগ্রহে ঝলমল করে কুসুমের তাজা মুখটা।

অবশেষে এল সেই শুভক্ষণ !

এল পয়লা তারিখের সন্ধ্যে।

আনন্দে ছলছল করতে করতে বাবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল কুসুম সেজেগুজে। ক'টি পরেই যেটা তার বাপের বাড়ী হয়ে যাবে।

'উঃ কত দেরী করলে ?'

'দেরী আবার কোথা ? এই তো ফিরলাম।'

'চলো চলো।'

কিন্তু উৎসাহটা অরবিন্দর একটু দমে গেল, বন্ধুর মেসোর সঙ্গে দেখা করতে।

'তিনি রাগ ঝাল মুখে বললেন, 'চাবি আর কিসের দেব ? বাড়ী তো এখনো খোলা। নিজে ভাইঝি হয় কিন্তু কি বলবো মশাই এমন হ্যাঙলা স্বভাব দেখিনি। জিনিসপত্তর সব বাঁধা-ছাঁদা, এবো রান্নাবান্নার পাঠ পর্য্যন্ত নেই, বাইরে কোথায় খেয়ে আসবে, তবু বলে কি—

'ওঁরা তো কাল থেকে দখল নেবেন। আজকের রাতটা থেকে যাই কাকা'। দেখুন দে মজার কথা, একটা রাতের জন্যে ! ছিঃ ! দেখুন তো এঁকে নিয়ে এলেন বাড়ী দেখাতে।'

অরবিন্দ লজ্জিতভাবে বলে, 'তাহোক, তাহোক, কাল আবার আসবো না হয়।'

মেসো বীরবিক্রমে বলেন, 'কেন কাল ? আজই চলুন। সেই ইস্তক বলছি মশাই, 'এখ আর আমি বাড়ীর মালিক নই, মালিক পয়লা থেকে দখল নিয়ে, বাড়ী ঝোওয়ানো ইত্যাদি করবে মোসরা আস্‌বেন, তোরা না, তিরিশ তারিখের মধ্যে যাহোক একটা ব্যবস্থা করে নে।' তা' কথা যে কানেই নেয় না। যেখানকার যা সাজিয়ে রেখে বসে আছে। এই আজ দেখলাম মোট-মাটরি বাঁধছে তাও আবার কাল সকাল অবধি জের টানছে। চলুন আপনি, ওর মধ্যেই দেখে নেবেন। গুটিয়ে তো মালপত্তর।

অগত্যা কুসুমকে নিয়ে 'ওর মধ্যেই' ঢুকতে হবে অরবিন্দকে। ভেবেছিল আজই দুজনে পরামর্শ করে ফেলবে, কোনখাটায় কি রাখবে, কোথায় বা শোবার খাট, কোথায় বা খাবার টেবিল তা আর হল না।

শুধু নীরবে নিঃশব্দে চোখ বুলিয়ে যাওয়া।

শুধু চোখ থেকে মনে ধরে নেওয়া !

এদের দরজার বাইরে রেখে মেসো আগেই ঢুকলেন। শোনা যাচ্ছে—বেশ দরাজ গলায় বল 'এই তো দেখলি বিপদ, এঁরা আজই এসে গেলেন। যাহোক করে ছুতিয়ে-পাতিয়ে কেরং আজকের মত। তবে স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন ভদ্রলোক, একবার দেখে যান। তুই মা একটু : কাপড়-টাপড় দিয়ে—জামাই কোথা? বেরিয়েছেন বুঝি? অ, আচ্ছা।.....এই যে আসুন আপনার

ঝটি শুটি ঢুকে পড়ে ছুটিতে!

আর ঢুকেই ধক্ করে মনের মধ্যে যেন একটা ধাক্কা লাগে অরবিন্দর। সেই মৈস্তদ আসবাবপত্র কটা সরিয়ে ফেলেছে। বাড়ীটা যে এমন রিক্ত শ্রীহীন হয়ে যাবে, তা তো ধারণা ন তার!

প্যাসেজটার সামনেই জমা হয়ে পড়ে আছে ছোট্ট সংসারটুকুর সামান্য সম্বল।

দুটো ট্রাঙ্ক সুটকেস, একটা আলনা, প্যাকিং কাঠের কটা চেয়ার টেবল, হাঁড়িকড়া, । বেলুন, ছোট্ট বটি, ছোট তোলা উনুন, এক চুপড়ি শিশি বোতল কৌটো কাঁচের জার।

সব সস্তা, সব খেলো খেলো, তবু আজ আর খেলো বলে হাসি পেল না অরবিন্দর। হ যেন অনেক দূরে কোথায় চলে গেছে।

'এই যে চলে আসুন, এই আর একটা ঘর।' মেসো উদাত্ত আহ্বান জানাল কুহুনকে। ে ঢুকতে গিয়েই পিছিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কুহুন আর অরবিন্দ।

ঘরে মেসোর ভাইঝি দাঁড়িয়ে।

একটা শূন্য ঘরে এরকম চুপচাপ একটা মানুষ শুধু একলা দাঁড়িয়ে আছে, এ দৃশ্যটা যেন গা ছমছমে।

কিন্তু ঘরটা কি একেবারে শূন্য?

সেই আমকাঠের তক্তপোষটা তেমনি রয়েছে না দেয়াল ঘেঁসে। সেদিনকার সস্তা ছাপা। চাদরটা পাতা নেই আজ, সাদা ধবধবে চাদর বালিশে রাতের শোয়ার শয্যা প্রস্তুত। চৌকীটা সরু পাশি দুটো বালিশ সম্পূর্ণ ধরে না, একপাশের কোণগুলো একটু একটু ঝুলে পড়েছে।

সেই চৌকীর মাথার কাছে ছোট একটা টুলের উপর একটা কাঁচের গেলাসে গোটা পাচ রজনীগন্ধার গাঁথা একটু তোড়া।

ব্যস, আর কোথাও কিছু নেই ঘরে। না মেজের, না দেওয়ালে।

দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি এগিয়ে এসে মৃদু হেসে সেই কথাই বলে, 'কোথাও কিছু নে আপনাদের একটু বসতে দিই। সব বাঁধা হয়ে গেছে।'

বিছানাতেও তো বসা যায়, কিন্তু সে-কথাটা বোধহয় মনে পড়ে না মেয়েটার, নিজেই বিছানা আড়াল করে দাঁড়িয়েছে বলে।

কুসুমের চাইতে বেশ কিছু ছোটই হবে মেয়েটা। রোগা, মলিন। মুখটা কচি কচি, চোখ দুটো কেমন ভীরু ভীরু, আর বুঝি একটু বেশী কালো।

এ মেয়েও প্রেমে পড়ে ঘর ছাড়ে।

একবার ভাবলো অরবিন্দ।

ভাবলো—ভালোবাসার কি বোঝে ও!

মেয়েটি আবারও একটু কুণ্ঠিত হাসি হেসে কুসুমকে বলে, আপনাদের খুব অসুবিধের কেলেন তাই না? আমরা কিন্তু কাল খুব ভোরেই চলে যাব। আজ, মানে—ভাবলাম রাত্রে তো আপনার আসছেন না, শুধু শুধু কেন আজ থেকেই—এ ঘরটায় তো থোয়াবার কিছু নেই।'

অরবিন্দর বুকটা একটু কাঁপে। বেপরোয়া মুখরা মেয়ে কুসুম না জানি কি বলে বসে! কি না, অরবিন্দর ভয়টা অমূলক।

কুসুমের উত্তরটা খুব মৃদু শোনালো।

না কি শুনতেই পাওয়া গেল না?

শুধু প্রশ্নই শোনা গেল একটা, খুব মৃদু, প্রায় অস্ফুট। 'কোথায় বাড়ী গেলেন আপনারা?'

'বাড়ী আর কোথায়?' আর হাসল না মেয়েটি, শুকনো শুকনো মুখে বললো, 'পাওয়াই যা পাওয়া গেলে কি আর এতদিন ধরে কাকার দোকানে করাই?'

'তা' হলে?' আরও অস্ফুট হয়ে আসছে কেন কুসুমের স্বরটা?

মেয়েটি তেমনিভাবেই বলে, 'ঠিক হয়েছে 'ও' আবার ওর পুরনো মেসে চলে যাবে, আমি আমার এক মামাতো দিদির বাড়ী। পরে কিছু জোগাড় হলে'—থেমে গেলো মেয়েটি। তারপর ঘরের স্তব্ধতা ভাঙতেই বোধকরি আবার বললো, 'বেশ লাগলো আপনাকে, এমন অমিলি হয়ে আছে সব একটু চা-ও খাওয়াতে পারলাম না। আপনার স্বামী হয়তো—'

না এবার সে নিজে থেমে গেল না, থামিয়ে দিল কুসুম। বাধা দিয়ে বললো, 'উনি তো আমার স্বামী নয়। বিয়েই হয়নি এখনো আমার। বাড়ী থেকে চলে এসেছি আমি ওঁর সঙ্গে।'

মেয়েটি থেমে গেল। কেটে পড়লেন বন্ধুর বেলো!

'একী মশাই, এটা কি রকম কথা হলো?'

'সত্যি কথাই হল'। অরবিন্দ বললো।

'তার মানে?' যাচ্ছেতাই রকমের চেঁচিয়ে উঠলো মেসো, অকথ্য করে উঠলেন বাড়ীওয়ালা

মাথার সেই শালীনতার উদ্দেশে। বললেন দেখে নেবেন তাকে। বললেন এটা ভদ্রলোকের ভদ্রলোকের বাড়ী। বললেন বাড়ী তিনি কখন নিতে নেবেন না—তিনমাসের ভাড়াবাবদ যে টা তাকে দিয়েছে অরবিন্দ, সেটা যেন কোর্টে গিয়ে আদায় করে।' 'ভাড়া' শব্দটা যে অনুচ্চারিত কথা, সেটা ভুলেই গেলেন রাগের চোটে। চেঁচিয়ে লাফিয়ে অবশেষে আদরের ভাইঝিকে আদেশ দিলেন, 'তোর সব জিনিসপত্তর ছড়িয়ে যেমন ছিলি, তেমনি থাক মা লতু! দেখি কে হটায়। আমি রইলাম পিছনে।'

যিনি পিছনে থাকার ভরসা দিলেন তাঁকে পিছনে ফেলে বেরিয়ে এল অরবিন্দ আর কু

না, একথা জিগ্যেস করল না অরবিন্দ কুসুমকে 'অমন অদ্ভুত কথা কেন বললে তুমি? ছোট করলে নিজেকে?'

নিজেকে ছোট ক'রেই কি অনেকটা বড় হয়ে গেল কুসুম অরবিন্দর কাছে?

কি জানি কি হলো। কিন্তু ভারী কৃতজ্ঞ হচ্ছে অরবিন্দ কুসুমের কাছে। কুসুম উদ্ধার করলে, অরবিন্দকেই তো উদ্ধার পেতে হ'তো যা-তা অদ্ভুত একটা কিছু বলে।

অরবিন্দই কি পারতো ভাল করে ধরে না এমন দুটি বালিশ পাশাপাশি সজোরে ও চৌকীটাকে স্থানচ্যুত করে, সেখানে নিজের নতুন অর্ডার দেওয়া সৌখিন ডিজাইনের ডা খাটটা পাততে?

একটি দেখা

টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী স্যামুয়েল মর্স ছবি আঁকতে খুব ভালবাসতেন।

একবার প্রাণদন ঢেলে একটি তৈলচিত্র এঁকেছেন, বিষয়বস্তু: একটি মানুষে অন্তিম-মুহূর্ত—রঙে রেখায় জীবন্ত করতে চেয়েছেন একটি প্রাণের মৃত্যু-যন্ত্রণা।

এক বন্ধুকে আহ্বান জানালেন ছবিটি দেখার জন্যে।

বন্ধুটি খুঁটিয়ে সবকিছু দেখলেন মনে হোল।

—কেমন হয়েছে? জিজ্ঞাসা করলেন মর্স।

মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন চিকিৎসক বন্ধুটি—উহু—এ যে দেখছি ম্যালেরিয়া।

আমরা যেমনটি শিক্ষা পাব তেমনটি জীবনকে—শিল্পকে দেখব, বিচার করব।

র‍্যালে

গত ৭৫ বছর ধরে সাইকেলের তালিকায়
শীর্ষতম নাম

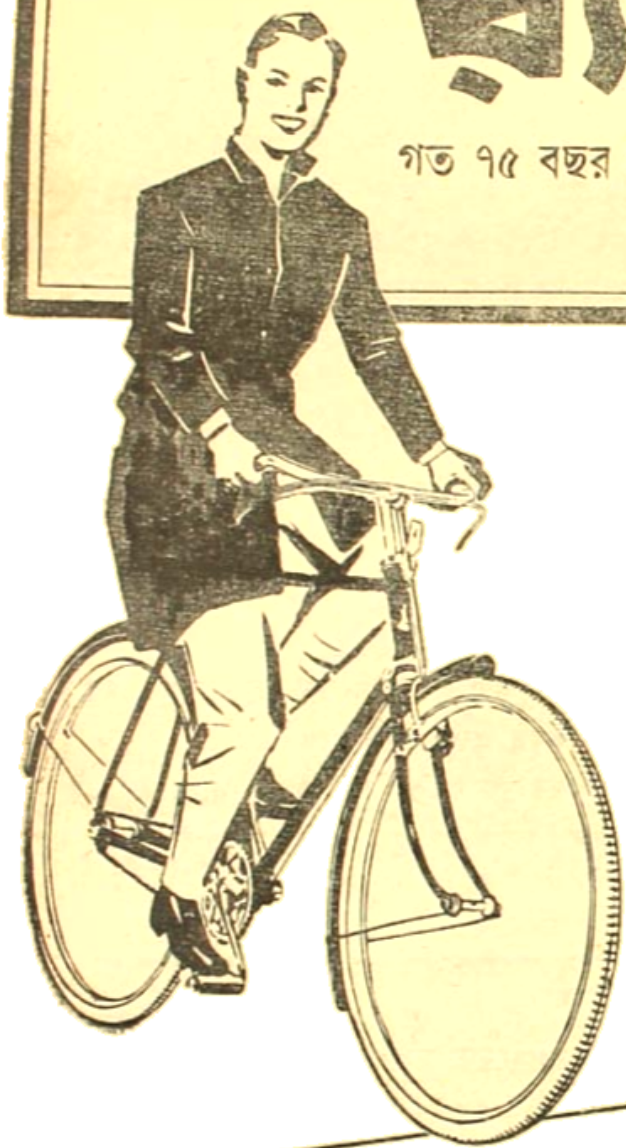

১৮৮৬ সাল থেকেই র‍্যালের শ্রেষ্ঠত্ব
পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের
দ্বারা প্রশংসিত ও স্বীকৃত।
৭৫ বছর ধরে নানা রকম
পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে র‍্যালে
ক্রমাগতই উন্নততর হয়ে উঠছে।
আজ তাই আগের তুলনায়
হিতে উন্নত যে র‍্যালে আপনি
পাচ্ছেন তা' গুণে অতুলনীয় এবং
দামের দিক থেকে সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাট।

র‍্যালে কেনা সব সময়ই লাভজনক

SEN RALEIGH Product

অধিকতর আরামের জন্য
উইট্‌কপ
সীট লাগান

সেন-র‍্যালে

অন্তিম উপলব্ধি

বনফুল

সুরেন প্রাণভয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের আমবাগানে। বাগানটা গ্রামের বাইরে সেখানে একটা খোড়ো ঘরও ছিল। সেই ঘরে এসে বসেছিল সুরেন। বসে কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছি না। তার মনে হচ্ছিল, কেবলি মনে হচ্ছিল, এ কি হল। এত সাধ, এত স্বপ্ন, এত বক্তৃতা, উৎসাহ, এত লাফালাফি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল সব। হঠাৎ পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচে হল সে। চতুর্দিকে মেঘঢাকা জোৎস্না। আম গাছগুলো প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি গাছে অসংখ্য জোনাকী। লক্ষ লক্ষ চোখ যেন চেয়ে আছে তার দিকে। তারা যেন উৎ হয়ে প্রতীক্ষা করছে কারও। এ-ও তার মনে হল ওই অসংখ্য চোখে যেন ব্যঙ্গের হাসিও বেরুচ্ছে। তারা যেন নীরবে তাকে বলছে, ভীরু, তুমি পালিয়ে এলে কেন? ওই গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে লড়তে লড়তে মরতে পারলে না! সহসা ওই অসংখ্য চোখের দৃষ্টি যেন সরব হয়ে উঠল লক্ষ বিদ্রূপকণ্ঠে। প্রশ্ন করতে লাগল তারা।

"ভীরু, তুমি পালিয়ে এলে কেন? পালিয়ে এলে কেন? কেন, কেন, কেন—"

"আমি একা কি অত লোকের সঙ্গে লড়তে পারি!"

"নিশ্চয়ই পার। ইচ্ছে করলে তুমি একাই একশ' হ'তে পার। তোমার দেহটা হয় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত কিন্তু তুমি বাঁচতে। রোজ তো গীতা আওড়াও এ কথাটা মাথায় ঢোকেনি এখনও

"কিন্তু আমার এই দেহটার জন্যেই তো সব। সমাজ, দেশ, রাজনীতি, সাহিত্য, আর্ষ স্বজন সবই তো এই দেহটাকে কেন্দ্র করে। দেহটাই যদি না থাকে—"

"তোমার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে তুমি আদিম অসভ্য বর্বর। স্বার্থপরের মতো নি প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত। কিন্তু এটা কি ভুলে গেছ স্বার্থপরতাই শেষ পর্যন্ত সমূহ বিনাশের কারণ এটা কি জান না যে পালিয়ে তুমি বাঁচতে পারো না? এখনই যদি ওই গুণ্ডার দল তোমাকে এ ঘিরে ধরে, কি করতে পার তুমি! আর ছুটবে? কতদূর ছুটবে? শেষ পর্যন্ত মুখ থুবড়ে যাবে, শেষ পর্যন্ত মরতে হবেই। পশুর মতো মরতে হবে। তার চেয়ে বীরের মতো মরলে না যে যারা স্বার্থপর পশু, তারা যত বড় শক্তিশালী হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাদের অধঃপতন হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে যারা মরেছে তাদেরই সম্মিলিত শক্তি শেষ পর্যন্ত টেনে নাবিয়ে তাকে। ওই দেখ—"

সুরেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। সে চারদিকে চেয়ে দেখল অসংখ্য জোনাকী তার দিকে যেন সকৌতুকে হাসছে। বিদ্রূপকণ্ঠ অবিশ্রান্ত বলে যাচ্ছে—পালিয়ে এলে কেন! কেন, কেন, কে

তারপর একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ যেন বিদীর্ণ করে' দিলে অন্ধকারকে। একটা পেচা ডেকে উঠল। তারপর আ একটা পেচা। তারপর আর একটা। হুসেনের মনে হ'ল কিসের যেন একটা প্রস্তুতি চলছে। সামনে ফাঁকা জায়গাটা হঠাৎ বেশী আলোকিত হয়ে উঠল। চাঁদ এতক্ষণ মেঘ-ঢাকা ছিল, সহসা মেঘমুক্ত হল তারপর কোলাহল উঠল একটা। অসংখ্য লোকের চীৎকার। সঙ্গে সঙ্গে একটা বাজনা। মনে হ যেন কারা টিন বাজাচ্ছে। পরমুহূর্তে আর সন্দেহ রইল না। একজন লোক ছুটতে ছুটতে উর্দ্ধশ্বা এসে দাঁড়াল সেই আলোকিত স্থানটায়। লোকটার পোষাক-পরিচ্ছদ থিয়েটারের রাজার মতন কিন্তু বিস্রস্ত। একদিকের জুলফি নেই, খুলে পড়েছে। তার পিছু পিছু ছুটে এল একদল লোক টি বাজাতে বাজাতে। আর একদল লোক তারস্বরে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল একটা—

খুলে গেছে রাংতা যে ঘুরে গেছে রং
আর কেন আর কেন মিথ্যে ভড়ং।
বেরিয়েছে মাটি খড়
করে সব নড়বড়
আর তো মানাচ্ছে না
থিয়েটারি ঢং।
খুলে গেছে রাংতা যে ঘুরে গেছে রং।

সব টিনগুলো একসঙ্গে বেজে উঠল। হাততালি দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল সবাই থিয়েটারের রাজা এদিক ওদিক চাইতে লাগল। ভাবটা যে ফাঁক পেলে পালাবে। কিন্তু ফাঁক নেই।

তখন আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে' উঠল সে।

"ঠিক করে' দেব, ঠিক করে' দেব—সব ঠিক করে' দেব—" হা-হা করে উচ্চকণ্ঠে হেসে উ সবাই। আবার শুরু হল আবৃত্তি।

পশু কি দেবতা হয় মুখোশ পরে'?
মুখোশ যে সরে' গেছে চিনেছি তোরে।
ধরা পড়ে গেছ দাদা
বেরিয়ে পড়েছে কাদা
আর কেন আর কেন
পড়না সরে'!
পশু কি দেবতা হয় মুখোশ পরে'!

থিয়েটারের রাজা কটমট করে' চেয়ে রইল এই অদ্ভুত জনতার দিকে। যেন তাদের ভস্ম দেবে। কিন্তু কিছু হল না। আবার উঠল উচ্চ হাসির রোল। আবার বেজে উঠল টিনগুলো। ভীত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তার সন্দেহ হচ্ছিল সে জেগে আছে না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। আবার শুরু আবৃত্তি।

ঘুমিয়ে গদার শির দিয়ে সেক্চার
বোকাদের কতকাল ভোলাবে গো আর?
আসবে দণ্ডদাতা
আসবে ভয়ত্রাতা
দম্ভের পঙ্কজ হবে ছারখার
বোকাদের কত কাল ভোলাবে গো আর!

"আমি বলছি সব ঠিক করে দেব। সব ঠিক হয়ে গেছে। তোমরা মিথ্যে ভয় পাচ্ছ। যেতে দাও—"

চীৎকার করে হাত পা নেড়ে বলতে লাগল থিয়েটারের রাজা। কিন্তু কেউ তাকে দিলে না। আরও ঘিরে ধরল চারদিকে। আরও জোরে জোরে বাজতে লাগল টিন। আরও জোরে করতে লাগল আবৃত্তি।

এ কথা যে লেখা আছে ইতিহাসময়
শিবহীন যজ্ঞের ধ্বংসই হয়।
দক্ষ পারেনি যাহা
তুমি কি পারবে তাহা?
বীরভদ্রের কথা অলীক তো নয়
তার পদাঘাতে সব চূর্ণ যে হয়!

"থাম—থাম—থাম তোমরা—"

কিন্তু কেউ থামল না। হঠাৎ সুরেন লক্ষ্য করল তার জামাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। হাতে গুলি লেগেছিল মনে পড়ল। জামাটা খুলে ফেলে ক্ষতস্থানটা সে চেপে ধরল আর এক হাত কবিতার আবৃত্তি চলতে লাগল।

যে কান্না ফোটে পড়ে লক্ষ চোখে
বন্ধ হয় যে তাহা কন্ঠনালীকে
মহাকাল করে আজ
উদ্যত সেই বাজ
কি করে' এখন বল রুখবে ওকে।
ঝরিয়েছ অশ্রু যে লক্ষ চোখে।

পুড়িয়ে ঘরের চাল উড়িয়েছ ছাই
করিয়েছ হত্যা যে পিতামাতা ভাই
ধর্ষিতা রমণীর
ঝরেছে নয়ননীর
সুতরাং ওরে পাপী নিস্তার নাই।
সুদে ও আসলে শোধ হবে পাই পাই।

এর পর অন্ধকার নেমে এলো সুরেনের চোখে। তার মৃত্যু হল।
"কই, ফাঁসিতেও তুমি তো বাঁচতে পারলে না?"
একটি যুবক এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল। সুরেনের মনে হল তাহলে সে তো মরেনি।
"কে আপনি—"
"আমি ক্ষুদিরাম"

সুপরামর্শ

একদিন একটি যুবক এল বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সোক্রাটিসের কাছে, জানতে চাইল তার পক্ষে বিবাহ করা উচিত হবে কিনা।

এর উত্তরে সোক্রাটিস জানালেন তার বিবাহ করাই উচিত কারণ যদি যুবকটি একটি ভালো স্ত্রী পায় তাহলে সে সুখী হবে আর যদি তার স্ত্রী তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে তাহলে—তাহলে সে দার্শনিক হবে।

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একটি মর্মান্তিক সত্য উচ্চারণ করেছিলেন সোক্রাটিস।

ঘুঘু

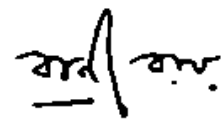

"বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,
এইবারে ঘুঘু তব বধিব পরাণ।"

—প্রাচ্য ছড়া

একজন দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক দার্শনিকের ভঙ্গিতে রাস্তা চলছেন। বয়স তাঁর যৌবনের সীমান্ত, আকৃতি পুরুষোচিত। প্রধান বিশেষত্ব মুখেচোখে বুদ্ধির দীপ্তি। বেশভূষা ভদ্র।

বালিগঞ্জে কোন অভিজাত পরিবেশে একটি বড় বাড়ীর সম্মুখের দরজায় তিনি থামলেন। মুখের জলন্ত সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফেলে মুষ্টিত সিল্ক-কোঁচা খদ্দরের পাঞ্জাবির পকেটে গুঁজলেন। তারপরে বাঁ-হাত আলগোছে কলিংবেলে ছোঁয়ালেন।

দ্বিতলে বসবার ঘরে তিনি উপনীত। মামুলী সোফা-সেটির পাশে একটি ছোট ভক্তপোষে ফরাস। সেখানে কয়েকটি তরুণ ও আধাবয়সী লোকেরা তাস খেলছে সরবে।

"আরে আসুন, আসুন নিশাকরবাবু। চা আন্।" একজন চাকর চায়ের পাত্র হাতে ছুটে এল।

গৃহস্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবল আড্ডাটির মালিক। পাঞ্জাবি পাজামা পরা অবস্থায় আধশোয়া হয়ে হাতের তাস শাফ্‌ল্ করছিল। বলে উঠল, "হায়রে কপাল! নিশাকরবাবু, আপনার জন্যে বাজী হেরে গেলাম। এলেন কেন আপনি?"

নিশাকর ধীর ছন্দে আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব দেখে মনে হ'ল তিনি বুঝি প্রেটোবিক দর্শনের আলোচনায় বসছেন, কোন অলস তাসের আড্ডায় নয়।

ধীরে-সুস্থে বললেন, "বাজী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর, ফল্গুর সঙ্গে আমার বাজী ছিল। আমি বলছিলাম উর্মিলা মজুমদারের পার্টি ছেড়ে আজ এখানে কখনই আসবেন না আপনি। ও বলছিল, আসবেন।"

নিশাকর অভিনেতার ভঙ্গিতে বললেন, "তাহ'লে আমি দুঃখিত যে আপনি বাজী হেরেছেন।"

একটি ছিপ্‌ছিপে তরুণ হাতের তাস ফেলে লাফিয়ে উঠল—"ইস্! কলেজের বেলা হয়ে গেল। নিশাকরবাবু, আপনি বসুন, আমি দৌড়ে ক্লাসটা নিয়ে আসি। ছেলেগুলোকে একটা কিছু লিখতে দিয়ে আসছি রোলকলটা সেরে। ভারী ইন্‌টারেস্টিং গল্প জমবে আজ। উর্মিলা মজুমদারের আমি একটি ভক্ত কিনা আবার!"

বলার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক সম্পূর্ণ অধ্যাপকজনবিরুদ্ধ ভঙ্গি করে দুই হাত শূন্যে স্থাপন করল হাসির হাওয়া সারা ঘরে দুলে উঠল।

গাঁজার কল্কে টানার ভঙ্গিতে সিগারেট মুঠোয় ধরে প্রচণ্ড টান দিয়ে নিশাকর বলল: চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরাজি ভাষায়, "আমি তোমার ব্যবহারে লজ্জা পাচ্ছি।"

সুমন ততক্ষণ উঠে দাঁড়িয়েছে, হাড় জিরজিরে রুগ্ন চেহারা, গালের হাড় ঠেলে উঠেছে। সে বলল, "বুঝুন আপনারা কেমন লোকের উপর ছাত্রদের ভার দেওয়া হয়েছে।"

ইনকাম্ ট্যাক্সের উকীলপ্রবর মোহিত বলে দিল, "ভালো কাজ করেছেন কর্তৃপক্ষ। জীবনে দাঁড়াতে হলে ওঁকি দেখা চাই।"

এদের প্রায় সকলেরই স্বাস্থ্যহীন, কিরকুটে চেহারা, দেখলে যেন মেয়েলি মনে হয়। এদের মধ্যে এক নিশাকর পুরুষালি, বলিষ্ঠ গঠনের অধিকারী। বয়সে তিনি এঁদের প্রায় সকলের চেয়েই অনেকটা বড়। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি বা এঁরা কেউ সচেতন নন।

বুদ্ধি বা বিদ্যার ক্ষেত্রে এই সব মাঝামাঝি বা মিডিওকার লোকের মধ্যে নিশাকর বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ছাপ আছে তাঁর, যে কয়টি পরীক্ষা দিয়েছেন, সেগুলোর কৃতিত্ব রয়েছে। কলমেও দক্ষতা আছে। সর্বোপরি অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁকে উচ্চ সমাজে বেমানান করেনি, যদিও তিনি দরিদ্র ঘরের সন্তান। নিশাকরকে তাঁর কেতাদোরস্ত ব্যবহারের জন্য সকলেই পছন্দ করতেন। গাম্ভীর্য ও স্বল্পভাষণের জন্য তাঁকে উচ্চাঙ্গের ব্যক্তি বলে প্রতীয়মান হ'ত।

নিশাকর বাঁধানো দাঁতে বিদ্যুতের হাসি হেসে বললেন, "উর্মিলা মজুমদার বার পাঁচেক আমাকে নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়েছেন। দু'বার বাড়ী পর্যন্ত এসেছেন।"

"যাচ্ছেন না?"

"না:!" তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে নিশাকর উত্তর দিলেন।

"কেন, কেন?"

"ওই সব বড়লোকী ঢং আমার ভাল লাগে না।" এমন দার্শনিকভাবে নিশাকর কথা বললেন যেন সে বাড়ীতে তিনি আজ্ঞা জমাচ্ছেন, তাঁরা তাঁর সমকক্ষ লোক। যেন তিনি মোংরা গলির নাম উঁচু বাসিন্দা নন, যেখানে লজ্জায় তিনি বন্ধুদের ডাকেন না। নিজেই এর ওর বসার ঘরে এসে উদয় হন তাসখেলা না থাকলেও রাজা-উজীর মারা গল্প, পরচর্চা সমস্তই বেপরোয়া চলে। চিত্রতারকাদের মধ্যে দুই একজন এই সভ্য আড্ডায় কদাচিৎ পদক্ষেপ করলেও করেন। ওঁদের নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলে অনর্গল। তাছাড়া কোন নামকরা মহিলার কেচ্ছা, চেনালোকের বিদ্রূপাত্মক চিত্র বর্ণনায় পটু এঁরা—এই বাসিন্দা পুরুষের দল, যারা সম্পন্ন পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু নিজেরা বিশেষ কিছু করতে পারেনি। অতএব তারা frustration-এর রোগী। তারা অর্থে ঠিক অভিজাত নয়, সজ্জন। কৃতী পিতা পুত্র হিসাবে তারা সমাজের উচ্চস্তরে বিচরণশীল। অথচ মহিমপুরের কুমারের মত গাড়ী করে বেড়াতে

পারেন না। আর্টিস্ট চক্রবর্তীর পুত্রদের মত পিতৃসঞ্চিত অর্থে তা দিতে পারে না। ফলে মনে অ জাগে। রূপের অহমিকা তারা পায়নি, অসাধারণত্ব দেখায়নি। অথচ চারপাশে দেখছে চেয়ে যে অভিজাত হয়নি তারা, অথচ মধ্যবিত্তের গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠেছে। তাই নিজেদের যা নেই তার হীনমন্যতা বোধ আছে, সেই হীনমন্যতায় তারা বিব্রত করে চতুর্দিকে যা দেখে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অ করতে। আচার আচরণে উগ্র পালিশ, ব্যবহার বিনীত। কথা ঘরে ঘরে বলা। অন্তরের অতি অ সহজে ধরা পড়ে না।

এই দলের মধ্যমণি নিশাকর। নিশাকর নামী লোক, বীণ বাজিয়ে। কাগজে কাগজে নাম, তাঁর ছবি। মেয়েরা তাঁকে পছন্দ করে। সুতরাং তিনি এদের হিরো।

ঘরের আলোকে মলিন করে ঘরে এলেন এতক্ষণে রুমা। ফিরোজা শাড়ী, চুলে বেল একহারা মালা জড়ানো কালো কবরী পিঠে লোটানো। কাঁচের চুড়ি পরা শাদা হাতে দু'খানা বই। সৌন্দর্যে শরতের প্রাচুর্য। পরিপূর্ণ দীর্ঘ দেহে, টানা চোখে, আরক্ত অধরে লেখা আছে আমন্ত্রণ। ধারণে আবেদনের ভঙ্গি।

কেউ লক্ষ্য করতে পারল না নিশাকান্তের চোখেমুখে একপলক বিদ্যুৎ খেলে গেল। পর অত্যন্ত উদাসীন ভঙ্গিমেলে তিনি চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসলেন। সিগারেটের টান ঘ হ'ল।

স্মিত সরু গলায় চীৎকারের চেষ্টায় দু'সুর বার করে ফেলল, "আরে রুমা, এত দেরী রান্নাঘরে কাটালে এতক্ষণ এদিকে যে বাজী জিতে বসেছ। নিশাকরবাবু এখানে।"

সুমিতের স্ত্রী স্বামীর বন্ধু নিশাকরের দিকে এগিয়ে এসে মুক্তার মত দাঁতের সারি হাসল। কালো চুলে আলো জ্বলে উঠল, কালো চোখের মণি সাপের মত জ্বলে উঠল। ছত্রিশ বৎ সুন্দরী হাততালি দিয়ে বলল, "কি মজা! বেট্টোর টিকেট কিনতে ছোট এখন।"

বাজীটা সিনেমা দেখানো বোঝা গেল।

"বই দু'খানা এবার বা-জে দিয়েছেন, বা-বি-শ!"

নিশাকরের হাতে রুমা বই ফেরৎ দিয়ে ঠোঁট ফুলল। ঘরভর্তি পুরুষ, সে একা মক্ষিরাণী। নাই। অসংখ্য আরবিরা রাত্রির নায়িকা একা সেজে অভ্যাস আছে।

"ভাল বই পাবে। উর্মিলা আমাকে বহু বই উপহার দিয়ে দিয়ে পাগল করে ছে সেগুলো দিয়ে যাব। তবু আলমারীতে আবার জায়গা হবে।"

পাঁচ ছেলের বাবা ইন্‌কামট্যাক্সের উকীল অপূর্ব হাসতে হাসতে বলল, "ছি-ছি-ছি বইগুলো কি এতই বাজে?"

"বাজে বলছি না, অবাঞ্ছিত।" নিশাকর যাজ্ঞবল্ক্যের গাম্ভীর্যে মন্তব্য দিলেন।

রুমা অগাধ খুশি নিশাকরের উন্নত দেহে স্তব্ধ করে মুখ টিপে হাসল, "উর্মিলাকে বিয়ে করু

উভয়ের মধ্যে ভাবান্তর। দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। নিশাকর ছাদের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, "আমি বিয়েই করব না কখনও।"

কল্যাণীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বর্ণিকাবাহার মত বন্ধনহারা হাতে স্বামীর বন্ধুদের কান ও প্রাণ উদভ্রান্ত করে তুলল সে।

নিশাকরের জীবনের একটি সন্ধ্যা।

• • • •

(রামধনু রংয়ের ধানের ক্ষেত শেষ সূর্য্যাস্তে দীপ্ত। নীল উৎপলের মত আকাশ জলের বুকে নিজের মুখ দেখছে। সারি সারি কুঁড়েঘরে ধানকাটা, ধান সেদ্ধ হচ্ছে। কলকাকলি মুখর একটি দিনের শেষ। কৃষক দম্পতি তারা, মেলে দিয়েছে ধান রোদের আভায়। গাছের আড়াল থেকে চতুর ঘুঘু দেখছে। দুস্তমান পাখপাখালিকে তাড়িয়ে ফিরছে কৃষক। কিন্তু চতুর ঘুঘুকে ধরে কে? বৃদ্ধ শস্তের শিষ খসে পড়ে মাটিতে, অথবা বাতাস বয়ে যায় রামধনু রং-এ দোলা দিয়ে। ঘুঘুকে ধরা যায় না। সবুজ পাতার আড়ালে বাসা তার লোকচক্ষুর অগোচরে। শুধু করুণ ডাক তার সকলকে উতলা করে তোলে। জনপদবধূ জঙ্গুবনে সূর্য্যোদয় দেখবার সময়ে চমকে ফিরে তাকায়। মুগ্ধ হয় সে, ব্যাকুল হয়। সে ভাবে ঘুঘু বুঝি একা তারই জয়গান গাইছে। এবারে কৃষকের স্বেদসিক্ত শস্তকণা একে একে চুরি যায়। ধরা যায় না চোরকে।)

• •

দ্বিতীয় সন্ধ্যা নিশাকরের।

উর্ম্মিলা মজুমদারের হালফ্যাশানী বাড়ীতে।

উর্ম্মিলার দীপ্তি রূপে নয়, চরিত্রে। বসবার ঘরে একাই সে বসেছে নিশাকরের সামনে।

"খুব লোক আপনি! আপনার বীণ শুনবার আশায় কত লোক বসেছিল। এলেন না যে বড়?"

নিশাকর চুপ।

"কি, কথার উত্তর দিলেন না যে বড়?"

চোখ তুলে তাকালেন নিশাকর। গভীর হয়ে উঠেছে দৃষ্টি তাঁর, নিম্নস্বরে বললেন, "আমার বীণের জন্যে আমার আদর না হয়ে, নিজের জন্যে হ'লে আসতাম।"

উর্ম্মিলা চকিত দৃষ্টি ফেলে একবার তাঁকে দেখল, তারপরে অতি সহজকণ্ঠে বলে উঠল, "কি যে বলেন? আমাদের কাছে আপনার নিজের মূল্য নেই না কি?"

এই উর্ম্মিলা—মানস। গভীরতার জালে তার মানস-মীন ধরা দেয় না।

হতাশ হ'লেন নিশাকর। বহুদিন যাবৎ উর্ম্মিলা মজুমদারে দৃষ্টি আছে তাঁর। বিদুষী ধনীকন্যা। গেলে বন্ধুদের কাছে মাথা তুলে দাঁড়ানো চলে। গাইয়ে-বাজিয়ে লোকের অবিবাহিতা ভদ্রকন্যার সঙ্গ

সুলভ নয়। উর্মিলা অতি আধুনিকা, বহুদিন সে কুমারী আছে। কিন্তু বয়স্থা চিরকুমারীর দলে পড়ে না। এমন একটি মেয়ে, যার প্রচুর কৌতুক, তেমনি অন্বেষণ করছিলেন নিশাকর। খোলাখুলি বলা চলে না। তাঁর অর্থ নেই, কোন উচ্চ অর্থকরী জীবিকা নেই। অনেকবার প্রত্যাহত হয়ে আত্মবিশ্বাসও গেছে তাঁর। যদি আবার প্রত্যাখ্যাত হন? উর্মিলার মনে কি আছে জানা না। ভয় হয় নিশাকরের। তাই বন্ধুমহলে মনোভাব অনুচ্চারিত রেখে চলেন।

চাকর রূপার পাত্রে গৃহজাত নিমকী, শিরীষের কড়াপাক, তালশাঁস সন্দেশ এনে দ নিশাকর শিল্পী, তাঁর মধ্যে প্রতিভার সন্ধান পেয়েছে গৃহকন্যা। তাই বিশিষ্ট আয়োজন তাঁর উ

এককাপ গরম জলে আতিথ্য শেষ করে না উর্মিলা। নিশাকর উদরসরায়ণ না ভোজনে উদাসীন নন। কিন্তু এখানে ভড়ং রেখে চলতে হ'বে, কে জানে এই প্রাসাদের জামাতা তিনি কিনা। নিস্পৃহ স্বরে বললেন তিনি, "খাবার নয়, চা নিচ্ছি।"

সাধাসাধি করে উর্মিলা তাঁকে একখানি নিমকি মেওয়াতে পারল।

উর্মিলা বলল আবার, "না আসা অন্যায় হয়েছিল আপনার এত বলা সত্ত্বেও। ছিলেন সেদিন, শুনি?"

নিষ্পাপ দেবদূতের সত্যভাষণ হ'ল, "সুমনদের বাড়ী।"

"শুনি ওর স্ত্রী রুমা আপনার বিশেষ প্রিয়পাত্রী?" হাল্কা পরিহাসে কথা বলা হ'লেও দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

আহত বেদনার অভিনেতা ভঙ্গিতে তাকালেন নিশাকর—"রুমা? রুমা আমার কন্যাস্থানী

অপ্রতিভ উর্মিলা মাথা নামাল।

ইতিমধ্যে উর্মিলার ছোট বোন নীলা এসে গেছে গানের স্কুল থেকে। ঘরে প্রবেশমাত্রে জানেন, নিশাকরবাবু, আজ আপনার বন্ধুপত্নী নীলা দত্ত আমাদের স্কুলে গিয়েছিলেন।

চরম উদাসীনের ভানে নিশাকর চেয়ে রইলেন।

উর্মিলা প্রশ্ন পাঠাল, "হঠাৎ কেন?"

"উনি রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী করবেন, তাই।"

"হ্যাঁ, ওর এ সমস্ত খুব আসে।" নিশাকর মন্তব্য দিলেন।

"ওর সঙ্গে কিন্তু আপনার নাম জড়ায় খুব—কিছু মনে করবেন না নিশাকরবাবু।"

"আমার সঙ্গে কার নাম না জড়ায়? ইতিপূর্বে তোমার দিদি আর একজন মহিলা বলছিলেন। আমি ভাগ্যবান।"

চিবুক দিয়ে নিশাকর উর্মিলাকে দেখালেন।

"কে, দিদি, কে?"

"কেউ নয়। তুমি সেতারটা রেখে এসো।"

"যাচ্ছি, বাবা, যাচ্ছি। তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে বললেই পারো।"

নিশাকরের মুখ এই ইঙ্গিতে দীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি উর্মিলার প্রতি চেয়ে দেখলেন উর্মিলা পরমবিস্ময়ে তার মুহূর্তে দমন করে কঠোরস্বরে বলল, "কি যে বাজে বকিস! বড়দের কথা বলা তোর স্বভাব। কার সঙ্গে কার নাম জড়ায় তা দিয়ে তোর দরকার কি?"

আত্মপক্ষ সমর্থিত হ'ল, "বারে, ওঁকে নাকি সদাসর্বদা নীলা দত্তের বাড়ী দেখা যায়। পরী মত সেজে তিনি ঘর আলো করে থাকেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর ড্রইংরুমে এসে হাজিরা দেন নিশাকর বাবু। পাশের বাড়ীর মেয়ে আমাদের সঙ্গে গান শেখে। তারা হাসাহাসি করে।"

"কে সেই মেয়ে?" সঙ্কীর্ণ-দীর্ঘ চোখ তির্যক ভঙ্গিতে ফেললেন নিশাকর, "তার কি আর কোন কাজ নেই?"

উর্মিলার মুখে কালছায়া—"নীলা, ভেতরে যাও।"

কথা না বাড়িয়ে নীলা স্থানত্যাগ করল।

"এতো মেয়ের সঙ্গেই বা আপনার নাম জড়ায় কেন?" চিন্তিতকণ্ঠে উর্মিলা সুস্থ প্রশ্ন করল

"কারণ আমি যে বিভিন্ন সমাজে যাই—যেতে হয় আমাকে।"

"তবে আপনি নীলা দত্তের বাড়ীই বেশী যান আজকাল।"

"ছি! করুণায় কাতর নিশাকরের দৃষ্টি, "কিছুদিন আগে স্বামী মারা গেছে তার। আমি স্বামীর বন্ধু ছিলাম। মেলে সান্ত্বনা পায়।"

উর্মিলা কথান্তরে চলে গেল। নিবিড় কোন মুহূর্ত নিশাকর তার সান্নিধ্য রচনা করতে পারেন না। অথচ প্রতিক্ষণেই মনে হয় কোথাও বা আছে তেমন উপাদান। অতি সতর্ক উর্মিলা মাঝে মাঝে এমন দৃষ্টিতে তাকায় যেন তাঁর হৃদয়ের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত দেখতে চায়। কিছুতেই ধরা দেয় না সে, অথচ ধরতে চায়। বন্ধুমহলে অপযশ কিঞ্চিৎ হয়েছে নিশাকরের উর্মিলা-এপিসোডে বৈকল্যে। এতাবৎকাল অতি চাতুর্যে তিনি চলেছিলেন। অতি কৌশলে বুঝিয়েছিলেন যে স্ব ঘটিত ব্যাপারে যাবতীয় প্রত্যাখ্যান তাঁরই অবদান। ধরাছোঁয়ার অতীত উর্মিলাকে নিয়ে বিপ্রিত তিনি। যদি বিবাহজোয়ালে বড়লোকের বলদ জোড়া যায়, তবে তিনি বেঁচে যান। কিন্তু করা যায়? উর্মিলার প্রতি আক্রোশ, ক্রোধ শুধু জমা হ'তে থাকে।

হাল্কা কথায় সময় কাটাতে ভালবাসে উর্মিলা। নিশাকর ভালবাসেন না। পাবার বস্তু যা নসদ না পেলে তাঁর রুচি নেই। উঠে গেলেন তিনি নিজের নিস্পৃহ সুদূরতা দেখিয়ে।

বারান্দায় উর্মিলার নির্নিমেষ নয়ন তাঁকে নিরীক্ষণ করতে লাগল দূর থেকে রাত্রির অন্ধকারে

• • • •

(ধূপছায়া ধান আর রাখা যায় না। রৌদ্রে মেলে দিয়েছে কৃষকসম্পত্তি। প্রত্যহ দুর্ভ পা ঠোঁটে তার বিলুপ্তি। করুণ ঘুঘুর গানে দিগন্ত ভরে ওঠে। কৃষক চোরকে পায় না খুঁজে। কৃ

তো বুদ্ধ পাখীর গানে। কৃষক কি ভাবতে পারে ওই দীঘল ডানার রূপালীধূসর পাখী এমন? যে বেদনায় যে শোকে শোকে কেঁদে বেড়ায়, যার করুণ মধুর ঘুঘু ডাকটি কৃষককে অপরাহ্নের আকাশ নীচে উন্মনা করে তোলে, সেই কি অপহারক? গাছের ডালে বহু পাখীই বসে। গাছের ডাল আড়াল থেকে কাক ডাকে, শালিক, চড়াই নেমে আসে। তারাই মন্দ। কৃষক একটি ফাঁদ স্থির করল।)

• • •

গাছের পাতায় পাতায় ফুল, কৃষ্ণচূড়া গাছ ফুলে ঢাকা। নীচের পীচের রাস্তায় পরাগ সমা সঙ্গে সন্ধ্যা। পশ্চিম আকাশে একটি তারা নীলাভ জ্যোতিতে জ্বলছে।

ঘরের মধ্যে সুদূর নক্ষত্র-দীপ্তি ম্লান করে কোন মহিলার কানে হীরার ফুল জ্বলছে। বর্ষের বিলীয়মান রেখায় তার শাড়ী সারা ঘরে বসন্তের বার্তা বলে যায়। তার চুলের, পরিচ্ছেদের সুরভিত অন্ধকার। কেরামের শেডের মধ্যে নীল আলোর আধো অন্ধকার নীল ঢাকা বাইরের জগৎ থেকে।

মহিলা মধ্যবয়সী কিন্তু রূপে ললিতা। কোমল সৌন্দর্য্য তাঁর, বেশভূষার শান্তিনিকেতনী মুখে চোখে লাস্য।

সিগারেট মুখে এখানেও নিশাকর সমাসীন।

নিশাকরের তৃতীয় সন্ধ্যা।

নীপা দত্ত হাতের চম্পক-অঙ্গুলি সুললিত ভঙ্গিতে আন্দোলন করে বলল, "সামান্য রংয়ের ছোঁয়া লেগেছে কিনা আমার শাশুড়ীর মুখ হাঁড়ি হয়ে ওঠে। যান তো আর এ যুগে পারিনে দিদিমাদের মত।"

"সেসব আবার কে পারে এখন? রং ছাড়া তোমাকে ভাবতেই পারা যায় না।" আর নীপা করুণ গুঞ্জনে বলে চলল, "উনি, আপনি ওঁর বন্ধু জানেনই তো, আমাকে শাদা শাড়ী দিতেন না। যে যে দিনে যে যে শাড়ী উনি ভালোবাসতেন, তাই আমি পরি। তাইতো এখন কি করলে শান্তি পাবো, বলে দিন।"

নিশাকর হাতের চুরোট ছাইদানে ফেলে ঘরময় দ্রুত অস্থির পাইচারি করলেন। নীপার কাছে এগিয়ে নিম্নস্বরে বললেন, "নীপা, তুমি শিল্পী, তুমি আমারি মত। ভালবাসা ছা বাঁচতে পারো না। আবার ভালবাসতে চেষ্টা করো।"

"আমার যে ঘর ভেঙে গেছে।"

"আবার ঘর বাঁধতে পারো।"

"কে আসবে আর?" বনলতা সেনের বিখ্যাত "পাখীর নীড়ের মত চোখ তুলে" নীপা করল।

"পাশেই সে আছে, নীপা। চিনে নাও।"

"আপনি!" বিস্ময়ের ভাণ করল নীপা।

"আমি ছাড়া আর কে চিরদিন তোমার পাশে আছে? বন্ধুর স্ত্রী। চুপ করে থাকা ছাড়া ভদ্রলোকের গতি কি?"

জানালার বাইরে যেন শনের বনে বাতাস খেলে গেল ফিস্‌ফিস্ করে। বড় বড় চোখ বিস্ফারিত করে নীপা বলছে আধবোরের খুকীর স্বরে, "আপনি। আমি যে শুনেছিলাম উর্মিলা মজুমদারের সঙ্গে আপনার বিয়ে।"

সাহেবী উচ্চারণ অনুকরণ প্রয়াসী নিশাকর গাঢ় টিপে ধরে ইংরাজিভাষণ দিলেন, "মাই গড! আই ডোন্ট নো এনিথিং আবাউট ইট।"

"আপনি প্রায়ই যান ওর বাড়ী।

"কি করবো, বলো? ভদ্রমহিলা আমার পেছনে ধাওয়া করেন ক্রমাগত। আমার জীবনে আর নিরাপত্তা নেই। এবার ইয়োরোপ পালাবো ওর ভয়ে।"

গল্পের কোরকের মত হাত মুখে চেপে হেসে উঠল নীপা, তারপরে বলল আবার, "তাহ'লে কথা?"

"ও তো বন্ধুপত্নী।"

"আমিও তো তাই।"

"না, তুমি তা নও।"

গভীর স্বরে নিশাকর বললেন, "তোমার জীবনটা এমন হ'ল, আমারও বিয়ে করা ঘটলো না। এসো একসঙ্গে নূতন জীবন আরম্ভ করা যাক।"

এই চরম নাটকীয় মুহূর্তে বাইরে আবার ফিসফিসানি শোনা গেল, তার সঙ্গে চাপা হাসি।

"কে?" নিশাকর মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, "জানালার পাশে কে লুকিয়ে আছ, এবারে এসো।"

অপরাধীভাবে একমুখ চাপা হাসি নিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়াল উর্মিলা মজুমদারের দুই বোন নীলা আর নীপা দত্তের পাশের বাড়ীর মেয়ে, নীলার গানের স্কুলের বন্ধু রুবি। দু'জনের এলোমেলো চুল, এলোমেলো বেশভূষা, হাতে ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট। রুবির মনে রাত্রে আলো জ্বালিয়ে একটা খেলার আড্ডা হয়।

"আমাদের শাটলকক উড়ে এসেছে। তাই নীপাদির মনে খুঁজছিলাম। দারুণরা একটা জবাব দিয়ে হাতের পালক দেখিয়ে তারা পালিয়ে বাঁচল।

নিশাকর ভ্রূকুঞ্চন করে চেয়ে রইলেন।

* *

নিশাকরের শেষ সন্ধ্যা।

এসেছেন উর্মিলার বাড়ী বিনা আহ্বানে আজ। দেহ ক্লান্ত, মনও ক্লান্ত। দৃষ্টি ঝ আশাময়।

প্রতিদিনের মত চাকর নিয়ে বসবার ঘরে বসালো না। বারান্দার বেতের চেয়ারে উর্মিলার অপেক্ষা করতে লাগলেন। উর্মিলা এল ভদ্র কিন্তু সাধারণ বেশে। অন্যদিন তাঁর আসায় একটু রং লাগে যেন। কিন্তু স্বাভাবিক ভদ্র চিরদিনের মত ব্যবহার উর্মিলার, ড্রইংরুমে জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি। চেয়ার টেনে বসল উর্মিলা, "বা গরম, এখানেই বসা যাক।"

এটা ওটা কথা চলতে লাগল। উর্মিলার মধ্যে কোন বৈলক্ষণ নেই, কিন্তু তবু তাং যায় না আজ। নিশাকর সজাগ হয়ে উঠলেন।

চাকর যথারীতি আতিথ্যের আয়োজন এনে ধরল। নিশাকর নিশ্চিন্ত হ'লেন। চি ছুড়িয়ে গেলেন শীতল শরবতে।

"শুনলাম আপনি ডক্টরেট পেয়েছেন।"

"না, তেমন সঠিক খবর নয়।" উর্মিলা জানাল।

নিশাকর লক্ষ্য করতে বাধ্য হলেন যে বিনা প্রয়োজনে কথা বলছে না উর্মিলা। তার স্বচ্ছতা।

"আমি এখন উঠি।" অগত্যা তিনি বললেন।

"আচ্ছা।" উর্মিলা আগেই উঠে দাঁড়াল।

"একদিন আমাদের বাড়ী যাবেন তাহলে। বহুদিন যান না কেন?"

উর্মিলা নিরুত্তর।

"কবে আসছেন, বলুন। বলুন না।" নিশাকর নাছোড়বান্দা।

"শুনুন তবে—আমার সময় নেই।"

"সময় নেই!"

"না। আপনার সঙ্গে আলাপেরও আর আমার সময় নেই।" ভাবলেশহীন মুখে, ভাবে কণ্ঠে উর্মিলা বলে দিল।

নিশাকর বিস্মিত হ'লেন, কিন্তু পরাজিতের ভূমিকায় অভিনয় তাঁর অভ্যাস নেই। দরিদ্র—হীনঘরের ছেলের মধ্যের স্বাভাবিক ইতরামি, যা তিনি চাপা দিয়ে রাখতে অভ্যস্ত, মা উঠল। অর্থপূর্ণ কটাক্ষে তাকিয়ে চাপা গলায় তিনি বললেন পরম বিদ্রূপে—"হঠাৎ অরুচি!"

পলকে উর্মিলার মুখ লাল হয়ে উঠল, সে বলল, "আপনার যেমন হঠাৎ নীপা দত্তে অরুচি কারণ সে তরুণ ও ধনী প্রার্থী পেয়ে হঠাৎ বিবাহ করেছে। নীপার টাকা আছে। তাই প্রার্থীর হয় না।"

"বুঝেছি। আপনার সেই হাড়ে-পাকা জ্যাঠা বোন লাগিয়েছে?"

"নিশাকরবাবু, চুপ করুন। কলকাতা সমাজে এতদিন সাধু সেজে বেড়িয়েছেন। সমস্ত মো আপনার রূপে পাগল, আপনি উদাস এই ভান করেছিলেন। আমার কেমন সন্দেহ হ'ত, তাই কোনদি আপনার উপর আস্থা ছিল না।"

"আস্থা না থাকাই এত!" নিশাকরের ইতরামি আবার প্রকট হ'ল।

"আপনার লজ্জা নেই? আমি মনে করেছিলাম আপনার প্রতিভা আছে। আপনার ভানে সহৃদয় বন্ধুত্ব মনে করে আপনার সঙ্গে মিশেছি। আমার নামে যা বলেছেন, সবই শুনেছি আমি।"

"আপনার বোনই মিথ্যাবাদী।"

"আমার বোন শুধু নয়, অনেকে বলেছে। আগে বিশ্বাস করতাম না। এখন মিলিয়ে দে দেখে সব বুঝেছি। তাদের আড্ডায় বসে বন্ধুর চোখে ধুলো দিয়ে বন্ধুপত্নীর সঙ্গে প্রেম করুন গে। এখা আসবার চেষ্টা করবেন না।"

"তুমি আমাকে চেয়েছিলে, পাওনি বলে চটে গেছ।"

"নিশাকরবাবু, আর একটি অপমানকর কথা উচ্চারণ করলে দারোয়ানের গলাধাক্কা খেয়ে বা হ'তে হ'বে। আমি নির্বোধ, কিন্তু আপনার মত হীন নই।" উর্মিলা ফটকের দিকে এগিয়ে গেল।

থাক আর দারোয়ান ডেকে নাটক করতে হবে না। তবে আমিও একটা কথা বলে যা তোমরা বড়লোকের মেয়েরা আমাদের মত গরীব গুণীজনদের নিয়ে মাতামাতি কর বটে কিন্তু বিবাহকা বাড়ী ও গাড়ী বেছে নাও। বিয়ের পরে ধনী স্বামীর ঘরে খেয়ে শুয়ে তোমাদের সময় কাটে তখন আবার উপরি পাওনা হিসাবে আমাদের টানাটানি করো। আমাদের কি অবস্থা হয়, তা কোনদিন? প্রেমের ভান করো তোমরা তাই ভানই পাও বদলে। আচ্ছা।" স্যালুটের ভঙ্গি হাত তুলে নিশাকর রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

• • • •

(ঘুঘু ধরা পড়েছে। কৃষকদম্পতি প্রকৃত ধানচোরকে দেখে স্তম্ভিত। বহুদিনের ধানী ে আজ ফাঁদে পড়ল। কৃষক একটা তীরের মত হাতিয়ার তুলে নিল।)

• • • •

শোবার ঘরে চিকনের বালিশে মুখ লুকিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে উর্মিলা। তার চে অশ্রু—অজস্র অশ্রু।

ঘুঘুর বুকের তীর যে কৃষকেরও বুকে বিঁধে গেছে।

সম্পূর্ণ উপন্যাস

বিদূষক

শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়

পূর্বপুরুষদের দান

তখনো ইতিহাস লেখা হয়নি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষ যে ফসল প্রথম ফলাতে সুরু করেছিল তা হচ্ছে বার্লি। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগেকার মিশরের মিনার-এর যে ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে যে শস্যের নিদর্শন রয়েছে তা বার্লি ব'লেই পণ্ডিতেরা বলেন। তাছাড়া, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী ও স্কাণ্ডিনেভের প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতেও বার্লির প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। খৃষ্টজন্মের ২৭০০ বছর আগে সম্রাট সেন্নুঙ্ এর চাষ সুরু করেছিলেন চীনে।

আমাদের সংস্কৃত পুরাণ ও শাস্ত্রাদিতে যবের উল্লেখ রয়েছে। মহেঞ্জোদড়োর সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কারের মধ্যেও জানা গেছে যে বার্লির চাষ খৃষ্টজন্মের ৩০০০ বছর আগে ভারতবর্ষে ছিল। বেদে যবের উল্লেখ থেকে আরো মনে হয় ধান বা গম চাষের অনেক আগেই ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য ছিল বার্লিশস্য। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা বার্লির পুষ্টিকর গুণগুলির কথা জানতেন। পালা-পার্বণ ও উৎসবে এবং প্রাত্যহিক আহার্য ও পানীয় হিসেবে বার্লির ব্যবহার ছিল। এই কারণে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বার্লিশস্য একাত্ম হ'য়ে আছে।

আজো বার্লি মানুষের একটি বিশিষ্ট খাদ্য। বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে অসংখ্য মানুষ বার্লির পানীয় দিয়েই জীবনধারণ করে। বার্লিশস্য থেকে উৎপন্ন পার্ল বার্লি ও গুঁড়ো বার্লি সহজে হজম হয় এবং শারীর ক্রিয়ার সহায়ক ব'লে রুগ্নদের জন্যেই এর বহুল ব্যবহার।

শস্য উৎপাদন পদ্ধতি ও যান্ত্রিক উন্নয়নের ফলে বার্লির চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। 'পিউরিটি বার্লি' প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিঃ-এর সর্বাধুনিক কারখানায় উঁচুজাতের বার্লিশস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বার্লি তৈরী হয়। এই জন্যেই 'পিউরিটি বার্লি' রুগ্ন, শিশু ও প্রসূতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। যুবা ও বৃদ্ধরাও এই বার্লি খেয়ে উপকার পান।

অ্যাটলান্টিস (ইষ্ট) লিঃ (ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

বিদূষক

বাস থেকে নেমে গাঁয়ে ঢোকবার রাস্তাটায় পা দিয়েছি রাধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হৈ হৈ উঠল রাধু।

এই যে বিদেশী লোক। কোত্থেকে আসা হল? পথ ভুলে নাকি বাবা?

বলে এসেই সটান জড়িয়ে ধরল আমাকে। ওর স্বভাবটা মোটেই বদলায়নি। আগে ছিল ঠিক তেমনটি আছে।

রাধু বললে বাজারে যাচ্ছিলুম বৌয়ের তাড়ায়। তা থাকগে বাজার—এতদিন পরে তুই একদিন মাছ না খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। তা ছাড়া মাছের যা দর—টাকাটাই বেঁচে আমার বাড়ীতে কিন্তু আগেই তোকে যেতে হবে বলে দিচ্ছি। পরে না হয় তোর নিজের আ বাস। কতদিন দেখিনি তোকে বলত। কতো কথাই যে জমে আছে—

কোন কথা না বলে রাধু আমায় হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। বিড় বিড় করে ব লাগল পথ চলার সঙ্গে সঙ্গে।

আচ্ছা ছেলে বাবা। দশটা বছরে গাঁয়ের দিকে পা বাড়াবার নাম নেই। সব শহু হয়েছেন। এদিকে আমরা দু'টো ভাল লোকের সঙ্গে একটু আড্ডা দেবার জন্যে হা-পিত্তেশ কা

তারপর কী করে আমার মুখের দিকে চোখ তুলে গলা নামিয়ে বললে—হ্যাঁরে শহরে কী দয়ামায়াগুলো মানুষের মন থেকে চলে যায় নাকি রে? আমাদের সেই ছেলেবেলার কথাও একেবারে ভুলে গিয়েছিস?

খুব অপরাধী মনে হল নিজেকে। কুণ্ঠার সঙ্গে বললাম—

কি যে বলিস, সে-সব কথা কী ভোলবার? কিন্তু আমি তো এখন বাংলাদেশেতেই চাকরি নিয়ে চলে গেছি সেই মাদ্রাজের দক্ষিণে।

ততক্ষণে রাধু আমাকে দত্তদের বাগানের মধ্যে এনে ফেলেছে। এইটাই ওর বাড়ীতে সটকাট রাস্তা। দত্তদের বাগানে ঢুকে আমার ছেলেবেলার অনেক কথাই মনে পড়ল তার স করে মনে পড়ল কেলো ঠাকুরের কথা। তাই আগের কথার রেশ ধরে রাধুকে বললাম—এই ওই দত্তদের বাগানে এসেই আমার মনে পড়ে যাচ্ছে কেলো ঠাকুরের কথা। সেই পোড়াকাঠে চেহারা, ছারপোকা রঙের পানের ছোপ ধরা দাঁত, মাথায় ভিজে গামছার পাট,—হাতে চা পুঁটুলি। চারিদিকে ঝিম মেরে যাওয়া ঠিক দুপুরবেলায় কেলো ঠাকুর এই বাগানের ভেত আসত। বল, ঠিক বলছি কিনা?

রাধু হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে চুপ করে রইল। আমি তাই দেখে আরও বলতে লা —রোজ আমরা টিকিনের সময় আসতুম এই বাগানটায়। বেলটা, আঁশফলটা, জামরুল-লিচুটা-আস জন্যে। এই গায়েচলা পথটা দিয়ে ঠিক সেই সময়ে আসত কেলো ঠাকুর—রায়েদের বাড়ীর জামসুন্দ পুজো সেরে। আমরা তার ওপর উৎপাত কিছু কম করতাম না। বিশেষ করে তুই আর অ পুটুলিতে ভাল কিছু থাকলেই ঠাকুরকে ধরতাম। ঠাকুর ক্ষিরের ভাল, নারকেল নাড়ু, সন্দেশ থাকত আমাদের দিত। তারপর ট্যাঁক থেকে বার করত—বঁড়শী আর কড়। বলত—লিখিবে প মরিবে দুঃখে—মৎস্য মারিবে থাকিবে সুখে।

স্যার ঠিক বলছি কিনা রাধু। কেলো ঠাকুরের কাছেই আমাদের মাছ ধরার হাতে খ কেলো ঠাকুর ট্যাঁক থেকে বঁড়শী বার করে আমাদের বঁড়শী চেনাত। এইটে কৈলে টনসন, এ পুটুসে টনসন, এইটে কাটানো বঁড়শী, এইটে মিরগেল বঁড়শী, এইটে কুমীর মারা বঁড়শী। মনে অ তোর রাধু? কতো ছিপ যে কেলো ঠাকুর তৈরী করে দিয়েছে তোকে আর আমাকে। কিন্তু কে ঠাকুর কী আজও বেঁচে আছে রে? যদি থাকে তো দেখা করে যাই চল। এই তো বাগান পার হ তার বাড়ী।

রাধু ফোঁৎ করে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বললে—কেলো ঠাকুর গত বছরের আগের ব মরেছে। এখন তার বাড়ীর পোতাটা ছাড়া আর কোন চিহ্নও নেই।

হঠাৎ করে মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। আত্মীয় বিয়োগের একটা গভীর আমাদের মুহূর্তের মধ্যে পেয়ে বসল। জানি কেলো ঠাকুর আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নয়। অ দশ বছর আগে আমি গাঁ ছাড়ার পর থেকে কেলো ঠাকুরের সম্বন্ধে খুব সজাগ মন নিয়ে বিশেষ ি একটা চিন্তা কোনদিনই করিনি—তবু এই মুহূর্তে দত্তদের বাগানে দাঁড়িয়ে কেলো ঠাকুরের সেই টুকিট ভালবাসার কথাগুলো মনে পড়তে লাগল। কেলো ঠাকুর পুজো করে ভালমন্দ কিছু পেলেই এই বাগ এসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করত। জিনিসগুলো আমাদের বিলিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তার যেন হত না। আর আমাদের বায়নাক্কাও তার ওপর কিছু কম ছিল না। সেসব বায়নাক্কা মেটাতে কে ঠাকুর নানানভাবে। ছিপ তৈরী করে দেওয়া তো তার একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। ছাড়া কড় মেজে দেওয়া, পিপড়ের টিপ যোগাড় করে দেওয়া—এইসব নানারকম ব্যাপারে আমা আবদার চলত কেলো ঠাকুরের ওপর। কেলো ঠাকুরও সেসব বায়নাক্কা মেটাতে এতটুকু কসুর কে দিন করেনি। আজ সেই সব কথাগুলো বড় বেশী করে মনে হতে লাগল কেলো ঠাকুর মারা গে শুনে। সে যতদিন বেঁচে ছিল তার সম্বন্ধে আমাদের কারুরই কোন কৌতূহল ছিল না। কিন্তু মরে গিয়ে হঠাৎ করে নিজেকে মনে পড়িয়ে দিয়ে গেল দারুণভাবে। অন্ততঃ আমার তো এই মু তাই মনে হল। রাধুকে জিজ্ঞাসা করলাম—

কেলো ঠাকুর মারা গেল কি করে রে?

রাধু বললে—অপঘাতে।

তারপর আমার মৃদু ধমক দিয়ে বললে—তা তুই কি এই বাগানেই দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি বাড়ী যাবিনে?

এতক্ষণে হুঁস হল। সেই বুড়ো আঁসফল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে বক্‌বক্ করছি। এক বড়িনি সেখান থেকে।—কেলো ঠাকুর কতদিন তার পুঁটুলিটা খুলে মেলে ধরেছে এরই তলায়।

বললাম—চল চল।—কেলো ঠাকুর মরে গেছে শুনে মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছিল প্রথমটা

রাধু বললে—বাড়ী চল, কেলো ঠাকুরের কথা তোকে শোনাব সব।

বললাম—কেলো ঠাকুরের কি নতুন কোন কথা আছে যে তুই আমায় শোনাবি? আমি না এই দশটা বছর এদেশে নেই। কিন্তু তার আগে কেলো ঠাকুরকে আমি আর তুই যতটা জানি কেউ তো তেমন জানতো না। এই দশ বছরের মধ্যে কেলো ঠাকুরের জীবনে এমন একটা আসতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি নে—যাতে করে তুই নতুন কিছু তার সম্বন্ধে আমায় শো পারিস। তবে হ্যাঁ, তার মরণটা কেমন করে হোল সেটা শোনবার আগ্রহ আমার আছে। সত্যিই আমাদের ভালবাসত তো!

রাধু আমার মুখের দিকে চেয়ে বিজ্ঞ হাসি হেসে বললে—মেয়ার আর মেনি থিংস্ ইন্ হেভেন আর্থ। বুঝলি—?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে—কেলো ঠাকুরের ইতিহাস শুনলে তুই তাজ্জব যাবি—একথা আমি হলপ করে বলতে পারি। যে কেলো ঠাকুরকে আমরা জানতাম—সেটা তার প পরিচয় একেবারেই নয়।

অবাক হয়ে বললাম—তার মানে?

রাধু সংক্ষেপে বললে—মানে পরে বলব। চল এখন বাড়ীতে চোক।

বলতে বলতেই সে হাঁক পাড়ল—মা, মাগো। দেখো কে এসেছে।

রাধুদের বাড়ীর ভেতর ঢুকতেই রাধুর মা মাঙা জ্যেঠাই বেরিয়ে এলেন। সেই ম মতোই হাসি হাসি মানুষটি। চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ লেগেছে। প্রণাম করলাম। মাঙা বে থুতনি ধরে চুমু খেয়ে আশীর্বাদ করলেন। অভিযোগের সুরে বললেন—এমনি করে কী ভুলে থ হয় বাবা। রাধুর তো এমন দিন যায় না যেদিন তোমার নাম ও না করে। তোমরা দুটিতে ছিলে জোড়ের পায়রা।

ঘরে উঠে তক্তাপোষের ওপর বসতেই দশ বছরের খবরের লেনদেন শুরু হয়ে গেল। কে আছি—কী করছি—ইত্যাদি। রাধু এদিকে আমাকে বসিয়ে বাগানে ঢুকেছে ডাব পাড়াবার ব্য

জ্যেঠাইয়ের কাছ থেকেই তাঁদের সব খবর নিলাম আমি। এসে একথা সেকথার গাঁয়ের অনেকে কথা উঠল। শেষে জ্যেঠাই বললেন—কেলো ঠাকুর মারা গেছে শুনেছ বাবা?

বললাম—হ্যাঁ, রাধু বলছিল।

জ্যেঠাই বললেন—সে এক বিদঘুটে মরণ বাবা। সারা গাঁয়ে হৈ হৈ। আর তখন মরবার একটা হিড়িক পড়েছিল। ওদিকে কেলো ঠাকুরকে দাহ করে ফিরতে না ফিরতে আরও এক কাণ্ড। বাড়ীর জানলুবরের দোলেতে কীর্তন গাইতে এসেছিল যে বাইজীটা—বসিবাবুর বাইরের ঘরে সেই র তাকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখা গেল। তাই নিয়ে থানা পুলিশ সারা গাঁ তোলপাড়। সে দিন যে গাঁয়েতে কিভাবে কেটেছে তা আর বলতে পারিনে। বসিবাবুর ছেলে রমানাথ তো শেষ পর্যন্ত রাধুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। বললে—রাধু, তুই আমার ছেলেবেলার বন্ধু, আমার বাঁচা ভাই। এক উটকো ঝামেলায় পড়লুম দেখছিস তো। তা রাধু অবশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াতে তার ব্যবস্থা করে দিল। রাধুর শালা গণেশ তখন এখানকার দারোগা ছিল কিনা। তে রমানাথের তো হাতে দড়ি পড়বার জোগাড়।

ইতিমধ্যে রাধু গোটা দুই ডাব কেটে এনে হাজির করেছে।

নে, নে, গলাটা একটু ভিজিয়ে নে। জানিতো এক কুড়ির কম তোর খোল ঠাণ্ডা হয় না। গাঁয়ে আসবি আগে থাকতে যদি জানতুম তাহলে লাল গাছের ডাবগুলো পরশু আর অমূল্য বাগানে বেচে দিতুম না।

তারপর ডাবের জলটা কাঁচের গ্লাসে ঢেলে ঢেলে বললে—বা কী বলছিল রে?

বললাম—কে এক বাইজী গলায় দড়ি দিয়েছিল রমানাথদের বাড়ীতে তার গল্প করছিলেন।

রাঙা জ্যেঠাই বললে তোমরা গল্প কর বাবা, আমি দেখি আবার নাতীটা গেল কোথায়। দুর্গান্ত হয়েছে আজকাল।

জ্যেঠাই চলে যেতেই রাধু তক্তাপোষের উপর চেপে বসল। হেঁকে বললে—সুষমা, আ সিগারেটের কৌটোটা নিয়ে এসো তো।

সঙ্গে সঙ্গে রাধুর বৌ সুষমা অল্প ঘোমটা টেনে সিগারেটের কৌটো আর দেশলাই একটা সা এনে রাখল।* রাধু বললে—এই স্থাখ আমার বৌ সুষমা। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। যাও এবার চা চ দিকি। এই হল আমার ছেলেবেলার সবরকম বদ কাজের সঙ্গী সাথী। এর নাম আমার কাছে লক্ষ শুনেছ তুমি।

সুষমা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। বেশী কথাবার্তা না বলে—ফিক করে একটু মিষ্টি হেসে চায়ের চাপাতে গেল।

দুজনে একটু একলা হতেই আমি বললাম—রাধু, কেলো ঠাকুরের কথাটা মন থেকে কিছু যাচ্ছে না রে! কি অপঘাতে মরণ হল তার? রাধু গম্ভীর হয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে—সা

কামড়ে। একদম জাত সাপ। কিন্তু কেলো ঠাকুর সাপের কামড়ে নরলেও সাপটাকে মেরে ে পায়নি এতটুকু।

তারপর খোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে—এদিকে তো রায়েদের বাড়ীতে দোল। একসপ্ত মোচ্ছোব হবে শ্যামসুন্দরের নাটমন্দিরে। বসিবাবুর ভাগ্নে রমানাথ নতুন সম্পত্তি পেয়েছে। রমা নিশ্চয় তোর মনে আছে। সেই যে খুব সাজগোজ করে ক্লাসে আসত বলে পণ্ডিত মশাই জামাইবাবু ডাকতেন।

বললাম—হ্যাঁ খুব মনে আছে। থার্ড ক্লাসে মনা মাষ্টারের পিটুনী খেয়ে সেই যে পালা বোধ হয় স্কুলে আসে নি।

রাধু বললে—গ্রাম ছেড়ে গিয়েছিল কলকাতায় মাসীর বাড়ী থেকে পড়বে বলে। তা সে অঠৈরস্তা ভবিষ্যতি হয়ে পালিয়ে এল গাঁয়ে। বসিবাবু মারা যাবার পর সেই তো এখন বাবু। সবাই ব এবার দোলটা একটু ঘটাঘটি কর রমানাথ।

গত কটা বছর আদায়-পত্তর ভাল হয়নি তাই সেরকম জাঁকজমক করতে পারেনি। কাঁচা টাকা অনেকগুলো হাতে পেয়ে রমানাথ রাজী হয়ে গেল।

দোল-মঞ্চ নাটমন্দির সব ইলেকট্রিক দিয়ে সাজান। ডায়নামো বসাল পুজো বাড়ীতে ধামের অন্ত নেই। ভুলো মিত্তির ছুটল কলকাতায় ভাল ভাল যাত্রার দল বোগাড় করতে। রমানা গিয়ে কিত্তুনী যোগাড় করে নিয়ে এলো। শুনলুম মেয়েটি নাকি বিখ্যাত গায়া কিত্তুনীর সম্পর্কে নাতনী হয়। যেমনি রূপসী তেমনি মিঠে গলা। চার রাত্তির গাইবে চারশো টাকা নেবে। ৭ রাত কেত্তন শুনে আমরা একেবারে মজে গেলুম। রমানাথকে বললুম—আসল রত্ন বেছে এনেছ র বুড়োরাও একবাক্যে বললে—এমন কেত্তন তারা গায়া কিত্তুনীর পর আর শোনেনি। কিন্তু ঐ রাতেই কেত্তন শোনা গেল। তার পরের দিনই কিত্তুনীর এল তেড়ে জ্বর ম্যালেরিয়া। কিত্তু সেরে উঠে গান গেয়ে এখান থেকে বিদেয় নেবো। এদিকে ভুলো মিত্তিরও কালীঘাটের গণেশ এনে হাজির করেছে। ক'রাত তারাই আসর রাখল। সারাটা গাঁ ফুর্তির নেশায় মেতে হঠাৎ এর মধ্যেই একদিন শুনলুম রমানাথ হৈ হৈ করছে শ্যামসুন্দরের পুজো বন্ধ হয়ে আছে। বে আড়াইটে বাজে কেলো ঠাকুরের পাত্তা নেই। প্রথমে মনে হয়েছিল সারা রাত জেগে যাত্রা শুনে ঠাকুর ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তার ঘরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে বাবুর বাড়ীর চাকররা ফিরে এল। ঠাকু নেই। এদিকে সেদিকে খোঁজাখুঁজি কোনও পাত্তা হল না ঠাকুরের। নমু ঠাকুরকে দিয়ে স্নান পুজো সারা হল। রমানাথ এদিকে সারা গ্রাম তোলপাড় করতে লাগল,—কেলো ঠাকুর গেল ে হাজার হোক তার মামার বন্ধু তো। তার তো তিন কুলে কেউ ছিল না। না বৌ, বেটা, সংসার। কাজেই পাত্তা আর দেবে কে? তা ছাড়া তার ধুতি, জামা, চাদর, জুতো সব যে তেমনিই মজুত রয়েছে। নিশ্চয় সে বাইরে কোথাও পালিয়ে যায় নি। খোঁজ খোঁজ।

তোলপাড় হয়ে গেল। পুরো দুটো দিন পরে সমস্তিপুরের রোজা আজান মিঞা এসে খবর দিলে হোগলা কুঁড়ের জংগলের ভেতরে সে সাপ ধরতে গিয়ে দেখে ঠাকুর পুরুত সেখানে মরে পড়ে আছে। তা শুনে তো আমরা দৌড়ে গেলুম হোগলার সেই আকাট জংগলে। দেখি জংগলের মাঝখানে পুকুরটা পাড়ে ঘাসের ওপরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে কেলো ঠাকুর। তার সারা শরীরটা তখন ফুলে উঠে বি হয়ে গেছে। এক হাতে ধরা আছে একটা ছিপ আর থলেতে মাছের চার, আর অন্য হাতে—

বলেই রাধু একটু চুপ করল। তারপর বলল—ওঃ, সে এক বীভৎস দৃশ্য। অন্য হাতটায় জড়া রয়েছে একটা এই তাগড়া কেউটে সাপ। কিন্তু সাপটার গলাটা এমন জোরে টিপে ধরেছে ঠাকুর মরে যাবার পরেও তার আঙুলের সে টেপন আলগা হয়নি এতটুকু। মনে হয় সাপটা কামড়ে পালাবা চেষ্টা করেছিল—কিন্তু ঠাকুর তা হতে দেয়নি। ঠাকুর তো মরেছেই সাপটাকেও সাবাড় করেছে সে সঙ্গে। যাই হোক—সেই দেহ নিয়ে তো আমরা সৎকার করতে গেলুম। বন্ধুর ভাগ্নে বলে রমানাথ তার মুখাগ্নি করলে। তা সেদিক থেকে রমানাথের বন্ধজ্ঞান আছে বেশ। শ্রাদ্ধ-শান্তি কীভাবে হ তাই নিয়েও আলোচনা হল শ্মশানে বসে। কিন্তু এদিকে দোলের উৎসবটা একেবারে ছত্রাকার হ গেল। সারারাত বসে ঠাকুরকে পুড়িয়ে আমরা গ্রামে ফিরে এলুম সকাল বেলা। এসে দেখি আর এ বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড ঘটেছে। বসিবাবুর বাইরের ঘরে সেই সুন্দরী কিন্তুনী গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। গাঁয়ে লোক ভেঙে পড়েছে সেখানে। কেলেঙ্কারীর আর অন্ত নেই। রমানাথ তো মাথায় হাত দিয়ে ব পড়ল। তারপর ছেলে মানুষের মতো হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। গণেশ দারোগাকে খবর দেও হল। পুলিশরা এসে দড়ি কেটে লাশ নামাল। সে যে কী একটা ভয়ানক অবস্থা সারা গাঁয়ে আর বলে পারিনে। শেষে গণেশকে অনেক করে ধরে পাকড়ে—কেসটাকে ঠিক করা গেল। কিন্তুনীর ওদি এমন কেউ ছিল না যে মামলা-মোকদ্দমা লড়ে। কাজেই গণেশের চেষ্টায় কেসটা ফাঁসিয়ে দেওয়া হল এই তো গেল বাইরের কথা।

বলে রাধু একটু চুপ করল।

বললাম—বাইরের কথা বলছিস কেন? এর ভিতরে কি আরও কিছু কথা আছে নাকি?

রাধু আর একটা সিগারেট ধরাল। ইতিমধ্যে সুষমা গরম গরম পাপর ভাজা আর চা এ সামনে রেখে দিল। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে সে ভয়ানক গম্ভীর হবার ভান করে বললে- তা আছে। আর সেই ভেতরের কথাই হল—কেলো ঠাকুরের আসল কথা—যা গাঁয়ের লোক- কেউই জানে না।

কেলো ঠাকুর মারা যাবার পর তার ঘর হাতড়ে মোটাকতক পুঁথি ছাড়া আর কিছুই পাও যায়নি। সেগুলো আমিই নিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে। হঠাৎ একদিন সেই পুঁথির তাড়াটা খুঁ বাছতে বাছতে তার ভেতর থেকে একখানা বেশ মোটাসোটা চামড়ায় বাঁধান খাতা বার হয়ে এল উল্টেপাল্টে দেখে অবাক হয়ে গেলুম। বসিবাবুর ডায়েরী। সেটা খুলে পড়তে পড়তে কেলো ঠাকুরে

আদি-অন্ত সব ইতিহাস জানতে পারলাম। অবশ্য এ সম্বন্ধে আমি গাঁয়ের কোন লোককে কি বলিনি। কিন্তু আমার আশ্চর্য লেগেছিল এই ভেবে যে, বসিবাবুর ডায়েরী কেলো ঠাকুরের ঘ এল কি করে?

বলতে আমার মোটেই বাধা নেই। তাছাড়া যাকে নিয়ে ব্যাপার সেও তো ইহজগতে নেই।

রাধুর বাড়ীতে বসে কেলো ঠাকুরের ইতিহাস শুনতে লাগলাম। রাধুও আমাকে খে পেয়ে একের পর এক সিগারেট টানতে টানতে সে গল্প শোনাতে লাগল।

কেলো ঠাকুরের ভাল নামটা যে কী তা গাঁয়ের কেউ জানে না। সবাই তাকে ঐ নামে চেনে। পোড়া কাঠের মতো চেহারা। দাঁতগুলো পানের ছোপে ছারপোকার রং ধরেছে—হাসলে যে বেরিয়ে পড়ে অতি বিদঘুটে দেখায় কেলো ঠাকুরকে। আমরা জন্মাবধি কেলো ঠাকুরকে ঐ দেখে আসছি। তার চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত—বাইশ না বাহান্ন।

কেলো ঠাকুর আমাদের গাঁয়ে এত পরিচিত হলেও আসলে কিন্তু সে আমাদের গাঁয়ের নয়। সে যে কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছিল, কবে এ গাঁয়ে এসেছিল তার সন্ধান আর রাখত না বসিবাবু ছাড়া।

ডাকসাইটে উপেন রায়ের ছেলে বসন্ত রায় বাপ মারা যাওয়ার পর কর্তা হয়েছে। বয় তার তখন বছর বাইশ। কর্তা হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করল বসন্ত ওরফে বসিবাবু। একদিন তিন নদীর ধারে গেল পাখী শিকার করতে। সঙ্গে বন্ধুবান্ধব! এর মধ্যেই বসিবাবু মদে বেশ রপ্ত হ বন্ধুবান্ধবদের তালিমে। পাখী শিকার তো যেমন তেমন বোতল কয়েক মদ খেয়ে বসির মাথায় রো গেল। বললে—যে সাঁতরে নদীটা পার হতে পারবে তাকে এক্ষুনি একশো টাকা দোব। বন্ধুর রাজী নয় নদীতে নামতে।

মোক্তা বোস বললে—তুমি তো আচ্ছা বড় রসিক লোক! এমন দামী ব্রাণ্ডির নেশাট নামিয়ে মাটি করতে চাও?

বসি তাদের গাল দিতে লাগল। হঠাৎ দেখা গেল নদীর ধারে যে ছেলেটা একমনে ম নজর লাগিয়ে ছিপ ফেলে বসে ছিল সে উঠে এসে বললে—আমি এক্ষুনি সাঁতরে পার হব নদী। দেবেন তো!

বসি আনন্দে ছোকরার পিঠ চাপড়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সেও ছিপ সুতো গুটিয়ে রেখে ঝাঁপ দিল। তারপর তাকে দেখা যায় একবার ডুবতে একবার ভাসতে। এমনি করে সে ওপারে পৌঁছল।

মোক্তা বোস বললে—চল বসি ঐ কেলে কিষ্টে ছোঁড়াটাকে কলা দেখিয়ে সরে পড়ি। তোকে আর একশো টাকা খসাতে হবে না।

বসি গর্জন করে উঠল—চুপ কর শালা। যত সব চুনোর কলজে নিয়ে অপেছিস, আমাকেও কি তাই পেয়েছিস নাকি?

তারপর সে ছোকরা সাঁতরে এপারে আসা অবধি বসিবাবু অপেক্ষা করল। সে এপারে আসতে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে - টাকা তো তোমাকে দেবই, তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব তোমার এখানে কে আছে?

ছোকরা বললে—কেউ না। আমি যেতে রাজী আপনার সঙ্গে।

বয়সে প্রায় দুজনেই সমান। কাজেই বন্ধুত্ব হতে দেরী হল না।

বসিবাবুর পার্শ্বচর হয়ে গেল ছোকরাটি।

মোক্তা বোস বললে—এ তোমার কী টেস্ট বসি। ছোঁড়াটার না আছে চাল, না আছে চুলো একেবারে যাকে বলে হা-ঘরের বাচ্চা। তারপর চেহারাটা দেখেছ—যেন টাড়কাক শালা। ওকে তুমি আমাদের দলে ভিড়োলে।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটি অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর ক'রে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুল জমবে না।

• বিনামূল্যে একসেট পলতে
• যে কোন অংশ সহজলভ্য

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

PATENT NO. 6134 OF—51

প্রস্তুতকারক :

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

বসিবাবু বললে—যার খুশি হবে সে আমার কাছে আসবে। আমি কাউকে মাথার দিব্যি দি আসতে বলছিনে।

মোস্তা বোস সেই থেকে ডুব মারল। সদানন্দ, বেচারাম, তিনু লাট, ভবতারণ আরও অনে যেমন বাবুর বাড়ী ফুর্তি করতে জমতো তেমনি জমতে লাগল। কিন্তু মোস্তা বোস আর এল না।

রাস্তায় একদিন নাকি তিনু লাটের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মোস্তার। তিনু বললে—কি গো বে গোসা হয়েছে নাকি বাবুর ওপরে।

মোস্তা বললে—ধুর ধুর, ইয়ারকির মর্যাদা যে রাখেনা তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে আছে?

তিনু লাট বললে—বেশ তো বিনে পয়সায় ফুর্তি লোটা যাচ্ছিল বাবা। হঠাৎ তোমার মতি এমন পাল্টাল কেন?

মোস্তা বললে—ঐ দাঁড়কাকের বাচ্চা, শালা ঘাটের মড়া, পোড়াকাঠটা বছিন বাবুর বাড়ী ক তত্তদিন আমি ওদিকে নেই। দেখি বাবুর মাছ ধরার সঙ্গী কে হয়?

মোস্তা বোসের মত অহংকার সে নিজে বড় বর্শেল। বসিবাবু মাছ ধরতে যাবার সময় বোসকে সঙ্গে নেবেই। আর মোস্তারও বাহাদুরী কম নয়। কদাচিৎ তার বঁড়শী থেকে পালাতে পারে।

তিনু লাট যথাসময়েই গিয়ে বসিবাবুর কাছে কথাগুলো পাড়ল। বসিবাবুও সেই করছিলেন। সত্যি সত্যি মোস্তাটা এরকম ব্যবহার করবে বসি একথা ভাবতে পারেনি। নেমকহারাম। কম মদ আর মাংস গেলেনি বসিবাবুর পয়সায়। মোস্তা ব্যাটা সে সব ভুলে এদিকে দিন দিন যত সে এই নতুন লোকটাকে দেখছে—ততই মুগ্ধ হচ্ছে। লোকটা যেন যাদু জ সেদিন সকালে মাথা তুলতে পারছিল না বসিবাবু—তার আগের রাতে মাত্রাটা খুব বেশী হয়ে গেছিল। এসে জলের সঙ্গে ওলে কি একটা খাইয়ে দিলে—আর ঘণ্টার মধ্যে শরীর একদম ঝর কেলো ঠাকুরটি যে একেবারে রত্ন—বসির সে কথা জানতে বাকি নেই। চেহারা খারাপ তা কী এসে যায়?

একটা ব্যাপার কিন্তু ভারী রহস্যময় ঠেকে। জিজ্ঞাসা করলে কিছুতেই নিজের নাম বলে গলায় পৈতে আছে। তিন বেলা সন্ধ্যে আহ্নিক করে লোকটা। বামুনের ছেলে তাতে কিছু নেই। তাই বসি তাকে ঠাকুর বলেই ডাকতে আরম্ভ করলে। তিনু লাট বলেছে ওতো শুধু ঠাকু ও তোমার বাপের ঠাকুর দেখছি। আমার কাছে ও কিন্তু কেলো ঠাকুর।

বসির ইয়ারকিটা খুব পছন্দ হয়ে গেল। বললে,—বেশ বেশ ওকে কেলো ঠাকুর ডাকা যাবে।

সেই থেকে ওর কেলো নামটা চালু!

তার কিছু দিনের মধ্যেই শ্যামসুন্দরের পূজারী গোবিন্দ চক্রবর্তী মারা গেলেন। বসি ব

—কেলো ঠাকুর শ্যামসুন্দরের ভারটা তুমিই নাও। বিঘে পাঁচেক দেবোত্তর সম্পত্তিও তোমায় না করে দেব এখন।

কেলো ঠাকুর বললে—আপনার কৃপা!

বসি ধমকে উঠল—কের ঐ আপনি আজ্ঞে। কতবার না বলেছি ওসব তোমায় ছাড়তে হবে আর ঐ কৃপা-টৃপা ওসব কথা আমার ইয়ারদের ভেতর চল নেই। ওসব বলবে না খবরদার বলছি

কেলো ঠাকুর সে ধমক খেয়েও কিন্তু জোড় হাত খোলে না। কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে তারপর কী করে যার হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে এক মগ সিদ্ধির শরবত এনে হাজির করে।

শরবত ভর্তি গ্লাসে চুমুক মারতে মারতে বসিবাবু বলে, বেঁচে থাক ঠাকুর। ভবতারণ, বেচারু আর তিনু লাট এক সঙ্গে বলে ওঠে—সার্থক সিদ্ধি ঘুঁটতে শিখেছিলে ঠাকুর। দাও পায়ের ধুলো দাও।

গ্লাসের শরবত শেষ করে বসিবাবু বলে—বোম্বা শালা আর এদিকে আসে না। না আসুক্ গে।

গভীর ক্ষোভের সুর বেজে ওঠে তার কথায় বোঝা যায়, বসিবাবুর ভেতরে ঘা লেগেছে। মোছিল বসিবাবুর সব চেয়ে অন্তরঙ্গ। সে যে এমনভাবে তাকে অপমান করবে একথা বসিবাবু ভাবতে পারেনি। কিন্তু তার জন্যে তো আর কেলো ঠাকুরকে বিদেয় করা যায় না।

আশ্চর্য লোকটা জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব রপ্ত করে বসে আছে। সেদিন বিকেলে বসিবাবুরইপুরের চৌধুরী বাড়ীতে নেমন্তন্নে যাবেন। তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে বললে—দীনে কাপড়-চোপড় বার কর।

দীনে বেয়ারা কাপড়-জামা-জুতো এনে সামনে রাখতেই বসিবাবুর মাথায় রক্ত চড়ে গেল চীৎকার করে বললে—তিন দিন আগে পই পই করে বলে রেখেছি কালী চৌধুরীর নাতনীর বৌভাতে নেমন্তন্নে যাব—জামা-কাপড়গুলো কুঁচিয়ে রাখিস। তা কোথায় কী? এখন এই খড়খড়ে ধুতি, পাঞ্জাবী পরে সং সেজে আমায় বৌ বাড়ীতে যেতে হবে? নিয়ে যা শালা এসব আমার সামনে থেকে।

বলে দুম্দাড় করে সব টেনে ছুড়ে ফেলে দিল।

দীনে বেয়ারা দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল ঘরের সামনেটায়। সে তো জানে বাবু একবার রাগলে একেবারে বাড়ী মাথায় করে তুলবে। এখুনি হয়তো সোটাকতক লোকের বরখাস্তের হুকুম হয়ে যাবে কিন্তু তারও তো কিছু করার নেই। সীতেনাথ করাসে বরাবর কাপড় কুঁচোয়। সেই ওই কাজটা ভাল জানে। ক'দিন থেকে সে ম্যালেরিয়ার জ্বরে অচৈতন্য। আর এদিকে নানা কাজে বুড়ো দীনে বেয়ারার মনেও নেই বাবুর নেমন্তন্নের কথা। বাড়ীতে একটা মেয়ে ছেলে গিন্নীবান্নী না থাকলে যা হয় আর কী কেউ তাকে মনেও করিয়ে দেয়নি। কিন্তু এখন কী করা যায়?

সামনেই সে পেয়ে গেল কেলো ঠাকুরকে। ডুবন্ত অবস্থায় কুটো পেলে যেমন মানুষ সেটা আঁকড়ে ধরে—তেমনি করে সে কেলো ঠাকুরের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল।—ঠাকুর কী করি বলত?

কেলো ঠাকুর বললে—কী হয়েছে দীনু? বাবু এতো চেঁচামেচি করছেন কেন?

আর কী হয়েছে। সর্বনাশ যা হবার তা হয়েছে। আজ বিকেল বেলায় বাবু যাবেন চৌ বাড়ীতে নেমন্তন্নে, কাপড় কোঁচানো হয়নি।

কেলো ঠাকুর বললে—একটা ছুরি, এক বাটি জল আর খানিকটা সুতো আন দিকি।

দীনে যেন ডুবতে ডুবতে বেঁচে উঠল।—এই যে এক্ষুনি দিচ্ছি ঠাকুর।

বাবুর ঘরের সামনে বারান্দায় একটি মাদুর বিছিয়ে কেলো ঠাকুর বসে গেল কাপড় কোঁচাতে।

বসিবাবু কলঘরে যেতে যেতে সে দৃশ্যটা দেখে গেল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে কাপড়, চাদর, পাঞ্জাবি কুঁচিয়ে ফিনে করে কেলো ঠাকুর এনে বাবুর সা হাজির। কাপড়-জামার দিকে দেখে বসিবাবুর মেঘলা মুখে হাসি ফুটল। বললে—সীতেনাথকে তে কাছে এবার কাপড় কোঁচাবার জন্যে ট্রেনিং নিতে বলব।

কেলো ঠাকুর বিনয়ে গলে গেল।

এসব তো আছেই, এ সব ছাড়াও কেলো ঠাকুরের অন্য গুণও যথেষ্ট। বাবু শিকারে কেলো ঠাকুর সঙ্গে যায়। পাখী মারার পর, রান্না করার পালা। কেলো ঠাকুর বলে—বসিবাবু ও বি হাঁস কি হরিয়াল রাঁধতে তোমার পাঁড়েঠাকুর সাতজন্মেও পারবে না। ও কাজটা আমার ছেড়ে দাও।

বসিবাবু বলে—তুমি পাখীর মাংস রাঁধতে জানো নাকি?

কেলো ঠাকুর ছারপোক রঙের দাঁতগুলো বার করে হাসতে হাসতে বলে—বামুনের ছেলে র জানিনে বল্লে চলবে কেন?

তারপর সারা সকাল দুপুর মাণিকপুরের বিলে দৌড়োদৌড়ি করে কটা কাদাখোঁচা আর হাঁস নেরে নিয়ে দলবল শুদ্ধ বসিবাবু বটগাছের ছায়াটায় এসে দাঁড়াল। দেখে অবাক কাণ্ড। এর ইট পেতে কেলো ঠাকুর আতপ চালের ভাত রান্না করে ফেলেছে। ভাল কামিনী আতপের জায়গাটা ন-ম করছে। পাখীগুলো পৌঁছতেই ঠাকুর সেগুলো চটপট কেটে ফেললে। তারপর কে আদা-লঙ্কা মাখিয়ে কি যে প্রক্রিয়া করল তা সেই জানে। আধ ঘণ্টার মধ্যে পাখীর মাংস বাবুদের এসে হাজির গরম গরম ভাতের সঙ্গে। যেন ম্যাজিক জানে কেলো ঠাকুর।

রান্না মুখে দিয়ে বসিবাবু তারিফে কেটে পড়ে।

তিনু লাট সায় দিয়ে বলে—এমন হাত যার তাকে তারিক করাই উচিত। চেপে ধর কিছুতেই ছেড়ো না ঠাকুরকে।

ভবতারণ পাখীর ঠ্যাংটা চিবুতে চিবুতে বলে—বাওয়া তুমি ছদ্মবেশী দ্রৌপদী। নৈলে ঐ কাঠের ভেতর এমন গুণ কোত্থেকে এল? তাছাড়া তুমি তো বিশুদ্ধ বামুনের ছেলে—এমন মো রান্নাটা রপ্ত করলে কোত্থেকে যাদু?

ছাক্কা ! ঝকঝকে ! পরিষ্কার !

'অ্যালকাথিন'এ তৈরী

রঙিন ঘরকন্নার জিনিসপত্র

-ভাঙে না

অ্যালকাথিনে তৈরী ঘরকন্নার জিনিস
আপনার বাড়ি বছর বছর মনোরম ব
তুলবে। হাল্কা অথচ মজবুত বলে
বলেই বাচ্চার হাতে আপনি
জানতে পারবেন সুন্দর 'ডিজাইন' আপ
টেকসই এবং রং যা
নষ্ট হতে দেয় না, বিশেষভাবে তৈ
রেফ্রিজারেটরের ভোজন এক্সপার্টে
দাগ মোছা খুব সহজ হবে। আর যি
প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে তো
টিকিন বাক্সগুলি।

মনে রাখবেন :
অ্যালকাথিন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত
ও নিরাপদ।
'অ্যালকাথিন' বাজার ও অন্য গরম জি
পরিষ্কার করতে হবে।

শিশুদের জন্য বেস্ট, মা
আর খেলনাও পাওয়া যা

'অ্যালকাথিন' হচ্ছে আই-সি-আই মার্কা পলিথি

1ST IN THE WORLD IN INDIA

বাবুর জন্যে পেগে ব্রাণ্ডি ঢালতে ঢালতে কেলো ঠাকুর জবাব দেয়—বামুনের ছেলে রান্না জা বললে তো চলবে না।

কেলো ঠাকুর সবাইকে মদ ঢেলে ঢেলে দেয়। নিজে কিন্তু ছুঁলেও একটা পেগ মুখে তোলে বসিবাবু এই নিয়ে কতো রাগারোগ এমন কি মান-অভিমান পর্যন্ত করেছে। তা কোথায় কী! কে ঠাকুর বলে মদ খেলে নাকি তার তড়কা হয়। বসিবাবু বিশ্বাস করেনি প্রথমটায়। তাই হুকুম দিয়ে একদিন ভবতারণ আর তিনু লাটকে।

তারাও জোর করে ধরে কেলো ঠাকুরকে চিৎ করে ফেলে মুখে মদ ঢেলে দিয়েছিল। য মাতালের কাণ্ড। কিন্তু তার পরেই কেলো ঠাকুরের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল। কোটরে ঢোকা ছুটো তার লাল হয়ে ঠেলে বেরিয়ে এল পনেরো মিনিটের মধ্যেই। দড়াম করে মাটিতে পড়ে সে হা খিঁচুতে লাগল দারুণভাবে। তাই দেখে বসিবাবুর নেশা ছুটে গেল। ওরে জল নিয়ে আয় বাতাস কেলোটা বোধ হয় শেষ হয়ে গেল।

তারপর ধড়াধড়া জল, পাঁচ জোড়া পাখার বাতাস সনানে ঘণ্টাখানেক চলবার পর কেলো মিট মিট করে চোখ চাইল। সেইদিন থেকে বসিবাবু প্রতিজ্ঞা করেছে কেলোকে আর মদ বলবে না।

তাই কেলো ঠাকুর সবাইকে মদ বিলোয়—নিজে খায় না।

সবাই যখন বেহেড মাতাল হয়ে যায় তখন সে এক এক করে সবাইকে টেনে টেনে ঠিক শুইয়ে দেয়। বসিবাবু মাঝে মাঝে মদ খেয়ে বমিও করে। কেলো ঠাকুর সে সময়ে সারারাত বসে থাকে বসিবাবুর পাশে।

কটা দিনই বা সে বসিবাবুর আশ্রয়ে এসেছে। এর মধ্যেই লোকটার ধ্যান-জ্ঞান যেন বসি কিসে বাবু একটু ভাল থাকে, ফুর্তিতে থাকে, তাই দেখতেই কেলো ঠাকুর সর্বদা ব্যস্ত। আর ব কোন মেয়েছেলে না থাকাতে ছুরছাড়া বসিবাবুর সব সময়ে একটা লোকের দরকার হয়ই।

বসিবাবু রীতিমত কেলো ঠাকুরের বশ হয়ে গেল।

দুপুরের খাবার পর ইদানীং পাশার বৈঠকে কেলোকে ছুড়ী না পেলেই বসিবাবুর চলে তার অবশ্য কারণও আছে। ভবতারণ আর তিনু লাট একদিন বাজী ধরল। যে দল হারবে তাকে বোতল মদের দাম আর একটা ছাগল দিতে হবে কিস্টের জন্যে। পাশায় ভবতারণ আর তিনু। ছুড়ী হল সাংঘাতিক। বসিবাবু কিছুতেই ও-দুজনকে ছুড়ি ধরতে দিতে রাজী হত না। দু একসঙ্গে বসলেই অপরদল হারত নির্ঘাৎ। কিন্তু সেদিন কিছু আর করার জো নেই। বসিবাবু বু পেরেছে—মদের দামটা আর ছাগল জোগাড় করার ব্যাপারটা তারই ঘাড়ে পড়বে। তাই আগে থা কেলোকে ডেকে বললে—কেলো ঠাকুর, বোতল চারেক ভাল মাল আর একটা নধর পুষ্টু ব্যবস্থা কর তো। দমদমে যাব কিস্টি করতে।

খরচের দিকে তো কথা নয়—বসি তা করতে তো রাজী আছেই। কথা হল মোস্তা বোস নো —এখন বসির ছুড়ী হয় কে? তবু মোস্তা থাকলে কিছুটা বোঝা যেত। মনের ভাবনাটা মুখে প্রকাশ করে ফেলল বসিবাবু কেলো ঠাকুরের কাছে।—ঠাকুর, আজ ভবতারণ আর তিনু লাটে মিলে আমা সোহাগান হারাবে দেখছি। আমার ছুড়ী যে কাকে বাছব ঠিক করতে পারছি না এখনও।

কেলো ঠাকুর ছারপোকার মতো দাত বার করে একগাল হেসে বললে—আমাকে নিয়ে বসবে?

বসিবাবুর প্রথমটা অন্যমনস্ক লাগ হল। তিনু লাটের চালটা যে কী কেলো ঠাকুর জানে না বলে এমন কথা বলছে। পরক্ষণেই মনে হল—এখনিতে তো হারছিই দেখি না কেলোকে ছুড়ী নিয়ে। মনে মনে বসি আগে থাকতে ঠিক করেছিল সদানন্দকে। তা সদানন্দ যেমন বোমভোলা লোক চালে অন্ধি-সন্ধি সে অত বোঝেও না। ওকে ছুড়ী দিলে তো হার নির্ঘাৎ। এই নিয়ে তার মনটা বেজা খুঁত খুঁত করছিল। তাই কেলোর কথাটা একটু মনে মনে নাড়া চাড়া করে সে রাজী হয়ে গেল।

খাওয়ার পর একটু জিমিয়ে নিতে নিতেই বেলা চারটে। পাশার আড্ডা বসল। কেলে ঠাকুরকে বসিবাবুর জুড়ি বসতে দেখে তিনু লাট টিপ্পনী কাটল—এ তোমার পাখীর মাংস রান্না নয় ঠাকুর এতে দস্তুর মতো মাথা লাগে।

কেলো ঠাকুর—হাসে খালি মিচ মিচ করে। কথা কয় না।

খেলা সুরু হয়ে গেল। প্রথম দিকে একটু ঢিমে, তারপর একটু একটু করে খেলার তে বাড়তে লাগল। কেলো ঠাকুর ঘুঁটি নিয়ে ঘাপটি মেরে ঘাঁটি আগলে বসে আছে। এদিকে তিনু লাটে চাল সড়সড় করে এগিয়ে আসছে। কটা ঘুঁটি পেকেও গেল। কেলোর সামনে এগিয়ে গেল পাঁ ঘুঁটি কটা। কেলোর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। বসিবাবু তো ক্ষেপে উঠল—শালা, ঘুঁটিগুলো বসিয়ে রেখে কোন ছাদ হবে তোর?

এবার কেলো নরীয়া হয়ে উঠল। চোখ দুটো তার কোটর থেকে বার হয়ে এল। গলা শির ফুলিয়ে হাঁক ছাড়ল পঞ্জুরী। আশ্চর্য পঞ্জুরী লেগেছে তিনটে পাশায়। তিনু লাটদের একটা পাকা ঘুঁ সাবাড়। দেখে তো বসি তাকিয়া ছেড়ে উবু হয়ে বসল। তিনু লাট আর ভবতারণ মনে মনে ভয়ান খা খেয়ে গেল। তবুও এখনও কটা ঘুঁটি আছে। চালিয়ে নিয়ে যেতে পারলে হয়। কিন্তু বাঘে আবার কেলো ঠাকুর বাঘের মতো হাঁকাড় পাড়ল—কচে বারো। তারপর কেলো যা হাঁকে পাশা তাই পড়ে—দু'তিন নয়, বারো পাঁচ সতেরো, পোয়া বারো—একের পর এক পড়তা পড়তে থাকে কেলো ঠাকুরের চালে। তিনু লাট আর থাকতে না পেরে বলে উঠল—শালার চেহারায় যেমন শকুনি পাশাও ধরেছে শকুনির মতো।

তিনু লাট আর ভবতারণ যাকে বলে সোহারান হেরে যাওয়া—তাই হল।

বসি কেলো ঠাকুরকে কোলে তুলে নাচাতে লাগল। কিস্তি অবশ্য ঠিকই হল বসিবাবুর পয়লার কিন্তু বসির তাতে পরোয়া নেই। সে এখন হাজার টাকা খরচ করতে রাজী।

সবই ঠিক চলছে। খুব ভালভাবেই চলছে। তবু বসিবাবুর মনটা ভাল যাচ্ছে না য মোস্তা শালা আর এল না। তা না আসুক গে: কোলাতে আর মোস্তাতে তফাত তের।

কিন্তু কথাটা তো মোস্তাকে নিয়ে নয়—গোলাপীকে নিয়ে। গোলাপীর কথা কিছুতেই ব পারে না বসিবাবু। দেখতে একটু শ্যামলা কিন্তু রূপ যেন তার সারা শরীরে ধরে না। বর্ষার ক দীঘির জলের মতো যেন চার পাড় উপচে পড়ছে। মোস্তা কোত্থেকে যে গোলাপীর সন্ধান পেয়েছি কে জানে। হাজার বার জিজ্ঞাসা করে?—বসিবাবু মোস্তার কাছ থেকে সেকথা বার করতে পারেনি

বেশ কয়েকবার বসিবাবু গোলাপীর ওখানে কাটিয়ে এসেছে। একটা খটকা বিঁধে বসিবাবুর মনে। মেয়েটি মোস্তা বলতে অজ্ঞান। মোস্তা যা বলবে তাই করবে।

বসিবাবু মনে মনে চটেছিল কম নয়। ভেবেছিল ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কী?

কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত সে গোলাপীকে ভুলতে পারেনি কিছুতেই। ইদানীং সেই জোর চেপে বসেছে বসিবাবুর মনে। কিন্তু মোস্তা ছাড়া তো সেখানে যাওয়া যাবে না। ব বুঝতেই পারেনি যে মোস্তাটা এতখানি বেঁকে বসবে। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বসিবাবু থাকতে না পেরে মোস্তার বাড়ী গিয়ে হাজির। মোস্তা ঘোস বাড়ীতেই ছিল। শুকনো মু বাবুকে অভ্যর্থনা করলে। হাজার হোক ক্যাপ্টেন তো। বসিবাবু বললে—মোস্তা এট ভাল হচ্ছে?

মোস্তা কাঠ কাঠ গলায় জবাব দিলে—না ভাই আমায় ক্ষ্যামা দাও। ওসব মদ ভাঙ আমি ছোব না ঠিক করেছি।

বসিবাবু চটে উঠল—দেখ মোস্তা ওসব ন্যাকামী আমার কাছে করিসনি।—শালা পৈতে বেরচারী হয়েছ?

বলেই কিন্তু বসিবাবু বুঝতে পারল চটলে কাজ হাসিল হবে না। তাই তক্ষুণি গলাটা নরম বললে—তোকে ছাড়া আমার চলবে না মোস্তা। আজ সন্ধ্যেবেলায় আর আমার বাড়ী।

মোস্তার গো কম নয়। বললে—আমায় যদি চাও তো ঐ শালা দাঁড়কাককে তাড়াতে ও তোমার বাড়ীতে থাকলে আমি যাব না। হাজার হোক আমার একটা বংশমর্যাদা জমিদার না হতে পারি বসি, কিন্তু তুমি তো জান আমার বাপ-ঠাকুদার কতো বড় নাম ছিল এ তা ছাড়া তোমাকেও বলি। আমরা এতো সব ভদ্দরলোকের ছেলে থাকতে তোমার শেষ পর্যন্ত হল কিনা ঐ হা-ঘরের বাচ্চাটার সঙ্গে।

বসিবাবু অন্য সময় হলে মোস্তার মুখ দেখা বন্ধ করে দিত। কিন্তু গোলাপীর কথা আর দ্বিতীয় কথা উচ্চারণ করল না। শুধু বলল—তুই আয় আজ সন্ধ্যেবেলায়—দেখি অ করতে পারি।

বলে নিজের বাড়ী ফিরে এল বসিবাবু। কিন্তু ফিরে আসা থেকে তার অবস্থা হল সাপে ছুঁচো গেলার মতো।—কি কুক্ষণে যে কেলো শালা জুটেছিল। এখন গ্রাম রাখি না কুল রাখি কেলো ঠাকুরকে বিদেয় দেওয়া অসম্ভব। কেলো আসার পর থেকে তার বাড়ীতে বাস করার আর বেড়ে গেছে। চাকর-বাকর আগেও ছিল—এখনও আছে। কিন্তু তবু মনে হয় একজন কেউ আছে —যে তার জন্যে ভাবে। সে কী খাবে, কী পরবে, কেমন করে একটু আরামে থাকবে, এসব একজন অন্ততঃ ভাবে। বসি কী এমনই নেমকহারাম যে তাকে এক কথায় বিদেয় করে দেবে। কি গোলাপী? মোক্ষ ছাড়া তাকে পাওয়ার উপায় নেই। এই দোটানার মধ্যে পড়ে বসিবাবু সারা দুপুরটা ছটফট করতে লাগল।

সন্ধ্যের আসরে কেলো ঠাকুরকে দেখে বসিবাবু তাকে সরিয়ে দিয়েছিল শ্যামসুন্দরী পুজোবাড়ীতে। ওদিকে বসিবাবুর বাইরের ঘরে সবুজ সেডের ভিতরে আলো জ্বলে উঠল। ওপরে ঝাড় লণ্ঠনটা সেই আলোয় ঝকমক করতে লাগল। নীচে জাজিমের তাকিয়াগুলোতে ফরসা ওয়াড় পরান হয়েছে। ডিবাসের মুর্তিটিও ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে। গিল্টির ফ্রেমে বাঁধান বড় ।

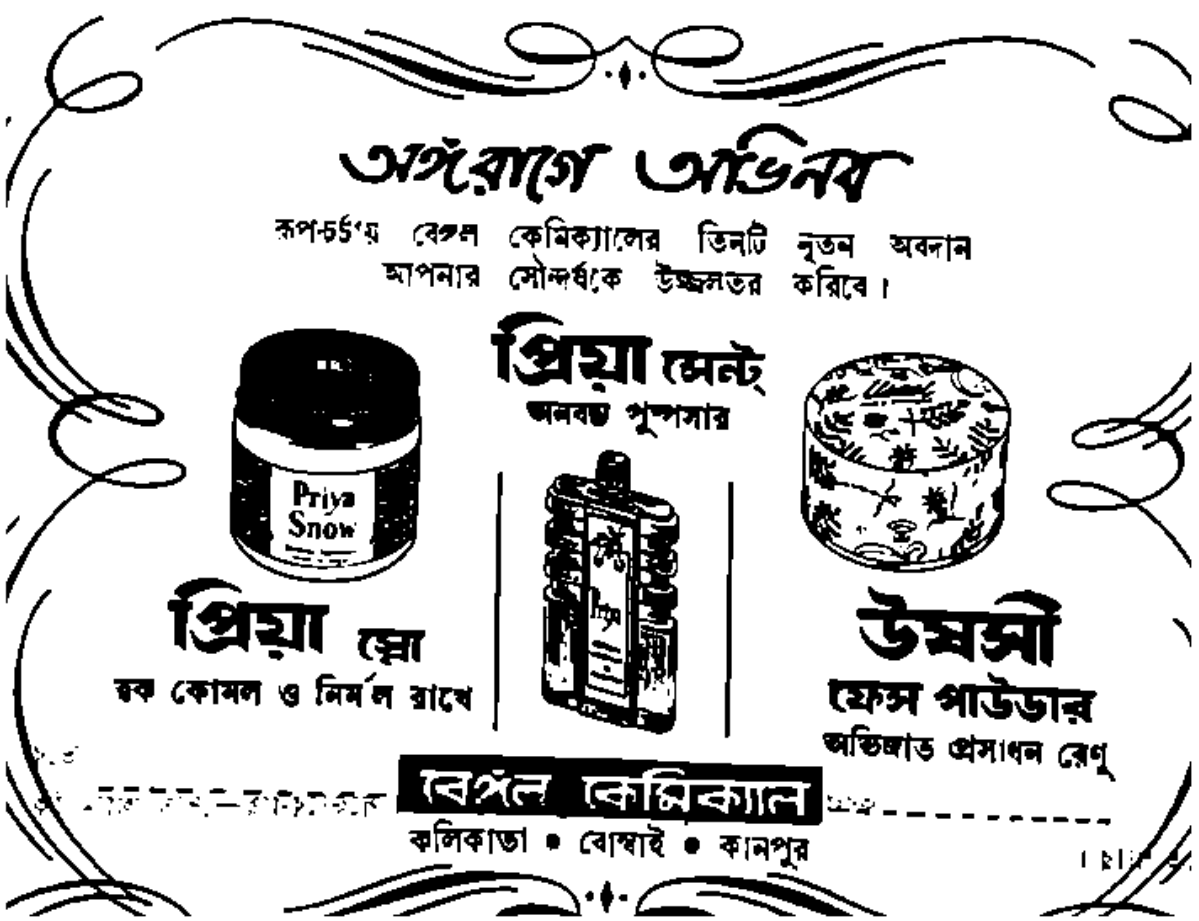

বিলিতী ছবিগুলোও ঝেড়ে মুছে ঝকঝকে করা হয়েছে। অনেকদিন পরে বসিবাবুর বৈঠক গানের আসর বসেছে। বসিবাবু মনে মনে নিজেকে খুব ভাল মেজাজে রাখবার চেষ্টা করছে। বোস এসে ঢুকল। পরনে চুনটকরা কুঁচোন কাঁচি ধুতি, হাঁটু পর্যন্ত ঝুল সিলেকরা পাঞ্জাবি, বগলে প্রাক্তির বোতল। সদানন্দ, ভবতারণ, তিনু লাট—সবাই হৈ-হৈ করে উঠল। তিনু লাট গলা ব বললে—এসো, এসো বঁধু এসো আধ আঁচরে বোসো। কিসো রাই মান ভাঙল কেমন করে? ে তার যে তোমার বিহনে—

বসিবাবু একটা ধমক দিলে তিনু লাটকে—চুপ কর তিনে, কেষ্টোযাত্রার আসর নয় শালার ন্যাকামী শুনলে পিত্তি অবধি জ্বলে যায়।

সিদ্ধির শরবত নিয়ে এল দীনে বেয়ারা। ইদানীং একাজটা কেলো ঠাকুরই করত। ভবতারণ বলে উঠল—বসিবাবু তোমার কালো মাণিকটি গেল কোথায়?

বসিবাবু কথা বলল না। শুধু শরবতের গেলাসটায় দু'একটা চুমুক মেরে একপাশে রেখে দিলে।

সদানন্দ বললে—শরবতটা আজ বানিয়েছে কে হে বসিবাবু। একেবারে জ্যালসা করে কে

বসিবাবু কেলো ঠাকুরকে পুজোবাড়ীতে বিদেয় করে মনে মনে বড্ড অস্থির হয়ে পড়েছিল ওপর সিদ্ধির শরবতে 'রা' না থাকাতে মাথায় তার রক্ত চড়েছিল। সদানন্দের কথা শুনেই থেকে শরবতের গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঘরের এককোণে ছুঁড়ে দিলে। ঝনঝন করে গ্লাসটা ভেঙে ছিটকে পড়ল চারদিকে। দীনে বেয়ারা, সীতেনাথ করাস দৌড়ে এল। বসিবাবু কিন্তু কে বললে না—গম্ভীর হয়ে চুপচাপ বসে রইল তাকিয়া ঠেস দিয়ে। মোল্লা বোস এদিকে বোতল খুলে এক পেগ ভর্তি করে তার সামনে ধরতেই সে সেটা চো চো মেরে দিয়ে গড়গড়ার সটকা তুলে নিল।

ভবতারণ হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে টপ্পা ধরল—

আমারো মনো বেদনা সই
বল কারে কই—

ভবতারণের টপ্পার গলা সুন্দর। তার সঙ্গে বাঁয়ে তবলা সঙ্গত করছে—তিনু লাট। আস্তে আস্তে আরও দশ বারোজন ইয়ার বক্সি এসে হাজির হল। মদ চলতে লাগল—ভবতারণের ওপর বাহবা। তবু কিন্তু বসিবাবুর মেজাজ ভাল হল না। মোল্লা হরদম বাহবা দিতে লাগল ব চালতে লাগল বসিবাবুর পেগে।

ওদিকে পুজোবাড়ীর বারান্দায় বসে ঢুলতে ঢুলতে কেলো ঠাকুরের কানে আসতে ল টপ্পার সুর আর তবলার আওয়াজ। রাত বারোটা বাজল, একটা বাজল তবু বৈঠকখানায় চলছে সমানে। কেলোর প্রাণ ছটফট করতে লাগল বসিবাবুর জন্যে। এতো রাত জাগলে ব

শরীরে কিছু থাকবে। তাছাড়া কতো মদ খাচ্ছে বাবু তার কে জানে। অন্যদিন সে নিজে হাতে ঠেলে দেয়। ঠিক জায়গায় গিয়ে সে কায়দা করে থামিয়ে দেয় বসিবাবুকে। আজ তাকে থামাবে কে? অত মদ খেলে যে পিলে পচে মরে যাবে বাবু এই বয়সেই। কিন্তু তবু তো ওখানে যাবার হুকুম নেই। কেলো ঠাকুর ভাবসুন্দরের মন্দিরে বারান্দায় অস্থির হয়ে পায়চারী করতে লাগল। রাত দুটোর সময় সব চুপচাপ হল। দীনে বেয়ারা ঘুমন্ত চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে কেলো ঠাকুরকে খবর দিলে—বাবু বমি করে ভাসিয়েছে বাইরের ঘরে। বমির ভেতরেই পড়ে আছে মুখ থুবড়ে ভবতারণবাবু, সনানন্দবাবু, তিনুবাবু অজ্ঞান। মোল্লা বোস কিন্তু আসর থেকে সটান বাড়ী চলে গেছে।

কেলো ঠাকুর এক দৌড়ে ওবাড়ীর বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হল। দেখে ভাঙা বোতল গ্লাসে ঘরের একটা দিক একেবারে নরক হয়ে আছে। আর একটা দিকে বসিবাবু বুকে তাকিয়া চেপে ক্রমাগত বমি করে যাচ্ছে। তার মুখটা বমির মধ্যেই থুবড়ে পড়ে আছে। অন্যদিকে তিন লাট সনানন্দ আর ভবতারণ প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে তার মধ্যেই থেকে থেকে কিং বিড় করে কী সব বলছে।

বসিবাবুর অবস্থা দেখে কেলো ঠাকুরের হঠাৎ দুচোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সে ঝট করে মাথাটা ঘরের দরজার বাইরে টেনে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। তারপর বালতির পর বালতি জল ঢেলে বাবুকে পরিষ্কার করে যখন দীনে বেয়ারা আর সীতেনাথ করালের সঙ্গে কেলো ঠাকুর বাবুকে বিছানায় এনে শুইয়ে দিলে তখন সে একেবারে বেহুঁস। কিন্তু সেই অবস্থার ওপর আরও ভাবনা জুটল। বসিবাবু একটু পর থেকে এমন হেঁচকি তুলতে সুরু করল, বোধ হয় এক্ষুণি দমটা আটকে যাবে। না হয় পেটের নাড়ীভুড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে নির্ঘাৎ।

কেলো ঠাকুরের সারা রাত ঘুম হল না। দাওয়াই তৈরী করে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াতে লাগল বসিবাবুকে। শেষে প্রায় সকাল নাগাদ বসিবাবু শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

এরপরে দুটো দিন বসিবাবু বিছানা থেকে আর উঠতে পারে নি। শরীরটা নিতান্তই খারাপ হয়েছিল। তিন দিনের দিন বিছানা থেকে উঠেই বসিবাবু মোল্লা বোসকে ডাকতে পাঠাল। মোল্লা আসতেই ঘরে বসে কিছুক্ষণ কি সব গুজগুজ ফুসফুস হল। তারপর বলা নেই কওয়া নেই বাবু তিনটে ট্রেনে কলকাতা যাত্রা করল মোল্লা বোসের সঙ্গে।

যাবার সময় কেলো ঠাকুরকে একবার ডেকে দুটো কথাও বলে গেল না। তা না থাক কেলো ঠাকুরের কিন্তু মোল্লা বোসকে বড় ভয়। বাবুকে সঙ্গে করে কোথায় যে নিয়ে গেল এই চিন্তায় কেলো ঠাকুরের আহার নিদ্রা ঘুচল। দীনে বেয়ারাকে এসে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ দীনু, বলতে পার বাবু গেল কোথায়? দীনে বেয়ারা অনেক দিনের লোক। জানে সব ব্যাপার। তাই চোখ মোটবে বললে—শ্বশুরবাড়ী।

কেলো ঠাকুর বললে—ধুর, বাবুর এখনো বেই হয় নি।

দীনে বললে—তা না হোক। অইবুড়ো কার্তিকের পয়সা দিলেই বৌ জোটে।

ঐ তুমি পাও!—ভাড়া করা শ্বশুরবাড়ী আর কি গো ঠাকুর!

কেলো ঠাকুরের বুঝতে কিছু বাকি রইল না।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা হাড়ে হাড়ে সে বুঝল তিনদিন পরে। তিনদিন পরে বাবু ফি মোস্তা বোসের সঙ্গে। সঙ্গে এল আর একটা কোথাকার উটকো লোক। সেই উটকো সারাদিন বসে বাপের ঠাকুরের মতো সেবা খেলে। বাবুর তাকে খুব খাতির! অথচ চেহারাটা যেন গাড়ীর গাড়োয়ান একটা। বিকেলে যাবার সময় বাবু তার হাতে ঝকঝকে পাঁচ হাজার টাকা দিলে। দীনে আর কেলো ঠাকুর বাইরে থেকে শুনতে পেল বাবু বলছে—এতে গোলাপীর হীরের সেট গড়িয়ে দিও।

বাবু বলল—আর যা লাগে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব আসছে সপ্তায়।

লোকটা বললে—গোলাপী যা চায় সে কি আর পাঁচ হাজারে হবে?

বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনে কেলো ঠাকুরের চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

রাত্রিবেলা শ্যামসুন্দরের মন্দিরে দীনে বেয়ারাকে ধরল কেলো ঠাকুর।

বস দিনু বস। এই একটু চন্নামেতা নাও, এ ঘর একটু—পেসাদ ঘর।

দীনে ভক্তিভরে চরণামৃতটুকু মাথায় বুকে ছুঁইয়ে সুং করে খেয়ে ফেললে। প্রসাদী ফেলে খুটি-সুটি বসল কেলো ঠাকুরের সামনে মন্দিরের বারান্দায়।

কেলো ঠাকুর জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা বাবুর কি তিনকুলে কেউ নেই?

দীনে বললে—থাকবে না কেন গো? বাবুর মামারা হল এক একজন দিকপাল। বাবুর মেসো হল ডাকসাইটে এটর্নী হরিপদ দত্ত। তাঁকেই তো বুড়োকর্তা বাবুর সম্পত্তির অ দেছে। তিনিই তো সব সম্পত্তি দেখাশুনা করেন। আমি কতোবার গেছি বাবুর সঙ্গে সে আমহোর্স স্ট্রীটের ওপর মস্ত চকমেলান বাড়ী। বাবুর মাসী সাকেত অযোধ্যায়। বাবুকে কী ভ বে বাসেন। বাবু গেলে যেন সগ্‌গো হাতে পান। এতো করে বলেন বাবুকে যেতে—কিন্তু দিকে ঘেঁসবে না। এই সব হাড়-হাবাতেদের সঙ্গে দিনরাত পড়ে থাকবে।

কেলো ঠাকুর বললে—তা শুনেছি বাবু লেখাপড়া জানা ছেলে—এরকমটা বিগড়ে গেল কি

দীনে বললে—আর বোলো না ঠাকুর। বাপ বেঁচে থাকা অবধি বাবু ছেল সোনা তারপর বাপ মল। এসে জুটল ঐ মোস্তা বোস—বাবুর শনি। যত রকম বদখেয়াল এসে এক ছুটতে লাগল। তাছাড়া আর একটা কথা কী জানো গো ঠাকুর—এ হল এ বংশের দোষ। কে বা দোষ দিই কী করে? ওনার বাপের এসব ব্যায়রাম ছেল কি কম?

দীনের কথা শুনতে শুনতে কেলো ঠাকুর অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। দীনের দিকে নেই। কর্তার আমলের বেয়ারা সে। বাবুকে সে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। সে এ

পাড়া-মহল্লার সব জানে। সেইসব কথা সে বলে যেতে লাগল। কেলো ঠাকুরের মাথায় তখন একটা মতলব এসে লেগেছে। সে সেটা নিয়েই ভাবতে বসেছে তখন। দীনের কথাগুলো কিছু কানে যাচ্ছে কিছু যাচ্ছে না।

খানিক পরে ফোঁৎ করে একটা নিশ্বেস ফেলে কেলো ঠাকুর বললে—বাগানী-মা তো বাবুর। তিনি কিছু বলতে পারেন না বাবুকে?

দীনে হেসে ফেললে—ও আমার পোড়া কপাল! বাগানী-মা বাবুর মা হতে যাবে কোন দুঃখে বাবুর মা তো কর্তাবাবুর ধর্মপত্নী—ওই যেনার ছবি বাবুর ঘরের দরজার মাথায় ঝুলতেছে। বাগানী-মাকে কর্তাবাবু তো বে করেননি সরবেড়ের বাগানবাড়ীতে এনে রেখেছিলেন। অবিশ্যি তেনাকে দেখলে কে বুঝতে পারত না বে করা পরিবার নয় বলে।

কেলো ঠাকুর সব শুনে-টুনে বললে—ওঃ, তা এখন তুমি যা বাবুর আবার কী দরকার টরকার হয়।

দীনে বেয়ারা ধড়মড় করে উঠে পড়ল। দেখি মোল্লা বোস গেল কিনা। পাড়েকে খাবার দিতে বলি গিয়ে।

বেরোতে হবে? চুল শুকিয়েছে তো?

ভিজে চুল বাঁধা আর চুলের সর্বনাশ ডেকে আনা একই ব্যাপার। ভুলেও কখনও ভিজে চুল বাঁধবেন না কারণ ভিজে চুল বাঁধলে চুলের সৌন্দর্য আর সাবলীলতা দুই-ই নষ্ট যায়। যদি মনে করেন যে আপনার চুল শুকোবার আগেই আপনাকে বেরোতে তবে ভাল করে জবাকুসুম তেল দিয়ে চুলের গোড়াগুলিতে মালিশ করুন, তারপর পরি করে আঁচড়ে চুল বেঁধে ফেলুন। জবাকুসুম তেল চুলের একটি মস্ত বড় বন্ধু আর এ রেখে জল না ঢাললে কোন ক্ষতি হবেনা। এর চমৎকার সুগন্ধ আপনার মন নিশ্চয়ই স্নিগ্ধ আনন্দে ভরিয়ে দেবে। জবাকুসুমের অপূর্ব ভেষজ-গুণাবলী মাথা ও স্নায়ু স্নিগ্ধ করে।

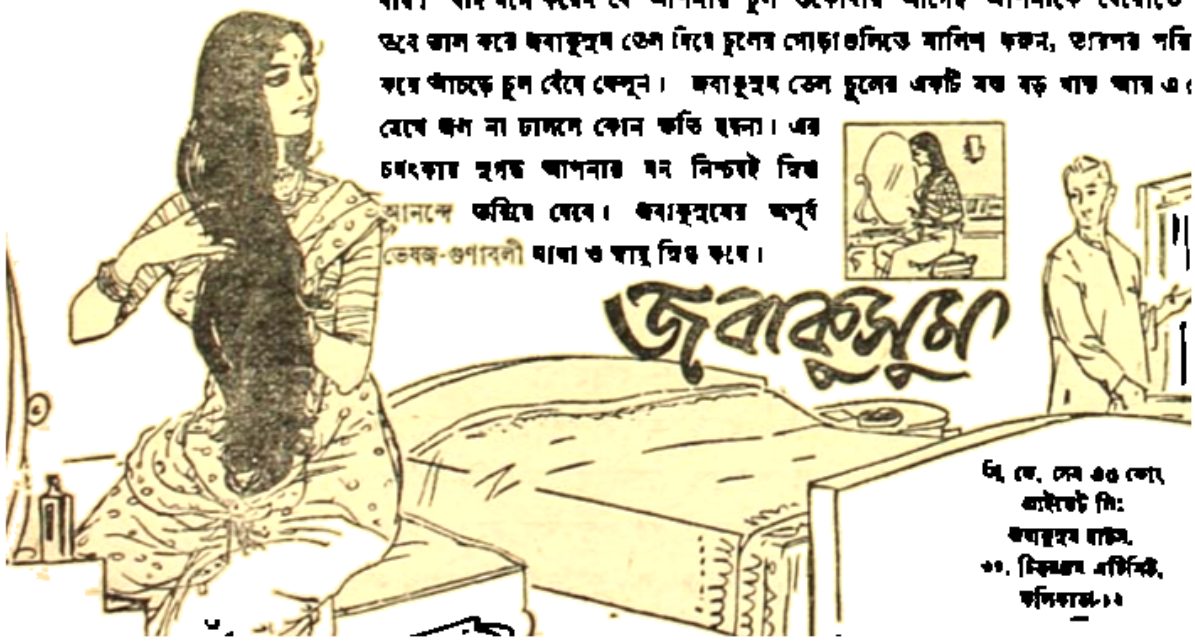

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
৩১, সিকদার বাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

পরের দিন সকালে কেলো ঠাকুর সটান বাবুর কাছে গিয়ে হাজির। বসিবাবু পাচটা দাও দিকিনি!

কেন তোমার আবার টাকায় কি হবে?

একবার কলকাতায় যাব। ভাগ্নীর ছেলেটা ভয়ানক ভুগছে কদিন টাইফয়েডে। দেখে আসব। কাল খবর পেয়েছি।

বসিবাবু হেসে ফেলেন—তোমার তো তিন কূলে কেউ নেই ঠাকুর, তোমার আবার এল কোত্থেকে?

কেলো ঠাকুর চিঁচিঁ করে কি একটা জবাব দিলে। বসিবাবু বেশ বুঝতে পারলে ছেলের অসুখটা একদম বাজে কথা। তবুও পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে ঠাকুরের হাতে দিয়ে বললে—যাও কলকাতায় ঘুরে একটু ফূর্তি করে এস।

তারপর একটু থেমে বললে—তা তোমার যে যাত। কুকুরের পেটে আবার ঘি সয় না থাকগে একটু এদিক ওদিক করে থিয়েটার-টিয়েটার দেখে এসো।

কেলো ঠাকুর বললে—শ্যামসুন্দরের পুজোর আমি সব বন্দোবস্ত করে যাচ্ছি—তোমার হবে না। আজ হল এই সোমবার, আমি ফিরব বিষ্যুৎবার। সেই কথাই রইল। কেলো পায়ে চটি দিয়ে গায়ে একটা উড়নী ফেলে সেই দিনই বিকেলের গাড়িতে কলকাতার রওনা হ

কেলো ঠাকুর ফিরেও এল ঠিক বিষ্যুৎবার। সঙ্গে করে বাবুর জন্যে কালীঘাটের এনেছে। আর এনেছে লাল আলতা পাতায় জড়ান কিসের একটা কবচ। বসিবাবুকে সে বললে—এটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে হাতে পরতে হবে তোমায়।

বসিবাবু তাচ্ছিল্যের সুরে বললে,—কী এটা?

এটা মহাশক্তি কবচ। খুব বড় তান্ত্রিকের কাছ থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে করিয়ে এনেছি মারণ উচাটন বশীকরণের কাজ খুব ভাল হয়।

বসিবাবুর মুখে এবার হাসি ফুটে উঠল। কদিন থেকে ক্রমাগত সোনাপীর সোনাপী বসিবাবু মজে আছে। গয়নাগাঁটি কাপড়-চোপড় অজস্র চালছে সোনাপীর পায়ে। সোনা কাছে যে না আসছে এমন নয়। শুধু আসা কেন যেমন যেমন সোহাগ ঘর করার তা করছে। যেন বেশীই করছে। তবু বসিবাবুর মনের কোণে কোথায় যেন একটা খটকা লেগে আছে। সো ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। আর যত বেশী করে তার এই কথাটা মনে হচ্ছে তত বেশী করে উঠছে সোনাপীকে পাবার জন্যে। মোক্ষা ঘোষের কাছে সে যেমন করে নিজেকে দিয়ে অমনি করে সে কি বসিকে দিতে পারে না। মোক্ষার থেকে বসি কম কিসে?

বসি অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল এতদিন। কেলো ঠাকুরের দেওয়া কবচটা হাতে পেয়ে সে করে লাফিয়ে উঠে বসল। বললে—ঠাকুর তুমি আমার সত্যিকারের মিতে!

কিন্তু বাইরে এসে সে নিজের মনের আনন্দে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। বসিরা চৌপ সিলেছে। কবচটা আসলে শনি নিগ্রহ কবচ। ঐ ব্যাটা শনি মোস্তা বোস, ওই শনি গোলাপী ঘ কে সেই মাগীটা। এই কবচের চোটে এবার দেখি তারা টেঁকে কেমন করে? দেখি বাবু ভাল হয় কি না হয়?

কলকাতায় গিয়ে কেলো ঠাকুর আরও একটা কীর্তি করে এসেছে। সেটা সে কারুর কাছে ভাঙল না। কিন্তু তার ফলেই হোক বা ঐ কবচের গুণেই হোক—পরের রবিবার সকালে হরিপদ দ এটর্নীর নতুন কেনা মোটরখানা এসে বসিবাবুর বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। গাঁয়ের ছেলে বুড়ো ভেঙে পড়ে সে জায়গাটায় হাওয়াগাড়ী দেখবে বলে। যদিও কলকাতার কাছে তবুও এই প্রথম মোটরগাড়ী এ গাঁ এল। তাদের চীৎকারে অন্দরমহলে বসিবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। বারান্দা দিয়ে তাকিয়ে দেখে মেসো আর মাসী গাড়ী থেকে নামছেন। তাড়াতাড়ি করে নেমে এসে বসিবাবু তাঁদের পায়ের ধুলো নি বাড়ীতে ঢোকাল। মনে মনে কিন্তু ভয়ানক দমে গেল বসি। এই সকালে মেসো মাসী কেন? মেসোকে আবার বসি মনে মনে ভয় করে ভয়ানক—যা রাশভারী লোক। ইয়ারকি ফাজলামির ধার দিয়েও তিনি যান না। কখন কেউ তাঁর মুখে কোনদিন এক টুকরো হাসি দেখেননি।

বসি ভাবতে লাগল মেসো আসার কারণটা কী? সম্পত্তির ব্যাপার? তা আমায় ডেকে পাঠালেই চুকে যেত। নাকি অন্য কিছু? কিন্তু কি যে ব্যাপার বসি ভেবে ঠিক করতে পারল না।

মেসো হরিপদ দত্ত গম্ভীর মুখে সটান বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলেন। তারপর এঘর সেঘর ঘুরে ওপরে বসির শোয়ার ঘরে এসে ঢুকলেন। সেখান থেকে সটান নেমে এলেন বসির বৈঠকখানায়। বসি মনে মনে মৃত্যু ইচ্ছে করতে লাগল। মদের বোতল, গেলাস সব ছড়ান রয়েছে বৈঠকখানার আজিমের ওপরে। দীনে বেয়ারার ওপর রাগ হল ভয়ানক। মনে হল হারামজাদা কেন এগুলোকে সরিয়ে রাখেনি অতো বেলা অবধি।

মেসো হরিপদ দত্ত বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এসে গম্ভীর মুখে শুধু বললেন—হুম্!

মেসো মাসীর সামনে আর মুখ তুলতে পারে না বসি। মনে করছে মাটিটা এখুনি ফেটে যা তার ভিতরে ঢুকতে পারলে বোধ হয় এই লজ্জার হাত এড়ান যায়।

মাসী বসির কপালে বুকে খালি হাত বোলান আর বলেন—কেমন আছিস্ বাবা?

বসিবাবু বললেন—কেন বেশতো ভাল আছি মাসিমা।

মাসী বললে—সেই কেলো ঠাকুর মেলো কোথায়? সেইতো আমায় তোর অসুখের খবর দিয়েছিল। তা কতদিন ভুগলি বাবা অসুখে—আমায় আগে একটু খবর দিলি না কেন?

বসিবাবু দাঁত কিড়মিড় করে চাপা গলায় বললে—শালা!

বরাত এই যে সেটা কারুই কানে গেল না।

কেলো ঠাকুরের খোঁজ পড়ল। শোনা গেল সে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে। মাসী সেখানেই ছুটলেন

মেসো আর মাসী সারাদিন বসির বাড়ীতে কাটালেন। বসিও সারাদিন অস্বস্তিতে করতে লাগল। দীনেকে দিয়ে ইয়ারবক্সিদের বাড়ী বাড়ী খবর পাঠিয়ে দিলে—খবরদার তারা যেন এ বাড়ীর দিকে না আসে।

বিকেলে যাবার আগে মেসো আর মাসী বসিকে নিয়ে বসল। মেসো বললেন—এমন কাটান আর তোমার চলবে না বসন্ত। আমি আর তোমার মাসী দুজনেই ঠিক করেছি তোমাকে সংসারী করব। একটি মেয়েও দেখেছি আমরা। বাগবাজারের ঘোষেদের বাড়ীর মেয়ে। মেয়েটি সুশ্রী, সুলক্ষণা। তাছাড়া ঘোষেদের বাড়ীর বংশ-মর্যাদার কথা জানে না সারা বাংলায় এমন লোক ক

বসিবাবু কি একটা বলতে গেল।

মাসী তাকে অনুনয় করলেন—না করিসনি বসন্ত, লক্ষী বাপ আমার। মেয়েটার একটু হয়েছে, তা হোক। তোর সংসারের জন্যে একটু চালাক চতুর মেয়েই দরকার।

বসি আবার কি একটা কথা বলতে গেল।

এবার তার কথায় বাধা দিলেন স্বয়ং হরিপদ দত্ত। এবার তাঁর গলা থেকে এইনীর আ বেরিয়ে এল। বললেন—তোমার ইচ্ছে হয় করবে বিয়ে, ইচ্ছে না হয় করবে না। একটা কথ তোমায় জেনে রাখা ভাল। তুমি যদি এই রকম উড়নচণ্ডে হয়ে কাটাও, তবে তোমার সম্পত্তির আ আমি আর করতে পারবো না। তোমার সম্পত্তি থাক বা যোল্লায় যাক—তা নিয়ে আমি আ ঘামাতে আসব না। আমার স্পষ্ট কথা তোমাকে আমি জানিয়ে গেলুম। যদি মেয়েটিকে চাও আসছে রবিবার আমার বাসায় এসো। বন্ধুবান্ধব সঙ্গে এনো না কিন্তু মেয়ে দেখবার জন্যে।

কথা শেষ করেই তিনি উঠলেন। মাসী বসির মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—না ক বাবা। তোর মেসো মেয়ের বাপকে এক রকম কথাই দিয়েছেন। মাসী লোকের মাথা হেঁট ক সোনা আমার। নতুন কেনা মোটর গাড়ী চড়ে মেসো-মাসী সন্ধ্যেবেলায় কলকাতায় ফিরলেন।

মেসো মাসী বিদেয় হতেই বসি হাঁক পাড়ল। কেলো ঠাকুর কোথায় রে? কেলো এসে সামনে দাঁড়াতেই বসি তার ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। চুলের ঝুঁটি ধরে বল এক্ষুণি তুই বিদেয় হ' আমার বাড়ী থেকে। হারামজাদা বদমায়েস। যার খাস তারই দাড়ি ও মাসীকে দিয়ে আমার কথা লাগিয়ে এসেছিস? বেরো শালা, দূর হ', এক্ষুণি তোর মুখ দেখতে চাই

কেলো ঠাকুর আস্তে আস্তে বাবুর বাড়ী থেকে তার জিনিসপত্তর নিয়ে সেই রাতেই গেল রাধুদের বাড়ীর কাছে শম্ভু পণ্ডিতের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে সেখানেই রাতে থাকার ব্যবস্থা ফেললে। কিন্তু বাবুর বাড়ী শ্যামসুন্দরের পুজো সে রীতিমত সকাল-সন্ধ্যে করে যেতে লাগল।

কেলো ঠাকুরকে বিদেয় দিলেও বসি কিন্তু পার পেলো না। রবিবার তাকে মাসীর বা যেতেই হল। তারপর সেখান থেকে ঘোষেদের বাড়ী মেয়ে দেখতেও যেতে হল।

মেয়েটি বেশ বড়সড়। শোনা গেল ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্ণৌয়ে দাদামশায়ের কাছে —তাইতে গড়নটা কিছু বাড়ন্ত। বয়সও অবশ্য কিছু এমন কম নয় প্রায় ষোলো। এত বেশী অবধি কলকাতার বামুন কায়েত সমাজের মেয়েদের আইবুড়ো থাকার কথা নয়। তবে এ দাদামশাইয়ের আদুরে নাতনী বলে তিনি তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে একে পার করতে চাননি।

মেয়েটির চেহারা দুর্গা প্রতিমার মতো। কনকচাঁপা গায়ের রং—গোলগাল একটু দে গড়ন। সাজলে ঠিক জমিদারের গিন্নী বলেই মনে হয়।

বসিবাবু গ্রামের বাড়ীতে চলে এসে ভাবতে বসল। মেসো মাসীর কাছ থেকে সময় সাতটা দিন। কিন্তু বসি যতই ভাবে ততই তার সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। এদিকে গোলাপী, ও মেসো। গোলাপীর চিন্তা বসি কিছুতেই ছাড়তে পারে না। অন্যদিকে ভাবে মেসো স অফিসিরি ছেড়ে দিলেই তো সেছি আর কি! ওসব আদায়-তশীল, বাকী-বকেয়া রোকড়-বে কারেন্সা তার মাথায় কিছু ঢোকেও না আর সে ঢোকাতে চায়ও না। সম্পত্তির দায় ঘাড়ে চা জীবন শেষ। স্ফূর্তি-ফার্তার দফা গয়া। মেসোকে চটান মানেই যে বিপদ ডেকে আনা। ভয় নুশকিলে পড়ল বসি। বন্ধুবান্ধব কারুর সঙ্গেই পরামর্শ করতে পারে না। মোক্তার সঙ্গে তো ন মোক্তা শুনলে এক্ষুণি ঠাট্টা করবে। বলবে—

কেলো ঠাকুরের জন্যেও এদিকে কদিন থেকে মনটা কেমন যেন ছটফট করছিল বা ওরকম তাড়িয়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি সেদিন। যাই হোক রাগের মাথায় হয়ে গেছে কাজটা। (নিতে হচ্ছে কেলো ঠাকুর গেলো কোথায়। দীনে বেয়ারাকে ডেকে বললে—হ্যাঁরে দীনে, তে ঠাকুর কোথায় একবার পাত্তা করতে পারিস?

দীনে বেয়ারা বললে—বাবু তিনি তো রোজ শ্যামসুন্দরের মন্দিরে পুজো করতে আসেন। শুনতে পাই তিনি আর এ বাড়ীতে থাকেন না। সেই দত্তদের বাগানের পাশে শম্ভু পণ্ডিতের আটচ বাস কচ্ছেন।

তার পরের দিনই বসিবাবু গিয়ে পাকড়াও করল কেলো ঠাকুরকে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে। তখন সবে হাত পা ধুয়ে মন্দিরে ঢোকবার উদ্‌যোগ করছে। বসিবাবু একেবারে গিয়ে কেলো ঠা সামনে হাজির। বললে—ঠাকুর তোমায় সেদিন বড্ড যা-তা বলেছি। সেই থেকে মনে মোটেই পাচ্ছি না। তা তুমি পুজো সেরে নাও, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

কেলো ঠাকুর তো প্রথমটায় অবাক। শেষে বসির কথা শুনে ব্যতসমস্ত হয়ে বলে উঠ না না, তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না ঘরে যাও। আমি পুজো সেরে যাবো এখন।

দীনে বেয়ারা অবাক হয়ে দেখল ঠাকুরকে ঘরে নিয়ে বাবু ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। ব থেকে দিনে বেয়ারা শুনতে পেল বসিবাবু আর কেলো ঠাকুর সারা দুপুর একটুও না ঘুমিয়ে খালি বলে যেতে লাগল।

বসিবাবুকে সারা দুপুর জপাতে লাগল কেলো ঠাকুর। বসি খালি জোটনার নামে। আমি কি চরিত্তিরের লোক তা তো তুমি জানো ঠাকুর, ওসব ভাল ঘরের ভাল মেয়ে এনে ক্যাসাদে পড়ব। তা ছাড়া মোল্লাপীটা বড্ড মন কেড়ে নিয়েছে।

কেলো ঠাকুর বললে—স্থাখ বসিবাবু, তুমি হলে দেখাপড়া জানা বিদ্বান লোক—তোমায় বলা সাজে না। হ্যাঁ, তুমি যদি মোল্লা কোসের মতো হেঁজি-পেঁজি হতে তাহলে না হয় তোমার একথা শোভা পেত। আর বে যখন করতেই হবে তখন ভাল ঘরের মেয়েই আনা ভাল—বয় বিশেষ করে তুমি যখন বলছ মেয়েটি তোমার—

বসিবাবু চুপ করে আছে দেখে কেলো আবার সুরু করল—তাছাড়া এ বে'তে দত্তমশাই হবেন—একটা মানী লোকের মান থাকবে। তোমার নিজের মা নেই মাসী হল মায়ের মতো তাঁকেও খুশী করা হবে। বসি তুমি এ-বে'তে না কোরো না, লক্ষ্মী ভাইটি।

কেলো ঠাকুরের গলায় বড় ভাবের স্নেহকোমল অনুরোধ ফুটে বেরিয়ে এল। বসি তবুও চাপ। কিছুক্ষণ পরে ফোঁৎ করে একটা নিশ্বেস ফেলে বললে—সব বুঝি, কিন্তু ঐ মোল্লা পাড়ার মেয়েমানুষ বলে ডাকবে—এ আমি সহ্য করতে পারব না। তার চেয়ে আমার নিজের সম্পত্তি নিজে দেখব, মেসো রাগ করে করুক—কী করব।

কিন্তু তারপরের দিনই ঘটল আর এক ব্যাপার।

পরের দিন ছিল বসিবাবুর জন্মদিন। সেদিন সে বাগানী-মার কাছ থেকে একটা বড় চিঠি পেল।

বসিবাবুর বাবা উপেন রায়ের অনেক সদ্‌গুণ থাকলেও জমিদারের সবচেয়ে বদ্ ব্যারাম হাত থেকে তিনি রেহাই পাননি। তাঁর নারীতে আসক্তি ছিল অসাধারণ, তিনি গ্রাম থেকে অনেকখানি দূরে সরবেড়েতে একটা বাগানবাড়ী করেছিলেন। প্রকাণ্ড বড় বাগানবাড়ী প্রায় বিঘের জমির ওপরে। সারা বাগানবাড়ীটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যেই পুকুর, বাগান, খামার, সুন্দর বাংলো বাড়ী। ঘরগুলো চমৎকার ফার্নিচারে সাজানো।

ইতিমধ্যে বসিকে জন্ম দিয়ে বসির মা সতীলক্ষ্মী আঁতুড় ঘরেই চোখ বুজলেন। উপেন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। সেই বেপরোয়া জীবন তাঁর চলতে লাগল বছরের পর বছর। রায়ের ভাগ্যাত হাক ঘোষ একবার যশোর জেলায় গেল কী একটা কাজে। সেখান থেকে আনল এক বামুনের মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। যশোরের মেয়ের রূপ দেখে উপেন রায় ঘ' হয়ে গেল ভরা যৌবনের মেয়ে—সারা শরীর দিয়ে তার অপূর্ব লাবণ্যের স্রোত বইছে যেন গলা কাঁচা সোনা। চোখ, তেমনি নাক, তেমনি থুতনির গড়নটা। মাথার ঢেউ খেলান ছাঁটুছোঁয়া ঘন মেঘের মতো থেকে পায়ের পাতার আঙুলগুলো পর্যন্ত আশ্চর্য রকমের সুন্দর। দেখেই মনে হয় বড় ঘরের মেয়ে

উপেন রায় আর উচ্চবাচ্য করলেন না সেই থেকে ছেলে মেয়ে কাঁধে করে সে সরবেড়ের বাগানবাড়ীতে তার বাচ্চাটিকে সঙ্গে করে। উপেন রায় সেখানেই কাটাতে লাগলে বেশীর ভাগ সময় নিজের ঘর ছেড়ে। উপেন রায়ের উচ্ছৃঙ্খলতার নৌকো বোম্বাইয়ের মেয়ের ঘাটে এ সেই ঝোঁকের কেলেঙ্কারি—তা আর উঠল না উপেন রায় সব ছেড়ে সরবেড়ের বাগানবাড়ীতে পনেরো বছর কাটিয়ে দিলেন। সবাই বললে—বোম্বাইয়ের মেয়ে—কাহিনী নয় জানে।

বসন্তর মা মারা যাবার পর উপেন রায়ের বেলাগোনা জীবনের খবর পেয়ে বসন্তর মাসী এসে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। উপেন রায় মারা যাওয়া অবধি বসন্ত মাসীর বাড়ীতে থেকেই পড়াশুনা করতে লাগল। মাঝে মাঝে আসত গাঁয়ে—কিন্তু ভিড়োতে পারত না।—বাপের সঙ্গে দেখা হত কদাচিৎ একবার বাপের সঙ্গে দেখা করতে সে নিজেই গিয়েছিল সরবেড়ের বাগানবাড়ীতে ছোটবেলায়। বেশ না আছে সেকথা সে সময়ে বাগানী-মাকে দেখে বসন্তর খুব ভালও লেগেছিল। কিন্তু বাগানে মার কোলে গিয়ে সেই তার মনে হল এই বাড়িটাই তার বাবাকে এখানে আটক করে রেখেছে অমনি তার শিশুমন বাগানী-মার ওপর বিরূপ হয়ে উঠল। বাগানী-মার মেয়ে পুষ্পকেও সে খুব ভা চোখে দেখল না। অবশ্য পুষ্প তখনও নিতান্তই শিশু বলা যায়। সেই প্রথম সেই শেষ। তারপর বস কোনদিনও সরবেড়ের বাগানবাড়ীতে যায়নি বাগানী-মা অবশ্য তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন বহুবার

সোনার স্বপন!

লর্ডের মেলি, চকোলেট ও ক্রীম ভরা মনোহর লজেন্স মুখে পড়লে শরীর ও মন মিষ্টি রসে ভরে যায়। মনে হয় রোজই এক বয়াম খাই।

লর্ডের

লজেন্স ও টফি

জেমস লর্ড এণ্ড সন্স
কলিকাতা-১

এমন কি একবার বসন্তকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য নিজেও এসেছিলেন এবাড়ীতে। কিন্তু তাঁর অ খবর আগে থেকে পেয়ে—বসন্ত গা ঢাকা দিয়েছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের মনে বিতৃষ্ণার এসে জমেছিল খানিকটা ঘৃণা—বাগানী-মার ওপর। সে মনে মনে ভাবত বাগানী-মা তার বাবাকে করেছে তাঁর সম্পত্তি হাত করার জন্যে। এবার তাকেও বশ করতে চাইছে—যাতে সে কথা না বলে।

উপেন রায় সরবেড়ের বাগানবাড়ীতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন।—তার মাথার শির ছিঁড়ে গিয়ে ডাক্তাররা তার নড়াচড়া বারণ করে দিয়েছিল। কিন্তু তবুও তাকে অজ্ঞান অবস্থায় অনেক লাবণ বাড়ীতে এনে ফেলা হয়। তাঁকে শেষ অবস্থায় দেখবার জন্যে বাগানী-মা বসন্তর কাছে অনুমতি চেয়ে এবাড়ীতে এসে কটা দিন বসে থাকার। বসন্ত বাগানী-মাকে সে অনুমতি দেয়নি।

উপেন রায় মারা যাবার পর থেকে বসন্তের সঙ্গে বাগানী-মার সম্পর্কও খুব ঢিলে হয়ে। তবুও মাঝে মাঝে বসন্তের জন্মদিনে কি দুর্গাপুজোর সময় সরবেড়ের বাগানবাড়ী থেকে কাপড়, মিষ্টি নিয়ে লোক আসে বসন্তর কাছে। সঙ্গে লেখা থাকে একটা চিরকুট—"নিরাপদীর্ঘজীবেষু, বাবা শারদীয়া মহাষষ্ঠীতে আশীর্বাদ করি তুমি চিরজীবী হও। তোমার হতভাগিনী মা।" পুঃ—যদি ৮ দশমীর পর একবার এখানে আস তো আমার আনন্দের অবধি থাকবে না।

কিন্তু বসন্ত সে সব চিঠির জবাব কোন দিনই দেয়নি। যে লোক জিনিস নিয়ে আসতে ফিরে গিয়ে বলত—বাবু ভাল আছেন।

তবে উপেন রায় বেঁচে থাকতে বসন্ত বাগানী-মাকে যে চোখে দেখত—তিনি মারা যা সেটা আস্তে আস্তে বদলাতে লাগল। বসন্ত দেখল—বাগানী-মা তার সম্পত্তির কিছুই দাবী করছে এক সরবেড়ের সম্পত্তিটাকে সম্বল করে তিনি আর তাঁর মেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। শত্রু দূরে থাক—তিনি বরঞ্চ স্নেহই করে এসেছেন চিরকাল বসন্তকে।

বসন্তেরও মাঝে মাঝে ইচ্ছে করত সরবেড়েতে যেতে। তার ভিতরে ভিতরে একটা ইচ্ছা ছিল—মা আর মেয়ে কেমন করে দিন চালাচ্ছে তা দেখবার জন্যে। তবে বাইরে কেমন একটা এসে তাকে চেপে ধরত। তাই সে ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারত না সরবেড়েতে।

এবার বসির জন্মদিনে সরবেড়ের বাগানবাড়ী থেকে একটা লোক এল—বাগানী-মার আশীর্বাদ নিয়ে। সঙ্গে নিয়ে এল আধমণটাক্ ওজনের একটা কই মাছ—একেবারে টকটকে আর বাগানী-মার নিজের হাতের তৈরী কাঁচাগোল্লা, কোঁচান ধুতি, চাদর ইত্যাদি। কিন্তু তা আরও একটা জিনিস ছিল যা দেখে বসন্তের মনটা খুশীতে ভরে গেল। ছিল ফ্রেমে-বাঁধান তে ওপর এমব্রয়ডারী তোলা একগোছা রজনীগন্ধা। নীচে লেখা পুষ্প।

সুন্দর হাতের কাজ।

লোকটা এসে একটা চিঠি দিল বসন্তকে। বসন্ত খুলে দেখল বাগানী-মার চিঠি।

দীর্ঘ চিঠিতে তিনি লিখেছেন নানা কথা। নানা স্নেহ বাক্যে চিঠিটার বেশীর ভাগ তিনি ভরি ফেলেছেন। শেষে লিখেছেন—"বাবা, তোমার পিতার অবর্তমানে এখন তুমিই আমাদের অভিভাবক বিশেষতঃ তুমি এখন বড় হইয়াছ, শিক্ষিত হইয়াছ। উপরন্তু পুত্র পিতার সমতুল্য। আমি অনেক আ করিয়াছিলাম—যে একবার তুমি আমার এখানে আসিবে। তোমাকে দেখিয়া আমি অন্তরের তৃপ্তি লা করিব। কিন্তু ঈশ্বর এই হতভাগিনীকে সে সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন। আমি জানি আমাদের প্র তোমার মনোভাব অত্যন্ত বিরূপ। কিন্তু বাবা বসন্ত, তুমি আমার প্রতি যতই বিরূপ হও না কেন—আ তোমাকে চিরদিন পুত্র জ্ঞান করিয়াছি। তাই তোমাকে দেখিবার জন্তে প্রাণের আকুলতা এত বেশী অন্য দিকে আমার কন্যা পুষ্প এই আঠারো বৎসর অতিক্রম করিল। সেও তার দাদাকে দেখিবার ম ব্যাকুল। কন্যা বড় হইয়াছে, এখন তাহার বিবাহ দেওয়া আমার কর্তব্য। যদিও অর্থের দিক হই তোমার পিতা আমাকে বঞ্চিত করেন নাই—তবুও লোক-সামর্থ্য তো আমার কিছুই নাই। আমি ম দুইটি ভৃত্য ও কিছু কৃষক প্রজা লইয়া এই নির্বান্ধব পুরীতে একা কাটাইতেছি। সরবেড়ের বাহিরের জ আমার কাছে একেবারেই অজ্ঞাত। তাই তোমাকে অনুরোধ করি, একবার একটু সময় করিয়া য এখানে আসিতে—তবে বড়ই ভাল হইত। আমি জানি আমার এই অনুরোধ ব্যর্থ হইবে—তবু জানি আমি তোমাকে কোনদিন অনুরোধ করিতে বিরত হইব না। ইতি—তোমার হতভাগিনী মা।"

চিঠিখানার আদ্যোপান্ত পড়ে বসন্তর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাগানী-মার ওপর বি মনোভাবটা তার ইদানীং যথেষ্ট কমে এসেছিল। এই চিঠিটা পড়ে একটি আত্মীয়-বন্ধুহীন অনা স্ত্রীলোকের জন্ত বসন্তর মন বেদনা বোধ করতে লাগল। সে এবার ঠিক করল একবার সরবেড়ের বা বাগানী-মা আর তার মেয়ে পুষ্পকে দেখবার জন্তে। তার জন্মদিনের পাঁচদিন পরে সে কাউকে কি না বলে শুধু কেলো ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে সরবেড়ের বাগানবাড়ীতে এসে হাজির হল।

বসন্ত যখন সরবেড়ের বাড়ীতে এসে পৌছাল—তখন প্রায় বেলা ন'টা। গ্রাম থেকে ঘোড় গাড়ীতে আসতে লেগেছে প্রায় ঘণ্টা দুই। এই দু' ঘণ্টার মধ্যে বসন্ত ভেবেছে নানা কথা—বাগানী-ম সম্বন্ধে। বাগানী-মার ওপর ছেলেবেলায় তার একটা ঘৃণা মিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব ছিল। তার কা বাগানী-মায়ের জন্তেই তার বাবা তাদের পুরোনো ঘর-বাড়ী ছেড়ে এমন কি বসিকে পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে চ উঠেছিলেন সরবেড়ের বাগান-বাড়ীতে। বাগানী-মা আসা থেকে বসি জানে তার বাবা সরবেড়ের বাগানে পনেরোটা বছর কাটিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—তার ওপর বাগানী মা'র স্নেহের কথাগুলো। তিনি এ বাড়ীতে কে দিন আসেন নি। বসিকে সেই ছেলেবেলায় একবার ছাড়া আর দ্বিতীয় বার দেখবার সুযোগ হয়নি তা তবুও বসির ওপর তাঁর স্নেহের অন্ত ছিল না। কারণে অকারণে তিনি বসিকে খাবার তৈরী ক পাঠাতেন। কাপড়-জামা কিনে পাঠাতেন। তাকে সরবেড়ের বাড়ীতে খাবার জন্তে অনুরোধ করতে

প্রত্যেক বার। তার মনে হল বাগানী-মা তার বাবাকে বোধ হয় বশ করেছিলেন এই স্নেহ দিয়ে। মা তার বাবার যে উচ্ছৃঙ্খলতাকে তার মাও রাশ টানতে পারে নি—সেটা তো বাগানী-মা আসার পেমে গিয়েছিল একেবারে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বসির মনে বাগানী-মার উপর বেশ খানি শ্রদ্ধা এসে গেল।

সরবেড়ের বাগানবাড়ীর দরজায় গাড়ী গিয়ে দাঁড়াতেই চেনা দরোয়ান অর্জুন সিং এসে ঝুঁকে দাঁড়াল। অর্জুন সিং প্রায়ই যায় বসির কাছে—মায়ের কাছ থেকে জিনিসপত্তর নিয়ে। সিংকে সঙ্গে নিয়ে বসি একেবারে অন্দর মহলে ঢুকে পড়ল—কাউকে কিছু জানবার সুযোগ না। বাইরে কেলো ঠাকুর জিনিসপত্তর গোছাবার ব্যবস্থা করতে লাগল।

অর্জুন সিং বসিকে নিয়ে গিয়ে হাজির করল একেবারে খিড়কীর বাগানে। বাগানটায় নানা ফুলের গাছ। গন্ধরাজ, বেল, টগর, জবা, অতসী, অপরাজিতা। সুন্দর সাজানো বাগান। সেই বাগানের মধ্যে বসি দেখা পেল বাগানী-মার। বাগানী-মা একটা ছোট্ট সাজি হাতে নিয়ে ফুল তুলছিলেন। পরনে ছিল একখানা সাদা পরদের থান। তাঁর অনাড়ম্বর সন্তোষাত স্নিগ্ধ সুন্দর চেহারার মধ্যে যে কি একটা মহিমার প্রকাশ দেখতে পেল। আগে সে কোনদিন কোন স্ত্রীলোকের চেহারার এই দেখেনি, তার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা হেঁট হয়ে গেল। মন্ত্রচালিতের মতো সে গিয়ে বাগানী-মার ধুলো মাখায় নিয়ে বললে—আমি বসন্ত।

বাগানী-মা হাতের সাজিটা মাটিতে নামিয়ে রেখেই বসন্তের মাথাটা বুকে টেনে নিলেন। তার চিবুক স্পর্শ করে হাতটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে চুমু খেতে লাগলেন। তারপর ধরা গলায় আর চোখে বলতে লাগলেন—এমনি করে কী মাকে পর করে দেয় বাবা? তা তুমি আসবার আমায় একটু খবর পাঠালে না কেন বাবা?

বসি বললে—মার কাছে আসব, তার জন্যে খবর পাঠাবার দরকার কী?

মা চোখ মুছতে মুছতে বললেন ঠিকই তো বাবা, বসির মনটাও ভয়ানক ভিজে গেল। সামলে নিয়ে সে বললে—পুষ্প কই, তাকে তো দেখছিনে।

মা বললেন—দেখি আবার সে গেলো কোথায়। বয়সটাই তার বেড়েছে বাবা, নইলে সে বড্ড ছেলেমানুষ। গাছে গাছে লাফালাফি করে এমন, যে আমার ভয় করে কোনদিন না পা ভেঙে গাছ থেকে পড়ে। এই বয়সের মেয়ের হাত-পা ভাঙলে যে কী দুর্গতি হবে—

কথা বলতে বলতে—তিনি বাড়ীর মধ্যে এসে পৌঁছালেন। তারপর ডাকাডাকি করে বাড়ীটা সরগরম করে তুললেন। তাঁর ডাকে অর্জুন সিং এল, ভোলা আর ভুতো দুই চাকর ছুটল। পুরোনো কালের রাঁধুনি পাড়েঠাকুর এল, মার দুই খাস ঝি বিনি আর রতনমণি এল। সারা বাড়ীতে হৈ-হৈ পড়ে গেল—বসন্তকে যে মা কোথায় রাখবেন কী খাওয়াবেন তাইতো অস্থির হয়ে পড়লেন।

ভোলা গেল গয়লা পাড়াতে দুধ, দই, মিষ্টির বন্দোবস্ত করতে। দুতো ছুটল জেলে পাড়া বিনি আর রতনমণিকে নিয়ে মা নিজেই লেগে গেলেন বসন্তের তদারকিতে।

এদিকে বসন্ত সারা বাড়ীটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লেগেছে। তার বাবা মরবার এক সপ্তাহ আগে এখানে বাস করে গেছেন। তার বাবার বন্ধ ঘরের সামনে এসে মা চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলতে আশ্চর্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরটা। আসবাবপত্র যেখানে যেমনটি ছিল তেমনটিই রয়েছে। দেখলে মনে হয় যেন এ ঘরের মালিক এখুনি কোন কাজে বাহিরে গেছেন। মা বললেন—বাবা, এটি তো বাবার ঘর ছিল। এখন থেকে তোমার হল। তুমি এই ঘরটাতেই থাকবে।

এদিকে বাইরে কেলো ঠাকুর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে ঠিক করতে না পেরে বাগ বাড়ীটা ঘুরে দেখতে বার হয়ে পড়ল। পাঁচশ বিঘের সম্পত্তি। উপেন রায় শখ করে করিয়েছিলেন এই বাগানবাড়ী। এখানে নেই হেন ফলের গাছ নেই। দেশী বিলেতী এমন ফুল নেই যা এখানে পা যাবে না। তাছাড়া বাগানের মাঝখানে বিরাট পুকুরে মাছ ঠাসা।—পুকুরের জলটা কাকের চো মতো কালো অথচ পরিষ্কার। পুকুরের ধারে স্নানের ঘর।

কেলো ঠাকুর ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল। বাগান, পুকুর, সব কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছ লোকজন কোথাও কোথাও কাজ করছে—ডাল ছাঁটছে, চারা পুঁতছে। শেষে পুকুরের এক পাড়ে। কেলো ঠাকুর অবাক হয়ে গেল। একটা প্রকাণ্ড বুড়ো আমগাছ হেলে এসে পড়েছে পুকুরের ও কেলো ঠাকুর তারই তলায় এসে দাঁড়িয়ে দেখছিল পুকুরের জলটা। হঠাৎ সে দেখতে পেল একটি ষ সুন্দরী মেয়ে আমগাছের ডাল থেকে ঝপাং করে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর সুরু হয়ে পুকুরের জলে তোলপাড়। কেলো ঠাকুরকে মেয়েটি দেখতেই পায়নি। সে আপন মনে জলে সাঁ কাটতে লাগল। কখনো ডুবে যায়—কখনো ভুস করে ভেসে ওঠে। কখনও বুকটাকে জলের উ ভাসিয়ে চিৎ সাঁতার কাটে—মাঝে মাঝে কুলকুচি দিয়ে জল ছাড়ে ওপরের দিকে ফোয়ারার মতো।

এমন সময় মার খাস ঝি বিনি দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির। আমগাছটার পাড়ে এসে হাঁক ছাড়ল—দিদিমণি গো, ঘরে এসে দেখসে কে এয়েচেন। মা তোমায় খোঁজ করতিচেন।

বিনি দাসীকে দেখতে পেয়ে কেলো ঠাকুর আস্তে আস্তে সে জায়গা থেকে সরে পড়ল। এ সে চিনতে পেরেছে মেয়েটিকে। বাগানী-মার মেয়ে পুষ্প। প্রায় আঠারো বছর বয়স হয়েছে পুষ্প চমৎকার সুন্দরী মেয়ে। তবুও এতদিন কেন যে বিয়ে হয়নি মেয়েটির। ভাবতে ভাবতে কেলো ঠা ফিরে এল বাড়ীতে। এসেই শুনতে পেল বসিবাবু তাঁকে খোঁজ করছেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর বসি একটু ঝিমোচ্ছিল—তার বাবা উপেন রায়ের পালঙ্কের উপর শু আজ তার মনে হচ্ছিল ঘরোয়া জীবনের অনেক কিছু থেকেই সে বঞ্চিত হয়ে আছে। আজ বাগানী

তাকে মায়ের মতো যত্ন করে নিজে হাতে রেঁধে খাইয়েছেন। সতক্ষণ খাওয়া শেষ না হয়েছে—পাশে বসে পাখার বাতাস করেছেন।

বসন্ত কুণ্ঠিত হয়েছে, আপত্তি করেছে—কিন্তু মা ছাড়েন নি। পুষ্পর সঙ্গেও দেখা হয়েছে ব কুড়ি বছরের অসাধারণ সুন্দরী যুবতী মেয়ে। তাকে প্রথম দেখে বসির অনেক দিন আগে দেখা বাগান ছবিটা মনে পড়েছিল। তবু এক। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই গড়ন। কিন্তু তফাতও ছিল অ মাকে সেদিন বসির কতোই বয়স্কা ভারিক্কী বলে মনে হয়েছিল। পুষ্প একেবারেই তার বি প্রথমে এসেই হাততালি দিয়ে নেচে উঠেছিল বসন্তকে দেখে। কী মজা নদা না, দাদা এসেছে।

মা তক্ষুণি ওধরে দিয়েছিলেন—ছিঃ পুষ্প, এসেছে বলতে নেই দাদাকে—এসেছেন বলবে।

বসি আপত্তি করেছিল—না মা, আপনার মনকে কেউ কি আপনি আজ্ঞে করে? ও তুমিই বলবে।

তারপর পুষ্প বসন্তকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাহিরের বাগানে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছি হরিণ মিঠুয়ার সঙ্গে। তার শখের গরু সরলার বাচ্চা হয়েছে সম্প্রতি সেটাও সে হাজির করেছিল করে। বলেছিল—দাদা, এর একটা নাম দিতে পার?

তারপর তার হাতে পোঁতা নানা রকম গাছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল পুষ্প তাদে বার, ইতিহাস শুনিয়ে।

বসন্তর আজ মনে হচ্ছিল—সে অনেককাল পরে একটা সহজ আনন্দময় জীবনের সন্ধান পে তাই সে পরম আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিল পালঙ্কের উপর।

বেলা চারটে নাগাদ ঘুম ভাঙতেই মা ঘরে এলেন। হাতে ফলের থালা আর শ্বেত পাথরের গেলাসে ফলসার শরবত। বসন্তের কোন ওজর-আপত্তিই টেঁকল না—তাকে ফলের থালাটা টেনে বসতে হল। মা কথা বলে যেতে লাগলেন। প্রথমে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন বসন্তর সব খবর। নানা কথায় বসন্তর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধেরও তিনি প্রশ্ন করলেন। বসন্ত বাসানী-মা দূরে থাকলেও তার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখেন সবই। তাছাড়া আত্মীয়-স্বজনদেরও বাসানী-মার অজানা নয়। একথা সেকথায় বাসানী-মা বসন্তর মাসী-মেসোর খবর নিলেন। ত বললেন—বাবা বসন্ত, আমি যদি তোমার হতভাগিনী মা না হয়ে মাসী হতাম—তবে অনেকদিন আমি তোমার সংসারী হবার ব্যবস্থা করতাম।

বসন্ত ফল চিবোতে চিবোতে মৃদু স্বরে বললেন—মাসীমা খুব জোর করছেন। কিন্তু আমি ঠিক করে উঠতে পারিনি। মেয়েও দেখা হয়েছে। কিন্তু—মা এবার বসন্তর পাশে এসে ব তারপর তার গায়ে নরম হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—বাবা, সংসারী হবার বয়স তোমার হ আমার কথা শোনো। মেয়েটি যদি ভাল হয় তবে আপত্তি না করে বিয়ে করে ফেল। মে না থাকলে কি সংসার মানায় বাবা? তুমি একলা থাক—কিন্তু তোমার জন্যে আমার যে দুশ্চিন্ত

তোমাকে বোঝাব এমন উপায় আমার নেই। এ দুশ্চিন্তার বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন তো বাবা। আজও আমি সেই বোঝা বইছি। জানি আমার করার কিছু নেই, তবু ভাবনার হাত থে তো রেহাই পাই না। তুমি একটি বিয়ে করে সংসারী হলে—আমার এই দুশ্চিন্তাটা কমে অনেকখানি।

বসন্তর নিজের বিয়ের কথা উঠতেই সে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল—পুষ্প তো বেশ বড় হয়েছে—ও তো বিয়ে-থার ব্যবস্থা করা দরকার।

পুষ্পর বিয়ের কথা উঠতেই মার সুন্দর কর্সা মুখটায় কে যেন কালি মেড়ে দিল। অত্যন্ত স্বরে তিনি বললেন—বাবা, পুষ্পর বিয়ের কথা ভাবতে আমার ভয় হয়। জানি এর বিয়ে দেওয়া একান্ত দরকার। তবু যখনই মনে হয় বিয়ে দিতে গেলে তো ওর মা-বাপের পরিচয় দেওয়া দরক তখনই আমার হাত-পাগুলো ভয়ে অসাড় হয়ে যায়। ওর বিয়ের ভাবনাটা যদি আমি এর ছেলেবে ভাবতাম তা হলে হয়তো আমার জীবনটাই অন্য রকম হত। কিন্তু ওর ছেলেবেলার দিনগুলোও খুব সুখের ছিল না।

বসন্ত চুপ করে মায়ের কথা শুনে যাচ্ছিল। মৃদুস্বরে এবার বললে—আপনি এতো দুশি

পূজার প্রীতি উপহার

এইচ, এম, ভি, রেডিও, রেডিওগ্রাম, গ্রামোফোন ও রেকর্ড। ট্রানসিষ্টার রেডিও, বাইনাকুলার, লাইস ও আগফা ক্যামেরা, কোডাক ফিলিম এবং টেপরেকর্ডার পাওয়া যায়।

নান এণ্ড কোঃ প্রাইভেট লিঃ

৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার-কলিকাতা-১

করছেন কেন? ওতো আমারই বোন, ওর ভাল বিয়ের ব্যবস্থা কাজের সময় ভাল ছেলে আছে যারা ওকে লুফে নেবে।

মার দুচোখ দিয়ে জল ঝরছিল ঝর ঝর করে। তিনি কাপড়ের আঁচলে চোখ দুটো মুছে বললেন—তুমি তোমার উপযুক্ত কথা বলেছ বাবা। কিন্তু তবুও—

বসন্ত এবারে মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল। তবুও কী?

মা এবারে যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন। দুটো হাত চেপে কান্নাটাকে ভিতরে রোধ করে গলায় বললেন—পুষ্প হল বাসুনের মেয়ে বাবা। ওর বাবার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—আমি বাসুনের ঘরেই দেব।

এবার বসন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। বাগানী-মার আসল পরিচয়টা ও এতক্ষণ ভুলেই গিয়ে খানিকটা চুপ করে কী ভাবল বসন্ত। তারপর হঠাৎ বলে উঠল—বেশ, আমি চেষ্টা করছি ওর জন্যে। আপনি কিছু চিন্তিত হবেন না। ভাল বাসুনের ছেলের সঙ্গেই আমি পুষ্পর বিয়ের ব্যবস্থা ক

মা বললেন—আমি বেঁচে থাকতে তা কি সম্ভব বাবা? আমার তো কলঙ্কিনী নাম এ যাবে না।

হঠাৎ বসন্তর মধ্যে তার স্বাভাবিক পুরুষকার জেগে উঠল। সে চড়া গলায় বললে—ত দেখে নেবেন যদি আমি ওকে ভাল বাসুনের সঙ্গে এক মাসের মধ্যে বিয়ে দিতে না পারি তো উপেন রায়ের ছেলে নই।

দিন দুই সরবেড়ের বাগানবাড়ীতে বাস করে। বসিবাবু যখন বাড়ীতে ফিরে এল তখন রীতিমতো অন্য মানুষ। সেই আগেকার হাসি খুশিভরা মেজাজের আর সন্ধান পাওয়া গেল না মধ্যে। সে জায়গায় এখন দেখা দিয়েছে একটি দায়িত্বশীল গম্ভীর মন। বসি এখন ভাবছে ত আছে তার বোন আছে। বোনের বিয়ের দায়িত্ব সে বেছে নিয়েছে সেই সঙ্গেও সে নিয়েছে সম্মানের দায়িত্ব। বাগানী-মাকে বসি কিছুতেই আর পর ভাবতে পারছে না। তাছাড়া সে কাছে কথা দিয়ে বসেছে সে এবারে সংসারী হবে। কেলো ঠাকুর সরবেড়ের থেকেই বসির পরিবর্তনটা দেখতে দেখতে এল। অবশ্য সরবেড়েতে থাকার সময় সে মার কাছে বসে অনেক গল্প এসেছে বসির সম্বন্ধে। শুধু গল্প করা নয় মায়ের পায়ে ধরে বলেছে—বসন্ত এখন আপনার বশ অনেকটা, আপনি ওকে মোস্তা বোস আর সেই মেয়েটার হাত থেকে বাঁচান মা। এই শনি দুটো ঘাড় থেকে নামলে ও একেবারে অন্য মানুষ। ওর মতো ভালো মনের লোক চট করে চোখে পড়ে

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—তা কেমন করে হবে বল?

কেলো ঠাকুর বলেছিল—আপনি ওকে বাগবাজারের বোসেদের বাড়ীর মেয়েটিকে বিয়ে ক বলুন। সে মেয়ে ভাল বংশের চালাক চতুর মেয়ে। সে এলেই এর রাশ টেনে ধরবে।

ঠিক যাবার আগেই বসন্ত মায়ের পায়ের ধুলো নিচ্ছিল। মা তার চিবুক স্পর্শ করে চুমু খেয়ে বললেন—বাবা বসন্ত আমাকে তুমি ঋণমুক্ত কর।

বসন্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কিসের ঋণ মা ?

মা বললেন—আমি বাবা এই সম্পত্তির বোঝা আর বইতে পারছি না। সরবেড়ের সম্পত্তি ও বৌমার হাতে তুলে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি বৃন্দাবন যেতে পারি ততই আমার মঙ্গল। ইহকালটা আবার তছনছ হয়ে গেল, পরকালের চিন্তা এখন থেকেই করা দরকার। পুষ্পর সম্বন্ধে আর আমি ভা না। তুমি যখন ওর দায়িত্ব নিয়েছ তখন আমি নিশ্চিন্তি। এখন উপযুক্ত ছেলে হয়ে আমার পরকা কাজের যত তাড়াতাড়ি পার ব্যবস্থা কর।

যে বসন্ত মাসী-মেসোর হুমকি আর অনুরোধ-উপরোধে টলেনি, সে আজ হঠাৎ মত ব কেলল। মাকে বলেই ফেলল—আচ্ছা আমি আপনাকে কথা দিলাম দু'মাসের মধ্যেই আপনার বে এনে দেব।

বাড়ীতে ফিরে এসেই সে কেলো ঠাকুরকে নিয়ে পড়ল; ঠাকুর একবার কলকাতায় যাও। আমার একখানা চিঠি নিয়ে। মাসীকে জানিয়ে এসো বিয়ে করতে আমি রাজী।

কলকাতায় যাত্রা করবার আগে বসিবাবু আবার কেলো ঠাকুরকে ডেকে পাঠাল। বললে ঠাকুর কলকাতায় যাচ্ছ এদিক সেদিক ঘুরে পুষ্পর জন্ত একটা ভাল বামুনের ছেলে সন্ধান কোরো যে মাকে কথা দিয়ে এসেছি আমি—

কেলো ঠাকুর আগেই মনে মনে ঠিক করেছিল কলকাতায় গিয়ে পুষ্পর জন্তে একটি বামুন ছেলের খোঁজ করবে। কিন্তু তার মনে ভয়ও ছিল—মায়ের পরিচয় জেনে কি আর কোন ভাল ঘরে ছেলে পুষ্পকে বিয়ে করতে রাজী হবে ?

মুখে সে বলেছিল—আচ্ছা দেখব

তারপর সে কলকাতায় চলে গিয়েছিল দুপুরের ট্রেনে। অবশ্ত ফিরেও সে এসেছিল সেদিন রাতে কিন্তু পরের দিন থেকে সে প্রায় রোজই কলকাতায় যাতায়াত করতে সুরু করে দিয়েছিল।

সপ্তাখানেক পরে কেলো ঠাকুর বসিবাবুর কাছে এসে বললে—বসিবাবু একবার সরবেড়ে যেতে হবে আমার, বড় জরুরী দরকার। বসিবাবু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কেন সরবেড়েতে তোর এক্ষুণি আবার কী দরকার পড়ল।

কেলো ঠাকুর মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে—পুষ্পর ঠিকুজী কুষ্ঠী কিছু আছে কিনা মা জিজ্ঞাসা করতে হবে। না থাকলে অন্ততঃ তার জন্মের বছর তারিখ এগুলোও জোগাড় করা দরকা বিয়ের সম্বন্ধ করতে গেলে—এসব ভয়ানক কাজে লাগে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল তুমি যাবে নাকি সরবেড়েতে ?

বসিবাবু বললে—নাঃ, যতদিন পুষ্পর জন্যে একটা কিছু জোগাড় না হচ্ছে—ততদিন সরে যাওয়া চলবে না। তবে তুমি যখন যাচ্ছ তখন কিছু ভাল চার সঙ্গে নিয়ে যাও। সরবেড়ের পুকুরে বড় মাছ আছে। ধরে নিয়ে এসো আসার সময়।

পরের দিন কেলো ঠাকুর সরবেড়েতে গিয়ে হাজির হল। সঙ্গে নিয়ে গেল একজোড়া ভাল আর ম্যানটনের বাড়ীর বড়শী। আর নিল কয়েক রকমের ভাল চার। কেলো ঠাকুরকে দেখে মা খুশী। আগের বার এসে কেলো ঠাকুর মার গোপালের পুজো করেছিল।—তার সঙ্গে সে যে সব করেছিল—তা শুনে মা মুগ্ধ হয়েছিলেন। এবার কেলো ঠাকুরকে পেয়ে মা যেন বসিকেই পেয়েছেন মনে হল।

কিন্তু বসিতে আর কেলোতে তফাত অনেক। কেলো ঠাকুর ওসব আদর-আপ্যায়নের ধারেও গেল না। সে নিজে হাতে বাগান থেকে ফুল তুলে ঠাকুর ঘর পরিষ্কার করে গোপালকে সাজা মাকে সে কিছুই করতে দিল না। সে নিজেই গোপালের পুজো শেষ করল।

কিন্তু মা যখন তাকে আসন পেতে বসিয়ে পাখা হাতে পাশে বসলেন—তখন সে রীতিমতো হয়ে উঠল। তার গলা দিয়ে ভাত কিছুতেই নামতে চাইল না। মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে সে বল আমাকে আপনার বাতাস করতে হবে না মা। আমার পাতের কাছে কেউ পাখা হাতে বসলে খেতেই পারব না।

অগত্যা মাকে উঠতে হল। কিন্তু তিনি তদারকি করে খাওয়াতে লাগলেন কেলো ঠাকু খেতে খেতে একসময় বসির কথা উঠল। কেলো ঠাকুর বললে—আপনাকে যে সে কি চক্ষে মা তা আর বলতে পারিনে। বাড়ী ফিরে গিয়েই সে বিয়েতে মত দিয়েছে বাপীর কাছে। শ্রাবণে তার বিয়ের ঠিক হয়েছে। তা ছাড়া পুষ্পর জন্যে তো আমাকে রোজ সে কলকাতায় পা আমিও চেষ্টা করছি এদিক ওদিক খুব। দেখি যদি আপনার গোপাল কৃপা করেন তো এই জাই হয়ে যেতে পারে। তবে ওর ঠিকুজী-কুষ্ঠি যদি কিছু থাকে—

মা বললেন—না বাবা, ওর ঠিকুজী কুষ্ঠি তো কিছুই নেই।

কেলো ঠাকুর বললে—ভাবনার দরকার নেই। ঠিকুজী আমি তৈরী করিয়ে নেব আমাকে ওর জন্মদিন, মাস আর সালটা দেবেন। আন্দাজ কটা নাগাদ জন্মেছে তাও যদি ম মনে থাকে সেটাও বলবেন। আমি খুব ভাল জ্যোতিষীকে জানি।—সে ঠিক তৈরী করে দেবে

এমন সময় পুষ্প এসে হাজির। কোমরে গাছ কোমর বাঁধা। কর্সা মুখচোখ রোদে রা উঠেছে। মাথার চুলগুলো গুড়ো পাকিয়ে কোনরকমে চুড়ো করে বসান মাথার ওপর। কেলোকে সে একগাল হেসে উঠল।—এই যে ঠাকুরদাদা, কখন এলে? দাদা কেমন আছে? দাদা এসেছে না?

কেলো ঠাকুর বললে—না, তার অনেক কাজ। সে আসতে পারল না। কিন্তু আপনি ছিলেন দিদিমণি? সকাল থেকে তো আপনার দেখা পাইনি।

সকালে এবাড়ীতে আসা থেকে কেলো ঠাকুর সারা বাড়ীটা খুঁজেছে। কিন্তু পুষ্পর পাত্তা পায়নি মনে মনে সে একটু হতাশ হয়েছিল। মাকেও কিন্তু সে মুখ ফুটে পুষ্পর কথা জিজ্ঞেস করতে পারেনি এখন পুষ্পকে দেখে তার মন আনন্দে ভরে গেল। তার মনে হল—তার সব আকাঙ্ক্ষা যেন মিটে গেল।

বরফ পুষ্পকে দেখবার জন্যে মনটা বারবার ছটফট করেছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও কেলো ঠাকুর এই ব্যাপারটাকে তার পূর্ণ সচেতন মন দিয়ে দেখতে পারেনি। সে কেবল একটা অন্ধ আকর্ষণ অনুভব করেছে পুষ্পর ওপর।

পুষ্পকে দেখেই কেলো ঠাকুরের খাওয়া মাথায় উঠে গেল। হাত দিয়ে ভাতগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বললে—এতক্ষণ কোথায় ছিলেন বিদিমণি?

পুষ্প বললে—পুকুরে চার করে এলাম, খেয়ে উঠেই মাছ ধরতে বসব। কদিন থেকে চার করছি—কিন্তু কিছুতেই বড় রুই গাঁথতে পারছি না।

মা হাসলেন। বললেন—কি রকম মেয়ে দেখেছ ঠাকুর? সারা সকাল বিকেল গাছে চড়ে মাছ ধরে বেড়াবে—এই বয়স পর্যন্ত। বিয়ে হলে এতদিনে বোধ হয় দু'তিন ছেলের মা হয়ে যেত।

পুষ্প কৃত্রিম কোপে নাকে তেড়ে উঠল।—মা কের যদি তুমি ওসব কথা বলবে তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে।

তারপর কেলো ঠাকুরের পাতের কাছে বসে বললে—শুনেছি ঠাকুরদা তুমি নাকি খুব ভাল বর্শেল্। আচ্ছা, বড় রুইয়ের জন্যে কী চার সবচেয়ে ভাল হয় বলতে পার?

কেলো ঠাকুর বললে—আমার জ্ঞান অতি অল্প। তবে যা জানি তা আজ বিকেলে বাতলে দেব আপনাকে। আমি কলকাতা থেকে ভাল চারও কিছু এনেছি। মনে মনে কেলো ঠাকুর ভারি খুশী হয়ে উঠল। সে যে পুষ্পর কোন একটু কাজে লাগতে পেরেছে—এই ভেবেই তার মন আনন্দে ভরে গেল।

দুপুরের খাওয়া শেষ হতেই কেলো ঠাকুর কাজে লেগে গেল। সঙ্গে আনা ব্যাগের ভিতর থেকে এক এক করে সব জিনিসগুলো টেনে বের করতে লাগল।

পুষ্পও উৎসাহের চোটে যত তাড়াতাড়ি পারে খাওয়া শেষ করে এল। সে রুদ্ধ নিশ্বাসে কেলো ঠাকুরের পাশে বসে দেখছিল কী সব জিনিসপত্র বার হয় ব্যাগের ভিতর থেকে।

কেলো ঠাকুর সোটা আষ্টেক কৌটো বার করে ফেললে ব্যাগের থেকে। পুষ্প তার একটা হাতে নিয়ে ঢাকনা খুলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে—ইস্ ব্যাপোঃ, কী দুর্গন্ধ! বলেই সেটা আবার বন্ধ করে দিলে জিজ্ঞাসা করলে—এসব কী?

কেলো ঠাকুর এক একটা কৌটো দেখিয়ে বলতে লাগল—এই হল পচা পনীর পাউডার, এই হল একাদশী, এই হল আধপচা পিপড়ের ডিম।

পুষ্প বললে—বাবাঃ, মাছ ধরার এতো সব জিনিসপত্তর আছে? তাতো কই জানতুম না। আমি খালি খোলভাঙ্গা আর গোবর দিয়ে মাছ ধরতুম।

ইতিমধ্যে ঝি রতনমণি খোল ভেঙে এনে হাজির করেছে। জায়গাটা খোলভাঙার গন্ধে উঠেছে। কেলো ঠাকুর কিছুটা ভাত তার সঙ্গে কেলে মাখতে মাখতে বললে—জানেন দিদিমণি না পোঁকবার ক্ষমতা খুব বেশী। তাদের চোখ ভাল থাক আর না থাক—তারা গন্ধটা টের প তাড়াতাড়ি। তাই মাছেদের ডেকে আনবার একমাত্র উপায় হল চড়া গন্ধওয়ালা চার। এই র এই একাঙ্গীগুলো একটু আগুনে চান্‌কে আনতো।

আগুনে চান্‌কে আনতেই একাঙ্গীর গন্ধ ভুর ভুর করে বার হতে লাগল। খোলভাজা সঙ্গে একাঙ্গী গুঁড়ো করে তাকে আচ্ছা করে মেখে ফেললে কেলো ঠাকুর।

পুষ্প বললে—ঠাকুরদা, যে গন্ধ তুমি বার করেছ তাতে আমারই জিভে জল আসা মাছ তো কোন্ ছার।

কেলো ঠাকুরের কুৎসিত মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে বার হল।

দুপুর একটু গড়িয়ে যেতেই কেলো ঠাকুর তার হুইল জোড়া নিয়ে পুকুরের এক কোণে বসল। চার করবার আগে সে ভাল করে পুকুরের চারধার দেখতে লাগল। তারপর এক মাছের ফুট কাটা দেখে সে বুঝল এখানে মাছ আছে। এ ফুট খুব বড় মাছের ফুট। আনন্দে মনটা নেচে উঠল। সেই জায়গাটায় কয়েক তাল চার ফেলে দিয়ে জাঁকিয়ে বসল। তারপর বঁড়শীর একটাতে গাঁথল পচা শিপড়ের ডিম আর বাসি পাঁউরুটি-চটকানো টোপ, অন্যটায় এ একটা জীবন্ত কেঁচো। কেঁচোর পিছন থেকে শূল গাঁথা করে মুখটা তার খালি রেখে দিল। যে মুখটা হিলহিল করে নড়বে। সেইটাই ভাল টোপ হবে।

জোড়া হুইলে টোপ গেঁথে কেলো ঠাকুর শিকারী বাজের মতো ফাতনায় দৃষ্টি মেলে বসে পাশে বসে আছে পুষ্প।

ক্রমশঃ কেলো ঠাকুরের মন ফাতনা ছেড়ে পুষ্পর চিন্তায় মেতে উঠতে লাগল। তার চো হইল ফাতনার দিকে কিন্তু মন গেল উড়ে।

হঠাৎ পুষ্প তাকে ঠেলা দিয়ে চাপা গলায় বলে উঠল—ঠাকুরদা ঘুমোচ্ছ নাকি? ফাতনা ডুবিয়ে টেনে নিয়ে গেল দেখলে না?

কেলো ঠাকুর বিশ্রী দাঁত বার করে হেসে বললে—যেতে দেন না দিদিমণি। সোতটা

বলতে বলতেই পুকুরের দিকে ফিরে চক্ষের নিমেষে একটা হুইলে টান লাগিয়েছে ঠাকুর। ব্যস, তারপরেই তোলপাড় কাণ্ড। পুষ্প অবাক হয়ে সে দৃশ্য দেখতে লাগল। প্রকাণ্ড মাছ গেঁথেছে বঁড়শীতে। মাছটা গোঁ নিয়ে এক একবার চলে যাচ্ছে তীরবেগে পুকুরের মা গলগল করে হুইল থেকে সুতো ছাড়ছে কেলো ঠাকুর। তারপর এক সময় মাছ এগিয়ে যো দাঁড়ায় অমনি কেলো ঠাকুর সুতো গুটোতে থাকে পাকে পাকে। মাছটাকে টেনে নিয়ে আসে দিকে। আবার সেটা গোঁ নিয়ে দৌড় মারে অন্যদিকে। কেলো ঠাকুর শক্ত হাতে হুইল

ধরে আছে। তার ডগাটা বেঁকে ধনুকের মতো হয়ে যাচ্ছে। একটা প্রচণ্ড উত্তেজনায় পুষ্পর দম হয়ে আসছে। চাপা গলায় সে বলছে—ঠাকুরদা প্রকাণ্ড মাছ ছেড়ো না কিন্তু।

মাছটার সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ সুরু হল কেলো ঠাকুরের। সাধারণতঃ এত বড় মাছ বঁড়শী ধরা পড়ে না। মাছটাকে খেলিয়ে ঘায়েল করতে লাগলো কেলো। এক একবার হেঁচকা টানে ে কড় নেয় পলপল করে। কেলো ঠাকুরের হাতের তেলো কড়ের ঘর্ষণীতে কেটে দুফাঁক হয়ে গে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। কেলো ঠাকুরের ভ্রূক্ষেপ নেই। তার সারা শরীর দিয়ে ঘাম ঝ লাগল টস্‌টস্ করে। শেষে ঘণ্টা দেড়েক যুদ্ধ করে মাছটা হয়রান হয়ে পড়ল। তখন তাকে ে কাছে আনা হল। দেখা গেল প্রায় আধমণটাক ওজনের বিরাট একটা পাকা রুই। আনন্দে ব উত্তেজনায় পুষ্প কেলো ঠাকুরের হাতটা জড়িয়ে ধরল। কেলো ঠাকুর শিউরে হাতটা ছাড়িয়ে নি কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল তার যুদ্ধক্লান্ত স্নায়ুগুলোতে যেন কোমল স্নিগ্ধ হাত বুলিয়ে দিল। মাছটা ওপরে টেনে তুলে বাড়ী আনতেই পুষ্প হৈ হৈ লাগিয়ে দিল। পুষ্পর মা এলেন। মাছটা দেখে বললেন—কর্তার আনলের মাছ। তিনিও মাছ ধরতে খুব ভালবাসতেন। এই এতদিন ে এই পুকুরে ছিপে এত বড় মাছ ধরা পড়ল। তা এটা এক্ষুণি বসন্তকে পাঠিয়ে দাও। এখানে ে ওর সদ্ব্যবহার হবে না। এখানে মাছ খাবার লোক তো এক পুষ্প। তা সেও তো বড় মাছ খাবে না।

কেলো ঠাকুর তো অবাক!—কেন, দিদিমণি বড় মাছ খান না?

মা বললেন—ওমা, তা তুমি জানো না। ও বড় মাছ কিছুতেই খেতে পারে না। বড় ম ধরেই ওর আনন্দ। খাবার বেলায় চুনোপুঁটি। আর যদি কই মাছ হল তো পুষ্প দুনিয়া ভুলে যা ছেলেবেলা থেকেই ওর এই অভ্যাস।

কেলো ঠাকুর শুনে বললে—আশ্চর্য।

কিন্তু তারপরের দিনই কেলো ঠাকুর সরবেড়ের বাজার থেকে ছোট ছোট বঁড়শী আর সরু ফিনে নিয়ে এলো। পুঁটুসে টনসন—পুঁটি মাছ ধরার বঁড়শী, কৈসে টনসন—কই মাছ ধরার বঁড়শী তারপর সারাদিন বসে বসে একটা ছোট হাতছিপ তৈরী করে ফেললে। সন্ধ্যের ঝোঁকে একত পচা গোবর পুকুরের এক কোণে ফেলে কেলো ঠাকুর কৈসে টনসন বঁড়শীতে সিঁদড়ের টোপ দিয়ে ি ফেলল। ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ফাতনায় টান পড়ে। কেলো ঠাকুর টান মারে—বড় পোনা ধরার টা ফাতনা ডুবছে, মাছ খাচ্ছে অথচ টান দিলে মাছ ওঠে না কেন! কেলো ঠাকুর ভাবতে বসল। শে ভেবে ভেবে সে বুঝতে পারল যে কই মাছের টান অত বড় হলে চলবে না। যত ছোট হবে মা তত টানও সূক্ষ্ম হওয়া দরকার। রাত এক প্রহর পর্যন্ত সেদিন পুকুরের ধারে কাটিয়ে দুটো বেশ ে কই মাছ নিয়ে সে ফিরে এল।

এবার পুষ্পর অবাক হবার পালা।—ওমা এই দেখ, ঠাকুরদা কই মাছ এনেছে। পুষ্পর চে দুটো আনন্দে চক্‌চক্ করছে। সঙ্গে সঙ্গে কেলো ঠাকুরের চোখ দুটোও।

পরের দিন থেকে ছোট হাতছিপটি কেলো ঠাকুরের সঙ্গী হয়ে গেল। তার কড় সরু বঁড়শী অতি ছোট। সেই ছোট হাতছিপে কেলো ঠাকুর পুকুরের পাড়ে বসে অতি সূক্ষ্ম টান ক করতে লাগল—যাতে কই পুঁটি এমন কি চড়কের মতো ছোট মাছও উঠতে পারে। এই চার অভ্যাসে কেলো ঠাকুর টানের আসল ব্যাপারটা রপ্ত করে ফেললে। যে কোন মাছই তার বঁ একবার ঠোকরালে আর রক্ষে নেই—তাকে ঠাকুর তুলবেই।

দিন চারেক পরে সে যখন গ্রামে ফিরে এল তখন বসিবাবু তাকে মৃদু ধমক দিলেন—এ সমবেড়েতে কি করছিলে কেলো ঠাকুর?

কেলো ঠাকুর মুখ কাঁচুমাচু করে মাথা চুলকে জবাব দিল—মাছ ধরছিনুম।

বসিবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল।—মাছ ধরছিলে? তা বেশ। প্রথমদিনের মাছ ধরেছিলে ঠাকুর—একেবারে ফার্স্ট ক্লাস। টাটকা ভাজা খেলাম লুচির সঙ্গে—ভারী খাওয়া। খেতে তোমায় আশীর্বাদ করেছি।

কেলো ঠাকুর হঠাৎ বললে—তুমি কই মাছ খেতে ভালবাস না বসি?

বসিবাবু একটু অবাক হয়ে কেলোর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—হাঁ, তা বড় কই না খেতে ভালবাসি বই কি?

কেলো ঠাকুর বললে—আমি তোমায় ভাল কই মাছ ধরে খাওয়াব কালই।

কেলো ঠাকুর কলকাতায় যাতায়াত করতে করতে কিছু দিনের মধ্যেই পুলের জন্যে সম্ব করে ফেলল। বসিরহাটের মুখুজ্যে বাড়ীর ছেলে। ছেলেটি দেখতে শুনতে মন্দ নয়। আগে কড়ি ছিল—ইদানীং অবশ্য পড়তি। ছেলেটি পড়াশুনায় ভাল। বি. এ. পাস করেছে, এখন আর ওকালতি পড়বে। তা তার জন্যে সে কিছু পয়সা চায়।

খবরটা একজন ঘটকের মুখে শুনেই কেলো ঠাকুর একদিন সটান বসিরহাটে গিয়ে বাপের সঙ্গে দেখা করল। ছেলের বাপ কেলো ঠাকুরকে দেখে আর একজন ঘটক বলো নিয়েছিল। কেলো ঠাকুর যেতেই সোজাসুজি সে তার দাবী জানিয়ে দিল। অন্যান্য খরচাপত্র ছেলের লেখাপড়ার খরচ দিতে হবে নগদ দশ হাজার টাকা।

ছেলের বাপ কেলো ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলবার সময় তার দাবী-দাওয়ার কথাগুলো এতো বাজে বইল যে, মেয়ের বংশপরিচয়ের খুঁটিনাটি নেবার কথা আর তার মনে বইল না।

কিছুদিন পরে কেলো ঠাকুর বসিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ছেলের বাপের কাছে হাজির। পরিচয় পেয়ে ছেলের বাবা গদগদ হয়ে উঠল। কিন্তু ছেলের এক পিসেমশায় সেখানে উপস্থিত। তিনি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তো কায়স্থের সন্তান, এই ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ের ব আপনি সংশ্লিষ্ট হলেন কী করে?

বসির মুখখানা প্রথমে রাঙা হয়ে উঠল প্রশ্নটা শুনে। সে কিছু বলবার আগেই কে ঠাকুর জবাব দিল—আজ্ঞে মেয়েটি এঁর পিতার বন্ধু-কন্যা। মেয়ের বাবা অনেকদিন আগে মারা গে তাঁর বিধবা ও মেয়েটি এঁরই আশ্রয়ে আছেন উপস্থিত।

বসিরবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললে—মেয়ের বাবা আমাদের এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। আমা কতকগুলো বড় বড় সম্পত্তি বেহাত হয়ে যায় একবার। তারপর সেগুলো তাঁরই মুখের জোরে উ হয়েছিল। তাই বাবা তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি মারা যাবার পর আমার বাবা তাঁর মে বিয়ের জন্যে বিশ হাজার টাকা রেখে গেছেন। সেটার সবটাই আপনাদের ছেলে পাবে। তাছ তার যা গহনাপত্র আছে সেও প্রায় হাজার দশেক টাকার।

কথা শুনে ছেলের বাবার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠেছে। যে সিসেমশায় সন্দিগ্ধ নিয়ে বংশ-ইতিহাস জানতে চাইছিলেন—তাঁকে আর কোন রকম প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়ে ছো বাবা বলে উঠল—তাহলে শুভস্য শীঘ্রম্।

তারপর বসির দিকে ফিরে বললে—আপনি তো মশাই দেখি মহাশয় ব্যক্তি। না হলে ব্যাপারে এত মাথা ঘামাচ্ছেন—। সত্যি এতো আপনার নিজের কিছু নয়—।

বসন্ত কথা পাকা করে এসে সরবেড়েতে মাকে খবর দিল। মা সব শুনে খুশী হয়ে র আর কেলো ঠাকুরকে অজস্র আশীর্বাদ করতে লাগলেন। কেলো ঠাকুর ঘন ঘন গ্রামের বাড়ী যে সরবেড়ে যাতায়াত করতে লাগল। প্রথমে সে খুব উৎসাহ নিয়ে পুষ্পর বর খুঁজতে লেগেছি কিন্তু যেই বিয়ের সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল—অমনি তার মন মেজাজ ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। আ সেই সদানন্দ ফুর্তিবাজ মেজাজ আর তার রইল না। বেশীর ভাগ সময়ই সে গোঁজ হয়ে কাটাতে লাগল হয় শ্যামসুন্দরের মন্দিরে নয় সরবেড়ের বাগানে পুকুরের ধারে কইমাছ ধরা ছিপ ফেলে। ছিপই খ জলে পড়ে রইল কিন্তু তাতে মাছ উঠল না পর্যন্ত। পুষ্পর বিয়ের দিন যত ঘনিয়ে আসতে লাগল—ত তার অন্য কাজে মন একেবারে কমে যেতে লাগল। সে ক্রমশঃ নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ভুলে যে আরম্ভ করল।

বিয়ের পনেরো দিন আগে থাকতে বসিরবাবু কেলোকে নিয়ে এসে উঠল সরবেড়ের বাগ বাড়ীতে। বসির মতলব ছিল বিয়েটা বেশ জাঁকজমক করে হয়। কিন্তু মা বাধা দিলেন। বললেন দরকার কি বাবা এত লোক জানাজানিতে, সমাজের সবলোক তো আর এক নয়। তা ছাড়া জাঁ জমক করতে গেলেই তোমাদের গ্রাম থেকে এই গ্রাম থেকে অনেক লোককে আনতে হবে। তা সঙ্গে আমার জীবনে তো কোনদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। তারাও এখানে এসে খুব খুশী হবে না, অথবা কৌতূহলী হয়ে উঠবে।

বসন্ত মায়ের কথাটা বুঝতে পারল। বললে—ঠিক বলেছেন মা। শুধু বরযাত্রী ক'জনকে খা দিয়েই বিয়েটা সেরে ফেলা যাক।

পুষ্পর বিয়ের দিন সারা বাড়ীতে মোটামোটি ছাড়াক লণ্ঠন জ্বলল—ভিতর মহলে। ব থেকে কিছুই বোঝা গেল না ভিতরে কি হচ্ছে। লালুইকররা ডিয়ান করল। ভিতরের হল কেলো ঠাকুর পুরুত হয়ে যজ্ঞবেদী সাজিয়ে বসে গেল। বাড়ীতে একজনও এয়ো এলো না—স্ত্রী-আচার করবার জন্যে। বসিবাবু মনে মনে ভেবে রাখল বরের দিক থেকে কেউ কিছু প্রশ্ন বলবে—এঁদের বংশে এসব করা নিষেধ আছে।

সন্ধ্যাবেলায় লগ্ন। বসি মনে মনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ভারী বিকেল থেকে। বরযাত্রীরা একা তাকেই সব সামলাতে হবে। কেলো ঠাকুর তো বিয়ের পুজো-আচ্চা নিয়ে ব্যস্ত। মা-ঠ বর্ণা ঢিয়েছেন গোপালের ঘরে। বসিবাবু ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগল—ঘরে বাইরে।

বিকেল কেটে গিয়ে ক্রমশঃ সন্ধ্যা হয়ে এল। সন্ধ্যাও গড়িয়ে যেতে লাগল। বরপ পাত্তা নেই। বসন্ত ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠল। ক্রমশঃ বিয়ের লগ্নও পার হয়ে গেল। বসন্তর গা বিনবিন করে ঘাম ঝরতে লাগল। গোপালের ঘরে গিয়ে মাকে ধরে পড়ল সে—কি হবে মা তো কই কেউ এল না।

মা বললেন—অনেক দূর থেকে তো আসবে ওরা—আর একটু অপেক্ষা কর—বিয়ে ভোরের লগ্নে হবে। এমন সময় অর্জুন বীর এসে খবর দিল—বাইরে এক ভদ্রলোক বসিবাবুর ন ডাকছেন। বসিবাবু ধড়মড় করে উঠে দৌড় দিলেন। বাহিরে এসে দেখলেন—এক ভদ্রলোক আছেন গেটের কাছে। বসিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কোন বিপদ-আপদ হয়েছে কী মশাই? বর এখনও পর্যন্ত।

ভদ্রলোক কোন কথা না বলে—একখানা চিঠি দিলেন বসিবাবুকে। সে চিঠিটার আ পড়ে বসিবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল, জিভ ভিতর দিকে টেনে ধরল। চোখ দুটো একটা নিদারুণ জলে ভরে গেল বসির। চিঠিখানা কোন একজন হিতৈষী লিখেছে ছেলের বাপকে—পুষ্প ম মার সমস্ত ইতিহাস জানিয়ে।—উপেন রায়ের সঙ্গে তার বাবের সম্বন্ধ খুঁটিনাটি পর্যন্ত জানাতে ভুল লোকটি।

বসিবাবু ভদ্রলোককে তক্ষুণি বিদায় করল। তারপর সটান মাকে এসে বলল সব কা কাতরভাবে বললেন—তাহলে কী বাবা আমার প্রতিজ্ঞা থাকবে না?

বসি রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জন করে উঠল—আমি আজ পুষ্পর বিয়ে দেবই বামুনের ছেলের স যেমন করেই হোক। তারপর দেখব কে এমন সর্বনাশের কাজ করল। তার মুণ্ডু চিবিয়ে পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।

বসিবাবু মায়ের কাছ থেকে বার হয়ে সটান হলঘরে এসে দাঁড়াল। দেখল কেলো ঠাকুর সব জোগাড়-যন্ত্র করে জিনিসপত্র সাজিয়ে বসে আছে চুপচাপ। সে আজ পুরুত। গরমের ঘাম পোড়া কাঠের তক্তার মতো শরীরটায় ঝুলছে সাদা একগোছা পৈতে।

হঠাৎ বসিবাবুর কী হল—বললে কেলো ঠাকুর শোন।

তারপর তার কাছে সব কাহিনী বলে বললে—তুমি পুষ্পকে বিয়ে কর আজ রাতে—

কেলো ঠাকুর বাধা দিয়ে বলে উঠল—না না, একি বলছ তুমি বসি?

বসিবাবু বললে—আজ রাতে ঐ উচ্ছৃঙ্খল করা মেয়ের বিয়ে না হলে—ওর জাতধর্ম থাকবে হিঁদুর ঘরের ছেলে হয়ে তোমার তো সেটা অজানা নেই। আর তা ছাড়া—মায়ের প্রতিজ্ঞা না থা তাঁর মনও কী রকম ভেঙে যাবে বুঝতে পারছ?

কেলো ঠাকুর তবু বলল—আমার মতো একটা কুৎসিত হতভাগা লোকের সঙ্গে তুমি পুষ্পর। দেখে বসি? তার চেয়ে তাকে জলে ভাসিয়ে দাও না।

—কিন্তু কেলো ঠাকুরের কোন আপত্তিই খাটল না। বসি তাকে জোর করে বরের পিঁ বসিয়ে পুষ্পকে নিয়ে এল। অগত্যা কেলো ঠাকুর মন্ত্র পাঠ করতে লাগল নিজেই। যাগযজ্ঞ নিজেই করল। মাকে তারা আর সম্প্রদানের জন্যে বিরক্ত না করাই স্থির করল।

কেলো ঠাকুরের সঙ্গে পুষ্পর বিয়ে হয়ে গেল সেই রাতেই।

বিয়ের পর তারা জোড়ে গিয়ে গোপালের ঘরে মাকে প্রণাম করল। দেখে-শুনে মা শুধু মুখে দুজনকে আশীর্বাদ করলেন।

পুষ্পর বিয়ে হয়ে যেতেই মা আর বসন্তর বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করলেন না। তাঁর সমস্ত বি সম্পত্তি বসন্তর হাতে দিয়ে তিনি এক সপ্তাহ মধ্যেই চলে গেলেন বৃন্দাবনে।

কেলো ঠাকুর আর পুষ্প সরবেড়ের বাগানবাড়ীতে বাস করতে লাগল। বসন্ত কিছুদিন সরবেড়ে কাটিয়ে চলে গেল গ্রামে।

বসন্ত গ্রামে ফিরে আসতেই মোস্তা ঘোষের খবরে পড়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় মোস্তা নিজেই এসে হাজির বসির বাড়ীতে। সঙ্গে এনেছে একটা বোতল। সেই বোতলের ছিপিটা খুল খুলতে সে বললে—কিহে ক্যাপ্টেন, কদিন যে একেবারে নিপাত্তা, ব্যাপারখানা কী? বাড়ীতে যে করে শুনলুম সরবেড়ে না কোথায় গিয়েছিলে?

বসিবাবু বললে—হ্যাঁ, গিয়েছিলুম সরবেড়েতে। সেখানে একটু কাজ ছিল।

তারপর একটা চোখ নটকে কদর্য হাসি হাসতে হাসতে বললে—তা তুমি আজকাল অত ঘন সেখানে যাচ্ছ কেন হে ক্যাপ্টেন? মেয়েটা খুব সুন্দরী নাকি?

মোস্তার কথা শুনে বসন্তর কান মাথা সব ঝাঁঝাঁ করতে লাগল। মনে হল উঠে মোস্তার গা একটা চড় কষিয়ে দেয় খুব জোরে।

মোস্তা কিন্তু থামল না। বলতে লাগল—আমি গত বিষ্যুৎবার কলকাতায় গিয়েছিলু সোনাপীর সঙ্গে দেখা হল। তুমি আর তার কাছে যাও না। সে বেচারী কেঁদে কেটে হাট পাকাচ্ছে

ওদিকে কলকাতায় জোর কানাঘুষো শুনে এলুম তোমার সঙ্গে নাকি বাগবাজারের বোসেদের ে সম্বন্ধ হয়েছে। আসছে শ্রাবণ মাসে বিয়ে?

বসিবাবু বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে বলে উঠল—না, না, পাকা কথা এখনও—।

মোস্তা গোঁফে তা দিয়ে মুখ মটকে বললে—তা বেশ, বিয়ে থা করে ভাল ছেলে হওয়াই ; কিন্তু গোলাপীর এদিকে কি করবে? তার যে হীরের মুকুট গড়িয়ে দেবার জন্যে জাঁক করে এ তার কী করলে?

মোস্তা বোসের কাছে গোলাপীর কথা শুনে প্রথমটায় বসির মনটা খুব আনচান করে উঠে সারা শরীরে একটা বিশ্রী রাগ ছড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্য, মেয়েটাকে এত দিচ্ছি তবু তার চাহিদা মেটে একটা পেলেই আর একটার জন্যে বায়নাক্কা ধরে। বসিবাবু চটে গেল। মোস্তা বোসকে বল গোলাপীকে খুশী করার সাধ্যি আমার নেই মোস্তা।

মোস্তা বললে—তুমি তার ভালবাসার জন্যে তাকে কিছু উপহার দেবার প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞা তুমি রাখতে না পার তো তোমার নিজের মানটাই তার কাছে খাটো করবে।

বসি ফাঁপিয়ে উঠল—তুই থাম মোস্তা। ভালবাসার কথা বলিস নি। গোলাপীকে এত এই ক'বছরে, তবু গোলাপী আমায় খালি ধোঁকাই দিচ্ছে।

মোস্তা বসিকে বাধা দিয়ে বললে—সে আমাকে ভালবাসে তার বড় ভায়ের মতো।

কথা শুনে বসির পিত্তি অবধি জ্বলে গেল। বললে—বড় ভাই হয়ে তার জন্য উপকারটা করে

বসির কথা শেষ করতে না দিয়েই মোস্তা বোস চীৎকার করে উঠল—মুখ সামলে কথা বল।

কিন্তু বসন্ত রায় হল উপেন রায়ের ছেলে। ওসব ধাবড়ানিকে সে থোড়াই কেয়ার তাছাড়া একটা দোসাদের এতদূর স্পর্ধা যে তার সামনে গলা হাঁকড়ে তাকেই ধাবড়ানি দেয়।

বসন্ত চতুর্গুণ চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল—শালা, এখুনি আমার বাড়ী থেকে দূর হ'।

তার তেরিয়া মেজাজ দেখে মোস্তা বোস আর কোন কথা বলতে ভরসা পেল না। চাবুক কুকুরের মতো কুঁচকে ঘরের বাইরে চলে গেল। তারপর রাস্তা থেকেই সে চেঁচিয়ে বললে—' নাম যদি মোস্তা বোস হয় তো তোকে আমি দেখে নেব। ও: ভারী আমার কর্তা ডাক্তার জমিদার

মোস্তাকে তাড়িয়ে বসিবাবু গুম হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর মোস্তার ফেলে যাওয়া বোতলটার গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে একটা লাথি কষিয়ে দিলে। মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে শ্—শালা।

বোতলটা একদিকের দেওয়ালে ঠাস করে লেগে ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল।

গল্পটার এই পর্যন্ত বলে রাধু থামল। আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে জিজ্ঞেস করল—শ্যাসছে যে গল্পটা?

বললাম চমৎকার গল্প। কিন্তু এ গল্প তো আসলে বসিবাবুর গল্প—কেলো ঠাকুর তো নায়ক নয়।

রাধু বললে—বসিবাবুকে বাদ দিয়ে কেলো ঠাকুরের ইতিহাস বলা সম্ভব নয়। তোকে তো আগেই বলেছি বসিবাবুর ডায়েরী থেকেই কেলো ঠাকুরের এসব ঘটনা সংগ্রহ করেছি আমি। আর সেই ডায়েরীর সঙ্গে এক তাড়া চিঠিও পেয়েছিলাম। চিঠিগুলো লিখেছিল পুষ্প বসিবাবুকে তার সর্বনাশ হবার পরে। সেগুলো বসিবাবু এক তাড়া করে রেখেছিল। মরবার কিছুদিন আগে সেগুলো দিয়ে যায় কেলো ঠাকুরকে।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—পুষ্পর আবার কী সর্বনাশ হল? কেলো ঠাকুরের সঙ্গে তার বিয়েটা কী তুই তার সর্বনাশ বলে মনে করছিস?

রাধু বললে—না, এ বিষয়ে যা সর্বনাশ হবার তা হল কেলো ঠাকুরের। কিন্তু সেটা তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। বসিবাবুর ডায়েরীর সেই পাতাটা তোকে আমি পড়ে শোনাচ্ছি দাঁড়া। ভারী ইন্টারেস্টিং।

বলেই রাধু উঠে ঘরের মধ্যে ডুব মারল কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর একটা চামড়ায় বাঁধা পুরোনো বড় মোটা খাতা আর তার সঙ্গে একতাড়া চিঠি এনে হাজির করলে। সেই পুরোনো খাতাটা পাতা উল্টে সে একটা জায়গা বের করে আমায় পড়ে শোনাতে লাগল।—মনে আজ আমার অনেক আনন্দ। আমি আজ একমাস মোক্ষদা বোসের মুখদর্শন করি নাই। এই দীর্ঘ একমাস আমি মদ ছুঁই নাই। কিন্তু অন্যদিকে নায়ের জন্য, পুষ্পর জন্য ও সবার উপর কেলো ঠাকুরের জন্য আজ সকাল হইতে মনটা বড় উতলা হইতেছিল। সন্ধ্যাবেলায় কেলো ঠাকুর বাগান হইতে আসিয়া হাজির। এই দীর্ঘ একমাস সে সরবেড়েতেই বাস করিতেছিল। সে তো জানে না আমি এর মধ্যে নিজেকে কত শোধরাইয়াছি। আমি আনন্দের সঙ্গে কেলো ঠাকুরের হাত ধরিলাম। তারপর আর মোক্ষদা বোসের দারুন অপমান করিয়া একমাস আগে সেই যে দূর করিয়া দিয়াছি—ইহার মধ্যে তাহার মুখদর্শন করি নাই। করিবার ইচ্ছাও আর নাই। আমি এখন সবদিক দিয়া নিজেকে বিবাহিত জীবনের জন্য প্রস্তুত করিতেছি।

নিজের কথা বলা শেষ করিয়া আমি কেলো ঠাকুরের দিকে ভাল করিয়া চাহিলাম। দেখি তাহার চেহারা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহার চোখ দুটি আরও গর্তশায়ী হইয়াছে। মুখের চেহারা বীভৎস। উপরন্তু সেই পানখেকো দাঁতের এখন তখন হাসি সে যেন লোপাট হইয়াছে। তাহার সারা মুখ কালিপড়া। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমরা কেমন আছ ঠাকুর? তুমি আর পুষ্প।

জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে কেলো ঠাকুর আমার হাতদুটো জড়াইয়া ধরিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কুৎসিত মুখ কান্নায় আরও বিকৃত হইয়া উঠিল। একটু পরে কান্নার বেগ কমিলে

সে বলিল—বসি আমি না হয় একটা ঝোঁকের মাথায় একটা পাপ করে ফেলেছিলাম—কিন্তু একজন বিদ্বান বিবেচক লোক হয়ে এমন শাস্তি কেন দিলে?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন তোমাকে কি শাস্তি দিলাম?

কেলো ঠাকুর বলিল—ঐ সাংঘাতিক সুন্দর মেয়ের আমার মতো কুৎসিত স্বামী? পু আমি মনে মনে চেয়েছিলাম সন্দেহ নেই কারণ তার রূপে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তার জন্ম বসিরহাটের মুখুজ্যে কর্তাকে সব জানিয়ে চিঠিও দিয়েছিলাম—যাতে ঐ সম্বন্ধ ভেঙে যায়। কিন্তু ছিলাম বেহদ্দ বোকা। একটা পোকা আগুনে ঝাঁপ দিলে যে তার কী অবস্থা হয়—তা আমার জানা ছিল না। আমার অবস্থা এখন তাই। পুষ্পর রূপের আগুনে আমি জলেপুড়ে যাচ্ছি কিন্তু কাছে এগোই এমন সাধ্যি আমার নেই। আমার মনে হয় ওকে ছোঁবারও অধিকার আমার নেই

হঠাৎ আমার চোখে সব রহস্য পরিষ্কার হইয়া গেল। কেলোর দুষ্কর্মের জন্য তাহার নিদারুণ রাগ হইল। ইচ্ছা হইল তাহাকে ধরিয়া চাবুক মারি। কিন্তু সখন সে বলিল—বসন্ত আমাকে তোমার দারোয়ান দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে মার। তাতে যদি আমার এ জ্বালা যায়।—তখন স্থির করলাম—তাহাকে মারিব না। কিছুই বলিব না। জ্বলুক সে নিজের জ্বালায়।

আমি চাতে পাত পিষিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলাম। সে আমার পায়ের উপর আছ আবার বলিল—বসন্ত আমার তুমি দয়া কর, আমায় কঠোর শাস্তি দাও, আমায় নিদারুণভাবে কর।—আমি আর এ জ্বালা সহ্য করতে পারছি না—বলিতে বলিতে সে কাঁদিতে লাগিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—পুষ্প একথা জানে?

সে বলিল—হ্যাঁ, তাহাকে গত সপ্তাহে এ কথা বলেছি। বলার পর থেকে সে আমার সামনে ছেড়ে দিয়েছে। আমাকে সে ভয়ানক ঘৃণা করে।

আমি বলিলাম—তুমি এখন এখানেই থাক সরবেড়েতে গিয়ে কাজ নেই।

আমার মনের যে স্ফূর্তি সকালে দেখা দিয়েছিল—সন্ধ্যায় তাহার লেশমাত্রও খুঁজিয়া প না। কেলো ঠাকুরের উপর রাগ হওয়া দূরে থাক—মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হইলে দেখিলাম—তাহা করুণাতে আমার মন ভরিয়া গেল।

ডায়েরীর পাতাটা পড়া শেষ করে রাধু আমার মুখের দিকে একটু তাকাল। তারপর এব চুপ করে থেকে বললে—পুষ্প আর কেলো ঠাকুরের বিয়ের পর থেকে সরবেড়ের বাগানবাড়ীতে ব্যাপার চলতে লাগল তার সমস্ত বর্ণনা দিয়ে পুষ্প চিঠি লিখেছিল বসন্তবাবুকে। অবশ্য এ সব f লিখেছিল তার সর্বনাশ হবার পর।

তারপর চিঠির তাড়াটা ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে রাধু বললে—এতগুলো চিঠি তোর অনেক সময় লাগবে। হয়তো ধৈর্যই থাকবে না। আমি এই চিঠির কথাগুলো মোটামুটি এ করে তোকে বলে যাচ্ছি। এর মধ্যে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা কী হল জানিস? প্রথম

প্রথম লাইনেই পুষ্প বসিবাবুকে লিখেছিল—শ্রীচরণেষু দাদা, আমি তোমাদের সকলের ওপর ৫ লইলাম।

আমার মনে নানান প্রশ্ন ভিড় করে এসেছিল। কিন্তু রাধুকে সে সব প্রশ্ন করে আরও ৫ জটিলতার মধ্যে ফেলতে পারলাম না। আমারও এদিকে উঠার তাড়া। তাই বললাম—গল্পটা এ সংক্ষেপ কর রাধু।

রাধু বললে—সরবেড়ের বাগানে কেলো ঠাকুরের সঙ্গে পুষ্পর বিয়ে দিয়ে তো বসিবাবু বাগানী প্রতিজ্ঞা রক্ষা করল। বাগানী-মাও কতকটা মনের ক্ষোভে, কতকটা নিজের পরকালের চিন্তায় বৃন্দ রওনা হলেন। পড়ে রইল পুষ্প আর কেলো ঠাকুর।

পুষ্পর স্বভাব বাহিরে যতই ছেলেমানুষীতে ভরা থাক না কেন ভিতরে তার যে চিরাচরিত ন ছিল সে এই বিয়ের ব্যাপারে রীতিমত ক্ষুব্ধ হল। বিশেষ করে পুষ্প খুব ভালভাবেই জানত যে নিজে অপূর্ব সুন্দরী। তার বিয়ের উপযুক্ত পাত্র যে হবে তাকে হতে হবে খুব সুপুরুষ এক রাজকুমার। ৫ মনে এ ধরনের একটা ধারণা জাগিয়ে দিয়েছিল ঝি রতনমণি।

রতনমণি হল কর্মকারের মেয়ে। বালবিধবা ছোটখাট মাজা চেহারা। বয়স প্রায় পঞ্চাশের ক গড়িয়ে এসেছে কিন্তু দেখে আদৌ তা বোঝা যায় না। তার বাবুরা তাকে খুব নেকনজরে দেখতে সেই সুযোগে রতনমণিও বাড়ীর সবার উপর কর্তৃত্ব করে চলত। বশোরের মেয়ে আসার পর রতন বড় মুশকিলে পড়ে গেল। সে প্রথমে তার ওপর কিছুটা কর্তৃত্বের সুযোগ নিতে গিয়েছিল—কিন্তু ত বিশেষ সুবিধা হল না। বশোরের মেয়ে তার সঙ্গে ঝির মতোই ব্যবহার করতো। এই নিয়ে এক সে কোঁদল করে হাট পাকিয়ে ফেলল। উপেন রায় নিজে বিরূপ হলেন। রতনমণিকে তিনি ৫ গলায় শাসিয়ে দিলেন—যদি এখানে থাকতে চাস তো এ বাড়ীর মালিকের কথা শুনে তোকে চ হবে। আর এ বাড়ীর মালিক এখন আর আমি নই—উনি। বলে বাগানী-মাকে দেখিয়ে দিলেন

. রতনমণির যাবারও অন্য কোন জায়গা ছিল না। সে মার কাছে কাঁদাকাটি করে মাফ ৫ নিয়ে সরবেড়েতেই থেকে গেল। কিন্তু বাগানী-মার পায়ের পড়ে সে তার পুরোনো অভ্যাস ছাড় বাধ্য হল যখন তখন তার বাইরে যাওয়া বন্ধ হল। তবুও ব্যাধি তার গিয়েও যায় না। রতনমণি অভ্যাস ছাড়তে পারল না। বাড়ীর মধ্যে রতনমণিই পুষ্পর একমাত্র সঙ্গী হয়ে রইল। পুষ্প রতনম দেওয়া তার এই জ্ঞানের সঞ্চয়কে এমনভাবে লুকিয়ে রাখল সবার চোখের আড়ালে যে তার মা ৫ টের পেলেন না মেয়ের মনের গতি। বাইরে সে যেমন ছেলেমানুষ ছিল তেমনই রয়ে গেল।

কেলো ঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে পুষ্পর আত্মাভিমানে দারুণ আঘাত লাগল। কে ঠাকুরকে সে যে অপছন্দ করত তা নয়। কিন্তু তাকে বর হিসাবে ভাবা পুষ্পর স্বপ্নের অগো সে কোন ছোটবেলা থেকে ভেবে রেখেছে—টুকটুকে চেহারার রাজপুত্তুর আসবে তার জন্যে। ৫ শরীর হবে দেবতাদের মতো সুন্দর। সে দুহাত দিয়ে পুষ্পর সুন্দর শরীরকে আলিঙ্গনে বাঁধ

কতো কল্পনা করেছে পুষ্প মনে মনে। শেষ পর্যন্ত কিনা ঐ হতকুচ্ছিৎ পোড়াকাঠের মতো চে একটা লোকের সঙ্গেই তার বিয়ে হল। ওর সঙ্গে সারাজীবন কাটতে হবে ভাবতে গিয়েই পুষ্প বেঁকে বসল। দারুণ রাগ হল তার মায়ের আর বসন্তর ওপর।

বিয়ে বা চুকে যেতে সে একলা ঘরে এসে ঢুকল। সেখানে দেখল রতনমণি বুক চ কাঁদছে আর বলছে—আমার সোনার প্রতিমা এ কোন ভূতের হাতে পড়ল গো। ভগবানের বিচার গো।

রতনমণিকে দেখতে পেয়েই পুষ্প তাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। —রতন, আমাকে খানিকটা বিষ এনে দে খাই।

রতনমণি তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললে—বলছ বটে, এ সে মরতে যাবে কোন যে মরবার সে মরুক। তোমার এখন ভোগ করবার বয়স।

পুষ্প বললে—ভোগের নমুনা তো দেখছিস!

রতনমণি বললে—ও পোড়াকাঠটা তো তোমার চাকর হয়ে থাকবে। ওকে কি করে রাখতে হবে তা আমি তোমায় বলে দেব এখন। তুমি তোমার নিজের রাস্তায় চলবে। কে নেই দিদিমণি আমি আজও বেঁচে আছি তোমার সেবার জন্যে।

পুষ্প যে ভয় করেছিল তা হল না। কেলো ঠাকুরের সঙ্গে পুষ্পর বিয়ে হল এই কেলো কিন্তু পুষ্পর ধারে-কাছেও গেল না। পুষ্প যথাসাধ্য আগের মতো ব্যবহার করতে লাগল তার বিয়েই হয়নি এমনি একটা ভাব। কেলো ঠাকুরকে সে এড়িয়েও যেত না, কাছেও ডাকতো

ইতিমধ্যে মা চলে গেলেন বৃন্দাবনে। পুষ্প আর কেলো ঠাকুর বাড়ীতে একা পড়ে কেলো ঠাকুরের কিছুতেই পুষ্পর কাছে আসবার সাহস হয় না। কিন্তু বেশ বোঝা যায় সে পুষ্প থেকে ভালবাসছে। পুষ্পর জন্যে সে রোজ কই মাছ ধরে। পুষ্পর হরিণকে আদর করে ক এনে খাওয়ায়। পুষ্পর গরু-বাছুর ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে এঁটুলি মেরে দেয়। দূর থে পুষ্পকে দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

পুষ্প যখন পুকুরে সাঁতার কাটে কেলো ঠাকুর তখন ঝোপের আড়ালে ছিপ ফে হয়ে বসে দেখে পুষ্পকে। পুষ্প যখন বাগানের গাছের ডাল ছাটে তখন দূরে গাছের আড়ালে কেলো ঠাকুর তাকে এক দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। কিন্তু কিছুতেই সে ভরসা করে পুষ্পর এগোতে পারে না। বিয়ের আগে সে পুষ্পর কাছে যতটা সহজে যেতে কথা বলতে পার যেন সে সেটুকুও পারে না। কেলো ঠাকুর যে দূর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখে—তা পু পারে। কিন্তু কিছু বলে না। মাঝে মাঝে সে সহজ হবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে আগে ব্যবহার করতে কেলো ঠাকুরের সঙ্গে কিন্তু কিছুতেই সেটা সে পেরে উঠে না।

বিশেষ করে রতনমণি যখন তাকে বলে—তুমি তো রাজরাণী দিদিমণি। তোমার ইচ্ছে মতে ভোগ কর।

কেলো ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বলে—এটা তো তোমার জোয়ানী নয়। ধর না কেন তোমার একটা গোষা বাঁদর।

পুষ্প কোন কথা বলে না। তবে একটা ঠিক যে, বিয়ের পর থেকে পুষ্প অনেক ভা হয়েছে। অনেক কথা সে নিজে নিজেই বুঝতে শিখেছে।

একদিন রতনমণিকে সে বললে—দেখলি রতন মায়ের আক্কেল দেখলি। রাজপুত্তুরের আবার বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে বৃন্দাবনে উঠল।

রতনমণি বললে—বসিবাবুর আক্কেলের কথাটাও ধর। তাই সেজে এল গোরখমে। তেকুনি বলেছিনু—এর মতলব ভাল নয়। তারপর দেখ না নিজের একটা হতচ্ছাড়া ছোলাকে সঙ্গে এমন সোনার পিরতিমের বেটা কী ভাবে ভড়কী দিয়ে করিয়ে দিলে। আর শুধু কী ত বসিবাবু বেশ জানত যে মাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিলেই সম্পত্তিটা বসিবাবুর হাতে এসে যাবে। মনে রাস হত। কিন্তু তবুও সরাসরি সে ভাবতে পারত না যে বসন্ত জেনে-শুনে তার অপকারটা করেছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে কেলো ঠাকুরকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালে। ডাক পেয়ে কেলোর অবস্থা কাহিল। ঘিনঘিন করে ঘামতে থাকে কেলো ঠাকুর। শেষে নিজের সঙ্গে অ বুদ্ধ করে এসে হাজির হল পুষ্পর ঘরে। পুষ্প বসেছিলো মাটির ওপর, নীচে ছিল রতনমণি কেলো ঠাকুর ঘরে এসে ঢুকে দরজার কাছে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। পুষ্পও মুখ নীচু বসেছিল। তা আঙুল দেখিয়ে একটা চেয়ারে বসতে বলল কেলো ঠাকুরকে। কিন্তু কেলো ঠ কিছুতেই সে চেয়ারে বসল না। খাড়া দাঁড়িয়েই রইল পুষ্পর সামনে।

পুষ্প কাঠ গলায় বললে—ঠাকুর একটা কথার সত্যি জবাব দেবে আমায়?

কেলো ঠাকুর মুখ তুলে বললে—কি কথা?

পুষ্প বললে—আমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে কী তোমার বাবু আর তুমি আগে থেকেই ফন্দী করে রেখেছিলে?

কেলো ঠাকুর শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি বললে—বসন্ত দেবতা। এ ব্যাপারে তার দোষ নেই।

পুষ্পর মুখে খানিকটা বিষাক্ত হাসি ফুটে উঠল। সে বিকৃত স্বরে বললে—দেবতা তো আ ওপর খুব দয়া করলেন। তা বিয়ের এই ফাঁদটা পাতল কে?

কেলো ঠাকুর শুকনো গলায় আস্তে আস্তে বললে—আমি সব কথা তোমায় শোনতে চা কিন্তু—

বলে রতনমণির দিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পুষ্প বুঝতে পারল রতনমণি থাকতে ঠাকুর কোন কথা ভাঙবে না। তাই তাড়াতাড়ি উঠল—রতন তুই একটু বাইরে যাতো।

রতনমণি অনিচ্ছাসত্ত্বেও আড়ামোড়া খেয়ে উঠল। তারপর বেজার মুখ করে বাইরে চলে রতনমণি বাইরে চলে যেতেই কেলো ঠাকুর পুষ্পর কাছে সরে এল। তারপর আকুল হয়ে বলে —পুষ্প তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি অন্ধ হয়ে পাপ করে ফেলেছি। আমি আগে জানতা যে আমার এতে এতো বড় শাস্তি হবে। আমি যে তোমার জীবন নষ্ট করেছি ভেবে প্রাণে এতটুকু শান্তি নেই পুষ্প। আমি দিনরাত দুঃখের আগুনে পুড়ছি।

পুষ্প বললে—সে কথা থাক। এখন আমার বল কে একাজ করল?

তখন কেলো ঠাকুর আস্তে আস্তে সব কথা খুলে বলতে লাগল পুষ্পকে। সব শুনে মুখ শক্ত হয়ে উঠল। চোখ দুটো দিয়ে তার আগুন বার হতে লাগল। মুখ দিয়ে তার বার তুমি একটা পিশাচ, তোমার মুখ দেখলে পাপ হয়। তুমি কাল থেকে আর আমার সামনে এসে

কেলো ঠাকুর করুণ গলায় বললে—পুষ্প তুমি আমার উপর এতো নিঠুর হয়ো না। শুধু দিনে একটি বার তোমাকে দেখতে দিও। আমি যেন আর কিছু চাই না।

পুষ্প বললে—তোমার নিজের যদি কিছু আত্মসম্মান থাকে তো কালই এখান থে না হলে আমি অঙ্কুন সিংকে দিয়ে তোমার গলাধাক্কা দিয়ে এ বাড়ী থেকে বিদেয় ক

এ পুষ্পকে কেলো ঠাকুর কোন দিন দেখেনি। কেলো ঠাকুর মনে মনে ভাবতে লাগ ছেলেমানুষীতে ভরা পুষ্প কী করে এতো কঠিন হয়ে উঠল।

ঘটনাটা ঘটল বসিবাবুর ফুলশয্যার দিন।

শ্রাবণের মাঝামাঝি বসিবাবুর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েতে পুষ্প এল না। কেলো লাফ-ঝাঁপ করে বিয়েতে মেতে রইল। নিজের কথাটা ভুলে থাকবার একটা মস্ত বড় উপা পেল কেলো ঠাকুর।

বসিবাবুর বাড়ীতে আজ কদিন থেকেই উৎসব লেগে আছে। বসির মেসো মাসী এসে গ্রামে রয়েছেন, প্রায় এক সপ্তাহ ধরে সমস্ত উৎসবের আয়োজন করেছেন তাঁরাই। ি গেছে। বসি বাগবাজারের বোসেদের বাড়ীর মেয়েকে বিয়ে এসে ঘরে তুলেছে। এই দুদিনের ম সঙ্গে তার ভাবসাবও হয়েছে অল্পবিস্তর। বিশেষ করে বসন্ত মুগ্ধ হয়েছে নতুন বৌয়ের গানে। ে মেয়ে লক্ষ্ণৌয়ে ঘাদামশায়ের কাছে থাকার সময় ঠুংরী গান শিখেছিল ঘর করে। সুন্দর গলায় সে সে শুনিয়েছে বসন্তকে গ্রামের বাড়ীর ছাদে গভীর রাতে। বসন্ত মজে গেছে। বাইরের দুনি কাছে প্রায় লোপাট হয়ে গেছে। আজ কদিন থেকেই সে মনে মনে মতলব ভাঁজছে ফুল-শয্যার রা

কিন্তু হঠাৎ রাত প্রায় দশটা নাগাদ সরবেড়ের বাগান থেকে অর্জুন সিং এসে খবর দিল দিদিমণিকে পাওয়া যাচ্ছে না বাড়ীতে। দুপুরের পর থেকে কেউ জানে না তিনি গেছেন কোথা চারদিক খোঁজা হয়েছে কিন্তু কোন সন্ধান নেই। খবর পেয়ে বসন্তর সমস্ত আনন্দ উবে গেল। স সারা মনটা তেঁতো হয়ে উঠল। তীব্র রেগে গিয়ে হুকুম দিয়ে বললে—যে ক'টা বি-চাকর-দরো ওখানে তোরা আছিস সবকটাকে জেলে পুরবো আমি দাড়া।

তারপর অর্জুন সিংকে জেরা করতে লাগল বসি ভারীভাবে। হুকুমী আর জেরাতে অর্ সিং বললে—কিছুদিন থেকে বাবুর বন্ধু মোস্তা বোস ওখানে যাতায়াত করছিলেন। বাবুর বন্ধু ব বাড়ীর লোকে তাঁকে কিছু বলেনি।

কথা শুনে বসন্ত মাথায় হাত দিয়ে পড়ল। বিয়ে বাড়ীর সমস্ত আলো তার চোখের সামনে নি গেল। মোস্তা বোস এতদিনে তার এই সর্বনাশটা করলে।

ওদিকে সরবেড়ের বাগানের ভিতরকার কথা জানত রতনমণি। প্রথমে মোস্তা বোস খোঁ খবর নিয়ে হাজির হয়েছিল সরবেড়ের বাগানবাড়ীতে। তারপর রতনমণিকে ডেকে পাঠিয়ে নি অর্জুন সিংএর ঘরে। রতনমণি আসতেই মোস্তা বোস আত্মীয়তার সুরে বলেছিল—মাসী আ বসিবাবুর ইয়ার।

মোস্তা বোস তার জামার পকেট থেকে ব্যাগ বার করে পাঁচখানা দশ টাকার নোট রতনমণি হাতে গুঁজে দিলে।

রতনমণি বাইরে আসতেই অর্জুন সিং বললে রতন, ও হল বসিবাবুর সব-সে-সেরা দো —মোস্তা বোস। ওকে একটু ভাল জিনিসের বন্দোবস্ত করে দিও।

রতনেরও মোস্তা বোসকে খুব পছন্দ হয়ে গেল। অর্জুন সিংএর ঘরে বসে পরামর্শ করে নি করল রাতের বেলায় সে খিড়কীর দরজা খুলে দেবে মোস্তা বোসকে। আর এদিকে দিদিমণিকে বলে কয়ে ঠিক করে রাখবে।

মোস্তা বোস সেদিন রাতের বেলায় চোরের মতো সরবেড়ের বাগানে ঢুকলেও পরের দিন থে সে বুক ফুলিয়ে দিনের বেলাতেই বাগানবাড়ীতে ঢুকতে লাগল। সবাই জানল বসিবাবুর বন্ধু আসছে।

মোস্তা বোস অনেকদিনের ঘুঘু। মেয়েছেলেকে কী করে কথায় বশ করতে হয় তা জানে। বিশেষ করে যখন সে শুনল—যে পুষ্পর বিয়ে হয়ে গেছে কেলো ঠাকুরের সঙ্গে অথচ পু কেলোকে আমলই দেয় না, তখন সে রীতিমতো ব্যস্ত হয়ে উঠল পুষ্পর সম্বন্ধে।

শেষে একদিন সে পুষ্পকে নিয়ে বাগানবাড়ী ছেড়ে উধাও হল।

তারই এক সপ্তার মধ্যে বসিবাবু একখানা চিঠি পেলেন—পুষ্পর চিঠি। তাতে সে লিখেছে- আমি সবার উপর শোধ লইলাম।—তোমরা আমার উপর যে অবিচার করিয়াছ তাহার জন্যে আ তোমাদের উপর শোধ লইলাম। যাকে জানাইও তাহার পুষ্প বাড়ী ছাড়িয়াছে। বিনীতা—পুষ্প।

তারপর থেকে না বসন্ত বা কেলো ঠাকুর কেউই পুষ্পর নাম করেনি।

বসিবাবু শুধু মাঝে মাঝে কেলো ঠাকুরকে বলেছে—ঠাকুর একটা ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করে সংসারী হও।

কেলো ঠাকুর শুধু দাঁত বার করে বোকার মতো হাসতে হাসতে বলেছে—কি যে বল বাবু লোকের বিয়ে হয় একবার। ঐ একবারেই যে জ্বান হয়েছে—তাতে আর ওপথে যাচ্ছিনে। কিন্তু মাঝে মাঝে রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠত পুষ্পর খবর শোনবার জন্যে। সে জানত পুষ্প বসিবাবুকে লেখে মাঝে মাঝে।

ঘর ছেড়েও পুষ্প বসিবাবুর কাছে চিঠি লেখা ছাড়তে পারেনি—এইটাই আশ্চর্য। সেই থেকেই কেলো ঠাকুর শুনেছে—পুষ্প কলকাতার বাইজী মহলে সেরা সুন্দরী হয়েছে। পাকা কীর্তনে সে কীর্তন শিখছে। কলকাতার রাজা-মহারাজারা তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়।

কিন্তু বসিবাবু হঠাৎ মারা যাবার পর থেকে পুষ্পর চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেছে। সেই গত কটা বছর পুষ্পর আর কোন খোঁজই পায়নি কেলো ঠাকুর। এক একবার তার মনে হয় যে অঞ্চলে সে বাস করে, সেখানে গিয়ে খোঁজখবর করে একবার তার সঙ্গে চোখের দেখা করে কেমন হয়। কিন্তু কিছুতেই আর সে নিজের মনে সাহস করে উঠতে পারেনি।

এমনি ভাবেই দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন তার সঙ্গে পুষ্পর দেখা হয়ে গেল। ঐ উৎসবে বসিবাবুর ছেলে রমানাথ কলকাতা থেকে বাইজী নিয়ে এল। সেই বাইজী গাড়ী থেকে সটান এল শ্যামসুন্দরের নাটমন্দিরে।

অপূর্ব সুন্দরী সুন্দরী বাইজী। জড়োয়া গয়নায় বেনারসীতে ঝলমল করছে তার সারা। সেই বেশসুদ্ধ সে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল শ্যামসুন্দরের মন্দিরের বারান্দায়। যেন কত দূর থেকে এক তীর্থযাত্রী।

চোখের জল মুছতে মুছতে সে যখন উঠল কেলো ঠাকুর একটু চরণামৃত নিয়ে এগিয়ে যায় তার কাছে। দুজনে চোখাচোখি হয়ে গেল।

কেলো ঠাকুর দেখল অনেক বদল হয়েও পুষ্প পুষ্পই আছে।

পুষ্প দেখল—কেলো ঠাকুরের কোন বদল হয়নি। তেমনি পোড়াকাঠের মতো তেমনি পানের ছোপধরা দাঁতগুলো। কিন্তু ঠাকুর যখন হাসিমুখে তাকে চরণামৃত এগিয়ে দিল মনে হল কেলো ঠাকুরের মুখের হাসিটা বড় মিষ্টি, চোখের দৃষ্টিটা অদ্ভুত ক্ষমা-সুন্দর। আর তাদের ঘিরে যেন অনেক দিনের না বলা কথা ঘুরে পড়ছে।

কেলো ঠাকুর কিন্তু একটা কথাও বলল না। পুষ্পও না।

এর একদিন পরেই পুষ্প ম্যালেরিয়ায় পড়ল। দু'চারদিন ভুগে সেরেও উঠল। কিন্তু

বাধল পথ্য নিয়ে। ম্যালেরিয়ার জ্বরে অন্তত ডাক্তারের কুইনাইন খেয়ে মুখের স্বাদ চলে গে কীর্তনীয়ার। সে কিছুই খাচ্ছে না!—

জ্বর থেকে উঠে পুষ্প বেশ খানিকটা মুষড়ে পড়েছিল। সে বিছানার ওপর বসে বিশ্র করছিল সেদিন বিকেলে। জ্ঞানসুন্দরের পূজার ফুল আর চরণামৃত নিয়ে কেলো ঠাকুর এলো সে করতে। ফুলটুকু আর চরণামৃতটুকু পুষ্পর হাতে দিয়ে সে বললে—ক'দিন তো বেশ জ্বর ভে হল। কিন্তু শুনতে পেলাম তার পর থেকে পেটে কিছু যাচ্ছে না। কাল কইমাছের ঝোল দি পথ্য করতে ইচ্ছে হয় কী?

পুষ্পর চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে সে কথা কইতে পারল না। শুধু জলভরা চো দুটো বুকের দিকে ঝুলে মাথা নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

রাধু একটু চুপ করে থেকে বললে—কেলো ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে যা ঘটল সো আমি বললাম আমার অনুমান থেকে। অবশ্য অনুমানটা করেছি তারপরের ব্যাপার থেকেও অনেকটা গণেশ দরোয়ান এসে যখন পুষ্পর গলায় দড়ি দেওয়া লাস কেটে নামাল, তখন তার ব্লাউসের ভিতর থে একটা চিরকুট পাওয়া গিয়েছিল। সেটা সে আমায় দেখিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল—বাড়ী ছাড়া পর থেকে যে আশ্রয় এতদিন খুঁজে বেড়িয়েছি সেই আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েও হারালাম—এমন হতভাগি আমি। আমার মরণই ভালো।

সম্রাট পঞ্চম চার্লস চেয়েছিলেন ধর্মবিষয়ে প্রজারা হবে একমত। এক্ষেত্রে মতের পার্থক্য আর গেল না। সম্রাট স্বমতে আনতে না পেরে অনেককেই দিলেন মৃত্যুদণ্ড।

দীর্ঘকাল রাজত্বের পর সম্রাট ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যভার ত্যাগ করে এক আশ্রমে এসে উঠলেন।

সেখানে দশবারোটি ঘড়ি রয়েছে। তিনি রোজই তাদের চালাতে লাগলেন, কিন্তু দেখলেন কোনটার সঙ্গেই কোনটার সময়ের মিল থাকছে না। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও না।

তখন তিনি সখেদে বলে উঠলেন, কী মূর্খ আমি, দুটো ঘড়ি একই রকম চালাতে পারি না, আর আমি কিনা চাইছিলুম সব মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস হবে একই রকম!

বাঙলার ঢপকীর্তন ও মধুকান

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'বাঙলার ঢপকীর্তন' বলার উদ্দেশ্য যে, এক সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙলাদেশের মাটিতে পরিবেশেই পদাবলী কীর্তন ও ঢপকীর্তনের মতো রসসঞ্চারী গানের সৃষ্টি সম্ভব। ঢপকী মহাজন পদাবলী-কীর্তন থেকে গঠন, প্রকৃতি ও প্রকাশে ভিন্ন। মহাজন-পদাবলী-কীর্তন বাঙলার বি রসিকজনেরই ভোগ্য, কিন্তু ঢপকীর্তন বাঙলার সর্বসাধারণের জন্যই নির্বাচিত। ঊনবিংশ শত শেষভাগে এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে বিশেষভাবেই ঢপকীর্ত প্রচলন ছিল।

ঢপকীর্তনের স্রষ্টা ও প্রচারক ছিলেন একদিক থেকে মধুসূদন কিন্নর তথা মধুকান। আজ বাঙালী বাঙলার প্রতিভাবান কবি ও গীতিস্রষ্টা মধুকানের কথা একরকম বিস্মৃত বলে আনুমানিক ১২১২ সালে ও কারু কারু মতে ১২২০ অথবা ১২২৪ সালে অর্থাৎ ইংরাজী প্রায় কিংবা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার অন্তর্গত উলসিগ্রামে মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল নটবৃত্তিই ছিল মধুসূদনের জীবিকা উপার্জনের একমাত্র উপায়। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ আগেও বাঙলাদেশের পটুয়াদের মতো নটেরা পল্লীতে পল্লীতে নাচগান করে বেড়াত। যদু খুলনার ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র মিত্র নটদের 'কিন্নর' বলেই অভিহিত করেছেন। সুতরাং 'কি মধুসূদনের নৃত্য-গীতবৃত্তিরই উপাধি এবং কিন্নরকে কথিত ভাষায় বলা হয় 'কান'।

মধুসূদন কিন্নরের কাব্যপ্রতিভা দাশরথি রায় ও গোবিন্দ অধিকারী অপেক্ষা মোটেই ছিল না। দাশরথি রায় ও গোবিন্দ অধিকারীর মতো মধুসূদনও কৃষ্ণকীর্তন ক'রে পল্লীতে পল্লীতে বেড়াতেন। শ্রদ্ধেয় সতীশবাবু তাঁর যশোহর খুলনার ইতিহাসে লিখেছেন: "যশোহরেও নিবাসী মধুরধ্বনি মধুকান (কিন্নর) তেমনই নূতন ধরনে নূতন সুরে কীর্তন গাহিয়া দেশবিখ্যাত হইয়া কপোতাক্ষীকূলে বসি মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা' বিরহের যে সুরভঙ্গী দিয়াছিলেন, বেত্রবতীকূলে কিন্নর মধু তেমনিই তাঁহার 'ঢপ' সঙ্গীতের বিভিন্ন পালায় নূতন পদ্ধতির পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছে সতীশবাবুর উক্তি থেকে বোঝা যায়, গীতি-রচয়িতা হিসাবে মধুসূদন দুজন ছিলেন। যাই হোক পাঁ ও কীর্তনে পার্থক্য যথেষ্ট থাকলেও ঢপকীর্তন তখন বাঙলার সাধারণ সমাজে 'পাঁচালী' নামেই পরি ছিল। আসলে পাঁচালী ও কীর্তন এই দুটিরই অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল রূপ হল পঞ্চালিকা-প্রব কীর্তিলহরী প্রবন্ধ। শার্ঙ্গদেব খ্রীঃয় তেরোশো শতকের গোড়ার দিকে সঙ্গীত-রত্নাকরে বিশেষ এদের পরিচয় দিয়েছেন। বিদেশী পণ্ডিতদের অভিমত যে, পুতুলনাচ অথবা পুতুলনাচের আ গীতিই পঞ্চালিকা নামে পরিচিত ছিল। অনেকে ঢপকীর্তনকে পাঁচালীর পরবর্তী রূপ বলেন, ে

দাশরথি রায় প্রভৃতি কীর্তিকাররা সকলেই প্রায় পাচালী-গায়ক ছিলেন। আবার বেশীর ভাগ পণ্ডিত মতে কীর্তন ও বাউল গানের সংমিশ্রণে চপকীর্তনের সৃষ্টি এবং বাঙলাদেশের নিজস্ব সঙ্গীত হিসাবে কী বাউল ও পরবর্তী চপকীর্তন তিনটিই প্রসিদ্ধ। বাউলের সঙ্গে কীর্তনের মিশ্রণে চপকীর্তনের সৃষ্টি হও সম্ভব।

মধু কিন্নরের পিতার নাম আনন্দ কিন্নর, সুতরাং কিন্নর মধুসূদনের বংশপরম্পরা উপা 'কিন্ন'-নাম গন্ধর্বশ্রেণীভুক্ত সুমিষ্ট গায়ক বা গায়িকা, কিন্নর বা কিন্নরী থেকে সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবি অনেকে মধুসূদনের পিতার নাম বলেন তিলকচন্দ্র কিন্নর। অন্তত প্রভের দুর্গাদাস লাহিড়ী সেক বলেছেন। যাই হোক, মধুসূদনের পূর্বপুরুষ সকলেই সম্ভবত কণ্ঠমাধুর্যের অধিকারী ছিলেন এবং তা জন্য সকলে তাঁদের সঙ্গীতবিলাসী গন্ধর্বশ্রেণীর কিন্নরদের সমপর্যায়ভুক্ত করেছিলেন।

মধুসূদন বিদ্বান ছিলেন না, কিন্তু প্রতিভাবান ছিলেন। কাব্যপ্রতিভার অধিকারী ছি বলেই তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অসংখ্য কাব্যমাধুর্যপূর্ণ গান রচনা করেছিলেন। গান রচনা ক'রে তা সুর তথা রাগ ও তালেরও যোজনা করতেন। তাঁর রচনায় উপমা, অনুপ্রাস ও সংস্কৃত শব্দের প্র লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে মধুসূদন উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্তানী-সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। শোনা মুসলমান ওস্তাদ ছোটে খাঁ ও বড়ে খাঁ তখন ঢাকায় ছিলেন। মধুসূদন তাঁদের কাছে নাকি খেয়াল ও এবং ঢাকার রাধামোহন বাউলের কাছে বাউলগান শিক্ষা করেন। বাঙলার মহাজন-পদাবলীর রা সম্বন্ধে মধুসূদন সচেতন ছিলেন এবং কীর্তনের অনুরাগীও ছিলেন। সুতরাং টলসীগ্রামে ফিরে এসে বা ও কীর্তনের সংমিশ্রণে নূতন চপকীর্তনের রূপদান করা। সৃষ্টিপ্রিয় মধুসূদনের পক্ষে মোটেই অসম্ভব ন হতে পারে যে প্রচলিত প্রাচীন রীতিধারা পাচালীর ভিত্তিতেই কীর্তন ও বাউলের সেই সংমিশ্রণ স হয়েছিল ও তাতে ক'রে পুরাতনের সৌন্দর্যে নূতন চপকীর্তনের রূপ আরো মাধুর্যমণ্ডিত ও হৃদয়গ্র হয়েছিল। অবশ্য চপকীর্তনের সৃষ্টি সম্বন্ধে মতভেদও আছে।

চপকীর্তনেও ছিল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পালাগান। মধুসূদন পালাগানের মতো দল নিয়ে পল্লী পল্লীতে চপকীর্তন গেয়ে বেড়াতেন। শোনা যায় কাশিম বাজারের রাণী স্বর্ণময়ীর বাড়ীতে প্রতি বৎ রাসের সময় তাঁর চপকীর্তন নির্দিষ্ট ছিল। মহাজন-পদাবলীর মতোই তাঁর কীর্তনে ছিল বিরহ-মিলনাত্ব ব্রজলীলার বিষয়বস্তু। মাথুর, প্রভাস, কলঙ্কভঞ্জন, অক্রুর সংবাদ কোনটা পালাই তাঁর কীর্তনে ন পড়েনি। তবে তাঁর কীর্তনে ছিল ছোট ছোট তালের সমাবেশ। সকল পালার গান ও তা বিষয়বস্তু তিনি নিজেই রচনা করতেন, আর তারই জন্য মহাজন তথা বৈষ্ণবসাধক-পরম্পরায় প্রচলি পদাবলী কীর্তন থেকে তাঁর প্রকৃতি ও গতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারই জন্য বিদগ্ধ বৈষ্ণবমহলে ও গান বিশেষভাবে সমাদর লাভ করেনি। কিন্তু তাহলেও তাঁর পালা রচনায় বিশেষ কাব্যমাধুর্য ও লালিত্য ছিল ও সেজন্য পরবর্তী যুগে পদাবলী কীর্তনের মতো চপকীর্তন সর্বসাধারণের সমাজে প্র লাভ করে আজও পর্যন্ত বাঙলার সমাজে টিকে আছে। পাঁচকড়ি দে মধুকানের চপকীর্তনের উ

ক'রে ব'লেছেন: "চপকীর্তন গায়ককে একাই সর্বচরিত্রের অভিনয় করিতে হয়। ... সেজন্য গা সে কি বলিতেছে, উক্তির পূর্বে তাহা উল্লেখ করিবেন। যেমনে ছোট ছোট উক্তি বা প্রশ্নোত্তর স্বরের ভিন্নতা এবং হস্ত ও মুখের তদনুসারী ভঙ্গির দ্বারা বক্তৃতা করিলে শ্রোতাদের বুঝিতে অসু হইবে না।"

মধুসূদনের প্রায় সকল গানের শেষেই 'সূদন' অর্থাৎ নিজের নাম সম্পুটিত থাকত। ড দুর্গাদাস বাবু লিখেছেন: "এক সময়ে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করেন—মধু, তুমি 'মধু' নাম ত্যাগ ক 'সূদন' ভণিতা দাও কেন? তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—'মধু পাছে বিষ হয় এই ভয়ে মধু নাম। আমার সাহস হয় না"। শোনা যায়, ৪৫ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

মধুকানের ভক্তিরসসিক্ত দু'একটি গানের নিদর্শন যেমন—

বিভাস—কাওয়ালী

এখন কেন পারবে চিন্তে, হয়েছ হে নিশ্চিন্তে,
চিন্তে থাকলে পারতে চিন্তে,
চিন্তনা শ্যাম সেব চিন্তে।
কর তব মন স্বচিন্তে, চিন্তে থাকলে পারতে চিন্তে,
আমি পেয়েছি চিন্তে, তুমি ত পার না চিন্তে।
বট নবীন নবীন চিন্তে, নবীন হলে পারতে চিন্তে,
নবীন প্রবীণে চিন্তে, কি কাজ অসার চিন্তা চিন্তে।
এখন তব কা চিন্তে, রাজা বট রাজা চিন্তে,
গিয়েছ পা-ধরার চিন্তে,
যে চিন্তে শ্যাম আমার চিন্তে;
এসেছি যে ভেবে চিন্তে, পার কি না পার চিন্তে।
যে ছিল তোমার চিন্তে, তোমায় এখন সে চিন্তে,
সূদন বলে দিয়ে চিন্তে, তুমি ত আছ নিশ্চিন্তে॥

অপূর্ব এই অনুপ্রাসের ঝঙ্কার ও রচনাচাতুর্য। ভক্তি, রসিকতা, গাম্ভীর্য ও সরসতা এই গুণেরই তাঁর গানে সমাবেশ। তাঁর আর একটি গান যেমন,

ধর্ম অবতার, কি ধর্ম রাখলে তার,
গুরু যারা বিদ্যা হে তোমার।
রাধা তোমার প্রেমের গুরু, শুনেছিলাম ওহে চারু,
এখন দেখি তুমি গুরু তার।—প্রভৃতি

এই গানটির রসিকতার আবরণে একটা তীব্র ও মার্মস্পর্শী ব্যঙ্গ আছে। তার মধ্যে

দর্শনের ধারণা এবং অনুভূতিও ছিল গভীর। এ সম্বন্ধে তাঁর মোহিনী রাগে ও মধ্যমান তালে গান রচনা উল্লেখযোগ্য। গানটি হ'ল,—

তবদারা ভবে তারা নাম শুনি তোমার।
তাইতে এবার দিয়েছি ভার তার তার মা তার
নারায়ণ ভাণ্ডোদরী ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিকা,
কে জানে তোমারে তুমি কালিকা রাধিকা ;
গোলকে সর্বমঙ্গলা ব্রজে কাত্যায়নী,
কাশীতে মা অন্নপূর্ণা অনন্তরূপিণী,
তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয় মা তুমি স্বর্গ মর্ত্য,
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি পঞ্চতত্ত্ব,
ভক্তজন্য চরাচরে তুমি গো সাকার,
পঙ্কে পঙ্কে লয় হলে তুমি নিরাকার

এই চলকীর্তনটিতে দর্শন ও যোগসাধনার পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছে। চক্রে চক্রে মহাশক্তি বিকাশ বর্ণনাচ্ছলে পরম বৈষ্ণব মধুসূদন শক্তিসাধনার নিগূঢ় তত্ত্বকথারও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচনা যে

ঘটে ঘটে সর্বঘটে আছ গো আপনি,
মূলাধার কমলে মা গো শিবের কামিনী।
তদূর্ধ্বে আছে স্থান মা নাম স্বাধিষ্ঠান,
ষড়দলে পদ্ম আছে তথায় অধিষ্ঠান,
চতুর্দলে আছ তুমি কুলকুণ্ডলিনী,
ষড়দল পদ্মে সিংহাসনে মা আপনি।
তদূর্ধ্বে নাভিস্থল মা ব্রহ্মা-সরোবর,
রক্তবর্ণ পদ্ম আছে তাহার ভেতর।—প্রভৃতি।

এ'যেন ঠিক সিদ্ধসাধক রামপ্রসাদের রচনারই প্রতিধ্বনি। বাঙলার সজল মাটিতে বিশেষভা বিষ্ণুঠাকুর ও শক্তিঠাকুরাণীরই প্রভাব বেশী দেখা যায়। নদীয়া, নবদ্বীপ, শান্তিপুরের পাশাপাশি শক্তি সাধনার পীঠস্থান তারাপীঠ, কুলয়া প্রভৃতি বীরভূমের তীর্থে বৈষ্ণব ও শক্তি এই যুগল ভাবধারার রূপ [illegible] করিয়ে দেয়। মধুসূদন কিন্তরও বাঙালী, তাই রাধাকৃষ্ণলীলার পরমপূজারী হলেও তিনি মহাশক্তি মাতৃলীলাকেও তাঁর গীতিরচনা থেকে বাদ দিতে পারেন নি। মধুসূদনের গান এখন অনেকে একরূপ ভুলতেই বসেছে, কিন্তু মনে হয় বাঙলা সাহিত্যের জয়যাত্রা যতদিন ভারতের বুকে অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদি মধুসূদন তথা মধুকানের স্মৃতিও শুধুই বাঙালী নয়, ভারতের ও ভারতের বিরুদ্ধ সমাজে চির সমুজ্জ্বল থাকবে

দুর্বল

নন্দু বললে, কারণ মেয়েরা দুর্বল। আর দুর্বল বলে কোনো কিছুতে স্টিক করে থাকতে পারে না।

বুড়োদা হাসলেন। নন্দু বললে, হাসলেন যে। বুড়োদা বললেন, আখ, তোমার মতো ব যখন আমার ছিল, ও ধরনের ঠাউরো অবস্থা চের উপরেছি। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলেছে সে ধারণা ভুল। তার মাশুল দিলুম জীবনভোর। বুড়োদা থামলেন। আবার একটু মৃদু হাসলেন। বললেন, তোমার বয় মজা কি জানো, বিচারের তারিখ ফেলে না। পাঁচ আইন মোতাবেক কটপট রায় দিয়েই মামলা করতে চায়।

ও বয়েসটা আমার যেদিন ছিল, এটা তখনকার কথা। তখন সদ্য ডাক্তারী পড়তে ঢু রমার সঙ্গে আলাপ হল। ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলুম কুচবিহার। ওখানেই এক বন্ধুর বাড়ীতে দেখলুম। প্রথম চোটে কোনো কিছু অসাধারণত্ব পাইনি ওর মধ্যে, না চেহারায় না কথাবার্তায়। নজরে পড়বার তা ওর চোখে-মুখে একটা দৃঢ়তা। সুনীলদের বাড়ীতে যাই আসি। রমাকে দেখি ব সখনো কিছু কথাবার্তা হয়। রমা বেশ মিশে গেছে সুনীলদের পরিবারে। সুনীলকে বলে দা বাবাকে মেসোমশাই, মাকে মা। বাইরে থেকে কে বলবে সে ওবাড়ীর কেউ নয়। একদিন জানলুম ে ক্লাস এইটে। সেদিন মনে হল বয়েসের তুলনায় চের নিচে পড়ে। সুনীলকে কথাটা জিগেস ক বললে, মেয়েটার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে বেশ। মাঝখানে নানা গোলমালে ওর পড়াশুনো হয়নি। এখা আবার আরম্ভ করেছে। জানো দেখতে নিরীহ হলে কি হবে, ভয়ানক তেজী মেয়ে। ওর বিয়ে হ কিন্তু ওর পছন্দ হয়নি, চলে এসেছে স্বামীর ঘর থেকে। বাপ মা ভাই কেউ ভারপা দিলে না। কুচ নেই, বেরিয়ে এল বাপের বাড়ী থেকে। ভাবতে পারো এমন মেয়ে আর ওই তো বয়েস।

সুনীলের কথা শুনে তাজ্জব লাগল, আমার চাইবার চোখ একদিনেই বদলে গেল। রমাকে করে দেখলুম। ওই ছিপছিপে মেয়ে, ওর দেহে পেলুম শক্তির অসামান্য পরিচয়। ওই সাধারণ মুখ, ব গালে একটা নীল শিরা জেগে উঠেছে। ও মুখে দেখলুম কী অনমনীয় দৃঢ়তা। ছুটি ফুরিয়ে এল, চলে ওখান থেকে। কিন্তু রমাকেও নিয়ে এলুম মনে করে।

আবার ছুটি হল, আবার গেলুম সুনীলদের বাড়ী। এবারে রমার সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গতা একদিন শুনলুম ওর কাহিনী। বাবার রোজগারেই সংসার চলে। বাবার সেই রোজগারও অনি বাড়ীর মধ্যে আর যে রোজগার করতে পারত, সে দাদা। তা সে তো পলিটিক্স করে ফিরী ফিরী । বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক তার কতটুকু। রমা বাড়ীর বড় মেয়ে, সে ছাড়া আরও চারটি তার পরে, সব মেয়ে। কাজেই সে চোদ্দ বছরেই গলগ্রহ হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে সংসারের কাজ সামাল দিতে

আর অনিয়মিত ইস্কুলে যেতে যেতে সে ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠল। হেড্ দিদিমণি খুব ভালবাসতেন রমাকে। পড়াশুনায় যা কিছু সাহায্য ওর কাছ থেকেই পেয়ে এসেছে।

একদিন দেশ থেকে রমার কাকা এলেন। সঙ্গে দূরসম্পর্কের এক ভগ্নীপতি। দিনকত থাকলেন ওদের বাড়ী। খাওয়া-দাওয়া সিনেমা দেখা, আনন্দ স্ফূর্তি হল খুব। ভগ্নীপতিটি রমার মাকে বললেন, মা, আপনাদের মেয়ে যারা যাওয়া ইস্তক আর হাসিখুশীর মুখ দেখিনি। এখানে এসে দিনকত যেন নব কলেবর পেলাম। আর না, অনুমতি দেন এবার বাড়ীতে ফিরি। বলেই কাঁস করে এ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, বাড়ী তো নয়, নিরানন্দপুরী, ফিরি যে কেমন করে তাই হল ভাবনা জামাইএর দুঃখে রমার মার চোখে জল এসে পড়ল। সান্ত্বনা দিলেন, কি আর করবে বাবা, সবই ভবিত নইলে দু দুবার গড়া সংসার অমন করে ভাঙবে কেন? জামাই চুপ করে রইল। কিন্তু রমার কাক কর্মঠ লোক। তিনি চুপ করে যাবার পাত্তর নন। দাদাকে বোঝালেন, এই তো তোমার সংসার, এ তো তোমার আয়, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। এর উপর ভরসা করে তুমি হাতের লক্ষ্মী পা ঠেলবে? মেয়ের বয়েস কম বলছ? চোদ্দ কি একটা নিতান্ত কম বয়েস হল? নিজের দিয়েই বিচ কর না। বৌকা যখন হয় বৌদির বয়েস ছিল কত? এতখানি বয়েস হল তোমার এখনো কি আগে মতো ভাবলে চলে? একটু ভবিষ্যৎ ভাবতে শেখো। ভগবান না করুন, কিন্তু ধরো, যদি হিত অহি কিছু একটা হয় তোমার, তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে, একবার ভেবেছ? কে দেখবে এদের? তোম ছেলে? তাকে এতদিনেও চিনলে না। ছেলের ভরসা ছাড়। ও কমরেড হয়েছে। ওর রোজগার খে গেলে অন্ন পাল্টে আসতে হবে। তার চেয়ে যা বলি শোনো। বীরেন গাইগুঁই করছে, তা আমি ও মত করাবখ'ন। তুমি মত করলেই হয়। ওদের অবস্থাও ভাল। মেয়ে তোমার সুখেই থাকবে। চ কি দরকার অন্ধকারে তোমাকেও সাহায্য করতে পারবে। বীরেনের বয়েস নিয়ে হয়ত একটু কথা উঠবে বৌদি ম্যান ম্যান করতে পারে। চল্লিশ আবার পুরুষ মানুষের একটা বয়েস নাকি। তা ছাড়া বীরেনে স্বাস্থ্যটা দেখেছ একবার। খুকীর মতো পাঁচটাকে একসঙ্গে কাত করে দিতে পারে, তোমাকে বেশী বলব। তাই বলছি পরশু লগ্নে ভাল লগ্ন আছে, আর বৃথা ভাবা চিন্তা নয়।

রমার দাদা সব শুনে বললে, ব্যাপারটা খুকীর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ও রাজী থাকলে কার কি আশ্চর্যের কথা সব চেয়ে বেঁকে বসলেন, খুকীর মা। তিনি অনশন ত্যাগ করলেন। ওই বুড়ো জামাইয়ে হাতে তিনি কিছুতেই মেয়েকে সমর্পণ করবেন না। তার চেয়ে মেয়েকে খুন করে, তিনি আত্মঘা হবেন।

এতোটা একনাগাড়ে বলার পর বুড়োদা থামলেন। নার্স এসেছেন। বুড়োদা তাকে স করে ভেতরে গেলেন। ওর স্ত্রীর অসুখ। ফিরে এসে বেশ করে বসলেন। নন্দুর দিকে চেয়ে বললে যতটা ভাবছ, অতটা দুর্বল মেয়েরা নয়। যা বলছিলুম।

শেষ পর্যন্ত রমাই এগিয়ে এল। কাকা ওকে দুবছর ধরে কি মন্ত্র দিলেন ওই জানে। যা

ধীরে মায়ের কাছে এসে স্পষ্ট করে বললে, মা কেঁদোনা। আমার ইচ্ছে বিয়েটা এখানে হয়। রু চমকে উঠলেন। মেয়ের দিকে চাইলেন। তারপর চাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, ওমা, তো পরামর্শ কোন শত্রুরে দিল। রমা তেমনি পরিষ্কার জবাব দিলে, আমি নিজেই ভেবে দেখলাম মা, যখন সবারই ভাল, তখন আর অমত করে লাভ কি। আর যা অবস্থা এর চেয়ে ভাল বিয়ে হবে কেমন করে। মা তুমি কেঁদো না।

বুড়োদা বললেন, বোস, অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবার-জীবনে। চৌদ্দ বা বছরে, কোথায় চোখে মুখে রোমান্টিসিজম্ টৈ-টৈ করে বেড়াবে, আর কোথায় মুখ দিয়ে গোড় সব পাকা কথা বেরুচ্ছে। কত অল্প বয়সেই না আমরা জ্ঞানবৃক্ষের ফলগুলো ভক্ষণ করেছি, অ্যাঁ!

বুড়োদা একটু থামলেন। তারপর আবার সুরু করলেন, রমাই যখন রাজী তখন আর কোথায়। লালপেড়ে কোরা মিলের শাড়ী পরে শাঁখা সিঁদুর দিয়ে গোধূলি লগ্নে রমার বিয়ে হবে দাদা বললে, অর্থনৈতিক অসাম্যের জন্য সামাজিক যূপকাষ্ঠে একটি নিরীহ মেয়ের বলি হল প্রতিশোধ নিতে যেন কখনো না ভুলি, এই শপথ। তার খুকী দেশব্যাপী বিপ্লব দিয়েই এর প্র নিতে হবে। তোর সাহায্যও চাই।" তোর বরটা তো শুনেছি 'কুলাক'। বিস্তর জায়গা-জমি-মালিক। তুই মাসে মাসে আমাদের পত্রিকাফাণ্ডে বেশ কিছু চাঁদা দিয়ে যাবি। ওদের টাকাতে সংস্কার করতে হবে। রমা তেমনি স্পষ্ট করে বললে, আচ্ছা। কিন্তু রমার দাদা প্রকৃত কর্ম ছাড়লে না যাতায়াত ট্রেণ খরচ, শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রণামী, প্রত্যেক শালীকে এক টাকা করে শ দিয়ে ভগ্নীপতির হাতে বেঁচেছিল বত্রিশ টাকা, রমার দাদা সেটা নিয়ে পত্রিকা ফাণ্ডে জমা দিলে।

বিদায়কালে সবাই কাঁদল। রমাও। যাবার আগের মুহূর্তে রমার দাদা এসে হাজির। একান্তে ডেকে বললে, দুর্বল হসনে, ভেঙ্গে পড়িসনে, এ শুধু 'স্ট্রাগল ফর এক্সিসটেন্স' এই রমার হাতে একতাড়া ফুলস্কেপ কাগজের বাণ্ডিল দিলে। তিন বছর ধরে রমার দাদা কার্ল মা ক্যাপিটালের' অনুবাদ করছিল। একটা খণ্ডই মাত্র করে উঠেছে। তাই বোনকে দিয়ে বলল বিয়েতে এই আমার উপহার। সব সময় কাছে কাছে রাখিস, তোকে বল যোগাবে। এতক্ষণ রমা এবার কাঁদল। দাদা তার চোখ মোছাতে যেতেই রমা বললে, নিজেরটা মোছ, আমার ও নিয়েছি।

রমা ফিরে এল শ্বশুরবাড়ী থেকে একমাস পরে। মা শিউরে উঠে বললেন, আমার কমলের এমন হাল কে করল। রমা স্পষ্ট করে বলল, তোমার জামাই। তার বিছানায় শুতে যা একমাস ধরে শুধু যন্ত্রণা দিয়েছে। আগের দু' বউও এমনিভাবে মরেছে। মা আমি আর শ্বশুর না। ও আমার স্বামীও নয়। মা কানে আঙুল দিয়ে বললেন, হতভাগী, বলিসনে, বলিসনে। যা ছিল তোর কি করে খণ্ডাবি? বাবা শুনে বললেন, তা কি করে হয়। শহরে আমার না আছে। পেটের মেয়ের স্বামপরামর্শে একটা কেলেঙ্কারী বাধাতে পারিনে। বরঞ্চ বীরেনকে আ

বলে দেবোখ'ন। টাকা পয়সা নেই তাতে কি? স্বামী গরীব হলেও সে স্বামী। দাদা বললে, তাকে যদি বাস্ তো ও কেস্ করতে পারে। ক্যাপিটালিস্ট আইনে ওর অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আ চাই এই ক্যাপিটালিজম্‌কে জড় থেকে উপড়ে ফেলতে। এই সব পেটি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে গ্রো কজ্ ছাপার্ড হবে। রমা তখন কি করে? বসে বসে স্থির মস্তিষ্কে ভাবল। তারপর ইস্কুলের বড়দিদিমণি কাছে গেল, তাঁকে সব খুলে বললে, বাবা মা ও দাদার কথা বললে। বড়দিদিমণি অনেকক্ষণ ধ ভাবলেন। ওকে জিজ্ঞেস করলেন, কি করতে চাও তুমি?

রমা বললে, আমি বেঁচে থাকতে চাই। জীবনটাকে গড়তে চাই। যে করে হোক লেখাপ শিখতে হবে, রোজগার করতে হবে জীবিকা। ডাইভোর্স করতে হবে। যাকে স্বামী বলে মা'নব না তার পদবী বয়েই বা বেড়াব কেন? বলেই রমা থামল একটু, তারপর নরম সুরে বললে, আর বিয়ে করতে হবে।

বুড়োদা বললেন, নন্টু, একথা একটা চোদ্দ বছরের মেয়ের। খুব কি দুর্বল দুর্বল শোনাচ্ছে নন্টু চুপ। বুড়োদা সুরু করলেন।

বড়দিদিমণির ভাই কুচবিহারে থাকেন। রমাকে তিনি সটান সেখানে পাঠিয়ে দিলেন সুনীলেরই পিসি তিনি। তাই ও-বাড়ীতে এসে উঠল রমা।

এই কাহিনী শোনা ইস্তক রমা আমার দিনের চিন্তা রাতের স্বপ্ন হয়ে উঠল। রমাকে বললু রমা আমাকে আপন বলে জেনো। যদি কোনো দরকার হয়, নিঃসঙ্কোচে জানিও। রমা হাসতে লাগল কুচবিহারে কি নিয়ে যেন গোলমাল বেধে উঠল। ইস্কুল কলেজে হল ধর্মঘট। নেত্রী বলে রমার ইস্কু থেকে নাম কাটা গেল। কুচবিহার থেকে হল বহিষ্কার দণ্ড। অমন মেয়েকে জায়গা দিয়েছেন বং সুনীলের বাবার উপর সরকারী হামলা সুরু হল। রমা বললে, মা, আমি চালাই এখান থেকে। ওকে সঙ্গে লড়াই করব এমন জোর নেই আমাদের। সুনীলের বাবা মা চোখের জলে ভেসে বললেন, কোথা যাবি, তুই দুধের বাছা। আমি থানা পুলিশ জজ ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে ধরে পায়ে ধরে অর্ডার ক্যান্সে করিয়ে নেব। রমা স্পষ্ট করে বললে, মেসোমশাই, মা, তোমরাই আমার বাবা মা, তোমাদের বিপদে ফেলতে চাইনে।

বুড়োদা বললেন, তারপর আমার নাম করে বললে, ওকে একখানা টেলিগ্রাম করো। আমি কলকাতায় পড়ব। একটা থাকবার জায়গা ঠিক করে যেন ও স্টেশনে থাকে। আমি টেলিগ্রাম পে প্রথমে ঘাবড়ে গেলাম। কোথায় রাখব কি বিত্তান্ত। কিন্তু রমার বিপদ, আমার কাছে আশ্রয় চেয়েছে এ যে আমার স্বপ্নের ব্যাপার। জগতে কি এমন কাজ আছে, যা ওর জন্যে করতে না পারি? কলকাত তোলপাড় করে ওর জন্যে সীট জোগাড়ে বেরলুম মেয়ে হোস্টেলে। সুনীলের বাবা প্রথম প্রথম স খরচটাই দিতেন। কিছুদিন পরে ওকে টিউশনি জোগাড় করে দিলুম দুটো। ও তখন বাকী খরচটাই ও নিতে লাগল। আমার মনে মনে ইচ্ছা কিছু টাকা আমিও দিই। কিন্তু রমা সে টাকা নেবে না বে।

এবার আমরা কাছাকাছি হলাম। রমার সঙ্গে কত কী পরামর্শ করলুম দিনের পর রমাকে বললুম, রমা তুমি নার্সিংএ ভর্তি হও ম্যাট্রিকটা দিয়ে। খুব ভাল হবে। রমা শুধু হাসত, দিত না। আমি ভেবেই নিয়েছিলুম রমা নার্স হবে। আমি ডাক্তারী পাস করব। তারপর দুজনে ছোট্ট মাতৃসদন খুলব, মফস্বলে গিয়ে। মফস্বলে একটা মাতৃসদন খোলা আমার বরাবরের আকাঙ্ক্ষা। মা রমা এসে সে আকাঙ্ক্ষা আরো উজ্জীবিত করল। আরো একটা ইচ্ছে ছিল আমার। সেটা তো পারছ, রমাকে বিয়ে করা। বড়ই শক্ত কাজ। আমার বাবা মা ভীষণ গোঁড়া। তারা কিছুতে দেবেন না। তবু মনে মনে আমি শক্তি সঞ্চয় করছিলুম। নিদেনো অবশ্য এখনই কিছু করতে পা আগে পাস করি, ও পাস করুক, দুজনে স্বাধীনভাবে দাঁড়াই। হবে না।

কিন্তু নার্সিং পড়বার কথা উঠলে রমা সাড়া দেয় না কেন? ও শুধু হাসে। ওর উপ জোর করে চাপাতে চাইনে। এদিকে ওর ম্যাট্রিক পরীক্ষা এসে গেল। কী ভীষণ পড়তে সুরু শরীর ওর যায় যায়। যত বলি, রমা অত পড়ো না। শরীরটি নষ্ট হলে পরীক্ষা দিতে পারবে না। শুধু হাসে! একদিন হলও তাই। ওর হোস্টেলে গিয়ে শুনি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। খুব ব বললুম, এভাবে তো পরীক্ষাই দিতে পারবে না। তা দিলে পরীক্ষা। বললে তো ভালই দিচ্ছি। শেষ হতে ও কুচবিহার গেল। জোর করে আমিই পাঠালুম। কিন্তু কলকাতা আমার কাছে বিস্ব গেল। কিছুতেই মন টেকে না। পড়াশুনায় মন বসে না। রাতদিন শুধু কি করি কি করি। সময় চিঠি এল। আমার কাছে রমার প্রথম চিঠি। আমার কাছে আমার প্রেমের প্রথম চিঠি। থরথর কা আমার কাঁপতে লাগল। সমস্ত শরীরে কাঁপুনী উঠিয়ে আনন্দ এল। রমা লিখেছে কুচবিহার তার ভাল না। যথাসম্ভব শীঘ্র কলকাতায় ফিরবে। আর লিখেছে নার্সিং ট্রেনিং নেবে। লিখেছে যেন বেশি যে না করি, শরীরের যেন যত্ন নিই।

বুড়োদা হেসে বললেন, খুব সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছে না কি নন্দু। প্রথম প্রেমের ব্যাপারটাই হে। সর্বদাই তাজা। এই যে তুমি আজ এত জ্বালা পাচ্ছ, ওটা আর কিছু না, তোমার অভিজ্ঞতাটা পুড়ে পুড়ে খোদাই হয়ে যাচ্ছে। এই যে ইস্টাম্পো মারা হল, এ একেবারে কর যখনই তোমার উত্তর জীবনে এ প্রসঙ্গ উঠবে, দেখবে যা-খাওয়া খোপ থেকে কেমন তাজা উত্তাপ আসে। লজ্জা পাচ্ছ কেন হে? তোমরা আজকালের ছেলেরা ঢের বেশী শক্ত-পোক্ত।

যাক, যা বলছিলুম। রমার চিঠি পেয়ে আমি আমাদের কলেজের প্রিন্সিপালকে গিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গিয়ে ধরলুম, মেট্রনকে অনুরোধ করলুম। তাঁরা বললেন, বেশ। মেট্রন বললেন এ কাজ কী পারবে? বড্ড মেহনতের কাজ। মেট্রনের কথায় হেসে উঠলুম, বললুম, তুমি ও দেখনি। কোনো রকম দুর্বলতা তার ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারে না। কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলে, দূর, নার্সিং ট্রেনিং-এ ওকে ঢোকাচ্ছিস কেন? ও কাজ কী ভদ্রলোকের মেয়েরা করতে যত সব অশ্লীল আবহাওয়া। ওদের কথায় হাসলুম। ওরা রমাকে দেখেনি। আমি নার্সদের

কিছু কিছু জানি। যাদের আর কোনো গতি থাকে না তারাই আসে নার্সিং পড়তে। এখন তো ভাল। আমাদের সময় যা কাণ্ড তোমরা ধারণা করতে পারবে না। আমি জানতুম এসব। তবু আমার মনে হত, আহা, যারা দিনের পর দিন রোগ থেকে আরোগ্যের পথে শত সহস্র লোককে নিয়ে যাচ্ছে সুস্থ করে তুলছে দুর্বিতকে, তাঁদের সম্মান করবার কি কেউ নেই? আট ন ঘণ্টা অমানুষিক অত্যন্ত ডিউটি অপর্যাপ্ত বেতন, মেট্রন স্টাফনার্সদের নিপীড়ন, সর্বদা পিছল পথের হাতছানি এ-সবই আমার জানা। যে কোন মেয়ে হলে আমি এ ব্যবস্থায় কখনও সায় দিতাম না। কিন্তু রমার কথা স্বতন্ত্র। আমার মনে হয়েছিল এই নির্যাতিতা, নিপীড়িতা অগণ্য সেবিকাদল দিনের পর দিন রমার মতো একটি শক্তিমান মেয়ের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছে। কবে আসবে সে মেয়ে যার দুর্বার বিদ্রোহে, অপরাজিত শক্তিতে এই দুর্বল মেয়েগুলোর এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ খানখান হয়ে ভেঙে পড়বে। অপরিমিত সূর্যালোক দিয়ে যে এদের পুঞ্জীভূত অন্ধকার উড়িয়ে দিয়ে নির্মল করে দেবে, রমাকে ভেবেছিলুম সেই মেয়ে। আমার আদর্শ মেয়ে।

কিছু দিনের পর দিন যায়, রমা আর কুচবিহার থেকে ফেরে না। ভর্তি হবার শেষ তারিখ পার হয়ে যায় দেখে দরখাস্ত নিজেই করে দিলুম। ওকে টেলিগ্রাম করলুম। বোধহয় আমার অবস্থাটা ভাষায় কি? শেষ মুহূর্তে রমা এসে হাজির। যাহোক ভর্তি তো হয়ে গেল। আমার স্বপ্ন আমার সাধ তো পূর্ণ হয়ে এলো। হঠাৎ একদিন রমা এসে বললে, আমি এ কাজ ছেড়ে দিতে চাই। আমি তো আকাশ থেকে পড়লুম। সে কী? কেন? বললে, এ কাজ আমি পারব না। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, মেট্রন, বন্ধুদের ঠাট্টা হাসি আমার চারিধারে ফুটে উঠল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, একটি অতি সাধারণ, ক্ষীণজীবী দুর্বল মেয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে মিনমিন করে কাঁদছে। এই রমা! সেই বিদ্রোহিনী! সব সাধ সব সাধের ইমারত, সেই মুহূর্তে আমার মনে হল কাঁচা ইঁটের গাঁথুনীর। ঘৃণা হল। হয়ত সে ভাব মুখে ফুটে থাকবে। বলে উঠলুম, ছি ছি রমা, তুমি এমন সাধারণ, এমন দুর্বল, ভাবতো ভাবিনি। বিষ ফুটল আমার কণ্ঠস্বরে, আমার মুখেও। দেখলুম, অপমানে রমার মুখের নীল শিরাটি রক্তের আড়ালে ঢাকা পড়ল। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে স্পষ্ট উচ্চারণে বললে, বেশ তাহলে নার্সিং পড়ছি। অবহেলাভরে টিটকিরী দিলুম, আপনার ঘৃণা অভিরুচি। দেখলুম, রমার চোখ সজল হয়ে এল, কিন্তু পলকে তা সামলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ও চলে যাবার পর মনে পড়ল, ওকে অপমান করেছি। অনুশোচনায় জর্জরিত হতে লাগলুম। কতবার ওর কাছে গেলুম ক্ষমা চাইতে, ওকে পেলাম না। দশদিনের মধ্যেও ওর নাগাল পেলাম না। একদিন নার্সদের কোয়ার্টারে গিয়ে খবর পাঠালুম। ওতো এলোই না, আবার বলে পাঠালো বাইরের লোকের সঙ্গে ও দেখা করবে না। আমি বাইরের লোক। অপমানে আমার শরীরে জ্বালা ধরল। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। আর না, আর না, জীবনে ওর সঙ্গে আর দেখা করতে আসব না। শক্ত হব আমি পুরুষ। আমার দুর্বলতা সাজে না।

কিন্তু নন্দু, বুড়োদা বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, আমিই আমার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিনি, চিঠি লিখেছি। ও কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা রেখেছে। দেখাও করেনি, জবাবও দেয়নি ও পাস করে বেরুলো। আমিও পাস করলুম। পসার জমলো। প্রতিজ্ঞা করলুম অকৃতদার থাকব, কিন্তু দেখ, সে কথাও আমি রাখতে পারিনি। বিয়ে করিছি, ছেলেমেয়ে হয়েছে। রমা কিন্তু ঠিক একরকমই আছে। বিয়ে না করলে না আর। কত শক্তি থাকলে নিজের প্রতিজ্ঞায় এমন অটল থাকা যায়, নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়া যায়।

বুড়োদা চুপ করলেন। নন্দু কি বলতে যাচ্ছিল থেমে গেল। নার্সটি বাইরে এসেছে। শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এই যে রমা, আজ এত্তুনি চললে? রমা জবাব দিল, সেরে খুব ভাল। থাকবার তো দরকার দেখছিনে। বুড়োদা বললেন, যদি তাই বোঝ, বেশ। ব্যাগ টাকা বের করে রমার হাতে দিলেন। রমা অম্লানবদনে টাকা কটি ব্যাগে পুরে বললে, আজ আসবার আর দরকার দেখছিনে, তবে নেহাত দরকার হলে ফোন করবেন। ও চলে গেল।

বললুম, বুড়োদা, এর কথা বলছিলেন না কী? বুড়োদা বললেন, হ্যাঁ। না দেখে পারিনে, তাই কারো অসুখ বিসুখ হলে ডাক দিই। আর ও আসে, কত্তী পরিচর্যা করে চা মেয়েরা যখন শক্ত হয়, তাদের কি মোয়ানো যায়?

জর্জ ডেনী নামে এক ভদ্রলোক হাতে একটি বল নিয়ে আলোচনা সভায় যেতেন। মতের গরমিল হলে বলটাকে উঁচুতে তুলে ধরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতেন বিপরীত দিকে: আপনি কি রং দেখছেন?

অন্যপক্ষ উত্তর করত: আমরা দেখছি কালো।

ডেনী মাথা নাড়তেন: উঁহু, হল না, আমি দেখছি সাদা। ঘুরিয়ে দিতেন বলটা। অপর পিঠটা সত্যিই সাদা।

—কাজেই আমরা দুজনে বলের রং বিষয়ে কখনোই একমত হতে পারি না, বলতেন ডেনী, যতক্ষণ না আমি আপনার দিকটা দেখছি, আপনি আমার দিকটা।

অনেক বিবাদ বিসংবাদের হাত থেকে আমরা রক্ষা পাব যদি আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ঐ বলের দুদিক দেখতে পারি।

উৎসব উপহার হিসেবে সেলাই কল আজকাল এত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে কেন? আপনার পরিবার খুসী হবে সেইজন্য কি? আপনার প্রিয়জনেরা আপনার বিবেচনার তারিফ ক'রবে, এই সুন্দর মনমত উপহারটি তাদের জীবনযাত্রার অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াবে, তাই? হ্যাঁ। কিন্তু শুধু তাই নয়—এই সেলাই কল প্রাচুর্য্যের স্বচ্ছলতার প্রতীক। আপনার পরিবারের জন্য আদর্শ উপহার। এ বছর 'উষা'-র নতুন 'স্ট্রীমলাইনড্' মডেল দিয়ে আপনার পরিবারকে চমক লাগিয়ে দিন। সুন্দর, আধুনিক গড়ন আর নিখুঁত কাজের জন্য ভারতের বাইরে চল্লিশটিরও বেশী দেশে সমাদৃত —এদেশে এই প্রথম বাজারে ছাড়া হচ্ছে।

উষা

সেলাই কল

মন্দাক্রান্তা

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

কলকাতার রাস্তায় অন্ধকার নেমেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু সন্ধ্যা গভীর হয়নি। বয়স যে বেড়েছে, এ তা বুঝতে পারি। সারাদিনের পরিশ্রমের পর চৌষট্টি টাকার লোভও এই দেহটাকে আর টানে যেখানে নিতান্ত না গেলে নয়, সেইখানেই যাই। বাকি কাজটুকু পরদিনের জন্য মুলতুবি রেখে সকাল ফিরে আসি।

আজও ফিরলুম অন্য দিনের মতো। জামা-কাপড় বদলে দক্ষিণের বারান্দায় বসলুম আরামচৌকি তাই ভালো লাগে এই জায়গাটুকু। সূর্যাস্তের পর থেকেই বাতাস বইতে শুরু করে, খানিকক্ষণ বসে থ শরীরের ক্লান্তি যায় জুড়িয়ে। মনে হয় দক্ষিণের এই বারান্দাটুকু আছে বলেই কলকাতা শহরে আজ আছি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা এসে পাশে বসলেন, বললেন, সব রোগী দেখা হল তো? কথা না বলে শু হাসলুম।

অন্নপূর্ণা বললেন: হাসবেই তো! এখনও ভাবো, টাকার জন্যেই তোমায় খাটতে বলি।

এ তাঁর পুরনো অভিযোগ। অনেকবার শুনেছি, তাই উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করি না।

টাকাটাই সব নয় বুঝলে, টাকার চেয়ে মানুষ অনেক বড়।

তাতো সত্যি!

সেইজন্যই তো জিজ্ঞেস করি, যাদের না দেখে ফেলে রেখে এলে, কাল সকালে গিয়ে দেখবার সুযোগ পাবে তো?

তেমন রোগী কি ফেলে আসি!

কী জানি! সারাজীবন ডাক্তারী করে তোমাদের প্রাণ যা হয়েছে, তাতে কিছুই বিচিত্র নয়।

এ কথার উত্তরেও আমি একটু হাসলুম।

হঠাৎ সিঁড়ির ঘরে আমার ছোট ছেলের ছায়া দেখলুম। সে নীচে তার পড়ার ঘরে মাস্টারে পড়ছিল। কেন উপরে এল, সে কথা জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হলুম।

সেবু ধীরে ধীরে এল না, এল দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে। বলল: তোমায় একবার নীচে যে এখুনি এইমাত্র, দেরী করলে চলবে না।

সে কি!

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম।

সত্যি বাবা, মেয়েটি যেন কী রকম করছে!

এবারে আমার স্ত্রী ব্যস্ত হলেন, বললেন : কোন্ মেয়েটি ?

দেবু হাঁপাচ্ছিল, বলল : দরওয়ান ঢুকতে দিচ্ছিল না, জোর করে ঢুকে পড়েছে। যা তা বলে এ চেঁচামেচি করছে নীচে।

অন্নপূর্ণা উদ্বিগ্ন হলেন, বললেন : পাগল নাকি ?

পাগল !

দেবু ভাবল একমুহূর্ত, তারপর বলল : হবেও বা ! কিন্তু—

কিন্তু কী ?

কিন্তু ঠিক পাগলের মতো তো বকছে না। মনে হচ্ছে—

দেবু থামল, কী বলবে বোধ হয় ভেবে পেল না।

এইটুকুই আমার নিজের সময়, একান্তভাবে আপনার। এই বিশ্রামটুকু বিঘ্নিত হলে আমি যে খুশি হই না তা সবারই জানা। দেবু তাই আরও কিছু বলবার প্রয়োজন বোধ করল, বলল : সাংঘাতিক যেন বলছে, দেখা তাকে করতেই হবে। আর দেরী হলেও চলবে না। সে বিষ খেয়েছে।

অন্নপূর্ণা আঁতকে উঠলেন, আমিও উঠলুম চমকে।

দেবু থামেনি, বলল : বলছে, তুমিই নাকি তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী। তাই মরবার আগে তোমার সঙ্গেই একটা বোঝা-পড়া করবে। কী চেহারা তার !

দেবু শিউরে উঠল, বলল : লাল লাল চোখ, ঘোলাটে দৃষ্টি, রুক্ষ চুল, রুক্ষ চেহারা, কথাও আরও রুক্ষ। সামনে দাঁড়াতেই ভয় করে, তাই পালিয়ে এলুম।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলুম, বললুম : পরিচয় দিয়েছে কিছু ?

পরিচয় ! তাতো দেয়নি। নাম বলল লিপি সেন, দার্জিলিঙের পরিচয়।

মন্দাক্রান্তা !

অন্নপূর্ণা যেন চেঁচিয়ে উঠলেন।

তাই কি ?

আমি ভাবতে লাগলুম। লিপিই বুঝি তার নাম ছিল। লিপি সেন ! আমি তার নাম রেখেছিলাম মন্দাক্রান্তা।

দুলে দুলে দুলকি চালে চলত মেয়েটি। আমি তার চলার ভিতর একটা ছন্দ দেখলুম, কালিদাসের ছন্দ

শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতি বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।

শুধু চলার ছন্দে নয়, রূপের বর্ণনাতেও মিল ছিল সেই মেয়েটির সঙ্গে। যেদিন প্রথম তাকে দেখেছিলুম, সেই দিনই আমার স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম, বললুম : দেখো মন্দাক্রান্তা।

আশ্বিনের এক উজ্জ্বল বিকেলে দার্জিলিঙের ভানাটোরিয়াম থেকে সে বেড়াতে বেরুচ্ছিল

একটি যুবকের পাশে হাসিমুখে দুলে দুলে চলছিল মেয়েটি। এক নজর দেখেই আমি তার নাম দিলে মন্থরাক্রান্তা।

চায়ের পেয়ালা হাতে অন্নপূর্ণা চাইলেন চারিদিকে। তেমন কিছু দেখতে না পেয়ে মুখের দিকে চাইলেন। আমি হেসে বললুম: দেখছ না মেয়েটিকে?

অন্নপূর্ণাও দেখলেন। বাঁধানো পথ দিয়ে তারা উপরে উঠে যাচ্ছিল। সেই ছন্দোময় চলা। টানা দীর্ঘ ছন্দ, চলায় চটুলতা নেই এতটুকু। অনেকক্ষণ ধরে তাকে দেখলেন, মুগ্ধ বিস্ময় দেখলু চোখে। বললেন: বেশ মেয়েটি।

যুবকটিকেও আমি লক্ষ্য করেছিলুম, তার দীর্ঘ ঋজু দেহ কিছু ক্ষীণ, কিছু স্তিমিত। মন্থরা হাসিতেই কিছু উৎসাহ পাচ্ছে মনে হল। বললুম: ছেলেটি বোধ হয় ভুগছে।

ভুগছে কেন বলছ?

চলনটি দেখলে না! বড় নিস্তেজ। মন্থরাক্রান্তার পাশে ঠিক মানাচ্ছে না।

পুজোর ছুটিতে আমরা দার্জিলিঙ এসেছিলুম। ছেলেমেয়েরা আসেনি। সামনে পরীক্ষা। দার্জিলিঙের আবহাওয়াতেও তাদের অরুচি ধরেছে। সেই অবজরভেটরি হিল আর বার্চ হিল জলাপাহাড় আর কাটা পাহাড়! দেখে দেখে কলকাতার মতোই পুরনো হয়ে গেছে জায়গাটা। কত তবু বৈচিত্র্য আছে, আছে বন্ধুবান্ধব, হৈ-হুল্লোড়। পুজোটা কলকাতায় মন্দ কাটে না। আমরা দুজনায় এসেছি দার্জিলিঙে।

মন্থরাক্রান্তারা মিলিয়ে গেলে অন্নপূর্ণা আবার কথা কইলেন, বললেন: একটা জিনিস লক্ষ্য করা বোধহয় করিনি।

অন্নপূর্ণা বললেন: মেয়েটিও আমাদের লক্ষ্য করেছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমরা চাইতেই সেই যে মুখ ফিরিয়ে নিল আর এদিকে দেখল না। কোথায় লজ্জা আছে মনে হল।

হেসে বললুম: নিজেদের যৌবনটা কি ভুলে গেলে? কোনদিন কি এমন করে বেড়াতে এই বয়সেও তো তোমার লজ্জা গেল না।

বলে কালকের ঘটনা তাঁকে মনে করিয়ে দিতে যাচ্ছিলুম। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। কেলে একা বেরতে কাল সকালেও তাঁর লজ্জা দেখেছি। কিন্তু অন্নপূর্ণা বাধা দিলেন, বললেন: সিঁথিতে কিন্তু সিঁদুর দেখিনি।

সিঁদুরের রেওয়াজ আজকাল উঠে গেছে: শুধু ব্রাহ্ম কেন, অনেক হিন্দু মেয়েও সিঁদুর প পাচ্ছে। কেটে গেলে যা হবার তা।

কথাটা তিনি মানলেন কিনা জানি না, কিন্তু উত্তরও দিলেন না। মনে হল, কোথা খটকা রয়ে গেল।

আমি আশ্চর্য হচ্ছিলুম অন্য কারণে। একটা মেয়েকে নিয়ে আমরা এমন কৌতূহলী হলুম যে মেয়ে তো অনেক দেখি। কই তাদের নিয়ে তো এমন মাথা ঘামাইনি কখনও।

এইটুকুই তার বৈশিষ্ট্য। এক নজরেই চোখে পড়ে এমন মেয়ে। জনতার ভিতর থেকে ত চিনে নেওয়া যায়। ভিড়ের ভিতর কখনো হারিয়ে যায় না। সবচেয়ে স্পষ্ট বুঝি তার যে ভঙ্গিটি, তার চলার ছন্দটি। তাই দেখে বলে ফেলেছিলুম মন্দাক্রান্তা। কতকটা না ভেবেই। এ দেখছি এর চেয়ে সার্থক নাম বুঝি আর হত না।

সেই মন্দাক্রান্তার সঙ্গে পরিচয় হল কয়েকঘণ্টা পরেই। সন্ধ্যা তখন গভীর হয়েছে, শীতে ঘ হয়নি অন্ধকার। ড্রেসিং গাউনের উপর একখানা তুস জড়িয়ে প্রথম রাতের ঠাণ্ডাটা উপভোগ করছিল খানিকক্ষণ আগে একখানা বৃটিশ মেডিকেল জার্ণাল খুলে বসেছিলুম। পাতা ওল্টাবার আলস্যে সেখ কোলের উপরই বন্ধ হয়ে গেছে। অন্নপূর্ণা খাটে উঠেছিল অনেকক্ষণ। নিবিষ্ট মনে একখানা ম পড়ছেন। ঘরে শব্দ নেই। বাইরের কোলাহলও যেন থেমে গেছে, খেয়াল করিনি। সামনের দ তেজানো ছিল মনে হল, বাহির থেকে কে টোকা দিল।

বেয়ারা আসে শব্দ করে। দরজায় টোকা দিয়ে কে আসবে! উত্তর দিলুম না। কিন্তু দেখ অন্নপূর্ণাও নভেলের পাতা থেকে মুখ তুলেছেন।

আবার সেই শব্দ! খুব কৃত উৎকর্ণ হয়ে না থাকলে যেন শোনাই যাব না। বললুম: কে!

কোনো সাড়া নেই।

অন্নপূর্ণা এগিয়ে গেলেন। দরজা খুলেই দেখলেন সেই মেয়েটিকে। ওমা, মন্দা—

বলেই থেমে গেলেন।

মন্দা নয়, আমার নাম লিপি। লিপি সেন। আপনাদের পাশের ঘরেই থাকি আমরা।

এসো এসো।

বলে অন্নপূর্ণা তাকে ঘরের ভিতরে আনলেন।

আমি আমার পা দুখানা গুটিয়ে বসলুম।

মন্দাক্রান্তার ছন্দটি দেখেছিলুম আগে, এইবারে তার রূপ দেখলুম। দুহাত জুড়ে নমস্কার করে বসে আমার সামনের চেয়ারটিতে। একটুখানি সলজ্জ হাসি তার ঠোঁটের কোণে লেগেছিল। শুধু তা লাগেনি, বিস্ময়ও জেগেছিল। তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন কী একটা মিল আ আমার ছোট মেয়ের সঙ্গে। চলনে তো নয়, বোধ হয় আচরণে। কিংবা তার ঐ হাসিটুকুতে।

আমার দৃষ্টির সামনে মেয়েটি আরও লজ্জা পেল, আরও জড়োসড়ো হয়ে বসল। শীতে যে ন তাতে আমার সন্দেহ নেই। তবু তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলুম না।

একসময় আমার স্ত্রীর সঙ্গে মেয়েটি গল্প শুরু করল, বলল: নামের বোর্ডে আপনাদের পরিচয় পে ভাব করতে এলাম।

অন্নপূর্ণা জবাব দিলেন : বেশ তো।

কিন্তু ভাববেন না যে নিঃস্বার্থে ভাব করতে এসেছি।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল : রোগী আছে।

কিন্তু বেড়াতে এসে আমি তো রোগী দেখি না।

দেখেন না!

বড় বিষণ্ণ দেখাল মন্দাক্রান্তাকে। তার সেই সলজ্জ হাসিটুকু হঠাৎ ঠোঁটের কোণা থেকে মি গেল। কিন্তু তাকে আঘাত দিয়ে নিজেও যেন আঘাত পেলুম। বললুম : দেখিনা মানে যে দেখব নয়। এক আধটি রোগী দেখলে কি আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে!

লিপি আবার হাসল। কিন্তু সে হাসিতে আমার ছোট মেয়েকে আর খুঁজে পেলুম না। ব কিছু হয়েছে তোমার?

আমার চিকিৎসকের জীবন হল ছাব্বিশ বছরের। এই দীর্ঘ দিনে কতো শত ছাব্বিশ প নিজের মেয়ের বয়সী মেয়ে দেখেছি অগণিত। কিন্তু কাউকেই 'আপনি' বলতে পারিনি। পারলুম না।

লিপি আশ্চর্য হল, বলল : আমার! আমার রোগ হবে কেন! আর হলেই বা আপনাকে কষ্ট দেব!

অন্নপূর্ণা আশ্চর্য হলেন তার কথা শুনে। কিন্তু কিছু বলবার অবকাশ পেলো না। লিপি সে এক মূল্যবান জীবন।

বললুম : কই, তাকে তো আনোনি।

আনব?

লিপির দৃষ্টি আবার উজ্জ্বল হল! তারপরেই গেল নিবে। বলল : আচ্ছা, কাল সকালে আন

আমি সমর্থন করলুম। বললুম : সেই ভাল। রাত হয়েছে, পথের ক্লান্তিও দূর হয়নি। সকালে দেখব।

লজ্জিতভাবে লিপি বলল : আমারই ভুল হয়েছে। আপনারা যে আজই এলেন, সে কথা মনে ছিল না। আসি এখন।

বলে উঠে দাঁড়াল। অন্নপূর্ণাও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : কাল এসো কিন্তু।

আসব।

বলে বেরিয়ে গেল মন্দাক্রান্তা।

কিন্তু এল না। পুবের বারান্দায় প্রভাতের ভিজে রোদ হল প্রখর। প্রাতরাশ শেষ স্বাস্থ্যান্বেষীরা একে একে বেরিয়ে পড়লেন। বেরল না মন্দাক্রান্তা। পাশের ঘরে থাকে বলেছিল, ি ঘরে কোন সাড়া নেই। মনে হল, এখনও তাদের ঘুম ভাঙেনি। এতো বেলা অবধি ঘুমোয় তারা।

টেবিলের উপর থেকে কালকের অসমাপ্ত পত্রিকাটি টেনে নিলুম। অন্যমনস্কভাবে পাতা উ গেলুম খান কয়েক। কিন্তু লেখার ভিতর মন গেল না। বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে গেছে আমার বো মেয়ে সীতা। তিনসুকিয়ায়। অনেক দূরের পথ। অনেকদিন তাকে দেখিনি। মন্বাক্রান্তাও কি আসবে ?

আমার অসতর্কতা লক্ষ্য করেছিলেন অন্নপূর্ণা, বললেন : নিজে থেকে মন্দাক্রান্তা আসবে না।

আমি বুঝি চমকে উঠলুম। আমার মনের কথাটি কী করে ধরা পড়ে গেছে। মেনে নি বললুম : কেন বলতো ?

আমি হলেও আসতুম না। যার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, সে আসবে না।

বোকার মতো তাকিয়ে থাকতে দেখে বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা, বললেন : বেড়াতে বেরিয়ে যে দেখনা, ভাল কর। কিন্তু কী দরকার ছিল সেকথা ফলাও করে বলবার ! তাতেও শব্দ মিটল না, বেয়ারা ডেকে আরও কতগুলো কথা বললে। সে মেয়ে হয়তো নিজের কানেই সব শুনতে পেয়েছে।

তা সত্যি। কিন্তু আসতেও তো বলেছিলুম। আর বেয়ারাকেই বা এমন কী বলেছি ! না বোর্ড থেকে আমার নামটা সরিয়ে নেবে, এই কথাই তো বলতে বলেছিলুম ম্যানেজারকে। এতেই কা সম্মান যাবে।

ভদ্রলোকের মেয়েকে আর কী বলবে বল ?

তাও বটে।

একটু ভেবে বললুম : কী করা যায় বলতো ?

কী আর করবে ! নিজের স্বভাবের সংশোধন কর। সবাই তো তোমার স্ত্রী নয়, যে যা বল মুখ বুঁজে সবই সয়ে যাবে।

তাতে মন্দাক্রান্তা আসবে না।

আমি জানি, মায়েরও মনে হয়েছে মেয়ের কথা। কোথায় যে খানিকটা মিল দেখা যায় বলে না দিলেও তা চোখে পড়ে। আর আমার চোখে যা পড়েছে, তা কি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় আমার ধারণা যে মিথ্যে নয়, তা প্রমাণ হল তাঁর পরের কথায়। বললেন : পাশের ঘরটা একব দেখে আসব ?

সেটা কি ভাল হবে ?

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে অন্নপূর্ণা কথা কইলেন : একটা কথা ভেবে আশ্চর্য লাগছে।

বাকিটুকু শোনবার জন্যে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

বললেন : সিঁথিতে সিঁদুর নেই, অথচ এক ঘরে আছে।

আমি তাঁর ভাবনা দেখে হেসে ফেললুম।

হাসছ তো ! কিন্তু আমার মনে কেমন খটকা লেগেছে।

সবেতেই তোমার সন্দেহ।

বাইরে থেকে আওয়াজ দিয়ে বেয়ারা ঘরে এল। সকালের চায়ের সরঞ্জাম তখনও পড়ে ছি সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে লিপির কথা জিজ্ঞাসা করলুম, বললুম ডেকে দিতে।

কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই লিপি এল। বললুম: তোমার রোগী কোথায় গা?

লিপি বুঝি অভিভূত হল, বিহ্বল হল তার দু'চোখের দৃষ্টি। এই মুহূর্তে আমার কথা তার কি হল বলে মনে হল না। আরও একটু অন্তরঙ্গ ভাবে বললুম: খাই নিয়ে এসো।

লিপি তবু গেল না, অস্ফুট স্বরে বলল: আপনি বিরক্ত হবেন না তো?

তার সঙ্কোচ দেখে আমার হাসি এল। বললুম: আমার কালকের কথা, না? কিন্তু যা আছে বলেই তা নিয়ম, আর সকলের জন্যেও এক নিয়ম নয়।

এবারে অন্নপূর্ণা তাকে টেনে নিয়ে গেলেন, ফিরলেন সৌনককে সঙ্গে করে। সৌনকই তার লিপির সৌনকদা। এই যুবকটির পরিচয় দিতে লজ্জার সীমা ছিল না লিপির। বলল: সৌনকদাকে নিজের ছেলের চেয়েও বেশি ভালবাসেন। আমি ছাড়া তাদের আর কোনো সন্তান নেই কিনা!

বাধা দিয়ে সৌনক বলল: দেখুনতো, শুধু শুধু আপনাকে জ্বালাতন করছে। কী দরকার ছি সময়ের!

তুমি থামো সৌনকদা: আদেশের সুর ধরা পড়ল লিপির কণ্ঠস্বরে: দরকারটা যদি বুঝতেই প তো আড়াই বছর ধরে শরীরে এমন রোগ পুষতে না।

আড়াই বছর ধরে ভুগছে?

বিস্ময়ের আমার অন্ত রইল না।

তা হবে না! এম. এ. পরীক্ষার আগে থেকেই তো ভুগছে। ছেলে বেলায় হয় ছিল বলে বেশি বয়সে পড়াশুনো শুরু করেছে। সমবয়সীরা ওর অনেক আগেই কলেজ ছেড়েছে।

আজ সৌনক বসেছিল আমার সামনের চেয়ারখানিতে। ভাল করে তার মুখের দিকে চা সেই সুশ্রী গৌর মুখে কিসের ছায়া পড়েছে যেন। বড় ম্লান, বড় ফ্যাকাসে, দীর্ঘদিনের ক্লান্তিতে অবসাদের অন্ধকার নেমেছে।

রোগটা যে পুরনো তা জানলে কী করে?

ভুগছে যে, সেই থেকেই কেমন মনমরা হয়ে আছে। দেখছেন না।

সত্যি কথা। ভিতরে কোন রোগ না থাকলে এই বয়সে মানুষ বুঝিয়ে যায় না। কিন্তু সে বলা চলে না, বললুম: ব্যাপারটা খুলে বল।

বলবার জন্যই লিপি এসেছিল, কিছু গোপনও করল না। বলল: অল্প অল্প জ্বর শুরু হয়, প্রায় আড়াই বছর আগে। ও তখন এম. এ. পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে। প্রথমটা কেউই লক্ষ্য করে কেননা, আটানব্বই বা নিরেনব্বই জ্বর এমন কোন দুর্বলতা আনে না যে ঐ বয়সের কোন ছেলে শুয়ে পা

তবে ধরা পড়ল কী করে?

এবারে উত্তর দিল সৌনক, বলল : এ আমার অনুমান মাত্র। তীব্র একটা গ্লানি অনুভব করত পড়ায় মন বসত না, উৎসাহ পেতাম না কাজে। কী একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত আমার বুদ্ধি চেতনা। ভাবতাম অতিরিক্ত পড়ার জন্যেই বুঝি এমন হচ্ছে। তাই উইনকারনেসের ডোজ খানি বাড়িয়ে দিলাম। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার কথা মনে এল না।

একটু থেমে বলল : পরীক্ষা হয়ে গেল, কিন্তু শরীর ভাল হল না। পড়ারও চাপ ছিল। প বছর দিল্লীতে চাকরির পরীক্ষা দেব। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। ব্রঙ্কাইটিস হল পরীক্ষার কয়েকটা আগে। আর এই সময়েই প্রথম ধরা পড়ল যে কোন কঠিন রোগের বীজাণু শরীরে বাসা বেঁধেছে বছর আগে থেকে। তা হলে পিলেটা এমন বেয়াড়াভাবে বেড়ে উঠে ঝুলে পড়ত না। লিভারটা বেড়েছে কিন্তু ব্রঙ্কাইটিস সেটাই বা বাড়বে কেন!

কী চিকিৎসা হচ্ছে?

সৌনককে একথার জবাব দিতে দিল না লিপি, বলল : চিকিৎসা যদি ঠিক হত, তা হলে ভাববার কিছু ছিল না। প্রথমে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা হয়েছিল। সে অল্পদিন। তারপর হল কালাজ ট্রিটমেন্ট। মাস কয়েক আগে একদিন গলা দিয়ে রক্ত উঠল। এবারে টি. বি. বলে সবাই নিঃসা হলেন। জলপাইগুড়ির হাসপাতালে বুকের ছবি নেয়া হল। কিন্তু কোথায় টি. বি.? যে কোনো মানুষের মতো পরিষ্কার ফুসফুস। তখন স্থির হল, রোগটা হয় ব্রাঙ্কাইটিস, নয় ব্রোংকোসিস।

বাধা দিয়ে বললুম : ব্রোংকোসিস তো সেকেলে ব্যাপার?

লিপির ঠোঁটে একটুখানি ম্লান হাসি দেখলুম। বলল : আমরা মফঃস্বল শহরে থাকি। সেকেলে একেলে নানারকমের গালভরা রোগের নাম। নইলে তা অকালমৃত্যুর যুক্তি কোথায়।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। এ তার অনুযোগ নয়, একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা লুকিয়ে তার মন্তব্যের আড়ালে! বললুম : রক্তটা পরীক্ষা হয়েছিল তো!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিপি জবাব দিল : হয়েছিল কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি।

এখানে এসে কী চিকিৎসা হচ্ছে?

নির্লিপ্ত ভাবে লিপি জবাব দিল : যেমন সেখানে।

অন্নপূর্ণা সবই শুনছিলেন মনোযোগ দিয়ে। এবারে আমার মনের প্রশ্নটি নিজের মুখে শু দিলেন, বললেন : কলকাতায় কেন চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে না?

এ কথার উত্তর বুঝি লিপিরও জানা ছিল না। বলল : এই প্রয়োজনের কথাটা কেউই আমা বলেন নি। যা বলেছেন তা অন্য রকম।

বলে মাথা নত করল।

আমি সৌনকের দিকে তাকালুম, সেও কোন কথা কইল না। জিজ্ঞেস করলুম : কী বলে ওঁরা?

মাথা নিচু করেই লিপি জবাব দিল: বলেছেন, বিয়ে হলেই সব সেরে যাবে। তাঁদের পর আমরা দার্জিলিঙ এসেছি।

হঠাৎ মুখ তুলে বলল: কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন? ওকে খুব ভাল করে দেখা দ বাড়িতে আমি চিঠি লিখে দিয়েছি, জবাব পেলেই ওকে কলকাতায় নিয়ে যাব।

আমি অন্য কথা ভাবছিলুম, অনেকদিন আগে একটা বিদেশী জার্নালে এমনি একটা কথা পড়েছিলুম। তার প্রথম লক্ষণগুলি ঠিক এমনিই। কিন্তু রক্তটা পরীক্ষা না করলে কিছুই বলা য আর নিজের হাতে রক্ত নিলেই সবচেয়ে ভাল। বললুম: আর একবার রক্ত দেখা দরকার।

আজই ব্যবস্থা করি এখানে?

বলে লিপি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: তার চেয়েও ভাল হয় যদি রক্ত টানবার সরঞ্জাম এখানে পা

এখানকার ডাক্তারবাবুর কাছে চেয়ে দেখি।

বলেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শৌনক বলল: কী পাগল মেয়ে দেখুন। দেশেও ঠিক এমনি এতগুলো পরীক্ষা পাস করেও এতটুকু লজ্জা এল না। নিজের বাবাকে তো সমবয়সী বন্ধু ভাবে, বাবার সামনেও অনেক অশোভন কাজ করে ফেলে। আমার মা নেই, তাই রক্ষে।

এদের সম্পর্কটা আমরা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কিছু বলবার আগেই লিপি ফিরে এল বাক্সটা এগিয়ে দিল হাসতে হাসতে।

পেয়েছ মা!

বলে হাত বাড়িয়ে আমি তা নিলুম।

এই মা ডাকে কি নেশা আছে কোন? কোন মোহ! একান্ত অপরিচিতের সঙ্গেও সহজ, হয় মুগ্ধ ও নির্ভর। যে মেয়ে মা হয়েছে, সে তো মাতাল হয় মা ডাকে। আমি লিপিরও লক্ষ্য করলুম। বলল: আমার সম্বন্ধেই কিছু বলছিল শৌনকদা, তাই না!

সরঞ্জামগুলি গোছাতে গোছাতে একটু হাসলুম।

আমার হাসি দেখে লিপি বলল: শৌনকদার রকম অমনি। আমাকে নির্লজ্জ প্রমাণ ব আনন্দ পায়।

এ কথার উত্তর দিলেন অন্নপূর্ণা, বললেন: উপায় নেই মা, দিনে দিনে ও অভ্যেস আমাকে কি কম লজ্জায় ফেলেন উনি।

লিপি এইবারে সত্যিই লজ্জা পেল, সেটুকু ঢাকবার জন্যে বলল: 'ওর সঙ্গে একা আস আমার মার খুবই আপত্তি ছিল। কিন্তু বাবা আমাকে পাঠালেন। কতকটা জোর করেই প বললেন, 'ওর মা থাকলে কি আর লিপিকে পাঠাতাম?' শুনে মা বললেন, 'তিনি থাকলে

ভাবনা ছিল! তাঁর সঙ্গে মেয়েকে পাঠাতে আমারও কোন দ্বিধা হত না।' মেয়েদের এই সংস্কারে বাবা চিরদিনই ঘৃণা করেন। বললেন, 'ভালবাসায় স্বার্থ থাকে না। মানুষ যাকে ভালবাসে, তাকে সে দেবতার আসনে বসায়। সমস্ত গ্লানি সমস্ত পাপ থেকে তাকে আড়াল করে রাখে।'

বড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল লিপির চোখ দুটো, হঠাৎ যেন বাষ্পাচ্ছন্ন হল। একটু থেমে বলল মাকেই শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল।

এ কথা আমার জানা। পিছন ফিরে অন্নপূর্ণাকে একবার দেখলুম। সমর্থনের আভাষ ছিল না তাঁর দৃষ্টিতে। সংস্কার মুক্ত হতে এখনও আমাদের সময় লাগবে।

বয়পাতি গোছানো আমার শেষ হয়েছিল। শৌনককে কাছে ডেকে পিপেটে খানিকটা রক্ত নিলুম। কিন্তু স্লাইড টানবার সময়েই বুকের ভিতরটা ধাঁ করে উঠল। আজ প্রায় বিশ বছর কারও রক্ত নেবার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু তবু আজ পাকা হাতের মতো একটা বাধা অনুভব করলুম। মনে হল, রক্তের সাদা কণিকাগুলো হঠাৎ বেড়ে উঠে স্লাইডখানা আটকে রাখতে চাইছে। মনের উদ্বেগ আমার ধরা পড়তে দিলুম না, কিন্তু সন্দেহ যদি সত্য হয় তো—

ভাবতে ভয় হল।

অন্নপূর্ণা এবারে কথা কইলেন, বললেন: এসব তো ভুলে গেছ। ঠিক নিতে পেরেছ তো!

সে কথার উত্তর না দিয়ে আমি লিপির হাতে রক্তটা তুলে দিলুম। সেই সঙ্গে বাক্সটাও বললুম: রিপোর্টটা তাড়াতাড়ি এনো।

বিকেলেই পরীক্ষার ফল জানা গেল। সন্দেহ আমার সমর্থিত হয়েছে। কেসটি লিউকিমিয়া।

রেহটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলুম, জীবনের শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছে শৌনক। এই দুটি তরুণ প্রাণের আনন্দের দিন সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে আজ প্রায় সমাপ্তির মুখে। টেনে-টুনে শৌনক আর কয়েকটা মাস বাঁচবে।

বড় বড় চোখে লিপি আমার দিকে চেয়ে ছিল। মুখ তুলতেই বলল: ভাল দেখলেন তো!

এইখানেই আমাদের অভিজ্ঞতার পরীক্ষা। ঘরের চৌকাঠ পেরবার আগেই যে রোগীর শেষ নিঃশ্বাস পড়বে, তার পরিবারকেও আশ্বাস দিয়ে আসতে হয়।—কী না হয় ভগবানের ইচ্ছায়! সত্যিই তো যে শক্তিমান পুরুষ দুনিয়ার সব কিছু সৃষ্টি করলেন, তিনি একটা প্রাণরক্ষা করতে পারবেন না। ঘরে ঘরেও তো প্রাণের সন্ধান হতে শোনা গেছে। সহজভাবে উত্তর দিলুম: চিকিৎসার কোন দরকার নেই।

মৃত্যুর চরম আশঙ্কা অন্তরেই চাপা রইল, মুখে তার ছায়াও পড়ল না। নিশ্চিন্ত আনন্দে লিপি শৌনকের দিকে তাকাল।

মিথ্যা আমি বলিনি, কিন্তু যা বললুম তা কি সত্যি! এ রোগের চিকিৎসা নেই আমাদের শাস্ত্রে অনিবার্য মৃত্যুকে চেষ্টা করে হয়তো বছর দুই ঠেকানো যায়। কিন্তু বাঁচানো যায় না। পয়সার অভাব ছিল না এমন কোটিপতিও তার পরমাত্মীয়াকে বাঁচাতে পারেননি এদেশে। এখন তাঁরই অরূপণ হাতে

যে গবেষণা শুরু হয়েছে গভীর ভাবে, আমরা তারই সাফল্যের অপেক্ষায় বসে আছি। চিকিৎসা আর চিকিৎসার দরকার নেই কি এক কথা?

কোন ওষুধ দেবেন না?

ওষুধ! দার্জিলিঙের হাওয়ার চেয়ে কি বোতলের ওষুধ বেশি কাজ দেবে না!

বললুম না যে ওষুধ দিয়ে তার জীবনের শেষ কটা দিন বিষাক্ত করতে চাইনে।

লিপি খুশী হল। খুশিতে উজ্জ্বল হল। সৌমনের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিক্ষেপ করে বলল: এ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কী বল!

সৌমন উত্তর দিল না। মনে হল, তার মনের ভিতরে কোথায় খানিকটা সন্দেহ রয়ে আমার আশ্বাসে কি তার দেহের কষ্ট দূর হবে। রোগটা তো তার মনের নয়!

লিপি উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার ডান হাতের মুঠোর ভিতরে খানকয়েক নোট দেখতে পা সেগুলো এগিয়ে দেবার সুযোগ না পেয়ে বিব্রত বোধ করছিল। আমি হেসে ফেললুম, বললুম: জামাইএর কাছে ডাক্তাররা কী নেয় না।

লিপি পালিয়ে গেল।

দুপুরে খাবার টেবিলে অন্নপূর্ণা আমায় চেপে ধরলেন, বললেন: একটা সত্যি কথা বলবে

বললুম: বল।

তুমি ওর চেহারা দেখেই বলেছিলে, ছেলেটি ভুগছে। কিন্তু পরীক্ষা করে তোমার মত পা এমন ভুল তো তোমার হয় না!

এবারেও হয়নি।

সেকি, তবে তুমি মিথ্যে কথা বললে?

এ কথার উত্তর নেই।

অন্নপূর্ণা বললেন: কী রোগ হয়েছে ওর?

আমি লিউকিমিয়ার নাম বললুম। তিনি বুঝতে পারলেন না। বললেন: বুঝিয়ে বল।

অ্যানিমিয়া আর লিউকিমিয়া দুটোই রক্তের রোগ। রক্তের লাল কণিকা কমে গে অ্যানিমিয়া, তার চিকিৎসা আছে। আর সাদা কণিকা বাড়তে শুরু করলে বলি লিউকিমিয়া। ি দিয়ে এই বৃদ্ধিকে বন্ধ করা যায় না। প্রাণটাকে রক্ষা করবার জন্য প্রকৃতি যে দুর্গ রচনা করে রেখে তার একমাত্র চিকিৎসক। নিজের শক্তি দিয়ে বাড়তি রক্ত কণাগুলিকে মারে। কিন্তু রক্তস্রোত বেরিয়ে প্রথমে সেগুলো জমা হয় প্লীহায়, তারপর যকৃতে। দিনে দিনে তাই এ দুটো বেড়ে ওঠে। শরীরের কাজ বন্ধ হয়, মৃত্যু ঘটে।

অন্নপূর্ণা শিউরে উঠলেন, বললেন: সৌমন বাঁচবে না?

গভীর ভাবে বললুম: কয়েকটা দিন নিশ্চয়ই বাঁচবে, কিন্তু কটা মাস তা বলতে পারি না

শৌনককে সঙ্গে নিয়ে মন্থরাক্রান্তা রোজ বেড়াতে বার হয়। সকালে বিকেলে দুবেলা বার হ শাড়ি বদলায় একেলা ওকেলা, ভাষা বদলায়, জুতো বদলায়। বদলায় না শুধু তার চলনটি, তার চ দুখটি। তবে একটু যেন তাড়াতাড়ি ইচ্ছাকৃত, তাড়া আছে পৌঁছবার। একটু যেন হাঁফা শব্দ, টেনে বল হয় না, হেসে চলে। শৌনক পিছিয়ে পড়ে, আরও খানিকটা উঠে মন্থরাক্রান্তা দাঁড়ায়। আমাদের চোখে আড়াল হতেই হাত ধরে টেনে তোলে।

এক একদিন মন্থরাক্রান্তা আসে। হেসে বলে: কেমন দেখছেন?

আমিও হেসে জবাব দিই। বলি: বেশ।

পিছন ফিরে দেখি, অন্নপূর্ণার মুখ আরও গম্ভীর হয়েছে।

বেশিদিন দার্জিলিঙে থাকা কোন বারই আমার ভাগ্যে ঘটে না। রোগীদের টেলিগ্রাম ও টেলিফোনে অতিষ্ঠ হয়ে বিছানা-বাক্স বাঁধি। এবারেও বাঁধলুম।

যাত্রার মুহূর্তটিতে লিপি এল ছুটে। উজ্জ্বল চোখ মেলে আনন্দ উপচে পড়ছে। বলল: বাং চিঠি পেয়েছি জানো?

তাই নাকি?

হঠাৎ এক ঝলক রক্ত এসে মুখখানি তার রাঙিয়ে গেল। বাঁ হাতে আঁচলের একটা প্রান্ত টে আনল ডান হাতের কাছে। তারপর গভীর মনোযোগে সেই প্রান্তটুকু দুহাতের আঙুলে নাড়াচাড়া শুরু করল

হেসে বললুম: কী খবর পেলে শুনি!

মুখ নামিয়ে লিপি বলল: আপনারই সব কথা বাবাকে জানিয়েছিলাম। তিনি উত্তর দিয়েছে ফিরে গেলেই আমাদের বিয়ে হবে। তেসরা অঘ্রাণ ভাল দিন আছে।

চলতে চলতে আমার হৃৎপিণ্ড বুঝি থেমে গেল। কী সর্বনাশ! তারিখটা মনে মনে হিসেব ক নিলুম, আর একটা মাসও যে বাকি নেই, মুখে আমার উত্তর এল না।

আপনি খুশী হলেন না?

খুশী? খুশী হয়েছি বৈকি। আমার নেমন্তন্ন হবে তো?

রিক্সাওয়ালারা তখন আমাদের টেনে ও ঠেলে উপরে তুলছে। বকবকে একখণ্ড রোদে দাঁড়ি লিপি উত্তর দিল: নিশ্চয়ই। আসতে হবে কিন্তু। দুজনকেই।

অপরাধ বোধের মতো একটা গভীর বেদনায় বুকের ভিতরটা আমার মুচড়ে উঠল। মন্থরা দাঁড়িয়ে আছে। থেমে গেছে। ঘুরিয়ে গেছে তার চলার ছন্দটি। তার দেহটাও আর দুলে উঠছে দুলকি চালে। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি। মন্থরাক্রান্তা নয়, চা-বাগানের লিপি সেন।

সারাটা পথ মন আমাদের ভারাক্রান্ত হয়ে রইল, কিন্তু কিছুই করবার নেই। কিছুই আ করতে পারি না। উত্তর বাঙলায় চা বাগানের মালিক এরা। এইটুকুই শুধু জেনেছি, জানি না এদের ঠিকা লিপির বাবাকে যে সব কথা খুলে জানাব, তারও কোন উপায় ছিল না।

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু হল না। দিন কয়েক পরেই লিপির বিবাহের পত্র পেয়ে গেলুম। শুধু ছাপা চিঠি নয়, আসবার জন্ত বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন লিপির বাবা।

অন্নপূর্ণা অনেকদিন থেকেই অগ্রসর ছিলেন। বললেন: এইবারে একটা বিহিত কর। ছেলেমানুষির ভরে একটা কচি মেয়ে বিধবা হবে, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। তুমি না আমি লিখে দিচ্ছি মেয়ের মায়ের কাছে।

শেষে আমিই লিখলুম। কিছু গোপন না করে সব কিছুই জানালুম তাঁকে।

ফেরত ডাকে উত্তর এল। আমার কর্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা তিনি করেছেন। জানিয়েছেন যে তেতে দিয়ে দুটি তরুণ প্রাণে আঘাত দিতে তাঁর ইচ্ছে হল না, অনির্দিষ্ট কালের জন্ত বিয়ের দিন তিনি দিলেন।

এরপরে কয়েকটা মাস কেটে গেছে। শীত পেরিয়ে বসন্ত এসেছে দ্বারে। কলকাতার সে লিপিকে আমরা ভুলে গেছুম, কিন্তু শ্রান্ত বিশ্রামের দিনে অথবা অবসরের মুহূর্তে যাদের সঙ্গে পরি তাদের স্মৃতি বেঁচে থাকে দীর্ঘদিন। হিসেবের খাতায় এদের নাম নেই, এদের ছবি আঁকা থাকে পাতায়।

মন্দাক্রান্তা আজও আমাদের কাছে সজীব হয়ে আছে।

সেই মন্দাক্রান্তা এসেছে এখানে। নিচে আমার অপেক্ষা করে আছে। আর আমার ছো আছে দাঁড়িয়ে। বিশ্রামের কথা আমি ভুলে গেলুম, ভুলে গেলুম বয়সের কথাও।

চলো।

বলে ছুটে নেমে এলুম মেবুর সঙ্গে। মনে হল, আমার পিছনে অন্নপূর্ণাও নিচে নেমে এলেন।

লিপি তখন আমার রোগীর ঘরের টেবিলে মাথা রেখে ঝিমচ্ছিল, বড় ক্লান্ত অবসন্ন সে তাকে। আমাদের পায়ের শব্দে চমকে জেগে উঠল। বলল: আপনি এসেছেন! না এলে ও ওপরে যেতে হত।

বড় কঠিন শোনাল তার কণ্ঠস্বর। যে উদার পরিবেশে তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়, সেই আভাস নেই কোনখানে।

লিপিই আবার কথা কইল, বলল: আপনিই যে আমার জীবনটা নষ্ট করলেন, কাল তা প্রথম জানলাম। দেখুনতো, এই চিঠিখানা আপনার লেখা কিনা!

বলে তার ছোট হাত ব্যাগের ভিতর থেকে একখানা চিঠি বার করে এগিয়ে দিল।

তার বাবাকে লেখা সেই পত্রখানি! স্বীকার করে বললুম: হ্যাঁ।

ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো লিপি লাফিয়ে উঠল। বলল: তবে কেন সেখানে প্রতারণা করো কেন বলেছিলেন সৌনক নীরোগ?

উত্তেজনায় লিপি হাঁপাতে লাগল।

বললুম : শান্ত হয়ে বস। আমি সব বলছি।

এখন আপনি শান্ত হতে বলছেন। লিপি ফুঁপিয়ে উঠল, মাত্রিলিঙে একথা বলতে পারেন বিয়ের খবর দিতে যেদিন ছুটে এলাম, বাধাই যদি দেবেন তো সেদিন কেন দিলেন না। কেন সি আশ্বাসে সেদিন আমাদের পাগল করে গেলেন।

এ কথার কী উত্তর দেব?

কান্নার মতো তীব্র বেদনায় লিপি ভেঙে পড়ল। বলল : বিধবা হয়ে আমি বেশ বাঁচতে পারব কিন্তু এ অসম্মান আমার সইবে না। আপনি জানেন না, এ কথা শুনলে বাবা কত বড় আঘাত পাবে তাঁর সারা জীবনের বিশ্বাস ভেঙে পড়বে এক নিমিষে।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি।

শৌনক কি মারা গেছে?

নিঃশেষে মরল কোথায় : লিপি জবাব দিল নিষ্ঠুর ভাবে : প্রেম তার পাপ হয়ে বেঁচে রইল।

দুহাতে মুখ ঢেকে বলল : বেঁচে রইল আমারই দেহে।

আমি উদভ্রান্ত হয়ে গেলুম। শুধু একটি মুহূর্তের জন্য। তারপরেই দেখলুম তার ব্যাগের ভি থেকে কী একটা বার করে মুখে পুরে দিতে যাচ্ছে।

আমি গোড়াতেই সন্দেহ করেছিলুম। এগিয়ে গিয়ে তার হাতখানা নিজের মুঠোর ভিতর ধরলুম। ম্লান হাসিতে বেদনার্ত হল লিপির সুন্দর মুখ। বলল : এ ছাড়া যে আমার আর গতি ডাক্তারবাবু, এবারে আর বাধা দেবেন না।

তার দু'চোখের পাতা বেয়ে তখন ধারা নেমেছে। কী সরল শান্ত মুখখানি! দুহাতে তার ব্যাগটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। বলল : এর মধ্যে দুখানা চিঠি রইল—একখানা আমার বাবাকে লে আর একখানা পুলিশের জন্যে।

আমার কঠিন হাতের মুঠোয় তার নিটোল নরম হাত দুখানি থরথর করে কেঁপে উঠল।

বসন্তের সন্ধ্যা কি অন্ধকার হয়ে যাবে!

এনামেলের বাসন

● দামে সস্তা ● ভারে লঘু ● ব্যবহারে টেঁকসই ● বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর।

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিমিটেড

২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১২

আধুনিকা

শরদিন্দু মাইতি

খুব বড় বাড়ী, কিন্তু সেকালের ধরণের। সদর অন্দর নানা দিকে ছড়ানো, দুটো তিনটে সিঁড়ি। দুই তিন ছোট ছোট চৌকো উঠোন, তার মধ্যে কল চৌবাচ্চা। ঘরগুলো আজকালকার ১০০ ফোয়ার ফুট নয়, প্রায় ৪০০ ফোয়ার ফুট। রান্নাঘর আঁশ নিরামিষ আলাদা। ঠাকুর ঘর, ভাঁড়ার, বড় ভাঁড়ার, বাসন মাজা কল, চানের কল, বাসন রাখা ঘর, কত কি, যেন একটা গোলকধাঁ বাড়ী বড় হলে কি হয়, কোথাও এক চিলতে জমি পড়ে নেই। ছোট ছোট অন্ধকার উঠোনে পাচিলের মাথায় কয়েকটা করে পুরানো টব বসানো, তার কোন ঘর নেই। তবে নিজে থেকেই ওতুতে দুই এক রকমের ফুল হঠাৎ ফুটে ওঠে। সেই ফুলেই গৃহদেবতার পূজা হয়। বাইরে গে আসে না। কোনো কোনো উঠানে সকালের রোদ একটু পড়ে কিন্তু তাতে কলের ধারের স্যাওলা ম যেন সবুজ মখমলের মত দেয়ালের গায়ে ক্রমেই আরো পুরু হতে থাকে।

বাড়ীর আয়ু কতদিন ঠিক বলা যায় না। যত্ন থাকলে যে রকম চেহারা হয় মোটেই নয়। বহুকাল ধরে মানুষের পদক্ষেপ বুকে ধরে ধরে সিঁড়ির মাঝখানগুলো গামলার মত গর্ত হয়ে এ দেয়ালের চুণ-বালি নানা জায়গায় খসে পড়েছে। ভাঙা শার্সির ফাঁক কোথাও কাগজ দিয়ে আটকান, কোথাও খোলা পড়ে আছে। ছড়কো কোথাও আছে কোথাও আলগা, স্নানের ঘরের দরজার তালাগুলো জল এক হাত করে ক্ষয়ে পড়ে গিয়েছে। দরজা জানালার রং বহু বর্ষার ধুয়ে সাদা হয়ে এসেছে; তার পাড়ার ছেলেরা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নিজের ও পরের নাম লিখেছে, দুই একটা গালাগালিও ছাড়েনি। কোন চিত্রশিল্পী ছুরি বা কালি দিয়ে ফুল ও মানুষের মুখ এঁকে রেখেছে।

গৃহিণী শুচিবায়ুগ্রস্তা, সকলের হাতে খান না। নিজেই রান্না করেন। ঠিকে ঝি বাসন দিয়ে গেলে তার উপরে জল ঢেলে তবে ঘরে তোলেন। ঐ ঝিটা ছাড়া চাকর বা দরোয়ান বলতে একা পুরুষ মানুষ এ বাড়ীতে কাজ করে। সে এই বাড়ীতেই ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছে। বেশী খাই নেই, বাড়ীর বাবুদের পুরানো জামা কাপড়েই পোষাকের কাজ চালায়, খায়ও মারাত্মক নয়। ফুটো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ সবই করে। একেবারে বাবুদের গুরু।

বাড়ীতে ঝাঙালীর সনাতন সমস্যা। গৃহিণী ছেলের বিয়ে দিতে চান। কিন্তু বড় কড়া পছন্দ। ি মনের মত মেয়ে পান না। আরো মুস্কিল এইজন্যে যে আজকালকার ছেলে মায়ের কথায় ত ওঠে য যাকে মেয়ে দেখবার ভার দিয়েছে বটে, তবে মতামতগুলো বেশীর ভাগই ছেলের, তার কথামতই কাজ হ

ঘটক ঘটকী দুই আনাগোনা করে। তবে গৃহিণী নিজে কথা বলেন বলে স্ত্রীলোকই পছন্দ করে বেশী। অন্দরের দরজা দিয়ে ঘটকী আনাগোনা করে। গৃহিণী দোতলায় তাঁর শোবার ঘরেই মস্ত বড় উঁ খাটের উপর বসেন। খাট থেকে বড় নামেন না। রান্না খাওয়া সেরে সেই যে খাটে এসে বসেন সন্ধ্যা আগে নামেন না। ওইখান থেকেই উঁচু গলায় পঞ্চাননকে ডেকে ডেকে সব কাজের তদারক করেন। যদি কখন পঞ্চানন বাইরে যায় ত গৃহিণী হেমাঙ্গিনীই তার কাজ আংশিক করেন গলার জোরে। কেউ কড়া নাড়লে উপর থেকে হাঁক দেন, "কে রা" বলে। যদি নিতান্তই দরজা খুলে দিতে হয় ত খাট থেকে নেমে সরু বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেখানে অন্দরের দরজার সঙ্গে একটা দড়ি বাঁধা থাকে। বারান্দা থেকে দড়িতে টান দিলেই দরজা খুলে যায়। আগন্তুক বাড়ীতে ঢুকে আবার দরজা এঁটে দিতে পারে।

দুপুর বেলা ঘটকীর আসবার সময়। হেমাঙ্গিনী এক মুখ পান মোক্তা দিয়ে ঘটকীকেও একটা পান এগিয়ে দেন। গিন্নীর লোক ভোলানো সাজগোজ খুব নেই। চল্লিশ বৎসর বিয়ে হয়েছে। ঘোটা ব এতদিনে কম হন নি। সেই বিয়ের সময়ের গলার হার ঘসে সমান হয়ে গিয়েছে। হাতের চুড়ি হারে লাগতো না বলে বছর ত্রিশ আগে একবার ভেঙে গড়ানো হয়েছিল। তাও এখন হাতে একেবারে বসে গিয়েছে। পরনে লাল পাড় সাধারণ শাড়ী। শোবার ঘরে সেমিজ-টেমিজের বালাই নেই।

হাসিতে মুখ আলো করে ঘটকী এসে বললে, "আজ মা খাসা মেয়ের সম্বন্ধ এনেছি। এমন হয় না রং নয়ত চাঁদের আলো, মুখ নয়ত পুগ্‌পা পিটিয়ে, চলন যেন রাধিকার মত। খবরের কাগজে ত অনেক গৌর বর্ণা সুন্দরী মেয়ের কথা পড়, এ তেমন মেয়ে নয়। গালে টোকা দিলে রক্ত ফেটে পড়বে গোলাপের মত। পাড়ার লোক বলে ইহুদীর মেয়ে নাকি।"

ব্যগ্রভাবে হেমাঙ্গিনী বললেন, "তা আজকাল ত লুকিয়ে-চুরিয়ে কত রকমই বিয়ে হচ্ছে, হয়ত ও ইহুদী কি ক্রিশ্চিনই হবে। বাড়ীর লোকে বলতে চায় না। এমন আমি দু' একটা বাড়ীর কথা জানি। একজন বর্দ্ধার মেয়ে বিয়ে করে এনেছিল। দেশে আসবার পর বৌকে কারুর কাছে বার করত না। এমন কি মেয়ের বিয়ের সময়ও মা দাঁড়াল না, ঠাকুমা দাঁড়াল। আর একজন করেছিল ইংরেজ মেম বিয়ে। সে মেমও চিরজীবন অন্দরমহলে কাটিয়ে গেল। মেমের মেয়েকে লুকিয়ে বাঙালী ঘরে বিয়ে দিলে। যাকে সামনে বার করল না, কাকীকে মা সাজাল। ওরকম বাপু আমরা চাই না। মা-বাপ ভাই বোন সব দেখে শোনো।"

ঘটকী বললে, "আপনি মেয়েটিকে দেখুনই না! যদি পছন্দ না করেন চুকে গেল, আর যদি পছন্দ করেন ত তখন সব দেখে শুনে নেবেন।"

হেমাঙ্গিনী বললেন, "সে হবে না বাছা। মেয়ে পছন্দ করে তারপর বলতে পারব না যে তোমার াকে দেখাও, পছন্দ হয় কিনা দেখি।"

ঘটকী বললে, "আচ্ছা তবে ও-খবর নিয়ে আসব। আর অন্য মেয়েরও সন্ধান দেব। সবার মেয়া ানে করেই আমি তাড়াতাড়ি এসেছিলাম।"

হেমাঙ্গিনী বললেন, "তা বেশ করেছ বাছা। একটা কথা বলতে গিয়ে আমি আমার পাঁচটা ভুলে যাই। ভাগ্যে মনে পড়ল তাই বলি। তা হাঁা গা, মেয়ের বয়স কত? বাপেরই বা কাজকর্ম কি?"

ঘটকী বললে, "সেসব আমি ঠিকঠাক জেনে এসেছি। আজকালকার মত বেড়ে মেয়ে এমন পাবে না। সবে চোদ্দয় পা দিয়েছে। বাপ ওকালতি করে। অভাব নেই সংসারে। মেয়ে সাজিয়ে দিতে পারবে।

হেমাঙ্গিনী বললেন, "তবেই খেয়েছে। আমার ছেলে বিয়ে করবে অতটুকু মেয়েকে? কুড়ি ব মেয়ে চাই তার। বয়স ত ছেলের খানিকটা হয়েছে। আর দেখ বাপু মুখপুড়ী মেয়ে যেন না হয়। পড়িয়ে পড়াশুনো পছন্দ করে।"

ঘটকী বললে, "কুড়ি বছরের মেয়েকে আবার ভাবনা! আজকাল ত ঘরে ঘরে পঁচিশ ছ বছরের মেয়ে রয়েছে। বাপ মা দিতে পারছে বিয়ে? টাকা চাই, নাচ চাই, গান চাই, তবে না নেবে লোকে!"

হেমাঙ্গিনী মুখরোচক গল্প পেয়ে বললেন, "সে কথা আর বলতে? এই ত আমাদের বাড়ীর দু দুটি আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে তিরিশ বছর পার হয়ে গিয়েছে। লেখাপড়াও যে করেনি তা নয়। ব নেই, কেবা বিয়ে দিচ্ছে? আমি বললেই এক কথায় বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু সে আমার ছেলের নয়। একে কুচ্ছিৎ কালো তায় আবার পাড়ার মেয়ে। বড় বেশী জানা। তবে একটি মেয়ে আছে ভাল। যেমন চেহারা তেমন পড়াশুনো। কিন্তু তাদের আবার নজর উঁচু। আমার হীরের টুকরো ছে তাদের মন ওঠে না, বিলেত-ফেরত চাই। বোকা বুদ্ধি ত! বিলেত-ফেরতের তলায় তলায় কত ে সাহেবের কেচ্ছা থাকে তা ভুলে যায়।"

ঘটকী বললে, "তা এক কাজ কর না বাপু! ছেলেকে বল না ভাল ভাল মেয়ের সঙ্গে ভা করে নিতে। তারপর নিজেই বাছাই করবে। আজকাল ত আকছার ঐ হচ্ছে। এর সঙ্গে ট্রামে তার সঙ্গে দোকানে তার, কারুর বা আপিসে তার; ব্যস হয়ে গেল বিয়ে দুমাস চারমাস পরে। জাতকুল দেখার ঝামেলা নেই।

গিন্নী নাক সিটকে বললেন, "সে হবে না বাছা। একে আমাদের বড় ঘর, তায় আবার ে ছাঁদা। ও-সব মেয়ে ত মেয়ে নয় যেন রঙ্গিনী মায়াবিনী। বড় ঘরের মেয়ে ত আর আপিসে ট্রামে বেড়াচ্ছে না। যাদের বাপের এক পয়সার মুরোদ নেই তারাই আপিসে যায়। রথ দেখা কলা বে হয়। চাকরীকে চাকরী, আবার টোপ ফেলে-ভদ্দরলোকের ছেলে গেঁথে তোলা। শেষে কোন মাগী ঘাড়ে এসে বেঁতে বসবে কে জানে। আজকাল তো চেনবার জো নেই। সবাই বিদ্যুনি পেটকাটা জামা পরে আপিস করে বেড়াচ্ছেন। তাদের ত লাভই হবে। আমাদের জাতকুলও যাবে, একটা পয়সাও আসবে না।"

ঘটকী বললে, "আচ্ছা মা, উঠি তাহলে। এবার ভবর খবর আনব দেখে নিও।"

গিন্নি বললেন, "গোটাকতক একসঙ্গে জোগাড় করে এনো। মেয়েদের নামের একটা ফর্দ ক ছেলে বলেছে বাপু পিছু নম্বর দেবে। তারপর বাছাইএর সময় যে মেয়ে সবচেয়ে বেশী নম্বর পাবে তা নেওয়া হবে।"

ঘটকী, "যা বলেন মা,"—বলে উঠে চলে গেল।

গৃহিণীর ঘুম এসে গিয়েছিল। হাই তুলতে তুলতে তুড়ি দিয়ে বালিশটা টেনে নিয়ে চুল এ শুতে যাবেন এমন সময় পুত্ররত্নের আবির্ভাব। মা ছেলেকে দেখে বললেন, "পাড়িনে বাপু, তোর বন্ধুক ব পণ নিয়ে। তুই কি পুরুষ ছেলেকে বিয়ে করবি যে অত এম্. এ., বি. এ. খোঁজ করছিস?"

ছেলে বললে, "কি করব বল? যখনকার যেমন।"

তোমার মেয়েদের মত মহাকালী পাঠশালায় পড়া আধুনিক কালে চলে না। সামলাতে পারে তারই দাম বেশী।

মা কিছু না বলে পিছন ফিরে শুয়ে পড়লেন।

* * *

দিনকয়েক পরে আবার ঘটকীর আবির্ভাব। এসেই বললে, "এবার মা, আমাকে ফেরাতে পার না। বলতে পারবেন না যে এইটি হোল না কি ওইটি হোল না। ব্রহ্মাণ্ডে যতরকম আছে সব সন্ধান নিয়ে তবে পেরথমে সেই সুন্দরী মেয়ের কথা বলি। তার বাপু, মা বেঁচে নেই। তবে মামাবাড়ী আছে, সে সবই নিতে পারবে।"

গিন্নী বললেন, "মামা একটা খাড়া করতে কতক্ষণ লাগে? ওসবে কাজ নেই বা, তুমি নূতনের কথা বল। তবে ও নামটাও ফর্দে লিখে রাখছি ছেলেকে দেখাব।"

ঘটকী বললে, শ্যামবাজারে একটি মেয়ে আছে। বি. এ. পাস করেছে, বিলিতী নাচ জানে আ শান্তিনিকেতনীও জানে। বাপের টাকাকড়ি বেশ আছে। বড় ব্যবসাদার।"

গৃহিণী বললেন, "খরচপত্র কি রকম করবে? নগদই বা কত আর গয়নাগাঁটিই বা কত?"

ঘটকী বললে, "গয়না অঢেল দেবে। আর নগদ মানে—ছেলেকে বিলেত পাঠাবে। এখা পাসে মন ওঠে না।"

গিন্নি বললেন, "ওরে বাবা, তার মানে ছেলেটাকে একেবারে পর করে দেবে। আমার ইচ্ছে নয়, তবে ওকে বলতে হবেই একবার। বৌ যেই যেই করে নাচলে আর ছেলে মনের পিপেয় খাবলে সাহেবী হয় বটে, কিন্তু সংসার ত ছারখার হয়ে যাবে।"

ঘটকী বললে, তোমার বাপু সব তাতেই খুঁৎ খুঁৎ। তবে বালিগঞ্জেরটি কর। ওরা ছেলে-টা চায় না। মেয়ের বাইশ বছর বয়স। গাড়ীর সখ আছে, তাই বাবা নগদ দেবে না, গাড়ী দেবে। খুব পাস করা মেয়ে।"

গিন্নী বললেন, "তার মানে বৌএর পেছনে মাসে দুশ আর গাড়ীর পেছনে দুশ'। মাসে শ'চারেক খরচ বেড়ে যাবে। কপালে কি আছে জানি না। সবই ছেলেকে বলে দেখতে হবে।"

বউকী বললে, "তাছাড়া কনে পক্ষের আবার খাঁই আছে। নিজ বাড়ী না হলে ওরা দেবে না।"

গিন্নী ঠোঁট উল্টিয়ে বললেন, "বাড়ী? কত বড় বাড়ী চাই? আট কাঠার উপর বাড়ী, কলকাতা সহরে?"

বউকী বললে, "সে কথা সত্যি মা। কিন্তু পেল্লায় বাড়ী হলেই ত হয় না। একটু সারিয়ে-সু না দিলে চোখে ধরবে কেন মানুষের?"

হেমাঙ্গিনী বললেন, "এত বড় বাড়ী সারানো ত কম কথা নয়। এই বিয়ের হাঙ্গামে বাড়ী সা যদি আট দশ হাজার খরচ হয়ে যায় ত আর খরচ কিসে হবে? কনের বাপ দেবেই বা কত? কড়ি দিয়ে ত আর ধরতে পারবে না।"

• • • •

যাই হোক, অবশেষে হেমাঙ্গিনীর পুত্র জয়দেবের বিবাহ স্থির হল। মা ছেলে দুজনের একটু অতৃপ্তি রইল। মেয়ের বাপ নগদ পাঁচ হাজার মাত্র দেবেন, গহনা কাপড়ও আছে। খ যাওয়া ত আছেই। সুতরাং তাদের দশ থেকে বারো হাজার নিশ্চয় খরচ হবে। ছেলে ত চাকা কারবার করে, কিন্তু এম্. এ. পাস। তাই—পাঁচ হাজারের উপর নগদ উঠল না। মেয়েটি—মরি না হলেও দেখতে শুনতে ভালই। পরের ঘরের মেয়ের বয়স কে জানে? বলে তেইশ বছর, ছাব্বিশ সাতাশ হবে মনে হয়। গিন্নি বলেন, 'একটা খুঁৎ আছে, মেয়ে আপিস যায়।' আচ্ছা, বিয়ে তারপর হেমাঙ্গিনী ও-সব পাট চুকিয়ে দেবেন। ছেলে বলে,—"অত চট্ করে কাজ ছাড়া য এখন দুই এক মাসের ছুটি নিক বলে-কয়ে। তারপর আস্তে আস্তে ছাড়বে। তোমার ত আর বে বিয়ে বাকি নেই যে অত ভাবছ। কেউ একঘরে করবে না।"

বাড়ী মেরামত হল না। পাঁচ হাজার ত মাত্র নগদ। তার মধ্যে বউই নয় নয় করে কার থাক বৌএর মুখ দেখা, আত্মীয়-কুটুম্বকে খাওয়ানো, শোবার ঘরগুলোর কলি ফেরানো এসবে অন্ত হাজার ত বেরিয়েই যাবে। তাহলে থাকবে কি? কারবারী ছেলে নগদ অন্তত কিছু হাতে রাখতে চা

কর্ত্তার বয়স হয়েছে, শরীর একেবারেই ভাল নয়। নিজে একটা আলাদা ঘর নিয়ে থ গিন্নি কি ছেলে কারুর সঙ্গেই তাঁর বনে না। কাজেই ছেলের বিয়ের কথায় তাঁর মত কেউ জি করে না। যা ব্যবস্থা মায়ে-পোয়েই করেন। আয়ও তাঁদের, ব্যয়ও তাঁদেরই।

• • • •

মেয়ের বাড়ীতেও হৈ-হৈ পড়ে গিয়েছে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে, পাত্র এম. এ. পা বাড়ী আছে, সংসারেও বড় নয়, এ ত খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু বিয়ে ত আর মুখের কথ

খরচ আছে খুবই, অথচ কর্ত্তার সম্বল ত ঐ চাকরীটুকু, তাও আর ২।৩ বছরের মধ্যেই পেনসন যাবে। যাই হোক, ভাগ্যে মেয়ের বিয়েতে আপিস ধার দেয়। নগদ পাঁচ হাজার আর বিয়ের য রকম খরচের জন্যে তিন, কর্ত্তাকে এই মোট আট হাজার যোগাড় করতেই হবে। তার মধ্যে ছয় হা যায়। তবু আপিস মেয়ে চাকরী করে, তাই নিজের গহনা কাপড় নিজেই করছে। কিন্তু সেই কোন্ সোজা কাজ? সোনার ভরি একশ তিরিশ টাকা করে, হুরিও ভরি পিছু ১৫৲১৬৲, যাক। নামডাক। ঘড়ির ত গ্রন্থিক বাজারে; তবু চোরাই মাল হলেও আনা চাই একটা। কাঠ বলে ম কিছু আছে কিনা বলা যায় না; অথচ একটা খাট আর একটা আলমারি ত দিতেই হবে। স জিনিষ কেনবার জন্যে মেয়ে বাসন্তী নিজেই দোকানে দোকানে ঘোরে; অথচ এদিকে বরের থেকে বলে পাঠিয়েছে আশীর্ব্বাদ হয়ে গেলে আর দোকান বাজারে ঘোরা চলবে না। দো বাজারে না ঘুরলে বাজার সরকার রাখতে হয়; সে ত আবার আর একটা বাড়তি খরচ। অ লুকোচুরি করেই কাজ এগোতে হচ্ছে। যেটুকু গহনা না দিলে বরের বাড়ীতে মুখরক্ষা হয় না তা হাজার তিনেক টাকা পড়ে যাবে। আজকালকার মেয়ে আবার গহনার চেয়ে কাপড়ের ভক্তই (কথায় বলে 'কাপুড়ে বিবি'। কাজেই মেয়ের জামা-কাপড়ে হাজার খানেক টাকা অন্তত না চা লোকের সামনে সে বেরোতেই পারবে না। বেনারসী, ব্যাঙ্গালোর, জর্জ্জেট, শান্তিপুরী, কাঞ্চি সবই একখানা করে চৌয়াতে হয়েছে।

মেয়ের বাড়ীতে খুব একটা ঘটা হল না। বরযাত্রীদের খাওয়াতেই হবে। কনে যাত্রী য একেবারে নিকট আত্মীয়স্বজন। কনেটিও খুবই বুদ্ধিমতী হিসেবী। পিঁড়িতে বসবার আগে নি জিনিষপত্র বাক্সে বন্ধ করে চাবি নিজের কাছে রেখেছিল। লোক দেখাবার জন্যে হাট করে কিছু সা রাখে নি। কেবল বিয়ের মধ্যে যা এসে পড়ছে সেটা বাইরে রাখতেই হচ্ছে।

যা না দিলেই নয় সেইমত করেই সব দেওয়া হল। কনের গায়ের গয়না কাপড় ছাড়া প্রত্যে জিনিষে দোকানের টিকিটে দাম লেখা। মেয়ে পাঠানো তত্ত্ব পাঠানো পর্য্যন্ত সে সব টিকিট খোলা না। কন্যাপক্ষ কত টাকার জিনিষ দিয়েছে বুঝতে যাতে বরপক্ষের একটুও ভুল না হয়।

বিয়ের দিন থেকে পুরা এক মাসের ছুটি—অনেক কষ্টে মঞ্জুর করে বাসন্তী শ্বশুরবাড়ী এল। এ বাড়ীতে জনকয়েক আত্মীয়-স্বজন ত থাকবেনই, তাদের চোখের উপর দিয়ে নূতন বৌ কিছু আপিস পারবে না। ও-কথাটা লোক-সমক্ষে হেমাঙ্গিনী একেবারেই অস্বীকার করতে চান। সবাইকে বং কলেজের পড়া সেরেই বিয়ে হ'য়ে গেল।

অন্তরালে মহাদেব কিন্তু অন্যরকমই বলে। "আজকাল বড় বড় আই. এ. এসের বৌরাও চ করে। তুমি করলে আর ক্ষতি কি? এখন কিছুদিন করে চল। সময় মত পরে ছাড়লে হবে।"

বাসন্তী বলে, আমারও এখুনি কাজ ছাড়বার ইচ্ছা নেই। কি হবে ঘরে হাত পা মেলে থেকে? তুমি ত সারাদিন কারবার সামলাবে। এত বড় ভাঙা বাড়াটা আমায় তত্ত্বক্ষণে গিলে খে

আর কি? ক'দিনের মধ্যেই ত দিদিরা বাসিয়া সবাই যে যার বাড়ী চলে যাবে। ঠাকুরপো ব করবে। থাকবার মধ্যে ত দুঘরে দুই কোণে বাবা আর মা। এই এত বড় রাক্ষুসে বাড়ীটা তোমরা করে ফেল না কেন? কোন কাজে লাগছে?"

অমরেশ বললে, "হাঁ, বিক্রী করা গেলে ত ভালই হত। কিন্তু—বাবা যে অনেক আগেই বন্ধক রেখে টাকা নিয়েছেন। সে টাকা আর শোধ হয় নি।"

বাসন্তী বিস্মিত হয়ে বললে "ওমা তাই নাকি? আগে ত ঘুণাক্ষরেও শুনিনি। তাই চাকরী ছাড়া আবার মাথায় থাকবে।"

অমরেশ চুপ করে রইল। মনমরা ভাবেই বাসন্তীর ছুটির একটা মাস কেটে গেল। স্বামী নয় বলে মনে তার দুঃখ ছিল, এখন আবার বাড়ীও বাঁধা শুনে তার কপাল চাপড়াতে ইচ্ছা করছিল

আপিস যাবার দিন বাসন্তী আর লুকোচুরি করে আপিস গেল না, সবস্তেই গেল। যার নেই ঘর নেই, তার আবার চাকরী করার লজ্জা কি?

আপিসে এসেই শুনল বড় সাহেব ডেকেছেন। ঠিক দিনেই ত কাজে জয়েন করেছে, আবার বড় সাহেবের ডাক কেন?

সাহেবের ঘরে যেতেই তিনি বললেন, দেখ মিস মিত্র, তোমার নতুন নামটা মনে থাকে এই কাগজের নামটাই হবে বোধ হয়। এই দেখ।"

বাসন্তী গম্ভীর মুখ করে বলল, "হাঁ"।

সাহেব বললেন, "তোমার স্বামীর ত অনেক ধার দেখছি। পাওনাদাররা তোমার বেতন মাসে ১০০৲ কাটতে চায়। আমি কি বলব বল।"

বাসন্তী মনে মনে প্রমাদ গণল, বললে, "সাহেব আমার নিজেরও যে কহেক হাজা হয়েছে বিবাহ ব্যাপারে। আমি মাসে মাসে শোধ দেব ১৫০৲ করে কথা আছে। তার উপর কাটা গেলে থাকবে কি?"

সাহেব বললেন, "তুমি ত তিন শ' টাকা বেতন পাও। আড়াই শ' দিলে পঞ্চাশ ৲ তোমার খাওয়া-পরার জন্য ত তোমার স্বামীকে টাকা দিতে হবে না।"

———

হাতের কাছে ক্যাপস্টান
মজুত রাখুন!

যেখানেই থাকুন, আর যাই করুন—সবসময়ে হাতের কাছে ক্যাপস্টান মজুত রাখবেন। ধূমপানে এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাবেন না।

উইল্‌স-এর ক্যাপস্টান-এর
তুলনা নেই

বিম্ব

চিত্তরঞ্জন মাইতি

আপনারা যে কেউ দীঘায় গেছেন, সমুদ্র দেখার আগে যাঁদিকে একটা সাদা বাংলো তাঁর চোখে পড়েছে। ঐ বাংলোটি মেইথ সাহেবের। আপনার মনে এই পরিচ্ছন্ন বাড়ী ও তার চারদি বিস্তৃত ঝাউএ ঘেরা চত্বর বেশ তৃপ্তি দিলেও কোন কৌতূহল জাগবে না। আমারও প্রথম জাগা কিন্তু একদময় আমি সত্যিই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম; আর না হয়েও উপায় ছিল না। আমি দীঘায় ছিলাম আর একটি ঘটনাও আমাকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল। সেই ঘটনাই এ কথাবস্তু।

মিঃ মেইথ ক্ষমা করবেন, আপনার গোপন কাহিনীটি সবার কাছে প্রকাশ করে দিচ্ছি কিন্তু বলব না বলেও কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না। আর আমার বিশ্বাস ব্যক্তিগত বলে কাহিনীই নেই। একান্ত আপনার কাহিনীও কালে সবার হয়ে যায়।

আমি রোজ বেড়াতে বেড়াতে আপনাকে দেখতাম আপনার ঐ সাদা বাড়ীর ছাদে আরাম কেদারায় বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে। আপনার রেশমী সাদা চুলগুলো হয়ত হাওয়ায় তখন দুলত, কিন্তু দূর থেকে তা দেখা সম্ভব ছিল না। আপনার পাইপের থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠত। আপনার মনেও তেমনি একটা ভাবনা নিশ্চয়ই আপনার বাস্তব পরিবে ছাড়িয়ে উঠত মনের আকাশে। আপনি সুখী কি দুঃখী আমি বুঝতে পারতাম না। তবে চিন্তায় হয়ে থাকতে আমি আপনাকে বহুদিন দেখেছি।

একটি মেয়ে আর একটি ছেলেকে আপনার ঝাউবাগানের একপ্রান্তে বসে বসে সমুদ্র কখনো বা পরস্পরকে মুখোমুখি তাকাতে আমি দেখেছি, কিন্তু আপনিও যে তাদের গভীর মনোযোগে দেখতেন, তা আমার একবারও মনে হয়নি। মনে হল সেদিন যেদিন আপনি সত্যি অবাক করলেন সবাই

সেদিন ১০ই বৈশাখ, আমার বেশ মনে আছে। বেড়াতে এসেছি, তাই বিয়ের তারিখ আমার জানা ছিল না। তারপরের ঘটনা আমার জানার কথা নয়, তবু জানলাম, কারণ এমন বি একটা ঘটনা আপনি ঘটালেন যা সচরাচর ঘটে না। আর তাই তা ঐ অঞ্চলের লোকদের ভিতরই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল না, আমার কানেও এসে পৌঁছল। কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। মেয়ের বাবার মুখে যখন শুনলাম, তখন অবিশ্বাসের কিছুমাত্র কারণ রইল না। মেয়ের বাবা আমি আপনার বাগানের শ্রীনিবাস মালীর কথাই বলছি। সে যখন আমাদের কয়েকজন কৌ সামনে ঘটনাটি বলছিল তখন আমি বেশ লক্ষ্য করে দেখলাম যে সহজভাবে কথাগুলো বলতে পারে আনন্দ, কৃতজ্ঞতা আর উত্তেজনা মিশে তার চোখেমুখে একটা করুণ কান্নার ভাব ফুটে উঠেছিল।

সমস্ত ঘটনাটি আমরা শ্রীনিবাসের কাছে শুনলাম। কিন্তু আপনি ঘটনাটি শুনেছিলেন একেবারে শ্রীনিবাসের মেয়ে মাধবীর মুখ থেকে। পাড়াগাঁয়ের পঞ্চদশী মেয়েটি কি আপনাকে সব কথা গুছিয়ে বলতে পেরেছিল? না আপনি তার বোবা মুখের ভাষা স্পষ্ট বুঝে নিতে পেরেছিলেন?

আপনি যেদিন ঘটনাটি শোনেন সেদিন দীঘার সমুদ্রে ঢেউএর চূড়ায়, সোনালী বালুবেলা ঝাউএর ঝালরে ঝালরে তরল জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়ছিল। আপনি ছাদের থেকে দেখছিলেন মেয়েটিকে আপনার কাউবাগানের ভেতরে একটা গাছের ছায়ায় পঞ্চদশী মেয়েটাকে লুটিয়ে দিয়েছিল সে। নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে ভেবে আপনি এগিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখলেন আপনারই মালীর মেয়ে মাধবী বালুর বিছানায়, কাউএর ছায়ায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। আপনি মেয়েটির মাথায় হাত রাখলেন। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে যখন তাকাল তখন একেবারে বিশ্বাসই করতে পারল না যে তাদেরই মালিক সাহে তার মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। বড় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল মেয়েটি। আপনি এক মুহূর্তে তার সব লজ্জা ভাঙিয়ে দিয়ে তার জলভেজা মুখখানাকে তুলে ধরলেন। আপনার চোখে তখন করুণা ঝরছিল। মাধবী ঠিকই তা দেখতে পেয়েছিল। সে আপনার পদমর্যাদা ভুলে গিয়ে আপনার বুকে মাথাটা রেখে ফুঁপি ফুঁপিয়ে কান্না জুড়ে দিলে।

আপনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। কতক্ষণ পরে সে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলে আপ তার মুখ থেকে যেটুকু সার সংগ্রহ করলেন তা আপনার মনে নিশ্চয়ই এক আশ্চর্য প্রেরণার সৃষ্টি ক থাকবে। আপনি মাধবীকে বললেন,

ভীরু মেয়ে, চিন্তা কোর না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু এই স্তোকবাক্যে মাধবীর অশান্ত মন কি জুড়োতে পারে? যে মানুষটা ইস্কুলের মাই হয়েও তার মত সামান্য একটা মালীর মেয়েকে ভালবাসার কথা শুনিয়েছিল, সে আজ যদি আরও ভ মেয়ের সন্ধান পেয়ে তাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে তাকে কি করে ফেরাবে মাধবী। কত বড় ধ মেয়ে আজ তার প্রতিদ্বন্দ্বী। গা ভরে সোনার গয়না দেবে তার বাবা। কি সম্বল আছে মাধবীর মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দেবার। শুধু কয়েক বলক কান্না ছাড়া।

কিন্তু তবুও যখন আপনি তাকে সান্ত্বনা দিলেন তখন ভূমন্ত মানুষের ঘড়কুটোটিকে আঁকড়ে ধর মত অবস্থা হল মাধবীর।

থৈ থৈ সমুদ্রের মাঝখানে একেবারে ডুবে যাবার আগে হাত বাড়িয়ে দিলে মাধবী। সহি অসাধ্য সাধন করলেন আপনি। সোনায় মুড়ে দিলেন মাধবীর হাত। কল্পকথার কন্যার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠল সে কন্যা। মন উতল বরের বাপের। মাষ্টার পাত্রটিও লক্ষ্মীস্রোতে মত এসে বসল বরের পিঁড়িতে। শাঁক বাজল। মেয়ে সম্প্রদান করা হল। বিয়ের প্রতিটি আচা অনুষ্ঠান আপনি দেখলেন নিবিষ্ট তন্ময়তায়। তারপর যখন বরকনে গাঁটছড়া বেঁধে বাসরঘরের দি পা বাড়াল তখন আপনি গিয়ে দাঁড়ালেন তাদের সামনে। এতক্ষণ অনুষ্ঠানের ভিতর মাধবী আ

হয়েছিল। এবার আপনাকে মুখোমুখি পেয়ে তার কৃতজ্ঞতায় ভরা দেওটা লুটিয়ে দিল আপনার প শ্রীনিবাস আর তার বৌ কাপড় দিয়ে চোখের জল রোধ করলে। গা তখন ভেঙে পড়েছিল শ্রীনিব কুঁড়েঘরের উঠোনে। সাহেব সোনাদানা দিয়ে ঘিরে দিলে মাধবীর। ধন্য ধন্য রব উঠল চারিদি আপনি মাধবীর হাত ধরে তুললেন। তারপর তার হাতে পরিয়ে দিলেন যে বস্তুটি তার মূল্য ঠিক শহরে দৌড়তে হয়েছিল শ্রীনিবাস আর বরের বাবাকে। ফিরে এসেছিল তারা বিস্ময়ে বিস্ফারিত আপনার দেওয়া হীরের আংটিটি কয়েক সহস্র টাকা মূল্যের। তাও প্রায় দুষ্প্রাপ্য।

আমি জানি আংটিটি মাধবীর হাতে দিয়েই আপনি ফিরে এসেছিলেন আপনার বাং তারপর ছাদে উঠে আরামকেদারায় পা এলিয়ে দিয়ে পাইপ ধরিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে হাওয়া উঠছিল। আপনি তাকিয়েছিলেন দীঘার সমুদ্রের দিকে। তরল মদির জ্যোৎস্না কাঁপছিল ঢেউএর আর ঝাউএর পাতায়। সমুদ্রের জল তখন ভাঁটার টানে দূরে সরে সরে যাচ্ছিল। আমি হলফ বলতে পারি আপনার মনও সেই সঙ্গে সরে সরে যাচ্ছিল। যাচ্ছিল আর এক সমুদ্র উপকূলের আজ থেকে ষাট বছর আগে—কর্ণওয়ালের সমুদ্র-উপকূলে।

'এই ফুলওয়ালী, ফরগেট মি নট।' ছোট্ট নীল তারাফুলগুলো ফুলওয়ালীর হাত থেকে আইলীনের হাতে তুলে দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'বলতে পারো কেন এমন হল ফুলটির নাম?' ফু তখন গালের একপাশে আলতো করে চেপে রেখে স্পর্শসুখ নিচ্ছিল আইলীন। চোখেমুখে চি চিহ্নটি এঁকে আপনার দিকে সে তাকাল। আপনাকেই এবার আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে হোল।

এক সময় বিধাতাপুরুষ যেন তাঁর সৃষ্ট ফুলগুলির নামকরণ করতে এলেন। বিচিত্র সব নামকরণের পালা শেষ করতে অনেক সময় কেটে গেল। শেষে যখন ফেরার পথে পা বাড়ি অমনি পথের ধারে একটি ছোট্ট তারাফুল বিধাতার দিকে করুণভাবে তাকিয়ে বললে, ফরগেট (আমাকে ভুলে যেয়ো না)। বিধাতাপুরুষ অমনি হেসে বললেন,—এই নামেই হবে তোমার আইলীনের নীল চোখে এবার ফুটে উঠল 'ফরগেট মি নট'এর ছবি। আপনার হাতটি নিজের ওপর টেনে নিয়ে সে বললে, 'ফরগেট মি নট, ডার্লিং।'

আপনি যে ভোলেননি তার পরিচয় আপনার সারা জীবনের পাতায় লেখা হয়ে আছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা আইলীনকে নিয়ে আপনি সামান্য কেরানী হয়েও অসামান্য কাজ কর সুইজারল্যাণ্ডের-তুষার রাজ্যে পা করে এসেছেন। রোদের প্রাচীন প্রস্তরমূর্তিগুলির কাহিনী চেষ্টা করেছেন। আরও হয়ত কিছু করতেন, কিন্তু সে সুযোগ নেবার আগেই আপনার সামান্য নিঃশেষ হয়ে এল। এবার পাউণ্ড ছেড়ে আপনি শুধু প্রেমকেই আঁকড়ে ধরতে চাইলেন। আ কাছ থেকে ডাক এল আইল অব ওয়াইটে যাবার। হোটেলের মোটা বিল মেটাবার সঙ্গতি ত আপনার। অগত্যা নানা অজুহাত দেখিয়ে বন্ধ করতে হল যাত্রা। কিন্তু বন্ধ হল না আইলীনের উপকূলে ছুটি উপভোগের আকাঙ্ক্ষা।

খবর পেলেন আপনি। যথাসর্বস্ব নিয়ে আপনিও কয়েকটি দিন পরে ছুটে গেলেন আইল ব ওয়াইটে। নিঃসঙ্গ আইলীনকে সমুদ্র উপকূলে সঙ্গ দেবার প্রবল ইচ্ছাকে আপনি কিছুতেই দূরে সরি রাখতে পারলেন না। কয়েকটি হোটেলে খোঁজ করে আপনি আইলীনের সন্ধান পেলেন না। যখন এ নিরাশ হয়ে ফিরতে মনস্থ করেছেন তখন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন আইলীনকে।

ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় সবকিছু স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও আইলীনকে চিনে নিতে আপন একটুকু ভুল হয়নি। ওর গলায় তখন কাঁপছিল আপনারই একটি প্রিয় গানের সুর। আপনি আবে আবিষ্ট হবার আগেই বিস্ময়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। আর একটি কণ্ঠ সহসা যুক্ত হল সেই সঙ্গে আইলীনের সঙ্গে। অন্য পুরুষের কণ্ঠ, এ যে আপনার কল্পনারও অতীত। কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছি আপনার, কিন্তু যেতে পারলেন না আপনি। কারু পক্ষেই বোধকরি সে অবস্থায় যাওয়া সম্ভব ছি না। অদূরে বালুবেলায় আপনি উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে রইলেন কতক্ষণ। কানে ভেসে এল ওদের হা গান আর এলোমেলো কথা। সমুদ্রতীর একসময় নির্জন হয়ে এল। ওরা উঠল। আপনারই পাশ কাটি ওরা চলে গেল বাহুবদ্ধ হয়ে। আপনি দেখলেন, হাঁ স্পষ্টই দেখলেন, আইলীনের আঙুলে একটুকরো হী ঝলমল করে জ্বলছে। যে পুরুষটিকে আশ্রয় করেছে আইলীন সে যে আপনার মত নিঃস্ব নয় তা আপ মুহূর্তে অনুভব করলেন। আইলীনের হাতে জ্বলছিল যে হীরের আংটি তা নিশ্চয়ই নতুন আগন্তুকের দা এনগেজমেন্ট রিং হওয়াই স্বাভাবিক।

ওরা চলে গেল আর আপনি বসে রইলেন। দূরে পাহাড়ের গায়ে ঢেউগুলো আছড়ে প টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছিল। আপনার মনটাও তেমনি ভেঙে যেতে লাগল। এক সময় ঘৃণা ও আপনার নিজের ওপর। অর্থহীন মানুষ যে একেবারে অর্থহীন সে উপলব্ধি এল আপনার মনে। স সঙ্গে মাথা তুলল আর একটা আকাঙ্ক্ষা। দারিদ্র্যের এ বন্ধনাকে যেমন করেই হোক জয় করতে হ কিন্তু ইংল্যাণ্ড তখন আপনার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আপনি স্বদেশ ছেড়ে অজানা বিদেশে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য পাড়ি জমালেন। একটি হীরের আংটির কাছে হেরে গিয়ে আপনি অবশেষে স সমুদ্র পেরিয়ে এসে পৌঁছলেন হিরণ্ময় ভারতবর্ষে।

তারপর শুরু হোল আপনার দীর্ঘ সংগ্রাম। কেবল একটি উন্মাদনাই আপনাকে দিনে রা হাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। বিপুল অর্থের অধিকারী হতে হবে আপনাকে। যার মূল্যে কেনা যা জগতের সকল বস্তু। এমনকি প্রেমও যার কাছে দুর্মূল্য হবে না।

আসামে চা-বাগানের ম্যানেজার থেকে হলেন মালিক। চৌরঙ্গীতে বিখ্যাত জুয়েলারী দোকানে পার্টনার থেকে হলেন প্রধান। কলকাতা মহানগরীতে আপনি হলেন অন্যতম বিত্তবান। এবার আপ সারাভারত চুঁড়ে সংগ্রহ করলেন একটি দুষ্প্রাপ্য হীরক। তৈরী করলেন এক মনোরম আংটি। পরাজ প্রতিশোধ নেবার পালা এবার আপনার। আপনি প্রস্তুত হলেন দেশে ফেরার জন্য। আইলীনদের সাম থেকে এবার আর চোরের মত পালিয়ে আসতে হবে না আপনাকে। সাদাস্ত হোটেলের বিল মেটা

ভরে সমুদ্রউপকূলে যাত্রা আর আপনার স্থগিত রাখতে হবে না। এবার প্রেমিকাই অ
মি নট' ফুলের গুচ্ছ তুলে দিয়ে সকরুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকবে।

যাত্রার আগে আপনি এসে দাঁড়ালেন প্রসাধন কক্ষে। এতদিন নিজের দিকে একটিবারও তাকাবার সুযোগ ছিল না আপনার। লক্ষ্য ছিল শুধু লক্ষপতি হবার। কিন্তু এবার আপনি ফিরে নিজের কাছে। এখন একান্তে নিজেকে সাজাবার পালা। কিন্তু এ কি হল! বিবর্ণ হয়ে গেল মু মুখ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এ আপনি কাকে দেখলেন! কর্ণওয়ালের সমুদ্রতীরে যে তরুণ ঘুরে বেড়াত একটি তরুণীর হাত ধরে, সী-গালদের করতালি দিয়ে চকিত করত, পাহাড়ের গায়ে যে সাদা ফেনার রাশির মত হাসি ছড়াত, সে আজ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই যুবকের নাম নিয়ে বেঁচে রইল আর একজন, যার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, গায়ের চামড়া দুধের সরের মত কুঁচকে গিয়েছে।

দীর্ঘ চল্লিশটি বছর ভারতবর্ষে আপন অজ্ঞাতে কখন পার করে দিয়েছেন মিঃ ফেইথ। সঙ্গে যেহ যে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে না, হিসেবে এ সত্যটুকু আপনার চোখে ধরা পড়েনি আগে। জীবনের হিসেব মেলাতে গিয়ে ভুল হয়ে গেল আপনার। ষাটের কোঠায় পৌঁছে নতুন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যে বিড়ম্বনা এ সত্য নির্মমভাবে বুঝতে পারলেন আপনি। এতদিনের উত্তেজনার এবার পর্বতপ্রমাণ হয়ে এল আপনার ক্লান্তি। সমস্ত দেহমন চাইল বিশ্রাম। দীঘার নির্জন এই সমুদ্র আপনি বেছে নিলেন। এইখানেই রচনা করলেন আপনার শেষ জীবনের আশ্রয়। ঝাউবীথি ঘেরা বাড়ীটি আপনার সত্যিই মনোরম।

আপনি বসে থাকেন ছাদের ওপর আরামকেদারায়। পাইপের মুখে ধোঁয়া ওঠে। অলস দেখেন দূর সমুদ্রের লীলা। আরও কুড়িটি বছর কাটিয়ে দিলেন আপনি এমনি করে। অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করবার পক্ষে একটি মানুষের জীবনে এতগুলি বছর যথেষ্টই বলতে হবে।

কিন্তু আপনি সত্যিই আশ্চর্য করলেন সবাইকে। আপনার মৃত মনটা সহসা মাধবীর মাঝে বেঁচে মাধবীর পরাজয় তাই আপনার পরাজয় বলেই মনে হল। অর্থের কাছে প্রেমের হার হবে ব আপনি চাইলেন না। মাধবীকে রত্ন-অলঙ্কারে সাজাতে গিয়ে আপনি নিজের গলাতেই ফাঁসের মালা নিলেন। আর হীরের আংটি! সে তো অন্ধকারে লুকোনো আপনার প্রেমকেই উজ্জ্বল করে দিলে।

চারাগাছ

সুনন্দা দাশগুপ্ত

কি ঝড় কি বৃষ্টি!

পুরো দুটো দিন হুলস্থুল কাণ্ড করে আজ সবে শান্ত হয়েছে সে ঝড়।

অমল বসেছিল জানালার শিক ধরে। বাড়ীর এই জানালাটা দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিলে দেখা যায় দুটো নারকেল গাছের ঝাঁকড়া মাথা। গাছ দুটো রোদে পোড়ে। বৃষ্টিতে ভিজে চলে অচল দাঁড়িয়ে। আর উদ্ধত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে ওঠে প্রতিকূল হাওয়ার স্পর্শে। জানালাটার নীচে পোড়ো জমিটার একপাশে লিকলিকে একটা অশথ গাছ। অমল জানালায় বসে এই গাছটার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়েছিলো। গাছটা সন্ধানের পর যেদিন সেটা অমলের নজরে পড়েছে, তারপর থেকে দিনে দিনে তিলে তিলে কেমন একটা আত্মীক যোগ যেন গড়ে উঠেছে তার ওটার সঙ্গে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যায় সে এখানে বসে। কখনো শুধু দেখতে দেখতে। কখনো বা রোদ রং গাছ পোড়ো-জমিটার ছবি আঁকতে আঁকতে।

আজও রং তুলি নিয়ে বসেছিল অমল—ভোরের প্রথম রোদ এসে পড়া নতুন পাতা ওঠা অশথ গাছটার ছবি আঁকতে। এ গাছটার কত ছবিই না আজ পর্যন্ত সে এঁকেছে। একবার গাছটাকে গরু মুড়িয়ে খেয়ে গেলে ব্যথায় মনটা টনটন করে উঠেছিল ওর। একটা ছবি এঁকে রেখেছে অমল গাছটারও। যেন একটা শূন্য রিক্ত কঙ্কাল হাত। আকাশের দিকে হাত মেলে কিছু চাচ্ছে। আজ তার নতুন ওঠা বৃষ্টি-ভাজা পাতাগুলোর ওপর আলো পড়ে চকচক্ করতে দেখে মনটা অমলের খুশী হয়ে উঠেছে। রং তুলি নিয়ে বসেছে গাছটার এই তাজা রূপের আনন্দটুকু ধরে রাখতে।

আজকের কাগজে অমল দেখেছে অশথ গাছ উপড়ে পড়ে একটা গাড়ীকে চেপ্টে ফেলেছে ও আরোহীরা হত। মানুষগুলোর জন্য অমল বেদনা বোধ করেছে কিন্তু শক্তি—এই গাছটাও তার এমন শক্তি ধরবে একদিন! অপরের কৃতি সন্তান দেখে, মা যে দৃষ্টিতে নিজের নাবালক পুত্রের দিকে তাকান, অমল ঠিক সেই দৃষ্টিতে গাছটার দিকে তাকাচ্ছিল আর ছবি আঁকছিল।

রান্নাঘরে বাবাতে মাতে এক পশলা ঝগড়া হয়ে গেল। মা বাজারের থলে টেনে ফেলে দিয়ে বারান্দায়—যাও কাঁচাই খাও গিয়ে এসব! সবুজ সবজি। গা-ভরা ভিটামিন। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে মানুষের ঘরে রোজ রোজ গরু ছাগলের পথ্যি। পড়াশুনার পাট তো গেছেই—এখন ঘাসপাতা খাও বসে বসে।

বাবা কেটে পড়লেন—

কানে আঙুল না দিয়েও কান বন্ধ করা যায়। অমল ছবি আঁকায় নিবিড় হলো।

—অমল দেখলো না কিছু কিন্তু সে জানে—বাবা না খেয়ে অফিসে চলে গেলেন।

ভাইবোনগুলো মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে এখানে ওখানে।

মা রান্নাঘরে বসে কাঁদছেন।

মনটা কেঁদে হালকা করে কাজে হাত দেবেন।

এমনি সময় বাড়ীতে এলো মানী অতিথি।

সদর দরজা থেকে ডাকতে ডাকতে ভেতরে ঢুকল অমলের পিসতুতো বোন। আর পিসীমা।—মা সেই সোজা এক্সাপুর থেকে ট্রেন্ট করে এসেছি। খুব ভালো করে আগে একটু কড়া চা খাওয়াও অসিত ডেকে বলল সমবয়সী মামীকে।

অমল এখনও জানে মা কি করছেন, ভাইবোনগুলো কি করছে।

ওরা ত্রস্তব্যস্ত হাতে বারান্দায় ছড়িয়ে থাকা বাজার ঘলিতে ভরছে।

মা তাড়াতাড়ি চলভরা বালতির কাছে গিয়ে আঁজলা আঁজলা জল তুলে চোখে মুখে দিয়ে কান্নার চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করছেন। তারপর মুখে শোভন অভ্যর্থনার হাসি নিয়ে বেরিয়ে আসবেন—'এসো এসো' বলে। ওদের বসিয়ে অমলের কাছে এসে দাঁড়াবেন। বলবেন, শীগ্‌গির ওঠ। মাসিমার কাছ থেকে দশটা টাকা ধার করে নিয়ে আয় তো। অমল আরো নিশ্চিন্ত হলো এর জন্য খাতায়। দুর্ভাবনা কাতর শুকনো মুখ নিয়ে মা যখন ঠিক সেই কথাই বললেন এসে ওকে, তখ না তুলেই জবাব দিল অমল—সোজা গাড়ী চালিয়ে কোন হোটেলে চলে যেতে বলো।

এ ঘরে কথা বললে ও ঘরে শোনা যায়। চাপা গলায় ছেলেকে ধমকে উঠলেন মা—শুনতে পাবে

—পাক।

—পাক! রুষ্টকণ্ঠে ছেলেকে ধমকাতে যাচ্ছিলেন মা এই বলে যে, ওরা যে আমাদের গরিবের বাড়ীতে ওঠে সেই তো বেশী। আত্মীয় বলেই তো ওঠে। কিন্তু অতিথিদের এসে এ ঘরে দেখে, তাড়াতাড়ি হাতে চৌকির উপরকার ময়লা জামা কাপড় ঠেলে ননদ জায়েকে বসাতে বসাতে বলবে বুঝি তাকিয়ে আর ঘরে তুলতে পারিনে তাই। এক ফাঁকে ছেলের দিকে তাকালেন মা অনুনয়ভরা দৃষ্টি

উঠতেই বলো অমলকে।

চা খেয়ে ওরা বেরিয়ে গেলেন পুজোর সওদা করতে। ফিরে এলেন বাহারী কাগজ মোড়া-বড় নানা প্যাকেট হাতে। প্যাকেটগুলো ধুপধাপ করে চৌকির উপর ফেলতে ফেলতে অসিত ক ঘাম বড়ালো আঙুলে টেনে।—নাঃ, জিনিসপত্র আর কেনবার উপায় নেই। ছেঁাবার উপায় নেই। এ গেল শ'ছয় বেরিয়ে।

অমল বুঝতে পারছে মার মুখ 'হা' হয়ে গেছে।

—ছ' শ টাকার শাড়ি কিনলে!

অসিত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললো—এতেও কি মনে করেছ বাড়ীর মেয়ে বৌদের তোমার মন রে দেখো না, আবারো না আনতে হয়।

আত্মগর্ব উদ্ভাসিত মুখ অসিতের।

বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেল অমল।

যখন ফিরলো তখন তিনটে বেজে গেছে। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেছে। শুধু উনির উপে মা ছেলের জন্য ঘরদোর করছেন। ফের রওনা হবার উদ্‌যোগ করছেন পিসীমারা।

ক্লান্ত অভ্রান্ত অমল এসে দাঁড়ালো।

শান্তিপুর ধুতির কোঁচা দু হাঁটুতে চেপে ধরে তার পাড় কোঁচাচ্ছিল অসিত। অমল এসেছে বুঝে সে বলল—আচ্ছা! আচ্ছা দেওয়া হলো প্রীমানের।

অসিতের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমল।

অসিত কোঁচাটা হাতে মুচড়ে ফুল করে ছেড়ে দিয়ে সোজা হলো—এই সব ছেলে যে দেশের ভবি সে দেশের হয়েটা কি বলো মামী।

অমলের চোখ দুটোকে কেন যে ভয়ার্ত মা, মা নিজেই জানেন না। ভাতের থালি থেকে ছো মাথাটা আবডাল করে রাখা মতো দাঁড়িয়ে মা বলতে লাগলেন—তা তো ঠিকই। তা তো - যথার্থ কথাই।

চোয়ারে পা তুলে হাঁটুর উপর হাত রেখে ঘড়ি পরতে পরতে অসিত বললো—কথা যথার্থ হ তো হবে না মামী। অভিভাবকদের অবহিত হতে হবে। তোমাকে মামাকে ভাবতে হবে। ও শুধু সংসারের কথা নিজেদের কথা ভাবলেই চলবে না। আরো বড় করে ভাবতে শিখতে হবে। আ বড় করে ভাবতে শিখাতে হবে ছেলেমেয়েকে। দেশ ডিজেনারেট করছে কেন—

—সেই তো—সেই তো। কাঁপা কণ্ঠ মার। ছেলের ঘরস্পন্দনের শব্দ তিনি বুকে অনুভব করছে ছেলের ঘন নিঃশ্বাস তার পিঠে এসে পড়ছে।

গিলে-করা ফিনফিনের আদ্দির পাঞ্জাবি তুলে নিল অসিত—আইন করে রক্তের আগুন-ঘর যে আমরা যে কতদূর কি করতে পারবো—এই তো তার দৃষ্টান্ত। সরকার কি ছেলেমানুষ করে দিতে পা অভিভাবক সতর্ক না হলে—দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তোমাকে এ আমি বলে দিলাম। জানই ে তিন তিনবার সরকার আমাকে বিদেশে পাঠিয়েছে আমাদের দেশের পরবর্তী জেনারেশনের এমন পতন ে ঘটছে তার মূল অনুসন্ধান করার জন্য। আমাদের পরবর্তী মিটিংএর আলোচ্য বিষয়ও এটা।

মা ছেলেকে আড়াল করে অনবরত কেবল সম্মতিসূচক ঘাড় মাথা নেড়ে চললেন। ভাতের গ ছেড়ে দিলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সাগরে পুত্রের হাত ধরে বললেন—আয় খেতে আয়।

ক্ষুধার্ত অমল তখন অপসৃয়মান গাড়ীটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবছে, ও যদি সেই অ গাছটার মতো উপুড় হয়ে পড়ে গাড়ীসুদ্ধ লোকটাকে অমনি খেতলে চেপ্টে ফেলতে পারতো।

ভাত নিয়ে বসে থেকে থেকে ফের মা ছেলের খোঁজে এসে দেখলেন, জানালার দিকে মুখ ে ধরে অমল তার সেই লিকলিকে অশথ গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে।

———

পাস মার্ক

সৈয়দ মুজতবা আলী

আমার প্রস্তাব শুনে ফুলমামা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এ নাকি এমনই এ ব্যাপার যা সচরাচর ঘটে না।

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার পানে চেয়ে ফুলমামা বললেন, বলিস কি—সাহস হয়?

ওঁর আশ্চর্য হওয়া দেখে প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। অন্যায় কিছু বললাম কি? সাহসের প্রসঙ্গে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম। বললাম, এ আর এমন শক্ত কি—পৃথিবীতে সবাই তো করছে।

বলিস কি রে—পৃথিবীর খবরটাও রাখছিস আজকাল? ফুলমামা আরও অবাক হলেন যে

বাঃ রে, নিত্যদিন খবরের কাগজে কত দেশের কত খবর রাজারাজি রাজা-হাজামা—খুন জখ এসব বেরুচ্ছে না?

ও—তাই বল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ফুলমামা বললেন, আমি ভেবেছিলাম আর কিছু! বেছে বেছে ওই খবরগুলিই বুঝি পলাধঃকরণ করিস?

এ কেমন খোঁচা খেওয়া প্রশ্ন। পলাধঃকরণ করি মানে গিলি শুধু ওই খবরগুলিই? কিন্তু ভালই লাগে ওই জাতীয় ঘটনার বিবরণ পড়তে সে কি আমার মনেরই বিশেষ একটি প্রবণতার ন: বা ওই ধরনের চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ একটি গুণ ও সদ্‌গুণ—সহৃদয়জাত মানুষ সরল কাও গাছের মত। ওঁদের বুঝতে একটুও বুদ্ধির প্রয়োজন নাই। ঈষৎ চালু সিমেন্টের মেঝেতে সামান্য চাললে সে ধারা যেমন অনায়াসে গতিপথটি চিহ্নিত করে গড়িয়ে চলে, তেমনি মন-খোলা সাধু প্রকৃ মানুষদের মনে পৌঁছতে একটুও ডাইনে বাঁয়ে হেলাহেলির দায়িত্ব নাই। কিন্তু যে মানুষ নীতিবি সমাজবিরোধী জটিল কর্মের জালে হিজিবিজি কাটা—তার মনের ঘট ছাড়াতে গেলে রীতিমত বুদ্ধি অনুশীলন করতে হয় এ কি ফুলমামা জানেন না? নিজে তো সরকারের ঘরের চাবিকাঠি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কত ভাবে কত না কৌশলে আলো ফেলে তাল তাল অন্ধকারকে ভংগ করছেন। গ করছেন অহরহ, প্রশংসা কুড়োচ্ছেন, পদোন্নতির গৌরবে ফুলে ফুলে উঠছেন অথচ বিস্ময়ের চাবুক আমাকে ওই পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন! রাগ হ'ল, দুঃখ হ'ল, সবচেয়ে অস্বস্তি করতে লাগলাম তা প্রকাশ করতে না পেরে। ওঁর তীক্ষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টির সামনে কেমন অভিভূত-অ হয়ে রইলাম।

ফুলমামা এতক্ষণে কিঞ্চিৎ সদয় হলেন। ঈষৎ হেসে বললেন, শুধু খবরের কাগজগুলো পড় হবে না রে—বইটই এ সম্বন্ধে যা আছে কিছু কিছু পড়া দরকার। আর দরকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার।

সাহস করে বললাম, এ সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছি মুলমামা। পাচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার থেকে আগাথা ক্রিস্টি—কোনান ডয়েল—সব।

বলিস কি—এত! আমার পরিহাসে তীক্ষ্ণ হল ওঁর কণ্ঠস্বর।

ক্ষুণ্ণ স্বরে বললাম, ওঁদের লেখার দাম নেই বুঝি?

তাই বললাম! হাসলেন মুলমামা। দাম যদি না-ই থাকবে লক্ষ লক্ষ লোক দাম দিয়ে কিনছে কেন! সে কথা নয়। কথা এই, গল্প পড়ে জিনিসটা যেমন সহজ মনে হয়—আসলে ওটা সোজা নয় মোটেই। সত্যিকারের খুনের তদন্ত করতে গিয়ে দেখেছি—খুনীর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব বা অধিক পরিচিত জন সকলেই সন্দেহভাজন। তার ফলে অন্ধকারে আলো ফেলতে গিয়ে বেড়ে যে অন্ধকার। অথচ এসব ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষকে সন্দেহ না করলে তদন্তের গোড়াতেই গলদ হয়ে যায়

বললাম, দেখবেন—আমি ঠিক পারব।

ঠিক বলছিস? নিজের উপর বিশ্বাস রেখে বলছিস, না সকলকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দে মন তৈরী করছিস?

বললাম, তা জানি না।

আমার রাগ করতে দেখে উনি আমার পিঠ চাপড়ে হেসে উঠলেন। বেশ—বেশ। এ একটা দৃষ্টান্ত আমার দেখা যাতে করে তোর বুদ্ধির উপর খানিকটা আস্থা রাখতে পারি। কাল হা স্টেশনে যাবি বুঝলি? বেশ করে লক্ষ্য করবি মানুষের চালচলন। যাকে মনে হবে স্কুলার ট —সন্দেহজনক চরিত্র—তাকে ফলো করবি। কি কি ঘটে টুকে রাখবি নোটবুকে—তারপর আমায় দি দিবি। কেমন?

আপনার দেখা পাব কোথায়? আপনি তো মাঝে মাঝে এমন ডুব মারেন—মাসের পর পাত্তাই পাওয়া যায় না।

ওইটিই যে আমাদের ডিউটি। হাসলেন মুলমামা। ডুবুরি না হলে রত্নের সন্ধান মেলে? একেবারে অতলে তলিয়ে যাই না আমরা। ওই হাওড়া স্টেশনেই হয়তো দেখতে পাবি। চি পারবি নে। আচ্ছা—যাতে চিনতে পারিস সে ব্যবস্থা করে রাখব। এখন আর আরও খানিকটা তা দিয়ে তোকে কাজের উপযুক্ত করে দিই—তারপর বুঝব তোর বাহাদুরি।

অনেক দিনের ইচ্ছা—পুলিশ লাইনে ঢুকব—অন্তত মনের গোয়েন্দাগিরি করব। মুলমা কাছে তাই মনোভিলাষ ব্যক্ত করেছিলাম। উনি ইচ্ছা করলে আমায় যথেষ্ট সাহায্য করতে পার ...জানি! আই-বি ব্র্যাঞ্চের একজন নামকরা কর্মী উনি। ইংরেজ আমলে পদোন্নতি হয়েছিল কৃতিত্বের গুণে—স্বাধীন ভারতে তার জের টেনে অফিসার হয়েছেন। চাঁদের পিছনে ছায়ার মত লেগেছি একথা—যাঁদের অশেষ নির্যাতন ও কারাবাসের নিমিত্তমাত্র হয়ে কর্মখ্যাতি লাভ করেছিলেন—তাঁ ওঁকে খাতির করে আরও উন্নতির শিখরে তুলে দিয়েছেন। ছায়াটা এখন দিক পরিবর্তন করেছে।

২

কুলমামার উপদেশমত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলাম। আহারাদি সেরে দুপুরবেলায় এলাম। স্টেশনে।

হাওড়া স্টেশনকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায় অনায়াসে। জলময় সমুদ্র আর জনময় এমনিতেই সমুদ্র চঞ্চল; বিক্ষুব্ধ ঢেউগুলি লম্ব করে বেলাভূমিতে ভেঙে ভেঙে পড়ছে, গর্জনে তালা লাগার জো। স্টেশনে ট্রেন পৌঁছলে যে ঢেউ প্ল্যাটফরমে ভেঙে পড়ে আর তা থেকে যে ওঠে—তার চেহারাটা হুবহু এক। কিন্তু বড় বড় ঢেউগুলি সর্বদাই উঠছে না—সব সময়ে সম্ভবও না। সকালে ঘণ্টা দুই-তিন, বিকেলেও দু'তিন ঘণ্টা ঝড়ে ফুলে ওঠে সমুদ্র। সে স্রোতের মুখে সব কিছু কুটোর মত ভেসে যায়—মানুষের চেহারাটা তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। শুধু একটি দ্রুতগতিচালিত সর্বাঙ্গের বিক্ষেপ চকিতে ভেসে উঠে চকিতে মিলিয়ে যায়। বহু মানুষের মধ্যে একটি মানুষকে তখন চিহ্নিত করা সহজ কি? সে চেষ্টাও করিনি। আমি শুধু লক্ষ্য করি প্ল্যাটফরমের বাইরে বিরাট ছাউনির তলায় কিংবা বিশ্রামাগারে যারা কিছু সুস্থির হয়ে চলাফেরা—অথবা আলাপ-আলোচনায় মগ্ন রয়েছেন—সেই মানুষগুলিকে। এঁদের চলন, চাউনি, কথা ভঙ্গি, পোশাক-পরিচ্ছদ, লাগেজপত্র—সবকিছুই লক্ষ্যণীয়। সন্দেহ জাগলে এইগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ করাই বিধি। যেখানে সন্দেহ—সেইখানে একতাল অন্ধকার—আর সেইখানেই সযত্নে আলো জ্বালি সমাধানের চেষ্টা করবে—উপদেশ দিয়েছিলেন কুলমামা।

তাঁর উপদেশ মত চলছিলাম।

সিগারেট স্টলের কাছে—গোল ঘড়িটার নীচের দাঁড়িয়ে আছি ঘণ্টাখানেক ধরে। কত পোশাক পরা মানুষ আসছে—যাচ্ছে, তাদের ভঙ্গীতে ও আলাপে বিরাট ছাউনিটা মুখরিত হয়ে আসা-যাওয়ার দুই বিপরীত স্রোত কখনো উত্তাল হচ্ছে—কখনও স্তিমিত, লাগেজবাহী মানুষের দৌড়চ্ছে কতজন—কেউ বা একরাশ ছেলেমেয়ে সামলাতে সামলাতে গলদঘর্ম হচ্ছে একটু পা আসার জন্য মন্থরগতি স্ত্রীকে লাগাচ্ছে ধমক—এই সব অবাক চোখের দেখার জিনিসই এসব শুধু এড়ি করছি—চলতে চলতে থামল কে—পিছনে সাবধানী দৃষ্টি ফেলল কোনজন, কার দৃষ্টিতে উদ্‌ভ্রান্ত ভা গলায় কথা বলছে কে—কিম্বা ইসারা করছে কাকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছি সব, সন্দে অবকাশ ঘটছে না। সবই যেন স্রোতে-ভাসা কুটো—পলকপাতের মধ্যে দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে তার জায়গায় ভেসে আসছে নূতন মানুষ—নূতন ঘটনা—নূতন ইঙ্গিত। হঠাৎ চেয়ে দেখি—এক স্রোতের গতিটা বেশ মন্থীভূত হয়েছে—কয়েকজন মানুষ এক হয়ে হাত মুখ নেড়ে তর্ক জুড়ে উৎফুল্ল মনে এগিয়ে গেলাম। নিশ্চয় সমাজ-বিরোধী কোন ঘটনা।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি জনতাব্যূহবদ্ধ এক প্রৌঢ়া বিধবা বিপন্ন মুখে কি যেন বলছেন। কাছে এসে দাঁড়ালাম।

একজন লোক তখন বলছেন, আপনি ভুল করছেন মা—অপরিচিত মানুষকে বিশ্বাস করতে নে—বিশেষ এই অজানা জায়গায়।

বিধবা বললেন, ভদ্রলোককে যদি বিশ্বাস না করব তা'হলে পথ চলব কেমন করে বাবা! উনি তো আপনাদেরই একজন।

না গো বাছা। ভাল পোশাক পরলেই কি মানুষ ভাল হয়! ওরা নানান্ কিকিরে ঘোরে।

আমি কি করে জানব বাবা। বুড়ো মানুষ—তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে যার—সে এত বিশ্ব-ঘাতুকী হবে! বললে, মা, আপনাকে ঠকিয়েছে টিকিটবাবু। কম দামের টিকিট দিয়েছে—বেশী দূর যেতে পারবেন না তো।

একজন প্রশ্ন করলেন, আপনি বুঝি ওকে টিকিট দেখিয়েছিলেন।

হ্যাঁ বাবা। ভদ্রলোক মশায় বলে বিশ্বেছিলেন পই পই করে, বেজানা জায়গা—বখুনি কি কেনাকাটা করবে হিসেব মিলিয়ে নেবে। তাই ভাবলাম—রেলবাবু টিকিট তো দিলে—কোনখেনের টিকিট কাউকে শুধিয়ে নিই একবার। উনি যাচ্ছিল এই দিক দিয়ে—আমার মনের কথাটি যেন অন্তর্যামি হয়ে বুঝে নিয়ে বলল, হাঁগা মা, কিছু বলবে কি? আঁচলের গেরো খুলে টিকিট বা'র করে বললাম বাবা, এইটে পড়ে ভাখেন তো ঠিক আছে কিনা। বড্ডমান যাব আমি। উনি চশমাটা কাপড়ে মুছে-ভাল করে দেখে বলল, কি বললে মা, বড্ডমান? কিন্তু টিকিট তো তোমায় দেখছি ছিরামপুর পঞ্চন্ত এখান থেকে আরও দেড় টাকা ভাড়া লাগবে। বললাম, সে কি বাবা, আমি যে দু'টো টাকা দিলা রেলবাবুকে, উনি এই টিকিটখানা আর পাঁচটা নতুন পয়সা দিলে। তা'লে কি—। ভদ্রলোক বলল তোমাকে মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকিয়েছে মা। আচ্ছা, আমিও দেখছি কেমন রেলবাবু ও! দাও তে টিকিটখানা—ওর জুয়োচুরির নিকুচি করেছে। বলে টিকিটখানা নিয়ে উই জানালার দিকে চলে গেল তারপর থেকে হা-পিত্যেস হয়ে বসে আছি—উনি আর এলো না।

ভিড়ের ভিতর থেকে একজন বলল, জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছেন আপনি। আপনার টিকি ঠিকই ছিল—সেটি বেচে দিয়ে পয়সা নিয়ে ব্যাটা সরে পড়েছে।·· মেয়েছেলেদের ঠকানো সহজ বলেই—

শেষ পর্যন্ত দয়ালু ভদ্রলোকদের চেষ্টায় মহিলাটি সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেলেন। আমার মাথা একটি কথা গেঁথে রইল মোক্ষম ভাবে—মেয়েছেলেদের ঠকানো সহজ।

যেমন এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করলাম। মেয়েদের বিশ্রামাগার আর কাউন্টারের সামনে···ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। এই সব জায়গাতেই প্রতারণার নূতন কোন দৃ অবশ্যই চোখে পড়বে।

কিন্তু হায়—একটি অপ্রীতিকর মন্তব্য কানে গেল,···মিন্‌সেগুলোর আক্কেল দেখেছ দিদি মেয়েদের সামনে ঘুর ঘুর করে না বেড়ালে যেন ভাত হজম হয় না! মরণ দশা!

সরে গেলাম সেখান থেকে। সেদিন আর কোন সন্দেহজনক ব্যাপার চোখে পড়ল না।

পরের দিন হাওড়া স্টেশনে গেলাম।

গিয়ে দেখি শত কালের মত এক জায়গায় চাপ বেঁধে হৈ হৈ করছে মানুষ। নিষ্ফল বিতর্ক নয়—রীতিমত উত্তেজনায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছটফট করছে ওরা।

মার ব্যাটাকে, আচ্ছা করে পিটলে তবে যদি আক্কেল হয়।

না, না, পুলিশে দাও, ওরা যা করবার করুক গে। আইন নিজের হাতে নেওয়া ভাল নয়

পুলিশ কি করবে! ওরা যদি ঠিকমত ডিউটি করে, তাহলে এমন ব্যাপার হয়?

কি—কি হয়েছে মশায়?

নতুন কতকগুলি দর্শকের সঙ্গে আমিও রঙ্গস্থলে পৌঁছে প্রশ্ন করছি তখন।

দেখুন মশায়—ব্যাপার দেখুন, এই ভদ্রমহিলা টিকিট করতে দিয়েছিলেন ওই ভদ্রলোককে একজন রুখে উঠলেন, আর ভদ্রলোক বলবেন না দয়া করে।

তা যা বলেছেন মাদা—আমাদের সকলকার মুখেই চুনকালি লেপে দিয়েছে। এই লো টিকিট করতে দিয়েছিলেন মহিলাটি। একখানা দশ টাকার নোট দিয়েছিলেন। তা উনি টি সঙ্গে ফেরত দিচ্ছেন মাত্র চব্বিশটি নয়া পয়সা। ব্যাণ্ডেলের টিকিট। বলছেন—মহিলাটি নাকি এক নোট দিয়েছিলেন একখানা।

ইস্—বলেন কি? দিনে-দুপুরে ডাকাতি। মার ব্যাটাকে।

কিন্তু সে সুযোগ ঘটল না—রঙ্গমঞ্চে পুলিশের আবির্ভাব হলো।

যারা দুষ্কৃত দলনার্থে চড় উঁচিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা পিছিয়ে এসে ভিড়ের গায়ে গেলেন। যাঁরা আস্ফোলন করেছিলেন দূর থেকে তাঁরা মন্তব্য করলেন, মিছে দাঁড়িয়ে থেকে আপি হই কেন—ও যাদের ব্যবস্থা তারাই করবে। তাঁরাও সরে পড়লেন। পাতলা ভিড়ে পড়ে রইলাম আ আমারই মত জন দুই বেকার ছেলে!

পুলিশ অফিসার আমাদের পানে চেয়ে বললেন, আপনারা দয়া করে আসবেন আমাদে সাক্ষী হিসাবে অবশ্য।—

কৌতূহলী হয়ে আমরা ওঁর সঙ্গ নিলাম।

আফিস ঘরে এসে বসলেন ইন্‌সপেক্টর। বিষয়টাকে পরিষ্কার করে নেবার জন্যে প্রাথমিক য করলেন।

প্রথমে মহিলাটির জবানবন্দী নেওয়া হলো।

উনি বললেন, আমার ঠিকই মনে আছে বাবা, দশ টাকার একখানা নতুন নোট দিয়েছি ভদ্রলোককে ব্যাণ্ডেলের টিকিট কাটবার জন্যে। উনি একখানা টিকিট আর এই ক'টি পয়সা আমা দিয়েছেন। আমি অনাথা মানুষ--তার মন্দ কিছু জানি না—কখনো কোনো রাস্তায় বেরুই নি—

আচ্ছা সব শুনলাম—এইবার ওর বক্তব্য শুনি। ইন্‌সপেক্টর ফিরলেন ভদ্রলোকের দিকে। কি বং আপনি?

ভদ্রলোকের মুখ পাংশু হয়ে গিয়েছিল। আগাগোড়া ব্যাপারটাই ওর কাছে অদ্ভুতপূর্ব ঠেকছি হয়তো। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, আমার কথা শুনছেই বা কে—বিশ্বাস করবেই বা কে এক টাকার একখানা ময়লা নোটে এত ময়লা উঠে আসবে তা কি ভাবতে পেরেছিলাম। উঃ—বড় কাল!

আপনার যা বক্তব্য নির্ভয়ে বলুন।

কি বলব আর—আমরা পিছু ডাকা কুসংস্কার মনে করি। বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছি—মেয়ে পি ডাকলে—বাবা লক্ষ্মে আসবে আজ। সারা পথটা খুঁত-খুঁতে মন নিয়ে আসছি। স্টেশনে এসে দেখি—উ বিষণ্ণমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। পাশ কাটাচ্ছিলাম, কানে গেল, বাবা শুনছেন, আমায় যদি দয়া করে একখা টিকিট কেটে দেন। বললাম, মেয়েদের জন্য আলাদা টিকিট ঘর আছে ওই দিকে যান। বললেন, আপ দয়া করে টিকিটখানা এনে দেন। ঘর থেকে বার হই নি কখনো—আজ নিতান্ত দায়ে পড়ে···। ভাবল হয়েও বা—মানুষের কখন কি বিপদ হয় ঠিক তো নেই। তা ছাড়া চোখের জলকে অবিশ্বাস করতে শিখিনি দয়াবৃত্তির চর্চা করলাম। কিন্তু সে যে এমন সাংঘাতিক ভাবে আমাকে নাকের জলে চোখের জলে নাকাল চোবানি খাওয়াবে—

বাধা দিলেন ইন্‌সপেক্টর, থাক ওসব কথা। ভাল করে ভেবে বলুন দিকি—যে একটাকার নোটখা উনি দিয়েছিলেন—সেটা ময়লা ছিল কি না?

যতদূর মনে হয়—এই ব্যাপারটার চেয়েও নোংরা।

ভদ্রলোক রসিক মনে হ'লো।

এবার মহিলাটির দিকে ফিরলেন ইন্‌সপেক্টর, আর আপনার দশ টাকার নোটখানি একেবা ঝকঝকে নতুন। তাই বললেন না?

মহিলাটি একটু থতমত খেয়ে সামান্যক্ষণ কি যেন ভাবলেন। পরে জোর দিয়ে বললে একেবারে নতুন বাবা, একটুও দাগ ধরেনি।

অভিযুক্ত পুরুষটির দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন ইন্‌সপেক্টর, কত নম্বর কাউন্টারে টিকিট কেটেছিলেন মনে আছে?

···উনিশ নম্বর। একটা লম্বা ঝাঁকা ছিল তার মাথায়।

অলরাইট। ইন্‌সপেক্টর তাঁর সহকর্মীর দিকে ঝুঁকে কানে কানে কি যেন বললেন। সঙ্গীটি মুচ্‌কি হেসে ঘাড়-হেলিয়ে যার হয়ে গেল।

এইবার আমাদের দিকে ফিরলেন উনি। আপনারা কি বলেন?

আমার সঙ্গী দু'জন আমতা আমতা করে বলল, প্রথমটা কি হয়েছিল জানি না—গোলমাল শু আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। মনে হয় ভদ্রলোকের কথা ঠিক নয়।

আপনি ?

আমি বললাম, আমি অনেক পরে এসেছি। তবু মনে হয়—মেয়েরা এমনভাবে উলটো চা পারেন না।

আপনার এ ধারণার হেতু ?

কালই এখানে একটা ব্যাপার দেখেছিলাম। বলে সংক্ষেপে সেটা বললাম।

ইন্‌সপেক্টর হেসে বললেন, ওঃ—অ্যাজিওম্যাটিক ট্রুথ! আপনি তা'হলে নিঃসন্দেহ।

ওর এই মন্তব্যে ঘমে গেলাম; সাহস হারালাম না। বললাম, সব জায়গাতেই দেখছি ে ঠকেন।

তা বটে। উইকার সেক্স কিনা।

মনে মনে ক্রুদ্ধ হলাম, কিন্তু ক্রোধ প্রকাশের উপায় ছিল না!

এমন সময় ওর সহকারী অফিসারটি ফিরে এলেন। দু'জনে অনুচ্চ স্বরে কি যেন করলেন। প্রধান অফিসার বার দুই তিন ঘাড় নাড়লেন—হাসলেন। তারপর এদিকে ফিরে দেখুন—আপনাদের দু'জনকেই চালান দিতে বাধ্য হব—যদি না সত্য কথা বলেন।

মহিলাটির দিকে ফিরে বললেন, চার্জটা শুধু এর বিরুদ্ধেই নয়—আপনিও জড়িত হয়ে প আপাতত দু'জনকারই বডি সার্চ করানো হবে। তারপর—

ওঁদের পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন।

আমার সঙ্গী দু'জন যুবককেই বললেন, আপনাদের নাম ঠিকানা রেখে আপনারা যেতে আজ্ঞে—নমস্কার।

সবাই চলে গেলে আমায় বললেন, আপনি সত্যবাবুর তাগে, নয়? দেখবার চোখ আছে, কিন্তু গোড়া থেকেই একটি ভুল সূত্র ধরে বিভ্রান্ত হয়েছেন। একটি কথা সর্বদা মনে র পাবলিকের চোখ আর পুলিশের চোখ এক নয়। পুলিশের চোখ দিয়ে যখন দেখবেন সব জিনিসকেই ঘুরে রাখবেন। একটা কিছু ধারণা নিয়ে—একটু সহানুভূতি নিয়ে যদি তদন্ত করতে যান—অমনি ভুল

আশ্চর্য হয়ে বললাম, আপনি জানেন আমাকে?

জানি। সত্যবাবু সব বলে গেছেন আমাকে। জানেন—এই মহিলাটি হলেন চিট, নির্দোষ।

কেমন করে জানলেন?

…কুইরি করে জানলাম—উনিশ নম্বর কাউন্টারে একখানিও বক্সকে দশ টাকার নোট ছিল না অতি ময়লা এক টাকার একখানি নোট পড়ে রয়েছে। দু' একজনকে চেহারার বর্ণনা দিয়েছিলেন ব —ময়লা বলে তারা নেয়নি। মাত্র ঘণ্টা খানেক হলো কাউন্টারের চার্জ বুঝে নিয়েছেন ক্লার্ক—ে টিকিট বিক্রী হয় নি।

বললাম, এমনও তো হতে পারে একশো টাকার ভা নোতে ওই দশটাকার নোটখানা হাতকে ধরে গেছে।

তাহ'লে একশো টাকার নোট একখানা কাউন্টারে থাকবে নিশ্চয়। ওখানে একখান একশো টাকার নোট নাই।

অন্য কাউন্টারের ক্লার্ক যদি দশটাকার বদলে সেটা নিয়ে থ কেন?

হেসে ফেললেন অফিসার। বললেন, সত্যবাবুর তাগে বটে আপনি—তাঁর মতই জেরাটা করলেন ধন্যবাদ। কিন্তু সে কথাও আমরা ভেবেছিলাম। ক্লার্ক বলেছেন, তিনি কাউন্টারে যাবার পর ও-ধরনে লেনদেন মোটেই হয় নি—অর্থাৎ একশো টাকার ভাঙানি নেয়নি কেউ।

এই সময়ে ওঁর সহকারী অফিসারটি বার হয়ে এলেন হাসতে হাসতে। বললেন, ভদ্রমহিলা বেয় ঘাবড়ে গিয়ে কান্নাকাটি করছেন স্যার। বলছেন, এবারের মত আমায় মাপ করুন, এমন কাজ আর করব ন নেহাত অভাবে পড়ে একাজ করেছি।

আমার পানে চেয়ে বললেন অফিসার, কি বলেন, মাপ করব?

মাথা নীচু করে বললাম, না, ওকে সাজা দিন।

সাজা দিবার মালিক আমরা নই—সে বিচার কোর্ট করবে। যাক, ওর নামে চার্জসীট তৈরী কর।

৪

শিক্ষা হয়ে গেল রীতিমত। এসব ব্যাপারে কোন পক্ষ অবলম্বন করলে বিচারে ভুল হয়। ঘটনা সঙ্গে যাঁরা যে ভাবেই জড়িত থাকুন—সকলকে সমান ভাবে দেখাই হল তদন্তকারীর কর্তব্য। কেউ সন্দেহ অতীত নন, পুরোপুরি দোষীও নন কোন ব্যক্তি। ঘটনা, ব্যক্তি, চরিত্র, সমস্তই নৈর্ব্যক্তিক তুলাদণ্ডে চাপি তোল করতে না পারলে প্রকৃত দোষীকে চিহ্নিত করা কঠিন ব্যাপার। অতঃপর এই নীতি ধরে কাজ কর হবে।

পরের দিন দুপুর বেলায় এসে দাঁড়িয়েছি গোল ঘড়িটার নীচেয়—দেখি রেলিঙের ওপাশে আর এ তরুণ দাঁড়িয়ে। দিব্যি ফিটফাট স্মার্ট ধরনের ছেলে। পরনে ঢোলা পায়জামা—হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের পাঞ্জা পায়ে হাওয়াই চটি, চোখে দৃষ্টি ঢাকা নীল চশমা, পিছন-ঠেলা চকচকে চুল, ঘাড়ের কাছে খড়িমা ঘাসের মত খানিকটা সাদা গুঁড়ো। ছোকরার মুখে উদ্বেগের ছায়া—সেটা স্পষ্ট নয় যদিও। চো চাউনির সঙ্গে হৃদয়ভাবের যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—এমন বুঝি কিছুতে নয়। দৃষ্টি হল মনের দর্পণ, কিন্তু চশমায় ঢাকা দু'টি চক্ষু-দর্পণে কোন ছায়া কখন ঘন হয়ে উঠছে কে বুঝবে? তবু চাল-চলন কে অস্বাভাবিক ঠেকল। ছেলেটি বার কয়েক বাঁ হাতের কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল—যদিও মাথার উপরে টাঙা রয়েছে প্রকাণ্ড ঘড়িটা। দু'বার পা বদল করে ডাইনে বামে হেলল, একবার রেলিংটা চেপে ধরে হাতের মুঠোয় বাঁ হাত দিয়ে বার তিনেক মাথার চুলগুলো পিছন দিকে ঠেলে দিলে, অবশেষে প

থেকে বার করলে প্লাস্টিকের সিগারেট কেস। সবে তা থেকে সিগারেট বার করে ঠোঁটে চেপে লাই জ্বেলে মুখের কাছে নিয়ে গেছে—অমনি লোকাল ট্রেন এসে থামল প্ল্যাটফরমে। জনস্রোতের মত ঘ ছড়িয়ে পড়ল স্টেশনে। সিগারেট ধরালে না ছোকরা। কেসের মধ্যে সিগারেট পুরে লাইটার সমেত পকেটে ফেললে—জনস্রোতের পানে চেয়ে রইল নির্নিমেষে। একটু ভুল হল আমার বর্ণনায়। দৃষ্টি ওর হীন কিনা—নীল চশমার আবরণ ভেদ করে দেখতে পাইনি, শুধু নিশ্চল দেহবিন্যাসে মনে হল দৃষ্টিও। জনতার সঙ্গে নিশ্চল হয়ে লেগে রয়েছে।

জনতা পাতলা হতেই একটি ছেলেকে দেখা গেল এই দিকে এগিয়ে আসছে হাসিমুখ সমবয়সী ছেলে। ইনিও এগিয়ে গেলেন খানিকটা। কাছে এসে দু'জনের প্রীতি সম্ভাষণ ও করমর্দন।

উঃ—দুটো থেকে অপেক্ষা করছি।

কি করবো দুখানা ট্রেন মিস করলাম যে।

বেশ করেছ—ওদিকের খবর?

আগন্তুক এদিক-ওদিক সন্তর্পণে চেয়ে নিলে একবার। তারপর গলা নামিয়ে বললে, চলে

ইনিও গলা নামিয়ে বললেন, মধু এলো না কেন? রাজী হয়েছে তো?

কথাটা এখনও পাড়তে পারিনি।

বলিস কি! এদিকে সব আয়োজন কমপ্লিট। তাহলে উপায়!

চুপ এদিকে আয়—আরও কথা আছে বলছি।

ওকে হাত ধরে টেনে আনলে সিগারেট স্টলের ডান ধারে। ফিস ফিস করে খানিকটা কি বুঝলাম না। আন্দাজ করে নিলাম ব্যাপারটা রহস্যময়।

আরও কিছুক্ষণ ফিসফাস চাপা গলায় আলাপ চালিয়ে প্রতীক্ষমান ছেলেটি দ্রুতিগম্য স্বরে তাহলে কাল সন্ধ্যের পর—

না—এমনি সময়ে আসবি। দুপুরই সবচেয়ে ভাল সময়। নিরিবিলি।

বেশ করমর্দন করে ওরা বিপরীতমুখী হল। আগন্তুক স্টেশনের বাইরে—প্রতীক্ষমান প্ল্যাট অভ্যন্তরে।

ঠিক করলাম কাল দুপুরে আমিও আসব।

৫

দুটো বেজে দশ মিনিটে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফরমে এসে থামল ট্রেন। তাড়াতাড়ি গেটের মুখে দাঁড়ালাম। জলস্রোতের মত জনস্রোত অবিরল ধারায় বয়ে চলেছে—সাধ্য কি এক জোড়া চোখের বন্ধকে খুঁজে টেনে তোলা। ভিড় পাতলা হলে দেখলাম ওদের। দু' পাশে দুই মূর্তি—মাঝখানে এক

মুখী তরুণী। সুখরী না হলেও—সুশ্রী মেয়ে। স্লিপার পায়ে বেণী দোলানো কুমারী মেয়ে, হাতে উল বুনবার সৌখিন সংস্করণ একটি ভ্যানেটি ব্যাগ।

গেট পার হয়ে ওরা বুকস্টলের কাছে একবার থামল। সেখানে নানা আকারের সাপ্তাহিক মা ত্রৈমাসিক ইত্যাদির প্রদর্শনী। মেয়েটি দু'একখানা কাগজ তুলে খালি নাড়াচাড়া করল; একখানি সাইজের পত্রিকা তুলে নিলে। পাশ থেকে মলাটের ছবিটা দেখতে পেলাম। একটি স্বাস্থ্যবান যুবক সুপুষ্ট পেশী সমন্বিত হাত দু'খানি মাথার উপরে তুলে হাসছে। অনাবৃত দেহের প্রতিটি অংশে শা সুষমা—পৌরুষ মহিমামণ্ডিত কান্তিমান দেহ। সুসমঞ্জস ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলিতে স্বাস্থ্য সমাচার বিঘোষি ওর উন্নত বাহুর সমান্তরালে পত্রিকার নাম পরিচয়—'স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য।'

কত দাম? শুধোল মেয়েটি।

চার আনা।

মাত্র চার আনায় এমন চমৎকার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য! মন্তব্য করলে, একটি ছেলে।

মেয়েটি ঘাড় বাঁকিয়ে ভ্রূকুটি করল, ডিসপেপটিক বাঙালী ছেলেরা এমন জিনিস কল্পনা ক পারে?

পারে বইকি। আজকাল গ্রামশ্রী মেলাশ্রী রাজ্যশ্রীদের ছবি দেখনি?

দেখেছি। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছে, এ আর ক'টা দিন।

দেখবি—দেখবি—আজও দেখবি। বলে দ্বিতীয় ছেলেটি হেসে উঠল।

মেয়েটি ভ্রূকুটি হেনে বললে, ইস্,—দাম পড়েছে আমার—দেখতে! চল—টি স্টলে গিয়ে বসিং

তিনজনে ওয়েটিং হলের একান্তে টি স্টলে গিয়ে বসল। ওদের একটু দূরে আমিও বসলাম।

চায়ের সঙ্গে টোস্ট এলো—অমলেট বিস্কিট এলো। চায়ের পেয়ালার টুংটাং শব্দের সঙ্গে ওদের গলার আলাপ জমে উঠল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমার মনে তখন নানান চিন্তা। এই অতি সাধারণ ত তরুণীদের নিয়ে আমি কেন রহস্য কল্পনার জাল বুনে চলেছি! শহরের যে-কোন জায়গায় এরা সুল প্রতি মতে দেখছি এদের। ময়দানে, পার্কে, রেস্টুরেন্টে, কফি হাউসে, সিনেমা হলে, কলেজ প্রাঙ্গণে, পাঠাগা চলন্ত ট্রামে, ফুটপাথে এরা একত্র হলেই এমনি ধরনের হাল্কা আলাপ বা কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা স্থান কাল ও আলাপ আলোচনার সামান্য রূপান্তর মাত্র। এই যে চা খেতে খেতে নীচু গলায় এরা যা বা —তা স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছি।

চল—চা খেয়ে মেট্রোয় ম্যাটিনি শো-টা দেখে আসি।

কি বই আছে?

বই যাই থাক না—এই গরমে ঘণ্টা দুয়ের জন্য সিমলা হাজিলিং-এর স্বাদ নেওয়া মন্দ কি!

তারপর?

ওখান থেকে ট্যাক্সিতে ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে লম্বা একটা ট্রিপ, কারপোতে ডিনার, তারপর··

হঠাৎ চায়ের পেয়ালাটা উল্টে পড়ল তরুণীর হাত থেকে। ত্রাস্ত কণ্ঠে ও বলে উঠল—না, এ হতেই পারে না, কোয়াইট অ্যাবসার্ড! উঃ—কি ভয়ঙ্কর লোক তোমরা!

সকলের দৃষ্টি এইদিকে পড়ছে দেখে কণ্ঠস্বর সংযত করল। বলল, মাপ কর আমাকে—° ট্রেনেই ফিরে যাচ্ছি আমি।

অকৃত্রিম রোষ কটাক্ষ ক্ষেপণ করে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সে।

যুবক দুটিও সামান্য ক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।···এরাও উঠে দাঁড়িয়েছে তখন একজন মেয়েটির পাশে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, আঃ—শুধু শুধু সীন ক্রিয়েট করছিস কেন? ! ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসিগে।

না ফিরেই যাচ্ছি আমি।

আঃ—কি হচ্ছে ছেলেমানুষি! যুবকটি ভ্রূকুটি হানল।

ছেলেমানুষি! আমরা বুঝি হাটের পণ্য! রোষ ভরে এগিয়ে গেল মেয়েটি।

কি বিপদ—কথাটি মোটেই বুঝছ না। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে চলল।

অপর যুবকটিও চায়ের বিল মিটিয়ে ওদের সঙ্গী হল।

আমিও পায়ে পায়ে এগুচ্ছি। এক মুহূর্ত আগেও ভাবতে পারিনি—কল্পনার চিত্র এমন হয়ে উঠবে! এ কি ইলোপমেণ্টের ব্যাপার? কিংবা আরও নীতি বিগর্হিত কিছু-টা আজকাল হয়ে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রায়ই উঠছে! জানি এই স্টেশনে জাল বিছিয়ে ঘোরাঘুরি করছে সিসিং স্কে স্টেশন ইয়ার্ডেই রয়েছে রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট। রেল পুলিস পরিবেষ্টিত ও পশ্চাদ্ধাবমান জনতার পুরে হয়ে তরুণ-তরুণীদের প্রায়ই ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট অভিমুখে আসতে দেখা যায়। এখানে প্রায়ই যা ঘটে· ও রোমান্সের তেমন মনরোচক কাহিনী বইয়ের পাতাতেও ক্বচিৎ পাওয়া যায়। বেশ বুঝছি—তেমনি একটি মনরোচক কাহিনীর জাল বুনে চলেছে। নায়িকার ভূমিকাটি স্পষ্ট; কিন্তু দুটির নায়ক কোনটি—ঠিক করতে পারছি না। দুটি হলেই বা ক্ষতি কি!

যাই হোক—এদের দুই ছাড়া করলে চলবে না, এবং যাতে এরা মিসিং স্কোয়াড কবলিত আমার চাকরির দরখাস্তের প্রধান বয়ান—as regards my qualification লাইনটি ব্যর্থ করে না সে দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। আজকের সুযোগ নষ্ট হলে ফুলমামাকে মুখ দেখাব কি করে!

ওদের চোখে চোখে রেখে চলছি। প্ল্যাটফরমের দিকে চলতে চলতে যুবক দুটি রীতিমত করতে লাগল। মেয়েটি একবার করে মাথা বাঁকায় আর এগিয়ে যায়। ক্রমাগত অনুনয়-বিনয়ে ন নরম হ'ল মেয়েটি।·····গতিপথ পরিবর্তিত হ'লো। এবার···ক্যাণ্টনমেণ্ট পার হয়ে দলটি পৌছল প্রথম বিশ্রামাগারের সিঁড়ির মুখে, এবং একটু ইতস্তত না করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেল।···· আমিও রয়েছি।

এ এক নূতন রাজ্য। এক তলায় প্রশস্ত গাড়ী বারান্দার উপর প্রশস্ত ছাদ—টবে বাগানো ফুলের সজ্জায় ছোটখাটো একটি পার্ক যেন। সামনে গঙ্গা—ওপারে সৌধনগরী কলকাতা। বামে বক্‌ঝকে হাওড়া ব্রীজের খানিকটা গঙ্গায় ঝুলছে, দক্ষিণে আদল নগরের কোলে জলনাগরীর পত্তন—যে কোলে কোলে নানা ধাঁচের জাহাজের মেলা। নীল আকাশের নীচেই সাঁতার কাটছে এক ঝাঁক চিল তাদের নীচেঃ...গঙ্গা সমেত দুই নগরের ঘর্ম্মাবলী, আবার গঙ্গার স্রোতে ভাসছে একরাশ সাদা ফুলের সিন্ধু পারাবতের দল। ছোট বড় মাঝারি নৌকা চলছে—কাজ তারি সীমায় ছুটছে, বয়া ভাসছে, ফ বোটের জটলা···

ওরা ঘরের মধ্যে না গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল এই অপরূপ মিছিল।

বাঃ—কি সুন্দর! মেয়েটির রোদ রক্তিম দৃষ্টিতে সৌন্দর্য তন্ময়তার আবেশ।

কতক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে থাকবি? একজন যুবক বলল।

যতক্ষণ খুশি। হেসে জবাব দিল মেয়েটি। ট্রেন ধরবার তাড়া নেই তো।

তাহলেও—তাড়া একটু রয়েছে তো।

না—কোন তাড়া নেই। শহরে ঢুকলে সেই তো দম বন্ধ করা—ধোঁয়া।

চেয়ার আনব ঘর থেকে?

কি হবে—এই তো বেশ আছি।

সত্যিই কি ওপারে যাবি নি?

মানে কলকাতায়? মেয়েটি নিঃশ্বাস ফেলে খানিক চুপ করে রইল। পরে বলল, জানি যেতেই হ না গিয়ে উপায় যা কি!

বুঝলাম—এর পিছনে পীড়নের ইঙ্গিত রয়েছে। মেয়েটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমন একটি ঘটনায় জড়ানো হচ্ছে—যা হয়তো নীতিবিরোধী। যা হয়তো·····, কিন্তু আমার বিচার বিশ্লেষণ এখন থাক, কিছু করতে হয় এইটুকু সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।

তাড়াতাড়ি নেমে এসে রেলওয়ে পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরের আপিসে ঢুকলাম।

টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কি লিখছিলেন ইন্‌স্‌পেক্টর। আমায় দেখে মাথা তুলে বললেন, হ্যালো আপনি সত্যবাবুর ভাগ্নেকে না? ব্যাপার কি?

ঘটনাটা সংক্ষেপে বিবৃত করে বললাম, ওদের চালচলন সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে।

.ইয়েস, কোয়াইট এগ্রি উইথ ইউ—ইয়ং ম্যান। চলুন—দেখে আসি। বলে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন। ঘরের বাইরে এসে একজন টিকিট চেকারকে বললেন, চ্যাটার্জি—আপনাকে একটু যেতে হবে। একবার আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমটা চেক করতে হবে। সন্দেহ হচ্ছে—আপার টিকেট না কয়েকজন যাত্রী ওখানে ঘোরাফেরা করছে।

টিকেট চেকারকে নিয়ে আমরা যখন পৌঁছলাম, তখনও মেয়েটি উন্মনচিত্তে বন্ধুর দুপুরের গঙ্গা ও শহরকে দেখছে।

টিকেট চেকার···রসভঙ্গ করে বললে, আপনাদের টিকেট দেখাবেন দয়া করে?

টিকেট!—তিন জনেই চমকে উঠল।—তরুণ দু'জনের তো মুখ শুকিয়ে এতটুকু। ওরা আমতা আমতা করে বলল, আমরা এষ্টেশনের বাইরে থেকে আসছি।

কতক্ষণ হল এসেছেন?

দুটোর ট্রেনে ব্যাণ্ডেল লোক্যালে—প্রায় ঘণ্টাখানেক হল।

ঘণ্টাখানেক হ'ল ট্রেন থেকে নেমেছেন—অথচ শহরে যান নি? আশ্চর্য তো! এবার এঁ এসে প্রশ্ন করলেন, ইন্‌স্‌পেক্টর।

ইন্‌স্‌পেক্টরকে দেখে ওরা আর একবার চমকে উঠল। আমতা আমতা করে বলল, এই মাথা ধরেছে বলে—এই খোলা জায়গায় এসে—

তরুণীটির পানে ফিরলেন ইন্‌স্‌পেক্টর। বললেন, ও—আপনিও এঁদের সাথী? তা কিছু মনে না করেন—দু'একটা প্রশ্ন করব আপনাকে। দেখুন এটা আমাদের ডিউটি। আপনাদের নিরাপত্তার জন্য এমন অপ্রিয় কর্তব্য করতে হয়। জানেন তো—কি সাংঘাতিক জায়গা এই হাওড়া ষ্টেশন—

তরুণী ততক্ষণে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, বেশ তো—জিজ্ঞাসা করুন।

এঁরা—মানে আপনার সঙ্গের এই ভদ্রলোকদের সম্পর্কটা—মানে এরা কি আপনার আত্মীয়?

তরুণী সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল, এরা দুজনেই আমার আত্মীয়।—ভাই।

সহোদর—না কজিন?

একজন—এই ইনি হলেন সহোদর আপন দাদা, উনি পিসতুতো ভাই।

আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন?

আসছি শ্রীরামপুর থেকে, যাব,—একটু ইতস্তত করে মেয়েটি বলল, ভবানীপুর।

মাপ করবেন—জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—ভবানীপুরে কোন প্রয়োজনে যাচ্ছেন?

মেয়েটি মাথা নামিয়ে আঙুলে আঁচলের খুঁট জড়াতে লাগলেন। ওর মুখখানিতে রোদ লেগে ততক্ষণে সোনা বরণ হয়ে উঠেছে।

ইন্‌স্‌পেক্টর পুনরায় বললেন, যদি খুব গোপন কথা না হয় দয়া করে বলুন।

তথাপি নিরুত্তরে আঙুলে আঁচলের খুঁট জড়াতে লাগল তরুণী।

এবার তরুণদের দিকে ফিরলেন ইন্‌স্‌পেক্টর, আপনারা বলবেন কি?

তরুণ দু'জন ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠেই কেমন আনমনা হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে প্রথম তরুণ অর্থাৎ মেয়েটির সহোদর ভাই বলল, একটা প্রাইভেট এনগেজমেণ্টের ব্যাপার ছিল, সেরে আমরা ন'টার ট্রেনে ফিরব।

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন, ভবানীপুরের কোন্ ঠিকানায় আপনারা যাবেন যদি জানান—

এ আর বেশী কি। বলে ঠিকানা জানিয়ে প্রথম তরুণটি বলল, এইবার আমরা যেতে পারি

গম্ভীর গলায় ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন, না। যতক্ষণ না আপনাদের স্টেটমেন্ট টেরিফাই করে নি পারছি ততটুকু সময় আমাদের আপিস ঘরে দয়া করে বসবেন চলুন। ওখান থেকে ভবানীপুরের বাস আমরা ফোন করব, অবশ্য ফোন যদি থাকে। ফোন না থাকে, থানায় ফোন করব যাতে ওঁরা কেউ এ পড়েন। তার পরে আপনারা ফ্রী। কিছু মনে করবেন না।

এইবার দ্বিতীয় তরুণটি উষ্ণ হয়ে উঠল। বলল, আমাদের মিছিমিছি হ্যারাস করছেন জানেন—আইনত—

আইন মেনে চলতে হয় আমাদের—মাঝে মাঝে তাই অভদ্র হতে হয়। শান্তকণ্ঠে বললে ইন্‌স্‌পেক্টর। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ সমস্তই আপনাদের নিরাপত্তার জন্য। আসুন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্রথম তরুণ অনুচ্চকণ্ঠে তরুণীকে বলছিল। কেমন, হ'লো তো খেয়ালের খেসারত দাও এবার! মান সম্মান! এখন ভদ্রলোকেরাই বা কি মনে করবেন কথায় বলে! উঃ—এমন দুর্ভোগেও মানুষ পড়ে!

৬

ঘণ্টাখানেক পরে সসম্মানে মুক্তি পেয়ে ওরা হাসতে হাসতে চলে গেল। ওরা চলে যে নিজের অযোগ্যতার গ্লানি আমায় পীড়ন করতে লাগল। মানুষের হাটে মানুষ চিনতে এসে তিন দি ধরে এমন মারাত্মক ভুলই বা করছি কেন? বয়সের অভিজ্ঞতা নাই, না সব ঘটনার কালো পিঠ সর্বদাই চোখে ভাসে বলে? সকলকে সন্দেহ করব, অথচ মানুষ ও ঘটনাগুলিকে নিরপেক্ষ মন দি বিচার করব—মাছ ধরব, জল ছোঁব না—এ কেমন করে সম্ভব!

সত্য কথনের প্রমাণ দিয়ে ওরা বিজয়ীর মত হাসতে হাসতে চলে গেল। হাঁ—ব্যাপার পারিবারিক আর গোপনীয় বটে। ভবানীপুরের বাড়ীতেই ছিল এন্‌গেজমেণ্ট—পাত্র পক্ষ—দেখতে আসবে মেয়ে। এসব ব্যাপারেও একটি অলিখিত নিয়ম আছে—যা ভদ্রতারই অংশ, যার সঙ্গে ব্যক্তির পরিবারের মান-সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। সেই প্রথামত পাত্র বা পাত্রী পছন্দের কাজটি ঘটে তাদের নিজ নি এলাকায়। অর্থাৎ পাত্রীর বাড়ীতে আসেন পাত্র পক্ষ, পাত্র পছন্দের নিয়ম পাত্রের নাগড়াকে। কাউ অপরের এলাকায় এনে দেখানো সম্মান হানিকর। এই ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষ রাজী হননি শ্রীরামপুর যে ওঁদের অসুবিধা ছিল—সময়াভাব ও মন্দ স্বাস্থ্যের। তাই মেয়েটিকে কৌশল করে আনবার চেষ্টা চলি ভবানীপুরে ওর পিসির বাড়ীতে। পছন্দের কাজটি ওইখানেই সারা হবে। ব্রেকফাস্টে বসে মেয়ে ব শুনল—দুপুরের ট্রেনে কলকাতা আসার উদ্দেশ্য—তখনি ও বেঁকে বসল। ওর মর্যাদায় আঘাত লেগে

বই কি! অকৃত্রিম ক্রোধ সেই আঘাতে মর্যাদারই রূপান্তর মাত্র। মেয়ে চাইছিল এই ঘটনা অব্যাহতি পেতে। তাই মাথা ধরার ভান করে এসেছিল উচ্চ শ্রেণীর বিশ্রামাগারে। দুপুর রাতে বসে প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে তন্ময়চিত্ত হওয়া—কালক্ষেপের কৌশল মাত্র। আরও উপায়ে কাল হরণ করা যায় ভাবছিল হয়তো, সেটা ঘটলো অপ্রীতিকর ঘটনাকে আশ্রয় করে। সে ওরা সসম্মানে মুক্তি পেল। কি ঘটলো অতঃপর। কনে-দেখা আলো তখন নিভে গিয়েছিল কি? মেয়েটিও কি ফিরে আসতে পেরেছিল আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে?

এই ধরনের ভাবনার তরঙ্গে পাক খেতে খেতে আমার আত্মসম্মান বোধ আত্মপ্রকাশ নিজের অকৃতিত্বে সুগভীর লজ্জায় অনেকক্ষণ অসাড় হয়ে রইলাম। পরের দিন হাওড়া স্টেশনে না—তার পরের দিনও নয়। কুলমামার সঙ্গে দেখা করলাম না।

একদিন কুলমামাই এলেন আমার খোঁজে। বললেন, কিরে, আর দেখা করিস নে চাকরি করার সাধ বুঝি মিটে গেল?

মুখ নামিয়ে ঘামতে লাগলাম। কি উত্তর দেব!

কুলমামা বললেন, ব্যাপার কি? চাকরি করবিনে?

অতিকষ্টে বললাম, সব শুনলে আপনি আমায় অযোগ্য মনে করবেন।

হাসলেন কুলমামা। তাই নাকি! কিসে তোর যোগ্যতা প্রমাণ হলো শুনি?

মাথা নামিয়ে মুখ ফেরালাম বিপরীত দিকে।

আরও কাছে এসে আমার পিঠের উপর একখানা হাত রেখে বললেন কুলমামা, লজ্জা কি আমি সব শুনেছি মিত্তিরের মুখে। মিত্তির বলছিল, ছোকরার উদ্যম আছে, ওয়াচ করার ধৈর্য অবজারভেশন শক্তি আছে। এই লাইনে ওইগুলোই বিশেষ দরকার। তবে লোকচরিত্র অধ্যয়নে দু'একদিনের কাজ! কত দেখে শুনে ঘা খেয়ে বিফল হয়ে হয়ে তবে তো অভিজ্ঞতা সঞ্চ কেলিওর ইজ দি পিলার অব সাক্সেস—এই মটো আমরা সর্বদাই জপ করে থাকি। আর জগৎ এ কথাটাও ভুল নয়। নে—চটপট লিখে ফেল বিকি দরখাস্তখানা, আমি আজই নিয়ে যাব ও

মুখ তুলে দেখি কুলমামা হাসছেন। ছাত্রের পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদে শিক্ষক যে বোধ করেন—তেমনি গৌরব-কৃতিত্ব মেশানো হাসি।

———

দুটি গাছ ও একটি প্রেম

শ্রীঅমিত কৃষ্ণ বসু

গোকুল গাঙ্গুলী বললেন, "ঐ যে ওপারে একটি বিরহী গাছ দেখছো, ওর দিকে তাকালেই আমার বুকের ভেতরটা হুহু করে ওঠে।"

আমরা এপারে বসেছিলাম। ওপার আর এপারের মাঝখানে কৃত্রিম হ্রদের জল, সেই জলে আয়নায় মুখ দেখছে আকাশ। ওপারের কিছুদূর দক্ষিণে ট্রেন লাইন।

দক্ষিণ কলকাতার এই কৃত্রিম হ্রদের চালু নাম হচ্ছে 'লেক'। সোজা কথায় আমরা বসেছিলাম লেকের উত্তর ধারে।

গল্পের গন্ধ পেয়ে আমরা বললাম "কেন গোকুলদা?"

"ওর বিরহ-বেদনার কথা ভেবে। সে যে কি দুঃসহ যাতনা তা তো আমি জানি।" বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন গোকুল গাঙ্গুলী।

"ওর আবার বিরহ কিসের?" শুধালে সোমেন সরকার।

গোকুল গাঙ্গুলী বললেন, "ওর পাশে আরেকটি গাছ ছিল।"

"কোথায় গেল সে?"

"কাটা পড়েছিল।"

"কাটলে কে?"

"কলকাতার ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট্।" বললেন গোকুল গাঙ্গুলী। "তাহলে প্রথম থেকেই বলি শোনো। তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমার জীবনেও একবার প্রেম এসেছিল।"

বিশ্বাস না করলে গল্প শোনা যাবে না, এই ভেবে আমরা বললাম, "নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবো। আপনি আপনার প্রেমের গল্প বলুন গোকুলদা?"

স্বপ্ন ঘনিয়ে এলো গোকুলদার চোখে—মধুর অথচ করুণ, করুণ অথচ মধুর অতীতের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন চোখে নিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "তখন এই লেক-টেক ছিল না, এখানে ছিল শুধু ডাঙা আর ডাঙা, গাছ আর গাছ। এইখানে বিকেলবেলা বেড়াতে আসতুম আমি আর বকুলমালা। কোথায় তার সঙ্গে প্রথম দেখা, কোথায় দ্বিতীয় দেখা, তারপর কবে কোথায় কেমন করে আরো দেখা, তারপর ধীরে ধীরে কেমন করে প্রেম দানা বেঁধে উঠল, সে সব অনেক কথা। এইটে শুধু জেনে রাখো বকুলমালা আমার প্রেমে পড়েছিল, আর আমার বুক চিরলে তখন দেখতে পেতে সেখানে খোদাই করা রয়েছে বকুলমালা নাম।"

"ওর বাবা জানতেন তো?"

"তাহলে আর প্রেম হল কি?" বকুলমালার বাবা একদম টের পাননি, ঐ তো মজা।" ব গোকুল গাঙ্গুলী।

"আমি আর বকুলমালা গিয়ে বসতুম ঐ গাছটির তলায়।"

"ঐ বিরহী গাছটির তলায়?"

"গাছটি তখন বিরহী ছিল না।" বললেন গোকুল গাঙ্গুলী। "ওর সাথীটি ছিল ওর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তখনকার দিনে প্রেম করা এখনকার মত সহজ ছিল না, দেখাশোনা মেলামেশার ছিল হাজারো রকমের বাধা। তাহলেই বোঝো বকুলমালা আমাকে কতখানি—"

কান্তিকুমার বললে, "আপনাদের তখন বয়স কত ছিল গোকুলদা?"

"এ সব বেয়াড়া প্রশ্ন করে রসভঙ্গ কোরোনা কান্তি।" বললেন গোকুল গাঙ্গুলী। "এ হে বলা। খানায় এজাহার দেওয়া তো নয়। যাক্ গে, এখন কাজের কথা শোনো। বকুলমালার বাপ পয়সাওয়ালা লোক। তাই বলে ভেবো না আমি সেইজন্যেই প্রেমে পড়েছিলুম বকুলমালার। অন্ত ব আমি খুবই হিসেবি, কিন্তু প্রেমে বেহিসেবি। ও হলো গিয়ে স্রেফ হৃদয়ের ব্যাপার, ওখানে মোক চলে না—অন্ততঃ গোকুল গাঙ্গুলীর চলে না। আগুন ছাই চাপা থাকে না, কথাটা শুনেছ আমাদের প্রেমের আগুনও একদিন—কি করে জানি না—ধরা পড়ে গেল বকুলমালার পয়সা বাপের কাছে! আ: বকুলমালার বাবা বয়সে সেকেলে হলেও ওর স্বভাবটা ছিল আশ্চর্যরকম এ উনি একদিন কি করলেন জানো?"

"জানি নে।"

"উনি একদিন আমায় গোপনে ডেকে বললেন, 'দেখ বাপু, প্রেম-ট্রেম আমি বুঝিনে, তুমি কি মেয়েকে বিয়ে করতে চাও?' আমিও সোজা কথার ছেলে। বলুম 'নিশ্চয় চাই, নইলে আর প্রেম কেন?' তখন তিনি বললেন, 'শুনে সুখী হলুম। কিন্তু শুনে তুমি হয় তো সুখী হবে না, তোমাকে করলেই সঙ্গে সঙ্গে বকুলমালা আমার ত্যাজ্য কন্যা হবে। বিয়েতে আশীর্বাদ করব বটে, কিন্ত আধলা দেবো না।' আমি বলুম, 'তাহলে আপনার সমস্ত টাকাকড়ি, বিষয়-আশয়—' তিনি বললেন লেখাপড়া করে দেবো আমার গুরুর আশ্রমের নামে। তোমাকে বিয়ে করে যদি বকুলমালা সারা উপোস দিয়ে কাটাতে চায় তো তাই কাটাবে, আমি আপত্তি করব না।' আমি তখন ম্যাট্রিকে করেছি তিন তিন বার ফেল করে। প্রাণে প্রেমের জোয়ার, কিন্তু পকেটে গড়ের মাঠ, কবে চাকরি তার কিছু স্থিরতা নেই। বকুলমালার বে-আক্কেল বাবার কথা শুনে আমার চিত্ত বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। ছিলুম উনিই কিছু বলবেন বকুলমালাকে; কিন্তু উনি কিছুই বললেন না। ভেবেছিলুম বিয়ে বকুলমালাকে আটকে রাখবেন, আসতে দেবেন না এই গাছের ধারে আমার কাছে। কিন্তু না হলো আমার আশঙ্কা। ভদ্রলোক কোনোরকম বাধা দিলেন না মেয়েকে। রোজ বিকেলে আসতে লাগল বকুলমালা। আমরা দুজনে বসতে লাগলুম ঐ গাছের তলায়। কি প্যাথেটিক

শোচনীয় পরিস্থিতি ভেবে দেখ একবার! বকুলমালা জানে আমার গলাতেই সে মালা দেবে। সে জানে আরেকবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলেই আমার পাস কেউ আটকাতে পারবে না। পাস করলেই সঙ্গে সঙ্গে চাকরি। আর আমি চাকরি পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুহাত এক করে ফেলতে হবে বকুলের বাবাকে লুকিয়ে। তারপর ভদ্রলোক খবর পেয়ে প্রথমটা হয়তো চটবেন, কিন্তু যা-মরা একমাত্র সন্তানকে তো আর ফেলতে পারবেন না, সুতরাং মেয়ে-জামাইকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করবেনই। আর তাহলেই তো সমস্ত বাধা মিটে গেল।"

আমি বললাম, "বকুলমালা বুঝি একদম টের পায় নি যে ওঁর বাবা—"

"একদম নয়।" বললেন গোকুল গাঙ্গুলী। "এরপর একদিন বকুলমালার বাবা আমার সঙ্গে গোপনে কথা কইলেন। সে বড় ভয়ানক কথা।"

"কথাটা কি, গোকুলদা?"

কথাটা এই রকম। বকুলমালার বাবা দিগম্বরবাবু বললেন, "বাবা গোকুল, এক মস্ত বড়লোকের একমাত্র ছেলে, রূপে গুণে পয়সায় তোমার তুলনায় স্বর্গ। ছেলেটির বয়সও কম, বকুলমালার সঙ্গে মানাবেও ভালো। এই বয়সেই মস্ত চাকরিতে ঢুকেছে, পাঁচশো টাকা মাইনে, তার ওপর মোটরক অ্যালাউয়ান্স্, ছানো ত্যানো, অনেক কিছু। আর তুমি তো বাপু এখন ত্যাগেও ভাজছ। এই ছেলে বাবা তো আমার মেয়েকে, মানে বকুলমালাকে, তার একমাত্র পুত্রবধূ করবার জন্যে প্রায় খেপে উঠেছে বললেই চলে। কিন্তু তোমার সঙ্গে পাকাকথা না বলে তো আমার এই ভাবী বেয়াইকে হাঁ বা না কি বলতে পারছি নে। তুমি যদি বলো আমার ত্যাজ্য কন্যাকেই তুমি বিয়ে করবে, তাহলে আমার এই বেয়াইকে আমি সোজা জবাব দিয়ে দিই, উনি অন্য কোথাও ওঁর ভাবী পুত্রবধূর সন্ধান করুন। আ আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির দানপত্র আমার গুরুদেবের নামে রেজিষ্ট্রী করিয়ে ফেলবার জন্যে উকিল খবর দিই। ঐ এক টিলে বকুলমালা আমার সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে, আর আমার সমস্ত সম্পা মালিক হবে আমার গুরুদেবের আশ্রম।"

গোকুল গাঙ্গুলী বললেন, "কিন্তু বকুলমালার কি অবস্থা হবে?"

"তোমার স্ত্রীর কথা তখন তুমি ভাববে বাবা গোকুল। তুমি দরিদ্র স্বামী হলে সেও তো দারিদ্র্যের অংশভাগিনী হবে। তোমার আশ্রয় ফুটপাথে হলে সেও তোমারই পাশে ফুটপাথে আশ্রয় নে তুমি অনাহারে মরলে সেও অনাহারে তোমার সঙ্গে সহমরণে যাবে। সে যে সীতা সতী সাবিত্রীর মে মেয়ে। সে কথা ভুললে তো চলবে না বাবা গোকুল।"

মাত্তামাত্তি কোনোরকম হকা করা গেল না। দিগম্বরবাবু এক কথার মানুষ। বকুলমালা হয় বড়লোকের বড় চাকুরে ছেলেকে বিয়ে করে বাকী জীবনটা বড় ঘরের বৌ হয়ে সচ্ছল অবস্থায় কাটা আর না হয় তো গোকুল গাঙ্গুলীর গলায় মালা দিয়ে বাপের ত্যাজ্য কন্যা হবে।

গোকুল গাঙ্গুলী বললেন, "আমি কবে ম্যাট্রিক পাস করব, কবে চাকুরি পাব তার যে কিছু নেই। আপনি যদি বকুলকে ত্যাজ্যকন্যা করে দেন তাহলে বিয়ে করে আমি ওকে খাওয়াবো কি?"

"সে ভাবনা আমার নয় বাবা গোকুল।" বললেন বকুলমালার বাবা। "আমি তোমায় জামাই বলে বরণ করে নিতে একেবারেই রাজী নই। বকুলমালাকে বুঝিয়ে বলে দিও তোমায় বিয়ে করার যদি তার হয়ে থাকে, তাহলে শঙ্খ মেটাবার মাশুল দিতেও তাকে তৈরি থাকতে হবে। তোমার গলায় মালা দেবে, আমার সম্পত্তিও ভোগ করবে, এই দুই নৌকোতে একসঙ্গে পা দিয়ে থাকা তার চলবে এ কথা তাকে পরিষ্কার বলে দিও।"

গোকুল গাঙ্গুলী বললেন, "এই নিষ্ঠুর কথা আমি তাকে বলতে পারব না। আপনিই বলে দেবেন

"তাঃ বেশ।"

মেয়েকে কথাটা খোলাখুলিই বলে দিলেন মিগধরবাবু। শুনে মেয়ে, অর্থাৎ বকুলমালাও বা "তা বেশ।"

পরদিন বিকেলবেলা যখন দেখা হলো গাছের তলায় যথারীতি, তখন বকুলমালা ছলছল কণ্ঠে বা "গোকুলদা!"

গোকুল গাঙ্গুলী বললেন, "কি, বকুলমালা?"

কি, সেটা খুলে বললে বকুলমালা। বললে বাপের ঐশ্বর্য হেলায় প্রত্যাখ্যান করে সে রাখবে প্রেমের মর্যাদা। দেবে না ঐ ধনীসন্তানের গলায় মালা। গরীব গোকুলের সহধর্মিণীই সে। গোকুলের পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বের সমস্ত দুঃখ সইতে সে রাজী। গোকুলের প্রেম তার কাছে দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য তার কাছে তুচ্ছ।

চট করে পকেট থেকে একখানা ছুরি বার করে তার ধারালো ফলা বার করলেন গোকুল গা ছুরি দেখে চমকে উঠল বকুলমালা। শিউরে উঠে শুধালে "ছুরি কেন গোকুলদা?"

গোকুল গাঙ্গুলী বললেন, "এই গাছের বুকে এই ছুরি দিয়ে এসো আমরা আমাদের দুজনের খোদাই করে রাখি—গোকুল, বকুল। দুটি নাম পাশাপাশি। এরা অন্তত তিনশো বছর এই গাছের জেগে থাকবে, আমাদের প্রেমের সাক্ষী হয়ে। জীবনে আমরা যত দূরেই সরে যাই না কেন, এই বুকে এই দুটি নামের মধ্যে আমরা পাশাপাশিই থাকব, আমাদের এই পাশাপাশি থাকা কেউ বন্ধ পারবে না। আমার নামটি তুমি খোদাই করো বকুলমালা, তোমার নাম খোদাই করব আমি।"

ধারালো ছুরির নিষ্ঠুর আঁচড়ে ঐ গাছের বুকে পাশাপাশি দুটো নাম পাকাপাকি ভাবে হয়ে গেল: গোকুল—বকুল।

কাহিনী এই পর্যন্ত শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠে আমরা বললাম, "তারপর গোকুলদা, তারপর?"

গোকুলদা বললেন, "তারপরের অংশটুকুই ভীষণ রকম দুঃখ-বিদারক। শুনলে তোমরা অশ্রু করতে পারবে কিনা জানি নে। বকুলমালার আশ্চর্য প্রেমের জোর দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গে

বিকারে ভরে উঠল মন। বিবেক বললে ওরে অর্ব্বাচীন, এ তুই করছিস্ কি? এ যেন নারীরত্নের বরমাল গলায় পরে এ যেন নারীরত্নকে সারা জীবন তোর সঙ্গে সংসারিত্বে জুড়িয়ে মারতে চাস তুই? মিনমি লোকটা তারি একগুঁয়ে, ওর যে কথা সেই কাজ। তোকে বিয়ে করলে বাপের একটি আধলা পাবে ন বকুলমালা, এ একেবারে ধ্রুব সত্য। বকুলমালাকে তুই ছেড়ে দে তোর সর্ব্বনেশে রাহুর গ্রাস থেকে বেচারা পঞ্চাশওয়ালা বাপের মেয়ে, তাকে হতে দে পঞ্চাশওয়ালা শ্বশুরের পুত্রবধূ, বড়ো চাকুরে স্বামীর স্ত্রী ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, বকুলমালাকে তুই ছেড়ে দে গোকুলচন্দ্র। নইলে বিধাতার অভিশাপ বর্ষিত হবে তোর শিরে।.....”

“তারপর, গোকুলদা!”

“আমি বিবেককে বল্লুম থামো, থামো, আর বলতে হবে না, বকুলমালাকে আমি নিশ্চয় ছেড়ে দেবো। জানি আমি একটা গুড-ফর-নাথিং অপদার্থ; আমার ভাগ্যেও ভাঙ্গা জীবনের ফুটপাথে এমন হীরের টুকরো নারীরত্নকে টেনে আনলে নরকেও আমার ঠাঁই হবে না। কিন্তু হে বিবেক, বকুলের প্রেম যে আঠার মতো লেগে আছে আমার গায়ে; সেই আঠা-প্রেম আমি কেমন করে ছাড়াই? সোজা পথে ছাড়ানো সম্ভব নয়, ছাড়াতে হবে বাঁকা পথে।”

বাঁকা পথ ধরলেন গোকুল গাঙ্গুলী। হৃদয় হচনচ করে গেল, বুক ফেটে চৌচির হবার উপক্রম তবু ধরলেন বাধ্য হয়ে বাঁকা পথ, ছলনার পথ।

বললেন, “বলি বলি করেও যা বলা হয়নি অনেকদিন, তা এইবারে বলি। তোমায় আমার মিলন অসম্ভব বকুলমালা। আজই হোক আমাদের শেষ দেখাশোনা।”

“একি নিদারুণ রসিকতা, গোকুলদা?” কান্নায় ফেটে পড়ে বললে বকুলমালা।

বহুকষ্টে অশ্রুসংবরণ করে কাষ্ঠহাসি হেসে গোকুল গাঙ্গুলী বললেন, “রসিকতা নয় বকুলমা সত্যকথা।”

“তবে কেন গাছের বুকে আমাদের দুটি নামই খোদাই করলে? কেন? কেন? কেন?”

পাষাণে বুক বেঁধে গোকুল গাঙ্গুলী বললেন, “এই জন্যেই, বকুলমালা!”

তারপর বলতে লাগলেন “আমরা গাঙ্গুলী, কুলীন বংশ, আর তোমরা হলে ঘোষাল। ঘোষালদে সঙ্গে গাঙ্গুলীদের ক্রিয়াকর্ম্ম তো চলে না বকুল। তাছাড়া শুধু শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে তোমায় ঘরে এনে কি লাভ হবে? তোমার বাপ সোজা বলে দিয়েছে একটি আধলা দেবে না। সব দিক দিয়েই লোকসা আমার সইবে না বকুলমালা।”

“আগাগোড়া মিছে কথা, বলতে বুক ফেটে যেতে লাগল গোকুল গাঙ্গুলীর। তবু বলতে হলো বকুল মালার ভালোর জন্যেই।

শুনে কান্না থেমে গেল বকুলমালার। শুকিয়ে গেল চোখের জল, জলের জায়গায় দেখা দি

"এতদিন তোমায় বড় ভুল বুঝেছিলাম আমি।" বললে বকুলমালা। "এতদিনে মুখোস খুলে বন্ধুবাদ।" বলে চলে গেল নির্পিতা সিংহীর মতো।

গোকুলদা বললেন, "বকুলমালার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। এরপর একদিন দেখা দিগম্বর ঘোষালের, মানে বকুলমালার বাবার সঙ্গে। শুনলুম পাকা হয়ে গেছে বকুলমালার বিয়ের তা সেই বড়লোকের বড় চাকুরে ছেলের সঙ্গে। বিয়ে হ'লো খুব ঘটা করে। সানাই বাজালে সেরা ও সকলে হোলেন ও সম্ভ্রান্ত। সানাই যা কাঁদলে, তার চাইতে ঢের বেশি কান্না কাঁদলুম আমি। প ওয়ালা শ্বশুরবাড়ীতে চলে গেল বকুলমালা, গোকুলচন্দ্রকে কাঁদিয়ে। ওদিকে ঐ গাছের বুকে পাশা রয়ে গেল গোকুল-বকুল। তারপর থেকে ঐ গাছের তলাটা যেন তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল আমার কা যখন তখন গিয়ে সজল চোখে তাকিয়ে থাকতুম গাছের বুকে আঁকা আমাদের দুটি নামের দিকে। গো বকুল, কি আশ্চর্য্য মিল। বিধাতা আমাদের মেলাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মিলতে দিলে না ঐ একগ খামখেয়ালী দিগম্বর ঘোষাল।"

"তারপর গোকুলদা ?"

"রোজ যাই! রোজ বসে থাকি গাছের তলায়। একদিন গিয়ে দেখি এক ঝাঁক লোক আর নানারকমের যন্ত্রপাতি নিয়ে জরিপ শুরু করেছে। শুনলুম ওরা সব ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের এখানকার অনেক জায়গার মাটি কেটে নকল হ্রদ তৈরি হবে, তার ফলে কাটা পড়বে অনেক জরিপওয়ালাদের সর্দ্দার গোছের যিনি ভদ্রলোক, তাঁর হাতের নক্সায় দেখলুম আমাদের বহু মুহূর্ত্তের স্মৃতি-মধুর এই দুটি গাছও কাটা পড়বে বলে চর্চ্চে করা হয়েছে। শুনে আমার মাথায় যেন মেরে বজ্রাঘাত হল, পায়ের তলায় নাচতে লাগল মাটি। আমি বললুম, 'দাদা, এ দুটি গাছকে কি বাঁ যায় না কাটা পড়ার হাত থেকে?' ভদ্রলোক বলবেন, 'বাঁচানো না বাঁচানো তো আমার হাতে নয়। ওপরওয়ালার হুকুম আমাকে তামিল করতেই হবে। এ দুটি গাছই কাটা পড়বে, এ সব জায়গায় হবে কিনা! এ একেবারে সেটলড্ ফ্যাক্ট, এর আর নড়চড় নেই। পরশু থেকে গাছ কাটা শুরু হবে।'

"তখন আপনি কি করলেন গোকুলদা ?" শুধালাম আমরা।

"পণ করলুম ঐ সেটল্ড্ ফ্যাক্ট্ আন্‌সেটল্ড্ করতে হবে, রাষ্ট্রগুরু সুরেন বাড়ুজ্যের মতো গাছের মৃত্যুদণ্ড যেমন করে হোক রদ করাতে হবেই, নইলে বকুলমালাকে হারিয়েছি, এদেরও হ আমার জীবনের আর রইল কি? মরিয়া হয়ে চলে গেলাম ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের এক জাঁদরেল অফি কাছে! তার নাম তোমাদের জানাতে চাই নে। ধরে নাও তাঁর নাম ব্যানার্জ্জী সাহেব। তাঁকে বললুম সব কথা। শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে উঠলেন ব্যানার্জ্জী সাহেব। তারপর বললেন, 'দুটি বাঁচানো অসম্ভব, মিষ্টার গাঙ্গুলী। আই ক্যান সেইভ্ ওয়ান ট্রি অনলি। ঐ দুটি গাছের এ নিতেই হবে চিরবিদায়।' আমি বললাম 'তাহলে বাঁচান ঐ গাছটিকে, যার বুকে খোদাই করা আ নাম দুটি।' অমায়িক হাসি হাসলেন অফিসার।"

"তারপর, গোকুলদা ?"

"তারপর শুরু হলো গাছ কাটা, মাটি কাটার কাজ। তৈরি হলো লেক। ব্যানার্জী সাহেব হুকুমে কাটা পড়ার হাত থেকে রেহাই পেল ঐ গাছটি। দূর থেকে ঐ গাছটির দিকে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে হত কাছে গিয়ে দেখি ওর বুকে লেখা আমাদের নাম দুটি। কিন্তু শুধু চাতো কাছে গেলেই শুনতে পাবো তার বিরহের আর্তনাদ, সে কাঁদছে তার চারিয়ে যাওয়া সাথী গাছটির জন্যে, যে কাটা পড়েছে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের হাতে। সেই থেকে শুধু এপার থেকেই ঐ গাছের পানে তাকাই। কিছুতেই ওপারে গিয়ে দেখতে পারিনে। ভয় হয় বিরহী গাছের বিরহ-বাথা অত কাছে গেলে আমি সইতে পারব না।

শেষ হলো গোকুল গাঙ্গুলীর গল্প। হঠাৎ কি একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় উঠে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তিনি। এতক্ষণ আমরা অভিভূত হয়ে শুনছিলাম। গোকুলদা চলে যেতে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ ভাবটাও চলে গেল। কার্তিকুমার বললে, "গোকুলদা লেক শুনে গেলেন।"

সোমেন সরকার বললেন, "শুনে না সত্যি, সেটা সরেখ করে দেখলেই তো হয়। চলো না ওপারের ঐ বিরহী গাছটার বুক পরীক্ষা করে দেখা যাক।"

গেলাম। ভয় ভয় করে খুঁজেও ঐ গাছের বুকে কোনো নাম খোদাই করা দেখতে পেলাম না।

"বলেছিলুম না, লেক শুনে ?" বললে কার্তিকুমার। "সাধে কি আর লোকে বলে শুনে গোকুল গাঙ্গুলী ?"

ভাবলাম, হতে পারে কাহিনীটি আমাদের শুনেছে গোকুলদার অন্যতম শুনে। কিন্তু এমন কি পারে না ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের অফিসার ব্যানার্জী সাহেবের গৃহিণীর নাম বকুলমালা, তাই দুটি গা তেতর সেই গাছটিকেই তিনি কেটে ফেলবার হুকুম দিয়েছিলেন, যার বুকে—

কিন্তু থাক সে, সে কথা ভেবে আর লাভ কি ?

মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(একটি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক)

দক্ষতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতেছে

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং-এর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়

হেড অফিস :

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩

শাখা সমূহ :

মিশন রো, উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, খড়্গপুর,

[illegible]

মুখ

অমিয়ভূষণ মজুমদার

ঈষৎ ঘোমটার আড়ালে একটুকরো মুখ। সে মুখে অপরূপ কমনীয়তা।

উত্তর কলকাতার বিশীর্ণ গলির মধ্যে একখানা একতলার ঘর। অপ্রশস্ত ঘরে একটি মধ্যবিত্ত পরি ঘরকন্না।

মলিন বিবর্ণ একখানি ছেঁড়া শাড়িকে কেটে পর্দা তৈরী করে তাদের জানালাকে ঢেকে (হয়েছে। একটি সংসারের শালীনতা তার গার্হস্থ্য-জীবনকে ঢেকে রাখার প্রয়াস।

কিন্তু কখনো কখনো বিশীর্ণ গলির বদ্ধ বাতাসেও গতির জোয়ার লাগে। পুবে বড়োবাড়ী ঝিরঝিরে দক্ষিণের বাতাসে পর্দাটা দুলে দুলে ওঠে। তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যায় অবগুণ্ঠন খুলে পা চেয়ে দেখো, দেখতে পাবে ঈষৎ ঘোমটার আড়ালে এক টুকরো মুখ।

আর যখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে শহর ঘেমে ওঠে—আকাশে বাতাস নেই, কিংবা তাদের ত গুমোটে অবরুদ্ধ হাওয়া; তখন অন্ধ গলিতে আর শালীনতা বা গার্হস্থ্য-জীবনের গোপনতার বালাইকে রেখে দেওয়া যায় না। তাদের জানালার বিবর্ণ শাড়ির পর্দা তখন উদ্গ্রোচিত, সংসার তখন নির্লজ্জ উ

ঈষৎ ঘোমটার আড়ালের ফর্সা একটুকরো মুখকান্তির সুঢৌল আড়াটির সম্পূর্ণতাকে তখন উপলব্ধি করতে পারো। দেখবে—সুন্দর, সুশ্রী একখানি মুখ।

পঁচিশ বছর বয়েসের তরুণী বধূর দেহের কান্তি অবলুপ্ত। শীর্ণ চেহারায় মলিন শাড়িটির ম দারিদ্র্যের মসীলেখা। অঙ্গ-অবয়বে কোন শোভা-সম্পদকেই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ব শুধু মুখখানিতে।

ঈষৎ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সুকোমল মুখের যে সাড়া—তা, তোমাকে আমাকে এখনো আকর্ষণ ক্ষমতা রাখে।

উত্তর কলকাতার বাই লেনের বিশীর্ণ একটা গলি। অধিকাংশ ঘরেই নোনাধরা জীর্ণ কে ঘরের কাটলে কাটলে ছারপোকার আশ্রয়। বদ্ধ বাতাস আর ক্লিষ্ট আলোর দৈনন্দিন মধ্যবিত্ত পরিবার দিন যাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি।

সকাল হতে সন্ধ্যা, এবং সন্ধ্যা হতে রাত্রি ভাবনার শোকা বেচে বেচে যারা অর্ধরাত্রি-জাগরণ কাটায়—তাদের মধ্যে সুশ্রী মুখের আড়ায় একটি শীর্ণা তরুণী বধূ স্বামী, পুত্র-কন্যা নিয়ে এই বিশীর্ণ একখানি অন্ধকার একতলার ঘরে দিন কাটায়।

তবু এ-গলিতেও সুখ আছে, সমৃদ্ধি আছে। বড় বড় দালান আর প্রশস্ত বাতাসে খো সংসার যে নেই এমন কথা বলা যায় না।

চাঁদনির বাজার থেকে কর্তার দেওয়া সুচিক্কণ পর্দা, নতুন দেওয়ালে ডিসটেম্পারের রঙ, আর বিজলী বাতির সুতীক্ষ্ণ আলো—এ-গলির মধ্যেও দু'চারখানি বাড়িতে আছে। ইংলিশ খাটে নেটের মশারি ইলেকট্রিকের তীব্র হাওয়ায় দোলা খায়—দু'চারখানি সুদৃশ্য ঘরে। কিন্তু এ-গলির মধ্যে তা যেন ব্যতিক্রম।

বাই লেনের মধ্যে একতলার ঘরে পঁচিশ বছরের বধূটির সুকোমল মুখশ্রীও আর একটি ব্যতিক্রম।

স্বল্প আয়ের পরিবার ছারপোকার মতন যেখানে বংশ বীজ বর্ধন করে চলেছে, সেখানে নিত্যকারের ঘ লেগেই আছে। কর্তার সঙ্গে গিন্নীর কৌশল, পিতার সঙ্গে পুত্রের, ভাইয়ের সঙ্গে বোনের ঝগড়া—এ গলি তো নিত্যকারের ঘটনা।

বিশেষ কোন সংসারই সাম্য নিরুপদ্রব নয়। আর তা হবেই বা কেমন করে? ভাইনে আন বাঁয়ে কুলোয় না। দারিদ্র্য, সংগ্রাম আর অস্বাস্থ্য—তার প্রতিটি রেখা প্রতিটি মুখে রেখাঙ্কিত। চোখে-মু মলিনতার ছাপ। অস্বাস্থ্যকর দেহ-মন। মুখে এবং মনে তার প্রতিবিম্ব প্রতি ঘরে ঘরেই।

এ-ঘরেও তার ছায়া আছে।

স্বামীটির খাপটের আর সীমা নেই। কোন মার্চেন্ট অফিসের জুনিয়র ক্লার্ক। স্বল্প বেতনে দি কেরানি। অফিসের নির্যাতনে দেহ-মনে ঘুণ ধরেছে। কিন্তু গৃহে সে একচ্ছত্র সম্রাট। হাঁক-ডাকে পরি বাড়ির কর্তা।

সকালে চায়ের জন্ত কড়া তাগিদ, 'নবাব নন্দিনী হল কী? এদিকে বেলা যে কতো তার কী হি আছে? বাজার যে উঠে গেল!'

শান্তপদক্ষেপে কলাইকরা চায়ের কাপ হাতে নবাবনন্দিনী দুকলো পাশের ঘর্মা দেওয়া টি চালের একফালি রান্নাঘর থেকে ঘামে ভিজে সপ্‌সপে চেহারায়। স্বামীর কটূক্তির জন্তে কিন্তু যে অনুশোচনা নেই।

রোগা শীর্ণ হাত দুখানিতে অজস্র মিনতির চিহ্ন, মুখখানি কিন্তু স্বতন্ত্র। শুভ্র সুডৌল মুখখা অবগুণ্ঠন একটু খসে গেছে—স্নেহমাখা মুখ। এমন একটা পরিতৃপ্তি সেখানে কেমন করে শোভা পায়।

কণ্ঠেও মাধুর্য, 'বাজার আজ না গেলেও চলতে পারে। নারকেল আছে। মুসুর ডাল ন নারকেলের বড়া ভেজে দেবোখন! কষ্ট করে আজ আর বাজার নাইবা গেলে! আবার ফিরেই তাড়াহুড়া করে নাকে মুখে গুঁজে অফিসে ছোটা।'

'আহা, নন্দিনী রাইকিশোরীরে! নারকেলের বড়া ভেজে দেবো! গোনাগুন্তি নারকে বড়ায় কতো তেল খরচ হবে কতো সে হিসেব করেছ কী? সরষের তেলের দাম কতো জানা আছে? নারকে বড়া আর মুসুরির ডাল, তার সঙ্গে বলোনা কেন পাওয়া ঘি একটু! কপাল করে সেই রাজপুরীতে গে তো পারতে—যেখানে খাবারের কোন অভাবই নেই।—বেঁটে কুৎসিত আধা-প্রৌঢ় স্বামীটি খেঁ উঠলো।

তবুও প্রতিবাদ নেই সেই কোমল বিনম্র কণ্ঠে—'না হয় পোস্ত বেটে দিই তোমার। আমাদের শুধু মুসুর ডালেই চলে যাবে।'

কর্কশ কণ্ঠ আবার গর্জন করে উঠলো, 'তাই নাকি! এই যদি হিসেবীয়ানা হয় ত আরম্ভ তবে যায় কোথায়?

পর্দাটা খসে গেছে। সামনা-সামনি চোখাচোখি হতেই ঈষৎ ঘোমটায় মুখখানিকে ঢেকে নিয়ে আর কোন বাক্যব্যয় না করেই চলে যায়।

অশিক্ষিত ছোট মন। দিন রাত মেয়েলী ঝগড়া করার স্বভাব আধা-প্রৌঢ় স্বামীটির।

তবু শাশুড়ী জীবিত নন। ননদ, জা, ভাসুরের বালাই নেই। এ-গলির অন্যান্য সংসারে শাশুড়ী, ননদ নিয়ে বধূ নির্যাতনের ঢেউ বহু, সে ঢেউ এ-সংসারে বইবার কথা নয়।

কিন্তু থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করে অবনীনাথ কেন যে আজো স্বল্প আয়ে অপেক্ষাকৃত নগণ্যপল্লী অফিসে কলুর বলদ হয়ে আছে—তার সমস্ত দায়িত্বই যেন বধূ অনীতার।

স্বামী, আর বৎসরান্তে স্বামী প্রদত্ত কয়েকটি কচি-কাচা পুত্র-কন্যা,—এই নিয়েই সংসার। একটু নিরপত্রব হওয়া চলতো; কিন্তু ভূনিয়ার ক্লার্ক অবনীনাথের বাদশাহী মেজাজে তা হবার উপায় নেই।

অনিতার এ-সংসারে আগমনে কোন সমারোহ ছিল না।

অবনীনাথের বিপত্নীক বাপ দেখেশুনে সুন্দরী কন্যাকে বধূরূপে ঘরে তুলেছেন। তিনি আর নগদ কিছু রৌপ্য মুদ্রা। শ্বশুরের তার জন্যে আকর্ষণ ছিল না। পুত্রবধূরও নয়। স্বামী শ্বশুরকেই চিনেছিল বেশি সে। কিন্তু বছর না ঘুরতেই তাঁর স্বর্গারোহণে অবনীনাথের কর্তৃত্ব। এ বৌ—যার আয়নায় কিছুমাত্র নেই, তাকে নিয়ে জীবনযাত্রা তার বিড়ম্বিত।

শ্বশুরের মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকেই প্রকৃত অভাব অনটন সুরু। বৎসরান্তে মাইনের টা ভূনিয়র ক্লার্ক। পিতা কিছুই রেখে যেতে পারেন নি।

আর বছর বছর ছেলেমেয়ে শুধু দৈহিক নির্যাতন নয়, মানসিকও বটে। তবু ঈশ্বরের দিয়ে আর ভাগ্যকে দোষারূপ করে অনীতা তাদের মন নিয়েই একটু শান্তিতে থাকতে চায়।

তবে অবনীনাথ মুখেই চীৎকার করে শুধু—ওটি ওর মধ্যযুগীয় পৌরুষের একটি বহিঃ অভিব্যক্তি মাত্র। তাছাড়া সে মাতাল-দাঁতালও নয়; আর অনীতাকে এখন বিশেষ অবজ্ঞাও ব অনীতা তা বোঝে; আর তজ্জন্যি তার চোখ ছাপিয়ে জল আসে, যখন দেখে নিরবিচ্ছি ভূনিয়র ক্লার্ক টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে আর ট্রাম বাস ভাড়া কমিয়ে প্রসবকাতরা স্ত্রীর খাদ্যের জন্যে এটা ওটা খাবার ফল-পাকড় থেকে আরম্ভ করে বেশি-বিলিতি দু'চারটি ওষুধ-বিষুধও নিয়ে আসে।

স্বামী অফিস চলে গেলে এক পালে ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও লাগে খণ্ড প্রলয়। ছাংলা ছেলে রান্নাঘর থেকে হয়ত গুড় চুরি করে খেয়েছে—বয়োজ্যেষ্ঠা বোনের তার জন্যে তর্জন-গর্জন, অনুশাসনের আর অন্ত নেই। ইস্কুলে যেতে গিয়ে কার বই-খাতা পাওয়া যাচ্ছে না, কলঘরে

প্রতিদ্বন্দ্বিতার কলরব—কলরোল নিত্যই তুমিও আমার মতন শুনতে পাবে। এমন কি পর্দাটা সরে গে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের দু'একটি রথও যুদ্ধও যে দেখতে পাবে না এমন নয়। সে-সব সামলাতে এসে বধূটি নিশ্চুপ। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে সৎ উপদেশে তাদের শান্ত করতে অদ্ভুত সহনশীলতা অনীতার।

ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে-পাঠশালে গেলে কোলের কচি-কাচা নিয়ে গুনগুন কণ্ঠের গানও আমাদে সকলের কানে বিস্ময়ের সুর তোলে।

সংসারের জলন্ত কোন আগুনের আঁচই অনীতার গায়ে লাগে না যেন।

উত্তর কলকাতার অন্ধ গলি বাই লেনের মধ্যবিত্ত জীবন-দর্শনে নতুন আর কীই বা থাকতে পারে?

সেই অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘর, সেই নোনাধরা দেওয়াল, সেই ছারপোকার বংশবৃদ্ধি! নিম্ন ম মধ্যবিত্ত জীবন-সংগ্রামের সেই একই ছবির পুনরাবৃত্তি।

তবু কিছু পরিবর্তন আছে বৈকি!

পরাধীন ভারত থেকে স্বাধীন ভারতের জাগরণে কিছু ভুল করেছে, কিছু ভুল ভুটেছে। যুদ্ধ খে যুদ্ধোত্তর সমাজ—ন্যায় নীতি এবং জীবন পরিবেশের ধারাকেও অনেকক্ষেত্রে পালটে দিয়েছে। রূপবদ কিছু না কিছু ক্ষেত্রে এনেছে।

উত্তর কলকাতার অন্ধগলি বাই লেন থেকে আর একটু খোলামেলা পথ, তার দক্ষিণে ইম্প্রুভমে ট্রাস্টের কল্যাণে সুপ্রশস্ত রাজপথ ভূপেন বোস এ্যাভেন্যু। অনেক নিম্নমান মধ্যবিত্ত হঠাৎ ফেঁপে উঠেছে অনেক ক্ষয়িষ্ণু পরিবার একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর বাকী যারা, তারা একই লাগাম মুখে নি ছ্যাকরা গাড়ীর কল যোড়া হয়ে আছে।

অধ্যাত্ত মার্চেন্ট অফিসের জুনিয়র ক্লার্কের সংসারটিও আছে। আছে সেই উত্তর কলকাতার বি বাই লেনেতেই। শুধু একতলা থেকে দোতলার প্রশস্ত ঘরে বসবাস এখন।

মলিন বিবর্ণ ছেঁড়া শাড়ির পর্দা থেকে রঙ-বেরঙের ছিটের পর্দায় তিনখানি ঘরের জানালা ঢাকা।

মাঝে মাঝে পরিবর্তনও হয়। সপ্তাহান্তে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সুস্পষ্ট চিহ্নকে খুঁজে পাওয়া যায়।

অবনীনাথের যুগ আর নেই।

চল্লিশ বছর কেরানিগিরির পর বাধ্যতামূলক কর্মচ্যুতি। পেনশন নেই, অধ্যাত্ত মার্চেন্ট অফি গ্র্যাচুয়িটিও পাওয়া যায় নি। কিছু কিছু প্রভিডেন্ট ফণ্ড; তাও আর কতোই বা! সবই প্রায় গে দেনার দায়ে। তিন তিনটে মেয়েকে পার করতে দরিদ্র কেরানিকে কী কম কড়ি সহ্য করতে হয়েছে।

তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে বছর বছর ছেলেপিলের মধ্যে এখন শুধু পাঁচটিতে ঠেকেছে। দুটি ছে এবং তিনটে মেয়ে। চাকরি থাকতে থাকতেই তিনটে মেয়েকে পাত্রস্থ করেছে অবনীনাথ। আর তা ফলে তারা নিতান্ত হা-ঘরে বা অকাল কুষ্মাণ্ডের হাতেও পড়েনি।

দুটি ছেলে সাবালক। দুটিই চাকরীতে বহাল হয়েছে। প্রতিষ্ঠাবান একেলে মার্চেন্ট অফি

আর বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সৌজন্যে আসল মাইনে এবং মাসমি ভাতায় ভালো রোজগারই ক থাকে তারা।

একালের সৌখীন ছেলেরা একতলার জীর্ণ প্রকোষ্ঠ থেকে দোতলার তিনখানি প্রশস্ত ঘরে ে টাকার ভাড়ায় উঠে এসেছে। ঘরে বছর বছর কলি ফেরানো হয়। নিওনের আলো, ইলেকট্রিক প দু'চারটে সৌখীন আসবাবপত্তর।

পুত্র, পুত্রবধূ আর এক আধটি নাতি-পুতি নিয়ে সেকালের বধূ অনীতার যেন পরিপূর্ণ গৃহিণীপনা।

একালের ছেলেরাও হিসেবী এবং সংযমী। অভাবের ঘরে স্বভাবকে তারা সংযত করতে জা তাই দুই ভাইয়ের পাঁচ-ছশো টাকার আয়ের নাতিদীর্ঘ সংসারে হাহাকারের ঝড় নেই!

একতলার অন্ধকার ঘরে কালো বেঁটে চেহারায় যে পৌরুষ, মধ্য যুগীয় শাসন-কর্তার যে বি সংসারে সর্বময় কর্তৃত্বের যে দাপট; আশ্চর্যের ব্যাপার, দোতলার প্রশস্ত ঘরে অবনীনাথের মধ্যে তার বিন্দুমাত্রই প্রকাশ নেই।

প্রভিডেন্ট ফণ্ডের দেনা মিটিয়ে মাত্র এক সঙ্গে হাজার টাকা সম্বল করে যেদিন থেকে অবনী সংসারে বসেছে, তখন থেকেই সে স্থবির। কণ্ঠ তার অবরুদ্ধ। সকালে চায়ের অঙ্গে আর সে তাগিদ নে

বরং অনীতার কর্ত্রীত্বই আজ প্রখর। স্বামীকে উদ্দেশ করে পূর্বেকার বিনয়-নম্র কণ্ঠস্বর স এখন তেজোদৃপ্ত, 'বুড়ো মিন্সের যদি কোন আক্কেল থাকে! দুবেলার জায়গায় চারবেলা পাথর গেলা আর ঘুঘানো। এখনো বাজারে গেলে না, কী ছাই গিলে আমার সোনার চাঁদের' খেয়ে অ যাবে শুনি?"

'চা-টা হলে খেয়ে বাজারে গেলে চলবে না? মাত্র তো সকাল সাড়ে ছটা।'—সংয বিনম্রধ্বনি শুধু অবনীনাথের কণ্ঠে।

তবুও জলন্ত আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়লো। সর্বময়ী কর্ত্রী অনীতা বিমূঢ় স্বামীর কথায় বেগুনে জ্বলে উঠলো', 'কেন, বাজারটা সেরে এসে চা খেলে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হবে? খাবে পরবে, তাদের জন্যে এটুকু করতেও যদি নিজের বিবেক সাড়া না দেয়—তাহলে আর কী বলবো বলে

'কিছুই বলতে হবে না, সত্যি কথাই বলেছো, এক্ষুণি যাচ্ছি আমি'—বাজারের থলি হাতে ছেঁড়া চটি দুটি ঘসটাতে ঘসটাতে অবনীনাথ গলি পথ থেকে চুপেন বোস এ্যাভেন্যুর প্রশস্ত রাজপথে পৌঁছায়।

রাজপথে প্রখর সূর্যের নরম রোদ।

তিরিশ বছর আগেকার রোদ যেন আর নেই। সকাল ছটা বাজতে না বাজতেই যে দুনিয়ার ফার্ক অবনীনাথের মাথায় উত্তপ্ত কিরণ বর্ষণ করতো। বাজারে বেরুতে না বেরুতেই তখন ে সপ্তমে চড়ে উঠতো!

আরো আশ্চর্য, তিরিশ বছর আগে কালো বেঁটে-খাটো চেহারায় একগাল কাঁচা পাকা দাড়ি

মলিন বেশভূষায় যে মানুষটির মুখে কাঠিন্য সর্বক্ষণই থাকতো লেগে—তিরিশ বছর পরে সে-মুখে প্রশ্ন সহনশীলতা, নম্র, ভদ্র একখানি পুরো প্রৌঢ়ত্বের চলচলে মুখ নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে শান্ত সৌ অবনীনাথ।

একটু সবুজ তরিতরকারি আর কিছু টাটকা মাছ নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরলে, ছেলে ' তবু একটু ভালো করে খেয়ে-দেয়ে অফিসে যেতে পারবে।

অনীতা ঠিকই বলেছে, 'বাজার থেকে ফিরে চা-টা খেলেই বা কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে

পথ চলতে চলতে অবনীনাথ আজ আর বধূ অনীতার মুখচ্ছবি দেখতে পায় কিনা জা না; কিন্তু তুমি-আমি যারা তিরিশ বছর আগেকার উত্তর কলকাতার অন্ধ গলির খবর জানি, তারা আজ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত গলিতে গোলপাতা ছেয়ে, হৃষ্টপুষ্ট কর্ত্রী অনীতার রেখাঙ্কিত মুখখানি দেখে ও সতের কণ্ঠস্বর শুনে অনুমান করতে পারে—ইতর ঘোমটার আড়ালে বধূ অনীতার সেই একটুকরো মু একতলার জীর্ণ ঘরে পর্দাটা সরে গেলে সেই যে সুগৌর মুখের আড়াটির সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ, আজ কী প্রক দিবালোকে তার কিছু চিহ্নকেও খুঁজে পাওয়া যায়!

"জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল—"
—বিদ্যাপতি

যুগে যুগে সৌন্দর্যের এই-ই
শাশ্বত স্বীকৃতি

আচরণ আর আবরণীতে সজ্জিতা হলেও পূজোর সমস্ত আনন্দের বিকাশ আপনার মুখে—আপনার মুখখানিকে অবিস্মরণীয়, অনিন্দ্যসুন্দর ও সুষমা সুরভিত রাখবে বোরোলীন।

বোরোলীন
পরম প্রসাধন

জি. কে. গার্ণামিটকিলাল প্রাইভে
বোরোলীন হাউস • কলিকাতা

ভাষার উত্তেজনা

শ্রীসুকুমার সেন

অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও মনে এখন একটা ধারণা জন্মেছে যে সব ভাষাই সমান। অর্থাৎ যে ভাষায় প্রচুর পরিমাণে বই বার করলে অপর প্রচুর বইওয়ালা ভাষার সমকক্ষ হবে। যাঁরা বিশ্বাস রাখেন তাঁদের ভেবে দেখা উচিত যে কোনো ইস্কুলের কোনো ক্লাসে সব ছেলে একই মাস্টারের কাছে একই বই পড়ে এক পরীক্ষায় একই রকম ফল পায় না। উপরোধ-অনুরোধে অথবা জোর করে সব ছেলেকে উঁচু ক্লাসে প্রোমোশন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে যে পার্থক্য বেড়েই যায়। সমকালীন ভাষার মধ্যেও সেই ব্যাপার। ভাষা বিজ্ঞানে বলে যে ভাষা পরিবর্তনশীল। যেমন মানব সমাজের আর সব কিছুই পরিবর্তনশীল। ভাষার পরিবর্তনশীলতার বেগ কম হতে পারে। কদাপি একেবারে নিরুদ্ধ হতে পারে না। যদি হয় তবে সে ভাষা প্রয়োজনমাফিক হলেও তা জীবনহারা। কোন মানুষ-সমাজের ব্যক্তির সে ভাষা জন্মাদি মরণান্ত প্রতিদিনের ব্যবহার ভাষা কখনোই নয়।

ভাষা সর্বদা পরিবর্তনশীল বলেই অতীতে এক ভাষা থেকে বহু ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন এক থেকে নিম্নগামী নদীস্রোত বহু ধারায় বিভক্ত হয়ে উপনদীর সৃষ্টি করে। ভাষা-পরিবর্তনকে নদী স্রোতের সঙ্গে উপমা প্রশস্ত, সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরোপুরি খাটে না। দু নদীর স্রোত মিলে এক নদী হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এক ভাষা আর এক ভাষার সঙ্গে মিলে আত্মহারা হয়েছে এমন দেখা যায়নি।

এক ভাষা থেকে অনেক ভাষা জন্ম নেয়। মূল ভাষার শক্তি শাখা ভাষাগুলির মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকবে—এমন প্রত্যাশাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা সাধারণত ঘটে না। হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয় না, এক মায়ের ছেলেরাও যেমন দেহে ও মনে সমান শক্তিধর হয় না, এক ভাষা সন্তানেরাও সমান জোরালো ও সৌষ্ঠবময় হয় না। এক সংস্কৃত ভাষা থেকে বহু প্রাকৃত ভাষা হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে শুধু পালি প্রধানত আর অর্ধমাগধী ও মাহারাষ্ট্রী অংশত গণনীয় ভাষা (সংস্কৃতের তুলনায়)। অন্যগুলির এমন জোর মিল না যাতে সেগুলি সাহিত্য সৃষ্টি করে টিকে থেকে। শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী ইত্যাদি প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃতের মত বলিষ্ঠ ও উচ্চিষ্ট ভাষার বীজাণু জন্মসূত্রে এমন উত্তেজনা লাভ করেনি যাতে অঙ্কুরগুলি দৃঢ়মূল ও প্রাংশু বৃক্ষ হতে পারত। বিভিন্ন মধ্য প্রাকৃত ভাষা থেকে উদ্গত আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির সম্বন্ধে এ কথা আরও বেশি করে খাটে।

নয়-চয়নী

আমাদের দেশে নেতা ও অ-নেতা শিক্ষিত ব্যক্তিদের এ ধারণা স্থান পেয়েছে যে সব ভাষাই সমা তেজস্বান্, কেবল চর্চার অভাবে—অর্থাৎ বই লেখা হয়নি বলে কোন কোন ভাষা অপর কোন কো ভাষার তুলনায় "অনগ্রসর"। অর্থাৎ ভোজপুরী ও মগহী ভাষা যা মৈথিলী, বাংলা, ওড়িয়া ইত্যাদি মতই পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃত থেকে জন্ম নিয়েছে, তা কেবল বই লেখা হয়নি বলেই এখন হীন বলে মং হচ্ছে। যদি ভোজপুরী মগহীতে প্রচুর বই লেখা হয় (—অনুবাদ করা মৌলিক বই লেখার চেয়ে অনে সহজ কাজ, সুতরাং অনুবাদ করলেও হয়) তবে অচিরে ভোজপুরী মগহী বাংলার সমকক্ষ, এমন কি ইংরেজীরও প্রতিদ্বন্দ্বী কেন না হবে।

এ ধারণা ঠিক নয়। চর্চায় ভাষার শক্তি বাড়ে—একথা ঠিক। কিন্তু মানুষের মুখে মুখে যে চা হয় তাতেও ভাষার শক্তি বাড়ে। মুখের ভাষার জোর হলে তবেই তো তা কলমের মুখে জোরে বেরবে ভোজপুরী মগহী নেহাত কম লোকে বলে না। যারা বলে তারা দৈহিক শক্তিতে অখ্যাত নয়। সুতরা শুধু চর্চায় ভাষার জোর বাড়ে একথার সমর্থন মিলছে না।

তবুও কথাটি ঠিক। চর্চায় ভাষার জোর নিশ্চয়ই বাড়ে যদি সে চর্চার পিছনে চিন্তা থাকে। অর্থা যদি রাগবুদ্ধের মোটর মস্তিষ ডাইনামোর দ্বারা পরিচালিত হয়। বুদ্ধিমান্ ও বিদগ্ধ বক্তার এবং চিন্তাশী জ্ঞানী লেখকের জিভের ও কলমের শানেই ভাষার ক্ষুরে ধার বাড়ে। অন্যথা বৃথা চর্চায় ধার পড়েই যায়। পা ছয় কোনের মধ্যে বাংলাই যে বড় হয়েছে তা এই কারণেই। দুইশাব থেকে আরম্ভ করে মালাধর বসু, বৃন্দাব দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, গোবিন্দ দাস কবিরাজ, জ্ঞান দাস, নরোত্তম দাস, চণ্ডীদা রামেশ্বর ভট্টাচার্য, নরহরি চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়, রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচ বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দ বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ইত্যাদি ইত্যাদি (কেউ যেন তালিকাটি সম্পূ মনে করে আমাকে বিব্রত না করেন) ইত্যাদি মননশীল লেখকদের প্রায় হাজার বছরের চেষ্টার ফলে আ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই ঋদ্ধি। বহু বহু সাধকের বহু শতাব্দব্যাপী এই সাধনার সিদ্ধি যদি কোন ভা দশ বিশ বছরেই সম্পূর্ণ করতে চায় তবে ভেল্‌কি বাজি অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। শোনা আছে, ভেল্‌কি বাজিতে দু'চার মিনিটের মধ্যে আমের আঁটি আম গাছ গজিয়ে তাতে তখনি আম ফলানো যায়, কিন্তু কে আম যে বাজারে ব্যাপার করা যায় এমন কথা কখনো শুনিনি।

আমাদের দেশে ভাষা নিয়ে সমস্যা জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা এ সমস্যার প্রতি অবহিত আছে তাঁদের উদ্দেশ করেই এই ক'টি কথা লিখলুম।

———

ভারতের প্রাণধর্ম্ম

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

প্রাণধর্ম্ম এই সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাখ্যা না করিয়াই ইহার তাৎপর্যার্থ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলি বিষয়বস্তুর অবতারণা করিতেছি। ভারতবর্ষের জনসাধারণ যে আদর্শনিচয়কে জীবনযাপথে অবশ্য পাথেয়বোধে বহুকাল ধরিয়া বংশপরম্পরায় গ্রহণ করিয়াছে তাহাই ভারতের প্রাণধর্ম্ম। এই ভারতে কত রাষ্ট্রের পতন হইয়াছে। কত নব রাষ্ট্রের উত্থান হইয়াছে। কত সমাজ বিপ্লব ঘটিয়া কত ধর্ম্মমতের আবির্ভাব, বিলোপ ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কালস্রোতে মানুষের গড়া সব কি জলবুদ্বুদের মত মনে হয়। এসব কিছুই যেন শরতের প্রভাতে পত্রপ্রান্তস্থিত শিশিরবিন্দু। নূতন নূতন আবিষ্কারের মদই অভিমানস্ফীত হইতেছে ততই কালের ক্রুর হাসি মানুষের মুখে বো কালিমা রেখা টানিয়া দিতেছে। মানুষ মৃত্যুঞ্জয় হইবার স্বপ্ন যুগে যুগে দেখিয়াছে এবং দেখিতেছে কালের খর বেগকে সহ্য বা প্রতিহত করিবার শক্তি দিয়া স্বপ্নের মত রহিয়া গিয়াছে। এই ভারতের লোকের নিকট জীবনই সব নয়, মরণও ইহার চরমান্ত। আর এক কথায় ভারতীয় নিত লোকসঙ্গীতের জীবন সুর মরণতাল এবং সুখ ও দুঃখ এর লয়। এই সঙ্গীতের উপলব্ধি বৈদিক ক হইয়াছিল এবং এই উপলব্ধি এখনও পর্য্যন্ত অম্লান দীপ্তিতে ভারতীয় চিত্তগগনে বিরাজিত রহিয় অমরাত্মার পূজক বৈদিক ঋষিরা মনকে আবিষ্কার করিয়া বরণীয় করিলেন। অপরদিকে ক্ষ সকল বস্তু এই মতের প্রবর্ত্তক মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব অহিংসা ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। পূর্ণ সুখীগণ ন অস্বীকার করিতে পারিলেন না, এবং উত্তর সুখী জীবনকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। 'নুরনে' যে কবি মরিতে চাহে না তিনিও গাহিলেন "মরণ তুঁহু মোর শ্যাম সমান"। এখানে জী সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া মরণকে দেখা হয় নাই—ভারতে জীবন-মরণ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্টরূপে স গ্রাহ্য হইয়াছে। যদিও পরের যুগে সংস্কৃত নাটকে মৃত্যুর স্থান নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তথাপি ভা চন্দ্র সূর্য তুল্য দুইটি মহাকাব্যে মরণকে স্বীকার করা হইয়াছে। করুণ রস যতটা চিত্তকে অভিভূত ব পারে এতটা আর অন্য কোন রস পারে কি? করুণ রসের ছায়া বুকে লইয়া বিরহভাব যত হয় তত মাধুর্য্য কি শুধু মিলনে আছে। মিলনে বিরহ, বিরহে মিলন এই আসল প্রেমিকের দর্শন। সেইরূপ জীবনে মরণ এবং মরণে জীবন। দার্শনিক যুক্তিতত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন এবং নিত্য আত্মাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সবই সত্য কিন্তু চিত্তলয় অথবা অবিদ্যার অথবা দুঃখের নাশকে পরিহার করিয়া শুধু আত্মনিষ্ঠ হইতে পারিয়াছেন কি? সেই নিত্যবস্তু ও না কোন ধরার কবরভূমি না হইয়া আত্মগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সমধর্ম্মই প্রথম, প্র মূলীভূত প্রাণধর্ম্ম।

এই সমন্বয়ের উদাত্তমন্ত্র ঋগ্‌বেদে ধ্বনিত হইল। ঋষি গাহিলেন "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" ইত্যাদি। মধ্য যুগেও এই সমন্বয়ের গীতি মহিম্নঃ স্তোত্রে প্রশস্ত স্থান পাইয়াছে।

"ত্রয়ীসাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতিচ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

বর্তমান যুগে সেই সমন্বয় প্রোজ্জ্বল হইয়া দেখা দিল রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গীতিতে।

"কালী হলি মা রাসবিহারী—নটবর বেশে বৃন্দাবনে
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেশী।"

"জান না রে মন, পরম কারণ,
কালী কেবল মেয়ে নয়।
সে মেঘেরই বরণ করিয়া ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়।"

এই সমন্বয় বুদ্ধি যখন ঘনীভূত হয় তখন এক সমাজের লোকেরা অন্য সমাজের লোকের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি বুঝিতে পারে এবং পরস্পরের সহিত মিত্রভাসূত্রে আবদ্ধ হয়। বৈদিক ঋ প্রার্থনা করিতেছেন—

"দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহংচক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে॥"

হে মহাবীর আমাকে দৃঢ় কর। সকল প্রাণীই আমাকে মিত্রদৃষ্টিতে দেখুন। আমিও যেন সকলা মিত্রের মত দেখি। আমরা যেন পরস্পরকে মিত্ররূপে দেখি। এই প্রাণধর্ম ভারতের। এই বুনিয়াদ উপরই গড়িয়া উঠিয়াছিল মৈত্রীর অভ্রভেদী প্রাসাদ। অপরকে অকপট চিত্তে আত্মতুল্য মনে করি জীবনের কর্মস্রোতকে সেইভাবে প্রবাহিত করার বাস্তব চেষ্টা ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। নির্বৈর সমাজ এই পুণ্যভূমিতেই প্রাচীনকালে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাই ঋষিসমাজ। এই পরিবেশে মৃগ ও মৃগে মহিষ ও ব্যাঘ্র, অহি ও নকুল প্রভৃতি নিত্যবৈরিভাবাপন্ন জন্তুগণ পরস্পর স্বাভাবিক দ্বেষ প্রভৃতি বি হইয়া পরম মিত্রের মত একসঙ্গে বাস করিত। ইহাই সমাজ-জীবনের কামনীয় চরম সীমা। এ জীবনে মূলমন্ত্র কোথায়? এই প্রহেলির শক্তি শুধু মস্তিষ্কের নাই। ইহার কাজ হইতেছে—বিশ্লেষণ, বিচার সন্ধান করা। এই কৃত্রিম বন্ধন দৃঢ় আঘাত সহ্য করিতে পারে না। নানা চিত্তকুসুমের মালা গাঁথিব সামর্থ্য এই এলো সূতার নাই। বিচার সূর্য্যরথের অরুণ সারথি সংশয়। পথ বন্ধুর। ভাঙ্গাগড় মধ্য দিয়াই বিচারককে অগ্রসর হইতে হয়। একটি অখণ্ড সূত্র না থাকিলে মালার বাঁধন যেমন নির্ভ

যোগ্য হয় না তেমনি একটি আত্মাই সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এই বোধ না জ
এমন সর্ব্বাত্মিকা মালা গাঁথা অসম্ভব। ঈশোপনিষৎ বলিলেন "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্য
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥" ইত্যাদি। স্বকৃপরিশিষ্টে যজ্ঞের মধ্যেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক
সন্ধান দিলেন "পরেষা বৃণকারার্থং যজ্জীবতি স জীবতি।" ইত্যাদি। 'সর্ব্বভূতহিতেরতঃ' এই ব্রত
মানসিক কোন্ অবস্থায় করিতে পারে? এ আপন এ পর এই গণনা সঙ্কীর্ণ চিত্তের। এই গণ্ডী অ
করিতে না পারিলে কখনও সকলকে আপন করা যায় না। জাতীয়তাবাদের পরিধি বিশাল হই
অতি বিশাল নয়। তাহাও সঙ্কীর্ণতার বেড়া দিয়া ঘেরা। মানবতাবাদও অতি বিশাল বটে।
তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অহমিকা আছে। মানুষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাণী। অপর প্রাণিগণ মানুষের ভো
সাধন। মানুষের সেবাতেই ইহাদের জীবনের সার্থকতা। এক কথায় ভূদেবতা মানুষ। বৃক্ষল
অন্যান্য সকল উদ্ভিদ্ মানুষের সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা সম্বন্ধে ভোগ্য। তাহারা চিরকালই উপায়
কালেই উপেয় নয়। মনুষ্যেতর জীবজন্তুর এই একই গতি। গাভীর দুগ্ধ মানুষ পান করে বলিয়াই
জীবন সার্থক ও ধন্য। অশ্বের কার্য্য ভার বহন করা। এই ভাবে মানুষ প্রয়োজনীয় জীবজন্তুকে গৃহপ
করিয়াছে এবং মনুষ্য সমাজের নিত্যপ্রয়োজনে ইহাদের ব্যবহার করা হয়। সেইজন্যই এত অ
যাহারা নিত্য প্রয়োজনে লাগে না তাহাদের দূরে রাখা হইয়াছে। ভারতের জ্ঞানী ঋষি বলিলেন—

চণ্ডী ১।৪৫ জ্ঞানঞ্চ তন্মুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যৎ তয়োরপি॥"

ঐ ১।৪৪ "যতোহি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষি মৃগাদয়ঃ"

ভারতের বিশ্বাত্মতা বিশালতম। তাহার পরিধি আকাশের মতই অনন্ত।

এই বিশালতমতার উপলব্ধি খণ্ড দেশ ও খণ্ডকালের গণ্ডীতে হয় না। যেমন সীমিত সি
যোগ করিয়া সীমাহীনে কোন কালেই পৌঁছান যায় না। ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যাকে যোগ
কোনও কালেও অনন্তে পৌঁছান যায় না। যেমন সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বর্ষ
সসীমকাল রাশি কখনও অসীম কালের আভাস দিতে পারে না। আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র, তারা
সূর্য্য প্রভৃতি কল্পনা রেখায় যুক্ত করিলে যেমন অনন্ত দিকের সন্ধান পাওয়া যায় না তেমনই খ
সমবুদ্ধির সমাহার অখণ্ড আমিত্বের ধারণার আভাসও দিতে পারে না। ভেদবুদ্ধি তিরোধানের
না করিলে এই উজ্জ্বল—অখণ্ড আমিত্বের স্ফুরণ হয় না। এ আমি বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত, সকল
অনুস্যূত অথচ কালাতীত, সকল দেশানুগত অথচ দেশাতীত। আমির অভাব কোন দেশে; কোন
এবং কাহার মধ্যে আছে। যখন জড়শক্তি নিজপরিণামে ব্যগ্র, যখনও কোন প্রাণীরও আবির্ভ
নাই তখনও এই পরিণামের পূর্ব্বে আমির অস্তিত্ব ছিল না এবং পরেও থাকিবে না এরূপ ধারণা ব
কোন সঙ্গত কারণ আছে কি? মধ্যে যে যোগসূত্র ছিন্ন হয় নাই তাহার প্রমাণ তাহার এব
বিভিন্নরূপের মধ্য দিয়াই পরিণামের আত্মপ্রকাশ। অভিন্নরূপে যে প্রকাশিত হয় তাহাকে

বিচ্ছিন্ন অথবা সংঘত রাখিবার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। ভেদবুদ্ধি পরাহত হয় অভেদ বুদ্ধির দ্বারা, সাম্যবুদ্ধির দ্বারা নয়। কারণ ভেদ বুদ্ধি থাকিলেও সাম্য বুদ্ধি হইতে পারে কিন্তু অভেদ বুদ্ধি হয় না। এই অভেদ বুদ্ধি মস্তিষ্কের সাহায্যে উপলব্ধি করিতে পারিলেও বশীভূত করা যায় না জীবনের এই বুদ্ধিই যখন প্রভুত্বের দ্বারা সকল বৃত্তিবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে তখনই ধন্য মানব আধ্যাত্মিক উন্নতির অচলভূমিতে অবস্থান করেন। হৃদয়ের প্রসার না হইলে এ অবস্থায় পৌঁছান যায় না। প্রেমের বিকাশ না হইলে পরকে নিজের সঙ্গে গ্রথিত করা যায় না। চিত্তহীন আত্মা পুষ্পহীন মালার সূত্রের মত। সামাজিক জীবনের মুক্তিই কাম্য ও উপভোগ্য। অনাস্বাদ্য রস রসই নয়। প্রেমের বিকাশ কাহার দ্বারা হয় না—সেবার দ্বারা হয়। সকলের যদি অভয়-আশ্রয় হওয়া যায় এবং কথায়, কাজে এবং চিন্তায় যদি পরের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারা যায় তাহা হইলে বুঝা যাইবে প্রেমের স্ফুরণ হইতেছে। কুটিলতা, অভিমান, আত্মশ্লাঘাখ্যাপন, প্রাধান্য স্থাপন প্রভৃতি এই পথের কণ্টক। জানা, অজানা সকলের কথা ভাবিতে হইবে। বর্ণভেদ, শারীরিক গঠনভেদ অথবা মানসিক অপরিপক্কতা, আচার-ব্যবহারে বৈষম্য, ভাষার বৈজাত্য প্রভৃতি ভেদের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। হৃদয়ের সব বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তি আছে যাহার প্রকাশ বিভিন্ন ভাবে হইলেও কিন্তু একই কার্য্য করিয়া যাবে সেটি হইতেছে দুইকে এক করা। চিত্ত জয় হিসাব করিয়া হয় না—অর্থ দিয়াও হয় না, ভয় দেখাইয়াও না, ধোঁকা দিয়াও হয় না—হয় শুধু অকুণ্ঠ আত্মত্যাগে। এই প্রেমই ভারতের প্রাণধর্ম্ম।

এই প্রেম এত ব্যাপক যে তাহার গতি কত বিভিন্নমুখী যে হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না এই প্রেমের স্রোত যখন জীব জগতের দিকে বহে তখন অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া সামাজিক জীবন প্রতিফলিত হয়। যে পশুকে আত্মতৃপ্তির জন্য বধ করিতে চাহিতেছে সে পশু যে আমার পরমাত্মীয় আমি নিজেকে বধ না করিয়া কেমন করিয়া এই পশুকে বধ করিব। তখন অন্যসমস্ত হৃদয়বৃত্তি তার বধের প্রয়োজনীয়তার বিচার তখন উদিত হইবার অবসরই পায় না। যাহার ভেদবুদ্ধি আছে এবং আত্মাভিমান সবল এবং অপরের প্রতি তুচ্ছতা বোধ তাহার পক্ষেই এই বিচার শোভা পায়। তাহা অন্ত শারীরিক বল অথবা অস্ত্রজাত বল। ভারতের উন্নত প্রাণের পরিচয় চিত্তের বিস্তৃতিতে। যে পরে আপন করিয়াছে সে বধের চিন্তা তাহার মনে উদিত হইবেই বা কি করিয়া! অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ প্রাদেশিকতা প্রভৃতি নিম্নস্তরের চিত্তের ধর্ম্ম। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে ভারতের প্রাণ কি নিরচিত্তে না বরং সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত তাহাদেরই। কত কালের ব্যবধানে একটি বুদ্ধ বা একটি চৈতন্য জন্মায়। তাহাই যদি হয় তাহা হইলে দুই এক জনের কথা লইয়া এত মাতামাতি করিতেছেন কেন? এর উত্তর অতি সহজ ভারতের প্রাণ নিস্পন্দ দীঘির জল নয়। এ যে চিত্ত দুরন্ত নদীর মত খরস্রোত। এই নদী সদাস্রোতা বটে, তাহা হইলেও সে যে বহিয়া চলিয়াছে তাহার একটি লক্ষ্য আছে। নদী যেমন আপন প্রিয় সাগর সঙ্গমের জন্য ছুটিতেছে, প্রিয় প্রাপ্তির পরে সে আপন সত্তাই হারাইয়া ফেলে। তেমন ভেদবুদ্ধি স্বাভাবিক নিয়মেই ছুটে অভেদ জ্ঞান সাগরের দিকে। অভেদ বুদ্ধির উন্মেষ হইলেই ভেদবুদ্ধি সেখানে চিরতরে বিলয় হয়। তা হইলে পূর্ণ প্রাণধর্ম্ম কি?

এই প্রাণধর্ম্ম বুঝিতে হইলে আমাদের আর একটি দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হ আমরা এতকাল ধরিয়া ভাবিয়া আসিতেছি যে, আমি অমর অর্থাৎ আমার রূপান্তর হয় না। পরিবর্ত্তনই আমাকে স্পর্শ করে না। এটি কিন্তু প্রাণধর্ম্ম নয়। এই সনাতন সম্বন্ধে স্বল্প-আলোচন করিয়াছি। এটি প্রাণ নদীর স্থায়ী খাত হইলেও প্রাণের ধর্ম্ম নয়। যাহা প্রাণের ধর্ম্ম তাহা প্রা অবলম্বন করিয়া থাকে। এই প্রাণকে একটি বর্ত্তমান কালে অবস্থিত প্রাণবিশেষের সসীম জী মনে করিলে ভুলের ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যদ্রূপে সীমারেখা মানু কল্পনার সাহায্যে টানিয়াছে। তাহারই ফলে জীবজগতে এত ভেদ দেখা দিয়াছে। এখন সকলেই যে এক এই কথাই ভুলিয়া গিয়াছি। বিশাল প্রাণ স্রোতস্বিনী যাহার হয়ত জন্ম হইয়াছে অন্তরে, সেই স্রোতস্বিনী বহিতে বহিতে নানাকৃতি ধারণ করিয়া কালক্রমে বিভিন্ন চেতনার স্তর অ করিয়া থাকে। সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিমানী হইতে শিখে। অভিমানী হইয়াই সে বি বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলে। এই বিচ্ছেদের বুদ্ধিই প্রাণীর সর্ব্বনাশের সহিত বিজড়িত অগ্রগতির প্রেরণ স্ব-ব্যক্তি, স্ব-পরিবার অথবা স্ব-শ্রেণীর উর্দ্ধে উঠিবার শক্তি এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে হয় না। তাহা নানা কদর্য্য মনোবৃত্তির পরিপুষ্টি ঘটিয়া থাকে। অখণ্ড প্রাণপ্রবাহের সন্ধান বিজ্ঞান দিলেও, বৈজ্ঞা সেবা করিতেছেন ভেদদৃষ্টি কলুষিত ব্যক্তিদের। এরই ফলে অপূর্ব্বদান অভিশাপে পরিণত হ বিজ্ঞান বরলব্ধ দৃপ্ত পুরুষেরা হয় শোষণে অতি ব্যগ্র, না হয় সংহারে প্রবৃত্ত। প্রাণের রূপান্তরের নিরূপণ করিতে পারিলে এবং সেই জীবনের উদ্দেশ্য জানিতে সমর্থ হইলে নূতনভাবে আমাদের সং রূপ দিতে পারিব। এই অভেদবুদ্ধি শুধু কাল্পনিক অথবা ভাবুক মনের দৃষ্টিভঙ্গী নয়। ইহা বিজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গী। বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হইলে আমরা প্রাণের একতা ভালরূপেই প্রমাণিত করিতে এখনও সম্পূর্ণভাবে কল্পনা-নিরপেক্ষ বস্তুজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত পারি নাই। অন্যান্য মতবাদগুলির আলোচনা করিবার সুযোগ বর্ত্তমানে আমার নাই। য কথায় বলিতে পারি অপর মতগুলি অলৌকিকতার আবরণে আবৃত। মানুষের জ্ঞানের সীমা সংকীর্ণ তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রশস্ত পথে সর্ব্বজ্ঞতা লাভের কৌশলও অ প্রত্যক্ষের উপর ভিত্তি করিয়া জ্ঞানের সংগঠন না করিলে বিভেদ অনিবার্য্য।

উপসংহারে বলিতে চাই, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি ভালবাসা প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। স তত্ত্বের প্রতি পক্ষপাত সর্ব্বজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত। প্রেমই প্রাণের পরিণত ধর্ম্ম। প্রেমেই প্রাণের প ও চরমোৎকর্ষ। কারণ প্রেমের মাধ্যমেই চরম বিস্তার লাভ করে প্রাণ। সর্ব্বদেহের মধ্যেই স্পন্দন অনুভব করিয়া এই প্রাণই বিশাল ঐক্য প্রাপ্ত হয়। এই উপলব্ধিই বহুর কল্যাণ যাহ সেই কর্ম্মে অনুপ্রেরিত করে। আত্মরক্ষার স্বতঃপ্রবৃত্তি এবং মৃত্যুভয় যেমন ব্যক্তি প্রাণের স্বাভা তেমন প্রাণপ্রবাহের এক তীব্র এবং অনন্তকালব্যাপী স্পন্দনশীলতার উপলব্ধি অপরিসীম আনন্দের মৃত্যুর মৃতসঞ্জীবনী রসায়ন। এই অখণ্ড ও অনন্তপ্রসারী প্রাণকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের দর্শন, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া উঠুক।

উৎসবের ঔজ্জ্বল্যে

উজ্জ্বল পরিবেশে নিজেকে উজ্জ্বল ক'রে তোলার
বাসনা সকলের-ই। আর লাবণ্যময়ীর
ঔজ্জ্বল্য একান্তভাবে তার ঘন কৃষ্ণ কেশদামে।
আনন্দ-উৎসবে ও রূপসাধনায় লক্ষ্মীবিলাস
তার শতাব্দির ঐতিহ্য নিয়ে
আপনার সেবায় নিয়োজিত।

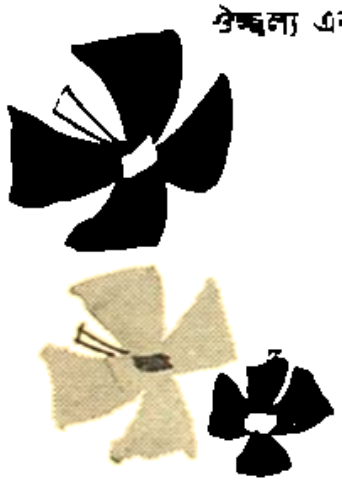

লক্ষ্মীবিলাস
তৈল

এম. এল. বসু এণ্ড কোঃ প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

মারীচ-মায়া

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

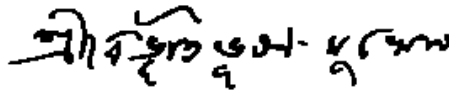

"মারীচ কোথায় ছিল একটা রাক্ষস, ধাঁ করে নিজের চেহারা পালটে নিয়ে একেবারে হয়ে একটা সোনার হরিণ। তোরা আজকাল বলবি তাহা গাঁজাখুরি। কলকাতায় গলির এক কালি এই রকটুকুতে ব'সে বিশ্বদর্শন করছিস কিনা সবাই।"

বাণ্ডিল থেকে একটা বিড়ি বের করে নিয়ে মন্তব্য করলেন শিবকালী।

হারান বলল—"আপনারা জিদ ধ'রে ব'সে থাকবেন সত্যি বলে তাই আমাদেরও বলা গাঁজাখুরি, নইলে কবি-কল্পনা বলেও তো একটা জিনিস আছে দাদু।"

শিবকালী বিড়িটা ধরিয়ে বললেন—"অর্থাৎ ঐ একই কথা একটু পোষাকী সাজে, অত বড় লোকটা বলেছে, এই না? কিন্তু সে বনে-জঙ্গলে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসে নিত্যি ঐ চলছে সেখানে···"

"তাই নাকি দাদু!···ঐ কাণ্ড হচ্ছে নিত্যি?···রাক্ষস সোনার হরিণ···"

—সবাই প্রশ্ন নিয়ে ঘন হয়ে বসল। শিবকালী বললেন—"আর তেমন ঘোর জঙ্গলও কোথাও, তাতে রাক্ষসও নেই, সুতরাং তাদের সোনার হরিণ হয়ে যাওয়ার কথাও ওঠে না। কোলা ব্যাঙ্গ বাঘ হয়ে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে গেছে এতো আমার স্বচক্ষে দেখা। শুধু পারল লাফিয়ে পড়তে তাই আজ জাঁক করে কথাটা বলতে পারছি, নইলে আমাকেও তো লোকে কলকের ধোঁওয়া বলে উড়িয়ে দিতে পারত এতদিন।"

হারান একটু মুচকি হেসে কি বলতে যাচ্ছিল, সবাই হৈ-হৈ করে থামিয়ে দিল তাকে, শিবক বলল—"ওটার কথা বাদ দিন দাদু···কি হয়েছিল বলুন···ব্যাঙ হয়ে উঠল?···নিজের চোখে দেখলেন

"হিজেলগড়ের কুমারবাহাদুরের সেই হয়ে গেছি আমরা দুজনে; আমি আর পশুপতির দিনেন। দিনেন তখন নূতন ডেপুটি হয়ে মেদিনীপুরের একটা মহকুমায় রয়েছে, কুমারবাহাদুরের সেই সূত্রে আলাপ।

হিজেলগড় এস্টেট মেদিনীপুরের একেবারে শেষ দিকে। খানিকটা তার মধুর এলাকাতেই পড়ে। ওদিকে খানিকটা পাহাড় জঙ্গল, এদিকে জমিটা উঁচুনীচু হয়ে নেমে আসতে বাংলার সমতলের সঙ্গে মিশে গেছে, মাঝে মাঝে শাল, পিয়াশশালের বন। একটু এগিয়ে মধু পাহাড়ের মধ্যে গিয়ে পড়লে হাতী থেকে সুরু করে সব বড় বড় জানোয়ারই পাওয়া যাবে, তবে এ জঙ্গলে ছিটকে-ছাটকে একটা বাঘ কি ভল্লুক যদি কখনও এসে পড়ল, নয়তো হরিণ, বুনো শূ

খরগোস শিকারের মধ্যে এই। দ্বিজেনের শিকারের ঝোঁক আছে, বুঝে বলে বড়-কর্তারই কথা, ত হরিণ-খরগোস হলেই যেন ভেতরে ভেতরে বেশি খুশি। আমি সঙ্গ নিয়েছি, শুনেছি কুমারবাহাদুর গাইয়ে-বাজিয়ে আছে ভালো ভালো, তার ওপর দিন কতক রাজ-আতিথ্যের লোভ। শিকারের ব উঠলে দখল দিতে পারব—কিসে যে পেছপা তাই বলনা—এদিকে শিকারে গেলেও ভয় শুধু বন্দুকে আওয়াজটা। তোদের দিদিমা দুটো বাতাইচণ্ডীর মাদুলি বেঁধে দিলে একটা, যাতে বড়দের ওঁরা যে ছিটকে-ছাটকে এসে না পড়েন, অন্যটা···"

হারান বলল—"তাহলে আবার দ্বিতীয়টার দরকারই কি ছিল দাদু?"

"কেন, সেকেণ্ড লাইন্ অব্ ডিফেন্স (second line of defence) ব'লে একটা জিনি নেই?"

দুটু বিরক্ত হয়ে উঠে বলল—"লড়াইয়ের যখন কিছু বুঝিস না, চুপ ক'রে শুনে গেলেই পারিস। তারপর দাদু?

"তোদের দিদিমণিকে কথাও দিয়ে বেরিয়েছিলাম—যতদূর পারি চেষ্টা করব গান-বাজনা আসরটাই জমিয়ে তুলতে যাতে ওদিকে যেতেই না হয়। শুভক্রাইডে আর ইষ্টার নিয়ে দ্বিজেনে মাত্র তিনটে দিন ছুটি, তার মধ্যে একটা তো পথেই কেটে যাচ্ছে। পৌঁছে, হাতি থেকে নেমে স রাজবাড়ির বৈঠকখানায় দাখিল হয়েছি, খবর পাওয়া গেল পরদিন সকালেই শিকারে বেরুতে হবে ব্যাপার কি? না, আমরা পৌঁছুবার কিছুক্ষণ আগেই লোক ছুটে এসেছে—কাল রাত্রে মাইল দশেক দূরে জঙ্গলের ধারে একটা গ্রামের মধ্যে থেকে বাঘে একটা বড় বাছুর নিয়ে পালিয়েছে। পৌঁছে সন্ধ্যের, হাতে মাত্র রাত্তিরটুকু···"

"আর মাদুলি, দাদু?" বীরু প্রশ্ন করল।

"হাতেই রয়েছে। তবে রক্ষাকবচ বাঁধতে একটা যে ঐদিকে ভুল ক'রে ব'সে আ তোদের দিদিমা। অবিশ্যি পরে টের পেলে সেটা গেরো আর কাকে বলে? বিষিপত্রে মায়ের সিঁদে সিঁদুর ছিল, কোথায় সেইটে পুরে দেবে, না, মায়ের খাঁড়ার হাতের ফুল পুরে দিয়ে বসে আছে হোল না কিছু, তবে খাঁড়ার হাতের ফুল, শুনে কাওই তো, একটা দুর্ভোগ তো গেল। আদ আপ্যায়নের রাজকীয় ব্যবস্থাই, কিন্তু সবইতো ফিকে মেরে গেল। যাই হোক, রাতটুকু কোনরক ইষ্টিনাম জপ করে আমরা চা-টা খেয়ে সকাল আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম দুখানা জীপে ক'রে একটাতে কুমারবাহাদুর, আমরা দু'জন আর কুমারবাহাদুরের পারিষদ দয়ালবাবু। অপরটাতে কুমা বাহাদুরের খাস চাকর অক্ষয়। একটা দল রান্নাবান্না আর অন্য সব কিছুর সরঞ্জাম নিয়ে রাত্তিরে বেরিয়ে পড়েছে। গ্রামের বাইরেই তাঁবু পড়বে। ঠিক হয়েছে সেইখানেই খাওয়া দাওয়া সেরে এব ফিরিয়ে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব। আমাদের সঙ্গে বন্দুক চলল তিনটে; একটা কুমারবাহাদুরে একটা দ্বিজুর আর একটা—কি যে বলে···"

"পারিষদের ?" দুটু প্রশ্ন করল। শিবকালী বললেন—"না, সে বচনেই বাঘ মারে আমার আর একটা বন্দুক রইল অক্ষয়ের হাতে। আমি নাম দিয়ে এসেছিলাম—অক্ষয় কবচ।

মন্দ লাগছিল না মেহাত। এসে পর্যন্ত সর্বত্রই বাঘ,—চায়ের কাপে, পুডিংয়ের পোলাওয়ের ডিশে, মাংসের বাটিতে; তারপর অনেক সাধ্যসাধনার পর যখন একটু ঘুম এল বাঘেরই স্বপ্ন—খুবই অশান্তিতে গেছে রাত্তিরটা, সকাল থেকে কিন্তু সে-ভাবটা গেল কেটে। আরও হালকা ভাবে কাটল। কুমারবাহাদুর নিজের শিকারের কিছু কিছু গল্প করলেন, গো দ্বিজেনও বলল নিজের অভিজ্ঞতার কথা। বাকি সবটা আমাতে আর দয়ালবাবুতে বাঘেদের উজির মারতে মারতে চললাম। উনি একটা ঝাড়েন তো আমি তার চেয়ে আরও দু'পে বাড়িয়ে ঝাড়ি। তাতে এঁটে উঠতে পারবেন কেন বল্? আমার সে এদিকে আবার একেবারে টাটকা অভিজ্ঞতা সব···"

সবাই বিস্মিতভাবেই মুখের দিকে চাইল। বীরু বলল—"অভিজ্ঞতা! এখন পৌছুলেনই না দাদু।"

"স্বপ্নগুলো দেখলে কে রে সমস্ত রাত? নষ্ট হতে দোব? বাগবাজারের ছেলে আমি, শিকারে কোথাকার এক দ্বিজেনগড়ের দয়াল সা আমার ওপর টেক্কা দিয়ে যাবে? এসা রঙ চড়িয়ে যে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে না?"

দশ মাইলের মধ্যে প্রায় মাইল সাতেক পর্যন্ত আমাদের জীপ চলল। তারপর মাই হাতীর ওপর। বচনে বাঘ মারতে মারতে বেলা প্রায় এগারটার সময় আমরা ক্যাম্পে পৌছুলাম। গিয়েই একটা সুখবর, বাঘ নয়, চিতে। দেখে সে সব নাস্তিকের দল—বলি মাদুলি কিছু নয়?

ঘণ্টাপচারে রাজভোগ তৈরি। সেবা করে' একটু আরাম করে প্রায় একটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। হাতীরই ব্যবস্থা। গ্রামেও একটা তোরের ছিল, সেটাকে নিয়ে তিনটে একটার ওপর কুমারবাহাদুর, একটায় দ্বিজেন আর দয়ালবাবু, একটার ওপর আমি আর নীচে লাঠি বর্শা নিয়ে কিছু পদাতিক আর তাদের সঙ্গে কুমারবাহাদুরের হাউণ্ডটা। চেন্-করা।

ক্যাম্প থেকে গ্রামটা প্রায় পোটাক দূরে। সেখানে পৌছুবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘের সঙ্গে এ সামনা-সামনি···"

"সামনা-সামনি!···তারপর?—একসঙ্গে বলে উঠল সবাই।

শিবকালী আর একটা বিড়ি বের করে টিপে টিপে মসলা পরখ করতে লাগলেন অধৈর্যভাবে হাতটা ঝেড়ে বলল—"এই আপনার মস্ত বড় রোগ দাদু। কি অবস্থায় ফেলে রেখেছে নেই—বিড়ি টিপতে বসলেন!···তারপর?"

শিবকালী বিড়িটা ধরিয়ে দু'চোঁক ধোঁয়া গিলে নিয়ে বললেন—পৌছেতেই সব সে

ক'রে দিয়ে গেলেন। কাল রাত্তিরেও নাকি বাঘটা এসেছিল। একটা গোরুকে ঘায়েল করেও পাড়ার একেবারে ভেতরে সেঁদিয়ে। তারপর তাড়াহুড়ো খেয়ে গ্রামের শেষ দিকে একটা বুড়ির একটা ছাগল মুখে করে নিয়ে পালিয়েছে। দিনের বেলা রক্তের দাগ দেখে দেখে লোকেরা লাঠি বর্শা নিয়ে সামনের জঙ্গলটা পর্যন্ত গিয়েছিল। সেখানে একটা ঝোপের মধ্যে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে বাঘটা একজনের পিঠে একটা থাবা বসিয়ে তারপর কোথায় যে লুকিয়ে পড়ল আর সন্ধান পাওয়া যায়নি তবে ঐ বনেই আছে। একটা লোক ঘায়েল হোল। এদিকে খোদ কুমারবাহাদুর এসে পড়েছেন ওরা আর ঘাঁটাওনি বেশি। শুধু লক্ষ্য রেখে গেছে এ বন থেকে বেরুল কিনা।

বনটা গ্রাম থেকে প্রায় ক্রোশখানেক দূরে। ওখানকার আন্দাজে বলছি, মাঝে যদি কোন পাহাড় বা উঁচু টিলা না রইল তো বহুদূর পর্যন্ত তো দেখা যায়। খুব বড় জঙ্গলও নয়, প্রায় সমস্ত বেড়টাই তো দূর থেকে রয়েছে দেখা; শুধু মাঝামাঝি গিয়ে বাঁ দিকে সাবুই ঘাসের মোটা তিনের টিলা অল্প একটু জায়গা নিয়ে তাতেই ওদিকের খানিকটা যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কুমারবাহাদুর হুকুম দিলেন এগুতে। একেবারে মুখোমুখি বাঘের, আমার তো…"

"এই আপনার মুখোমুখি হওয়া দাদু!"—মুটু উৎকণ্ঠায় নিশ্বাস বন্ধ ক'রেই বসেছিল, নামিয়ে দিয়ে সেটা, বলল—"কোথায় এককোশ দূরে বাঘ তাও জঙ্গলের মধ্যে কোথায় তার ঠিক নেই…"

"তার মুখোমুখি হওয়া আর কলকাতার বীহু হাজরার গলিতে আমাদের এই মুখোমুখি হয়ে মসলিস জমানো তো এক হতে পারে না। ক্রোশখানেক পথ তো তার জলখাবার। তিনটি লাফ দেবে ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে। যাই হোক, শিবকালীর দুঃখ আর বুঝছে কে? হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটা ছুটল সামনে, গাঁ থেকেও অনেক লোক জুটে গেছে, সঙ্গে টিন, মাদল, কাঁসর। ওরা গিয়ে ওদিক থেকে জঙ্গলটা ঘেরে ফেলে হৈ-হল্লড়ের সঙ্গে এগুলো বাজাতে আরম্ভ করবে যাতে বাঘটা এদিকে এসে পড়ে। এদিকে আমাদের তিনটে হাতীর ওপর তিনটে বন্দুক।

হাতী তিনটে এখান থেকে একসঙ্গেই বেরুল, বনের কাছে গিয়ে আলাদা হয়ে যাবে। কুমার বাহাদুরেরটা বনের মাঝখান দিয়ে, আমাদের দুটো দুই কিনারা ঘেঁসে। টিলার দিকে প্রায় অর্ধেকটা এগিয়েছি, আরম্ভ হয়ে গেল জঙ্গলের সেই মারীচ-মায়া যার কথা গোড়াতেই বলেছি। পাশাপাশি তিনটে হাতীর ওপর গল্প করতে করতে চলেছি আমরা, হঠাৎ পেছনে গা থেকে উৎকট হল্লা, ঘুরে দেখি সত্যিই যেন একটা লম্বা সোনার বাটই তীরের মত ছুটে আসছে। শ'দুয়েক গজ দূরে তারপর কিছু বুঝে ওঠবার আগেই আমাদের পাশ দিয়েই সোঁ ক'রে বেরিয়ে গিয়ে টিলার সাবুই জঙ্গলটার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা সবাই হতভম্ব হয়ে গেছি, কুমারবাহাদুর পর্যন্ত, এক শুধু অক্কা ছাড়া। সে তার বন্দুকটা বাগিয়েও ধরে ছিল। রেখে দিয়ে কুমারবাহাদুরের দিকে চেয়ে বলল—'ভোসাবে হুজুর। এ সেই পলাশবনীর চিতেটার মতন ধেতো, হয় তো বা সেইটেই ছটকে বেরিয়ে পড়েছে।"

গল্পও শুনলাম। চিতেগুলো বেঙ্গল রয়েলের চেয়েও ধূর্ত তো, এ ধরনের কতকগুলো সেগুলো মানুষ-খেকো হয়ে আরও ধূর্ত হয়ে ওঠে। এতই যে, এদের অঞ্চলে এদের বাঘু-বাঘ পড়ে গেছে; এদের নিয়ে গল্পদব চলিত আছে যা ভূতের গল্পের মতনই। অক্ষয় জানাল ব গাঁয়ের মধ্যেই ছিল। বনের মধ্যে ছাগলটা খেয়ে রাত্তিরেই আবার চলে এসে গ্রামের মধ্যেই ছিল। কোথায় তা বলা শক্ত, হয়তো কারুর ঘরের মধ্যেই, না হয় কিছু কিছু ঝোপ-ঝাড় তো আশে-পাশে, কিম্বা গ্রামের মধ্যেও। জানে, ঐ যে রক্তের দাগের ভাঁওতা দিয়ে দিয়েছে, গ্রামে আর নজর যাবে না কারুর।

কি জানি এতটা কি সম্ভব! তবে অক্ষয়ের কাছে যা শুনলাম তাই বললাম তোদের। যা দেখলাম তা তো প্রায় এই জিনিসই।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমরা জায়গাটা ঘিরে ফেলে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলা কোথাও বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল না। অথচ জঙ্গল বলতে শ'-খানেক বিঘে জমি নি শুকনো একটু হলদেটে সাবুই ঘাস, আর মাঝে মাঝে বন-গেঁদার ঝোপ, তার সঙ্গে গুণে-গেঁ হয় গুটিপঞ্চাশেক বেঁটে শাল গাছ। তিনটে হাতী দিয়ে ঘেরে আমরা ঘণ্টাখানেকের ওপর হয়রা কোথায় বাঘ? এদিকে রোদ নরম হয়ে আসছে, যেন কিছু একটা যাদুই হয়ে গেল চোখের এইটেই ধ'রে নিয়ে আমরা তল্লাসি ছেড়ে আবার বড় জঙ্গলটার দিকে এগুলাম। আমাদে বীটার্সের (Beaters) দল তাদের টিন-মাদল নিয়ে ততক্ষণে জঙ্গলের ওদিকে গিয়ে ঘিরে দাঁ আমরা গিয়ে লাইন ধ'রে নিয়ে লাউড স্পিকার দিয়ে বলব, তারপর তারা আরম্ভ করবে।

প্রায় জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছেছি, আবার একচোট সেই কাণ্ড।—আমরা সাবুই থাকতে থাকতেই গ্রাম থেকে আরও একদল লোক লাঠি বর্শা নিয়ে ছুটে গিয়েছিল, আমর আসবার পরও তারা পিটুচ্ছিল ক্ষেতটা, হঠাৎ তাদের একটা তুমুল চীৎকার। সঙ্গে সঙ্গে দেখি সেই সোনার বাট। এবার ডান দিকে বন্দুকের রেঞ্জের খানিকটা বাইরে—তবু তিন হাওদা দিয়ে তিনটে নলই ত্যাগ করে উঠল, তিনটে ফায়ারও, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা? যে কি উঠল তার মধ্যে দিয়ে সত্যি যেন মনে হোল তীরের মতন ছুটে গিয়ে বনের হালকা ঘাসের ি মিলিয়েই গেল জিনিসটা। শিকার করি বা নাই করি সঙ্গে গেছি অনেকবারই তোরা ব রকম কারে প'ড়ে যেতে হয়েছে—না হয় সেই কথাই মেনে নিলাম—কিন্তু এ ধরনের কিছু এ দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

জঙ্গলের ধারে গিয়ে আমরা সব আলাদা হয়ে গেলাম; ডানদিক ঘেঁসে আমরা, বাঁয়ে আর দয়ালবাবু, মাঝখানে কুমারবাহাদুর। লাউড স্পিকার দিয়ে বীটার্সদের আরম্ভ করে দিতে আমরা এগুলাম।

খানিক এগিয়েই বেশ বুঝতে পারা গেল এ জঙ্গলে এসে ও-বাঘকে কায়দা করা সে ॥

অসাধ্যসাধন। প্রথমত দূর থেকে যতটা মনে হয়েছিল ঠিক ততটা ছোট নয়, তার ওপর রকমারি গাছপালা লতা-আগাছায় ভরা। এক এক জায়গায় এত রোদ্দুরেও প্রায় অন্ধকার। এক এক জায়গায় রং-বেরঙের ডালপালা ফুলপাতার সঙ্গে রোদ-ছায়ায় ঝিলমিলিতে কেমন যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মনে। এক এক জায়গায় আবার কিছুই নেই, শুধু ঐ লম্বা লম্বা ঘাস; পাশের লম্বা লম্বা গাছের ছায়া পড়ে এখানে হলদের সঙ্গে কালোর টানে একটু যেন অন্যরকমই। সমস্ত জায়গাটা উঁচুনীচু, এদিকে যতই পাহাড়ের কোল ঘেঁসে এসেছে ততই আবার বেড়ে গেছে সে ভাবটা—ঐ জায়গায় উঠতেই গাছপালার মধ্যে দিয়ে জলের ছোট ছোট ঢেউও চিকচিক করে উঠছে। শুনেছিলাম বনের মাঝামাঝি নাকি একটা ছোট হ্রদ বা জলা গোছেরও আছে। এগুলো নিশ্চয় তারই ঢেউ। সব মিলিয়ে মনে হয় এ যেন একটা মায়া-কাননের মধ্যেই ঢুকে পড়েছি আমরা। এখান থেকে শিকার ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, সে একটা বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। তাই যেন হয়েও চলল। ওদিক থেকে টিন-মাদলের সঙ্গে হৈ-হল্লা করতে করতে ওরা এগিয়ে আসছে, মাঝে মাঝে "ঐ বাঘ!—ওদিকে—ঐ সেল!"—বলে আওয়াজ উঠছে, কিন্তু কাজ কিছুই হচ্ছে না। আমাদের হাতী বড় গাছের ডাল ভেঙে আগাছা ঠেঙিয়ে এগিয়ে চলেছে আস্তে আস্তে। তবে বাঘটা যে রয়েছে এটা টের পাওয়া গে

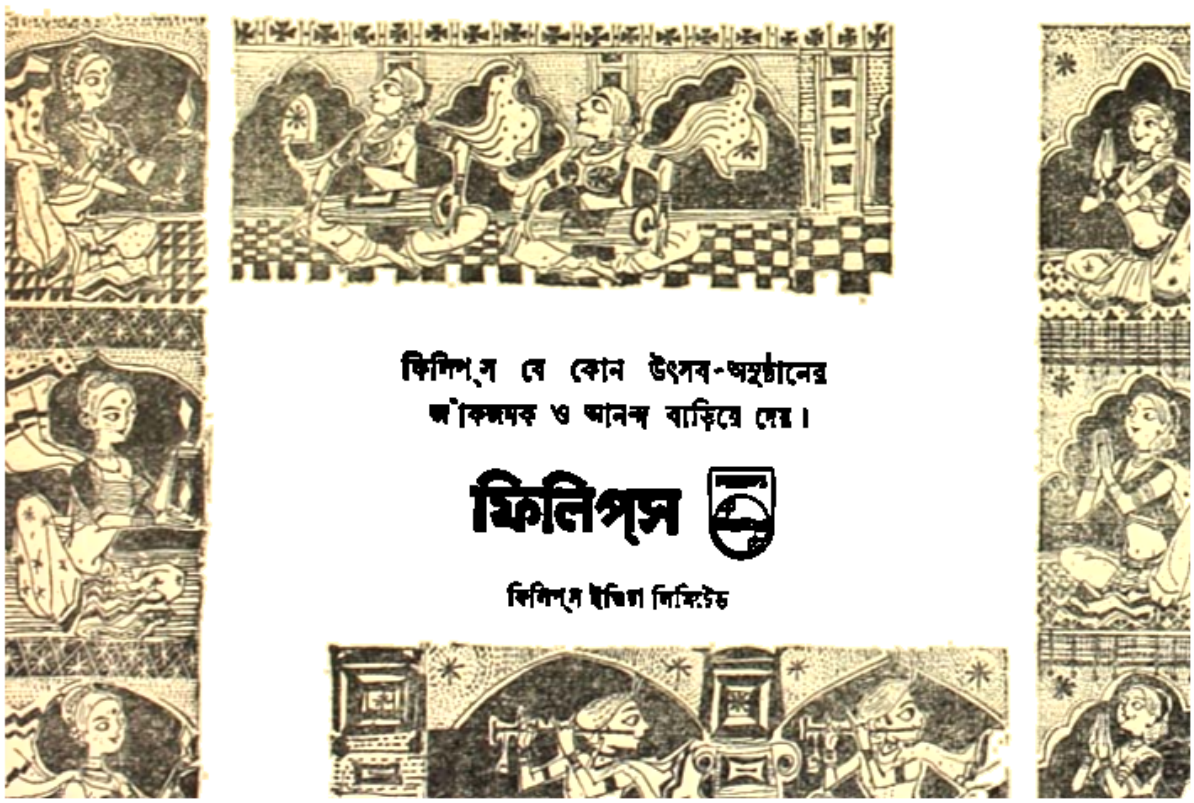

ফিলিপ্‌স যে কোন উৎসব-অনুষ্ঠানের
আকর্ষণীয় ও আনন্দ বাড়িয়ে দেয়।

ফিলিপ্‌স

ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

দুবারের দু'টো ঘটনায়। একবার আমাদের দিকেই বেশ আরও খানিকটা এগিয়ে একটা ঐরকম হল্লা উঠল!—"এসেছে!—ধরেছে!—কামড়েছে!" তাড়াতাড়ি হাতী ছুটিয়ে গিয়ে দেখি এ লোককে কাপড় পেতে ঘাসের ওপর শুইয়ে রেখেছে, কাঁধের কাছটা বাঁধা একটা ন্যাকড়া কালি দি ব্যাপার কি, না, বল পিটতে পিটতে লোকটা একলা পড়ে গিয়ে একটা ঝোপের সামনে এসে পড় বাঘটা পেছনে কোথা থেকে এসে ঘাড় কামড়ে ধরে। সেরই করে কেলত, কুমারবাহাদুরের কু হঠাৎ কোথা থেকে এসে পড়তে বাঘটা লোকটাকে ছেড়ে কুকুরটার দিকে ঘুরেছে, সঙ্গে সঙ্গে সো এসে পড়তে পালিয়ে যায়। খুব বেশি জখম করতে পারেনি লোকটা, বেশ সা-জোয়ানও। হাওদাতেই লাউডস্পিকার রয়েছে। কুমারবাহাদুরকে জানাতে তিনি লাউডস্পিকারেই লোক ক্যাম্পে পাঠাবার ব্যবস্থা করে কেলতে বললেন।

আবার খানিকটা এগুতে আর একবার ঐ রকম কাণ্ড। এবারেও কুমারবাহাদুরের কুকু বাঁচায় লোকটাকে, তবে বাঘে ধরবার আগেই।

আর ঐ কুকুরটা। কুমারবাহাদুরের হাওদাতেই ছিল তাঁর সঙ্গে। কি ভেবে সাবুই (নামালও সি। তারপর বনের ধারে এসে ছেড়ে দিতে সেই যে মাটি আর হাওয়া শুঁকতে শু বেরিয়ে গেল তারপর যেন সমস্ত জঙ্গলটা চ'ষে বেড়াচ্ছে—একবার ও-কোণে আওয়াজ তুলল, পরেই মাঝখানে, আবার খানিক পরে একেবারে ঘোর হয় উল্টো দিকে। পরে কুমারবাহাদুরের শুনলাম ব্যাপারটা। নাকের জোরেই ওরা শিকার খুঁজে বের করে তো, হাতী-মানুষে মিলে বনটাকে কচলানয় যে নানা রকমের গন্ধ ওঠে তাইতে ও সেই হারিয়ে কেলছিল ঐরকম মাঝে মাঝে।

এগুতে এগুতে তিনটে হাতী যখন আবার বনের ওদিকে গিয়ে একত্র হোল তখন রোদ হলদে হয়ে এসেছে। আর আশা নেই। কুমারবাহাদুর বোধ হয় আমাদের মুখ চেয়েই বন আর বনের মধ্যে দিয়ে ঠিক শিকার খুঁজতে খুঁজতে না গিয়ে, বাইরে বাইরে দিয়েই বেরিয়ে আমরা, একটু নজর রাখতে রাখতে, তাইতে যা হয়। ঠিক হোল একদিক দিয়ে আমাদের দুটো যাবে, অর্থাৎ একরকম গল্প করতে করতেই যাব আমরা, একদিক দিয়ে অক্ষয় ওর হ নিয়ে যাবে।

অক্ষয় বলল—তাকে মাঝখান দিয়ে যাওয়ারই হুকুম দেওয়া হোক। কুমারবাহাদু ভাবলেন একটু, তারপরে বললেন—তাহলে আমরা যেমন এসেছি তেমনিই ফিরে যাই। তবে তাড়াতাড়ি। নইলে বনের মধ্যে অন্ধকার হয়ে যেতে পারে। সে বড় খারাপ হবে। অক্ষয় বেলায় ওকে মাঝখান দিয়ে যেতে দিতে রাজী নয়। তবে সে আপত্তি টেকল না। পড়ন্ত বেলা উনি এবার হাউওটাকে হাওদাতেই তুলে নিলেন।

আমার মাথায় হঠাৎ এক ভূত চেপে বলল—ওর সঙ্গে যাব। ঘিজেন ঘোর আপত্তি

কিছু একটা হয়ে গেলে তোদের দিদিমার কি হবে? কি করে মুখ দেখাবে ও? আমার মা কুমারবাহাদুরের ভালোই লাগল—ঘোল-সতের যা দু'একটা বছর পেয়েছেন তাতে মনে করে যা কিরতি-পথটা ভালোই কাটবে; এবার তো ঠিক শিকারও নয়। বললেন—কিছু যদি হয়ই তো চেষ্টা-চরিত্র করে তোদের দিদিমার একটা ব্যবস্থা দেবেনই ক'রে—বিদ্যাসাগর মশাইয়ের দেশের তো। এগুলাম আমরা আবার।

মাঝামাঝি এসে আমরা যখন বিলের ধারটায় এসে পড়েছি; আকাশে সূর্যাস্তের আ সুরু হয়ে গেল ওদিকে। সে যে কী অপূর্ব কি ক'রে বোঝাই তোদের এখানে ব'সে? বসন্ত তো, বিলের ওপারে বনের মাথা পলাশের স্তবকে লালে লাল, তার ওপর পশ্চিম থেকে সূর্যের……"

"দাদু!"—ডাক দিয়েই দুটু খপ করে ডান হাতটা চেপে ধরল, বলল—"যখন কুমারবাহা হাওদায় উঠলেন তখনই সন্দেহ করেছিলাম সত্যি ভূতে পেয়েছে আপনাকে। তা, ও আর এ হবে। এখনও ব্যাঙ এলো না, তারপর বাঘ হয়ে লাফাবে। না দাদু, মোহাই…"

"নাঃ, নেহাত গন্ডমূর্খ সব!"

—শিবকালী একটু হেসে হাতের বিড়ির টুকরোটা ফেলে দিয়ে আর একটা ধরালে বললেন—"ঐ যে ভাঙা ভাঙা মেঘের কথা বললাম, গত রাত্রে এখানে একটু বৃষ্টিও হয়ে গিয়েছিল। ওরকম ভাব যাচ্ছে, বিলটার কাছে এসে একটু আধটু ব্যাঙের ডাকও কানে যেতে কুমারবা মাহুতকে বললেন হাতীটাকে আর একটু জোরে চালিয়ে যেতে। এসব পাহাড়ে জায়গায় এই হঠাৎ মেঘ জমে হঠাৎ বৃষ্টি নেমে যায় তো। লাউডস্পিকার ভুলে অন্য মাহুত দুটোকেও বলে এমন সময় হাউওটা হঠাৎ বড় বেশি চঞ্চল হয়ে উঠল। ক্রমাগত হাওদায় কাঠ আঁচড়ায়, শোঁকে আর তার সঙ্গে গলা ছেড়ে ডাক। চেনে বাঁধা রয়েছে, কিন্তু যেন ধরে রাখা যায় এদিকে কিছুই তো দেখা যায় না। বিলের ধারটা পরিষ্কারও, শুধু জলে হাত পাঁচ ছয় পর্যন্ত জা ছোট ছোট একরকম সাদা ফুলের লতা আর একরকম লম্বা-লম্বা ঘাসে ঢাকা। তবু কুকুরটার বাড়া দেখে কুমারবাহাদুর হাতীটাকে দাঁড় করিয়ে নামিয়েই দিতে বললেন ওকে। মাহুত ইঙ্গিত ব হাতীটা হাঁটু মুড়ে বসতে না বসতে কুকুরটা লাফিয়ে নেমে প'ড়ে হাওয়া শুঁকে, মাটি আঁচড়ে খানিকটা জায়গা ঘুরে আবার এখানেই ফিরে এল; তারপর মাটি শুঁকতে শুঁকতে একেবারে ধারে গিয়ে যেন ফুলকালাম লাগিয়ে দিলে। ডাকতে ডাকতে এগিয়ে যায়, কুমারবাহাদুরের দিকে ডাকতে ডাকতেই ফিরে আসে, আবার এগিয়ে যায়; অথচ কোথায় কিছু নেই, একটু নড়নচ নেই ঘাসের। একটু ঘোর ঘোর হয়ে এলেও আলো তো বেশ স্পষ্টই।

কুমার বাহাদুর মাহুতটাকে বললেন—"দেখ্‌তো নেমে কি; কুমীর নয়তো? এ-বিলে আছে জানা ছিল না তো।"

হাতীটা পা মুড়ে বসেই ছিল, মাহুত নেমে এগিয়ে গেল। গত রাত্রের বৃষ্টির জন্যে যা জলটা একটু ঘোলাটে, মাহুত খানিকক্ষণ দেখে নিয়ে বলল—"তাই মনে হচ্ছে হুজুর, কুমীরেরই নাকের ডগাটা।..."

নেমে গিয়ে মাথাটা একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলল—"না হুজুর, একটা কোলা ব্যাঙ..."

"আচ্ছা মজা তো! ব্যাটা একটা কোলা ব্যাঙ দেখে জঙ্গল মাথায় করছে চেঁচিয়ে?"

—ব'লে বন্দুকটা আলস্যভাবে হাতে নিয়ে উনিও নেমে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আনিও।

এই সময় অক্ষয়ের হাতীটাও পড়ল এসে। পরে অক্ষয় বললে—

ডাকের আওয়াজটা ওর তেমন ভালো লাগেনি; তাড়াতাড়ি তাই হাতী চালিয়ে চলে আ ও-ও ব্যাপারটা শুনে নেমে এগিয়ে এল। তারপর এক সেকেণ্ডের মধ্যে হয়ে গেল কাণ্ডটা। মার্ বাদু ভিন্ন আর কীইবা বলা যায়?

আমরা দুজনে জলের হাতখানেক দূরে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে দেখছি, দুজনের, 'ব্যাঙই তো কুমারবাহাদুরের কথাটা ভালো করে শেষও হয়নি, অক্ষয় আমাদের পেছন থেকে চীৎকার ক'রে ই —'সরে আসুন হুজুর আপনারা—শীগগির!'—সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে একটা লাফ। একটা ব্যাঙ হাজারগুণ হ'য়ে জল ঘুলিয়ে লাফিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গেই অক্ষয়ের দোনলা বন্দুক থেকে দুম দুম ক'রে আওয়াজ।...এখনও ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে..."

"সেই বাঘটাই!...ব্যাঙ হয়ে জন্মে...মারীচের মতন!...মারীচই নয়তো দাদু!..."

—সবাই হড়াহুড়ি ক'রে নিজের নিজের প্রশ্ন দিয়ে ঠেলে উঠতে যাচ্ছিল। শিবকালী বি হাতটা তুলে থামিয়ে দিলেন, বললেন—"মারীচকে তো 'অমর হও' ব'লে বর দিয়ে যাননি লক্ষ্মণ..."

"তবে—তবে দাদু!"

"জঙ্গলের সব ব্যাটাই মারীচ যে! বললাম না?—নিত্যি ঐ কাণ্ড চলছে। জিনিসটা বাহাদুরের জানা ছিল। আমিই কি জানতাম না? তবে দুজনেই কেমন গুলিয়ে ফেলে মনের দিয়ে পড়েছিলাম—ঐ গুলিয়ে ফেলাও আবার জঙ্গলের আর এক যাদু। টের পেয়েছিল অ আসামাত্রই।...জিনিসটা হচ্ছে ইংরেজীতে যাকে বলে কামুফ্লাজ (Comouflage)।

আশপাশের সঙ্গে এক হয়ে মিশে আত্মগোপন করা ব্যাঙেদের মধ্যে নাকের ডগা- হলদে মাথায় একটু জাগিয়ে—এক ধরনের ছদ্মবেশ বা ভাঁওতা। এই যেমন হারান তোদের মধ্যে

"এই যেমন দাদুর গল্প"—হারান একটু হেসে উঠে পড়ল—"গাঁজার ধোঁয়ার জিনিস বিড়ির ধোঁয়ায় দিব্যি সত্যি বলে চালিয়ে দিলেন তোদের কাছে দাদু।"

পথ চলার আনন্দ

ভালো চলতে চাই ভালো
জুতো। জুতোর
আরামেই চলার আরাম।
চুক্তান্ত আরাম দাটার
জুতোয়। উপরন্তু সুশ্রীতে
শোভা, নিখুঁত নক্সা।
ফলে, শুধু সুখে চলা নয়,
সব ভালো ধরে চলা।

Bata

বাটা দু কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

একটি বিকেলের গল্প

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

এই বিকেলটা যে এইরকমই হবে তা যেন মীরা আগেই জেনেছিল। দুপুরবেলা ঘুমিয়ে প
ঘুম ভেঙে শুয়ে শুয়েই দেখল কাটা চটা মেঝের ওপরে ছেঁড়া মাদুরটা পেতে মা শুয়ে
দিদির বিয়েতেও কনে বদলার জন্যে দিদির শ্বশুরবাড়ী থেকে ঐ মাদুরটা নিয়েছিল। দিদির শ্ব
পাঁওনাগণ্ডা সম্পর্কে খুব নাকচোখখেদেসা ব্যবহার করেছিলেন। প্রত্যেকটা জিনিষ এবং
খুব যাচাই-এর চোখে দেখেছিলেন। ভাবটা ছিল, জানি সব জানি। বাজিয়ে না করে না নি
ঠকে যাব।

কিন্তু নিজেরা যখন দিলেন—তত্ত্ব করলেন, বা দিদিকে কিছু দিলেন, তখন এ
ভদ্রলোকটি-ই আর একটা নীতি অনুযায়ী কাজকর্ম করলেন।—দেব, তবে সংসার ও প্রথা
যা দরকার তাই-ই দেব। ঐ গরীব সংসারে আর বেশীকিছু দিয়ে লাভ নেই। বরঞ্চ, মেয়েটা
নিজের ঘরে আসুক, তখন সে নিজেদের মানুষ হবে। তাকে যা দেবার তখন দেব। তার আগে

তাই তত্ত্বের জিনিষগুলো ছিল বিশ্রী। পাড়ার মনোহারী তৈরী। জিনিষগুলো ছিল যেমনি
ঐ মাদুরটা এমনই ছোট ছিল, যে কোনমতে দিদি বসতে পেরেছিল সেই গ্রীষ্মের দুপুরে—
লক্ষ্মীদিদি—বারবার যাচাই হতে রাজী হওয়া দিদি। যতক্ষণ না গাড়ী চড়ে তার জন্যে বর
ততক্ষণ দিদি ঐখানে আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল।

মাদুরটা দেওয়া হয়নি। মা সেই মাদুরটা পেতে শুয়ে আছেন। পাশ দিয়ে দুটো ব
করকর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মার ঘেন্না করছে না। মা সেদিকে তাকাচ্ছেন না। ম
বই পড়ছেন।

ঘুমভেঙে মার দিকে চাইতেই আজকে মীরা দেখল, মা আর তার অজান্তে, ঐ কাটা
ওপরে একটা দামী সোনালী শাড়ী কে যেন ছড়িয়ে রেখে গিয়েছে।

আর কোন কথা তার মনে হলো না। রোদের এমন উগ্রসোনালী রঙ সে
দেখেনি।

দেখে মীরার মনে হলো, এই রকম রঙের নানা ধরনের কাপড় পরে সে সোনালীকে
রজতের দাদা কনকের সঙ্গে ঘুরতে দেখেছে।

কনকেরই পাড়ীতে। সোনালী এমন পাথরের মতো মুখ করে সামনের দিকে সোজা
থেকেছে, যে মীরার মনে হয়েছে, এমন অহঙ্কারী মেয়েকে কনক ভালোবাসে কি করে।
ওর মধ্যে।

এ প্রশ্ন করেছে তার হিংসুটে মন। তারপরেই তার বাবা, নম্র, ভালোবেসে ভরা ভালো মনটা বলেছে সোনালীর সব আছে। ফর্সা রঙ, বাবার টাকা, স্মার্ট স্কুলে পড়ে স্মার্ট হবার ছাড়পত্র।

আশ্চর্য এই, যে সোনালী স্কুলে তারই সঙ্গে পড়তো। পরে এমন দূরে সরে গেল, যে ইচ্ছে করলেও মীরা তার সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। ভয় হয়েছে। পাছে সোনালী চিনতে না পারে। পাছে তাকে অস্বীকার করে। আর কনকের সে নাকউঁচানো ভাব। আজকের রোদটা মেখে তার প্রথমে সোনালীর কথা মনে হলো। তারপর কনক, সোনালী, রজত—তিনটে সুখী মানুষের চেহারা মনে পড়লো। কনক বিয়ে করবে সোনালীকে। রজতও সোনালীর কাঁধ ধরে ছবি তোলায়, হাত ধরাধরি করে গল্প করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

কেউ কিছু মনে করে না। নিন্দে হয় না। কথা হয় না। সবকিছু ওদের কি সুন্দর মানিয়ে যায়।

তবু রজত অন্যরকম। আর রজতের কথা মনে হতে মীরার মনে হলো আজকে মঙ্গলবার।

মীরা তাড়াতাড়ি উঠলো। উনোনে চায়ের জল চাপানো আছে সে জানে। জলটা এতক্ষণে সাঁ সোঁ করছে। মীরা তাক থেকে পেয়ালা দুটো পেড়ে নিল। চা করলো। মাকে দিল, নিজে নিল। ছোট ভাইটা এখনো দুধ খেলেই ভাল। কিন্তু তাকে দুধ চায়ে মিশিয়ে সে একটা কলাই করা গেলাসে দিল। চিনির কৌটায় একটুকরো পাউরুটি ছিল। ছোট ভাইটাকে সেই রুটিটা দিল।

তারপর মীরা জামাকাপড় বদলে নিতে ঘরে ঢুকল। মঙ্গলবার পরবে বলে, সে রবিবারই কাপড় কেচে শুকিয়ে বিছানার নিচে রেখেছে। ব্লাউজ রেখেছে বাক্সে।

জামাকাপড় বদলে নিল মীরা। মুখে পাউডার মাখতে গিয়ে তার আজও মনে হলো সাদা স্নোলকাম মাখা উচিত নয়।

তারপর সে নিজেই নিজেকে বললো, এবার ভাল একটা পাউডার কিনতে হবে।

বড়লোকের বাড়ীতে টিউশানী করা মহামুস্কিল। সেদিন ছাত্রী বলে বসলো—মীরাদি, আপনি পাউডার মাখেন কেন? আমার দিদিরা কেউ মাখে না। সবাই অন্য জিনিষ ব্যবহার করে।

কে জানে কি সে সব! যা মাখলে ঘামতে লজ্জা করে না, মুখে ফুটে ওঠে না পাউডারের দাগ।

বাসস্টপে রজতের সামনে দাঁড়িয়ে ঘামতে মীরা কি কম লজ্জা পেয়েছে?

কিন্তু পাঁচটা দশ-এর বাস না ধরতে পারলে সে রজতকে পাবে না।

মীরা মাকে বললো—মা যাচ্ছি। ফিরতে দেরী হবে। ভাবছি সুধার বাড়ীতে ঘুরে আসব।

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে মীরা উসখুস করতে লাগল। বাসস্টপের ঠিক সামনেই রজতদের বাড়ী। তার ওপারে। আর বাসস্টপের পেছনে মীরাদের বাড়ী। কোনদিন এখানে বাসস্টপ ছিল না। এক মাস হলো সিমেন্টের এই ছোট শেডটা তৈরী হয়েছে। রজতদের বাড়ীর সামনে একটা ঢ়াল পড়েছে।

রজত এখনো আসেনি। অথচ একটা বাস এল। মীরা দেখেও না দেখবার ভান করে

অন্য দিকে চেয়ে রইল। তার মনে হলো বাসের আর রাস্তার সব লোকগুলোই তাকে দেখে হা তারা মজা পেয়েছে। যে রাস্তায় একই নম্বরের বাস চলে, সে রাস্তায় একটা বাস ছেড়ে মানেই কারু জন্যে অপেক্ষা করছে মেয়েটি। এসব আর কে না বোঝে।

এখন এটা বেশ একটা খেলায় দাঁড়িয়েছে। রজতকে সে দেখছে দুই বছর সেণ্টগ্রেগরিয়াসে' পড়া, দায়িত্ববিহীনভাবে সুখী, অত্যন্ত স্মার্ট একটি টেনিস খেলা ছেলে। তার চেহারা সুন্দর। তার ওপরে ধনী।

এই ছেলেকে দেখে মীরার মুগ্ধ হবার কথা, কিন্তু ছেলেটির কোনদিনও মীরার মন কথা নয়। কিন্তু যেদিন বাসে মীরার পার্স চুরি হয়েছিল, কণ্ডাক্টরের সামনে রাগে, দুঃখে চোখে জল এসেছিল, সেদিন তাকে আশ্চর্যভাবে রজত সাহায্য করেছিল। রজত আর একটি সঙ্গে ইংরেজীতে গল্প করতে করতে চলেছিল। মীরার বিব্রত বিপন্ন অবস্থাটা দেখে সে ছে নিচু গলায় কি বললো। তারপর ঝুলে পড়ে কণ্ডাকটরকে ডাকল।

মীরাকে সে নেবে যাবার সময়ে বললো—কিছু ভাববেন না। আপনার ভাই কি আমি চিনি।

পরে একদিন এই বাসস্টপে দাঁড়িয়েই রজত সহজভাবে হেসে বলেছিল—আজ পার্স আবে দেখে নিন?

মীরা অসহজ বোধ করেছে।

রজত বলেছে—প্রায়ই ত' একই বাসে চলাফেরা

—কোথায় যান?

—পড়াতে।

—ও!

বলে রজত তখনি আগ্রহ হারিয়েছে। দেখতে ভাল, আর যৌবনের চটক আছে বে বলা যায় মীরার সঙ্গে। কিন্তু সে পড়াতে যায়, এই মনে করলেই যেন তার মধ্যে ভবিষ্যতের এক কুঁজো মেকিয়েভেলের মাষ্টারনীকে দেখা যায়।

তারপরে কখনো সখনো কথা হয়েছে।

আর আঠারো বছরের এক স্বল্পবুদ্ধি মেয়ে—যাকে বি. টি. পড়ে টিচার হতেই হবে, তবু দেখে মনে মনে—সেই মীরা মনে মনেই ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছে রজতকে। এখন রজত যেতে সাধারণভাবে যতটুকু দেখা হয়, তার ভেতর থেকেই সে মানে বের করতে চেষ্টা করছে।

আজকে রজত তাকায়নি। আজ তবে ও আমার উপর রাগ করেছে। ওর রাগ হবার কি করেছি আমি? আমি কি ব্যবহারে বা চালচলনে কোন কিছু করেছি বা প্রকাশ করে দেখে রজত অসন্তুষ্ট হতে পারে? ও অসন্তুষ্ট হলে, না তাকালে, আমার ভীষণ কষ্ট হবে।

হে ভগবান, তুমি ওর মনটাকে ভাল করে দাও। ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় শনিবার, মঙ্গলবার বিষ্যুৎবার। সপ্তাহে তিনদিন মাত্র ওকে আমি দেখি। যদি তা-ও দেখতে না পাই, অথবা এই সামান্য দেখার সময়টুকুর মধ্যে, ওর চোখে আমি কোন আগ্রহের আলো দেখতে না পাই, তা'হলে আমার কষ্ট হবে।

আজকে রজত আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আজ আমার মনটা খুশীতে ভরে গিয়েছে আজ আমি যেতে যেতে যে নতুন গানটা শুনেছি, সেইটে মনে মনে গেয়েছি। যেদিন রজত আমার দিকে এমনি খুশী হয়ে চায়, হাসে বা একটা কথা বলে আমার বাড়ী ফিরে রেডিওটা খুলে সব আধুনিক গান শুনতে ইচ্ছে করে। এখন রজতকে ভালোবেসে আমি সব গানের কথাগুলোর মানে খুঁজি আবার মনে হয়, গানগুলোর যে কথা-ই হোক না কেন—সেই আদিকালের 'পাষাণের বুকে' আর এখনকার 'না যেও না, রজনী এখনো বাকি'—সব গানগুলোই যেন রজতের প্রতি আমার ভালবাসাতে ভিজে করে রচা। আমার মনও ঐ গানের সুরের মতো দুঃখে, বেদনায়, আনন্দে দোলা খায়, ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আসে।

এই সব মীরার চিন্তা। মীরা এই সব ভেবেছে। রজতের ব্যবহারগুলোর মানে বের করে করে জোর করে নিজেকে ভাবপ্রবণতার পাকে পাকে বেঁধে কষ্ট পেয়েছে।

এই কষ্টতে একটা আনন্দ আছে।

এখন, মীরা দেখছে—কয়েক সপ্তাহ ধরে, রজত তার সঙ্গে একই বাসে যায়। যায় আর এসপ্লানেডে নেমে যায়।

মীরার সঙ্গে সে যে সবসময় কথা কইতে চেষ্টা করেছে তা নয়। তবু মীরার মনে হয়েছে ভিড়ের মধ্যে রজতের চোখটা যেন তাকে বারবার ছুঁয়ে যাচ্ছে।

মীরা মনে করেছে, রজত এমনি করে হয়তো সুযোগ খুঁজছে। সুযোগ সুবিধা ছাড়া কি কথা বলা যায়? পথে-ঘাটে বড়জোর কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করা যায়। অন্তরের কথা বলতে তেমন সুযোগ তেমন পরিবেশ নিশ্চয়ই চাই।

রজত টেনিসর‍্যাকেট দোলাতে দোলাতে রোজ আসে। আজ এল খালি হাতে। আর কর্ডের ট্রাউজারের ওপর ঘননীল সিল্কের শার্ট। চুল উস্কোখুস্কো, পায়ে চটি।

বাসটায় আগে উঠল মীরা। আগে একটা বাস গিয়েছে, তাই এ বাসটা ফাঁকা ছিল। মীরা উঠে লেডিজ সিটে বসলো। বুঝল যে পিঠের কাছে ঐ যে লম্বা সিটটা তাতে বসলো রজত।

সমস্ত শরীরটা মীরার কেমন যেন সজাগ হয়ে উঠল।

কেমন করে ছেলেরা আর মেয়েরা পথেঘাটে কথা বলে কে জানে? এমনি করে চলতে চলতে রজত কি তাকে বলবে, এই স্টপে নামি আসুন?

নেমে মীরা বিব্রত বোধ করবে। তখন, রজত তাকে সহজ হতে দিয়ে একটা সিগ ধরাবে। হাওয়া থেকে বাঁচিয়ে নিচু হবে। তারপর মীরা আর সে হাঁটতে হাঁটতে ভিক্টোরিয়ার চলে যাবে।

মীরাকে সে বলবে—

—লজ্জা পেয়েছেন? কিন্তু এমনি করে আপনার সঙ্গে কথা বলবার আমার অনেক দিনের স

মীরা জবাব দিতে পারবে না। তারপর রজত তাকে বলবে—আমার কাছেও আপনি সহজ। কথা কইবেন না? বাধ্য হয়ে চোখ তুলবে মীরা।

এই রকম হবে না কি, মীরা ভাবতে চাইল। একটু পেছন ফিরলে সে রজতকে দেখতে অথচ কিছুতেই মীরা ঘাড়টা ফেরাতে পারছে না।

এলগিন রোড থেকে বাসটা খুব তাড়াতাড়ি চলে ময়দানটাকে বাঁদিকে এসপ্লানেডের দিকে।

হঠাৎ, মীরা যদিও জানতো এ রকমই হবে, তবু তার হৃৎপিণ্ডটা একটু লাফাল। রজত বলে

—একটু কথা ছিল। নামবেন এখানে?

যন্ত্রচালিতের মতো নামলো মীরা। পার্ক স্ট্রীটের স্টপ।

রজত বললো—কেমন করে যে বলি, বুঝতে পারছি না!

রজতকে বড় অসহায় দেখাল। চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলে

—খুব তাড়াতাড়ি বলে ফেলি?

মীরার জিভটা তালুতে আটকিয়ে গিয়েছে। বুকের ভেতরে শব্দ হচ্ছে। মুখ ঘেমে যে পাউড বিশ্রী শাদা শাদা ছোপ ফুটে উঠেছে তা সে বুঝতে পারছে।

এই স্টপে দাঁড়িয়ে তাকে বলবে রজত? এমনি করে অন্য বাসগুলোর দিকে অস্থির চোখে চ চাইতে? এমনি ভিড়ের মধ্যে? মীরা অসহায় বোধ করল।

রজত বললো—দেখুন, বাসে উঠে দেখলাম, পার্সটা আমিই আজ ফেলে এসেছি। আমার একজন বন্ধুর আসবার কথা আছে—বাড়ীতে যদি যাই তাহ'লে আমার বড্ড দেরী হয়ে আপনি আমাকে একটা টাকা ধার দিতে পারেন? কালই আমি দিলীপকে দিয়ে দেব।

মীরা বিবর্ণ মুখে রুমালটা খুললো। গিট খুলে নয়া পয়সার উপদ্রবে কোনঠাসা একটি ক্ষী নয়লা নোট বের করলো।

রজতকে সে নোটটা দিল।

এবার থামল নয় নম্বর বাস। বাস থেকে লাফিয়ে নামল একটি মেয়ে। এংলোইণ্ডি বছর আঠারো হবে বয়স। রজত তাকে দেখে হাসল। তারপর মীরাকে বললো—ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।

মেয়েটির কোমরে সে হাতটা জড়িয়ে নিল। দু'জনে দ্রুত পার হয়ে গেল পার্ক স্ট্রীট। একবার হাসল। এখান থেকেও মীরা সে হাসির শব্দ শুনতে পেল।

মীরার ঘাস আসছে না। মীরা দাঁড়িয়ে আছে। এরপর সে ভবানীবাজারের ছাত্রীটিকে পড়াবে। ঘণ্টাখানেক বাংলা শেখাবে একজন গুজরাটি মহিলাকে।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে তার রাত ন-টা বাজবে। তারপর, মা-র সঙ্গে পিঁড়িতে বসে কলাই ডালের ভাত খেয়ে মীরা শুতে যাবে বরলা বিছানায়, ভাপসা গন্ধের মধ্যে।

মীরার মনে হলো, রজত হয়তো তাকে নিয়ে-ই হাসাহাসি করছে। মেয়েটিকে বলছে—কিছু খেকে ঐ মেয়েটাকে কি রকম নাচাচ্ছি জান?

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলছে—সত্যি?

মীরার হঠাৎ মনে পড়লো, তার ঘাড়ের উপর কি রকম বিশ্রী একটা আঁচিল আছে। ঘাড়ের ঐ আঁচিল। কি কুৎসিত! বাসে বসে বা দাঁড়িয়ে রজত নিশ্চয় সেটা অনেকদিন দেখেছে।

আর কে না জানে, ঘাড়ে আঁচিল আছে, দেখতে সাধারণ অবস্থার গরীব, এই সব মেয়ে রজত-রা কোনদিনও ভালবাসে না, বাসতে পারে না।

মীরার নিজেকে খুব হতভাগ্য, বঞ্চিত, শূন্য মনে হলো।

শূন্যমনে মীরা সামনের দিকে চাইল। কি আশ্চর্য, হল এ্যাণ্ডারসনের বাড়ীটার গায়ে কি রকম নির্লজ্জভাবে বিকেলের রোদটা জ্বলছে। সোনালীর মধ্যে লাল আভা ছড়িয়ে।

পেছনের দিকে তাকাল।

সেখানে, সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে, সুখী সুখী মানুষের জন্য, রজতদের জন্য, কনকদের জন্য, সোনালীদের জন্য, বিকেলটা একেবারে অবারিত কনকচাঁপার অকালি ঢেলে দিয়েছে।

মীরা মনে করতে পারলো, তাদের বাড়ী থেকে রোদটা কখন চলে গিয়েছে। কত তাড়াতাড়ি।

বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মীরা বুঝতে পারল, তার যা পাওনা, সেই হিসেবের যা খানিকটা রোদও সে পেতে পারে না।

সে রোদ যত সুন্দর এবং যত উজ্জ্বল হোক। সে রোদ যদি মঙ্গলবার বিকেলের রোদই হয় তবু-ও না।

স্বভাবের স্বাদ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ইস্কুলটা খুঁজে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হল না ইন্দিরার।

আর, হ্যাঁ, ঐ সংলগ্ন বাড়িটাই তো হস্টেল।

স্টেশন থেকে সটান চলে এসেছে। কত দূরের কত দিনের পথ। সর্বাগ্রে দেখা করা চা তারপরে অন্য কথা, অন্য কাজ। নিজের চিন্তা। নিজের সুখ-দুখ।

ভরা-ভর্তি ইস্কুল হচ্ছে এখন। ভিতরের কম্পাউণ্ডে কোনো ছেলেই ঘুরছে না এদিক-ওদি গেটে দারোয়ান মোতায়েন।

'টিফিন হয় না ইস্কুলে?' জিজ্ঞেস করল ইন্দিরা।

প্রশ্নটা কেমন অদ্ভুত লাগল। টিফিন ছাড়া ইস্কুল হয় নাকি? আর, সকল প্রশ্ন ছেড়ে প্রথ টিফিনের প্রশ্ন? কাউকে কিছু খাওয়াবে নাকি? খাওয়াবে তো সঙ্গে বাক্স-বাটি কি অন্য কোনো বা কোসন দেখছি না।

'টিফিন হয় সেই দেড়টায়।' বললে দারোয়ান।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল ইন্দিরা। এখন তো মোটে বারোটা বেজে কুড়ি।

'কতক্ষণ টিফিন?'

'আধঘণ্টা।'

'এই আধঘণ্টা ছেলেরা কী করে?'

হাসল দারোয়ান। 'কী আর করে! খায়।'

'আধঘণ্টা ধরেই কি খায়?'

'তা কি আর খায়! খেতে বড় জোর দু-পাঁচ মিনিট। বাকি সময় খেলে, ছুটোছুটি ক ছেলেদের দুষ্টুমির কি অন্ত আছে?' নিজের মনেই হাসল দারোয়ান।

গেটের বাইরে এই রাস্তায় আসে না?

'না, না, রাস্তায় যাবে কী! আমি তবে আছি কী করতে?'

'কিন্তু যখন স্কুলের শেষ ঘণ্টা পড়ে? ছুটি হয়ে যায়?'

'বা, তখন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে বৈ কি। যারা পায়ে হেঁটে যাওয়া-আসা করে তাদের ছাড়া গতি কী! যারা বাসে যায় তারাও সময়-সময় রাস্তায় নামে, কিন্তু তা বাসে উঠতে। বাস সব-চোকে না কম্পাউণ্ডে।'

'আর যারা হস্টেলে থাকে ?' কৌতূহলে চঞ্চল হল ইন্দিরা।

'তারা কম্পাউণ্ড পেরিয়ে হস্টেলে ফিরে যায়।'

'তারা বুঝি রাস্তায় আসে না ?'

'না। হস্টেলের পথ স্কুলের পিছন দিয়ে। কম্পাউণ্ডেরই মধ্যে। এই রাস্তার সঙ্গে তার নেই। দেখুন না ঐ বাগানের ধার দিয়ে।'

তা হলে আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী। ভিতরে ঢুকি। খোঁজ নিই।

তবু দোনামনা করতে লাগল ইন্দিরা।

দারোয়ানের কাছে প্রথম থেকেই একটু অদ্ভুত লাগছে। এত সব খবরাখবর তার কাছে দেখতে-শুনতে তো বেশ ভদ্র, সম্ভ্রান্ত মহিলা। সোজা ভিতরে ঢুকে আফিসে খোঁজ নিলেই হয়। জানবার বিষয়ই বা কী ! কোন ছেলে রাস্তায় নামে ! কোন ছেলে নামে না।'

'আপনার কি কারুর সঙ্গে দেখা করবার দরকার আছে ?' দারোয়ান এগিয়ে এল এক পা।

'হ্যাঁ, তারই জন্য তো কলকাতা থেকে আসছি।'

'আজ এসেছেন ?'

'হ্যাঁ, এই তো, এইমাত্র। এই সকালের ট্রেনে। আর স্টেশন থেকে সোজা এই ইস্কুলে।

'খুব জরুরি নিশ্চয়ই।' কণ্ঠস্বরে সহানুভূতির টান আনল দারোয়ান। 'তবে মিছিমিছি দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছেন কেন ? ভিতরে ঢুকে সোজা রেক্টরের সঙ্গে দেখা করুন।'

তা ছাড়া আর উপায় কী। গেট পেরিয়ে ভিতরে কয়েক পা এগুলো ইন্দিরা। পর ফিরে এল।

দারোয়ানকে বললে, 'দারোয়ানজী, তুমি কৃপা করে আমাকে একটা ছোট্ট উপকার ঠিক এক্ষুণি না হয়, টিফিনের টাইমে ?'

প্রায় আকাশ থেকে পড়ল দারোয়ান। 'কী উপকার ?'

'তোমাকে আমি ভারী হাতে বকশিস দেব।' ইন্দিরা গলা নামাল।

'আরে, আগে কাজটা কী তাতো বলবেন।'

'কাজটা বিশেষ কিছুই নয়। একটি ছেলের সঙ্গে আমার একটু দেখা করিয়ে দিতে পা দুচোখে মিনতি দিয়ে তাকাল ইন্দিরা।

'ছেলের সঙ্গে ? কে ছেলে ?'

'নাম বিজন। বিজন সরকার। বিজু বলে ডাকে।'

'বিজন নামে কত ছেলে আছে তার ঠিক কী।' বিরক্ত হচ্ছে দারোয়ান।

'এ খুব ছোট। ছ-সাত বছর মোটে বয়েস। নিচুর দিকে পড়ে নিশ্চয়ই। খুঁজে বার তোমার কষ্ট হবে না। আর, আরো তোমাকে বলে দিচ্ছি।' ইন্দিরার স্বরে ব্যাকুলতা ব

'দেখবে যা চোখের কাছে সোনা-মতো ছোট্ট একটা আবছা জট আছে। হাসলে কী মিষ্টি যে ে চোখের কোণ চকচক করে উঠল।

'ছেলে চিনে আমি ক্লাস থেকে তাকে তুলে নিয়ে আসব?' দারোয়ান প্রায় মাথা দিয়ে বলল। 'ছেলে আমার সঙ্গে আসবে কেন? আর সে এলেও ক্লাসের মাস্টার তাকে হাতে ছেড়ে দেবে কেন? জিজ্ঞেস করলে আমি কী বলব?'

'আচ্ছা এখন না হোক, টিফিনের সময়? যখন সব এলোমেলো হয়ে যাবে? সব ছুটোছুটি হুটোপাটি পড়ে যাবে? তখন?'

'ততক্ষণ আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

'থাকব।'

তা আর বেশি কথা কী! মনে মনে বললে ইন্দিরা। রাত ভোর করে দিতে পারি, যা যদি একবার বলো তাকে সত্যি এনে দেবে। দাঁড় করিয়ে দেবে আমার চোখের কাছে।

আচ্ছা, সত্যি যদি বিজু আসে, দাঁড়ায় তার বাগানের মধ্যে? তাহলে কী হয়? নিজের থেকে ছুটে এসে তার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, না, সে ছুটে গিয়ে তাকে দুই বুকে মধ্যে আঁকড়ে ধরবে প্রাণপণে? তারপর কী হয়? তারপর কি সে কিছুক্ষণ পরে আলিঙ্গন শি দেয়, ছেড়ে দেয়, চলে যেতে দেয় বিজুকে? না কি তাকে তেমনি বুকে করে ছুট দেয় রা মাঠ দিয়ে, পাহাড়-নদী পেরিয়ে—তাকে তার কলকাতার বাসায় নিয়ে আসে?

যদি ছেলেটাকে খুঁজে পাই, তখন কী বলব তাকে? কে ডাকছে বলব? জিজ্ঞে দারোয়ান?

ইন্দিরার চোখ ছলছল করে উঠল, ধরা গলায় বললে, 'বলবে তার মা ডাকছে।'

'মা? আপনি মা?' দারোয়ান প্রায় বসে পড়ল মাটিতে। 'তবে আপনার কিসের সোজা গিয়ে ছেলেকে দেখে আসুন।'

ইন্দিরার যেন তবু নড়বার নাম নেই।

তবে নিশ্চয়ই পাগল, নয়তো অভিসন্ধি মন্দ। নইলে যদি মা-ই হবে, তবে ছেলেকে কথায় এত কাঠখড় পোড়াতে হয় কেন? কেনই বা হয় বকশিস কবলাতে? কী ছেলেটাকে চুরি করে নিয়ে যেতে চায় নাকি?

পিছিয়ে গেল দারোয়ান। ইস্কুলের এক কেরানিবাবুকে বাইরে বেরুতে দেখে তাড়াতাড়ি 'দেখুন দেখি ইনি কী চান।' বলেই লক্ষ্য করলে ইন্দিরাকে। 'যান, ওঁর সঙ্গে যান। উনিই সব ব্যবস্থা করতে। আমি শুধু দারোয়ান, গেটকিপার।'

'আসুন।' এগিয়ে এসে বললে কেরানি।

আর লুকোবার উপায় নেই। কেরানিকে অনুসরণ করল ইন্দিরা।

না, লুকোবার আছে কী! ইন্দিরা তো সরকারীভাবেই আবেদন করতে এসেছে। নইলে কলকাতা থেকে এতটা পথ চলে আসা তো চারটিখানি কথা নয়। শুধু একটা অসভ্য ছেলেখেলা খেলবার জন্যে কি কেউ এত কষ্ট করে? খায় না, খায় না, চোখের দুপাতা একত্র করে না?

শুধু দূর থেকে একটু দেখেই চলে যাব? তাকে ছোঁব না, ধরব না, আদর করব না? কথা কইব না তার সঙ্গে? তার মুখের একটু ডাক শুনব না?

আফিস-ঘরে এসে বসল ইন্দিরা। কেরানিকে বললে তার বক্তব্য।

'কী নাম বললেন? বিজন সরকার?' খাতাপত্র ঘাঁটতে লাগল কেরানি। 'কোন ক্লাসে পড়ে ঠিক বলতে পারেন না? নতুন ভর্তি হয়েছে বলছেন? ছ-সাত বছর বয়েস? হ্যাঁ, পেয়েছি। বাবার নাম সুদক্ষিণ সরকার? হ্যাঁ, এই তো নতুন ভর্তি হয়েছে, প্রিপেরেটরি ওয়ান্-এ পড়ে। হস্টেলে থাকে। আজ এসেছে স্কুলে। ক্লাসে আছে।'

'ক্লাসে আছে?' ইন্দিরার দুচোখ লালসায় জ্বলজ্বল করে উঠল। 'ক্লাসটা কোথায়?'

'এই তো নিচেই। এ ঘরটার দুখানা ঘর পরে।' বললে কেরানি।

'এত কাছে?' ইন্দিরা যেন এখুনি ছুটে চলে যাবে সে ঘরে।'

'দাঁড়ান, রেক্টরকে খবর দিই।' কেরানি উঠল চেয়ার ছেড়ে।

ইন্দিরার সমস্ত শরীরে যে উল্লোসের সুর বেজে উঠেছিল সহসা তা স্তিমিত হয়ে গেল। ধাক্কিতে চলে পড়ল চেয়ারে। কেরানি যেমন উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে সেও তো পারত উঠতে। যেতে পারত পিছু-পিছু। দু পা এগুলেই তো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পেত বিজুকে। কী না জানি করছে এখন বিজু। মুখখানি কেমন করে রয়েছে। কোন দিক করে রয়েছে। আশ্চর্য, কিছুতেই উঠতে পারল না ইন্দিরা। কি এক অবসাদ তাকে গ্রাস করে বসল। চলুন, আমিই যাচ্ছি রেক্টরের কাছে—বলে চালাকি করে দিব্যি ঢুকতে পারত ক্লাসরুমে। চোখ প্রথমে যার উপরে পড়ত, সন্দেহ কি, সেই তো তার বিজু, তার বিজুর চোখ দুটি।

হঠাৎ কতগুলি ছেলের কলরব শোনা গেল। যেন কাছাকাছি কোন ঘর থেকেই উঠেছে সে গণ্ডগোল। কান খাড়া করল ইন্দিরা। কোলাহলের ঐ ছোট ক্ষীণ তন্তুটা কি বিজুর গলার নয়? না, না, ও বিজুর হবে কী করে? বিজুর কি এখন আর কোলাহল করবার মন আছে?

রেক্টর এল। বাঙালীই বটে। কিন্তু কিরকম আঁট-সাঁট কাট-কাট চেহারা।

'আপনিই মিস্টার রায়?' উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল ইন্দিরা।

'হ্যাঁ, বসুন।' বলতে বলে জ্ঞানেশ রায় বসল মুখোমুখি। 'আপনি মিস্টার সুদক্ষিণ সরকারের কী?' একটু বা তাকাল পর্যবেক্ষকের চোখে।

চোখ নামাল ইন্দিরা। বললে, 'হ্যাঁ, প্রিপেরেটরি ওয়ান-এর বিজন সরকারের মা।'

খাতাপত্র কিছু দেখতে হল না জ্ঞানেশের। বললে, 'হ্যাঁ, বুঝেছি। কী চান আপনি?'

বিষাদ মাখান আয়ত চোখ তুলল ইন্দিরা।

'ছেলের সঙ্গে দেখা করতে চান?'

ইন্দিরার চোখ সম্মতিতে প্রশান্ত হল।

'শুনুন।' শাসকের মত গম্ভীর মুখ করল জ্ঞানেশ। 'আমি দুঃখিত, আপনাকে হতাশ হচ্ছে। বিজন সরকারের সঙ্গে আপনার দেখা হওয়া অসম্ভব।'

'অসম্ভব?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ইন্দিরা।

'অসম্ভব মানে এই ইস্যুলে অসম্ভব।'

'তবে ওর হস্টেলে?'

শুষ্ক রেখায় হাসল জ্ঞানেশ। 'স্কুল ইনক্লুডস হস্টেল। আমি হস্টেলেরও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।'

'আমি মা, আমি আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে পারব না?' চাউনিতে একটু f ঘাবাল ইন্দিরা। ভঙ্গিটাও বা তর্কের মত করল।

'আপনি বিজনের মা এ আমি কোশ্চেন করছি না—'

'মানে? আমি বিজনের মা নই?'

'বললাম তো সে-পয়েণ্ট আমি তুলছি না। যদিও আইনত পারতাম তুলতে। আরো বিব্রত হতেন আপনি। ক্রেডেনশিয়ালস দেখাতে হত।'

'ধন্যবাদ।' যুক্তির সামনে পড়ে থতমত খেল ইন্দিরা। বললে, 'আমি যদি মা বলে গ্রাহ্য হলে আমার সন্তানকে আমার দেখতে চাওয়ার বাধা কী?'

'চাওয়ার বাধা নেই পাওয়ার বাধা।'

'কেন, বাধা কেন?'

'ওয়ার্ডের যে গার্ডিয়ান একমাত্র সেই দেখা করতে পারে। আর কেউ নয়।'

'মা সন্তানের অভিভাবক নয় বলতে চান?'

'গার্ডিয়ান বলতে বুঝছি অফিসিয়াল গার্ডিয়ান। মানে, রেকর্ডেড গার্ডিয়ান—মানে, আ বইয়ে যে গার্ডিয়ান বলে লিপিবদ্ধ—'

'কে সে?'

'মিস্টার সুদক্ষিণ সরকার। ওয়ার্ডের যিনি বাবা—'

'শুধু তিনি কী করে হন?'

'আইনের চোখে তো তিনিই প্রকৃত গার্ডিয়ান। এক্ষেত্রে তিনিই এসে ছেলেকে ভর্তি করে গেছেন, ইস্কুল আর হস্টেল দুয়েরই যাবতীয় খরচ বহন করেছেন ও করছেন—সো অন এল ক বিধিতে ও ব্যবহারে তিনি, মানে, সুদক্ষিণবাবুই একমাত্র গার্ডিয়ান।'

'হ্যাঁ, তাই ইস্কুলের নিয়ম। আমরা ছেলেকে বাপের কাছ থেকে পেয়েছি, তাই আমরা বাবাকে চিনি, তাই শুধু বাবাকেই এলাউ করব ছেলের সঙ্গে দেখা করতে—'

'মাকে করবেন না? মার কোনো অধিকার নেই?' চোখের দৃষ্টি রুক্ষ হল ইন্দিরার।

'অন্যত্র কী অধিকার আছে তাতে আমরা আগ্রহান্বিত নই কিন্তু স্কুলে, বর্তমান অবস্থায় নেই বলে মনে হচ্ছে।'

'মাকে দেখা করতে দেবেন না, এটা কি আচারের জাস্টিস?'

'এটা ডিসিপ্লিন। তাছাড়া আরো একটু কথা আছে।' জানেশ চোখের দৃষ্টিটাকে একটু বাঁকা করল।'

'কী কথা?'

'ছেলের গার্ডিয়ান, মানে যিনি ছেলেকে এখানে ভর্তি করে দিয়ে গেছেন, তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ আছে যে ছেলের মা যদি আসে বা ছেলের মা বলে পরিচয় দিয়ে কেউ আসে, তার হাতে যেন ছেলেকে ছেড়ে না দিই। সে তো দূরের কথা, এমন কি, তাকে যেন ছেলেকে দেখতেও না দিই।'

'এতদূর!' জ্বলে উঠল ইন্দিরা।

'শুধু মা নয়, যে কোনো আত্মীয়, সবাই ব্যানড। একমাত্র যিনি গার্ডিয়ান, মানে স্বয়ং মিস্টার সরকারই পারবেন শুধু দেখতে শুনতে, তদারক করতে। তবে কাউকে যদি তিনি লিখে অথরাইজ করে যেন সে তাঁর পক্ষে এসে দেখে যেতে পারে। বেশ তো, স্বচ্ছন্দ সমাধানের সূত্র বললে জানেশ, 'আপনি সুদক্ষিণবাবুর কাছ থেকে একটা রিটন অথরিটি নিয়ে আসুন, আমি দেখা করার বন্দোবস্ত করে দেব।'

'অথরিটি দেবার লোক এখানে কোথায়?'

'না, আমি মিন্ করছি, চিঠি লিখে ডাকে আনান সেই ছাড়পত্র। এই ধরুন, সামান্য তিন চার দিনের ওয়াস্তা।'

'ওরে বাবা!' শিউরে উঠল ইন্দিরা। 'তিন-চারদিন এখানে থাকব কোথায়? থাকবই বা কী করে? আজ রাত্রের গাড়িতেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। ছুটি নেই।'

'তা কী করব বলুন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

'আচ্ছা, আমি ওকে একটু দূর থেকে দেখতে পারি না?' করুণ সিক্ত স্বরে বললে ইন্দিরা 'সত্যি বলছি, আমি ওকে ছোঁব না, ধরব না, কোলে নেব না, কথা কইব না, ডেকে উঠব না, শুধু এক চোখের দেখা দেখব—তাও কি সম্ভব নয়?'

'কোত্থেকে দেখবেন?' আর কখন?'

'এই ধরুন, খানিক পরে টিফিন হবে ইস্কুলে। ছেলেরা সব মাঠে বারান্দায় বেরিয়ে পড়বে, ছুটোছুটি করবে, তখন জিমের ঘর থেকে [illegible]

রেক্টর শব্দ করে হেসে উঠল। বললে, 'বিল্ খুব শান্ত, খুব বাধ্য ছেলে। টি খাবার পরেও সে চুপচাপ ঘরের মধ্যে বেঞ্চিতে বসে থাকে। তার বাবা তাকে বলে ে স্কুলের বাইরে যাবে না। সে তাই প্রাণপণে মেনে চলে। এতটুকু অবাধ্য হয় না। তার ক্লাসরুমটাই স্কুল।'

'বেশ তো, তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে একটু দেখব ওকে।' ইন্দিরা তার অবয় চাইল একটু উজ্জ্বল করতে। 'সামান্য অতটুকুও তো পারেন এলাউ করতে?'

না, বাপ করবেন। অত্যন্ত দুঃখিত।' বিনয়ে আরো ঘনীভূত হল রেক্টর। 'অ পারি না।'

'অতটুকুও নয়?' ক্রোধে চেয়ারের হাতলটা মুঠো করে চেপে ধরল ইন্দিরা। 'এ কী বর্বর

'আপনি খুব নিষ্ঠুর ভাষা ব্যবহার করছেন, কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার হৃদয়ঙ্গম ক আপনি নিজেকে আমার জায়গায় প্লেস করুন আর আমাকে দাঁড় করান প্রার্থী হিসেবে। যেখানে একজনের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বারণ করা আছে, তাকে আপনি প্রশ্রয় দেন?'

'বা:, চোখের দেখা দেখতে দিই বইকি।' টেবিলের উপর সামান্য ঝুঁকে পড়ল ইন্দিরা। যদি কোথাও বেড়াতে যায়, বাইরে বেরোয়, তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখা, দেখতে পাওয়া, ঠেকাবেন কী করে?'

'ঠিকই বো। বাইরের ব্যাপারে আমার কোনো দায়িত্ব নেই, পারব না ঠেকাতে।' কঠি রেক্টর। 'কিন্তু স্কুলের মধ্যে আমিই সর্বেসর্বা, অবাঞ্ছিতকে নিশ্চয়ই প্রতিরোধ করব।'

'খুব কৃতিত্বের পরিচয় দেবেন।' ব্যঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠল ইন্দিরা।

'শুনুন। ব্যাপারটা তো শুধু আপনার দেখা নয়, ওরও দেখা।'

'ওরও দেখা মানে?'

'আপনি ওকে দেখছেন আর প্রতি পলকে আশা করবেন ও-ও আপনাকে দেখুক, ওর চোখ এসে আপনার চোখে। বলুন, তাই চাইবেন না, আশা করবেন না? দেখা কি কখনো সম্পূর্ণ যাকে দেখছি সে আমাকে না দেখে?'

'আমি দূর থেকে দেখব—ও-ও যদি আমাকে একটু দূর থেকে দেখে, তাহলে ক্ষতি কী!'

'ক্ষতি কী! আপনাকে দেখলেই তো ও ভীষণ উত্তেজিত হবে। মা এসেছে বলে আপনার দিকে। কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে। তখন আপনি পারবেন সামলাতে? পারবে থাকতে? মাঝখান থেকে ফল দাঁড়াবে কী! ফল দাঁড়াবে, ডিসিপ্লিন মেইনটেও হবে না। গ পই পই করে যা নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল তার ব্যতিক্রম হবে।'

দু গালে দু বিন্দু চোখের জল নেমে এসে পড়ি পড়ি করছে, ইন্দিরা বললে, 'বেশ, এমন ব

তবুও নরম হয় না জ্ঞানেশ রায়। বললে, 'দেখুন, এর মধ্যে আবার ভৈরবের অবকাশ আ আপনি হয়তো সতর্ক হলেন কিন্তু ভৈরবং ও-পক্ষ হয়তো নড়ে চড়ে উঠল, জায়গা বদলাল, দেখে যে আপনাকে। তখন সব মাটি। তাই বলা করুন, কোনো চান্সই আমি নিতে পারব না। তা ছাড়া— পাশ ও-পাশ তাকাল জ্ঞানেশ।

'তা ছাড়া—' আরো কী আতঙ্কের কথা বলে বিবর্ণ মুখে তাকিয়ে রইল ইন্দিরা।

'তা ছাড়া আপনাকে নিয়ে ছেলেদের মধ্যে কোনো কথা ওঠে, কোনো গুজব শুরু হয় বাঞ্ছনীয় নয়। কার মা দেখা করতে এসেছিল, দেখা পায়নি—এই থেকে শুরু করে প্রশ্নটা দাঁড়াবে, কার মা, কার মা দেখা পেল না? ক্রমে উত্তরটা স্পষ্ট হবে, বিজুর মা; বিজুর মা দেখা পায়েনি তার ছেলের সঙ্গে—পায়েনি মানে তাকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। শেষকালে কা যদি বিজুর কানে ওঠে, বিজুর অবস্থাটা কী রকম হবে বলুন তো। আপনি যখন ওর মা তখন নিশ্চয়ই ওর মঙ্গল চাইবেন। সুতরাং আমি বলি কি? ঘড়ির দিকে তাকাল জ্ঞানেশ, 'আপনি বেশি ক্ষণ আর থাকবেন না।'

'আমাকে চলে যেতে বলছেন।' ঘাড় ঘোরাল ইন্দিরা। 'যদি না যাই?'

'যদি না যান!' মুঠের মত চোখ করল ডেইজি। 'বিজুকে তাহলে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেব আটকে রাখব। অন্তত যাতে ইন্দুলের ত্রিসীমায় তার অস্তিত্বের কোনো আভাস না থাকে। ত আপনার লাভ কী! শুধু ছেলেটারই দুর্ভোগ।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ইন্দিরা। পরাভূতের মত বললে, 'এরই জন্যে আমি কলকাতা থেকে এসেছিলাম? আর স্টেশন থেকে সোজা ইন্দুলে?' এই রকম একটা মমতাহীন, নৃশংস ব্যবহ সম্মুখীন হব বলে?'

জ্ঞানেশ সমব্যথীর সুরে বললে, 'সত্যি যদি আসবার আগে চিঠি লিখে জানতেন ব্যাপারটা—

চলে যাচ্ছিল ইন্দিরা, থামল। বললে, 'এই ব্যবহারের কোনো প্রতিকার নেই ভেবেছেন?'

'হয় তো আছে। কিন্তু পদ্ধতিটা যে কী তা বলতে পারব না।'

'পরামর্শ কেউ চাইছে না আপনার কাছে! দেখতেই পাবেন।' দরজার দিকে এ ইন্দিরা।

'শুনুন। আপনি এমন ভাব করছেন যে আমিই নিষ্ঠুর—'

'তা ছাড়া আবার কী।'

'না, নিষ্ঠুর আপনার স্বামী।'

যেন টলে পড়ে যাবে ইন্দিরা, দরজাটা ধরে ফেলল।

যেতে যেতে আবার ফিরল। কান্নাকাঁপা গলায় বললে, 'বিজু কেমন আছে অন্তত এটুকু আমাকে দিতে পারেন?'

'বিজু কেমন আছে এ প্রশ্নের তো একটাই শুধু উত্তর হতে পারে।'

'শুধু একটা উত্তর?'

'হ্যাঁ, বিজু ভালো আছে, স্ফূর্তিতে আছে, মা-বাবা বাড়ি ঘর সব ভুলে নতুন জীবন মেতে আছে—'

'অন্য উত্তর হতে পারে না কেন?'

'অন্য উত্তর হলেই তো বিপদ। যদি বলি, ও মন-মরা হয়ে আছে, কারু সঙ্গে মেশে না হ করে, খায় না, খেলে না, খালি খালি মা-মা করে—'

আঁচলের প্রান্তে চোখ ঢাকল ইন্দিরা।

'আপনাকে একটা গাড়ি ডেকে দেব?'

'দরকার নেই।'

হৃতসর্বস্বের মত রাস্তায় নেমে এল ইন্দিরা।

কোথায় যায়। সুগতার কথা আগেও মনে ছিল, এখন আবার মনে পড়ল। তার স্বামী ব একজিকিউটিভ লাইনের লোক, কিছু একটা সুরাহা করে দিতে পারে হয়তো।

খুঁজে খুঁজে সুস্নতাদের বাড়ি এসে পৌছুতে দুপুর গড়িয়ে গেছে।

সব শুনে সুস্নতা তো বিশ্বাসই করতে পারে না। মা তার ছেলেকে দেখতে পাবেনা এ ব বাইরে। বাপ হুকুম জারি করলেই হবে?' ছেলে কি একলা বাপের?'

'তুই কিছু ভাবিসনি। উনি ফিরুন অপিস থেকে, সব বন্দোবস্ত করে নেবেন। চাইকি আজ আমাদের বাড়িতে এনে রাখব, তোর সঙ্গে কাটাবে রাতটা—'

আনন্দে ঝলমল করে উঠল ইন্দিরা।

'উনি বললে রেষ্টর 'না' করতে পারবে এমন মনে হয় না।' শরীরে স্বামিসর্বের ঢেউ সুস্নতা। 'মায়ের কাছে ছেলে থাকবে এর মধ্যে বেআইনি কী আছে? ছেলেকে পেলে আজ আর ফিরে যাবি না তো।'

'তা কি কেউ যায়?' প্রতিমার মত মুখ করল ইন্দিরা। 'সবই তো এই সন্তানের জন্যে। পেলে আর কী চাই?'

আপিসে খবর পাঠিয়ে অনীশকে তাড়াতাড়ি বাড়ি আনল সুস্নতা।

সব বললে সবিস্তার।

'এখার দ্রুত ব্যবস্থা করো। যে করে হোক মায়ে-পোয়ে দেখা করিয়ে দিতেই হবে। স্বয়ং রেষ্টর শুদ্ধু বিজুকে বেমক্কা করে নিয়ে এল সুস্নতা বলল।'

'তোমরাও চলো না সঙ্গে।' অনীশ বললে সাহস করে। 'যদি হয়ে যায় এই সুযোগেই সামান্য একটু চোখের দেখায় অনুমতি দিতে আপত্তি কী।'

তিনজনেই গেল হস্টেলে। তিনজনেই দাঁড়াল রেষ্টরের সামনে।

'সামান্য একটু চোখের দেখার অনুমতি দিতে আপত্তি, জানেন বললে রুক্ষ স্বরে, 'যেহেতু কি বলা হয়েছে, বোঝানো হয়েছে, ওর মা নেই, ওর মা মরে গিয়েছে।'

'মরে গিয়েছে!' হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেলে না ইন্দিরা।

'ওর বাবা তাই বুঝিয়েছেন ওকে। প্রথম যখন ওর মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়—'

'আমার কাছ থেকে যখন ওর বাবা ওকে চুরি করে নিয়ে যায়—' ইন্দিরা ক্রুদ্ধ হওয়া করে পারল না।

'তা জানিনা। আমাকে যা বলা হয়েছে তাই বলছি। প্রথম যখন বিজুর মায়ের সঙ্গে কি হয়, বিজুকে বলা হয় ওর মা হাসপাতালে আছে। তারপর সে বিচ্ছেদ যখন দীর্ঘতর হয় আর বিজুর যখন ব্যাকুলতর হতে থাকে তখন তাকে বোঝানো হয় তার মা মরে গেছে, আকাশের তারা হয়ে গে

'একবার বিজুকে নিয়ে আসুন না, দেখি না ছুটুড়ে মা দেখে কেমন তার রিয়্যাকশান হয়।' এটা একটা ছেলেখেলা এমনি ভাবের থেকে বললে সুস্নতা।

'তারপর মা যখন ছেলেকে ছেড়ে চলে যাবেন, ছেলে এখানে একলা পড়ে থাকবে—তখন?'

মা না বুঝুক, মুহূর্তে সমস্ত ছবিটা অনীশ আর সুপ্রভার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'তা ছাড়া উনি যে এতটা পথ এসেছেন সেটা, মাপ করবেন, জ্ঞানেশ হতে জোড় করবা মেয়ে তত নয়, যত জেদের বশবর্তী হয়ে।

'আপনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, আপনার কিছু বুঝতে আর বাকি নেই।' রাগের কথাটা হালকা টান দিয়ে বললে ইন্দিরা।

'কী আর করব বলুন, আপনার স্বামীই সব বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

'কী বুঝিয়ে দিয়েছেন?' এবার সুপ্রভা কাপটা মারল।

'বিশেষ কিছু নয়। কলকাতার কোর্টে ওঁর স্বামী সুদক্ষিণ সরকার বিবাহ-বি মামলা করেছেন।'

'তাতে কী!' ইন্দিরা মুখিয়ে উঠল।

'তাতে ছেলের কাস্টডি নিয়ে প্রশ্ন। কে কাকে ফাঁকি দিয়ে ছেলেটাকে ছোঁ মেরে কবজায় নিয়ে যেতে পারে সেই চেষ্টা।' জ্ঞানেশ নৈর্ব্যক্তিক হল। 'নইলে, ছেলেটা নতুন পরিবে মজিয়ে একরকম আছে, তাকে হঠাৎ সেন্টিমেন্ট্যাল আপসেট্ করে দেয়াটা কাজের কথা নয়। মঙ্গল চিন্তাই যার প্রধান চিন্তা—'

'মায়ের চেয়ে আপনার যে দেখছি বেশি দরদ—' ঝঙ্কার দিল সুপ্রভা।

জ্ঞানেশ হাসল। বললে, 'থাক গে, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বিজুকে পেয়েছি আ বাপের কাছ থেকে। তাই তার বাপের কথাই এক্ষেত্রে চলবে, বলবৎ হবে। মা ছেলেকে দেখে স্পষ্ট নিষেধ। সে নিষেধ অমান্য করা যাবে না।'

'কেন নিষেধ কেন?' এও সুপ্রভার জিজ্ঞাসা।

'তা জানি না। তবে ডিভোর্স মামলার পিটিশনের একটা নকল আমাকে মিস্টার দিয়েছেন, তাতে সব ভাইলেন্স অ্যালিগেশান আছে—'

'সব—সব মিথ্যে।' ইন্দিরা আগুন হয়ে উঠল।

'হয়তো আপনার কথাই ঠিক। সব মিথ্যে। কিন্তু আমি নাচার, আমাকে পার্ডিয়ানে মিস্টার সরকারের কথাই মানতে হবে।'

সুপ্রভা ইন্দিরাকে নিয়ে এল বাইরে। গাড়িতে দুজনে এসে নিঃশব্দে বসল, বসে রইল কতক্ষণ পরে সামিল হল অনীশ।

বাড়ি এসেই নিভৃতি খুঁজে নিয়ে সুপ্রভা স্বামীকে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, ভাইলেন্স অ্যালিগেশন!'

'মেয়ে তো, তাই মেয়ের সম্পর্কে কু-কথা শোনবার জন্যে খুব আগ্রহ?' অনীশ টিপ্পনী ব

'তোমার আগ্রহও তো কম নয়।' পালটা ছুঁড়ল সুপ্রভা। 'তাই নিব্বাটা শোন রেষ্টুরের সঙ্গে কেমন একটু একলা হলে!'

'সে তো তোমারই কৃপায়। মিসেস সরকারকে তখন চালাকি করে টেনে নিয়ে গেলে বলে তো রেস্টরের সঙ্গে একলা হতে পারলাম।'

'অতএব', খিলখিল করে হাসল সুগতা, 'কার নিন্দা করো তুমি? এ আমার এ তোমার শোক আমরা এক নৌকার মোসাফির।' সুতরাং বলো এবার কথাগুলো কী।

'স্বামী-স্ত্রীর যতক্ষণ ভাব ততক্ষণ তারা এক দেহ একমন, আর যখন তারা শত্রু তখন তার সাপ-বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর। তখন হেন কুকথা নেই যে তারা কইতে পারে না, হেন কুকাজ নেই তার করতে পারে না। অন্য শত্রুতার তবু সীমা আছে কিন্তু দাম্পত্য শত্রুতার কোথাও কেউ রেখা টানতে পারেনি।'

'কিন্তু আহা, কুকথাগুলো কী?' অস্থির হয়ে উঠল সুগতা।

'প্রথম, কোন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত—'

'দ্বিতীয়?'

'দ্বিতীয়, রোগ আছে সংঘাতিক। যার জন্যে ছেলেকে ছুঁতে দিতে ধরতে দিতে কাছে রাখতে দিতে আপত্তি।'

'সব বানানো।'

'সমস্ত মামলার সাজসজ্জা। কিন্তু যতক্ষণ সাক্ষ্যপ্রমাণে না ঢুকেছ ততক্ষণ, এমন আইন বানানে বলবার কার এক্তিয়ার নেই। কিন্তু তোমার বন্ধু কোথায়?' ব্যস্ত হয়ে উঠল অনীশ। 'তাকে কিরি ট্রেন ধরতে স্টেশনে পৌঁছিয়ে দিতে হবে তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি একা যাবে না, আমিও সঙ্গী হব।' কালো কটাক্ষ হানল সুগতা।

'এখনো আমরা এক, একা নই। একজন হলে সমুদ্র শুকোয় কিন্তু একা নদী বিশ ক্রোশ।'

স্বচ্ছ মুখে হাসতে লাগল সুগতা।

কলকাতায় পৌঁছেই উকিলের উপর চড়াও হল ইন্দিরা।

শীগগিরই, সম্ভব হলে আজই, একটা গার্ডিয়ানশিপের দরখাস্ত করুন আমার হয়ে।

'কেন, কী হল!' উকিল মদনগোপাল মজা পেল। বললেন, 'ম্যালিগেশানস কী?'

'ভাইলেন্ট পসিবল ম্যালিগেশনস।'

'বুঝেছি। আপনার স্বামী মানে ছেলের বাপ অভিভাবক হতে অনুপযুক্ত—এটা স্টেট করতে হবে। তার জন্যে স্টক বিশেষণ এগুলো—মাতাল, বেশ্যাসক্ত, নির্দয়, বদরাগী, সংসারব্যাপারে উদাসীন—একেবারে অপদার্থ।'

'হ্যাঁ, আর রোগের কথা উল্লেখ করবেন। সরলে-সারল্য কিন্তু পড়ে পাঠ্য—'

'হ্যাঁ, করব। দুদুটো রোগ বলব। টি-বি আর ভি-ডি—কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ কী হল শুনি তো।'

ইস্কুলের ব্যাপারটা বলল সব ইন্দিরা। কী অপমান, কী লজ্জা, আঁচলে কোমর ব লড়াই করতে গিয়ে সেই আঁচল খুলে তাতে চোখের জল মুছে আসা। কী ঘেন্না!

'একটা কিছু প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।'

'শুনুন এক কাজ করি।' মদনগোপাল বললে, 'আপনার গার্ডিয়ানশিপের দরখাস্তে ঐ জানেশ রায়কে পক্ষ করে দিই। ওর বিরুদ্ধে এই অ্যালিগেশান করি যে ও অবৈধভাবে আমার ছে আটকে রেখেছে। তাই মামলার যে অর্ডার হবে তা রেস্টরের উপর বাইণ্ডিং হবে—'

'কিন্তু ইতিমধ্যে মামলার নিষ্পত্তির আগেই আমি একবার বিভুকে দেখে আসতে চাই। আসতে চাই ঐ রেস্টরের সামনেই, ওর কর্তৃত্বের উপর লাথি চালিয়ে—'

'হ্যাঁ, সঙ্গে একটা ইনটেরিম দরখাস্ত করে দেব, আমি আমার ছেলেকে দেখে আসবে কেমন সে আছে, হস্টেলে কেমন তার ঘর নেওয়া হচ্ছে। সেটিমেণ্ট্যালি আপসেট যাতে যাতে ওকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ে-থুয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আসতে পারি তার জন্যে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার চাই। আমি মা, আমার ভদ্রমহিলার ইন্টারভিউ নয়। আমি আমার শিশুকে ধরব, কোলে নেব, চুমু খাব—'

'করুন, করে দিন দরখাস্ত।' আকুল হয়ে উঠল ইন্দিরা।

একই জজের কাছে দুই মামলা। এক সুদক্ষিণের পিটিশান, বিবাহবিচ্ছেদের; দুই ই পিটিশান, গার্ডিয়ানশিপের। সুদক্ষিণ বিবাহবিচ্ছেদ চাইছে যেহেতু ইন্দিরা ব্যভিচারে লিপ্ত ইন্দিরা ছেলের অভিভাবক হতে চাইছে যেহেতু সুদক্ষিণ দুশ্চরিত্র, অকর্মণ্য। বিবাহবিচ্ছেদের ইন্দিরা লড়ছে এই বলে যে সুদক্ষিণের সমস্ত উক্তি মিথ্যে, পরোক্ষে আত্মদোষের আচ্ছাদ গার্ডিয়ানশিপের মামলা সুদক্ষিণ লড়ছে এই বলে যে পিতারূপে সেই স্বাভাবিক অভিভাবক, ই সমস্ত অভিযোগ কাল্পনিক।

কিন্তু এখন ঝগড়া তুমুল হয়ে উঠেছে ইনটেরিম বা মধ্যবর্তী পিটিশনে যাতে ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার চেয়েছে ইন্দিরা।

কোর্ট-রুমের একদিকে দাঁড়িয়ে ইন্দিরা, কাঁদতে কাঁদতে দুই চোখ লাল; আরেকদিকে সুদক্ষিণ, সর্বক্ষণ রাগ পুষতে-পুষতে সমস্ত মুখ থমথমে, বিস্বাদ।

সমস্ত ঘর লোকারণ্য।

'মা হয়ে ছেলেকে একটিবার চোখের দেখাও দেখতে দেবেন না?' প্রশ্ন করলেন জজ।

'কেন দেব না?' সুদক্ষিণের পক্ষে উকিল অটলবিহারী উঠে দাঁড়াল। নিশ্চয়ই দেবে; ব দেখাটা ছেলের পক্ষে মঙ্গল হয়।'

'আর সেটা মঙ্গল হবে কিনা তার বিচার করবার অধিকার মার নেই!' পাল্টা টিপ্পনী মদনমোহন।

'কী করে থাকবে! মার মতলব তো ছেলেটাকে শুধু আপসেট করে দিয়ে আসা, যা করে ছেলেটা অসুস্থ হয়ে পড়ে, যাতে করে মার ছেলের কাছে থাকবার কেসটা আরো স্ট্রং হ নইলে স্থানে-স্থিতিতে ভালো ইস্কুলে যোগ্য লোকের তত্ত্বাবধানে ছেলেটা আছে, তাকে ডিস্টার্ব কর হেতু কী।'

অটলবিহারী অটল তার যুক্তিতে।

'আপসেট বা বিপর্যস্ত করার একটা কথা উঠেছে।' শুনুন স্যার, মদনগোপাল টাইয়ের নট একবার ধরল বাঁ হাতে। 'ওরা ছেলের কাছে প্রচার করেছে যে ওর মা মরে গেছে। বুঝুন এ আপসেট করা নয়। একটা মিথ্যা কথা বলে ছেলেটাকে চিরজীবন ম্লান করে রাখা শোকাচ করে রাখা—'

'এমন যে মা সে মৃত নয় তো কী।' অটলবিহারী চোঁস করে উঠল।

'ছেলের কাছে এমন-মা তেমন-মা কী। ছেলের কাছে মা, মা।' মদনগোপাল টাইয়ে গ্রন্থিটাকে আরো একটু আঁট করল। 'এখন ছেলেকে সত্য বোঝাবার জন্যে, তাকে প্রকৃতিস্থ করব জন্যেও অন্তত মাকে একবার দেখা করতে দেওয়া দরকার—'

'কখনোই নয়।' অটলবিহারী টলল না। 'এখন মাকে পাওয়া মানেই ছেলের ভীষণ আনন্দি হওয়া—সেই আনন্দেরও একটা আপসেটিং এফেক্ট হবে নির্ঘাৎ—'

'চমৎকার।' মদনগোপাল বিভ্রম মেশাল। 'এমনি যেখানে বাপে-মায়ে বিরোধ নেই, সেখা স্বাভাবিক ক্ষেত্রে, মা যদি ছেলেকে দেখতে যায় হস্টেলে, ছেলেকে মা আনন্দিতই করে, এবং বিদায়ে সময়ে বিষণ্ণ—তাতেই ছেলে আপসেট হয়ে যায় আর সেই কারণে মায়ের দেখা করাটা নিষিদ্ধ হয়?

'এখানে যে মশাই ভূত হয়ে দেখা করতে যাওয়া। ভূত দেখলে ভয় পাবে না ছেলে? ছেলে ভূত হয়ে ভয় পাইয়ে দেয়া ঠিক হবে?'

'নিশ্চয়ই ঠিক হবে। ওখানে মায়ের ভূত হয়ে যাওয়া নয়, বাপকেই ভূত বলে দেখতে শেখ যে মিথ্যে বলতে পারে, আর এমন মিথ্যে যে জ্যান্ত লোক মড়া হয়ে যায়, সেই তো আসল ভূত। সুতর সত্যের খাতিরে ন্যায়ের খাতিরে—'

'আমরা এখানে ধর্মকথা শুনতে আসিনি। সমস্ত প্রশ্নটাই হচ্ছে ছেলেটার মঙ্গলের প্রশ্ন—'

উকিলের তর্কের কি শেষ হয়? তারা তো নিরস্ত হবার জন্য জন্মায়নি। তাদের ে রিটায়ারমেন্টও নেই।

তাই জজ বললেন, 'সমস্ত ব্যাপারটার একটা মীমাংসা হয় না?'

'হ্যাঁ, হয়। কেন হবে না? চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী!' দু পক্ষের উকিলই ঘাড় হেলাল

'সমস্ত বিবাহিত জীবনটাই তো একটা আপোসে মিটমাট।' হাসলেন জজ।

'যা মনে হয় সিন্ধু আসলে দেখা যায় বিন্দুমাত্র।'

'আসলে কিছু নয়, ছোট্ট একটা স্ফুলিঙ্গ থেকেই দাবানল।'

'পক্ষরা আর তাঁদের উকিলেরা চলুন আমার খাসকামরায়।' জজ উঠলেন চেয়ার থে 'দেখা যাক, কামরাতে আলোচনা করে একটা রফা-নিষ্পত্তিতে আসা যায় কিনা।

ভালো কথা। চিহ্নিত কজন লোককে নিয়ে জজ তাঁর কামরাতে ঢুকলেন। তাঁর দু' বসালেন দুজনকে, ডাইনে ইন্দিরা, বাঁয়ে সুদক্ষিণ। বিরুদ্ধ উকিলেরা যার যার মক্কেল ঘেঁষে।

ইন্দিরা আর সুদক্ষিণকে এবার লক্ষ্য করলেন জজ। বললেন, 'পরস্পরের দিকে তা একটু হাসুন। মনে করুন আমরা এখানে কেউ নেই। আমরা প্রপঞ্চ।'

দুজনেই হাসল, কিন্তু কেউ কারু মুখের দিকে তাকাল না।

'যদি বলেন তো আপনাদের দুজনকে নিরিবিলি এ ঘর ছেড়ে দিয়ে আমরা চলে য বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন জজসাহেব। সঙ্গে—সঙ্গে উকিলের দল।

সে কী! ইন্দিরা আর সুদক্ষিণও উঠে পড়েছে।

মানে এরা নিরিবিলি হতে রাজী নয়।

আবার যে যার চেয়ারে বসল স্থির হয়ে।

জজসাহেব বললেন, 'বেশ তো, বলুন না কোথায় আপনাদের বাধছে। কথা ক'ন না। করে কাটিয়ে দিন সব ভুল বোঝাবুঝির কুয়াশা। এমন কী আছে, কী হতে পারে, যা ক্ষমা দি অনুতাপের অশ্রু দিয়ে ধুয়ে-মুছে নেওয়া যায় না?'' শত ক্ষতবিক্ষত হয়ে লোক ফিরে আসতে স্বাস্থ্যে, তেমনি শত কলঙ্কিত অবস্থায়ও লোকে ফিরে আসতে পারে ভালোবাসায়, সমর্পণে। কঠিন নয়, অসম্ভব নয়। পরিবেশটা একটু নড়ে গিয়েছে, কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে চেষ্টা কর তিনটি অক্ষরে ডি-ও-জি ডগ হয়ে আছে তাই দিয়েই জি-ও-ডি গড করে তোলা যায়। বে ক'ন না কথা। 'সুদক্ষিণকে স্পষ্ট লক্ষ্য করলেন জজ।

'ঐ ভ্রষ্টার সঙ্গে কী কথা কইব?' ফুসে উঠল সুদক্ষিণ।

'দেখুন কী বর্বরের মত ভাষা।' জ্বলে উঠল ইন্দিরা। কোর্টে বলেও জিভের উপ শাসন নেই, বুঝুন সে কত বড় পাষণ্ড।'

এই নিয়ে দুজনে শুরু হয়ে গেল বচসা। বকাবকি গালাগালি ক্রমান্বয় ঝগড়া। যা মুখে তাই বলতে লাগল। যা মুখে আসে না তাও।

জজ ও উকিল সবাই অপ্রস্তুত। কিছুতেই থামানো যায় না কাউকে। ওরে দেখি বি কাণ্ড। খেঁচো খুড়তে সাপের আবির্ভাব।

এবার শুরু হয়েছে চরিত্র ও সতীত্বের পাঁচালি।

জজ ভাবছেন, সব কথার শেষ হয়, এ-কথারও শেষ হবে। আর শেষ হয়ে গেলে যে

কিন্তু, না, এবার এসেছে এরা সন্তানের পরিচ্ছেদে।

'না, না, ডাইনি। কালনাগিনী।' বললে সুদক্ষিণ।

'বাবা না বাজেলোক। ফালতু।' বললে ইন্দিরা।

যদি পারে তো সুদক্ষিণ টেবিল থেকে পেপার ওয়েটটা কুড়িয়ে নিয়ে ইন্দিরার মুখের উ ছুঁড়ে মারে। আর, ইন্দিরা যদি পারত, নখে-দাঁতে ছিঁড়েকুটে সুদক্ষিণের মুখটা রক্তাক্ত করে দিত

এখনি ভীক্ষ্ণতম উত্তেজনার মুহূর্তে ইন্দিরা চেঁচিয়ে উঠল, 'কে বলে বিজু তোমার ছেলে?'

'কে বলে তোমার?'

অদ্ভুত করে হাসল নর। বললে, 'নাদারহুডটা ক্যাচ্। ফাদারহুডটা প্রিজাম্পশান। প্রিজাম্পশানটা সব সময়েই রিবাটেবল। তাই প্রিজাম্পশানটা—অনুমানটা খণ্ডে দিচ্ছি। কিসের স্পর্ধা করছ, তুমি বিজুর বাপ নও।'

'তা হলে কে, কে সে কীর্তিমান?' দু'হাতে চেয়ারের দুই হাতল ধরে ঝুঁকিয়ে এল সুদক্ষিণ।

'সে প্রশ্ন অবান্তর। তোমার যেটুকু জানবার দরকার সেটুকু জেনে রাখ।'

'স্যার,' জজকে সম্বোধন করল সুদক্ষিণ। ওর এই র‍্যাডমিশনটা রেকর্ড করে রাখুন। ব্যভিচারের এ একটা সুদৃঢ় প্রমাণ।'

জজ বললেন, 'ওকে ওথ দেওয়া হয়নি, তাই ওর এই স্টেটমেন্ট এভিডেন্স নয়।'

মিটমাটের আশা বৃথা। জজ সবাইকে নিয়ে আবার কোর্টে চলে এলেন।

কোর্টে এসে অর্ডার দিলেন। দরখাস্তকারী মানে ইন্দিরার ইনটেরিম পিটিশন মঞ্জুর হ সে দরখাস্ত লিখিত স্থানে কথিত ইস্কুলের হস্টেলে তার ছেলে বিজনকুমার সরকারের সঙ্গে যেে দিন বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে দেখা করতে পারবে। দেখার কাল এক ঘণ্টা। ইন্দিরা ইচ্ছে কর তার ছেলেকে যা ইচ্ছে উপহার দিতে পারবে। ছেলেকে ছুঁতে, ধরতে, আদর করতে পারে কথিত স্কুল ও হস্টেলের রেক্টর তাকে এসব ব্যাপারে কোনো বাধা দিতে পারবে না। বরং তা এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে উল্লিখিতভাবে দরখাস্তকারীর সাক্ষাৎকার সুগম ও সহজ হয় তা দেখবে সযত্নে।

অর্ডারের আর্জেন্ট নকল বের করে ইন্দিরা বাড়ি গেল।

তার উকিলরা বললে, 'আজ রাতের ট্রেনেই চলে যান। দেরি করলে সুদক্ষিণ না ও- থেকে ছেলেকে সরিয়ে ফেলে।'

ইন্দিরা বললে, 'রেক্টর খুব জব। তাই না?'

'নিশ্চয়।' আশ্বাস দিল মদনগোপাল। 'ইন্টারভিউতে এবার বাধা দিলে কন্‌টেম্পটে পড়ে অর্ডারের নকলটা তাকে দেখালেই সে দেখা করিয়ে দিতে বাধ্য। সে এই মোকদ্দমার পার্টি। সব অর্ডার জানে এই আইনের অনুমান।

ছেলের সঙ্গে দেখা হবে, তার চেয়েও বেশি আনন্দ, রেস্টরের সঙ্গে দেখা হবে বলে। কঠিনকে এখন কেমন বিগলিত দেখাবে এই ভাবতেই সুখ।

অটলবিহারী সুদক্ষিণকে পরামর্শ দিল, আজ রাতের ট্রেনেই বেরিয়ে পড়ুন। অর্ডার রেস্টরের উপর জারি হবার আগেই ছেলেকে ঐ ইস্কুল থেকে হস্টেল থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। ছেলে সরিয়ে নিয়ে যাবার পর অর্ডার মিনিংলেস। ছেলেকে ইস্কুল থেকে সরানো যাবেনা এখন কে ইনজাংশানের অর্ডার হয়নি। সুতরাং মেক হেস্ট। সমস্তটাই প্রেস্টিজ-ফাইট। বেরিয়ে পড়ুন। ছেলে নিয়ে সটকান দিন।

দেখাচ্ছি কার ছেলে। সুদক্ষিণ কোমর বাঁধল।

একই ট্রেনে দুজনে চলল কিন্তু কেউ কিছু জানল না।

সুদক্ষিণ ভাবছে কেমন আলগোছে সরাবে ছেলেকে আর ইন্দিরা ভাবছে কেমন নিবিড় ধরবে বুকের মধ্যে।

শেষ মুহূর্তে একটা কার্স্ট আপার বার্থ পেয়ে গেল। সেকেণ্ড ক্লাস টিকিটটা বদলে নিল সুদক্ষি কয়েকটা কানরা পরেই সেকেণ্ড ক্লাস লেডিজে চলেছে ইন্দিরা।

কেউ কারু খবর রাখে না।

রাত গেল। পরদিন সকাল গেল। দুপুরও যায় যায়।

মাঝরাত থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এ অঞ্চলে কয়েকদিন থেকেই হচ্ছে একনাগাড়ে।

ট্রেন আর যাবে না। সামনের একটা ব্রিজ ভেঙে গিয়েছে বন্যায়।

আরো এক রাত্রি ও এক সকালের রাস্তা ছিল।

এখন উপায়? কাকে কী জিজ্ঞেস করে? কে পরামর্শ দেয়?

ভাঙার যেমন রিপোর্ট, কেউ বলছে এক দিনেই সেরে ফেলবে। কেউ বা বলছে এক সা যদি সময় থাকে একদিন এখানে বা পিছনের কোনো স্টেশনে অপেক্ষা করতে পার। অপেক্ষা না ক ফিরে যাও স্বস্থানে। এ ট্রেনটাই ডাউন ট্রেন হয়ে ফিরে যাবে।

স্টেশনটা কী দেখতে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল ইন্দিরা।

দেখল, বৃষ্টিটা ধরা, তার কামরার কাছেই সুদক্ষিণ দাঁড়িয়ে। আর খানিকদূর থেকে হাফি এক শার্ট-হাফপ্যাণ্ট পরা যুবক এদিকে আসছে দ্রুত পায়ে।

অনায়াসেই তাকে চিনতে পারল ইন্দিরা। তার বড় ননদের ছেলে নন্দন।

শুনেছিল এরকমই কোনো একটা স্টেশনে সে পোস্টেড। রেলের সে ইঞ্জিনিয়র জাতীয় একটা কাজ করে। রাস্তাঘাটের মেরামতি দেখেশুনে বেড়ায়।

'কি আশ্চর্য, আপনারা কোত্থেকে?' নন্দন নিচু হয়ে সুদক্ষিণকে প্রণাম করল।

সুদক্ষিণ ভেবেছিল 'আপনারা' বুঝি ফিরের করে যাওয়া। কিন্তু, না, পিছনে কাউকে করছে নন্দন। বলছে, নেমে পড়ুন। ট্রেন আর যাবে না।'

সুদক্ষিণ চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখল, ইন্দিরা।

ইন্দিরা এমন মুখ করে নামল আকাশে এ দুর্যোগ ছাড়া আর যেন কোনো দুর্যোগের সে রাখে না।

'আপনারা যাচ্ছিলেন কোথায়?'

'আমাদের ছেলেকে দেখতে।' দিব্যি বললে ইন্দিরা।

সুদক্ষিণের কাছে আরো একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা আশা করে নন্দন। সুদক্ষিণ জায়গা স্কুলের নাম দিলে। বললে, 'ছেলেকে ঐ স্কুলের বোর্ডিংয়ে রেখেছি। দুজনে যাচ্ছিলাম একটু দেখতে।

যেহেতু নন্দন, মামা আর মামিমাকে একসঙ্গে ভাবছে, একদলে, তখন অলক্ষ্যে নিজে অজানতে, সুদক্ষিণ আর ইন্দিরা কাছাকাছি সরে এসেছে, বা তাদের সরে আসতে হয়েছে কাহাক যাতে নন্দন কিছু না জানে না বোঝে এ যেন দুজনেরই মনোগত অভিলাষ।

'ব্রিজ বোধ হয় এক দিনেই রিপেয়ার হয়ে যাবে। কাল সকালে খবর পাব। যদি রি হয়ে যায় কালই ফের স্টার্ট করতে পারবেন। নচেৎ,' পরিচ্ছন্ন দাঁতে হাসল নন্দন, 'দেরি দেখলে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। এখন চলুন তো আমার কোয়ার্টার্সে। ব্যাচেলারস কোয়ার্টার্স।'

ওদের দুজনকে নন্দন পৃথক বা ভিন্ন দলের ভাবতে পারছে না, অমনি ভাবারও কোনো ওঠে না, সুতরাং ইন্দিরা আর সুদক্ষিণকে পাশাপাশিই বসতে হল ট্যাক্সিতে।

কে জানত গায়ের সঙ্গে গা লাগবে, নিশ্বাসের সঙ্গে নিশ্বাস। কে জানত এতক্ষণ এত কাছা বসেও দুজনে খেয়োখেয়ি করবে না।

বেশ খানিকটা নির্জনে ছাইভ করে এসে পাওয়া গেল প্রকাণ্ড একটা পাহাড়, তারই সার সার কতগুলি শাদা বাড়ী, ওই ইঞ্জিনিয়ার্স কোয়ার্টার্স। কী সুন্দর, কেমন ছবির মত যেন আমরা ওখানে থাকতে পারি না?

'ওরকম নির্জনে প্রকৃতিকে প্রতিবেশী করে থাকতে পারলে জীবনের অন্য অর্থও বুঝি আ হয়।' বলতে বেশ ভালো শোনাবে বলে বললে সুদক্ষিণ।

'আমি তো একলা। তাই আমার শুধু দুই কামরা। বেড আর সিটিং। আর এক চি বারান্দা। সবই অত্যন্ত নীর্ণ। আপনাদের খুব কষ্ট হবে।'

'না, না, কষ্ট কী।' কত কষ্ট যেন এমনি উপেক্ষা করেছে, সেই ভাবে বললে সুদক্ষিণ।

আর কত রাত এমনি কাটিয়েছে এমনি ভাবের থেকে ইন্দিরা বললে, 'মোটে একটা তো রাত বাড়িতে পৌঁছেই চায়ের পাট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'খবরদার, কম কথা বলো এখানে।' ফাঁকায় পেয়ে বসে বসল ইন্দিরা।

'চারদিকের এই পার্বত্য গাম্ভীর্য কথা কইতেই দিচ্ছে না।' বললে সুদক্ষিণ।

'খুব ভালো। কথা কইতে শুরু করলেই না ঝগড়া শুরু হয়।'

'হাঁ, আমি সাবধানে আছি।'

'সব বিষয়েই সাবধান থেকো।' কালো কটাক্ষ ইন্দিরার চোখের কোণে ঝিলকিয়ে উঠল।

চায়ের পাটের পরে রাতের খাওয়ার পাট।

আর তখনই নামল বৃষ্টি। আবার বৃষ্টি। পাহাড় গলানো বৃষ্টি।

নিজে সিটিং রুমটা নিয়ে বেড রুমটা ওদের দিয়েছে নন্দন। একটা বাড়তি খাট আনবে ভেবে বৃষ্টির জন্যে হল না। খুব কষ্ট হবে আপনাদের।

সব দেখেশুনে সুদক্ষিণ বললে, 'না, না, কষ্ট কী।'

'মোটে এক রাতের তো মামলা।'

খেয়ে-দেয়ে খাটে শুয়েছে ইন্দিরা, আর সুদক্ষিণ চেয়ারে বসে দুলছে।

আর বৃষ্টি করছে অবিচ্ছেদ।

কতক্ষণ পরে ইন্দিরা উঠে এল। বললে, 'তুমি এবার শোও, আমি চেয়ারে বসি।'

তাই। সমান-সমান।

সুদক্ষিণ শুল। আর চেয়ারে বসে দুলতে লাগল ইন্দিরা।

বৃষ্টি করছে অতন্দ্র।

কতক্ষণ পরে উঠে এল সুদক্ষিণ। বললে, এর কোন মানে হয় না।'

'কিংবা ভীষণ কোনো মানে হয়।' দীপ্ত চোখে তাকাল ইন্দিরা।

'আজ রাত্রে তো আমরা দুজন। দুজন হলে তেঁতুল পাতায়ও ন'জন ধরে শুনেছি।'

'কী সর্বনাশ! মোটেই নজন নয়, দু'জন। দুজনের সঙ্গে দুজন মেলে।'

'দুজনও মিলত, তবে তার দরকার নেই।'

'কথার অতীত এক কথা আছে, তাই হয়তো আজ পাহাড়ে, মাঠে, অন্ধকারে, বৃষ্টিতে'—মনের কথা বলতে পারল ইন্দিরা।

'তাই অনায়াসেই খাটে তুলোবে দুজনকে।'

'এবং কে জানে হৃদয়েও।'

ভোর হয়-হয় এমন সময় জাগা চোখে জিজ্ঞেস করল সুদক্ষিণ, 'যদি ব্রিজ রিপেয়ার হয়ে আসে, তা হলে ছেলেকে কি দেখতে যাবে?'

'কী দরকার।' বোজা চোখে বললে ইন্দিরা, বাড়ী ফিরে যাব।

———

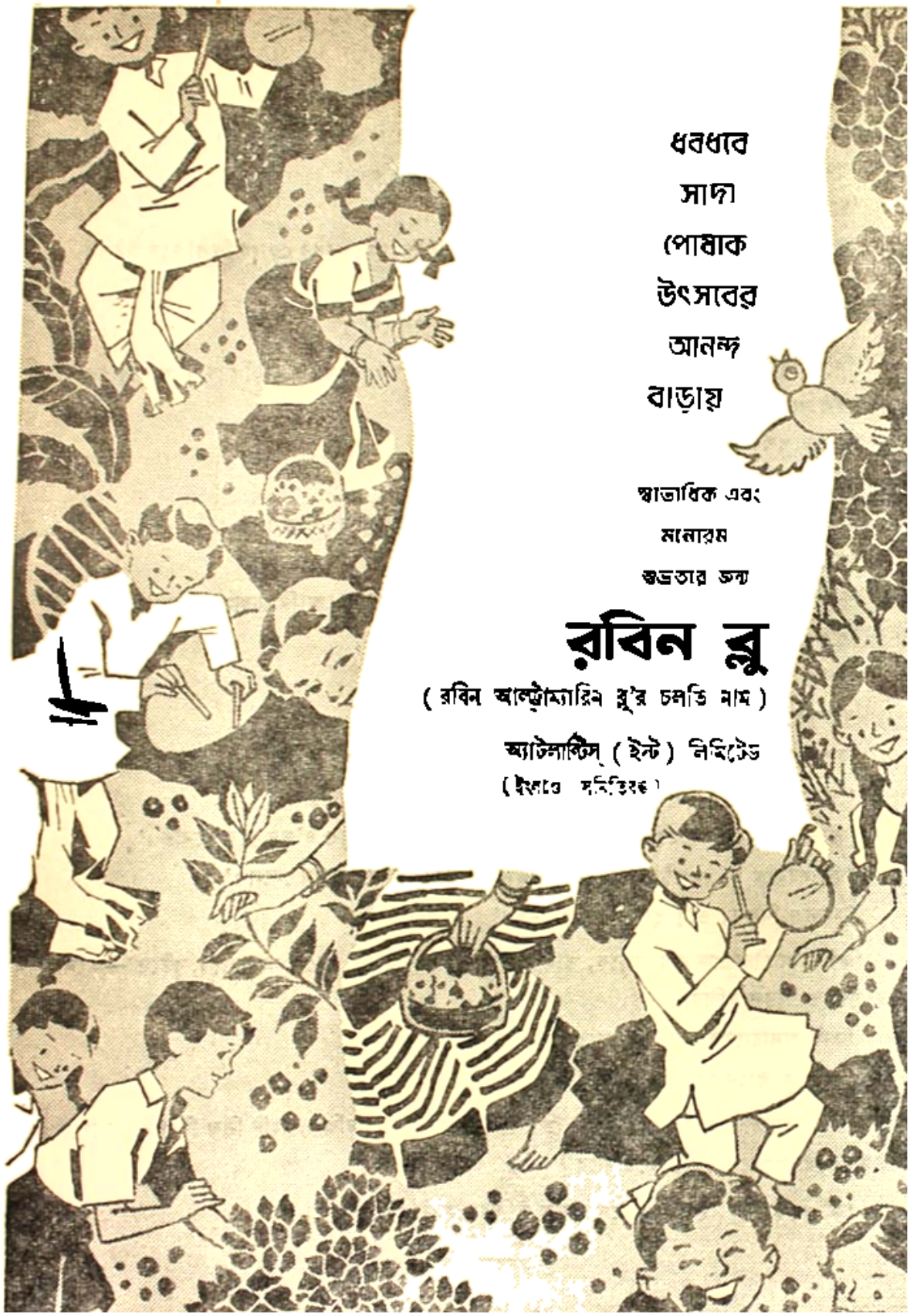

ধবধবে
সাদা
পোষাক
উৎসবের
আনন্দ
বাড়ায়

স্বাভাবিক এবং
মনোরম
শুভ্রতার জন্য

রবিন ব্লু

(রবিন আল্ট্রামারিন ব্লু'র চলতি নাম)

অ্যাটলাস্টিস্ (ইন্ট) লিমিটেড
(ইংলণ্ড সমিতিবদ্ধ)

জীবন যৌবন

দক্ষিণারঞ্জন বসু

ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু···!—করুণ ও আর্তস্বরের এই ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজার কড়া ব্যাকুল ঘা পড়তেই ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলেন ডাক্তার বড়ুয়া।

শীতকাল। রাতও নেহাত কম হয়নি। গোটা গলিটাই প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিলো ঘুমে

ডাক্তারবাবু, শুনছেন ডাক্তারবাবু! একবার দয়া করে নেমে আসুন না ডাক্তারবাবু!—অসহায়তার কান্নায় ভেজা হলেও এই কণ্ঠস্বরকে চিনে নিতে বিশেষ অসুবিধে হয় না ডাক্তার বড়ুয়ার। এ যে তেরো নম্বরের নতুন ভাড়াটেদের সেই খাপছাড়া ছেলেটারই কাণ্ড তাতে কোনোই সন্দেহ নেই তাঁর।

না, তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজাটা না খুলেই নয়। তা না হলে হয়তো সারা গলিটাকে আধপাগলা ছেলেটা জাগিয়ে তুলবে একটা সোরগোল বাধিয়ে।—ওভারকোটটা কোনো রকমে চাপিয়ে ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে আসেন অবনী বড়ুয়া।

আমাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু, আমাকে বাঁচান। আমি বিষ খেয়েছি।—ডাক্তারবাবু সদর খুলে সামনে এসে দাঁড়াতেই তাঁর দুপা জড়িয়ে ধরে আশীষ।

বিষ!—বিস্ময়ে কেঁপে ওঠেন বড়ুয়া। আধপাগলাই হোক আর যাই হোক বাইশ তেইশ এমনি একটা জোয়ান ছেলে এই কেলেংকারি করে বসলো, ডাক্তারবাবু যেন ভাবতেই পারছেন তবু আরেকবার জিজ্ঞেস করলেন—সত্যি সত্যি বিষ খেয়েছো তুমি?

হ্যাঁ বিষই খেয়েছি—আফিম। প্রায় তোলাভোর আন্দাজ গিলে ফেলেছি।—বলতে থরথর করে কাঁপছিলো আশীষ। সে আর দাঁড়াতে পারছিলো না। কপাটের ওপর তাকে মাথা দিতে দেখে ডাক্তার নিজেই তাকে ধরে নিয়ে এসে বাইরের ঘরে শুইয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন গভীর দুশ্চিন্তার সঙ্গে, কখন খেলে?

সে আমার ঠিক মনে নেই ডাক্তারবাবু। হাঁ, মিনিট পনেরো বিশ হয়তো হবে। তার হতে পারে, কমও হতে পারে। সবই আমার ঘুলিয়ে যাচ্ছে, কখন কী করে যে এখানে তাও কিছুই মনে পড়ছে না। আমাকে বাঁচিয়ে দিন ডাক্তারবাবু—আমাকে বাঁচান, আপনার পড়ছি।—বলেই সত্যি সত্যি তক্তপোষ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আশীষ একেবারে পায়ের ওপর পড়ে ডাক্তারবাবুর।

মানসিক উত্তেজনার জন্যেই হয়তো ছেলেটির পালস-এর রিটটা একটু বেশি দ্রুত চলেছে। তাকে অস্বাভাবিক বলা চলে না। আশীষের নাড়ী টিপে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন ডাক্তার।

স্টেথেসকোপ বসিয়ে হার্টের ব্যাপারেও তেমন শংকিত হবার মতো কিছু পেলেন না তিনি। মুখটা এ লাল হয়ে উঠেছে বটে, তবে ভিজে ব্লটিং পেপারের মতো তা ফুলে ফুলে ওঠেনি। তাছাড়া চোখে তারারও তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি, চোয়ালটাও ঝুলে পড়েনি। তবু সাবধানের মার নেই, ও নীতিবাক্যের ওপর নির্ভর করেই সেলাইন ওয়াটার দিয়ে ওকে বমি করানো হলো প্রচুর পরিমাণে তারপর ওকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খেতে দিয়ে জিগ্যেস করলেন ডাক্তার বড়ুয়া :

তুমি বিষ খেতে গেলে কেন ?

কেন বিষ খেতে গেলাম জিগ্যেস করছেন ডাক্তারবাবু! না খেয়ে উপায়ই বা কি? আম বেঁচে থাকার আর সার্থকতাই বা কোথায় বলুন। বেকার পরগাছা জীবনের কী মূল্য ? বাড়ীতে বৃদ্ধা অবিবাহিতা বোন ও ছোট পঙ্গু ভাইয়ের একমাত্র অবলম্বন ছিলাম আমি। কিন্তু এই জীবনগুলো রক্ষার মুরোদ যার নেই সে শুধুই অভিসম্পাত কুড়োবার জন্যে বেঁচে থাকবে, সে-ই বা কেমন কথ তাই মরবার জন্যেই নিরুপায় হয়ে আফিম খেলাম। মরলে আর কিছু না হোক, অন্তত একটা দোষে বোঝা তো কমবে সংসার থেকে, এটুকুই লাভ।

তাহলে বাঁচবার জন্যে আবার এতো অনুনয়-বিনয় কেন ?—বেশ একটু খোঁচা দিয়েই এবার ক করেন ডাঃ বড়ুয়া।

না, সত্যি ডাক্তারবাবু, আমি বড্ড ভুল করেছি ডাক্তারবাবু, বড্ড ভুল করেছি। মৃত্যু পালি যাবার পথ হতে পারে, কিন্তু মৃত্যু দিয়ে দৈন্যকে কখনো জয় করা যায় না। এখন বেশ বুঝতে পার দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে আমার দাঁড়ানোই উচিত ছিলো। সে সুযোগ আমায় করে দিন ডাক্তারব আমায় বাঁচান।—একটা মর্মান্তিক আকুলতা ফুটে ওঠে আশীষের এই আবেদনের মধ্যে। বাঁচ আকুলতা। ডাক্তারের কোমল হৃদয়কে সেই আবেদন গভীরভাবে স্পর্শ করে।

ব্র্যাণ্ডিটা খেয়ে বেশ একটু যেন চাঙা হয়ে উঠেছে আশীষ। একটা কি ওষুধও খাইয়ে দে হয়েছে তাকে।

কী হে, এখন একটু ভালো লাগছে তো ?

হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, একটু যেন জোর পাচ্ছি মনে হচ্ছে।

তা হলে এ যাত্রায় আর মরার সাধ মিটলো না, বোধ হয় বেঁচে গেলে।—আর একটি খে দিলেন ডাক্তার বড়ুয়া।

কেনই বা মরবো বলুন। জানেন আমার বয়স কতো ? র‍্যাম ওনলি টুয়েন্টিথ্রি—ওনলি টুয়েন্টি স্যার! সুন্দর এই পৃথিবীতে এখন আর আমি মরতে চাইনা ডাক্তারবাবু—আমি চাইনা মৃত্যুর শী শীতল হাত আমার কেড়ে নিক মাটির এই শ্যামল কোল থেকে। দিনের প্রদীপ্ত সূর্যের নীচে অ আমার পূর্ণত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখে যেতে চাই ডাক্তারবাবু! আপনার পায়ে পড়ি আপনি আমা বাঁচান!—ক্লান্তে মুখর হবার মতো অনর্গল বকতে শুরু করে আশীষ। তাই শুনে অবনী ডাক্তারের।

পড়ে যায় আশীষের বাবার একদিনের কথা। এই ছেলেকেই একবার দেখাতে এনে সর্বেশ্বর বলেছিলেন 'আমাদের পুরুষানুক্রমিক রক্তধারাই হলো এমন। নিজেকেও আমার কিছুকাল থ্রম্বাটিক এ্যাসাইলাম কাটাতে হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ নিরোগ হয়েই তো আমি বিয়ে-থা করেছিলাম। কিন্তু ছেলেটার মধ্যে গোলমাল দেখে এখন কেবলি মনে প্রশ্ন জাগছে, এ কি আশীষের অতিরিক্ত পড়াশুনোর ফল, না আমার বংশধারার পরিণতি।' কিছুদিন পরেই সর্বেশ্বর মারা গিয়েছেন, ছেলের চিকিৎসা পুরোপুরি করে যেতে পারেন নি—সংসারটাকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে রেখেই তিনি বিদায় নিয়েছেন।

পড়াশুনায় আশীষ সত্যি খুব ভালো ছেলে ছিলো সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ অবধি সে পড়াশুনো করতে পারলো কৈ! বি. এ. পড়তে পড়তে বাপ মারা যেতেই তার লেখাপড়ায় ইতি। সে কি কম দুঃখ আশীষের। তবু দিনরাত বইপত্তর নিয়েই থাকতো ছেলেটা। আশা, কোনো রকমে পাশ দিয়ে বি. এ.-টা যদি পাস করা যায়। শেষ পর্যন্ত তাও হয়নি।

আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমি কি সত্যি সত্যি বাঁচবো!—লাল চোখ দুটোকে উপর দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে এই প্রশ্ন করে আশীষ। গালের দুপাশের কোথে তার খুথু জমেছে পুরু কথায় তাই তার অস্পষ্টতা। তা বুঝতে পেরেই ডাক্তার নিজেই কোণার দিক থেকে একটা পাতিল এনে এগিয়ে দেন তার সামনে। তারপর তাকে আর এক আউন্স ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে বিদায় নেন।

এবার চুপচাপ একটু ঘুমোও তুমি।—ডাক্তারবাবু ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বলে এই এবং যেতে যেতেই শুনতে পান আশীষের একটা মন্তব্য, ঘুম না শেষ ঘুম কে জানে।

রাত অনেক হয়েছে। তা হলেও ভোর হতে এখনো বাকি। বারান্দায় ময়নাটা এমন কোনোদিন তো এমনি সোরগোল বাধায়নি।

ডাক্তারবাবু ওঠো, ওষুধ দাও। ডাক্তারবাবু ওঠো, ওষুধ দাও।—এই একই ডাক এ ডেকে চলেছে ময়না এবং এই একটানা ডাকের মধ্যে একটা অদ্ভুত রকমের অস্থিরতা।

ময়নার অস্বাভাবিক চিৎকারে জেগে ওঠেন বন্ধুরা। স্থির থাকতে না পেরে তিনি ছুটতে নেমে আসেন নিচে।

বাইরের ঘরের আলোটা জালিয়ে দিয়েই স্তম্ভিত হয়ে যান ডাক্তারবাবু। আশীষ যে ভীষণ করছে। এ জন্যেই ময়নাটাও এমনি অস্থির হয়ে উঠেছিলো।

উঃ, আমাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু! ওকে যে আমি কথা দিয়ে এসেছিলাম, আবার আশায় ও আজীবন বসে থাকবে। আর যে যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না ডাক্তারবাবু, একটা ভাবে দিয়ে আমায় বাঁচান। মরে গেলে ও কি ভাববে বলুন তো, ভাববে আমার কোনো মুরোদ নেই· ভাঁওতা দিয়ে সরে পড়েছি। ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জার কথা!

কার কথা বলছি জিগ্যেস করছেন? দাঁড়ান, একটু ভেবে নিই। না, সে নামটা বড্ড

যাচ্ছে। আচ্ছা, মরবার আগে মানুষের কি এমনি সব কিছু ভুল হয়ে যায় না কি ডাক্তারবাবু? তা হলে ওর নামটা আমার কিছুতেই মনে আসছে না কেন?—একবার একটু থেমে বলতে বলতে আশীষ যেন একটু দম নেবার চেষ্টা করে আশীষ। কিন্তু এসব কি বকছো বকবক করে, এই বলে ডাক্তার এ দমকে দিতেই সে আবার শুরু করে :

হ্যাঁ, এবার অনেকটা মনে পড়েছে। সাধারণ একটি মেয়ে। ভিড়ের মধ্যে থেকে তাকে খুঁজে বার করা সত্যি কঠিন। একটু বেঁটে হলেও দেখতে মোটামুটি ভালোই। আমরা যখন কিছুদিন ছিলাম ওদের পাশের বাড়িতে। ওর দীর্ঘ চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে ও প্রায়ই এসে জানলায় দাঁড়াতো। মনে হতো আষাঢ়ের একখণ্ড কালো মেঘ যেন আকাশে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে ওদের জানলায় এসে আটকে পড়েছে। ওই মেঘের ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হতো আমার। জানো ডাক্তারবাবু, একদিন ওর ওই বেণীটা আমি ছুঁয়েও ছিলাম। খুব ভালো লেগেছিলো। এই আমার প্রথম প্রেম ডাক্তারবাবু। কিন্তু তবু ওর নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না কেন? ভারি মিষ্টি নাম ঐ নামে আমি কত ছোট ছোট কবিতা লিখেছি, আর সে নামটা আজ একবারে মনে আসছে না কিন্তু আর পারছি না যে ডাক্তারবাবু, ভেতরটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো একেবারে!—বলতে বলতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আশীষ।

ডাক্তার বন্ধুরা রোগীর কথা শোনবার চাইতে রোগের উপসর্গগুলো লক্ষ্য করছিলেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে। চট করে তিনি একটা ইনজেকশন তৈরি করে নিয়ে এলেন পাশের ঘর থেকে এবং রোগীকে সেটা দিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার যেন তার সম্বিৎ ফিরে পেলো! খুব আস্তে আস্তেই এবার সে বললে :

ওর নামটা এতোক্ষণে মনে পড়ছে ডাক্তারবাবু। হ্যাঁ, ওর নাম হলো মীনা। না, না, মীনা নয়, মীনা ওর বড়দির নাম—ওর নিজের নাম হচ্ছে লীনা। মনে পড়েও আবার ভুল হয়ে যাচ্ছে ছিঃ ছিঃ, কেন এমন হচ্ছে বলুন তো। লীনার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে আমার যে মরা ঠিক হবে না ডাক্তারবাবু! তাই এবারের মতো আমায় বাঁচিয়ে দিন ডাক্তারবাবু! আশীষের স্বর আবার একটু চড়া হয়ে ওঠে।

না, না তুমি মরবে কে বলে, তুমি নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে।

হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, আমায় আপনি বাঁচিয়ে তুলুন। জানেন তো মরার কি যন্ত্রণা! সুইসাইডে যন্ত্রণা আরো বেশি। আমি আর সহ্য করতে পারছি না ডাক্তারবাবু।

আগে মনে হয়নি কেন এসব কথা বাছাধন? তাহলে তো আর এ দুর্গতি তুলতে হতো না—অবনী ডাক্তারের এ শ্লেষাত্মক প্রশ্নের উত্তরে একটু চুপ করে থেকেই আবার মুখর হয়ে ওঠে আশীষ

সবই মনে হয়েছিলো ডাক্তারবাবু, কিন্তু সেটিমেন্টের কাছে কোনো যুক্তিই তখন দাঁড়াতে পারেনি কিন্তু এখন বেশ বুঝতে পারছি কী ভীষণ ভুল করেছি। আমাদের গাঁয়ের অঘ্রদির কথা মনে পড়ছে

আমি তখন ছোট ছিলাম। বিধবা হয়ে তিনি বাপের বাড়িতে চলে এসেছিলেন অল্পবয়সে। আ কতো আদরই না তিনি করতেন। বিশেষ করে আমাকে। স্কুল ছুটির পর ফিরতি পথে অনুদির একবার যেতেই হতো। বেশ মনে আছে, প্রায় রোজই তিনি দই-চিড়ে খেতে দিতেন। একদিন শোনা গেলো অনুদির নামে কি একটা কলঙ্ক রটেছে আর সে লজ্জা ঢাকতে তিনি খেয়েছেন। শুনেই তাকে দেখতে গেলাম। উঃ মারকীয় যন্ত্রণায় সে কি ভয়াবহ দৃশ্য! ভোর অনুদির সব যন্ত্রণার অবসান হলো। সকালে পুলিশ এসে তাঁর শবকে চালান দিলে শহরে। তদন্তের পর পরদিন যখন সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহটাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হলো সে আরেক ব্যাপার। না, আর বলতে পারছি না ডাক্তারবাবু, আর বলতে পারছি না।—বলতে বলতে অ কোলা কোলা বোজা চোখের কোলে বড়ো বড়ো দুটি জলবিন্দু জমে ওঠে।

তোমার আর কিছুই বলার দরকার নেই বাপু। তুমি বরং আরেকটু ঘুমোও।—ভোর ঘুমে শরীরটা একটু মজবুত হবে।—বলেই পেছন ফিরে বেরিয়ে আসতে উদ্যোগী হন ডাক্তারবাবু অমনি এক নতুন প্রশ্ন তুলে বসে আশীষ।

শুনুন, শুনুন ডাক্তারবাবু, আপনি পরলোক বিশ্বাস করেন? মৃত্যুর পর আত্মা কোথা বলতে পারেন?.

কি বলেন, পরলোক আপনি বিশ্বাস করেন না? আত্মা বলতে আমরা যা বুঝি মৃত্যুর সঙ্গে তাও শেষ হয়ে যায়, এই আপনি বলতে চান। ডাক্তার মানুষ আপনি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, বলতে পারেন। কিন্তু আপনাদের যুক্তিকে বুদ্ধি দিয়ে শুধু যাচাই-ই করা চলে—ব্যাখ্যা চলে না। আমার মনে হয় আপনাদের ধারনা আগাগোড়াই ভুল। আত্মা অবিনশ্বর, তার শে —এই পুরোনো কথাটাই ঠিক। কেউ যদি সমাজের অবিচারে বা আত্মজনদের নির্মম ব আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়, তবে জানবেন তার প্রেতাত্মা সেই অবিচারের প্রতিশোধ তুলতে পাশেই ঘুরে বেড়াবে সর্বদা। অনুদিও সমাজকে এখনো পর্যন্ত ক্ষমা করতে পারেন নি। দেখতে পাচ্ছেন না ডাক্তারবাবু, দরজার ছায়াটা, ঐ যে দেয়ালে যেখানটায় পড়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে অনুদি ডাকছেন আমায় হাতছানি দিয়ে। একটু দাঁড়াও অনুদি, আসছি ভাই। তাড়া কিসের? আচ্ছা অনুদি, তোমার সঙ্গে ওরা কারা—ওই যে কালো কালো সব তোমায় চা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি বলে, ওরাও আমাকে নিতে এসেছে—প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমার চাই? কিন্তু ভাই অনুদি, এই অচেনা লোকগুলোকে দেখে আমার যেন বড্ড ভয় ভয় লাগছে। বলছো কোনো ভয় নেই? আচ্ছা বেশ, তাহলে দাঁড়াও আরেকটু।—বলতে বলতে পাশ ফিরে আশীষ। একটু তন্দ্রা আসে। সেই অবসরেই রোগীর মুখে এক পুরিয়া ওষুধ পুরে দিয়ে বেরিয়ে আসেন ডাক্তার বন্ধুরা।

আশীষের বাড়িতে এবার খবরটা পাঠানো দরকার। ডাক্তার লোক পাঠালেন।

তেরো নম্বরে খবর পৌঁছুতেই সেখানে হুলুস্থুল কাণ্ড।

আকাশে তখন সবে সূর্যদেব চোখ মেলছেন। পাখির কলরব সবেমাত্র শুরু হয়েছে গাছে গাছে ডাক্তার বড়ুয়ার বাড়ির ময়নাটা মাঝে মাঝে বলছে : আমি ময়না, গুড মর্ণিং ; আমি ময়না, গুড মর্ণিং !

মা বোন ভাই তিনজনই হায় হায় করতে করতে ছুটে এসেছে আশীষকে দেখতে। ডাক্তা সবাইকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছেন। বারণ করে দিয়েছেন হৈ-হল্লা করতে। আশীষ ঘুমুচে যতোক্ষণ পারে ঘুমাক। সেই অবসরে তিনি আশীষ সম্বন্ধে দুচারটে কথা জেনে নিতে চান তা মায়ের কাছ থেকে।

হ্যাঁ, আপনার ছেলে ডিলিরিয়ামের মধ্যে বার বার লীনা বলে একটি মেয়ের কথা বলছিলো মেয়েটি কে বলুন তো ?

কি আর বলবো ডাক্তারবাবু, ওই হতচ্ছাড়া মেয়েটাই তো আমার ছেলেকে পাগল করেছে ওর জন্যেই তো অতোদিনের পুরনো বাড়ি ছেড়ে তেরো নম্বরের এই ফ্ল্যাট বাড়িতে উঠে আসতে হয়ো আমাদের।—আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে এটুকু বলেই থেমে যান মহিলা।

লীনা আপনার ছেলেকে পাগল করেছে, তার মানে। আপনার ছেলেকে সে ভালো বাসে এইতো। আপনার ছেলেও তো তাকে ভালোবেসেছে, সেও কি পাগল হয়েছে ?—মুশকিলের প্রশ্ন ক বলেন ডাক্তারবাবু।

সে আবার পাগল হবে ! সে তো বেশ দিব্যি কর্পোরেশন স্কুলে মাস্টারি করছে, ভা রোজগার করছে, আনন্দে আছে। মাঝখান থেকে আমাদের সর্বনাশটা করলে !—বলেই কপা করাঘাত হানেন আশীষের মা।

কী করে লীনা আপনাদের সর্বনাশ করলে ? রাগের বশে কেন মিছেমিছি একটি সাধারণ মে ওপর এরূপ দোষারোপ করছেন ? এ ঠিক নয়।

এ কি বলছেন আপনি ডাক্তারবাবু ? বৈদ্যের মেয়ে হয়ে বামুনের ছেলেকে বিয়ে করতেই হ একে অন্যায় গো বলবেন না আপনি ? কর্তা বাধা দিয়েছিলেন, তা নিয়েই তো বাপ-ছেলেতে ঝগড় স্বর্গে গিয়ে তিনি বেঁচেছেন, এখন আমিও যেতে পারলে রক্ষা পেতাম।—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদ অধীর হয়ে ওঠেন সর্বেশ্বরবাবুর স্ত্রী। তবু তাঁকে সহজে ছেড়ে দিতে নারাজ ডাক্তার বড়ুয়া।

তা হলে তো দেখছি আপনারাই দায়ী আপনাদের ছেলের আজকের এ অবস্থার জন্যে। বি আমি বলে দিচ্ছি, ছেলেকে যদি বাঁচাতে চান তাহলে লীনাকে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন এবং সবচে বেশি প্রয়োজন।—মায়ের প্রাণে প্রচণ্ড একটা দোলা লাগে ডাক্তার বড়ুয়ার এই কথায়। বি মহিলা নিষ্পলক চেয়ে থাকেন কতোক্ষণ ধরে তাঁর দিকে। তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি নামিয়ে এনে চুপচ বসে থাকেন।

কী বলেন, নত আছে? তাহলে আপনাদের আগের বাড়ির ঠিকানা দিন লীনাকে ডাকিয়ে আনি এখানে।

লীনাদিকে আমিও গিয়ে নিয়ে আসতে পারি। যাবো মা?—ডাক্তারবাবুর শেষ কানে যেতেই লাফিয়ে এসে আশীষের ছোট ভাই পরিমল মায়ের অনুমোদন চায় তাদের পু বাড়িতে একবার ঘুরে আসার জন্যে। লীনাকে আনার চেয়েও ওদের বাড়িতে গেলে অন্টু মন্টুর স তার এই সুযোগে একবার দেখা হয়ে যাবে পরিমলের কাছে সেটাই অবশ্য বড়ো কথা।

ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু,—এদিকে ঘুম ভাঙতেই আশীষ চেঁচিয়ে ওঠে এবং তার সং ময়নাটাও। ময়নার গলার বেশ জোর। তার ডাক শুনতে পেয়েই বড়ুয়া নেমে আসেন এবং তাঁ পিছে আশীষের মা-বোন-ভাই।

আশীষ তখনো চোখ মেলতে পারছে না। চোখ দুটো আগের চেয়েও বেশি ফুলে উ তা হলেও সে এখন সম্পূর্ণ সচেতন। পায়ের শব্দেই সে বুঝতে পেরেছে, ডাক্তারবাবু এসেছেন। আরো যেন অনেক কয়টা পায়ের শব্দ! এ বাড়িরই লোকেরা কেউ কেউ তাকে দেখতে এসে হয়তো। এই মনে করে ও নিয়ে আর মাথা ঘামায় না আশীষ, বড়ুয়াকে লক্ষ্য করেই বলে:

ডাক্তারবাবু এসেছেন? দয়া করে একটু যদি বসেন তা হলে দু চারটে কথা বলি।

বেশতো বলো না, তোমার সব কথাই শুনবো।—আশীষের এবারের কথার রকম ডাক্তার ধরতে পেরেছেন বিষক্রিয়া কেটে গেছে এবং রোগীর পূর্ণ জ্ঞানও ফিরে এসেছে। ত তাই অসীম আনন্দ। সেই আনন্দের আভাষ আশীষের মা লক্ষ্য করেন ডাক্তারবাবুর মুখে রেখা দেখে। তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকেন। ডাক্তারের নির্দেশে ততোক্ষণে বেরিয়ে গেছে লীনাকে আনতে।

কি হে, বলছো না যে কিছু। এখন অনেকটা ভালো লাগছে তো?

হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, এখন আর সেই যন্ত্রণাটা নেই। সত্যি বলবো ডাক্তারবাবু, আমি বা ভীষণ অন্যায় করে ফেলেছি। এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি, সংসারের সব দায়-দায়িত্ব পালিয়ে যাবার জন্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করা কি সাংঘাতিক অপরাধ। আর এ খবরটা শুনতে লীনাই বা কী মনে করবে আমাকে। তার কাছে আমি কতো ছোট হয়ে যাবো বলুন তো। ডাক্তারবাবু, লীনার বাবা আমার কোনো পাকা চাকরি না হওয়া পর্যন্ত আমার হাতে তাঁর স সঁপে দিতে রাজী না হলেও সেই মেয়েই বার বার আমাকে বিয়ের ব্যবস্থাটা করে ফেলতে দিয়েছে। বলেছে, যতোদিন আমার না কোনো একটা পাকা কাজ জুটছে ততোদিন তার উ কানাকড়িটি পর্যন্ত আমাদের সংসারের জন্যেই সে ব্যয় করবে—সেজন্যে আমি যেন কিছুই না লীনার বাবা-মা লীনার মাইনের টাকার একটি পয়সাও খরচ করতে দেয় না, সে কথাও সে ব কিন্তু এতো সত্ত্বেও নিজে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে লীনার প্রস্তাবে সায় দেওয়ায় আমার মনের সম্মতি যে

অথচ ব্যর্থতায় ব্যর্থতায় অপমানের বোঝাটা ক্রমেই যেন ভারি হয়ে উঠছিলো মাথার ওপর। শেষ পা আর সহ্য করতে না পেরেই এই কাণ্ড করে বসেছিলাম। সে যাই হোক ডাক্তারবাবু, দয়া করে আপ নিশ্চয়ই দেখবেন, লীনার কানে এ খবরটি যেন কোনো ক্রমেই গিয়ে না পৌঁছোয়।

বেশ তা না হয় দেখা যাবে। কিন্তু মা যে ছেলের খবর না পেয়ে পাগলের মতো হয়ে ছুটতে ছুটে এখানে এসে হাজির হয়েছেন।

মা এসেছেন? কোথায় মা? মা, তুমি আমায় ক্ষমা করো।—ডাক্তারের কথায় উচ্ছ্বসি হয়ে ওঠে আশীষ। উঠে বসতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। অনেক কষ্ট করে একবার সামান্য চে মেলে তাকায় মায়ের দিকে। তার শিয়রেই এসে বসেছেন মা। মাথায় মায়ের হাতের মধুর স্পর্শে অসীম তৃপ্তি! সেই হাতখানাকে নিজের হাতে চেপে ধরে আশীষ।

মা, তুমি কাঁদছো? কেন কাঁদছো মা? আমি তো ভালো হয়ে উঠেছি। ডাক্তারবাবু আমায় ভালো করে দিয়েছেন। তুমি আর কেঁদো না।—রুদ্ধ আবেগে মায়ের চোখ থেকে টপ টপ করে কয়ে ফোঁটা জল পড়েছে ছেলের কপালে। তাতেই অধীর হয়ে উঠে মাকে আশীষ বারণ করে কাঁদতে।

কে রে অমন সুন্দর করে পা টিপছে? সন্ধ্যা বোনটি, তাই না?—আপন অনুভূতিতেই আ ঠিক ঠিক ধরে ফেলে। সন্ধ্যা কিন্তু কোন জবাবই দিতে পারে না। মায়ের মতো তারও ঘর রুদ্ধ হ আছে এ ঘরে ঢোকার পর থেকেই।

মা, আমি লীনাদিকে নিয়ে এসেছি। এই গাখো লীনাদি এসেছেন।—হাঁফাতে হাঁফা পরিমল লীনাকে নিয়ে হাজির। লীনার বাবাও এসেছেন সেই সঙ্গে।

কয়েক মুহূর্ত ধরে রোগীর ঘর নিস্তব্ধ। সবাই কিছুক্ষণের জন্যে পুতুলের মতো অনড়।

হঠাৎ ডাক্তার বদ্রুয়া দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, ছেলেটা খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে এ যাত্রায়। নিয়ে আর আপনারা বাড়াবাড়ি করবেন না।

এই বলেই লীনার বাবাকে নিয়ে ডাক্তারবাবু তাঁর নিজের ঘরে চলে গেলেন।

শুভ মর্ণিং!—নয়নাটা একবার আপন খেয়ালেই প্রভাতী অভিনন্দন জানালো।

---

* * এক দুর্দমনীয় স্বাধীনতার স্পৃহা এবং সাধনের দ্বারা দেবতাকে মানুষ বলিয়া ধরা এবং মানুষের মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করা, ইহাই বাঙ্গালীর পুরাগত সাধনার মূল লক্ষণ বলিয়া দেখিতে পাই।

বিপিনচন্দ্র পাল

নাইল-নাগিনীর প্রেম

সমরেশ মজুমদার

অপরাহ্নের রোদ্দুপতি জুলিয়াস সীজার পৃথিবী জয়ে বেরিয়েছেন। মহান পম্পেইকে পর্যুদস্ত মিসরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে থামলেন। বিশ্রাম নেবেন কয়েকদিন। তা আবার জয়যাত্রা সুরু হবে। লক্ষ্য বহুদূর—ভারতবর্ষ।

আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করে তিনি এক কৌতুকপ্রদ খবর শুনলেন। রাজপ্রাসাদে নেই। রাজসিংহাসনের দু'জন দাবিদার। ভাই আর বোন, দু'জনেই রাজধানীর দুই বি উপকণ্ঠে তাঁবু গেড়েছে এবং যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

খবর শুনে মজা লাগল সীজারের। রাজপ্রাসাদ অধিকার করে তিনি দুই দাবি তলব করলেন। মধ্যস্থরূপে এ কলহের তিনি মীমাংসা ক'রে দিয়ে যাবেন।

আদেশনামা পেয়েই 'রাজা' টলেমি সীজারের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর চরণ বন্দনা ক তাঁর ক্রূর আকৃতি আর চতুর ব্যবহারে সীজার মনে মনে ঘৃণা বোধ করলেন। বললেন, এক কথা শুনে বিচার হয় না। অন্য পক্ষ কোথায়?

কিন্তু অন্য পক্ষের দেখা পাওয়া গেল না। 'রাণী' ক্লিওপ্রেট্রার কোন সন্ধান নেই। টলেমিকে হাঁকিয়ে দিলেন।

পরের দিন সকালে প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে ব'সে তিনি মানচিত্র ও কাগজপত্র দেখছে সময় দ্বাররক্ষী সেনানী এসে জানালো, সিসিলি থেকে এক রাজভৃত্য তাঁর জন্যে উপঢৌকন এ সেই উপহার স্বয়ং সে সম্রাটের সামনে উপস্থিত করতে চায়।

সীজারের আদেশে সিসিলির নাগরিক তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। মাথায় প্রকাণ্ড গালিচা। নাগরিক সবিনয়ে জানালো, এমন মহামূল্য কার্পেট দুনিয়ায় বিরল, আদেশ কার্পেটখানিকে মাটিতে খুলে পেতে দিয়ে সে সম্রাটকে তার সৌন্দর্য দেখাবে।

মাথা নেড়ে সীজার বললেন, খোল তোমার গালিচা, দেখা যাক কেমন জিনিষ।

মাথার বোঝা মাটিতে নামল। তারপর এক পরমাশ্চর্য ঘটনা। কার্পেটখানা গড়িয়ে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী নারী। বিস্রস্ত বেশবাস সংব রমণী উঠে দাঁড়িয়ে সম্রাটকে অভিবাদন করল। সীজারের মুখে রা নেই। জীবনে এমন ঘটনা আর কখনো পান নি।

কী আশ্চর্য রূপের দ্যুতি তাঁর সামনে। ঘরের মধ্যে যেন হাজার তারার আলো। মু সোল্লাসে বললেন, এ-কী ব্যাপার! কে তুমি ভদ্রে?

উত্তর দিল, আমি রাণী ক্লিওপেট্রা।

রাণী ক্লিওপেট্রা! এভাবে এ অবস্থায়?

যদি অনুমতি করেন সম্রাট, আনুপূর্বিক নিবেদন করি। তবে একান্তে বলতে চাই।

অবশ্য অবশ্য। আশেপাশে যারা ছিল তাদের সবাইকে সরিয়ে দিলেন। কাছে বসালেন ক্লিওপেট্রাকে। একাগ্র হয়ে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। ক্লিওপেট্রা ধীরে বলতে লাগলেন অতীত ইতিহাস…

মিসরের রাজা ৮ম টলেমির দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান তিনি। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৮ শতকে তাঁর ভাঁরা চার ভাই বোন। মৃত্যুকালে রাজা এক অদ্ভুত উইল করে গেলেন, তাতে জানা গেল, মৃত্যুর পর তাঁর বড় মেয়ে ও বড় ছেলে এক সঙ্গে যৌথভাবে রাজ্যশাসন করবে। বড় ক্লিওপেট্রা, বড় ভাই ৭ম টলেমি, ক্লিওপেট্রার চেয়ে চার বছরের ছোট। দু'জনের মত ভিন্ন, পথ ভিন্ন তাদের জীবনসম্ভোগের দৃষ্টিভঙ্গী। অতএব বিবাদ বাধলো। চক্রান্ত ঘনিয়ে উঠল। ৭ম টলে গুপ্তচর ক্লিওপেট্রার জীবননাশের চেষ্টায় নিয়োজিত হল। প্রাণভয়ে তিনি সিরিয়ায় পালিয়ে গেলে কিন্তু দমবার মেয়ে নন ক্লিওপেট্রা। সিরিয়ায় বসে তিনি এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করলে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত, এমন সময় মহামান্য সম্রাট জুলিয়াস সীজার তাঁদের মাঝখানে পড়লেন নিজের রাজধানীতে ক্লিওপেট্রার প্রকাশ্যভাবে আসবার উপায় ছিল না, চতুর্দিকে গুপ্তচর ছুরি উঁচিয়ে আছে। তাই সম্রাটের কাছে পৌঁছাবার জন্যে তাঁকে এই উপায় অব করতে হয়েছে…

অসংখ্য যুদ্ধের মহানায়ক এতক্ষণ যেন কোন আবেশময় স্বপ্নকাহিনী শুনছিলেন, বলে বল কি, যুদ্ধ করবে তুমি, সৈন্য চালনা করবে! তোমার বয়স কত?

একুশ বছর, সম্রাট।

কিছুক্ষণ বিহ্বলনেত্রে ক্লিওপেট্রার মুখের পানে তাকিয়ে থেকে সীজার বললেন, যুদ্ধ ছ আর কি জান?

অশেষ বুদ্ধিশালিনী ক্লিওপেট্রা সম্রাটের অবস্থা বুঝে নিয়েছেন। লাস্যবিভঙ্গে মাথা হেলি বললেন, কলাবিদ্যাতেও অপারগ নই সম্রাট। নৃত্য গীত প্রমোদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেও পারি

সেই ভাল, যুদ্ধ তোমার জন্যে নয়। সে তো আমি আছি। সারা দুনিয়া তোমার পা তলায় এনে দেব। তুমি আমার আরও কাছে এসো।

পৃথিবীর ইতিহাস মোড় ঘুরে অন্য রাস্তা নিল।

ক্লিওপেট্রা। যুগ যুগ ধরে এই মিশরীয় মেয়ের নাম বিস্ময় আর কৌতূহল জাগিয়ে কবি লিখেছেন কাব্য। নাটক লিখেছেন নাট্যকার। শাস্তমরী ছলনাময়ী ক্লিওপেট্রা। অসমসাহসি ক্লিওপেট্রা। বীরাঙ্গনা ক্লিওপেট্রা। প্রেমিকা ক্লিওপেট্রা। "নাইল নদীর নাগিনী" ক্লিওপেট্রা।

কিন্তু মিথ্যা ছিল না তাঁর প্রেম। সীজারকে তিনি ভালবেসেছিলেন। যদিও উচ্চাশা মনে, ছিল ক্ষমতা ঐশ্বর্য আর বিলাসব্যসনের প্রতি দুর্নিবার মোহ, তাহলেও তাঁর হৃদয় পত্তন উপরে ছিল তাঁর নারীত্ব আর মাতৃত্ব। কিন্তু বারংবার ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তিনি রক্ত হয়ে বঞ্চিত হয়েছেন, নিষ্ফল হতাশায় আর্তনাদ করেছেন।

জুলিয়াস সীজার রণসজ্জা পরিত্যাগ ক'রে প্রেমিকের বেশ ধারণ করলেন। বহু মাস অতি করলেন আলেকজান্দ্রিয়ার, লাস্যলীলায় আর বিলাসব্যসনের মধ্যে ক্লিওপেট্রা তাঁকে আচ্ছন্ন রাখলেন। বিয়াহ হয়েছিল। যাকে বলে গন্ধর্ব বিবাহ। পুত্র হল। ক্লিওপেট্রার আশা অ স্পর্শ করল যেন। আলেকজান্দ্রিয়ার রাণী। এবার হবেন রোমের সম্রাজ্ঞী। তারপর সারা পৃ অধীশ্বরী। এবং ভবিষ্যতে রাজমাতা।

অবশেষে সীজারের ঘোর কাটল। আবার দেশজয়ে বেরুলেন। তারপর ফিরলেন পথে। ক্লিওপেট্রাকে বলে গেলেন, কিছুদিনের মধ্যেই ক্লিওপেট্রা যেন রোমে চলে আ সেখানে যে বিরাট বিজয়োৎসব হবে তাতে তিনি উপস্থিত থাকবেন সীজারের পাশে।

অধীর আগ্রহে শিশুপুত্রকে নিয়ে ক্লিওপেট্রা কয়েকদিনের মধ্যেই রোমে গিয়ে উপস্থিত হ সীজারের সম্মানে বিজয়োৎসব সুরু হয়ে গেছে। রাজধানী উৎসবে মত্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁর কোথায় সেই সম্মান, কোথায় সেই আতিথেয়তা? সম্রাট তো নয়ই, তাঁর কোন পদস্থ প্রতি নয়, সামান্য একজন সেনানী তাঁকে নিয়ে গেল সহরের প্রান্তে, সম্রাটের এক বাসস্থান তাঁকে পৌঁছে দিয়ে জানালে, এইখানে ক্লিওপেট্রা থাকবেন। মন্ত্রীপরিষদ এই ব্যবস্থাই দিয়েছেন।

স্তম্ভিত হলেন ক্লিওপেট্রা। কিন্তু কোন উপায়ও পেলেন না। বুঝলেন, হাওয়া বইছে দিকে। খবর পেলেন, রোমের নাগরিকগণ তাঁকে অবাঞ্ছিত অতিথি বলে মনে করছে নামে যা তা কুৎসা রটনা করছে, এমন কি এই ব্যাপার নিয়ে তারা সম্রাটের বিরুদ্ধেও বি জানিয়েছে।

তারপরেই হঠাৎ যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত। প্রকাশ্য সভাস্থলে বিশ্বজয়ী সম্রাট দুর্ধর্ষ জুলিয়াস সীজার চক্রান্তকারীদের হাতে প্রাণ হারালেন।

দু'চোখে অন্ধকার দেখলেন ক্লিওপেট্রা। এখন তিনি কি করবেন? কোথায় য শিশুপুত্রের প্রাণের আশঙ্কায় বিমূঢ় হলেন। সহসা ভাগ্যের এ কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

সীজারের বন্ধু ছিলেন মার্ক অ্যান্টনি। সেনানায়ক। পরিষদের অন্যতম সদস্য। সীজার হত্যার চক্রান্তের মধ্যে ছিলেন না। জানা যায় সীজারের হত্যার প্রতিশোধ নেবার তিনি জনগণকে রীতিমতো ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন কিছুদিন।

মার্ক অ্যান্টনির সঙ্গে ক্লিওপেট্রার সাক্ষাৎ হল। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। প্রথমবার দেখা হ

এন্টনি আলেকজান্দ্রিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। ক্লিওপেট্রার বয়স তখন চৌদ্দ। উদ্ভিন্নযৌবনা সে কিশোরীর রূপের ছটা দেখে বিমোহিত হয়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয়বার যখন দেখলেন তা যৌবনভারাবনত সেই লীলাময়ী রমণীর দেহে রূপের ভরা জোয়ারের পূর্ণতা, দুই চোখের কোণে বিদ্যুৎবা কথার সুরে বীণার ঝঙ্কার। এ সেই নারী মুনিগণ আজীবনের তপস্যার ফল যার পায়ে উৎ করে দেয়, যার কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন চাঞ্চল্যে মেতে ওঠে।

মার্ক এন্টনি মোহাবিষ্ট হলেন। ধরা দিলেন নিজেকে। ধরা পেলেন অবশ্যই। ক্লিওপে দ্বিতীয় প্রেম—মার্ক অ্যান্টনি।

এন্টনি ক্লিওপেট্রাকে আশা দিলেন, সাহস দিলেন। বললেন, এখন ক্লিওপেট্রা ফিরে যাক নিজে রাজ্যে। এন্টনি রোম সিংহাসনের দাবিদার সীজারের ভ্রাতুষ্পুত্র অকটেভিয়ানের সঙ্গে আপোষ ক করে আবার নীলই তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন।

কিছুদিন এন্টনির সঙ্গে বসবাসের পর ক্লিওপেট্রা নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন। দিন যা কিন্তু এন্টনির কোন সংবাদ নেই। ক্লিওপেট্রা নিজের সাধ্যমত অকটেভিয়ানের সঙ্গে লড়াই করব জন্যে নৌবহর প্রস্তুত করেছিলেন, কিন্তু এন্টনির সাহায্য ছাড়া তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করবার সা পাচ্ছিলেন না।

অবশেষে সংবাদ এলো, টার্সাস থেকে এন্টনি খবর পাঠিয়েছেন। ক্লিওপেট্রা সেখানে গিয়ে ত সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন, যুদ্ধযাত্রার পরিকল্পনা সেইখানেই আলোচিত হবে।

ক্রোধে ক্ষোভে জ্বলতে লাগলেন ক্লিওপেট্রা। কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে। তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি আর প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না।

বজরার বহর সাজিয়ে ক্লিওপেট্রা যাত্রা করলেন। সে কী আড়ম্বর! বিলাসোপকরণের সে উচ্ছল প্রাচুর্য! নিজের বৈভব আর প্রাবাস্য দেখিয়ে এন্টনি অভিভূত করে দেবেন, এই ছিল ক্লিওপেট্র অভিপ্রায়।

বজরা তীরে ভিড়ল। এন্টনির দূত এসে জানাল তার প্রভু নডারের গৌরভবনে তাঁকে সম্বধ জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছেন। উত্তরে ক্লিওপেট্রা জানালেন, তাঁকে তাঁর অমাত্যবর্গ নিয়ে বজর এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন মিসরের রাণী।

দূত চলে গেল। তারপর এলেন মার্ক এন্টনি সদলবলে। বজরার শোভা দেখে তাঁদের চ বিস্ফারিত হল। সুসজ্জিতা তরুণীর দল তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল। বজরার প্রধ প্রকোষ্ঠে রাণী সুবর্ণখচিত আসনে বসে আছেন। মাথার উপর সোনার চাঁদোয়া। চারিদিকে রেশমে আচ্ছাদন। মীনকেতনের রূপ ধারণ করে তাঁর দু'পাশে দুই বালক বাঁশীতে নরম সুর বাজাচ্ছে। মিসরী ধূপধুনোর উগ্র মদির গন্ধে জলস্থল আমোদিত মন্থর।

অতিথিরা আহারের সময় এসেছেন। অতএব আগে তাঁরা আহার করে নিন। কথাবার্তা পা

হবে। পাশের বজরায় আহারের ব্যবস্থা। সেই বজরায় উঠে যে পথ বেয়ে তাঁরা ভোজন-প্র ঢুকলেন সেই পথ টাটকা ফুলের স্তবকে আচ্ছাদিত করা হয়েছে, চলতে চলতে অতিথিদের পা সেই আস্তরণের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। ঝাড়বাতির নানা রঙের আলোর ঝাড় ফুলছে চারিদিকে। হ কারুখচিত গদির আসন পাতা হয়েছে অতিথিদের জন্যে, আহার্য সাজানো হয়েছে মণিমুক্তাখচি পাত্রে। আয়োজন দেখে স্তম্ভিত হলেন অতিথিরা। উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় আর স্তবগানে মুখর মার্ক এন্টনি।

দ্বিতীয়বার প্রণয়লীলায় রাণী ক্লিওপেট্রা তাঁর চরণে আহুতি নিবেদন করলেন। যাকে ভালব তাঁকে অদেয় রইল না কিছুই। বিবাহের মতো একটা অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হল। এন্টনি তাঁকে কথা যেমন করে হোক ক্লিওপেট্রার পুত্র সীজেরিয়নকে তিনি রোমের সিংহাসনে বসাবেন। ভাগ্যদেব অলক্ষ্যে হাসলেন আর একবার।

যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে লাগল। কিন্তু কোথায় সেই শৌর্য, সেই বীর্য, মার্ক এন্টনি বিলাসের গা ভাসিয়ে দিয়ে যেন হারিয়ে ফেলেছেন নিজেকে।

দুঃসংবাদ। প্রথম যুদ্ধে তাঁদের হার হয়েছে। অকটেভিয়ান এগিয়ে আসছেন। এন্টনি ঘুমি কাটল। রণাঙ্গন অভিমুখে রওনা হলেন তিনি। উভয়ের মধ্যে পরামর্শ করে স্থির হল, ক্লি তাঁর নিজস্ব নৌবহর নিয়ে আপাতত মিসরে ফিরে যান, সময় মতো এন্টনি তাঁকে আবার করবেন।

অনন্যোপায় হয়ে ক্লিওপেট্রা তাই করলেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখলেন, এন্টনিও তাঁকে করেছেন। এক রণতরীতে দু'জনে মিলিত হলেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছলেন।

আবার যুদ্ধের আয়োজন চলতে লাগল। সংবাদ এলো সসৈন্যে অকটেভিয়ান আলেকজ উত্তরপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর অপেক্ষা করার সময় নেই। মার্ক এন্টনি তাঁর সমস্ত নিয়ে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ক্লিওপেট্রা বুঝলেন, বিনা পরিকল্পনায় এলোমেলোভ চালনার ফল কোনদিনই ভাল হয় না, এক্ষেত্রেও হবে না। তিনি রাজধানীর অন্য প্রান্তে যে মন্দি করেছিলেন সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

যুদ্ধে মার্ক এন্টনি হেরে গেলেন। তাঁর সৈন্যদামন্ত নিঃশেষে বিধ্বস্ত হল। বিজয়ী অকটে রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। এই সময় একজন সহচর এসে মার্ক এন্টনিকে খবর দিলে ক্লিওপেট্রা মন্দিরে গিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তবে আর কেন? ভাবলেন এন্টনি। এ দেহ শত্রু হবার আগে তিনি নিজেই নষ্ট করবেন। তরবারি উন্মুক্ত করে মুহূর্তে তা ঢুকিয়ে দিলেন নিজের রক্তাপ্লুত দেহে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

সাধের শেষালেন ক্লিওপেট্রা। বুঝলেন, সব আশার শেষ হল এতদিনে। শেষ সময়ের জন্য প্রস্তুত হলেন। স্নান করলেন, তারপর মহামূল্য সুগন্ধিসার ছড়িয়ে নিলেন সারা অঙ্গে। রাজীর বেশ পরিধান করে পরিচারিকাকে আদেশ জানাতে বললেন। তারপর তৃপ্তির সঙ্গে আহারে সমাধা করে একাকিনী শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে সোনার পালঙ্কে দেহ এলিয়ে দিলেন। হাতে ছিল ছোট এক মুক্তাখচিত কৌটা, বুকের উপর কৌটাটি স্থাপন করে তার ঢাকনা খুললেন। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল নীলাভ একটি মক্ষিকা, তার পাখার গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল। তারপর সেই মহাবিষধর মক্ষিকা তাঁর অনাবৃত বুকের উপর বসে তার বিষাক্ত হুল ফুটিয়ে দিল, দেখতে দেখতে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হলেন ক্লিওপেট্রা সে তন্দ্রা আর ভাঙল না।

মৃত্যুর পূর্বে ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী বিজয়ী অক্টেভিয়ানের কাছে দুটি প্রার্থনা পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পুত্রটিকে যেন হত্যা করা না হয়, এবং তাঁকে যেন মার্ক এন্টনির সঙ্গে একই কবরে সমাধিস্থ করা হয়।

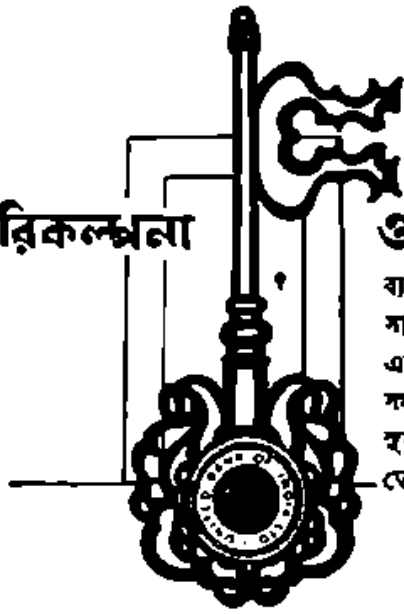

পরিকল্পনা ও সমৃদ্ধির সোনার কাঠি

ব্যক্তির কল্যাণ ও জাতীয় সমৃদ্ধি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এই কল্যাণ বা সমৃদ্ধি সাধন একমাত্র পরিকল্পনানুযায়ী প্রচেষ্টার দ্বারাই স্বল্পকালে সম্ভবপর। এবং পরিকল্পনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে জাতীয় তথা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর।

সুসংগঠিত ব্যাঙ্কের মারফত সঞ্চয় যেমন ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তা দূর করে, তেমনি জাতীয় পরিকল্পনারও রসদ যোগায়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ভারতের সর্বত্র ব্যাঙ্ক অফিস এবং পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে করেস্পণ্ডেণ্ট মারফত

আপনার ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার গ্রহণে আগ্রহী

ঝড়

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

জানলা দিয়ে তোর মনের আকাশটা আসছে আর ঝড়ের শব্দ। শুয়ে শুয়ে ঝড় দেখতে পাই জানলার বাইরে গাছগুলি বড়ই লম্বা লম্বা আর ফুলের চারাগুলি খুবই ছোট। তাই ওরা বি বেঁকে যায়, মাথা নোয়ায়, ডালগুলি ভেঙে দুচড়ে যেতে থাকে, তা এই বিছানা থেকে আমার চোখে না। ঝড় আমাকে দেখা দেয় না, শুধু শব্দ শোনায়।

জানলা দেওয়ার জন্যে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা। বাইরে দিলে। থাক না খানিকক্ষণ খোলা।

তাই কি হয় তোর সব ভিজে গেল যে।

'কিছুই ভেজেনি মা, আমি যে শুকনো সেই শুকনোই আছি।'

'হ্যাঁ, শুকনো না আরো কিছু। বৃষ্টির ছাট এসে সব ভিজিয়ে দিয়েছে। এরা সব গেল কে কী যে আক্কেল এদের!'

'দুটি জানলাই বন্ধ করে দিলে মা।'

'দেব না, তোর ঠাণ্ডা লাগবে যে! একটু কিছু খা এখন। এক কাপ দুধই না হয় খা।'

'না।'

'আঙুর আনিয়ে রেখেছি, খাবি গোটাকয়েক?'

'না মা।'

'তোর কেবল না আর না। না খেলে শরীর সারবে কী করে বল তো?'

'আমার না খেয়ে খেয়েই সারবে।'

'তোমার বাপু কেবল জেদ আর জেদ। কাউকে ডেকে দিয়ে যাব? বিনু, অনু, জয়ন্তী সবে গল্প করবি?'

'না মা।'

'আমিও যে তোমার কাছে একটু বসব তার জো নেই। বিনুর ছেলে দুটি এমন হয়েছে আমার ছাড়া খাবে না। কী যে মতলবে।'

'তুমি ওদের খাইয়ে দিয়ে এসো মা। তোমাকে এখন আর এখানে বসতে হবে না।'

'রেডিও খুলে দিয়ে যাব?'

'না।'

'বইটই পড়বি একখানা? দিয়ে যাব?'

'না।'

'একেবারে কিছু যদি না নিয়ে থাকিস তাহলে তো শুয়ে শুয়ে শুধু রাতের ভাবনা ভাববি।'

'তুমি ভেব না মা, আমি কিছু ভাবব না। তুমি যাও ওদের বাইরে এসো। আমি ততক্ষণ শুয়ে বইয়ের পদ্য শুনি।'

তুমি কী রকম রাগ করে চলে গেলে। আমি রাগ করলে তুমি আর আজকাল হাস না কিন্তু তে রাগ দেখলে আমার মাঝে মাঝে বড় হাসি পায় মা। তুমি এইটুকুতেই রেগে অস্থির? আর আমি যে সাত বছর শুয়ে আছি, আমি রাগ করব কার ওপর? ভাগ্যের ওপর? ছি ছি ছি, ভাগ্য কথাটা মনে উচ্চারণ করতেও যে লজ্জা হয়। আমার মত একুশ বছরের লেখাপড়া জানা মেয়ে কি ভাগ্য মানে? ব না দুর্ঘটনা। আমি কি দুর্ঘটনার ওপর রাগ করব? কয়েকদিনের জন্যে অজ্ঞান হয়ে রইলাম তারপর ক আস্তে আমার সব শরীর অবশ হয়ে গেল। একটা দুর্ঘটনা। না কার অ্যাকসিডেন্ট নয়, ট্রেন অ্যাকসি নয়, প্লেন ক্রাস নয়, শুধু সব ভেঙে-চুরে চুরমার হয়ে যাওয়া। এও এক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা বড় খটো শব্দ। আমি যদি কবিতা লিখতাম, আগে লিখতাম—সেই সাতবছর আগে। দুটো খাতা ভরে ফেলেছিল এখন আর পারিনে—কলম ধরতেই পারিনে। আর তাই চিঠি লিখতে পারিনে, নিজের হাতে তা লিখতে পারিনে। আমার লেখাই এখন মনে মনে লেখা, মনে মনে লেখা আর মনে মনে মুছে যে না মুছে ফেলবার দরকার হয় না। আপনিই মুছে যায়। আকাশের মেঘের মত। মেঘে মেঘে কত কত দুঃখ কত সাগর কত পর্বত। তারপর সব অন্ধকার। কালো শ্লেটের মত, দিদিমণিরা আসবার আ হাইস্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডের মত। তখন কত কবিতা লিখেছি। স্কুলে থাকতে। অবশ্য খুবই কাঁ এখন লিখলে আর অমন কাঁচা কবিতা লিখতাম না, কুকুর নিয়ে বিড়াল নিয়ে ফুল নিয়ে বড় দিদিমা নিয়ে ছড়া লিখতাম না। এখন লিখলে কী লিখতাম। যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যে দুর্ঘটনা ঘটে যা তাই নিয়ে লিখতাম। কিন্তু দুর্ঘটনা কথাটা বসাতাম না। বড় শ্রুতিকটু। তার চেয়ে ভাগ্য এখন দুর্ভাগ্য ভালো। হোক সেকেলে। কিন্তু মানে তো একই। আর কানে তো ভালো শোনায়। ব কি আমার দুর্ভাগ্যের ওপর রাগ করব? যাকে আমি ধরতে পারিনে, ছুঁতে পারিনে, আঁচড়াতে কামড় পারিনে, তার ওপর রাগ করে কী লাভ? আমি কি ডাক্তারদের ওপর রাগ করব? তাঁরা কি চিকিৎসা করেছিলেন? কিন্তু বাবারা তো বেছে বেছে এই শহরের সবচেয়ে ভালো ডাক্তারই এনেছিলে শুরুতেই বড় ডাক্তার এনেছিলেন। বাবারা তো কোন কৃপণতা করেননি। এই সাত বছর ধরে আমার চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। যাঁরা ডাক্তার বদলাচ্ছেন, ডাক্তাররা শুধু বদলাচ্ছেন, চিকিৎ যাঁরা বদলাচ্ছেন। আমিই শুধু বদলাচ্ছি না। আমি তাহলে রাগ করব কার ওপর? বাবাদের ওপর তাঁরা খুব ভালো। মার ওপর না। মা খুব ভালো। তবে কি ডাক্তারদের ওপর? তাঁরা কেন করলেন? অবশ্য ভুল করেছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু ভুল যদি না করে থাকেন আমার ব সারছে না কেন। তাহলে স্বীকার করুন আপনাদের ক্ষমতা নেই। তাই আমার রোগ যতদিন ব আমার চিকিৎসাও ততদিন আছে। ভাবতে মজা লাগে না—আমি যেন এক বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র। একা

রোগ-সৈন্য আর একদিকে ডাক্তারদের দল। তাঁদের হাতে আধুনিক সব মারণাস্ত্র। আটম বম, হাইড্রো বম। আমার রোগকে ওঁরা বলছেন পলিনিউরেলজেরিয়া। বাব্বা, কি লম্বা নাম। আমার রোগও ত মত মেয়ে। স্ত্রীলিঙ্গ। ও আমার সর্বাঙ্গে ঘুণ্টুতে ঘুণ্টুতে মিশে রয়েছে। ও আমাকে ভালোবেসে আমাকে ছেড়ে নড়তে চায় না। সতীনের ভালোবাসা। সতীন, কী বিশ্রী কথা। ঠাকুরমার মুখে শু তাঁদের আমলে সতীন থাকত যার আমলে নেই। বাবা মা ছাড়া আর কোন মেয়েকে ভালোবাসতে বউদিদের আমলেও ও-আপদ ঢুকে গেছে। বউদিদের সতীন নেই। কোনদিন সতীন হতেও পারে আইন তাদের পথ আটকে রাখবে। কিন্তু বান্ধবীদের পথ আটকাতে পারবে না। বড়দার বান্ধবীদের বড়বউদির মুখ কী রকম ভার হয়ে যায়। চোখের ভাব অন্য রকম হয়। আমি সব দেখতে পাই, সব আমাদের দেখতে সবাই তো আসেন। তাঁরা আমাকে দেখেন, আমি তাঁদের দেখি। ছোড়দা ভারি চা কোন মেয়ে বন্ধুকে পারতপক্ষে বাড়িতে আনে না। বাইরে বাইরে ঘোরে। ছোটবউদির রাগটা তাই বগড়াটাও চাপা। স্বামীর বান্ধবীরা আজকাল স্ত্রীর আধা সতীন। আধা না পোয়া সিকি সতীন। সে ভয় নেই। আমার সিকিও নেই, দু-আনিও নেই। ছটাকও নেই, কাঁচ্চাও নেই। বন্ধু থাকলে যে আর এক বান্ধবীর ভয়? স্বামী থাকলে তো তার ভালোবাসা নিয়ে ভাগাভাগি। আমার ছেলে বন্ধু নেই। বন্ধুরাই বা কোথায়। পর্ণার বিয়ে হয়ে গেছে। বরুণা এম. এ. পড়ে। কিন্তু আমার আর খোঁজ নে তার এখন কত বন্ধু। বোধহয় ছেলে বন্ধুই বেশি। পাড়ার ছেলেরা আমারই কম বন্ধু হতে চে তখনো আমি ফ্রক ছাড়িনি। মাঝে মাঝে শুধু শখ করে শাড়ি পরি। সেই তখন থেকেই। কত ভা ভাব জমাতে চাইত। আমি তখনই কিছু কিছু বুঝতে পারতাম। এখন আরো ভালো করে বুঝতে এখন আর কেউ আসে না। না এলো। তাদের কারো ওপর আমার রাগ নেই। এই সাত বছরে সবাইকে ভুলেছি। তাদের ওপর আমার রাগ নেই, ডাক্তারদের ওপর রাগ নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে রাগ করতে ইচ্ছে করে। বুঝতে পারিনে কার ওপর রাগ করব। অদৃষ্টের ওপর রাগ করাই ভ কিন্তু অদৃষ্ট কথাটা উচ্চারণ করতে লজ্জা হয়। বড় সেকেলে কথা। আমি সেকেলে হতে চ তাছাড়া যাকে দেখতে পাইনে ধরতে ছুঁতে পাইনে বুঝতে পর্যন্ত পারিনে তার ওপর রাগ করা সমান কথা। তাই যাদের দেখি তাদের সবাইর ওপর মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর রাগ হয়। ইচ্ছে হয় সবাইকে তুলো কুটোর মত কুটি কুটি করি, দাঁত দিয়ে কামড়াই, নখের আঁচড়ে রক্ত বের করে সবাইকে শেষ করি। আমার এই অবস্থার জন্যে কাউকেই আদালতে দায়ী করতে পারিনে, তাই সবা আসামী সাব্যস্ত করি।

'ওরা, একেবারে চুপচাপ শুয়ে আছ যে।'

'চুপচাপ থাকবো না তো কী করবো ছোটবউদি।'

'তা ঠিক। তোমার এখন চুপ করে থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'তোমার যেমন চেঁচামেচি করা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে ছোটবউদি।

'কী করব ভাই, মেয়েটা বড় জ্বালায়। দিদির ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি লেগেই আ ছেলেমেয়ের কী যে জ্বালা তা তো আর বুঝলে না। মেয়েটা ছিঁচকাঁদুনে হয়েছে বলে তোমার ব কী রাগ।'

ছোটবউদি কী চালাক তুমি। সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ঘুরিয়ে নিলে। ভেবেছ ছেলেমেয়ের তোলায় আমি মনে দুঃখ পেয়েছি। আমি যদি ভালো থাকতাম, তোমাদের মত এত তাড়াতাড়ি বিয়ে কা কিনা। এম. এ. পড়তাম। পাস করতাম—প্রফেসরি করতাম। তারপর যা হবার হত। বিয়ে হলেও তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়ে হতে দিতাম কিনা।

'জানো শুক্লা, খালি কি মেয়ের ওপর রাগ। আমাকেও আজকাল ছুচোখ পেতে দেখতে পারে কেবল বলে মোটা হয়ে যাচ্ছ। আমি মোটা হচ্ছি আর তুমি পাল্লা দিয়ে রোগা হচ্ছ শুক্লা। ভালো খাওনা-দাওনা, হবে না এমন? আমার ইচ্ছে করে কি জানো? আমার গায়ের মাংস কেটে কেটে তে হাতে পায়ে লাগিয়ে দিই। তাতে যদি তোমার শরীর সারে।'

'খবরদার ছোটবউদি, অমন কাজও করতে যেয়ো না। অনর্থক ছোড়দার শরীর থেকে রক্তপাত হ

'কেন তার রক্তপাত হবে কেন?'

'বাঃ রে, তোমরা যে অর্ধাঙ্গী। তিনি তোমার অর্ধাঙ্গ। তুমি তাঁর অর্ধাঙ্গিনী। একজনের কাটলে আর একজনের দেহে প্রাণ থাকবে নাকি? তুমি বলছিলে তোমাকে দেখতে পারে না। এবার দ্যারেঙ্গ অ্যানিভারসারিতে গোপনে গোপনে কত টাকা দামের শাড়ি এসেছে শুনি? পঁচিশ না তিরিশ? বুঝি দেখতে না পারার নমুনা?'

'আহা শাড়িই বুঝি সব! এসো শুক্লা, তোমার চুল বেঁধে দিই। বাব্বা, কী চুলই না তোমার যা চুলের অরণ্য। তুমি যখন ভালো হয়ে উঠবে কবজনে এই চুল নিয়ে কবিতা লিখবে। কতজনের ইচ্ছে ওই রাশ রাশ চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকতে।'

'থাক বউদি, একসঙ্গে অতগুলি লোক যদি আমার চুলের মুঠি এসে ধরে আমার ঘ টাক পড়ে যাবে।'

'চুলের যত্ন না করলে এমনিই টাক পড়বে। এসো তোমার চুল বেঁধে দিয়ে যাই।'

'না বউদি, এখন না। এখন থাক। তোমার পায়ে পড়ি, একটু বোসো। ঝড়টা থামুক তার পরে

'ওমা, ঝড়ে তোমার কী করবে। তোমার দাদারা বাইরে—বোধ হয় এই ঝড়বৃষ্টির জন্যেই ও আজ দেরি হয়ে যাবে। তোমার চুলটা বেঁধে দিয়েই যাই। মা বললেন, আমার এখনো সব কাজ পড়ে আ ঘর ঝাঁট দিতে হবে, বিছানা পাততে হবে।'

'আঃ, যাও বলছি। যাও এখান থেকে। আমার জন্যে তোমাদের কারো কিছু করতে হবে না।

'রাগ কোরো না শুক্লা, রাগ করলে তোমার শরীর আরো খারাপ হবে। কী লক্ষ্মী মেয়ে তু সবাই বলে এতদিন ধরে ভুগছে তবু কী শান্ত সেবাজ। কী মিষ্টি কথা, আর কী সুন্দর মুখ। বাড়ির

তুমি সবচেয়ে সুন্দরী শুভা। এত রূপ আর কারো নেই। মুখখানা ঠিক একেবারে ফুটন্ত পদ্মফুলের ঠিক তেমনি হচ।'

'পদ্মফুলের মত মুখ। আর দেহটা ঠিক তার ডাঁটার মত না বউদি? যাও, তুমি তোমার পেতে এসো। তারপর আমি চুল বাঁধব। বড় খামুক—তারপর।'

ছোটবউদি চলে গেল। বিয়ের আগে আমি ওকে জয়ন্তীদি বলে ডাকতাম। খুব ভালো আমার কত মুখঝামটা সহ্য করে। ছোটবউদি আমার বন্ধু, আমার সখী। আমি সীতা ও সরমা। সীতা কিন্তু আমার রাম নেই। সীতাকে রাবণ রামের কাছ থেকে চুরি করে এনেছিল। আর রাবণ আমাকে আগে থেকেই দশ হাতে আগলে রেখেছে পাছে রাম আসে। বউদি বিছানা গেল। বিছানা পাতায় ওদের কী আনন্দ! ওদের বিছানা শুধু ঘুমোবার জন্যে আর আমার বিছানা সব সময়ের জন্যে। বিছানা আমার কাছে বিষ। আমি আর পারিনে। আর জেগে জেগে এম শুয়ে থাকতে পারিনে। তবু কত যত্ন করে এই বিছানা আমার মা রোজ দুবার করে পেতে দিয়ে কোন কোন দিন তিনবারও পাতেন। সব সময় তো কাছে থাকতে পারেন না। যেন নিজের কে সব সময়ের জন্যে পেতে রেখে যান। আমার মা সাদা থান পরেন। আমার বিছানার রং সাদা। বিছানা আমার মায়ের কোল। আর বউদির বিছানা তার স্বামীর কোল। আমি কী করে জা আমি সব জানি। সব জানি। আমার দেহটা থেমে আছে মন তো আর থেমে নেই। সে অনেক অনেক—অনেক। বড়দা বলেন অমুখে তোর কিন্তু একটা মস্ত লাভ হয়েছে শুকু। বাংলা ইংরেজী নাটক উপন্যাস কিছুই আর বাকী রাখিসনি। সাতটা বছরে তুই সাতটা এম. এ. পাস করেছিস আমার তো একখানা বই ছুঁয়ে দেখবারও সময় নেই। অর-আরি না হলে কোন একখানা বই পারিনে। বড়দা মেজদা আপনারা ইঞ্জিনিয়ার। আপনাদের নিজেদের কর্ম আছে হেয়ার স্ট্রীটে। ব্যস্ত। আপনাদের বই পড়বার সময় কোথায়। দরকারই বা কি। কিন্তু আমার তো না পড়ে উপা বই আমার সঙ্গী। অবশ্য বড়দা যত বাড়িয়ে বলেন তত নয়। তত আমি পড়িনি। প্রথম প্রথম পড়তে তো ভয়ই হত। ভয়ের চেয়ে বেশী হত লজ্জা। সবাই ঠাট্টা করবে। লুকিয়ে লুকিয়ে আর বিদেশী ভাষা তার সমস্ত রস আর রহস্য আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখত। দুজনে মিলে লু খেলা। আমি তাকে ছুঁতে যাই আর সে পালায়। ছেলেবেলায় কত খেলেছি উঠোনে, পার্কে, বি পার্টিতে গিয়ে। বন্ধুরা আমার চোখ বেঁধে দিত। আমি ঠিক আন্দাজে আন্দাজে বের করে দি আমার মাথায় টোকা দিয়েছে, কে আমার বিনুনী ধরে টান দিয়ে গেল। আমার আন্দাজে সবচেয়ে ছিল। পর্ণা বলত শুকু তুই একটা কুকুর! কুকুরের মত তোর শুঁকবার শক্তি। বই পড়ার বেলায় আন্দাজে আন্দাজে এগিয়েছি। চোখে রুমাল বাঁধা। দেখতে পাইনে কিছু। একবার তো মল্লিক বাগানের দেয়ালে আমার মাথা ঠুকে গেল। ইংরেজী বই পড়তে গিয়েও কতবার যে আমার মাথা তার ঠিক নেই। ডিকসনারি দেখে দেখে পড়েছি। কিন্তু ডিকসনারি হল মূর্তিমান রসভঙ্গ। না ে

চলে না, আবার দেখতে গেলে ধৈর্য থাকে না। তারপর আমার চোখের রুমাল খুলে গেল। দেখি সাম এক বিরাট বেয়াদব। মাথা ঠুকতে ঠুকতে অনেক ফোকর বেরোল। অনেক জানলা। জানলা ব দরজা। হাজার দরজা। সব খোলেনি। আস্তে আস্তে খুলছে। বিশ্ব সাহিত্যের দোরগুলি আস্তে আ খুলছে। আমি যখন ভালো হয়ে উঠব তখনও দোরগুলি বন্ধ হবে না। কিন্তু আমার জানলা দুটি এখ বন্ধ। বৃষ্টি কি এখনো থামেনি? ঝড় কি এখনো থামেনি? এখনো তার শোসানি আর ফোঁসফোঁস সমানে চলেছে।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং।

আবার কার ফোন এল।

বিছানার কাছেই ফোন। ইচ্ছা করলেই ফোনটা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারিনে। কিন্তু বাজনা শুন ভালো লাগে। যিনি ফোন করছেন তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে ভালো লাগে? কে ফোন করছে? বি নন তো? এই ঝড়ের মধ্যে কি আমাকে মনে করেছে? কে আমাকে ফোনে ধরতে চাইছে? কে কে? কে? কড়া নাড়ার শব্দ শুনলে আমি বুঝতে পারি কে। পায়ের শব্দ শুনলে চিনতে পারি আসছে। কিন্তু ফোনের বাজনা সব এক রকম।

'হালো, কে আপনি? ও: ডক্টর দত্ত? আসতে পারবেন না? না না, এই ওয়েদারে কী ব বেরোবেন? না, আজ এসে আপনার দরকার নেই। আপনি পরশুই আসুন। আমি ভালো আ বেশ আছি। ঠিক আছে। একদিন ম্যাসাজ বাদ গেলে আমার কিছু হবে না।'

ওঁর কি আর একটু কথা বলবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছা করছে না। আ ছেড়ে দিলাম।

ডাক্তার। ডাক্তার ছাড়া আমাকে আর কে ফোন করবে; উনি আসতে চেয়েছিলেন। আ বারণ করে দিলাম। কী আর হবে ম্যাসেজ করে? একদিন বাদ গেলে কোন ক্ষতি হবে না। আজ ি বছর ধরে উনি চিকিৎসা করছেন। তারি তো লাভ হল। ডক্টর দত্ত কিন্তু ভালো লোক—ভদ্রলোক। সময় আমাকে ভরসা যেন তুমি হারিয়ে—সেরে উঠবে। সারি আর না সারি সেরে ওঠার কথা শুনতে ভালো লাগে। উনি সপ্তাহে তিনদিন আসেন। শুধু কাজ সেরেই চলে যান না। কাজের পর বসে ব গল্প করেন। অথচ ওঁর আরো কত কাজ পড়ে থাকে, আমার মত ওঁর আরো কত পেসেন্ট। ওঁর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে না যেত, ওঁর ঘরে যদি বউ আর চারটি ছেলেমেয়ে না থাকত, আমি ভাবতে পারতাম উ আমার প্রেমে পড়েছেন। দূর। উনি পড়লেই বা কি! আমি পড়তাম নাকি। ডক্টর আর নার্সের প্রে গল্প পড়েছি। পেসেন্ট আর নার্সের প্রেমের গল্প পড়েছি। পেসেন্ট আর ডাক্তারের—। না মনে পড় না। বাজে কথা। লেখকদের মত সব বানানো কথা। যতক্ষণ আমি রোগিণী আমার প্রেমে শুধু রো পড়বে আর কেউ না। পেসেন্টকে যে ভালোবাসা তার মধ্যে শুধু স্নেহ সহানুভূতি আর অনুকম্পা। ে মধ্যে প্যাসন নেই। আমি চাইনে তোমাদের স্নেহ, চাইনে তোমাদের সিম্প্যাথি। সিম্প্যাথির ও

পরম আপনার আমার। ডাক্তার ছাড়া আমাকে কি করে ভালোবাসবেন? তিনি সবই দেখে ম্যাসাজের সময় সবই দেখতে দিতে হয়। অবশ্য মা সামনে থাকেন। মা আমার নার্স। অ ধাত্রী, আমার ধরণী। আমার সব অঙ্গ আমার মা দেখেন, আমি দেখি আর ডাক্তার দেখেন। কেউ না—আর কেউ না। ডাক্তারই একমাত্র ভাগ্যবান পুরুষ, দুর্ভাগাবান পুরুষ যিনি আমার কু দেখেছেন। দেখুন। ওঁর কাছে আমার আর লজ্জা নেই। ডাক্তারকে সব দেখাতেও হয়, ডাক্তারকে শোনাতেও হয়। শুধু মন না খুললেও চলে। তিনি চাদর উল্টে আমার শরীরের সব দেখতে পান, মনকে তো দেখতে পান না। আমি তাকে চাদরের পর চাদর চাপিয়ে ঢেকে রেখেছি। আর আদরে আদর। আমি নিজেই আমার মনকে আদর করি। আমার যে সুন্দর সবল মন অতিকা অসুস্থ দেহের মধ্যে বাস করছে তার দুঃখ আমি ছাড়া আর কে বুঝবে? ডাক্তার কতটুকু বুঝতে পা বুঝতে পারুন আর নাই পারুন ওঁর সহানুভূতি আছে। উনি আমাকে ধরে ধরে হাঁটান, ওঠ-বস ক তারপর নিজে ওই চেয়ারটায় বসে বসে গল্প করেন। প্রেমের গল্প নয়, ধরকন্নার গল্প নয়। সেস নভেলেই পড়ি। ওই বুড়ো মানুষের মুখে সে গল্প আর কী শুনব। উনি শিকারের গল্প বলেন, মাছ গল্প বলেন। মাছ ধরার ওঁর খুব শখ। জলের জন্তু আর ডাঙার জন্তু শিকার করতে গিয়ে কবে কোন পড়েছিলেন আর বুদ্ধির জোরে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন—সেইসব গল্প। মাঝে মাঝে শুনা লাগে না। শুনতে শুনতে আমি আরো ছেলেমানুষ হয়ে যাই। আমাকে আরো ছেলেমানুষ করে বোধহয় ওঁর উদ্দেশ্য। আমি যেন এগারো বছরের খুকি। ফ্রক পরে ঘুরছি, বেড়াচ্ছি, ছুটছি, লা ভাবতে মন্দ লাগে না। কিন্তু উনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বয়স বাড়তে থাকে। এক বাড়তে বাড়তে যেন একষট্টি, একাত্তর, একাশিতে গিয়ে পৌঁছায়। রাত্রির অন্ধকারে জেগে জেগে আমি উঠি। যদি জেগে উঠে দেখি আমি বুড়ী হয়ে গেছি। যদি বুড়ো হওয়ার আগে আমার এই রোগ ন তাহলে কী হবে আমার—কী হবে।

কিন্তু রাত যখন ভোর হয় আর আমি আমার মুখ দেখি, আর আমার মায়ের হাসিমুখ আমার সব ভয় দূর হয়ে যায়।

ছোড়দার বন্ধু বেণুদা আমাকে আর এক রকম ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। ঝড়ের ভয়। অব কোনে কোনে। বউদিদিদের ভাই আর দাদাদের বন্ধু কতজনের সঙ্গেই তো কোনে আলাপ কিন্তু বেণুদার মত কথা বলতে কেউ জানেন না আর যেচে যেচে অত কোনও কেউ করেন না। নিজে একটু হিসেব করেই ফোন করি। অমনিতেই দাদারা আমার জন্যে কত খরচ করেন। ওঁদে আর বাড়াতে চাই না। ওঁরা আমার জন্য দামি রেডিও কিনে দিয়েছেন। তাতে আমি পৃথি কোন বড় শহরকে ধরতে পারি। সেখানকার গান শুনতে পারি, বক্তৃতা শুনতে পারি। লণ্ডন নিউইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন, রোম, যে কোন বড় শহর আর পুরনো শহরকে আমি কানে দিয়ে পাই। দাদারা রেডিওটা আমার ঘরে রেখেছেন, কোনটা রেখে দিয়েছেন বিছানার পাশে।

আমি আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে পারি। কিন্তু সবাইর সঙ্গে গল্প করে কী আনন্দ আছে? সবা কি গল্প করতেই জানে? বেণুদা কথা বলতে জানতেন। আর তার সেই হোটেল থেকে যখন তখ আমাকে ফোন করতেন। বেণুদার নাওয়া-খাওয়ার যেমন ঠিক ছিল না, কাজকর্মের কিছু ঠিক ছিল না তেমনি ফোন করবার সময়ও কিছু ঠিক ছিল না। আর আমি সব সময় ঠিক হয়েই আছি। আম সবই বাঁধাধরা! নাওয়া-খাওয়া ঘুমোন বিশ্রাম পড়াশুনো সব ডাক্তারের নিয়মে বাঁধা। তাই মনে মা সবদিক থেকেই বেঠিক বেণুদাকে আমি বড় পছন্দ করতাম। আমি তাঁকে তিনবার মাত্র দেখেছি। ফ ছিপছিপে চেহারা। বয়স দাদাদের চেয়ে কম। কিছুতেই তিরিশের বেশী না। আর দেখতে দাদাে চেয়েও সুন্দর। কিন্তু তাঁদের মত গুণীও নন, বিদ্বানও নন। আমার মত বেণুদাও ডিগ্রীহীন। কিন্তু বাইরে পড়াশুনো খুব আছে, আর ঘুরতে খুব ভালবাসতেন। দিল্লী, আগ্রা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ওঁর মুখে বাঁধা মাসের মধ্যে পনের দিন বেণুদা বাইরে কাটান। বিয়ে থা করেননি। মা বাবা নাকি বেনারসে থাকেন।

ছোটদাকে কতদিন জিজ্ঞেস করেছি 'বেণুদার কিসের বিজনেস?' ছোড়দা হেসে বলতেন, ওর ক আর বলিসনে। ও একটা ফোরটোয়েন্টি। আজ সিমেন্ট, কাল প্লাস্টিক। ওর কোনটা যে ঠিক কোনটা বেঠিক ধরা শক্ত।' বড়দা বলেছিলেন, 'তুকুর সঙ্গে তুই আর আলাপ করিয়ে দেবার মানুষ পাসনি কেন ও-ধরনের লোককে অ্যালাউ করিস।'

ছোড়দা বলেছিলেন, তাতে কি! বাড়ীতে তো আসে না। দূর থেকে তুকুর ও আর কী ক্ষা করতে পারবে। তুকু ওর সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে একটু মজা পায় তো পাক না।

ক্ষতি! যেন কাছে এসেই আমার ক্ষতি করবার কারো সাধ্য আছে। আমার যেন কোন বু হয়নি। নিজেকে রক্ষা করবার মত শক্তি হয়নি।

বেণুদা খুব কথা বলতেন, খুব গল্প করতেন।

সেবার বলেছিলেন, 'তুমি যে কী করে অমন উদ্ভিদের মত এক জায়গায় শিকড় গেড়ে বসে আ আমি ভেবেই পাইনে তুকু'।

আমি বলেছিলাম, 'যাঃ রে, আমি ইচ্ছে করে বসে আছি নাকি?'

'জানি ইচ্ছে করে বসে নেই। একান্ত অনিচ্ছায় শুয়ে আছ। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার কী ই করে জানো? ঝড়ের মত উড়ে গিয়ে তোমাকে একেবারে ঝড়ের বেগে উড়িয়ে নিয়ে আসি।'

'রক্ষে করুন বেণুদা—অমন ঝোড়ো-হাওয়া আমার সইবে না। আমি যে শুকনো পাতা।'

'তুমি কেন শুকনো হতে যাবে তুকু। তোমার কথা এত সরল, তোমার গলার স্বর এত মিষ্টি! আ তোমার গলা শুনব বলেই তো এত ঘন ঘন ফোন করি।'

'যাঃ, কি যে বলেন!'

মাঝে মাঝে মনে হত বেণুদা সত্যিই বড় নিষ্ঠুর। আমার মত মেয়েকে এসব কথা বলে লাভ কি উনি কি বোঝেন না এতে আমার কত কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্ট পাওয়ার জন্যে আমার মন অপেক্ষা করে থাকত তিনি কষ্ট না দিলে আমি যেন বেশি কষ্ট পেতাম। একমাত্র বেণুদাই আমার অসুখকে আমল যেন না

আমার রোগের কম-বাড়ার খোঁজ নেন না। একমাত্র তাঁর কাছেই আমি সুস্থ সবল স্বাভাবিক যেন আমি ইচ্ছে করলেই যা খুশি তাই করতে পারি।

তিনি আর একদিন বলেছিলেন, 'আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় তোমার খাটশুদ্ধ তোমাকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে আসি, তারপর গরুড় পাখীর মত আকাশময় ঘুরে বেড়াই।'

আমি বলেছি, 'দোহাই বেণুদা, অমন কাজও করবেন না। আমি যত হাল্কা আমার খাট তত ভ আপনি ব্যালেন্স রাখতে পারবেন না।'

বেণুদা বলেছেন, 'আমি কোনদিনই তা পারিনে। সেই ভালো। আলাদা খাটের দরকার আমার পিঠই তোমার পীঠস্থান হোক।'

আর একদিন বোম্বে থেকে প্লেনে ফেরার পথে বেণুদা নাকি ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলেন। এসে সেই ঝড়ের গল্প। তিনি বললেন, 'কী বাপ্পিই যে হয়েছিল। আর একটু হলেই যেতাম আর কি। ঝড়ের মধ্যে তোমার কথা আমার মনে পড়ছিল।'

'ওমা ঝড়ের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক।'

বেণুদা বলেছিলেন, 'তোমার সম্পর্ক বুঝি শুধু ঘরের সঙ্গে?'

সম্পর্ক যে ঝড়ের সঙ্গেও আছে তা আমি পরে টের পেয়েছিলাম। ছোড়দা সেদিন হঠাৎ এসে ব চীটিং আর ফোর্জারির দায়ে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে বেণুদার নামে। আর তিনি আত্মগোপন কর সেদিন আমার বুকের মধ্যে ভীষণ একরকম ঝড় বইতে লাগল। সেকি সমুদ্রের ঝড় না আকাশের ঝড়-জানিনে, বোধ হয় দুই-ই।

বেণুদা কি ধরা পড়েছেন? নিশ্চয়ই পুলিস তাকে ধরে ফেলেছে। নইলে একদিন না ফোন করতেন। তিনি ফোন না করে থাকতে পারতেন না। কিন্তু কেন বেণুদা অমন করতে গেলেন তাঁর এমন দুর্মতি হল। আমার মত তিনিও কি অসুস্থ? আমি দেহে তিনি মনে। কিন্তু আমার ওপর আমার তো কোন হাত নেই। আর বেণুদার? হতে পারে তাঁরও কোন হাত নেই। পুলিস সিঁড়িমিঁড়ি ধরেছে। কিন্তু তাহলে—

তিনি পালিয়ে বেড়াবেন কেন? আমি আর ভাবতে পারিনে। ভাবলে আমার বুকের মধ্যে কী রকম যেন ঝড় ওঠে। আমি তার ঝাপটা সইতে পারিনে। শরীর দুর্বল বলেই সইতে পারিনে। কবে সুস্থ হব, সবল হব? তখন সব ঝড়-ঝাপটা সইতে পারব। ঝড়ের মধ্যে বেরোতেও পারব। জানলা খুলে দিয়েছেন। বৃষ্টি কি থামল! এরই মধ্যে সন্ধে হয়ে গেছে। রাস্তার আলোগুলি জ্ব ঘরের আলোই বা জ্বাললে কেন মা। আমার অন্ধকারই ভালো।

'বিনু চিনু এসে গেছে। ওঃ কি ভেজাটাই ভিজেছে। এত করে বলি একটা লেকেণ্ডহ্যা অন্তত কিনে নে।'

দাদারা এসেছেন। এবার সবাই আমার ঘরে এসে বসবেন। এখানে বসে সবাই চা খ আমার সারাদিনের খবর নেবেন। আর জিজ্ঞেস করবেন, 'কেমন আছিস তনু।'

আমি জবাব দেব, 'ভালো আছি, বেশ ভালো আছি।'

নতুন জীবনের নতুন দাবী

পূরণ করতে নবজাতকের
জননীকে পুষ্টির
টনিকের ওপর নির্ভর
করতে হ
সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃ
ভাইনো-ম
ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়
সাহায্য ক
এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি
ফিরিয়ে আনে

ভাইনো-মল্ট

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা—১৩

সমান

"ভাস্কর" (শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ)

ওয়ান, টু, থ্রি—

তাহারা দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। সাদার্ন এভেনিউ-এর পূর্ব প্রান্ত হইতে একটি তরুণ একটি তরুণী সাদার্ন এভেনিউ-এর দক্ষিণ পাশ দিয়া পাশাপাশি দৌড়াইতেছে। যুবকটির গায়ে সার্ট, প্যান্ট, পায়ে ক্যানভ্যাসের জুতা। তরুণীটির পায়ে সাদা-নীল মেশানো ক্যানভ্যাসের জুতা, পরনে সার্জের হাফপ্যান্ট, নাইলনের ব্লাউজ, বাঁ-হাতে রিষ্ট-ওয়াচ, ডান-হাতে দুইগাছি চুড়ি, একগাছি কাঁচের একগাছি সোনার। বয়স যুবকটির বয়স হইতে তিন চার বছর কম হইবে। রং ফর্সাই বলা যায়। নিটোল স্বাস্থ্য, মুখখানি সুন্দর এবং হাসি হাসি।

দুইজন পাশাপাশি দৌড়াইতে দৌড়াইতে যেখানটায় রিফিউজিদের বাড়ীঘর আরম্ভ হইয়াছে, সে কাছের মোড়ে আসিয়া থামিল। দুইজনেই বেশ হাঁফাইতেছে।

বীথি বলিল, কেমন, দেখলেন ত, দৌড়তে পারি কি না।

সতীশ বলিল, সত্যি আপনি বেশ দৌড়তে পারেন, আমার মতই।

বীথি বলিল, আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের ভুল ধারণা আছে।

সতীশ বলিল, আচ্ছা চলুন, আস্তে আস্তে গোল পার্কের কাছে ফিরে যাই। গাড়ী যে যে রেখে এসেছি।. আর একটা অনুরোধ আছে, আমার সঙ্গে একটু চা খেয়ে যেতে হবে।

বেশ, চলুন।

গাড়ীতে উঠিয়া উহারা একটি রেস্তোঁরায় ঢুকিল। চা খাইতে খাইতে সতীশ বলিল, কা হাঁটার প্রতিযোগিতা হবে। এবার ওদিক থেকে। সকাল ঠিক সাড়ে ছ'টায় আসবেন। রসা রোড গোল পার্ক পর্যন্ত।

বেশ, তাই হবে।

পরদিন সকালে ঠিক সাড়ে ছ'টায় সতীশ এবং বীথি রসা রোড এবং সাদার্ন এভে সংযোগস্থলে উপস্থিত হইল। ঠাণ্ডা বাতাস ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে। যাঁহারা রোজ বেড়াইতে তাঁহারা অনেকেই ফিরিতেছেন। পূর্ব দিকে সূর্য উঠিতেছে। রৌদ্র এখনও তেমন তীব্র হয় নাই। রাখিয়া উহারা সাদার্ন এভেনিউ-এর বাঁ পাশে একটি স্থানে আসিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া হাঁটিবা প্রস্তুত হইল।

সতীশ বলিল, রেডি—

বীথি বলিল, স্টেডি—

সতীশ বলিল, গো—

হাঁটিতে হাঁটিতে উহারা গোল পার্কের পাশে আসিয়া পৌঁছিলে সতীশ বলিল, তাই ত, আপনি যে হাঁটতে পারেন, আমারই মত।

বীথি বড় বড় কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, পারিই ত।

সতীশ বলিল, চলুন আস্তে আস্তে ফিরে যাই। আজও কিন্তু একটু চা খেয়ে যেতে হবে।

আপত্তি কি?

ধীরে ধীরে গাড়ীর কাছে যখন পৌঁছিয়াছে তখন বেশ বেলা হইয়াছে। তবে, রৌদ্র শিছনের দিকে থাকায় তেমন কষ্ট হয় নাই। বীথির মুখ বুক ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। সতীশ পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বীথির ঘাম মুছাইয়া দিবার উদ্যোগ করিতেই বীথি খপ করিয়া রুমালটি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, চলুন, বেলা হয়ে যাচ্ছে।

গাড়ীতে বসিয়া সতীশ বলিল, কাল সাঁতার। ঠিক সাড়ে ছ'টায় আসবেন। আমিই নিয়ে আসব আপনাকে। সুইমিং কস্ট্যুম প'রে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।

আসব।

পরদিন সাঁতারের প্রতিযোগিতায় দেখা গেল, বীথিই জিতিয়াছে।

এর আগেকার একটু কথা আছে। সতীশ এবং বীথির মধ্যে প্রায়ই এই বলে তর্ক হয়, আমরা আর আপনারা সমান কি না। বীথি বলে, নিশ্চয়ই সমান। সতীশ বলে, কখনো না!

সতীশ বলে, আপনারা কখনও পুরুষের সমান হতে পারবেন না।

নিশ্চয় পারব।

নিশ্চয়ই, না।

নিশ্চয়ই, হাঁ। স্কুল কলেজের পরীক্ষার ফল দেখেছেন? আমরা আপনাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছি নে?

তা হ'তে পারে। কিন্তু শারীরিক শক্তিতে?

কেন, শারীরিক শক্তিতেই বা কম কিসে? শোনেন নি তারা বাঈ-এর কথা। তিনি সার্কাস করতেন, বুকের উপরে হাতি ধরতেন। আমরা প্যারাস্যুট নিয়ে এরোপ্লেন থেকে লাফ দিচ্ছি, ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হচ্ছি, পার্বত্য অভিযানে যোগ দিচ্ছি।

সতীশ বলিল, দু'একজন হয়তো একটু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। কিন্তু মোটের উপর আপনারা—

আপনাদের সমান।

মোটেই না।

নিশ্চয়ই, হাঁ।

আচ্ছা, তা'হলে একটু পরীক্ষা করেই দেখা যাক।

আপত্তি নেই।

সতীশ এবং বীথি পরামর্শ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর স্থির হইল, উহারা ক শ্রমসাধ্য কার্যে প্রতিযোগিতা করিয়া দেখিবে।

বীথি বলিল, আচ্ছা, যদি আমি পারি বা জিতি—

স্বীকার করব, আপনারা আমাদের সমান।

শুধু এই স্বীকার? আর কিছু না?

বাজি রাখবেন?

রাখতে পারি।

সতীশ বলিল, যদি আপনি সমান হন বা জেতেন, তা'হলে আপনি যা চাইবেন, তাই আ দেব—অবশ্য আমার সাধ্যের বাইরে না হলে।

বীথি বলিল, আমারও সেই কথা। যদি আমি হারি, তা হ'লে আপনি যা চাইবেন আপনাকে দেব, অবশ্য যদি সাধ্যের বাইরে না হয়।

বেশ, এই কথা রইল, কেমন?

হ্যাঁ, এই কথা রইল।

এই প্রতিজ্ঞা অনুসারেই উহারা দেক আর সাধারণ এ্যাভেনিউতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নামি দেখা গেছে, উহারা দু'জনেই সমান।

২

রবিবার, সকাল সাড়ে ছ'টা। গঙ্গার ধারে রাস্তার পাশে গাড়ী রাখিয়া সতীশ এবং বীথি ধারে গিয়া বসিয়াছে। সামনে গঙ্গার গেরুয়া রং-এর জলস্রোত বহিয়া যাইতেছে। কয়েকখানি ব জাহাজ দাঁড়াইয়া আছে সম্মুখে। কোন কোনটার চিমনি দিয়া অল্প ধূম বাহির হইতেছে। নদীর কতকগুলি নৌকা। নদীর মাঝখান দিয়া স্টীম লঞ্চ চলিয়াছে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে। একটু দূ দিকে একটি লম্বা জেটি, তাহার পাশে লাগিয়া আছে একটি লঞ্চ। জেটির উপর দিয়া কত লোক য করিতেছে। পতিতোদ্ধারিণী এই গঙ্গা কত মানুষের কত চেষ্টা কত সাধনার ফল বুকে করিয় আনিতেছে দেশ-দেশান্তর হইতে। উভয় তীরের শত আবর্জনা, শত মলিনতার বোঝা আপনার পূত বহিয়া লইয়া পরম স্নেহভরে উভয় তীরকে আলিঙ্গন করিতেছে।

কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিবার পর সতীশ বলিল, তার পর?

তারপর কি?

বাজি ত জিতলেন, এখন কি চান আপনি বলুন?

বীথি নতমুখে বসিয়া হাতের নখ খুঁটিতে লাগিল।

সতীশ বলিল, নখ খোঁটা অভ্যাস ভাল নয়। অন্যমনস্ক হয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে অনেক সময় নখ ভেঙে যায়, রক্ত পড়ে।

বীথি নখ ছাড়িয়া আঁচলের খুঁটে মনোনিবেশ করিল।

সতীশ বলিল, কই কিছু বলছেন না যে!

আপনি জানেন না আমি কি চাই?

বোধ হয় জানি।

বোধ হয় নয়, নিশ্চয়ই জানেন।

বীথি মুখ তুলিয়া সতীশের মুখের দিকে চাহিল। সতীশ বীথির মুখের দিকে চাহিল।

শুভদৃষ্টি হইয়া গেল।

সতীশ বলিল, চল, বাড়ী ফেরার আগে কোথাও গিয়ে কিছু খেয়ে নি। আমার খিদে পেয়েছে।

তাই চল।

একটি রেস্তোঁরার খোপের মধ্যে বসিয়া খাবার খাইতে খাইতে সতীশ বলিল, এবার তাহলে মা বাবাকে বলা যেতে পারে। কি বল?

তা পারে। আমার মা কিছুটা অনুমানেই বুঝতে পেরেছেন।

তা পারুন। কিন্তু—

এখন আবার কিন্তু কি?

এই কথা বলিয়া বীথি আঁৎকাইয়া উঠিল।

না, এমন কিছু নয়। আমাদের বিয়ের একটা সর্ত হবে যে, যদি কখনও কোন বিষয়ে—বিশেষ শারীরিক প্রশ্ন বিষয়ে তুমি অসম্মান হয়ে যাও, তাহলে কিন্তু ডাইভোর্স হয়ে যাবে।

বীথি গম্ভীর হইয়া গেল।

সতীশ বলিল, মানে, তুমি সব বিষয়ে সমান বলেই—।

বুঝেছি।

কেমন, আমার সর্তে রাজী?

রাজী। কিন্তু এরকম বারে বারে রাজী হওয়া আমার ভাল লাগে না। গণ্ডাগণ্ড সাক্ষী করে যে রাজী হয়েছি, সেই রাজীই আমাদের শেষ রাজী হওয়া উচিত।

মানে, ওই একটু সর্তে।

আচ্ছা।

বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

নূতন বিবাহ জীবন যেমন করিয়া চলে, সতীশ ও বীথির জীবনও তেমনি করিয়াই চলিতে লাগিল। দুজনেই খুব সুখী। উহাদের মা বাবা, দিদি-জামাইবাবুরাও খুশী। উহাদের জীবনযাত্রার মধ্যে নূতনত্ব বিশেষত্ব

কিছু নাই, সুতরাং তাহা লইয়া গবেষণা অনাবশ্যক। শুধু মাঝে মাঝে তাহারা পরীক্ষা করিয়া দেখে ঠিক সতীশের সমান আছে কি না। তাই কখনো কখনো দৌড়াইয়া, কখনো হাঁটিয়া, কখনো বাসে একত্র ওঠানামা করিয়া তাহারা পরখ করিয়া দেখে তাহারা সমান আছে কি না। এইটুকু উহাদের কাজকর্মে অন্যান্য নববিবাহিতদের কাজকর্মের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই।

মাসের পর মাস চলিয়া যাইতেছে। সতীশ ও বীথির কাছে মনে হয় একটি মাস যেন একটি কোথা দিয়া কেমন করিয়া দিন, সপ্তাহ, মাস চলিয়া যাইতেছে তাহার কোন হিসাবই নাই। সমস্ত যেন বসন্ত কাল। সমস্ত বাতাসই যেন মলয় বাতাস, সমস্ত আকাশই যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ভরা, পাখীর ডাকই যেন কোকিলের কুহুস্বর, সমস্ত শব্দেই যেন মৃদঙ্গের সুর।

এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছে। শুধু কিছুদিন অন্তর তাহারা কোন একটা পরিশ্রমের প্রতিযোগিতা করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে, বীথির শারীরিক কর্মশক্তি ঠিক সমান আছে কি না। এ পরীক্ষায় বীথি সর্বদাই সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। উহাদের ডাইভোর্সের কোন কথা ওঠে নাই। একদি উঠিতে গিয়া বীথি প্রায় পড়িয়া যাইতেছিল। এক ভদ্রলোক সময়মত ধরিয়া না ফেলিলে হয়ত আঘাত লাগিত। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, কেন এমন হ'ল?

এমন তোমাদেরও ত হয়।

তোমার কাছে যা শুনলুম, তাতে মনে হয়, তুমি বেশ জোর করে হাতলটা ধরতে পার নি।

বোধ হয় তা নয়। সামার ওয়েটা কম বলেই বোধ হয় এমন হয়েছে।

আচ্ছা, বেশ ২৫ ওয়েটের দাগা কয়েকটা কিনে এনো বা অর্ডার দিয়ে করিয়ে নিও।

একদিন বীথি সতীশের দিদির বাড়ী হইতে ফিরিতেছে। সঙ্গে সতীশ। বেশি দূর নয়, ফিরিতেছে। সতীশ লক্ষ্য করিল, বীথি যেন ঠিক আগের মত হাঁটিতে পারিতেছে না। সতীশ আজকাল যেন তুমি আগের মত হাঁটিতে পার না, মনে হচ্ছে।

তা হতে পারে। শরীরটা একটু ভারি ভারি হয়ে গেছে কি না।

কেন এমন হ'ল।

তা কি জানি? তুমিই ত বলেছিলে, তুমি আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়েছ।

তা হয়েছ। কিন্তু—

কিন্তু কি?

তুমি শারীরিক শক্তিতে আমার চেয়ে কমে না যাও। সর্তের কথা মনে আছে?

আমি কি করব বল? সবাই বলছে, আমি সুন্দর হয়েছি, সেটা কি আমার দোষ? আমার বল কমেছে বলে আমার মনে হয় না। তবে গড়নটা হয়ত বদলেছে, যে জন্য হাঁটা, দৌড়ান, এই তোমার মত পারছি না।

আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি, কি করা যায়।

বীথি অনুযোগের সুরে বলিল, আমার কোন দোষ নেই কিন্তু।

৩

সতীশ ডাক্তারের কাছে, বন্ধুবান্ধবের কাছে পরামর্শ লইতেছে। কি করা যায়? কেহ বলিতেছেন খাওয়া কমিয়ে দিন। কেহ বলেন, ভাত বন্ধ করে দিন। পিসিমাকে বলিতে গিয়া সেদিন সতীশ তীব্র ধমক খাইয়াছে। এমন লক্ষ্মীপ্রতিমে বউ, তাহে মন উঠছে না। না খাইয়ে শুটকি না করলে হচ্ছে না যত সব! সতীশ সকলের কাছেই সব বলে, কিন্তু সর্তের কথা কাহাকেও বলিতে পারে না। সে কেম করিয়া বলে শারীরিক কর্মপটুতার সমান না হইলে সে বীথিকে বিবাহই করিত না, এবং এই কর্মপটুর হারাইলে সে যে বীথিকে ত্যাগ করিবে বলিয়া সর্ত করিয়াছে, তাহাই বা কেমন করিয়া বলে?

দিন কয়েক সতীশ বীথিকে লইয়া খুব হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল। কিছুটা উন্নতি দেখা যায় বটে কিন্তু ঠিক সতীশের সমান হয় না। কয়েকদিন সাঁতার কাটিল, তাহাতেও খুব ফল হইল না। বরঞ্চ এই সকা পরিশ্রমের ফলে ক্ষুধা বাড়িয়া যাওয়ায় খাওয়া বাড়িয়া যাইতে লাগিল এবং তারি সঙ্গে সঙ্গে বীথির শরীরও কে একটু বেশি ভারি হইতে লাগিল। বীথিকে যে দেখে সেই বলে, ভারি সুন্দর হয়েছে দেখতে। এমন কি মনদেরাও একথা স্বীকার না করিয়া পারে না।

এমনি করিয়াই দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়। সতীশ ও বীথি বাড়ীতে আনন্দেই থাকে, আত্মীয় স্বজনের কাছেও আদর পায়। সিনেমায় যায়, মিমগ্রণে যায়, পূজা দেখিতে যায়, সভা দেখিতে যায়। বে ভাল আছে তাহারা। কিন্তু, সেই ছোট্ট একটি 'কিন্তু' সতীশকে বিব্রত করিয়া তোলে। তাহার মন মাঝে মাঝে উন্মনা হইয়া যায়।

এমনি করিয়াই কাটিয়া গেল কত দিন।

একদিন একটি খেলাধূলার আসরে গিয়া এ-কথা ও-কথার মধ্যে বীথির কথাও উঠিয়া পড়িল। একজন ব্যায়ামবিদ্ পরামর্শ দিলেন, আপনার স্ত্রীকে স্কিপিং করান। সবচেয়ে সোজা এক্সারসাইজ। সেজেগুজে বাইরে বেড়তে হবে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করতে হবে না। বাড়ীর মধ্যে, ঘরের মধ্যে, এমন কি শোবার ঘরের মধ্যেই এ এক্সারসাইজ সহজেই করা যায়।

সতীশ মন স্থির করিয়া ফেলিল। ঠিক! স্কিপিংই সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। আজই আরম্ভ করা যাক।

খেলা শেষ হইল। বিভিন্ন প্রকার খেলায় পারদর্শিতার জন্য বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার বিতরিত হইল। সভাপতির বক্তৃতা হইল। ধন্যবাদ প্রদান শেষ হইলে সমাপ্তি-সঙ্গীত। সতীশ সমাপ্তি সঙ্গীতের সমাপ্তি পর্যন্ত

অপেক্ষা না করিয়া সভা ত্যাগ করিয়া সোজা একটি বড় মনোহারী দোকানে গিয়া দুইটি বড় বড় ক্লিপিং কিনিয়া ফেলিল। সতীশ যখন বাড়ী ফিরিল, তখন বেশ একটু অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে।

বাড়ী ঢুকিতেই সতীশের মা বলিলেন, এত দেরি যে?

সতীশ বলিল, একটা খেলার আসরে গিয়েছিলাম।

হাতে ওটা কি?

সতীশ ঘড়ির পুঁটুলিটা বাঁ বগলে ক রয়া বলিল, ও কিছু না।

সতীশ নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিল, ঘর অন্ধকার, কিন্তু একটু একটু গলার স্বর। যাইতেছে। স্বরটা বীথির, ঠিক স্বাভাবিক স্বর নয়। হঠাৎ আলো না জ্বালিয়া সতীশ পর্দা সরাইয়া প্যাকেটটা মেঝের এক পাশে ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তোমার কি অসুখ হয়েছে?

না।

দেখ, অনেকদিন আমাদের কোন রাত্রিক প্রতিযোগিতা হয় নি। আজ স্টীপিং কম্পিটিশন দু'টো স্টীপিং ঘড়ি কিনে এনেছি। দেখি কে জেতে, কে হারে। আচ্ছা, এমন সময়ে তুমি শুয়ে কেন? আলো জ্বালব?

জ্বাল।

আলো জ্বলিতেই সতীশ সহসা জিভ্ কাটিয়া বলিল, কে দিদি? কখন এলে? এখানে এক অন্ধকারে বসে আছ কেন?

বীথির শরীরটা তেমন ভাল নেই কিনা।

কেন, কি হয়েছে? ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে?

ডাক্তার ডাকতে হবে না।

তবে?

ওই, একটু গা কেমন কেমন করছে।

বীথি হাত হইতে একটু তেঁতুলের চাটনি মুখে পুরিয়া চাটিতে লাগিল এবং জিভ ও টাকরা টাক্ টাক্ শব্দ করিতে লাগিল।

দিদি উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে শুধু বলিয়া গেলেন, এখন স্টীপিং-টিপিং করা চলবে না। বু

সতীশ খাটের কাছে যাইতেই বীথি বলিল, শুনলে ত, স্টীপিং করা চলবে না। আমি হেরে গেছ

সতীশ পাশে বসিয়া বলিল, তাই ত দেখছি।

আমার কোন দোষ নেই কিন্তু।

না, না, না। তোমার আর দোষ কি!

কিন্তু তোমার সর্ত?

কি, ভাইভোর্সের কথা বলছ ?

বীথি সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বলিল, আমি তোমার সমান হ'তে পারলুম না যে ?

কি আর করবে বল ? ভগবানই তোমাদের মেরে রেখেছেন। যাক, আমি ভাবছি, ও সর্ত বোধ হয় নাকচ করে দেওয়াই ভাল।

যা ভাল বোঝ, তাই কর।

সতীশের সর্ত নাকচ হইয়া গেল। বীথির চোখে মুখে একটা আহ্লাদের আভা ফুটিয়া উঠিল। বীথি একটুখানি আচার আঙুলে লইয়া সতীশকে বলিল, আচ'র খাবে ?

তুমি খাও !

বীথি আবার চাটিয়া টাক্ টাক্ করিতে লাগিল।

গ্রাম্য সমাজ-শাসন

এদেশের রাষ্ট্রীয় শাসনের পাশাপাশি সমাজ-শাসনের প্রথা আবহমানকাল হতেই প্রচলিত আছে একটি মাত্র কারণে রাষ্ট্র-বিপ্লব দ্বারা এই দেশ কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এর কারণ শতনের পর আমাদের সমাজ স্বতঃস্ফূর্ততাতে রাষ্ট্রের করণীয় কাজ নিজেদের হাতে তুলে নিত। এই আমাদের তৎকালীন শক্তিশালী সমাজের ছিল। বস্তুতঃপক্ষে মহল্লায় মহল্লায় গ্রামে গ্রামে ছিল সমর্থক ও আজ্ঞাবাহী বেসরকারী শান্তি সেনার বল। এ ছাড়া দেশের শাসনযন্ত্রের নিম্নতম স্তরের কর্ম মূলতঃ সমাজপতিদেরই অধীন ছিল। এইজন্য কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল বা বিধ্বস্ত হলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ রাষ্ট্রের ন্যায় তারা প্রকট হয়ে উঠতো। কিভাবে আমাদের এই সমাজ জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রিত অন্তে সন্ঘটিত হত সেই সম্বন্ধে আমি এইবার আলোচনা করবো। এই বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থায় স্বার্থের সংঘর্ষের কোনও সুযোগ ছিল না। আজকালকার ইউনিয়নবোর্ডগুলিতে দেখা যায় যে উহা বা তেরোটি গ্রামের সমষ্টি নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। এইজন্য প্রায়ই এদের সাত বা পাঁচখানি প্রতিভূরা একত্রিত হয়ে অপর তিন বা দুইখানি গ্রামের স্থানীয় সমস্যাকে অবজ্ঞা করে সেখানকার ম মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করে। এইজন্য কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি নিয়ে এই সমাজ তৈরী হলেও এই পাড়াকে উহার নিম্নতম বা লোয়েষ্ট ইউনিটরূপে স্বীকার করা হতো। এই গ্রাম বা পাড়ার অধিবে ঐ গ্রাম বা পাড়া প্রত্যেক অংশের উপর সমান স্বার্থ ছিল। এইজন্য উহার একাংশে রাস্তাঘাটের হলে উহার অপরাংশের লোকেদের ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয় নাই। এর কারণ এদের সম্পত্তি জমিজম সকল অংশেই বিক্ষিপ্ত থাকায় সেখানে যখন তখন যাতায়াতের প্রয়োজন হয়ে থাকে। বিবোধই সমাজ-শাসনের সুবিধার জন্যই বোধ হয় এইরূপ একটি লোয়েষ্ট ইউনিট তৈরী হতো। এর আমাদের তৎকালীন সমাজপতিরা কোনও দিনই বলপ্রয়োগে সমাজ-শাসন করার পক্ষপাতি ছিলে এইজন্য সম্ভাব্য ভেদাভেদ বা মনোমালিন্যের কোনও সুযোগের স্থান তাঁদের পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থ রেখেনি। প্রতিটি গ্রাম বা পাড়ার বাসিন্দাদের স্বতঃস্ফূর্ততাবে মনোনীত পাঁচজন সদস্যের দ্বা গ্রাম্য সমাজগুলি শাসিত হয়ে এসেছে। এইজন্য ভোটাভুটির ব্যবস্থার দ্বারা কোনও মনোমালিন্যে করা হয় নি। এইরূপ স্বতঃস্ফূর্ত নির্ব্বাচন একমাত্র স্বল্পপরিধির স্থানেই সম্ভব। একটি পরিবারের ব্যক্তিকে প্রধান করা উচিত তা যেমন ঐ পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের জানবারও প্রয়োজন হয় না। একটি ছোট পাড়ার কোন কোন ব্যক্তির বিচার সর্ব্বগ্রাহ্য হবে তাও সেখানকার লোকগুলির মাথা কারণ কখনও ঘটায় নি। সকলেই জানে যে, গ্রাম্য-শাসন ও বিচার-ব্যবস্থার ভার ছিল এই পঞ্চ উপর। এই পঞ্চায়েতের অধীনে প্রতি পাড়া বা সমগ্র গ্রামের জন্য একাধিক চৌকিদার নিযুক্ত থা এই পঞ্চায়েত সরকার নিজেরা কোনও বিতর্কমূলক খাজনা বা ট্যাক্স আদায় করার কোনও ভার না। এই কাজ রাজা বা জমিদারদের উপর ন্যস্ত ছিল। বোধহয় মনোমালিন্য এড়াবার জন্যে তাঁ

বা জমিদারদের নিকট হতে কয়েকটি ভূখণ্ড চেয়ে নিয়েছিলেন। এই ভূখণ্ডসমূহের উপস্বত্ব হতে এই সব চৌকিদারদের ভরণপোষণ করা হতো। কিন্তু এইখানেও তাঁরা সম্ভাব্য তহবিল তছরূপ অপবাদ হতে মুক্ত থাকতে চেয়েছিলেন। এইজন্য ঐ সকল ভূখণ্ড ঐ সকল চৌকিদারকেই বংশপরম্পরায় ভোগ করতে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা শুধু দেখতেন যে ঐ জমির চৌকিদারীস্বত্বের বিনিময়ে তাঁরা ঠিকভাবে গ্রামরক্ষী রূপে কাজ করছে কি না? বংশানুক্রমে এই সকল ব্যক্তিরা স্বকর্মে নিযুক্ত থাকায় লোক নিয়োগের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করবারও তাদের (পঞ্চায়েতের) সুযোগ ছিল কম। সকলেই জানে যে, গ্রাম্য বিবাদের মীমাংসা এই পঞ্চায়েতপ্রধানরাই নির্ধারণ করতেন। ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষাৎভাবে অবগত হওয়ার সুযোগ তাদের বেশী ছিল। এইজন্য তাঁদের বিচারে বিচার বিভ্রাট ঘটিতে কারুর মনে অকারণে গ্লানি সৃষ্টি করে নি। এঁদের একিয়ারভুক্ত এলাকা ছোট থাকায় এঁরা কোনও প্রকার অবিচার করতে সাহসী হতেন না। এর কারণ যাদের উপর তাঁরা অবিচার করতেন, তাঁরা জানতেন যে পরের দিন তাকে নিয়েই তাদের কাজ করতে হবে। এরূপ কয়েকটি কনটিগিয়াস বা পরস্পরসংলগ্ন গ্রামের সমষ্টি নিয়ে তৈরী হতো মূল গ্রাম্য সমাজ। এই মূল সমাজের অধিপতিকে বলা হতো সমাজপতি। দেশ বা প্রদেশ বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণকেই সমাজপতিরূপে সমগ্র সমাজের উপর স্থান দেওয়া হয়েছে। গ্রাম্য অধিনেতারা রীতিনীতি সম্বন্ধে এই সমাজপতির বিধানসমূহ মেনে চলতেন। [শাসনব্যাপারে সমগ্র সমাজের এই সমাজপতি এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মধ্যে অপর একটি স্বতঃস্ফূর্ত শাসন সংস্থা ছিল। এদের বলা হতো গ্রাম্যমণ্ডলী এবং উহার অধিনেতাকে বলা হতো মণ্ডলেশ্বর। পাঁচখানা গ্রামের লোকেরা যাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতো বা মেনে চলতো তাঁকেই তারা বলতো মণ্ডলেশ্বর। এই মণ্ডলেশ্বররা আবার সমাজপতিদের মেনে চলতেন।]

দরিদ্ররা পালপার্বণে মাত্র তাদের পাড়ার লোকদের নিমন্ত্রণ করতো। মধ্যবিত্তরা শ্রাদ্ধ-শান্তিতে সমগ্র গ্রামকে নিমন্ত্রণ করতো। কিন্তু ধনীরা এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করতো সমগ্র সমাজকে। বাঙলা দেশে পূর্বে এইরূপ বহু গ্রাম্য সমাজ বা গ্রাম্য সমষ্টিতে বিভক্ত ছিল। রাষ্ট্রীয় শাসনে দেশকে কয়েকটি জেলা ও জেলাকে কয়েকটি মহকুমায় বিভক্ত করেছিল। কিন্তু সামাজিক শাসনের সুবিধার জন্য সমাজপতিরা উহাকে বহু সমাজে বিভক্ত করে রেখেছিল। এইরূপ একটি গ্রাম্য সমষ্টির নাম ছিল হালিশহর সমাজ। কাঁচড়াপাড়া, গরিফা, নৈহাটি, ভাটপাড়া, কাঁঠালপাড়া, মাদরাসা, নারায়ণপুর ও হালিশহর নামেও পরস্পরসংলগ্ন গ্রাম সমষ্টি নিয়ে পূর্বকালে হালিশহর সমাজের সৃষ্টি করা হয়। ঋষি বঙ্কিমের মাতামহ বংশের পূর্বপুরুষ কাঁঠালপাড়া সুপণ্ডিত রঘুদেব ঘোষাল একদা এই হালিশহর সমাজের সমাজপতি ছিলেন।

তৎকালে এই ভারতীয় সমাজের শক্তি ছিল অসীম। সেই যুগে সমাজকে কেহ আঘাত হানতে প্রতি-আঘাত হানতে উহা সক্ষম ছিল। আজও বহু গ্রাম্য সমাজে ইহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কেহ যদি কোনও কুলনারীকে ফুসলে এনে শহরের কোনও ব্যক্তির বাড়ীর পাশে বাড়ী ভাড়া করে রাখিতে যায়; তাহলে সেই ব্যক্তি তা দেখেও দেখতো না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি ঐ নারীসহ কোনও গ্রামে এসে উপস্থিত হয়, তাহলে সেইখানকার সামাজিক প্রতিক্রিয়া তাকে তৎক্ষণা

গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করবে। এইজন্য আজও কোনও চোর বা বেশ্যানারীর কখনও গ্রামে স্থান ।
তারা নয় ব্যাঘাঘাত দুর্বৃত্তদের কলেবর বৃদ্ধি করেছে, নয়তো তারা গ্রাম ত্যাগ করে প্রথমে ডিস্ট্রিক্ট
এবং পরে কলিকাতার ন্যায় পাঁচমেশালী শহরের পঙ্কিল বস্তীগ্রামসমূহে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এই
সমাজ অপরাধীদের বিতাড়িত করেছে এবং পাপী ও অন্যায়কারীদের নিয়ন্ত্রিত করেছে। অন্যায়কারী
পাপী এবং পাপী থেকে অপরাধীর জন্ম হয়ে থাকে। এইভাবে বাপে বাপে এরা অপরাধীতে পরিণত
এই অন্যায়ী ও পাপীদের গ্রাম্য সমাজ প্রারম্ভেই দমন করায় তারা অপরাধীতে পরিণত হবার কোনও
সুবিধা পায় নি। এছাড়া অপরাধীদের নিরপরাধী হবার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আমাদের গ্রাম্য সমা
থাকে। আমাদের অনেকেই বাল্যকালে এর ওর বাগানের ফল চুরি করেছি। গাছ হতে কলসী
খেজুরের রস চুরি করে খেয়েছি। গ্রামের লোকেরা আমাদের ধরে নিজেরা কখনও শাস্তি দে
তারা আমাদের ধরে আমাদেরই পিতামাতার কাছে নিয়ে গেছে। যা কিছু শাস্তি তা আমাদের পিত
আমাদের দিয়েছেন। এই শাস্তি অন্য কারুর কাছ হতে না আসায় আমাদের মনে কোনও নৈতিক
স্থান পায় নি। আমাদের গ্রামের লোক জানতো যে এতে আমাদের আত্মসম্মানের কোনও হানি হ
আমাদের গ্রামসমাজ এই ভাবে আমাদের ভালো থাকবার সুযোগ দিয়েছে, বলে আজ আমরা দ
একজন। এইসব কাজ শহরে বসে করলে হয়তো এতোদিনে আমরা দশ বারো বারের দাগী হয়ে
এইজন্য থানায় পাঠানো তো দূরের কথা, এইসব বিষয় গ্রাম্য পঞ্চায়েতেরও কখনও বিচার্য্য বিষয় হয় নি

এইবার এই গ্রাম্য-সমাজের ও জমিদারদের অধীন তৎকালীন পুলিসী ব্যবস্থার সম্ব
এক কথা বলে এই প্রবন্ধটি শেষ করবো। প্রতিটি গ্রামের জন্য একজন চৌকিদার বহাল থাকতে
জমির উপস্বত্ব হতে পুরুষানুক্রমে এদের ভরণপোষণ হতো তাদের বলা হতো চৌকিদারী (চাকরাণী
কয়েকটি গ্রামের সমিতির উপর থাকতো একজন দফাদার। এদের ভরণপোষণ হতো দফাদারীস্বত্ব
জমি-জমার আয় হতে। এ ছাড়া একটি গ্রাম্য সমষ্টি হতে অন্য এক গ্রাম্য সমষ্টির যোগাযোগের
সংযোগস্থলে ঘাঁটি আগলে অবস্থান করতো ঘাঁটিয়াল। এরা পুরুষানুক্রমে ঘাঁটিয়ালিস্বত্ব সম্বলিত জা
উপভোগী ছিল। এই চৌকিদার, দফাদার এবং ঘাঁটিয়ালগণ সমাজপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো।
উপর খবরদারী করার জন্য শেষে থানাদারদের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন থানার থানাদাররা পুরুষানুক্রমে
স্বত্ব সম্বলিত জমি-জমার উপভোগী ছিলেন। এই সকল থানাদাররা কিন্তু জমিদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রি
প্রকৃতপক্ষে এই সকল জমিদাররাই ছিল আজকালকার সুপারিন্টেনডেন্ট পুলিস। সকলেই
পুরাকালে যোগাযোগের অভাবের জন্য রাজকর্মচারীদের মাহিনার বদলে জমিজমার স্বত্ব দেওয়
এইসব কার্য্য না করেও এদের বংশধররা সেদিন পর্য্যন্তও তাদের পূর্ব্বপুরুষদের জন্য নির্দ্ধারিত
উপস্বত্ব ভোগ করে আসছে। আমার মতে প্রাচীন জমিদারদের কাছারী নথিপত্রে উল্লেখিত বি
সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করলে আমাদের দেশে প্রাচীন শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হওয়া যেতে
মুসলমান শাসকগণ প্রয়োজনবোধে শহরসমূহে পুলিসী ও শাসনকার্য্যের জন্য একজন করে কোতোয়া
করলেও গ্রাম্য শাসননীতির সামান্যই অদল-বদল করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসকগণ প্রবর্ত্তিত শাসন
আমাদের দেশের এই শাসনব্যবস্থাকে সম্মুখে রেখে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত অবস্থায় প্রচলিত করে
আমার মতে এই সম্পর্কে গবেষণা করলে প্রাচীন শাসন সম্পর্কীয় বহু প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব।

একটা বেড়াল ও একখানা চিঠি

নীললোহিত

কর্তা বললেন, "আরে এতো জানা কথা, আবহমান কাল ধ'রে যা হ'য়ে আসছে - তাই হবে। তুমি ও আর পরে। ও সব ছেলে-ছোকরার আকস্মিক উদ্গীরণে কানও দিতে হয় না, ধামও দিতে হয় না।"

গিন্নিবালা হাসিমুখে বললেন,

"বউমাকে আনতে কাকে পাঠাই বলোতো? নকুলকে পাঠাবো?"

নকুল কর্তার জ্ঞাতি ভাগ্নে।

হরবিলাস বললেন,

"কেন, বরুণই যাক্ না। দেখতে শুনতে সেটাই তো ভাল হবে। ঘিরাগমনে যাবনি, বেয়াই বেয়া সে কোভ মিটবে কিছুটা—"

"ওরে বাবা—" গিন্নিবালা বললেন, "যে গম্ভীর গলায় তোমার ছেলে বউমাকে আনার কথা বলা জজসাহেব যেন রায় দিচ্ছেন—ওকে এখন কে ঘাঁটাবে, তাছাড়া বাড়িতেও নেই, বেরিয়ে গেছে কখন।"

হরবিলাস বেশ সময় নিয়ে ধরাট গলায় হাসলেন,

"গিন্নি ভেবোনা, ও গাম্ভীর্য চলো মুখোস। এত লম্ফ-ঝম্ফ করলো, এত চড়পালো, বাইরে ব বলায় তো রাখতেই হবে বরুণকে—"

গিন্নিবালা চারপাশটা দ্রুত একচোখ দেখে নিয়ে বললেন,

"তুমি থামো বাপু, কোথা দিয়ে কে শুনে ফেলবে তারপর আবার—যাই নকুলকেই তাহলে পা মোহনলালকে গাড়ি বার করতে বলি -" গিন্নিবালা চকল পায়ে বার হ'য়ে গেলেন।

এখন সন্ধ্যা।

বরুণ সেদিন রাধার বাড়ি গেলো না। ওর বিয়ের রাত্রি ছাড়া, তিনবছরের মধ্যে এই ব্যতিক্রম। লেক-এর পাশে এসে দাঁড়ালো। চতুর্দিক ঝমঝম্ করছে। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে এক একটু নিরালা জায়গা বার করলো বরুণ। রুক্ষ ঘাসের ওপরেই পা ছড়িয়ে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লো।

ওর মাথার ভেতরে যেন লাভা গড়াচ্ছে। কপালের ওপর ঝুলে পড়া চুলের গুচ্ছ বাঁহাত দিয়ে ক'রে ধ'রে ওপরদিকে ঠেলে তুলে দিলো। পকেট থেকে নীল মসৃণ কাগজের চিঠি বার করলো একখা ইচ্ছে করছে, এই মুহূর্তে, চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। না, নষ্ট করা হবে এ দলিল।

দীপা আসুক, আসতে দাও দীপাকে—। এ চিঠি দেখে--সুন্দর ভাল-লেগে থাকা যে কেমন বদলায়—কেমন বর্ণান্তর ঘটে, সেটা দেখতে চায় বরুণ, দেখাতে চায় সবাই

অন্ততঃ ওর বাবা থাকে। সিগারেট ধরিয়ে, ঠোঁট বেঁকিয়ে বরুণ হাসলো। —ঐ বড্ড বেশী মেয়ে তাদের মেয়েদের ওপর চিরকাল ওর ঘোর অরুচি। অথচ রাধা··· কনভেন্টে পড়ে স্বয়ং রাধা···। এমন একটি অনন্যার ভালবাসা পেয়ে বরুণ ধন্য হয়েছে — তৃপ্ত হয়েছে। রাধার টেনিস খেলা রাধার মুখে ইংরিজী ফ্রেঞ্চ শুনে, রাধার লেখা সুচিন্তিত প্রবন্ধ প'ড়ে—এমন কে আছ পৃথিবীতে অভিভূত হবে, হয়েছে।

এমন যে অসাধারণ, তাকে বাবা-মা একটিবার চোখের দেখা দেখতে পর্যন্ত চাইলেন না। অপরাধ সে বৈদ্যর ঘরে জন্মেছে—বামুনের ঘরে নয়। এ ধরনের গোঁড়ামি এ যুগে এখনো যে থাকতে পা

বরুণ সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো।

·· নাও, এখন বামুনের ঘরের সুন্দরী বউ নিয়ে ঘর কর।

—এমন রূপসী বউ হয় না। এমন লক্ষ্মী বউ হয় না।

রূপ না ছাই। যেন একতাল ননী গ'লে গ'লে পড়ছে। অমন চোখ-টাটানো ফরসা রঙে শ্যামলা রঙের রাধা অনেক মিষ্টি। আর লক্ষ্মী বউ তো পক্ষী হ'য়ে গেলো। এখন উড়াল দিলো —হরবিলাস মুখুজ্যে! তোমার পাইয়ে বাজিয়ে সুন্দরী পুত্রবধূ-তোমার মুখে চুনকালি লেপে দিলো। ঢেলে দিলো তোমার মুখুজ্যে বংশে।·· বরুণ মুখার্জি এতে খুশি। আন্তরিক খুশি।

কিন্তু, রাধা ওর হাতে চিঠিখানা দিয়ে অমন ক'রে ওর দিকে চোখ টান্‌লো কেন? মুখ ক'রে টুক্‌রো টুক্‌রো হাস্‌লো কেন? এটা যে ওর লেখা নয়, দীপাকে এমন চিঠি কেন, সাধারণ ও মামুলি চিঠিও যে, এই আড়াই মাসের মধ্যে বরুণ লেখেনি, ওর একথা কী বিশ্বাস করলো না রাধা!

ওর বাংলা হস্তলিপির সঙ্গে রাধার পরিচয় নেই—তা ঠিক। ওদের পত্রালাপ ইংরিজীতে হয়েছে। কিন্তু, তবু ওর কথাই কী চূড়ান্ত নয়! আর, দীপার এ চিঠিখানা এলোই বা কী করে হাতে! সেও এক বিস্ময়!

বরুণ কী করে জানবে, লোয়ার সারকুলার রোডে দীপাদের পাশের বাড়িতে থাকে ইন্দিরা সিনহুতো বোন, সেই ঘটিয়েছে কাণ্ডটা।

পড়োশী বন্ধুরা দীপাকে ক্ষেপিয়ে তোলে,—বরের চিঠি লেখা, না লেখালে নড়্‌ছিনে সাতেক দীপা তা-না-না ক'রে কাঁকি দিয়েছিলো। কিন্তু, সাধ্য কী বন্ধুদের সমূহ-কৌতূহল ে তারপর থেকে বন্ধুরা রোজই দীপার বরের চিঠি দেখে। চিঠিগুলো শুধু উচ্ছ্বাসেই পূর্ণ নয়, নতুন ন নতুন সুরের।

"কিরে রাধা! তোর বরুণ নাকি শুধু তোরই বরুণ—"

একটা চেয়ার টেনে রাধার মুখোমুখি ব'সে টিট্‌কিরি ছুঁড়লো ইন্দিরা। রাধার নাক উ দুর্নাম আছে। কাউকেই নাকি আমল দেয় না। ইন্দিরার দিকে না তাকিয়ে নেলপলিশ্‌ ক'রতে চোখটা একটু কোঁচকালো রাধা।

"নিশ্চয়ই। একশ'বার। এ নিয়ে অতের মাথা গরম করার কোনো কারণ তো আমি দেখিনে—"

"রাখ্ তোর গোবর শিবের তুলে—" ইন্দিরা এতোদিনে দিন পেয়েছে সহজে ছাড়বে কেন, ব্যা ঝংকার দিয়ে উঠ্লো।

"—যে আমার সোহাগ দিয়ে বরুণ দীপাকে রোজ চিঠি লেখে, সে চিঠি একখানা দেখ তে—"

"মেলা বকিসনে ইন্দিরা, থাম্। এমনি আমার মুড্ একদম নষ্ট হয়ে যাবে। বরুণ চিঠি লিখ্ দীপাকে—তাতেই হয়েছে···" রাধা হাতের পলিশ শেষ ক'রে, ফুঁকে পায়ের আঙুল ধরলো।

ইন্দিরা মনে মনে মুখ ভেংচালো,

—তোমার মুড না মুণ্ডু—, তোমার মুডকে আমি থোড়াই কেয়ার করি, গলায় কিছুটা আন্তরিকতা সুর টান্লো ইন্দিরা।

"নারে রাধা, সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর। বরুণ রোজ প্রেমপত্র দিচ্ছে দীপাকে—"

"থাম্লি ইন্দিরা—" গলা তুলে ধমকে উঠলো রাধা।

ইন্দিরা চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো, দরজার দিকে যেতে যেতে বললো, "বিশেষ না করতে চা —করিসনে—জানানোটা আমি কর্তব্য মনে করেছিলাম তাই জানিয়ে গেলাম···"

দরজার বাইরে ইন্দিরা বেরিয়ে আসতেই, রাধা তার কাঁকড়া রব্-করা অলোকগুচ্ছ দুলিয়ে ছু এলো। দুহাত দিয়ে ইন্দিরার ডান হাতটা জাপ্টে ধরে বললো,

"ইন্দিরা! বরুণের একখানা চিঠি এনে আমাকে দেখাতে পারিস?"

"দেখি—"বলে হাত টেনে নিয়ে চলে গিয়েছিলো রাধা এবং তার পরদিনই একখানা চিঠি এ দিয়েছিলো রাধার হাতে।

তৃতীয়বার পড়া চিঠিখানা চতুর্থবার পড়া শুরু করলো বরুণ।

: মিষ্টি দীপা,

এই মুহূর্তে তোমাকে কাছে পেতে ভারি ইচ্ছে করছে। একান্ত কাছে। বৃষ্টি পড়ছে ঝম্ঝমিয়ে বাতাস বেপরোয়া। অমন মনটা কখন চ'লে গেছে আমার দীপার কাছে। শরীরটাও যদি যে পারতো·····!

এই দুরন্ত বাদলায়, এই অশান্ত মন-ঝড়ে—চার দেওয়ালের বাধা, গুরুজনদের নিষেধ সব অগ্রা করে তোমাকে টেনে বার করতাম হড়মুড়িয়ে। ছুট্ দিতাম তারপর। লোকালয় থেকে চলে যেতাম হা ধরাধরি করে অনেক দূরে।

মেঘের মাদুরে ঢাকা অনেক বড় আকাশের নীচে, শাল-পিয়ালের বনকে পেছনে করে, আঁকা বাঁকা ছোট্ট নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসতাম আমরা। তুমি আছ—আমি আছি। বড় বৃষ্টিকে ভয় কি আমাদের? কোন দুশ্চিন্তাই আমাদের আক্রমণ করতে পারতো না।

উদাম হাওয়া তোমার চুল ওড়াবে, আঁচল খসাবে—তোমার তো আবার ভারী লজ্জা। বসন শাসনে

না থাকলেই সিঁদুর রাঙা হয়ে যাও। সেই লজ্জার লালিমা চোখ ভ'রে আবার আমি দেখতাম। সেদিনের মতো লাল হয়ে আমার বুকেই মুখ লুকোতে। আমি তো এই চাইছিলাম। নিবিড় করে ও বুকে বেঁধে রাখতাম তোমাকে। বৃষ্টি-ভেজা তোমার ঠাণ্ডা শরীরটাকে উষ্ণ ক'রে দিতাম আমার স সবটুকু তাপ দিয়ে।

তারপর, ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলে, আকাশে একটি দুটি করে তারা ফুট্‌লে, আমি ধীরে উঠে দ চলা শুরু করতাম। লোকালয়ের একেবারে কাছাকাছি এসে আমার বাহু বন্ধন থেকে মুক্তি দিতাম তোম কেমন ভাল হতো না? ইতি তোমারই—

চিঠির নিচে—ইতি তোমারই—কথাটার ওপর বরুণ অনেকক্ষণ চোখ রাখলো, তারপর ফেললো চিঠির মাথায়—শুধু ১৩ই চৈত্র লেখা। পত্রলেখকের ঠিকানা নেই।

: লোকটা শুধু ভণ্ড নয়, কাপুরুষ। একটা স্কাউন্ড্রেল্ কোথাকার! নাম ঠিকানা লেখার টুকু পর্যন্ত নেই।

চিঠিটা মুচড়ে দলা পাকিয়ে আবার সামলে নিলো বরুণ।—না, চিঠিটা নষ্ট করা চলবে না।

বিতৃষ্ণা চোখে নীল রঙের কাগজটার দিকে তাকালো।

—কী বিশ্রী এই নীল রংটা! অথচ নীল আকাশ নিয়ে কবিদের কতই না বাড়াবাড়ি!

বাড়ি যখন ফিরলো বরুণ, তখন রাত্রি ন'টা।

দোতলায় উঠতেই যেন ধাক্কা খেলো। ব্রীড়াময়ী দীপা তন্ময় হ'য়ে গান গাইছে। মুখে বসার ভংগীতে লজ্জা এবং একাগ্রতা যুগপৎ ফুটিয়েছে দীপা।

—কী আশ্চর্য অভিনয়ই না করতে পারে এই মেয়েরা!

কী অসাধারণ কলাকুশলী! এক কথায় দীপাকে বিচারিণী ছাড়া আর কী-ই বা বল ……! যার ভেতরে এতই ইবে—সে কিনা—।

"এই যে বরুণ, এসো, ভেতরে এসো। এত দেরী করলে কেন? কত ভালোসঙ্গীত গা আমার দীপা মা, মন ভরে গেলো আমাদের—" হরবিলাস মুখুজ্যে ছেলেকে ডাকলেন।

বরুণ সটান নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

—তোমরাই শোন। তোমরাই খুশী হও। কালকে সকালেই টের পাবে, তোমাদের ঐ সঙ্গীত গাইয়ে সুন্দরী বউয়ের ভেতরে কত গরল, কতখানি পাক আর উচ্ছৃঙ্খল হাওয়া সঙ্গে ক'রে ও এনেছে। আজকে রাত্রে, বরুণ দীপার জীবনটা আগে শুনে নেবে তারপর কাল সকালে……।

রাত্রি সাড়ে দশটা।

খাওয়া-দাওয়া মিটে গেছে অনেকক্ষণ। শাশুড়ী বউকে নানাভাবে তালিম দিচ্ছিলেন, তাই দেরী হলো।

—কি রকম ধরন-ধারণ—চলন-বলন বরুণের পছন্দ তার কিছু আভাষ দিলেন গিন্নিমা।

পুঁটুলি আদৌ বরুণের পছন্দ নয়—তা ইঙ্গিতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারে বারে বুঝিয়ে দিলেন। রাধার কথাটা ইসারায় একটু জানাতে চেয়েছিলেন—শেষ পর্যন্ত থেমে গেলেন। কিন্তু এ কাজটি আগেই সারিতে দিয়েছেন দীপার পিসতুতো বোন অর্থাৎ নকুল। নিজের আত্মীয়-স্বজন কেউ ঠাঁই দিলে না নকুলকে লতাপাতা জড়িয়ে কি রকম মামা সম্পর্ক, সেই মামা হরবিলাস মুখুজ্যে নকুলকে শুধু আশ্রয়ই দেন নি লেখাপড়া শিখিয়েছেন—মাঝারি অঙ্কের একটা চাকরি পর্যন্ত জুটিয়ে দিয়েছেন।

নকুল অকৃতজ্ঞ নয়। মামা মামীর সবদিক দিয়ে ভাল হোক মনের থেকে চায় নকুল। ওই প্র মেট্রোতে বরুণের সঙ্গে রাধার মাখামাখি দেখে ফেলে!—অমন উৎকট ইঙ্গবঙ্গ ললনা যে কিছুতেই হরবিল মুখুজ্যের পুত্রবধূ হ'তে পারে না, তাও আবার একমাত্র পুত্রের—তা সুনিশ্চিত। কাজেই আশু প্রতিব প্রয়োজন।

প্রথমে মামী জানালেন, তারপর মামা। আর তার তিন মাস পরেই বরুণের বিয়ে হয়ে গে হরবিলাস ছেলের সমস্ত আপত্তি কান পেতে শোনার পর শুধু এই কথা বললেন,—আমি কথা দিয়ে ফেলো এর আর নড়চড় হবে না।

—বেশ। সব ঝামেলা-ঝক্কি এরপর তোমাদেরই পোয়াতে হবে।

বরুণের কোনো দায় নেই, কোন চিন্তাও নেই।

ঐ একফোঁটা ননীর মতো মেয়ের সাধ্য কি বরুণ আর রাধার জীবনে ছন্দপাত ঘটায়।

ফুলশয্যার রাত্রে দীপাকে খোলাখুলি সব জানিয়ে দিলে বরুণ।—বাপ-মার জেদে পড়ে বি করতে হয়েছে বরুণকে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। দীপার খুশি হলে থাকতে পারে এবাড়িতে কিন্তু বরু সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই দীপার। দীপা কোনো কথা না বলে চোখ বড় বড় ক'রে তাকিয়েছিল শুধু।

তিনদিন পরে ধিরাগমনে গেল দীপা—বরুণ গেলো না। ঠিক রওনা হওয়ার কিছু আগে ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। অসহ্য মর্মন্তুদ দুঃখ মনে চেপে, হরীনশংকর শুধু মেয়েকে নিয়ে গাড়ি উঠলেন। তারপর আড়াই মাসের মধ্যে জামাইকে নেমন্তন্ন ক'রে ক'রে হয়রান হ'য়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে দীপার বাবা মা।

ঘরে ঢুকলো দীপা।

আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে, বরুণের অস্থির পদচারণা দেখে অবাক হলো এক গিরিবালার কাছে শুনেছে, বরুণের কথামতোই ওকে আজ আনা হয়েছে।—কোনও সম্পর্কই যখন নেই, ও দিয়ে আবার কী প্রয়োজন রে বাবা!

দীপা ঘরে ঢুকতেই, বরুণ দীপার দিকে পেছন ফিরে রাস্তার ধারের জানালার কাছে গি দাঁড়ালো! হাতের ধরানো সিগারেটটা মুখে না দিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিলো অনেক দূরে। জান গরাদ দু'হাত দিয়ে ধরে সামনের একফালি আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে রইলো। মুহূর্ত দুই তিন। তার পরেই নক্ষত্রবেগে ঘরে খট করে দরজা বন্ধ করে দিলো। দীপার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো।

"তোমার প্রেমিকটি কে শুনি? কোথায় থাকেন তিনি?……

প্রখর ব্যঙ্গের গলায় বলতে গেলো বরুণ কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর বিশ্বাসঘাতকতা করলো, অস্থির বার করলো।

"আমার প্রেমিক—!!" দীপা অবাক চোখে তাকালো।

"……হ্যাঁ, হ্যাঁ। অমন আকাশ-পড়া চোখ করো না। যিনি তোমার অদর্শনে ছটফটিয়ে একখানি করে পত্র দিচ্ছেন তোমাকে—। যাকে তুমি সব অঞ্জলি দিয়ে ব'সে আছো?" মিষ্টুর মিষ্টি মতো মুখ করতে চাইলো বরুণ, কিন্তু মুখভঙ্গি ওর অনায়ত্ত।

"ও…!" হেসে ফেললো দীপা।

"হাসতে তোমার লজ্জা করছে না?" বরুণ দৃষ্টি ধারালো করলো।

"বারে। তোমার প্রিয়া থাকতে পারে, আমার প্রিয় বুঝি থাকতে পারে না?" মিষ্টি মিষ্টি হ লাগলো দীপা।

"তার মানে? কী বলতে চাও তুমি?"

দীপা বরুণের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে হাসলো,

"মানে? মানে তো তুমিই জানো ভাল—"

থতিয়ে গেল বরুণ। তীক্ষ্ণ প্রশ্নময় দৃষ্টি কিছুটা নমিত হলো, গলার চড়া পর্দাও অনেকটা না অস্ফুটে প্রায় অর্থবহতোক্তির মতো উচ্চারণ করলো,—তাতে আর এতে! কিন্তু কথাটাকে চাপা গলা আবার চড়িয়ে বললো,

"আমাদের কথা কোনদিন উচ্চারণ করো না তুমি। আমাদের ভালবাসায় কোনো নো নেই।—"

"নোংরামি…!"

"নিশ্চয়ই—। এ সমস্ত কী—…সেই লজ্জার লালিমা চোখ ভ'রে আবার আমি দেখতাম…" ব কথাটার ওপর বরুণ খুব বেশী জোর দিলো, "…তুমি সেদিনের মতো আমার বুকেই মুখ লুকো …আমার হৃদয়ের সবটুকু তাপ দিয়ে তোমার ঠাণ্ডা শরীর উষ্ণ করে দিতাম—আমার বুকে নিবিড় বেঁধে রাখতাম—।

"এসব কী? কী এসব—? এমন নোংরা চিঠি যে—" উত্তেজিত বরুণ ক্ষিপ্রহাতে চিঠিখানা মেলে ধরলো দীপার চোখের সামনে।

"ওমা! এ চিঠিখানা যে গরু-খোঁজা খুঁজেছি—। তোমার কাছে এলো কী ক'রে ঐ চি চকল হাতে দীপা চিঠিখানা টেনে নিতেই, বরুণ আবার বাধা দিয়ে চিঠিখানা কেড়ে নিয়ে পকেটে পুর "এ চিঠি তুমি পাচ্ছোনা—। কাল সকালে মাকে দেখাবো। —তাদের অতি-ভাল-ঘউয়ের কীর্তি-ব দেখুন একবার—বুঝুন একবার…"

দীপার ঠোঁটের দুপ্রান্ত বিস্তারিত হলো। সহাস্য কৌতুকে ভুরু তুলে কয়েক মুহূর্ত বরুণের দি তাকিয়ে থেকে বললো,

"এ চিঠি তুমি মাকে দেখাতে পারবে?" দীপার আকর্ণ সপ্রতিভ হাসিতে ক্রমশঃ ফেপে যাচ্ছে ব

"নিশ্চয়ই দেখাতে পারবো। প্রয়োজন হ'লে বাবাকেও দেখাবো। এমন অশ্লীল চিঠি যে অ স্ত্রীকে কোনো ভদ্রলোক লিখতে পারে—। আর এই লোকটার চিঠি তুমি আমার ব'লে চালিয়েছে তোমার সব বন্ধুবান্ধবের কাছে…" বরুণকে মুঠি পাকাতে দেখে খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো দীপা।

"একী আশ্চর্য উক্তি তোমার মুখে! স্ত্রী ব'লে আমাকে তো তুমি স্বীকারই করোনি—"

"আমি স্বীকার করি আর নাই করি, দুনিয়া শুদ্ধ সকলেই তো জানে—তুমি আমার স্ত্রী, ম মাস বিয়ে হয়েছে আমাদের,—কী অস্বীকার কর, সেটা? আর এ চিঠিখানা হলো তেরোই চৈত্রের। অশ্লীল চিঠি তুমি রোজই একখানা ক'রে পাও, সে খবরও আমি পেয়েছি—বলো এর জবাব কী? জবাব দিতে চাও তুমি?" দীপা কলকল্ ক'রে হেসে ফেললো। ডান হাতখানি প্রসারিত কর বরুণের দিকে।

"দেখি, তোমার বাবার একখানা চিঠি?" দীপার স্পর্ধায় এবং নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে বরুণ একে স্তম্ভিত। কপালে কয়েকটা খাঁজ ফেলে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো শুধু।

"সাহসে কুলোলো না তো?" দীপা ঘুরে দরজার কাছে গেলো। কবাটের খিলের ওপর হাতখানা রাখলো,

"এত রাত্রে আর চেঁচামেচি করোনা, মা-বাবা দুজনেই হয়তো উঠে আসবেন—" খিল খুলে ফেলে করিডোরে বেরিয়ে গেলো। বরুণ ক্যাল্ ক্যাল্ করে তাকিয়ে রইলো। দীপার বিস্ফারিত খোঁপাটা অদৃশ্য হ' বরুণের মনের কোণে একটা স্পষ্ট ইচ্ছে উঁকি দিলো,—দীপার কথা কাটাকাটি আর একটু দীর্ঘস্থায়ী হ ওর মন্দ লাগতো না।

টেলিফোনটা করিডোরেই থাকে। তবে প্রয়োজন হলে—হরবিলাস এবং বরুণ দুজনের শো ঘরেই আনা চলে। দুটো ঘরেই প্লাগ সকেট আছে। টেলিফোন হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলো দীপা। ে লাগিয়ে বরুণ ডায়াল করলো; বরুণ ব্রেক ঘর্ষক বনে গেছে। মিনিট খানেক অপেক্ষা করার পর সাড়া পেলো।

"এই মুখপুড়ি। ঠিক জানি তুই জেগে আছিস। এত রাত্রি জেগে কচ্ছিস কী? পড়া ক করছিস, না চিঠি লিখছিস?'

…চিঠি লিখছিস—? তবেই পাস করেছিস তুই। আর তো পুরো একটা মাসও বাকী নেই অনিলবাবুকে ধরা ক'রে এখন চিঠিলেখা বন্ধ করতে বল্, না হলে এত সব ক্লেশ-পরিশ্রম সব বৃথা।

…আমার খবর? সে ভাই অদ্ভুত রোমান্টিক্। সে রোমান্স ফোনে জানানো যায় না—ে হ'লে বলবো। তবে তোর খবর আছে। তোর সেই হারানো মাণিকটি খুঁজে পাওয়া গেছে।

তেরোই চৈত্রের চিঠিখানা। বাপ্‌রে, চিঠিখানা না পেয়ে কী রাগই না করেছিলি আমার ওপর। —এবার খুশি তো?···কোথায় ছিলো? আমার কাপড়ের ভাঁজে কেমন ক'রে সেঁধোলো কে —আচ্ছা, এবার রাখি—কেমন? আর রাত্রি জাগিস নে, শুয়ে পড় এবার—" ফোন কেটে দিলো দীপ

বিমূঢ় বরুণ নিচু গলায় জিগ্যেস করলো,

"ভদ্রমহিলাটি কে?" জোড়াখাটের একটাতে বসে আছে বরুণ। আর একটাতে পা বসলো দীপা, বললো,

"ভদ্রমহিলা সম্পর্কে তোমার শ্যালিকা এবং আমার মাসতুতো বোন। গত বারোই মাঘ ৎ হয়েছে। ওর এবার বি. এ. পরীক্ষার বছর। ভদ্রমহিলার শ্বশুরের খুব ইচ্ছে যে—বউমা বি. এ. * দেয়। হঠাৎ, এর মধ্যে মেসোমশায় বদলি হ'য়ে গেলেন নাগপুরে। মেয়েকে দু'মাসের জন্য রেখে আমাদের বাড়িতে। পরীক্ষা দিয়েই টুটুল চলে যাবে ওর শ্বশুরবাড়িতে—এলাহাবাদে। অনিলবাবু একখানি করে দীর্ঘ পত্র দিচ্ছেন টুটুলকে।

এদিকে, আমার বন্ধুরা রোজ চিঠি চিঠি ক'রে অস্থির—বন্ধুদের নানারঙের আলোচনার জোগাতে আমার আর ইচ্ছে হলো না, টুটুলের সহৃদয়তায় ওর চিঠিগুলি তাই কাজে লাগিয়েছি খুলে রেখে দেখিয়েছি আমার বন্ধুদের। সুবিধে হয়েছিলো এইজন্যে, টুটুলের ভাল নাম দীপালি—অ দীপা ব'লে ডাকেন।" এক মুহূর্ত থামলো দীপা।

আর কিছু জিগ্যেস করবে আমাকে? অস্পষ্ট শোনালো দীপার গলা। উঠে দাঁড়াল মাথার একটা বালিশ আর সুতনিটা নিয়ে পোবার ঘরের লাগোয়া কাপড়ছাড়ার ছোট্ট ঘরে গিয়ে। বরুণ বলতে গেল,—এ ঘরেই শোও—। কিন্তু পাতলা ছিপছিপে দীঘল সরল দীপার মুখে কঠিনে- এমন কিছু দেখলো, যাতে শেষ পর্যন্ত কিছু বলতে পারলো না। চুপ করে তাকিয়ে রইলো। তাকিয়ে দেখলো, ছোটো ঘরে আলো জ্বললো, তার একটু পরে আবার নিভে গেল। বুঝলো শুয়ে দীপা, বরুণ একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে পড়লো। নরম বিছানায় শুয়ে নিজেকে কেমন যেন অপরাধী লাগলো ওর। এ্যাসট্রের গা ঘষে সিগারেটটা নিভিয়ে বেড্ সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিলো।

—কত আশ্চর্য ঘটনাই না ঘটে এই পৃথিবীতে—চোখ বুজে ভাবতে লাগলো বরুণ।

মিনিট দুই পরে—

"ওরে বাবারে···!" আর্তস্বরকাতর গলা দীপার।

বরুণ ধড়মড়িয়ে লাফিয়ে উঠলো। আলো না জ্বেলেই ছোটোঘরে ছুটলো! ঘরে ঢোক সঙ্গেই কম্পমান দীপা একটা অসহায় করুণ ভঙ্গি নিয়ে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলো ওকে। ত্রস্ত বরুণ শুধা

"কী হয়েছে দীপা?" ভয় পেয়েছো?

মেঝেটা আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে দীপা থরথরিয়ে হিস্টিরিক রোগীর মতো কাঁপতে লাগলো, তাড়াতাড়ি তিনি। চাঁদের চোরানো আলোতেই বরুণ দেখতে পেলো—পাশের বাড়ির সাদার

বেলানো হলো বেড়ালটা, দীপার মেঝেতে পাতা সুজনির একপাশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। বরুণ হেসে ফেললো।

—এই সাহস দীপার! এতক্ষণ এত কথার ফুলঝুরি ছড়ালো যে মেয়ে, সে কিনা একটা বেড়াল দেখে—

দীপার কাঁপুনি বেড়েই চললো। ভক্তি আরো এলানো।

বরুণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ওর মনের তলায় এক অস্থিরতা কাঁপছে। পাঁচমিনিট আগেকার বরুণের সঙ্গে এখনকার বরুণের বুঝি এতটুকু মিল নেই। যেন হঠাৎই মনটা দুর্বার বাঁক নিয়েছে একটা। দীপাকে জেমনি করে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে বরুণ। হৃদয়ের আধারে আশ্চর্য অনুভূতি রক্তের দোলায় বিচিত্র স্পন্দন। এ অনুভব বরুণের একেবারে নতুন। আগেকার কোনোদিনের সঙ্গে এ অনুভবের কোনো মিল নেই। কয়েকটি দীর্ঘ মুহূর্ত অপেক্ষার পর, বরুণ পাঁজাকোলা করে দীপাকে বিছানায় এনে শুইয়ে দিলো। ঘর থেকে ছোট ঘরে যাবার দরজাটা বন্ধ করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো।

চোখ বুজে বালিশে মাথা গুঁজে পাশবালিশ আঁকড়ে শুয়ে আছে দীপা। বোজা-চোখের মণি দুটো মৃদু মৃদু কাঁপছে।

—হলোর ধূসর রোঁয়া রোঁয়া থাবাদুটো ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে ওর দিকে—বাঁকানো দারালো বড় বড় নোখ, এলো ··।

এসে গেলো...দীপার মুখ ছুঁই ছুঁই। লাল—নীল—কালো-হলুদ ভয়। মিউ—করে শব্দ হলো একটা। আর যায় কোথায়—বালিশ পাশবালিশ ছিটকে ফেলে দীপা প্রায় গড়িয়ে চলে এলো বরুণের পাশে। আর এক মুহূর্তও দেরি করলো না বরুণ, দুহাত বাড়িয়ে দীপাকে কাছে টেনে নিলো। হৃদয়ে যত প্রেম আছে, সব যেন উজাড় করে একেবারে ঢেকে দিল দীপাকে।

নিঃশব্দ রাত্রি আর নিভৃত কক্ষ, আলোর লাবণ্য আর আঁধারের গোপনতা, বাতাসের উল্লাস আর আকাশের হাতছানি, তীব্র আবেগ আর এলোমেলো ভয়, দুটি তরুণ সুকুমার শরীর আর উন্মুখ-মঞ্জুরিত মন—সব মিলিয়ে স্বর্গ রচনা করলো।

বরুণের বুকে মাথা গুঁজে নিরাপদ দীপা লজ্জায় ভীরু হচ্ছে—ছিঃ, ছিঃ, এমন উৎকট বেড়াল ভীতি ওর, বরুণ নিশ্চয়ই অন্য কিছু ভাবছে। হলোকে একটা রুপোর বগ্‌লাস দেয়া মনে মনে স্থির ক'রে ফেলেছে।

বঙ্গদেশ আজ মা হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার কোলে বঙ্গবাসী নামে এক সুন্দর শিশু * * * আমি আশ্বাস পাইতেছি এ সন্তান মরিবে না।

—রবীন্দ্রনাথ

আগুন যখন জ্বলে
উপন্যাস
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বর্ণ বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল
উৎসব সমারোহ
দূরান্তের আত্মীয়
পরিজনের সান্নিধ্য
উজ্জ্বলতর হোক....

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

MEDIUMISE-P 60

আগুন যখন জ্বলে

নদী তাকে ঠিক বলা চলে না। উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি অপ্রশস্ত একটি খাল। নাম যমুনা-আর এই যমুনা-জোড়ের নাম অনুসারে তার পূর্বদিকের ছোট্ট গ্রামখানির নাম যমুন-গাঁ।

নদীর ওপারের জমিটা একটু উঁচু। কাঁকর-পাথরে ভরা ডাঙ্গা। মাঝে মাঝে শুধু বাবলা আর বাঁশের জঙ্গল। ওখানে চাষ-আবাদ চলে না। মানুষের বাস-বস্তিও ছিল না।

নদীর এপার-ওপার দু'পার যেন দু'রকম।

যমুন-গাঁয়ের উর্বর মাটিতে ফসল যখন ফলে, অদূরের ওই প্রকাণ্ড প্রান্তরটা তখন বহু সকরুণ নয়নে এপারের এই গ্রামখানির দিকে—তার শস্যশ্যাম ক্ষেত খামারের দিকে মনে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

কিন্তু এমন একদিন এলো, ভূতত্ত্ববিদের কল্যাণে কাঁকর-পাথরের সে ডাঙ্গা জমিটাও কাজে লেগে গেল।

কোথাকার কোন্ এক আর্মেনিয়ান সাহেব বোরিং করে দেখলেন সে ডাঙ্গার নীচে নাকি আছে। জমির নিম্নস্বত্ব কিনলে বড় জমিদারের কাছে, তারপর ওপরের স্বত্ব কেনার হিড়িক পড়ে

তারপর সে এক হৈ-হৈ কাণ্ড। কত যে লোহা-লক্কড়, কত কল, কত চাকা, কত আর কত জয়েন্ট এসেন্ এসে পড়লো তার ইয়ত্তা নেই। বয়লার এলো, চিমনি বসলো, মাটি খুঁড়ে হলো। পাথর-কাটা ডিনামাইটের শব্দে গ্রামের মানুষগুলি থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

আপিস হলো, বাংলো হলো, ছোট বড় ইমারতে অট্টালিকায় জায়গাটা একেবারে ভরে

গাঁয়ের মুখে হেড-সিয়ারের চাকা বন বন করে ঘুরতে লাগলো। মাটির তিনশো ফুট থেকে কালো কয়লা উঠতে লাগলো ওপরে।

যমুন-গাঁয়ে একটা লোক ছিল। নাম ছিল তার শ্রীমন্তলাল। লোকে তাকে চিমনলাল ডাকতো। চার পাঁচ বিঘে জমির ফসলে দিন তার ভাল চলতো না। বাড়ীতে ছিল একটা ছো আর এক বিধবা বোন।

এই সুযোগে তার একটা সুরাহা হলো। যমুনা-জোড়ের ওপারের ডাঙ্গার কয়েক বি তার ছিল। কোম্পানী তা চড়া দামে কিনে নিলে।

চিমনলাল ভাবলে দিন বুঝি তার ফিরে গেল। হতভাগা এ গাঁয়ে বাস করে আর লাভ

অন্ধ এক ব্রাহ্মণ কুঞ্জবিহারী তার প্রতিবেশী। চিমনলাল জানতো তার টাকা আছে। আ থেকেই সেই টাকাগুলির ওপর ছিল তার লোভ। এইবার একটা 'মওকা' পেয়ে গেল। হা

করে এসে বসলো তার কাছে। 'পেন্নাম হই ঠাকুর' বলে ভক্তিভরে একটি প্রণাম করলে তারপর নিবেদন করলে তার আর্জি। বললে, 'আমার জমি ক' বিঘে তোমাকে নিতে হবে ঠাকুর।'

সঙ্গে সঙ্গে দামদস্তুর হয়ে গেল। লেখাপড়া করলে, টাকা নিলে, কিন্তু রেজেষ্ট্রি রইলো বাকি বললে, ওর জন্যে আর কিসের চিন্তা, যখন হোক্ একদিন রেজেষ্ট্রি করে নেবো।

তারপর একটি শুভদিন দেখে গ্রামের বাস সে তুলে দিলে। কুঠিপাড়ায় কয়েকটি টিন আ খাপরার বাড়ী তৈরি করে সেইখানেই চলে গেল।

গরুর গাড়ীর চাকার লোহার বেড়ি বসাতে পারতো চিমনলাল। আরও অনেক কিছু পারতো। সেই বিদ্যা সম্বল করে চিমনলাল সেখানে খুলে বসলো একটি কামারশালা।

ভাবলে যদি কামারশালা না চলে তো পরে অন্য কিছু করবে।

কিন্তু মানুষের আর যখন বাড়ে, ভগবান তাঁর যাবের পথ বেশ প্রশস্ত ক'রে দেন। ছেলে মদন গোপালের বয়স তখন ছোল। কামারের ছেলে, লেখাপড়া শেখেনি। শিখেছিল কেমন ক'রে তা ভাঙতে হয়, 'ফোর-সিজার' কুমুদের ক'টা প্যাচ্, আর 'আয়রণ-সেফ' ভাঙতেই বা ক'টা হাতুড়ি প্রয়োজন। বাপের বাক্স ভেঙে মদনগোপাল টাকা ওড়াতে লাগলো।

তখন সবেমাত্র তাদের বাড়ীর সুমুখে লাল কাঁকরের রাস্তাটার ধারে দোকান-ঘানি বসতে আরম্ভ হয়েছে। সারি সারি খাপরার বাড়ীগুলোর সামনে পুরনো টিন, পেরেক আর শালের খুঁটি দি চালা নামানো হচ্ছে। কোথাও সেলাইয়ের কল, কোথাও ঘুড়ির দোকান, কোথাও কাঠের গোল বিড়ির দোকান, মদের ভাঁটি। হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, কাবুলীওয়ালা, মাদ্রাজী, কত দেশের ক ব্যবসাদার এসে কারবার খুলছে। এদের ভেতর মদনগোপাল নিজের সঙ্গী বেছে নিলে। তারপর একদি এক মাড়োয়ারীর দোকানে তালা ভেঙে টাকা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লো। চিমনলালের কপাে কিছু অর্থদণ্ড ছিল। টাকা দিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে এনে অপমান তিরস্কারের কিছু বাকি রাখলে না।

বিধবা বোন বললে,—ঘরে বৌ আন্ দাদা, বাঁদরামি ওর ঘুচে যাবে।

তাই হলো। বার-তের বছরের একটি মেয়ের সন্ধান করে চিমনলাল ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলে

মন কিন্তু মদনগোপালের তাতেও বসল না। একদিন এক অন্ধকার রাত্রে বাপকে সর্বস্বা করে দিয়ে—ঘরে বৌ রেখে সে যে কোথায় কোন্‌দিকে উধাও হয়ে গেল কেউ তার খোঁজ-খবর দি পারলে না।

যমুন-গাঁয়ে যে অন্ধ ব্রাহ্মণের কাছে জমি বিক্রির নামে টাকা নিয়ে চিমনলাল কুঠিপাড়ায় উ এসেছিল, সেঁ বেচারার সংসার বলতে তের-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে। নাম দাসী। দেখতে সুন্দরী এত সুন্দরী যে, সচরাচর তেমন মেয়ে পাড়াগাঁয়ে বড় একটা নজরে পড়ে না। আর শুধু সেইজন দাসীকে নিয়ে গ্রামের লোক কত কথাই না বলাবলি করে।

সত্যিই তো।

বাপ অন্ধ। আর তার আগুনের মতন এই সুন্দরী মেয়ে। বিয়ে দেবে কেমন করে? অ কেউ কেউ বলে, বুড়ো অন্ধ হলে কি হবে, বুড়োর টাকা আছে। কৃপণ-কঞ্জুষের একশেষ। এই উপযুক্ত শাস্তি। মরুক ব্যাটা জলে-পুড়ে।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, অন্ধ কুঞ্জবিহারীর জলে-পুড়ে মরবার কোনও লক্ষণই দেখা যায় না।

তারও আগের কথা। প্রায় দশ-এগারো বছর হ'লো। কুঞ্জবিহারীর স্ত্রী দামিনী তখন ছিল। দাসী তখন নিতান্ত ছোট।

বাপের বাড়ী থেকে একটা গরুর গাড়ী করে দামিনী-বৌ যমুন-গাঁয়ে ফিরছে। দুধারে ধানের ক্ষেত। মাঝে গাড়ী চলবার একটি কাঁচা রাস্তা। চৈত্র মাস। দু'পহরের রোদ তখন চারি ধাঁ ধাঁ করছে। গরু দুটো আর চলতে পারছিল না—পথের ধারে একটা আম গাছের ছায়ায় গাড়ী খুলে দিলে। অদূরে পত্রবিহীন একটা সজনে গাছে বিস্তর ডাঁটা ঝুলছিল। দামিনী-বৌ অ চিৎকার করে উঠলো,—'ও বাবা কিষ্ট,—দে বাবা চারটি পেড়ে'—ওই স্থাখ্ বাবা, ওই স্থাখ্! সজনে-গাছ স্থাখ্ একবার, হা-স্থাখ্ ভাল!'

'বাবাঃ! এই ধুদ্ রোদে! না বাবু, পারবো।'—বলে কেষ্ট-গাড়োয়ান জল খাবার মাঠের মাঝে একটা ছোট ডোবার দিয়ে নামলো।

নিরুপায় হয়ে দামিনী-বৌ এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। তার নিজের উঠবার নয়, সে নিজেই বোকা-কতক পেড়ে নিতে পারতো। ছেলেবেলায় এমন সে কত পেড়েছে।—

সেই রাস্তার ওপরেই কিছু দূরে মনে হলো যেন একটা বছর-আট-দশের ছেলে টিল কাঁচা আম পাড়ছে। দামিনী-বৌ ডাকলো—ওরে ও বাবা, কে বেটিস্ রে তুই!

ছেলেটা পেছন ফিরে আম কুড়চ্ছিল, বোধ করি শুনতে পেলে না।

দাসী তখন গাড়ীর ভেতর ঘুমোচ্ছে। দামিনী-বৌ তাড়াতাড়ি একটুখানি এগিয়ে গিয়ে ডা —ওরে ও ছোঁড়া, তুখা ঘর বেটেরে তুর?

কাঁচা একটা আমে কামড় দিয়ে মুখখানা বিকৃত করে ছেলেটি এবার পেছন ফিরে তাক ডাগর ডাগর চোখ, গায়ের রং কালো, কিন্তু মুখের গড়ন বেশ সুন্দর। পরনে ক্যাকাসে গেরুয়া ছেঁড়া একটা কাপড়। গলায় যজ্ঞোপবীত।

দামিনী-বৌ বললে,—ওমা! তুই বামুনদের ছেলে নাকি রে?

মুখের চিবানো আমটি সে প্রথমে চোখ বুজে গিলে ফেললে, তারপর বললে,—হঁ গ।

নাম কি তুর? ঘর কুথায়রে? মা-বাপ আছে?

কিন্তু একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠলো না, চুপ করে হাতের আমটায় আর এক কামড় দিয়ে কচ্‌মচ্ করে চিবুতে লাগলো।

দামিনী-বৌ বললে,—মার দেখি বাবা, আমাদের ছোই গাড়ীর কাছকে। দু'টো সাজ, খাড়া পেড়ে দিবি।—ছুট্ গাছ, বেশী ডাগর লয়।—পাশের ধারে একটা ছোট খেজুর গাছের দিকে আঙ্ দেখিয়ে বললে,—এই এতটুকুন্।

সাগ্‌নে? হুঁঃ! আমি বলে তাল গাছে উঠতে পারি! এই বলে ছেলেটি একটুখা থামলো।

তারপর চোখ দুটো তুলে সে আবার জিগ্যেস্ করলে,—হ'-গো, দুন্ আছে। তোমাদে কাছে? দুন্?

দামিনী-বৌ বললে,—না বাবা, দুন তো নাই।

তবে—হোই দে, যা!—বলে সে তার হাতের আধ-খাওয়া আমটি মাঠের দিকে সজোরে ছুঁড়ে দিলে। কাঁচড়ের অবশিষ্ট কয়েকটি আম মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে দামিনী-বৌ-এর আগে-আগে গাড়ি দিকে চলতে চলতে বললে,—এস, হেথাই দাও—সে সাগনে গাছটো।

দামিনী-বৌ এতগুলো কাঁচা আমের মায়া পরিত্যাগ করতে পারলো না। সেগুলো সে ত আঁচলে কুড়িয়ে নিয়ে বললে, যাই বাবা, এই যে, এগুলোর টক্ রাঁধবো গা আজকে।

তারপর বলতে-না-বলতে ছেলেটা অতিশয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সজ্‌নে গাছে চড়ে বসলো। দামিনী বৌ যতক্ষণ না নিষেধ করলে—ততক্ষণ সে গাছ থেকে নামলো না।

বছরের এই সময়টায় এমনিতে তো পত্রপুষ্পহীন সজ্‌নে গাছের শোভা সৌন্দর্য্য কিছুই থাকে না, তার ওপর এই ছেলেটির কল্যাণে গাছটি সেদিন একেবারেই ন্যাড়া হয়ে গেল।

এতগুলো সজ্‌নের ডাঁটা দেখে কেষ্ট গাড়োয়ানের অত্যন্ত লোভ হলো। বললে,—আমাকে গুচ্ছেক্ দিবে ঠাকরুণ!

দামিনী-বৌ বললে,—ই-রে খালভরা, না দিলেই লয়। ভাগ্যি ভাল এই ছেলেটি ছিল! । বাবা,—তুমার নাম কি বাবা?

ছেলেটি তখন গাড়ীর চাকার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বললে,—আমার নাম লখিন্দর।

কুন্ গাঁয়ে ঘর বাবা তুমার?

ঘর? বলে একটা বলদের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে,—এনেক্ দূর—হোউ মাধবডি।

কেষ্ট গাড়োয়ান মাধবডি চিন্‌তো। বললে,—ও বাবা, মাধড্ডি হেতা কুথা ঠাকরুণ, ইখান থেকে আট-দশ কোশের বেশী তো কম লয়।

দামিনী-বৌ অবাক্ হয়ে গেল। মিনিট খানেক পরে জিগ্যেস্ করলে,—তবে ইদিকে কোথা যে ছিলে বাবা তুমি?

লখিন্দর বললে,—আম খেতে এসেছিলাম।

—আম? সেই মাধড্ডি থেকে?

সখিন্দর এবার হেসে ফেললে। বললে,—না গো, তাই আসে? আমি যে হোই গাঁ আছি আজ কদ্দিন থেকে।—উত্তর দিকে মাইল খানেক দূরে কতকগুলো গাছপালার আড়া গ্রামখানা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল সখিন্দর হাত দিয়ে তাই দেখিয়ে দিলে।

'কেনে? উ গাঁয়ে তুমার কে আছে সখিন্দর?'

'থাকবেক্ আবার কে? ছুতোর ঘরে থাকি।'

দামিনী-বৌ বললে,—হেই মা! বামুনের ছেলে ছুতোর ঘরে কেনে বাবা?

সখিন্দর বললে,—ই, উয়াদের ঢেঁকশালে আজ বইচি যে কদ্দিন থেকে।

দামিনী-বৌ-এর বড় ভাবনা হলো, বললে,—হঁ বাবা, তাহেলে ঘরে তুমার কে আ বাবা?

সখিন্দর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল। বললে,—না। কাকা আছে আর খুড়ি আছে।

'সে আবার কেমন কাকা খুড়ি গো!'

সখিন্দর বললে,—খুড়ি-শালী ভারী বজ্জাত যে!

দামিনী-বৌ মিনিট খানেক চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলে, তার পর জিগ্যেস করলে বাবা, তুমরা কুলিন বামুন?

সখিন্দর বললে,—হঁগো, চাটুজ্যে আমরা।

দামিনী বললে,—আমাদের সঙ্গে যাবে সখিন্দর? আমাদের ঘর যমুন-গাঁ।

হঁ, চল।—বলে সখিন্দর আর কোনও কথা না বলে গাড়ীর ওপর চড়ে বসলো।

সখিন্দর সেই যে এসে যমুন-গাঁয়ে ঢুকলো,—আর কোথাও গেল না।

তার পর বছর-পাঁচছয় পরে দামিনী-বৌ মারা গেল।

সখিন্দর বড় হলো।

চাষে খেটে, ঘরের কাজকর্ম করে এখন সে বেশ মোটাসোটা হয়েছে, গোঁফ উঠেছে, গায়ে কিন্তু আরও কালো হয়ে গেছে।

কথাবার্তায় কাজে-কর্মে অনেক সময় তাকে পাগল বলে মনে হয়।

তা হোক্। কুঞ্জবিহারী এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন যে সখিন্দর কুলিনের ছেলে, দ তার হাতে তুলে দিয়ে তিনি নির্ভাবনায় মরতে পারবেন।

সেদিন আহারাদির পর কুঞ্জবিহারী হাঁকলেন,—হঁকো কলকেটো একবার দিয়ে যা তো দা

কলকের তামাক সেজে আগুন দিয়ে হঁকোটা সে তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে এলো। কিন্তু টানতে টানতে হঠাৎ এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেই, আগুন সমেত কলকেটা বৈবাৎ তাঁর গায়ের পড়ে গেল।

কুঞ্জবিহারী চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন, ওরে বাবারে,—বাবারে,—মেলেক্ এই আবা বিটিটো আমাকে মেলেক্!

দাসী ছুটে এসে আগুনের টুক্‌রোগুলো সরিয়ে দিয়ে বললে,—দিজে ফেললে, ফেলে আমা হলো দোষ?

কানা কুঞ্জ আগুনের ভয়ে তখন দেয়ালের কাছে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন,—দোষ হবে নাই? কই, আর কুনদিন পড়ে না কেনে?

তাঁর এই তিরিক্ষি মেজাজের কথা দাসীর অজানা ছিল না, তাই সে আর বেশী কিছু না বলে দু ঠোঁট দিয়ে এক রকম শব্দ করে বললে,—আ-মরণ!

কর্তার এই নতুন গুনে কুঞ্জবিহারী আবার লাফিয়ে উঠলেন। 'হুঃ! আমার মরণ তো ইবার চাইছিস তুরা! হা-ভগবান! এই বলে সেইখানেই তিনি উবু হয়ে বসে পড়লেন। হাত দুটি জো করে উপরে কড়িকাঠের দিকে মুখ তুলে কান্নার সুরে বলতে লাগলেন,—উঠতে বসতে আর কেনে! নরক-যন্ত্রণা পদু! ইবারে কিপা কর ভগবান!…'

ঘরের চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে বুড়ো বাপের কাণ্ড-কারখানা দাসী সবই দেখলো। রাগে দুঃখে তার মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বের হলো না, ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে গিয়ে সে রান্না-ঘরে চালার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়ে নিজস্ব উনোনটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

বৈশাখ মাস। গতকাল বিকেলে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাঠে লাঙল দেবার জন্যে কৃষাণের সঙ্গে একটা কোদাল হাতে নিয়ে লখিন্দর সেই কোন্ সকালে বেরিয়ে গিয়েছিল। বেলা দুপুর গড়িয়ে গেলে সে বাড়ী ফিরে এলো।

পায়ের শব্দ পেয়ে কুঞ্জবিহারী বললেন, কে?-কে বটে?

আমি লখিন্দর। বলে হাতের কোদালটা সে সশব্দে দেয়ালের কাছে নামিয়ে রাখলো।

নীচের দিকে মুখ নামিয়ে কুঞ্জবিহারী আপন মনেই বললেন,—সেই ভাত খেয়ে খেকে তামুক খেলম নাই এক ছিলুম,—এমনি কপাল! হা-ভগবান!

লখিন্দর একেবারে স্নান করে বাড়ী ঢুকেছিল। ভিজে কাপড়টা ছেড়ে তাড়াতাড়ি কলকে আগুন চাপিয়ে নিজেই বার কতক টেনে, তারপর হুঁকোটা কুঞ্জবিহারীর হাতে দিয়ে, ভাত খাবার জন্যে রান্নাঘরে চলে গেল। দেখলো, দাসী তখনো খুঁটিতে ঠেস্ দিয়ে হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে চুপ করে বসে আছে। লখিন্দরকে দেখে সে অন্যদিনের মত ভাত দেবার জন্যে উঠে গেল না।

লখিন্দর তার কাছে গিয়ে বললে,—এই! ভাত দে।

দাসী ভ্রূক্ষেপ করলে না। লখিন্দর ভাবলে,—সে ঘুমিয়ে গেছে, মাথায় হাত দিয়ে ডাকলে,—এই! দাসী! উঠ!

দাসী ঘাড় নেড়ে বললে,—লারব। নিজে বাড়্গা, বেড়ে নিয়ে খেগে যা।

সকাল থেকে কিছু না খেয়ে ক্ষিদের তখন তার পেট মলছিল, বললে,—ভ্যাংরাম্বি এ সময় লাগে না দাসী, দেখা বলছি,—উঠ !

হকুন শুনে দাসী মাথা তুলে বললে,—ও মাগো ! ইনি আবার রাজপুত্তুর এলেন অ খাবি তো খাপ্পা ভালোয় ভালোয়,—না খাবি তো হোই রইল পড়ে !

ক্ষিদে তখন তার অসহ্য হয়ে উঠেছিল, লখিন্দর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, ধীরে রান্নাঘরের ভেতর ঢুকে নিজেই একটা থালা নিয়ে ভাত বাড়তে আরম্ভ করলে।

কিছুক্ষণ পরে দাসী মাথা তুলে তাকালো। একবার উঠতেও গেল, কিন্তু লখিন্দর তখন থালাটা নিয়ে রান্নাঘরের অন্ধকার কোণের দিকে ব'সে খেতে সুরু করেছে। সে আর উঠে আবার তেমনি মাথা গুঁজে হাঁটুর ফাঁকে মিটমিট ক'রে তাকিয়ে দেখতে লাগলো,—অনভ্যস্ত হা তার কানাউঁচু থালাটার ওপর একরাশ ভাত ঢেলেছে, বাটি অভাবে বিরিকলাইয়ের পাতলা ডাল কানা ছাপিয়ে মাটিতে পড়ছে।

ক্ষিদের চোটে ভাতগুলো যখন সে প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছে, দাসী তখন উঠলো। ঘরে ঢুকে মুখটিপে একবার হাসলো। তারপর মুখে কোন কথা না বলে নিজের ভাগের ভাত, ত লখিন্দরের উচ্ছিষ্ট থালায় ঢালতে আরম্ভ করলে। ব্যাপার দেখে লখিন্দর হাত নেড়ে তাকে করতে গেল, বললে,—লারব বলছি, আমি আর খেতে লারব দাসী, ঢালিস্ না,—ঢালিস্ না।

কিন্তু দাসী সেকথা শুনলে না, ছেঁসেলে যা-কিছু ছিল, সমস্তই উজাড় ক'রে দিয়ে আবার বাইরে এসে হেঁটমুখে ব'সে রইল।

দাসী নিজে তখনও খায়নি। সে যে তার নিজের ভাত-তরকারি তার থালায় ঢেলে দিয়ে —অতসব গোলমেলে কথা বুঝবার মত মাথা লখিন্দরের নয়। মানুষের ক্ষিদেরও একটা পরিমাণ অনেক চেষ্টা করেও ভাতগুলো সে নিঃশেষ করতে পারছিল না। অথচ দাসীর মত চালাক চতু যে কেন এমন অবুঝের মত কাজটা ক'রে বসলো তাও সে ভাল বুঝতে পারল না। শেষে আপ বলে উঠলো, ইয়ার চেয়ে বললেই তো হয়,—যা ইবারে আরসা তুই। ঘাড়ে ধরে তেড়ে দিলেই তে

দাসী শুনতে পেল কথাগুলো। বক্তার উদ্দেশ্যও ছিল তাই। তেমনি মাথা হেঁট ক অবাব দিলে, —'যা কেনে,—কে লেহন্ করছে তুকে ?

দাসীর মুখ থেকে অবাবটা যে এমন রূঢ় হয়ে বেরুবে লখিন্দর তা ভাবেনি। তাই সে মুখোমুখি উত্তর-প্রত্যুত্তরের জন্য প্রস্তুত হয়েই বাঁ-হাত দিয়ে রান্নাঘরের কালিমাখা দরজাটা টেনে বাড়িয়ে বললে,—আমি কি খেতে চাইছি নাকি ? বলি—আমি কি একটি রাক্কোস্ যে আমাকে পিণ্ডি গিলতে দিয়ে গেলি ?

রাক্কোস ল'দ্ তো কি বেটিস্ তুঁই ? এই বলে দাসী একটুখানি থেমে বললে, কই ডাক ই-গাঁয়ে কে আছে আমি একবার দেখি—কে এতো খেতে পারে তোর মতন ? দেখি সে কেমন মা

লখিন্দর উল্টো পথ ধরলে, বললে,—আর তুই বুঝি কচি খুঁকি? তুই খেতে লারিস? ভাতের থালা যে বিড়ালে ডিংতে লারে!

দাসী বললে,—বেশ করি—খাই আমার বাবার খাই। তুই কার খাস্?

ভেতর থেকে আর কোন জবাব পাওয়া গেল না। মিনিট-দশ পরে রান্নাঘর থেকে যে পুকুর থেকে যখন সে আঁচিয়ে ফিরলো, তখনও পর্যন্ত মুখ দিয়ে সে একটি কথাও বললে না।

আহারাদির পর লখিন্দরের একটুখানি ধূমপানের দরকার হয়। দাসী যেখানে বসেছি তার পাশেই উনোন্। কল্কের তামাক সেজে আগুন নেবার জন্যে লখিন্দর সেই উনোনটার কাছে এসে বসলো।

এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে কুঞ্জবিহারী হাঁকলেন,—লখিন্দরের খাওয়া হলো রে?

লখিন্দর তখন চিম্‌টে দিয়ে কল্কের ওপর আগুন চাপাচ্ছে। বললে, কি বলছো?

কুঞ্জবিহারী বললেন,—আমাকে ধ'রে ধ'রে নিয়ে চ' তো বাবা একবার কুঠিপাড়া। চিমুনলাল দেখছি মহাবিপদে ফেললেক আমাকে।

কল্কের মুখ দিয়ে লখিন্দর আগুন বেরাতে লাগলো।

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে কুঞ্জবিহারী আবার ডাকলেন, লখিন্দর!

কিন্তু কারও কোন উত্তর পাওয়া গেল না।—না দাসীর—না লখিন্দরের।

অন্ধ কুঞ্জবিহারী বললেন, কেউ যে রা কাড়ছে নাই রে?

দাসীর দিকে পেছন ফিরে লখিন্দর বসেছিল, চুপি চুপি বললে,—আমি লারব।

কথাটা বলেই সে কুঞ্জবিহারীকে এড়িয়ে তামাক টানবার জন্যে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

কুঞ্জবিহারী আবার হাঁকলেন,—দাসী!

দাসী এবার কথা বললে। রা কাড়বেক নাই কেনে,—উ কি কম বজ্জাত! লারবে বলে পালালো।

এবার ঘরের ভেতর থেকে কানা কুঞ্জর বেশ একটু রুক্ষ কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল—'দু' চালের ভাত মারছেন দু'বেলা! তার একটা কিতজ্ঞতা নাই! কানা মানুষ, একা একা যা ব্যাটা যে যাবি, হুমড়ি খেয়ে পড়ে মরিস তো মরবি,—আমার কি! হা-ভগবান!

কিন্তু এইমাত্র তার এই খাওয়ার কথা নিয়ে লখিন্দরের সঙ্গে দাসীর বচসা হয়ে গেছে। হয় তারই জন্যে সে রাগ করে কুঠিপাড়ায় যেতে চাইল না। এই ভেবে সে অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যই বোধকরি দাসী এগিয়ে এলো। বললে, আমি গেলে হবেক?

কুঞ্জবিহারী বললেন,—হুঁ, তা তুই যদি ঠ্যাঙা ধরে ধরে আমাকে নিয়ে যেতে পারিস, তা হবেক্ নাই কেনে, হবেক্।

তবে আমি চট্ করে চারটি খেয়ে নিই, দাঁড়াও। বলে দাসী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে

আলো থেকে অন্ধকারে এসে ঘরের ভেতর প্রথমে তার নজর চলছিল না। হেঁসেলে যা-কিছু ছিল সে রাগ করে লখিন্দরের থালায় তখন ঢেলে দিয়ে গেছে। ভেবেছিল অতগুলো ভাত সে পারবে না!

এই ভেবে সেই কাপসা অন্ধকারে আন্দাজি সে তার উচ্ছিষ্ট থালাটার দিকে হাত বাড়ালো।

ও মা, এ কি? থালা একেবারে পরিষ্কার। একটি ভাতও ফেলে রেখে যায়নি।

কিক্ করে আপনমনেই হেসে ফেললে দাসী। তারপর কতকগুলো মুড়ি এনে থালায় দি সে পেটভরে খেয়ে নিলে।

কুঞ্জবিহারী অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। দাসী বললে,—এই রোদ্-বেলাতে না-ই-বা গেলে ব টুকছেন বাদেই না হয় যেও।

কুঞ্জবিহারী রেগে উঠলেন। বললেন, কাহকেই যেতে হবেক্ নাই। তোদোই তোদোই নিজেই যাব।

এই বলে হাতড়াতে হাতড়াতে বাঁশের লাঠিটি হাতে নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

দাসী আর কোনও কথা না বলে চট করে ছুটে গিয়ে লাঠির একটা দিক বাঁ হাত দিয়ে ধরে আর একটা দিক বাপের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে, চল।

দু'জনে আগে-পিছে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে দরজার কাছে একটা নি তলায় নিরিবিলি বসে বসে লখিন্দর তামাক টানছে। দাসী তাকে দেখেও দেখলে না। তা সেদিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিলে।

বৈশাখের এই খর রৌদ্রে তারা যে সত্যিসত্যিই এমনি ক'রে বেরিয়ে পড়বে লখি ভাবেনি। হুঁকোটা সে তাড়াতাড়ি সেইখানেই নামিয়ে রেখে তাদের কাছে এসে দাঁড়াল। ব আমাদেরই বলে মাটিতে পা পুড়ে যাচ্ছে, আর বাবাজির দেখ ইয়ের!—এই বলে দাসীকে কোন কথা বলতে না দিয়ে কুঞ্জবিহারীর লাঠিটা দাসীর হাত থেকে একরকম ছিনিয়েই নিজে টেনে নিলে।

দাসী বললে, না,—তুখে যেতে হবেক্ নাই। যা তুই তামুক খাগা।—বলে সে ল হাত থেকে লাঠিটা আবার ছিনিয়ে নেবার জন্যে হাত বাড়াল।

দাসীর হাতটা সরিয়ে দিতে আর কতক্ষণ! দাসীকে সরিয়ে লখিন্দর বললে, যমুন্ বালি হয়ে আছে তপ্ত আগুন! চেঁচাস্ না শুটেক্। যাস্। নিমতলায় ওই হুঁকোটা নি ঘরকে যা।

কুঞ্জবিহারী এতক্ষণ কোন কথাই বলেননি। ব্যাপারটা কি হচ্ছে বুঝতে তাঁর খুব বে হলো না। বাঁ হাতটা বাড়ালেন একবার। ভেবেছিলেন বোকরি দাসীকে তাঁর হাতে পাবেন। কিন্তু পেলেন না। দাসী তখন লখিন্দরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুঞ্জবিহারী বললেন, তাই যা কেনে তুই। বললে কথা শুনিস না কেনে?

দাসী মুখ টিপে একটু হাসলো। তারপর লখিন্দরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললে, তা উয়ার মায়া কিনা আমার ওপর, তাই ভাতগুলা সব মেরে দিয়ে আমাকে উপোস্ দেয়ালেক্।

কথাটা শুনে লখিন্দরও না হেসে থাকতে পারলে না। কি যেন সে বলতেও গেল, কি কুঞ্জবিহারী রয়েছেন সঙ্গে, কাজেই কিছু বলা আর তার হয়ে উঠলো না। হাসতে হাসতে ফিরে তাকিয়ে দেখলে, দাসী নিমগাছের তলা থেকে হুঁকোটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকছে।

কুঠিপাড়া থেকে তারা যখন ফিরলো তখন সন্ধ্যা। চিমনলালের সঙ্গে তাদের দেখা হয়নি মুখখানি শুকনো করে কুঞ্জবিহারী ঘরের দরজার কাছে চুপ করে বসলেন এসে। লখিন্দর আস্ফালন করতে লাগলো, চিমনলাল শালাকে যদি আমি না মারি তো, আমার নাম মিথ্যে! টাকা নিয়ে ফাঁকি দেয়া,—শালা এতবড় বজ্জাত!

কুঞ্জবিহারী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—হা-ভগবান! কানা বামুনকে ফাঁকি দিলে তুমিই দেখো পদু, লিক্কংশ করো উয়াকে!

লখিন্দর তামাক সাজতে বসলো। তামাক সাজতে সাজতে বললে—ওই জমি ই-বছর আবাদ করবো,—তারপরে দেখবো ব্যাটা কি করতে পারে! কোম্পানির চোটে চিমনলালের ওই হাঁড়ির মত মুখ—আমি দু'কাক করে দেবো।

কুঞ্জবিহারী মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। বললেন, রেজেষ্টলি করে' দেব বলে' লেখাপড়া কাগজটাও যে বেটা হাত করে নিয়ে গেল। হা-ভগবান। কানা বামুনকে যেমন পথে বসাইছে পদু উয়াকেও যেমন তেমনি পথে বসতে হয়।

লখিন্দর বললে, তাঁহা দেখলাম,—চোখের ছামুতে বসে রইছে বেটা, আমাদিকে দেখে কু ক'রে কুন্‌রাগে পালালো! ওঃ! ইয়ের পিতিকার না করি তো আমার নাম মিছে।

কুঞ্জবিহারী জিগ্যেস্ করলেন,—হাঁ হে, সেই কে-একজন বললেক্ ওর ছেলেটাও কুন্‌দিনে পালাইছে?

লখিন্দর বললে,—হাঁ, সেই মদনা, বেটা চোর, শালা ডাকাত।

হুঁকোটা হাতে নিয়ে কুঞ্জবিহারী বললেন,—হে ভগবান! হে ভগবান! ইয়ের বিচের তুমি ক'রো বাবা।

লখিন্দর বললে, ভগবানকে করতে হবেক্ নাই,—আমি করবো। উয়াকে মেরে কেহেল খাটতে হয়, তাই খাটবো গা। এই বলে সে রান্নাঘরের চালার ওপর উঠে এসে বললে,—দাসী, দে চারটি ভাত দে, ঝপ ক'রে খেয়ে লিই।

ভাত রেঁধে দাসী একটা কেরোসিনের কুপি জেলে চুপ ক'রে বসেছিল, লখিন্দর কাছে এসে দাঁড়াতেই মুখ তুলে চাইলো।

লখিন্দর বললে,—ভাত দে।

দাসী বললে, জেলে খাওগে যাও।

লখিন্দর বললে, দাঁড়া আগে মারি চিমনলালকে, করেদ্ হোক্, তার পরে তো? এখন যে

দাসী বললে,—না, এক্ষুণি যাও।

লখিন্দর বললে, দাঁড়া, ভাত খেয়ে গায়ে জোর হোক্।

দাসী বললে, জেলের ভাত খেয়ে গায়ের জোর করবে। এখানে আর নয়।

লখিন্দর একটু হেসে বললে, তাহ'লে কি তুই বলতে চাস্, তুই আর আমাকে খেতে দিবি

'—না। কাল থেকে নিজেই রেঁধে খাবে।—বলেই দাসী সেখান থেকে উঠে পাল লখিন্দর তাড়াতাড়ি তার কাপড়ের আঁচলটা চেপে ধরে ফেললে। বললে, তুই আমার উপর কো করেছিস্ বল্।

দাসী বললে, লোককে তুমি মারবে? মেরে জেল খাটবে?

লখিন্দর বললে, চিমনলাল তুর বাবার টাকা মেরেছে, আমি চিমনলালকে মারব—' দোষ?

—হাঁ, তাতেও দোষ। মারবে কেনে? আদালত আছে, নালিশ করবে।

লখিন্দর বললে, আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবেক্। রাগ করিস না বাপু, ভাল লাগে না।

দাসী কিক্ করে হেসে ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

কিন্তু চিমনলালকে মারতেও হলো না, লখিন্দর জেলও খাটলে না, মাস পাঁচ ছয় পরে একদিন কলেরা রোগে চিমনলাল মারা গেল।

টাকা ফিরে পাবার আশা কুঞ্জবিহারী ছেড়েই দিয়েছিলেন। মানুষটা বেঁচে থাকলেও ব মাঝে দু'এক কথা শোনাবার পথ ছিল, এখন আবার তাও গেল। সংবাদটা শুনে কুঞ্জবিহারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, যা খালাস! বাস্তুনের অভিশাপ,—ছয়মাস পেরোলো নাই। কিন্তুক্ বেচারা, মরে গেল?

লখিন্দর এই সংবাদ বয়ে এনেছিল, রান্নাঘরের চালার ওপর দাসীকে ডেকে বললে,- দাসী,—খতম্! শালা পটল তুলেছে।

দাসী জিগ্যেস্ করলে,—কে?

—কে আবার? চিমনলাল।

দাসী বললে,—আহা, ভারি কষ্ট হলো কিন্তুক্ –

লখিন্দর বললে,—আহা কি? ওর জন্যে আবার আহা কি? যেমন কর্ম তেমনি ফল।

দাসী বললে, আহা, তা বলো না। ওর সেই ছেলেটো ফিরেছে? সেই মদনগোপাল?

না।

তবে? ঘরে তো রইলো সেই কালো বৌটা, আর ওর বিধবা বোন! কি করে কি হবে থাবেক কেমন করে?

একটু আগে যে লখিন্দর তার মৃত্যুসংবাদে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল, সেই লখিন্দরের বুক থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো। বললে,—হুঁ, তা বেটে!—এবং এই কথা বলবার পর তার মুখ চেহারাটাও সহসা বদলে গেল। এমনি বিচিত্র মানুষের মন!

এদিকে চিমনলালের বিধবা বোন কামিনী আর যুবতী বৌ নেড়ী—কি যে করবে কিছুই যে গেল না। কামিনী অনেক কাঁদলো, মরবার সময় টাকাকড়ি কিছুই সে রেখে যায়নি বলে কান্নার ম চিমনলালকে যেরকম করে সে গালাগালি দিতে লাগল, জীবিতাবস্থায় সেসব কথা স্বকর্ণে শুনলে কামিনী সে আস্ত রাখতো কিনা সন্দেহ।

কোনরকমে দিনকতক চললো। চিমনলালের কারবারের দড়ি, কাঠ, চাকার বেড়ি ইত্যাদি কিছু ছিল সেগুলো এক মাড়োয়ারীকে সওদরে বিক্রি ক'রে কামিনী আরও কয়েকটা দিন পার করলো

তারপর কিন্তু আর চলে না! পাড়া-পড়শী সকলেই বিদেশী, অপরিচিত। যমুন-গাঁয়ে দি কোন লাভ নেই। পাড়াগাঁয়ের অবস্থা সকলেরই সমান।

তাদেরই বস্তির খান-পাঁচছয় ঘর বাদ দিয়ে ছোট একটা খোলার ঘরে 'সোল্ড মেডেলিষ্ট' হোমিওপ্যাথ্ ডাক্তার থাকতো। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। গায়ের রং কালো, কিন্তু বেশ জীবন্ত চেহারা। চোখ দুটো আবড়ার আঁটির মত গোল, মাথায় ঢেউ-খেলানো টেরি। জনপ্রবাদ নাকি বেশ বড় লোকের ছেলে। নাম ভুবন সামন্ত।

লোকটা সবই জানে। জানে না শুধু হোমিওপ্যাথি। সস্তা বলে লোকজন আসে তার কা ওষুধও নিয়ে যায়, সারে যদি তো এমনিতেই সারে, ভাবে বুঝি তার ওষুধে সারলো।

না যদি সারে তো অদৃষ্টের দোষ দেয়।

অসহায় দরিদ্রের একমাত্র সান্ত্বনা।

মানুষের দারিদ্র্যের মূলধনে ভুবন সামন্তর ডাক্তারী চলছিল।

বৌ-এর অসুখ করেছে বলে কামিনী একদিন তাকেই বাড়িতে ডেকে আনলো। আনে বটে, কিন্তু এই রোগী আর ডাক্তারকে নিয়ে কয়েকটা দিন তাকে অত্যন্ত বেগ পেতে হলে তারপর কি হলো,—সে সব কথা আর জেনে কাজ নেই। দিন তাদের আবার বেশ ভালই চল লাগলো। এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে।

কিন্তু বেশী দিন নয়, সাত আট মাস পরে, একদিন রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ভু ডাক্তার কুঠিপাড়া ছেড়ে কোথায় চলে গেল কেউ কিছু জানতেই পারলে না।

ভুবন ডাক্তার যাক্, তার জন্য দুঃখ নেই কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, সেইদিন থেকে চি লালের যুবতী পুত্রবধূ নেড়ীকেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

শেষ পর্য্যন্ত তারা যে এমনি করে উধাও হবে কামিনী তা ভাবতেও পারেনি। প সকালে সে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে বসলো কিন্তু চোর যদি তার সঙ্গীকে ডাকি দেয়, তাহলে ডাক করে কিছুই বলবার থাকে না।

কামিনীরও হলো তাই। বেশিক্ষণ সে চেঁচিয়ে কাঁদতেও পারলে না। গোড়ারমুখী নেড়ীকে বারম্বার অভিশাপ দিতে লাগলো।

কামিনী ভেবেছিল তার লুকিয়ে রাখা যে কটি টাকা আর গয়না আছে তা যেবে না, কিন্তু এবার তাকে দায়ে পড়ে তাও করতে হ'লো।

যমুন-গাঁয়ে তাদের বসত-বাড়ীটা খালি পড়েছিল, কামিনী এক একবার ভাবে সেখানে চলে যায়, কিন্তু তাও সম্ভব নয়। বাড়ীর দেওয়াল চারটে শুধু খাড়া হয়ে আছে। খড় নেই।

তাছাড়া বাড়ীটা কুঞ্জবিহারীর বাড়ীর কাছেই। চিমনলাল তার কাছ থেকে টাকা নি কাণ্ডটা করে গেছে, তারপর আর কুঞ্জবিহারীর প্রতিবেশী হয়ে সেখানে বাস করাও চলে না, ধানের ব চাষ করিয়ে তার ধান-চাল নিয়ে পেট চালানোও চলে না।

এ ব্যাপারে ভয় অবশ্য তার কুঞ্জবিহারীকে নয়। কুঞ্জবিহারী অন্ধ। চোখে দেখতেও না। ভয় করে সেই লখিন্দর ছোঁড়াটাকে।

কামিনী তাই কুঠিপাড়াতেই থেকে গেল। এর ওর বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করে একটা কোনোরকমে চালাতে লাগল।

এমনি করে প্রায় বছরখানেক কাটালে।

তারপর একদিন এক শীতের সন্ধ্যেবেলায় কোথা থেকে হারানো মদনগোপাল হঠাৎ কিরে দরজায় হাঁকলো,—পিসি!

কামিনী ঘরেই ছিল। তাড়াতাড়ি উঠানে এসে তাকে দেখে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠ 'ওরে আমার মদনরে, ওরে আমার বাবারে, তুই এতকাল বাদে কি করতে এলিরে, নিজের বলতে যে আর কেউ নাই রে!'

তাদের যে এই হাল হয়েছে মদনগোপাল তা ভাবতেও পারেনি।

একটা ডাকাতি কেসে ধরা পড়ে তার জেল হয়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই সে বাড়ী কিরেছে। ভেবেছিল বাড়ীতে দিনকতক আরাম করে থেকেই সে আবার মৃগয়ায় বেরুবে।

বাপের মৃত্যু সংবাদ শুনে মদনগোপাল একটু কাঁদলো।

তারপর বৌএর কথাটা জিজ্ঞাসা করলে পিসিকে।

কামিনী প্রথমে খুব কাঁদলে খানিকটা। তারপর যে কথা বললে তার মর্ম্ম এই যে, বৌ লক্ষ্মী মেয়ে, মদনগোপালের গৃহত্যাগের পরদিন থেকেই কেঁদে কেঁদে না খেয়ে সে একেবারে

হয়েছিল, কেউ কিছু বললেই জবাব দিত যে, সে নিজে গিয়ে তার স্বামীকে খুঁজে আনবে। কা নিষেধ না শুনে একদিন সে সত্যি সত্যিই বনমাজোড় পর্যন্ত ছুটে পালিয়েছিল। কামিনী নিজে গি জোর করে তাকে ধরে আনে। কিন্তু সেই ধরে আনাই হলো কাল। তার পরদিন হতেই সেই তার কি অসুখ হলো,—ডাক্তার, কবিরাজ কেউ কিছু ঠিক করতে পারলে না। শেষে শুকিয়ে কা মত হয়ে একদিন রাতে সে তার মার কাছে যাচ্ছি বলে সেই যে চলে গেল, আর ফিরে এলো না।

না এলো তো বয়েই গেল।

মদনগোপাল বললে, হুঁ!

মদনগোপালকে আবার ফিরে পেয়ে কামিনী কিন্তু আশ্বস্ত হ'লো। ভাবলে,—ভাই-পো এ বড়-সড় হয়েছে, পায়ে ইংরেজী জুতো, গায়ে শাল, মাথায় টেরি,—এইবার বুঝি তার দুঃখ ঘুচবে পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করে আর তাকে খেটে হবে না। কিন্তু যে জন্যে মদনগোপাল ফিরে এসেছে, সে-সব অনেক কথা। কলকাতায় গিয়ে এই ক'বছরে সে অনেক কাণ্ড করেছে। অনেক পেয়েছে। অবশেষে একটা ঘড়ির দোকানে সে কাজ করছিল। মাইনে যা পেতো,—একটা মানুষ দিন তাতে মন্দ চলতো না। কিন্তু একদিন একটি ঘড়ি চুরি করে সে একটুখানি আনন্দ করলো, ধরা পড়ে চাকরিটি গেল। ভাবলে,—বাপ হয় তো দেশে এতদিন কারবার ক'রে বড়লোক হয়ে কিছু টাকা নিয়ে সেখানে একটা ঘড়ি মেরামতের দোকান খুললে মন্দ চলবে না। এইরকম কথাই ভাবছিল। হঠাৎ একদিন একটা আড্ডায় গিয়ে কয়েকজন বন্ধু জুটে গেল। ছিনতাই, রাহাজানি মোটর নিয়ে দিনে-দুপুরে ডাকাতি, এই সব তাদের কাজ। মদনগোপাল ভিড়ে গেল তাদের দলে তাদের সঙ্গে একটা গহনার দোকানে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়লো। জেল হলো।

ছাড়া পেয়ে মদনগোপালকে আসতে হয়েছে কুঠিপাড়ায়। আসতে হয়েছে নিজেরই প্রয়োজনে অনাথা পিসিকে খাওয়াবার জন্য নয়।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মদনগোপাল জিগ্যেস করলে, মরবার সময় বাবার কত টা ছিল পিসি?

পিসির মুখখানা হঠাৎ কালি হয়ে গেল। বললে,—আ-আমার পোড়াকপাল! সে কথা আ বলিস্ না বাছা। ছাদ্দের দিনে বৌয়ের বালা জোড়াটা বিক্রি করলম।

একটুখানি থেমে মদনগোপাল বললে,—বৌ-এর আরও গেল-কি কি সব গয়না ছিল?

কামিনী বললে, তা আমি মিছে কথা বলব কেনে বাছা! ছিল। পাঁচ ভরির একটা বি ছিল। মাথার চিরুনী একটি, আর একটি আড়াই ভরি সোনার তাগা। এই বলে সে কিছুক্ষণ থে তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে আবার বলতে লাগল,—তা বাছা, আমি প্যাটে খেয়েছি। মাসে মাসে সাড়ে তি টাকা করে ঘরের ভাড়া দিয়েছি। মিছে কথা বলছি তো বাবা আমার মুখে পোকা হোক্!

মদনগোপাল বললে, তা বেশ করেছিস,—ভালই করেছিস—

কামিনী তখনও খাচ্ছিলো না, বললে,—চিমনলাল মিস্তিরির বোন—তাকেও দেখে দুখ-করতে হলো। তুই না এলে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে আরও কী যে আমাকে করতে হতো ভগবান জানেন।

সে রাতে মদনগোপাল আর কোন কথা বললে না। পরদিন সকালে কামিনীকে বললে, পিসি, যমুনা-জোড়ের জল অনেকদিন খাই নাই। কাল দেখলুম্ পট্টি সোয়ালের কলস ঘাটে রইছে। এক কলসী নিয়ে আয়গা যা।

কামিনী কলসী নিয়ে জল আনতে গেল। কিন্তু যমুনা-জোড়ের জল খাবার সাধ মদনগোপাল ছিল না। এই সুযোগে তার নিজের কাজ আরম্ভ ক'রে দিলে সে। সমস্ত ঘরখানা তন্ন তন্ন খুঁজে,—জিনিসপত্র ওলট-পালট ক'রে দিয়ে, অবশেষে রান্নাঘরের একটা কোণের দিকে এক ছেঁড়া অব্যবহার্য্য বিছানার নীচে একটা মাটির কলসীর ভেতর কাপড়ে বাঁধা কিছু টাকার সন্ধান সে পেলে। গুণে দেখবার অবসর তখন ছিল না। পুঁটুলি সমেত টাকাগুলো নিয়ে সে পালিয়ে গেল।

পিসি ফিরে এসে দেখলে জল আনবার নামে ঘর থেকে তাকে বিদেয় করে ভাইপো সর্ব্বনাশ করেছে। চুরি-করা ধন চোরে নিয়েছে। মুখ ফুটে কাকেও কিছু বলবার উপায় টাকার শোকে সেদিন তার আর খাওয়া হলো না। কেঁদে কেঁদে যত পারলে, যা মুখে এলো বলে মদনগোপালকে গালাগালি দিলে, অভিসম্পাত করলে এবং বেলা দুপুর গড়িয়ে গেলে পর যে টাকাগুলো তার ঘরের মেঝের নীচে পুঁতে রেখেছিল সেগুলো তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে নিজের পথ দেখলে।

মদনগোপালের নেওয়া পুঁটুলিতে নোটে টাকায় ছিল পাঁচশোর কাছাকাছি। দিন-চার আবার সে ফিরে এলো। সঙ্গে ঘড়ি মেরামতের বিস্তর আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, টেবিল, চেয়ার, ঘর নানা রকমের ঘড়ি, চেন, ক্যালেণ্ডার, তস্বির ইত্যাদি নানাপ্রকার জিনিষে একটা গরুর গাড়ী বোঝাই করে কুঠিপাড়ায় তাদের সেই খোলার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। টাকার শোকে পিসি প্রাণ ত্যাগ করবে সে আশঙ্কা না করলেও এমনি যে একটা কিছু হবে তা সে আগেই ভেবেছিল। পরদিনই দেখা গেল, চিমনলালের কাঠ-ঘড়ির দোকানখানি মদনগোপালের ঘড়ির দোকানে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আর শুধু তাই নয় খোলার চালার সুমুখে টক্‌টকে লাল রঙে লেখা লম্বা-চওড়া টিনের সাইনবোর্ড পর্য্যন্ত টাঙানো।

নেড়ী থেকে নীহারিকা হওয়া সহজ, কিন্তু কারবার চালানো ভাবলেই চালানো সহজ না।

এক মাস যায়, দু'মাস যায়, মদনগোপালের ওয়াচ কোম্পানি আর চলে না। দেয়ালে দম-দেওয়া ঘড়িগুলো টিক্‌টিক্ করে অনবরত চলতে থাকে, মদনগোপাল চেয়ার টেবিলের ধুলো যন্ত্রপাতিগুলো পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখে, নিজেই রাঁধে, বাড়ে, খায় আর সুমুখে রাস্তা পথের পানে তাকিয়ে থাকে। কদাচিৎ কোন লোক এসে হয়তো কোন ঘড়ির দাম জিজ্ঞেস

যাব।—এই পর্যন্ত। গত মাসে একজন মাদ্রাজী খালাসী এসে সাড়ে আটআনা দিয়ে একটি 'র' ঘড়ি সারিয়ে নিয়ে গেছে। দিন-চার হ'লো একটি বাবুকে সে একটি হাত-ঘড়ি বাঁধা চামড়া কি করেছে। এ-কারবারে সাড়ে চারশ টাকা ভেঙে জিনিষপত্র আনা তার উচিত হয়নি। বাকী পঞ্চা টাকায় তার আর ক'টা দিনই-বা চলবে! কুঠিপাড়ার মাটির নীচে কয়লা যৎ-সামান্যই ছিল। কয় ব্যবসাও তখন ভাল নয়। সুযোগ বুঝে ইংরেজ কোম্পানি একজন ধনী মাড়োয়ারীকে কুঠিটা বি করে দিয়ে তখন সরে পড়েছে। বিদেশী যদি বা পথে ছিল, আমাদের। এই স্বদেশী ব্যবসা তাড়াতাড়ি টাকাটা তুলে নেবার জন্যে সেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করে 'পিলার কাটিং' সুরু ক দিলে। তখনকার দিনে কয়লাকুঠির নিয়মকানুনও এত কড়াকড়ি ছিল না। মালিকের ভয়ে কু ম্যানেজার সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। এলোপাথাড়ি কয়লা কাটতে গিয়ে কলিয়ারীতে একদিন আগুন গেল। আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা হবার তাই হলো। ওপরের মাটি ধ্বসে গিয়ে যেখানে-সেখ এক-একটা ভয়াবহ গহ্বরের সৃষ্টি হতে লাগল।

খাদের নীচে ভয়ে যখন কুলি-কামিন নামতে চায় না, কুঠির বাবুরা একে একে চাকরি ছে চলে যাচ্ছে, দোকানদারি উঠতে আরম্ভ হয়েছে। মদনগোপাল কি করবে, কোথায় যাবে, ঘ দোকানটি তুলে নিয়ে কোথায় যাবে ঠিক করতে পারছিল না।

এমন সময় মদনগোপালের ফিরে আসার খবর পেয়ে একবার শেষ চেষ্টা করবার জন্যে একা এক অপরাহ্ণ-বেলায় অন্ধ কৃষ্ণবিহারী লখিন্দরকে সঙ্গে নিয়ে মদনগোপালের ছোট সেই ঘ দোকান-ঘরটিতে এসে উপস্থিত হলেন।

মদনগোপাল জিগ্যেস করলে, কি মনে ঠাকুর? কি কাজ?

কৃষ্ণবিহারী কোন ভণিতা না করেই বললেন,—তুমি হয়তো জানো না বাবা, তোমাদের চ বিঘে জমি তোমার বাবা আমাকে বিক্রি করে গেইছে, কিন্তুক জমিটি এখনও লেখাপড়া রেজষ্টরি হ নাই, আজ দিব কাল দিব করে তো চিমনলাল গত হলো।

—তা আমাকে কি করতে হবেক?

মদনগোপাল মুখ তুলে তাকালো।

লখিন্দর জবাব দিলে। বললে,—করতে আবার কি হবেক্, রেজষ্টরি করে দিতে হবেক্।

কৃষ্ণবিহারী হাত বাড়িয়ে বললেন,—হ্যাঁ বাবা, হেই বাবা, এই কানা বামুন তুর হা ধরছে বাবা—

মদনগোপাল বললে,—টাকা?

কৃষ্ণবিহারী বললেন, টাকা আমি হাতে হাতে চিমনলালকে দিঁয়েছি রে বাপ!

লখিন্দর বললে, এক আধশ' নয়—করকরে চারশ টাকা নগদ।

মদনগোপাল জিজ্ঞেস করলে,—কাগজে-কলমে লেখাপড়া কিছু হইছিল?

কুঞ্জবিহারী বললেন,—ই বাবা—ইইছিল, কিন্তুক সিটি তোমার বাবার কাছেই ছিল। ত তো চিমনকে কুছুদিন অবিশ্যেস্ করি নাই বাপ্!

মদনগোপাল কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে,—আচ্ছা, আমি দেখি বাবার কাগজপত্র কোথায় কি আছে, তারপরে দিব তাই সব ঠিক করেই দিব।

কুঞ্জবিহারী খুশী হয়ে বললেন,—বেশ বাবা বেশ, তাহলে কবে আসব আবার?

—আসতে আর হবেক্ নাই, আমি নিজেই খবর দিঁয়ে পাঠাবো। বলে মদনগোপাল সেদি মত তাদের বিদেয় ক'রে রাত্রের খাবারের আয়োজন করবার জন্যে উঠে গেল।

কুঞ্জবিহারী যমুন-পারে ফিরছিলেন। ডান হাতে ধরা তাঁর লাঠির অগ্রভাগ বাঁ হাত দিয়ে ধ ধরে। লখিন্দর আগে আগে চলছিল। সন্ধ্যা তখনও হয়নি। অদূরে 'হেড্-গিয়ারের' মাথার ঘূরন্ত চাকার পেছনে ডুবন্ত সূর্য্য তখন রাঙা হয়ে উঠেছে। লখিন্দর একটু তাড়াতাড়ি চলতে লাগল সুমুখে ট্রাম লাইন পার হয়ে সাইডিং লাইনের পাশ দিয়ে যমুনাজোড়ে গিয়ে নামতে হবে, সঙ্গে মানুষ, বাবাবিপত্তি অনেক থাকতে পারে। রাঙামাটির যে-পথের ওপর দিয়ে তারা চলছিল, ব পেছনে একটা বোঝাই-করা গরুর গাড়ী আসছে দেখে লখিন্দর একটুখানি পাশ কাটিয়ে দাঁড়া একটা খাবারের দোকান উঠে যাচ্ছে। গাড়ীর ওপর বড় বড় লোহার কড়াই, গামলা, ভাঁ ভাঙা টিন, পেতলের থালা, কাঠের বাক্স আর এই সব খুচ্‌রো খালি জিনিসের ওপরে কাঠের ও তক্তপোষ, আর তারই পাশে অতি কষ্টে বসে আছে একটা মানুষ। পথের ধুলোয় তার ধুতি-চা বিশ্রী রং হয়েছে। লোকটা যমুন-পারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল। মুখখানা এমনিই শুক্‌ দেখলেই মনে হয়, গত ক'দিন থেকে পেটে তার কিছুই পড়েনি। লখিন্দর ও কুঞ্জবিহারীর কাছা গাড়ীটা আসতেই লোকটি তাদের মুখের পানে তাকিয়ে একটুখানি চম্‌কে উঠলো। গাড়োয় হেঁকে বললে, ওরে ও বলাই, দাঁড়া, দাঁড়া, দাঁড়া বাবা একবার।

বোঝাইয়ের ঠেলায় গরু দুটো তখন দাঁড়াতে পারলেই বাঁচে। লোকটি গাড়ী থেকে লখিন্দরের মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকলে, খোকা!

ছেলেবেলায় লখিন্দরকে অনেকে খোকা বলে ডাকতো। হঠাৎ তার সেই বহুদিনের ডাক-নাম শুনে সে মুখ ফিরিয়ে চাইবামাত্র চিনতে পারলে, কতকাল পূর্ব্বে যাকে সে পরিত্যাগ চলে এসেছে এ সেই তারই কাকা। এমন অকস্মাৎ পথের ধারে যে তার সঙ্গে আবার দেখা লখিন্দর তা ভাবেনি। সেও অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে,—কাকা! তুমি কোথা?

কাকার মুখের চেহারা সহসা বদ্‌লে গেল। অত্যন্ত রুক্ষকণ্ঠে বললে, হেথা কোথা? অভাবে এই যে খোকাবটো উঠেই নিয়ে চল্‌লম্ ইখান্ থেকে,—আর তুই হারাম্‌জাদা লুকোই-লুকোই পালাই পালাই বেড়াচ্ছিস্? চ—ঘরে চ।

লখিন্দর বললে,—না, ঘরে আমি আর যাব নাই।

স্পষ্ট জবাব শুনে কাকার মাথা আরও গরম হয়ে উঠলো। বললে,—যাবি নাই? আছিস এখানে?

—এই যে, এই—বলে কুঞ্জবিহারীকে দেখিয়ে লখিন্দর আরও কি যেন বলতে য কুঞ্জবিহারী বললেন,—হুঁ বাবা, আমার ঘরেই আছে বাবা এনেক দিন। বলি,—সৎবামুনের থাক্, আছে তো থাক্।

কাকা তার রেগেই ছিল, তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—হুঁ, ঠিক হইছে, বেটা মেয়েছি বামুনের জাত? এইজন্যেই তো হারামজাদাকে আমি চোখের বার করতে চাইলম্ নাই, বলি আপুনি কুথায় কার জাত মেরে।

কুঞ্জবিহারী হাঁ করে সব শুনছিলেন। শুনতে শুনতে পথের ধারেই ব'সে পড়লেন। বলে এ্যাঁ—এ্যাঁ, কি বললে বাপ?

কাকা বললে,—আপুন আর বলেই বা কি হবেক্ মহাশয়? উয়ার বাপ ছিল আমার ম কোথা থেকে একটা বেজাত বাগ্‌দির মেয়ে এনে আলাদা ঘর করে রইলো—তারাপে ওই উয়াপে মেয়েটো সেল মরে।

মা যদিও তার শৈশবেই মারা গিয়েছিল তবুও যাকে লখিন্দরের মনে পড়ে, বাবা তার ঘ ঘর বেঁধেও ছিলেন না, তাঁর নামে সেরকম কোন দুর্নামও রটতে সে শোনেনি।

কথাটা শোনবামাত্র লখিন্দরের আপাদমস্তক জ্বলে উঠলো। রাগে তখন তার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছিল।

কুঞ্জবিহারী জিজ্ঞাসা করলেন, কে ওর পৈতে দিয়েছিল তা'হলে?

কাকা বললে,—সে আর বলেন না মহাশয়। দাদা এক সুন্দুর-বামুনকে ডেকে, দিয়ে পৈতে। কার কথা শুনলেক নাই তখন। কি আর বলবো মহাশয়, তারাপে দাদাও সেল সইবেক্ কেনে মহাশয়? ই অধম্ম সয় কখনও?

কিন্তু যজ্ঞোপবীত তার এই কাকাই দিয়েছিল। লখিন্দর তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। তার স্পষ্ট মনে পড়ে।

সে আর থাকতে পারলে না। একটা ঢোঁক গিলে বললে, পৈতে তুমি নিজে দাও নাই অ

কাকা একটা ধমক দিয়ে বললে,—চুপ কর্ বেকুব, হারামজাদা, বামুনের সর্ব্বনাশ ক'রে কথা কইছে ছাখো! আমাকে আবার চোখ রাঙানি! পাজি ছুঁচো কাঁহাকা!

কথাগুলো শুনে রাগে অভিমানে থরথর করে কাঁপছিল লখিন্দর। চোখ দুটো জ্বলছিল। একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বের হ'লো না, ধীরে ধীরে পেছন ফিরে সেই রাস্তা লখিন্দর একপা একপা ক'রে চলে গেল।

কাকা আবার বললে,—হুঁ, যা হারামজাদা, বেরো বলছি, বেরো ইখান থেকে! দূর হ!

চলে গেল?—বলে অন্ধ কুঞ্জবিহারী একবার তার হাত দু'টো শূন্যে তুলে বললেন,—হা ভগ লখিন্দর! লখিন্দর!

ডাক শুনে লখিন্দর একবার পেছন ফিরে তাকালো, কিন্তু অবরুদ্ধ অশ্রুর চাপে কণ্ঠে তার সরলো না, একবার ভাবলে,—ফিরে যায়—অন্ধ ওই বুড়ো ব্রাহ্মণকে পৌঁছে না দিলে হয়তো ওই ধারেই তাকে বসে থাকতে হবে। সন্ধ্যার আবছা-ধোঁয়ায় তখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে

লখিন্দরের কাকা বললে,—তুমি আবার চোখে দেখতেও পাওনা ছাই! চল তবে চল, গাড়ীতেই চল,—গাঁয়ের ধারে নামাই দিয়ে যাই।

কুঞ্জবিহারী ধীরে ধীরে তার লাঠিটি হাতে নিয়ে উঠলেন। বললেন,—হা ভগবান!

—আর ভগবানকে ডাকলে কি হবেক? ঘরে যেয়ে পাচিত্তি ক'রে চুপচাপ বসোগা আখুনও লোক জানাজানি হয় নাই। এখনও পথ আছে। এই বলে লখিন্দরের কাকা তাঁর ঘরে কোনরকমে তাকে গাড়ীর ওপর তুলে নিলে।

লখিন্দর যে কোথায় গেল কিছুই বলে গেল না। কিন্তু গেল সে সত্যিই।

গ্রামের একপ্রান্তে তালগাছে ঘেরা একটা পুকুরের ধারে কুঞ্জবিহারীকে গাড়ী থেকে না দেওয়া হ'লো। আকাশে চাঁদ উঠেছিল তাই রক্ষে, তা না হ'লে এই অন্ধ বৃদ্ধের আজ কষ্টের থাকতো না। গ্রামের এক ছোকরার সঙ্গে পথে দেখা হতেই দয়া ক'রে সে তাকে বাড়ী পৌঁছে গেল। দাসী তখন তাদের তিনজনের ভাত রেঁধে রান্নাঘরের চালায় চুপ ক'রে বসেছিল।

লখিন্দর চলে গেল, কিন্তু দিনরাতের চলাচল বন্ধ হলো না। দাসী রাঁধে, বাড়ে, খায়, বাপকে খাওয়ায়, আবার কোন-কোনদিন বা লখিন্দরের ভাত বেড়ে তার আসার অপেক্ষায় অ বৃথাই সদর কাটায়। এমনি করেই দিন যায়।

যে অপবাদ লখিন্দরের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তা যে কে সত্যি হতে পারে দাসী তা ভাবতেও পারে না। সে যে কোনদিন এমন ক'রে তাদের পরি ক'রে চলে যেতে পারে তাও তো বিশ্বাসযোগ্য নয়!

পুরোহিত ডেকে কুঞ্জবিহারী প্রায়শ্চিত্ত করলেন, কিন্তু তার কারণ তিনি কাউকে বললেন না।

দাসী মনে মনে রেগে খুন হলো। অবশেষে পুরোহিত বিদেয় হলে একটা স্বস্তির নি ফেলে কুঞ্জবিহারী চুপ ক'রে বসলেন। হতভাগা ওই ছেলেটাকে ঘরে এনে যে ব্রাহ্মণত্ব তিনি হ ফেলেছিলেন আজ আবার তা ফিরে পেয়ে একদিকে যেমন তাঁর খুশীর সীমা রইলো না, অন্য আবার তেমনি এই এত বড় অনুঢ়া কন্যার বিয়ের ভাবনায় কুঞ্জবিহারী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়

দখিনের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই মস্তবড় স্বার্থের মুখে ছাই পড়লো দেখে কুঞ্জবিহারী নিষ্কলুষ যুবকের নিষ্কলুষ, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে, নামে, কাজে, কর্মে, আচারে, ব্যবহারে, কত রকমের দোষ যে নির্বিচারে আরোপ করতে লাগলেন তার আর সীমা সংখ্যা নেই। শুনে মনে হ মানুষটাকে এতদিন কাছে রেখে স্বার্থের যে বন্ধন গ্রন্থিটি দিনে দিনে শক্ত হয়ে উঠছিল, সেদিনের বিচ্ছেদের সন্ধ্যাবেলায় সেটি যেন চিরদিনের মত ছিঁড়ে গেছে। মনে হলো, এ-বন্ধনের যেন কো মূল্যই কোনোদিন ছিল না।

চাষবাস দেখাশোনা করবার জন্যে কুঞ্জবিহারীর একটি লোকের প্রয়োজন। দাসী বড় হয়ে তার জন্য পাত্রও একটি চাই। এদিকে মদনগোপালের কাছ থেকে জমি রেজিষ্ট্রির আর কোন সংবা পাওয়া গেল না। গ্রামের সদাই ঘোড়ল তার সমবয়সী, বাড়ীও তার বেশী দূরে নয়। কুঞ্জবিহারী সে নিজেই লাঠি ধ'রে কোন রকমে তার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেখান থেকে যে সংবাদ নি তিনি বাড়ী ফিরলেন, সত্যিই তা নিদারুণ।

কুঞ্জবিহারী তাঁর ঘরের দাওয়ায় ব'সে ডাকলেন,—দাসী!

দাসী রান্নাঘর থেকে কাছে এসে বললে, কি?

সর্বনাশ হইছে।

কি সর্বনাশ?—বলে উত্তরের প্রতীক্ষায় দাসী তাঁর বিমর্ষ মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কুঞ্জবিহারী বললেন,—আমার সেই কেনা জমিটুকু মদনগোপাল আর একজনকে বিক্রি ক দিয়েছে।

দাসী জিগ্যেস্ করলে, তুমি আর পাবে নাই তাহ'লে?

ঘাড় নেড়ে কুঞ্জবিহারী বললেন, না।—এই বলে কিছুক্ষণ থেমে তিনি আবার বললেন,—বি তাহ'লে কি হবেক?

—কি হবেক্ তা আমি কি জানি বাবা।—বলে দাসী সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল,—জবাব কুঞ্জবিহারী যেন দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলেন। বললেন,—তা জানবি কেনে? ওঃ! হায় হায়! সমান, সবাই সমান। কেউ কারও নয়, কেউ কারও নয়।

দাসী ফিরে দাঁড়ালো। বললে,—এ আবার কী! কাউকে না পেয়ে শেষে আমাকে পড়লো!

পড়বো নাই? তুকে নিয়েই তো আমার সর্বনাশ।

তুমার সর্বনাশ হবেক্ নাই তো হবেক্ কার?—বলেই দাসী চলে যাচ্ছিল সেখান থে কুঞ্জবিহারী বললেন, কেনে?—কেনে, কেনে তাই শুনি?

দাসী বললে, যিনি দোবে যা-না ইচ্ছে তাই বলে অপমান! কেউ মারছে তোমার ব কেউ করছে সর্বনাশ! তার চেয়ে কাজ নাই,—একজনকে তো তড়েছ, আমিও চললম্।

তার মা। বেরো, বেরো তুরা সব! এখুনি বেরো আমার ঘর থেকে। সাপে ধরে খোসামুদি করেতে লারব আমি! বাবারে বাবা! হা-ভগবান! হা-ভগবান!—এই বলে রাগে ঝাঁপতে কুঞ্জবিহারী লাঠিখানি তুলে নিয়ে একটুখানি তফাতে উঠে গিয়ে বসলেন।

দাসীর মুখ থেকে আর কোনও জবাব শুনতে পাওয়া গেল না। কুঞ্জবিহারী আপন বলতে লাগলেন, আমার কিছু হবে যাবেক্ নাই—যা কেনে, যা, সব চলে যা—তুর হ'! গরু, গাই বিচ্‌বো কাল, তাবাকে চলে যাবো আমার বেহিকে পুনী। খেতে আমি পাবোই যেখানকে সেইখানে। পয়সা দিব আর খাব।

কিন্তু রাগের সময় মানুষ মুখে যা বলে, কাজে তা করা বড় শক্ত।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় কোথাও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ঘরে লোক আছে বলে কুঞ্জবি মনে হ'লো না। মনে সন্দেহ হ'তেই হাঁকলেন, বাসী!

নিস্তব্ধ ঘর নিস্তব্ধ হয়েই রইলো। একটা টিকটিকি ডেকে উঠলো শুধু। কুঞ্জবিহারী ডাকলেন।

এবারও তাই।

দাসী চলে গেছে। কিন্তু সে চলে গেলেও তাঁর কোনও ক্ষতি হবে না। সেকথা তিনি মুখেই বলেছিলেন। এখন দেখলেন, কথাটা বলা তাঁর অন্যায় হয়েছে। সহায়-সম্বলহীন অথর্ব অন্ধ শব্দায়মান এই চলন্ত পৃথিবীটি যে নিতান্ত সুখ-ভোগ্য নয়, এতক্ষণে কুঞ্জবিহারী যেন তা সর্ব্বাঙ্গে উপলব্ধি করতে লাগলেন।

অনাহারে সমস্ত রাতটা তাঁকে এক রকম বিনিদ্রই কাটাতে হলো। আবাল্য পরিচিত এই ক্ষুদ্র সংসারটির কোথায় যে কোন্ বস্তু থাকে, সে সংবাদ যদিও তাঁর কয়েকটি অভ্যস্ত ইন্দ্রিয়ের অবিদিত ছিল না, তবু বিবাহযোগ্যা যুবতী কন্যা যার আজ নিরুদ্দেশ, তার পক্ষে ক্ষিধের পেট গেলেও মুড়ির হাঁড়ি থেকে সামান্য মুড়ি এনে খাওয়াও আজ অসম্ভব হয়ে উঠলো। কি কারণে সে চলে গেল, কাল থেকে গ্রামে তাঁর মুখ দেখানো ভার হবে, কে তাঁকে দেখাশোনা করবে, কে দেবে—এই হলো তার দুশ্চিন্তা।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জবিহারী ধড়মড় ক'রে উঠে বসলেন। নিঃশব্দ তাঁর খাঁ খাঁ করছে। দুর্ব্বিসহ মনোবেদনায় সর্ব্বশরীরের স্নায়ুশিরা যেন শিথিল হয়ে পড়ছে—এমনি ত হতে লাগলো। বুড়ো বয়সে বেদনা দুর্ভোগ যে তাঁকে এমনি করে ঘিরে ফেলবে, তা তিনি এক মুহূর্ত্তেও ভাবতে পারেন নি। দৃষ্টিশক্তিহীন তাঁর দুটি সাদা চোখ বেয়ে দর্ দর্ করে জল গড়িয়ে পড়তে

কিন্তু এমনভাবে অনর্থক বসে থেকেই-বা কি হবে? কুঞ্জবিহারী তাঁর লাঠিটি ধরে খেতে খেতে সদাই মোড়লের বাইরের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

এত সকালে এই অন্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে সদাই জিগ্যেস করলে,—এত সকালে কি মনে করে বল দেখি?

কুঞ্জবিহারী বললেন,—গাই আর বলদ-জোড়াটা আমি বিক্রি করবো। নিবি?

সদাইয়ের তাতে প্রয়োজন ছিল। সে আর দ্বিরুক্তি করলে না। বললে,—কত দাম হবেক ঠাকুর?

কুঞ্জবিহারী বললেন, তুর সঙ্গে দাম-দস্তুর করব নাই. তুই যা দিবি দে।

সদাইয়ের ছোটভাই গদাই মোড়লের একজোড়া চাষের বলদের দরকার। গাইটি সে নিজেই রাখবে। বললে,—তাই তো ঠাকুর, সকাল বেলায় এসেছ যখন, তখন আর কি বলবো তুমাকে? দেরিটা কুঞ্জবিহারীর অসহ্য হয়ে উঠছিল, দামটা তিনি নিজেই বলে বসলেন। বললেন, গাইটির দাও পঁচিশ, আর বলদ জোড়াটি পঁয়ত্রিশ।

সদাই একটুখানি ভেবে জিগ্যেস্ করলে, তাহলে কত হ

কুঞ্জবিহারী বললেন,—তিন কুড়ি।

সদাই বললে,—আচ্ছা, তাই দাও ঠাকুর, হরেগড়ে তাই হলো, দশ টাকা ছেড়ে দাও! দাও উঠ, চল তবে, গাই-গরু নিয়ে আসিগা চল।

তাই হলো।

সঞ্চিত অর্থ তাঁর যা-কিছু ছিল তার সঙ্গে আরও পঞ্চাশটি টাকা যোগ করে একত্রে একটি কাপড়ে বেঁধে পরিধের বস্ত্রের নীচে বেশ করে কোমরে বেঁধে নিলেন, তারপর বেলা প্রায় বারোটার সময় ভগবানের নাম স্মরণ করে বাইরের দরজায় শেকল টেনে দিয়ে পথের ওপর তিনি একাই বেরিয়ে পড়লেন। কোথায় যাবেন তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই।

বিকেলে দেখা গেল, কুঠিপাড়ার পাকা রাস্তা,ধরে কুঞ্জবিহারী ধীরে ধীরে পথ চলছেন। হাঁটুর ওপর পর্য্যন্ত রাঙা ধুলো উঠেছে। কোথাও বোধকরি আছাড় খেয়েছিলেন, বাঁ-হাতে ছড়ে যাওয়ার দাগ। দেহের মুখখানা শুকনো, মলিন।

মানুষের পায়ের আওয়াজ পেলেই থামছেন। জিজ্ঞাসা করছেন, কে যাচ্ছ বাবা?

অন্ধ দেখে দয়া হচ্ছে মানুষের। বলছে হয়ত'—কি বলছেন?

কুঞ্জবিহারী জানতে চান—পথের মাঝে কোথাও কোনও ধ্বসে যাওয়া গহ্বর আছে কি না! তা'হলে সে-রাস্তাটা তিনি বাঁচিয়ে চলবেন।

পথচারী লোকেরা দয়া করে বলে দেয়, এ-দিকটায় সে-সব কোনও ভয় নেই। চলে যাও তুমি সোজা।

পথের ধারে ছোট একটি টিনের চালায় একটি পানের দোকান। কয়েকজন ছোকরা সেখানে বসে গল্প-গুজব করছিল। কুঞ্জবিহারী জিগ্যেস্ করলেন,—হাঁ বাবা, কে রইছ বাবা ইখানে?

দোকানদার বলে উঠলো,—এদিকে নয়,—এদিকে রাস্তা নয়। ডানধারে চেপে যাও একটু

ডানদিকে একটু সরে দাঁড়িয়ে তিনি আবার বললেন,—ইদিকে একটো মেয়েকে যেতে বাবা? খুব সুন্দর, আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে?

কে একটা ছোকরা হঠাৎ বলে উঠল,—কে? তোমার বৌ?

দোকানদার একটা বিড়ি ধরাচ্ছিল; বললে, অতসবে কাজ কি বাবু তোর? পষ্ট বলে দেখি নাই, বাস্—ছুরিয়ে গেল।

কুঞ্জবিহারী আবার সেখান থেকে চলতে আরম্ভ করলেন।

পথের ধারে নূতন একটা গহ্বরের মুখে সেদিন আগুন আর ধোঁয়া উঠছিল। ওপ বালি মাটি ফেলে ধোঁয়া বন্ধ করবার জন্যে কুঠির মালিক সেখানে জন-ত্রিশেক কামিন লাগিয়ে ঝুড়ি বোঝাই করে ধাঙরিদের মেয়েগুলো গর্তের মুখে মাটি ফেলছিল আর একসঙ্গে গান ধরেছিল।

কুঞ্জবিহারী তারই পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। অন্ধ মানুষের চোখ দু'টো যেমন কোনও করে না, কান দুটো আবার তেমনি দিনরাত সতর্ক সজাগ হয়েই থাকে। গান শুনে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। মনে হলো, তাদের সঙ্গে দাসীর পরিচিত কণ্ঠস্বরও যেন শুনতে পাওয়া ডাকলেন, দাসী! ও দাসী!

অন্ধের অনুমান মিথ্যে হলো না। দাসী তার মাথার ঝুড়িটা ফেলে দিয়ে সোজা য দৌড়োতে লাগল। পথের ধারে চিমনলালের সেই আগেকার কাঠদড়ির দোকানটা মাত্র তার চেন আন্দাজি তাড়াতাড়ি সেখানে ঢুকে পড়তেই ঘড়ির দোকান দেখে প্রথমে সে একটুখানি থে পড়ে গেল। কিন্তু মদনগোপাল বড় হলেও তার সেই ছেলেবেলার চেহারার বিশেষ কোনও হয়নি। অন্তত দেখলে চেনা যায়। খদ্দেরের আশায় সে তখন তার চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছিল।

দাসী চট্ করে বলে বসলো বাবা আসছে মদন, তুমি বল যে আমি ইখানে নাই।

মদনগোপাল কিন্তু তাকে চিনতে পারেনি। অবাক হয়ে সে তার মুখের পানে চেয়ে পথে কয়েকজন লোককে জিগ্যেস্ করতে করতে হোঁচট্ খেতে খেতে যমুন-গাঁয়ের কানা কুঞ্জ দোকানের দরজায় এসে দাঁড়ালেন, তখন আর এই মেয়েটিকে চিনতে তার দেরী হলো না।

খাপরার চালায় ঝোলানো টিনের সাইনবোর্ডের গায়ে ধাক্কা খেয়ে কুঞ্জবিহারী বলে রইছ বাবা ইখানে?

ভেতর থেকে মদনগোপাল বললে,—আমি মদনগোপাল, কেনে? কি বলছেন?

দাসী কোন্‌দিকে গেল বাবা, আমার বিটি ধাসী? তাকে দেখলে?

মিথ্যা বলতে মদনগোপালের আটকায় না। বললে, না দেখি নাই। বলেই সে দাসী দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে লাগল।

মেয়ের খোঁজে কুঞ্জবিহারী সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কি ভেবে আবার ফিরে

বললেন,—জমিটুকুন্ বিচে দিয়ে আমাকে নিষ্কৃতি করলি বাবা মদন, আমি ইবারে দাঁড়াই কে বলতে পারিস ?

মদন গোপাল চুপ করে রইল। কোন উত্তরই দিলে না।

কুঞ্জবিহারী বললেন,—আমিও আজ সব বিচে-খুচে দিয়ে ঘর থেকে বেরেইছি বাবা, ঘরে আ ঢুকবো নাই। কার লেগে ঢুকবো বাবা ? আমার সেই মেয়েটাও পালাই পালাই বেড়াচ্ছে। এ আমার কপাল। হা ভগবান ! হা ভগবান !—বলতে বলতে তিনি যেমন এসেছিলেন আর তেমনি দ দিয়ে পথ দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলতে শুরু করলেন।

দাসী একদৃষ্টে সেইদিক পানে তাকিয়ে রইলো। সেখান থেকে যখন আর তাঁকে দেখা গেল দাসী তখন একটুখানি এগিয়ে এসে মদনগোপালকে বললে,—তোমার ঘরের কাজকর্ম সব আমি করে । মদন, তুমি আমাকে খেতে দিবে ?

মদনগোপালও এতক্ষণ মনে মনে তাই চাইছিল। সানন্দে ঘাড় নেড়ে বললে, কেনে দিব না হাঁ দিব।

দাসী একটা ঢোঁক গিলে আবার বললে, আচ্ছা, আমি যদি মাঝে মাঝে খাদে গেটে প আনি, তাহলে আমার বাবাকেও দিবে তো খেতে ? আর এইখানে থাকতে ?

মদনগোপাল ঘাড় নাড়লে, বললে, নিশ্চয়ই দিব। কেনে দিব নাই ?

দাসী বললে, তাহলে যেই ভাই মদন,—যা তুঁই ডেকে আন্ বাবাকে।

হা ছাখ্ ভাল্! এখনও ওই রাস্তাতে রইছে। হা ছাখ্। কানা-মানুষ, পথে-বিপথে য' কোথা পড়ে থাকবেক্ হয়তো !—এই বলে দাসী আঙুল বাড়িয়ে রাস্তার ওপর তার বাবা দেখিয়ে দিলে।

মদনগোপাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।—দাসী বললে, বলো না যে আমি ইখানে আছি বলো, একটি বামুনের মেয়ে আমার ঘরে রাঁধে। আর গাই-গরুগুলার কিছু বেবস্থা করে এসে কিনা শুধোও।

মদনগোপাল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে তক্ষুনি কুঞ্জবিহারীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো।

কুঞ্জবিহারী বললেন,—দাসী তাহলে কোথা গেল বাবা, একবার খোঁজ করে ছাখো।

হাঁ, আমি লোক পাঠাচ্ছি। বলে মদনগোপাল তাঁকে তার ঘড়ির দোকানের মেঝের ও আসন পেতে বসিয়ে দিলে।

মদনগোপাল এখান থেকে পালাবে পালাবে ভাবছিল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দাসীর ম একটা সুন্দরী মেয়ে এসে পড়লো একেবারে তার হাতের মুঠোর মধ্যে।

এইসব মানুষ ভগবানের কথা একবারও ভাবে না। কিন্তু এমনি অযাচিতভাবে নিজেরও অজা স্বার্থসিদ্ধির কোনও উপকরণ যখন তাদের হাতের কাছে এসে যায়, তখন ভাবে বুঝি ভগবান তাকে এখ

থেকে বেতে দিতে চান না। তার ওপর ভগবানের দয়ার বুঝি অন্ত নেই! মদনগোপালও ভেবে বসলো।

কানাকে সরিয়ে ফেলতে তাকে বেশ পেতে হবে না। অতি সহজেই তাকে সরিয়ে দে তারপর একা ঘরে সে আর দাসী! দাসী আর সে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে মদনগোপাল গেল খাবার ব্যবস্থা করতে।

আজ আর সে একা নয়। তারা তিনজন।

ভেতরে গিয়ে দেখলে কয়েকটা ইঁট জড়ো করে দাসী বসে বসে মাটি মাখছে।

মদনগোপাল জিগ্যেস করলে,—কি হবেক ওতে? এ কি করছো তুমি?

বাবা যাতে শুনতে না পায়—এমনিভাবে দাসী চুপি চুপি বললে, উনোন্ পাতুবো। তো কামার?

ও!—বলে মদনগোপাল একটু হেসে তাদের আহারের বন্দোবস্ত করতে লাগলো। দাসী জি করলে,—বাবা কি বলেক? গাই-গরু, ঘরবাড়ী,—কার জিম্মায় রেখে এসেছে?

মদনগোপাল বললে,—গাই-গরু বিক্রি করেছে।—আর ঘরে বললেক এমন কিছুই না 'তে হয়।

দাসী চুপ করে রইলো। মদনগোপাল আবার বললে, কানা বাপের ওপর এমন কী রাগ যে ঘর ছেড়ে চলে এলে?

দাসী ঘাড় নেড়ে বললে,—হইছে।

মদনগোপাল বললে,—আবার বাপকে ছেড়েও তো রইতে পারলে!

দাসী একটু হেসে বললে,—এমনিই হয়!

মদনগোপাল আবার জিগ্যেস্ করলে,—আর সেই যে একদিন একটা ছোক্‌রা এ তোমার বাবার সঙ্গে, কোথা সে?

দাসী চুপ ক'রে হেঁটমুখে কাদামাটি দিয়ে উনোন পাতুতে লাগলো।

কথাটা সে শুনতে পায়নি ভেবে মদনগোপাল আবার বললে, কোথায় গেল সে ছোক্‌রা?

জানি না। বলে দাসী তার নিজের কাজে মন দিলে।

মদনগোপালও আর কোন প্রশ্ন করলে না। দাসীর দিকে বারম্বার লোলুপদৃষ্টিতে তা তাকাতে ঘড়ির দোকানে গিয়ে বসলো।

রাত্রে খেতে ব'সে কুঞ্জবিহারী বললেন, দাসীকে পেলে নাই বাবা মদন?

মদনগোপাল বললে,—কুঠিপাড়া থেকে সেই তখনই পালিয়েছে সে। লোক ফিরে এল, বল —কালকে একবার ওইদিককার কুঠিতে খুঁজে দেখবেক্।

দাসী চলে আসার পর থেকে কুঞ্জবিহারীর পেটে কিছুই পড়েনি। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আ করে তিনি বললেন, যে-মেয়েটি তোমার ঘরে রাঁধে মদন,···আহা,—হাঁ মা, তোমার ঘর কোথা মা?

অদূরে ঘরে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে দাসী তার দিকে তাকিয়েছিল, প্রশ্ন শুনে মুখ টিপে এ খানি হাসবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না। বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা বেদনা অনুভব করলে

হয়তো সে মেয়েটি লজ্জায় তার সঙ্গে কথা বলছে না ভেবে কুঞ্জবিহারী বললেন,—কানা বামুন আমি মা, আমাকে লজ্জা ক'রো না। আমার একটি বিটি আছে। এই বলে তিনি একটু খেয়ে একটা ঢোঁক গিলে আবার বললেন,—রাগের তাপে কি যে সেদিন বললাম,—এমন রোজ ব কিন্তুক্ পাল'াই কখনও যায় না। আমিও বলি,—সে তবে তুর সঙ্গেই তো সংসার, গাই-গরু বিচে-খুচে দিঁয়ে চলে এলম্ মা। কপালে যা আছে—তাই হোক!

তাঁর কথার উত্তরে কেউ কোন সাড়া দিলে না দেখে কুঞ্জবিহারী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়া —মদনগোপালের নির্দেশমত উঠোনের একপাশে আঁচাতে বসে বললেন,—যমুন-গাঁয়ে একবার যে পাঠাই দেখ বাবা মদনগোপাল,—ঘরকেই যদি সে আবার ফিরে যেইছে।

বেশ।—বলে মদনগোপাল ঘাড় নাড়লে।

দাসী দরজার কাছে তখনও দাঁড়িয়ে।

মদনগোপাল তার ঘড়ির দোকান-ঘরের ভেতরেই শোবার জায়গা করেছিল দুজনের। কুঞ্জ বিহারীর আর তার নিজের।

রান্নাঘরের পাশে যে-ঘরে কামিনী থাকতো সেই ঘরে ছিল দাসী।

খাওয়া-দাওয়ার পর কুঞ্জবিহারীকে দোকানঘরে নিয়ে এলো মদনগোপাল।

হুঁকোকলকেটা নিয়ে আসতে ভুলেছে কুঞ্জবিহারী। অথচ তার তামাক খাওয়ার অভ্য মদনগোপালের কাছ থেকে বিড়ি চেয়ে চেয়ে খেয়েছে গোটাকতক। আর ভাল লাগছে না।

মদনগোপাল আবার একটি বিড়ি তাকে ধরিয়ে দিলে।

বিড়ি টানতে টানতে কুঞ্জবিহারী বললেন, শুনো বাবা মদনগোপাল, মানুষের এই জিনিষটা চণ্ডাল। আমি অন্ধ, চোখে দেখতে পাই না, ছি, ছি, আমি মরতে রাগ করে ঘর কেনে চলে এলম বল দেখি?

মদনগোপালও তার পাশে বসে বসে বিড়ি টানছিল। বললে, তা সত্যি। আপনার বাড়ি আবার ফিরে যাওয়াই ভাল।

—হেঁ বাবা, কাল সকালেই আমি চলে যাব। তুমি বাবা আমাকে ধরে ধরে দিয়ে আ পারবে তো?

মদনগোপাল বললে, কেনে পারবো? আমি দিয়ে আসব গা।

কুঞ্জবিহারী বললেন, দাসী ঘরকেই ফিরে যাবেক্। তুমি কি বল?

—হ্যাঁ, ঘরকে যাবেক বই-কি !

কুঞ্জবিহারীর সন্দেহ হলো। যদি না যায় ? চিরদিনের জন্যে সে গৃহত্যাগ করেছে—এমনও হতে পারে ! কিন্তু না, তার এই অন্ধ বাপকে ছেড়ে সে কখনও তা করবে না। কুঞ্জবিহারী যে আপ মনেই বলতে লাগলেন, ওই যে বললাম—রাগ। রাগ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। দাসীও তো করেই চলে গেইছে আমাকে ছেড়ে !

তবে রাগ মানুষের চিরদিন থাকে না—এই যা সান্ত্বনা। দাসীরও রাগ পড়ে যাবে। আবার বাড়ী ফিরবে।

কুঞ্জবিহারী বললেন, তুমি আমার একটি কাজ করে দেবে বাবা ?

—কি কাজ বলুন।

—তোমার ইখানে রাঁধুনী যে বামুনীটি কাজ করছে তাকে একবার শুধোই এসো তো বাবা, কেউ আপনার লোক আছে কি না ?

মদনগোপাল বললে, কেনে ?

—আমি তাহ'লে তাকে মাইনে দিয়ে রাখবো আমার ঘরে। কাজকম্ম করে দিবেক্। ও তো বাবা অন্ধ নাচার। তা ছাড়া দাসীর তো বিয়ে দিতে হবেক্। বিয়ের পরে মেয়েরা তো বাপের থাকে না বাবা।

মদনগোপাল বললে, আপনি শুয়ে পড়ুন। বামুনীকে আমি শুধোচ্ছি।

—তুমি কোথা শুবে বাবা ! কুঞ্জবিহারী জিজ্ঞাসা করলেন।

এই ঘরেই শোবো। বলে মদনগোপাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দাসীর তখন খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।

মদনগোপাল সেখানেও শুনলে সেই এক কথা।

—কাল সকালেই আমি ঘর চলে যাব।

মদনগোপাল বললে, ইখানে থাকতে কি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে ?

দাসী বললে, কষ্ট কেনে হবেক ? তাই বলে তোমার ঘরে আমরা চিরকাল থাকবো নাকি ?

দোষ কি ? মদনগোপাল অনুরোধ জানালে, কালকের দিনটে থাকো। পরশু যাবে। আজ তো নিজে রেঁধে খেতে হয়, আর একটা দিন তোমার হাতে রান্না খেয়ে নিই।

দাসী জিজ্ঞাসা করলে, বাবা কি বলছে ?

মদনগোপাল কথাটা গোপন করলে। বললে, তা তো জানি না। শুধোব।

কুঠিপাড়ার সবাই বোধকরি ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুম নেই এই তিনটি মানুষের চোখে।

কুঞ্জবিহারী অন্ধ মানুষ, সঙ্গে অনেকগুলো টাকা রয়েছে, তার ওপর রাত্রিবাস ক

শত্রুপুরীতে। চিমনলালের ছেলে মদন[illegible]কে সে বিশ্বাস করবে কেমন করে? অনেক রাত্রি চোখে তার ঘুম এলো না।

মদনগোপাল উঠছে, ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, দাসী যে-ঘরে শুয়ে আছে সেই ঘরের দোরে একবার দাঁড়াচ্ছে আবার ফিরে আসছে। ঘুম আর আসছে না কিছুতেই।

ওদিকে দাসীর চোখেও ঘুম নেই।

একে নতুন জায়গা, তার ওপর ক্রমাগত মনে হচ্ছে—এ কী করলে সে? অন্ধ বাপের ওপর করে বাড়ী ছেড়ে চলে আসা তার উচিত হয়নি। একে মেয়েছেলে, তার ওপর সুন্দরী যুবতী, ক'রে বাড়ীর বাইরে থাকা তার পক্ষে নিরাপদ নয়।

কিন্তু বাপের ওপর রাগ তার তখনও পড়েনি।

লখিন্দরকে সে তাড়িয়ে দিলে কেন? সে-জন্যে তাকে সে তাড়িয়েছে, সে-কথা যদি সত্যিও তা'হলেই বা কি হয়েছে? সে অপরাধ তো তার নয়!

আর সে মানুষটাই-বা কেমন? চলে যে গেল তার সঙ্গে একবার দেখাও করলে না!

এমনি সব নানান ভাবনা তাকে ঘুমোতে দিচ্ছে না কিছুতেই।

রাত্রি তখন কত কে জানে!

বাইরে থেকে এসে মদনগোপাল ঘরে ঢুকতেই কুঞ্জবিহারী চীৎকার করে উঠলেন, কে?

—আমি মদনগোপাল।

কুঞ্জবিহারী বললেন, তুমিই কি বারবার যাচ্ছ আর আসছো? আমি সেইজন্যেই ঘুমতে ন বাবা। কুঠিপাড়া শুনেছি চোরের জায়গা। ভাবছি—চোর-টোর নয় তো?

মদনগোপাল তার জবাব যেন তৈরি করেই রেখেছিল। তক্ষুণি বলে বসলো, আপনি ঘু দাসীকে খুঁজতে আমি চারজন লোক পাঠিয়েছি চারদিকে। বলেছি—খবর পাবি কি ছুটে এসে আ খবর দিবি। তাই সেই খবরের জন্যে ঘর-বার করছি। এখনও কেউ ফিরলো নাই কেনে ব পারছি না।

কুঞ্জবিহারী যেন কৃতজ্ঞতায় গলে গেলেন।

—আমার জন্যে তুমি এত করেছ বাবা?

মদনগোপাল বললে করব নাই? মেয়েছেলে, দেখতে শুনতে ভাল—তার ওপর বয়েস খা আমাদের এই শালার জায়গাও তো ভাল নয়। কয়লাকুঠি হয়ে থেকে সব গুণ্ডা বদমাইস এসে বাস ক তো এখানে।

কুঞ্জবিহারী উঠে বসলেন।—তা যা বলেছ বাবা! বিড়ি আছে একটা? দেবে?

আবার একটা বিড়ি ধরিয়ে দিলে মদনগোপাল।

রাত্রি তখন সবে বোধ হয় শেষ হচ্ছে।

কোথায় যেন মোরগ ডাকছিল।

কৃষ্ণবিহারীর চিরকালের অভ্যাস—এই ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করা। সেদিনও তিনি উঠলেন।

দেখা গেল, মদনগোপাল তার আগেই উঠে বসে আছে।

অন্ধের সমস্ত ইন্দ্রিয় এত সজাগ থাকে যে, ঘরের ভেতর আর-একজন মানুষ যে বসে আছে টের পেলেন কৃষ্ণবিহারী, বললেন, তুমি কি রাত্রে ঘুমোও নাই নাকি মদনগোপাল?

—কই আর ঘুমোলাম। শুনুন, একটা খবর পাওয়া গেছে দাসীর। আমি গেলে সে আসবেক্ নাই, তাই আমি আপনার উঠবার জন্তে বসে আছি।

কৃষ্ণবিহারী একেবারে যেন লাফিয়ে উঠলেন।—দাসী কুথা আছে বাবা? খবর পেয়েছ আমি এখুনি যাব। তুমাকে কি বলে যে আশীর্বাদ করব বাবা—

চলুন। বলে মদনগোপাল কৃষ্ণবিহারীকে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর?

যমুনা-জোড়ের বাঁকের কাছে যে জায়গাটায় খাদ ধসে গিয়ে বিরাট গহ্বরের মুখে আগুন আর ধোঁয়া উঠছে, মানুষ দূরের কথা—পশুপক্ষী যার ত্রিসীমানা মাড়ায় না, মদনগোপাল ধরে ধরে সেই পথে নিয়ে চলল কৃষ্ণবিহারীকে।

পথে লোকজন একরকম নেই বললেই হয়।

গাছপালার ঝোপের পাশ দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় থমকে মদনগোপাল। বললে, আপনি তো দেখতে পাবেন নাই ঠাকুর। চোখ থাকলে দেখতে পেতেন গাছের তলায় দাসী বসে আছে আর একটা লোকের সঙ্গে।

কৃষ্ণবিহারী বললেন, লোকটা সখিন্দর নয় তো?

—কে সখিন্দর? মদনগোপাল যেন কিছুই জানে না!

—সেই যে ছোকরাটি আমার ঘরে ছিল।

মদনগোপাল বললে, না তাকে আমি চিনি। সে নয়। ইখান থেকে ডাকবেন না। পালাবেক।

কৃষ্ণবিহারী জিজ্ঞাসা করলেন, তা'হ'লে কি করবো বাবা?

মদনগোপাল বললে, দাসীর কাছাকাছি নিয়ে যেয়ে আমি আপনাকে ছেড়ে দেবো। সোজা ডাকতে ডাকতে দাসীর কাছে চলে যাবেন। তখন ও আর পালাতে পারবেক্ নাই। অন্ধ বাপ তার একা-একা আসছে, তখন আর চুপ করে থাকতে পারবেক্ নাই। তাড়াতাড়ি এসে আপনাকে।

—ঠিক বলেছ বাবা, চল।

এগিয়ে চললো দুজনে।

হাত-দশেক দূরেই ভীষণ এক গহ্বর। পা হড়্‌কে একবার পড়লেই—একেবারে নীচে, গাঙা পুরীর অগ্নিকুণ্ডে।

মদনগোপাল চুপি চুপি বললে, এসে গেইছি ঠাকুর। দাসী পেছন ফিরে বসে আছে। আর একটু এগিয়ে আসুন—তারপর ছাড়বো। কোনও ভয় নেই। সোজা পথ।

গহ্বরটার কাছাকাছি এসে মদনগোপাল তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

কুঞ্জবিহারী ডাকলে, দাসী!

ডাকতে ডাকতে এগিয়ে গেল।

—দাসী! দাসী!

তার পরেই ভীষণ একটা আর্তনাদ!

তার পরেই সব চুপ।

মদনগোপাল এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলে, কোথাও কোনও জনপ্রাণী নেই। নিশি নিভাবনায় সে যমুনা-জোড়ের ঘাটে গিয়ে নামলো। ঘাটে হাতমুখ ধুয়ে সে চলে গেল তার বাড়ীর দিকে

যাবার সময় সে তাকাতে তাকাতে গেল সেই গহ্বরটার দিকে। দেখলে সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে।

শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া!

দাসী! দাসী!

ধূলিধূসরিত দেহ, গায়ের কাপড়জামা ময়লা, মাথার চুলগুলো উস্‌কো-খুস্‌কো। কোথেকে এলো লখিন্দর কে জানে? কুঞ্জবিহারীর বাড়ীর ভেতর ঢুকে দেখলে বাড়ীতে কেউ নেই।

কোথায় গেল এরা?

আবার ডাকলে, দাসী! দাসী!

ভাবলে, কোথাও গেছে হয়ত'। আসবে এখুনি। উঠোনের একপাশে চুপ করে বসলো লখিন্দর

সেখান থেকে গোয়াল-ঘরটা দেখা যাচ্ছে। সেদিকে নজর পড়লো লখিন্দরের। দেখলে, বলদ নেই, গাই নেই।

তাহ'লে কি এরা কোথাও চলে গেল নাকি?

লখিন্দর উঠে দাঁড়ালো।

ওদিকে মদনগোপাল পরমানন্দে একটা গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরছিল। হঠাৎ মনে হলো আজ বেশ ভাল করে খেতে হবে। রাস্তার ধারে হাটতলা। আগে বেশ জমজমাট ছিল এখন ধীরে ধীরে সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

হাটে তখনও লোকজন কেউ আসেনি। দোকানদারি সবে খুলতে আরম্ভ করেছে। এক মেছুনী শুধু কয়েকটা মাছ নিয়ে বসেছে। মদনগোপাল একটা মাছ নিলে।

মাছ নিলে কিন্তু পয়সা কোথায়?

পয়সা নিয়ে সে বের হয়নি। মদনগোপাল মেছুনীকে বললে, ধার রইলো। বাড়ী য সময় আমার দোকান থেকে নিয়ে যাস্।

মেছুনীর তখনও বউনি হয়নি। কি যেন সে বলতে গেল, কিন্তু মদনগোপালের ভয়ে বলতে পারলে না।

মাছটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে বেশ একটু দেরি করেই বাড়ী ফিরল মদনগোপাল।

রোজ সকালে দাসীর চা খাওয়ার অভ্যাস। উনোন ধরিয়ে চা তৈরি করে দাসী দে দুধ নেই। ঘড়ির দোকানটা দাসী আগেই দেখে এসেছে। বাবাও নেই, মদনগোপালও ভেবেছিল তারা বোধ হয় পুকুরে গেছে মুখ হাত ধুতে। আসতে তাদের দেরি হচ্ছে, এদিকে বাচ্চে ছুড়িয়ে, তাই সে দুধ না দিয়েই একবাটি চা নিজে খেয়ে নিয়ে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে চুপ বসেছিল, এমন সময় মদনগোপাল এলো। মাছটা তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, কেমন রান্না করতে পার।

দাসী ভেবেছিল তার বাবাও এসেছে। বললে, চট করে আগে দুধ এনে দাও। বাবা দিতে হবেক্।

মদনগোপাল বললে, বাবাকে তো দিয়ে এলাম বাড়ীতে।

দাসী বললে, ঘরে যে কেউ নাই, সকালে বাবার চা খাওয়ার অভ্যেস্। কে চা করে দিবে

মদনগোপাল বললে, তোমার বাবা বললেক—আমার জন্তে ভেবো না। তুমি ঘরকে যাও।

দাসী উঠে দাঁড়ালো। বললে, আমিও যাব।

—বারে, তোমার জন্তে মাছ আনলম, রেঁধে-বেড়ে খেয়ে-দেয়ে যেও। এবেলা তোমাকে যেতে দিব নাই।

দাসী বললে, না না, আমার কাপড় নাই জামা নাই, কাল থেকে আমি চান করি নাই, যাব। একা একা বাবার খুব কষ্ট হবেক।

—বা রে, আচ্ছা মেয়েমানুষ তো! আমাকে এক কাপ চাও দিবে নাই?

দাসী থমকে থামলো।—চা দিব, দুধ কই?

দুধ আমি আনছি। তুমি ততক্ষণ কুয়োর জলে চান করে নাও।

চান করবো, কাপড় কোথা?

মদনগোপাল বললে, ধোপাবাড়ীর কাচা কাপড় রইছে, এসো, দিবে এসো।

এই বলে তাকে কাপড় দেবার জন্তে দাসী রাত্রে যে-ঘরে শুয়েছিল সেই ঘরে তাকে

গেল। দেয়ালের কাছে একটা টিনের বাক্স দেখিয়ে খোলাই আছে, ওর ভালাই তোলো।

দাসী বাক্সটার দিকে এগিয়ে যেতেই মদনগোপাল ঘরের দোরটা দিলে বন্ধ করে। বন্ধের আওয়াজ শুনে দাসী ফিরে দাঁড়ালো। বললে, দুয়োরটা বন্ধ করলে কেন?

মদনগোপাল দোরে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো। বললে, তোমাকে আমি যেতে দিব নাই। এইখানে আমার কাছে তোমাকে থাকতে হবেক্।

দাসীর সর্বশরীর থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো।

কিন্তু ভয় পাবার মেয়ে নয় দাসী।

—তোমার সাহস তো খুব!

মদনগোপাল বললে, হ্যাঁ, আমার এমনি সাহসই বটে।

এই বলে সে এগিয়ে গেল দাসীর দিকে।

ঠিক এমনি সময়ে বাড়ীতে ঢুকলো লখিন্দর।

দাসীকে পাবার পথ নিষ্কণ্টক করে দিয়ে মনের আনন্দে মদনগোপাল মাছ হাতে নিয়ে বাড়ী ঢুকেছিল সদর দরজা খোলা রেখেই। ঘড়ির দোকানটা ভেতর থেকে খিল বন্ধ দেখে লখিন্দর চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখলে, সদর দরজা খোলা। মনে হলো, কুঞ্জবিহারী এখানে এসেছিল কিনা একবার জিজ্ঞাসা করে যাই। কিন্তু ভেতরে গিয়েও দেখে, কেউ কোথাও নেই। চালার পাশে কাৎলা মাছ একটা পড়ে রয়েছে, আর কতকগুলো কাক ঠুকরে ঠুকরে মাছের চোখটা খেয়ে ফেলছে।

লখিন্দর আপন মনেই বললে, ইখানকে আসে নাই তাহলে। কিন্তুক্—

—যা-আ-আ! হুস্—হুস্!

হাততালি দিয়ে কাকগুলোকে তাড়িয়ে দিলে লখিন্দর।

এমন সময় কে যেন কোত্থেকে চেঁচিয়ে উঠলো: ছাড়ো—ছাড়ো বলছি—ছাড়ো!

লখিন্দর পেছন ফিরে তাকালে।

আবার আওয়াজ! আবাল্য-পরিচিত দাসীর চাপা কণ্ঠস্বর: মদন! আঃ! ছাড়ো!

লখিন্দর চীৎকার করে উঠলো, দাসী!

দাসীও শুনতে পেয়েছে লখিন্দরের ডাক! সেও চেঁচিয়ে ওকে ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু লখি— বলবার পরেই মনে হলো, কে যেন তার মুখটা চেপে ধরেছে।

লখিন্দর ঘরের দোরে একটা ঠেলা দিয়ে দেখলে, দোর ভেতর থেকে বন্ধ। ঘরের ভেতর দাসীকে কে যেন আক্রমণ করেছে সেকথা বুঝতে তার দেরি হলো না।

মাছের কাছে উঠোনের একপাশে বড় একটা কাঁস-বঁটি পড়েছিল। তাড়াতাড়ি সেইটে নিয়ে এসে লখিন্দর কপাটের জোড়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে তুলে দিতেই দোরের খিলটা গেল খুলে।

লখিন্দর তার চোখের সুমুখে যে দৃশ্য দেখলে তা দেখে মরা মানুষেরও রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

অসহায়া দাসী নরপশু মদনগোপালের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে—পরিত্রাণ পাবার প্রাণপণ করছে, কিন্তু পারছে না। ঘরের দরজা খুলে গেছে, পেছনে লখিন্দর এসে দাঁড়িয়েছে—প্রবৃত্তির প্রাণ উন্মাদনায় সে-জ্ঞান যেন সে মুহূর্তের জন্য হারিয়ে ফেলেছে।

দাসী আর কোনও কথা বলছে না কথা বলবার শক্তি সে যেন হারিয়ে ফেলেছে।

লখিন্দর আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে বঁটির বাঁটটা নিয়ে মদনগোপালের মাথার ওপর সজোরে এক বাড়ি!

কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষের এই বিপুল উত্তেজনা। মার খেয়েও মদনগোপাল নির্বিকার।

লখিন্দর আবার মারলে তাকে। বঁটির বাঁট দিয়ে মারতে অসুবিধা হচ্ছিল। বঁটির ব্লেডের বাঁকা। সোজা যদি হতো, প্রাণপণে একটি কোপ সে বসিয়ে দিতে পারতো মদনগোপালের গলার থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে যেতো।

লখিন্দরের মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। বঁটিটা নিয়ে সে বসলো মেঝের ওপর। সেটাকে পা দিয়ে চেপে যেমন করে মাছ কোটে, তেমনি করে মদনগোপালের একখানা পা তুলে লখিন্দর তার দুই সবল বাহু দিয়ে বঁটির ধারালো ব্লেডের ওপর প্রাণপণে দিলে চালিয়ে। পা কাটতে পারলে না, কিন্তু পায়ের মাংসটা কেটে প্রায় দু'খণ্ড হয়ে গেল।

চীৎকার করে উঠে বসলো মদনগোপাল। ঝাঁপিয়ে পড়লো লখিন্দরের ওপর। লখিন্দর তখন মরীয়া হয়ে গেছে। লাথি মেরে মদনগোপালকে উল্টে ফেলে দিয়ে লখিন্দর আবার তুলে নিলে দু'হাত দিয়ে। মারতে গিয়ে দেখলে সে তখন লুটিয়ে পড়েছে মেঝের ছটফট করছে পায়ের যন্ত্রণায়। টকটকে লাল রক্তে ভেসে গেছে জায়গাটা। গল্ গল্ করে ঝ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে পা থেকে। পায়ের শিরা কেটেছে নিশ্চয়ই। মদনগোপালের আর উঠে ক্ষমতা নেই। মদ্ ব্যাটা তুই থাক্ খোঁড়া হয়ে!

এতক্ষণে লখিন্দরের নজর পড়লো দাসীর দিকে।

কিছুক্ষণের জন্য বোধকরি সে তার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। দেখা গেল সে তার কাপড়ট টুনে পরে উঠে বসেছে। একমাথা চুল খুলে গিয়ে পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুতেই আর সে সে বাগাতে পারছে না। চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়াচ্ছে।

লখিন্দর বললে, ওঠ! চল্! মরতে এখানে কি জন্যে এসেছিলি? এই শালা মদনা!

বলেই ছাক্ থু বলে' তার মুখের ওপর একমুখ থুতু দিয়ে দাসীকে নিয়ে লখিন্দর বেরিয়ে চ

রাস্তায় গিয়ে লখিন্দর জিজ্ঞাসা করলে, তুর বাপ কোথা?

—ঘরকে সেইছে।

লখিন্দর বললে, না যায় নাই। আমি তুদের ঘর থেকেই আসছি।

—সেইছে, তুই জানিস না। মদন দিয়ে এসেছে।

উ-শালার কথা আমি বিশ্বাস করি না। নে, চল্।

এই বলে লখিন্দর আপনমনেই খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে দেখলে, দাসী হাঁটতে পারছে না।

লখিন্দর দাঁড়ালো। বললে, তুর বাপই তাহ'লে তোকে মদনার কাছে রেখে গেছে? তুই তাহলে ইচ্ছে করে ছিলি এইখানে?

না, না, না।

কান্নায় ভেঙে পড়লো দাসী।

নে চল্ আর কাঁদতে হয় না।

লখিন্দর হাত বাড়িয়ে দাসীর একটা হাতে ধরে বললে, আয়! আস্তে আস্তে আয়।

এই বলে সে নিজেও তার সঙ্গে ধীরে ধীরে পথ চলতে লাগলো।

ফিরে এলো দাসী তার নিজের বাড়ীতে। ফিরে এলো হারিয়ে-যাওয়া লখিন্দরকে নিয়ে।

কিন্তু কী কুক্ষণেই সে রাগ করে পালিয়েছিল বাড়ী থেকে। কী কুক্ষণেই সে গিয়েছিল কুঠিপাড়ায় মদনগোপালের কাছে আশ্রয় নিতে।

দাসীকে সবই করতে হয়।

ঘর-সংসারের কাজ করে, রাঁধে বাড়ে খায়, লখিন্দরকে বসে বসে খাওয়ায় আর বলে, আর তুই আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে নাই বল!

লখিন্দর হেসে বলে, যাব একবার।

—কোথা?

—কুঠিপাড়ায়। মদনার কাছকে।

দাসীর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। নির্বোধ এই সরল মানুষটি না জেনে আবার তার ক্ষতস্থানে হাত দিয়ে ফেলেছে।

লখিন্দর বলে, তোকে পাবার জন্যে ওই লোকটাই তোর বাবাকে মেরে ফেলেছে।

মেরে ফেলেছে?

দাসী চমকে ওঠে।

মদনগোপালের অসাধ্য কর্ম কিছু আছে বলে তার মনে হয় না, তবু কেমন যেন এই নিষ্ঠুরতম সত্যটিকে মন তার মেনে নিতে চায় না কিছুতেই। শুধুই মনে হয় তার বাবা যেন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রাত্রে এক-একদিন তার ঘুম ভেঙে যায়। স্পষ্ট যেন শুনতে পায় তার সেই অসহায় অন্ধ পিতা কাতর কণ্ঠস্বর!—দাসী! দাসী!

গভীর রাত্রে দাসী তার ঘরের জানলার কাছটিতে চুপ করে বসে বসে দেখে—সুমুখে তমসাবৃতা রজনী, আকাশে অগণিত নক্ষত্রের মহিমার, নিম্নে ঘের উত্তপ্ত ধরিত্রী রাত্রির গভীরতায় শীতল এসেছে, ঈশ্বরের করুণার মত কেমন যেন একটি স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ। জীবনের সব জ্বালা তার গেছে, হারানো পথিকবরকে সে ফিরে পেয়েছে, তাকে ঘর বেঁধেছে মনের আনন্দে। কিন্তু এই আ মাঝখানে যমুনা-জলের ওপারের ওই কুঠিপাড়ার দিকে তাকালেই মনে হয় যেন ওই প্র অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে পথহারা কোন্ নিরুদ্দেশ পথিক তার হারানো কন্যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ৫ সুমুখে যার দিকচিহ্নহীন গভীর অন্ধকার, দিবস-রাত্রির কোনও প্রভেদ পার্থক্যই যার কাছে নেই, কে এমন সাথীহারা করে ছেড়ে দিয়েছে এই মৃত্যুপুরীর মাঝখানে? পলকহীন নয়নেই সেখানে সোচনীয় মৃ

মদনগোপাল এখনও সেই কুঠিপাড়াতেই আছে। খোঁড়া মদনগোপাল।

ঘড়ির বেকোন এখন আর তার চলে না। বেঁচে থাকতে হলে খেতে হয় আর হলে কিছু রোজগারের একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু আশ্চর্য্য, কোনও ভাল কাজ করতে তার মন চায় না। মদের দিকে তার প্রতিটি বিন্দু রক্তের কি অনিবার্য্য আকর্ষণ

১৯০০—১৯৬০

ট্রাভেল এজেন্টের যাত্রী সংখ্যার উপরই নির্ভর করে তার সুনাম ও প্রতিষ্ঠা। গত ৬০ বৎসরে আমাদের যাত্রী সংখ্যা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নৌ ও বিমান যাত্রায়, স্বতন্ত্রভাবে মাল পাঠান, হোটেলে স্থানের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করিতে আমাদিগকে সুযোগ দিন।

GRAMS : TRAVELJENA

ফোন : ২

জীনা এণ্ড কোম্পানী

২৫, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

দিল্লী জরিখ (বৈদেশিক অফিস)

কুঠিপাড়ার আশ-পাশের গ্রামে প্রায়ই আজকাল চুরি হয়। মদনগোপাল ভাল করে হাঁটতে পারে না। চিরজন্মের মত একটা পা তার জখম্ হয়ে গেছে, তবু লোকে বলে নাকি মদনগোপাল একটা দল করেছে। প্রতি রাত্রে তারাই নাকি এই কাজ করে বেড়ায়।

নিজে রোজ রান্না করে খেতে তার ভাল লাগে না, তাই রমন খালসীর বিধবা যে-বোনটা এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরে বেড়াতো তাকেই সে তার বাড়ীতে এনে রেখেছে।

কিন্তু এতেও তার মনে সুখ নেই।

দোকানের ভাঙা চেয়ারটিতে বসে বসে সে শুধু ভাবে আর ভাবে—

তার ভাবনার কোনও কূলকিনারা নেই।

চোখের সুমুখে দেখে, প্রায়ই নতুন নতুন জায়গায় কাটল ধরছে, মাটি ফুঁড়ে আগুন উঠছে লোকজন ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, বা থাকছে ধসে গিয়ে পাতালপুরীর প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছে।

আর ওদিকে যমুনা-জোড়ের ওপারে যমুনগা আগেও যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনিই আছে নদীর তীরে শিরীষ আর বাঁশের জঙ্গল, মাঠঘাট শস্যসজ্জিতে বারমাস সবুজ।

এই মাটির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচে গেছে শুধু মদনগোপালের।

যমুনগাঁয়ে উঠে যেতে সে পারতো, যাবার ইচ্ছেও হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু যাবার পথ সে নিজেই বন্ধ করে দিয়েছে। সেখানে দাসী আছে। সেখানে লখিন্দর আছে।

তার চোখের সুমুখে ধসে যাওয়া পাতাল-গহ্বরের প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা দিবারাত্রি ধুধু করে জ্বলতে থাকে। ওইখানেই সে নিজের হাতে চিতাশয্যা রচনা করে দিয়েছে এক নিরীহ অন্ধের। ওই ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে আছে বুঝি তার দীর্ঘশ্বাস! তাই বোধ হয় সেদিকে সে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না। ও ধোঁয়া তার চোখে লাগলে চোখ জ্বালা করে। সে জ্বালার আর নিবৃত্তি নেই! তার বুকে আগুন বুঝি আর নিভবে না। এই আগুনেই তাকে পুড়ে মরতে হবে সারাটা জীবন।

আনন্দোৎসবে
অপরিহার্য্য

কাকাতুয়া মার্কা ময়দা
হ্যারিকেন মার্কা ময়দা
গোলাপ মার্কা ময়দা
ঘোড়া মার্কা ময়দা

প্রস্তুতকারক :
দি হুগলী ফ্লাওয়ার মিলস্ কোং লি
দি ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার মিলস্ কোং
ম্যানেজিং এজেন্টস্
শ ওয়ালেস্ এণ্ড কোং লিঃ
নিবেদক :—
চৌধুরী এণ্ড কোং

তোমার পুরানো আখরগুলি

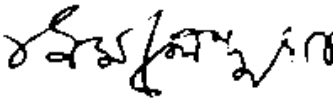

—আবার—আবার আঁকচারা কাটছে ছেলেটা! আমায় কি তোমরা শান্তিতে মরতেও দেবে না! ক্ষোভ আর আক্রোশে চীৎকার করে উঠলেন নিত্যগোপাল, বউমা কোথায় গেলে!

একতলায় ছিল মণিদীপা, প্রায় এক দৌড়ে ছুটে এল, হাঁফাতে লাগল: আপনি চুপ করুন ব বুকের যন্ত্রণাটা বেড়ে যাবে।

পাশের ঘর থেকে একটা দ্রুত পলায়নের শব্দ। প্রবুদ্ধ পালাচ্ছে দ্রুতপদে। ওর হাফ প্যাং পকেট থেকে এক টুকরো রঙের কেক্ পড়ে গেছে। তাও কুড়োবার সময় নেই। দাদু জানতে পেরে আর কি রক্ষে আছে!

—উঃ কী বদমায়েস হয়েছে ছেলেটা, মণিদীপা মন্তব্য করল নীচু গলায়, কিন্তু শ্বশুরকে শুনি আমি আজ সায়েস্তা করে দেব।

—হ্যাঁ, বেশ করে শাসন করে দিও বৌমা, হঠাৎগলায় বলে উঠলেন নিত্যগোপাল, আমি টের পেয়েছি ওতা পাশের ঘরে এসেছে। একটু থেমেই বললেন, দেখে এসো তো কি নোংরা করে

আপন মনে গজ গজ করতে লাগলেন তিনি কত কষ্ট করে বাড়ী তুললুম আর এই ছেলের জ্বালায় তা রক্ষে করার উপায় নেই! খালি যেখেনে-সেখেনে—আহ কি করেছে বউমা?

মায়ের ঘরটা ঘিরে একবার উঁকি মেরেছিল দীপা, উত্তর করল, কাঁচের শার্সিতে টিয়া পাখী আঁকছি

—বউমা! চিৎকার করে উঠলেন নিত্যগোপাল।

মণি ছুটে এসে দু'হাতে বুক পিঠ চেপে ধরল: বাবা, আমি বুঝেছি, আপনি চুপ করুন, অ একটা অ্যাটাক হলে—

আর বাঁচানো যাবে না, আর বাঁচবেন না নিত্যগোপাল, হাতে পা দেবার আগেই মুক্ত যাবেন, এই বাড়ী এই ঘর এই সংসার থেকে একেবারে উহ্য হয়ে যাবেন, না হয়ে যাবেন। মাত্র করেক আগে কার্ডিয়াক অ্যাটাক হয়ে গেছে। কী লিখতে যাচ্ছিল ডাক্তার! কেস অফ হার্ট কোলিওর। ক ঘরেই ব্লাডপ্রেসারে শয্যাশায়ী। হঠাৎ—একেবারে হঠাৎ তিন দিন আগে এমনি সন্ধ্যায় ফুলফুল যাম দিল, বুকটা ধড়ফড় করল, যন্ত্রণা হোল, অব্যক্ত যন্ত্রণা, স্নায়ু সব অবশ হয়ে এল, কোনরকমে সিন্দু চাবিটা মণির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, সব রইল বউমা—তারপর আর কিছুই জানেন না।

নিশ্চিত মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন নিত্যগোপাল, চেনা পৃথিবীকে আবার একটু করে চিনছেন, কিন্তু ছায়াবাজীর মত এই ক'দিনে পৃথিবীর এত রঙ এত আলো সব যেন ছুটি তীব্র

সমাধানহীন বৈপরীত্যে এসে ঠেকেছে—সাদা আর কালো, জীবন আর মৃত্যু, এর মাঝামাঝি আর কোন রঙ নেই, অবকাশ নেই, এই আছি এই থাকব না, অস্তিত্বের এই এক অপরিসীম বিড়ম্বনা!

এমনি আলো-আঁধারির মুহূর্তে চেতনা যেন ছাড়ুক খেয়ে উঠল, তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে গড়া এ বাড়ী, এইখানে তাঁর প্রতিষ্ঠা, এ তাঁর অস্তিত্বের অংশ—কতদিন ধরে এতটুকু বাসার স্বপ্ন দেখেছেন, সহ্য অভাবের মধ্যে থেকেও তিল তিল করে পয়সা জমিয়েছেন—আর তাঁরই কীর্তিমান নাতি কিনা আজ তাঁর চোখের সামনে বাড়ীটাকে একেবারে হতকুচ্ছিৎ করে ফেলতে চাইছে! এ তাঁর ব্যক্তিত্বে লাঞ্ছনা, তাঁর অস্তিত্বের অপমান, হ্যাঁ, যখন চলাফেরার সামর্থ্য ছিল তখন দেখেছেন নীচের সদর ঢোকবার মুখেই ডান দিকের দেয়ালে ছেলেটা একটা মানুষের মুখ এঁকেছে, এঁকেছে না লোহার পিন দিয়ে চার চারটে খোঁদল বানিয়েছে, দুটো চোখ, একটা নাক আর মুখ, ভাগ্যিস কানটা করবার আগে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তাই ছেলেটার কান দুটো ধরে টানতে পেরেছিলেন।

মাসখানি ওষুধ এনেছে, কয়েক টোটা কোরামিন। দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। হৃৎপিণ্ডে অনেক অবসাদ। তাকে শক্তি দিতে হবে। হবেই। এ মৃত্যু তিনি চান না। এখনো বছর ঘোরেনি ভাড়াটে বাসার সেই দুঃসহ দশা থেকে নিজের বাড়ীতে এসেছেন, এরই মধ্যে চলে যেতে হবে? কেন? কেন?

একঢোকে ওষুধটা খেয়ে ফেললেন। পাশ ফিরে শুলেন। চিৎ হলে বুকে লাগে। চোখ বন্ধ করতেই সেই ছবিটা ভেসে উঠল। হতভাগা ছেলে। মানুষের মুখ না নরকরোটি! শয়তানের চোখ এঁকেছে কী রকম বর্তুলাকার, অন্ধকার, ভয়াবহ।

—বউমা, মোলায়েম গলায় বললেন নিত্যগোপাল, দেয়ালের ওটা চুন বালি দিয়ে বুজিয়ে দিও আর কাঁচেরটা সোডা দিয়ে ঘষে তুলে ফেলো, আমি মরে গেলে যা খুশী কোরো, এই কটা দিন আমাকে—

—বাবা—বাবা, কেঁদে ফেলল মণিদীপা।

আবার উত্তেজনা আসছে। আসবেই। এ বাড়ী যে তাঁর। এই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র এইখানে তিনি যে তিনি—খুব বেশি করে তারই অনুভব।

—আমি ওকে মামার বাড়ী পাঠিয়ে দোব কিংবা হোস্টেলে রাখব, আপনি একটু ঘুমোন বাবা মণিদীপা হাত রাখল শ্বশুরের কপালে, আর ওকে এ বাড়ীতে নয়।

প্রবুদ্ধ রইল না। পরদিন থেকেই বিস্তর কারাকাটি করল। কিন্তু না, আর নয়। আবার এক ছবি এঁকেছে, ভাগ্যিস রান্নাঘরের দেয়ালে, তাই দোতলায় টের পাবার উপায় নেই, নইলে এবারে ঐ সরাসরি দুটো হাড় আর একটা খুলির রকম দেখলে শ্বশুরমশায় নিশ্চিন্ত শক্ ণেতেন! এরপর বরদার আঁকবে, তার পরে জানালায়, হয়তো উঁচু বীমকেও রেহাই দেবে না।

কী অসভ্য ছেলে! কোথা থেকে যে এই অভ্যেস পেয়েছে! এরই জন্যে শ্বশুরের কাছে গঞ্জনা স্বামীর কাছে লাঞ্ছনা, আর সহ্য হয় না মণিদীপার, তাই বিদেয় করেছে মামার বাড়ীতে, সেখান থেকে পাঠাবে এমন এক বোর্ডিং স্কুলে যেখানে বছরান্তের সারেণ্ডার হয়? তবে সে নিশ্চিন্ত হবে।

আরো নিশ্চিন্ত হবার জন্যে সে রেখাগুলো মুছতে গেল। সেই কাঁচের উপরে রঙের রেখা, এক সবুজ পাখী উড়ে যেতে চাইছে! কিন্তু পারল না। যত রাজ্যের ক্লেদ এল। কাঁচা হাত। কিন্তু খারাপ কি

রাত্রে চুপি চুপি কথাটা জানল তার স্বামীর কাছে, কোন আর্টিস্টকে দেখানো হয় না, এই ছবিগুলো অনিরুদ্ধ বললে, কেপেছ!

—আচ্ছা, কোন মনস্তত্ত্ববিদকে! মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল দীপা।

—রক্ষে কর, তার চেয়ে আর্টিস্ট ভাল, বিরক্ত বোধ করল অনিরুদ্ধ: আসতে বলব'খন কিশোরীলালকে, আজকাল মাথাবাবু কি সব আঁকছে, ঐ বুঝবে'খন।

পরদিন রাতে কিশোরীলাল এল। অনিরুদ্ধর বন্ধু। পাশের ঘরে নিত্যগোপাল ঘুমোচ্ছে আলো নেভা ঘরে পা টিপে টিপে এগোল তারা। ফস করে দেশলাই জ্বলে উঠল পাশের ঘরে! কিশোরীলালের চোখ দুটো জ্বলতে লাগল কী এক প্রাপ্তির আশায়।

—বউমা!

নিত্যগোপালের ঘুম ভেঙে গেছে: কে পাশের ঘরে?

—আমি মণি।

—তোমার সঙ্গে ও কে?

চমকে উঠল মণিদীপা। সুইচ টিপল। শ্বশুরের কাছে এল।

সন্দেহভরা চোখ নিয়ে নিত্যগোপাল তাকালেন তার দিকে: আলো জ্বালনি কেন? জেগে ই এই তো! আমার কি ঘুম আছে! ওঘরে কে দাঁড়িয়ে আছে? ডাকো তাকে।

কিশোরীলাল বার-দরজার চৌকাঠ পেরোল।

—হুঁ, কঠিন হয়ে গেলেন নিত্যগোপাল: বুঝেছি, বোস তুমি কি বুঝলে বল।

উৎসাহের সঙ্গে কিশোরীলাল আরম্ভ করলে: ও চমৎকার ছবি সব, এ হোল বিশুদ্ধ চেতনার ধ্য প্রিহেলেনিক, পেরুভিয়ান, এসিয়াটিক, যাই বলুন, যতই বলুন, ঐ সব প্রিমিটিভ আর্টের নিদর্শনের সঙ্গে এই শিশুমনের আঁকা ছবিকে মিলিয়ে দেখতে হবে, তবেই বোঝা যাবে কেন, কোন সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ ছবি এঁকেছিল, শিল্পের উৎস কোথায়। এই সব দেয়াল চিত্রের যে সিম্বল ব মধ্যে রয়েছে আদি মানবাত্মার স্বাক্ষর, কেননা শিশুমন আদি মানুষের মতোই বিমুগ্ধ, বিস্মিত, বিশ্বাসী—

—তোমার মাথা, তোমার মুণ্ডু, তোমার পিণ্ডি, অমির সব কটা সঙ্গী কি বদ্ধ পাগল! অক ক্রোধে কঠোর হয়ে উঠেছেন নিত্যগোপাল: বউমা, আমায় ডাক্তার বলে গ্যাছে কাল থেকে আমি ৎ উঠে বসব। তা আমি ঐ ঘরেই বসতে চাই। কাল সকালে। তার আগেই ঘরটা সাফিয়ে গুছিয়ে রে কার্তিকের হিম, শার্সি বন্ধ রেখো—আর আরামকেদারার দুপাশে দুটো পিতলের টব দিও। আর কিশোরীলাল একটি শ্রীকৃষ্ণের ছবি এঁকে দিও, চেহারাটা যেন কৃষ্ণের মতই হয়, একটু ধ্যানমগ্ন করব, বুঝো

সাহস পেয়ে কিশোরীলাল বলল, একটা কথা বলব কাকাবাবু, অবশ্য অন্য কাঁচ লাগিয়ে ে মানে ঐ ছবি আঁকা কাঁচটা যদি খুলে নিই—

—বউমা! চীৎকার করে উঠলেন নিত্যগোপাল।

—এই যে বাবা, মণিদীপা ছুটে এল।

—কিশোরীলালকে বারণ করে দাও, ও যেন শ্রীকৃষ্ণের ছবি না আঁকে, শিল্পী হয়েছেন, শিল্পী—

আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, ইশারায় একরকম জোর করেই কিশোরীলালকে ঘরের বাইরে নি গেল মণিদীপা।

ঝড় উঠেছে। আবার অশান্তি বাধবে। আবার অনিরুদ্ধর গঞ্জনা। নিত্যগোপালের উৎসব কিশোরীলালের সনির্বন্ধ অনুরোধ। কি করবে, কোথায় যাবে সে। জীবন যন্ত্রণাময় হয়ে উঠবে। চো জল এসে গেল মণিদীপার। কাল সকালের আগেই ঘর সাজাতে হবে। কি করে সাজাবে সে! যে দাতে সে সুন্দর করবে ঐ কাঁচের শার্সিকে।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল নিত্যগোপালের। মনটা ছাঁৎ করে উঠল। বেঁচে আছি তে আবার সেই জীবনের সম্মুখীন হওয়া, অনেক এলোমেলো ভাবনার প্রস্তরে জীবনের উত্তাপ অন্বেষণ ক প্রায় মৃত্যুর ভেতর থেকে অল্প অল্প করে বেঁচে ওঠা।

* * *

এই শরীরটা একটা পদার্থ, এখনো জৈব আছে, তিনি মরে গেলে এ শরীর আর তাঁর থাকবে জড় হয়ে যাবে। কী ভয়ঙ্কর কথা! তাঁর তো নিজের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই মরতে, তাহলে এই দেহ এই চঞ্চল চলমান কথোক দেহটা এমন জড় হতে চাইছে কেন! প্রাণ কখনো অপ্রাণকে চায়! ধিক্কার ধিক্কার—এ এই ক্লোব, অণুপরমাণুর পাগলামি, মূঢ়তা।

অসহ্য এই ক্লান্ত শরীরের ষড়যন্ত্র, অসহ্য এই তরল অন্ধকার।

—বউমা—বউমা—প্রায় আর্তকণ্ঠে ককিয়ে উঠলেন নিত্যগোপাল: জানালা বন্ধ কেন মা? আ উঠিয়ে দাও, আমি পাশের ঘরে বসব, আমি দাঁড়াব, ছুটব, আমি চারদিনে শরীরের কথা শুনতে, সে আ কথা শোনে!

সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখ নিয়ে ছুটে এসেছে মণি, অবাক হয়ে কথাগুলো শুনলো সে, কি ব চান, কি করতে চান উনি!

অনিরুদ্ধর কাছে ছুটে গেল সে: ওঠো, ওঠো, বাবা আবার চেঁচামেচি সুরু করেছেন।

—তোমার জন্যেই তো, আট, আট, যত সব পাগল জুটেছে, বলতে বলতে অনিরুদ্ধ উঠে ব দুপায়ে ঝাড়া দোল, ছুটল নিত্যগোপালের ঘরের দিকে।

আমি বেঁচে আছি অথচ বেঁচে নেই, কেননা আমি যে কোন মুহূর্তে মরে যেতে পারি—না, ম আমায় বাধ্য করা হতে পারে—এই ভয়, এই উত্তেজনা আমি ভুলতে চাই। কে ভোলাবে, কিসে ভু বাইরেটা আজ ঠাণ্ডা, মৃত্যুর মত, ওই যে ধড়ধড়ি জানালা খুলে গেল, শার্সি বন্ধ হল, বাইরে আকাশ যে থেকে থেকে কাঁচগুঁড়ো বৃষ্টি পড়ছে, আবার সেই বৃষ্টি মিহি কুয়াশার মত ভেসে বেড়াচ্ছে, সব নরকের কবরের মত, পৃথিবী যেন হারিয়ে ফেলেছে জীবনের উত্তাপ। তিনি হারিয়ে ফেলেছেন নিজেকে। অ রকম অবস্থায় মনে পড়ে একমাত্র নিজেকে আর মৃত্যুকে।

প্রফুল্ল রায়ের নূতন উপন্যাস

তটিনী তরঙ্গে ৫৲

নাগমতী (২য় মুদ্রণ) ৫৲

প্রমথনাথ বিশী ও অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রক্ত সম্পাদিত

বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক ১০

বাংলার আদি যুগ হইতে শুরু করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত যে
গদ্য রচনা সংকলন। বিরাট ভূমিকা সম্বলিত

নূতন উপন্যাস

উপকণ্ঠে

—নয় টাকা—

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

লেখকের একজনকারার কাছেই গল্পে যে পাত্র-
পাত্রীদের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল—এই গল্পে
তাহাদেরই দেখিতে পাইবেন। বাংলার বিভিন্ন
জীবনের বিচিত্র পরিণতি

গল্প-পঞ্চাশৎ

বহ্নিবন্যা (৩য় মুদ্রণ) ৳

প্রভাত-সূর্য (৩য় মুদ্রণ

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ (৩য় মুদ্র

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের
নবতম উপন্যাস

লীলাভূমি ৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
নবতম ও বিচিত্রতম উপন্যাস

মধুমিতা ৫৲

প্রমথনাথ বিশীর
২০টি ছোট ও বড় গল্পের সংকা

গল্প-পঞ্চাশৎ

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
নূতন বই

একটি পৃথিবী, একটি হৃদয় ৪৲

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উত্তরায়ণ (বর্ধিত সংস্করণ) ৫৷৷০

কবি ৪৲ স্বল্পপত্র ২৸০

কৈশোর স্মৃতি ৪৲ প্রতিধ্বনি ৩৲

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে
নূতন উপন্যাস

এই তীর্থ

সুমথনাথ ঘোষের

নীলাঞ্জনা ৫৲

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের

কাব্য সাহিত্যের ধারা

—পাঁচ টাকা—

বাণী রায়ের
তিন নূতন

প্রেম

প্রবোধকুমার সান্যালের

দেশদেশান্তর (নূতন মু) ৩৷৷০

অরণ্যপথ (নূতন মুদ্রণ) ৩৷৷০

আশাপূর্ণা দেবীর

গল্প-পঞ্চাশৎ ৮৲

শ্রেষ্ঠগল্প ৫৲

কবিশেখর কালিদাস রা

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

আহরণ

(শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

তরঙ্গের পর ৫৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

শ্রেষ্ঠ গল্প

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গল্প-পঞ্চাশৎ ৮৷৷০

আরণ্যক (নূতন সংস্করণ) ৫৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ে

সাত পাকে বাঁধা

নবনায়িকা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

মিলনান্তক ৪৷৷০ কথাচিত্র ৩৲

গল্প-পঞ্চাশৎ ৮৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

জন্মেছি এই দেশে (নূতন সংস্করণ) ৪৷৷০

মনে ছিল আশা (নূতন সং) ৪৲

শ্রেষ্ঠগল্প (২য় সং) ৫৲

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী, সমালোচক ও অধ্যাপকদের লিখিত কুমুদ
সাহিত্যের সর্বদিক-ব্যাপী আলোচনা

কুমুদ-কাব্য পরিচিতি ৲

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা ৬৲

আমাকে বসিয়ে দাও, আমি বসব, ছেলে মানুষের মত বলে ফেললেন তিনি। অনিরুদ্ধ একটা বে লিলির টব এনে রেখে গেল সামনে, মণি ইজিচেয়ারটা পাতছে এই ঘরেই।

গলা শুনে ছুটে এল দুজনে।

—আপনার চলাফেরা চলবে না, ডাক্তার বলেছে অবস্থা বুঝে অল্প অল্প করে, বলল অনিরুদ্ধ, আপনা পিঠে বালিশ দিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিচ্ছি, আপনি আধশোয়া অবস্থায় জানালার কাছে থাকুন, আর আমি নিজের হাতে সব কাঁচ পরিষ্কার করছি, আপনি আর একরম কথা বইবেন না।

শেষকালে প্রায় শাসন করল অনিরুদ্ধ। তাই যেন মেনে নিলেন প্রান্ত নিত্যগোপাল। টবের গাছটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে হোল তিনি যদি ঐ গাছের মত একটা জীবন পেতেন, ওর মত করে বাঁচতে পারতেন, তাহলে দেহের এত জটিল যন্ত্রের থাকত না, তাহলে এত শিরা উপশিরা, এত স্নায়ুজাল, রক্ত রক্তের প্রবাহ, মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড, কিছুই থাকত না, আর তিনি বাঁচতেন দীর্ঘকাল ধরে, অক্ষয় বটের আয়ু নিয়ে

তে লিলির গাছের দিকে তাকালেন তিনি, ছিপছিপে তরুণীর মত ওর লম্বা পাতা একেবারে কাণ্ড থেকে বেরিয়ে অজস্র চওড়া ফিতের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তুবড়ির মতো ফেটে পড়েছে, এই হোল জীবনের ছন্দ, সুন্দর, আনন্দস্পন্দিত, আবেগময়।

আর ঐ, ঐটে কি—হঠাৎ চোখ পড়ে গেল শালির কাঁচের দিকে, নিত্যগোপাল তাকালেন পুত্রবধূর দিকে : তোমার আতসী কাঁচ আছে মা ? নিজের মনেই বললেন, তা কি করে থাকবে !

—হ্যাঁ আছে, মণিদীপা বলল, খুব ভাল ম্যাগনিফাইং গ্লাস।

—ও, তোমারও ছেলেমানুষী বুদ্ধি মাঝে মাঝে চাগে বুঝি, নিত্যগোপাল হাসলেন।

—না, আমার নয়, মণি উত্তর করল, প্রবুদ্ধর।

—ও, ঈষৎ কঠিন হয়ে গেলেন নিত্যগোপাল : আচ্ছা তাই যাও।

আতসী কাঁচটা পেয়েই শালির ওপর ঝুঁকে পড়লেন তিনি।

বড়ে আর বাপটায়, বৃষ্টি আর কুয়াশায় ওর গায়ে এক চমৎকার প্যাটার্ন হয়েছে—ঠিক—ঠিক ঐ লিলির পাতার মত—কে করল, কেন করল, এখানে তো প্রাণ-অপ্রাণের, জড় আর জৈবের একই ছন্দ, সেই একই কারুকৃতি। পাতা আর হিমের পালক—একটা যা বেড়ে উঠল, গড়ে উঠল আর অপরটা যা প্রাণহীন বস্তুকণায় তৈরী হল—এ দুয়েতেই একই রসের কারুকার্য ! সর্বত্র এ কি লেখা লিখেছে প্রকৃতি। অনাদি অনন্তকাল ধরে কোন আখরে কোন কথা বলে যাচ্ছে সে !

তবে কি প্রকৃতি কোন পার্থক্য রাখেনি জড়ে আর জীবে, তবে কি সমস্তই প্রাণস্পন্দিত, প্রাণময় সমস্ত কিছুতেই কি সেই এক প্রাণ ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে, ধ্বনিত হচ্ছে, নানারূপে বিকশিত হয়ে উঠছে……

—ঘটনা, আস্তে আস্তে নিত্যগোপাল বললেন, আমার নাতি যে ছবি এঁকেছে, ঐ যে ও ঘরে শালিতে, ও-তে কেউ যেন হাত না দেয়।

ভারতবর্ষীয় মন্দির শিল্পের বৈশিষ্ট্য

কুমারস্বামী গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতবর্ষকে প্রকৃতি যেমন অরূপণ হাতে বন পর্বত নদীর শোভায় সাজিয়েছে এখানকার মা তেমনি চেয়েছে তাকে সাজাতে মঠ মন্দির হেউলের অভ্রভেদীতায়; ভারতের অঙ্গে অঙ্গে মত তাই মন্দিরের শোভা। প্রত্যেক সমাজই তার ধর্মস্থান বা ধর্মস্থানকে অবলম্বন করে সমাজমনের আদর্শকে রূপ দিতে চেয়েছে; এই কারণেই একটা সমাজের আদর্শবাদ এবং রূপ কল্পনাকে অনুসরণ ক হলে সেই সমাজ কর্তৃক উদ্ভূত মন্দিরশিল্পের অনুসরণ অপরিহার্য বলে গণ্য হয়। মানুষের সংস্কৃতি কলাশিল্পের ক্ষেত্রে যা কিছু শোভন ও সুন্দর বস্তু রচনা করেছে চিত্র, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য তার মধ্যে প্র কিন্তু সভ্যতার বিবর্তন পথে এবং উন্নততর সৃষ্টি কৌশল আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে স্থাপত্যে মানুষ পার লাভ করেছে সর্বশেষে। হয়ত চিত্র এবং ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে মানুষের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায় ইতি পরিপূর্ণতা লাভ করে গিয়েছে; তাই দেখা যায় চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর্যের সভীর উদ্বেগপূর্ণ আত্মজিজ্ঞা এর পরে কি? কিন্তু স্থপতির কাজ এখনও শেষ হয়নি। রূপ ও রীতির অফুরন্ত ভাণ্ডার অনাবিষ্কৃত রয়েছে এখনও; এখনও সেখানে মানুষের নূতন সৃষ্টির বিরাম নাই।

স্থাপত্যশিল্পে পৃথিবীর সভ্যজাতিগুলির প্রত্যেকটিই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য রেখে গিয়েছে। স্থাপত্যের ভিত্তি; ঊর্ধ্বে শূন্যক্ষেত্রে তার বিস্তৃতি। আদিম মানুষ গুহাবাস পরিত্যাগ করে আবাস করতে শিখবার সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্যশিল্পের সূত্রপাত হয়। মনে রাখতে হবে যে মানুষ তার ম চিত্ররচনার কৃতিত্ব লাভ করেছিল। ভারতবর্ষের সিংহলপুর, স্পেন ও ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী পর্বতগুহায় এবং আফ্রিকার কোথাও কোথাও সুপ্রাচীন যুগের মানুষের আঁকা ছবি এখনও দেখা যায়। ইং মানুষ মাটি ও পাথর দিয়ে মূর্তিও তৈরী করতে শিখেছিল। কিন্তু আবাসগৃহকে সুচু সুবিন্যস্ত সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে তার সময় কম লাগেনি। মিশরবাসীরা পিরামিড নির্মাণ করে শূন্যকে করবার অভিযান আরম্ভ করে। টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস তীরবর্তী অসুর জাতি স্তরে স্তরে ধোল ঘনে জিগুরাত নির্মাণ করে স্থাপত্যশিল্পে নূতনত্ব বিধান করে। পারস্যবাসীরা বহু স্তম্ভশোভিত বিস্তৃতক্ষে আচ্ছাদনের তলায় আনতে সক্ষম হয়; তারাই আবার খিলেন আবিষ্কার করে স্থাপত্যশিল্পকে বে একধাপ এগিয়ে দিয়েছিল। মন্দির নির্মাণে গ্রীকজাতি যে উৎকর্ষলাভ করেছিল ইউরোপীয় শিল্পগুরু মতে সে কৃতিত্বকে অন্য কেউ আর কখন অতিক্রম করতে পারেনি। শিল্পগৌরবে গ্রীক স্থপতির ভারতের মন্দিরনির্মাতা অপেক্ষা বেশী কি কম সে তর্কে না গিয়ে একথা অনায়াসেই বলা যায় যে তা মন্দির ভারতের আদর্শবোধকে যে ভাবে প্রতিফলিত করেছে অন্য কোথাও মন্দিরশিল্প বোধ হয় তেমন একটা জাতি বা সমাজের মর্মকথা বা সাধনোপলব্ধি সুচুভাবে প্রকাশ করতে পারেনি।

মন্দির বা উপাসনাগৃহ নির্মাণের আরম্ভে আদিম যুগের সমাধির প্রভাব ছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ডলমেন নামে পরিচিত এই সব সমাধি পৃথিবীর বহু জায়গায় দেখা যায়। জমিতে বৃত্তাকারে সাজান পাথর দিয়ে এই সব সমাধি নির্দিষ্ট থাকত। জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই মৃতদেহ এই যুগে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হত; পশু বা বন্য ছিল বিপদের হাত থেকে বাঁচবার ঐন্দ্রজালিক কৌশল মাত্র। ক্রমে মানুষের বিশ্বাস জন্মে যে দেহের ভিতরে দেহাতিরিক্ত কোন সত্তা বর্তমান; মৃত্যুতে ঐ সত্তা দেহ থেকে নির্গত হয়ে ঊর্ধ্ব দিকে প্রয়াণ করে। কোথায় যায়। অজ্ঞাতলোকে; হয়ত স্বর্গে। ওপরে উঠবার জন্য প্রয়োজন হয় সিঁড়ি বা ধাপের; পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে আকাশকে ধরে রাখবার জন্য আছে মেরু পাহাড়; এই পাহাড়ের উপরে আছে সেই অজ্ঞাতলোক। পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। আরও বিশ্বাস ছিল যে এই মেরুপাহাড়কে বেয়ে উঠতে পারলে মানুষের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভব। এই ধারণা থেকে মেরুপাহাড়ের অনুকরণে ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া প্রাসাদ নির্মাণ করে দেওয়া হত সমাধির উপরে, যাতে ঐ ধাপগুলি অবলম্বন করে মৃতের পক্ষে ঊর্ধ্ব আকাশে উঠে যাওয়া সহজ হয়। এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েই প্রাচীনতম পিরামিডগুলি তৈরী হয়েছিল। পরেকার কোণাকৃতি পিরামিডের প্রত্যেকটির ভিতরেও ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া কাঠামোটি আছে। প্রাচীন অসুর দেশে তৈরি হয়েছিল জিগুরাত; ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শের স্তূপগুলিও অমনি ধাপে ধাপে উঠে গেছে চলা হোলসকের মত। এই ঊর্ধ্বসঞ্চরণশীলতাই মন্দির বা উপাসনা গৃহের মৌলিক রূপটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে।

ভারতবর্ষের মন্দির স্থাপত্যে আদর্শবোধকে নানাভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করা হয়েছে বৃত্তাকার ভিত্তি নক্সার উপরেই প্রাচীন ভারতের প্রথম দেবগৃহ নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান হয়। যে গৃহের অনুসরণই রয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ এবং জৈন স্তূপের ভিত্তি নক্সায়; এই বৃত্তাকার ভিত্তিনক্সার মন্দিরের প্রচলন যে ভারতবর্ষে ছিল তার প্রমাণ রাজগীরের মানিয়ার মঠে, সাঁচীতে এবং আরও অন্যান্য জায়গায় পাওয়া যায়। এই বৃত্তাকৃতি ভিত্তি নক্সার উপর গম্বুজের আকারে উঠে স্তূপ;—স্তূপের এই অংশকে বলা হয় অণ্ড। নভোমণ্ডলের সঙ্গে সাদৃশ্যসম্পন্ন এই অংশের উপরে থাকে চতুষ্কোণ বেদিকার আকৃতি হর্মিকা; এই হর্মিকা স্বর্গের প্রতীক। হর্মিকার উপরে মহাশূন্যের প্রতীক ছত্র। মূলত এই স্তূপে স্তূপ বৃত্তের অভ্যন্তরে চতুষ্কোণ নিয়ে যে নক্সা পরবর্তী যুগের মন্দিরের ভিত্তি নক্সার সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে পারা যায় না।

অবশ্য মন্দির শিল্পে উপকরণ হিসাবে পাথরের ব্যবহার প্রবর্তিত হওয়ার প্রারম্ভিক যুগে মন্দিরে ভিত্তি নক্সা সরল চতুষ্কোণেরই আকার নিয়ে ছিল দেখা যায়। মন্দির নির্মাণে পাথরের গাঁথুনির আরম্ভ খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ছয় শ' বছর পরে। এই যুগের মন্দিরে যেমন সমচতুষ্কোণ নক্সাও দেখা যায় তেমন আয়তক্ষেত্রের শেষ প্রান্তে অর্ধবৃত্তাকৃতিসম্পন্ন মন্দিরও আছে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মন্দিরের ভিত্তি নক্সার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই যুগের মন্দিরের নক্সার সঙ্গে তখনও

বর্ণিত নানা নামে পরিচিত ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলের অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য দেখা দিতে থাকে। এই মণ্ডলগ নক্সার মূল বৈশিষ্ট্য নক্সাগুলিকে সামগ্রিকভাবে বেষ্টন করে থাকা একটি করে চক্র; এই চক্র যে নক্সাগুলির নাম হয় মণ্ডল। এই মণ্ডলগুলিকে প্রকৃতির অনন্তশক্তির আধার দেবদেবীর রহস্যময় প বলে বিঘোষিত করা হয়; মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে মূল শক্তির বীজটিকে ধ্যান করবার নির্দেশ তন্ত্রশাস্ত্রে অ মন্দিরের ক্ষেত্রে মণ্ডলের ছবিটি ত্রিমিতনক্সারূপে বিন্যস্ত হয়; এই নক্সার কেন্দ্রস্থলে তন্ত্রসম্মত ম কেন্দ্রস্থিত বীজমন্ত্রটির পরিবর্তে মূল দেবতার মূর্তি অধিষ্ঠিত হয়। তান্ত্রিক যোগী যেমন ধ্যানের দা মণ্ডলের চক্র ভেদ করে রহস্যময় নক্সার কেন্দ্রস্থিত বীজটিকে আপনার হৃদয়ের সঙ্গে একাত্মক করে ে জন্য সাধনা করেন, প্রতীক হিসাবে ভক্তও তেমনি মন্দিরে মণ্ডলচক্র ভেদ করে অন্ধকার গর্ভগৃহের প্রদীপের ছায়াচ্ছন্ন আলোকে উদ্ভাসিত দেববিগ্রহের নিকট আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করে একাত্মক কৃতার্থ বোধ করেন।

মন্দির ভিত্তির এই বৈশিষ্ট্যটি খুব স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে আ বাংলার পাল সম্রাট ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত সোমপুর বিহারের মন্দিরে। এই মন্দিরের নক্সার আয়তে প্রতিটি বাহু মাঝখানে একটু করে ভেঙে বেরিয়ে আছে; তন্ত্রের ভাষায় এই নক্সার নাম 'সর্ব সর্বতো মণ্ডল।' যদিও মন্দিরের নক্সার মণ্ডল বা বৃত্তের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না তা হলেও একথা ব বোঝা যায় যে তন্ত্রের দিক থেকে নক্সাটিকে একটি কাল্পনিক মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বলেই পরি হয়েছিল। উত্তর ভারতীয় রীতির মন্দিরের নক্সায় এই সর্বতোভদ্র নক্সারই ব্যাপক প্রচলন দেখা পাহাড়পুর মন্দিরের আকৃতিও মন্দির শিল্পের বিশিষ্টতার অন্যতম সাক্ষ্য; মন্দির গঠনের সঙ্গে f পিরামিড, প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ এবং ষোলমঞ্চের সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রতি ধাপে প্রশস্ত বারান্দা; পর পর কয়েকটি ধাপের পর মন্দির শীর্ষে একটি সমতল চতুষ্কোণ চাতাল; এই ধরণের আকৃতিসম্পন্ন সুদূর ব্রহ্মদেশে এবং যবদ্বীপেও দেখা যায়। ব্রহ্মদেশে নিম্নবর্তী ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া অংশের উপর যায় উত্তর ভারতীয় রীতির মন্দির; যবদ্বীপে গম্বুজের আকারের স্তূপ। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া বেদী, চতুষ্কোণ চাতাল গম্বুজের আকৃতির শিখরবিশিষ্ট উত্তর ভারতীয় রীতির মন্দির একই মৌলিক ভাবধারা থেকেই রূপ গ্রহণ করেছিল।

উত্তর ভারতীয় রীতির মন্দিরকে নাগর রীতির মন্দির বলা হয়; এই রীতি যে একটা বিশিষ্ট ধর্ম তথা চিন্তাধারাকে অভিব্যক্ত করেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মূলত প্রাচীন আদর্শের নক্সার উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও দেহগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে মন্দির নির্মাতারা নানা পরীক্ষার পথে চিন্তাকল্পনার সংযোজন করেছিলেন, যার ফলে মন্দিরের আকৃতিতে এবং অলঙ্কারসজ্জায় নানা লক্ষ্য করা যায়। ভূমির উপর চাতাল; চাতালের উপর ভিত্তি। ভিত্তির উপরে গর্ভগৃহের উপর বাড়; এখানে অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন অংশের উপর ক্রমে সরু হয়ে আসা শিখর; শিখরের উপরে আ আমলকের উপরে কলস ও ধ্বজ। বৌদ্ধস্তূপের বেলায় যেমন মাটির উপরে পাঁচটি অংশে বিভক্ত

বেদী, অণ্ড, চন্দ্রিকা আর ছত্র, এখানেও তেমনি বেদি চাতাল, পিঠ, বাচ, শিখর এবং আমলক। মূল আকাশের দিকে উঠে যাওয়া এই পাঁচ অংশে বিভক্ত গঠন ভারতীয় কল্পনার সুমেরু পর্বতেরই অনুকল্প।

এক সময়ে এই রীতির মন্দির ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেছিল; দাক্ষিণাত্যের পট্টডকল (অন্ধ্রপ্রদেশ) থেকে উত্তরে হিমালয় ও কাশ্মীর পূর্বে গৌহাটি থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত এই রীতির অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য সাগর বিধৌত উড়িষ্যা, মধ্য ভারতের খজুরাহোতে, পশ্চিম রাজস্থান ও গুজরাটে এই রীতির মন্দির বিশেষ পরিণতি লাভ করেছিল। উড়িষ্যার কোনারকে ১২৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরসিংহ দেব যে সূর্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, সেইটিই হয়তো ভারতবর্ষীয় মন্দিরগুলির মধ্যে বৃহত্তম! সামঞ্জস্যপূর্ণ গঠন ও অলঙ্কারসজ্জায় খজুরাহোর কান্দারিয় মহাদেব মন্দির এবং ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দির সত্যই তুলনাহীন। বিস্তৃত নীল আকাশের কোলে মন্দির শিখর উঠে গিয়েছে যেন এক গ্রধ্যানমগ্নে উপবিষ্ট মহাযোগীর মূর্তি; পিঠ যেন এই যোগীপুরুষের আসনবদ্ধ পদদ্বয়; গর্ভগৃহ যেন দুই জঙ্ঘা ও উদর; শিখরটি যোগীর দেহকাণ্ড; আমলকচূড়া যোগীর মস্তক। মন্দির শিল্পী কি অদ্ভুত রূপ কল্পনাকেই না এই মন্দির দেহে মূর্ত করে তুলেছেন; এই মন্দির যে সত্যই ভারত সাধনার মর্মকথাটির রূপময় প্রকাশ—যার দিকে তাকালে যোগ ধ্যানের সেই কথাটিই মনে হয়—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনঃ সুখেষুবিগতস্পৃহ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

মন্দির যেন এই আদর্শেরই অনবদ্য অভিব্যক্তি।

———

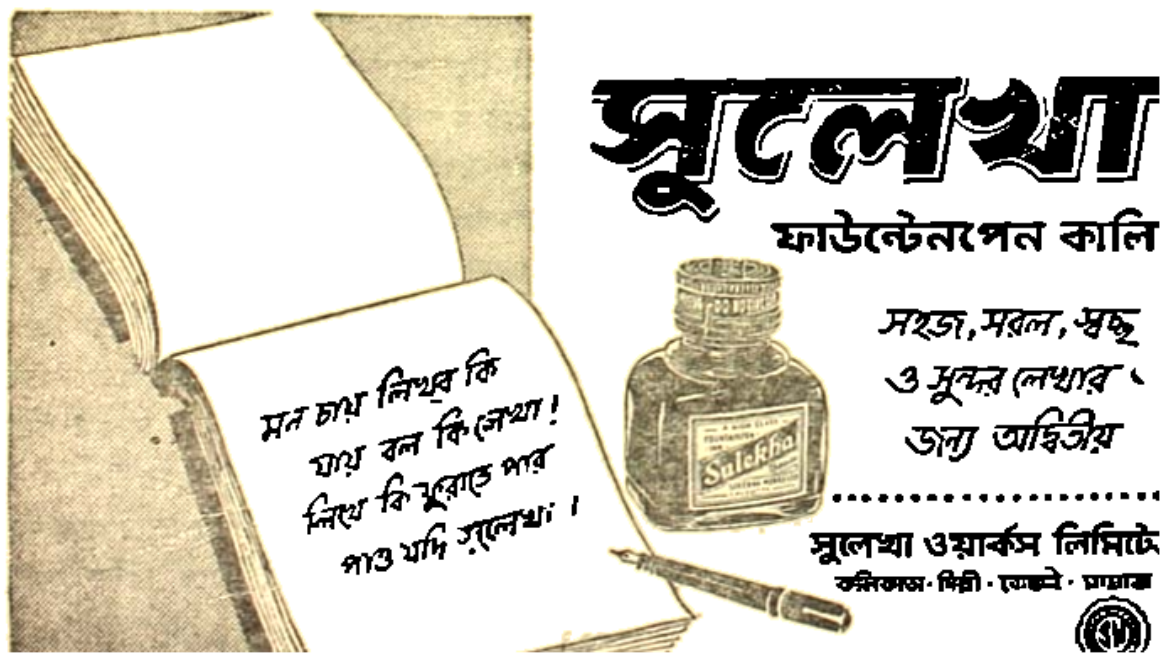

সুখী

প্রেমেন্দ্রকুমার সান্যাল

অলকাদেবীর দুই মেয়ে নীনা এবং মিলি বিলাস-বৈভবের মধ্যে মানুষ হয়েছিল। পুরনো বাড়ি অতিশয় নিরিবিলি অঞ্চলে যে মস্ত বাগানবাড়িতে ওরা বড় হয়েছে, সেই বাড়ির চতুঃসীমার সাধারণ স্বল্পবিত্ত গৃহস্থের বসবাস ছিল না, এবং ওই বিশাল বাগানবাড়ির বাইরে যে জগৎটার সঙ্গে মাঝে তাদের পরিচয় ঘটত, সেটাও ভরা ছিল রাজা মহারাজা উপাধিধারীদের গোষ্ঠী, এবং তাদের পরিবারের পুরুষ-মহিলা, ছেলে ও মেয়ে। দুটি মেয়ে প্রায় আঠারো বছর বয়স অবধি মসলিনে পরেছে, এবং কনভেন্টে পড়াশুনো করেছে। ওরা পিয়ানো বাজিয়েছে, নাচ শিখেছে এবং বি খেলেছে। কয়েক বছর আগে মেয়ে দুটিকে দেশী গান শেখাবার জন্যে বিশেষ উচ্চ সমাজের শিক্ষয়িত্রীকে রাখা হয়েছিল, এবং তিনি অনেক শ্রেষ্ঠা-চরিত্রের পর নীনাকে দু' একটি রবিঠাকুরে শেখাতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু বাংলা উচ্চারণটি মনোজ্ঞ নয় বলেই নীনা সেসব গান আর চায়নি। তবে সে যেটুকু অনুশীলন করেছিল তারই সুখ্যাতিতে পুরনো জমিদার মহলের নানা পরিবারের মহিলা ও পুরুষগণ মুখরিত হয়েছিলেন। নীনার সম্বন্ধে কোন কোন অভিজাত মহলের তরুণ কুমারগণ কিছু উচ্চাশা পোষণ করেন। সাহেব-মেম সমাজের বাইরে অলকাদেবীর বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা কম ক্যালকাটা ওদের বাড়ির গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। কারও মাথা ধরলে তাঁকেই কল্ দেওয়া হত।

অলকাদেবী অতিশয় অমায়িক এবং মধুর প্রকৃতির মহিলা ব'লে পরিচিত। তিনি বিধবা। তাঁর পঞ্চাশ হল বৈ কি। তাঁর মাথার কাঁচাপাকা সুন্দর চুলগুলি রব-করা, এবং তিনি মিহি ধান ধুতি পরেন, এবং শাদা রঙের নরম রেশমি চটি ব্যবহার করেন। তাঁর পুত্রসন্তান নেই। মেয়ে সঙ্গে বাংলায় কথাবার্তা বলা তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক। ছোট মেয়েটিকে একটু আধটু বাংলা জন্য তিনি তাঁর বন্ধু কর্ণেল ডেনাম হোয়াইট্ সাহেবের মারফত এক ইংরেজির বিশিষ্ট অধ্যাপক ভদ্রলোককে কিছুদিনের জন্য রেখেছিলেন। সর্ত ছিল এই যে, সপ্তাহে একদিন একঘণ্টার জন্য আসবেন, এবং প্রতি ঘণ্টার জন্য একশ টাকা তিনি পাবেন। কিন্তু ভদ্রলোক দিন তিনেক আসার পর টেলিফোন যোগে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে দেন, এবং অলকাদেবী একখানি তিনশ' টাকার চেক্ চ মারফত তাঁর কাছে পাঠিয়ে ঋণ পরিশোধ করেন।

অলকাদেবীর স্বামী ব্যারিষ্টার টি-এন-সেন একদা কলিকাতার উচ্চসমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাংলার এক অতি ধনবান জমিদারের সন্তান এবং তিনি বিলাতে মানুষ হন। অলকাদেবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। নীনা এবং মিলি তাদের কিশোর বয়স অবধি বিলাতেই বড় হয়। মেয়ে দুটি

ইংল্যাণ্ডের নাগরিক বলেই সর্বত্র গণ্য। কিন্তু সেনসাহেব কলকাতায় অগাধ ভূ-সম্পত্তির মালিক এবং সরকারি ব্যাঙ্কে তাঁর পৈতৃক বহু টাকা জমা থাকার জন্য তাঁকে শেষ বয়সটি এখানেই কাটাতে হয়। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই হঠাৎ মারা যান। তাঁদের বিলাতের সেই বাগানবাড়িতে এখন দুটি অভিজাত ইংরেজ পরিবার ভাড়া থাকেন। অলকাদেবী এখান থেকেই সেই সম্পত্তির তদারক করেন। তিনি 'লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস্'-এর গ্রাজুয়েট।

দুই মেয়ের জন্য দুটি পাত্রকে অলকাদেবী মনে মনে নির্বাচন ক'রে রেখেছিল অনেক দিন থেকে। নীনার পাত্রটির নাম গুরবাক সিং। ছেলেটি বিলাতে ছিল, এবং সে নাকি মহারাজা গুলাব সিংয়ের কোন্ সুবাদে যেন প্রপৌত্রস্থানীয় হয়। ছেলেটি চুলদাড়ি রাখে না, এবং হাতে কখনও পরে না। অতি সুশ্রী রূপবান এবং দেখতে যুবক। বিলাতে সে নাকি লিংকন্স্ ইন এ ব্যারিস্টার হয়েছে।

সম্প্রতি কিছুদিন আগে নীনার বিবাহ রেজেস্টারী ক'রে হয়ে গেছে। গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের সর্বাপেক্ষা বড় হল্‌টিতে সেই উপলক্ষে অলকাদেবী একটি ভোজসভায় বন্ধুমহলকে আপ্যায়িত করেন। নীনা এখন কিছুদিন কলকাতাতেই থাকবে। গুরবাক সিং লুধিয়ানা থেকে ফিরে ওকে নিয়ে বিলেত চ'লে যাবে।

দেবরায় তার গল্পের আসরে ব'সে বলল, এ ধরনের পরিবারকে আজকাল অনেকটা যেন অবান্তর ব'লে মনে হয়। কিন্তু একটা কথা ঠিক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ করাটা এই পরিবারটির পক্ষে যথেষ্ট কল্যাণজনক হয়নি। অর্থনৈতিক কারণে অলকাদেবীর মনে ইদানীং নানাবিধ দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

মুন্সী দেওজীবন প্রশ্ন করল, কেন স্যর?

দেবরায় বলল, সম্ভবত ভূমিকম্পের ভয়! তাঁর জানা জীবনের বাইরে থেকে একটা অজানা জীবনের সঙ্কেত অন্ধকার থেকে চুপি চুপি যেন উঁকি দিচ্ছিল। তিনি অর্থনৈতিক সমাজ বিপ্লবের ভয় পাচ্ছিলেন।

আপনি কেমন ক'রে জানলেন?

আমার সঙ্গে ওঁদের পরিচয় হয় জাহাজে। আমি বোম্বাই পোর্টে ফিরছিলুম। ওঁদের চিন্তার ধারাটা আমি অনুভব করতুম।

কিন্তু ওঁরা আপনার মতন দেশী বাঙালীকে আমল দিলেন যে?

দেবরায় হেসে উঠল উচ্চকণ্ঠে। বলল, ঠিক বলেছ। তবে উনি এবং ওঁর মেয়েরা আমাকে দেশী এবং বাঙালী ব'লে ঠিক ঠাওরাতে পারেননি! মনে করেছিলেন আমি রোম কিংবা এথেন্সের কেউ হব। আমার কিন্তু চিনতে ভুল হয়নি। তবে প্রথমটা আমি ওঁদেরকে পার্শী মনে করেছিলুম। মেয়ে দুটির চেহারাতেও ইরানী-আর্মানীর ছাপ ছিল।

দিন দুই আলাপ হবার পর আমি মিলিকে ডেকে বলেছিলুম, একদিন তোমাদের বাড়িতে গিয়ে কুমড়ো শাক চচ্চড়ি এবং শুক্তো রেঁধে খাইয়ে আসব! জীবনে অনেক সুখাদ্য থেকে তোমরা বঞ্চিত।

মিলি হাসিমুখে প্রশ্ন করেছিল, চচ্চড়ি শুকতো—সে আবার কি জিনিষ? Is it some sort of bengali dish?

বলেছিলাম, হ্যাঁ, খেতে ভারি চমৎকার!

গল্পের মাঝখানে চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে সহকারী অশোক বলল, আপনার গল্প কি শেষ হচ্ছে না স্যর।

দেবরায় আবার হাসল। বলল, না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতুম না। আরও পঁচিশ বছর তোমার মতন তরুণ যুবকরা আমার গল্প শুনে বলবে, আমি মিথ্যাবাদী।

তারপর?—বন্ধুরা একটু উৎসুক হয়ে উঠল।

ভূমধ্যসাগরে তখন কি যেন একটা গণ্ডগোল চলছিল,—দেবরায় তার গল্পের সূত্র ধ'রে লাগল, আমাদের জাহাজটি আসছিল ভয়ে ভয়ে। সবশুদ্ধ ষোলদিন লাগবার কথা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে দিনের ধাক্কা। সুতরাং জাহাজে আরও বেশি সংগ্রহের দরকার। এর ফলে পোর্ট সৈয়দে দুদিন প'ড়ে রইলুম। জীবনে ওই প্রথম লালবর্ণের বড় দেখেছিলুম। আমরা সবাই গিয়েছিলুম এ পিরামিড দেখতে।

একটু থেমে দেবরায় বলল, নীনাকে অতটা আমি বুঝতে পারিনি, কারণ তাকে ভারতীয় বললে ভুল হবে। তার চাল-চলন ঠিক বেশি নয়। ওই জাহাজেই দেখলুম, সে একদিন পার্টি দিল, সেইদিনই জানলুম, সাউদাম্পটন্ থেকে জাহাজ ছাড়বার আগে তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধব এই জা চলেছে। এর মধ্যে ওরা দল বেঁধে এই জাহাজেরই নীচের তলায় সুইমিং কস্টিউম্ প'রে সাঁতার বে বল্‌ড্যান্স্ করছে রোজ সন্ধ্যায়, শেরী-ভারমুথ্ খাচ্ছে ডিনারে, অথবা রুশব্যালের অনুকরণে 'হংসনৃত্য' কোথাও না কোথাও। জাহাজের ক্যাপ্টেন, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কেমিস্ট, ইংরেজ সরকারের অফিসিয়ল্,—এবং অনেকের পরিবার-পরিজন—অলকাদেবীর দলের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে মিলি তার ক্যামেরা নিয়ে একটু ঘুরে-ঘুরে থাকে, কিন্তু নীনা একেবারে তলিয়ে যায় তার সমবয়স্ক তরুণী দলে। নীনার দেহসৌষ্ঠব ও লাবণ্য কি প্রকার এটি সকলেই স্বচক্ষে দেখে আলোচনা ক কেননা সাঁতার দিয়ে সে যখন জল থেকে উঠে আসে, অনেকেই ভিড় ক'রে দাঁড়ায় তার দে উপভোগ করার জন্য। মিলি একটু লজ্জাক্রমেই হাসিমুখে অন্যদিকে তার মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং যেখানে রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউ গুণি, সেইদিকে স'রে আসে। অলকাদেবী তখন নীনার যৌবন প্রাচুর্যের দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে কি ভাবেন, আমি খোঁজ নিইনি!

মিলির জন্য পাত্র ঠিক ছিল। ছেলেটি বাঙালী। বিজয়াগড়ের মহারাজা মনোরেঞ্জনের পৌত্র। ছেলেটির নাম ভোলেন্দ্র। সে দেরাদুন মিলিটারী একাডেমি থেকে পাস ক'রে বিগত কমিশন্ড্ হয়। কিন্তু ক্রীটের যুদ্ধের পর দুর্ভাগ্যক্রমে তার আর কোনও খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি। বেঁচে নেই, এটি বিশ্বাস ক'রে নেওয়া হয়েছিল। অলকাদেবীর চোখে নাকি সেই প্রথম অশ্রু দেখা গিয়ে

দেশে ফিরে মোটামুটি এইটুকু জেনেছিলুম, দুই কন্যা এবং তাদের জননী অলকাদেবী বিপুল ধন ও সম্পদের মালিক, এবং একটি আইন বিশারদ সাহেব কোম্পানি এঁদের সমস্ত সম্পত্তি ও আমানতি টাকার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন। অলকাদেবীর স্বামু ভারতপ্রসিদ্ধ প্রাক্তন ব্যারিস্টার মিঃ নর্টন তাঁর জীবন-কালে এঁদের সম্পর্কে একটি সুব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন।

অলকাদেবী আমাকে না ডাকলে আমি ওঁদের বাড়ি যেতুম না। একলা থাকায় ওঁরা অভ্যস্ত ছিলেন। টেলিফোন ওঁদের যোগাযোগের প্রধান বাহন ছিল, এবং সপ্তাহে চার পাঁচবার ওঁরা বিলাতের সঙ্গে ট্রাঙ্ককলে আলাপচারী করতেন। ওঁদের প্রধান ডাক ও চিঠিপত্রাদি এসে পৌঁছতো বিলাত থেকে। অনেক সময়ে মেহেদের জামা এবং জোব্বাও আসত সেখান থেকে। অলকাদেবীর ওখানে বড়দিনের এবং নববর্ষের কার্ড এসে পৌঁছত বুড়িবুড়ি। আমার মনে হত এঁরা এদেশের নয়। সে যাই হোক, আমাকে ওঁরা নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তি বলেই ঠাওরাতেন। আমি যে বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার, এই পরিচয়টুকু নিয়ে ওঁদের সামনে দাঁড়ানোই যেত না। এ ছাড়া পিয়ানোর স্বরলিপির সঙ্গে মিলির হাত ধ'রে আমার পক্ষে বরমর নেচে বেড়ানো সম্ভব নয় শুনে মীনা আমাকে যেন একটু কৃপার চক্ষেই দেখে। বিলাত থেকে ফিরে আমি অল্প দামের একখানা গাড়ি কিনেছিলুম, কিন্তু সেখানা নিয়ে ওঁদের বাগানবাড়ির ফটকে একবারও ঢুকতে সাহস করিনি, পাছে আমি অনুকম্পার পাত্র হই। সুতরাং ট্যাক্সিখানা বাইরে থেকেই বিদায় করে আমি ওঁদের দেবদারু এবং ইউক্যালিপ্টাস ভরা বিশাল বাগানের মধ্যে প্রবেশ করতুম। ওঁদের খান দুই 'রোলস্ রইস' গাড়ি ছিল।

একদিন মিলি তার গাড়িতে তুলে আমাকে বলল, চলুন, আপনাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

রোলস রইস্ গাড়িতে আমাকে তুলে বাগান পেরিয়ে পথে বেরিয়ে সে বলল, আপনি ত' আমাকে তা মেখিয়ে রাখলেন। কিন্তু কই, সেই যে বলেছিলেন "চড়বড়ি আর গুপ্‌তো" খাওয়াব,—সে কবে?

হেসে বললুম, ওটা চড়বড়ি নয় মিলি,—চচ্চড়ি! গুপ্‌তো নয়, গুক্‌তো!

মিলি বলল, কোন্ হোটেলে পাওয়া যায়, চলুন।

হেসে বললুম, মুশকিল কি জান, লক্ষ লক্ষ বাঙালী পরিবার ঝুমড়োপাক চচ্চড়ি আর গুক্‌তো খায় কিন্তু ওদুটি সুখাদ্য কোন হোটেলে পাওয়া যায় না,—এমন কি পাইস্ হোটেলেও নয়!

পাইস্ হোটেল!—মিলি মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, সেটা কি?

গরীব-গেরস্থরা যেখানে খুব সামান্য পয়সায় খেয়ে পেটটা কোনমতে ভরায়!—বলতে বলতে আমি হঠাৎ চুপ ক'রে গেলুম।

মিলি আমার কথাটা বোধ হয় ভাল বুঝতে না পেরে এক সময় বলল, কোথায় থাকে তারা?

হাসিমুখে এবার বললুম, বাঃ জান না? তারা যে কোটি কোটি, তারা তোমার আমার চারদিকে সব জায়গায় ছড়িয়ে থাকে!

গাড়িখানা ঘুরিয়ে এল্‌গিন রোডের পাড়া পেরিয়ে লোয়ার সার্কুলার রোডে সে ভিক্‌টোরি

মেমোরিয়ালের দিকে চলল। আমি অনুভব করছিলুম, সে আমার কথাটা বিশ্বাস করেনি। কিছুক্ষণ থেকে ট্রাম লাইনটা পেরিয়ে গিয়ে সে বলল, মনসেল, আপনি বড্ড খারাপ দিয়ে কথা বলেন। But talk so loosely, please।

ওর কথায় আমি ক্ষুব্ধ হইনি। এক সময় মৃদুকণ্ঠে বললুম, তুমি যেটি এখনও জানতে পারনি, সে নেই—কেমন ক'রে ধ'রে নিলে, মিলি?

মিলি ছোট্ট কথায় জবাব দিল, মা আমাকে বলেনি কোনদিন!

সেদিন ভক্টোরিয়ার ওদিকে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে মিলি আমাকে ধ'রে কিছু কিছু কাহিনী শুনে নিল। অতঃপর গার্ডেন রীচ হয়ে আমরা সেদিন ফিরে এসেছিলুম। এর কিছুদি যখন মিলি আরেকবার আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইল, আমি বললুম, আজ আমিই তোমাকে আনব। চল—

সেটা শীতকাল। তখনও রৌদ্র আছে। মিলি তার সুন্দর ফ্রকটির উপর একটি ফ্লানেলের ফুলিয়ে আমার পাশে বসল, এবং আমি ষ্টিয়ারিং ধরলুম। আমরা চললুম উত্তরে। এসব রাস্তার সা বিশেষ পরিচয় নেই। মাইল দেড়েক পেরিয়ে এক সময় সে বলল, মিঃ রায়, এদিক দিয়ে যাচ্ছি, মা বলবেন না! she'll be shocked! It's too much for us.

কেন?

মিলি ইংরেজিতে বলল, পৃথিবীর সর্বত্র অনেক নোংরা ঘৃণ্য আছে, মা তার থেকে আমাদের রাখতে চান্।—দাঁড়ান্ এ কোথায় যাচ্ছেন, মিঃ রায়? এদেরই কথা কি সেদিন আপনি বলছিলেন? রাস্তায় শুয়ে আছে? ফুটপাথে ব'সে আছে? ডাস্টবিনে নোংরা ঘাঁটছে?

অতঃপর মিলি স্বীকার করল, তার তেইশ বছরের জীবনে এই প্রকার অভিজ্ঞতা তা'র হয়নি এখন বেশ বুঝতে পারছে, তাকে কনভেন্ট থেকে ছাড়িয়ে এনে মা কেন তার জন্য ইংরেজ গভর্নেস রেখে আমি সেদিন মিলিকে মধ্য ও উত্তর কলকাতার সর্বাপেক্ষা ঘিঞ্জি ও নোংরা অলিগলির মধ্যে নি দেখিয়ে এনেছিলুম, অর্থনৈতিক কারণ, দারিদ্র্য এবং অশিক্ষার জন্য মানুষ কি প্রকার দুর্গতির মধ্যে বিড়ম্বিত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। মাঝে মাঝে শুনেছি মিলি ঘুমের এক প্রকার শব্দ করে উঠে মাঝে দেখেছি তার মুখের চেহারা বিবর্ণ হয়ে এসেছে। আমি তখন ভাবলুম, না, আর নয়,—ঘণ্টা হতে চলল, এবার ফিরে যাওয়া যাক্। তার স্পর্শাতুর মনে আমার হাত দিয়ে কোনও দাগ না পড়ে!

সেদিন গাড়ি ঘুরিয়ে যখন তাকে বালীগঞ্জে এনে পৌঁছে দিলুম, তখন সে আমাকে ধন্যবাদ বলল, এটা শুধু আমার নতুন অভিজ্ঞতা নয়, মিঃ রায়,—এ অনেকটা "discovery of India।"

•

বোম্বাইয়ের বিমানঘাঁটি সান্তাক্রুজের রেস্তোরাঁয় বসে এই ছোট্ট একটি কাহিনী দেবব্রা আরম্ভ করেছিল। ওরা যাচ্ছে কলকাতায়। কিন্তু 'স্কাই মাস্টার' বিমানটির কলকাঠিতে কিছু গণ্ডগো জন্য একটু দেরি হচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল।

দেবব্রত বলল, হ্যাঁ, কথাটা পরিষ্কার হওয়াই ভাল। মিলি অবশ্য পাঁচ সাত বার এখানে ওখানে বেড়িয়েছিল আমার সঙ্গে। অধিকাংশ সময়ে সে পায়জামা পরত, তাঁর ওপর কুর্তি দেওয়া চলতলে পাঞ্জাবি অথবা একটা পুরুষোচিত টিলে আচকান,—কব্জিটা তার বন্ধ। আমি তার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। কিন্তু তার ওই একটু গায়ে পড়া ভাবটি লক্ষ্য ক'রে যদি আমি মনে করতুম, সে আমার প্রণয়প্রার্থী হচ্ছে, তবে আমার ভুলই হত। অনেক সময় সে তাদের হল্ এর সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো পূর্ণদৈর্ঘ্য আয়নার দিকে ফিরে আমাকে সহাস্যে প্রশ্ন করতো, কেমন দেখাচ্ছে আমাকে, মিঃ রায়? Do I look like an angel?

আমি তার স্বাস্থ্য এবং শরীরিক গঠনের দিকে চেয়ে বলতুম, আগে একখানা এঞ্জেলের ছবি দেখি, পরে বলব!

Oh, you naughty fella'—

এই ব'লে হেসে সে লীলায়িত ভঙ্গীতে আমার হাত ধরে বাইরে চ'লে যেত। আমার সঙ্গে তার তামাসা ওই পর্যন্তই।

কিন্তু অলকাদেবীর মনে ইতিদিনে দুর্ভাবনা এসে গেছে। আমি 'কমনার' এটি তিনি অবশ্যই ভাবতেন এবং মিলিকে ডেকে এক এক সময় তিনি বলতেন, মিলি তুমি আমাকে আজকাল অবাক করে দিচ্ছ। তুমি নাকি লাল পেড়ে শাড়ি পরবে বলেছ?

হ্যাঁ, মা। আমি শাড়ি পরব এখন থেকে। কি চমৎকার কর্ম হয় বলো ত?—মিলি একটু আবদার ধরেই বলল, আমি আর 'সেল্ফ্-অ্যাসিল্' দিতে চাইনে, মা।

অলকাদেবী করুণ কণ্ঠে বলতেন, এটা বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি, মিলি? বোধ হয় এটা মিঃ রায়ের প্রস্তাব!

মিলি বলত, না মা, সত্যি বলছি, আমার নিজেরই ইচ্ছে। উত্তর কলকাতার সবাইকে দেখি শাড়ি পরে। তারাও ত বাঙালী, মা!

অলকাদেবী ঈষৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন একদিন,—মিলি, তুমিও নীনার মতন লক্ষ্মীই হবে, এইটি কামনা ক'রে এসেছি। নীনা হয়ত বিলেত গিয়ে ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনে জয়েন্ করবে, তা জান? পোশাক সম্বন্ধে এখন থেকেই সতর্ক হওয়া দরকার। এখন স্বাধীন হয়েছে আমাদের দেশ! তোমাকেও ফরেন্ সার্ভিসে আমার দেবার ইচ্ছে, মিলি!

মিলি বলল, তার জন্য আমাকে কি করতে হবে, বল মা?

ডিসিপ্লিন্ শেখো, মিলি। নিজেকে কন্ট্রোল্ কর, রেগুলেট্ কর।—অলকাদেবী বললেন, স্বাধীন ভারত তোমার কাছে অনেক আশা করে, মনে রেখ। কমনার্সদের সঙ্গে এত মেলামেশা করলে তোমার নিজের কাল্চার ম্যাফেক্টেড্ হতে পারে, মিলি।

মিলি চুপ ক'রে গিয়েছিল।

এরপর থেকে অলকাদেবী আমাকে আর ডাকেন নি। কিন্তু মিলি একদিন আমাকে ফোনে

ডেকেছিল! আমি প্রথমেই তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করলুম। মিলি জানাল, সে ছাড়া আর সবাই ভ আছে। প্রশ্ন করেছিলুম, তুমি ভাল নেই কেন? মিলি জবাব দিল, দিনরাত আজকাল সমাজতন্ত্রের পড়ছি। মাথা গরম। আপনি আসছেন কবে?—হেসে বললুম, সময় না পেলে যাই কেমন করে? সি বলল, শনিবারে ঠিক পাঁচটায় আসুন না 'শাহাজাদীর' সামনে? ওখানে আপনার জন্ম একা দাঁড়ি থাকব! আমি জবাব দিলুম, তোমার মাকে লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইনে, মিলি। কথ শুনে মিলি কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল। পরে বলল, ক্ষমা করবেন, আপনাকে অনেক হ্যারাস্ করেছি 'ও-কে'। গুড বাই!

মিলি টেলিফোন ছেড়ে দিল। আমি যেন বেঁচে গেলুম।

মিঃ মেহেতা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, আঃ আপনি মেয়েটার টুঁটি টিপে মারলেন, মিঃ রায়? সা অনুরোধ রাখলেন না?

দেবরায় বলল, আমি ওঁদের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইনে বলেই স'রে এসেছি, মিঃ মেহেতা!

কিন্তু মেয়েটির আন্তরিকতা? আপনার প্রতি মিলির—

দেবরায় হেসে উঠল। বলল, ছোট মেয়ের স্বাভাবিক স্নেহ আছে তার পুতুলের প্রতি! সেখা আন্তরিকতার অভাব নেই! কিন্তু যথাসময়ে পুতুল খেলা ভেঙে দিয়ে সে চ'লে যাবে অন্যত্র!

বন্ধুরা চুপ ক'রে গেল।

মুন্সী মেওজীবন প্রশ্ন করলেন, তারপর?

দেবরায় বলল, তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। কতদিন, সে হিসেব রাখিনি। ছয়ত বছর হবে। একদিন একটি লোক আমার কলকাতার অস্থায়ী অফিসের ঠিকানা খুঁজে খুঁজে আ কাছে এসে হাজির। লোকটি নমস্কার ক'রে একপাশে দাঁড়াল। বললুম, কোত্থেকে আসছ? নাম তোমার?

লোকটি বেশ প্রবীণ। বলল, আমার নাম ইউসুফ। আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি। ব সেনসাহেবের বাড়ি রান্নাবান্না করি। বড় মেমসাহেব এই চিঠি আপনাকে দিয়েছেন। আপনি মেহের করে একবার তাঁর ওখানে আসুন।—চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে লোকটি দাঁড়াল।

কাগজখানি অতি সুন্দর। চিঠিখানা টাইপ করা। একবার চিঠিখানার উপর চোখ বুলিয়ে আমি বললুম, আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি গিয়ে বলো, চিঠি পেয়ে আমি খুশী হয়েছি।

ইউসুফ সেলাম জানিয়ে বিদায় নিল।

দিন দুই পরে আমি যথারীতি একখানা ট্যাক্সি নিয়ে বালিগঞ্জের সেই বাগানবাড়িতে গিয়ে হ হলুম। আমন্ত্রণলিপির মধ্যে এমন কোনও কথা ছিল না, যাতে আমি ঔৎসুক্য বোধ করতে পারি। প্রথমেই আমি বন্দুকধারী সেপাইকে দিয়ে ইউসুফকে ডেকে পাঠালুম। ইউসুফ এসে আমাকে অভি জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল।

নীচের তলা থেকে ইতোমধ্যেই একজন কর্মচারী বোধ করি আগেই টেলিফোনযোগে উপরতলা আমার আগমনবার্তা জানিয়ে দিয়ে থাকবে। উপরে গিয়ে দাঁড়াতেই অলকাদেবী আমাকে নিতান্ত এক আত্মীয়ের মতো অভ্যর্থনা ক'রে তাঁর লাউঞ্জে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বাড়িতে নীনা বা মিলি কাউকে দেখছিনে। প্রশ্ন করতেই অলকাদেবী বললেন, নীনা বিলেতে, কিন্তু মিলিকে নিয়ে আমি একটু সমস্যায় পড়েছি দেবকুমার। তোমাকে ডেকেছি সেইজন্যেই।

আমি তাঁর দিকে তাকালুম।

তিনি বললেন, মিলি আমার কাছে নেই, থাকতেও চাইছে না!

সে কি, আপনি মা! মিলি ত' অবুঝ নয়? কোথায় সে?

অলকাদেবী বললেন, সে আছে তার পছন্দমতো একটি জায়গায়। আজ প্রায় বেড় বছর হ চলল, সেখানেই আছে। আমার কর্মচারীদেরকে পাঠিয়েছি, এটর্নী উকীল ব্যারিস্টার, বন্ধুবান্ধব—সবাই পাঠিয়েছি একে একে তার কাছে। কিন্তু সে আসেনি।

কি বলে?

আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, এই তার ইচ্ছে।—অলকাদেবী বললেন, কিন্তু সে আমি পা

সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে কয়েকটি নতুন বই

প্রাচ্যবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র

শান্তি ও মৈত্রীর জন্যে ১৫ নঃপঃ
(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরকালে এন. এস
ক্রুশ্চেভের বক্তৃতাবলী
এন. এস. ক্রুশ্চেভ—সংক্ষিপ্ত জীবনী
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সোভিয়েত
পররাষ্ট্র নীতি
শান্তি ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর পথ
নিরস্ত্রীকরণ ২০ নঃপঃ
কৃষি উন্নয়নের সুযোগ সম্ভাবনার পূর্ণতর
সদ্ব্যবহার করিতে হইবে ২০ নঃপঃ

শান্তি ও আন্তর্জাতিক মৈত্রী পতকাবাহী—
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ২০ ন
সোভিয়েতের নানাজাতি ২৫ ন
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক
উন্নয়নের উৎপাদনাংক ৩০ ন
সোভিয়েত জাতীয় অর্থনীতিতে বিজ্ঞানের
ভূমিকা
শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে পেন্সন ব্যবস্থা
সোভিয়েত কারখানায় কর্মব্যবস্থা

সোভিয়েত দেশ কার্যালয়

১১১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৬

উপরের ঠিকানায় অথবা স্থানীয় এজেন্টের নিকট যোগাযোগ করুন:

না, দেবকুমার। আমার স্বামীর সম্মান, পরিবারের কালচার, আমার নিজের সম্ভ্রমবোধ,—এসব তুচ্ছ সেই জায়গাটিতে আমি গিয়ে দাঁড়াতে পারব না! তুমি যদি তাকে ফিরিয়ে আনতে পার, দেবকুমার তাই তোমাকে ডেকে এনেছি! এই বংশের সম্মান আর মর্যাদা তুমি যদি কোনমতে বাঁচাতে পার, দেবকু —সেনবংশ চিরকাল তোমার কাছে ঋণী থাকবে!

অলকাদেবীর চোখ দুটি বাষ্পাকুল হয়ে এল। তিনি একটি ছোট ঠিকানা আমার হাতে দি তাঁর এরূপপ্রকার উদ্বেগ-আকুলতা আগে আমি দেখিনি।

মুখ তুলে বললুম, আপনার সঙ্গে কি কোনমতেই সেখানে যাওয়া চলে না?

না না না, দেবকুমার—অলকাদেবী অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, কোনমতেই না। সেখানকার যে বর্ণনা শুনেছি, তা'তে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের বংশাবলীর মর্যাদা ও সম্মান চির জন্য কলঙ্কিত করতে পারব না। মেয়ে যদি আমার মরে সে সইবে, যদি আমাদের সমস্ত বিষয় রেজকপে দান ক'রে দিতে হয় তাও সইবে,—কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে আমাদের চিরকালে যে মানহানি হবে, সে আমার সইবে না। এ কথাটা তুমি মিলিকে ভাল ক'রে বোঝাতে পারবে আমি বিশ্বাস করি' দেবকুমার।—বলতে বলতে থরথরিয়ে তাঁর চোখে জল এল।

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, বেশ, আমি যাচ্ছি। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাকে কথা কিন্তু এত লোক গিয়েও যখন তাকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি, তখন আমার অনুরোধ সে মানবে বলা কঠিন। আশীর্বাদ করুন, তাকে যেন তার মায়ের কাছে হাসিমুখে এনে দিতে পারি।

আশীর্বাদ করার ব্যাপারটা তাঁর জানা আছে কিনা, সেটি আর লক্ষ্য না ক'রেই আমি তরতর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলুম। পিছন থেকে তিনি কেবল বললেন, আমি জানি দেবকুমার, তুমিই ফিরিয়ে আনতে পারবে!

মেহেতা বললেন, ব্যাপারটা যেন জটিল মনে হচ্ছে?

দেওজীবন প্রশ্ন করলেন, মেয়েটি ভদ্রজীবন যাপন করছে ত? কুমারী মেয়ে কি কোনও বিপদে পড়েছে? কি বলুন ত?

দেবরায় হাসল। বলল, না, একটি মোটর দুর্ঘটনা মিলির গাড়ি একটি লোককে চাপ পথে লোক জড়ো হয়ে যায়। লোকটিকে তুলে নিয়ে মিলিকে যেতে হয় হাসপাতালে। লোকটির পায়ে খুব চোট লাগে। অলকাদেবী সেই ব্যক্তিকে কয়েক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে ব মিটমাট করতে চান্। পুলিশ এবং আদালতও এতে রাজি হয়। কিন্তু এই সূত্রে মাতা ও কন্যা একটা আদর্শগত বচসা বেধে ওঠে। মিলি বাড়ি ছেড়ে চ'লে যায়। বিলাত থেকে নীনা ও গুরবা এসে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেও এটার নিষ্পত্তি করতে পারেনি। তারা আবার ফিরে গেছে।

অশোক প্রশ্ন করল, তারপর? আপনি গেলেন ঠিকানা নিয়ে?

হ্যাঁ, গেলুম অবশ্য—দেবব্রত বলল, তবে সেটা শহরতলী। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট, সেখানে যে আঁধাড়ে-পাঁধাড়ে এখনও রাস্তা বানায়নি, আলোও তেমন জ্বলেনি। যাওখানে একটা গরুর খাটাল, সেটা ছাড়াতে পারলে তবে একটু পথ পাওয়া যায়। গাড়িখানা ভিতর দিকে নিয়ে যাওয়া গেল না—এ খানা খোয়স। সুতরাং ওখানা এক জায়গায় রেখে এখানে ওখানে অনেক খোঁজাখুঁজি করতে লাগলুম অবশেষে বাড়ির নেট নম্বর মিলিয়ে যেখানে এসে দাঁড়ালুম, সেটি একখানি ছোট্ট অসমাপ্ত নতুন একত বাড়ি। ইমারত সবে উঠেছে, এখনও বালি ধরানো হয়নি। বোধ হয় এ একটা নতুন 'কলোনি' হ উঠছে। ঘুরে ঘুরে দুচারখানা বাড়ি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। বড্ড নিরিবিলি।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলল। একটি তরুণ যুবক বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলে, কোত্থেকে আসছেন কা'কে চাই ?

বললুম, মিলি সেন আছেন এখানে ? আমার নাম দেবকুমার রায়।

ছেলেটি চলে গেল, এবং বোধ হয় সেকেণ্ড দশেকও নয়—ঝড়ের মতো মিলি ছুটে এসে হাসিমু আমার হাত ধ'রে বলল, কী ভাগ্যি ! মনে পড়ল এতদিনে ? আসুন, আসুন,—আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—

আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি। কিন্তু আমার সেই 'পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহটাকে মিলিই টেনে নিয়ে এ সামনের তক্তায় বিছানা পাতা। একটি চশমা পরা বয়স্ক সুন্দর যুবা তার ওপর শুয়েছিল, আমাকে দে উঠে বসল। মিলি গলগলিয়ে হেসে বলল, এখন আমি আর মিলি সেন নই, মিলি মিত্র।—এই শোনো, ই আমার গুরু দেবকুমার রায়, বুঝেছ ? এঁর গল্প কত করেছি তোমার কাছে, মনে আছে ত ? আর এই যে আমার দেওর,—সুকুমার। ও এখন বি. এস-সি পড়ে ! কী যে সুন্দর এঁদের চেহারা, দেখছেন দেবুদ আমার ছোট ননদের এই সেদিন বিয়ে হয়ে গেল ! তার স্বামী ভারি চমৎকার হয়েছে ! কই, মা, ও ম পিসিমা ?—আপনারা আসুন এঘরে। এঁকে একটুও লজ্জা করবেন না। ইনি আমার দাদার মতন, আ গুরু ! ওই যা, আপনার পায়ের ধুলো নেওয়া হয়নি ত !

তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে মিলি আমার পায়ের ধুলো নিল। পরনে তা'র সুন্দর রাঙাপ শাড়ি, ললাট সিন্দুরশোভিত।

আমি ততক্ষণে ক্ষুব্ধশ্বাস হয়েছিলুম। গলাটা শুকিয়ে উঠেছিল। মুখের হাসি টেনে বললুম, ক বিয়েতে নেমন্তন্ন পেলুম না যে ?

বিধবা মহিলা দুজন এসে দাঁড়াতেই মিলি সোৎসাহে আবার বলল, এই যে আমার শাশুড়ী-মা, আর ও পিসিমা। আমাকে একটুও কাজকর্ম করতে দেন না ওঁরা, একটিবারও রান্না করতে দেন না। পাছে আম হাতে ছ্যাঁকা লাগে। আমি কিন্তু চচ্চড়ি-শুকতো—সব রাঁধতে শিখেছি, দেবুদা ! এবার আপনাকে নেম ক'রে ঠিক খাওয়াব।

শাশুড়ী বললেন, বাবা, অনেক ভাগ্যে এমন বৌমা পেয়েছি। এমন গুণবতী মেয়ে আমাদের গা গেরস্থ ঘরে একটিও আসেনি।

ওই নাও, অমনি মায়ের বর্ণনা আরম্ভ হল!—হাসিমুখে মিলি বলল, হাঁা, শুনুন দেবুদা, গোলমালের মধ্যে যে আমাদের বিয়ে হল কি বলব। আমার নিজের মা বড্ড বাধা দিয়েছিলেন! নাঃ সে কথা বলতে বড্ড লজ্জা করে। মা, আপনি বলুন!

শাশুড়ী বললেন, বৌমার গাড়িতে রঞ্জিতের পায়ে একটু ধাক্কা লাগে। বৌমাই ওকে হাসপাতালে নিয়ে যান্। রঞ্জিতের পা এখনও সারেনি, হয়ত ভবিষ্যতে সামান্য একটু খুঁড়িয়েই হাঁটবে।

সুকুমার বলল, বৌদিদিই দাদাকে ভাল ক'রে তুলেছিলেন।

রঞ্জিত এতক্ষণ হাসিমুখে আপ্যায়োড়া শুনছিল। এবার বলল, ক্ষতিপূরণ ওঁরা দিতে চেয়েছিলেন, য়্যাক্সিডেন্টটা আমার দোষেই হয়। ক্ষতিপূরণ আমি নিইনি। ও টাকা কি হবে আমাদের?

হাঁা, বাবা—শাশুড়ী বললেন কি হবে ক্ষতিপূরণ? পরের টাকা কি নেয় কেউ? ওটা লোভের কথা! তা'র চেয়ে বড় ক্ষতিপূরণ আমার ঘরে এসেছে! বিয়ের আগে বৌমা একদিন এসে বললেন, মা, আমাকে আপনাদের পায়ে একটু জায়গা দিন। বৌমাকে সেইদিনই আমি মাথায় তুলে নিলুম, বাবা। মা আমার লক্ষ্মী! যেদিন ওদের বিয়ে হল, তার পরের দিনই রঞ্জিতের আপিসে ওর পাসের খবর বেরোল। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা মাইনে বেড়ে গেল।

শুনুন দেবুদা, আমার ভাসুর আছেন দিল্লীতে। বড় চাকরী করেন।—মিলি আনন্দে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলল, তিনিও মার কাছে অনেক টাকা পাঠান্। আমাদের কোনও অভাব অসুবিধে নেই, দেবুদা। তাঁদের এই দেখুন না, আমার দেওর পাস ক'রে যেদিন কাজে ঢুকবেন, আমি সেইদিন থেকে

সংক্রামক ব্যাধি!

শতাব্দীর পুঞ্জীভূ
কুসংস্কারাচ্ছ
সমাজ নিষ্পিষ্ট
সংক্রামক ব্যা
গ্রস্ত ব্যক্তি
করতে ভয়
স্থান দিত তা
সমাজের বাহি

আর আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সে স্থান পেয়ে আত্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে, রোগমুক্ত হচ্ছে—চিকিৎসা-বিজ্ঞা মাধ্যমে।

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীরে নব নব আবিষ্কার চিকিৎসা জগ বিস্ময়ের সৃষ্টি করছে। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় সংক্রা ব্যাধি ছাড়াও ধবল-কুষ্ঠ, একজিমা, সোরাইসিস্ ও নানাপ্রক কঠিন কঠিন চর্মরোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হচ্ছে।

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটী

প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম

১ নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন—৬৭—২১৫৯।

শাখা—৩১ নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পাশে

ওর জন্যে ভাল মেয়ে একটি খুঁজব,—ওই দেখুন, কথা শেষ না হতেই ঠাকুরপো পালাচ্ছেন। যাকে বলে রেখেছি জানেন, দেবুদা? ঠাকুরপোর জন্যে বংশোকের মেয়ে আমরা চাইনে। সমান সমান ঘরে ছেলেমেয়ের সব সময় ভাল।

এতক্ষণে আমি কতকটা মানসিক স্থিতিলাভ করেছিলুম। এবার বললুম, অলকাদেবী আমায় এখানে পাঠিয়েছেন। ফিরে গিয়ে তাঁকে কি বলব?

অন্যরা চুপ করে রইলেন, কিন্তু মিলি হঠাৎ খুব হেসে উঠল। পরে বলল, বলবেন, আমার যে আনন্দে বাংলা দেশে এখন আর কেউ নেই। কিন্তু মা যেন আমাদের আর টাকার লোভ না দেখান ওতে আমার স্বামী আর শ্বশুর বাড়ির অপমান, দেবুদা।

ঘরের ভিতরটা যেন থমথম করে উঠল।

এবার শান্তকণ্ঠে মিলি পুনরায় বলল, কিছু চাইনে দেবুদা—আর কিছু আমার চাইবার নেই, বলবেন মাকে! আমি যা চেয়েছিলুম, যা আমার কাম্য,—সৌভাগ্যক্রমে আমার এই শ্বশুরবাড়িতে পেয়ে গেছি!

এবার বললুম, আমিও যথার্থ আনন্দ পেয়ে গেলুম!

মিলি বলল, দুঃখ হয় তাঁর জন্যে! তাঁর বাড়ি একা। একাই তাঁকে জীবন কাটাতে হবে। লক্ষ টাকার শুকতার তাঁকে বইতে হবে। ওই বিরাট শূন্য বাড়িতে মহলের পর মহল—তাঁর জন্যে পড়ে রইল তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হবে একা ছায়ার মতন। ওটা যে অভিশাপ—মা বোধ হয় আজও বুঝতে পারেন নি!

মিলির কথা শুনে হয়ে শুনল। রঞ্জিত শান্তকণ্ঠে এবার বলল, আমাদের সংসারটা তিনি ভেঙে দিতে চান্,—এটা তাঁর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে না, দেবুবাবু। আপনি তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলবেন।

মাথার ঘোমটা আর একটু টেনে মিলি সহাস্যে বলল, মায়ের ছেলেমানুষী আছে অনেক! তিনি হিসুমতে মানুষ হননি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে টাকার লোভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না—এটা উনি জানা নেই, দেবুদা।

পিসিমা বললেন, এসো বাবা ভেতরে, একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যাও। বৌমা কথায়-কথায় বলেন, তুমি বৌমার মন্ত্রগুরু! এসো বাবা—

মিলি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বলল, আসুন, দেবুদা—

• • •

'স্কাই মাস্টার' এবার প্রস্তুত হয়েছে। লাউড্-স্পীকারে ডাক পড়ল। ধলধলসহ দেবু কফির টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল। পরে হাসিমুখে বলল, ওদের সুখের ঘরকন্নাটা আমিও ভাঙতে গিয়েছিলুম। যে ফিরবার পথে ভাবতে ভাবতে এলুম, এমন আনন্দময় সুখী পরিবার জীবনে অল্পই দেখেছি। মিলি একটু ভুল করেনি।—

রামানন্দ স্মরণে

ভবানীশঙ্কর রায়

তখন আমি বাঁকুড়ার জেলা জজ। যুদ্ধের চিড়িকে কলকাতা থেকে লোক অপসরণ আরম্ভ হয়ে গে শুনতে পাই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এসেছেন। উঠেছেন তাঁর নিজস্ব বাড়ীতে। তাঁর সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি যাব করছি। একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখি আমার সাড়ীবারান্দায় একখানা রিক্সা থামল। নামলেন স্বয়ং রামানন্দবাবু।

আমরা তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলুম। লজ্জিত হয়ে বললুম, "ব কেন কষ্ট করে এলেন? আমারেই যাবার কথা ছিল। দু' একদিনের মধ্যে যেতুম। এতদিন যাই তার জন্যে দুঃখিত।"

তিনি বললেন, "আপনাদের সঙ্কোচের কিছুমাত্র কারণ নেই। যখন সময় পাবেন আসবেন। ব আমি থাকতেই এসেছি। থাকব অনেকদিন।"

তার পর তিনি জানতে চাইলেন আমাদের কাছে ইংলণ্ডের ইতিহাস আছে কি না।

ছিল না। নিরাশ হলেন। একদিন অপেক্ষা করলে হয়তো কলেজ লাইব্রেরী থেকে করা যেতো, কিন্তু একটা দিনও সবুর করবার উপায় নেই। 'মডার্ণ রিভিউর" জন্যে সম্পাদকীয় নির্দিষ্ট দিনে ডাকে দেওয়া চাইই চাই।

আমার কৌতূহল দেখে বললেন, "পার্ণেল সম্বন্ধে যৌবনে যা পড়েছিলুম এখন তা ঠিক মনে হাতের কাছে রেফারেন্স না থাকলে শুধুমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করে সম্পাদকীয় লেখা চলে না। প্র অংশ উদ্ধৃত করে যুক্তির সঙ্গে প্রমাণ যোগ করতে হবে।"

"পার্ণেল? আইরিশ নেতা পার্ণেল?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"হাঁ। টাইমস পত্রিকা তাঁর চিঠি বলে জাল চিঠি ছেপেছিল। তা নিয়ে তদন্ত কমিশন পার্ণেল কলঙ্কমুক্ত হন। কমিশন সাব্যস্ত করে চিঠিখানা জাল। সেকালে এই নিয়ে চি চি পড়ে তিনি উত্তর দেন।

আমার এত কথা জানা ছিল না। ইতিহাসের ছাত্র ছিলুম আমিও। কিন্তু আমার পাঠ পার্ণেল সম্বন্ধে অত খুঁটিনাটি ছিল না।

যা হোক, আমাদের বাড়ীতে এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা ছিল। তাতে পার্ণেল সম্বে তথ্য ছিল। তা পড়ে রামানন্দবাবু বলেন, "চলবে। এখন এটি কি অনুগ্রহ করে আমাকে দিয়ে যেতে পারেন? আমি কাল সকালেই ফেরত পাঠাব।"

আমার কাছে টাইপরাইটার ছিল। আমার গৃহিণী তৎক্ষণাৎ টাইপ করে দিতে উদ্যত।

প্রয়োজনীয় অংশটা ছিল বেশ লম্বা। রামানন্দবাবু অন্যকে খাটাতে রাজী নন। নিজেই খাটবেন। বই নিয়ে রিক্সায় ওঠেন। মোটর প্রত্যাখ্যান করেন। আমরা তাঁর তথানিষ্ঠায় অভিভূত হয়ে যাই। শুধুমাত্র রেফারেন্স করাবার জন্যেই তিনি সেদিন অত দূর এসেছিলেন। অত শ্রম স্বীকার করে।

বইখানা সত্যি সত্যি তার পরের দিন সকালে ফেরত এলো। ভেবেছিলুম তিনি অন্ত কয়েক লাইন কপি করিয়েছেন! তা নয়। পরের মাসের "মডার্ন রিভিউ"তে লক্ষ্য করলুম তিনি দীর্ঘ একটি অংশ এনসাইক্লোপীডিয়া থেকে তুলে দিয়েছেন। তাঁর কাছে তো টাইপরাইটার ছিল না। সমস্তটাই তিনি স্বহস্তে লিখে নিয়েছিলেন। কী অসাধারণ ধৈর্য! নীল পেনসিলের দাগ এখনো আমার এনসাইক্লোপীডিয়ায় রয়েছে।

পরে তাঁর সঙ্গে আরো অনেকবার দেখা হয়েছে। প্রধানত তাঁর বাঁকুড়ার বাড়ীতে। ঝড় আসুক ঝাপটা আসুক, রোগ আসুক, শোক আসুক, রামানন্দবাবুর সম্পাদকীয় রচনা বন্ধ হবার নয়। বিলম্বিত হবার নয়। ঠিক নির্দিষ্ট দিনে তাঁর কাগজ বেরোবেই। তার আগে তাঁর সম্পাদকীয় রচনা কলকাতায় পৌঁছবেই। সেই আশ্বাসে বাঁকুড়া থেকে ডাকে ছেড়া হবেই। সময়জ্ঞান ছিল তাঁর কর্তব্যজ্ঞানের অঙ্গ যে-সময়ে যে-কথাটি প্রাসঙ্গিক সে-সময়ে সেটি প্রকাশিত না হলে পরে তার কদর থাকে না। ঐ পার্কের সম্বন্ধে উদ্ধৃতিটি কেন যে সে-সময় প্রাসঙ্গিক ছিল এতদিন পরে আমার খেয়াল নেই। কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এ বিষয়ে আশ্চর্য দক্ষতা ছিল তাঁর।

পি ই এন নামক লেখকসঙ্ঘের তরফ থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাহিত্যের উপর ছোট ছোট এক একখানি বই যাতে বেরোয় তার আয়োজন করেছিলেন শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া। তিনি আমাকে ভার দেন বাংলাসাহিত্যের। শ্রীমতী লীলা রায়ের সহযোগিতায় আমি একখানি ছোট বই লিখি ইংরেজীতে। তখন শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া রামানন্দবাবুর কাছে সেখানি পাঠিয়ে দেন অনুমোদনের জন্যে এবং অনুমোদিত হলে ভূমিকা লিখনের জন্যে। এই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার বহু আলোচনা হয়। সব মনে নেই মনে থাকলেও গোপনীয়তা ভঙ্গ করা উচিত নয়। একজনের প্রশংসা করে আমি কিছু লিখেছিলুম। তিনি বলেন লেখক হিসেবে সেই ব্যক্তি বাংলাসাহিত্যে ঠাঁই পেতে পারেন, কিন্তু জালিয়াৎ হিসেবে তাঁর স্থান কারাগারে। রামানন্দবাবুই ক্ষমা করে তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এ কথা শোনার পর আমার রচনায় সাবধানতা করতে হলো। এমনি আরো কতক জায়গায়। মহা বিপদে ফেললেন তিনি আমাকে যখন বললেন যে মাইকেলের দ্বিতীয়া পত্নী বিবাহিতা ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথকে মোটের উপর সুখী লিখেছিলুম। তাতেও রামানন্দবাবুর আপত্তি। বললেন, "আপনি জানেন না যে রবীন্দ্রনাথের মতো দুঃখী মানুষ আর নেই।" এই বলে আমাকে জানালেন রবীন্দ্রনাথের কী কী দুঃখ। কেন দুঃখ। সেসব কথা আমি তখনো প্রকাশ করিনি, এখনো প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত। সবজান্তা জার্নালিস্টের হাতে পড়ে আমাকে অনেকগুলি বোম বিসর্জন দিতে হয়। কিন্তু রামানন্দবাবু আমাকে আদৌ বাধা করেননি। বরাবরই বলেছেন, "আমি সাংবাদিক। সাহিত্যের কী

বুঝি! কতটুকু জানি! আমার মতো অজ্ঞ আর নেই। তবে আমি সবদা লক্ষ্য রেখেছি প্রবাসী ব সাহিত্যের মান উঁচু রাখে। স্ট্যাণ্ডার্ড সেট করে।"

"প্রবাসী" সম্বন্ধে বলতে বলতে একদিন তিনি একথাও বলেছিলেন, "আপনারা সকলেই প্রবাস লিখেছেন। একালের প্রত্যেকটি লেখক প্রবাসীরও লেখক ছিলেন। কিন্তু একজন বাদ। তাঁর কোনোদিন প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়নি।"

জানতে চাইলুম কে তিনি। উত্তর পেলুম, "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

জেরা করলুম না। তার দরকার ছিল না। ব্রাহ্মসমাজকে শরৎচন্দ্র ক্ষমা করেননি। ব্রাহ্মসম শরৎচন্দ্রকে ক্ষমা করেননি। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রবাসীতে প্রকাশ করলে রামানন্দবাবু হয়তো লা হতেন। কিন্তু লাভ লোকসান তাঁর কাছে তুচ্ছ। প্রিন্সিপল্‌স তাঁর কাছে বড়। যার জন্যে তিনি উ ত্যাগ করেছিলেন।

বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলন আর জালিয়ানওয়ালাবাগের পর অসহযোগ আন্দোলন। বা সাহিত্যে এ দু'টো আন্দোলনের কোন্‌টার কতখানি প্রভাব? এ প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলেন, "স্বা যুগে যে-উদ্দীপনা যে-প্রেরণা দেখেছি অসহযোগের যুগে সে-রকম কিছু দেখিনি। সাহিত্য সঙ্গীত চি ইত্যাদি জীবনের সমস্ত বিভাগে স্বদেশীর যুগে যেন বসন্তের আবির্ভাব হয়েছিল। কত কম সময়ের সাহিত্যের যেমন বিকাশ ঘটল। অসহযোগের মূল সুরটা নেগেটিভ। তার থেকে সৃষ্টি আসবে কী ব রাজনীতি হতে পারে, সাহিত্য হয়নি।"

আমার মতো গোঁড়া গান্ধীভক্তের পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত। কিন্তু তাঁর কাছে আমি এর যুক্তি খুঁজে পাইনি। সত্যিই তো। অসহযোগ আন্দোলনের সাহিত্যিক ফলশ্রুতি স্বদেশী আন্দো সঙ্গে তুলনায় নিকৃষ্ট। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে নেই। ভারতের অন্যান্য প্রান্তে গান্ধীজীর আহ্বানে অ উদ্বেল হয়। সেইসঙ্গে সাহিত্যেও জোয়ার আসে। রবীন্দ্র ঐতিহ্যে লালিত আমরা অসহযোগের অসহযোগ করি সাহিত্যে। জীবনে যাই করি না কেন। সন্ত্রাসবাদও সাহিত্যে ফুল ফুটিয়ে যায়নি। এ ফোটাচ্ছে না।

রামানন্দবাবু ও আমি দু'জনেই যখন বাঁকুড়ায় তখন ১৯৪২ সালের অগস্ট আন্দোলন সুরু হয়ে খবরের কাগজ বন্ধ। খবর আসতে থাকে লোকমুখে। রোমাঞ্চকর খবর। আমি যদিও অহিংসার তবু আমার মতে অত বড় একটা জাতীয় সঙ্কটে দেশের লোক যদি অহিংসার সেনাপতির অভাবে নে হয়ে অহিংসার চেয়ে হিংসায় অধিক পৌরুষ দেখায় সেটা কাপুরুষতার চেয়ে বা নিষ্ক্রিয়তার চেয়ে তা আমি ভেবেছিলুম রামানন্দবাবুও তাই বলবেন। দেখলুম তাঁর মত অন্যরকম।

তিনি বললেন, "কাজটা ভালো হচ্ছে না। আন্দোলনটা এই যে হিংসার দিকে মোড় নিচ্ছে ইংরেজেরই সুবিধে। ইংরেজ ভালো করেই জানে কেমন করে হিংসা দমন করতে হয়। জানে না অহিংসার সঙ্গে লড়তে। অহিংসাকেই ওরা ভয় করে।"

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "এ আন্দোলন বিফল হবে।"

তখন আমি ওটা মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাই হলো। ছ'মাসের মধ্যেই ে ঠাণ্ডা। তার পর এলো মেদিনীপুরে সমুদ্রের দিক থেকে বান। সে কী দুর্যোগ! ডাঙায় বাঘ। জ কুমীর। ইংরেজের রোষ থেকে যদি কেউ বাঁচে তো প্রকৃতির হাতে মরে। বাঁকুড়া থেকে মেডিকাল স্কু ছাত্রদের পাঠাই সেবা করতে।

রামানন্দবাবু কবে বাঁকুড়া থেকে কলকাতা ফিরে গেলেন ঠিক মনে নেই। তাঁর সঙ্গে আ অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। একবার তিনি ও আমি বিষ্ণুপুর গিয়ে সেখানকার স্কুলের সা বক্তৃতা দিই। আমার বক্তব্য তাঁর অনুরোধে সংক্ষেপে লিখে দিই। তিনি "প্রবাসী"র সম্পাদকীয় ম প্রকাশ করেন। একবা কৈশোরে "প্রবাসী"তেই আমার হাতে খড়ি। সে-সময় রামানন্দবাবুকে একখ চিঠি লিখে তাঁর অটোগ্রাফ আর ফোটোগ্রাফ চেয়েছিলেন। তিনি ফোটোগ্রাফ দিতে পারেননি। অটোগ্র দিতে গিয়ে যা লিখেছিলেন, তার একটি কথা এখনো আমার স্মরণে আছে। বলেছিলেন, ব্যক্তিগতভ কারো একটু সেবা করতে পারলে মনে তৃপ্তি হয়।

উপরে যেসব কথাবার্তা লিপিবদ্ধ হলো সেসব নোট থেকে নয়, স্মৃতি থেকে। অবিকল রামান বাবুর উক্তি নয়। উক্তির মর্ম। তাঁর মুখে সবের কথা বসিয়ে দিইনি। সতর্ক থেকেছি যাতে ওঁকে বোকা না হয়।

ছেলেবেলা থেকেই আমি "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ" পড়ে মানুষ হয়েছি। রামানন্দব অজ্ঞাতসারে তাঁর হাতে গড়া। কিন্তু "বিচিত্রা"র লেখক হওয়ার পর থেকে ক্রমে দূরে সরে যাই। বাঁ কিছুদিনের জন্যে নিকট করেছিল। তারই বিবরণ দিলুম।

পূজা ও উৎসবের দিনে—

আধুনিকতম রুচির স্বর্ণালঙ্কারের রূপ ও বৈচিত্র্য
প্রিয়জনকে উপহার দিবার নানাপ্রকারের অভিনব ও
চিত্তাকর্ষক অলঙ্কারের অপূর্ব্ব সমাবেশ।

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চ্চেণ্টস্

স্থাপিত—১৮৮২

১-এ, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস), কলিকাতা ফোন : ২২-২২৭০

ব্রাঞ্চ : ৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ফোন : ৪৭-১২৫৮

চাকরি

সুষমা দেবী—

"আমি সব বন্দোবস্ত করে এলাম, মা। কমলা স্টুডিওতে যে নতুন ছবিটা তোলা হবে, আমাকে একটা ছোট পার্ট দেবে বলেছে। প্রথমে অবশ্য তেমন কিছু আশা কোরো না, কেবল হাত-খরচ কিছু কিছু দেবে। তবে সিনেমায় একবার নাম যদি করে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের কষ্ট থাকবে না।"

সুনীতি ছেঁড়া কাপড় নিয়ে বসে সিলাই করছিলেন, মেয়ের কথা শুনে সেলাই তাঁর থেমে ছুঁচটা হাতে ছুটে গেল। "আঃ" বলে সেটা আঙুল থেকে বার করে তিনি উত্তর দিলেন, "না মায়া, তোকে ও-পথে আমি যেতে দোব না। সবাই না খেতে পেয়ে মরি সেও ভালো, ও রাস্তা নয়।"

"নইলে যে আর রোজগারের কোনও পথ দেখি না মা? বিদ্যেও এমন কিছু নেই যা দিয়ে পথে যেতে পারি। ওঁরা বলছিলেন সিনেমার জন্যে তেমন কর্সা না হলেও ক্ষতি নেই, ছবিতে রঙ ত যাবে না? তবে মুখশ্রী চেহারা আর ভালো গড়ন দরকার।"

"সে হোক গে, তুই অন্য কিছুর চেষ্টা দ্যাখ্, এই যেমন নার্স-টার্সের কাজ।"

মায়া খিল খিল করে হেসে উঠল, দরজার সামনে চটি খুলে সে মার পাশে এসে "সেখানেও যে আমি একেবারে আনাড়ি? কে আমায় কাজ দেবে? পাস না করলে নার্স যায় নাকি?"

"তা যায় না ঠিকই, কিন্তু আমি পাকলের সঙ্গে কথা বলেছি। তার একটি জানা ঘর আছে করবার জন্যে তাঁদের একটি মেয়ের দরকার, পাস করা নার্স তাঁরা চান না। একজন বুড়ো মেয়ে দেখা শোনা করতে হবে। তিনি নাকি প্রায় শয্যাশায়ী। সেখানে কিন্তু তোকে রাত্তিরেও থাকতে যায়া। তাঁরা খাওয়া-পরা ছাড়া মাসে ষাট টাকা করে দেবেন। মন্দ কী? হাজেনও ত কিছু কিছু দুজনের মিলিয়ে একরকম করে আমাদের চলে যাবে এখন। সংসার ত বড়ো নয়? অবস্থাটা একটু আমি তোর বিয়ে দোব।"

"তুমি তা হলে সব ঠিক করেই বসে আছ? আমার কিন্তু ভয় করছে মা, ও কাজ আমার হ বলে মনে হয় না। তার চেয়ে সিনেমার কাজ অনেক ভালো ছিল, তা ছাড়া এতে ভবিষ্যতে আশাও আছে।"

"তুই ও-মতলব ছেড়ে দে, মায়া। ও পথ কাঁটায় ভরা, গেলেই খোঁচা খেতে হবে। আমি প কথা দিয়েছি, সে কাল এসে তোকে নিয়ে যাবে। চেষ্টা করে জাখ্না, ছাড়তে কতক্ষণ!"

"তোমার মত সব কুসংস্কার, মা! আজকাল সিনেমায় নামছে না কে? যদি কাঁটার ঘে খেতে হত, তা হলে ভদ্রঘরের লেখাপড়া জানা মেয়েরা এ পথে আসত না। আগে হয়ত অন্যরকম ছিল, কি এখন সে অবস্থা কেটে গেছে।"

"হয়ত তাই, কিন্তু আমি যে এখনও সে সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারিনি? এখনও তাই মি পড়ে আছি। উনি যেদিন হঠাৎ চোখ বুজলেন, ভেবেছিলাম আর উঠে দাঁড়াব না, পৃথিবীকে চেয়ে যে না। সংই ত আমার করতে হল? তবেও একটা দিন থাকতে পারিনি তোদের ভাইবোনকে নি সম্বলের মধ্যে হাতের গুয়া চুড়ি চারগাছা ছিল। তাই বিক্রি করে কোনও রকমে সে সময়ে দায় উদ্ধার হ তার পর থেকে তিন বছর ত কাটিয়ে এলাম।"

"এর নাম কি কাটিয়ে আসা, মা? নিজের শরীর পাত করে লোকের বাড়ি ঠিকে খেটে কী করে যে দিন চালিয়েছ, তা ত জানি। দাদা রোজগারে নেমেছে, তাই চলছে। নইলে এতদিনে হয়ত আ শেষ হয়ে যেতাম।"

সুনীতি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "রাজুর কথা আর বলিসনে। ইচ্ছে হল কিছু দিলে, নইলে ঘুচিয়ে এল। ও যদি ভালো করে রোজগারপাতি করে আনত, তা হলে কি আজও আমায় ঠিকে খাটতে যাওয়া? আমি ত ভদ্রঘরেরই মেয়ে, স্বামীর রোজগারে নিজেরা খেয়েছি, ঠিকে লোকও রেখেছি।"

"তুমি যদি দাদাকে আরও কিছুদিন পড়াতে পারতে মা, তা হলে ভালো হত। ওর পড়তে ই ছিল, কিন্তু তোমার কষ্ট দেখে পড়া না ছেড়ে উপায় ছিল না। তুমি তিন বাড়িতে কাজ করে যা আ তাতে ঘর ভাড়া দিয়ে আর পেটে খেয়ে একটা পয়সাও বাঁচত না। ঐ দেখেই ত দাদা রোজগারের জন্যে ব হল। থাকগে, ও সব কথা, খেতে যাও, খিদে পেয়েছে।"

ছেঁড়া কাপড় পাশে ঠেলে রেখে সুনীতি মেয়েকে ভাত দিতে গেলেন।

"কই গো, দিদি, কোথায়? আমি এসেছি।"

ময়লা তেলচিটে শতছিন্ন থানের আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সুনীতি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন "এসেছ পারুল? একটু বোসো। আমি মায়াকে ডাকি।"

"দেরি করলে হবে না দিদি, সাড়ে ছটার মধ্যে সেখানে পৌঁছোতে হবে।"

"মায়া, মায়া, তৈরি হয়ে নে মা, পারুল এসেছে তোকে নিয়ে যেতে।"

ঘর থেকে রোয়াকে বেরিয়ে মায়ার বুকটা ধক করে উঠল। সে কোথায় সিনেমা আর্টিস্ট হবার ফিল্ম স্টার হবার স্বপ্ন দেখছিল, এমন সময়ে মা তাকে কোন্ বুড়ীর সেবা করতে পাঠাচ্ছেন। তার মু এল, 'আমি যাব না, পারুল মাসীকে ফিরে যেতে বলো, কিন্তু মার শতছিন্ন কাপড়ের মধ্যে ম্লা মুখখানি দেখে মায়া যেন কেমন হয়ে গেল, শুধু বলল, "তুমি বলছ মা, কিন্তু আমি সে কাজ কি করতে পারব?"

পারুল বলল, "কেন পারবে না বাবা? এ ত আর হাসপাতাল নয় যে কোথায় সেটি এঁটে মাথায় পরে ঘড়ি ধরে কাজ করতে হবে? বাড়িতে যার ব্যায়রাম চলে সেবা করো না? এও সেই রকম।"

"সে অন্য কথা, মাসী।"

"এও তাই মনে করো। আমি আর দাঁড়াতে পারব না, তাড়াতাড়ি করো।"

সুনীতি বললেন, "দেরি হবে না, পারুল। দাঁড়াও, আগে মায়ার খাবারটা দিয়ে আসি।" রান্না ঢুকে তিনি এক পেয়ালা চা আর একটু গুড় দিয়ে দু'খানা হাতগড়া রুটি নিয়ে মায়াকে খেতে দিলেন। এসে বললেন, "মায়াকে তোমার তত্ত্বাবধানে দিচ্ছি পারুল। মেয়ে আমার ছোট, কোনও জ্ঞান নেই, তাই যেন বিপদে পড়ে না।"

"তুমি বোকো না বাপু! ওকে নাকি আবার ছোট বলে?...চলে এসো মায়া, আমার দাঁড়াবার টাইম নেই।"

হাতে একটা কাপড়ের বোলা নিয়ে মায়া পারুলের সঙ্গে চলে গেল।

পুরনো আমলের মস্তবড়ো বাড়ি। গাড়ি বারান্দায় দুখানা মোটর দাঁড়িয়ে। বেউড়ি টুলের উপর বসে দারওয়ান ঢুলছে। মায়াকে নিয়ে পারুল সেখানে হাজির হল। "চলো ভিতরে ঠাকুমা থাকেন তেতলায়।"

ভিতর বাড়িতে ঢুকতে সামনে মাঝবয়সী কর্সা মোটাসোটা গিন্নীকে দেখে পারুল বলল, "মা যে বলেছিলেন, ঠাকুরমার কাছে থাকবার জন্যে একটি মেয়ে চাই, তাই এই মেয়েটিকে এনেছি।"

মায়ার দিকে চেয়ে গিন্নী ভ্রু কুঁচকে বললেন, "একি পারবে? বড্ড ছোট মনে হচ্ছে মেয়ে, তুমি কি আগে কোথাও রুগীর কাজ করেছ, না এই নতুন হাতে খড়ি?"

মায়া কিছু বলবার আগে গিন্নীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পারুল বলল, "রুগীর সেবা করে না কে মা, এর জন্যে ত আর পাস করা নার্স লাগে না। রোগীকে চান করানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো,—একাজ ও খুব পারবে।"

কিন্তু তিনি ত সাধারণ রুগী নন। তা ছাড়া মেয়েটির ঐ ত পাকাটির মতো চেহারা, ও কি ঝাড়াচাড়া করতে পারবে? তাঁর ত পলকে প্রলয় হচ্ছে। তাঁকে সামলানো ঐটুকু মেয়ের কর্ম নয়। তাই তোমায় বলেছিলুম একজন শক্ত সমর্থ দেখে লোক আনতে।"

"আপনি ওকে দিয়ে করিয়েই দেখুন না? না পারে অন্য ব্যবস্থা করব।"

"কাপড়-চোপড় এনেছে?"

"ঐ বোলার ভিতর সব আছে। এ রইল। আমি চললুম।" পারুল মায়াকে রেখে চলে গেল।

গিন্নীর সঙ্গে মায়া উপরে উঠে গেল। বোলা সেরিয়ে তারা তেতলায় এসে পড়ল। সামনে হাত, তারই একধারে দুখানা ঘর, আর কোণে-ঢাকা বারান্দা। মায়াকে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "ঐ তোমার রুগী। রোগ এমন কিছু নয়, তবে বয়স হয়েছে কিনা

এখন শিশুর মতো হয়ে গেছেন। তোমাকে সেই ভেবেই ওকে দেখতে হবে।" খাটের পাশে এগিয়ে এ সবিতা ডাকলেন, "মা, ও মা? শুনতে পাচ্ছেন? এই মেয়েটি এসেছে আপনার কাছে থাকতে।"

বৃদ্ধার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই, কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আপনার মনে বিড় বিড় করে বকছেন পুত্রবধূ আরও জোরে ডাকাতে তিনি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, "নিজেরা সব পেট পুরে গিলে ম দেখতে এসেছে! আমি যে সকাল থেকে দাঁতে কুটোনি কাটিনি, সেদিকে কারও খেয়াল আছে?"

"সে কী, মা? এই ত খানিক আগে আমি নিজে হাতে আপনাকে খাইয়ে গেলুম? যে বলছেন—'খাইনি'?"

"হ্যাঁ, বলছি। বেশ করব, বলব। 'খাইয়ে গেলুম'! কী খাইয়ে গেছিস্? নিজে খেয়ে মি কথা বলা?"

আর কথা না বাড়িয়ে সবিতা বললেন, "এখন থেকে এই মেয়েটি আপনার সব কাজ করবে।"

"কি? ওটা কে? কালামুখীকে আমার ঘরে ঢুকিয়েছিস কেন? সরে যা বলছি সামনে থেকে হাতের কাছে জলের গ্লাসের ঢাকনি পেয়ে সেটা তুলে ঠাকুমা মায়ার দিকে ছুঁড়ে মারলেন।

মায়া তাড়াতাড়ি সরে না গেলে তখনই তার মাথায় লেগে কাণ্ড হত। ভয়ে তার মুখখানা এতটু হয়ে গেল। অস্ফুটস্বরে সে বলল, "এঁর কি মাথার গোলমাল? ও রকম করছেন কেন?"

"না, না, সে রকম কিছু নয়, অচেনা লোক দেখলে মা ওরকম করেন। তুমি ভয় পেও ন আগেই ত তোমায় বললুম, উনি ছেলেমানুষের মতো হয়ে গেছেন? থাকতে থাকতেই সব ঠিক হয়ে যাবে তোমার নাম কী?"

"মায়া।"

"চা খাবে? পাঠিয়ে দোব?"

"আমার জন্যে করতে হবে না। যদি আপনাদের জন্যে তৈরি হয়, তা হলে এক পেয়ালা পাঠি দিতে পারেন। হ্যাঁ, আমাকে এখন কী কী করতে হবে সেইগুলো একটু বুঝিয়ে দিন।"

"বলছি। ঐ যে বাথরুম, সাবান, তেল, গামছা, তোয়ালে সব আছে ওখানে। ওখান থে বালতি করে গরম জল এনে মাকে চান করিয়ে দেবে। তার আগে গায়ে মাথায় ভালো করে তেল দি বেশ রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে। খুব বেশী বাদুর খাত কি না? চান হয়ে গেলে খবর দিও, ভাত পাঠিয়ে দোব তোমাকেই খাইয়ে দিতে হবে।" সব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দিয়ে সবিতা নীচে নেমে গেলেন।

মায়া আড়ষ্ট হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল, যার উপর অভিমানে তার চোখে জল এসে গেল

"এই ছুঁড়ী, ওখানে দাঁড়িয়ে তুই কী খাচ্ছিস? আমার সন্দেশ চুরি করেছিস বুঝি?...বৌমা, বৌমা, বৌমা"—বলে ঠাকুমা চিৎকার করতে লাগলেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে মায়া বৃদ্ধার কাছে গিয়ে দু হাত তাঁর সামনে মেলে ধরে মৃদু হেসে বল "এই ত হাত রয়েছে, সন্দেশ কোথায়? আপনি সন্দেশ খাবেন?"

"যে না ? ওরা কি আমায় খেতে দেয়, ঐ বৌটা নিজে সব খায়। পাব কোথায় ?"

"আমি দোব, কিন্তু তার আগে লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে চান করে নিন, না হলে কিছু পাবেন না।"

"তুই কোথায় পাবি ? চুরি করবি বুঝি ? ওমা, কোথায় যাব গো ? বৌমা, ও বৌমা, গেলে কোথায় ? এ বলছে চুরি করবে !"

মায়া কী আলাতনেই পড়ল ! এ তাকে কোথায় নিয়ে এল পাকল মাসী ? কিন্তু এসে যখন পা তখন ত আর উপায় নেই ? স্নানের ঘরে গিয়ে মায়া সব জোগাড় করে নিয়ে এল, বিছানায় উপর ঃ সুখ পেতে সে ঠাকুমাকে তেল মাখাতে গেল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হাত পা ছুঁড়ে তিনি এক বীভৎস অ সৃষ্টি করলেন। দেখে ভয় পেয়ে মায়া দৌড়ে নীচে নেমে গেল।

তাকে অমনি করে আসতে দেখে একজন দাসী বলল, "ঠাকুমাকে একলা রেখে নেমে এলে ?"

"মাকে ডেকে দাও ত ?"

মায়ার গলা শুনে সবিতা ভাঁড়ারঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। "কেন, কী হয়েছে, মায়া ?"

"আপনি একবার আসুন ! উনি যা করছেন তেল মাখাতে পারছি না।"

বিরক্ত কণ্ঠে সবিতা বললেন, "চলো।" উপরে উঠে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, ঠাকুমা পরনের মেঝেতে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে শুয়ে গান গাইছেন।

"তুমি অত ভয় পেলে চলবে না, উনি অমনি করবেনই। তা হলেও জোর করে সব করবে এছাড়া উপায় নেই। যাও, যাও, গিয়ে তেল মাখাও।"

মায়া সাহস করে এগিয়ে গিয়ে ঠাকুমার একটা হাত ধরে তেল মাখাতে লাগল। গান করতে চমকে উঠে তিনি বললেন "করছিস কী ?"

"তেল মাখিয়ে দিচ্ছি।"

"না আমি মাখব না। ভাত দেবে না শুধু তেল মাখাবে !"

সবিতা বললেন, "চান করে নিন মা। এখনই ঠাকুর ভাত আনবে।"

মায়া জোর করে কোনও রকমে ঠাকুমাকে তেল মাখিয়ে গা মুছিয়ে দিল। তাঁর সঙ্গে ধস্তাধস্তি সে ঘেমে নেয়ে উঠল। অনভ্যস্ত হাতে তার কাজ এগোতে চায় না। সবিতা বললেন, "জিনিষগুলো থেকে সরাও। ওগুলো বাথরুমে রেখে এসো।"

"যাই", বলে লজ্জিত হয়ে মায়া সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে যথাস্থানে রেখে এল।

ঠাকুর ভাত এনে ছোট টেবিলের উপর থালা নামাতেই ঠাকুমা চেঁচিয়ে উঠলেন, "কি এনে ওকে বুঝি ভাত বলে ? ছিঃ, ছিঃ ! তুই যাগে যা, ও আমি খাব না। সন্দেশ দে।"

মায়া তাঁকে ভোলাতে চেষ্টা করল। "খাবেন সন্দেশ, আগে ভাত খান। শুনছেন ঠাকুমা ?"

ভাত দেখে মায়া তাঁর মুখে দিতে গেল। হঠাৎ তিনি তার হাতটা ধরে কট করে একটা কামড়ে দিলেন।

"উহুঃ, উহুঃ, গেছি, গেছি! হাত ছাড়ুন, আঙুল গেল আমার!" জোরে মাথা চেঁচিয়ে উঠল।

সবিতা জোর করে কাঁকি দিয়ে মাথার হাতটা শাশুড়ীর মুখ থেকে বার করে বিরক্তির স্বরে বললেন "দিনের পর দিন এই রকম অত্যাচার করলে কে আপনার কাজ করবে, মা? দেখুন দেখি ওর আঙুলে অবস্থা, আসুন, আমি খাইয়ে দিই।" সবিতা তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন।

• • •

রাত্রে ঠাকুমা দুধ ছাড়া আর কিছু খান না। সন্ধ্যার পরই তাঁকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে মাথা নিচে খেয়ে এসেছে। রাত দশটা বেজে গেছে। ছোট টেবিলের উপর রাখা টেবল্ ল্যাম্পের মৃদু নীল আলো ঘরখানা যেন ম্লান দেখাচ্ছে। টেবলের সামনে মাথা চেয়ারে বসে আছে। সারাদিনের পরিশ্রমে তার ক্লান্তি আসছে, ঘুম ধরেছে, ইচ্ছা হচ্ছে এই মুহূর্তে বাড়ি গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

ঠাকুমার খাটের পাশে একটা চৌকির উপর মাথার বিছানা করে দিয়েছে। বৃদ্ধার ঘুমন্ত মুখের দি

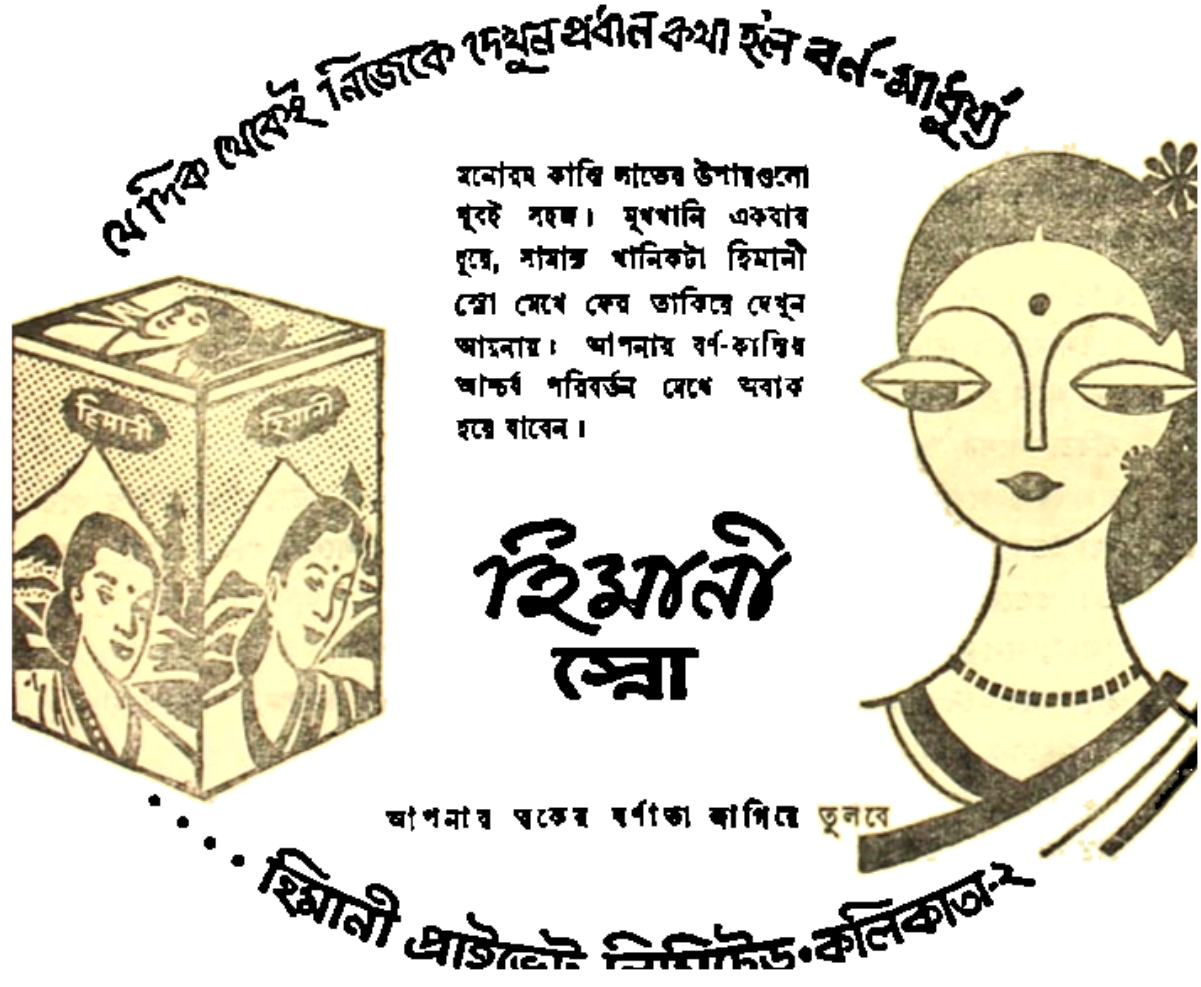

চেয়ে ওঁর পাশে শোবার ইচ্ছা মায়ার চলে গেছে, যতক্ষণ পারে সে এখানেই বসে থাকবে। এইভাবে আ খানিকক্ষণ বসে থাকার পর ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে এল। বিছানায় গিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

মাঝ রাতে প্রবল ঝড়ে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। তার গলাটা কে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেছে। মায়া চীৎকার করে কেঁদে উঠতে চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না, কেবল এ গোঙানির শব্দ। মুখ চোখ তার লাল হয়ে নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল। মায়া প্রাণপণে হাতাহাতি ব লাগল, সমস্ত শক্তি দিয়ে শেষকালে তার আক্রমণকারীকে ঝটকা মেরে ঠেলে ফেলে দিল। সামলাতে না পেরে ঠাকুমা অর্ধেক বিছানায় অর্ধেক মেঝেতে পড়ে গেলেন। মায়া তখন তার বিছ উঠে বসে হাঁপাচ্ছে। আর ঠাকুমা সেই অবস্থায় চোখ বার করে রাক্ষসীর মতো তার দিকে আছেন।

"কী হচ্ছে ঠাকুমা? আমায় কি খুন করবেন?" মায়া উঠে তাঁকে জোর করে বিছানায় করে শুইয়ে দিল। শুয়েই তিনি বলে উঠলেন, "সারাদিন খেতে দিলি না, আমার সব সন্দেশ চুরি খেলি? আমি চোর ধরেছিলুম, চোরটা গেল কোথায়?"

ঘুমের ওষুধ এনে মায়া তাঁকে কোনও মতে খাইয়ে দিল। "ঘুমিয়ে পড়ুন নইলে নীচে গিয়ে আবার ডেকে আনব।"

ঘুমের ওষুধ খাবার কিছু পরে আবোল-তাবোল বকতে বকতে ঠাকুমা আবার ঘুমিয়ে পড় মায়া চেয়ারে এসে বসল, আর শুতে সাহস করল না। গলায় হাত বুলিয়ে দেখল, খুব ব্যথা হয়েছে, গিলতে পর্যন্ত লাগছে। ঐ রোগা শিকড়ে আঙুলগুলো যেন লোহার মতন শক্ত। আর একটু হলেই হাতে মায়া শেষ হয়ে যেত। মা তখন বুঝতেন মেয়েকে কোথায় চাকরি করতে পাঠিয়েছেন।

আর তেজান দরজার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে মায়া দেখল কেবল ঘুটঘুটে অন্ধ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সে ঘড়ির দিকে চাইল। সবে দুটো বেজেছে, ভোর হতে তখনও অনেক। ঠাকুমা গভীর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, তার নাক ডাকছে। সে দিকে চেয়ে মায়ার মন বিতৃষ্ণায় ভরে ক্লান্তিতে অবসাদে তার শরীর ভেঙে পড়ছে, কাল আর তাকে মাথা তুলতে হবে না।

হঠাৎ খুট করে দরজার শব্দ হল। মায়া সেদিকে চাইল, তাবল হয়ত বেড়াল এসেছে। আধ-ভেজানো দরজা ক্রমশ একটু একটু করে ফাঁক হতে লাগল! ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে মায়া সেই চেয়ে রইল! একটা মানুষের মাথা দেখা গেল, দরজার ভিতর ঢুকছে। কী অদ্ভুত তার চেহারা! বুক ধড়ফড় করে উঠল, মনে হল তখনই সে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

মানুষটা এক পা এক পা করে ঘরের ভিতরে ঢুকল, মাথাটা সমস্ত কামানো, বিশ বাইশ বছরের কর্সা ছেলে, পরনে রাত্রে পরবার পায়জামা আর কোট। ভয় বিস্ফারিত চোখে মায়া দেখল, তার অন্ধকারের মতো চোখ দিয়ে ছেলেটা যেন মায়াকে গিলছে, মুখখানায় রাগ যেন ফেটে বেরোচ্ছে। হে

হাত দুটো লোহার শিকলি দিয়া বাঁধা। মায়া উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে বাইরে পালিয়ে যেতে গেল, কিন্তু দরজা সামনেই ছেলেটা রয়েছে, সামনে দিকে আরও সে এগিয়ে আসছে। ভয়ে মায়া কেঁদে উঠল। এবার ছা তার পাশ দিয়ে বাইরে যেতে গিয়েই দরজার বাইরে একজন চাকরকে দেখে সে থমকে দাঁড়াল।

ছেলেটির কাছে গিয়ে তার হাত ধরে চাকরটি চাপা গলায় বলল, "নিশুতি রাতে সারা বাড়ি খুঁ বেড়াচ্ছি, আর তুমি এখানে এসেছ, খোকাবাবু; যেই একটু বাইরে গেছি, অমনি সেই ফাঁকে পালিয়েছ তোমায় নিয়ে আর পারি না! নীচে চলো।"

"না, যাব না"—ছেলেটি ধমকার দিয়ে উঠল। চাকরটি তাকে ধরে টানতে টানতে সিঁড়ি দি নামাতে লাগল। ঘুমন্ত বাড়ির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ছেলেটি কচি ছেলের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল দোতলায় আলো জ্বলল, সবিতার গলা শোনা গেল, "খোকন ওপরে গেল কী করে, বিষ্টু? যাও ওে শুইয়ে দিয়ে আর একবার ঘুমের ওষুধটা বেশী করে খাইয়ে যাও গে।"

উত্তরে বিষ্টু বলল, "ঘুমের ওষুধে আজকাল কিছুই হয় না মা।"

"সে কথা আমায় বলোনি কেন? ডাক্তার বাবুকে জানাতে হবে ত? কাল সকালেই তাঁে ফোন করব।"

একটু পরেই দোতলার আলো নিভে গেল, ছেলেটির কান্না থামল। বাড়ি আবার আগের মত নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

মায়া বসে বসে মিনিট, সেকেণ্ড গুনতে লাগল। একদিন এক রাত্রি তার কাছে এক বছরে মতো হয়েছে। এ পথ আর যারই হোক, তার নয়। মায়া কিছুতেই পারবে না এ চাকরি করতে।

ঘড়ির কাঁটা ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগল, অন্ধকার দিকে হয়ে এল। কাক ডেকে উঠল। রাস্ত ময়লাফেলা গাড়ির ঘড়ঘড়ানির শব্দ শোনা গেল। মায়া উঠে ঠাকুরের কাছে গিয়ে দেখল, তিনি তখন ওষুধের ঘোরে গাঢ় ঘুমিয়ে আছেন।

আবার সকাল হবে, আবার এদের বাড়ির সেই ভয়াবহ জীবন আরম্ভ হবে। মনে হতেই মায়া শরীর শিউরে উঠল। এরা এমন সব পাগল নিয়ে কী করে ঘর করে, অন্য কোথাও পাঠাতে পারে না?

আকাশ বেশ ফর্সা হয়ে গেছে, আর দেরি করলে মায়া আজ এখান থেকে বেরোতে পারবে না আলমারির মাথা থেকে নিজের ঝোলাটা নামিয়ে সে কাঁধে ফেলল, তাওয়াল জোড়াটার পা গলিয়ে ছাে বেরিয়ে এল। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরের দরজা খুলে কটক পেরিয়ে মায়া রাস্তায় এসে পড়ল।

সাপ

ছোড়দার বিবাহ উপলক্ষ্যে ছোড়দিকে সাপে কামড়াইল।

আমরা কয়জনে মিলিয়া হট্‌লা করিতেছিলাম, রান্নাঘরের কোণ হইতে আতঙ্ক ও ক্রন্দনের মি অদ্ভুত এক আর্তনাদ শুনিয়া সদলবলে ছুটিয়া গেলাম। ছোড়দি করুণ গলায় বার দুই বলিল, 'সাপ!' আমাদের পায়ের নিচে অজস্র সাপ অমনি যেন কিলবিল করিয়া উঠিল, লাফাইতে লাফাইতে সম বলিতে লাগিলাম, 'কোথায়, কোথায়?'

ঘটনাটি তবে পরিষ্কার করিয়া বলি।

ছোড়দার বিবাহ-সংক্রান্ত আত্মীয়-স্বজনের ভিড় তখন অনেকটা পাতলা হইয়া গিয়াছে। যাব করিয়াও যান নাই—এইরূপ কয়েকঘর অতি উৎসাহী আত্মীয়-স্বজন ছাড়া সকলেই স্থানান্তরিত হইয়াছে এই সব আত্মীয়দের লইয়া তখনো বিবাহের বক্রী উৎসব দিবারাত্র চলিতেছে। সেইরূপ কয়েকটি দিন মধ্যে একটি রাত্রের ঘটনা বলিতেছি। রাত্র তখন প্রায় বারোটা। আমাদের খাওয়া-দাওয়া তখনো নাই। লম্বা বারান্দায় সারি সারি আসন ও পাতা সাজানো হইয়াছে, নুন পড়িয়াছে, লুচি পড়িবে। অ কয়েকজন মিলিয়া তখন নূতন বৌ-দি লইয়া হাসি-মশকরা করিতেছি। কেহ কেহ বলচ্যুত হইয়া আ হইয়াছে। এমন সময় রান্নাঘর হইতে প্রচণ্ড আর্তনাদ শুনিয়া আমরা উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম। আর্তন রোল বাতাসে ধাক্কা খাইতে খাইতে দ্বিতীয়বার আমাদের চমক দিল। আর বৌ-দি নয়, এবার অ রান্নাঘর অভিমুখে তীরবেগে ছুটিলাম।

রান্নাঘরে উঁচু করিয়া সিমেন্টে বাঁধানো তিনটি উনুনে কয়লা পুড়িতেছে, কোনোটায় কড়াই চাপ কোনোটায় হাঁড়ি। তারি পার্শ্বে একটি তোলা উনুন—কাঠের। এই উনুনটি নির্ঘর্মা বসিয়া আছে। ই ঝুলিতেছে বৈদ্যুতিক বাল্‌ব, ধোঁয়ায় অপরিচ্ছন্ন। পরিষ্কার বাল্‌বের নীচে হইতে ছুটিয়া আসিয়া কুয়া বাল্‌বের আলোয় রান্নাঘরের সমস্ত কিছু পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল না। আমরা সকলে মিলিত আতঙ্কের সহিত কহিয়া উঠিলাম, 'কি, কি? ব্যাপার কি?'

ছোড়দি স্তিমিত কণ্ঠে দুইবার মাত্র বলিল, 'সাপ সাপ?'

মনে হইল পায়ের নিচ দিয়া পিচ্ছিল দ্রুততায় কিলবিল করিয়া অজস্র সাপ পলাইয়া যাইতে উত্তপ্ত স্থানের উপর যেমন লাফাইয়া লাফাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় সেইরূপ লাফাইতে লাফাইতে বা লাগিলাম, 'কোথায়, কোথায়?'

ছোড়দি গা ছাড়িয়া দিয়াছে। মোড়ার উপর বসিয়া পিছনে রান্নাঘরের গায়ের উপর গা এলি দিয়াছে: শরীর তার বুঝিবা হিম হইয়া যাইতেছে। আমাদের রক্তস্রোত বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হইয়া উ লাগিল। বলিলাম, 'কোথায়, বলো?'

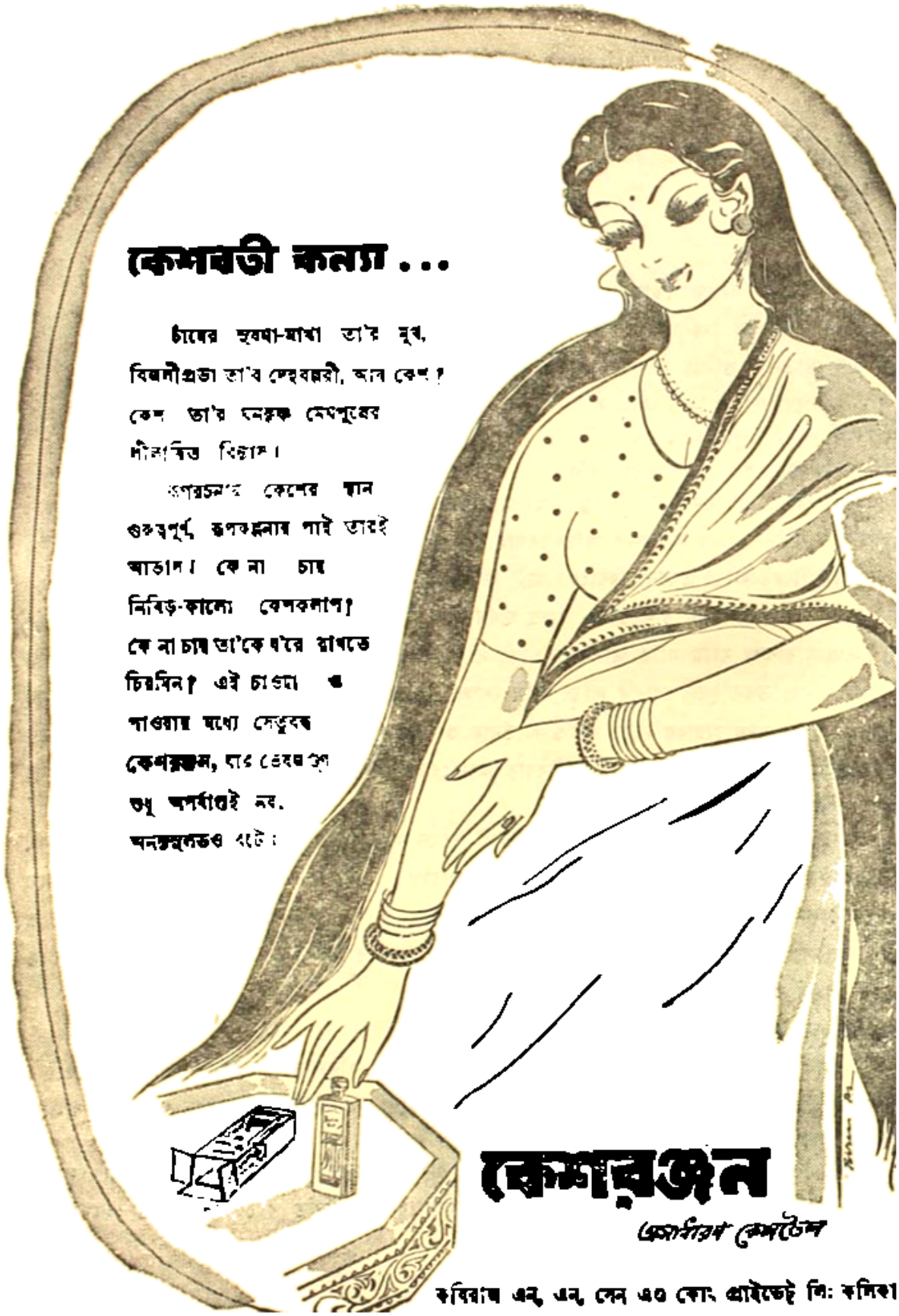
কেশবতী কন্যা...
চাঁদের সুষমা-মাখা তাঁর মুখ,
বিজলীপ্রভা তাঁর স্নেহবল্লরী, আর কেশ?
কেশ তাঁর মেঘপুঞ্জের
লীলায়িত বিকাশ।
রূপসজ্জায় কেশের স্থান
গুরুত্বপূর্ণ, রূপকল্পনায় পাই তারই
আভাস। কে না চায়
নিবিড়-কালো কেশকলাপ?
কে না চায় তা'কে ধরে রাখতে
চিরদিন? এই চাওয়া ও
পাওয়ার মধ্যে সেতুবন্ধ
কেশরঞ্জন, যার ভেষজগুণ
শুধু অপরাপই নয়,
অনন্যসুলভও বটে।
কেশরঞ্জন
কেশসিরম কেমিক্যাল
কবিরাজ এন, এন, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকা

কোনো প্রকারে আড়ষ্ট হাতটি তুলিয়া ছোড়দি দেখাইল, 'ওই যে।'

ওই যে! বলে কি? সকলে চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম, আবার বলিলাম, 'কই, কোথায়?'

অল্প আলোয় কিছুই দেখা যায় না! আমাদের বুঝি বুঝি একেবারেই ভোঁতা হয়ে গেল। করিতে হইবে বুঝিতে পারিলাম না।

ছোড়দি বলিল, 'শরীর অবশ হ'য়ে যাচ্ছে। পা-টা বেঁধে দে।'

এতক্ষণে খেয়াল হইল। খেয়াল হইবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া সবল বলে ছুটিলাম ঘড়ি খুঁজি কাপড়ের পাড় মিলিল। তাহাই সই! বিক্রম সহকারে পাকাইয়া পাকাইয়া কাপড়ের পাড় আঁট কা সমস্ত পায়ে জড়াইলাম, সাপ নাকি কামড়াইয়াছে গোড়ালীর কাছটায়। কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে কেহই নি নিজের কাজ করিতে পারিতেছিলাম না। কাছে ভিতে কোথায় যে সাপটি লুকাইয়া আছে বলা যায় না। ব বুঝিয়া আবার ছোবল বসাইতে কতক্ষণ!

রাঙাদি ছোড়দির কানের কাছে মুখ নিয়া সজল গলায় ডাকিতেছে 'ছোড়দি, ছোড়দি!'

ছোড়দির সাড়া নেই। রাঙাদি ছোড়দির গায়ে হাত বুলাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ওরে ডা এ যে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

ঠাণ্ডা হইয়া যাইবার কথায় হঠাৎ সজাগ হইয়া ছোড়দি বলিল, 'ওই স্থাখ তোলা উনুনের পাশে।'

একদল ছোড়দিকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া গেলো। কেহ ছুটিল ডাক্তারখানায়, ওঝার খোঁজে।

এতক্ষণ মেজদার পাত্তা পাই নাই। একটি সুদীর্ঘ টর্চ জ্বালাইয়া তিনি অতি সন্তর্পণে আ আসিতে বলিতে লাগিলেন, 'যেমন তোদের বুদ্ধি! অন্ধকার ঘরে সাপ পাবি কোথায়, এই নে টর্চ। ব ডাক্তার ডেকে আনি।'

'ডাকতে গেছে!'

'থাক। আমিও যাচ্ছি।'

ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ। তোলা উনুনের পাশে কাবু হইয়া লাগিয়া আছে। সরু লিক ক করিতেছে। টর্চ ফেলিয়া আমরা দূর হইতে দেখিতে লাগিলাম। কে-যে মন্তব্য করিল এ জাতীয় কামড়ালে ওঝার বাবার ইত্যাদি। কেহ বলিল, এ জাতীয় সাপ কামড়াইবামাত্র নিজে কাদার মত হইয়া যায়; এমন কি শরীর ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া পড়ে। কথাটি সত্য, কেননা—কাঠি দিয়া তুলিতে দেখা গেলো সাপটি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া উঠিয়া আসিতেছে।

বাহিরে উঠানে বসিয়া মুহ্যমান গলায় ছোড়দি বলিতেছে, রবি এদিকে আয়। মুকুট, বাদল, কা আয় না, আয় বাবা। আমি চললেম, ভালো হয়ে থাকিস্ তোরা।'

নতুন বৌদি ছোড়দির মাথায় বাতাস করিতেছিলেন ও ধীরে ধীরে চোখ মুছিতেছিলেন। রাঙ ছোড়দির গায়ের সঙ্গে লাগিয়া বসিয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছিল।

রাঙাদির হাত ধরিয়া ছোড়দি বলিল, এদের দেখিস। আমার তো ছুটি হ'য়ে গেলো।

দুধ ও মাখন দিয়ে তৈরী

সুমধুর স্বাদে এমনটী আর হয়নি

কোরে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ · কলিকাতা-১০

ছোড়দির ছেলে-পিলেরা এক পার্শ্বে জড়াজড়ি করিয়া বসিয়া ভীষণভাবে কাঁদিতে আরম্ভ করি দিয়াছে! কে তাহাদের প্রবোধ দিবে, তখন সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য লইয়া ব্যস্ত। সমস্ত বাড়ি প্রত্যেকটি আলো অনর্গল করিয়া জ্বলিতেছে। পাড়া-প্রতিবেশীরা রাত্রের ঘুম ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন

ছোড়দি বলিল, 'আমার পলিসিটা! অ্যাসাইন করা হলো না তো, টুলু? জ্ঞান থাকতে থাক নিয়ে আয়!'

ছোড়দা তখন হতভম্ব হইয়া বারান্দায় উঁচু হইয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল কি যেন ভাবিতেছিল। কো জবাব দিল না। নতুন বৌদি পাখা থামাইয়া আড়চোখে বুঝি ছোড়দার দিকে চাহিলেন। উৎসবের মা খানে একি বিপর্যয়! কতজনের কত আনন্দোচ্ছ্বাস, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝি নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে

রাঙাদি ও বড়দি প্রাণপণ অনুনয় করিয়া ছোড়দিকে ডাকিতে লাগিল। সাড়া নাই। পা বাঁধন কোনোখানে হয়ত বা আলগা হইয়া থাকিবে। নতুবা এত শক্ত বাঁধন ভেদ করিয়া এত শীঘ্র বিষটি মুক্ত হইয়া গেলো। এমন কি ডাক্তার আসিবার ফুরসত পর্যন্ত মিলিতেছে না! বাঁধনের উপর নূতন কা বন্ধন দেওয়া হইল। মাথায় জল ঢালা হইল। তবু ছোড়দির সাড়া নেই।

সব বুঝি শেষ হইয়া গেলো। ছোড়দি একেবারেই অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। দিদি ও নূতন বৌ

ঘিরিয়া ছোড়দির ছেলেপিলেদের শান্ত করিবার জন্য বৃথাই প্রাণপণ সান্ত্বনার কথা বলিতেছে। কো ছেলের হাহাকার বিন্দুমাত্র মন্দীভূত হইতেছে না।

আমরা বিষধর সাপটিকে কাঠের ডগায় করিয়া বারান্দার অত্যুজ্জ্বল আলোর নিচে আনিয়া ফেলিল টর্চের আলো ও বৈদ্যুতিক আলোয় সাপটির পরিচয় গোপন রাখিবার বিন্দুমাত্র অবকাশ রহিল না। ব দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে সাহস বাড়িল, হাত দিয়াই দেখিলাম। আশ্চর্য, এ যে কই মা নাড়ি। পিঁপড়া পর্যন্ত লাগিয়া আছে।

'মাছের নাড়ি! সাপ নয়!' সকলেই পরখ করিয়া দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল।

ছোড়দি ধীরে ধীরে সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, 'অ্যাঁ'?

সাপটিকে ছোড়দির কাছেই টানিয়া নিয়া গেলাম, বলিলাম, 'আখো, এটা সাপ?'

ছোড়দি বলিল 'উঁহু!' চোখ রগড়াইয়া বলিল, 'সাপ না তো? ঠিক দেখেছিস তোরা?'

হঠাৎ যেন ঊর্ধ্বগামী অগ্নিশিখার উপর প্রবল বারিপাত হইল। নিমেষের মধ্যে সমস্ত ক্রন্দন হইয়া গেলো।

ছোড়দি বলিল, 'হঠাৎ গোড়ালির কাছটা জ্বালা ক'রে উঠলো, ভাবলাম সাপ! বড্ড কড়া সুচি ছাড়তে গিয়ে ঘি ছিটে পড়েছিলো তা হ'লে!'

প্রকৃত পক্ষে ঘটনাটি তাহাই। ছোড়দি ভাজিতেছিল লুচি। কড়াই থেকে পায়ের উপর উত্তপ্ত ছিটাইয়া পড়ে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তোলা উনুনের উপর মাছের নাড়ি নড়িতে থাকে সাপেরই মত। মাছের ন নড়িবে আশ্চর্য বটে! কিন্তু পিপীলিকাশ্রেণী যদি তাহাকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করে, তাহা হ নির্জীব নাড়ি হইলেও তাহাকে নড়িতে হয়। কিন্তু তাহার এই নিরুপায় নড়া এমন ঘোরতর বিপর্যয় ঘটাইবে ? তাহার জানা থাকিলেও তাহাকে নড়িতে হইত।

নিজের হাতেই পায়ের বাঁধন খুলিতে খুলিতে ছোড়দি বলিল, 'ওই টিমটিমে আলোয় অত যায়? তোরা তো বাল্‌বটা সাতদমে পরিষ্কার করবিনে!

মেজদা ছুটিয়া আসিলেন। ভীষণ সমস্যা তাঁহার চোখমুখ দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতেছে—ডাক্ত বাবু আসিলেন না, কেন না সর্প দংশনের চিকিৎসা কোনোদিন তিনি করেন নি ও করেন না।

কমল ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'ডাক্তার গেলাম না। সেফ্‌টিন্ নিয়ে এলাম।'

বীরু চোরের মত বাড়িতে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, 'ওরা এ মুলুকে নেই। এখন অবস্থাটা কেম

নতুন বৌদি ছোড়দার মুখের দিকে তাকাইয়া অকস্মাৎ কিক করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

ধীরে ধীরে উঠিয়া গা মোড়ামুড়ি দিতে দিতে ছোড়দা ঘরে গেল।

এত পরিশ্রম একেবারে মাঠে মারা যায়, অতএব ছোড়দি বলিল, 'হে, সেফ্‌টিন্ একটু সে এ খাওয়ার ওষুধ, না সোঁকার ওষুধ রে!'

———

হারানো মেয়ে

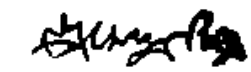

গলিটা দিয়ে গেলে একটু সুবিধে হয়। যে ঘুরে না গিয়ে তাই সাধারণতঃ এই পথেই রাত্রে ফিরি।

একটু নোংরা, অন্ধকারও বটে। কিন্তু অনেকদিনের যাওয়া-আসায় চেনা হয়ে গেছে। দিনে কোথায় পেছল কোথায় খোদলে জল জমে থাকে তাও প্রায় মুখস্থ।

গলির মুখটা একটু বেশি অন্ধকার। একদিকে লম্বা একটা দেওয়াল আর একদিকে বাড়ির পেছন দিক। বড় রাস্তার আলো পৌঁছোয় না গলিটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানকার ল্যাম্পের আলোটাও না।

সেদিন রাত্রে প্রায় গাছের ওপর পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে একটু বিরক্ত হয়েই বলে —এখানে কি করছ খুকি?

ফ্রক-পরা বছর দশেকের একটি মেয়ের পা-টাই আর একটু হ'লে মাড়িয়ে দিচ্ছিলাম।

মেয়েটা ওই অন্ধকারে মাটিতে বসে করছে কি?

পকেট থেকে দেশলাইটা বার করে জ্বাললাম। ভীত কাতর মুখে মেয়েটা সভয়ে আমার দি আলোয় চাইল।

মেয়েটিকে চিনি। এই গলিতে তাদের বাসা। মামার বাড়িতে থাকে। অত্যন্ত অভাবের মামা কোথায় একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করে। তাতে তার নিজের একপাল আওবাচ্চারই আহার জোটে না। বাপ-মা মরা অনাথ ভাগনীটা তাই গলগ্রহ হিসাবে বিনা মাইনের ঝি-গ মতই থাকে।

বাড়ির ফাইফরমাজ থেকে হাট বাজারের কাজও ওই—একরত্তি মেয়েটাই বেশীর ভাগ করে

মেয়েটার অবশ্য তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। রোগা জীর্ণ চেহারা হলেও মেয়েটা বেশ হাসি-খুশি। ঝি-চাকরের কাজ করাটা তার কাছে এখনো শাস্তি নয়—একরকম খেলা।

ট্যাবস ট্যাবস করতে করতে থলি হাতে বাজারেও আসে, মুদির দোকানেও চাল চিনি কিউএ দাঁড়ায়, আবার গলি থেকে বেরিয়ে হেলে ভাজার দোকান থেকে মামা-মামীর মেজাজ যদি থাকলে মুড়ি বেগুনি ফুলুরীও কিনে নিয়ে যায়।

মেয়েটাকে এই রাস্তাঘাট দোকানেই অনেকবার দেখেছি। মিষ্টি স্বভাবের জন্যে সবাই তাকে স্নেহও করে। নেহাত বাচ্চা হলেও মেয়েটা বেশ চালাক চতুর।

সেদিন মুদির দোকানে কি মশলা কিনে আমাদের রামু মুদির কাছে বাকি রেজগি নিয়ে খুন। এ তুমি কত ফেরত দিয়েছ রামুদা! তুমি কিছুই হিসেব জানো না নতুন পয়সার।

আমি হিসেব জানি না!—রামু বেশ ক্ষুণ্ণ,—আমি কম দিয়েছি বলতে চাস্। রামু যদি কোন দিন কাউকে ঠকিয়েছে!

রামু এ গর্ব অবশ্য করতে পারে। তার দোকানের জিনিসের দর চড়া হতে পারে, কিন্তু ওজনে কি হিসেবে সে ঠকায় না কখনও।

মেয়েটা তবু হাসতে হাসতে বলেছিল,—তুমি নিজে যে ঠকেছ। তুমি ত' আমায় এগার আনা ফেরত একান্তর নয়া পয়সা দিয়েছ কেন? এই নাও দু-নয়া পয়সা!

তবু রামুকে নয় আনার পর্যন্ত হুতভম্ব করে দিয়ে মেয়েটা হাসতে হাসতে চলে গেছল।

রামু অপ্রস্তুত হয়েও খুসি মুখে বলেছিল—বোকা বানিয়ে দিয়েছে বটে! এ মেয়ের যদি অমন কপাল না হত!

মেয়েটাকে দেখে একথা অনেকেরই হয়ত মনে হয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার সংগ্রাম এখন বড় কঠিন। করুণায় মনটা একটু ভিজে না উঠতেই শুকিয়ে যায়।

মেয়েটার কাতর মুখ দেখে সেই মুহূর্তে কিন্তু বুক মোচড় দিয়ে উঠল। সামান্য বেসলাইনের আলোতেও সে মুখের করুণ হতাশা সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। মেয়েটার এরকম চেহারা কোনদিন দেখিনি।

কি হয়েছে কি খুকি?

মেয়েটা কান্না ধরা গলায় বললে—সিকিটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছে।

আস্ত একটা সিকি হারিয়ে যাওয়া যে পৃথিবীতে কত বড় শোকাবহ দুর্ঘটনা ওই মেয়েটির চোখ দিয়ে দেখে শুদ্ধ হয়ে বুঝলাম। মেয়েটির কাছে ঘটনাটাও শুনলাম একটু একটু করে।

তার মামার অম্বলের অসুখ আছে বুঝি। এই রাত্তিরে বাবাটা বাড়াবে মেয়েটাকে একটা সিকি দিয়ে মোড়ের পানের দোকান থেকে তাড়াতাড়ি এক বোতল সোডা আনতে পাঠিয়েছিল। গলির এই জায়গাটায় মোড়ে আসবার সময় হঠাৎ একটা ছুঁচো না কি নর্দমা দিয়ে আওয়াজ করে ছুটে যাওয়ায় ভয় পেয়ে সরে আসতে গিয়ে তার হাতের সিকিটা পড়ে গেছে।

মেয়েটি মুখে না বললেও বোঝা গেল এ সিকি হারাবার জন্যে তাকে বেশ কিছু শাস্তি পেতে হবে, এবং সে শাস্তিকে সে ভয় করে। মেয়েটি হাসিখুশি থাকে নেহাত তার নিজের স্বভাবে, নইলে তার পরিবেশের তাতে কোন সাহায্য নেই।

বেসলাই জেলে জেলে অনেকক্ষণ মেয়েটির সঙ্গে এদিক ওদিক খুঁজলাম।

সে সিকি কোথাও পাওয়া গেল না। বাপ মা খোয়ানো বিবৃতি করা মেয়ের হারানো সিকি অত সহজে কি পাওয়া যায়!

আমাদের খোঁজাখুঁজির মধ্যেই কিছুক্ষণ বাদে মেয়ের মামা স্বয়ং এসে হাজির। সোডা আনতে দেরী দেখে নিজেই বেরিয়েছেন খোঁজ নিতে।

সিকি হারাবার কথা শুনে ত রাস্তার উপরই প্রায় এই যায়েন ত সেই যায়েন, নেহাত উপস্থিত থাকতেই পাসানিটা মুখেই শেষ হ'ল।

যাবার সময় মামা শেষ চমকি দিয়ে গেলেন,—ও সিকি যদি না পাস্ ত বাড়ির বন্ধ জানবি।

মেসদাইএর কাঠি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তা জেলে মেয়েটার মুখ দেখবার অবশ্য তখন অবসর প্রায় শেষ কাঠিটা জ্বালতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আর দরকার হল না। আমাদের টর্চের আলো।

সেই সঙ্গে একটু জড়িত কণ্ঠে শুনলাম,—কি তামাসা এখানে হচ্ছে বাবা!

দুলাল হাজরার গলা শুনেই চিনলাম। এই গলিতেই তারও বাসা।

বাসাটাই সে এখনো ছাড়েনি। নইলে গত কবছরে লোহা-লক্কড়ের কারবারে ফেঁপে উঠে এ ছাড়িয়ে সে প্রায় চৌরঙ্গীতে পৌঁছে গেছে বলা যায়।

তার পেল্লয় মোটর এ গলিতে ঢোকে না।

তাই বড় রাস্তার গ্যারেজে সেটা রেখে সে এটুকু হেঁটেই আসে রাত্রে। আসে অবশ্য একটু টলতেই।

এ গলির তাতেই কৃতার্থ হওয়া উচিত।

হাজরাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হ'ল।

সব শুনে সে ত আমার ওপরই খাপ্পা।

এই একটা সিকির জন্যে মেয়েটাকে এতক্ষণ ধরে আমি নির্ঘাৎ আঁতাকুড় ঘাঁটাচ্ছি! আমার কি মানুষের চামড়া নেই?

নে, এই নে খুকি!—পকেট থেকে একটা গোটা টাকাই বার করে সে মেয়েটার হাতে গুঁজে একবার বাধা দিতে গেলাম তাতে আরো চটে উঠে একটা পাঁচ টাকার নোটই এবার মেয়েটা জোর করে নিইয়ে ছাড়লে।

মেয়েটা বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে পানের দোকানের দিকেই চলে গেল।

আমার দিকে একবার ঘৃণাভরেই তাকিয়ে হাজরাও তার বাসার দিকে পা বাড়াল।

অন্ধকারে সে ঘৃণার দৃষ্টি অবশ্য স্পষ্ট দেখতে পাইনি। লক্ষ্য করবার মত মনের অবস্থাও ছিল দুলাল হাজরার বাদশাহী বদান্যতায় তখন আমি হতবাক হয়ে গেছি।

কয়েক মাস একটা কাজে তারপর কলকাতা থেকে চলে যেতে হয়েছিল।

ফিরে আসার পর ট্রাম থেকে সেদিন রাত্রে বড় রাস্তাটা ধরে আসছি।

এক জায়গায় ভিড় দেখে কৌতূহলী হয়ে একটু উঁকি দিতে হ'ল।

সেই অনাথ মেয়েটিকে ঘিরেই ভিড়। সেই চেহারা সেই পোশাক শুধু আজ মেয়েটার—চোখের জল করার আর বিরাম নেই।

পাশের একজন নিজে থেকেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।

মেয়েটি একটা টাকা নাকি হারিয়ে ফেলেছে। হাত থেকে পড়ে টাকাটা রাস্তার ড্রেনের ঝাঁঝরি দিয়ে গলে পড়েছে বোধহয়।

ওপাশ থেকে আর একজন মন্তব্য করলেন,—সব চালাকী মশাই। পয়সা আদায়ের নতুন ফিকির আমি সেদিন এই মেয়েটাকেই আর এক রাস্তায় পয়সা হারিয়েছে বলে এমনি যারা কান্না কাঁদতে দেখেছি কিন্তু ওর হারায় নি!

ভিড় থেকে বেরিয়ে চলে এলাম।

ওরা যাই বলুক আমি জানি মেয়েটা আজ সত্যি সব হারিয়েছে।

সে নিজেই হারিয়ে গেছে আমাদের এই হুজার দুনিয়ায়।

———

জয়নাদ ও আর্তনাদ

(নাটিকা নয় কবিকা)

আশীষ সেন গুপ্ত

উত্তর কলকাতার ফ্লাট বাড়ীর একখানি ঘর, বড়-লোকের ড্রয়িংরুমের নকল করা শস্তা-ফার্নিচার দিয়ে সাজানো। তবুও ওর একটা শ্রী আছে। ঘরে দুটি প্রাণী সে আছে,—ভবানী আর অপূর্ব্ব। ভবানী বিধবা, বয়েস ত্রিশ, ঈষৎ ভুলাঙ্গী, কিন্তু তবুও সুন্দরী। সে চঞ্চল-মনে একটা সোফেটার কি আর কিছু বুনছে। অপর ব্যক্তি অপূর্ব্ব, বয়েস চল্লিশ, সাহেবী পোষাক পরা। তার আসনের পাশে একটা টিপয়ে চায়ের সরঞ্জাম। টি-পট থেকে পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে সে বলে :

অপূর্ব্ব। আসতে পারুক বা নাই পারুক, একটা তার করতেও ত পারত।

ভবানী। পারলে করত বৈ-কি!

অপূর্ব্ব। আপনি দেখছি বাংলা কাগজের অতিরঞ্জিত খবরগুলোই সত্যি বলে মেনে নিয়েছেন।

ভবানী। অতিরঞ্জিত খবর!

অপূর্ব্ব। নিশ্চয়!

ভবানী। কেমন করে জানলে?

অপূর্ব্ব। সবই কি দেখে শুনে জানতে হয়? অনুমান দিয়েও অনেক কিছু জানা যায়।

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। তার মাথা-জোড়া টাকের চারদিকে পাকা চুল। তিনিও ফর্সা, সুপুরুষ, গায়ে লংক্লথের কতুয়া, পায়ে চটি। তার নাম শঙ্করনাথ।

শঙ্কর। ঠিক বলেছ তারা, তর্কশাস্ত্র অনুমানকেও সম্মানের আসন দেয়। তবানীটা আবার যে রিয়েলিষ্ট! তা অনুমান দিয়ে কি জানলে তুমি আমার?

অপূর্ব্ব। গাল দিলেন, দাদু!

শঙ্কর। তাই বলে ডেকে তার ভাগও নিলাম।

ভবানী। অপূর্ব্ব বলে আমাদের কাগজগুলো সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত খবর দেয়।

শঙ্কর। তারা তা জানলেন কেমন করে?

ভবানী। আমিও ওকে সেই কথাই বলছিলাম।

অপূর্ব্ব। আচ্ছা দাদু, আমাদের গবর্ণমেণ্ট বা বস্তু আছে, মানেন ত?

শঙ্কর। বস্তু শব্দটি ব্যবহার করে যদি তুমি বোঝাতে চাও, বলব মানি না। আর যদি বোঝাতে চাও, তাহলে ঢোক গিলে বলতে হয় ···তো···আছে!

অপূর্ব্ব। আর যদি কনষ্টিটিউশনের, মানে, সংবিধানের কথা তুলে বলি,···

শঙ্কর। উঁহু হুঁ। ও-কথা তুলোনা, তাহলে ভবানীর সঙ্গে তর্কে হেরে যাবে। ও বলবে আমরা স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে কনষ্টিটিউশনকেও স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছে। সিটিজেনশিপের অধিকার হরণের ব্যাপারে কনষ্টিটিউশনকে কাঁচকলা দেখানো।

অপূর্ব্ব। সিটিজেনশিপের অধিকার আবার

কে! কিছু লোক উপদ্রবে অথবা ভয়ে আসাম ছেড়ে চলে এসেছে।

ভবানী। আর অনেকগুলো লোক তাদের সেখানে থাকা অসম্ভব করে দিয়েছে খুন-খারাপি করে, ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দিয়ে, বিষয়-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে, আরো ভয়ঙ্কর এমন সব কাজ করে যা, মেয়েছেলে বলে, মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে আমার বাধছে।

শঙ্কর। আর তথাকথিত কনষ্টিটিউশনাল্ গবর্ণমেণ্ট না চেয়েছে সেই উপদ্রব থামাতে, না চেয়েছে উপদ্রুতদেরকে আশ্রয় দিতে। মানি, ভারত ইউনিয়নের মানচিত্রে আসাম নামক একটি রাজ্য আছে। সেই রাজ্যের আছেন একজন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের রাজভবন আছে, হাতীশালে হাতী আছে, আস্তাবলে ঘোড়া আছে, মন্ত্রি-জোট আছে, মাজীর-উজীর, সেপাই-শান্ত্রী, ডম্বর-লম্বর-নকর কোন কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু ও-সবই হচ্ছে ছায়া, ভাষা, ব্রেফ্ মায়া।

একটি তরুণী প্রবেশ করল।

এই যে মালিনী দিদি এসেছ। কি বুঝে এলে?

মালিনী। এই মাত্তর তুমি যা বল্লে দাদু, ঠিক তাই,—মায়া।

শঙ্কর। কি?

মালিনী। চাকরি।

অপূর্ব্ব। নেই নাকি?

মালিনী। ছিল জেনেই ত গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখলাম নেই। মায়া!

অপূর্ব্ব। বল কি!

মালিনী। দেখলাম আমার আসনে বসে আছেন আর একটি তরুণী, আমার চেয়ে সুন্দরী, আর আমারি মত সুঘোরী। চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে আর একবার চেয়ে দেখলাম, দেখলাম তাঁর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে দুই হাতে চেয়ারের দুটো হাতল ধরে খুত্‌নিটা তাঁর ঠেকিয়ে সাহেবের দিকে ঝুঁকে পড়ে আমাদের [illegible] মিষ্টার রসরাজ সরকার—সেই যে দাদু, সেই লো[illegible]

শঙ্কর। তামসন হাতে ডেমাইনা দেখবার জন্য ধরে টানাটানি করত?

মালিনী। হাঁা, দাদু, হাঁা। সেই রসরাজ সাহেব আমার আসনে অধিষ্ঠিতা নবাগতাকে কাজ দিচ্ছেন।

শঙ্কর। হেসে, বেঁকে, গলে, চলে?

মালিনী। ঠিক, দাদু ঠিক! কিন্তু তুমি তা কেমন করে?

শঙ্কর। ও-বয়সে আমরা ওই রকম করতাম কি

অপূর্ব্ব। আপনাদের আমলে মেয়েরা কাজই করত না।

শঙ্কর। কিন্তু বাজারে মেছুনিরা মাছ বেচ হেঁসেলে বসে সেই মাছ ছেড়ে দিত তোমাদের মি যার বয়স তখন ছিল বছর ষোলো, দেখতেও বেশ কোলো। ভবানী যে

ভবানী। যা তা বলছ কেন, মামা। আমার শুনিছি, খুব সুন্দরী ছিলেন।

শঙ্কর। তুই বড় বেশি রিয়ালিষ্ট হয়ে য ভবানী। মেছুনীর সঙ্গে মিলিয়ে বেশ একটা গ বসেছিলাম, মিলি তুই এক ধাক্কা মেরে ছিঁড়ে!

ভবানী। তোমার তাঁত তুমিই বোন মামা একবার হেঁসেলটা দেখে আসি। অপূর্ব্বকে যে বলেছি আবার।

বোনবার সরঞ্জাম শুচিয়ে অন্দরের দিকে অগ্রসর হলো।

মালিনী। ও মা, শোন।

ভবানী দাঁড়ালো, মালিনী তার কাছে গেল চাকরী হইল না শুনে দুঃখু পাও

ভবানী। থাকবে, তাই কি ভেবেছি কোন দিন?

মাকে ভড়িয়ে ধরে মালিনী বল্ল

মালিনী। বাঁচালে, মা। তোমার মতো লক্ষ্মী মা কারু নেই মা, কারু নেই, কারু নেই।

মাকে ছেড়ে দিয়ে শঙ্করের কাছে ছুটে এলো, ভবানী চলে গেল।

তারপর শোন, দাদু। মিষ্টার রসরাজ আমাকে দেখতে পেয়ে চোখের পলকে রাজ-অফিসারের রূপ ধরলেন!

শঙ্কর। ওঁর অপাঙ্গের লাস্য মিলিয়ে গেল?

মালিনী। গেল, দাদু।

শঙ্কর। ধনুকভঙ্গি-কৌমুদি মুদিত হোলো?

মালিনী। হোলো, দাদু।

শঙ্কর। বঙ্কিম ঠাম ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো ঋজু হয়ে উঠল?

মালিনী। উঠল দাদু।

শঙ্কর। মিলিয়ে নাও হে, অপূর্ব্ব ভায়া, আর বোঝ যৌবনে ও-সব আমার তালিম দেওয়া ছিল কিনা।

অপূর্ব্ব। আপনি একটা ভুল খুলুন না, দাদু।

শঙ্কর। খুলি যদি, তোমাদের সেই শেরিডানের School for Scandalকে ডুবিয়ে দোব, দেখে নিয়ো।

মালিনী। খোল যদি, অপূর্ব্বদাকে কখ্খনো ছাড়তে দিয়োনা।

অপূর্ব্ব। বা রে! এই অপূর্ব্ব বেচারা আবার কি অপরাধ করল?

মালিনী। তুমি ত অফিসার হয়ে ওই রসরাজ কুকারেরই ঐতিহ্য বহন করবে! এখন শোন, তাঁর কীর্ত্তি। অফিসার রসরাজ সাহেব আমাকে দেখতে পেয়েই মিলিটারী-মাপে পা ফেলে-ফেলে আমার সামনে এসে অটেন্‌শন্ পোজ নিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর সাহেবী উচ্চারণ নকল করে বল্লেন—"অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি মিস ব্যানার্জ্জী, আপনার বিরুদ্ধে পুলিশ রিপোর্ট থাকা করে আপনাকে চাকরীতে বহাল রাখা কিছুতে সম্ভবপর হোলো না।"

শঙ্কর। শুনে এক-পশলা চোখের জল বর্ষণ ক মালিনি?

মালিনী। আমি বল্লাম—"ডিসচার্জ্জ নোটিশ যে-জোর দিয়ে এসেছি, সেই জোর দিয়েই যাচ্ছি।" তিনি বল্লেন,—"ওটা কল পাবেন।" বল্লাম—"হবে কাল থেকে ওই আসনের ধারে যাব না। কিন্তু আজ ওতে বসেই আমাকে কা হবে।" "উনি বসে আছেন যে"—উনি কথাটি একটু অতিরিক্ত জোর দিয়েই রসরাজ কথাটি "ওঁকে উঠে যেতে বলুন না।"—বল্লাম আমি। বল্লেন—"তা কি করে হয়! আপনারা যখ করেছিলেন, উনি তখন তদারকিয়ার করেছিলেন চালু রাখবার কাজে সহায়তা করতে;" "তা আ বুকে হেঁটে আবার ফিরেই এসেছি, তখন সাভিস নেবার দরকার ত সরকারের আর নেই কথা শুনে আপিস শুদ্ধ লোক হেসে উঠল। ে চেঁচিয়ে তুলিয়ে দিয়ে রাজ-অফিসার রসরাজ বা না, তা হতে পারে না। একজন রেবেল কর্ণ একজন লয়াল সিটিজেনসের অধিকারের চেয়ে বড় হতে পারে না! আমরা তা হতে দোব না

অপূর্ব্ব। ঠিকই বলেছিলেন তিনি।

মালিনী। ঠিকই বলেছিলেন! আমরা রে

অপূর্ব্ব। রেবেলই ত! অর্ডিনান্স যখুনি করলে, তখুনি রেবেল হলে।

মালিনী। আমরা রেবেল, দাদু?

শঙ্কর। লাগাম যারা পরাতে জানেনা, ত বলে কপাল চাপড়ায়—যারা জানে, তারা চৌ-ঘু

অপূর্ব্ব। আর লাগাম যারা পরতে চায় না, দাদু?

শঙ্কর। তারা অন্তরের উচ্ছল শক্তির পরিচয় দেয়। সেটা তাদের স্বধর্ম্ম। তোমরা ত তারা রবিঠাকুরের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটার তারিফ কর?

অপূর্ব্ব। তা করি।

শঙ্কর। আবার ভাঙ্গা-নালা বাঁধ নিয়েও গরব কর।

অপূর্ব্ব। তাও করি।

শঙ্কর। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ যেমন কাম্য, তেমন সেই নির্ঝরকে নির্দ্দিষ্ট খাতে বহিয়ে নিয়ন্ত্রিতে নিয়োগ করাও বিধুপের ধর্ম্ম। মানি একথা?

অপূর্ব্ব। মানি!

শঙ্কর। যাঁরা স্ট্রাইকের নোটিস দিয়েছিলেন, তাঁরা স্বপ্নভঙ্গের পরিচয়ই দিয়েছিলেন।

অপূর্ব্ব। তাই নাকি দাদু!

শঙ্কর। আজ যাঁরা শাসক, পরবশতার দিনে তাঁরা মন নায়ক ছিলেন, তাঁরাই তা বলতেন।

অপূর্ব্ব। এখন ত তা বলেন না।

শঙ্কর। জন-নায়করা শাসক হয়ে সবখেনে, সবকালেই, শাসন-যন্ত্রটাকে সর্ব্বস্ব ব'লে মনে করেছেন, ভেবেছেন ঈশ্বরাজারের মতো ওটাকে চালু রাখতে পারলেই জন-কল্যাণ ই যন্ত্র থেকে আপনিই বেরিয়ে আসবে, খনি থেকে যেমন রে তেল বেরিয়ে আসে। ওই একটি পদ্ধতি থেকেই াম্রাজ্যবাদের আর ধনতন্ত্রবাদের সকল গলদ বেরিয়ে এসে বশ্বকে বিষাক্ত করে ফেলেছে।

মালিনী। তুমি স্ট্রাইকের কথা বল, দাদু।

শঙ্কর। স্ট্রাইকের নোটিস একটা কথা খুবই স্পষ্ট রে প্রকাশ করেছিল। তা হচ্ছে এই যে, ছ'শ বছরের াস-সায়রে স্রোতের সঞ্চার হয়েছে। যাঁরা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের তারিফ করেন, তাঁদের কর্ত্তব্য ছিল ওকে নিজেদের াহাতে নেওয়া, নেতৃত্ব দেওয়া। মূর্জ্জটি গদার বেগ ধারণ করবার জন্য নিজের জটাজাল বিস্তার দিয়েছিলেন, বজ্র-বাহু বাড়িয়ে হিমালয়ের পাথর এনে গো-মুখী-ধারা বন্ধ করতে চান নি। মঘব ঐরাবত তা চেয়েছিল, ভেসেও গিয়েছিল।

অপূর্ব্ব। উপমাটা কি ঠিক হোলো, ভয়ী হয়েছে কে?

শঙ্কর। আপাততঃ ঐরাবতই জিতেছে। কিন্তু সায়র তাতে করে পুনরায় পল্বলে পরিণত হবে, যাঁরা ভাবেন, তাঁদের বুদ্ধির তারিফ করি না। স্রোত একবার যখন লাল-সায়রে ঢোকবার পথ নিয়েছে, তখন ও-সায়র আর কখনো পচা-পাঁকে উঠ্‌বে না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল স্বাধীনতার সংগ্রাম-কাল পর্য্যন্ত ওর জল ছিল নিশ্চল, ঘোলাটে; অত্যাচারের অশ্রুধারায় আর প্রজাশোনিত স্বেদবিন্দু-বর্ষণে লবণাক্ত। কিন্তু আ তা রইল না, নিশ্চিত করে তা জেনো।

মালিনী। বল দাদু, অপূর্ব্বকে বুঝিয়ে বলে আমরা যার খেলাম, কিন্তু হার মানলাম না।

অপূর্ব্ব। শুধু তার ঘরে রইলে!

মালিনী। কার? আপনার?

অপূর্ব্ব। তা কেন! সংসারের, আর সরকারে

শঙ্কর। তাই ত বলি ভায়া, তোমার সরকার হেরে গেল। আর হেরেও যে জেতা যায়, তারও আছে।

অপূর্ব্ব। তাও যায় নাকি, দাদু?

শঙ্কর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আর দ্বিতীয় নিকো রুশ প্রচণ্ড মার খেয়েছিল। তার হারই হোতো, লেনিন জার্মেনীর সঙ্গে পৃথক সন্ধি করতেন। বিশ্ব-যুদ্ধে সেই রুশ সোবিয়েত ইউনিয়ন হয়ে বাহিনীকে নিজের দেশের সীমানা থেকে, সারা

উরোপ থেকে, বেঁটিয়ে বিদেয় করে দিয়ে বালিন অবধি খল করে বোলল। সে-কথা তোলনি বোধ করি।

অপূর্ব্ব। মাপ করবেন দাদু, রাশিয়ার কথা শুনে-শুনে কানে-কালা হয়ে গেলাম। আর তা শুনতে পারি না!

মালিনী। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্য অপূর্ব্বদা যে, অনাগত হলেও, অনেক দিন ধরে, আপনাকে তা শুনতেই হবে। হবে এই সেদিন তারা কুকুর-যুগলকে মহাকাশ ঘুরিয়ে পৃথ্বী ফিরিয়ে এনেছে। কলির কেবল সন্ধ্যে, অপূর্ব্বদা।

অপূর্ব্ব। রাশিয়ার ধর্ম্মঘট হয় না।

মালিনী। দরকারও হয় না আজ।

শঙ্কর। সোবিয়েতের উৎপত্তিই হয়েছিল ধর্ম্মঘট থেকে। কিন্তু থাক সে কথা। যিনি একটা উদাহরণই দি। শুনবে তা?

অপূর্ব্ব। দেশের কথা যা বলবেন, সব শুনব। শুধু, দয়া করে বিদেশের কথা শোনাবেন না।

মালিনী। ব্রিটেন আমেরিকার কথা?

অপূর্ব্ব। তাও না।

মালিনী। উট পাখী ঝড়ের আভাস পেলেই মরুর বালির মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে থাকে, ভাবে ওই করেই বেঁচে যাবে। দু-একটা বাঁচেও নাকি। আপনিও বেঁচে যাবেন, অপূর্ব্বদা।

অপূর্ব্ব। যদি তোমার দিদিকে বিয়ে করবার সৌভাগ্য আমার হয়। কি বল?

মালিনী। ওইটেই ত হবে কন্‌ডিশন-প্রেসিডেন্ট!

অপূর্ব্ব। তোমার দিদির দেওয়া কন্‌ডিশনও বড় কম নেই। বলুন দাদু, আপনার যিশি দুষ্টোক্তিটাই শোনা যাক্।

শঙ্কর। এ-দেশে বিপ্লববাদ দমন করতে বিগত ইংরেজ সরকার চরম কড়া রকমের একটা আইন জারি করেছিল। রাউলাট আইন। তখন তারা জিতেছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু অচিরে কোথায় রইল সেই রাউলাট আইন? কোথায় রইল তারা, যারা ওই আইন জারী ক বিপ্লবের কাছেই তাদেরকে হার মানতে হয়।

অপূর্ব্ব। আপনি কি বিপ্লব-বাদকে আবার তুলতে চান?

শঙ্কর। বিপ্লব ম্যানুফ্যাকচার করা যায় না। আসে, নিজেরই তাগিদে আসে। কখনো আসে, কখনো আসে ঝড়ের গর্জ্জনে দশ-দিক আবার কখনো বা তুচ্ছ একটা উপলক্ষকে অবল আবির্ভূত হয়ে কিছুকাল তুষের আগুনের মতে ধুঁইয়ে হঠাৎ একসময়ে দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে

অপূর্ব্ব। তাই কি আমাদের প্রাইম বলেছিলেন ট্রাইকটা আসলে সিভিল-রেবেলিয়ন

শঙ্কর। লক্ষণটা তিনি ঠিকই ধরেছিলেন, প্রকাশ সম্বন্ধে ভুলও করেছিলেন। সরকারী ক অবচেতন-মনে যাই থাক, ওর আয়োজনে ছিল ম আততায়ী করে গোটা কয়েক টাকা বাড়ি অহিংস সাধু প্রয়াস।

মালিনী। না, না, দাদু, তোমার এ রিডিং নি

শঙ্কর। তোদের নায়করা কংগ্রেসের স্বা ভাবেননি, তার শক্তির কথাও না,—আবা রেবিলিয়ানের জন্য প্রস্তুত না হয়েও অর্ডিন করেছিলেন। সরকার তাঁদের দুর্ব্বলতা বু তাই ভয়ী হয়েছেন। কিন্তু শান্তিমূলক ব্যবস্থা করে আবার যেমন নিজেদের দফ্‌তরে-দফ্‌তরে ফিরিয়ে রেখেছেন, তেমন দফ্‌তরখানার ইউ আইনি করবার আইন পরিকল্পনা করে অসহো তলায় পাঠাবার ব্যবস্থাও করেছেন। ফল দাঁড়া সরকার যা করতে চাননি, ট্রাইক সরকারকে করিয়ে নিলে,—আবার ট্রাইক-নায়করা যা কল্প নি, সেই সিভিল রেবেলিয়ান জন-মানসে এনে

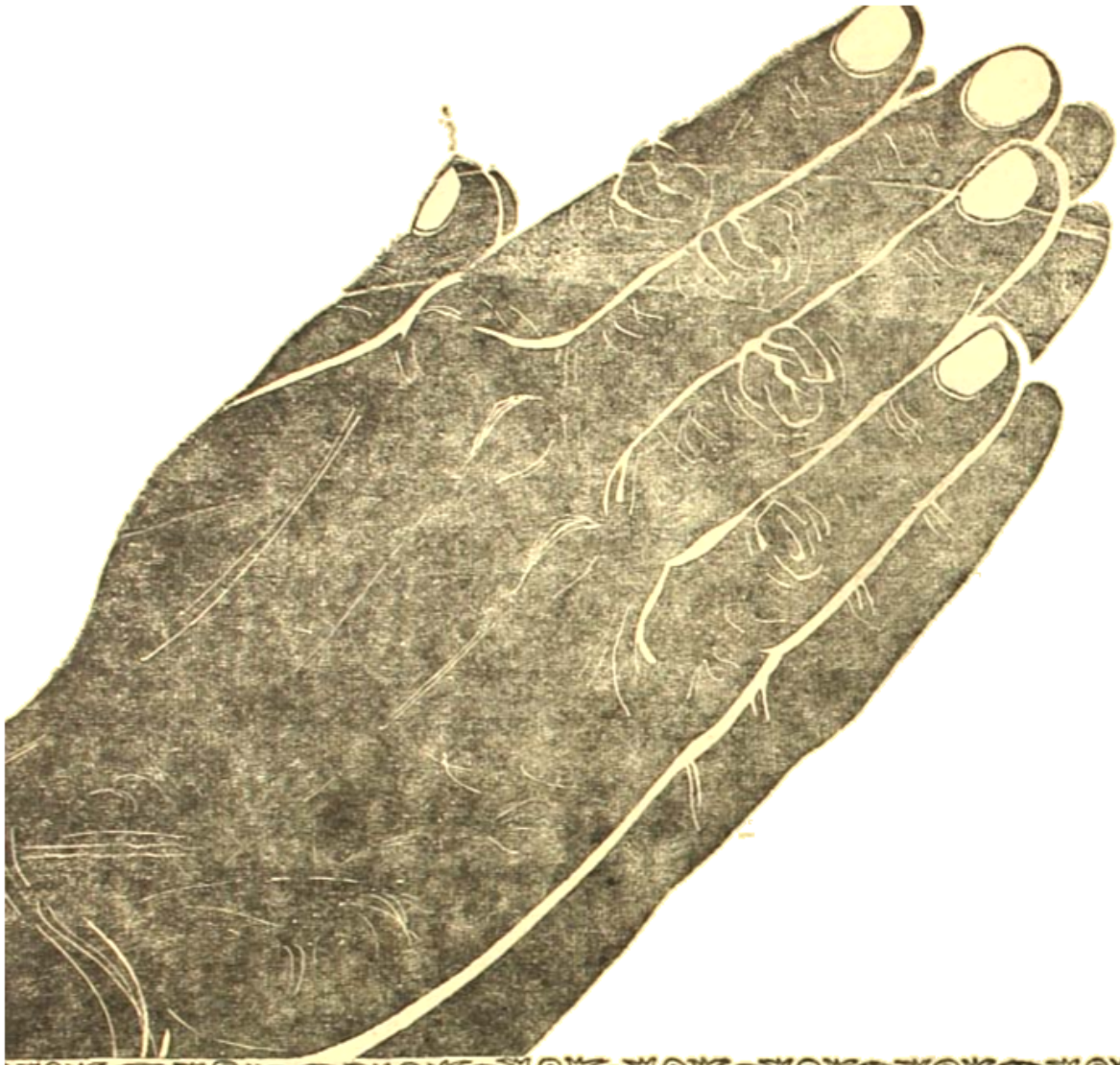

सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्॥

সুখী হোক সবে, হোক সবে নিরাময়
সকলেই যেন সুন্দর দেখে দুঃখকে করে জয়।

ওরিয়েণ্ট পেপার মিলস্ লিমিটেড
ব্রজরাজনগর, উড়িষ্যা
(ম্যানেজিং এজেণ্ট) বিড়লা ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড

অপূর্ব। আপনি যে ভয়ানক কথা বলছেন, দাদু।

শঙ্কর। অবস্থাটা যে ভয়াবহ, আসামের দিকে তাকিয়েও কি তা বুঝতে পারছ না, ভায়া।

অপূর্ব। ওটাও কি সিভিল-রেবিলিয়ানের প্রসঙ্গে?

শঙ্কর। যদি বাঙালী বিদ্বেষকেই একমাত্র কারণ বলে মনে কর, তাহলে তা বলা অযৌক্তিক হয়। আর যদি ওর মেয়াদ আর কাল বিবেচনা কর, কনষ্টিটিউশন অগ্রাহ্য করাকে কিছুমাত্র যদি গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত থাক, তাহলে একেবারে নিঃসন্দেহ হতে পার কি? অতীত দিনের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাকে নিছক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে, তার রাজনীতিকে গুরুত্ব না দিয়ে, যে-ভুল করা হয়েছিল, তারই ফলে ভারত বিভক্ত হলো। আসাম বাঙালী সেটিজেনদেরকে বিতাড়িত করে, তাদের উপর উপদ্রব করে, যে অপরাধ করেছে, তার চেয়ে কম অপরাধ করেনি সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে।

মালিনী। কেরেলার কথাও অপূর্বদাকে শুনিয়ে দাও দাদু। উনি ত আবার সিগ্‌গীরই অফিসার হবেন!

শঙ্কর। কেরেলার কমিউনিষ্ট সরকারকে কান সময়েই চ্যালেঞ্জ দেয়নি, চল্লিশ হাজার সিটিজেনকে বিতাড়িত হতে দেয়নি, দশ হাজার বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া প্রশ্রয় দেয়নি। সেখানে সিভিল-রেবিলিয়ান করেছিল যেতে কংগ্রেস-লীগ-ক্যাথলিক-প্রজাসমাজতন্ত্রী-পঞ্চনাত প্রভৃতি। তাদের সেই রেবিলিয়ানকে স্বীকার করে নিয়ে, তাকেই যুক্তি দেখিয়ে, রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তন করা হলো, আর আসামের বেলায়?

অপূর্ব। আপনারা ও নিয়ে বড় বেশি উত্তেজিত হয়েছেন, দাদু!

শঙ্কর। দেখে খুব আশ্চর্য হচ্ছ?

অপূর্ব। কিছুটা ত বটেই।

শঙ্কর। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, তুমি যাকে তুমি বিয়ে করবে স্থির করেছ, আসামে পড়ে, আর তার জন্য কিছুমাত্র উৎস তুমি!

অপূর্ব। আপনারাও ত কেউ নলিনীর নাম বারও উচ্চারণ করেন নি এতক্ষণ, রাজনীতিই আলোচনা করেছেন।

শঙ্কর। ভবানী তার মনের উদ্বেগ কখনো মুখে করে না। আর মালিনী রোজ তিন-চারবার করে পোর্টে যাওয়া-আসা করে। ওদের মুখে তাত চোখের পাতায় নিদ নামে না।

মালিনী। আর দাদু গোহাটী যাবার জ করেন। মা যেতে দেন না।

শঙ্কর। তিনটে প্রি-পেইড তার করা একটারও রেসপন্স নেই।

অপূর্ব। আমাকে ত আপনারা কিছুই জান

মালিনী। সে কী অপূর্বদা! আসামে ঘটছে তাও আপনি জানেন, আর দিদি সোহা তাও আপনার ভোলবার কথা নয়। আমর করেছিলাম আপনিই প্লাই করে দিদিকে নিয়ে কালকের ফার্স্ট ফ্লাইটেই যান না চলে।

ভবানী প্রবে

মা, অপূর্বদাকে বলছি, উনি কালই গিয়ে দিদি আনুন।

ভবানী। তুই ছেলেমানুষ, যা মুখে আসে ত পারিস। কিন্তু আমি ত পরের ছেলেকে বিপ ঠেলে দিতে পারি না।

শঙ্কর। আমি ত আর পরের ছেলে ভবানী-মা। আমাকেই যেতে যে তবে।

ভবানী। তুমিও পরের ছেলে, বাবা; দয়া হয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ। আমি তাবা কাল চলে যাই!

শঙ্কর। তুই যাবি কিরে!

অপূর্ব্ব। আপনার যাওয়া হতেই পারে না।

মালিনী। চল মা, তোমাতে আমাতেই চলে যাই।

মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল।

ভবানী। হ্যাঁ, একটা মেয়ে আছে কি নেই, তা জানিনে—আর একটা মেয়েকে হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে আগুনে ফেলে দিয়ে আসি আর কি!

মালিনী। তবে অপূর্ব্বদাকেই যেতে দাও, মা।

অপূর্ব্ব। আমারই কি যাবার উপায় আছে?

মালিনী। কেন, অপূর্ব্বদা, তোমার আবার বাধা কি?

অপূর্ব্ব। আপিস!

মালিনী। তোমাদের আপিস কি ছুটি দেয় না?

অপূর্ব্ব। তোমরা, ট্রাইকাররা, আপিসে আপিসে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়েছ, তা সুশৃঙ্খলায় আনতে সরকার কর্মীদেরকে একবারও সময় দেওয়া হচ্ছে না।

মালিনী। নেতার মাইও, অপূর্ব্বদা! উপরিওলারা যে খুশি হবেন! আপনার দু-পা অচিরেই চার-পা হবে।

ভবানী। কী যে তোর কথার ছিরি হচ্ছে মালি!

মালিনী। অন্যায় কি আর অমন কথা বেরোয়, মা? ঠাইক হয়েছিল বলে বটকেও বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য একটা দিনের ছুটি পাওয়া যায় না, এমন কখনো শুনেছ তুমি?

অপূর্ব্ব। আমি অবিবাহিত, আশা করি, সে-কথা তুমি জান।

ঘরের সকলেই তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মালিনী। ওঃ। আমি সে-কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

শঙ্কর। বুদ্ধি আমল রে ভবানী!

ভবানী। সারা দিনটা যা ওলট করে ছিল।

মালিনী। জানালাটা খুলে দাও, দাদু।

শঙ্কর। ঝাট আসবে যে।

মালিনী। আসুক! মেঝে আমি মুছে নেব। আমার যেন দম আটকে আসছে!

ভবানী। তুমি এখন খেয়ে নেবে, অপূর্ব্ব?

অপূর্ব্ব। নিলেও হয়! চলুন, দাদু।

শঙ্কর। ভগবান মাপাননি, ভায়া।

অপূর্ব্ব। সে কি!

ভবানী। মামা রাতে কিছু খান না!

শঙ্কর। কিছুই খাইনে ভায়া, শুধু এক বাটি দুধ একজোড়া সন্দেশ ছাড়া!

অপূর্ব্ব। মালিনী এস, তবে।

মালিনী। আমি একটু বেরুবো।

ভবানী। বেরুবি কিরে!

মালিনী। হ্যাঁ মা, চুল খুলে দিয়ে এই বৃষ্টি খানিকটা ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে করছে।

ভবানী। শোন মেয়ের কথা! ঘরে আরামে বসে ভিজতে ওর সখ হয়েছে! যারা পথে এসে দাঁড়াবার ঠাঁই কিছু হারিয়ে, তারা ভিজুক বিধাতার অদৃষ্টকে, তেমন এই বৃষ্টিকে!

মালিনী। মা! তুমি কি দিদির কথা মনে করে ওকথা বল্লে, মা?

ভবানী। চল অপূর্ব্ব, তুমি খেয়েই নাও।

ভবানী আর অপূর্ব্ব অন্দরে চলে গেল।

মালিনী। দাদু!

শঙ্কর। কি দিদি?

মালিনী। মা যা বল্লেন, তাও কি হতে পারে?

শঙ্কর। যারা আশ্রয় হারিয়ে পথে দাঁড়িয়ে যারা কোনদিনই কোন আচ্ছাদনের তলে মাথা গোঁজবার ঠাঁই নিয়ে জন্মায়নি, এই দুর্যোগের রাত তাদের কষ্টের কারণ, ভবানী সেই কথাটিই আমাদের স্মরণ করতে বলে গেল।

মালিনী। দিদির কথা ভেবেই কি আজ বিশেষ করে ভাগ্যহারাদের দুরদৃষ্টের কথা ওর মনে পড়ল?

শঙ্কর। পড়াই সম্ভব, আর স্বাভাবিকও বটে!

মালিনী। দিদিরও কি ওই দুরদৃষ্ট হতে পারে?

শঙ্কর। বৃষ্টি ত বি-এ, বি-টিকে এড়িয়ে বর্ষিত হয় নাই মালিনি!

মালিনী। তা জানি দাদু! কিন্তু দিদি—তুমি কি মনে কর দাদু—, আমার দিদিও এই সময়টিতে পথাশ্রয়ী হয়েছে?

শঙ্কর। অসম্ভবও নয় ত।

মালিনী। আমার দিদি?

শঙ্কর। আসাম থেকে যে মেয়েরা শিলিগুড়িতে এসেছে, তারাও কারু-না-কারু দিদি ত বটে। আর শুধুই কি দিদি? দিদি, প্রণয়িনী, জননী।—একদিন দারা এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে একটু বৃষ্টিতে ভিজলেই কত লোক হা-হা করতে করতে শুকনো গামছা-কাপড় নিয়ে তাদের পিছু পিছু ছুটে যেত, আজ তারা অসহায়ের মতো প্লেটফর্মে, গাছতলায়, ছেঁড়া তাঁবুতে বসে বর্ষার বারিধারা মাথা পেতে নিচ্ছে!

মালিনী। সত্যিই ত দাদু!

শঙ্কর। ওরে মালিনী-দি, রেফিউজি হবার অভিশাপই ত এই যে, একদিনে দীর্ঘকালের সাজানো সংসারই শুধু ভেঙে যায় না—তারা যে একদিন কারুর স্নেহের, ভালোবাসার, শ্রদ্ধারও পাত্র-পাত্রী ছিল, লোকে তাও ভুলে যায়। তারা নিজেরাও তা ভোলে। আর তা ভুলতে পারে বলেই ক্যাম্পে অত অসম্মানের জীবন যাপন করেও বেঁচে থাকে, সাড়ি বেঁধে দাঁড়িয়েও আত্মহত্যা করে না।

মালিনী। আমার দিদিকে তেমন অসম্মানের জীবন যাপন করতে হবে না, দাদু!

শঙ্কর। যদি শিলিগুড়ি পর্যন্ত পৌঁছে থাকে কিন্তু তার জীবনে, তোমার জীবনে, তোমা জীবনে, তোমার এই দাদুরও জীবনে, এমন এসেছিল দিদি, যেদিন এক চুল এদিক ওদি সবাইকেই ওই জীবন যাপন করতে হোত।

মালিনী। বল কি দাদু!

শঙ্কর। সত্যি কথাই বলছি, ভাই।

মালিনী। দেশ-বিদেশের ইতিহাসের এত দিন ধরে শোনালে, বোঝালে,—আর আমাদের জীবনের এমন বিস্ময়কর, বেদনাময়, কথা এ বলে না তুমি!

শঙ্কর। বলিনি। আজও বলব না।

মালিনী। সে-কথা কোন সময়ের কথা দাদু

শঙ্কর। স্বাধীনতা পাবার সময়কার কথা বিভাগের সময়কার কথা। তোমার বয়েস বছর, আর তোমার দিদির ছয়। তোমাদের বা আত্মবলি!

মালিনী দুই হাতে মু শঙ্কর শূন্যে চেয়ে রইল। দরজায় কে যেন ক মেঘ ডমরু বাজালো।

মালিনী। দাদু, কে যেন দরজার কড়া নাড়ে

শঙ্কর। আমি দেখছি!

নলি-দি!

বলে নলিনীকে টেনে

এলি তুই, দিদি! আর দিদি, আয়। ভিজে গিয়েছিস!

মালিনী ছুটে গিয়ে তাকে জড়ি

মালিনী। তোর জন্যে কত ভাবছিলাম মা, ওমা, দিদি এসেছে। মাগো!

ছুটে ভিতরে।

নলিনী। দাদু, তোমরা ভাল আছ ত। মা?

ভবানী, অপূর্ব্ব, মালিনী প্রবেশ করল।

ভবানী। নলি! এলি, মা!

নলিনী ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল।

নলিনী। মা!

মায়ের কাঁধে মাথা রেখে ঝুলে ঝুলে কাঁদতে লাগল।

ভবানী। আর ভয় নেই, মা! আসতে যখন পেরেছিস, ভাবনা থেকে আ । তখন মুক্তি পেয়েছি।

নলিনী ডুকরে কেঁদে বলে:

নলিনী। না, মা, না!

মেয়ের মুখখানি দুই হাতের মাঝে নে ধরে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে ভবানী বল্লে,

ভবানী। হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। আর আমাদের কোন ভাবনা নেই। চল্ মা, ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো বদলে নবি।

মালিনী। চল্ দিদি, ভিতরে চল্।

তারা নলিনীকে নিয়ে ভিতরে গেল।

শঙ্কর। ওর মনে এখনো ভয় রইছে। তোমার স্থিতি হয়ত লক্ষ্য করেনি।

অপূর্ব্ব। আমি আজ চলেই যাই, দাদু। কাল বিকেলে আসব।

শঙ্কর। তাও কি হয়, ভায়া? বিছানায় পড়ে এপাশ, পাশ করার চেয়ে এখানে মুখোমুখি বসে কেঁদে আর ধা করে ফিউচার প্রস্পেক্ট সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে ওয়াই ভালো নয় কি! বুড়োর উপদেশ শোন, ভায়া— here is many a slip between the cup and e lip.

মালিনী ভিতরের দিকের দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বললে

মালিনী। অপূর্ব্বদা, দিদির সঙ্গে দেখা না করে চলে যেন না কিন্তু।

শঙ্কর। নলিনী-দি তোমার কানে-কানে তাই বলে দিলে?

মালিনী। না, আমার মন বলে দিলে।

ভিতরে চলে

শঙ্কর। আশ্চর্য্য ভাল মেয়ে হয়েছে এই মালি নলি।

অপূর্ব্ব। হবে না! আপনি গড়ে তুলেছেন।

শঙ্কর। আমি ত গড়তেই চাই, ভায়া। কিন্তু য গড়ে তুলি, ভাগ্যদেবতা তাঁর নির্ম্মম হাত দিয়ে ত ভেঙে দেন। সে-দেবতা ওদের ভাগ্যের, না আমা বুঝতে পারি না বলেই ত ওদেরকে ছেড়ে আমি চলে চাই। কিন্তু ওরা ছাড়ে না। ওদের ভাগ্যের আমার ভাগ্য জড়িয়ে রেখে নিজেরাই দুঃখ পায়।

নলিনী প্রবেশ

আয় দিদি, আয়।

অপূর্ব্ব উঠে দাঁড়িয়ে

অপূর্ব্ব। এস! নলিনী!

নলিনী। ভালো আছ?

শঙ্কর। এখন ভালো হলেন। এতদিন ওঁর হার্ট বড়ই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, কেইল করেনি কেবল…

অপূর্ব্ব। তর্কের ষ্টিমুলাণ্ট দিয়ে দাদু তা রেখেছিলেন বলে।

শঙ্কর। আয় দিদি, আমার পাশে এসে কানে-কানে কথা কইবার অবসর বেশিদিন ত পাবে না।

নলিনী। কেন দাদু?

নলিনী শঙ্করের পাশে গিয়ে

শঙ্কর। ওই বদ্যটা যে তোকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। চেয়ে দেখ্না, চোখ দুটো লালসায় করছে।

নলিনী। তোমার আমার সম্বন্ধ যে অবিচ্ছেদ্য, দাদু!

বলে বাঁ-হাত দিয়ে দাদুকে জড়িয়ে ধরল।

শঙ্কর। তা, দোষ কি? হলেই বা দ্বিচারিণী।

নলিনী। কি বল্লে দাদু!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

শঙ্কর। কি বল্লাম!

অপূর্ব্ব। কথাটা অত সিরিয়াসলি নিলে কেন, নলিনী?

অপূর্ব্ব তার কাছে গিয়ে বসে।

নলিনী। কোন কথাটা?

অপূর্ব্ব। দাদু যা বল্লেন।

নলিনী। দাদু কি বল্লেন! আর যাই বলুন, আমি তা ভুল বুঝব?

আবার দাদুর পাশে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে।

দাদু, তোমার আমার সম্বন্ধ যে অবিচ্ছেদ্য, কেউ কি তা বুঝতে পারে?

শঙ্কর। তা কি পারে!

নলিনী। এমন সুরে তুমি কথাটা বল্লে যে, মনে হোলো কথাটা যেন আর কারো মুখ দিয়ে বেরুল।

মালিনী ট্রেতে কফি নিয়ে ঢুকল

মালিনী। নে, দিদি, খুব গরম এক কাপ কড়া কফি খেয়ে নে। যা ভিজেছিলি!

নলিনীর কাছে টিপয়ের ওপর রাখল এবং কফি ঢালতে লাগল।

নলিনী। সংসারের ভার কি শেষটায় তোমার ছোট-গিন্নীর হাতেই তুলে দিলে, দাদু?

শঙ্কর। আমার ভাইনেও চিনির নৈবিদ্যি, বাঁয়েও তাই। দুষ্টি-ভোগ বই ত নয়। সর্ব্বস্ব গ্রাস করবেন যাঁরা, তাঁর একজন ত সাম্নে বসে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছেন, আর একজন বাড়ছেন গোকুলে।

মালিনী। গোকুলে যিনি বাড়ছেন, তিনি কাঁটা হয়ে সেইখানেই থাকুন। এ-বাড়ীর কি দিয়েছেন কি গিয়েছেন।

নলিনী। কি করবি তার রে, তুই?

মালিনী। ল্যাজ মেরে ঠ্যাঙ ভেঙে দোব। খাবে নাকি অপূর্ব্বদা?

অপূর্ব্ব। একটু আগেই ডিনার খেয়ে এলাম।

মালিনী খিল খিল করে হে

মালিনী। মরেছে রে! উনি আবার অফি জানলেন দাদাই, আপনাদের মালেকরা ডিনারের কফি গিলেই লম্বু করেন।

অপূর্ব্ব। তবে দাও এক কাপ।

মালিনী। দেখলি দিদি, যেই শুনেছে মাকে অমি নোটা বাড়িয়ে দিলে! আমি তোকে দিদি, কেউ যদি বলে তোকে ত্যাগ কর অফিসার করে দেবে, ও সেই মুহূর্ত্ত থেকেই। আর ফিরেও চাইবে না।

নলিনী। তাহলে ত বেঁচে যাই। যা শঙ্কর কফি তরতি একটা পেয়

হাতে তুলে দিয়ে মালিনী বল্লে।

মালিনী। নিন। শ্বাস বন্ধ করে, এক চুমুকে খালি করে ফেলুন ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করে স্বপ্ন পাবেন অফিসার হয়েছেন।

অপূর্ব্ব। তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক,

নলিনী। তুই এত কথা শিখলি কি করে।

মালিনী। এনভাইরণমেন্টের দাবী মেটাতে

নলিনী। যে এনভাইরণমেন্টে আমি এত ভাই, তা কথা যোগায় না, হতবাক্ করে দেয়!

অপূর্ব্ব। আমি ত তোমার মুখে সেখানকা বলেই বসে আছি।

নলিনী। শুনবে ? কিন্তু তুমি হয়ত সইতে পারবে না।

মালিনী। তুই বুঝি ভাবিস, দিদি, অপূর্ব্বদা এমনই ধরণের লোক যে, দুঃখের কথা শুনে গলে যাবেন ?

নলিনী। না, হৃদয়হীন বলেই শুনে ও রেগে উঠবে। ও আর আমার মুখও দেখবে না।

অপূর্ব্ব। ও-সব কি তুমি বলছ, নলিনী !

নলিনী। আমার র‍্যাশনালিটি সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছে কি !

অপূর্ব্ব। কেন ? তাই বা হবে কেন ?

নলিনী। আ-আ ! যদি স্মৃতি লোপ পেত, বিচার-বুদ্ধি না থাকত ! তাহলে বেঁচে যেতাম, আমি বেঁচে যেতাম, সবাই বেঁচে যেতাম।

উঠে ছুটে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সকলে স্তব্ধ হয়ে রইল। ভবানী প্রবেশ করল।

ভবানী। একি ! সকলেই এমন চুপ করে আছ কেন ? কি হয়েছে ? মামা ?

শঙ্করনাথ হাত উঁচু ক'রে ইসারায় ওকে চুপ করে থাকতে বল্লেন।

ভবানী। চল্ নলি, খাবি চল। আয়, মালি !

জানালার কাছে দাঁড়িয়েই নলিনী

নলিনী। আমি খাব না, মা আমার ক্ষিদে নেই।

ভবানী। সে কিরে !

কেউ কোন কথা কইল না। শঙ্করনাথ নলিনীর কাছে গিয়ে তাকে বাহুপাশে জড়িয়ে নিয়ে

শঙ্কর। চল্ দিদি, খাবি চল্।

নলিনী। বল্লাম ত দাদু, আমার ক্ষিদে নেই।

শঙ্কর। তুই বল্লেই আমরা তা মেনে নোব কেন ?

With the erection of the second spun pipe plant at the Kulti Works of The Indian Iron and Steel Co. Ltd. the production of spun iron pipes will increase from 60,000 to 150,000 tons per year. This additional tonnage will save India Rs. 8 crores annually in foreign exchange. The output of the plant will help to satisfy India's growing demands for pipe mains. Employing the latest techniques, this unit is the first to produce 16" to 27" diameter spun iron pipes in the country.

THE INDIAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED

WORKS AT BURNPUR & KULTI

Pig Agents.
MARTIN BURN LTD.
MARTIN BURN HOUSE
12, Mission Row, Calcutta 1

ASSOCIATED AT :
NEW DELHI BOMBAY BURNPUR

IISCO

to meet the nation's needs

যাবে তোকে আসতে হয়েছে, তা আমরা চোখে না দেখেও বুঝতে পারি পথে তোকে না খেয়েই থাকতে হয়েছে।

নলিনী। যা দেখিছি, যা শুনিছি, যা করিছি—তার ফলে ক্ষিধের পেট পুড়ে গেলেও, খেতে রুচি হয় না। শুচিবোধে গা ঘিন্ ঘিন করে।

সোফায় এসে বোসল।

মা, আমার কাছে এসে বোস

ভবানী তাই বসে তার একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিল।

আর একবার কফি খাওয়াবিরে, মালি?

মালিনী। খাবি দিদি? আমি এখুনি তৈরি করে আনছিরে!

মালি আগেকার ট্রেটা নিয়ে চলে গেল।

অপূর্ব্ব। আমি আজ যাই তবে।

নলিনী। যাবে?

অপূর্ব্ব। জলটা ধরেছে মনে হচ্ছে।

নলিনী। জল না ধরলেও শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে ভিজে-ভিজেই যেতে হবে। শেষ পর্য্যন্ত তুমি থাকতে পারবে না, তা আমি নিশ্চয় করেই জানি। তবুও যতক্ষণ পার, বোসই না আমাদের সঙ্গে।

অপূর্ব্ব। বেশ তাই-ই বসছি।

অপূর্ব্ব বোসল। জানালার কাছ থেকে ফিরে আসতে আসতে শঙ্কর বল্লে।

শঙ্কর। জল এখন পড়ছে না বটে, তবে আকাশের বুকে মেঘে-মেঘে ভীষণ লড়াই চলছে।

ভবানী। বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে ঘন ঘন।

মালিনী প্রবেশ করল

মালিনী। তোর জন্যে কফি নিয়ে এলাম রে, দিদি।

টিপয়ের উপর রাখল

নলিনী। তুই এত ভালো মেয়ে হয়ে গেলি কবে রে, মালি?

মালিনী। তোর বোন হবার ভাগ্য পেয়ে। বুঝি শুনিনি পৌষাটিতে তুই হয়েছিলি লক্ষ্মীরাণী।

নলিনী। আর কিছু শুনিস নি?

মালিনী। না। কফি ঢেলে দোব?

নলিনী। না। দরকার মতো আমিই নোব'খন।

হাত বাড়িয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং আলো টিপে তা জ্বেলে দিলে।

ঘরের আর সব আলোগুলো নিভিয়ে দে।

মালিনী। রক্ত খাটিয়ে নিচ্ছিস তুই।

বলতে বলতে সবগুলো সুইচ off করে দিলে।

নলিনী। এইবার তোর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়

মালিনী। মাপ করতে হচ্ছে দিদি, এ হুকুম অগ্রাহ্য করব।

নলিনী। আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বল

মালিনী। আর আমি যাব চলে! আমিই এত কাই-ফরমাস খাটলাম?

নলিনী। যাদু, মালির সামনে সে-সব কি বল

শঙ্কর। তুমি কি সব বলবে তা ত আমি জানি!

নলিনী। না জানলেও আঁচে বুঝে নিয়ো তোমার মুখশ্রীই বলে দিচ্ছে। যা আমার নির্ব্বাক। ওঁর হাতের আঙুলগুলো ঠাণ্ডা হ উনিই কি কিছু বোঝেন নি বলতে চাও, যাদু?

শঙ্কর। আমি কিছু বলতে চাই না। সে তোর কষ্ট হয়, শুনতেও চাই না কিছু।

নলিনী। আমার কষ্ট হবে! জানিনা কষ্ট হবে কি রিলিফ্ পাব। তবে অপূর্ব্ব শক্ পাবে।

অপূর্ব্ব। আমি ত চলে যেতেই চেয়েছিলাম।

নলিনী। হ্যাঁ, আমিই থাকতে বলিছি।

ভবানী। আমি বলি নলি, আজ তুই কিছুই বলিসনি। আজ তুই সুস্থ নেই। তোর হাত হাতে নিয়ে এতক্ষণ বসে থেকে আমি বুঝতে পারছি, তোর শিরায় শিরায় তরল আগুন নেচে বেড়াচ্ছে।

নলিনী। বুঝতে পারছ, মা!

ভবানী। আমি ত তোরই মা। আর দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতাও যে আমার তুচ্ছ নয়, তোরা তা জানিসনে। মামা জানেন।

নলিনী। আজ যদি না বলি, এখুনি যদি না বলি, আমার শিরায় শিরায় যে আগুন নেচে বেড়াচ্ছে তুমি বলে দাও, তা আমাকে তোমাদের সামনেই পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

ভবানী। বল্ তবে।

নলিনী। মালির সামনে?

মালিনী। কেন, আমি কি কচি খুকী নাকি রে!

নলিনী। আমি যা বলব, তা কোন কুমারী মেয়ের সামনে বলা উচিত নয়!

মালিনী। একজন কুমারী মেয়ে যা বলতে পারে, আর একজন কুমারী মেয়ে তা শুনতেও পারে।

নলিনী। আমি আর কুমারী নই।

একটা বাজ পড়ল ঘরে। নলিনী দুই হাতে মুখ ঢাকল। ঘরের যে যেখানে যেমন ভাবে ছিল, পাথরের মূর্ত্তির মতো স্তব্ধ রইল। থেকে থেকে মেঘ গর্জ্জন করতে লাগল, আর বিদ্যুৎ চমকে চল।

ভবানী। মালিও থাকবে, মালিও সব শুনবে।

হাত থেকে মুখ তুলে নলিনী বলে:

নলিনী। বেশ, শুনুক তবে।

মালিনী শঙ্করের পাশে গিয়ে

সকলেই কিছুকাল চুপ করে রইল।

অপূর্ব্ব। তুমি কি মনে কর নলিনী, যতটুকু আমার সম্বন্ধ, ততটুকু শোনবার পরও আমার থাকবার দরকার আছে?

নলিনী। নেই মনে কর যদি, যেতে পার আবার নেহাৎ অসহ্য না হওয়া পর্য্যন্ত থাকতেও এটা জেলখানা নয়। আর বাইরে যাবার দরজায় লাগানো নেই। ভিতর থেকেই তা খোলা যায়।

বলে সে পেয়ালায় চা লাগল। একটু পরেই সে বলে

দাদু! আমার ব্যবহারে ভাডিজম্-এর পরিচ না মাসোইজম্-এর? ফ্রয়েড তো তোমার নখে ডগায় নেচে বেড়ান।

শঙ্কর। ফ্রয়েড ওই দুটি মনোবিকারকে বিকৃতি যেমন বলেছেন, তেমন বলেছেন প্রথমটির থেকে দ্বিতীয়টিরও উদ্ভব হতে পারে।

নলিনী। অপূর্ব্ব তাহলে ভাবতেও পারে যে নিজেকে আঘাত করবার তীব্রতা বাড়াবার জ বলিয়ে রাখতে চাই, ওকে আঘাত করবার জন্য ন

শঙ্কর। ওর সহানুভূতি আকর্ষণ করবার জ করতে পার।

নলিনী। তা কি স্বাভাবিক নয়? সারা এতদিন ওকে ভালোবেসেছি। একেও তুমি বলবে?

শঙ্কর। আমি ত তা বলিনি, দিদি।

নলিনী পেয়ালায় একটা চুম

নলিনী। ও কি বলবে? ও কি ভাববে?

শঙ্কর। ওর কি বলা উচিত, কি ভাবা উচি

কেবল তাই বলতে পারি—কি বলবে, কি ভাববে, তা ত বলতে পারি না। সবটা না শুনে ও নিজেও তা পারে না।

মালিনী। এখানে অপূর্ব্বদা ছাড়াও আমরা তিনজন ভ্রাতা রয়েছি, দিদি।

নলিনী। অপূর্ব্বর এখানে থাকা কেন দরকার, তা অপূর্ব্বও বোঝে না, তুই-ও বুঝিসনে। ওই থেকেই ধরে নওয়া যায়, তোরা ভালবাসা কি তা জানিসনে, ভালো লোকটিকে বাসিসনে। তোরা আত্ম-কেন্দ্রিক, কেবল নিজেদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শকেই ভালোবাসিস।

মালিনী। বলতে চাস আমরা স্বার্থপর?

নলিনী। না, বলতে চাই তোদের মনের ভালো লাগাকেই তোরা ভালোবাসা ভাবিস। কিন্তু তা নয় রে! দুষ্টির মনে থাকে বাসনা, কামনা। দুইটি দৃষ্টির সেই বাসনা-কামনা যখন পরস্পরকে রিপেল্ না করে অ্যাট্রাক্ট করে, তখনই দুটি মনে ভালোবাসার উদ্ভব হয়। ওর পরিণতি হয় বোঝাপড়ায়, লেন-দেনে, বিরহ-মিলনের অবসানে, পরস্পরের পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণে। ভালোবাসা প্যাশন নয়—প্যাশনের পরম পরিণতি, স্পিরিচুয়াল আপ্লবণ!

শঙ্কর উঠে এসে তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাত রেখে বল্লেন:

শঙ্কর। সারা মন দিয়ে তোকে আশীর্ব্বাদ করি দিদি, সেই ভালোবাসা তোর জীবনকে ফুটিয়ে তুলুক।

নলিনী। সাধে কি বলি দাদু, তোমার আর আমার জীবন অবিচ্ছেদ্য। সবাই আমাকে ত্যাগ করলেও তুমি আমাকে ঠেলে ফেলবে না। কিন্তু তোমাদের হয়ত ভালোবাসার এই তত্ত্ব কথা শোনবার ধৈর্য্য নেই। আসামের উত্তেজনার মধ্যে-আমায় তোমরা পেতে চাও আমারই অভিজ্ঞতা চোলাই করে। তোমাদেরকে তাই বলবার চেষ্টা করব।

টে থেকে কাপটা তুলে
দু'তিন চোক কফি খেয়ে নিয়ে কাপটা রেখে দি

আসাম ধোঁয়াচ্ছিল ভিতরে ভিতরে অনেক দি আমি গৌহাটী যাবার অনেক আগে থেকেই। দেখে আগুনের অস্তিত্ব করনা করবার মতো বাঙালী আসামে অনেকেই ছিলেন। কিন্তু হা তাঁদের আস্থা ছিল। মানুষের শুভ-বুদ্ধির উপর বিশ্বাস ছিল। আসামকে বাংলা থেকে তাঁরা ব বাসতেন না। আবার কাপটা তু

শঙ্কর। নলি-দিদি এ-কথা অস্বীকার করবা নেই।

নলিনী। আমি যখন মাষ্টারি করতে গেলা তখনি উঠেছে। তা সত্ত্বেও বহু অসমীয়া মহিলা-কর্ম্মী বন্ধুত্ব দিয়ে আমাকে ধন্য করলেন। যে জানেন। ছুটির দিনে কোন-না কোন অসমীয় আমার খাবার নিমন্ত্রণ থাকতই। শিক্ষিতা ও শিক্ষিত তরুণরা এক যায়গায় জড়ো হলে যেমন র রহস্যের পিন-ফোটানো, সর্ব্বত্রই হয়ে থাকে, তখ হোতো। বাঙালী আসামকে শুষে খাচ্ছে, এম একেবারে উঠত না, তাও নয়। কিন্তু অবজেক্টি তা প্রমাণিত করতে পারত না—অর্থনীতির অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রীরাও নন। সে-সব ব বেরিয়ে পড়ত, যাকে 'শোষণ' বলা হয়, আসলে অ-বাঙালী ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় বিদেশী বা চাকরির ক্ষেত্রেও বাঙালী-অসমীয়ার অনুপাত আধিক্য প্রমাণিত করতে পারত না। আ দেবার কর্তৃত্ব ত ছিল হয় আসাম-গবর্ণমেণ্টের গবর্ণমেণ্টের, বাঙলা-গবর্ণমেণ্টের বা বাঙালীর বাঙালী-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ল।

মালিনী। কেন?

নলিনী। তা অনুসন্ধান করবার দায়িত্ব ছিল আসাম-সরকারের, আর ভারত সরকারের হোম-এফেয়ার্স আর ফরেন-এফেয়ার্সের কর্তাদের। তারা কি করেছেন বা করেন নি—তা আমার জানা নেই। জানবার কথাও নয়।

অপূর্ব্ব। অহেতুক একটা বিদ্বেষ এমন করে ছড়িয়ে পড়তে পারে?

নলিনী। হেতু অবশ্যই একটা ছিল, কিন্তু তা বাঙালীর ব্যবহার নয়—বাঙালীর বিরুদ্ধে প্ররোচনা।

মালিনী। কে বা কারা তা করতে পারে?

নলিনী। আসামে অরাজকতা সৃষ্টিতে যাদের স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

অপূর্ব্ব। তারা কারা?

নলিনী। সেইটেই ত জানবার কথা।

শঙ্কর। তারা যারাই হোক, খুব চতুর তারা। বিদ্বেষ, আর ধর্ম-বিদ্বেষ যে আগুনের মতোই ছড়িয়ে পড়ে, এ-কথা তারা ভালো ভাবেই জানে,-এ-কথাও জানে যে, ওর প্রভাব রয়েছে প্রতিপন্ন পারলেই ভারত-সরকারের নায়কদের দৃষ্টি ঘোলাটে দেওয়া যায়; তাদের বিচারে বিভ্রান্তি এনে দেওয়া

অপূর্ব্ব। তাঁরাও কেন অহেতুক বাঙালীর প্রতি ভাবাপন্ন হবেন?

শঙ্কর। হবার কোন কারণ নেই, হয়ত হ কিন্তু একটা মুস্কিল হয়েছে এই যে, বাংলার বাংলার কালচারকে, বাঙালীর মনকে, যে ছাঁচে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের রেনেসাঁ। তাদের অধি কালচারকে আর মনকে ঠিক সেই ছাঁচে ঢে

করেনি। বড় সাহিত্যিক, বড় রাজনীতিক, সব রাজ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু রামমোহন, বঙ্কিম, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র বিশেষ করে বাংলাতেই অভিব্যক্তি। এইজন্যই বরাবর সাহিত্যে শিল্পে রাজনীতিতে অধ্যাত্মবাদে বাঙালী সর্ব্বভারতীয় ওই সব ক্ষেত্রের নায়কদের সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে একমত হতে পারেনি। বাঙালী পৃথক দৃষ্টি-কোণ থেকে জীবনকে, জাতিকে, পৃথিবীকে দেখেছে। এই জন্য বাঙালীকেও অনেক অবাঙালী সংশয়ের চোখে, সন্দেহের চোখে দেখে। এরই জন্যে ভারতের প্রাইম মিনিষ্টার কখনো বলেন কোলকাতা যুদ্ধের শহর, কখনো বলেন সোভাষ্টার শহর, কখনো বলেন কোলকাতা তার নিজের রাষ্ট্রের বিভীষিকা! তিনি এখন বলছেন, বাঙালী অত্যন্ত প্রাদেশিকতা-দোষে দুষ্ট, আর স্বভাবতই ভীরু, পলাতক। তাই তিনি আমাদের এই ঘটনার অন্তরালে যে গভীর কোন ষড়যন্ত্র থাকতে পারে, তা তাদেরই চাননা। ষড়-যন্ত্রীরা এইটেই চেয়েছিল।

মালিনী। সে যাই হোক, আপনি যখন বলে উঠল, হোটেলে থাকা তখন আমার পক্ষে সম্ভব হোল না। অনাথীরা একজন শিক্ষিকাই আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন, তাঁর স্বামীর সম্মতি নিয়ে। বিপ্লবী-কেরানীদেরকে যেমন করে লুকিয়ে রাখা হতো বলে দাদুর মুখে শুনেছি, তেমন করেই আমার ওই অনাথীরা বান্ধবী আমাকে লুকিয়ে রাখতেন। তাঁদের ছাদের চিলে-কুঠুরীতে সারাদিন আমি বসে থাকতাম, আর সারা রাত ছাদের একটি অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে দেখতে পেতাম এখানে-সেখানে আগুনের লেলিহান জিহ্বা লক্ লক্ করছে। কখনো কখনো শুনতে পেতাম সমবেত আর্ত্তনাদ, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে উল্লাস আর অট্টহাসি। তৃতীয় দিনে আমার বান্ধবী জানালেন আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁরা বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। আমি বল্লাম রাতে অন্ধকার নেমে তাতে গা মিশিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ব। তারপর অদৃষ্টে যাই থাক্।

মালিনী। তিনি বারণ করলেন না?

নলিনী। হাঁ, না, কিছুই বল্লেন না। রাত আঁধার নামল, নীল চাদরখানা দিয়ে মুখ বুক ব্যাগটা বুকে চেপে, ছাদের সেই অন্ধকার কোণে রইলাম। রাত এগারোটা বেজে গেল। বারোটা হয়। আমি সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নীচে নামলাম

ভবানী। ওরে, থাম্, থাম্, আর আমি পারি না।

নলিনী। এখন যেন শুনতে পারবে না, মা? তোমার পাশেই বসে রয়েছি।

নলিনী খানিকটা কফি ঢে সদর দরজা অবধি পৌঁছে দোরটা খোল করছি, পিছন থেকে আমার বান্ধবীর মা তালা লাগানো আছে। খুলে দিন, আ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, একা যেতে পারবে বল্লাম, পারতেই হবে। তিনি বল্লেন বিপদে যে! এখানে থাকলে আপনারাও পড়বেন—, আমি বল্লাম। এখানেও যা আমি আপনাকে পৌঁছে দোব, তিনি বল্লে জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায়? জবাব দে থানায়, নয় এয়ারপোর্টে, যেখানে সুবিধে।

মালিনী। লোকটি ত খুব ভালো!

নলিনী। হাঁ, খুব ভালো।

নলিনী এক চুমুক কফি।

ভবানী। সংসারের সবাই কি মন্দ হয়?

নলিনী। শুধু বোঝা যায় না কে ভালো, ওই বাড়ীর কাছেই ভীষণ হল্লা শুরু হোলো।

বল্লেন—"দেখুন ত একা একা বেরিয়ে গেলে কি বিপদেই না পড়তেন। চলুন, ওপরে চলুন, এখন আর বাড়ী থেকে বার হওয়া যায় না। সত্যিই তা যায় না।" বোতলাম উঠে ছাদে যাবার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি বল্লেন—ওদিকে কেন? আমার শোবার ঘরে আসুন।

মালিনী। নচ্ছার, অসভ্য!

নলিনী। না রে, লোকটা ঠিক তা নয়। আমি তার শোবার ঘরেই গেলাম।

অপূর্ব্ব উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে

অপূর্ব্ব। আমি চল্লুম।

নলিনী। আরো কিছুক্ষণ থেকে শেষ পর্য্যন্ত শুনে যেতে পারতে।

অপূর্ব্ব বার হয়ে গেল না, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

মালিনী। তুই দিদি, পারলি তার শোবার ঘরে যেতে?

নলিনী। চেঁচাতে অবশ্য পারতাম। কিন্তু তাতে অনেক বেশি লাঞ্ছনাকে ডেকে আনতাম। তা ছাড়া আশা করেছিলাম আমার আশ্রয়দাত্রী বান্ধবীকেও ওই শোবার ঘরেই দেখতে পাব ত।

মালিনী। সেদিনে দেখতে?

নলিনী। না। সন্ধ্যের পরেই ছেলে-মেয়ে নিয়ে তিনি ওঁর ভাইয়ের বাড়ীতে চলে গেছেন, আমার উপস্থিতি এই বাড়ীতে হাঙ্গামা ডেকে আনবে ভেবে।

মালিনী। ওই লোকটাই তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছিল!

নলিনী। তা হবে। রাত দুটো পর্য্যন্ত তার শোবার ঘরে তারই বিছানায় বসে রইলাম। ওই দেড়ঘণ্টাকাল মুহূর্ত্তের জন্যও সে স্থির হয়ে বসতে পারেনি। কখনো সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কখনো অস্থিরভাবে পায়চারী করেছে, কখনো বা মিনিট কয়েকের জন্য একটা চেয়ারে বসে ছোট ছোট প্রশ্ন করেছে।

শঙ্কর। কি রকম প্রশ্ন, নলিনি?

নলিনী। এই, অসভ্যতার ওপর খুবই রাগ নাকি? ভাতি হিসেবে তারা খুব অনুপস্থিত, তা ভাবছি নাকি? এই সব। তার ওই সব প্রশ্নই সবল করে তুল্ল। মনে হোলো, সে প্রমাণ করতে চাইছে যে, সব অসভ্যতাই কিন্তু হয়নি। একটুখানি করে বসে থাকবার পর হঠাৎ এক সময়ে সে বাইরে গেল, আর ফিরে এলো কালো রংয়ের একটা রেইন-কোট আর একটা টুপি নিয়ে। কোটটা গায়ে পরে নিয়ে টুপিটা মাথায় দিল। জুতোই বিছানায় ফেলে দিয়ে আবার চলে গেল সে।

শঙ্কর। বীরের মতো নিজের সঙ্গে সংগ্রাম এই ভদ্রলোক!

নলিনী। তখন তা মনে হয়নি। তখন প্রতি এই ভেবে কেঁপে-কেঁপে উঠেছি, পড়ল বুঝি ঘাড়ে মতো ঝাঁপিয়ে! রেইন-কোট আর টুপিটা ফেলে চলে গেল যখন, তখন কতকটা আশ্বস্ত হলাম। ও তাহলে সত্যিই আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে

মালিনী। তবে বউকে, ছেলে-মেয়েদের থেকে সরিয়ে দিয়েছিল কেন?

নলিনী। হাঙ্গামার ভয়টাও হয়ত একেবারে ছিল না।

আবার এক চোক কফি খেয়ে নি এবার সে ঘরে ঢুকল সাহেবী পোষাক পরে। আ কোটটা আর টুপিটা পরে প্রস্তুত হয়েই ছিল। বল্লে—"বাঃ! দূর থেকে দেখে কেউ সন্দেহও আপনি স্ত্রীলোক।" আমাকে ঘরে নিয়ে গ্রেসিং সামনে দাঁড় করিয়ে বল্লে—"দেখুন ত চেয়ে।" চেয়ে রইলাম একটু কাল আয়নার প্রতিফলিত চেহারার দিকে। সত্যিই কি অতটা ভয় পে

আমি? মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখ দুটো জ্বল্-জ্বল্ করছে, বুক কেঁপে-কেঁপে হেইন-কোটটা ছিঁড়ে-ফেড়ে ফেলতে চাইছে। চেয়ে দেখুন, সঙ্গে আরো কি নিলাম—সে বলে। ঘুরে দাঁড়ালাম তার দিকে। সে পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করে ধরে—ছটা গুলি আছে, ছটা লোককে রোখা যাবে। চলুন।

মালিনী। এ তুই এনিয়ে বলছিস, দিদি।

নলিনী। বলাটা বানানো ত বটেই, কিন্তু ঘটনাটা সত্যি। দুর্গা বলে পা বাড়ালাম। বাড়ির বার হয়ে দরজার বাহির থেকে সে তালা লাগিয়ে দিলে। তারপর বল্লে চলুন পথ ধরে যাওয়া হবে না, মাঠ ভেঙেই যাব আমরা। পারবেন ত? মুখে বল্লাম পারব, কিন্তু বুকের ভিতরটা হঠাৎ আমার ঠাণ্ডা হয়ে গেল; মনে হোলো, ভিতরের সব রক্ত যেন জমে বরফ হয়ে গেছে। কার সঙ্গে চলিছি? কোথায় চলিছি? চলিছি ত চলিইছি, ক্ষেতের আল ধরে জলা-জঙ্গল এড়িয়ে চলিইছি। মাঝে-মাঝে হোঁচট খাচ্ছি। ক্ষিপ্রগতিতে আমাকে বাহু বাড়িয়ে সে ধরে ফেলছে। কখনো কোন শুকনো যায়গায় হাত ধরে বসিয়ে দিচ্ছে, একটু জিরিয়ে নিন, রক্ত হাকাচ্ছেন, বলে।

মালিনী। দিদি, আমার ভাই তখন বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, তোর বদলে আমি যদি হতাম রে!

নলিনী। চলতে চলতে আকাশের দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছিলাম। এক সময় দেখতে পেলাম শুকতারার উদয় হয়েছে। একটু পরেই ভোর হবে। তখন? সে যেন আমার মনের প্রশ্ন বুঝতে পারল। সে বল্ল—সামের ওই বনের ও-ধারেই এয়ারোড্রোমের রাস্তার মোড়। ভোর হবার আগেই আমরা পৌঁছে যাব।

মালিনী। তুই প্লেনে এসেছিস্?

নলিনী। হ্যাঁ প্লেনেই এসেছি। বনটাও নিরাপদে অতিক্রম করলাম। রাস্তাটা অনেক উঁচুতে। পাহাড়ে ওঠবার মতো করে এঁকে বেঁকে উঠে রাস্তাটা ধ পড়ল, তখন দেখলাম মশালের আলোয় সমস্ত লাল হয়ে উঠেছে, আর উন্মত্ত জনতার চীৎ থেকে কাছে এগিয়ে আসছে। পলকে দেখতে দু'তিন-খানা লরী ছুটে আসছে, আর তার উ আর লাঠি আর বল্লম-তলোয়ার হাতে নিয়ে দু লোক লাফাচ্ছে আর চীৎকার করছে। হঠাৎ ে তলা থেকে মাটি সরে গেল। সবল দুই আমাকে জড়িয়ে নিয়ে কোমর অবধি উঁচু ঘা সে শুয়ে পড়ল। সেই অবস্থাতেই খানিকটা গা একটা গাছের গুঁড়িতে দু'জনে আটকে গেলাম।

মালিনী। কি সর্ব্বনাশ!

নলিনী। গাছটার ঝুলে-পড়া ডালের পা উপরে আলো ফেলতে ফেলতে একে একে তিন রাস্তার উপর দিয়ে পর পর ছুটে চলে গেল। সে চীৎকারও দূরে মিলিয়ে গেল। লোকটা তখ ছাড়লে না। আমি বল্লাম—ওরা অনেক দূরে চ চলুন, আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে ভিতরের পশু তখন ক্ষেপে উঠেছে, মানুষের তখন অর্থহীন তার কাছে। মা! মাগো!

মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বুকে ফুলে ফুলে সে কাঁদতে লাগল। অপূর্ব্ব হয়ে গেল। ভবানীর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু পড়তে লাগল। শঙ্কর উঠে এসে তা দাঁড়ালো। মালিনী সোফার পিঠে বাঁ তার মাঝে মাথা গুঁজে পড়ে রইল, সে লাগল, বিদ্যুতের আলো মাঝে মাঝে ঘরে ফেলে যেতে লাগল।

শঙ্কর। তুমি অধীর হলে তোমার মেয়ে স সান্ত্বনা পাবে, ভবানী-মা?

— উৎসব অনুষ্ঠানে ও পূজা পার্ব্বণে —

লক্ষ্মী ঘি

বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দের বার্ত্তা বহন করে।

হাজার হাজার প্রশংসা পত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকটী —

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক – অমৃতবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ছেলেদের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষ্মীঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

আমি লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডাঃ কালিদাস নাগ

লক্ষ্মীঘৃত ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল

শ্রীসীতা দেবী

লক্ষ্মীঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, অসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

ছোট বড় সকল রকম টিনে পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ, পবিত্র ও স্বাস্থ্য

ভবানী। আমি ত অধীর হইনি, মামা। আমি ভাবছি, এই পরিবারটিকে নিয়ে অদৃষ্ট বার বার একই নিষ্ঠুর খেলা কেন খেলছেন, মামা?

শঙ্কর। শুধু কি এই পরিবারকে নিয়েই ভবানী? তেরো বছর আগে পূর্ব-বাংলায় আর পাঞ্জাবে বহু পরিবারকে নিয়ে তাদের অদৃষ্ট যে খেলা খেলেছিল, তেরো বছর পরে আসামের বাঙালী পরিবারদের নিয়ে তাদেরও অদৃষ্ট ফিরে-ফিরতি সেই খেলাই খেয়ে।

ভবানী। কিন্তু মা আর মেয়ে একই অভিশাপে হত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত আর একটি কোথাও কি পেয়েছ, মামা?

নলিনী মুখ তুলে মায়ের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললে।

নলিনী। তুমিও, মা!

ভবানী। হ্যাঁ; একই অভিশাপে হত আমরা, মা আর মেয়ে!

মেয়েকে কাছে টেনে নিলেন। তার গালে গাল লাগিয়ে বসে রইলেন। চার চোখ থেকে চারটি অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

শঙ্কর। তেরো বছর আগেকার সেই রাতটিও এমনই বর্ষণমুখর ছিল রে, দিদি। গাঁয়ের একপ্রান্তে তোদের পৈত্রিক বাড়ী, অপর প্রান্তে আমার। পদ্মা বয়ে চলে তার দক্ষিণ-সীমানা কেটে। স্বাধীনতা পাবার আগেকার বছর। তোর বাবা আর আমি, প্রায় সমবয়সী দুই রাজবন্দী, কত সুখস্বপ্ন দেখি স্বাধীন ভারতের ঐশ্বর্যপূর্ণ রূপ কল্পনা করে। মুসলিম-লীগ করল ডাইরেক্ট য়্যাকশন ঘোষণা। ভারত জুড়ে জ্বলে উঠল আগুন। আমাদের শান্ত গাঁ-খানিও অব্যাহতি পেল না।

নলিনী। তখন আমরা পরাধীন ছিলাম, দাদু।

শঙ্কর। কিন্তু বাস্তুহারা ছিলাম না। নিজের মাটিতে নিজের ঘরে নিজের পরিবেশে নিজের মানুষের মধ্যে ছিলাম। তোর বাবা ছিল আমার বাল্যবন্ধু, আমার প্রতিবেশী। তোরা ছিলি আমার স্নেহের। আমাদের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিতাম। তোর বাবা ছিল আমার ভাই। তোর মা ছিল আমার বোন। তোরা ছিলি আমার ভাইঝি। তোদের বাড়ীর সঙ্গে আমার বাড়ীর ছিল নিবিড় আত্মীয়তা। তোর বাবা আর আমি, প্রায় সমবয়সী দুই রাজবন্দী, কত সুখস্বপ্ন দেখি স্বাধীন ভারতের ঐশ্বর্যপূর্ণ রূপ কল্পনা করে। মুসলিম-লীগ করল ডাইরেক্ট য়্যাকশন ঘোষণা। ভারত জুড়ে জ্বলে উঠল আগুন। আমাদের শান্ত গাঁ-খানিও অব্যাহতি পেল না।

নলিনী। তখন আমরা পরাধীন ছিলাম, দাদু।

শঙ্কর। কিন্তু বাস্তুহারা ছিলাম না।

মালিনী। কিছু না জেনে তোমার কত ব্যথারই কারণ আমরা হয়েছি, মা।

ভবানী। তোরা আমার মনের কামনা, চিত্তের আনন্দ। যে লাঞ্ছনা, যে গ্লানি, যে অশুচি কোন সতী নারী কখনো ভুলতে পারে না, তোরা আমাকে তাই ভুলিয়ে রেখেছিলি। তাই তোদের মা হয়েও তোদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু ওই মামা আমার, সংসারের সকল শোক-তাপ হাসি চেলে তাসিয়ে দিয়ে, নিজের ধর্ম-সর্বস্ব বিকিয়ে, আমাদের তিনজনকে বাঁচিয়ে রেখেছেন সে-কথা কখনো মন ভুলিসনি তোরা।

শঙ্কর। এ সময়ে অমন রাগে কথা বলিসনে ভবানী। দিদির সঙ্গে আমাকে দুটো মনের কথা বলতে দে।

শঙ্কর নলিনীর পাশে এসে বোসল।

তারপর, নলি-দি, তোমার সেই নাইট-এয়ার্কটির পরের কীর্তিটুকু শুনিয়ে যাও ত, দিদি।

নলিনী। যা শুনেছ, তার পরেও।

শঙ্কর। হ্যাঁ, হ্যাঁ তার পরের কথা; পরের কথাই ত লবে। এস মালি-দি, বোস এসে আমার পাশে।

নলিনী। হয়ত কিছুটা সময় আমার জ্ঞান ছিল না। ান ফিরে পেয়ে চোখ মেলে দেখতে পেলাম আকাশ রে পড়েছে। রাতের সব ঘটনা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হলো। ধীরে ধীরে উঠে বোসলাম।

মালিনী। আর সেই লোকটা?

নলিনী। তাকেও দেখলাম। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠস দিয়ে বোসে আছে।

মালিনী। অন্ধকার থাকতে-থাকতেই চলে যায়নি তচ্ছাড়া!

নলিনী। গেলে ত বুঝতাম সত্যই সে হতচ্ছাড়া।

মালিনী। তুই কিন্তু তাই আসাম দিয়ে অনেক বকলে গছিস, দিদি।

নলিনী। আসামে গিয়ে নয় রে, আসাম থেকে আসতে। আমি উঠে বসেছি দেখে সে উঠে দাঁ পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো আমার কাছে।

মালিনী। তোর পায়ে পড়ে কাঁদতে শুরু কর বুঝি!

নলিনী। না। পকেট থেকে একখানা ছো টিকিট বার করে আমার সামে ফেলে দিয়ে বল দিন। কোলকাতার টিকিট। অনেক চেষ্টা করে কিনে রেখেছিলাম। আমি কোন কথা বলাম না পকেট থেকে তার রিভলবারটা বার করে জিজ্ঞাস —এটার কি দরকার হবে? কেন, আত্মহত্যা আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম। না, লাঞ্ছনার প নিতে, সে বললে। তা নিয়েও কি পরিত্রাণ দাঁতে দাঁত ঘসে আমি বললাম। সে বলল আত্মহত্যা করলেও পাপের না। রিভলবারটা সে পকেটেই পুরল, এরোপ্লেনের টিকিটখানাও তুলে তারপর বলল,—আসুন, আধঘণ্টার মাঝেই প্লেন। আপনাকে প্লেনে তুলে দিয়ে শহরে ফিরে যাব। এবার সে আমার পাশে পাশে রইল না, আগে চলল। রাস্তায় উঠতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি বড় ভালো লাগল। মনে হোলো স্নেহধারা বর্ষিত প্লেনে চোকবার ঠিক আগেই পিছন ফিরে একব দেখলাম সকলের পিছনে হাত যোড় করে সে রয়েছে। হয়ত ক্ষমাই চাইছে।

সকলেই চুপ করে

মালিনী। আচ্ছা দিদি, লোকটাকে তুই ক্ষম পারিস?

নলিনী। ও-কথা ভাববার সময় এখনো পাইনি

শঙ্কর। লোকটা কিন্তু আসলে খারাপ নয়। ওপর ওর আকর্ষণ হয়েছিল ঘটনার অনেক

এখন সহজভাবে মেলা-মেশা না করে ও নিজেকে রিপ্রেস করেছে। সেই রিপ্রেসনই, ওর মনে ভায়োলেন্সের প্রবৃত্তি এনে দিয়েছে। তাও হয়ত ও জয় করতে পারত, যদি না শেষ মুহূর্তে দরী-ভরতি মশালধারী সশস্ত্র লোক-গুলোর অট্টহাসন ওর ভায়োলেন্সকে উস্কে দিত। ওর মনের বিকার এনভাইরনমেন্টাল্ আর ম্যাক্সিমেন্টাল্। ওকে ক্ষমা করতে পারিস, দিদি।

নলিনী। ভেবে দেখব, দাদু।

শঙ্কর। হ্যাঁ, ভেবে দেখিস। আর এ-কথাও তোরা ভাবিস, যেমন ব্যক্তি, তেমন জাতিও, যদি নিজের বাসনা কামনাকে রিপ্রেসড্ রাখতে বাধ্য হয়, তাহলেও ভায়োলেন্ট হতে পারে। দুর্বলতম মুহূর্তেই ব্যক্তি যেমন, ভায়োলেন্ট হয়, জাতিও তেমন তাই হয়। আসাম প্রাক্তন মুস্লিম-লীগের মতো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মেনীর মতো, অন্তরে-অন্তরে পীড়া অনুভব করছিল তার কারণ এখনো ধরা পড়েনি। সে নিজেও তা প্রকাশ করতে পারেনি।

মালিনী। সেটার তুমিও আদাজের হয়ে ওকালতী করছ, দাদু!

শঙ্কর। এই ভাখ! ওকালতি করলাম কোথায় রে! তার ভায়োলেন্স যে পার্ভারসন, তাই ত বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

মালিনী। কিন্তু ক্ষতি ত আমাদেরই হোলো?

শঙ্কর। হোলোই ত! হয়ত আরো হবে।

মালিনী
নলিনী } আরো হবে!

শঙ্কর। মাটি কার, তাই ঠিক করে নেবার জন্য অসমীয়ারাই কেবল উতলা হয়ে ওঠেনি, সারা পৃথিবীর ছোট-বড় সব-জাতিই তাই উঠেছে।

মালিনী। আবার তুমি বিদেশের কথা বলছ, দাদু!

শঙ্কর। ও কিরে! অপূর্বর কথা তোর মুখে শুনে ও তার মতো উটপাখী নোস্। তবুও তাকে যেটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম, তোকেও তাই দি। শোন্। আজকার ভারত ইউনিয়ান একেবারে একটি রাজনীতিক সৃষ্টি। ভারতের ইতিহাসে আর কখনো হয়নি। এই রাজনীতিক ইউনিয়ন তাগিদে গড়ে ওঠেনি। পোলিটিশিয়ানরা এ তুলেছেন তাঁদের কল্পনা দিয়ে, কামনা দিয়ে এতে অনেক গোঁজামিল রয়েছে, অনেক কিছু বাকী থেকে গেছে।

মালিনী। সে বোঝা-পড়া কি এই ভাবেই হ

শঙ্কর। না, বোঝা-পড়ায় বিঘ্ন ঘটলেই উপদ্রব চলতে থাকবে। সংযুক্ত-মহারাষ্ট্র মহা-গুজরাটের দাবী, মাদ্রাজ থেকে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের দাবী, পাঞ্জাবী সুবার দাবী, নাগাল্যাণ্ড ইউনিয়নের প্রতি অঙ্গরাজ্যের সীমানা বাড়াবার দাবীর মূলেই রয়েছে ওই একটিই প্রশ্ন, মাটি কার

মালিনী। তার ত সমাধান হয়ে গেছে।

শঙ্কর। সমাধান হয়নি, রফা হয়েছে। রফা করে, সমাধান করে না। রফার ফল-অবিরতই ত হচ্ছে। আর অবিরতই নতুন উঠছে—প্যাশন জাগছে, তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে ব্যয়-বাহুল্য নিষ্ফলও হয়ে পড়ছে, Sc অথবা repressed হচ্ছে।

ভবানী। তাই কি মনের আগুন ভূবের মতো মনের গহিনেই জ্বলছে।

শঙ্কর। হ্যাঁ। তারই প্রকাশ হচ্ছে এখানে সেখানে, কোন-না-কোন দাবী নিয়ে। মা উঠলেই তার সঙ্গে সঙ্গে তার দাবী উঠবেই মাটির সঙ্গে নাড়ীর যোগ না থাকলে, মা

দোল, তারা ভুইচাপার মতো স্বচ্ছন্দগতি হবে না। আবার মাটির দাবী না মিটলে, পেটেরও দাবী মেটে না। শ্রেণীভিত্তিক সমাজ, ধনভিত্তিক রাষ্ট্র, সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্কৃতি, ভাষাভিত্তিক রাজ্য, পোলিটিকাল ইউনিয়নের পক্ষে অনুকূল নয়—যদি না সে ইউনিয়ন মোনোলিথিক হয়। মোনোলিথিক রাষ্ট্র আমাদের ট্রাডিশনে নেই।

মালিনী। আর আমরা তা চাইও না।

শঙ্কর। নায়করাও বলেন, তাঁরাও চান না। কিন্তু ফেডেরেল আর আসাম বুঝিয়ে দিল তাঁরা কংগ্রেস ডিক্টেটর-শিপ অপ্রতিহত রেখে আসলে তাই-ই চান। তাঁরা যা চান, জাতি তা চায় না। তাই তাঁরা যে ব্যবস্থা করেন, জাতি তা সারা মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না। অথচ প্রকাশ্যে অগ্রাহ্যও করে না। এই কনফ্লিক্টিং প্রশাসনিক গার্ডারসন সৃষ্টি করছে। তাই আবার সংক্রামিত হচ্ছে শাসিতদেরও মনে-মনে। শাসনকর্তারা আইনের অস্ত্র হাতে নিয়ে আস্ফালন করেন, মেজরিটির দম্ভ নিয়ে তাল ঠোকেন। আর রিপ্রেসড্ শাসিতরা মাটির দাবী, ভাষার দাবী, পেটের দাবী নিয়ে জ্বলে ওঠেন, জ্বালাও সৃষ্টি করেন। আসামের ঘটনাটা কেবলমাত্র অসমীয়া-বাঙালীর অনিবনাও বলে যাঁরা বোঝাতে চাইছেন, কার কতটা দোষ তাই বিচারের বিষয় করতে চাইছেন, আসল কারণ চাপা দিয়ে বেঁচে থাকতে থাকতেই তার ফল তাঁরা পাবেন। আর আমরা যদি প্রতিবিদ্বেষের প্রবৃত্তি নিয়ে অসমীয়াদেরকে কেবলই হীন প্রতিপন্ন করতে থাকি, তাহলে সেই হীনতা আমাদেরকেও স্পর্শ করবে; আসামের ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে আমাদেরকেও হতে হবে।

তবানী। কিন্তু বাঙালীর যে ক্ষয় ও ক্ষতি হ প্রতিকার কিসে হবে, মামা?

শঙ্কর। হয়ত কিছুটা হবে, অনেকটাই হবে না বাংলা থেকে আমরা যারা এলাম, তাদের অনে তেরো বছরেও ফিরতে পারলাম না। আসাম যারা এলো, তাদের সকলেও হতে পারবে না। ও সীমা নেই! এ ক্ষতির তুলনা নেই! কিন্তু এ আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, ভারতে একমাত্র ডিটেহারা হয়েও কারু ওপর জুলুম করলাম না, আমরাই খণ্ডিত বিশীর্ণ রাষ্ট্রের সীমা বাড়াবার জন্য প্রবৃত্ত হলাম না, আর একমাত্র আমরাই রিফ স্বীকার করে না নিয়ে ব্রাত্য রাজনীতিক নায় শাসকদের অপ্রীতিভাজন আর নাংটেমেয়ার হয়ে আমাদের দেশপ্রীতি, আমাদের মানবপ্রীতি, প্রতি আমাদের অবিচলিত বিশ্বাস, আ আত্ম-বিরোধের ওই পাপ থেকে নিবৃত্ত রাখল। নাশিনী গঙ্গা আর যমুনার মতো আমাদের ভবানী নলিনীরা অপরের পাপ বহন করেও পাপীর কল্যা করতে পারে। কেবল এই পুণ্যের জোরেই নিজেরা বেঁচে থাকব, ভারতবর্ষকে সকল অনাচা মুক্ত রাখব, সেই প্রত্যয় নিয়ে সত্যকে তোরা কর। তোদের প্রয়াসের ফলে বিকার ও বিকৃ মুক্ত হউক দুর্গত অথচ মহান্ ভারত।

॥ যবনিকা ॥

হিং টিং ছট্

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রীং, ক্রীং, সরবে টেলিফোন বক্কার দিয়ে উঠলো—সে টঙ্কার সম্পাদক মহাশয়ের। জোর তাগিদ—ভারতী'র কল্পলোকে মাঘের পূজার উপচার কই? বললাম—ফীত পূজা সংখ্যাগুলির জন্মর হোক্—সত্যিকার সাহিত্যিকরা বিগদর্শন করুন—তাঁরা নমস্ত আমরা না ঘরকা না ঘাটকা, জনতা বহার চাপরাশ বইবার ক্ষমতা নেই, ধ্যানাসনে সমাসীন মৌনও নই—আনন্দময়ীর খাসতালুকেও বাস করি তাঁর আগমনে আজকাল ত আনন্দে দেশ ছেয়ে যায় না—ছাইপাশ লিখবো কি, বলবো কি—চিন্তায় এ আবিলতা, ধারণায় এসেছে আসক্তি, ধ্যানে নেই সংযম, অধ্যয়নে নেই স্পৃহা, নিদিধ্যাসন বুঝি না—শু কথার আড়ম্বরে, ভাষার চাকচিক্যে ভাবের মোহে আর রুচির বিকারে পাঠক-পাঠিকদের বিভ্রান্ত অন্তরের কাছে অপরাধী হবো—

বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা
জোয়ার এসে উজিয়ে যাব
ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা

গল্প লিখবো কী হয়ে ওঠে গ—ল—প—সম্পাদক মহাশয়রা বাতিল করতে থাকো—প্রবন্ধ হয়ে যায় ত তত্ত্বের কবন্ধ, রম্যরচনা রূপ নেয় হ ব র ল হিং টিং ছট্—পাচবিশালী বাদি মাংসের চপ বা চক্‌চকে ব রাংতামোড়া পানের খিলি, বাইরে থেকে রঙে রসে সমুজ্জ্বল। আচ্ছা বেশ—লেখা যেবো, কর্তব্যেমেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। অনেক ভক্তের অনেক শতদল কুসুম কল্পনারের সঙ্গে চোখের জলে মিশিয়ে দুর্বা অর্ঘ্য যদি গ্রাহ্য হয় এবারের সীমানা পেরিয়ে।

পরদিন সকালেই কলম হাতে বসলাম। বারটা রবির, দিনটা ছুটির, মনটা কিন্তু আমার এই ত্র্যহস্পর্শের ফল কিন্তু ফললো উল্টাই। জ্যোতিষ রত্নাকররা মিলিয়ে দেখতে পারেন গ্রহ সমাবেশের সঙ্গে। হয়তো পাঁজিতে পুঁথিতে কালবেলার কুটিলালিপি ছিলো। আকাশের দিকে দেখি কমল হ্রদে থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে দ্যুতি। কনকবরণীর কনকাঞ্চনে চারিদিক ঝলমল। ে ভাগ্যলক্ষ্মীর স্নিগ্ধ লগ্নে অরুণ সারথির রথ মেদুর আকাশের মেঘহীন নীল নিভৃতিতে রাত্রির পরিচ্ছবি নিটোল ঘুমের আমেজে তখনও স্বপ্নাচ্ছন্ন। শরৎ প্রসন্ন দিন, সুবাসিত চা, খবরের কাগজ হাতে—জ্যোতিষের গরম গরম খবর—বিজ্ঞ আমি, প্রাজ্ঞ আমি, এমন দিনে কাঠাসনের ধূপকাঠে বন্দী না হয়ে আনন্দে যদি বেরিয়েই পড়ি, ধনধান্যে ভরাভূমির স্বপ্নই দেখি তবে, যাইঃ লেখা থাক—ঘোরা কলকলিকাতা কলিকাতার পথে পথে।

নেমে এলেন পথে—পায়ে হেঁটে বেড়ানোই শ্রেয়, যদিও এখানে উন্মুক্ত প্রান্তরের উদার স্ব

নেই, ঘাঁড়ের আর লোকের গুঁতো বাঁচাতেই পৈতৃক প্রাণ প্রায় খাঁচাছাড়া, নোংরা আর নোংরামীর কথা নাই বা বললাম। পথে যেতে যেতে কেন কী জানি মনে পড়ে গেলো লালদীঘির পাশে মানুষের ভিড়ে গাদাগাদি। তারই ভিতর কতোদিন চোখে পড়েছে রাস্তার আড়াআড়ি পেতলের দুটো পাত—দুপো বন্ধ ছুতোর গুঁতো খেয়ে এখনও চকচক করছে, ইতিহাসের এক নম্বর অধ্যায়ের স্মৃতি বুকে করে। যোল দুশো চার বৎসর আগে দারুণ অগ্নিবাণে বাঙালনদ এক খুনের দিনে মারহাট্টা ডিচ্ পেরিয়ে পেরিয়ে পরেই ডিঙিয়ে এসেছিল সিরাজদ্দৌলা আর তার পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, উদ্ধত বেয়াকে উড়িয়ে দিতে। ত স্মৃতিকণা বাদুড়ে কলকাতার ধূলির পারে আজও ওড়ে। আজকের কলকাতায় বসে কল্পনা করতে পা কি চৌরঙ্গীর জঙ্গলে থাকতো 'বিগ গেম', সেখানে ছিলো ডাকাতদের আড্ডা, জঙ্গলদীয়ের আস্তানা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সরু সুঁড়ি পথ ধরে কলকাতা থেকে কালিঘাটে যেতে হতো—যে যাওয়া ছিল বিপজ্জনক এই সেদিনেও ভবানীপুর থেকে চিৎপুরে যেতে হলে লোকে বলতো কলকাতা যাচ্ছি—কলকাতার প্র সীমানাই ছিল লালদীঘি—সার্কুলার চৌধুরীদের বাছারী ছিল সেখানে—পরে তার নামকরণ হলো Ta Square. সিরাজদ্দৌলার সময় ফোর্ট উইলিয়াম এখানেই। ইলাইজা ইম্পের যুগে তিনি থাকতেন আজকে লরেটোর কাছে—সেটা তখন জঙ্গল মত 'Deer Park', যা থেকে নাম হয়ে পার্ক ষ্ট্রীটের। হরিণ-হরিণী ঘুরে বেড়াচ্ছে সদর ষ্ট্রীট ক্যামাক্ ষ্ট্রীটের এলাকায়—আর তারই মাঝে হরিণচকিতনয়না তরুণী আতাম্রকুন্তল মেয়ে দেখাও যাচ্ছে মাঝে মাঝে। আজকের এই ঝলমলে নিয়ন আর ফ্লোরেসেন্ট আলোর মাঝখানে ম পড়ে কি সেই জমাট অন্ধকারের দিনগুলোকে—ইচ্ছে হয় সেই তারাঝরা আকাশের এক টুকরো যদি যি পাই—চৌরঙ্গীনাথ তুমি ত ছিলে সাধুসন্ত—অন্নহীন হয়ে কোন অনন্ত দেবতার উপাসনা তুমি করেছো জঙ্গলে বসে তার হদীস দেখাবে কে—

কূলের উপরে কূলের বসতি তাহার উপরে ঢেউ
ঢেউয়ের উপরে ঢেউয়ের বসতি ইহা জানে কেউ কেউ।

চৌরঙ্গীনাথ কি জেনেছিলেন যে মত সাগরের ঢেউয়ের উপর বসেই বেপারীরা নেমেছিল পা থেকে দুঃসাহসিক বিদেশীর দল। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে তাদের আগমন। ভোগবতীর তী তারা তরে নিলে ভাগীরথীর জলে। নব যৌবনবতী কলকাতাও কিশোরীপূজন কিশোরীভজনে মাতলে তখন বক্তাক্ত নিবিড় নিশীথে দিল্লীরাজশালার কক্ষে কক্ষে বাতি নিভছে। বঙ্গপ্রান্তে পদ্মাবিপদির একব নিঃশব্দ চরণ ফেলে বণিকলক্ষ্মী এসে দাঁড়ালেন সুরুমপথের অন্ধকারে। তাদের নৌকা সোনার তরী ফিরে গেলো 'সোনে তরণি'। বাঘাবনের শার্দুল চিহ্নিত পথে পথে বেতের জঙ্গল চিরে গড়ে উঠ গোবিন্দপুর সুতোহুটী। বটবঙ্কিনীর আঙিনায় বসে বৈঠকখানা বাজারে গুড়গুড়ি টানতে টানতে বেচাকে লগ্ন এসে গেলো। সুন্দরী বিধবা 'সতী' হতে হতে সাহেবের অঙ্কশায়িনী হলো। 'ভোর হলো শ্রাবণশর্ব্বরী,' রাত পোহাতেই দেখা গেলো বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে সেই সুরো অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতার কৈশোর, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তার যৌবন, বিংশ শতাব্দীতে সে প্রৌ

বাতিনাইনী, আত্মীয়স্বজন পরজন, ভুঁইফোড়, আগন্তুক-পরগাছা, অতিথি-অভ্যাগত, বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিতের নিয়ে বৃদ্ধবয়সে সে হিমসিম খাচ্ছে, টাল সামলাচ্ছে, তাল ঠুকছে—বুঝি জলে ডুবছে, বন্যায় কাতরাচ্ছে অন্তত পৃথক্‌জাত ভাইবোনেদের জন্য চেঁচাচ্ছে। দুমুটো অন্নের জন্য তার ছেলেরা কাতর, তার মেয়েরা বিপন্ন তার আকাশ হয়েছে ছোট, তার ঘরে পড়েছে বেড়া। তার যৌবনের তপ্ত দিনগুলির কথা স্মরণ করে যদি দুটো চোখের জল ফেলে পুজোর দিনে তাতে যদি তার আত্মানুসন্ধানের দিশা মেলে তবে হয়ত গ্লানিকর হবে না। একদিন সে ছিল তখনকার রাজপুত্রদের সেরা প্রেয়সী সাহসাগর, তেপান্তর মাঠ পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে আসতো নাইটরা, লর্ডরা, তার গ্যালাহডরা—

নিঠুর গরজী তুই মানস মুকুল তাতবি আগুনে
সে আগুন আজ দিনান্তের অবজ্ঞার ধান, আরম্ভেই যার অবসান
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা দুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ লজ্জকণা।

আজ যদি তার ছেলেমেয়েদের দুধ ঘি মাখন মাছ দুরে থাক, শুধু ডাল ভাত তেল নুনের হয়, সে যদি আজ অখ্যাত অবজ্ঞাত হয়ে দেশে-বিদেশে ধিকৃত হয়, তবে তার প্রথম যৌবনের দিনগুলির কথা স্মরণ করে তারা যদি দুফোঁটা চোখের জল ফেলে তবে তুমি সমালোচক তাকে ব্যানপ্যানানি বা emotional abandon বলে ডিক্রী খারিজ করলেও মহাকালের দরবারে তার লাঞ্ছিত ছবির একটুকরো থেকে যাবেই। তারতপথের নিশানা যে এইখানেই—সেই পথিক আজিও চলেছে।

সে যুগের কলকাতাতে শুধু দুরন্তবিনের ইতিহাসেই লেখা হয়েছে তাতো নয়, বোম্বে হার্মাদদের দৌরাত্ম্যের কথা, ফাবলী ক্রীতদাসীদের হা-হুতাশ, আর্মেনিয়ান রূপসীদের জেল্লার কাহিনী, চৌকীর গল্প, ভোর রাতে বাগানবাড়ী ফেরতা নতুন বাবুদের জুড়িগাড়ীর ঘোড়ার খুরের কদম কদম সঙ্গে নতুন গানের বন্ধেশ সুর আর তালের সঙ্গে কলকাতা কাঁপছে, দুলছে, দুলছে, শুধু বাইনাচে। শ্রীঅরবিন্দের কথা মনে পড়ছে—a Society electric with thought and loaded with passion। এর পরের যুগেই আমরা দেখেছি রামমোহনকে, দ্বারকানাথকে, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে, মেকলকে। বিদায় নিচ্ছে সতীদাহ প্রথা, ঠগীরা, পিণ্ডারীরা। খোলা হচ্ছে স্কুল হাসপাতাল, শোনা যাচ্ছে বেদান্তের বাণী, একেশ্বরবাদের কথা। সুপ্রীম্ কোর্ট গ্র্যাণ্ডহরীকে ডেকে নতুন ব্যাখ্যা করছেন। হোরেস উইলসন্ অনুবাদ করছেন মালতীমাধব, উত্তর রামচরিত, মুদ্রা এসিয়াটিক সোসাইটি তখন স্যার উইলিয়ম জোন্সের কল্যাণে সুপ্রতিষ্ঠিত। বেঙ্গল থিয়েটারে সর্বস্ব পুরাণের অনুবাদ, চৌরঙ্গী থিয়েটারে হচ্ছে অভিনয়। তারও আগে ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে ২৭শে এক তরফুরে রাশিয়ান হেরাসিম লেবেডফ্ নিজের লেখা দুটি প্রহসন নিয়ে তখনকার ডোমতলায় অর্থাৎ এখন যা হাটে অভিনয় করেন। সেকালের রাইটার্স বিল্ডিংএও কলেজ বসতো—১৮২১ সালে

মাতৃপূজায়
অপরিহার্য্য

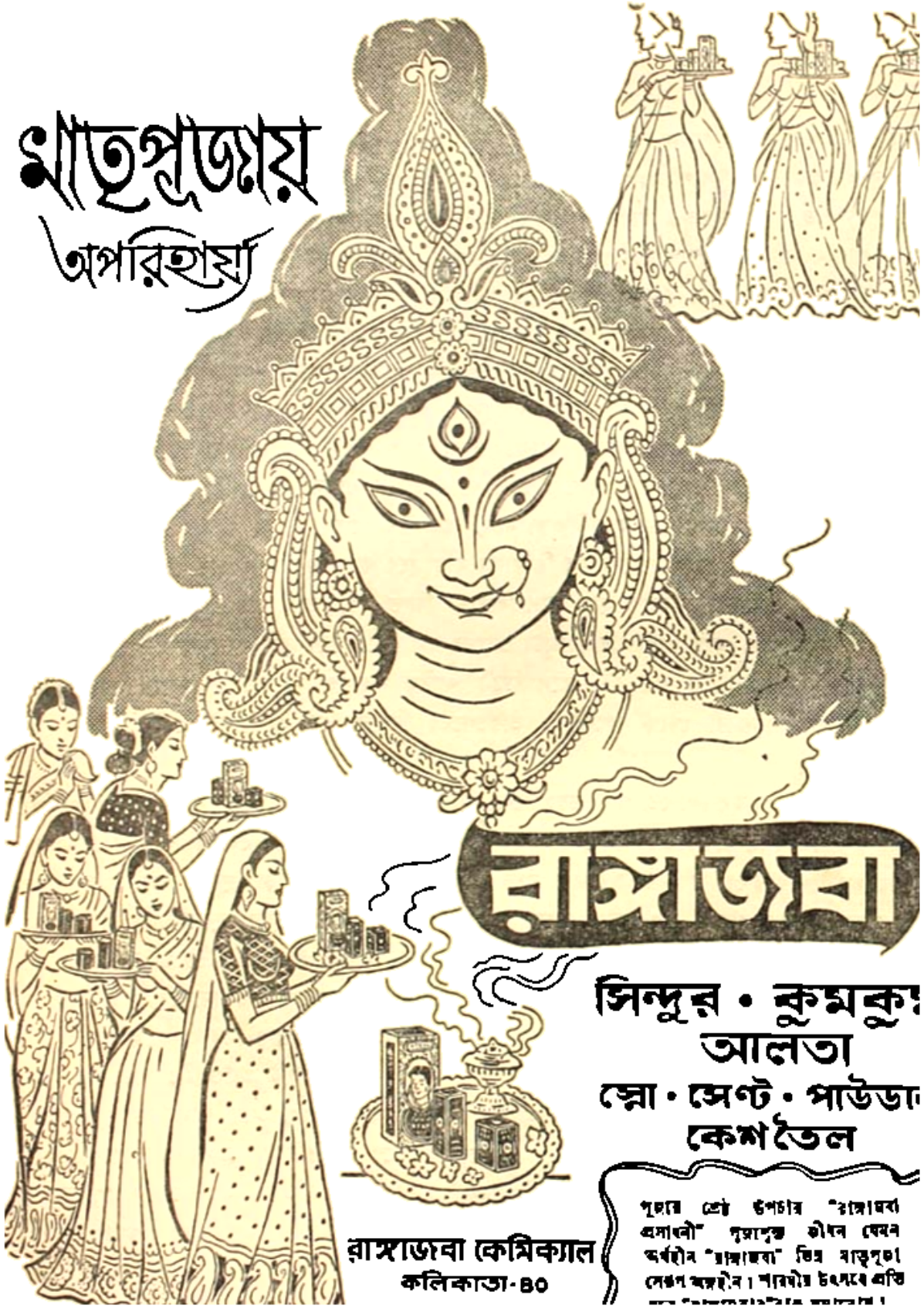

রাঙ্গাজবা

সিন্দুর • কুমকুম
আলতা
স্নো • সেন্ট • পাউডার
কেশতৈল

পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার "রাঙ্গাজবা প্রসাধনী" পূজাশেষে জীবন যেমন অর্থহীন "রাঙ্গাজবা" বিনা মাতৃপূজা তেমন অসম্পূর্ণ। শারদীয় উৎসবে প্রতি

রাঙ্গাজবা কেমিক্যাল
কলিকাতা-৪০

কলিকাতা উন্নয়ন কমিটি বলেছে (Committee for the improvement of the city of Calcut
তখনও দেখি বাজারে মাছ নেই (১৮২২), গভর্নমেন্ট কমিটি সংগঠন করছেন "To examine into the
of Calcutta fish market and report upon the possibility of improvement". ৭
ওয়েলেসলীকে লিখিত একটি পত্রে পাচ্ছি শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা :

যোগিনাং যো হৃদাকাশে বিদ্যুদ্বর্ণ প্রকাশতে,
সএব দারুরূপেণ নীলাদ্রৌ ভাসতে মহঃ।

দেখছি কাশীতে গিয়ে হেষ্টিংস বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের কাছে নহবতখানা তৈয়ারী করিয়ে দি
শ্রীহরি/শ্রীহরা নিত্যবিজয়ার্থাং শ্রীশ্রীতোরণ সমীপে প্রভূত মুদ্রাব্যয়েন সর্বাঙ্গ নির্মিত পাষাণময় প্রাসাদ ৭
নৈতিকং নরেন্দ্র কারয়ামাস।"

কলকাতা সম্বন্ধে কত কথাই বলা যায়, কত গল্প করা যায়—মনে করতে পারেন আজকে ৫
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল একশো বেড়শো বছর আগে সেখানে জেল ছিল। এর নাম ছিল "বিরজী ৫
নন্দকুমারকে রাখা হয়েছিল এখানে এবং সেদিন 'নীল' আন্দোলনের দং দাহেবকে। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে
জুলাইএর গেজেট খুলে পড়ুন—দেখতে পাবেন "হিন্দু কলেজের" প্ল্যান, আবার পাবেন শ্রীরামপুর কলেজে
বর্ষতলা এ্যাকাডেমীর বিবরণ, সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস। দেখবেন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কলেজের পারি
বিটরণী সভায় আবৃত্তি করেছেন রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন,
লাহিড়ী। আবার ওদিকে অ্যানটুনী ফিরিঙ্গী গাইছে—

পৃষ্ঠে আর কৃষ্ণে কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথাও শুনি নাই।
আমার খোদা যে হিঁদুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে
আমার মানব জনম সফল হবে—যদি রাঙা চরণ পাই।

মনে পড়ে কি—রূপচাঁদ পক্ষীর কথা—উনবিংশ শতাব্দীর বিচিত্র চরিত্রের একটি—সুদর্শন
বালক—নিজের নাম রেখেছে খগরাজ। গানের দল বাঁধলে, নাম দিলে কাষাখোঁচা, ময়না,
ইত্যাদি।

শ্রীমতী রাধার কেনা সারভেণ্ট
এই দেখ আছে দাসখত এগ্রিমেণ্ট
এখনি করিব প্রেজেণ্ট, ব্রজপুরের লবদব।

আজ মনে পড়ছে কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত তরুণ কবি ডিরোজিওর কবিতা—

"The moon stood silent in the sky
and looked upon the earth

অর্দ্ধ শতাব্দীর জয়-গৌরব

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, যেদিন বাংলা দেশ প্রথম বিদেশী বর্জনের মন্ত্র গ্রহণ করে, সেদিন আমরা কার্ত্তিক সেই মন্ত্রকে জাতির জীবনে সার্থক করে তোলবার জন্যে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি।

এই দেশের জল-হাওয়ায়, এই দেশের প্রাচীন চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে সম্বল করে, বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে, দেশের স্বাস্থ্য ও শক্তি বর্দ্ধনের জন্যেই আমরা আয়ুর্বেদোক্ত প্রণালী নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করে, দেশীয় ঔষধ প্রস্তুতের এই বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি।

আজ এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতকৃত ঔষধ, শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতবর্ষের বাহিরে বিশ্ব-দরবারেও আয়ুর্বেদের মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

তাই সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ ভারত-নায়কগণ প্রত্যক্ষভাবে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-কারিতা পরিদর্শন করে সানন্দে তাঁদের শুভেচ্ছা দিয়ে ইহাকে গৌরবান্বিত করেছেন।

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাবলীর আদি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

কার্ত্তিক ঔষধালয়

ঢাকা লিঃ

The clouds divided, passing by
In homage to her worth
When like a thing that is not ours
This earthiness goes by
And we behold the spiritualness of all that cannot die
'Tis then we understand the voice which in the neighbourhood sings
And feel the mystic melody played on the forest strings"

আজকের মেঘের আর ধূম্রজালের আড়ালে সেদিনের কলকাতার শুভ্র রূপকে এমন করে কোনো কবি দেখতে পান, জ্যোৎস্নাস্নাত রূপরিক্ততার মাঝে—

সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা
সপ্তর্ষির পূজাদীপমালা

না, আজ আমাদের নাভিশ্বাস উঠেছে, শুধু বয়ই ভাবেনি, মনও হেরেছে—আজকের কলকাতার আ বাতাসে লোভ, ক্ষোভ, মোহ, রক্তবাজী, চৌর্যবৃত্তি, লতাসাধন, কামায়নচুম্বন, পথে পথে কণ্টকের ক্ষত ঘরে ঘরে গুপ্তসর্প গৃঢ় ফণা—দিকহারা অলক্ষ্মী রয়যাত্রী তখন বলতে ইচ্ছে করে।

হে মোর সুন্দর, আজ তুমি হও বর্বর, কহ বিচার তবু আমাদের আশার অন্ত নেই, ব বিরাম নেই, গড়ে উঠবে নতুন সমাজ, নতুন রাষ্ট্রধর্ম—সাধকশিল্পীর গোষ্ঠী, ত্যাগীভোগীর দল, অবাতিচা সকল। আজ আমরা সন্ধান করবো সাময়িক উত্তেজনার ঊর্ধ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি নীতি, ক্ষুধার কি থেকে চিন্তার আবিলতা থেকে চেষ্টার নৈষ্কর্ম্য থেকে মুক্তি। আলোকপিয়াসী মানুষ খুঁজবে এক অমৃতভাণ্ডকে, যা মণ্ডিত করবে জীবনকাণ্ডকে নূতন সংহিতায়, অভয় গীতায়, ধ্যানের নৈঃশব্দে, প্রবাহে, বিজ্ঞানীর বীক্ষণে, চাষীর মাঠে, গণচিত্তের উদ্বোধনে, প্রেমের রসতীর্থে, সাধকের মহাভাবে সে ক্ষেমঙ্কর দক্ষিণপাণি উত্তর-সাধক কবি যে আঁকবে কলকাতার এই ক্রান্তদর্শী ছবি। সকল মানুষের কাছে ইতিহাসলক্ষ্মী চোখের জলে এই নিবেদনই জানাচ্ছেন। আজ আমাদের কারু বিরোধ নেই, বিতণ্ডা নেই, বিষাদ নেই—দূর হয়ে যাক সমস্ত সংশয়, সন্দেহ, সংকীর্ণতা। যেখানে কাজ হচ্ছে—তার সঙ্গেই আমাদের হোক্ আন্তরিক সংযোগ—নবজাগ্রত চেতনা বঞ্চনা-বেদনার ইতি ঊর্ধ্বে উঠে বলুক—

"A deeper dedication to the higher values of life.

জীবনে মরণে পথের শরণে দুনিয়ার যত পদাতিকদের একটি প্রণাম লহ। কবিগুরুর ভাষায় প্রণামই জানালাম হিং টিং ছট্ মন্ত্র পড়ে।

সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য

গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট

এম,বি,সরকার
এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন:-৩৪-১১৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-১২ গ্রাম-স্বর্ণশিল্পী
ব্রাঞ্চ-বালি গঞ্জ-১৩৯/১/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-১৯ ফোন- ৪৬-৪৬৬৬
দোকানের পুরাতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১,মহাত্মা গান্ধী রোড,কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর - সিটি - ১৪৫৮

বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ

ALL THE WORLD'S A STAGE.

—*Shakespeare.*

The theatre is growing in importance as a social organ. Bad theatres are as mischievous as bad schools or bad churches; for modern civilization is rapidly muliplying the class to which the theatre is both school and church The truth is that dramatic invention is the first effort of man to become intellectually conscious. No frontier can be marked between drama and history or religion, or between acting and conduct, nor any distinction made between them that is not also the distinction between the masterpieces of the great dramatic poets and the commonplaces of our theatrical seasons. When this chapter of science is convincingly written, the national importance of the theatre will be as unquestioned as that of the army, the fleet, the church, the law and the schools.

—*George Bernard Shaw.*

যদি আমরা রঙ্গালয় হইতে বুঝাইতে পারি যে সমস্ত কলাবিদ্যার উন্নতি রঙ্গালয় দ্বারাই হইতেছে—কবি নাটক লিখিতেছেন, নট তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন, গায়ক সুর সৃষ্টি করিতেছেন চিত্রকর তুলি ধরিয়াছেন, ভাস্কর রঙ্গস্থল সুসজ্জিত করিতেছেন, বৈজ্ঞানিকও যোগদান করিয়া অবাস্তবে বাস্তব-ভ্রম উৎপাদন করিতেছেন—যদি আমরা দেখাইতে পারি রঙ্গালয় হইতে সর্বপ্রকার কলাবিদ্যার উন্নতি হইতেছে, যদি আমরা বুঝাইতে পারি যে অভিনয় বিদ্যাও অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় জাতীয় সভ্যতার পরিচয়স্থল—তবে নট সুধীজনসমাজে তাঁহার যোগ্য মর্যাদা—তাঁহার আজীবন পরিশ্রমের পুরস্কার—তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার সিদ্ধি অবশ্যই লাভ করিবেন।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

"They were to the effect that the stage was, above all, a reflex society, a mirror in which the public should see its image and the legitimate depicture of it

বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ

শ্রীসুধাঙ্কর সেন

কোন কোন দার্শনিক এই পরিদৃশ্যমান জগৎটাকেই স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। কেহ বা জগৎ মায়ামাত্র আর ব্রহ্ম সেই মায়াবী যিনি আমাদের মনে জগদ্রূপ ভ্রান্তি উৎপন্ন করেন। বা বলেন, জগৎ ভগবানের লীলামাত্র, আর আমরা তাঁহার লীলার সঙ্গী হইয়া সুখদুঃখরূপ চক্রের মধ্যে করি। আবার কেহ বা বলেন, জগৎ একটা বিশাল রঙ্গমঞ্চ, আমরা এখানে প্রবেশ করি নানা ৎ অভিনয় করার জন্য, আর এই অভিনয় শেষ হইলেই আমরা বিদায় গ্রহণ করি। সেক্সপীয়র বলেন,—

"All the world's a stage,
And all the men and women merely players,
They have their exits and their entrances."

আমাদের দেশের সাধক কিন্তু গম্ভীরতর কথা বলিয়াছেন—

'এ মায়া প্রপঞ্চময় হরের রঙ্গমঞ্চ মাঝে,
রঙ্গের নট নটবর হরি যারে যা সাজান সে তাই সাজে।'

অথচ এই ভবরঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের মধ্যেই আবার কেহ কেহ কৃত্রিম রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া অভিনেতাদের (যাহাদের আমরা বলি দর্শক) প্রশংসা বা নিন্দার ভাজন হন। বৈজ্ঞানিক বলেন, দীর্ঘস্থায়ী স্বপ্নের মধ্যে কখনও কখনও স্বল্পস্থায়ী স্বপ্ন দেখিয়া থাকি, তেমনই বলা চলে যে সংসার আমাদের যে অভিনয়, উহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু এই অভিনয়ের মধ্যেই আবার কে স্বল্পকালীন অভিনয়, আর কেহ সাজেন দর্শক।

দেশবিদেশের নাট্যকলা ও রঙ্গমঞ্চের ক্রমবিকাশের ইতিহাস যেমন চিত্তাকর্ষক, কৌতূহলোদ্দীপক। প্রাচীন ভারতের নাটক ও রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইত,—শ্রব্য ও দৃশ্য, নাটকও কাব্যের মধ্যেই পরিগণিত হইত। সে যুগে নাটকের সাধারণ নাম ছিল রূপক, আর এই দশ প্রকারের শ্রেণীবিভাগ ছিল। বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণে বলিয়াছেন—অভিনয় চতুর্বিধ—অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গির দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হয়, বাচিক অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা যাহা সম্পন্ন হয়, আহা অভিনেতা বা অভিনেত্রীর বেশবিন্যাসাদি হইতে দর্শকগণ যাহা আহরণ করেন ও সাত্ত্বি অভিনেতাদের স্তম্ভ, স্বেদ প্রভৃতি ভাবের প্রকটন হইতে দর্শকদের মনে যে ভাবের সঞ্চার হয়।

'তত্রাঙ্গাভিনয়োঽবস্থানুকারঃ চতুর্বিধঃ।
আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈবমাহার্য্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা॥'

সেকালে প্রধানত উৎসবাদি উপলক্ষেই অভিনয় হইত, আর এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য ছি দর্শকগণকে আনন্দ পরিবেশন করা ও তাহাদিগকে কল্যাণের পথ নির্দেশ করা। অধিকাংশ নাটকেরই বিষয় রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণ হইতে গৃহীত, অবশ্য মৃচ্ছকটিকের মত সামাজিক নাটক কিংবা মুদ্রারাক্ষসের মত ঐতিহাসিক নাটকও ভারতবর্ষে রচিত হইয়াছিল, আর মধ্যযুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রী কবি কর্ণপুর প্রভৃতি গোস্বামী বা পরিকরগণ নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এদেশের আলঙ্কারিক নাট্যকারদের নাটক রচনার কতকগুলি কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছিলেন। এদেশে যে ট্র্যাজিডি বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তাহার মূলেও ছিল ভারতের এক বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। এক কথ বলিতে গেলে উহাকে বলিতে হয় ধর্মবুদ্ধির প্রেরণা। শুধু তাই নয়, যাহাতে দর্শকের মনে কোন গর্হ আঘাত লাগে, যাহাতে তাহাদের কাম, ক্রোধাদি রিপুর উত্তেজনা হয় অথবা যাহা দেখিলে লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃ উদ্রেক হয়, সেই সকল দৃশ্য রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন করা সেকালে নিষিদ্ধ ছিল। (এ সম্পর্কে সাহিত্যদর্পণ দ্রষ্টব্য)

সেকালের আলঙ্কারিকগণের মতে কাব্যের মধ্যে নাটক শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, নাটকই ধ অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ-লাভের উপায়, ত্রিবর্গসাধনং নাট্যম্।

প্রাচীন গ্রীসদেশেও নাটক, বিশেষত বিয়োগান্ত নাটক অসাধারণ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। মহা এরিষ্টটল্ তাঁহার 'পোয়েটিক্স' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—ট্র্যাজিডি আমাদের অন্তরে ভয় বা করুণার উদ্রে করিয়া আমাদের রুদ্ধ বেদনাকে সহসা অশ্রুরূপে মুক্তিদান করে, আর এইজন্যই ট্র্যাজিডি আমাদের আন দান করে। করুণ রস যে আমাদের আনন্দ দান করে, একথা আমাদের দেশের আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীকগণের একটা গভীর জীবন-দৃষ্টি ছিল, এই দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া য সফোক্লিস্, ইউরিপাইডিস্ প্রভৃতির রচনাবলীতে। তথাপি প্রাচীন গ্রীসেও নাট্যকারগণকে অনেকগু আলঙ্কারিক বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এরিস্টটলের ত্রিবিধ ঐক্যের কথা- কালগত ঐক্য, স্থানগত ঐক্য ও ঘটনার ঐক্য। (Unities of time, place and action)। ঘটনার ঐক্য অবশ্য নাটকের পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু কালগত ঐক্য বা স্থানগত ঐক্য তো একটা কৃত্রিম বি আর এইরূপ বিধি উৎকৃষ্ট নাটক রচনারই অন্তরায়।

ইংরেজী নাট্যসাহিত্যে সেক্সপীয়রের আবির্ভাব সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। ষোড়শ শতাব্দী ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা যে বৃহত্তর জগতের সন্ধান পায়, তাহার ফলে ইংরেজ জাতির মনে নূ আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। এই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাই মার্লোর (Marlow Tamburlaine নামক নাটকে। কিন্তু সেক্সপীয়রের অভ্যুদয়ে অন্যান্য নাট্যকারদের প্রতিভা ম্লান হইয়া যায় সেক্সপীয়র যে শুধু একজন অসাধারণ নাট্যশিল্পী ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার দৃষ্টি ছিল যেমন গভীর, তেমন ব্যাপক, তদুপরি তাহার মধ্যে ছিল শিল্পীর নির্লিপ্ততা ও ঋষির প্রজ্ঞা। এলিজাবেথীয় যুগে রঙ্গমঞ্চের শ্রী ছিল না, আর তখন বালকেরাই নারীর ভূমিকায় অভিনয় করিত কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটক দর্শকদের য আনন্দ পরিবেশন করে নাই, তাহাদের মনকে অন্তর্মুখী করিয়া তুলিয়াছিল।

তাঁর ভক্তরা বহুনামে ডেকে
এসেছে, যেমন—
মহিষাসুরমর্দিনী
দুর্গা
দশভুজধারিণী
মহাকালী
চামুণ্ডেশ্বরী
সিংহবাহিনী
পার্বতী
ইত্যাদি আরও কত কি
এবং যে কোন একটি
নাম ধরে ডাকলেই
মা সাড়া দেন

কিন্তু.....

একমাত্র এবং অদ্বিতীয় স্বাভাবিকভাবে চুল কালো করার তেল লোমার কোনই বিকল্প নেই।

লোমা

বিশ্ববন্দিত চুল কালো করার তেল

ইংলণ্ডে যেমন সেক্সপীয়র আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ফরাসী দেশে তেমনি মলিয়ের। সেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁহার বিয়োগান্ত নাটকাবলী আর মলিয়েরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি তাঁহার মিলনান্ত নাটক কমেডি। নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মলিয়েরের কয়েকখানি নাটক বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ক্রম্‌ওয়েলের যুগে ইংলণ্ডে পিউরিটান ভাবধারা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। সেক্সপীয়রের বহুদিন ইংলণ্ডে উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রতিভার আবির্ভাব হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেরিডান 'The School of Scandal', 'Rivals' প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়া নাট্যকার হিসাবে কিছু খ্যাতি অর্জন করেন।

ইতালিয়ান নাট্যকার মেটারলিঙ্ক ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যে এক নূতন ধারার প্রবর্তন করেন। তাঁহার একটি প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—সেক্সপীয়রের নাটকে আমরা মানুষের আদিম প্রবৃত্তির উদ্দাম লীলা বিশেষ দেখিতে পাই,—উন্নত, মার্জিত রুচি, দেব-প্রকৃতি মানুষের পক্ষে সেক্সপীয়রের নাটকসমূহ তৃপ্তিদায়ক হইতে পারে না। সাঙ্কেতিক নাট্যরচনায় মেটারলিঙ্ক অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে মেটারলিঙ্ক ও রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাট্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ যুগের মানুষের চিন্তাধারাকে যিনি প্রথম প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিয়াছিলেন, তিনি নরওয়ের প্রখ্যাত নাট্যকার ইবসেন। তাঁহার 'Doll's House', 'Ghost' প্রভৃতি নাটকগুলি এক সময়ে বহু নিন্দিত হইয়াছিল। বস্তুনিষ্ঠতা, আদর্শবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি সহানুভূতি এইগুলি ইবসেনের নাটকের বৈশিষ্ট্য। বার্নার্ড শ-এর রচনায় আছে বুদ্ধির বিদ্যুদ্দীপ্তি, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, জীবন জগতের প্রতি এক তির্যক দৃষ্টি। বার্নার্ড শ-এর রচনায় আছে প্রাচুর্য্য, আছে বৈচিত্র্য, কিন্তু উহার মধ্যে চমক আছে, তাহা সহজেই নিঃশেষ হইয়া যায়। গল্‌স্‌ওয়ার্দির নাটকেও একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, এক বিদ্রোহের সুর আছে। আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে ইউজিন ও নীলের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকের শেষ দশকে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'মস্কো আর্ট থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখ নিকোলাই গগোল, আইভান টুর্গেনিভ, লিও টলষ্টয়, সেকভ্, ম্যাক্সিম গোর্কি প্রভৃতির রচিত নাটক পুশকিনের কাব্যের নাট্যরূপ বহুবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইয়াছে। সমাজের নিম্নস্তরের দরিদ্র, লাঞ্ছিত শোষিত ও নিপীড়িত নরনারীর প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি এই সকল নাটকের বৈশিষ্ট্য।

আধুনিককালের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য One Act Play বা একাঙ্কিকার প্রবর্তন ইংরেজী সাহিত্যে এই একাঙ্কিকা অভাবনীয় সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান কর্ম্মব্যস্ততার যুগে যন্ত্রদানব অত্যাচারে অত্যধিক প্রপীড়িত মানুষের কাছে ছোট গল্প ও একাঙ্কিকা উভয়েরই একটা বিশেষ মূল্য আছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের রঙ্গমঞ্চে দর্শকগণের কল্পনার অবকাশ ছিল কিন্তু একালের রঙ্গমঞ্চে দর্শকগণের মনে স্বপ্ন বা বিভ্রম সৃষ্টির সকল আয়োজনই সম্পূর্ণ। এই বিভ্রম সৃষ্টির জন্য বিপুল আয়োজন ও অর্থ হইয়া থাকে, তাহা সেকালের মানুষের কল্পনারও অতীত ছিল। এ যুগে আবার নাটককে চলচ্চিত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিতে হইয়াছে। এখন আর সে রঙ্গমঞ্চ নাই, নাটকের সে 'টেকনিক' নাই, অভিনেতা

বা অভিনেতৃবর্গের প্রযোগ-কৌশলেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তথাপি এখনও সেক্সপীয়রের মত ক নাট্যকারের নাটকের মর্য্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এ কথাই বরং বলা চলে যে, এ কোন মধ্যযুগীয় নাটকের অভিনয়-দর্শনের সময় আমরা সেই যুগেই নীত হই। প্রত্যেক দেশসমূহে অভিনয়ে দ সাফল্য অর্জ্জন করাই শিল্পী-জীবনের প্রধান সাধনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানে নাট্যকারের সম্মুখে যুগ-সমস্যা, তাঁহারা সেই সমস্যারই সমাধান খুঁজিতেছেন। নাটকে নাট্যকলাকে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ না ক যে মত প্রচার করা চলে, বার্ণার্ড শ'র নাটকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তথাপি, সম্ভবত এ কথা স পাশ্চাত্ত্য দেশেও বর্ত্তমান কালে সেক্সপীয়রের মত কালজয়ী প্রতিভার আর আবির্ভাব ঘটিতেছে না।

বর্ত্তমানে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, রাশিয়া, নরওয়ে, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে ও নাটকের যে পরিণতি ঘটিয়াছে, আমাদের দেশের নাট্যশিল্পী, নট ও নটী এবং নাট্যামোদীগণের জানা প্রয়োজন।

বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহারা বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় মধুসূদন ও দীনবন্ধু হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা সাহিত্যে অনেক শক্তিশালী নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটা মনোমোহন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল প্রভৃতি নাট্যকারগণ নাট্যসাহিত্যকে ভূরিদানে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি এ কথা সত্য যে, আধুনিক কালে বাংলার গীতি- ছোট গল্প বা উপন্যাস যেমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে, নাট্য-সাহিত্যে তেমন হয় নাই। এ যুগে আবার নাটকের দৈন্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই নাটকের সাফল্য রচনার গুণের উপর না করিয়া অভিনয়ের নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। অথচ জাতির সম্মুখে কোন বলিষ্ঠ বা ক আদর্শ স্থাপন করিতে হইলে নাটকই উহার প্রকৃষ্ট বাহন। এ যুগে তো সমস্যার অন্ত নাই, সেই সমস্যার সমাধানের পথ এ যুগের নাট্যকারগণকেই নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এইরূপ প্রচেষ্টা আমাদে যে একেবারেই হয় নাই, তাহা বলি না; কিন্তু খুব বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই। নব নাট্য-আন্দোল পথে চালিত হইবে, ইহাই এ যুগের প্রধান সমস্যা। এ যুগে নাট্যকারগণ যদি জনপ্রিয়তার বা popularityর মোহে শুধু তরল ও চটুল জিনিষ পরিবেশন করেন, অথবা চলচ্চিত্রের প্রভাব হইতে হইতে পারেন, তবে তাঁহারা দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের পথেই লইয়া যাইবেন। আজ শত সমস্যায় নিরাশায় মুহ্যমান, লক্ষ্যভ্রষ্ট বাঙ্গালী জাতিকে আশার সঞ্জীবনী বাণী শুনাইবার, তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের দীক্ষিত করিবার, তাহাদের রুচি ও প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন সাধন করিবার দায়িত্ব নাট্যকারদের ও ত স্বত্বাধিকারীদের। কে অগ্রণী হইবে?

উৎকৃষ্ট বার্লি বলিতেই লিলি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, টাট্‌কা ও স্বাস্থ্যপ্রদ

সকল বয়সে ও ঋতুতে সমান উপযোগী

সোভিয়েট রঙ্গমঞ্চ

[illegible]

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে নরনারীর সাংস্কৃতিক জীবনে রাশিয়ার রঙ্গমঞ্চ, অপেরা, চলচ্চিত্র, পুতুলনাচ ইত্যাদি মহান শিল্পের আদর্শ রেখেছে। এবং শুধু রাশিয়ার নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে প্রভা করেছে। বর্তমান চীনা নাটক তার বাইরের কাঠামো আগের মতো থাকলেও রূপ প্রভাবে অনেক প হয়েছে। পূর্ব ইউরোপে হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশেও নাট্যের নব নব বিকাশ হ ইউনেসকো আন্তর্জাতিক নাট্যকলার বিকাশে বহু প্রচেষ্টা করছেন এবং ভারতে তার শাখা কাজ শুরু ক কিন্তু মস্কো প্রভৃতি স্থানে বিখ্যাত শিল্প ও গবেষণাকেন্দ্র কোন্ কোন্ দিকে কাজ করেছে সে বিষয়ে গৌরব কলকাতা রঙ্গমঞ্চের প্রযোক্তা ও শিল্পী সংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে দু একটি কথা লিখলাম

নাট্যকলা জনমানসে যত গভীর প্রভাব বিস্তার করে অপর কোনো ললিতকলাই তেমন পারে মানুষের শিক্ষাবিস্তার এবং তার রুচি ও শিল্পরুচি বর্ধনের যতগুলি মাধ্যম আছে তার পুরোভাগে নাট্যকলার

জনমানসে সোভিয়েট রঙ্গমঞ্চের অপরিসীম প্রভাবের মূলে আছে তার আদর্শগত ও শিল্পগত দৃষ্টি বহুমুখীনতা এবং গণজীবনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। সোভিয়েট রঙ্গমঞ্চের মহান সংস্কারক স্তানি প্রবর্তিত অভিনেতাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি এক কল্যাণপ্রসূ প্রভাব বিস্তার করেছে। নাটকের বা রূপায়ণ, প্রত্যক্ষ জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহমুক্তি এবং শিল্পী যে চরিত্র রূপায়িত করছেন তার মনস্তত্ত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধির জন্যে শিল্পীকে শিক্ষাদানের পন্থা ও পদ্ধতির সমন্বয় স্তানিস্লাভস্কির নাট্যশৈলীতে সাধিত। শুধু সোভিয়েটে নয়, রাশিয়ার বাইরেও স্তানিস্লাভস্কির নাট্যশৈলী অনুসৃত হয়েছে। যখন মস্কো আর্ট থি ফ্রান্সে প্রথম পরিভ্রমণ করে, তখন ফ্রান্সের প্রখ্যাত নট, প্রযোজক ও নাট্য-তত্ত্বাবধায়ক আন্দ্রে বলেছিলেন, মস্কো নাট্য-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তাঁর শিক্ষা গ্রহণের আছে, কারণ স্তানিস্লাভস্কির সোভিয়েট রঙ্গমঞ্চে যেভাবে সংস্কার সাধন করা হয়েছে তিনি চেষ্টা করেও তা পারেননি। ইংলণ্ডে অ ও প্রযোজক মাইকেল রেডগ্রেভ স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতির সমর্থক ও প্রচারক। তাঁর রচিত 'দি ওয়েজ এণ্ড মীনস্' নামক পুস্তকে তিনি বলেছেন, স্তানিস্লাভস্কি প্রবর্তিত পদ্ধতি হচ্ছে অভি শিক্ষাদানের সর্বোত্তম পদ্ধতি। বিশিষ্ট মার্কিন মঞ্চ-পরিচালক হ্যারল্ড ক্লারম্যান লিখেছেন, একমাত্র নাট্যপদ্ধতি যা তিনি জানেন তা হচ্ছে স্তানিস্লাভস্কির পদ্ধতি। বস্তুত, ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জগতে স্তানিস্লাভস্কির পদ্ধতি যে একটা মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

সাম্প্রতিককালে সোভিয়েট রঙ্গমঞ্চগুলি অভিনব নতুন নতুন নাটক পরিবেশন করে সাফল্য অর্জন করেছে। তার মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হচ্ছে ভিসেভোলড ভিসনেভস্কী রচিত 'দি ওপ

ট্যাভেডি', নিকোলাই পোগোডিন রচিত 'ক্রেমেলিন চিমস্' এবং 'দি থার্ড প্যাথেটিক', গালিনা নিকোলেং রচিত 'ব্যাটল অন্ দি হুইলস্', এবং ভি. রোগ রচিত 'ইন সার্চ অফ্ হ্যাপিনেশ'। শেষোক্ত নাট তরুণদের উদ্দেশ্যে রচিত। তরুণদের জীবনে কিভাবে চলা উচিত, কিভাবে তাদের কাজ করা উচিত। কিভাবে ভালবাসা উচিত তার মর্মবাণী এই নাটকে মূর্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিশু রঙ্গালয় কর্তৃক ও দক্ষতা ও শিল্পশৈলীর সঙ্গে এটি অভিনীত হয়েছে। শিশু নাট্যমঞ্চকে রাশিয়ায় ঘুগান্তর এনেছে।

মালি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত লিও তলস্তয়ের 'দি পাওয়ার অফ ডার্কনেস' নাটকটি রাশিয়ান ক্লাসিক নাটকসমূহের আধুনিক সর্বোত্তম পরিবেশনার মধ্যে অন্যতম।

মস্কোকোতস্কি থিয়েটারে নিকোলাই ওকলোপকভের পরিচালনায় আলেকজেণ্ডার অস্ট্রোভ্স্কি প্রভৃতি বিশ্বনাট্যকারদের বিয়োগান্তক নাটক 'স্টর্ম'-এর অভিনয় বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। এই নাটকের নাম-ভূমিকায় তরুণী অভিনেত্রী ই কোভিরেভা তাঁর অনন্যসাধারণ নাট্যপ্রতিভা ও অনুভূতির সা পরিচয় দিয়েছেন।

সোভিয়েট রঙ্গমঞ্চে শুধু রাশিয়ান নাট্যকারদের রচিত নাটক নয়, বহু রঙ্গমঞ্চে শ্রেষ্ঠ বিদেশী নাটকও অভিনীত হয়ে থাকে। এই সব নাটকের মধ্যে যেগুলি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে সেগুলি হলো ইতা নাট্যকার এডুয়ারডো ডি ফিলিপোর 'ওয়ানস ওন ফ্যামিলি' এবং 'ফিলুমেনা মারটুরানো' ফিনিসীয় না রচয়িত্রী হেলা ডিয়োলিওকির নাটক 'জাস্টিন' এবং তরুণ গ্রীক নাট্যকার জি সেবাস্তিপোকলুর 'দি অ্যাক্রেস

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সোভিয়েট রঙ্গমঞ্চের সকল নতুন ও চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্যের আলোকপাত করা সম্ভব নয়। অতীতের কয়েক বছরে অধিকাংশ নাটকই অভিনেতা অভিনেত্রী, প্রযো এবং নবীন ও প্রবীণের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় পরিবেশিত হয়েছে। এই সকল নাটকের চরিত্র যেমন বি তার বিষয়বস্তু ও নাট্যশৈলীও তেমনি বিচিত্র। এ থেকেই উপলব্ধি করা যায় গণতন্ত্রবাদী সোভিয়েট ন প্রযোজকরা কত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্পীশৈলী নিয়ে নাটক উপস্থাপন করেন। গুণগত বিচার করলে স নাটক-অভিনয়ে হয়তো সমান উৎকর্ষ দেখা যাবে না। তবে নতুনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কিছু ভুলভ্রান্তি থাকেই এবং অসাফল্যের মধ্য দিয়ে সাফল্যের পথ রচিত হয়।

সোভিয়েট রাশিয়ায় সোভিয়েট শিল্পী পরিচালিত বহুসংখ্যক নাট্য শিক্ষায়তন আছে। এই স শিক্ষায়তনে খ্যাতনামা রাশিয়ান অভিনেতা অভিনেত্রী এবং প্রযোজকেরা তাঁদের জীবনের মূল্যবান অভিজ্ঞত বাস্তবানুগ ঐতিহ্যধারা নিয়ে তরুণ অভিনেতাদের অভিনয়শৈলী শিক্ষাদানের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকেন

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ছাড়া সোভিয়েট রাশিয়ায় বহু সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ও আছে। শুধু এক রাশি কেন্দ্রাবেশনে ৯০০টি সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় আছে। তাঁরা পেশাদার বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে ন অভিনয় করে থাকেন। সোভিয়েট জনসাধারণের গভীর নাট্যানুরাগ ও দৃষ্টির উচ্চমান এই সৌখীন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিফলিত। সোভিয়েট নাট্যকলার প্রগতিতে এক নতুন অধ্যায় এতে সূচিত হয়েছে জনজীবনের সঙ্গে সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার বন্ধন হয়েছে দৃঢ়তর।

আমেরিকার নাটক ও রঙ্গমঞ্চ

অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়

প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর আগে আমেরিকার উল্লেখযোগ্য নাটক রচিত হয়নি। ঊনবিংশ শত শেষার্ধে কিছু কিছু পূর্ণ হাস্যরস ও তাঁড়ামিপূর্ণ কৌতুকনাট্য (Burlesque) অনুষ্ঠিত হতো। আ কাল পর্যন্ত আমেরিকার পুস্তকব্যবসায়ীরা কপিরাইট আইনের কোনো ধারই ধারতেন না। ব্যবসাটা ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা বুঝতেন, শুধু দেশের সাহিত্যসংস্কৃতির কি দশা হলো তার কোনো খ রাখতেন না। অনেক সময় ইউরোপ থেকে নাটক আমদানি করা হতো। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আ লিঙ্কন আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। এই বিষয় নিয়ে টম টেলার নামে একজন ইংরেজ যে না রচনা করেন তা এই সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। অনেক সময় উপযুক্ত নাটকের অভাবে উপন্য নাট্যরূপ দেওয়া হতো। উদাহরণস্বরূপ 'টমকাকার কুটির' ও 'দি গিল্ডেড এজ' উপন্যাস দুটির উল্লেখ করা যায়। জনসাধারণও মেলোড্রামার ভক্ত ছিল। ভাষাইতাবোধকে কোনো কোনো সময় অভিনন্দিত করলেও, আমেরিকার নাটক দেখতে চাইতেন না। বেলাস্কোর প্রতিভা ছিল, সফোক্লিসের 'ইলেকট্রা' নাটকের প্রযোজনা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন খ্যাতকীর্তি ইউরোপীয় না স্ট্রিণ্ডবার্গ, হাউপট্মান, সুডারমান, বার্ণার্ড শ' প্রমুখ নাট্যকারদের কীর্তির তুলনায় বেলাসেকার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বললেই চলে।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে অথবা তার কাছাকাছি সময়ে স্বপ্নেও ভাবা যেত না যে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে আ তেমন মূল্যবান কিছু দিতে পারবে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোর নিউ থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হলো। বছর পরে নিউইয়র্কেও অনুরূপ থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হলো। নাটকের নতুন পরীক্ষা শুরু হলো। খ্রীষ্টাব্দে জর্জ পিয়ার্স বেকারের প্রেরণায় ও আনুকূল্যে নাটক রচনা শুরু হয়, এর থেকে হার্ভার্ডের '৪৭ ওয়ার্কশপ'-এর জন্ম হয়। কবি-নাট্যকার উইলিয়ম ভগান মুডির 'দি গ্রেট্ ডিভাইড' (১ 'দি ফেইথ্ হীলার' (১৯০৯) নাটক দুটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের দুটি বিশিষ্ট রচনা। পাইপার অব্ হ্যামেলিন' কাহিনীটির কাব্যনাট্যরূপায়ণও নিউ স্ট্র্যাকোর্ড থিয়েটারে খুব জনপ্রিয় হ কিন্তু কাব্যনাট্য ও গদ্য উপন্যাসের নাট্যরূপের মাধ্যমেও আমেরিকার নাট্যজাগরণ সম্ভব হয়নি।

শত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই লিট্‌ল থিয়েটার আন্দোলন শুরু হলো। গোটা আ জুড়ে ছোট ছোট অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী তাদের নতুন অভিযান শুরু করলো। তারা ছোট ও অল্পটি নাটক নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে একদল অভিনেতা ও নাট্যকার প্রতিভা মিলিত হলেন—তাঁদের বলা হতো প্রভিন্সটাউন অভিনেতৃসংঘ। পর বছর গ্রীষ্মকালে এঁদের সঙ্গে মিলেন বরুণ নাট্যকার ইউজিন ও' নীল—অল্পকালের মধ্যেই তিনি এই সংঘের নেতা হয়ে উ

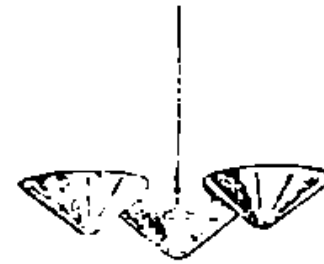

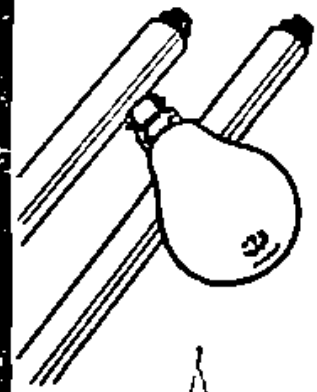

এ বছর এমন উপহার দিন যা কাজে লাগবে

এই উৎসবের আনন্দের দিনে একটা উপহারের মত উপহার দিতে চান? এমন জিনিস দিন যা আপনার পরিবার সারা বছর ঘরে ব্যবহার ক'রতে পারবে—যেমন জি. ই. সি.-র ইলেকট্রিক্ হিটার, ইস্ত্রি কিংবা রং-বেরং-এর আধুনিক ল্যাম্প শেড। সত্যিকারের কাজের জিনিস ব'লেই আপনার পরিবারের সকলে এ উপহার পেলে সুখী হবেন।

G.E.C.

ঘরের কাজের নানা জিনিস

বাল্যকাল থেকেই থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল—তাঁর পিতা ছিলেন একজন অভিনেতা। ১৯১৩-১৪ মধ্যে তিনি কয়েকখানি নাটক লিখেছিলেন। বেকারের '৪৭ ওয়ার্কশপে'ও যোগ দিয়েছিলেন, প্রিন্সটাউনে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'বাউণ্ড ইস্ট' নাটকটি অভিনীত হয়।

এই সময় থেকেই আমেরিকার রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যায়। নিউইয়র্ক ছি সমস্ত আন্দোলনের কেন্দ্র। প্রিন্সটাউন অভিনেতৃসংঘ গ্রীণউইচ গ্রামে একটি ছোট থিয়েটার প্র করেছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এই ক্ষুদ্র নাট্য সংস্থাটি পূর্ণাঙ্গ রূপে পরিণত হয়ে কয়েকটি পঞ্চাংক ও একাংকিকার অভিনয় করেন। যদিও পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের তুলনায় তাঁদের দর্শকসংখ্যা ছিল তবুও তাঁদের উদ্দীপনার অভাব ছিল না। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁরা সাতচল্লিশ জন লেখকের তিন খানি নাটক অভিনয় করেছিলেন। লেখকদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন আমেরিকান।

এ ছাড়াও এই সময় নিউইয়র্কে অন্যান্য নাট্যগোষ্ঠীও ছিল। ওয়াশিংটন স্কোয়ারের অভি স্থাপিত হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁরা একাংকিকার উপরই প্রধানত জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু যু এদের প্রচেষ্টা ব্যাহত হলো। যুদ্ধের পরে 'থিয়েটার গিল্ড' নাম নিয়ে তাঁরা পুনরায় আত্মপ্রকাশ ক ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা নিজস্ব মঞ্চও প্রতিষ্ঠা করলেন। ও'নীলের কয়েকখানি নাটকও এখানে অভিনীত হ

বড়ো বড়ো শহরে অনুরূপ অনেক নাট্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পেশাদারী থি জনপ্রিয়তা কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি। 'এ বিজ আইরিশ রোজ' (১৯২৪) আড়াই হাজার বার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। ও'নীলের কোনো নাটকও এত বেশী দর্শক সাফল্য লাভ করে নি অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীরা ব্রডওয়েকে প্রভাবিত করেছিল। আজ 'এ বিজ আইরিশ রোজ' জাতীয় কথা কারো মনে নেই, কিন্তু ও'নীলের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

ও' নীল সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে: America known other play wrights before but with him American drama makes its real entry into the world theatre. নাটকের বিচিত্র আংগিক নিয়ে তিনি সারা জীবনব্যাপী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তিনি 'এক্সপে টেক্‌নিক'-কে নানাভাবে পূর্ণাংগ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিচিত্র দৃশ্যপটকে তিনি সংহত সিটিংয়ের একটি সামান্য ডেকই তাঁর দৃশ্যপটের পক্ষে যথেষ্ট। জটিল প্লট বর্জন করে ও'নীল অত ও সাধারণ জিনিসকে অবলম্বন করলেন: একজন সাধারণ নাবিক জাহাজের মধ্যে যারা আছে কিংবা লম্পট, নিগ্রো মেয়ে ও বিশ্রী মদ নিয়ে তার পংকিল জীবন যাপন করছে। সংলাপের মধ্যেও তিনি অতি নাটকীয় রীতি বর্জন করেছেন। 'স্ট্রেঞ্জ ইন্টারলিউড' নাটকে ও'নীল চেতনাপ্রবাহের নিগূঢ় নাটকের ক্ষেত্রে নিয়ে এলেন। চরিত্রের নিগূঢ় চিন্তাকে সংলাপের আকারে পরিবেশন করা 'মুরনিং বিকামস্ ইলেক্ট্রা'-তেও তিনি নতুন রীতির প্রয়োগ করেছেন।

সিডনি হাওয়ার্ড, এস. এন. বেহরম্যান, ফিলিপ ব্যারি (এঁরা সকলেই ৪৭ ওয়ার্কশপের মানদ রবার্ট শেরউড, মোস হার্ট, জর্জ কপম্যান প্রমুখ নাট্যকারেরা আমেরিকার নাট্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক

হাওয়ার্ডের 'দে নিউ হোয়াট দে ওয়ানটেড' (১৯২৭) নাটকটিতে, কিভাবে একটি তরুণী প্রতারিত। একজন বৃদ্ধকে বিয়ে করেছে—এই সমস্যাটিকে চমৎকারভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 'দি সিলভার ব (১৯২৬) নাটকটিতে অন্ধ মাতৃস্নেহের পরিণাম দেখানো হয়েছে। বেহরম্যানের 'বায়োগ্রাফি' একটি মার্জিত

শতকরা ২০ ভাগ অধিক শক্তি সম্পন্ন, আটার মেষেতের মধ্যে ঘণ্টায় ৫০ মাইল গতিবেগ ; খাড়াই পার্ব্বত্যপথে অনায়াসে আরোহণ ; নিরাপদে অধিক দূর গমন ; এই সব গুণ শতকরা ২০ ভাগ মিতব্যয়িতা। পরিচালক।

ওভারহেড ভালভ, ইঞ্জিন সংযুক্ত নূতন এমবেসেডার গাড়ী হইতে আপনি এই সব সুবিধা পাইবেন। মোটর চালকগণ এই শ্রেণীর অন্য কোন মোটর গাড়ীতে এরূপ সুবিধা পাইবেন না।

হিন্দুস্থান Ambassador

প্রভূত শক্তিসম্পন্ন মোটর গাড়ী
হিন্দুস্থান মোটরস্ লিমিটেড, কলিকাতা-১

কমেডি। ফিলিপ ব্যারি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের জন্যও কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু তিনি অপেক্ষ দুরূহ বিষয় নিয়েও নাটক লিখেছেন। তাঁর 'হোটেল ইউনিভার্স' (১৯৩০) নাটকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানিবলের অভিধান নিয়ে রবার্ট শেরউড 'দি রোড্ টু রোম' (১৯২৭) নামে যে ব লিখেছিলেন, তাতে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। হার্ট ও কফ্‌ম্যান দুজন মিলে কয়খানি উল্লে কমেডি রচনা করেছেন। এই যুগের নাট্যকারদের সংলাপগুলি পরিচ্ছন্ন ও উন্নততর। কোনো ে নাটক ও' নীলের নাটকের চেয়ে ভালো লেখা হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের নাট্যকারদের মধ্যে এল্‌মার রাইস ও জন হাওয়ার্ড লসনের নাম উল্লেখযোগ্য। রাইসের 'দি অ্যাডিঙ্ মেসিন' (১৯২৩) নাটকটিকে একখানি পরীক্ষামূলক নাটক বলা যায়। লসনের 'প্রসেশন্যাল' নাটকটি নতুন টেকনিকে লেখা। ত্রিশের যুগের মার্কিন নাটকে এ প্রভাবও লক্ষণীয়। তবে এই সমস্ত নাটকে প্রচারধর্মিতার লক্ষণও আছে। অর্থনৈতিক বাস্তবতা নাটক লেখা হয়েছে। সিড্‌নি কিংস্‌লের ডেড্ এণ্ড (১৯৩৫) এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে উল্লেখ

আমেরিকার নাট্যসাহিত্যে লোকনাট্যেরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে লোকনাট্য আন্দোলনটি দানা বেঁধে ওঠে। অধ্যাপক কোচ উত্তর ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকনাট্য পরিষদ স্থাপন করেন। নিগ্রো কৃষক ও দরিদ্রের জীবনের প্রতিও নাট্যকারদের দৃ জেগেছে লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণেও লোকনাট্য আন্দোলন জেগে ওঠে। নিগ্রোর লোকনাট্যগুলি ত বিখ্যাত। অস্থায়ী ফ্রেডারাল থিয়েটারে নিগ্রো প্রডাকশান ছিল একটি মূল্যবান উপকরণ। ও ওয়েলসের নিগ্রো ম্যাকবেথ (১৯৩৬) বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রচেষ্টা।

এই নাট্য সংস্থা কর্তৃক মিরাক্যাল ও মরালিটি প্লেও অনুষ্ঠিত হয়। রেডিয়ো ও ডকুমেণ্টারী টেকনিকের সংমিশ্রণে নতুন ধরনের মরালিটি প্লে রচিত হয়। নিউইয়র্ক থিয়েটার সংস্থার মরালি ঈশ্বর ও শয়তানের দ্বন্দ্বকে, শ্রেণীসংঘাতের রূপকে দেখানো হয়; বলাবাহুল্য এগুলি নাটকীয় প্রভাবে এর সঙ্গে কোনো কোনো নাট্যকার কাব্যনাট্যের নব প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন। ওয়ালেস স্টিভেন্স ওয়েল অ্যাণ্ডারসন, আর্চিবল্ড ম্যাক্‌লিশ প্রমুখ নাট্যকারেরা আধুনিক যুগের কাব্যনাট্য রচয়িতা উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক কালের মার্কিন নাট্যকারদের মধ্যে টেনেসী উইলিয়মস্ ও আর্থার মিলারের নাম উল্লেখযোগ্য। উইলিয়ম্‌সের 'এ স্ট্রীটকার নেমড ডিজায়ার' (১৯৪৭), মিলারের 'ডেথ্ অব এ সে (১৯৪৯) নাটক দুটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তীব্র বাস্তবতাবোধ পর্যবেক্ষণদক্ষতা তাদের প্রাত্যহিক জগতের ধূলিতলে নামিয়েছে। তাদের নাটকে তাই জনসাধারণ নিজেদের জীবনকেই পেয়েছে। মার্কিন নাট্যসাহিত্য প্রকৃতপক্ষে এই শতাব্দীরই ফসল, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বনাট বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

সারা দেশে সকালের জনপ্রিয় সংবাদপত্র

দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক

আনন্দবাজার পত্রিকা

সংবাদে সকলের অগ্রণী

কিন্তু এমন একখানি সুন্দর সংবাদপত্র অনেকেই পড়তে পান না

কারণ তাঁরা বাস করেন গ্রামে—ডাকঘর থেকে বহুদূরে

যেখানে প্রতিদিন ডাক বিলি হয় না।

—বিশেষ করে তাঁদেরই জন্য আছে—

অর্দ্ধ সাপ্তাহিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

প্রতি সোম ও শুক্রবার প্রকাশিত হয়।

দৈনিক কাগজের সমস্ত খবর এতে পাবেন আর পাবেন উৎকৃষ্ট

প্রবন্ধ গল্প ও রস-রচনা। একাধারে সংবাদ ও

সাময়িক পত্র

কিন্তু

আপনার অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য আপনি হয়তো আরও কিছু পড়তে

চান, ভাল ছোট গল্প, সরল প্রবন্ধ, রম্যরচনা, সমালোচনা, অনুবাদ-সাহিত্য, সরস

টিপ্পনী, ভ্রমণ, সিনেমা ও খেলা-ধূলার সংবাদ। তাহলে—

সকলের প্রিয় সাপ্তাহিক

দেশ

পড়ে তৃপ্তি পাবেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিমিটেড, ৬নং মুক্তারকিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

চিত্রে

বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ

গল্প-ভারতী — শারদীয়া — ১৩৬৭

নরওয়েতে মঞ্চস্থ ইবসেনের 'পিয়ার গ্যুন্ট' নাটকের একটি দৃশ্য।

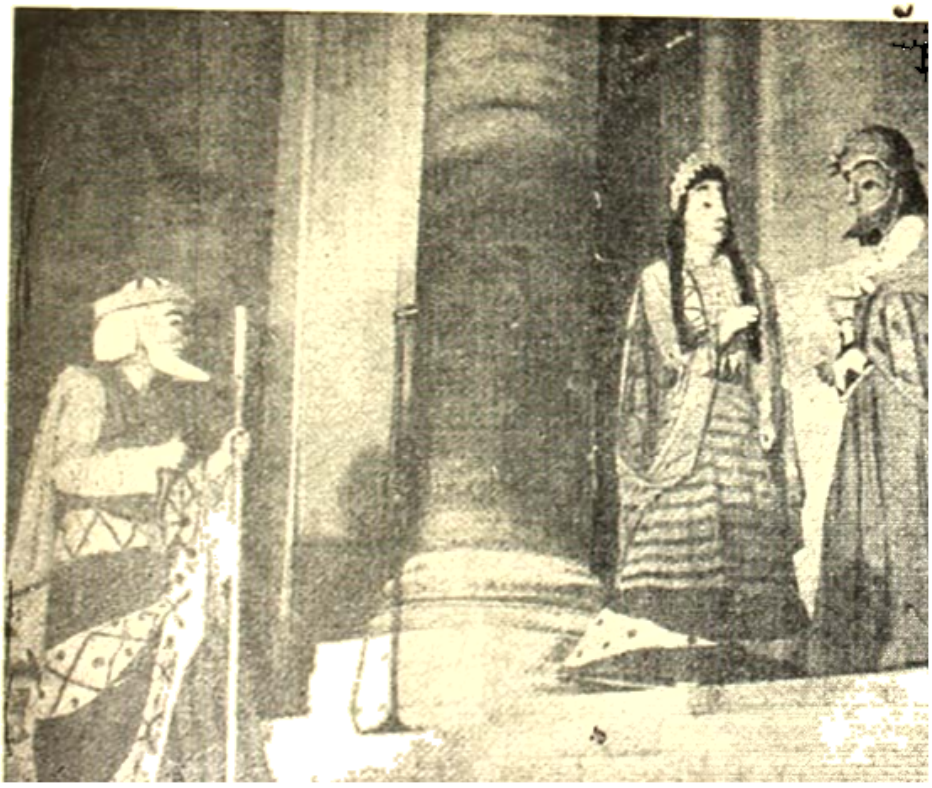

নাট্যকার অ্যাসচিলাসের চিত্ত 'অ্যাগমেমনন' নাটকের একটি দৃশ্য।

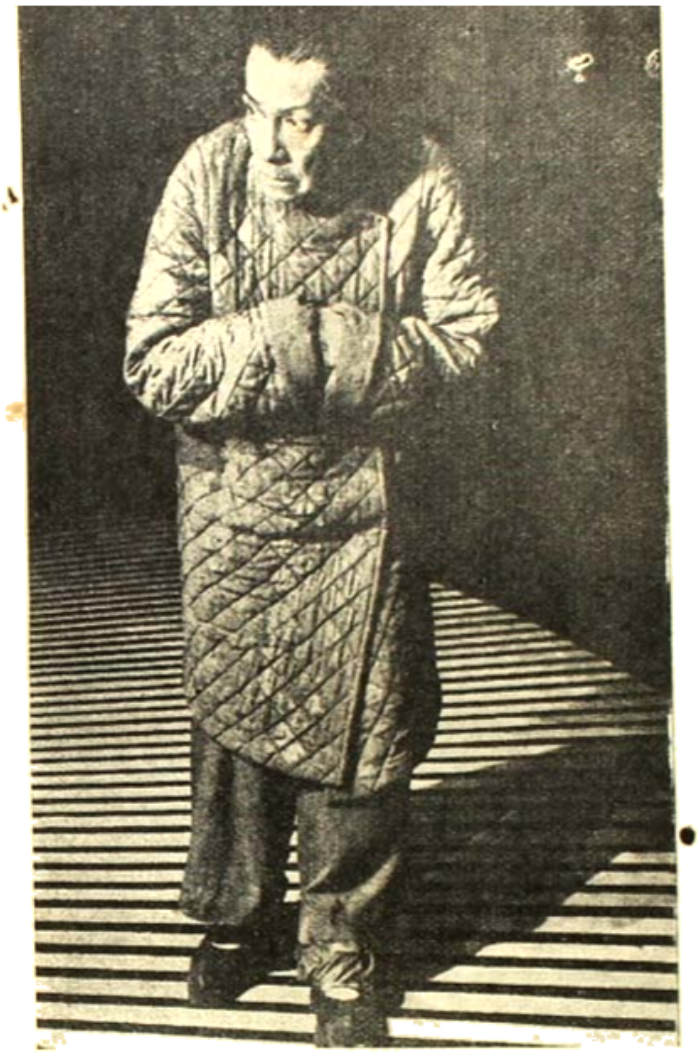

চিত্রে বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ

জার্মান নাট্যকার
ম্যাক্স ফ্রিশ রচিত
'দি চাইনিজ ওয়াল' নাটকের
একটি বিশিষ্ট ভূমিকায়
হিলা স্টুডিউএস।

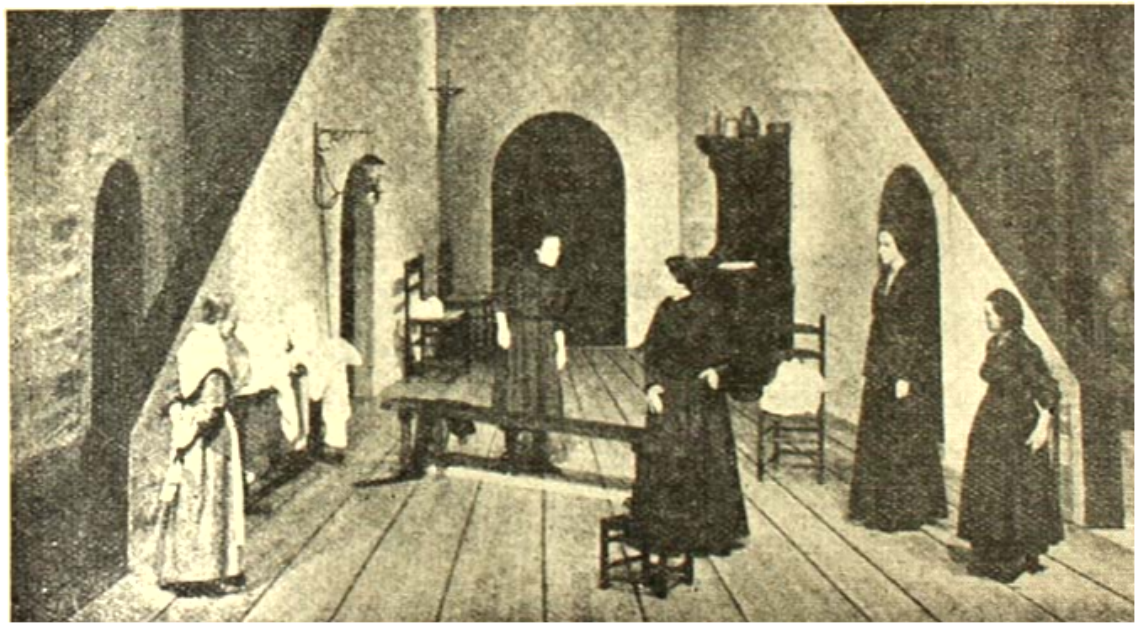

ফরাসী জাতীয় রঙ্গমঞ্চ কমেদি ফ্রানসাইসে (প্যারিস) অভিনীত ফলস্ কনফিডেন্স নামক বিখ্যাত নাটকের একটি দৃশ্য।

সের মাদ্রিদনি
ারে অভিনীত
স্পাওভেদের
ক আকর্ষণীয়
অভিনয় দৃশ্যে
ভিনেতা বাওরের
অপূর্ব ভঙ্গিমা।

চি
বি

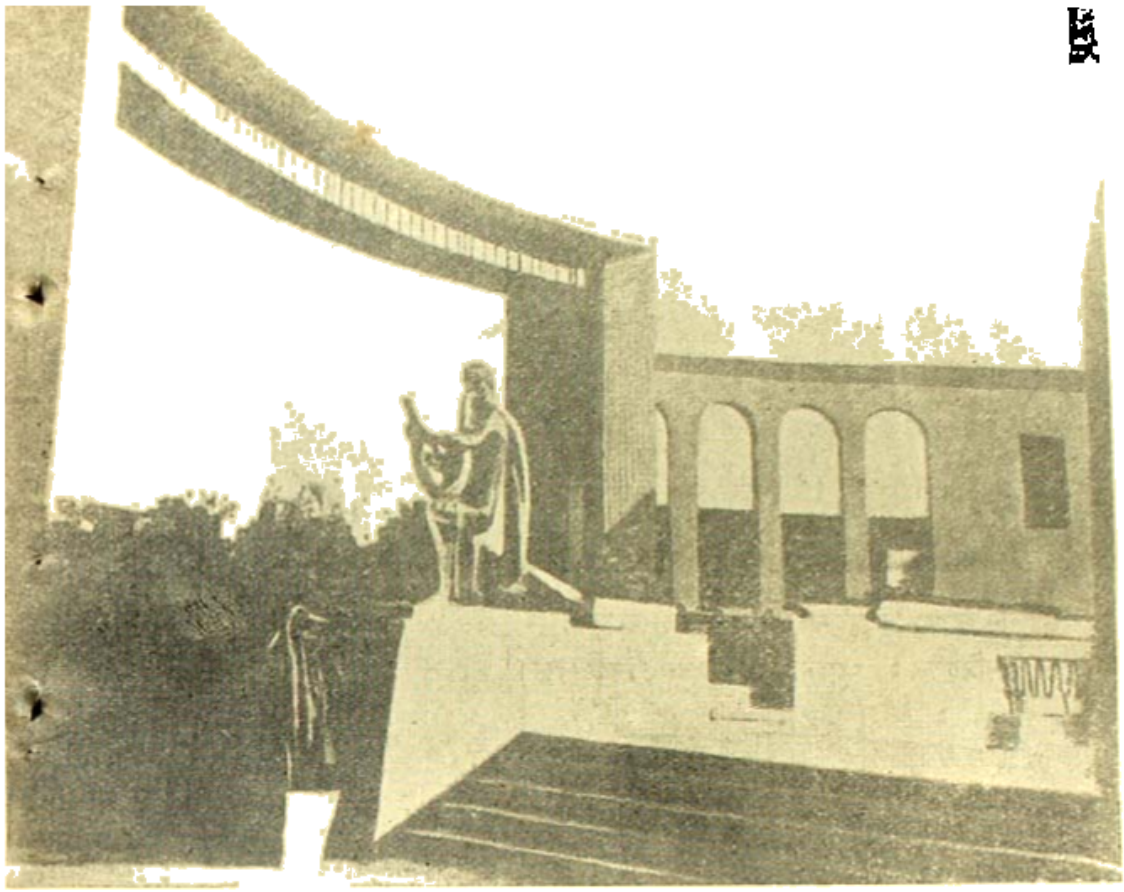

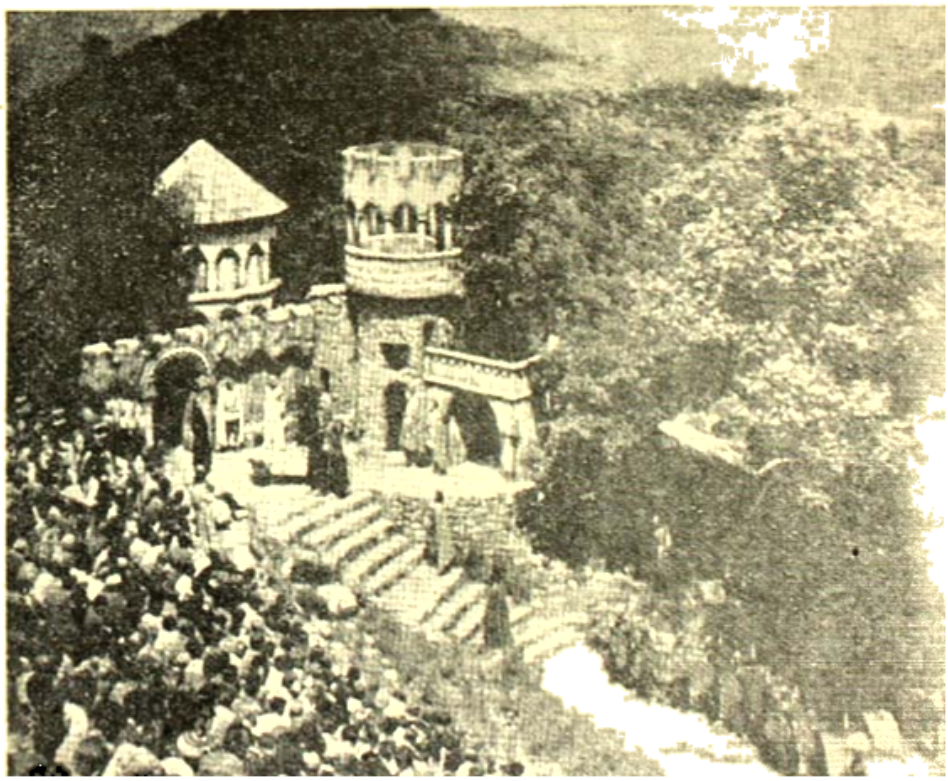

ফিচ্‌ জার্মানীর
ক্রোজন হুসবুর্গী
বাড় বিয়েটার থেন্‌।
একটি পুরনো ইতিহাস
প্রসিদ্ধ বাড়ীকে মঞ্চে
রূপান্তরিত করা
হয়েছে চারপাশের
প্রাকৃতিক পরিবেশের
কিছুটুকু পরিবর্তন
না করে

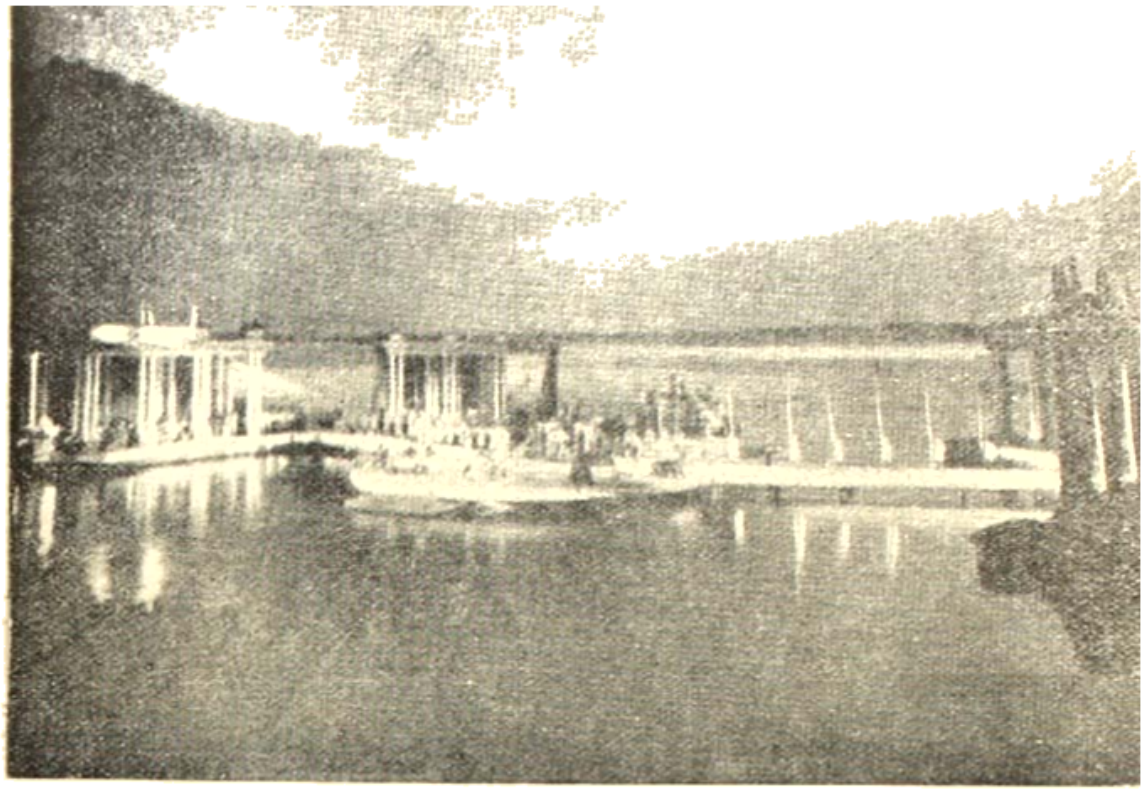

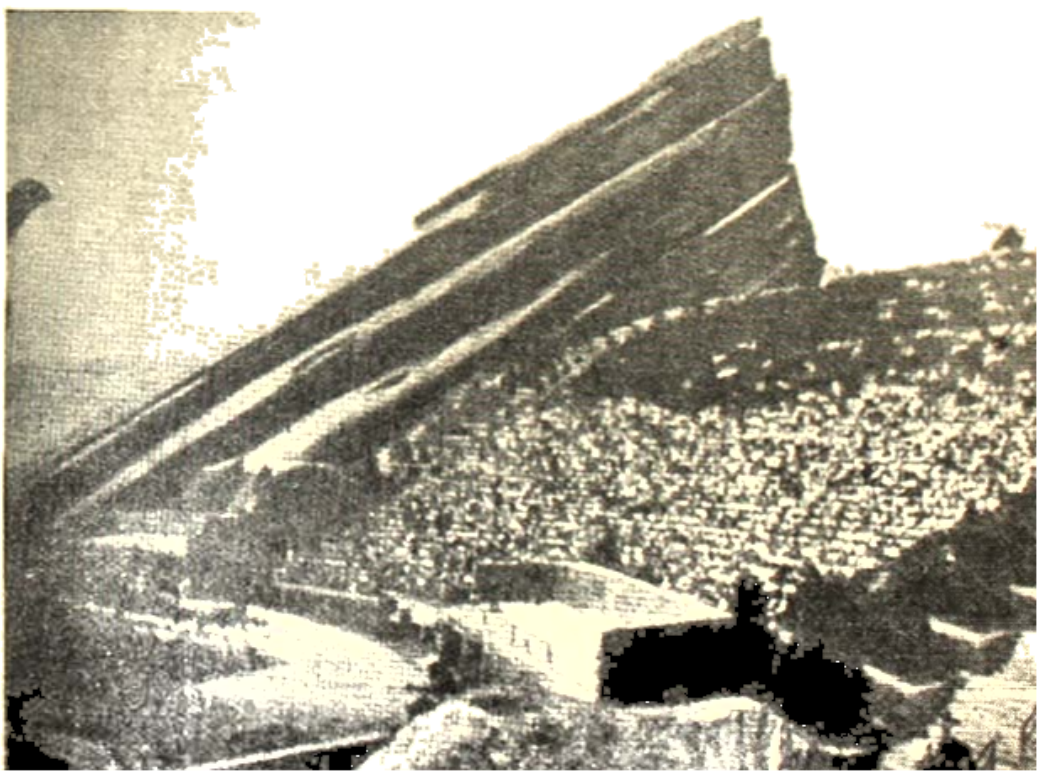

আমেরিকার কলোরাডোর রকি পর্বতের ক্লোজন লেকস্থলী : রেড রকস্ পার্ক থিয়েটার। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঢালু ভাবে এর আসন-গুলি তৈরী করা হয়েছে, এটা স্থাপত্য-শিল্পের এক অভিনব

বহু দর্শক-পরিবৃত্ত
মঞ্চে গীতি-নাট্যের
অভিনয়। আমেরিকার
ওহিও অঞ্চলের একটি
'মিউজিক-কার্নিভাল'।
অভিনয় ব্যবস্থাটি
আমাদের যাত্রাভিনয়কে
স্মরণ করিয়ে দেয়।

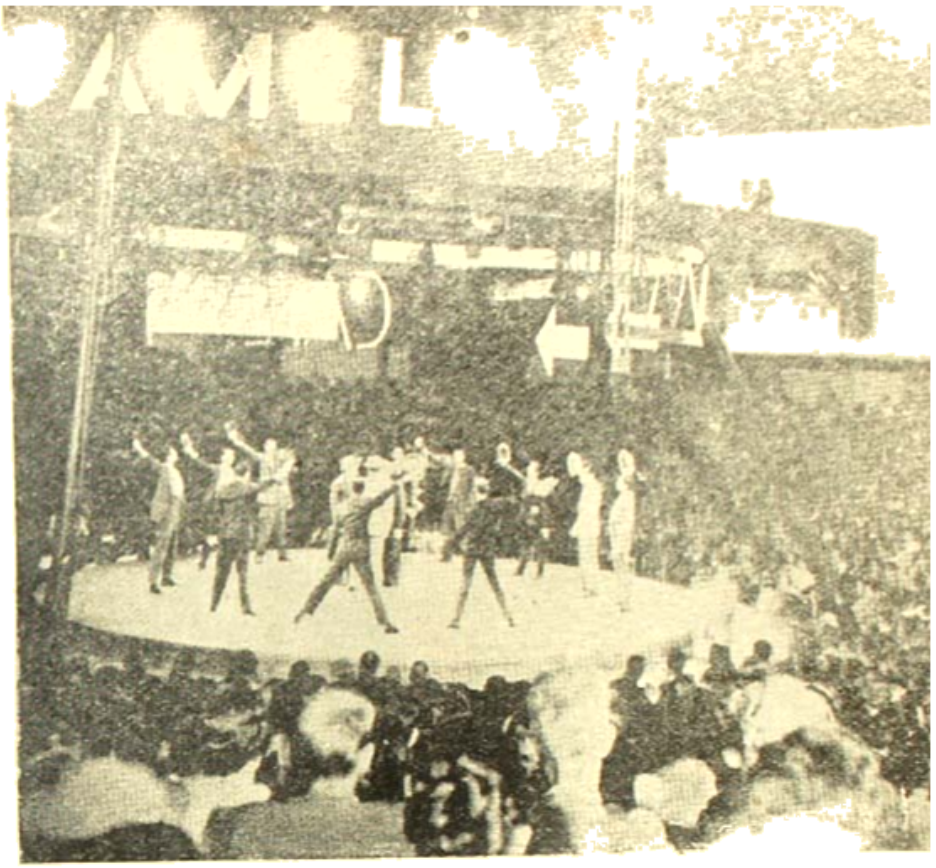

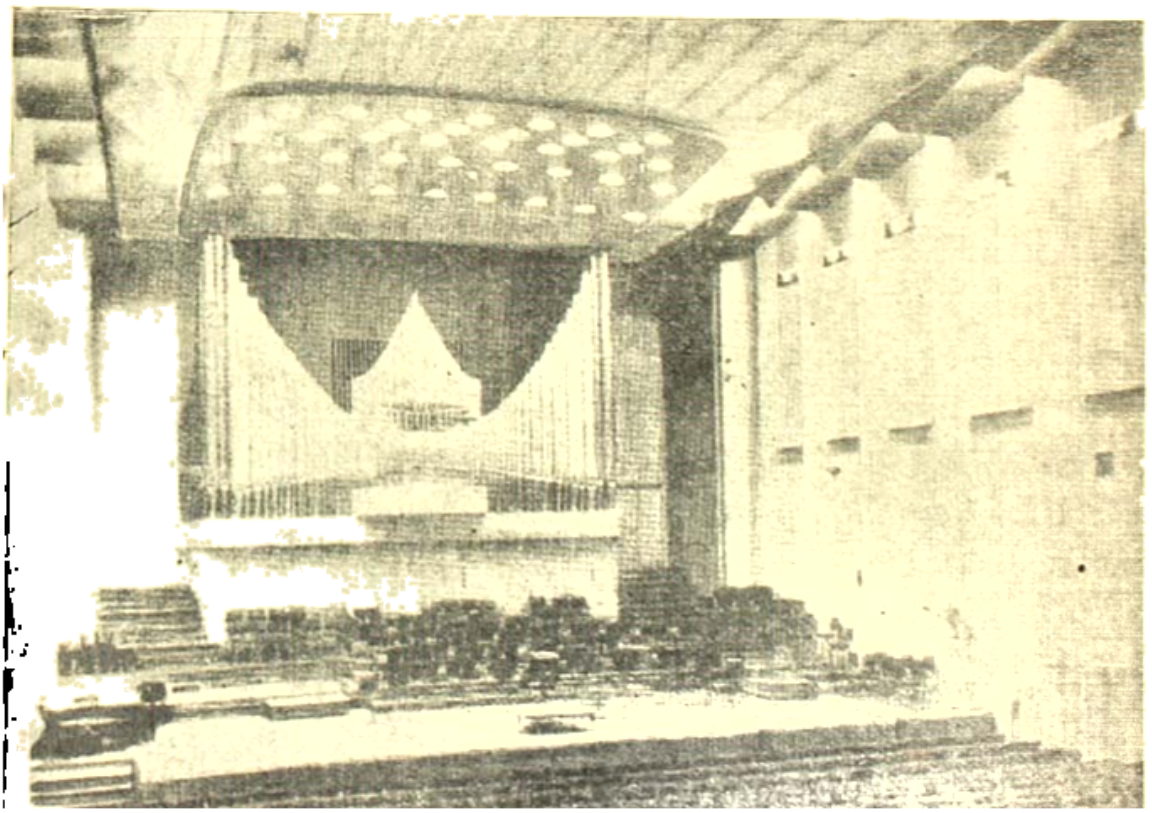

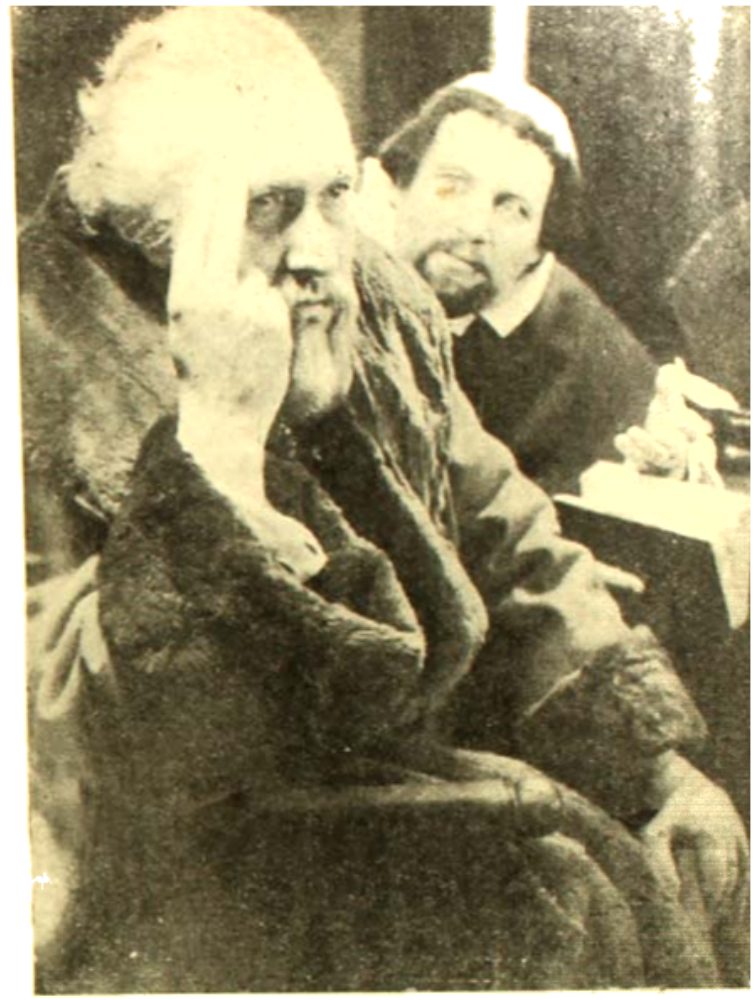

দুর্গাদিনী নাটকে পশুপতির ভূমিকায়

দেশবিদেশের খবর

মস্কোয় আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলন

সম্প্রতি মস্কোয় ২৫তম আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে
ভিন্ন ভিন্ন বক্তৃতায় সম্পাদক উইন্টারনিৎস নাম উল্লেখ করেন ভিন্নে মন্তব্য বিশ্লেষণের
ক্যালিদাস নাগ ও উইন্টারনিৎস আঁকে দেখা যাচ্ছে একদশকাল পরে এই মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল
রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পর্কে তুলিচিত্র ভাষণ দান করেন

তেয়াত্র্ ঘ্ ফ্রাঁস

ফরাসী নাট্যকলার আদি পর্বে আদিম অভিনয়ধারা বিদ্যমান ছিল। একাদশ শতাব্দী থেকে ে ধর্ম-নাটকের প্রাধান্য লক্ষ্যগোচর হতে থাকে। ফরাসী নাট্যকলা বা 'দ্রাম'-এর বিষয় ছিল ধ বাইবেলের কাহিনী। অভিনেতা ছিলেন যাজক ও অপেশাদার নট-নটী। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে দ্রামের ঘটতে থাকে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর সীমান্তে এসে তা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে 'মিস্তোয়্' বা মিস্ট মধ্যে। কিছুদিন আগে নোত্র্ দাম্-এ এই প্রাচীন নাট্যের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। বইটির না 'মিস্তোয়্ ঘ্ লা পাসিওঁ (মিস্ট্রী অফ্ দি প্যাসন)।

ধর্ম-বিরহী ফরাসী নাটকের জন্মও মধ্যযুগে, ধর্ম-নাটকের আবির্ভাবের কিছু পরেই। অল্পদিনে ধারা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সুতরাং পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত নাট্যকলার দুটি ধারা ফরাসী দেশে বিদ্যমান ধর্মমুখী ও ইহবাদী নাটক। ধর্মনাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—'মিরাক্ল্ ঘ্ থেয়োফীল', 'মিরাক্ল্ ঘ্ থাম' (১৩৪০ খ্রীঃ), 'লা ঘ্ সাঁ নিকোলা', 'মিসতোয়্ ঘ্ লা পাসিওঁ' (১৪৪০ খ্রীঃ) এবং আরো ও প্যাসন-প্লেগুলি। ইহবাদী নাট্যধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল মূলত ফ্যাবলিটি প্লে এবং লঘু হাস্যরসাত্মক ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের জনপ্রিয় নাটক ছিল 'লা ঘ্ লা ফইয়ে', 'সোতি ঘ্ লা প্রাঁস দে সো', দর্বা এ্ ঘ্ মারিওঁ' এবং পঞ্চদশ শতকের 'ফার্স্ ঘ্ মেত্র্ পাত্লাঁ' ইত্যাদি।

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে প্যারিতে প্রথম রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। একদল পেশাদার নটগোষ্ঠী মঞ্চটি নিয়ে অভিনয় করত। পরে এরাই 'রয়াল ট্রুপ্' রূপে অভিহিত হয়।

ইতিমধ্যে ইউরোপের বুকে জাগল রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের ঢেউ। অন্যদিকে ইতালীয় এসে পৌঁছল। ১৫৭০ খ্রীঃ প্যারিতে এক ইতালীয় নটগোষ্ঠীও এল 'কমেদিয়া দেল'আর্ত্' নিয়ে। চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল ফরাসী নাট্যকলা, যুগপ্রচলিত দ্রাম-এর পাশে এল নতুন ধরণের নাট্য প্রচলন। দেশের নানাদিকে নাট্য-আন্দোলন দেখা দিল, 'সাঁ জেরেম্যাঁ', 'সাঁ লোরা' ইত্যাদি নাট্যাভিনয় অন্যতম প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠল। মেলাগুলিতে অভিনয়ের জন্যে উঁচু মঞ্চ বাঁধা হত। আ ক্ষেত্রে তার দৃশ্যপট, পার্শ্ব ও পশ্চাৎপট থাকত না; শুধু মাথার ওপর খোলা আকাশ আর পেছনে ও বাসাবাড়ী। কিন্তু এই প্রচেষ্টাগুলি ছিল বিক্ষিপ্ত, অনেকটা আমাদের দেশের যাত্রার মতো। ফরাসী সুশৃংখল নাট্য-আন্দোলনের প্রথম প্রামাণ্য খবর পাওয়া যায় ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে।

ফরাসী নাটক ও নাট্যকলাও ক্লাসিসিজমের সংহতি ও শিল্পসৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠল এই এই বিকাশের প্রধানতম স্থপতি সপ্তদশ শতকের তিন স্বনামধন্য প্রতিভা—কর্নেইল, রাসীন এবং মা প্রথম দুজন গীতিকাব্য ও মহাকাব্যকে নিয়ে এলেন নাট্যজগতের এলাকায়, এবং শেষজন নিলেন প্র

কমেডী। কর্নেইল 'লা সিদ'-এ ফরাসী ট্র্যাজেডীকে গভীর স্তরে উন্নীত করলেন। তাঁর প্রধান নাট্যবি ছিল ইতিহাস ও রাজনীতি, তার সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছিলেন মানবতার সুর ও সাব্‌লিমিটির সুর। এ গুণে তাঁর 'হোরেস', 'সিনা' (১৬৪০ খ্রী:), 'পলিইকট্‌' (১৬৪৩), 'টিত্‌ এ বেরেনিস' ইত্যাদি রচ শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। জ্যাঁ রাসীন ছিলেন কর্নেইলের কনিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী; তাঁর ট্র্যাজেডীর মৌল বি ছিল—প্রেম। কর্নেইল শ্রুতি ও দীপ্তির ক্ষেত্রে ট্র্যাজেডীর যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, রাসীন তাকে কাব্য-সুরভিত করে তুললেন; তাঁর নাটকের প্রেমবৃত্তে ইতিকথা ও উপকথা সুন্দরভাবে মিলিত হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনাগুলির অন্যতম—'আন্দ্রোমাক', 'বেরেনিস', 'বাজাজে', 'ফিদ্র' (১৬৭৭), 'ব্রিটানিকাস' (১৬৬৯), 'আতালী' (১৬৯১)।

শুধু ফরাসী সাহিত্যের নয়, সর্বকালের সর্বাঙ্গসুন্দর কমেডীর অন্যতম শিল্পী—মলিএর। তাঁর প্রথ দিকের প্রহসনগুলি অবিমিশ্র অপ্রসাদিত, কিন্তু ক্রমেই তাঁর লেখনী সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে এবং দুর্বলদে প্রহসন পরিণত হয় শিল্পসম্মত 'কমেদী'তে। সমাজের নর-নারীর আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কে করে তিনি যেসব কমেডী অফ্‌ ম্যানার্স এবং কমেডী অফ্‌ ক্যারেক্টার লিখেছেন, তাতে জীবন সম্পর্কে এ গভীর ও সমন্বিত দৃষ্টি ও দর্শন প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখ্য—'লে' ক যে কাদ্‌ (১৬৬২), 'লা বুর্জোয়া জাঁতিওম', 'লা সিজাঁত্রপ' (১৬৬৬), 'লা' তার্ত' এবং 'তারত্যাফ (১৬৬৯)। ফরাসী নাটকের এই সমৃদ্ধির সময়ে ফ্রান্সের সিংহাসনে ছিলেন চতুর্দশ লুই। ১৬৭০ খ্রীষ্টা অভিজ্ঞতম ও দক্ষতম অভিনেতাদের নিয়ে গঠিত হল পেশাদারী নাট্যসংস্থা। সে সময়ে এঁদের বলা হত- 'পেসিঅন্তের' ও 'সোসিওতোর'।

এর পরের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস অষ্টাদশ শতাব্দীর সীমানায় এসে। এ সময়ের নাট্যকাররা ছিলে প্রধানতঃ বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক। তাঁরা মঞ্চকে ব্যবহার করতেন অন্যতম শিক্ষাধারকরূপে এবং আচরণবাদের দৃষ্টান্তস্থলরূপে। এই সময়ের অধিকাংশ রচনাই ছিল কমেডী অফ্‌ ম্যানার্স ও ক্যারেক্টার। তার মধ্যে মলিএরের নাটকে আবেগ ও রসমূরসের প্রাচুর্য ছিল। 'ক্রিস্পাঁ' এবং 'লিত্যাল্‌ ত-স' মেত্র' নাটকে লা সা একটি নতুন চরিত্র মঞ্চে আমদানি করলেন—প্রভুর বিশ্বাসঘাতক অনুচর। অর্থবানদের আক্রমণ করে তি নাটক লিখেছেন—'তুারকুয়ে'।

ভলতেয়রও ফরাসী নাট্যসাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন। নতুন সমাজের সংগঠন ও স্বরূপবর্ণনে তিনি প্রাচীন প্রথাকে বারবার আক্রমণ করেছেন। 'ঈদিপ' নাটকে তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন যাজকদে বিরুদ্ধে। অতঃপর ফরাসী রঙ্গমঞ্চে অশ্রুর বন্যা নিয়ে এলেন দিদ্‌রো। তাঁর 'লা পের ত ফামিএ' নাটকে (১৭৫১) করুণ রস সজল ও ঘনতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু বোমারশের 'লা বারবিয়ে ত সেভিল' এবং 'ল মারিআজ ত ফিগারো' ইত্যাদি কমেডীকে আশ্রয় করেই ফরাসী নাট্য ও অভিনয়কলা শক্তি ও ঐশ্বর্য সঞ্চ করেছিল। ১৭৯০ খ্রী: জাতীয় পরিষদ মঞ্চের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিল। ১৮১২ খ্রী: গড়ে উঠল আজ নাট্যশালা—'কমেদী ফ্রাঁসেজ'।

ফরাসী রোমান্টিক নাটকের জন্মলগ্ন ১৮৩০ খ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে। আলেকজান্দার দ্যুমা আ প্রোসপার্কস্য, ভিক্তর ইউগো এবং আলফ্রে দ ভিনী দিলেন গীতিকাব্যিক প্রসারধর্ম এবং আলফ্রে দ মুক্তি দিলেন কুমারীর নিরুদ্ধ প্রেমাবেগকে। জীবন ও মনকে সামনে রেখে রোমান্টিক নাটক রূপে মঞ্চসজ্জা সেদিন মেলল। বেলজিয়ান নাট্যকার মেতারলিঙ্ক এই পারিতে বসেই বিখ্যাত রূপক-সাংকে নাটকগুলি লিখেছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ স্থাপিত আঁতোয়ানের 'তেয়াত্র্ লীব্র্' (ফ্রি থিয়েটার) নাট্যরসি মধ্যে এক নতুন উত্তেজনা জাগিয়ে তুলল। আঁতোয়ান দৃশ্যপটে নিয়ে এলেন বাস্তবতা এবং অভিনয়ে স্বাভাবিকতা। তিনি নতুন নাট্য-প্রতিভার আবিষ্কার যেমন করেছেন, তেমনি টলষ্টয় ইবসেন প্রভৃতি নাট্যকারকেও উপস্থাপিত ও জনপ্রিয় করেছেন। তাঁর তেয়াত্র্ লীব্র্-এর অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ অনে শিল্পীও পাদপ্রদীপের সামনে সেদিন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন—পলফোর্ট, লুনে পঁ, জ্যাক কপো ও তাঁদের অন্যতম।

আভাঁগার্দ্ বা প্রধান প্রধান রঙ্গমঞ্চ ছাড়াও ফ্রান্সের 'বুলভার'-এর রঙ্গালয় উল্লেখযোগ্য। এ এবং কমেডী অফ্ ম্যানার্স্ই ছিল এগুলির মুখ্য অভিনেয়। এখানে বিভিন্ন সময়ে যাঁদের বই অ হয়, তাঁদের মধ্যে উল্লেখনীয়—সার্দু, লাবিশ, মরিস দনে, ফেদো, আলফ্রে কাপুস, দাশা গিত্রী, রেক্তে, ত্রুয়ার বুর্দে, আলফ্রে সাভোয়া, জ্যাক দ ফাল এবং সম্প্রতিকালের মার্সেল পানিঅল, ফের্দেনা, মার্সেল আশার, আঁদ্রে রুসাঁ, লুই ভুক্স প্রভৃতি।

গত শতকে ফরাসী সাহিত্য ও মঞ্চের মধ্যে একটা অলিখিত বিচ্ছেদ এসেছিল। এখন অ অবশ্য নেই। আঁদ্রে জীদ, পল ক্লদেল, কোলেৎ, জুল্ রোমাঁ, সাত্র্ প্রভৃতি সাহিত্যিক মঞ্চের মঞ্চে চালনা করেছেন। এযুগের অন্যতম সার্থক প্রতিভা জাঁ গিরদু এক নতুন ধরণের শৈলী ও কাব্য-ম আশ্রয়ে উপন্যাসেও অভাবনীয় নাটকীয় গতি সঞ্চারণে দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর নাটকে এই রূপ আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ। তাঁর 'জিগ্‌জিগ্', 'এলেক্ত্র', 'লা ফল দ পাইও' এবং 'লা গের দ ত্রোয়া ে পা লিঅ' (হেয়ার উইল বি নো ট্রোজান ওয়ার) সমধিক খ্যাত। শেষ গ্রন্থটি ক্রিস্টোফার ফ্রাই 'ট অ্যাট্ দি গেট্স্' নামে অনুবাদ করেন এবং অনূদিত সংস্করণটি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অভিনীত হয় পরের জনপ্রিয় নাটক কক্তোর 'মাশিন অ্যাফিরনাল' ও 'লে পের্' তারীব্ল্' এবং ক্রাঁসোয়া মরি 'আস্‌মোদে'। আঁরি দ মঁতেরলার প্রতিভার স্বাক্ষর 'লা রেন মর্ত' ও 'লা মইত্র্ দ লাঁতিয়াগ' নাট্যসাহিত্যের অন্যতম দিগ্‌দর্শন বলে পরিগণিত হয়েছে। জ্যাঁ পল সার্ত্র-এর 'লে মুশ্', 'লে মাঁ 'লা দিয়াব্ল্ এ লা বঁ দিয়ু' এবং আলবেয়ার কামুর 'ক্যালিগুলা' নাটকের মাধ্যমে জীবন ও জীবন অতি সুন্দরভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত করা হয়েছে। জুল সুপারভিয়েলের 'লেহেরেজাদ', 'লা ক্লসার এবং আদিবেয়ির 'লা ম কোর' নাটকগুলিতে আধুনিক অতিবাস্তবতার আমদানী করা হয়েছে।

বর্তমান ফরাসী নাট্যকারদের মধ্যে দুজন নিঃসন্দেহে শক্তিমান—জ্যাঁ আনুইল এবং আরথা সা আনুইলের নাট্যপ্রতিভা বহুবিচিত্র ও বহুবিস্তৃত। তিনি 'এরমীন'-এর মতো রোমান্টিক নাটক লি

আবার 'তোহার জার সাঁ বার্গাত্র'-এর মতো বস্তুপ্রধান নাটক বা 'জাঁতিগন'-এর মতো রাষ্ট্রিক নাটক লিখেছেন। সালাত্রু নাট্যদ্বন্দ্ব ও নাট্যরসের বিস্তারে অসাধারণ পারদর্শী। তাঁর এই শিল্পপ্রতিভার স্বা 'লা তের এ রঁদ' এবং 'লে নিউই ত লা কলেত্র'। ওপরে উল্লিখিত নাটকের বেশির ভাগই যুদ্ধের সময়ে লেখ

ফ্রান্সের জাতীয় নাট্যশালা 'কমেদী ফ্রাঁসেজ' একটি সক্রিয় সংস্থা। এখানে পুরনো নতুন ধরণের উৎকৃষ্ট নাটকই অভিনীত হয়। অনেক বিখ্যাত নাট্য-পরিচালক এখানে সমবেত হয়েছিলেন—কে ছুভে, বাতি, হুলাঁ, বারো। ফরাসী অপেরা ও অপেরা-কমিকের খ্যাতি দেশ ও বিদেশজোড়া। এখানে পুরনো ও নতুন বইয়ের প্রতি সমান পক্ষপাতিত্ব। পল ক্লদেলের 'জ্যান্ ও বুসে' এ যুগের একটি বিখ্য অপেরা-নাট্য। এখনকার ব্যালেও জনপ্রিয় ও সমাদৃত। বিভিন্ন ব্যালে দলের মধ্যে প্রসিদ্ধ হল : লে লিফারের পারি অপেরা বালে, শাঁ-জে-লিজে বালে এবং হুলাঁ প্যতা ও জনিন শর'র ব্যালে দল। নাট্য জগতে ফরাসীদের আর একটি অবদানও উল্লেখযোগ্য। এখনকার কয়েকটি ছোট-ছোট রঙ্গালয়ে আ বাস্তবতার নামে নানা নিষ্ঠুর ও বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা করা হয় এবং প্রয়োজনস্থলে বিচিত্র যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। অনেক দর্শক, বিশেষত মহিলারা এইসব দৃশ্য দেখে প্রেক্ষাগৃহেই অনেক সময়ে অজ্ঞ হয়ে পড়েন। তবু দর্শকের অভাব হয় না। বার্তমানিক বিক্ষোভ ও বিভিষিকাই এই অদ্ভুত ও বীভৎস রসে প্রয়োজনা এবং আস্বাদনের মূলে সক্রিয় বলে মনে হয়।

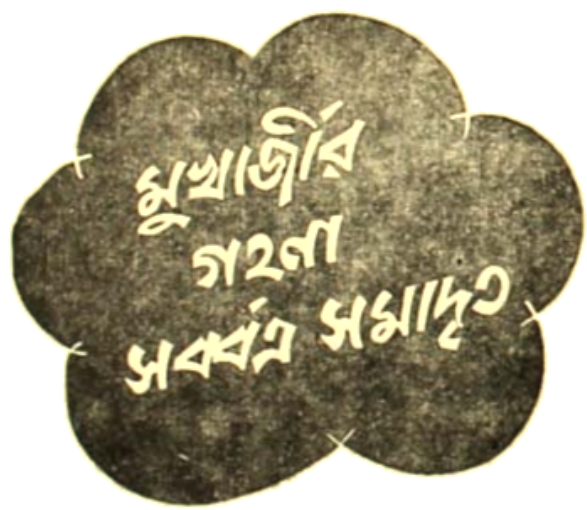

মুখার্জী জুয়েলার্স
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রথম শ্রেণীর নাট্যাভিনয় প্যারি শহরেই একদিন সীমাবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি তার পরিধি যথে প্রসারিত হয়েছে। একে 'নাট্যকলার বিকেন্দ্রীকরণের পর্ব' বলা যেতে পারে। এই বিকেন্দ্রীকরণে অনেকগুলি কারণ কাজ করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখ্য জাঁ ভিলার-এর নাটকীয় আবে ফরাসী ক্লাসিক শাস্ত্রগত বিধিবিধান এবং পাণ্ডিত্যের নিষ্ঠাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এই নিয়ম এবং মননশীলতার অতিপরতার বিরুদ্ধে একদল তরুণ শিল্পী একরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। অনেককে নিয়ে জাঁ ভিলার এক নতুন দল গড়লেন। উদ্দেশ্য হল—পথের মানুষের কাছে পুরনো নাটকগুলি উপস্থাপিত করা, তার ভাব ও রসকে জনগণের মনের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তা প্রাচীন রীতি যথাযথ অনুসৃত না হয়, নাইবা হল! ১৯৪৮ খ্রীঃ থেকে ভিলার এই দল নিয়ে (যা পরলোকগত জেরার ফিলিপও ছিলেন) দেশের নানা স্থান ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সার্কাসের তাঁবু জনগণের মাঝখানে আসর পেতে, ইউগো, মলিএর মুসে, আরিস্তোর বিখ্যাত নাটকগুলি অভিনয় আন্তরিকতা এবং আন্দোলনে ভিলারের প্রয়াস সার্থক হল, জনতার রঙ্গালয় জনপ্রিয় হল, নাট্য আ গতি ও শক্তি পেল। তাঁর হাতে গড়া 'তেয়াত্র্ নাসিওনাল পপুলোর' ফরাসী নাট্যসাহিত্য ও না ইতিহাসে এক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ।

এই ন্যাশনাল পপুলার থিয়েটারের আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নাট্যকেন্দ্র হয়েছে। রাষ্ট্রের সহযোগিতায় এই কেন্দ্রগুলি দেশবাসীর রুচিবদলে তৎপর রয়েছে। সাঁ এতোয়েন, রেন, এঁজা প্রভৃতি ফ্রান্স-এর নাট্যকেন্দ্রগুলি এর মধ্যেই নাম করেছে। গ্রীষ্মকালীন উৎসব-প্রাঙ্গণগুলিতে নট ও নাট্যরসিকদের ভীড় জমে ওঠে। আকর্ষণীয় দৃশ্যপট এবং রঙ্গীয় অভিনয়ে এই সাময়িক রঙ্গা মোটেই তৃতীয় শ্রেণীর নয়। এরই পাশে-পাশে অপেশাদার নাট্য আন্দোলনও আজকের ফ্রান্সে বিশিষ্ট লক্ষণ। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে বারোশ' নাট্যসংস্থা ছিল, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে তা দাঁড়িয়েছে পনেরো হাজার।

বর্তমান কালের প্রসিদ্ধ ও কনিষ্ঠতম নাট্যসংস্থা 'তেয়াত্র্ দ্য ফ্রাঁস'। এখানে প্রবেশ মুক্তির একমেব প্রাধান্য এবং এর নাটকলাকে অনেকে উদ্ভাসিক বলে মনে করেন। এছাড়াও আছে সাঁত্র্, জ দ্য লুয়ে ও দ্য লে, গ্রেজিয়ে দ্য তুলোজ্। আজেনে থিয়েটারের রীতিনীতি নতুন ধরণের। হলটিকে এ জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয় এক-এক প্রতিযোগী দলের হাতে, প্রত্যেককেই সুযোগ দেওয়া হয়। এ থেকে আবিষ্কৃত হয় নতুন নতুন প্রতিভা, যাঁদের প্রযোজক পরিচালকরা পেশাদারী মঞ্চে নিয়ে এসে যেন। ফরাসী অভিনেতৃবৃন্দ সাগর পেরিয়ে বিদেশেও আজ সংস্কৃতির দূত স্বাক্ষর রেখে এসেছেন স্বদেশে সিনেমা-টেলিভিসনের প্রতিযোগিতার মাঝখানেও নাটকাভিনয়কে সম্মান জনপ্রিয় করে রে তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে ফ্রান্সের নাট্যালোকের প্রসারতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে এবং ফরাসী মেজাজে

[ফরাসী শব্দের বাংলা রূপান্তরণে লেখককে সাহায্য করেছেন স্কটিশ চার্চ কলেজের দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য।]

দুর্গোৎসব

দুর্গা দুর্গতিনাশিনী—অর্থাৎ যাঁর নামমন্ত্র আমাদের অভয় দান করে এবং সকল বিপদে ত্রাণ করে।

বাঙালীর আজ দুর্দিন সমাগত, সাম্প্রতিকতম মর্মন্তুদ ঘটনায় বাঙালী শোকাহত। অন্য পক্ষে, শিল্পে সাহিত্যে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ প্রভাব সুদূর প্রসারী। জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে বাঙালীকে, আবার শক্তির আরাধনায় সমস্ত মন প্রাণ নিয়োগ করতে হবে। দুর্গার আরাধনায় সেই শক্তিরই বিকাশ যা সকল দুঃখ ও দৈন্যকে, বিচ্ছেদ ও বেদনাকে প্রতিরোধ করবার অনমনীয় সাহস ও বীর্য্য দান করে। বঙ্কিমচন্দ্র যে দুর্গার চিত্র কল্পনা করেছিলেন—লোভ, লালসা, ঘৃণা, অহংকারকে যা চূর্ণ করবে—দশ হস্তে অসুর শক্তিকে দমন করবে, বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তিরূপে যাঁর অবস্থিতি—তাঁরই আবাহন হোক আজ বাঙালীর ঘরে ঘরে।

●

কে, সি, দাশ, প্রাইভেট লিমিটেড

আবিষ্কারক—রসোগোল্লাই

কলিকাতা

আধুনিক হাঙ্গেরী রঙ্গমঞ্চ

রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতির কৃষ্টি ও ভাবধারার ধারক-বাহক হচ্ছে রঙ্গমঞ্চ। জাতির ঐতিহ্য, তার সমাজচিন্তা, তার সমস্যা ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমেই। বাংলাদেশের আধুনিক রঙ্গমঞ্চ আমরা যেমন বাঙালী জাতির আধুনিক ভাবধারা, সমস্যা ও সেইসঙ্গে তার ঐতিহ্যের পরিচয় পাব, তেমনি হাঙ্গেরীর আধুনিক নাট্যমঞ্চে আমরা তার জাতীয় ভাবধারা, সমস্যা ও কৃষ্টির পরিচয় পাব।

আধুনিক হাঙ্গেরী রঙ্গমঞ্চ বলতে বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে আমাদের শুরু করতে কারণ হাঙ্গেরীর আধুনিক নাট্য-আন্দোলনের সূচনা ওই সময় থেকেই। সে সময় একদল দুঃসাহসিক অভিনেতা সমগ্র দেশব্যাপী গ্রামে গ্রামে ঘুরে নাটক-অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে জাতির কৃষ্টি, সমস্যা ও ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র তুলে ধরতেন। কি বিপুল বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে তাঁরা হাঙ্গেরীর কৃষ্টি ও ভাবধারার অগ্নিশিখা অনির্বাণ রেখেছিলেন তা অকল্পনীয়।

এই দুঃসাহসিক অভিনেতৃদলের পুরোভাগে ছিলেন এক মহীয়সী নারী, নাম তাঁর শ্রীমতী ডেরি। হাঙ্গেরী যখন অস্ট্রো-হাপসবার্গ রাজন্যবর্গের অর্ধ-ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে বাঁধা তখন এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে নাট্যকলার মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে স্বদেশের কৃষ্টি, ভাবধারা ও স্বাধীনতার বাণী প্রচারে ব্রতী হন। শ্রীমতী ডেরিকে হাঙ্গেরীর আধুনিক নাট্য-আন্দোলনের জন্মদাত্রী বললে অত্যুক্তি হয় না।

হাঙ্গেরীর বর্তমান অভিনেতা-অভিনেত্রীরা শ্রীমতী ডেরির উত্তরসাধক। যে গৌরবময় ঐতিহ্য লাভ করেন তা সযত্নে তাঁরা রক্ষা করে এসেছেন। ১৯৪৫ সালে হাঙ্গেরীতে যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তখন তাঁরা নব উদ্দীপনা ও উৎসাহ লাভ করলেন, এবং হাঙ্গেরীর রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক নতুন সংযোজিত হলো।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মুক্তিসংগ্রামে পরাজয়ের পর হাঙ্গেরী বৃহত্তম রঙ্গালয় বুদাপেস্টের জাতীয় শালা অন্যতম জাতীয় প্রতিরোধ কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল হাঙ্গেরীর প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং ১৯৪৫ সালে ফাসীবাদের কবল থেকে হাঙ্গেরীর মুক্তিলাভের এই জাতীয় নাট্য গণতান্ত্রিক কৃষ্টি আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে তা সহজেই অনুমেয়।

এই প্রাচীন নাট্যশালায় বহু খ্যাতনামা অভিনেতা জীবনপাত করেছেন। হাঙ্গেরীর সুপ্রসিদ্ধ নট গিউলা সাইটস এই রঙ্গালয়ে চেকভের একটি প্রহসন-নাটকে তাঁর অভিনয় জীবনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বহুমুখী প্রতিভাময়ী সুন্দরী গিজি ব্যাজর ১৯৫১ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। তিনি হাঙ্গেরীর নাট্যলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ কোসাথ পুরস্কার লাভ করেন।

অকৃত্রিম,
বিশুদ্ধ ও ফলপ্রদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাবলী

বলিতে

সাধনাকেই

বোঝায়

আয়ুর্ব্বেদ জগতে
বহু সাধনার ফল

সাধনা

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ.
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম. সি. এস (আমে
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য

১৯৪৫ সাল থেকে বিশিষ্ট অভিনেতা ও শেক্সপীয়র নাটকের প্রযোজক টমাস মেডর জাতীয় : যঞ্চ পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এখানে অভিনয়ের অতি-আধুনিক স্টাইল নিয়ে নানা পরী নিরীক্ষা চলেছে।

শেক্সপীয়র এবং মলোরী দীর্ঘকাল যাবৎ জাতীয় নাট্যশালায় প্রভাব বিস্তার করে এসেছে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, বিংশ শতাব্দীর শেক্সপীয়র নাটকের অন্যতম বিশেষজ্ঞ স্যাণ্ডর হেরে একদালে জাতীয় নাট্যশালার সহকারক ও পরে পরিচালক হয়েছিলেন। তিনি হাম্পেরীতে কয়ে ইংরাজি রঙ্গমঞ্চ পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে হাম্পেরীতে ইংলণ্ডের চেয়েও বেশীসংখ্যক শেক্স অভিনেতার আবির্ভাব হয়। তাঁদের মধ্যে জোসেফ টিমার, ল্যাজলো উন্‌গাকরী, মারগিট লুকাস, ' টোকস্ শেক্সপীয়রের নাটক অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন।

হাম্পেরীর অন্যতম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রঙ্গালয় হচ্ছে জোকাই থিয়েটার। এই রঙ্গমঞ্চে কেবল হাং নাট্যকারদের রচিত নাটকই অভিনীত হয়। কোসাথ পুরস্কারপ্রাপ্তা অভিনেত্রী মারগিট ডাইকা নাট্য সম্প্রদায়ের অন্যতম সদস্যা। বিংশ-শতাব্দীর হাম্পেরীর মহীয়সী নারী মেরী জাজসী-র ভূমিকায় অ করে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। হাম্পেরীর বিশিষ্ট নাট্যকার স্যাণ্ডর ব্রোডি রচিত 'দি নাটকে অভিনয় করে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী জুলসা ব্যাস্থি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। তি জোকাই নাট্যসম্প্রদায়ের একজন সদস্যা।

ক্লাসিক্যাল নাটক-অভিনয়ের জন্যে হাম্পেরীতে বিখ্যাত হচ্ছে পেটফি থিয়েটার। এই র অভিনয় করে অ্যাত্তো এগটে কোসাথ পুরস্কার লাভ করেন।

ক্লাসিক্যাল ও সমসাময়িক নাটক-অভিনয়ের জন্যে হাম্পেরীতে মাডাক থিয়েটারের খ্যাতিও নয়। এই রঙ্গমঞ্চে ক্লারী টোলনে-'শ্রীমতী ভেরি'র নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের চিত্ত জয় ক এই রঙ্গমঞ্চের আর একজন খ্যাতনামা অভিনেতা হচ্ছেন মিকলস গ্যাবর। কয়েক বছর আগে চল ক্লারী টোলনের 'জুলিয়েট' ভূমিকার বিপরীতে 'রোমিও'র ভূমিকায় তিনি অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন ক মাডাক থিয়েটারের অন্যান্য সাফল্যমণ্ডিত নাটকের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'আনা ফ্রাঙ্কের ডা

হাম্পেরীতে মিউনিসিপ্যাল মিউজিক হল এবং তার শাখা ব্লাহা লুজা থিয়েটার গীতি অভিনয়ের জন্যে সুপ্রসিদ্ধ। মিউনিসিপ্যাল মিউজিক হলে অভিনেত্রী প্রিমা হাম্মা হোরথীর না ঐতিহাসিকদের 'সারডাস কুইন' এবং নাট্যকার লাজোস লাজটাই-এর 'থ্রী স্প্রিং' গীতি-নাট্যের ম দেখবার জন্যে যে বিপুল সংখ্যক দর্শক সমবেত হয় তা থেকে তাঁর জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায়। গীতি-হাস্যার্ণবের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে হাম্পেরীতে সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করেছেন কালম্যান দাব কোসাথ পুরস্কারদানে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে। তিনি নিজে একজন সুদক্ষ অভিনেতা ননি, হা এক খ্যাতনামা অভিনেতৃবংশের ঐতিহ্যবাহকও হচ্ছেন।

হাম্পেরীর আধুনিক রঙ্গমঞ্চের মধ্যে আর্দি থিয়েটারেরও অবদান উল্লেখযোগ্য। পর্বতন '

'থিয়েটার' নামে পরিচিত নাট্যমঞ্চে এটি বর্তমানে অবস্থিত। রাইনহার্ডট সম্প্রদায়ের বিখ্যাত অভিনয় শৈলী এখানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এখানে যে সকল নাটক পরিবেশিত হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কোহাটের 'ব্লিস্ ফ্রেট লাভ্' এবং সুইজারল্যাণ্ডের ডুরেনমাট বিরচিত বিয়োগান্তক প্রহসন। এ নাট্য-সম্প্রদায়ে অভিনয়কুশলতায় যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের পুরোভাগে আছেন ইভা ফতরো হাঙ্গেরীর বহুসংখ্যক ছায়াছবির নায়িকা ও কোসাথ পুরস্কারপ্রাপ্তা ইলমা ভূলা, মারিয়া সুলিয়ক।

বুদাপেস্টের শ্রমিক প্রধান জেলা অ্যাঙ্গাল ফোল্ডে কবি আতিলা জোশেফের নামে একটি রঙ্গমঞ্চ আছে। এই মঞ্চে হাঙ্গেরীর কয়েকটি অতি জনপ্রিয় নাটক অভিনীত হয়েছে এবং এখানকার প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী জুসি কমলস জনসাধারণের অতি প্রিয় নায়িকা।

বুদাপেস্টের বাইরে আটটি শহরে ঐতিহ্যবাহী রঙ্গমঞ্চ আছে। এইসকল রঙ্গমঞ্চের বহু অভিনেতা অভিনেত্রী কোসাথ পুরস্কার ও অন্যান্য সম্মান লাভ করেছেন।

এ ছাড়া, হাঙ্গেরীতে আধুনিক নাট্য-আন্দোলনের জনয়িত্রী ও দেশপ্রেমিকা শ্রীমতী ডেরির নামে এক ভ্রাম্যমাণ রঙ্গমঞ্চ আছে।

হাঙ্গেরীর জনমানসে নাট্যানুরাগ যে কত গভীর এবং জাতির কৃষ্টিতে রঙ্গমঞ্চ যে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা উপরোক্ত ভ্রাম্যমাণ রঙ্গমঞ্চ এবং রাজধানীর বাইরে বিভিন্ন শহরে রঙ্গমঞ্চগুলির বিবরণ প্রদর্শনী থেকে উপলব্ধি করা যায়।

———

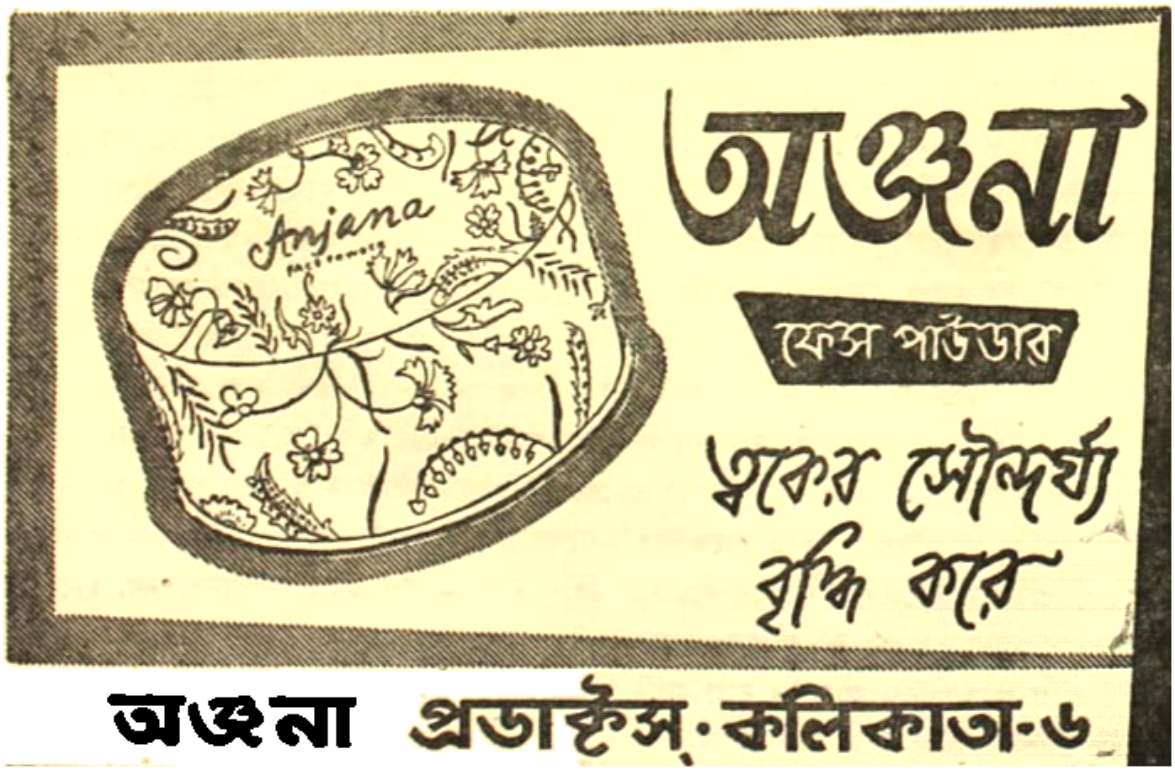

জার্মানির আধুনিক নাট্যধারা

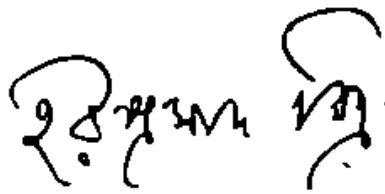

জার্মান সাহিত্য বলতে যা বোঝায়,—ইংলণ্ডে এলিজাবেথের আমলেই তার স্বর্ণযুগ এসেছিল বলে ধরা যায়,—ফরাসী দেশে তা যদি চতুর্দশ লুই-এর শাসনকালে অতিবাহিত হয়ে থাকে,—তা জার্মানিতে সে যুগ দেখা দিয়েছিল আরো আধুনিক কালে,—খ্রীষ্টাব্দের আঠারো শতকের শেষে উনিশের আদি পর্বে। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে, লেসিং-এর কলমেই অবিশ্যি জার্মানির নাট্য-সাহিত্যের সূচনা ঘটেছিল। সে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয়ের সময় তখন। লেসিং এক ধর্মযাজকের সন্তান। তাঁর জন্ম ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে। ফরাসী ক্লাসিক আদর্শের অনুকরণ চলা তখনকার জার্মান সাহিত্যে। লেসিং তাঁর ছাত্রাবস্থায় লাইপজিগে থাকতে থাকতেই, নিজের দে সাহিত্যধারার এই দুর্দশা ঘটতে দেখে এ-দুর্যোগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তবু তাঁরও মনের গ ছিল মোলিয়েরের মতন নাট্যকার হবার স্বপ্ন। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'তরুণ পণ্ডিত' নামে একখানি ব্যঙ্গ লিখে ফেলেছিলেন তিনি। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় স্মরণীয় নাট্যরচনা 'কুমারী সারা স্যাম্‌' প্রকাশিত হয়। জার্মানির মধ্যবিত্ত সমাজের এক নারী এ নাটকের নায়িকা। তাঁর জীবনের ট্রাজে রূপ দিতে গিয়েই আধুনিক জার্মান নাট্য-সাহিত্যের জন্ম হয়।

অতঃপর অন্যান্য কাজে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল কিছুদিনের জন্যে। ১৭৬৭ Minna von Barnhelm নামে একখানি কমেডি লিখে লেসিং আরো নাম করলেন। কিন্তু সে মেয়ের কীর্তির মান তখনো জার্মান নাট্যকারের নাগালের বাইরে। সে যাই হোক, ১৭৬৭-র এ থেকে ১৭৬৮ সালের নভেম্বরের মধ্যে নাট্যসমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি টুকিটাকি যে-সব কথা লিখেছি 'হাম্বুর্গ নাট্যকলা' (Hamburgische Dramaturgie) নাম দিয়ে সেই সব লেখা যখন গ্রন্থাকারে হোলো, তখন, অ্যারিস্টটলের পরে তাঁরই মধ্যে দ্বিতীয় একজন নাট্যকলাবিদের আবির্ভাব ঘটেছে বলে সব স্বীকার করে নিলেন। শেক্‌স্‌পীয়রের সামর্থ্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শোনা গেল লেসিং-এর আলোচ জার্মানির নাট্যচিন্তায় ফরাসী প্রভাবের অতিরেক যা বাড়াবাড়ির যুগ শেষ হোলো।

লেসিং-এর শেষ দু'খানি নাটকের শিরোনাম 'Emilia Galotti' এবং 'Nathan Wise'। সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে লেসিং-এর কবিত্ব যদি আর একটু থাকতো, তাহলে তাঁর ঐ শেষ নাট্য-রচনাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকের অন্যতম বলে গণ্য হোতো। লেসিং এমিলিয়ার আদর্শেই শিলার তাঁর 'Kabale und Liebe' লিখেছিলেন—যার ইংরেজি অনুবাদ হতে

'Intrigue and Love'। এ লেখার আগেই বেরিয়েছিল শিলারের প্রথম নাটক—'দস্যুবল'। শিলার যতো কবিত্বের আবেগে ভরপুর ছিলেন, ঠিক সে অনুপাতে নাট্যকারের সংযম ছিল না তাঁর মধ্যে। যে শিলার, তেমনি গোটেও ছিলেন প্রধানতঃ কবি। ফ্রাঙ্কফোর্টের এক উকিলের ছেলে তিনি। ১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তাঁর বয়স মাত্র ষোলো বছর,—সেই সময়ে আইন পড়বার জন্যে তাঁকে লাইপজিগে পাঠানো হয়। কিন্তু আইনে মন ছিল না গোটের। তিনি সেখানে গিয়ে নাট্যচর্চায় মন দিলেন,—লেসিং-এর সে সমালোচনাও পড়লেন,—সেই সঙ্গে অধ্যাত্মবিদ্যাতেও তাঁর মন গিয়েছিল কিছুদিনের জন্যে। যাকে যা সে-কালের রসায়ন-চর্চাতেও মেতে উঠতেন তিনি। অতঃপর পিতার নির্দেশে তাঁকে আবার স্ট্রাসবুর্গে আইন পড়তে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে দার্শনিক সমালোচক হার্ডারের প্রভাবে পড়েছিলেন তিনি। ও জীবনে রুশো এবং সেক্সপীয়রের আকর্ষণও তখন থেকেই। সেই স্ট্রাসবুর্গেই তাঁর অন্তর-রাজ্যে প্র রমণী-প্রণয়ের গভীর আলোড়ন জেগেছিল। কিন্তু প্রণয়কে বিবাহে সম্পূর্ণতা লাভ করতে দেওয়া গোটে আদর্শ-বিরুদ্ধ ব্যাপার! ফ্রাঙ্কফোর্টে গিয়ে আইন-ব্যবসা শুরু করবার পরে, তিনি তাঁর বিখ্যাত Gootz V Berlichingen লিখেছিলেন। গোটের সমস্ত রচনার মধ্যে এটিই বোধ হয়, সর্বাধিক অভিনয়যোগ্য রচন এর পরে আবার একটি প্রেমের দুর্যোগ,—তারপর, তাঁর আর ক'খানি নাট্যরচনা,—তারপর, প্রসিদ্ধ 'ফাউস্ট'-

শারদ উৎসব

শরৎলক্ষ্মীর স্বর্ণস্পর্শে প্রকৃতির অভিনব রূপসজ্জা মানুষের মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের সৃ করে। এই আনন্দ-উৎসবকে সার্থক করে তো দেহাভরণের বিচিত্র রূপ ও শ্রী।

তাই অতি আধুনিক রুচির ও ফ্যাশনের মনোরম ও চিত্তাকর্ষক পোষাক-পরিচ্ছদের অপূর্ব সম্ভার দেখতে পাবেন এখানে। তার সঙ্গে দেখবেন কতরকমের প্রসাধন সামগ্রী ও উপহার দ্রব্যের অতুল আয়োজন। আপনার পছন্দসই ও প্রয়োজনমত সমস্তই পাবেন আমাদের এখানে।

জে, এন, দত্ত এণ্ড সন্স

২১২এ ও বি, মহাত্মা গান্ধী রোড,
(আপিসিয়াল রোড বড়বাজার) কলিকাতা-৭

বিঃ দ্রঃ—আমাদের প্রত্যেক পোষাকে জে. এন. দত্ত এণ্ড সন্স মার্কা দেখিয়া লইবেন

সূচনা—এবং সেই সময়েই, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার এক প্রণয়ালোড়ন। অতঃপর ইটালি ঘুরে এসে তিনি দু'খানি নাটক লেখেন—Iphigenia in Tauris এবং Torquato Tasso। জীবনের সেই সন্ধিক্ষণেই প্রথম উপলব্ধি করেন যে জগতে তাঁকেই শ্রেষ্ঠ কবি বলা যেতে পারে,—আত্মমগ্নতা কাটিয়ে উঠে সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে যিনি নিজের ভূমিকাটি ঠিক-ঠিক বুঝতে পেরেছেন। Egmont, Iphigenia এবং Ta পরে একটি সুদীর্ঘ বিরতি। সেই বিরতির পরে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'ফাউস্ট'-এর প্রথম খণ্ড এবং সালে সে-কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড বের হয়।

'ফাউস্ট' গোটের শ্রেষ্ঠ কাব্য, শ্রেষ্ঠ নাটক এবং সমগ্র জীবনদর্শন। ঐ নাটকের শুরুতেই ভগ দেওয়া আশীর্বচন ধ্বনিত হয়েছে—মানুষ যতক্ষণ বুদ্ধ করবে, ততক্ষণই তার ভুল ঘটতে পারে, কি সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সে তার সিদ্ধির কূল পাবে,—আর সার্থকতায় পৌঁছোনো তো তার অবশ্যম্ভাবী বিধি

সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, গোটের দিব্যমূর্তিই এখনো আধুনিক জার্মান মনের উপাস্য নাটকের ক্ষেত্রে, একালেও তাঁর সৃষ্টির আবেদন ফুরিয়ে যায়নি। তবে আধুনিক জার্মান নাট্যসা আদিপর্ব গোটের মৃত্যুকাল থেকে (১৮৩২ খ্রীঃ), বোধ হয় আরো বছর ষাটেক এগিয়ে এসেই চিহ্নি যেতে পারে। ১৮৯০-এর কাছাকাছি সময়ে সারা য়ুরোপে প্রবল এক ভাবের ঢেউ এসেছিল। মার্কস্ এবং নীট্‌শের দর্শন, দুটি বিপরীত দিক থেকে জেগে-ওঠা দুটি আলাদা আলাদা ঢেউ বটে এই দুইয়ের ভাঙনাতে যে ফল ফলেছিলো, সামগ্রিক বিচারে—সেটা কার্যতঃ একই অভিঘাত। চেয়েছিলেন বুর্জোয়া সমাজের অপসারণ,—নীট্‌শে চেয়েছিলেন মধ্যবিত্ত সমাজের অত্যন্ত নীতিসূত্র করে, তাকে বর্জন করবার মতন উপযুক্ত ব্যক্তিদের অভ্যুদয়। ফরাসী সাহিত্যে মোপাসাঁ এবং মতন ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটেছিল সে সময়ে। রুশ সাহিত্যে টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্‌কি, টলস্ট দিয়েছিলেন। অচিরে স্ট্যানিস্লাভস্‌কি এসে, সে দেশের 'মস্কো-আর্ট-থিয়েটারে' টলস্টয়, গর্কি, এবং চেকভের নাটকগুলি দেখিয়ে যেন। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বিখ্যাত ইবসেন জার্মানিতে সুদীর্ঘকাল স্বেচ্ছা কাটিয়েছেন। তাঁর 'The Pillars of Society', 'A Doll's House' এবং 'Ghosts' জার্মানির র অভিনীত হয়। তাঁর যেন কিছুকাল আগে প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শের শেষ নাট্যকার হেবেলে হয়েছে। হেবেলের মৃত্যুর (১৮৬৩ খ্রীঃ) পরের পঁচিশ বছর জার্মানিতে ফরাসী ভাবানুগতাই ছি সাহিত্যের নিয়ন্তা। সে আমলের প্রসিদ্ধ যাঁরা, তাঁদের মধ্যে Wildenbuch-এর (১৮১৫-১৯০৯) না যায়। কতকটা সেই সময়েই, জার্মানির নাটমঞ্চে 'প্রকৃতিবাদ' বা ন্যাচারালিজম দেখা দেয়। বার্লি মিউনিকে এই নতুন বাস্তবনিষ্ঠার আদর্শ সংবর্ধিত হয়। অটো ব্রাহ্ম (Otto Brahm) নামে একজন নেতৃত্বে কয়েকজন লেখক মিলে তখন Freie Bühne নামে এক অভিনয়-সংঘ শুরু করেন: ১৮৯৪ সেই অটো ব্রাহ্ম-ই 'ডয়েটশ্ থিয়েটর'-এর পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। তিনি বললেন—'স আমাদের এই নতুন নাট্যাদর্শের একমাত্র কথা।' আর্নো হল্‌জ্ (Arno Holz) এবং জোহান্স (Johannes Scolz)—এই দু'জন লেখক তাঁদের যৌথিক রচনাতে সেই নব্য বস্তুনিষ্ঠা বা প্রকৃতিবা

ছুলনেন। তারপর যেখা ছিলেন হাউপট্‌ম্যান এবং সাডারম্যান (Gerhart Hauptmann এবং Herman Sudermann)।

গত ষাট বছরের পর পর দুটি মহাযুদ্ধ এবং আনুষঙ্গিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জার্মানি নাট্য-সাহিত্যে হয়তো আজ পর্যন্ত সেই 'প্রকৃতিবাদেরই' নানা অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে। স্টাইলাইজেশন সেখানে য লেখা হয়নি। হাউপট্‌ম্যান নিজেও তা লিখেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁকে গভীর নৈরাত্মবোধের দিকে নিয়ে গেছে। ১৯২০ সালে তাঁর Der weisse Heiland বের হয়। তাতে স্পেনের মেক্সিকো-বিজয় ছিল নাটকের বিষয়বস্তু। বিবিধ মেক্সিকোবাসীদের দিকেই নাট্যকার তাঁর মমতা প্রকাশ করেছিলেন। হাউপট্‌ম্যানের কাব্যনাট্যের মধ্যে 'Und Pippa tanzt' (১৯০৬) এবং আরো কোনো কোনো রচনায় আকৃতি লোকসাহিত্য এবং লোকশ্রুতির প্রভাব দেখা যায়। ১৯১১ সালে তাঁর 'Die Ratten' বেরিয়েছিল—ই ইংরেজী শিরোনাম 'The Rats'। সেই লেখাটির পরবর্তী আমলকে তাঁর জীবনে প্রকৃতিবাদের পরব অধ্যায় বলা যেতে পারে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত—জার্মানির আধুনিক নাট্যধার তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্ত ছিল না। শেষ বয়সে, ১৯৩০-১৯৪৪-এর মধ্যে,—তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মান জীবনের যে অন্ধকার ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করেছিলেন, তারই ছায়া রেখে গেছেন। হাউপট্‌ম্যান এবং সাডা মানের পরে সমকালীন অন্যান্য যাঁদের নাম করা হয়, তাঁদের মধ্যে Max Halbe (১৮৬৫-১৯৪৪ George Hirschfeld (১৮৭৩-১৯৩৪) প্রভৃতি নাট্যকারেরাও ছিলেন প্রকৃতিবাদী।

প্রকৃতিবাদের পাশাপাশি বিপরীত আরো একটি ঢেউ এসেছিল জার্মানিতে। অস্ট্রিয়ার ভিয়ে অঞ্চল থেকেই সে-আন্দোলন দেখা দেয়। তাছাড়া সামাজিক বাস্তব-বিশ্লেষণময় নাটক,—যথাবিহিত নীতিবোধে বিরুদ্ধে Frank Wedekind-এর, অথবা তাঁরই প্রদর্শিত পথে Carl Sternheim-এর তীব্র নাট্যবাণ,- ১৯১০ থেকে ১৯২০-এর মধ্যে এই দু'জনের কলমে, এবং জার্মানির বাইরে থেকে পাওয়া অগাস্ট স্ট্রীণ্ডবার্গে প্রভাবে তথাকথিত 'এক্সপ্রেশনিজ্‌ম্‌'-এর ঢেউ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে এবং তার পরবর্তী আরো সাম্প্রত পর্বে আরো নানা উৎসাহে অনুশীলনে জার্মানির আধুনিক নাট্যধারা খুবই সমৃদ্ধি। ১৯৩৩-এর কাছাকা সময় থেকে সেখানকার নাটকে এবং রঙ্গমঞ্চে জনগণের অধিকার বেড়েছে বই কমেনি। তবে গোয়েবল্‌সে আমলে জার্মান নাট্যসাহিত্যও হয়তো ইহুদী বিতাড়নের কাজে নামতে বাধ্য হয়েছিল। সে দুর্যোগ এখন অ নেই। এখন আকাশে অন্তহীন মেঘ—মানুষের মনে অন্তহীন সংঘাত।

বসু এণ্ড কোং

দেশী ও বিলাতি কাগজ, ষ্টেসনারী ও ছাপিবার কালি বিক্রেতা

পরিবেশক :

টীটাগড় পেপার মিলস্‌ কোং লিঃ
বেঙ্গল পেপার মিলস্‌ কোং লিঃ
ইণ্ডিয়া সুটিপ এণ্ড এলেক্সসপিরি লিঃ
গেজেস ইঙ্ক ফ্যাক্টরী লিঃ

নরওয়ের রঙ্গমঞ্চ

শচীন্দ্রকুমার ঘোষ

বিশ্বের নাটক ও রঙ্গমঞ্চের তিনটি প্রধান যুগ নির্দেশিত হয়ে থাকে—গ্রীক যুগ, এলিজাবেথীয় যু আধুনিক যুগ। এই তিন যুগে তিন ধরনের নাট্যধারার প্রবর্তন হয়েছে। ক্লাসিক নাট্য রোমান্টিক নাট্যধারা ও বাস্তবধর্মী নাট্যধারা। প্রথম নাট্যধারার নায়ক ইসকাইলাস, সফোক্লিস ইউরিপিডিস, দ্বিতীয় নাট্যধারার নায়ক হলেন শেক্সপীয়র আর তৃতীয় নাট্যধারার নায়ক ইবসেন। নর কাছে বিশ্বরঙ্গমঞ্চ অশেষভাবে ঋণী, কারণ বিশ্বরঙ্গমঞ্চের আধুনিক ধারার উদ্ভব হয় এই দেশে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত নরওয়ে ডেনমার্কের একটি প্রদেশমাত্র ছিল এবং তখন পর্যন্ত নর লেখকরা ডেনিশ ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করতেন। ১৮১৪ সালে ডেনমার্কের অধীনতা থেকে মুক্ত পরেই নরওয়ের প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য গড়ে ওঠে। তবে নরওয়ের খ্যাতনামা লেখকদের সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই দেখা গিয়েছিল। চারজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার তখন নরওয়ের রঙ্গমঞ্চকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেন। এঁরা হলেন ইবসেন। Bjornson, Jonas Lie, Alexander Kielland এই চ নাট্যকারকে নরওয়ের 'বৃহৎ চতুষ্টয়' (Big four) বলা হয়ে থাকে। এঁরা সকলেই বাস্তব স সমস্যার অবতারণা করলেন নাট্যসাহিত্যের মধ্যে।

ইবসেন নাট্যসাহিত্যের মধ্যে গদ্য-বাস্তবতার প্রবর্তন করেন। তিনি সুগঠিত নাট্য (well made play) গ্রহণ করেন এবং এই নাট্যরীতির মধ্যে ছাড়া ভাবের পরিবর্তে গুরু সমস্যা বিষয়ের প্রবর্তন করেন। তিনি নাট্যঘটনাকে বিশেষভাবে সংহত করে আনেন। তিনি পূর্ববর্তী নাট্যকারদের মত বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলিকে চূড়ান্ত সংকট পর্যায়ে না নিয়ে ঠিক নাট্যস আগেই নাটক আরম্ভ করেন এবং কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পূর্ব অবস্থা দর্শকদের জানিয়ে এবং পরিশেষে নাটকের অধিকাংশে সংকট মোচনের পর্যায়টি দেখিয়ে থাকেন। এই নাট্যরীতির তিনি দর্শকদের চিত্তকে সদাজাগ্রত ও বুদ্ধিসচেতন রাখতে সক্ষম হন। ইবসেন তাঁর নাটকের সমসাময়িক সামাজিক বিপ্লবাত্মক সমস্যারই অবতারণা করেন। তিনি মানবসমাজের ব্যাধিগুলি উ করে বিশ্লেষণ করেন, ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসকে কঠোরভাবে আঘাত করেন এবং সংকীর্ণতা, অহংকার প্রভৃতি তীব্র বিদ্রূপে বিদ্ধ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে আর্থিক অভাব, সামাজিক অবিচার, অভিজ্ঞতা এবং বিদেশে দীর্ঘ নির্বাসনের ফলে তিনি তীক্ষ্ণধার সমাজ সমস্যামূলক নাটক লিখতে হয়েছিলেন। তাঁর প্রাথমিক নাটকগুলি ছিল রোমান্টিক ও কবিত্বময়। কিন্তু তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি উঠেছে পরবর্তী গদ্য সমস্যামূলক নাটকগুলির মধ্য দিয়ে। নারীর আত্মচেতনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে তাঁর 'A Doll's House' নাটকের মধ্য দিয়ে। সাধারণ লোকেদের দোষ সংশোধন করতে গিয়ে কিভাবে সমাজ পরিত্যক্ত হ'য়ে পড়ল তার পরিচয় আমরা পেলাম 'An Enemy of the Peop

মধ্যে। পিতার দোষ ও ব্যাধি কিভাবে পুত্রের মধ্যে সংক্রামিত হয় এবং কিভাবে একজন নারী স্বামী পুত্রের আচরণে জর্জরিত হয়েছে এবং পুঞ্জীভূত অন্ধ সংস্কারের প্রভাব থেকে নিজেকে অবশেষে মুক্ত করতে পেরেছে তার বর্ণনা পেলাম 'Ghosts' নাটকের মধ্যে। Hedda Gabler, Rosmersholm প্রভৃতি নাটকে দুর্দমনীয় প্রবৃত্তিময় নারীচরিত্রের তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত ও দুর্বার খেয়ালী লীলার রূপ পরিস্ফুট হয়েছে।

ইবসেনের সমসাময়িক নাট্যকার ছিলেন Bjornson। কিন্তু ইবসেনের মত অসাধারণ নাট্যপ্রতিভা তাঁর ছিল না। Bjornsonও ইবসেনের মত সামাজিক সমস্যা নিয়ে নাট্য রচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল একটু আশাবাদী ও সামঞ্জস্যপ্রয়াসী। এজন্য অবশ্য তিনি সমসাময়িক বিদ্রোহী বুদ্ধিজীবী দর্শকদের কাছে প্রশংসাভাজন হননি। ঐতিহাসিক নাটক নিয়ে তিনি প্রথম তাঁর নাট্যসাধনা শুরু করেন কয়েক বছর পরে তিনি বাস্তবধর্মী নাটক রচনা আরম্ভ করেন। The Editor, A Bankruptcy প্রভৃতি নাটকের মধ্যে এই বাস্তবতার সূত্রপাত হয়। Bjornson-এর সর্বপ্রধান নাটক হ'ল A Gauntlet. স্বামী যেমন স্ত্রীর প্রাক্-বৈবাহিক জীবনের পবিত্রতা দাবী করেন, স্ত্রীও স্বামীর কাছ থেকে সেই পবিত্রতা দাবী করতে পারেন কি—এই প্রশ্নটিই তিনি তুলে ধরেছেন নাটকটির মধ্যে। Bjornson-এর নাটকের মধ্যে অগভীরতা ও ভাবপ্রবণতা মাঝে মাঝে দেখা গেলেও তাঁর সামঞ্জস্যবোধ, প্রীতিস্নিগ্ধ রসিকতা এবং সকলের প্রতি গভীর সহানুভূতির জন্য তাঁর নাটকগুলি বিশেষ মূল্যবান সম্পদ হয়ে আছে।

ঘুট হামসুনের ন্যায় Jonas Lie-এর খ্যাতিও নাটক অপেক্ষা উপন্যাসেই বেশি। তাঁর Merr Wives নাটকটির হাস্যরস সুন্দর সত্ত্বেও তাকে বড় নাটক বলা চলে না। Alexander Kiellend-এর নাটকগুলির মধ্যে Three couples ও The Professor নাটক দুটিই মাত্র উল্লেখযোগ্য। মঞ্চের জন্য অধিকতর ক্ষমতাবান নাট্যপ্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হলেন Gunnar Heiberg. Aunt ulrikke নামক সামাজিক নাটক নিয়ে তাঁর নাট্যজীবনের সূচনা। পরে তিনি আবেগধর্মী নাটক রচনা করেন এবং এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে তাঁর The Balcony এবং Love's Tragedy সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

আধুনিক নরওয়ের নাট্যকারদের মধ্যে হেজ ক্রগ-এর (Hedge Krog) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি নরনারীর বিভিন্ন বয়স ও অবস্থার প্রেম অবলম্বন ক'রে কমেডি রচনার দিকে প্রথমে ঝোঁকেছিলেন। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে Happily Ever After, Trial প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্রগের হাতে নাট্যরীতির কুশলী প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, লঘু ও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বঘটিত জটিলতা অবতারণায় তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। হেজ ক্রগের সঙ্গে আর একজন শক্তিশালী নাট্যকারের নাম করতে হয়। তিনি হলেন নর্ডাহল গ্রীগ (Nordahl Grieg)। গ্রীগ যদি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মারা না যেতেন, তা'হলে তিনি নিশ্চয়ই নরওয়ের আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে স্বীকৃত হ'তেন। যুদ্ধ ও তার সমসাময়িক ঘটনার চিত্র তাঁর কোনো কোনো নাটকের মধ্যে ধরা পড়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিবেশে হান্স হেইবার্গ (Hans Heiberg) ও আর্থার ওমরের (Arthur Omre) নামও করা যেতে পারে। যারা জার্মান সৈন্যদের তীব্র বিরোধিতা করে নি, তারা এই সব নাটকের মধ্যে কঠোরভাবে আক্রান্ত হয়েছে।

———

এক নজরে ব্রিটেনের রঙ্গমঞ্চ

স্টীফেন মাড ডট্যাকস্

মিশরের "এবাইডোস প্যাশান প্লে"কে নাটক ব'লে গণ্য করলে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের প্র আগে দু'হাজার-আড়াই হাজার বৎসর বেড়ে যায়। ঐ নাটকের অভিনয়ের কাল থেকে (দু'হাজার তিন হাজার বৎসরেরও বেশী) গ্রীক নাট্যকার এই খ্রিস্টাব্দের "দি সাপ্লিয়াস্" নাটকের অ কাল (৪৯০ খৃঃ পূঃ)—দু'হাজার আড়াই হাজার বৎসরের ব্যবধান। অবশ্য ভারতীয় নাটক ও নাট্যা বয়স গ্রীক নাট্যাভিনয়ের চেয়ে বেশী হ'লে ভিন্ন কথা। সে যাই হোক, 'এবাইডোস প্যাশান প্লে' ন অভিনয় কিভাবে হ'ত তার কোনও নিদর্শন আমরা পাইনি। আমাদের সামনে আছে গ্রীক না নাট্যাভিনয়ের নিদর্শন—আছে ভারতের নাট্যশাস্ত্রের বিবরণ। ভারতের নাট্যশাস্ত্রের ভারতীয় রঙ্গম বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এখানে সেই বিবরণ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই বটে কিন্তু ব্রিটেনের সম্বন্ধে কোন কথা জানতে গেলে, রোমের রঙ্গমঞ্চের এবং রোম যার কাছে ঋণী সেই গ্রীসের র কথা স্মরণ করতেই হবে। গ্রীসে নাটকের ও নাট্যাভিনয়ের উৎপত্তি হয়েছিল ডাওনিসাস উৎসবে—অর্থাৎ দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে। সমবেত "ডিথিরাম্ব" সংগীতের সঙ্গে, একটি দু পাত্র-পাত্রীর যোগ করে,—তারপর উক্তি-প্রত্যুক্তির ভেতর দিয়ে কাহিনী গড়ে তোলার যে চে দিয়েছিল, তা থেকেই নাটকের জন্ম। এই কারণেই ডিথিরাম্বের গর্ভে নাটকের জন্ম ব নাটকের জন্মভূমি এবং বাল্যলীলাভূমি হয়েছিল—"অর্কেস্ট্রে"—বৃত্তাকার একটি বেদিকা বা ক্ষেত্র। এর সামনেই ছিল চাষু পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে তৈরি করা সোপানশ্রেণী—দর্শকদের (এপিদৌরাস নামক স্থানে এই ধরনের নাট্য ব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া গেছে)। কালক্রমে এ ও পেছনে 'স্কিন' বা 'সিনবিলডিঙ' গড়ে উঠেছিল এবং তার সামনে ছোট পরিসরের একটি মঞ্চ- 'প্রোস্কিনিয়াম' বা 'প্রোসিনিয়াম' গড়া হয়েছিল। গ্রীক রঙ্গমঞ্চের বিবর্তন আসলে এই তিন স সিনবিলডিঙ, প্রোসিনিয়াম এবং অর্কেস্ট্রার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। সংক্ষেপে বলা যায় নাট্য বি প্রকৃতি এবং অভিনয়ে পাত্রপাত্রীর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অর্কেস্ট্রার গুরুত্ব কমিয়ে মঞ্চের এবং প সিনবিলডিঙের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং ক্রমশঃ দর্শকের আসনশ্রেণী অর্কেস্ট্রা এবং মঞ্চ এই তিন মধ্যে সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। রোমানরা গ্রীসের কাছ থেকে এই নাট্যাদর্শই—

[illegible] এবং নিজেদের স্থাপত্যবিদ্যাবলে রঙ্গমঞ্চের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ক

আগেই বলেছি, অর্কেস্ট্রার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল। তার ফলে অর্কেস্ট্রা অর্ধবৃত্তাকার রূপ পেয়েছিল এবং ক্রমে প্রোসিনিয়ামের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। আর সিনবিলডিঙ এর গঠনে জটিলতা দেখা দিয়েছিল—কারুকর্মের স্পর্শ লেগেছিল।

ব্রিটেনে 'Caerleon'-এ এবং 'Verulamium'-এ যে দুটি প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের নিদর্শন (তৃতীয় শতাব্দীর পাওয়া গেছে—তা ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চের প্রাচীনতম নিদর্শন বটে কিন্তু রোমান রঙ্গমঞ্চেরই অনুরূপ রূপ রোমানরা ব্রিটেনে যে নাট্যাভিনয় করতেন তারই নিদর্শন। তবে, এই অভিনয় বেশী দিন চলেনি। কয়ে শতাব্দী যেতে না যেতেই গীর্জার পুরোহিতরা অভিনেতাদের এবং অভিনয়ের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন—পঞ্চম শতাব্দীতে অভিনেতাদের অপাংক্তেয় বলে ঘোষণা করলেন এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে থিয়েটারগুলি আইন জারি করে বন্ধ করে দিলেন—পাঁচ শতাব্দী ধরে চলল 'অন্ধকার-যুগ'। এই সময় আগের অভিনেতারা কি করতেন, নাট্যাভিনয় একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কি না অনুমান সাপেক্ষ উত্তর। সে যাই হোক, প্রকৃতির পরিহাসই বটে, যে পুরোহিত শ্রেণী নাটকের গলা টিপে ধরেছিলেন সে পুরোহিত শ্রেণীই অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে খ্রীষ্টধর্মের বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে—গীর্জার মধ্যে নাট্যাভিনয় সুরু করেছিলেন। তারই ফলে ইস্টার উৎসবে ইয়োরোপীয় নাটকের পুনর্জন্ম সম্ভব হ'ল। মিরাকেল, মরালিটি প্রভৃতি নাটক অভিনীত হতে লাগল। গীর্জার প্রাঙ্গণ থেকে অভিনয় ক্রমে জনসাধারণে

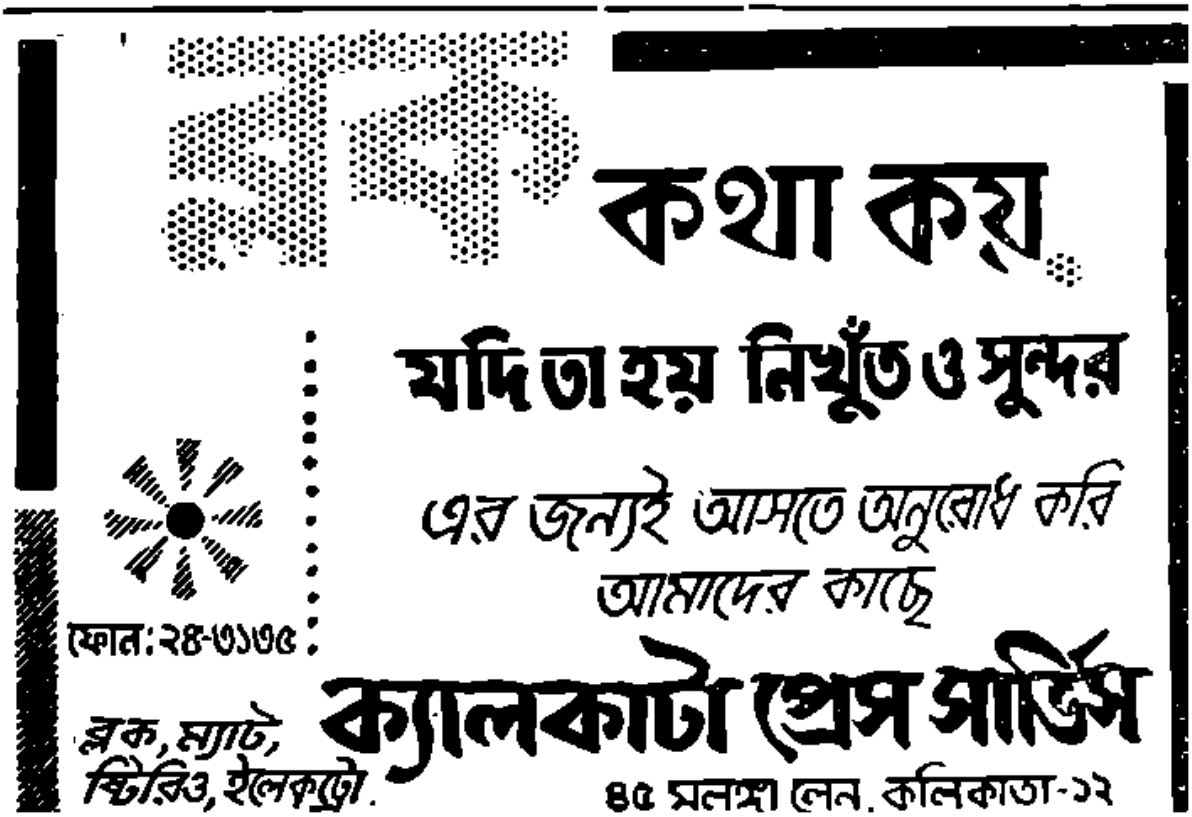

মধ্যে প্রসারিত হ'ল। পুরোহিত অভিনেতার স্থান দখল করল—সাধারণ ব্যক্তিরা। অভিনয়ের ব্য "বণিক সংঘ" ও 'স্থানীয় জনসংঘ' (Confre'ries)। এই থিয়েটার বলতে কিন্তু গ্রীস থিয়েটারের মত কিছু বুঝায় না। হাটে মাঠে ঘাটে খোলা জায়গায় এই অভিনয় হত—' হত মাটির বা পাথরের বেদিকার বা কাঠের মাচার উপরে, কোথাও কোথাও রোমান এম্ফিথি দৃশ্যসজ্জা ছিল না কিছুই। 'স্থান' (plates) সূচিত হত উল্লেখে বা বিবৃতিতে। ক্রমে অভিনয়ে—স্থান, সংকেতিত করবার জন্য কিছু কিছু 'সংকেত' ব্যবহৃত হয়েছিল। যেমন একদিকে স্বর্গ বিপরীত দিকে নরক দেখানো হত—সংকেতের সাহায্যে এই স্তরের পরে ব্রিটেনের জাতীয় জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে—ইতিহাসের বিবর্তনের ফলে শতাব্দীতে "এলিজাবেথান যুগ" এসেছিল। এই যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকীর্তি—মার্লো শেক্সপীয়রের এই সময়ে নাট্যাভিনয় হাট মাঠ থেকে সরে এসে সরাইখানার ঘাটে ভিড় জমিয়েছিল। খোলা ছেড়ে ঘেরা জায়গায় মাথা গুজবার চেষ্টা করেছিল। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহরে "দি থিয়েটার"-এর —সাধারণ রঙ্গালয়ের শুভ-সূচনা। ক্রমে একের পর এক থিয়েটার দেখা দিতে থাকে। সরাইখানা এসব থিয়েটারের গঠনে সুপরিস্ফুট। গোলাকার 'অডিটোরিয়াম'—সামনে সমতল খালি-জায়গা— কয়েক সারি বেঞ্চ ইত্যাদি বা আসনশূন্য জায়গার মধ্যস্থল পর্যন্ত একটি রেলিং ঘেরা মঞ্চপাট (প্রসারিত থাকত। তার উপরেই অভিনয় হ'ত এবং তার তিনদিকে দর্শক দাঁড়িয়ে থাকত। এই পাটের সেই আগের ধ্রুব সিনবিনডিড-এর মতো গুম্বুজ এবং কারুকার্যময় দেওয়াল থাকত। এই দে মাঝমাঝি থাকত একটি বড় দরজা, এবং তার দুপাশে একটি করে ছোট দরজা। কোন কোন থি পাশেও দরজা থাকত। ঐ দেওয়ালের উপরে রঙ্গমঞ্চ ঝুলে অলিন্দের মতো। একটা গ্যালারি থাকত গ্যালারিতে যেমন বিশিষ্ট দর্শকরা বসতে পারতেন, তেমনি 'আপার স্টেজটি'তে বা দোতলায় দাঁড়িয়ে অভিনয় সম্পন্ন করা যেত। অভিনয়ে দৃশ্যসজ্জা বেশী কিছু ছিল না। "মঞ্চপাট"এর (plates) মুখের উল্লেখেই রাজপ্রাসাদে বা গভীর অরণ্যে পরিণত হত। চরিত্রের প্রবেশ-নিষ্ক্রমণের সঙ্গে স্থানে বদলে যেত এবং সব ব্যাপারটাই ঘটত দর্শকের কল্পনা বলে।

এলিজাবেথান যুগের পরে—ক্রমশঃ ইতালীয় রঙ্গমঞ্চের প্রভাব বাড়তে থাকে এবং দৃশ্যসজ্জার দেখা দিতে থাকে। এই প্রভাবে যে নূতন আন্দোলন দেখা দেয় তাকে বলা যেতে পারে—'Mo towards the proscenium arch and the picture-frame stage.'

কিন্তু আন্দোলন তার ক্রমপরিণতির পথে অবাধে এগিয়ে যেতে পারেনি। ধর্মীয় অন্তর্দ্বে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার পুরোহিত-রোষ এসে নাট্যাভিনয়ের গতিরোধ করে। পিউরিটান নাট্যাভিনয় বন্ধ করে যেন এবং এই বন্ধদশা চলতে থাকে ১৬৬০ পর্যন্ত -চার্লসের সিংহাসনে ফি পর্যন্ত এর পরবর্তী যুগ। 'রেস্টোরেশান যুগ' নামে ইংলণ্ডের ইতিহাসে পরিচিত। এই নাট্যাভিনয়কে ঐ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই যুগে যেরূপমঞ্চ দেখা যায় তাকে বলা হয়—এ

(Apron stage), সামনে 'প্রোসিনিয়াম তোরণ'—ভিতরে দৃশ্যপট "Back shutters and side wings" অডিটোরিয়ামে—সম্মুখে পিট-এ (pit) বসবার বেঞ্চ এবং তার পেছনে গ্যালারি। অতীত ও বর্তমানে —পুরাতনের ও আধুনিক রঙ্গমঞ্চের সন্নিবেশ এই রেস্টোরেশান রঙ্গমঞ্চ। এই সময়ের অভিনয়ে নতু নতুন নানা প্রথা দেখা দিয়েছিল তাদের বিবরণ দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই। অষ্টাদশ উনবিংশ এ বিংশ শতাব্দীর রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এইসব প্রথার ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে পরবর্তী যুগে একদিকে যেমন দৃশ্যসজ্জার বাহার ও জটিল যান্ত্রিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বৈজ্ঞানি আবিষ্কারের ফলে, আলোকসম্পাতাদি ব্যাপারে নব নব কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। ১৮০০ থেকে ১৯০ এর সময়ের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই গ্যাসের আলোর এসে আলোকসম্পাতে নতুন যুগের সূচনা করেছে ইলেকট্রিসিটি আবিষ্কারে ও ব্যবহারে আরো দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। রঙ্গমঞ্চের গঠনেও না পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটেছে—বস্তুকৌশলের এত উন্নতি হয়েছিল যে (১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক নাট্যরসি লিখেছিলেন)—the scene of a railway train of twelve coaches dashing madly throug the darkness to the accompaniment of usual whistling steam and dies"—রঙ্গমঞ্চে দেখা সম্ভব হয়েছিল। এই সময় থেকেই যন্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করে রঙ্গমঞ্চকে যথেষ্ট ব্যবহার করার অধিকা এসেছে। মঞ্চকে টুকরো টুকরো করে আবার নতুন করে জোড় লাগাবার ক্ষমতা এসেছে। মঞ্চযন্ত্রী —devoted their energies to inventing means for making stages turn, sink and slic rise up in sections or descend in mass"। আধুনিক রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা এবং আলোকসম্পা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির এক বিস্ময়কর দান। আজ থিয়েটারে আর অশিক্ষিত কর্মীর স্থান নেই। প্রাচীন না বেশ আধুনিক নাট্য-বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে।

———

পূজার বাজার

আকর্ষণীয় আয়োজন

সিল্ক ও তাঁতের শাড়ী, তৈরী পোষাক-পরিচ্ছদ ও জামা তৈরীর বিভিন্ন রকমের কাপড়ের অপূর্ব্ব সমাবেশ।

আসুন—আমাদের এখানে পূজার বাজার করে আনন্দলাভ করুন ও লাভবান হউন।

বেঙ্গল ষ্টোর্স লিঃ

সহরের শ্রেষ্ঠতম বিশ্বাসীয় বিপণি।

গ্রীক নাটক ও রঙ্গমঞ্চ

ডঃ [illegible] —

গ্রীক নাটকের আদি উৎস ছিল মিসর, কিন্তু অগ্রগতি গ্রীসের নিজস্ব। গ্রীক নাটকের উপজীব্য গ্রীসের জাতীয় দেব-দেবী ও ধর্মের কাহিনী,—ফিনিসিয়ানদের অনুকরণে ডায়োনিসাস (ব্যাকস সুরা দেবীর পূজা, ডোরিনদের অনুকরণে এ্যাপোলো বা সূর্যদেবতার পূজা, এরিয়ানদের অনুকরণে চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রের পূজাকে কেন্দ্র করিয়া গ্রীক নাটকের ভূমিকা।

এই সমস্ত দেবতার পূজার অঙ্গদিক স্তোত্র পাঠ, নৃত্যানুষ্ঠান। প্রথমে সৈন্যদের মধ্যে সুরা দেবী ব নিষিদ্ধ ছিল, সুতরাং এই সুরা উৎসবে সহজেই সামরিক নৃত্য প্রচলিত হইল, ঐক্যতান (chorus) অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত হইল, ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের রীতির অনুরূপ "সূত্রধার"-এর আবির্ভাব হইল। সূ রঙ্গমঞ্চে সমস্ত উপাখ্যান বর্ণনা করিত; তাহার নির্দেশ অনুসারে অভিনেতা অভিনয় করিত। কিছুকাল সঙ্গীত প্রচলিত হইল—প্রথমে সামরিক বাঁশি (flute), পরে দামামা (Drum), সর্বশেষে কণ্ঠসঙ্গীত।

সুরাদেবীর পূজার পরের স্তরে গ্রীক নাটকে দুইটি পৃথক রূপ প্রচলিত হইল—(১) হা (comedy satire), (২) বিয়োগান্ত (trazedy)। বিয়োগান্ত নাটক আইয়োনিয়া (Athens)-এর বৈশি

মহাকবি হোমার তাঁহার মহাকাব্য Iliad-এর মাধ্যমে গ্রীক ট্রেজেডীর বীজ বপন করেন। কা বীজ ছিল ব্যাকাস দেবতার তরল অনুষ্ঠানের মধ্যে নিহিত। কালক্রমে সিসিলী হইতে এই পূজার অঙ্গ নানা প্রকার ঘুংঘোস নৃত্য, ঐক্যতান সঙ্গীত এবং বীভৎস অঙ্গভঙ্গীর অবতারণা করা হইল।

লেখকদের রচনাকাল অনুসারে গ্রীক ট্রেজেডীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) আদিকাল (৪৯৯ খ্রীঃ পূঃ)। এই যুগে Phrynichus প্রথমে গ্রীক নাটকে নারী অভিনেত্রীর অবতারণা করেন।

(২) মধ্যকাল—(৪৯৯-৪০৫ খ্রীঃপূঃ) এই যুগই গ্রীক নাটক পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল—Aesch; Sophocles, Euripides এই যুগের বিখ্যাত গ্রীক নাট্যকার, ইতিহাসের দিক দিয়াও এই একশত গ্রীসের গৌরবময় যুগ।

(৩) অন্তকাল—অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের পূর্বকাল ৪৯৯-৩২০ খ্রীঃ পূঃ—পরিক্লিসের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গ্রীসের জাতীয় জীবনে অনেক ক্ষেত্র সঞ্চিত হইতেছিল। ফলে গ্রীক নাটকেও এই পতন সূচিত হইয়াছে। Chaeremon-এর নাটকে এই পতন সূচিত হইয়াছে। গ্রীক কমেডীর কালক্রম: কমেডীরও তিনটি পর্ব আদিযুগ—শ্রেষ্ঠ নাট্যকার Aritophanes (৪৪৪-৩৮০ খ্রীঃ পূঃ), (২) মধ্যযুগ (৪০০-৩০৮ খ্রীঃ পূঃ)—নাট্যকার Alexis, (৩) অন্তযুগ—৩০৮ খ্রীঃ পূঃ পরবর্তী কাল।

গ্রীক নাটকের বৈশিষ্ট্য একাঙ্ক নাটক, এক অভিনেতার অভিনয়ে, প্রথমে নারী বিবর্জিত নাটক, নারী অভিনেত্রীর আবির্ভাব ও প্রাধান্য; প্রথমে নানা প্রকার বেশভূষার সংমিশ্রণ, পরে জাতীয় পরিচ্ছদ, সব

পুনরায় উভয় সংমিশ্রিত পরিচ্ছদ; নৃত্য, গীত, ললিত পদ ছন্দের অবতারণা। গ্রীক নাটক সমালো সাহিত্যের দার্শনিক আবেষ্টনের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। Sophocles, Plato, Aristotle, Didymus প্র বিখ্যাত মনীষীগণ গ্রীক নাটকের আদর্শ রচনাশৈলী, অভিনয়, অভিনেতার বিষয়ে নানা দিক হইতে আলো করিয়াছেন।

গ্রীক রঙ্গমঞ্চ সাধারণতঃ পাহাড়ের ঢালুর মত স্থানে হইত। একটি বৃত্তাকার স্থানে বেদীর উপর যাঁ নৃত্য ও সঙ্গীতাদি পরিবেশন করিতেন তাঁহারাই থাকিতেন। দর্শকগণ অন্যদিকে উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায় অবস্থায় থাকিতেন। এই প্রাকৃতিক রঙ্গমঞ্চ হইতেই দর্শকগণের জন্যে কাঠের উচ্চাভিমুখী আসন পাহাড়ের ঘেঁষিয়া তৈয়ারী হইত।

রোমান নাটক ও রঙ্গমঞ্চ

গ্রীক নাটকের মতন রোমান নাটকও রোমের জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি। রোমান নাটকে উৎপত্তি আদি যুগে জাতীয় জীবনের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু অভিনয় রীতি গ্রীক হইতে গৃহীত। রো জাতির অভ্যুদয়ের পূর্বেই গ্রীক নাটক পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। প্রতিবেশী দুইটি দেশের মধ্যে যা আদান-প্রদান ছিল, সুতরাং সাংস্কৃতিক জীবনে প্রভাবও বিশেষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

আদি পর্বে রোমান নাটক ছিল নৃত্য এবং সঙ্গীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নৃত্য ছিল বীভৎস অঙ্গভ সঙ্গীত ছিল অশ্লীল রচনা। বিবাহের সময় রোমানগণ নৃত্য ও সঙ্গীত দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিত, এই আ উৎসবকে কেন্দ্র করিয়াই রোমান নাটকের উৎপত্তি, কিন্তু এই যুগের রোমান নাটকের যথার্থ নাটক আ দেওয়া যায় না।

সাহিত্যসম্মত রোমান নাটকের জন্মস্থান গ্রীস। পিউনিক যুদ্ধের পর ২৪০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে রোমান ম্যাসিডোনের অনুকরণে একটি নাটকের অনুষ্ঠান করে। এই নাটকের লেখক ছিলেন Andronicus—তিনি ছিলেন অভিনেতা। তাঁহার আদি নিবাস গ্রীসের অন্তর্গত Tarentum নগর। Andronicus একখা ট্রেজেডী ও একখানি কমেডি লাটিন ভাষায় রচনা করিয়া গ্রীক নাট্যসাহিত্যের বীজ বপন করেন।

রোমান নাট্যকারদের মধ্যে Seneca বিখ্যাত। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ ট্রেজেডি রচয়িতা। Sen নানা দিক দিয়া Sophocles এবং Euripides-এর অনুকরণ করিয়াছিলেন—বিষয়বস্তু পদ্যছন্দে কথোপকথ ঘটনা পরিস্থিতি সৃষ্টির দিক দিয়া তাঁহার অনুকরণ সার্থক।

রোমান অভিনয়ের মধ্যে বালকের অবতারণা অত্যন্ত বেশী। বংশীবাদক বাঁশী বাজাইবে, তাহ সম্মুখে একটি সুন্দর সুবেশ অষ্টাদশবর্ষ বালকের উপস্থিতি অপেক্ষিত, অভিনেতা অভিনয় করিতেছে, সম্মু বালক। তাহার উপস্থিতির সঙ্গে নাটকের কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু তাহার উপস্থিতি না হইলে নাটক জমি হয় না, গ্রীকদের মতন Chorus boys রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে সঙ্গীত পরিবেশন করিতেছে।

রোমান নাটক সাধারণতঃ পঞ্চাঙ্ক। রোমান কমেডীতে Chorus-এর স্থান অত্যন্ত স্বল্প, দৃশ্য আড়ম্বরের আধিক্য। Roman Circus শেষকালে Roman theatre-এর স্থান অধিকার করিয়া সাম্রাজ্যবাদী রোমান জাতির মন ও দেহ অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হইয়াছিল। দীর্ঘকাল স্থায়ী নাটকের আ অপেক্ষা amphitheatre-এর মধ্যে হিংস্র পশুর জীবনঘাতী খেলা তাহাদিগকে আনন্দ দিত। রোমান ক্রীড় ছিল প্রত্যেক গৃহস্থের জীবনের অঙ্গ। সুতরাং প্রেক্ষাগৃহে নাটক অপেক্ষা ক্রীড়াদী রোমান নাগরি অধিক আনন্দ দিত।

অভিনয়ও কালক্রমে অত্যন্ত নিম্নস্তরে আসিয়া পড়িল। অভিনয়ের আভিজাত্য অপেক্ষা পরি অলংকার, প্রেক্ষাগৃহ, আসন, আলোর খেলাই রোমান নাটক ও অভিনয়ে প্রধানতর স্থান গ্রহণ করিল।

অধুনাপ্রাপ্ত রোমীয় রঙ্গমঞ্চের ধ্বংসাবশেষ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, রোমীয় রঙ্গমঞ্চ রঙ্গমঞ্চকে অবলম্বন করিয়া নির্মিত হইত। পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া ইহা নির্মিত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে বৃত্তাকারে খিলানের উপর ইহা নির্মিত হইত। উচ্চ মঞ্চোপরি সর্বপ্রকার অভিনয় হইত। দৃশ্য পরিবর্তনে আলাদা কোনও বন্দোবস্ত ছিল না, কোনও অঙ্কিত দৃশ্যাদি ছিল না। প্রাচীর গাত্রেই দৃশ্যাদির কাজ ক বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রুটাক পম্পাই নগরীর রঙ্গমঞ্চের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া উহার গ্রীক ভিত্তিই অনুমান কর

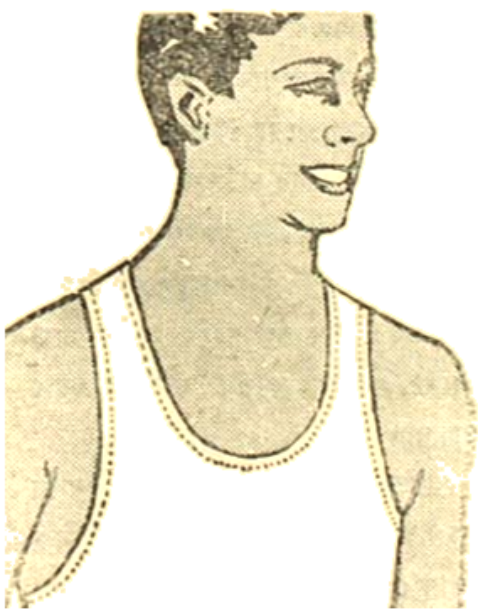

The finest
under the sun

Pioneer's

VESTS
TEE SHIRTS
TENNIS SHIRTS
CHAIN SHIRTS
DRAWERS
& BRIEFS

Stocked by
leading stores

PIONEER KNITTING MILLS LTD.

নয়া চীনের নাট্যকলা

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

নয়া চীনে গীতিনাট্য দেখতে গিয়ে দু দুবার ঠকেছি। পিকিংএ মেয়েদের আসরে পিকিং অ দেখতে গিয়েছি। মঞ্চের উপর একটি তরুণী চাষের সাজে সজ্জিতে তাথৈ নৃত্য করে দিচ্ছে। অভিনেত্রী? বন্ধু লিউ বলল, উনি ডঃ মেই লান্ ফাস্ট। ষাট বছরের বৃদ্ধ। চীনের সেরা অভি পিকিং অপেরায় মেয়েদের ভূমিকাও পুরুষেরা গ্রহণ করে। আমি বললুম, ডঃ মেই শুধু চীনের নয়, অ একজন সেরা অভিনেতা।

এবার শাংহাই শহরে শাওশিং অপেরা দেখছি। এবার আর ঠকব না। চীনা বন্ধুকে ব তারা, তোমাদের অভিনেতারা বেশ সেজেছে। বন্ধু বললে, অভিনেতা কই? সবই যে অভি শাওশিং অপেরায় স্ত্রী-পুরুষ সব পাট মেয়েরাই করে। ঐ সব নকল গোঁফদাড়িওয়ালী, স্ত্রীলোক। আবার ঠকলুম। একেই বলে অভিনয়, যেটা নয়—সেটাও হয়। যেন চীনা তোজ চীনে অনেক ধরনের অভিনয় দেখেছি। গীতি-নাট্য বা অপেরাও নানান রকমের! আ যাত্রার মত কথা গান সুর কাব্য—সব কিছু মিলিয়ে। বাদ্যযন্ত্রগুলির তীব্র তান আমাদের অ কানে অনেক সময় কর্কশ লাগে। যদিও মঞ্চের উপর অভিনয়, অনেক সময় দৃশ্যপটের বালাই থাকে আবার শাওশিং অপেরায় আধুনিক দৃশ্যপট। চীনা অপেরায় বর্ণ-বিচিত্র পোশাক-আশাক; মুখের রকমারি আঁকাবাঁকা। অভিনয়ধারা ঐতিহ্যমুখী, এর মধ্যে বিশেষ ব্যাকরণ আছে, বিশেষ মুদ্রা চলনে-বলনে প্রতীকের প্রাবল্য। অনেক অপেরায় শরীরচর্চার প্রদর্শনীয় একটি অঙ্গ।

গীতিনাট্যের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হলেও কালোপযোগী। কোথ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কাহিনী, কোথাও আবার পারিবারিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্ পৌরাণিক গল্প ও আধুনিক মতবাদের প্রচারে লেগে গিয়েছে। কম্যুনিষ্ট সরকার নাট্যকলাকে এ কাজে লাগিয়েছে। অভিনয়ের সমাদর প্রচুর। রাষ্ট্র ও নাট্যকলার পৃষ্ঠপোষকতা করছে বহু অর্থব্যয় শাংহাইএ কুকুর-দৌড়ের মাঠে গড়ে উঠেছে বিরাট এক রঙ্গমঞ্চ সরকারী অর্থে। অভিনেতৃগণের জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। জনসাধারণের মধ্যে অপেরা বিশেষ প্রিয়। বড় বড় শহরে অনেক শুধু অপেরাই হয়। এদিক থেকে দেখলে, আমরা এদেশে যাত্রাকে যথেষ্ট অবহেলা করি। চীনা আ বিভিন্ন চরিত্রের অনুকরণে পুতুল আর মুখোস দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।

নয়াচীনে পাশ্চাত্যপন্থার নাট্যাভিনয়ও যথেষ্ট হয়ে থাকে। অভিনয়ের ধারা বাস্তবমুখী। আধুনিক মঞ্চ, আধুনিক দৃশ্য-সংস্থান, সাধারণ বেশভূষা, সাধারণ কথাবার্তা। পিকিংএ একটি আ নাটক দেখি, তার মঞ্চ-সজ্জা পুরোপুরি বাস্তবকে অনুসরণ করে। তার ক্ষেত-খামার কৃষকের কক্ষ,

পরিবেশ সবই সত্যি বলে গ্রহণ হয়। যদিও ঘূর্ণায়মান নয়, তবু অতি দ্রুত দৃশ্যপরিবর্তন তাক্ষুষ করে যে নাট্যপরিচালককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, দৃশ্যপরিবর্তনের ব্যাপারে অভিনেতারাও হাত লাগা তারাও মঞ্চের আসবাবপত্র সরিয়ে দেয়। আধুনিক নাটকে স্ত্রীপুরুষ মিলিত অভিনয় করে। যে নাটক দেখি, তাতে বর্তমান শাসকদের মতবাদ প্রচারের ব্যবস্থা ছিল। রাষ্ট্র নাট্যকলা পরিচালনা বলে প্রবেশ দক্ষিণা অল্পই।

যেখানে আবার পুরোপুরি নাটক অভিনয় সম্ভব হয় না, সেখানে নাটকীয় কথোপকথনের দিয়ে আধুনিক ভাবধারা পরিবেশিত হয়। শাংহাইএ শ্রমিকদের একটি ক্লাবে এই ধরনের অভিনয় যে ছোট মঞ্চের উপর মাত্র দুটি চরিত্র—স্বামী আর স্ত্রী। শুধু চেয়ার টেবিল—কোন দৃশ্যপট নেই। কথোপকথনের মধ্যে বর্তমান পারিবারিক আইনের বিষয় জনসমক্ষে নিয়ে আসছে।

বিশ্ববিদ্যালয়েও নাট্যকলার চর্চা আছে। ক্যাণ্টনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে নাট পোশাক পরে ছাত্র-ছাত্রীদের মহলা দিতেও দেখেছি।

নরাচীনে নাট্যাভিনয় বিশেষ জনপ্রিয়।

Puja Greetings

from

ATIONAL RUBBER MANUFACTURERS

LIMITED.

MAKERS OF THE FAMOUS

"ROAD FINDER"

CYCLE TYRES and TUBES

CALCUTTA • BOMBAY • DELHI

KANPUR • MADRAS & KOTTAYAM.

গ্রন্থশ্রী এ

• শারদীয় সাহিত্যের অপূর্ব সম্ভার

রবীন দাশের সদ্য প্রকাশিত উপন্য

অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যা তারা

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

সাতদিন (গল্প-সংগ্রহ) ২·৫০

শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

কন্যামৃগয়া ৩৲

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের বর্ণোজ্জ্বল উ

উপনদী (বেতারে অভিনীত)

পরিবেশনা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলি

গ্রন্থশ্রী প্রাইভেট লিঃ, ৪৩।৪ বালিগঞ্জ প্লেস, ক

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের আরো একখানি রম

মেঘ পাহাড়ের গান

জাপানের রঙ্গমঞ্চ

ডক্টর প্রতিপদ পাল

জাপানকে খুব ভাল লেগেছিল, তার অন্যতম কারণ জাপানী জাতির সৌন্দর্যপ্রীতি। বেদের ঋ চেয়েছিলেন পার্থিব ধূলিকে মধুময় করে দেখতে, কিন্তু সেই মাধুর্যের অনুভূতি জনম সঞ্চারিত হয়নি, কিন্তু জাপানে সুন্দরের প্রতি অনুরাগ সর্বস্তরে ও বহুব্যাপক। ব্যানের সকল ক্ষেত্রে এ প্রীতি দীনতম মানুষকেও সৌন্দর্যপিপাসু করেছে। হাকোন সহরে একটি কলাভবন দেখতে গিয়েছিল —মোকিচি ও কাডা এই কলাভবনের স্থাপয়িতা। তিনি কলাভবনের পরিচয়পত্রে লিখেছিলেন—"জাপা জাতির বৈশিষ্ট্য—সে চায় মানুষকে আনন্দ দিতে—সাংস্কৃতিকে সে রমণীয় করে, রম্য জিনিষের পরিবেশনে এটি অত্যুক্তি নয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাপানযাত্রী নামক অনবদ্য রম্যরচনায় লিখেছেন :—"জাপা রূপরাজ্যের সমস্ত দখল করেছে। যা কিছু চোখে পড়ে, তার কোথাও জাপানীর আলস্য নেই, অন্য নেই ; তার সর্বত্রই সে পরিপূর্ণতার সাধনা করেছে। অন্যদেশে গুণী এবং রসিকের মধ্যেই রূপরসের বোধ দেখতে পাওয়া যায়, এদেশে সমস্ত জাতের মধ্যে তাই ছড়িয়ে পড়েছে। য়ুরোপে সার্বজনীন বিদ্যালি আছে, সার্বজনীন সৈনিকতার চর্চাও সেখানে অনেক ধায়গায় প্রচলিত, কিন্তু এমনতরো সার্বজনীন র বোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসম করেছে।"

কবির অনুশীলিত রসবোধ দিয়ে জাপানী এই বিশেষত্বকে এমনভাবে উপলব্ধি করেছেন সে সম্ব বিমত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বহু য়ুরোপীয় পণ্ডিতও এই কথা সমর্থন করেছেন। জাপানী অতি কলার মধ্যেও এই প্রবুদ্ধ সৌন্দর্যপ্রীতি, এই বিশুদ্ধ রসবোধ আপনাকে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করেছে।

জাপানীরা বলেন যে তাদের অভিনয় রীতির উদ্ভব হয়েছে অনেক অতীতে, ইতিহাসের সন তা সে পৌরাণিক কালের পরিমাণ করতে পারে না—কিন্তু তার প্রথম প্রকাশ অন্যান্য দেশের মতই ধ সঙ্গে ওতপ্রোত ছিল। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আমরা এক নাটকের সন্ধান পাই—তার নাম কোজিকি কোজিকির অর্থ পুরাণ কাহিনী। জাপানীরা চীন ও কোরিয়া থেকে নৃত্য ও গীত গ্রহণ করেছিল— নৃত্যগীত দুই স্থানে বার্ষিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হ'ত। প্রথম রাজসভায় রাজসভাসদগণের চি বিনোদনের জন্য—দুই মিকাডো দেবতার মন্দিরে। এই দুই ধরনের নাচগানের নাম ভিন্ন ছিল এবং ধা ধারণও অনেকটা তফাত ছিল। দেবতার জন্য মানুষের গান সব দেশেই ছিল—কিন্তু সব দেশেই যে ম মানবীয় ব্যথা-বেদনাকে প্রকাশ করতে নূতন রূপ নিয়েছে।

কিয়াটো সহরের চেরীফুলের নৃত্যানুষ্ঠান একটি বার্ষিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

অতীতের নাচ ও গান থেকে প্রথম যে অভিনয়ের উদ্ভব হল তার নাম নো। জাপানী আ কলায় 'নো' নাটকের এক বিশেষ পরিমাণের স্থান আছে। এগুলি সাধারণতঃ ঐতিহাসিক ঘটনার লিখিত হত। রাজপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় নো সংরক্ষিত হয়ে উঠল। সংলাপের আগে নাচ ও মধ্যে এক কবিত্বময়, রহস্যময় পরিবেশ তৈরি হত নো নাটকে। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে এই বি আরম্ভ। অনেকে বলেন প্রায় আটশত নো নাটক লেখা হয়েছিল, কিন্তু এখন সাধারণতঃ দু শত ন সন্ধান পাওয়া যায়। নো নাটকের তিনটি ভাগ ছিল—প্রথম দেবতার উপাসনা, দ্বিতীয়তঃ অপ্রকৃত প্রেত মৈত্রীধানের, তৃতীয়তঃ মানুষের জীবনসংঘাতের বর্ণনা। নো কিন্তু নব নব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হ নি—এখন যেসব নো নাটক দেখানো হয়, সেগুলি অভিনেতৃদলের প্রাচীন ভাবধারার মাধ্যমেই প করেন।

দুইটি গম্ভীর নো নাটকের মাঝে কৌতুকপূর্ণ এক একটি প্রহসন দেখানো হত—রঙ্গব্যঙ্গম প্রহসনগুলিকে জাপানীরা কাইওকেন বলে। এই ধরনের প্রায় তিন শ প্রহসন বর্তমান আছে। এ লঘু কৌতুকতার পরিবেশে সমসাময়িক জীবনের ছবি দেখানো হয়েছে।

জাপানী অভিনয়ে কাবুকির স্থান অত্যুচ্চ। আমার জাপান ভ্রমণের সময় সুপ্রসিদ্ধা শকুন্তলা রাও ও আমি একটি কাবুকি অভিনয় দেখেছিলাম। এই অভিনয় দেখে মুগ্ধ হতে হয়। রঙ্গমঞ্চ—নট ও নটীগণের অপূর্ব সহর—তাহাদের নৃত্য ও গীত মনে এক অপূর্ব ভাব সঞ্চার করে। কবি একজন নর্তকীর দ্বারা উদ্ভাবিত—তার নাম ওকুনি। এই রসিকা নৃত্যপটীয়সী নারী ইজুমো নগরে মন্দিরে নাচগান করতেন। মন্দিরে যাতে অধিকতর লোক পূজা দেয় সেইজন্য নাচ ও গানের পরিবর্তন করেন—পরিবর্তনের ফলে কাবুকীর জন্ম হয়। তার পদ্ধতি শীঘ্রই জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং সহরের নর্তকীরা এর অনুকরণ আরম্ভ করলেন। ফলে নানা অনাচার ঘটতে লাগল, যার জন্য অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হল। তখন মেয়েদের অভিনয় করবার জন্য পুরুষ ও বালক নির্বাচি লাগল—কিন্তু তবুও বারণ থেকে গেল। পরে লোকমতের চাপে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

ফলে লোকের দৃষ্টি নূতনতর আনন্দদানের জন্য পুতুল নাচের উদ্ভব করল।

এই পুতুল নাচ খুব সমাদর লাভ করল। টোকিও, কিয়াটো, ওসাকা প্রভৃতি বিখ্যাত সহর নানা বিচিত্ররূপে এই পুতুল নাচের অভিনয় চলল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিন্তু এই জনপ্রি ভাঁটা পড়ল এবং পুনরায় নবীন আঙ্গিকে নবভাবে কাবুকির অভ্যুদয় ঘটল। সাকাতা তোজুরো একজন প্রতিভাশালী নট, কুশলী নাট্যকার চিকামাৎসু মনজাইমন-র সাহচর্যে এই অভ্যুত্থানের গো করেন। তারপর নাগোকু নামে অন্য একজন নাট্যকার সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এখন বংশানুক্রমে নট ও নাট্যকার জাপানে আবির্ভূত হয়ে জাপানী নাট্যকলাকে সঞ্জীবিত করে রেখেছিল।

সৈয়দ মুজতবা আলীর

অপরূপ রসরচনা

চতুরঙ্গ

সাড়ে চার টাকা

রসরচনার ক্ষেত্রে আলী সাহেব এক এবং অদ্বিতীয়। সমকালীন নানান বিষয়বস্তুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ও অন্তরঙ্গ আলোচনায় প্রোজ্জ্বল নবতম রসগ্রন্থ।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

আয়ুবের সঙ্গে ২·০০ ॥

পাকিস্তানের ডিক্টেটরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের চমকপ্রদ ও চাঞ্চল্যকর কাহিনী।

বরিস পাস্তেরনাকের

বহু বিতর্কিত উপন্যাস

•ডাঃ জিভাগো

॥ সাড়ে বারো টাকা ॥

পৃথিবীর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। মূল উপন্যাসের একটি অক্ষরও বর্জিত হয়নি। কবিতার অনুবাদ ও সম্পাদনা :

বুদ্ধদেব বসু

জরাসন্ধের

নবতম উপন্যাস

ন্যায়দণ্ড

॥ সাড়ে ছয় টাকা ॥

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম এক আশ্চর্য লেখক জরাসন্ধ। মানুষের সাধারণ জিজ্ঞাসাকে জরাসন্ধ তাঁর বস্তুসন্ধানী দৃষ্টির আলোয় জীবন-জিজ্ঞাসার গভীর স্তরে নিয়ে যান। বিচারশালার পটভূমিকায় এই আশ্চর্য উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে।

তামসী (৬ষ্ঠ মুঃ) ৫·৫০

লৌহকপাট ১ম খণ্ড (১২শ মুঃ) ৪·০০ ॥ ২য় খণ্ড (১০ম মুঃ) ৩·৫০ ॥ ৩য় খণ্ড (৫ম মুঃ) ৫·০০ ॥

বারট্রাণ্ড রাসেলের

প্রবন্ধগ্রন্থ

•সুখের সন্ধানে

॥ পাঁচ টাকা ॥

[The Conquest of Happiness]

সুখ দুর্লভ কেন? মনকে কি ভাবে সঞ্চালিত করলে সুখলাভ সম্ভব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক তা আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে।

অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী।

সমরেশ বসুর

আশ্চর্য উপন্যাস

বাঘিনী

॥ সাত টাকা ॥

বাংলা সাহিত্যে সমরেশ আশ্চর্য ব্যতিক্রম। তিনি দোষমুক্ত। জীবনের গভীর ঘনিষ্ঠভাবে এর আগে কে করতে পারেননি। 'সে সবার পিছে' আর এ জীবনের সন্ধান দিয়েছেন সন্ধানী শিল্পী এই নবতম উ

গঙ্গা (৫ম মুঃ)

শ্রীমতী কাফে (৩য় মুঃ)

সুবোধকুমার চক্রব

সর্বোত্তম উপন্যাস

তুঙ্গভদ্রা

॥ চার টাকা ॥

সুবোধকুমার চক্রবর্তী বিরল সাহিত্যিকদের অন্যতম এ অগ্রগণ্যও। ঐতিহাসিক প লেখা তাঁর সার্থক লেখা।

মণিপদ্ম ৪·০০

তিব্বতের পটভূমিকায় ৫

[• এই দুটি গ্রন্থ এ্যাণ্ড কোং-এর সহযোগিতায়]

উল্লেখযোগ্য বই

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মহাশ্বেতা ৫·৫০

[প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়]

আনন্দকিশোর মুন্সীর

রাঘব বোয়াল ৩·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক

মনোজ বসুর

মানুষ গড়ার কারিগর ৫·৫০

[দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুল]

সন্তোষকুমার দে'র

বৈঠকী গল্প ২·৫০

নিখিলরঞ্জন রায়ের

ভবানী মুখোপাধ্যায়ে

জর্জ বার্নাড শ

[চিন্তানায়কের উপন্যাসোপ

সতীনাথ ভাদুড়ীর

পত্রলেখার বাবা

মোহনলাল গঙ্গোপাধ

নাথোকুর রচিত কাবুকী নাটক ঘটনার জটিল প্রবাহে বেগবান নদীর মত উদ্বেল, অভি আরও আনন্দের সঙ্গে নাথোকুর অনেক নাটক অভিনয় করেন। নাথোকুর পরে কাবুকি রচনায় যার সর্বোচ্চ—তিনি হলেন মোকুআমি। মোকুআমির নাটকে দস্যু চরিত্রের মহানুভবতা ফুটিয়ে তোলা হত তিনি দেখিয়েছেন পাপ করলে তার ফলভোগ করতে হবে—তাই তার মহাপ্রাণ দস্যুরা নয় শাস্তি পেতে নিয়েছে, নয় চরিত্র পরিবর্তনের মধ্যে পুণ্যের জয় ঘোষণা করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের য়ুরোপীয়রা নাট্যকলার প্রভাবে জাপানের অভিনয়ে নূতন রূপ দেখা পাওয়া গেল।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সিজার জাপানী ভাষায় অনূদিত হয়। এর প্রভাবে ঐতিহাসিক নাটকে রূপান্তরিত হতে সুরু হল। অবশ্য নূতন কাবুকী পুরাতন আঙ্গিককে সম্পূর্ণভাবে হল না। পুরাতন কাবুকী ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে সমসাময়িক সমস্যার আলোচনা করত—নূতন পরিপূর্ণভাবে ঐতিহাসিক নাটক হল—। ইতিহাসের কোনও বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ কালকে তার রীতিনীতি দিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি করা হতে লাগল।

এই নব ঐতিহাসিক কাবুকী নাটক রচনা মুকুচি ওচি সর্বোত্তম সাফল্য লাভ করেন। ইতিহাসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতেন। কাজেই তার নাটকীয় চরিত্রের মনের ভাব বিশ্লেষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেননি। এই দিকে মুকৌচির রচনা প্রশংসনীয়।

মুকৌচি সেক্সপীয়ারের সমগ্র নাটকের অনুবাদ করেন। তিনি যে সব নাটক নিজে রচনা তাতে সেক্সপীয়ারের ভাবধারা বিশেষভাবে পরিস্ফুট ছিল। তিনি নাটকের মধ্যে বলতে চাইতেন সংঘাত আসে নর ও নারীর চারিত্রিক তারতম্যের জন্য—মানুষের চরিত্রই তার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

কাবুকী জনপ্রিয় থাকলেও তার পাশে পাশে একদল নূতন সাহিত্যিক এলেন—তাঁরা ব কাবুকী অতীতের কঙ্কাল—বর্তমানের সমস্যাকেই নাটকে রূপায়িত করতে হবে। রুশকে পরাজিত পর জাপানে যে নব জাতীয়তা আবির্ভূত হল, এই নূতন বৈপ্লবিক দল তরুণ ভাবধারায় পুষ্ট। কিন্তু তিনজন প্রখ্যাত কাবুকী নট ডানজুরো, কিকুগোরো, সধাজি বেঁচেছিলেন ততদিন নূতন দল বিশেষ কিছু পারেননি। তাঁদের মৃত্যুর পর নবনাট্য আন্দোলন প্রবুদ্ধ এবং প্রবল হয়ে উঠল।

জাপানে বহুদিন মেয়েরা অভিনয় করতে পারতেন না। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই নিষেধ তুলে হলেও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে মহিলা অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চের পাদ-প্রদীপের সামনে দাঁড়াননি।

বিংশশতাব্দীর প্রথম পাদে ইবসেন জাপানী মনে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেন। ইনি সাদাজি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইবসেনের একটা নাটকের অভিনয় করেন। এই নাটকের নবীন মহিলা জাপ বিহ্বল করে তুলল—তাঁরা তখন বিদেশী নাটকের অভিনয়ও অনুকরণ করতে সুরু করলেন।

বামপন্থী দলেরা লিটল থিয়েটার নামে এক ধরনের নূতন নাটক লিখতে সুরু করেন—এর কিছু ওদানি কাওরত, ওকামোটা কিডো, কিকুচিকান এই নাট্যকারদের মধ্যে সমধিক সুপ্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানী অভিনয় রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল, এবং ১৯৪৪ সালে প্রা সব রঙমঞ্চ বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৪৪ সালের নবেম্বরের পরে এইসব নিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে। সেই থেকে নূতন উদ্যমে, নূতন আয়োজনে কাবুকী এবং নব নাটকের অভিনয় সুরু হয়েছে।

আজ পর্যন্ত পুরাতনের অনুকরণ ছাড়া জাপানী নাট্যকলার কোনও নূতন যুগের অভিনব পন্থা যায়নি—হয়ত নূতন উষার অরুণোদয় হয়েছে কিন্তু তাহার অন্তরাল ভেদে সে আলো এখনও আমাদে দুয়ারে পৌঁছায়নি।

বিশ্ববিখ্যাত মনোবিৎ ও মনীষী ডেল্ কার্নেগির যে দু'খানি বই

পৃথিবীর সর্বদেশে লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রয় হয়েছে বাংলায় তাদের অনুবাদ এই প্রথম।

ডেল কার্নেগির মানবজীবনের উজ্জীবনমন্ত্র

প্রতিপত্তি ও বন্ধু লাভ

How To Win Friends & Influence People

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় শোভন সংস্করণ ॥ ৪·৫০ ॥

দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন

How To Stop Worrying & Start Living

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় শোভন সংস্করণ ॥ ৫·৫০ ॥

জীবনে আপনি কি চান? প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, যশ, সম্মান, আর্থিক উন্নতি, সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি সর্বাঙ্গীণ সাফল্য, পারিবারিক সুখশান্তি? জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে, মহাজন-ব্যবসায়ী-ছাত্র-শিক্ষক চাকুরীজীবী-আইনজীবী-সাংবাদিক-সাহিত্যিক-ধনী-নির্ধন—সকলকার পক্ষেই অবশ্যপাঠ্য কাজে লাগাবার মতো দুখানি বই। কাহিনী, উদাহরণ, তথ্য ও প্রেরণায় সরস স্বাদু ও সুখপাঠ্য রচনা।

আমাদের পরিবেশনায় অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই:—

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের **শ্রেষ্ঠ গল্প** ৫·০০ ॥ প্রতিভা বসুর **প্রেমের গল্প** ৪·০০ ॥ সজনীকান্ত দাসের **স্বনির্বাচিত গল্প** ৫·০০ পরিমল গোস্বামীর **স্মৃতিচিত্রণ** (২য় সংস্করণ) ৭·০০ বনফুল বৈরাগীর উপন্যাস **এক মুঠো আকাশ** (৫ম মুদ্রণ) ৫·০০ ॥

বাকীটুকু না বললেও চলে। যাত্রীদের মনে স্বস্তির আভা ফুটে ওঠে। সুবিনয় উঠে পড়ে খাওয়া সেরে—সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় পায়চারী করে। প্লেনে রেস্তোঁরা থেকে বয় খাদ্যোপকরণ কি সব তুলছে।

যাত্রীরা যায় রাণওয়ের দিকে। অপরিচিত মিষ্টি একটা সৌরভ, প্লেনের ভিতরের গুমোট ভাব কেমন তখনও মিশিয়ে আছে। কানে আসে প্রপেলারের গর্জন। প্লেনটা 'টেক অফ' করবার রাণওয়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে—ইঞ্জিনের শব্দ তীব্রতর হয়ে আসে। মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে সামনে পাইলট রুমের দরজার মাথার লাল আলোটা জ্বলছে।

—কাইন্ড্ সিট্ বেলটস্।

সাবধানী আমেরিকান ভদ্রলোক সামনের সিটে বসেছে বেল্টটা কোমরে বেঁধে। একটা ঝাঁ —পাশের কাঁচের জানলা দিয়ে নীচের দিকে চেয়ে থাকে সুবিনয় অন্যমনে। দূরে সরে যাচ্ছে বাড়ি—ধানক্ষেতগুলো চৌকা বরফির আকারে হয়ে উঠেছে—জলের রেখা কেমন নীল কালোয় একাকার ইঞ্জিনের শব্দটা তীব্র হয়ে কানে বাজে। একটানা তীব্র শব্দটা বেড়ে চলেছে।

এয়ার হোস্টেস সেই মেয়েটি ওর দিকে এগিয়ে দেয় কাগজখানা এয়ার কণ্ডিশনের ছাপ অমৃতবাজার পত্রিকা. আজ সকালে কলকাতা থেকে আসবার মুখে তুলে এনেছে।

বাড়ী পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যাবে। দক্ষিণ কলকাতার একটা ছোট রাস্তার ধারে মোতলা ! প্রতিমা এতক্ষণ বোধহয় তার টেলিগ্রাম পেয়ে গেছে—আজ বিকালেই পৌঁছচ্ছি।

পথচেয়ে থাকবে !—টফি !

এয়ার হোস্টেস্ ওরদিকে এগিয়ে দেয় ছোট প্লেটে সাজানো কতকগুলো টফি। গোটা কয়েক নেয়—সময় কাটাতে হবে তো।

প্লেন উড়ে চলেছে পর্বত সীমার উপর দিয়ে রৌদ্রজ্জ্বল আকাশ, নীল আকাশে ভেসে চ দু'একটা মেঘ, নীচের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায় বনসীমা, মাঝে মাঝে পাহাড়ী বস্তি। এঁকে চলেছে জলতরা নদী।

পাহাড়সীমা ছাড়িয়ে সমতলের দিকে চলেছে প্লেন। মাটির রং রূপ বদলে গেছে। নারি সুপারী গাছ ঘেরা সবুজ ধানক্ষেত, কালো জলতরা বিল ফুটে ওঠে।

হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়ে কেমন মনে হয়; অসীম আকাশে একা উড়ে চলেছে প্লেন এতবড় বিশ্বের বিশালে একটি ক্ষীণ বিন্দুর মত হারিয়ে গিয়ে যেন পথ খুঁজে ফিরছে।

ফাস্টেন ইওর বেল্টস্। হঁসিয়ারী আলো ফুটে ওঠে।

একটা ঝটকা মেরে ওপরে উঠে যায় প্লেনটা। চারি পাশের আলো মুছে গেছে—সাদা মেঘস্তরের বুকে হাতড়ে চলেছে প্লেন; আবার নীচে নামে তীব্রবেগে, মেঘটা পাক দিতে দিতে আ প্লেনের ডানায় এসে লাফ দিয়ে পড়ে মেঘস্তর—গ্রাস করে নিতে চায়।

ইঞ্জিনের শব্দ বেড়ে উঠেছে। কাঁপ করছে প্লেন। বাইরের আকাশে বৃষ্টি নেমেছে।

পাইলটরুম থেকে বের হয়ে আসে ক্যাপ্টেন, একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। বলে ওঠে—

আগরতলার ওয়েদার খারাপ—আমরা দমদমের দিকে চলেছি।

ঝড়ের এলাকা কাটিয়ে ট্রেনটা মন্থর গতিতে চলেছে। আবার সেই সবুজ ধান-ক্ষেত বিল জল। পূর্ববঙ্গ এলাকা যতদূর দৃষ্টি যায় সবুজ ক্ষেত আর সবুজ গ্রাম মাঝে মাঝে নদী। ক্ষুদ্র বিন্দুর মত নে ভেসে চলেছে গঞ্জ শহর। সারা ত্রিভ খেলনার মডেলের মত দেখা যায়।

সারা জীবনটা যেন এমনি আলোছায়ার ভরা: মালিনীকে মনে পড়ে এমনি নিঃসঙ্গ নির্জনে। এ দুর্বাসার মতো এসেছিল রূপ আর তৃষ্ণা নিয়ে। অতৃপ্ত সেই তৃষ্ণা—মরীচিকার তৃষ্ণার মত তাকে মরুতীর্থ থেকে সুধা শ্যামলিমার সন্ধান দিতে পারেনি।

প্রতিমা এতক্ষণ বোধ হয় পথ চেয়ে আছে। পাঁচটা প্রায় বাজে, কখন পৌঁছে যেত সে। ঘ দিকে চাইতে থাকে। মেঘমলিন আকাশ; নীচে রেল লাইন দেখা যায়, ডবল লাইন। গাড়ী চলেছে কেঁচোর মত। মাঝে মাঝে স্টেশন; দু'একটা চিমনি দেখা যায়; মনে হয় নৈহাটি কাঁচড়াপাড়া ছাড়ি আসছে ট্রেন দমদমের দিকে।

বৃষ্টি হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগেই, থমথমে আকাশ। কেমন ভ্যাট পাংশু ধূসর মেঘে ঢাকা। হ অতর্কিত একটা কটকায় কেঁপে ওঠে সমস্ত ট্রেনখানা। ধোঁয়ার তুলীর মত একরাশ মেঘ নাক দিয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে লাফ দিয়ে পড়েছে ওর ঘাড়ে, ডানার অসংখ্য রিপিট নাটগুলো যেন খুলে পড়বে। ট্রেনখ প্রাণভয়ে তাড়া খেয়ে যেন ঊর্ধ্বাকাশে উঠে পালাবার চেষ্টা করে। সেখান থেকেও তাড়া করেছে পুঞ্জ মেঘ দল—

নামছে, নেমে পালাবার প্রাণপণ চেষ্টা। থরথর করে কাঁপছে ট্রেনটা, দূর আকাশ কোলে এ আলোর তীক্ষ্ণ বিলিক ফুটে ওঠে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি ঝলসে ওঠে, থরথর করে কাঁ ট্রেনখানা। ঢেকে গেছে নীচেকার সেই রেল লাইন—ছোট্ট ছোট্ট খেলাপাতির ঘর, নদী বৃত্তিকা কিছু। মেঘের রাজ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে ট্রেনখানা, একবার ধোঁ মেরে উঠছে আবার এদিক—ও দিয়ে পালাবার চেষ্টায় নেমে আসছে।

সুবিনয় স্বপ্ন দেখছে আর একটু পরেই তাদের ট্রেন নামবে দমদমে রাস্তার ধারে কাঁকড়া শিরীষগা ঘটনা, ঘণ্টার রোড ধরে এগিয়ে যাবে সহরের দিকে। মনটা ছুটে চলে ট্রেনের চেয়েও বেশী বেগে।

ম্লান একটি মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে—এলে?

প্রতিমার হাতখানা তুলে নিয়েছে সে। আবদ্ধ কণ্ঠে বলছে প্রতিমা—কি ভাবনাই না হয়েছি বোধ হয় দেখতেই পাবনা তোমায়।

হঠাৎ চমকে ওঠে কো-পাইলট ছোকরা ককপিট থেকে ভিতরে এসেছে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো সারা দেহমনে ওর ঝড়ের চিহ্ন। বলে ওঠে,

—দমদমের আশেপাশে ঝড় চলেছে ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পিডে।

ক্লিয়ারেন্স পাইনি।

উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে যাত্রীদল—তবে?

—ভয় নেই, আমরা বাগডোকরার দিকে চলেছি। সেইখানেই ল্যাণ্ড করবার চেষ্টা করবো।

চমকে ওঠে সুবিনয়। এখান থেকে আবার বাংলার অন্যপ্রান্ত অবধি যাওয়া করতে হবে তাতে আর ঝড়ের সেই গর্জন নেই, আলোর নিশানাও নিভে গেছে। মন্থর গতিতে একটানা শব্দ তুলে উড়ে চল

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, মেঘরঙ্গ ভেদ করে প্লেন নেমে এসেছে অনেক নীচে। গ্রামসীমা দেখা যায় প্রদীপ জ্বলছে। কোথাও মাঠে আগুন জ্বেলেছে কারা। অতল অন্ধকারে সাঁতরে চলেছে প্লেনখানা—ধূসর নির্মল আকাশে ফুটে উঠছে তারার সমারোহ।

বৈচিত্র্যময় জীবন, একদিকে ঝড় ওঠে; তারের ঝড়, অন্যদিকে নামে শান্তিস্নিগ্ধ দীপালোক উজ্জ্বল ম্লান সন্ধ্যা। একদিকে তার জীবনে এসেছিল বালিনী, অন্যদিকে এসেছে প্রতিমা। জীবনের দুই দিক, যার মাঝে পথ চিরে চলেছে জীবনের দীর্ঘতর ক্লান্ত পথ।

আলো! নীচে আলোর নিশানা। আঁধার ঝলসে উঠেছে রানওয়ের দুপাশে আলোর সঙ্কেত আকাশে সন্ধানী আলোটা ঘুরপাক দিচ্ছে। একটা তীব্র আওয়াজ ওঠে প্লেন থেকে। নীচেকার ঐ আলোর কষাঘাতে চমকে ওঠে কানের মধ্যে যেমন একটা চাপ।

প্লেনটা ছোঁ মেরে নেমে আসছে। একটা কর্কশ যান্ত্রিক আর্তনাদ করে মাটি স্পর্শ করে চাকাগুলো—কয়েকটা ঝাঁকানির পর স্থির হয়ে আসে প্লেনটা, আস্তে আস্তে রানওয়ের থেকে বাঁ দিকে এগিয়ে এসে থামল।

বনের ধারে বিস্তৃত মাঠে ইতিমধ্যেই এমনি ঝড়-খাওয়া দু'তিনখানা প্লেন এসে জমেছে। ওখান থেকে ঝড়ের তাড়ায়। এরাও এসে যেন আশ্রয় নিল এই বন্দরে।

ফলের সোজা কাটঠ চেয়ার যেখানে যা ছিল ইতিমধ্যে ইংরেজ আমেরিকান পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী জনতায় তা ভর্তি হয়ে গেছে, ওয়েলাইড এয়ারপোর্ট কয়েকটা প্লেনের এই যাত্রীদের অযাচিত সব ব্যবস্থাই বানচাল হয়ে গেছে।

স্টেশন সুপারভাইজার নিজে তদারক করছে। ক্যানটিনের সামান্য আয়োজন নিঃশেষ প্রায়—গাড়ি ছুটেছে দূর বাজারে খাবার-দাবার সিগারেট পত্র আনতে।

উৎকণ্ঠিত যাত্রীদল প্রশ্ন করে—ঝড়ের সংবাদ কি!

সুবিনয় প্রশ্ন করে—এখান থেকে কোন টেলিগ্রামে বা ম্যাসাজ পাঠানো সম্ভব নয়?

প্রতিমার কথা মনে পড়ে; এত দ্রুত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে সব চিন্তা যেন ঘুলিয়ে যায়। নাড়ে সিগন্যাল অফিসার।

—টেলিগ্রাম স্টেশন এখানে নেই। তবে ঝমঝমে কোডে খবর পাঠাচ্ছি ওরা যদি এখান খোঁজ নেন খবর পাবেন—গুড ইউ আর সেফ।

কে কার খোঁজ নেয়—প্রতিমার খোঁজই সে নেবে না উল্টে প্রতিমাই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে প্লেন না নামার খবর পেয়ে।

হোস্টেসরা সুটকেশগুলো প্লেন থেকে নামিয়ে দিয়েছে—রাত্রিবাসের আয়োজন করছে যাত্রীদল বারান্দায়—হলে অফিস ঘরের এদিক সেদিকে। আগেকার প্লেনের যাত্রীদলও পড়ে আছে।

এয়ার লাইনস কর্পোরেশনের অতিথি, সাদ্ধ্য চা, ডিনার তারাই সাঙ্গ করবে। তাছাড়া এ মধ্যে খাবার-দাবারের আয়োজন নেই। পাশের সিটের আমেরিকান ভদ্রলোক নির্বিকার চিত্তে পকেট পিপি বার করে গলায় ঢালছেন—এর পরে চুরুট ধরিয়ে ক্রাইসলার সিরিজের বই বের করে মুখস্থ করা

এয়ার কোম্পানি প্লেন থেকে এমার্জেন্সী কম্বলগুলো বের করে দিয়েছে যাত্রীদের।

আবার আলো জ্বলে ওঠে রানওয়ের, অন্ধকার আকাশে সন্ধানী আলোটা ঘুরপাক খাচ্ছে।

দূর আকাশে আকাশে ঝড়ের সঙ্কেত। এ কোন ট্রেন তাদেরই মত ঝড় থেকে আত্মরক্ষার পালিয়ে আসছে।

—ডিক্রুগড় বাউণ্ড ট্রেন।

যাত্রীরা নেমে আসছে। হঠাৎ চমকে ওঠে সুবিনয়। মেয়ের হুক যেন মুখে চলকে এসে ও প্রান্তরের বুকে রাত্রির আঁধার নেমেছে—রানওয়ের আলো নিভে গেছে। একঝাঁক আলোর ওরা আসছে হলের দিকে।

—তুমি!

বিভিন্ন ধারা একাকার হয়ে এসে মিশেছে রাত্রি নির্জনে এই দূর পর্বত রাজ্যের মেশে।

মালিনীকে চিনতে পারে নি প্রথম সুবিনয়, তেমনি হাসি—মাথার চুলগুলো টেনে খোপা ব বাঁধা; সেই চোখের কালো অতল দৃষ্টি। কাঁধে একটা ফারকোট আলতো করে চাপানো।

ক্লান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে—সুবিনয়কে দেখে সেও চমকে উঠেছে। দীর্ঘ তিন বৎসর ব্যবধান তাদের দেহমনে বহু পথ চলার পরিবর্তনের ছাপ এসেছে।

—বসি কোথায়?

ঠাঁই নেই। সুবিনয়ই আমন্ত্রণ জানায়—এই দিকেই এসো।

আগে থেকেই অপিস ঘরের প্রান্তে নির্জন বারান্দার এককোণে হোল্ডঅল খুলে পেতে রেখে সুবিনয়—সেইখানেই এসে বসল মালিনী। কোটটা যেন অবজ্ঞাভরে গা থেকে নামিয়ে ফেলে।

—উঃ! কাটাও সারারাত। কাল কখন পৌঁছবো ঠিক নেই।

তোমার খবর-টবর কি? একদম বেপাত্তা। চাকরি করছো না তেমনি ভবঘুরে!

না! করছি।

আরও কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। বিয়ে-থা করেছে আজ শান্তি পেয়েছে সে ওই বড়-এ জীবনের কলরব থেকে, তবু মনে হয় আজকের বেলা সেই ঝড় যেন জীবনের অস্তিত্বের বেঁচে থাক আনন্দ পাবার আশ্বাস এনেছে। ওর দিকে চেয়ে থাকে, এতটুকু বদলায়নি মালিনী। তেমনি উজ্জ্বল যৌ এখনও তার জীবনের কূলে কূলে আহ্বান আনে উথাও হবার।

—তুমি!

মালিনী ব্যাগ থেকে পাকটা বের করে কাঁধে গলায় চালকা ভাবে ঠেকাতে ঠেকাতে জবাব দেয় চাকরীই নিলাম শেষ পর্যন্ত অয়েল কোম্পানির কার্মে। কলকাতা থেকে পালিয়ে আছি নির্জন ডিগবয় এক কোণের বাংলোয়।

ঘর বাঁধেনি মালিনী, ঘর বাঁধতে মানা ওদের। ওর কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি—হতাশার ছাপ।

—একটু চায়ের ব্যবস্থা হবে না?

—চল, দেখা যাক।

রেস্তোঁরায় দুটো টেবিল এক করে কয়েকটি ছিটকে আসা প্লেনের পাইলট কোপাইলট রেডি অফিসারদের ড্রাগের আড্ডা জমেছে, টেবিলের উপর একপাশে জমা করা টাকা সিকি দুআনি নয়াপয়সার বিবি মুদ্রার স্তূপ। একমনে তাস ভাঁজছে তারা।

প্লেন উঠুক না উঠুক কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই তাতে।

শিলং থেকে কবেকে নিয়ে চলেছে তারা, কিন্তু কোথায় বা বিয়ে কোথায় বা বর! কনে বাঘডোগরায় আটকে বসে আছে।

গলা খাটো করে মালিনী রসিকতা করে, বিয়ে করবে তো বলো সুবিনয়, এয়ারপোর্টেই বিয়ের ব্যবস্থা করাই। কনে তো হাজির, বরযাত্রীরও অভাব হবে না।

চমকে ওঠে সুবিনয়, অতল অন্ধকার ভেদ করে কলকাতার সেই ফ্লাটের কথা মনে পড়ে। ব্যাকুল কাতর মুখ—প্রতিমা রাতের আঁধারেও তার পথ চেয়ে আছে।

হাসে মালিনী—কি ভাবছো।

সুবিনয় জবাব দেয়—এ কনে বিয়ে তো করবে না।

—মানে! মালিনী সোজা তির্যক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ কি ভেবে নামাল। চোখ তুলে চাইতে আর যেন সাহস তার নেই, আপনমনে চায়ের পিয়ালায় চামচ দিয়ে চিনি নাড়তে থাকে।

সুবিনয় তাকে আহ্বান জানিয়েছিল ব্যাকুল কণ্ঠে, সেদিন মালিনীর মনে অন্য কোন আহ্বান, ঘর বেঁধে এক জায়গায় বসতে পারবে না। বৃহৎ সমাজের মাঝে মাথা তুলে বাঁচতে চায় সে। জীবন ওই সুবিনয়ের মত সামান্য একজনকে ঘিরে নয়, আরও বড় মন চাই তার।

অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে তার বুক দীর্ণ করে। নির্জন অতল তমসার এক; আলোজ্বলা এই এয়ারপোর্ট আজ বহুজনকে দিয়েছে নিরাপদ একটু আশ্রয়, জীবন বাঁচিয়েছে। তার আঁধার জীবনে কোথাও একটু আশ্রয় নেই—আজও নভচারী প্লেনের মত আঁধার আর মেঘস্তর হাতড়ে পার হয়ে চলেছে সে।

হঠাৎ সুবিনয়কে আবিষ্কার করে এইখানে—তারই পথ চেয়ে যেন দাঁড়িয়েছিল সে।

নির্জন কাশবনে রাত্রি নেমেছে—শুধু অন্ধকারে ভেসে আসে রেডিও টাওয়ার থেকে টুকরো কথার টুকরো—শরতের শেষ কোথায় এই পরিবেশেও ফুটেছে শিউলী ফুল—আঁধারে সাদা সাদা ফুল টুপটাপ ঝরছে নির্বাসিতা ধরিত্রীর বুকে—এখানের শুষ্ক গাছের বুকে ডাকে রাতজাগা পাখি।

সারা এয়ারপোর্ট যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। রানওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা প্লেন—তারার আলোয় ওদের সাদা ডানাগুলো ঝকঝক করছে। মাঝে মধ্যে বাতাসে কাটাচ্ছে সাদা উত্তরী বিপদপ্রসারী কাশ বন, দূরে মর্থ ইস্টার্ন লাইনে রাতের এক্সপ্রেস ট্রেনখানা শিলিগুড়ির দিকে ছুটে।

আবার সব নিস্তব্ধ।

মালিনীর চোখে ঘুম নেই কত রাত্রি জানে না। চুপ করে বসে আছে সুবিনয়, সিগারেটে আগুনের আভায় নাকচোখের একফালি দেখা যায়। কেমন যেন স্বপ্ন দেখছে সে।

মালিনী এ যেন অন্য কোন মালিনী। উত্তর ত্রিবিধের ব্যর্থ প্রতীক মানা একটি নারী, দিনের এও বদলে যায়, রাতের নিস্তব্ধতায় আপন সত্তাকে খুঁজে পেয়ে ব্যর্থ হতাশায় গুমরে উঠেছে সারাক্ষণ।

—সেদিন ভুল করেছিলাম।

সুবিনয় কথা বললো না, মালিনী আজও আশা রাখে সেই অবিচার আর ভুলের ক্ষমা করতে পারবে। অসহ্য হয়ে উঠেছে ত্রিবিধের সেই নির্জন কর্মজীবন। প্রজাপতির মধু সংগ্রহ করা অরণ্য পর্বতবেষ্টিত সেই পরিবেশে মানুষবেশী বহু জানোয়ারকেই দেখছে সে।

উত্তর দেয় না সুবিনয়, মালিনী কি যেন বলতে চায়। ব্যাকুলভাবে চেয়ে থাকে সুবিনয় তার দিকে ওই কথা শোনবার জন্য কত দিন কেটেছে তার—কত বিনিদ্র রজনী।

আজ তার আশাতীত ভাবেই মালিনী এগিয়ে এসেছে নিবান্ধব এই বনরাজ্যে রাত্রির এ তমসাচ্ছন্ন আঁধারে।

ঘুরে দেখা যায় সেই বিয়ের লগ্নভ্রষ্ট মেয়েটি বসে আছে—কাঁদছে বোধ হয়। সুবিনয় মালিনীর মুখ ফেরাল।

—কথা বলছো না?

মালিনীর প্রশ্নে চমকে ওঠে সুবিনয়। জীবনে এতদিনের চাওয়া আজ অযাচিত ভাবেই তার রূপ ধরে দেখা দেবে ভাবেনি।

মনে হয় প্রতিমাকে ভালবাসেনি সে কৃতজ্ঞতার চিহ্নই ফুটে উঠেছে তার ব্যবহারে। প্রতিমা ও মালিনীকে তুলতে সাহায্য করেছিল মাত্র, আজ মালিনীকে পেয়ে মনে হয় প্রতিমা তার জীবনে এ অপ্রয়োজনীয় বস্তু—তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

মালিনীর কালো অতল চোখে রাত্রির আকাশের তারার প্রতিবিম্ব সেই আলোয় নতুন তার কামনাতুর মনকে খুঁজে পায় সুবিনয়—প্রেম একবারই আসে জীবনে, তার জীবনে মালিনীকে ঘিরে সব সুর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছিল—বাকী জীবন সেই সৌরভ অনুসন্ধান করেই কেটেছে।

কোথায় রাত-জাগা পাখী ডাকছে। পূর্বদিক ফরসা হয়ে আসে। একটা রাত্রি তারা জেগেই কাটিয়ে একটি শরতের শিউলি-ঝরা সৌরভমুখর রাত্রি।

—চিঠি দেবে তো?

মালিনীর হাতখানা তার হাতে, ওর স্নেহ ছেয়ে যাচ্ছে ভিজবরের দিকে। আজ সুবিনয়ের মনে মালিনী আবার ফিরে আসবে তার জীবনে অসীম শূন্যতা পূর্ণ করে দেবে সে। সুবিনয়ের কাছে আজ নতুন করে বাঁচবার স্বপ্ন।

হ্যাঁ! যদি ডাকি আসবে সেদিন?

হাসে মালিনী, মিষ্টি এক টুকরো হাসি।

ওদের ট্রেনটা উঠে গেল উপরে—দূর আকাশে শব্দ তুলে উধাও হয়ে গেল মালিনীকে নিয়ে।

তারপরই ছাড়ছে তাদের গন্তব্যগামী ট্রেন। কর্মব্যস্ত সেই মহানগরী।

…এতক্ষণ যেন অন্যজগতে বাস করছিল সুবিনয়, বাঘডোগরার সেই নির্জন রাত্রি, মালিনীর কামনাব্যাকুল চাহনি। অতীতের বুকে হারানো অমৃতসন্ধান।

বাড়ী ফিরেই অবাক হয়ে যায়। প্রতিমা বিছানায় পড়ে আছে আগেকার থেকে অনেক সুস্থ। মৃদু হাসিতে মুখ ভরে তোলে প্রতিমা—এলে যা হোক!

প্রতিমার হাতখানা তুলে নেয় সুবিনয়—ইস্ কি হয়ে গেছো!

প্রতিমা কথা কইল না—চুপ করে স্বামীর নিবিড় স্পর্শটুকু অনুভব করে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, মুখে ওঠে মিষ্টি সলজ্জ একটু হাসি। বলে ওঠে—

—যদি ফিরে এসে দেখতে না পেতে?

চমকে ওঠে সুবিনয়! কাল রাত্রে বাঘডোগরা এয়ারপোর্টে বসে নিশীথ রাত্রে সে নতুন বাঁচবার স্বপ্ন দেখেছিল—আমন্ত্রণ জানাবার আভাসও দিয়েছিল মালিনীকে।

দিনের আলোয় সেই অনুভব আজ শিউরে ওঠে নিবিড় লজ্জায়।

—কি ভাবছো?

—বাবো বল্লেই কি ছুটি মেলে!

নির্লজ্জের মত সুবিনয় প্রতিমার হাতখানা টেনে নেয়। অন্য কোন সুবিনয়। মালিনীকে আর

কাঞ্চুলী
সমুদ্র
উপন্যাস

সহযোগিতা ও প্রগতির

তাৎপর্য্য প্রচার

[illegible] জেলার দারেগিরি মৌজা নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] গত ৮ই [illegible] ১৯৪৯ সালের [illegible] তারিখে বিবেচিত হয়েছেন।

তিন বছর পূর্ব্বে কারিগরি ঐ গ্রামের আদর্শ প্রগতিশীল কৃষক হিসেবে কাজ সুরু করেন এবং তখনই ঐ এলাকার [illegible] চাষি, [illegible] ও সমবায়ের কাছে প্রচুর উন্নতি করে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে যখন ঐ গ্রামে কাজ সুরু হয় তখন ঐখানে মাত্র ৩১ একর জমিতে উন্নত ধরনে ধানের চাষ করা হ'ত কিন্তু ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ঐ ধরনে চাষের পরিমাণ বেড়ে ১৯৮ একরে দাঁড়ায়।

কারিগরির মতো গ্রামসেবকরাই, গ্রামবাসীদের মধ্যে থাকবেন, সহযোগিতা ও প্রগতির নতুন আদর্শ প্রচারে সাহায্য করছেন এবং নতুন ভারত গড়ার এঁরাই প্রতিনিধিদের অবদান যোগাচ্ছেন।

পরিকল্পনা আনবে প্রাচুর্য্য

আনবে নিরাপত্তা

এর সাফল্যের জন্য কাজ করুন—সঞ্চয় করুন

DA 49/314

কাঞ্চুলী

সম্বুদ্ধ

দিন তিনেকের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন ভদ্রলোক। সেই থেকে এই গল্পের শুরু।

তাঁর আসল নামটি এখনও বলা সম্ভব নয়। ধরা যাক নাম অমূল্যবাবু। দৌলতপুর কলেজে প্রফেসরি করেন। ক্ষুদ্র পরিবার—স্ত্রী গৌরী, মেয়ে বাবলু, বয়স দু'বছর, ছেলে ভূতনাথ, বয়স চার। এরা সঙ্গেই থাকেন। এর বাইরে, বাবা মা ছোট বোনেরা থাকেন বরিশালে, বাবা সেখানে প্রফেসর। ভাই অজিত আর গুটি দুই বোন্ থাকেন কলকাতায়—ভাই রোগী থাকেন, বোনরা কলেজে পড়েন।

ঠিক মাস পনর হল কলকাতা ছেড়ে দৌলতপুরে চাকরি নিয়ে এসেছেন। অধ্যাপক কলকাতার বাড়িটিকে হাতছাড়া করেননি, মাস-মাস ভাড়া টেনে যাচ্ছেন। সেখানে আছেন তাঁর এক পিসতুতো বৌদি, আর দাবেক পিসীমা। বাড়িটাও রক্ষা হচ্ছে, তাঁদেরও বাড়ি-সমস্যা মিটছে আপাতত। বাড়িটি ভাল, ছেড়ে দিলে হঠাৎ এমনটি মিলবে না, আর যেখানেই থাকা হোক, কলকাতায় হামেশা যাতায়াত তো আছেই। সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা। বাড়িটি কলকাতার বাইরে দক্ষিণে, বৈকুণ্ঠঘাটা গ্রামে, রথতলা বলে মরা-গঙ্গার ওপরে একটা ঘাট আছে যে-সরকারদের, তারই কাছে।

১৯৪৯ সন। ৩০শে ডিসেম্বর, বরিশাল থেকে হঠাৎ বাবা আর মা দৌলতপুরে এসে হাজির। বাবা জরুরি কাজে কলকাতায় যাবেন। অনেকদিন পরে যাচ্ছেন, শরীরও কিন্তু খারাপ, সঙ্গী হিসেবে তাই ছেলেকে নিয়ে যাবেন। মা এসেছেন, এই ক'দিন পুত্রবধূর গার্ডিগার্ড হয়ে থাকবেন, ভূতের ভয় না পায়।

ছুটির দরখাস্ত ছেড়ে দিয়ে পয়লা ডিসেম্বর ভূতনাথ চাপলেন।

দোসরা থাকবেন, তেসরা থাকবেন, কাল গেলে তেসরা রাতের ট্রেনে ফিরে আসবেন, এই

নিজের বাড়ি জোড়া। কলকাতায় পৌঁছে উঠলেন কলবায় গৌরীদের বাড়িতে, বাবা কালীঘাটে, মামার বাড়িতে।

দোসরা আর তেসরা দুপুর ধরে কাজও হ'ল; তেসরা বিকেলে একটু আড্ডা দিতে গেলেন কলেজ স্কোয়ারে, মৌচাক অফিসে, বেরোচ্ছিল তারই খোঁজে। কিন্তু মুখুজ্যে ছোট গল্পই ত লিখছেন খালি, ছোটদের উপন্যাস লিখুন না একটা।

বললেন, উপন্যাস আমার হয় না, দম থাকে

কিন্তু মুখুজ্যে বললেন, হয় না কি একটা ক যান বসে দুর্গা বলে, ঠিক লেখবেন হ'য়ে যাবে।

বললেন, আচ্ছা, চেষ্টা করা যাবে।

কলেজ ষ্ট্রীট সেরে বাড়িমুখো। কলব জিনিসপত্র সামান্যই, সেটা গুছিয়ে রেখে, বৈকুণ্ঠঘাটা। পিসীমার সঙ্গে দেখা করে, খি খেয়ে স্টেশনে যাবেন। রাত দশটায় ট্রেন কালীঘাট থেকে সোজা চলে যাবেন স্টেশনে কেনা হ'য়ে গেছে সিটি বুকিং থেকে।

বৈকুণ্ঠঘাটার বাড়িতে পৌঁছলেন, তখন প্রা বেরিয়ে আসছেন যখন, সন্ধ্যা পার হ'য়ে অন্ধকার নেবেছে।

সিঁড়িতে বসেছিল বৌদির মেয়ে ডল। বা

—কাকে ?

—এই তো।

দেখলেন, ছোট্ট একটা মেয়ে, কালো, অন্ধকারে প্রায় মিশে গেছে, সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে। ন্যাংটো, একটা শুধু হাতখানেক কাপড়ের কালি দুভাঁজ করে তার পিঠে কেলে গলার দিয়ে বাঁধা।

বললেন, কে এ ?

ডল বললে, ভিখারী, ভিক্ষে চাইতে এসেছিল।

অন্ধকার হ'য়ে গেছে, একা ফিরে যেতে পারছে না, ভয় পাচ্ছে। তুমি একটু এগিয়ে দিয়ে যাও না।

বললেন, বেশ তো, চল্। কোথায় থাকিস তুই ?

ছোট্ট এতটুকুন মেয়েটা, দেখলে মনে হয় বয়স বছর তিনেকের বেশী নয়। বা হয়তো কিছু বেশীই হবে, খেতে পায় না বলে বয়সের আন্দাজে বাড়েনি। পুটপুটে স্পষ্ট কথা, ঝিনঝিনে গলা। বললে ঐ যে গো হোথা, রথতলা আছে না ? সেই ঘাটে।

—চল্।

বলে বেরিয়ে পড়লেন, মেয়েটা পেছনে আসছে। কয়েক পা গিয়ে থামতে হল। মেয়েটা অন্ধকারে পথ ঠাওর পাচ্ছে না, হাঁটতে পারছে না। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নে আমার হাত ধরে আয়।

মেয়েটা বললে, থাক আমি ঠিক যাচ্ছি। ছোট্ট ধমক দিয়ে বললেন, পাকামো করিসনে, ধর হাত।

মেয়েটা ভয়ে ভয়ে হাতটি বাড়িয়ে দিলে। ছোট্ট মুঠ বুঠোটি নিজের হাতের বুঠোয় নিয়ে, পা বাড়িয়ে বললেন, বল কি নাম তোর ?

—কাকুলী।

—কাকুলী কি নাম হয় ? ঠিক করে বল। কাঞ্চনী ?

—তাই তো। কাকুলী।

—বেশ। ঘাটে কে আছে তোর, মা ?

—মা তো নেই আমার।

—মরে গেছে ? আপদ গেছে। কার কাছে থাকিস তবে ?

—দাদা কে, তোর ভাই ?

—ভাই কেন হবে। তার কাছেই তো মা আমাকে তার ঠেয়ে বেচে দিয়েছে, পা টাকায়।

—সত্যি, মা বানিয়ে বলছে, কে জানে। বেচে দিলে কেন ?

—তা কি জানি। তখন তো আমি ছোট্ট ডান হাতটা তুলে, কতটুকু, তার এ বোঝাতে চেষ্টা করল কাকুলী।

অধ্যাপকের হাতের মুঠি একটু আঁট হ'য়ে বললেন, দাদা তোর কেউ হয় না ?

—না, হয় না। তার কাছে থাকি।

—আর কি করিস ? রেঁধে দিস তাকে ?

—তা কেন দেব। আমি রাঁধতে পারি সে হল একটা মস্ত লোক বুড়ো লোক। ভিখে

—কি খাস ?

—চা আর মুড়ি।

—ভাত খাসনে ?

—ভাত ? না তো।

—কক্ষনো খাসনে ?

—না।

ভিক্ষে করে বেড়াই, ভাত পাব কোথায়। আর মুড়ি এনে দেয়, তাই খাই।

সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে, কে জানে মিথ্যেও যদি হয়, শুনতে ছ্যাঁৎ করে ওঠে মনে

সরু গলি পার হয়ে, বড় রাস্তায় এসে ততক্ষণ। রাস্তায় পা দিয়ে ডানদিকে বেঁকে চারেক ঘুরে ঘাটটা।

কাকুলী বললে, দেরি হয়ে গেল। আম আজ।

—মারবে না। আমি বলে দেব।

—দেবে তো ঠিক ?

—হ্যাঁ, দেব।

আর কথা নেই, নিঃশব্দে দুজনে চললেন। চাঁদ নেই, আকাশে শুধু তারার আলো। পথটা অন্ধকার, পথের পাশে পাশে তেঁতুলগাছ আর আম-কাঁঠালের গাছে আরও অন্ধকার করে রেখেছে। অন্ধকারে গা ফেলে ফেলে, হাতের মুঠোয় মেয়েটাকে শক্ত ক'রে ধরে নিয়ে, বললেন অধ্যাপক।

মনে জেগে উঠছে অলিভার টুইস্ট—ফ্যাগিন। এই মেয়েটা, একে কিরকম ধীরে ধীরে ভিক্ষা আর পাপের পথে নিয়ে চলেছে; এর জীবনের শেষ হবে কোথায়?

ভাবতে ভাবতে গা কেমন করে উঠল। নিজে হাতে ধরে সেই ফ্যাগিনের কাছেই পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন তিনি? বিদ্যাব্রতী অধ্যাপক তিনি, খ্যাতনামাও কেউ কেউ বলেন, গোঁয়ার আদর্শবাদী বলেও দুর্নাম একটু-আধটু নেই তা নয়। হীনতার গ্লানি থেকে মানুষের সমাজকে মুক্ত করা যায় কি করে তা নিয়ে অনেক চিন্তা, অনেক মন্ত্রনা করেছেন এককালে, বছরের পর বছর ধরে জেল খেটেছেন, পুলিসের মার খেয়েছেন, সেই নেশার চোটে নিজের ছাত্রজীবনকে নষ্ট করেছেন, চাকরি-জীবনকেও বিসর্জন করেছেন বারংবার। তিনিই যাচ্ছেন, হাতে ধরে এই মেয়েটাকে পৌঁছে দিতে সেই পাপের দরজায়, ফ্যাগিনের হাতে, ফ্যাগিনের চেহারা একটা ভেসে উঠল মনের মধ্যে ঢেড়া, বেঁটে, কোলকুঁজো, অথচ দুষ্টপুষ্ট, বুদ্ধের চোখের চামড়া থলথলে হয়ে ঝুলে পড়েছে, চামড়ায় ভাঁজ ভাঁজ রেখা। দাঁত একটাও নেই, ঘোলাটে চোখ, অনেক নেশা-ভাং অভ্যাসের ফল, রোদ-বৃষ্টিতে পুড়ে পুড়ে কাদার মত গায়ের রং। ঘাটের এক কোণে বুধবু হ'য়ে বসে আছে, মেয়েটাকে যাওয়ামাত্র হুকুম করবে, দে।

পয়সা কটা হাতিয়ে নিয়ে বলবে, দেরি হ'ল কেন?

তখনই এগিয়ে গিয়ে বলতে হবে তাঁকে, আমি দেরি করিয়েছি, ওর দোষ নেই। অন্ধকারে একা আসতে

বুড়ো সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে দেখবে তাঁকে। কেন এত মাখামাখি।

পাপীর মন, সন্দেহে ভরা। হয়ত পুলিসের ভাববে তাঁকে, চলে এসে মেয়েটাকে ধরে নি কাজ নেই, তার চেয়ে ঘাটে পৌঁছে একাই যেতে ত দেবেন ওকে, নিজে দূরে সরে থাকবেন

মেয়েটা হঠাৎ কথা কয়ে উঠল। বলল তুমি কিন্তু ঘাটকে বোয়োনি। আমি একা যেতে

—কেন? পৌঁছেই তো দেব তোকে বললা

—না। দাদা চটে যাবে তোমাকে দেখলে,

যা ভেবেছিলেন তাই। বললেন, আচ্ছা। পেয়েছিস্ আজ?

—দু পয়সা মোটে।

—আজ কি খাবি?

—দেবে কিনা। চার পয়সার কম পো খেতে দেয় না সেদিন।

পকেট হাতড়ে দুটো আনি তার হাতে অধ্যাপক। বললেন, দাদাকে দিস।

আবার চুপচাপ। মেয়েটার হাতটাকে জোরে চেপে ধরলেন অধ্যাপক। এই তো বাচ্চা—দুতুর চেয়েও ছোট। তাকে নিজে ধরে আবার ফিরিয়ে দিতে চলেছেন···

পারতেন কি এমনি করে এগিয়ে দিয়ে দুতুকে? বাবলুকে?

হঠাৎ গা কেঁপে উঠল। বাবলুকে দুতুকে করে দিয়ে আসা। কিন্তু এই মেয়েটা, এ তে চেয়েও ছোট। তাদের মতই নিষ্পাপ।

তাদের দিতে পারেন না—একে পৌঁ যাচ্ছেন কি বলে?

ভাবছেন, ওদিকে পায়ে পায়ে কিন্তু চলেছেন ক্রমশ। হাতের মধ্যে ছোট্ট কবজি হ'ল. বাবলুরই হাত তো! সেও তো এমনি পরম নির্ভরে পাশে চলতে থাকে, যখন তার

—বাবু!

চমকে উঠলেন তার আচমকা ডাকে। বাবা বলে ডাকল না?

না, বাবা বলেনি, বাবু বলেছে। বাবলু নয় এ। কাকুলী। তাকে এগিয়ে দিতে চলেছেন তিনি, পৌঁছে দিতে চলেছেন তার দাদার হাতে। দাদা ক্যাপিন। তা হোক্ তবু সেই তার একমাত্র আশ্রয়।

একমাত্র? নয়ই বা কেন আর কে আশ্রয় দেবে তাকে। কেন, তিনি নিজে তো পারেন। পারেন তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে—এই এখনই, এক্ষুনি। কিন্তু নিয়ে কোথায় রাখবেন? নিজে থাকতেন যদি এখানে, নিজের বাড়িতেই রাখা যেত। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। তিনি চলে যাচ্ছেন, আজই। এখানে রেখে যাবেন কার কাছে? পিসীমাদের ঘাড়ে রেখে যাওয়া যায় না। অন্য আত্মীয় যাঁরা আছেন, তাঁরাও দায় নিতে চাইবেন না। দায়িত্বের প্রশ্ন আছে, কি জাত, কার মেয়ে, কে ওর মা, তার ও বৈধ না অবৈধ সন্তান, সব প্রশ্নই উঠবে। নিজে নিয়ে যাবেন? গৌরীও তো এ প্রশ্ন তুলতে পারেন। বাবা মা সেকেলে লোক, তাঁদেরও একথা মনে হবে। নিয়ে যাবেন কোথায়, সামলাবেন কি করে?

তারপর, আরেক কথা আছে, নিজে থাকেন পাকিস্তানে, লোকে বলে লেডীজ সীটে বাস। কখন উঠতে হয় ঠিক নেই। এদিকেই যদি চলে আসতে হয়—ও হবে ওণ্ডার দল থেকে চুরি করা মেয়ে। তাদের কাছে যদি ধরা পড়ে যায়, তাদের আক্রোশ এড়ানো, সেও এক সমস্যা।

হ'ল না। যে দুর্গতির পথে যাওয়া ওর নিয়তি। তার হাত থেকে ওকে বাঁচানো সাধ্য হল না তাঁর। ভেবেও লাভ নেই একথা। বাবলু নয়, ও কাকুলী, শুধুই কাকুলী। ওকে রক্ষা করার দায় তাঁর নয়, সাধ্যও নেই। ওকে বিধাতাই সৃষ্টি করেছেন গাটারের gutter, destined for the gutter। বিধা অমনি করেই পাঠিয়েছেন; ওর নিজের ম বেচে দিয়েছে সাড়ে তিন টাকায়—কথাটা হয়তো। তবু তো দয়া করেছে; জন্মে ন ফেলতে পারত। সেইটেই তো বেশী স্বাভাবি ঐ শ্রেণীর মেয়ের পক্ষে। বা হয়তো জ্যান্ত ফেলে দিয়ে যেত পথের ধারে কোপবাড়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে; কেঁদে কেঁদে গলা শুকিয়ে মরে যে খেয়ে পড়ে, বা শেয়াল কাকে ঠুকরে খেয়ে তা করেনি, দয়াই করেছে। বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছে। তারপর না হয় বিক্রীই করে দিয়ে অনকে। না দিয়েই করতই বা কি—নিজের ব্যবসা, তাইতেই তো নামাতে হ'ত শেষ সমাজের রীতিই এই, পাপের পথে একবার ফেলেছে, তার আর মুক্তি নেই। মর্যাদা কিনে পথ খোলা নেই। সামাজিক মানুষের ম জীবন নিয়ে বাঁচবার অধিকার নেই—পাপের প তাকে চলতে হবে, আজীবন, পুরুষানুক্রমে। বাপ থাকলে বেচত না তাকে, মা একা, মা বলে হয়েছে। বেঁচে যদি থাকে, পাপের পথে তাকে হবেই—সেই নামানোটা নিজের হ নামিয়ে, আরেকজনের হাতে সে ভারটা ছেড়ে কাকুলীর মা, এইটুকু মাত্র তার অপরাধ। কিছু গুরুতর অপরাধ নয়। বেচেছে সা টাকায়—কে জানে, ঐ সাড়ে তিন টাকা দি চাল কিনেছিল সাতদিন উপোস থাকবার নিজে যাকে খাইয়ে বাঁচাতে পারবে না, তা হাতে তুলে যদি দিয়েই থাকে সেখানে খে থাকবে এই ভরসা করে, এমন কী অপরাধ তার?

অপরাধ কাকুলীরও নেই। তবু, পরের জ সাজা তার উপরে পড়েছে—তবে হাত এড়া

খাইয়ে বাঁচাতে। লেখাপড়া শেখাতে। বড় করে তুলতে, মার্জিত সমাজের একজনের মত করে গড়ে তুলতে। কিন্তু তারপর? সে সমাজ তাকে মর্যাদা দেবে না। গ্রহণ করবে না, প্রতি পায়ে প্রতিক্ষণে প্রশ্ন করবে। কে তুই, কোন্ সাহসে এখানে এসে ঢুকেছিস? জানিস না তোর জায়গা এখানে নয়?

নিয়ে যেতে পারবেন তিনি, নিজে যদি বেঁচে থাকেন পারবেন খাইয়ে বাঁচাতে, লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে তুলতে। কিন্তু, সমাজের হাতের সে অস্ত্রের আর আঘাত থেকে আগলে বাঁচাতে ত পারবেন না। বরং, সন্ত্রাস মন তার মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়ে তারপর যদি আজীবন অসম্ভ্রমের মধ্যেই তাকে ফেলে রেখে যেতে হয়। তার চেয়ে সে সম্ভ্রমের রাজ্যে তাকে না নিয়ে যাওয়াই সঙ্গত। যে সমাজে, যে পরিবেশে তার জীবন কাটবে, তার মধ্যে বেড়ে ওঠাই তার পক্ষে বরং স্বস্তিকর।

তাই হোক। বাবুর নয়, ও কাকুলী। ওর দাদার কাছেই ওর বিধাতা-নির্দিষ্ট স্থান। ওর ভাগ্য-নির্দিষ্ট স্থান। গায়ের জোরে সেখান থেকে ওকে বিচ্ছিন্ন করবার সাধ্য নেই তাঁর, অধিকারও বোধ হয় নেই। যাক্ দাদার হাতেই পৌঁছে দিয়ে যাবেন ওকে। ক্যাশিন? হোক ক্যাশিন। ক্যাশিন আর বিল সাইকস্‌রাই তো ছাপিদের ভরসা। তারাই তাদের আপনার জন।

বিদ্যুতের বেগে চিন্তা চলেছে মাথার মধ্যে, পা চলছে অতি মন্থর গতিতে। তবুও সামান্য পথ, ফুরোতে সময় লাগে না। ঘাট এসে গেল। আলো নেই, শুধু সরকারদের বাড়ির বারান্দা থেকে সামান্য একটু আলোর আভাস এসে পড়েছে ঘাটের গায়ে।

কাকুলীর হাত ছেড়ে দিলেন, বললেন, যা আমি এইখানে দাঁড়ালাম।

কাকুলী ফিসফিস করে বললে, তুমি এ
দাদা দেখতে পাবে।

—নারবে। তারপর পুলিসের হাতে দিয়ে

—বেশ তো, দিলে। তাতে কি হবে?

—ও বাবা। পুলিসরা পেলেই নিয়ে কেটে

—তুব, তাই কাটে কখনো?

—তুমি জানো না। পুলিসরা কেটে কে
গিয়ে। হাসপাতালেরাও নিয়ে কেটে ফেলে। ে
হাসপাতালে গিয়েছিল, তারা কেটে ফেলেছে

—নোটো কে?

—আছে নোটো, আমাদেরই মতো!
মা আছে, তবু তাকে কেটে ফেললে।

ক্যাশিন। এই কথা বুঝবার এই ি
এমনই করে আতঙ্ক ধরিয়ে দেয়, যেন পু
বুদ্ধিদাতার খোঁজ করতেও সাহস না পায় কো

—আর কে কে আছে তোদের আর
মতন?

—কত্তো।

—কে বল?

—হাবলা। কোকন। পুঁটে। জানো
একটা পাজি, হারামজাদা শয়তান। খালি
পয়সা কেড়ে কেড়ে নেয়, আর বলে বলে আ
খাওয়ায়।

—তুই বলে দিতে পারিস নে?

—বলে দিয়ে কি হবে। দাদা তাকেই
বলে পুঁটে খুব বড় পিকপকেট হবে।

—আচ্ছা আচ্ছা। যা এবার।

কাকুলী পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। ঘাটে
পথের ধারে প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ। অধ্যা
আড়ালে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলেন।

কাকুলী গিয়ে ঘাটে নামল। ঘাটের
করা। তার কোণে কোণে উঁকি মেরে
দেখে, আবার ওপরে, সামনে এসে দাঁড়াল।
কথা বলছে না।

জল অবধি নামলেন, আবার উঠে এ ঘাটে, চারদিকে আর কেউ নেই।

পেছনে, ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে চাপাগলায় ডাক এই, আয়।

কাজলী তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

—কই, তোর দাদা?

—নেই তো।

—গেল কোথায়?

—তা যাক। এক্ষুনি আসবে। তুমি চলে যাও।

—তুই থাকবি কোথায়?

—এইখানে বসে থাকব।

—একা একা?

—তাই থাকি তো।

—ভয় করবে না?

—তা করবে! তুমি যাও, আর থেকো না।

ভয়ানক পাকা পাকা শোনাচ্ছে কথাগুলো। এতটুকু মেয়েটা এমন করে বলতে পারে, এ যেন বিশ্বাস হয় না। কিন্তু, হবেই বা না কেন। মানুষের বুদ্ধি পাকে, বয়সের সঙ্গে। এই বয়সেই অনেক গোড় খেয়েছে ও—পেকে গিয়েছে। শক্ত হয়ে গিয়েছে।

একমুহূর্ত থেমে দাঁড়ালেন অধ্যাপক। তারপর হঠাৎ বললেন, এই, শোন। তুই আমার সঙ্গে যাবি?

—ও বাবা, না। দাদা তাহলে কেটে ফেলবে।

—দাদা জানবে না। কোনদিন খুঁজে পাবে না তোকে। যাবি?

—কোথায় যাব?

—আমি যেখানে থাকি। পাকিস্তানে।

—পাকিস্তানে তো সবাইকে কেটে ফেলে থালি।

—কে বললে তোকে? আমি তো থাকি। আমাকে কি কেটে ফেলছে?

—তুমি বড়লোক। ছোট ছেলেদের কেটে ফেলে।

—ধ্যেৎ। মিছে কথা। যাবি তো বল।

—কাজলী একটুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর ধীরে

—হ্যাঁ।

—তোমার বাড়ি?

—হ্যাঁ।

—সেখানে আর কে থাকে?

—আমার ছেলে থাকে, মেয়ে থাকে। তো ছোট্ট তারা। যাবি?

—না, তুমি যাও।

মস্ত একটা ঝাঁড়া উত্তরে গেল। স্বস্তির ফেলে অধ্যাপক তার হাত ছেড়ে দিলেন। থাক তাহলে তুই। আমি যাই।

—হ্যাঁ। তাই যাও। তাড়াতাড়ি যাও, ম পড়বে।

সারাক্ষণই সে শঙ্কিত দৃষ্টিতে রাস্তা তাকাচ্ছিল। অধ্যাপকও তাকান নি তা নয় খুব চুরি করে একটা কাণ্ড করছেন দুজনে অধ্যাপক, চোর সেজে গেছেন একটা বুড়ো ভয়ে।

আবার বললেন, যাবি না তাহ'লে?

—না। তুমি যাও।

অধ্যাপক ঘাট ছেড়ে উঠে এলেন। এপাশে তাকিয়ে দেখলেন একবার। না, কেউ নেই। রাস্তা পার হয়ে এপারে এসে উঠলেন। গ'ড়ে গিয়ে বাসে উঠতে হবে। মুখ ফিরিয়ে বাড়িয়েছেন, ডাক কানে এল, ও বাবু।

চট্ করে ফিরে এলেন। কাজলী ঘাট ছে প্রায় ওপরে এসে দাঁড়িয়েছে। এদিক ওদিক খুব ফিসফিস করে বললেন, কাল এসো তুমি যাব।

যাবি?—আজই চল না।

—না, আজ নয়। কাল।

বলেই চট্ করে পিছিয়ে ঘাটের দিকে গাছের ছায়ার আবরণে।

গিয়ে দাঁড়ালেন কাঞ্চলীর সা বললেন, কাল নয়, আজ এক্ষুনি চল। আয়।

কাঞ্চলী একমুহূর্ত দ্বিধা করল, তারপর তাঁর হাত শক্ত করে ধরে বললে, তাই চল।

অধ্যাপক হেঁট হয়ে তাঁকে তুলে নিলেন। গায়ের মোটা র‍্যাপারটা খুলে ছড়িয়ে, তার মাথাটা নিজের কাঁধে রেখে র‍্যাপার দিয়ে আপাদমোড়া ঢেকে দিলেন তাকে। বললেন, চুপ করে থাকবি, নড়বি না কথা বলবি না। ভয় নেই তোর।

বলে অত্যন্ত দ্রুতবেগে পা চালিয়ে দিলেন। সেই পাকুড়গাছের সোজাসুজি গলি ঢুকেই গ্রামের মধ্যে, তার ভেতর ঢুকে পড়লেন। ন'টের মোড়ে নয়, সেখানে অনেক লোক। এই গলি ঘুরে গ্রামের অন্য দিক দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে, সেই অন্ধকার মোড়ে গিয়ে বাস ধরবেন তিনি। তিনিই চোর, চোরের হাত থেকে মেয়ে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছেন।

যেতে যেতে হঠাৎ মনে হল, উপন্যাসের কথা বলেছিলেন বিশু মুখুজ্যে—এই তো কী চমৎকার উপন্যাস শুরু হ'য়ে গেল। পায়ে পায়ে মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল কথাটা—উপন্যাস, উপন্যাস।

কলবায় গিয়ে, কাঞ্চলীকে বাড়িতে ঢোকালেন না তিনি। নিয়ে যাচ্ছেন, একথা যত কম জানাজানি হয় ততই ভাল। বাইরের বারান্দার কোণে অন্ধকারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, চুপ করে বসে থাকবি, কথা বলবি না।

বাড়িতে ঢুকে দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেন। মালপত্র বিশেষ কিছু নয়। জামা-কাপড়ের একটা থলে মাত্র। বাঁ হাতে থলে, ডান হাতে র‍্যাপার ঢাকা কাঞ্চলী। চলে এসে দশ নম্বর বাসে উঠলেন। শেয়ালদা প্ল্যাটফর্মে যখন পা দিলেন, ন'টা বেজে গেছে।

বাসের ঝাঁকুনিতে কাঞ্চলী ঘুমিয়ে পড়েছিল। প্ল্যাটফর্মের আলো আর গোলমালে জেগে উঠল। [illegible] বাবা এসে

কানের কাছে কাঞ্চলী হঠাৎ কথা ক বললে, ও বাবু আমি যাব না।

সেরেছে। চমকে উঠে অধ্যাপক বললে কি হল।

—না। যাব না আমি। গেলে দাদা কেটে ফেলবে। পুলিসে দিয়ে দেবে।

নড়ছে না কিন্তু তখনও। শুধু পুটপুট কা কানের গোড়ায়।

অধ্যাপক বললেন, ধ্যেৎ পাগলা। নে, থাক।

—না না, যাব না আমি। আমাকে তুমি দিয়ে যাও।

—এটা শেয়ালদা স্টেশন। কোথায় নাি তোকে?

—যেখানে ছিলাম আমি, দাদার কাছে।

—দাদার কাছে, তো এলি কেন?

—আমি কি এলাম? তুমি তো নিয়ে এ করে। ও বাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গে দিয়ে যাও আমাকে। নইলে দাদা কেটে ফে

অধ্যাপকের মনে হল তাঁর মাথা মুখ থেকে ঝাঁ ঝাঁ করে গরম বেরুচ্ছে। চাপা গ দিয়ে বললেন, চুপ কর বলছি। নইলে আ ফেলব তোকে।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের ওপর থেকে হাউ চীৎকার—ওগো, ছেলেধরা আমাকে ধরে গো। চেঁচাচ্ছে আর হাত পা ছুঁড়ছে।

চোখের পলকে ভিড় জমে গেল। চারি প্রশ্ন শুরু হল, কি হল মশাই, ব্যাপার কী?

কাঞ্চলী চেঁচিয়ে উঠল, আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে গো জোর করে।

অধ্যাপকের সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ছুটে ে থেকে দুম করে কাঞ্চলীকে নামিয়ে দিলেন মধ্য থেকে অনেকগুলো গলা এক সঙ্গে ে

ঘেন্নায় অপমানে অধ্যাপকের তখন চোখ ফেটে জল আসবার অবস্থা। কাকুলীকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছেন, সেইখানেই চাঁদ দাঁড়িয়ে আছে, আর ছট-ফটানি কান্নাকাটি কিছুই নেই।

তার দিকে চেয়ে অধ্যাপকের দাঁত কিসকিস্ করে উঠল। ইচ্ছে হল ঠাস করে চড় বসিয়ে দেন পাজিটাকে

হাত প্রায় তুলেই ফেলেছিলেন, আবার তাকে সামলে নিলেন, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দাঁড়ালেন। তার দিকে চাইতেও আর প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

পরের চরিত্র সংশোধনের সুযোগ বিনা খরচায় পেয়ে কেলে উৎসাহিত হয়ে ওঠে না। এমন আহাম্মুক বাংলা দেশে কমই আছে। বহুজনের মুখে বহুপ্রকার মন্তব্য বেরুতে লাগল। অধ্যাপক রোমাঞ্চিত কলেবরে শুনতে লাগলেন।

—চেহারাখানি তো করেছেন খাসা ভদ্রলোকের মতই।

—ব্যাপার চাকা দিয়ে বেমালুম নিয়ে যাচ্ছিল বাচ্চাটাকে।

—ধরে পাট করে দিন মশাই।

—হিন্দুই তো? না পাকিস্তানী মুসলমান?

খোলাই দিন, বাপের নাম মুছে বেরিয়ে আসবে।

একটি ছোকরা ঘাড় ছাটা, হঠাৎ এগিয়ে এসে ঘুষি তুলে বললে, শালা বদমাইস!

অধ্যাপক গর্জে উঠলেন মুখ সামলে।

চারদিক থেকে গর্জন উঠল মারো, মেরে ঠাণ্ডা করে দাও।

বাইরে হলে মারধর হয়তো আগেই শুরু হয়ে যেত। স্টেশন প্ল্যাটফর্ম বলেই এতক্ষণ হয়নি। এইবার মনে হল আর ঠেকছে না। এত লোকের সঙ্গে মারামারি করা সম্ভব নয়। বয়সও গেছে পঁয়ত্রিশ ছাড়িয়ে। অধ্যাপক মনে মনে তৈরী হয়ে নেলেন, মারটা এবার খেতেই হল।

কিন্তু মারধর শুরু হতে হতেও হল না। ভিড় যখন গলাটা থামচে ধরেছে প্রায়। ভিড়ের পেছ একটা শান্ত ভারী গলা শোনা গেল।

কি হচ্ছে ব্যাপার, দেখি তো।

আচমকা বাধা পেয়ে ভিড়ের উৎসাহ এক গেল; দুহাতে তাকে ফাঁক করে পথ বানিয়ে লোক সামনে এগিয়ে এল। লম্বা চেহারা, পোশাক, বুট পট্টি পরা। ভিড় ঠেলাঠেলি দিলে—জি. আর. পি.। ঠ্যাঙাবার উৎসাহটা গেল সবার।

পুলিস অফিসার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দুহাত তুলে নমস্কার করে বললেন, স্যর আ

অধ্যাপকের চোখ তখন নিষ্প্রভ লাগছে। চেষ্টা করে মনকে সংযত এবং দৃষ্টিকে সংহত হল। তাকিয়ে দেখলেন, সামান্য চেনা-চেনা। ঠিক মনে করতে পারছেন না। অপ্রতিভ বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু—

—আমি পাবনা কলেজে পড়তাম, স্যর, ভিড়ে তাকিয়ে বললেন, আপনারা যান ভিড় করবেন

ভিড় কিছু পিছন হটল; একেবারে তাঃ দুটো একটা অস্ফুট উক্তি শোনা গেল—

—চলুন ভাই।

—এইবার আর কি ঘরে ঘরে সামলে দেওয়

—ও ত জানা কথাই। সব সাঁটের ব্যাপা

অফিসার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। এক কনস্টেবল দাঁড়িয়ে ছিল। ইঙ্গিতে তাকে বললেন, ভিড় হটাও।

কনস্টেবল ভিড়কে বললে, চলিয়ে যান আ হাঙ্গা করবেন না।

ভিড় মিলিয়ে গেল, অবশ্য খুবই অপ্রসন্ন মনে স্বাধীন হয়েও লাভ হল না কিছু, পুলিসের সমানই চলছে, এই রকম ভাব।

দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু অধ্যাপক আর অ আর কাকুলী।

অধ্যাপক বোকার মত হেসে বললেন, মুখ

অফিসার বললেন, ঐ রকমই। স্বাধীন হয়ে আরও যেন বেড়েছে। কিন্তু, ব্যাপারটা কী হচ্ছিল বলুন তো।

বলতে বলতে কাঞ্চনীর দিকে চোখ পড়ল। সে হতভম্ব হয়ে ঠায় চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এক একবার যেন ভাবছে হাত বাড়িয়ে অধ্যাপকের জামার খুঁটটা ধরে নেবে। কিন্তু সাহস করে সেটুকুও হাত বাড়াতে পারছে না। তার সামনেই পুলিস দাঁড়িয়ে।

তার দিকে তাকিয়ে অফিসার বললেন, এটি কে?

অধ্যাপক ততক্ষণে ধাতস্থ হয়েছেন। বললেন, ওকে নিয়েই তো কাণ্ড।

বলে, সংক্ষেপে অবস্থাটা বিবৃত করলেন। করে বললেন, আমি ভেবেছিলাম ওকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে যাব। ওই চেঁচামেচি করে হাট বাধালে। এখন কি করি বলতো?

অফিসার একটু হাসলেন। অনুকম্পার ভাব। অধ্যাপকরা এমনিই কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত হয়ে থাকে, এতো জানা কথা। বললেন, এরা কি স্যর, অত সহজে উদ্ধার হবার মাল? এই বয়সেই পেকে ঝুনো হয়ে গেছে। নিয়ে গিয়ে কি করবেন একে, পোষ মানাতে পারবেন না।

অধ্যাপকের অধ্যাপকী-মন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বললেন, তার কোন মানে নেই। With good treatment—

অফিসার ঈষৎ হেসে বললেন, হবে না স্যর। জাত ক্রিমিন্যাল এদের ঝোঁকই ঐদিকে। স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার এদের অন্যমত অরুচি। আমরা তো এই নিয়েই ধাটাধাটি করি সারাক্ষণ, আমরা জানি জাতই আলাদা।

অধ্যাপক অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, সে যাক। এখন একে কি করি বল। যেতে না চাইলে জোর করে নেওয়া তো আর সম্ভব নয়।

অফিসার বললেন, নেওয়ার সার্থকতাও নেই স্যর। আপনার সঙ্গে গেলে আর কিছু না হোক বাঁচত, তা ওরই যখন মতিগতি নেই তখন আর করবেন।

অধ্যাপক বললেন, ছেড়ে দিয়ে যাব কোথায় স্টেশনে?

—তা নয় আর কোথায়। আপনি ভাববেন না স্যর, ও ঠিক ঝাঁকের কই ঝাঁকে নেবে। ওদের দলবল কি এখানেও নেই ভাবছেন?

অধ্যাপক ব্যাকুল হয়ে বললেন, না না, না। আমি ওকে আশ্রয় দিতে পারলাম আমার আর ওর ভাগ্য। কিন্তু তবু তো যারো আশ্রয় ওর ছিল। আমিই সেখান থেকে ওকে নিয়ে এসেছি। নিয়ে যেতে যদি নাই পারি অন্তত সেখানে ফিরে পৌঁছে দিয়ে আসার যে

অফিসার বললেন, তার মানে, এই মেয়ে করে আবার আপনি সেই রথতলার ঘাটে ছুটে

অধ্যাপক বললেন, সেই তো হচ্ছে ভাবনা আমার তাই ছুটতে হয়। অথচ প্ল্যাটফর্মে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, গাড়ির সময় আর মিনিট কুড়ি। এই ট্রেনে আবার ন আমার উপায় নেই—বাবা নিশ্চয় এতক্ষণ উঠে গেছেন।

অফিসার বললেন, তাই তো বলছি। মিছে মন খারাপ করবেন না এ নিয়ে, এ মেয়ে মেয়ে নয়। একে আপনি নিশ্চিন্তমনে ছে চলে যান।

অধ্যাপক বললেন, সেইটেই যে পারছি না হঠাৎ বললেন, তুমি এই ভারটি নাও—কে দিয়ে ওকে সেই রথতলার ঘাটে পৌঁছে দাও। কোথায় আমি বলে দিচ্ছি।

অফিসার খুব গম্ভীরমুখে—করুণার হাসি হচ্ছিল বলেই হয়তো খুব বেশী গম্ভীর মুখে —ঘাট আমি চিনি। বেশ তাই দেব পৌঁছে, চলে যান। এই মেয়ে যা, ওই কোণে বসে থা

কইলে না। করুণ চোখে একবার চাইল অধ্যাপকের দিকে, দারোগার দিকে চোখ তুলে চাইতেও পারল না—কাঠের পুতুলের মত হেঁটে গিয়ে বেঞ্চের কোণ ঘেঁষে বড়ুর পায়ে গুটিসুটি মেরে বসে রইল।

অধ্যাপক বললেন, আজ রাতে ত আর হবে না, তুমি কিন্তু কাল ভোরেই পৌঁছে দিও ওকে, কেমন ?

অফিসার বললেন, আজ্ঞে হাঁ, নিশ্চয় দেব।

অধ্যাপক একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন—শোন, আর এক কথা। পুলিসকে ওর ভারি ভয়। পুলিসের লোক দিয়ে পাঠিও না।

—আজ্ঞে না, আমার বাড়ির চাকরকে দিয়ে পাঠাব। ওকে সঙ্গে করেই বাড়ি নিয়ে চলে যাব আমি আজ। টাঙ্গিসঙ্গে থাকি, কিছু অসুবিধে হবে না।

—আর, অমর—দুবার ঢোক গিললেন, অধ্যাপক, তারপর ক্ষুব্ধস্বরে একটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন —কিছু খাবার কিনে দাও ওকে—কিছু খায়নি। বলেই—হঠাৎ ফিরে তাড়াতাড়ি হেঁটে গেট পার হয়ে ঢুকে গেলেন, কাজুলী যেখানে বসে আছে সেদিকে আর ফিরে তাকালেন না পর্যন্ত। তাঁর তখন কান্না পাচ্ছে, গলার কাছে কি একটা ঠেলে ঠেলে উঠছে। নিজেকে ভারি ছোট বলে মনে হচ্ছে। বাঁচাতে চেয়েছিলেন মেয়েটাকে, পারলেন না। এ তাঁর লজ্জা, সবচেয়ে বেশী লজ্জা ওই একরত্তি মেয়েটার কাছে। তাই তার দিকে আর ফিরে তাকাবারও সাহস নেই তাঁর—যদি হঠাৎ মন দুর্বল হয়ে যায় ?

ফিরে আর তাকালেন না। তাকালে দেখতেন, সেই কোণে পুঁটুলি পাকিয়ে বসে কাজুলীও নিষ্পলক চোখে তাঁরই দিকে চেয়ে রয়েছে। তাঁর মূল্য তার জানা নেই। তবু ঐ একটা লোককে সে দেখেছিল, যে তাকে মায়া দেখিয়েছে, দাদা তাকে মারবে শুনে যেচে পয়সা দিয়েছে, একটা নয়, দুটো আস্ত এক-আনি।

আনি দুটো তখনও তার মুঠোর মধ্যে।

নিজের কাছ থেকেও দৌড়ে পালিয়ে অত্যন্ত [illegible]

টিকিট দেখাবার কথাও ভুলে গিয়ে। চেকার চেয়ে দেখলেন, তারপর কি ভেবে আর ডাকলেন না।

বাবা অনেক আগেই এসে গাড়িতে উঠে ছিলেন, খুঁজে পেতে দেরি হল না। মাথাতে তাঁকে তুলে দিতে এসেছিল, দোরের কাছে কিছুক্ষণ তার সঙ্গে আজে-বাজে কথা হল। সে ফিরে বাড়ি চলে গেল, অধ্যাপকও নিজের গিয়ে, চাদর মুড়ি দিয়ে সটান শুয়ে পড়লেন। তাঁর মনে পড়েছে, একুনি তাঁকে ঘিরে প্ল্যাটফর্ম ভিড় করছিল, তাদের মধ্যে কোন লোকের এই এমনকি এই কামরাতেও থাকা অসম্ভব নয়। কাছে মুখ দেখাবার ইচ্ছে নেই তাঁর। শুয়ে কিছুক্ষণ ভারি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। হঠাৎ একটা বিষম শ্রান্তি নেমে এল মন ভরে, পড়লেন। গাড়ি যখন ছাড়ল, তিনি তখন ঘুমে অ

অনেক রাতে, ঘুমের মধ্যে মনে হ'ল কে ত চোখ মেলে দেখলেন, চেকার।

বুক পকেটে হাত দিয়ে টিকেটটা বার ব এরই মধ্যে হঠাৎ একটা সরু গলার তীব্র চীৎকার এল—উঃ,—মরে গেলাম গো।

ধড়মড় করে উঠে বললেন। ঠিক তাঁর তলার ঢুকে একটা ছোট বাচ্চা ঘুমিয়েছিল। মধ্যে তার একটা হাত বাইরে মেঝের এসে টিকেট নিতে গিয়ে না-দেখে তার সেই হা চেকার মাড়িয়ে দিয়েছেন।

একবার চেঁচিয়ে উঠেই কিন্তু তক্ষুণি থে বাচ্চাটা। চেকার ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে বললেন, আয় তো দেখি কে তুই। আয়, আয়।

গুটিগুটি বাইরে বেরিয়ে এল বাচ্চাটা। কা চেকার চোখ পাকিয়ে বললেন, ঐপাশে ঢুকে

কাকুলী ততক্ষণে আর একবার পাখর হ'য়ে গেছে। এও নিশ্চয় পুলিস।

অধ্যাপক তাড়াতাড়ি বললেন, থাক থাক, ওর ভাড়া আমি দিয়ে দিচ্ছি।

চেকার একবার চেয়ে দেখলেন, তারপর বলল আপনি দেবেন? কেন?

অধ্যাপক চোক গিলে বললেন, মানে, ওর নিশ্চয়ই নেই পয়সা।

চেকার একটু মুচকে হাসলেন, বলল to be in money.

অধ্যাপকের রক্ত গরম হয়ে উঠল, বললেন, Supposing I am. Is it any business of yours?

চেকার মুচকে হেসে বললেন, Oh no. sure. একটু থেমে বললেন, Anyway, I don't think she is three yet. Goodnight.

বলে চটপট্ বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে।

কাকুলী তখনও দাঁড়িয়ে। অধ্যাপক তাকে বললেন, তুই এলি কখন?

কাকুলী কথা বললে না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। অধ্যাপক একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন, যা, শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্। চোক তলায়, কাঁদতে হবে না।

কাকুলী তখনও কথা বললে না; চুপচাপ গিয়ে সীটের তলায় ঢুকল। ঘুমুল কি ঘুমুল না, কে জানে। ঘুমোলই নিশ্চয়, না ঘুমিয়ে সারারাত জেগে জেগে চিন্তা করবে, অত চিন্তা করতে সে শেখেনি।

শেখেনি কথা বলতেও। নইলে চুপ করে থাকত না, কথা বলত। বলত, এটা বুঝতে পারছ না, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার?

বলতে পারে নি, কিন্তু এই কথাটাই তার মনে জেগে উঠেছে বারবার। প্ল্যাটফর্মে জড়ো হ'য়ে বসে তাই তার দিকেই চেয়েছিল সারাক্ষণ। তিনি যখন একলা একলা ভীষণ ভয় করছে তার। অথচ চলে যাবে তাও পারছে না, পুলিস-দারোগা নিয়ে বসে থাকতে বলেছে।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল; তারপর দারোগা গিয়ে ঘরে ঢুকেছেন, কাকুলী উঠে এল গেটের কাছে চলে এল। মস্ত এক দল লোক ঝুঁচকি নিয়ে ঢুকছিল, তাদের মধ্যে মিশে তলায় তলায় গুড়ি মেরে সেট পার হয়ে গেল, গাড়ির জানালায় জানালায় তাকিয়ে বেড়ে দেখল, বাবু কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে।

সাহস করে সামনে এগিয়ে গেল না; আড়ালে সরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ঝি গাড়িতে ঢুকে গেছেন, লুকিয়ে লুকিয়ে গি গাড়িতে বেয়ে উঠেছে; পাছে কেউ দেখে ভয়ে সীটের তলায় গিয়ে লুকিয়েছে।

এবার ঢুকে হাত-পাগুলোকে প্রাণপণে টো রাখল সে, আবার কেউ না দেখে ফেলে, বলগ বেনাপোলে কাস্টমের লোকরা যখন সীটে তলায় উঁকি মেরে দেখছে, কাকুলী তখন দম মটকা মেরে পড়ে আছে, আবার কেউ তা নাবিয়ে না নিয়ে যায়।

ভোর বেলায়, খাবার বার করে অধ্যাপক এই ব্যাং, বেরিয়ে আয়, খাবার খাবি!

এক ডাক, দু ডাক, কাকুলী নড়ে না। ত পড়ে বললেন, হেই, শুনতে পাচ্ছিস না পায় না?

কাকুলী বড় বড় চোখ করে বললে, হুঁ।

—তবে আর বেরিয়ে।

কাকুলী উঠে এল। তার হাতে খাবার দি বললেন, হাত ধুবি না?

কাকুলী হাতটাকে পিঠের সেই নোংরা

বললেন, অমন হড়মুড় করে খাসনে। আস্তে আস্তে খা, কেউ কেড়ে নেবে না।

কিন্তু কেড়ে নেবে না বললেই কি আর সে ভরসা পায়। কেড়ে নিচ্ছে, এই দেখাই তো তার অভ্যাস তাড়াহুড়ো করে খেতে গিয়ে বিষম লেগে গেল; কাশির ধাক্কায় আস্ত আধখানা সিঙাড়া ছিটকে পড়ে গেল হাত থেকে।

অধ্যাপক বললেন, নে, জল খা।

জল খেয়ে সুস্থ হল কাবুলী; চোখ দুটি তখনও সেই ঘুলোয়-পড়া সিঙাড়ার ওপরে বাঁধা। জল খেয়ে হাত বাড়িয়ে সেটাকে তুলতে গেল। অধ্যাপক ব্যস্ত হয়ে বললেন, এই এই, ওটা ফেলিস্‌নে।

কাবুলী বাড়ানো হাত গুটিয়ে নিলে, কিন্তু মুখে বেদনা ফুটে উঠল। কেন দিলে না তাকে তুলতে, অমন তো তুলেই খায় সে।

অধ্যাপক বললেন, এই নে, এইটে খা। আরেকটা আস্ত সিঙাড়া দিলেন। কাবুলী খুব শক্ত করে ধরে অল্প অল্প কামড়ে কামড়ে সেটাকে খেলে। চোখ তখনও ঘুরে ঘুরে গিয়ে সেই আধখানার ওপরে পড়ছে। কিন্তু হাত বাড়াতে আর সাহস হচ্ছে না।

মৌলতপুর কলেজ স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াল, বেলা তখন ন'টা। অধ্যাপক ধরাধরি করে মালপত্তর নামিয়ে নিলেন। কাবুলীকে ডেকে বললেন, এই চল, নেমে আয়।

কাবুলী কথা না বলে ভয়ে ভয়ে এসে দোরের কাছে দাঁড়াল, হাতে তুলিয়ে তাকে নামিয়ে দিলেন।

বাবা এতক্ষণ কিছু বলেন নি, নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ওটাকে নাবালি কেন?

—নামাব না তো কি করব।

—যাবে কোথায়?

—কোথায় আর, আমাদের বাসায়ই।

—কেন? কে ও?

—বদ্‌র'খন।

বাড়ি, কোয়ার্টার। স্টেশন থেকে এসে ঘরে মিনিট আড়াই সময় লাগে।

বাড়িতে ঢুকতেই, মা, স্ত্রী ছেলে মেয়ে সবাই প্রশ্ন করলেন, মেয়েটা কে?

বললেন, বদ্‌র'খন।

মেয়েটার ইতিবৃত্ত যখন সংক্ষেপে বললে বললেন, আনলি তো, সামলাতে পারবি? বললেন, না পারব কেন।

বাবা বললেন, খাওয়ার খরচের কথা বলিনি সব গ্যাং, এদের ডালপালা সর্বত্র। দলের কে বেরিয়ে গেলে এরা ডেস্পারেট হয়ে ওঠে, সব ফাঁস করে দেয়। যদি টের পেয়ে যায়?

অধ্যাপক বললেন, পাকিস্তান অবধি কি আ থাকবে তাদের?

—তা অসম্ভবও নয়। গুণ্ডার দলের আর পাকিস্তান কি।

—দেখিই না। তেমন যদি বুঝি, না হ ইটিরিয়ারে সরিয়ে দেব কোথাও। তাই বলে আসতে তো পারা যায় না সেখানে।

বাবা আর কিছু বললেন না। বেশী বলা ভাঁ নয়।

মা বললেন, এনে ঠিকই করেছিস, ঐটুকু তাকে বাঁচাবার চেষ্টা তো করতেই হবে। কিন্তু, রাখবি? তার চেয়ে এক কাজ কর না—অ সঙ্গে দিয়ে যে নিয়ে চলে যাই।

—তাতে লাভ? তোমার সেখানে পুজো সমাজ আছে, তোমারই বরং ঝক্কি বাড়বে সাম আমার তো আর সেসব নেই।

—তার জন্যে নয়, ঐটুকু মেয়ের ঝক্কি আ বলছি এই জন্যে, এটাও তো কলকাতার সারাক্ষণ ঘাতায়াত, এখানে থাকলে ওর হ হঠাৎ খোঁজ পেয়ে যেতে পারে। বরিশাল, অ কেউ আর জানতে যাচ্ছে না।

—আর সেখানেও যদি খোল বুঝি, না হয় গ্রামে পাঠিয়ে দেব। বা মফেজকেও দিয়ে দিলে হয়—তার মেয়ে নেই, আদর করে নিয়ে মেবে। ওর তো আর হিন্দু-মুসলমান বলে কিছু নেই, বেঁচে থাকলেই হ'ল।

মফেজ এঁদের খাড়োয়ান। অনুগত এবং বিশ্বাসী। অধ্যাপক বললেন, সেটা মন্দ বলনি। কিন্তু আজ নয়, এখন এইখানেই থাক। দরকার হয় তো পরে পাঠিয়ে দেব, মফেজকেই দিয়ে দিও।

গৌরী একফাঁকে আড়ালে ডেকে বলে তোমার কাণ্ডটা কি বল তো?

অধ্যাপক বললেন, কি, মেয়েটাকে নিয়ে এসেছি, এই তো? বেশ করেছি।

গৌরী বললেন, এনেছ বলে কে বলছে?

—কি বলছ তবে, কি জাত তার ঠিক নেই?

—তাও নয়। আমার কি, আমি পুষে রাখতেও পারব, খেতেও দিতে পারব। কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই, হুস্ করে তো নিয়ে এলে, তারপর শোবে কোথায়, পরবে কি?

—শোবে বিছানায়, পরবে জামা-কাপড়।

সেই কথাই বলা হচ্ছে। নিয়ে এলে, অমনি জামা-কাপড় কটা নিয়ে আসতে হয় না? এখন হঠাৎ আমি পাই কোথায়? না কি ন্যাংটো হয়েই মেয়ে বেড়াবে?

—আহা, কিনে আনবার তো সময় ছিল কত। জামা-কাপড় নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না—সে আমি ঠিক করে নেব।

—ঠিক তো কত কর।

—করবই তো। শোনো বলছি। বাবলু-চুকুর পুরোনো জামা ইজের কিছু নেই? তাই খুঁজে একটা পরিয়ে দাও আপাতত। তারপর আমি কাপড় এনে দিচ্ছি, বানিয়ে দিও।

—বেশ। আর শোওয়া? ঐ মেয়েকে আমি

—বেশ তো, খাটের তলায় শুইয়ে রেখো।

—চটে গেলেই তো হয় না সব। কো এসেছে, কি রোগবালাই গায়ে আছে না আ মরদা, নাকে পোঁটা, মাথাভর্তি উকুন—ও বাবলু-চুকুর সঙ্গে শুতে দেব না আমি—মরে গে

—কাউকে মরে যেতে হবে না, তোমারও ন নয়। কাঁথা সতরঞ্চি যা থাকে, দিয়ে একটা আপাতত করে দাও না।

—আর মশারি?

—মশারি লাগবে না। ঘুমুতে তো গ পড়ে। মশারি ছিল সেখানে?

সে সেখানে যা ছিল তা ছিল। আমি বিনা শোয়ালে তো। তারপর মশার ধরে উড়ি থাক ঠ্যাঙে করে। আর নয় তো আ আমাকে উদ্ধার করুক। পরের মেয়ে, এনে ফেলবে?

—আচ্ছা আচ্ছা, এক্ষুণি তো ঘরে ব রাত্তিরের কথা রাত্তিরে—তার এখনও দশঘ এক্ষুণি খ্যাচাখেচি শুরু কোরো না। ওঁরা ঘুমান। ততক্ষণ ধৈর্য ধরে থাক।

ধৈর্য আমার ঠিকই আছে। যাক, যা করব করব এখন, তোমার আর কষ্ট করে মাথা হবে না।

—That's a good boy। এই কথাট বললেই হ'ত।

কাকুলী ততক্ষণ বাবলু-চুকুর সঙ্গে করে নিয়েছে। বাবলুর তার চেয়ে ছোট পেলে আর জ্ঞান থাকে না। চুকু কিছু লোক, ভেবেচিন্তে মেশে।

তারা দু'জনে কাকুলীকে টানাটানি করছে কাকুলী এদের ধারার সঙ্গে পরিচিত না করছে তার, আবার যাবড়েও যাচ্ছে।

—না ভাই। তোমাদের মা বকবে।

—বকবে কি করে? মা তো রান্না করতে গেছে।

বাবলু বললে, এই, তোর মাথায় অত ময়লা কেন? সাবান দিস নে? সাবান দেওয়া বলে কাকে, তাই কি জানে কাকুলী! বললে, হ্যাঁ, দিই তো।

—ঘোড়ার ডিম দিস।

এদের একটা সুবিধে আছে, কে ও, কোথা থেকে এলো, কেন এলো, এসব বাজে প্রশ্ন নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। এসেছে, বেশ করেছে, মিটে গেল। কালো আর ধলো, সাফ আর নোংরা এ নিয়েও কোন মাথা-ব্যথা নেই, খেলার সাথী তো, হলেই হল।

নতুন জায়গা, প্রথম দিন, বেশী চালচলন করতে দিলেন না গৌরী, আলগা-মতন খানিক মাথা গা ধুইয়ে, বাবলুর ছেলেবেলার ইজের আর ফ্রক একটা পরিয়ে দিলেন, অল্প-একটু সভ্য-মতন দেখতে হল। খাওয়ার সময় অবশ্য এক সঙ্গেই বসিয়ে দেওয়া হ'ল তিনজনকে। রোজ নাকে পোঁটা, কিন্তু বাইরের বারান্দায় তাকে খেতে দিলে ছেলেমেয়ে পোটাপিটি বাধিয়ে দেবে। আর, রাখতেই যখন হবে একসঙ্গে, এরা আর ওরা এক নয় আলাদা, একথাও বজায় রেখে চলা যায় না।

বাবা আর মা সেই রাত্রের স্টীমারেই বরিশাল চলে যাবেন। তাঁদের দেরি করা চলে না, সেখানে বাড়িতে অভিভাবক কেউ নেই, শুধু মেয়েরা।

যাবার সময়েও মা বললেন পুত্রবধূকে, যদি দেখিস ওকে রাখতে বিপদ হচ্ছে, বরিশালে পাঠিয়ে দিস্।

অধ্যাপক সন্ধ্যার ট্রেনে তাঁদের সঙ্গে খুলনায় চলে গেলেন, স্টীমারে তুলে বসিয়ে দিয়ে আসবেন।

সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরে এসে দেখেন, তুমুল কাণ্ড বেধে গেছে।

শোবার ঘরের অন্য পাশে, মেঝের ওপর সতরঞ্চি আর কাঁথা দিয়ে কাকুলীর জন্যে বিছানা করে দিয়েছেন গৌরী। মশারিও একটা ঝুটিয়ে এনেছে কোথা থেকে।

কিন্তু, বাবলু-তুতুর তাতে ভীষণ আপত্তি। কেন

ঘরে ঢুকতেই গৌরী বললেন, নাও, সা তোমার ছেলে-মেয়েকে। বাবা বাবা, আমাকে ছিঁড়ে খেতে বাকি রেখেছে এতক্ষণ।

অধ্যাপক বললেন, কি হল, ছিঁড়ে খাচ্ছিল নাকে? আমিল তো একটি বই মা নেই।

বাবলু বললে, ছিঁড়ে খাইনি বাবা, সত্যি ছিঁড়ে খাইনি। এসে দেখ, একজন আস্ত আছে

তুতু বললে, ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছি তো বলল বলল ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে বাকি রেখেছি।

—বেশ। কিন্তু কেন, এত ছিঁড়ে খাওয়া-কিসের?

বাবলু বললে, আচ্ছা বাবা, তুমিই বল। একলা ঐ বিছানায় শুতে ভয় করবে না ওর?

অধ্যাপক কাকুলীর দিকে চেয়ে দেখলেন। ি টার ওপর, এক মুড়োয় দেয়াল ঘেঁষে জড়ো হ'য়ে তাকিয়ে বসে আছে সে। কাল থেকে ঝড়কাপ টা ক্রমাগত চলেছে তাকে নিয়ে, তো খেইই পাচ্ছে না সে। বললেন, না, করবে না

—করবে না? ঐটুকুন মেয়ে, কি করে একা একা? নিশ্চয় ভয় করবে ওর দেখো।

—করবে না। সবাই কি তোর মত, বুড়ো খালি 'ইঁদুর ছানা ভরে ঘরে'? ও তোর মতো

—না, নয়, তুমি জানো।

—জানিই তো।

গঙ্গার ঘাটের কথাটা মনে পড়ে গেল, কিন্তু না। কি হবে সে বিভীষিকার গল্প এদের শুনি

তুতু বললে, বেশ, ভয় পাবে না, খুব বীর কিন্তু, রাত্রে যদি ওঠে?

—তখন ডাকবে আমাদের।

—যদি অন্ধকারে আছাড় খায়?

—অন্ধকার হবে কেন? আলো তো জ্বালাই

—যদি ব্যাং এসে ঢোকে ওর বিছানায়?

—ঢুকবে না। মশারি গুঁজে দেওয়া হবে।

বাবলু বললে, কিন্তু সবাই একসঙ্গে শুলে

ভুতু বললে, বুঝলি না দিদি, ও কিনা আমাদের পাড়ীর মেয়ে নয়, ও কিনা কালো, তাই ওকে নিয়ে বিছানায় শুতে বাবা আপত্তি।

গৌরী তর্জন করে বললেন, হ্যাঁ, বলেছে তোকে। ঐ তো আরো কালো, তোকে নিয়ে শুই না?

ভুতু বললে, ইঃ, আরো কালো না হাতী।

গৌরী বললেন, কালোই তো। ঘুটঘুটে কালো। কালকাতুয়ার মতো।

বাবলু বললে, বেশ তাই—ভুতু আল-কাতুয়ার পিঠ নতুন ছুতো। ও একেবারে দুধ ফেননিভ শয্যা। তাহলে কেন ওকে নিয়ে শোবে না?

গৌরী বললেন, আঁটে নাকি এইটুকুন বিছানায়। দাদাদাদি হ'য়ে গরমে মরে যাই এমনিতেই।

বাবলু বললে, বেশ, ওকে নিয়ে আমি ভুতু আর বাবা শোব, তুমি গিয়ে ওর ঐ বিছানাটাতে শোও।

গৌরী বললেন, তা তো বটেই। বকাস নে এখন, ঘুমো।

তড়াক্ ক'রে এক লাফ দিয়ে ভুতু ঘরের মাঝখানে। মেঝের চিৎ হ'য়ে পড়ে হাত পা আছড়াচ্ছে আর বাবা এপাশ-ওপাশ করছে: উঃ বাবারে, কী গরম, শুতে পারছি না, আমাকে এই খাটের তলায় বিছানা করে দাও।

অধ্যাপক বললেন, এই হনুমান, উঠে আয়।

ভুতু বললে, যাব কি করে, ভীষণ গরম।

—মার খেলে আরও ঢের বেশী গরম লাগবে। আয় উঠে।

ভুতু গম্ভীরমুখে এসে খাটে উঠল। খাটের একদম ওপাশে চলে গিয়ে, ধুপ্ করে শুয়ে পড়ে একদম নট্-নড়ন-চড়ন হ'য়ে ওপর দিকে চেয়ে রইল।

অধ্যাপক বললেন, এখন ঘুমো ছুটোতে। ওর সঙ্গে আজ শুলে ওর মাথার দু লক্ষ বিরাশি হাজার নম্বো ঢেবয়টা উকুন, সব হেঁটে চলে আসবে তোদের মাথায়। আসবে। আর আমার মাথায় এসে থাকতেই না, আমার তো ছোট ছোট চুল।

গৌরী বললেন, একটাই বা আসবার দরকার

অধ্যাপক বললেন, আচ্ছা, এখন ঘুমো না। আমি সব উকুন-টুকুন ছাড়িয়ে দেব দেখিস্।

বাবলু বললে, তাহলে কাল একসঙ্গে শুতে তো?

গৌরী বললেন, আলালে। কালকের কথা কালকে হবে। আজ এখন আজকের কাজ কর, ঘুমো।

কাফুলী তখনও একভাবেই তাকিয়ে বসে। অধ্যাপক উঠে তার কাছে গেলেন। বললেন, একা একা শুতে পারবি না এখানে?

কাফুলী শুধু তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

অধ্যাপক বললেন, কিচ্ছু ভয় নেই। রাতে যদি ঘুম ভাঙে আমাদের ডাকবি। আলাই থাকবে ঘরে।

বলে, তাকে ঘরে শুইয়ে দিয়ে মাথার এ চপাড়ে, মশারি ফেলে গুঁজে দিলেন।

কাফুলী হুঁ-হা কিছুই বললে না। এপা শুয়ে এদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নিশ্চল রইল। তারপর একসময় ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে

সবাই ঘুমুচ্ছে। আলোটাকে মাথার কা অধ্যাপক শুয়ে শুয়ে বই পড়ছেন। পড়ছেন, থেকে বই নামিয়ে কাফুলীর দিকে তাকিয়ে মেয়েটা বোকা নয়, বেশ বুদ্ধিমান। কিন্তু খেয়ে মনটা-আধমরা হ'য়ে আছে—আচমকা কেমন পাথর হ'য়ে যায়, মন আর দেহ নিশ্চল করে দিয়ে শুধু নির্বাক অপেক্ষা ক ঝড়-ঝঞ্ঝা যা আসে এসে যাক্। ঠিক যেন ব বিপদ বুঝে নিজের ভেতরে নিজেকে লুকিয়ে ওকে বাঁচাতে হলে এই জড়তা ভাঙতে হবে কি করে সম্ভব?

মাথায় খুব করে সাবান মেখে, নিজেই ক্ষুর দিয়ে সারা মাথা কামিয়ে পালিশ করে দিলেন। ঘন কোঁকড়া চুল, ধুলোয় বালিতে জট বেঁধে আছে, তার তলায় চামড়ার ওপরে চাপবাঁধা ময়লার আস্তর। চেঁচে-ছুলে সব পরিষ্কার করে দিলেন, কেটেও গেল দু'চার জায়গায়। তা হোক, এই এক সুবিধে আছে মেয়ের, কাঁদে-চাঁচে না চুপ্ করে বসেই থাকে—যা-কিছু ঘটছে, তার হাতে নির্বিকার হ'য়ে আত্মসমর্পণের অপূর্ব ক্ষমতা জন্মে গেছে ওর।

তারপর প্রচুর গরম জল আর সাবান দিয়ে, তার সর্বাঙ্গের জমাট ময়লা ঘষে ঘষে তুলে দিলেন। উঠ্‌তে চায় না, নারকেল-ছোব্‌ড়া দিয়ে ঘষা দরকার এমনি অবস্থা।

বাবলু হুতু পরম আনন্দে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখছে। সৌরী একবার বললেন, অল্পে অল্পে করলে হ'ত না? একদিনে অতখানি করছ, এর পর দেখো জ্বর হ'য়ে মরে যাবে।

অধ্যাপক বললেন, জ্বরই যদি ঘাবড়াবার কি আছে। জ্বর হয় তো ওষুধ খাবে। দেখছ অবস্থা, এই ক্লেদ, একে খাঁটা দিয়ে আর মাঝপথে ছেড়ে দেওয়া যায় কখনও?

হুতু বললে, আহা, অল্প অল্প করে, তার মানেই অনেক দিন ধরে। তার মানেই হচ্ছে, আজও একসঙ্গে শুতে দেবে না, কালও না। তার পরদিনও না। বুঝলি দিদি কায়দাটা?

সৌরী বললেন, আহা, শুন্ না, বারণ করছে কে।

অধ্যাপক বললেন, কারু কিছু ভয় নেই। অল্পে অল্পেও করা হবে না, শুতেও আর হবে না কাউকে। গা গলগল করে কাদাজল বেরুচ্ছে গা থেকে, শেষ অবধি সবটাই না গলে বেরিয়ে যায়, হয়তো দেখবি খুঁজে খুঁজে আর মেয়েটাই খুঁজিয়ে গেছে। হাঁরে, বয়স তো এইটুকু, এত কাদা এই ক'দিনে জোটালি কি করে? না কি আগের জন্মের জাওলাও খানিক নিয়ে

ধোয়া মোছা শেষ করে হাতে পায়ে মাথে দিয়ে, গায়ে পাউডার দিয়ে সাফ জামা ইজে দেওয়া হ'ল যখন, দেখা গেল ভালই দেখাচ্ছে ে —হোক কালো, মুখ চোখ তার কুচ্ছিৎ নয়, বুদ্ধি আছে চোখে মুখে।

বিকেল বেলা কলেজ থেকে ফিরে এসে, ছাই পারঅক্সাইড দিয়ে তার কান ধোয়ানো হ' জলে সুন ফেলে তাই দিয়ে তার মুখ গলা ধোয়ানো হ'ল। তারপর রাত্রে আন্টোনাইন, ডোরে ক্যাষ্টর অয়েল।

বাইরে ধুয়ে ভেতর ধুয়ে ঝরঝরে সাফ ক বললেন, এই নাও, আর মাথায় উকুন নাকে পে এর। রীতিমত জেন্টল্‌ম্যান।

কাফুলীরও দেখা গেল, দেহ মন চটোই খু উঠেছে—এদের সঙ্গে মিশতে আর তেমন ভয়ত না—আত্মপ্রত্যয় ফিরে আসছে একটু একটু ক

সাবান ঘষার চোটে জ্বর হবে, ভয় ছিল। হল না। ঝড়েজলে থেকে থেকে একটা লাই মেয়েটার চমৎকার মজবুত হয়ে গেছে, বে স্বাস্থ্য। হজম করবার শক্তিও প্রচুর। প্রথম দি অবশ্য কিছু সামলে-সামলে খাওয়াতে হল দিনকতক পেটপুরে খাবার পরেই তার শরীর শীর্ণ থাকলো না। বেশ গোলগাল হয়ে উঠ বিলিক মেরা দিল মুখে চোখে সর্বাঙ্গে। ঘরে ছোট একটা খাট এসেছে তার জন্যে, বাবলু হুতু আপত্তি নেই।

দিন দশ পনর না যেতে দেখা গেল, কাফু মতই হাসিখুশী হয়ে ঘোড়দৌড় করে খেলে ে অতীতের কালো বিভীষিকা মন থেকে আ মুছে গিয়েছে এরই মধ্যে; সবার সঙ্গে এক মনে করতেও আর আটকাচ্ছে না তার অবশ্য খানিকটা বড় সাহায্য হ'ল এখানে ব্যাপারে। খেলার সঙ্গীরা অনেকেই মুসলমা

হুঁকে তো হিন্দু-মুসলমান কাকে বলে সেটা কেউ।

হাসিখুশীর আর হাসিরাশির অর্ধেক ছড়া যখন মুখস্থ হয়ে গেল কাকুলীর, তখনও তার এখানে একমাস পেরোয়নি।

এরই মধ্যে একদিন কলকাতা থেকে চিঠি এল। পাড়ায়, কেষ্ট ঘটকের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে।

অধ্যাপক বললেন, ঐ দলের কাজ। বুড়ো ক্যাশিয়ার ঘাটে বসে থাকত, বাচ্চাগুলোকে পাঠোত ভিক্ষে করতে, সেই তাকে সব খবর সন্ধান নিত। তারপর সময় বুঝে কোপ মেরেছে।

বললেন, দিই তাই চিঠি লিখে, পুলিস খোঁজ পেয়ে যাক।

গৌরী বললেন, তার ফল? পুলিস তাদের খোঁজ পাবে, আর তারা আমাদের খোঁজ পেয়ে যাবে। এই মেয়েকে নিয়ে এসেছ, মনে আছে? কে আগে বাঁচাও, পুলিসের ভাবনা পুলিস ভাবুক।

চিঠি লেখা হল না।

জানুআরি পার হয়ে গেল। ফেব্রুয়ারিরও খানিকটা।

বরিশাল থেকে শেষ চিঠি এসেছিল জানুআরির শেষে। তারপর আর আসেনি। এ রকম সাধারণত হয় না। অন্তত তিন চার দিন অন্তর চিঠি আসেই। কাজেই উদ্বিগ্ন হবার কথা। তবু হঠাৎ চঞ্চল হবার অভ্যাস নেই তাঁর। অধ্যাপক বিশেষ কিছু ভাবলেন না। হয়তো তাঁরা ভুলে গেছেন লিখতে, বা না লিখেও ভেবেছেন লিখেছি বা হয়তো ডাকেরই গোলমাল।

কিন্তু একটা নিয়ে চিন্তা। এক বোন কলকাতায় অনার্স নিয়ে পড়ছে। পুজোর ছুটির পর থেকে সে আর কলকাতায় ফেরেনি। কথা, বরিশালে বাবার কাছে অনার্সের পড়াটা জলিয়ে নেবে, নিয়ে গৌরতপুরে দাদার কাছে এসে থাকবে কিছুদিন, তারপর একেবারে টেস্টের আগে চলে যাবে পাঠিয়ে দেবেন। জানুআরির পনরোই না হো তারিখ নাগাদ সে গৌরতপুরে এসে পৌঁছে চিঠি না আসে নাই এল, তার কি হল। না কেন?

অথচ এখানেও পড়া দেখে নিতে সময় তার। আরও দেরি করলে শেষ সামলা বিশে বাইশে নাগাদ দেখে অধ্যাপক চিঠি অমলা দেরী করছে কেন। তাকে তাড়াতাড়ি দিন।

মা সাধারণত চিঠি লেখেন না, বাবাই তাঁর চিঠি এল একটা ছুটো, তাতে অমলার ব নেই। ফেব্রুআরি পড়তে অধ্যাপক চঞ্চল হয়ে পরপর তিন চারটে চিঠি দিলেন, অমলাকে পাঠাও। নো রিপ্লাই। তখন মনে মনে শ উঠলেন। অমলারই কি অসুখ-বিসুখ করল ১৬ই ফেব্রুআরি হঠাৎ কলকাতা থেকে অজি এল: বরিশালের খবর জানো কি না? বে এখানে আসবে?

মানে বুঝলেন না। ভাবলেন, হয়ত পাচ্ছে না, তাই লিখেছে। জবাব দিলেন, চিঠি কদিন পাইনি, তবে যতদূর জানি সুস্থ সকলে। এখন আমাদের আসবার কোন নেই।

আবার ১৭ই একখানা, ১৯শে একখান একখানা চিঠি অজিতের। সব চিঠিতে এ বরিশালের খবর জান কিনা? এখানে আসবে

প্রত্যেকটারই জবাব দিলেন সঙ্গে সঙ্গে জবাব: বরিশালের চিঠি এখনও পাইনি। হয় সব ভালই আছেন; এখন আসবার বে নেই।

কিন্তু এর মধ্যে ১৬ই থেকেই হঠাৎ থমথমে ভাব ছড়িয়ে পড়ল হাওয়াতে। কলেজ জায়গাটা একটা দ্বীপ-বিশেষ।

যারা এই কলেজ বানিয়েছিলেন তাঁরা একথা মনে রাখেন নি যে তপোবনেরও লোকালয়ের সংস্রব দরকার হয়। চিরকাল ধরে এখানে যাঁরা বাস করেছেন, তাঁরা নিজেদের নিজস্ব তপোবন নিয়েই থেকেছেন। বাইরের লোকালয় বা জনতার সঙ্গে মেলা-মেশাও করেন নি। সংস্রবও রাখেননি, ফলে এখনকার দিনেও বাইরে যা ঘটে তার হাওয়া কলেজের মধ্যে এসে সব সময়ে পৌঁছয় না। খবর পর্যন্ত আসে না অনেক সময়। পাঁচ মাইল দূরে খুলনা শহর। তার খবরও অনেক সময় এখানে এসে পৌঁছয় তিনদিন পরে; ততক্ষণে বাসি হয়ে পচে আর লোকের মুখে মুখে বারংবার চর্বিত হয়ে তার বার্তা ও মানে দুইই হয়তো বদলে গেছে।

খনখনে হাওয়া বাইরে। খুলনায়,—অন্যত্র থেকে আগত যাত্রীদের মুখের ভাবের ততটা নয় যতটা তাদের বুধ চোখের শুষ্ক চেহারার সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে কথা বলতে গিয়ে থতমত খেয়ে থেমে যাওয়ায়। কিছু একটা হয়েছে বা হচ্ছে কোথাও, কি-যে সেটা ভাল বোঝা যাচ্ছে না। তবু যেন একটা আতঙ্কের আভাস। খুলনাতে ঘটছে না কিছু, ঘটবেও না হয়তো, তবু যেন কিসের ছায়া কিসের ভয় ভয়।

কলকাতামুখো যাত্রীর সংখ্যা অকস্মাৎ অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে, মালপত্র নিয়ে বা না নিয়ে অসম্ভব ত্রস্ত আর ব্যস্ত হয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে তারা। খবর আসতে লাগল খুলনা স্টেশনে আর যশোর স্টেশনে হায়রানি করা হচ্ছে তাদের—যেমন খুশি সার্চ করে মালপত্র কেড়ে নিয়ে, ঘাটে ঘাটে আর গেটে গেটে ঘুষ আদায় করে আর সঙ্গের টাকাকড়ি গয়নাগাঁটির নাগাল ছুতোয় অজুহাতে আটকে রেখে। ঠিক কতখানি হচ্ছে তার হিসেব মেলে না। স্টেশনে বেড়িয়ে দেখতে গিয়ে চোখেও পড়ে না বিশেষ। অথচ সবাই বলে, হচ্ছে। করছে তারা তাও খবর এলোমেলো—কেউ বলে পুলিস, কেউ বলে আনসার, কেউ বলে রিফিউজীরা। ভারত থেকে বাঙালী আর অবাঙালী রিফিউজী বহু এসেছে খুলনায় তারাই করছে। মালপত্র তছনছ করছে ছড়িয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে, কেড়েকুড়ে নিচ্ছে, যে খেয়ালখুশী মানুষকে টেনে নামিয়ে দিচ্ছে রিফিউজী হয়ে চলে যেতে পারে না। যাত্রীরা তর্ক করছে করে না। দাঁতে দাঁত চেপে চুপ যায়, কেউ বা হাতে পায়ে পড়ে। দিব্যি বেড়াতে যাচ্ছি, চিকিৎসা করাতে যাচ্ছি, যে যাচ্ছি না। যাচ্ছ না তো ভাতের হাঁড়ি কে ও নিয়েছিলাম, বিশেষ কিছুই, আবার কিনে তাই। বেশ তো। ওটা নিতেই যদি আ না। হাঁড়িটাকে প্ল্যাটফর্মেই ফেলে রেলগাড়ি ওঠে—নিয়ে নিক যার খুশি।

মানুষের মুখে আর খবরের কাগজে নানার আসছে ক্রমাগত। কালশিটের হাঙ্গামা হয়ে বলছে হিন্দু-মুসলমান; কেউ বলছে, না, কা ফেরারী ধরবার জন্য পুলিস গিয়েছিল, লোক তাদের মেরে তাড়িয়েছে, মেরেও জনতিনেককে: তারপরে পুলিসও গ্রামের ওপরে পালটা শোধ নিয়েছে। গ্রামের লে আর পুলিসরা মুসলমান, এই,—নইলে 'সা ঠিক ওটা নয়।

আগুন যত ধোঁয়া তার চেয় বেশী, সত্যি গুজব রটে তার বিশগুণ। বিশেষ করে যশে খোদ রবিঠাকুরের শ্বশুরবাড়ির দেশ-সাহিত্যিক প্রতিভা খুলে যার গল্প করতে বসবে

কাগজে খবর আসছে: কলকাতায় ঢালী আর জে. পি. মিত্তির একেবারে অ বক্তৃতা দিচ্ছেন। পড়ে হিন্দুরা পুলকিত, তা কি রকম বলছে দেখ লোকটা—কতবড় একজন, সোজা কথা! মুসলমানরা সমা ফেপে যাচ্ছে: বটে!

সত্যি করে কতদূর ঘটবে বা ঘটবে না সে হাত, কিন্তু কিছু একটা ঘটে যাওয়া যে সত্ত

না কাউকে। মাটিতে বাকুক, বাতাসে বিদ্যুতের ঝলকি—ছোঁয়াছুঁয়ি লেগে গেলেই হ'ল।

আতঙ্কের আভাস দর্শন—জানার চেয়ে না-জানা বিপদের আতঙ্ক আরও বড়। অধ্যাপকের কানে আসছে কিছু কিছু, মনে মনে আভাস পাচ্ছেন বিপদের, মুখে কিছু বলছেন না। কি হবে, আগে থেকে সবাইকে শঙ্কিত বিহ্বল করে তুলে? বিপদ আসেই যদি, তখন তার থেকে বাঁচবার জন্যে দেহের মনের সবখানি শক্তির প্রয়োজন হবে। আগে থেকে নাম জপ করে সে শক্তি আর ভরসাকে দুর্বল করে ফেলে লাভ নেই। তারপর রইল পরম নির্ভরসার মধ্যেও মানুষের মনের শেষ ভরসা—নাও তো কিছু হ'তে পারে সত্যি করে। কিন্তু, খবর যাই থাক, চিঠি কেন আসছে না? আতঙ্কই যদি হয়, তবে তো আরও আগে থেকেই পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল বয়স্থা মেয়েকে। কি করছেন?

মনে মনে অধীর হ'য়ে উঠলেন অধ্যাপক। বাবাকে জানেন, এককালের দুঃসাহসী লোক, শরীরে আর মনে অসম্ভব দৃঢ়তা চিরকাল—এমন প্রাচীন বয়সেও তার জিদ ছাড়েনি। বিপদের কথা ভেবে আগার চঞ্চল হওয়া রীতি নয় তাঁর; আসুকই না আগে, তখন দেখা যাবে, এই হচ্ছে যুক্তি।

তাঁর এ খুব জানা কথা: মা একদিন বলেছিলেন, বিপদ ভেবে কি করব। বিপদ যদি আসেই, দেখি আগে দেখি আগে করে, শেষে যেদিন বলবেন আত্ম-রক্ষার আয়োজন করো, সেদিন দেখব তার প্রয়োজনই ফুরিয়ে গেছে।

এটা অবশ্য কিছু অত্যুক্তি। কিন্তু,—

চিঠি যদি ডাকে না আসে, স্টীমার ভর্তি হ'য়ে লোক আসছে প্রতিদিন, লোকের মুখেও তো খবর পাঠাতে পারেন!

শেষটা বললেন, এরকম করে সারাক্ষণ ভাবা যায় না। [illegible] আমি। দেখে আসব ভাবটা দুর্লভ হঠাৎ কি করে হল। মনে মনে দু'চার শুনিয়েও দিয়ে আসব ভাল করে। আর লিখতে একটা দিন দেরি করলে অমনি বসুর পৌঁছয়: "চিঠি না পাইলে উদ্বিগ্ন থাকি"। চিঠি না দিলে আমার 'উদ্বিগ্ন' থাকবার কিছু না উদ্বিগ্ন হবার অধিকারই নেই আর কারো।

গৌরী বললেন, অত অস্থির হও কেন। তো ছেলেমানুষ নয়। ধীর মাথার ভেবে করবেন যা করবার।

অধ্যাপক খেঁকিয়ে উঠে বললেন, বক্তৃতা দি ধীর-মাথার লোক বলেই তো বিপদ করে ধীর যে দরকারের সময়েও চটপট নড়াচড়ার কথ না। তুমি কী জানো—তোমার তো আ নয়।

গৌরী বললেন, আমারই তো আরো বেশ ইন্-দ।

বলেই কেটে পড়লেন। খপড়া জমল না।

বিশে তারিখ। ক্লাস সেরে বেরোচ্ছে প্রায় তিনটে। কলেজ থেকে নেমে আসা ভদ্রলোক সামনে এসে বললেন, নমস্কার।

খুলনার একটি অফিসার। মাস দু এসেছেন। নিজে থেকেই আলাপ কর ছিলেন ভদ্রলোক এক সভার মধ্যে; তার দু'-তিন দিন দেখা হয়েছে। অল্প বয়স।

—কি খবর, এদিকে হঠাৎ?

এমনি। ডিউটিতে এসেছিলাম এইদিকে, একটু দেখা করে যাই।

—বেশ তো, চলুন বাড়িতে।

—না না, বাড়িতে আর যাব না, এ কিরব। কাজ তো কিছু নয়, এমনি এব যাওয়া।

তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, চিঠিপত্র পেয়েছেন?

—বলুন না। পেয়েছেন?

—ক'দিন পাই নি। একটু উদ্বিগ্নও আছি তাই নিয়ে। কেন বলুন তো?

—বরিশালে গোলমাল হয়েছে, তার খবর কিছু পেয়েছেন?

—কিচ্ছু না। হয়েছে গোলমাল?

—বেশী নয়, অল্প।

—কবে?

—তেরোই, রাত্রে।

—আপনি জানলেন কোথায়?

—দেখে গিয়েছিলাম, ঐ পথে এলাম। টাউনে ছিলাম ঘণ্টাকয়েক।

—দেখলেন কিছু?

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে বললেন, না, দেখিনি কিছু। শুনেছি। তেরোই হয়েছিল শুনলাম, খুব বেশী কিছু নয়। পরদিনই কন্‌ট্রোল্‌ড হ'য়ে গেছে।

একটু থেমে বললেন, আপনাদের বাড়ির ঠিকানা জানিনে, নইলে খবর নিয়ে আসতাম। তা হোক, শুনেছি বন্ধুর, দুটো-একটা Strong case হয়েছে মাত্র—তেমন নামকরা লোক কেউ ইন্‌ভল্‌ভ্‌ড হ'লে শুনতে পেতাম নিশ্চয়ই।

—তা বটে।

—ও কিছু নয়; তাঁরা নিশ্চয়ই সুস্থ আছেন, চিন্তা করবেন না।

—করেই বা এসোবে কি।

—না, তাই বলছি, মিছে চিন্তা করবেন না। তাঁরা ভালোই আছেন।

—অসভ্যা।

—আচ্ছা, চলি।

দু' তিন পা এগিয়ে গেলেন, আবার ফিরে এসে বললেন, এই খবরটা নেবার জন্যেই এসেছিলাম।

—বুঝেছি।

ট্রেন এসে গেছে, ভদ্রলোক স্টেশনে চলে গেলেন।

অধ্যাপক বাড়ি ফিরলেন, যথাসাধ্য স্বাভাবিক গৌরীর কিন্তু চোখ এড়াল না; একটু করলেন, অত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন? কি হ

—কিচ্ছু না। ভারভাক্তিক হবার চেষ্টা করি

—নিশ্চয় হয়েছে কিছু। আমাকে লুকোবে বল কি হয়েছে?

—কিচ্ছু না। বরিশাল যাব।

—আবার উঠল বাতিক? ক্লাসে কি গণ্ড ঐ চিন্তাই কর খালি?

—ক্লাসে চিন্তাটাকে ঠেলে রেখে দিই বলে থেকে বেরিয়ে সেটা জোর হয়ে ওঠে। জানানো নয়, আমি সত্যিই যাব কাল।

—গিয়ে কী লাভ হবে?

—যাওয়াটাই লাভ। এরকম আনসার্টেন্‌টি ছটফট করা যায় না। গিয়ে দশাটা কি দেখা যাবে?

—শুধু দেখলেই তো হবে না। ঘর, ঘ হয়েই থাকে সেখানে তুমি সুদ্ধু বিপদের মু পড়লে হাঙ্গামা তাতে কমবে, না বাড়বে? নিশ্চয়ই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করছেন। লোকও আছে প্রচুর, তিনি ডাকলে না এলেও পা কেউ।

—বুদ্ধিটা ভালো। সেখানে হয়তো বিপদ অতএব আবার সেখানে গিয়ে কাজ নেই, বাঁচিয়ে দূরে সরে থাকাই সুযুক্তি। সাবাড় যা যায় সব, তবু তো বংশটা রক্ষে পাবে।

—তাই বলেছি? কর, যা ভালো বোঝ ক

—কি বলেছ তাহ'লে?

—বলেছি, যদি হয়েই থাকে বিপদ, এম হতে পারে, তাঁরা রওনা হ'য়ে পড়েছেন। তু কোন কাজে আসবে না, বরং হয়তো এইখা থেকেই বেশী কাজ হবে। জান না তো, আজই তাঁরা বেরিয়ে পড়ে থাকেন? তু ওদিকে, তাঁরা আসবেন এদিকে—স্টীমারে

হয়। ট্রাঙ্ক টেলিফোন যদি হয় তো করে দেখ, বা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম একটা পাঠিয়ে দাও। এমনও তো হ'তে পারে কাল চিঠি আসবে।

—বেশ কালকের দিনও দেখব। কিন্তু কালও যদি কোন খবর না পাই, পরশুর স্টীমারে আমি ঠিক চলে যাব।

—বেশ তো, পরশুর কথা পরশু।

—না, পরশু নয়। আজই বলে রাখছি, পরশু তখন আবার যদি হাউমাউ ছুড়ে দাও, ভাল হবে না।

—ছুড়ব না। কিন্তু তুমি তো চলে যাবে। এখানেও যদি কিছু হয়? আমি একা এই এতগুলোকে নিয়ে কি করব? নিজেদের দুটো ছিল, আবার তো তার ওপরে পরের একটাকে কাউ ছুটিয়ে এনেছ।

তা বটে। এদের একা ফেলে যাওয়া—তারই বা উপায় কি করা যায়। অধ্যাপক চিন্তিত হলেন; বললেন, আচ্ছা সে যাহোক একটা ভাবা যাবে।

পরদিন এবুপে। সকাল থেকে দুপুর অবধি এক রকমই কাটল। নতুন খবর কিছু নেই। বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে, একটি ছেলে আসে মাঝে মাঝে পড়তে, তাকে পড়াতে বসলেন। বেকার বসে থাকলে চিন্তা এসে মাথায় চাপে; কাজে থাকলে তবু কেটে যায়।

পড়ার মাঝখানে গৌরী এসে চিঠি হাতে দিলেন। যাও, অস্থির হয়ে উঠেছিলে, এবার ঠাণ্ডা হও।

পোষ্টকার্ডটি হাতে নিয়ে অধ্যাপক পড়লেন। গৌরী বললেন ভাল তো? কি হচ্ছে না হচ্ছে। আজই যাব—এবার ভাখো আমি ঠিক বলেছিলাম কিনা। সবাই সুস্থ আছেন, খবর পেলে তো? এবার নিশ্চিন্ত হয়ে পড়াও।

বলে ঘরের ভেতর চলে গেলেন।

অধ্যাপক চিঠিটিকে পড়লেন। একবার, দুবার। পড়ে পকেটে রেখে দিলেন। আবার পড়াতে লাগলেন।

একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। চিঠি আবার পকেটে পুরে আবার পড়াতে লাগলেন।

ছাত্রটি লক্ষ্য করে দেখছিল। বললে, বাড়ি থেকে?

—হ্যাঁ।

—ভাল আছেন সব?

—লিখেছেন তো।

—তাহলে আছেনই ভাল। যাক খবর পেলে তাহলে। আমরাও চিন্তায় পড়েছিলাম।

—কিসের চিন্তা?

—ঐদের জন্যে। বরিশালে ট্রাবল হয়েছে খবর পেয়েছি।

—কতটুকু?

—তা জানিনে। হয়েছে, এই মাত্র শুনেছি

—শুনলে কবে?

—দিন চারেক হল, প্যাসেঞ্জারের মুখে।

—কি বললে তারা?

—বলে না কিছুই, প্রশ্ন করলে একেবারে থাকে, বলে কিছু হয়নি। কিন্তু বলার ভঙ্গি বুঝে নেওয়া যায়।

—দিন চারেক ধরে জেনেছ, আমাকে কেন?

—সত্যি বলব স্যর? ঐ জন্যেই। শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। কারো কোন কথা না চলে যাবেন।

—যাবই তো।

—না। গেলে বিপদে পড়বেন, সেখানে এখন শান্ত নয় শুনেছি।

—তাই বলে যাব না? আমার সময় সেখানে তা জানো?

—জানি। এও জানি, আপনি যে

আমরা সব ছেলেকে জানিয়ে দিয়েছি, আপনাকে কেউ না বলে।

—আজ বললে কেন?

—আজ আপনি খবর পেয়েছেন তাঁরা সুস্থ আছেন, তাই!

—কিন্তু, ট্রাবল হয়েছে তো বোঝা গেল? উনিশে তারিখের চিঠি, সেদিন পর্যন্ত সুস্থ ছিলেন, জানলাম। তারপরে কি হয়েছে, জানব কি করে? আমি কালই যাব।

—আপনি যাবেন না। যেতে হয় আমরা কেউ যাব।

—তার মানে?

—মানে, ভয় যদি থাকে, সে আপনার। আমাদের কেউ চাইবে না। আমরা জন দুই মিলে চলে যাব, সব খবর নিয়ে আসব। আপনাকে যেতে দেব না। এ আমরা অনেক আগেই ঠিক করে রেখেছি।

—অতি ভাল কথা। অতি সৎসিদ্ধান্ত। আমার পরিবার বিপন্ন, আমি যাব না শিকের উঠে নিরাপদে বসে থাকব, ওরা যাবেন আমার প্রক্সি দিতে। যাও, কেটে পড়—আজ আর পড়াব না আমি। বদ্ ছেলেকে পড়াতে নেই।

—আচ্ছা স্যর, যাই তাহলে। আমি কিন্তু রেডি থাকব, বলেন তো কালকের স্টীমারেই যেতে পারি।

চলে গেল। এই ছেলের নাম আসাদুজ্জামান। দুবার ফেল করা ছেলে। অধ্যাপক চেয়ে রইলেন তার দিকে: তারপর চিঠিটি আবার বার করলেন। ডাকলেন, শুনে যাও।

গৌরী খাবার করতে বসেছিলেন, খুন্তি হাতেই উঠে এলেন। বললেন, কি বল, কাজ করছি।

—এদিকে এসো। চিঠিটা পড়েছ?

—পড়েছি।

—পড়নি। ভাল করে পড়।

—আর কত ভাল করে পড়ব। আমরা আজ

—এই খবর নয়। পড়ো চিঠিটা। জোরে পড়।

—মাথাই খারাপ। বলে গৌরী চিঠি তুলে। থেকে থেকে পড়লেন:

দাদুর বাসা,

কল্যাণবরেষু,

আমরা সকলে ভাল আছি। তোমরা আছ। গৌরী বাবলু তুতু কোথায়, কেমন আমরা ভাল আছি। ইতি—

বৌ

বৌমা, তাঁর মায়ের সাদরজনীন ডাকনাম।

চিঠি নামিয়ে রেখে বললেন, এই তো হল।

—হল না, ওর মানে বোঝনি।

—মানে আবার কি।

—বলছি। কোথা থেকে লিখেছেন, দেখে

—গৌরী চিঠিটি আবার তুলে নিলেন। বললেন দাদুর বাসা। তার মানে?

—হ্যাঁ। আমাদের বাসা বাজার পাড়ায়, ও জায়গা। দাদুর বাসা অনেকটা নিরাপদ।

—জানি। সে তো কথাই ছিল, হঠাৎ যে গোলমাল হ'লে সবাই সেই বাড়িতে চলে যাবে

—এবং সেই গোলমালটা অত্যন্ত রকম ওপর না চেপে পড়লে তোমার শ্বশুরমশাই বাড়ি অন্যত্র নড়বেন না এও জানা কথা। তাঁরা সে গিয়েছেন, এতেই বোঝা গেল—গোলমাল অন্তত তার খুব জোর সম্ভাবনা ঘটেছে।

—হুঁ! তারপর?

—তারপর বৌমা বড় একটা চিঠি লেখে লেখেন যখন, রাজ্যশুদ্ধ সবার খবর দিয়ে ছমাসের জমানো খবর একদিনে দিয়ে। চিঠি বি অত্যন্ত সংক্ষেপে।

—বেশী আর কি লিখবেন। ভাল আছেন যে না অবি এই তো খবর। গোলমাল

—অতো সোজা নয় হে। এসো বুঝিয়ে দিই।

চিঠিটি হাতে নিয়ে গৌরীর সামনে মেলে ধরে অধ্যাপক বোঝাতে লাগলেন: সংক্ষেপে লিখেছেন, তার মানে বিস্তৃত করে লিখলে বা লম্বা চিঠি লিখলে সেটা নাও আসতে পারতো। ভেবে নেওয়া যেতে পারে চিঠিপত্রের ওপরে সেন্সর বসেছে।

এ কবি কল্পনা।

—কল্পনা নয়। চিঠির ভাষাটা দেখ। আমরা ভাল আছি। তার মানে, ভাল নাও থাকতে পারতাম, যা-থাকবার মতো সম্ভাবনা ঘটেছিল বা ঘটছে। গৌরী বাবলু তুতু কোথায় কেমন আছে। তার মানে—

—তার আবার মানে কি। আমরা তো কলকাতা গিয়ে থাকতে পারি।

—না। তাঁরা জানেন, তোমরা কোথাও যাও বা আমি কোথাও যাই—আগে থেকে তাঁদের না জানিয়ে যাই নে, তোমাদেরও পাঠাইনে। যে কোন দিন তাঁরা কেউ হঠাৎ এসে পড়তে পারেন, এসে বাড়ি বন্ধ দেখলে মুশকিলে পড়বেন—এইজন্যেই আগে থেকে জানাই, অন্তত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিঠি দিই। আরও তো এখন যে-কোনদিন অমলার চলে আসবার কথা—এখন বাড়ি বন্ধ থাকতেই পারে না। কাজেই, গৌরী বাবলু তুতু কোথায়, ও কেমন আছে—এর মানে হচ্ছে, তারা ওখানেই আছে এখনও, না সরিয়ে দিয়েছে? না সরিয়ে থাক তো অবিলম্বে সরাও। তারপর আবার, আমরা ভাল আছি। মানে, সেন্সর যদি সত্যিই বসে থাকে, 'আমরা ভাল নেই' লিখলে বুঝে নেবে গোলমালের খবর দিচ্ছে, অতএব ওটা লেখা হচ্ছে ত তাকে আশ্বস্ত করতে, যে চিঠির মধ্যে কোন আপত্তিকর বার্তা নেই। এবার বুঝলে?

গৌরী ধীরে ধীরে আবার চিঠিটা তুলে নিলেন। খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে সেটিকে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। আস্তে আস্তে বললেন, এই সোজা কথার মধ্যে এত

—ঠেলায় পড়লেই জানতে হয়। আমার একদিনে জেনেছি। জেলখানায় থেকে বছরে বছর ধরে শিখেছি। 'আমার ভয় হয়নি' বুঝতে হবে বেউলি জেলে অনেকের ঘরআলি "সন্তোষ হঠাৎ প্রোমোশন পেয়েছে, একেবারে ট্রিকের ব্যাপার—এটা আনন্দজনক সংবাদ, নেই।"

এর মানে, 'সন্তোষ সাঙ্ঘাতিক আত্মহত্যা গলায় দড়ি দিয়ে। এই সংবাদ আনন্দ-বাজার পাঠিয়ে দাও।'

গৌরী চোখ গোল গোল করে বললেন, এত কি করে জানব।

—তুমি জান না। বৌমা জানেন। অনে শিখতে হয়েছিল। বুঝলে?

গৌরী নিশ্বাস ফেলে বললেন, বুঝলাম ওঠো, খেতে চলো।

—চলো। আরও খবর আছে। গোলমা সম্ভাবনা শুধু নয়, সত্যিই ঘটেছে। কতখানি, জানিনে।

—কে বললে?

—সাবাহুজ্জমান বলে গেল এইমাত্র। ও চারদিন আগেই জেনেছে, আমি বাস্ত হ'য়ে যাব, তাই আমার বিপদ ভেবে আমার কা রেখেছে।

—ঠিক করেছে। বুদ্ধির কাজ করেছে।

—তা তো বটেই, নিজেকে বাঁচানোর বুদ্ধি কিন্তু ওরা শুধু নয়। খবর আমি পেয়েছিলাম অন্যের মুখে।

—সে আমি আন্দাজ করেছিলাম মুখ দে একটা কিছু হয়েছে। কে বললে?

—সে চিনবে না। নাম বলা সম্ভবও ন খবরটা গোপনে দেবার জন্যেই এসেছিলেন।

—কে। আমার?

.তামাদের যদি বাড়িতে একা থাকতে ভয় করে, চারুবাবুর বাড়িতে গিয়ে থাকবে ; বা বলো তো কাউকে সঙ্গে দিয়ে কালই কলকাতার ট্রেনে তুলে দিয়ে যাই। ছেলেমেয়ে কোথায় গেল ?

—বাবুল ও বাড়িতে, অনিমার সঙ্গে পুতুল খেলছে। কাজুলী ঘরেই আছে। ঘুমুচ্ছে বোধ হয় মাঠে।

ঘুমে যেতে দেবে না। চোখের আড়াল যেন কখনও না হয়। আর ওদের কানে যেন কিছুতে না যায়।

কাজুলী কি করছে ?

গৌরী উঁকি মেরে দেখে এলেন, বললেন, ঘুমোচ্ছে।

খুলনা-বরিশাল লাইনের স্টীমার ইতিমধ্যে কখন গিয়ে লিনে একটিতে দাঁড়িয়েছে, কলকাতায় যাবার ট্রেন আছে মাত্র দুটি। বরিশালের স্টীমার খুলনা থেকে ছাড়ে বেলা আটটায়, বরিশাল স্টীমার এসে খুলনায় পৌঁছায় শেষ রাত্রে ; অন্ধকার থাকতেই কলকাতার এক্সপ্রেস ট্রেন ছেড়ে চলে যায়। তার আবার কলেজ স্টপনে ধরা উঠে গিয়েছে, ধরে গিয়ে আরও আধঘণ্টা লাগিয়ে—দৌলতপুর স্টেশনে। আরেকটা গাড়ি বেকেল পাঁচটায় ছেড়ে চলে যায়, সেটা কলেজে দাঁড়ায়। কলকাতা থেকে গাড়ি ফেরে, এক্সপ্রেস রাত দশটায়, পাসেঞ্জার আসে ভোর সাড়ে ছটায়।

পরদিন, বাইশে। ভোরের আলো তখনও ভাল করে ফোটে নি, অধ্যাপক জেগে উঠলেন, বললেন, কি বল তাহলে, দিই হাঁটা ?

গৌরী কাঁচাঘুম ভেঙে উঠে বললেন, এই শুরু হ'ল। টাকা নেই।

—আছে। আমি কাল নিয়ে এসেছি অ্যাডভান্স। ব কিনা তাই বল, একটা থলেতে কাপড়জামা গোটা ই দিয়ে দাও, আর একটা সতরঞ্চি, ব্যস্।

—আচ্ছা আচ্ছা, আগে ওঠ, মুখ হাত ধোও, রিপরে তো।

—বেশী পরে নয়। গেলে ছ'টার গাড়িতেই যেতে

বাবলু বললে, বরিশালে ? ও বাবা, আমি

অধ্যাপক বললেন, তা বটেই তো। ওঃ তো তাকিয়ে পুবদিকে, পক্ষীরাজ ঘোড়াটা কিনা।

বলে পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুজলেন।

বাবলু বললে, বাবা, আবার ঘুমুলে যে, ও যাবে না ?

—যাঃ, যাব না। আমার বাপের বাড়ি, যাই না যাই সে আমার খুশি।

গৌরী উঠে বসতে বসতে বললেন, কি হ'ল সত্যি ?

—ভাবছি। যাওয়া উচিত নিশ্চয়ই ; অথচ যদি পথে ক্রস্ করি ?

—যা করবার স্থির করে ফেলো চটপট।

গৌরী খাট ছেড়ে নামলেন। আঁচলটা জড়িয়ে নিয়ে, উঠেই ঠাকুরবাড়ির দিকে প্রণাম করা তাঁর রোজকার অভ্যাস, হাত জো জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে উ সর্বনাশ !

—কি হ'ল ?

—সব চলে এসেছে।

অধ্যাপক লাফিয়ে উঠে বললেন, লুঙির কসি আঁটতে আঁটতে বললেন, কে কে, গোন।

গৌরী দেখে দেখে বলতে লাগলেন,—অমলা, কাকা, কাকীমা, তাঁদের ছেলেমেয়েরা, সবাইই আছে, তোমার বাবাকে দেখছি না।

—বৌমার পরনে কি কাপড়, দেখ। বলে অ এক লাফে এসে জানলায় দাঁড়ালেন। পুকুরের পা ঘুরে এরা আসছেন। তাকিয়ে দেখে স্বস্তির নি পড়ল—নাঃ, বৌমার পরনে লালপেড়ে শাড়িই বটে

দোর খুলে সবাই হৈচৈ করে বেরিয়ে গেলেন, পুকু পৌঁছতে না পৌঁছতে ওঁরাও এসে পড়লেন।

সকলেরই রক্তচোখ শুকনো, যেন কতদিন

কোন কথা বলবার আগেই অধ্যাপক বলে বাবা কই ?

বৌমা বললেন, বললেন, তোমরা যাও আমি কদিন পরে যাব।

—নিয়ে আসা উচিত ছিল। যাক, এখন আর কথা নয়, আগে গিয়ে সুস্থ হ'য়ে নাও।

ঘরে এসে সবাই বসলেন। সংক্ষেপে বিবরণটা জানা গেল। আগের দিনই আভাস পাওয়া গিয়েছিল, দুটি মুসলমান ভদ্রলোক এসে সতর্ক করে দিয়ে গিয়েছিলেন। রাতে শুরু হয় সকালবেলাই মফেজ বন্ধু গাড়িতে ক'রে ক'রে এদের দাদুর বাড়িতে পৌঁছে দেয়। সেই বাড়িতেই কেটেছে কদিন এদের, আরও অনেকের। চারদিকে হল্লা চলেছে, চলেছে হাঙ্গামা, বাড়ির ওপর তলায় আটকে থেকে এরা দূরে থেকে হল্লা শুনেছেন, আগুন দেখেছেন আর সারারাত জেগে কাটিয়েছেন।

মফেজ এ ক'দিন অদ্ভুত কাজ করেছে, বন্ধু গাড়িতে করে বাজার এনে দিয়েছে, এই এতগুলো লোকের খাবার সংস্থান। লোকে তাকে বলেছে, মফেজ, তোকেই কেটে ফেলব। মফেজ বলেছে, তা কেল তো কি করা যাবে, তাই বলে মনিবকে তো ছাড়তে পারি না।

কাকা বললেন, রিফিউজী হলে ট্রেনে উঠতে দেয় না, নাকি রে ?

—কেন ?

—দেখলাম কিনা। পুলিস আর আনসারের লোক স্টীমারে উঠে গেল, সকলের মালপত্র খুলে দেখছে, প্রশ্ন করছে কোথায় যাবে। বর্ডারে যাব বললে তাদের নামতে দিচ্ছে না। আমি তাই বেগতিক দেখে কলেজে যাব বলে এখানকার টিকিট কেটে উঠে বসলাম। তা নইলে সোজাই চলে যেতাম—এখানে যাবতাম না।

এইখানে থাকবে, খেয়ে ঘুমিয়ে চেহারা ভা নেবে। তা নইলে, এই ঝোড়োকাকমার্কা চেহারা দেখলে যেতেই দেবে না, ট্রেন থেকে দেবে যেখানে ইচ্ছে।

বাসু বললে, বাবুর সাংঘাতিক অবস্থা খালি চলছেন, আমি এতলোককে ঘরে সবাইকে বললাম আগে যা হয়েছে, এখন যে পর আর দাঙ্গা হবার কারণ নেই, দেশ-ছেড়ে যারা যেতে চাইল তাদের ঠেকালাম, যে গিয়েছিল তাদের জোর করে ফিরিয়ে আনলা তাদের কাছে আমি কী কৈফিয়ৎ দেব ? সবাইকে ফেলে রেখে কি করে একা পালিয়ে চ

অধ্যাপক বললেন, আমি আগেই জানতা রেখে এলি কেন ?

—অনেক জোর করেছিলাম। বললেন চলে যা, আমি কয়েকদিন পরে যাব।

—তার মানেই, তোদের পার করে দিয়ে বার নিজে চেপে বসে থাকবেন, নড়বেন না।

বাসু বললে, আমি বললাম আমি থাকি বললেন, না, তুই যা, ওদের পৌঁছাদে, অ অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবি, তারপর আমি একসঙ্গে যাব।

অধ্যাপক বললেন, বদমা তোর যেতে তোকে দিয়ে হবেও না—সে আমি নিজে যা আজই ফিরে চলে যা। গিয়েই বাবাকে আসবি।

মা বললেন, আজ এই এল, আজই যাবে কি

বাসু বললে, তা পারব। আজই যাচ্ছি যত শীগ্‌গির পারি তাঁকে নিয়ে ফিরে আসব।

বৌরী বললেন, বলবি, আপনার জন্যে বে রইল সেখানে, আপনি না গেলে বৌদি যাবলু কুকু যাবে না।

খেয়ে ঘুম দাও। আর শোন, একটি কথা সবাইকে বলে দিচ্ছি, যেই আসুক, যাই জিজ্ঞাসা করুক—একটি কথাও খবরদার বলবে না কাউকে, একদম কোন আলোচনাই নয়, নিজেদের মধ্যেও নয়।

আড়ালে এসে বৌমা বললেন, আমার এমন করে চলে আসবার ইচ্ছে ছিল না। কি করব মেয়ে দুটো রয়েছে। আর তার চেয়েও তোর কাকীমা এমন পাগলের মত চেঁচামেচি করতে লাগল। শেষে ভাবলাম, থাক, ওকে জোর করে আটকে রেখে দায়িত্বের ভাগী হই কেন।

—কাকীমা চেঁচামেচি করবে সে তো জানা কথা, স্বাভাবিকই তার পক্ষে। থাক, ও নিয়ে কোন কথা বোলো না।

কাকীমা-কাকা এমনিতে একটু ভীতু লোক, তার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। কাকীমা থাকতেন গ্রামের বাড়িতে। এমনিতেই গ্রামে লোক কম, তাতে পার্টিশনের পর অনেকে চলে গেল, শূন্য গ্রামে কাকীমা থাকতে সাহস পান না—শেষটা হঠাৎ চলেই গেলেন, মেদিনীপুরে। এরাই অনেক বুঝিয়ে পীড়াপীড়ি করে ফিরিয়ে এনেছিলেন পুজোর আগে। তাও আবার, পুজোর ছুটিতে হঠাৎ রোগ শুরু হ'য়ে তাঁর পর পর তিনটে ছেলেমেয়ে মরে গেল। বাকিগুলার চিকিৎসার জন্য শহরের বাড়ীতে ফিরেছিলেন, তারপর এই ব্যাপার। ছেলেমেয়ে যে-কটা অবশিষ্ট আছে, তাদের কথা ভেবে তাঁর মন চঞ্চল হ'য়েছে বা তিনি চেঁচামেচি করেছেন বলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

অমলারও চলে আসাতে আপত্তি ছিল। তার কথা, হোক না, তাই বলে আমরা বাড়ি ছেড়ে দেশ ছেড়ে পালাব কেন?

আপত্তি টেকেনি, আসতেই হয়েছে। বললে, খেয়া ধরে গেল, সবাই মিলে তোরা আমাকে একেবারে মেয়েমানুষ বানিয়ে দিলি।

ব'সু ফিরে চলে গেছে—দুটন্ত ডাল আর ভাত

নেমে খেয়ে উঠে সবারই যেন চেহারা কি ফিরল, গৌরী বললেন, এবার আর কথা নয়, লাগাও পড়ে।

কিন্তু ঘুম কি হয়। শুক্রবার সেটা, কলেজ বাইরের ঘরে বই নিয়ে অধ্যাপক শুয়ে আছে হচ্ছে না।

ভেতরের ঘরে আস্তে আস্তে কথা হচ্ছে; পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, একটু চেঁচিয়ে কথা বলা হঠাৎ জোর গলায় বলে ফেলছেন, ওরে কারা আগুন গৌরী, সে কি আল্লা হো আকবর!

গৌরী তাড়াতাড়ি বলছেন, চুপ্ চুপ্।

কাকীমা আবার বলছেন, আর এই যে দের আরও রাগ ধরিয়ে। সব ভয়ে মরছে, এ নেই কওয়া নেই খালি খিঁখি করে হাসি—

অমলা বললে, হাসবে না তো কি কাঁদবে তোমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের সাজে। যা আর আর্তনাদ করছিলে সবাই মিলে সারাক্ষণ, পারা যায়।

কাকা এঘরে একবার বললেন, শরৎ ডা কেটে ফেলেছে।

—নারায়ণপুরের?

—হ্যাঁ। একেবারে দু'টুকরো। দেহের পাওয়াও যায় নি।

—থাক, এ আলোচনা নয়।

দুর্ধর্ষ লোক ছিলেন শরৎ ডাক্তার। চিকিৎসক, তেমনি জোয়ান—তেষট্টি বছর বয়ে বাঘ মেরেছিলেন, হাতাহাতি যুদ্ধ করে। বয়স হয়েছিল আশির ওপর, চোখ অন্ধ থাকতেন। তাঁকে মারতে চাইল কে?

ঈষৎ একটুখানি ঝিমুনি এসেছে, হঠাৎ কা তীক্ষ্ণ শিশু কণ্ঠ: জানিস, কুট্টি কাকীমার ঘ

ছোট এক ছেলে বলছে,
বিস্ফারিত-নেত্রে চেয়ে শুনছে।

ধমক দিয়ে বললেন, চুপ, চুপ বলছি।

কাকুলীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সে শুনতে শুনতে একেবারে আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে—সেই পাথরের পুতুল তাকে তুলে নিয়ে নিজের খাটে চলে এলেন, শুইয়ে দিয়ে বললেন, ঘুমো।

এটা লক্ষ্য করেছেন, 'কেটে ফেলা' কথাটা কানে গেলেই কাকুলী অমনি আড়ষ্ট বিহ্বল হয়ে পড়ে। অথচ ভাগ্যও এমন, ঠিক ঐ কথাটিই ঘুরে-ফিরে এসে ওর কানে পৌঁছে দেয় সবাই।

পাশের বাড়িতে থাকেন কালিদাস বাবু। ডিমনস্ট্রেটর এবং জিমন্যাষ্টিক মাষ্টার একাধারে। যেমন জোয়ান তেমনি ফূর্তিবাজ; আর মাছধরার ব্যাপারে একটা জিনিয়াস। আগে থেকে তারিখ দিয়ে ঘণ্টা বলে দিয়ে মাছ গাথেন।

বেলা দেড়টা, কালিদাসবাবু ছিপ হাতে করে বেরুলেন। বললেন, মাইজী, উনুনে আঁচ রেখো। অধ্যাপককে ডেকে বললেন, এই বর্ষায়, ঘুরবেন না।

প্রকাণ্ড বড় বড় কই কলেজের পুকুরে—সত্য যুগের মাছ। তিনি গাথেন, ইনি টেনে তোলেন, তারপর দুজনে মিলে সহস্তে কেটেকুটে সব বাড়ি বাড়ি ভাগ বিলিয়ে দেন। ছুটির দিনে এই চাকরি দু'জনের। অধ্যাপক বললেন, কি শুতে দেবেন না একটু?

আচ্ছা আচ্ছা আধঘণ্টা টাইম দেওয়া গেল, নিন, গড়িয়ে। মাইজী, অতিথিদের বলে রাখ, গাথতে যদি পারি ভগবানের ইচ্ছের।

তাহলে কিন্তু আজ কারু যাওয়া হচ্ছে না। শুয়ে, ঘুমিয়ে পড়েছেন কি পড়েন নি, গৌরী এসে ঠেলা দিলেন: ওঠো ওঠো শীগগির, কালিদাসবাবু ডাকছেন।

পুকুর-পাড় থেকে প্রাণপণ চীৎকার আসছে, ও মশায়, দৌড়ে, নইলে আমাকেই নিয়ে গেল।

আচমকা লাফিয়ে উঠে মাথা ঘুরে গেল, গা থরথর দেয়াল ধরে দাঁড়ালেন, গৌরী ছুটে জল আর খেতে গিয়ে অর্ধেক পেটে গেল অর্ধেক পড়ল—দৌড়ে পুকুরধারে চলে গেলেন। কালি সুতো ছাড়ছেন, ছিপ ধরে পুকুরের এক দৌড়চ্ছেন আর চেঁচাচ্ছেন।

দেখেই বললেন, এসেছেন? বেশ ক ঐ বড়শীটা খুলিয়ে ফেলুন।

সেটা পাড়ের তলায় ছড়ানো, এতক্ষণ খুটে তাই ভাগ্যি।

বড়শী তুলতে তুলতে অধ্যাপক বললেন, কা

—মিনিট পাঁচেক। এই পাকটা মে আসুক।

—বাঁচালেন। সে পাঁচমিনিট তো শু না করে তুলেছেন ডেকে, ঠেলার চোটে এ আবার নাচের আজিকে বধূয়ের মত নাচের।

মাছ ফিরে এল; পাড়ের গায়ে তাকে খেলি কালীদাসবাবু বললেন, নিন এবার। সাবধা আবার যদি গো মারে তবে ছেড়েই দিতে হবে- হাতে আর কিছু নেই।

মাছও তখন অবসন্ন; আর হুড়াহুড়ি ক একেবারেই ধরে তুলে আনা গেল। কালীদা এলেন। দেখা গেল, সুতোর টানে তাঁর হাতও কেটে চিরে কালাকালা হ'য়ে গিয়েছে।

মাছ হাতে করে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে ছাড়লেন, মাইজী, অতিথিদের যাওয়া হ'ল বলে দাও।

বৌমা বললেন, আজ যাব না?

গৌরী বললেন, তাই তো বলছেন।

অধ্যাপক বললেন, কী আজই যাবে! জিরিয়ে নাও। এখানে তো গোলমাল নেই। দরকারই বা কি, আরামসে বসে থাক না এই

কালীদা মাথা নেড়ে বললেন, না দিদি। যখন বেরিয়েছি, তখন না পৌঁছে আর মন

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

— আর কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

আদরের পুতুলের জন্য সুন্দর জামাকাপড়।
মিনু তার পুতুলের জন্য সর্বদাই সুন্দর জামাকাপড় যোগাড় করে। মিনু তার দিদির জামা নেয়, তার মার শাড়ী নেয়, আর তাছাড়া তার নিজের জামাকাপড় তো আছেই। আর সব জামাকাপড় সে একটু সানলাইট দিয়ে কাচা—কিন্তু কি ধপধপে কর্সা আর ঝক ঝকে রঙীন।

জামাকাপড় তোলার আর চাদরগুলোর দিকে দেখুন। অত সব কাপড় কাচতে আজই একটু সানলাইট লেগেছে। সানলাইটের সরের মত প্রচুর ফেনায় অনেক কাপড় কাচা যায়, আর আছড়ানর দরকার হয়না। আপনার কাপড় কাচার জন্য সানলাইট সাবানই ব্যবহার করুন।

*সানলাইটে জামাকাপড়কে **সাদা** ও **উজ্জ্বল** করে*

[illegible]

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড বম্বে

অধ্যাপক তবুও বারবার বাধা দিলেন। বোঝালেন। কাকীমা শুনবেন না।

গৌরী বললেন, থাক বৌমা, চলেই আসবারা।

অধ্যাপক বললেন, বাঃ, তুমিই অতিথিকে তাড়াচ্ছ?

গৌরী বললেন, তাড়াচ্ছি। আটকে রেখে সে দায়িত্ব নেবে, কাল যদি এখানেই শুরু হ'য়ে যায়, বা ট্রেন যদি বন্ধ হয়ে যায়, তখন জবাব দেবে কি?

—তা বটে। বেশ, তাই হোক।

কালিদাসবাবু শুনে মারমুখো হ'য়ে ছুটে এলেন, মাথা কাটাকাটি একটা হ'য়ে যাবে আজ। আজ যাওয়া চলবে না।

অধ্যাপক বললেন, থাক, আটকাব না।

কালিদাসবাবু বললেন, তার মানে? মাছ না খেয়ে চলে যাবেন, আমি ব্যাটা তাহলে রজ্জুরে পুড়তে গেলাম কি জন্যে? না, আমার বাপ-মা বেঁচে নেই বলে আমার চামড়াতেও রজ্জুর লাগে না?

—আহা, মাছ খেয়ে যাবেন, ভয় নেই।

গৌরীকে বললেন, উনুনে কাঠ দাও, মাছ আমি এখুনি কুটে দিচ্ছি।

তাড়াহুড়ো করে মাছ কোটা হল, ভাজা হ'ল, ঝোল হল, খাওয়াও হ'ল।

গৌরী বললেন, ভাজা মাছ খানিকটা সঙ্গে দিয়ে দিই কাকীমা। আবার কবে ফিরে আসবেন, দেশের মাছ কবে খাবেন কে জানে।

কাকীমা বললেন, ও আশীর্বাদ আর কোরো না গৌরী। আর আসব না, দেশের মাছ আর খাব না।

—তাহ'লে দিয়ে দিই।

—না না, সঙ্গে দিয়ে দিতে হবে না আর। রেখে দাও, তোমরা খেয়ো।

—আমরা কত খাব।

অতিথি আছে বলে, আর অসময়ে বলে, আজকের ওপর মাছ ঘরে এসেছে। এরা গেলে, দুইয়ে নিজেরা টু পয়েন্ট থ্রি।

গৌরী বললেন, সে হবে না, মাছ আমি ছোট একটা হাঁড়িতে করে এক হাঁড়ি দিয়ে দি দেশের শেষ মাছ।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মা একবার শুধু গৌরীকে, বাচ্চাদেরও দিয়ে দে।

অধ্যাপক বললেন, না।

মা বললেন, অন্তত ছেলেমেয়েকে দে। যদি রইল, তবে একলা আমার দিয়ে কি লাভ

অধ্যাপক বললেন, এখানে হবে না। বাবা বরিশালে রয়ে গেছেন, তাঁর জন্যই ও থাকতে হবে। তুমি যাও, ভেবো না।

পাঁচটার ট্রেন। অধ্যাপক নিজে সঙ্গে রাত দুপুরে বনগাঁ। বর্ডার পার নিশ্চিন্ত থেকে রাতের ফেরত গাড়ি ধরে সকালবেলা এসে পৌঁছলেন।

এতদিন চাপা ছিল, পরদিন থেকে আর প না, মনের মধ্যে ভয় এবার স্পষ্ট করেই দে ছেলেমেয়েকে যতদূর সম্ভব আসলে রাখা হয়ে দূরে কোথাও না যায়, গুজবের গন্ধ যেন পায়।

কলেজের চারদিক ঘিরে হস্টেল। হিন্দু ঘরগুলো এঁদের বাড়ির গায়ে। গৌরী একটা ভরসা, হস্টেল। হইই যদি কিছু, ছেলেরা তো আছে।

অধ্যাপক হাসলেন। বিপদ যদি আসে কে কাকে সামলাবে, আর কে কাকে কে মারবে, তার আগাম হিসেব করে নিশ্চিন্ত হ না। বিচিত্র জীবনে এ সত্যকে বারংবার করতে হয়েছে তাঁকে।

বড় কিছু নয়। কিন্তু ছোটোখাটো ঘা ঘটেও গেল এর মধ্যে। [illegible]

কেরত গাড়িতে চড়মুড় করে তারা ফিরে এসে হাজির—সিনেমা দেখা হয়নি। কি হল? সবাই মিলে উত্তেজিত কলরব তুলে বলে গেল, ভীষণ কাণ্ড, খুলনায় হাঙ্গামা করেছে, একজন সাফ খুন।

—কোথায়? একে একে বল।

ক্রমে যেই পাওয়া গেল। অরবিন্দবাবু আছেন বড় উকিল, অবস্থাপন্ন লোকও বটেন। তাঁর মস্তবড় বাড়ি, রিফিউজীরা নাকি চড়াও হতে গিয়েছিল, সেই বাড়ি দখল করতে। অরবিন্দবাবুর লোক বাধা দিয়েছে।

খুনটা কিন্তু সেজন্যে হয়নি। চড়াও হ'তে গিয়েছিল যারা, তাদেরই মধ্যে দু'দলে কি নিয়ে বেধেছে, তাই থেকে হতে হতে একজন আরেকজনকে ভলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলেছে—এক কোপেই একদম দু'টুকরো। কেটে নাকি সেই ভলোয়ার হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে সোজা ভিড় চিরে হেঁটে চলে গিয়েছে লোকটা, কেউ তাকে ধরতে পারেনি।

—দেখলে কারা?

তারা নিজেরা দেখেনি—সে কি দেখা যায়? বাপ্‌রে! শুনেছে। হঠাৎ লোক দুদ্দাড় ছুটছে—তারাও ভয়ে ভয়ে দৌড়ে যে যেখানে পেরেছে গিয়ে উঠেছে—ডাকবাংলোয়, দোকানঘরে, সিনেমার বারান্দায়। তারপর সবাই মিলে জড়াজড়ি করে স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠে হাঁফ ছেড়েছে। সিনেমা? বাপরে—প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি এই বলে ভাগ্যি।

—তাই বলো। দাঙ্গা নয় তাহলে?

—ত' নয়, স্যর।

—তবে তোমরা বীরেরা ছুটলে কি বলে? সবাইকেই কেটে ফেলত সেই একটা লোক তার একটা ভলোয়ার দিয়ে?

তারা বোকা হাসি হেসে বললে, তা তো বটেই স্যর। তবু···

—বুঝেছি। যাও, এবার সুস্থ হয়ে ঘুম লাগাও গিয়ে। সিনেমা বেশী দেখতে নেই, চরিত্তির খারাপ

ছেলেরা চলে গেল। সৌরীর দিকে ত অধ্যাপক বললেন, এদেরই ভরসা করেছিলে তো

—এরা এমন ভীতু, জানব কি করে?

—ভীতু কেউ নয়, আবার সময়মতো সবাইই ভয় আর আতঙ্ক কাকে কখন চেপে ধরে তার হিসেব নেই। পরের ওপর ভরসা করারও তাই হয় না কিছু। নিজেকে না বাঁচিয়ে পরকে বাঁচাতে এতবড় আশা করা যায় কার কাছ থেকে?

বাবলু হঠাৎ কাছে এগিয়ে এল। বললে, কেটে ফেলেছে, বাবা?

অধ্যাপক ফিরে তাকালেন। খানিক দূ আর কাফুলী দাঁড়িয়ে। দুই চুপচাপ, কাফুলী ব বললেন, কোথায় কেটে ফেলেছে? ভাগ।

বাবলু বললে, ঐ সে, ছেলেরা বলে গেল?

—ওরা কলেজের ছেলে, ইংরেজী কথা কয় কি বুঝবি?

—বল না।

—বলব না। খেলা করবি আয়। হাত দে ঘড়িটা দোলনা বানিয়ে দিই।

কাফুলীর দিকে তাকিয়ে, মনে মনে ব কপাল একখানা তোর!

শোনা গেল এরই মধ্যে আর এক কাণ্ড নিজে নিজে শান্তিরক্ষক সেজে যাত্রীর ওপর উ করছে যারা, তারা এক কারবা বার করেছে—স্টেশন ছাড়ার পর, পথের মধ্যে চেন টেনে থামিয়ে যাত্রীকে 'সার্চ' করার ভানে লুট কর পুলিশ এসে ঠেকাতে না পারে।

কলেজের এক ছাত্রের বোন, মুসলমানই, ফুলতলা। তাকে এরা আটকেছে—ইণ্ডিয়া যাচ্ছে বলে। শেষে নাকি হাত ধরে ট্রেন থেকে নামিয়েছে।

এই খবর ছাত্রদের মধ্যে রটে গেল।

পরদিন ছাত্ররা তৈরি হ'য়েই ট্রেনে উ

সেদিন যেই চেন টেনেছে, ছাত্ররা তাদের আটকালে। তারা ফেলে দিয়ে দুজন ছাত্রকে ধরে পিটে দিলে। আর যায় কোথা। ট্রেন থেকে ঝপাঝপ নেমে পড়ল ছেলেরা, কলেজ ভেঙেও দলকে দল ছুটে চলে গেল। তারপর যেদন মার—রেললাইনে অল্পদিন আগে নতুন খোয়া ঢালা হয়েছিল তার অর্ধেক উড়ে গেল। ছেলেরা ফিরে এসে বললে, আর চেন টানবে না কেউ।

সত্যিই চেন টানা বন্ধ হ'ল। অন্তত এই এলাকার মধ্যে। কিন্তু লোকের মনে আতঙ্ক বাড়ল। মার খেয়ে আরও রুখে গেল ওরা—হয়তো সত্যিই এবার হাঙ্গামা বাধাবে। আর বাধাবেই যদি, কলেজের ওপরে আক্রোশ থাকা তো খুবই স্বাভাবিক। কলেজ-এলাকাতে থাকেন যাঁরা, আচমকা আক্রমণ যদি হয়, তাঁদের দশা কি হবে?

আতঙ্ক ছড়িয়েপড়ল, এবার আর ঠেকানো গেল না তাকে। বরিশালের খবর লোকের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে, মুখে মুখে রটছে।

মুখে সাহস দিচ্ছেন সবাইকে, ভাব দেখাচ্ছেন যেন কিছুই এমন হয়নি, কিন্তু মনে মনে কণ্টকিত হয়ে উঠেছেন অধ্যাপক। ছ'চল্লিশের দাঙ্গা কলকাতার বুকে বসে দেখেছেন তিনি; শুনেছেন নোয়াখালি আর বিহারের দাঙ্গার বিবরণ, এখন শুনছেন বরিশাল আর ঢাকার কথা। মুখে ছেলেমেয়েকে বলছেন ভয় নেই, অথচ নিজে তো জানেন, বীভৎসতার সে দাবানল যদি সত্যিই এসে হানা দেয়, ভরসা দেবার, রক্ষা করবার কোন সাধ্যই নেই তাঁর। মনে জোর পাচ্ছেন না অথচ হেঁকে বলছেন ভয় নেই আমি তো আছি—এর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা, বড় লজ্জাকর আত্মপ্রবঞ্চনা পরপ্রবঞ্চনা আর কী হতে পারে? আর সে প্রবঞ্চনা করতে হচ্ছে তাদেরই, যারা তাঁর ওপরে একান্ত নির্ভরশীল, যারা তাঁর কথা শুনছে আর মনেপ্রাণে বিশ্বাস করছে সত্যিই ভয় নেই তাদের, তাঁর আশ্রয়ে তাঁর বাহুবলে তারা নিরাপদ।

পড়েছে তাই নয়, মুসলমানেরও মুখে দীপ্তি নে অঞ্চলের বাঙালী মুসলমানরা শান্ত প্রকৃতি, তার চায় না। কেউ বা মনে মনে প্রার্থনা করছে হাঙ্গ না হয়, কেউ-বা যদি হয় তবে উৎকণ্ঠায় আগে খিটখিটে খেঁকী মেজাজ হ'য়ে উঠেছে। পথে চলে লোকজন তার শব্দসাড়া উচ্ছ্বাস নেই, মাছতরকারি কেনাবেচা হয় তাতে দরাদরি নেই প্রাণখুলে কথাবার্তা বলাটাকেই এড়িয়ে চলছে, কারো কোন কথা থেকে আগুনের ফুলকি ওঠে। ক্লাস হচ্ছে কলেজে, প্রফেসররা অ পড়াচ্ছেন, ছেলেরা আড়ষ্ট হ'য়ে শুনে যাচ্ছে। চাকার মত চলেছে জীবনযাত্রা, প্রাণহীন, তার কোথাও জলুষ নেই, আনন্দ নেই। ভয়ঙ্ক ঢেউ যেন ছুটে আসছে সগর্জনে, তার দিক থে সরিয়ে নেওয়াও যায় না, পেছন হটে পালা নেই—সম্মোহিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে দাঁড়ি একই কথা ভাবছে মনে মনে: আসবেই পড়ুক না, যা হবার তা হ'য়ে যাক—রুদ্ধ অনিশ্চিত প্রতীক্ষা আর সহ্য হয় না।

ক্লাস নিতে যাচ্ছেন, নিয়ে ফিরে আসছে কালো ছায়া, মুখে কথা নেই। না অধ্যা গৌরীর। মুখোমুখি পড়েন, পরস্পরের দিকে কথা বলতে যান, আবার যেন যান ভুলে বলব, বলবার কি আছে? খেতে বসে নিঃশব্দে ভাত বেড়ে যেন, অন্যজন তেমনি নিঃ উঠে যান—ইনিও বলেন না আর একটু দি বলেন না আর একটু খাও। মাঝে মাঝে শুধু নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে পাইচারি করেন অধ্যা নীচু ক'রে কি ভাবতে ভাবতে ভ্রূকুঞ্চিত হ'য়ে তারপর আবার আচমকা নিঃশ্বাস ফেলে তাকান। তাকান গৌরীর দিকে, বাবলু দি দিকে—মনের মধ্যে কিসের একটা মন্থ উঠছে থাকে।

সময়ে জানলায় বসে কলেজের দিকে ছাত্রদের আনাগোনার দিকে তাকিয়ে থাকেন। বাবলু দুদু আর বাইরে খেলতে যায় না—তাদেরও মনের ওপর কালো মেঘ। যদি-বা যায় হঠাৎ, বেশিক্ষণ থাকে না কোথাও, চেঁচিয়ে ডাকার পাটও যেন উঠে গেছে বাড়ি থেকে। আর কাকুলী—সে তো নড়াচড়াই বন্ধ করেছে প্রায়, বোবা জন্তুর মতো অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে মাঝে মাঝে, তারপর আবার সে তাকানোটাকেও বিপজ্জনক অপরাধ মনে করে চোখ বুজে ফেলে।

বাবলু দুদুর খেলাধুলো ভালবাসানো কিছু নেই। চুপচাপ করে পা দেখে হাঁটে। হঠাৎ চোখ তুলে বাবার দিকে তাকায়, চোখে চোখে পড়লেই চোখ ফিরিয়ে নেয়। যেন প্রকাণ্ড একটা লুকোচুরি চলেছে বাবার সঙ্গে সবার—সবাই জানে কথাটা, এও জানে যে আর সবাইও জানে, তবু প্রত্যেকে অপরের কাছে ভান করছে না-জানার; অথচ মনে মনে প্রত্যেকেই জানে, সবে ভান সবার কাছেই ধরা পড়ে আছে।

কলকাতা থেকে অনেকের অনেক চিঠি আসছে—চলে এসো, চলে এসো।

সৌরী বললেন, শোনো, রাগ না করো তো একটা কথা বলি।

অধ্যাপক চোখ ফিরিয়ে তাকালেন তাঁর দিকে।

সৌরী বললেন, ডাক্তারবাবুদের বাসায় একটা ঘর খালি আছে। এখানে, পথের একেবারে ওপরে হল্লা হলে যদি কেউ আসে, প্রথমেই এসে পড়বে আমাদের ওপর। ঐ বাড়িতে উঠে যাবে?

অধ্যাপক বললেন, না।

সৌরী ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন, কিন্তু সে ব্যাকুলতাকে যতদূর সম্ভব চাপা দেবার চেষ্টা করে বললেন, না কেন।

অধ্যাপক আবার তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, ভয় করছে?

সৌরী বললেন, নিজের জন্যে ভয় আমি করিনে।

অধ্যাপক বললেন, দেখেছি।

—ওরা বুঝে কিছু বলে না, ভয় পায় তুমি। কিন্তু আমি তো দেখছি। খাওয়া-দাওয়া অব হ'য়ে গেছে ওদের।

—জানি। তবুও……

বলে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ব শোন। এ বাড়ি ছেড়ে ও বাড়িতে গেলেই শেষ হবে না। প্রশ্ন কথা হচ্ছে, ভয় জিনিসটা গ হাঁটে না, আর এ ভয় এসেই পড়ে যদি, কোন্ থেকে কী মূর্তিতে আসবে তার কিছু ঠিক নেই পাড়ায় গেলেই যে নিরাপদ হবে, সেটা মিথ্যে এমনও হ'তে পারে, এখানে এই দুটো মাত্র দিকে লক্ষ্যই করবে না তারা, ও পাড়ায় অনেক অনেক লুটের আশা বলে ঐদিকেই আগে করবে।

—তার তো নিশ্চয়তা নেই কিছু।

—নেই, এবং আমিও আসলে সে-কথা বলছিনে। আসল কথাটা হচ্ছে, ভয়কে দৌড়ে ফেলে পালানো যায় না; বরং ভয় পেয়ে দৌড় ভয়ই আরও তেড়ে এসে চেপে ধরে। সেই জিজ্ঞেস করেছি ভয় পেয়েছ কিনা। সত্যি যদি থাকো, তো বলো, ওপাড়ায় নয়, একেবারে বর্ডা করেই পৌঁছে রেখে আসি।

—তা বলিনি। সে যাবেও না।

—গুড্ কথা, বীরের মতো কথা। ও পাড় যাবার দ্বিতীয় কারণ, কালিদাসবাবু। তিনি অন্য পাড়ায়, আমিই টেনে আমাদের পাশে এসেছি। এখন যদি আমরা হঠাৎ চলে যাই, একেবারে একলা ফেলে যেতে হবে, তার বা আরও একেবারে পথের ওপরে। ও পাড়ায় তো বাড়ি নেই সে তাঁকেও মুছে নিয়ে চলে যাব।

—তা বটে।

—ছেলেমেয়ে ভয় পেয়েছে, আমিও যে

এক কাজ কর, ওদের নিয়ে তুমি চলে যাও, আমি থাকি।

—আমি যাব না। তুমি থাকবে কেন?

—এই ছেলেদের পড়াতে?

—ছেলেরা ছেলে, তাদের হিন্দু-মুসলমান নেই। শুধু তাই বলেই নয়—আমার বসে থাকতে হবে, বাবার জন্যে।

—তিনিই বা আসছেন না কেন? বাসু গেছেও তো অনেকদিন হ'ল।

—দু'দিন। এলে আগেও আসতে পারতেন, হয়তো এসেও পড়বেন আর দু' একদিনে। তাঁর জন্যে অপেক্ষা না করে আমি পারি নে। তুমি চলে যাও।

—না।

—তাহলে আমরা থাকি, ওদের পাঠিয়ে দিই হাউকে দিয়ে।

—না। শুধু বাবলু টুকু হ'লে দিতাম। কাঞ্চলীকে অন্যের সঙ্গে পাঠানো যায় না—কে জানে সেখানে কে ওর জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে।

—অথচ ওকে রেখে শুধু বাবলু টুকুকে পাঠিয়ে দেওয়া, সেটাও সম্ভব নয়।

—সত্যি, বাবা এলে যদি যাওয়াই হয় আমাদের, ওকে কি করবে? নিয়ে যাবে? না এখানেই রেখে যাবে কোথাও?

—এখানে কার কাছে রেখে যাবো?

—হাসানের কাছে।

হাসান কলেজের ছেলে, অত্যন্ত ভাল ছেলে।

অধ্যাপক বললেন, হ্যাঁ, রাখতে গেলে হাসানের বাড়িতেই একমাত্র রেখে যাওয়া যায়। কিন্তু সে তো পরের কথা, তখন দেখা যাবে। কাঞ্চলী কি রাজী হবে থাকতে?

—রাজী না হ'লে জোর করেও রাখতে হবে। ওর পক্ষে এখন এইখানে থাকাই নিরাপদ।

—তবে পারে। কিন্তু জোরজার যদি করাই, ওকে

—কেন?

—যদি কথা ওঠে, হিন্দুর মেয়ে, মুসলমানের এ এল কি করে—নিশ্চয় চুরি করে নিয়ে আনা তখন? হাসান মাথা দেবে না?

—ধুত্তোর, এত আর ভাবা যায় না বাপি!

—ভাবতে বলছে কে। ভেবে যার কূল তাকে নিয়ে না-ভাবাই যুক্তি। আসতে না বোঝা যাবে।

রাত্রে বাবলু টুকু শোয়, বাবাকে প্রাণপণে ধরে, যেন তাঁর দেহ থেকে সাহস আর ভরসা নিচ্ছে। কাঞ্চলীর খাটটাও টেনে একত্র করা হয়েছে—তিন শিশুকে পাশাপাশি শুইয়ে দুজনে পাহারা দিয়ে থাকেন।

অস্ত্র বলতেও ঘরে নেই কিছু—হানাই বা কিছুক্ষণ অন্তত লড়বেন নেই এমন কোন হ সরু ছোট্ট মাংস-ছাড়ানো ছুরি শুধু আছে সেইটাকেই ঘষে ঘষে অত্যন্ত ধারালো করে অধ্যাপক, মাথার কাছে বিছানার তলায় রেখে

গৌরী বললেন, কি ব্যাপার, লড়াই যদি হাতে দিয়েই লড়বে নাকি তুমি?

—আছে থাকনা হাতের কাছে। কা যেতেও তো পারে।

এর অনেকদিন পরে, নিরাপদ পরিবে গৌরী একদিন হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলো, সত্যি তো, ছোট ছুরিটা কেন রাখতে বিছানার তলা

অধ্যাপক স্থিরদৃষ্টিতে চাইলেন তাঁর বললেন, শুনবে? রাখতাম—সত্যি যদি আ মজবুত বাড়ি, দোর জানালা ভেঙে তাদের ঢুক দু'মিনিট সময় পাব। সেই দু'মিনিটে ক'জনের গলা কেটে দিতে পারব ছুরিটা দিয়ে তাদের হাতে পড়ার আশঙ্কা থাকবে না।

গৌরী চোখ তুলে তাকালেন। ধীরে ধীরে আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম। আমি

—করতে না, তাও জানি।

আরও একদিন কাটল। বরিশালের কোন খবর নেই—না মানুষ, না চিঠি।

দুপুরবেলায় বাবলু ছুটে দৌড়ে ফিরে এল, বড় বড় চোখ করে চুপি চুপি বললে, জানো মা, কলেজের একটা ছেলেকে মেরে ফেলেছে।

—যাঃ। কে বললে?

—খোকনদা বললে। সে দেখে এসেছে।

—ওল! খোকনদা দেখে ফিরে এল, আর তাকে অমনি ছেড়ে দিলে, না?

অধ্যাপক উঠে এসে কাছে দাঁড়ালেন। দেখেই বাবলু জড়োসড়ো হয়ে গেল। অধ্যাপক তাকে কাছে টেনে নিলেন। মাথায় হাত রেখে অভয় দিয়ে বললেন, কি হয়েছে?

—ঐ সেট না! তার ওখান দিয়ে দুটো কলেজের ছেলে আসছিল, একটা বুড়ো রিফিউজী তাদের টাকা কেড়ে নিয়েছে, একজনকে ছুরি মেরেছে, এক্ষুনি।

—আহা মরেই গেল ছুরিটা?

বাবলু বললে, ধুৎ।

—তারপর? রিফিউজী কে বললে?

—হ্যাঁ, রিফিউজী। খুব বুড়ো, কালো, একটা পা খোঁড়া।

—জানা গেল, বুড়ো আর কালো আর খোঁড়া হলেই রিফিউজী হয়। ছেলেটার কি হ'ল? মরে গেল?

—তা জানিনে।

—যাওয়াই ভাল। দুপুরবেলা, বাজারের মাঝখানে, যদি একটা মাত্র কালো বুড়ো খোঁড়া রিফিউজী একটা মাত্র ছুরি নিয়ে দুটো কলেজের ছেলেকে দুটো করে ফেলতে পারে, তবে তাদের বেঁচে থেকেও লাভ নেই। মরে গেছে আপদ গেছে, একদিন ছুটি পাওয়া যাবে কলেজে। আর কি খবর?

—আর কিছু নেই।

বাবলু হয়তো বলতে যাচ্ছিল, তুমি যা ভেবেছ তা নয়, তোর শুনতে হবে না। বলিসনে দিদি, বাবা

কাটল আরও দিন দুই। মুখের অন্ধকার অন্ধকার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে সকলের অসম্ভব ভিড়—ট্রেনে উঠতে না পেরে খুলনা অসংখ্য মানুষ পড়ে থাকছে প্রত্যহ। পথে স্টেশনে তো মারামারি রোজই হচ্ছে—নতুন যা যায়, ট্রেনের যাত্রীরা বাধা দেয়, এই নিয়ে। তারিখে এক ছাত্র একটি চিঠি এনে দিলে সার, আপনাদের চাকর বাসু দিয়েছে দেখলেন, বাবার চিঠি—

বাসু বাড়ি যাচ্ছে। তার সঙ্গীরা সব চ ওকে আর আটকে রাখলাম না, খুব ভয় আমার এখনও দেরি হবে, এত ভিড়ে যে না। তুমি ওদের নিয়ে চলে যাও।

বললেন, তুমি কোথায় গেলে?

—খুলনায়। আজকের স্টীমারে এসে এক্সপ্রেসে উঠতে পারেনি, বিকালের ট্রে আপনাকে দেখা করতে বলেছে এই স্টেশনে।

—এলো না কেন?

—সঙ্গে আরও লোক আছে। বলে আপনাদের চলে যেতে বলে দিয়েছেন আপনা

বিকেলে স্টেশনে গেলেন। বাসু জানা বাড়িয়ে ছিল। চেঁচিয়ে বললে, যেতে বলেছে

—বাবা কেমন আছেন?

—ভাল।

—তুই কেলে চলে এলি কেন? বলে নিয়ে আসবি?

—এলেন না। ভীষণ ভিড়। স্টীমারে না। আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিলেন।

সব উড়েরা চলে গেছে। এরা শেষ হল।

গাড়ি ছেড়ে দিলে। বাসু চেঁচিয়ে বলবে

সেই ছেলেটিই হয়তো বলে দিয়েছে খবরটা ; দল বেঁধে ছেলেরা এসে বাড়িতে উঠল। স্যর, আপনারাও নাকি চলে যাবেন ?

—যাওয়া কি অন্যায় ?

—অন্যায় বলতে পারিনে। কিন্তু চলে যাবেন। একথাও তো বলতে পারিনে। সত্যি বলুন, যাবেন ?

—যাবার ইচ্ছে এখনও নেই। কিন্তু ঘটনাচক্রে যদি যেতেই হয় ?

—যাবেন না স্যর। আমাদের অনুরোধ। পুরোনোরা তো চলেই গেছেন। আপনারাও যদি যান, কলেজ ভেঙে যাবে।

—যাক না। আমাদের মেয়ে তাড়াচ্ছে যারা, তারা এসে পড়াক্।

—যাবেন না স্যর। ভয় পান যদি, আমরা পাহারা দেব আপনাকে। বলুন, আজ থেকে দশজন করে ছেলে আপনার এই বাইরের ঘরে রোজ রাত্রে জেগে বসে থাকবে।

—আমাকে পাহারা দিয়ে কি হবে ? কলেজের বাইরে, গ্রামে যারা আছে, যাদের পাহারা দিতে কেউ নেই। তাদের দিয়ে পাহারা দিয়ে বাঁচাতে পারবে ? পার তো তাই কর গিয়ে। আমাকে পিকেটিং করতে হবে না, পাহারাও দিতে হবে না।

ছেলেরা ফিরে গেল।

গৌরী বললেন, ওরকম করে বলতে কেন ছেলে-গুলোকে ? হয়তো রাগ করে গেল।

—রাগ করেনি।

—কি করে জানলে ? বড় কড়া কথা বল তুমি মানুষকে। ওদের কি দোষ ?

—কড়া কথা বলতেও হয় অনেক সময়। দোষ ওদেরও—যারা অন্যায় করছে তাদের ধরে পিটবার সামাজিক দায়িত্ব ওদেরই। যাদের হাতে ভবিষ্যৎ সমাজের ভার।

—আজ কি করবে এখন ?

—বাক্স গুছিয়ে নাও।

—কেন ?

—কারণ, বাসুও চলে গেছে। বাবা আমাদের হুকুম পাঠিয়েছেন চলে যেতে। তাঁ তিনি নিজে যাবেন না। গিন্নি। অতএব ব বরিশাল ছুটতে হচ্ছে। তোমাদের এখানে এব যাব না। পাঠিয়ে দিয়ে তারপর যাব।

—কার সঙ্গে যাব আমরা ?

—কালিদাসবাবু যাবেন বলছিলেন। তাঁর

—তা হবে না। এই হাঙ্গামার বাজারে কি ঘটে যায়—ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্যের ঘাড়ে হ'য়ে যাব না আমি। তাঁরও বৌ রয়েছে মেয়ে —পথের মধ্যে হয়ই যদি কিছু, তাদের সামল আমাকে সামলাবেন ?

—ধ্যেৎ, যতো বাজে কথা।

—বাজে কথা নয়। রাগ করো আপনি কিন্তু এই অসময়ে পরের ভরসায় আমি। গাড়িতে উঠব না। যেতেই যদি হয়, তুমি নি আসবে চলো।

—বেশ, তাই। গোছাও বাক্স। আর যে

—কালই ? কালই যাব কি করে ?

—কাল না হোক, পরশু। যাবার মুখবি নেই। মালপত্তর নেবার দরকার নেই কি যাওয়াও যাবে না। স্রেফ একসেট করে কাপড় আর তিনটি ছেলেমেয়ে।

—তারপর, সেখানে গিয়ে কার কাছে ক করে পরব ?

কিনে পরবে। আর এত তাগাদা করে চলে এলো চলে এসো লিখছেন যাঁরা, তাঁরা য পড়েন একদিন পরবার মতো একটা, কাপড় য না পারেন তোমাকে, তাঁদের উঠোনে তিন দ ফিরে চলে আসবে নিজের ঘরে, বাঁচো আ

পরদিন দুপুরে খবর এল, ম্যাজিস্ট্রেট

শ্রীমতী ওয়াহেদা রেহমান
গুরুদত্তের "চৌদ্দবি কা চাঁদ" ছবিতে

রূপ যেন তার রূপ কথারই রাজকন্যার মতো...

শ্রীমতী রূপ অপরূপ। যেন রূপকথার, রূপবতী রাজকন্যা! ···· এত রূপ, এত লাবণ্য সে-ওতো ওর নিজেরই ঐশ্বর্য। চতুরী চিত্রতারকা ওয়াহেদা রেহমান জানেন, সৌন্দর্যের সোপান রচনা হলো ত্বকের সুকুমার কোমলতা। 'তাইতো আমি রোজই লাক্স ব্যবহার করি। এর সফেন পরশে কেবল সত্যিই ত্বক হয়ে ওঠে আরও লাবণ্যময়ী' ওয়াহেদা বলেন। আপনার সুন্দরতাও বাড়িয়ে তুলুন — নিয়মিত লাক্স ব্যবহার করে।

LUX
TOILET SOAP

চিত্রতারকার সৌন্দর্য্য-সাবান
বিশুদ্ধ, শুভ্র, লাক্স

এলেন, হলঘরে সব ছাত্র আর অধ্যাপককে নিয়ে সভা বসালেন। খুব প্রাঞ্জল করে বোঝাতে লাগলেন। বিশৃঙ্খলার সময়ে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে যথাসম্ভব অবিচলিত থাকা, যেন দুষ্কৃতকারীরা আর সমাজের শত্রুরা কোন ছিদ্র খুঁজে না পায় অপকর্মের। কেউ বিচলিত হবেন না। সবাইকে বুঝিয়ে নিরস্ত করবেন যেন চঞ্চল না হন, অহেতুক ভীত না হন—এই দায়িত্বই ছাত্রসমাজের।

ছাত্ররা বললে, স্যর, বিহারীরাই গোলমাল বাধাবে তাদের সামলে রাখতে পারে না কেন, পুলিস?

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, তাদের সামলানো কিছু কঠিন ব্যাপার, তবে আমি ব্যবস্থা করেছি তাদের একসঙ্গে জোট পাকিয়ে থাকতে দেওয়া হবে না—দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু একটি ভুল করেছেন আপনারা। বিহারী এদের সব নয়।

—বিহারীই তো।

—না। যাদের দেখছেন আপনারা, এরা কোন বিশেষ স্থান বা দলের নয়। কোন স্থান-বিশেষের নাম করে এদের বোঝালে সেই স্থানের ওপর অবিচার করা হবে। মনে রাখবেন, এই ধরনের দেশত্যাগের হিড়িক যখন পড়ে, The first people to run are very often those against whom the police are holding warrants.

অধ্যাপক মনে মনে বললেন, অতি ঠিক কথা। এখানে যাদের 'বিহারী' বলা হচ্ছে, আসলে তাঁরা কলাবাগান আর রাজাবাজারের দল।

আলোচনা বেশ চলছিল, হঠাৎ একটা সামান্য কথায় জল ঘুলিয়ে উঠল। থার্ড ইয়ারের একটি ছেলে বললে, আমাদের একটি কথা স্যর। কলেজের প্রেসিডেন্ট এবং ডি এম হিসাবে আপনারই শোনা দরকার কথাটা।

—বলুন।

—চারিদিকে আতঙ্কের হাওয়া, সকলেরই মন চঞ্চল। আমাদের অধ্যাপকরা বেশীর ভাগই হিন্দু। ধরধরে ভাব চলছে। এঁরা মন স্থির করে পারছেন না ঠিকমত। আমাদের ক্লাস হচ্ছে, ক্লাসে প্রাণ নেই। এঁদের অবস্থা আমরা বুঝতে এঁদের আমরা দোষ দিতে পারিনে। এঁদে আপনি আশ্বাসের ব্যবস্থা করুন, কলেজের মধে ইউনিট বসিয়ে দিন। তাহলে কলেজ নিরা অধ্যাপকরাও সুস্থ হ'য়ে থেকে স্থিরমনে পড়াতে

ম্যাজিস্ট্রেট মুচ্‌কে হাসলেন। বললেন, পু আমি দিতে পারি। কিন্তু প্রফেসররা অত ভয় বলছেন, অত ভীরু বলে আমি তাঁদের মনে And they should have nothing to fea are true Pakistanis.

সভা অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল। অসন্তোষের একটা নিঃশব্দ ঝড় বয়ে চলে গেল মনে মনে।

ছেলেরা অনেকে উঠে বেরিয়ে এল।

সভার শেষে অধ্যাপক বাড়ির দিকে পিছন থেকে ডাক এল, স্যর, শুনুন।

দাঁড়ালেন। এক ঝাঁক ছেলে এসে ঘি যারা কাল বলতে গিয়েছিল যাবেন না, আমর বাড়ি পাহারা দেব, তারাই বললে, কি ক করলেন?

অধ্যাপক সকলের দিকে চেয়ে দেখলে হেসে বললেন, তোমরাই বল।

—চলে যান আপনি—আটকে রাখবার নেই আমাদের। ডি এমকে বললাম প্রফেস পাহারা দিন, তাঁর ঐ জবাব? টিট্‌কা আপনাদের? বরিশালে মরেছে যারা, তা পাকিস্তানের শত্রু ছিল? আর পাকিস্তানের এই কাণ্ড যারা বাধিয়েছে তারা? আপনারা স্যর। বলেন তো আমরাই টিকেট কিনে বেনাপোল পার করে দিয়ে আসব আপন আমাদের মারো [illegible]

বাড়ি এসে সব বললেন অধ্যাপক।

গৌরী বললেন, ঠিকই বলেছে ছেলেরা।

দুদিন পরে দোলপূর্ণিমা। তেসরা থেকে তিনদিন ছুটি। শুক্রবার, আর দোলের জন্যে দুদিন। ঠিক হ'ল তেসরাই রওনা হবেন। কালিদাসবাবুও যাচ্ছেন সেদিন, স্ত্রীকে রেখে আসবেন। একসঙ্গে গেলে আর কাউকে কারুর ফেলে যাওয়া হল না।

রাত দুপুরে জেগে উঠে গৌরী দেখলেন, অধ্যাপক ঘুমোননি, জানালা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে খাড়া হ'য়ে বসে আছেন বিছানার ওপরে। বললেন, কি হ'ল, ঘুমোবে না?

একবার ডাকলেন, দুবার ডাকলেন, জবাব নেই। অধ্যাপক শুনতেই পাচ্ছেন না—নিস্পন্দ পাথরের মূর্তি। দেখে ভয় হল, গায়ে ঠেলা দিয়ে বললেন, কি ভাবছ অত?

অধ্যাপক ফিরে তাকালেন না, অত্যন্ত অন্যমনস্ক স্বরে বললেন, ভাবছি? হ্যাঁ, ভাবছিই তো।

—কি হবে অত ভেবে! যা হবার হবেই। এবার ঘুমোও।

—হয় আর কি ভেবে, ভাবাটাই হয়।

—কি ভাবছ?

—ভাবছি পালিয়ে যাচ্ছি। নিজেকে বড় ছোট মনে হচ্ছে।

—আহা! বানের মুখে সবাই বুঝে ছুটে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। তাকে পালানো বলে না।

—একে বলে 'এ তো বান নয়, উচিত ছিল সবাই মিলে দাঁড়িয়ে থাকা। মারামারি করেও নিজেদের টিকিয়ে রাখা। এটা আমারও দেশ, এখানে বেঁচে থাকবার, টিকে থাকবার অধিকার আমারও কারুর চাইতে কম নয়, ঐই কথা মনে রেখে স্থির হ'য়ে থাকা।' তা তো পারলাম না।

—পারলাম না, সে অপরাধ তোমার নয়। সবাই

—সে তো জানি। করতে চাইছিও না কিন্তু বড় নিশ্রী লাগছে।

গৌরী চুপ করে রইলেন। মনে পড়ল, ঠিক ক'রে বয়লারের মত শান্ত রহনে নিঃশব্দে জ্বলতে ছিলেন এঁকে, যেদিন,—ছেড়ে চলে আসেন প্রিন্সিপ্যাল এমন কাজ করছিলেন যাতে কলেজ অনিষ্ট। অথচ বাধা দিতে গিয়ে শুধু অপমানিই বা বিরক্ত হ'য়ে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন অধ্যাপক এলেন যেদিন ভোরে, সেই রাত্রিও এমনি করে বসেছিলেন তিনি: বলেছিলেন, খালি মনে হ হ'য়ে গেলাম—হেরে গেলাম, পালিয়ে গেলাম।

গৌরী বলেছিলেন, তাই যদি মনে কর, না পারতে?

—তা পারতাম না; আমাদের নিজেদের গা দিয়ে গড়া কলেজ, তার এমনি করে অপঘাতে মৃ থাকা সম্ভব নয়। অথচ, চলে যাওয়াও ঠিক হ' উচিত ছিল বোধ হয় টিকেই থাকা, মারামা একে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা করা।

তারপর হঠাৎ নিশ্বাস ফেলে বলেছিলে করব। সবাইকেই ভূতে ধরেছে, একা কুইক মোট হয়ে কি করব।

সেই কথাটি আবার নতুন করে মনে গৌরীর। চিরকাল ফুর্তিবাজ লোক, হাসিখু হয়োড় নিয়ে থাকা স্বভাব—সেই লোককে দেখে ছ'মাস অবধি কেমন শুকিয়ে গেছেন, নতুন ক্লাস নিচ্ছেন, সবই করছেন কিন্তু কেমন যেন পুতুলের মত, কোন কিছুতে উৎসাহ নেই, প্রা নতুন আয়না, সভাসমিতি থেকে ডাক অধ্যাপকরা, ছাত্ররা চিড় করে আসছেন যে করতে—ইনি খালি পিছিয়ে সরে সরে গৌরী প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তর পেয়েছিলে মারার অভাব না।

—ভিন্ন এবাই যে ভাবাচ্ছে তোমাকে।

আনন্দে আমি পলাতক, অপ্রস্তুত।

আত্মগ্লানির সেই ছ'মাসকাল গৌরীর স্মৃতিতে আজও স্পষ্ট। কথাটাকে আর বাড়তে দিতে চাহিলেন না তিনি, বললেন, এ যাওয়া তো সে রকম যাওয়া নয়। এ যাচ্ছি, শুধু এদের জন্যে।

—অধ্যাপক ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে ঘুমন্ত তিনটি শিশুর দিকে তাকালেন। বললেন, তা বটে। এদেরই জন্যে।

গৌরী বললেন, তাছাড়া, এবার তো একেবারে চলেও যাচ্ছিনে আমরা। বাবার জন্যে বরিশালে যেতেই হবে তোমাকে, সেইজন্যই আমিও যেতে রাজি হ'লাম। আবার আমি ফিরে আসব।

অধ্যাপক চট্ করে মুখ ফিরিয়ে চাইলেন। মুখ-জোড়া অন্ধকার ফুঁড়ে এক ঝিলিক আলোক ফুটে উঠ্‌ল: নিশ্চয়।

গৌরী বললেন, ঘুমোবে না?

অধ্যাপক কথা বললেন না। নিঃশব্দে শুয়ে পড়লেন।

রাত থাকতে উঠে, বাড়ি থেকে বেরোতে হল। খুব ভোরেই ট্রেন আসে; এবড়ো খেবড়ো ডাঙা পথে প্রায় আধমাইল হেঁটে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। মালপত্র সামান্য—একটিমাত্র বড় স্টীল সুটকেস, নেহাত যা না হলে নয় এমন কাপড়-চোপড় ভরা; একটি জলের বোতল, একটি থলের পথের খাবার। আর কিছু নয়—নিজের হাতে যা ব'য়ে নেওয়া শক্ত হবে, এমন কিছুই নয়। কালিদাসবাবুও ঠিক ঐভাবেই তৈরি হয়েছেন। একটি বেয়ারা চলেছে সঙ্গে দুজনের মালপত্র নিয়ে, দুই পরিবার পাশাপাশি হেঁটে চলেছেন, একেবারে নিঃশব্দে। ত্রয়োদশীর চাঁদ, শেষরাত্রে ডুবে গিয়েছে, সেই অন্ধকারে। আলো নেননি সঙ্গে, কেউ একটি কথা বলছেন না—শিশুরা পর্যন্ত নয়। শোনা গেছে, খানার কাছে পথের

পালিয়ে যাচ্ছেন—চোরের ভয়ে নিজে চোর পালিয়ে চলে যাচ্ছেন অধ্যাপক।

অথচ নিজের দেশ ছেড়ে, দেশভাগের এ পরে নিজের ইচ্ছেয় ফিরে চলে এসেছিলেন, ত নাগরিক বলে পরিচয় স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে। প বহুবার করে নিজেকে বলতে বলতে গেলেন, চ না আমি, যাব না—আবার ফিরে আসব, এদের আন্‌ব।

স্টেশনে ভিড়। স্টেশনমাষ্টারের ওপর হুকুম, ওধারের টিকিট দেবে না কাউকে। অনেক করে কলকাতার টিকিট মিল্‌ল। ট্রেনে অসম্ভব আপার ক্লাসের টিকিট নিয়ে লাভ নেই, আর বরং থার্ডক্লাসের গাড়ী বেশী, ঠেলেঠুলে উঠে পড় পারে কোনক্রমে। আর তখন মেজাজও বিগড়ে যেটুকু না দিলে নয় তার বেশী পয়সা দিবার প্র না। ট্রেন এল, রীতিমত মারামারি গুঁতোগুঁ এক থার্ডক্লাস কামরায় উঠে পড়া গেল শেষপর্যন্ত

গাড়ি ঠেসে ভরা, তার উপরে আরও অ পঁচিশেক লোক উঠতে যাচ্ছে। বর্ডার টিবি কেউই পায়নি, তা হোক। যে কোন স্টেশনে কেটে উঠে তো পড়, তারপর চেকারকে ঘ দিয়ে টিকিট বাড়িয়ে নেওয়া হবে। এই কারণ ধাক্কাধাক্কি করে উঠতে গিয়ে গায়ে চোট লাগ্‌ল কাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছে, যাক—বেঁচে থাকলে আব ওঠার চাপে বাচ্চাদেরই বিপদ, তারা পড়ে যা তলায়। অধ্যাপকের একহাতে বাবলু, কাঞ্চনী। ভুতু গৌরীর হাতে ধরা। নিজের পেছনের ধাক্কা সামলে দুজনকে আগে হাঁ গাড়িতে উঠলেন। গাড়ির ভেতর কোণে দুটি এগিয়ে দিয়ে, জানালার হাত বাড়ালেন, বেয়ার গলে সুটকেস আর থলে তুলে দিলে। এ গৌরী বললেন ভুতু? ভুতু কোথায় গেল?

উঠতে গিয়ে ভিড়ের চাপে ভুতু তাঁর হাত থে

ATTRACTIVE PACKAGING SELLS YOUR PRODUCT

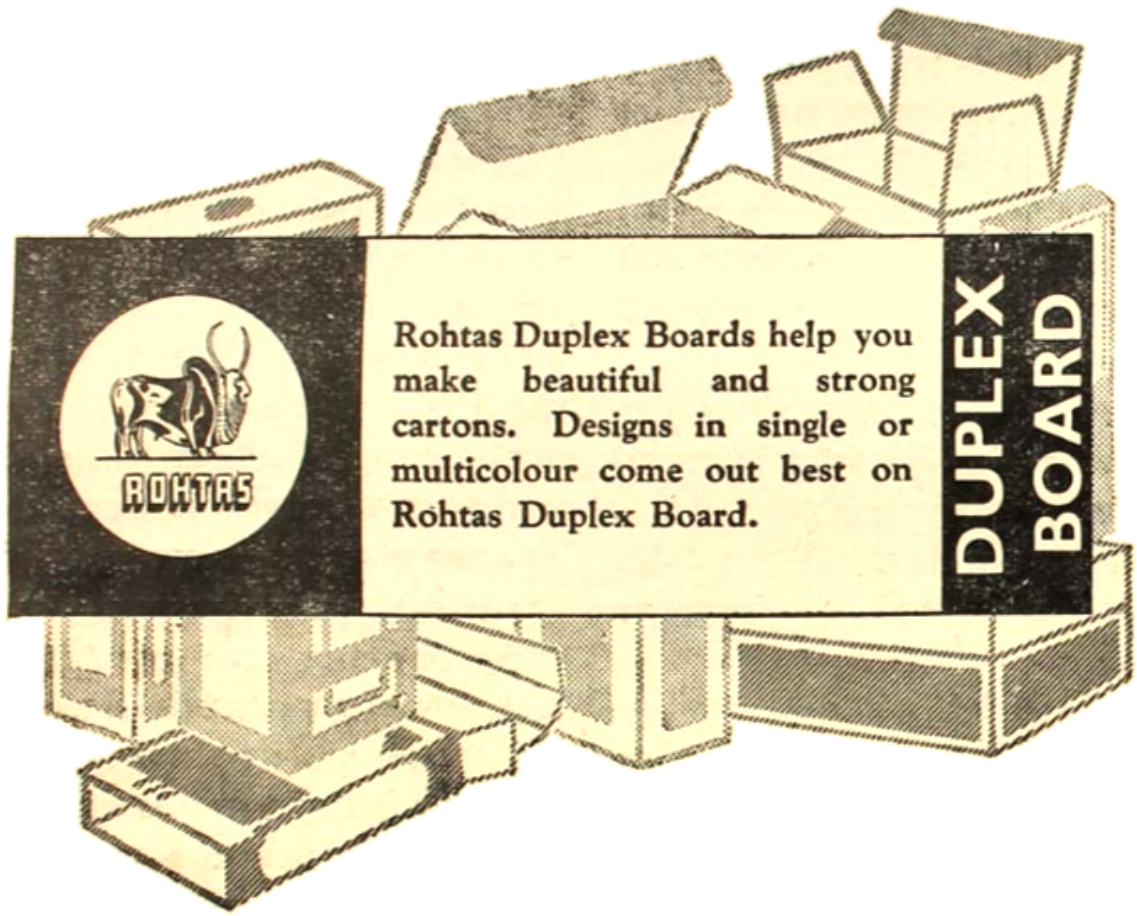

SAHU JAIN INDUSTRIES

ROHTAS INDUSTRIES LTD.

Dalmianagar, Bihar

LARGEST PRODUCERS OF PAPERS AND BOARDS IN THE COUNTRY

সেইখান থেকে কালিদাসবাবু বললেন, এই যে ভুতু, আমার হাতে। তাঁর বাঁ কাঁধে অনিমা; ডান হাতে পায়ের তলা থেকে কুড়িয়ে ছেলেটাকে উঁচু করে তুলে ধরলেন তিনি। একবার ফিরে তাকিয়ে দেখে, অধ্যাপক বাকিদের গুছিয়ে কোণঠাসা করে দিতে লাগলেন। সবসুদ্ধ এমন একটা চেঁচামেচি কোলাহল, কারু কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। হঠাৎ তার মধ্য থেকে তীব্র শিশুকণ্ঠে কান্না জেগে উঠল—ও বাবা।

সৌরী চমকে বললেন, ভুতু।

—কোথায় ভুতু?

কালিদাসবাবু তখনও ভিড়ের মধ্যে। গলা উঁচু করে, ছেলেসুদ্ধ হাত ঝাঁওয়ার মত নেড়ে বললেন, এই যে ভুতু, আমার হাতে।

এতক্ষণে চেয়ে দেখার ফুরসৎ হ'ল। ভুতু তো নয় আর একটা ছেলে। ভুতুরই মতন বয়স আর জামা। ব্যাপার দেখে হকচকিয়ে গেছে ছেলেটা—কান্নাটান্না নেই।

—এ কে, এ তো ভুতু নয়?

কালীদাসবাবুও তৎক্ষণে টের পেয়েছেন। বললেন —এটা কেরে তুই আমার হাতে এলি?

ছেলে কথা কয় না।

অধ্যাপক চেঁচিয়ে বললেন, ও মশায়রা, এ ছেলে কার?

এতক্ষণে দূরের কোণ থেকে একজন হাত বাড়ালেন, আহা, ও যে আমাদের। দিন দিন ভাই।

অধ্যাপক ছেলে এগিয়ে দিলেন, বললেন, ছেলেটা নেই, খেয়ালই হ'ল না এতক্ষণ?

কালিদাসবাবু খাস বিক্রমপুর। বললেন, আরে দূর মশায়। ছেলে তো, আবার হবে।

কিন্তু, ভুতু কই?

—তিনজনে একসঙ্গে ডেকে উঠলেন, ভুতু! ভুতু!

ভুতুর গলা সেই একবারই মাত্র শোনা গিয়েছিল। আসলে আর সে চাঁচায়নি। চাঁচাল কোথা থেকে?

দেখ, দেখ তাকিয়ে। দু তিনজন জানালে মুখ বাড়াল। কতবড় ছেলে?

ঘণ্টা হয়ে গেছে। তখনও সমানে ঠেলে লোক। ভাল করে দেখাই যায় না কিছু। এ গাইরে দাঁড়িয়ে হাসান—সে এসে ছুটেছে শেষ বললে, কই, বাইরে তো নেই ভুতু।

—ভুতু! ভুতু?

হঠাৎ দূরের কোণে ভিড়ের মধ্যে এক নিচু হ'য়ে প্রায় পায়ের তলা থেকে তুলে ছেলেটাকে। দেখুন তো; এইটি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। দিন।

লোকের হাতে হাতে এবার মেল হ'য়ে ছেলে।

—কোথায় গিয়েছিলি?

ভুতু নীরব। তুবার তিনবার প্রশ্নের পর তুমিই তো ছেড়ে দিলে আমাকে।

অধ্যাপক বললেন, থাক বাবা, দুঃখ কো এই ভিড়ের ঠেলায় নিজেকেই হারিয়ে ফে তুমি তো মাত্র ছেলে, তাও কালো কুচকুচে।

গাড়ি নড়ে উঠেছে। বাবলু হঠাৎ চীৎক কেঁদে উঠল—আমার জল।

বড় একটি সেলুলয়েডের জল-পুতুল। বিনয় করে পাওয়া। পালাবার সময় যে যা সম্পত্তি নিয়ে পালায়—বাবলু নিয়ে এসে জলকে। ঐ ভিড়ের মধ্যেও একহাতে তা চেপে নিয়ে গাড়িতে উঠেছিল। কিন্তু এখন ভেতরের চাপে তার যে পুতুল চেপ্টে যাবা হয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে বললে, ভেঙেই সে

সৌরী বললেন, যাওয়াই উচিত। এ মানুষ যেতে পারে না, তুই আবার ওটা এসেছিস কেন?

অধ্যাপক বললেন, কি বিপদ! আমর এনেছি। ও-ও ঠিক একই কারণে এর

তোর। ভেঙে চ্যাপ্টা হ'য়ে যাবে। রেখে যাবি এখানে?

বাবলু রাজী নয়। অনেকবার করে বলে ক'য়ে তাকে রাজী করাতে হ'ল। গাড়ি চলতে শুরু করেছে, বাইরে হাসান, জানালা ধরে হেঁটে চলেছে। হাত বাড়িয়ে অধ্যাপক পুতুলটা তার হাতে দিলেন। হাসান আমার নাতনীটাকে তুমি রেখে দাও।

বাবলু বললে, ভাল করে রেখো কিন্তু হাসান কাকা।

হাসান বললে, ভয় নেই, খুব যত্নে রাখব, রোজ সাবান মাখিয়ে চান করাব, দুধ খাওয়াব। ভয় নেই তোর, তুই ফিরে এসে ঠিক পেয়ে যাবি।

গৌরী ম্লান হাসি হাসলেন: ফিরে এসে! হাসানেরও মুখে কালো ছায়া পড়ল: বেশ, আমি নিজে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসব একে।

অধ্যাপক বললেন, অতদূর দরকার নেই। খাইয়ে-টাইয়ে রাখ, তারপর যদি নাই ফিরি নেহাত, ভালমন্দ পাত্র-চাত্র পাও তো দিও বুলিয়ে।

গাড়ির বেগ বেড়েছে। হাসান জানালা ছেড়ে দিলে। আর বেশীক্ষণ হলে সে বিপদে পড়ত—চোখের জলকে আর ঠেকে রাখা যাচ্ছিল না।

গাড়ি চলল। মন্থর গতিতে—এত বোঝাই, যেন টেনে চলতে পারছে না। স্টেশনে স্টেশনে থামছে, প্রতি স্টেশনে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। নামছে না কেউ, সবাই খালি উঠতে চাচ্ছে। গাড়ির ভেতরকার যাত্রীরা, কেউ-বা এদের বাধা দিচ্ছে উঠতে, কেউ বা তাদের ঠেকিয়ে এদের টেনেটুনে নিচ্ছে, ওরই মধ্যে ঠেলেঠুলে জায়গা বানিয়ে দিতেও চেষ্টা করছে।

—আরও কোথায় তুলছেন মশাই, দেখছেন না অবস্থা!

—দেখছি। কিন্তু এদেরও তো যেতে হবে।

—তা, অন্য গাড়িতে কি জায়গা নেই?

—দেখে আসুন না গরজ থাকে।

পৌঁছে আর তারও ঠাঁই নেই। তখন, হাতে ওঠে, গাড়ির তলার রডে আর বাম্পার বোলো—তাও না পারো তো টেনে হাঁটু বরাবর আর বেশী দূর নয়।

ছেলেমেয়ে নিঃশব্দে চলেছে। বেলা দশটা তোর খেকে না খেয়ে আছে, তবু কথা বা অধ্যাপক একবার বললেন, ওদের খেতে দেবে

গৌরী বললেন, দেব কি করে, হাত পা যাচ্ছে না। বেনাপোলে গিয়ে দেব।

—তাই করে সবাই—বেনাপোলে অনেকক্ষ গাড়ি, লোকজন প্ল্যাটফর্মে দম নিতে নামে, জায়গা হয়; টিউবওয়েলও আছে প্ল্যাটফর্মে।

ঝিকরগাছা। যশোর। নাভারণ।

যাত্রীদের মনের ওপর একটা কাল ভার ক্র আসছে। কথাবার্তা কমে আসছে, নড়াচড় আড়ষ্ট হয়ে আসছে। সামনে বেনাপোল। স্টেশন। সার্চ আর হয়রানি স্টেশন। বহু অফিসার—কোন্ গাড়িতে ভাগ্যক্রমে কে কে জানে। কেউ আছে, ভদ্র ব্যবহার ক করবেই, সেটা তার কর্তব্য, কিন্তু দরকারে অসৌজন্য বা হয়রানি করে না লোকতে।

কেউ বা আবার এমন আছে, রূঢ়তা আর করাটাকেই যার পৌরুষপ্রকাশ বলে ধারণা। কথায় যেটা হত সেটাকে রূঢ় ধমক দিয়ে বে দিয়ে যে পোটলাটাকে নেড়ে দেখা যেত। অকারণ লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। প্রতিবাদ করে না, কশাইখানার পশুর মত ব নিষ্প্রভ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। হয়তে মধ্যে যোকা হাসি হেসে হেঁ হেঁ করে অফিসারে করতে চায়। তেমন যদি কেউ উঠে পড়েন সম্ভ্রম বাঁচাবার উপায় হচ্ছে একেবারে নির্বা থাকা, মালপত্তর থাকে থাক যায় যাক। যে

কটা, যা হয়তো বে ঘর জন্মের মতো ভেঙে ফেলে চলে এলাম তার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে যে থালা দুখানা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম, তাই যখন রূঢ় হস্তের অকারণ পীড়নে ঝন্‌ঝন করে আছড়ে পড়ে ভেঙে যায়, তখন তার সেই আর্তনাদ বুকের মধ্যে এসে ঘা মারে মানুষের। অথচ প্রতিবাদ করতে গেলে বিপদ ঘটবে।

বেনাপোলে পৌঁছবার আগে থেকেই তাই প্রত্যেক যাত্রীর দম বন্ধ হ'য়ে আসে, বুকের মধ্যে থরথর করতে থাকে, কি জানি কি হয়।—এই ফাঁড়াটা কোনক্রমে উৎরে গেলেই বাঁচা। অবশেষে বেনাপোল ছেড়ে গাড়ি যখন আবার চলে, রুদ্ধ নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে বেরোতে থাকে বুক থেকে। বর্ডার লাইন পেরিয়ে 'হিন্দুস্থানে' ঢুকেছে গাড়ি, টের পাওয়া মাত্র কলরব পড়ে যায়—যখন বোঝা গেল আর এ গাড়ির পেছন হটে পাকিস্তান ফিরে যাবার ভয় নেই, তখন কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা না করেই আশপাশের গাড়ির মেয়েরা ক্রমাগত উলু দিতে থাকে, পুরুষরা হরিধ্বনি করে; এতক্ষণের জমাট মুখ হঠাৎ খুলে গিয়ে সবাই মিলে এমন একটা কলকলানি শুরু করে দেয়, যেন হাজারখানেক পাতিহাঁস হঠাৎ এসে একত্র মিলল। মুখ খোলে, আরম্ভ হয় যার যার এলাকার দাঙ্গার বর্ণনা। পথের খবর, পাকিস্তান আর তার কাস্টম অফিসারদের আদ্যশ্রাদ্ধ।

নাভারণ ছাড়ল গাড়ি। বেনাপোল এল। তারপর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছবার আগেই হঠাৎ থেমে গেল।

কি হ'ল? সিগন্যাল পায়নি। অকস্মাৎ মন বিষয় হয়ে ওঠে—আবার দেরি কেন? হবার যা একবারে হয়ে গেলেই হয়—তার আবার বিলম্বিত প্রতীক্ষা বড় খারাপ লাগে। বিপদ তত ভয়াবহ নয় যত ভয়াবহ তার কল্পনা আর প্রতীক্ষা।

গাড়ি থেমেছে, আর নড়ে না। তখন বাইরে চেয়ে দেখলেন, গাড়ির দুই পাশে লাইন ধরে সৈন্য দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ দেখা গেল, যাত্রীরা সব নেমে যাচ্ছে থেকে। কি হল? নামতে হবে—এইখানে হবে সবাইকে।

তা হতে পারে—এত ভিড়ে মালপত্র সম্ভব নয়। তাই হয়তো নামতে বলছে। সব নেমে দাঁড়াক, তারপর একজন একজন এসে নিজের মালপত্র খুলে দেখাবে।

কতক লোক নেমেছে, কতক অগ্রসর হয়েছে, ছোকরা বয়স অফিসার একটি লাফিয়ে উঠল হেঁকে বললে, নামো, নেমে যাও শীগ্‌গির।

অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন, আমরাই নামব মালপত্র নিয়ে নামতে হবে?

অফিসার বিকট মুখভঙ্গী করে গর্জন করে নামতে যখন বলা হয়েছে, তার মানেই এক গাড়ি চাই।

ঘোরতর ইংরেজী, ভাষার যত ভুল তা পুষিয়ে গেছে উচ্চারণের দাপটে। অধ্যা বিস্ফারিত করে চেয়ে দেখলেন। খুব চেনা মু পড়ল তাঁরই ক্লাসে পেছনের বেঞ্চিতে বসে সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাস, পাবনা কলেজ।

আর উচ্চবাচ্য করলেন না; সুটকেস আ দুই হাতে ঝুলিয়ে সিঁড়িতে চলে এলেন। হাতে শুধু আর কাবুলী।

লাইনের পাশে, অসমান জমি, পোড়া কাঁকরের এলোমেলো স্তূপ—তারই ওপ দাঁড়াতে হ'ল।

তারপর? দৈববাণী হ'ল: ফিরে চলে লাইন ধরে—প্ল্যাটফর্মে গিয়ে ওঠ। ঘুটে-ঘুটে করা বৃথা। আগে পেছনে লম্বা লাইন প প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশে। সেই লাইনে গা মিলি চললেন; সবার আগে কালিদাসবাবু, তাঁ ক্রমান্বয়ে মেয়েরা আর শিশুরা—সবার

নিমের তুলনা নেই

২০০০ বছর ধরিয়া ইহার
উপকারী গুণগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত

দাঁত সুদৃঢ় ক
মাড়ীও সুস্থ রা

নিম টুথপেষ্ট

ইহা নিমের সক্রিয় ও উপকারী
গুণ এবং আধুনিক টুথ পেষ্ট-
গুলিতে ব্যবহৃত ঔষধাদি সমন্বিত
একমাত্র টুথ পেষ্ট

পত্র লিখি
নিমের উপকারি
প্রয়োজনীয় পুস্তিকা পাঠান হয়

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা-২৯

—কিনেছি।

—তবে কেন বললে নেমে যাও ?

—অমন বলে।

—কেন বললে ? কেন আমাদের নামিয়ে দিলে গাড়ি থেকে ?

—অমন দেয়। রাজার গাড়ি কিনা !

—না, বলো। কেন দিলে নামিয়ে ?

—পরে বলব বাবা। বড় হ'য়ে বুঝবে। বুঝবেই তো। তিনি নিজে চাননি শোনাতে—এখনও চাইছেন না। কিন্তু যে-জিনিস আপন বিক্রমে শতধারা হ'য়ে বেয়ে আসছে, চোখে পড়বেই, না-পড়ে ছাড়বে না এই তার পণ—তাকে এদের চোখ থেকে চিরদিন আড়াল করে রাখবেন সাধ্যি কি তাঁর।

উঁচু-নীচু পোড়াকরলার গিরিশ্রেণীর চড়াই উতরাই ভাঙতে ভাঙতে চলেছেন, পায়ের তলায় শব্দ হচ্ছে কচর-কচর মচর-মচর, মনে পড়ছে অনেককাল আগেকার চীৎকার : হুঁসিয়ার কাইল হো যাও—সরকার, সেলাম ! ঠোঁটের ফাঁকে হঠাৎ হাসি ফুটে উঠছে : সেটা ছিল স্বাধীনতার লোভ, এটা হ'ল স্বাধীনতার লাভ, বা রে ইংরেজ—পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে।

টালটক্কর খেয়ে হাঁটা, শিশুদের পক্ষে কঠিন। প্রতি পদে ধরে সামলাতে হচ্ছে তাদের। তবু তারা চলেছে, নিঃশব্দে। বাবলুর মুখ ঈষৎ ফ্যাকাশে, ঠোঁট সামান্য নীল। তার ভয় করছে। তুতুর দুই ঠোঁট শক্ত হ'য়ে চেপে এঁটে আছে, চোখ জ্বলছে, নামিয়ে দেওয়ার অপমানটা লেগেছে তার মনে। কাঞ্চনী চলেছে কাঠের পুতুলের মত, তার মুখে চোখে একটা নির্বিকার নিষ্প্রভতা।

সৌরী বললেন, খুব ভারী লাগছে বাক্সটা ?

—দুর্দান্ত। বিষয় সম্পত্তি এত না আনলেই হ'ত।

—আমার হাতে দেবে ? দাও না একটুক্ষণ নিই।

—থাক আর বীরত্বে দরকার নেই। নি তো আছাড় না খেয়ে হেঁটে চল।

প্ল্যাটফর্মে উঠে, পায়ের তলায় সমতল জা গেল। তা ভাল। কিন্তু আর একটি জিনিস গেল সঙ্গে সঙ্গে—গরম শান। এমন গরম তলা ফুঁড়ে পায়ে এসে লাগে।

আর তাঁর তবু চামড়ার সোল—শিশুদে কাপড়ের জুতো, রবারের সোল।

প্ল্যাটফর্মের ওপর, পাঁচ-ছ'জন করে দাঁড়িয়ে লাইন করেছে যাত্রীরা। স্টেশনঘরের সিগন্যালের হাতলগুলোর বরাবর থেকে পেছা বাঁধানো প্ল্যাটফর্ম অবধি এসে উঠতে পা লোক—পেছনের ছাই-গাদার তখনও বহুজন দৈববাণী হল : প্ল্যাটফর্মের কিনারা ছেড়ে স ঠেলাঠেলি করে যাত্রীর লাইন ডানপাশে স পেছনে হইসল দিয়ে গাড়ী ছাড়ল, ধীরমন্থর গ কাটিয়ে, স্টেশন ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল। যাত্রী আতঙ্ক, মুখে অনুচ্চারিত প্রশ্ন : ছেড়ে গেল ন চলে গেল সব লোককে এইখানে ফেলে। উপায় ? না—গেল না। যাত্রীরা যে-পর্যন্ত গাড়ি সীমানা পার হ'য়ে গাড়ি থামল। যাত্রীর লাই দড়ি বেঁধে বেড়া হ'য়েছে। তার ওধারে অফিসার দাঁড়িয়ে—লম্বা, বেঁটে, ফুলপ্যান্ট, অনেকরকম। আবার দৈববাণী হ'ল : দেখি, পাসপোর্ট, ডোমিসাইল সার্টিফিকেট কার কি

সে কি রে বাবা ? ১৯৫০ সনের তো পাসপোর্টের নাম কেউ শোনেনি তখনও। সার্টিফিকেট দরকার হয় বাসিন্দা বিদেশীর, এই দেশের বলে গণ্য হ'য়ে সরকারি চাব হয়। এমনিতে তার নামও জানে না এরা

অধ্যাপক বললেন, সেটা ধীরে-সুস্থে চিন্তনীয়। উপস্থিত কর্তব্য, ছেলেমেয়েকে বাঁচানো। চলো টিউবওয়েলে।

যাত্রীরা তখনও বজ্রাহত। টিউবওয়েলে ভিড় পড়েনি। এক্ষুণি পড়ে যাবে—চটুকা ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই জল খেতে ছুটে আসবে তৃষিত পশুরা। তার আগে সেরে নিতে হবে।

টিউবওয়েলে গিয়ে বললেন, পেট পুরে জল খেয়ে নাও সব। মাথায় জল দিয়ে দাও এদের। ধিয়ে, জামা-কাপড় ভিজিয়ে মাথায় চাপিয়ে দাও একটা করে—নইলে চাঁদি ফেটে মরে যাবে। জুতো ভিজিয়ে দাও।

তাড়াতাড়ি সুটকেশ খুলে, একটা করে জামা ইস্ত্রের হাতের যারে যা পাওয়া যায় টেনে বার করে ভিজিয়ে মাথায় মাথায় দিয়ে দিলেন, জুতো ভিজিয়ে দিলেন। নিজেরাও আকণ্ঠ জল খেয়ে নিলেন, বোতলে জল পুরে নিলেন।

—খাবার দাও এবার।

—এই অবস্থায়?

—অন্য অবস্থা পাচ্ছ কোথায়, বেলা এগারোটা বাজে। এই বালখিল্যরা খেয়ে নাও পেট পুরে।

—খাব না।

হুকুম জবাব। বাবলু কানুনী নীরব।

অধ্যাপক চেয়ে দেখলেন ছেলের দিকে। রাগে আর চাপা-কান্নায়—থমথম করছে মুখখানা। বললেন, রাগ করে নিজেকে কষ্ট দিতে নেই। খেয়ে নাও। পিত্তি পড়বে। দাও ওদের।

গৌরী বললেন, তুমিও নাও।

—উঁহু। আমার এখন নয়।

—কেন?

—ভয় নেই। নেই যার পিত্তি, পড়বে কোত্থেকে। তুমি এদের দাও। আমি দেখি রাস্তার খবরটা কি।

যাত্রীদের লাইনের সামনে, প্ল্যাটফর্মে আড়াআড়ি বড়ি খাটিয়ে বেড়া হয়েছে। তার ওধারে অফিসাররা, যাত্রী কাকুতি-মিনতি করছে। অন্তরা সে দাঁড়িয়ে। লম্বা ফর্সা এক অফিসার, মুখে পা খুব বেশী নয় কিন্তু চালচলনে বোঝা যায় মাতব্বর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। অধ্যাপক তাঁর সাম বললেন, আমাদের যাবার কি হ'ল? অধ্যা মানুষ। অফিসার খুব লম্বা। সেই মহিমার আ ওপর থেকে তাকিয়ে দেখে, অফিসার পাসপোর্ট আছে? বা ডোমিসাইল সার্টিফিকে

—না। পাসপোর্টের কোন রীতি নেই ডোমিসাইল সার্টিফিকেটও কেউ রাখে না সাথ

—তাহ'লে আমিও যেতে দিতে পারি না য়ান সরি।

—কিন্তু এসব দরকার হবে তো কেউ বলেনি

—আমার জানা দরকার যে তোমরা বোন পাকিস্তানী সিটিজেন।

—এতে হবে? পকেট হাতড়ে অধ্যাপক কাগজ বার করলেন। প্রিন্সিপ্যাল দিয়ে দিয়ে পরিচায়ক পত্র। কাগজটা খুলে ধরে বললেন অফিসার এক নজর তাকালেন, পড়ে দেখলে সন্দেহ। বললেন, I want something এতে হবে না। যেওনার ডায়সালে সার্টি অন্তত ইউ-বি প্রেসিডেন্টের সার্টিফিকেট।

—এ না হলে হবে না?

—না। গভরমেন্টের হুকুম।

—আমরা তো কেউ জানিনে এ হুকুমের জানলে নিয়ে আসা যেত।

—সেটা আমার দোষ নয়।

—কবে জারি হয়েছে হুকুম?

—কাল রাত্রে। রাত বারোটায় আমরা স পেয়েছি।

—সেটা আমরা জানব কি করে। স্টেশনেরও টিকেট না-বেচা উচিত ছিল। ত চুপ।

সার্কুলার জারি হবার আগে। সার্কুলারটা রীতিমত প্রকাশ করা হবে, লোকে জানবে, তারপরেই তো একটা বিশেষ তারিখ থেকে কাজে চালু করা যাবে তাকে।

—Don't argue, please. This is not a place for lecturing.

পরম দর্প ও অবজ্ঞাভরে অফিসার ঘুরে দাঁড়ালেন।

রাগে অপমানে অধ্যাপকের মুখচোখ জ্বালা করে উঠল। কড়া কিছুই হয়তো বলে ফেলতেন; হাতে টান পড়ল। ভুতু কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজীতে কথাবার্তা, ভাষা বোঝেনি সে। কিন্তু মানেটা বুঝে নিয়েছে ঠিক। মুখ লাল তার, হাত ধরে টেনে বললে, ফিরে চল বাবা। আমরা যাব না। সৌলতপুর তো যেতে দেবে?

অধ্যাপক ঘুরে দাঁড়ালেন; পিছন দিকে কয়েক পা এগিয়ে থামলেন। ভদ্রলোক বাত্রী জনকতক, অফিসারটিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন। খুব মোলায়েম তেল-চিক্কণ ভাষায় তাঁকে পটাচ্ছেন। তিনি নিজে তার সঙ্গে তর্ক করেছেন, ওটা অত্যন্ত বেয়াদবি, এঁরা কোনপুরুষেই অমন বেয়াদব নন, অতএব সদয়-বিবেচনার যোগ্য—এমন বাক্যও কানে এল গুটিকতক। আবার কানমুখ ঝাঁঝাঁ করে এল, আবার নিজেকে সংযত করলেন। এদের দোষ নেই, এরা নিজেকে বাঁচাতে চাইছে মাত্র। এদের দোষ নেই—অফিসারের পরনের ফুলপ্যাণ্ট আর মুখের পাইপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এরা। তবু দৃষ্টি সেই সেইদিকেই গিয়ে পড়তে চায় ঘুরে ফিরে। হঠাৎ দেখলেন, উনিশ কুড়ি বছর বয়সের একটি ছেলে, বেশ ফর্সা রং, চোখা নাকমুখ, অফিসারের সঙ্গে তর্ক জুড়েছে। মিনতি করছে না বলেই বিশেষ করে চোখ পড়ল হয়তো। মুখটি খুব চেনা—কে রে? তারপর মনে পড়ল। তারই ছাত্র, থার্ড ইয়ার ইকনমিকস। নাম মনে নেই।

একটু দেখলেন, একটু মুখ ফিরিয়ে নিলেন যখন চাইলেন তখন ছেলেটা নেই, সরে গেছে।

করবার কিছু নেই আর। তর্ক করে ফল মিনতি করাও সম্ভব নয়। থাক এইখানেই ওদিককার ট্রেন এলে উঠে বোসো, বাড়ি —তারপর যা করবার হবে।

ভিড়ের মধ্যে মিনিট দুই পরে সেই ছেলে হঠাৎ মুখোমুখি হ'য়ে গেল। এগিয়ে এসে বললে, কিছুতেই পারছি না স্যর, ডারি কড়া

—কে?

—ঐ টপস্যাঙ্গার লোক, বাসটে বলেই আবার চট্ করে চলে গেল।

সৌরী তখনও বাবমু আর কাঞ্চনী প্রোরে দাঁড়িয়ে। যাবেন বা কোথায়—ছা প্ল্যাটফর্মে কিছু নেই। বাইরে যেখানে ব আউট অব বাউণ্ডস্, সিপাইদের বেড়ার মাথার ভিজে জামা দুবার শুকিয়েছে ইতিমধ্যে ভিজিয়ে দিয়েছেন। ভুতু তার মাথার ব দিয়েছে, বলছে, আমরে চাইনে। খাবা কারোই হয়নি। চারদিকে সকলের মুখে হতাশ আর আশঙ্কা, তার মধ্যে খাওয়ার পা যায় না। এরা অনেকেই গ্রাম্য লোক—ে ছেড়ে বেরিয়েছে, ফিরিয়েই ঘরি দেয়, সে আর পৌঁছবার টাকাও নেই হাতে, ওঠবার ম হয়তো নেই। নিজের জন্যে সত্যি করে তে নেই অধ্যাপকের—তিনি ফিরে গেলেও আ না। কিন্তু এরা? অথচ, করবারও নেই কি ক্রোধে মুখচোখ জ্বালা করতে লাগল; হা মুঠো হ'য়ে উঠল। কি করবেন? ইচ্ছে হ' পারতেন যদি, ট্রেন থামবার আগেই ইঞ্জি ড্রাইভারকে ঠেলে ফেলে দিয়ে, নিজে ইঞ্জি সোজা ট্রেনকে পার করে নিয়ে চলে যেতে

দি
ইউনাইটেড্
কমার্সিয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

(১৯৪৩ সালে রেজিষ্টারি কৃত)

হেড অফিস : ২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১

অনুমোদিত মূলধন
বিলিকৃত ও স্বীকৃত মূলধন
সংগৃহীত মূলধন —
সংরক্ষিত তহবিল

শাখা সমূহ

ভারতে : সকল শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান নগর ও শহর

পাকিস্তানে : চট্টগ্রাম ও করাচী

ব্রহ্মদেশে : রেঙ্গুন, মৌলমিন, মান্দালয়

মালয়ে : পেনাং, কুয়ালা-লামপুর, ক্লাং

সিঙ্গাপুর কলোনীতে : সেরাগণ রোড, সিঙ্গাপুর

যুক্তরাজ্যে : লণ্ডন

হংকং কলোনীতে : হংকং এবং কাউলুন।

এজেন্ট :—পৃথিবীর সর্ব্বত্র—ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া

ব্যবসায় ও ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্য্যাবলী :—

এই ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ, অনুমোদিত জামিনের পরিবর্ত্তে ঋণদান, বিল খরিদ, ড্রাফ্‌ট দান ও তারে টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করে। আন্তর্দ্দেশীয় ও বৈদেশিক শাখাসমূহ এবং পৃথিবীব্যাপী ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ব্যাঙ্ক সর্ব্ববিধ ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনের সুযোগ দান করে।

জি. ডি. বিড়লা — এস. টি. সদাশিবন

ঘণ্টাখানেকেরও বেশী বোধহয় কাটল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আর আশপাশের লোকেদের অসহায় বিলাপ শুনে শুনে। তারপর হঠাৎ এক সময়ে সেই ছেলেটি আবার এসে সামনে দাঁড়াল। এসেই বললে, চলুন স্যর।

—কোথায় ?

—গাড়িতে। আপনার জন্যে পারমিশন পেয়েছি, অনেক কষ্টে।

—একা আমার জন্যে ?

—তাই পাওয়া যায় না।

—আর এই এতলোক ?

—সে তো আমার সাধ্য নয়। আপনার জন্যে পথ খুলেছি, স্টাফের আর কেউ আছেন ?

—আছেন। কালিদাসবাবু।

—তা'হলে সেই ফাঁক দিয়ে তাঁদেরও পথ করা যাবে হয়তো।

—কিন্তু এই সব লোক, সবাই যদি আটকে থাকে, একা একা আমি যাবই বা কি বলে ?

—আপনি থেকেও তো এদের বাঁচাতে পারবেন না। চলুন, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। অতি কষ্টে খুলেছে পথ, আবার বুজে যেতে কতক্ষণ।

—চল।

সুটকেস হাতে নিতেই সে কেড়ে নিলে,—আমাকে দিন।

—কিছু দরকার নেই।

—নেবারও তো দরকার নেই, আমি থাকতে।

পেছনে বেশ কয়েকশ' চোখ, বিস্ময় আর ঈর্ষার চোখে এদের দেখছে—পেছন থেকে দৃষ্টিগুলো যেন পিঠে এসে বিঁধছে। আবার সেই অনুভূতি এল অধ্যাপকের—পালিয়ে যাচ্ছেন, দেশসুদ্ধ সবাইকে পেছনে ফেলে রেখে একা নিজের পথ করে পালিয়ে যাচ্ছেন।

বেড়া, তার ওপারে ট্রেন। বেড়া পার হয়ে গেলে তার নাগাল মিলবে।

ঘড়ি পার হতে যাচ্ছেন, হুকুম চ'ল, যাওয়া চলবে না।

ছাত্রটি এগিয়ে এল। বললে, মানে এঁদের জন্যে পারমিশন পেলাম না ?

—কে প্রফেসর—ইনি ?

—হ্যাঁ। এই দেখুন, প্রিন্সিপ্যালের চিঠি।

—হুঁ।

—আর, ইনিও। কালিদাসবাবুকে দেখা

—বেশ। বাক্স খুলুন।

—কেন ? পারমিশন তো পেয়েছি।

—পারমিশন পেয়েছেন, যাবার। তাতে র রেহাই হয় না।

—রেহাই চাইছেও না কেউ। দেখু নমালে, গৌরী আর কালিদাসবাবুর স্ত্রী যে খুলে দিলেন। তিনজনে মিলে একেকট ঝেড়েঝুড়ে টিপেটুপে দেখলে, কা টাকাকড়ি। তারপর বললে, যান, সে গাড়িতে উঠুন।

পা বাড়াতেই, একটা লোক, ময়লা রঙি দেখে মনে হয় খাঁটি লোকার, এক ছুটে কানে কানে কি বললে। ফাঁক এল, যা হয়নি।

—আবার কি ?

—সেই লোকটাই এগিয়ে এল। গৌরী দিয়ে দেখিয়ে বললে, এঁর কাছে টাকা আছে

গৌরী বললেন, সার্চ করবেন ? করুন। যদি ?

অধ্যাপক বললেন, দাও দেখতে। কি, করবেন বডি-সার্চ ?

একটি অফিসার হঠাৎ এগিয়ে এলেন।

—চলুন কোথায় যেতে হবে। গৌরী পা বাড়ালেন, পেছনে কালীদাসবাবুর স্ত্রী।

কালিদাসবাবুই ঠেলে দিলেন তাঁকে—যাও হে, তুমিও যাও। একটা দিন অন্তত লোকে ভেবেছে আমাদের টাকাকড়ি আছে, সেও তো ভাগ্য।

সেই অফিসারটি কাছে এলেন, খুব নীচু গলায় বললেন, মাপ করবেন, আমরা হুকুমের চাকর মাত্র। বলেই তাড়াতাড়ি ফিরে চলে গেলেন।

স্টেশনঘরের পেছন দিকে ছোট কামরা। এঁরা বেরোলেন, অধ্যাপক সঙ্গে যেতেই একজন বাধা দিলে: পুরুষ মানুষ সঙ্গে যাবে না।

—তার মানে?

গৌরী ফিরে দাঁড়ালেন কিছু দরকার নেই। তুমি দাঁড়াও এইখানে।

চলে গেলেন। অধ্যাপক সেই ঘোরের কাছে দাঁড়িয়ে। কে জানে আবার কোন্ অসম্ভ্রম আসছে। হঠাৎ দেখেন বাবলু কাছে নেই। কোথা গেল?

—বাবলু? ও বাবলু?

মিনিট পাঁচ-সাত পরেই এঁরা ফিরে এলেন।

সঙ্গে বাবলু। মাকে নিয়ে যেতে দেখে, সে নিজে থেকেই পেছনে চলে গিয়াছিল, কেউ দেখেনি।

বাঁচা গেল। অধ্যাপক এগিয়ে গেলেন, নীচুগলায় বললেন, অসম্ভ্রম কিছু করেনি তো?

—সাহস!

—চলো, আর দেরি নয়।

গৌরী বললেন, কিন্তু, আর একটু জল নিলে হত না? বোতল খালি।

ফিরে চাইলেন। এবার টিউবওয়েল পড়েছে দরির ওধারে—আবার ফিরে গিয়ে জল আনা চলবে কিনা কে জানে।

ছেলেটি বললে, চলুন স্যার, গাড়িতে উঠুন আগে। জল আমি পরে এনে দেব।

একেবারে খালি গাড়ি। অনেকটা এগিয়ে গিয়ে,

—এত এগিয়ে এলে কেন? ঐদিকে উঠে ত'ত। সব তো খালি।—এলায়।

দ্বিতীয়কাকে পেছনে ফেলে দৌড়ে চ গাড়ির কামরাও যতটা এগিয়ে সামনে যাওয়া বাঁচোয়া।

দোর খুলে দিয়ে বললেন, ওঠো।

ডান কোলে জুতু। এতক্ষণে কথা বললে: ন না। হেঁটেই চলে যাব।

—সে কিরে। হেঁটে কি যাওয়া যায়—অ

—খুব আমি হাঁটতে পারব। উঠো না গাড়িতে। আবার যদি বলে, যেতে পার আবার যদি বলে নেমে যাও?

—আর বলবে না।

—ওরে না না, বলবে না।

প্রায় জোর করেই গাড়িতে তুলতে হ'ল ছে অন্যরা আপত্তি করল না। ছাত্রটি বললে, বোধ স্যর, জল নিয়ে আসি।

গাড়িতে উঠে, একেবারে ভেতরের কো বসলেন এঁরা, জানালা দিয়ে ঝুঁকে চেয়ে আরও কেউ আসে কিনা বেড়া পেরিয়ে।

গৌরী বললেন, একটি মহিলা এসেছেন, ব নথো অনেক গয়না-গাঁটি। তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত সার্চার; আমাদের দিকে তাকায়ই নি আলতো আলতো একটু হাত বুলিয়ে দেখলে যা

—যাক।

আর একটি পরিবার এগিয়ে আসছে ছাড়া এই গাড়িতেই এসে উঠল। একা গাড়িতে ওঠা আতঙ্ক।

ছাত্রটি ফিরে এল। কাঁধে বিরাট এক কাঁদি

—একি কাণ্ড! তুমি নিজে কেন ব'য়ে আ

সে জবাব না দিয়ে নেমে গেল। আবার ফি বোতলে জল ভরে এনেছে, হাতে এক ক গাড়িতে উঠে সেই প্রশ্নের জবাব দিলে: সো

—বাইরে। দিন স্যর, আবার না-টা কেরত দিয়ে যেতে হবে।

তার সেই কেটে দিলে ; অন্ত পরিবারটিকেও সহায় হল।

এর মধ্যে হঠাৎ এক টিকিট চেকার এল গাড়িতে। ছাত্র বললে, বাবা, নামো। ঐ দেখ আবার এসেছে। আবার নামিয়ে দেবে।

—দেবে না, তোর ভয় নেই।

চেকার এলেন, টিকিট দেখলেন। বললেন, কি বলছে খোকা ?

—বলছে, আবার নামিয়ে দেবে।

ভদ্রলোক ম্লান হাসলেন। বললেন, আমরা কি নামিয়ে দিই ? আমাদের তো সেল্ লোকসান।

এতক্ষণে সুস্থ হয়ে বসা গেল। ছাত্রটি বললে, তবু ভাল বেঁচেছে স্যর। এটুকুন যদি করতে না পারতাম তবে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকত না।

মৌরী খাবার বার করলেন, বাচ্চাদের বেঁটে দিলেন।

বাবলু খাচ্ছে, কাকুলীর গলা বন্ধ, নামছে না ; দুই বন্ধু, প্রায় খাচ্ছে না।

অধ্যাপক বললেন, তোমার লজ্জা কি এতে। কিন্তু তুমিও কি কলকাতায় যাচ্ছ ?

—না স্যর।

—তবে ?

—আমি এসেছিলাম স্যর, আপনাদের জন্যেই।

একটি ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যে কখন এসে গাড়িতে উঠেছেন। দীর্ঘ চেহারা, মাঝ-বয়সী। তাঁকে দেখিয়ে বললে, এঁর সঙ্গে এসেছিলাম ধর্জারে যদি কোন অসুবিধা হয়, তাই এই অবধি এগিয়ে দিতে। এসে ভালই করেছি।

—কে ইনি ? তোমার আত্মীয় ?

—না। এঁরা ক্রিশ্চান। আমাদের বাড়িতেই

—তবু এসেছিলাম বলে। যা ঝামেলা হয়েছে।

—কি করলে ?

—দেখলেন না, ঝগড়া করছিলাম ? ঐ হচ্ছে ওদের অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর। খুব ও অফিসার, এদিকে বেশ অমায়িক। কিন্তু কড়া। সার্কুলার পেয়েছে তো পেয়েছে—আর কোন নড়চড় নেই।

—তারপর ? কি হ'ল ?

—আমি বললাম, প্রফেসর ছুটিতে যাচ্ছে দেবে না তার মানে ?

ও বললে, আমি কি করব, গবর্মেণ্ট অর্ডার

আমি বললাম, ছুটিতে যেতে না দিয়ে, করে, প্রফেসরকে আটকে রাখা যাবে ? ব এঁরা চাকরি ছেড়ে দেবেন। গভর্মেণ্ট কি দেশের এডুকেশনকে কোলাপ্স করিয়ে দিতে ?

বললে, তার আমি কি জানি। কি প্রফেসর, তার প্রমাণ পাব কি করে ?

বললাম, প্রমাণ, আমি বলছি। আমি পুরের ছাত্র।

—তুমি ছাত্র, তার প্রমাণ ?

—প্রমাণ তো তোমার তোলবার কথা ; দিন-চারেক আগেই এইখানে তোমার সঙ্গে হাতাহাতি করে গেছি, সব ভুলে গেলে ?

তবু নয়, তবু নয়—ক'রে শেষটা দিলে পা

—বেশ করল। কিন্তু, আমাদের তো হ'ল। এই হাজার-দুই লোক, এদের গতি কি এখানে নেই পড়ে থাকবার মত জায়গা, নেই মত গাছতলা।

—শুনলাম তো, ওদিক থেকে যে ট্রেন তাইতে তুলে দেওয়া হবে।

—তারপর ? ফিরে এরা যাবে কোথায় ?

—অন্ত কে ভাবে।

—কি কব ?

—বৌদি আবার ফিরে আসবেন, এমন কথা বলব না—বলার মুখ নেই। আপনি ? আপনি কি আর আসবেন ফিরে ?

—আসব।

দ্বিধাহীন দৃঢ়স্বরের সংক্ষিপ্ত জবাব। শুনে মনে হ'ল চমকে গেল ছেলেটা।

বললে, আসবেন ? কেন ?

উত্তর দিতে গিয়ে অধ্যাপক হঠাৎ থেমে গেলেন। সত্যি মনের কথাটাই বলতে যাচ্ছিলেন : তোমার মতো ছেলে এখনও আছে বলে।

কিন্তু মুখে উচ্চারণ করা হল না কথাটা—কাব্য-কাব্য শোনাবে।

একটু থেমে বললেন, বাবা বরিশালে আটকে আছেন, তাঁর জন্যেই ফিরে আসতে হবে আমাকে।

—কবে আবার ফিরবেন ?

—এদের পৌঁছে দিয়েই। দেরি করব না, নেহাত যদি অসুস্থ না হই।

—আচ্ছা। আমি এবার যাই, স্যর।

ট্রেনের ঘণ্টা পড়েছে।

নমস্কার করে ছেলেটি নেমে গেল।

বাবলু বললে, ও যাবে না ?

অধ্যাপক বললেন, না। ওর এইখানেই বাড়ি।

—বা, আমাদের ?

গাড়ি ছাড়বার পর হঠাৎ মনে হ'ল, ছেলেটির নাম জিজ্ঞেস করা হয়নি।

বনগাঁ স্টেশনে লোকারণ্য।

খালি ট্রেন চলে এসেছে পাকিস্তান থেকে—হৈ-হৈ রবে ভিড় এসে ট্রেনকে ঘিরে ধরল। খালি কেন গাড়ি—আবার কি ট্রাবল হ'ল ?

কৌতূহল অনেকের। মেটাবার মানুষ নেই। [illegible]

বারবার করে একই জবাব দিতে হয় তাদের। দিতেও হয় সাবধানে—উত্তেজনার মুহূর্তে, অসত্য করে নতুন উত্তেজনার যোগান না দেওয়া হয়ে যা

প্রশ্নের পর প্রশ্ন, উত্তরের পর আবার প্রশ্ন, কোলাহল। এদিকে ক্লান্তি আর অবসাদে গা-গ ঝিমঝিম করছে। তবু ঘুরেফিরে এক কথা চলেছেন বারবার, গোলমাল যা হয়েছিল থেমে গভর্মেণ্ট স্ট্রং স্টেপ নিচ্ছে—এখন আপনারা এখানে যেন কোন গোলমাল না হয়। এখা সেখানে আবার তার পাল্টা শুরু হবে, তাহ'লে আপনারা স্থির থাকুন, হাওয়া শান্ত হো খুলুক।

কথা কারু বা শুনছে হচ্ছে, কারু বা হচ্ছে না যাদের, তাদের মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন উঠে

সমাদরের অবশ্য অভাব নেই—দুধ চাই ? বাচ্চাদের জন্য ?

—না, খাবার আমাদের সঙ্গেই আছে।

অন্য যাত্রীর দরকার থাকতে পারে, দেখুন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সবাইকেই দেওয়া হচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক পরে ট্রেন ছাড়ল।

অধ্যাপক বললেন, ওগুলোকে শুইয়ে ঘুমোক।

বাবলু তুতু শুয়ে পড়ল। ক্রমে ঘুমিয়ে খানিকটা। কাজুলী সেই বেনাপোলে গাড়িতে বেঞ্চি আর দেয়ালের ঘেরা কোণে গিয়ে গুটিসু বসেছে, সেই থেকে আর নড়েন নি বলতে ঘুমোয়ও নি, শুধু অলজল করে চেয়ে দেখছে মনে বোধ হয় ইচ্ছে হচ্ছিল নেমে পড়ে বেঞ্চি অন্ধকার কোণে গিয়ে লুকোয়। কিন্তু তাও সাহ না।

অধ্যাপক বললেন, এই বাঘ খেয়েছিস্ ?

গৌরী বললেন, হ্যাঁ।

শেয়ালদায় গিয়ে গাড়ি থামল প্রায় ছ'টায়। পথের ধকলে আর মনের অবসাদে অধ্যাপকের তখন সর্ব শরীরে ব্যথা, পা আর উরু ভরে মস্ত মস্ত ফোঁড়া উঠেছে।

নিজেদের বাড়ি তখনও জোড়া; উঠতে হবে সন্ধ্যায়। কালিদাসবাবু উঠবেন তাঁর আত্মীয়বাড়িতে। কামডহরী।

স্টেশনের বাইরে এসে মুটেকে বললেন, চলো, সাউথ স্টেশন। বালিগঞ্জ।

কুনু আমার হাতা ধরেছে ধরল। ট্রেনে চড়ব না—আবার নামিয়ে দেবে।

—ঠিক আছে। চলো ট্যাক্সি।

একই ট্যাক্সিতে এসে, এঁরা বালিগঞ্জ স্টেশনে নেমে কসবার চলে গেলেন। কালিদাসবাবু ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেলেন কামডহরী। কসবার বাড়িতে সবাইকে রেখে, স্নান করে, তক্ষুণি বেরিয়ে গেলেন কালীঘাটে, ভবানীপুরে। মা উঠেছেন ভবানীপুরে, বোনের বাড়িতে, তাঁদের সবাইকে দেখা দিয়ে আশ্বস্ত করতে হবে, বেঁচে আছি, এসেছি।

ভাই বললেন, তুমি কি আবার ফিরবে?

—হ্যাঁ। পরশুই।

মা বললেন, আর যাবার দরকার?

—বাবাকে আনা।

বোন বললেন, সেটা অন্য কাউকে দিয়ে হয় না?

—না। এই সময়ে, অন্যের ঘাড়ে বোঝা চাপানো যায় না।

—কিন্তু, রিস্ক?

—সে তো রইলই। বাবা আমার, রিস্ক নেবে অন্য লোকে এতখানি পর···মনে করা যায় সংসারে কোন ব্যক্তিকে?

কসবার বাড়িতে ফিরলেন, রাত তখন এগারটা। পরদিন ভোরে দেখা গেল, ব্যথা আর ফোঁড়া তো নয় নি,—আবার ফিরে যাওয়া চলেন। দুঃ ভীষণ আপত্তি; যদি আর ফিরতে না পার? যদি বলে, গাড়িতে যেতে পারে না?

—বলে হেঁটে চলে আসব। বোঝা আ তোদের নিয়ে। একা আমাকে ঠেকাবে কে-

—কিন্তু না গেলে কি হবে?

—বা বুদ্ধি! দাদু আছেন না? তাঁ আসতে হবে না?

—গিয়েই তাঁকে নিয়ে চলে আসবে তো?

—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ।

দৌলতপুরে ফিরলেন, থাকলেন দিন দুই পরে আবার বরিশাল। হাসান এসে বলে যাবেন না স্যর, বরং আমি যাই।

—সে হয় না। দরকার আমার, কই avoid করলে হবে কেন।

—কই বলে নয়। রিস্ক।

—সে রিস্ক তো তোমারও হতে পারে! থেকে নামবামাত্র ছুরি মারতে যদি আসে কেউ আগে নামগোত্র জিজ্ঞেস করে, তারপর মারবে

বরিশাল গেলেন, কলেজে বলে গে পৌঁছব, কালই বিকেলে আবার ফিরে স্টীমা

গিয়ে দেখলেন, সেটা অসম্ভব। নেহের প্যাক্ট হয়েছে, রাস্তা খুলেছে, লোকও ছুটে হয়ে স্টীমারঘাটে—হাজার হাজার লোক হ পড়ে আছে। দিনের পর দিন খোলা ম বুকে হেঁটে দিনে কয়েকহাত করে স্টীমারে দিকে এগোচ্ছে। বরিশাল থেকে বেনাপোল মাত্র পাঁচটাকা এগারো আনা, সেই টিকেট ব্ল্যা বিকোচ্ছে পঁচিশটাকা করে। কিন্তু সে বর্ণন মনের সম্পর্ক নেই। একদিন একদিন ক চেষ্টার পরে উনিশ দিন পরে খুলনার টিকিট নি অনেক কলকারখানা করে। দৌলতপুরে এ

সেই ছাত্রটিকে এবার এসে খুঁজে বার করেছিলেন, তার নাম মতিউর রহমান। বললে, ঠিকমত পৌঁছে-ছিলেন, স্যর? তারপর বললে, আর তো দেখা হবে না, এবার যখন যাবেন, বৌদিকে আমার সেলাম বলে দেবেন।

বাবাকে নিয়ে যেতে হবে, ওদিকে ট্রেনের ভিড় অসম্ভব বেড়েছে, দিন দিন আরও বেড়েই চলেছে। বহিশাসে বসে শারীরিক আর মানসিক ক্লেশে তাঁরও স্বাস্থ্য ভেঙেছে—ট্রেনে যাওয়াই তো মুশকিল।

মতিউর বললে, এখানে হবে না স্যর। খুলনায় গিয়ে যদি চড়েন তো গাড়িতে তুলে দিতে পারি।

—বেশ, তাই চড়ব।

তাকে টাকা দিয়ে দিলেন। কার্ডে সেকেণ্ড, ক্লাস পাও—ওর কষ্ট না হয়।

দুপুরে একটায় খুলনা স্টেশনে গেলেন। ট্রেন ছাড়বে পাঁচটায়, তখনই যাত্রীতে সব গাড়ি ঠেসে গেছে। প্ল্যাটফর্মে পৌঁছতেই মতিউর এগিয়ে এল, আসুন স্যর। ইন্টার ক্লাসের এক কামরায়, কোণের দিকে নিয়ে বসিয়ে দিলে। এই ভাল, দোরের কাছে নয়। ধাক্কা পড়বে না।

—ইন্টার কেন নিলে?

—ঠিক আছে স্যর, বেশী পয়সা দিয়ে কী হবে? তাছাড়া কার্ডে সেকেণ্ডে ভিড় আরও বেশী।

মতিউর একদল ছেলে জুটিয়েছে, ভোর আটটায়ও আগে স্টেশনে এসে, সাইডিংএ ছিল গাড়ি তাইতে উঠে জায়গা দখল করে সেই থেকে ঠেসে বসে আছে দলসুদ্ধ। এঁদের বসিয়ে, দলকে ছেড়ে দিলে। দলের ছেলেগুলোর অনেকেরই মুখ চেনেন না অধ্যাপক, হয়তো কলেজের ছেলেই নয়। বেলা দুটোয় মতিউর বললে, ঠিকমত যেতে কি পারবেন, স্যর? না বলুন আমরা জনকতক সঙ্গে যাই, বেনাপোল অবধি পার করে দিয়ে আসি।

—না না, তার দরকার নেই।

—এখন করবে না, গাড়ী আছে।

—তুমি খেয়েছ?

—তাতে কি হয়েছে স্যর, বাড়ি গিয়ে খাব তো।

—না খেয়েই বেনাপোল যেতে চাইছিলে? খাওয়াও এবার।

—যাচ্ছি স্যর।

কাছে এসে চুপি চুপি বললে, স্যর, আ কিরবেন?

—নিশ্চয়।

—আচ্ছা। পা ছুঁয়ে দুজনকে প্রণাম করে গাড়ি থেকে নামল। খানিকটা গিয়ে, আবার এসে জানালায় দাঁড়াল। অধ্যাপক হাসলেন মায়া কাটছে না?

—না স্যর, একটা কথা।

একটু ইতস্তত করে বললে, একটা কাজের দেব, স্যর?

—কি কাজ? হাতী পিলতে হবে?

—না স্যর?

—তবে বলে ফেল।

—আমার ঘড়িটা, স্যর। কলকাতায় দিয়ে এসেছিলাম মেরামত করতে। যদি আসেন। আমার যাওয়া তো হচ্ছে না।

—তোমাকে যেতেও হবে না। ঠিকানা দেবে তো আমাকে?

—তা দেবে। চার্জটা হচ্ছে—

—দিয়ে দিও না, বর্ডারে কেড়ে নেবে। ঘ পাই, টাকা ছুটবে।

ঠিকানাটা নিয়ে, নিজের হাতের ঘড়ি খুলে মতিউরকে; এইটে রেখে দাও। যতদিন না তোমার কাজ চলবে।

—থাক স্যর, তার দরকার নেই।

—আমার আছে [illegible]

ক সময়ে না হয় দামের হিসেবটা adjust করে নেব। তামার নিশ্চয়ই সোনার ঘড়ি? মতিউরের চোখ সজল করে এল। তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন, থাকারাম। একসঙ্গে দুটো ঘড়ি নিয়ে আমাকে াসতে দেবে?

মতিউর বললে, দিন ঘড়ি।

বাবাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে, পিসীমাদের জন্যে াড়ির খোঁজ করতে বলে, আবার দৌলতপুরে করলেন অধ্যাপক। এঁরা বাড়ি পেয়ে উঠে গেলে, খন গিয়ে আবার নিজের বাড়িতে সংসার পাতিয়ে তে হবে।

আসবার আগের দিন ভাইকে বললেন, বেরোচ্ছিস, ই ঘড়িটা ডেলিভারি দিয়ে আসিস তো!

ভাই নাম-ঠিকানা পড়লেন। মুখ গম্ভীর হ'ল। ার দোষ নেই। পরিবেশের গুণে সাদা মনও বিষ য়ে ওঠে। বললেন, কে এ?

—ছাত্র।

—মুসলমান তো? দরকার?

—থাম্। এই ছেলে না থাকলে তোর দাদাকে বৌদিকে, তোর বাবাকে, নিয়ে এসে পৌঁছতেই ারতাম না, জানিস?

দৌলতপুরে ফিরে, দিন কুড়ি পরে চিঠি এল, বাড়ি াওয়া গেছে, পিসীমারা উঠে যাচ্ছেন।

অতএব আবার রওনা হলেন।

দু'দিন লাগল বাড়িকে ঘুরে মুছে নতুন করে সাজিয়ে লডাল করলা কিনে গোছাতে; তারপর সবাইকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হ'ল।

বোনদের নিয়ে মা আর বাবা ভবানীপুর থেকে সাজা চলে আসবেন; এঁরা চলে যাবেন কসবা থেকে।

বিকেলবেলায় কসবা থেকে ট্যাকসিতে উঠলেন। ড়িয়াহাট মার্কেটের মোড় ঘুরে, সামনে পড়েছে াড়ানো বাস, ট্যাকসির গতি কমাতে হ'ল।

ড্রাইভারকে পথ চেনাতে হবে, ভুতুকে নিয়ে

হঠাৎ কাঞ্চলী চেঁচিয়ে উঠল, এই খুঁটে হার শয়তান। সঙ্গে সঙ্গে হাতে ছিল একটা লিপ কৌটোতে তার কাকড়ার পুতুল ভর', সেইট করে ছুঁড়ে মারল।

একটা ছোট্ট ছেলে, হাড়-জিরজিরে বাসের পাশে পাশে রাজাবাবু রাজিনা বলে করছিল, কৌটোটা সোজা তার গায়ে গিয়ে লাগল না বিশেষ। কিন্তু ছেলেটা বিদ্যুৎগতি দাঁড়াল। কাঞ্চলী আবার চেঁচিয়ে বললে, হা শয়তান।

ছেলেটাও চেঁচিয়ে বললে, কাঞ্চলী হার

সর্বনাশ! বলে গৌরী এক ঝটকায় ব টেনে সরিয়ে নিলেন। অধ্যাপক ঠিকমত ব্যাপারটা। মুখ ফিরিয়ে বললেন, কি হ'ল?

গৌরী বললেন, কিছু না। শীগ্‌গির চল।

বাসকে পার হ'য়ে গাড়ি তখন স্পীড্ গৌরী ঝুঁকে পড়ে বললেন, আরও জোরে যে

—কেন, হ'ল কি?

—পরে বলব।

প্রথম দিন, রান্না-খাওয়া চুকতে রাত অ ঘরে এসে গৌরী সব বললেন। বলে বললে ভয় করছে।

—কিসের ভয়?

—কি জানি। ওদের দল আছে, দল যে আমরা চুরি করে নিয়ে গেছি। তারাও নিশ্চয় বসে নেই, ওকে খুঁজছে। হঠাৎ দেখে ফেলল যদি তাকে তাকে এসে জেনে যায়?

—যায় তো যাবে।

—দেখ, অমন করে উড়িয়ে দিও না কথাট ভেবে দেখ, মেয়েটাই দুর্ভাবনা। ওকে পাও অবধি আমাদেরও ভাল যাচ্ছে না। একটা এ অশান্তি বেড়েই চলেছে।

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি—হাসি খুসীর মেলা

কোলে

লজেন্স
ও
টফী

সুপ্রসিদ্ধ কোলে বিস্কুটএর

প্রস্তুতকারক কর্তৃক
আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

—তা বলছি না। কিন্তু তুমিই ভেবে দেখ, সত্যি কিনা।

—সত্যি জিনিস জানতে অনেক ঘটে। তোমার সঙ্গে যেদিন আমার বিয়ে হল, ঠিক তার পরদিনই রায়-গানদিদির একটা দাঁত পড়ে গেল। তোমার সঙ্গে যদি বিয়ে না হ'ত, দাঁতটা পড়ত না।

—যেতেরি ভাল লাগে না।

—সত্যি কথা কারোই ভাল লাগে না।

—শোন, আমি সিরিয়াস্‌লি বলছি।

—বল, আমি সিরিয়াস্‌লি শুনছি।

—রাগ কোরো না। ওকে সামলে রাখা সহজ হবে না। ওকে আর কোথাও দিয়ে দেওয়া যায় না?

—কোথায়? নিজেদের বাঁচাবার জন্তে আবার রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসব?

—না। কিন্তু যেখানে জায়গা আছে—ধরো অনাথ-আশ্রমে? তারা তো এদেরই রাখে।

—আচ্ছা, ভেবে দেখা যাবে। এখন, রাত পোরোটায় তো অনাথ আশ্রম খোলা থাকে না। ঘুমাতত ঘুমোও।

গৌরী চুপ করলেন। ঘুমিয়েও পড়লেন। অধ্যাপক কিন্তু ঘুমোলেন না। গৌরীকে শান্ত করবার জন্ত নরম সুরে কথা বলেছেন। কিন্তু মন তাঁর চিন্তিত হয়ে উঠেছে। বিপদের আভাসই কি? গৌরীর দাদাই কি সত্যি—বেরেটার তাস্যাই খারাপ, তাকে শাস্তি দেবার সাধ্য কারো হবে না?

দুদিন পরে আবার দৌলতপুরে ফিরলেন। গৌরীকে বলে গেলেন, আর কাউকে কিছু বোলো না। ওকে সামলে রেখো, সতর্ক থেকো। অচেনা চাকর রাখবে না, অচেনা ভিখারীকে ঢুকতে দেবে না।

মাসখানেক কেটে গেল। অধ্যাপক আট দশ দিন অন্তর একবার করে আসছেন। ঘরসংসার খানিকটা কলকাতার দাদির হলেও আসলে গ্রাম—সে সবাই সবাইর চেনা। ভিখারী আর দি পর্যন্ত। অচেনা লোক আচমকা এসে বাড়ি বা খোঁজখবর নেবে, তার পথ নেই। কাঞ্চনীকে যথাসাধ্য আগলে রাখছেন। বাইরে যেন না, সেও যেতে চায় না—বাড়ির সামনে একটি উঠোন। বাড়ির আর পাড়ার ছোট সেইখানে খেলতে আসে, তাদের সঙ্গে মা মেয়ে যায়, এই পর্যন্ত।

এমনি করে মাসখানেক গেল। গৌরী নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন, আর বোধ হয় আমিই বেশী বেশী ঘাবড়েছিলাম।

অধ্যাপক বললেন, তখনই তো বললাম হচ্ছে সাপ-ছাড়া পাখি। কে কোথায় কখন খ ঠিকানা নেই। সেই ছেলেটাই যে এখনও তা বলেই আছে, খবর দিচ্ছে, তারই বা ঠিক কি।

গৌরী বললেন, তবু সতর্ক থাকতে হয়।

—তা তো বটেই। কিন্তু বিপদটা কি তবেই তো সতর্ক হওয়া। কি বিপদ, কোনদি আসছে, জানব, তবে তো তার সম্বন্ধে বা বুঝে করা যাবে। বিপদে তাই নিয়ম, আ ভেবে মনকে দুর্বল করতে নেই—যখন আ কোমর বেঁধে লড়তে হয়। যাক, এখন যে হলে, তবেই হ'ল।

আরও দিন সাতেক পরের কথা। দু গরম পড়েছে, বাড়ির লোক কতক বাইরে ঘুমিয়ে। গৌরী সামনের ঘরে বসে, সেলাই বাবলু পাশে বসে, কাজে কত রকম বিঘ্ন সৃষ্টি তার মহড়া দিচ্ছে। ঘরের কোণে বসে ন্যাকড়ার ছাট নিয়ে পুতুল বানাতে ব্যস্ত।

হঠাৎ বাইরে থেকে ডাক এল: পুরোনো ভাঙা কাচ বিক্রী।

বাবলু ব্যস্ত : বললে, যাচ্ছি।

যাচ্ছি নয়, ওঠ্। ও দাঁড়িয়ে থাকবে? কথা বললেই ওজর।

কাকুলী বললে, আমি যাব, মা?

দুজনে একসঙ্গেই বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

একটি মুহূর্ত। তারপরেই কাকুলী তীব্র একটা চীৎকার করে ছুটে এসে ঘরে ঢুকল, গৌরীর কোলের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। সর্বাঙ্গ তার থরথর করে কাঁপছে, মুখে কথা নেই, প্রাণপণে খালি ঠেলে আরও কোলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, যেন ভয়ার্ত পশু প্রাণের ভয়ে গর্তে ঢুকে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইছে।

কি হ'ল, এই মেয়ে,—কি হ'ল রে তোর?

অনেক টানাটানি, তবু সে মুখও তোলে না—কথাও কয় না—কথা বলবার শক্তিই যেন হারিয়ে গেছে।

—বাবলু!

বাবলু ছুটে এল। কি হ'ল ওর মা?

—তাই তো বলবি। বাইরে কি দেখে এল?

—কিছু দেখে নি তো! গিয়ে দাঁড়াল, তারপরই চেঁচিয়ে উঠে দৌড়ে এল। আমি ভাবলাম কিসে কামড়েছে।

—এই, কি হ'ল রে? কামড়েছে?

কাকুলী অতিকষ্টে ঘন নিলে। ভয়ার্ত-স্বরহীন রুদ্ধ-কণ্ঠে বললে, দাদা!

দাদা! গৌরীর আপাদমস্তক বিদ্যুতের শক খেলে গেল। লাফিয়ে উঠে তিনি ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। কেউ কোথাও নেই।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলেন, তারপর আবার ঘরে ঢুকলেন। কাকুলী কুঁকড়ে-মুকড়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে আছে; বাবলু তাকে ডেকে কথা করে টেনে তোলবার চেষ্টা করছে।

গৌরীকে দেখে বললে, কি হয়েছে, মা? ওর

—থাম। কে এসেছিল?

—কই, কেউ তো আসে নি?

—আসে নি! তবে ডাকল কে বাইরে থেকে?

—ডাকল? ও, সে তো ভাঙা-কাচওয়ালা।

—দেখলি তাকে?

—হ্যাঁ।

—কি রকম লোকটা?

এতক্ষণে বাবলুর খেয়াল হ'ল। বললে, ভীষণ চেহারা।

—ভীষণ মানে? কি রকম দেখতে, বল। বেঁটে? ফর্সা? কালো?

বাবলু তা কিছু বলতে পারে না। খালি কিরকম যেন, তাকে দেখলেই ভয় করে।

—খুব মস্তবড় জোয়ান?

—মস্তবড়? না তো!

—তবে?

—তা জানিনে। দেখলেই ভয় করে।

তারপর ফিসফিস করে বললে, তাকে দেখে পেয়েছে ও, মা?

—কি জানি। চুপ করে থাকবি, কাউকে না। আবার যদি দেখিস তাকে, ছুটে এসে ক বলবি।

সামনের বাড়ির ছেলে চাণক্য। খুব ভাল। এতদিন কাউকে বলেন নি, এবার গৌরী ডেকে পাঠালেন। সব কথা খুলে বললেন। বললে, ভাবনার কথা। এদের বড় বড় গ্যাং, ধাটায় না এদের। এই বাচ্চারাই হচ্ছে ওদের এবং ভবিষ্যৎ কালের কর্মী। এরা দলের বাইরে এদের স্বভাবতই আশঙ্কা হবে বুঝি দলের ক্ষ করে দিলে, এবং সেইটি হলেই মুশকিল।

—কিন্তু সত্যি কি ওকে নিয়ে এতটা ভা তারা? এতই ডেস্পারেট হয়ে উঠবে?

—বলা যায় না কিছু। ও খুব ইন্টেলিজেন্ট

—কি ?

—কেষ্টদার বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছিল, মনে আছে ? তার খানিকটা গ্যাং ধরা পড়েছে। পুলিস বলেছে, এই পাড়াতেই আস্তানা গেড়ে তারা খোঁজখবর নিচ্ছিল, তারপর অ্যাটেম্পট্ করেছে। ওর রথতলার দাদাই যদি সেই লোক হয় ? ওই বলে দিয়েছে এ সন্দেহ হওয়া তাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক।

—কিন্তু, তাই বলে এতদিন পরে ওর খোঁজ করবে ?

—বিচিত্র কি। এতদিনও হয়তো খোঁজ করেছে, এবার সেই ছেলেটার মুখে সন্ধান পেয়েছে।

—বাড়ির সন্ধান ?

—বাড়িও ক্রমে ক্রমে। ছেলেটা হয়তো বলেছে ট্যাক্সিতে ছিল। ট্যাক্সির রং বা অন্য কোন একটা বর্ণনা দিয়েছে, তার থেকে ওরা সে ট্যাক্সিটাকে লোকেট্ করেছে। এদের দলবল তো সর্বত্র।

—কিন্তু ট্যাক্সি তো বাড়ি অবধি আনিনি আমরা—গলির মুখে নেমেছি।

—ঠিক কথা। ওদেরও তাই বাড়িটা বার করতে সময় লেগেছে।

—তার মানে ? আজ ঐ লোকটা ওর খোঁজে খোঁজেই এসেছিল ?

—বিচিত্র নয়।

—দৈবাৎ এসে পড়েছিল এখনও হতে পারে। কিন্তু ভেবেই আসুক আর না ভেবেই আসুক, ওকে দেখে গেছে ঠিকই। আর ও যখন চিনতে পেরেছে তাকে, সে ওকে চেনেনি এটা বৃথা আশা। চিনেছে বলেই চট্‌পট সরে পড়েছে।

গৌরীর মুখ অন্ধকার হয়ে এল।

চাণক্য বললে, কাকাবাবু কবে আসবেন ? গরমের ছুটি কবে থেকে ?

—চার-পাঁচ দিন আরও।

—বেশ। এলেই তাঁকে সব বলবেন। ইতিমধ্যে

—ডেকে ?

—ডেকে, যা হয় হবে। আমি আজই যে বলে রাখছি। আপনি এক কাজ করবেন। যখন সন্ধান পেয়েছে, আবার হয়তো আসবে ওকে ভুলিয়ে বা পাকড়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা আপনি লক্ষ্য রাখবেন। যদি সন্দেহজনক দেখেন ওর সঙ্গে কথা বলছে বা ওর দিকে দিচ্ছে, তক্ষুণি এমন একটা কিছু শব্দটব্দ করবে আমি বুঝতে পারি। আমি এ কদিন বেরুব না বসে থাকব। আপনি ডাকলেই বন্দুক নিয়ে তারপর যা থাকে কপালে।

—সে কি কথা। খুনোখুনি করবে ?

—তার দরকার নাও হতে পারে। শুধু মেরে ঠেসে ধমক, বলে দেব চুরি করতে ঢুকেছি যা হয় তখন দেখা যাবে, আগে খুঁজে তো পাক

—কাউকে কিন্তু বোলো না।

—কেপেছেন। যোগেশকে শুধু বলব বরং আমার ঘরেই বসিয়ে রেখে দেব।

অধ্যাপক হঠাৎ সেই রাত্রেই এসে পড়ে কারণে গ্রীষ্মের ছুটি আগেই হ'য়ে গেছে। ট্রে গাড়ি ; বাড়ি পৌছলেন, রাত তখন আড়াইটে রাতেই সব শুনলেন।

শুনে তাঁর মুখ গম্ভীর হ'ল। বললেন, বাঁচাব মেয়েটাকে ; পারব কি না কে জানে নাম খোদা ঘর জেতা ছামড় ফোঁড়কে জেতা ঐশ্বর্য আর কি অশান্তি।

গৌরী বললেন, কি করবে এখন ?

অধ্যাপক বললেন, ভাবতে হবে। আ বলেছ ?

—না। শুধু এক চাণক্যকে ছাড়া।

—তা হোক। আর কাউকে বোলো না শরীর কিছু খারাপ ছিল ; পরদিন বেরো

—কে ?

—চিনি নে।

বাইরে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক। নমস্কার করে বললেন, চিনতে পারছেন ?

মার্জিত উচ্চারণ, কিন্তু ভাঙা-ভাঙা গলা ; চেনা গলা বলেই মনে হ'ল। বললেন বাবলু, আলো।

—না না আলো নয়।

তখন ঠাহর করে দেখতে হ'ল। অনেককাল আগের দেখা, তখন পরনে ছিল মোটা সাদা কুর্তি আর জাঙ্গিয়া, নীল-নীল লাইন টানা। এখন ফুরফুরে ধুতি-পাঞ্জাবি, সেন্টের গন্ধ ভুরভুর করছে। তবু চিনতে কষ্ট হ'ল না। বললেন, আসুন আসুন। হঠাৎ ? বাড়ির খোঁজ পেলেন কি করে ?

বলতে-বলতেই মনের মধ্যে
হবে কি—?

ভদ্রলোক বললেন, বলছি সব। একা বসতে পারি কোথাও ?

—আসুন।

বারান্দার পাশে ছোট্ট খুপরিঘরে এনে বসালেন। কি বলুন ?

—কেউ শুনতে পাবে না তো ?

—না।

—কাকুলী আছে ?

এই কথাটাই মনে হচ্ছিল, তবু চমকে উঠলেন অধ্যাপক। গলার স্বর যথাসম্ভব অবিকৃত রাখবার চেষ্টা করে বললেন, কাকুলী কে ?

—সেরি করবেন না। আমার সময় নেই। বলুন, আছে ?

—আছে।

অধ্যাপক দৃষ্টি মেলে এঁর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। অনেককালের চেনা। পুলিসের খাতায় ভাল কথা নেই এর নামে। তবু আগের দিনের মতই নিঃসংশয়ে মনে হ'ল, একে বিশ্বাস করতে পারেন।

—সে কি ?

—না, আমার দলের কাজ নয়। কিন্তু আমি জানি। বলছি শুনুন। যে দলের মধ্যে ছিল ও, অসাধ্য কাজ নেই।

ডাকাতি ধরা পড়েছে, ওদের ধারণা ও ধরিয়েছে। সেই থেকে খোঁজ চলছিল। খুব ডুখোড় মেয়ে, যা একবার শোনে বা একবার আর ভোলে না। ওদের ভয়, সে পাছে পুলিসের হাতে গিয়ে পড়ে, আরও কাকেও ধরিয়ে দেয়। আগেই ওকে সরাতে হবে।

—তারপর ?

তারপর, এতদিন খোঁজ পায় নি। কাল এক চোখে দেখে গেছে। কালকের মধ্যেই প্রোগ্রাম হয়ে গেছে। যে ভাবে হোক ওকে সরিয়ে চেষ্টা হবে।

—নিয়ে কি করবে ?

—তা জানিনে, সাবাড়েই দেবে হয়তো। সেট নয়। কথা হচ্ছে, ওকে হাত করবার সব চেষ্টাই তারা ; আপনি যদি আগলে রাখেন তবে আপন ছেড়ে দেবে না। বাবলু কে ?

অধ্যাপকের কণ্ঠ শুষ্ক। কষ্টে আওয়াজ বার বললেন, আমার মেয়ে।

—যেটি আপনাকে ডেকে দিলে ?

কথা বেরোল না, মাথা নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ

—ঐরকমটা ভেবেছিলাম। কাকুলীকে না বাবলুকে হাতিয়ে নেবে তারা, এই জ্ঞান।

অধ্যাপকের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে। বাবলুর জেনে নিয়েছে তারা ? অনেকক্ষণ চুপ করে রই তারপর বললেন, আপনি জানলেন কি করে ?

—জানতেই হয়, এটা হচ্ছে গ্যাং এগেন্স্ট গ্যা নাম শুনেই চিনেছি আপনি। এও জানি, একজ চোখ রাঙানিতে আপনি মেয়ে বার করে দেবেন ন

—হুঁ।

আমি আপনাকে চিনি ; আশ্রয় যাকে দিয়েছেন, হঠাৎ তাকে ছেড়ে দেবেন না। আপনাকে এদিক থেকে চনে এমন আরও অনেক লোক ছিল প্রেসিডেন্সিতে ; ওদের দলেও এমন অনেক আছে। তারা বলেছে, ওতে কাজ হবে না ; বরং আপনি সতর্ক হ'য়ে যাবেন। তাই শেষ স্থির করেছে, ওকে ভুলিয়ে বা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা হবে ; তাতে যদি বাধা জেন তো বাবলুকে নিয়ে পাখি উড়বে।

—কবে ?

—তা জানিনে। কিন্তু অবশ্য দেরি করবেন না, টা ঠিক। আমি খবর পেয়েছি সন্ধ্যেবেলায়, তক্ষুণি লে এসেছি।

—কেন ?

ভদ্রলোক হঠাৎ হাসলেন। কেন আর কি, গ্যাং গেনস্ট গ্যাং। আচ্ছা, চলি।

—এক্ষুণি ? একটু বসুন।

—না। অহেতুক রিস্ক নিতে নেই। আমি সেছিলাম, এটা জানাজানি হলে আপনার রিস্ক পড়বে ই কমবে না।

—একটা কথা। ওরা কারা ?

—সে তো জানিনে। পিসীমার বারণ।

ঈষৎ একটু হেসে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, লঘু ক্ষিপ্র পায়ে দরজা পারে হয়ে, বেঁকে গ্রামের ভেতরের রাস্তাটা পথ ধরলেন।

অধ্যাপক স্থির হ'য়ে বসে রইলেন।

এও গুণ্ডা। সত্যি বলতে গুণ্ডার দলের সর্দার, দুর্ধর্ষ লোক বলেই নাম ছিল। অথচ, সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে—সুপুরুষ, শিক্ষিত, মার্জিতরুচি। জেলখানায় পরিচয় য়েছিল এর সঙ্গে।

গৌরী এসে ঢুকলেন। ও কে এসেছিল ?

—চিনবে না।

—তবু ? গৌরী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, কি

—আমাকে ঠকাবে তুমি ? বল কি হয়েছে

—বলব। বাবলু কোথায় ?

—খেতে বসেছে। তোমাকে ডাকতে এলা

—আসছি এক্ষুণি।

উঠে গিয়ে চাণক্যকে ডাকলেন, একমিনি বলেই ফিরে এলেন। গৌরী তখনও ভ্রূকুঞ্চিত করে কি ভাবছেন। বললেন, বলবে হয়েছে ?

—বলব। শোন। কাল ভোরবেলায় বেরোচ্ছি। কানপুর আর ছোটমামার ওখানে

—কাকুলীকে নিয়ে ?

—বাবলু-তুতুকেও। কি করে বুঝলে ?

—বুঝি। কিন্তু, হঠাৎ কেন ?

—বললাম তো, পরে বলব। এখন প্রশ্ন

—না, তুমি এক্ষুণি বল। আমার ভয় করা লোকটা কে ?

—বহুদিন আগেকার বন্ধু। সতর্ক ক গেল।

সংক্ষেপে সব বললেন গৌরীকে। গৌরী এমনিধারা আশঙ্কাই আমারও মনে হয়েছিল এখন, কতদূর গড়ায়।

—দেখা যাক।

—কানপুর পালিয়ে যাবে, সেখানে পালি পার পাবে এদের দৃষ্টি থেকে ?

—জানিনে। পালানোই যখন শুরু একবার, তখন শেষ অবধি দৌড়ে দেখ্ক্রমাগত ছুটে পালাব ওকে নিয়ে, আর ও ক্রমাগত তেড়ে আসতে থাকবে পেছন থে শেষপর্যন্ত কে জেতে।

গৌরী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তা ধীরে বললেন, তোমাকে বাধা দিয়ে লাভ

করে চলছ তুমি। পৃথিবী জুড়ে অন্যায় আর অবিচারের রাজত্ব, একা একা তার বিরুদ্ধে কতখানি লড়তে পার তুমি?

—এখন নয়, ওসব আলোচনা অবসর কালের জন্যে। আপাতত ভাত বেড়ে দেবে, তারপর একটি বাক্স দেবে, ওদের তিনজনের জন্যে প্রচুর জামাকাপড় ভরে।

—আর?

আমার জন্যে শুধু একসেট ধুতি-পাঞ্জাবি। আর অনেকগুলো টাকা।

—ভাল সংবাদ। কিন্তু, তারা যদি কেপেই যায়, তবে শুধু ওদের সরিয়ে কি হবে? আমরাই কি নিরাপদ?

—জানি। ওদের সরানো আজই দরকার। নিজেদের কথাও ভাবতে হবে, কিরে এসে। ইতিমধ্যে সাবধানে থাকবে, চাণক্যকে বলে রাখবে।

বাক্স গুছিয়ে, সব প্রস্তুত করে, গৌরী শুতে এলেন। অধ্যাপক শুয়ে শুয়ে চিঠি লিখছিলেন। পাশের খাটে তিন শিশু ঘুমে অচৈতন্য। তাদের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন, হঠাৎ মনে হ'ল, এ ভাগ্যেরই বাঁধন; পরস্পরকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে ঘুমুচ্ছে এরা, এই আলিঙ্গন ভাগ্যের বাঁধন, টেনে ফেলবার সাধ্যি তাঁর নেই।

মনে মনে দেবতাকে প্রণাম করলেন গৌরী, বললেন, তুমি এদের একসঙ্গে এনে বেঁধেছ, সে বাঁধন কবে খুলবে তাও তুমিই জানো—আমি আর ভাবতে পারিনে।

অধ্যাপক মুখ তুলে দেখলেন না, লিখতে লিখতেই বললেন, সব রেডি?

—হ্যাঁ। শোবে না?

—এই শুই। এটা শেষ করে নিই।

গৌরী পাশে এসে শুলেন, মিনিটখানেক চুপ করে রইলেন, তারপর খুব আস্তে আস্তে বললেন, শোন, রাগ কোরো না। মামার কাছে নিয়ে

—বোকা যাবে মানে, সেখানে একটা হ কাণ্ড করে আসবে। কিন্তু, ভেবে দেখ, তাঁরও আছে, বাড়িতে অন্য লোকজন আছে। এই বিপদে তাঁরা যদি যেতে না চান। দোষ দে না। আর, সবকথা না জানিয়ে তাঁদের ঘাড়ে রেখে আসাও তো উচিত হবে না।

অধ্যাপক অসহিষ্ণু সুরে বললেন, কি আপ তর্কই তোমার সঙ্গে একুণি শেষ করতে হবে আ

—তর্ক করছিনে আমি, তর্ক করে তোমাকে যায় না সেটা আমার চাইতে বেশী কেউ জ কিন্তু খালি আমার ওপরে রাগ করলেই তো স সমাধান হ'য়ে যাবে না।

—রাগ কে করছে। কিন্তু সব-কিছু নিয়ে আদাগোড়া খুলে শুনতে হবে তোমার, এরও মা নারীজাতির অত কৌতূহল ভাল নয়।

—এই নারীজাতি দিনরাত আগলে বেড়াচে এত পরোপকার করে বেড়াতে পারছ, মশায়।

আহা, অহঙ্কারে মরেন যোগ।

—অহঙ্কারই তো। কিন্তু ঠাট্টা ছাড়, সবসময় ভাল লাগে না।

—আমি ঠাট্টা করি তোমার সঙ্গে? আ সাহস? এও কি একটা কথা হল?

—কের?

অধ্যাপক তখনও লিখে যাচ্ছেন। হঠাৎ এই দেখ, তোমার মেজমামীকে এই লিখে দিলা হয় নি?

—মেজমামীকে?

—আহা, পড়েই দেখ না ছাই। সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি ছোঁয়ালেন তাঁর বাঁহাতে। দেখ, পড়

গৌরী বুঝলেন। ঝুঁকে পড়ে কাগজটা ছোট একটি স্লিপ। আজেবাজে কথা; তার নী ছোট লাইনে: কানপুর নয়, সহ। একবার প

ছেন—একটা হাতীর মুখ আঁকা হচ্ছে। শুঁড় এঁকে, রে গোড়ায় কলমের এলোমেলো আঁচড় দিতে দিতে লেন, বুঝলেন কিছু? বল তো, হাতীর বদি গোপ ত, সেটা গজাত কোথায়, শুঁড়ের গোড়ায়, না তার গায়?

গৌরী একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন লোকটির দিকে। ত বছরেও এঁকে চিনতে পারলেন না তিনি—মাটিও নয় াথরও নয়; বা মাটিও বটে পাথরও বটে, এ কিসের ড়া মানুষ?

খুব নীচু গলায় বললেন, টিকেট?

অধ্যাপক কাগজে লিখলেন: চাবুকা কিনবে। াবার লিখলেন, সবাই জানবে কানপুর।

গৌরী হাত বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে দিলেন। লেন, ঘুমোও।

বাতি নিভতেই অধ্যাপক কাগজের ছোট্ট স্লিপটিকে ড়ে তুলে নিলেন, মুখে পুরে চিবিয়ে গিলে ফেললেন।

গৌরী পাশ ফিরে শুলেন। পাথরের মানুষ, বুদ্ধিটা রেছে ভালই। সম্ভ মাসতুতো বোন, তার স্বামী বড় কিদার। সিমলের বাস। লোকে জানবে কানপুর লল, আসলে এরা থাকবে সিমলেয়—সরকারী কোয়ার্টারে কড়া পাহারায়; তাছাড়া, বিনা দ্বিধায় এই ার স্বীকার করে নিতেও তাদের আপত্তি হবে না। নেকদিন পর গৌরীর মনে হ'ল, আশ্বস্ত হয়েছেন, সুস্থ য়েছেন।

সকালবেলায়, বাড়ির লোক আশ্চর্য হ'য়ে বললে, ঠাৎ?

অধ্যাপক বললেন, বড় বড় ব্যাপার তো হঠাৎই হ'য়ে াকে। যাই একটু ঘুরে আসি—অনেকদিন মামা-মামীর শ্রীচরণ দেখা হয় নি।

তুফান এক্সপ্রেস, ন'নটা।

ট্যাক্সি যখন গলি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, চোখে পড়ল, খতলার ঘাটে এক খোঁড়া ভিখারী বসে আছে। লোকটাকে আগে দেখেন নি। বুকের রক্ত ছলাৎ করে

স্টেশনে নামলেন, কানপুরের টিকিট চারখানা নিয়ে সোজা ঢুকে পড়লেন প্ল্যাটফর্মে। একটি সামনে চাবুকা, বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দেখে এগিয়ে এসে বললে, একি, আপনি হঠাৎ!

—মামার বাড়ি যাব। তুমি কোথায়?

—আমি কোথাও নয়, এসেছিলাম এ সী-অফ্ করতে, তা সে আপদের টিকিই নে আমি এইবার বাপের বাড়ি ফিরে যাব।

—বেশ কথা। এসো।

গাড়িতে উঠলেন, গল্প করতে করতে চাবুক এল; তারপর এক ফাঁকে টিকিট কখানা পকে দিলে! অধ্যাপক মৃদুস্বরে বললেন, প্ল্যাটফর্ম?

—আছে।

তারপর গলা চড়িয়ে মিনিটকতক গল্পগুজ করে নেমে গেল।

অধ্যাপক বাক্স খুলে দুটো তিনটে ভারী ই করলেন, বেঞ্চিতে বেঞ্চিতে বিছিয়ে বিছানা ইস্টারক্লাসের ভাড়া বেড়ে ভালই হয়েছে কমেছে। বাক্স বাঙ্কে তুলে রেখে, বো জল নিয়ে এলেন। এসে প্ল্যাটফর্মের দিকে বসলেন। কাঞ্চনী তাঁর কোলের কাছে। ওপাশের জানালায়—মুখ বাড়িয়ে গাড়ি দেখছে

ফার্স্ট বেল হ'য়ে গেল।

অধ্যাপকের মন হৃষ্ট। আর পাঁচটি মিনি তারপরেই পেছনে পড়ে থাক শহর কলকাতা ওতার দল; সামনে রইল অনন্ত পৃথিবী অ স্বাধীনতা। সিমলা পাহাড়ের মাথায়, কোয়ার্টারের নিরাপদ আশ্রয়ে ভয়হীন জী বেড়ে উঠুক শিশুরা। সুশীলবাবুকে ভাল ক আছে, এদের আশ্রয় দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হ লোকের। যা যদি ভাল মনে হয়, কনে দেওয়া যাবে তিন শিশুকে—সুশীলবাবু

আর চার মিনিট—তিন মিনিট। কল আর পাউরুটি বিস্কুট-ওয়ালারা শেষ হাঁক হেঁকে ফিরে যাচ্ছে, প্ল্যাটফর্মে জনতার তাড়াহুড়ো শেষ হয়েছে।

হঠাৎ কাকুলী চীৎকার করে উঠল। অস্পষ্ট একটা ঘোঁয়াটে চীৎকার, যেন তার গলা আর মুখ চেপে ধরেছে কেউ।

—কি রে।

কাকুলীর দুই চোখ বিস্ফারিত,—জানালার ফ্রেমের ওপরে থুতনীটি চেপে বসেছে, একদৃষ্টে দূরে তাকিয়ে আছে।

'কি হ'ল রে। কি হ'ল?'

—তিনবার ঝাঁকুনি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে প্রশ্ন করার পর সে জবাব দিলে: স্বরহীন গলায় বললে, দাদা।

—অ্যাঁ।

দ্রুতহাতে তাকে টেনে সীটের ওপরে শুইয়ে ফেললেন অধ্যাপক, চেপে ধরে রইলেন যেন উঠতে না পারে। ঘরে, যেদিকে সে তাকিয়েছিল, সেইদিকে চোখ ফেরালেন। চিনতে কষ্ট হ'ল না। প্ল্যাটফর্মের ভিড় পাতলা হ'য়ে এসেছে, তার ফাঁকে ফাঁকে এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে লোকটা, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রত্যেক যাত্রীর মুখে মুখে আর প্রতি কামরার জানালায় দ্রুতবেগে বুলিয়ে যাচ্ছে।

ভাল করে চেয়ে দেখলেন লোকটাকে। এমন কিছু পালোয়ান চেহারা নয়। বরং শীর্ণই বলা যায়। খুব শীর্ণ মুখ, যেন রোদেপোড়া আবলুসির মতো, হাঁটার ভঙ্গীতে কিন্তু মনে হয় দেহে অসাধারণ ক্ষিপ্রতা। দ্রুতবেগে হেঁটে এগিয়ে আসছে প্ল্যাটফর্ম আর গাড়ি দেখতে দেখতে। তার চোখে চোখে পড়ে গেল হঠাৎ, নিজের বুক কেঁপে উঠল। অদ্ভুত একটা ক্রূর দৃষ্টি চোখে, যেন চন্দ্রবোড়া সাপের চোখ। বুঝলেন, কেন বাবলু বলেছিল ভীষণ চেহারা।

তাকালেন। দুমিনিটও নেই আর। গার্ড ফ্ল্যা এসে ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়েছেন। লোকটা এগিয়ে আসছে। অধ্যাপক হাত বাড়িয়ে ফ্রেম ধরলেন, এই গাড়ির দিকে আর একটু এ কাঠের পাল্লাটা তুলে দেবেন, ভেতরে দেবেন না।

আর, তারপরও যদি চেষ্টা করে কোন ব করতে, মারবেন এক ঘুষি তার নাকে, তারপ হয় হোক।

লোকটা আরও কাছে এল। তার অচঞ্চল দৃষ্টি অধ্যাপকের মুখের ওপর এসে অধ্যাপক দুইহাতে জানালার ফ্রেম ধরে টেনে তু

পরক্ষণেই সে ফ্রেম তাঁর হাত থেকে খসে প

কাকুলীকে ঠেসে ধরে রেখেছিলেন। তোলবামাত্রই সে বেঞ্চি থেকে পিছলে নেমে বাক্সকে নামতে দেখলে ইঁদুর যেমন করে তেমনি করে দৌড়ে পেছনদিকের দরজা গিয়েছে। দরজা তখনও দুটোই খোলা। সো দিয়ে তরতর করে কাকুলী ছুটে নেমে গেল। পড়ে সোজা দৌড় দিলে পেছনের লাইন অধ্যাপক এক লাফে দরজার কাছে গিয়ে পড়লে

গাড়ি যেন স্টেশনে ঢুকছে। আর কি গেল না—শুধু লাল টকটকে একরাশ রক্ত পিকচারি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল।

—ও বাবা—ও বাবা—ও বাবা—। বলে আর ক্রমাগত চীৎকার করে কেঁদে উঠল; বেঞ্চি নীচের লুটিয়ে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে লাগল।

বাক্সটাকে পড়ে রইল, অধ্যাপক দুই হাতে জড়িয়ে ধরে প্রাণপণ বলে টেনে প্ল্যাটফর্মে ফেললেন, হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন, কাঁদিস নে, কাঁদিস নে, কাঁদিস নে।

বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল—নিরাপদ

বিদ্যাসাগর ঃ ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ

অরবিন্দ পোদ্দার

ইতিহাস রচিত হওয়ার কালে ঐতিহাসিক পুরুষদের কর্মের প্রকৃত তাৎপর্য সকল সময় ধরা পড়ে এমন কি অত্যন্ত ইতিহাস সচেতন ব্যক্তির নিকটও না। তাই, খুব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মও কোন সময় কৌতূহল জাগায় মাত্র, তার অন্তর্নিহিত বাণীটি লোকচক্ষুর অন্তরালেই গোপন থেকে যায়।

বাংলার সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এমনি একজন ব্যক্তি। তাঁর সম অধিকাংশ মানুষের নিকট তিনি শুধু বিদ্যার সাগর, দয়ার সাগর, পরদুঃখকাতর, উদারচেতা ব্য পরিচিত ছিলেন ; শুধু সমকালে কেন, পরবর্তীকালেও স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকের তাঁর এই পরিচয়ই লাভ করেছে। কিন্তু, তাঁর চিন্তা ও সমাজ সংস্কারের কর্ম যে গভীরতর রূপান্তরের সম্ভাবনায় উদ্দী তা খুব লোকের উপলব্ধিতেই আগ্রত ছিল। খুব কম লোকই উপলব্ধি করেছেন, এই লোকটি এব অভিপ্রায় নিয়ে এক দুঃসহ অচলায়তনের পৃষ্ঠদেশ থেকে মানুষকে মুক্ত করার স্বপ্ন নিয়ে সমাজপ্রবাহের বাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁকে অস্বীকার করা শক্ত, প্রতিরোধ করা আরও শক্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলকাতায় পঠনপাঠনে নিরত, তখন 'ইয়ং বেঙ্গল' হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র কর কলস্বরে আকাশ মুখরিত করে তুলেছিল। সেই কলরবের প্রতিক্রিয়া তাঁর আপাতশান্ত চিত্তে কী ক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা নির্ণয় করা কঠিন ; আরও কঠিন চেতন অবচেতন মনের অন্তঃসলিলা চিন্ত ধারাকে উদ্ধার করা। কিন্তু, তা সত্ত্বেও অধ্যয়ন শেষে তিনি যখন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন তখন গেল, তাঁর কণ্ঠেও 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর সুর ধ্বনিত 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর নায়কদের সঙ্গে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, স অধিষ্ঠান, ঐতিহ্যের অধিকার ইত্যাদিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কোথায়, কোন্ ভাবনায় ও ক মিল তা কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে অনায়াসেই প্রতিপন্ন করা যাবে। কিন্তু, তার আগে এটুকু স্ব এই মিল সত্ত্বেও বৃহত্তর সমাজ পরিসরে তাঁদের কর্মের প্রভাব স্বতন্ত্র, এবং বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরে সমাজ রূপান্তরে অধিকতর সত্যতা ও বলিষ্ঠতায় প্রতিষ্ঠিত। তার কারণও স্পষ্ট। 'ইয়ং বেঙ্গল'এর তৎকালীন সামাজিক মূল্যবোধে অস্বীকৃত ও গর্হিত আচরণ দ্বারা সমাজকে আক্রমণ করেছিলেন, এবং আক্রমণে প্রচণ্ড ঔদ্ধত্যও ছিল ; কিন্তু সেই ঔদ্ধত্য পানভোজনাদি ও আনুষঙ্গিক কলুষের আতিশয্যে যেন হাস্যকরও ছিল। ফলে, সমাজের ধীরপ্রবাহিত জীবনধারায় তা যেন মিশতে পারল না, কেমন যেন ব উপদ্রবের মত তা সমাজের প্রান্তসীমায় কোলাহল করতে লাগল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেশীয় সংযোগ অন্তরঙ্গ ; তারই গভীর উৎস থেকে তিনি জীবনের রস আহরণ করেছেন, তাঁর সর্বাঙ্গে বাংলার আকাশ। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং পবিত্র শুদ্ধ জীবনযাপন তাঁকে বাংলার মাটির ঐশ্বর্যে ঘিরেছে, সন্তানের আসন তিনি কখনও হারান নি। তাই, তাঁর ঔদ্ধত্য শুধু প্রান্তিকের লক্ষ্য নিয়ে নেই, তা সমাজের অন্তঃপরমাণুতে প্রবহমান।

তাই, স্বভাবের ঐক্য সত্ত্বেও, প্রভাবে তাঁরা স্বতন্ত্র। ইংরেজ-আনীত ইউরোপীয় ভাবধারা

হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ ভারতীয় শাস্ত্রাদি, সামাজিক আচারবিধি, আদর্শ ইত্যাদি সম্পর্কে একান্ত শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েন। আশ্চর্য এই, প্রথম জীবনে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ না পেয়েও, বার বৎসর সংস্কৃত অধ্যয়ন করার পরও, বিদ্যাসাগর হিন্দু কলেজেরই ছাত্রদের মত অভিনব ভাবনায় ভাবিত হয়ে উঠলেন; তিনি সনাতন চিন্তাধারা ও আদর্শে কোনরূপ আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। সংস্কৃত কলেজের পরিচালনার কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর তাঁর চিন্তাৎ ও কর্মে এই মনোভাবটি অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে উঠে। তৎকালীন রূপান্তরিত সমাজ পরিবেশে শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত, এবং কোন্ শ্রেণীর অনুষ্ঠান ছাত্রদের মানস পরিমণ্ডলে জাগ্রত রাখতে হবে, তা তিনি শিক্ষা দপ্তরের নিকট লিখিত পত্রাদিতে ব্যক্ত করেন। তার একটিতে তিনি পরিষ্কার লেখেন, নানা কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত পড়াতে বাধ্য হলেও এমন সব ইংরেজী রচনার সঙ্গে তিনি ছাত্রদের পরিচিত করাতে চান যাদের যুক্তিধারা ও অন্তরসম্পদ ছাত্রদের মন থেকে সাংখ্য ও বেদান্তের প্রভাব মুছে দিতে পারে। তাঁর মতে, সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৮৫৩ সালে ডঃ মোয়াটের নিকট লিখিত অন্য একটি পত্রে তিনি ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্রাদির সাহায্যে ছাত্রদের চিত্তে "বিশুদ্ধ জ্ঞানসঞ্চার" করার কথা উল্লেখ করেন। কী বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ও সৎসাহসের সঙ্গে তিনি ভারতীয় শাস্ত্রাদি অস্বীকার করেছেন তা ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হয়। একটু সঙ্কোচ অথবা একটু দ্বিধা কখনও তাঁকে এতটুকু বিচলিত করেনি। তাঁর লক্ষ্য ছিল, সংস্কৃত কলেজ থেকেই হিন্দু কলেজের অনুরূপ একদল ছাত্র সৃষ্টি করা, যাঁরা হ'বেন সর্ববিদ্যায় কৃতী অথচ প্রাচীনের আকর্ষণ মুক্ত, তাঁরা ইউরোপের যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে কুসংস্কারকে চিরকালের জন্য বিসর্জন দেবেন। তাঁরাই বাংলার গ্রামে গ্রামে একদা ছড়িয়ে পড়বেন, এবং নতুন জাতি ও নতুন দেশ গড়ে তুলবেন।

এমনি ভাবে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করে, এবং তাঁকে শ্রেয়সের ধ্যান আমূল পরিবর্তন করে দেয়। এই যুক্তিবাদ সম্ভবত তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাসকেও কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছিল। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য, এবং তিনিই সভার সর্বপ্রথম সম্পাদক ছিলেন। সভার চিন্তানায়ক অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন বিদ্যাসাগরের পরম সখা। দত্ত মশায়ের নেতৃত্বে সভার সদস্যবৃন্দ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঈশ্বরের স্বরূপ, অস্তিত্ব ইত্যাদি নিরূপণ করতেন। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষ্য অত্যন্ত সরল। তিনি লিখেছেন, "একজন বলিলেন, ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ কিনা?' যাহার যাহার আনন্দস্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্ধারিত হইত।" পুনরায়, 'এখানে যাঁহারা আমার অন্তস্বরূপ, যাঁহারা আমাকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্মভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না।" ইত্যাদি। দেবেন্দ্রনাথ যাঁদের সম্পর্কে এই ইঙ্গিত করেছেন তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের নাম থাকা স্বাভাবিক।

শান্ত, ধীর, অথচ তেজস্বী এই লোকটির মধ্য দিয়ে এমনি করেই ইতিহাসের অন্তরবেদনা আপনাকে ব্যক্ত করেছে। তাঁর জীবন সচেতন মন অত্যন্ত সহজেই কালের গোপন মর্মবাণীটি আত্মস্থ করতে পেরেছিল। অন্যান্য অনেকের মত তিনিও অনুভব করেছিলেন, ভারতবর্ষের সমাজ জীবন যে ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে এসেছে, এবং আমরা যে ঐতিহ্যের অধিকার পেয়ে এসেছি, তার সৃষ্টির সম্ভাবনা বহুকাল নিঃশেষিত। ঐ পথে সৃষ্টির সম্ভাবনা আর নেই—যুক্তির দ্বার অবরুদ্ধ। সুতরাং, ভারতবর্ষকে যদি নতুন

কে, সি, দাশের রসগোল্লা

প্রিয়জনের প্রীতিভোজে উপাদেয় উপাদান

বায়ুশূন্য টিনেও পাওয়া যায় এবং বহুদিন অবি
অবস্থায় থাকে বলিয়া দূর দূরান্তরে উপহার
স্বরূপ পাঠানো যায়।

●

সেই সঙ্গে পাবেন

রসোমালাই ঃ সন্দেশ ঃ দধি ইত্যা

●

রসোমালাই আবিষ্কারক ঃ

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা—৩

পরকালের ভাবনায় আকুল ভারতচিত্তকে তিনি উপস্থিত বর্তমান অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর প্র
কেরাতে চেয়েছিলেন। এই বস্তু পৃথিবীই তাঁর সাধনার তীর্থক্ষেত্র, এবং সাধনার লক্ষ্য মানুষ।

আমাদের জাতীয় জীবনের ক্ষুদ্রতা, সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতদের অহংকার, এবং যে কুসংস্
আমাদের দেশের সামগ্রিক প্রকাশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তার জন্য বিদ্যাসাগরের লজ্জার অবধি ছি
না। গভীর দুঃখে একবার তিনি বলেছিলেন, আমাকে যদি কেহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলে তাহ'লে আম
নিরতিশয় লজ্জাবোধ হয়। তাঁদের মধ্যে তিনি যে শঠতা, আদর্শ এবং কর্মের বৈপরীত্য লক্ষ্য করেছে
তাতে তাঁর চিত্ত ক্ষোভে ঘৃণায় ক্রোধে জ্বলে উঠেছিল—তাঁদের সঙ্গে একই সারিতে একই ভাবে বিবেচি
হওয়ায় তাঁর ছিল অপরিসীম অসম্মান। তেমনি, ইংরেজী শিক্ষার কারখানা থেকে যে এক শ্রে
অর্ধশিক্ষিত মানুষ-পণ্য সৃষ্টি হচ্ছিল—যারা বি-এ পাশ, বি-এ ফেল, এম-এ পাশ এম-এ ফেল করে বাজা
বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা স্ফীত করছিল—তাদের সম্পর্কেও তাঁর লজ্জাবোধ কম প্রখর ছিল না। এ সম্প
একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে।

একবার পূর্ণচন্দ্র নামক একব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে লক্ষ্ণৌতে জিজ্ঞাসা করে, বিদ্যাসাগর মশায়, আপ
তো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়ার ছেলো, কিন্তু এটা হয় কেন বলুন দেখি। যে ছেলেটা সেবে
ক্লাস থেকে বা'র হয়ে যায়, সেও লেখে I has; যে এণ্ট্রান্স পাস করে, সেও লেখে I has; যে এল-
পাস করে, সেও লেখে I has; যে বি-এ পাস করে সেও লেখে I has; যে এম-এ পাস ক
সেও লেখে I has; এ জিনিসটা কেন হয়? এর কি কিছু প্রতিকার নেই? আপনারাই ত
ইউনিভারসিটির মা-বাপ।...বিদ্যাসাগর গুলিখোরদের কয়েকটি গল্প বলে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন
আটখানা ইটের উপর বসা (একটাতে ১০৮টা ছিটে খেতে পারলে একখানা ইটে বসার অধিকার জন্মে
সবসেরা ছিটে-খোরের গল্পটি এইরূপ—'আমার বাড়ি ফরাসডাঙ্গা। বাড়ি গিয়া দেখি কোথাও বাড়ি নাই
ঘর নাই, পুকুর নাই, গাছ নাই, পালা নাই, সব মাঠ হইয়া গিয়াছে। ছিরামপুর থেকে চুঁচড়ো পর্য
সব ধূধূ করছে মাঠ। ছিরামপুরের গঙ্গার ঘাট থেকে একটা সুড়ঙ্গ আর চুঁচড়োর গঙ্গার ঘাট থে
আর একটা সুড়ঙ্গ; একটা দিয়ে পালে পালে গরু যাইতেছে, আর একটা দিয়া গাড়ি গাড়ি আ
যাইতেছে; মাটির ভিতর কোথায় যায়, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনেক খুঁজিয়া বুঝিলাম—মাটি
ভিতরে কল আছে, কলের ১০০টা মুখ তারকেশ্বরের কাছে গিয়া বাহির হইয়াছে। কোনটা দিয়া বাতাব
কোনটা দিয়া মনোহরা, কোনটা দিয়া কাঁচাগোল্লা, কোনটা দিয়া রসগোল্লা, কোনটা দিয়া ছানাবড়া, কোনা
দিয়া পানতুয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু, ভাই, খেয়ে দেখ সবই একরকম তার। এক পাকের তৈরি কিনা!'

গল্পটি শেষ করে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেন, 'আমাদের যে-সব ছেলে আছে, তাদের কাছ থেকে
আমরা মাথিনা নিই, পাওথা কি নিই, একজামিনেশন কি নিই, নিয়ে কলের ঘোর খুলি,—দেখাইয়া দিই
এইখানে মাষ্টার আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, এইখা
চেয়ার আছে, এইখানে কালি কলম দোয়াত পেন্সিল স্লেট সবই আছে। বলিয়া তাহাদের কলের ছেড
ফেলিয়া দিয়া চাবি ঘুরাইয়া দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈয়ারী হইয়া তাহারা কেহ সেকেন ক্লাস দিয়
কেহ এণ্ট্রেন্স হইয়া, কেহ এল-এ হইয়া, কেহ বি-এ হইয়া, কেহ বা এম-এ হইয়া বেরোয়। কিন্তু সবা

বিদ্যাসাগরের এই গল্পটির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের একটি চমৎকার চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক, অর্থ বই এবং শব্দ, শব্দার্থ ও ব্যাখ্যার সীমায় ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে যারা অবশেষে বেরিয়ে আসে তাদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় মসজিদ পর্যন্তও পৌঁছায় না; তাই তারা I has লিখে ব্যাকরণ ও অর্থশিক্ষার বুলি কপ্‌চে সোরগোল করে। কিন্তু, প্রশ্ন এই, বিদ্যাশিক্ষার কারখানার কথা অবগত এবং তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেও বিদ্যাসাগর ঐ শিক্ষা বিস্তারের জন্য—বিশেষত স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য—এমন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন কেন? কেনই বা তাঁর ধ্যানে তিনি ছিলেন নিদ্রাহীন? এই প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তরই সম্ভব, এবং তা এই: তাঁর স্বপ্ন ছিল, আজ যারা I has লিখছে তারাই একদিন I have লিখবে; অর্থাৎ, প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আপন জীবনকে আলোকিত করে দেশের দেহে প্রাণসঞ্চার করবে, এবং ভারতীয় সমাজের অচলায়তন পুনরায় গতি অর্জন করবে। যে পশু, সে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আবার যাত্রা করবে নিরন্তর সৃষ্টির পথে। তিনি বলেছিলেন, মাতৃভূমির অজ্ঞান তমিস্র দূর করার যে ব্রত তিনি গ্রহণ করেছেন, তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তা উদ্‌যাপিত হবে। বস্তুত, তাই তাঁর হয়েছিল। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণ চিন্তায় ব্যয়িত হ'য়েছে; ভাব-বিলাসের মধ্য দিয়ে নয়, প্রত্যক্ষ কর্মের ভেতর দিয়ে।

বিদ্যাসাগর দেশের শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার ইত্যাদির জন্য যে আন্দোলন করেছিলেন, বিস্তৃত বিবরণ আমাদের সকলেরই জানা। সেই বহুল প্রচারিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তাঁর সর্ববিধ সামাজিক কর্মের তাৎপর্য কি, আধুনিক বাংলা সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে তার স্থান কোথায়, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে এই প্রবন্ধের শেষ করব।

বিদ্যাসাগর সম্ভবত ইংরেজদের নীতিশাস্ত্রগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করার অবকাশ পাননি। তা সত্ত্বেও, বিদেশাগত ভাবধারা দেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তিনি ছিলেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক। তাঁর চিন্তায়, যুক্তিতে, মননে ইউরোপীয় যুক্তিবাদের ছাপ। সেখানে মানুষকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে, যে সব সামাজিক অধিকার তাদের জন্য স্বীকৃত, এদেশের মানুষও প্রচলিত সামাজিক ঐতিহ্যের পীড়ন মুক্ত হয়ে সে স্বীকৃতি লাভ করুক, যে যুক্তিতে পুরুষের অধিকার সে মুক্তি অর্জন করে নারী প্রকৃত মানুষ প্রতিষ্ঠিত হোক, এ ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। অর্থাৎ, ভারতবর্ষকে বিশ্বমুখী হ'তেই হ'বে—এই যে কালের অন্তরকে একদল করে তুলেছিল, বিদ্যাসাগর-মানসও সেই আকুতিতে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। বিধবা বিবাহ বিধিসম্মত করার জন্য তাঁরা সমবেতভাবে যে আবেদন করেছিলেন, তার একস্থানে লেখা ছিল, বিধবা বিবাহ প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয় এবং তা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির আইনে বা দেশাচারে নিষিদ্ধও নয়। আবেদনের মধ্যেও নিজের দেশকে সংশোধিত উন্নততর করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমপর্যায়ভুক্ত করা বোধ ও মানবতার স্বীকৃতিতে অন্যের পার্শ্ববর্তী হওয়ার, এক কথায়, বিশ্ববাসী হওয়ার আগ্রহ অম্লান।

তাঁর মানবতার বোধও ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। এও অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার যে, তিনি পারমার্থিক কল্যাণের চিন্তায় ভাবিত হননি। ইন্দ্রিয়াতীত অনিশ্চিত অনির্দেশ্য সত্যের ধ্যানে আত্মনিমগ্ন করে তিনি এই পূর্ণ মানবক্ষেত্রকেই তাঁর সমস্ত কর্মের, ভাবনার, সাধনার একমাত্র ক্ষেত্রস্বরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কর্ম যেমন সঙ্কোচহীন, দ্বিধাহীন ও পৌরুষদৃপ্ত, তাতে মনে হয় বাস্তব মানুষের জীব

তাঁর সমস্ত কর্মই যেন একটি মাত্র উদ্দীপনায় একটিমাত্র আকৃতিতে উজ্জ্বল। তাহলো, মানব অভিজ্ঞতার তীর্থে, প্রবাহিত-হতে-থাকা জীবনের প্রাঙ্গণে মিলিত হওয়া, এবং তাকে সজ্ঞান কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা উন্নত পূর্ণতর আলোকের সন্ধানে প্রবাহিত করা। এই প্রবাহ যেন কোন এক সীমায় আবদ্ধ হয়ে না থা যেন অনন্ত জীবনের সন্ধানে তা নিয়তই উৎসাহিত থাকে। এ এক অপূর্ব জীবনবোধ—এই পৃথিবী পরম ও চরম জেনে তারই রূপান্তরশীল ঐশ্বর্যের মধ্যে নিজেকে সৃষ্টি করা, দেশকে সৃষ্টি করা, দেশের অগ মানুষের আকৃতিকে ভাষা দেওয়া,—বিদ্যাসাগরের সব কর্ম সব চিন্তাই এই বোধে দীপ্ত। এই বোধ কর্মকে করেছে দুর্বার, হৃদয়বৃত্তিকে প্রখর, এবং তাঁর পৌরুষকে তেজে অনন্ত করেছে।

এই জীবনবোধই তাঁর কর্মকে তাঁর কালের সীমা পার হয়ে কালান্তরে সত্য হয়ে উঠার শ দিয়েছে। আধুনিক অর্থে পুনরুজ্জীবনের যে প্লাবন উনবিংশশতকের বাংলায় অনুভূত হয়েছিল, বিদ্যাসাগ কর্ম ও সাধনা তারই সার্থক অভিব্যক্তি। তাঁর মাধ্যমেই তাঁর কালের অগণিত মানুষের অব্যক্ত আকা বাণীরূপ লাভ করেছে। সেদিক থেকে রামমোহন রায়ের মত বিদ্যাসাগরও ইতিহাসের বাহন, সম সংস্কৃতির নির্মাতা। বিংশ শতাব্দীর এই শেষ পাদে বাংলা দেশ যে দারুণ সমাজ সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অত্র হ'য়ে চলেছে, তখন তাঁর মত একজন কর্মবীরের অভাব নিয়ত আমাদের ব্যথিত করে। তাঁর মত ক্ষুরধা ও বিরাট হৃদয়ের অধিকার পেলে বাংলাদেশ অনায়াসেই এই সঙ্কটে জয়ী হ'তে পারত।

চক্র-বর্তী

অমলা দত্ত

শীতের মন্থরতার এতদিনে বুঝি অবসান হ'ল; আকাশে বাতাসে টের পাওয়া যাচ্ছে বসন্তের আমে
সোনালী রোদ একটু ঝিলিক দিয়েই পালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রেখে যাচ্ছে তার আগমনের ইঙ্গি
গাছে গাছে জেগেছে জীবনের স্পন্দন, নেড়া গাছগুলোতে সবুজ পাতার উঁকিঝুঁকি। ভুল ক'রবার ব
উপায় নেই যে সত্যি এবার বসন্ত আসছে; আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বসন্তের জয় কেতন উ
গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে; আকাশে বাতাসে ঘোষিত হবে তার বিজয়বার্তা; সোনা
রোদের উষ্ণ আলিঙ্গনে শীতের জড়তা ঝেড়ে ফেলে লোকজন উঠবে উৎসাহে টগবগিয়ে।

পৃথিবীর রূপ গেছে বদলে, গাছে গাছে সবুজের সমারোহ। বাড়ীর সামনের লনের বরফ
করবার সমাপ্তি হ'য়েছে, তার বদলে এসেছে গাছের এবং ফুলের পরিচর্যার পালা, বাড়ীর সবাই এ ক
উৎসাহে মেতে উঠেছে। বিচিত্র ফুলে ফুলে অজস্র লতানে গোলাপের সুষমায় ধরণীর অপূর্ব প্রকা
পোর্টোমাক নদীর ধারে চেরীফুলের স্তবকগুলি যেন নেশা ধরায়। বসন্তের সুরের সঙ্গে সুর মিলি
নূতন করে ঘর সাজানো হচ্ছে, শীতের ভারী পর্দাগুলো সরিয়ে টাঙানো হচ্ছে হাল্কা রঙএর পর্দা; বসা
রঙের ছোপ ধরেছে লোকের মনে; মেয়েদের গায়ে উঠেছে হাল্কা জামা—বাসন্তী এবং সবুজ রং
প্রাধান্য; বসন্তের আহ্বানে সবাই যেন সাড়া দিয়ে বলে উঠতে চায়—শীত আমাদের স্থবির করে রে
পারেনি, সবুজ কেতন উড়িয়ে আমরা চিরসবুজ বসন্তকে স্বাগত জানাচ্ছি, যাতবো এবার তো
নতুন খেলায়।

নতুন খেলার বাস্তব রূপ নেয় গাড়িগুলি; শীতের সময়কার গাড়ির বরফ পরিষ্কার করা
এঞ্জিন গরম করার পালা শেষ হ'লো, এবার গাড়ীর এন্টিফ্রিজ ফেলে দিয়ে তেল বদলে, টায়ার
করিয়ে দীর্ঘভ্রমণের জন্য tune করিয়ে নিতে হবে। এর পরেই সুরু হবে দীর্ঘযাত্রা—চলা শুধু
ক্রততর গতিতে কেবল এগিয়ে চলা, গতির আনন্দে ছুটে চলা। মার্কিনী হাইওয়ে তৈরী হয়েছে এই
খেলার উপযোগী করে। এখানে শুধু ক্রত থেকে ক্রততর গতিতে ছুটে চলতে হবে, এ খেলায় মন্থরতা
বিশ্রামের কোন অবকাশ নেই, গতিবেগ একটু কমলেই পেছন থেকে অন্য খেলোয়াড় এসে রাস্তা
ছিটকে ফেলে দিয়ে আপন পথ করে নেবে। হাজার হাজার গাড়ি ছুটে চলেছে কত শত পরিবার নি
চাকার উপরেই জীবনের একটা বড় অংশ কাটে এখনকার লোকের। চক্রবর্তী উপাধিটা এরা ন্যা
ভাবেই দাবী করতে পারে। রূপকথার মন্ত্রশক্তির মত এই নতুন সভ্যতাও চক্রে বর্তনকারী অশ্ব
এবং অর্ধ-শকট এক নতুন জীবের সৃষ্টি করে চলেছে। এদের খেলা শুধু ছুটে চলা, ক্রত থেকে ক্র
গতিতে। বছরের পর বছর গাড়ির অশ্বশক্তি কেবল বেড়েই চলেছে আর তার সঙ্গে তাল রেখে
চলেছে ছোটার বেগ।

জায়গার আলোচনাতে যাবার আগেই অনেকটা আনন্দ লাভ করেন। এ যাত্রার জন্য উৎসাহ উদ্দীপ অন্ত নেই, প্রথমেই ছোট A. A. A. যে জোগাড় কর পথের চিলতে চিলতে ম্যাপ, সংগ্রহ কর হোটেল "মোটেলে"র নামের তালিকা, টেলিফোন করে জায়গা রিজার্ভ করে রাখো, গাড়ির লাগেজ রা কেলে রাখো কতকগুলি খাবারের টিন—অসময়ের সম্বল হিসেবে।

গন্তব্য স্থানটা নির্ণয় করাই একটা বড় সমস্যা; আটলান্টিকের তীর থেকে প্রশান্ত মহাসাগ তীর পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল দেশটার যাবার উপযুক্ত সুন্দর জায়গা আছে অগুন্তি আর যাত্রাটাকে উপভো করে রেখেছে প্রশস্ত, সুন্দর এবং সুগম পথ। রাস্তাগুলো এত সুন্দর হওয়াতেই বোধহয় গন্তব্যস্থানটা গৌ হয়ে গেছে, এই সুন্দর রাস্তা ধরে চলাটাই এদেশে বড় হয়ে উঠেছে। টার্ণপাইক, পার্ক-ওয়ে, হাই-ওয় এখানে ছড়াছড়ি, তাও প্রতিযোগিতায়, আরো নতুন নতুন রাস্তা তৈরী চলছে। টার্ণ পাইকগুলো এদে গর্বের বস্তু। চমৎকার চওড়া এবং মসৃণ রাস্তা, মাইলপ্রতি গাড়িগুলোকে পয়সা দিয়ে চলতে হয়। রাস্ত দু'প্রান্তেই আছে টোল-হাউস, টার্ণ-পাইকে গাড়ি ঢুকলেই কে কোন জায়গায় ঢুকলো সেটা চিহ্নিত ক টিকিট দিয়ে দেবে এবং সে রাস্তা থেকে বের হবার সময় মাইল অনুযায়ী পয়সা দিয়ে চলে যেতে হ পথের ধারেই নির্দেশ দেওয়া থাকে যে আর কতটা দূরে আছে টোল হাউস, প্রত্যেকেই তাড়া পয়সা

With the best compliments of—

THE EAST BENGAL RIVER STEAM SERVICE LTD.

Managing Agents : **RAJA SREENATH ROY & BROS. PRIVATE LTD.**

87, SOVABAZAR STREET, CALCUTTA-5.

Telegrams :
"INDOSTEAM", Calcutta.

Telephones :
55 | 1138
1019 (3 Line

করে যাতে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকে, টাকা পয়সা বার করতে দেরী করে অথবা পেছনের গাড়িগু সময় নষ্ট না করে। নিউজার্সি টার্ণপাইক এখানকার একটি বিখ্যাত রাস্তা, নিউইয়র্ক থেকে পেনসিলভ পর্যন্ত সোজা চলে এসেছে। এ রাস্তাগুলোতে কোন intersection নেই; ওভারব্রীজ করে রাস্তাতে অন্য রাস্তার উপর দিয়ে নিয়ে গেছে, এ রাস্তায় ঢুকবার জন্য অন্য একটা শাখা পথকে এ পাতার মত গোল করে ঘুরিয়ে এনে এটার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে যাতে এ রাস্তার সঙ্গেই জোড়া যায় অন্য গাড়ির গতি ব্যাহত না হয়। টার্ণপাইকে জোরে চলাই নিয়ম, এ রাস্তা এত মসৃণ যে গাড়ির সঙ্গেই সোজার-আশিতে উঠে যায়। ফিলাডেলফিয়া থেকে ওয়াশো পর্যন্ত, বিস্তৃত পেনসিলভ টার্ণপাইকে তো সোজারের নীচে চ'লবারই নিয়ম নেই।

এখানকার পার্ক-ওয়েগুলোই দেখতে সবচেয়ে সুন্দর। আপ এবং ডাউন গাড়ির জন্য র ভাগ করা এবং এই ভাগটা করা হয়েছে সুন্দর একটা পার্ক দিয়ে অর্থাৎ দু'টো রাস্তার মাঝখান সুন্দর একটা পার্ক আগাগোড়া চলে গিয়েছে। বাল্টিমোর থেকে ওয়াশিংটন যাবার জন্য আছে বাল্টি পার্ক-ওয়ে, বস্টন থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত যে মেরিট পার্ক-ওয়ে চলে গিয়েছে সেটাকে এক কথায় করতে হলে ব'লতে হয় অপূর্ব। শুধু পথ চলাটাই যে কত আনন্দের হতে পারে এ পথ দিয়ে চললে ভাল করে টের পাওয়া যায়। শরৎকালে এ রাস্তার অসামান্য শ্রী দেখেছিলাম। Fallএ (হেমন্তে) গাছের পাতাগুলির রঙ বদলায় সবুজ পাতার বদলে দেখা যায়, লাল হলদে আগুনে রঙের ছড়াছড়ি আসবার আগে গাছগুলি যেন মরণের হোলি খেলায় মেতে ওঠে। পাতার রঙ বদলানো দেখতে সা থেকে লোক যায় নিউইংল্যাণ্ডে বেড়াতে।

এ-দেশের ধমনীর মত ছেয়ে আছে হাই-ওয়েগুলি; দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক নাড়ির যোগ রয়েছে এই হাইওয়েগুলোর মধ্য দিয়ে। দেশের এক প্রান্তের পণ্য আর এক প্রান্তে পাঠিয়ে অভিকায় ভ্যান বোঝাই করে হাই-ওয়ে দিয়েই। দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে পূব থেকে পশ্চিমে য জন্য আছে অনেক হাই-ওয়ে। এদেশের অগুন্তি হাই-ওয়ের মধ্যে কয়েকটা খুব বিখ্যাত। উত্তরে থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে ফ্লরিডা (আমাদের দেশের কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর মত) পর্যন্ত ২৩৯০ লম্বা একটি রাস্তা চলে গিয়েছে। কানাডার কুইবেক প্রদেশ থেকে এ রাস্তা সোজা চলে আমেরিকার দক্ষিণতম প্রদেশ ফ্লরিডায়। এ রাস্তা দিয়ে চলা একটা নতুন অভিজ্ঞতা। কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী অ্যাডিরণ্ডাক অঞ্চলটা এখনও আদিম প্রকৃতি তার বন্য অরণ্য সৌন্দর্য নিয়ে অ প্রতাপে রাজত্ব করছে। মাইল কুড়ির মধ্যে লোকজন, দোকানপাট, এমন কি পেট্রোল স্টেশনের চিহ্ন নেই, রাস্তার দু'পাশে কেবল নিবিড় ঘন গাছের সারি, রাস্তার একপাশের গাছ অন্য পাশের শাখায়-শাখায় যুক্ত হয়ে সবুজ আর্চ তৈরী করেছে, আকাশটাকে প্রায় দেখাই যায় না, সূর্যের আলো ভয়ে উঁকি মারে, প্রবেশ পথ পায় না। এ পথ দিয়ে চ'লতে চ'লতে মনে হয় আধুনিক সভ্যজগৎ কোথায় এক নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে চলে এসেছি; অরণ্যের এই আদিম সৌন্দর্য্য মনকে ভরে এবং মুগ্ধ করে রাখে। সীমান্তবর্তী অ্যাডিরণ্ডাক পার হয়ে পরদিন হ্রদ পর্যন্ত অঞ্চলটা আদিম প্রকৃতির অখণ্ড সত্তা মানুষের হাতের স্পর্শ পাওয়া যায় শুধু এই মসৃণ পথটাতে—যেখানে বিংশশতাব্দী তার সমস্ত

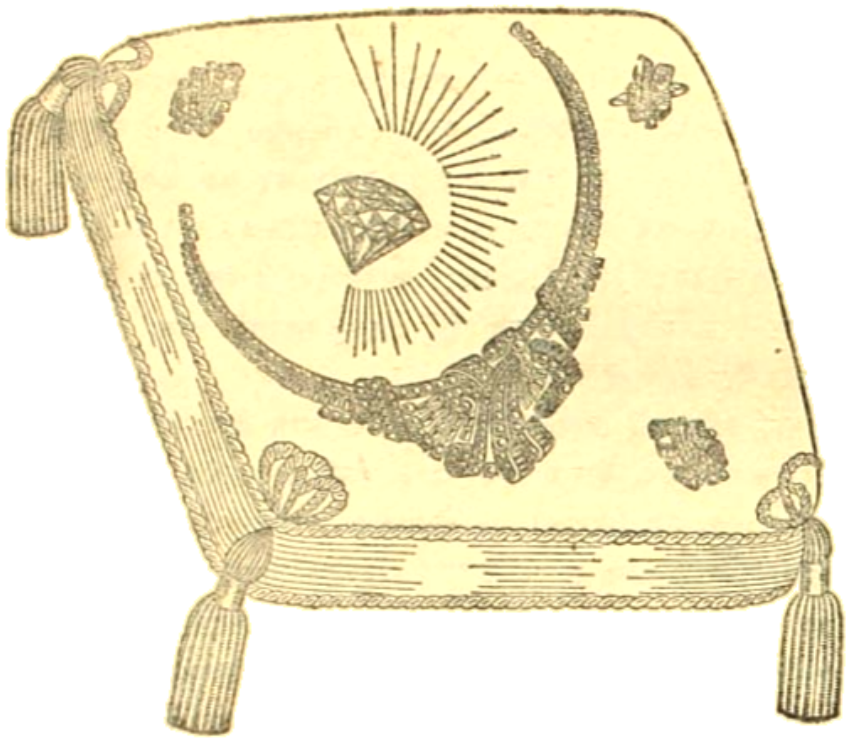

আধুনিকতম রুচির সর্ব্বপ্রকার স্বর্ণ-অলঙ্কার, মণি, মুক্তা, হীরা,
জহরত প্রভৃতির অপূর্ব্ব সম্ভার।
বিবাহ ও উৎসব অনুষ্ঠানে প্রিয়জনকে উপহার দিবার
নানাপ্রকার অভিনব ও চিত্তাকর্ষক অলঙ্কার।

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস্

স্থাপিত ১৮৮২

১-এ, বেণ্টিক ষ্ট্রীট (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্), কলিকাতা।

ফোন : ২২-২২৭০

ব্রাঞ্চ :—৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন : ৪৭-১১৫৮

যায়। প্রকৃতি আর এখানে তাহার সুন্দর রূপে দেখা দেয় না, পাহাড় অরণ্য এবং আটলাণ্টি মাখামাখিতে এক প্রশান্ত সৌন্দর্যে মন ভরিয়ে দেয়। এ রাস্তা ধরে চলেই মেইন পার হয়ে নিউ হ্যাম্পশ মাসাচুসেটস, কানেকটিকাট প্রভৃতি একের পর আরেক প্রদেশ পার হয়ে একেবারে আমেরিকার ফলার ফ্লরিডাতে চলে যাওয়া যায়। ফ্লরিডাতে অবশ্য শীতের সময় যাওয়ারই রেওয়াজ। দুরন্ত শীত আর ব তুহিন স্পর্শ থেকে পালিয়ে বড়লোকরা এ সময়ে সূর্যকিরণের উষ্ণ স্পর্শের আশায় ফ্লরিডা ছোটে। শীতের এখানকার হোটেলগুলো দুর্মূল্য, তাই আজকাল একদল লোক গ্রীষ্মকালেই ফ্লরিডায় চলে যায়; বড়লে লীলানিকেতনটা শীতের সময় না হোক গ্রীষ্মের সময়েই একবার দেখে আসতে।

কত পরিবার ছোটে পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্তে, আটলাণ্টিকের তীর থেকে প্রশান্ত মহাস তীরের দিকে! কত যে বড় বড় হাই-ওয়ে পূর্বপ্রান্তকে পশ্চিমপ্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করেছে; মাসাচু প্রভিন্স টাউন থেকে ক্যালিফোর্ণিয়ার লঙ বীচ পর্যন্ত ২৪১৭ মাইল লম্বা রাস্তা ধরে চলে যায় কত অগুন্তি ; কেউ বা ধরে বস্টন থেকে ইয়েলোস্টোন ন্যাশন্যাল পার্ক হ'য়ে ৩৩০০ মাইল লম্বা যে রাস্তাটা অরলিয়ন গিয়েছে। নিউজার্সির আটলাণ্টিক সিটি থেকে ৩০৯৩ মাইল লম্বা যে রাস্তাটা সানফ্রানসিসকে গিয়েছে সেটা ধরে ছুটে চলে কাতারে কাতারে গাড়ি—এ পথটা খুবই জনপ্রিয়। ভার্জিনিয়া লস অ্যাঞ্জেলেস এবং মেরীল্যাণ্ড থেকে সানফ্রানসিসকো পর্যন্ত বিস্তৃত পথ ধরে চলে যায় ঝাঁকে গাড়ি। এ ছাড়াও আছে অগুন্তি পথ, যার যেটা পছন্দ সেটা ধরে এগিয়ে চলে। শিকাগো থেকে মাইল লম্বা যে রাস্তাটা হলিউডের স্যাণ্টামোনিকা বীচ পর্যন্ত চলে গিয়েছে সেটার পথের দৃশ্য খুবই ; এ পথ ধরে ছোটে গাড়ির সারি, সেণ্ট লুই শহর পার হয়ে গাড়ি ছুটে চলে ওকলাহামা সিটির নিউমেক্সিকোর মরুভূমি ছাড়িয়ে কাউবয় এবং কাউগার্লের রাজত্ব টেকসাস্ প্রদেশে। আমেরিকা গাথা কত কাহিনী এ জায়গার সঙ্গে জড়িত। দামনেই পাওয়া যাবে রেড ইণ্ডিয়ান অধ্যুষিত অ রহস্যময় আলবুকার্ক এবং গ্যালপ্ শহর। বহু প্রাচীন বীরত্ব কাহিনীর সঙ্গে জড়িত এ অঞ্চল। পা আড়াল থেকে শুধুমাত্র তীর ধনুকের সাহায্যেই এরা শ্বেতজাতির আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। তা রেল লাইন স্থাপনের প্রচেষ্টাকে বারে বারে ব্যর্থ করে দিয়েছে। এ অঞ্চল পার হয়ে যাবার ক্যালিফোর্ণিয়ার স্বর্ণ কুড়োবার প্রলোভনটা অনেকটা সংযত করে রেখেছিল। আজ পর্যন্ত রেড ইণ্ডিয়ান জাতির বশ্যতা পুরোপুরি স্বীকার করে নেয়নি। এখনও এরা নিজেদের আচার আচরণ বজায় রে গ্যালপে দেখেছিলাম রেড ইণ্ডিয়ান কনফারেন্স; প্রতি বছরই রেড ইণ্ডিয়ানদের সমস্ত শাখা গ্য কনফারেন্সে মিলিত হয়। গ্যালপ্ ছাড়িয়ে টেক্সাসের মরুভূমির মধ্য দিয়ে গাড়ি ছুটে চলে তীব্র। একদল উইলিয়াম থেকে এ রাস্তা ছেড়ে চলে যায় গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের দিকে, আর একদল ছোটে সুবর্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ায়।

গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের যাত্রীদল উইলিয়ম থেকে বড় রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে গাড়ি ছুটে চলে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের দিকে—যেখানে কলোরাডো নদী হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় পাহাড় আপনাদের পথ করে নিয়ে সমতল ভূমিতে নেমে গেছে। উপর থেকে মনে হয় ছোট একটা নদী।

— উৎসব অনুষ্ঠানে ও পূজা পার্ব্বণে —

লক্ষ্মী ঘি

বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দের বার্ত্তা বহন করে।

হাজার হাজার প্রশংসা পত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকটী —

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেই এত চাল কিনিব।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক - অমৃতবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষ্মীঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিলাম, বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

আমি লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডাঃ কালিদাস নাগ

লক্ষ্মীঘৃত ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল

শ্রীসীতা দেবী

লক্ষ্মীমার্কা ঘি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অনুরূপ, অসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

ছোট বড় সকল রকম টিনে পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ, পবিত্র ও স্বাস্থ্যপ্রদ

পাহাড়ের সৌন্দর্যও অদ্ভুত, সাধারণ পাহাড়ের সহজ সৌন্দর্য এখানে নে গাছপালা হীন ব পাথরের নীরস সৌন্দর্য ; এর বলিষ্ঠ সৌন্দর্য মনকে টানে আবার দূরেও ঠেলে দেয়। ক্ষণে ক্ষণে এ পাহা রঙ্ বদলায়, যেগুনি রঙের আবেশ মুছে যেতে না যেতেই ফুটে ওঠে আগুনের শিখার মত লালচে আভ ছাপ। গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের সর্বনাশা সৌন্দর্য অনেকে সহ্য করে উঠতে পারে না। আমাদের এক সহযা ক'দিন গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নে কাটাবার জন্য এসেছিলেন, প্রথম রাতেই এক অদ্ভুত অনুভূতিতে তাঁর মন ভরে এ এটাকে তিনি ভালই বলবেন না মন্দই বলবেন, স্বীকারই জানাবেন না দূরে ঠেলে ফেলবেন বুঝতে না সারাটা রাত আধ শঙ্কিত আধ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাটে। এ অনুভূতি সহ্য করতে না পেরে পরদিনই এ জায়গা ছেড়ে চলে যান। এ জায়গা ছেড়ে না গেলেও একটা নতুন অনুভূতিতে যে মনটা ভরে ওঠে বিষয়ে সন্দেহ নেই, এ অনুভূতির নাম দেওয়া যায় না, সত্যিই অভূতপূর্ব এ অনুভূতি, পূর্বে আর ক এমন অনুভূতির সঙ্গে পরিচয় হয়নি।

এখানকার 'এলটোডার' এবং ব্রাইট এঞ্জেল হোটেল দু'টোই একেবারে পাহাড়ের সর্বোচ্চ শি এখানকার পাহাড় এবং হোপি রেড ইণ্ডিয়ানদের বাড়ীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হোটেল দু'টি তৈরী ; ব থেকে মনে হয় কাঠ এবং এবড়ো-খেবড়ো পাথর দিয়ে বাড়ী দু'টি বানানো, ভেতরে অবশ্য আধুনিক ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ। হোটেল দু'টি পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্তরে এবং তারপরেই মহাশূন্য। সেই মহাশূন্য নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় পৃথিবীর বুক ভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে তৃণশূ খাড়া পাথরের বলিষ্ঠ পাহাড়। এ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ভৌগোলিক দিক থেকে এ অঞ্চল যে পৃ অতি প্রাচীন অংশ সে বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। চিরদিন আমরা পাহাড় দেখতে উর্ধ্বে তাকা কেমন পাহাড় যে দৃষ্টি নত করে দেখতে হয়? কি অদ্ভুত রঙ্এর খেলা যে এ নীরস পাথরের গায়ে যায়। এ শক্ত পাথর ক্ষণে ক্ষণে বেগুনী, কমলা এবং ধূসর হয়ে ওঠে, এবং একটা সংজ্ঞাহীন অনুভূ মনকে ভরে তোলে। প্রকৃতির নব নব বিকাশ—সূর্যোদয়, মেঘের বৈচিত্র্যরূপ, উষার প্রকাশ দেখে ই যুগের মানব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যেমন সূর্যের স্তব, বরুণের জাগোন এবং উষার বন্দনা রচনা করে তাদে বিস্মিত হৃদয়াবেগের প্রকাশ করেছিল তেমনি এক সংজ্ঞাহীন অনুভূতি প্রকাশের বেদনায় আধুনিক মানু উদ্বেল করে তোলে। হঠাৎ মনে হয় জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র যেন একটু খুলি খুলি ক'রছে এবং তারা বিন্দু দীপ্তিতে মাথার যেন বোধ উঠে যাচ্ছে।

এ পরিচিত পৃথিবীর যেন সবটাই একেবারে চেনা নয়, এর বাইরে আরও কিছু আছে একটা মনোভাব নিয়ে গ্রাণ্ড ক্যানিয়ন ছেড়ে চলে আসতে হয়।

অ্যারিজোনার পেইনটেড্ ডেজার্টের মধ্য দিয়ে গাড়ি আবার এগিয়ে চলে। ধূসর রঙএর এবং প্রস্তরীভূত বৃক্ষের বিচিত্র রঙ্ থেকেই এ অঞ্চলের নাম হয়েছে 'রঙীন মরুভূমি'। বহু যুগ আ অঞ্চল নাকি জলাভূমি ছিল এবং এ সব গাছ জলস্রোতে ভেসে এসে আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের তলায় চাপা ছিল ; খনিজ সাইলিকা আয়রণ অকসাইড এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থের সঙ্গে মিশে এইসব এমন রামধনুর রঙে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে। এই 'রঙীন মরুভূমি'র শুষ্ক শুভ্রহীন উষর অঞ্চলে চলতে সবুজ গাছপালা দেখবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে ; রঙীন বালি এবং শিলীভূত রঙীন শুষ্ক বৃক্ষের

গরমে গাড়ির র‍্যাডিয়েটর গরম হয়ে গেলে জল দিয়ে ঠাণ্ডা করা যায়। জলের ব্যাগগুলো গাড়ির বা ঝুলিয়ে রাখে জলটা ঠাণ্ডা রাখবার জন্য।

অ্যারিজোনা, নিউ মেক্সিকো এবং টেক্সাসের উষর অঞ্চল পার হয়ে গাড়ি ছোটে স্বর্ণপ্রদেশ ক্যা কোর্ণিয়ার দিকে। আমেরিকার মধ্য অঞ্চলের রুক্ষভূমির পরে এ অঞ্চলের শ্যামশোভা মনকে টানে। রাস্ত দুপাশে দেখা যায় কমলালেবু এবং আপেলের বিস্তৃত বাগান। প্রশান্ত মহাসাগরের কাছে এসে পড়েছি বার্তা জানিয়ে দেয় পামগাছের সারি। মরুভূমির উত্তপ্ত হাওয়ার পরে পাওয়া যায় ক্যালিফোর্ণিয়ার চির ব বাতাসের সোহাগ পরশ। পাহাড় এবং সমুদ্রের মিলিত সম্ভাষণ।

ক্যালিফোর্ণিয়ার বৃহত্তম নগরী—লস এঞ্জেলেস্‌এর খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী। কমলালেবুর চাষ, পেট্রো উৎস এবং সর্বোপরি চিত্রজগতে হলিউডের খ্যাতিই এ নগরীর সমৃদ্ধির কারণ।

অতি আধুনিক শহর লস্ এঞ্জেলেস্ বিরাট উঁচু, সিটি হল, ফেডারেল বিল্ডিং প্রভৃতি বাড় গুলি থা সত্ত্বেও নিউইয়র্কের মত রাস্তা অন্ধকার হয়ে ওঠে নি ; সব সময়েই ঝকঝক করছে শহরটি।

এ শহরের বিখ্যাত অঞ্চল হলিউড যেন একটা ভিন্ন শহর। এখানকার হলিউড বুলভার্ডের উপ গ্রোম্যানের চীনা থিয়েটারে তারা একটা মজার জিনিস দেখেছিলাম—ভূগুপদ চিহ্নধারী ধরিত্রীর মত থিয়েটারের প্রাঙ্গণ সহস্র চিত্রতারকার পায়ের ছাপ সযত্নে বাঁধিয়ে বুকে ধারণ করে রয়েছে। চিত্রতা পদচিহ্ন লাঞ্ছিত পদরেণু এখানকার বালক-বালিকা তরুণ-তরুণীর পূজ্য। রাত্রিবেলা নাকি কখনো কখনে পদচিহ্ন অপহরণের চেষ্টাও চলে। প্রশস্ত হলিউড বুলভার্ডের উপরে অনেকগুলি নাম করা স্টুডিও হলিউডে ঢুকবার আশায় অনেক মেয়ে এ শহরে অল্প চাকুরি নিয়ে আসে। সানসেট বুলভার্ড এখানক সবচেয়ে সুন্দর রাস্তা। এ রাস্তায় মাইলের পর মাইল গাড়ি নিয়ে ছুটে যাবার তুলনা হয় না। বেভা হিলস্ এখানকার সবচেয়ে ঐশ্বর্য অঞ্চল। প্রথম শ্রেণীর চিত্রতারকারা এখানে বাস করেন। ছবির সাজানো বাহার, সুন্দর সুন্দর বাড়ী, চমৎকার বাগান।

এখানে খুব ভাল ভাল অনেক বীচ আছে ; সবচেয়ে ভাল লেগেছিল হলিউডের সন্নিকট সান্টামনি বীচ।

বেভারলি হিলসের কাছে ওয়েস্ট উড বিলেজে আছে মস্তবড় ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ; এখান ছাত্রছাত্রীরা গত ক'বছর ধরে প্রতি গ্রীষ্মে ভারতবর্ষ বেড়াতে আসছে।

লস এঞ্জেলেস অতি আধুনিক শহর কিন্তু পুরনো এবং নতুন জগৎ—ইয়োরোপ এবং আমেরি অদ্ভুত সংমিশ্রণ ভূমি সানফ্রানসিস্কো নগরী। পাহাড় এবং প্রশান্ত মহাসাগর মিলে শহরটিকে অসা সুন্দর করে রেখেছে। একদিকে রয়েছে বিশ শতাব্দীর আধুনিকতম সেতু—গোল্ডেন ব্রীজ—অন্য দি আছে অতি প্রাচীন তারে টানা 'কেবল কার'। কেবল কারে চড়ে হোয়ার্ফ অঞ্চলে চলে গেলে মনে যেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে চলে এসেছি। হোয়ার্ফের ধারের ছোট ছোট ভিন্ন দেশীয় রেস্তোরাঁগুলোর ভূ চলে ইটালীর কাপ্রি অঞ্চলের সঙ্গে।

সানফ্রানসিস্কো শহরটিকে অতি সুন্দর দেখায় সানফ্রানসিসকো ওকল্যাণ্ড ব্রীজ থেকে। এ শহ

যা পেয়েছি যা পাইনি..

তার হিসেব ক'রে লাভ কী? অল্পস্বল্পে যা পেয়েছি, তাকে ভালো ক'রে রাখবার চেষ্টা করব, আর যা পাইনি অথচ চাই, তা করতে হবে পাবার চেষ্টা।

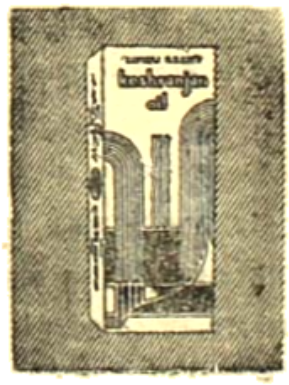

আপনার চুল ভাল জাতের হ'লে আপনার একমাত্র চেষ্টা হবে তা'র সৌন্দর্যটি বজায় রাখা। আর তেমন না হ'লে মোট-কথা চুলের জাত যেরকমই হোক না কেন, কেশরঞ্জন তেল তাকে শ্রীবৃদ্ধি করবেই।

কেশরঞ্জন একটি অভিজাত প্রসাধনী হলেও এর আবেদন কিন্তু সকলেরই জন্য জেনে

প্রস্তুতকারক এন,এন সেনের

কেশরঞ্জন

কোণিয়ার জলবায়ু এবং সৌন্দর্যের খ্যাতি জগৎজোড়া, প্রতিবছর বহুলোক আসে এখানে বেড়াতে ফিরবার পথে কেউ হয়ত মেক্সিকোতে ঘুরে যায় স্প্যানিশ সভ্যতা এবং বুল ফাইটের একটু নমুনা সংগ্রহ করে

কেউ কেউ ছুটিটা কাটাতে চান দেশের বাইরে—সমুদ্র পাড়ি না দিয়ে তারা চলে যান গ নিয়ে কাছাকাছির বিদেশ কানাডায়। নায়েগ্রা ফলস্‌এ মধুযামিনী কাটানো এদেশের তরুণ-তর স্বপ্ন। নায়েগ্রার উপরের রেনবো ব্রীজটা পার হয়ে ঢোকে কানাডায়। মুগ্ধ নেত্রে দেখে আমেরি এবং বিশাল অশ্বখুরাকৃতি ক্যানেডিয়ান ফলস্‌। প্রচণ্ডবেগে জলপড়ার তোড়ে জলের অতি ক্ষুদ্র অসংখ্য কণিকা ছিটকে এসে কুয়াশার সৃষ্টি করে—তারই নাম মিস্টিক স্প্রে; নব বিবাহিত দম্পতি মুগ্ধ হয়ে সে দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে দেখা যায়।

নায়েগ্রা ফলস পার হয়ে চমৎকার এলিজাবেথ পার্ক-ওয়ে ধরে এগিয়ে চলে গাড়ি, পাশে প দেখা যায় লেক অন্টারিয়োর নীল জল। টোরোন্টো শহর ছাড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে চলে গ্যানানকীর দি সেণ্ট লরেন্স নদী এবং অন্টারিয়ো হ্রদ মিশে যেখানে সহস্র দ্বীপ তৈরী হয়েছে; চলতে চলতে গাড়ি থে লোকে বোট নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দ্বীপগুলো দেখে। স্বামী বিবেকানন্দ এক সময় এর একটি দ্বীপে কিছুদি বাস করেছিলেন। বোট ছেড়ে আবার গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলে কানাডার রাজধানী অটোয়ার দিকে ক্যানালের পাশের সুন্দর রাস্তা'টা ধরে ঢুকে পড়ে শহরে তাড়াতাড়ি পার্লামেণ্ট, গীর্জা এবং অন্যান্য দ্র স্থানগুলো দেখে নিয়ে এগিয়ে চলে মন্ট্রিয়ালের দিকে। মন্ট্রিয়ালে না পৌঁছানো পর্যন্ত প্রকৃত বিদে স্বাদ পাওয়া যায় না। এখানে এসে তবেই একটু ফরাসী সভ্যতার স্বাদ পাওয়া যায়, এখানকার নো দাম গীর্জার গঠন ভঙ্গিতে, ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং রাস্তার পাশের খোলা কাফেতে প্যারিসের প্র সুস্পষ্ট। কুইবেকই প্রকৃত ফরাসী এলাকা। মন্ট্রিয়ালে ইংরেজী এবং ফরাসী দুটো ভাষাই চলে, কুইবে ভাষা ফরাসী। কুইবেক পুরনো শহর, সমুদ্র থেকে থাকে থাকে শহর উঠে গেছে, শহরটাকে সুরক্ষি করবার জন্য এককালে খুব যত্ন নেওয়া হয়েছিল, সমুদ্রের ধারে পুরনো আমলের কামান এখনও সাজা রয়েছে, শহরে ঢুকতে হলেও গেট পেরিয়ে তবে ঢুকতে হয়। কুইবেক সুন্দর শহর, এখানকার পুর ধরনের বাড়ী, ফরাসী ছাদের chateau এবং শহরে ঢুকবার গেট সব মিলিয়ে কুইবেক শহরকে এমন এ বৈশিষ্ট্য দিয়েছে যা আমেরিকা মহাদেশে বিরল।

কুইবেক থেকে উত্তর দিকে এগিয়ে গেলে লরেন সিয়ান পর্বতে যাওয়া যায়; লরেন সিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য জগৎ বিখ্যাত। ঘন পাইন গাছের বন্য দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে। গাড়ি মাইলের মাইল ছুটে চলে সেই রাস্তা ধরে। গ্রীষ্মকালে অনেক লোক আসে এখানে ক্যাম্প করে থাকতে, কে আসে ট্রাউট মাছ ধরতে, কেউ আসে শিকার করতে, কেউ আসে শুধু প্রকৃতির কোলে ক'টা দিন কাটা ছুটির সময়টা এভাবে বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্য অর্জন করে আবার গাড়ি নিয়ে ছোটে যে যার কর্মস্থানের উদ্দে

বেড়াবার এত জায়গা এবং চলবার এত পথ থাকাতেই বেড়াতে যাওয়ার স্থান নির্বাচন ক এত শক্ত। এ বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত আমেরিকান অটোমোবিল অ্যাসোসিয়ে

যেয়। হোটেল বা মোটেল ও এদের দিয়ে রিসার্ভ করানো যায়, আর পাওয়া যায় হোটেল বা মোটে নাম এবং মূল্য তালিকা।

মোটেলগুলি এ দেশের নিজস্ব জিনিস; মোটর গাড়ি নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার রেওয়াজ যা সঙ্গে সঙ্গে মোটেলের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে চলেছে। মোটর এবং হোটেল এ দু'টি কথা। মোটেল শব্দটির উৎপত্তি, গাড়ি এবং মানুষ দু'য়েরই থাকবার ব্যবস্থা মোটেলে করা হয় মানুষ এবং গাড়ির মধ্যে কোনটা মুখ্য এবং কোনটা গৌণ সেটা বলা মুস্কিল। হাইওয়ের পাশে শহর থেকে একটু দূরে প্রচুর জায়গা নিয়ে মোটেল তৈরী করা হয়। হোটেলের মত ঘর, ব এবং উপরন্তু একটা গ্যারাজ বা অন্তত মোটর রাখবার জায়গা প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে ব মোটেলের চেহারা বাইরে থেকে দেখতে বাংলো প্যাটার্নের, ঘরের ভেতরের ব্যবস্থা অতি আ হোটেলেরই মত—চমৎকার ফার্নিচার, টেলিভিসন, শীতের দিনে সেন্ট্রাল হীটিং এবং গরমের সময় কণ্ডিশানের সমস্ত ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ। বাইরে বেড়াবার সময় সারাদিন গাড়ি নিয়ে ছুটে সন্ধ্যেবেলা মোটেলে আসে রাত কাটাতে। আগে থেকে মোটেল রিজার্ভ করা না থাকলে বিকেল পাঁচটা বা মোটেল খোঁজার তাড়া পড়ে যায়। দেরী হলে হয়ত সব মোটেলে জায়গা ভর্তি হয়ে যাবে, তখন বেলা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে আবার মোটেল খুঁজতে কতদূর চলতে হবে কে জানে।

অনেকের উৎসাহ সারাদিন গাড়ি চালিয়েও শিথিল হয় না; তারা মোটেলে জিনিসপত্র জিনার খাওয়া সেরে গাড়ি নিয়ে চলে যায় ড্রাইভ-ইন থিয়েটার দেখতে; প্রকাণ্ড খোলা জায়গ উঁচু স্ক্রিনে ছবি দেখানো হয়, টিকিট কিনে গাড়িটা নিয়ে ভেতরে চলে যেতে হয়, খালি জায়গা গাড়িটা রেখে গাড়িতে বসেই ছবি দেখতে হয়, গাড়িটা রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই সিনেমার লোক একটা মাইক গাড়িতে ফিট করে দিয়ে যায়; ছবির শেষে গাড়ি চালিয়ে চলে আসা, সাধারণ সিনেম ঢুকবার আগে গাড়ি পার্ক করবার জায়গায় খোঁজে এখানে বিব্রত হতে হয় না।

গাড়ি নিয়ে চলতে চলতে রবিবারের উপাসনার কাজটা সেরে নেবার জন্য আছে কি ড্রাইভ-ইন চার্চ। এগুলির অনুকরণে আজকাল তৈরী হচ্ছে ড্রাইভ-ইন ব্যাঙ্ক। চলতে চলতে থেকেই ব্যাঙ্কের কাজটাও সেরে নিতে পারা যায়, পার্কিং এর জায়গার খোঁজে আর সময়ের হয় না।

চলতে চলতে গাড়িটা ময়লা হলে খোঁজ করতে হয় একটা অটো-লণ্ড্রির; মিনিট দোকান পেলে খুব অল্প সময়েই ধোয়ানোর কাজটা সারা যায়। মিনিটম্যানের দোকানে দরজাটা বন্ধ করে নিয়ে যায় একটা ঢাকা জায়গায়, সেখানে সুইচ টিপলেই সাবান এবং বিশ্ব গাড়িটাকে সব দিক থেকে পরিষ্কার করে দেয়। তারপর আর একটু এগিয়ে আর একটা সুইচ টিপলে দিক থেকে ফোয়ারার মত জল এসে গাড়িটাকে ধুয়ে দেয়; গাড়িটা তাড়াতাড়ি মুছে যায় গাড়ি ফিরিয়ে দেয়, গাড়িটা ধোয়া মোছা হতে সবশুদ্ধ দু মিনিট সময় লাগে।

রাতটা মোটেলে কাটিয়ে ভোরবেলা উঠেই আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে হয়·পুরো ব্রে পাওয়া গেলে ভাল না পাওয়া গেলে চা কফি, যা হোক কিছু খেয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে।

পেছানো ধুমায়িত কফি নিয়ে একটু বিশ্রাম—তারপরেই আবার গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলা। বারে পরেই আবার সুরু হবে লাঞ্চ খাওয়ার জন্য পছন্দ মত একটা রেস্তোরাঁর সন্ধান; একটার পর এ রেস্তোরাঁ ছেড়ে গাড়ি এগিয়ে যাবে আরো ভালোর অনুসন্ধানে। দূরে অনেকখানি জায়গা সাজানো-গোছানো হাওয়ার্ড জনসনের রেস্তোরাঁটা, কিম্বা ঝকঝকে ডাইনারটা সহজেই চোখে প রেস্তোরাঁ এবং ডাইনার পছন্দ করতেই অনেক সময় কেটে যায় তাও হয়ত পরিবারের সবার পছন্দের সঙ্গে পু পুরি মিল হয় না, পেছনে ফেলে-আসা রেস্তোরাঁটা বেশ রমনীয় মনে হয় লাঞ্চটা সেরে কড়া কাপ কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে, যাতে দিবানিদ্রা কাছে ঘেঁষতে না পারে। গাড়ির তেল এবং টায়ার পরীক্ষা করিয়ে, পেট্রোল ভর্তি করে আবার যাত্রা সুরু।

পথ চলতে চলতে কেবল চোখে পড়ে গাড়ি আর গাড়ি, অগুন্তি গাড়ির স্রোত। সমস্ত দ এমন পাগলের মত ছুটছে কোথায়? চাকা, গাড়ি, পথ আর উদ্দাম গতির বেগ—এই নিয়েই চ সভ্যতা। হলিডে থেকে ফিরে এসে হয়ত একবার মনে করে আর কিছুদিন অন্ততঃ গাড়ি নিয়ে ছু না, কিন্তু সপ্তাহান্তে দেখা যায় আবার তেমনি বেগে গাড়ি নিয়ে ছুটে চলেছে—কোথায় কে জা এরা গর্ব করে বলে,— Americs on wheels, America on the go. এ যাত্রার শেষ নেই, কোন্ দু নিয়তি অবিশ্রাম গতিতে এদের টেনে নিয়ে চলেছে! অনন্ত যাত্রার অভিশাপ এদের কে দিলো?

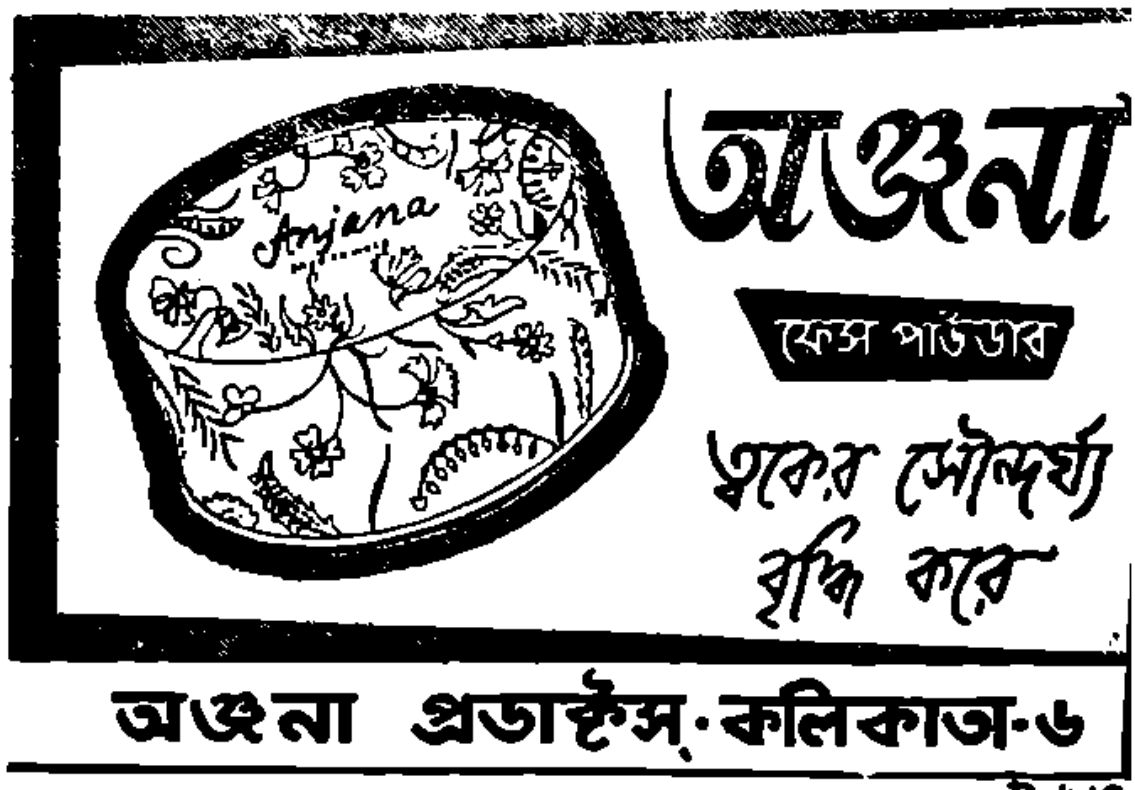

রবীন্দ্র যুগ

খাওয়া সময় আহার, মাথার উপর একটা ছাদ আর পরনের কাপড়—আপনার আয় বাদের হিসেবের মধ্যে এই তিনটি বিষয়ের ব্যবস্থা রাখতেই হবে ; কিন্তু চতুর্থ বিষয়—আপনার ভবিষ্যতের ব্যবস্থা। সন্তানদের লেখাপড়া, মেয়ের বিয়ে, আর বুড়ো বয়সের নিশ্চিন্ত অবসর।

আপনার নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য আপনার বর্তমান আয়ব্যয়ের হিসেবে এই চতুর্থ বিষয়টি হোক জীবন বীমা। সামান্য টাকায় অনেক কিছু করার সহজতম উপায় হ'ল এটি। ভবিষ্যতে আপনার যখন আর উপার্জনক্ষমতা থাকবে না, তখন জীবন বীমার মাধ্যমে সঞ্চিত আজকের সামান্য অর্থ বহুগুণ হ'য়ে আপনার হাতে ফিরে আসবে। পলিসি নেবার দিন থেকেই আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা একটি আর নির্দিষ্ট হ'য়ে রইল।

চতুর্থ বিষয়

রবীন্দ্র যুগ

কালিদাস নাগ

গ্রন্থ-ভারতীর সাদর আমন্ত্রণে সুরু করি রবীন্দ্র কথা ও কাহিনী। ১৯১১ থেকে ১৯৪১ অর্থাৎ শুরুতে ৪০ থেকে ৮০ বছর পর্য্যন্ত তাঁর জীবন ও রচনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছি, আমাদের মত দুচার চলে গেলে হয়ত সে সব কথা বলবার বেশী কেউ থাকবে না। তাই অনেক বন্ধু ও সহকর্ম্মীদের তাগিদে র শতবার্ষিকী স্মরণে লিখে যাই।

১২৬৮ সালে ২৫শে বৈশাখে জন্মে যখন ১৩০০ সালে পদার্পণ করেছেন তখনই রবীন্দ্রনাথ "১ সালে কবিতায় লিখেছিলেন :

'তোমাদের শতবর্ষ আগে
সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে—
কত কথা, পুষ্প প্রায় বিকশি তুলিতে চায়
কত অনুরাগে
একদিন শতবর্ষ আগে!

১৫ই আশ্বিন ১৩০৩ সালে দেখি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম তাঁর কাব্য গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় লিখছেন "অ সমস্ত কাব্যগ্রন্থ একত্র প্রকাশিত হইল; এজন্য আমার স্নেহভাজন (তাগিনেয় সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ প্রকাশকের নিকট কৃতজ্ঞ আছি"। ৺সত্যপ্রকাশবাবু ও তাঁর পুত্র শিল্পী সুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যা জোড়াসাঁকো ও বরোদায় বহুবার দেখেছি ও তাঁদের কাছে অনেক সেকালের গল্পও শুনেছি, বহুত বেশী কিছু লিখে যাননি। কিন্তু বন্ধুবর প্রশান্ত মহলানবীশও আমার কাছে ১৩০৩ সালে প্রকাশিত "টালী এডিশন" স্থায়ী প্রেরণার উৎস হয়ে আছে; সেই বইখানি বুকে ধরে রবীন্দ্র কথা সুরু করলাম।

২৩শে চৈত্র ১৩০০ (১৮৯৪) সালে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের গুরু বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গারোহণ কর রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব্ব অর্ঘ্য রচনা করে বঙ্কিম স্মৃতিসভায় পড়েছিলেন সেটি বাঙলা গদ্যের আদর্শ হয়ে আ মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে অসুস্থ বঙ্কিমচন্দ্রই সভাপতিত্ব করেন যে সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমর প্রবন্ধ পাঠ ক "ইংরাজ ও ভারতবাসী"। বঙ্কিম শুনে যান রবীন্দ্রনাথ (মাত্র ৩২ বছরের যুবক) শিখদের শেষ গুরু গো সিংকে স্মরণ করে বলছিলেন—

"অন্যের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না; প্রাণ-পণ নি সহিত ত্যাগ স্বীকারেই প্রকৃত কার্য্যসিদ্ধি"। ১৩০০ অব্দানে দুটি কবিতা যেন মাতৃভূমি বাঙলাকে

কবি! তবে উঠে এস। যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই কর আজি দান।
বড় দুঃখ বড় ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র শূন্য, বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার!
অন্ন চাই প্রাণ চাই আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট! এ সৈন্য মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।"

১৩০১ সালে অপূর্ব্ব কবিতা "মৃত্যুর পরে" লেখা : হরত বঙ্কিম ও কবি বিহারীলালের মৃত্যুর স্মরণে।

২৪শে অগ্রাণ ১৩০২ "স্বর্গ হতে বিদায়" লিখেছিলেন

হে জননী পুত্রহারা!.....
দুঃখে সুখে ভরে ভরা প্রেমের সংসারে
তব গেহে তব পুত্রকন্যার মাঝারে
আমারে লইবে চির পরিচিত সম।

১৮৭২ সালের বঙ্গদর্শনের যুগ থেকে, ৩০।৩৫ বছরের রবীন্দ্রনাথ "সাধনার যুগ" (১৮৯১-৯২) বাঙালীর হাত ধরে পৌঁছে দেন।

কবি-জনোচিত স্বর্গ রাজ্য থেকে রবীন্দ্রনাথ নেমে সুখ-দুঃখ ভরা এই বাঙলার মাটিতে ক কলমে লেগেছিলেন, "সাধনা" পত্রিকার ছোট গল্পে ও চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে (হরত বঙ্কিম প গেছেন) সাধনার নূতন তাৎপর্য্য পাই। কবি প্রথম বিলাত ভ্রমণ, প্রায় তিন বছর সেরে (১৮৭৮–১৮৮ আবার দশ বছর পরে মাত্র তিন মাস (১৮৯১) ইউরোপে কাটিয়ে আসেন; প্রথম "ইউরোপ প্রবা পত্র" (ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত দাদা দ্বিজেন ঠাকুরের মন্তব্যসহ) ও বালক রবির নব গদ্যরীতি আজও বি ব্যাপার। দ্বিতীয় বিলাত যাত্রা (১৮৯০ আগষ্ট-নভেম্বর) তিন মাস মাত্র হলেও 'সাধনার' মত পত্রি প্রকাশের মাল-মসলা জুগিয়েছিল। আর এক নূতন গদ্য রীতি "পঞ্চভূতের ডায়েরী"তে পাই : এ খানিও নূতন করে পড়তে অনুরোধ করি—ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূত নিয়ে গদ্য নাটে ছাচে ভিন্ন রচনার সূচনা রবীন্দ্রনাথ করেন এবং কবি বন্ধু নাটোর মহারাজ জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়কে সে উৎসর্গ করেন। তিনিই ছিলেন কবির ৫০ জন্মোৎসব আয়োজনে প্রধান উদ্যোক্তা টাউন হলে যেখেরি

এনামেলের বাসন

● দামে সস্তা ● ভারে লঘু ● ব্যবহারে টেঁকসই ● বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর।

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিমিটেড

২৪. চিত্তরঞ্জন এভিনিউ. কলিকাতা—১৩

আমার অবনীন্দ্রনাথ মৃদঙ্গের প্রথাত কলাবিৎ ছিলেন, তিনিই ১৯১৭ সালে পাখোয়াজ-সঙ্গত
কবির বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে—

যেথা যেথা নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরি
দিন আগত ঐ ভারত তবু কৈ ?

মহারাজ নাটোর ও গল্প রসিক ব্যারিষ্টার প্রভাত মুখোপাধ্যায় 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিক
কাল প্রকাশ করেন। ১৯ শতকের শেষ দশকের এই সব রবীন্দ্র বন্ধুদের কথা মনে পড়ে গেল।
তাঁর প্রতিপক্ষ দল সুরেশ সমাজপতির নেতৃত্বে,—'সাহিত্য' পত্রিকায় সাহিত্যিক যুদ্ধ ঘোষণা করেন
জের চলে ১৯১১ সালের রবীন্দ্র জন্মোৎসব পর্য্যন্ত। ইতিমধ্যে প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যগুরু বঙ্কি
বঙ্গদর্শন নব পর্য্যায় চালিয়ে স্বদেশী যুগের গোড়াপত্তন করেন (১৯০১-১৯০৪); এমনি নানা যুগে
রূপ সাহিত্য-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ দেখা দিয়েছেন।

রবীন্দ্র গল্প সাহিত্য নূতন-চোখে পড়া দরকার। ভারতী প্রভৃতি প্রাচীন পত্রিকায় তাঁর গল্প
থাকলেও "সাধনা"তেই—প্রায় ২.৪ বছর ধরে প্রকাশ হয়; ১৩০২ সালে সাধনা উঠে যায় কিন্তু রো
এক অভিনব গল্প সাহিত্য ; পূর্ব্ববঙ্গে বন্ধুত্বাগের কাজে যখন কবির জমিদারী পতিসরে গিয়েছি মনে প
সেখানে লেখা ছোট গল্পগুলি—কোনটাই তোলা যায় না, গল্পের সঙ্গে প্রতিমাসে লিখেছেন প্রবন্ধ,
কৌতুক কত কি। তার সঙ্গে সমসাময়িক পত্রিকা (ইংরেজী ও বাঙলা) থেকে 'সাময়িকী' ও
প্রবর্ত্তিত বঙ্গদর্শনের অনুসরণে গ্রন্থসমালোচনা। ইউরোপে সমালোচনা ও সাহিত্য পর্য্যায়ে উঠেছে। সে
যান বজায় রেখে বাংলার সমালোচনা সাহিত্যও রবীন্দ্রনাথ গঠন করেন। বিদ্যাসাগর (মৃঃ ১৮৯১) ও
(১৮৯৪) সাহিত্য দিয়ে সুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান ও দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গ
সাহিত্য—এমন কত ভাল সমবদ্ধারী সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ করে গেছেন, ৪০ বৎসরে পদার্পণ (
করে নব পর্য্যায়ে বঙ্গদর্শন সম্পাদনার আগেই। সুরকার দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সমবদ্ধার ছিলেন রবী
বন্ধুভাবে পাল্লা দিয়ে দুজনে বর্ষাসঙ্গীত রচনা করেছেন ও দোলপূর্ণিমায় দুজনে আবির নিয়ে মা
করেছেন, এসব কথা কবির মুখেই শুনেছি; বন্ধুবর দিলীপকুমার রায় বহুস্থানে এসব প্রসঙ্গ লিখে
কবিগুরুর একান্ত স্নেহলাভে ধন্য হয়েছেন।

সাধনার-যুগমাত্র ৪ বছর হলেও তাই গভীর তাৎপর্য্য নিয়ে আজ দেখা দেয়; তাই আ
বঙ্কিমের হাতে যে বঙ্গদর্শন প্রকাশ হয় তার যেমন পুনর্মুদ্রণ হয়েছে, তেমনি রবীন্দ্র শতাব্দী উপলক্ষ্যে
থেকেও সংকলন করা উচিত, বঙ্কিম যুগের গল্প রাবিন্দ্রিক গল্পে কেমন রূপান্তরিত হল। বৌঠাকুরা
থেকে সুরু করে গল্পগুচ্ছের সার্থক সৃষ্টি 'নষ্টনীড়' ক্রমশ চোখের বালি ও নৌকা ডুবি উপন্যাস ব
বেরুল—সে সব কথা ও কাহিনী উদ্ধার করা উচিত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) লাভ
গেছেন যে 'চোখের বালি'র নায়িকা বিনোদিনী ও "গোরা" তাঁকে কত বড় প্রেরণা দিয়েছিল;
অন্তর্দাহে শরৎ সাহিত্য বিকশিত হয়; গল্প-সাহিত্যের পুষ্টি দুজনে পাশাপাশি কেমন করে গেছে
প্রকাশ করলে 'গল্প-ভারতী'তে সাদরে ছাপা উচিত।

কিন্তু 'গল্পগুচ্ছে'র ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বসাহিত্যিক হয়েছিলেন, মুগ্ধ হলেও তাঁর ৫

ধবধবে কাপড় পরে
খুশী মনে খেলা করে,
পাড়ার যত মেয়ে মিলে—

— এদের জামাকাপড়

অ্যাস্কো
দিয়ে কাচা

গল্পগুচ্ছ একদিন বিশ্বসাহিত্যে আবৃত হবে এবং তাঁর কথা বলেছে। গল্পগুচ্ছের কাবুলীওয়ালা ও ক্ষুধিত পাষাণ দেখেছি ইউরোপ আমেরিকা পার হয়ে বিশাল সোভিয়েটে লক্ষ নরনারীর হৃদয় জয় করেছে। ৫০ রবীন্দ্র জন্মোৎসবে (১৯১১) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন—

জগৎ কবি সভায় মোরা তোমারি করি গর্ব্ব
বাঙালী আজি গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব্ব ॥

কিন্তু তাঁর কুড়ি বছর আগে (১৮৯১-৯৫) বঙ্কিম তিরোধানের পর রবীন্দ্রনাথ—শুধু গানের নয়—গ রাজা; এ যুগের ক'জন গল্প সাহিত্যিক সেকথা স্মরণ রেখেছেন? গল্প-ভারতী তাঁদের সন্ধান করুক; ভারতের আধুনিক সাহিত্যে যত গল্প বেরিয়েছে একা বাংলা গল্প সাহিত্য—মাপে ও সাহিত্যিক মানে—সব ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে।

অল্পকাল স্থায়ী 'সবুজ পত্রে'র মত 'সাধনা'ও বাংলার সাময়িক ও গল্প সাহিত্যে স্থায়ী প পেয়েছে। অথচ আগাগোড়া অমূল্য রচনায় পরিপুষ্ট করলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র (মনীষী দার্শনিক দ্বিজেন ঠাকুরের পুত্র) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্পাদক করেছিলেন। তিনি ছিলেন নীরব ক সজাগ সাহিত্যিক। তাঁকে ১৯০৯-১০ সালে শিলাইদহে দেখেছি ও তাঁর কাছে বসে অনেক কথা শু তাঁর যোগ্য পুত্র বন্ধু সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুরোধ করি সুধীন্দ্রনাথের রচনা সংকলন ও জীবনী নি নিপুণ তুলিকায় সুধীন্দ্রনাথও বহু গল্প রচনা করে গেছেন, বাঙালী প্রায় ভুলেছে। সৌম্যের ম্য আমাদের মধ্যে আছেন—জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে লেখিকা কেউ গিয়ে তাঁর শয্যা পার্শ্বে বসে সেকালের র রবীন্দ্র-সুধীন্দ্র সম্বাদ—লিখে নিতে পারেন। পূজনীয়া ইন্দিরা দেবীর তিরোধানে সে যুগের সেরা সা আমরা হারিয়েছি, তাঁকে লেখা চিঠিগুলি ইন্দিরা দেবী 'ছিন্নপত্র' নামে জীবন স্মৃতির সঙ্গে ১৯১১ প্রকাশিত করেন। ইন্দিরাদেবী ও তাঁর মনীষী স্বামী প্রমথ চৌধুরী সেই 'সাধনার যুগ' থেকেই সবুজ সাহিত্যালোচনা সুরু করেন। মস্কো যাত্রার পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনে দেখবার যখন প্রথম করে বিদা তখন ইন্দিরা দেবী আশ্বাস দিয়েছিলেন—যদি আমি থাকি রবীন্দ্র শতাব্দী উপলক্ষে সেকালের কথা লি তাঁর পিতৃদেব সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৮৬২ সালে মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে যখন বিলাতে যান—রবী মাত্র এক বছরের ও সেই সেই শিশু রবির খবর বিলাতের চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। বীণ সত্যেন্দ্রনাথকে দেখা ও তাঁর আবৃত্তি শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল; নব পর্য্যায় বঙ্গদর্শনের স রবীন্দ্রনাথ তখন আবার ঝাঁপ দিয়েছেন আত্মদর্শনে কারণ নিজের সংসারে মৃত্যু হানা দিয়েছে।

জমিদারী ছেড়ে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার (১৯০১) এক বছর প্রথম আঘাত একনিষ্ঠা জীবনসঙ্গিনী মৃণালিনী দেবী ৭ অঘ্রাণ ১৮০৯ (১৯০২) সালে গেলেন! নৌকাডুবির লেখক জীবন সমস্যার ও কন্যা ও ২ পুত্র নিয়ে যেন হাবুডুবু খাচ্ছেন ' কাব্যে ও খেয়ায় তার প্রমাণ পাই। ১৩১০ আশ্বিন সেজ মেয়ে রেণুকার (রাণী) মৃত্যু পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৬) গত হলেন এবং পর বৎসর শিশু পুত্র শমীন্দ্র হঠাৎ কলেরা আক্রান্ত হয়ে চলে গেল;—সেই সব প্রচণ্ড আঘাত কবি পিতার স্মরণ নেন ! করে কয়ন গীতাঞ্জলীর অধ্যাত্ম সঙ্গীত ধারায় ও ডাকঘরে (১৯১২) অমর রূপ নিয়েছিল। ৫০ ব

করতেন। 'নৌকাডুবী', 'চোখের বালি', শরৎোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত লিখে বাঙলা উপন্যাস সাহিত্যের মহাক 'গোরা' (১৯১০) ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে প্রকাশ করেন। সাহিত্যিক ও জনসাধারণের প্রাণে বিরাট জাগরণের উন্মেষ রবীন্দ্রনাথ করেন সেসব কথা পরে জানাব।

১৯০১ থেকে ১৯১১ আবার স্বদেশী যুগ ও সন্ত্রাসবাদের সন্ধট কাল; তারই পটভূমিকায় সেকা রবীন্দ্র রচনা বুঝতে হবে। ১৮৮১ শিক্ষার্থী রবীন্দ্রনাথ যখন তিন বছরের ইউরোপ প্রবাস কোরে দেশে ফে তখন থেকে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা বিকসিত হয়। দেশাত্মবোধ তাদের ঠাকুর পরিবারে জন্মগত: ই পিতা দেবেন্দ্রনাথ জাতীয় মহাসভার উদ্বোধনে (১৮৮৫) হাজার টাকা চাঁদা দেন ও রবীন্দ্রনাথ "আ দিয়েছি আজ মায়ের ডাকে" প্রভৃতি স্বদেশী গান লেখা সুরু করেন, সেসব কথা আমার "সুরের গুরু রবীন্দ্রনা গ্রন্থে লিখেছি। ১৯১১ সালে বিলাত থেকে ফিরে আর এক কংগ্রেস মণ্ডপে তাঁর দেবদুর্লভ ক বঙ্কিম রচিত জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম' একা গেয়ে বিরাট জনতাকে মুগ্ধ করেন। Lord Curz (১৮৯৯-১৯০৫) এসে বঙ্গচ্ছেদ ও উৎপীড়ন সুরু করবার আগেই সত্য জাতীয় কবি রূপে রবীন্দ্র বিভিশীবু ও অত্যাচারী পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কণ্ঠরোধ (প্রেস আইনের প্রতিবাদ) ও স্বদেশী সমাজ (১৯০ যেমন প্রাণমাতান গদ্য রচনা করেন, তেমনি 'শতাব্দীর সূর্য্য অস্ত গেল', 'হিংসার সমাপ্তি আঘাতে' প্রভৃ কবিতাকে Boer যুদ্ধ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯০০-১৯১৪) পর্য্যন্ত সাধন সঙ্কেত সমগ্র জাতি দিয়েছেন; 'স্বদেশী গান' সে যুগে বাউলরূপে প্রকাশ করে জাতিকে মরণের সম্মুখীন হতে শিক্ষা দিয়েছে সেকথা গান্ধীজী বুঝেছিলেন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানে যখন শুধু বাংলা নয় সমগ্র ভারত দ্বিধাবি তখন নোয়াখালি যাত্রার পূর্ব্বে গুরুদেবের গান শিখে গান্ধীজী বাংলার ছেলে-মেয়েদের প্রার্থনা সভ গাইয়েছিলেন তা নিজে তাঁর কাছে বসে শুনেছি—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চলরে।"

গুরুদেব চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর ঐ মরণ-বরণের গান গান্ধীজীকেও (১৮৬৯-১৯৪৮) প্রেরণা দিয়েছিল তিনি যেমন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (১৮৪৪-১৯২৬) 'বড় দাদা' বলতেন তেমনি রবীন্দ্রনাথকে—১৯১ সালে শান্তিনিকেতনে আশার পথ থেকে বরাবর গুরুদেব বলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছেন।

বাংলার রঙ্গমঞ্চ

গল্প-ভারতী—কার্ত্তিক, ১৩৬৭

উৎসব-সজ্জায়

বেনারসী
ও
ভারতীয় সিল্ক
শাড়ী

মোহিনী
মোহন
কাঞ্জিলাল
এণ্ড সন্স্

কলেজস্ট্রীট জংশন- কলি:৯
ফোন: ৩৪-৪৫২০

৮৮৫০

নব-নাট্য আন্দোলন

নারায়ণ চৌধুরী

আজ প্রায় বছর দশ-বারো যাবৎ বাংলাদেশে নাট্য-আন্দোলনে একটা নতুন গতিবেগের সং হয়েছে। এটি আশার লক্ষণ সন্দেহ নেই। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে বাংলার নাট্য-আন্দোলনে নূতন আশার সূচনা একটা দিক্-পরিবর্তনের আভাস বহে এনেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশের ন পরিস্থিতি আর পূর্বের জায়গায় স্থাণু হয়ে নেই, তা সূর্যধর্মের সঙ্গে তাল রেখে সম্মুখপানে এগিয়ে চলে এতকাল নাট্য-জগতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রভাবটাই একান্ত ও প্রায়-অবিসম্বাদী ছিল; এখন স্থায়ী রঙ্গম পাশে পাশে অপেশাদার বা নৌখীন নাট্য-সংস্থাগুলির কর্ম-তৎপরতাও বাংলার সামগ্রিক নাট্য-প্রয়াসে এ বিশিষ্ট জায়গা জুড়ে বসেছে। নৌখীন নাট্য-সংস্থাগুলির কোন-কোনটিকে আর নৌখীন আখ্যাও বোধ দেওয়া যায় না। কেন না ইতিমধ্যেই তারা যথেষ্ট সংগঠন-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে; কয়েকটি তো রীতি পেশাদারী ভিত্তিতে সুসংগঠিত হতে চলেছে। 'বহুরূপী', 'লিটল থিয়েটার,' 'জাতীয় নাট্য-পরিষদ,' 'থিয়ে সেন্টার', 'রূপকার', 'নব-নাট্যম', 'শিশু-রঙমহল'—এগুলিকে আজ আর নিছক অপেশাদার বা নৌ নাট্যসংস্থা নামে পরিচিত করবার উপায় নেই। ওরা আজ শহরের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে প্রায় নিয়মিত ভা অভিনয় করতে শুরু করেছে এবং দর্শকও আকর্ষণ করছে প্রচুর সংখ্যায়। নতুন কালের নতুন দর্শকদের মধ্যে এঁদের নাটকের প্রভাব অতিসহজ। যতই দিন যাবে ততই এই প্রভাব বৃদ্ধি পাবে মনে হয়। বাংলার নব-নাট্য আন্দোলনের ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা উজ্জ্বল, এ লক্ষণ স্পষ্ট।

নব-নাট্য আন্দোলনের একটা ইতিহাস আছে। এই আন্দোলনের সর্বপ্রথম পথিকৃৎ বলা পারে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে। তাঁরই প্রবর্তনায় প্রচলিত বাংলা নাটকের আঙ্গিকে রসসজ্ঞ অভিনয়কলার প্রণালীতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংসাধিত হয়। মঞ্চসজ্জারও ঘটে আমূল রূপান্তর। ন ও নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনেও শিশিরকুমার যুগোচিত শিক্ষিত বিদগ্ধ রুচির পরিচয় রেখে। আজ থেকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে শিশিরকুমার বাংলা নাটকে যে নূতন গতিবেগের সঞ্চার করেছিলেন তার যে নব-নাট্য আন্দোলনের প্রেরণার সূত্রপাত। তারপর পর্বে পর্বে এর বিকাশ ঘটে।

আজ থেকে বিশ-পঁচিশ বছর আগে কলকাতার স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের পাশে পাশে থিয়েটারের একটা ঐতিহ্য প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছিল। ধর্মতলায় স্টেজ-ভাড়া করে চীপ্ থিয়েটারের ন নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ হওয়ার ঘটনা হয়তো অনেকেরই স্মৃতিতে আজও জাগরূক আছে। কিন্তু যে-ক কারণেই হোক্ কলকাতা শহরে চীপ্ থিয়েটারের রেওয়াজ টেঁকসই হল না। কিছুদিন চলবার পর থিয়েটার ভেঙে গেল।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে, বাংলার বর্ধমান রঙ্গমঞ্চের প্রবর্তক সতু সেন নিয়মিতভাবে ধারার নাটক মঞ্চস্থ করবার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় নাট্য-শালার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু পরিকল্পনাও পরিকল্পনার স্তর থেকে আর অগ্রসর হয় অগ্রসর হয় নি।

নব-নাট্য আন্দোলনের জন্ম। এক হিসাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে এই আন্দোলনের জননিত্রী বলা যায়। দ্বি যুদ্ধের আঘাতে-সংঘাতে চারিদিকে যে নূতন আলোড়নের সূত্রপাত হয় তারই ভাব-পরিমণ্ডলের ম নূতন এই নাট্য-আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এই আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য, নবীনরাই আন্দোলনের ধারক ও বাহক। স্বর্গত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ দুই-চারিজন বর্ষীয়ান বাদ দিলে এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই বয়সে তরুণ। বিজন ভট্টাচার্য, তরুণ রায়, শম্ভু মি তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, তাপস সেন, উৎপল দত্ত, গঙ্গাপদ বসু, গিরিজা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় সলিল সেন প্রভৃতি প্রায় সকলেরই বয়স যৌবনের সীমার অন্তর্গত, দুই-একজন প্রৌঢ়ত্বের সীমারে ছাড়িয়ে গিয়ে থাকবেন; স্বভাবতঃই এঁদের বয়সের দ্বারা এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুরঞ্জিত, আর সেই দৃষ্টিভ ছাপ গিয়ে পড়েছে তাঁদের রচিত, অভিনীত, প্রযোজিত নাটক-সমূহের উপর। স্বাদে-গন্ধে মেজাজে মানসিকতায় বাংলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের অভিনয় থেকে নব-নাট্য আন্দোলনের অভিনয়সমূহের আদে যে কিঞ্চিৎ আলাদা, তা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করবেন।

এই পার্থক্যের হেতু কী, তা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। বাংলার পেশাদার রঙ্গম ঐতিহ্য পুরাতন ও সমৃদ্ধ। জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রসর প্রয়াসের সঙ্গে যোগ রেখে বাংলার রঙ্গ গত একশো-দেড়শো বছরে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে এসেছে। বাংলার জাতীয়তাবাদী মুক্তি-আন্দোল অগ্রগতিতে বাংলার রঙ্গমঞ্চের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে তা আজ আর শুধু সঙ্কীর্ণ নাট্য-জগতেরই এ তথ্যমাত্র নয়, তা জাতির বৃহত্তর ইতিহাসেরও একটি বস্তুগত সত্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার ম

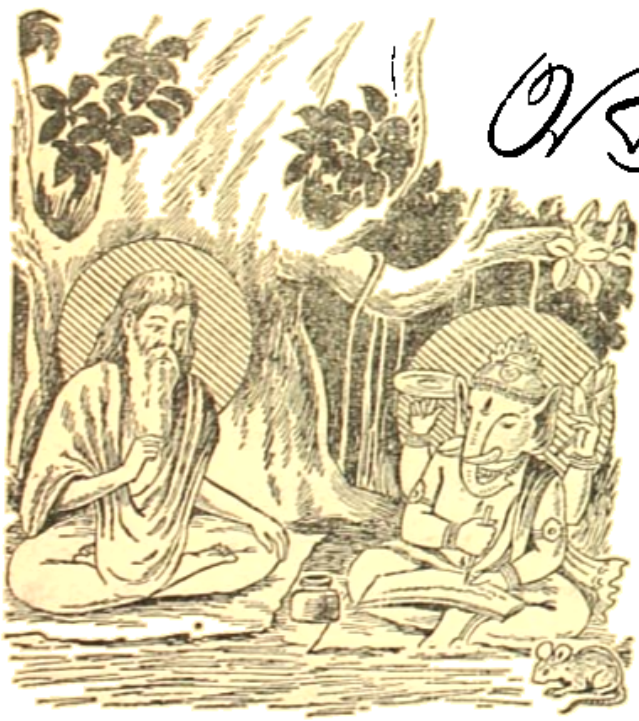

একদা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা ক ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লে খোঁজ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অব পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্ত রাজি হইয়ে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।

আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে লেখার গতি কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই সুলেখা আজ এত জনপ্রিয়

বাংলার সামগ্রিক জাতীয় সংস্কৃতি যেমন নিত্যবর্ধমান হয়েছে, তেমনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের বি অনুশীলনেও তার পুষ্টি কিছু কম হয়নি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), অমৃতলাল অর্ধেন্দু মুস্তফী, ধর্মদাস সুর, তারাসুন্দরী, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুসুমকুমারী প্রভৃতি এবং এ যুগের শিশির অপরেশ চৌধুরী, নরেশ মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরেশ মুখোপাধ্যায়, যোগেশ চৌ নীহারবালা, প্রভা দেবী, চারুশীলা, কঙ্কাবতী, সরযূবালা প্রভৃতি প্রতিভাবান ও প্রতিভাবতী অভিনে অভিনেত্রীদের সমবেত চেষ্টায় বাংলাদেশের নাট্যশালা যে জাতীয় মানসের উপর একটি সুদৃঢ় ছাপ সমর্থ হয়েছে তা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সে যুগের গি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সর্বস্বীকৃত বিশিষ্ট নাট্য-প্রতিভাদের পাশে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখ একালীন নাট্যকারদের নাট্যরচনার এ সব মিলিয়ে জাতীয় নাট্যশালার একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে বলা যায়।

কিন্তু এমন একটা সময় এল, যখন পূর্বর্ণিত এই উৎকর্ষ আর সমৃদ্ধি সত্ত্বেও জাতীয় গভীর বিপদের সম্মুখীন হল। তার আত্মরক্ষাই দায় হয়ে উঠল। নাট্যশালার আকস্মিক অবনতির এটা ঘটে নি, ঘটেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। জনমনের উপর সিনেমার অপ্রতিহত প্রভাব এই সিনেমার ক্রমবর্ধমান চাহিদা বৃদ্ধিতে নাটকের চাহিদায় টান ধরল, এবং সেই অনুপাতে নাটকের জন হ্রাস পেতে থাকল। কলকাতার স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ আছে চারটি : স্টার থিয়েটার, রঙমহল, বিশ্বরূপা (শ্রীরঙ্গম) ও মিনার্ভা। দক্ষিণ কলিকাতার কালিকা এক সময় এই সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পূর্বোক্ত কারণেই সম্ভবতঃ স্থায়ী সে হতে পারে নি, কিছুকাল দর্শক আকর্ষণের পর তার তৎপরতার ঘটল। সুতরাং হয়েদরে, হাতবদল হয়ে অথবা না হয়ে, মোট চারটি রঙ্গমঞ্চই হল কলকাতার স্থায়ী নাট সাকুল্য সম্পত্তি।

স্বভাবতঃই নাট্যজগতের এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় সঙ্ঘবদ্ধ ও অর্থবলপুষ্ট সিনেমা শিল্পে প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠা বেশ কঠিন ব্যাপার। সিনেমায় যে চটক আছে, রঙমঞ্চে তা নেই, ব সম্ভবও নয়। চটুল যুগরুচির সহিত সিনেমা-শিল্পের সাযুজ্যও রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয়তা হ্রাসের আর একটি যদিও এ কথা সুবিদিত এবং স্বীকৃত যে, জাতীয় সংস্কৃতির ওঠা-পড়ার সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের যে নিবিড় যোগ যোগ সিনেমা-শিল্পের ভাগ্যে কোন কালেই অধিগত হওয়া সম্ভব নয়। সিনেমা-শিল্পের প্রকৃতির মধ্যে একটা অস্থিরতা ও চটুলতা আছে যা জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তার নৈকট্যের পথে বাধাস্বরূপ। জনমনোহারী হয়েও জাতীয় সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ বোধ করি কোন সময়েই হতে পারল না।

সে যাই হোক, সিনেমার অপ্রতিহত প্রভাব বস্তুতঃ রঙ্গমঞ্চের জীবনে দুর্দিন ঘনিয়ে আন এরেশেই নয় সব দেশেরই জীবনে একটা বাস্তব সত্য। কলকাতার রঙ্গমঞ্চের পক্ষে এটি আরও বে সত্য হয়ে উঠেছিল নানা কারণে। আজ থেকে ১৫।২০ বছর আগেকার কলকাতার রঙ্গমঞ্চের অবস্থা স্মরণ করেন তা হলেই আমাদের কথার যাথার্থ্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ সঙ্কটের দিনে নব-নাট্য আন্দোলনের আবির্ভাব একটা পরম আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল। আন্দোলনের সজীব কর্মতৎপরতা ও তারুণ্যোচিত উৎসাহ বাংলার নাট্যজগতে যে অনুপ্রেরণা ও স্ফূর্তির সঞ্চার করল, তা বহুবিধ বাধা জয়ের সহায়ক হয়ে দেখা দিল। প্রকৃত প্রস্তা

এ কথা অবশ্য সত্য যে, স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ যে উদ্দেশ্যে নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করে, নব-নাট্য আন্দোলন উদ্দেশ্য তা থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। নব-নাট্য আন্দোলনের প্রবক্তারা প্রথমতঃ আধুনিক সামাজিক সমস্যামূ নাটক মঞ্চস্থ করবার অভিপ্রায়েই ওই নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে পৌরাণি ঐতিহাসিক, আধা-ঐতিহাসিক নাটকের প্রাধান্য; একালীন সমস্যার প্রতিফলন পেশাদার নাটকে খুব ব প্রতিভাত হতে দেখা যায়। পেশাদার রঙ্গমঞ্চ দুই-চারিবার এই জাতীয় নাটক মঞ্চস্থ করবার চেষ্টা করে পর্যন্ত দর্শকদের অসহযোগিতায় সে প্রয়াস ত্যাগ করেন। শেষের দিকে নাট্যাচার্য ভাদুড়ী মশায় 'পরিচয়' প্রভৃ নাটকে এইরূপ এক নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে প্রয়াসও যে পুরাপুরি সফল হয়েছি এমন কথা বলা যায় না। যাকে ইংরেজীতে বলে 'problem play' সেই রকমের সামাজিক সমস্যামূ নাটকের অনুকূলে এ দেশের দর্শক-রুচির সমর্থন সেই সময় খুব প্রবল ছিল না। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের দ্ব পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে সেই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশী ছিল, যাঁরা সামাজিক সমস্যামূলক নাটক অপে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু সংবলিত নাটক দেখতেই সমধিক ভালবাসতেন, বড় জোর তাঁ আটপৌরেভাবাপন্ন বিষয়ের রূপায়ণ পছন্দ করতেন, কিন্তু তার বাইরে ও তার বেশী দূরে তাঁরা যেতে প্রস্তু ছিলেন না।

নাট্যজগতের এই প্রচলিত সংস্কারের পরিবর্তন সাধন নব-নাট্য আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল নাটকের কলারীতি আর আঙ্গিকের মৌলিক পরিবর্তন সাধনেও তাঁরা প্রয়াসী হয়েছিলেন। বি

সাইকেলের জন্য ভাল আর মজবুত
টায়ার ও টিউব্
'রোড ফাইণ্ডার'
ন্যাশানাল রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিমিটেড
কলিকাতা * দিল্লী * বোম্বাই * কানপুর
মাদ্রাজ ও কোট্টায়াম।

চিত্রে
বাংলার রঙ্গমঞ্চ

'দুঃখীর ইমান' নাটকের একটি দৃশ্য। রূপকার কর্তৃক অভিনীত

বহুরূপী সম্প্রদা অভিনী 'ছেঁড়া

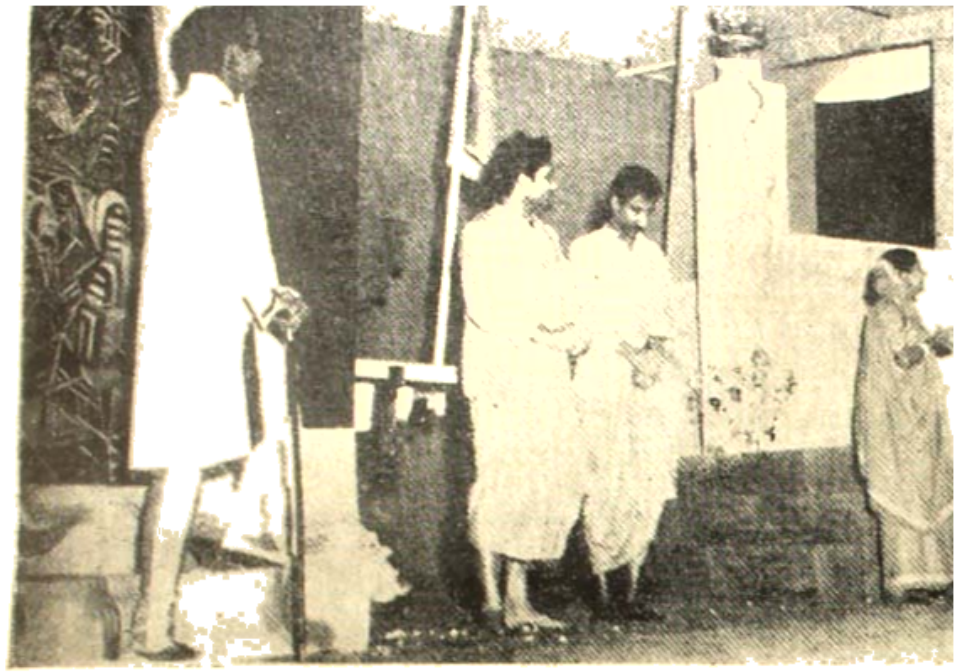

মহাকবি মধুসূদনের
'কৃষ্ণ কুমারীর
ঘাড়ে রোঁ'
অভিনয়ের
একটি দৃশ্য।
ক্রিটেরিয়ন থিয়েটার

ভারত

যায় এই যে, উদ্দেশ্যের এই ভিন্নতা সত্ত্বেও নব-নাট্য আন্দোলন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের কর্মপ্রয়াসের পরি হয়ে দেখা দিয়েছিল। যুগধর্মের কারণেই নব নাট্য-আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের তু অগ্রসর ও প্রগতিশীল; তা বলে তাকে পুরাতন ধারার প্রতিকূল মনোভাব কোনক্রমেই বলা যায় নব-নাট্য আন্দোলনের নূতন কর্মতৎপরতা পুরাতন ধারারই সম্প্রসারণ; বিপরীতধর্মা বা বিরুদ্ধাচারী চেষ্টা নয়। পুরাতন ধারার অভিনয় আর নূতন ধারার অভিনয়ের উদ্দেশ্য যতই ভেদ থাকুক, তাকার দুইই রঙ্গমঞ্চের ব্যাপার তো বটে। দুইয়ের কর্মপ্রয়াসের এই মৌলিক অভিন্নতাই একজনকে অপরের পরি করে তুলতে সাহায্য করেছে। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ হয়তো আজও নব-নাট্য আন্দোলনের প্রয়াসকে তেমন চোখে দেখে না; তাদের অবাঞ্ছিত প্রতিযোগী বলে মনে করে। কিন্তু এ কথা সংশ্লিষ্ট সকলেরই রাখা দরকার যে, এই সন্ধি-লগ্নে নব-নাট্য আন্দোলন তার নবীন উৎসাহ আর সজীবতা নিয়ে যদি রঙ্গমঞ্চের পাশে এসে না দাঁড়াত তা হলে শেষোক্তের ভাগ্যে কী ঘটত বলা কঠিন। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের আশাতীত উজ্জীবন ও সক্রিয়তার মূলে নব-নাট্য আন্দোলনের দান অনেকখানি। হিসাবে নব-নাট্য-আন্দোলনের ভূমিকাটিকে বিশেষ কাল ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নাট্য পরিত্রাতার ভূমিকা বলা যায়।

নব-নাট্য আন্দোলন সামাজিক সমস্যামূলক নাটকের সবিশেষ পক্ষপাতী, সে কথা আগেই ব এই ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শ নব-নাট্য আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের অনেকখানি প্রেরণা ভূমি ইবসেন, বার্নার্ড শ', গ্রীওবার্গ, ইউজীন-ও-নীল প্রমুখ প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্য নাট্যকারদের দৃষ্টান্ত সামনে তাঁদের ভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে, নতুন নাট্যকারেরা নতুন নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কারও কারও এইসব প্রখ্যাত পশ্চিমী লেখকদের নাটকের ছায়াতেই রচিত, আবার কোন কোন রচনা প্র পশ্চিমী নাটকের ভাবানুবাদ। যেমন, বহুরূপীর 'ধনঞ্জয়', 'পুতুল খেলা', যথাক্রমে ইবসেনের 'E of the People' ও 'Doll's House'-এর ভাবানুসরণ। ইবসেনের 'Hedda Gabbler'-এর অ নব-নাট্যের একটি নাটক আছে। শেখভের 'Cherry Orchard' বাংলায় অনূদিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে শুনেছি। উদীয়মান নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায় দস্তয়েভস্কির প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'The Idi কাহিনী অবলম্বনে চমৎকার একটি নাটক রচনা করেছেন। থিয়েটার সেন্টারের ধনঞ্জয় বৈ মৌলিক এবং বিদেশী ভাবাশ্রিত উভয়বিধ নাট্যরচনায় হাত সুন্দর। নব-নাট্যের নাটক 'জনরব' একটি প্রসিদ্ধ স্প্যানিশ নাটকের অনুসরণে লিখিত। শুধু যে সু নব-নাট্য সংস্থানগুলিই বিদেশী ভাবাশ্রিত নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন তা-ই নয়, নিতান্ত অপেশাদার নাট্য-সংস্থার তরফেও এ-জাতীয় সংবেদনতার পরিচয় পেয়ে অবাক হয়েছি। পাভলভ্ ইন্‌স্টিট্যুট নামক একটি সংস্থা বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী পাভলভেরই একটি থিয়োরীকে করে 'মরুকন্যা' নামক একখানি অভিনব ধরনের নাটক বাংলায় মঞ্চস্থ করেছেন। এই নাটকের এবং চরিত্র সবই বিদেশী, অথচ নাটকটি খুবই সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে বলে শুনেছি। নাট্যজগতের গতানুগতিক আবহাওয়ায় এই রকমের একটি নূতন ও অনভ্যস্তপূর্ব বিষয়বস্তুর নাটক অ হওয়া বড় কম কথা নয়। পাভলভের নামে ইন্‌স্টিট্যুট পাভলভেরই বক্তব্যের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক তি সংবলিত বাংলা নাটক জনসমক্ষে উপস্থাপিত করছেন—এ জিনিস এক দশক পূর্বে অভাবিত ছিল।

সচলতার আরও প্রমাণ, কলকাতার সওদাগরী আপিস, ব্যাঙ্ক-ইন্সিওরেন্স, খাস সরকারী আপিস গুলিতে যে সব সাংস্কৃতিক সংস্থা আছে, নূতন নূতন নাটক প্রযোজনায় তাঁদের অসাধারণ উৎসাহ। নাট ব্যাপারে তাঁদের এরকম সুতীব্র উৎসাহ পূর্বে কখনও দেখা যায় নি। তাছাড়া, পল্লীতে পল্লীতে যে-সব ক্লাব অ্যাসোসিয়েশন আছে তাঁদের মধ্যেও নাট্য-বিষয়ে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে আমরা ক্রমশঃ নাট্যমনস্ক হয়ে উঠছি তার লক্ষণ অতি স্পষ্ট। কলকাতার স্থায়ী রঙ্গমঞ্চগুলির আয়ের এক প্রধান উৎসই হ'ল এইসব শৌখীন বা অপেশাদার নাট্য-সংস্থাগুলিকে স্টেজ ভাড়া দেওয়ার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ যতদিন সংশ্লিষ্ট সকলের সুবিধার্থে সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে জাতীয় নাট্যশালা গড়ে উঠছে, ততদি এই ব্যবস্থাই চলতে থাকবে বলে মনে হয়। আজকাল নাটকের প্রতি অনুরাগ সমাজের মধ্যে খু ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে। এমন কি পুলিশবিভাগ, সংস্কৃতি শিল্প সাহিত্যের এলাকা থেকে যাঁরা সচরা দূরে থাকতেই অভ্যস্ত, তাঁরাও দেখছি নাটক প্রযোজনায় সবিশেষ উৎসাহী। পুলিশ বিভাগের যারা অনুষ্ঠা সর্ব-ভারতীয় নাটক প্রতিযোগিতায় এবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। আগা বৎসরে যাতে তাঁরা প্রথম পুরস্কার পেতে পারেন তার জন্যে এখন থেকেই তাঁরা তোড়জোড় শুরু করেছেন।

এ সবই নাট্যচর্চা ও নাটক সম্পর্কে বাঙালী জাতির নবোৎসাহের দ্যোতক। একদিন, অল্প কিছুকাল আগেও, এই রকমের অভিযোগ শুনতে পাওয়া যেত যে, বাংলা নাটক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে অনুন্নত অঙ্গ; বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ যেরকম দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে, বাং

অটুট বন্ধুত্ব

যেখানে দুজনের রুচির মিল, সেখানেই বন্ধুত্ব বেশী স্থায়ী হয়। এই সাইকেলের বেলাতেই দেখুন না! র‍্যালে সাইকেলের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সকলেই একমত। কারণ সুদৃশ্য ও নিখুঁত এই সাইকেলটি বছরের পর বছর ব্যবহারের পরেও সমান নির্ভরযোগ্য থাকে।

র‍্যালে

বিশ্ববিখ্যাত

নাটক সেই অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। বাংলা দেশের সাহিত্যিক সম্প্রদায় যে বিষয়ে তেমন উৎসাহী নন, নাটকের অনুন্নত অবস্থাই তার প্রধান দায়ী। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রগতি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি জাত-লিখিয়েদের নাটকলা সম্পর্কে অনুৎসাহী করে রেখেছে। এখন আর সে কথা যায় না। নাটক বিষয়ে পূর্বের হতোদ্যম ভাব আর নেই। দিন দিন নাটকের প্রতি উৎসাহ বেড়ে চ পেশাদার অ-পেশাদার সব রকম নাটকেরই আজ উন্নতি লক্ষ্যগোচর। বর্তমান হারে যদি নাটকের চলতে থাকে তা হলে এমন দিন নীঘ্রই আসা অসম্ভব নয় যখন নাটক আর সাহিত্যের অনগ্রসর অ পরিগণিত হবে না, নাটকই হবে সাহিত্যের সবচেয়ে পরিপুষ্ট শাখা। একদা নাটকের পক্ষে বাংলা সা অধিপতির আসনে অধিষ্ঠিত হওয়াও কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। বাংলা নাটকের এই যে অ অগ্রগতি, এর মূলে নব-নাট্য আন্দোলনের অনেকখানি দান আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

তাই বলে নব-নাট্যের ধারক ও বাহকদের আত্মসন্তুষ্ট বোধ করবার কোন কারণ নেই। নাট্যের উদ্যোগীদের উৎসাহের কমতি নেই, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাব। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্র প্রযোজকেরা দীর্ঘ দিনের চর্চার মধ্য দিয়ে, নানারকম ঠেকে শিখে ও ভুল করে শিখে, যে অভিজ্ঞত করেছেন, তার মূল্য খুবই বেশী। নব-নাট্যোৎসাহীদের এই অভিজ্ঞতা আয়ত্তের মধ্যে নেই; সন্ধান দ্বারা তাঁদের সেই অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করতে হবে। দু'দিনের শিক্ষায় পূর্বের বহুদিনের শিক্ষা কুক্ষি তাঁদের এরকম আন্তরিকতা থাকা চাই। নব-নাট্য প্রযোজিত নাটকগুলি অধিকাংশই সাময়িক সমস্য নাটক। একালের কোন-না-কোন প্রশ্ন বা সমস্যাকে কেন্দ্র করে বেশীর ভাগ নাটক রচিত। ন

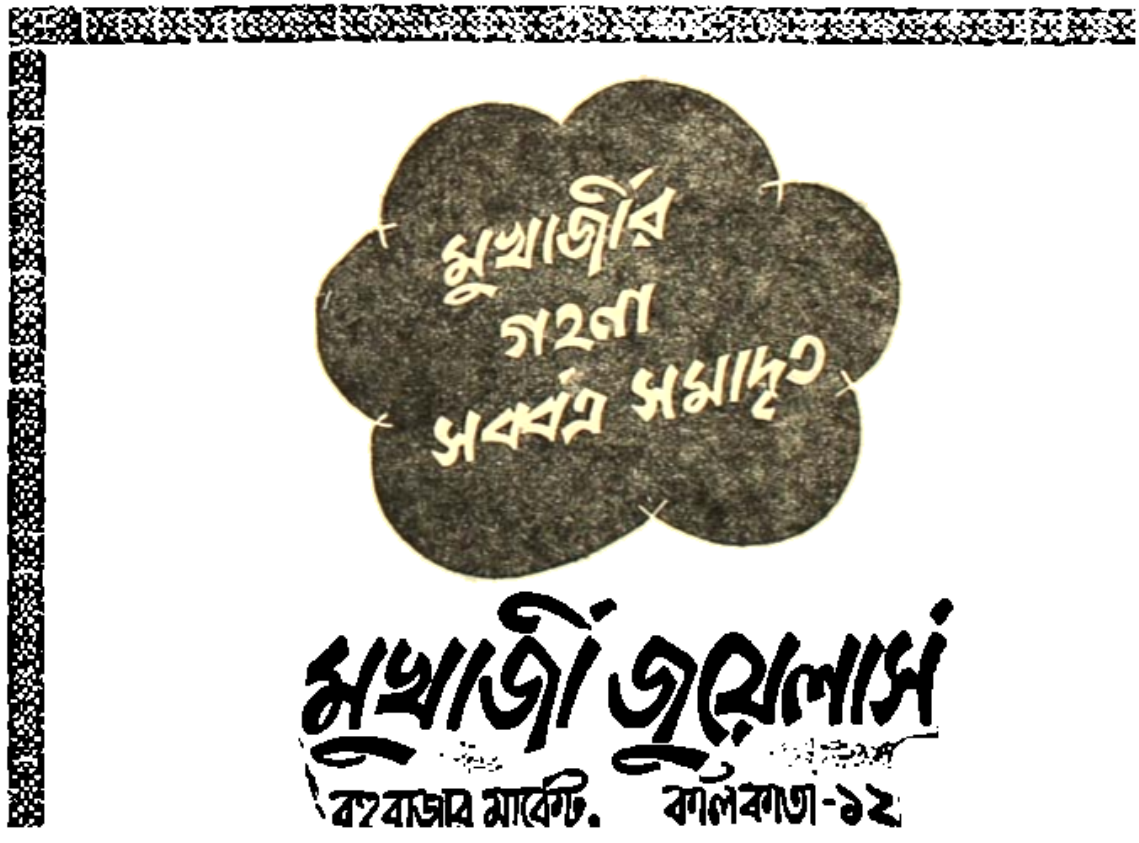

গঠনের মধ্যেও আধুনিক কালোচিত বাস্তবতার ছাপ খুব প্রবল। এই কারণেই হোক কি আর কোন কারণে হোক, নব-নাট্যগুলিতে দরদস্তার বড় অভাব। এদের আবহাওয়ায় রক্ত বেশী নিরুত্তাপ বাস্তবের ছাপ, সময় সময় বিশ্বাসদ্রোহী বাস্তবতার চাপে দর্শকের হাঁফ ধরে যায়। নাটকে নৃত্যগীতের আতিশয্য আমরা সমর্থন করি না, তবু উপলক্ষ্যোচিত নৃত্যগীতে পুরাতন নাটকে যে একটা সরসতা বহমান ছিল, তা থেকে নব-নাট্য নিজেকে বঞ্চিত করে দর্শকেরও বঞ্চনার কারণ হয়েছে। এখনকার নাটকে হিউমার কম, বাস্তব-প্রাধান্যজাত নির্মমতাই বেশী।

কিন্তু নব-নাট্যের সবচেয়ে বড় ত্রুটি, তা এখনও জাতীয় সংস্কারের সঙ্গে নিবিড় যোগে যুক্ত হতে পারে নি। এখনও যেন তার ভাবভঙ্গী পদ্ধতি-প্রকরণ বিদেশী নাট্য-সংস্কারকেই বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয়। বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি—শুধু নাট্য-ঐতিহ্য নয়, সামগ্রিক জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি, নব-নাট্যের ধারক-বাহকদের অনুরাগ কতটা গভীর তা পরীক্ষণীয় বিষয়। তাঁদের কাছ থেকে এ বিষয়ে সংশয়াতীত প্রমাণ পেতে এখনও বাকী আছে। সব দেশেই আধুনিক কালের তারুণ্যের একটি লক্ষণ, তা বিদেশী, তা জাতীয় নয়, তার প্রতি অত্যুৎসাহ। আমাদের তরুণ সাহিত্যিক আর নাট্যকারদের সম্বন্ধেও এই অভিযোগ অল্প-বিস্তর করা চলে। বিদেশী ভাবধারা সম্পর্কে তাঁদের মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ জাতীয় ভাবের দ্বারা নিয়মিত ও সংযত হওয়া দরকার। নব-নাট্যের উদ্যোগীদের ক্ষেত্রে এ কথাটি বলবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাঁরা যদি তাঁদের নবীন প্রাণের সজীবতা ও কর্মস্ফূর্তিকে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের দ্বারা সঞ্জীবিত করতে পারেন তা হলে তাঁদের নাট্যপ্রয়াসের আর সীমা নেই।

ষোড়শ বর্ষ

কার্ত্তিক

দীপালী সংখ্যা

১৩৬৭

গল্প-ভারতী

সম্পাদকীয়

'গল্পভারতী'র শুভার্থী ও সহকর্মীদের বিজয়া সম্মেলনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। সেই এ সত্য নিষ্ঠুর হলেও পরিস্ফুট হয়েছে যে বাঙালী আমরা আবার যেন জীবন-মরণের সন্ধি দাঁড়িয়েছি। বৃহৎ বঙ্গ আজ খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন। আমাদের বঙ্গ, প্রতিবেশী বিহার উড়িষ্যা ও অ পেরিয়ে শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি শ্রীহট্ট থেকে শ্রীক্ষেত্র ও দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত প্রেমধর্ম্ম ভক্তি ও সাহি প্রবাহ ছুটিয়ে বিরাট পূর্ব্বাঞ্চলকে উর্ব্বরা করেছে। তাই মিথিলার বিদ্যাপতি ঠাকুর ও রাঢ়ের চণ্ড কবি, তাঁদের অমর "পদাবলী" কীর্ত্তনে সারা পূর্বভারতকে মাতিয়েছিলেন; সন্ত শঙ্করদেবের প অসমিয়া নয় বহু বাঙালীর হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত করেছে। অথচ সেই আসামেই বাঙলার নর নির্য্যাতিত; গণতন্ত্র প্রসারের সঙ্গে কি আমরা এগোচ্ছি না পেছোচ্ছি? আজ-ভক্ত রায় রাম চৈতন্যদেবের কাছে এসে কোন ভাষায় ভক্তি-শাস্ত্রের চর্চ্চা করেন? আজ গণতান্ত্রিক গণ্ডামে উ তৈলঙ্গ সংঘর্ষ কেন? সৈব দুর্বিপাকে উড়িষ্যা আজ বিপন্ন; বাংলার ধনী-নির্ধন সাধারণত স করছে। সেইসঙ্গে সজাগ থাকতে হবে, আসামের মত বিহার উড়িষ্যা থেকেও বাঙালী আক্রমণ হতে পারে। এর প্রতিকার রাষ্ট্রের না সাধারণ মানুষের হাতে? কে এ প্রশ্নের জবাব দেবে।

শুধু বিজয়া সম্মেলনে এই কথাই মনে আসে যে বাঙালীকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে—ভাষা তুলে দি হবে;—অর্থের জোরে নয় পরমার্থের উপর নির্ভর করে। হাজার বছরের ভাষা আমাদের বা "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" এই মহাসত্য চণ্ডীদাস ও শ্রীচৈতন্য থেকে বি রবীন্দ্রনাথও বিচিত্রভাবে ও পদ-মাধুর্য্যে প্রকাশ করে গেছেন। আজ প্রয়োজন এখন বাঙালী মেয়েদের এই বিরাট ঐতিহ্যের পূর্ণ সন্ধান দেওয়া। তার জন্য তরুণদের "পাঠচক্র", প্রবীণদের প ও সাহিত্য-প্রকাশনী ও নিরক্ষর জনসাধারণের জন্য চাই দেশব্যাপী কথকতা। সেকালের শ্রীধর কথকের মত এযুগের উদীয়মান সাহিত্যিক-সাহিত্যিকাদেরও নিপুণভাবে "কথকতা"র ব্রত

(Television ত দেখলাম আমেরিকা ও রাশিয়ার গ্রামে গ্রামে) যখন এসেছে, ও শিক্ষায়তনগুলি ক্রমবর্দ্ধমান শিক্ষার্থীদের স্থান দিতেও যখন অপারগ, তখন সহর-পল্লীতে ও গ্রামে গ্রামে ছবি ও গানে মাধ্যমে নবযুগের কথকতা বাঙলা ভাষা ও আদর্শের প্রচার সুরু করুন। এক্ষেত্রে সমস্যা "অর্থ" নয়, কর্ম্মীর যেমনই আজ প্রয়োজন। তাই 'গল্পভারতী'র মাধ্যমে সবার সহানুভূতি ও সহযোগ প্রার্থনা করি, যে বাঙালীর শ্রেষ্ঠ তিথি বিজয়া সম্মেলন সার্থক হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এককালে বিজয়ী বাঙালী আজ পরাজিত অথচ তাদের প্রাণে আছে স্বদেশপ্রেম ও দিব্য প্রেরণা সেটি জাগাতে হবে, যেমন জাগাতে চেয়েছিলে রবীন্দ্রনাথ ; ১৯০৪ সালের ২২শে জুলাই তিনি চৈতন্য লাইব্রেরীর আমন্ত্রণে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে বলেন :—

"আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকিলে আত্মরক্ষা হয় না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত করা ও চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়···আমাদের সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয় স্থাপন ও আপন ঐক্য-প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে ; নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখি না।" কবিগুরুর এই দিব্যবাণীর সাক্ষী ছিলেন সভাপতি স্বয়ং "বঙ্গবিজেতা" রচয়িতা মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত দুজনেই আজ পরলোকে, কিন্তু তাঁদের আশীর্ব্বাদে হয়ত অর্দ্ধশতাব্দী পরে নির্য্যাতিত বাঙালীই এ নূতন "স্বদেশী সমাজ" গড়ে তুলবে। ১৯০৪ সালে স্বদেশী সমাজ লিখে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগের সূত্রপাত করেন ; তারপর বাঙলার অঙ্গচ্ছেদ (partition) প্রকাশ্যে ও গোপনে একাধিকবার হয়েছে। কি বাংলার অঙ্গচ্ছেদ কখনো হতে আমরা দেব না—এই পুণ্যব্রত বিজয়া সম্মেলনে সব বাঙালী ভাইবোনকে গ্রহণ করতে বলি।

রাশিয়া ও ঋষি টলস্টয় (১৮২৭-১৯১০)

আন্তর্জাতিক প্রাচ্য বিদ্যার্থী সম্মেলন থেকে যখন মস্কো যাবার নিমন্ত্রণ পেলাম তখন ম পড়ল আমার প্রায় দশ বছর আগে প্রকাশিত বই Tolstoy and Gandhi (পুস্তক ভাণ্ডার, পাটনা সেই বইখানির ভিতর দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম রাশিয়া ও ভারতের মৈত্রী সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। সেই ১৯৪১ সালে টলস্টয় কন্যাকে উপহার দেন তখনকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন। সেই মুখবন্ধে রেখে, এ বছর প্রকাশিত আমার নূতন বই Greater India বা বৃহত্তর ভারত বইখানি নিয়ে আ মাসে মস্কো গেলাম। বন্ধুবর ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় Deligationএ নেতাক্ষ আমার বইটি কংগ্রেসে উপহার দেন ; তার মধ্যে আমাদের পরলোকগত বন্ধু G. Roerichএর সার নিবন্ধ Indology in Russia আমি ছেপেছি দেখে, শুধু রুশ বন্ধুরাই নন, অন্য দেশীয় Orientali সকলও সুখী হলেন ; সেসব কথা ক্রমশ প্রকাশ্য।

আকাশে ও বিমানে যখন বড়রকম ভাটা পড়েছে তখনও দুর্মূল্য রুশ Jet প্লেন চেপে ভাইবে পাহাড় কিউয়েন লুড, বাকে কারাকোরাম গিরিমালা ও উত্তাল হিমালয় দেখতে দেখতে যখন ছয় ঘ মধ্যে ৩০০০ মাইল Aeroflot উড়ে এলাম, নিজেও বিশ্বাস করিনি এটা সম্ভব! মস্কোতে পঞ্চা কাল আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কাটলেও একটু অবসর পেলেই ছুটেছি রাশিয়ার মনীষী লেখক ও শিল্পী সন্ধানে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীলের কৃপায় Tolstoy, Turgenev, Dostoievs

রঁলাঁর খবর প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের মধ্যেই পড়েছি। সালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইউ
গিয়েই মহান চিত্রকর নিকোলাস্ রোরিখের (Roerich) সঙ্গে পরিচয় করেছি। আবার রলাঁর
সংযোগ হবামাত্র তাঁর হাত থেকে উপহার পেয়েছি তিনটি অমূল্য জীবনী: Beethoven, Mic
Angelo ও Tolstoy। টলস্টয়ের সঙ্গে রলাঁর পত্রালাপ তাঁর ছাত্রাবস্থায় অর্থাৎ ১৮৮৭ সালে,
টলস্টয় ৬০ বছরের প্রবীণ ও বিশ্ববিখ্যাত রুশ সাহিত্যের নেতা। এই টলস্টয়ের সঙ্গে আবার তা
নেতা গান্ধীজীর পত্রালাপ হয়েছিল, সে খবরও রলাঁর বাড়ীতে শুনি। রুশ গ্রন্থকার Paul Bir
(তাঁর দোসর টলস্টয়-শিষ্য Bulgakov এখনো জীবিত। কেও সাহায্য করেছি; তাঁর Tolstoy
the Orient গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ আছে। সবাই আমরা মিলতাম রম্যা রলাঁর স্নিগ্ধ অতিথিশালায়
Lake Lemanএর উপর সুরম্য Vila Olgaতে। এখানে যেমন রলাঁর সঙ্গে Mahatma Gandhi
কাজ শেষ করি, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনালোচনারও সূত্রপাত হয় (১৯২১-
আমার Tolstoy and Gandhi শুরু হয় সেই যুগে কিন্তু ছাপা হয় ৩০ বছর পরে। তার পরে
সংস্করণ নিজ হাতে এবার রেখে এলাম ঋষি টলস্টয়ের নির্বাণ-পঞ্চাশিকা স্মরণ করে। ম
Tolstoy Museum সম্বন্ধে আমায় লিখিয়েছেন টলস্টয়-শিষ্যা বিদুষী মহিলা পরিদর্শিকা। আ
জন্মভূমি (ও সমাধি স্থান) Yasna Poliyana গ্রামে তীর্থযাত্রীর মতন দুই বাঙালী এবার গিয়েছি
আমি ও বন্ধুবর অধ্যক্ষ গৌরীনাথ শাস্ত্রী। তিনি আমার অনুরোধে টলস্টয় সমাধি-প্রস্তরের
বৈদিক প্রার্থনার উচ্চারণ করেন। টলস্টয়ের ৫০শত (1910—1960) মৃত্যুবার্ষিকী এইভাবে
দাদামশায়ের প্রদত্ত গ্রাম-বাটিকায় আমরা শ্রদ্ধিগণ পরিশোধ করি। শেষ জীবনে তাঁকে Orth
গীর্জার নেতারা ধর্মচ্যুত (excommunicate) করেন। অথচ সারা বিশ্বে তাঁরই রচনা-আধার
সাহিত্যের সে যুগে জয়-জয়কার (১৮২৭-১৯১০) টলস্টয় যুগই পূর্ব-পশ্চিমের সত্য আধ্যাত্মিক মিলনে
হিন্দু ধর্ম ছাড়া বেদ উপনিষদাদি তিনি (অনুবাদে) বহুকাল পাঠ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
পাশ্চাত্যের ভোগ নয়, প্রাচ্যের সংযম ও তিতিক্ষাই যে বিশ্বযুদ্ধ ও ধ্বংস থেকে আমাদের বাঁচাবে—
স্পষ্টভাবে প্রথম ঋষি টলস্টয়ই প্রচার করে যান। প্রাচীবাসী আমরা সবাই তাঁর কাছে এক্ষেত্রে ঋ
তাই আমরা স্মরণ করাই, মহাত্মা গান্ধী, শুধু ভারতের স্বাধীনতা নয়, কালো মানুষের মহাদেশ আ
স্বাধীনতারও সূচনা করে সেখানে ২১ বছর নির্বাসনের মধ্যে কাজ করেছিলেন, এবং দক্ষিণ আ
'টলস্টয় আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন; হয়ত গান্ধী-নিধি (Trust) এদিকে দৃষ্টি দেবেন।

—কালিদাস

মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(একটি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক)

দক্ষতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতেছে

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিংএর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়

হেড অফিস :—৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩

শাখা সমূহ :—মিশন রো, উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, খড়্গপুর,

সাধক ও মনীষীর চোখে মাতৃরূপা কালী

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

আমরা নিখিল বিশ্বের যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই শক্তির বিচিত্র প্রকাশ দেখিতে পাই জড়শক্তি, প্রাণশক্তি, চৈতন্যশক্তি, আত্মশক্তি। আমাদের মধ্যে যে মহাশক্তি নিদ্রিতা রহিয়াছে তাঁহাকে জাগাইবার জন্যই শক্তির আরাধনা করিতে হয়। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ে মূলে রহিয়াছে যে শক্তি, আমরা সেই শক্তিরই উপাসনা করি, মাতৃভাবে সেই শক্তিকেই ভাবনা করি একাক্ষর মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই আমরা অভয়, অশোক ও অমৃত হই। ব্রহ্মের রুদ্র রূপ দেখি আমরা ভীত হই না, আমরা জানি, মৃত্যুও তাঁহার ছায়া, অমৃতও তাঁহারই ছায়া।

আমরা মহাকালীর আরাধনা করি অন্ধকারময়ী অমাবস্যার নিশীথে, দীপাবলী যখন প্রায় নির্ব্বাপিত তিমিরাবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত, পশুপক্ষী সুপ্তির ক্রোড়ে মগ্ন এমন সময়ে। এই শক্তি-সাধনা কিন্তু সহজ সাধ্য নয়। ভূতশুদ্ধি, আসন-শুদ্ধি, প্রাণায়াম প্রভৃতি এই সাধনারই প্রস্তুতি। শাস্ত্রের নির্দ্দেশ এই—দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ, দেবী ভূত্বা দেবীং যজেৎ। আমরা প্রতি বৎসর জগন্মাতা শ্যামার অর্চ্চনা করি থাকি কিন্তু যে সাধনার বলে আমাদের অন্তর্নিহিতা শক্তিকে জাগ্রত করা যায়, সেই সাধনা হইতে আজ আমরা ভ্রষ্ট হইয়াছি। যে দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়া শ্রীরামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

'মায়ের মূর্ত্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥
করে অসি-মুণ্ডমালা, সে মা-টি কি মাটির বালা,
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিভাইয়ে?
শুনেছি মার বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো,
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাখাইয়ে?
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য্য আর হুতাশন,
কোন্ কারিগর আছে এমন দিবে একটি নিরমিয়ে?
অশিবনাশিনী কালী সে কি মাটি ঘড় বিচালি?
সে ঘুচাবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে?'

সে দিব্য অনুভূতি আমাদের নাই। রূপকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীরামপ্রসাদ অরূপে পৌঁছিয়াছিলেন আবার শিশুর মত মাতৃচরণে শরণ লইয়া তিনি দুঃখদৈন্যকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। মরণকে জ করিয়াছিলেন। যেদিন আমরা মায়ের চরণ আশ্রয় করিব, সেইদিনই মা বরাভয়দায়িনীরূপে আমাদে সম্মুখে আবির্ভূতা হইবেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি গাড়ী, তুমি এঞ্জিনিয়ার, আমি রথ, তুমি রথী, যেমন চালাও, তেম

সাধক যখন এই অনুভূতি লাভ করেন, তখন তিনি ধর্মাধর্মের পারে চলিয়া দিব্যোপলব্ধি লাভ করিয়াই কমলাকান্ত গাহিলেন—

'সমানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী সো মা।
তুমি আপন-সুখে আপনি নাচ, আপনি দাও মা করতালি,
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশিভালী।
যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না হে মা, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥
সঙ্গে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি।
তুমি যেমন রাখ তেমনি থাকি, যেমন বলাও তেমনি বলি।
অন্তরস্থ কমলাকান্ত বলে দিয়ে গালাগালি—
এবার সর্ব্বনাশি, ঘরে আসি, ধর্মাধর্ম দুটো খেলি'।

• • •

যিনি মাতৃচরণরূপ তীর্থ আশ্রয় করেন, তিনি সকল বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ ক মৃত্যুভয়কে তিনি অতিক্রম করেন। জগন্মাতাই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, তিনিই মহামায়া, তিনিই মোক্ষ-প্রদায়িনী। তিনি কখনও করালবদনী, কখনও সৌম্যা, কখনও তিনি বনমালীরূপে, আবার ক মহাভাবময়ী রাধারূপে বিরাজ করেন। দাশরথি রায় এই অপূর্ব্ব অনুভূতি লাভ করিয়া সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করিয়াছেন। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন 'কালী চলি মা রাসবিহারী নটবর বৃন্দাবনে'।

আর দাশরথি রায় গাহিয়াছেন—

যে ভাবে তারা-পদ ঘটে কি তার অপদ
সে পদ ব্রহ্মপদ মুক্তিপদপ্রদায়িনী।
কি আর করিবে কালে, মহাকাল যার পদতলে,
ডাকিলে 'জয়কালী' বলে কালভয়ে পলায় অমনি।
মায়ের মায়া অনন্ত, অনন্ত না পায় অন্ত,
কাল-হরা কালীমন্ত্র তারিণী ত্রিগুণধারিণী।
মা আমার দক্ষিণে কালী কখন বা হন করালী,
কখন হন বনমালী কভু রাধা মন্দাকিনী'।

• • •

গোবিন্দ চৌধুরী বাংলার অন্যতম প্রসিদ্ধ শক্তিসাধক। বিভিন্ন গানের মধ্য দিয়া তিনি অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উপলব্ধি করিতেছেন—মা ব্রহ্মময়ী পুরুষ-প্রকৃতি হইয়া বিশ্বে লীলা করেন, আমাদের কোন কর্তৃত্ব, কোন স্বাধীন সত্তা নাই। তিনিই মাতৃরূপে সংসার করেন, ভার্য্যারূপে প্রণয়ের লীলাভিনয় করেন, আবার শিশুরূপে সূতিকা-গৃহ আলোকিত ক তিনি কাহাকেও অতুল বৈভবের অধিকারী করেন, কাহাকেও পথের ভিখারী করেন। গাহিয়াছেন—

[illegible]

দেখেছে নিখিল বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজায়ে,
আবার আপনি খেল সে বাজারে পুরুষ-প্রকৃতি হ'য়ে,
মিছে পৃথক্‌ভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞানহীনে

'ওমা সর্ব্বজীবে তুমি শিবে মাতৃরূপা হ'য়ে পাল,
আবার ভার্য্যারূপে ব্রহ্মময়ি, তুমি প্রণয়ের খেলা খেল !
তুমি শিশু-মূরতি হ'য়ে আলো কর সূতিকা-গৃহ,
আবার খেলিয়ে নানা খেলা অন্তে শ্মশানে লুকাও সেই দেহ,
মিছে মায়া-ভ্রমে জীবে ঘুরাও মা ভুবনে ॥

'ওমা কারে করেছ রাজ্যেশ্বর মা অতুল ধনের অধিকারী,
কারে করেছ পথের কাঙ্গাল মুষ্টিমের অন্নের ভিখারী,
কেউ বা সুখে কাটায় নিশি পুষ্প-শয্যায় শয়ন করি,
কেউ বা গাছের তলায় তৃণ-শয্যায় দুঃখে কাটায় মা বিভাবরী—
সকলি তোমার খেলা বুঝেও বুঝিনি ।

'ওমা কেমন মহামায়া তোমায় পায় না বিধি বিষ্ণু ভেবে—
শ্মশানে ভ্রমে ভব সদা সে তোমার মায়া-প্রভাবে,
আপনার মায়ায় আপনি তুমি মাতায়াত কর বারম্বার,
আবার নিজে বুঝ না নিজের মায়া এমনি তোমার মায়ার বিকার—
সে মহামায়া বিশ্ব মোহিনে বুঝিবে কেমনে' ॥

• • •

আমাদের এই বাংলাদেশ যেন 'তিন পাগলের মেলা'—পাগল নিমাই, পাগল শ্রীরামপ্রসাদ পাগল শ্রীরামকৃষ্ণ। জগন্মাতার চরণে চিরশিশু রামকৃষ্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তি ষোলসেরেও ছয়সিকের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, যা ব্রহ্মময়ী তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলি দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী, যিনি সাকারা, তিনিই নিরাকারা, যিনি বিরাট, তিনিই অরাট। জল জমিয়া বরফ হইলেই সাকার, আবার সংহত তুষারপিণ্ড গলিয়া জ হইলেই নিরাকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাকুলভাবে মায়ের চরণে শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। জগন্মাতাও সন্তানে ব্যাকুল প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন।

• • •

আধুনিক যুগে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম বাঙালীকে নব্য তান্ত্রিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন 'আনন্দমঠে' ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গার মূর্ত্তির মধ্যে মাতৃভূমির অতীত, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ রূপ দেখাইতেছেন। ব্রহ্মচারী বলিতেছেন—

"কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্বা, এইজন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্ব্ব

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাতে যে খর্পর কেন'?

ব্রহ্মচারী। আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল, "বন্দে মাতরম্"।

স্বদেশী যুগে যাঁহারা দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনের জন্য আত্মাহুতি দিয়াছিলেন, তাঁহারাও ঐ মূর্তির ধ্যান করিয়া ভয়কে অতিক্রম করিতেন। ইঁহাদের পূজা ছিল রাজসী পূজা। তাঁরা প্রলয়ের উপাসনার মধ্য দিয়াই ইঁহারা উপলব্ধি করিতেন—

'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন'।

স্বদেশী যুগের এই ব্যাপা তরুণগণ স্বদেশের জন্য আত্মত্যাগের প্রেরণা লাভ করিতেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' হইতে।

• • •

কালীমূর্তির এক অভিনব তাৎপর্য্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল স্বামিজীর দিব্যদৃষ্টিতে। স্বামিজী ব যিনি হৃদয়কে শ্মশানে পরিণত করিতে পারেন, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইতে পারেন, তাঁহার জ জগন্মাতা শ্যামা নৃত্য করেন। যে দুঃখদৈন্যে বিচলিত বা মৃত্যুভয়ে ভীত হয়, কালনৃত্য সম্ভোগ কর মত বীর্য্য যাহার নাই, শ্যামাপূজায় তাহার কোন অধিকার নাই। যাঁহার অন্তরে জাগে অমেয় বীর্য দুর্জ্জয় সাহস, আত্মবিশ্বাস যাঁহার প্রচণ্ড, তিনিই জগন্মাতার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পান। যাঁহারা নেতা জীবনদর্শনের সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা জানেন স্বামিজীর এই ভাব-কল্পনা নেতাজীকে বিশেষ প্রভাবিত করিয়াছিল।

স্বামিজীর 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' নামে বাংলা কবিতা ও Kali the Mother নামক ইং কবিতা শব্দচয়ন-নৈপুণ্যে ও ভাবগাম্ভীর্য্যে অতুলনীয়। আমরা ইংরেজি কবিতাটির অনুবাদ নিম্নে দিলা

'নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য বায়ুবেগ।
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীশালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি হুংকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরি-চূড়া জিনি
নভতল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র,—মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর!—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।
কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,

এই অনুবাদে যে মূলের সৌন্দর্য্য অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই স্বামিজীর চিন্তাধারা উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবকেও প্রভাবিত করিয়াছিল।

• • •

ভগিনী নিবেদিতা এবারে হলে Kali the Mother সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে যেমন স্বামিজীর চিন্তাধারার প্রভাব আছে, তেমনই এই মনস্বিনী মহিলার চিন্তার স্বকীয়তার পরিচয় আছে। এই বক্তৃতাটি (পুস্তিকাকারে মুদ্রিত) পাঠ করিলে ভূয়োদর্শন, অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর তত্ত্বদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। নিবেদিতা বলেন—

'হিন্দুর পারিবারিক জীবনে মায়ের প্রভাব সর্ব্বাধিক—মাতাপুত্রের সম্পর্কই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও নিবিড়। জীবনের সর্ব্বস্তরে পরিব্যাপ্ত জননীর সুগভীর স্নেহ। সেই জন্যই বোধ হয় অনাদি কাল হইতে সৃষ্টির যিনি মূল কারণ, সেই পরমেশ্বরকে আপনার হইতেও আপনার করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'মা'। হিন্দুর নিকট ইহা অপেক্ষা পবিত্রতর ও মধুরতর নাম আর কিছুই নাই।

'দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও কালী ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ। একই মহাশক্তির বিভিন্ন নাম। নানাভাবে তাঁহার প্রকাশ। দশপ্রহরণধারিণী, অসুরবিনাশিনী, বিশ্বজননী দুর্গা সেই মহাশক্তির অপূর্ব্ব প্রতীক। চরাচর বিশ্ব-প্রকৃতি তিনিই। জগদ্ধাত্রীরূপে সেই মহাশক্তিই সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। আর মহাকালী, যিনি ভয়ঙ্করা ও লোলরসনা, মৃত্যু ও ধ্বংস যাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে—সেই অগ্নিরূপা মহাকালীর নিকটেই সাধকের সমগ্র অন্তর শুদ্ধ হইয়া যায়। তাহার আকুল হৃদয় মথিত করিয়া একটি মাত্র শব্দ বাহির হইয়া আসে—'মা'।

'শিশুর নিকট তিনি কেবল মা। শিশু কেবল জননীকেই চায়, আর কিছুতেই তাহার প্রয়োজন নাই। মাও তাহাকে আশ্রয় দেন। মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অধিক জানার প্রয়োজন নাই—কেবল তাঁহাকে ভালবাস।

কাপুরুষ যে, সেই মায়ের ভয়ঙ্কর রূপে ভীত। 'সাহসে যে দুঃখেরে চায়·····মাতৃকৃপা তা কাছে আসে'। (ভগিনী নিবেদিতা, প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, পৃঃ ১৪৭)

নিবেদিতার বক্তৃতা পড়িলে মনে হয়, তিনি যেন ভারতীয় সাধনার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে আর একজন প্রতীচ্য পণ্ডিতেরও কথা মনে পড়ে, যিনি সাধনার দ্বারা ভারত-আত্মার বাণীকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও তন্ত্রের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি প্রধান বিচারপতি জন উডরফ। কালীপূজার তাৎপর্য্য তিনি যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কয়জন ভারতীয় তা করিয়াছেন?

• • •

শ্রীঅরবিন্দ যে দিব্যজীবন বা পূর্ণযোগের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহারও মূল কথা—মহাশক্তির নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। এই মহাশক্তি প্রসন্ন হইলেই জীব ও শিবের মিলন সাধন করিয়া থাকেন।

আজ যদি মহতী বিনষ্টির হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা পাইতে হয়, তবে আবার নূতন করিয়া শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের একান্ত প্রয়োজন, বাহুতে অমোঘ বীর্য্য, মনে দুর্জ্জয় পৌরুষ, কর্ত্তব্যে অবিচল নিষ্ঠা, চিত্তে প্রসন্নতা, চরিত্রের দৃঢ়তা এবং স্বদেশ ও স্বজাতির সঙ্গে একাত্মতা জগন্মাতা আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া আমাদিগকে শ্রেয়ের পথে লইয়া চলুন

আভিজাত্যের মূল্য

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অভিলাষ ঘরুয়া ছিলেন তিনপুরুষে মার্চেন্ট অফিসের কেরানী। তার ছেলে অপূর্বর যে একদা কী অভিজাত হবার বাসনা হ'ল তা বোধ হয় সে-ও জানে না। কিন্তু সে বাসনাটি তিনি অতি সঙ্গে মনের মধ্যেই রেখেছিলেন—উপহসিত হবার ভয়েই কারুর কাছে প্রকাশ করেন নি।

কিন্তু যে বাসনা মানুষের ভাবনার সঙ্গে অর্থাৎ অষ্টপ্রহরের সব কাজ সব চিন্তার মধ্যেও অবচে জড়িয়ে থাকে—সে বাসনা সিদ্ধ হয়ই। অপূর্বরও হয়েছিল। ধমনীর রক্তটা নীল বর্ণে রূপান্তরিত হ কিনা তা জানা সম্ভব নয়—কিন্তু বাকী যেটা—চলন-বলন বেশভূষা জীবনযাত্রা—সবটাই একেবারে খাঁটি বা অভিজাতের মত করে ফেলেছিলেন এটা ঠিক।

অবশ্য এই যুদ্ধ না এলে এবং তার পিছনে পিছনে স্বাধীনতা না পাওয়া গেলে এ সিদ্ধি কী আসত সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। হয়ত সত্যই, বাইরে না হোক এ উচ্চাশার জন্য কাছেই অন্তত উপহাসাস্পদ হয়ে উঠতেন। কারণ তাঁকেও পিতৃ-পিতামহের পন্থা অনুসরণ করে বয় এক মার্চেন্ট অফিসেই ঢুকতে হয়েছিল চাকরি নিয়ে। উনিশশ সাইত্রিশে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনেতে পেয়েই সেদিন তাঁকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়েছিলেন বি-এ ফেল করা অপূর্বরত্ন। তাঁর বাও সেজন্য সত্যনারায়ণ এবং সোনার বেলপাতা সাজিয়ে কালিঘাটে পুজো দিয়েছিলেন। এই অভাবনীয় সৌভ জন্য, এবং যথানিয়মেই বছর দুই চাকরি করার পর নিতান্ত একটি তৎকালীন দিনের থার্ড ক্লাস পর্যন্ত (তৃতী ক্লাস এইট্) পড়া সাধারণ ঘরের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, মনের গোপন উচ্চাশার মূলে সবচে আঘাত পড়ছে জেনেও। এর প্রথম কারণ বাবা—এই মা-বাপ-মরা মেয়েটির নামে তিন হাজার পলিসি ছিল জেনে তিনি আর কারুর কোন কথা শোনেন নি—সেই টাকায় মেয়ের বিয়ে দিয়ে হয়েছিলেন, আর দ্বিতীয় গৌণ কারণ হলেন নিজেই—উচ্চাশার চেয়েও সেদিন স্বাভাবিক ধনলোভ প্রবল হয়ে উঠেছিল, নিজেকে খুব কঠিন করে রাখতে পারেন নি।

কিন্তু সে ত্রুটি পরবর্তীকালে সেরে নিতে পেরেছিলেন। স্ত্রী পারুলকে লেখাপড়া শিখ পারলেও চালচলন আদব-কায়দায় যতটা মানুষ করা সম্ভব তা করে নিয়েছিলেন, কয়েকটা ইংরেজী ব শিখিয়ে নিতে ভুল করেন নি।

তবু হয়ত এসব কোন কাজেই লাগত না—যদি না অপূর্বর ভাগ্যক্রমে ঠিক সময়ে যুদ্ধটা বেধে যেত। ব্রিটিশ আর্থ যুদ্ধ বাধতেই যাবার ওপরের বহু সাহেব যুদ্ধে চলে গেলেন—তার ফলে ওপর যে শূন্যতা সৃষ্টি হ'ল সেটা ভরাতে হল নিচের লোক দিয়ে। সাহেবদের মত মাইনে আশা করা বা অপূর্বও তা করেন নি—তবু উন্নতি যে হ'ল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে, লাফ দিয়ে দিয়ে সব রকম সুদূর ব আশাকেও ছাড়িয়ে গিয়ে—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাইরে শুনিয়ে রাখা হয়েছিল যে এসব প্রোমোশনই অস্থায়ী। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতে, সাহেবদের ফের আধোগতন শুরু হবার আগেই এল স্বাধীনতা। যারা ছিলেন তাদের মধ্যেও অনেকে বরং বিদায় নিলে নেহাৎ যাদের কোন চালচুলো বা অন্যত্র করে খাবার কোন যোগ্যতা নেই—এমনি দু'চার জন সাহে টিকে রইলেন। আবার একটা পদোন্নতির প্রবল জোয়ার এল। অপূর্ববাবু অনেকদিনই দস্তসাহে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, এবার একজন ছোট সাহেবে পরিণতি হলেন—সামান্য কিছু টাকার শেয়ার বি শেষ পর্যন্ত ডিরেকটারও হয়ে বসলেন।

এতদিনের স্বপ্ন সফল হ'ল!

এদিকেও যেমন ধাপে ধাপে এগিয়েছেন, ওদিকেও তেমনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিলেন না। শ্য তলী থেকে উঠে এসেছেন বালিগঞ্জে, শেষ অবধি নিউ আলিপুরে বাড়ি ক'রে সম্পন্ন ও পদস্থ ব্যক্তির উপ মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে বাংলো প্যাটার্ন উঁচুতিদের বাড়ি, গা টেলিফোন—কিছুরই অভাব নেই তাঁর। পুরাতন আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন বহুকাল নতুন অন্তরঙ্গতাও করেছেন বেছে বেছে, সাবধানে। অর্থাৎ কোথাও কোনমতে না কেউ কেরানী বংশ কোন চিহ্ন প্রকাশ পায়, কোন আচারে-আচরণে না সে নিম্নমধ্যবিত্ততা ফুটে ওঠে।

সবই হয়েছিল—সামান্য যেটুকুও বাকী ছিল এবার একমাত্র কন্যার বিবাহে সেটুকুও সে নিতে চেয়েছিলেন।

একমাত্র সন্তান অনীতা—বাপের আদরের 'নীটা'।

'লা মার্টিনিয়ারে' পড়া মেয়ে, নাচে, গানে অভিনয়ে ছবি আঁকায় শিল্পকর্মে সমান দক্ষতা।

তার চেয়েও বড় কথা—সত্যকারের সুন্দরী মেয়ে। এরূপ বাঙ্গালী-সংসারে দুর্লভ।

এমন মেয়ে পাওয়া তাঁর উচ্চাভিলাষের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেই মনে করতেন দস্তসাহেব।

এ মেয়ের সু-পাত্রের অভাব হয় না। কিন্তু যেমন তেমন সুপাত্র হলে দস্তসাহেবের চলবে না। তি খুঁজে খুঁজে বারও করলেন ঠিক তেমনি একটি পাত্র। বাংলা দেশের এক বিখ্যাত এবং প্রাচীন জমিদ বংশের ছেলে, পিতামহ ইংল্যাণ্ডে মেম রক্ষিতা নিয়ে বাস করতেন, সেইখানেই বাবা যান।

ছেলের বাবার বিবাহসম্বন্ধ-এবং বিবাহ দুই-ই হয় বিলেতে—মাও তেমনি নীলরক্ত অভিজাত—দুষ্টি এক আত্মাবিনী। ছেলের সে মা নেই, বাবা পুনরায় বিবাহ করেছেন—সেও আমেরিকান এক অভিনেত্রীকে বছরে দু'মাস এখানে থাকেন—দু'মাস ফুল উপত্যকায়। ছেলে আশৈশব বিলেতে পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং প করেছে, এখানে ভারত সরকারে মোটা মাইনের চাকরিও পেয়েছে। সম্প্রতি মিশর না সুদান সরকার কা যেন তাকে এক বছরের জন্য ধার নিয়ে গেছে, আর দু'মাস পরেই ফিরবে সে। ফিরে এলে বিয়ে হবে- কথা পাকা হয়ে রইল। ছেলে ঠিক বিদেশ-যাত্রার আগে কোন পার্টিতে নীটাকে দেখে এবং তা গান শুনে পছন্দ করে গিয়েছিল—সেই আভাস পেয়েই ছেলের বাবাকে চেপে ধরেছিলেন দস্তসাহেব, তিনি পাত্রী দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। স্পষ্টই বলেছেন যে, ছেলে বিলেত থেকে ভাল একটি মেয়ে বিয়ে করে আনতে পারে নি বলে আমি তাকে তিরস্কার করেছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি যে ভালই করেছে ছোকরা—ঈশ্বর করেন মঙ্গলের জন্যে। না হলে কি এমন মা-লক্ষ্মী পেতুম। কী বলেন মিঃ দত্ত।'

বলে হাহা করে হেসে উঠেছিলেন। তাঁর মার্কিন স্ত্রীও তাঁর খুশী হয়েছিলেন. নীটাকে দেখে এ আ

ফলে দত্তসাহেবের খুশির সীমা নেই। তিনি যে সত্য-সত্যই আপ্লাবিত হয়েছেন তা তাঁর বার্তায় চালচলনে প্রকাশ পাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। তার চোখমুখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সে খুশির ঝলক।

অবশ্য এতে দত্তসাহেবের আর্থিক সুবিধা কিছু হচ্ছে না। তা তিনি চানও নি। ওরা প্রচুর টাকার কথা বা কোন দাওনাপোওনার কথাই তোলেন নি কেউ—মেয়ে দেখে শুনে পছন্দ হয়েছে, ছেলের যোগ্য বলে মনে করেছেন এই যথেষ্ট—তার বেশি তারা মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নন—এসবই ঠিক। দত্তসাহেবকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। এত বড় মর্যাদার উপযুক্ত প্রতিমর্যাদা যাতে তিনি দিতে পারেন—সে মান যাতে থাকে—এ বিষয়ে তিনি সদাসতর্ক ও সজাগ। এ কথা না কেউ বলতে পারে যে তিনি এ যৌতুক অনুপযুক্ত। তিনি হঠাৎ বড়লোক।

তাই তিনি যথাসাধ্য হিসেব করে করে, নিজের স্মৃতিসমৃদ্ধ মন্থিত অভিজ্ঞতায় হয়ে এবং অপর ধনীবন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে ফর্দ যা তৈরী করেছেন, তাতে খরচের অঙ্ক হাজারে পৌঁছাবে বলেই মনে হয়—অন্তত তার কম নয়। তবে তার জন্য তাঁর দুঃখ নেই। মাত্র মেয়ে—যা কিছু আছে, আজ হোক কাল হোক—ওরই তো সব। না হয় ওর সুখের জন্য খরচ করলেন। বরং আরও কিছু বেশি খরচ করতেও প্রস্তুত আছেন তিনি। এমন রাজা জামাই তার, তার উপযুক্ত আয়োজন তো চাই।

চারিদিকে সমারোহের সাড়া পড়ে গেছে, স্বামী-স্ত্রী বাজার করে, ফর্দ তৈরী করে, ক আর প্যাটার্ন দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, অগ্রিম অন্তত সাত হাজার টাকা বায়না দেওয়া হয়ে এমন সময় অকস্মাৎ বলতে গেলে পরিষ্কার নীলাকাশ থেকে বজ্রপাত হ'ল।

সেদিন তাঁরা, সম্পূর্ণ হীরের যে সেট হবে তারই, নমুনা পছন্দ করে দু'হাজার টাকা বায়না দিয়েছেন এক বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করতে—জামাই আগামী বুধবারই এসে পৌঁছবে—তার জন্য বিমান কী রকম অভ্যর্থনার আয়োজন করা যায়, তারই পরামর্শ করতে। ঐ খানেই পাঁচজনকে নিমন্ত্র একটা পার্টি দেবেন, না পরে গ্রেট ইস্টার্নে একটা ভোজের আয়োজন করবেন—এই আলোচনাতে করতে না পেরে প্রায় অবসন্ন হয়ে তাঁরা যখন বাড়ি ফিরলেন তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। এ তাঁরা মেয়েকে জেগে থাকতে দেখবেন আশা করেন নি। সে প্রত্যহ রাত সাড়ে আটটা নটার মধ্যে নিয়ে—দশটায় শুয়ে পড়ে। কখনও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। সেই মেয়েকে আজ এখনও পর্যন্ত দুই রুমে বসে থাকতে দেখে তাঁদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

দত্তসাহেব বললেন, হাউ ম্যাবলি—এ যে প্রেজাকেস্ট্ সারপ্রাইজ! আর এখনও পর্যন্ত বসে আছ যে।'

কথাটা হাসিমুখেই বললেন বটে দত্তসাহেব কিন্তু মনে মনে বেশ একটু অস্বস্তি অনুভব লাগলেন। কারণ এর মধ্যেই লক্ষ্য করেছেন যে মেয়ের মুখ বড় বেশি গম্ভীর—তাদের দেখেও আনন্দের আলো ফুটে উঠল না সে মুখে।

নীটা বিনা ভূমিকাতেই একেবারে কাজের কথা পাড়ল।

এ মেয়ে বলে কি ?

কিছুক্ষণ দুজনেরই মুখে কোন বাক্য স্ফূর্তি হ'ল না। অবশেষে অনেক চেষ্টায় কণ্ঠস্বর খুঁজে পে পারুলই। বলল, এ আবার তোমার কেমন ধারা ঠাট্টা খুকু! আর এসব লোকের কি এই সময়? বে আমরা দুজনেই ডেড টায়ারড্ হয়ে বাড়ি ফিরেছি!

'ঠাট্টা হলে অবশ্যই এ সময় তাগাদায় না মা—সেটুকু বুদ্ধি আমার আছে।'

'তার মানে!' বিহ্বল হতবুদ্ধি দত্তসাহেব প্রশ্ন করেন, জানো এখন পর্যন্ত ন হাজার টা আমার খরচ হয়ে গেছে, আরও বহু টাকার ফেরে জড়িয়ে পড়ব!'

'সেইজন্যেই তো রাত জেগে বসে আছি বাবা। আর যাতে খরচ না হয়—এবং যা খরচ হয়ে তার মধ্যে এখনও যদি খানিকটা বাঁচানো যায়।'

'কিন্তু কেন? কেন? এ উদ্ভট কথা তোমার মাথাতে আসছেই বা কেন?'

'ও ছেলে মদ খায়। নিত্য মদ না হলে চলে না। তাছাড়া বিলেতে থাকার সময় নারী-ঘ বহু কেলেঙ্কারী করেছে। একবার ওকে বার্মিংহামের ওর হোস্টেল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল—ওর বা সে সময় বিলেতে ছিলেন বলে বিস্তর ধরপাকড় ক'রে বাঁচিয়েছিলেন। যার চরিত্র ভাল নয় এবং মাতাল—তাকে আমি বিয়ে করতে পারব না।

'কিন্তু কে—কে বলেছে এসব কথা। এসব মিছে কথা! রটনা! কেউ তাংচি দেবে বলে রটিয়েছে বা রটাচ্ছে। তোমার এ সৌভাগ্যে যে অনেকেরই ঈর্ষা হবে এটা তো বোঝ?

দত্তসাহেব গলায় জোর দিয়ে বলেন।

'আমার বন্ধু মিলি চন্দ্রকে তোমরা জান—সে অত্যন্ত সিউরিটান, তাও বহুবার বলেছি। সম্প্র তার দিল্লীতে বিয়ে হয়েছে—এখন সে মিলি শ্রীপ্রকাশ। মিলি পাত্রের মামাতো বোন হয়—সেটা দৈব আবিষ্কার ক'রে চিঠি দিয়েছিলুম। সে খুব সঙ্কোচের সঙ্গেই সত্যি কথাগুলো লিখেছে এবং বারবা অনুরোধ করেছে যে আমি যেন শুধু তার কথাতেই কোন কিছু না করি। তা আমি করিও নি। ও চিঠি পেয়েছি কাল। আজ সকাল ও দুপুরের মধ্যে ওদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পরিচিত এবং সংশ্লিষ্ট বহু লোক কনট্যাক্ট করেছি। সকলে একরকম কথা বলেনি তা বলাই বাহুল্য, তবু, তাদের সতর্কতা ও সাবধা সত্ত্বেও, মিলির মূল দুটো অভিযোগ তারা সকলেই সমর্থন করেছে। আমি শুধু শুধু একটা চা পেয়ালায় তুফান তুলছি না বাবা!'

দুজনেই চুপ করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

ভাগ্যে ঝিটা একটু কালা এবং চাকরটা রান্নাঘরে পড়ে ঘুমে'চ্ছে এসময়—পারুলের আগেই কথাটা মনে হ'ল—নইলে কথাটা ছড়িয়ে পড়তে একটুও দেরি হ'ত না। কি চাকর বাড়িতে থাক কোন 'সিক্রেসী' থাকে না।

খানিক পরে দত্তসাহেব বললেন, 'তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে বিলেতে মানুষ হয়েছে, সে যদি গ বা ডিনারের সঙ্গে একটু করে মদ খায়—তাকে মাতাল বলা চলে না কোনমতেই। আর—আমিও একেবারে খোঁজ-খবর করিনি তা মনে কোর না—মেয়েছেলের ব্যাপারে তার কোন দোষ কেউ উ

কাগজের মধ্যে থেকে একখানা ফোটো বার করে ওদের সামনে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দেয় নীটা।

মাত্র মাস তিনেক আগের তারিখ এবং সেই সাক্ষাৎ পারেরই।

কোন ক্যাবারেতে বা কফি-হাউসে দো-আঁশলা একটি প্রায় উলঙ্গ নর্তকীর ফোটো।

ছবির পিছনে কোন বন্ধুকে তামাসা করে লেখা যে—'তুমি এলে না, এলে একেবারেই যে জীবন নিরামিষ কাটত তা নয়। এখানেও মানুষ থাকে, ভদ্রমানুষও থাকে। আর তাদের জীবনধারণের উপকরণও দুর্লভ নয়। তার প্রমাণ এই পাঠালুম।'

আবারও কিছুক্ষণ একটা কষ্টকর অসহ নিরবতা।

তারপর রস্তমসাহেব বলে উঠলেন, 'এ বন্ধুকে লেখা ছেলেমানুষি। তার জেনারিক উত্তেজক ক অঙ্গেই ডেলিবারেটলি পাঠানো—এটা বুঝছ না? চিঠির ভাষাতেই তো তাই বোঝা যাচ্ছে। নইলে এ কম্প্রোমাইজিং ছবি কেউ কখনও পাঠায়? সে যায়নি ওখানে, যেতে চায়নি হয়ত, সে ঐ ধরনেরই কে নীচ আমোদই পছন্দ করে—তাই তাকে তাতাবার জন্য একটু দুষ্টুমি। মিথিং এল্‌স্।'

'না বাবা। তাই মনে করে নিশ্চিন্ত হতে পারলে আমিও খুশী হতাম। অকারণে তো বিব্রত করা আমার পক্ষে খুব আনন্দের কথা নয়। কিন্তু এ হ'ল জীবন মরণের প্রশ্ন—চির জীবনের আমি বহু খোঁজ নিয়ে—নিজের মনে অন্তত নিঃসন্দেহ হয়ে একথা বলছি। উপহাস করবার বা বলা যে অন্যত্র যে এইসব স্থানে যেতে পারে—এই শ্রেষ্ঠীর স্ত্রীলোককে আলিঙ্গন করতে পারে—তাকে আমি বলে ভাবতে পারি না বাবা।'

এইবার পারুল কথা কইল। বরং কেটে পড়ল বলা যেতে পারে।

'তুমি বড্ড পাকাপাকা কথা কইছ নীটা। তুমি কি তার—সাহেব স্কুলে কলেজে আমাদের থেকে অনেক উঁচু কোন অসাধারণ জীব হয়ে গেছো? বা জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতা তোমার আমাদের অনেক কম? আমরা ভেবে-চিন্তে বুঝে-সুঝে যা ঠিক করেছি, তা তোমার ভালর জন্যেই কা তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে এলো কেন! নিজের বিয়ে নিয়ে ত্রিভুবন এক করে বেড়াচ্ছ—এট খুব গৌরবের কথা—না? ছি-ছি। আমরা লজ্জাবোধ করছি তোমার আচরণে।'

পারুল থামবার সঙ্গে সঙ্গেই রস্তমসাহেব শুরু করলেন, 'তাছাড়া বিয়ের আগে—বয়স্ক যে একটু এদিক ওদিক করেই—এগুলো হল আমোদ-আহ্লাদেরই অঙ্গ। এসব এত সিরিয়াসলি নিতে জানো ওর বাবা ওকে বলে বিয়েছিলেন বিলেত থেকে বিয়ে করে আসতে—কিন্তু ও তা আসে নি।'

'হ্যাঁ—তা জানি। আসে নি পারেনি বলেই। হি ওয়াজ কাউণ্ড আউট! কোন ভদ্র ওকে নেয়নি। তাছাড়া প্রচুর টাকা ছিল ওখানের ব্যাঙ্কে—সব উড়িয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে বলেই ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের চাকরি নিতে হয়েছিল ওকে তাড়াতাড়ি।'

য়্যাবসার্ড। কে এসব সিলি কথা যে তোমার মাথায় ঢুকিয়েছে! এ অসম্ভব, এ হ'তেই না। ইংল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড মিলিয়ে ওখানে চার পাঁচখানা বাড়িই আছে ওদের।'

সুশ্রী ম্যাকফ্লিনড, মেয়ে—তুমি যদি তোমার স্বামীকে জয় করতে বা বশ করতে না পার—সে তোমার মো যে ঘরে পড়ছ, যে স্টাটাসে উঠছ তার জন্য এটুকু রিস্ক নিতে তয় পাওয়া তোমার উচিত নয়।

নীটা তার শান্ত ভাসর চোখ দুটি বাপের মুখের ওপর রাখে, 'তোমারও কি এই কথা বাবা ?'

'বাপি কথাটা তুমি বুকে রাখো', কণ্ঠে মেয়ের মধু ঢেলে দিয়ে বলেন অপূর্ব, 'এ বলতে গে রাজবংশে তোমার বিয়ে হচ্ছে। কিছু দিন আগে—আর আগেই বা বলছি কেন—এখনও বহু হাজা আয়ে উড়িষ্যা বা বিহারে বা অন্য প্রদেশে বাদের রাজত্ব করেক হাজার একরের বেশী নয়—অথচ শ্রী এই যুগে শতাধিক। এছাড়া উপরন্তু আছে অঢেল। তবু কি এসব ঘরে মেয়ে দিতে কেউ ইতস্তত করে? ব সেবে যেচে তুলে দিয়ে আসে মেয়ে—ঐ ঘরে মেয়ে দিতে পেলে ধন্য মনে করে নিজেকে। তুলনায় আর এ কতটুকু বল ?

'বুঝেছি বাবা। সরি—তোমাদের এই সময় অনর্থক খানিকটা বকালাম। গুড্ নাইট।'

সে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে দোর দিয়ে শুয়ে পড়ল।

এরপর দুটো তিনটে দিন রক্তসাহেবের কাটল কণ্টক শয্যায়।

সেদিন নিজের ঘরে গিয়ে নীটা শুয়ে পড়তে পারল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত হয়েছিল—কি রক্তসাহেব হতে পারেন নি। মেয়েকে তিনি মেয়ের মায়ের চেয়ে একটু বেশীই চিনতেন—তাই এই আকস্মি গুরুতার জন্য তাঁর অস্বস্তির সীমা ছিল না।

যাই হোক—তিন চারটে দিন যখন ভালয় ভালয় কেটে গেল তখন রক্তসাহেবও হাঁফ ছাড়লেন একা

তাঁরা একটু শক্ত হয়েছেন বলেই মেয়ে নরম হয়েছে। এ বিষয়ে পারুলের বুদ্ধিই ভাল। হাজ হোক মেয়েছেলে মেয়েছেলেকে ভালই চেনে।

ইতিমধ্যে হ'বু জামাতা দেখে ফিরে এসেছেন। রক্তসাহেবেরও ছুটোছুটির অন্ত নেই। এ বাড়ুষ, তাঁকেই সব করতে হবে তো। অবশ্য তাঁর অফিসের প্রায় তিন চারশ কর্মী, অসংখ্য কন্ট্যাক্ট এঁরা হাসেনাই তাঁর হকুম তামিলের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন তবু মাথা তো তিনিই !

জামাই বাবাজীকে অভ্যর্থনা করতে তাঁরা জোকজন ফুলের মালা নিয়ে ঘমঘমে গিয়েছিলেন বি মেয়েকে সঙ্গে যেতে বলতে পারেন নি। কেমন যেন সাহসে কুলোয় নি। ঠিক সেই কারণেই গ্রেট ইস্টা পার্টির কথাও আর তোলেন নি। কে জানে এই মুখেই যদি মেয়ে বিগড়ে বসে ? তার চেয়ে আরও ব দিন যাক, উদ্যোগ-আয়োজনটা আর একটু সেরে নিক, আরও বেশী টাকা খানিকটা খরচ হয়ে যাক তারপর আর কিছু বলতে পারবে না। তখন একটা নৈতিক জোর বাড়বে তাঁর।

বিয়ের দিন অবশ্যই ঠিক হয়ে গেছে—সে তারিখটা পরোক্ষভাবে নীটাকে জানিয়েও দেও হয়েছে—এমন কি তার যে চারেকরকমের শাড়ি ও জামা কেনা হচ্ছে—সেগুলোও তার ঘরেই জড়ো হয়ে অর্থাৎ এর পর আর 'জানিনা' বলতে পারবে না। শাদা ক্রমশই জালে জড়িয়ে পড়ছে বেশী করে—ওড়ব ক্ষমতা আর থাকছে না।

এইভাবে আরও সপ্তাহ তিনেক কাটাবার পর—বিয়াহের যখন মাত্র আর নটি দিন বাকী আ একদিন সকালে নীটা কোথায় বেরুল। রক্তসাহেব সর্বদাই ব্যস্ত এখন—পারুলের মায়ার টিল নেই

পাওয়ার সময়ও ফিরতে না দেখে পারুল একটু চিন্তিত হয়ে উঠল। জানাশুনো দু একজন ওর বন্ধুর বাড়ী ফোন করেও দেখল—কিন্তু কেউই খবর দিতে পারল না। অবশেষে উদ্বিগ্ন হয়ে বস্তুসাহেবকে অফিসে টেলিফোন করবে এমন সময় বেলা দুটো নাগাদ ওদিক থেকে ফোন বেজে উঠল। হ্যাঁ, নীটারই গলা সে বলছে, একটু আটকে গেলুম মা-মণি, তুমি খেয়ে নাও। আমি এখানেই খেয়ে নিচ্ছি। বাড়ি ফিরে সব বলব।'

এই বলে, পারুলের তরফ থেকে কোন প্রশ্নের অবসর না দিয়েই ফোন্ রেখে দিল।

পারুলের বিরক্তির সীমা রইল না। এ আবার কি আহ্লাদেপনা! এতক্ষণ ধরে তাকে উপবাসী রেখে এইটুকু সংক্ষিপ্ত খবর। কেন আর দুটো শব্দ বেশী উচ্চারণ করলে কি মহাভারত হয়ে যেত!

বিকেলে বাড়ী ফিরলে রীতিমত তিরস্কার করবে সে—মনে মনে ভেবে রাখল।

অবশ্য খুশীও একটু হ'ল সে ওর মধ্যেই—অনেকদিন পরে নীটা তাকে মা-মণি বলে ডেকেছে।

নীটা ফিরল ঠিক সন্ধ্যাটার মুখে।

পারুল তখন একটু অধীর ভাবেই ওর অপেক্ষা করছিল—ড্রইংরুমে দোরের কাছে, বাইরের মুখ করে বসেছিল সে। বস্তুসাহেব একটু আগে ফিরেছিলেন, তিনিও সব শুনে পারুলকেই যথেষ্ট ঝি করেছেন—মেয়ের ওপর যথাযথ চোখ না রাখবার জন্য। নিতান্ত বাধ্য হয়ে তখনই তাঁকে ডেকোর কাছে যেতে হয়েছে তাই নইলে তিনি বোধ হয় এতক্ষণ চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করতেন। সেই পারুলের আরও উৎকণ্ঠার কারণ, বস্তুসাহেব ফেরবার আগে পারুল ফিরলে হয়। এবার যদি তিনি ফিরে মেয়েকে দেখতে না পান তো রক্ষা থাকবে না।

এই সময় মেয়ের আগমন একান্ত আকাঙ্ক্ষিত সন্দেহ নেই কিন্তু মেয়ে ঘরে ঢুকতে তার বেশ আকৃতি দেখে পাথর হয়ে গেল পারুল।

এ কে ঘরে ঢুকল। এ তো নীটা নয়! এ যে তার ছদ্মবেশধারী কেউ!

নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না পারুল। নিজের বিচারবুদ্ধিকে তো নয়ই।

নীটার মাথায় কাপড়, সিঁথিতে সিঁদুর।

মণিবন্ধে ঝকঝক করছে দুগাছি সাদা শাঁখা।

বিহ্বল অভিভূতের মত চেয়েই আছে পারুল, সেই অবসরে কাছে এসে প্রণামটা সেরে নিল তারপর বেশ সহজ কণ্ঠেই বললে, আজ আমার বিয়ে হয়ে গেল মা। এবার স্বামীর ঘর করতে যা আশীর্বাদ করবেন সুখী হই। ধনী ও অভিজাত হবার ভূতে না পেয়ে বসে আবার!'

'তার মানে? তার মানে কি!' অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে এই কটি কথা উচ্চারণ করে পারুল। কিন্তু দাঁড়িয়েও থাকতে পারে না বেশীক্ষণ। পা দুটোয় যেন নেই কিছু।

'মানে অতি সোজা মা—আমি যাকে ভক্তি করতে পারব, শ্রদ্ধা করতে পারব—এমনি

তো সে দায়িত্ব আর কারুর ঘাড়ে চাপাব না—বুঝে নিয়েই ভুল করেছি। কিন্তু সে নিজেরই ভুল—অপরের ভুলের খেসারত নয়। এই সান্ত্বনা।'

'কী বলছ খুকু। তুমি পাগল হয়ে গেছ না আমি হয়েছি। কিছুই তো বুঝতে পারছি না একি ছেলেখেলা পেয়েছ নাকি তুমি—যা? বিয়েটা কি ছেলেখেলা?'

'ছেলেখেলা নয় বলেই তো আমার জীবনটি নিয়ে তোমাদের খেলতে দিতে পারলুম না মা। আমি এটাকে অত্যন্ত সিরীয়াস জিনিস বলেই মনে করি।'

'কিন্তু এমন রাজা জামাই ফেলে কোন্ মহামানবকে বেছে নিলে তুমি তাই শুনি! কে সে এমন ভাগ্যবান?'

ঠিক কি করবে—তিরস্কার করবে না কান্নাকাটি করবে না রাগ করবে—ভেবে পায় না পারুল। সে অনুভূতির চেয়ে কৌতূহলটাই বড় হয়ে শেষ পর্যন্ত।

'তাকে তুমিও চেনো মা। মহামানব কেউ নয়, ধনী তো নয়ই। সামান্য একজন ইস্কুল মাষ্টার এই বিয়ে করার জন্য তাঁকে এখন হয়তো উপরান্ত টিউশনী নিতে হবে—হয়তো আমাকেও চাকরি খুঁজতে হবে তাঁকে একটু বিশ্রাম দেওয়ার জন্য।'

'ইস্কুল মাষ্টার! শেষে তুই একটা ইস্কুল মাষ্টারকে বিয়ে করলি।...কে সে এমন রাজা জামাইয়ের চেয়ে বড় হ'ল!'

'আমাদের হিন্দুঘরের ঐ কুসংস্কারটা বড় ভাল লাগে না। স্বামীর নাম করাটা আমার তত পছন্দ নয়—তবু একবার করছি। প্রণববাবুকে তুমি ভাল ক'রেই চেনো মা—প্রণব ঘোষ। ছেলেবেলায় আমাকে পড়িয়েছিলেন!'

'প্রণব! শেষে ঐ প্রণবটাকে—? ওর যে চল্লিশের ওপর বয়স হয়েছে খুকু।'

'হ্যাঁ মা। ঠিকই ধরেছ। একচল্লিশ। উনি তো মিথ্যে বলেন না। আমি প্রস্তাব করতে উনি প্রথম সেই আপত্তিই তুলেছিলেন। আমি শুনিনে। বৃদ্ধ মহাদেবকে বিয়ে করেছিলেন বালিকা উমা—আমাদের শাস্ত্রেরই কাহিনী।'

'তুমি প্রস্তাব করেছিলে? আর ও আপত্তি করছিল? হাসালি খুকু, হাসালি তুই! এক ভাগাবও, লোফার—পথের ভিখিরী সে আপত্তি করবে। আসলে মহাশয়তান সে, কৌশল করে জানে জড়ি তোকে দিয়ে এই প্রস্তাব করিয়েছে, জানে এক মেয়ে এত বিষয় সবই তো পাবে। কিন্তু সে ওকে বালি বা দিও—কোনদিন একটি পয়সা আর পাবে না তোমরা।'

'তুমি একটু ভুল করছ মা, অনেক খুঁজে টালিগঞ্জের এক উদ্বাস্তু পল্লী থেকে ওঁকে বার করেনি সাত বছর পরে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা সেদিন।... আসলে আগের দিন সারারাত ধরে ভেবেও উ ছাড়া এমন কাউকে মনে করতে পারিনি—যাকে আমি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা করতে পারি।...অনেক পুরুষ দেখে —মনে কোরনা এতখানি বয়স পর্যন্ত আমাকে সবাই এড়িয়ে চলেছে—কিন্তু যাদের দেখেছি, বিশেষ ক তোমাদের গড়া এই এক অদ্ভুত অভিজাত সমাজে—তাদের কেউই আমার স্বামী হবার উপযুক্ত বলে ম করি না। ঐ মানুষটির কথাই মনে ছিল—সরল, স্বাভাবিক মানুষ অথচ কর্তব্যনিষ্ঠ, সত্যবাদী। দরিদ্র কি

রাজী করাতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে—বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর বিভীষিকা ভাঙতেই তো একবেলা গেছে তিনি রাজী হয়েছেন এক সর্তে—এখান থেকে কিছু নিয়ে যেতে পারব না। পরনের শাড়ি আর দু গাছা বালা বাদে।'

'কিন্তু তুই কি পাগল হয়ে গেলি খুকু? এ কী করলি! তুই গিয়ে সেই গরীবের সংসারে ঢুকিতে, বাসন মাজতে পারবি। এ পাগলামি তুই কেন করলি মা। কেন আমাকে বললি না—আমি হয় অন্য পাত্র দেখতুম।'

'তা তুমি পারতে না। তোমাকে আমি চিনি। বাবার আভিজাত্যের মোহ তোমাকে ব বেশী করে পেয়ে বসেছে। এই পাত্রের লোভ তুমি ছাড়তে পারতে না। আর বাসনমাজা রান্না ঘেমি না চেষ্টা করে। নতুন রকম তো!'

'কিন্তু এটা কি—আমাদের প্রেস্টিজটাই কি ছেলেখেলা পেয়েছ! কাল সকালে এ খবর ছড়াবে—তখন আমাদের পোজিশান কী হবে ভেবে দেখেছ! এ বিয়ে আমি মানব না। আমি জোর আটকাব! সে লোফারটাকে জেলে দেব আমি।'

দুই সজলচোখে পারুলের যেন আগুন জ্বলতে থাকে। রাগে হাঁপাতে থাকে সে!

'পারবে না মা। একুশ পূর্ণ হয়ে আমি বাইশে পড়েছি—আমাকে আর তুমি আটকাতে না। হাঁ আর একটা যেন কী বলছিলে? প্রেস্টিজ, সোস্যাল পোজিশান? সত্যি কথা বলতে কি ঐ শব্দই আমাকে ভূতের মত তাড়া করেছিল মা—তাই এমন পাগলামি করতে হয়েছে। অনেক করেছি তোমাদের ঐ মিথ্যা আভিজাত্যবোধের জন্য—ছেলেবেলা থেকেই সয়েছি। কিন্তু তুলিনি—কথাও না। আমাকে তোমরা ঐ একটা মিথ্যা মোহের কাছে আধালা বলি দিয়েছ—বাকী জীবনটাও চাইছিলে, সেইটে আর হ'তে দিতে রাজী নাই। জীবন যদি নষ্ট করতেই হয়, নিজেই করব। তে জন্য নষ্ট হ'তে দেব না!'

'আমরা তোকে কষ্ট দিয়েছি? তোকে বলি দিয়েছি? এতদিনের এত অর্থ ব্যয়, এত এই পুরস্কার?'

অতিকষ্টে থমিয়ে থমিয়ে উচ্চারণ করে পারুল। দারুণ আঘাতে তার যেন প্রত্যাঘাতের প্রবৃত্তি শক্তিও চলে গেছে।

'মনে করে ভাখো তো মা—ছেলেবেলায় তোমাকে কতটুকু পেয়েছি। বিকেল বেলা আমি থেকে আসতুম—তোমারও বেরোবার সময় হ'ত। তুমি যেতে সোস্যাল কল দিতে, তুমি যেতে ইংরো শিখতে মেমের কাছে, যেতে সিনেমায়—যেতে বাবার সঙ্গে বাবার ওপরওলা অফিসারদের বাড়ি। থাকতুম ঝিয়ের কাছে, সেটা সন্ধ্যে হলেই নাক ডাকিয়ে ঘুমোত। যেদিন মাষ্টার আসত তো আসত - একা ভূতের মত চুপ করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম। যেদিন অসহ্য বোধ হ'ত—পাড়ায় যে মুড়িউলী সন্ধ্যাবেলা মুড়ি দিতে, তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তুম, ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম। একদিন আমার মাষ্টার মা দেখতে পেয়ে বাবাকে বলে দিয়েছিলেন—সে তুমি তাঁকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলে—তাঁর এই নাক গলা

রাখা হ'ল—সবই হ'ল কিন্তু তুমি কোথায়? তোমরা কোথায়? সেই বি-চাকর আর মাইনে-করা মাষ্টার-মাষ্টারনী। গানের মাষ্টার, নাচের মাষ্টার, ছবি আঁকার মাষ্টার। ইস্কুলের পড়া, তার ওপর এইসব চাপ—এক একদিন প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত, ভাবতুম সামনের ঐ বস্তির মেয়েগুলো আমার চেয়ে সুখী। কিন্তু তোমরা কোনদিন আমার দিকে তাকাওনি, আমার প্রাণটি দেখোনি। শুধু তোমরা বড় হবে, আরও বড় হবে—এই ছিল তোমাদের লক্ষ্য। ঝিয়ের কাছে থেকে, ঝিয়ের সঙ্গে ইস্কুলে গিয়ে—বাড়ি ফিরে হেন সুকথা নেই যা শিখিনি। আমার অতি অল্প বয়সেই বিগড়ে যাওয়া উচিত ছিল—যাইনি সেটা তোমার কি তোমাদের গুণ নয় মা—আমার গুণ। কিন্তু তখন থেকেই মনে মনে ভাবতুম যদি কোনদিন দিন পাই—এই অবহেলার শোধ নেব।···তবু হয়তো তা নেওয়া হত না—যদি সামনে এই সর্বনাশ দেখতে পেতাম। তোমরা সব জানতে সব শুনেছিলে—তবুও আমাকে বিয়ে দিতে চাইছিলে শুধু জামাইয়ের আর জামাইয়ের বংশের পরিচয় দিয়ে নিজেরা গর্ববোধ করবে বলে। তাতে তোমাদের কী লাভ হ'ত মা বলতে পার? কী পেতে হাতের মধ্যে? মেয়ের চোখের জলের চেয়েও যার দাম বেশী?'

পারুল স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। তার কথা বলার শক্তিও লোপ পেয়েছে যেন। অবাক হয়ে চেয়ে রইল মেয়ের মুখের দিকে। এ যেন ওর সে মেয়ে নয়—যাকে সে চিনত। এ যেন আর কেউ।

কে জানে যার সেই করুণ অসহায় বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে নীটারও চোখে জল আসছিল কি না হয়তো বা সেটা গোপন করতেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কেমন এক রকমের শুষ্কস্বরে বলল, 'তবে এখন আসি মা, বাপিকে বোল।'

দোরের কাছ পর্যন্ত গেছে—চলেই যাচ্ছে, বুঝি চিরকালের মতই। পারুল প্রাণপণ চেষ্টায় বলল 'কিন্তু কোথায় যাচ্ছ, কোথায় থাকবে—সেটাও আমরা জানব না?'

'জানবে বৈকি মা। সময় হলেই জানাব। ঠিকানাও দেব। তবে আজ নয়, এখন নয়। আপাতত শুধু এইটুকু জেনে রাখো—স্বামীর ঘরেই যাচ্ছি, তাঁর কাছেই থাকব। কোন ছোট কাজ যাতে সত্যিকার মাথা হেঁট হয় বাপমার—এমন কিছু করব না।'

সত্যিই চলে গেল সে।

হয়তো প্রণব বাইরেই কোথাও অপেক্ষা করছিল, রাস্তাতেই দাঁড়িয়েছিল হয়তো। হয়তো ট্যাক্সি পয়সাও নেই। হেঁটে গিয়ে ট্রামেই উঠবে।

কে জানে তাকে ডেকে ডাকা উচিত ছিল কিনা। তাকে কঠিন তিরস্কার করে, পুলিসের ভয় দেখিয়ে—অপমানের ভয় দেখিয়ে কিছু করা যেত কিনা!

কিন্তু কিছুই করা হ'ল না। কী করা উচিত তাও ভেবে পেল না পারুল।

শুধু বাইরের সেই ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে চেয়ে বিমূঢ়ের মত বসে রইল সে।

———

গুরুদেব

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

গুরুদেব আসছেন শুনলেই কার্তিকবাবুর হৃদকম্পন উপস্থিত হয়। তিনি যদি মল্লিক বংশের কুলগুরু। তাহলে এত চিন্তার কারণ ছিল না, একজোড়া ধুতিচাদর, দশ টাকা প্রণামী, আর তার সঙ্গে তাড়াটা পেলেই অজস্র আশীর্বাদ করতে করতে বিদায় নেন। কলকাতায় তিনি কখন-সখন আসেন। পাঁচ বছরে হয়ত একবার শিষ্য বাড়ী পায়ের ধুলো পড়ে। বর্ধমান জেলায় কোন সুদূরপল্লীতে, তাঁর ঘরবাড়ি সম্পত্তি। গুরুধানের কৃপায় কোন কিছুর অভাব নেই। ক্ষেত-খামার, হাল-বলদ, গরু-ছাগল নিয়ে সচ্ছল অ কিন্তু এ যে একেবারে খাস মহারাণীর স্ব-নির্বাচিত গুরুদেব! সিল্কের গেরুয়া পরা গৌরকান্তি কা দিব্যকান্তি গৌর গৌর চেহারা! কেবল বাংলায় নয় ইংরিজী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় যেমন অনর্গল কইতে পারেন, তেমনই কীর্তন গাইতে গিয়ে দুহাত তুলে যখন নৃত্য শুরু করেন, বহু শিষ্য-শিষ্যা ভাব মূর্ছা যায় তাঁর চরণ তলে। কলকাতায় তাঁর পসার সবচেয়ে বেশী। অগণিত শিষ্য-শিষ্যা। শিষ্যের চেয়ে শিষ্যার সংখ্যা অধিক এবং বেশীর ভাগই বড়লোকের ঘরের বৌ-ঝি; তবু জজ, ব্যা উকিল, মহাজন, কন্ট্রাক্টর, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী পুরুষ যে কত তার ঠিকঠিকানা নেই। গুরুদেবের আ তাই একবার হলে শিষ্যদের ভক্তির বন্যায় ছুটো সপ্তাহ কোথা দিয়ে যে গড়াতে গড়াতে ছুটো মাসে হয় কেউই বুঝতে পারে না। আজ বরানগর, কাল আগরপাড়া, পরশু যাদবগড়, তারপরদিন হয়ত দূরে কোন ফুলফুলওয়ালার বাগানবাড়ী দেখতে দেখতে হরেকরকমের গাড়ীতে করে ওঠে। তারপর সা ব্যাপী উৎসব! খোলকরতাল সঙ্কীর্তন। হীরতাম্ ভুজাতাম্, গুরুর নামের কেবলম্! মোহপুরুষ শিষ্যাদের ভীড়ে ভীড়। রকমারী শাড়ী, হীরামুক্তার অলঙ্কার, শিফন নাইলনের সঙ্গে রকমারী পেন্ট মুখ। গুরুকে নিয়ে যেন কাড়াকাড়ি পড়ে যায় বিশেষ করে ধনী শিষ্য মহলে।

ভয়টা সবচেয়ে বেশী কার্তিকবাবুর এইখানে! বাস্তবিক এক আধদিন হলে সহ্য হয়। যে গুরুদেব কলকাতায় থাকবেন, সে কদিন আর দিনে রাতে খাসডীর টিকি দেখা যাবে না। সেই যে চা মুখে দিয়ে ছুটবে গুরুভাইয়ের কারুর না কারুর গাড়ীতে করে, তারপর কখন ফিরবে তার নেই। রাত্তির দশটা হতে পারে, বারোটা হতে পারে, আবার তার চেয়েও যদি বেশী হয় তার মধ্যে কথাও মুখে উচ্চারণ করা চলবে না। তাহলেই বিপরীত। মোট কথা সংসারটা যে মায়া ছাড়া কিছু নয় এবং মানুষ অঙ্কের মত এরি পিছনে ছুটে মরছে—এই সত্যটা যেন বেশী করে উপলব্ধি করে মাস কদিন তাই সংসারের সকল বন্ধন নিজ হাতে ছিন্ন করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়। স্বামী ছেলে মেয়ে কারুর দিকে তাকায় না। ছেলে মেয়েরা কখন স্কুলে যাচ্ছে, কে কি খাচ্ছে, কোথায় শুচ্ছে যেমন কোন খোঁজখবর না, তেমনি ঘরদোরের কি অবস্থা যে হয়েছে ঝি-চাকরের হাতে, চোখের সামনে দেখেও যেন দেখবে না। উপরন্তু স্বামীকে যখন তখন কেবল খাসডী খোঁটা দেয় না, যেন দিব্যজ্ঞান দিয়ে ছাড়ে। বলে, গুরু [illegible] মানুষের জীবনে এক সুদুর্লভ সৌভাগ্য। বহুজন্মের সুকৃতি থাকলে তবে এ সুযোগ

কার্তিকবাবুর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়। বলেন সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য। তুমি যখন আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী তখন অর্দ্ধেক পুণ্য আমার হিসেবের খাতায় ঠিকই জমা পড়ছে। কাজেই কাজকর্ম কামাই করে বৃথা ছুটোছুটি করে মরি কেন? তাছাড়া তোমার সঙ্গে যদি একই পথের পথিক হই, তাহলে আর ব্যবসা-বাণিজ্য করে খেতে হবে না। এই দুটো মাসেই লাল বাতি জেলে ছাড়বে।

মালতী স্বামীর মুখের কথা যেন খামচে মেরে বন্ধ করে দেয়। জানো গুরুর কৃপায় কত লোকের অবস্থা ফিরে গেছে। কত ব্যবসায়ীর ধনদৌলত উথলে উঠেছে। যার প্রতি একবার গুরুর কৃপা হয়, তার সংসারে আর কোনদিন কোন অভাব থাকে না।

কার্তিকবাবু স্ত্রীর এ কথাটা মেনে নিতে পারেন না। তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বলেন, আমি আজকালকার দেবতারাও সব ঘুষখোর হয়ে গেছে। শুধু তেলা মাথায় তেল ঢালে, যার দু'দশ লক্ষ আছে তার ওপর আরো দশ লক্ষ চাপিয়ে দেয়।

ছিঃ ছিঃ ওকথা বলো না। শুনলে পাপ হয়। বলে দুহাত দিয়ে কান চেপে ধরলে।

নইলে তোমার প্রতি তাঁর কৃপা হয় না কেন? যদি তোমারও ত তিনি গুরু। ভক্তি শ্রদ্ধা তুমিও ত তাদের কারো চেয়ে কম করো না।

তবু গুরুর পক্ষ নিয়ে কোমর বাঁধে মালতী। বলে, তোমার জন্যে কতটুকু আর করতে পারি। দেখো গে দিনরাত তারা পড়ে আছে গুরুর পায়ের তলায়, বাড়ীঘর, স্বামীপুত্তুর সব ভুলে একমনে শুধু সেবা করে চলেছে। ভক্তির স্থানে ফাঁকি বাটপাড়ি চলে না মনে রেখো। গুরু অন্তর্যামী। তিনি সবই বুঝতে পারেন।

তাহলে তোমার সেবার মধ্যে কোথাও ফাঁকি আছে নিশ্চয়।

জিব কেটে উত্তর দেয় মালতী। হয়ত তাই। একদিন সেখানে গেলে, চোখে দেখলে বুঝতে পারতে সেবা কাকে বলে। বড় বড় লোকের সব স্ত্রী—জজ, ব্যারিষ্টার, উকিল মহাজন—তাঁরা কেউ গুরুদেবকে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে, কেউ স্নান করিয়ে দিচ্ছে, কেউ খাইয়ে দিচ্ছে, আবার কেউ বা পাখার বাতাস করে, পা টিপে দিয়ে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে। আবার কেউ পায়ের বুড়ো আঙুল ধুয়ে চরণামৃত খাচ্ছে। এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে বললেন, জানো, ভক্তিতে দিলার বন্ধু তর্কে বহুদূর।

কার্তিকবাবুর ঠোঁটের ডগায় যেন উত্তরটা জীবন্ত ছিল। বলে উঠলেন, তা তুমিও তো ওই রকম করলে পারো।

কি করে হবে? আমার ত বাড়ী থেকে বেরুতে বেরুতেই আটটা বেজে যায়। তিনি স্নান করেন ভোরে। রাত চারটেয়। সূর্যোদয়েরও পূর্বে। রাত্তিরে যারা থাকেন তারাই ভাগ্যবতী।

কার্তিকবাবু বলেন, তাই যদি বোঝ এত কষ্ট করে দুপুর রাতে না ফিরে একেবারে গুরুসেবাটা সম্পূর্ণ করে এলেই পারো। ব্যবসার উন্নতি তাতে ঘ'ন সত্যি সত্যি হয়।

সকলে ত তোমার মত বোকা নয়। সেখানেও ভীড়, এমন কম্পিটিশন্ যে কে আগে গুরুকে নাওয়াবে, তেল মাখাবে, খাওয়াবে, ঘুম পাড়াবে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। বড় বড় লোক, যাদের নাম বেশী, পয়সা বেশী, তাদেরই অধিকার বেশী। আমার মত সামান্য শিক্ষা তাঁর বহু বহু আছে।

তাই বলো, এটা ছিল প্রধান অজুহাত। গুরুর চোখে সব শিষ্যই সমান। সেখানে ইতরবিশেষ

স্বামীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মালতী বলে, তাঁর কি অপরাধ। পক্ষপাতিত্ব তো তিনি করেন না করছেন শিষ্যরা। এটা তাদেরি অপরাধ! গুরুর সেবা নিয়ে তারাই করে কাড়াকাড়ি। শুনলাম না কোন একজন জমিদার লক্ষ টাকা খরচ করে নতুন আশ্রম তৈরী করে দিয়েছেন। কাজেই তাঁর কলকাতার আশ্রমের সর্বেসর্বা। তাঁরই হুকুম সবাই মেনে চলে।

এইভাবে এতটুকু সুযোগ পেলে মালতী গুরুর গুণকীর্তন করতে ছাড়তো না। যাতে স্বামীর আকৃষ্ট হয় গুরুর প্রতি, সব সময় সেই চেষ্টা করতো।

এক একদিন এসে এক একটি অলৌকিক কাহিনী বলতো। কোন দরিদ্র শিষ্যের কঠিন রোগ ভাল করেছেন গুরুদেব। কার অবস্থা খারাপ ছিল গুরুর চরণধূলি তার বাড়ীতে পড়ায়, একেবারে ঘুরে ফেঁপে উঠেছে তার ব্যবসা।

ইঁটের কারবার করেন কার্তিকবাবু। ক'বছর ধরে লোকসানের পর লোকসান খাচ্ছিলেন। হঠাৎ একদিন কি মনে করে গুরুদেবের আশ্রমে গিয়ে হাজির হলেন। রাত যেন প্রায় দশটা, কিন্তু রথযাত্রার ভীড় সেখানে।

গুরুদেবকে ঘিরে বসে আছেন ভক্তি গদগদ মূর্তি শিষ্য-শিষ্যের দল। মাঝখানে ফুলের মালায় দেবতার মত স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট গুরুদেব। দু'পাশে দাঁড়িয়ে দু'জন তরুণী চামরব্যজন করছে।

হঠাৎ একজন শিষ্য প্রশ্ন করলে, বাবা ভগবানের স্বরূপ কি?

গুরুদেব উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, সে কি আমার মত, তোমার মত। সে কি আম জাম নারিকেল রে!

আহা আহা করে সমুদয় ভক্ত একসঙ্গে তারিফ করে উঠলো। যেন এতবড় কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে আর কোন মহাপুরুষ কখনো ধারণাও করতে পারেননি, পারবেন না।

একটু পরে আর একজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, বাবা যারা দিনরাত ভজনপূজন করে তারা এত কষ্ট পায় কেন?

তারা যে শকুনির জাত। যত উঁচুতে উঠুক না কেন দৃষ্টিটা সব সময় পড়ে থাকে ভাগাড়ের দিকে। তাই কষ্ট পায়! গুরুদেবের মুখে যেন অমৃতবর্ষণ হলো।

জয় গুরু। জয় গুরু। বলে সঙ্গে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ বিগলিত হয়ে ওঠে।

এবার একজন তরুণী বিধবা সঙ্কুচিত কণ্ঠে পিছন থেকে শুধালো, বাবা ঈশ্বরের বিভূতি আপনি লাভ করেছেন, আপনার চোখে তাঁর কি রূপ, যদি দয়া করে একটু বর্ণনা যেন তা শুনে আমাদের হতভাগ্যের জন্ম সার্থক হয়।

পিছন ফিরে একবার ভক্তিমতী শিষ্যাকে দেখে নিয়ে গুরুদেব বলে উঠলেন, ওরে পিঁয়াজ, পিঁয়াজ দেখেছিস তো? ঈশ্বর হলেন তেমনি! একটার পর একটা খোসা ছাড়িয়ে ফেললে, সব শূন্য!

চারিদিক থেকে ধ্বনিত হলো, 'জয় গৌর' 'জয় গৌর' 'গুরু কৃপাহি কেবলম্'।

পথে আসতে আসতে মালতী স্বামীকে জিজ্ঞেস করলে, কেমন দেখলে গুরুদেবকে!

তা'হলে এত সব বিশিষ্ট লোক জজ, ব্যারিস্টার, উকিলগুলো বুঝি গাড়ল কিছু বোঝে না, জ্ঞান বুদ্ধি বুঝি ভগবান কেবল একা তোমার মাথায় দিয়েছেন।

মোট কথা গুরুর নিন্দা মোটেই সহ্য করতে পারে না মালতী। মনে মনে স্বামীর প্রতি বি: হয়। তাঁর এই অবিশ্বাসী মনে কেমন করে ভক্তির উদয় হবে, সব সময় তাই চিন্তা করে। একা মালতী এসে বললে, দেখো, আমার কি সৌভাগ্য শনিবার দিন গুরুদেব আমার বাড়ীতে পায়ের ধু দেবেন কথা দিয়েছেন।

এ্যাঁ! সে যে অনেক খরচা। কার্তিকবাবু আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। ওই বিরাট দলবল সঙ্গে না নিয়ে তিনি পা বাড়াবেন না।

চুপ করো। তার জন্যে তোমার কাছ থেকে একটা পয়সাও আমি চাই না। আমার নি টাকা দিয়েই আমি গুরুর সেবা করবো। জানো কত জন্ম-জন্মের পুণ্যের ফলে তবে ওঁর চরণধুলো প বাড়ীতে। আমি আজ ক'বছর ধরে চেষ্টা করছি কিন্তু কখনই আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি! এবার ভগ মুখ তুলে চেয়েছেন! গুরুর কৃপা হয়েছে। রাগে মালতীর চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে। স্বা দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে ঘরে চলে যায়।

কার্তিকবাবু পিছনে পিছনে এগিয়ে গিয়ে বলেন, আমি কি টাকা দেবো না বলেছি, যে ব রাগ করছো?

আবার কি করে বলবে? তোমার মনের ভাব কি আমি বুঝি না, ভেবেছো? বলতে বল মালতীর দু'চোখের কোণে জল ছল ছল করে। আঁচল দিয়ে চোখের প্রান্ত মুছতে মুছতে বলে, জা যে বাড়ীতে ওঁর চরণধুলো পড়ে, সেখানে অভাব অনটন বলতে আর কিছু থাকে না। তাই ওঁকে নি এত টানাটানি।

বেশ তো 'কলেন পরিচিয়তে'। দেখা যাবে তিনি আমাদের কি করেন।

হঠাৎ যেন গর্জে ওঠে মালতী। যদি তোমার ব্যবসায় লাভ হয়, আমার গুরুদেবের কৃ তাহ'লে তুমি তাঁকে কি দেবে বলো?

খপ্ করে কার্তিকবাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, বেশ যা লাভ হবে তার অর্ধেক দেবে কথা দিচ্ছি!

ঠিক বলছো? গুরুর নামে কিন্তু মিথ্যা বলতে নেই! ভেবে-চিন্তে কথা দাও।

স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ঘাবড়িয়ে যান কার্তিকবাবু। গুরুর প্রতি অচলা ভ ও ঐকান্তিক বিশ্বাসের অনির্বাণ হোমানল যেন জ্বলতে থাকে সেখানে।

কথা দাও, সত্য করে বলো। যা বলেছো, তা ঠিক তো? স্বামীর চোখের উপর নিজের। আবদ্ধ করে প্রশ্ন করে মালতী।

এবার কার্তিকবাবু বলে উঠলেন, হাঁ বুঝবো তোমার গুরুর কৃপা। বেশ যদি লক্ষ টাকা হয় তো দেবো পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁকে প্রণামী।

মুখে ওকথা বললেও মনে মনে কার্তিকবাবু জানতেন যে তাঁর ওই টলটলায় ব্যবসায় লক্ষ টা লাভ হওয়া যেমন অসম্ভব, তার অর্ধেক দান করাটাও তেমনি কল্পনাতীত।

চললো। সন্ধ্যার সময় একলা মালতী গুরুদেবের পায়ে ধরে কেঁদে পড়লো। বললে, আমার মুখ র কক্ষন! আমার স্বামীকে কথা দিয়েছি যে আপনার অনুগ্রহে তার অভাব দূর হবে, ব্যবসা ফুলে ফেঁ উঠবে।

গুরুদেব সস্নেহে মালতীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বেটি, কোন চিন্তা নেই তোর ও আমি ঠাকুরকে জানাবো তোর মনের কথা।

সেদিন বিদায় নেবার সময় শুধু গুরুদেব কার্তিকবাবুর সব বিবরণ অর্থাৎ কি ব্যবসা, কোথ কি ঠিকানা মালতীর কাছ থেকে লিখে নিয়ে গেলেন।

ছ'টা মাস গেল না, কার্তিকবাবু একেবারে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। কোথা থেকে বড় মাড়োয়ারী মহাজন কন্ট্রাক্টর এসে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ইটের অর্ডার দিয়ে গেল। বছরের শে সত্যি সত্যি তার লক্ষাধিক টাকা লাভ হলো।

মালতী যেন চেপে ধরলে স্বামীকে। বললে সত্য রক্ষা করতে।

কার্তিকবাবু দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, আমি শুধু লাভের অর্ধাংশই প্রণামী দেবো ঃ তাঁর কাছে মন্ত্র নেবো মালতী। তুমি ঠিকই বলেছো, উনি সাক্ষাৎ দেবতা।

সেই মাসের শেষে সবচেয়ে ভাল একটা দিন দেখে, তাঁরা স্বামী স্ত্রী রওনা হলো বিন্ধ্যা গুরুদেবের মূল আশ্রমে। সেখানে গিয়ে কার্তিকবাবু সকলের আগে একেবারে আছড়ে পড়লেন গুরুদে পায়ের তলায়। বললেন, বাবা অপরাধ মার্জনা করুন। অধম সন্তানকে দয়া করুন। আমি বড় প এতদিন আপনাকে চিনতে পারিনি।

গুরুদেব সস্নেহে কার্তিকবাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ওঠ বেটা, ভগবান তোর করবেন।

রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিণের সাধ গেল, দরিদ্রের কুটীরে গোপনে এক রাত্রি যাপন করে দেখে আসেন দরিদ্র প্রজারা কি ভাবে থাকে।

রাজধানী থেকে একটু দূরে এক দরিদ্র কাঠুরের কুটীরে তিনি এক শীতের সন্ধ্যায় অতিথিরূপে উপস্থিত হলেন একাকিনী। কাঠুরিয়া তাঁকে সাধারণ মহিলা ভেবে যথাসাধ্য অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে—"মহাশয়া, আমি অবিবাহিত, আর একটি মাত্র ঘর আমার, এক্ষেত্রে আপনাকে স্থান দেওয়া অসম্ভব মনে হলেও, আপনি আমার অতিথি! আপনি নিশ্চিন্তচিত্তে আমার কুটীরেই থাকুন। আমি সারারাত বাইরে থেকে আপনাকে পাহারা দোব।

ক্যাথারিণ বলেন—"এই দারুণ শীতে আপনি বাইরে থাকবেন একথা শোনার চেয়ে আমার পক্ষে যে চলে যাওয়াই ভাল!"

বলা বাহুল্য, কাঠুরিয়ার মহত্ত্ব ও উদারতা ক্যাথারিণ ভুলে যান নি। পরে রাজ্যের এক উচ্চপদে তাকে নিযুক্ত করেছিলেন।

ভ্যাড়া

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

হারাধনের কি সুমতি এসে আমাদের সবাইয়ের সামনে চায়ের বাটি বসিয়ে দিয়ে গেল। আমরাও একসঙ্গে চায়ে চুমুক মেরে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম—অঃ!

কার্তিকের হরুণ হিম-পড়া সন্ধ্যেবেলাতে সবাই জমে বসলাম চায়ের বাটি ঘিরে। ঘনা ডাক্তার যে স্বগতোক্তির মতো বললে—এবার একটু গল্প-সল্প হলে মন্দ হত না।

আমরা সবাই একযোগে বটুক ঠাকুদ্দার দিকে তাকালাম। দেখি ঠাকুদ্দা তাঁর ট্যাঁক থেকে একটা হিজ্ মাস্টারস্ ভয়েসের গিনেং কৌটো বার করলেন। তারপর ধীরে-সুস্থে সেটি খুলে তার থেকে একটা কালো বড়ি বার করে টপ করে সেটা মুখে ফেললেন। তারপর তারিয়ে তারিয়ে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন ঠাকুদ্দা।

হারাধন সোজাসুজি ঠাকুদ্দাকে বললে—ঠাকুদ্দা এবার তো আপনার হিজ মাস্টারস্ ভয়েস এসে গেছে। আর কী ভয়েস খুলে দিন এবার।

ঠাকুদ্দা কারুর দিকে না তাকিয়ে বাধ্যাই গলায় হাঁকলেন—সুমি, আর এক পেয়ালা চা নিয়ে আয়তো!

তারপর দু চোখ বুজিয়ে কিছুক্ষণ ঝিম মারলেন। ঘনা ডাক্তার তার নাকের ওপর থেকে কাগজটা টেনে নিল। হারাধন আর তারক হাতের কাছে তাসের প্যাকেটটা নিয়ে পেটাপেটি খেলবার জন্য তাস বাঁটতে লাগল।

শিবদাস কি একটা ডিটেক্‌টিভ নভেল পড়বার চুতো করে তাকিয়ার মাথা রেখে কাত হল।

কিন্তু সবাই আড়চোখে মাঝে মাঝে ঠাকুদ্দার ধ্যানস্থ মূর্তির দিকে তাকাতে লাগল।

হঠাৎ ঠাকুদ্দা চোখ খুলে বললেন—বুঝলে ভায়েরা, আমি সার ভেবে দেখলাম ভ্যাড়াই হচ্ছে বাঙালির একমাত্র ভরসা। ভ্যাড়াতেই দেশের সব সমস্যার সমাধান হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ঘনা ডাক্তার বললে—বলেন কী ঠাকুদ্দা? ভেড়ার মাংসে না হয় কিছুটা প্রোটীন ফুডের চাহিদা মিটতে পারে, তা বলে দেশের এই অন্ন-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, তা ছাড়া নিদারুণ বেকার-সমস্যার সমাধান—

ঠাকুদ্দা ডাক্তারকে বাধা দিয়ে বললেন—বেকার সমস্যা বলে কোন সমস্যাই বাংলাদেশে নেই ডাক্তার ওকথা বাদ দাও তুমি। দেশের নওজোয়ানরা তো দিব্যি আছে। যাচ্ছে যাচ্ছে, গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখছে। রীতিমতো তিন টিমের সিনেমায় হাজিরা দিচ্ছে। সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা অবধি তারা ব্যস্ত আছে তাদের কাজে। তারপর মাঝে মাঝে খুব হাত নিস্‌পিস্ করলে গোটাকয়ে ট্রাম-বাসে আগুন ধরিয়ে কলকাতা সরগরম করে দিচ্ছে। বাপ্‌রে, তাদের কী বেকার বলতে পারি তাদের কতো কাজ!

শিবদাস তাকিয়া থেকে মাথা তুলে বললে—কী যে বলেন ঠাকুদ্দা। গরমেন্টের পর্যন্ত মাথার টন

ঠাকুমা বললেন—আরে বাবা ভ্যাড়া শুদ্ধ অর্থে মেষ, দেশের সব সমস্যার সমাধান করতে পারে।

তারক আর হারাধন তাস সরিয়ে ফেলে একযোগে জিজ্ঞাসা করলে—কি করে?

ঠাকুমা বলতে লাগলেন—মেষ পোষ। ক'মাস অন্তর বারে বারে বংশবৃদ্ধি করবে। ঘ বাঠের ঘাস আর গাছের পাতা। তাদের মাংস যত পার খাও, বিক্রী কর। ব্যস, অন্ন সমস্যার সমা ধান। তাদের পশমে লাল ইমলি কী বারিওয়ালের মতো পশম বানাও। সেই পশমে কম্বল হা বস্ত্রের অভাব থাকবে না। তাদের চামড়ায় লেদার জাকিন আর জুতো বানাও। ক্ষুরে আর শিরীষ বানাও। হাড়ে ছুরির বাঁট তৈরী কর। এ সব বাইরে একবার চালান দিতে পারলে কর স্টার্লিং আর ডলার আমদানি করবে দেশে। তাতে দেশের ভাগ্যগুলোর উন্নতি হবে। তারপর চল শি আর সংস্কৃতি। তা সে ব্যাপারে মেষ তো হল শিক্ষার পীঠস্থান। কলেজের মেসগুলো থেকেই আম দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা তৈরী হচ্ছে। তাছাড়া মেসই হল বাঙালী প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত জা নতুবা রাধাঠাকুরের মেস না হলে শরৎচন্দ্রের মতো প্রতিভা ফুটতে পেত কিনা সন্দেহ। এদিকে ঠাকুরের প্রথম জীবনে ঠাকুরবাড়ীর মেস তারপর শান্তিনিকেতনের মেস। এই দু'জন দিকপাল সাহি মেসের মহিমা জানতেন বলেই না তাঁদের উপন্যাসের নায়কদের জন্যে ব্যবস্থা করে দিলেন—পটলড মেস। তখনকার কালের দ্রষ্টা ঋষিরা পর্যন্ত মেসের মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে রাশিচক্রের প্রথমে দিয়েছেন। তাতের সেরা ইংরেজ আর তাদের একজন সেরা কবি ব্লেক, ল্যাম্ব কবিতা লিখে বিখ্যাত গেলেন। তারপর মেষ না শ্রীমান ও শ্রীমতী মেষ অর্থাৎ চার্লস্ আর মেরী ল্যাম্ব—তাদের খ্যাতি তো ই সাহিত্য ক্ষেত্রে কায়েমী হয়ে আছে।

ইতিমধ্যে সুমতি আরও এক কাপ চা দিয়ে গিয়েছিল। তাতে চুমুক লাগিয়ে গলাটা ভাল ভিজিয়ে নিয়ে ঠাকুমা আবার বললেন—শিক্ষার সেরা শিক্ষা দিয়েছেন শঙ্করাচার্য। বলেছেন "যে যস্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।"—অর্থাৎ মোটার সেই বাটপাড়ের ভয়। সেই চরম শিক্ষাটি যদি লাভ করতে তো ভাড়ার লোমের কম্বল সম্বল করে মনুষ্য জন্মের আদর্শ হিসাবে মরতে না। আর যদি গৃহী হতে চাও তাহলেও ঐ ভাড়াই উপযুক্ত শিক্ষা দেবে। গৃহিণীদের কাছে ফ্রেঞ্চ ভাড়া হয়ে কোন ঝামেলা থাকবে না। হারাধন বললে—ঠাকুমার যতো বয়স বাড়ছে ততই দেখছি মাথা সা হয়ে উঠছে। তা ঠাকুমা সরকারকে একটা এ সম্বন্ধে স্কীম দিয়ে দেখুন না কী হয়। চাইকী অন্ ইণ্ডিয়া ল্যাম্ব রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর হয়ে যেতে পারেন।

ঠাকুমা বললেন—হাক ঠাট্টা করিসনি। ইচ্ছে করলে কী আর হতে পারি না?

বৃদ্ধ ভারতবর্ষের বৃদ্ধ সরকার আমাদের মতো বুড়োদেরই কদর জানে সব চেয়ে বেশী। তাই যে মা বুড়োদের জন্যে পিঁজরা পোল মা বানিয়ে যতো কিছুর ডিরেক্টরী দিচ্ছে তাদের ডেকে ডেকে।

তারক জিজ্ঞাসা করলে—তা ঠাকুমা এতো মানোয়ার থাকতে হঠাৎ আপনার এই ভাড়ার কারণটা জানতে পারি কি?

ঠাকুমা বললেন—বহুদিন আগে আমার একবার যোগারূঢ় অবস্থায় দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছিল। অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন করবার মতো আমিও দেখেছিলাম—ভারতবর্ষের আসমুদ্র হিমাচল কেবল [illegible] অফিস আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ সব চালাচ্ছে ভেড়ারা। দেশে যে সা

ঘনা ডাক্তার অবাক হয়ে বললে—বলেন কী ঠাকুর্দা। আপনি তাহলে বেদব্যাসের ব্রহ্মসূত্রের মতো একটা বটুক শর্মার মেঘসূত্র রচনা করে ফেলুন না।

ঠাকুর্দা একটু হেসে বললেন—করব করব, সব করব। ভ্যাঙার বাড়ী থেকে এমন সুতো টেনে বার করব যে সেই সুতোয় কাপড় বুনলে কমসে-কম তিরিশটে বছর তা টেঁকবে।

ঘনা ডাক্তার বললে—ওকথা এখন থাক ঠাকুর্দা। আপনার কী করে মেঘদর্শন হল সেই গল্পটা একবার বলুন শুনি।

শিবদাস বললে—মেঘদর্শন কী করে আর হয়। একবার ভ্যাঙার খোঁয়াড়ে গিয়েছিলেন ঠাকুর্দা, সেইখানেই মেঘদর্শন হল।

ঠাকুর্দা শিবদাসের দিকে ভুরু কুঁচকে রক্ত চক্ষু মেলে তা

ঘনাডাক্তার বললে—আঃ, চুপ কর না শিবে।

কিছুক্ষণ বিদ মেরে থেকে ঠাকুর্দা চোখ মেললেন। তার পর চায়ের কাপটা এক চুমুকে শেষ করে বলতে সুরু করলেন।

ছেলেবেলা থেকেই আমার যোগ প্রাণায়ামের দিকে একটা বড় ঝোঁক ছেল। উপনয়ন সংস্কার হবার পর থেকে আমি রীতিমতো যোগ অভ্যাস করতে সুরু করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণায়ামও। বছর দুয়ের মধ্যে আমার শরীরে এমন শক্তি এল যে একবার প্রাণায়ামে বসে ঘন ঘন বললে সমস্ত শরীর ঢাকা হয়ে যেত। আর হাইড্রোজেন পোরা বেলুনের মতো আমি আসনে বসা অবস্থায় চড় চড় করে শূন্যে উঠে যেতাম। কড়িকাঠে গিয়ে টিকি লাগত আর আমি যোগের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় টিক টিক করতাম।

ঘনা ডাক্তার বললে—শুনেছি যোগে নাকি ভাল দীক্ষাগুরুর দরকার হয়। আপনি কার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন ঠাকুর্দা?

ঠাকুর্দা হট করে বললেন—আমার স্বপ্নে দীক্ষা হয়েছিল। গুরুর নাম করতে মানা আ

তারপর নিজের কথায় ফিরে এসে বলতে লাগলেন—

কিছুদিন যেতে না যেতে আমি চড় চড় করে বেড়ে গেলাম। শরীরটা এ্যাই ঘাসাসই হয়ে গেল। মাথায় এক বোঝা চুল, গালে গালপাট্টা—এ্যাই দাড়ি। গোঁফের দুটো ডগা টেনে মোচড় মেরে কানে দু'পাক দিয়ে বাঁধতুম।

ঠাকুর্দার কথা শুনে শিবনাথ, তারক, ঘনা ডাক্তার আর হারাধন নীরবে পর পর মুখ চাওয়াচায়ি করে নিল। ঠাকুর্দা যে চেহারার বর্ণনা দিলেন তা পেতে হলে হয় গাড়ে চারকিট খুন খুনে ঠাকুর্দাকে পুনর্জন্ম পেতে হবে। শিবনাথ কী একটা বলতে যাচ্ছিল। ঘনা ডাক্তার চোখ মটকে তাকে থামতে বললে।

ঠাকুর্দা বলতেন—বিশ বছর বয়সেই আমার চেহারা দেখে লোকে মনে করত আমার বয়স হবে ত্রিশ বছর। কিন্তু তখনই আমার মনে ঘোর বৈরাগ্যের উদয় হল। তাহলেও দীক্ষা পেয়ে ছিলাম বটে

ছাই—বলে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে সটান গঙ্গার ধারে গিয়ে হাজির হলাম। দেখি তার কিছু ত সুন্দরবন কাছাড় ডেল্‌পাচের ইস্টিমার ভোঁ দিতে দিতে ঢেউ ছেড়ে মাঝ-গঙ্গায় প্রায় পড় পড় হচ্ আমি আর দেরী করলাম না। জয় মা কামিক্ষে কালী বলে প্রাণপণে দম নিয়ে চড় চড় করে হা ভেসে পড়লাম। তারপর ইস্টিমারের ওপরে আসতেই দিলুম আস্তে আস্তে দমটা ছেড়ে। ইস্টিমারের ে ওপর এসে সমস্ত দমটা ছেড়ে দিলুম। ইস্টিমারের সব লোক তো অবাক। এতো আশ্চর্য হল তারা যে ত কাছে ভাড়ার একটা পয়সা পর্যন্ত নিলে না।

যথাসময়ে আমি কামরূপে এসে হাজির হলাম। কামরূপ হিন্দুদের মস্ত বড় তীর্থস্থান। সতী দেহ কাঁধে নিয়ে শিব প্রলয় নাচন নেচে সৃষ্টিকে প্রায় রসাতলে দেব আর কী, এমন সময় বিষ্ণু চক্রকে পাঠালেন সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলতে। শিব তখন এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে নাচ আর এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ছে দেবীর এক একটা অঙ্গ। শেষে দেবীর যোনীদেশ এসে কামিক্ষেতে। সেই থেকেই কামিক্ষে হল তান্ত্রিকদের মহাপীঠস্থান। সহায়সম্বলহীন অবস্থায় একমাত্র দেবতা আলখাল্লা আর দেবতা দেওটে দেহ ঢেকে এসে হাজির হলাম কামিক্ষেতে। এদিকে মুখে গোঁফের জংগল জমে গিয়ে দেখাচ্ছে যেন গুবরেপোকা দিব্যি। কী আর করি শেষে মায়ের নাম করলাম। গানের গলা ছিল বরাবর। টেনে শ্যামাসঙ্গীত গাইতে লাগলাম।

হারাধন বলল—ঠাকুর্দা আপনি গান গাইতে জানতেন নাকি?

ঠাকুর্দা একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন—জানতাম মানে? আমার গানের চোটে প পর্যন্ত বশ হয়ে যেত। একবার কেষ্টা গয়লার গর্ভিনী গরুটা হারিয়ে যায়। আমি গান গেয়ে সেই টেনে কেষ্টার গোয়ালে এনে ফেলেছিলাম। আর একবার গান গেয়ে চড়ুই পাখীর ঝাঁক নামিয়ে মহরার সরষের ক্ষেত একেবারে ফাঁকা করে ছেড়েছিলাম।

সবাই একসঙ্গে চোখ কপালে তুলে বললে—তাই নাকি ঠাকুর্দা?

ঠাকুর্দা ডাঁটের মাথায় বললেন—তবে আর বলছি কী? কামিক্ষেতে মায়ের মন্দিরের পৈ বসে এমন শ্যামাসঙ্গীত ধরলাম যে চারপাশ থেকে লোকজন ছুটে এসে আমাকে ঘিরে ধরল। লোকে ভীড় জমে গেল আমার গান শোনবার জন্যে। মন্দিরের পুরুত পাণ্ডারা পর্যন্ত আমার গান শুনতে পাঠ ফেলে চলে এল। আমি আপন মনে একের পর এক গান গেয়েই চলেছি। হঠাৎ গলাটা উঠতে গান বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালুম। কিন্তু তক্ষুনি চারপাশ থেকে লোকেরা আমায় চেপে ধরল। বল দোহাই আপনার সন্ন্যেসী ঠাকুর, গান থামাবেন না। এমন অপূর্ব সঙ্গীত আমরা জীবনে শুনিনি। গেয়ে যান।

আমার আর পেটের ভাবনা রইল না। পাণ্ডারা তক্ষুনি আমার সেবার ব্যবস্থা করে। কামিক্ষেতে এক শ' একঘর ব্রাহ্মণের বাস। তারা পালা করে আমাকে নানা অন্নব্যঞ্জন খাওয়ায়। আমি মায়ের মন্দিরের পৈঠেতে বসে নাম গান করি। দেশ-দেশান্তর থেকে লোক আসে সেই গান শু

এদিকে ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে যখন খেতে যাই তখন একটা জিনিস সব বাড়ীতেই নজরে পড়ে। পাই প্রত্যেক বাড়ীর উঠোনে একটা করে খোঁয়াড়। তাতে আটকানো থাকে অনেকগুলো ভ্যাড়া

পাতে। আর তাছাড়া দিনের পর দিন যার আর দেখি ভেড়াগুলো সংখ্যায় বাড়ছে। কচিকাচা ভেড়া নয়, সবগুলোই প্রায় শিংওয়ালা পুরুষ ভেড়া। তাদের মধ্যে মোটাকতক করে মেড়াও থাকে। দেখে-শুনে আমার মনে গিয়ে কেমিন এক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা এখানে কী খুব যক্ষা রোগের প্রকোপ? শুনেছি যক্ষা রোগে ভেড়ার রক্ত উপকারী। ভেড়া কোলে নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকলে যক্ষা রোগ দূর হয়। তাই কী আপনারা সবাই এতোগুলো করে ভেড়া পোষেন?

শুনে ব্রাহ্মণ বললেন—আজ্ঞে না। আমাদের ভেড়া পোষার অন্য উদ্দেশ্য আছে। আপনি ব্রহ্মচারী সাধক, ও-কথা আপনাকে শুনে আর দরকার নেই। আসলে এই ভেড়া-জন্ম হল কর্মফলের জন্যে। ওদের নিয়ে আমাদের মেয়েরা খেলা করে।

ব্রাহ্মণের কথা শোনা এস্তোক আমার বুকটা ধড়াস করে বসে গেল। মনে পড়ল ছেলেবেলায় ঠাকুমার কাছে শুনেছিলাম কামিক্ষের মেয়েরা সবাই মোহিনী মন্ত্রে পটিয়সী। তারা সেই মন্ত্রে পুরুষদের ভেড়া বানিয়ে রেখে দেয়। কথাটা কী তবে সত্যি?

মনোভাকার বলে উঠল—বলেন কী ঠাকুমা? এই টোয়েন্টিথের সেঞ্চুরীতে বিজ্ঞানের যুগে এখনও এসব চলে নাকি?

ঠাকুমা মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—চলে বৈকি, এখনো চলছে। আর ভারতবর্ষে এ এখনও বহুদিন চলবেও।

বলে আবার কিছুক্ষণ বিমঝেরে থেকে ঠাকুমা তাঁর গল্পের খেই ধরলেন।

এমনি করে গান গাইতে গাইতে আমার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। একদিন মায়ের মন্দিরে দৈঠেতে বসে গান গাইছি আপন মনে। এমন সময় এক বিরাট রাজহাতী এসে আমার সামনে দাঁড়াল আর তার পিঠের ওপর থেকে নেমে এলেন এক রাজপুরুষ। গান থামাতে হল। সত্যি কথা বলতে কী একে বিরক্তও যে না হলুম এমন নয়। জিজ্ঞাসা করলুম—কে আপনি? কি চান?

তিনি বললেন—আমি এখানকার রাজার ভাই। মহারাজ আপনার গানের খ্যাতি শুনে থেকে আপনার গান শোনবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন। তাছাড়া মা কামিক্ষে কালী তাঁকে কাল স্বপ্নে বলেছে আপনার মতো সাধক নাকি কলিযুগে দুর্লভ, তাই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবার অনুরোধ জানাতে। আমি হাতী এনেছি আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে। এখন কৃপা করুন।

হাতীর শুঁড়ের ওপর একটা চাপড় কষিয়ে বললে—লে কাবা। হুঁ হুঁ বেসে জায়গা না একেবারে খোদ রাজবাড়ী।

ঠাকুমা বললেন—প্রথমে ভেবেছিলাম সেখানে যাব না। তারপর ভাবলাম মা যখন স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন তখন নিশ্চয় তাঁর মনে একটা কিছু অভিসন্ধি আছে। দেখাই যাক্ না মায়ের মতলবটা কী। এ মনে করে হাতীর পিঠে চড়ে রাজবাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম।

রাজপ্রাসাদে গিয়ে আমি একনাগাড়ে চারদিন চাররাত্রি মায়ের নাম গান করলাম। আর সব সভাসদ, রাজবাড়ীর লোকেরা সবাই মিলে চারদিন চাররাত্রি স্তব্ধ হয়ে সেই গান শুনল। শেষে মহারাজ

সাধনা অতি উঁচু স্তরের সাধনা। প্রভু এবার আপনি আমার প্রাসাদে একটু বিশ্রাম করুন। আপন পরিচর্যা করবার জন্যে দেবী মন্দিরের ভৈরবীদের নিযুক্ত করলাম।

শিবদাস বললে—কী রকম ভৈরবী ঠাকুর্দা? বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামে যেরকম ভৈরবীর বর্ণনা আ সেই গেরুয়া কাপড়-পরা রুদ্রাক্ষের মালা হাতে গলায়; মাথায় বাঁধা জটা, হাতে ত্রিশূল?

ঠাকুর্দা শিবদাসের কথার খেই ধরেই বলে চললেন—যুবতী, সুন্দরী, পীনোন্নত পয়োধরা বিম্বাধরোষ্ঠী। দেখলে তোর মাথা ঘুরে যেত শিবে।

হারাধন একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—সবাই?

ঠাকুর্দা বললে—প্রত্যেকটি। তবে তাদের মধ্যে যে প্রধানা ভৈরবী সেটা—

বলে ঠাকুর্দা দুচোখ বুজিয়ে মুখের ভাবটা যাত্রার দলের প্রেমিকের মতো করে ভাবগদগদ মাথা নেড়ে বললেন—আহা!

বলে কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়েই ঝিমমেরে রইলেন। পরে চোখ খুলে বললেন—সে যে কি রূপ বলতে পারি না। যেন ঠিক জগদ্ধাত্রী প্রতিমে। পৃথিবীতে অমন রূপ আমি দেখিনি। সে এসে দাঁড়িয়ে বললে—আমার নাম অনামিকা। আমি আর আমার সঙ্গিনীরা আজ থেকে মহা আজ্ঞায় আপনার চরণের দাসী হলাম। আসুন প্রাসাদে আসুন প্রভু।

বলে আমার হাত ধরে প্রাসাদে নিয়ে চলল অনামিকা। তার কথার সুরে যেন হাজার বীণা বেজে উঠল। আর হাতের ছোঁয়ায় মনে হল যেন একরাশ পদ্মফুলের বনে হাত ডুবিয়েছি আমি। কে ছিল একটা কালকেউটে, ঘিরেছে এক ছোবল করিবে। কিন্তু পরক্ষণেই আমার যোগবল বোঝা হা বিষ নামিয়ে দিলে।

রাজধানীর যে মহলটায় ভৈরবীরা আমাকে নিয়ে তুলল তার নাম ভৈরবী ভবন। এখানকা নিয়ে একজন তান্ত্রিক। আর তান্ত্রিক সাধুদের ওপর তাঁর ভক্তি অসীম। তাই ভৈরবীদের তিনি আশ্রয় দিয়েছেন তাঁর প্রাসাদে। তা ছাড়া শুনতে পেলাম রাজার একমাত্র কন্যা ভৈরবী হয়ে অ থেকে অপেক্ষা করছেন ভৈরবের। বহু তান্ত্রিক, বহু রাজা মহারাজা, বিদ্বান, পণ্ডিত, বড় বড় ব রাজকন্যার রূপের খ্যাতি শুনে নানা জায়গা থেকে কামিক্ষেতে এসেছে। কিন্তু সবাই শেষ পর্যন্ত রাজ মোহিনীমন্ত্রে ভেড়া হয়ে গেছে। রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞা যে লোক তাঁর মন্ত্র কাটিয়ে উঠতে পারবে তিনি ভৈরব করবেন। কিন্তু তেমন কোন লোক আজও এ তল্লাটে আসেনি। শুনে মনে মনে বা ছুঁড়ী পড়ত একবার আমার পাল্লায়। তার পরেই বললুম—যাকগে ওসব কথা ভেবে আমার দরকা আমি তো ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেছি।

ভৈরবী ভবনে যে সে ঢুকতে পায় না। তার ঘোরে সব সময়ে কটা ভৈরবী পাহারা দিচ্ছে পাহারাওয়ালী ভৈরবীরা অন্য ভৈরবীদের থেকে কিছুটা তফাত। ওদের মুখের ওপর যেন বড় বড় আর দাড়ির রেখা আছে। চেহারাগুলো ষণ্ডা (ভাজপুরী দরোয়ানদেরও হার মানায়। আমি কিনা পুরুষ যার প্রবেশ বারণ এর অন্দর মহলে। অন্য পুরুষদের প্রবেশ এখানে নিষেধ।

দুটো দিন পরেই ব্যাপারটা আরও পরের হল। বুঝলুম ওই দশ ভৈরবীরা আমার যোগবলের পরীক্ষা করছে। ওদের পরীক্ষা হয়ে গেলে এদের সর্দারনী অনামিকা আমার পরীক্ষা করবে। তারপর পরীক্ষা করবে রাজকুমারী। রাজা আসলে আমাকে এখানে এনে ফেলেছে তার জামাই করার মতলবে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও মতলব আঁটলুম। মনে মনে বললুম—

আর সাধন সমরে

দেখি ছেঁড়া হারে না ছুঁড়ী হারে।

ভৈরবী ভবনে বিবি জামাই আদরে আছি। ভৈরবীদের সেবা নিচ্ছি আর যাদের নাম গান করছি। কিন্তু কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপারও নজরে পড়ছে। সর্দারনী ভৈরবী অনামিকাকে এ মহলে দেখি কালো-ভূতে আর দেখি প্রতি শনিবার মঙ্গলবার রাতে সমস্ত ভৈরবীগুলো একসঙ্গে কোথায় উধাও হয়। পাশে পাঁচিল ঘেরা একটা বাগানবাড়ী গোছের জায়গা। তার ভিতরে কিছু দেখতে পাই না কিন্তু শনি মঙ্গলবার প্রথম রাতে সেখান থেকে গান-বাজনার আওয়াজ আসে। তারপর বারোটা বাজার পর থেকে গান-বাজনা থেমে যায়। তখন হাজার হাজার ভেড়ার আর্তনাদ ওঠে—ভ্যা-ভ্যা-ভ্যা-ভ্যা। যেন আকাশটা ফেটে যেতে থাকে। মনে হয় যেন একসঙ্গে হাজারটা ভেড়া বলিদান হচ্ছে। আর ভেড়াগুলো প্রাণের দায়ে চেঁচাচ্ছে। ব্যাপারটা ঘটে কিন্তু ঐ শনি আর মঙ্গলবার। তারপরে আবার যেকে সেই। কোন গোলমাল নেই। ভৈরবীরা যেমন তেমনি ঘরস্থিত হয়ে থাকে। খায়দায়, ঘুমোয়। আমার সেবা করে।

কিন্তু ব্যাপারটার কথা ভেবে আমার সাধন-ভজন প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। ভাল রে ভাল ব্যাপারটা কী? খুচরো ভৈরবীদের জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু তারা কোন উত্তর না দিয়ে মুচকি হেসে সরে পড়ে।

এক শনিবার রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করে করোটির পাত্র ভরে একপাত্র কারণ পান করেনিলুম। তারপর সাধনায় বসব বসব করছি এমন সময় ঘরের কোণ থেকে আওয়াজ এল—ম্যাও! দেখি এক বিশ ভালো বেড়াল বসে আছে কোণটাতে। তার চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে। দেখেই মনে হল ও চোখ যেন কোথায় দেখেছি। এক মুহূর্তে ব্যাপার হয়ে গেলুম। বুঝতে পারলুম ও হল অনামিকার চোখ। তাকলুম অনামিকাকে। দেখি কোথায় বিড়াল? অসামান্যা রূপসী অনামিকা রাজরাণীর মতো সেজে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপার কী? ঘরের ভেতর থেকে খিল আটকানো। বললাম তুমি ঘরে ঢুকলে কেমন করে?

অনামিকা বললে—রাজকুমারী আর অন্যসব ভৈরবীরা মিলে যাদুমন্ত্রে এখন ফুর্তি করছে। আমার ভাল লাগল না। প্রভু আপনার জন্যে আমার মনটা কেমন কেমন যেন করে উঠল। তাই কালো বেড়াল হয়ে পালিয়ে এলাম আপনার কাছে। তারপর আমার চোখের ওপর এক কটাক্ষ হেনে ভুবনমোহিনী হাসি হেসে বললে—প্রভু, তুমিই আমার প্রাণনাথ। কবিন তোমায় দেখা থেকে তোমার পায়েই আমার মনপ্রাণ দিয়েছি। কিন্তু অবাসীরা তোমায় দিনরাত এমন ঘিরে থাকে, তোমায় একলা পাওয়াই যায়। তাই মনের কথা আমার মনেই গুমরে মরছে।

বলতে বলতে সে আমার কাছে ঘেঁসে এসে দাঁড়াল। বললে—আমায় গ্রহণ করে আমার জীবন সার্থক কর প্রভু।

হারাধন বললে—উঃ, খুব বরাতজোর রবিঠাকুরের কোটেশানটা বেড়েছেন তো ঠাকুমা।

ঠাকুমা কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ননীডাক্তার বলে উঠল—ওসব বাজে কথা থা আপনার কথা শুনে অনামিকা কি বলল, বলুন এখন? এ রকম সাসপেন্সের মাঝখানে রেখে আধে-বাজে বলা ঠিক নয়।

অনামিকা বললে—পতিযোগ্যা হতে তো আপনাকে আমি বলছি না। জানেন তো আমাদের বি নিষিদ্ধ। আপনি আমার ভৈরব হয়ে এই প্রাসাদে বাস করুন।

বললাম—ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জার কথা। বিবাহ ছাড়া স্ত্রী সংসর্গে কল্পান্তকা বিশেষে আমি ব্রহ্মচারী, আমায় তুমি ক্ষমা দাও।

অনামিকা বললে—তান্ত্রিকরা বিবাহ ছাড়াও স্ত্রী সংসর্গ করতে পারে। এ হল এক ধরনের সা এতে নরকবাস হয় না। সাধক-সাধিকেরা এতে করে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করে।

বললাম—থাক তোমার অক্ষয় স্বর্গ। আমার ওতে দরকার নেই।

শেষে কিছুতেই পেরে না উঠে অনামিকা আমার ওপর বশীকরণ মন্তর ছাড়লে। বিড়বিড় করে সব বলে আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে।

কার আজ্ঞে, মা কামিক্ষে কালীর আজ্ঞে।

অবিশ্যি সেসব মন্তরে আমার কিছু হল না। মন্তরগুলো সড়সড়া পিঁপড়ের মতো আমার গায়ের একটু সুড়সুড়ি দিয়ে পিছনে পড়ে গেল। আমিও এদিকে বোম বলে প্রাণায়ামের দম নিলুম। মনে বললুম বোস ছুঁড়ী তোকে কেমন করে জব্দ করতে হয় দেখাচ্ছি।

প্রাণায়ামের দম কষতেই দেখি কোথায় কী? কিছুক্ষণ ঘরের ভিতর কিছুটি নেই। হঠাৎ ছেড়ে দিতেই দেখলাম অনামিকা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল সে জায়গায় ঘাঘা গেড়ে বসে আছে বিরা বাঘিনী। আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে, বিশ্রী দাঁত বার করে হাসছে আর জিভ দিয়ে চাঁট চা বাপরে কী চোখ দুটো! যেন আগুনের ভাটা। বুঝলুম প্রাণায়ামের দমটা ছেড়ে ভুল করেছি। মে মায়ার পড়ে গেছি। আর এ মায়া যা-তা মায়া নয়। মহাভয়ঙ্কর তন্ত্রের মন্ত্রপূত মায়া। ইতিমধ্যে বা আমার দিকে তাগ করে লাফ মেরেছে। আর আমি প্রাণের দায়ে আউড়ে দিয়েছি একটা মারণ মন্তর—

ওঁ হ্রীং হল হল লহ লহ
বহ বহ কাট কাট
মারয় মারয় মারয় মারয়।

বলতে বলতেই দেখি ভৈরবী মায়া একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। কোথায় বা বাঘিনী, কোথায় কড়িকাঠে মাথা লাগিয়ে ঝুলে ঝুলছে ভৈরবী অনামিকা। ভাবলুম থাক ছুঁড়ী ঝুলুক ওখানে। ওখান আর নামাব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে এমনসা কাকুতি মিনতি করতে লাগল যে দয়া হল। ঠ্যাং ধরে তাকে তো মাটিতে নামালুম। মাটিতে নেমেই সে আমার পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মোহাই প্রভু ম নিও না। বুঝতে পারিনি তুমি এত বড় সাধক।

কিন্তু মারণ মন্তর ঝেড়ে এদিকে আমার অবস্থাও কাহিল হয়ে গেছে। গুরুদেবের মানা সি মন্তরটা ব্যবহার করতে। ভুলে গিয়ে আমি প্রাণের দায়ে তা আউড়ে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে দেখি ম

এদিকে অনামিকা আমার পায়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। বলছে প্রভু তুমি একজন পুরুষ সিংহ। তুমি আমায় রক্ষা কর। আমার জীবন যৌবন সব তোমার। সেসব নিয়ে আমায় তুমি ধন্য কর। আমাকে তুমি তোমার শিষ্যা করে নাও প্রভু। আমি তোমার সঙ্গে কামিক্ষে থেকে চলে যাব। আর যদি এতে রাজী না যাও তো মায়ের মন্দিরের পেছনে যে তান্ত্রিকী পুকুর আছে তাতে আমি মানস করে ডুবে মরব যেন পরজন্মে তোমার ভৈরবী হই। জানতো সে পুকুরে যে যা মানস করে ডোবে সে তাই পায়।

মনে মনে ভাবলুম সর্বনাশ। একে তো ধৈর্য্য না করা যাবে না। তাই একটু চালাকি করে বললুম, তা তুমি যদি আমার শিষ্যা হতে চাও সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু দীক্ষার জন্যে তো অপেক্ষা করতে হবে।

অনামিকা বললে, তোমার শিষ্যা হবার জন্যে আমি অনন্তকাল অপেক্ষা করতে রাজী আছি। কিন্তু প্রভু আজ রাতে রাজকুমারী তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবে। সে বড় ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষ। সে ভূত প্রেত পিশাচ সিদ্ধ হয়ে বসে আছে। তার মায়া বড় ভয়ানক মায়া। আসলে একটা ডাইনী রূপসী মেয়েছেলের বেশ ধরে বসে আছে।

একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললাম—ও সব অনেক মায়া আমি দেখেছি।

আমার কিছু করবে।

অনামিকা বললে—প্রভু আপনি মস্ত বড় সাধক তাই ভরসা হয় আপনি সে মায়া কাটিয়ে আসবেন কিন্তু প্রভু প্রতিজ্ঞা করুন, এ দাসীকে কোনদিন ভুলবেন না।

কি বিপদ ছুঁড়ী কিছুতেই পা ছাড়ে না। শেষে প্রতিজ্ঞা করতেই হল। বললাম—বেশ তোমাকে আমি আমার সেবাদাসী করব।

একটু পরেই একজন ভৈরবী এসে তেমনি দরজায় ঘা দিলে। আর অনামিকা যেমন কেলে বেড়াল হয়ে ঢুকেছিল তেমনি হয়ে ফুট করে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

সেই প্রতিহারিণী ভৈরবী এসে আমায় খবর দিলে রাজকুমারী এখানে আসছেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অষ্ট সখী পরিবৃতা হয়ে রাজকুমারী এলেন আমার ঘরে। রাজকুমারীকে দেখে একটা কথা খালি মনে পড়তে লাগল। যেন একটা আগুনের হল্কা জ্যান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানটি একবার লাগবে সেই জায়গাটা একেবারে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। চোখ দুটো তাঁর পদ্মপলাশ লোচন বলা চলে। কারণ দুটো চোখই ঘোর লাল। বুঝলাম কারণ পান করে ঐ রকম করেছে। রাজকুমারী আমার ঘরে এসে বসলেন আর সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট সখীও উধাও হল। এখন কেবল আমি আর রাজকুমারী। রাজকুমারী একটু মুচ্‌কি হেসে আমায় বললেন—শুনেছি আপনি একজন মস্তবড় সাধক।

বিনীত ভাবে বললাম—না, না এমন কিছুই নয়।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী বুকের কাছটা গুর গুর করতে লাগল। যে সব মন্ত্র তন্ত্র জানি সে সব তো অনামিকাকে জব্দ করতেই খতম হয়ে গেছে। এখন যদি রাজকুমারী আমায় পরীক্ষা করতে করে, তাহলেই তো গেছি আর কী!

তাই একটা উল্টো চাল চাললাম। বললাম—আপনি শুনেছি একজন অতি উচুদরের সাধিকা [illegible] কিছুই আপনি গ্রাহ্য করেন না। আপনার কাছে আমার সাধনা অতি নগণ্য। আমি এর

বিনয়ে রাজকুমারী বশ হলেন। বেশ দেখলাম মুখের সেই তেতো হাসিটা মিলিয়ে গেল।

আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—বয়স কতো?

বললাম—এই কুড়ি।

রাজকুমারী এইবার অবাক হয়ে বললেন—মাত্র কুড়ি। তাতেই এতোদূর এগিয়েছেন। এ এইসব ভৈরবীদের সঙ্গে বাস করেও আপনার সাধন-চ্যুতি ঘটল না। এতো খুবই আশ্চর্যের কথা। এ নিশ্চয় কলির অন্তর্যুগ। আচ্ছা আপনি কী এই বয়সেই বাসনার নিবৃত্তি করে ফেলেছেন।

খুব বিনীত ভাবেই বললাম—প্রায় সব বাসনার নিবৃত্তি করে এনেছি, শুধু একটা ছাড়া। তা বাসনাটা এখানে এসে হয়েছে।

রাজকুমারী পরম আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—সেটা কী?

বললাম—শনিবার আর মঙ্গলবারে ঐ বাগানে কী হয় তা দেখবার বড় বাসনা হয়।

রাজকুমারী বললেন—এই কথা। এ আর এমন বেশী কথা কি? চলুন আজ রাত্তেই আপনি দেখাচ্ছি।

বললাম—আমি রাজী।

একটু পরেই আমি পাশের বাগানের মধ্যে গেলাম রাজকুমারীর সঙ্গে। সেখানে দাসীরা সেঁটা নিয়ে খুব বেড়াচ্ছে। গেটে ভয়ানক কড়া পাহারা, কোন পুরুষের সেখানে প্রবেশ একেবারে নি বাগানের মধ্যে যেখানে-সেখানে ঘিয়ের বাতি জ্বলছে। তাতেই দেখা যাচ্ছে নানারকম ফল ফুলের ভরা বাগানটা। বাগানের মধ্যে অজস্র নারীমূর্তি নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে। রা সেই বাগানে আসতেই সবাই চেঁচিয়ে উঠল। রাজকুমারী আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ঘ ঘিরে ভৈরবীরা উল্লাসে মেতে উঠল। ঘড়াঘড়া কারণ আসতে লাগল। সে যে কতো রকমের ক আর বলতে পারি না। মাধ্বী, গৌড়ী, কাশ্মরী এমন কি সাঁওতালী কারণ পর্যন্ত। আর ভৈরবী একটা ঘড়া এক একজন গলায় ঢালতে লাগল। রাজকুমারী নিলে চলেন সবারের সেরা।

কারণ পান করার পর সঙ্গীতের আসর বসল। সবাই কোরাসে গলা মিলিয়ে একট গান গাইতে লাগল।

ভেড়া দেখব ভেড়া দেখব
ভেড়ার সঙ্গে করব ছলা
চড়ব ঘোরা ভেড়ার পিঠে
দেবো ভেড়ার কানে মলা।
জ্ঞ মলে দাও চিমটি কাটো
লোম ছিঁড়ে দাও ছ্যাড়াং করো
ভেড়া কিছু করবে নাকো
কষে দুষি চাবুক মারো
শুধু একটু চুলকোবে মুখ
[illegible]

যদি কেউ বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে

তাতে আপনার কি এসে যায় ?

এসে যায় বৈ কি! আপনার মতো যাত্রী ও ছাত্রপরায়ণ তাঁদের প্রত্যেকেরই এতে এসে যায়। যারা বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে, তারা রেলের কামরায় আপনারই জায়গা বেদখল করে। আর টিকিট না কেটে যে টাকা তারা ফাঁকি দেয়, তা দিয়ে অতিরিক্ত আরও অনেক সুবিধা নিশ্চয়ই আপনার জন্য করা যেত।

আপনার সরলায় এই আনন্দ-ভ্রমণ ছেলে ছোকরায় হঠাৎ খেয়ালের বশে মাঝে মাঝে করে বটে, কিন্তু নিয়মিতভাবে বিনা টিকিটে যারা ভ্রমণ করে তারা যে পাকা চোর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আপনার নির্লিপ্ততায় এই দুষ্কৃতকারিরাই পরোক্ষে উৎসাহ পায়। পুলিশ বা টিকিট-পরীক্ষকের কাজ করতে কেউ আপনাকে বলছে না, কিন্তু টিকিট-পরীক্ষক যখন কোন বিনা টিকিটের যাত্রীকে ধরেন, তখন সেই টিকিট-পরীক্ষক কি অন্ততঃপক্ষে আপনার সাহায্য বা নৈতিক সমর্থনও প্রত্যাশা করতে পারেন না ?

বিনা টিকিটে ভ্রমণ বন্ধ করতে সাহায্য করুন

রাজকুমারীকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম এ কি সঙ্গীত? রাজকুমারী বললেন, এ হল ভেড়ু ভৌতাসে গাওয়া হচ্ছে। তারপর আমায় একপাত্র কাবেশ পান করতে দিলেন রাজকুমারী। বললে আপনি সাধক ব্যক্তি, এই কারণে আপনাকে অতি শীঘ্র যোগারূঢ় করে দেবে। কিন্তু ভেড়ু যোগ গুহ্য যোগ। সে যোগের কথা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। যদি শিখতে চান তো বলুন সে আমি আপনাকে এখুনি দেখিয়ে দিতে পারি।

বললাম—তাতে লাভ কী?

রাজকুমারী বললেন—তাতে দিব্যদৃষ্টি লাভ হবে। দেখবেন সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয়ের মূ কী শক্তি কাজ করছে। কী রাজী?

রাজকুমারী এদিকে আমার সঙ্গে কথা বলছেন আর ইতিমধ্যে দেখি ভৈরবীরা সবাই মিলে বা পিছনের দিকে একটা বড় দরজা খুলে দিয়েছে। দেখি কয়েকশ' ভেড়া বাগানটার মধ্যে ঢুকে দেখলাম ভেড়াগুলো অদ্ভুত। তাদের মুখগুলো অনেকটা মানুষের মতো। কারুর বা গালে গালপাট্টা, মাথায় বাবরি, কারুর মুখে আশু মুখুজ্যের মতো কাঁটা গোঁফ, কারুর বা প্রজাপতি, কারুর বা রুডোল্ফ্ ভ্যালেন্টিনোর মত গোঁফ। কারুর ক্লেককাট দাড়ি। কারুর আবার কিছু নেই। বা ভেড়ারা আবার এত সখ করে গোঁফদাড়ি ছাঁটে। দেখে তো তাজ্জব বনে গেলাম। দেখলাম সেই গুলো একটা অদ্ভুত অস্পষ্ট ব-ব-ব-ব আওয়াজ করতে করতে দৌড়ে এল বাগানের মধ্যে। আর ভৈ সবাই এক একটা কোলে তুলে নিলে চটপট। ঘিয়ের বাতির আলোয় স্পষ্ট দেখলাম ভেড়াগুলো ক জলজল করে তাকিয়ে রইল ভৈরবীদের মুখের দিকে। যেন কতো কী বলতে চায়। তারপর যেই তা বার করে ভৈরবীদের হাতটা একটু চেটে দিতে যাবে, অমনি প্রলয় বেঁধে গেল। দেখলাম ভৈরবীর ভেড়াগুলোকে কোল থেকে ধুপধাপ ছুড়ে ফেলে দিলে। আর সবাই হাতে একটা করে খেঁটে লা দমাদম পিটতে সুরু করলে ভেড়াগুলোকে। বাপ্‌রে সেকি সাংঘাতিক মার। তাদের হাতের লা ঠিক ধুনুরীর হাতের তুলোধুনো যন্ত্রের মতো চলতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ভেড়াগুলো দৌড়ে ব পালাতে চাইল। কিন্তু সব দিকের দোর তখন বন্ধ। তাদের আর্তনাদে আকাশ ফেটে যাবার মতো কানে খালি বাজতে লাগল—বিকট ভ্যা ভ্যা আওয়াজ। এদিকে রাজকুমারী তখন মনের আনন্দে হা দিচ্ছেন আর হুঁকছেন—পেট, পেট, আরও পেট। পিটিয়ে তুলোধোনা কর। সে ভয়ংকর দৃশ্য দেখে চোখ বুজিয়ে বসে রইলাম।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক অবিশ্রান্ত ভাবে ভেড়া ঠেঙিয়ে ভৈরবীরা একটু ক্লান্ত হল। তখন ভেড়ার বাগানের পিছনের দরজা খুলে আর একটা খোঁয়াড়ে আটকে রাখা হল। ভৈরবীরা বড় বড় কারণে গলায় ঢালতে লাগল। আমি রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এই কী মেষদর্শন?

রাজকুমারী হেসে বললেন—এতো কিছুই নয়। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আপনাকে ভেড়াসেনের রীতিনীতি শিখিয়ে দিয়ে মেষ গুহ্যতন্ত্রের দীক্ষা দেব।

বলে আমার হাত ধরে টেনে বাগানের মধ্যে একটা ঘরে নিয়ে এলেন। সেখানে আমাকে কী নতুন কারণ পান করিয়ে, আমার শরীর থেকে সব বস্ত্র খুলে নিলেন। তারপর আমাকে ভেড় প্রক্রিয়া দেখাতে লাগলেন রাজকুমারী। আসনাদি আগে থেকেই তো অভ্যাস ছিল। আরম্ভ করে

দেখতে দেখতে আমার চোখের সম্মুখ থেকে ঘর-বাড়ী, বাগান, গাছপালা, তৈরবী রাজকুমারী সব উধাও হল। আমি দেখলাম আমি একটা বিরাট পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে আছি। আর নীচে তার বিছিয়ে আছে সসাগরা ভারতবর্ষ, ঠিক যেন মাটি দিয়ে তৈরী একটা ম্যাপ। পাঞ্জাব-সিন্ধু গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ সব দেশগুলো স্পষ্ট স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভেসে উঠল দিল্লীর কুতুবমিনার, লালকেল্লা, যমুনা নদী। তারপর দেখি পিঁপড়ের সারের মতো কতকগুলো জীব সার বেঁধে চলেছে। সারটা চলেছে মাইলের পর মাইল। তারপর চোখে পড়ল গঙ্গা নদীর অববাহিকা ধরে সেই একই রকম কতকগুলো প্রাণীর সারি চলেছে। তারপর দেখি হিমালয়, বিন্ধ্য, পূর্বঘাট, পশ্চিমঘাট, নীলগিরি কোথাও আর বাদ নেই, সেই একই প্রাণীর মিছিল চলেছে মাইলের পর মাইল। ক্রমশঃ সেই পিঁপড়ের সারের মতো প্রাণীর সার আমার চোখের সামনে বড় হয়ে উঠতে লাগল। দেখলাম দলে দলে সার বেঁধে চলেছে শুধু ভেড়ার পাল। ভেড়া, ভেড়া, সব ভেড়া। অসংখ্য হিমাচল কেবল ভেড়াতে ভর্তি। এক একটা সারির সামনে এক একটা করে 'সর্দার' ভেড়া চলেছে পথ দেখিয়ে। অন্যগুলো চোখ বুজে তাকে অনুসরণ করে চলেছে। একটা দলের মাথায় দেখলাম একটা লাল কাশ্মীরী দুম্বা। আর একটা দলের মাথায় একটা বিদ্‌ঘুটে শিংওয়ালা গোঁয়ার ভেড়া। আর এক দলের মাথায় রয়েছে নধর পরিপুষ্ট চোখ টুলু টুলু বিরাট একটা ভেড়া। সে যে কতো রকমের কতো আকারের ভেড়া তা আর বলে শেষ করতে পারব না। তারপর আস্তে আস্তে

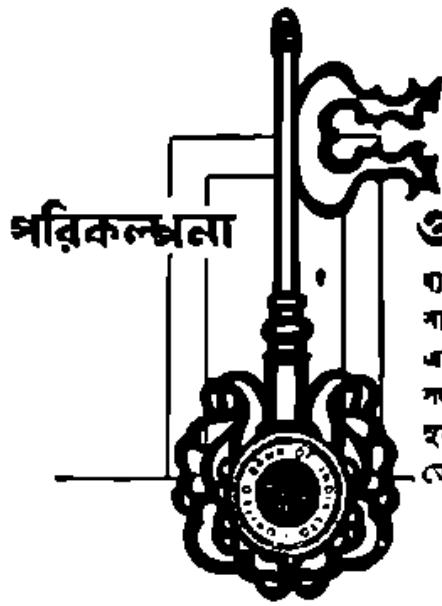

পরিকল্পনা

ও সমৃদ্ধির সোনার কাঠি

ব্যক্তির কল্যাণ ও জাতীয় সমৃদ্ধি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এই কল্যাণ বা সমৃদ্ধি সাধন একমাত্র পরিকল্পনানুযায়ী প্রচেষ্টার দ্বারাই স্বল্পকালে সম্ভবপর। এবং পরিকল্পনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে জাতীয় তথা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর।

সুসংগঠিত ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা যেমন ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তা দূর করে, তেমনি জাতীয় পরিকল্পনারও বল যোগায়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক

অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪, চাইল্ড ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ভারতের সর্বত্র ব্যাঙ্ক অফিস এবং পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে করেস্পণ্ডেন্ট ব্যবস্থা

আপনার ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার গ্রহণে প্রস্তুত

সে দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল। দেখলাম বড় বড় সব শহরের ছবি। দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ। শহরগুলোতে একটা মানুষ নেই কেবল ভেড়া। রাস্তা-ঘাট ভেড়ায় ভর্তি। বাস্‌ট্রাম চালাচ্ছে ভেড়ারা। কলেজে বক্তৃতা করছে ভেড়ার দল, শুনছে কচিকচি ভেড়ার ছানারা। অফিস আদালতের কাজ করছে দলে ভেড়া। এমন কি সরকারী দপ্তরগুলো পর্যন্ত ভেড়ায় ভর্তি। একটা গোল বাড়ীর মধ্যে একদল শিং ভেড়ার বৈঠক বসেছে মাঝখানে। তারই চারদিকে দলে দলে ভেড়া ঘিরে বসে চট্টগোল করছে। এ ভেড়া তাদের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠল—আমাদের মেষতন্ত্রের শাসনপদ্ধতিকে দুনিয়ার মধ্যে শাসনপদ্ধতি বলে মনে করি। কারণ তাতে প্রত্যেকটি মেষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। অন্য একদিক থেকে আর একজন ভেড়া বললে—আমরা মেষতন্ত্রে মোটেই বিশ্বাস করি না। আমরা গণতান্ত্রিক তন্ত্র।

অন্য দল থেকে আওয়াজ উঠল—গণতান্ত্রিক তন্ত্র চলবে না। চাই মেষতন্ত্রের জয়।

তার সঙ্গে সঙ্গে দুদিক থেকে ভেড়া দুটো মাঝখানে নেমে এসে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে শিংয়ে ঘা লেগে আগুনের ফুলকি বার হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে যতোগুলো ভেড়া ছিল সবাই ঢুঁসোঢুঁসি করতে সুরু করে দিল। লেগে গেল ভেড়ার লড়াই।

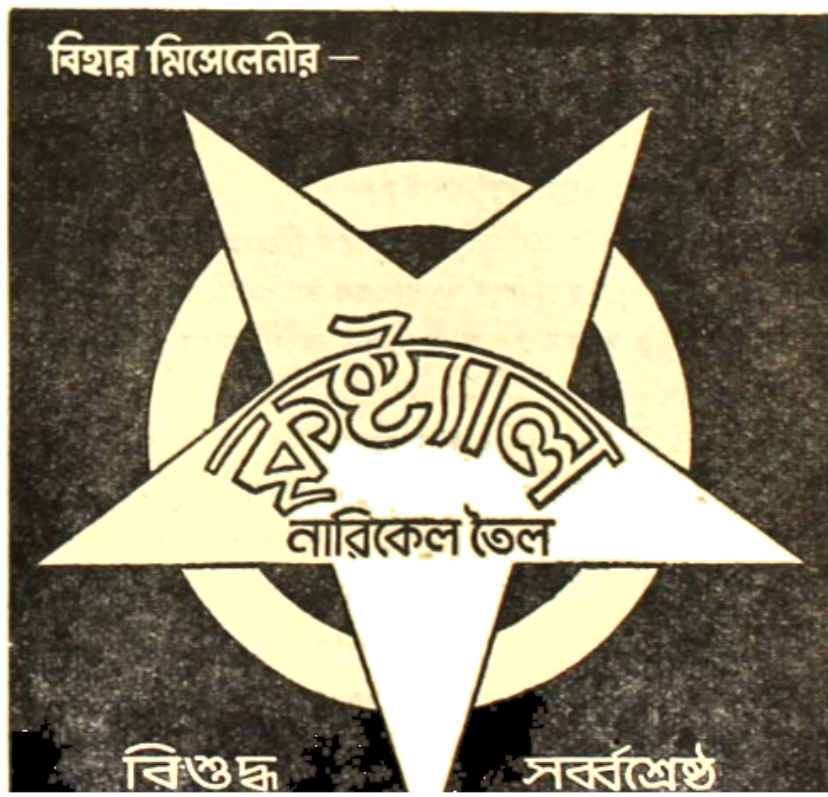

এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। ভাবলাম আমি নিজেও কী ভেড়া হয়ে গেলাম নাকি? যেই সে কথা ভাবা, অমনি আস্তে আস্তে আসনে ঢিলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় বা কি? দেখলাম যে ঘরে ছিলাম সেই ঘরেই রয়েছি। আমার সামনে দাঁড়িয়ে রাজকুমারী মুচকি মুচকি হাসছেন। আমায় শুধালেন—কি যেন স্বপ্ন দর্শন হল?

বললাম—আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার কৃপায় আমি দিব্যদৃষ্টি পেলাম।

আমি শুনেই চুপ করে গেলাম। আর দ্বিতীয় কথাটি মুখে আনলাম না।

এতক্ষণ পরে মোড়াঙ্গার কথা কইল। বললে—তা হলে সেই কামরূপ কামিক্ষের রাজকুমারীই বলে আপনার গুরু কী বলেন?

ঠাকুদা বললেন—হ্যাঁ, তা এক রকমের বলতে পার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আমাকে খতম করবার মতলব করেছিল।

তারক জিজ্ঞাসা করল—কেন?

ঠাকুদা বললেন—আর বল কেন? সেই অনামিকা ছুঁড়ীর কথা সব জানাজানি হয়ে গেল দুদিনে মধ্যেই। রাজকুমারী আমায় ডেকে বললেন—আপনিও তাহলে স্ত্রীজাতির বশীভূত। বলে মন্ত্র পড়া জল ছিটিয়ে দিলে আমার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা ভেড়া হয়ে গেলাম। নিজের দিকে তাকিয়ে আমা কান্না পেয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল অনামিকা বলেছিল মন্দিরের পিছনে ডাকিনীপুকুর আছে সেখানে যে যা মানস করে ডুব দেয় সে তাই পায়। ভেড়া হয়ে গিয়েও আমি সেকথা ভুলিনি। এ দৌড়ে মায়ের মন্দিরের দিকে চলে গেলাম রাজবাড়ী ছেড়ে। কয়েকটা লোক আমায় ধরতে ছুটল পিছু। কিন্তু রাজকুমারী বললে—ও একজন সাধক। ওকে ছেড়ে দাও মায়ের মন্দিরের চাতালে ও থাকবে।

রাজকুমারী তখনও জানত না আমার মতলবটা কী?

আমি আর দেরী না করে চারপায়ে দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে জয় মা কালিকে কালী বলে ঝাঁপিয়ে পড়লুম ডাকিনী পুকুরের জলে। শুনলুম গলা দিয়ে শুধু বার হল ভ্যা, ভ্যা, ভ্যা, ভ্যা।

ডোবার সঙ্গে সঙ্গে মানস করলাম যেন আমি আবার আমার মানুষ দেহ ফিরে পাই আর কলকাতা ফিরে আসি।

ওমা! ডুব থেকে উঠেই দেখি কোথা কামিক্ষে কোথায় কী? আমি কলকাতার গঙ্গায় এসে ভেসে উঠেছি। সামনে দেখছি ওই হাওড়ার পুল। ওই হাওড়া স্টেশনের ঘড়িটা। জগন্নাথ ঘাটের পৈঠেগুলো যেমন আগে দেখেছিলাম তেমনই কাদামাখা হয়ে পড়ে আছে।

নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—মানুষ হয়ে গেছি। জল থেকে উঠে এসে দেখি একটা জ্ঞান ফুল হয়ে গেছে। মানস করবার সময় মানুষ দেহটাই চেয়েছি। আমার সেই আগেকার বদমাইশ মা ছ'ফিট চেহারাটা তো চাইনি। তাই দেহটা মানুষের হলেও সাইজটা ভেড়ার মতোই গাড়ে চার বি রয়ে গেছে।

এইখানে এসে ঠাকুদা চুপ করলেন। তারপর গম্ভীর গলায় হাঁকলেন—ঘুমি চটপট আর এক কা

শাড়ি

মানবেন্দ্র পাল

তবু সরযূ বিশেষ সাড়া শব্দ দিল না। জানলার বাঁধানো জায়গাটুকুতে দুটি পা তুলে একটা পা ঠেসান দিয়ে আর এক পায়ের পা দুখানি ঠেকিয়ে অন্যমনস্কের ভান করে বাইরের দিকে তাকি চুপ করে বসে রইল।

না, এসব হৈ-চৈ—হাসিঠাট্টা, দলবল নিয়ে বেড়াতে যাওয়া ভালো লাগে না তার। এখন করে এমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকে ঐ জানলাটির ধারে। কত লোক যায়—এই দূরে ব সরযূ তাদের মুখের ভাষা ঠিক ঠিক যেন বুঝতে পারে। ঐ রাস্তা দিয়ে গোরুর গাড়ি যায় মহুরপরি দূর গ্রামের যাত্রীরা হয়তো এসেছিল গঙ্গাস্নানে। ফিরছে তারা ঘড়া ভর্তি জল ভরে। ঘড়ার মুখটি পদ্ম দিয়ে ঢাকা। এই পথ দিয়ে বৃদ্ধ শিওন তারক ঘুঘুডেঙ্গা ঝুলি কাঁধে চিঠির বাণ্ডিল হাতে রোজ যায়। বাড়িতে গিয়ে হাঁকে—'চিঠি আছে'—সে বাড়িতে অকস্মাৎ কী চাঞ্চল্য পড়ে যায়। চিঠিই বা কত রকা কারও বাড়ি পোস্টকার্ড—কারও সরকারী খাম—কারও বাড়ি বা আসাদা নীল খাম! সরযূ এই দূরে যেন সেই খামগুলির ভিতরের চিঠিগুলিতে কী লেখা আছে বলে দিতে পারে।

অল্প দূরেই গঙ্গা। এখন শ্রাবণ মাস। গঙ্গার জলে ঘোলা নেমেছে। জল কানায় কানায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সরযূ জানলায় বসে তাকিয়ে থাকে—দূরে ওপার থেকে ধোঁয়ার মতো বৃষ্টি এ আসছে। ওপারের ঐ যে ছোট্ট টিনের-চাল বাড়িটা—ওটা এই মুহূর্তে বৃষ্টিধারায় যেন অস্পষ্ট হয়ে দূরের মধ্যে মিলিয়ে গেল!

সরযূর এই হল নিত্যকাজ। এতেই তার আনন্দ। এই নিয়েই সে ডুবে থাকে। এই নিয়ে কাটায় তার কর্মহীন অলস দ্বিপ্রহরগুলি।

এমনি সময় ওদিকের ঘর থেকে সরযূর মায়ের গলা পুনরায় শোনা গেল—সরযূ, কাপড় পরা

না, ভালো লাগে না—সত্যি ভালো লাগে না এদের সঙ্গে বেরোতে।

মহিষমর্দিনী পুজো আরম্ভ হয়েছে। এ অঞ্চলের বিখ্যাত পুজো। কেউ বাদ যায় না—ছেলে ঘোয়ান সবাই একদিন না একদিন গিয়ে প্রতিমা দর্শন করে আসবেই। আজ এ বাড়ির সবাই য শুধু এ বাড়ি নয়, পাশাপাশি দুতিন বাড়ির বৌ-ঝিরা বেরোচ্ছে। বেলা এখন তিনটে। এইবেলা বে সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু—

কিন্তু সরযূর ভালো লাগে না এসব। আমোদ-আহ্লাদ হাসিঠাট্টা সব যেন ফুরিয়ে গি কেন এমন মনে হয়? সরযূ তার এই পঁচিশ বছরের কুমারী জীবনটা শুধু শুধু করে খুঁজে দেখে—না কাছে কোনো আঘাত পায়নি—সে সুযোগই আসেনি জীবনে! না আঘাত, না অভিঘাত কারও উ শুধু একটানা সাদামাটা জীবন চলে এসেছে—আরও চলবে কত কাল—যেমন করে গালবোরাই বজর

মাত্র আবার এ জীবন জেগে উঠবে—যেতে উঠবে—রঙীন হয়ে উঠবে। তা না আসুক। তার জন্যে দুঃ নেই। জীবন সবাই ভোগ করতে পারে না। সেও না হয় সেই দলে। কিন্তু এখন অকর্মণ্য অবলম্বনশূ জীবন টেনে নিয়ে যাবে কী করে? যদি তখন মা বাবা তাকে লেখাপড়া শেখাতো! তাতো শেখালো না চোদ্দবছর বয়েস হতে না হতেই মা বলে বসলে—আর পড়াশোনার কাজ নেই! এবার পার করতে পারে বাঁচি। একে তো রূপের ঐ ছিরি!

সরযূ বন্দিনী হল ঘরে। সেই থেকে চলেছে তার এই বন্দী-জীবন। মৃত্যু না এলে মুক্তি নেই।

—সরযূ—।

আবার ডাক। না, আর দেরি করা ঠিক নয়। যেতেই হবে। নইলে এখনি অশান্তি! চীৎকার ক'রে পাড়া মাথায় করে তুলবে। পাড়া-পড়শীরা বলবে মায়ে-মেয়ে চুলোচুলি হচ্ছে।

সরযূ উঠে চৌকির নীচে থেকে তার টিনের ট্রাঙ্কটি বের করলে! না, কাপড়-চোপড় নেই। ঐ একখানি রয়েছে। ধানী রঙের ভালো শাড়ি একখানি। এ শাড়িটি পরলে তাকে ভালো মানায় কি বলতে পারে না, তবে এটি পরলে তারি তৃপ্তি পায়। এর রঙটি যেন তার মনের মতোই লজ্জানম্র বেদনাবিদ্ধ

ধীরে ধীরে শাড়িখানি বের করল সরযূ। নিখুঁত ভাঁজ করা। নিজের সবটুকু যত্ন সবটুকু স্নেহ ঢেলে সরযূ ভাঁজ করে রেখে দিয়েছিল শাড়িটি ট্রাঙ্কের নীচে। সেই যে বাদুর বিয়েতে পরে গিয়েছিল—তারপর আর পরে নি। এ শাড়িটি কালেভদ্রে পরে—বিশেষ বিশেষ গোনা চারবার যেতে হলে।

না আর ভালো শাড়ি তার নেই। কিনে দেবার ক্ষমতাও নেই কারও। একমাত্র দাদা উপায়েতেই সংসার চলে। তাও তো স্ট্রাইকের জন্যে এবার বেশ কিছু টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে। দাদা স্বভাবগম্ভীর। চুপচাপ থাকে। সামান্য টাকা মাইনে। সরযূ বুঝতে পারে দাদাকে। তার ওপর বাবা ব্যাধি তো লেগেই আছে। আর আছে বোন সুষমার খরচ।

হ্যাঁ, সুষমার জন্যে খরচটা সবাই একটু বেশিই করে। এই সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। দাদা অত লক্ষ্য রাখে না। মা-ই দাদাকে বলে বলে সুষমার ফ্রক, ব্লাউজ, শাড়ির ব্যবস্থা করে দেয়। বাড়িতে যে আর কারও কোনো কিছু দরকার আছে সে চিন্তাকে প্রশ্রয়ই দেয় না। এমন কি মায়ের নিজের পরনে শাড়িখানারই যে কী দশা হয়েছে তা দেখেও দেখে না। এখন যদি কোনোরকমে দু'পয়সা মা বাঁচাতে পারে তা খরচ করবে বোনের জন্যে। বোনের হয়তো অত খেয়াল নেই, মা নিজেই দাদাকে বলে বলে পাউডার আনিয়ে নেবে, স্নো কিনে নেবে। বোনের দু'জোড়া জুতো চাইই—হাল ফ্যাসানের চুল বাঁধার সরঞ্জাম মা-খুঁজে পেতে কিনিয়ে নেবে।

না, এর জন্যে মায়ের ওপর সরযূর কোনো অভিমান নেই, বোনের ওপরও হিংসে নেই। হিংসে ভাবতেই পারে না সরযূ। কত ছোটো বোনটি। ওর মুখে একফোঁটা হাসি দেখলে সরযূর মনে আনন্দ আর ধরে না। অমন প্রাণ খুলে সে তো কখনো হাসতে পারেনি। আর কেন যে মায়ের অকস্মাৎ সুষমার ওপর এত পক্ষপাত—প্রকাশ না করলেও এবং বাড়ির অন্য কেউ টের না পেলেও সরযূ বুঝতে পারে, এ তার জন্যে মাকে দোষ দেয় না।

কিন্তু আর নয়। এখনি কাপড় পরে নিতে হবে। ওরা অপেক্ষা করছে।

[illegible]

ভালো শাড়ি কিনে দেবে এমন তো মনে হয় না। আর সে যে নিজে কোনোদিন মায়ের কাছে পোষাকী শাড়ির কথা মুখ ফুটে বলতে পারবে এমনও সম্ভব হবে না। ও যেন মায়ের সং মেয়ে। বাবাকে বলবে? তাও সম্ভব নয়। ভয়েই বলো, শ্রদ্ধাতেই বলো অথবা সংকুচিত ভাবেই বলো পর্যন্ত ঐ মানুষটার কাছে কোনোদিন মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারেনি। দুঃখ এই যে, বাবাও একটি বারের জন্যে তার দিকে ফিরে তাকায়নি। সংসারে যখন কেউ দেখে না, কুমারী কন্যাদের কাছে বাবা যে কত বাংলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের সমদুঃখী যোনমাত্রেই তা জানে। কিন্তু সরযূ এখানেও বঞ্চিত তার

সরযূ শাড়ির পাট ভাঙতে গিয়ে আর ভাঙল না। থাক। এটা অন্তদিন অন্য কোথাও পরা যাবে। এই ভেবে একটা সাধারণ কাগা শাড়ি ভেঙে পরে নিল।

ঠিক এমনি সময়ে ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল সুষমা।

—দিদি তোমার এখনো চল না! আচ্ছা সাজ হচ্ছে তো! এই পর্যন্ত বলেই অবাক হয়ে গেল

—ওমা! তুমি এই শাড়িখানা পরে যাবে নাকি! এ তো বাড়িতে পরার!

সরযূ তার উত্তর না দিয়ে শুধু বললে—একি ফ্রক পরেছিস কেন?

সুষমার মুখটা লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেল। মাথা নিচু করে বললে—মা ফ্রক পরতে বললে।

সরযূ বুঝতে পারলে, যেহেতু পাশের দু'চার বাড়ির বড়ো বড়ো মেয়েরা হাঁটু পর্যন্ত ঝুল ফ্রক বেরিয়েছে অতএব তাঁর মেয়েকেও ফ্রক পরাতেই হবে। তা না হলে আর আধুনিক চল কী করে?

সরযূ কঠস্বরে আদেশ করলে—যাও ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরে এসো। মাকে বলো, আমি বলেছি।

সুষমার মুখখানি শুকিয়ে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সরযূ সস্নেহ স্বরে বললে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও!

নিতান্ত অনিচ্ছাবসেই যেন সুষমা চলে যাচ্ছিল, সরযূ আবার ডাকল—আর শোনো। মুখে হয়েছে! এক গাদা পাউডার!

সুষমা কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে—মা এমনি করে মাখিয়ে দিয়েছে।

—সবই মা! নিজে এত বড়ো হয়েছ, ভালো করে পাউডার মাখতে পার না? এই বলে হাতে আঁচল দিয়ে বোনটির মুখের পাউডারের উৎকট প্রলেপটুকু মুছে দিল।

—পালে আবার এসব কী?

সুষমা অপরাধীর মতো বললে—মা, রেখাদের বাড়ি থেকে এনে মাখিয়ে দিয়েছে।

এত দুঃখেও হাসি পেল সরযূর। বললে—আচ্ছা যাও, ফ্রক খুলে শাড়ি পরে এসো।

দুঃখ হল, লজ্জাও হল। কালো কুৎসিত মেয়েকে সুন্দর করে তোলবার জন্যে মূঢ় এ কী চেষ্টা।

সরযূ বুঝতে পারে, তাকে নিয়ে মাকে অনেক কষ্ট, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক গঞ্জনা সহ্য করেছে। আজও যে হয় না তা নয়। তবে অনেক কম। কারণ সরযূ আজ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে সে মৃত। তার আর গতি নেই—উপায় নেই। আজ সে সবার সমালোচনার বাইরে। মায়ের বুক থেকে কি শেল নড়েছে এতটুকু? তা তো নড়েনি। সরযূ যেন তাঁর ব্যর্থ মাতৃত্বের প্র

পারে না। সারা জীবন যেন ছেলেটা এই সংসারের কাছে হাসবৎ লিখে দিয়েছে। এ আঘাতটাও এ পড়ে সরযূর ওপর। এই বিধি মেয়ে গলায় কাঁটা হয়ে আটকে থাকলে কি কারও মুখে হাসি ফোটে?

এখন তাই মায়ের সব আশা ঐ সুষমার ওপর। যেমন করে হোক এর একটি সংসারে বি দেবেই। তার জন্যে মেয়েকে যত রকমে পারে আধুনিক করে তোলবার চেষ্টা। সাজে-পোশাকে চলনে বলনে তাকে এমনভাবে তৈরী করা হচ্ছে যা না দেখলে, না আধুনিক। তাইতো সরযূ লক্ষ্য করে বোনটি যখন একমুখ পাউডার মেখে রঙ পরে—গালে রঙ চড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ইস্কুলে যায় তখন থেকে দাঁড়িয়ে যাও হাসে আবার পাড়া-প্রতিবেশীরাও জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে। প্রভেদ এই দু' রকমের হাসি দু'রকমের। মায়ের মুচকানো সরযূর বুক ফেটে যায়। কিন্তু রাগতে পারে না, চীৎকার করতে পারে না—ওটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। মৃদু অথচ কঠিন কণ্ঠে শুধু বলে—কী যে সং সাজিয়ে মেয়েটাকে ইস্কুলে পাঠাও—

মা সে কথায় কর্ণপাত করে না। বলে—বেশ বেশ! তোমার মতো বয়স্কুনো জরদ্গব হয়ে যা থাকলেই চলবে কিনা। এই বলে দ্রুত কক্ষান্তরে চলে যায়।

শুধু সাজ-পোশাকেই নয়, মেয়েকে প্রতি সপ্তাহে প্রতি নতুন বই দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে সিনেমা হলে। এর খরচও মাকেই বহন করতে হয়। মেয়ে একাই সন্ধ্যের শো-তে সিনেমা দেখতে যায়-একাই ফেরে রাত্তিরে। মেয়ে বড়ো হচ্ছে। এই বয়েসটা যে কী সাংঘাতিক সরযূ দিদি হয়ে যা বুঝতে পারে সত্যবতী মা হয়ে তা যে কেন বুঝতে পারে না তা ভাবতে গিয়ে সরযূ কূলকিনারা পায় না। যতবার বলেছে—ওর মাথাটা অমন করে খেওনা তোমরা।

মা বিরক্ত হয়ে বলে—মাথা খাওয়া আবার কী? এই বয়সে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে না সবাই তো আর তোমার মতো বুড়িয়ে যায় নি।

হ্যাঁ, সত্যিই বুড়িয়ে গিয়েছে সরযূ। এ জীবনে আর তার আশা নেই—আকাঙ্ক্ষা নেই—কল্প নেই। এখন তার আর সখ বলে কিছু থাকা অন্যায়—আমোদ-আহ্লাদে আজ তার অধিকার নয়। জীবনে বাকি কটা দিন হাবার এই সংসারে দুবেলা দুমুঠো ভাত পিলে পড়ে থাকো—আর কিছু নয়।

এ সবই সত্য। এ সবই সরযূ স্বীকার করে। তবু কেমন করে জানাবে তার কোনো আশা না থাকলেও, কোনো আহ্লাদের উপলক্ষ্য না থাকলেও—তার দুটি একান্ত আপন জিনিস আছে। এক স্নেহের অধিকার আর একটি আনন্দের প্রেরণা। প্রথমটির পাত্র সুষমা, দ্বিতীয়টির উপলক্ষ্য ঐ জানালার ধারে বসে দূরের পানে তাকিয়ে থাকা। চিন্তার মুক্তি যার পূর্ণ আনন্দের আস্বাদ কেবল সেই করতে পারে সে দিক দিয়ে সরযূ জানে সে দুর্লভ ভাগ্যের অধিকারী।

কিন্তু একদিনও অশান্তির হাত থেকে সরযূ নিষ্কৃতি পেল না। সুষমাকে শাড়ি পরেই ঠাকুর দেখতে যেতে হল, পাউডারের প্রলেপও মুছে ফেলতে হল, এমন কি গালের ওপর রঙটিও আংশিক তুলে না ফেলে সুষমা দিদির সামনে দাঁড়াতে পারেনি। তখনকার মতো সত্যবতী কোনো কথাই বললেন না ঠাকুর দেখার আনন্দ মাথায় উঠল ওঁর। গম্ভীর মুখে কোনো রকমে প্রতিমা দর্শন সেরেই সবে অনেক আগেই বাড়ি এসে ঢুকলেন। তারপর রাত হলে স্বামী ফিরলে ছেলে কোলে শুরু হল ও আক্রমণ।

যেন! তবু এত হিংসে কেন? ওকি চায় সবাই ওর মতো খুনসুড়ি হয়ে বসে থাকবে? তা ছাড়া ম মেয়ে—তার কিসে ভালো মন্দ—তা আমি বুঝি না।

কথাগুলি বিশেষ স্বামীকে শুনিয়ে বলার কারণ, সকলেই জানে এবাড়িতে সরযূকে যদি অভি হীন ও সত্যকার ভালোবাসা কেউ বাসে তা হলে একমাত্র তিনি। খাবার সময় সরযূ পাখা নি বসলে তাঁর খাওয়াই হয় না।

যাই হোক, মায়ের এই তীব্র বাক্যগুলির কোনোটাই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল না। প্রত্যেকটিই সরযূর গভীরে গিয়ে আমূল বিদ্ধ হয়ে রইল। তবু বিস্ময়ের বিষয় এই—সরযূ একটি কথাও বললে না। যে এমন করে ভুল করা—এ দুইয়ের মধ্য স্বল্প থাকলেও এ বাড়িতে যে মস্ত বড়ো ব্যতিক্রম তা সরযূর স্বীকার করতে হয়।

সরযূ নিঃশব্দ বেদনে বক্ষ ভরে' চুপচাপ অন্ধকারে জানলায় গিয়ে বসল।

অনেকক্ষণ পরে সেই ঘরে যেন কার নিঃশব্দ পদসঞ্চার অনুভব করল সরযূ।

—দিদি!

—আয়।

—ও মা, তুই কাঁদছিস?

সরযূ সস্নেহে বোনকে কাছে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলে। মনে মনে কামনা করলে—আর কিছু চাই না, এই মেয়েটাকে জীবনে সুখী কোরো—এর মুখে যেন দুখিনী মা আমার আনন এইটুকু দেখো।

পাড়ায় আবার একদিন উৎসবের বাঁশি বেজে উঠল। আবার একটি বিবাহ বাড়ির এ দরিদ্রের সংসারে এসে পৌঁছল। অবশ্য নেমন্তন্ন সকলের নয়—সুষমার বন্ধু রেখাই দিদির কেবলমাত্র সুষমাকেই নেমন্তন্ন করে গেছে।

সন্ধ্যে থেকেই সুষমার সাজগোজের ধুম পড়ে গেল। ভালো করে চুল বাঁধল, সাবান দি ধুলো। রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে পা ধুলো। তারপর শুরু হল প্রসাধন। আজ মা কারও কথা শুনবে না। দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েকে সাজাতে লাগলেন।

মায়ের মনের মতো সাজ বেশ নিখুঁতই হল। কিন্তু মুশকিল হল শাড়ি নিয়ে। বিয়ে মেয়েকে রঙ্গ পরিয়ে পাঠাতে মায়ের বেশ মন সরলো না। বিশেষ তিনি এরই মধ্যে লক্ষ্য করেছেন আজ শাড়িই পরেছে। কাজেই তাঁর মেয়েকে আজ শাড়ি না পরালেই নয়। তখনই শাড়ির সন্ধা গুলি খোলা হল। সুষমার শাড়ি একেবারে ছিল না যে তা নয়। এমন কি দু'তিনখানি ভালে ছিল। এগুলি সত্যবতী ছেলেকে দিয়ে কিনিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মুশকিল এই যে, শাড়িগুলির প্রা লাট ভাঙা। নতুন কেনার সঙ্গে সঙ্গেই একবার করে পরেছে আর যেমন তেমন করে বাক্সর মধ রেখেছে। মা মেয়েকে নতুন নতুন জিনিসই কিনে দিয়েছে কিন্তু যত্ন কেমন করে করতে হয় তা শে শেখানো তো সরযূকেও হয়নি। তবু সে যে যত্ন করতে শিখেছিল তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই

পরে যাবার যোগ্য নয়। এখন উপায়? কার কাছে শাড়ি ধার করতে যাবেন? কেইবা দেবে? তা ছাড়া পাড়ার কারও শাড়ি ধার করে প'রে পাড়ার বাড়িতেই যাওয়া যায় না। তখন হঠাৎই সত্যবতীর মনে পড়ল সরযূর একখানি তোলা শাড়ির কথা। তারি সুন্দর শাড়িখানি। যে পরে তাকেই মানায়। তিনি তখনই সুষমাকে পাঠিয়ে দিলেন সরযূর কাছে।

সরযূ আজও সন্ধ্যার সময় ঘর অন্ধকার করে চুপচাপ বসেছিল জানলায়। সুষমা এসে বললে—দিদি, তোর শাড়িটা দে।

সরযূ যেন আকাশ থেকে পড়ল।—আমার শাড়ি! আমার আবার কোন্ শাড়ি?

সুষমা হেসে বলে—সেই যে দামী রঙের—

সরযূ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে বললে—না না, ও আমি দেব না। ঐ একখানি—

এইটুকু উষৎ উত্তেজনার সঙ্গে বলে ফেলেই সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিলে। ধীর গম্ভীর স্বরে বললে—আমার শাড়ি কেন? তোমার তো অনেক শাড়ি আছে।

সুষমা নিজের শাড়িগুলির দুর্দশার কথা বলতে সাহস করল না। বললে—মা, তোমারটা পরতে বললে।

—মা বলেছে। না, মাকে বোলো, এ শাড়ি বড়দের জন্যে। তোমাকে ও মানাবে না।

শুকনো মুখে মাথা নিচু করে সুষমা ফিরে যাচ্ছিল। সে মুখ দেখে সরযূর মনটা কেমন হু হু করে উঠল।—আহা, হয়তো ওর নিজেরই সখ হয়েছে, দিদির শাড়িটি পরে। তাই সাহস করে বলতে না পেরে মায়ের ওপর দায়িত্ব চাপাচ্ছে। আর তা ছাড়া একদিনই তো পরবে। ক্ষতি কী তাতে? আর যদি শাড়িটা নষ্টই করে ফেলে—তাতেই বা কী এসে যায়? কী হবে ঐ একখানা শাড়ি যত্নের ধনের মতো আগলে ধরে রেখে? কদিনই বা নিজে পরে? আর ভালো শাড়ির মোহই বা কিসের জন্যে?

সরযূ চোখ বুজিয়ে ভালো করে একবার নিজেকে যাচাই করে দেখে নিলে। না, লোভ নেই, লালসা নেই, মোহ নেই, সখ নেই, আহ্লাদ নেই, একটা বিরাট 'নেই'-এর অট্টহাসি সামনে শুধু একা সেই-ই আছে। মনে মনে সরযূ ঠিক করলে বোনকে পরতে দিয়ে ও শাড়ি আর ফেরত নেবে না। ওর যখন অতই ভালো লাগে তখন ওটা ওকেই দিয়ে দেবে। তার আর ও ভালো শাড়িতে ইহজন্মে দরকার নেই।

যেমন একথা ভাবা তখনই সরযূ ডাকলে—সুষি, শুনে যা। এই বলে নিজে ট্রাঙ্ক খুলে তার ভিতর রক্ষিত শাড়িখানি বোনের হাতে দিয়ে দিলে। মুখে বললে না বটে, একেবারে দিলাম—কিন্তু যেভাবে দিল তাতে যেন সর্বস্ব ত্যাগ করেই দিল।—যা পরগে।

সুষমা খুশি হয়ে চলে গেল।

সুষমা চলে গেল, আর সেই অন্ধকার শূন্য ঘরে জানলায় বসে সরযূর মনে হল যেন কোন্ এক যুগ এসে তার ক্ষুদ্র বুদ্ধ জন্মটুকু আজ ছিঁড়ে নিয়ে গেল। শুধু কি শাড়িটাই দিল সরযূ? আর কিছু নয়? ঐ রঙীন শাড়িটির সঙ্গে তার কল্পনার তার স্বপ্ন আনন্দের কত স্বপ্ন যে জড়িয়ে ছিল।

সরযূ নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আলো পড়েছে। মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি কানে আসছে। সরযূ জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে তাকালো। অন্ধকার ঘরে চৌকির কাছে তার টিনের ট্রাঙ্কটির ডালা খোলাই পড়ে রয়েছে

কিন্তু নেমন্তন্ন বাড়ি থেকে সুষমা যখন ফিরে এসে সরযূর সামনে দাঁড়ালো তখন মুখে তার হাসি নেই। কোনোরকমে ভাঁজ করে শাড়িখানা দিদির হাতে তুলে দিল।

কিন্তু সুষমা শাড়িখানা ফেরত দিতেই সরযূ কেমন আশ্চর্য হল। মনে মনে ভাবল, এ শাড়ি একেবারেই দিয়ে দিয়েছিল, তবে আবার ফেরত নেয় কেন? পরক্ষণেই ভাবল, ফেরত যখন দিচ্ছে দিক। কিন্তু—আহা কী ভীড়ই হয়েছে। এমনি অযত্ন করে রেখেই ওদের শাড়ি দিতে করে না। কেমন রঙ দেখলি? সুষমা নিঃশব্দে মাথা দোলালো। সরযূ শাড়িখানা ভালো করে করবার চেষ্টা করে দেখলে অমনি কে যেন তার বুকে হঠাৎ শর নিক্ষেপ করল। এ কী শাড়ির দশা! পায়ের কাছে পাড়টা ছিঁড়ে উড়ে গেছে—আর একটা আঁচল একেবারে কালি কালি

বুঝতে বাকি রহিল না যে শাড়ি পরার অনভ্যস্ত মেয়ে শাড়িখানি যেমন তেমন করে পরে বিয়ে বাড়ি বন্ধুদের সঙ্গে ছুটোপাটি করেছে, এবং কোথাও কোনো খোঁচ লেগে শাড়িখানি দুর্দশা ঘটেছে। এভাবে ছিঁড়েছে তাতে আর ফেলাই চলবে না, রিপু চলবে না। এ শাড়ি—ক সরযূর সুপ্ত বক্ষে কোথা থেকে একটা ঝড় যেমন একেবারে হা হা করে ডুকরে কেঁদে উঠল। তার শিরায় শিরায় রক্তের বেগ দ্রুততর হয়ে উঠল। মাথাটা ক্রোধে দুঃখে ঝিম্ ঝিম্ করে তখনও অপরাধী চতুর্দশী কিশোরী মাথা নিচু করে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সরযূ দেহের সমস্ত একত্র করে সুষমার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলে—পাজি শয়তান মেয়ে! বলতে বলতে ক্রোধে স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু আশ্চর্য এই দিদির হাতে এই প্রথম এমন মার খেয়েও সুষমা সেখান থেকে এক নড়ল না, এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলল না। বরঞ্চ কোথাও কিছু নেই সেই ছিন্ন শাড়িখ মুখ চাপা দিয়ে সরযূই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। লজ্জা—লজ্জা—এ মুখ আর তার বোনের কাছে কোথা দেখাবে কী করে! সে যে বড়ো গর্বে এই শাড়িখানি বোনকে দান করেছিল। সে যে মনে কর সব সাধ সব আহ্লাদ সব তুচ্ছ শখের অনেক উর্ধ্বে সে চলে গিয়েছে।

কিন্তু সামান্য একখানা শাড়ি আজ তাকে এ কী লজ্জা দিয়ে গেল।

মডার্ণ ডেকরেটরস
৬৫-এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন-৫৫-২৫

কি পাইনি

শক্তিপদ রাজগুরু

মাঠের মধ্যে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা ; বসতি থেকে অনেক দূরে। কাশ কসাড় বন ভেদ করে একখানি এ্যাসফ্যাল্টের পথটা চলে এসেছে। দূরে ব'ক্সিলিং রোডের ধারে ঘনসবুজ শালবনের সীমা —আরও দূরে আকাশ কোলে হালকা মেঘনীল ছায়া মেখে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয় পর্বতশ্রেণীর ওরাংগে মেঘের সীমায় যেখানে পাহাড়ের সীমা মিলেছে তারই ঠিক উপর দিয়ে উড়ে চলেছে একঝাঁক পাখী—আঁকাবাঁকা রেখার মত।

বাবডোগরা এয়ার পোর্ট। রাণওয়ের জায়গাটুকু বাদ দিয়ে ওরাই অয়েলের কাশ ঘাস গজিয়েছে দূরে পেট্রল ষ্টোরের ঘরখানা—ওপাশে ফায়ার ফাইটিং গ্যারাজ—বাস তারপর থেকেই সুরু হয়েছে তরাই এর স্বাদ পাওয়া আধা বুনো অঞ্চল। কেমন একটা নিঃস্ব একাকীত্বের নির্জনতা এর চারিপাশে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সুবিনয়। গতকালের সকাল আর আজকের সকাল—দুটি যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঘণ্টাকার এই চব্বিশ ঘণ্টা কত আশা নিরাশা আর ব্যর্থতার বেদনায় রঙীন।

শিলং থেকে কাল এতক্ষণ বের হয়েছে ; সমুদ্রতলের পার্বত্য শহর উঁচু নীচু পথ—আর দাবাং পাহাড়ে সমুদ্রতলের বৃক্ষবিরল শৈলকুমারী, অঙ্গে তার পাইনের ঘনসবুজ সাজ, ঝর ঝর ঝর্ণার সুর জাগে তার ছন্দে।

ছোট ষ্টেশন ওয়াগনখানা বহু গাড়ীর ভিড়ে মিশে নামছে পাহাড় থেকে—সাড়ে এগারোটায় ফ্লে প্রায় বাট মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে হবে তাকে।

খাসিয়া ড্রাইভার আশ্বাস দেয়—ডোণ্ট ইট ওরি স্যার, আই গো কুইক।

হাতুলিবাঁক—মাথার চুলের কাঁটার বাঁক—আরও কত রকম আঁকাবাঁকা পথ, পাহাড় আর পথট লুকোচুরি খেলে চলেছে কে কার গতিরোধ করে—তারই অবসরে ওরা গাড়ী নিয়ে নামছে। লাইন দিয়ে নামছে আসাম রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাস ট্রাক্সি—ষ্টেশন ওয়াগনের দল। মাঝে মাঝে একটু সমতল ঠাঁইএ আভাষ দুএকটা খাসিয়া বস্তী পাহাড়ের গায়ে ঝরনার জল ঝরিয়ে জলের সঞ্চয়, মোংয়া কাপড় জড়ানো ছেলেমেয়ে দেখা যায়, কোথাও চরছে দুএকটা মুরগী—বাস গাঁ ছাড়িয়ে আবার সেই পাহাড়—পাহাড়ের পর পাহাড় শ্রেণী। ঘনসবুজ বনানী—আর বুনো কলাগাছের জঙ্গল এখানে ওখানে। কোথাও কমলালেবুর বাগান—বাতাসে জমাট হয়ে আছে কমলা ফুলের তীব্র মিষ্টি সৌরভ। বুক ভোর নিঃশ্বাস নিয়ে তৃপ্তি আসে।

সবকিছু ছাপিয়ে মাঝে মাঝে মনে পড়ে কলকাতার কথা, প্রতিমার চাহনি তার হাসিভরা মুখখানা। হঠাৎ কেন টেলিগ্রাম এলো ভাবতে পারে না—তবে কি খুবই অসুস্থ! হয়তো তাই।

ঘড়ির দিকে চায় আর হিসাব করে—নংপো ক্রসিং আসতে আর দেরী নেই, একমুখো পথ। নীচে থেকে উপরে উঠে আসবার সমস্ত গাড়ী—উপর থেকে নীচে যাবার সব গাড়ীই থামবে ওখানে, সবাই দুদিক থেকে জমায়েত হলে তার পর নীচের গেট খুলে ওরা নেমে যাবে—শিলং যাত্রীদের জন্য উপর

চাইল একবার—আবার এক্সিলেটারে চাপ দিয়ে ওই দুরপাক খাওয়া পথে নিপুণ হাতে স্টিয়ারিংএ দে দেয়।

পোহাটির কাছে এসে আবার সমতলভূমি পেয়ে বেগে ছুটে চলে গাড়ী শহরের মধ্যে অফিসের দিকে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুবিনয়, দশটা পঁচিশ। সময় মতই এবার অফিসে রিপোর্ট করে খুশী মনে ড্রাইভারকে বকশিষ করে।

পেশাদারী সেলাম—যন্ত্রচালিতের মত ড্রাইভার একবার হাতটা তুলে নমস্কার জানাল। ন জানাবার কোন সুযোগই নেই। ক্রমে হয়তো কোনদিন দেখাও হবে না। সুযোগটা ওই দুটো টাকার।

প্যাসেজ শিলং থেকেই বুক করছিল এসে শুধু গাড়ির হওয়া মাত্র। মালপত্রের লগেজ চু নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরায় সুবিনয়।

সাড়ে বারোটায় প্লেন ছাড়বে, পৌঁছবে তিনটা নাগাদ। বাড়ী পৌঁছবে প্রায় বারটা। এ কেমন আছে কে জানে! হঠাৎ অসুস্থ হবার খবর পেয়ে ছোড়ছে। আসবার আগে দাঁড়িয়ে ছিল ম —হাসিমুখে বিদায় দেয়।

সেই সঙ্গে ফরমাইস ছিল অনেক কিছুর। আসামের নাগাদের তৈরী রঙীন কাপড়, লুই আরও টুকিটাকি অনেক কি সব।

এয়ার কোম্পানির কোচটা চলেছে শহরের বুক দিয়ে—এপাশে ব্রহ্মপুত্রের ঘোলা জল কা পাহাড়ের নীচে পাক দিয়ে বেগে ছুটে চলেছে। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট কাঠ বাঁশের তৈরী —অন্যদিকে মিটার গেজের লাইনে চলেছে একটা ট্রেন শহর ছাড়িয়ে অন্ধকার পাহাড় বন ঘেরা দেশের পানে ছুটে চলেছে। লামডিং মণিপুর রোড—আরও কতদূরে কে জানে।

দুপাশে ধানক্ষেত জলাভূমি, ইউনিভারসিটি এলাকা—রেডিও স্টেশনের সীমা ছাড়িয়ে গাড় শহর থেকে দূরে চলেছে। ছোট গ্রাম—সুপারী নারিকেল গাছের সীমাহীন সবুজ ছোঁয়া লাগা বাংলারই বুকে ফিরে এসেছে যেন। মোড় ঘুরেই কতকগুলো বাড়ী লম্বা টিনের শেড দেখা যায়।

প্লেন ছাড়তে তখনও দেরী, ঘুরে রাণওয়ের ওপাশে মেঘ জমেছে। ঘুসর মলিন মেঘ, বড় জমেছে যাত্রীর ভীড়। মাঝে মাঝে উপরের সিগন্যাল রুম থেকে ভেসে আসে ঘুরাগত কণ্ঠস্বরের নি টুকরো যান্ত্রিক শব্দ। এয়ার পোর্টের কিউরিও শপে দেশী-বিদেশী খদ্দেরদের ভিড়।

রাণওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে প্লেনখানা, দমকা বাতাস বইছে—মেঘখানা ক্রমশঃ ছেয়ে ফেলে আ আধখানা—দূরের পাহাড় শ্রেণী আবছা হয়ে মুছে গেছে বৃষ্টির ধারাপাতে। কারা প্লেনের ডানায় থেকে মোটা শিকল দিয়ে আংটাগুলো মাটির সঙ্গে আটকে দিল—দমকা বাতাসে যেন সরে না যায়।

বৃষ্টির ঝাপটা আসছে। বারান্দায় জমেছে গ্রামান্তরের কৌতূহলী জনতা মেয়ে মদ; হাওয়াই দেখতে এসেছে। মুখে কাটা সুপারী আর চুন লাগানো খোয়াই পান—চোখে বিস্মিত বিস্ফারিত সব কিছুর মধ্যেও সুবিনয় যেন একা অপরিসীম একাকীত্ব বোধ করে। প্লেন ছাড়বার সময় উত্তী গেছে। হলের রেডিওটায় ঘোষণা শোনা যায়।

অনুপস্থিতির কারণ ছাত্রের সঙ্গে জানাচ্ছে যে, আবহাওয়ার গোলমালের জন্য প্লাইট নং ১৪

পাহাড় থেকে ছুটে আসছে রাণ্ডভের ওপাশের সবুজগাছগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে বৃষ্টির তোড়ে।

বাইরের জনতা ঠেলে এসে ঢুকছে হলের কোণে। ঝাঁকা মাঠে বিরাটাকার চিলের মত বকবকে ডাকোটা প্লেনটা ভিজছে—ভিজছে কংক্রিট করা রাণওয়ের একফালি এলাকা আর বারান্দার নীচে কয়েকটা ক্যানা ঝিমিয়ে গোদাপ গাছ। প্রপেলারের ঝাপটায় তারা বেঁকে গেছে তবু ফুলকোটা তাদের ফুরোয় নি।

এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশনের অতিথি। তাদের লাকের বন্দোবস্ত রেস্তোরাঁয় করা হয়েছে কোম্পানি থি কোর্স লাঞ্চ আমিষ নিরামিষ যে যা চাইবে মিলবে।

এক পাশের টেবিলে খেতে বসেছে তাদের প্লেনের পাইলট কোপাইলট রেডিও অফিসার ক'জন পাশেই চেয়ারে বসে হাত পা নাড়ছে এয়ার হোস্টেস। মুখে ঠোঁটে লাল রং এর প্রাচুর্য যৌবন-টল্ল দেহ। ওই নকল সাজগোজ না করলে দেখতে ভালো লাগতো তাকে।

উদ্দাম গতিতে কিসের যেন আলোচনা করছে। প্লেন ছাড়ুক বা না ছাড়ুক কোন কিছুই তাদের আসে যায় না।

প্রতিমা! আজ তিন বছর এসেছে সুবিনয়ের জীবনে। তার আগের সেই উদ্দাম জীবনযাত্রার কথা ভোলেনি আজও। ওই লিপস্টিক রুজ মাখা কোন মেয়ের কথা মনে পড়ে—ওমনিই কে যেন এসেছিল তার সেই রুক্ষ-ওঠা জীবনে। ভালো চাকরি লোভনীয় মাইনে, কোম্পানির দেওয়া ফার্নিশড্ কোয়ার্টার, কোন কিছুরই অভাব নেই। সুখী করতে পারতো সেই মেয়েটিকে কিন্তু তা হয়নি। ঝড়ের মত এসেছিল ঝড়ের মত চলে গিয়েছিল মালিনী। হ্যাঁ—নামটাও ভোলেনি সে।

ঝড় থেমে গেলে যেমন ছিটিয়ে পড়ে থাকে চূর্ণ ফুলদল সবুজ পাতা-প্রশাখা—কোনও পাখীর বাস মালিনী চলে যাবার পর সুবিনয়ের জীবনও তেমনি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। প্রতিমা তখনই আসে তা জীবনে। আবার নতুন করে বাঁচতে শেখে সুবিনয়।

হলটা কেঁপে ওঠে ওই রূপবতী রঙীন কন্যার হাসিতে, পরনে সাদা স্কার্ট, সাদা হাফ হাতা জাম কলারটা নীল, কাঁধে নীল রঙের মেজের উপর জরির কাজকরা একটা ট্রাইপ। হাসছে—প্রাণখোলা হাসি

সুবিনয় একবার চেয়ে মুখ নামাল। সুপ কারি রাইস আর মেষ পাতে কিছু ফল। খাবার টেবিল থেকে মাঝে মাঝে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে, মেঘ ফাঁকা হয়ে আসছে। মিথ্যা এই অনুসন্ধান দূর আকাশ পথের যাত্রী সে—তার এলাকা এইটুকুর মেঘ রোদ নিয়ে নয়।

উপরে কর্মব্যস্ত গলার আওয়াজ শোনা যায়। টুকরো মোটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে বেয়ারার পাশের টেবিলে একটি আমেরিকান ভদ্রলোক মোটা ফোলিও ব্যাগটা নামিয়ে রেখে খাওয়া সেরে পকেট থেকে ছোট একটা শিশি বের করে গ্লাসে রঙীন পানীয় একটু ঢেলে আরাম করে মোটা চুরুটটা ধরালো

সুবিনয়ের দিকে চেয়ে হাসে একটু—নো চান্স।

প্রায়ই হয় এ অঞ্চলে। আবহাওয়ার কোন স্থিরতা নেই। বিশেষ করে বর্ষাকালে, শীতকালে জমে কুয়াসা। প্লেন ওঠা নামা বন্ধ, বর্ষায় কোথাও মেঘ জমেছে—এলোমেলো 'এয়ার পকেট' যে এক একদিন উঠলই না।

মাইকে ঘোষণা শোনা যায়—ফ্লাইট নাম্বার ২৮২, যথন তারা আগরতলা ছাড়বে ঘণ্টা পনের

ষোড়শ বর্ষ

ষষ্ঠ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ

১৩৬৭

গল্প-ভারতী

সম্পাদকীয়

বিশ্ব-বৈঠক (United Nations) দিবস

U. N. পনের বছর পূর্ণ করে (১৯৪৫-৬০) সাবালকত্ব লাভ করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ San Francisco-তে যে প্রথম বৈঠক আহূত হয়, সেখানে (তখনো ইংরেজ অধীন) ভারতের প্রতি হয়ে যোগ দেন ভারত-গৌরব দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ। আজ তিনি কি সুখী হয়েছেন? আমূল ৪৯ দিয়ে সুরু করে U.N.O.র সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৯'র খাতায়। Belgium তার ভূতপূর্ব্ব জ বিশাল Congo ছেড়েও ছাড়ে না? তলে তলে Sabotage ও খণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে Congo'র স্বাধীনত করতে। এই অবস্থার মধ্যেও কিন্তু সুযোগ্য ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীরাজেশ্বর দয়াল সব বিপদ উপেক্ষা মনোনীত সম্পাদক হয়ে কাজ করে গেছেন, সেই আমাদের গৌরব। ইন্দোনেশিয়ার জমিদারী ছাড়তে বা Dutch-রাও ঠিক এইভাবে শয়তানী চালিয়েছিল। (১৯৪৭-৪৮) কিন্তু স্বাধীন ভারতের মুখ্যমন্ত্রী নেহে সত্তেজ ভাষণে ও পূর্ণ সাহচর্যে, Soekarno ওলন্দাজদের হটাতে পেরেছেন। যদিও তারা এখনো New G ছাড়েনি। আজ ভারত অবধ্য বিব্রত, মহাচীনের হিমালয়-সমস্যা ঘনিয়ে তোলার ফলে; কিন্তু এক্ষেত্রে দিহি কেউ করলেন না, নেহেরুজীরও মুখ বন্ধ, কারণ কম্যুনিষ্ট চীন U. N. আইনের বাইরে; ৬০০ মি চীনাদের U. N. এর বাইরে outlaw করে রেখেছেন কারা? বর্তমান সীমান্ত সমস্যা থাকলেও চীনকে করার তাগিদ ভারত কিন্তু বরাবর দিয়ে এসেছে।

ভারতের আর এক সুপরামর্শও ভেসে গেল, U. S. A. ও U.S. S.R. "ঠাণ্ডা-যুদ্ধে"র বরফ-প্র দুই পক্ষ একবার মিলে নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) কতটা এখুনি সম্ভব এটাই স্থির করুন—এই নেহেরুজীর অতি সংযত ও সুচিন্তিত মন্তব্য; কিন্তু তিনি Eisenhower-Khrushchevকে খেলাতে প না এবং নিরাশ হয়ে দেশে ফিরে এলেন। শুধু আমরা নই General Assemblyর বহু জাতিই নে সমর্থন করেছেন ও করবেন। ২৭শে জুন যে বৈঠক অকারণে ভেঙেছে, হয়ত—U. S. এর নূতন প্রে

নৈরাশ্যের মধ্যে আশা এই, যে বহু শতাব্দীর অত্যাচারের পর আফ্রিকা মহাদেশের বহু জাতি স্বা হয়ে রাষ্ট্রসংঘের নূতন সদস্য-পদ লাভ করেছে ; শতাধিক বছর আগে লাইবেরিয়া স্বাধীন গণতন্ত্র রূপে প্রতি লাভ করে ; আর স্বাধীন রাজ্য ইথিওপিয়া (একবার মুসোলিনী-আক্রান্ত হলেও) খ্রীষ্টান রাষ্ট্র রূপে স্বা ছিল। ক্রমশঃ Egypt, Lybia, Ghana, Tunisia, Morocco, Mali, Nigeria, Guinea প্রভৃতি কা সদস্য বিশ্বরাষ্ট্র ভুক্ত হয়েছে। এই সব রাষ্ট্রসমূহই এশিয়া—আফ্রিকার মিলনবন্ধন ও মৈত্রী সুদৃঢ় করেছে। অ শুধু ইউরোপ ও আমেরিকা তাদের কূটনীতি বা অর্থনীতির বলে সবাইকে দমাতে পারবে না, যদিও চে ত্রুটি নেই, তার প্রমাণ প্রত্যহ আমরা পাই।

রাজনৈতিক জটিল সমস্যা বাদে, শিক্ষা ও সমাজগঠনের ক্ষেত্রে (U. N. ও U. N. E. S. C. O.) কল্যাণকর কাজের সূচনা করেছেন। মানবের মৌলিক অধিকার (Human Rights) নারী ও শিশুদের অ ইত্যাদি নিয়ে গভীর আলোচনা চলেছে। শ্রমিক জগতের উন্নতিকল্পে আন্তর্জাতিক শ্রম-পরিষদ (I. L. O বহুকাল কাজ করে আসছেন। শিশুদের অধিকার (Children Charter) প্রসারিত হয়েছে ও সামাজি পরিষদে ৭৮টি রাষ্ট্রের ভোটে একবাক্যে স্বীকৃত হয়েছে যে বর্ণ (Clour) জাতি, ধর্ম ও ভাষাদি নিয়ে মানুষে নির্যাতন দূর করতে হবে (আসামে এ খবর পৌঁছবে কিনা জানা নেই)। শেষে আনন্দের সঙ্গে স্ম করাই যে বিশ্ব নারীসঙ্ঘের প্রচার প্রচেষ্টার ফলে নারীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে চেষ্টা হোক্—এ শুভ প্রস্তা এনেছিলেন পাকিস্তানী, আফগানী, লাইবেরিয়া, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা।

নরনারীর সাধারণ জীবনের মান ও মর্যাদা বাড়াতে এইসব ক্ষেত্রে যত চেষ্টা চলেছে, U. N. O. পুস্তকাদি থেকে তার সংকলন ও পরিবেশন করা আশু প্রয়োজন। পত্রিকা-সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীর এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শুধু দিল্লীতে নয়, আমাদের বিশাল আন্তর্জাতিক কেন্দ্র কলকাতার ম কলেজে এইসব গঠন-মূলক কাজের বিবরণী প্রচার করা উচিত ; তবেই U. N.এর সাধারণত্ব, সা হবে, এই কথাই এবছর মহাসমিতি সদনের বার্ষিক ভাষণে বলেছিলাম।

সুব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯১১-১৯৬০)

আচার্য প্রফুল্লকুমার রায় (Dr. P. K. Roy)-এর দৌহিত্র ও প্রবীণ I. C. S. সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যা পুত্র Air Marshal সুব্রত মুখার্জি অকালে দেহত্যাগ করেন ; ভারতীয় দেশরক্ষা বাহিনীর তিন বিভাগ (A Sea & Land Forces) তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখান। তাঁর শেষ তর্পণে, দিল্লী থেকে অ যোগদান করি ও তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করি। তাঁর মত কর্তব্য-নিষ্ঠ ও সুদক্ষ কর্মচারী ভারত সহজ বহুদিন পাননি। তিনি আদর্শবাদী বাঙালী ছিলেন, অথচ কঠিনতম পরীক্ষার ক্ষেত্রে শুধু বাংলার নয় স ভারতের তিনি মুখোজ্জ্বল করে গেছেন। ভগবান তাঁর পিতামাতা, পত্নী ও একমাত্র পুত্রকে শান্তি দি "মৃত্যোর্মাঽমৃতম্ গময়"।

বিশ্ব-সাহিত্য

একটি দিনের ইতিহাস

—মারিয়া কুব্‌মীঞ্‌স্কা (পোলীয় হ'তে অনূদিত)

অনুবাদক : ডঃ হরপ্রসন্ন ঘোষাল

[প্রথম থেকে আমাদের একটি পরিকল্পনা ছিল যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন আহরণ করে গল্প-ভারতীতে পরিবেশন করব। এই পরিকল্পনা রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে দূর-দূরা সাহিত্যিক বন্ধুদের সহযোগিতা কামনা করেছিলাম। অনেকেই এ বিষয়ে আমাদের সক্রিয় ভাবে স করে আসছেন।

গল্প-ভারতীর নূতন পাঠকেরা জেনে আনন্দিত হবেন যে গত কয়েক বৎসর ধরে প্রখ্যাত সাহি ডক্টর হিরন্ময় ঘোষালের পোল সাহিত্যের সেরা গল্প উপন্যাসের অনুবাদ গল্প-ভারতীতে প্রকাশিত হয়ে আ এই পর্যায়ে তাঁর যে সব রচনা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিকে সমকালীন পোল সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব মূলক রচনাগুচ্ছ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ভারতীয় সাহিত্য একাডেমী এই রচনাগুলিকে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের কথা চিন্তা করছেন—এই সংবাদ নয়াদিল্লীর পোল দূতাবাসের তথ্যপত্রে (মে'র সংখ্যা) প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্বেই গল্প-ভারতীতে আমরা এ কথা উল্লেখ করেছি। শারীরিক অ হেতু ডক্টর ঘোষাল কিছুকাল আমাদের কোন রচনা পাঠাতে পারেননি। সম্প্রতি তিনি একটি অনুবা পাঠিয়েছেন ও আরো পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন। কাজেই পোল সাহিত্য সংগ্রহ আরো কিছুদিন চ এটি শেষ করার পর আমরা চেক্, রুষ, ফরাসী, জার্মাণ ও অন্যান্য দেশের সাম্প্রতিক কালের শ্রেষ্ঠ সা সম্ভার পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেব। এই বিরাট পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সকলে সহযোগিতা প্রার্থনা করি।]

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসের রাতে এমন গুমোট পড়েছে যে ঘুম বন্ধ হয়ে আসে। হেইনত্‌ বনের চৌকিদার যুজেফ্‌ ব্রন্‌কার কুঁড়ের ভেতর ঘামে সর্বাঙ্গ চট্‌চট্‌ করে। চৌকিদারের দশ বছরের ভাদ্‌কা মেঝের ওপর খড় পেতে শুয়েছে। কিন্তু চোখে তার ঘুম নেই। ঘরটার একদিকে খুপরি ভেতর পালকের লেপের তলায় তার ভাতা ও আর সংসা যে কী করে অমন অসাড়ে ঘুমোচ্ছে, তাই একটু আশ্চর্য হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে। মাছিগুলো ভীষণ জ্বালাতন শুরু করে দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া মাত্রেই দ্বিগুণ গোঁ নিয়ে ভন্‌ভন্‌ করে ফিরে আসে। ঠোঁটের কোণদুটোয় ভিড়

জমা হয়। যাবে তেলা চুলগুলোর ভেতরে ভেতরে ঢুকে যায়। আর খালি পিঠের ওপর সুড়সুড়ি দে ফুলে ফুলে পাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পায়চারী করে বেড়ায়।

ভ্রাদ্‌কা ভাবছে কালকের ঘটনাটার কথা। তার ভাতা আর সৎমার মধ্যে বেশ একটু ব হয়ে গেছে। ও যখন কুঁড়েতে ঢোকে তখন শুনতে পেয়েছিলো, ওর ভাতা "বনের লোকগুলে কথা বলছে। কী নিয়ে বচসা, শুনতে পাচ্ছিলো, কিন্তু সৎমা ওকে গোয়ালে যেতে বলে। কী এ ভুলে গেছে এই ছুতো করে ফিরে এসেছিলো বটে, কিন্তু ওকে দেখা মাত্রেই সৎমার খান্‌খেনে হঠাৎ থেমে যায়। "বনের লোকগুলো" সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে। কাল শুকদমারের রে য়ানেক, বলে, ওরা নাকি দেশভক্ত বীরের দল, কিন্তু ওর ভাতা একটা ধমক দিয়ে বলেন, ছোটমুখে ব বা-তা বড় বড় কথা যেন আর না শোনেন। য়ানেকের বয়েস বারো পেরিয়েছে। তাই পরে পাশায়, বনে চলে যাবে, কিন্তু ছেলেরা সবাই হাসাহাসি করে বলে, বনে দুধের বাচ্ছাদের করবার কিস্সু নে য়ানেকের জন্যে ভ্রাদ্‌কার মনে বেশ একটু দুঃখ হয়েছিলো। বন্ধু হিসেবে য়ানেক্ ভারী ভালো। ভ্রাদ্ শিক্ষয়িত্রী, অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণীর, বলেন, য়ানেক্ সত্যিকারের খাঁটি পোল্। শিক্ষয়িত্রী যা বলেন ভ্রা সব বিশ্বাস করে, কারণ ভারী ভালো মানুষ তিনি।

ওর ভাতা "বনের লোকগুলোকে" দেখতে পারে না। যাতা বলে গাল দেয়…তা হো ভাতা তো?… ভাতার সম্বন্ধে কোনো মন্দ কথা ভাবতে ভ্রাদ্‌কার ভয় করে, কারণ তাহলে পাপ। কিন্তু তাহার কথা যখন মানে না, বারে বারে ফিরে আসে: ভাতা আলেমানীদের গাঁয়ারায় আ যায়। সেখানে বসে বসে মদ টানে তাদের সঙ্গে।

পাঠশালার ছেলে-মেয়েরা ওর দিকে আড়চোখে তাকায়, ভ্রাদ্‌কার সঙ্গে তারা কথা কইতে না, শুধু য়ানেক্ বলে, ভ্রাদ্‌কা "খাসা মেয়ে", বেশী বক্‌বক্ করে না, ওর ওপর নির্ভর করা চলে, অঙ্কগুলো, যা পেটে আছে সব ভল্‌ভল্ করে উগ্‌রে দেয়। ঐ একটা ভালো কথার জন্যে ভ্রাদ্‌কার য়ানেকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। তাবে সেই কথা, ঘুম আসে না চোখে। কুঁড়ের ভেতর গাঢ় একটু আলো দেখা দেয়। জান্‌লার কাঁচের ওপর খুব আস্তে টোকা দেওয়ার আওয়াজ শোনা। ভ্রাদ্‌কা কান পেতে শোনে, তারপর পা টিপে টিপে জান্‌লার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। রাতপোহা ঘোলাটে আলোয় চোখে পড়ে দুটি নওজোয়ান: মাথায় বেসামরিক টুপী, কিন্তু কোর্তার কাটটা সামা উঁচু পা-চাকা জুতো, তাদের ভেতর পাৎলুনের পায়াদুটো ঢোকানো, কোমরে আঁটা কোমরবন্ধ।

ভ্রাদ্‌কা জান্‌লাটা খোলে একটু। বহুদিন খোলা হয় নি, কব্জাগুলো ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ করে ও ভ্রন্‌কার ঘুমের ঘোরে বিড়্-বিড়িয়ে বকুনি অল্পক্ষণের জন্যে থেমে যায়। তার মেয়ের গা শিউরে ওঠে, ঘুম ভেঙে গেছে বোধ হয়। চুপ করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে…ভাতা, সৎমা, কেউ নড়ে না।

—কে তোমরা?—শুধায়।

—"বনের লোক"।

—এদিকে না আসাই ভালো—বলে মেয়েটি।

—চৌকিদার বাড়ী আছে?

ভ্রাদ্‌কা চুপ করে থাকে। ঠিক সেই সময়ে ভ্রন্‌কা জেগে ওঠে।

—"বনের লোক", তোমায় কথা জিজ্ঞেস করছে।

ভ্রন্‌কা বিরক্তিভরে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—যেও না ওদিকে—সংধ্যা বলে।

চৌকিদার বারণ না মেনে এগিয়ে যায়। ভ্রাদ্‌কা শোনে, দালানের বাইরে চুপিচুপি কথা কী বলছে ওরা ধরতে পারে না, ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, তাতার জন্যে ভয় হয়, আর অন্যেও, কোনো একটা বিপদ না ঘটে। কিছুক্ষণ পরে "বনের লোকগুলো" চলে যায়।

ভ্রন্‌কা কুঁড়েয় এসে ঢোকে; তার মেজাজ সেপড়ানো, যা-তা বলে গালি পাড়ে। খুব ত পোষাক বদলাতে লেগে যায়, সংধ্যাও উঠে কাঠ আনতে যায়, রান্নার ব্যবস্থা করে, তাতার কিন্ত না, খাবার জন্যে দেরী করবার সময় নেই।

ভ্রাদ্‌কা খড়ের ওপর গিয়ে বসে, ঘাড়ের পেছনে রোদে-পোড়া হাতদুখানি রেখে হেলান দেয়। তাতা কয়েকবার খড়ের ওপর হোঁচট খায়। জুতোর আগাটা ওর গায়ের খুব কাছ দি গেলো। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময়ে তাতাকে উঁচু মাথাটা বেশ একটু নোয়াতে হলো।

তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, চৌকিদারের দেখা নেই। কুঁড়ের ভেতর সব নিশুম। উনুনের আগুন নিবে গেছে, খাবার-দাবার যা রান্না হয়েছে জুড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ, মুখে তোলে নি। ছুটির সময়েও ভ্রাদ্‌কা পাঠশালায় যায়। শিক্ষয়িত্রী ছেলেমেয়েদের বই পড়তে আজ পাঠাগার খোলা। কিন্ত ভ্রাদ্‌কা তাতার ফেরার আশায় ঠায় ঘরে বসে আছে।

দুপুরের দিকে জুতোর মচ্‌মচানি শোনা যায়, ভ্রন্‌কা ফিরছে, টর মাতাল। মাথা নুইয়ে কুঁ এসে ঢুকলো, হাতে দু-জোড়া উঁচু পা-ঢাকা জুতো। ঘরের মাঝখানটায় নামিয়ে রেখে ধপ্‌ করে ওপর বসে পড়লো।

—কোত্থেকে আসা হচ্ছে?—শুধায় সংধ্যা।

—আলেদানীরা দিলো।

—ঘুরিয়ে দিয়োচো বুঝি!

—খাম্‌, বলচি!

—মুখাশ্‌!

ভ্রাদ্‌কা হাত দিয়ে কানদুটো চেপে ধরতে চায়, কিন্ত চোখদুটোও যে খোলা। বুঝতে কোন্‌টা বেশী অসহ্য: শোনা না দেখা।

তাতা নিকেল-করা একটা বড় ঘড়ী বের করে মেজের ওপর রাখে। ভ্রাদ্‌কা জানে, ঘড়ী ছিলো না। ঘড়ীটা জোরে টিক্‌টিক্‌ করে চলে। ভ্রাদ্‌কার গায়ে পাক দিয়ে ওঠে। সকা খায় নি বলে নয়। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওরা, নিশ্চয়ই তাদের রক্তাক্ত দেহের ও চাপা দেওয়া হয়েছে, আর ওদের জুতোগুলো ঘরের মাঝখানটায় দাঁড় করিয়ে রাখা। ভ্রাদ্‌কা ক করতে পারে না, হুড়মুড় করে উঠে পড়ে গায়ের ওপর কোনো রকমে একটা ফ্রক্‌ ফেলে, এক জুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। কুঁড়ে থেকে যতদূরে পারা যায়, শিগ্‌গির, শিগ্‌গির·· তাতা যেন ঘ

না পারে। চুলগুলো আঁচড়ে বাঁধা হয়ে ওঠে নি। উস্কো-খুস্কো, এলোমেলো একমাথা চুল নিয়ে সে পাঠশালার বেড়ার আগড় খুলে ঢুকে পড়লো।

শিক্ষয়িত্রী বসে আছেন একটা বেঞ্চির ওপর আর তাঁর সামনে ঘাসের ওপর বসে সপ্তমশ্রেণী পাঠশালার সবচেয়ে উঁচু। শিক্ষয়িত্রী ওদের সব পাঠ শেষ করে দিতে চান্; কী একটা বই পড়ে শোনান্ ভ্রাদ্‌কার পক্ষে অবোধ্য ভাষায় অর্থ করেন, তারপর সহজ কথায় ভাবটা বুঝিয়ে দেন।

ভ্রাদ্‌কা কী করবে বুঝতে পারে না, ওর দিকে অতগুলো চোখ তাকিয়ে রয়েছে। শিক্ষয়িত্রী তার অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করে ডাকেন নিজের কাছে:

—তুইও শুন্‌বি, ভ্রাদ্‌কা? বইখানার গোড়ারদিকটা অবিশ্যি জানিস না। তাহোক্, এমন চমৎকার বই, আরো অনেকবার পড়বি নিশ্চয়। এ হেকোভিচ্-এর "ক্ষ যাসি"।†

ভ্রাদ্‌কা বিশ্ববিখ্যাত লেখকের লেখা "যাচনদার যাকৌ" পড়েছে। শিক্ষয়িত্রী যে ওকে থাকতে বললেন তাতে ওর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। ঘাড়ী ফেরবার ওর সাহস নেই। ঘাসের ওপর বসলে একপাশে।

—কোন্‌খানটায় থেমেছিলাম আমি?—শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞেস করেন।

—ঐ সেই বিশ্বাসঘাতকটার কথা হচ্ছিলো।—য়ানেক্ বলে।

—হীলন্ হীলনীয়েস্-এর কথা—যোগ করে আন্তন্।

"হে প্রভু, আমার অনিষ্টের প্রতিশোধ দিন"—শিক্ষয়িত্রী হীলন্ হীলনীয়েস্-এর কথা পড়ে চলেন —"আর আমি আপনার কাছে ওদের সবাইকে ধরিয়ে দেবো, প্রধান শিষ্য পীতর, সীমুস্, জেম্, য়াউক্ জীম্স্, সবচেয়ে বড় পাণ্ডাদের, তারপর লীসিয়াকে, উম্মুস্‌কে, ওদের শত শত হাজার হাজার ধর্মাবলম্বীদের, দেখিয়ে দেবো ওদের প্রার্থনা-মন্দির, ওদের কবরস্থান, আপনাদের সমস্ত কারাগার খালি করে দিলেও ওদের জায়গা হবে না।"

—বিশ্বাসঘাতক—পুনরুক্তি করে য়ানেক্।

ভ্রাদ্‌কা এখানে এসেছিলো তার সৎমার মুখের "য়ুদাশ্", এই কথাটা কিছুক্ষণের জন্যেও মন থেকে দূরে রাখবার জন্যে। কিন্তু তা হলো না। য়ুদাশ্-এর মূর্তি হীলন্ হীলনীয়েস্ আর ব্রনকার সঙ্গে মিলে এক হয়ে গেলো। শিক্ষয়িত্রীর পড়ায় বাধা দিতে তার সাহস হয় না, অথচ প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে, তার পক্ষে ও গল্প শোনা ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছে। ছাড়া ছাড়া কতকগুলো কথা তার কানে ধরা পড়ে। শিক্ষয়িত্রী পড়ে চলেন। ভেত্তীয়স্ বলছে হীলন্‌কে:

"প্রতিহিংসার বহ্নি কি এখনো তোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে?"

হীলন্ উত্তর দেয়, "না, কিন্তু সামনে আমার নীরন্ধ্র রাত্রি।"

ভ্রাদ্‌কা উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধের রুমালটা গায়ে আঁটসাঁট করে জড়িয়ে নিলো, যেন ঐ ওমোট গরম দিনে তার গা শিরশির্ করছে। চলে যাচ্ছিলো, এমন সময়ে শিক্ষয়িত্রী পড়া থামিয়ে ওকে পাঠশালার ভেতর নিয়ে গেলেন। ভ্রাদ্‌কার মুখে পাণ্ডুর, রক্তহীন।

—তোর অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে নাকি রে? শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞেস করেন।

—না। হীলনীয়েস্-এর শেষ পর্যন্ত কী হলো?

—খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করলো। সন্ত পল্ ওকে দীক্ষা দেন। শেষ পর্যন্ত যথার্থ ঈশাঈর মত নিগৃহীত হ

এইবার ভ্রাদ্কার মনে সুবাশ ও হীলনীদেস্ পৃথক্ হয়ে গিয়ে আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করা সে ভেবে স্থির করতে পারে না। তার তাতাকে কোন দিকে স্থান দিতে পারা যায়।

বই নিয়ে মাঠের আল ধরে কী ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলে গেলো। চৌ বাড়ী নেই, শুধু সংমা মেজের কাছে বসে মাথাটা দুহাতের ওপর অসহায়ভাবে ভর করে জানালা পথের দিকে চেয়ে আছে। ভ্রাদ্কা সঙ্গে আনা বইটা পড়তে বসলো। সন্ধ্যে হবার একটু পরে চৌ ঘরে ফিরলো। দেখলেই বোঝা যায় উত্তেজনায় সে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না। সংমা গরম করতে চড়িয়ে দিলো। ভ্রাদ্কা কুঁড়ের এককোণে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে যেন তাকেই খোঁজে।

—ভ্রাদ্কা—তাতা বললো—একটু অন্ধকার হয়ে গেলেই পাহারার আড্ডায় গিয়ে আমি যা বলে আসবি।

ভ্রাদ্কার বুকটা কেঁপে ওঠে। একবার বলতে চায়, সে পারবে না। কিন্তু ভয়ে মুখ দিয়ে কথা বেরয় না।

—বাচ্চা মেয়েটারে ওদের ঘরের পাহারার আড্ডায় পাঠানো! না, ওরে যেতে হবে সংমা বলে।

ব্রন্কা বেঞ্চি থেকে উঠে ঘুষি পাকিয়ে স্ত্রীর দিকে তেড়ে গেলো। সংমা ঘুষি এড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো।

ভ্রাদ্কা, এই শুনছিস, পাহারার আড্ডায় গিয়ে বল্‌বি—চৌকিদার মেয়েকে ডেকে বলে— যেন ওরা খুব আস্তে আর সাবধানে যায় ভারেংস্কির বড় রাস্তার দিকে, তারপর যেন পুরোনো খাদ পেরিয়ে, চারা-বনটার উদিক দিয়ে উঁচু চিপিটার ওপর চলে যায়, বাদবাকী সব ওরা বুঝে নেবে। যা হবে ভুলবিনি তো?

ভ্রাদ্কা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে! যা, বল্‌চি।

ভ্রাদ্কা বেরিয়ে গেলো। অন্ধকার নেমে এসেছে। গোলাঘর পেরিয়ে যেতেই কয়লার পেছন থেকে সংমার ছায়ামূর্তি সামনে এসে দাঁড়ালো।

খাসনে ভ্রাদ্কা। ও যেমন সুবাশ, নিজেই যাগ্‌না।

ভ্রাদ্কা উত্তর দিলো না, সটান বেরিয়ে গেলো। বেশ খানিকটা পথ যাবার পর যখন কুঁয়ে আর দেখা যায় না, তখন সে দৌড়তে সুরু করলো। মেঘলা রাত। জুলাই মাস হলেও গোধূলি অন্ধকার পৃথিবীকে ঢেকে ফেলেছে। পাঠশালার কাঠের বেড়াটার কাছে এসে থামলো ভ্রাদ্কা। লোক চলাচল বন্ধ হয়নি। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। খানিক পরে মনে হলো জানেক্ তাদের বাড়ী থেকে বেরলো।

—জান্‌কু—ডাকলো খুব আস্তে। ছেলেটি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। সে গলার স্বর চিনতে পো

য়ানেক্ জানে, ভ্রাদ্‌কা যা-তা আবোল তাবোল বকবার মেয়ে নয়। আগড়টা সরিয়ে কাছে এগিয়ে এলো। ভ্রাদ্‌কা তাকে বনের ধারটায় নিয়ে গিয়ে এক নিঃশ্বাসে সব কথা বলে চল্‌লো। তার বুকের ওপর যে কথাগুলো ভারী হয়ে চেপে বসেছিলো সেগুলো একটা একটা করে নামিয়ে দিলো। ঐ ছেলেটাকে সব বলা যায়, সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আর সে নিজে আকাশ পাতাল ভেবে কোন কূলকিনারা পাচ্ছিলো না। শুধু জানতো, সে পাহারায় আজ্ঞায় যাবে না কখনো। বাড়া কেল্লার পর তার ভাতা যদি কেটেও ফেলে তাহলেও নয়। য়ানেক্ বড়দের মত ভারিক্কী ভঙ্গীতে সবকথা শুনলো, তারপর বল্‌লো :

—বাড়ী ফিরে যা, বলিস্‌নি কিন্তু যে পাহারায় আজ্ঞায় যাস্‌নি।

ভ্রাদ্‌কা ভয়ে ভয়ে বাড়ীর পথ ধরে চল্‌লো, অথচ তার মনে গভীর আনন্দ। "বনের লোকগুলো" যে কোথায়, সে কথা জানিয়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। যখন বাড়ী পৌঁছলো, তখন ভাতা আর সৎমা ঘুমিয়ে পড়েছে। খড়ের ওপর গিয়ে শুলো ভ্রাদ্‌কা। ভাবে য়ানেকের কথা : ও চলে আসার পর যে কী করলো কে জানে, হয়ত "বনের লোকগুলোকে" খবরটা দিয়ে এসেছে। হঠাৎ তার মনে একটা অজানা ভয় বারে বারে হানা দিতে লাগলো—"বনের লোকগুলো" যদি জানতে পারে যে ভাতা বিশ্বাস ঘাতকতা করছে, তখন তার অবস্থা কী হবে। য়ানেকের কাছে দৌড়ে যাবার সময়ে এ বিপদের সম্ভাবনার কথা তার মনে আসেনি।

রাত যখন এগারোটা তখন শুনতে পেলো, ভাতা বেরিয়ে গেলো। সে যে বাড়ী নেই সেকথা মনে করে নিজেকে ওর অনেকটা হাল্কা বোধ হলো। আর ঘণ্টা আন্দাজ পরে সৈনিকদের ভারী পা-ফেলার আওয়াজ আর চিড়িং-বিড়িং করে বলা জার্মেনী ভাষা কানে এলো। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তারা দরজার ওপর ঘা দিচ্ছে। ভারী বুটের আওয়াজে ঘর কাঁপিয়ে ঝিনিসপত্র তছনছ করে ঘরে এসে ঢুকলো। সৎমা আলোটা উস্কে বাড়িয়ে দিলো।

—ভ্রন্‌কা কোথায় ?

—বনের দিকে গেচে।

—পাকড়াও করবো ব্যাটাচ্ছেলেকে। যেওয়ালের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে বাছাধনকে। ●

—কেন, কি করেছে ? সৎমা শুধালো।

কী করেছে ? রাগে মুখে কেনা তুলে ভেঙালো কর্পোরাল্—আমাদের খবর দেয়নি যে বনের ভেতর "গুণ্ডার" দল লুকিয়ে আছে। ঘণ্টাখানেক আগে আমাদের আক্রমণ করেছিলো। আমাদের একজন মারা পড়েছে। তার জন্যে জবাবদিহী করতে হবে ভ্রন্‌কাকে।

—ভাতা আমাকে আপনাদের খবর দিতে বলেছিলো—স্থিরভাবে বললো ভ্রাদ্‌কা।

কর্পোরাল্ অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে। ঐ একরত্তি পটকা একটা মেয়ের ঘোরে একজন পাহারাওয়ালার জান্ গেছে। তার আশ্চর্যভাব ক্রমে অক্ষরোষে পরিণত হলো। কড়া জার্মেনী বুট-শুদ্ধ পা দিয়ে ধাঁই করে একটা লাথি মারলো মেয়েটার মুখে। ভ্রাদ্‌কার ভাঙা দাঁত চেপিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত বরতে লাগলো। তবু সে একটু শব্দ মাত্র করলো না। মাটির ওপর বসে পড়লো। সৎমা খানিকটা তাকড়া ভিজিয়ে রক্ত বন্ধ করতে চেষ্টা করতে লাগলো।

—বল্ সত্যি করে—কর্পোরাল হুমকি দিয়ে জিজ্ঞেস করে—কাকে খবর দিয়েছিলি যে তোর তোকে পাহারায় আস্তাবে যেতে বলেছিলো ?

—কাউকে নয়। বনের ধারটা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছিলাম। খুব অন্ধকার হয়ে গিয়েছি ফিরে দেখি তাতা ঘুমিয়ে পড়েছে।

—রক্তাক্ত মুখ দিয়ে কোনো রকমে টেনে টেনে বললো ভ্রাদ্কা।

জার্মেনীরা উঠে দাঁড়ালো। তারপর আপন ক্ষমতা ও শক্তিহীনতার মর্যাদা যথাসম্ভব রেখে মাথাগুলো খাড়াখাড়াভাবে একটু নাড়িয়ে ঘোর দিয়ে বেরিয়ে গেলো। সংঘা ব্লেকের কাছে হাতের ওপর মাথাটা রাখলো। জার্মেনীদের পায়ের শব্দ শোনা যায় না। কুঁড়ের সামনেই কে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চয়। উত্তেজনা-স্তব্ধ কাটে কয়েকটি মুহূর্ত। ভ্রাদ্কা তার বনের সন্ধানের প্রতিশক্তির সাহায্যে বুঝতে পারে তাতার পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে।

—তাতা আসছে—বলে আস্তে আস্তে।

পায়ের শব্দ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসে।

—কে রে, ভ্রুকা নাকি ?—কর্পোরাল্ হাঁকলো।

উত্তর শোনা গেলো না। সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ ঠাঁই করে উঠলো। সংঘা হাত দিয়ে ঢাকলো। ভ্রাদ্কা লক্ষ্য করলো, তার শ্রম-বিকৃত হাতদুটো থরথরিয়ে কাঁপছে।

ভ্রাদ্কার মুখ ছাপিয়ে ক্ষীণ রক্তের প্রস্রবণ বহে চলেছে। তার আর অন্ত নেই……

ব. (সবিন্দু ব, বিপরীত রেফ্-চিহ্ন যুক্ত) = ফরাসী *j*, বৎসামান্ত i-যুক্ত।

ঞ = n (ইস্পানী)।

ফ = f.

ভ = v.

ল = ইং w.

ব্র = vr.

ভ্ল = vw.

সংখ্যাতত্ত্ব

পরিসংখ্যানের মজাই এই যে তা নিখুঁত সত্যি কথা বলে ফেলে। উদাহরণ—যদি একটা চাষীর ছেলে এক ঘণ্টায় তোলে পাঁচ সের পটল আর একটা মেয়ে তোলে চার সের তাহলে—জিজ্ঞেস করুন কোনো পরিসংখ্যানবিদকে—তিনি টকাস করে বলে দেবেন, দুজনে একত্রে এক ঘণ্টায় তুলবে ন' সের পটল।

এবার খোদ চাষীকে জিজ্ঞেস করুন, তিনিও তার মত করে যোগ করবেন এবং কষে বলবেন, ওরা দুজনে একটাও পটল তুলবে না, আড়ালে আবডালে ব্রেক গল্প

স্মৃতি স্মৃতি

শ্রীকালিদাস নাগ

রবীন্দ্রনাথের বন্ধু নাটোররাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় শেষ জীবনে 'স্মৃতি-স্মৃতি' সুরু করে অসমাপ্ত রেখে গেছে তার বহু যুগ পরে আমরা কবি-সান্নিধ্য পেয়েছি কিন্তু তবু আমাদের রবীন্দ্র স্মৃতি-স্মৃতির পসরাও নয়, এ-স্মৃতি অলিখিত থেকে যাবে। তরুণদের তাগিদে মৌখিক কিছু কিছু বলেছি কিন্তু লেখা হয় গল্প-ভারতীর তাড়ায় যদি কিছু লেখা হয় সুখী হব।

প্রবেশিকা-কটকে পৌঁছতে তখনও চার বছর বাকি, ১৯০৪ সালে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠেছি, ৩।৪ বছরে বড় "দাদা"দের দল আমাদের শোনার চারুলতাকর "দেশের কথা" টেনে নিয়ে যায় তাদের আখড়ায়, দেখি বৈঠক ছোরাছুরি ও লাঠি খেলা থেকে সুরু করে অনেক কিছু খেলা চলছে।

মাষ্টারদের মধ্যে যাকে সব চেয়ে ভালবাসি তিনি রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্র থেকে কবিতা আর শোনান 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।' "ভারতসঙ্গীত" থেকে পড়ে চলেছেন, মুগ্ধ হয়ে শুনেছি। হঠাৎ ক্লাসের পড়া থামিয়ে আমাদের নিয়ে যেন সভা করলেন, বহুক্ষণ ধরে পড়ে শোনালেন, রবি ঠাকুর "স্বদেশী সমাজ" :

"আসুন, আমরা মনকে প্রস্তুত করি। ক্ষুদ্র দলাদলি কুতর্ক পরনিন্দা সংশয় ও অতিবুদ্ধি হতে হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে ক্ষালন করিয়া, অন্ত মাতৃভূমির বিশেষ প্রয়োজনের দিনে, জননীর বিশেষ আহ্বানে দিনে, চিত্তকে উদার করিয়া, কর্মের প্রতি অনুকূল করিয়া……আমাদের সমাজপতিকে অভিভাবক করি শুভক্ষণে আমাদের দেশের মাতৃগৃহকক্ষে মঙ্গল প্রদীপটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলি…"

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তখন অনেক কিছু বুঝিনি কিন্তু তাহার মধ্যে যে সুর বেজে উঠছে সেটি প্রাণ মাতিয়েছিল। তখন থেকে কবির গান ও কবিতা নিত্যসঙ্গী হল কিন্তু কবিকে দেখেছি, কিছু পা (১৯০৫) স্বদেশী সভায় ভিড়ে এবং (১৯০৬) কলকাতা কংগ্রেস মণ্ডপের স্বদেশী মেলায়; সভাপতি দাদাভাই 'স্বরাজ' মন্ত্রের উচ্চারণের সঙ্গে বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ গান ও রবীন্দ্রনাথের "যদি তোর ডাক শুনে কেউ আসে না তবে একলা চলো রে তারপর সভা।"

শ্যামবাজারে 'পান্তির মাঠে' লাঠি তলোয়ার খেলা দেখতে যাওয়া অতি সহজ ছিল, দূরত্ব মনেই হত কখনও আবার চলেছি, একা নয়, সদলবলে নতুন শেখা স্বদেশী গান গাইতে গাইতে—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক
মুখ তুলে আজি চাহরে।

তখনো জানিনা এইটি রবীন্দ্রনাথের গান, শুধু মুগ্ধ হয়ে আমরা গেয়েছি।
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

এইপ্রাণমাতান রামপ্রসাদী সুরের গানও তাঁরই, এই গানটি রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের অন্যতম রচনা করে

১৯০৯ সালে পাশ করে বিদ্যাসাগর কলেজে (Metropolition নাম তখন) প্রবেশ ; শুধু বি নয় কঠিন জীবন পরীক্ষারও প্রবেশিকা। England's Work in India রচয়িতা ব্যারিষ্টার নগেন্দ্রনাথ (মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনী লেখক) তখন অধ্যক্ষ, আমাকে ভর্তি করান। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব দীপ্ত সহকর্মী পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ তাঁর সুরম্য সংস্কৃতি পঠন ও প্রেরণা দিয়ে আমাদের ধন্য ক ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগর স্বর্গারোহণ করেন ; তার একযুগ পরে আমরা কলেজে এসে তাঁর জীবন্ত তাৎপর্য্য কিছু পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর-চরিত পড়ে :

"আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার সাগর বলিয়াই জানি... কিন্তু এই পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব...ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে ব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার ব গৌরব; তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব। যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বি উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।"

কবির পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম (১৮১৭—১৯০৫) বিদ্যাসাগরের কালে (১৮২০- দেবেন্দ্রনাথের সহকর্মী সুহৃদ ছিলেন, তাই বিধবা বিবাহ প্রস্তাব যখন কেউ ছাপতে ভরসা পা তখন দেবেন্দ্রনাথ তাঁর তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত) পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব ছেপে ন অধিকার সুদূর রামমোহন যুগ (১৭৭৪—১৮৩৩) থেকে আধুনিক যুগে প্রসারিত করে দেন। দেবে যখন দেহত্যাগ করেন (১৯০৬) তার আগেই চোখের বালি (১৯০৩) প্রকাশিত হয়েছে ; রবীন্দ্রনাথের সামাজিক উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে শুধু নব্য রীতি নয়, নবযুগের সূচনা করে ; সেকথা গল্প-সম্রাট চট্টোপাধ্যায়ের নিজ মুখে শুনেছি। ৪১ বছরের বিপত্নীক হয়ে রবীন্দ্রনাথ নব-পর্য্যায় যব-দর্শনে নৌকাডুবি চোখের বালি প্রকাশ করেন। এ দুখানি বই শরৎ সাহিত্যের সূচনা করে—শরৎচন্দ্রের উদয়ের আগেই। পরে গোরা উপন্যাস আমরা পাই ও 'প্রবাসী'তে উদ্‌গ্রীব হয়ে মাসে মাসে পড়ি। গোরা—স্বদেশী। গল্প মহাকাব্য ; সেটি শেষ হল যখন, তখন দূরত্ব ঘুচিয়ে কবিগুরু কাছে ডাকলেন। শুধু আমরা ছা [illegible] 'প্রবাসীর অভিজ্ঞাবক' প্রবাসীও 'গোরার" তার্কে উত্তেজিত দেখেছি।

করাল অন্ধকার! সহধর্মিনী মৃণালিনী দেবী (১২৮০—১৩০৯) ১৯০২ সালে মাত্র ৩০ বছরে বিদায় নে চিহ্ন তার অমর হয়ে আছে 'স্মরণে'র পংক্তিতে। দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা (১৮৯০—১৯০৩) ও কনিষ্ঠ শমীন্দ্র (১৮৯১—১৯০৭) দু'জনেই পিতার দুঃখ দূর করে অকালে পিতাকে ছেড়ে যান। সে যুগের চাপা-ব প্রচ্ছন্ন আছে গীতাঞ্জলীর মধ্যে, সেকালের নাটা রচনায়; কবির কাছে সে সব কথাও পরে শুনেছি—

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক
তবে তাই হোক।
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক।

ত্রিশ বছরের স্ত্রীর মৃত্যুশয্যায় বসে যে বেদনা কবিপ্রাণকে মথিত করে তার সাক্ষী এই গা 'স্মরণ' কবিতায় এ যুগের মানুষ পাবেন।

"মাতৃহারার সিংহাসনে খোকাই (শমীন্দ্র) তখন চক্রবর্তী-সম্রাট ছিল। সেই ভগ্ন শিবতে গে খোকা ও খোকার মার ভাবটুকু সূর্য্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে। সেই অন্তর্ মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে' আমার অশ্রুবাষ্প এ রকম খেলা খেলেছে, তাকে নিবা করতে পারিনে।"

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন' গল্প থেকে সুরু করে, অমর নাট্য ডাকঘরের (১৯১২) অমল এবং 'শি "শিশু ভোলানাথ" ও 'পুনশ্চ'র (১৯০২) শিশু (অন্যান্য দৌহিত্র নীতিন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গীত), পর্য্যন্ত র রচনায় রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব্ব শিশুতত্ত্ব প্রচার করে গেছেন: তার সাক্ষী "জগৎ পারাবারের তীরে শিশু করে খেলা।" ১৯০৭ সালে ছোট ছেলে শমী কলেরা হয়ে হঠাৎ মৃত্যুর দ্বার গেল; সে মর্ম্মান্তিক আঘাতে কথা কবির অসুস্থ অবস্থায় তাঁর কাছে বসে শুনেছি। অমলের মৃত্যুশয্যার পাশে কবি 'ঠাকুর্দা' যখন বসেছে তখন আমাদের শমীর কথা মনে হল। ১৯১৭ কলকাতা কংগ্রেস সেরে গান্ধিজী জোড়াসাঁকো ভবনে য সে দৃশ্য দেখেছেন। প্রেক্ষা-গৃহের পাশ থেকে সুর এসে সবাইকে চোখের জলে ভাসিয়ে দিল—

জীবনে যত পূজা হলনা সারা
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরু পথে হারাল ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

শোকের দাহন প্রচণ্ড অথচ কবি শান্ত। তিনি অসীম ধৈর্য্য ও একাগ্রতা দেখিয়ে বিচিত্র রচন বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন: রাজা প্রজা থেকে সুরু করে, সমূহ ও স্বদেশ, শিক্ষা ও সমাজের অপ গদ্য রচনা ১৯০৮ পর্য্যন্ত আমরা পেয়েছি। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়টি যে গড়ে তুলেছেন সেই সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে গভীর স্বাধ্যায় করেছেন তার সাক্ষী অপূর্ব্ব গদ্যকা "শান্তিনিকেতন" (১ থেকে ১০ খণ্ড ১৯০৯-১১; ৫০ জন্মতিথি পর্য্যন্ত); রবীন্দ্রনাথের গানে উপাসনা, 'গীতাঞ্জলি

ডাকঘর ও অচলায়তন (১৯১২) নাটকগুলি আমাদের শুনিয়ে তৃতীয়বার সমুদ্র-পাড়ি দিয়েছি (১৯১২-১৩)। তখন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-কবি ও যুগনায়ক রূপে ত্রিশ বেশে ও বিদেশে, বাংলা তথা ভারত সংস্কৃতি প্রচার করে গিয়েছেন। এ বহুতর জীবনী তাঁর এখন মনে অলিখিত মহাকাব্য ; তা'র ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেছেন, তাঁর বিপুল পত্রাবলীতে আর 'জীবন 'ছিন্নপত্র' ও 'ছেলেবেলা' প্রভৃতি স্মরণীয় রচনায়। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তিনি যুগান্তর এনেছেন 'চ লিখে, তার মূল্য নির্দ্ধারণ করে গেছেন পাকা জহুরী শরৎচন্দ্র। 'ভারতের যন্ত্রদর্শনে 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধ থেকে করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও প্রবাসীতে কি অপূর্ব্ব গদ্যসাহিত্যের বিস্তার দেখেছি : তপোবন ও 'ভারত ইতিহাসের ধারা' আমাদের তরুণ শিক্ষার্থী জীবনে এতবড় প্রেরণা দিয়েছে যা কলেজে বা বিশ্ববি আমরা পাইনি।

সেই পঞ্চাশ বছর আগে (১৯১০-১১) ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও আদর্শ ইতিহাস ও ভবিষ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে অমোঘ ইঙ্গিত আমাদের দিয়েছিলেন তা থেকেই বাঙলার ও নিখিল ভারতে ' ভারত" (Greater India) আমরা সুস্পষ্ট ও সার্থক ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্র বলে চিনেছিলাম ! রবীন্দ্র দান আমাদের কাছে অবিস্মরণীয়। আমার 'ভারতমৈত্রী মহাবঙ্গ ও Discovery of Asia (১৯৪৫) G India (১৯৬০) প্রভৃতি রচনার প্রতি ছত্রে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছি। রবীন্দ্রনাথই অ একমাত্র "পুরোধা", বৈদিক যুগের পথিকৃৎ ঋষি-নেতা। এই যুগে আরও স্মরণীয় রবীন্দ্রনাট্য এক রূপক ধারা (Symbolism)।

মাত্র ১১ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার সঙ্গে বোলপুর গ্রামে আসেন (১৮৭৩)। সেখানে তলায় বসে "পৃথ্বীরাজ পরাজয়" নামে এক নাট্যকাব্য লেখেন ; সেটি লুপ্ত হলেও অন্য রচনার মধ্যে সন্ধান কিছু বেরিয়েছে ও জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে যে (১৮৮১) "রুদ্রচণ্ড" না তারই রূপান্তর। কবির রচিত সেই প্রথম নাটকখানি উৎসর্গ করেন 'নটের গুরু' তাঁর দাদা জ্যো ঠাকুরকে। এই দাদার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নটভূমিকায় অনেকবার নেমেছেন : গীতিনাট্য 'কালমৃগয়া' "ব প্রতিভা" (১৮৮১-৮২) পর্য্যন্ত। ১৮৮৭তে লেখা রাজর্ষি উপন্যাস থেকেই কবি ১৮৯০ সনে তাঁর নাটক "বিসর্জ্জন" লেখেন ও নিজে রঘুপতি-ভূমিকায় আশ্চর্য্য অভিনয় করে 'ভারত সঙ্গীত সমাজে' অভিনেতা রূপে শ্রেষ্ঠ সম্মান পান। ১৮৮৯ সালে রচিত 'বৌঠাকুরাণীর হাট' অবলম্বনে, বহু পরে 'প্র (১৯১৬) ও 'পরিত্রাণ' নাটক লিখে অভিনয় করান। ১৮৮৯ সালে লেখা 'রাজা ও রাণীতে' নাম তিনি যুবারূপে নেমেছেন।

বালক অবস্থায় 'অলীকবাবু'তে অভিনয় করে যখন সবাইকে রবীন্দ্রনাথ অবাক করেন তখ জানতেন না যে ফরাসী হাস্যরসিক Moliere এর অতি সূক্ষ্ম হাস্যরসের অবতারণা কবি রবীন্দ্রনাথই যাবেন। তার প্রমাণ রয়েছে 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২) তথা 'দেবরক্ষা' (১৯২৮) 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (ও 'চিরকুমার সভা'—যা আজও ছেলেমেয়েদের মুগ্ধ করে। ১৯০৭ সালে 'হাস্য-কৌতুক' ও 'ব্যঙ্গ রচনা দুইটি প্রকাশিত হয়।

জোয়ার'; প্রথম শুভ-নাটা শারদোৎসবের সঙ্গে যখন 'শেষ শোধ'এর আভাষ পাই, সেই সঙ্গে দর্শক আমি চোখের জলে ভেসে শুনেছি—

সোনার থালায় সাজাবো আজ দুখের অশ্রুধার
জননী গো গাঁথব তোমার গলায় মুক্তাহার॥

দুখের অশ্রুধার রবীন্দ্রনাথের নিজের ঘরে যখন বয়েছিল, সে যুগেই সুরু হল বাঙালী তরুণদের মরণ-যজ্ঞ; আত্মাহুতি দিল কত শত ছেলে মেয়ে আজও তার পুরো হিসাব মেলেনি: ক্ষুদিরাম কানাই সত্যেনের ফাঁসি থেকে সুরু হয়েছিল মা বোনদের অশ্রুপ্লাবন; নীরবে তারা সহ্য করে গেছেন চরম দুঃখ; "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে (১৯০৯) দেশের কবিকে দেখলাম বৈরাগী রূপে। তিনি জনতার মাঝে দিব্য প্রেরণায় গাইছেন

আগুন আমার ভাই আমি তোমারি জয় গাই।

আবার বাউল সুরে সবাইকে মাতিয়েছেন—

বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি
বলো ভাই ধন্য হরি।
ধন্য হরি ভবের নাটে ধন্য হরি রাজ্যপাটে
ধন্য হরি শ্মশান ঘাটে ধন্য হরি ধন্য হরি॥

হরিজনদের কল্যাণচিন্তায় গান্ধিজী দক্ষিণ আফ্রিকায় Passive Resistance সুরু করার আগেই, কবিতা ও গানের রূপকে—বিশেষ "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে—রবীন্দ্রনাথ অহিংস-সংগ্রাম সুরু করেন, সেকথা আজ অনেকে বিস্ময়ের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। নিষ্ঠুর রাজশক্তির সঙ্গে স্বদেশ-প্রেমিকের সংঘাত অনিবার্য্য রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ এ সত্য বহুদিন থেকে প্রচার করে এসেছেন; কবির অর্ঘ, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের ল নমস্কার' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মানিকতলা বোমার মামলা, বারীন ঘোষের ফাঁসির হুকুম, পরে দ্বীপান্ত চালান, বাঙলার সর্ব্বত্র ধরপাকড়, রাজা-কর্ম্মচারী ও প্রজা-দলের হত্যা-পর্ব্ব সব আমরা ছাত্রাবস্থায় দেখে দেখেছি, তেমনি তাদের বিরাট সাহিত্যিক পটভূমিকায় কবি 'গোরা' রচনা করে ভবিষ্যতের পথনির্দ্দেশ করেছেন। পরে রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সরে এলেও রবীন্দ্রনাথ এযুগে শুধু কবি নন বিরাট জন-নায়ক তাই ১৯১২ সালে, বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বে, তাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে তিনি দিয়ে যান—

ঘোর তিমির ঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত নয়নে অনিমেষে
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে, স্নেহময়ী তুমি মাতা
অনশন দুঃখ, ত্রাসক জয়হে—ভারত ভাগ্য বিধাতা। জয়হে জয়হে জয়হে—।

অমৃতকথা ও কাহিনী

যীশুখ্রীষ্টের কথা—

—"শিষ্যেরা যীশুর নিকটে এসে বললে, স্বর্গরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তখন যীশু একটি শি আপনার কাছে এনে বললেন, আমি তোমাদের সত্য কথা বলছি, তোমরা যদি না ফের ও শিশুদের না হয়ে ওঠ তবে কোনমতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। কাজেই যে কেউ নিজেকে শিশুর মত করে সেই স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ। আর যে কেউ এর মত একটি শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে আমাকেই গ্রহণ করে। কিন্তু যে ক্ষুদ্রগণ আমাতে বিশ্বাস করে, যে কেউ তাদের মধ্যে একজনের অন্যায়, তার গলায় বড় যাঁতা বেঁধে তাকে সমুদ্রের অগাধ জলে ডুবিয়ে দেওয়া বরং তার পক্ষে ভাল। প্রযুক্ত জগৎকে ধিক। কেননা, বিঘ্ন অবশ্যই উপস্থিত হয়, কিন্তু ধিক সেই ব্যক্তিকে যার দ্বারা উপস্থিত হয়। আর তোমার হস্ত কিম্বা চরণ যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তা কেটে ফেলে দুই হস্ত কিংবা দুই চরণ নিয়ে অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং খঞ্জ কিংবা পঙ্গু হয়ে প্রবেশ করা তোমার ভাল। আর তোমার চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তা উপড়িয়ে ফেলে দুই চক্ষু নিয়ে অগ্নিময় নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং একচক্ষু হয়ে জীবনে প্রবেশ করা তোমার দেখো এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে একটিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করোনা। কেননা আমি তোমাদিগকে তাদের দূতগণ সব সময় আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ স্বর্গে সবসময় দর্শন করেন। কোন ব্যক্তির যদি মেষ থাকে, আর তাদের মধ্যে একটি হারিয়ে যায়, তবে কি সে অন্য নিরানব্বইটি ছেড়ে পর্বতে ঐ হারান মেষটির অন্বেষণ করে না? আর যদি সে কোনক্রমে সেটি পায় তবে আমি তোমাদের বলছি, যে নিরানব্বইটি হারিয়ে যায় নাই, তাদের অপেক্ষা সেইটির জন্য সে বেশী আনন্দ করে। এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে একজনও যে বিনষ্ট হয়, তোমার স্বর্গস্থ পিতার এমন ইচ্ছা নয়।"

• • • •

—"যীশু বললেন তাঁর শিষ্যদের যে, তোমার ভাই তোমার নিকটে কোন অপরাধ করে যাও, যখন কেবল তুমি ও সে থাক তখন সেই দোষ তাকে বুঝিয়ে দিও। তা যদি সে শোনে তুমি আপন ভাইকে লাভ করলে। কিন্তু যদি সে তা না শোনে, তবে দুইজনকে সঙ্গে নিয়ে তাতেও যদি না কাজ হয় তবে মণ্ডলীকে বল। আর যদি মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে তাহা পরজাতীয় লোকের ও করগ্রাহীর মত হবে। আমি তোমাদের সত্য করে বলছি, তোমরা পৃথিবী কিছু বন্ধ করবে তা স্বর্গে বন্ধ হবে। এবং পৃথিবীতে যা কিছু মুক্ত করবে তা স্বর্গে মুক্ত পৃথিবীতে তোমাদের দুজন যা কিছু যাচ্ঞা করবে, সে বিষয়ে যদি একচিত্ত হয়, তবে আমার স্বর্গ কর্তৃক তাদের জন্য তা করা যাবে। কেননা যেখানে দুই কি তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি তাদের মধ্যে আছি।"

•

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—

—"আমারই ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা, এ ভাব ভাল নয়। আমি দেখি তিনিই রয়েছেন। মানুষ প্রতিমা, শালগ্রাম, সকলের ভিতরই এক দেখি। এক ছাড়া দুই আমি দে অনেকে মনে করে আমাদের মত ঠিক, আর সব ভুল—আমরা জিতেছি আর সব হেরেছে। এগিয়ে এসেছে সে হঠাৎ একটার জন্য আটকে গেল। পেছনে যে পড়েছিল সে তখন এগিয়ে গোলকধাম খেলায় অনেক এগিয়ে এসে, পোয়া ঘুঁটি আর পড়ল না। হারজিত তার হাতে। তা দিয়ে খেলা যায় না। যেখানে ভাব অত উঁচুতে থাকে, রোখ পায়, তবে ঠাণ্ডা শক্তি। এদিকে পাশির

অনন্যপূর্ব্বা
উপন্যাস
শ্রীসীতা দেবী

অনন্যপূর্ব্বা

শ্রীসীতা দেবী।

সরোজিনী রোজ যেমন ভোরে উঠিয়া দিনের কাজ আরম্ভ করেন, সেদিনও তাহাই করিতেছিলেন চায়ের যোগাড় করা, বাজারের পয়সা গণিয়া করিয়া রাখা প্রভৃতি করিতে করিতে হঠাৎ তাঁর মাথাটা ভয়ানক ঘুরিয়া গেল। একটা চেয়ার ধরিয়া সামলাইবার চেষ্টা করিতে করিতে তিনি সা মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন এবং অজ্ঞানই হইয়া গেলেন।

ভাগ্যে কর্ত্তা বিনোদবাবু সেদিন কি মনে করিয়া সকালেই উঠিয়াছিলেন। পড়নের পথে ি ছুটিয়া আসিলেন এবং তাহার পর বাড়ীতে রীতিমত গোলমাল বাধিয়া গেল। সবাই উঠিয়া পড়িল, চাকর ছুটিয়া আসিল। ডাক্তার ডাকিতে লোক ছুটিল। সরোজিনীকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া বিছা আনিয়া শোওয়ান হইল।

ডাক্তার আধঘণ্টার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি গৃহস্বামীর বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে, যদিও ব কিছুটা ছোট। বিনোদবাবুর ছোটভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে কলেজে পড়িয়াছিলেন। নামডাক অ পসারও ভাল। বয়স চল্লিশের দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু ভদ্রলোক এখনও বিবাহ করেন নাই।

সরোজিনীর জ্ঞান হইয়াছিল, দু একটা কথাও ক্ষীণস্বরে বলিতেছিলেন। কথা যেন একটু জড় বলিতেছেন। বাঁদিকটাও তাঁহার একটু অস্বাভাবিক লাগিতেছে। বাড়ীর কাজ কিভাবে চলিবে ব ক্রমাগত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মেয়ে খুকী বলিল, "তুমি খাম ত বাপু, যেমন করে হয় ি চাকর রয়েছে ত, তারা দু চারটে দিন চালাতে পারবে না?"

সরোজিনী বলিলেন, "ওরা ছাই পারে। না দেখলে কোন কাজ হয়? চাকরটা পারে চুরি করতে আর কি ত ওপের বুকড়ি, পারে শুধু বাসন ভাঙতে।"

কর্ত্তা বলিলেন, "ওগো অত কথা বোলো না। ডাক্তার বাবু এসে গিয়েছেন। অত বল্‌ছ শুনলে রাগারাগি করবেন।"

ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ সেন আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ভদ্রলোক দেখিতে বেশ ভালই, তবে কাছে দু চার গাছা চুল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। দৈর্ঘ্যে মাঝারি, তবে দেহ সুগঠিত ও মেদব হওয়ায় তাঁহাকে লম্বাই দেখায়। অল্পসময় ফিটফাট সাজেই সাজিয়া থাকেন। এখন খুব তাড়াতা আসিতে হইয়াছে বলিয়া ধুতি পরিয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। রোগিণীর ঘরে ঢুকিয়া বলি "কি বাধালেন আবার? এত করে বলি যে বয়স বাড়ছে, সেটা একটু মনে রাখুন।" তা মনে র উল্টো দিকে। বয়স বাড়ছে, অনিয়মও বাড়ছে, খাটুনিও বাড়ছে।"

সরোজিনী ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বাড়ীর গিন্নীর বিশ্রাম কোথায়? এই ত শুয়েছি, তা ব

ডাক্তার রোগিণীকে পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, "কেন স্বপ্না কিছু পারে না? বড় মেয়ে হয়ে গেল। এর পর ত নিজের সংসারই দেখতে হবে।"

স্বপ্না কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। করুণা মুখখানা লাল করিয়া বলিল, "আমাকে কিছু ক বিলে ত? মায়ের কাযো ক'জ ত পছন্দই হয় না। না করে ত আর শেখা যায় না?"

ডাক্তার বলিলেন, "করতে আমার দেবে কে? বাড়ীর কাজ নিজে জোর করে নিয়ে করবে

সংযোগিনীর blood pressure মাপা প্রভৃতি সব রকম পরীক্ষা হইয়া গেল। ডাক্তার বলিলে "এখন আর গিন্নীগিরি করার চেষ্টা করবেন না। অসুখের উপর দিয়ে গেল, এর চেয়ে ঢের বেশী sori হতে পারত। একেবারে চুপ করে শুয়ে থাকতে হবে, বেশ কিছু দিন। কোনো অজুহাতেই উঠবেন নার্স আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে দেখবে, বাড়ীর কাজেও স্বপ্নাকে সাহায্য করবে। সংসা কাজ না হয় একটু লণ্ডভণ্ড করেই চবে। এই prescription-টা আমি নিয়েই যাচ্ছি। সঙ্গে এব লোক দিন, সে ওষুধটা নিয়ে আসবে। আর স্বপ্না যাকে দেখবে, নিয়মমত যেন ওষুধ খান, আর একেবা যেন না ওঠেন।"

স্বপ্না মুখ ভার করিয়া বলিল, 'কি করে যে কাজ চলবে, তাই ভাবছি। আমি সত্যি কোনোদিন কিছু করিনি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "শিখতে আরম্ভ করতে হবে ত কোনো সময়? এই সুযোগ বা ছুটে যাই বল, ঐটাকেই কাজে লাগাও। আচ্ছা, চলি এখন, নার্স আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পাঠি দিচ্ছি।" তিনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন, বাড়ীর একমাত্র চাকর বিধু তাঁহার পিছন পিছন চলি

হরেন্দ্রনাথের ডিস্‌পেন্‌সারি বড় ইাস রাস্তার উপরেই। গাড়ী থামাইয়া সেইখানে নাবি দেখিলেন দুজন কম্পাউণ্ডার দুইরকম কাজে ব্যস্ত। বড় বাবুটি একজন খরিদ্দারের জন্য ঔষধ গুছাইতেছে ছোট ঋষিকেশ একখানা সিনেমা সংক্রান্ত মাসিকপত্র লইয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়িতেছে।

হরেন্দ্রনাথ ঢুকিতেই সে ধড়মড় করিয়া বই ফেলিয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিল। হরেন্দ্র বলিলে "তুমি এই চিঠি দুটো নিয়ে যাও। হাসপাতালেই এঁদের এখন পাবে। এখনই হাতে লোক পাও যাবে না, দু চার ঘণ্টা দেরি হতে পারে। চিঠিতে সব লিখে দিয়েছি। তোমার আর কিছু করতে হবে: শুধু চিঠিগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে, এই খবর তুমি নিয়ে আসবে। এখানে আমাকে না পাও, বা গিয়ে খবর দেবে।" ঋষিকেশ জুতায় পা গলাইতে গলাইতে চিঠি দুখানা লইয়া বাহির হইয়া গেল ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসিয়া হরেন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ রোগী দেখিলেন, ও চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ দিলেন তাহার পর উঠিয়া বাড়ী চলিলেন। নাওয়া-খাওয়া ও অল্পক্ষণ বিশ্রাম করা ছাড়া বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর বিশেষ নাই। তিনি অবিবাহিত, মা বাবা দেশে থাকেন। ভাই বোনেরা নিজের নিজের সংসারে আছেন বাড়ীখানা তাঁহার নিজের। একলা মানুষের অতবড় বাড়ীর কোনো প্রয়োজন হয় না, তাই একতলা অধিকাংশ ঘর ভাড়া দেওয়া আছে, একটি ঘর শুধু তিনি রাখিয়াছেন, রোগী দেখার জন্য। উপরে তি থাকেন ও তাঁহার এক বুড়ঢুড়ো ভাই রমেশ থাকে। সেও ডাক্তারী পড়িতেছে। আত্মীয়-স্বজ কলিকাতায় আসিলে মাঝে মাঝে বাড়ীর অন্য ঘরগুলি ভরিয়া ওঠে, বেশীর ভাগ সময় বাড়ী চুপচাপ নিব

নার্স তখনই পাওয়া যায় নাই, তবে ঘণ্টাখানেক মধ্যেই পাওয়া যাইবে বলিয়া একজন ডাক্তার দিয়াছেন। আর একজন লিখিয়াছেন যে কালকের মধ্যে নিশ্চয়ই তিনি লোক জোগাড় করিয়া দি বিনোদবাবুর বাড়ীর পরিস্থিতি ভাবিয়া হরেন্দ্রনাথের হাসি পাইল। বিনোদবাবু খুব কম্পিট মানুষ গৃহিণীই তাঁহাকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেন। আর স্বপ্না ত কোনো কাজে হাত দিতেই ভয় পায় নিজের অকর্মণ্যতার জন্য নাই যে সম্পূর্ণরূপে দায়ী এইটা প্রমাণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। বোধহয় এতক্ষণে মাথার চুল ছিঁড়িতেছে। তাহাতে কোনও আপত্তি ছিল না, তবে সরোজিনী সকলের দুরবস্থা দেখিয়া উঠিয়া পড়েন, এই ভাবিয়া হরেন্দ্রনাথ একটু শঙ্কিত হইলেন।

বিনোদবাবুদের বাড়ীর অবস্থা সত্যই আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছিল। কোনোমতে ঠা খাইতেই আটটা বাজিয়া গেল। তাহার পর চাকর ঔষধ লইয়া ফিরিতে দেরি করিল, সুতরাং করা, রান্না করা সব কাজেই অনেক দেরি হইল। দুপুরের খাওয়া সারিতেই বেলা গড়াইয়া স্বপ্না যখন প্রায় কাঁদিবার উপক্রম করিতেছে, তখন ঝি আসিয়া বলিল, "একজন মেয়েলোক মিদিমণি। বলছে ডাক্তারবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

স্বপ্না ছুটিয়া গেল, দরজার কাছে। একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে, বছর বাইশ তেই হইবে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রং, বেশ বড় চোখ, নাকমুখের কাট বেশ ভাল। মুখখানা স্বপ্নার ভাষায় bright," তবে মুখখানা গম্ভীর। খোঁপাটাও বেশ উঁচু হইয়া আছে, মাথার কাপড়ের তলায়। সাজসজ্জা বিধবার মত। হাতে কোনো গহনা নাই, শাদা ব্লাউস ও ফিতা পাড় শাড়ী পরা। রংটাও কাল। হাতে খুব ছোট একটা সুটকেস্।

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিই কি নার্স? ডাঃ সেন পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

মেয়েটি বলিল, "হাঁ, আমিই নার্স ডাঃ সেন পাঠাননি ঠিক, তিনি ডাঃ গুপ্তকে দিয়েছেন, তিনি আমায় পাঠালেন।"

স্বপ্না বলিল, "ভিতরে আসুন। আপনি খেয়ে এসেছেন ত?"

মেয়েটি বলিল, "খেয়েই এসেছি।" বলিয়া স্বপ্নার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া সরোজিনীর সামনে দাঁড়াইল। স্বপ্না তাহাকে ঘরে ঢুকিতে বলাতে পায়ের স্যাণ্ডাল্ খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করি ঘরের এক কোণে নিজের সুটকেস্ নামাইয়া রাখিল। বিছানার কাছে আসিয়া রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি অসুখ?"

স্বপ্না বলিল, "Blood pressure বেশী, আজ সকালে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছি ডাক্তারবাবু ত একেবারে শুইয়ে রাখতে বলেছেন। আচ্ছা, আপনার নাম কি? কি বলে ডাকব

মেয়েটি বলিল, "আমার নাম বিনতা।"

সরোজিনী এতক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিনতাকে দেখিতেছিলেন। অতিশয় অল্পবয়সী, স্বপ্নার চে জোর তিন চার বৎসরের বড় হইবে। দেখিতে ত ভালই বলিবে লোকে। গৃহিণীর মেজাজটা খারাপ হইয়া গেল। এত অল্প বয়সী মেয়ে কাজ করিতে বেশী পারিবে না, বা পারিলেও চালি ঘর-সংসারে সাহায্য করিতে পারিবে ডাক্তারবাবু বলিলেন, কিন্তু একি জানে কিছু? আজকালকার মেয়ে সংসার যতদিন না ঘাঁকিয়া বসে, ততদিন কিছু শেখে না, কিছু করিতে চায় না। আরো ব

আছে, কর্ত্তা স্বয়ং আছেন। দুজনেই এখনও বিপত্নে পড়িবার বয়সের গণ্ডির মধ্যেই আছেন। তবে শোনা আপনাকে মেয়েটি অতিশয় সংবাদিকা। বিনতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নার্সের কাজ কতদিন করছ?"

বিনতা বলিল, "তা এক বছরের উপর হয়ে গেছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "সব কাজ জান?"

বিনতা বলিল, "সবই শিখে নিয়েছি।"

গৃহিণী বলিলেন, "সংসারের কাজকর্ম?"

বিনতা বলিল, সে সমস্তই জানি। যা করতে বলবেন, সবই পারব।"

সরোজিনী বলিলেন, আজ সকাল থেকে যে কি আখান্তর, তা তোমায় কি বলব বাছা। নাওয়া খাওয়া, রান্না, বান্নার কোনো কিছু কি ঠিক মত হয়েছে? আমার দশা দেখ। চান না করে পড়ে আছি সকাল থেকে। কি যে খেয়েছি তা ভগবান জানেন।"

বিনতা বলিল, "দেখি, আমি কতটা করে উঠতে পারি।" সে ক্ষিপ্র হাতে ঘরখানা গুছাইয়া লইল। স্বপ্নাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা সব জানিয়া লইল। সময় হইয়াছে দেখিয়া একদাগ ঔষধ খাওয়াইয়াও দিল। বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক হীটার আছে জানিয়া জল গরম করিতে বসাইয়া দিয়া আসিল। স্বপ্না অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল যে এই মেয়েটি যেন তাহার মায়ের চেয়েও তাড়াতাড়ি কাজ করে এবং বেশ পরিপাটি করিয়া করে। ঘণ্টা দেড়েক ভিতর বাড়ীর চেহারা বদলাইয়া গেল রোগিণী ঔষধ পথ্য সেবন করিয়াছেন। তাঁহার গা মোছান, কাপড় ছাড়ান, চুল বাঁধা সবই হইয়া গিয়াছে। ঘরটিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সরোজিনীর মুখের ভাবেও একটু প্রশান্তি আসিয়াছে। বাবা আর সকলে এখন চা খাইতে বসিয়াছে। দেরি হইয়া যাওয়ার খালি এইটুকু চিহ্ন অবশিষ্ট আছে, জলখাবারটা আজ বাড়ীতে তৈয়ারী নয়, কিনিয়া আনা হইয়াছে।

সকলের জন্য চা ঢালিয়া দিয়া বিনতা বলিল, "আমি তাহলে আমার চা-টা নিয়ে পাশের ঘরে যাই মায়ের যদি কিছু দরকার হয়?"

স্বপ্নার ইচ্ছা ছিল যে বিনতা তাহাদের সঙ্গেই বসিয়া খায়। সে একবার বিনোদবাবুর দিকে তাকাইল। তিনি কিছু বলিতেছেন না দেখিয়া সেও ভয়ে কিছু বলিল না। মায়ের আবার যা জাত-বিচার ঘটা, বিনতা কি জাত তাহা স্বপ্না জানে না। সুতরাং সে টেবিলে বসিয়া সকলের সঙ্গে একসঙ্গে খাবে জাত যাইবে কিনা তাহাও সে বলিতে পারে না। বিনতা চা লইয়া চলিয়া গেল।

চা খাওয়া শেষ হইতে না হইতে ডাক্তারের গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। বিনোদবাবু তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন। ধীরে-সুস্থে চা জলখাবার শেষ করিয়া স্বপ্না তাহার পিছন চলিল।

হরেন্দ্রনাথ বাড়ীতে ঢুকিয়াই বলিলেন, "কি খবর?"

বিনোদবাবু বলিলেন, "খানিকটা ভালই ত বোধ হচ্ছে।"

"নার্স পেয়েছেন?"

কর্ত্তা বলিলেন, "পেয়েছি, বেশ ভালই কাজ করছে।"

হরেন্দ্রনাথ রোগিণীর ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন যে ঘরখানির চেহারা এবং রোগিণীর মুখের চেহ

উঠিয়া দাঁড়াইল ও নমস্কার করিল।

পারিবে কি?

সরোজিনীকে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছেন এবেলা?"

"অনেকটা ত ভাল মনে হচ্ছে।"

"ওষুধ পথ্য সব ঠিক ঠিক খাচ্ছেন ত? উঠবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করেন নি?"

সরোজিনী বলিলেন, "যা দশা হয়েছিল সকালে, তাতে উঠে পড়বারই কথা। তবে দুপুরে এল, তখন থেকে কাজ ঠিক মতই হচ্ছে।"

ডাক্তার বিনতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ডাক্তার গুপ্ত পাঠিয়েছেন আপনাকে?"

বিনতা বলিল, "হ্যাঁ।"

"উনি আপনাকে আগে আগেও কাজে পাঠিয়েছেন?"

বিনতা বলিল, "হ্যাঁ, তিন চারবার উনি আমাকে কাজ দিয়েছেন।"

"আপনি কতদিন নার্সের কাজ করছেন?"

বিনতা বলিল, "দেড় বছরের কাছাকাছি হবে।"

হরেন্দ্রনাথ আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সরোজিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এই তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে হচ্ছে। স্বপ্নার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, "স্বপ্না ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, এই কথা শুনিবামাত্র সে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

সরোজিনী উৎসাহিত হইয়া বলিলেন "ওমা তাই নাকি? এই ত সত্যিকারের বন্ধুর আমার ত মুখে শোকা পড়ে গেল বকতে বকতে, কিন্তু কে শুনছে কার কথা? তা কোথা থেকে এল শুনি একটি! ও বাছা বিনতা, তুমি যাও ত ওকে একটু এঘরে আসতে বল, একসঙ্গেই সত্যি যা আমার দশা হয়েছে, এখন মেয়ের বিয়ে-টিয়ে দিয়ে যাওয়াই ভাল। হুট্ করে কোনদিন যাব, তখন কর্ত্তা যে কি করবেন, তিনিই জানেন।"

বিনতা ঘর হইতে বাহির হইতেই হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মেয়েটি বেশ ভাল কাজ করছে?"

সরোজিনী বলিলেন, "কাজ ত খুব ভাল করছে। যেমন আপনি বলেছিলেন, ঘরের কাজও আমার কাজও করছে। তবে বড় ছেলেমানুষ যে?"

ডাক্তার বলিলেন, "তাতে আর এসে গেল কি? অল্পবয়সে মানুষের খাটবার ক্ষমতা বেশী থাকে।"

সরোজিনী বলিলেন, "তা থাকে বটে, তবে কাজ করার ইচ্ছাটা থাকে না। আর তা ছেলেমানুষ মেয়ে বাড়ীতে রাখতেও ভয় করে আমার। নানারকম লোকজন আসছে যাচ্ছে ত?"

হরেন্দ্রনাথ হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন "নাঃ, আমাদের দাদাকে আপনি একেবারেই চেনেন না দেখছি। ভদ্রলোকের মাথার চুল পেকে গেল, এখনও তাঁকে চোখে চোখে রাখতে আর ছেলের বয়স ত নগদ ষোলো, তার জন্যেও আপনার ভয় আছে নাকি?"

"আহা ওদের জন্যে ভয় করে তাই কি আর আমি বলছি? তবে মেয়েটির বিষয় কিছুই ত জানা আমি? কাদের মেয়ে কি বিত্তান্ত? এই যে সংস্কৃতে বলে না যে অজ্ঞাতকুলশীলকে বাড়ীতে রাখতে তাই আর কি?"

যদি স্বভাব চরিত্রের সার্টিফিকেট চাইতে হয়, তাহলে লোক আর পাওয়াই যাবে না। ডাক্তার বা নার্স নিজের কাজটা ভালমতে জানে কিনা, এটাই জিজ্ঞাস্য, তার স্বভাব চরিত্র যেমনই হোক। এই যে আমি মাসে পঞ্চাশবার হুটহাট করে ঘরে ঢুকি, আমার বিষয়েই বা আপনি কি জানেন?"

সরোজিনী বলিলেন, "কি যে বলেন তার ঠিক নেই। আপনি আর অন্য লোক? নিজের ভাই বা দেওর যদি হতেন, তাহলেও ত এর চেয়ে বেশী বিশ্বাস করতে পারতাম না।"

এমন সময় বিনতা ও বিনোদবাবু আসিয়া চোকাতে তাঁহাদের এমন মুখরোচক আলোচনাটি থামিয়া গেল।

বিনোদবাবু একটু ব্যস্ত হইয়াই আসিয়াছিলেন, না জানি ডাক্তার সরোজিনী সম্বন্ধে কি বলিবেন। তবে ঘরে ঢুকিয়াই শুনিলেন যে হরেন্দ্রনাথ স্বপ্নার জন্য একটা বিবাহের সম্বন্ধ আনিয়াছেন শুনিয়াই তাঁহার মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম, শুনি একটু পাত্রটি কে?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পাত্রটি আমারই আত্মীয়, তবে খুব নিকট আত্মীয় নয়। দূর সম্পর্কের এক মামাতো ভাইয়ের ছেলে। এঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে, চাকরিও পেয়েছে। বাপ যা বর্তমান, এবং ওর উপর নির্ভর করেন না। তাই বোন যারা আছে, তারা এর চেয়ে বড়, কাজেই এর কোনো বাধেল নেই। সুতরাং মনে হল, পাকে দেওয়া চলতে পারে।"

বিনোদবাবু এবং তাঁহার পত্নী দুজনেই সমস্বরে বলিলেন, "তা ত নিশ্চয়ই, কোনোদিক দিয়েই মন্দ শোনাচ্ছে না। তা তাঁরা মেয়ে কেমন চান? ছেলের বয়স কত?

"বয়স হবে ছাব্বিশ সাতাশ। মেয়ে অবশ্য তাঁরা আশ্চর্যরকম কিছু চান না। সাধারণতঃ লোকে যা চায় তাই আর কি? দেখতে মোটামুটি ভাল, লেখাপড়াও খানিক জানে, এবং বাপের অবস্থা কাজ চলা গোছ সচ্ছল। তবে ছেলেটির একটু ফরসা বউ লাভের আগ্রহ আছে, তাই স্বপ্নার কথা চট্ করে মনে হল। ওর বয়স হল কত?"

সরোজিনী বলিলেন, "আঠারো।"

হরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ইয়ারে পড়ছে?"

বিনোদবাবু বলিলেন, "এই ত সেকেণ্ড ইয়ার শেষ হল, সামনের মাসে টেষ্ট।"

ডাক্তার বলিলেন, "তাহলে এঁদের যদি মেয়ে পছন্দ হয়, এবং যদি ঘরে আপনাদের মনে তাহলে পরীক্ষা দেওয়া অবধি অপেক্ষা করবেন, না আগেই দিয়ে দেবেন?"

সরোজিনী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ওমা অপেক্ষা আবার কেন করতে যাব? ঠিক হলে বিয়ে দিয়েই বিয়ের পর কত মেয়ে পরীক্ষা দেয়, ও তাই দেবে না হয়।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি ত আন্দাজে অনেক কিছু বলে দিলাম ওদের, এখন যাচাই করে নিতে হবে যে আমার কথাগুলো ঠিক কিনা। চেহারা ত ঠিকই বলেছি, পড়াশুনোর কথাটাও ঠিকই বলেছি। আচ্ছা, গান করে নাও? ওদের ত আমি বলে দিলাম গান জানে মেয়ে। অনিল, মানে আমার ঐ ভাইপোটির, একটু গানের বাতিকও আছে।"

বিনোদবাবু বলিলেন, "গান জানে বলা চলে, তবে খুব যে ওস্তাদ গাইয়ে তা কিছু নয়। মাষ্টার ত

সরোজিনী কাজের কথা পাড়িলেন, বলিলেন, "তা ওঁরা ত মেয়ে দেখতে চাইবেন একবার এখানেই আছেন ত সব ?"

ডাক্তার বলিলেন, "ছেলে আর তার বাবা ত আমার বাড়ীতেই এসে উঠেছেন। মেয়ে যে চাইবে বই কি ? আমার কথার আর মূল্য কি বলুন ? যে মানুষটা নিজে এত বয়স অবধি একটি জোটাতে পারল না, সে আর বউয়ের ভাল মন্দ কি বুঝবে ? নিজেরাই দেখে যাক্।"

গৃহিণী বলিলেন, "আর আমি রইলাম এখন চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে, এখন এ সবের ব্যবস্থা করে মেয়ে দেখানোর জোগাড়-জাগাড় ত আছে ? চারটিখানি কথা ত নয় ?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাই বলে আপনি যেন এখনি উঠে হৈ-চৈ বাধিয়ে দেবেন না। ত আমি এদের ভাগিয়ে দেব। আমি তাদের বলেইছি যে মেয়ের মা এখন সম্প্রতি অসুস্থ আছেন। ব খুব formally, ঘটা করে মেয়ে দেখা এখন হবে না। এমনি যেন বেড়াতে আসছি, এমনি ভাবেই এ তাদের নিয়ে আসব। আমি আসব, ওরা বাপ বেটা দুজনে আসবে, আর ছেলের প্রাণের বন্ধু একজন এখানে সেও আসবে হয়ত। এই চারজনের বেশী না। আপনারাও স্বপ্নার দু একজন বন্ধু ছাড়া আর ক ডাকবেন না। একটু চা জলখাবার খাবে, গান শুনবে, গল্প করবে চলে যাবে। আমি খুব বেশীক্ষণ এখানে বসে বক্ বক্ করতে দেব না। জলখাবার যদি আপনি বাজার থেকে কিনে এনেও খাইয়ে তারা কিছু মনে করবে না। ও সব খুঁত মেয়েরাই বেশী ধরে, তা এদের সঙ্গে মেয়ে কেউ আসছে না।

সরোজিনী বলিলেন, "ঐ ফাঁকে দিলেন শুনিয়ে আমাকেও একটা কথা। তা বাজারের জল খাওয়াব না একেবারে। আমার চাকর অনেক দিনের, জলখাবার খানিক খানিক করতে জানে। দিলে পারবে। যেদিন আসবেন আপনারা, তার দুদিন আগে জানাবেন যেন।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তা ত নিশ্চয়। আচ্ছা, শুয়ে শুয়ে সব plan করুন, আনন্দের আ যেন এখনি উঠে বসবেন না।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

২

ডাক্তার বাহির হইয়া যাইবামাত্র বাড়ীর আর যে যেখানে ছিল, সবাই আসিয়া ঘরে ঢু স্বপ্না নিজে, তাহার ছোট ভাই নীরেন ও সর্ব্বকনিষ্ঠা বীণা। বাড়ীর ঝি চাকর দুইজনও আসিয়া তবে স্বপ্নার বাবা এই সময় কি কাজে বাহির হইয়া গেলেন।

স্বপ্না ঢুকিয়াই বলিল, "খুব বলে দিলে গান গাইতে পারে, আমার সঙ্গে বাজাবে কে ? আম সঙ্গে বাজনা না থাকলেই sole ফুল হয়ে যায়। নিজেও বাজিয়ে গাইতে পারি না। আর মাষ্টার ম দু হপ্তার জন্যে ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছেন।"

সরোজিনী বলিলেন, "এই নাও যা হল এখন। বন্ধুবান্ধব কেউ নেই যে বাজাতে পারে ?

"হ্যাঁ আমার বন্ধুরা ত সাক্ষাৎ তানসেন, বাজাতে জানেই না কেউ।"

নীরেন বলিল, "বরকেই বাজাতে বলিস দিদি।"

বিনতা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "অত বেশী কথা বলবেন না আপনি, ওতে pressure বেড়ে যেতে পারে।

সরোজিনী বলিলেন, "আমাকে চুপ করতে দিচ্ছে কে? এমন একটা ভাল সম্বন্ধ এল, তা গোড়াতেই প্রতিবন্ধক দেখ। গান ভালবাসে ছেলে, মেয়ে যদি প্রথমে গেটাই না পারে, তাহলে ও মন খিচড়ে যাবে না?"

বিনতা একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কি গান করেন আপনি? রবীন্দ্র সঙ্গীত না classical?"

স্বপ্না বলিল, "classical গাইবার মত গলা আমার নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতই শিখছি এখন। আধুনিক গান বাবা বড় অপছন্দ করেন, তাই ওটা শিখি না।"

বিনতা বলিল, "রবীন্দ্র সঙ্গীত হলে আমি সঙ্গে বাজিয়ে দিতে পারি, অভ্যাস আছে আমার যেদিন গাইবেন, তার আগের দিন বলবেন, আপনার সঙ্গে একটু প্র্যাক্‌টিস্ করে নেব।"

সরোজিনী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বলিলেন, "কোন গুণটা যে তোমার নেই বাছা তাই ভাবি বাক, এখন অন্যদিকে মন দিতে পারব।"

পরদিন সকালে ডাক্তার আসিতেই সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা মেয়ে দেখতে আসা দিন কিছু কি ঠিক করলেন?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অসুখ-বিসুখ সব ভুলে গেছেন বুঝি? এখন শুধু ঐ এক চিন্তা? আসা এখন পরশু বিকেল বেলা।" বলিয়া বিনতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ওষুধপত্র ঠিক মত খাচ্ছেন ত অনিয়ম কিছু করেননি?"

বিনতা বলিল, "ওষুধ ঠিকই খেয়েছেন, অনিয়ম কিছু করেননি।"

সরোজিনী বলিলেন, "যা কড়া নার্স পাঠিয়েছেন, পান থেকে চুন খসবার জো নেই ওর কাছে।"

ডাক্তার বলিলেন, "ঐ বয়সের অন্য মেয়ের পক্ষে যা নিন্দে, নার্সের পক্ষে তাই প্রশংসা।"

সরোজিনী হঠাৎ বিনতার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বয়স কত হয়েছে গা মেয়ে আমার স্বপ্নার চেয়ে বড়ই ত হবে?"

বিনতা বলিল, "ওঁর চেয়ে আমি অনেক বড়, আমার বয়স তেইশ।"

হরেন্দ্রনাথ মনে মনে বলিলেন, "অত বড়ও ত দেখায় না। বোধহয় মর্য্যাদা বাড়াবার জন্যে বাড়িয়ে বলছে।"

তিনি অতঃপর উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আপনি ত আস্তে আস্তে ভালর দিকেই এগোচ্ছেন আমার দুবার আসবার কোনো দরকার নেই। কাল সকালে আসব না, সন্ধ্যার সময় আসব। আপনাকে ভাল হাতে রেখে যাচ্ছি, অসুবিধা কিছু হবে না। তবে দরকার মনে করেন ত খবর দেবেন", বলিয়া বিনতার দিকে তাকাইয়া একটু হাসিয়া প্রস্থান করিলেন।

সরোজিনীর তখনই কিছু কাজ ছিল না। তিনি বলিলেন, "তুমি যাও না বাছা, ছাদ থেকে একটু ঘুরে এস স্বপ্নার সঙ্গে। সারাদিন ঘরে বন্ধ হয়ে আছ। ওঁকে একবার ডেকে দিয়ে যাস্ত রে স্বপ্না।"

[illegible] বিনতা [illegible] "আসুন বিনতাদি

বিনতা বলিল, "না ভাই ; গরীবের মেয়ে আমি, বেশী পড়াশুনো করবার অবকাশ পেলাম কোথ বাড়ীতে পড়ে কোনোমতে ম্যাট্রিক পাশ করেছি। তারপর নানা বিপদের মধ্যে দিয়ে আসতে হল, রোজগার করতে ঢুকতে হল আর পড়াশুনা করতে পারিনি। যখন কাজে থাকি না, তখন ঘরে পড়বার করি, কিন্তু আর পরীক্ষা দিতে পারব কিনা জানি না।"

স্বপ্না চুপ করিয়া আছে দেখিয়া বিনতাই জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি পরশু কি গান গাইবেন, করেছেন কিছু ?"

স্বপ্না বলিল, "অনেক বেশী গান ত এখনও শিখিনি। ভাবছি একটা শরতের গান গাইব আর হেমন্তের গান গাইব। বেশ সহজ সুর দেখে বেছে নেব।"

"তাই নেবেন", বলিয়া হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ তুলিল বিনতা, জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ডাক্ত আপনাদের আত্মীয় নাকি ?"

স্বপ্না বলিল, "না, আমার কাকার সঙ্গে কলেজে পড়েছেন কিনা, তাই দাদা বলেন বাব অসুখ-বিসুখ হলে উনিই দেখেন আমাদের। মায়ের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসাও করেন, তবে এমনিতে একটু গম্ভীর বলে আমরা তাঁর ধারে কাছে বেশী ঘেঁসি না।

বিনতা জিজ্ঞাসা করিল, "বর যিনি আসছেন দেখতে, ওঁরই আত্মীয় ত তিনি ?"

স্বপ্না মাথা সঞ্চালনে জানাইল, তাহাই বটে। তাহার পর অন্য কথা আসিয়া পড়িল।

পরের দিনটা আগাগোড়া হৈ-চৈ করিয়া কাটিয়া গেল। কি জলখাবার করা হইবে, স্বপ্না কি ক কে তাহাকে সাজাইবে, কি গান গাহিবে সে ইত্যাদি। সরোজিনী ক্রমাগত কথা বলিয়া চলিলেন, চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে থামাইতে পারিল না। তবে উঠিতে সে তাঁহাকে কিছুতেই দিল না এবং ঔষধ খোসময়ে খাওয়াইয়া ছাড়িল।

তার পরের দিন কলে যেখার পালা। বিধু বাজারে গেল বেশ কিছু টাকা লইয়া। তাহার জিভটা গজগজ করিতে লাগিল, সরোজিনীর অসংখ্য নির্দেশে। স্বপ্না এবং বিনতা মিলিয়া বসিবা ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিল। স্বপ্নার দুই সখীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান হইল। এই পাড়াতেই থাকে, কাজেই বেশীদূর যাওয়া করিতে হইল না, তাহাদের জন্য। কাপড় জামা, মায়ের নি স্বপ্না বাহির করিয়া রাখিল, এবং বিনতার সঙ্গে বসিয়া গান দুইটিও একবার অভ্যাস করিয়া লইল। স শুনিয়া বলিল সে নির্ভুলভাবেই গাহিতে পারিবে। দুপুর বেলার খাওয়া-দাওয়া তাড়াতাড়ি সারিয়া বিকালের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রান্নাঘর হইতে নানারকম খাবারের সুগন্ধ ও বীণা ও নীরেনকে করিয়া তুলিল।

স্বপ্নার বন্ধুদের আগে আগে আসিতে বলা হইয়াছিল। তাহারা ত উৎসাহের আতিশয্যে ঠি সময়েই আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাড়াহুড়া করিয়া স্বপ্নাকে গা ধোওয়াইয়া সাজাইতে বসিয়া গেল। পর্ব চলিতে লাগিল সরোজিনীর শোবার ঘরেই, কারণ তিনি সব কিছু দেখিতে চান। স্বপ্নাকে কাপড় হইতেছে এমন সময় তাহার মা বলিলেন, "আচ্ছা বিনতা, তুমিও ত বসবে ওদের সঙ্গে ? তা এ রকম কাপড় পরে যেও না, সবাই সেজেগুজে এসেছে। স্বপ্নার একখানা ভাল শাড়ী বার করে দিক তোমায় জন্যে

কনেকে সাজান হইয়া গেল। বিধু আসিয়া খবর দিল খাবার করা হইয়া গিয়াছে এবং সে সব জিনিস জাল আলমারীতে তুলিয়া রাখিয়াছে। সরোজিনীর নির্দেশমত বরপক্ষের চারজনের জন্য খাবার সেট করিয়া সাজাইয়া রাখা হইল। বাড়ীর লোকজনের পরে যেমন তেমন করিয়া দেওয়া যাইবে এখন। বলিয়া ঘরে ছোট-খাট একটা ফরাস পাতিয়া দেওয়া হইল। মেয়েরা এখানেই বসিবে, গান বাজনা করিবে।

বরপক্ষ আসিতে কিছু দেরি করিল না। হরেন্দ্রনাথ অতিশয় সময়জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ, সর্বদা ঘড়ি কাঁটা ধরিয়া চলেন। অন্যদের বিনোদবাবু অভ্যর্থনা করিয়া বাহিরের ঘরে বসাইলেন। ডাক্তার চলিলে রোগিণীর ঘরে তাঁহাকে দেখিবার জন্য। সেইখানেই কনে, তার বন্ধু-বান্ধব সকলকেই পাইলেন। স্বপ্নাকে বলিলেন, "বাঃ, দিব্যি বেখাচ্ছে, তোমাকে ঠিক পছন্দ করবে। গানটা ঠিকমতো তোলো।" সরোজিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উৎসাহের চোটে কোনো অনিয়ম করেননি ত?"

সরোজিনী বলিলেন, "বিশ্বাস না হয়, বিনতাকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনার নার্স আপনাকে মিথ্যাকথা বলবে না।"

হরেন্দ্রনাথ তাহার দিকে তাকাইতেই বিনতা বলিল, "ওষুধ পথ্য সব ঠিক ঠিক খেয়েছেন। বিছানা থেকে নামেননি।"

ডাক্তার উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল, আর কয়েকটা দিন এই রকম লক্ষ্মী হয়ে থাকুন তাহলেই এবারকার মত উৎরে যাবেন। এখন তোমরা চল ত সব বসবার ঘরে। তোমার বাবা সেখানে আছেন।"

মেয়ের দল তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। বিনতাকেও তাহাদের সঙ্গে যেতে দেখিয়া হরেন্দ্রনাথ একে বিস্মিত হইলেন, তবে কিছুই বলিলেন না।

বিনোদবাবু একটু আড়ালেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আগে চা দিয়ে দেব নাকি?"

"অত তাড়াতাড়ি কি দরকার? একপালা চা ত খেয়েই বেরিয়েছে, খাবার আগে আর একবার খাবে এখন। আলাপ পরিচয় করুক আগে, গানটান শুনুক।" হরেন্দ্রনাথ নিজেই সকলের সঙ্গে স্বপ্নার আলাপ করাইয়া দিলেন, "ইনি আমার দাদা, রসিকলাল, এই তাঁর ছেলে অনিল, এইটি অনিলের বন্ধু মৃগাঙ্ক। আর এটি যে স্বপ্না তা সকলে বুঝতেই পারছেন।"

স্বপ্না রসিকলাল ও হরেন্দ্রকে প্রণাম করিল, যুবকদ্বয়কে নমস্কার করিয়া সঙ্গিনীদের মধ্যে বসিয়া পড়িল। রসিকলাল তাহাকে মামুলি গোটাকয়েক প্রশ্ন করিলেন, সে সন্তোষজনক উত্তরই দিল।

তাহার পর ভদ্রলোক বলিলেন, "তুমি বেশ গান কর শুনেছি, আমাদের দু একটা শুনিয়ে দাও।"

স্বপ্না পিছনে উপবিষ্ট বিনতার দিকে চাহিল। সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া হারমোনিয়মের সামনে বসিল। গান আরম্ভ হইল।

স্বপ্না প্রথমে গাহিল, "পরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে।" কোনো ভুল না করিয়া গান শেষ করিল, তবে গলা খুব উঠিল না। আর একটি গাহিতে অনুরুদ্ধ হইয়া এবার গাহিল "হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলি", এটাও চলনসই একরকম হইল। উপরি উপরি দুবার গাহিয়া স্বপ্না একেবারে হাঁপাইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এবার অন্য একজন গাও, ও একটু বিশ্রাম নিক্।"

সম্মতিসূচক একটু ঘাড় নাড়িয়া বিনতা আবার হারমোনিয়ম টানিয়া লইল। মুখের ভাবটায় আরো যেন একটু বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল। তার পর মধুর ভাবগম্ভীর কণ্ঠে গান ধরিল, "এরে ভি সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে।"

হরেন্দ্রনাথ হঠাৎ যেন সচকিত হইয়া, সোজা হইয়া বসিলেন। এই বয়সে এমন গান যে মুখের ভাবই বা এমন কেন? কিন্তু কি আশ্চর্য্য সুন্দর গলা। ইহার গান ত একটা শুনিয়া তৃপ্তি হয় স্বপ্নার জন্য তাঁহার একটু ভাবনা হইল। এমন গানের কাছে ত তাহার ছেলেমানুষী গান দাঁড়াইতে পারে দুইবোনের দিকে একবার আড়চোখে তাকাইয়া দেখিলেন। তাহারা একেবারে তন্ময় হইয়া শুনিতেছে

একটা গান শেষ হইবামাত্র চারজন শ্রোতাই সমস্বরে আর একবার গান গাহিবার আ জানাইলেন। এবারে সে আর রবীন্দ্র সঙ্গীত না করিয়া মীরাবাইয়ের একটি ভজন গান ধরিল।

গান শুনিবার আরো ইচ্ছা ছিল সকলের, তবে হরেন্দ্রনাথই থামাইয়া দিলেন। ইহাকে এ এখানে এতক্ষণ বসাইয়া রাখা উচিত নয়। সরোজিনীর কিছু প্রয়োজন হইতে পারে। আর স্বপ্না হইতে সকলের মন যদি একেবারে সরিয়া যায়, সেটাও ঠিক নয়। কাজেই দ্বিতীয় গান শেষ হইবামাত্র বলিলেন, "আপনাকে আর বসিয়ে রাখা ঠিক নয়। আপনার patient বোধ হয় একেবারে impation উঠেছেন।" বিনতা সকলকে একটা সমবেত নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর সাধা-সাধনা করিয়া বীণাকে দিয়া একটা গান করান হইল। সে ছেলেমানুষ, ছেলে মতই গাহিল। অতঃপর জলখাবার আসিল, চা আসিল। খাইতে খাইতে গৃহকর্ত্তার সহিত বরদ হরেন্দ্রনাথের খানিক কথাবার্ত্তা হইল। ঘণ্টাদেড়েকের বেশী তাঁহারা বসিবেন না, বলিয়া হরেন্দ্রনা দিয়াছিলেন, দেড়ঘণ্টা হইতে না হইতেই তিনি সদলবলে প্রস্থান করিলেন।

বিনোদবাবু স্ত্রীর ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "মেয়ে ত গেল, এখন পছন্দ হল কিনা কে জানে?'

সরোজিনী বলিলেন, "কালই খবর পাব ডাক্তারের কাছে। তোমার কি মনে হল, মে পছন্দ হয়েছে?"

"মেয়ে ত পছন্দ হয়েছে বলে মনে হল, তবে শোনার কথা বলতে পারি না। যা গান শোনাল। বিনতা তার পরে আর কারো গান পছন্দ হবার কথা নয়।"

সরোজিনী বলিলেন, "সত্যি, কি গলা মেয়ের! এর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। কোন গু নার্সের কাজ করছে জানি না। কোন গুণটা নেই মেয়ের? এক গায়ের রংটা ধবধবে নয়। এর কপাল পুড়ল, ভগবানের কি বিচার!"

বিনোদবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "মেয়েটি বিধবা নাকি?"

"তাইত মনে হয় গোবাক-আদাকে। জিগ্‌গেস তো আর করা যায় না।"

বিনতা আসিয়া পড়ায় তাহাদের কথা থামাইতে হইল।

হরেন্দ্রনাথ বলবল সহ বাড়ী ফিরিয়া কাপড়-চোপড় বদলাইয়া দোতলার সামনের বারান্দা বসিলেন। বাড়ীর ভিতর এই স্থানটিতে সবচেয়ে বেশী হাওয়া। বাড়ীতে যখন মানুষ থাকে, সন্ধ্যাটি খানেই কাটায়, কেহই এখান হইতে নড়িতে চাহে না। হরেন্দ্রনাথ সাধারণতঃ এ সময় বাহিরেই যোরে

হরেন্দ্রনাথ বয়সে অবশ্য বেশ কয়েক বৎসরের বড়, তবু অনিল তাঁহার সঙ্গে মন খুলিয়াই গল্পগাছা করিত কাকা বলিয়া তফাৎ হইয়া থাকিত না। বলিয়াই বলিল, "কাকা, গান কেমন শুনলেন আজ ?"

কাকা মুখের সিগারেটটা 'অ্যাশ্ ট্রে'তে নামাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "কার গানের কথা বলছ ?"

অনিল বলিল, "ঐ যে বিধবা মেয়েটি গান করল," "এরে ভিখারী সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আশ্চর্য্য সুন্দর গলা। লোকে সাধারণতঃ মেয়েদের পাখীর মত গলাই খু পছন্দ করে, আমার কিন্তু একটু ভারি গলা বেশী ভাল লাগে! ভারি expressive"

পাশ হইতে মৃগাঙ্ক হঠাৎ বলিল, "মেয়েটি কিন্তু মোটেই বিধবা নয়।"

হরেন্দ্রনাথ চট করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া বসিলেন, বলিলেন, "তুমি ওকে চেন নাকি ?"

মৃগাঙ্ক বলিল, "সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় নেই, তবে ওর বিষয় অনেক কথা জানি। আমার মামা বাড়ীর গ্রামের মেয়ে। ওর নাম বিনতা বোধ হয় ?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বোধ কিনা জানি না, তবে নামটা বিনতাই বটে। কি তা ওর বিষয় ?"

মৃগাঙ্ক বলিল, "আমার মামার বাড়ীর গ্রামে যেতাম মাঝে মাঝে। ঐ গ্রামেরই একটি ছেলের সঙ্গে ওর খুব ভাব ছিল, কলেজে একসঙ্গে পড়েওছি। বছর চার কি সাড়ে চার আগের কথা বলছি। তখন সবে বি. এ. পাস করেছি! শুনলাম শীতলের বিয়ে হচ্ছে, যাবার জন্যে চিঠি লিখেও পাঠাল। এক ঢিলে দু পাখী মারা যাবে, বিয়ে বৌ-ভাতের নেমন্তন্ন খাওয়াও হবে, আবার মামার বাড়ী বেড়ানোও হবে, ভেবে তল্পি-তল্পা বেঁধে ত যাত্রা করলাম। মামাবাড়ীর আদর-যত্ন খুবই উপভোগ করলাম, কিন্তু বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েই বাধল বিপদ।"

কন্যাপক্ষ, বরপক্ষের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হয়েছিল, জানি না। দেনা-পাওনা নিয়ে মহা গোলমাল বেধে গেল। মেয়ের বাবা নেই, মামা একজন কন্যাকর্ত্তা হয়ে বিয়ে দিতে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না। প্রথমে তর্কাতর্কি, তারপর বকাবকি, গালাগালি এবং শেষে মারামারির হবার উপক্রম হল। বরকর্ত্তা বর উঠিয়ে নিয়ে বীরদর্পে বাড়ী ফিরে এলেন।

আমি বিরক্ত হয়ে বাড়ী চলে গেলাম। মেয়েটির কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিয়ে আসরের বধূ প্রসন্নের মধ্যে কেমন স্থির পাথরের মূর্ত্তির মত বসেছিল। বেশ সুশ্রী মুখ, তাতে তার উত্তেজনার কোনো চিহ্ন নেই। বাড়ীতে বসে মনটা ছটফট করতে লাগল, এই নারকীয় নাটকের কি সমাপ্তি হল, জানবার জন্যে। তবে তখনই কোনো খবর নেবার চেষ্টা করলাম না। নিজে যেতে ইচ্ছা করল না। বরযাত্রীর দলে ছিলাম, কেউ যদি চিনে ফেলে আবার চেঁচামেচি করে সেটা বিশ্রী হবে। দু তিন চার পরে, বাড়ীর একটা ছোকরা চাকরকে পাঠালাম খোঁজ নিতে। সে ফিরে এসে যা বলল, তাতে আরো অবাক হয়ে গেলাম। শীতল চলে আসার পর চারিদিকে আর একটা বর খোঁজার জন্যে ছুটোছুটি আরম্ভ হয়, এবং গাঁজাখোর গোছের একটা অকর্ম্মা ছোড়াকে ধরেও নিয়ে আসা হয়। কিন্তু মেয়ে হঠাৎ বেঁকে বসল। বলল, "আমি ঐ গাঁজাখোরকে বিয়ে করব না। আমাকে কি তোমরা কাঠের পুতুল পেয়েছ আমি বরং লোকের বাড়ী ঝি-গিরি করে খাব, এই বলে সেই রাত্রেই সে বাড়ীর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে সে [illegible]

মৃগাঙ্ক থামিবামাত্র অনিল বলিল, "তুমি নিজেই কেন বরের আসনে গিয়ে বসলে না, তাহ মেয়েটা রক্ষা পেত।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "রক্ষা ত এমনিতেই পেল। অন্য লোকে রক্ষা করার চেয়ে যে নিজের রক্ষা পায়, তার রক্ষা পাওয়াটারই দাম বেশী।"

মৃগাঙ্ক বলিল, "সে রকম ইচ্ছা একবার হয়েছিল বটে, তবে কন্যাপক্ষের কেউ কেউ আ চিনতেন। আমি শীতলের বন্ধু, এই নিয়ে পাছে আবার কৈ-চৈ হয়, সেই ভয়েই আর গেলাম না।"

অনিল বলিল, মেয়েটি অনন্তপূর্ব্বা হয়ে গেল তবে?

হরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কি পদার্থ?"

অনিল বলিল, "কাকা, আপনি একবার বিলেত গিয়ে একেবারে চিরকালের মত সাহেব হয়ে গে অনন্তপূর্ব্বা হল সেই মেয়ে যার বিয়ের আসর থেকে বর উঠে যায় এবং সেই রাতেই যাকে আর পাত্রস্থ কর না। পাড়াগাঁয়ে এসব মেয়ের আর বরই জোটে না।"

কাকা বলিলেন, "অতি চমৎকার।"

অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর মেয়েটির কি হল আর জানতে পারনি কিছু?"

মৃগাঙ্ক বলিল, "বছর দুই পরে আবার মামার বাড়ী গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলাম কলকাতায় থেকে কাজকর্ম করে খাচ্ছে। কি কাজ ঠিক শুনিনি। যে মামার বাড়ী ওরা ছিল, তাঁকে অনেক হাঙ্গামা হয়। বিনতার মা আর ভাইকে বাড়ী থেকে বিদায় করে দিয়ে, অনেক নাক খ খেয়ে তবে তিনি নিষ্কৃতি পান। তারপর আর ও গ্রামে যাই নি, মেয়েটির কথা ভুলেও গিয়েছি আজ হঠাৎ মেঘে চমকে গেলাম।

তিনজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হরেন্দ্রনাথ আর একটা সিগারেট ধরাই দিতে লাগিলেন। হঠাৎ অনিল বলিল, আমার বাড়ীর সকলে যে এই সব বুজরুকিতে বড় বেশী করে, না হলে আমিই বিনতাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করতাম।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ও যত মিষ্টি গানই করুক, তোমার মা বাবা রাজী হবেন বলে ম না। বলত কথাটা তোমার বাবাকে বলে দেখতে পারি।"

অনিল বলিল, "নাঃ থাক। অতদূর নিজের খেয়ানে এগোনো ঠিক নয়। বাবা মায়ের মতী অনেক রকম ত? এ ক্ষেত্রে ত সে সব কিছু মিটবে না। তার উপর আবার ঐ সামাজিক অসু থাক্ গে ওরা যা ভাল বোঝেন করুন। আর ঐ মেয়েটি যে বিয়ে করতে রাজী হবেন, তারই বা স্থিরতা!

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "রাজী না হবারই কথা। পুরুষ মানুষের যা পরিচয় উনি পেলেন, উৎসাহ করে আবার কাউকে বরণ করতে এগোবার কথা নয়। তবে কোনো বিশেষ মানুষকে পছ ফেললে, সে ক্ষেত্রে এগোতে পারেন বটে।"

অনিল বলিল, "তা ঠিক। এ সব নিয়ম হয়েছিল যখন তখন কনেদের বয়স হত ছ বছর বছর। এখনকার সব বড় বড় মেয়ে নিয়ে এসব খেলা খেলতে চাইলে চলবে কেন? সেই আমাদের পণ্ডিতরা বোঝেন না।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা, এখন অন্য কথা তুলি একটা। আসলে যাকে দেখতে গিয়ে

অনিল বলিল, "দেখতে ত ভালই। অন্য সব দিকেও ভাল বলেই মনে হল।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কাল ওদের বাড়ী গেলেই ত ওরা ছেঁকে ধরবেন, মতামত জান চাইবেন। কি বলব?"

অনিল বলিল, "আমার কথায় ত আর কাজ হবে না? বাবাকে রিপ্রেজেন্ট করুন। এ ক্ষেত্রে আমরা বাঙালী ছেলেরা ত বাপের সুপুত্তুর সবাই।

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহলে তাই জেনে নি। আর কোনোদিকে বাধা কিছু হবে বলে মনে না, তবে স্বপ্নার বাবা বেশী বড়লোক নয় কিছু। সাধারণ চাপোয়া গৃহস্থ। টাকাকড়ির দাবী খুব ক করলে, তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে মেয়েটি মোটামুটি ভাল, পরিবারটাও ভাল। খুব সাহেবী নে অথচ অত পাড়াগেঁয়েও নয়, বিয়ে করলে ওখানে ঠকবে না।"

এমন সময় হরেন্দ্রনাথকে কে ডাকিতে আসিল। তিনি উঠিয়া নীচে চলিয়া গেলেন। যুবকদ্বয় অ খানিকক্ষণ সেইখানে বসিয়া বসিয়া গল্প করিল। তারপর মৃণাল নিজের বাড়ী চলিয়া গেল। অনিল এ খানি বই লইয়া পড়িতে বসিল।

৩

সকাল হইতেই স্বপ্নাদের বাড়ীর তিনজন লোক অন্ততঃ হরেন্দ্রনাথের পথ চাহিয়া বসিয়াছিল বিনোদবাবু আর সরোজিনী ত বটেই, স্বপ্নারও জানার আগ্রহ কম ছিল না যে বরপক্ষ তাহাকে দেখি পছন্দ করিয়াছে কিনা। নিজে সে দেখিতে ভালই এই বাহাই তাহার ছিল, আর লেখাপড়া, গান, খেল সবই ত সে জানে? বাবা যে তাহাকে কিছু দিবেন না, এমনও নয়। সুতরাং না পছন্দ হইবার কি আছে বত কনে দেখার সভায় সে গিয়াছে, তাহার চেয়ে সর্বাংশে খারাপ কনেও লোকে পছন্দ করে দেখিয়াছে এক বিনতাদি তাহাকে গানে হারাইয়াছে, নইলে গানও তাহার মন্দ হয় নাই।

সুতরাং বেলা ন'টা সাড়ে ন'টার সময় যখন হরেন্দ্রনাথের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। বিনোদবাবু তাড়াতাড়ি স্ত্রীর শয়নকক্ষে আসিয়া ঢুকিলেন, এবং স্বপ্না গিয়া ঢুকি পাশের ঘরে।

সরোজিনী বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর আনলেন, বলুন?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন "মেয়ে দেখে ত সবাই ভালই বলছে, এখন আপনাদের সঙ্গে ঘরে বসে ত ত? আমার ত প্রায় ঘরের বাড়ীর পিসী আর কনের বাড়ীর মাসির অবস্থা, কাজেই আমি আর ভিতর বাধা গলাচ্ছি না। কাল রসিকদাদা আসবেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে, আগে আগে ব ব্যাপার চুকিয়ে ফেলতে চান, তাহলে বরং আপনিই চলুন আমার বাড়ী সন্ধ্যাবেলা। সে সময় আ বাড়ী থাকি।"

বিনোদবাবু বলিলেন, "তাই যাব, বসে বসে খালি মাথামুণ্ডু ভেবে কিছু লাভ নেই।"

এমন সময় বিনতা সরোজিনীর চা লইয়া ঘরে ঢুকিল। ইহারই মধ্যে সে স্নান সারিয়া আসিয়াছে খোলা চুল ঘাড়ে চাকিয়া নামিয়া পড়িয়াছে, মুখখানা আরো ছেলেমানুষের মত দেখাইতেছে। সরোজি চায়ের পেয়ালা হাতে করিয়া বলিলেন, "আমি আর কিছু খাই আর নাই খাই, চা বার পাঁচেক না খে

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার অত চা খাবার সময় কোথায়? দু বার যা ধরা আছে, তার বে খাই না।" বিনতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কোথায় গান গাইতে শিখেছিলেন আপনি? কাল চমৎকার গাইলেন। সিনেমায় না ঢুকে গানের লাইনেই গেলে পারতেন। কম খাটুনি হত।"

বিনতা বলিল, "যেবে যতদিন ছিলাম, বাবার কাছে শিখেছিলাম। তিনি খুব ভাল গাইয়ে তারপর কলকাতায় এসে এক পিসতুতো বোনের কাছে মাঝে মাঝে শিখেছি। তবে গান শেখাতে হলে যেভাবে গান শেখা দরকার, তা ত আমি শিখিনি? কাজেই ওটা career করতে পারতাম না।"

সকাল বেলাটায় কাজের তাড়া বেশী, কাজেই হরেন্দ্রনাথ আর বেশীক্ষণ বসিতে পারিলেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া সরোজিনীকে বলিলেন, "আর সাত আটদিন শুয়ে থাকলেই আপনার শান্তির অং হবে। তবে মেয়ের বিয়ের জন্যে অতিরিক্ত হৈ-চৈ করে আবার পড়বেন না যেন। বিয়ে ঠিক হলে এখন দু তিন মাস দেরি হবে, কারণ হিন্দু শাস্ত্রমতে এখন দিন নেই। সেই অগ্রহায়ণ হবে হয়ত।"

সরোজিনী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়েটা হবে আপনার মনে হচ্ছে?"

"মনে ত হচ্ছেই। বরের পছন্দ হয়েছে মোটামুটি, আর বরের বাবার পছন্দ হয়ে যাবে এখন, ত বেয়াই যদি একটু হাত ঘরাজ করেন।"

তিনি চলিয়া যাইতেই বাড়ীতে আবার কোলাহল লাগিয়া গেল। বিবাহ এখনও পাকাপাকি হি নাই, কিন্তু তাহাতে কিই বা আসে যায়?

সন্ধ্যা হইতে না হইতে বিনোদবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন হরেন্দ্রনাথের বাড়ী। কথা চলিল খানিকক্ষণ। হরেন্দ্র বসিয়া থাকায় দুই পক্ষই একটু রাশ টানিয়া কথাবার্তা বলিলেন, এবং ব্যা ভালয় ভালয় চুকিয়াই গেল। এখন ত আর কয়েকদিন মাত্র শ্রাবণ শেষ হইতে বাকি। ইহার কোনো পক্ষই তোপাড় করিয়া উঠিতে পারিবে না। সুতরাং অগ্রহায়ণ মাসেই বিবাহ হইবে, এই কথাবার্তা হইয়া রহিল।

সরোজিনীকে পর দিন দেখিতে গিয়া হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি ত ভালই আছেন যে আর দিন সাতের বেশী আপনার নার্সের দরকার হবে না। যদি না অবশ্য বাড়ীর কাজের জন্যে রাখেন, বিয়ে অবধি।"

সরোজিনী বলিলেন, "কি যে আপনি বলেন তার ঠিক নেই। আমি যেন টাকার ছালায় বসে আছি। মাসে নব্বুই টাকা দিয়ে ঘরের কাজের জন্যে লোক রাখব। বড় জোর একটা ঝি রাখতে পারি। টানাটানি চিরকালই, এখন আরো বেশী হবে, মেয়ের বিয়েতে ত অন্যে নিষ্কৃতি পাব না।

"কে বা পায়? ছেলের বিয়েতে পুষিয়ে নেবেন। আচ্ছা ডাকুন যেখি বিনতাকে, ওর সঙ্গে কথা আছে।"

বিনতা রান্নাঘরে কি একটা কাজ করিতেছিল, ডাক শুনিয়া সরোজিনীর ঘরে আসিয়া দু সরোজিনী বলিলেন, "ডাক্তারবাবু কি বলছেন শোন।"

বিনতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হরেন্দ্রনাথের দিকে তাকাইল। তিনি বলিলেন, "আপনার এখ [illegible] ভাই বিয়ের হাঙ্গামা শেষ হয়ে যাবে তার পরে অন্য কোথাও কাজ নি

বিনতা বলিল, "এখন ত ঠিক নেই কিছু। কাল একবার ছুটি নিয়ে মিসেস্ মল্লিকের বাড়ী যাব। উনিই আমাকে বেস্টের ভার্গ কাজ দেন। যদি কেউ লোক চেয়ে থাকে, তাহলে সেখানে গিয়ে ঠিক করবার চেষ্টা করব।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "

খবর নেন না?"

বিনতা বলিল, "সে করলে ত আমার চলে না? মাসে দুটো দিন বসে থাকলেও আমার অনেক ক্ষতি কাজেই যেখানেই কাজ পাই যেতে হয়।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এ কাজের পক্ষে আপনি বড় বেশী ছেলেমানুষ। যাক্, অবস্থা বৈগুণ্যে আজ বাসেও কাজ অনেক রকম করতে হয়। একটা কাজেরই কথা বলছি এখন। কাজটা আমারই বাড়ীতে।"

সরোজিনী বলিলেন, "আপনার আবার এখানে কে আছে যে নার্স লাগবে?"

"বাড়ীটাতে ভাড়া বড় বেশী, কাজেই অনেকের চোখ আছে সেটার উপরে। একটি ভাড়াটী খু অসুস্থ হয়েছেন, সন্তান সম্ভাবনা। ইচ্ছা করলে নার্সিং হোমে যেতে পারতেন, পয়সা কড়ি একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু এমন মামার বাড়ী থাকতে সেটা তিনি করবেন কেন? কাজেই আমার বাড়ীতে আসছেন, অন্ততঃ এক মাসের জন্যে। এখন আমার বাড়ীতে ত স্ত্রীলোক কেউ নেই, ঝি-ও নাই একটা একে সারাদিন আগলাবে কে? বয়স বেশী নয়, কলকাতায় কোনোদিন থাকেও নি। সুতরাং আপনা পরদাপর হতে হচ্ছে। এখানকার কাজ হয়ে গেলেই আপনি আমার ওখানে যাবেন।"

বিনতা বলিল, "যখন বলবেন তখনই যাব।"

সরোজিনী বলিলেন, "আপনি যখনই বলবেন, তখনই আমি ওকে ছেড়ে দেব, আমার সত্যি এখন কোনো কাজ নেই। বহুকাল এত আরামে থাকিনি, তাই মনটা একে ছাড়তে চাইছে না। আগে আগে যখনই নার্সের হাতে পড়েছি, তখনই খালি ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়েছে প্রাণটা, যে কতক্ষণে আবার উঠে দাঁড়াব।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এতবড় সার্টিফিকেট সহজে কেউ কাউকে দেয় না, লিখে দিন, তাহলে কাজে লাগবে।"

সরোজিনী বলিলেন, "এই ত আপনাকে বলেই দিলাম মুখে, আপনিই ত নিচ্ছেন ওর আমার পরে।"

ডাক্তার বলিলেন, "অন্যের জন্যে বলছি আর কি? আমার কাছে ত সার্টিফিকেটের দরকার ছিল না, আমি ত ওকে এতদিন ধরে দেখছি। আচ্ছা, চলি এখন। রোজ আসবার এখন দরকার নেই টেলিফোনে খবর দেবেন প্রয়োজন হলে", বিনতার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আর আমার প্রয়োজন হলে আমিও তখনই খবর দেব।"

বিনতা বলিল, "আচ্ছা।" হরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন।

স্বপ্না বলিল, "বাবাঃ, বিনতাদি এরপর মস্ত বড়লোকের বাড়ী যাবে। কত আরামে থাকবে।"

বিনতা বলল, "থাকছি কি আরাম করতে? কাজই ত করতে হবে?"

স্বপ্না বলিল, "তাহলেও অতবড় সুন্দর সাজান বাড়ী, গাড়ী, টেলিফোন কত কি? কিছু

বিনতা হাসিল, কিছু বলিল না।

দিন পাঁচ পরেই বিনতার ডাক আসিল। হরেন্দ্রনাথ নিজেই আসিয়া তাহাকে বলিয়া গেছে বলিলেন, "পূর্ণ কাল দুপুরে আসছে, আপনি সকালে উঠেই যাবেন আমার ওখানে। তার ঘরটর করতে হবে। সংসারে ত স্ত্রীলোক নেই, কাজেই ওঁদের জন্যে কি রকম ব্যবস্থা করতে হবে, তা বুঝতে পক্ষ। আমি সকালেই গাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

সরোজিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনার আরামের অবসান হল এরপর। আবার কোমর কাজে লাগুন।"

সরোজিনী রাত্রেই বিনতার হিসাবপত্র চুকাইয়া রাখিলেন। হরেন্দ্রনাথের যেমন ঘড়ির ধরিয়া চলা অভ্যাস, হয়ত ভোর রাত্রেই গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইবে। বিনতাও নিজের সামান্য জিনি গুছাইয়া রাখিল।

বেশ সকাল সকালই গাড়ী আসিয়া হাজির হইল। বিনতা সকলের কাছে বিদায় লইয়া গ গিয়া উঠিল। স্বপ্না চুপি চুপি বলিল, "এল কিন্তু তাই, ঠিক সে সময়।"

বিনতা বলিল, "খবর পেলেই আসব। হয়ত বরযাত্রী হয়েই আসব, যদি বেশী দি থাকি।"

অল্পক্ষণের পথ, দেখিতে দেখিতে গাড়ী গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া গেল। চাকর বাহির হইয়া ম জিনিষপত্র নামাইয়া লইল এবং গৃহকর্ত্তা স্বয়ং বাহির হইয়া আসিলেন তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে। ত সঙ্গে করিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "বড় তাড়াতাড়ি গাড়ী গিয়ে পড়েছে না? ড্রাইভারকে সকালে যেতে বলেছিলাম তা সে খুব তাড়াতেই চলে গেছে। আপনার চা-টা হয়েছে?"

বিনতা বলিল, "না, হয়নি, ওদের বাড়ীতে একটু দেরিতেই চা হয়। এখানে খেয়ে নেব কিন্তু দেখুন।"

হরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "কি বলছেন, বলুন?"

বিনতা বলিল, "আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমি কত ছোট আপনার চেয়ে।"

হরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, ওটা বলতে বেশী অসুবিধে হবে না, 'আপনি' টা বলতে অসুবিধা লাগছিল। স্বপ্নার সমানই ত প্রায়।"

বিনতা বলিল, "কোন ঘরে জিনিষগুলো রাখব?"

ল্যাণ্ডিংএর উপরেই একটি মাঝারি গোছের ঘরের ঘরজা পাশের এক ঠেলায় খুলিয়া দিয়া হ বলিলেন, "এই ঘরে রাখ। খাট একটা আছে, আলনাও আছে। আর কি লাগবে বল?"

বিনতা বলিল, "আর কিছু লাগবে না।"

হরেন্দ্র বলিলেন, "একটা আয়নারও দরকার নেই?"

বিনতা বলিল, "ছোট আয়না একখানা আছে বাক্সের মধ্যে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন "প্রয়োজন জিনিষটাকে একেবারে উড়িয়েই দিয়েছ দেখছি। আচ্ছা, চা [illegible]

বিনতা ভাবিল, "ইনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন যেন আমি ওঁর বাড়ীর অতিথি। আমি যে একটা মানুষ, তা ত বহুবৎসর ভুলে গিয়েছি।"

খাইবার ঘরে চাকর চা সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার চাকরটির চা চলা জিনিষটা আদতের মধ্যে নেই। ঢালতে গেলেই চা পেয়ালায় বড় না পড়ে, তত পড়ে পিরীচে আর টেবল্ ক্লথে। কাজেই চা আমি নিজেই ঢেলে নিই।

বিনতা পেয়ালাগুলি টানিয়া লইয়া বলিল, "আমি ঢেলে দিচ্ছি। তিন পেয়ালাই চলবে?"

গৃহস্বামী বলিলেন, "তাই চলে। আর একজন বাদিন্দা আছেন বাড়ীতে, এখনই চোখ মুছতে মুছতে হাজির হবেন।"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই একটি বাইশ তেইশ বৎসরের যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখে বিরক্তি ছাপ সুস্পষ্ট। "রোজ চাকর ডাকাডাকি করিয়া এই সময় তার ঘুম ভাঙাইয়া দেয়, কারণ তাহার উপর এ রকম আদেশ আছে। বিনতার আসার কথা সে জানিতই বোধ হয়, কারণ তাহাকে দেখিয়া কিছু বিস্ময় দেখাইল না। হরেন্দ্রনাথ পরিচয় করাইয়া দেওয়াতে, বিনতাকে নমস্কার করিয়া নীরবে খাইতে লাগিল।

বিনতা দেখিল এ বাড়ীতে খাওয়ার ঘটা বেশ আছে। আর নাই বা হইবে কেন বড় মানুষের বাড়ী?

হরেন্দ্রনাথ হঠাৎ বলিলেন, "তুমি নিজে যে কিছুই খাচ্ছ না?"

বিনতা বলিল, "সকালে বেশী কিছু খাই না।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বেশী ত খাচ্ছ না, কমও যে কিছু খাচ্ছ না? কলটল অন্ততঃ একটা নাও?"

যতেশ একটু কৌতূহলী দৃষ্টিতে বাসার দিকে তাকাইল। কাহারও খাওয়া লইয়া এত মাথা ব্যথা ত দেখা যায় না? মেয়েটি চেনা কেউ নাকি?

বিনতা অগত্যা একটা আপেল তুলিয়া লইল। হরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে তাহার বিস্ময় ক্রমে বাড়িতে লাগিল। তাহার রোগিণী যিনি হইবেন, তিনিও বাসায় বাড়ী আসিতেছেন, সেও কি বাসার বাড়ী আসিয়াছে? এত আদর ত বিগত ছয় সাত বৎসরের ভিতর কেহ তাহাকে করে নাই?

খাওয়া হইয়া গেল। যতেশ নিজের ঘরে প্রস্থান করিল।

হরেন্দ্রনাথ বিনতাকে লইয়া স্বর্ণের ঘর ঠিক করিতে চলিলেন। তাহাকে যে ঘর দিয়াছিলেন তাহার পাশের একটা ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই ঘরে ও থাকবে। দেখ এখানে খাট দুটো আছে, যদি এখানে তোমাকে শুতে হয় ত অসুবিধা হবে না। আলনা আছে, ড্রেসিং টেবল্ আছে আর কি দরকার?"

বিনতা বলিল, "বেশী আর কি দরকার হবে? ড্রেসিং টেবল্ ড্রয়ার রয়েছে কাপড়-চোপ তাতেই রাখবেন। একটা easy chair গোছের কিছু দিয়ে রাখলে হয়, কখনও যদি বসে থাকতে চান।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এখার ওঘার অনেক ছড়ান আছে চেয়ার, দুটো পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোম ঘরে একটা রেখে নিও। আর ত কিছু চাই না? আচ্ছা আমাকে এখন বেরুতে হচ্ছে। ঘণ্টা করে তোমাকে একলা থাকতে হবে। ঘর ঘোর গোছাও, আমার শোবার ঘর ঐটা। ওখানে বই আ এসে, যদি সময় না কাটে বই নিয়ে পোড়ো। আমি একেবারে স্বর্ণকে নিয়ে আসব।" বলিয়া তি চলিয়া গেলেন।

সাহায্য করিতে। তাহার সাহায্যে ঘর দুইখানিকে সে ঠিকঠাক করিয়া, ঝাড়িয়া, মুছিয়া, ঝক্‌ঝকে ক তুলিল। দোতলায় দুইটি বাথরুম আছে। তাহাদের শুইবার ঘর সংলগ্ন যেটি, সেটিও সে ভাল ক পরিষ্কার করাইল। নিজে স্নান করিয়া লইল। তাহার পর বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভা লাগিল। কতকাল সে শুষ্ককণ্ঠে নরভূমির উপর দিয়া হাঁটিতেছে। কত বিপদ, কত অপমান, তাহার জীবনকে বিড়ম্বিত করিয়াছে। বাবা যে দিন হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তখন হইতে তাহাকে যে মানুষ বলে করে নাই, এমন কি মাও নয়। তিনিও তাহাকে নিজের জীবনের মূর্ত্তিমতী দুর্ভাগ্য বলিয়াই করেন। প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া যে তাঁহাদের প্রতিপালন করিতেছে, তাহার জন্য কোনো কৃতজ্ঞতাই মনে নাই। ইহা যেন করিতে বিনতা বাধ্য।

রমেশ খাইয়া কলেজে চলিয়া গেল। বাড়ী একেবারে শূন্য। নীচের তলায় চাকররা কাজ করিতে বসিয়া বসিয়া তাহার ঘুম পাইতে আরম্ভ করিল।

হঠাৎ বাড়ীর সামনে গাড়ী থামার ও গাড়ীর দরজা বন্ধ হইবার শব্দ শোনা গেল। জানাল উঁকি মারিয়া বিনতা দেখিল ডাক্তারের গাড়ীই বটে। তিনি নিজে আসিয়াছেন, একটি মেয়ে নামিয়া এবং এক রাশ জিনিস নামান হইতেছে। বিনতা সিঁড়ির মুখে গিয়া দাঁড়াইল, ইহাদের অভ্যর্থনা ক জন্য।

হরেন্দ্রনাথ স্বর্ণকে লইয়া উপরে উঠিলেন। মেয়েটি বিনতার সমবয়সীই হইবে, এক আধ ব বড় বা ছোট হইতে পারে। কাপড়-চোপড় পরা, কথাবার্ত্তা, বরণধারণ কোনো কিছুতেই নাগরি ছাপ নাই।

উপরে উঠিয়াই হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এই স্বর্ণ, আর এই বিনতা। স্বর্ণ ইনি থাকবেন সঙ্গে, দেখাশোনা করবেন। যখন যা দরকার একে বলবে। ঘর ত ঠিক আছে, না?"

বিনতা বলিল, "ঠিকই আছে, এই যে এদিকে আসুন।"

স্বর্ণ ও হরেন্দ্রনাথ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। স্বর্ণ ত আনন্দে আটখানা! উঠিল, "বাঃ, কি সুন্দর ঘর। তা হবে না কেন? মেজমামা ত বড়মানুষ। দিন কতক আরাম করে নি

"তা কর আরাম। তবে শয়ীরটাকে ঠিক রেখো। কাল তোমায় দেখতে একজন আসবেন। তিনি যেমন বলবেন ঠিক তেমনি ভাবে চলবে। বিনতা অবশ্য তোমাকে ঠিক পথেই র অত্যন্ত কড়া নার্স বলে তাঁর সুনাম আছে।"

স্বর্ণ বলিল, "এরই মধ্যে এত কড়া হয়ে গেছেন? আমার বয়সীই ত হবেন? আমি ত একটা কথা শুনলে এখনও কেঁদে ফেলি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার মত আদুরে ত সবাই হয় না? তোমাকে বাপের বাড়ীর দিলে মাটি করেছেন, এখন আবার স্বামীরা মাটি করছেন, সকলের ত সে সুবিধা থাকে না?"

"মেজমামা যে কি বল তার ঠিক নেই। বাবারে আমার যা গা ঘিন্ ঘিন্ করছে সারাদি চেঞ্জে, একটু স্নান করতে পারলে হত।"

বিনতা বলিল, "স্নানের ত সবই ঠিক আছে। আপনার কাপড়-চোপড় কোন বাক্সে আছে — — — দিন।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা স্নান-টান সেরে নাও চট্‌পট্‌, নইলে খাওয়ার দেরি হয়ে যাবে। ঝিন একে নিয়ে একেবারে খাবার ঘরে এস, এঁর স্নান হয়ে গেলে," বলিয়া তিনি নিজের ঘরের দিকে প্রস্থান করিলেন।

স্বর্ণ বাক্স হইতে কাপড়-চোপড় টানিয়া বাহির করিতে করিতে বলিল, "আপনার কি মেজমামার সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ?"

বিনতা বলিল, "না খুব অনেক দিন নয়, মাসখানেক হবে।"

স্বর্ণ বলিল, "আচ্ছা, স্নানটা আগে সেরে আসি। বাক্সগুলো একটু গুছিয়ে দিন না ভাই, ততক্ষণ আমার হেঁট হয়ে কাজ করতে ভাল লাগে না।" বলিয়া সে স্নানের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বিনতা বসিয়া বাক্স গুছাইতে লাগিল। খানিক গুছাইয়া ভাবিল, থাক এত গুছাইয়া কাজ নাই বাহির করিয়া দেরাজেই গুছাইয়া রাখা ভাল: তাহা হইলে আর বাক্স টানাটানি করিতে হয় না সারাক্ষণ। কি স্বর্ণ আগে স্নান সারিয়া আসুক, তাহার পর এসবের ব্যবস্থা হইবে। মেয়েটি বয়সের পক্ষে অত্যন্ত ছেলেমানুষ অন্ততঃ কথাবার্ত্তায়। তবে কার্য্যতঃ হয়ত পৃথিবীপনা কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছে। কথাবার্ত্তায় মাঝে মাঝে মানুষকে অপ্রস্তুতে ফেলিতে বলিয়াই বোধ হয়।

স্বর্ণ বাহির হইয়া বলিল, "বাক্সগুলো বন্ধ করেন নি যে?"

বিনতা বলিল, "ভাবছি সর্ব্বদা পরবার কাপড়-চোপড়গুলো দেরাজেই রেখে দিই, তাহলে আর সারাক্ষণ হেঁট হয়ে বাক্স খুলতে হয় না।"

স্বর্ণ বলিল, "তাই রাখুন তাহলে। আর দেখুন ভাই, আপনি ত বড় নয়, কিছু আমার চেয়ে, অ 'আপনি আজ্ঞে' করতে পারব না আমি। আমিও 'তুমি' বলি, আপনিও 'তুমি'ই বলুন। নার্স থাকবে, তা প্রথমে ভেবেছিলাম যে খুব তারিক্কি বুড়ো মানুষ হবে। কথাই বুঝি বলতে পারব না, তার সঙ্গে। আমি আবার বুড়ো-টুড়ো ভালবাসি না।"

বিনতা হাসিয়া বলিল, "হাঁ, অনেকেই চারপাশে ছেলেমানুষই পছন্দ করে। তা চল, আগে খাওয়া সেরে আসি, তোমার মামা হয়ত অপেক্ষা করছেন।"

খাবার ঘরে যাইবামাত্র হরেন্দ্রনাথও আসিয়া প্রবেশ করিলেন, চাকরও খাবার লইয়া আসিল। স্ব বলিল, "ওরে বাবা, এইরকম সাহেবী কায়দায় খেতে হবে নাকি? ওসব আমি জানি-টানি না।"

তাহার মামা বলিলেন, "চেয়ারটায় বোস ত, তারপর যেরকম খুশি খাও। নিজে তুলে নিতে অসুবিধা হয় ত বিনতা তোমাকে দিয়ে দিবেন। ওঁর নিজের খেতে একটু দেরি হয়ে যাবে, তা হোক। সেবা কাজ যারা নেয়, তাদের অনেক অসুবিধা সহ্য করতে হয়।"

বিনতা বলিল, "ঐটুকু দেরিতে আমার কিছু অসুবিধা হবে না। আপনাকেও দিয়ে দিই?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তা দাও। এক যাত্রায় পৃথক ফল আর কেন?"

বিনতা দুইজনকে পরিবেশন শেষ করিয়া তবে নিজে খাইতে বসিল। স্বর্ণের খাওয়া শেষ হইতেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, মেজমামা, টেবিলে যারা একসঙ্গে খেতে বসে তারা একসঙ্গেই ওঠে নাকি আমাদের দিশী নিয়মে যেমন করে? না যার যার যখন হয়ে যায়, সে তেমন উঠে যায়?"

মেজমামা বলিলেন, "তুমি গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এস ত, তারপর এখানে বসে গল্প কর, একজন য

স্বর্ণ উঠিয়া গেল, গোলক তাহার ব্যবহৃত প্লেট গেলাস সব উঠাইয়া লইয়া গেল। বিনতা বলি "উনি এই প্রথম কলকাতায় এলেন বুঝি? সব জিনিষই ওর নতুন লাগছে?"

"বাল্যকালে যদি এসে থাকে, আমি যখন বিলেতে ছিলাম। তারপর আর নিশ্চয়ই আসেনি কিন্তু তুমি এখনও ত কিছু খাচ্ছ না? এত কম খেয়ে এতক্ষণ খাট কি করে? এ বয়সে আরো এ বেশী খাওয়া উচিত।"

বিনতা একটু হাসিয়া বলিল, "বাবা যারা যাবার পর আর কিছুই খেতে পাব কিনা তার ত ছিল না? তাই কত অল্প হলে চলে, তারই অভ্যাস করছিলাম।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এখন ত নিজে রোজগার করে খাচ্ছ, এখন আর ও সে ভাবনা ভাব কথা নয়? এখন খাওয়াটা আস্তে আস্তে বাড়াও।"

স্বর্ণ হাত মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিল। বসিয়া বলিল, "বাবা:, মেজমামা, তুমি কি আস্তে আ খাও। এই না সবাই বলে তোমার ভয়ানক প্র্যাক্‌টিস্, মরবার সময় নেই।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মরবার চেষ্টা ত করিনে এ পর্য্যন্ত, কাজেই সময় হবে কিনা জানি না। নাইবার, খাবার সময় একটুখানি হাতে রেখেছি, নইলে চলবে কেন?"

সকলের খাওয়া হইয়া যাওয়াতে, যে যাহার কাজে চলিয়া গেল।

৪

দিন সাত আটের ভিতরই স্বর্ণের বেশ মন বসিয়া গেল। ডাক্তারের আদেশ অনেকগুলি প করিতে হইত, এই যা ছিল তাহার বিরক্তির কারণ। আর স্বামীর চিঠি ঠিক সময়মত না পাইলে তৎক্ষণাৎ পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিয়া যাইত, এই ছিল আর এক বিপদ। বিনতা তাহাকে বুঝাইয়া, করিয়া কোনোমতেই থামাইতে পারিত না। এমন কি হরেন্দ্রনাথের উপস্থিতিও তাহাকে আশ্ব করাইত না। একদিন বকুনি খাইয়া মামাকে বলিয়া বসিল, "নিজের ত ও আপদ নেই, তুমি কি আমার কষ্ট?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "একেবারে প্রভাসের বাপী?" কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী?" বুঝি না তবু এটুকু বুঝি যে এরকম করলে তোমার শরীর খারাপ হবে, এবং আর একটি প্রাণীরও অনিষ্ট হবে

তিনি বাহির হইয়া যাইতেই স্বর্ণ জিভ কাটিয়া বলিল "মেজমামার সঙ্গে ওরকম করে কথা ঠিক হয়নি না?"

বিনতা তাহার কথায় একেবারে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। গুরুজনের সঙ্গে লোকে এইরকম ব কথা বলে নাকি? স্বর্ণের কথার উত্তরে বলিল, "ঠিক হয়েছে তা বলতে পারি না তাই।"

স্বর্ণ বলিল, "এ রাম, কিছু যদি মনে করে?"

বিনতা কিছুই বলিল না। বলিলেই কি? হরেন্দ্র কিছু মনে করিবেন, কি করিবেন না, বুঝিবে কিরূপে?

স্বর্ণ বলিল, "আবার এখন মেলাই-মেলাই কিছু ভাল লাগছে না। একটু গড়িয়ে নিই।"

দুমিনিট শুইয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা ভাই, মেজমামাকে বলে একটা ঝি রাখিয়ে দিতে পা আমার জন্যে ?

বিনতা বলিল, "আমিই ত রয়েছি, আবার ঝি কি করবে ?"

"না ভাই তোমাকে সব কাজের কথা বলা যায় না। ঝি থাকলে একটু পা-টা টিপে দিত, এ আমাদের পাড়াগাঁয়ের গল্পগুজব করত, রাত্রে যখন ঘুম হয় না তখন মাথায় হাত বুলোত।"

বিনতা বলিল, "এ সবই ত আমি করতে পারি। মানুষে নার্স রাখে ত এই সব কাজের জন্যেই।"

স্বর্ণ বলিল, "না ভাই, তোমাকে আমি পা টিপতে বলতে পারব না। তোমাকে মেজমামী এ খাটির করে চলেন যে তোমাকে নার্স-টার্স কিছু মনেই হয় না। আমি যেমন এক রাঙ্গা এসেছি, তুমি যেন আর একজন এসেছ।"

বিনতা ভাবিল সত্যই তাই। এখানে আসার পর একদিনের জন্যও মনে হয় নাই যে পরম পরিবর্তে সেবা করিতে আসিয়াছে। যেন নিজের অতি নিকট আত্মীয়ের বাড়ীতেই সে আছে। আদর, যে সম্মান সে পায়, তাহা নিজের মা বাবার ঘরেও সে পায় নাই। সেবার কাজ তাহাকে কি বা করিতে হয় ? স্বর্ণকে সমস্তদিন যথা নিয়মে খাওয়ান, নিদ্রা, ঔষধ সেবন প্রভৃতি করান অবশ্য কাজ নয়। তাহাকে নার্সের বদলে সিক্রেটারীর কাজই বেশী করিতে হয়। আর সংসার চালানো ভারটাও কেমন করিয়া যেন তাহারই হাতে আসিয়া পড়িতেছে। চাকররা ধরিয়া লইয়াছে যে তাহাকে সব বিষয় জিজ্ঞাসা করা উচিত, এবং গৃহকর্তা এমন সানন্দে তাহাতে সম্মতি দিতেছেন যে ইহাই পাকাপাকি নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্বর্ণের কথার উত্তরে বলিল, "তোমার মেজমামার মত ভদ্রলোক জগতে কটা জন্মায় ভাই ? পৃথিবীর কারো সঙ্গে বোধ হয় তিনি কখনও খারাপ ব্যবহার করেন নি। তা, চা খাবার সময় আমি কথা তাঁকে তারপর তিনি যা স্থির করেন।"

স্বর্ণ বলিল, "রেখেই দেবেন দেখো। টাকা পয়সা ত ওর কাছে খোলামকুচি। আমার বিয়ে এক কথায় এক হাজার টাকা দিয়ে দিলেন সাহায্য বলে।"

চা খাওয়ার সময় স্বর্ণ নিজেই কথাটা পাড়িল। বলিল, "মেজমামা, আমার জন্যে একটা রেখে দেবে ?"

মেজমামা বলিলেন, "এখনই কেন ? যখাকালে হবে।"

স্বর্ণ বলিল, "আঃ কি যে বল ! এই আমার পা-টা টিপে দেবে, গল্প খল্প করবে। এক মাইনেটা আ দিতে পারি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সারাদিন গল্পগুজব দিয়ে কাটাও, তাই হাত পা ব্যথা করে। তোমার এ রোজ মাইল দুই হাঁটা উচিত। তা এমন বুষ্টি যে বাড়ীর বার হওয়া যায় না। তা রাখ ঝি, দেখে শুনবে মামার বাড়ী এসে যত্নেই আদর পাওয়া গেল না। মাইনের কথাটা এখন নাই বা ভাবলে ? গল্প কি বিনা সঙ্গে চলে না ?"

স্বর্ণ বলিল, "ও আমাদের সব পাড়াগাঁয়ের গল্প জানলে ত ?"

স্বর্ণ বলিল, "সে কবে ছিল, এখন আর সেখানের কথা মনে নেই।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে ত কি সর্ব্বাগ্রে দরকার। একে ত বাবাজীবন বধা সময়ে চিঠি লেখেন তার উপর যদি আবার গল্প করার লোকও না থাকে, তাহলে ত জীবন দুর্বিসহ।"

স্বর্ণ কি একটা কাজে উঠিয়া গেল। হরেন্দ্রনাথ তখনও চা খাওয়া শেষ করেন নাই। বিনতা বলি ওঁর জন্যে যদি বিয়ে রাখতে হয়, তাহলে আর আমাকে রাখার দরকার ত নেই! ওঁর এখনকার যা কাজ ব দু একদিন দেখিয়ে দিলে বিয়ে পারবে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পাগল নাকি তুমি? স্বর্ণর সব কাজ করবে বি? বিয়ের একটা কথা শুনবে? আর আমাদের দেশের বি ত? তাঁদের গুণপনা আমার অজানা নেই। সমস্ত মাটি হবে একটি মধ্যে। আর ওর বেয়ান ত, আজ বি দরকার, কাল বিয়ের বদলে বাঁধুনি দরকার। তুমি পালাতে ব্যস্ত হচ্ছে? এখানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে?"

বিনতা বলিল, "না, না, একেবারেই তা নয়। পালাতে ব্যস্ত হব কেন? এতদিন কার ব কোথাও কোনো বাড়ীতে আমি এত নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে পারিনি। আমি যে ভদ্রলোকের মেয়ে বিশেষ কোথাও স্বীকার করেনি কেউ। glorified বিয়ের মতই থেকেছি। অবশ্য আমার কা অনেকটা সেইরকম।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহলে ত মা বাপীকেও কি ভাবতে হয়, ওঁরাও ঐ কাজই করেন। ব তোমাকে কতগুলো personal কথা জিজ্ঞেস করি, কিছু মনে কোরো না। তোমার জীবনের ইতিহ খানিকটা আমি শুনেছিলাম একটি ছেলের কাছে। স্বর্ণাকে যেদিন দেখতে যাওয়া হয়, সেদিন সে গিয়ে বন্ধুরূপে। তোমায় চিনতে পেরেছিল। তার কাছে তোমার কথা শুনলাম, যদিও সব কথা det সে জানে না সেই বাক্তংস বিবাহ সভায় সে উপস্থিত ছিল। তুমি কি বিরক্ত হচ্ছ?"

বিনতা বলিল, "না, বিরক্ত হব কেন? আমি ত নিজে অপরাধ কিছু করিনি? শুধু অন কৌতূহল পরিতৃপ্ত করতে অবশ্য নিজের দুঃখের কথা আমি কাউকে বলিতে চাই না। কিন্তু আপনি নিশ্চ জন্যে জানতে চাইছেন না!"

"না তা নয়। তবে সেদিন থেকেই ভাবছি যে তোমাকে কোনোদিক দিয়ে যদি কিছু সাহায্য যায়, তাহলে হয়ত ভাল একটা career তোমার হতে পারে। অত অল্প বয়সে তোমার যে রকম মনের তুমি দেখিয়েছ, তাতে বোঝা যায় যে তোমাকে সাহায্য করলে সেটা বিফল হবে না, যা করতে তুমি। তা তুমি পারবে।"

বিনতা অনেক কষ্টে চোখের জল সম্বরণ করিল। সহানুভূতি বা সমবেদনা সে কখনও পায় নাই বোধ হয়। একটু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আপনি কি জানতে চান বলুন, উত্তর দিচ্ছি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পড়াশুনো কতদূর করেছ?"

বিনতা বলিল, "বাবা বেঁচে থাকতে ওঁর কাছে পড়ে ম্যাট্রিক দিয়েছিলাম। পাসও করেছি তারপর অবসর পেলেই একটু-আধটু পড়েছি, তবে পরীক্ষা দিতে হলে যতটা তৈরি হওয়া দরক

বিনতা বলিল, "টীচারি করতে গেলে যা পেতাম, তাতে আমার মা, ভাই আর আমার নিজের খাওয়া পরা চলত না। এতে সামান্য কিছু বেশী পাই, সারা মাস কাজ করলে।

হরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় থাক তুমি ?"

বিনতা বলিল, "এখানে একজন পিসীমা আছেন, তাঁর বাড়ী থাকি। মা আর ভাই গ্রামে থাকে আমার মাসিমার সঙ্গে।"

"আমার বাড়ীর গ্রাম থেকে, এঁরই কাছে তুমি পালিয়ে এসেছিলে ?"

"হাঁ।"

"আচ্ছা, আই. এ. দিতে যদি চাও, তাহলে ক'মাস সময় দরকার হবে তোমার তৈরি হয়ে নেবার জন্যে।"

"মাস ছয় হলে পারি।"

হরেন্দ্রনাথ এইবার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "তবে দেখি কি হলে সুবিধা হয়।"

বিনতাও খাবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল। তাহার চোখ দিয়া ক্রমাগত যে জল পড়িতে লাগিল, তাহা অন্য কেহ বুঝিত না, নিজেও সে পুরোপুরি বুঝিল না।

বি একজন পরদিনই উপস্থিত হইল। নাম মোক্তা, গোলকের দূরসম্পর্কের পিসীমা হয়। মাঝবয়সী বিধবা মানুষ। অন্যকাজ যত পারুক বা নাই পারুক, পাড়াগাঁয়ের গল্প করিতে খুব ভাল পারে, এবং পা টিপি বলিলে কোনো আপত্তি করে না। কাজেই স্বর্ণ তাহাকে অবিলম্বে অত্যন্ত পছন্দ করিয়া বসিল।

হরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি স্বর্ণ, কি পেয়ে খুব খুশি ত ?"

স্বর্ণ বলিল, "হাঁ মেজমামা, ভারি চমৎকার মানুষ; কত গল্প করেছি কাল রাত্তে। ঘুমতে রাত্রে বেজে গেল।"

হরেন্দ্রনাথ কিছু বলিবার আগেই রমেশ বলিল, "তোমার যে শুধু বারোটা বাজল তা নয়, আমা বাজল। যা জ্যান্‌জ্যান্ করেছে। আমার ঘর থেকে আবার তোমার ঘরের প্রায় সব কথাই শোনা যায়।"

স্বর্ণ বলিল, "এ রাম, তাই নাকি ? তবে ত আস্তে আস্তে কথা বলতে হবে।"

তাহার মেজমামা বলিলেন, "কথাটা না বললেই ভাল রাত্রিবেলা। তোমার ত নটার মধ্যেই ঘুমি পড়া উচিত। আচ্ছা বিনতা, তুমি ত এখন অনেক সময়ই free থাকবে। পড়াশুনোটা কর না কিছু কি বইটই এখানে নিয়ে এসেছ কি ?"

বিনতা বলিল, "আনিনি কিছু। তা আজ বিকেলে গিয়েই নিয়ে আসতে পারি। যাব তাই।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বিকেলে চা খাবার পর যেও, তখন গাড়ীটা দিতে পারব।"

বিনতা বলিল, "গাড়ীর আর কি দরকার ? ট্রামেই যাব।"

"আবার একটা বোঝা ঘাড়ে করে ট্রামে-বাসে ওঠবার কি দরকার ? গাড়ীতেই যেও", বলিয়া হরে উঠিয়া গেলেন।

অতদিন যে সময়ে ফেরেন, হরেন্দ্রনাথ তাহার আগেই আজ ফিরিয়া আসিলেন। চা খাইবার টেবিলে বসিয়া শুধু এক পেয়ালা চা খাইলেন।

স্বর্ণ বলিল, "তুমি কিছু খাচ্ছ না কেন মেজমামা ?"

মনে হচ্ছে। আর দেখ স্বর্ণ, যদি আমি শুয়েই পড়ি, ঘটা করে আমায় দেখতে এস না। Infection ল এখন তোমার একেবারে চলবে না। ছায়াই মাড়াবে না আমার ঘরের।" বিনতার দিকে কি বলিলেন, "বইগুলো নিয়ে এস গিয়ে তাড়াতাড়ি, আর ফিরবার পথে আমার ছোট কম্পাউণ্ডার ঋষিকে ডেকে নিয়ে আসবে।" তিনি প্রস্থান করিলেন, স্বর্ণ এবং বিনতাও যাবার ঘর ছা চলিয়া গেল।

বিনতা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া পিসীমার বাড়ী চলিল। খুব বেশী দূর নয়। বেড়ালো মতন দু ছুটি ছোট ছোট পুপরির মত ঘর। একটিতে পিসীমা থাকেন, আর একটিতে বিনতা থাকে, যখন তার থাকে না। পিসীমার ঘর সামান্য একটু বড়, তবে জিনিসপত্রে ঠাসা। বিনতার ঘরে একখানা তক্তাপোষ আছে আর একটি বেতের চেয়ার। কাপড়-চোপড় রাখার জন্য দেয়ালে আটকান আ পিসীমার একটি মেয়ে আছে, সে বিবাহিতা। যখন মায়ের কাছে বেড়াইতে আসে, তখন রাত্রে বি সঙ্গেই শোয়, মায়ের ঘরে জায়গা হয় না।

বিনতা তাড়াতাড়ি নিজের খাতা বই প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ও ডিস্‌পেন্‌সারি হইতে ঋষিকেশকে ল করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। উপরে গিয়া নিজের ঘরে সেগুলি গুছাইয়া রাখিল। মোতীকে ব "আজ আমার বিছানাটা আমার ঘরেই করে দিও ত।" তাহার পর হরেন্দ্রনাথের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইল। তিনি খাটে বসিয়া ঋষিকেশের সঙ্গে কথা বলিতেছেন, সে নাকে কাপড় দিয়া দরে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া বিনতার সাটা বিরক্তিতে জ্বলিয়া গেল। ঋষিকেশ বাহির হইতেই সে-ঘরে চু বলিল, "কি জ্বর সত্যিই এসেছে?"

হরেন্দ্র বলিলেন, "এসেইছে মনে হচ্ছে। তুমি ঘরে যে ঢুকছ, যদি আবার তোমার হয়? স্ব তাহলে বিপদে পড়বে?"

বিনতা বলিল, "ওর ঘরে আজ আর যাবই না আমি। মোতী ওর কাজ করছে করুক, স্বর্ণের বেশী পছন্দ। আপনাকে কে দেখবে, সবাই দূরে সরে দাঁড়িয়ে থাকলে?"

হরেন্দ্র বলিলেন, "আমার অসুখ-বিসুখ করে এতই কম যে আমার দেখাশোনা করার লোক কেউ নেই। ভাবছিলাম ঋষিকেশটাকে একটু কাজে লাগাব, তা তার নাকে কাপড় দেওয়ার ঘটা আর ভরসা হচ্ছে না, ভয়েই মরে যাবে।"

বিনতা বলিল, "আমি করে দিচ্ছি আপনার সব কাজ। নাকে কাপড়ও দেব না, ভয়েও মরব না

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি পুরুষ patient-এরও কাজ করেছ নাকি?"

বিনতা বলিল, "করেছি, দুতিন জনের। একেবারে শয্যাগত রোগী নয় অবশ্য। তাঁরা সহজই ছিলেন।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অসহজই আর হবেন কোন দুঃখে? অন্য মেসেও সব রকম patient-এর ব মেয়ে নার্সরা করে। আমাদের মেসেই নানা বাধা আছে। থাক্ কেমন থাকি আগে দেখি। আ থার্মোমিটারটা যাও ত ঐ দেরাজ থেকে।"

বিনতা থার্মোমিটার বাহির করিয়া জ্বর দেখিল, ইহারই মধ্যে ১০২০-এর উপরে উঠি

বিনতা দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "সত্যিই জ্বর হয়েছে, বেশ বেশী জ্বর। দিদিমণি যেন এখি না আসেন।"

হরেন্দ্র শুইয়া শুইয়া একখানা মাসিকপত্র উল্টাইতেছিলেন। বলিলেন, "অসুখের সবচেয়ে খা হচ্ছে যে করবার কিছু থাকে না। মানুষ ভয়ানক ক্লান্ত আর বিরক্ত হয়ে যায় এতে।"

বিনতা জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু পড়ে শোনাব?"

"শোনাও। গান অত সুন্দর কর, পড়তেও নিশ্চয়ই ভাল পার। একটু কবিতা পড়ে শোনাও, এ গানের মতই লাগবে।"

বিনতা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বই থেকে শোনাব?"

"ঐ আলমারিটা খোল, ওতে কাব্যগ্রন্থ আছে সবগুলো। এর থেকে "যৌবন বেদনা রসে উ আমার দিনগুলি" কবিতাটা শোনাও।"

বিনতা বই বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। চেয়ারটা খাটের খুব কাছে টানিয়া লইল। চুপচা পড়িতে লাগিল। খুব বড় কবিতা নয়, অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল।

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পড়াটাও দেখি গানের মত ভাল আসে তোমার। আচ্ছা, এইবার "স্বর্গ হই বিদায়"টা পড় দেখি।"

বিনতা পাতা উল্টাইয়া কবিতাটি বাহির করিল। হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দাঁড়াও ঘরের ঐ আলোটা নিভিয়ে দাও ত। এই কোণের আলোটা ভাল, বইয়ের উপর ঠিক আলো পড়বে, আমার মু পড়বে না।"

নির্দ্দেশমত আলো জ্বালিয়া ও নিভাইয়া বিনতা আবার পড়িতে বসিল। এ কবিতাটি শেষ হই হরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "যেতে নাহি দিব" পড়তে পারবে?"

বিনতা একটু থামিয়া বলিল, "ওটা জোরে জোরে পড়তে আমি পারি না, চোখে জল এসে যায়। বেশী বাবার কথা মনে পড়ে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "থাক তাহলে, একটু বিশ্রাম করে নাও। ভাগ্যে ছিলে বাড়ীতে, না হ ঋষিকেশকে সম্বল করে এই রোগের দুস্তর সাগর কি করে পার হতাম জানি না। আর যাই করুক, এ সুন্দর করে কবিতা পড়ত না। তুমি রবীন্দ্রনাথের সব বই পড়েছ?"

বিনতা বলিল "সব বই ত হাতে পাইনি? যতগুলি পেয়েছি, পড়েছি, অনেকবার করে পড়েছি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার খুব ভাল লাগে ওঁর লেখা?"

বিনতা বলিল, "ওঁর লেখা ভাল না লাগাও সম্ভব নাকি?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সম্ভব না হবে কেন? আমাদের দেশ ত ভর্ত্তি এই সব অসম্ভব সম্ভাবনায়।"

বিনতা বলিল. "আপনি বারবার চুলের ভিতর আঙুল চালাচ্ছেন, আপনার নিশ্চয় মাথা ব করছে। আমি টিপে দিই?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দাও টিপে। তবে বিছানায় উঠে বসতে হবে, অত দূর থেকে টে যাবে না।"

বিছানায় উঠিয়া বসিয়াই বিনতা রোগের মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। মাথাটা বেশ উত্তপ্ত হয়ে আছে

নিজের ত বিপদ ঘটতে পারে। আমি দুই একদিনে উঠব না, বুঝতেই পারছি। ক'দিন তোমার ঘরের রুগী নিয়ে বসে থাকতে হবে তার ঠিকানা নেই। তারপর যদি তুমি রোগে পড়, তখন তো দেখবে কে?"

বিনতা বলিল, "বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন।"

"বাড়ীতেই বা তোমাকে দেখবে কে? ঐ বৃদ্ধা পিসীমা?"

বিনতা বলিল, "আর কেউ যদি না থাকে আমার ত কি আর করা যাবে?"

হরেন্দ্র বলিলেন, "কেউ না থাকলেও সেবা-যত্ন হওয়া সম্ভব, তা দেখতেই পাচ্ছ। তোমারও ঐ রকম করে হবে, যদি দরকার হয়।"

হাসিবার চেষ্টা করিয়া বিনতা বলিল, "কি নার্সের ভয়ে আর একটা নার্স রেখে দেবেন?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি নার্স এইটেই কি তোমার একমাত্র পরিচয়?"

বিনতা বলিল, "তা নয়। তবে অন্যলোকে ত আমার আর কোনো পরিচয় স্বীকার করেনি, আমিও সেগুলো ভুলে যেতে বসেছিলাম।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নিজে যে মানুষ, সে পরিচয়টা যে ভোলেনি, তার প্রমাণ ত পাচ্ছি। তোমার কি আজ খাওয়া-দাওয়ারও দরকার নেই, রাত বেশ হয়েছে না?"

বিনতা বলিল, "না, বেশী কিছু রাত হয়নি। আমার খাবার তুলে রাখতে বলে আসছি, পরে আপনি কি খাবেন বলুন, তৈরি করতে বলে আসি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বার্লিওয়াটার ছাড়া আর কিছু আমার খাওয়া চলবে না এখন। করতে বল।"

বাহির হইয়া গিয়া বিনতা প্রয়োজনমত নির্দেশ দিয়া আসিল। ঋষিকেশ এই সময় কত ওষুধপত্র লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। টেবিলে সেগুলি নামাইয়া রাখিয়া ও হরেন্দ্রনাথের কাছে নির্দেশ শুনিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল। বিনতা আসিয়া ঔষধাদি ভাল করিয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এই ছেলের আবার ডাক্তার হবার সখ ছিল। আমাকে দিয়ে লিখিয়ে কত সুবিধা করবার চেষ্টা করেছে।"

বিনতা বলিল, "সব মানুষ সব কাজ পারে না। আমার একটি দাদাতো ভাই আছে, দেখলেই তার ফিট হয়। আমার যদি ডাক্তার হবার সুযোগ থাকত, তাহলে ভালই ডাক্তার পারতাম। রোগকে ভয় পাই না, মূর্ছাও যাই না কাটা ছেঁড়া দেখলে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আই. এস. সি পাস করে ডাক্তারী পাস করতে ত তোমার ত্রিশ বছর হয়ে যাবে।"

বিনতা বলিল, "শুধু তাতে ত দুঃখ ছিল না, না হয় হলই ত্রিশ বছর। কিন্তু এই সাত আট আমার মা আর ভাইয়ের কি হত? আর আমারই বা খরচ চলত কি করে?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে ত বটে, ও লাইনে তাবা চলবে না। অসুখটা ছাড়ুক আগে, তখন নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আচ্ছা, ঐ tablet দাও ত দুটো।"

করিল। বিনতা আবার মাথা টিপিতে বসিল। মাথার যন্ত্রণা একটু কমিয়াছে দেখিয়া, পা হাত টিপি বসিল। সারাটা রাত তাহার প্রায় এইভাবে চলিল। হরেন্দ্রনাথ একবার বলিলেন, "তোমাকে এম করে তোলাতে আমার বড় সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে বিনতা।"

বিনতা বলিল, "কি আশ্চর্য্য। সেবা করতে বসলে ঐ সব ভাবা যায় নাকি? আমার কা ত এই? আপনি যদি আমার নিজের দাদা হতেন, আমি করতাম না? একটুও কিন্তু ভাববেন আপনি। বারোমাস ত আমি এই কাজ করি?"

"কর, উপায় যখন নেই। আমি রোগে পড়িনি যতদিন, তাই বড় অস্থির লাগছে। চুলটা এ টেনে টেনে দাও ত?"

বিনতা বিছানায় বসিয়া আবার আস্তে আস্তে চুলের গোছা টানিয়া টানিয়া দিতে লাগিল খানিক পরে বলিল, "বার্লিটা নিয়ে আসি, আপনি খেয়ে নিন্ ত। তারপর ঘুমবার চেষ্টা করুন।

"আচ্ছা আন। ঘুমটা আসতে আসতেও আসছে না।"

বিনতা গিয়া বার্লি লইয়া আসিল। খাওয়ান হইয়া গেলে নিজে একছুটে গিয়া দুইগ্রাস ভাত খাই আসিল। একেবারে মিথ্যা কথা বলিলে ত হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিবেন না।

তবুও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল?"

বিনতা বলিল, "যেদিন night duty করি, সেদিন রাত্রে বেশী কিছু খাই না।"

"ভালই কর। তবে সত্যি কিছু একটু খেয়েছ ত?"

বিনতা বলিল, "নিশ্চয়। নইলে সেবায় কি করতে?"

সে আস্তে আস্তে বিছানা বালিশ সব ভাল করিয়া ঝাড়িয়া গুছাইয়া দিল। বাদলা হাওয়া আসিতেছে দেখিয়া দুই একটা জানলা বন্ধ করিল। তাহার পর প্রয়োজন মত হাত পা টিপিয়া, মাথা হাত বুলাইয়া রোগীকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মাঝরাত পর্য্যন্ত রোগের কষ্ট সমান চলিল, তাহার পর অবিরাম পরিচর্য্যার ফলেই হোক্ বা যে কারণেই হোক, যন্ত্রণা কমিতে আরম্ভ করিল কিন্তু বিনতা উঠিল না, সেইখানে বসিয়া যেমন কাজ করিতেছিল, করিতে লাগিল। নির্দ্দেশমত আবা ঔষধ খাওয়াইল।

রাত একটার কাছাকাছি হরেন্দ্রনাথ ঘুমাইয়া পড়িলেন। পাছে ঘুম ভাঙে বলিয়া এবার বিনতা হা সরাইয়া লইল। খাট হইতে নামিয়া খাটের সঙ্গে লাগান একটা চেয়ারে বসিল। ঘরের কোণের দিকে একটা খোলা জানালার পথে বর্ষার রজনীর মেঘ ভারাক্রান্ত আকাশ দেখা যাইতেছে। ঘরে তিমি আলো, অর্দ্ধেক ছায়া, অর্দ্ধেক আলো। হরেন্দ্রনাথের মুখটা যেন পাথরের খোদা মূর্ত্তির ম দেখাইতেছে।

তাহার অল্প অল্প ঘুম আসিতে লাগিল। তবু জোর করিয়া ঘুমাইল না, আবার যদি হরেন্দ্রনা জাগিয়া ওঠেন। কিন্তু ভোর রাত্রির কাছাকাছি পর্য্যন্ত তিনি জাগিলেন না। এই সময় পরিশ্রান্ত দেহ চেয়ারে বসিয়াই বিনতা ঘুমাইয়া পড়িলেন, এবং তাহার মিনিট পনেরো বুড়ি পরেই হরেন্দ্রনাথ চো খুলিয়া তাকাইলেন। ঘরের আলোটা বড় স্তিমিত, তাহার মধ্যে নিদ্রিতা বিনতাকে কেমন যেন ছায়া মত দেখাইতেছে।

৫

মানুষের দৃষ্টির একটা প্রভাব আছে বোধ হয়। হরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ বিনতার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতেই সে হঠাৎ চোখ খুলিয়া তাকাইল। হরেন্দ্রনাথ জাগিয়া আছেন দেখিয়া উদ্বিগ্নভাবে করিল, "কতক্ষণ উঠেছেন?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বেশীক্ষণ না, মিনিট দশ পনেরো হবে। তুমি একটুও ঘুমতে পারলে?"

ঘণ্টাখানিক ঘুমিয়েছি।

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি অন্ততঃ চারঘণ্টা ঘুমিয়েছি। একটু সুস্থ বোধ হচ্ছে এখন। জ্বর কমছে বোধ হয়। তুমি না থাকলে আজ আমি যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যেতাম বিনতা। এইরকম কষ্ট কি একলা পড়ে থাকা, একটা ভয়াবহ ব্যাপার।"

বিনতা বলিল, "কেউ কি আর আসত না? তা কখনও হয়? এতগুলো লোক রয়েছে বাড়ীতে?"

"আসবার মত কে আছে? স্বর্ণ আসতে পারে না। রমেশ ত অর্দ্ধেক দিন কলেজে duty রাখে। না দিলেও আমার ধারে কাছে আসত কিনা সন্দেহ। সেও একটি দ্বিতীয় ধরিত্রেশ। আর চাকরের কথা ছেড়ে দাও।"

বিনতা বলিল, "নার্স একটা আনিয়ে নিতে ত পারতেন, মেয়ে হোক, পুরুষ হোক।"

"প্রথম দিনই কাউকে ডাকার কথা মনে হত কিনা সন্দেহ। এমন চট করে বেড়ে যাবে তা ভাবি নাই। মেয়ে নার্স একজন অপরিচিত এসে আমার কতটা সেবা করত জানি না। তুমি বাড়ীর মানুষের হয়ে গেছ তাই তোমার কাছে এতটা শুশ্রূষা নিতে পারলাম। কোনো male nurse হয়ত ঘুটতেন পর্য্যন্ত এবং তাঁর চটা ওঠা হাতের ঘর্ষণে আমার গায়ের অর্দ্ধেক চামড়া এতক্ষণে উঠে যেত।"

বিনতা বলিল, "যেচারারা! তাদের হাত নরম নয় ত তারা আর কি করবে?"

"করবে না কিছুই। সেবা করাটা মেয়েদেরই কাজ, তারা করলেই ভাল। শিশু আর রোগী মেয়েদের হাতে যতটা ভাল থাকে ততটা আর কারো কাছে থাকে না"।

বিনতা বলিল, "জ্বর কতটা আছে দেখব এখন?"

"দেখ।"

থার্মোমিটার বাহির করিয়া বিনতা জ্বর পরীক্ষা করিল। এখন ১০১° ডিগ্রী। বলিল, "বেশ খানি কমেছে। মাঝ রাতে গায়ে হাত দিয়ে মনে হচ্ছিল যেন এর চেয়ে আরো দু ডিগ্রী বেশী।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আর একটু কমবে হয়ত। তবে দিনের বেলা, বিশেষ করে বিকালের দিকে আবার বাড়বে। তুমি দুপুরে ঘুমিয়ে নিও খানিকটা।"

"নেব। দিনের বেলা আপনি যখন ঘুমিয়ে যাবেন, সেই সময় আমিও ঘুমিয়ে নেব।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোর হয়ে আসছে। আর এখন ঘুমতে ইচ্ছা করছে না। মুখ হাত একটু চা খেতে পারলে হত। তা শ্রীমান গোলকের এখনও উঠতে দেরী আছে।"

বিনতা বলিল, "তার জন্যে বসে থাকার কি বা দরকার? উপরে ইলেকট্রিক ষ্টোভ রয়েছে,

সে বাহির হইয়া গিয়া নিজের হাত মুখ ধুইয়া ফেলিল। ঘুমের ঘোরটা কাটিয়া গেল। তারপর জল একটু গরম করিয়া রোগীর মুখ ধোয়ার জন্য লইয়া আসিল। তাঁহার নির্দ্দেশ মত টুথব্রেষ্ট ব্রাশ, প্রভৃতি বাহির করিয়া আনিল, তোয়ালে আনিল, ছোট গামলা আনিয়া ছোট টেবিলের উপর রাখিল। হরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "তুমি এইবার জানালা দিয়ে পাঁচ মিনিট তাকিয়ে থাক। আমার দাঁত খিচনো মুখটা তোমাকে দেখাতে ইচ্ছা করি না।"

বিনতা হাসিয়া বলিল, "বাবা আপনি বড় বেশী fun করেন। অসুখ করেছে, এখন অত ভয়ও করলে চলে? আচ্ছা আমি ততক্ষণ চা-টা করি গিয়ে, আপনি মুখ ধুয়ে নিন", বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

খানিক পরে চায়ের ট্রে হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল। হরেন্দ্র মুখ ধুইয়া বসিয়া আছেন। বলিলেন "শুধু একটা পেয়ালা কেন? আর একটা নিয়ে এস। তুমিও খাও, সারারাত জেগে রয়েছ।"

বিনতা আর একটা পেয়ালা লইয়া আসিল। ভাবিয়া হাসি পাইল যে বেশীর ভাগ বাড়ীতেই তাহাকে বিলের সঙ্গেই চা, ভাত সব খাইতে দেওয়া হইত। হাসিটা মুখ হইতে ভাল করিয়া মুছিবার আগেই সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। হরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসছ কেন?"

বিনতাকে কারণটা বলিতে হইল। হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাদের অত দোষ দিও না বিনতা সেখানে টাকার সম্পর্কটাই ছিল শুধু। তারা টাকা দিয়েছে, তুমি কাজ দিয়েছ। এখানের সম্পর্কটা প্রা আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখানে সে রকম ব্যবহার তুমি কি করে পেতে পার?"

বিনতা কিছু না বলিয়া নীরবে চা ঢালিতে লাগিল। এক পেয়ালা চা হরেন্দ্রনাথের দিকে অগ্রস করিয়া দিয়া বলিল, "আরো আছে খানিকটা টি পটে।"

হরেন্দ্রনাথ চা খাইতে খাইতে বলিলেন, "এই কাজ করছ ত অনেক দিন, কিন্তু আপাগোড়াই resen করেছ মনে হচ্ছে।"

বিনতা তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "resent করিনি, কিন্তু মনে খুব কষ্ট পেয়েছি। ছোটবেলা গ্রামে যখন ছিলাম, তখন বড়লোক ছিলাম না, কিন্তু গ্রামের মধ্যে আমার বাবারই খ্যাতি ও সম্মান বেশী ছি পাণ্ডিত্যের জন্যে, সাধুতার জন্যে। আমি তাঁর মেয়ে হয়ে এতই নীচে নেমে গেলাম? একেবারে কি চাকরে দলে চলে গেলাম?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কষ্ট হতে পারে বটে তোমার। অদৃষ্টচক্রে মানুষকে অনেক রকম দুঃখ পো হয়। অন্য কোন লাইনে গেলে ভাল করতে। কিন্তু তোমাকে পরামর্শ দেবার বা সাহায্য করবার কে ছিল না যে। আশা করছি আমি এবার তোমার জন্যে আর একটু ভাল ব্যবস্থা করতে পারব। কো কাজটা সবচেয়ে তোমার পছন্দসই হবে তাই ভাবছি। অবশ্য রোজগারও খানিকটা করা চাইত।"

বাড়ীর চাকর-বাকরের সাড়া এইবার পাওয়া যাইতে লাগিল। বিনতা বলিল, "ওরা যখন। করবে, আপনার জন্যে আবার আনব?"

"আন। তবে স্পর্শের ধারে কাছে যেও না।"

"না, না, ও উঠবার আগেই আমি স্নান করে, কাপড় বদলে ফেলব। তাতেই হবে, না?"

[illegible] বলিলেন "তাতেই হবে। আমার সন্দিগ্ধতা ত আর বয়স করেনি। তবে মেয়ে

চায়ের বাসন-কোষণ তুলিয়া লইয়া বিনতা বাহির হইয়া গেল। সে সব যথাস্থানে রাখিয়া ব হইতেছে, এমন সময় স্বর্ণ হাই তুলিতে তুলিতে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বিনতাকে দেখিয়া জি করিল, "কেমন আছেন মেজমামা?"

বিনতা বলিল, "আছেন এখন একটু ভাল, রাত্রে বড় কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু তুমি রাস্তা দাঁড়াও চাই, আমার কাছে এসো না। আমি স্নান করে আসি আগে, তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব।

"বাবাঃ, তোমাদের এতও ঝামেলা। চরেছে ত ভাত্রী একটু জ্বর। তাতে এত ছোঁয়া ভাবনা। আমরা ত সব এক ঘরেই শুই, জ্বর হলেও।"

বিনতা বলিল, তা শোও চরত। কিন্তু এখন যে তোমার শরীর ঠিক নেই।" বলিয়া স্বর্ণকে কথা বলিবার অবসর না দিয়া সে তাড়াতাড়ি স্নান করিতে চলিয়া গেল।

স্নান করিয়া নিজে চা-টা খাইয়াই লইল। রোগীর ঘরে বসিয়া খাইতে কেমন যেন লজ্জা তাহার পর হরেন্দ্রনাথের চা লইয়া তাঁহার ঘরে চলিল। পথে রমেশের সঙ্গে দেখা। বিনতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মেজমার জ্বর খুব রয়েছে এখনও?"

বিনতা বলিল, "জ্বর আছে এখনও। তবে রাত্রে যতটা বেড়েছিল, ততটা নেই।"

রমেশ বলিল, কাল রাত্রে ফিরতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। তখন ভাবলাম, আর ডা করব না। আজ দরকার হলে আমাকে ডাকবেন।"

বিনতা বলিল, "আচ্ছা। আজ হয়ত ভালই থাকবেন।" চা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখি কম্পাউণ্ডার বীরেন দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে। বিনতাকে দেখিয়া নমস্কার করিল, তাহার পরে হইয়া চলিয়া গেল।

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। এখন অনেকেই খোঁজ-খবর নিতে আ কিন্তু শুধু আমার চা কেন?"

বিনতা বলিল, "আমি খেয়ে এসেছি।"

"আচ্ছা। ঐ ওষুধগুলো রেখে রাখ, চা খাওয়ার আধঘণ্টা খানিক পর থেকে খাওয়াতে কোরো। আমি ভাল থাকতে ত আমার বিশ্রাম নেই, অসুখে পড়লেই এক বিশ্রাম। তা সেবা যত্নের থাকলে এ বিশ্রামও কাজে লাগে না।"

বিনতা বলিল, "আজ চরত কষ্ট হবে না অত।"

"আজই খুব বেশী ভাল থাকব না। দেখা যাক্, গোলকটাকে বল ত খবরের কাগজ-টাগজ দিয়ে যেতে। তুমি কাগজ পড়ো না?"

"পড়ি, তবে ইংরিজি কাগজ সব সময় হাতে আসে না। পিসীমা একখানা বাংলা কাগজ সেটাই পড়ি, যখন তাঁর কাছে থাকি। আচ্ছা, বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়াড়গুলো বদলে কোথায় থাকে ধোওয়া চাদর?"

"ঐ আলমারিটাতে। এই নাও চাবি।"

বিনতা আলমারি খুলিয়া চাদর প্রভৃতি বাহির করিল, বলিল, "আপনার উঠবার কিছু দরকা

বিছানা ঠিক করিয়া হরেন্দ্রের কপালে হাত দিয়া বলিল, "আপনার জ্বর আর একটু কমেছে বোধহ

"মেহেরা", বলিয়া ডাক দিয়া রমেশ এই সময় ঘরে আসিয়া ঢুকিল। জিজ্ঞাসা করিল, "এ জ্বর কত ?"

"এখনই টা খেলাম, দেখব এক্‌টু পরে। তা তুই যে এসে ছুটলি, যদি infection লাগে ?"

রমেশ বলিল, "লাগে লাগবে, কলেজে কি কেউ আমাকে অত খাতির করে চলে ? কোন রোগ না ঘাঁটছি ?"

হরেন্দ্র বলিলেন, "সে কাজের খাতিরে যা কর তা কর। এখানে এখন দরকার ত নেই কিছু, বিনুই সব করছেন।" রমেশ বাহির হইয়া গেল। বাহির হইতে মোতী কি খবর লইয়া গেল, এবং গোলক খবরে কাগজ দিয়া গেল। হরেন্দ্র বলিলেন, "বিখ্যাত ব্যক্তি হলে কাগজে bulletin ছাপিয়ে দিলে হত, সকলে একসঙ্গে জানতে পারত।"

দিনের কাজ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। দুপুরের পর হইতেই জ্বর বাড়িতে আরম্ভ করিল কাজেই হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও বিনতা ঘুমাইতে যাইতে পারিল না। রোগীর ঘরেই চেয়ারে বসি মাঝে মাঝে দশ পনেরো মিনিট করিয়া ঝিমাইয়া লইতে লাগিল। হরেন্দ্রনাথ একবার জিজ্ঞাসা করিলেন "বীরেনটাকে আসতে বলব নাকি ? সে রাত্রী আছে।"

বিনতা বলিল, "আজই কিছু দরকার নেই। আমি উপরি উপরি তিন চার রাত জেগেছি কত আর এখন ত শুধু বসে আছি, করতে হচ্ছে না ত কিছু।"

"রাত্রে হবে। আচ্ছা, আজকের দিনটা দেখ। কালকেও যদি বেশ খানিকটা না কমে, তাহলে আর একটা লোক একদিনের জন্যে হলেও রাখতে হবে। নইলে তোমার নিশ্চয় অসুখ করবে, আমি সেটা একেবারে চাই না।"

সন্ধ্যা হইতে আবার মাথার যন্ত্রণা সুরু হইল, জ্বরও বাড়িল। বিনতা আবার আগের রাত্রের মত জাগিয়া কাটাইল। তবে যন্ত্রণা অত তীব্র নয়, জ্বরও অত বাড়িল না। মাথা টিপিতে হইল না, বসিয়া বসিয় চুলের ভিতর দিয়া আঙুলি চালনা করিয়াই বিনতা রোগীকে ঘুম পাড়াইয়া দিল। শেষ রাত্রের দিকে কিছুক্ষণ হাত পা টিপিতে হইল।

ভোরবেলা হরেন্দ্রনাথের ঘুম ভাঙিল। বলিলেন, "সকালের কাজগুলো করে দিয়ে তুমি ছুটি নাও আজকের মত। সন্ধ্যার আগে আর এদিকে এসো না। বীরেনকে ডেকে পাঠাচ্ছি, সে দিনের বেলাটা থাকবে। রাত্রে হয়ত আবার তোমায় ডাকতে হবে। তোমার পরিচর্য্যা ছাড়া ঘুমতে পারব না।"

বিনতা বলিল, "আপনি অনর্থক ভাবছেন দেখুন। আমি ঠিক পারব। আচ্ছা, আপনি বীরেন বাবুকে ডাকুন দুপুরের জন্যে, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, তার পর আরো তিন রাত উপরি উপরি জাগতে পারব। অবশ্য তার দরকার হবে না। আজ ত মনে হচ্ছে জ্বর আরো কমে গেছে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দাও দেখি থার্মোমিটারটা, কম হতে পারে।" জ্বর সকালে খুবই কম দেখা গেল। হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কাল হয়ত ছেড়ে যেতে পারে। মাথাটাও হাল্‌কা হয়ে গেছে, গলাটাও better এ নিতান্ত তোমার সেবার গুণে বিনতা। যেরকমভাবে আরম্ভ হল, তাতে আশা করিনি যে এত সহজে নিষ্কৃতি পাব।"

বিনতা বলিল, "আগে একেবারে সেরে যান ত ?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কাল না হয় পরশু সেরেই যাব। এক প্রকার কিছুদিন আগে বলেছিলে ঘটে যে, নীপ্‌গিরই একটা শারীরিক উৎপাতের সম্ভাবনা আছে।"

বিনতা বলিল, "এইটুকুই বলতে বুঝি তাঁর বুদ্ধিতে কুলল ? ভাল কিছু বলতে পারলেন না ?"

ডাক্তারবাবু ঢের কিছুই বলেছেন। কতদূর ঘটে ওটে সেখা যাক্। দাও এখন ওষুধ। আর আ ফিস্‌লেন্‌দারিতে একটা টেলিফোন করে এস, বীরেন যেন ঘণ্টার পরে চলে আসে। চারটে পর্যন্ত তা থাকতে হবে।"

বিনতা নির্দেশ পালন করিয়া আসিল। হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা, এখন ত অনেকটা আছি। তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। তোমার এখন কিছুর মধ্যে যাওয়া উচিত, course খুব লম্বা নয়, বর ছ'মাস থেকে একবছর। এর ভিতর গান ভাল করে শিখতে পার ? শেখাবার মত।"

বিনতা বলিল, "গানের recognised স্কুল বা কলেজ যা আছে, সেগুলোর course অন্ত ছোট চার পাঁচ বৎসর লাগবে। বাড়ীতে শেখা যায় অল্প সময়ে ওস্তাদ রেখে, কিন্তু সে একে খরচ অত্যন্ত ে তার উপর একটা ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা না থাকলে, চাকরি পাওয়ারও সুবিধা থাকে না।"

হরেন্দ্র বলিলেন, "মাষ্টারীর লাইনে যদি যাও, তা সেও চার পাঁচ বৎসরের কম হবে না। অ বি. টি. পাস না করলে ত ভাল কাজ পাবে না ?"

"সেই ত, কোনদিকেই সুগম পথ কিছু নেই।"

হরেন্দ্র বলিলেন, "অল্পসময়ে, মানে এর চেয়ে অল্প সময়ে, নার্সিংএর ডিপ্লোমা তোমার যেতে পারে। অনেকদিন একাজ করেছ, সেটারও খানিক মূল্য আছে। তবে এই লাইনের দো তোমার যতই থাক, কাজটা তুমি পছন্দ কর না। আমারও ভাবতে ভাল লাগে না যে তুমি চিরকাল ে খেটেই দিন কাটিয়ে যেবে। আরো ত একটা লাইন আছে অবশ্য, কিন্তু সে বিষয়ে ভাল খোঁজ-খবর না নিয়ে কিছু বলব না।"

আর সামান্য কিছু পথ্যও সেবন করিলেন। খাইয়া-দাইয়া বিনতা যখন আবার হরেন্দ্রন ঘরে ঢুকিল, তখন বীরেন আসিয়া বসিয়া আছে। ঔষধাদি কখন কি দিতে হইবে সব তাহাকে বুঝ দিয়া বিনতা বলিল, "ঠিক চারটে বাজলেই আসব আমি। আপনার চা একেবারেই নিয়ে আসব।"

ঘরে ঢুকিতেই শুনিল স্বর্ণের ঘরে উচ্চকণ্ঠে কাহারা গল্প করিতেছে। আজ ছুটির দিন, হে কলেজ নাই, তাহারই গলা। স্বর্ণের কোন এক প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "যেবারে আবার ভ বা জোর কপাল নিয়ে জন্মেছেন। আমাদের জ্বর হলে কেউ কখনও বাঁচা যেরেও জিগ্‌গেস করে আর ওঁকে দেখ, এমন যোলাযেম সেবা পাচ্ছেন যে মাথা ধরা সারার বদলে আরো বেড়ে যাবে। বল কি লোকে হাতছাড়া করতে চায় সহজে ?"

স্বর্ণ বলিল, "তুমি বড় কাজিল বাপু। নার্স সেবা করছে তাও তোমার সয় না ? নি গেলেই পারতে ?"

"আমাকে ত ঘরে ঢুকতে দিতেই চাও না, যেমন। নার্স বটে, তবে ওঁর নার্স

"তা নাই এল। ওর ত আমার পিছনে বেশী খাটতে হচ্ছিল না, বসেই ছিল প্রায়। এক মানুষ অত কষ্ট পাচ্ছে, দেখে যাবে না? তাও বেহদ্দার মত মানুষ, যিনি নাকি সকলের জন্যে করতে প্রস্তুত।"

"সাধে কি আর বলি মেজদার কপাল চাল? তুমি যেন চীজ, তুমিও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমু" গল্পটা এবার তাহাদের অন্যদিকে চলিয়া গেল।

কথা শুনিয়া প্রথমে বিনতার রাগ হইল, কি কাহিল ছেলে, সত্যই। তাহার পর তা তাহার বাঁচিয়া সেবা করিতে যাওয়ার এইরূপ অর্থ মানুষে করিলেও করিতে পারে। অন্ত কত জায় সে কাজ করিয়াছে, কিন্তু যাহা নিষ্কাম কাজ, তাহার বেশী করে নাই। কিন্তু কোথায় বা সে কি পাওনার বেশী পাইয়াছে? এখানেও ত দেনা-পাওনা সমানই যাইতেছে না? সে পাইতেছে যে দিবার ইচ্ছাও তাহার বেশী। যাহা পাইতেছে তাহারও বেশী কি? চিন্তার ধারাটা সে জোর করি অন্যদিকে ঘুরাইয়া লইল।

দুপুর বেলা খানিকক্ষণ ঘুমাইল। অবশ্য যতক্ষণ ঘুমাইবার ইচ্ছা ছিল তাহা পারিল না। ম ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। বীরেন ঠিকমত পরিচর্য্যা করিতে পারিতেছে কিনা কে জানে? ঘরির ঘ ঠিকমত আছে কি? ঘড়ি দেখিল প্রায় তিনটা। এখনও ঘণ্টাখানিক তাহার ছুটি আছে। কি করি কাটান যায়? বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু মন ভাল করিয়া লাগিল না।

অবশেষে চায়ের জোগাড় করিল। বিনতা উঠিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, চুল বাঁধিয়া প্র হইয়া লইল। চা তৈরি হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য বাহিরের ঘরে গেল। গোলক চা করিতে চা ও খানকতক বিস্কুট লইয়া হরেন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকিল। বীরেন নাই, হরেন্দ্র একলাই ত বই পড়িতেছেন।

চায়ের ট্রে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বিনতা জিজ্ঞাসা করিল, "বীরেনবাবু এরই ম চলে গেছেন?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অনিচ্ছুক মানুষকে বেশীক্ষণ ধরে রাখতে ভাল লাগে না। তাই আধ আগেই ছেড়ে দিয়েছি। তুমি চা খেয়েছ?

"না খাইনি। আমারটাও নিয়ে আসছি।" বলিয়া বাহির হইয়া গিয়া একটা পেয়ালা ল আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন এখন? জ্বর কি উঠেছে? মাথা কেমন আছে?"

হরেন্দ্র বলিলেন, "জ্বর সামান্য একটু আছে। মাথাটা ত ভালই behave করছে এখনও পর্য্য স্বর্গ বেরিয়ে গেছে বোধহয়?"

বিনতা বলিল, "কোথায় গেল?"

"একটু আগে আবেদন পাঠিয়েছিল তার বিকে দিয়ে। সে তার শিসশাশুড়ীর বাড়ী যেতে চ রাত্রে আসবে। একলা বি তার গল্প করার স্পৃহা মিটতে পারছে না বোধহয়। যেতেই বল'ম। গ তাদের পৌঁছে দিয়ে ফিরল কিনা, সেটার খবর নিও খানিক পরে। চা-টা ঢাল। তোমারও কি বিস্কু দিয়ে খাবে?"

বিনতা বলিল, "বিকেলে আমি চিরকাল শুধু চা খাই। এখানে আপনি জেদ করেন ব

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নিতান্ত আর দুজন প্রাণী তোমার উপর নির্ভর করে আছেন তাই, না হ চাকরী-বাকরীর তোমার দরকার ছিল না। দিব্যি শিলীমার বাড়ী না খেয়ে বসে থাকতে। আচ্ছা, এক কথা জানতে চাই। তুমি বিধবার মত বেশ কর কেন?"

মিনিট খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বিনতা বলিল, "দেখলাম এই বেশটা একটু আড়ালের কা করে। মানুষে বেশী নজর দেয় না।"

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "নজর দেওয়ার উৎপাতও ঘটেছে তা হলে?"

বিনতা বলিল, "কিছু কিছু এ উৎপাত সকলকেই সহ্য করতে হয়। "যিনি আমার কাজ দে সেই মিসেস্ রক্ষিত আমায় প্রথমেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ভয় না পেতে, upset না হতে।"

হরেন্দ্র বলিলেন, "বিধবা সেজে বিশেষ কিছু লাভ হয়েছে?"

"খুব না হোক, কিছু হয়েছে। একটু যেন দৃষ্টিপাতের অযোগ্য ভাবে মানুষরা।"

হরেন্দ্র বলিলেন, "ভাল। স্বজাতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা কিছু বাড়ছে না। আচ্ছা, এইবার চা বাসনগুলো সরিয়ে রেখে এস। যদিও বেজেছে মোটে সাড়ে চারটা, তবু মেঘের কল্যাণে অন্ধকার এসেছে। একবার ইচ্ছা করছে আলো জ্বালতে, আবার এই বাদল অন্ধকারটা উপভোগ করতেও ই করছে। একটা গান শুনিয়ে যেতে?"

"আপনি শুনতে চাইলেই গাইতে পারি। কি গান গাইব?"

বালিশে ঠেস দিয়া একটুখানি উঠিয়া বসিয়া হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সেদিন "এরে তিখ সান্ত্বনায় কি রস তুমি করিলে," গেয়েছিলে। গানটা অপরূপ, তুমি গেয়েও ছিলে অতি সুন্দর কা কিন্তু ও গান আজ শুনতে চাই না। তুমি মীরাবাইএর গান-টান কিছু গাও আগে। তারপর বা গান শুনব। সর্ব্বশেষের জন্যেই মিষ্টি জিনিষ রাখতে হয়।"

বিনতা প্রথমে গুনগুন করিয়া, পরে একটু গলা চড়াইয়া গাহিল,

"মেরে জনম মরণকে সাথী,
তুঝে নহী বিসরুঁ দিন রাতি।
তুঝ্ দেখ্যা বিন কলন পড়ত হ্যয়, জানত মেরী ছাতী।
উঠী চল্ চল্ পন্থ নিহারুঁ, রোম্ রোম্ আঁখিয়াঁ রাতী"

চোখের উপর হাত চাপা দিয়া হরেন্দ্রনাথ গান শুনিতেছিলেন। হঠাৎ হাত সরাইয়া বলি "গানেটা জান নিশ্চয়ই?"

"জানি"।

"একটু বল ত।"

বিনতা বলিল, "হে আমার জনম মরণের সাথী, তোমাকে যেন দিন রাত্রিতে কখনও ভি না হই। তোমার দর্শন বিনা শান্তিলাভ হয় না, আমার অন্তর ইহা জানে। উঠে উঠিয়া আমি তো [illegible]

বিনতা বলিল, "বাবার কাছে কোথাকি 'ব্রহ্মসঙ্গীত' ছিল, তাতেই এ ব্যাখ্যা ছিল। বাবা গা করবার সঙ্গে এগুলিও মুখস্থ করিয়েছিলেন।"

হরেন্দ্রনাথ মিনিট দুই চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "গানটাই তোমার ব্যবসা career হত, কিন্তু বড় বেশী সময় লাগবে। খুব যদি আধুনিকা হতে, তাহলে বলতাম play back singer হও, তাতে পয়সাও ছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ তোমার ভাল লাগত না।"

বিনতা বলিল, "ভাল সত্যিই লাগত না। গান গাই প্রাণের শান্তির জন্যে। কিন্তু পয়সা বাড়িয়ে সারাক্ষণ যে যা গাইতে বলবে তাই গাইব, এ হয়ত ভাল লাগত না।"

এমন সময় হরেন্দ্রনাথের দুই বন্ধু তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপা সাহায্যে ঘরে আরো গোটা দুই তিন চেয়ার আনাইয়া দিয়া বিনতা প্রস্থান করিল।

সে রাত্রে হরেন্দ্র ভালই ঘুমাইলেন। পরদিন সকালে দেখা গেল, তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে

৬

সকাল হইতেই বিনতাকে ডাকিয়া হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার ব্যবহার করা সব কি ধোপারবাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

বিনতা বলিল, "আজকের দিনটা না দেখেই?"

"কতকগুলো ত দিয়ে দাও। আর নিজের কাপড়-চোপড় সব Dettol দিয়ে কেচে না আবার ত সকলের সঙ্গে মেলামেশা করবে।"

"আচ্ছা, তা দিচ্ছি। ডিসপেন্সারির কাউকে কিছু খবর দিতে হবে?"

"বীরেনটাকে একবার ডেকে দিও। আর দেখ নিজে খুব ভাল করে বিশ্রাম কর। কিন্তু যেন অসুখ না করে।

বিনতা বলিল, "আমার হাড় শক্ত হয়ে গেছে। রাত জাগা নূতন নয় আমার কাছে, infectionএ সম্বন্ধেও আমার একটু immunity হয়ে গেছে। আমার কোনো অসুখ করবে না।"

"অত বড়াই আগেই কোরো না, দেখ দু চার দিন।"

সেদিনটা ভালই গেল। কোনো অসুখ কাহারও করিল না। দুপুরে নিরুপদ্রবে অনেক ঘুমাইয়া লইল বিনতা। মধ্যে মধ্যে গিয়া হরেন্দ্রনাথের খোঁজ লইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার শারীরিক কোন কষ্ট আছে বলিয়া বোধ হইল না।

দু একদিনের ভিতরই হরেন্দ্রনাথ উঠিয়া পড়িলেন। যেদিন অনুপস্থা করিলেন, সেইদিন খাবার টেবিলে বসিয়া বলিলেন, "নিজে ত সারলাম, এখন রুগীগুলির আমার কি দশা হয়েছে, দেখ হয়। ক'টা মরল কে জানে? তাদের দেখার ভার অবশ্য আর একজন ডাক্তারের হাতে দিয়েছিল তবে তিনি কতদূর কি করতে পেরেছেন জানি না।"

স্বর্ণ বলিল, "এখনই আবার ছুটোছুটি করবে? দুর্বল লাগে না?"

"লাগছে খানিকটা। খুব ছুটোছুটি এখনই করতে পারব না। তবে সকালের দিকে একবার ঘ বেরতে হবে। কয়েক দিন এখন এই রকম চলুক। তারপর আবার আস্তে আস্তে ফিরে যেতে হবে আগ

স্বর্ণ বলিল, "সময় কোথায় পাবে? আমার ঝি ঠাকুরুণ ত আবার চললেন। তাঁর যে অসুখ করেছে।"

বিনতা বলিল, "তোমার কাজ আর কতটুকু? ওরই মধ্যে তের সময় করতে পারব আমি।"

স্বর্ণর তখন চিঠি লেখার প্রয়োজন ছিল, সে উঠিয়া গেল। বিনতাও উঠিতে যাইতেছিল, হরেন্দ্র বলিলেন, "তোমার এখনই কোন কাজ আছে?"

বিনতা বলিল, "এখনই কাজ কিছু নেই।"

"তাহলে বোসো এখানে একটু। তোমার সঙ্গে খানিক আলোচনা দরকার।"

বিনতা বসিল। হরেন্দ্র বলিলেন, "মেয়েদের অনেক রকম career ত আছে আজকাল, চিরকালের careerটার বিষয় কি ভেবেছ তুমি?"

বিনতা কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "কিসের কথা বলছেন আপনি?"

"এই ঘর-সংসার করা। যা সব মেয়েই করে আমাদের দেশে।"

বিনতা বলিল, "তা ত আমার আর হওয়া সম্ভব নয়, আপনি ত জানেন আমার ইতিহাস, আর সেখানেও জানেন।"

"জানি সবই। গ্রামে ফিরে গিয়ে বিয়ে কর যাকে হোক একটা, এ আমি বলছি না। সম্ভব হয়ত নয়। কিন্তু ধর এমন ছেলে যদি পাওয়া যায়, যার এসব কুসংস্কার নেই, রাষ্ট্রীয় যে তোমাকে স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে। কলকাতাই থাকবে তোমরা, পল্লীসমাজ নিয়ে তাহলে হবে অবশ্য খুব উদার হৃদয়, সচ্চরিত্র ছেলে হওয়া দরকার, যে তোমার পূর্ব ইতিহাসের কথা জীবনে আর না। এ রকম যদি পাওয়া যায়, ত কি বল তুমি?"

বিনতা অনেকক্ষণ নীরব রহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "দেখুন এ বিষয়ে কারো সঙ্গে কথা বলিনি আমি, বলবার কেউ ছিলও না। আজ আপনাকে বলছি। আপনি আমার অনাত্মীয় এ সঙ্কোচ আমি করব না। নিকটতম আত্মীয়কে যে ভাবে বলতাম, সেই ভাবেই বলছি। গ্রাম থেকে পালিয়ে আসি, তখন স্থিরই করেছিলাম, বিয়ে আমি আর করব না। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদের পুরোপুরি মানুষ ভাবে না, মানুষের মত ব্যবহারও করে না, তাদের সঙ্গে। আর আমার পাশা খেলা হবার ইচ্ছা ছিল না। তবে সেটা অত্যন্ত আঘাত খাওয়ার একটা প্রতিক্রিয়া। ক্রমে সে আঘাতটা জুড়িয়ে মন আর মতের কিছু পরিবর্তন হল। আমি মানুষ ও সমাজ আগাকে যাই ভাবুক। তাই সাধারণ মত ঘর-সংসার করার ইচ্ছাও যে কখনও হয়নি তা বলতে পারি না। তবে এক বিষয়ে মত আমার হইল।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি বিষয়ে?"

মাথা নীচু করিয়া মৃদুকণ্ঠে বিনতা বলিল, "নিজের ভরণপোষণের জন্যে বিয়ে আমি করব এমন কাউকে বিয়ে আমি করব না, যাকে আমি ভাল করে না চিনি। শুধু আমার জন্যেই যে নিতে চায় এমন মানুষ যদি কেউ থাকেন তাহলে আমি ভেবে দেখতে পারি। তাও যদি তাঁর আমার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস থাকে। বিয়ের পর আমি হঠাৎ আবিষ্কার করতে চাই না যে নিতান্ত ভুল করেছি।"

তবে এরকম ছেলে পেতে হলে তোমার পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করা দরকার। আর সকল দিক দিয়ে যোগ্য পাত্র অন্য লোকে খুঁজে দিতে পারে, কিন্তু তুমি কাকে ভালবাসতে পারবে, সে তুমি ছাড়া কে বুঝবে? যদি তোমার ক্লান্তি না থাকে, তবে কয়েকজন মানুষের সঙ্গে আমি তোমার আলাপ করিয়ে দিতে পারি। মানুষগুলি সচ্চরিত্র এবং পরিবার প্রতিপালনে সক্ষম নিশ্চয় হবে, এই অবধি আমি বলতে পারি। বাকিটা, তোমার নিজের পরখ করে নিতে হবে। আমি বলছি না যে তুমি এখন থেকে কাজকর্ম পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে খালি এই এক চিন্তা নিয়ে থাক। তুমি যা করছ সবই কর, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের এই দিকটার সম্ভাবনাটাও ভাব। কেমন রাজী আছ?"

বিনতা বলিল, "আপনার কথায় রাজী আমি হবই, যা আপনি করতে বলেন। আমার কল্যাণাকাঙ্ক্ষী এবং কল্যাণ করতে সক্ষম, পৃথিবীতে আর কেউই নেই। আপনি আমার জন্যে যা ব্যবস্থা করবেন তাতে আমার অমঙ্গল কখনও হবে না।"

হরেন্দ্রনাথ একটু বিদ্রূপভাবে হাসিয়া বলিলেন, "অতখানি বিশ্বাস কাউকে কি করা যায় বিনতা? মানুষ চেষ্টাই করতে পারে অন্যের কল্যাণের জন্যে, কিন্তু ফলাফল ত ভগবানের হাতে? যা হোক, চেষ্টাটা ত করব। আর দেখ, আর একটা কথা।"

বিনতা বলিল "বলুন।"

তুমি এই বিধবা সেজে বেড়ানটা ছাড়। ধরেছিলে যখন প্রথম তখন নজর এড়াবার জন্যে ধরেছিলে। এখন যে নজরটাই পড়া দরকার তোমার উপর? ভাবী বধূকে কেউ এরকম সজ্জায় দেখতে চায় না। চেহারাটা ত তোমার ভালই, সেটার স্বাভাবিক শ্রী অবলুপ্ত করার এমন প্রবল চেষ্টা নাই বা করলে?"

বিনতা বলিল, "সে ত অর্থ সাপেক্ষ ব্যাপার, এখনি করা শক্ত। তা ছাড়া লজ্জাও করবে।"

লজ্জার কথা ছেড়ে দাও, তুমি ত অন্যায় কিছু করছ না? আর অর্থ যা লাগে তা আমি দিচ্ছি। এতে কিছু সঙ্কোচ কোরো না। আমাকে অনাত্মীয় তুমি ভাব না, সেই রকম করেই এটা নাও যেন বড় ভাইয়ের কাছ থেকে নিচ্ছ। তাতেও তোমার খারাপ লাগে ত ধার বলেই নাও। যখন পারবে তখন ফেরৎ দেবে।"

বিনতা বলিল, "তাই দেব।"

টেলিফোনে ডাক আসাতে, হরেন্দ্রনাথ উঠিয়া গেলেন। বিনতা কিছুক্ষণ খাইবার ঘরেই বসিয়া রহিল, তাহার পর উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। পড়াশুনা তখন করা চলিত, কিন্তু কিছু করিতে ইচ্ছা করিল না। বই নাড়িয়া-চাড়িয়া সরাইয়া রাখিল। অনেকক্ষণ শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিল, তাহার পর কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল। জাগিল যখন তখন প্রায় চা খাওয়ার সময় হইয়া গিয়াছে।

খাইবার ঘরে আসিয়া দেখিল, সকলেই উপস্থিত, এমন কি ছুটির দিন বলিয়া রমেশও হাজির। মর্ম বলিল, "অন্যদিন সবার আগে বিনতাদিই আসে ব্যবস্থা করতে, আজ সেই সব শেষে এল। এরকম করে ত কখনও ঘুমোও না তুমি? শরীর-টরির খারাপ ত করেনি?"

"না শরীর খারাপ করেনি, অনেকদিন ঘুম কম হয়েছিল, আজ তাই একটু ঘুমিয়ে নিলাম। কে কাল ছিল নাকি কিছু?"

হয়েছে আজ। ইচ্ছে করছে কোথাও বেড়িয়ে আসি, বা একটা সিনেমা দেখে আসি। কিন্তু কেই নিয়ে যাবে? আমি ত শহুরে মেয়েদের মত সব জায়গায় হট হট করে একলা ঘুরতে পারি না?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বিনতা যাবে?"

বিনতা বলিল, "সিনেমা দেখতে ত ইচ্ছা করছে না, তবে বেড়াতে গেলে যেতে পারি। হাওয়া লাগানোও মাঝে মাঝে দরকার।"

হরেন্দ্র বলিলেন, "তাহলে চল সকলে মিলে একবার ময়দানেই ঘুরে আ ইাটাটা স্বর্ণর দরকার। রমেশ যাবি?"

রমেশ বলিল, "তোমরা যে আজ বেরুবে, তা ত জানা ছিল না? আর একটা appointment ফেলেছি যে?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা তবে যে যে যাবে, সে সে ready হও। আমিও আসছি একটু থেকে, বলিয়া উঠিয়া গেলেন।"

স্বর্ণ অবশ্য রঙীন শাড়ী, গয়না পরিয়া রীতিমত সাজিয়া আসিল। বিনতার চুল বাঁধা ছাড়া কিছু করিবার ছিল না। হরেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "তোমার বাজার হাট কি ক হবে বিনতা, তাড়াতাড়ি করে নাও। স্বর্ণকে নিয়ে এরপর তোমাকে প্রায়ই বেরুতে হবে। তখন এ উষা সন্ধ্যা সেজে বেরলে চলবে না। একরকম কাপড়-চোপড়ই পরতে হবে।"

স্বর্ণ বলিল, "সত্যি মেজমামা, কি যে মেয়ের জেদ, ভূত সেজে সে বেড়াবেই। এই ত বা লজ্জাও করে না। এখনই না হয় বিয়ে হয়নি, কিন্তু হবে ত একদিন, মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছে? রকম কি করতে আছে? ভাবী স্বামীরও অমঙ্গল হয় এতে।"

হরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "যাও, স্বর্ণ শিরোমণি কি বিধান দিচ্ছেন শোন। কোন হতভ পরমায়ু ক্ষয় করছে কে জানে?"

বিনতা বলিল, "বদলেই ত ফেলছি সাজপোষাক।"

ময়দানে খানিক বেড়ান হইল। স্বর্ণেরই বেড়ান সবচেয়ে প্রয়োজন, কিন্তু হাঁটিতে সব অনিচ্ছুকও সেই। এতবার তাহার বলিবার প্রয়োজন হইল যে তাহার মেজমামার শেষে বিরক্তিই গেল। বলিলেন, "থাক আজ আর দরকার নেই, নিজেকে খুব বেশী শ্রান্ত করে ফেলা ঠিক নয়। কোনো দোকানে যেতে চাও?"

বিনতা বলিল, "সময় ত হয়েছে ঢের, গেলেও হয়।"

তাহারা ফিরিয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া হরেন্দ্রনাথ একটা বড় দোকানে ঢুকিলেন, এবং জোর করিয়াই খান দশ শাড়ী ও কয়েকটা জামার কাপড় কিনিয়া বসিলেন। এগুলি জিনিষ এবং দামী জিনিষ কিনিবার ইচ্ছা বিনতার ছিল না, কিন্তু হরেন্দ্রনাথের উপর কথা কহিতে পারিল না।

আবার গাড়ীতে উঠিয়াই স্বর্ণ বলিল, "কি সুন্দর সুন্দর শাড়ী ভাই, দেখলেই দোকান শুদ্ধ কিনতে ইচ্ছে করে। আসুক ও, এই পাঁচ ছ'দিন পরেই ত আসছে, চারখানা শাড়ী অন্ততঃ না আমি ছাড়ছি না।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দোকানে থাকতে বললে না কেন? চারখানা শাড়ী কি আর

"আহা, আমি কি পাগল নাকি? এখে ত খাওয়া-দাওয়া, ডাক্তার, নার্স, কি, কোন খরচা আর আমার জন্যে না হচ্ছে? এর উপর আবার শাড়ী কিনি। কেন ও রেখে না কেন? বেশ আর করছে বাড়ী বসে, আমার জন্যে ওকে করতে হচ্ছে বা কি?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাঁ, compound interest শুদ্ধ সব আদায় করে নিও। কী কি রেখে কেন।

বাড়ী আসিয়া বিনতা শাড়ী জামার বোঝা লইয়া একবার নিজের ঘরে ঢুকিল। তাহার ঘরে এখন ড্রেসার সহ ড্রেসিং টেবিল আসিয়াছে। শাড়ীগুলি তাহার ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া ভাবিল, "কোথা থেকে কোথায় যে ভেসে যাচ্ছি জানি না। নিজে কোনো দিনই হয়ত এসব আবার পরতাম না, কি ওর কথা অমান্য করার ক্ষমতা আমার নেই।"

সকালে উঠিয়া নরম পাড় ধুতি আর সে পরিল না। নক্সাকাটা লাল পাড়ের শাড়ী পরিয়া বাহির হইল। স্বর্ণ একেবারে হাততালি দিয়া উঠিল, "দেখ মেজমামা, চেহারা ওর একেবারে বদলে গেছে না? বয়সও যেন কমে গেছে।"

মেজমামা বলিলেন, "বয়েসটা ওর আসলে কমই। তাড়িকী হবার জন্যে বাড়িয়ে বেশী বলেন।"

বিনতা হাসিয়া বলিল, "মোটেই তা নয় মামিমা। বাড়ীতে যখন ছিলাম, তখন মা জেদ করতেন চার বছর বয়েস কমিয়ে বলার জন্যে। যখন আমার আঠারো বছর বয়স তখন চোদ্দ বছর বলা হত দেখতে আমি ঠিক আঠারো বছরের মতই ছিলাম, কাজেই কিসের জন্যে যে বলা হত জানি না।"

স্বর্ণ বলিল, "ও বাপু বলতে হয় পাড়াগাঁয়ে। আমার ত প্রায় কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে কিন্তু বলা হত তখন ষোলো।"

চায়ের টেবিল ছাড়িয়া অতঃপর যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। হরেন্দ্রনাথ আজ কাজে বাহির হইলেন একবার। যাইবার সময় বিনতাকে বলিয়া গেলেন, "আজ আমার এক ডাক্তারবন্ধু হয়ত খেতে আসবেন, তোমার রেঁধো। আর দেখ একটা লোক আসবে আন্দাজ দশটার সময় কিছু সোনা জিনিষ নিয়ে। তার কাছ থেকে বালা হোক, চুড়ি হোক, কিছু একটা নিও নিশ্চয়। দাম বেশী কি কম সে সব তুমি ভাবতে যেয়ো না। আমিই ওদের বাড়ীর ডাক্তার, কাজেই টাকার ব্যবস্থা সেই সূত্রে হয়ে যাবে।"

বিনতা বলিল, "কাজ করতে এসে আমি যে এক উৎপাত হয়ে দাঁড়ালাম আপনার পক্ষে আমার ভারি লজ্জা করছে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "উৎপাত আবার কি? তুমি ত টাকা ধার নিচ্ছ। আর কাজ করতে এসেছিলে সেটা নাইবা ভাবলে? রক্তের সম্পর্কে আত্মীয়তা ছাড়াও অন্য আর একরকম আত্মীয়তা আছে সংসারে? বন্ধুত্বের সম্পর্ক বলে একটা জিনিষ আছে যা রক্ত সম্পর্কের কাছাকাছিই যায়। একজন আর একজনের জন্যে অনেক কিছু করতে পারে এ ক্ষেত্রে। এতে লজ্জার কিছু ত নেই? এই যে এত করে সেবা করলে আমার, এতে ত লজ্জাবোধ করলাম না আমি? এটা ত তুমি বন্ধুত্বের দিক দিয়েই করেছিলে, পয়সার জন্যে করোনি? পয়সা দিতে গেলে নেবে?"

বিনতা বলিল, "তা কখনও আমি নিতে পারি?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, তবে আমার কাজটাও এইদিক দিয়েই বিচার কোরো। আচ্ছা চলি এখন।

বিনতা নিজের দিনের কাজের দিকে মন দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মনটা তাহার বড়ই বি হইয়া রহিল। কোনো কাজে যেন রস পাইল না। জীবনের ধারা তাহার এক খাতে বহিতেছিল, যে মাঝপথে তাহা অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল, জোর করিয়া স্রোতটাকে ভিন্নমুখী করিয়া দিল। ইহাতে কল্যাণ হইবে না অকল্যাণ হইবে? সে বুঝিতে পারে না। কিন্তু তাহার এতবড় হিতাকাঙ্ক্ষী উ মানুষ আর আছেই বা কে? তিনি যাহা চাহিতেছেন, তাহা না করিয়া সে পারে কি?

গহনা লইয়া লোক যথাকালেই উপস্থিত হইল। স্বর্ণত মহা খুসি অমন সুন্দর সুন্দর জিনিষ যে এত সুন্দর জিনিষ থাকিতে বিনতা যে কেন দুগাছি প্লেন্ কলী পছন্দ করিল, তাহা সে তা পাইল না। যাহা হউক, সেই দুগাছিই পরাইয়া বিনতার হাত দুখানা অনেকবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সে বলিল, "কি সুন্দর হাত তাই তোমার? এত খাট হবু কিরকম নরম।"

হরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন ঘণ্টার পরে। বিনতার অলঙ্কার পরা হাত তাঁহার দুই এড়াই

চা খাইবার সময় হরেন্দ্রনাথের এক ডাক্তার বন্ধু, ডাক্তার অমূল্য গুহ আসিয়া উপস্থিত হই বয়সে হরেন্দ্রের অপেক্ষা কিছু ছোট মনে হয়। চলনসই চেহারা, সুশ্রীও নয়, কুৎসিতও নয়। ক ভালই বলেন। বিনতা বুঝিতে পারিল না যে ইনি কি সূত্রে আসিয়াছেন। বিনতার সঙ্গে আলাপ কর জন্যই কি ইঁহাকে আনা হইয়াছে, না অন্য কারণে আসিয়াছেন? বোঝা গেল না ঠিক।

যাহা হউক, সে সকলকে চা জলখাবার পরিবেশন করিল, কথাবার্ত্তাও বলিল। স্বর্ণ আসিয়া বসিল বটে, তবে কিছু পরেই উঠিয়া পলায়ন করিল। হরেন্দ্রনাথ আর বিনতা বসিয়া অ সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। রমেশ সন্ধ্যার দিকে একবার আসিল, চা খাইতেও বসিল। ডাক্তার চিনিত আগে বোধহয়, দুচারটা কথাবার্ত্তা বলিল। দৃষ্টিটা কিন্তু তাহার সুসজ্জিতা বিনতার দিকেই আট রহিল। হরেন্দ্রনাথ সেটা লক্ষ্য করিতেছেন দেখিয়া শেষে অপ্রস্তুত হইয়া চোখ ফিরাইয়া লইল।

অতিথি চলিয়া গেলে স্বর্ণ আবার আসিয়া বসিল। বলিল, "তোমাদের সবই সাহেবীয়ানা যেখে গ্রামে অমন হট্ করে লোককে অন্দরমহলে আনে না, বাইরে বসায়, সেইখানেই খেতে দেয়

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার আবার সদর অন্দর কি? আইবুড়ো লোকের বাড়ী।"

স্বর্ণ বলিল, তা হলই বা হয়, মেয়েছেলে এখন রয়েছে ত দুজন?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। এখানে অত পর্দ্দ মানে না। এই যে এত সিনেমার ভক্ত, সেখানে কি ঘোমটা দিয়ে আলাদা জায়গায় বোস?"

"আহা, সে হল, সব অচেনা, তাদের কে ধরছে? আচ্ছা মেজমামা, যাবে একবার সি নিয়ে? তুমি ত বিকেলে এখন ক'দিন কাজে বেরবে না।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যেতে পারি, সবাই যদি যায়। কাল যাব না হয়। রমেশ কাল আর কোনো appointment কোরো না।"

রমেশ বলিল, "আচ্ছা।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহলে আজই টিকিট কিনে রেখে দেব। কি ছবি দেখবে? ইংরিজি, না হিন্দী?"

স্বর্ণ বলিল, "ইংরিজি ত এক অক্ষর জানি না, হিন্দিও জানি না ভাল। বাংলাই দেখব। ে

"তোমায় দেখতে নিয়ে যাচ্ছি যখন, তখন তোমার পছন্দমত ছবিই যাবে।"

সেদিন চায়ের পরবর্ত্তী সভা আর বেশীক্ষণ বসিল না। গৃহস্বামী তাঁহার নীচের ঘরে একজন রো দেখিতে গেলেন। স্বর্ণ ছাদে উঠিল বেড়াইবার জন্য, রমেন প্রস্থান করিল। বিনতা খানিকক্ষণ নিজে ঘরে বসিয়া বই পড়িবার চেষ্টা করিল, ভাল লাগিল না, সেও তখন স্বর্ণের অনুসরণে উপরে উঠিয়া গেল মোতী তখনও বাড়ী যায় নাই, রাত্রে যাইবে তাহার সঙ্গে স্বর্ণের একটা কি গভীর আলোচনা চলিতেছিল একলা একলা খানিকক্ষণ বেড়াইয়া বিনতা নীচে নামিয়া গেল। মোতলার মানুষজন কেহ আছে বলি মনে হইল না। সব ঘরই অন্ধকার। পড়াশুনা করিবার আবার চেষ্টা করিল, পারিল না। মনে অস্বাভাবিক ভারাক্রান্ত অবস্থায় নিজেই অবাক হইয়া গেল। তাহার ভিতর যেন দুইজন নারী বাস করিতেছে একজন বুদ্ধি দিয়া সব বোঝে, সেই ভাবেই নিজের জীবনকে চালিত করিতে চায়, অন্যজন কিছু বোঝে না তাহাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য এক শক্তি তাড়াইয়া লইয়া বেড়ায়।

পরদিন সকাল হইতেই স্বর্ণ সিনেমার ভাবনা ভাবিতে বসিয়া গেল। কি পরিয়া সে যাইবে? গল্পটা কি রকম? কে কে যাইবে? কখন প্রস্তুত হইতে হইবে? মেজমামা টিকিট করিয়াছেন কি না? সন্ধ্যা হইতে তাহার যেন আর তর সহে না।

তাহার তাড়ায় সকলেই যথা সময়ের পূর্ব্বে প্রস্তুত হইল, এবং বাহির হইয়াও পড়িল। হরেন্দ্রনা বলিলেন, "দেখ কেমন লাগে। তোমার গান শুনবার আগ্রহে "তানসেনে"র টিকিটই কিনলাম। ছিস্কিট সহজ, আর গল্পও তুমি খানিক খানিক শুনেই নিয়েছ। বিনতারও ভাল লাগবে, যা গানের ভক্ত তুমি এসেই পড়েছি যখন তখন যথাস্থানে গিয়েই বসা যাক্।"

উপরে উঠিবার আগেই একজন যুবক আসিয়া হরেন্দ্রনাথকে নমস্কার করিল। তিনি বলিলেন ঠিক সময়েই এসেছেন, উপরে উঠে গেলে খোঁজ পেতে দেরি হত, অন্ধকারের মধ্যে। বিনতা, ইনি আমা এক বন্ধু মৃগাঙ্ক দত্ত।"

বিনতা নমস্কার করিল, যুবকটি প্রতিনমস্কার করিল, তবে তাহার চোখের দৃষ্টিতে সামান্য যেন এক বিস্ময়ের ভাব দেখা গেল। বিনতা বুঝিল, এই সেই ছেলে যে স্বপ্নার মেয়ার দিন বরের সঙ্গে গিয়াছিল তাহার মামার বাড়ীর দেশের ছেলে। সেদিন বিধবার বেশে তাহাকে দেখিয়াছিল, আজ এত সুসজ্জি দেখিয়া অবাক হইতেছে বোধ হয়।

উপরে গিয়া সকলে নিজ নিজ আসন অধিকার করিল। হরেন্দ্রনাথের পাশে বিনতা, তাহার পা স্বর্ণ, স্বর্ণের পাশে রমেন। সর্ব্বশেষে মৃগাঙ্ক। বিনতা বুঝিল মৃগাঙ্ক হরেন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণেই আসিয়াছে পীড়িত চিত্তে ভাবিল আমি ভদ্রলোকের গলায় যেন কাঁটার মত আটকাইয়া গিয়াছি। কোনোমতে কাহারও ঘাড়ে গছাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচেন। কিন্তু ছি, ছি, এমন অকৃতজ্ঞ আমার হওয়া উচিত নয়। উঁহার কোনো দায় ছিল না, আমাকে এমনিই বিদায় করিয়া দেওয়া যাইত। আমার কল্যাণ কামনা করেন বলিয়াই তাঁহার এ চেষ্টা। কিন্তু এ চেষ্টায় কোনো ফল হইবে কি?

ছবি সকলের ভালই লাগিল। স্বর্ণ আহা উহু করিল বিস্তর, স্থানে স্থানে তাহার চোখে জল আসিয়া গেল। হরেন্দ্রনাথ বিনতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কেমন লাগছে বিনতা? গানগুলো শিখে নিতে পারবে, একবার শুনে? তানসেনকে জীবনদান করার জন্যে মেয়েটির গানটা ভারি সুন্দর। ওরকম গা

বিনতা বলিল, "লাগছে ত খুব ভাল। তবে একবার শুনে কি আর বিশ্বাস পাবে ?"

বাহিরে হইয়া মৃগাঙ্ক সকলকে নমস্কার করিয়া ও রমেশের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলিয়া প্রস্থান করি বিনতারা বাড়ী ফিরিল। স্বর্ণ সারাপথ বকবক করিল। রমেশ দুচারবার বিদ্রূপ করিবার চেষ্টা করিল, কি সফলকাম হইল না।

স্বর্ণ উপরে উঠিতে উঠিতে বলিল, "কি চমৎকার ভাই! দেখে কেঁদে আর বাঁচি না।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সুন্দর জিনিস দেখলে কি তোমার কান্না পায় স্বর্ণ ?"

"তা পায় মাঝে মাঝে। খুব খুসি হলেও মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলি।"

"তা হলে তোমার চোখের জলের মানে বোঝা সহজ নয় দেখছি।"

স্বর্ণ বলিল, "কারই বা সহজ ?"

৭

মোটরী কি চলিয়া গেলে দিন দুই বিনতার কাজ বাড়িল। স্বর্ণ কথা না বলিয়া থাকিতে পারে সারাদিনই তাহার গল্প শুনিতে হয়। আজকাল কেন কে জানে বিনতার বড় অধৈর্য্য লাগে। কেন এ যে এমন অনর্গল বকিয়া মরে ? অথচ ইহার পরিচর্য্যা করিবার জন্যই বিনতাকে আনা হইয়াছিল। সেকথা সে ভুলিয়াই গিয়াছে। সে ঘর সংসার দেখে, হরেন্দ্রনাথের বন্ধু-বান্ধব আসিলে তাহাদের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা আলাপ করে, এবং স্বর্ণের দেখাশোনা করে এবং তাহার বরের গল্প শোনে।

হরেন্দ্রনাথ কাজ করিবার সময় বাড়াইয়াছেন, তবে পুরাদস্তর কাজ এখনও করিতেছেন না। অ সময় বাড়ী থাকেন। বৈকালিক চায়ের আসরে বন্ধু-বান্ধবের আগমন প্রায়ই হয়। ডাক্তার অমূল্য গুহ আসেন, মৃগাঙ্কেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। আর একটি ছেলে আসে সে বাঙালী নয়, কিন্তু বাংলা থাকিয়া থাকিয়া বাঙালী হইয়া গিয়াছে। নাম বিমানবিহারী। চেহারাটা বেশ সুশ্রী।

বিনতার সহিত আলাপ-পরিচয় সকলেরই খানিকটা হইয়াছিল। তাহার ইতিহাস ইহারা সব জানে হয়ত। কথাবার্ত্তায় কিছু বোঝা যায় না। মৃগাঙ্কের সবই জানার কথা, সেও কিছু ধরা ছোঁওয়া দেয় কি সূত্রে যে হরেন্দ্রনাথের গৃহে এমনভাবে বিনতা আছে তাহা কেহ কি জানে ? না বলিয়া দিলে কা ত বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। সে যেন এবাড়ীর কর্ত্তার ভগিনী কি অন্য কোনো স্নেহাস্পদা আত্মীয়া। তাবেই সকলে ব্যবহার করে তাহার সঙ্গে। রমেশ ইহা লইয়া সারাক্ষণ মন্তব্য করে স্বর্ণের কাছে। মেয়রা বা বিনতা যাহাতে শুনিতে না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখে।

স্বর্ণ সোজাসুজি মানুষ, সে একদিন বলিয়া বসিল, "তোমার অত হিংসে কেন বাপু ? বিনতা তোমার ভাগটা কেড়ে নিচ্ছে ? মেজমামা ত সংসারি নয়, টাকাও আছে ঢের। যদি অনাথা মেয়ের মঙ্গে করেনই তা তোমার বুকে কাঁটা ফোটে কেন ?

"অনাথাকে সনাথা করার যে রকম চেষ্টা করছেন, তাতে মনে হচ্ছে, শানাই বাজল প্রায় বাড়ীতে

স্বর্ণ বলিল, "তা বাজুক না। ক্ষতি কি।"

"ক্ষতি আর কি ? তাবছি ঘরে ঘরেই না হয়ে যায়।"

স্বর্ণ তাহার পিঠে এক চড় মারিয়া বলিল, "কি যে বক তুমি রমেশ দাদা তার ঠিক নেই। মেজ যদি বিয়েতেই মন থাকবে তা হলে এতদিন তিনি বসে আছেন ? ওঁর মত সুপাত্র, চাইলে ত রাজকন্যা

"খেয়াল হয়নি তখন, এখন হচ্ছে। সুন্দরী মেয়ে যদি সারাক্ষণ চোখের সামনে ঘুরঘুর করে, আর দরকার হলেই গান শোনায় আর গায়ে মাথায় হাত বুলোয়, তাহলে মন সেদিকে না গিয়ে পারে পুরুষ মানুষের? যতই শুকদেব গোস্বামী হোক। দেখ এখন পরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে।"

স্বর্ণ বলিল, "হোক্ না, আমার কি বয়ে যাচ্ছে? আমি কিছু অখুসি হব না। বয়সে খানিকটা ছোট হবে এই যা। নইলে ও খুব ভাল মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে, ভদ্রঘরের মেয়ে। লেখাপড়াও জানে, গান জানে, সেলাই জানে।"

"তুমি যে ঘটকীর মত পাত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ একেবারে।" এমন সময় সিঁড়িতে হরেন্দ্রনাথের পায়ের শব্দ শুনিয়া রমেশ সেখান হইতে পলায়ন করিল।

স্বর্ণ কথা পেটে রাখিতে পারিত না। গল্প-গাছার সূত্রে কিছু কিছু বিনতার কানে গিয়াও পৌঁছিল। রমেশের উপর বিরাগ আরো খানিকটা তাহার বাড়িয়া গেল।

বিনতার দিন ভাল যাইতেছিল না। এখানে এত ঘরে সে থাকে, এত খাওয়া-খাওয়ার ঘটা, এত বিশ্রামও পায়, অথচ ভিতরে ভিতরে দারুণ একটা দুর্বলতা অনুভব করে। মনও যেন সারাক্ষণ বিভ্রান্ত, পথ খুঁজিয়া পায় না। ভবিষ্যৎ জীবনটা ক্রমেই যেন ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছে। এ বাড়ীতে কর্মকোলাহল লাগিয়াই থাকে। বন্ধু-বান্ধব নিত্য আসে, নিজের মন লইয়া বসিয়া থাকিবার সময় সে খুব পায় না। পড়াশুনাও করে ইহার মধ্যে মধ্যে।

ব্যাপারটা হরেন্দ্রনাথও লক্ষ্য করিতেছিলেন। সাময়িক কিছু গোলযোগ হইয়া থাকিবে, ভাবিয়া কিছুই বলিলেন না প্রথম। কিন্তু বিনতার মুখ আরও যেন বিমর্ষ হইয়া যাইতেছে। একদিন সকালে চা খাওয়ার পর তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে তোমার?"

বিনতা নিজেকে যেন একটুখানি সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "কিছু ত হয়নি।"

"কিছু হয়নি ত, ক্রমেই শুখিয়ে যাচ্ছ কেন? মুখটাই বা অত pale হয়ে গিয়েছে কেন? ঘরেই একটা ডাক্তার রয়েছে তাকে বলা ত যায় দরকার হলে?"

বিনতা বলিল, "দরকার হয়নি বলেই বলিনি।"

হরেন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ বসিয়া তাহাকে শরীর সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তুমি খাও বড় কম, আর একটু বাড়াতে হবে। খোলা হাওয়াও তোমার আরো বেশী দরকার। স্বর্ণকে আরও বেশী টেনে বার কর না কেন?"

"না বেরোতে চাইলে কি করব? ও ঘরে বসে বসে গল্প করতেই ভালবাসে। আর এখানে ও আছেই বা কতদিন? বলছে ত ওর স্বামী এলে তার সঙ্গে ফিরে যাবে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "গেলেই হল আর কি? ও ত কিছুই সারেনি। পাড়াগাঁয়ে গিয়ে এর বিপদ করুক আর কি? ওর স্বামীকে বুঝিয়ে বলতে হবে। ও চলে গেলে নিজেও ছাড়া পাবে এই আশায় বুঝি খুব খুসি হয়ে উঠেছ?"

বিনতা মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমার খুসি হবার কি আছে এর মধ্যে?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে খুসি হওনি?"

বিনতা হাসিতে গেল, কিন্তু সে চেষ্টায় তাহার চোখে প্রায় জল বাহির হইয়া আসিল। হরেন্দ্রনাথ

হয়? আবার সেই বিষের জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্যে? আবার সেই উৎপাত, সেই অপমান আর সে ভয়? এখানে মানুষের মত আছি, স্নেহ মমতা পাচ্ছি, সেটা বুঝি আমার সহ্য হচ্ছে না?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কথাটা আমি অর্দ্ধেকটা ঠাট্টা করে বলেছিলাম বিনতা। তুমি অত seriously ওটাকে নিও না। ঐ বিষের জীবনে তোমায় আর যেতে যাতে না হয়, তার জন্যে চেষ্টা ত কম করছি না কিন্তু তুমি পুরোপুরি সহযোগিতা করছ কই?"

বিনতা বিষণ্ণভাবে বলিল, "যতটা সাধ্য তা ত করছি।"

"তার বেশী আর মানুষে কি করতে পারে? আচ্ছা, আমার ত বেরুবার সময় হল। আজ সন্ধ্যা হয়ত পরিষ্কার থাকবে। একটু তাড়ি কম এমন ভাগসা ত কলকাতায় কোথাও নেই। গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়িয়ে আসা যাবে খানিক," বলিয়া হরেন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেলেন। বিনতা আবার স্বর্ণের কাছে বসিল একলা থাকিতে তাহার কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল।

সন্ধ্যাটা মেঘমুক্তই রহিল। কাজেই সকলে বেড়াইতে চলিল। গঙ্গার ধারে আজ লোকজন ব কখন বৃষ্টি আসিয়া পড়ে এই ভয়ে বেশী জনসমাগম হয় নাই। গাড়ী ছাড়িয়া তাহারা হাঁটিয়াই চলিল খানিকদূরে যেখা গেল মৃগাঙ্ক আসিতেছে।

স্বর্ণ বলিল, "আমরা কখন কোথায় বেড়াতে যাব, এ ভদ্রলোক জানে কি করে বল ত?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মন্ত্রতন্ত্র জানে বোধ হয় কিছু।"

মন্ত্রটা যে কি তাহা বিনতার জানা ছিল। তাহার মুখে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। ও তখনই সেটা অদৃশ্য হইয়া গেল। মৃগাঙ্ক আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহাদের সকলকে যথাযোগ্য অভিব করিয়া সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল।

আকাশে আবার ধীরে ধীরে মেঘ সঞ্চার হইতেছে দেখা গেল। স্বর্ণ বলিল, "ভাল সময়ই ও কলকাতায় এলাম বাপু, খালি বিষ্টি আর বিষ্টি।"

অগত্যা বাড়ীই ফিরিতে হইল। মৃগাঙ্ক তাঁহাদের সঙ্গেই আসিল। বসিবার ঘরে ঢুকিয়া হরেন্দ্র বলিলেন, "এই গোলক, আমার ঘর থেকে নূতন রেকর্ডগুলো আন্‌ত। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম 'তানসেন'এর রেকর্ড অনেকগুলো কিনে এনেছি। বিনতা এবার শিখে নিতে পারবে।"

কিন্নরী কণ্ঠে বর্ষা আবাহনের গান ধ্বনিত হইয়া উঠিল। খানিক শুনিয়া স্বর্ণ মন্তব্য করিল, " বর্ষাকে ডেকে কাজ নাই বাপু, বর্ষার জ্বালায় ত অস্থির। বর্ষা দূর করবার গান যদি কিছু থাকে ত বাজাও

মৃগাঙ্ক বলিল, "রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় ওরকম গান কিছু লেখেননি। উনি আবার যা বর্ষার ত কলেজে পড়তাম যখন, তখন প্রায়ই বলাবলি করতাম বৃষ্টির দরকার হলে, যে কবে একটা "বর্ষা ম ছুড়ে যাও, হড়মুড় করে বৃষ্টি নামবে।"

রমেশ বলিল, "রবীন্দ্রনাথের অনেক আগের এক অজ্ঞাত কবি একটা লিখে গিয়েছেন, গা হোক কবিতা, এ বিষয়ে।"

মৃগাঙ্ক বলিল, "সেটি কি?"

রমেশ বলিল,

স্বর্ণ বলিল, "রমেশমামার মত বাজে কথা বলতে কেউ যদি পারে। আচ্ছা, রেকর্ডের গান ত। এবার বিনতাদি একটা গান করত। বর্ষার গান নয় কিন্তু।"

দুগাঙ্কের সামনে গান গাহিবার ইচ্ছা বিনতার কিছু ছিল না। কিন্তু হরেন্দ্রও স্বর্ণের প্রস্তাব সমর্থন করাতে তাহাকে গাহিতেই হইল। কি গান গাহিবে স্থির করিতে পারিল না প্রথম, উঠিয়া গিয়া গান বই লইয়া আসিল। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক জায়গায় থামিয়া গিয়া গান ধরিল,

"সন্ধ্যা হল গো! ওমা সন্ধ্যা হল, বুকে ধর,
অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমার দিন কর।
ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো, সব যে কোথায় হারিয়েছে গো
ছড়ানো এই জীবন তোমার আঁধার মাঝে হোক্ না জড়।"

নিজের মুখের উপর আলো না পড়ে এমন ভাবে সে সরিয়া বসিয়াছিল, তবু তাহার মনে হইতে লাগিল, সকলেই যেন তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। হরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিটা যেন সে সর্ব্বাঙ্গে কি অনুভব করিতে লাগিল। গাহিতে পারিলে সে বাঁচে, কিন্তু কিছু না বলিয়া কি গাওয়া যায়?

গান শেষ হইতেই রমেশ বলিল, মেয়েদের গান ত হল, এমি-তে এবং রেকর্ডেও, এবার ছেলেদের দিক থেকে একটা গাওয়া উচিত।"

স্বর্ণ বলিল, "তুমি করনা একটা, ছেলেবেলা ত বেশ গাইতে?"

রমেশ বলিল, "চর্চ্চা না রাখলে কি মনে থাকে? মড়া কাটতে কাটতে কি আর গান হয়? দুগা বাবু কিন্তু বেশ গাইতে পারেন আমি জানি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহলে তিনি আমাদের একটু আনন্দ দান করুন না।"

দুগাঙ্ক বলিল, "গাই না যে একেবারে তা নয়, তবে হিন্দি গানই শিখেছিলাম লোক রো সেইগুলোই গলাতে আসে। বাংলা গান ভাল জানি না, অন্ততঃ এক্ষেত্রে গাইবার সাহস হবে না।"

"হিন্দি গানই করুন।"

দুগাঙ্ক উপরি উপরি দুখানা হিন্দি গান করিল। গলা ভাল, গানের শিক্ষাও আছে।

গান শেষ হইতেই বলিল, "বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। এই বেলা পালান ভাল, নইলে আবার জোর এলে বিপদে পড়তে হবে।"

সে চলিয়া গেলে হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বিনতা তুমি হিন্দি গান শেখনি কখনও? ভাল লাগে না।"

"শিখিনি বিশেষ। বাবা ও-সবের চর্চ্চা করতেন না। শুনে শুনে এর ওর কাছে দুএকটা শিখেছি ভালই লাগে, তবে বাংলা গান যেরকম মনকে স্পর্শ করে এ ত তা করে না?"

রমেশ এই সময় উঠিয়া গেল। স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, মেজমামা, তুমি কখনও গান করতে না?

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, মনে ত পড়ে না, তবে গান শুনতে চিরকালই খুব ভালবাসি। তুই নিজে শিখিসনি কোনো দিন?"

"হ্যাঃ, পাড়াগাঁয়ে ওসব কেই বা শেখাচ্ছে? তবু খান দুই তিন গান পাড়ার মেয়েদের কাছে শিখেছিলাম। মা বলত মেয়ে দেখতে এলেই ত গান শুনতে চাইবে, তখন গাইতে হবে ত।"

বিনতা বলিল, "তুমি একটা গান কর না ভাই।"

"হ্যাঃ, তোমার সামনে আমার আসি গান গাইব। [illegible]"

পরদিন স্বর্ণর স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বর্ণ তাঁহাকে লইয়া এমন ব্যস্ত হইয়া রহিল বিনতা তাহার ধারে-কাছেই ঘেঁষিতে পারিল না। বাড়ীতে চেঁচামেচি গল্পগুজব ঢের বাড়িয়া গেল। বা এমনিতে বেশী বাড়ী থাকিত না, কিন্তু প্রায় সমবয়সী একজন পুরুষ বাড়ীতে আসিয়া জোটাতে, সেও গ লোভে অনেক সময় বাড়ীতেই কাটাইতে লাগিল।

স্বর্ণের স্বামী প্রতুল আসিয়াই অবশ্য বিনতাকে লক্ষ্য করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "এ ভদ্রমহিলা কে রমেশ উপস্থিত ছিল, সে বলিল, "ওটি মেজদার পুষ্যিকন্যে।"

স্বর্ণ বলিল, "তুমি চুপ করত রমেশ দাদা। সব সময় খালি ঠেস দিয়ে কথা বলা। পুষ্যি কন্যে নয়, আমার দেখাশুনো করতেই মেজদাদা ওঁকে এনেছিলেন। তখন থেকেই আছেন আর কি?"

স্বর্ণ স্বামীর সঙ্গে ফিরিয়া যাইবে, না আরো কিছুদিন থাকিবে, তাহা লইয়া আলোচনা চলি হরেন্দ্রনাথ থাকার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন। তাঁহার কথার উপর আর কেহ কথা বলিতে স করিল না। স্বর্ণ একটু ক্ষুণ্ণ হইল, তবে পরের মাসে তাহার স্বামী আসিয়া কয়েকদিন থাকিয়া যাইবে দেওয়াতে, সে থাকিতে রাজী হইল।

বিনতার মনে হইল, তাহার বুকের উপর হইতে কে যেন পাষাণভার তুলিয়া লইল। কেন যে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, তাহা যেন প্রথমে বুঝিতেই পারিল না পর মুহূর্তেই তাহার বুকের রক্ত হিম হ আসিল। এ কোন ঝটিকাক্ষুব্ধ সাগরের একেবারে কূলে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে? আর এক পা অগ্র হইলেই ত নিশ্চিত মরণ? ইহারই জন্য তাহার হৃদয় এতদিন কাঁদিয়া মরিতেছে, মূর্খ সে বুঝিতে পারে কেন? ইহার মুখ যে চেনা নয়, তাই সে বোঝে নাই। ইহার স্পর্শও জীবনে সে প্রথম পাইল।

বাড়ীতে জামাই আসায় গোলমাল ত বাড়িলই, বেড়ানো, সিনেমা দেখিতে যাওয়া, আত্মীয়-স্বজ সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়া সবই বাড়িল। মাঝে মাঝে বিনতা সঙ্গে যায়, মাঝে মাঝে যায়ও না। শরীর তাহার ক্রমেই ভাঙিতে লাগিল।

রবিবার সকালে স্বর্ণ বলিল, "আজ ভাই আমরা দুজনেই বাইরে খাব, তুমি সেই রকম ব্যবস্থা পিসশাশুড়ীর বাড়ী যাচ্ছি।"

বিনতা জিজ্ঞাসা করিল "কখন আসবে?"

স্বর্ণ বলিল "আসব সেই রাত্রে। মেজদাদাকে বলেছি।"

"আচ্ছা সেই রকম বলে দিচ্ছি ঠাকুরটাকে।"

অল্পক্ষণ পরেই স্বর্ণ ও তাহার স্বামী বাহির হইয়া গেল। বিনতার হঠাৎ মনে পড়িল, বহুকাল পিসীমার খবর নেয় নাই। আগে আগে যখনই কাজে বাহির হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে গিয়া বুড়াকে দে আসিয়াছে। তিনি ক্রমেই অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার একমাত্র কন্যাও তাঁহাকে দেখিতে আসি খুব বেশী পারে না।

হরেন্দ্রনাথকে বলিয়া সেও ত আজ সারাদিনের মত ছুটি পাইতে পারে। নিজের ঘরেই কি আছেন বলিয়া বোধ হইল। পরদার এ পাশে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভিতরে আসব?"

"কে বিনতা, এস।" ঘরে ঢুকিয়া বিনতা দেখিল হরেন্দ্রনাথ শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে বিনতাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?"

"জানি, আমায় বলেই গিয়েছে।"

বিনতা একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল, "আজ ত কাজ নেই কিছু! ভাবছিলাম একবার পি পিসীমাকে দেখে আসি, অনেকদিন তাঁর কোনো খবর নিতে পারিনি।"

"বেশ ত যাও, আমি আজ এখনি বেরুচ্ছি না। তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসুক। খাবার ক কিছু ত?"

বিনতা বলিল, "ভাবছিলাম একেবারে রাত্রে ফিরব। স্বর্ণও ত সেই সময় ফিরবে।"

"স্বর্ণ না থাকলে বুঝি বাড়ীতে থাকা যায় না? তোমার সঙ্গে অনেক কথা ছিল যে?"

বিনতা বলিল, "তাহলে এখন যাব না। একেবারে খাওয়া-দাওয়া করে বেরিয়ে যাব। আপনা সময় হবে এখন?"

"হবে। বোসো তুমি।" বলিয়া খবরের কাগজখানা পাট করিয়া টেবিলের উপর রাখি আসিলেন।

আবার আসিয়া খাটেই বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ এখন?"

"ঐ একই রকম।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার ডাক্তারীতেও তোমার বিশ্বাস নেই, যা বলি তা শোনও না। খাব বাড়াতে বলেছিলাম, খাওয়া বাড়ানোর বদলে আরো কমিয়েছ মনে হচ্ছে চেহারা দেখে। আর এক ভাল ডাক্তারকে দিয়ে ভাবছি তোমায় পরীক্ষা করাব। নইলে শক্ত অসুখে পড়বে তুমি।"

বিনতা বলিল, "আপনার চেয়ে ভাল ডাক্তারে আমার দরকার নেই কিছু। আপনার কথা শুন আমি খুব চেষ্টা করি। কিন্তু বেশী খেতে কিছুতেই পারি না আমি। হয়ত শীতকালে ভাল থাকব। এ ভ্যাপসা গরমটা সহ্য হয় না আমার।

"থাকতেও পার, নাও থাকতে পার। আচ্ছা শোন, আমার অন্য কথাটা। মাসখানেক আগে যা বলেছিলাম, মনে আছে আশা করি।" এই তিনটি ছেলের সঙ্গে মিশলে কিছুদিন, তারাও মিশলে এখন যদি তাঁদের মধ্যে কেউ বিবাহের প্রস্তাব করেন তাহলে কি বলবে তুমি? আমি মৃগাঙ্কের ক বলছি আমায় জানিয়েছে সে বিবাহ করতে চায়, আর বেশী দেরী না করে। তুমি কি বল?"

বিনতা চেয়ারের হাতলটা শক্ত মুঠায় ধরিয়া বলিল, "কি আর বলব? ওর প্রস্তাবে আমি সম্ম দিতে পারলাম না।"

—"পছন্দ হল না?"

বিনতার মুখ তখন প্রায় সাদা হইয়া আসিয়াছে, আরো নীচু গলায় বলিল, "পছন্দ অপছন্দ অ কি? উনি ভদ্রলোক, শিক্ষিত লোক, সচ্চরিত্র লোক, এটা স্বীকার করছি।"

"কিন্তু ভবিষ্যৎ স্বামীরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পার না?"

বিনতা বলিল, "পারি না একেবারেই। কোনো দিন পারবও না। দেখুন, এই পরীক্ষাটা যদি দিন ভয় করে। বিয়ে আমি ভয়ের কাউকে করতে পারব না। অন্য লোক ডেকে এনেও লাভ কে কিছু, বিয়ে করতেই আমি বোধ হয় পারব না।"

হরেন্দ্রনাথ একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন, "সেটা আগে বুঝতে পারনি? তখ বলেছিলে যে সাধারণ মানুষের মত সংসারী হবার ইচ্ছে তোমারও মাঝে মাঝে হয়েছে।"

"কোনোদিনই কাউকে বিয়ে করতে পারবে না মনে হচ্ছে ?"

"প্রায় তাই। সুদূর ভবিষ্যতের কথা বলতে পারি না। যেমন একটা কথা বলছি, এই আশ্চর্য্যের মত শোনাবে, কিন্তু এটা ঠিক। আমার জন্যে আর কিছু করতে চেষ্টা করবেন না। আমার অদৃষ্ট আমাকে যে দিকে টেনে নিয়ে যায়, সেই দিকেই যেতে দিন। একদল আছে, ভগবানও যাদের ভাল করতে পারে না, আমি সেই দলের। ভাল আমার কোনোদিন কিছু হবে না। আপনি শুধু শুধু চেষ্টা করে বিফল হয়ে কষ্ট পাবেন কেন ?"

এতগুলি কথা একসঙ্গে বলিয়া বিনতা যেন হাঁফাইয়া উঠিল। চোখ জলে ভরিয়া আ

হরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ নীরবে তাহার কথা শুনিতেছিলেন। এখন সিগারেটটা বাহিরে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, "বিনতা চোখটা মোছ। অত বিচলিত হোয়ো না। তোমার ভিক্ষা আমি পূর্ণ করতে পারলাম না। তোমার জীবনটাকে নষ্ট হয়ে যেতে দিতে আমি পারব না। চেষ্টা করব অবশ্য বিয়ে দেবার চেষ্টাই যে করব, তা বলছি না। ভগবান তোমার অদৃষ্টে কি লিখেছেন, তার তুমি জানই বা কি ? কিছুই হতে পারে না, এই বা তুমি নিশ্চয় করে জানলে কি করে ?"

বিনতা বলিল, "আমি আর ক'দিনই বা আছি এখানে ?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ও ক্ষেত্রেও নিশ্চিন্ত করে কিই বা বলা যায় ?"

৮

স্বর্ণ সেদিন বেশ রাত করিয়াই ফিরিল, বিনতারও ফিরিতে দেরিই হইল। হরেন্দ্রনাথের ঘর বাহির হইয়া সে অনেকক্ষণ নিজের ঘরে পড়িয়া কাঁদিল। বুকের ভার কিছুই কমিল না। হরে বাহির হইয়া গেলেন, সেই শব্দ শুনিয়া সে উঠিল, স্নান করিল, যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু যে গলা দিয়া আজকাল পার হইতে চায় না।

তাহার পর গেল পিসীমার বাড়ী। তিনি বিনতাকে দেখিয়া হা-হুতাশ করিলেন। বড় বাড়ী, খাওয়া-দাওয়া ভাল, কাজও বেশী নয়, তাহা হইলে এমন চেহারা হইল কেন ? বিনতাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে। কিছুদিন বসিয়া বিশ্রাম তাহার পর যেন কাজে যায়।

বিনতা বলিল, আর এখন ছেড়ে কি হবে পিসীমা যে মেয়েটির জন্যে আমাকে ওরা ডেকে সে ত কিছুদিন পরে চলে যাবে; তখন ত আবার চলেই আসতে হবে।"

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরা তোর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে ?"

"খুব। বাড়ীর কর্ত্তা যিনি, তিনি দেবতার মত মানুষ, জীবনে বোধ হয় কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন নি।"

"খাওয়া-দাওয়াও খুব ভাল হয় বলছিল, অথচ কি শ্রীই হয়েছে।"

বসিয়া বসিয়া অনেক কথা হইল। ভাগ্যক্রমে আজ পিসতুতো বোনটিও আসিয়াছিল, সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। কাজেই ফিরিতে রাতই হইয়া গেল।

খাবার সময় সকলে একত্রিত হইতেই হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সবাকারই আজ day off ছিল না দুপুরে এলাম একবার একটা মানুষও দেখতে পেলাম না।" উত্তর কাহারও কাছে প্রত্যাশা করিলে

স্বর্ণ বলিল, "কালও আমি একটু বেরব বেহমাদা। হবে আজ যে রকম সারাদিন বাইরে রইল সে রকম থাকব না। সকালে বেরব আর চা খাবার সময় হতে না হতে ফিরে আসব।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভাল, বিনতাও কাল বেরতে চাও নাকি?"

বিনতা বলিল, "না, আমার আর কোথাও যাবার নেই। পড়াশুনো কিছু হচ্ছে না, কাল তা করে একটু পড়ব ভাবছি।"

বেশী কথাবার্ত্তা আর কিছু হইল না, খাইয়া-দাইয়া যে যাহার ঘরে প্রস্থান করিল। বিনতা অনেক রাত জাগিয়া নানা ভাবনা ভাবিল, তাহার পর শ্রান্তদেহে এবং শ্রান্ততর মনে ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে চা করিতেছে, এমন সময় হরেন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "চা খাওয়া হয়ে গেলে একবার এস ত আমার ঘরে। আমার তোমার জন্যে plan করছি।"

বিনতা বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইবামাত্র বলিলেন, "ভয় নেই, ভয় নেই, আমার বিয়ের ব্যবস্থা নয়। তিনটে বরকেই ত অপছন্দ করে দিলে, আবার এখনি বর কোথায় পাব?" এ plan অন্য রকম।"

স্বর্ণ আর প্রতুল এই সময় আসিয়া জোটাতে হরেন্দ্র আর কোন কথা বলিলেন না। চা খাই চলিয়া গেলেন। প্রতুল, স্বর্ণ ও রমেন যতক্ষণ বসিয়া চা খাইল ও বক্ বক্ করিল, ততক্ষণ বিনতাকে ঘরেই থাকিতে হইল। চা খাওয়ার শেষে স্বর্ণ বাহিরে যাইবার জন্য যখন জিনিসপত্র গুছাইল, তখন তাহাকে সাহায্য করিল। সকালে চাকরকে বাজারে পাঠাইল। তাহার পর নিজের ঘরে গিয়া কয়েক মিনিট চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হরেন্দ্রনাথ আবার কি বলিবেন কে জানে? সে শান্তভাবে শুনিতে পারিবে ত? পারিতেই হইবে।

হরেন্দ্রনাথের ঘরে গিয়া দেখিল তিনি ছোট টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়া কতকগুলি ছাপা কাগজ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। বিনতাকে দেখিয়া বলিলেন, "দেখ বিনতা, যে কাজ এতদিন করে সেই কাজটাই তোমার সুবিধাজনক হবে। অনেকদিন করেছ, অভ্যাস হয়ে গেছে। নতুন কিছুর ভিতর যেতে তোমার হয়ত ভাল লাগবে না। নার্সিংএর ট্রেনিং নেবার একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এটা পাস করতে পারলে তুমি ঢের বেশী রোজগার করতে পারবে। খুব বেশী দিনের course নয়। এ সময়টা তোমার যে দিকে যা টাকা লাগে, তা আমি দিয়ে দেব। তুমি ধার বলে নেবে আমার কাছে, কথা দিচ্ছে নাও এই formটায় সই করে দাও একটা।"

বিনতা একখানা ফর্ম তুলিয়া লইল পড়িবার জন্য। প্রথম লাইন পড়িয়াই তাহার মনে হইল তাহার হৃৎপিণ্ডের উপর কে যেন সজোরে আঘাত করিল। পাংশুবর্ণ মুখে সে যে চেয়ারটা কাছে ছিল তাহার উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

হরেন্দ্রনাথ তাহার কাছে উঠিয়া আসিলেন, ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল বিনতা শরীর খারাপ লাগছে?"

বিনতা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি যেতে পারব না।"

হরেন্দ্রনাথ মিনিটখানিক চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? না যেতে চাও ত আমি জোর করছি না, কিন্তু কেন যেতে চাইছ না?"

বিনতার হাত কাঁপিয়া ফর্মটা মাটিতে পড়িয়া গেল। মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "কলকাতা

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কত জায়গায়, কত অবস্থায় ত থেকেছ। এটাও দুদিনে অভ্যাস হয়ে যে Prospect-টা ভালই ছিল বিনতা, তোমার লাভই হত। একবার চেষ্টা করবে না?"

বিনতার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না, সে শুধু অসম্মতিসূচক মাথা নাড়িল। হরেন্দ্র বলিলেন, "কি বাধা, কোথায় বাধা বলবে আমাকে? যদি সে বিষয়ে কিছু করা যায়?

বিনতা ভাঙা গলায় বলিল, "আমি পারব না, মরে যাব।" তাহার মাথাটা টেবিলের উপর ঝুঁ পড়িল, কোনমতে নিজেকে যেন সে আড়াল করিতে চায়।

হরেন্দ্রনাথ বিনতার চিবুকে হাত দিয়া হঠাৎ তাহার মুখটা তুলিয়া ধরিলেন। জিজ্ঞাসা করি "বন্ধুকে ছেড়ে যেতে এত কষ্ট হবে তোমার?"

বিনতা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। পিতৃহীনা হইবার পর এক অদৃশ্য বর্ম নিজের হৃদয়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। অভাব, দুঃখ, গ্লানি, অপমান, সব যেন এই বর্ম্মে ঠে হারিয়া যাইত, বিনতাকে স্পর্শ করিত না। আজ স্নেহের স্পর্শে সেই বর্ম্ম তাহার খানখান্ হইয়া ভ পড়িল। ক্রন্দনের আবেগে তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। অশ্রু সাগরের ভিতর যে একেবারে মিলাইয়া যাইতে চায়। হরেন্দ্রনাথের কথার সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না।

হরেন্দ্রনাথ নিজের চেয়ারটা তাহার কাছে টানিয়া আনিলেন। বিনতার অবনত মাথার উপ বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "এখানেও ত মরে যেতেই বসেছ। এমন কি দুঃখ যার কোনো প্রতিকার। মুখ ফুটে একবার বলা যায় না?"

বিনতা উত্তর দিল না। হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বিনতা, লক্ষ্মীটি তুমি নিজেকে একটু সা চেষ্টা কর। তোমার এ কান্না আমার আর সহ্য হচ্ছে না। তুমি এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে। চেয়ার খাটে এসে বোসো। তুমি পড়ে যাবে এখনই।" বলিয়া নিজেই তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। খাটের বসাইয়া, নিজে তাহার পাশে বসিয়া বলিলেন, "শোনো বিনতা, তুমি বলতে পারছ না যখন, আমিই ব কিছুই বুঝিনি এতদিন তা মনে কোরো না। কিন্তু উপায় খুঁজে পেতে একটু দেরি হল। তুমি কি থাকতে চাও আমার কাছে, একেবারে আমার হয়ে?"

বিনতা এতক্ষণে মুখের উপর হইতে হাত সরাইল। তখনও তাহার চোখ দিয়া অবিরলধারে ঝরিতেছে। প্রায় শোনা যায় না, এমন স্বরে বলিল, "এ যে অসম্ভব দুরাশা, তা আমি জানি।"

একহাতে জড়াইয়া ধরিয়া হরেন্দ্রনাথ বিনতাকে তাঁহার বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন, "কি অসম্ভব কেন বিনতা? আর দুরাশাই বা কেন? আমি অবিবাহিত, সুস্থ, উপার্জ্জনক্ষম। তুমি বা সাবালিকা এবং রক্ত সম্পর্কে আমার কোনো আত্মীয়াও নও। আইনতঃ কোনো বাধাই নেই, বিবাহে

বিনতার মাথাটা হরেন্দ্রনাথের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল, যারপর নাই হতাশা-ভরা কণ্ঠে বলিল, " একেবারে আপনার অযোগ্য। দরিদ্রের মেয়ে, প্রায় অশিক্ষিত, কি ভাবে আমার জীবন কেটেছে এ তা ত জানেন। আমাকে গ্রহণ করলে সমাজে আপনি নিন্দিত হবেন, উপহাসের পাত্র হবেন।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যোগ্যতার বিচার কি দিয়ে করবে বিনতা? খুব বড়লোকের মেয়ে কি যোগ্য হয়? সে রকম খুঁজেছিল ত অনেকবার, কিন্তু কখনও ইচ্ছা হয়নি নিজের জীবনকে ত তাঁদের কারো সঙ্গে। তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, আমিও ভদ্রলোকের ছেলে, এক্ষেত্রে সামাই অ

একেত্রেও সমানই হয়ে দাঁড়াবে। এতদিন খেটে খেয়েছ, কারো পদানত হওনি, এটা তোমার গৌরব অগৌরব নয়। আর আমার নিন্দা যদি হয় হবে, আমি গ্রাহ্য করি না। উপহাস যদি করে আমার কানে আসবে না। কিন্তু এ সব ত বাইরের যোগাতার বিচার। সেখানে সম্পদ কিছু কি নেই? এমন সুন্দর চেহারা, এমন মিষ্টি গলা, এমন মমতায় ভরা দুখানি হাত, এর কোনো মূল্য নেই? তুমি অবাক হয়ে আমার কথা শুনো, না? সত্যি এসব কথার মানে কিছু নেই। আমার বিয়ের কোনো প্রয়োজন ছিল না সেইজন্য ভালমন্দ ওজন করে তোমাকে গ্রহণ করতে চাইছি, তাও ত নয়। তোমাকে বাদ দিয়ে আর আমার চলছে না, জীবনটা এমন শূন্য, এমন নিরর্থক মনে হচ্ছে যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আর তুমি যে আমাকে ঠিক আমারই মত করে ভালবাসছ, তাও কি আমি বুঝিনি? আমার অনুমান সত্য কি না তুমিই বল।"

বিনতা বলিল, "এর চেয়ে বড় সত্য জীবনে আমার আর কিছু নেই। এতক্ষণে হরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে সে একবার তাকাইল, বলিল, "পৃথিবীতে ভাল যদি কাউকে বেসে থাকি, সে আপনাকে। ভক্তি যদি কাউকে করে থাকি সেও আপনাকে।"

একনিষ্ঠ ভালবাসাই পাবার অধিকার দিতে পারে, আর কিছুতে পারে না।"

বিনতার অতীত জীবনটা যেন হঠাৎ হারাইয়া গেল। এখনই কি সে জন্মলাভ করিল এই আনন্দ লোকের মধ্যে? তাহার দুঃখ নিশীথিত কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিনগুলি কি ইহারই জন্য তপস্যা করিয়াছিল? চোখের জল তাহার শুখাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মুখে অনেকক্ষণ ভাষা আসিল না। হরেন্দ্রনাথের আলিঙ্গনের মধ্যে, তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, শুধু দুই হাতে তাঁহার একখানা হাত নিজের বুকের কাছে ধরিয়া রাখিল।

হরেন্দ্রনাথও খানিকক্ষণ নীরব হইয়াই রহিলেন, তাহার পর বিনতার চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "একেবারে কথা বলছ না কেন বিনতা?"

বিনতা বলিল, "কি কথা বলব? খুঁজে পাচ্ছি না।"

"খুসি হওনি?"

বিনতা বলিল, "ও কি কথা দিয়ে আমি বোঝাতে পারব?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পারা যায় না বটে। সব চেয়ে বড় খুসি, আর সব চেয়ে বড় দুঃখ কোনোটাই কথায় বোঝান যায় না। থাক সে ওটা আমাদের বুকের ভিতরেই এখন, ও নিয়ে নাড়াচাড় করে এখন কাজ নেই। কিছু হাল্কা আনন্দের কথা বল, সাধারণ প্রতিদিনকার কথাই বল। গলার স্বরটা তোমার সারাক্ষণই যে শুনতে ইচ্ছা করে।"

বিনতা নীচু গলায় বলিল, "একটা কথা বলব? তারি জানতে ইচ্ছা করছে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "একটা কেন, একশটা বল না? কি কি জানতে চাও বল?"

বিনতা বলিল, "এমন করে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছিলেন কেন? কি করেই বা আমার অন্য জায়গায় বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছিলেন! এত ভালবেসে এমন করে কষ্ট দেওয়া যায়?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ব্যবহারটা আমার যুক্তিসঙ্গতও হয়নি, বুদ্ধিমানের মতও হয়নি। এটা নিয়ে মনে ক্ষোভ রেখো না বিনতা, ক্ষমা কোরো আমাকে। নিজের মন আমি প্রথমেই ভাল করে বুঝতে

মনের মধ্যে জেগে উঠল। ক্ষণিকের মোহই এটাকে ভেবেছিলাম প্রথমে। প্রথম যৌবনে একবার খেয়েছিলাম। তখন বয়েস বড়লোক হইনি, সেইজন্যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলাম এক জায়গায়। ছুরির মত খানিকটা লেগেছিল, তার চেয়ে বেশী লেগেছিল আত্মাভিমানে। স্থির করেছিলাম, বিয়ে করবই না, সন্ন্যাসীও হব না। নারীকে জীবনে স্থান না দিয়েও যে সুখে সংসারে থাকা যায় সেইটাই দেখাব। সে পেরেও ছিলাম এতদিন।"

বিনতা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলিল, "আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এমন নির্বোধ কে পৃথিবীতে জন্মায় ?"

হরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "সে ত তোমার চোখ দিয়ে আমায় দেখেনি। আর প্রত্যাখ্যা সেই করেছিল, না তার অভিভাবকরাই করিয়েছিলেন তা ঠিক জানি না। আমি আজ তোমাকে দুঃ য় বলে বুকে করে নিচ্ছি, কিন্তু তোমাকেও অবহেলায় ফেলে পালিয়েছে, এমন নির্বোধ মানুষও কে কিন্তু থাক, যে কথা বলছিলাম। সেখ সহরে চাল ছাড়িনি। নারীসঙ্গবর্জ্জিত জীবন ছিল আমার, জন্যে দুঃখ করিনি কখনও। কিন্তু তুমি বাড়ীতে আসবার পর কি করে জানিনা আবহাওয়াটা বদলে গে তুমি দেখতে সুন্দর, কিন্তু সুন্দরী মেয়ে ত আগেও দেখেছি। গলাটা ভারি মিষ্টি, কিন্তু তাও কি কখনও শুনিনি ? বুঝতেই পারিনি প্রথমে ব্যাপারটা কি ঘটেছে।"

বিনতা অস্ফুট স্বরে বলিল, "ঠিক আমারই দশা। আমিই কি প্রথমে বুঝতে পেরেছিলাম।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "প্রথমেই হয়ত সবাই বোঝে না। আমি প্রথম বুঝলাম অসুখে পাগল হতে যেটুকু বাকী ছিল, তাও সম্পূর্ণ হল। অমন সেবা জীবনে কখনো কারো কাছে পাইনি। বুঝলাম যে অত ভাল লাগছে কেন সেবাটা। তুমি করেছ যে ? তোমার হাত আমাকে স্পর্শ করে বলে রোগশয্যাও আমার কাছে অমৃতময় হয়ে উঠেছে। মাথার কাছে বসে বসে হাত বুলতে, আর ব প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করত তোমাকে আরও কাছে পাবার জন্যে। বুঝলাম এবার আমার আর রক্ষা নেই, না তোমাকে সরাতে পারি জীবন থেকে। তাই এসব চেষ্টা আরম্ভ করলাম, যদিও জানতাম যে নি পায়ে নিজে এমন কুঠারাঘাত করছি, যে জীবনটা একেবারেই পঙ্গু হয়ে যাবে এরপর।"

বিনতা অভিমানভরা কণ্ঠে বলিল, "বিলায় ত এমনিই করে দিতে পারতেন। আমি য ঠিকই, কিন্তু আপনি চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হতেন।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে ক্ষমতা আমার ছিল না বিনতা। খুব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, আ ভুলতে পারবে এমন কিছু যদি হতে পারত, হয়ত তার মধ্যে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করে সরে আসতে পার কিন্তু আর কিছুর মধ্যে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।"

বিনতা বলিল, "পৃথিবীতে এমন কিছু ও আমি কল্পনাও করতে পারি না, যার মধ্যে থেকে আপনাকে হারানোর দুঃখ ভুলতে পারতাম।"

"বিনতা, তুমি ছেলেমানুষ বলেই বোধ হয় নিজেকে সহজে চিনেছিলে। আমি হাজার গো ধাঁধার ঘুরে কেমন যেন সব কিছু ঝাপসা করে ফেলেছিলাম। ভাবছিলাম যদি অন্য কাউকে বিয়ে তুমি দূরে চলে যাও, তাহলে হয়ত আমি একটু ভুলতে পারবো, অন্ততঃ চিরকালের মত হাতের বাইরে চলে গেলে. তাকে জীবন থেকে খানিকটা বাদ দিয়ে দিয়েই হবে। কিন্তু সে ত তুমি ইচ্ছে দিলে

শেষ চেষ্টা ঘুরে সরানোর। এও তোমার চোখের জলের বানে ভেসে গেল। আমাকে বাঁচালে তুমি এমনি করে এসে যদি আমার বুকে না পড়তে তুমি, তাহলে আমি হতভাগা তোমাকে চিরদিনের ম হারাতাম।" আর কিছু জানতে চাও?

বিনতা বলিল, "না।"

হরেন্দ্রনাথ এইবার বিনতার মুখখানা দুইহাতে তুলিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "তোমাকেও আম একটা জিজ্ঞাস্য আছে বিনতা। রূঢ় শোনাবে হয়ত, কিন্তু রাগ কোরো না। আমার জানা দরকার।"

বিনতা ভীতচক্ষে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "বলুন।"

"দেখ, একদিকে আমাদের একটা বড় পার্থক্য রয়েছে, সেটা বয়সের। আমি তোমার চেয়ে সত্তর বৎসরের বড়। এখনও অবশ্য বুড়ো হইনি। কিন্তু আরো কুড়ি বৎসর পরের কথা ভাব। তুমি তখন সুন্দরী যুবতী থাকবে, আর আমি হয়ে যাব পলিতকেশ বৃদ্ধ। তখনও এই অনুরাগ কি থাকবে? যা বলে ভাবতে খারাপ লাগবে না?"

বিনতা চমকাইয়া হরেন্দ্রনাথের আলিঙ্গন ছাড়াইয়া দূরে সরিয়া গেল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলি "আপনি কি আমাকে একেবারে জানোয়ার মনে করেন? আমি কি মানুষ নয়? আপনার বয়স যে হলে আর আমি আপনাকে ভালবাসতে পারব না? মানুষ কি শুধু রূপ আর যৌবনটাকেই ভালবাসে পৃথিবীতে আমার যদি কেউ ভক্তির পাত্র, ভালবাসার পাত্র থাকেন ত সে আপনিই, তা ত বিশ্বাস করেন আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, অমন দুর্মতি হবার আগে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়।" হরেন্দ্রনাথের দুই পা ধরিয়া তাহার উপর মাথা রাখিল।

হরেন্দ্রনাথ তাহাকে আবার টানিয়া লইলেন নিজের বাহুবন্ধনে। বলিলেন, "মুখের কথায় বলতে আমি বিশ্বাস করব বিনতা, পা ছুঁয়ে বলার দরকার নেই। তুমি কষ্ট পেলে, রাগও করলে বোধ হ কিন্তু কথাটা জানা আমার দরকার ছিল। আমি ডাক্তার, অসুস্থ দেহ, অসুস্থ মন এই নিয়েই আম কাজ। বহু বৎসর শুধু এদের নিয়েই আমি আছি। তাই মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে খানিকটা অবিশ্বাস আম এসে গেছে। মানুষের মন পরিবর্তনশীল, সেটাকে অপরাধও বলা যায় না। যদিও সেটা তোমার কা এখন দারুণ অপরাধ মনে হচ্ছে। বয়সের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীও বদলায়। সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি যে এমনই থাক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করি একাগ্র একনিষ্ঠ মন নিয়ে মেয়ে জন্মেছে আমাদে দেশে, বিধাতার আশীর্বাদে চিরকালই জন্মাবে। তুমি ত আমাদের মহাভারতের যুগের সাবিত্রীর জাতে মেয়ে। তিনি স্বামী ক'দিন পরে মারা যাবেন জেনেও তাকেই বিয়ে করেছিলেন। তুমিও স্বামী তোম চেয়ে আগে বুড়ো হয়ে যাবেন জেনেও তাকেই গ্রহণ করেছ।"

বিনতা বলিল, "দেখুন, মানুষ যখন দেবতাকে ভালবাসে তখন কি তাঁর বয়স বিচার করে?"

"তা করে না, কারণ তাঁরা চিরযৌবনের অধিকারী। আমরা যে মানুষ।"

বিনতা বলিল, "মানুষের কাছে দেবতা ত বেশীর ভাগ মানুষের রূপেই আসেন?"

"আসেন হয়ত। তাবিনি ও বিষয়ে বেশী কিছু।"

বিনতা অনেকক্ষণ আবার চুপ করিয়া রহিল। কথা বলিতে চায়, কিন্তু কথা বলিতে পারে না। এক দিনে মানুষের জীবনে এমন পরিবর্তন কি করিয়া আসে? ভোরবেলা যেমন তারাক্রান্ত হৃদয়ে যে দিন

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখছি, কিন্তু একটা আবেদন আমার রাখবে ?"

বিনতা বলিল, "আপনার কথা রাখব না, এত হতে পারে না, কিন্তু আবেদন বলবেন না, ও কানে খারাপ লাগে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আবেদন না হয় নাই হল, কথাটা হচ্ছে এই। লক্ষ্মী মেয়ে তুমি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন কোরো না, "তুমিই" বল। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা হতে যাচ্ছ সেটা আ ভুলে থাকতে দাও। বয়সটার কথা আমি আর ভাবতে চাই না।"

বিনতা হরেন্দ্রনাথের হাতটায় নিজের ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া বলিল, "তাই বলব, তাই বলব। তুমি আমার একটা ভিক্ষা মঞ্জুর কর, আমার কাছে আর নিজেকে কোনোদিন বৃদ্ধ বোলোনা, শুনলে যেন আমার কানে গরম লোহার ছ্যাঁকা দেয়। তোমার কোনো বয়স নেই আমার কাছে, তুমি আজও আমার শেষ দিন অবধি তাই থাকবে।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভাল, দুজনের কথাই দুজনে রাখলাম। কিন্তু তুমি প্রথমে বলতে যাচ্ছি কি, যখন তোমায় বাধা দিলাম ?"

বিনতা জিজ্ঞাসা করিল, "আত্মীয়-স্বজনকে জানান হবে ত ?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "জানান হবে বই কি ? এ ত লুকবার কিছু নয় ? তোমার যাঁরা আ আছেন জানাও তাঁদের। আমিও বাড়ীতে চিঠি লিখে দিচ্ছি। সম্প্রতি বাড়ীতে যারা আছে, তাদে বুঝেই বলা যাবে।"

বিনতা বলিল, "মা ত একেবারে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে যাবেন। তাঁর মতে ত অনন্তপূর্ণা কে বিয়েই হতে পারে না। তাঁর মূর্ত্তিমতী দুর্ভাগ্যরূপিণী মেয়ের এমন কপাল হবে, এ তিনি ধারণাও ক পারবেন না।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ধারণা না করুন, বাস্তব জিনিষটাকে স্বীকার তাঁকে করতেই হবে। যে পিসীমা কি বলবেন ?"

তিনি খুব খুসী হবেন। ওঁর ওসব কুসংস্কার নেই। তবে করতে কিছুই পারবেন না, হয়ে পড়েছেন।"

"খুসী হওয়ার লোকেরই অভাব, কাজ করবার লোক ঢের জোটে।"

বিনতা বলিল, "আর একজন লোক খুসী হবে না, সে তোমার ভাই রমেশ।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাই নাকি ? তিনিও বুঝি তোমার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন ? চোখ তাঁর, মাঝে মাঝে তাই মনে হত।"

বিনতা বলিল, "তা জানি না, তবে তুমি আমাকে নিলে, এ তার সহ্য হবে না। স্বর্গকে সারাক্ষ ঐ কথাই শোনায়। তোমার যে চেষ্টা আমার বিয়ে দেবার, সেটা নিতান্তই লোক দেখান, আসলে ভি অনেকেই আমাকে reserve করে রেখেছে।"

হরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "বাঁদর বলে কি হয়, ঘরেছে ঠিক। মৃগাঙ্ককে বিয়ে করবে না যখন, তখন মনে হল আমার যেন ফাঁসির হুকুম রদ হল।"

বিনতা বলিল, "সত্যিই পুরুষদের বুঝি না আমি। এই মন নিয়ে অন্য লোকের সঙ্গে আমার।

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আত্মহত্যাই আমিও করছিলাম বিনতা, নিতান্ত ভগবানের কৃপায় রক্ষা পেলা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে আমি বেঁচে থাকতাম, সে এই হরেন্দ্র নয়। তাকে দেখলে তুমি চি পারতে না। আচ্ছা ঐ বোকা লোকটাকে একটা চিঠি লিখব ?"

"কোন বোকা লোককে ?"

"যে তোমায় অনন্তপূর্ব্বা করে ফেলে পালাল। কার্য্যতঃ করে গেল অনন্তপূর্ব্বা। পুরুষজা উপরেই চটে গেলে। নিজেকে রেখে দিলে আমারই জন্যে—একান্ত করে। ও লোকটা আমার খুব উপকার করেছে।

বিনতা বলিল, "সত্যি কথাই। ওরা যদি উঠে না যেত তাহলে এতদিনে কোন নরকে যে কে জানে ? সেইটাকেই মেনে নিতাম হয়ত।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মানুষ এই নরকেই বাস করে বিনতা। সে দিক থেকে ঘনিষ্ঠতম হয়ে যাব, কিন্তু মনের তফাৎ তাদের সুমেরু আর কুমেরুর তফাতের চেয়েও বেশী। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ ক'টা বেজেছে।"

বিনতা তাকাইল। তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, বলিল, "কি ভীষণ দেরি করি দিলাম তোমার। তুমি ত এর দুঘণ্টা আগে বেরিয়ে যাও।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন "অনন্তদিনের নিয়মে কি আজও কাজ চলবে ? আর তুমি অত ব্যস্ত হোয়ো পালাবার জন্যে। না হয় আজ একটু ফাঁকিই দিলাম কাজে ? কোনোদিন ত দিইনি ?"

বিনতা বলিল, "যা তোমার খুসি।"

হরেন্দ্রনাথ এইবার বিনতাকে মুক্তি দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "তুমিও চল আমার সঙ্গে।"

বিস্মিতা বিনতা জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় ? রোগী দেখতে ?"

"রোগীদের কাছ অবধি তোমাকে নিয়ে যাব না। হিংসেয় তাদের রোগ আরো বেড়ে যাবে। সে নয়, গোটা দুই রোগীকে মাত্র আজ দেখতে যাব। তারপর তোমাকে নিয়ে বাজারে যাব।"

বিনতা বলিল, "না গেলে, চের ত রয়েছে, এখনি আবার কেন ? চিরজীবন ধরে পাবই ত তোমার কাছে ?"

হরেন্দ্রনাথ তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিলেন, "বুড়ী গিন্নীর মত পাকামী কোরোনা ত এখনি নূতন বউ হতে যাচ্ছ, ঠিক তেমনি চুপ করে থাকবে। আর শাশুড়ী যখন এখানে উপস্থিত নেই, তখন ও পুত্রের হুকুমমত সাজসজ্জা করবে। আমার বউ অন্য কারো কাছে ত হার মানতে পারে না ?"

বিনতা বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে। তোমার কথার উপর কথা বলা আমার উচিত হয়নি।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অনুচিত আর কি ? তবে ক'টা দিন সবুর কর একটু। যে ক'টা দ আছে তা একটু মিটিয়ে নিই। তারপর ত তোমার অবাধ হবার সব অধিকারই রইল। যাও দেখি, এ তৈরি হয়ে এস। বাড়ীতে কাজ আছে নাকি ?"

বিনতা বলিল, "কিছু নেই, সব সকালে মিটিয়ে রেখেছি। ভাবছিলাম তুমি না জানি কি আব বলবে, আর কেঁদে মরতে হবে সারাদিন ? নিজের কাছে ধরা পড়ার পর ঐ ত ছিল আমার কাজ। খে পারতাম না, ঘুমুতে পারতাম না, কোনো কাজে মন দিতে পারতাম না। খালি ভয় করত এই বুঝি তুমি ফি

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "একটু যদি আগে আমাকে জানতে দিতে। তা হলে এতদিন বসে এই বোকামীগুলো করতাম না।"

বিনতা বলিল, "তুমি আজ বলিয়ে নিলে, তাই বলতে পারলাম। নিজের থেকে পারতাম বুক ফেটে মরে গেলেও পারতাম না।"

হরেন্দ্রনাথ আবার তাহাকে কাছে টানিয়া নিলেন। বলিলেন, "কেন বিনতা? ভালবাসা এতবড় অপরাধ? এটা স্বীকার করতে মেয়েরা এত লজ্জা পায় কেন?"

বিনতা বলিল, "ভয় পায় বলে বোধহয়। প্রতিদান যদি না পায়, তা হলে সে লজ্জা চা পৃথিবীতে আর কোথায় জায়গা থাকে?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এটা কিন্তু আমরা পারি বিনতা। বেশ আমাকে দেখে কি খুব প্রেমিক মনে হয়? আগে যে ভালবাসার সামান্য আঁচও আমার জীবনে লেগেছিল, তাও ত গেছি।"

বিনতা হাসিয়া হরেন্দ্রনাথের কাঁধে মাথাটা রাখিয়া বলিল, "শুধু আঁচ বলেই অত সহজে ভু আমার মত যদি দাবানলের মধ্যে পড়তে, তাহলে ভুলতে পারতে না। ভালবাসা বলে যা কিছু তার বেশীর ভাগই ত ভালবাসা নয়।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "শতকরা নিরানব্বুইটা নয়। কিন্তু আবার যদি এখন প্রেমালাপ আরম্ভ তাহলে আমার আজ আর বেরুনই হবে না। অতএব একটু নির্মম হয়েই তোমাকে সরিয়ে দিচ্ছি উপর থেকে। যাও লক্ষ্মীটি; তাড়াতাড়ি ready হয়ে এস।"

বিনতা আরক্ত মুখে ঘরের বাহির হইয়াই পড়িল রমেশের সামনে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বিনতার উচ্ছ্বসিত মুখ ও চোখের দিকে তাকাইয়া সে সিঁড়ির মুখ হইতে সরিয়া গেল। বিনতার সন্দেহ সে হরেন্দ্রনাথের ঘরে কি কথা হয়, তাহা শুনিবার জন্যই এখানে দাঁড়াইয়াছিল। কি শুনিয়াছে জানে? তাহারা কেহই বিশেষ নীচু গলায় কথা বলে নাই। হরেন্দ্রনাথের অনুমান কি সত্য? র কি বিনতার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল? কে জানে? তাহার দিকে মন দিবার বিন্দুমাত্র অব বিনতার ছিল না।

প্রস্তুত হইয়া যখন হরেন্দ্রনাথের ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তিনিও প্রস্তুত। বিনতাকে বলিলেন, "আজ বিয়ের registrationএর নোটীশ দিয়ে দিলে কেমন হয়? তার পরেও প দিন বসে থাকতে হবে। মেরি করে কোনো লাভ আছে?"

বিনতা বলিল, "কিছুমাত্র লাভ নেই।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "চল বেরুই। যতটা কাজ এক সঙ্গে সেরে আসা যায়। আজকে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে চাই। একজনের ভবিষ্যতের plan নিয়েই এতদিন ব্যস্ত ছিলাম, এখন দু একসঙ্গে plan করতে হবে।"

হরেন্দ্রনাথ যতক্ষণ রোগী দেখিলেন, ততক্ষণ বিনতা গাড়ীতে বসিয়া নিজেকে একটু করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু রক্তধারার উন্মত্ত নৃত্যকে থামাইতে পারিল না, অসহ্য প্রবলতায় নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল। আনন্দের আতিশয্যে কি শেষে সে অসুস্থ হইয়া পড়িবে

বিনতা বলিল, "অসুখ নয়, কিন্তু স্বাভাবিকও নয়।"

হরেন্দ্রনাথ তাহার নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "বড় বেশী চঞ্চল। অতখানি overdose তো সহ্য হয়নি। চল বাড়ী ফিরে। আজ শুধু আংটিটা নিয়ে যাই, বাকী কাজ কাল হবে।"

বিনতা বলিল, "কি বিচ্ছিরি, আজই শেষে অসুখ বাধাব নাকি?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, না, অসুখ নয়। বাড়ীতেই ডাক্তার রয়েছে তোমার ভাবনা কি মুস্কিল এই যে তিনি ত শুধু ডাক্তার নন, ভাবী স্বামী এবং প্রণয়ীও বটেন। অসুখের মূলেও তি অবসান করবার ভারও তাঁর উপরে।"

হীরার আংটির দামটা দেওয়া ছাড়া আর কিছু বিনতাকে করিতে হইল না। আংটি পরি বাড়ী আসিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, "আর কাউকে কিছু বোঝাতে হবে না, এই দেখলেই বাড়ীর সবাই বুঝবে। স্বর্গ যা চেঁচাবে। তার মত ত তুমি মুনি-ঋষিদের দলে। কোন স্ত্রীলোকের দিকে তাকাওই না।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পৌরাণিক ঋষিরা ত সবাই প্রায় পরীক্ষায় ফেল। একটি অপ্স দেখলেই কাৎ হয়ে পড়তেন। আমি যাকে দেখে কাৎ হলাম তিনি ত ঢের বেশী উঁচু দরের জিনি আচ্ছা, এখন ত খাওয়ার সময় হোলো। খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও ত লক্ষ্মী মেয়ের মত তাহলেই বিকেলে আবার সুস্থ হয়ে উঠবে।"

বিনতা তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, "একটু অবাধ্য হব এবার, এখন ঘুমতে পারব না।"

হরেন্দ্রনাথ বেশী জেদ করিলেন না, কারণ বিনতার অসুস্থতাটা মারাত্মক কিছু ছিল না চাকর-বাকর ছাড়া বাড়ীতে কেহ ছিল না। দুপুরের খাওয়া চুকিয়া গেলে, দুজনে মিলিয়া সাম্প্রতি কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করিতে বসিলেন, কিন্তু দেখিতে দেখিতে কথাবার্তার মোড় অন্যদিকে ফিরিয়া গেল।

বিনতাকে শেষ পর্য্যন্ত ঘণ্টাখানিক ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে হইল, কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও ঘুমাইতে পারিল না। বিকাল হইতে না হইতে কাজের ছুতা করিয়া উঠিয়া পড়িল। হরেন্দ্রনা বলিলেন, "সকাল থেকে বাড়ীটা চুপচাপ ছিল আজ, সেটা মস্ত লাভ। নইলে সকলের চোখ কান বাঁচি চলতে হত। সেটা পারা শক্ত, বেশী উত্তেজনার মুখে। মেয়েরা কেঁদে কেটে খানিক হাল্কা হয় যায়, আমরা যে তাও পারি না। সকালে বুঝতে পারছিলাম না অনেক সময় পায়ের তলায় মা আছে কিনা।"

বিনতা বলিল, "বাইরে তুমি এত শক্ত দেখতে, যে কেউ কখনও বুঝবে না যে, ভিতরে তু এই রকম।"

"তুমি ত বুঝবে তাহলেই হল। ভিতরটার সঙ্গে আর আমার কারই বা সম্পর্ক? চিরদিন আমি একলা। আচ্ছা এইবার সব কিরল বলে, জ্বালাবে খানিক। বেশী upset হয়ো না, যে যাই বলুক তোমার নাড়ীর চাঞ্চল্য এখনও যায় নি।

বিনতা বলিল, "কোনদিন যাবেও না।"

চা খাইবার সময় বাড়ীর যাহারা বাহিরে ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই এক সঙ্গে ফিরিয়া আসিল

গেল। স্বর্ণ বিনতাকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, বিনতাদি, এ কি কাণ্ড?" তোমাকে য পরাল কে?"

হরেন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "বিবাহযোগ্য পুরুষ মানুষ ত এ বাড়ীতে একজনই আছে, পরিয়েছে।"

স্বর্ণ বলিল, "এ রাম, বিনতাদি শেষে মামী হবে বলল? প্রণাম করতে হবে এরপর? মাথাটা কাজিল হলে কি হয় ঠিকই বুঝেছিল। আমিই বরং বলতাম মেজমামা সন্ন্যাসী মানুষ ওর ও মন নেই। কোন মেয়ের দিকে তাকায়ই না।"

মেজমামা বলিলেন, "একবার ভাল করে তাকিয়েই ত এই দশা।

স্বর্ণ বলিল, বিয়ে কবে হবে মেজমামা? আমি থাকতে থাকতে হবে ত?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নিশ্চয়, তোকে ত বরকর্ত্রী, কন্যাকর্ত্রী দুইই হতে হবে। ইউরের জন্য কি দরকার ভাল করে একটা কর্দ্দ কর ত। তুইই ভাল পারবি। বিনতা ত কনে মানুষ, তার করবে। তাছাড়া সে জানেই বা কি? বিয়ে ত আগে করেনি।

স্বর্ণ বলিল, "সে ত বটে। তা ছাড়া নিজের বিয়ের কাজ, নিজে করতে নেই।"

৯

কিছুদিন পরের কথা। স্বপ্নাদের বাড়ীতেও বিবাহের ঘটা লাগিয়াছে। প্রথমা কন্যার বি ধুমধাম হইতেছে সাধ্যমত। গোধূলি লগ্নে বিবাহ। কাজেই তাড়াতাড়ি কাজ হইতেছে। ইহারই কনেকে সাজান হইতেছে, ঘর একেবারে ভর্ত্তি। এ ঘর ছাড়িয়া কেহ নড়িবার নাম করিতেছে না। সরে আসিয়া মাঝে মাঝে দেখিয়া যাইতেছেন।

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করিল, "মা বিনতাদি আসবে না আজ?"

মা বলিলেন, "আসতে ত অনেক করে বলে দিয়েচি, তার বাড়ী থেকেই ত বর বেরচ্ছে। আর দিদি বলছিস্ কেন, কাকী হয়ে বসেছে।"

স্বপ্না বলিল, "কি দারুণ কপাল বাবা মেয়ের। এল নার্স হতে, হল রাজরাণী।"

সরোজিনী বলিল, "তা মেয়ের গুণ আছে বাছা। রূপে ভোলায়নি। এমন সেবা করেছে যে ম জিতে গেছে। সে সব তাড়াতাড়ি, এখনি বর এসে পড়বে।"

বরের বাড়ী, অর্থাৎ বরের কাকার বাড়ীতে মহাধুম। আত্মীয়স্বজনে বাড়ী গম্‌গম্ করি অনিলের বাঁধের হাতে আজকার গৃহিণীপনার ভার দিয়া, বিনতা নিজের ঘরে বসিয়া স্বামীকে বুঝাইতে করিতেছে যে স্বপ্নাদের বাড়ী অন্ততঃ এত সাজিয়া যাওয়া তাহার ভাল দেখায় না। সেখানে সে ছিল একভাবে।

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি আমার কথা শুনবে কি না বল। তার উপর নির্ভর করবে য যাওয়া।"

বিনতা মিনতিপূর্ণ চোখে তাকাইয়া বলিল, "কবে তোমার কথা না শুনি আমি? আজ এ

হরেন্দ্র বলিলেন, "বেশ, আমিও যাব না, তুমিও যেয়ো না।" বলিয়া দৃঢ় হইয়া খাটের উপ শুইয়া পড়িলেন। বিনতা দুই হাত ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিল, বলিল, "রাগ কোরোনা, রাগ কোরোনা যা বলছ তুমি তাই হবে। ঐ রকম পাথরের মত চোখ করে আমার দিকে তাকিও না, আমার বুকের ভিতর হিম হয়ে যায়" বলিয়া স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিল।

অতঃপর বিনতার লাজলজ্জা নিবিবাদেই সম্পন্ন হইল, এবং হরেন্দ্রনাথের চোখে-মুখেও আর রাগে চিহ্ন দেখা গেল না। গোলাপী বেনারসী ও হীরার গহনায় সাজিয়া বিনতার মনের যা লজ্জা তাহা মনে রহিয়া গেল। বাহিরে আর প্রকাশ করিল না। শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনির ভিতর বরযাত্রীর দল বাহির হইয়া পড়িল

বিবাহ বাসরে তখন মহাভীড়। বরযাত্রীর দলের আশায় সকলে আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়াছে রসুন চৌকীর বাজনা, শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনির মধ্যে বরযাত্রীরা আসিয়া পৌঁছিল। প্রথমে সুসজ্জিত বড় গাড়ী। দরজা খুলিয়া দিতেই নামিলেন বর, বরকর্ত্তা, রমেশ ও একজন বন্ধু। পরের গাড়ীটা ডাঃ হরেন্দ্রনাথের অভ্যাগতরা তাকাইল বরের গাড়ীর দিকে, বাড়ীর লোকেরা বেশী করিয়া তাকাইল দ্বিতীয় গাড়ীখানার দিকে হরেন্দ্রনাথ পুরাতন বন্ধু, সুদর্শন হইলেও, নূতন নয়। সঙ্গিনীটি সুন্দরী ও অতি সুসজ্জিতা, সেও নূতন নয় কিন্তু আজ নূতন রূপেই আসিয়াছে। সরোজিনী ছুটিয়া আসিলেন অভ্যর্থনা করিতে, "এস ভাই এস, এ ঘরে স্বপ্না আছে।"

বিনতার বড়ই অপ্রতিভ লাগিতেছিল। কিন্তু উপায় ত নাই। তাহার উপর যে ভালবাসা নি বর্ষিত হইতেছে, তাহাতে সে প্রায় নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, হরেন্দ্রনাথের সামান্যতম কথাও সে না রাখি পারে না।

স্বপ্না বলিল, "বাবাঃ, যা দেখাচ্ছে। আমার দিকে কেউ আজ আর তাকাবে না।"

বিনতা বলিল, "যার তাকাবার সে ঠিকই তাকাবে। দেখ ভাই কথা দিয়েছিলাম যে বরযাত্রী ধ আদর হয়ত তাই এলাম।"

স্বপ্না বলিল, "হাঁ বেশীদিন থাকলে বরযাত্রী হবে বলেছিলে বটে। তা একেবারে চিরদিনের ম থেকে গেলে। তোমার ঠিক গল্পের Cindarella-র মত কপাল।"

রাস্তার ধারে একটা জঙ্গলের পাশে একদল ভবঘুরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের দলে মেয়েপুরুষ ছেলেমেয়ে সবই আছে।

শিল্পী বেরিয়েছেন তাঁর বিষয়বস্তুর খোঁজে। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে পড়লেন সেই ভবঘুরের দলের সামনে। লক্ষ্য করে দেখলেন তিনি, একটি তরুণী মাতা তার স্তন্যপানরত সন্তানের মুখের দিকে কি আকুল আগ্রহে চেয়ে আছে। শিশুটিও তার মায়ের গলা জড়িয়ে যেন একটি পরম শান্তির আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে—এইভাবে চেয়ে আছে তার মায়ের মুখের দিকে।

শিল্পীর চোখে মাতৃত্ব এক নূতন রূপ নিয়ে ধরা দিল। দৃশ্যটি মনে গেঁথে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন তাঁর শিল্পাগারে।

আজও র‍্যাফেলের মাডোনা জগৎজোড়া খ্যাতি নিয়ে রয়েছে। মাতৃত্বের ছবি অমনটি

॥ রবীন্দ্রপাঠচক্র ॥

পরিতৃপ্তিতে গড়া

অনেকের জীবন পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তায় ভরা। তবুও তিনি নিজেকে ধন্যবাদ দেন। তিনি কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেন। জীবনের সঞ্চিত পুঁজি দিয়ে তিনি ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। এখন বেশ সুখে দুঃখে জীবনযাত্রা পরিচালনা করে একটি নির্দিষ্ট ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের তিনি তার অন্যান্য জীবনের বিনিময়ে এক ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করতে পারবেন।

আপনার বেলায়ও কি তেমনি হবে? উপযুক্ত নিশ্চয়তা ও সুযোগ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি বহন করে এবং আপনার অবসর জীবনে একটি নিশ্চিত সচ্ছল আয়ের ব্যবস্থা করতে এলআইসি'র জীবনবীমার উপর নির্ভর করতে পারেন। মনে রাখবেন, এই সমস্ত সুবিধা আপনার জীবদ্দশায় যে কোনোই আপনার হবে। কিন্তু একটা ব্যাপারে এ সবিশেষ হবে না

* প্রতি বছর এল.আই.সি. ১৮ কোটিরও বেশি টাকার নতুন বীমা করে। এর মধ্যে ৭১ কোটি টাকারও বেশি দেয় দাবির জীবন বীমাকারীদের...

জীবনবীমার কোন বিকল্প নেই

রবীন্দ্র পাঠচক্র

রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্য-জিজ্ঞাসা (২)

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের বিরুদ্ধে আধুনিক সাহিত্য-পাঠকের অভিযোগ এই যে, তাঁহারা সামগ্রি দৃষ্টিতে কোন কবি-কৃতির বিচার করেন নাই, সমগ্রভাবে কোন কাব্য বা নাটকেরই সৌন বিশ্লেষণ করেন নাই। তাঁহারা কাব্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রতিটি অংশের অর্থাৎ শ্লোক বাক্যের রস, দোষ, গুণ, রীতি, ধ্বনি, অলঙ্কার প্রভৃতি নির্ণয় করিয়াছেন, সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে তাঁ অপূর্ব বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিলেও কোন কাব্যের উপর নূতন আলোকপাত করিতে পারেন না যেরূপ সমালোচনাকে নূতন সৃষ্টি বলা যায়, সে ধরণের সমালোচনা হয়তো ভারতবর্ষে ছিল না কিন্তু যে-ধর সাহিত্যবিচারের পদ্ধতি ভারতবর্ষে ছিল, তাহার কোন সার্থকতা নাই, এমন কথাও বলা যায় আলংকারিকদের আলোচনার ফলেই এদেশের যাঁহারা রসস্রষ্টা তাঁহারা শব্দচয়নে এবং দোষ-পরিহারে মাত্রার সচেতন হইতেন। অবশ্য, এই আলঙ্কারিক বিধিনিষেধই আবার কবিগণের স্বচ্ছন্দবিহা কল্পনাকে কিছু পরিমাণে ব্যাহত করিত। কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষেই আলঙ্কারিকগণ রসজ্ঞতার সঙ্গে সূক্ষ্মদর্শি নৈয়ায়িকী বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, এদেশে সাহিত্য-বিচারের অর্থ ক শরীরের ব্যবচ্ছেদ মাত্র (dissection), তাঁহারা ভ্রান্ত।

পাশ্চাত্ত্য দেশে সৃষ্টিধর্মী সমালোচনার অভাব নাই। তাঁহারা সমগ্রভাবে কাব্যের বিচার ক কবি-কৃতির মধ্য দিয়া কবির অন্তর্লোকে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছেন, কবির বিশিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গির (sty মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যক্তি-সত্তাকে উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, কখনও বা কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনাব কালানুক্রমিক আলোচনা করিয়া কবি-মানসের অভিব্যক্তির ধারাটি অনুসরণ করিয়াছেন, কেহ বা সা হইতে সমাজচিত্র সংগ্রহ বা ঐতিহাসিক তথ্য আহরণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, আবার কেহ বা ব্যক্তি ভালো-লাগা বা না-লাগার মানদণ্ডটি আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যখন মহাক গীতিকাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতির লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, তখন তাঁহারা সাহিত্ প্রত্যেকটি প্রকার-ভেদের (literary forms) সীমারেখা চিহ্নিত করিয়াছেন। আমরা মনে করি, সাহি বিচারে এইরূপ 'ফর্মুলার' আশ্রয়-গ্রহণ কৃত্রিম ও অনেকাংশে বিভ্রান্তিজনক। এইরূপ 'ফর্মুলা' অ করিয়াই আমরা বলিয়া থাকি, মধুসূদনের মেঘনাদবধ মহাকাব্য হয় নাই, কালিদাসের শকুন্তলা (ত প্রথম চারিটি অঙ্ক লইয়া বিচার করিলে) নাটক হয় নাই, হইয়াছে গীতিকাব্য, আর নাটক রচনায় রবীন্দ্র সিদ্ধকাম হন নাই। আমরা এইরূপ মন্তব্যের সারবত্তা স্বীকার করি না, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও করেন ন রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতের প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মত কাব্যের দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার প্রভৃ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, তেমনি আবার সাহিত্যের প্রকার-ভেদ লইয়াও কোনরূপ বিচার-বি করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিষয়ক নিবন্ধ-সমূহে আমরা 'সাহিত্যের তথ্য ও সত্য', 'সাহিত্য-

আমরা বলিয়াছি, 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং',—কাব্য বা সাহিত্যের এই সংজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ গ্র করিয়াছেন। সাহিত্যের এই রস নিত্যবস্তু, ইহা দেশ বা কালের অপেক্ষা রাখে না, এইজন্য শ্রেষ্ঠ সাহি যে দেশে বা যে কালেই রচিত হউক না কেন, উহা সকল দেশের সকল কালের রসিকসমাজের উপভো অম্লান কুসুমের মালার মত সহৃদয় ব্যক্তি উহাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, সাহিত্যিকের লক্ষ্য লোকহিতৈষণা নহে, সাহিত্যসৃষ্টি বিধাতার সৃষ্টির ম আনন্দ হইতে উদ্ভূত। সাহিত্য প্রয়োজনের অতীত সামগ্রী। অবশ্য, আমরা সাহিত্য হইতে কোন শি আহরণ করিতে পারি না, এ কথা সত্য নয়। রামায়ণ ও মহাভারত আমাদিগকে মনুষ্য ও মনুষ্যত্বের শ্রে দেয়, এ কথা সত্য, কিন্তু মহাকাব্য হিসাবেই এই দুইখানি গ্রন্থের গৌরব। সুতরাং দার্শনিক, নীতিশাস্ত্রে ও কবির লক্ষ্য এক নয়।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মেঘদূতের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—কালিদাসের মেঘদূতের মত পৃথিবী সকল শ্রেষ্ঠ কাব্যেরই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। পূর্বমেঘ আমাদিগকে পথের বিচিত্র নয়ন-শু সৌন্দর্য দেখাইয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত করে আর উত্তরমেঘ আমাদিগকে শ্রেয় বা কল্যাণের পথের নির্দেশ দে 'ভাষা ও ছন্দে' মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদকে বলিতেছেন—মানুষের ভাষা এতকাল প্রয়োজনের সীমার ম বদ্ধ ছিল, কিন্তু কাব্যের ভাষা অপ্রয়োজনের ভাষা, সে ভাষা মানুষকে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় প্রয়োজ ঊর্দ্ধে ভাবের স্বর্গলোকে লইয়া যাইবে। শুধু তাহাই নহে, আমি অভিনব ছন্দে যে কাব্য রচনা করি তাহাতে মহামানবের চরিত্র কীর্তন করিয়া মানুষকে দেবতা করিয়া তুলিব—

'দেবতার তরণীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে'।

ভাবাবিষ্ট বাল্মীকি নারদকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই—কাব্য যেমন মানুষকে আনন্দ পরিবে করে, তেমনই তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে মহৎ করিয়া তোলে, তাহাকে শ্রেয়ের পথ নির্দেশ কর এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতও সুস্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন, যিনি রসসৃষ্টির মধ্য দিয়া লোক-কল্যাণ সা করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।

এ বিষয়ে আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতদের অভিমত এই যে, কাব্য আমাদিগকে উপদেশ প্রদান ব বটে কিন্তু সে উপদেশ কান্তাসম্মিত। বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন—'যাহারা অল্পধী, তাহারাও কাব্যের অনুশীলন ফলে অনায়াসে চতুর্বর্গ-ফল লাভ করিতে পারেন। রামায়ণ আমাদিগকে এই শিক্ষাই দেয় যে রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির দৃষ্টান্তই আমাদের অনুসরণ করিতে হইবে, কেননা, উহাই শ্রেয়ের পথ, আর রাবণ প্রভৃ যে পথে গিয়াছেন, উহা বিনষ্টির পথ। বিশ্বনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সমর্থনের জন্য একটি উদ্ধৃ দিয়াছেন—

'ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণম্'।

বেদাদি শাস্ত্র নীরস, সুতরাং যাহারা তীক্ষ্ণধী, তাহাদেরই বহু ক্লেশে এই সব শাস্ত্রের চর্চার ব চতুর্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু কাব্য আমাদের অনির্বচনীয় আনন্দ উৎপাদন করে, সুতরাং যাঁর সুকুমারমতি, তাঁহারাও অক্লেশে কাব্য পাঠের দ্বারা চতুর্বর্গ লাভ করিতে পারেন।

প্রবৃত্তি হইবে কেন ?. উত্তরে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—যদি এমন হয় যে কটু ঔষধেও যে রোগের উপ হয়, মিষ্ট ঔষধেও সেই ব্যাধিরই নাশ হয়, তবে মিষ্ট ঔষধ সেবনে কোন্ রোগীর না প্রবৃত্তি হইবে ?

রবীন্দ্রনাথ হয়তো বলিতে চাহিয়াছেন, কবি লোক-কল্যাণ সাধন করেন বটে কিন্তু সে সম্ কোন সচেতন আদর্শ কবির মনে বর্ত্তমান থাকে না। আর এই কল্যাণের আদর্শ কাব্যের মধ্যে যত গ প্রচ্ছন্ন থাকে, কাব্য হয় তত বেশি রসঘন। কালিদাসের শকুন্তলা, মেঘদূত বা কুমারসম্ভবে মঙ্গলের আ আছে বটে কিন্তু উহা কোথাও প্রকট হইয়া উঠে নাই, উহা সুন্দরের আদর্শের সঙ্গে অভিন্ন। রবীন্দ্র উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত, ঔপনিষদিক ভাবধারায় নিষ্ণাত, তাই কাব্যবিচারেও তিনি এই প্রভাবকে অতি করিতে পারেন নাই। উপনিষদ বলেন—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জী আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'। 'আনন্দ হইতে ভূতগণ জন্ম লাভ করে, তাহারা আনন্দেই বিধৃত, আ আনন্দেই তাহারা অনুপ্রবিষ্ট হয়।' রবীন্দ্রনাথ বলেন, বিধাতার সৃষ্টির ন্যায় কবির সৃষ্টিও আনন্দ প্রকাশ, উহা যেন কবির লীলাবিলাস। বিধাতার মনে যখন সিসৃক্ষা জাগে, তখন তিনি বলেন—'একো বহু স্যাম্ প্রজায়েয়েতি'। 'আমি এক আছি, আমি বহু হইব, আমি প্রজা সৃষ্টি করিব'। কবির ম বহু হইবার, নিজেকে বিচিত্ররূপে প্রকাশ করিবার বাসনা জাগে। আবার উপনিষদ আমাদিগকে শি দেয়, ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অর্থই নিখিলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। ঈশোপনিষদ্ বলেন—

'যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ'॥

যিনি সমস্ত প্রাণিবর্গকে নিজের আত্মায় দর্শন করেন এবং নিজের আত্মাকে সর্ব্বভূতে দর্শন ক তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। একত্বদর্শী পুরুষ যখন নিজের আত্মায় সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনি শোক ও মোহের অতীত হন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, মানুষ যখন নিজের মধ্যে বিশ্বমানবের সঙ্গে মি প্রেরণা অনুভব করে, তখনই সে বিচিত্ররূপে—কাব্যে, চিত্রে, সংগীতে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে আপনাকে প্র করে। 'কাব্য···যদি আনন্দের প্রকাশ হয়, তবে সে মৃত্যুঞ্জয়ী'।

সাহিত্যের বিষয়-বস্তু কি ? মূল ভাবে বলা যায়, মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর। কিন্তু এই তিনটির যা তো কোন বিষয়বস্তুই নাই, থাকিলেও তাহা মানুষের চিন্তার অগম্য। সাহিত্যের বিশেষত্ব এই যে, উ শ্রেণীর প্রাধান্য নয়, ব্যক্তিরই প্রাধান্য। বিজ্ঞানে আমরা শ্রেণীবিভাগ (classification) বা জাতি-নি প্রয়াস দেখিতে পাই, ইতিহাস বা নৃতত্ত্বে নানা জাতির পরিচয় লাভ করি, কিন্তু ব্যক্তিই সাহিত্যের আ রবীন্দ্রনাথ এই ব্যক্তি কথাটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বলেন—'সাহিত্যের ব্যক্তি ে মানুষ নয়, বিশ্বের যে কোন পদার্থই সাহিত্যে সুস্পষ্ট, তাই ব্যক্তি'।

সাহিত্যে অলংকরণ জিনিষটি বাহির হইতে আক্ষিপ্ত নয়, 'অলঙ্কারঃ কটককুণ্ডলাদিবৎ, অর্থাৎ, অ সাহিত্য শরীরের অঙ্গে কটক, কুণ্ডল প্রভৃতির মত, বিশ্বনাথের এ কথা সত্য নয়, কবিরা ভাব বা অনুভূ প্রকাশ করিতে গিয়াই বিনা-প্রয়াসে অলংকারের আশ্রয় নিয়া থাকেন, তাই আমাদের দেশের অনেক রস মনীষীর দৃষ্টিতে অলংকার 'অপৃথগযত্ননির্ব্বর্ত্ত্য'।

লালসার বা উগ্র ভোগাকাঙ্ক্ষার অসংযমের দ্বারা যে সাহিত্য বিকৃত, সেই সাহিত্যই বস্তুতান্ত্রি এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য সংযমে ও শুচিতায়। সাহিত্য অবশ্য জীবন অস্বীকার করে না বা মানুষের সহজ প্রবৃত্তির প্রতি, তাহার জীবধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা করে না। কিন্তু কালে বাংলা দেশে এক শ্রেণীর তরুণ লেখক অতি আধুনিকতার নামে সাহিত্যে উগ্র ইন্দ্রিয়-লালসা 'আমদানি' করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একথা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন যে ইহাদের মধ্যে শক্তি পরিচয় আছে ও চিন্তার সবলতা আছে, কিন্তু দেশের যথার্থ সমস্যার সঙ্গে ইহাদের যোগ নাই এবং বিদে ভাবধারার দ্বারা ইহারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত, তাই ইহারা সত্যকারের সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন না ইহাদের অধিকাংশই সাহিত্যে 'সহজিয়া' সাধন গ্রহণ করিয়াছেন। এই সহজ পন্থার অনুসরণ করিয়া অল্প কাছে বাহবা পাইবার ইচ্ছাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'সাহিত্যিক কাপুরুষতা'।

আমরা যে অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের কথা বলিলাম, তাঁহারা অনেকেই ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন (Psycho-Analysis) দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মানুষ সকল গুপ্ত বা অগুপ্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলে আছে কাম বা যৌন লালসা আর এই সত্যটিকে সাহিত্যের মা প্রকাশ করাটাই যথার্থ সাহসের পরিচায়ক। সাহিত্যিকদের এইরূপ প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্র বলিয়াছেন—'সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্র দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। আজকাল সাইকো-এ্যানালিসিসের বু অনেকের মনকে পেয়ে বসে।'

• মানুষের চিত্তের উপকরণে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে—কাম, ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদি। ছিন্ন ক দেখলে যে বস্তু-পরিচয় পাওয়া যায়, সম্মিলিত আকারে তা পাওয়া যায় না। • বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গা প্রত্যেক সেই সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে। সন্দেশে কার্ব্বন আছে, নাইট্রোজেন আছে, কিন্তু সেই উপকরণে দ্বারা সন্দেশের চরম বিচার করতে গেলে বস্তুতত্ত্ব বিসদৃশ ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাকে একশ্রেণীতে ফেলা হয়; কিন্তু এতে করেই সন্দেশের চরম পরিচয় আচ্ছন্ন হয়। কার্ব্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ব পড়া সত্ত্বেও জোর করে বলতে হবে যে, সন্দেশ পচা মাংসের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। কেন উভয়ের উপাদান এক কিন্তু প্রকাশ স্বতন্ত্র। চতুর লোক বলবে, প্রকাশটা চাতুরী, তার উত্তরে বলতে হ বিশ্ব-জগৎটাই সেই চাতুরী।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রী নান্‌সেন একদিন বক্তৃতা করছিলেন সেণ্ট এণ্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মুখে।

কথা প্রসঙ্গে বললেন : আমি যখন এগিয়ে চলি তখন পেছনের নৌকা পুড়িয়ে দিই, পার হওয়া সেতু উড়িয়ে দিই। পিছু হঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, থাকে কেবল সামনে এগিয়ে যাওয়া।

সম্মুখে চলার ঐ এক মন্ত্র : বার্ণ দি বোট—পিছনে ফেরার কথা চিন্তা কোরো না।

অর্থনৈতিক আলোচনা

পশ্চিম বঙ্গের খসড়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের উন্নয়ন বিভাগের পক্ষ হইতে পশ্চিম বঙ্গের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী কল্পনার খসড়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় মোট ৩৪৬·০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে ব প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রধান প্রধান খাতে নিম্নরূপ ব্যয় ধরা হইয়াছে :

		মোট টাকা (কোটি টাকার হিসাবে)		শতকরা হিসাব
	কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা	৮১·৪৪		
	সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায়	২৫·৪২		
	বড় ও মাঝারি সেচ পরিকল্পনা	১৯·৫৬		
	বিদ্যুৎ	৩৮·৫০		
	গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প	১০·৫৯		
৬।	শিল্প ও খনিজ	২·৫৫		
৭।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৬·৫০		
৮।	সমাজ সেবা	২৪·৩৮		
৯।	বিবিধ	১·৩৪	৪২·২৮	
	বিশেষ পরিকল্পনা	৪০·৯৪		
	দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা	৫·০০		১
		৩৪৬·০০		১০০

পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে দেখা যায়, পশ্চিম বঙ্গের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিক ১৫১·৯ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৫৩·৭ (বিহারের কয়েকটি অঞ্চল পশ্চিম বঙ্গে যুক্ত হ ফলে পরিবর্তিত হিসাবে ১৪৭·৭) কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। এই দিক হইতে বিবেচনা ক পশ্চিম বঙ্গের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খুবই বৃহৎ হইয়াছে বলা যায়।

পরিকল্পনা কমিশন পশ্চিম বঙ্গের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ ৩০৮·৪ কোটি ট মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ সরকার অতিরিক্ত ৩৬·০৯ কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। খাদ্যশস্য উৎপাদনে পশ্চিম বঙ্গের ব্যাপক ঘাটতি

মূল খসড়া পরিকল্পনাকে অনুসরণ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাতেও ঘোষণা ক হইয়াছে, (১) খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, এবং (২) ইস্পাত, আলানি, বিদ্যু প্রভৃতি মূল শিল্পের সম্প্রসারণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, "ছোট, মাঝারি ও শিল্পের সম্প্রসারণের দ্বারাই কেবলমাত্র এই তীব্র বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব।" তৃতীয় পরিকল্পনাকা পশ্চিমবঙ্গে শিল্পখাতে সর্বমোট ১৩-১৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে।

৬ হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত বয়সের সকল বালক-বালিকাকে তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পশ্চিম বঙ্গে যে সব গুরুত্বপূর্ণ কার্য সুরু করা হইবে, তাহার মধ্যে নি লিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) দুর্গাপুরে একটি সার প্রস্তুতের কারখানা; (২) দুর্গাপুরে একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩) ব্যাণ্ডেলে একটি উচ্চ পর্যায়ের তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র; এবং (৪) কলিকাতা হইতে দুর্গাপুর এ কলিকাতা হইতে দমদম পর্যন্ত দ্রুত চলাচলের রাস্তা। রাস্তা দুইটির জন্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

জলঢাকা জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনার কাজও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যথেষ্ট অগ্রসর হইবে বলিয়া আ করা যায়।

পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফারাক্কা বাঁধের কোন উল্লেখ খসড়া পরিকল্পনায় নাই

পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংস্থানের বিষয়ে বলা হইয়াছে, পরিকল্পনা কমিশন ১৬০ কোটি টাকা দিতে স্বী হইয়াছেন। রাজ্যের বর্তমান অর্থসংস্থানের হিসাবে আরও ৯২·৮১ কোটি টাকা সংগ্রহ করে যাইবে অর্থাৎ মোট ২৫২·৮১ কোটি টাকার ব্যবস্থা হইবে। ইহার পরেও ৮৮ কোটি টাকার ঘাটতি থাকি যাইবে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এ অপরদিকে রাজ্যে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভদ্রলোকটি পার্কে এসে আর একটি ভদ্রলোকের পাশে বসলেন, তার জিজ্ঞেস যেন হাসিমুখেই বল্লেন—"এক টিপ নস্যি আছে নাকি মশাই ?"

—"আজ্ঞে না, এখন ওটা ছেড়েছি, ওটা ছিল আমার পঞ্চদশ বার্ষিক পরিকল্পনা।"

—"তা হলে, একটা সিগারেট্ ?—"

—"আজ্ঞে, সেটাও ছিল বিংশ বার্ষিক পরিকল্পনা। এখন ছেড়েছি।"

—"অন্ততঃ, একটু দোক্তা বা জর্দা ?"

—"আজ্ঞে ওটাও ছিল পঞ্চবিংশতি বার্ষিক পরিকল্পনা।"

—তবে পকেটে যদি রুমাল থাকে, তবে তার খানিকটা ?

—"সেটাও ছিল ত্রিংশতিবার্ষিক পরিকল্পনা—"

—"হতেই পারে না,"—এই বলে প্রথম ভদ্রলোকটি দ্বিতীয় ব্যক্তির পকেট থেকে রুমালটি টেনে বার করলেন।

বিজ্ঞান বার্তা

আটলান্টিক মহাসাগরের মানচিত্র

খাদ্য, খনিজ এবং জ্বালানী দ্রব্যের জন্যে মানুষ আজ হাত বাড়িয়েছে সমুদ্রের দিকে। কিন্তু জানে না সাগরের কোন অতলে আছে খনিজ সম্পদ কিংবা কোথায় বিচরণ করছে মৎস্যকুল।

অতএব প্রয়োজন হয়েছে একটি অভিনব মানচিত্র প্রণয়নের। আমেরিকান জিয়োগ্রাফিক সোসাইটির উদ্যোগে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের বিচিত্র মানচিত্র তৈরী হতে চলেছে। বিষুবরেখা থে উত্তর মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এই মহাসাগরের প্রতিটি অঞ্চলের জলচর প্রাণী ও জলজ উদ্ভিদ এবং সমুদ্র-গর্ভ বিভিন্ন পদার্থের স্বরূপ ও তার রাসায়নিক পরিবর্তন সম্বন্ধে তথ্যসমৃদ্ধ হবে এই মানচিত্র। সামুদ্রিক ঝ ঘরে তোলার জন্যে যে গবেষণা চলবে তার বিশদ বিবরণ বাতিরে রেখা হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে এখানে প্রাণীতত্ত্ব এবং ভূগোল উভয় শাস্ত্রেরই অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কাজেই এ ধোল বায়োজিয়োগ্রাফিক মানচিত্র যা ইতিপূর্বে কোথাও রচিত হয়নি।

এ মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা বোঝা যাবে একটি পরিকল্পনা থেকে। উডস ে ওশানোগ্রাফিক ইন্সটিটিউশনের ডাঃ কনাথিস আইসলিন একটি পরিকল্পনার উল্লেখ করেছেন ে সমেক্ষ উপসাগরের তলদেশে বাতাস পাম্প করা হবে, যদি এর ফলে তলদেশের উষ্ণ সমুদ্রস্রোত ও উঠে আসে তাহলে সমগ্র উপসাগরীয় অঞ্চলটি বরফমুক্ত হবে শীতকালেও নৌচলাচলের উপযোগী । নোভাস্কশিয়া ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের জলবায়ু উষ্ণতর হবে এবং পর্যাপ্ত মাছের ফসল উঠবে ধীবরের জালে।

একটি সঠিক মানচিত্রের সাহায্যে আজ জীবনের মান উন্নয়নের দুরন্ত আশা।

মহাসাগরের বারোশ' ফুট নীচে রয়েছে ম্যাকারেল জাতীয় মাছ। এখন এ মাছ দুষ্প্রা মানচিত্রে এ মাছের অবস্থান জানা গেলে মানুষের খাদ্যসমস্যার সুরাহা হবে।

ইউরোপ আমেরিকা এ দুই মহাদেশের মাঝখানে যে লবণাক্ত সমুদ্রের বিস্তার তার অতল উদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানী। মানুষ আজ আকাশের চায়, রত্নাকরের রত্নও চায়।

আলোকের অতীত আলোক

আমেরিকা যখন মহাসমুদ্রের গভীরে ডুব দিচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়া তখন মহাশূন্যে ১০ শত ে আলোকবর্ষ দূরত্ব অতিক্রমের আয়োজন করছে। মস্কোর কাছেই একটি নূতন মানমন্দিরে অতি শক্তি এক রেডিও টেলিস্কোপ নির্মাণের কাজ সুরু হয়েছে। এর সাহায্যে ১০ শত কোটি আলোকবর্ষ দূরে অব নক্ষত্র সম্পর্কে তথ্যাদি জানা যাবে। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। এই গ এক বৎসরে একটি আলোক রেখা যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দূরত্বকে বলা হয় এক আলোকবর্ষ বা । ইয়ার ।

ব্রিটেনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের আধুনিক পর্যায়

পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের একটি ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে ব্রিটেনে। যে বিদ্যুৎ-শক্তিকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে এসেছে তার একটি বার্কলেতে, অপরটি ব্র্যাণ্ড ওয়েলে। প্র থেকে ২৭৫ মেগাওয়েট ও দ্বিতীয়টি থেকে ৩০০ মেগাওয়েট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হবে। সমগ্র ব্রিটে বিরাট চাহিদার বহুলাংশ এর দ্বারাই মিটবে।

ব্র্যাডওয়েলে একটি ৩০০ টনের মেসিন বসানো হচ্ছে যার দ্বারা কর্মীরা দূর থেকে সমস্ত কাজ চালাতে পারবেন। কর্মীদের সুবিধার জন্য টেলিভিশনও বসানো হচ্ছে।

ক্ষুদ্রাকৃতি রাডার শক্তিশালী

বর্তমান জেট প্লেনের নভোচারী বিমান চলাচলের সমস্যা সমাধান করার জন্য এটি উদ্ভাবিত। একখানি আয়তন বিশিষ্ট এই বিশ্বের বিভিন্ন বিমানঘাঁটি এবং বিমানের রাডার সন্নিবেশিত হচ্ছে, এটির রাডারের সঙ্কেত অনুধাবন একশ' গুণ বেড়ে গেছে।

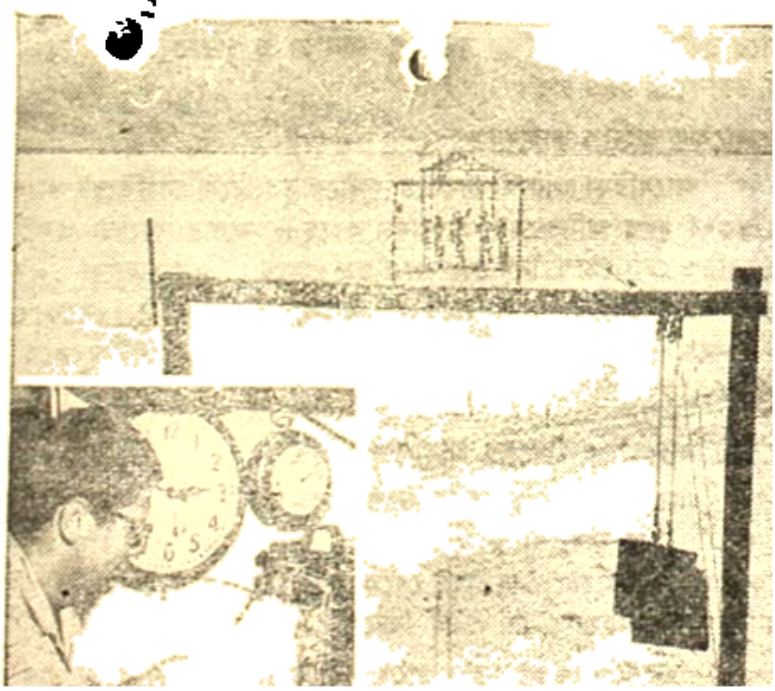

বিশ্বের বৃহত্তম রেডিও টেলিস্কোপ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়াগোতে যে রেডিও-টেলিস্কোপ তৈরী হচ্ছে তার খুঁটিনাটি পরীক্ষা করছেন কর্মীরা। একটি শুকনো হ্রদের বুকে এটি গড়ে উঠছে, তিন দিকে সাজানো রোভা পর্বতমালার প্রহরা। স্বয়ংক্রিয়

খেলাধুলা

পাকিস্তানী ক্রিকেট দলের আসন্ন ভারত ভ্রমণ

এবারে শীতের মরশুমে পাকিস্তান ক্রিকেট দল ভারত ভ্রমণে আসছেন সে সংবাদ আগেই প্রচা হয়েছে। পাকিস্তান দলের নতুন অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় ক মামুদ। এ পর্যন্ত পাকিস্তান ক্রিকেট দলের নায়কপদে আসীন ছিলেন ভারতীয় প্রাক্তন টেষ্ট খেলো আবেইল হাফিজ কারদার। ফজল মামুদও ১৯৪৬ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণের দলে স্থান লাভ করেছিলেন। কিন্তু দেশবিভাগের জন্য শেষ পর্যন্ত দলের সঙ্গে যাওয়া বন্ধ করে দেন।

পাকিস্তানের যে দল নির্বাচন করা হয়েছে তাতে ব্যাটিং এবং বোলিং ছাড়াও ফিল্ডিংএ দক্ষ পারদর্শী। এছাড়া যাঁর ওপর ক্রিকেট খেলোয়াড়দের শিক্ষাশিবির পরিচালনার ভার পড়েছে, তিনি এক সময়ে ভারতীয় দলের টেষ্ট খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁর নাম ডাঃ জাহাঙ্গীর খাঁ।

গত ১৯৫২-৫৩ সালে যে দল ভারত ভ্রমণ করে গিয়েছিলেন তার তুলনায় আজ পাকিস্তান ক্রি দল অনেক অভিজ্ঞ এবং দক্ষ। ইংলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে টেষ্টে হারিয়ে দিয়ে পাকিস্তান যে সমস্ত ক্রিকেট খেলে সেই সমস্ত মহলের মধ্যে নিজের স্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছেন।

পাকিস্তানী ক্রিকেট খেলোয়াড়দের যে নামের তালিকা লাহোর থেকে প্রচারিত হয়েছে শক্তি সম্বন্ধে আমাদের প্রাথমিক মন্তব্য হল যে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে এবার পৃথিবীর অন্যতম দলের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। ফজল মামুদের মত বিখ্যাত অলরাউণ্ডার ছাড়াও দলের সঙ্গে যে চা ফাষ্ট বোলার আছেন তাঁদের মধ্যে একজন মহম্মদ ফারুক। মহম্মদ ফারুকের সম্পর্কে পাকিস্তানী অধিনায়ক ফজল মামুদ খুবই উচ্চাশা পোষণ করেন। পাকিস্তান দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসে সৃষ্টিকারী হানিফ মহম্মদ সম্পর্কে নূতন করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এ ছাড়া ইমতিয়াজ আহমেদ, ই আহমেদ, আলামুদ্দীন, ওয়ালিস ম্যাথিয়াস, সুজাউদ্দীন এঁরা সকলেই শুধু উইকেটে দাঁড়িয়ে থাকতে নয়, দ্রুত রাণ তোলার দরকার হলে সমান পারদর্শিতার সঙ্গে উইকেটের চারদিকে মারের খেলা খে পারেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হল এঁরা সকলেই দলের সম্মান রক্ষার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করে খেলা গ্রহণ করেন।

পাকিস্তান দলের সফরের প্রথম খেলা পুণায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের বিপক্ষে ১৮,১ ২০শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এবারের সফরে পাকিস্তান দল পাঁচটি টেষ্ট ছাড়া আরও ৭টি খেলা অংশ গ্রহণ করবেন। আঞ্চলিক খেলার তালিকা বাদ দিলে রাষ্ট্রপতির একাদশের সঙ্গে বাম্বাইয়ে খেলা উল্লেখযোগ্য।

"থ্রোয়িং" সম্পর্কে বিতর্কের শেষ পর্য্যায়

আগে আমরা অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে ক্রিকেট বলের 'থ্রোয়িং' সম্পর্কে আলো করেছিলাম। আম্পায়ারদের "থ্রোয়িং" বল সম্পর্কে নিরেধাজ্ঞা প্রয়োগ নিয়ে যে তুমুল বাক-বিতণ্ডার

ক্রিকেট খেলায় এই ধরণের চুক্তি একেবারে অভূতপূর্ব্ব। ইংলণ্ডে ভ্রমণরত অষ্ট্রেলিয়ার দলের প্রথম খেলার আগে পর্য্যন্ত কোনরকম সন্দেহ করে বোলারদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা চলবে না। অ একটি বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে এক পক্ষের (অষ্ট্রেলিয়ার) বোলাররা ভাল করে হাত না ঘুরি ক্রিকেট বল ছুঁড়ে দেন। আম্পায়ারদের বলা হয়েছে যে সন্দেহজনক বোলারদের সম্পর্কে রিপোর্ট ক করতে। তারপর ঐ সমস্ত বোলারদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। কাজেই আমাদের আ কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে।

• • •

পেশাদারী টেনিস খেলোয়াড়দের ভারত ভ্রমণ

মাত্র কদিন আগে ভারতে বিখ্যাত পেশাদারী টেনিস খেলোয়াড়ের দল ভারত ভ্রমণ করে গেলে কলকাতায় যাঁরা প্রথম দিন গিয়েছিলেন তাঁরা নিরাশ হলেও দ্বিতীয় দিনে প্রথম শ্রেণীর টেনিস খেলা উপভো ক্রীড়ামোদী দর্শকবৃন্দকে আনন্দ দিয়েছিল। স্পেনের খেলোয়াড় জিমেনেজ এবং অষ্ট্রেলিয়ার ম এণ্ডারসনের সার্ভিস দীর্ঘকাল সকলের মনে থাকবে। আগামী ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ক্যালকাটা সা ক্লাবে জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতা সুরু হবে। আর ডিসেম্বরের শেষে পাকিস্তান ক্রিকেট দ কলকাতার টেষ্ট খেলা, সব মিলে শীতের কোলকাতা সর্ব্ব ভারতীয় দৃষ্টিশক্তিকে আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট।

ক্রীড়াঙ্গনে স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

খেলাধূলার জগতে হালফিল হামেশা রেকর্ড ভঙ্গের কাহিনী শোনা যাচ্ছে। কোনো সন্দেহ প্রতিযোগীবৃন্দ প্রাণপণ চেষ্টায় অনুশীলন করে চলেছেন যার দ্বারা পূর্বেকার সমস্ত জয়গৌরব ম্লান হয়ে যা এর জন্যে প্রভূত শারীরিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে এবং এই দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে তাঁরা কোন শেষ দেখ পাচ্ছেন না, অর্থাৎ কোথায় গিয়ে যে এই রেকর্ড ভঙ্গ করার ব্যাপারটি দাঁড়াবে তা কেউ বলতে পারছেন না।

সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে এতে শরীরের কোন ক্ষতি হয় কিনা। ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্ণালের থেকে বলা হয়েছে যে অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমযুক্ত ক্রীড়াচর্চ্চার ফলে পরবর্ত্তী জীবনে হার্টের কোন ক্ষ হয় না।

কিন্তু ট্রেনিং এর ফলাফল গবেষণা করে দেখা গেছে যে ট্রেনিং বন্ধ হয়ে গেলে শারীরশক্তির অবনতি ঘটে।

আর একটি পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে যে ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নতিলাভের জন্য সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত হয়ে পড়ার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ট্রেনিং চলা উচিত। কিন্তু জার্ণালের মতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বে প্রতিযোগীকে এই আশ্বাস দেওয়া দরকার যে দীর্ঘ-দূরত্বমূলক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে ধরণের ধারাবা বিপদ দেখা দেয় এক্ষেত্রে তা হবে না।

অ্যাথলিটদের শারীরিক সহন ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় অন্বেষিত হচ্ছে এবং সম্ভবতঃ এই পথেই সমস্যার সমাধান আসবে।

লোকো-বিভূষণ রাইমোহন

সত্যপ্রিয় ঘোষ

বিকেল চারটে নাগাদ লোকো অফিসের কেরানীদের মধ্যে যখন চাই উঠতে থাকে তখন সেই অ
আর আলস্যের একমাত্র ওষুধ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাইমোহন আঢ্য। তখন লোকো রিক্রিয়েশন ক্ল
অ্যাকটিং-সেক্রেটারি অজিত ব্যানার্জী (নাম্বার ওয়ান) টেবিল থেকে ইঞ্জিনের হিসেবপত্র দূর ক'রে
ড্রয়ারে ফেলানো স্লিপের কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে, কলমের উল্টো পিঠ লাল কালিতে চুবিয়ে চু
বসাবসি বসাবসি করতগুলি লেবেল তৈরী করে ফ্যালে। এ কাজ তাকে একা করতে হয় না। কী
যে খবর হয়ে যায়, পাশের ঘর থেকে সালেক চলে আসে, পাল আসে, এ-ঘরের আসে অজিত ব্যা
(নাম্বার টু), ননী ধর, কবি, অজিত সিনহা, মান্না ইত্যাদি। দু-একজন চাপরাসীও জুটে যায়, বস্তুরী প
হাজির থাকে ঠিক। লেবেল প্রস্তুতির ষড়যন্ত্রটা যথাসম্ভব চুপিসারেই হয়। লেবেলে নানারকম বি
কিমাকার মূর্তি আঁকা হয়—যার যা হাতে আসে, আর লেখা হয় নানান খেতাব, পরিচিতি, উপাধি—ইংরে
বাংলায়—যার যা মনে আসে, যেমন : ৪২০, সাবধান কামড়ে দেবে, গাধা, শ্রীরাইমোহন দি গ্রেট চামচি
ম্যাটিক (প্রাক্‌ঠ), ওয়াণ্ডারফুল ক্রিয়েচার অব গড, বিশ্বকর্মার রাইপ্রোডাক্ট, দূর স্কাউণ্ড্রেল, আমার
অষ্টাবক্র, লোকো-বিভূষণ—ইত্যাদি। তারপর লেবেলগুলি হাতে হাতে ছড়িয়ে যায়। এক হাতে ে
অন্য হাতে আলপিন। ওগুলো এখন আঁটা হবে রাইমোহনের কাছার কিংবা জামার পেছনে, সবাই
তকে থাকে। বস্তুর আবার আলপিনের কাজ জানে না, বস্তুরী তো, সে তার লেবেলটায় বেশ ক'রে
মাখিয়ে নেয়, তালেগোলে কেঁটে দেবে রাইমোহনের পিঠে। বেড়ালজালের মতো সবাই ঘিরে
রাইমোহনকে। অবকাশ আর আলস্য কোথায় উড়ে যায় মুহূর্তে, রাইমোহন বনাম বাকি সকলে
হাসলায় ঘরের মাঝখেড়ে হাওয়াটা নিমেষের মধ্যেই চাঙ্গা দিয়ে ওঠে, সবাই ফের ঝরঝরে বোধ করে।

লেবেল আঁটার আগেকার কাজ খেপিয়ে তোলা। খেপে উঠলে যখন সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হবে, দাঁ
খিঁচিয়ে তেড়ে তেড়ে আসবে, তখন টকাটক টকাটক লেবেলিং হয়ে যাবে। খেপানোর কাজে সব চ
দক্ষ অজিত ব্যানার্জী (নাম্বার ওয়ান), কারণ সে বলে বড়ো ভালো। বলিয়ে বলিয়ে এমন বাকাবাণ ছো
গলায় দূর থেকেই সে ছাড়তে পারে যা একেবারে মোক্ষম। সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই ঘুষা ধরে, পাঁচ
দিতে থাকে, আর সেই তপ্ত তেলের কড়ার মধ্যে প'ড়ে জ্যান্ত কাটা কইয়ের মতো রাইমোহন লা
লাফিয়ে উঠতে থাকে চেয়ার থেকে।

ঘরের এক কোণের ঘুপচিতে শ্রীরাইমোহনের বস্তর। ঘুপচি হলেও আপন এলাকার কাছা
হওয়া মাত্র, অফিসাররা আর চীফ ক্লার্ক বাদে, আর সবাইকেই রাইমোহনের কাছে নির্দ্বিচারে বেইজ্জ
হয়। প্রবাদ এই যে, ইনিই হচ্ছেন সেই বহু প্রত্যাশিত কল্কি অবতার যিনি কলিযুগে দুষ্টের পালন ও
ধর্ম চিরতরে কায়েমী করবার জন্যে ভারপ্রাপ্ত।

হিসাব রাখার সুবাদে দায়িত্ব তার স্কন্ধে ন্যস্ত। হাজরে খাতায় তার নামের পাশে চাকরিনামা লেখা আ 'জে. সি. ডব্লিউ' তার দ্বারা প্রকাশ পায় যে সে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হলেও কেরাণীসমাজে আপাতক্ষেত্রে তার বয়সের নাকি গাছপাথর নেই কিন্তু সবাই জানে তার চাকরি আর মাস পাঁচেক আছে অর্থাৎ তা অফিসের কাইলে তার বয়স পঞ্চান্ন পূর্ণ হবে।

যথানিয়মে আড্ডাও সুরু হয়ে গেছে।

অজিত ব্যানার্জী (নাম্বার ওয়ান) কায়দামতো শেভিং নিয়েছে। মাঝখানে গোটা-দুই চেরিং বাবধান রেখে রাইমোহনের দিকে মুখ ক'রে সে দাঁড়িয়েছে। শুরু করেছে তেল গরম করা বচন। ত শুনে শুনে তেল যখন ফুটিফুটি হয়ে উঠবে সেই সময় চাপরাশী নন্দকিশোর বা অন্য কেউ হুকের মতো এগি রাইমোহনকে একটা খোঁচা মারলেই ব্যস অমনি লেগে যাবে—খাঁক ক'রে উঠবে রাইমোহন।

অজিত (নাম্বার ওয়ানে) বলছে, 'আচ্ছা গৌতমবাবু, আপনি তো বাঙলার অনার্স। বলুন দিকি রাইমোহনদার বা চাচারা তার মুটু ডেসক্রিপশন বাংলা ভাষায় কি সম্ভব? ধরুন কাউকে যদি বোঝাতে। দেখতে উনি কেমনটি, তো বেশছি আইদার ছবি খিঁচে নিতে হবে, অথবা গোবরের ছাঁচে মুখখানা তু নিতে হবে। নয় কি? আপনি কী বলেন? অ্যাঁ?'

গৌতম নিরুত্তরে হাসতে থাকে রাইমোহনের দিকে তাকিয়ে।

'বিশ্বকর্মা ওঁকে নিজে-হাতে গড়েনি জানেন তো?'—অজিত নতুন দম টেনে শুরু করে, 'বিশ্ব ওয়াজ আদারওয়াইজ বিজি। তার ফ্যাক্টরির এক ক্যাজুয়াল লেবারের হাতে উনি তৈরী। তার ন উদ্যো। উদ্যো ওঁকে বানাতে বানাতে আনফিনিশট রেখে, গাঁজায় একটু দম দিয়ে নেবার জন্যে বাই গেছে, ইত্যবসরে একটা ফিটার সেখানে ঢুকে সেই ইনকমপ্লিট রাইমোহনদাকে দেখেই ভাঁতকে উ দাঁতকপাটি! ব্যাপার দেখে চার্জম্যান তো খুপচুরিয়াস। বললে হেঁকে, অভি হঠাও এই মূর্তি হিঁয়াসে এত্না কদাকার মূর্তি নেই মাংতা। বলতেই, ফিটার-মিস্ত্রি ছুটে এসে তাকে আনফিনিশড্ অবস্থাতে পৃথিবীতে ডেসপ্যাচ করেছে। এই হচ্ছে ওঁর হিস্ট্রি।'

রাইমোহন একটু নড়েচড়ে উঠলো। নাকের ডগায় ঝুলে পড়া বাইফোকাল চশমার ফাঁক দি তার চোখজোড়ায় খরদৃষ্টি বিদ্যুৎপাতের মতো একবার ঝিলিক মারলো অজিতের দিকে।

অজিত বুঝলো আরো দরকার। নয়তো ঝড় উঠবে না, আকাশে এখনো মেঘ জমেনি, হাও গরম হয়নি। অতএব শুরু করলো, 'আমরা ডি. এম. ই.-র কাছে ওঁর এগেনষ্টে জরেষ্ট কমপ্লেন করা জানেন তো? সার্ভিস রেজিষ্টারে উনি বয়স ভাঁড়িয়েছেন। লোকের একটা ক'রে বয়স থাকে, উনি তিন বয়স মেনটেন করছেন। ইস্কুলে—খুড়ি পাঠশালায়—পড়াকালীন একটা বয়স বাপে এসে জানিয়ে গেছে বিয়ে বসতে গিয়ে আরেকটা বয়স হ'লো—তিরিশ-পেরনো আইবুড়ো ধাড়ি নিজেকে অক্লেশে তেইশ ব' চালিয়ে লবকান্তিকটি সেজে এগারো বছরের এক ইনোসেন্ট গার্লকে বিয়ে করেছে, তারপর সাত ঘাটের। খেয়ে রেলে অফিসে এসে বয়স লিখিয়েছে বাইশ—যখন উনি পাকা বিয়াল্লিশ। লোকে সার্ভিস-। দু-চার বছর ম্যানেজ করে, কিন্তু ওঁর একদম বিশটি বছর পাষাণে কয়া আছে। এ লোক-জানাজানি। গেলে আমাদের অফিসের প্রেস্টিজ যে চিরে চরে যাবে।'

'আরে যা-যা:'—রাইমোহন এবার পেটের অসুখের মতো মুখ ক'রে খিঁচিয়ে উঠলো, 'তোর

'হাঁ৷ তাই বটে। প্রেস্টিজ হচ্ছে আমাদের ব্যাপার!'—সাড়া পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে অজিত ছাড়তে লাগলো, গৌতমবাবু, আপনি তো এ অফিসে নতুন। দাদার রেলের এজেন্ট হবার গল্পোটা শুনেছেন বলি শুনুন। দাদা ফরিদপুরের অজ পাড়াগাঁর লোক। বার পাঁচেক এনট্রান্স দিয়ে দিয়ে হাপসে গেছে কিছুতেই আর চৌকাঠ ডিঙতে পারে না, তো বাপ-মা বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিয়েছে। বললে, অনেক ব ক্সে করেছিস, এবার চরে খাগে যা। কী এমন কথা? দাদা গরম মেজাজে একবস্ত্রে বাড়ি থে বেরিয়ে, ডব্লিউ. টি. মেরে, কলকাতায় এসে পড়লেন। তারপর দু-চার দিনের মধ্যেই দাদা চাকরি জুটি ফেলেছে। ঐ চ্যাহারা আর মেজাজ দেখে কোন্ বাপের বেটা আছে দাদাকে নো-ভ্যাকান্সি বলবে দাদা, কলম বাগিয়ে বাপের কাছে চিঠি বেড়ে দিলে! রেল কোম্পানির এজেন্ট হইয়াছি। শীঘ্রই বা যাইবার ইচ্ছা আছে। সেই চিঠি গাঁয়ে পৌঁছতেই আশে-পাশে তিন-চারটে গ্রাম সহ সব বাব গরম! রেলকোম্পানীর এজেন্ট? বাপরে, সোজা কথা? বাচাদুর ছেলে বটে রাইমোহন, গাঁ অন্ধকারে আটকে থাকতে এনট্রান্সটাও ডিঙোতে পারেনি, কিন্তু কলকাতার আলোতে পা দিতে দিতেই রেলকোম্পানির সর্বেসর্বা হয়ে বসলো? (জানেন তো, রেলের জেনারেল ম্যানেজার আগে এজেন্ট বলা হত) তো রাইমোহনকে রিসিভ করতে স্টেশনে শত শত লোক ছুটে গেছে। ঢ ঢোল কাড়া-নাকাড়া নিয়ে ছ-বেহারার পালকি রেডি। বাপ নতুন কাপড় আর উড়ুনি গায়ে দি এসেছে: ছেলে এজেন্ট তার প্রেস্টিজ রক্ষা করা চাই তো। এদিকে ছেলে ট্রেন থেকে নেমেই আকেল গুড়ুম! ওদিকে লোকেরাও ভেবেছিলো, রাইমোহন সেলুন থেকে চাপরাসীদের কোলে চে নামবে—তা না এ যে থার্ড ক্লাসের ডাব্বা থেকে জানালা গলিয়ে হুৎ করে নামলো। কী ব্যা কী ব্যাপার? না তখন প্রকাশ হ'লো যে, রেলের এজেন্ট মানে ঢোলকোম্পানির দাদের মলমের এজে সেই চাকরি দাদা পেয়েছে। সাত টাকা থেকে চার আনা করে ইনক্রিমেন্ট হয়ে বারো টাকা গ্রেড। দাদার পকেটে তখন চার টাকা দশ পয়সা খাবি খাচ্ছে। ওদিকে পালকি ভাড়াই লাগবে টাকা আর বাজনার দরুন দ'পাঁচ টাকা। কী করা এখন? দাদা তখন প্রেস্টিজ বাড়ালেন কী ব জানেন? উপস্থিত ধোলাইর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সব্বাইকে একটা করে দাদের মলমের বে ফ্রি ডিস্ট্রিবিউট করে দাদা স্রেফ গা ঢাকা দিলেন।

সেকশনসুদ্ধ হাসির হুররা উঠলো।

রাইমোহন এবার চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'এইটা কি অফিস? না বাগানবাড়ি? ম পেয়ে গেছে সব। হ'ত আগেকার দিন, চাইট দিয়ে ছেড়ে দিত, অফিসের মধ্যে হোহো-হিহি বে যেত। ছি-ছি-ছি! ইজ ইট অ্যান অফিস! ছি-ছি-ছি! বয়োজ্যেষ্ঠর প্রতি এই ব্যাভার। কী অধঃপ এইজন্যই বাঙালী মরেছে—ব'লে গেছেন সুরেন বাড়াইজ্যা, রামমোহন রায়, স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত।

এইটুকু ব'লেই রাইমোহন চুপ।

ফলে অজিত (নাম্বার ওয়ান) ফের শুরু করলো, 'দাদার ইংরিজি জ্ঞানের হিস্ট্রী শুনেছে শুনুন বলি। ঢোলকোম্পানির চাকরি থেকে ডিসমিস হবার পর দাদা নামের পাশে বি. এ. ফি প্রাইভেট টিউশানি করা শুরু ক'রে দিলে। একদিন ছাত্তর জিগ্যেস করেছে: ম্যাস্টারমশাই, টিকা ইংরিজি কী? দাদা কি দমবার পাত্র, ব্লাকবোর্ডে বলে দিলে, লিট্‌ল্ ক্রোকোডাইল। আ

বানান কী? দাদা বললে: কাকে লেখা হচ্ছে? না,
এম্ দিয়ে দিন।

'আর সেই ক্যালকাটা গুড্‌সের গল্পটা?'—অনিল মিত্তির উস্‌কে দেয়।

'জানেন না?'—অজিত গলা আরো চড়িয়ে সুরু করলো, তখন দাদা গুড্‌সে বিডি-সিঙ টালিক্লার্ক। একদিন মালগুদোমে ডি. সি. এস. গিয়ে উপস্থিত, তখন বড়োদালবাবু সুদ্ধ আর সবা কে কোথায় দাঁও মারার ফিকিরে আছে, সেই ফাঁকে দাদা বড়োদালবাবুর চেয়ারে চিত্তিরে ব'সে এক বিমিয়ে নিচ্ছে। ডি. সি. এস. ভাবলে, এইই বুঝি বড়োবাবু। এদিকে হয়েছে কি, গুদোমে প্রচু আলু জমেছিলো, সেই আলু পচে রস গড়াচ্ছে। সাহেব তো সে দিকে পয়েন্ট আউট ক'রে বলে উঠেছে: ওয়াট ইজ দিস? ধমক দিয়ে দাদা আলুর ইংরিজি ভুলে মেরে দিয়েছে। কী করে বোঝা এখন? কিন্তু দাদা কি জমদার পাত্র? ঝাঁ ক'রে ব'লে দিলে চোস্ত বিলিতি ঢঙে: স্কাল্‌প্যান্ অ্যা প্যাপ্‌স্ অ্যাণ্ড ভ্যাপ্‌স্। অর্থাৎ কিনা বোল মন আলু পচে তেপদে গেছে। শুনে সাহেবের চো টারা। অল্‌রাইট বলে চলে গেলো। দাদা ভাবলো সবরক্ষে। কিন্তু পরের দিনই দাদার খবর হ গেলো!'—অজিত চোখমুখ উল্‌টে দাদার খতম হয়ে যাবার ভঙ্গী করতেই সমস্ত সেকশন হাসিতে ফেটে পড়লো।

'কের বলি শুনুন। ঐ কীর্তির পর দাদা নাম ভাঁড়িয়ে বেলেঘাটা লোকো সেডে কোল-মুনশী চাকরি পেয়ে বেবড়ক কাঁচা কয়লা পাচার করতে লেগেছে। তো একদিন এ. এম. ই. সাহেবের ইন্সপেক্‌ শন। সাহেব কোল-স্টেজে গিয়ে কয়লা দেখে বললে: হোয়াই স্ট্যাক দর্ট? দাদা তখন কোথা কিছু না পেয়ে ব'লে ফেলেছে: মোষ কয়লা খেয়ে নিয়েছে স্যার। সাহেব ইংরেজ, বাংলা বোঝে না বললে, ওয়াট? দাদা তখন মোষের ইংরেজী ভাবছে আর হাত বেঁকিয়ে মোষের শিংটা দেখাচ্ছে, হঠা সেখানে এক মোষের আবির্ভাব, লোকো ইয়ার্ডে অল্প অল্প ঘাস আছে তাই খাচ্ছে। দাদা অমনি চিৎকা দিয়ে উঠছে; দেয়ার দি ট্রানস্লেশন গোজ্ স্যর। রেস্পারিং ইজট্যাল স্যর। ইটিং কোল স্যর। ব্যস, বলতে দাদার কাজ হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে চাকরি নট হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে সালেক গোবেচারীর মতো মুখ করে রাইমোহনের কাছে গিয়ে একটা বিড়ি চেয়েছিলো। চাইতেই রাইমোহন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে তাকে তাড়া করেছিলো কিল উচিয়ে সালেক অমনি এ-টেবিল ও-টেবিলের ফাঁক ফোকর গলিয়ে পালিয়েছে। রাইমোহন চেয়ার ছে এগোতেই পেছনে ননী দত্ত তৈরীই ছিলো—সে পেছন থেকে দু-বগলে হাত দিয়ে রাইমোহনে অবলীলায় শূন্যে তুলে ধরেছিলো (রাইমোহনের ওজন তিরিশ সেরের বেশি হবে কিনা সন্দেহ), রাইমোহ ননীকে আচ্ছা করে কান মলে দিয়ে শাস্তি দিয়েছে—কিন্তু এদিকে তার পিঠে লেংগেপিং হয়ে গেছে অজিত ব্যানার্জি (নাথার টু) তার কাছায় ঝাড়া সিংওয়ালা হাটিমাটিমৃটিমের ছবি সেঁটে দিয়েছে।

লেবেল-লাগানো অবস্থায় রাইমোহন মুখটাকে বমি বমি করে চেয়ারে ফিরে হাঁফাচ্ছিলো।

এই অবস্থায় অজিত ব্যানার্জী (নাথার ওয়ান) কখন কখন এগিয়ে গেলো রাইমোহনের দিকে পালাবার ব্যবস্থা রেখে সে এবার কাছে গিয়েই দাঁড়িয়েছে। শুরু করলো, 'গৌতমবাবু, দাদার জলহস্ত দর্শনের কাহিনীটা জানেন না তো, না? জবর ব্যাপার। বলি শুনুন। পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের স

লম্বরখোনাতেই খানাপিনা ক'রে বেড়াত। তাতে, মনে আছে তো, সেই সবুজ রঙের চালিমুরে খিচুড়িভোগ আর তরকারি বলতে কচু-ঘেঁচু আর খোড়-বড়ি-খাড়া দিয়ে তৈরী একটা ঘাঁট। তো একদি ছেলেমেয়ে বই নিয়ে দাদা বেরিয়ে পড়েছে। খিচুড়ি-টিচুড়ি নিয়ে দাদা বলছে কি, যেখানে-সেখানে ব খেলে পেটটি চিলে হয়ে যাবে। লাটসাহেবের বাড়ির সামনে ব'সে খেতে হবে। সেখানে বি আঠারো জন খেতে ব'সে গেলো। খাওয়া-দাওয়ার পর দাদা ভাবছে এখন কি করা যায়। উকি দে হোয়াইটওয়ে-লেডলর ঘড়িতে দেখে নিলে আড়াইটে মাত্র বেজেছে। বললে চলো এবার চিড়িয়াখা গিয়ে জাওয়া খেয়ে আসি। সেই দলল নিয়ে দাদা একেবারে মাঠ বরাবর চললো চিড়িয়াখানায়। গে বললে, আমরা সব লাটসাহেবের জাতিগুষ্টি। তাইতে ঢুকতে আর পয়সা লাগলো না। ঢুকে তো ব বই আর সতেরোটা ছেলেমেয়েকে জন্তুজানোয়ার সব দেখাচ্ছে। কোনটা কী জানোয়ার জিগ্যেস করা দাদা গ্র্যাকার্ডে লেখা ইংরেজী প'ড়ে প'ড়ে সবাইকে অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছে। হতে হতে জলহস্তীর ঘ এসে পড়েছে। তো বউদি জিগ্যেস করছে, হ্যাগা, ওটা আবার কোন্ জানোয়ার? দাদা তা জলহস্তী দেখেনি। এদিকে নাম যা লেখা আছে তা দাদার উচ্চারণ হয় না। কিন্তু গিন্নীর কাছে প্রে গেলে তো মৃত্যু। তাই দাদা বেমালুম চেপে গিয়ে বললে: চুবছে উঠছে, চুবান খাইছে, ে উটপাতীর জন্ত হইব। এইটেই ইংরেজীতে লেখা আছে, ঠিক বুঝবা না।

ঘরের মধ্যে আবার একটা হাসির গোলা ফাটতেই রাইমোহন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে অজি আক্রমণ করলো।

লম্বা চওড়া বপাসই চেহারা অজিতের, তার কাছে রাইমোহনকে একটা পোকার মতো দে লাগে। কিন্তু তা বললে কী হবে, কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে রাইমোহনের মধ্যে রুদ্রশক্তির ভর রাইমোহনের তখনকার তেজে কারু হবে না এমন কেরাণী এখনো রেলে জন্মায়নি।

ফলে অজিত ই-টেবিল ও-টেবিলের ফাঁক গলিয়ে দৌড়চ্ছে এবং রাইমোহন তাকে ধরবার ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে। তার চোখদুটো জলছে দুঃশাসনের রক্তপিপাসু ভীমের মতো। ইতিমধ্যে দ গদুর আঠা দিয়ে আরেকটা লেবেল সেঁটে দিয়েছে তার পিঠে।

অনেক চেষ্টা করেও অজিতকে পাকড়াতে না পেরে রাইমোহন খেপা ষণ্ডার মতো ফুঁ ফুঁসতে চেয়ারে ফিরে এলো।

চতুর্দিক থেকে তার এই দুরবস্থার প্রতি সহানুভূতি বর্ষিত হতে লাগলো। কিন্তু তাতে ভুল পাত্র রাইমোহন নয়। সে খ্যাকখ্যাক করতেই লাগলো, থাক থাক, আমি সবাইকেই চিনি। এ অ মানুষ বলতে একটাও নাই, নট এ সিঙ্গল্। সবাই দুর্বৃত্ত। আজ একাদশী, সারাদিন আমি উপা আমার প্রতি এ কি ব্যাভার!'—বলতে বলতে রাইমোহন টেবিলের এপাশে-ওপাশে কী খুঁ লাগলো।

খোয়া গেছে খালির বোতল। মস্ত একটা বোতলে ক'রে সে রোজ বালি নিয়ে আসে। ম মাঝে বোতল উপুড় ক'রে চকচকিয়ে সেই বালি গেলে। আজ আধ বোতল খাওয়া হয়ে গেছে, বা রেখেছিলো অফিস থেকে বেরুবার সময় খেয়ে বেরুবে ব'লে। কিন্তু এই হাঙ্গামার সময় সেটি কে গ

এসিয়ে গেলো, 'অজিত আবার পেছনে লেগেছে বুঝি? রাগেন কেন দাদা। অজিত আপনা ভালবাসে তাই অমন করে। আপনিও তো দেখি ওকেই বেশী ক'রে হতুকী খাওয়ান। দিন দি একটু হতুকী দিন তো। আজ সারা দিনে একটুও হতুকী পাইনি।'

'তোমাকে দেব পরেশভাই'—রাইমোহন টগবগ করতে করতে বললো, 'তোমাকে যে ইউ আর এ জেন্টলম্যান। কিন্তু আর কাউকে আমি দেব না।'—ব'লে জামার তলাকার মোটা কতু পকেট থেকে ছোটমাপের একটা বালির কৌটা বের করলো, তার মধ্য থেকে বেরুলো হরীতকী। ৭ একটু খুঁটে নিয়ে সস্নেহে পরেশকে দিলো।

'দাদা, আমাকে?'—অজিত ব্যানার্জী (নাম্বার ওয়ান) এসে হাত পেতে দাঁড়িয়ে গোয়েচারী মেরে।

'লজ্জা নাই তোর!'—রাইমোহন গর্জে উঠলো, 'নির্লজ্জ দুর্বৃত্ত কথাকার! আমারে তুই ৭ ধরণা স্যার, আবার হতকী চাস!

'দাদার কাছে ছোটভাই আবদার করবে না?'—অজিত আরো ফাকা মারলো।

'আই অ্যাম নট ইওর দাদা। মো। হটো। হটো হিয়ারসে। দাদা বলে ডাকিস, কি কী তোর ব্যাভার! আগে চরিত্র গঠন কর। জাস্ট বিড অপ ইওর ক্যারেকটর, দু-মাস মো তারপরে আই স্যাল পারমিট ইউ টু কল মি দাদা।'

পেছন থেকে চাপরাসী নন্দকিশোর তার পকেট মারার চেষ্টা করতেই রাইমোহন সপ্তমে চ'ড়ে গেলে 'তুচ্ছ কীটানুকীট চাপরাসীর এত স্পর্ধা। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি! কালে কালে এ কী হ'লে ছি ছি ছি! হত আগেকার দিন টাইট দিয়ে ছেড়ে দিতাম। ক্ষীরোদবাবুর আমলে চাপরাসী-ক্লাস আমি এমন কণ্ট্রোলে করতাম, অফিসের সমস্ত ক্লার্ক আমারে সাপোর্ট করত। আইজকার দিনের ম কেরানীরা চাপরাসীদের মাথায় তুলে নাচত না! ছি ছি ছি! হিন্দীতে বাত করব, আঙুলের ডা ওঠাব-বসাব, তবে তো চাপরাসী। এ কী অনাচার। ক্ষীরোদবাবুর আমলে—

'ক্ষীরোদবাবুর আমলে'—অজিত কথা কেড়ে নিয়ে বললো, 'উনি নিজে কিন্তু ছিলেন লিটা ধপ্তরী। ষোল টাকা মাইনে। অফিসের সবাই ডাকত ল্যাডার-ম্যান ব'লে। তখন অনেক উঁ র‍্যাক ছিলো তো, মই লাগিয়ে ফাইল নাবাতে হত। ওর কাজ ছেলো সেই মই ঘাড়ে ক'রে দৌড় আর তাই বেয়ে উঠে ফাইল খুঁজে খুঁজে বের করা। একদিন ধপ্তরী আসেনিকো, ঘোড়াত ক দেবে কে? অর্ডার হয়ে গেলো: রাইমোহন সকলের ঘোড়াতে—'

'হটো হিয়ারসে'—রাইমোহন সহসা ভীষণভাবে চীৎকার ক'রে উঠলো, 'হোয়াট ইজ ি বড়োবাবু? কাণ্ট ইউ ম্যানেজ অফিস?'

বড়োবাবু সাধারণত এ-সব ব্যাপারে কান দেন না। নিজেও চুপচাপ রগড় দেখেন। f রাইমোহন এমন বিশ্রী গলায় চিৎকার করে ওঠার ধরনই হোক অথবা অন্য যে-কারণেই হোক, ি ভয়ানক অসন্তুষ্ট হলেন এবং সবাইকে উদ্দেশ ক'রেই তিনি জোর বকুনি লাগালেন। অজিতকে ে বললেন, সে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং এমনি অবস্থা আবার সৃষ্টি হলে সেই পর্যন্ত তাঁকে ডি. এম. ই

তখনো পাঁচটা বাজতে আধঘণ্টা বাকি। অজিতের উদ্যোগে খানিক পরেই পাশের ঘরে সভা ডাকা হ'লো রাইমোহনের পেছনে লাগা ব্যাপারে যারা অগ্রণী তাদের নিয়ে।

সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লো, যতদিন পর্যন্ত রাইমোহন সকলের কাছে ক্ষমা না চাই ততদিন পর্যন্ত কেউ আর তার পেছনে লাগবে না, সবাই তার সঙ্গে অতি শিষ্ট ভদ্র ব্যবহার করা মোদ্দামের ভাষার কথা কইবে, কেউ তার কাছে হরীতকী কিংবা বিড়ির জন্য হাত পেতে দেবে না। তা ক'রে অফিসটাকে যদি মরুভূমি ব'লে মনে হতে থাকে তাহ'লে না হয় অন্য কারো পেছনে লাগা যা কিন্তু রাইমোহনের পেছনে আর কিছুতেই না, ভুলেও না।

সভার দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী লুকনো বালির বোতলটা অবিলম্বে ফেরত পাঠানো হ'লো।

যে কথা সেই কাজ। এ অফিসের ট্রেজ্যা—বড়ো মারাত্মক, একটু এদিক-ওদিক হবার জো নে সতীন ভৌমিকের ভাষায় 'এ অফিসে ঘাড় শুধু একদিকে হেলে। ফলে রাইমোহন সম্পর্কে সবাই নির্বিব উদাসীন হয়ে গেছে। কারণ, হায়, বিনা দরকারে এ সংসারে কে কার ধার ধারে বলো। অদরকা দরকার সেও তো, একরকমের দরকার। কিন্তু সেদিনের ঐ ঘটনার পরে রাইমোহনের সঙ্গে সকলের 'অদরকারের দরকার'ও চিরতরে ঘুচে গেছে। কেউ আর তাকে ডেকে জিগ্যেস করে না। রাইমে কাউকে কিছু জিগ্যেস করলে শান্ত মোলায়েম জবাব পায়। কেউ আর তাকে উত্তাক্ত করা দূরে থা সপ্তাহখানেক অমনি কাটার পরে দম-বন্ধ-হয়ে-যাওয়া রাইমোহন একদিন অজিত ব্যানার্জী (নাথার ওয়ান) যখন জিগ্যেস করলো, 'কী অজিত ভাই, তোর মেয়ের নাকি অসুখ ?'—তখন অজিত যে অজিত সেই অজি কিনা ভদ্রতাসূচক কাঠহাসি হেসে বললো, 'এখন ভালোর দিকে। আপনি ভালো ? একটু শুকনো শুক দেখছি ?'—ব'লে উত্তরের প্রত্যাশায় না থেকে সে ব্যস্তভাবে গ্রাফডেক্স প্যানেলের ইঞ্জিনের নম্বর মি লাগলো !

আর কত সহ্য করবে রাইমোহন। তার মনের মধ্যে প্রাণের মধ্যে ফাৎফাৎ করে, অফিসের এখন যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসে। চাকরির বাকি আছে আর পাঁচ মাস মাত্র, কিন্তু এ-অব রাইমোহনের আর একদিনও বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। কেন যে তার এই দাহ, তাও সে মুখ কাউকে বলতে পারে না।

দিন দশেকের মাথায় একদিন রাইমোহন সমস্ত সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে পাশের ঘরে ব্যোম ভৌমিকের শরণাপন্ন হ'লো। কারণ ব্যোমকেশ অফিস-ইউনিয়নের সেক্রেটারি।

'কী ব্যোমকেশ ভাই, বাবারে আর ডাইকা। জিগ্যেস করো না, কী এমন অপরাধ করলাম ?'—হেসে ব্যোমকেশের টেবিলের পাশে এসে রাইমোহন বললো।

'আরে দাদা বসুন বসুন'—রাইমোহনকে টুলে বসিয়ে ব্যোমকেশ বললো, 'হুকুম কী দিন।'

রাইমোহনের চোখেমুখে আশা ফুটলো। বালির কৌটোটি বের ক'রে হরীতকী দিলো। ব্যোমকেশকেই নয়, ব্যোমকেশের ইশারা পেয়ে ইতিমধ্যে কয়েকজন রাইমোহনকে ঘিরে ধ তারাও সবাই হাত বাড়াতে রাইমোহন সবাইকেই একটু একটু দিলো। সকলের চোখে চাপা-হাসি।

'ভালো আছেন দাদা ?'—ব্যোমকেশ বললো।

ব্যথা করছিল বাবং। ঐ জন্যই পা তুলে বসেছি। ডাইন পাওটা তুলে বসলে একটু আরাম হয়, প্যাণ্টে চ্যাপ পড়ে তো। ঐ জন্য আমি ট্রামের মধ্যেও ডাইন পাওটা তুলে বসি।'

ইতিমধ্যে ব্যোমকেশের ইঙ্গিত পেয়ে পরেশ দাঁতেরা চ'লে গেছে শান্তির দোতলা অজিত ব্যানার্জি (নাথার ওয়ান)-এর কাছে। বললো, 'এই অজিত, দাদাকে আর দাঁড়ালনি। বেচারা সারেনডার করেছে

'তা'লে আবার শুরু হবে?'—অজিতও যেন এই সংবাদের অপেক্ষাতেই ছিলো, সঙ্গে সঙ্গে কুইকমার্চ ক'রে সে পাশের ঘরে গিয়ে পেছন থেকে রাইমোহনের পেটে একটা গোত্তা মেরে শুরু করলে 'কই দাদা, বিড়ি দিন।'

রাইমোহন চিড়বিড়িয়ে উঠলো, 'উঃ। দেখলে দেখলে দুর্বৃত্তর কাণ্ডটা? এই তো এতগুলি লোক, সবাই জেন্টলম্যান, তোর মতো অভদ্র চাষা তো কেউ না! আবার বিড়ি চাস! দাদা ব'লে ডাকি আবার বিড়িও চাস!'

অজিত খপ্ ক'রে রাইমোহনের পকেট ধ'রে টান মারতেই লেগে গেলো ধস্তাধস্তি। আর চেঁচামেচি। বয়স্থ লোকের মজবা আর হাসাহাসি। পেছন থেকে সেই অবসরে রাইমোহনের পিঠে লেবেলিং-ও হয়ে গেলো মুরারি এবং নরেনের তৎপরতায়।

'দাদা! দাদা!'—রাইমোহন বেবুনের মতো মুখ খিঁচোতে লাগলো, 'আগে চরিত্র গঠন কর তারপর দাদা ডাকিস, তারপর বিড়ি চাইতে আসিস। নির্লজ্জ বেলাহাজ অধঃপাতে কথাকার।'

কিন্তু অজিত নাছোড়। সে বিড়ি নেবেই। রাইমোহন বললো, বিড়ি নেই। অজিত বললো 'চেক ক'রে দেখি।' কিক ক'রে রাইমোহন হেসে ফেলে: 'দুর্বৃত্ত কথাকার!'—ব'লে সিগারেটের প্যাকেট বের ক'রে তার থেকে একটি বিড়ি সে অজিতকে দিলো।

বিড়ি শুধু দিলেই হবে না, ফের ধরিয়েও দিতে হবে। রাইমোহন দেশলাই জ্বাললো, ধরানো অজিত সাং ক'রে নিশ্বাস ছাড়লো, আগুন নিবে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে রাইমোহন রেগে আগুন, 'দেখলে? সবাই দেখলে তো ও কত বড়ো খচ্চর। গরীব মানুষের কাঠি ও কেমন লোকসান করে দেখলে তো ব্যোমকেশ ভাই। তোমরাই বিচার করো।'

'আচ্ছা এবার দম বন্ধ ক'রে ধরাব! আর একটা জ্বালুন।'

'নো।'—ব'লে রাইমোহন গজ গজ করতে করতে পাশের ঘরে নিজের চেয়ারে চ'লে গেলো।

অজিত পিছু নিলো। শেষ পর্যন্ত আরেকটা কাঠি রাইমোহনকে জ্বালতে হ'লো কিন্তু সেটাও অজিতের মত নিশ্বাসে নিবলো। ধাবা মেরে অজিত তখন দেশলাইটা কেড়ে নিয়ে পালালো।

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে অজিত শুরু করলো, দাদার কীর্তি শুনুন সবাই। দিনকয়েক আগে দাদ রথ দেখবি চ' ব'লে ছেলেপিলে বউ সবাইকে নিয়ে শেয়ালদা-বৌবাজারের মোড়ে রথের টান হয় তো তাইতে গেছে। বেজায় ভিড় ঠেলাঠেলি, বউছেলেমেয়ে তাতে কে কোথায় ছিটকে গেছে হুঁশ পর্যন্ত নেই, দাদা পাঁপর আর জিলিপি কিনে নিয়ে রথে চ'ড়ে যাবে ব'লে পড়ি-কি-মরি অ্যাটেম্পট্ নিয়েছে। কোটের সাবনেটায় আছাড় খেয়ে প'ড়ে তো জিলিপির হাঁড়ি ফটাস। কাদা থেকে জিলিপিগুলি কুড়িয়ে নিয়ে একে-ওকে গলিয়ে রথে কিন্তু দাদা উঠে ছেড়েছে। উঠে একটেরে ব'সে দাদা হাঁপাতে হাঁপাতে একহাতে জিলিপি একহাতে পাঁপর তো একবার ওতে কামড় একবার ওতে কামড় দিচ্ছে। এমন সময় একটা চিল

শুনে রাইমোহন খেপলো না। মিটিমিটি চোখে সে টিপিটিপি হাসতে লাগলো।

'দাদা, ইহা কি সত্য?'—শ্রীবিশ্বনাথ নাটুকে গলায় জিগ্যেস করলো।

'দূর থ্যাপা!'—রাইমোহন ফিকফিক হেসে বললো, 'শহতানটার পাটে পাটে এতও থাকে!' বানাতে পারে!'

'বানানো গল্প!'—পোড়া বিড়ির টুকরোটা রাইমোহনের টেবিলে ফেলে দিয়ে অজিত খাপ্পা বলতে লাগলো, 'আচ্ছা তাহ'লে আরো ঝাঁক ক'রে দিচ্ছি শুনুন সবাই। এই বর্ষার সিজনটার দাদা যাপা যাচ্ছে। অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা। সারা মুখে চৌটাচন্দন কেটে নিমাই সেজে যায়। ব দেখে টিকিট লাগে, সেইজন্যে শেয়ালদা সাউথ টু পাড়া কর্পোরেশনের ময়লা টানার ট্রেন আছে তা চুপিসারে চেপে চ'লে যায়। বাপার মাঠে চাষীদের খেতে আড়তে গোলায় গোলায় জ্বরুক্ জ্বরুক্ ব খঞ্জনি বাজিয়ে দাদা কেত্তন গায় ঘুরে ঘুরে। এক কলি দু-কলি গাইতেই চাষীরা কেউ এক পাল্লা শাক, কেউ চারটি নটে শাক, কেউ একটা লাউ, কেউ বা কুমড়ো, বেগুন, ঝিঙে, ঢেঁড়স যার যা আছে খয় করে। সমস্ত জিনিস কালেক্ট করার পরে দেখা গেলো পুরো এক ঠেলা-মতো মাল হবে। তখন ওদেরই থেকে চেয়ে-চিন্তে একটা ঠেলাও যোগাড় ক'রে নেয়। আবার বলে কিনা, ঠেলে নিয়ে যাবার জন্যে দু লোক যাও। ঐ করতে করতে রাত দুটো। সেই ঠেলা নিয়ে দাদা রাতারাতি বৌবাজার কোলে বিক্রি চ'লে যায়। ভোর চারটে নাগাদ পাইকিরি রেটে সব বিক্রি ক'রে দিয়ে দাদা পকেট বাজাতে বাজ বাড়ি ফেরে!'

রাইমোহন তখন বিড়ি টানছে বুঁদ হয়ে অর্ধনিমীলিত নেত্রে।

অজিত গলা চড়িয়ে বলতে লাগলো, 'এই বর্ষার সিজনে দাদার বাড়িতে কেউ যাবেন তো দে পাবেন দাদা তিনটে চৌবাচ্চা খুঁড়ে রেখেছে। তাতে ব্লাক-ওয়াইজ মাছ জিয়ানো হয়। একটাতে শুধু একটাতে শিং-মাগুর, আরেকটাতে শোল-নাটা। এসব মাছ যোগাড় হয় কোত্থেকে বলুন দিকিন? দা ফিরবার আর ছুটির দিনে দাদা ছিপ নিয়ে চললো, সারা বর্ষার সিজন। সেখানে গিয়ে ঘাসবনে ডুবিয়ে ছিপ নাচিয়ে নাচিয়ে মাছ ধরবে। একদিন একটা কই মাছও টোপ গিলেছে, ওদিকে একটা দা সাপ দাদার পায়ের বুড়ো আঙুলটাকে ব্যাঙ মনে ক'রে কামড়েও ধরেছে। কিন্তু দাদা সাপে কামড় অগ্রাহ্য ক'রে আগে মাছকে তুলছে। বলুক দিকিনি এও বানানো গল্প!'

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে রাইমোহন হাসতেই লাগলো। আজ আর সে কিছুতেই খেপবে না বলে করেছে যেন।

কিন্তু রাইমোহন না খেপলে অজিতের শান্তি নেই। সে এবার বর্ষা ছেড়ে শীতের প্রসঙ্গ তুলে রসিয়ে রসিয়ে বললো, সারা শীতকাল দাদার হাতে একটা মাথা-বাঁকানো ছড়ি দেখা যায়। তাই দিয়ে ন সে বাপার খেত থেকে অন্ধকারের মধ্যে কপি চুরি করে।

গরম হওয়া দূরে থাক, রাইমোহন এবার রসাবেশে কীর্তন ধরলো :

'কার যেন ভরা খেতে রে আমি দিয়াছিলাম হাত
সেই পাপেতে ছেড়ে যুবি গেল প্রাণনাথ।
ও-ও-ও আমায় পাগল কৈরা গেলারে প্রাণনাথ—'

'অফিসের তো ইজ্জৎ চিলে ক'রে দিলে'—ব'লে অজিত হঠাৎ লক্ষ্য করলো রাইমোহনের চেয়া পিঠে একটা গামছা। আর যাবে কোথায়, অজিত চেঁচিয়ে উঠলো, অফিসে গামছা শুকনো? গোরুর পুঁছে শুকোতে দিয়েছ নাকি অ্যাঁ!'

'অফিসে গোরু কোথায়?'—সচীন জিগ্যেস করলো।

'নিজেই তো একটা। পেতে থাকাকালীন চেয়ার তো দুঃস্থান, টুল বা তাজা বেঞ্চিও দাদা এন্টা টেন্ড. ছিলো না। ষ্টোরওয়ার্ডে ইন্ডিনের বাক্সর প'ড়ে থাকে তো তাই চেপে বসতে হত। অ অফিসে এসে কোকটে চেয়ার পেয়ে গিয়ে তাতে গামছা শুকোচ্ছে! মানসম্মান আর থাকলো না বি অফিসের!'

'মানের গলায় ছাই ঢেলে দে'—রাইমোহন বললো বড়ো-বড়ো চোখ ক'রে, 'ব'লে গেছেন গুরুদ দত্ত। মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে দে!'—ব'লে সে গুরুসদয়ের উদ্দেশে বারংবার নমস্কার ঠুকলো।

বচনে কাজ হচ্ছে না দেখে অজিত হঠাৎ লাফিয়ে প'ড়ে রাইমোহনের আঙুল থেকে চলচ আংটিটা টেনে খুলে নিয়ে পালালো। অষ্টধাতু বসানো মাঝখানে দেবনাগরী অক্ষরে তান্ত্রিক লেখা পেতবে আংটি, রাইমোহন কালীঘাট মন্দিরে মন্ত্রপুত ক'রে এই আংটি ধারণ করেছে। আংটি নেওয়াতে রাইমো চটলো, কিন্তু কী কারণে কে জানে, সে চেঁচামিচি করলো না। গুম হয়ে রইলো।

এবার অজিত আরেকটা গল্প ছাড়লো, 'গৌতমবাবু হিন্দু হয়ে দাদা গোহত্যার পাতকী, জানে তো? দাদার বন্ধুনা গাই ছেলো একটা। পাঁচ-ছ সের করে দুধ দিত। কিন্তু উপযুক্ত রকম খেতেটো দিত না সেটাকে, খচ্চা হবে যে। অর্ধাহারে গোরুটা ব্যাধিতে প'ড়ে গেলো। পশু চিকিৎসালয়ে খে করা হ'লো। বেলগাছিয়ার কোন বেড খালি নেই আর খালিগঞ্জেরটায় একটা খালি আছে কিন্তু সে ফ্রি-বেড নয়কো, দশ টাকা দিলে তবে পেশেন্ট ভর্তি হবে। দশ টাকার মায়া ছাড়াতে ছাড়াতে গোরুটারই প্রাণে মায়া ছেড়ে গেলো। মরা গোরু নিয়ে দাদার তখন আরেক হ্যাসাদ। কলকাতায় গোরু ফেলার জায় নেই কো, কী করা যায়? কর্পোরেশনের গাড়ীতে জমা করতে গেলে আট-দশ টাকার ধামলা। দা তখন ডেড অব নাইটে মরা গোরুটা রাস্তার ওপারে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখলো—বেওয়ারিশ মাল হ গেলো আর কি।'

'অতো বড়ো ধুমসো মরা গোরু দাদা একাই বইতে পারলো?'—কানাই বোস জিগ্যেস করলো।

'একা কেন। চার ছেলে তিন মেয়ে আর তিন জামাই রয়েছে কী জন্যে? সবাই মিলে ধরাধরি—'

রাইমোহন সহসা রামপ্রসাদী সুরে গান ধরলো :

'যত বানর রূপে এ ভবে জীবের আগমন,
যেমন ইচ্ছে হয়েছে কিম্বা হতেছে পাছে তার মতন—
অমঅমঅমঅমন।

যত বানর রূপে—

'বড়োসাহেব! বড়োসাহেব!—হঠাৎ ঘরের মধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত চিৎকার।

ডি. এম. ই. ততক্ষণে ঘরের একেবারে মধ্যে। রাইমোহনের গানে সবাই (বড়োবাবুসুদ্ধ) এম মশগুল হয়ে গিয়েছিলো যে কোন ফাঁকে ডি. এম. ই. ঘরে ঢুকে পড়েছেন, কেউ খেয়াল করতেই পারেনি

হঠাৎ তড়িতাঘাতে সকলের যেন একসঙ্গে মৃত্যু ঘটলো, যে যেখানে ছিলো সে সেই অবস্থাতেই কা কেলিয়ে রইলো।

কিন্তু ডি. এম. ই. বেরসিক নন। স্মিত মুখে তিনি রাইমোহনের কাছে এলেন, রাইমোহন ব রামভক্ত হনুমান অবস্থায় জোড়হস্তে কম্পমান। ডি. এম. ই. বললেন, 'কী খামলেন কেন? চলুক কী গান হচ্ছিলো?'

'এই না—আইজ্ঞা একটু সাধন ভজন—আইজ মনটা বড়ো উচাটন ছিলো তাই সুর'—রাইমে জোড়হস্তেই উত্তর দিলো।

'বটে! আপনার নামটি যেন কী?'

'আইজ্ঞা শ্রীরাইমোহন আঢ্য।'

'রাই-মোহন! বটে! সঙ্গীতজ্ঞ আছে নাকি?'

'আইজ্ঞা এখন আর নাই'—বিগলিত বিনয়ে রাইমোহন জানালো।

'নাই কেন? আবার করুন?'—ব'লে ডি. এম. ই. হাসলেন।

সেই হাসি দেখে ঘরের অন্য কেরানীরা (বড়োবাবু বাদে) ইতিমধ্যে বেঁচে উঠেছে।

ডি. এম. ই. এবার অজিত ব্যানার্জী (নামার ওয়ান)-এর দিকে ফিরে বললেন, 'এক কাজ ব ক্রিক্রিয়েশন ক্লাবের থেকে একটা আসর জমিয়ে দিন একদিন। অফিসেই হবে ঘরজা জানালা বন্ধ ক' তাতে রাইমোহন কীর্তন গাইবেন। 'কী?'—রাইমোহনের দিকে ফিরে বললেন, 'খোল-করতাল ব তো? সব নিয়ে আসবেন।'—ব'লে ডি. এম. ই. হাসতে হাসতে নিজের চেম্বারে চ'লে গেলেন।'

'হত ধানর রূপে'—দুরাত্ত ভুলে নিমাই হয়ে রাইমোহন কের সুর ধরলো চাপা গলায়।

সৃষ্টি

বিখ্যাত ভাস্কর গুটজন বর্গলাম-এর অক্ষয় কীর্তি হোল লিঙ্কনের প্রস্তরমূর্তি।

ঐ কাজের উদ্দেশ্যে একটি মার্বেল পাথর আনা হয়েছে। শিল্পী রোজ একটু একটু করে কাজ করেন। একটি নিগ্রো মেয়ে রোজ আসে স্টুডিয়োতে। মেঝেময় ছড়ানো পাথরকুচি কুড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

মেয়েটি তার কাজের কাজ করে যায় রোজ, সে আর তাকায় না আসল পাথরটির দিকে।

হঠাৎ একদিন তার চোখ পড়ে গেল। তখন কাজ শেষ হয়ে গেছে। নিগ্রো মেয়েটি অবাক হয়ে ছুটে গেল শিল্পীর একান্ত সচিবের কাছে, জিজ্ঞাসা করল অধীর আবেগে: ঐ কি লিঙ্কন?

—হ্যাঁ, তা হয়েছে কি!

—হয়েছে কি? বর্গলাম সাহেব কি করে জানলেন যে ঐ সমস্ত পাথরটার ভেতর লিঙ্কন লুকিয়েছিল?

বিস্ময়ে ফেটে পড়ল মেয়েটি।

জাল-ওষুধ

ডক্টর হরেন্দ্রনাথ রায়

সত্যমিত্রাকে বলেছিল মহুলিকা অসিত সেনের কথা। আর্দ্র চোখ দুটি তুলে বলেছিল, সোনা বিহুকে দুধ খাবার ভাগ্য নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করিনি মিত্রা। জীবনে দুঃখ কষ্ট সহেছি অনেক কিন্তু এত বড় দুঃখ আমি ভোগ করিনি কখনও। কিন্তু এর জন্য আমি এতটুকু ক্ষোভ করব না, এ-দুঃ সাধনাকে আমি জীবের ভূষণ বলেই মেনে নেব, যদি জানতে পারি তিনি বিন্দুমাত্রও তৃপ্তি পেয়েছেন আমা এ সাধনায়। মহুলিকা থামে। তারপর আবার বলে, মনে পড়ে প্রথম যে দিন তিনি এলেন এ অফিসে সে দিনের কথা। সে দিন তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল কো দেবের এক রাজপুত্র পথ ভুলে এসে পড়েছেন এখানে। তাই বার বার চুরি করে দেখেছিলুম তাঁকে।

সত্যমিত্রা মুচকি হেসে বলে, প্রথম দৃষ্টিপাতেই প্রেম।

মহুলিকা বলে, প্রেম নয়, ভাল লাগা।

সত্যমিত্রা উত্তর দেয়, ভাল লাগার ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠাই ভালবাসা।

মহুলিকা সে কথায় কান দেয় না। বলে, এমন পুরুষ আছে যাকে দেখতে সত্যিই ভাল লাগে।

—লাগে! সত্যমিত্রা তেমনিই মুচকি হেসে বলে, আর তারাই উত্তরকালে হয় পরম পুরুষ।

মহুলিকা এক মুহূর্ত কথাটিকে হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করে বলে, জানি না। তবে ভাল লাগ তাঁর ঐ ভাবে ভরা-চোখ দুটি। যেন সংসার বৈরাগ্যের সব কিছু উপকরণকে তার মধ্যে ধরে রেখেছিলে তিনি।

—তাই তাকে সংসার অনুরাগী করবার এই প্রচেষ্টা তোমার।

—মানুষের বাসনার অন্ত নেই মিত্রা, তার চেষ্টারও বিরতি নেই। তবে যদি এই, সব প্রচেষ্টা ফলব হয় না। একটু থেমে আবার বলে, দুবছর আগে এই নভেম্বর মাসে যে চেয়ারখানা আজ অধিকার করে বা আছ তুমি, সেইখানা অধিকার করে এসে বসলেন তিনি। আমাদের মধ্যে ব্যবধান রইল দু'হাতি এই টেবিলটা আর মাঝখানে উঁচু করা এই টাইপ মেসিনটা। দু দিন আলাপাকাঙ্ক্ষী মন অন্যমা বাসনা চেপে রইল দু চার। কিন্তু তৃতীয় দিনে বাসনা মিটল। তিনিই উঠে এলেন আমার পাশটিতে। আলাপের সূত্রপাত ক বললেন, একই অফিসে যখন কাজ, একই ঘরে যখন বাস, তখন চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকাটা শোভনীয় নয়

শুনে খুশিই হলুম। প্রত্যুত্তরে মুখ তুলে তাকিয়ে একটু হাসলুম মাত্র।

অসিত সেন বললেন, দু-দিন জয়েন করেছি অফিসে। কিন্তু এসে পর্যন্ত অবাক হয়ে গে আপনার কাজের বহর দেখে। দুটি হাতের আর বিরাম নেই। সমানে নেচে চলেছে মেসিনের ওপর কাজও কম নয়।

এবারও স্মিতমুখে মুখ তুলে তাকাই, কিন্তু বলি না, এ একদিনের কাজ নয়। কামাই করো তাই কাজ জমে উঠেছে।

না থাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি। এবার বলি, ধন্যবাদ। এতখানি উদারতার কাছে কারো আপত্তি থাকতে পারে এ আমি মনে করি না।

তিনি বলেন, টাইপ জানি বলে নিজেকে জাহির করতে চাই না। বাড়ীতে একটা মেশিন আ তারই ওপর ঠোকাঠুকি করি মাত্র। মনে মনে একটু গর্বের হাসি হাসি। এ এক আঙ্গুলে সখের টা করা নয়। অফিসের কাজ। ভুলচুক হলেই সর্বনাশ। হয়ত একটু বিদ্যার ভাণ মনের মধ্যে জেগেছি সেটুকু বুঝতে পেরেই তিনি বললেন, ভাবছেন যদি ভুল হয়। কিন্তু আপনার মত পাকা লোক যখন ক আছে, তখন ভুল সংশোধন করে নিতে কতক্ষণ!

এবার সন্ধ্যমিত্রা বলে, কি খোসামুদে লোকরে বাবা। গোড়া থেকেই খোসামোদ! গলে হ'য়ে গেলে নিশ্চয়ই?

মধুলিকা বলে, খোসামোদে ভগবান তুষ্ট মিত্রা, আমি ত ছার। তবুও কুণ্ঠিত হয়ে ব আপনাকে কষ্ট দেব আবার।

বলেন, কষ্ট নয়, বরং ইষ্ট। আচ্ছা আপনিই বলুন ত, পুরুষ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁ করে থাকি কি করে? দুদিনেই অস্থির হয়ে উঠেছি। এ ঘরে কোথায় যে কি আছে, আসবাবপত্র, দ জানালা, ঘড়ঘড়ি থেকে ইস্তক কড়ি-বরগাগুলির পর্যন্ত অস্তিত্ব সব আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। বিশ্বা হয় জিজ্ঞাসা করুন, আমি গড় গড় করে বলে যাব সব।

বললুম, নতুন লোক, তাই কাজকর্ম এখনও এসে পৌঁছয়নি আপনার টেবিলে। একবার আ সুরু করলে অস্থির হয়ে পড়বেন তখন।

সহাস্যে বলেন, এ রকম সুস্থিরের চেয়ে অস্থিরই আমার ভাল।

সন্ধ্যমিত্রা প্রশ্ন করে, কামপাগল লোক বল?

মধুলিকা মাথা নেড়ে বলে, তাই। কিন্তু ভাবনা হ'ল মেশিন ছেড়ে দিয়ে। অফিসের কাজ, চুক হলে মুস্কিল হবে আমারই। তাই ফিরে ফিরে দেখছিলুম বার বার। বুঝলুম স্পীড বেশী না হ আগ্রহ বেশী। এক এক খানা চিঠি শেষ করেন আর আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, দেখুন চলবে কি

সন্ধ্যমিত্রা প্রশ্ন করে, কি দেখলে, চলবে?

—না চলে উপায় কি? খুঁত ত নেই কিছু। ভেবেছিনু আনাড়ী লোক, ভুল হবে নিশ্চ তখনই উপদেশ দিয়ে দেব কিছু। কিন্তু দেওয়া হল না। তাই চিঠি থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে চলবে। এর চেয়ে ভাল আর কি আশা করতে পারেন কর্তৃপক্ষীয়েরা। তারপর কাজের মধ্য একটু একটু করে জড়তা বেড়ে ওঠে। সঙ্কোচ কমে আসে।

সন্ধ্যমিত্রা ভাল মানুষের মত বলে, আর মনের সুকুমারবৃত্তিগুলিতে দোলা লাগে।

মধুলিকা ম্লান হেসে বলে, মেয়ে টাইপিষ্টের জীবনে সুকুমারবৃত্তি বলে কিছু কি আছে মিত্রা? যদিও বা থাকে, তারা আবর্জনার স্তূপের তলায় কোথায় যে আত্মগোপন করে থাকে তার অস্তিত্ব পা যায় না।

—যায়। তবুনো আবর্জনা, তার তার নেই। বসন্তের একটা ফুৎকারেই যখন সব উড়ে

আলাদা। কিন্তু ও কথা থাক। ভদ্রলোক আমার উপকার করেছেন অনেক, কাজও করে দিয়েছে অনেক।

—পারিশ্রমিকও নিশ্চয় পেয়েছেন অনেক।

—না। সেইখানেই আমার দুঃখ। চাইলেই পেতে পারতেন অনেক। কিন্তু নিস্পৃহ লোক চাইবার অবকাশ হ'ল না তাঁর।

—আশ্চর্য্য!

—আমিও কম আশ্চর্য হইনি মিত্রা। সময় সময় নিজের কাঙ্গালপণায় লজ্জিতও হয়েছি কিন্তু বৈরাগী মনের তল পেলুম না। বড় গভীর।

সত্যমিত্রা হাসে। বলে, পাকা ডুবুরী নও, তাই তল পাওনি। নইলে পুরুষের মনের ত পায় না মেয়েরা, এ কেমন কথা?

—সত্যি কথা মিত্রা, এ মনের তল নেই। এ অতলান্ত মন। কোন ডুবুরীরই সাধ্য নেই এ তল পাওয়া।

সত্যমিত্রা বড় বড় চোখ মেলে একবার তাকিয়ে দেখে মহুলিকাকে। তারপর প্রশ্ন করে তুমি চেষ্টা করছিলে মহু?

মহুলিকা উত্তর দেয় না। নত মুখে বসে থাকে।

সত্যমিত্রা বলে, অতলান্ত মন যাদের, তারা লোক ভাল নয়। মনের মানুষ তারা হতে পারে কোন দিন।

মহুলিকা বলে, অভিজ্ঞতামূলক আমার জীবন নয় ভাই মিত্রা, পুরুষ চেনার ব্যাপারে। শুধু এইটু বলতে পারি, অসিত সেন লোক খারাপ নয়। তাঁর প্রাণ আছে।

—প্রমাণ পেয়েছিলে?

—পেয়েছিলুম। মণিমালার ব্যাপারে।

—মণি-মালা? সত্যমিত্রা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

মহুলিকা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। বলে তাকে কেন্দ্র ক'রেই অসিত সেনের এই বিচিত্র কাহিনী একটা সকরুণ ইতিহাস। এ থেকে মুক্তি না পেলে—।

মহুলিকা আতঙ্কে শিউরে উঠে বলে, না পেলে কি হবে মিত্রা, আমি জানি না। তবে মনে হয় উনি যে আর ফিরে পাবেন না কোনদিন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

সত্যমিত্রা বলে, আশ্চর্য! কিন্তু এমন কি ঘটনা মহু, যা একজন মানুষের সারা জীবনকে পঙ্গু করে রাখতে পারে?

—মানুষের জীবন বড় বিচিত্র মিত্রা। সহস্র আঘাতে যে থাকে অটল সামান্য ভুলের আঘাতে সে মূর্ছা যায়। হয়ত মর্মে গিয়ে এ আঘাত বেঁধে বলেই এ হয়ে ওঠে মর্মান্তিক। এমনি এক মর্মান্তিক আঘাত তাঁর জীবনকে পঙ্গু করে দিয়ে গেছে।

সত্যমিত্রা কোন প্রশ্ন করে না বটে কিন্তু সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে।

মহুলিকা বলে চলে, ছোট্ট একটি সংসার—দু ভাই, মা আর বোন। অভাব-অনটনের সংসার হ'লে

জানতে দেন নি একটি দিনের তরেও। কিন্তু প্রকাশ পেয়ে গেল যখন বড় ছেলে পাশ করলেন বি. এস-সি তখন থেকেই তাঁকে দাঁড়াতে হ'ল 'অরচিন্তা চমৎকারার' মুখোমুখি হ'য়ে। সেন বলেন, আকাশ ে পড়ল মাথায়, যে দিন যা প্রকাশ করে বসলেন সব কথা একটি একটি করে। বিরাট ঘণ্টাকালে আবদ্ধ ে এই সংসার। ভত্রাসন বাঁধা যায়। অপগণ্ড দুটি ভাই বোন, অসহায় মা, আর সবচেয়ে অসহায় আ অপেক্ষা করতে পারলুম না। ছুটে বেরিয়ে পড়লুম এবং হাতের কাছে যা পেলুম তাই আঁকড়ে ধরলুম।

পেলেন মাড়োয়ারী ওষুধের দোকানে চাকরী। ভাল ওষুধ, বিলিতী শিশিতে ভর্তি করা। বি ওষুধ বাজারে দুষ্প্রাপ্য। চোরা বাজারে এগুলিই বিলিতী ওষুধের চেয়ে চড়া দামে বিকোয়। আর মানুষ, বিলিতী ভ্রমে এ গুলিকেই কিনে নিয়ে যায় হাসি মুখে। বিবেকহীন মাড়োয়ারী, পরকাল ন না। ইহকাল নিয়েই তুষ্ট। রামজিকে স্মরণ ক'রে ব্যবসা চালায়। হয়ত শেষ পর্যন্ত একটা ধরমশ অথবা রামজির মন্দির বানিয়ে পাপ খালন করে। এরই কাছে বছর দুয়েক কেটে যায়। ব্যবসার খা খুঁটিনাটি সব জানা হয়ে যায় সেনের। শেষ পর্যন্ত বন্ধুর প্ররোচনায় নিজেই এই ব্যবসায়ের এ পত্তনি দেন।

সঙ্ঘমিত্রা শিউরে উঠে বলে, এই ভাল ব্যবসার? ছিঃ!

আমিও বলেছিলাম, ছিঃ। তিনি নিজেও বলেছেন, ছিঃ। কিন্তু না করেও উপায় ছিল তিনি বললেন, বন্ধুর প্ররোচনা আর সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে আমায় ঠেলে দিল ঐ প পৈতৃক বাড়ী গেল বিক্রী হয়ে। যেটুকু সম্বল ছিল, আদালত আর পাওনাদারেরা চেটে-পুটে খেয়ে সব। সে দিন রাত্রে বাইশ তেইশ বছরের যুবক আমি মা, ভাই, বোনের হাত ধরে নিঃসম্বল দাঁড়ালাম রাস্তায়। সেইদিনই আমি বিসর্জন দিলাম আমার মনুষ্যত্বকে, কৃষ্টি, শৈলী, বিবেক সব কিছু পত্তনি দিলাম এই অসাধু ব্যবসায়।

মহুলিকা থামে। তারপর আবার বলে, অসাধু ব্যবসা কারো সয়, কারো সয় না। ওনার সয় না। কিন্তু খেসারত দিতে হল অনেক।

—খেসারত মানে লোকসান? সঙ্ঘমিত্রা প্রশ্ন করে।

—না। এ আর্থিক খেসারতও নয়, এ মানসিক। আর এর জন্যে দায়ী মণিমালা। হয়ত ও অভিশাপের ফল। তাই আজ তিনি উন্মাদাশ্রমে।

সঙ্ঘমিত্রা চমকে উঠে বলে, উন্মাদাশ্রমে? বল কি?

মহুলিকা শ্রান্ত কণ্ঠে বলে চলে, মণিমালাকেও দোষ দি না। সে আঘাত পেয়েছে, সহে সে প্রত্যাঘাত করেনি, ক্ষমাও করেনি। এই ক্ষমা না পাওয়ার মধ্যে ব্যর্থতা, তাই বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াল এক জনের পক্ষে। চিত্তের ভারসাম্যে বিশৃঙ্খল ঘটিয়ে, বিপর্যয় ডেকে আনল মনরাজ্যে। আমি করেছিলাম, মিত্রা, ভারসাম্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যথাসাধ্য করেছিলাম, কিন্তু সফল হইনি।

সঙ্ঘমিত্রা অবাক হয়ে যায়। প্রশ্ন করে, তুমি চেষ্টা করেছিলে দুজনার মিলন ঘটাতে মহু?

মহুলিকা বলে, মিলন নয়, সমন্বয়। একের ক্ষমা অপরকে পাইয়ে একটা সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট হয়েছিল

—তাতে তোমার লাভ?

—লাভ? আর এত বড় ট্র্যাজেডি হয় ত ঘটত না মিত্রা। মহুলিকা থামে। কিন্তু আবার ব

বোনের মুখে হাসি ফুটল। ছোট বোন রমার বিবাহ দিলেন সুপাত্রে দেখে। খরচও করলেন বেশ। কি সহসা এই ছোট পরিবারটিতে পর পর দুটি অনর্থপাত ঘটে গেল। ছোট ভাই নিশীথ মারা গেল ব্রঙ্কাইটা সেন বলেন, চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটে গেল শেষ পর্যন্ত। ডাক্তারেরা একমত হতে পারলেন না বলে, আ রোগ ধরা পড়ল না। সুতরাং রোগের যা ওষুধ তা শিশিতেই ভরা রয়ে গেল। রোগীর ভাগ্যে জুটল ম মাঝখান থেকে ভাইটি মারা গেল।

দ্বিতীয় অনর্থপাত ঘটে গেল এর কিছু পরেই। রমার স্বামী, আদরের ভগ্নীপোতটি মারা গেল কয় দিনের জ্বরে। ওষুধ বিপত্তিতেই মৃত্যু হ'ল তার।

সজ্জমিত্রা এতক্ষণ শুনছিল মন দিয়ে। এখন প্রশ্ন করল, ওষুধ বিপত্তি মানে?

—সেন বলেন, অসুখের সঙ্গে পেটের মধ্যেও যন্ত্রণা ছিল একটা। ডাক্তার ইন্‌জেকশন্ দিলে ইনজেকশনের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল রোগী। সন্দেহ হয় ইনজেকসনের ওষুধটা ভাল। হয়ত সে ওষু নয়। অন্য ওষুধ শিশিতে ভরা ছিল। তাই রোগী সইতে পারল না, শেষ হয়ে গেল।

মহুলিকা বলে, ছমাসের শিশু কোলে নিয়ে রমা ফিরে এল। সেই হাস্যময়ী ফুলের মত মেয়ে, মাথ সিঁদুর মুছে সংসারের যাবতীয় ভোগৈশ্বর্যে জলাঞ্জলি দিয়ে মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল বিধবার বেশে। সইতে পারলেন না। পর পর এত বড় দুটি শোক। ভেঙে পড়ে শয্যা নিলেন একেবারে। সেনের মুখে শুনে তাঁর শেষ রাতের ঘটনাটি যেমনি করুণ তেমনি মর্মন্তুদ। গভীর রাত। মা শয্যায় শুয়ে ছটফট করছেন যন্ত্রণায়। ঘুম বুঝি বন্ধ হয়ে এল তাঁর। আগে রাতে ডাক্তার পাওয়া ভার। অনেক চেষ্টার পর ডাক্তার এসে দেখে শুনে প্রেসক্রিপসন লিখে বললেন, অরিজিন্যাল ওষুধটা যদি যোগাড় করতে পারেন, যন্ত্রণারও অ উপশম হবে, রোগীও এ যাত্রায় রেহাই পাবেন। দুষ্প্রাপ্য ওষুধ। কিন্তু সেন জানতেন, এ ওষুধ আছে ও ডাক্তারখানায়। আসলও আছে, নকলও আছে। রুদ্ধশ্বাসে তিনি নিজেই ছুটে এলেন ডাক্তারখানা তারপর ব্যগ্রচোখে খোঁজ করলেন ওষুধটির। কিন্তু কোথায় ওষুধ! স্থান শূন্য। তন্ন তন্ন পাতি পাতি ক খুঁজেও সন্ধান মিলল না কোথাও। যা মিলল সব নকল ওষুধ। হয়ত আসল ওষুধ বিক্রি হয়ে গে নিজেরই অজ্ঞাতসারে। নকল ওষুধের শিশিতে ঘর ছেয়ে আছে। সেদিন তারা যেন সব হাসতে লাগ দাঁত বার ক'রে। সেন সেইখানে ধপ করে বসে পড়লেন মাথায় হাত দিয়ে। আর ভীতি বিহ্বল দৃষ্টি তাকিয়ে রইলেন ওষুধগুলির দিকে।

রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে। চাকর এসে ডেকে নিয়ে যায় তাঁকে। খবর দেয়, মা মারা গেছেন যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ঘুম বন্ধ হয়ে মারা গেছেন তিনি।

এ শোক তোলবার নয়। তাই যেন তোলেন নি আজও। বুঝলেন, নিজের পাপেই এই অ অনর্থপাত। এ নিজেরই কৃতকর্মের ফল। তাই এ পাপ ব্যবসা তুলে দিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হলেন। এ অনাথিনী বোন আর তার শিশুপুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে হয়ত ইতস্তত: করছিলেন কিছুটা। কিন্তু ত তাই আর ভগ্নীপতি করতে পারেন নি যা, তাই করল মণিমালা। চরম আঘাত হানল সেই।

সজ্জমিত্রা প্রশ্ন করে, মণিমালাটি কে মহু?

—একটা মেয়ে। মহুলিকা একটু হাসে।

—সে ত নাম শুনেই বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু তার জাতি-তত্ত্ব আমার জিজ্ঞাস্য নয়, জিজ্ঞা

—বলছি, কিন্তু ক্রমশঃ। সেনের মুখে শুনলাম, মণিমালার সঙ্গে পরিচয়। তার বিয়ের দিন থে তবে এ শুধু চোখের পরিচয়, মুখের নয়। যার বৌ হ'য়ে এল মণিমালা, সে থাকত সেনের দোকানের উ ফুটের সামনের ফ্ল্যাটে। মণিমালাকে বিয়ে করে নিয়ে এল এক নব ফাল্গুনের সকালে। সে দিন সন্ধ্যে হার মানিয়েছিল কোকিলের বিরামহীন কুহুধ্বনি। কনে নামল গাড়ী থেকে বরের পিছু পিছু। বেনারসী শাড়ীর আঁচলের সঙ্গে ছুপেগরদের জোড় এক হয়ে গেছে গাঁটছড়ার বাঁধনে। মাথার সিঁথি থে ছোট কপালটি ঘিরে, আরক্তিম কপোল দুটি ঘুরে কনে-চন্দনের ফোঁটা। তারই মাঝে এক জোড়া কালো চোখ, টিকোল নাক আর অনবদ্য মুখশ্রী। পরনে রক্তাম্বরা বেনারসী শাড়ী। শুভ্র পা দুখা ঘিরে অলক্তের রেখা। যেন শারদলক্ষ্মীর শুভাগমন হ'ল নব ফাল্গুনের সকালে। এ চোখ জুড়ান বৃত্ত। ঘ জুড়িয়ে গেল সেনের। নিজের বোনের কথা মনে পড়ে গেল। তাকেও একদিন এমনি স সাজিয়েছিলেন তাঁরা।

বিয়ের দিন থেকেই সামনের ফ্ল্যাটের ছোট ঘরখানি বড় মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। এতদিন সামনা-সা দোকান ক'রে যে ঘরখানির দিকে তাকাবারও সময় হয়নি এক মুহূর্ত, আজ সেইখানিই আকর্ষণের ব সর্বক্ষণ। যেন শত কমল একসঙ্গে ফুটে উঠেছে সে ঘরে। আর তারই মাঝে এক দম্পতি যুগল ক কপোতীর মত নীড় বেঁধেছে সেখানে। ভারী সুখী দম্পতি। কলহাস্যে ঘর ভরে থাকে। মাঝে তার বেশ দমকা বাতাসের মত এসে ঢোকে দোকানে। এ বাঁধ-না-মানা-জোয়ার, দুজনকেই ভাসিয়ে যায় টানে। কখনও আদর সোহাগ, কখনও মান অভিমান, কখনও বা ছোটখাটো খুনসুড়ি লেগেই তাদের। মাঝে মাঝে মেয়েটি ছুটে আসে জানালার ধারে। হাসি মুখে দুহাতে পর্দাখানি টেনে দিয়ে চলে যায় ঘরের ভেতর। মনে হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে কিছু খেলায় মাততে চায় তারা। একটার পর দৃশ্য। সেনের ভাল লাগে বেশ।

বছর কেটে যায়। কদিন ধরে মেয়েটির দেখা নাই। সেদিন সকালে জানালার ধারে মেয়েটিকে দেখে চমকে ওঠেন সেন। কী বিবর্ণ মুখশ্রী। সারা মুখে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে সেই চল চল অঙ্গের লাবণি সব অন্তর্হিত। মেয়েটি এক মুহূর্ত দাঁড়াল জানালার গরাদে মাথা তারপর সরে গেল ধীরে ধীরে।

এরপর কদিন ধরেই লক্ষ্য করেছেন সেন সেই চিরানন্দময় ঘরে কেমন যেন নিরানন্দ নেমে এ সে ঘরের দীপ্তি নিভে গেছে। সে কপোত-কপোতীর দেখা মেলে না, যেন নীড় ছেড়ে চলে গেছে। একটা থমথমে ভাব ঘিরে রয়েছে ঘরখানিকে। বিরহীর দেখা যদি বা মেলে, বিরহের নয়।

সন্ধ্যমিত্রা মুচকি হেসে বলে, বিরহ উড়ে গেল নিশ্চয়ই। ও রকমই হয়। অতিবৃষ্টির পরই অ পুরুষদের বিশ্বাস নেই।

মধুলিকাও হাসে তবে এক টুকরো ম্লান হাসি। বলে, সব পুরুষ নয়। অন্ততঃ এই ে স্বামী নয়।

সন্ধ্যমিত্রা ঠোঁট টিপে বলে, আর তার সঙ্গে আর একজনও নয়। সে তোমার ঐ অসিত বাবাঃ কী চক্ষেই যে তাকে দেখেছ তুমি জানি না। কিন্তু এখনও সময় আছে মধু ফেরবার।

বাষ্টা সব সময় অন্তরের প্রকাশক হয় না। অসিত সেনের সঙ্গে আমার পরিচয় অন্তরের দিক থে
সেই অন্তরের অন্তরে যে পরিচ্ছন্ন শুভ্র মনটি আছে তার সাক্ষাৎ আমি পাই সব প্রথম। তাই আ
মানুষটিকে চিনতে আমার বিলম্ব হয়নি এতটুকু। মণিমালার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল থ
বাইরের দিকটা, তাঁর ব্যবসায়ী মনটা, তাই এত বড় ভুল করতে পেরেছিল সে। নইলে
চিনতে পারত তাঁকে। মহুলিকা চুপ করে। তারপর আবার বলে, বিলেতের যে দেখা নেই কেন তা যে
গেল দু-একদিনের মধ্যেই। সামনের বাড়ীর একটি চাকরকে ইদানীং প্রায়ই দেখা যেত দোকানে প্রেসক্রপ
হাতে। দামী দামী ওষুধ নিয়ে যায় সে। সেদিনও বিকেলের দিকে সে এসেছিল ওষুধের জন্যে।
ডাক্তারের প্রেসক্রপশন। দেখেই চিনেছিলেন সেন। প্রশ্ন করলেন চাকরটিকে, এত দামী ওষুধ নিয়ে য
কার জন্যে? চাকরটির নাম রাখাল। সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সামনের ফ্ল্যাটটিকে। বলে,
ঘরের বাবুর জন্যে। টাইফাড রোগ। বড্ড বাড়াবাড়ি যাচ্ছে কদিন। রোজ রোজ কত যে ওষুধ নি
গেলুম এখান থেকে তার লেখাজোখা নেই। কিন্তু কিছু ফল হ'ল না। অদৃষ্ট বাবু, সবই অদৃষ্ট। ডাক্ত
বলেন, আজকাল এ রোগের ওষুধ বেরিয়েছে, ধন্বন্তরী। কিন্তু বাবুর বেলায় দেখছি, ধন্বন্তরিও হার মান
ছেলেমানুষ বৌ, পাগলের মত হয়ে গেছে। গয়নাগাটি বাঁধা দিয়ে চিকিৎসা চালাচ্ছে। যে যা বলছে
করছে। টাকার দিকে গেরোটি নেই। জলের মত খরচ করে যাচ্ছে আর দিনরাত স্বামীর সেবা য
চলেছে। কি যে হবে বাবু জানি না।

চমকে ওঠেন সেন। সর্বনাশ! টাইফয়েডের ওষুধ আজকাল দুষ্প্রাপ্য। কালো বাজারে বি
হচ্ছে সব। প্রকাশ্য বাজারে যা পাওয়া যায় তার অধিকাংশই জাল। নিজের দোকানের ওষুধগুলিকে
তিনি চেনেন। আসল অনেকদিন অন্তর্হিত হয়েছে নকলের অন্তরালে। সুতরাং যত ওষুধই নিয়ে যা
ফল হবে না কিছু। তাই ভয়ে ভয়ে রাখালকে প্রশ্ন করলেন আবার, এখন কেমন আছেন তিনি?

রাখাল উত্তর দেয়, বড় ডাক্তার এসেছিলেন কিছুক্ষণ আগে। তিনি আশা দিতে পারেননি কি
শুধু বলে গেলেন, এইটাই শেষ ওষুধ। এর পরে আর কোন ওষুধ নেই এ রোগের। বলে দোক
থেকে সদ্য কেনা ওষুধটি তুলে দেখাল তাঁকে।

সেন পাথর হয়ে যান। কোন কথাই বার হয় না মুখ দিয়ে তাঁর। শুধু ওষুধটির দিকে ফ্যাল ফ্যা
করে তাকিয়ে থাকেন এক দৃষ্টে।

রাখাল চলে যেতে চায়। সেন বাধা দেন। কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে স্খলিত কণ্ঠে বলেন, শোন,
ওষুধ রেখে যাও। আমি আরও ভাল ওষুধ, টাটকা ওষুধ আনিয়ে দিচ্ছি তোমায়। তাতে কাজ হবে শীগ্‌গি
কিন্তু ফল হয় না। জানলা থেকে ডাক আসে, দেরী ক'র না রাখাল, ছুটে চলে এস ওষুধ নিয়ে।

রাখাল দাঁড়ায় না। তাকে পুনরায় বাধা দেবার আগেই সে দোকান থেকে নেমে ছুটে চলে যা
সেন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন ধপ করে।

ঘণ্টাখানেক পর কান্নার রোল ওঠে সামনের ঘরখানি থেকে। বাণবিদ্ধ বিহঙ্গীর মর্মন্তুদ হাহাকার।
সন্ধ্যিত্রা ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, সে কি! মারা গেলেন ভদ্রলোক?

মহুলিকার ঠোঁটের কোণ দুটিতে একটুখানি পাণ্ডুর হাসি দেখা যায়। ঘাড় নেড়ে জানায়, না

—না। কেউ পারে না। তিনি নিজেও পারেননি বলে আজ তাঁর এই দশা। সখেদে বলেছিলেন আমায়, মানুষ হ'য়ে জন্মেছি যখন তখন মরণকে এড়াতে পারব না জানি। তবে ভগব কাছে নিয়ত এই প্রার্থনা জানাচ্ছি, জ্ঞান বুদ্ধি যখন তিনি দিয়েছেন আমাকে, তখন পাগল হ'য়ে যেন না হয় আমায়। ভগবান এ প্রার্থনা তাঁর রাখেন নি।

সত্যমিত্রা চুপ করে থাকে। কিন্তু মল্লিকা বলে চলে, সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারেন নি তি মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। আর এক বাণবিদ্ধ বিহঙ্গীর আকুল ক্রন্দন বুকফাটা হাহাকারে অন্ত পড়েছেন। মনে পড়েছিল তাঁর মহাকবির সেই শাশ্বত বাণী,

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম: শাশ্বতী: সমা:
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকম বধী: কাম মোহিতম।

হাজার হাজার বছর আগেকার সেই এক করুণতম দৃশ্যের পুনরাবৃত্তির হয়ে গেল আজ। যুগল ক্রৌঞ্চ মিথুনের দ্বিতীয়টির হত্যাকারী হ'লেন তিনি। সেন বুঝেছিলেন, মহাকবির অন্তরের হা সে দিন যেমন নিষ্ফলে যায়নি, আজ সতীর হাহাকারও তেমনি নিষ্ফলা যাবে না। সেই দিনই ক করলেন তিনি, এই হীন ব্যবসার শেষ করে দেবেন অচিরেই।

পরদিন সকালে দেখা পেলেন মেয়েটির। জীবনের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে ফিরে এল একদিন এক নব ফাল্গুনের প্রথমে সে এসেছিল রাজরাজেশ্বরীর বেশে। আবার এক নব ফাল্গুনের সেই ফিরে এল দীনহীনার বেশে। আজ আর সানাইয়ের সুর কানে ভেসে এল না। মুহুর্মুহু শ হলুধ্বনি তাকে স্বাগতম জানাল না। এয়োরা ছুটে এল না বরণ করে নিতে বধূকে, হাতে ধরে মোটর থেকে নামাতে। আজ সবাই নিথর, নিস্পন্দ। বধূ নিজের চেষ্টাতেই নেমে এল গাড় থেকে। মাথায় নেই সেই সিঁথি মৌড়। কপালখানিকে ঘিরে নেই সেই কনে-চন্দন। পরনের রক্তাম্ব লাজে জলাঞ্জলি দিয়ে শুক্লাম্বর। হরিণ চক্ষু কোটরগত। সূক্ষ্ম সিঁথির প্রান্তে রমণীর সিঁদুরের রেখা চরণের অলক্তক রেখা তার মনোরম আশ্রয়টির মায়া এখনও ত্যাগ করতে পারেনি বলে অবলুপ্তির ম্লান হ'তে ম্লানতর। সেই আনন্দের প্রতিমা আজ পরিণত বিষাদের প্রতিমায়। বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই তাকিয়ে থাকেন সেন। কাশ বর্ষণ এতক্ষণে ধারাবর্ষণ হ'য়ে নেমে আসে দুচোখ বেয়ে। দুহাতে মুখ আর্তনাদ করে ওঠেন, এর জন্যে দায়ী আমি। ভগবান। এই আনন্দের প্রতিমাকে আজ বিষাদের প্র পরিণত করেছি আমি।

কয়েকদিন পর। রাখালকে দেখতে পেয়ে দোকানে ডেকে আনেন সেন। তারই মুখে খব বৌটি চলে যাচ্ছে এ ফ্ল্যাট ছেড়ে। বাপ মা কেউ নেই তার। শ্যামবাজারে মামার বাড়ী থেকে মানুষ হ ফিরে যাচ্ছে সেইখানে। মামার অবস্থা ভাল নয়। ভবিষ্যৎ ভাগ্য যে তার কি, সে নিজেই জানে না

রাখালকে বললেন সেন, তোমার মায়ের সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই রাখাল। ে মাকে বুঝিয়ে বল, এতে উপকারই হবে তার, অপকার হবে না। রাখাল লোক ভাল। প্রভুপত্নীর তার কাম্য। সে রাজি হয়ে চলে যায়। পরদিন রাখাল আসে। সেনকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। মাকে অনেক বলে-কয়ে রাজি করিয়েছি বাবু। তিনি ত বুঝতে পারছেন না কি উপকার আপনি

ছোট একখানা ঘর। তারই এক পাশে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি। কেমন এক উদাসী ভাব। সেনকে দেখে মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিল মাত্র। তারপর তাকিয়ে রইল সেই রকম উদাস দৃষ্টিতে।

এ দৃষ্টি সইতে পারলেন না সেন। যে কথা বলবেন বলে এতক্ষণ রিহার্সাল দিয়ে রেখেছিলেন মনে মনে, অপরাধী মন গুলিয়ে ফেলে সব। কোন মতে শুধু বললেন, রাখালের মুখে শুনলুম এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আপনি। তাই একবার দেখা করতে এলুম আপনার সঙ্গে। যে মহাপাপ করেছি, তারই কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই সব কথা আপনাকে খুলে বলে।

মেয়েটি অবাক হয়ে যায়। উদাস দৃষ্টির মধ্যে বিস্ময়ের ঘোর ফুটে ওঠে। বিস্ফারিত চোখ দুটি মেলে সে দাঁড়িয়ে থাকে নির্বাক ভাবে।

সেন বলেন, আপনার স্বামীর অকাল মৃত্যুর জন্য হয়ত কিছুটা দায়ী আমি। আপনার জানালার সামনে ঐ যে ওষুধের দোকান, ওখানা আমার। আপনার স্বামীর অসুখের সব ওষুধ বুঝি গিয়ে থাকে ওখান থেকে তা হলে বলি, আসল ওষুধ একটাও পান নি তিনি।

মেয়েটি ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে। অস্ফুট কণ্ঠে বলে আসল ওষুধ পান নি মানে?

মানে, সেন ঢোঁক গিলে বলেন, আসল ওষুধ যেখানে দুষ্প্রাপ্য, সেখানে অসাধু ব্যবসায়ীদের পাল্লায় নকল ওষুধ সহজ প্রাপ্য। আমি একজন অসাধু ব্যবসায়ী। তাই মনে হয়, আপনার স্বামীর মৃত্যুর জন্য হয়ত এই নকল ওষুধই কতকটা দায়ী।

মেয়েটি এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এইবার কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। পরক্ষণেই আর্তনাদ করে উঠল, হা ভগবান, এ কি শুনলাম আমি! সে এক মুহূর্ত কি এক বিষাদ করুণ দৃষ্টিতে চারিদিক তাকিয়ে দেখল। পর মুহূর্তেই জ্ঞান হারিয়ে সেইখানে লুটিয়ে পড়ল।

সত্যমিত্রা প্রশ্ন করে, এ কথা অসিতবাবু কি করে স্বীকার করল ভাই মধু। পুলিসে খবর দিলে যে নির্ঘাত জেল হ'ত তার।

—হয়ত হ'ত। শুধু জেল কেন, ফাঁসি হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু মানুষের বিবেক জিনিষটা বড় দুর্জ্ঞেয়। তার দংশনে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মানুষ। সেনও হারিয়ে ফেলেছিলেন সেদিন।

—ভাল করেন নি কিন্তু।

—সে কথা তাকে বলেছিলুম আমি। শুনে একটু হেসে বলেছিলেন, অপরের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে যদি না বাধে, নিজের বেলায় বা বাধবে কেন। কিন্তু তা নয়। ও পাপ যত উদ্গীরণ হয়ে যায়, ততই মঙ্গল। লোকে জানুক আমি কি। এ ওজরাই মনের মধ্যে চেপে রেখে পাগল হয়ে যেতে বসেছি। আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, দরদী বন্ধু। তাই সব কথা জানালুম আপনাকে।' বুঝলুম অনুতাপের হুতাশনে দগ্ধ হচ্ছেন তিনি দিন রাত। মধুলিকা থামে।

সত্যমিত্রা বলে, সেই সঙ্গে তুমিও কম দগ্ধ হচ্ছ না ভাই মধু।

মধুলিকা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, ভুলে যেও না মিত্রা মহাপুরুষদের বাণী। তাঁরা বলে গেছেন, পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়।

—এই বাণীকে তুমিও সার্থক করে তুলেছ মধু।

—তুলেছি এ কথা বলতে পারি না মিত্রা। তবে চেষ্টা করেছি তাকে ঘৃণা না করবার। পরের

এ আমার নীতি নয় ভাই। যার মধ্যে এত বড় এক মহৎ অন্তঃকরণ লুকান আছে; বলত, কি করে করি তাঁকে। রত্নাকরের মধ্যেই বাস করছিলেন বাল্মিকী মুনি। তাই ক্রৌঞ্চ মিথুনের দুঃখে তাঁর অন্তর দ্রবীভূত হয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল আদি কবিতে। এ ঠ'ল তার আত্মশুদ্ধি। এই আত্মশুদ্ধি আর এক রূপের পুনরাভিনয় হ'ল এখানেও। যে অন্যায় করেছিলেন সেন, তারই প্রতিকারের জন্য নিজে স্বেচ্ছায় ঠেলে দিয়েছিলেন মরণের মুখে, মেয়েটির কাছে সব কথা প্রকাশ করে।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে থাকে। হয়ত একটা ভাবোচ্ছ্বাস দু'জনকে বুক করে নেয়। এ নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে পুনরায় প্রশ্ন করে সত্যমিত্রা, এ ইতিহাসের অকালমৃত্যু নিশ্চয়ই এখানে ঘটে নয়। এরও সমাপ্তি একটা আছে।

—আছে। তবে সমাপ্তি খুব সুষ্ঠু নয়। তিন দিন পর আবার গিয়েছিলেন সেন মেয়েটির কা

—আবার?

—না গিয়ে উপায় ছিল না তাঁর। বিবেকের জ্বালা হুতাশনের জ্বালা। তারই দংশনে ব হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি। দেখা হতেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল মেয়েটি। বিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে ঘরের মাঝখানে দু'চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে। তার পরই ব্যাধ ভীত হরিণীর মত ছুটে পালাতে গেল ছেড়ে। কিন্তু বাধা দিলেন সেন। বললেন, আপনি ভয় পেয়েছেন বুঝেছি। কিন্তু এইটুকু বিশ্বাস ব চেষ্টা করুন, যা হয়ে গিয়েছে তার বেশী আর কিছু অন্যায় হবে না আমার দ্বারা।

মেয়েটি এবার ফিরে দাঁড়ায়। ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত দু'চোখে অগ্নিবর্ষণ করে ফুঁসিয়ে ওঠে চাই আপনার আমার কাছে। কেন আসেন এখানে বার বার বিরক্ত করতে। বেরিয়ে যান, এখুনি যে যান এ ঘর ছেড়ে। আপনার মুখ দর্শন করতে ঘৃণা করে আমার।

সেন ধীরে ধীরে বলেন, জানি। আমিও যে আপনার কাছে আসতে কতখানি লজ্জিত, সে একমাত্র ঈশ্বর জানেন। অথচ না এসেও উপায় নেই।

—কেন, কেন উপায় নেই বলুন আপনি। মেয়েটি প্রশ্ন করে সন্দেহ ভরা চোখে।

সেন তেমনি ভাবেই বলেন, সারা জীবনটা যে ব্যর্থ হয়ে গেল আপনার এ আমার অজানা অথচ কত দীর্ঘ পথই না পড়ে আছে সামনে। এ পথে চলতে হবে কতদিন ধরে। এ চলার মাঝে যে আছে, তা হয়ত একদিন সয়ে যাবে। কিন্তু খৈন্য? খৈন্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন হবে পাথে

মেয়েটি বাধা দেয়। জোর দিয়ে বলে, না, হবে না। দরিদ্রের মেয়ে দারিদ্র্যকে ভয় করে এত বড় সর্বনাশের পর আর কোন দারিদ্র্যই তার কাছে বড় হ'তে পারে না। সুতরাং কোন পাথে প্রয়োজন নেই আমার।

মেয়েটির তেজস্বিতায় সেন একটু ভড়কে যান। কিন্তু তার পরই সাহস করে বলেন, আ নেবার প্রয়োজন না থাক, কিন্তু আমার দেবার প্রয়োজন আছে।

মেয়েটি বিস্মিত হয়। দু'চোখ কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করে, মানে?

মানে, কী জবাবদিহি করব আমি পরকালে? দোকান আমি তুলে দিয়েছি। ওপাপ ব আর করব না। এরপর জীবনটাকে সৎপথে চালাতে চেষ্টা করব। হাজার পনর টাকা আমার সম্বল আ

আমার আত্মা তার চেয়ে বহুগুণ তৃপ্তি পাবে। বলতে বলতে পনের হাজার টাকার এক তাড়া নোট সমস্ত এগিয়ে দেন তার দিকে। মেয়েটি শিউরে ওঠে। সভয়ে এক পা পেছিয়ে গিয়ে বলে, ঘুষ! আপনি আমাকে ঘুষ দিতে এসেছেন আমার স্বামী হত্যার মূল্যস্বরূপ। আপনি নিয়ে যান, ও-টাকা নিয়ে যান এখান থেকে। ওগুলি আমি স্পর্শ করতে পারব না কিছুতেই। মেয়েটি দু'হাতে চোখ ঢাকে।

সেন দাঁড়িয়ে থাকে স্থাণুর মত।

মেয়েটি চোখ চেয়েই আবার আর্তনাদ করে ওঠে; না—না আপনি নিয়ে যান। আপনি শুনতে পাচ্ছেন না কিন্তু আমি পাচ্ছি। ও টাকার ভেতর থেকে আমার মত আরও কত অনাথিনী মেয়ের বুক ফাটা হাহাকার গুমরে উঠছে। কত মা-হারা পুত্রের আর পুত্র-হারা মায়ের আকুল ক্রন্দন আপনার টাকার মধ্যে জমাট বেঁধে রয়েছে। কত ভ্রাতৃহারা ভগ্নীর, কত ভগ্নীহারা ভাইয়ের ব্যথা লুকান আছে ওর খাঁজে খাঁজে। ঐ সর্বনেশে জিনিষ, স্বামী-হারা পত্নীর উষ্ণ শ্বাসে জর্জরিত জিনিষ, স্পর্শ করতে বলবেন আমাকে! আপনি যান। আমি অর্থের কাঙাল নই। লুব্ধা নারীও নই। আমি ঘৃণা করি ও টাকাকে বলতে বলতে সে একরকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সন্ধ্যমিত্রা বলে, আশ্চর্য তেজী মেয়ে তাই। সাধারণ মেয়ে হ'লে অতো টাকার লোভ ছাড়তে পারত না কিছুতেই।

মঞ্জুলিকা বলে, মেয়েটি সত্যই তেজী। শুধু কথায় নয়, কাজেও। সেই দিনই সে চলে গেল ফ্ল্যাট খালি করে দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আঘাতও হেনে গেল মর্মান্তিক।

আঘাত হেনে গেল মানে? সন্ধ্যমিত্রা প্রশ্ন করে একটু আশ্চর্য হয়ে।

মঞ্জুলিকা বলে, এ বাস্তব আঘাত নয় ভাই, এ নৈতিক আঘাত। এর প্রতিক্রিয়া দেহে নয়, মনে এই আঘাতেই মনে মনে অসুস্থ হয়ে পড়লেন সেন। তবে সে অর্থ তিনি আর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান নি সেই দিনই দান করে দিয়ে আসেন কোন এক সেবা সদনে। যারা আতুর, যারা দুস্থ, দুর্বলা আ কেনবার ক্ষমতা যাদের নেই, শুধু তাদের জন্যে ব্যয় করা হবে ও অর্থ। কিন্তু এতোতেও শান্তি পেলেন তিনি। কে যেন সব শান্তি হরণ ক'রে নিয়ে গেছে তাঁর। আমায় প্রায় বলতেন, চাকরী করবার ইচ্ছে আমার ছিল না কোনদিন। শুধু ছোট বোনটি আর তার কচি ছেলেটির মুখে দুটি অন্ন দেবার জন্যেই উপরন্তি আমার। ভারী ধাক্কা খেয়েছি জীবনে। ভেবেছিলুম কালের আবর্তনের প্রভাবে এ ধাক্কার তীব্রতা কমে আসবে একদিন। কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত। এর তীব্রতা বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। আজক আর এক উপসর্গ এসে জুটেছে।

প্রশ্ন করি উপসর্গ কিসের?

বলেন, মেয়েটিকে আমি স্বপ্ন দেখতুম মাঝে মাঝে। কিন্তু এখন দেখি প্রায়ই। হয়ত এ আম অত্যধিক মানসিক চিন্তার ফল। সে চুপি চুপি এসে দাঁড়ায় শিয়রে, মুখে একটি আঙুল তুলে দি যেন ইঙ্গিতে বলতে চায়, আমার স্বামী হন্তা তুমি। তোমায় আমি ক্ষমা করব না কোনদিন। গভীর রাতে এই নীরব ইঙ্গিত কী যে যন্ত্রণাদায়ক তা আমি বোঝাতে পারব না। দিনের পর দিন এ হ'য়ে উঠে অসহনীয়। আমি নিশ্চয়ই পাগল হ'য়ে যাব দিব্য বানাচ্ছি, যদি মেয়েটির ক্ষমা না পাই। মরতে আ ভয় পাই না, কিন্তু পাগল হয়ে বেঁচে থাকা—উঃ কী ভয়ানক! আমি কল্পনা করতে পাচ্ছি না।

[illegible] হয়ে আসে। চোখ তুলে প্রশ্ন ক

—না। তবে তার স্বামীর নাম বলতে পারি। অরুণ ভট্টাচার্য। রাখালের মুখে শুনেছি রেলে চাকরী করতেন ভদ্রলোক।

—জানি। মেয়েটির নাম মণিমালা।

সেন অবাক হয়ে যান। হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন আমার মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন, মণিমালা? আপনি চেনেন তাকে?

বলি, শুধু চিনি না, বিলক্ষণ চিনি। সম্পর্কে আমারই আত্মীয়। কিছুদিন আগে এমনি কাহিনী শুনেছিলুম মণিমালার মুখে। সে দিন সে কাহিনী ছিল অসম্পূর্ণ। আজ সম্পূর্ণ হল।

—মিস ব্যানার্জি! সেন আকুল হয়ে ডাকেন। এত কাতর ডাক এর আগে শুনিনি কখন বুঝতে পারি কি বলতে চান তিনি। তাই বড় বিচলিত হয়ে বলি, শুনুন, বাপ-মা-মরা মেয়ে মণিমা কিন্তু বড় তেজী মেয়ে। তবে সে আমায় ভালবাসে, আমার অনুরোধ সে অগ্রাহ্য করবে না। আপনি তার ক্ষমা পান, আমি সেই ব্যবস্থাই করব।

সেন উঠে আসেন চেয়ার ছেড়ে। সহসা দু'হাত দিয়ে আমার একখানা হাত চেপে ধরে ওঠেন, করবেন আপনি? আঃ! আমি চিরদিনের মত আপনার কেনা হ'য়ে থাকব। বড় আক ঘটনা। এর জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলুম না। একটা তড়িৎস্পর্শ সারা দেহটিকে কাঁপিয়ে দিয়ে নিজেকে সামলে নিতে হয়ত একটু সময় লেগেছিল। তারপরই আমার মুক্ত হাতখানি দিয়ে তাঁর ডান হা মণিবন্ধটি চেপে ধরে মুখের দিকে মুখ তুলে একটু আবেগ ভরা কণ্ঠেই বললুম, করব। শুধু আপনার জ করব। এই আপনাকে ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি তার ক্ষমা আপনাকে পাইয়ে দেব।

সব্যসাচী আশ্চর্য হয়ে বলে, একথা বলেছিলে তুমি? ধন্যি মেয়ে তুমি মহু। মণিমালার চেয়েও এ কথা বলতে সাহস পেলে?

—পেলুম। দেখেছিলুম মণিমালাও আমারই মত মেয়ে। পুরুষের যে বিকৃতি আমাকে করেছে, তার পরিচয় সে পায় নি। পেলে ক্ষমা না করে সে পারবে না।

—মণিমালা তোমার অনুরোধ রেখেছে মহু? ক্ষমা সে করেছে? সব্যসাচী প্রশ্ন করে।

—না। কথা দিয়েও কথা রাখে নি সে। সেনের যা আসল রূপ সেইটাই তুলে ধরতে চেয়ে তার চোখে। কিন্তু হায়রে অন্ধচোখ, তাতে দৃষ্টি ফোটাতে পারলুম না কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত তার হাতে ধরে মিনতি জানিয়েছিলুম, আমি যে তাঁকে কথা দিয়েছি তাই মণি, গা ছুঁয়ে শপথও করেছি। না রাখতে পারলে কি করে মুখ দেখাব তাঁকে?

মণি বুঝল। দুচোখ ভরা জল নিয়ে বলল, এমন কথা না দিলেই পারতে মহুদি। এ যে ক পক্ষে কতখানি কঠিন তা তুমি বুঝবে না ভাই। তবে তুমি অপমানিত হও, জীবনে শান্তিহারা হয়ে ঘুরে যে এ-ও চাই না আমি। যত কঠিন কাজ হ'ক, কথা দিচ্ছি, শুধু তোমার মুখ চেয়ে, একে সহজ ক'রে

সব্যসাচী বলে, মণিমালা নিজেকে চিনতে পারে নি মহু, তাই সে ভুল করেছে।

—শুধু ভুল নয় মিত্রা, মহাভুল। সহজ জিনিষকে জটিল করে দিয়েছে আরও। আর এই খুলতে প্রাণান্ত হয়ে গেলাম আমি। ভাবি, সে দিন যদি দুজনার দেখা না হ'ত এ জট পড়ত না।

—কিন্তু এর মধ্যে রাজীব এল কি ক'রে?

করিয়ে দিয়েছিলুম আমারই ঘরেতে। মণিমালাকে বলে দিয়েছিলুম চুপি চুপি, তুমি যে উপরোধে ঢে গিলছ না, এটা যে অভিনয় নয়, অকৃত্রিম, এ বিশ্বাসটুকু যেন করতে পারেন তিনি। কিন্তু পারা পা সার হল শুধু।

—কেন, রাজী হ'ল না মণিমালা?

না হলে ভালই হ'ত। এ নাটকীয় প্রহসনের সৃষ্টি হত না সেদিন। মণিমালাকে হাতে ধরে ঘ ছিনিয়ে নিয়ে এলাম। সেন বসেছিলেন। অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অ দৃষ্টিতভাবে। ভারী বিচলিত দেখাচ্ছিল তাঁকে। মণিমালা একবার তাকিয়ে দেখল তাঁর দিকে। কিন্তু অপরাধ ভারে পীড়িত লোকটির মধ্যে কি যে দেখল, সেই জানে। কিন্তু অকস্মাৎ দু হাতে মুখ ঢে আর্তনাদ করে উঠল, আমি পারব না মহুদি, ও আমি পারব না। স্বামীহন্তাকে ক্ষমা করতে পারব কিছুতেই। আমায় তোমরা ছেড়ে দাও। বলতে বলতে সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল উন্মাদিনীর মত।

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে পড়লেন সেন। মুখ মড়ার মত সাদা। ঠোঁট দুখা কাঁপছে থর থর করে। অসহায়ের মত বলে উঠলেন, আমি ক্ষমা পেলুম না মহু। মণিমালা আ ক্ষমা করল না।

আঘাতটা বড় গভীরভাবে প্রাণে বেজেছিল। স্নায়ুতন্ত্রীর ওপর এর প্রতিক্রিয়া আ গভীরভাবে দেখা দিল। দিন কয়েকের মধ্যেই কেমন হ'য়ে গেলেন সেন। একটু বেসামাল হ পড়লেন। মাঝে মাঝে চমকে উঠে বিড়বিড় ক'রে বলতেন, আমি ক্ষমা পেলুম না মহু। মণিমা ক্ষমা করলা না আমাকে।

কখনও কখনও বলতেন, সংসারটা বড় বেদরদী মহু। কেউ কারও দিকে চায় না। রমাট বড় ছেলেমানুষ। ও ঠিক আমায় বুঝতে পারে না। তাই ত বলি, তোমার বড় হিতৈষী, তোমার ' দরদী বন্ধু আমার কেউ নেই আর।

সত্যমিত্রা বলে, আমিও মেয়ে, তবুও মণিমালাকে এ ক্ষেত্রে সমর্থন করতে পারি না মহু। ব পারবে না তবে কথা দেওয়া কেন, আর এ প্রহসন করাই বা কেন?

—আমিও সেই কথা ভাবি মিত্রা। তবে মণিমালাকে এত দোষ আমি ভাবতে পারিনি কিন্তু এখন সব অপরাধই আমার।

—কারণ?

—আমি যদি এ ব্যাপারে মাথা না দিতুম মিত্রা, তা হলে এ দুর্ঘটনা ঘটত না আর উন্মা তিনি হতেন না। পাগল হ'য়ে বেঁচে থাকাটাকে তিনি ভয় করতেন বড় বেশী। সেইটাই ঘটে গে তাঁর জীবনে। রমা কেঁদে বলে, কি হবে মহুদি? কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দেব কি, নিজেকেই সামলা পারি না। চোখের জল মুছে বলি ভয় কি বোন, ভগবানকে ডাক, মঙ্গলময় তিনি। সব ম করবেন তিনিই।

রমা আকুল হ'য়ে বলে, আর সামলাতে পাচ্ছি না দিদি। দিনের বেলা তবু যা কিছুটা সজ্ঞা থাকেন, কিন্তু যত বাড়াবাড়ি যত উৎপাত সুরু হয় রাতে। নিজে ঘুমোন না, কাউকে ঘুমোতেও দেন ন

চমকে উঠে উত্তর দি, কি তাই ?

ভয়ে ভয়ে সে বলে, একটা কথা বলব ?

হেসে ফেলে বলি, এত ভয় কিসের। কি বলবে, বল না ?

—দাদাকে আমি সামাল দিতে পাচ্ছি না দিদি। আমার কোন কথাই শোনেন না। এতটুকু গ্রাহ্য পর্যন্ত করেন না। যা কিছু ভয় করেন তোমাকে। তুমি কাছে থাকলে আমার ভয় থাকবে না দিদি। সেইত আছ পরের বাড়ীতে। এস না আমাদের এখানে। দু বোনে বেশ। দাদারও বাড়াবাড়িটা কমে যাবে।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। তাই রাজী না হয়ে পারলুম না। সেই থেকে রমার কাছেই ব

—অর্থাৎ নিজের বাড়ীতেই আছ ? সন্ধ্যমিত্রা প্রশ্ন করে দুষ্টুমি হাসি হেসে। মহুলিকা এ কান দেয় না। শুধু বলে চলে, তারপর চিকিৎসা করালুম অনেক। কিন্তু ফল হল না। উর্ধ্বগতি রোগ, না কমে বেড়েই চলে দিন দিন। ডাক্তার বললেন, মানসিক রোগ। এর চি বাড়ীতে সম্ভবপর নয়। পাঠাতে হবে মেন্টাল হাসপাতালে। তাদের চিকিৎসাধীনে রোগী হয়ত উঠবে একদিন। তবে ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা। রমা কেঁদে ফেলে। বুবি, ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা, এ ব ক্ষমতা তার নেই। সান্ত্বনা দিই, চুপ কর বোন, কাঁদিস নি। হাসপাতালে গেলেই উনি সেরে আ ঠিক। ব্যবস্থা যা করবার আমি করে দিচ্ছি সব।

সন্ধ্যমিত্রা সাগ্রহে প্রশ্ন করে, করে দিয়েছিলে সব ?

মহুলিকা একটু হাসে। বলে, আমি করবার কে ভাই। যিনি করবার তিনিই করে দি সব। তবে একমাস হাসপাতালের চিকিৎসার ফল পাওয়া গেছে আশাতীত। ডাক্তারেরা করেন শীগ্‌গিরই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন তিনি। পয়লা ডিসেম্বরেই হয়ত ছেড়ে দেবেন। সন্ধ্যমিত্রা বলে, পয়লা ডিসেম্বরের আর বেশী দেরী নেই মহু। আর আটদিন মাত্র বাকী।

—জানি। কিন্তু এই আটদিন আমার কাছে আট যুগ ঠেকছে মিত্রা। সত্যিকথা কি আর পেরে উঠছি না আমি। সব দিক দিয়ে হেটলে হয়ে গেছি আজ। মুখে যত সাহসই দিই না রমাকে, আজ আমি সর্বস্বান্ত। বড় অসহায় বোধ করছি এখন থেকেই। রমার মুখে অন্ন পাচ্ছি না, পরনে বস্ত্র দিতে পাচ্ছি না। তার কচি ছেলেটাকে কাল যে কি খেতে দেব জানি নিজেরও অবস্থা সঙ্গীন। দুখানি বস্ত্র ছাড়া তৃতীয় বস্ত্র কিছু নেই। এমন সেলাই করা জীর্ণ বস্ত্র পরিনি কখনও। ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে কোন মতে দিনগুলি কাটিয়ে যাচ্ছি শুধু—কবে ডিসেম্বর আসবে সেই আশায়। তারপর আমার মুক্তি।

সন্ধ্যমিত্রা বলে উঠে, মুক্তি তোমার এ জীবনে নেই মহু। সোনার শিকল পায়ে পরেছ নিজে। এ খুলতে পারবে না কোন দিন। কিন্তু আমি তোমায় আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি প্রেমের তপস্যায় আজ তুমি বিজয়িনী। পার্বতী তপস্যা করেছিলেন শিবকে পাবার জন্যে। তুমি সেনকে পাবার জন্যে। অবশ্য আমি তুলনা করি না। কিন্তু তোমার তপস্যাও নেহাতে ফেলনা যায় না আমি কায়মনে প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও। অসিতবাবুর ওপর আজ আমার রাগ নেই, যেহে যিনি তোমার মত মেয়ের মন পেয়েছেন তিনি আমার নমস্য।

দেশ-বিদেশ

এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ স্বাধীন হল, প্রতিরক্ষার কয়েকটি বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদের ভার নিতে এগিয়ে এ ভারতীয় বীরবৃন্দ, এমন সময়ে প্রশ্ন উঠল কে নেবে ভারতীয় বিমান বাহিনীর কর্তৃত্বভার ?

১৯৪৬ সালের ১লা এপ্রিল—বাংলার কৃতি সন্তান শ্রীসু মুখোপাধ্যায় প্রথম ভারতীয়রূপে এই পদে অধিষ্ঠিত হলে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে নবযুগ এল, পুরাতনের পরিবর্তে ন জেট বিমান।

১৯১১ সালের ৪ই মার্চ কলকাতায় তাঁর জন্ম। এই সহ তাঁর প্রথম জীবনের লেখাপড়া।

এল ১৯৪২ সাল। ইংলণ্ডে গেলেন তিনি। বি বাহিনীতে ভারতীয়দের তখন গ্রহণ করা সুরু হয়ে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে তি নতুন বৃত্তিগ্রহণ করলেন।

১৯৩৩ সাল—ভারতীয় বিমান বাহিনী গঠিত হোল, তি এর সঙ্গে যুক্ত হলেন।

১৯৩৯ সালে সুব্রত মুখোপাধ্যায় হলেন স্কোয়াড্রনের প্রধা এই সময়ে উপজাতি আক্রান্ত নাগাল্যাণ্ড ঘাঁটি রক্ষার দুঃসাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রমাণ দিয়ে সকলে প্রশংসাভাজন হন।

১৯৪৩ সালে শ্রীমুখার্জি হন কোহাট বিমান ঘাঁটির প্রধান। ১৯৪৮ সালে হায়দ্রাবাদ রাজ্য আন্দোলনে তিনিই ভারতীয় বিমানবাহিনী পরিচালনা করেন।

উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে একটি কর্মময় প্রতিভাদীপ্ত জীবন নিভে গেল—এ বেদনা ভুলে যাবার না তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী, দরিদ্র মানুষের সমব্যথী ও তাদের কাছে সহজলভ্য। বাঙলার গৌরব করব এত একটি মানুষ অকালে বিদায় নিলেন—এ আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্য।

নির্বাচনী পরিহাস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট কেনেডির বয়স ৪৩ বৎসর কিন্তু তাঁকে দেখায় আ কম। ঐ বয়সে তিনি এত গুরুদায়িত্ব বহনের উপযুক্ত কিনা তা নিয়ে ভোটদাতাদের মধ্যে প্রচুর সং ছিল। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চমৎকার হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে।

— জোসেফ পি কেনেডি অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট কেনেডির পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন : জীবনে তুমি হতে চাও ?

পুত্রের উত্তর : আমি প্রেসিডেন্ট হতে চাই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট

জন এফ কেনেডি আগামী চার বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ব ৪৩ বৎসর। বিংশ শতাব্দীতে জন্মেছেন এমন অন্য কেউ আজ পর্যন্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট করেননি।

যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মাসাচুসেটস্ রাজ্যে মিঃ কেনেডির জন্ম। হাইস্কুল থেকে ডিগ্রী লাভের প লণ্ডনস্কুল অব ই হার্ভার্ড স্নাতকীয় পাঠ গ্রহণ করেন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক লাভ করেন।

১৯৪৩ সালের মাসে এক বোটের অধিনায় মিঃ কেনেডি নিযুক্ত ছিলেন একটি ঘটনায় অসমসাহসিকতা পাওয়া যায়। রাত্রে জাপানী যু আক্রমণে তাঁর বোট ভেঙে হয়ে যায়। পনেরো ঘণ্টাকা চলে তাঁর এ সংগ্রাম। তিনি হন। তা সত্ত্বে সঙ্গীদের নিয়ে আসেন বোটের ভাসমান টুকরোর কাছে এবং সেখান থেকে সাঁতার কেটে এক দ্বীপে পাঁচদিন ধরে নানা সঙ্কেতবার্তার সাহায্যে তিনি তাঁর ইউনিটের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। নারকেলের ওপর ক্ষোদিত একটি লিপি নিউজিল্যাণ্ড ইনক্যাণ্টির কাছে পৌঁছায় এবং

এরপর তিনি সাংবাদিকতা বৃত্তি অবলম্বন করেন। কিন্তু এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি সক্রিয় রাজনীতি যোগদান করেন ও ২৯ বছর বয়সে মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে ক্যাবট্‌লজ পরাজিত করে তিনি সেনেটে নির্বাচিত হন।

১৯৬১ সালের ২০শে জানুয়ারী মিঃ কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে আনুষ্ঠানিক ভা অধিষ্ঠিত হবেন।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত উদ্যোগে শিশু-চলচ্চিত্র নির্মাণ

নিউ দিল্লীস্থ শিশু-চলচ্চিত্র সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ দিবাকর সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন ক আমেরিকার চলচ্চিত্র প্রযোজকদের সঙ্গে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শন উপযোগী চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্প করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ভারতে শিশু-চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ভারতে আসতে পারেন। ভারত ও আমেরিকার শিশু-জীবন নিয়ে যে চলচ্চিত্র তৈরী হবে তা কেবল ম তথ্যমূলক হবে না, তাতে থাকবে বাস্তব জীবনকাহিনী।

ভারতে প্রত্যাবর্তন করেই তিনি চিত্রনাট্য রচনায় হাত দেবেন।

গ্রীসের ইতিহাসের একটি উড়ো পাতা…

এজিয়ান সমুদ্রের একটি দ্বীপে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি স্থানীয় মানুষ পাঠানো হোল স্পার্টানদের কাছে।

লোকটি এসে লম্বা বক্তৃতা জুড়লে। তার কথা শেষ হ'লে স্পার্টানরা বললে, আপনি গোড়ার দিকে কি যে বললেন ভুলে গেছি আর তাই শেষের কথাগুলো বুঝতে পারিনি।

অতঃপর তাকে ফিরতে হোলো শূন্য হাতে।

এবার অন্নাভাবগ্রস্ত দ্বীপ থেকে পাঠানো হোল এক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে। সে প্রচুর থলে নিয়ে হাজির হোল স্পার্টানদের কাছে। একটা থলি খুলে শুধু বললে: এটা খালি, ভর্তি করে দিন।

উদ্দেশ্য সফল হোল। একটা নয়, সব থলে ভর্তি হয়ে গেল।

যেখানে দরকার কাজ সেখানে বেশী কথায় কি প্রয়োজন।

বাংলার চিত্রশিল্প

কামিনীকুসুম—ভি. শান্তারাম
'শান্তি কি যাত্রী' ছবিতে

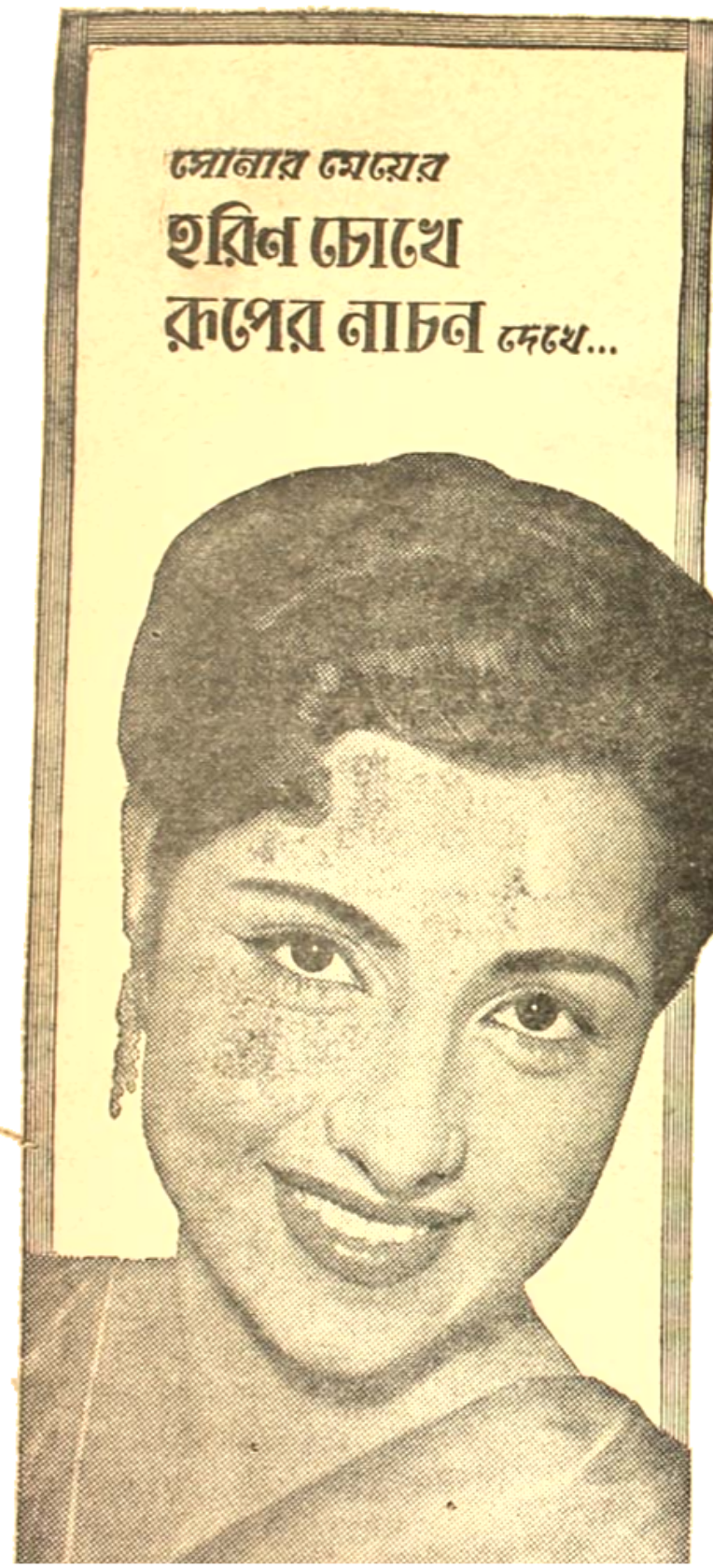

সোনার মেয়ের হরিণ চোখে রূপের নাচন দেখে, শিল্পীর হাতে তোলির ছোঁয়ায় ঝলমলানো সুন্দর-স্বাস্থ্যের ছন্দ যেন প্রাণের সঙ্গে মেলে! লাক্সের চিত্রতারকা কামিনী শান্তার চোখে আজ রূপ-নাচের চঞ্চলতা, রূপের রহস্যের উদ্ভাসিত আজ এ নারী ছন্দ। 'কোনই যা হয় লাক্সের কোমল ফেনায় সে আমি প্রতিদিনই পেয়েছি' —কামিনীকুসুম জানান তাঁর রূপ লাবণ্যের গোপন ছন্দটি।

LUX
TOILET SOAP

আপনিও ব্যবহার করুন
চিত্রতারকার বিশুদ্ধ, শুভ্র,

প্রাচীন বাংলার চিত্রকলা

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলার পটচিত্র সম্বন্ধে কিছু জানা নেই এমন বাঙালী খুব কমই আছে। পটশিল্পের প্রবহমান ধারা শুকিয়ে গিয়ে থাকলেও একসময়ে পটুয়ার আঁকা ছবি দেখা বাংলার প্রাচীন-সংস্কৃতির অন্যতম বলেই গণ্য হত। যমপটের ছবি ছাড়াও বীরভূম, বাঁকুড়া আর কালীঘাটে পোটোরা দেয়াল ঘরের ম ছবি আঁকত সে ছবির কিছু কিছু এখনও দেখা যায়। বাঙালীর চলিতধারার চিত্রকলের আরও পাওয়া যায় প্রতিমার চালচিত্রের দেবতা অসুর, আর পশুর মূর্তিতে। এই সব নানাধরনের ছবি স্বভাবতই অনুভব না করে পারা যায় না যে এই ধরনের ছবি আঁকার প্রচলন নিতান্ত সাম্প্রতিক কালে। অনেকদিনের ব্যবহারগত অভিজ্ঞতা না থাকলে এই ধরনের ছবি আঁকার কৌশল এবং রেখা ও স্বাচ্ছন্দ্য কখনও এতটা বিশিষ্টতা লাভ করতে পারত না।

যমপটের ছবিগুলি সাধারণতঃ দু'হাত থেকে তিন হাত চওড়া এবং বারোহাত বা তারও লম্বা হয়ে থাকে। চিত্রগুলি উপখ্যানমূলক; রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা, নরমেধ যজ্ঞ, বেহুলা লখীন্দর ক এবং চৈতন্যোপখ্যানই অধিকাংশ পটের উপজীব্য। পটগুলির নিম্নাংশে পারলৌকিক জীবনে যম মানবাত্মার নানাপ্রকার শাস্তিভোগের দৃশ্য থাকায় এগুলিকে সাধারণ ভাষায় যমপট বলা হত। এ বিষয়বস্তু এবং পট দেখাবার রীতিটি যে কত পুরোনো তার পরিচয় পাওয়া যায় উত্তর ভারতের হর্ষবর্ধনের সভাসদ বাণভট্টের লেখা হর্ষচরিতে। পিতার সংকটাপন্ন পীড়ার সংবাদে গৃহপ্রত্যাগমনমু নগরদ্বার অতিক্রম করে পথিপার্শ্বে কুতূহলী জনতার সম্মুখে চিত্র ব্যাখ্যানরত যমপট্টিকের অবস্থান করেছিলেন। বাংলার পটের মত লম্বাপটের প্রচলন রাজস্থানের জৈনদের মধ্যেও আছে। এক নিমন্ত্রণ পত্ররূপে ব্যবহার করা এই ধরনের পটকে বিজ্ঞপ্তিপত্র বলে। কিছুকাল আগে গুজরাটেও চি নামে এক পট দেখান সম্প্রদায় এমনি পট এঁকে বাংলাদেশের পোটোদের মতই দেখিয়ে বেড়াত। পট এই বিস্তৃত প্রচলন থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে বেশ প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে পট প্রচলন রয়েছে।

বৌদ্ধ সাহিত্যে, মহাকবি ভাসের রচিত নাটকে এবং রামায়ণে প্রাচীন ভারতে শিল্পকলার অ যে আভাস পাওয়া যায়। অজন্তা ইলোরা তিরুনাত্তিকড়াই ইত্যাদি অঞ্চলের পর্বতগুহায় এবং 'মন্বি চিত্র সাধনার পরিচয় আজও উজ্জ্বল রয়েছে তার কিছু অংশ যে বাংলাদেশেও ছিল তা নিঃসন্দেহে ে নেপাল থেকে সংগৃহীত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথিচিত্র থেকে। এই পুঁথিচিত্রগুলির ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক এবং মূল্যবান। এর কয়েকটি পুঁথি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি কয়েকটি ইংলণ্ডে, কয়েকটি কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামের সংগ্রহশালায় দেখতে পাওয়া যায়। ব ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়ও কিছু পুঁথি আছে। অবশ্য এই পুঁথিগুলির সবই বাংলায়ই লেখা বা আঁকা হ তা নয়; কয়েকটি নেপালের পুঁথিও আছে। তবে ছবির ঢং আর বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ছবিগুলি

পুঁথিগুলি সবই মহাযান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পুঁথি; পুঁথির মধ্যে অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা প্রধান। কোন কোন পুঁথিতে একাদশ শতকের বাংলায় যে পালরাজবংশ রাজত্ব করত সেই বংশসম্ভূত কো কোন সম্রাটের নাম ও রাজ্যাঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। যে লিপিতে বইগুলি লেখা সে লিপি সেই যুগে বাং দেশে বা পূর্বভারতে চলত। পুঁথিগুলির সবই তালপাতায় লেখা; আশুতোষ মিউজিয়ামে দ্বাদশ শতাব্দী একখানি কাগজের ওপরে লেখা বইও আছে।

ছবিগুলির মূল বিষয়বস্তু বৌদ্ধশাস্ত্রাশ্রিত ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী বা বুদ্ধের জীবনের নানা উল্লেখযো ঘটনা। অধিকাংশ ছবিই চৌকো চৌকো খোপের মধ্যে আঁকা; কোথাও পুঁথির কাঠের তৈরী পাটা পাশও ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলার পটচিত্রের ছবিগুলি রচনা কৌশল এবং বর্ণবিন্যাসের দিক থেকে বেশ উল্লেখযোগ্য প্রথমে পটুয়ারা কাগজের সঙ্গে কাগজ জুড়ে একটা লম্বা পট তৈরী করে, কাগজের এই চাদরটাকে শক্ত করবার জন্য এর ওপর দিকটাতে কাপড়ের টুকরো জুড়ে দেওয়া হয়। তার উপরে দেওয়া হয় মাটি আ গোবরের প্রলেপ। এই প্রলেপ শুকিয়ে গেলে পাতলা খড়িমাটির প্রলেপও লাগিয়ে ছবি আঁকবার জমি তৈরী করে নেওয়া হয়। পরপর এক একটা বিশিষ্ট ঘটনার ছবি সাজিয়ে আখ্যানভাগ গড়ে তোলা হয়; মোট তুলির আঁচড়ে ফুটে ওঠে কালোরঙের রেখার বাঁধুনি; ভেতরের জমি সমান করে ভরিয়ে তোলা হয় হলদে লা সবুজ আর ফিকে নীল রঙে। সোণালী আর রুপালী রঙের বিন্যাসও দেখা যায় গয়নায় আর কাপড়ে আঁচলে। বড় মোটা রঙ, বেশ ঘনভাবে করাজ হাতে বুলানো। গল্পগুলির আবেদন চমৎকার সোজাসুজি এসে মনের গায় লাগ কেটে যায় যারা দেখে তাদের। মানুষের শরীরের গড়নে আর বসা, দাঁড়ান আর চলা ভঙ্গীতে সুন্দর সচেতনতা আর নাটকীয়তার ভাব। এরা যেন সুদূর অতীতের কোন এক সমাজ থেকে যাত্রার আসরে নেমে এসেছে; কেউ ভুলে যায়নি তার বিশেষ চরিত্রটি, বিচ্যুতি হয়নি কারো পরে নিজে উপযুক্ত পোশাক আর অলঙ্কার। বিগত দিনের সমাজ ইতিহাসের সুন্দর দলিল এই সব ছবি; চিত্রকরে অতুলনীয় ধ্যানশক্তির স্বাক্ষর এইখানে, সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাটিকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখবার, বুঝবার এব বোঝাবার এ এক সুন্দর উপাদান।

এই চিত্রকল্পের প্রবাহ বেয়ে অতীতের দিকে গেলে বাঙালীর অতীত শিল্প কীর্তির বেশ কিছু অস্তিত্বের সঙ্গে এখনও পরিচয় ঘটা সম্ভব। যদিও অধিকাংশই তার হারিয়ে গিয়েছে নিঃশেষে। কোন কোন পুঁথিতে ছবি সাজাবার কৌশলটি বেশ লক্ষ্য করবার মত। কেবল যে ছবিগুলো বেশ স্পষ্ট বন্ধনিমুক্ত খোপের মধ্যে আঁকা হয়েছিল তা নয়, পুঁথিতে ছবির খোপগুলি ঠিক মাঝখানে এবং একটার পর একটা পাতায় পর পর সাজান। দেখতে গেলেই মনে হয় যেন বন্ধনীমুক্ত খোপে আঁকা ছবিতে সাজান একখানি জোড়া পটের পাট খোলা হচ্ছে আস্তে আস্তে। এই বিশিষ্টতা থেকে আমার মনে হয়েছে যে এগুলি মন্দিরের গায় সাজান পটচিত্রে যাকে বলা হয় টেম্পল প্যানার তারই পুঁথিগত সংস্করণ। সুপ্রাচীন যুগের প্রস্তর ভাস্কর্যেও এই ধরনের পটচিত্রের প্রভাব দেখা যায়।

বুদ্ধের জীবনী মহাযান বা তান্ত্রিক দেবদেবীর আলেখ্যসমৃদ্ধ এই প্রাচীন ছবিগুলি ক্ষুদ্রায়তন চিত্রের জগতে নিতান্তই তুলনাহীন। দেবদেবীদের দেহ গঠনে শিল্পী যে রেখা ব্যবহার করেছে তা যেমনই সূক্ষ্ম তেমনই নিখুঁত এবং অনবদ্য। ঐ রেখায় যেন দেবী দেহের থেকে স্তোত্রনামের লালিত্য সত্যই মূর্ছিত হয়ে আছে বলে

রয়েছে। এখানেও নানা বর্ণের বিচিত্র ক্রীড়া ; কিন্তু এই বর্ণসম্ভার পরবর্তী যুগের পটচিত্রের মত মোটা প্রখর নয়, স্নিগ্ধ এবং কোমল ; অথচ উজ্জ্বল ও নয়নাভিরাম। দেহভঙ্গির বিন্যাসের যে গতিপ্রবণতা চোখে আসনে যে স্নিগ্ধ হাতের বিন্যাস পরবর্তী যুগের পটচিত্রের নাটকীয়তার সেইখানেই সূত্রপাত হয়ে থাকবে এই ভঙ্গি লীলামধুর।

বৌদ্ধ কুড়ায়তন চিত্রের জগৎ অতি প্রশান্ত মনোলোকের জগৎ। এখানে মানুষের চাঞ্চল্য ও উদ্বেলতা ধ্যানের মহিমায় স্থির ও আত্মসমাহিত। রঙ ও রেখায় এখানে অন্তরাগের বর্ণচ্ছটা অপেক্ষাও চিত্তে স্থৈর্য এবং মননের গভীরতাই বেশি পরিস্ফুট। এই ছবিতে মনোজীবনের প্রতিচ্ছবি অপেক্ষাও অতীন্দ্রিয় ধ্যান জীবনেরই আলেখ্য দেখা যায়। এই স্নিগ্ধ নক্ষত্রালোকিত জগতের বিচরণশীল দেবদেবী যেন বিশ্বের নরনারীকে জানাচ্ছে সেই ঊর্ধ্ব জগতের আমন্ত্রণ, যেখানকার আকাশ ভগবান বুদ্ধের করুণাধারায় আপ্লুত ধ্যান জগতের প্রতিচ্ছবি এমনভাবে বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও চিত্রলোকে, বিধৃত হয় নাই। বাঙালি শিল্পীর এই চিত্রলোক সত্যই এক অনবদ্য সৃষ্টি।

শিল্পীর প্রাণ চায় মুক্তি। জীবিকার গ্লানি থেকে চিরকালের ছুটি।

সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী প্রাণ। মাঝে মাঝে কাজের তাগিদ আসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি সোজা হাঁকিয়ে দেন।

অবশেষে এলেন স্বয়ং আশুতোষ। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ।

আশুতোষ বললেন—অবনীবাবু, বছরে আপনি ছটি বক্তৃতা দেবেন, আমরা সকলে শুনে ধন্য হব, একে কি চাকরি বলে ?

অবনীন্দ্রনাথ উত্তর করলেন—ঐ যে মাস-মাইনে, ঐটেতেই তো ভয়।

তৎক্ষণাৎ আশুতোষের জবাব—মাইনে কোথায়, ও তো অর্ঘ।

অবনীন্দ্রনাথ ধরা দিলেন, সেই বন্ধনই হোল মুক্তি, শিল্প সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর চিন্তাধারা মুক্তিলাভ করল বাগেশ্বরী বক্তৃতার মধ্যে।

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের স্মরণে

অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের, তথা সমগ্র এশিয়ার আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পী—আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৫ ডিসেম্বর ১৯৫১ সালে স্বর্গারোহণ করেছেন,—নয় বৎসর গত হোলো, এখনও দেশের মানুষ দেখে সর্বশ্রেষ্ঠ কলাকৃৎ—ভারতের নবযুগের কলা-শিল্পীর পথিকৃত—একজন অলৌকিক প্রতিভাধর ওস্তাদ শিল্পী চিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে নাই। বিলাতের বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী টার্নারের মৃত্যুর অব্যবহি পরেই—জন রাসকিন্—টার্নারের চিত্রাবলীর বৈজ্ঞানিক সূচী নির্ম্মাণ করে—তাঁহার চিত্রের সমীচ সমালোচনার পথ সহজ করে দিলেন। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের তিরোধানের ৯ বৎসর পরেও—আম জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পীর চিত্রাবলীর সূচী নির্ম্মাণ করিতে পারি নাই। তাঁহার শ্রেষ্ঠচিত্রের উপযুক্ত রঙী প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়া—তাঁহার কলাকৃতির সঠিক সমালোচনার পথ সুগম করিতেও পারি নাই তাঁহার অলৌকিক বর্ণ-রচনা—মূল সত্তা প্রতিলিপিতে সমালোচকের চক্ষের সামনে উপস্থিত করা যায় ন বহু বৎসর পূর্ব্বে—তাঁহার কয়েকখানি চিত্র উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে মুদ্রিত রঙীন প্রতিলিপিতে প্রকাশি হইয়াছিল, কিন্তু এখন এইসব প্রতিলিপি পাওয়া যায় না। সুতরাং দেশের লোক দেশের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ চিত্ররচনার স্বাদ ও স্মৃতি ভুলিতে বসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিত্রের আংশিক প্রদর্শনী হয় বটে, কি স্বল্প-স্থায়ী কয়েকদিনের প্রদর্শনীতে—তাঁহার মৌলিক কলা-সৃষ্টির স্থায়ী ধারণার সৃষ্টি করা সম্ভব নয় রবীন্দ্র ভারতীর ভবনে অবনীন্দ্রনাথের স্থায়ী প্রদর্শনীর প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতায় স্থায়ী প্রদর্শনী ব্যবস্থা হইলেও তাহা সারা ভারতের রূপরসিকদের চাহিদা পূরণ করিতে পারিবে না। সুতরাং তাঁহ চিত্রাবলীর সহজ অনুশীলনের একমাত্র উপায় হইতেছে—তাঁহার কলা-শিল্পের নিখুঁত বৈজ্ঞানিক প্রতিলি প্রস্তুত করাইয়া—সারা পৃথিবীতে বিকীরণ করা। উৎকৃষ্ট প্রতিলিপির মারফত য়ুরোপের প্রাচীন আধুনিক ওস্তাদগণের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমরা অনায়াসে অনুশীলন ও সমালোচনা করিতে পারিতেছি। কি উৎকৃষ্ট প্রতিলিপির অভাবে—আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের চিত্তহারী রূপ-সৃষ্টির নমুনা দেশবাসীর নিকট "নি রূপ" হইয়া, টিনের পেটিকার মধ্যে কারারুদ্ধ আছে। আধুনিক রূপসাধকদের কোনও কাজে আসিতে না। তাঁহার চিত্রাবলীর প্রচার ও আস্বাদনের উদ্দেশে—"অবনীন্দ্র-পরিষৎ" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠি হইয়াছে—কিন্তু তাঁহারা এতাবৎ কাল আচার্য্যের সৃষ্টির যথাযথ প্রচারের কোনও ব্যবস্থাই করিতে পারে নাই। আচার্য্যের অনেক সুযোগ্য শিষ্য-প্রশিষ্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন—তাঁহারাও এবিষয়ে অনেকটা নিশ্চেষ্ট অলস।

আমাদের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর সৃষ্টিধারা বিস্মৃত হইয়া,—আমাদের বাঙ্গার সংস্কৃতির বড়াই ও আস্ফা একান্তই হাস্যাস্পদ।

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রেখে বাঙ্গার সাহিত্যিকরা ও

ফরাসী সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও মেলে না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও বর্তমান যুগের বাঙ্গালীর ও অবাঙ্গ দান মহনীয় এবং মহামূল্য। কিন্তু রূপচর্চার ক্ষেত্রে,—রূপ-সাধনার পথে আমাদের জাতীয় জীবন এ অনেকটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অন্যান্য সভ্যদেশে, রূপ-বিদ্যার চর্চা, রূপসৃষ্টির আদর, শিক্ষা ও সম একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে গৃহীত হয়েছে। কি আধুনিক, কি প্রাচীন দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির গ্রহণ করিবার শক্তি আমরা বহুদিন হারিয়ে বসেছি। তাহার ফলে দেশের চিত্র-শিল্প, স্থাপত্য ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমাদের মনে কোনও প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করিতে পারে না। কয়েকটি ঐতিহা কারণে ভারতে প্রাচীন শিল্পের ধারা উনিশ শতকের মাঝামাঝি শুদ্ধ হয়ে এসেছিল; এবং ইতিমধ্যে বি ইউরোপীয় শিল্পের মোহ আমাদের পরাধীন মনকে এমন আক্রান্ত ও আচ্ছন্ন করেছিল যে তার আমরা আমাদের প্রাচীন শিল্পের গৌরবের ইতিহাস একবারে বিস্মৃত হয়েছিলাম। ইতিমধ্যে, ইংর প্রভাব ভারতবাসীদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করিল যে ভারতের রূপসৃষ্টির প্রতিভা নাই। শিল্প ই গ্রাহ্য বস্তু, ইন্দ্রিয়-বিদ্বেষী ভারতের দর্শন-শাস্ত্র ভারতের রূপসৃষ্টির পথে বাধা রচনা করেছে। এ প্রাচীন ভারতে গ্রীক ও অন্যান্য যুগের কলা-সৃষ্টির তুলনার যোগ্য কোনও কলা-শিল্পের ইতিহাস ওঠেনি।

ভারতীয় রূপ-সাধনা ও রূপতত্ত্বের ইতিহাসের এই অলীক আরব্য-উপন্যাস আচার্য্য অবনী স্বীকার করে নিতে পারেন নাই। তাঁর মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারতের চিত্রসাধনার এ ঐতিহ্য অবশ্যই আছে—এবং প্রাচীন যুগের চিত্র-শিল্পের নমুনা কিছু না কিছু কোথাও বর্তমান আ সেই প্রাচীন নমুনা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধান পেলে, তাহাকে অবলম্বন করে নূতন যুগের উপ জাতীয় চিত্রপদ্ধতির সূত্রপাত করা সম্ভব হতে পারে। তিনি অনুসন্ধান করিতে সুরু করিলেন—এ ভারতের রেখা-রীতি কি জাতীয়, তাহার চরিত্র কি, তাহার ঐতিহ্য কি? মানুষ যাহা একান্তমনে ে তাহা নিশ্চয়ই লাভ করে। অনেক অনুসন্ধানের পর অবনীন্দ্রনাথ একখানা প্রাচীন চিত্র সমষ্টির গ্রা এল্‌বাম্ (মুরক্কা) পেলেন—তাহাতে অনেক প্রাচীন মুঘল "কলমে" লেখা ছবি ছিল। ছবিগুলির মারফৎ তিনি ভারতের মধ্যযুগের রেখা-রীতির পদ্ধতি ও ঐতিহ্যের সাক্ষাৎ পেলেন। রাজপুত শৈলীর কয়েকটি ছিন্ন চিত্র তাঁর হাতে পড়ল। ইহার মারফৎ অবনীন্দ্রনাথ হিন্দু চিত্রে প্রকৃতি কি তাহার পরিচয় পেলেন। এইরূপে তাঁর চোখের সামনে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রের ঐতি অনুশীলনের পথ প্রকাশিত হোল। ইতিমধ্যে ই, বি, হ্যাভেল্ মাদ্রাজ থেকে বদলি হয়ে কলিক সরকারী কলাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হলেন। হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ-ও প্রাচীন চিত্র-নি নানা নিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহ করিতে শুরু করিলেন। ভারতের গৌরবময় কলা সাধনার ঐতি ইতিহাস এইসব প্রাচীন নিদর্শনের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এইসব নানা নিদর্শন অনুশী বিশ্লেষণ করে, মধ্যযুগের ভারতের চিত্রলেখার ভাষা অবনীন্দ্রনাথ আয়ত্ত করে নিলেন, এবং সংকল্প ক যে এই প্রাচীন ভাষাকে তিনি নূতন পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যুরে শ্রেষ্ঠ কলা-সৃষ্টি থেকেও তাঁর উদ্দেশ্যের উপযোগী নানা উপাদান সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। পরে চীন ও জাপানের চিত্রাবলী অনুশীলন করে তা থেকে ভারতের নবীন পদ্ধতির চিত্ররচনার উপ উপকরণ ও শক্তি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার চিত্রিত রচনা আলোচনা—পর্যায় ও পদ্ধি

অনুকরণ বা পুনরাবর্তন নহে,—প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়ে তাহাকে ভিত্তি করে, নূতন প্র ভারতীয় চিত্রের জয়-যাত্রা।

এই নূতন পদ্ধতিতে চিত্রিত তাঁহার প্রথম চিত্র "শাজাহানের শেষ জীবন" ১৯০৩ সালে ল কার্জন সাহেবের দিল্লীর দরবারের প্রদর্শনীতে যেখান হোলো,—নানা কোলাহল ও গুঞ্জনের মধ্যে—চিত্রখা প্রথম পারিতোষিক লাভ করিল।

তারপরে, নবীন পদ্ধতিতে রচিত তাঁর কয়েকখানি চিত্র, "যক্ষমুকুট ও পদ্মাবতী", "মেঘদূত "বুদ্ধ ও সুজাতা", "অভিসারিকা" ইত্যাদি ছোট ছোট মিনিয়েচার্স—বিলাতের বিখ্যাত মাসিকপত্র "ষ্টুডিয়ো পাতায় রঙীন্ প্রতিলিপিতে প্রকাশিত হোল। এই প্রকাশের পর বিলাতের রসিক সমাজ ভারতে চিত্র-সাধনার এই নবীন উদ্বোধনকে প্রীতির চক্ষে অভিনন্দিত করিলেন। অনেকেই স্বীকার করিলে যে, য়ুরোপের রীতির অনুকরণে নহে,—বরং ভারতের নিজস্ব সত্যকে অনুসন্ধান করে—ভারতের নিজ আদর্শকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই—ভারতের প্রাচীন মুগ্ধ আধ্যাত্মিকতা নূতন যুগে, নূতন রূ আত্মপ্রকাশ করিবে, এবং সেই পথেই জাতীয় আত্মা, জাতীয় ঐতিহ্য সার্থকতা লাভ করিবে জাতীয়তার পুরোহিত অবনীন্দ্রনাথ—তাঁহার অলৌকিক চিত্রমালার মধ্য দিয়ে এই কথাই প্রচার ক দিয়েছেন। তাঁহার চিত্রসৃষ্টিতে ভারতের জাতীয় চিন্তা ও আধ্যাত্মিক আদর্শ নূতন রূপ নিয়ে বীণাপাণি হ রয়েছে।

কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে—আমাদের সমসাময়িক রূপসাধকরা—অবনীন্দ্রনাথের চিত্রবাদ স্পর্শ হারিয়ে—পশ্চিমে রীতির অনুকরণের পথে, বিপথে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ চিত্রবাদ স্থায়ী প্রদর্শনী ও উপযুক্ত উৎকৃষ্ট প্রতিলিপির মারফৎ—তাঁহার সাধনার "বাণী"—ব্যাপকরূপে প্রচারি হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এই সম্বন্ধে আমাদের সমাজের চিত্র-প্রেমীদের এবং জাতীয় সরকারের অনে কিছু কর্ত্তব্য আছে।

প্রাচীন শিল্প এবং সেই সব শিল্পে ওস্তাদ মানুষ সব থাকতে কি উপায়ে কোন রাস্তায় শিল্পকে অধিকার করা চলে তাই ভাবতে বসেছি আমরা, অথচ এই সহরের বুকেই শিল্পী-পাড়া সমস্ত বিদ্যমান, কাঁসারী পাড়া, পটুয়াটোলা, কুমোরটুলি, বাজপটি ইত্যাদি! ·····শিল্প শিক্ষাকে অধিকার করতে চাই তার বিষয়ে উপদেশ দেবার লোকের অভাব নেই। কিন্তু তাদের উপরে শ্রদ্ধাও নেই, বিশ্বাসও নেই এমন আমাদের যে তাদের প্রথাও শিক্ষা-প্রণালীকে আধুনিক শিল্প-শিক্ষালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্থান দিই।

—অবনীন্দ্রনাথ

প্রার্থনারত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৮৯০)
শিল্পী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র

এ শতকের প্রথমদিকে যে নব্য ভারতশিল্পের সূত্রপাত হয়, সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা হি গগনেন্দ্রনাথের নাম আজ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। অথচ যে আদর্শবাদ থেকে এই শিল্প আন্দো শুরু, শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ ও শিল্পসৃষ্টি তা থেকে এতো বিভিন্ন যে এই আন্দোলনের মধ্যে উপস্থিতি সত্যই বিস্ময়কর। প্রকৃতপক্ষে সেদিনের সেই আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে যে উদ্দীপনার হয়েছিলো, সেই কোলাহলের মধ্যে শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের নামও তালিকাভুক্ত হয়েছিলো। এখনো তাঁকে আমরা সেই আন্দোলনের অন্যতম নিয়ন্ত্রণী হিসেবেই সম্মান দিয়ে এসেছি, তাঁর একাকীত্ব ও স্বাত ঐশ্বর্য আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে গিয়েছে।

আজকের দিনে কোন শিল্পীর পক্ষে পথ নির্বাচনের সমস্যা অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ তার সামনে রয়েছে বিভিন্ন পথের সুস্পষ্ট পরিচয়। কিন্তু সেই যুগে একদিকে ফ্রান্সেল-পূর্ব সরকারী শিল্পপদ্ধতি একদিকে নব্যভারতীয় শিল্পধারার পরীক্ষণ অবস্থা, এই দুইয়ের মধ্যেই ভারতীয় শিল্পশিক্ষার্থীকে পথ নি করে নিতে হতো। এই দ্বিতীয় পথের মধ্যেই ভারতীয় শিল্পীর লক্ষ্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা আছে সিদ্ধান্তে গগনেন্দ্রনাথও পৌঁছেছিলেন। কিন্তু সেদিনের নব্যভারতশিল্পের রাজপ্রাসাদ রচনায় তাঁর আমা শুধু কর্মী হিসেবেই। তাঁর শিল্পের মহল সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র এবং সেখানে তিনি একান্তভাবে নিজস্ব শিল্পরচনাকে কোনভাবেই কোন মতবাদে বন্দী করা চলে না।

গগনেন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পের প্রাথমিক সাধনার সূত্রপাত নিজের অনুনিহিত তাগিদে। পেন কলম অথবা তুলি দিয়ে আঁকাজোকা করতে তার ভালো লাগতো। চোখের সামনে যা কিছু প্রাণময় মনে হয়েছে, তাকে রেখা দিয়ে ধরে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু জাপানী শিল্পী টাইকানও আরাই যখন কোল পরিভ্রমণে এলেন, তাঁদের ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায় তাঁর শিল্পীচিত্ত এক নতুন রূপে বাঙ্ময় সন্ধান পেলো। সময় থেকেই গগনেন্দ্রনাথের প্রকৃত শিল্পীজীবনের শুরু। জাপানী প্রথায় তুলি ও কালো রঙ, ব্যবহারের তিনি রূপ প্রকাশের এক নতুন ইঙ্গিত পেলেন। কালো রঙের বিস্তারের মধ্যে দিয়ে যে বিভিন্ন বর্ণ সৃষ্টি হয় তার আবেদন এত বিচিত্র ও সূক্ষ্ম, এই পদ্ধতির মধ্যেই শিল্পসৃষ্টি এক নতুন রহস্যের সন্ধান উন্মোচিত হয়ে উঠলো। কিন্তু প্রকৃত প্রতিভার লক্ষণ প্রভাবের দ্বারা ভারাক্রান্ত হওয়া নয়, তাকে ঐশ্বর্যে রূপান্তরিত করা। এই সময়ে গগনেন্দ্রনাথের অনেক রচনাই জাপানী শৈলাশ্রয়ী, অথচ নিজস্ব পা ও ভাবাবেগে তা একান্তভাবে স্বকীয় সৃষ্টির ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। এই সময়ের নিসর্গচিত্র, রবীন্দ্রনাথের জীবন চিত্র ও চৈতন্য চিত্রাবলী থেকে তাঁর দৃষ্টির বিশিষ্টতা ধরা পড়বে।

সমকালীন শিল্পীদের রচনা থেকে তাঁর শিল্প রচনার পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যদিও রেখাই ছবির প্রধান আশ্রয়, কিন্তু রচনার মেজাজ কোনক্রমেই অজন্তা, মোগল চিত্রকলা অথবা ভারতীয় ভা

তাঁর শিল্পী মানস দুটি সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত ছিল। একদিকে মোহমুক্ত বাস্তব অনুভব তাঁর রূপসৃষ্টিকে বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর একদিকে এক নিগূঢ় রোমান্টিক চেতনা এক অদৃষ্ট রূপলোক উদ্ঘাটিত করেছে। প্রথম যুগের চিত্রাবলী শিল্পীর বাস্তব চেতনারই চিত্ররূপায়ণ। দ্বিতীয় পর্যায়ের চিত্রে প্রথম পদক্ষেপ দেখা গিল কিউবিজম্ আশ্রয়ী চিত্র রচনার মধ্যে দিয়ে। আমাদের দেশে সাধারণ শিল্পরসি কাছে এখনো পর্যন্ত তিনি ভারতশিল্পে কিউবিজমের প্রবর্তক হিসেবেই পরিচিত। অথচ যে মানসিকতা সুদূর বিদেশী শৈলীর মধ্যে আত্মপ্রকাশের প্রেরণা অনুভব করেছিল তার রহস্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা একে অচেতন এবং য়ুরোপীয় শিল্পে কিউবিজমের উদ্ভব ও শিল্পপ্রয়োগ রীতির সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের কিউবিজম আ রচনার যে মূলগত পার্থক্য সে সম্বন্ধেও আমাদের অজ্ঞতা আশ্চর্যজনক।

য়ুরোপীয় শিল্পে রিনেসাঁস থেকে যে শিল্পপদ্ধতির উদ্ভব তার মূলকথা হলো দৃশ্যবস্তুকে যথাযথ ভাবে দেওয়া। এইভাবেই সুদীর্ঘকাল ধরে শিল্পীরা বস্তুর ও প্রকৃতির যথাস্থিত অবয়বটি ধরবার সাধনায় আত্মনি করেছিলেন। অবশেষে গত শতাব্দীর শেষের দিকে এসে এ সাধনার নৌকা চড়ায় ঠেকে গেল। যখ চোখকে ফাঁকি দেবার মধ্যে যে শিল্পের উৎকর্ষ ও সার্থকতা নেই এই সত্য উপলব্ধি করে অনেক শিল্পী উঠলেন। নতুন করে নবনতত্ত্ব আবিষ্কৃত হতে শুরু চলো। সেই নব্য আবিষ্কারের একটা দিক গেলো ত্রিকোণবাদ বা কিউবিজম্ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। এদের মতে দৃশ্যমান বস্তুজগৎ কর্ম বা গ দিক থেকে কতগুলি ত্রিকোণের সমষ্টি। মানুষ, পশু, প্রাণী, ঘর, বাড়ী, পাহাড় সব কিছুই এই ত্রি গঠনের আধারে ব্যক্ত। নতুন দৃষ্টিকোণ হিসেবে এই তত্ত্বের মধ্যে অভিনবত্ব আছে সন্দেহ নেই। শিল্প যখন তত্ত্ব ছেড়ে তথ্যের মধ্যে এলো তখন দেখা গেল বস্তুরূপের বহিরঙ্গের দিক একেবারেই অব এবং শিল্পীর বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বস্তুরূপ নিছক জ্যামিতিক প্যাটার্ণ সৃষ্টিতে পর্যবসিত হয়েছে।

গগনেন্দ্রনাথ যখন তাঁর শিল্পে ত্রিকোণবাদের সাহায্য নিলেন তখন তাঁর দৃষ্টি কোনক্রমেই বি নয়। য়ুরোপীয় কিউবিজমের মধ্যে প্যাটার্ণ সৃষ্টির যে ইঙ্গিত আছে, সেইটুকু তিনি তাঁর শিল্পে অ দিলেন। অথচ সে প্যাটার্ণ-সৃষ্টিও গাঠনিক (fromal) নয়। আলোছায়ার রহস্যে ও মনস্তাত্ত্বিক মূলে গত বিচিত্র। বস্তুতঃ এই প্যাটার্ণ সৃষ্টির রহস্যই গগনেন্দ্রনাথকে কিউবিজমের দিকে আকৃষ্ট করেছিলো। ধনিষ্ঠভাবে দেখলেই ধরা পড়বে শিল্পরচনার অন্যতম সৌকর্য রয়েছে প্যাটার্ণ সৃষ্টির মধ্যে। কবিতার মাত্রা ও ধ্বনির মূলেও এই প্যাটার্ণ সৃষ্টির বাসনা। চিত্রশিল্পে প্যাটার্ণের উদ্ভব রেখা ও রঙের নি অন্তর্বৃত্তিতে যার উদ্দেশ্য একটা সমতাল সৃষ্টি এবং তার মধ্যেই আমাদের সৌন্দর্যবোধ একটা বিশেষ তৃপ্তি পায়

গগনেন্দ্রনাথের রচনায় ত্রিকোণবাদের একটি বিশেষ পরিণতি লক্ষ্য করা গেল পরবর্তীকা কিউবিজমের একটা অদৃশ্য ছায়া তাঁর রচনায় থেকে গেলেও সব চিত্র যেন আলোর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত উঠলো। এ আলো রেমব্রান্টের মতো অন্ধকার পটে আংশিক বিচ্ছুরিত দ্যুতি নয় যা দৃশ্যবস্তুর এ অংশকেই জ্যোতির্ময় করেছে। গগনেন্দ্রনাথের হাতে এ আলো অনেকটা অনৈসর্গিক চিত্রপট—আলো রঙের খেলায় বহুবিচিত্র মূলকারী। এর মধ্যে যেটুকু ঘটনা ও বিষয়ের সমাবেশ হয়েছে তা এই আলো বর্ণের প্যাটার্ণ সৃষ্টির আশ্রয় হিসেবে এসেছে। ফলে বাস্তব ও কল্পনার এমন অভূতপূর্ব যোগাযোগ আ যার অভিনবত্ব কোন শিল্পের ইতিহাসেই লক্ষ্য করা যায় নি। এটা ঠিক শিল্পীচিত্তের খেয়ালী কল্পনা মনের গভীরে যে উপলব্ধি একটা রূপ পরিগ্রহ করে, অথচ বাস্তব জগতের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ নেই।

মনোজগৎ নয়, বা অবচেতন মনের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে নির্ভরশীল অথবা ইংরেজশিল্পী ব্লেকের ৷ কল্পনার অদ্ভুত উল্লাস নয়। গগনেন্দ্রনাথের এ জগৎ সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র—কৈশোরকল্পনার পরীর দে সৌরভে ব্যাপ্ত।

গগনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা প্রথমেই স্মরণে রাখা প্রয়োজন তিনি একান্তভাবেই মুক্ত শিল্পী। মুক্ত শিল্পী তিনিই যাঁকে কোন ক্রমেই কোন দল অথবা মতবা মধ্যে আবদ্ধ করা চলে না। আমাদের শিল্প ইতিহাসের যে উত্তেজনার মুহূর্তে গগনেন্দ্রনাথের ৷ জীবনের সূত্রপাত, অনিবার্যভাবে সেই বেগাব তাঁর ভাসা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর শিল্পপ্রেরণা একান্তভা ব্যক্তিকৈন্দ্রিক, কোন দল অথবা মতবাদের জালে আবদ্ধ হবার মতো মানসিকতা তার নয়। কারণে নব্য ভারতীয় শিল্পআন্দোলনের মধ্যে থেকেও তিনি চিত্রে ভারতীয়তার পুনরুজ্জীবনের : মোহগ্রস্ত হননি। আবার চিত্রে ত্রিকোণবাদ আমদানীর মধ্যেও য়ুরোপীয় ত্রিকোণবাদীদের জ্যামি গঠনের নিগূঢ় গোঁড়ামি তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর দৃষ্টিকোণ বিশুদ্ধ ত্রিকোণবাদীদের দৃষ্টিকোণ ৫ বিপরীত ভাবে কাজ করেছে। চিত্রে গঠনের অমূর্ততার আমদানিই ত্রিকোণবাদীদের প্রাথ লক্ষ্য। কিন্তু রূপসৃষ্টির এই উদ্দেশ্য গগনেন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেনি। তাঁর লক্ষ্য এক প্যাটার্নসৃষ্টি এবং প্যাটার্নের মধ্যে এক স্পর্শাতীত ও রোমান্টিক ভাবজগৎ রচনা। বস্তুত গগনেন্দ্রনাথের রোমান্টিক শিল্প এটি আর একটি অধ্যায়। প্রথম যুগে জাপানী শৈলীর সংস্পর্শে এসে রঙ্ বিস্তারের মধ্যে তিনি যে ৫ জগতের সন্ধান পেলেন তার পরিচয় আছে বিভিন্ন দৃশ্যচিত্র ও চৈতন্য চিত্রাবলীতে। গগনেন্দ্রনাথের ব সমগ্র প্রকৃতি ও প্রাণীজগৎ কল্পনার কোমল আভায় আবৃত। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে চীনা শিল্পীর গভীর বিস্ময় ব্যঞ্জনা নেই, অথবা য়ুরোপীয় শিল্পের নাটকীয় উত্তেজনা নেই। গগনেন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতির ৫ পরিবেশ একান্ত নিরাসক্ত, কোমল ও স্বপ্নময়। এই প্রথম যুগের রচনা মূলতঃ রেখাধর্মী কিন্তু পরবর্তী যখন রোমান্টিক কল্পনাবিলাস রেখাকে অতিক্রম করে আলোছায়ার বিচিত্র ও বিপরীত উৎসবের আশ্রয় গ্রহণ করেছে তখন অনিবার্যভাবেই তাঁর শিল্প স্বপ্নজগতের সন্ধান দিয়েছে।

গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের রোমান্টিক আবেদন ও তদনুসঙ্গী রীতি-পদ্ধতি পরবর্তীকালে চিত্রগঠনে বি শিথিলতা এনে দিলেও তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি কল্পনাবিলাসের সুস্থতায় ও রহস্যে এক অপূর্ব রূপজগৎ সন্ধান দিয়েছে। তার দৃষ্টির মধ্যে যে অগ্রগামীতা ছিলো সেই দৃষ্টিই তাঁকে স্বদেশ ও বিদেশের ন পথে পথে আকর্ষণ করেছে। শিল্পের মধ্যে দিয়ে বিশুদ্ধ ভারতীয়তার আমদানি এই ছিল নব্য ভারত আন্দোলনের আদর্শবাদ। গগনেন্দ্রনাথ বিশ্বের বিভিন্ন শিল্পপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করে এলেও তাঁর প্রতিভার বিশেষত্বে যে পুরোপুরি ভারতীয় এইখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

——

অবনীন্দ্রনাথ

চিত্রকলায় নবযুগের স্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথ। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাংলা যখন ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও জাতীয় ঐতিহ্যক্ষেত্রে নবযুগের তপস্যায় রত তখন অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাব শিল্পিগুরু রূপে। তাঁর বিরাট প্রতিভার আলোকে শিল্পের নবনব দিগন্ত উদ্ভাসিত।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট জন্মাষ্টমী তিথিতে অবনীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে তখন সংস্কৃতির চর্চা চলেছে বিপুল উদ্যমে। তিনি সেই সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার মধ্যেই লালিত হন। তিনি ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় সন্তান। প্রথমে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে তিনি যোগদান করেন, পরে স্যুযে শিল্পচর্চা করেন। মিষ্টার পামার ও বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী সিনর গিলহার্ডির কাছে ইউরোপীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষা।

অকস্মাৎ জীবনে একদিন এল পরিবর্তনের পালা।

ঠাকুর পরিবারের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে বসে সেদিন তিনি বইপত্তরের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন, হঠাৎ হাতে এল প্রাচীন ইরো-পারসীক পুঁথি, কী সুচারুরূপে চিত্রিত, কী বর্ণাঢ্য তার অলঙ্করণ, মুগ্ধ হয়ে গেলেন অবনীন্দ্রনাথ, তাঁর সুপ্ত কল্পনা জেগে উঠল, তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক চিত্রাবলী সৃষ্টিতে মগ্ন হলেন। ইউরোপীয় শিল্পের ছাত্র কোথায় হারিয়ে গেল, দেখা দিল চিত্রকলার নবীন স্রষ্টা, বিধাতা তাঁর হাতে সৃষ্টির তুলি তুলে দিলেন।

তখন তিনি তেইশ বৎসরের যুবক।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নিঃসঙ্গ সাধক দেখা পেলেন এক সহমর্মীর—ই. বি. হ্যাভেলের মধ্যে তিনি পেলেন সমবয়সী সহযোগী এক শিল্পীকে, দুজনে একত্রে ভারতীয় চিত্রকলার নবযুগের উন্মেষ সাধনে ব্রতী হলেন।

এতদিন তিনি ছিলেন নিভৃতে, এবার এলেন দেশবাসীর সমুখে। এতকালকার দিল্লী-শৈলী, পাটনা শৈলী ইত্যাদি নামে পরিচিত দেশী চিত্রকলার গতানুগতিক ধারা চলে আসছিল, শিল্পীরা বাঁধা নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ, কারিগরী সুলভ শিল্পচর্চার ফলে চিত্রকলার মান অবনত, এক কথায় শিল্পক্ষেত্রে চলছিল এক অরাজক অধ্যায়। অন্যদিকে ইউরোপীয় শিল্পকলার তখন অনুসরণ ছিল না, ছিল নিকৃষ্ট অনুকরণ।

অবনীন্দ্রনাথ এলেন অসামান্য প্রতিভার দ্যুতি নিয়ে, চিত্রকলার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় সংযুক্ত হোল। ভারতীয় চিত্রের নব জন্মদাতারূপে তিনি প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। পরিচিত হলেন প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার একজন নব্য পুরোহিতরূপে, ভারত শিল্পের পথিকৃৎ রূপে।

কিন্তু তাঁর এই পরিচয় সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ আছে।

স্বদেশী যুগে এই কথাটাই তাঁর সম্বন্ধে বড় হয়ে উঠেছিল যে তিনি স্বদেশী শিল্পী, ভারতীয় চিত্রে পুনরুদ্ধার তাঁরই হাতেও কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় তা নয়। তাঁর লক্ষ্য ছিল মৌলিক সৃষ্টির দিকে অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করে ভাবজগৎকে শিল্পে বিধৃত করতে চেয়েছিলেন তিনি, কোন কিছু উদ্ধার করার দিকে তাঁর প্রবণতা ছিল না। 'ছবিতে ভাব দিতে হবে'—এ ছিল তাঁরনবনবোন্মেষশালিনী স্বদেশী ছবি

আলংকারিক কাঠামো আর বিদেশী ছবির নিছক বাস্তবতা দুই-ই তাঁর ছবিতে বিস্ময়কর প্রতিভাবলে হয়ে এক অভিনব রূপের জন্ম দিল। আধুনিক চিত্রকলার সূচনা হোল তাঁর তুলিতে।

শিল্পক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কোন অঙ্কনরীতির অনুসরণ আবার কোন অঙ্কনরীতির প্রবর্তকও নন, আসলে তিনি একজন মৌলিক গুণলক্ষণাক্রান্ত শিল্পী, মহৎ প্রথম শ্রেণীর স্টাইলিস্ট। চিত্রে তাঁর স্টাইল ফুটে উঠেছে অঙ্কনভঙ্গীর দ্বারা নয়—মনোভঙ্গীর দ্বারা। তিনি রচনা করেছেন কবিতা—এখানের যা সুর তা হোল গীতিকাব্যের—মন্ময়, রহস্যময়, সুস্নিগ্ধ। চিত্রের বর্ণপ্রলেপ অত্যন্ত কোমল, সুষমামণ্ডিত।

আধুনিকতার নামে বাস্তবতা বা জ্যামিতিক মার-প্যাচ, চড়া রঙ, প্রখর রৈখিকতা বা যে ইজম তাঁকে তাঁর মৌলিক সাধনক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। বাইরের শিল্পকৌশলের বহু উপেক্ষা করে অন্তরের আলোর পথ চলেছেন তিনি। তাঁর নিজের কথায়—"সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সৃষ্টির অভিমিস্টি দৃষ্টি, এই হল আর্টিস্টের ভাবুকের রূপ সাধনার প্রথা প্রকরণ। চোখ বুজে ধ্যান নয়, স্বপ্ন নয়, সৃষ্টি সাধনায় বলীয়ান শিল্পী রূপরাজ্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করে সন্ধানে চলে গেল অ যেখানে রূপেরই প্রদীপ রূপের চাকনের মধ্যে জ্বলছে। সেখান থেকে নতুনতর দেখা নতুনতর শোনা এসে পৌঁছলেন শিল্পী যখন, তখনই ঠিক ভাবে পেলাম রূপের পাত্রে রূপাতীত রস—চিত্রে আলো আলোর ছন্দ ছলিয়ে দিলে প্রাণ, সঙ্গীতে সুর মিলল সুরাতীতের রেশটুকুতে, নর্তক থেমিয়ে গেল চল কোন সে অপরূপ দেশে যুগল তারার কাছে গিয়ে ঠেকেছে। রূপসাধনা থেকে রূপমুক্তির সাধনা পর্য দীর্ঘ পথ হল শিল্পীর সিদ্ধিলাভের পথ, নাস্ত পন্থাঃ!"

এই পথেই তিনি সাধনা করে গেছেন এবং সিদ্ধিলাভ করেছেন। নবরূপায়ণের ইতিহাসে অবনী এক অসাধারণ ও অবিস্মরণীয় প্রতিভা।

রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনীতে তাঁর যথার্থ পরিচয় উদ্ভাসিত—"আমার জীবনের প্রান্তভাগে মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেয়া যেতে পারে, তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্র নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন, তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলার আত্ম-উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর থেকে শিক্ষা-দান গ্রহণ করেছে। এঁকে যদি আজ দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে ইঁ থাকে, বিদেশী খ্যাতিমানদের জয়ঘোষণায় আত্মাবমান স্বীকার করে নেয়, তবে এই যুগের চরম কর্তব্য বাঙালী ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাঙলা দেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে ব করি।"

(১৩ই জুলাই ১

অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-মালার কোন উল্লেখযোগ্য চিত্রপঞ্জী ও তালিকা আজও তৈরী হয়নি। জীবনে তিনি যে কত চিত্র এঁকেছেন তার পরিমাপ এখনো হয়নি। বহু চিত্র এখনো প্রকাশের অপে তাঁর প্রকাশিত চিত্রের মধ্যে বিখ্যাত হোল 'ভারতমাতা', 'শাজাহানের শেষ জীবন', 'অশোকের 'শাজাহানের তাজনির্মাণের স্বপ্ন', 'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'আলমগীর', 'অভিসারিকা' প্রভৃতি।

'মেঘদূত' অবলম্বনে তিনি কয়েকটি ছোট ছোট ছবি আঁকেন। কালিদাসের 'ঋতু সংহার'-এর চিত্রণ তাঁর শিল্পীজীবনের শৈশবকল্পনা। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' ও 'চন্দ্রকলা' এই দুই কাব্যগ্রন্থের জন্য তি কয়েকটি চিত্র রচনা করেন। হট ও কোনর সাহেবের 'গার্ল অফ কাশ্মীর' গ্রন্থের জন্য তিনি ছয়খানি ছ আঁকেন। যদিও তিনি কাশ্মীর যাননি তবু ধ্যানদৃষ্টিতে কাশ্মীরের যে রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা অপূ এরপর তিনি ওমর খৈয়াম রচিত "রোবাইয়াৎ"-এর চিত্রায়ন করেন। তারপরে 'বাংলার রূপকথা' ও 'আর উপন্যাসের' চিত্রাবলীতে তাঁর অলৌকিক কল্পনাশক্তি ও আঙ্গিকের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়।

শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে শিল্পের নিগূঢ় তত্ত্বও প্রকাশিত। তিনি শুধু শিল্পী নন, তি ছিলেন শিল্পজ্ঞানী। শিল্পশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। এজন্যই তিনি শিল্পশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী গুণীদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর একটি গ্রন্থ—'ভারতশিল্প'। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে—বাংলার ব্রত ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় 'ভারত ষড়ঙ্গ' ও 'ষড়ঙ্গ দর্শন'। বাংলা ১৩৫৪ সালের বৈশা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ'। গ্রন্থ মধ্যে প্রকাশের বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছে—'চীন ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা অবনীন্দ্রনাথই প্রথম করেন এবং এক্ষেত্রে এ আলোচনাই এখনো অদ্বিতীয় হইয়া আছে।' ১৩৫৩ সালের জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত হয় 'ভারতশিল্পে মূর্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্র বাগেশ্বরী' অধ্যাপকরূপে তিনি যে সব বক্তৃতা দান করেছিলেন তা একত্রিত করে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয় 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' এরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'শিল্পায়ন'। (চৈত্র ১৩৬১ সালে প্রকাশিত)

আচার্য অবনীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে দেশবাসীর যথার্থ শ্রদ্ধা এখনো নিবেদিত হয়নি। ভারতের যে শিল্প আমরা বিস্মৃত হয়েছি। তাঁর পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থে আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে। তাঁ বিরাট সৃষ্টিসম্ভার উদ্ধার করতে হবে, প্রকাশ করতে হবে, তার মর্মগ্রহণ করতে হবে। তাঁর আ সৃষ্টিমালা সর্বজন প্রদর্শনযোগ্য করার জন্যে স্থাপন করতে হবে আর্টগ্যালারী—অবনীন্দ্র চিত্র-সংগ্রহাগা সে সংগ্রহালয় পরিগণিত হবে পবিত্র শিল্পতীর্থরূপে যেখানে কেবল মাত্র বাংলার নয়, ভারতের নয়, পর সারা বিশ্বের শিল্পরসিকবৃন্দ শ্রদ্ধাসহকারে প্রবেশ করবেন এক অপরূপ আনন্দলোকের পরিচয় লাভ করতে

—পঞ্চানন সিংহ

১৯২১ সালের একটি অপরূপ স্মৃতি—কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি প্রাচীরকার কক্ষ, উৎসুক শ্রোতার দল নিঃসঙ্গে শুনছেন এক শিল্পীর ভাষণ, শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর আশুতোষ। চলতি কথার ফুলুরে গাঁথা হয়ে চলেছে এক শিল্প প্রবন্ধ মালা—সমগ্র বাংলা সাহিত্যে যার জুড়ি নেই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাগেশ্বরী অধ্যাপক অবনীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিচ্ছেন, পরে তাই একত্র করে প্রকাশিত হয় 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'।

একপোঁছ হাসি

পারস্যের কোন এক শাহ্ এসেছেন লণ্ডনের একটি ইুডিয়োতে। একটি গাধার ছবি ে. হবেন।

—"এর দাম কত?" শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

—"হাজার পাউণ্ড"—উত্তর দিলেন শিল্পী।

—"হায় খোদা! আমি দেখছি তুমি নিজেই একটি গাধা। তা' না হলে এত গাধার ছবি এমন অসম্ভব দাম চাইছ? আরে, আমাদের দেশে এক পাউণ্ড দিলে একটা আসল গাধা কেনা যায়!

• • • • •

ছেলেরা তাদের মৃত বাপের ছবি আঁকতে দিয়েছেন কোন শিল্পীকে। ছবি শেষ করে শিল্পী নিয়ে এলেন ছেলেদের কাছে।

বড় ছেলে বললে—"বাবার আসল রং কিন্তু এত ফোরসা ছিল না।"

মেজো ছেলে বললে—"বাবার মুখও কিন্তু অত কর্কশভাবের নয়।"

ছোট ছেলে বললে—"ছবিতে যে দাগ দেখছি, ওরকম দাগ ত বাবার মুখে ছিল না।"

বেচারা চিত্রকর এ সব কথা শুনে কি আর বলবে? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে "ভগবানকে ধন্যবাদ। আপনাদের মধ্যে কেউ তো একথা বললেন না যে আপনার বাবার গা দিয়ে এখন তিসির তেলের গন্ধ বেরোয় নি।"

• • • • •

বুশ্রাপ্যা ছবির দোকানে গিয়ে এক ভদ্রলোক বিক্রেতাকে প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা, এ ছবির দাম কত?"

—"আড়াই হাজার টাকা মশাই।"

এই কথা শুনে কিছু না বলেই তিনি দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ক'দিন পরে আবার তিনি এলেন সেই দোকানে। দাম জিজ্ঞাসা করলেন সেই ছবিটার।

—"আজ্ঞে, দু'হাজার দু'শ টাকা!"—উত্তর দিল দোকানদার।

—"হুঁ' ভগবান, এবে দেখছি ঠিক গলাকাটার মতলব। ক'দিন আগে তুমিই না একশে কম চেয়েছিলে?"

—"আজ্ঞে মশাই, দেখলেন না ছবিটার বুকের দিকটা খুলে পড়াতে এখন একটা ছাতার দেওয়া হয়েছে। ঐ জন্যেই ত দামটা বেড়ে গেছে। আপনি ত জানেন, ছবি যত পুরানো আর তা হবে ততই তার দাম বাড়বে।

—"বটে! তবে নিয়ে এসত বাপু তোমার ছবিখানা একবার আমার কাছে। যা' করব বেরে ছবিটাকে আরও ভাঙাচোরা করে দি, যাতে তুমি এর দাম সাতটাকা পেতে পার।"—কথাটা ভদ্রলোক ক্রোধে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সম্পূর্ণ ঠিকানা-
দ্রুততর বিলি

আপনাদের চিঠির যে অংশটিকে আমরা সব চাইতে প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, সেই ঠিকানার অংশেই যেন আপনারা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হন, তখন আপনারা আমাদের হয়রানি করে যেন ঠিকানা সম্পূর্ণ থাকলে, চিঠিপত্র দ্রুতই হাতের পথ — এমনকি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পথ—যেয়ে।

নির্দিষ্ট স্থানে সোজাসুজি পৌঁছুবার জন্য আপনাদের চিঠিতে পরিষ্কার ও সম্পূর্ণ ঠিকানা থাকা প্রয়োজন।

আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন

ডাক ও তার বিভাগ